



আপনার
হাসিত দেহক
ভারতীয় সিল্ক
আপকৃপ কার
তুলুন

ফোন • বি.বি. ৪১১

হাইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

সাহিত্য-সমালোচনা	
ঐনোহিতলাল বসুদেব	কবি জীবনচরিত্র ৮১
	বক্তিত-বসুদে ৬১
	বক্তিতচরিত্র উপন্যাস (২য় খণ্ড) ৮১
	রবি-প্রকৃতি ৬১
	জীবনচরিত্র ৮১
	সাহিত্য-বিভাগ (২য় খণ্ড) ৮১
	বাংলা কবিতার ছন্দ (২য় খণ্ড) ৬১
	কাব্য
ঐনোহিতলাল বসুদেব	অপম-পলাশী (২য় খণ্ড) ৬১
	অমর-পলাশী (২য় খণ্ড) ৬১
	একম
ঐনোহিতলাল বসুদেব	জীবন-জিজ্ঞাসা ৬১
ঐনোহিতলাল বসুদেব	বিভিন্ন-উপল ৬১
	অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান
৮৬৪ বটক বোম	স্বাস্থ্য-বাক ৬১
ঐনোহিতলাল বসুদেব	পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ৬১
ঐনোহিতলাল বসুদেব	ভারতের অর্থনীতি ৬১
	জীবনী
ঐনোহিতলাল বসুদেব	চিত্র-চিত্র ৬১
এমিল ল্যাউগ	ট্যান্ডেম ৬১
	গল্প
ঐনোহিতলাল বসুদেব	আলোক ৬১
ঐনোহিতলাল বসুদেব	সমাজ ৬১

স্বকল্পিত প্রকল্পিত

প্রথম-মূল্যায়ন; পোট-বহিঃস্থ; জেলা-হাওড়া।

MRS. P. DEVEE'S (F.D.S.)

—কুমারী—

(Tablets.)

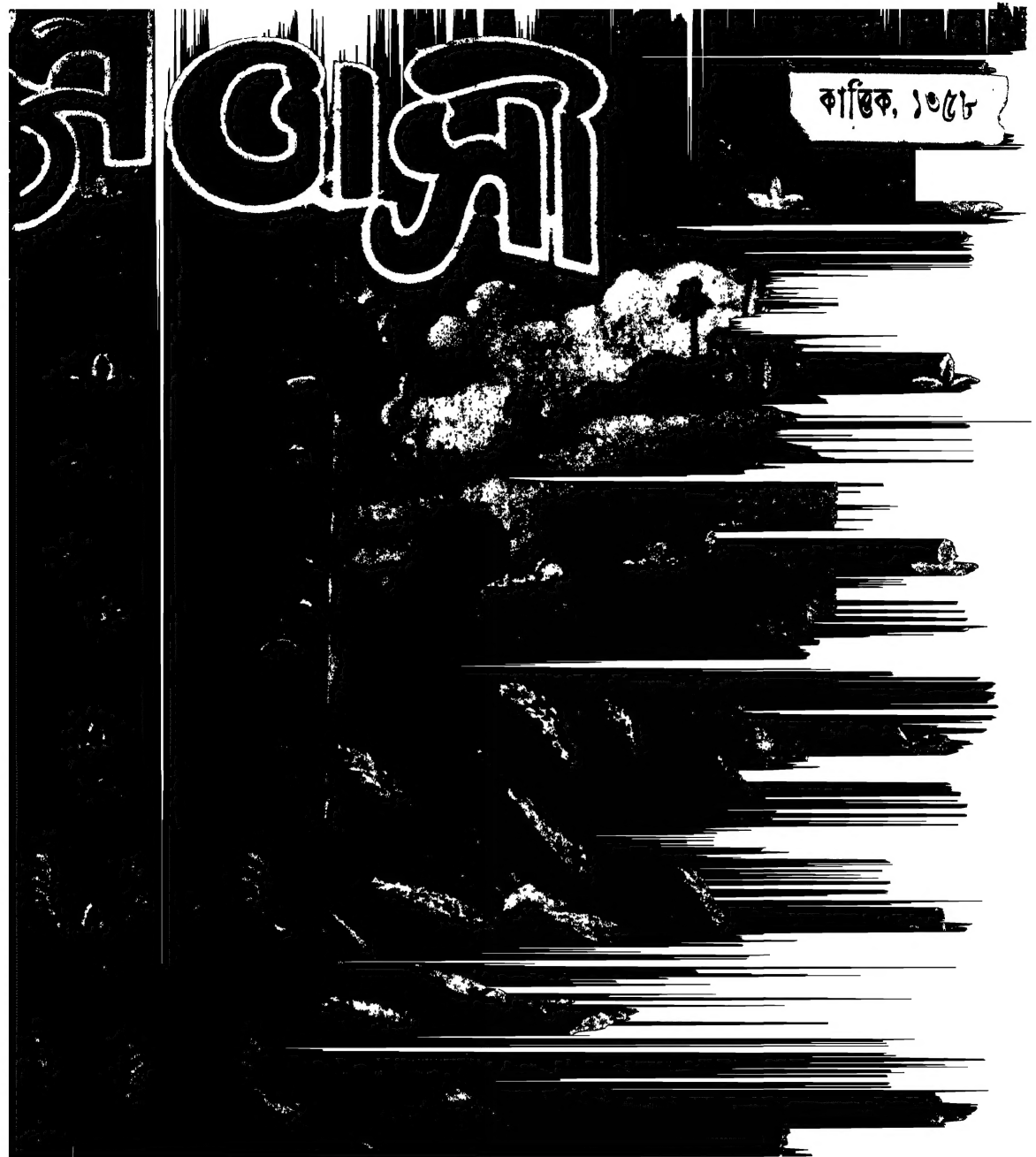


কুলসম্প্রদায় সাধারণতঃ বাসের পর বাস যে সব উপসর্গাদির জন্য নানাবিধ কষ্টভোগ করে থাকেন আর সকল অবস্থাতেই এরোজন বোধে ব্যবহার্য। হাজার হাজার রোগে পরীক্ষিত এবং ভাঙারণ কর্তৃক প্রমাণিত সম্পূর্ণ নির্দোষ ঔষধ। বর্ডাল ৬, পোটাল ৬, ও একটা পোটাল ৬, (জি পি: বক্তিত)। বড় বড় ভাঙারণকারী প্রাপ্য।

একমাত্র পরিবেশক—পি, ডেভী এন্ড কোং, কলিকাতা—৩৩

হানীর টকিট—এল, এন, হুগানী এন্ড সন সিবিটে, ১৩৭, বর্ডাল স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

প্রথিতবশা লেখিকা শ্রীশাভা দেবীর
নতুন গল্পের বই পটখর দেখা—মূল্য ১০
দেবদাসের আড়াল ২০
প্রথম উপন্যাস আলম কোরা—মূল্য ৬
সিঁথির সিঁথর—মূল্য ২
শ্রীশাভা দেবী ও শ্রীশাভা দেবীর স্ববিখ্যাত গল্পের বই
হিন্দুস্থানী উপকথা (সচিত্র) মূল্য ৬
শিওপাঠা সচিত্র সাভরাভার ধন—মূল্য ২
প্রাণিহীন—পি ২৬, রাজা বসন্ত দাস রোড, কলিকাতা।
মর্ডা বুক এক্সেল—১০৭ কলেজ কোয়ার্টার এবং
কল্যাণ বুক ডিপো—১০৬ বক্তিত চাটাজী স্ট্রীট, কলিকাতা।



কাঙ্ক্ষিক, ১৩৫৮

কমল আনন্দের
কোমল প্রসাদ

মীরা শো

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

রামায়ণ (সচিত্র) ৮৭১মানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১০০

সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ—

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১০

সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ

১০

চাটাজির পিকচার এলবাম ১—১৭

(১—২ নাই, ১০—১৭ আছে) প্রত্যেক সংখ্যা ৪৮

উষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)— ঐ

২৮

সোনার খাঁচা— শ্রীসীতা দেবী

২৪০

আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ

১৮

বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ

২৮

উজ্জানলতা (উপন্যাস)—

শ্রীশাস্তা ও সীতা দেবী

২৪০

কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীচন্দ্রনাথ মল্লিক

৪৮

গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক

১৪০

জাতিগঠনে ববীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার

১৪০

কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

৪০

চণ্ডীদাস চরিত—(৬৬৫প্রসাদ সেন)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি সংস্কৃত

২৪০

মেঘদূত (সচিত্র)—

শ্রীধামিনীভূষণ সাহিত্য্যাকাষ্য

৪৪০

অন্ননা—শ্রীহেমলতা দেবী

১৪০

খেলাধুলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৪০

বিলাপিকা—শ্রীধামিনীভূষণ সাহিত্য্যাকাষ্য

১৬০

ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ

১৪০

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র ।

প্রবাসী কার্যালয়

১২০১২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

= প্রবাসী =

১২০১২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা ।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য :—

ভারত পাকিস্তানী সভাক বার্ষিক মূল্য ১২৮, ই বাৎসরিক ৬৮, ই প্রতি সংখ্যা ১৮ টাকা। বিদেশী সভাক বার্ষিক মূল্য ১৮৮ টাকা, ই বাৎসরিক ১০৮ টাকা, ই প্রতি সংখ্যা ১৮ টাকা। অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ চইতে আরম্ভ হয়। টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল, বাহিরের ব্যাঙ্কের চেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ ব্যাঙ্ কমিশনও দেয়। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রবাসী না পৌঁছিলে ১০ তারিখের ভিতর জানাবার ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দিষ্ট গ্রাহক নথির সহ পত্র লিখিতে চইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাদগ, তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিশ্চেষ্ট চইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনরায় চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অবিলম্বে প্রাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্তী সংখ্যা তিন পিঃ দিতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে তিন পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় প্রারম্ভ-নথর উত্তরে না করিলে তাবাসাধনে কোনমতে অবহেলাবী।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য :—

মাসিক মূল্য—সাধারণ পূর্ণ একপৃষ্ঠা (৮ই: X ৬ই:) ৬০৮

" " অর্ধ পৃষ্ঠা (৪ই: X ৬ই:)

বা এক কলাম (৮ই: X ৩ই:) ৩২৮

" " সিকি পৃষ্ঠা (২ই: X ৬ই:)

বা অর্ধ কলাম (৪ই: X ৩ই:) ১৬৮

" " অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা (১ই: X ৬ই:)

বা সিকি কলাম (২ই: X ৩ই:) ১০৮

বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্রের আভ্যন্তর

প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে 'বিজ্ঞাপন' অগ্রিম মূল্যসহ কাৰ্যালয়ে পৌঁছান চাই। মূল্যসহ বিজ্ঞাপন প্রবাসী প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ ১০-১৫ দিন পূর্বে কাৰ্যালয়ে পৌঁছিলে এক দেবাইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রক দেবার মধ্যে যদি কোন ভুল থাকে তৎক্ষণাৎ আমরা নারী নহি। তাঁহারা বিজ্ঞাপনের প্রক দেবার তার আমাদের উপর দিবেন, তাঁহারা সমস্ত ভুল-ত্রুটির জন্য অভিযোগ করিলে গ্রাহক চইবে না। এক বৎসরের জন্য কটাকাই করিলে এবং বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম জমা দিলে টাকার ১০ হিসাবে বাব দেওয়া হয়।

কন্ডাক্টর—প্রবাসী কার্যালয়

প্রবাসী, ৫১শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৮

সূচীপত্র

কার্তিক—টেক্স

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীকবিত্তকুমার ভট্টাচার্য		শ্রীকাতারনীলান ভট্টাচার্য	
—উষাভ-সমতা	... ৩৭৪	—পান্ডিত্য বর্ণনে ইবরের অতিশয়-বিচার	... ৫২৬
শ্রীকতুলসের চরিত্র		শ্রীকালিকারঞ্জন কাম্বুনগো	
—দুয়াশা (গল্প)	... ৩১৮	—“আহানার আর আনকাহিনী” (সমালোচনা)	... ৩২৩
শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায়		শ্রীকালিদাস রায়	
—বাকী (গল্প)	... ২৩৫	—ইতিহাসে নাম (কবিতা)	... ৫৬৫
শ্রীজনকল্যাণ ঠাকুর		—বায়ের কোল (ঐ)	... ৬৮৮
—অখিল ভারত প্রাচ্যবিভাগ মহল্লিগেলন	... ২৫২	—বাটের পরে (ঐ)	... ৩৭৬
শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত		—সাহিত্যের কুল (ঐ)	... ২৫
—করবোলা	... ৩৭১	—সে দিন (ঐ)	... ২২৩
শ্রীঅপূর্বকুমার ভট্টাচার্য		শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	
—অতিস্মারিকা (কবিতা)	... ৫৬০	—গোপালের ব্যক্তি (গল্প)	... ২৫
শ্রীঅবরকুমার দত্ত		শ্রীকুমারলাল মল্লিক	
—সরসীর (কবিতা)	... ১৫২	—কবিতার হুঃখ (কবিতা)	... ২১
শ্রীঅমিতাকুমারী বসু		—কবির হুঃখ (ঐ)	... ৫০৫
—সর্বদা অকলে শারীর উৎসব	... ১৬৬	—জীউ (ঐ)	... ৫২৫
—সর্বদাতারের ওকার মাকাতা (সচিত্র)	... ৭২৪	—জরা (ঐ)	... ৬৮৮
শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়		—ভারত-মহিমা (ঐ)	... ১৬৩
—ফুকা শিব (গল্প)	... ৫২১	—রূপের কথা (ঐ)	... ৩১০
শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ		কৃষ্ণ দাস	
—অমরোথ (কবিতা)	... ৩৫৫	—বুন (গল্প)	... ২১৭
শ্রীঅমরেশ্বর চক্রবর্তী		শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	
—উষাধন (কবিতা)	... ৭১৭	—বাংলার অস্মিততর জেলার উন্নয়ন (সচিত্র)	৫১, ২৫০
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়		শ্রীগিরীজাশেখর বসু	
—সবুজগুপ্ত সবুজ স্তম্ভ কথ্য	... ৭৫৭	—কি নাম রাখা যায় ?	... ২৭৩
শ্রীআবিনাশ সেন		—পৌরাণিক গাথা	... ৫০১
—সিতিংটোন (সচিত্র)	... ৫২৩	—প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উদ্ভব	... ৬৫৭
শ্রীআর্ধ্য চক্রবর্তী		শ্রীমোহনচন্দ্র দাস	
—আশা (কবিতা)	... ৭২৩	—কল্পমায়া (গল্প)	... ৬১৭
—নব আবাস (কবিতা)	... ৩৭৬	শ্রীমোহনলাল ঘোষ	
শ্রীঅভ্যুত্থান সাত্তাণ		—মহারা (কবিতা)	... ৫৬৫
—প্রাণবানী (কবিতা)	... ৫১০	শ্রীমোহনকামোদন ভট্টাচার্য	
—শিখরী গাথা (কবিতা)	... ৮৮	—“সামান্যায়ণ তর্কপাণন” (আলোচনা)	... ২৫৬
শ্রীঅম্বিকা দেবী চৌধুরাণী		শ্রীমোহন রায়	
—আবারকলি (নাটিকা)	৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫	—কোমারক (সচিত্র)	... ২০০
শ্রীউষা বিবাস		শ্রীমোহনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	
—সাদানন্দ-অরণ্য	... ২৫	—কোমারী (কবিতা)	... ৬৫
শ্রীকমলকুমার বসু		শ্রীভিষকচন্দ্র চক্রবর্তী	
—প্রাণ (কবিতা)	... ৫৫৬	—“পুঁথি পরিচয়” (সমালোচনা)	... ৫০৫
—প্রাণ কামত (কবিতা)	... ৩১৭	—“বালা মহলকাণ্ডের ইতিহাস” (ঐ)	... ১১৭

শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়		শ্রীনিবাস রায়	
—একতারা (গল্প)	৩১	—ভাষ্যমূল (কবিতা)	১১২
শ্রীতপস্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়		—সেবতা হইয়া জাণো (ঐ)	৮৪
—‘উর্ধ্বা’ ও ‘বিজয়িনী’	৬০৪	—বার সন্ন্যাসা বৈশ্বকাম্য (ঐ)	৪৭৪
শ্রীভারতী রায়		—বর্ষ চাহি না আসি (ঐ)	২০৫
—বাণী (গল্প)	১৫৩	শ্রীকান্ত রায়, কাব্যভীর্ষ	
বাণী ধর্মবিকারী		—কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ (সচিত্র)	৩৩৩
—লোকারণ্য বা লোককল্যাণ ?	৪৫০	—“নিবন্ধের দুইটি আদিম দেবতা” (আলোচনা)	৪৯০
শ্রীভারতী রায়		—বাংলাদেশের মন্দির ও মন্দির (সচিত্র)	১৭২
—নেপালের বৌদ্ধধর্ম (সচিত্র)	৩০১	শ্রীনিবাস রায়	
শ্রীনিবাস রায়		—আমার চীন ভ্রমণ (সচিত্র)	৮৬
—কাহ্নের মানুষ শ্রীঅরবিন্দ	১১৩	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়		—বহিঃদেশের উপত্যকা ভীমার ভাষ্যমূল ভ্রমণবিলাস	১১৩
—পূর্বপুরুষের নামকীর্তন	৫৭	শ্রীকান্ত রায়	
—শ্রীমৎ বামীর কুল-পরিচয় ও কালনির্ণয়	৫১১	—এক (গল্প)	২৭২
শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়		শ্রীকান্ত রায়	
—ভূতীয় বিশ্বকালের নৃতন ভাষ্যমূল	৫৭১	—আমার দেশ	৩৭১
শ্রীকান্ত রায়		—মুক্তি ও মিলন	১৭
—পদ্ম (কবিতা)	২৮৮	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—চারি বেদের পৌরাণিক	২২৭
—খাত উৎপাদনে নৃতন দুইভাষ্য	৫৭৩	শ্রীকান্ত রায়	
—গোল মাল-সংরক্ষণ (সচিত্র)	২২২	—নব বসন্ত (কবিতা)	৩৩৫
—পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের উপাধানের পথ	৩৭৭	—কিরে দাঁত (ঐ)	৪২৫
—ভূমি-সেনা (সচিত্র)	২২০	—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈরাগ্যের বাণী	২৩১
—রামায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৩৪	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—রাণা রঘুনন্দনরায়ের মন উদ্বোধন ও বাহ্যিক (সচিত্র)	৭০
—কিরেদেশ (সচিত্র)	৪৩, ১২৪, ৩১১	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—একটা ছড়া	১৩৭
—হসেন সাগর, হারিহররায় (কবিতা)	৪৫২	—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ	৫২৬
শ্রীকান্ত রায়		—রচিত্তে	১৩৬
—কৃষ্ণরায় মিত্র	৪৭৮	—রবীন্দ্র-সংলাপ কবিতা	৪৭০
শ্রীকান্ত রায়		শ্রীকান্ত রায়	
—সেবানন্দ (উপভাস)	১৪৯	—সাহিত্যিক সেনা (গল্প)	৩৭
—রাজনগর (উপভাস)	১০, ২০৬, ৩০৭, ৪৪২, ৫২৬	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—সরকারী কলা-বহাবিভাগের প্রদর্শনী (সচিত্র)	৪৩১
—ভিক্টোর টাকাকড়ি	৬১	শ্রীকান্ত রায়	
—দিনাজপুর জেলায় পল্লীর আর্থিক জীবনের রূপান্তর	৩৪২	—শিকার বিবর্তন	৪৩২
—নেপালে ভাইপুলা	২৩২	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—“কে দিল আমার আঁখিত...” (গল্প)	১৬৩
—অমৃতসে (সচিত্র)	৫৫৬	শ্রীকান্ত রায়	
—টমাস আলভা এডিসন ও চলচ্চিত্র শিল্প (সচিত্র)	৭০৮	—সমতা—পথ কোথায় ?	২৪৬
—ভীম জাতির মৃত্যুসাধক বোতালাল ভেঙ্কট (সচিত্র)	২২৪	শ্রীকান্ত রায়	
—সুদান (সচিত্র)	৪৩৬	—আইনী (কবিতা)	৪৩৫
শ্রীকান্ত রায়		শ্রীকান্ত রায়	
—পিতৃস্নেহ ও তার স্বরূপ	১৫০	—কুল (গল্প)	৪৩৬
শ্রীকান্ত রায়		—মৃত্যুর অন্ধকার (গল্প)	৪৩৭
—করাসী-কবি লেক্‌চর বে গীল	২৩১	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—কিরেদেশ	৪৩, ১২৪, ৩১১
—অন্য অন্ধকূট (গল্প)	২৭৬	শ্রীকান্ত রায়	
শ্রীকান্ত রায়		—শান্ত (কবিতা)	২৩৮
—হলদীবাটের মন	১৮৪		

শ্রীমদভগবদ্গীতা		শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—কথা-ব্যাখ্যার	... ৪০২	—পশ্চিম সূত্র-বন্ধ (সচিত্র)	... ৩১২
—বোধের জন্য চট্টোপাধ্যায়	... ২৩৬	—প্যারিস (ঐ)	... ৩৬২
—স্বাভাবিক বর্ণনা দেউকর	... ১১৮	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—অবনীন্দ্রনাথ (কবিতা)	... ৩৪৮
—মনতবে এডলারের দান	... ৪০৫	—কান্ডন (ঐ)	... ৩০৯
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—সুপসি (ঐ)	... ৪২
—চন্দনবগরে শ্রীঅরবিন্দ	... ৮১	—স্বাভাবিক (ঐ)	... ১৩৫
—পতিচারীতে শ্রীঅরবিন্দ	২১৪, ৩২৩, ৪০৬, ৫৮২, ১৪১	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—অমর জাতি (সচিত্র)	... ১৩১
—কেন হেঁটে গেলে (কবিতা)	... ৪৩৫	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—বিগ্রহ (ঐ)	... ৬২৭	—কবির কথা (কবিতা)	... ৩৩৩
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—বুনিয়াদী শিক্ষা ও মনতবে	... ১৪৫	—বহিঃস্থ : কবিরানস ও মনতবে	... ৪৮৫
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতা অধিবেশন	... ৩২৭	—কাটা (গল্প)	... ৪৭১
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—স্বপ্ন (ঐ)	... ৭০৯
—মানক দেবী	... ৩০৬	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—ভারতীয় দর্শন-মহাসভা—পুণা অধিবেশন	... ৭৫৬
—কবি ভুবনেশ্বর রায়চৌধুরী (সচিত্র)	... ৪৯	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—ভারতের নিকট নৃত্যকারী উটমিসিয়ার আবেশন (সচিত্র)	৩২৫	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	... ৩১৩
—বোধের নীল-আন্দোলন ও শিশিরকুমার বোম	... ৪৪৭	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—বোধের নীল-আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য	... ৬৭৮	—নিজস্ব (অনুদিত গল্প)	... ৪৮৬
—“রামায়ণ-মহাভারত” (মহাভারত)	... ৩৭৭	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—শিশিরকুমার বোম ও জাতীয় রম্যক	... ৩৪৫	—কর্তব্যকর্মিকার কয়েক দিন (সচিত্র)	... ২৮৩
—সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা	... ৪২৭	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—আগে চল (কবিতা)	... ৬৯
—উত্তান (কবিতা)	... ৩৬৮	—এতটুকু (ঐ)	... ৫৭৯
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—হেঁটে ঘর (ঐ)	... ৩৬৫
—খান বব্বার পাট	... ৭০৬	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—বাংলায় কাপাস-চাষ (সচিত্র)	... ৩৫৯
—সাহিত্য ও সমাজ	... ৪৮০	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
(ব্রহ্মচারী) রমেশ	—	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	... ২৮৭
—বহিঃস্থ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার (সচিত্র)	৩৬৬, ৬৮৮	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে বহুবিধ	...
—সুন্দরী প্রহে হিন্দু-মুসলমান	... ৩১৯	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—প্রভাত (কবিতা)	... ৭৫৫
—স্বপ্নাবলী	... ৭০৯	—সম্মান (ঐ)	... ৩১৩
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
—কবী বারা (উপহার)	৩৪, ১৭৯, ৩০০, ৪১৫, ৫৬১, ৬৮৯	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	... ৫৭৫
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	...
—ভগ্নাবলী বা রামচন্দ্র (সচিত্র)	... ৮৫	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	...
—প্রণাম (কবিতা)	... ১৭১	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	...
—মোহনচন্দ্র (কবিতা)	... ৪১০	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	...
—পশ্চিমবঙ্গের বাতসর্ঘ্য	... ১৭৭	শ্রীমদভগবদ্গীতা	
শ্রীমদভগবদ্গীতা	—	—স্বপ্নাবলী (কবিতা)	...
—কবিতা-বীথ	... ১০৯	শ্রীমদভগবদ্গীতা	

শ্রীমদভ্যাস

—স্বাভাবিক চট্টোপাধ্যায়	৩৩০
শ্রীমদভ্যাস	
—বালা ও বাঙালী	৩২, ১৭৫, ৩২৮, ৪৭৫, ৪৮০, ৭০১
শ্রীমদভ্যাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
—স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক 'সন্তোষ'	২৭৮

শ্রীমদভ্যাস

—স্বাভাবিক	২৮৪
—ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিবন্ধিতা	৩১০
—শিকা ও স্বাভাবিক	২০
শ্রীমদভ্যাস পালিত	
—স্বাভাবিক হেলেনের বাবা	৭৪০

বিষয়-সূচী

অখিল ভারত প্রাচ্যবিভাগ মহাসভার—শ্রীমদভ্যাস ঠাকুর	২৪২	কোণী-বাঁধ—শ্রীশিবকুমার কর	১০২
অবলম্ব (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৩৫৫	খাত উৎপাদনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী—শ্রীমদভ্যাস	৭৭০
অভ্যুদয় (সচিত্র)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	খুন (গল্প)—স্বাভাবিক	২১৭
অবলম্ব (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৩৫৫	খ্রীষ্ট (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৬২৪
অভিসারিকা (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	গোপনচরিত্র (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫১০
অভ্যুদয় (সচিত্র)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	গোপনচরিত্র (গল্প)—শ্রীমদভ্যাস	২৫
আগে চল (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	গোল-আলু সংগ্রহ (সচিত্র)—শ্রীমদভ্যাস	২২২
আমার কলি (নাটক)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০, ৫৫৫, ৫৫৬	গ্রামবাসী (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৬০
আমার চান্দ্রবর্ণ (সচিত্র)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	চন্দ্রবর্ণের শ্রীমদভ্যাস—শ্রীমদভ্যাস	৮১
আমার দেশ—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	চারি বেঘের পৌরোহিত্য—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৭
আলোচনা	২৫০, ৫৫০	চোখ (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০
আশা (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	ছোট ঘর (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৫
ইতিহাসে নাম (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	জননী কল্পিত... (গল্প)—শ্রীমদভ্যাস	২৭০
উজ্জী 'ন' (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	জনপিতা—শ্রীমদভ্যাস	২৮৫
উজ্জী-সম্রাট—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	জগা (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৮৮
উজ্জী (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	"জগদানন্দের আত্মজীবনী" (সবালোচনা)—	
'উজ্জী' ও 'বিক্রমী'—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	শ্রীমদভ্যাস কামুনগো	৫৫২
একটা ছড়া—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	কুলা (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	১০২
একতারা (গল্প)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	টবাস আলতা এডিসন ও চলচ্চিত্র শিল্প (সচিত্র)—	
এটাই (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	শ্রীমদভ্যাস	৭০০
কথা-সাহিত্যের প্রথম বৃষ্টি—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	তপোশিলা বা গায়ক (সচিত্র)—শ্রীমদভ্যাস	১৫
কল্পকল্পিকার করক দিন (সচিত্র)—		তাজমহল (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৭১২
শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	তিলকের টাকাকড়ি—শ্রীমদভ্যাস	৫১
কবিতার মুখ (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের নতুন তাম্রশাসন—শ্রীমদভ্যাস	৫৭১
কবির বাবা (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	হিন্দু-পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণ—শ্রীমদভ্যাস	৫৭৭
কবির মুখ (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	বিনোদপুর জেলার পল্লীর আর্থিক জীবনের রূপান্তর—	
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	শ্রীমদভ্যাস	৫৫২
কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ (সচিত্র)—		হুয়াশা (গল্প)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৮
শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	হুয়াশা (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৬
কাহ্নের ম'মুদ শ্রীমদভ্যাস—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	হেবতা হইয়া জাগো (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৮৪
কাঁটা (গল্প)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	হোবানন্দ (উপভাস)—শ্রীমদভ্যাস	৭৫৫
কি নাম রাখা যায়?—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	দেশ-বিশেষের কথা (সচিত্র)—	১১০, ২৫০, ৩৮০, ৫১০, ৬০৭, ৭০৫
বিদ্যার মণি (সচিত্র)—		বিদ্যার (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৭
শ্রীমদভ্যাস	৫৫০, ৫৫৫, ৫৫৬	বর্ষসংসার রবীন্দ্রনাথের নতুন ইন্দ্রিয়—শ্রীমদভ্যাস	২৫
কুলজী এঁহে হিন্দু-মুসলমান—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	বাস বসার পাট—শ্রীমদভ্যাস	৭০৬
কুক্কুরের মিত্র—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	নব আশা (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৬
"কে ছিল আমার আদ্যাত..." (গল্প)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	নব মন্দির (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৫
কেন চেড়ে গেলে (কবিতা)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	নর্দাণ একলে শারীর উৎসব—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৬
কোলাহলী (ঐ)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	নর্দাণতীরের ওড়ার মাঝে (সচিত্র)—ঐ	৫৫৬
কোলাহল (সচিত্র)—শ্রীমদভ্যাস	৫৫০	নানক দেবী—শ্রীমদভ্যাস	৫৫৬

[illegible]

সূচী	১৩৭
পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষা আন্দোলন	১৩৮
পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যমূলক উদ্ভিদ শিকার	১৩৯
পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কোন্ দেশে ?	১৪০
বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ৩২ নব্বইতম সভাপতিত্বের অভিভাষণ	১৪১
বঙ্গবাসী খাল	১৪২
বঙ্গদেশে ভারত ও জাপান	১৪৩
বঙ্গী আত্মকাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা	১৪৪
বঙ্গভূমির বঙ্গ	১৪৫
বাংলার নিকটবর্তী	১৪৬
বাংলার নিকটবর্তী অভিযান	১৪৭
বাংলার বাণিজ্য ও কল	১৪৮
বাংলার পুস্তক-প্রকাশক সমন্বয়	১৪৯
বাংলার সমাজিক সমাজের সমন্বয়	১৫০
বাংলা	১৫১
বিধানসভার রায়ের নানা ভাষা	১৫২
বিধানসভার রায়ের পরিকল্পনা	১৫৩
"বিপ্লব-ভাষ্য" ও "ভক্তি-নিকটতম"	১৫৪
বিষয়ভিত্তিক বিবরণ	১৫৫
বিষয়ভিত্তিক ও মৈত্রীর "অংশীদার"	১৫৬
বিশ্বত বিদ্যাবী	১৫৭
বিহার গবর্ণমেন্টের অনুমতি	১৫৮
বুদ্ধিগতি শিক্ষার সংগঠন	১৫৯
বুদ্ধিগতি ও কলেজের শতাব্দিকী গ্রন্থ	১৬০
জাতির মিত্র	১৬১
জাতি ও জাতির বুদ্ধিগতির সমন্বয়	১৬২
জাতি-ব্রিটেন-বুদ্ধিগতি	১৬৩
জাতি-জাতির বুদ্ধি	১৬৪
জাতি-সরকারের বাজেট	১৬৫
জাতিগত অর্থের খনি ও ব্যবসায়	১৬৬
জাতিগত "জাহাজ" কর্মী	১৬৭
জাতিগত পাটের চাষ বৃদ্ধি	১৬৮
জাতিগত নৌবাহিনী	১৬৯
ভারতীয় ভাষা-নীতি	১৭০
ভারতীয় রাষ্ট্রপতি	১৭১
ভারতীয় বঙ্গের বুদ্ধিগতি	১৭২
"ভোট হাও নাই চিনি ও কাপড় পাইবে না"	১৭৩
বঙ্গবাসী নদী ও খাল	১৭৪
বাণিজ্যিক শিক্ষা বোর্ড	১৭৫
বঙ্গদেশের অবস্থা	১৭৬
জাতির বুদ্ধিগতির অর্থসাহায্য	১৭৭
জাতির জাতির পরিচয়	১৭৮
বিশ্ব-বঙ্গ-ভিটমিনিসি	১৭৯
"বুদ্ধি" পত্রিকার বাণিজ্য বর্ষ পুষ্টি সংখ্যা	১৮০
বুদ্ধিগতি	১৮১
বুদ্ধিগতির অপরাধ	১৮২
বুদ্ধিগতির সেবামূল	১৮৩
"বুদ্ধিগতি" পত্রিকা	১৮৪
বুদ্ধিগতির ও বিত্ত মন্ত্র	১৮৫
বুদ্ধিগতির বুদ্ধি	১৮৬
বুদ্ধিগতির নগর	১৮৭
বুদ্ধিগতির রায়	১৮৮
বুদ্ধিগতির ব্যক্তি ও ভারতীয় বুদ্ধিগতির প্রতিষ্ঠান	১৮৯
বুদ্ধিগতির উপাধি ও ভারতীয়	১৯০
বুদ্ধিগতির	১৯১
বুদ্ধিগতির পুষ্টি তালিকা	১৯২
বুদ্ধিগতির চাষকার দাপট	১৯৩
বুদ্ধিগতির বাণিজ্য মিত্র	১৯৪
বুদ্ধিগতির শিক্ষা-বিশ্ব	১৯৫
বুদ্ধিগতির অর্থের সমন্বয়	১৯৬
"বুদ্ধিগতির" নদী : অর্থ ও কাল	১৯৭
বুদ্ধিগতির কারণ ও চিকিৎসা	১৯৮
বুদ্ধিগতির উদ্ভাব-কলোনি	১৯৯
বুদ্ধিগতির সামাজিক-বিশ্ব	২০০
বুদ্ধিগতির অর্থ, কাল ও	২০১

चित्र-सूची

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚିତ୍ର

ধ্বংস-জননী—ঈদীয়েশব্দে গণ্যোপাখ্যায়
 বড়—ঈদীহাররজন সেনগুপ্ত
 বানগ্রহ— ঐ
 কুন্দের বৈরাগ্য—ঈশম্ভোব সেনগুপ্ত
 শিকারী—ঈদেবীপ্রসাদ দ্বারচৌধুরী
 হালকা হাওরা— ঐ

একবর্ণ চিত্র

অনুপ সিংহ, ডটর
অকশেশের ডিগ্রাবলী
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শোকবাখা
অহর জাতির ডিগ্রাবলী
আমেরিকা—
—ইন্টারিট অব টেকনোলজি, ব্যাসাচুসেট স
—কলম্বাসের স্মৃতিস্তম্ভ
—টমাস মেকারসন স্মৃতিসৌধ
এডিসন, টমাস আলভা
এডেন
ওক্লোরথের মন্দির, নর্থদাতীয়ে
ককাকুয়ারিকার ডিগ্রাবলী
করুতকা—ঐশচীন রায়
কলা-সহাবিতাংয়ের ঐশ্বরিতি ডিগ্রাবলী
কলিকাতা চীনা অকশের ডিগ্রাবলী
কার্পাস-চাবের ডিগ্রাবলী
কালিকারঙ্গম কাংককো
কিন্নর-মেশ-ডিগ্রাবলী
কুদীর-শিম—ঐশচীনাল লকুতুপ্ত
কোনারক ডিগ্রাবলী
কোরিয়ার ৩০তম ভারতীয় এম্বলে ইটনিটের মেডি
মিরিশচল হাস
মেজিয়ার এখান খাল
মেবেল আউলিয়া বীথ
মোল-আলু মাখিবার চালাখর, পুণা
মলকিজ ট ডিও
চীনা সংস্কৃতি বিশদ, নিউ দিল্লীতে
চীনা সাংস্কৃতিক বিশদ
জাপানের শান্তি চুক্তি বাকর
জাতিসংঘ রানপরিবারের ব্যারামাংগার
টাকশালে ভারতীয় মুদ্রা নির্ধারণ
টুয়েন্স কাংরা—ঐশচীন রায়
জিনিয়াং—
—আর্থসমাজ-মন্দির
—গাও স্মৃতিমন্দির ও নিবালর
—হিন্দু-মন্দির

...	১	দত্তাশ্রয় মন্দির, কিষ্করদেশ	...	৩১০
...	৬৪১	বিহীতে সরস্বতী পুজাশ্রুতান-দুত্তের অশ্রুতুতি	...	৪৪৪
...	৬৮৫	মহাভারতের মন্দিরমন্দির	...	৭২৫-৭
...	৫১০	বাইরোবিতে (পূর্ব-আফ্রিকা) ভারতীয় কবিশব্দার	...	৭৬৭
...	১২৯	অশ্রুতুতি ঐতিহ্য-সম্মিলন	...	৬৮৮
...	২৫৭	বিউ জাগী—প্রথম চলচ্চিত্র ইতিহাস	...	
		নেপাল—		
		—মাদুরা ঠেতা	...	৬০১
...	৩২	—বোম্বাই মন্দির	...	৬০৩
১৫০-১২		—মহাভারত মন্দির	...	৬০২
২৫৭, ৪৩৬		পূরীর অগ্নি মন্দির—শ্রীনাথচন্দ্র দাস	...	৪৬১
...	৩৮৪	প্যারিস চিত্রাবলী	৩৬৫, ৫৩২-৩৫	
১৬১-৬৪		প্রতিকৃতি—শ্রীনাথ দাস	...	৪৬৩
...	১৮৫	প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়	...	৬৬৮
...	১৮৪	প্রদর্শন—শ্রীবিষ্ণু মহাশক্তি	...	৬৬৫
...	১৮৪	বহির্ভারতে ভারতীয় প্রতিকৃতি	...	৬৬৭
...	১৮৪	বাংলার সেচনালী	...	৬১-৬
...	১৮০	বাংলার মন্দিরের চিত্রাবলী	১৭২-৭৪	
...	৬১৩	বাংলার—শ্রীঅসিত সেন	...	৪৬৪
...	৭২৫	বি. কে. বেহরু, গুয়াশিটনে	...	৬২
২৮২-২২		বেল্লিশিতে দুর্গোৎসব	...	২৪০
...	৪৬২	বোম্বাই, এলু হবিব	...	৬২৫
৪৬১-৬৪		ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে প্রচারকমল	...	৬৮৮
...	৮২-২৪	ভুক্তমন্দির মন্দিরচৌধুরী	৪২, ৬৮৮	
৩৪২-৬৪		ভূমি-সেনার চিত্রাবলী	২২০-২২	
...	৬৩৭	মন্দিরের চিত্রাবলী	৬১১, ৬৮৩-৬	
...	৪০-৭	মুক-মন্দির	...	২৫৪
...	৪৬২	মোতীলাল তেজাবৎ, ভীলসেতা	...	২২৪
২০০-২০৫		মন্দিরপুতানী—শ্রীহেমন্তী সেন	...	৬৮৫
১৪৪		মন্দির মন্দিরপুতানী মন্দির উপাধ্যায়	...	৭২
...	৭৬৮	মন্দিরমন্দির	...	৪৬২
...	৪৬০	মন্দিরমন্দির, মন্দিরপুতানী—মন্দিরমন্দির উপাধ্যায়	...	৬৩১
...	৪৬০	মন্দির মন্দির এলিজাবেথ	...	৬১৩
...	২২০	মন্দির মন্দির	...	১
...	৬৮৮-৬	মন্দিরমন্দির	...	৭৬৮
...	১২৯	মন্দিরমন্দির—মন্দিরমন্দির	...	৬২৬-৬
...	৬০৪	মন্দিরমন্দির	...	৬৬৫
...	১২২	মন্দিরমন্দির	...	৭৬৫
৭০-৭১		মন্দিরমন্দির	...	৬৬
...	৪৬৫	মন্দিরমন্দির	...	৬৮৫
...	৪৬০	মন্দিরমন্দির	...	৭২৬
...	৭০৪	মন্দিরমন্দির	৪৬২, ৪৬৫	
...	৭০০	মন্দিরমন্দির	৪৬৬-৪৭	
৭০১-৩		মন্দিরমন্দির	...	৬১৪
		মন্দিরমন্দির	৭০১-৩	



অবাসী ঘোষ, কলিকাতা

গণেশ-জন্মনী
শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



রামটেক মন্দির



রামটেক মন্দির হইতে অম্বা হ্রদের দৃশ্য

অবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

সারস্বতী বলহেমেন সত্যম্”

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

কাঙ্ক্ষিক, ১৩৫৮

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূজা

পূজা আগতপ্রায়। বাঙালীর ঘরে আগমনীর সুরের সঙ্গে নিয়ানন্দ দূর হয়, নগরে পল্লীতে—গ্রামে গ্রামে উৎসবের আনন্দ-শ্রোত বহিয়া যায়। আজ সে উৎসবের মধ্যে দেখি যেন বিধাদের ছায়া, সে আনন্দ যেন মনে হয় কষ্ট-সাধ্য। দেশে রহিয়াছে অভাবের ক্ষত, লোকের মুখে অসন্তোষের অভিলাষ। শাস্তি নাই কোথায়ও, সঙ্কট নাই কাহারও ঘরে।

ঘোর দাসত্বের দিনেও বাঙালীর ঘরে “বারো মাসে তরো পার্জন” ছিল, এবং সে সকল পূজাও তো উৎসবের মূলকে পূর্ণ হইত। আজ স্বাধীনতার দিন, চার বৎসর প্রতিবাহিত হইয়া গিয়াছে আমাদের স্বাভাবিকতার পর। হবে জনগণের কেন এ অবস্থা, কারণ কি এই নিদারুণ দৈহিক ও মানসিক অবসাদের? আজ কেন মনে হয় বুধাই এই শক্তির আবাহন, নিরর্থক এই দেবতার বোধন?

ছিল এক দিন হৃদয় অভিভূত, যখন বাঙালীর শক্তির প্রাধান্য ছিল সার্থক। তখনও বাংলাভূমির সম্রাটের স্বপ্রত্যয় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও অর্জুনিত হয় নাই, তাহার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিতের প্রবাহ ছিল। রাজ্যের জয়গত ও ব্যক্তিগত অধিকার ও সম্মান-সম্ভতি, স্বাধীন-হৃদয়ের মানমর্যাদা, সম্পত্তি রক্ষার্থে জীবনমরণ করিয়া সে শোণিততপ্পে কৃষ্টিত বা বিচলিত তখন হইত না। তুর্জয় শক্তিতে সে অতিক্রম করিত দারুণ ঋকট, বিষম বিপদ, অর্থ বৃষ্টিতে সে দেবীর ঐ আবাহনের :

“অহং জনায় সমং কৃণোমি”

দেবতা তখন ছিলেন জাগ্রত, তাহার পূজারী ছিল জাগ্রত, বহুসম কঠোর নির্মম। যাদের সম্মান তখন পূজা করিত সমরাজ্যে, শত্রুর রক্তে অসিফলক রক্তিত

করিয়া, আত্মবলিদান দিয়া। শৌর্য ছিল তাহার, বীর্ঘ ছিল তাহার, তিত্তিকা ছিল তাহার অঙ্গের ভূষণ। উদাত্ত হৃদয় ছিল সেই পৌরুষদৃষ্ট শক্তির পূজারী। তখনই ছিলেন দেবতা জাগ্রত।

সেদিনের আজল্যমান সাক্ষ্য রহিয়াছে পঞ্চভূমির ইতিহাসে, সে পূজারীর পরিচয় আছে বারোভূমির ইতিবৃত্তে। তাহারও পূর্বে তাহার বিবরণ আছে “দুই শগাধের” অভিযানে, শত বিদ্রোহ-বিল্লবের কিয়দস্তিতে।

তাহার পর বাঙালী গা ঢালিয়া দিল হিলাস-বাসনের শ্রোতে। পূজারী ভুলিল পূজার অর্থ, দেবতার নির্দেশ অগ্রাহ করিয়া উন্নয়নগামী ও লালসাগ্রস্ত হইয়া চলিল সে ধ্বংসের পথে। দেশ হইল শত্রুকবলিত।

তার পর গিয়াছে যুগযুগব্যাপী দাসত্বের বন্ধন, ক্রীতদাসের অভিলাষ। অযোগ্য অধম সম্রাটের অপোগণ্ড শিশুবৎ ক্রন্দন, আবেদন-নিবেদন, অভিমান-আবদার তত দিন বুধাই গিয়াছে। দেবতার নিদ্রাভঙ্গ হইল কখন?

আবার আসিল একে একে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী পূজারী, সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, স্হায়সম্বলহীন। কিন্তু তাহাদের চিত্ত ছিল সবল, সিদ্ধান্ত ছিল অটল। হিংস-বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিয়া তাহারা শোণিততপ্পে সঙ্কট করিল দেবতাকে; দেশের লোক বুঝিয়াও বুঝিল না, ভাবিল বুধাই এ আত্মবলিদান, অনর্থক এই নিদারুণ কৃচ্ছ-সাধন। সাধারণ লোক পূজার সেই প্রাচীন সনাতন অর্থ তখন ভুলিয়াই গিয়াছে। শুদ্ধ দান ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব, এ কথা কেহই জানে না।

আজ দেশের ভাগ্যচক্র ফিরিতেছে, ঐ চক্রের পেষণ সহ করিবার ঐচ্ছ্য ও পৌরুষ কি আমাদের আছে? যদি

থাকে, তবে কিসের এই বিলাপ-প্রলাপ, কেন এত ক্রোধ-দ্রোহ ও ঘেব ? স্বাধীনতার মূল্যদানে যদি আমরা অসমর্থ, তবে অনর্থক সকল পূজার আয়োজন, ব্যথাই এই শক্তির আবাহন।

স্বাভিজ্ঞের মূল্য নিরবচ্ছিন্ন সজাগ সতর্কতা এবং শক্তি পূজার অর্থ শব্দাহীন, নির্ধম কঠোর জ্ঞয়ে বীরগতি কামনা, এ কথা যেদিন দেশ বুঝবে সেদিনই হইবে পূজা সম্পূর্ণ সার্থক।

পশ্চিমবঙ্গ বাঙালীর শেষ দুর্গ একথা বহু বার আমরা বলিয়াছি। এই দুর্গ জীর্ণ ও ভগ্ন এবং ইহার অবিবাসিগণ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী বিদেশীর উৎপীড়নে ক্রিষ্ট। ইতিহাস-বিখ্যাত পঞ্চভূমের মধ্যে সিংহভূম, মানভূম ও শিখরভূম আজ বিদেশীর চক্রান্তে ও ভিন্ন প্রদেশীয়ের অতি হীন মনোবৃত্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উহার অধিবাসিগণ অবাঙালীর অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত। পশ্চিম-বঙ্গের স্বতন্ত্রাঙ্গের আশাভরসা বাহা কিছু ছিল—স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে যাহা যথেষ্টই বর্ধিত হয়—সে সকলও ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও কি আমাদের পূর্বের মনোভাবই থাকিয়া যাইবে ?

দাসত্বের যুগে, ক্রৌঞ্চপ্রাপ্তির ফলে “পাঠাবলি দলাদলি” দিয়া দুর্গাপূজা, কাগীপূজা চলিত। আজ স্বাধীনতার আলোয় আমাদের সে সকল কলঙ্কালিঙ্গ আরও ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহার অবসানের কোনও চিহ্ন তো দেখা যাইতেছে না।

দেশ ত বিভক্ত। শুধু পূর্ববঙ্গই বিচ্ছিন্ন হয় নাই—বদিও এক দল লোক চাৎকার করিয়া তাহাই জানাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রশালী অঞ্চল, যেখানে অমূল্য খনিজ সম্পদ রহিয়াছে, তাহা গিয়াছে। পূর্ণিয়া, কবিমগধ ইত্যাদি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাঙালীও এখন বিহারী ও অসমীয়ার অধীন। স্বতরাং বাংলার আছে কি ?

অথচ এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিকার ও সম্পত্তি লইয়া কাড়াকড়ি ও টানাইচড়া চলিতেছে। দেশের বাহা কিছু ভবিষ্যৎ আশা ছিল তাহাও সেই সঙ্গে রসাতলে যাইতেছে। যদি বুদ্ধিতাম যে দেশের লুপ্ত সমৃদ্ধি উদ্ধার করিবার জন্ত চেষ্টা চলিতেছে, যদি বুদ্ধিতাম তাহার শ্রী ক্রিয়াইবার পথ লইয়া মতবৈধ হইয়াছে, তবে ঐ দলাদলির একটা অর্থ পাইতাম।

বাঙালীর অস্তিত্ব লইয়াই প্রশ্ন। ভিন্ন প্রদেশে আমাদের স্থান সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে শূন্যে মিলাইতে চলিয়াছে। এই দরিদ্র প্রদেশে বাহা আছে তাহাতে দেশেরই সম্মান বাহ্যিক

তাহাদেরই সম্মান হওয়া অসম্ভব। অথচ এদেশের পরিধি বিস্তার বা ভারতের অন্য ক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার বৃদ্ধির কোনও সম্মিলিত প্রচেষ্টা নাই। আছে শুধু “উহাকে বর্ধিত করিয়া আমাদের দাও” অথবা “উহার সম্মানের মুখের গ্রাস আমার সম্মানকে দাও।” চাকুরীর ক্ষেত্রে তাই, জমিজমার ক্ষেত্রে তাই, এখন পার্লামেন্টে এবং ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনেও তাই। যদি বুদ্ধিতাম শুধু বোগ্যতার মাপকাঠিতে ব্যবহার, বা যদি বুদ্ধিতাম শুধু সঠিক অধিকার নির্ণয়ে বিচারের প্রশ্ন, তবে বলিতাম তথ্যস্ত।

পথে ঘাটে ফাঁকা কথা হুড়াহুড়ি চলিতেছে। “বিপ্লব বিদ্রোহ”, “গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র”, “গণমত গণবিপ্লব” ইত্যাদি গালভরা শব্দ ও শ্লোগানে আকাশ মূরতিত। কাগজে সত্য-মিথ্যার বালাই নাই, কিসে উপকার-অপকার হয় তাহার বিচার নাই, এক দল বাহা করে অন্য দলে বলে বা লেখে যে সে সবই মিথ্যা, কপট ও অনাগরপূর্ণ এবং তাহার পান্টা জবাবও সঙ্গে সঙ্গে আসে।

দেশের অবস্থা ত অবনতির দিকেই যাইতেছে ? ইহার প্রতিকারই ত প্রার্থনীয় ? তবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বা পরকে দোষ দিয়া কি লাভ হইবে ? বিদেশী সরকার গত দিন ছিল তত দিন তাহাকে দোষ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। এখন ত স্বাভিজ্ঞা আসিয়াছে, যদি বর্তমান সরকার না পছন্দ হয়, নতুন সরকার গঠনে অবহিত হউন। যাহাকে চিনেন, যাহার ইতিবৃত্ত জানেন, তাহাকেই বলুন অগ্রসর হইতে এবং তাহাকে সাহায্য করুন দেশের নতুন সরকার গঠন করিতে।

দেশের লোক যদি উৎসাহ উত্তম দেখায়, যদি যেখানে তাহার অধিকারচ্যুতি হইতেছে সেখানে দৃঢ়চিত্তে বাধা দিতে অগ্রসর হয় তবে এই জীর্ণ দুর্গই বিজয়ের আকর হইবে। দেশের প্রাচীন গৌরব ও পুরাতন শ্রী ফিরিয়া আসিবে। হতোম্ম হইয়া নির্বিষ সর্পের মত গজ্জাইলে শত্রু হাসিবে, কার্ণাটকার ত হইবেই না। ভ্রমকাতর বা উত্তমহীন লোকের স্থান আজিকার জগতে অতি অল্প, এবং যে দেশে প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জন লোক সেখানে বিন্দুমাত্রও স্থানের অভাব। এই সকল কথা শ্রবণ রাখিয়া, সজবজ্জ হইয়া অভিযান করিতে হইবে। যদি তাহা হয় বাঙালী গৌরবের সহিত বাঁচিয়া থাকিবে, অন্ত্যায় তাহার দাসত্ব ও অস্তিত্ব লোপ হুনিচিত।

যদি শক্তির বোধন কাম্য হয়, যদি সার্থক করার ইচ্ছা থাকে এ পূজা, তবে প্রথমে দূর কর মনের দৌরল্য, অন্তরের কলুষ-কালিমা, শরীরের আলস্য। দেবতার আশীর্বাদ তাহারই প্রাপ্য যাহার আত্মনিবেদন ঐকান্তিক।

খাদ্যসমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। এ বৎসর প্রথমটী অনাবৃষ্টির ভর্তুকি কসলের ভবিষ্যৎ খুব ধারাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। চাউলের দরও অনেক চড়িয়া গিয়াছিল। পরে বৃষ্টি হওয়ায় শেষ রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু চাউলের দর কমিতে চাহিতেছে না। গত চার বৎসরে চাউলের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী গেজেটে ইহার যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা একত্র করিয়া দেখিলে আশঙ্কা হয় যে বাংলাদেশে খাদ্যের অবস্থা সম্ভাই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। এবার আর এক বিপদ হইয়াছে—বহু ধান-কমিতে পাট চাষ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা কম, কারণ পাট পচাইবার ও হুইবার জলের এখানে একান্ত অভাব। শ্রোতের জল ছাড়া বহু পচা জলে ভাল পাট ওঠে না। কলিকাতার নিকটবর্তী যে সকল স্থানে পাট হইয়াছে সেখানে অহুসত্বান করিলে দেখা যাইবে যে পাট গাছ ভালই হইয়াছে কিন্তু জলের অভাবে ভাল পাট বাগির হইতেছে না। এবার ধানের কমিতে পাট চাষ করার খাদ্যসমস্যা বাড়িয়াছে, ডলার সমস্যার সমাধান কতটা হইবে বলা যায় না। পাট বা তুলার নিক্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইয়াও যে বহুতর বস্ত্রশিল্প এবং খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে চটকল চালানো যার ব্রিটেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের বাংলার উপরেই বেশী ঝোক দেওয়া দরকার।

বাংলার মূল্যায়নের হিসাব গেজেট হইতে সংকলন করিয়া নিচে দেওয়া হইল। ইহাতেও ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের বার্ষিকী হিচি হইতেছে :

জেলা	জুলাই '৪৮	জুলাই '৪৯	জুলাই '৫০	আগষ্ট '৫১
বর্ধমান				
(কালনা) ২০	২০/০	২২৫/৮	২২/৫	
বীরভূম ১৬	১৭৫৫	২২/০	১৬৫/০	
বাকুড়া ১৮	১৬	১৯	১৬৫/০	
মেদিনীপুর ১৭৫	১৭৫৫	২১	২২৫/০	
দুর্গা ২৬৫/০	২৬	২৪	৩২	
হাওড়া ২১/৪	২৯/৫	২৯/৫	৪০	
২৪ পরগণা ২৬৫/০	৩২	৩২	৪৪৫/০	
মদীরা ২৪৫/০	২২৫/৮	৩০৫/৭	৩২	
মুর্শিদাবাদ ২১৫/০	২২৫/৮	৪০	২২৫/০	
পশ্চিম				
দিনাজপুর ২৪	২০	২৩	৩৫৫/০	
গালদহ ৩৩৫	২৪	২৪	৩৩৫/০	
এলপাইগুড়ি ৩০৫	২২৫/৮	৩২	৪২৫/৮	

এই সমস্ত দর ঐ সব জেলার সর্বোচ্চ মূল্য। কতকগুলি

বাড়তি কর্তৃক এলাকা ছাড়া অধিকাংশ মূল্যই উঠাই চাউলের মূল্য। এই ভাবে উত্তরোত্তর প্রতি বৎসর দার বাড়িতেছে ইহা খুব আশঙ্কার কথা।

বাংলার অপচরও বহু বেশী হইতেছে। গত বৎসর ত্রিবেবন প্রামাণিকের সভাপতিত্বে অপচর তরফ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উহার সদস্য ত্রিভাষাভর হালদার মকবলের প্রোকিউরমেন্ট খদ্যাম দেরিতে চাহিলে তাঁহার সহিত কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর মতভেদ হয়। ত্রিভাষা হালদার অপচর খুব বেশী হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি অপচর ধরিবার ভর্তুকি পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কমিটির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ত্রিবেবন সেন খাদ্যমন্ত্রিকে প্রেরণ করিয়া যে সমস্ত তথ্য উদ্ধৃতি করিয়াছেন তাহাতে অপচর অতি সাংখ্যাতিক হ্রাসের হইতেছে বলিয়া বরা পড়িয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী চাউলের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন :

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
মণ	মণ	মণ
বর্ধমানের মজুত ধান	১৮,১২,৭৫০	১৭,২১,২৯২
ঐ চাউল	১৫,১৭,৩০০	৩১,৭০,৫৬৭
বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান	৭১,৪০,০৩৬	৯৮,৭০,০৫৪
ঐ চাউল	১,৫০,৮৫,১৬০	১,৩৭,২৪,৩৮৮
বৎসরের মধ্যে বিক্রীত চাউল		
এ শ্রেণি	২,১২,৭১০	১,২০,৭৮৭
বি " "	১,৩২,৮৫,৪২০	১,৩৪,৪৬,৯৯৬
বৎসরান্তে মজুত ধান	১৭,২১,২৯২	৩০,০৩,০৪২
চাউল	৩১,৭০,৫৬৭	৩০,৪২,৮০৫

বৎসরান্তে মজুত ও বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান চাউলের পরিমাণ বৎসর মধ্যে বিক্রীত ও বৎসরান্তে মজুত ধান চাউলের সমান হইত। সামান্য অপচর হইতে পারে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৫০,৫১,৬৭৪ মণ চাউল খার্তি হইতেছে এবং ১৯৪৯-৫০ সালের খার্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইতেছে ৫৮,০৯,৮৭৫ মণ। ত্রিবেবন সেন খাদ্যমন্ত্রিকে এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাঁচ মিনিট সময় চাহেন। কিন্তু মিলাইতে পারেন না, কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না, অগত্যা তখনকার মত দার এড়াইবার জন্য তিনি নোটিশ চাহেন এবং সে নোটিশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় খাদ্য সমস্যা আলোচনা এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ব্যবস্থা-পরিসরে ঐ আলোচনা হইতে দিলেই ভাল হইত। খাদ্যমন্ত্রী তরুণলকে হিসাবের এই মারাত্মক গলদ বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাইতেন।

খাদ্যসমস্যা লইয়া বিরোধী পক্ষ আলোচনা করিতে

চাহিতেছেন আর সরকার পক্ষ কেবলই উহা এড়াইয়া বাইতে-
ছেন ইহা উচিত নহে। বাংলার ঋতুসমত্তা এমন অবস্থায়
আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া
উহার সমাধান সুদূরপরাহত। ঋতুসমত্তাকে রাজনীতির
বাহিরে রাখিয়া উহার সমাধানের জন্ত সকলের সমানভাবে
চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত আবশ্যিক।

একটি মহৎ প্রচেষ্টা

“ঋতু উৎপাদন” (পাকিস্তান) পত্রিকার ১লা আশ্বিন সংখ্যার
নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তার লেখক
শ্রীরামপুর মহকুমার এগ্রিকালচারাল অফিসার :

“কিছুদিন পূর্বে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, অধিক ঋতু উৎপাদনে যিনি
নুতন পথের সন্ধান দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের প্রভাব
পাছ। এরূপ একজন লোকের কথাই এখানে বলিতেছি।
তিনি হইতেছেন তারকেখরের অন্তর্গত বৈতপুরের বহু-শ্রী
সরকারী কৃষি প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ মালিক শ্রীগোলোক
বন্দ্যোপাধ্যায়। চীন ও জাপানে মাছের মল ব্যবহার করিয়া
সেখানকার চাষীরা যে আমাদের দেশের অপেক্ষা দুই-তিন
গুণ অধিক ফলন পান, কৃষি-কর্মচারীদের নিকট একথা শুনিয়া
তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন এবং মলের প্রতি স্থানীয়
কুসংস্কার, ও চাষীদের রক্ষণশীলতা ও বিরুদ্ধ মনোভাবের কথা
জানিয়াও তিনি তাঁর কমিতে মল সার ব্যবহারে কৃতসম্মত হন।
তারকেখর শহর হইতে তাঁহার বাড়ী এক মাইল। যেখানের
সহিত বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়া উক্ত শহরের মল তিনি তাঁর কমিতে
এক-মোট হাত অন্তর ছোট ছোট গর্তে গত্ত মাঘ মাস হইতে
কেলা আরম্ভ করেন। বৈশাখ মাস পর্যন্ত মল কেলা হয়।
যেখরদিগকে তিনি প্রতি জালা মল বহনের জন্ত চারি আনা
করিয়া দিতেন। কৈর্যে শেষে তিনি উক্ত কমি চাষ করিতে
মনস্থ করিলে, মহুরেরা উক্ত কমিতে মল ব্যবহৃত হইয়াছে
বলিয়া চাষ করিতে অস্বীকৃত হয়। স্থানীয় লোকের ও কৃষি-
কর্মীদের চেষ্টার অতঃপর তাহার চাষ করিতে রাজী হয় এবং
আষাঢ় মাসে কমিটি ভালভাবে চাষ করা হয়। প্রাথমিক মাসে
‘পার্টনাই ২০’ নামক কৃষিবিভাগের নির্দোষিত বান রোপণ
করা হয়। ইতিমধ্যেই উক্ত কমির বান অত্যন্ত বানকে
হাপাইয়া উঠিয়াছে এবং হানে হানে এক একটী বাদে ১০টি
পর্যন্ত গাঁহ হইয়াছে।”

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন,
তাহা দিকে দিকে বিকীর্ণ হইক।

ময়ূরাক্ষী নদী ও খাল

“আগে অর ছিল, এখন নাই। কিন্তু আগের লোক-

সংখ্যার চাইতে এখন যে কারণেই হোক, লোক অনেক
বাড়িয়া গিয়াছে। আগে যে হারে উৎপাদন হইত, এখন তাহা
অত্যাশয়ের এক ভাগে হাঁড়াইয়াছে। নদী-মাতৃক দেশ, তাই
বাংলা ছিল শক্তভাষা। আজ নদী-খাল-বিল সব মজিয়া
গিয়াছে—আজ উৎপাদন বাড়াইতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন
সেই নদী-প্রবাহ অব্যাহত রাখা। আজকের পবনোঁচ তাই
সকল কাজ কেলিয়া সেই দামোদর-ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্মাণে
ব্যস্ত।

এই বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে, বীরভূমে মুন্ডারাই মলহাটি, রামপুর-
হাট, মহুরেশ্বর, মোল্লারপুর মহামদাবাজার, সিউড়ি, সাঁইখিয়া,
নাহর, লাংপুর, ইলমবাজার ও বোলপুর ধানার অঞ্চল—
মুর্শিদাবাদে সাগরদীঘি, মবগ্রাম, ধরগ্রাম, তরতপুর, বরগুমান
ও মির্জাপুর ধানার অঞ্চল এবং বর্ধমানে কেতুগ্রাম ধানার
অঞ্চল সেচের জল পাইবে। এই সমস্ত এলাকা ১৩৪০ বর্গ-
মাইল বিস্তৃত এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বিঘার ধানক্ষেত জল পাইবে।
তাহা ছাড়া রবিশস্তের কালে প্রায় তিন লক্ষ বিঘার সেচের
জল যাইবে। পতিত জমি উদ্ধার হইবে ৭৪০০০ বিঘ।
সেচের জলের মূল খাল ১৪০ মাইল ও শাখা-প্রশাখা প্রায় ৭০০
মাইল কাটা হইতেছে এবং অনেকগুলি অগ্রসর হইয়াছে। এই
কাজ শেষ হইলে, বাংলার ঋতুসমত্তের পরিমাণ অত্যন্তপক্ষে
১০ লক্ষ মণ বেশী করাইবে। আর দামোদর ত্যালির কাজ
সম্পূর্ণ হইলে সমগ্র বর্ধমান ও হুগলী জল পাইবে।”

“গৈনিক” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ১০ই আশ্বিন সংখ্যার
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ময়ূরাক্ষী পত্রিকার
উপর যেনব আশা পড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সার্থক হইক।

সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্യാবলী

গত প্রাথমিক মাসে ডায়মণ্ড হারবারে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত
সুন্দরবন অঞ্চলের মান্য সমস্য়াবলী আলোচনা করিবার জন্ত
একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাপ্রসাদ বৃন্দোপাধ্যায়
সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তথায় যে সব প্রস্তাব
গৃহীত হয়, তাহার চূড়ক উদ্ধৃত হইল :

হাসনাবাদ, সন্দেখালি ও হাড়েয়া পুলিশ ধানার অন্তর্গত
লক্ষ লক্ষ বিঘা ধান-জমির সর্বোপেক্ষা বেশী কতি হইয়াছে।
গত সেপ্টেম্বর মাসে কয়েক স্থানে বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায়
উক্ত জমিগুলিতে লোমা জল ঢুকিয়া পড়ে। সাগর, কাকদীপ,
মধুগাপুর, জয়নগর ও ক্যানিং ধানার অন্তর্গত কয়েকটি
ইউনিয়নও অত্যন্ত কতিগ্রস্ত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসি-
গণ অবর্ণনীয় হঃখপটের সন্মুখীন হইয়াছে এবং অবিলম্বে
সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। গহস্র সহস্র কুটার বিধ্বস্ত হইয়াছে
ও বহু গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। পানীয় জলের অভাব
বেধা দিয়াছে এবং বচা-বিধ্বস্ত কয়েকটি এলাকাও কলেরা

সহায়ারূপে দেখা দিয়াছে। উক্ত অঞ্চলে বস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে।

(১) প্রথমেই প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত অমতিবিলম্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া একটি ভদ্র কমিটি গঠন এবং উক্ত ভদ্র কমিটির প্রমুখ রিপোর্টার ভিত্তিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

(২) “বাঁধ” রক্ষার সমস্যা হইল সুন্দরবনের সমস্যা। বাঁধের ক্ষতি হইলে যে কেবল বংসরের ক্ষতি নষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু দুই তিন বংসরের ক্ষতি করির উৎপাদনী শক্তিও চলিয়া যায়। এই কারণে দেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা বামজমি অসাব্যবহারী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সুতরাং বাঁধগুলি যথোপযুক্তভাবে নির্মাণ করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং যে সব বাঁধের অবস্থা খারাপ সেইগুলি যথাযথভাবে যেরামতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কেবল খাদ্যসমস্যারই সমাধান হইবে না, পরন্তু অমশনশ্রিষ্ট কৃষিকীবিশিষ্ট উপকৃত হইবে কারণ তাহারাই এই বাঁধগুলিতে কাজ করিবে এবং জীবিকানির্বাহের পথ খুঁজিয়া পাইবে।

(৩) প্রত্যেক ইউনিয়নে ভাষা বুলায় ভাষা বিজ্ঞের এক দোকান খুলিতে হইবে, অসহায় ও ক্রান্ত লোকদের পরামর্শ সাহায্য দিতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে সাহায্যার্থে আরকত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) স্থানীয় এজেন্সী আরকত জনগণকে কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) পানীর জলের জন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপ খননের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) চাষ-আবাদের জন্য বীজ ও বন্দ জন্মের নিমিত্ত কৃষি-গণ দিতে হইবে। ইহাতে অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান সহায়তা লাভ করিবে।

(৭) সুন্দরবন এলাকার মধ্যে অব্যবহৃত বান চলাচলের অনুমতি দেওয়া উচিত।

(৮) সম্মেলনালি থানার অন্তর্গত গোসাবা ইউনিয়নের সাতজেলিয়া গ্রামে এবং হাডোতা ও ক্যানিং পুলিশ থানার মধ্যবর্তী দেওলী নামক স্থানে পুলিশী জুন্মের যে অভিযোগ আমদান করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভদ্রতের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৯) সুন্দরবন অঞ্চল বহুসংখ্যক উদ্বৃত্ত কৃষিকীবীর পুষ্কর-সত্তির উপযুক্ত স্থান। কারণ উক্ত অঞ্চলে প্রমত্তির বর্ধিত অভাব রহিয়াছে।

(১০) সুন্দরবনীয় ব্যবস্থা হিসাবে সুন্দরবনের সমস্ত এলাকা সরাসরি সরকারী কর্তৃক বাণীনে আনা উচিত এবং জমিদারী প্রথা বিলোপের পরীক্ষা এখানেই হইতে পারে। সুন্দরবন

অধিবাসীদের হৃৎকর্ষণ লাভের জন্য যৌথ কারবারের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা নির্দেশ বা দাবি আছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের লোকসমষ্টি কি করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহা জানাও প্রয়োজন মনে করি। কোন কোন সমস্যা রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া মিটিতে পারে না, ইহা সত্য। ভৌতিক সত্য বাপ-রিকের দায়িত্ববোধ। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদ নির্দেশ থাকা উচিত ছিল। ঐ অঞ্চল হইতে বান চান ও বস্ত্র চোরা পথে পাকিস্থানে ব্যাপক ভাবে চালান হয় এ কথা সর্বজনবিদিত। ৭ম প্রস্তাব অনুযায়ী অব্যবহৃত বান চলাচল হইলে তাহা বাড়িবে না কমিবে তাহা বলা বাহুল্য। বাঁধ রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় লোকের উদ্যম কতটা প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহারও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ৩৫ লক্ষ পরিবারের বৃত্তি-ব্যবসায়গত সংখ্যা মোট কত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ তিন বংসর অনুসন্ধানে তাহা স্থির করিয়াছেন। এই হিসাবানুযায়ী ২ লক্ষাবিক পরিবার কৃষি-কার্য করে, ৮৬ হাজার মাই ধরে, ৬০ হাজার তাঁত বোনে, ১৭ হাজার ছুতারের ও ২২ হাজার কুস্তকারের কাজ করে, ১৬ হাজার বাঁশ ও বেতের কাজ করে, ১১ হাজার স্বর্ণকারের ও ৩৪ হাজার মুচির কাজ করে। কাঁচ-পিতলের কাজ, সোলা ও শাকের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, রেশম কাঁচ পালন, শিঙের কাজ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন পরিবারের সংখ্যাও নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার সংখ্যা দুই হইতে দশ হাজারের মধ্যে। পরিবার পিছু পাঁচ জন হিসাবে লোক-সংখ্যা বরা হইলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই কোটি দাঁড়ায় ইহার মধ্যে পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ কত, নারী ও শিশু কত, কত লোক এই সকল বৃত্তি ব্যবসায় অঙ্গসরণ করে এবং পরিবার পিছু মাসিক বা বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কত, এগুলি নির্ধারিত হইলে তবে পল্লী-বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এতৎসম্পর্কে এক ‘দৈনিক’ সহযোগী বলিতে-ছেন যে শেষোক্ত তথ্য সংগৃহীত হইলে বুঝা যাইবে যে আমাদের দেশের লোক শহরের দিকে ঝুঁকিয়া করিতেছে, পুরীপার না ভাবিয়া শহর ও নগরের বহু হাওয়ার মধ্যে আর্থিক বাস্তবতার পথ খুঁজিতেছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, এই সমস্যা উদ্ভব হইয়াছিল প্রায় ২৫০ বংসর পূর্বে; এবং ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে ১০০

বঙ্গের পূর্বে। এই দুইটি তথ্য সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই। অনেকই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে পত্রী অকলের অবনতি প্রাকৃতিক বিবর্তনের অঙ্গ। এই ভাবে ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করিলে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে দোষী করা যাইবে না।

ইংরেজী শিক্ষার ফল

“শিকারতী” পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ত্রিপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী “বঙ্গ শিক্ষা সম্বন্ধে হুঁচকার কথা” প্রসঙ্গে যে ঐতিহাসিক তথ্য শুনাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইংরেজী শিক্ষার অশেষ দোষ। কিন্তু সর্বদোষ হরণ করিয়া ইহা এমন একটি অবদন ঘটাইয়াছে যে, তাহা উল্লেখ না করিলে ঐতিহাসিকের সত্যকে লজ্জিত করা হইবে। প্রফুল্লবাবুর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা আসোচনা করিব। কারণ তাঁহার ভাব বা মত পরবর্তী দেশের সাধারণ জনমতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

“ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজ শাসন এ দেশে সুদূর পরিবার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং সে কারণে তাহা কখনও জাতীয় উন্নতির সহায়ক হয় নাই। এ শিক্ষা কখনও জাতির প্রাণশক্তিকে জাগার নাই, বরং এই নিষ্পেষিত দেশকে আরও নিষ্পেষিত করিয়াছে। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার শাসন ও শোষণের বাহক উক্ত বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতিকে সর্বোপযোগী পরিবর্তন করা দরকার। ইহা জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সর্বপ্রাথমিক প্রয়োজন। যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তথাপি উক্ত প্রাথমিক কার্যের অসম্পূর্ণতার জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে এদেশে গত তিন বৎসরে ভেদন কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।”

ইংরেজ শাসন সুদূর পরিবার জন্য ব্রিটিশ-রাজ নিকোদের পরীক্ষিত শিক্ষা এদেশে আনয়ন করিলেন। তাঁহাদের বাহ্য প্রেষ্ঠ শিক্ষা ছিল তাহাই এদেশে প্রবর্তিত হয়। তাহার ফলে ব্রিটিশ-রাজের অবসান হয়। এদেশে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাহারা ভাবে ভাবনার, আচার আচরণে পাকাতা দেশীয়। কিন্তু ইহারা ইহা ব্রাহ্ম আন্দোলনের শ্রষ্টা এবং জাতীয় সংকল্পের রক্ষক। এই সংকল্পের উপর তাঁহাদের কোন প্রভা বা বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মমতা ছিল এবং এই মমতার প্রেরণায়ই নিকোদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। “ইয়ং বেঙ্গল”র আদি ও অন্তের ইহাই হইল সত্য ঐতিহাস।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গত এই আধুনিক আত্মীয়মিত্যাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী মোলানা আবুল কালাম আজাদ এই উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের “বিশ্বভারতী”—তাঁহার সাধনার ধন

নব-কলেবর ধারণ করিল। এই উপলক্ষে “বিশ্বভারতী”র হিতৈষীরা আমন্ত্রিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে মান্য প্রত্ন তঁাহাদের মনে জাগিয়া উঠিবে। তাহার মান্য কারণ আছে। “বিশ্বভারতী”র বীজমন্ত্র ছিল—“সত্যম্ শিবম্ আনন্দম্”। ভারতবর্ষের বিধান পরিষদ, অজ্ঞাত কারণে, ধামধেমালি বশে—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করিবার কালে “সত্যম্কে” দিয়াছেন বিসর্জন। এই বেঙ্গল কাহার তাহা জানি না।

সেইকালেই নানা প্রত্ন উদ্ভিগ্নাছে এবং এই বিষয়ে “পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা” ৮ই আধুনিক সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা বাঙালী মনের কোতের পরিচায়ক : “...রবীন্দ্রনাথ একক প্রচেষ্টায় বাহ্য করিতে চাহিয়াছিলেন, সহস্র শক্তি প্রত্যেকভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহার বিরোধিতা করিয়াছে, প্রতিজ্ঞাশীল শক্তি সেই প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়াছে, চতুর্দিক হইতে পিষ্ট করিয়া হাস ক্রন্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী যে পথে চলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহার উপলক্ষ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বংসের পন্থাকে তিনি ঘোষণা করিতে পারেন নাই।

“বর্তমানে বিশ্বভারতীর যে পরিবর্তন ঘটিল, আমাদের আশঙ্কা, সেই পরিবর্তন কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সফল করিবার সহায়তা করিবে? আজ যাহাদের কর্তৃত্বে, যাহাদের নির্দেশে বিশ্বভারতী পরিচালিত হইবে, তাহারা কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাস করেন? যে সত্য, সন্দেহ ও মতলের বাণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-আদর্শের মূল ভিত্তি, তাহা কি তাঁহাদেরই কর্তৃত্বাধীনে চূড়ান্ত অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে না? যে ব্যক্তিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সৃষ্টি, সেই ব্যক্তিকতাই কি বর্তমান কর্তব্যের অহুত্ব, চেতনাকে প্রভাবিত করে নাই?”

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

প্রায় দুই মাস পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। একজন পেন্সনপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, ত্রিপ্রফুল্লচন্দ্র চন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের সরকার কর্তৃক তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন আর আর সভ্যগণও ‘মনোনীত’ বলিলে সত্য কথা বলা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অহুমোদিত; বিশ্বভারতী কর্তৃক অহুমোদিত, সরকারের বেঙ্গলমাফিক মনোনীত; উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সভা কর্তৃক মনোনীত; কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণ বা তাঁদের প্রতিনিধি-হানীর শিক্ষাবিদগণ, অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী, এই লোকসমষ্টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কর্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মিত্রমক, যে শিক্ষা এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইত।

প্রারম্ভিক সংগঠন হিসাবে ইহার বেশী গণভঙ্গুলক কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়ত বর্তমানে সম্ভব হয় নাই। কারণ ১৯৫২ সাল হইতে আমাদের পরিচিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীকার খেলা শেষ হইল। আরম্ভ হইল নুতন নামের ‘স্কুল ফাইনাল’ পরীকা। ‘স্কুল ফাইনাল’ নামের অর্থ হইল স্কুলের শিক্ষার অন্তে যে পরীকা। ইহা পরিচালনা করিবেন এই মাধ্যমিক শিা বোর্ড। কোন্ শিক্ষার অন্ত, তাহা এই নুতন নামে বুঝা যায় না।

এই সব শাসনিক চুলচেরা প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া, এখন এই শিা বোর্ডের কার্যপদ্ধতি ও আদর্শ সহজে একটু আলোচনা করিতে চাই। সম্পাদকীয় মন্তব্যের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে তাহা হয়ত সম্ভব নয়, এবং এই বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য ও নামা অবিবেশনের নানা আলোচনার গতি সহজে আমাদের কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। সেইজন্য শোনা কথার উপর নির্ভর করিতে হয়; বোর্ডের সভাপনের কথাবার্তা হইতে অনেক তথ্যের ঞ্চ কহিয়া লইতে হয়। সেইরূপ জ্ঞানই আমাদের বর্তমান মন্তব্যের উপকরণ।

এই সব কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে বোর্ডের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। এক দলের দলপতি নাকি ডক্টর ভায়াপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্ দলের দলপতির নাম এখনও তনি নাই। সভাপন কে কোন্ দলের তাহা জানি না। কারণ দলাদলি ও ভোটাতুটির সংবাদ এখন পর্যন্ত অতি যত্নে গোপন রাখা হইয়াছে।

কিন্তু এই দলাদলি বা ভোটাতুটির সংবাদে আমরা বিচলিত হই নাই। আজকাল পত্রীপ্রাণে যত্নতর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতা নগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেমন লোকে ইংরেজী শিক্ষার ঘোহে দ্বিগ্ণবিক্ষ জ্ঞান হারায়াছিলেন সেইরূপ এখন পত্রী-বাসীরা কহিতেছেন। ইংরেজী আদলের পেজমপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদগণ একদিক হইতে চাহেন শিক্ষার প্রসার, অন্ দিকে দাবি করিতে-ছেন স্কুল-ঘরের এমন কতকগুলি সৌষ্ঠব যাহাতে এই শিক্ষার নিশ্চিত গতিরোধ হইবে।

দৃষ্টান্তরূপ এগুলির উল্লেখ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি শিক্ষকের গুণাবলী সহজে এমন অনেক কিছু সর্গ আরোপিত হইতেছে যে পত্রীবাসীর নক্তি নাই তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। বি-টি শিকক চাই, বিলাত ফেরত হইলে আরও ভাল। ব্যাখ্যারের কন্ চাই গ্রাজুয়েট শিক্ষক। ব্যাখ্যারের শিক্ষক মহাশয় গ্রাজুয়েট হইবার প্রয়োজন কি? আমাদের দ্বিজাত, বাবীম রাষ্ট্রের উপযোগী শিা কি হওয়া উচিত; মাধ্যমিক শিক্ষার নাম কি হইবে; কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের আর্থিক সম্ভার উপযোগী হইবে; বিদ্যালয়ের বাতী-ঘর, খেলার মাঠ, কিম্বাসিয়ার, টিউব ওয়েল

কতখানি আবশ্যক? বোর্ডের সম্পাদকের মিকট হইতে এই প্রশ্নের সহস্রর পাওয়া-বাইবে কি?

গ্রেস মার্ক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস-চ্যাংলার ত্রীশতাব্দী বন্দোপাধ্যায় ‘হুগাডহ’ আপিসে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে এক নম্বরের কন্ কেল করা লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে তাহা ঠিক নহে। বস্তুতঃ দশ নম্বর গ্রেস দিবার পর ইহার এক নম্বরের কন্ কেল করিয়াছে, অর্থাৎ পাস মার্ক অপেক্ষা আসলে ইহার ১১ মার্ক কম পাইয়াছে। ইহাদিগকে পাস করাইলে আবার এক দল এক নম্বরের কন্ কেল করিবে, সুতরাং ইহার শেষ কোথায়? তিনি পরে একটু কথা এই বলিয়াছেন যে ১৪ জন হেড এগজামিনার তাহাকে লিখিত ভাবে জানাইয়াছেন যে বাতা উদারভাবে দেখা হইয়াছে।

আইস-চ্যাংলারের উক্তি আমরা মানিতে পারিলাম না। তিনি ইংরেজী কথায় বলিয়াছেন, ইংরেজী ভিন্ন আর কোন বিষয়ে গ্রেস দেওয়া হয় নাই, সুতরাং সাধারণ ভাবে গ্রেস মার্কের প্রশ্ন উঠে না। ইংরেজীতে একটু পেপারের প্রশ্ন অত্যধিক কঠিন হইয়াছিল এবং ইহা হেড এগজামিনারেরা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই গ্রেস নম্বর দেওয়া হইয়াছিল। বাহার ঐ পেপারে ১০ পাইয়াছে, প্রশ্ন সাধারণতঃ বাহা হইয়া থাকে সেরূপ হইলে ইহারাই হয়ত ৩০ পাইত। সুতরাং ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া এই কতি পূরণ করা যায় না। এক প্রশ্ন কঠিন, তাহার উপর বাতা দেবার নির্দেশও দুব কঠোর রকমের দেওয়া হইয়াছিল। প্রশ্নে এবং বাতা দেবার অতিরিক্ত কড়া কড়ি করিয়া ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া কর্তব্য শেষ হইল ইহা মনে করা অবিচার।

বাংলার প্রশ্ন অত্যধিক কঠিন হইয়াছে। অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ হইয়াছে। ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট, বি-এ তিন পরীকাতেই বাংলার প্রশ্ন সব রকমে ধারাপ হইয়াছে। বি-এতে যে রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রশ্নকর্তা মহাশয়েরা হই খটায়ও লিখিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহার কন্ বহু পরীকারী কেল করিয়াছে। যে ছাত্র সব বিষয়ে ৬০০-র বেশী পাইয়াছে তাহাকে বাংলার ১ নম্বরের কন্ কেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ছেলে মোট ৬০০-র বেশী পাইয়াছে, পদার্থবিদ্যায় শতকরা ৯০ পাইয়াছে, তাহাকে বাংলার ২১১ নম্বরের কন্ কেল করাইবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। আগে নিয়ম ছিল যে কোন ছাত্র সব বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়া এক বিষয়ে অল্প কয়েক মার্কের কন্ কেল করিলে ঐ বিষয়টি উদার ভাবে দেখিয়া তাহাকে পাস করাইয়া দেওয়া হইত, যে নম্বর কম পড়িত তাহা মোট নম্বর হইতে কাটিয়া লওয়া হইত। এই

নিয়ম পালনে বাধা কিসের? কেহিষ্টের প্রেরে যে সব ভুল ছিল তাহা কলঙ্কজনক। এর জত যে সমস্ত হাজি কেল করিয়াছে তাহারা অত বিঘরে পাস করিয়া থাকিলে উদার ভাবে বাতা পুনঃ পরীক্ষা করিয়া পাস করাইয়া দেওয়া যাইত। তাহা না করিয়া এরূপ কেহে পুনঃ পরীক্ষার মার্ক আরও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনিরাহি। হেড এগকামি-নাররা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা উদারভাবে বাতা দেখিয়াছেন। ইহার কোন ঠাণ্ডা আছে কি না আমি না। যে হেড এগকামিয়ার পরীক্ষকের দেওয়া ৮ কমাইয়া ১ করিয়াছেন তিনিও ত উদারভাবে বাতা দেখিয়াছেন বলিয়া সহি করিয়াছেন? পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবহার একসঙ্গে আমূল পরিবর্তন না হইলে বর্তমান অশিক্ষিততা আরও বাড়িবে। ইহাতে হাজিহাজী, অতিভাবক ও দেশবাসী তিন পক্ষই কতিপয় হইতে থাকিবে।

তাইস-স্যালেলার মহাশয়ের এ বিষয়েও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে শিক্ষার মান ও পরীক্ষার মান অসম হইলে হাজির প্রতি অবিচার করা হয়। সে জ্ঞান তাঁহার আছে বলিয়া মনে হয় না। এবারে পরীক্ষার অতার ও অবিচার অতি স্পষ্ট, সুতরাং তাইস-স্যালেলার মহাশয়ের “চুন প্রলেপ” চেষ্টা অসমীচীন হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী গ্রন্থ

গত ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার শত-বার্ষিকী উৎসবের সূচনা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে যে পরিচালন-সমিতি গঠিত হয় তাহার কর্তৃপক্ষ হির করেন যে, বাংলাদেশে খ্রীষ্টিকার ইতিহাস রচনা এই উৎসবের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হউক। উপরুক্ত গবেষক ও ঐতিহাসিকের হাতে তাহার ভারপূর্ণ করা হয়। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল আমরা পুস্তাকারে প্রাপ্ত হইরাছি। তদুক্ত পরিচালন-সমিতিতে বক্তব্য জ্ঞাপন করিতেছি।

যে সব বাঙালী ঐতিহাসিক এই আড়াই শত পৃষ্ঠার পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের সংকলন করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙালী শিক্ষিত সমাজে সম্মানিত। এই পৃষ্ঠা-সংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় লিখিত। বক্তব্যের সংকলিত অংশে ঐরকমের বন্দোপাধ্যায়ের “নাহিভো বঙ্গনারী” ১৯৫-২১১ পৃষ্ঠা ভাষ্যে পূর্ণ। খ্রীষোপেশচন্দ্র বাগলের “বেথুন স্কুল ও কলেজের কথা” প্রবন্ধে ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জরুরী ও জরোয়তির বিবরণ আছে (২১২-২২৪ পৃষ্ঠা)। বেথুন কলেজের জনৈক হাজী জীমতী ভারতী রায় শতবার্ষিকী উৎসবের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। “রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বঙ্গমহিলা”—রাজনীতিকক্ষেে বাঙালী নারীর যোগদানের বিবরণ; লেখক খ্রীষোপেশচন্দ্র বাগল। রাজনীতির

ক্ষেে নারীর অবদানের সত্যকার প্রমাণ পাওয়া যাইবে কালের সংগঠনকার্যে। সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

এই পুস্তকের প্রাণ অংশ ইংরেজী প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ। ১-১২৫ পৃষ্ঠায় খ্রীষোপেশচন্দ্র বাগল সমসাময়িক সরকারী দলিল-পত্র, এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্রাদির উপর নির্ভর করিয়া বেথুন স্কুল ও কলেজের প্রামাণিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ বর্তমান যুগে বাংলা-দেশের খ্রীষ্টিকার ইতিহাস বলিলে তাহার প্রকৃত বর্ণনা করা হইবে। আচার্য্য যহুনাথ সরকারের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের মধ্যে খোপেশবাবুর একটা স্থান আছে। শতাব্দিক বর্ষব্যাপী নারী-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাসমূহের একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন খ্রীষ্টজাতি লিভিং (পৃ. ১২৬-৬৯)।

বাঙালী সমাজ এক শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিদেশী শাসনের ও পরদেশী সংস্কৃতির সম্মুখীন হইয়া কি করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে, আগ্রহ চাইয়া এই দুইটি বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এখনও - প্রায় প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্রের ভিত্তে তার পরিচর পাওয়া যায়। বেথুন স্কুল ও কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে তার মধ্যে বাঙালী সমাজের অনেক দোষ গুণের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেই দোষ-গুণ সর্ক-ভারতীর।

আমরা সুখী হইতাম যদি সর্কভারতীর খ্রীষ্টিকার ইতিহাস এই উপলক্ষে নতুন করিয়া সংগৃহীত হইত। ১৯৪৯ সালে যখন এই উৎসবের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় তৎসব পরিচালন-সমিতির নিকট তখন আমরা এইরূপ অগ্রোধ করিয়াছিলাম। তদন্তে পাইলাম যে, পরিচালন-সমিতি সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাজাজ, বোখাই প্রভৃতি প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ তৎসম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখান নাই। পত্র লিখিয়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টিকার সেবার আদ-নিবেদিত শিক্ষিত মন এরূপভাবে কৃষ্ণরক্তি অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা বর্তমান যুগের অরূপযোগী এবং ভারতবর্ষের কল্যাণের পরিণহী।

সাধারণ নাগরী লিপি

ভারতবর্ষে লিপি-সমস্যা—মান্য অকলে ও মান্য সমাজে বিভিন্ন অক্ষর থাকার জত যে সমস্তার উত্তর হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আচার্য্য বিনোবা ভাবে বাহা বলিয়াছেন, তদপেকা সরল উপায়ের কথা আমরা করনা করিতে পারি না। গত এই আশ্বিনের বাংলা “হরিজন” পত্রিকার তাহার অল্পলিখন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জত হুসিয়া দিলাম :

“দৃষ্টান্তরূপ বিনোবা ভারতবর্ষের ভাবাসমস্তার উল্লেখ করিয়া বলেন, হারাবরাবাদ রাজ্যে মারাঠি, কানার, তেলেগু,

উর্দু ও হিন্দী প্রভৃতি যে পাঁচটি ভাষা বলা হয় তার সবগুলির লেখাই নাগরী লিপি অবলম্বন করিলে তাহারা ভারতের ভাষা-সমস্তার সমাধানের দিকে সাহায্য করিতে পারে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর হইতে বেশী পৃথক নয়; কিন্তু তাহাদের লিপিগুলি পৃথক এবং এক হইতে অত্যন্ত দূরত্বের পক্ষে সেগুলি দেখাৱালের মত কাজ করে। সকল-গুলির পক্ষে এক সাধারণ লিপি থাকিলে তাহাদের লেখাপড়ার সুবিধা হইবে এবং তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকটে আনিয়া দিবে। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, লিপির বিভিন্নতার তাহাকে অশেষ দুর্ভোগ জুটিতে হইয়াছিল। এই রাজ্য অথবা কোন পুস্তকপ্রকাশক যদি প্রত্যেক ভাষার সংসাহিত্য নাগরী লিপিতে প্রকাশ করার ভার নেন, তবে ভারতের মহা উপকার করা হইবে।

“উর্দু যদি নাগরী লিপি গ্রহণ করে তবে তাহার দ্বারা ইহা হিন্দীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং তাহা হিন্দীকে সংস্কৃতের কৃত্রিম প্রভাব হইতে রক্ষা করিবে। বিমোবা একথা বলিতে চান না যে, উর্দু বা কান্নাভ লিপিকে একেবারে বর্জন করিতে হইবে। কিন্তু যদি এগুলির সঙ্গে তাহারা নাগরী লিপিও গ্রহণ করেন এবং তাহা ব্যবহার করেন, তবে তাহারা কালক্রমে এমন এক আদর্শ হিন্দুস্থানীর সৃষ্টি করিতে পারিবেন, অতঃসকলে দুই হইয়া বাহার অনুসরণ করিবে। বর্তমানে যদিও তাহারা জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা সত্ত্বেও একমত, তবুও সে ভাষা দেখিতে যে কেমন হইবে তাহা কেহই জানেন না এবং সেজন্যই তীব্র অশচি মিস্রল আলোচনার সৃষ্টি হয়। তাহাদের আদর্শ হিন্দুস্থানী এই সকল তীব্রতার অবসান ঘটাইবে। উর্দুর সেখানে ব্যবহার চলে এবং তাহার বেশ উন্নতিও হইয়াছে। তাহাদের কেবল ইহাকে একটু সহজ করিতে হইবে এবং ইহাকে নাগরী লিপিতে লিখিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহারা জাতীয়-ভাষা-সমস্তার সমাধানে উল্লেখযোগ্য দাম করিতে পারিবেন। ভারতের সমস্তা সমাধানে কেমন করিয়া তাহারা সাহায্য করিতে পারেন, ইহা তাহার একটি দুর্ভাগ্য হইবে।”

আচার্য্য তাবের প্রস্তাব কোন রাজ্যের সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লোকের মিত্যা তীতি থাকিবে। তীতি অপেক্ষা পরের লিপির প্রতি সহজাত সংস্কারই বর্তমান সমস্তা উৎপাদন করিয়াছে। এক আদর্শ, এক ভাষা, এক লিপি এই জাতীয় সংযোগ না হইলে মহাভারত সৃষ্টি হইতে পারে না। তবুও আমাদের মন এই আদর্শের আশা ছাড়িতে পারে না।

পূর্ববঙ্গে বাধ্যতামূলক উর্দু শিক্ষা

পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ সম্মতি এক নির্দেশ জারী

করিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানে মুসলমান ছাত্রদের বর্ণ পরিচয় উর্দু ভাষায় রক্ষা করিতে হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তাহারা কেবল উর্দু ভাষাই শিখিবে এবং চতুর্থ শ্রেণী হইতে ইচ্ছাধীন বিষয়রূপে বাদলা লওয়া চলিবে। উর্দু বরাবরই অবশ্যপাঠ্য ভাষা রূপে পরি-গণিত থাকিবে। পূর্ববঙ্গ সরকারের এই আদেশে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দেখা দিবে। এই আদেশ যদিও মুসলমান ছাত্রদের প্রতি প্রযোজ্য, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রেরাও এই আদেশের আওতার পড়িবে। কারণ পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু ছাত্র ও মুসলমান ছাত্র একই স্কুলে বিভাজ্যাস করিয়া থাকে। স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের উর্দু শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু ছাত্রদের বাংলা শিখিবার ব্যবস্থা থাকিবে এরূপ কোন কথা ঐ আদেশে নাই, সুতরাং হিন্দু ছেলেদেরও ঐ সঙ্গে উর্দুতে বর্ণ পরিচয় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। কলে হয় তাহা-দিগকে স্কুল ছাড়িতে হইবে নতুবা উর্দু পড়িতে হইবে।

রাজনীতি ও নিষ্ঠুরতা

গত ১লা আবিবের “অকর” পত্রিকার (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পত্রীসমাজের সাপ্তাহিক মুদ্রণ) “অপপ্রায়স” শিরোনামের যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে পৃথিবীর ধ্বংসের দিন বনাইয়া আসিতেছে :

“সহযোগী সংগঠন পত্রিকা একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের ইস্তাহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সহযোগী বলিতেছেন, ‘আমরা জানি দেশে দুর্ভিক্ষ হইতেছে না দেখিয়া কোন কোন মেতা ও শিক্ষিত ব্যক্তি মিথ্যাত্ব বিমর্ষ হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ না হইলে লোকে যে নির্বাচনে কংগ্রেসকেই আবার ভোট দিবে, এই আক্ষেপ কাহারও কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের পরাক্রম দেখিবার সুযোগ লাভের লোভে মিলে মিলে একেবারে অমায়ুষ্য করিয়া ফেলিতেও ইহাদের আপত্তি নাই।’

পান্চাত্য বৈজ্ঞানিক নির্বিকার চিত্তে আমাদের শুনাইতে-ছেন যে তাহাদের গবেষণাগারে এমন সব বিষ আবিষ্কৃত হইয়া গুদামঘাত হইয়া আছে যে তাহা বাতালে হুতাইয়া দিলে ২১ ঘণ্টার মধ্যে এক একটা জনপদ—পশ্চিম ইউরোপ বা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনপদ—প্রায়শূন্য হইয়া যাইবে; তাহার গাছপালা পুড়িয়া যাইবে। আমাদের পুরান প্রভৃতি পুণ্ডকে যে দাদন স্বর্গের আবির্ভাবে সৃষ্টি পুড়িয়া যাইবে এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী পাঠ করিয়াছি, তাহা নিজেদের জীবনে দেখিবার সুযোগ হইবে না কি ?

আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রতীক

আগামী পৌষ-মাঘ মাসে ভারতব্রাহ্মে নৃত্য নির্বাচন

হইবে। প্রায় ১৭ কোটি নরনারী এক কি দু'দিনের জুড় দেশের নিরাক্রম হইবেন। কারণ তাঁহাদের পছন্দ বা খেয়াল মত যেসব সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সক্রিয়গণী মনোনীত হইবেন এবং এইভাবে তাঁহারা ই আপাদমী পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া দেশের শাসনকার্য্য চালাইবেন। এই ভোটাভুটিতে মানা দল প্রতিযোগিতা করিবেন, এবং অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত নর-নারীর সুবিধার জুড় নানা চিহ্ন নানা দল পছন্দ করিরাছেন। এ সম্বন্ধে নির্বাচন পরিচালক ঐনুত্‌ত্বার সেন সকল দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। নিম্নে তার তালিকা দিলাম :

করওয়ার্ড ব্লক— দাঁতান সিংহ
ঐ (কুইকার পহী)— মাংসুয়ের হাত
অবিল ভারত হিন্দুগণসভা— খোকা ও খোড়সওয়ার
কিয়াণ-মহম্মদ-প্রজাদল— কুঁড়ে ঘর
অবিল ভারত রামরাজ্য পরিষদ— উদীয়মান সূর্য্য
ভারতীয় তপস্বীরা ফেডারেশন— হাতী
ভারতীয় কাতীর কংগ্রেস— কোয়ালে বঁধা এক কোড়া বলদ
ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল (সোশ্যালিষ্ট পার্টি)— গাছ
ভারতীয় সাম্যবাদী দল (কম্যুনিষ্ট পার্টি)— বানের শীষ ও কাণ্ডে

কয়েকটি প্রকাণ্ড ভুলের পরিণাম

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখের “আনন্দ বাজার পত্রিকা”র যে “বাহীনতা” সংখ্যা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ঐঅমলেপু সেনগুপ্ত একটি মন্তব্য করিরাছেন যার ফলে কোন ভুল কমিয়া যায় নাই বা কোন সমস্তার সমাধান হইতে পারে না। বর্তমানের সফট অবস্থা ৪ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রকাণ্ড ভুলেরই পরিণাম, ইহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। এই প্রকাণ্ড ভুল কয়টির মধ্যে ভারত-বিতাগে স্বীকৃতি সর্ব্ব প্রধান। এই মন্তব্যের মধ্যে যে সূক্তি আছে তাহা মার্কিনী সাংবাদিক হানসন বন্ডটনের সমপর্যায়ের। ক্লকভেন্ট ও চার্কিল ইন্সটার যে প্রকাণ্ড ভুল করিরাছিলেন তার ফলে আজ পাকিস্তান সত্যতা নাকি বিপদ হইরাছে। সেইরূপ নেহরু ও প্যাটেল ভারত-বিতাগ স্বীকার করিয়া ৩৫ কোটি বা ৪০ কোটি নরনারীর জীবন, সম্মান ও বিত্ত বিপন্ন করিরাছেন। এইরূপ বক্তব্যাদির সূক্তি স্বীকার করিয়া লইতাম যদি ইন্সটার ক্লকভেন্ট-চার্কিল আর কি করিতে পারিতেন তাহা বন্ডটনের প্রতীতি ব্যাখ্যাকার-গণের প্রবন্ধে দেখিতে পাইতাম। সেইরূপ দিল্লিতে নেহরু-প্যাটেলের গভ্যস্তর কি ছিল, তাহা দেখাইতে পারিলে অমলেপু বাবুর বক্তব্যের মূল্য ছিল। নেহরু ও প্যাটেলের নীতির সমর্থক না হইরাও তাঁদের হইরা এই কথা বলা যায় যে ‘পাকিস্তান’ প্রতিষ্ঠার সম্মতি না দিলে আমাদের কোটি কোটি নর-নারীর অবস্থা বর্তমানের অপেক্ষা উন্নততর হইত তাহা প্রমাণ-ভাব্য অগ্রাহ।

একই ডালে পেচক ও দাঁড়কাক

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত ‘পূর্বাচল’ (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ২০শে তারিখ সংখ্যার আসাম রাজ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যিতালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইরাছে। ধারা আসামের রাজ-নৈতিক হালচালের সন্ধান রাখেন তাঁরা এই ‘মিকাহ’ বিবাহের সংবাদে আশ্চর্য্যাব্বিত হইবেন না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে ধান তুলিবার সময়, পাট তুলিবার সময় একপ অগুন্ডি বিবাহ হয়। প্রায়ই ২০ মাস পরে ‘তালাকে’র ঘুম পড়িয়া যায়। আমাদের কেবল জাতিতে কৌতুহল হয় যে এই ব্যাপারে কে বর ও কে কনে—দুগু ও বৃদ্ধ।

“...ভারতবর্ষকে ‘সেকুলার’ রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টায় জওহরলালজীকে সাহায্য করাই হইল তাহাদের কংগ্রেসে যোগদানের অন্ততম উদ্দেশ্য। তাহাতে লীগ-নেতা জমাব সৈয়দ সাদউল্লা ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছেন, যেন ভারতবর্ষ বাস্তব ক্ষেত্রে আচার-আচরণে কার্য্যতঃ ‘সেকুলার’ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে বা অনুরূপ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই। একপ হীন ইঙ্গিত একমাত্র লীগ-নেতা ও তাঁহার সাঙ্গাতদের পক্ষেই সম্ভব। ইহা ‘সেকুলার’ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র না হইরা যদি পাকিস্তানের জায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধর্ম্মাঙ্ক মুন্না রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে চারি কোটি মুসলমানকে শাস্তিতে ও নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে দেয়া হইত না। আজও যে চারি কোটি মুসলমান সম্মানে ও শাস্তিতে এই রাষ্ট্রে বাস করিতে পারিতেছেন, তাহাই ভারতবর্ষের সেকুলারিজম এর স্পষ্ট নিদর্শন।

“প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতাবাদ হইল প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও লীগের মিলন কিরূপে সম্ভব হইল? মুসলিম লীগ উৎকট সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান না হইলেও ইহা বর্তমানে খোর প্রতিক্রিয়াশীল। সমস্বার্থের ভিত্তিতেই এই উত্তর প্রতিষ্ঠানের সম্মিলন সম্ভব হইরাছে। প্রকৃতিগত কারণেও এই দুইটি হুট এতদূর মিলন ঘটরাছে। একটি হলে দুইটি প্রতিষ্ঠানের যে অপূর্ণ চারিত্রিক সাদৃশ্য আছে তাহা হইতেছে উত্তরেই প্রতিক্রিয়াশীল।”

“প্রতিক্রিয়াশীল” শব্দটি হানে অহানে এত অধিক ব্যবহার করা হইতেছে যে তার কোন জালা নাই। কিরার বিরুদ্ধে হয় প্রতিক্রিয়া। ভারতরাষ্ট্রে কিসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিরাছে? প্রতিক্রিয়ার প্রের আজ বিগ-জনীন হইরা পড়িরাছে, কেবল কংগ্রেসই তৎকর্তৃক অভিহৃত হয় নাই। কিন্তু আসাম রাজ্যে বাহা ঘটতেছে তাহার গভীরে বাইতে হইবে এবং তাহা আধিকার করিতে হইলে ভাষা-বিদের আশ্রয় লইতে হয়। একপ একজন ভাষাবিদ উষ্টর

হুদীভূমির চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন পূর্বে আসামের ভাষা-সঙ্কট সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আজও তাহা সত্য; আজও ভাষার হ্রদ রাজনীতিকে মিশ্রিত করিতেছে। ভারত-রাষ্ট্রের চিরশত্রু মুসলিম লীগের সঙ্গে মিতালী রাষ্ট্রদ্রোহের সমান।

অনীতিবাবুর বক্তব্য এইরূপ ছিল :

“...উপাধৃতকালে আসামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর ভাষা অসমীয়া; ইহা কেবল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিম অংশে গোৱালপাড়া জেলার বাংলাও প্রচলিত। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে পার্শ্বভাগে অকলে বিভিন্ন পাহাড়ী ভাষা প্রচলিত—যথা গারো, খাসিয়া মিকির উমাঙ্গা বা কাছাড়ী নাগা এবং মণিপুরী কুকী ও লুসাই। হাদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে খাসিয়া ও মণিপুরীরা বিশেষ উন্নত এবং আমি নিজে মণিপুরে ও শিলং যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে আমার মনে কোম সন্দেহ নাই যে আসামের এই সকল পার্শ্বভাগে নিখিল-আসামের ব্রাহ্মভাষা হিসাবে বরং হিন্দীকে চায়—মণিপুরীদের অনেকের বাংলাতেও আপত্তি নাই—কিন্তু অসমীয়া কেহই চাহে না। আসামের পার্শ্বভাগে জাতিসমূহ এখনকার আসামের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ আসামের বাংলাভাষী। কোন্‌ দ্বায়ে এক-তৃতীয়াংশের ভাষা (এবং সেই ভাষার সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ব্যাপারিক ও রাজনীতিক প্রভাব অল্প আর একটি তৃতীয়াংশের ভাষা অপেক্ষা গুরুতর ইহা কেহ বলিবে না) অল্প দুই-তৃতীয়াংশের উপরে কোর করিয়া চাপানো যাউতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধির অসম্মা। ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীর অল্পতম মৌলিক অধিকার হইতেছে যে সে ভারতের যে অংশেই বাস করুক না কেন, তাহার ভাষা এবং ভাষাগত সংস্কৃতি সে অক্ষুর রাগিতে পারিবে।...

আসাম প্রদেশের মুক্তিসঙ্গত নাম হওয়া উচিত “পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ এবং এই পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের চারিটি বিশিষ্ট বণ্ড, ইহার প্রত্যেকটির অধিবাসী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও বতন্ত্র—(১) হিমালয়ের সাহুদেশের পার্শ্বভাগে আবর, মিরি, মিমি ও ডকলা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত, বালিগাঙ্গা ও দিয়া সীমান্ত অঞ্চল; (২) অসমিয়া ভাষীদের দ্বারা আবৃত পুন্ড উপত্যকা, এই অঞ্চলের পশ্চিমে বাঙালীদেরও বাস; ৩) পার্শ্বভাগ অঞ্চল—গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, মওগী জেলার কয় পাহাড় এবং নাগা পর্বত অঞ্চল, মণিপুর ও লুসাই পাহাড়; (৪) হুগা উপত্যকার কাছাড় ও গ্রীহটের অংশ—যাহা বাংলাভাষা প্রচলিত।”

শতকরা ৩০ জন লোক যদি নিজেদের স্বাধীন বাকী ৬৭ নর উপরে স্থাপিত করিতে চায় তবে এরূপ অস্বাভাবিক “মিলাহ” হাজা অল্প গতি কি আছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ

গত ১৮ই তারিখের “জনশক্তি” (সাপ্তাহিক) পত্রিকার “ত্রিবাণ্ডব” এই প্রস্তাবে এক জন লেখক যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুকা যায় কেন ত্রিপুরার প্রজাবর্গ পাকিস্তানের আশঙ্কার দিন কাটাতেছে। পুরাতন কথার, আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের অকর্ণ্যতার কথা উল্লেখ করিতে চাই না। এখন “যাজা” শেষ হইলে রাষ্ট্রের মঙ্গল।

“ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আসাম-কাছাড়ের সংযোগ নিয়ে যে অসুস্থ কাণ্ড ঘটে গেছে, তা সর্বজনবিদিত।

সংযোগের পরিকল্পনা প্রস্তুত হ’ল, নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ার এসে আত্মনা গাভলেন ত্রিপুরার। কত কন্টাক্টার এলেন, তাদের নিয়ে কাজও আরম্ভ হ’ল, লক লক টাকা ব্যয় হতে লাগল। কিন্তু তার পর? যখন কন্টাক্টাররা বিলের টাকা নিয়ে ঘরে উঠেছেন, তখন দেখা গেল, পথের যাজা হয়েছ ভুল পথে আর টাকাগুলো গেছে মাঠে মাঠে। ইঞ্জিনিয়াররা স্থান ত্যাগ করলেন অথবা করতে বাধ্য হলেন, এলেন নতুনের দল, আবার আরম্ভ হ’ল নতুন রাস্তা, এলেন নতুন কন্টাক্টার। এবার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে যাজা শুরু হ’ল।...”

বন্দী আরাকানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

গত জাৰণ-ভাদ্র মাসের শেষে একটি সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার মর্মার্থ এই : পাকিস্তানের সাহায্যে এবং সমর্থনে একদল মুসলিম ‘মুজাহিদ’ বা বর্ষযুদ্ধের দৈনিক ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চলে ‘জেহাদ’ চালাইতেছে এবং বৃহৎ এ তাহারা সম্ভ্রান্তি একটি ‘শরিয়াতী সাধারণতন্ত্র’ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

উক্ত ‘সাধারণতন্ত্রের’ প্রধান হইতেছেন আবুল কাশিম নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ‘ল’ গ্রাজুয়েট। আরাকানের তিনি একজন বনী কর্মিদার। তাঁর দলে কয়েক শত সমস্ত ‘মুজাহিদ’ আছে। যে ‘সাধারণতন্ত্র’ তাহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সেটি অবশ্য একটি ‘ভ্রাম্যমাণ সাধারণতন্ত্র’। ব্রহ্মদেশের সৈন্ত-দলের দৃষ্টিগোচর হওয়ার উপরই ইহা নির্ভরশীল। নাক নামে যে নদীটি ব্রহ্মদেশের আরাকান অঞ্চল এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত চট্টগ্রামের পার্শ্বভাগে অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, সেই নদীর কূলে কাশিম ঠৈর্যো ৩০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল শক্ত ঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছে। কাশিম-বাহিনীর কার্য-কলাপ এখন মউডঙেই কোর চলিতেছে।

কাশ্মীরের কারাগার এখানেও চলিতেছে, আরাকানের এই সমস্ত ‘মুজাহিদ’কে গোলাবারুদ কে জোগাইরাছে—অসম্প্রদে প্রকান্তে ও সরকারীভাবে নহে—তৎসম্বন্ধে জরুরী-কল্পনার অবকাশ নাই। সম্ভ্রান্তি পাকিস্তান হইতে মুজাহিদগণ চায় ইকি

মর্টার এবং অর্টোমেটিক অস্ত্রশস্ত্র পাইরাছে। কামা গিরাছে যে, গত দু'বছর সময় আরাকানের জঙ্গলে লুকান ব্রিটিশের কিছু অস্ত্রশস্ত্রও মুসলিম মুজাহিদের হাতে পড়িয়াছে।

একটি 'বাহিনী'ও তাহাদের আছে। এই বিত্তীয় বাহিনীর অধিনায়ক হইতেছে ব্রহ্মদেশীর পুলিশের কনিষ্ঠ প্রাক্তন সাব-ইন্সপেক্টর, নাম জাকর। বিমানবোনে জাকর করেকবার করাচী বাঁতায়াত করিয়াছে। কিছু কান্দীরী মোজা সে আরাকানে আমদানী করিয়াছে।

কিছুদিন হইল কাশিম ও জাকর মিলিত অভিযান চালাইতেছে।

আরাকানের এই মুজাহিদদের স্থানীয় মুসলমান বা ব্রহ্মের বিরোধীদের সহিত কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই; সংযোগও কিছু নাই। এই 'কেহাদের' উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ আকিরাব পর্য্যন্ত চাউল-উৎপাদনকারী সমগ্র অঞ্চলটি পাকিস্তানের আওতার আনা। আকিরাব বন্দরের সামরিক গুরুত্বও রহিয়াছে।

ব্রহ্ম সরকার এই 'কেহাদের' তাহাদের 'বরোয়া' ব্যাপার ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন, তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাহারা নিষ্ঠিষ্ট কোন অভিযোগ উত্থাপন করে নাই।

'মুজাহিদদের' লড়াইয়ের কারণ এই : ব্রহ্মদেশীর সৈন্তদল দেখা গেলেই তাহারা পার্শ্ববর্তী পূর্ব-পাকিস্তানে হুকিরা পড়ে এবং নিজেদের পরিচর দেয় আরাকান হইতে আগন্ত মুসলিম উদাত্ত বলিয়া। তাহারা বলে, আরাকানীদের অভ্যাচারে তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানে সম্প্রতি আরাকানীদের বিরুদ্ধে প্রচার চলিতেছে। ব্রহ্মদেশ হইতে পূর্ববঙ্গে চাউল চোরাই-করাবার প্রসিদ্ধ।

এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহা—এই কণ্ঠের কলে পাকিস্তানী মনোভাব হুনিয়ার চোখে আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। কম্যুনিষ্ট "পক্ষমবাহিনী"র মত পাকিস্তানীদের নিজেদের রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধনে তৎপর দেখা বাইবে।

ভারতরাষ্ট্রে অভ্রের খনি ও ব্যবসায়

"হুগাওয়ার" পত্রিকায় অভ্রখনি ও ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এখন পর্য্যন্ত এই ধর্মিক ভ্রব্যের বাজার বিদেশে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বিলাতে। হুদের সময় অভ্র অনেক সামরিক প্রয়োজনে লাগিয়াছে। হুতরাং তাহার মূল্য বাড়িয়াছে।

"ভারতীয় অভ্রের বেশির ভাগই পাওয়া যায় বিহারের অভ্র-খনি অঞ্চল থেকে। হাজারীবাগ জেলার কোডারমা, পাঁওরা, সাতগাঁওরা, জাহুয়া প্রভৃতি থানা, গয়া জেলার রকৌলি থানা

ও হুদের জেলার ঝাঁঝা টেপনের নিকটবর্তী কতকাংশ নিয়ে গঠিত বাট মাইল লম্বা ও বার মাইল চওড়া বিহারের এই অভ্রখনি অঞ্চল। ছোট বড় অসংখ্য অভ্রখনি আছে এই অঞ্চলে। বিহার তথা ভারতবর্ষের অভ্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হাজারীবাগ জেলার কোডারমা ও তার পরেই গিরিডি। ছোটনাগপুরের তরকারিত ভূমিতে অবস্থিত এই ছুটি জায়গা পৃথিবীর সমস্ত অভ্র-ব্যবসায়ীর কাছে সুপরিচিত। রাজ্য প্রদেশের যেকোন জেলা ও রাজপুতানার কিয়দংশ প্রভৃতি ছোটোও অভ্র পাওয়া যায়। শুভুর ও ভিলওয়ারা যথাক্রমে রাজ্য ও রাজপুতানার অভ্র-ব্যবসায়ের কেন্দ্র।"

ধর্মি বিজ্ঞানে বলে বাবুসার কোর্টজ ধর্মিকের গলিত শ্রোত বাহাকে "পেগমেটাইট" বলে, যখন অভ্রধারণ "মাইকা সিট" গুরুত্রে ভেদ করে, তখনই অভ্রের জন্ম হয়। কোট কোট বৎসর পূর্বে ঐরূপ ভ্রব্যের আগের শ্রোত বহিরাহিল। আজ মানা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পরে ঐরূপ ঘটনামূলগুলি অভ্র-ধর্মিতে পরিণত হইয়াছে। অভ্রধর্মিতে দেখা যায় পেগমেটাইটের মধ্যে পাথরের ভিতরে চাপ চাপ অভ্রের "পকেট" রহিয়াছে।

"অবশ্য সব পেগমেটাইটেই সমান অভ্র পাওয়া যায় না। কোমণ্ড জায়গার খুবই সামান্য পাওয়া যায়—আবার কোমণ্ড জায়গার বেশী পাওয়া যায়। অভ্রখনি অঞ্চলে অনেক জায়গায়ই অভ্রধর্ম-মিশ্রিত এই 'পেগমেটাইট' ভূপৃষ্ঠে দেখতে পাওয়া যায়। বিস্কোরক ব্যবহার ও হাতুড়ি, শাবলের সাহায্যে এই পেগমেটাইট কেটে মাহুয় নীচে নেমে যায়, আর তাড়! পাথরের ভিতর বকবকে অভ্রধর্মগুলি বেরিয়ে পড়ে। এমনভাবে সোজা পচিশ তিরিশ ফুট কেটে আবার পেগমেটাইটের ভিতর দিয়ে লম্বা হুতর কাটা হয়, আর পাথর কাটের অভ্রধর্মগুলি উপরে নিয়ে আসা হয়। এমন করে এক একটী অভ্রখনি পাঁচশ' হ'শ ফুট নীচে পর্য্যন্ত যায় এবং তাতে পচিশ ত্রিশ ফুট অভ্রের অনেকগুলি হুতর কাটা হয়ে যায়, বেশ লম্বা লম্বা। অভ্রখনিগুলি বেশী চওড়া হয় না। কারণ পেগমেটাইটের হুই পাশেই সাধারণতঃ থাকে মাইকা সিটের দেওয়াল। এই 'সিট'-এর মধ্যে অভ্র পাওয়া যায় না বলে এগুলিকে আর কাটা হয় না।

মাটির নীচে অধর্মি হুতর কেটে বাওয়া খুব বিপজ্জনক। মাটির নীচে বড় যাওয়া যায়, ভত্তই গরম—আর ওখানে ত উপরের মত অধর্মি হুতর হাওয়া পাওয়া যায় না। কাকেই বায়ু চলাচলের জগৎ প্রত্যেক ধর্মিতে হুই বা ভতোধিক যুগ করতে হয়—মাটির নীচে অধিকারে কিছুই দেখা যায় না, তাই সবে নিয়ে বেতে হয় মোষবাতি বা লঠন—তাতে ধর্মির নীচে গরম ওষোট জায়গা আরও গরম হয়ে ওঠে। তার পর উপর থেকে মাটি-পাথর চাপাও পড়তে পারে, তারও যথোচিত ব্যবস্থা করতে হয়। পাথরগুলোকে কাটাবার জন্য ব্যবহৃত

হয় ডিমানাইট। বিস্ফোরণে পাথরগুলো কেটে চৌচির হয়ে যায় আর পাথরের বড় হিটকে আসে বুলেটের চেয়েও কোরে। প্রমিকেরা কিছু প্রাণের মাথা ভুজ করে পালাক্রমে দিমরাত এই সব পাভালপুরীতে কাজ করে যাচ্ছে, আর ভূগর্ভ থেকে উঠিয়ে আনছে অতি প্রয়োজনীয় এই সম্পদ। অদেক বরপাতি দরকার হয় বড় বড় বনিতে কাজ করার জন্যে—যেমন বনির নীচে জল হয়—সে সব জল উপরে তুলে কেলবার জন্য চাই বড় বড় পাম্প। অত্র ও পাথর উপরে ভোলবার জন্য চাই বড় বড় ‘হরেট’—তা ছাড়া এই সব পাম্প ও হরেট চালাবার জন্যে থাকে বড় বড় এঞ্জিন ও বরলার। ‘এয়ার কম্প্রেসার’ চাই এই সব শক্ত পাথরে গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে যেসি ড্রিল তার জন্ত।

অত্র বহু ও মন্থণ—কিন্তু ভূগর্ভে অজ্ঞাত জিনিষের সংস্পর্শে এসে এর বহুভার কিছু ব্যতিক্রম ঘটে ও অদেক সময় মানা দাগ পড়ে এবং ভূগর্ভে পাথরের চাপে থাকে বলে কিছু কিছু অত্র অমন্থণও হয়। যত বেশী দাগযুক্ত বা অমন্থণ হবে, ততই তার দাম যাবে কমে—কারণ এগুলির বৈজ্ঞানিক ভরস্ব রোধ করার শক্তি কমে যায়। তাই এরূপ শ্রেণীবিভাগ দরকার হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে অত্রগুলিকে ভাগ করা হয় :—সম্পূর্ণ বহু, দাগযুক্ত মন্থণ যে অত্রগুলিকে সেগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে দামী ও প্রয়োজনীয়—এগুলিকে বলা হয় ইংরেজীতে ‘ক্লিয়ার এস এস’। তারপরে পর্যায়ক্রমে ‘গুড টেনড্’, ‘কোরার টেনড্’, ‘হেভিলি টেনড্’, ‘ব্যাডলি টেনড্’, ইত্যাদি। এমনই শ্রেণীবিভাগ করে অত্রগুলিকে গুণায়িত করে রাখা হয়। তারপর বিদেশ থেকে যেমন যেমন চাহিদা আসতে থাকে, বাস্তব তর্ক করে এগুলিকে চালান দেওয়া হয়।

কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনা

প্রতি যুগে এক একটা শব্দের ব্যবহার মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তাহাদের কর্মশক্তি হরণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের যুগে, যেদিন হইতে মার্কিনের বন ও বৈভব হুনিয়ার উপরে গবরদারি করিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে “প্ল্যামিং পরিকল্পনা” শব্দটি বর্তমান অংকে পাইয়া বসিয়াছে। যেন একটা অদ্ভুত আবিষ্কার এই শব্দের মধ্যে নিহিত আছে।

অবশ্য সাধারণ লোকে ভাবিয়া পায় না যে শব্দটির ব্যবহার কেন এত জনপ্রিয় হইয়াছে। তাহারও তাহাদের “অশিক্ষিত” বুদ্ধি দিয়াও বুঝে যে কীট-পতঙ্গ পর্যায় “পরিকল্পনা” ছাড়া কোন কাজ করে না। বর্ষার জন্ত খাঁড় সঞ্চয় ও আবাসস্থানের ব্যবস্থা একরূপ, শীত ও গ্রীষ্মের ব্যবস্থা অপরূপ। বাড়ি-প্রতিষ্ঠানের মন্থমকিকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ত্রীকিণীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভাষা শুনাইয়াছেন, তাহার আশ্রিত মকিকার নামাবিধি কৌশলের গল্প বলিয়াছেন। এই কৌশিকিতপটু লাত করিবার জন্ত বিরাট কলকারখানার বা

পবেষণাগারের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য অনেক সময় তাবি “পরিকল্পনা” শব্দটি অশিশিতে অশিশিতে আমরা এরূপভাবে আশ্র-হারা হইলাম কেন।

তবুও অধীকার করি না যে পবেষণাগার ও কল-কারখানার প্রয়োজন আছে; অতীতেও ছিল। সেইজন্য ভারতব্রাহ্মণের পরিচালক ত্রীকবাহরলাল মেহরু বর্ষন অববত তাহার “পরিকল্পনার” গুণকীর্তন করেন, তখন মন দিয়া শুনিতার। আজ তাহাও নৃতময় হারাইয়াছে। একটা নৃতম শব্দ আবিষ্কার না করিলে ব্যবসায় অচল হইয়া বাইবে যে।

গত কাঙ্ক্ষন-চৈত্র মাসে দিল্লী হইতে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :

ভারতীয় করলা হইতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-বিষয়ক পবেষণা পরিষদের পর্ব্বণি বডি ভারত-সরকারকে অহুরোধ করিয়াছেন।

কাউন্সিলের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের পর পুরোক্ত সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত কবাহরলাল মেহরু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; তিনি বৈজ্ঞানিক পবেষণার উন্নতি সাধনের জন্ত পরিষদকে বহুবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈজ্ঞানিক পবেষণাক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা হিসাবে অনেক কিছু বলা বাইতে পারে সভ্য; কিন্তু আমাদের আশ্র-প্রশংসারও অনেক কারণ আছে। বৈজ্ঞানিক পবেষণার উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট পরিষদের কার্যকলাপ প্রশংসার্হ। ইতিমধ্যেই দুইটি বীকণাগার খোলা হইয়াছে এবং সেখানে কাজ চলিতেছে। যেভাবেই হউক, আমরা ভাল কাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।...আর্থিক অনটন হেতু পর্ব্বণি পবেষণা এমন কি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা সংজ্ঞাত ব্যয় হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবে তিনি পরিষদকে উদ্ধল ভবিষ্যতের আলোচ্য প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, বৈজ্ঞানিক পবেষণার প্রসার বৃদ্ধির জন্ত উৎসাহ দানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

ভারতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শক্রমে একটি পরি-কল্পনা রচনার জন্ত পরিষদ একটি কমিটি গঠন করেন।

বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে ইহার পর এই পরিকল্পনা সংজ্ঞাত একটা নক্সা প্রস্তুত করা হয়।

পরিষদ এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যত সম্ভব সম্ভব এই পরিকল্পনা অহুসারে কার্যারম্ভ হওয়া আবশ্যক। অর্ব-বৈভিক কারণে অন্তরায় ঘটান আদৌ উচিত নহে। কপাস ইন ইউ এস এ বে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পরিষদ

ভারত-সরকারকে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। উক্ত পরিকল্পনার ২২ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই পরিকল্পনামুসারে ভারত ৭০ হাজার টন বিমান চালনার পেট্রল, ১৫ লক্ষ টন পারিবারিক ব্যবহার্য কয়লা, কিছু পরিমাণ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য লাভ করিবে।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে কর্পাস ইন্ডের রিপোর্ট পরীক্ষার অন্তর্গত পরিষদ নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞদ্বয়কে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন; যথা—শ্রী কে আর ডি টাটা, শ্রী জি ডি বিকলা, শেঠ কান্তরত্নাই লালভাই, লাল। শ্রীরাহ, ডাঃ এস এস ভাটনগর, ডাঃ কে সি বোষ এবং ডাঃ ডি এন ওয়াদিয়া। ভিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার অন্তর্গত কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে স্বাভাবিক পেট্রোলিয়ম পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানের অন্তর্গত পরিষদের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থতাত্ত্বিক তথ্যসম্বন্ধে ভীষণতরূপে রুচি করেন। তদুপরি খনিজ পেট্রোলিয়ম খনিজ করিয়া ভারতীয় বন্দরসমূহে ছুইট বা তিনটি শোষণাগারে উহা শোধন করা সম্ভবপর কিনা, তাহাও তাহার পরীক্ষা করেন। ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থতাত্ত্বিক তথ্যসম্বন্ধে কলে এ পর্যন্ত দেশের কোথাও তৈলবাহী এলাকার সন্ধান মিলে নাই; তদুপরি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সূচিন্তিত অভিযন্ত এই যে, দেশের কোথাও তৈলবাহী এলাকা হয়তো থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা পরিষ্কার করিতে ও কাকে লাগাইতে বহু বৎসর অতীত হইবে। সুতরাং এইরূপ কোনও সূত্র হইতে পেট্রল সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রয়োজন মিটাইবার আশা সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পরিষদ এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল প্রাপ্তের পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা-পরিষদের পরিচালক সমিতি গবেষণা সম্বন্ধে কতকগুলি নতুন পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে আনুমানিক ছুই লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় হইবে।

ভারতের ৫৬ মাস অতীত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে প্রয়োজ্য উপলক্ষে কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদন সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ভরসার কথা এখনও শুনি নাই।

ভূনিয়ার বাণিজ্য পোতের হিসাব

সম্প্রতি আমেরিকা ম্যারিটাইম কমিশন (U. S. Maritime Commission) বিভিন্ন দেশের সমুদ্রপোতের 'টেনেজ' বা মালবহন ক্ষমতার এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কি অবস্থা ছিল এবং বর্তমানে তাহা কি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় যুদ্ধের বিষম কর-কতি কাটাঁইয়া জাহাজী টেনেজ অতি কষ্টে ১৯৩৯ সালের পরিমাণ সামান্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। আবার ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বাক্যদের

সহ দূর হইতে আসিয়া আসিতেছে। যদি বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধ বনাইয়া উঠে, তবে সমুদ্রপোতের অবস্থা যে আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই হিসাবে দেখা যায় :

	১৯৩৯	১৯৫০
মোট বাণিজ্যপোতের সংখ্যা	১২,৬৬৫	১০,৭০৮
জাহাজী টেনেজ	৭,৯১,৩৯	৮,১৮,১২
ইংলও	২,১৫,৮৭	২,২০,১৮
আমেরিকা*	১,০২,১২	১,৩২,৯১
নরওয়ে	৬৯,৩১	৭৫,৬৭
পানামা	—	৪৯,৮৪
নেদারল্যান্ড	৩৪,২৫	৩৫,৭২
জাপান	২৯,৯৯	৩৫,৯৫
সুইডেন	২০,৩৩	২৭,০৫
গ্রীস	২৭,৯১	১৯,৩৩
শোভিথেট ক্রশ	—	১৮,২৪
অপরায়ন সম্মিলিত	—	১,৬১,৪১
জাপান	৭১,৪৫	—
জার্মানি	৫১,৭৭	—
ইটালী	৩৯,১০	৩৩,৮২

সম্প্রতি ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় জাহাজ মালিক সমিতির সভাপতি শ্রী জি. টি. কামদার ইহার বার্ষিক অধিবেশনে উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্রের টেনেজ মাত্র ৪ লক্ষ টন। ভারতের জাহাজী-বাণিজ্য মুচুক তাৎবে চালাইতে হইলে উপকূলের অন্তর্গত আরও ১,৭৫,০০০ টন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্গত ১,৫০,০০০ টনের জাহাজ প্রয়োজন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৩০,০০০ টনের জাহাজ যাজী বা যাজী ও মাল ভারত সমুদ্রে গমনাগমনের অন্তর্গত প্রয়োজন। এই জাহাজ ক্রয় করিতে ৭ হইতে ৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। সমস্ত উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইলে আরও ১৪ কোটি হইতে ১৬ কোটি টাকা এবং আমেরিকা, ইংলও, অস্ট্রেলিয়া এবং দূরপ্রাচ্যে গমনাগমন ও বাণিজ্যপোতের অন্তর্গত আরও কয়েকটি ১,২০,০০০ টনের জাহাজ কিনিতে ১২ হইতে ১৩ কোটি টাকা প্রয়োজন।

এই অভাব মিটাইবার অন্তর্গত ভারত গবর্নমেন্ট এককালে বিদেশী জাহাজী কোম্পানীকে ভারতে আমিয়া কাকড়ার-বার আরও সহায়তা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ৩৫ কোটি টাকার ৭৫ ভাগ শতকরা ২ টাকা সুদে

* ইহা হাভা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক কমিশনের তাৎবে যে ১৯,৯৫,০০০ টেনেজ আছে বা সেনাবিভাগের অন্তর্গত বহু টেনেজ আছে, তাহা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে।

অগ্রিম দিলে বাকী টাকা শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেশের মধ্যে সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই প্রসঙ্গে আন্দোলনের সুখের ও পরবশের দুঃখের কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তবেই দেশের মঙ্গল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সাহায্য

নিম্নলিখিত বিবরণটি “আমেরিকান রিপোর্টার” (বাংলা সংস্করণ) পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। এই সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুবেয়ের দেশ বলিয়া পরিচিত কেন তাহা এই সাহায্যের পরিমাণ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়।

এতৎসম্পর্কে দুই-তিনটি কথা আমাদের মার্কিনী বন্ধুবর্গের জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম—বাহারা উপর্যুক্ত হইতেছেন, তাহারা এই নামে সুখী নন। একটা অবাক ভীতি তাহাদের মনকে নাড়া দেয় যে দাতা এই দানের প্রতিদানে কিছু উত্তল করিয়া লইবেন। দ্বিতীয়—এরূপভাবে দান করিয়া মানুষের মন ক্লান্ত করা যায় না। চীনদেশ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণরূপ বহু কোটি টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগে পড়িয়াছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির নিদর্শনরূপ এই টাকার সুদ লওয়া হইল না। তাহা ব্যয় করা হইল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চীনদেশীয় যুবকদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে।

তার কলে তাহারা মার্কিনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিলেন, তাব ও চিন্তার হইলেন মার্কিনী, যেমন ইংরেজের আমলে আমরা হইয়াছিলাম। চিৎখং-কাই-শেক, মাও-সে-তুং ছাড়া চীনের নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই ছিলেন এইরূপ ভাবে মার্কিনের নিকট গণী।

আজ দেখিতেছি কি? এই নিঃস্বার্থ দানের কথা চীন-দেশের কেহ কি মনে-প্রাণে স্বীকার করেন? সেইজন্যই বলিতে চাই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এশিয়া ও আফ্রিকাকে কম অর্থসাহায্য করিতেন তবে তাহা কল্যাণপ্রসূ হইত বৈনী এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই শান্তিতে থাকিতে পারিতেন।

“আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও আর্থিক সমতা সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শ-দাতা পরিষদ” আনিচ্ছেন যে, ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও চুরপ্রাচ্যের দেশগুলি যোট ৫০০ কোটি ডলার সাহায্য পাইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে।

কোন দেশ কত ডলার সাহায্য পেয়েছে তার হিসেব এইরূপ :—

ভারত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, ব্রহ্মদেশ ৫০ লক্ষ ডলার, চীন ১৭৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, ইন্দোনেশিয়া ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, ইরান ৩ কোটি ডলার, ইসরাইল ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, জাপান ২ লক্ষ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, রিপাবলিক অব কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়া) ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, ফিলিপাইন ৭৬ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, রিউক দ্বীপপুঞ্জ ৬ কোটি

ডলার, সৌদি-আরব ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, থাইল্যান্ড ৬০ লক্ষ ডলার এবং তুরস্ক ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার।

আফ্রিকার দেশসমূহ : মিশর ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, লাইবেরিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ১০ লক্ষ ডলার।

ওশেনিয়া : অস্ট্রেলিয়া ২ কোটি ডলার, নিউজিল্যান্ড ৭০ লক্ষ ডলার এবং ওশেনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ৪০ লক্ষ ডলার।

পরামর্শদাতা পরিষদ নিম্নলিখিত সুপারিশও করেছে :

(১) ইউরোপ পুনর্গঠন পরিকল্পনার যদি কোনও দেশ যোগ দেয় তা হলে সে দেশকে “পরিবর্ত আন্দোলন” করা রাখতে হবে, কেননা এ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় সম্পদ হস্তান্তরের ভিত্তিতে। তবে কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ ভিত্তিতে হয় না।

(২) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৌকর্যার্থে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই যাতাতে সামরিক ব্যয় মিত্রদের নিমিত্ত এই “পরিবর্ত আন্দোলন”ের অর্থ পাওয়া যায়, তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) আগামী ২০শে জুন পর্যন্ত আর্থিক বছরে যে সব বিশেষ ধরনের বৈয়য়িক সাহায্য দেওয়া হবে, তাও হবে ঐ সম্পদ হস্তান্তরের ভিত্তিতে, সামরিক সাহায্যও ঐ একই ভিত্তিতে দিতে হবে। কখনই ঐ দানের ভিত্তিতে ঐ সাহায্য দেওয়া চলবে না।

(৪) বৈয়য়িক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির ক্ষত যে অর্থ দেওয়া হবে, তা হবে ঐয়ের ভিত্তিতে। তবে এরূপ সাহায্য দেওয়া হবে শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই, যেখানে দেখা যাবে যে, ঐ প্রদত্ত করে ঐ পরিকল্পনা সকল হতে পারে এবং সেই পরি-কল্পনার উদ্দেশ্যও যথোপযুক্ত ধরনের।

(৫) সম্পদ হস্তান্তরের (দান) ভিত্তিতে যে বৈয়য়িক সাহায্য দেওয়া হবে, সেই সাহায্যকে “কোনও মতেই বর্ণ ও উল্লারের মজুত তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলবে না এবং বিপরীত পক্ষে যে সব দেশ দেশত্বকা ব্যবস্থার যোগ দেবে, তাদের বর্তমান মজুত তহবিল হ্রাস করা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যবাল্যের প্রাথমিক সর্ব বলে ধরা হবে না।

উক্ত পরামর্শদাতা পরিষদ আরও দেখিয়েছেন যে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি রপ্তানি ব্যাঙ্ক ৩৩০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহ-বিলের কাগজ বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১০৭ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিশ্বত বিপ্লবী

মহারাষ্ট্র দেশে বহুদেব বলবন্ত কাকডে (Phadke) নামে একজন বিপ্লবী ছিলেন।

Digitized by srujanika@gmail.com

অগ্রিকটবর্তী কালে মহারাষ্ট্র দেশে মহাদেব শোবিন্দ রাণাকে প্রকৃতি শিকিত মেতার প্রাণত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সময়েই এই প্রাণ অশিকিত হুবক সশস্ত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। ব্রিটিশ শাসকবর্গ এই চেষ্টাকে কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষের (agrarian discontent) কল বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন তাঁহার নিকট প্রমাণ আছে যে, ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের আরোহণ চলিতেছে। কাকতের বিদ্রোহ তার প্রথম প্রকাশ। আজ মহারাষ্ট্র বলবত্তের বোণ্য সন্ধান দিতেছে।

তারতবর্ষে পূর্বাঞ্চলে অল্পরূপ চেষ্টা হইয়াছিল প্রায় ১৮৬০ সালে, “সিপাহী বিদ্রোহের” ২৩ বৎসর পরে। সেই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ‘মধুবন’—সোনারাম আওলেন। তিনি কাছাড়ী ছিলেন। পঞ্জুর ছিল তখন মহকুমার সদর শহর। সুতরাং ‘মধুবন’ ধ্বনি তুলিলেন—“চল পঞ্জুর”। পাশাপাশি একটি সরকার স্থাপিত করিলেন। প্রায় ১২ বৎসর এই অসম যুদ্ধ চলিল। শেষে ‘মধুবন’ বিদ্রোহস্বাত্ত্বের কোশলে বহা পড়িলেন। তখন তিনি কোম গ্রামে কবিরাজী ব্যবসার করিতেছিলেন। তাঁর জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া অনেক পন্নীগাথা রচিত হইয়াছিল। তাহা সংগৃহীত হওয়া উচিত।

“বিশ্ব-ভাগবতী ও ভক্তি-নিকেতন”

ত্রিসতীশচন্দ্র রায় আসামের ডিরেইটর অব পাব্লিক ইন্সট্রাকশন ছিলেন। সরকারী দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বুদ্ধাবন বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি যে বিদ্যাট কর্তৃত্বের মাধ্যম তুলিয়া লইতেছেন, তাহা বৌদ্ধ-মূলত কর্তৃত্বের উপযোগী। সেই সঙ্গে থাকে চাই ভক্তি ও পাণ্ডিত্য। একটি বিবরণে দেখিতেছি যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া তিনি ভক্তিশাস্ত্র, বর্ষ ও আচার সম্বন্ধে প্রায় ১২০ বাসি এই প্রকাশের পরিকল্পনা করিতেছেন।

এই বিদ্যাট কার্য একর দায়িত্বে সম্পন্ন হয় না। সত্যশব্দ্যু মবদীপণ্য, কলিকাতা, শিলং প্রভৃতি স্থানের ভক্ত, পাণ্ডিত ও লোকস্বাক্ষরদের আশীর্বাদ ও অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রচেষ্টার সকলতা কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা-সমিতি

এই সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী তাক্কার ও যুগ্ম-সম্পাদিকা শ্রীমতী এইচ সিং ও শ্রীমতী গুপ্তার বিবৃতি হইতে নিম্ন-লিখিত তথ্যাবলী সংকলন করা হইয়াছে :

“পঞ্জাব হইতে আগত লক্ষ লক্ষ গৃহহারা উদ্ধার স্বপ্ন উত্তর ভারতের নিদারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছিল তখন তাহাদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তৈরী জামা পোশাক

দেওয়ার জন্ত ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপালের পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার পশ্চিম-বঙ্গ মহিলা জরুরী সেবা-সমিতি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নারীসম্মেলন আর্থিক সহায়ত্ব এবং আমাদের বর্তমান রাজ্যপাল ডাঃ কাটজুর সহায় পৃষ্ঠপোষকতার ইচ্ছায় কার্যাবলী বিভিন্ন দিকে বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন কার্যগুলি সম্পাদিত হইতেছে : (১) সমিতি ১৮টি চরধাক্কের পরিচালনা করিতেছে এবং এই ১৮টি কেন্দ্রে বর্তমানে ৫৪২ জন মহিলাকে বোনা ও রুচী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই সব চরধাক্কের হইতে ইতিমধ্যেই ১৩০৪ জন শিক্ষার্থিনীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। (২) তিনটি কেন্দ্রে রুচী শাখার প্রায় ১৩০ জন মহিলাকে রুচী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ; এই তিনটি কেন্দ্রে হইতেছে বেহালা, কানু বোম লেন ও সরকারী ভবন। (৩) বরেন শাখার ১৫ জন বালিকাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই শাখায় খাদি, বৃত্তি, শাড়ী, চাদর প্রভৃতি তৈরী করা হয়। (৪) বরেনে শিকরিজীগণকেও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এ পর্যন্ত তিন দফার ৪১ জন শিকরিজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৩ জনকে সরকারী বিভিন্ন শিবির ও অভ্যন্তরীণ সমিতিতে নিয়োগ করা হইয়াছে। (৫) হিন্দী শিক্ষা দ্বাণে চতুর্থ দফার শিক্ষার্থিনীগণকে শিক্ষাদান করা হইতেছে। (৬) সমিতির সাধারণ সেবাকার্যের মধ্যে উদ্ধারদের ভিতরে বিতরণের জন্ত জামা-পোশাক সংগ্রহ, উদ্ধার রোসিদিগকে চিকিৎসা সাহায্য-দান, উদ্ধার বালিকাদের বিবাহের জন্ত আর্থিক সাহায্য, উদ্ধার শিশু ও মহিলাদিগকে উৎসব উপলক্ষে শিবিরে যাবে যাবে আহাৰ্য্য দান ইত্যাদি রহিয়াছে। একাধারে বেঙ্গালেশবিকাদের সাহায্য সাধনের গৃহীত হইবে।”

কলিকাতা মঙ্গরীর মধ্যে এইরূপ সেবা-সমিতির সংখ্যা অগণিত। সাময়িক প্রয়োজনে বাহা পড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ নূতন সমাজ-পন্থার প্রয়োজন অনুসরণ করিতেছে। সেই জন্ত “জরুরী” শব্দটি অব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধিত হইলে সমিতির পরিচালকবর্গ ও কর্মীবৃন্দ পঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত হইবেন।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় ২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) হইতে ২২শে কার্তিক (২০শে অক্টোবর) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

কর্মাব্যাক—“প্রবাসী”

যুক্তি ও জিগির

ঐবরদাচরণ গুপ্ত

মাহুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের মূলে রয়েছে যুক্তি। যুগে যুগে যারা মাহুষের মনকে নতুন নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছেন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতিতে তার পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁদের সবারই প্রেরণা ছিল যুক্তি, আর আবেদনও ছিল একান্তভাবে সাধারণ মানব-মনের ঐ সহজ যুক্তি-প্রবণতার প্রতি।

যুক্তির প্রতিধ্বনি হচ্ছে জিগির। এতে যুক্তির আলো নাই, আছে শুধু হকার। জনগণের মন এতে শুধু মোহাচ্ছন্নই হয়, বিন্দুমাত্রও সমৃদ্ধ হয় না। জিগিরের বহুল প্রচলনে উন্নতির প্রবাহ বরং বাহতই হয়ে থাকে। এর প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে।

প্রাচীন যুগের বেদ-উপনিষদের বাণী বাগযজ্ঞের জিগিরে পর্যাবসিত হয়েছিল। প্রতিবাদ এনেছিলেন বুদ্ধদেব। পরবর্তী যুগে জিগিরের প্রতিধ্বনিতে তাঁর বাণীও বিকৃত হতে বেশী দিন লাগে নি। শঙ্করাচার্য্য, ঐচ্ছৈতন্য সবার সম্বন্ধেই অন্ন-বিস্তর একথা খাটে। তবু জিগিরের জয়যাত্রার বিয়াম নাই।

কলিকালে নাকি নামেই যুক্তি। নাম ছাড়া অন্য গতি নাই—ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারেরা তিন সত্যি করে বেশ জোরের সঙ্গে একথা বহুপূর্বেই বলে গিয়েছেন। শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেই নয়, সম্প্রতি জীবনের সর্বত্র আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা অক্ষরে অক্ষরে এই আপ্ত বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছি। কর্মের প্রেরণার স্থান অধিকার করেছে এখন এদেশে নামের জিগির। সংঘম এবং নিষ্ঠা, পরিপ্রস্ন এবং সেবা দ্বারা যা অধিগত হবার কথা, আমরা তাকে কেবলমাত্র আবৃত্তি দ্বারাই আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি।

শুধু মাত্র আবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্রবোধ হয় কি না সে বিষয়ে মতভেদের বিস্তর অবকাশ রয়েছে। কিন্তু শুধু কথায় যে চিঁড়ে ভেজে না এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য। শাস্ত্রবোধ হুস্ন ব্যাপার; তার অভাবের অঙ্ককার আবৃত্তির ঘোঁরায় আলোকিত না হলেও হৃদয় দরকার মত চাপা দেওয়া যেতেও পারে। চিঁড়ে কিন্তু অতি স্থূল পদার্থ। ওর বেলায় শিশুকেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হয় না।

বর্তমানে আমরা সেই অসাধ্যসাধনেই ব্যাপৃত আছি। নবান্ধিত স্বাধীনতার দীপ্তি, তার সহজ প্রেরণা, তার একান্ত আহ্বান ও উদ্দীপনাকে অনায়াসে ধ্বলোকে

নির্কাসিত করে সবাই আমরা আগে ও পাছে, দক্ষিণে ও বামে দল বেঁধে দলে দলে কেবলমাত্র কথার জোরেই আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাস্তু, শিক্ষা-আদি করে সমৃদ্ধ সমস্তারই সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতে করে কর্মপ্রচেষ্টা থেকে অবচ্ছিন্ন হয়ে বুদ্ধি আমাদের শুধু একান্তভাবেই হারায় নি, বেশ খানিকটা তমসাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের কাছে অর্থই ধর্ম বলে মনে হবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই।

মাত্র কয়েক বছর আগে এই দেশেই ত জনগণের একান্ত সাধনায় ও সমবেত শক্তিতে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের অঘটন-ঘটন-পটিলসী সেই উজ্জ্বলিত ধারা সহসা কোন্ মরুপথে হারিয়ে গেল! স্বরাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখনই আমরা রাষ্ট্রের হাতে দেশের গঠনমূলক সমস্ত কর্মের দায়িত্ব নিঃশেষে সমর্পণ করে নৈকর্য্য সিদ্ধির সাধনায় লেগে গেলাম, সেই দিন থেকেই এই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। বৈদেশিক শাসনের অজস্র প্রতিকূলতা, সহস্র বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, শুধু জনগণের আগ্রহে, ত্যাগ আর সেবার পাদপীঠের উপর যে সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, স্বরাজ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা বেন নিত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়ের পর্ধ্যায়ে পড়ে গেল। চরকা-সজ্জ, গ্রাম-উত্তোগ-সজ্জ, তালিমি-সজ্জ প্রভৃতি অধিল ভারতীয় অস্থানগুলি কৃষিগণের ওদাসীনে অসংকৃত, অবজ্ঞাত হয়ে কোষমতে বেঁচে মরে রইল।

যাদের নেতৃত্বের দিকে সমস্ত দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাঁদের অধিকাংশেরই মনের দুয়ার খুলে গেল মস্মিগতা, আইনসভার সোনার মন্দিরে। খাদি, কুটার-শিল্প, বনিয়াদি-শিক্ষা, হরিজন-উন্নয়ন, জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞান—এ সব তাদের সহজ এবং আভাবিক পরিবেশ থেকে অপস্থত হয়ে প্রবেশ করল সরকারী দপ্তরে। ভাড়াটে বোড়া দিয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ টানাবার ব্যবস্থাও বোধ করি এর চেয়ে খুব বেশী বিশ্বয়কর ব্যাপার হ'ত না।

ভারতের বিপুল গণ-আন্দোলনের যিনি ছিলেন ভগ্নীর্থ তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। অহেতুকী ভাবপ্রবণতা কখনও তাঁর মনকে আর্বিষ্ট, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। ভক্তগণের জিগির তাঁর যুক্তিকে ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করবার সম্ভাবনা যাত্রাই তিনি

উদ্ভট আন্দোলনের গতিবেগ পুনঃপুনঃ প্রশমিত করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেননি। ভাবোন্মত্ত জনতাকে তিনি বারবার কর্ণের পথে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। অবসাদগ্রস্ত কর্ণসজ্জিগণকে তিনি নিজ আচরণ দ্বারা কর্ণের পথে অবিলম্বিত রেখেছেন। স্বাধীনতার অর্থ ছিল তাঁর কাছে দেবার পূর্ণ অধিকার। জীবন পণ করে তিনি সারা ভারতের জন্য সে অধিকার অর্জন করে গেছেন। কি সন্ধ্যাবহার করেছে ভারত তার ?

বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে বহু আবর্জনা এদেশের ঘরে বাইরে জমেছে। এক দিকে বর্ণজ্ঞানহীন পল্লীবাসী জনসাধারণের বিরাট অজ্ঞতা, আর এক দিকে বৈদেশিক শিক্ষায় অভিমानी মুষ্টিমেয় শহরবাসীর বুদ্ধির বিকৃতি, দেশাত্মবোধের অভাব। এ দুইটি পরিস্থিতিই অভ্যন্তরীণ অবস্থানীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ে এ দেশে যে সমস্ত ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরমুহূর্ত্ত থেকে এ পর্য্যন্ত, তার তুলনা বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। শোনা যায়, চীনদেশে নাকি অল্প কিছু দিন আগেও রণ-দুর্ঘটন নেতারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রায় অরবস্ত্র বিবর্জিত, বিপুল বাহিনী নিয়ে সমস্ত দেশটা তোলপাড় করে বেড়াতে, নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করবার জন্যে। ব্যাপারটা নিতান্ত অশাস্তিকর হলেও মোটেই জটিল ছিল না। আর, ও যোগের ওষুধও ওর ভেতরেই হয়ত ছিল। আমাদের সমস্তা কিন্তু ওর চেয়ে লক্ষ গুণে জটিল।

দলদলির জিগিরে স্বাধীন ভারত আজ প্রপীড়িত। কয়েকটা বছর আগেই কিন্তু পরাধীন ভারতের আপামর সাধারণ সমবেত হয়েছিল একচ্ছত্র জাতীয় মহাসভার পতাকাতলে—স্বাধীনতার সংগ্রামে। জাতীয় মহাসভা ছিল জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহার মূর্ত্ত প্রতীক। সেই স্পৃহা প্রয়াসশূন্য মিথ্যাচারের জিগিরে পরিণত হতে পারে নি, তার কারণ জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে ওতঃ-প্রোতভাবে গাঁথা ছিল ভাগ্য, সেবা ও গঠনমূলক কর্ণের তপস্বী। জাতীয় মহাসভার শক্তির উৎস ছিল সমস্ত জাতির সমবেত সমর্থন। ঐ সমর্থন জিগিরের হাওয়ায় চড়ে আসে নি, এসেছিল কর্ণের বাহনে। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে; কিন্তু সেই আরব কর্ণের বধচক্র যেন কৃষ্ণকক্ষে রণরাস্ত্র কর্ণের বধচক্রের মতই নিশ্চল হয়ে পড়েছে। আর এতে বরোই নানারকম সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে।

২

স্বরাজ-প্রাপ্তির পরে নবলঙ্ক রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক বাহিরে, ভারতের

বিরাট কর্ণক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতৃমণ্ডলীয় যে কর্ণশৈথিল্য তার প্রতিক্রিয়া এক দিকে যেমন সমগ্র জাতির মনোজগতে বিভ্রান্তি এনেছে, অপর দিকে তেমনি মহাসভারও প্রচুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছে। যে মহাপুরুষের অভিজ্ঞিত নেতৃত্বে জাতীয় মহাসভার কর্ণধারণ লোকসেবা কর্ণে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হয়েছিলেন, তাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতে তাঁদের অনেকেই কর্ণোৎসাহ এ দিকে যেন মন্দীভূত হয়ে যেতে লাগল। বোধ হয়, তাঁদের অজ্ঞাতসারেই অবস্থাটা দাঁড়াল ‘বামুন গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর’ কতকটা সেই ধরণের। এঁদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক নানা বিভাগের নিয়ামক হলেন তাঁদের সমগ্র কর্ণশক্তি এবং মনোযোগ সম্ভবতঃ প্রধাবিত হ’ল আমলাতন্ত্রের বশীকরণে আর প্রজাতন্ত্রের সম্প্রতিষ্ঠায়। আর সরকারী দপ্তরের বাইরে যারা রইলেন তাঁদের হাতে সুপরিচালিত গঠন-কর্ষসূচী এবং সম্মুখে সমস্ত রাজনৈতিক পরাধীনতা-পাশমুক্ত ভারতের সুবিশাল কর্ণভূমি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ন যথো ন ততো অবস্থায় হয় সতৃষ্ণমনে, নয় সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন—মন্ত্রিসভা, আইনসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দিকে, মিশ্র মনোভাব নিয়ে।

সাতচল্লিশ সালের মার্চ মাসে এলাহাবাদ নগরে ভারতের বিভিন্ন কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক-গণের সম্মেলনে যে গঠনকর্ষসূচী গৃহীত হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অঙ্কমোদন পেয়েছিল তাকে কার্যে পরিণত করবার যদি আন্তরিক চেষ্টা দেশে হ’ত, তা হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের হাওয়া বদলে যেত, এবং অনেক দুর্গতির হাত থেকে দেশ রেহাই পেত। কিন্তু তা হয় নি। যার স্থান হওয়া উচিত ছিল সবার আগে তাই রইল নিতান্ত কোণঠাসা হয়ে সবার দৃষ্টির অগোচরে। স্বাধীনতা আর সাম্প্রদায়িকতার জিগিরে দেশের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আর নেতৃবর্গের দৃষ্টি গ্রামে জনসাধারণের দিকে প্রসারিত না হয়ে নিবন্ধ রইল নগরীর বিধান সভায়, আইনসভায়, মন্ত্রণাসভায়। সেবা ও কর্ণযজ্ঞের স্থান নিঃশেষে-অধিকার করল জিগির ও জটলা।

এমন ধারা ব্যাপক নৈকর্ম্যের ফল যে কি হতে পারে তা ত গীতাকার বহুপুর্বেই শ্রীভগবানের জবানিতে বলে গিয়েছেন :

উৎসীদেধুরিবে লোকান কুর্ধ্যান কর্ণ চেনহম্।

সকরন্ত চ কৰ্ত্তা ত্রায়ণহতানিবাঃ প্রজাঃ।

প্রজার দুঃখ যে আজ চরমে উঠেছে সে বিষয়ে আশা করি দুই মত হবার কোনোই আশঙ্কা নাই। সকলের শোভাবাজাও যেমন সাড়ব্বর চলছে তাতে তাও যে

কারও দৃষ্টি এড়িয়ে বাবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সবার আগে চলেছে লাঠিসোটা নিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবকসভা, সঙ্গে সঙ্গে বোমা বাল্ব নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর সবার পিছনে রয়েছে সর্বোদয়ের শিঙা হাতে কুবক-মজুর-প্রজা পার্টি। এই সব সভ্য-সভা, ব্রক-পার্টি বা যারা অগ্রগী তাঁদের অনেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে জাতীয় মহাসভায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেই ছিলেন। বর্তমানে এঁদের জিগির আলাদা আলাদা, রীতিনীতি বধেই স্থিতিস্থাপক কিন্তু লক্ষ্য এক। সেটা হ'ল জাতীয় মহাসভার মোহ থেকে দেশকে মুক্ত করা, জাতীয় মহাসভার চাত থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে নেওয়া। এ কাজে শোনা যায় তাঁরা নাকি পরম্পরের সঙ্গে হাত মেলাতেও প্রস্তুত হয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে এ এক নতুন অধ্যায়, সন্দেহ নাই। সিঙ্কিয়া-ভোঁসলা-গায়কোয়ার-হোলকার মহারাজাদের যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমনধারা স্ববুদ্ধি হ'ত তা হলে আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের যে এ দশা হ'ত না এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

যখন বহিঃশত্রুর গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সংহতির একান্ত প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের সেই সব নেতারা পরম্পর হানাহানিতে শক্তি ক্ষয় করে বিদেশী শাসনকে এদেশে কায়ম করেছিলেন। তারও আগে বিদেশী যখন অগ্নেও এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভাবে নি, তখন এই বাংলা দেশেরই ধনিক আর সৈনিকে মিলে তুলে দিয়েছিল দেশটাকে বিদেশী বণিকের হাতে। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অকাজে একতা আর কাজের বেলায় অনৈক্যের দৃষ্টান্ত যুগে যুগে আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করেছে। আর আর দেশে সঙ্কট সময়ে অনৈক্যের মাঝে একা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। জাতির বিপদে দলাদলি তুলে তারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এমনটি কদাচিৎ হয়েছে; আর এর পরীত দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের ইতিহাসে প্রচুর। স্বাধীন রতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে মনে হয় তহাস তার পুরাতন অভিশাপের পুনরাবৃত্তি করতেই আবার চলেছে।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে গণদেবতার ধারণা এ দেশে সবেমাত্র সূত্র হয়েছে। এ পথে এখনও আমাদের বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। পথের সন্ধান যিনি দিয়েছেন তিনি পুনঃ পুনঃ দেখিয়েছেন ও পথ পল্লী অভিনয়, দিল্লী অভিমুখী আদৌ নয়। ঐ পথেই আসবে জাতির প্রকৃত কল্যাণ। বতদিন না জনমত জাগ্রত হবে তদিন পুরাতন অভিশাপের ভূত, যা কি না এদেশে

পাঠান, মোগল, ইংরেজ একে একে সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিল, সে আমাদের স্বল্প থেকে এক পাও নড়বে না—এ স্থানান্তিত। এ ভূত জিগিরে বাবে না। ফাঁকা আওয়াজে পাখী ত দূরস্থান, গাছের পাতাও পড়ে না—নড়েও না। আওয়াজ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, রেখে যায় খানিকটা ধোঁয়া; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভারতের রাজনৈতিক গগন আজ সমাচ্ছন্ন।

৩

কথা উঠেছে ভারতের পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভাপ্রতিবেশিত গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না এবং তার কারণ হচ্ছে সর্বত্র কংগ্রেসী সদস্যগণের আত্যন্তিক সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু তা না হলেও গণতন্ত্র সার্থক হবার সম্ভাবনা ছিল না। তন্ত্র আছে, তন্ত্রধারীও আছে এদেশে বহু, কিন্তু গণ কোথায়? মাথা না থাকলে মাথা ধরার প্রস্নই ওঠে না।

দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যারা চান, প্রাথমিক কাজ তাঁদের পার্লামেন্টেও নয়, ব্যবস্থাপক সভাতেও নয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রাম হ'ল তাঁদের কর্ষক্ষেত্র। কুমোর যখন প্রতিমা গড়ে, তখন প্রথমে গড়ে খড়ের খড়, তারপর করে একমেটে, পরে দোমেটে, সর্বশেষে মুণ্ড বসায়। পার্লামেন্ট, আইনসভা এ সব হ'ল গণতন্ত্রের মুণ্ড। খড়ের উপরেই মুণ্ডের প্রতিষ্ঠা। মুণ্ড থেকে ধীরেস্থে খড় বেরুলে, সে ইরাণী রূপকথা বতই বিশ্বকর হোক না, নিতান্ত অচল হবে তাতে সন্দেহমাত্র নাই। অপরপক্ষে, গণদেবতা যদি উষ্ম হন, তবে তাঁর মুণ্ড যেমনই হোক, জাতির সিঁদুর পথ থাকবে অব্যাহত। কাজেই স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের বর্তমান অবস্থায় দেশ-সেবকের প্রধান কাজই হবে জনমতের উদ্বোধন।

এ কাজে উত্তেজনার অবকাশ নাই। দলাদলির আশঙ্কা নাই। জাতীয় মহাসভা যখন জাতির মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে, শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, শত নির্ধাতন সহ করে জাতির মনকে স্বাধীনতা সময়ে একাগ্র করে তুলছিল, তখন কংগ্রেস একটা দল ছিল না। কংগ্রেসের যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জীবনপাত করে যারা এতে শক্তি সঞ্চার করেছেন, তাঁরা কোনো দলেরই ছিলেন না। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র, আদর্শ, কর্ষপদ্ধতি, এক কথায় এর উদ্দেশ্য এবং বিষয় ভারতের সার্বভৌমত্ব। বিদেশী শাসনের ভেদনীর অজস্র কূটকৌশলও সে সার্বভৌমত্ব খুব বেশী ক্ষুণ্ণ করতে পারে নাই। আর, আজ যখন স্বাধীন ভারতের অগণিত নয়নারী মুক্তির আলোকের অংশ পাবার জন্য অপেক্ষমান, যখন যুগ যুগ

ব্যাপী দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জাতির সমবেত শক্তির বিজয় অভিযানের মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত, তখন কংগ্রেসের সেই সার্বজনীনতা বিধগত হতে চলেছে তারই বহু বিশিষ্ট কর্মীর কথায় ও কাজে।

সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি বিচ্ছিন্ন করে, কামনো-বাক্যে এঁরা কংগ্রেসের অহিতসাধনে তৎপর হয়েছেন। স্বাধীনকাল স্বদেশ সেবায় যারা ছিলেন সতীর্থ, যারা ছিলেন গুরুভাই, স্বদেশপ্রেমের অমৃত ধারায় পূত হয়ে যারা বৈদেশিক রাজস্বের অগ্রাহ্য করে এক সঙ্গে কারাবরণ, অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছেন, আজ তাঁরাই অবস্থার পরিবর্তনে নিজ রোষ সঞ্চারণ করতে পারছেন না। তাঁদের সাম্প্রতিক ভাষণে ও আচরণে সর্বত্র তাঁরা তাঁদের এই নবজাত ক্রোধের নম্র পরিচয় দিচ্ছেন। ও-সবে যুক্তি এত কম আর জিগির এত বেশী যে স্বভাবতই মনে হয় যুক্তির অভাবকে জিগিরের হুকুর দিয়েই তাঁরা পূরণ করছেন।

কিন্তু কেন এই ক্রোধ! শাস্ত্রে বলে কামনা থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। কিসের কামনা প্রতিহত হয়ে, কোন বিষয়ে নিরাশ হয়ে তাঁদের এই ক্রোধ? দেশমাতৃকার সেবাই যদি তাঁদের কাম্য, তার ত সহস্র পথ খোলা ছিল। আজ চার বছর হতে চলেছে, বিদেশী শাসক আমাদের পথের দাবী মেনে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, আমরা সে পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছি?

কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ আর সম্মোহ থেকে জন্মে স্মৃতিবিভ্রম। মোহের বশেই আমরা মনে করি শাসনব্যবস্থার সূত্র পরিচালনা আর ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা তর্কবিতর্ক দিয়ে দেশের ক্ষুদ্র উন্নতি অতি সহজেই সম্ভব হবে। অর্থাৎ কিনা, ওদের বদলে আমরা যদি ওখানে বাই তবে বাতাবাতি দেশের হালচাল, বীতিনীতি দরকার মত রদবদল করে সব সমস্যারই সমাধান অচিরে করে ফেলতে পারি।

বহুকালের পরাধীনতার কলে রাজশক্তির সার্বভৌমিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সন্নিবেশিত আমাদের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস স্বতঃই জন্মে গেছে। আমরা মনে করি, রাজ্য যখন দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তখন দেশের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি তাঁরই ইচ্ছায়, ইজিতে বা আদেশে সম্ভব। এমনতর ধারণার কোনোই ভিত্তি নাই। ওরকমটা যদি সত্যিই হ'ত তা হলে স্বাধীন মুসলমান রাজত্বের পরে এ দেশে একজনও হিন্দু থাকত কি না সন্দেহ। প্রজার উন্নতি-অবনতি বসটা না রাজার উপরে নির্ভর করে, রাজার উন্নতি অবনতি তার চেয়ে চেয়ে বেশী স্থানান্তরিত ভাবে প্রজার উপরে নির্ভর

করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির সন্ধেও এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য। কাজেই যারা মনে করেন রাষ্ট্রশক্তি অধিগত হলেই দেশের সার্বভৌম উন্নতির রথ 'ছুই দণ্ডে চলে যাবে ছ'মাসের পথ' তাঁরা নিতান্তই ভুল ধারণা পোষণ করেন।

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রশক্তি প্রজাশক্তিরই প্রতীক। পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রজার প্রতিনিধি; জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাকে ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত করাই তাঁর কাজ। জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ, প্রভু বা গুরু হিসাবে সেখানে তিনি প্রেরিত হন না। জনসাধারণ তাঁর ইচ্ছাতে পরিচালিত হবে না, তিনিই জনসাধারণের ইচ্ছা বাতে কাঁধে পরিণত হয় ব্যবস্থাপক সভায় তার ব্যবস্থা করবেন। সেই উদ্দেশ্যেই জনসাধারণ তাঁকে সেখানে পাঠায়। এর ব্যতিক্রম হলে নীচাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়।

কাজেই দেশের শাসন যন্ত্রই হোক, অথবা পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থাপক সভাই হোক, সব প্রতিষ্ঠানেরই কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনা স্থানান্তরিত ও সীমাবদ্ধ। যে-কোনো গণ-তান্ত্রিক দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এ কথা স্থম্পষ্ট হবে যে প্রজার শক্তিতেই দেশ বড় হয়েছে, আর তার পার্লামেন্ট শক্তিমান হয়েছে।

মন্ত্রিসভা, পার্লামেন্ট, ব্যবস্থাপক সভার মহিমায় মোহাজুর হয়ে যাঁদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৬-এর "হরিজন পত্রিকায়" প্রকাশিত মহাত্মাজীৱ স্বাক্ষরিত বাণী থেকে নীচের ক'টি পংক্তি তাঁদের উপহার দিচ্ছি :

"জগতে বাহা ঘটতেছে তাহা যদি আমরা ভাল করিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারিব যে আইনসভার বাহিরে বাহারা থাকে তাহারাই দেশকে সভ্য সভ্যই চালায়। যদি তাহা না হইত, তবে প্রতি দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া যাইত; কারণ দেশের জীবনকে পরিচালিত করার কাজ রূপশাল এবং তাহার তুলনায় আইনসভার শক্তি নিতান্ত নগণ্য। ঠিক কথা হইল এই যে, সমুদ্রের সহিত জলবিন্দুর যে সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের সহিত পার্লামেন্টের সম্পর্ক তাহার চেয়ে বেশী নয়।" (ইংরেজীর অনুবাদ। নিউদিল্লী, ২০-৪-৪৬)

8

এ যে কথা উঠেছে, পার্লামেন্টে বলিষ্ঠ একটি বিরুদ্ধ দল না থাকলে গণতন্ত্র ঠিকমত কাজ করবে না ওর মধ্যে যুক্তির চাইতে জিগির আছে ঢের বেশী। আমরা জানি, গিরি-জাহার খাঁটা পিঠে না পড়লে দ্বিবিজয়ের মনে ভালবাসার আমেজ জন্মত না,—তাই বলে সর্বত্রই প্রণয়ের পক্ষে সম্মানজনী অপরিহার্য্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না নিশ্চয়ই।

দেশপ্রেমের একটা লঘিষ্ট সাধারণ চেতনা, দেশের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য সন্নিবেশিত একটা স্বাভাবিক সন্নিবেশ, এক

কথায় জাতীয় বিবেকবুদ্ধির উন্মেষ না হলে তথাকথিত গণ-তান্ত্রিক দলাদলিতে লাভের চাইতে আমাদের লোকসানই হবে বেশী। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে শত অনৈক্যের মধ্যেও যে জাতীয় স্বার্থগত একটা সহজ ঐক্যবোধ আছে, আমাদের দেশে এখন সেটা সবেমাত্র গড়ে উঠছে। সেই ঐক্যবোধই হবে জাতির স্বাধীনতার ভিত্তিকৃমি। তার উপরেই হবে জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতিষ্ঠা। দেশের ধারা নেতা, দেশসেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে নেবার অধিকার এবং অবসর ধাঁদের আছে, তাঁদের কাজ হবে স্বাধীনতার সেই পাদপীঠকে হৃদুট করা, সমুন্নত করা। আর তাঁদের পক্ষে অকাজ হবে এমন কিছু করা যাতে করে জাতির বিবেক বিভ্রান্ত হয়ে সেই ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে আসে।

যুগব্যাপী পরাধীনতায় যে সর্পিণ রাজনৈতিক মনোভাবে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা নিতান্তই বাতিল হয়ে গেছে। তবু অভ্যাসের বশে তাই আঁকড়ে ধরে আমরা আছি। লোকায়ত্ত শাসনের আত্মগত্যা কায়মনোবাক্যে ঘেন্নে নিয়ে, স্বাধীনতার দায়িত্ব এবং শৃঙ্খলাবোধকে আমরা সহজভাবে অঙ্গীকৃত করতে ঘেন্না পারছিলাম। ফলে, একদিকে যেমন নিরঙ্কুশ সমালোচনার স্রোত দেশের সর্বত্র বয়ে চলেছে, অন্যদিকে গঠনাত্মক সহযোগিতারও তেমন অভাব হয়েছে। পরাধীন ভারতের অসহযোগের জের ঘেন্না স্বাধীন ভারতে এসে আজও শেষ হয়নি। আর এতে করে প্রতিপদে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির মন্বরতায় ধারা অসহিষ্ণু হয়ে, আগামী নির্বাচনে ব্যবস্থাপক সভায় বা পার্লামেন্টে তাঁদের মত উচ্চ মনোভাবাপন্ন লোক যাতে সমধিক সংখ্যায় প্রবেশলাভ করতে পারে তারই সাধনায় তৎপর হয়েছেন,

তাঁরা খুব সম্ভব মনে করেছেন সোয়ার বদলালেই আজকার যেতো ঘোড়া কাল পক্ষীরাজ ঘোড়ায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু তা হয় না, হবেও না।

আর, উগ্র সাম্যবাদীর দল ধারা বোমা-বালু দিয়ে কেল্লাফতে করবার চেষ্টায় আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই; তবে উপায়টা যে তাঁদের সত্বপায় নয় তা ত তাঁরা নিজেরাই বলেন। আমরা শুধু বলি অমন সরাসরি উপায়ে স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। ও উপায় বাইবেলের আদিকাণ্ডে পৃথীব্যাপী প্রাবনের অত্মপান দিয়ে ভগবান নিজেই একবার পরখ করেছিলেন; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও পরাধীন্য স্থাপনের চেষ্টায় কতকটা ঐ রকমই তিনি করেছিলেন যুগোপযোগী উপকরণ দিয়ে। অত্মপানের ক্রটি উন্নয়ন কোথাওই হয়নি। কিন্তু ফল যা হয়েছে, তা ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

অসহিষ্ণুতা ও অত্মদারতার বশে দেশের বত সমস্তা, বত হুভোগ সবকিছুর দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ঋনিকটা মিথ্যা আত্মপ্রসাদ পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তাতে করে হুভোগের বোঝা আমাদের এতটুকুও হালকা হবে না, সমস্তাও সমাধানের পথে এক পদও অগ্রসর হবে না। বরং বোঝা আমাদের আরও ভারী বোধ হবে, সমস্তাও আরও নূতন নূতন আকারে দেখা দেবে।

যেখানে রোগ, চিকিৎসাও সেইখানেই প্রয়োজন। সত্যিই দেশের দ্রুত অগ্রগতি ধাঁদের লক্ষ্য হবে, তাঁরা ব্যবস্থাপক সভায় বা পার্লামেন্টে 'বলিষ্ঠ বিরুদ্ধ দল' গঠনের নিফল চেষ্টায় মন না দিয়ে, ও সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে, গঠন কণ্ঠের ভিত্তির উপরে, বিশাল ভারতের বৃক কোটি কোটি নর-নারী নিয়ে বিশাল ভারতীয় সেবাদল গঠনকার্যে মনোনিবেশ করলে অনেক সমস্তার উপরেই সমাধানের আলোক পড়বে—এ অতি স্থনিশ্চিত। আর, স্বল্পম্যন্ত ধর্ম্মস্ত্র ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

কবিতার দুঃখ

জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বটি মাছের স্বপ্ন দুখ ভাগী,
বাস করি এক ঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারিনে
প্রীতা কি কল্পজরে।
দেখি তাহাদের অন্নকষ্ট,
নানা দিকে ক্ষতি-ক্ষয়,
কিন্তু তাদের মৈনন্দিন
দিই না কোঁ পরিচয়।

তাতে কি সার্থকতা,
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের
কহি হাঁপানীর কথা ?
২
দাবানলে যুগ-মরকের কথা
বলে না'ক যুগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ-জলের
প্রতিনিধিত্ব দাবি,

রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে,
সন্দেশ নাই অণু,
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়,
রামধনু, রামধনু ।
পঙ্কেতে রয় বোটা,
কি দোষ, যদি না রহে পঙ্কে
পঙ্কের ছিটা-ফোটা ?

৩

হীরক রাখে না আবেষ্টনীর
কয়লা কালিমা লেশ,
অকথিত থাকে খনির আধার,
খনি-প্রমিতের ক্লেশ,
সাপের মাথার মাণিক—তাহারো
আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয় নাকো বিষদংষ্ট্রার
গয়লের সংবাদ ।
শুভ শব্দ ঘন—
শব্দকদের 'শব্দের' কাহিনী
করে না তো নিবেদন ?

৪

'চোক গেল' বলে পাণিয়া ফুকারে,
সেটি হয় সঙ্গীত,
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র গর্জন করে
সেটা তার বিপরীত ।
অতিক্রম যে করে সঙ্গীত
সব বাতনার সীমা,
ছন্দে ও সুরে রাজে তার চির
বাসন্তী পূর্ণিমা ।
ভিক্ততা রহে দূর
গীত যে সাগর-উষিত সুখা
সব তার স্বমধুর ।

৫

এসেছে দারুণ মনস্তর,
মাহুত করিবে কি ?
লাভ তো কিছুই হবে না, করিয়া
মনকে হতভ্রী ?
তথাকর নাম না দিয়া চাঁদকে
যদি বলা হয় 'খেটে',
পড়িবে কি একমুঠা বেশী ভাত
তাতে ক্ষুধিতের পেটে ?

কে হবে তাহাতে ধনী ?

খুলে লও যদি ধরাগাজের
স্বপ্নার আবরণী ।

৬

অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে,
কি বলিবে মহাজনে ?
কাশ্মীরী শাল, না বুনে, শিল্পী
'গাম্ছা'ই যদি বোনে ?
বাগা অজস্তা 'মাহুরা' গড়েছে,
খ্যাত যারা চরাচরে,
কলালক্ষ্মীই কাদিবে—তাহারা
যদি শুধু 'ঢেঁকি' গড়ে ।
বাড়িবে বিড়ম্বন,
সকল লেখনী লাঙল হইলে
উপবাসী রবে মন ।

৭

ভেব না নেহাৎ উদাসীন আমি,
নাহিক সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি,
ছোঁগাতে না পারি ধুতি ।
আমি তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা
বেদনার কথা কই,
স্তবপুরে তাহা পাঠাবার শুধু
যোগ্য করিয়া লই ।
বুঝিতে করো না ভুল,
বাণী-অর্চনা হয় নাকো দিয়।
গোবরের বর্জুল ।

৮

যুগ-উপযোগী হতে কহ মোরে
তাতে মোর কচি নাই,
সব দেশ, কাল, জাতির আমি যে
মধ্যমা পেতে চাই ।
খনিক, বণিক, শ্রমিক ক্ষণিক,
কারো প্রীতিকামী নহি,
আমি জগতের যজ্ঞের চক
দেবতার তরে বহি ।
আর কিছু নাহি পারি,
আমি তোমানিকে করি আনন্দ
অমৃতের অধিকারী ।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

শ্রীহরিহর শেঠ

মানবদেহ ধারণ করিয়া সর্বাপেক্ষা বাহ্য আবশ্যক তাহা শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত জীবনলাভ করা। এই দুইটির মধ্যে যে গুরুত্ব নিহিত এবং তাহা কাহার কতটা আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহার পরিমাপক কোন আখ্যা নাই, মাপিয়া দেখিবার কোন যন্ত্র বা পছা নাই। যেমন বিজ্ঞান মাপকাঠি এখন মূখ্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি তেমন কিছু নাই। তবে এখন মানুষের পরিচয় অনেকটা তাহার ধনসম্পদের বহিঃপ্রকাশে। আর তাহার সঙ্গে যদি সংযোগ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা। অতি অল্পক্ষেত্র ভিন্ন সাধারণতঃ দেখা যায়, ধনশালী ব্যক্তিগণই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রায় সকল বিভাগেই প্রাধান্য পাইয়া থাকেন, আর তাঁহারাষ্ট্র প্রধানতঃ মানব-সমাজে প্রখ্যাত। শিক্ষিত ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে তাঁহাদের মধ্যে নাই বা থাকিতে পারেন না একথা কেহই বলিবেন না। দুঃখের বিষয়, সে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বা মানবতার মর্যাদা আজ কোথায়! মনুষ্যত্বসম্পন্ন বিত্তহীন মানুষ সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন এমন মৌভাগ্যবান অধুনা কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়?

মনুষ্যত্ব বা মানবতাবিহীন ‘মনুষ্য’ নামধারী জীবের সঙ্গে বনচরী পশুর খুব বেশী পার্থক্য নাই। মানুষই একমাত্র জীব বাহ্যর সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বসবাস করিয়া থাকে। সেখানে মানবোচিত ধর্ম লইয়া জীবনধারণ করিতেই হয়। অন্তর্নিহিত স্তূপ প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া জগতের কল্যাণে রত হওয়াও মানুষের ধর্ম। সেই জন্ত আমরা নানাবিষয়ক বিদ্যার সাধনা করিয়া থাকি। বিজ্ঞান প্রভাবে জগতের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে সত্য। আজ বিজ্ঞানবলেই জগতের এই রূপ—অসম্ভব বলিয়া এতাবৎ বাহ্য কল্পনার অতীত ছিল তাহা এখন প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এসব যে বিজ্ঞান প্রভাবেই, একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু মানবজীবনে এই সব স্থূল-কলেজী বিদ্যাষ্ট্র যে শুধু মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে তাহা নহে। বিদ্বান ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা সাধারণতঃ শিক্ষিত বলিয়া থাকি। বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি যে যে বিষয়ে বিদ্যা অর্জন করিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে তিনি সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত বলিতে বাহ্য বুঝায় তিনি যে তাহা হইবেনই এমন কোন কথা নাই। বর্তমানে বিদ্যার্জনের জন্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র পথ। তথা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতিতে অনেক কিছু লাভ হয় সত্য। বিদ্যালোচনা জ্ঞানলাভের সহায়ক। কিন্তু সমাজে থাকিয়া স্তূভভাবে জীবনধারণের জন্ত তাহাই যথেষ্ট নহে। সেজন্য বাহ্য কিছু জ্ঞান প্রয়োজন তাহা তথায় পাওয়া বাইবেই এমন কথাও বলা যায় না। সেই জ্ঞানের নামই শিক্ষা। সেই জ্ঞান এবং জানিয়া সেই মত চলা বা প্রয়োগ করাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, মানবতার প্রতীক এমন শ্রেষ্ঠ মানুষের উদ্ভব যে অসম্ভব বা তথাকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই যে তিনি মনুষ্যত্ব বিবজ্জিত হইবেন একথা কেহই বলিবেন না। এরূপ শিক্ষিত লোক যেমন অনেক পাওয়া যায়, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কহীন এমন কি নিরক্ষর-দিগের মধ্যেও জ্ঞান ও মানবতার উচ্চ সীমায় আকৃত লোকের দৃষ্টান্তও জগতে বহু আছে। মানুষের ইন্দ্রিয়-গোচর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাহ্য শক্তির সহিত অন্তরেন্দ্রিয় স্থূল, সূক্ষ্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ের জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত মানবোচিত প্রচ্ছন্ন গুণাবলীর বিকাশ ব্যতিরেকে শিক্ষার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় না। মানুষের বাহ্য কর্তব্য তাহা পালনই তাহার ধর্ম। মানুষের মনুষ্যোচিত কর্তব্য পালন করিতে হইলে হিংসা, ঘেঁষ, লোভাদি রিপূর তাড়না হইতে প্রথম মুক্ত হইতে হইবে। ত্যাগের অল্পশীলন, আত্মসংযম অভ্যাস, দেশের কল্যাণ-চিন্তা ও তাহাতে রত হওয়া দরকার, ইহাই মনুষ্যত্ব। দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন আবশ্যক। বহুমুখ এই মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—

“চৌধুরের ধর্ম কি?—সৌহার্দ্য। অগ্নির ধর্ম কি?—দাহকতা। জলের ধর্ম কি?—দ্রাবকতা। বৃক্ষের ধর্ম কি?—কলপুষ্পের উৎপাদকতা। মনুষ্যের ধর্ম কি?—মনুষ্যত্ব।”

এই মনুষ্যত্বই যখন মানবজীবনের সার্থকতা, স্তূভরূপে উহাই চরম সম্পদ, তখন মানবতার সাধনার জন্য বাহ্য কিছু আবশ্যক সে দিকে যে লক্ষ্য রাখা উচিত, মনে হয় এ বিষয়ে নেতৃবর্গের উদাসীনতা আছে। আধুনিক ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে হারে মানুষ জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছে, পূর্বের যখন এ শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, আক্ষরিক শিক্ষা স্বল্পলোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল বা যখন গুরুমহাশয়ের

পাঠশালা টোল অথবা গুরুগৃহই বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল, তখন অনেক মানুষই এখনকার মত বিবিধ বিদ্যায় কুশিল না হইলেও শিক্ষিত জ্ঞানীর সংখ্যা যে কম ছিল তাহা নহে। পূর্বের সহিত তুলনা করিতে হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য, এখনকার মত তখন জীবনযাপন এত জটিল হইয়া উঠে নাই। তখন যে-সব শিক্ষার তত প্রয়োজন ছিল না এখন তাহা আছে। বাহার প্রয়োজন আছে তাহার অনুশীলন চাই-ই, কিন্তু তাহা মনুষ্যত্বের বিসর্জন দিয়া নহে।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপপুরাণাদিতে আমাদের কোন জ্ঞান নাই; কিন্তু গল্পে-কথায়, বাত্রা কথকতায়, থিয়েটারের পৌরাণিক কাহিনী হইতে এবং বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে যে ধারণা মনে বহুমূল হইয়া আছে তাহাতে এখনকার মত মনুষ্যত্বের এমন লাঞ্ছনা, এমন অবমাননা আর কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যাভ্যাস করিতে, বিদ্যার নানা দিকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি। বক্তাব্যবস্থা প্রচলন, উন্নতি এবং উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদের মনীষীরা সর্বদা সচেষ্ট; এমন কি আমাদের এই বক্তাব্যবস্থা বাহাতে ভারতের সর্বত্র প্রসারলাভ করিতে পারে সেজন্য আমরা উদ্যোগী হইয়াছি। ইহা অবশ্য ভালই। ইহার দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মনুষ্যত্বই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, বাহার অভাবে আজ আমাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত, সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, নতুন রাষ্ট্রিক জীবন কলঙ্কিত তাহা লাভের জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ত দেখি না। বিদ্যা ও শিক্ষা, মানুষ ও মনুষ্যত্বের স্বাতন্ত্র্য বিবেচনা করিয়া সে বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ ও পালন করিবার জন্য তাঁহাদের ঐক্যমত পরিহারের বিশেষ চেষ্টা কি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র-সমূহে পরিদৃষ্ট হয়? এই অপূর্ণতা দুর্বলতার জন্য আমাদের কত সম্পদ হ্রাস হইয়া সর্বনাশের পথ স্ফুটন হইতেছে কে তাহা নির্ণয় করিবে।

আমার এই সব মন্তব্য হইতে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রিষ্ট এক সংখ্যালঘু বিদ্বান সম্প্রদায় হইতে হয়ত কথা উঠিবে, সে শিক্ষা এবং তাহার পরীক্ষা কি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্ভব হইতে পারে। যদি একথা উঠে, ইহার ঠিক মত উত্তর দেওয়া বা পথ নির্দেশ করার মত ক্ষমতা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তদুত্তরে এই কথাই শুধু বলিতে চাই, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহ বাস ও শিক্ষা এসব বাহা এখন কল্পনার বিষয় হইয়াছে, লোক শিক্ষার পুরাতন ব্যবস্থাদি এখন আজ লুপ্তপ্রায়, এখন সরকারনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ভিন্ন

আমাদের জ্ঞানার্জন্যের এখন অন্য পথ নাই, তখন তাহার মধ্য হইতেই আমাদের মানুষ হইবার মত শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে, কি উপায়ে তাহার পরীক্ষা লওয়া সম্ভব এসব কথা শুধু শিক্ষাকেন্দ্রের নয় রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষভাবে লিখিত পুস্তক পঠনব্যবস্থা, কি পোট গ্রাজুয়েটের অপর কোন নতুন বিভাগ খোলার দ্বারা এ কার্য স্ফুটন হইবে বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট স্থল কলেজের শ্রেণী ছাড়াও তৎসহিত কথকতা যাত্রাদি অথবা ঐ সকলের স্থলাভিষিক্ত সরকারের ক্রিয় ডিভিশনের সহায়তা দ্বারা লোকশিক্ষার অন্য পথ গ্রহণ আবশ্যক সে সকল বিষয়েও চিন্তা করিতে হইবে।

আমার এই যে আলোচনা ইহা হয়ত 'ছোট মুখে বড় কথা'র মতই প্রতীয়মান হইতে পারে। আমাদের চরম পরীক্ষার দিন সম্মুখে। আমি দীর্ঘদিন হইতে বাহা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি, শিক্ষা প্রসঙ্গে রক্ততা অথবা প্রবন্ধাদিতে বা সভাসমিতিতে বলিয়া আসিতেছি তাহাই একটু বিশদ ও স্পষ্ট করিয়া এখানে বলিলাম মাত্র। আমার কথা, যদি আমার এই চিন্তাধারা বাহা আমার বিশ্বাস বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই ভাবিয়া থাকেন—তাহার কোন সার্থকতা থাকে তবে জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ বিষয় অবহিত হইতে হইবে। ইহার সারবত্তা অহুত হইলে সরকার সে শিক্ষার পথ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

একণে স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হইয়াছে। আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাবজনিত এই অবর্ণনীয় দুর্দিনে রাষ্ট্রনায়কগণ বহু চিন্তা-প্রস্তুত পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে অজস্র অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন। আশা করা যায়, ইহার সফল এক দিন পাইবই; কিন্তু ভয় হয় স্বাধীনতা পাইবার মাত্র এক যুগ পূর্বেও মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে আমরা বাহা ছিলাম একণে তাহা হইতে কত নামিয়া গিয়াছি, এই নিয়গামী গতিরোধ করিয়া আমাদের মধ্যে নতুন করিয়া মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে না পারিলে সম্যকভাবে তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের এই বর্তমান দুর্দশার একটা বড় কারণ যে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিলোপ-প্রাপ্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা আধিকার লাভ ত সকলেরই কাম্য, কিন্তু সে স্বাধীনতা মানুষের হইলেও মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত মানুষের যদি হয় তাহা অনিষ্টেরই মূলীভূত কারণ হইবে। বহু কাম্য বিপুল ভাগ্যগুরু স্বাধীনতা হয়ত অলিঙ্গিত হইয়া যাইবে। অমানুষ্যের হস্তে অধিকার পাওয়ার কখনও কল্যাণ হইতে পারে না।



গোপাল

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

সকালবেলা গোপাল যুঝ্জে তাহার ছোট মনিহারী দোকানের সামনে একখানা তিনপায়া টুলের উপর বসিয়া বিড় টানিতে-ছিল। মাঠের উপর অল্পস্র সোনালী রোদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বাতাসে একটা নাম-না-জান' ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে অথচ গোপাল যুঝ্জের মন যথেষ্ট প্রকুর নয়। গ্রামের বাজারে একাধিক মনিহারী দোকান, বেচাকেনা খুবই কম, একটা লোকের মোটা ভাতকাপড় কোটামণ্ড মুশকিল, এ অবস্থার গোপালের মন প্রকুর থাকিতে পারে না।

সংসারে গোপাল একা, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃ-কুলে কাছাকাছি কেহ নাই। অবিবাহিত গোপালের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, নৈশবে কিছুদিন কুলে গভীরতায় করিয়া-ছিল বটে, কিন্তু বিভালাত বিশেষ বটে নাই।

সৃষ্টিকর্তা এক একটা মানুষের সৃষ্টির ভিত্তর দিয়া এক একটা রসসৃষ্টি করিয়াছেন। কোন মানুষটি আদিরসপ্রধান, দেহিতে কন্দর্পের মত সুন্দর, কোন মানুষটি বীররসপ্রধান, সর্বদাই যুদ্ধং দেহি ভাব, কোন মানুষটি ককণরসপ্রধান, চোখ দুটি হল হল যুখে হাসি নাই, একটা অদৃষ্ট ছাংয়ের বোকার বিমত, আবার কোনটি হান্তরসপ্রধান—যেমন এই গোপাল যুঝ্জে। গ্রামবর্গ গোপাল বেঁটে মানুষ, হাত-পা শীর্ণ অথচ পেটটি খোটা, উপরের দাঁতগুলি উঁচু থাকায় যুঝ্জখানি সব সময়ই হাসি হাসি।

তিনপায়া টুলের উপর বসিয়া গোপাল আমমনে বিড় টানিতেছিল—আজ সকালে বরফার ঘেন অল্পদিনের চেয়েও কম। পথ দিয়া যে ছই-চার জন চলিতেছে তাহার দোকানের দিকে কিরিয়ও তাকাইতেছে না। বিড়টি পুড়িয়া গেলে সেটি কেলিয়া দিয়া গোপাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনপায়া টুলটির

ভারসমতা রক্ষা করিয়া পা' হুট তুলিয়া টুলের উপর আসন-পড়ি তইয়া বসে এবং মনে মনে দেনা-পাওনার হিসাব বভায়।

হঠাৎ একখানা মত বড় বড়বকে মোটর পথ ছাড়িয়া তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া থামে এবং ভিতর হইতে দুটি সুইপার তড়লোক মাঝিরা আসেন। গোপালের মানসিক গোলমাল হইয়া যায়, সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনপায়া টুলটি হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়। প্রথম তড়লোক আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করেন, “দেখুন, আপনি ত্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জীকে চেনেন?” গোপাল মাথা নাড়ে, কেননা নামটি তাহার হইলেও সে বুঝিতে পারে মোটর গাড়ীর বায়ু দুটি তাহার মত মগন্য লোককে হুঁকিতেছে না। পিছন তইতে দ্বিতীয় তড়লোকটি প্রশ্ন করেন, “হ্যাঁ মশায়, বসুন ত এ গ্রামের নামটি কি?” এই বার গোপাল কতকটা নির্ভর হয়, সমস্তম্বে জবাব দেয়, “আজ্ঞে এ গ্রামের নাম বেলগাছি।”

তৃতীয়া তড়লোক বলেন, “গ্রামের নামও মিলে যাচ্ছে, মনিহারী দোকানও মিলে যাচ্ছে, অথচ দোকানের মালিক ত্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জীকে আপনি চিনেন না—আশ্চর্য্য।” প্রথম তড়লোক হাসিয়া বলেন, “নাও চিনতে পারেন, সবটা পরিচয় ত দেওয়া হয়নি, সবটা মিলে হইতো চিনতে পারবেন, আমরা খুঁজছি ৩৬৫৬৬৬ মুখার্জীর প্রপৌত্র, ৩৬৬৬৬৬ মুখার্জীর পুত্র ত্রীগোপালচন্দ্র মুখার্জীকে।” তৃতীয়া গোপালের যুঝ্জটা প্রথমে লাল হইয়া ওঠে, তারপরে সেই পরিমাণে কালো হইয়া যায়। দ্বিতীয় তড়লোক এইবার হতাশ হইয়া বলেন, “তা হলে আপনি গোপাল যুঝ্জকে চিনেন না দেখি।”

বতমত খাইরা ভীত গোপাল এইবার বলিয়া ফেলে, “আজ্ঞে আমিই গোপাল যুগুৎসে।”

মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ এক কলসী ঢাকা পাইলে মাহুকের অবস্থা যেমন হয় গোপালের উত্তর শুনিয়া তত্নলোক ছুইটির সেই অবস্থা হইল, তাঁহার সম্বন্ধে চোঁচাইয়া উঠিলেন, “পেরেছি—পেরেছি।” তারপরে প্রথম তত্নলোকটি ছুই হাত ছোঁড় করিয়া অভ্যন্তর বিনীতভাবে নমস্কার করেন, আর দ্বিতীয় তত্নলোক বাঁ হাতে নেকটাই সামলাইয়া একেবারে খুঁকিয়া পড়িয়া গোপালের পদধূলি লন।

ইতিমধ্যে ছুই-চারি জন করিয়া গ্রামের অধেকেরই আসিয়া পড়েন। প্রথম তত্নলোক সেই সমবেত জনতাকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, “আজ আমাদের এক মহা আশ্বিনের দিন, এক মাস বরে আমরা যে রক্তের সন্ধান করছিলাম আজ তা এইখানে এই মুহূর্তে পেয়ে বড় হলাম। আপনারা নিশ্চয়ই শক্তিপুরের জমিদারদের নাম শুনেছেন, আমি হচ্ছি সেই জমিদারীর উকিল, আর ইনি হচ্ছেন ম্যানেজার। আপনারা হয় তো জানেন না যে, শক্তিপুরের জমিদার ত্রিগুণেন্দ্রনারায়ণ রায় বিলেত থেকে আসবার পথে এরোগেন্নে ভেঙে মারা গেছেন—সে আজ হ’মাসের কথা। রণেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন অবিবাহিত এবং তাঁর নিকট-আত্মীয়ও কেউ নেই—এ অবস্থার আমরা তাঁর দূর সম্পর্কের উত্তরাধিকারীর সন্ধান শুরু করি এবং যথাসময়ে ত্রিগোপালচন্দ্র মুখার্জীর নাম ঠিকানা পাই। গোপালবাবুর মাসীর বংশের মাথা হচ্ছেন শক্তিপুরের জমিদারদের দৌহিত্র। এক মাসের খোঁজাবুজির পর আজ আমরা শক্তিপুর জমিদারীর স্ত্রী সিংহাসনের মালিককে পেয়েছি।” শুনিয়া সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে—গোপালের মাথা ঘুরিয়া যায় এবং পা কাঁপিতে থাকে।

ইহার পরে কি অবস্থার এবং কেমন করিয়া গোপালকে ঘোড়ার তোলা হয় তাহা তাহার খেলনা নাই।

নুতন জমিদারের আগমন উপলক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া শক্তিপুরে মহোৎসব চলে। গোপালের দিনগুলি একটা যাত্রার অবস্থার ভিত্তর দিয়া কাটিতে থাকে; প্রকাণ্ড রাজ-বাড়ী, সাজান বড় বড় ঘর, আসবাবপত্র, বাঁক, গালিচা, আমলা গেম্বা, পাইক, পেয়ালা, দাসদাসী ইত্যাদির মালিক সে, এবং কেন্দ্রস্থল। অবশ্য বেলগাছির হেঁড়া হাকনাট-পর গোপাল আর সে নাই, পোশাকে-আধাকে তাহারও ভাল একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

সেদিন সকালবেলা গোপাল সপরিবার রাজবাড়ীর বাগানে বেড়াইতেছে এমন সময় কে একজন তত্নলোক খুঁড়ি-চাড়র বেসামাল অবস্থার হতভুত করিয়া তাহার পায়ে কাঁচ মওবৎ

হইয়া পড়েন। বেশ কিছুকণ বাদে খুঁড়ি উঠিয়া মাকে উপরকার হতা-বাঁধা চশমাছোঁড়া সংবত করিয়া কোঁচকাতে কহিতে থাকেন, “আহা কি সৌম্য সমাহিত ভাব, বদন মওতে কি দিব্যকোমতি, দর্শনে মহাপুণ্যলাভ হয়। মহারাজ আপনি মহাপুরুষ, মহাপুরুষ।” গোপাল পরিচয় পাইল তত্নট হানীত পণ্ডিত এবং মহা বর্ষপ্রাণ। পণ্ডিতবর উপস্থিত অত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, “এই যে এত লোক তোমরা এখানে উপস্থিত আছ, কৈ, কাউকে দেখে ত মন আকৃষ্ট হচ্ছে না? অথচ যেই মহারাজকে দেখলাম অমনি তক্তিতে মাথা ঠুঁর পাই আপনিই হয়ে পড়ল।” পণ্ডিত মশায় অনেককণ ধরিয়া বেদবেদান্ত হইতে কঠোর বিবাহসংকট ও পুণ্ডের শিক্ষাসমতা পর্য্যন্ত অনেক কথা বলেন। বিদায় লইবার সময় আবার পদধূলি লইয়া কহেন, “রাজা অনেক দেখেছি কিন্তু রাজর্ষি এই প্রথম দেখলাম।”

জমিদার বাড়ীর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় সন্ধ্যাবেলা আসর জমিয়াছে, মাঝখানে তাকিয়া চেস দিয়া গোপাল সমাসীন, চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সত্যসদয়ল, সুগন্ধি ভাস্মাকের ঝোঁয়ার বর তরপুর। সাহিত্যিক আনন্দবাবু কথা কহিতেছেন, বলিতেছেন, “বারিপাভ না হলে যেমন ফল কলে না তেমনি রাজার কৃপাদৃষ্টিপাত না হলে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, রাজা বিজ্ঞানাদিত্য অসুগ্রহ করেছিলেন বলেই কালিদাস কাব্য লিখতে পেরেছিলেন।” শ্রোতার বিজ্ঞতাবে বাড় মাড়ে, আনন্দবাবু উৎসাহিত হইয়া বলেন, “আরও দেখুন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সত্যকবি রাধাগুপ্তের তারতচন্দ্রের ইতিহাস, কৃষ্ণ-চন্দ্রের কৃপাতেই তিনি বশবী হয়েছিলেন। মহারাজ, আপনিই বলুন একথা যথার্থ কি না?” মহারাজ কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পান না, অথচ একটা কিছু বলিতেই হয়—অবশেষে যুহুহাত্ত করিয়া বলেন, “হ্যাঁ, কথা ঠিক, কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় কালিদাস বশবী হতে পেরেছিলেন।”

তিনি সত্য সকলে চমৎকৃত হয়, কেহ বলে, “কি অগাধ পাণ্ডিত্য,” কেহ বলে, “কি হৃদয় রসবোধ।” আনন্দবাবু সদগণ কর্তে বলেন, কি গভীর গবেষণা, কালিদাস যে বাঙালী ছিলেন এক কথায় মহারাজ তা প্রমাণ করে দিলেন—মহা-রাজের চরণতলে বসে কত যে শিখলাম, কত যে শিখব।”

দেউলে ব্যবসারী সত্যপদবাবু একটু দেরিতে আসিয়া শিখনে বসিতে বাধ্য হইরাছিলেন, এতকণে ঘষিতে ঘষিতে সামনে আসিয়া পড়িয়াছেন, আনন্দবাবুকে এক রকম ধামাইয়া দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “সাহিত্য তো সামান্য বিষয়, আমাদের মহারাজের ব্যবসার বুদ্ধি এত প্রখর যে চাঁটা বিরলা ঠুঁর চরণতলে বসে শিকালাত করতে পারে।” মহারাজ যে ইতিপূর্বে একটা ব্যবসারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এ খবর উপস্থিত সকলেরই জানা ছিল, সত্যবাবুর কথায় সকলেই

তাই একবাক্যে সায় দিয়া উঠে। সত্যাব্যু সোৎসাহে বলেন, “মহারাজের মত প্রতিভাবান মানুষ যদি আজ ব্যবসায়কেই নাহেন তা হলে একটা বিপ্লব ঘটে যায়।” আমন্দাব্যু হঠাৎ পাড় নহেন, কথায় তাঁহার উপর। তিনি বলেন, “প্রতিভার ক্ষেত্র ব্যবসায় নয়, প্রতিভার ক্ষেত্র সাহিত্য, বিরলা টাটা দু’দিনের কিন্তু কালিদাস রবীন্দ্রনাথ চিরকালের।” ইহার পরে আমন্দাব্যু ও সত্যাব্যুতে হাতাহাতি হইবার আগেই সত্য তদ্ব্যবহাঃ।

নিম্নরূপ রাজি, আসবোলায় শেষ কলিকা চড়াইয়া দিয়া খাস চাকর বিদায় লইয়াছে, পালকে শয্যা প্রস্তুত, শুইলেই হয়, অথচ গোপাল জানালার ধারে দাঁড়াইয়া কোৎসাদ্রাবিত ধরণীর দিকে ভাকাইয়া আছে। ধরণীর দিকে ভাকাইয়া আছে বলার তুল বলি হইল, কেননা গোপাল আসলে ভাকাইয়া আছে তাহার ব্যক্তিত্বের দিকে। কি আশ্চর্য্য, এতদিন সে নিজেই কামিত না কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাহার। সে মহাপুরুষ, রাজর্ষি, সে একটা বিরূপ প্রতিভা। বেলগাহির বাজারে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, পারিবেই বা কেন? ধরণীর আদর ধরণীসমাজেই হইয়া থাকে। ভগবানকে সন্মান করিয়া সে মনে মনে কহিল, “হে প্রভু, আমাকে লইয়া কি মহান খেলা তুমি খেলিবে তা তুমিই কেবল জান।”

আগসি বরে ম্যানেজারব্যু গোপালকে জমিদারী সংক্রান্ত হু’একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও পোটা করেক সই লইতে আসিয়াছেন। মহারাজের এত প্রবর বুদ্ধি যে ম্যানেজার বাহা দুখাইতেছেন তিনি তাহাই বুঝিতেছেন, আইনের বড় বড় ধারাগুলিতে পর্য্যন্ত আটকাইতেছে না। আশ্চর্য্য হইয়া ম্যানেজারব্যু বলিতেছেন, “মহারাজ আইন পড়েন নি জানি, কিন্তু না জানলে কিছুতেই বলতে পারতাম না আইন পড়েন নি।” মহারাজ একটু একটু হাসিতেছেন এবং কাগজে সই করিতেছেন এমন সময় বেদারী আসিয়া ধর আনাইল আমন্দাব্যু দরকার উপস্থিত—মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে চান। ম্যানেজার কাগজপত্র গুছাইয়া বিদায় লইলে আমন্দাব্যু ঘরে ঢুকিয়া পদগুলি লইলেন এবং হাতজোড় করিয়া কহিলেন, “আজ একটা মহাকাব্যের সূচনা করব তাই মহারাজের পারের বুলো নিতে এলাম।”

মহারাজ বসিতে অস্বস্তি করিলে আমন্দাব্যু চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং একটা পতীর ভাবনায় অবস্থায় তাঁহার মহাকাব্যের মোটা কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া ইহা লেখা হইবে, মহারাজের কীর্তি, খ্যাতি ও প্রতিভার কথার প্রত্যেকটি অধ্যায় ঠাসা থাকিবে। অবশেষে উপসংহারে বলিলেন, “অতীতকালে রাজামহারাজকে কেন্দ্র

করে যদি মহাকাব্য লেখা সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে একালে কেন হবে না—নিশ্চয় হবে, আমি দেখিয়ে দেব হবে।”

ইহার পরে সাধারণ কথা শুরু হয়। আমন্দাব্যু বলেন, “একখানা উপভাস ছাপতে প্রেসে দিয়েছি, কিন্তু টাকার যোগাড় হচ্ছে না, মহারাজের কাছে তাই সামান্য হাজারখানেক টাকা প্রার্থনা করছি।” সেদিন টাকা না পাইলেও আমন্দাব্যু আশা পাইয়া উঠিলেন।

বিকালের দিকে পদগুলি ও সেই সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধে করেকটি অমূল্য উপদেশ লইতে সত্যপদব্যু একটা মত বড় কাইল বগলে করিয়া উপস্থিত হন। এদিকে কোন কাপড়ের মিল নাই, একটা মিল খুলিবার সব ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে, কেবল টাকার ব্যবস্থা হয় নাই, এই বিষয়ে মহারাজের উপদেশ চাই। টাকা ঘরে রাখার চেয়ে কারবারে খাটানো যে লাভজনক একথা মহারাজের মত ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে বলিয়া দিতে হইবে না, তিনি অগ্রণী হইয়া মিলের অর্ধেক শেয়ার কিনিয়া লইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন বাকি রহিল মহারাজের আশীর্বাদ, তাহা পাইলেই মিলের প্রতিষ্ঠা ও গ্রীষ্মকাল অনিবার্য্য। ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ বিষয়টা তাবিত্য দেখিতে রাজী হইলেন।

ইহার পরে রাজবাড়ীতে সত্যপদব্যুর আনামোনা জন্মেই বাড়িয়া যায়, লোকে গোপনে বলাবলি করে ব্যবসায়-সংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া আরও একটা কথা চলিতেছে। শেষে যেদিন সত্যপদব্যুর সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী ভগ্নী মালিকা দাদার কাইল হাতে করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন সেদিন কথাটা আর গোপন থাকে না। অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই, কেননা মহারাজের বয়স হইয়াছে এবং পাত্রীটিও ভাল।

মালিকাকে গোপালের সত্যই ভাল লাগে। সেদিন সন্ধ্যার দিকে মালিকার শাড়ীর রং, চুলের গন্ধ এবং হাসির সুর এমন একটা আশ্চর্য্য পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, গোপাল তাহার মনের কথাটা বলিয়া কেলে। মালিকা ইহার ক্ষণ প্রস্তুত ছিল কি না বলা যায় না, তবে মত দিতেও সময় নষ্ট করে না। অতঃপর দুই জনে প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু ধায়। গোপাল রহস্য করিয়া বলে, “আমার মত বৃত্তা বরকে তোমার পছন্দ হবে মালিকা?” মালিকা জবাব দেয়, “পৃথিবীতে আপনার মত সুন্দর কে?”

আকাশে অগণ্য তারা, পৃথিবী নিখিল, রাজবাড়ীর ভেতলার ছাদে একাকী পদচারণ করিতেছে গোপাল। ভিন্ন মাস অতীতের ইতিহাস, অধ্যাত দরিত্রজীবন, বেলগাহির বাজার, মনিহারী দোকান, এ সব তাহার কাছে আজ বর্ণের মত অস্পষ্ট। এমন একটা সুসজ্জিত অতীত তাহার জীবনে

আদর্শেই ছিল কি না সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হয়। সাধারণ সে মনে, হইতেই পারে না। পারের নীচে ঐ যে ধূলিময় বরষা, উহা যেন দূরে আরও দূরে সরিয়া বাইতেছে, মাথার উপর ঐ যে তারকাখচিত বিরাট আকাশ উহা যেন কাছে, আরও কাছে নামিয়া আসিতেছে। গোপাল শুক হইয়া দাঁড়ায়, আপনার বিরাটকে আপনি অস্বস্তি করে। জানে সে বড়, শুনে সে বড়, দেখে গেল রূপেও সে বড়। পৃথিবী যদি তাহার কাছে কোড়হাত করিয়া না দাঁড়ায় তবে দাঁড়াইবে তাহার কাছে? তবে একটা কীট। তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট করিয়া বিঁধে, সেটাকে সে আর দেখি না করিয়া তুলিয়া ফেলিবে, গোপাল নামটাকে বদলাইয়া হয় মহাপাল না হয় কুপাল করিবে।

অনেক রাতে শোওয়ার ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিতে গোপালের সেদিন বেশ বেলা হয়। উঠিয়া দেখে চাকর নিত্যকার মত আলবোলায় নল লইয়া মাথার কাছে দাঁড়াইয়া নাই, ডাকিয়াও সাড়া পায় না। গোপাল রাগিয়া আঙুল হইয়া উঠে, খির করে জুতা মারিয়া তাহাকে অ'কই ভাঙাইয়া দিবে। কিন্তু এতকণে একটা চাকরও কি আসিতে পারে না? না—ইহারা অভ্যস্ত আশ'কারা। পাঁইয়া গিয়াছে, একটাকে ভাঙাইলে হইবে না, সেটাকে সেট ভাঙাইতে হইবে। গোপাল কেঁপিয়া বাহিরে আসে, মনে মনে তা'বে হাতের কাছে যাহাকে পাইবে তাহাকেই মারিয়া ফেলিবে, কিন্তু হাতের কাছে কাহাকেও পায় না। গোপাল তারঘরে ঢেঁচাইতে থাকে, এইবার সাড়া দেন দয়' ম্যানেজারবা'বু। ম্যানেজার বাবু সামনে আসিয়া দাঁড়ান এবং হু' হু' হাসিয়া গোপালের সমস্ত রাগ কল করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু র'বা, ম্যানেজারের হাসিটুকু কলের কাজ না করিয়া বরং তেলের ক'জই করে—ম্যানেজারের বোয়ালপাটাও ভে' ক'র নয়, পারের ধূলা লইতে তুলিয়া যায়।

গোপাল একটা কঠিন কথা বলিতে যায়, কিন্তু রাগে গলা দিয়া কোন আওয়াজ বাতির হয় না। ম্যানেজার-বাবুর মুহূর্ত্ত বিতৃণ্ডতার আকার ধারণ করে, তিনি বলেন, “এই যে, উঠে পড়েছেন গোপালবাবু।” গোপালবাবু। একি মহা অপমানজনক সংব'ধন! ম্যানেজারটা দেখা করিয়াছে নিশ্চয়—গোপাল হু'পা পিছাইয়া যায়। ম্যানেজারবাবু সেই হু'পা আগাইয়া আসিয়া বলেন, “পালাবেন না, শুনুন, একটা খুব জরুরি কথা বলবার আছে—ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমাদের কমিটার প্রিরেঞ্জনারায়ণ রায় মারা যান নি, কাল তিনি কারো থেকে হেঁটে কলকাতা পৌঁছেছেন, এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হচ্ছে আর কালবিলম্ব না করে এখন থেকে সরে পড়া।” সব কিম্বদন্তি একটা সীমা আছে, যাতলামিরও একটা সীমা আছে, গোপাল আর সহ্য করিতে পারে না, বমক

দিয়া উঠে—বলে, “বামুন, বামুন, টের বোয়ালপি সহ্য আর সহ্য করব না, বেরিয়ে যান আমার সামনে বেরিয়ে যান।”

ম্যানেজারবাবুর মুখ হইতে হাসিটুকু এবার যায়—দরম হইয়া বলেন, “বেরিয়ে যাওয়াটা সম্ভ'তি ক' দরকার হয়ে পড়েছে গোপালবাবু, জানেন না ভো' কমিটারটিকে, চক্ষিণ ঘণ্টা ম'দ থান, হাতের কাছে ত পেলেন ঘরে চ'রুক মারবেন। ভাল কথা, যাবা' পোলাকটা বদলে ফেলুন ভো', তারতঃ প্রাক'ব'কী' জিনিষই আপনি নিয়ে যেতে পারেন না, পরনের ঐ থানও না, অতএব ওখান' রেপে আপনার সেই ত হাকশাট আর বুতি পরে নিন, অনেক কষ্টে এ ছুটে করে এনেছি, হু'খের বিষয় হেঁচা চট কোড়ার কো' পোলায় না। নিন, একটু ভাড়াভা' ক'রুন।”

ম্যানেজারের পুঁটলিটি হইতে হাকশাট আর বুতি হইল—গোপাল দেখিয়াই তা'তাদের চিনিল।

পুরোনো হাকশাট আর বুতি পরিয়া খালি পারের পথে বাহির হইয়া পড়ে। রাগে, হু'খে ও লজ্জায় মা' করিয়া সে পথের একটা ব'র দিয়া চলিতে থাকে অবস্থার কেহই তাহাকে চিনিতে পারে না, যাত্রা লোক চিনিতে পারে তা'হার! হইতেছে ভ'র পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক আনন্দবাবু। আজ গোপালের আশাভিরুক্ত ধূলি ঝা'কা সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় পদ লইয়া হাসিয়া পাশ কাটান, আনন্দবাবু মহ'কা'বে চরিত্রকে তা'তের কাছে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়া চলিয়া

পথ চলিতে চলিতে গোপাল তা'বে সে কোথায় কি করিবে। তা'বিত্তে তা'বিত্তে সতাপদবাপুকে ম'য়ে গোপালের একটা সমস্তার সম'ধান হয়, সে সম'ভাবাবুর ঘাইবে এবং নিজের অনুল্য ব্যবসায়-বুদ্ধিটা তাঁতার ব'রিয়া দিবে। সম'ভাবাবু শুধন চা' খাইতেছিলেন, পো' প্রস্তাবটা শুনিয়া হাসিয়া বলেন, “ওটা নিজের কাছেই মনিহারী দোকানটা আবার চালাতে হবে ভো'।”

গোপালের চোখে ছুমিয়া অন্ধকার হইয়া আসে, পা' চান্ন না, ধূলিময় বরষাকে বড় কাছে, বড় আপনার বলিহ হয়—সে বসিয়া পড়ে। মনের মধ্যে চিন্তা ভালপোল পা' যায়, কত খু'খ ভাসিয়া আসে, ভাসিয়া চলিয়া যায়। তর্জা' হাসি হাসি মুখ ফুটিয়া ওঠে, তাইতো, গোপাল এতখ' খু'খটিকে কেমন করিয়া তুলিয়া ছিল? সর্ক্সা' মালিকার কাছেই চুটিয়া আসা উচিত ছিল, মালি' তাহাকে ভালবাসে। এ ছু'ধিনে সে তাহাকে বি' পরিভাগ করিবে না, দারিদ্রকে বরণ করিয়া মালিকা হ' তাহার হাত ব'রিয়া এক অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা হ'র করিবে

বাগানের ভিতর দিয়া আবছায়া অন্ধকারে গোপাল জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। হাঁ, সে ঠিকই আসিয়াছে, এই তাহার প্রিয়ভার্য মন্দির। গোপাল চাপা গলায় ডাকে, “মালিকা, মালিকা।” হৃদয়ের আহ্বান কবনও বার্ষ হর না, মালিকা জানালা দিয়া উঁকি মারে। গোপাল অকুল কণ্ঠে বলে, “আমি এসেছি মালিকা।” মালিকা জবাব দেয়, “আমিও আসিতেছি প্রিয়,” তারপরে ছুটিয়া চলিয়া যায়। গোপাল উবেল হৃদয় লইয়া অপেক্ষা করে। হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া ষাণ্ডা বেগে আসিয়া পড়ে তাহা মালিকা নয়, এক ধান ইট। বিহ্বল—বেগে মংখা সরাইয়া লইলেও গোপালের নাকটা কিব্বি জ্বলম্বল হয় এবং ধান ইটখানা পায়ের বুড়া

আঙুলের উপর আসিয়া পড়ে—গোপাল আর্দ্রবাদ করিয়া উঠে।

বেলগাছির বাজারে সাধুসন্ন্যাসীর দোকানের সামনেই গোপাল দুখুজের মনিতাদী দোকান। তিন মাসকাল ধাবৎ সে দোকান বন্ধ, ভালার মরিচা বহিয়াছে, সাইনবোর্ডখানা কাত হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন সকালবেলা সাধু দোকানের কাপ তুলিতে গিয়া দেখে পথের ওপাশের দোকানটির দরজা খোলা, সাইনবোর্ডখানা সোজা হইয়া তুলিতেছে এবং চির-পরিচিত গোপালের বৃষ্টি তিনপায়া টুলটির উপর বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

ধর্মসাধনায় রবীন্দ্রনাথের নূতন ইঙ্গিত

শ্রীশ্যামীচন্দ্র কর

কি করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলানার সমাধান খুজি পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মননে, বাগানে ও অচরণে চলেছিল তারি সন্ধান। সে সন্ধান তিনি পেতেছিলেন ধর্মের তাত্ত্বিক কিংবা বাবহারিক দিকে নয়, পেতেছিলেন অস্তিত্ব একটি দৃষ্টির সাহায্যে। “কালজ্ঞে” এছের ছোট ও বড় প্রবন্ধে তিনি সেই দৃষ্টির প্রসঙ্গে বলেছেন : “বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অণুও করিয়া দেখিবার অধ্যায় দৃষ্টি যাহাতে শক্তি নৈকতন অংশেরে বালকদের পক্ষে অংশ বা কল্পিত না হয়, অর্থাৎ এই লক্ষ্যে দৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই অংশেরে লক্ষ্যার্থে ইংরেজ সাংস্কৃতিকের জীবন উপহার দাখি করিতে আমি কুষ্ঠিত হই নাই।”

জীবনের অপরাধে এসে “মানুষের ধর্ম” এছের দ্বিতীয় অধ্যায়েও আর একবার রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেছেন—“বহু কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই শিল্প সৌন্দর্যের প্রেততা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাংস্কৃতিকের মন মেলবার দিকেই যায়।”—ইহাও সেই “ইতিহাসকে অণুও করিয়া দেখিবার অধ্যায় দৃষ্টির কথা। এর মধ্যেই বিশ্বমানবের মিলন-সাধন-খুজটির ইঙ্গিত মেলে। সেটি পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া দরকার।

গোটা মানব-সমাজের পথের বিবিধ পরীক্ষার কথা রয়েছে তার ইতিহাসে। এই ইতিহাসই তার সত্যতার বাহন। মহাকালের বুকে সত্যতারই জয়যাত্রা চলেছে। কালে কালে তার লক্ষ্যটা বত বড়, যত সাংস্কৃতিক, যত দীর্ঘস্থায়ী হোক, সবু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, সেটা সাময়িক। সেটা স্বা-এহন রাজ্য, স্বাধীনতা নয়।

স্বার্থের বাহ্য বর্জমানের ক্ষুদ্র দেশকালে লোকে মিলতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট পটভূমির দিকে তাকালে দেশতে পাই যে মানুষ মানুষের চিত্তে আত্মীয়তার আবেদন আনে দেশকাল অতিক্রম করে। এমন কি, মহা অত্যাচারীও সেখানে ক্ষমা হই হয়ে উঠে।

মানুষের মিলনবন্দী মহান আত্মার দেখা পাই সকল ধর্মেরই, তাদের উদ্দেশ্য মিলন-বাণীরও অন্তর্ভুক্ত নাই। কিন্তু কার্যতঃ বাণীর প্রভাব সকল করে নিচ্ছেই যত সমস্ত। আচার বা নীতির চেয়ে মূল সত্যটিকে গ্রহণ করাই আবশ্যিক। কিন্তু দেখা যায়, এ চেষ্টা এ পর্যন্ত প্রায় সকল ধর্মবাবস্থাতেই এসে দাঁড়িয়েছে বহু লক্ষ্যকাটা নীতির নানা কিছা-প্রক্রিয়ার অত্যাশে। রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়া কিন্তু নীতিগত নয়, বলা যায় তা দৃষ্টিভঙ্গিগত। তা হচ্ছে অণু ইতিহাসকে বা চিরন্তন বাস্তবকে দেখা। কালোত্তীর্ণ মানবকীর্তির নিদর্শন—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্পদগুলি দেশকাল নির্বিশেষে মানুষের কি আকুল অহুভূতির বিষয়, মহেজ্ঞানারোহ আবিষ্কারে তা বিলক্ষণ দেখা গেছে। মানুষ ধরোয়া নিষ্ঠা-বাবহারী তুচ্ছ ঘটবারীর গায়ে করেছে চিত্রাঙ্করণ। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্য ঐ সব শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ ভাঙে দেখেছে একালের সঙ্গে অপরগাণীত হৃদয় সেকালের যোগ। তার মনের মধ্যে পেয়েছে কোন্ সেই অচেনা মানুষের অন্তর্বেদনার মিল, সুকুমার সমর্থিত। রাজা-সাম্রাজ্য তুলিয়ে যায়, ‘কালের কপোলতলে শুভ্র সমুদ্র’ হয়ে থাকে এই বেদনাই। বেদনাত্তেই মানুষ এক, এইটাই তার চিরন্তন আকৃতি। যে সব কাজে এর প্রকাশ হয়ে চিরকাল মানুষকে আনন্দ দান করতে

পারে, সেই সকল কাজের সাধনাই মানুষের বর্ধা বর্ধসাধনা।

স্বাধীনতা কথামূল্য বলছিলেন তাঁর যত্নের কিছু-দিন আগে। রোগশয্যা থেকে উঠেছেন। উত্তরাধিকার প্রভাব প্রভাবাদেশীয় শিল্পগৃহ “চিন্তাভাষ্য”তে তখন তিনি বাস করছিলেন। সেই সময় তাঁর “বিশ্ব-পরিচয়” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল। প্রেস কপিতে ভাষা সংশোধনের সঙ্গে কোনও কোনও কবির প্রকণ্ড দেখে দিচ্ছিলেন তিনি নিজেই।

বইটির “সৌরভাষ্য” অধ্যায়ের এক স্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে, সৌরভাষ্যিক গবেষণার একটি সংবাদের অপেক্ষার ঠেকে গিয়েছিল বিজ্ঞানী ডাঃ ডগলাসের একটি সিদ্ধান্ত। “ক্রীমিচ মানবজাতি বিভাগ থেকে সংবাদ নিয়ে” সেই ভাষাটি জানা যায়। এই গবেষণার ভাষাটি সেবারে বইয়ে নতুন যোগ করা হয়। প্রকের এই স্থলে এসে কবির সঙ্গে বর্ধমান লেখকের একটু আলোচনা চলল। ডাঃ ডগলাসের সেই হারানো ভাষার আবিষ্কার কোথায় গেছে ভুলিয়ে, কিন্তু তাঁর সাধনার কল চিরকালের জন্যে মানব-সমাজের উত্তরাধিকারের সম্পদ হয়ে রইল। আজ যিনি পরিচিত, সেই ডাঃ ডগলাসও হয় শুধু একদিন যাবেন ভুলিয়ে কালে কালে এই ভাবে মান-হারানো কত ব্যক্তির সাধনা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছে নব-নব আবিষ্কারে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে পূর্ণতার পথে বিস্তৃত করে। মানুষের সাধনা বিজ্ঞানে যত মৈত্রীভাজক হয়ে থাকে; এমন যেন আর কিছুতে নয়।—এমনি ধরণের কথাই বলে-ছিলাম।

সুখে কবি বললেন, সাধনা মানুষেরই বিপর্যয় আছে; মানুষের বিপর্যয়ও তার মধ্যে দিয়েই প্রকাশকর। দেশে, জাতিতে, বর্ণে, ধর্মে, আমরা আজ যে পৃথিবীব্যাপী স্বাধীন-সংঘর্ষের মধ্যে লোকের ক্ষুদ্র রূপ দেখছি এ তার ব্যক্তিগত সাময়িক রূপ। তার যা চিরন্তন রূপ, তার মহৎ প্রকাশ এরূপ মৈত্রীভাজক বিকাশেই হয়েছে। বিজ্ঞানের মত সব কাজেরই সেইরূপ বিকাশ দেখা যায় ইতিহাসের পটে। উক্ত বিজ্ঞানালম্বী সাহেবটির শিকটে তাঁর হারানো হুজুট প্রকাশ পেয়ে অকুলে তাঁকে সাহায্য দিয়ে আনন্দিত করেছিল। বিশ্বস্ত অতীত থেকে মহেঞ্জোদারোর অধ্যাত লোকেরদের যে শিল্পনিদর্শনগুলি মিলল, সেগুলো মানুষকে তার মানব-বারার উত্তর-ইতিহাসের ভাষার সন্ধান দিয়ে তাকে করেছে ভেমনি অতিভূত। দান আছে, দাতা নেই, বুঝা যায়, সমস্ত দেশ-কাল-পাশ পেরিয়ে এক বিরাট অমল্ল অর্থও মানব-সাধনা চলেছে। এই ইতিহাসই শুধু মানুষের আসল স্বরূপ, বর্ধা সভ্যতার আধার, —তার সত্য পরিচয় এখানেই নিহিত।

কবি উল্লেখ যুগে বলে চলেছিলেন; হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে বেদনার সুর বাজল, তিনি বললেন, “কোথায় মানুষ তাকে

দেখবার দৃষ্টি নিয়ে বড় হবে, তা নয়, ক্ষুদ্র দলদলি চুলোচুটি নিয়েই সকলে ব্যস্ত। সব জাতির দান, সব দেশের দান সব ব্যক্তির দানই একটি সংহত সমগ্ররূপে দেখা দিয়েছে এই মানব-সভ্যতার অভিযানের মধ্যে। নতুন নতুন কীর্তির যোগা দ্বারা এই সভ্যতার সেবার লগে থাকে, এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের হাতে সেই সভ্যতাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই হচ্ছে মানুষের আসল কর্তব্য। বার্ষিক ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে হলে এই অর্থও অপৌরুষের মানব-সভ্যতারই ব্যান করতে হবে, সেই ব্যানই নিয়ে বাবে তাকে পরাধীনতার।

আমরা দেহরক্তধারা-যোগে ধরবাড়ী সম্পত্তিতে বা চিন্তা-ধারার নিজের ছাপ এঁটে দিয়ে সব কিছুকে অক্ষর করে রাখতে চাই। বৈচে থেকে জীবিতকালে এখনও যেমন ভোগ করব, আমি বৈচে না থাকলেও আমার ছাপদ্বারা কীর্তির মধ্যে আমি চিরকাল সেই গৌরবাবিকার নিয়ে অরবীর হয়ে থাকব, এইটু দেখে যাবার, বুঝে নিয়ে যাবার জন্যেই বার্ষিক ব্যাকুলতা। কিন্তু মহাকালের মধ্যে কি দেখছি? সে লোককে কেবলই সকল কিছু থেকে ছাড়িয়েই নেয়—কেড়ে নেয় তার কীর্তিকেও। মানুষের কাজগুলি যদি বা এই দেখা পৃথিবীতে ছুঁদিন স্থানও পায়, মহাকালের খেলার স্রোতের মুখে এই পৃথিবী, এই তার ইতিহাস—সব যায় তেলে।”

আগে থেকেই কবির ভাবনার ও লেখার এই চিন্তারই প্রবাহ চলেছিল। “মানুষের বর্ধা” গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, “পুরোনো সভ্যতার মাটি-চাপা তাড়াচোরা চিত্রশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করার জন্যে মানুষের প্রকৃত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অমৃতব করেছে তারই দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। হাবিতে, মূর্তিতে, ঘরে বাবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের খেলারকে প্রচার করতে চায় নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার হুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্ম-পরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মার সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অত্যাশ্রয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন।”

চিন্তাবহুল মহেঞ্জোদারোর বইগুলি কবির দণ্ডের আসার পর থেকে সেগুলির প্রভাব তাঁর অনেক রচনার উৎস হয়েছে। প্রায় একটা গোটা কাব্য—“শেষ-সপ্তক” বৃষ্টি হ’ল মহেঞ্জোদারোর প্রেরণা থেকে। তার পর থেকে অনেক কবিতার এবং ভাষণেই এসে গেছে মহেঞ্জোদারোর সেই প্রভাবই। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, যত্নের

প্রায় আশেপাশে ১৩৪৭ সনে প্রায় ৭ই পৌষের সন্ধ্যায়
মধ্য—“আরোপ্য”। তাতে না-বর্ষা মানব-সাধনার পাশে
দেবের বর্ণিত হাঁ-বর্ষা সাধনার আদর্শরূপে কবি ধরে
লিখেছিলেন চীনকে, আর ঐতিহাসিক আদর্শরূপে
মহেঞ্জোদারো-শ্রেণীর নামহীন অচেনা মানব-সাধনাকে।
কবিকে জীবন-সারাহে ইতিহাস ও বিজ্ঞান—বাস্তব বিচার
এই দুই শাখাই—অধ্যাত্ম-উদ্বীপনার বিশেষ সহায়তা করেছে।
ইতিহাসের প্রেরণার কথা এখানে বলা হ’ল—এমনি বাঁচি
বিজ্ঞানের প্রেরণা নিয়েও বলার কথা কবির জীবনে আছে।
কবি বলেন, “যে সাধনার লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন
করে সে সাধনা বর্ধের, কিন্তু যে সাধনার লোভের কারণকে
বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের
সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে বর্ধবুদ্ধির আঁক
মিলনের অপেক্ষা আছে।” “বিশ্ব-পরিচয়” গ্রন্থের ভূমিকায়
তিনি বলেছেন, “আজ বরষের শেষ পর্বে মন অতিভূত মধ্য
প্রাকৃতভঙ্গে—বৈজ্ঞানিক মাত্রাবাদে।”

বিশ্বভারতী পরিষদের ভাষণেও পূর্বে কবি বলেছেন : “বহু
কালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই
তা হলে দেখব, আত্মসত্ত্বী পলিটিক্সের দিকে যুরোপের আত্মাব-
মাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার
আলোক অলোকে, সেখানেই তার বর্ধা আত্মপ্রকাশ—কেননা
বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে
বিজ্ঞানেই যুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে
প্রকাশ করে।” (১৩৩২)।

ইতিহাসও আঁক বিজ্ঞানের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে চলেছে।
বিশেষত: মাটি খুঁড়ে বাতু, জাতিভগ্ন বা ভাষার স্রব্দ ধরে
পুরাতত্ত্বের সাহায্যে ইতিহাসের যে অংশ সক্রিয়, তাকে
বিজ্ঞানের আঁক বলেই ধরা যেতে পারে। মহেঞ্জোদারোর
পুরাবিদ্যা ও শিল্পকলার ভিত্তির দিগে তাবের ও ভাষার বিনিময়
হচ্ছে একালে-সেকালে। দুই কালের আচার-বিচার ছাপিয়ে
উঠেছে এই ভাষা। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথ ‘বিদ্যাভবনে’
ও ‘কলাভবনে’ এই চিরকালের ভাষাকেই করেছেন তাঁর
সাংস্কৃতিক বর্ধের সাধনময়। বিশ্বভারতীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই
কুটেছে এই দুটি বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নিজেকে
একথা বলেছেন।

হিন্দু যুগলমান দুই বর্ধের থেকেই বিশ্বাস্যমীর রক্ষণশীল
আচারনিষ্ঠ ব্যক্তির শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছেন কম।
কিন্তু তারই মধ্যে কবির সমকালে ‘বিদ্যাভবনে’র পণ্ডিত বিদু-
শেখর শাস্ত্রী মহাশয় এবং মোলানা জিন্নাউদ্দিনের মধ্যে যে
শ্রীতিভাব ও হৃদয় আচরণ লক্ষ্য করা যেত, তা ছিল আদর্শ-
হানীর। দুই বর্ধের হৃৎকেন্দ্রের মধ্যে ছিল মানবিক শ্রীতি।
কবির আশ্রমের পরিবেশে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতি-

বর্ধের হাজার নীতি-বৈচিত্র্যের উপরেও তারি প্রভাব দুটি
মাহুষকে মিলিয়েছিল আপন ক’রে। বপাক ছাড়া যিনি
আহার করেন নি, এমন মহাপণ্ডিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ঐষ্টান
পাত্রী দীমবন্ধু এওরুদের পদমূলি নিভেন। মেঘেরের মালা-
জলও সেই ব্রাহ্মণের কাছে সমান শ্রীতিতেই গ্রহণীয় হয়েছিল।
এ ঘটনা শান্তিনিকেতনে সহজেই খটেছে। এখানে বর্ধের
বাহন পূজা-অর্চনা নয়—মানবিক ব্যবহার। মত ছেড়ে ব্যক্তি-
গত জীবনেও যে বাস্তবতা কিরূপ কার্যকর হতে পারে, বিদ্যা-
ভবনের কর্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ এঁদের মধ্যে দিয়ে আমরা
প্রত্যক্ষ করেছি।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক-পরিষৎ-সভার ১৩৩২ সনের অধিবেশনে
“আচার্যের অভিভাষণে” বিশ্বভারতীর সাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
একস্থলে বলেছেন—“মহাজাতি একা সমুদ্রে দেশে বাক্যগত
সত্ত্ব প্রকাশ করা হয় কিন্তু ওদিকে জাতি-সম্মত লেগেই
আছে।” আকালী শিখ আন্দোলন ও মালাবারের মুসলমান
মোপলা দৌরাত্মের কথা উল্লেখ ক’রে তিনি বলেন—“বাদের
আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জাতি। তারত-
বর্ধের লোক পরম্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজাতি হবে তখন
তারাই মহাজাতি হতে পারবে। সেই জানবার সোপান
ভেঁজি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌছবার সাধনা আমরা
গ্রহণ করেছি।” এ সাধনার শাস্ত্রীয়হাশর কবির আদি
সহায়ক ছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন : “একদা যে-
দিন মুহম্মদ বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্বসম্প্রদায়ের বিদ্যা-
গুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী
হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করে-
ছিলেম। তার কারণ শাস্ত্রীমহাশয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের
শিক্ষাবারার পথেই বিদ্যালয় করেছিলেন। হিন্দুদের সমাজ
শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাকেও ব্রাহ্মণ
সঙ্গে খীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদার
ভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর যুগে এ কথা সত্য বিশেষ
ভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি
অনুভব করেছিলেম এই উদারতা, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির
প্রতি এই সমান আতিথ্য এইটাই হচ্ছে বর্ধা ভারতীয়—সেই
কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক রোমকদের কাছে
থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পছন্দ গ্রহণ করেছিলেন তখন
য়েছে গুরুদের ঋষিকল্প ব’লে খীকার করতে কুণ্ঠিত হন নাই।
আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র স্পৃহা খটে থাকে
তবে জানতে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিত্ত ভারতীয় ভাবের
বিকৃতি খটেছে।”

জিন্নাউদ্দিন সাহেবের মধ্যেও বর্ধের কোনো আত্মব্রত ছিল
না। তিনি ছিলেন সহজ সাদাসিধে ভাবের, অথচ মুখীক-
বুদ্ধি, নিরহঙ্কার লোক। তাঁর কাছে গেলে বর্ধের কোনো

অস্থানবের কথা যেন হ'ত না, কিন্তু বর্ণের সার-রস যে গ্রীতি ও আনন্দ—তার সান্নিধ্যে তা পাওয়া যেত, অস্বত্ব করা যেত সংকল্পের উচ্ছলতা। কবি যাদের সম্পর্কে বলেছেন, “বর্ণ-গতির বহির্বর্তী পরকে সে বুঝে ভীত ভাবেই পর বলে জানে কিন্তু সেই পরকে সেই কাকেরকে বরাবরকার মত ধরে টেনে আটক করতে পারলেই সে সুখী।” সেই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংকল্পমূলক প্রাণবান বর্ণ-প্রেরণা পৌছেছিল এবং মানুষের মত মানুষ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আপন স্বভাবের মধুর স্পর্শ বিলিয়ে মৌলানা নিজ বর্ণের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

এই মৌলবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বন্ধুত্বের ‘সম্বন্ধ’ এ সম্বন্ধই মানব-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের প্রেরণাই—মানববর্ণ। এই বর্ণেরই বাণী “যিনি বেদনীর সে পূর্ণ মানুষকে জানো, —অন্তরে আপনার বেদনার যাকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনার জানো, জানে নয়, বাইরে নয়।”

কবির জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখি জানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন ধরে চলছে তার বিচিত্র কর্মমুঠান। কিন্তু আত্মনিক ক্রিয়াকারণের চেয়ে জানকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন, এখানে দেখা যাচ্ছে সব ছাড়িয়ে উঠেছে বেদনার কথা। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রেও কণ্ঠ হচ্ছে জ্ঞান-অনুশীলনের অর মাত্র।

কবির আত্মানে আশ্রমে আরও যারা এসে গিয়েছিলেন, ইংরেজ শিরাসন এবং এও ছিলেন তাঁদের অগ্রতম। কিন্তু এঁরা সকলেই নিজ নিজ বর্ণে নিষ্ঠাবান থেকেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মানুষের এক বেদনাবোধমূলক অগুণ মানববর্ণে।

চীনাভবন হিন্দীভবন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রসাহাবার বিস্তারের সঙ্গে। নানা সাধক ও শিল্পী বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে আসা-যাওয়া করেছেন; রবীন্দ্রনাথের সাধনার ময় ও তার আয়োজন দেশ-দেশান্তর থেকে এঁদের যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমনি এঁরাও আশ্রমের আদর্শকে মান্যতাবে রূপান্তরিত করেছেন।

অবশেষে একটি অভিনব ব্যাপার দেখা গেল। প্রবকের অতল বর্ণসাধনার উপায়স্বরূপ কবির যে ঐতিহাসিক যোগ-দৃষ্টির ইঙ্গিতের উল্লেখ করা হ'ল শান্তিনিকেতনে আক ষ্টিক সেরূপ সাধনারই দ্বারা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। রাহুল্য বেদান্ত-মর্ষের সাধক স্বামী লক্ষরামল শান্তিনিকেতনে চীনাভবনে সম্প্রতি গবেষক হয়ে এসে একটি কঠোর সাধনার রত হয়েছেন। তাঁর সাধনার বিধয় হচ্ছে—মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও শিল্পকলার কাঠামোর বিভিন্ন মানব-সত্যতার মূলতন্ত্রের আবিষ্কার।

আরও একজন সংকল্প সাধকের কথা এ প্রসঙ্গে যেন পড়ে। তিনি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন—তিনি হিন্দী-

ভবনে মাদেকাল মাত্র যাপন করেন। চীনাভবনেরই কক্ষে এক সন্ধ্যায় তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। দেশে দেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জাতি-বর্ণ-বর্ণ, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-প্রকৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে শাশ্বত এক মানব-বর্ণ পথ করে চলেছে; তার বরূপ উপলব্ধির সাধনাতে ইনিও নিরত। বলেছিলেন—রাশিহাতে তিনি ভ্রমণ করেছেন। টেনের কামরার দুঃসহ শীতের এক রাজি। ওদেশের এক স্বাক্ষীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা পরস্পর কুলগত যোগের সন্ধান পেলেন। সুদূর দুই দেশের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দের মূল বাতু সম্বন্ধে বিচারের দ্বারা টেনে অবস্থিতের স্বজকালটুকুর মধ্যেই সে বসিষ্ঠতা আরও দানা বাঁধে। রাশিয়ার একটি মন্দির এবং সৃষ্টির কথাও রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছিলেন। বিশ্বভারতী বিভাগবনের আধুনিক গবেষণা-এছ ‘গোথিক’ মন্দিরও সেই মন্দিরের উল্লেখ সম্প্রতি চোখে পড়ল। এছের ভূমিকাত্তে লিখিত আছে: “অমৃত্যু হর, মহাজান সাধক-গণের ভগ্নপ্রভাব...তিমাসম্বন্ধেও অতিক্রম করিয়াছিল। প্রতি-বেশী জাতিদেরও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। ...তারতবর্ষ ছাড়াইয়া নাথ-যোগ আরও পারন্ত এমন কি রাশিয়া পর্যন্ত এককালে বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা অনুসন্ধানের বিষয়।” পাদটীকার আছে: “রাশিয়ার বাকুতে আলামুখী দেবার মন্দির শৈব নাথযোগীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরপায়ে বোধিত লিপি আছে।” নানা ক্ষেত্রে ঐক্যের এরূপ অনুসন্ধান যেমন বিদ্যাতবন চীনাভবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলছে, কলা-ভবনেও শিল্পের বেদীতে মানববর্ণের সেই সন্ধান ও সৃষ্টির একই অর্থা নির্বেদিত হচ্ছে। আশ্রমের অত্যন্ত বিভাগে পুরা-কালীন সন্ধানের চেয়ে বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও সৃষ্টির ভাগিদাই বড়।

কবি তাঁর “মানুষের বর্ণ” এছের শেষ অধ্যায়টিতে একটি বৌদ্ধ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তার ভাষণার্থ্য হচ্ছে সংসারের সর্ব-জীব-কল্যাণ। সেই সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশেষ কাহিনীটি যুক্ত করে বলেছেন, “ঃঃঃ আসে ত আত্মক, যত্ন হরতো হটুক, কতি বটে ত বটুক, মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হটুক, সমুদ্র দেশকালকে স্নানিত করে বলতে পারুক—“সোহম্।”

বুদ্ধদেব যে সর্বজীব-কল্যাণ চেয়েছিলেন, কিভাবে তা সাধন করতে হবে, তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই মর্মে বলে-ছিলেন—“একপুত্রবর্তী মাতা যেমন করে নিজের পুত্রটিকে রক্ষা করে, সেই মমতা ও প্রযত্নে সকল জীবকে সেবা করতে হবে।” রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মিত্ত প্রদেশ হতে সমগ্র জগতের প্রতি আমরা সেই বেদনামটিরই প্রবাহ উৎসারিত দেখতে পাই।



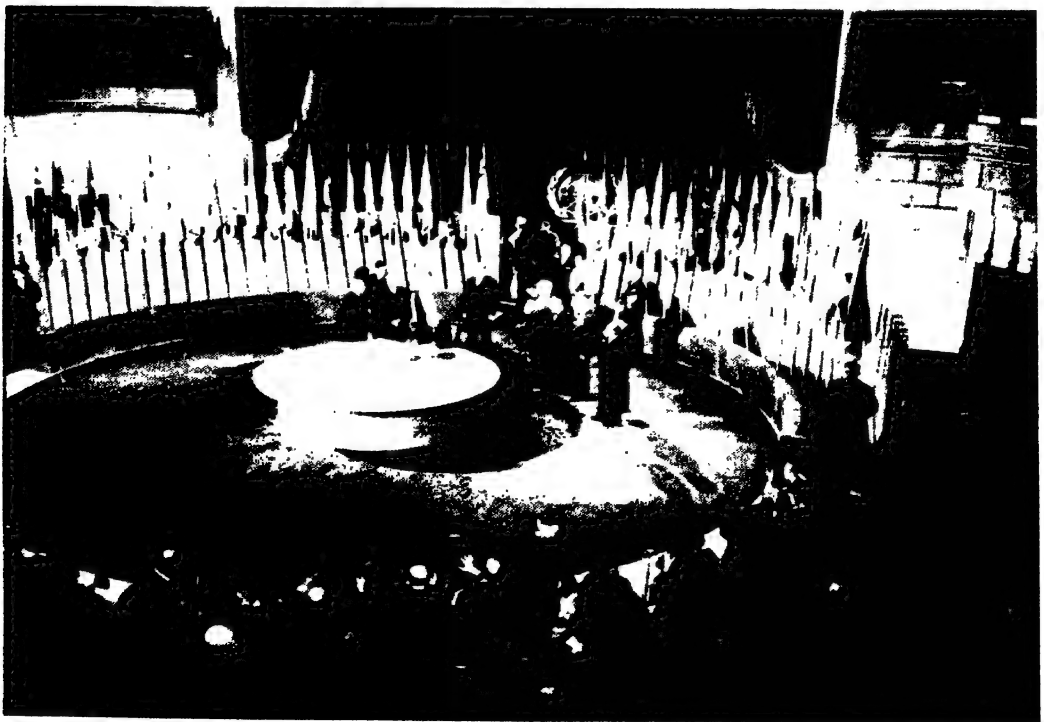
কো. মেন্ডাক কংগ্রেস "মসেস" গৃহীতকে ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি মডেল প্রদান



কোরিয়ায় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের ভারতীয় সভ্য ডক্টর অনূপ সিংহকে
কোরিয়ান গালিকার দলের হোড়া উপহার



সান ফ্রানসিস্কো, ক্যালিফোর্নিয়া—এখানে জাপানি আত্মঘাতী বোম্বার্ডারের হতভয়



১৯৪৫ সালে সান ফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের স্রষ্টি

যেদের কাছে লেখা হুঁ একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বদনা-অহুভূতি-প্রবণ মনটির পরিচয় মেলে। ব্রহ্ম, সেবা, ঐশ্বর্য দিয়ে যেদেরা নিজের মনে বিশ্বমতকে অবিকার করবে, বহুকে এক করে বাঁধবে এবং বহুর মধ্যে এক বিস্তৃত হয়ে অষ্টমের বিশিষ্ট রসটিকে মানা তাবে আবাদন করবে—এই ভাবটাই তাঁর সেই পত্রগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে, সেটিই নামান্তরে তাঁর পরিণত জীবনের উপলব্ধি ‘সোহম’ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রায় মধ্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি এক-একখানি পত্রে এ সব অহুভূতির কথা লিখেছেন তাঁর পরিজনমণ্ডলীকে। ঈশ্বর মধ্য দিয়ে যেন বিকশিত হয়ে উঠছে রসনির্ভর মহী-রুহের প্রাণসুখ। মহাবাক্য প্রাত্যহিক মানব-সংস্পর্শে অবলিঙ্গ হয়ে তাত্ত্বিকতার শুষ্কতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কবি তখন বিলাসে। খুব সম্ভব ১০১৮ সনই হবে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ক অঙ্কিত চক্রবর্তীর প্রথম কতার স্মরণ লীলাসর শৈশব-বিষয়ে কবি পত্র পেয়েছেন এবং অক্লিষ্টবারে পী ত্রীমুক্তা লাগনা দেবীকে তিনি তার যে উত্তর দিয়েছেন তাতে কবি মাতৃহের শিখাটিকে কোথায় তুলে ধরতে বলেছেন তা আছে পত্রের কয়টি পঙ্ক্তিতে।

ও

কল্যাণীয়ায়

লাগনা, এবার আশ্রম থেকে কেবল তোমাদের হৃৎকমের চিঠি পেরেছি। তোমার চিঠিতে অমিতার জীবনরত্নের কতকটা আভাস পেয়ে খুব খুশি হলাম। তাকে দেখবার জন্য আমার মনের মধ্যে খুব উৎসাহ আছে। তার সঙ্গে পূর্বা-গণের পালা আমি পূর্বেই শেষ করে এসেছি—এবার কিরে গিয়ে রাগবৈচিত্র্য সূক্ষ্ম করতে হবে।

তোমার হৃদয় প্রদীপে যে মাতৃহের শিখাটি জ্বলে উঠেছে সেটি কেবল তোমার কতার মুখের উপর পড়লে চলবে না—তাতে বিগলননার আরতি করতে হবে—যখন সকল ছেলের উপর এই আলো বিকীর্ণ করতে থাকবে তখন সেই জননীর আরতি হবে।...আমরা মরনাগী যে কেউ আশ্রমে এসে জুটেছি প্রত্যেকেই পুকার অর্থা নিজের জীবন দিয়ে পূর্ণ করব এই সেবার ভারই আমাদের উপর আছে—কারো বা শতদল পদ্ম কারো বা পাঁচটি পাতার করণী। সেই অর্থের ঝালা তোমা-দের ঘরের কাছে অপেক্ষা করছে—বেলা বয়ে যেন না যায়।

আশীর্ব্বাদক

ত্রিরাবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একখানি পত্র লিখেছিলেন এই লাগনা দেবীকেই। তখন কবি শিলাইদহে। পুত্র রবীন্দ্রনাথের পরিণত সম্পদ হয়েছে। পুত্রব্যুৎ প্রতিমা দেবীকে সংসারে কি তাবে প্রতিষ্ঠিতা দেখতে চান, সেই পরম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে কবি পত্র লিখেছেন। কবির চিত্ত সকল সময়েই সকল বিষয়ে অসীমের

দিকে অগ্রসর হয়ে আছে; এই কয়েকটি পত্রে আমরা পাই তাঁর সংসারের কল্যাণময় এই অহুভূতিকে কোন্ অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলের জন্যেই তাঁর মঙ্গল-কামনা চিরদিন এমনি হয়ে প্রকাশ পেরেছে:

ও

শিলাইদহ

নদীয়া

কল্যাণীয়ায়

মা, তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। আমার সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হবে, আমি অনুভব করব তিনিই একে চালনা করছেন, তাঁর প্রসন্নতার আমার গৃহ আলোকিত হয়ে থাকবে—সুখে ছুখে লাভে কতিপয়ে আমি প্রকাশ উদ্ভল হয়ে উঠব, বিনয় সেবারপতার কাছে ভোগসুখের ঐশ্বর্যতা নত হয়ে রইবে এই আমি আশা করে আছি। তাঁকে মনে প্রাণে অত্যন্ত নিকটে উপলব্ধি না করলে সচিহ্ন থাকে না, শৈশিলা এসে পড়ে, কথার কথার আনন্দমুখিত খটে—সংসারের পরিভ্রমতা এবং শান্তি নষ্ট হয়। এইজন্য প্রতিদিনই তাঁকে পাবার সাধনা এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা চাই। যেদের মনে ঈশ্বর যখন তত্ত্বসংকে উৎসর্গিত করে দেয় তখন যে মাগুণী, যে স্ত্রী, যে সামর্থ্যের বিকাশ হয় প্রতিমার মধ্যে আমি সেটি দেখব এই আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের মধ্যে যে কল্যাণময় মাতৃভাব আছে, যা সংসারের সমস্ত কালিমা ঘুচে দেয়, সমস্ত উপদ্রব সশ্রু করে, সমস্ত সুখা মেটায়, দাহ জুড়ায়, অত্যাচার দূর করে, যার রূপটি নেই, বিরক্তি নেই, যা সকলের উপরে থেকেও সকলের কাছে নত, যা সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েও সকলের শেষে আপনাকে স্থান দেয়, যার অভিমান নেই, ঐশ্বর্যতা নেই, নিজের অবিকার নিয়ে অন্যের উপরে দাবি করতে চায় না, নিজের অবিকারকে ধরু করেও অন্যের দাবি যে প্রসন্ন মুখে মিটিয়ে দেয়—বিশ্বমাতার সেই সুখাময় মাতৃহকে আমি বোমার মধ্যে আমার ঘরে আবিস্কৃত দেখব। এই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে যখন রক্ত নয় এই অমৃতই আমার খর পূর্ণ হবে।...বৌমাকে ও মীরাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে।

শুভানুধ্যায়ী

ত্রিরাবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অনুভবের সাধনা চলছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন বাপে। কোনো বিষয়ই তা থেকে বাদ পড়ে নি। তাই না তিনি আমাদের জন্যে যেনে গেছেন এমন একটি তত্ত্ব যা শুষ্কতা ত্যাগ করে এক পরম অধ্যায়লোকের সিংহদ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করেছে।

বন্দী যাত্রা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬

এক বড় উৎসবের ষাটাত্তেও বড় বাতীটা সরে গেল না। ওখান থেকে চলে আসার পরও প্রভাতের চিত্তাঝাজো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল বাতীটা। ওই বাতীতে লক্ষীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একদা—আজও তক্তিতরে ওঁরা প্রণাম করেন লক্ষীরূপিনী সেই শক্তির উদ্দেশে। কিন্তু লক্ষী কি সত্যিই ওখানে অধিষ্ঠিত হয়ে ওঁদের প্রাণে প্রেরণা দেন? লক্ষীকে হারিয়ে কিংবা না পেয়ে—লক্ষীপূজার খটা যেমন প্রভাতদের মত মধ্যাহ্ন সংসারে—ভেমন আচার-উপকরণের বোঝার ভারী হয়ে তক্তিতা একটু হয়ে উঠেছে কি ওখানে? এই তক্তির অর্থ আজও প্রভাতের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তার মনে প্রশ্ন রয়েছে সত্যিই কি ভগবানকে ভালবাসি আমরা? এই যে সংসারে এত আচরণ নিষ্ঠা পবিত্রতার অহুষ্ঠান—ব্যানধারণা পূজা পাঠের আভরণ—বর্জিত তক্তির চাপে চোখ দিয়ে হ-হ করে জল পড়া—কণ্ঠ আবেগে ক্রুদ্ধ হওয়া—বায়ুভাঙিত বেতসপঞ্জের মত সারা দেহ কঁপে কঁপে ওঠা—এ সবই কি তক্তিরের জিনিস? হয়তো তাই—হয়তো তা নয়। হয়তো মনের মধ্যে তাবলোকের ভূমিতে এই গাছ-গুলি সহসা সন্তোজ হয়—শাখাপ্রাশাখা ছড়িয়ে সংসারকে কিছুকণের জন্য আড়াল করে রাখে। তবু এই তক্তিকে প্রভাত ভাবে—শীতকালের বোঁয়ার মত। সে বোঁরা খন এবং সর্কজ ব্যাপ্ত হয়েও উর্ধ্বের বায়ুস্তর ভেদ করতে পারে না। উপরের হিমকণার চাপে মাটির সারিষা থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে দুষ্কর। সংসারী মানুষের বারজত পূজা-পার্বণ নিত্য গৃহস্থ ঘরে বা অহুষ্ঠিত হয়, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ভোজপাঠি পুষ্প চরম ব্যান মন্ত্রের জপ প্রণামের নিষ্ঠা অস্ত্রের দরদর ধারা বেনকম্প এই সবও বুঝি উর্ধ্বস্তর ভেদ করে অমল সুন্দর সহবাত্রী হতে পারে না; এই সংসারের শত পাকে কড়িয়ে তক্তির মুহূর্তগুলি হয় অত্যন্ত কণহারী এবং তাবের আয়ু বাষ্পের চেয়েও লঘু সংকিশ্ত। বাই হোক বাতীটা স্পষ্ট হয়ে রইল মনে। তৈলচিহ্নের মানুষ এখনও কারা ধারণ করে তৈলচিহ্নের শীচের এসে দাঁড়ায়। তাঁর বুখে এসয় দীপ্তি—কণ্ঠে অপূর্ব লাব্ধি। ওই বর্ষারসী যেম প্রভাতের জগতে চেলা মানুষ-গুলির থেকে আলাদা। ও বাতীর গিলহুকের ওপর যে তেলের প্রদীপটি অলহিল তারই মত নিঃ—আপন বৃত্তের মধ্যে হুস্পূর্ণ একটি শিখা। প্রচারের আভিষাখা নাই—ভয়: শাপের শক্তিও রাখে।

বাতীতে বা তো এমন করে কথাগুলি বলতে পারেন না। সেকালের যে গল্প মা করেন—তার মধ্যে একালের বন্ধনার কোতটাই বেশী কোটে।

একালে ভোদের না আছে খাওয়ার ভোগ—না আছে পরবার সুখ। মনের আনন্দ থাকবে কি করে। তখন টাকার পনেরো সের আধরণ চাল, দুই দশ সের আর ভাল মাছের সের দুই মাগুণি হ'লো তো আট আনা। লোকের পাপে পাপে সব নষ্ট হয়ে গেল।

—পাপ করছে কারা—এর সঠিক উত্তর পাওয়া মুশকিল। অভিযোগকারী ছাড়া পাপ হয়তো সবাই করে। কিন্তু উনি গল্প বললেন কি সুন্দর করে। একালের শিকা বানের সেকালকে ঘৃণা করতে শেখার, ঘৃণা না হোক খানিকটা তাচ্ছিল্যের তাব কোটে—ভাদের সবাইকে ডেকে ওই গল্প শোনার ইচ্ছা হচ্ছে প্রভাতের। ওর ইচ্ছা হচ্ছে বলে—সাহস ও প্রত্যাপন্নমতিভূ সেকালেও চূর্ণভ ছিল না—শক্তির অর্থ তাঁরা তুল বুঝেন না—সর্বোপরি রাষ্ট্রভেন চুচ বিখাস আপনার উপর। কিন্তু আত্মপ্রচারে অহকার আসে বলে—সেই বিখাস নাও করতেম ঈশ্বরের উপর। এই ঈশ্বরকে পিছনে রেখে মানুষ এগিয়ে চলেছে আজ। কিন্তু শূন্য, শূন্য,—অমিত্যভের বাণীর মত একটা কিছু ঝাঁকড়ে ধরে একটা কিছুতে স্থির হবে থাকতে চায়—চারদিক থেকে শ্রোত উদ্ভাল হয়ে তৈলে দেয় তাকে সামনে। শূন্য, শূন্য, সেই পথ দিয়ে তার মিক্রোশন যাত্রার শুরু।

পর পর কয়েকদিন প্রভাত গেল ওখানে। শুভকর প্রত্যোক বায়েই ওকে ডাকতে আসে। বলে, চলুন যেক কোঠাইয়ার হুকুম।

প্রভাত সে হুকুম মানে। সেই ঘরটিতে গিয়ে বসে। যেক কোঠাইয়া আসেন মিষ্টির রেকাবি নিয়ে। সবদিন সন্দেশ নয়—ঘরে তৈরি নারকেল নাড়ু—সরের নাড়ু—কোম দিম বা চিঁড়ের পায়স। বলেন—মিষ্টি খুব কর তবে গল্প বলব। অকুরন্ত তাঁর গল্পের তাভার। সেকালের ঐশ্বর্য যেম সঞ্চিত রয়েছে গল্পগুলিতে। এই বাতীর গৌরবগাথা নয়—অপকীর্ণিত—এদের অভিধি সংকারের পাশে প্রজা নির্ধাতনের কথা—দানের সঙ্গে শাসনের নির্ভুরতা—তক্তির সঙ্গে ভোগ-পঙ্কিলতার আবর্ত—মহুত চরিত্রের হুজের দিকটির প্রতি ইদিত করে। কালের পৃষ্ঠে এছির পর এছি পড়ে—কালের শ্রোত শিথিল করে এছির বন্ধন—ভেসে যার মানুষ—তার বর্ধ—তার অবর্ধ—হিংসা ব্যাতি দত্ত ভালবাসা প্রজা প্রতি-

হিংসা—ভক্তি ও ভেদবুদ্ধি ফুল পাতা বতকুটী সব নিয়ে শ্রোতের পতিতে ভেসে চলে সংসার। শুধু মাহুয চার ধামতে—একবার পিছন কিরে দেবতে—যা ছিল অশচ পাশ নি ভাই নিয়ে করনার ফুল ফোটাতে—কি ফুলের সে করনা—ভেমনি রামরাজ্য প্রতি মাহুযের মনকেই বুঝি প্রলুব্ধ করে। কোন একটি বিশেষ কালে নয়—সর্বকালে।

একদিন প্রভাত শুভকরকে বললে, আচ্ছা ভোমাদের বাকীতে তো পরদা-প্রথা এখনও ? কখন রয়েছে ?

শুভকর আরক্ত মুখে বলে, আমি জানি না।

কি জানিস না যে শুভ ? রেকাবি-হাতে মেজ কোঠাইমা বরে চুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শুভকর সলজ্জে উত্তর দিলে—এই পরদা-প্রথা—যা ভোমরা আজও মান।

মেজ কোঠাইমা হাসলেন, আররা যে বড় দুর্বল আর রামাদের কালটাও ছিল রাজা-বাদশাহ, তাঁরা ইচ্ছে করলেই প্রকার সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারতেন।

এখন তো আর সে কাল নেই।

অভ্যাস আর সাহসের অভাব। কিন্তু হঠাৎ বাইরে গেরে ঘোমটা ছুচিয়ে দাঁড়ালেই কি আমাদের সব দোষ খণ্ডন হয়ে যাবে রে! আগুন অবক্ষণা পুড়িয়ে দেয়—সে তার ঈর্ষ; বাতাহুরি মেবার চেঁচা তার মধো মেই।

তা ঘাই বল—ভোমাদের কালের পোশাকগুলোও কি বৈধী। যেমন মোটা—ভেমনি জবরজ্ব।

—ওরে ওগুলো তৈরি হ'ত আমাদের কুচিতে—ভোদের রা।—ভোদের পরেও কুচি বদলাবে—নতুন লোকেরা আসবে ভোদের পোশাক দেখে। এমনি হয়—না হলে মাহুয য পুরানো হয়—পৃথিবী যে একঘেরে হয়।

একথা খীকার করে প্রভাত। পৃথিবী ভাই আজও পুরাতন হ'ল না—আজও আকাশের নীল, গাছের সবুজ, পানীর ফাকলি—কুতুদের আস-যাওয়ার তিসাব হ'ল না পুরাতন। কিন্তু পরমুহুর্তে ভাবে এই যে বহু যুগের পৃথিবী পুরাতন হয় না মাহুযের কাছে—একি শুধু তার বাহু বৈচিত্র্যের প্রভাবে—না মাহুযের মনে নিত্যকালে সৃষ্ট হচ্ছে যে পৃথিবী তারই রঙে চারিই বর্ণে গড়ে ধরিতে অপরাধ হয়ে উঠছে চির পুরাতন শু ? স্রষ্টা শুধু মাহুযকে সৃষ্টি করেন নি—সৃষ্টি করেছেন মন। সেই মনের নিত্য রসায়ন-ক্রিয়ার ফলে রয়েছে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। ক্ষুদ্র শিশু মাটির চেলি গড়ে আমন্দ পাশ—বড়দের মাঝে নিমিস ভেদে-চুরে বিশৃঙ্খল করেও তার আমন্দ।

তার সৃষ্ট জগতে বাস করতে সে গীড়া অহুতব করে—সে। নিষেধ হাতে কিছু গড়তে—নিষেধ সৃষ্ট আমন্দ-লোকে নজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই তার সর্বোত্তম উপভোগ। এই (মাহুযের) জ্বের কপে উগ্ন হয়—জ্ঞানের সঙ্গে হয়

অহুরিত; পৃথিবী ও জীবন নতুন বৈচিত্র্যে ও লীলার সমৃদ্ধ হয়।

আশ্চর্য্য, এই একটি কালের মধ্যে বাস করে আর একটি কালকে প্রত্যক্ষ করতে পারে খুব কম লোকেই। বর্গমানের শব্দ ও আলো অতীত বা ভবিষ্যতের মৌল ভাষাকে বাস্তব হতে দেয় না—ওই শব্দ-আলোর সমারোহ নিয়ে মাহুয মত্ত হয়ে ওঠে—সে পিছনে চার না, সামনেও অজ দূর পর্যন্ত তার দৃষ্টির প্রসার। যেন চোখে ঝুঁলি পরানো বোকা চাবুকের স্পর্শভয়ে চালকের ইন্ডিকে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে চলেছে—দিগ্বিদিক হারা হয়ে।

ঔর মুখে সেকালের গল্প শুনে সেকাল সম্বন্ধে নতুন করে জানবার প্রজ্ঞা জেগেছে প্রভাতের মনে। সেকাল সভ্যতার অনেক পিছনে পড়ে নাই। এই কালের মতই মাহুয প্রকৃষে মহত্ত্ব বৈরাচারে বাসনে ও জনসেবার সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে। সেকালের অত্যাচার ছিল ফুল—তার প্রতিরোধ-চেঁচাও ভেমনি ফুল। একাল রাজনীতিতে হুন্দ কলা-কৌশল বিস্তার করে মাহুযকে হাসি ও ক্রুদ্ধির মধ্য দিয়ে কখন কাছে টানছে, কখন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একালের কর্ম্ম মাহুযের হুটি রূপ। কখনও বর্পণ, কখনও বা বরাভর তার প্রেরণ। রাজনীতির খেলায় দক্ষ মাহুযের এ ছাড়া গতি নাই।

ডান হাতে ভোর বজা বলে

বাঁ হাত করে শতা হরণ।

বৈভ-জীবনের সাধনার সিঁধি লাভ করতে চায় মাহুয।

আশ্চর্য্য, এই বৈভ-জীবনের রহস্য সেকালের বড় বাকীতেও প্রকাশ পেল একদিন। প্রভাতের বদ্র ভেদে গেল—চলতে চলতে ওর সামনে পড়ল প্রকাণ্ড এক গহ্বর—অন্তলম্পর্শী যত্নাপুরী।

মাত্র ছ'দিন আগের কথা। প্রভাত আর শুভকর মেজ কোঠাইমার আসর থেকে গল্প শুনে কিরছিল সেই গলিপথ দিয়ে। গলিপথ শেষ হলে বৈঠকখানা ঘরে ওরা পৌছল। হঠাৎ শুভকর চকল হয়ে উঠল। বললে, একটু দাঁড়াবেন তার—আমার একটা জিনিস ফুলে কেলে এলুম ওখানে।

কি জিনিস—কবিতার বাতা নয় তো ?

হাঁ—লক্ষ্যর মাথা মাঝিরে শুভকর উত্তর দিলে। বাতাটা কাল সিঁধা নিরেছিল—কিরিয়ে দেয় নি।

আর একটা দিন বেশী রইলই বা তার কাছে—

না—সেজ্ঞ নয়। কাল কলেজ ম্যাপাজিনে একটা কবিতা দেব, আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। একটু দাঁড়ান আসছি।

ও চলে গেল। প্রভাত একলা দাঁড়িয়ে ঘরের আসবাব সজ্জা দেখতে লাগল। বেশী কিছু নাই ঘরে শুধু যা আছে তা সাধারণতঃ আকালকার ঘরে থাকে না। এর ছাড়া এত উঁচু, যেকো এত চওড়া আর দৈর্ঘ্য এর এমন অদ্বুত যে বতঃই এর

জাগে মানুষকে জুজু করে দেওয়ার এই আয়োজন কেন? প্রথম দিন এই খরে বসে প্রভাতেরও মনে হয়েছিল এত ক্ষুদ্র আমি। আর কি নগণ্য! শুঁরা বর তৈরি করে মানুষকে করেছেন অসহায় অর্থাৎ খরের মহত্ব মানুষ অভিভূত হয়ে কোথায় মিশিয়ে যায়।

কোথায় ছিলেন জিলোচন সেন—সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, প্রভাত এই অপরাহ্নে তুমি কি মনে কর হে?

আজ্ঞে যেক কোঠাইয়ার কাছে এসেছিলাম।

গুড—গুড। জিলোচন সেন হর্ষবনি করলেন। প্রভাতের মনে হ'ল শুঁর বর ঈশ্বর জ্ঞানো—উজ্জ্বলিত আবেগ—প্রবর। মনে হ'ল অস্বাভাবিক।

জিলোচন সেন বললেন, নিজে দেখে-শুনে কাজ করা ভাল। আমাদের কাল ছিল আলাদা। গুরুজন্মেরা বললেন, অল্প দিন তোমার বিয়ে—তথ্য। কোথায় বিয়ে—পাত্রী কেমন—কত বয়স এসব জানবার অধিকার আমাদের ছিল না, এসব জানানও শুঁরা কর্তব্যবোধ করতেন না। এক কথায় বিয়ে হয়ে যেত—আর আমরা যে ঈকান্তম তাও নয়। কর্তাদের দূরদৃষ্টি ছিল আশ্চর্য্য রকমের। ঠিকই কোপ্তি—রাশি গণ ঘোটক এসব বিচারের উপরেও নিজেদের চোখে দেখতেন লক্ষণ, পায়ের গড়ন, চলন, মাথার চুল কপাল চোখ আর জিঠোট চিবুক গলার খর হাসির আওয়াজ গায়ের লোম তন্ন তন্ন করে মিলিয়ে ঘরে আনতেন সুলক্ষণা কড়া। বোধ করি আমরা ঠিকিনি তাতে। তুমি তো দেখেছ কয়েকখানা অয়েল-পেন্টিং ছবি। ভাল লাগে নি তোমার?

প্রভাত অবশিষ্ট বোধ করছিল। এ প্রশ্ন কেন তুললেন উনি? শুঁর অস্বাভাবিক বরের প্রভাব কি?

কি হে—চূপ করে রইলে যে—ভাল লাগে নি? কঠে জোর দিয়ে প্রশ্ন করলেন। আদেশের সুর সেই প্রশ্নে।

প্রতিকূল মন্তব্য অসঙ্গততার নামান্তর। তা ছাড়া অতঃ-তার কারণও যখন নাই। শুঁদের ছবি কতখানি শ্রদ্ধা আদায় করতে পারত সে প্রভাত জানে না কিন্তু গল্প ছবিগুলির প্রশ্ন প্রতিষ্ঠা করেছে। শক্তিময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী নারী।

প্রভাত অপ্রাণিত স্বরে বললেন, চমৎকার। শুঁদের যে শক্তি—

শুভকর কিরে এল।

জিলোচন সেন বললেন, ভাল জী শুঁর সংসারের সম্পদ নয়, জাতিরও সম্পদ। মুসোলিনীরা আত্মজীবনী পড়েছ তো? ভাল গৃহিণী গড়তে চেয়েছিলেন তিনি—জাতিকে তুলবেন বলে। হিটলারও চেয়েছিলেন ভাল মা যিনি এসব করবেন স্বাস্থ্যবান ছেলে—জাতির সম্পদ।

শুভকর প্রভাতের হাত ধরে বললে, আশুহ।

মানে?—জিলোচন সেন উচ্চস্বরে বললেন, সবটা না

শুনেই? ভাল লাগছে না বুঝি? প্রভাতের পামে কিরে বললেন, আমি চাই—তোমাদের নিজের পছন্দ মত...মানে আমাদের কাল তো আর নাই যে, পিতার আদেশে...তবে তোমাদের চোখ—অর্থাৎ দৃষ্টিও তো পরিষ্কার নয়—একটু খোলাটে। তা হয়ই—কালে সবাইয়ের দৃষ্টি অমন হয়ে। তাই ভাল-মন্দ বিচারের একটা বেই বরিয়ে দেওয়া কর্তব্য আমাদের। নয় কি?

প্রভাত হতভম্বের মত বললে, আজ্ঞে হাঁ।

গুড্। জিলোচন সেন হুয়ার চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত তোমার কথা শুনে। তেরি গ্যাড টু হিয়ার—

শুভকর শুধন প্রভাতকে টেনে নিচে নিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে যেক কোঠাইয়ার গলার খর প্রভাত শুনলে।

হি, জ্ঞান হারিয়েছে? বারী তোমার ছেলের মত—

ছেলের মত? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ছেলের মত?

আজ বাদে কাল যে আমাই হবে—জামাই আর ছেলেতে তকাং আছে কিছ? তোমার জ্ঞান খুব টনটনে, নয়? জিলোচন সেনের উচ্চকণ্ঠ একতলা থেকে শুনলে প্রভাত।

একটা রুচ আঘাতে ওর খপ্প ভেঙে গেল। এই জমাই কি সাহিত্য-সভানেয়ে শুভকর ওকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিল? মহিমময়ী নারীর ভূমিতায়—সামনে এলেন যেক কোঠাইয়া—হাতে তাঁর মিস্ট্রি থালা। তাঁর আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরে বললেন সেকালের গল্প। কেন বললেন? এই বাড়ীর ঐশ্বর্য্য মহত্ব বীরস্ব মহাহতবতা সবকিছু দিয়ে প্রভাতকে অভিভূত করে দেবেন বলে?

প্রভাত হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল।

শুভকর পিছন থেকে ডাকলে, প্রভাত-না?

প্রভাত মুখ ফিরিয়ে চাইলে না।

শুভকর পিছনে চলতে চলতে বললে, রাগ করলেন?

প্রভাত কিরে চাইলে। অকালব্যর্থার মত ধমধমে ওর আকৃতি—গলার বরটাও বেশ তারি। বললে, রাগ করবার কারণ কি নেই?

শুভকর আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কি কারণ?

এই মাত্র ওপরে যে-কথা হ'ল তা বোধ করি শোন নি? বল, এ ব্যাপারের কিছু জ্ঞান না?

প্রভাতের স্নেহোজিত্তে শুভকর বতমত খেয়ে বললে, আমি—আমি কি করে জানব।

ওর বিব্রত ভাবে প্রভাতের মায়া হ'ল। সভ্য এ অবোধকে ভৎসনা করে লাভ নাই। কবিশ্বঃপ্রাণী তরুণ—মনের উজ্জ্বল কবিতার পত্রপুটে সঞ্চয় করেই ওর আনন্দ—সংসারের কুটিল পথেরখার সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা সম্ভব নয়।

সন্মুখে শুভকরের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, যেহে এক

দিন আমাদের বাড়ীতে তোমার খাতা নিয়ে—যাবে তো ?

যাব। আপনি আমার ভুল শুধরে দেবেন তো ?
দেব।

শুভরত অকস্মাৎ আনন্দে অধীর হয়ে প্রভাতের পাহের কাছে অবনত হ'ল।

১৭

খানিকটা দেরিতেই ঘুম ভাঙল। দিনের আলো প্রখর হয়ে চোখে লাগছে। কানে আসছে তরকারি রাখার শব্দ, একটা অস্বস্তিকর গন্ধে ঘুমের আলস্য ভেঙে গেল। প্রভাত উঠে বসল।

আহ্নিকগতিতে পৃথিবী গুরাতন দাগেই পৌছেছে—চারিদিকের ঘটনাপুঞ্জ সময়ের শ্রোতে একই জায়গায় জমবে, ক্রান্ত নয়ন যা থেকে সংগ্রহ করবে অবসাদ। ছোট্ট উঠানের মাথায় এক কালি বাতাস—মাছ তরকারি বাসি ডালের কটু অন্ন গন্ধ—আর ওপাশের কলহপরায়ণা গৃহিণীর একটানা অভিযোগ-অভিশাপের ক্রন্দ—জীবনকে বিখাদ করে দেবার সুপ্রচুর উপকরণ বন্দেই কানে প্রভাত। জীবনের শ্রোতবারা এর মধ্যেই বিলুপ্ত হবেন। ওই কালি আকাশে উদয়াচলের শোভা না ফুটলেও তার বাগী বহন করে আনে কোমল রঙ; বাতাস সাগর-পারের উদার স্পন্দে নুতন উত্তরে সজীবিত করে আশাকে; সৌন্দর্য্য ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে সুধার পাত্র। জীবন-রসায়নে জীবনযাত্রা হ্রদোবর হয়।

ঘুমহাত ঘুরে সলিটার দিকে চাইলে—উৎসব-ক্রান্ত আসরের মতই সেটা ত্রিহমান। গত কালের অপরিমিত বাগ্‌বাহল্যে ওর পুঞ্জি ফুরিয়েছে। নিশানগুলি এখনও গৃহ-অলিন্দে জামালার বারান্দার নামা ভঙ্গীতে টাঙানো রয়েছে—ফুলের মালা তুলিয়ে গেছে, দীপের শোভাও নাই। কয়েক দিন আগে সরবে যে বাঁধা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—আজ তা অন্তর আশ্রয় করেছে। স্বাধীনতার মর্যাদাকে অবঃপর আসন দিতে হবে অন্তঃপুরে।

একটা রেশম-ব্যাগ নিয়ে মা ঘরে ঢুকলেন। একবার বাজারে যেতে হবে বাবা—ওঁর পেটে ব্যথা উঠেছে।

নিরাপত্তিতে ব্যাগটা হাতে নিলে প্রভাত।

মা একটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, এইতেই যা হয় আনিস।

প্রভাত বললে, মাছ, আলু সব তো এতে হবে না।

চুনোমাছ আনবি—আর আলু না এনে বরং কচু আর পেঁপে আনবি। গলার বর নাথিয়ে বললেন, ক'দিনই এটা ওটায় বরচ হয়ে গেল বেশ—আজ তো মাসের শেষ।

প্রভাত বললে, তবে থাক না বাজার।

পাগল। ঘরে এক ছিলকে তরকারি নেই—খাবি কি দিয়ে তাভ।

প্রভাত বললে, সেদিন বল নি কেন আমার যে সংসার-খরচ থেকে স্বাধীনতা—দিবস পালন করা যাবে না।

এমন জিনিস যা কখনিকালে কেউ দেখে নি—তা বারণ করতে পারি। দিন যেভাবে হোক চলে যাবে।

ভাই হতুত যাবে। এই আশ্বাসে মা চল্লিশ বৎসর সংসারের হাল ধরে আছেন—বাবা দশটা পাঁচটার জীবন বাঁধা রেখেছেন। অন্যেরা যেখানে উৎসবে বেপরোয়া আনন্দে মাতল—এ সংসার সেই পরম ক্ষণেও হিসাবের অকপাত করল মনে মনে। চারিদিকের বড়বড় বাঁচিয়ে অতি কষ্টে কোথা থেকে ছিনিয়ে আনা হ'ল আনন্দক—কীণ আয়ু—উপরে থিতানো অন্ন জল নীচের তার জাম আছে পাঁক।

ধলি হাতে সে বাজারে বেরিয়ে গেল। বাজারের রাস্তায় বহু রকমের পণ্য নিয়ে বসেছে কত লোক—বহু কণ্ঠের বিভিন্ন ঘোষণায় ক্রোতাকে করছে বিভ্রান্ত। আজ এদের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে প্রভাত। এরা কি উপভোগ করেছে স্বাধীনতার আনন্দ? যে পরধ বাঁধা রেডিও যোগে বিকোষিত হয়েছে তারতবর্ষের প্রাসাদে কুর্জীরে—শহরে পল্লীতে—এরা কি তাবে নিয়েছে সে খোঁষণা?

না—উৎসব অন্তে এরা ত্রিহমান নয়—নীচের জমা পাঁক উপরে থিতানো জলের বর্ণকে মলিন করে নি। এরা চিরকাল বেহিসাবী বলেই—পরিণাম নিয়ে মাথাব্যথা করে না। এই যে একটি পরিবার পথের ফুটপাতে বেচছে লেবু, আমড়া, কচি শসা আর চালতা। বয়ীষ্মী গৃহিণী সুতি থেকে জিনিসগুলি দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের হাতে—ছেলেমেয়েরা কেউ বা ন্যাকড়ার কেউ বা ফুটের রকে কেউ বা হাতে করে চোঁচাচ্ছে—আনামে ভিন—বাবু আনামে ভিন। মাখন লে যাও বাবু—আমার রাঙাবাবু লে যাও। বিচ্ছিন্ন সুর—হৃদতার ভঙ্গিতে কিরে চাইছে ক্রোতা—জিনিস হাত থেকে গিয়ে উঠছে বলিয়ার। এ পরিবারটিকে জানে প্রভাত। গেল ভাত্রে ডাইরেই অ্যাকশনে প্রাণ দিয়েছে বৈজু।

তার লজ কয়েকদিন মাত্র হা-হুতাশ করেছে মনিরা। দিনের পর দিন শোককে টেনে জীবনযাত্রাকে পঙ্খ করে তোলে নি। বৈজু থাকতেই ওরা বিক্রয় নিয়ে পথের ধারে এমনি করে চোঁচাত—সংসার-চালবার কৌশল ছিল আয়ত্তে। ওদের সংসারে একটি লোক কমলে—মনে খানিকটা আঘাত লাগে—কিন্তু সংসারের গারে তার আঁচ পৌঁছায় না। একটি মাহুষের উপার্জনে বহুপোষ্যতারগ্রস্ত সংসার নির্ভর করে না।

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে দারিদ্র্য আছে—কিও জীবন-যাপনের সমস্যা ভেমন জটিল নয়। সর্ববিজ্ঞ দারিদ্র্যের জটখোলা প্রণালীতে সামাজিক মানদণ্ডের পঠনটি তিস্তর।

এদের বাড়ীর কুলবধূরা পারে হেঁটে এক বাড়ী থেকে অত বাড়ীতে কিংবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গেলে পথ তাদের মর্যাদা হরণ করে না—নৃতন অতিথির আগমনে—বিরোধ বা প্রাচ্যবাসরে লৌকিকতার দণ্ড দেওয়া না—দেওয়ার উপর মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে না—কিংবা সংসারের কলক নিয়ে সমাজে অচল হবার ব্যবস্থাও নাই। হুঁর্যের আলো অরূপণ ভাবে যেমন পূজাবোধীতে আর মর্দ্যামার পড়ে—হান বিচার করে না—এদের বেঁচে থাকবার চেষ্টাও সেই জাতীয়। আকস্মিক দৈবহুর্বিপাকে এরা কতিপয় হয় বটে—হুর্ভিকে—জলপ্লাবনে—ভূমিকম্পে—যুদ্ধ কিংবা ব্যাধিতে হাজারে হাজারে এরা নিশ্চিহ্ন হয়—তবু সেই যত্নের অগৌরব কম। মধ্যবিত্তের সংসারে যত্ন—দিনের পর দিন যে ভাবে উঁকি মারে যে ভাবে আধিপত্য বিস্তার করে—কর করে জীবনী শক্তিকে...প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। . তাবলে এরা মধ্য-বিত্ত নয় বলেই এদের সমস্যা হয়ত বুঝতে পারছি না—এদের যত্নকে ভাবছি তেমন ভাবাবহ নয়—তবু আকাশ আচ্ছাদনে ও দর্শনরনে—তবু অন্ন বা ছাতু-আটার সংযোগে—এদের জীবনযাপন-প্রণালী যে গ্রহিহীন একথা অস্বীকার করি কেনম করে। তবু প্রাণধারণের নীতিতে এরা রাস্তালতা নয়—পথের দুর্কাদল পদতলে পিষ্ট হলেও সহজে বিনষ্ট হয় না। হুটী হুঁদের অভিযাপ পৃথিবীতে ছায়া বিস্তার করেছে, আগামী যুদ্ধেও ছায়া গাঢ়তর হবে। সর্বস্বারা আর সর্বময়দের ঘন্থে রাষ্ট্র রূপ পরিবর্তন করছে—যারা বয়ের নয়—ঘাটেরও নয়—অবাং মধ্যবিত্ত—ভাদের কথাটা ভাবছে কি কেউ? না, তারা থাকবে না—। ভাদের চিন্তা, বুদ্ধি, প্রতিভা, আকাশ আর পাভালকে বেঁধে বেঁধে মাধ্যাকর্ষণে নিরস্ত্রিত করছে। তাদের নিরেই পৃথিবী, অগচ পৃথিবী থেকে তারা বুছে যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলার অনন্ত আপিস থেকে কিরে এসে ডাকলেন, প্রভাত।

প্রভাত এলে বললেন, ভূমি উপরুক্ত ছেলে—তোমার কাছে আমি এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। বুঝতে পারছ না? কাল জিলোচন সেনকে অপমান করেছে ভূমি।

আমি? বিস্মিত প্রভাত পিতার পামে চাইলে।

নয় ভ কি। উনি আদর করে তোমার ডেকেছিলেন, ভূমি তত্ত্বতার মর্যাদা রাখনি। ঠুর বাড়ীতে গিয়ে ঠুকে অপমান করার সাহস হ'ল তোমার।—আশ্চর্য।

পিতার ভৎসনার প্রভাত আলো দেখতে পেলে। কখনও সে পিতার কথার প্রত্যুত্তর করে নি—আজ সে পারলে না যৌন থাকতে। বললে, উনি ভ যাজ্ঞ রেখে কথা বলেন নি।

যাম। অনন্ত গর্জন করে উঠলেন। জান উনি কত বড় মানী লোক? নিজে এসেছিলেন—আজীব হবার দাবী নিয়ে—তবেছেন লেখাপড়ার তোমার কেরিয়ার ভাল—ভাই—

প্রভাত বললে, বেশ ভ—সে কথা আপনায় সন্দেহ কইলেই যথেষ্ট হ'ত—আমাকে টানবার কারণ বুঝলাম না।

ঠুর বিষয়-সম্পত্তি ভাবছ সব শেষ হয়েছে? এখনও যা, আছে সেই সব একজন বুদ্ধিমান বিদ্যাম ছেলের ভৃত্যবাসনে দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। ছেলে নাই—হুটী যাজ্ঞ মেয়ে। একটা মারা গেছে, আর একটিকে কাছে রেখেই—অবাং যত দিন উনি বেঁচে থাকবেন—

প্রভাত বললে, স্পষ্ট করে যদি বলতেন এক কথা তা হলে অসম্মানের কারণ ঘটত না।

অনন্ত মরম হয়ে বললেন, অত বড় মানী লোক—সরাসরি কথাটা পাড়তে কতখানি লজ্জা ভাব দেখি। আমি অবস্ত বুঝেছিলাম—ভেবেছিলাম ভূমি বুদ্ধিমান—ভূমিও বুঝবে।

প্রভাত নম্রকণ্ঠে বললে, হাঁ বাবা—আমিও বুঝতে পেরে-ছিলাম।...তাই কিছু অভ্যস্ত করে ফেলেছি। কিন্তু উনি একথা কেন বুঝলেন না যে ঠুর মানসম্মত যেমন উঁচু, অস্তের মানসম্মত যেমন উঁচু না হলেও খানিকটা আছে। কোন আত্মমর্যাদানীল ছেলে ঠুর প্রভাবে রাজী হতে পারে না। কথা শেষে প্রভাত আর সেখানে অপেক্ষা করলে না।

ভুক্তিত অনন্তের বাঙালিশক্তির অবকাশ রইল না। চির-দিনের মত নিরীহ প্রভাত বলে কি। তার বস্ত্র একটা মর্যাদা আছে একথা কোন দিন তো অনন্তের বাদপাতে ছিল না। বস্ত্র মত, এও বিচিন্ত বটে। তাঁদের কালে...কিন্তু সে কালের দৃষ্টান্তে এ কালের তরুণরা অহুপ্রাণিত হয় না, কতকটা উপ-হাসের ভিত্তিতে তারা সে কালের কাহিনী শোনে। তাঁর নিজের সংসারে আভা-অবহেলার মনস্তাপ এ বাবং ভোগ করতে হয় নি—আপিসের সহকর্মীদের কাছে শোনা বহু কাহিনী মনে রাখা আছে। সে সব কাহিনী শুনেছেন যাজ্ঞ—মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় নি। পৃথিবীটা বেয়াজ্ঞ রকমে বদলে যাচ্ছে এই ধরণের ক্ষোভ কিছু প্রকাশ করেছে, কতকটা ভাঙিল্য কতকটা মজা-দেবার মত বার্তাগুলি মনের উপভোগ-রসে পরিপাক হয়ে গেছে, নিজ কালের গৌরব প্রচারে সত্য বলতে কি আনন্দ লাভই করেছেন এতদিন—আজ ছেলেবেলার পড়া পড়পাঠের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে :

কি যাতনা বিধে বুঝবে সে কিসে,

কছু আশীবিধে দংশনি ধারে।

হুমরনী ঘরে ঢুকে দেখলেন, হু'হাতে বুক চেপে ধরে অনন্ত বালিশে উপুড় হয়ে শুয়েছেন। বললেন, বুকের ব্যাথাটা কি বাতল?

হুঁ।

গরম জল এসে দেব?

না। শোন, এদিকে এস।

সুন্দরী কাছে এসে বসতেই বললেন, আর কোম আশা নেই, বুঝলে?

কিসের আশা?

প্রভাতের বিয়ে দিয়ে বউ আসবে—বুড়ো বয়সে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বউয়ের সেবা থাকবে—

সুন্দরী বললেন, সে আশা করি নে।

নিশ্চয় কর—মিথ্যা বলো না। প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন যমজ। আশা কর না তো সংসার কিসের জন্ত? কার জন্ত হুতের ব্যাপার খেটে মরছ।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুন্দরী বললেন, যা দেখি চারদিকে যাতে ভরসা হয় না যে বউয়ের সেবা পাব।

কি দেখে?

কেন—মিথিরদের বাড়ী—মুখুজ্জদের বাড়ী—দত্তদের বাড়ী—শীলদের বাড়ী—যে দিকে তাকাবে সব শেয়ালের এক। কেউ বলে না যে ছেলের বিয়ে দিয়ে সুখী হয়েছি।

তোমাদের কালেও এ ব্যাপার ছিল তো। যুধ নামিও—আমি জানি—মার কাছে অনেক কথা শুনেছি তুমি—

সে হরত অভাবের জন্য—

ঠিক তা নয়। তবু যা তোমাকে ভালও বাসতেন যথেষ্ট। নিজের পায়ের পছন্দা তোমার পরিয়েছেন—নিজের যুগের বার তোমার ভুলে দিয়েছেন।

হু'জনেই বামিককণ মৌন হয়ে রইলেন। অন্তীত যত কষ্টই হোক—যুতির কিনারে কোমল রঙ একটু লেগেই কে। হরত সে বর্ণ বিলাসের—তবু তা আনন্দদায়ক।

অনন্ত বললেন, এতটুকু বেলার এ সংসারে এসেছিলে। বলতেন—একটা বিড়াল ছানাকে নাড়লে চাঙলে মারা যায়, আর মানুষের ওপর মারা পড়বে না? কিন্তু আজ যা আসে—ভারা আলাদা সংসারের রীতি নীতি নিয়ে—সাদা সংসার গড়বে এই সঙ্কল্প নিয়েই আসে। তাদের এক রং বাঁধতে পারা কি তেমনি সহজ তাব?

যাক—ওসব কথা ভেবে মন ধারাপ করো না—

না—বুড়ো বয়সে নিজের পায়ের বল থাকে না বলেই বলা। আমাদের কালে কর্তব্যটা ছিল বড়—এরা মানুষকে যি তার ওপরে। তারা—তারা—। দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে যি ছাড়লেন অনন্ত।

তুমি প্রভাতকে পড়া ছেড়ে কাছে চুকতে বলেছিলে?

হাঁ—কিন্তু ভেবে দেখলাম তুল করেছিলাম। ওকে ত বঁরাভাতে পাঠি না যে পড়বার কথটা আমার নাই। হলে পড়িয়ে টাকা রোজগার করছে—ও স্বাধীন।

না—না—প্রভাত ভেদন নয়। সবাই ওর সুখ্যাতি করে। পাল দিলেন সুন্দরী।

অনন্ত প্রভাতের না করে ললাটে তর্জনী স্পর্শ করে হাসলেন।

১৮

এর পর পুজো এল।

স্বাধীন তারতের প্রথম শারদীয়া। কাগজ কাগজে এর বাঙা বিঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু সন্মেল জাগে, পঙ্কাবে আর বাংলায় বাস্তবতাপীর বিপুল সংখ্যায় শরতের আনন্দকে ফুটিতে দেবে না এবার। বিভক্ত পঙ্কাবে আর বাংলাতে সংখ্যালঘু হিসাবে যারা পড়ে রইল—তাদের জ্ঞান দূর করতে পারে এমন অভ্যুপায়ের সন্ধান কে দেবে? বরাভয়দায়িনীর মহিমা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে কি?

সাহিত্যের বাজারে নতুন শারদীয়া সংখ্যার আবির্ভাব—আর সব অভাব মোচন করবে এ আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। পুরাতন লেখকদের যে যেমন পেরেছেন নতুন নৌকায় টেনে তুলেছেন উজ্জ্বলারা।...যেমন বেলুঙ মঠের পারাপারের নৌকায় ইঁকড়াক করে যাত্রী বোঝাই করা হয়। আর প্রতি-যোগিতা সুর হয়েছ কুমারতুলির ক্যারিগর দণ্ডের। কে কত ভাল প্রতিমা আমতে পারেন তারই উত্তোপ আয়োজন চলছে। তারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়েছে উৎসবটাও সেই গৌরব অমুঘায়ী হওয়া চাই—টাকার হিসাব রাখার প্রয়োজনই বা কি। পাড়ায় পাড়ায় চাড়া সংগ্রহের ধুম লেগে গেছে।

প্রভাতদের বাড়িতে চাদা আদায়কারীরা এল। এক দল নয়, দু'দল।

অনন্ত বললেন, গেল বার তো এক জারগায় চাদা দিয়েছি, এবার হু'জারগায় কেন?

এবার একটা নতুন পুজো হচ্ছে তার।

তা হলে চাদাটা ভাগ করে নিও।

তা কি করে হয় স্যার। আর গেল বারে যা দিয়েছেন এবারে তার চেয়ে বেশী না দিলে...বুঝতেই তো পারছেন স্বাধীন তারতের প্রথম পুজো—

অনন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তারত স্বাধীন হয়েছে, আমাদের আর তো বাড়ি নি বাপু।

স্বাধীনতার জন্ত কত দেশের লোক কত কষ্ট সহ করেছে তার—সামাজ হু'টাকা চাঁদা—

অনন্ত চটে উঠলেন, যখন উপার্জন করবে তখন এসব লম্বা লম্বা কথা বল, আহ তো বাপের হোটেল—

ছেলেরা চটে উঠল, আমাদের ইন্সট করছেন। আচ্ছা দেখ্ লেগে।

সবাই একযোগে চীৎকার করে উঠল, জর হিন্দু।

প্রভাত বেরিয়ে এসে বললে, তবু তবু চোঁচাছ কেন?

দেখুন প্রভাত-না—আপনার বাবা আমাদের অপমান করেছেন—উনি যতকণ না মাগ চাইছেন ততকণ আমরা

ম্লোগান আওড়াব। বলে ছেলেটি দলের দিকে ক্রি়ে চীংকার করে উঠল।

দেশের শত্রু—

সম্বরে সকলে প্রতিধ্বনি ভুলল, দুর্দাবাদ।

প্রভাত হাত কোঁড় করে বললে, আমি কমা চাইছি।

ছেলেদের দলপতি সামনে এসে বললে, আচ্ছা—সে বা হয় হোক—চাঁদাটা এখন পাব কি?

পরন্ত এসো।

সবাই জয় হিন্দু ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

অনন্ত ততক্ষণ ক্রোধে কোঁড়ে কাঁপছিলেন। বললেন, তুই ওদের টাকা দিবি বললি কেন? বত সব গুণ্ডার সর্দার—পুঙ্খের নামে গুণ্ডামি।

প্রভাত বললে, আপনি নেয়ে নিন গে—আপিসের বেলা হ'ল।

অনন্ত বললেন, কিন্তু বলে রাখছি প্রভাত—ওদের নিয়ে যদি আমরা স্বাধীনতার বড়াই করি সে বড়াই বেশী দিন থাকবে না।

প্রভাত বললে, বাবা, ডাইরেট্ট একশনে এরা পাড়া বাঁচিয়েছে।

হঁ—তাই গুণ্ডামিতে হাতটি হয়েছে পাকা। এসিড বাল্ব, বোমা তৈরী, ষ্টেনগাম চালানো, ছোরা ঝারার কারুদা আর সেই সঙ্গে গুণ্ডাদের মত সুসু উচ্চারণ—

প্রভাত তর্ক ভুললে না। শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি নেয়ে নিন গে।

অনন্ত গজ গজ করতে লাগলেন।

বাড়ীর মধ্যে আসতেই সুনয়নী বললেন, ওরা চোঁচাচ্ছিল কেন গো?

পুঙ্খের চাঁদা চার—বত সব মা-মরা বাপে-বেদান ছেলের মাতৃভক্তি দেখলে পিঁড়ি শুদ্ধ রি রি করে অলে।

সুনয়নী বললেন, তা ওদের বেন বিদের করলে—মেয়ে কামাইকে ভো—

ভক্ত করতে হবে—নয়? তিন বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে—এখনও ভক্ত? সাধ-আজ্লাদ যে বই বই করে উথলে উঠছে।

অনন্তর তিক্ত হাসি দেখে সুনয়নী আপনাকে সামলে নিলেন। নয়ম গলায় বললেন, লোকত: বর্ণভ: না হোক—আপন সন্তান—

পরগোত্রের মেয়ে আবার আপন হয় কখনও? ওদেরও দেখি দেখি রব। আমাদের মত বারা—ভাদের বর্ণ মেই—সমাজও নেই—আমরা সব সৃষ্টি হাতা—কালাপাহাড়। বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন অনন্ত।

সুনয়নী চূপ করে রইলেন। স্বামীর মনের বেদনা তাঁর মনেও যে সঞ্চারিত হয় নি তা নয়—কিন্তু শারদীয়ার দিনে

মেয়ের মান বুঝানি—ভার কল্পনাকে পীড়িত করে তুলছে। বৎসরাচ্ছে একখানি কাপড় দিয়ে স্নেহ প্রকাশেরও সুযোগ বুঝি তাঁর ঘটবে না।

অনন্ত বললেন, সন্তার দিনেও হস্তর মশার ভিন বছরের বেশী কাপড় দিতে পারেন নি—আমাদের গায়ে নিশ্চয় সে ছুঁবে লেগে নেই। সুনয়নীর মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে সে বাধা। অদৃষ্ট কাঁটা—চোরা বেদনা। সে গভীর ছুঁবে আছও অসুস্থত্ব করেন তিনি তাই নিজের মন দিয়ে মেয়ের মনকে স্পর্শ করেন বার বার। ছুঁবে গায়ে লেগে থাকে না সন্ত্য কথা—কিন্তু বাইরেটা যদি মাহুয়ের সব হ'ত।

মেয়েকে আনবে না এবার? অনেক দিন দেখিনি তাকে।—অভ্যস্ত কোমল কণ্ঠে সুনয়নী বললেন।

সে বর অনন্তর মনকে স্পর্শ করল—একটি নিঃশ্বাস বুকের মাঝে টেনে নিয়ে ভিন বললেন, মেয়েকে কে আর না দেখতে চায় বল। কিন্তু দেশনের বাজার—চাল জোগাব না কচি ছেলের ছুঁবে জোগাব। মা আসেন বটে বছর বছর—কিন্তু কি দেখতে যে আসেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাসটা আর চাপতে পারলেন না।

মা এলে যারা খুসী হয়—তেমন তেমন লোকের সংখ্যাও বাংলার কম নয়। সেটা মাকে দেখবার আগ্রহ নয়—বৈচিহ্ন্য-সন্ধানী মনেরই খেলা হয় তা।

এর মধ্যে অনিমেয় দিন তিনেক প্রভাতদের বাড়িতে এসে ক্রি়ে গেছে—প্রভাতের সঙ্গে দেখা হয় নি। এক দিন একটা চিঠি দিয়ে বলে এসেছিল—বিশেষ দরকার, তাকে এক বার অবস্থা করে পাঠিয়ে দেবেন। বলেছিল মেপথচারিণী সুনয়নীকে উদ্দেশ করে'।

সহজ মেলামেশার মধ্যেও রহৎ একটি ব্যবধান ছিল ছ' বাড়ীর। প্রভাতের সঙ্গে দীপা বা অনিমেয়ের অন্তরলতা থাকলেও ওরা কোন দিন প্রভাতদের অন্ত:পুরে আসে নি। এ বিষয়ে ওদের সন্কেচ কতটা ছিল বলা কঠিন, কিন্তু প্রভাত সম্ভ্রত হয়ে উঠত ওদের ডাক শুনলে। ভাড়াভাড়ি বাইরে এসে ওদের টেনে নিয়ে যেত অজ্ঞদিকে। এ বাড়িতে ওদের অত্যাধনা করবার সাহস কোন দিনই প্রভাতের হয় নি। বাড়ীর সুপ্রকটিত দৈহ অথবা অত্যাধনা মাহুয়ের মাজাজানহীন আলাপের অসৌকর্য—কোন্টাকে ভর করত প্রভাত, কে জানে। ওদের বা কিছু আলাপ পথের দিকের একমাত্র আদালার মাঝ্যে সুসম্পন্ন হ'ত।

ইদানীং প্রভাতের সন্কেচটা বেড়েছে। বিশেষ করে টিউপানি না মেওয়ার পর। ওরাও এই প্রসঙ্গটিকে সবচেয়ে এড়িয়ে গেছেন—ভবু মনে হয়েছে ওদের আলাপের বহুদূর সুরটি ঠিক মত আর থাকছে না। অনিমেয়ের কাছে ও বেশ বাণিকটা অপরাধী হয়ে আছে।

প্রত্যভ বাড়ী ফিরলে সুলক্ষ্মী বললেন, বড় বাড়ির মেলে
সেহিল—এই যে চিঠি। বলছে বিশেষ দরকার, দেখা
দেবে। একটু থেমে বললেন, তুই মুক্তি আর ওদের ওখানে
পাস নে?

প্রত্যভ বললে, বাবার সময় হয় নি।

সে কি রে—তোর কি এত কাজ যে বছর সড়ে দেখা
দেতে সময় পাস না। ওরা ভোকে ভালবাসে বলেই না
বাঁকে! বড়লোকের সঙ্গে অসন্তোষ করলে নিজেরাই কষ্ট
বি—

প্রত্যভ আহত হয়ে নিজের ঘরে এসে বসলে। ফুলের
লাগে এমন অর্থ কোম দিন ওর কাছে পুষ্ট হয় নি।
দের আলোর প্রাসাদ ও কুটির বঙ্গপুরীর সৌন্দর্যে বলমল
রে—বহুত তো তাঁদের আলোর সমগোষ্ঠীর। প্রত্যাশার
বৃষ্টি ওরই সৌন্দর্যে লুপ্ত হয়ে ছিল—আর সত্যিই তো
এমন প্রত্যাশা ছিল না প্রত্যভের মনে। সত্যিই ছিল না কি
প্রত্যাশা? সুলক্ষ্মীর কচি ও সংকল্পের মহামূল্যে বিনিময়িকার
রে ওকে হুমিবার আকর্ষণ করেছে। ও লোভীর মত ছুটে
ছে—লোভীর মত কাটিয়ে দিয়েছে বর্তার পর বট। সেই
সাপ-আলোচনার পরিমণ্ডলে।

—সেই লোভের চেহারা এমন সুসজ্জিত নয়—চিহ্নসজ্জ
যত কমত না গানি। টিউপানি পাবার প্রত্যাশার একবার
তার মূলমুষ্টিটা প্রত্যভকে রক্ত আঘাত করেছিল। সেই
খাতিক যুগুর্ভও নিঃশব্দে সরে গেছে—কিন্তু অভাবগ্রস্ত
তারের ক্লেশরাশির কিছু অংশ প্রত্যভের মনে সঞ্চিত হয়ে
ছে। ও ভেদন সহজ ভাবে অনিমেবদের সঙ্গে মিশতে
ছে না।

পরের দিনও ও অনিমেবদের বাড়ীতে গেল না। অনিমেব
সেই দিন সন্ধ্যাবেলার পথের মাঝে ওকে ধরলে।
র—একেবারে উধাও? চিঠিটা পাসনি তো?
পেয়েছি।—

তবে? ওবেলার বহুকণ অবধি অপেক্ষা করলাম—এলে
—তুমি কি একটা সমিতি নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছ।

একটা কিছু চাই তো। প্রত্যভ হাসলে।

এবার বোঝ করি পুছোতে কোথাও বেরুবে না?

পুছোতে বেরুবার সাহস আমাদের—

এ যেম সকালের দেশভ্রমণ। পারে হাঁটা পথ—পথে
। ডাকাত। অনিমেব শব্দ করে হাসলে।

তা ছাড়াও সাহসের দরকার হয় না?

ই—ট্রেম কলিশন? আচ্ছা প্রত্যভ—প্রাণের মাঝে তো
বেশী হাল হবে থেকে?

প্রাণ রাখিতে প্রাণাত্য বলেই তো—

ক'পোমি রাখ। অনিমেব তাকাল। তার কাছে

একটা পরামর্শের কত হু'বেলা হাঁটছি—তোর কিন্ত এখাই
দেই।

কি এমন পরামর্শ?

এবার পুছোটা কি কলকাতার কাঠাতে হবে? না
কিছুতে নয়। আমি বলছিলাম দিল্লীতে বেড়িয়ে আসা
যাক—

মন্দ কি—রাজধানী-দর্শন।

দীপা বলছে দার্কিলিং।

আরও ভাল। একেবারে আমার বাড়ী।

মামার বাড়ী?

নয়? মা তো কি বছর ওখানেই আসেন এই সময়ে।

—ওই হিমালয়ে।—ওটা আমাদের মামার বাড়ী নয়?

অনিমেব হো হো করে হেসে উঠল—তাই ভাল—কি
বলিস?

মন্দ কি। প্রত্যভ নিকুংসাহ গলার জবাব দিলে।

মানে? সবিস্ময়ে প্রত্যভের পানে চেয়ে হেসে উঠল
অনিমেব। যেন তার পক্ষে কলকাতাতে থাকাও বা—
পাহাড়ে যাওয়াও তাই।

উদাস দৃষ্টিতে অনিমেবের পানে চেয়ে প্রত্যভ বললে, তা
ছাড়া কি।

তা হলে তুই যাবি নি?

প্রত্যভ পুষ্ট না বলতে পারলে না। বছর দুই আগে ওরা
শিলং গিয়েছিল—সুখস্বস্তির মত তার রেখা এখনও সমস্ত
যুষ্টিতে লেগে রয়েছে। পাণ্ডুবাটে প্রীমার থেকে মোটরে ওঠা
—মাংসপার ক্রসিং—এ আপ-ডাউন হ'বারের মোটরগুলির
সাক্ষাৎকার—পাহাড়ী হেলমেটেরেদেব কাছে কমলালেবু কেনা
আর সপিল পাহাড়ের পথে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে ময়ূর গতি
মোটরের দক্ষ অভিযান আজ বগ্নে দেখা দৃষ্ট বলে মনে হয়।
সেদিনও তা যন্ত্রের মত মনে হয়েছিল। পর্বতসারুতে
ভরলারিত বোজন-বিভূত স্তম-সমারোহ—নীলের চন্দ্রাতপের
সঙ্গে তার বিভালী—সে যেম পৃথিবী ছাড়িয়ে আরও কোম
পৃথিবীর বার্তা। প্রত্যাহের ধূম-ধূলিমলিন পৃথিবী নয়—কলহ-
কোলাহল মাথা গৃহাদমণ্ড নয়, শাণিতমুখ তীরের আঘাতে
বিধ জীবন বারণের বিচিত্র সমতাও নয়—বহুজ-প্রবাহিত
উৎসের মত স্রেরের বঁকার ভুলে দৃষ্টি থেকে যেপথ্যে অভ্যস্ত
হয়েছে এবং দেপথ্য থেকে অন্তরে আশ্রয় নিয়েছে সে জগৎ।
সে জগৎ বগ্নে পাওয়া অশচ চিরজীবী।

কিরে—যাবি তো? অনিমেব ওর দাঁক বরে মাঝা দিল।

প্রত্যভ দাঁক নাড়লে।

দীপা বললে, মনে আছে সেবার বিন্দপস কলস থেকে
কিরতে পাহাড়ের মাথার এক ঝাঁক রডোডেনড্রন দেখে তোমার
আবুতি, 'উদ্ধত বত মাথার শিখরে রডোডেনড্রন ওছ।'

দীপা তেকে মিরে গেল চারের টেবিলে—বিপুল হাতে
বাবার-ভরা প্লেট রাখলে সামনে—পেরালার পেতালার ঢাললে
চা—পিরানোর তুললে সুর। হাসিতে গলে করনার মশগুল
হয়ে কেটে গেল দীর্ঘ সময়।

বাকীতে কিরে এসেও বপ্পের ঘোর আর সুরের মোহ
কাটল না প্রভাতের। মনে হ'ল পৃথিবীর তপস্তাই হ'ল এই
জগৎকে আরও করা। বপ্পের মাধুর্য্য হারী হয় বাস্তবের
উপকরণ মিথ্যেই। বস্তুরক বাঁধবার কৌশল যার আরও নয়
তার পক্ষে বস্তু শুধু বিলাস নয়—পীড়নও বটে। বহি-সমর্পিত
পতনের আলো...

জানালটি বুলে দিলেই গলির ওপ্রান্তে তেতলা ঘরখানি
দৃষ্টিতে পড়ে। সন্ধ্যার সুখে ও ধরে নীলবাতির আলো অলে—

সে আলো রাত্রির মধ্যবাহেও অলে—রাত্রিশেষে প্রভাত-ভারার
সন্ধ্যাও পাল্লা দেয়। কাচে-বেরা কাছের আলোর চারদারে
পতনেরা ডানা কাপ্টার—ডানা কাপ্টাতে কাপ্টাতে প্রায়
বৃষ্টিত হয়ে পড়ে, তবু আলোর মোহ তাদের ঘোচে না।

কত বিভিন্ন দিশীথে তেতলা ঘরের ওই আলো দেখে
প্রভাতের মনে হয়েছে—ওই আলো আলার তপস্তাই পৃথিবীতে
সার্থক হওয়ার মানদণ্ড। বস—মোতাম্য—সুখ—কল্পবৃক্ষের
ফলের মতই অনায়াসে চরন করে নেওয়া যায়—সম্পদের
দক্ষিণা যদি করতলগত হয়। সে সম্পদ বিঘাতা দেন না—
ভাগ্যও দেয় না—হুঁচি আর উত্তমের আকর্ষণ দিয়ে পেতে
নিতে হয়।

ক্রমশঃ

যুগসন্ধি

ক্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বসুধা ভেমনি বিচিত্র আর আকাশ ভেমনি মীল,
হারিবেছে শুধু প্রকৃতির সাথে মানুষ মনের মিল।
জ্যোৎস্না ত আর হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে পারে না তার,
অরুণ পারে না পুঞ্জীভূত সে দূরিতে অন্ধকার।

সৌন্দর্য্যের সন্ধ্যামে কেহ যাত্রা করে না হরু,
স্নেহ-করুণার অন্তর কারো কাঁপে নাকো হরু হরু।
প্রতিহিংসার মত্ত মানব, অন্তরে পুঁথি' তর
জগৎবিচারগতার করে সে বিচারের অভিনয়।

মানুষ জানে না—কি তার ইচ্ছা, জানে না কি-বা সে চার,
পৃথিবী এ কোন্ অমিশ্রিতের রয়েছে প্রতীকার ?
কোথা আনন্দ ? হৃদয়বিহীন জীবনে বাজিছে ব্যাধ।
কোথা প্রশান্তি ? অজুতব করে দারুণ অহিরতা।

কুল কুল কুল কল-ধ্বনিত এ মহে শান্ত নদী,
আপনার মনে একটানা স্রোত বহে নাকো নিরবধি।
এ যে সীমাহীন সুক সাগর, ধামে না আন্দোলন,
বাহুর আঘাতে বার বার বারি ক'রে ওঠে গর্জন।

দেখিরা দেখেনি, ঠেকিরা দেখেনি ; কে তারে সত্য কহে,
আদি-মানবের আদিমতা আকো রক্তে বাহার বহে।
বিচূর্ণ হ'ল—হিল বাহা—কিছু অকুয়ার স্মরণ।
শোনা যায় শুধু হৃদয়ের রথ-চক্রের ঘর্ঘর।

প্রলয়-সাধনা-মগ্ন মানুষ প্রীতির প্রার্থী নয়,
চাহে হৃদয় বিপুল শক্তি, চাহে নির্দ্বন্দ্ব জয়,
চাহে প্রভুত্ব, একাধিপত্য, কমাহীন সংগ্রাম,
জীবনচিহ্ন-বিলুপ্তি—বুকি শান্তি তাহার মায়।

প্রকৃতির স্নেহ, শোভা ও সুসমা বৃদ্ধ হৃদয়ে তরি'
জীবন-সাধনা করিতে হবে যে আবার সূতন করি।
কেমন বিকোত ? কেমন এ বিরোধ ? কেমন এত সংঘাত ?
বহু, নিজের অন্তর-পানে কর গো দৃষ্টিপাত।

আকাশে আকাশে সূর্য্য-ভারার যে সুর স্পন্দমান,
সেই সুরে আজ বাজিরা উঠুক জীবনের বঁত পান।
সুগের সন্ধ্যা এসেছে—জান না ? এল সন্ধিকণ,
আর দেহী নয় মনোমন্দিরে কর পূজা-আয়োজন।

কিন্নর-দেশ

শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রী

অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[কিন্নর বা কিন্নরভূমি সাহিত্যিকদের কল্পনার সৃষ্টি নহে। কিন্নর-দেশ একটি আছে—হিমালয়ের কোলে, তিব্বতের গারে। কিন্নর ও তিব্বতের বাগাযোগ অতি প্রাচীন ও অতি ঘনিষ্ঠ। আকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও চারাগত সাদৃশ্য এতদ্রুতরে অনেকটা। কিন্নর-পল্লীতেও লামা আছে। রয়েরা অভ্যন্তরীণ হরিজনশ্রেণীর লোক—নিপীড়িত। তিব্বতে ঘৃণিত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এতাবৎ অজ্ঞাতপ্রায় কিন্নরদের কিন্নরভূমির কথা কে-কোন দিন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইয়া উঠিতে পারে।

লেখক কিন্নরদের অর্দ্ধদেব বলিয়াছেন। এমনই অভিনব তাহাদের হিক সৌন্দর্য, আর অপূর্ব তাহাদের মিহি কণ্ঠস্বর। পাঠক অজ্ঞাত-প্রায় এই হিমাচলবাসী আদিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষার, জীবিকার, মাজিক রীতি-নীতি ও আর্থিক অবস্থার চিত্র এই লেখার পাইবেন।

লেখক এগার মাস আগে লিখিয়াছিলেন—“হিমাচলপ্রদেশের রাজ-নীতিমলার সহিত এই সীমান্তপ্রদেশের মোটর ও টেলিফোন দ্বারা যোগাযোগ রাস্তার দিক হইতেও প্রয়োজন।” আজ এই প্রয়োজন বেশে উপলব্ধ হইতেছে।

আগ-জ্যোতিষপুরের কামরূপের সহিত হাজার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত রয়ের প্রাচীন রাজধানী কামরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল কি? আবার খিতে পাই চীনে বাণিজ্যের দুর্গ ছিল—অনুবাদক।]

এক সময়ে লোকে মনে করিত হিমালয় অলঙ্ঘ্য। কিন্তু জ্ঞানের উন্নতির এই যুগে উন্মূল মূলও আর অলঙ্ঘ্য নহে। জ্ঞানের প্রসাদে স্থান-কালের ব্যবধান আজ প্রায় মাণ্য হইয়াছে। কিন্নর-দেশ-বাসীর কাছে বিজ্ঞানের সব চমৎকারিতা কবাবে সুচী মনে হয়। এ কথা যে বলিতেছি তাহার কারণ এলা হইতে ১৪০ মাইলের দূরত্ব, মল্ল এছের দূরত্ব অপেক্ষা কম মনে হয় মাই। কিন্নর প্রদেশের প্রধাম স্থান চীনা মলা হইতে ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

১৯৪৮ সালে শিমলা ও পূর্ব-পঞ্জাবের রাজ্যগুলি লইয়া হিমাচলপ্রদেশ গঠিত হয়। অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের মধ্যে প্রধাম ন রামপুর, বুশহর, সিরমোর, মণ্ডী ইত্যাদি। ভারত-কার হইতে ইহাদের ভাড়া দেওয়া হয়। মণ্ডীর রাজ্যের সকলের অপেক্ষা বেশী পান। এই প্রদেশের ক্ষেত্রফল ৬০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩৫০০০। হিমাচল-দেশে বিলীম বুশহর রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৩৮০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১১২০০০। বুশহরের কিন্নর-অধ্যবিত্ত ভূ-ভাগের ক্ষেত্রফল ২০৬০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৩৫০০০। কিন্নর-দেশকে ‘কুমোর’ এবং কিন্নরদের ‘কুমোরা’ বলা হয়। বহা কিন্নর লোকটি ব্যবহার করিব। কিন্নরের পূর্ব-পশ্চিমে নত, পশ্চিমে কুমু (পঞ্জাব), উত্তরে—লাহোর, দক্ষিণে রামপুর রাজ্য। কিন্নর-দেশ ভারতের সীমান্তপ্রদেশ।

ইহার সীমা তিব্বতের মধ্যমা গ্রাণে মিলিয়াছে। সংলগ্ন গ্রাম শিবকী তিব্বতের সীমার অবস্থিত। এই স্থানে দুই দেশের সীমানা মিলিয়াছে। এই পথেই প্রাচীনকাল হইতে দুই দেশের আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। তাহা ও সংস্কৃতির দিক হইতে তিব্বত ও কিন্নরের মধ্যে খুব সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু



কিন্নর প্রদেশের অশোক আশ্রমের কর্মাব্দসহ

শ্রীধর্মদেব শাস্ত্রী ও শ্রী আর. এস. মিশ্র

তিব্বতীয়গণের অপেক্ষা কিন্নরবাসীদের উন্নততর মনে হয়। এই সীমান্তপ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশ বৃদ্ধি পায়। পান-আহারে, রীতিনীতিতে ও বেশভূষায় তিব্বতবাসীদের সহিত এদের অনেকটা মিল, সব চাইতে বড় ব্যবধান, তিব্বতে বর্ণ-ভেদ মাই, কিন্তু কিন্নরদের মধ্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। তেমনি তিব্বতীয়দের অপেক্ষা কিন্নরদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বিকশিত। তাহা প্রাচীন আধ্যাত্মের দাম। বৌদ্ধ-ধর্ম উহারই এক শাখা। আর উত্তর ধর্মের সমসিদ্ধান্ত অহিংসার ও ভগবতার বিস্তার জনসাধারণের বৌদ্ধধর্মের প্রসাদেই হইয়াছে।

দেব-জাতি কিন্নর

সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য বাদ দিলে, কিন্নর ও তিব্বতীয়দের আকার-প্রকারের ভেদ স্পষ্ট। কিন্নরেরা দীর্ঘাকৃতি, তিব্বতীয়েরা অপেক্ষাকৃত বর্ষকায়। আকৃতিতে কিন্নরেরা প্রাচীন আধ্যাত্মের মত। কালিদাস কিন্নরদের অশ্রুণু বলিয়া-ছেন। তাহা ঠিকই মনে হয়? যে অর্থে বামর অর্দ্ধ-মর, কিন্নর সে অর্থে অর্দ্ধদেব। ইহারাই মাহু ও দেবতার মধ্যবর্তী। এত প্রাচীনত্ব, এরূপ অতিমানব দেহ-সৌন্দর্য, এমন অপূর্ব

কণ্ঠস্বর আর কোথাও শুনি নাই। কিছু দারিদ্র্য অপরিণীত। অথচ চুরি এখানে নাই-ই। রাস্তার বাম গম্বু কেহ কেলিয়া পেলে, অপর কেহ তাহা হোঁরও না। ব্যক্তিগত নাই বলিলেই হয়। বহু-পতি-প্রথা থাকিলেও কোন জীলোক মতপান বা অত মেশা করে না। এখানকার লোক কোন কোন বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকাল হইতে এই জাতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। পুরাণে, মহাভারতে, এমন কি উপনিষদে পর্যন্ত কিম্বদন্তির উল্লেখ আছে; প্রাচীন সাহিত্যকারেরা কিম্বদন্তির গুরু, বক আদি



কিম্বদন্তির সেবাসলের দুই জন সভ্যসহ ঐশ্বর্যদেব শাক্তী

দেবজাতিতে ভুক্ত করিয়াছেন, নৃত্য, ভক্তি ও সঙ্গীতকলার লিখিত তাহাদের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন। চিরদিন ইহার শাক্তিপ্রিয় ও কলা-প্রেমিক। তাহাদের প্রাচীন রীতি-নীতি আজও মুরকিত কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দৈত্য পরিব্যাপ্ত। জীবনধারণোপযোগী আহারও তাহাদের মিলে না। অনেককে আমরা জনলে বাগ-পাতা খাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

কালনীতে বাতায়ত করে এমন বহু কিম্বদন্তির বহু পত ভিন্ন বংসর আয়াকে চীনীতে বাইতে অহুরোধ করিতেছিলেন। বিফার কর্মচারী ঠিকর বাপার পরামর্শে হগনলালতাই পরীক্ষের সঙ্গে এবার কিম্বদ-দেশে বাজা করি। শ্রীতকালে কিম্বদেরা ভেড়া-হাগল লইয়া নীচে চলিয়া আসে। যে সব স্থানে তাহারা আসে তদ্ব্যে কালসী প্রবাস। কিম্বদ-কালসী এই সব পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কালসী এক সময়ে প্রবাস বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল। আর সংস্কৃতির দিক হইতে, ইহারই নদীর ধারে মহারাষ্ট্র অশোকের চৌক শিলা-লেখ বিস্তারিত। তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন।

পত দুই বংসর এক আদিবাসী হরিজন কিম্বদ-বন্দিত শ্রীতকালে আশ্রমে আসিয়া থাকিতেছে। তাহাদের দিকট হইতে আশ্রমবাসীরা নিয়মিত কর্ণের বৃক প্রেরণা পাইয়াছে। কিম্বদেরা নিয়ত এখানে বাতায়ত করে। তাহাদের দেখিয়া

পর্জন্তবাসী সাহাসিকা মেঘ-হাগ পালক কিম্বদবের দৃষ্টি সদা মনে আগ্রহিত হয়। ভ্রমণকালে তাহাদের সম্বন্ধে বাহা জানিয়াছি এখানে দিতেছি।

এই হতভাগ্য প্রদেশের দিকে যদি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহা হইবে প্রম সার্থক মনে করিব। এক সময়ে যে জাতি উন্নত ছিল আজ তাহারা অহুরত—অবহা তাহাদের শোচনীয়। অত সব আদিবাসীর মত আদিবাসী বলিয়া গণ্য হওয়ার ও আদিবাসীদের বিকাশের নিমিত্ত যে সব সুযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা পাওয়ার পূর্ণ দাবি তাহাদেরও আছে। বার্ষিক ভারতের সরকার ও জনসাধারণের দিকট হইতে এ দিকে অনেকটা আশা করা বাইতে পারে।

বেশভূষা

পশম উৎপাদন ইহাদের জীবিকা। পরিবেশও ইহাদের পশমে ভৈরী। ছোট বড় সকলের হাতেই কাঠের তকলি; অবসর পাইলেই তাহাতে তাহারা পশমের হুতা কাটে; পারে কোশের পর কোশ চলিতেছে, আর হাতে তকলি ঘুরাইতেছে। মেঘ-পালন প্রবাস ব্যবসায়। ময়নারী উভয়েই কেণ্ট ক্যাপের মত এক প্রকার টুপি পরে। টুপিতে একটি পট সংলগ্ন—শ্রীতকালে তাহা দিয়া কান ঢাকে। কিম্বদীরা বেগী বাবে। বেগী টুপির নীচ হইতে ঝুলিয়া থাকে। পর্ক যে কি তাহা তাহারা জানে না। জীলোকেরা কবলের মত মোটা পশমী শাক্তী পরে। অভাবে পড়িলে তাহা দুইরা কবল রূপে বিক্রয় করিয়া দেয়। মেঘদের পরিবেশ বলিতে বুঝায়, ঘোড় (শাক্তী), টেপা (টুপি) ও চোলী (হাতাবিহীন স্লাউচ বিশেষ)। ঐশ্বর্যকালে অবিকাংশ হলে শাক্তী দিয়াই চোলীর কাছ সাহিয়া লয়। পুরুষেরা পশমী পারজামা ও আচকান পরিধান করে—নীচে কোন কোর্ডা থাকে না। তাহারা পশমে ভৈরি হুতা ব্যবহার করে—নাম স্পন্দ। আচকান (হুতা) এখানকার প্রাচীন বেশ। বরকের উপর দিয়া চলার জন্য যে হুতা তাহারা ব্যবহার করে তাহা হাগলের লোমে ভৈরি হয়। জীলোকেরা কানে রৌপ্যভূষণ ধারণ করে—দেখিতে কাঁটার মত। বনীদের অলঙ্কার সোমার ভৈরী, গরীবদের দিকট বাতুতে।

ভাষা ও সাহিত্য

কিম্বদন্তির ভাষা বহুভাষ্য—নাম হৃদয়ত। লিপি ভিন্ন নহে। সাহিত্য বলিতে কিছু নাই। লোকগীতি খুবই সুন্দর। মগরী লিপির প্রচলন হইতেছে। কয়েকটি শব্দ :

কিম্বদ	হিন্দী	কিম্বদ	হিন্দী
ভা	পানী	মংগ	বাল
কিম্ব	মকার	দাউচ	বহন
বোলংগ	পেত	ভেতে	দালা
লঠরী	মোটা	জমা, ওয়	দাতা

কিন্নরদের মধ্যে আশ্রয় নাই। সংস্কারাদি নিষেধাই নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। সংস্কার অহুষ্ঠানে অগ্নির স্থান নাই। দুপ-বুনা আলাইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্মের গুরু লামারাও সংস্কার নিষ্পন্ন করাইয়া থাকে। কিন্নর-গ্রামেও লামা আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠভূমি

কিন্নরদের পুরাতন রাজধানী কামরু। এখন বুশহরের রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন তথায় ঠাকুর রাজত্ব করিতেন। এখানে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কেল্লা আছে। আকীবন কয়েদীদের সেখানে রাখা হইত। চারিদিকে বহু প্রাচীর; দরজা একটিও নাই। দৃষ্টি দিয়া কয়েদীদের ভিতরে নামাইয়া দেওয়া হইত। খাভও ঐ ভাবেই দেওয়া হইত। ভিতরে যে বাইত, জীবনের জন্ম বাইত। ‘চীনী’ কিন্নর-প্রদেশের মহাশ্রাণুপূর্ণ স্থান ও কেল্লা। এখানে বাণাসুরের হুর্গ বর্তমান। চীনী হইতে আঠার মাইল দূরে শতদ্রু-তীরে মোরংগ নামক স্থানে পাণ্ডবদের একটি হুর্গ আছে : লোকে বলে অজাতকাসকালে তাঁহারা এক রাত্রে উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তুমিলাম ৩২ মাইল দূরে লামবংগে এইরূপ আর একটি হুর্গ আছে।

পাণ্ডবদের বাসর-শিত বিবাহ-রাত্রে কিন্নরেরা গাহিয়া থাকে। লোকে বলে এখানকার বহুপতি-প্রথা পাণ্ডব-সংস্কৃতিরই ফল।

‘দেবতার’ গোলামি

উত্তরাঞ্চলকে লোকে দেবভূমি বলে। ‘কিন্নর’ও এই কথার ইঙ্গিত মেলে—অসংখ্য দেবদেবীর পূজা ভার সাক্য। প্রত্যেক গ্রামের দেবতা ভিন্ন। আর তাদের নামে সম্পত্তি ও কারাগার রহিয়াছে। পাছে দেবতা বিরূপ হন এই আশঙ্কার লোকে সন্ধ্যা ভটহ। দেবতার আবিপত্য সর্বক্ষেত্রে। দেবতাদের দাসত্বে কিন্নররা আত্মপূর্তে আবদ্ধ। কোমও স্কুলের কথাপ্রসঙ্গে জনৈক শিক্ষক আমাকে কোমও দেবতাদের সত্বে প্রশ্ন করেন। তত্বতরে আমি বলি—“পরমায়্যাই এক যাক্স দেবতা, আর সবই অর্ধোপার্জনের বাহানা।” এক কথার লোকটি বলিয়া বলিল—‘দেবতার বিরুদ্ধে এখানে বলা চলবে না। সে অধিকার কারও নাই।’ এক গ্রামে দেখিলাম, দেবতা পালকে উপবিষ্ট হইয়া এদিক-ওদিক হেলিতে হুলিতেছেন। আর দেবতার এদিক-ওদিক হেলা দোলাকে তক্তেরা নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। কোণ্ডির দেবী হইতেছেন বুখা দেবতা। বদরীনাথ, মহেশ্বর, নাগল আদিকেও প্রধান স্থান দেওয়া হয়। জনশ্রুতি, সরহান বাণাসুরের রাজধানী ছিল।

পিতার মৃত্যু হইলে কোম পরিবারের তাই-বোনদের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া ঝগড়া বাধে। কোণ্ডির দেবী নাকি মৃগা-স্থিতি ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া বিবাদের রক্তা-নিষ্পত্তি

করিয়া দেন। এখানকার দেব-দেবী বীরের রূপে পরিকল্পিত। সব দেবতার কাছেই মৃত্যু আর মাস নিবেদন করা হয়। বৌদ্ধমন্দিরের দেবতারারও বাঘ বান না; তাঁহাদের কাছে পর্যন্ত মাস ভোগ চড়ান হয়। দুই দেবতার মধ্যে এইটুকুই



একটি আশ্রম বিভাগের কিন্নর বালক-বালিকারদল

মাত্র পার্ণক্য যে বৌদ্ধ-দেবতা মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে মন্দিরের বাহিরে যান না। এই দেবতার নাম ছোকী-ই-রোল—রক্ষক দেব। চীমীর বৌদ্ধ মন্দিরে মাটির তৈরি সুন্দর সুন্দর বিশাল মূর্তি আছে। ভগবান বুদের রজনী চিত্র দিয়া সুন্দর—শিল্পকলার উত্তম নিদর্শন। ভূত-প্রেতের হাত হইতে রক্ষার জন্মও অনেক মূর্তি ভৈরব হইয়াছে। অনাবৃষ্টি হইলে দেবতাদের সন্তোষ বিধানের জন্ম লোকে উদ্ভূত অন্ন (বাঘ বা গর) পর্যন্ত পূজারীদের দিয়া দেয়। সরহানের ভগবতী-মন্দিরে প্রত্যহ দশ-বারটা ছাপ ও ছাপ-শিত বলি দেওয়া হয়। ঐ মন্দির হইতে প্রায় দুই মণ রূপা ও পঞ্চাশ তোলা সোনার ভিনটি ছাতা চুরি গিয়াছে বলিয়া তুমিরাহিলাম। ইহা হইতে মন্দিরের সম্পত্তির পরিচয় মেলে। মন্দিরের খাজানা নাই। মন্দিরের সম্পত্তি হইতে অনায়াসে বহু স্কুল চলিতে পারে। এখানে হরিজনদের ছাত্রা পর্যন্ত পড়িতে পার না। দত্তদণের গ্রামের মন্দিরের কার্যকরী সমিতিতে দুই জন সংস্কারপন্থী যুবক আছে। তাই তথায় একটি স্কুল পরিচালিত হইতেছে। উপরেই বলি-রাহি, মন্দির বাড়িরই প্রভূত সম্পত্তি। এখানকার সার্বজনীন মন্দিরগুলি এখন হিমাচল-প্রদেশ-সরকারের নিয়ন্ত্রণাবধীনে। সরকার ইচ্ছা করিলে এদিকে অবস্ঠাই কাজ করিতে পারেন। সর্বসাধারণের সহযোগিতা নিঃসন্দেহ পাওয়া যাইবে। পশু-বলি বন্ধ হওয়া ও হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার স্বীকার করা আত্মকর্তব্য। দেব-দেবতা বাধণর লোকের উদয়পুষ্টির উপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার সংস্কার হওয়া দরকার। সাধারণের মনের পরিবর্তন-সাধন কঠিন কাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া কিন্নরদের উন্নতি হইবার নহে। সর্বজনীন সংস্কারের ইহা ব্যাপক কেন্দ্র। সংস্কারের জন্ম কিন্নরেরা

উদ্ভাবিত হইয়া রহিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হইবে। ইহারা দেবতা ও গৌরবাদের মাকড়সা-জালে আটক পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন জাতির বিকাশ-কালে আধ্যাত্মিক দিক হইতে সবিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

বহুপতি-প্রথা

পরিবার-প্রথার বিকাশকালে এক সময়ে জী পরিবারভুক্ত সব তাইদের পত্নীরূপে আসিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই বহুপতি-প্রথার সূত্রপাত হয়। পাণ্ডবদের সময়ে হয় তো তাহা সাধারণ প্রথা ছিল। আজও যেখানে এই প্রথা প্রচলিত সেখানে লোকে লোকপাখার আদরপূর্বক পাণ্ডবদের কথা শ্রবণ করিয়া থাকে।

শিমলা হইতে রওনা হইয়া আমরা কুমারসেনে পৌছি। তার পরে কোঠগড় রামপুরে বাই। এই প্রথা তথ্য নাই। কিন্তু সেখানে হইতে নয় মাইল দূরে গৌরা নামক স্থানে রাজ-পুত্বেদের মধ্যে বহুপতি-প্রথা বর্তমান; হরিজনদের মধ্যে নাই। আশ্চর্যের ব্যাপার। কৌমসারবাওর ও রওয়াই-এ অহুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে, তথ্য এই প্রথা সকল জাতির মধ্যেই বর্তমান। এ স্থানের (গৌরার) আশপাশে চাষ-আবাদেদের কমি নাই, আর্থিক স্বাভাব্যতাও লোকের নাই তাই কোলী আদি হরিজনদেরা সম্মিলিত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। বাহাদের মধ্যে বহুপতি-প্রথা প্রচলিত তাহাদের চিন্তাধারা এইরূপ : তাইয়েরা পৃথক পৃথক বিবাহ করিলে পৃথক ভাবে থাকিতে আরম্ভ করিবে, কমি-কমা ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া বাইবে, আর কমিবে। কঠোর হস্তত্যাগ পাহাড়ী জীবন স্রগম করার জন্য বহুপতি-প্রথা প্রয়োজন একথা তাহারা মনে করে। শিকার পূর্ণ বিস্তার হওয়ার পূর্বে এই প্রথার অবসান ঘটাইলে কিয়তের আর্থিক অবস্থা বিপর্যাস হইবে, আমারও ইহাই বিশ্বাস। শিকা পাইলে তাহারা বুঝিবে, এক পরিবারে এক অয়ে থাকিতে হইলে সম্মিলিত বিবাহ যে করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। এখানে এই প্রথার অর্থ ইহা নয় যে, কোন জীর সব পতি সকল সময়েই বাঁড়িতে থাকে। ভেড়া-হাগল চরাইবার জন্য তাহাদের আলাদা আলাদা থাকিতে হয়। সকলে যখন একত্র হয় তখন গৌরা নামক স্থানের প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক তাই ক্রম-অনুসারে দুই দিন করিয়া পায়। দুই তাইয়ের এক পত্নীও থাকে। দুইয়ের অধিক তাইদের পৃথক পত্নীদের সহিত তাইদের সহবাস ভেদন নিষিদ্ধ নহে।

কিয়র-দেশে এই প্রথা রীতিবীকৃত ও পূর্ণরাজ্যের বিদ্যমান। সব তাইয়ের একই পত্নী—আট নয় তাই হইলেও। পত্নীর উপরে সকলের সমান অধিকার। বিবাহও এক সঙ্গেই হয়। কৌমসারবাওর ও রওয়াই-এ পত্নীর উপর ষোড়শের অধিকার বেশী। কল তার ভাল নহে। কিয়রে এইরূপ

নহে; এখানে জীর বর পৃথক এবং যখন কোন পতি ভিতরে যায় তখন বরজার টুপি রাখিয়া যায়। ঐ নিদর্শন দেখিলে অপর কোন তাই-জীর বরে প্রবেশ করে না। ইহাই এখানকার ব্যবস্থা। অত্যা এই ব্যবস্থা নাই। কৌমসারবাওর ইত্যাদি স্থানে যে ভরজার রোগ দেখা যায় তার কারণ এই ব্যবহার অত্যা। কিয়রে এই ব্যাধি নাই।

বিবাহ-পদ্ধতি

বিবাহ বেশী বয়সে হইয়া থাকে। সুরক্ষিত হইলে কতটা আঠার বৎসর পর্যন্ত কুমারী থাকিতে পারে। ব্যাভিচার নগণ্য। বিবাহ মাতাপিতার সম্মতিক্রমে হয়। পরস্পরের সম্মতিক্রমেও কখনও কখনও হয়। পিতামাতার অহুমোদিত বিবাহে অধিক ব্যয় হয়। তাই যে যুবকের অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই সে সোজা যুবতীর সহিত কথা বলিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। মাতাপিতা সব ছেলের একটাই মাত্র বিবাহ দেয়। এই নিয়ম এখন কতকটা শিথিল হইয়াছে।

‘বধূ’-মাজার রীতি

উরগীর (শিমলা হইতে এই স্থান ১২৫ মাইল দূরে) ঠাকুর সিং নামক রাজপুত্র জমিদারের বিবাহ দশ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে হয়। কনে ও বরের বয়স যথাক্রমে কুড়ি ও একুশ ছিল। পিতা সঙ্কট হির করে। বরপক্ষ যখন কতোর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কতাপক্ষ টাকা (ভিলক) বাবদ এক টাকা আদায় করিল। কনেকে লইয়া লাভা (বর) যখন নিজ বাড়ী রওনা হইবে তখন কনে মাকে লুকাইয়া বহিয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্ততীকে কুড়ি টাকা দক্ষিণা দিতে হইল, আর পিতার কাহ হইতে কনেকে হাড়াইতে আরও কুড়ি। শালী এবং ভালক পত্নীকেও দশ দশ টাকা অহুস্রপ দক্ষিণা দিতে হইল। জামাতার কাহ হইতে টাকা আদায়ের এই এক রীতি। অগ্নি, সপ্তপদী ইত্যাদি সংস্কার-অহুষ্ঠান বিবাহে নাই। বরপক্ষে ছিল চার, আর কনেকে লইয়া কেরার সময় সঙ্গে আসিল আশী। চার বেলা তাহাদের আদর-সমাদর করিতে হইল। কিছু আয়োজন ত পূর্বেই ছিল। তার উপর আরও আটটা ভেড়া ও তিমটা হাগ কাটা হইল। বধূমাজা এমনই ব্যয়-সাপেক্ষ।

যে আসিয়া বধূ অত পতিদের ভিলক পরায়। তার মানে সে এখন তাহাদেরও পতিদে বরণ করিল। বিবাহের জন্য কেবল বধু তাই-ই কনের বাড়ী যায়। বিবাহ বস্ত্রত: কনের বাড়ীতে হয় না, হয় বরের বাড়ীতে। এইরূপ বিবাহে নব্য-মায়ের বধেচ্ছ ব্যবহার হয়। ধূপ আলান আর ভিলক হাড়া বিবাহের অত কোন সংস্কার পালন করা হয় না।

পিঠের বোকা

টুংডার নিকটে ঘরাট (জল স্রোত চালিত জাঁতা) আছে। আমাদের আগে আগে এক যুবক-যুবতী চলিয়াছে। যুবতীর পিঠে গমের বোকা, যুবক খালি হাতে। ঘরাটে পৌঁছিয়া যুবতী ভিতরে গেল; যুবক ছঁকা টানিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম :

‘এ কে?’

সে কহিল—‘শ্রী’

—তোমার বয়স?

—বলতে পারি না, কুড়ি হবে।

—তোমরা ক’ ভাই?

—পাঁচ।

—পাঁচ ভাইয়ের ক’ শ্রী?

—এক জনই।

—কাত্তে তোমরা?

—লোহার।

—তোমার শ্রী ঘরাট চালাচ্ছে। পিঠে যে গম বয়ে এনেছে সে ত নিজ চক্ষেই দেখেছি। সাহায্য হুঁই তুমি একটুও কর না? তোমাক টানতে বলে গেছ।

—আমাদের পাহাড় অঞ্চলে মেয়েরাই সব কাজ করে। আমি বোকা বইতে বাব কেন?

দেখিলাম যুবতীট শিলবতী ও পরিগ্রমী। যুবক তার সে ঘেন বলিতেছিল—‘পিঠের বোকা’ যত দিন না আমাদের হাল্কা হবে তত দিন স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের নাই।’

শ্রীলোকের সংখ্যাধিক্য ও ‘কোমো’

এখানে বহুপত্নী-প্রথা নাই। কচিং কোথাও কোন পুরুষ যে একাধিক বিবাহ কোনক্রমেই করে না তাহা নহে। কিন্তু তাহা একান্তই বিরল। কলে শত শত ঘরে অবিবাহিত থাকিয়া যায়—আজীবন কুমারীও থাকে। এইরূপ অবিবাহিত মেয়েরা অধিকাংশ হলে আমাদের কাছে দীকা গ্রহণ করিয়া ‘কোমো’ হয়। বাৎসর্য পূরণের চড়াইয়ের দুইট ‘কোমো’ শ্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের একজন তাল তাল হিন্দী বলিতে পারিত। মস্তক দুই জনেরই মুণ্ডিত। এক জনের পরিধানে লাল বস্ত্র। উত্তরের গলাভেই মালা। টুপির পরিবর্তে মাথার ক্রমাল জড়ানো। স্বাভাবিক বহুপত্নী-প্রথার দরুন বাধ্য হইয়া এদের ‘কোমো’ হইতে হয়; আর হুর্দল এবং কম সুলভী হইলেও। তাহাদের কতক ত বভাবতঃই বর্ণাভিযুক্ত হইয়া থাকে—তাহারা বেচ্চার ‘কোমো’ হয়। ‘কোমো’ হওয়ার পরে পিতৃগৃহেই তাহারা থাকে। আমাদের কাছে ভিক্তী ভাষা শিখিয়া, ঐ ভাষার একখানি বই রাখে ও তার পূজা করে।

বিনা পরসার মজুর

‘কোমো’ হইয়া দীকা গ্রহণের পরেও কুমারীরা স্বাভাবিক পিতার কাছেই থাকে—বাড়ীর কাজ করে। স্বাভাবিক ইহাতে খুবই হুঁশ, কারণ ‘কোমো’ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিনা পরসার থাকে।

বহুপত্নী-প্রথা

তাই যখন পুণ্ডক হয়, গৃহে ‘কোমো’ না থাকিলে, চাষ-বাসের কত সে আর একটি বিবাহ করে। কিন্তু ইহা নিয়মের।



একটি কোমো শ্রীলোক

ব্যতিক্রমের মতই। বহুপত্নী-প্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। চীনা যাত্রার পথে সড়কের উপরে মেঘ-রক্ষকদের তাঁবু সারি সারি। তাঁবুর এক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘তোমার বিয়ে হয়েছে?’

‘না, এখনও হয় নি।’ তাহার কণ্ঠস্বরে ও চেহারার বেদনা কুটরা উঠিল। পাশে তার ভাই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—‘আমাদের পাহাড়ী মেয়েদের বিয়ে চব্বিশের আগে হয় না।’ তরুণীর বয়স কুড়ির কাছাকাছি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বহুপত্নী-প্রথা যেমন কিন্নর-দেশে প্রচলিত, তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদও। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার পতি-পত্নী উভয়েরই আছে। বিচ্ছেদের পূর্বে তাহারা নিজ নিজ ব্যবস্থা করিয়া লয়। বিচ্ছেদের অনুমতি লইতে হয় শ্রীর পিতার কাছ হইতে। অতএব ঘরে যখন বাপের বাড়ী যার তখন তালুক হয়। কেহ যদি পতিগৃহ হইতে কোন শ্রীলোককে কুসুলাইয়া লইয়া যায় ত তাহাকে পূর্বপতির প্রার্থিত টাকা দিতে হয়—দুই শতও হইতে পারে। তালুক স্বাভাবিকতার অনুমতিতে হইলে লাগে পাঁচ হইতে কুড়ি টাকা মাত্র।

শ্রী বিক্রয়ের বস্তু

ভারতীয় সংবিধানের ২৩ : ১ অনুচ্ছেদে আছে : ‘মানব-পণ্য (শ্রী ও বালকের ক্রয়-বিক্রয়), বেগার খাটান, অথবা

ভবিষ্যৎ জোর-জবরদস্তি প্রভৃতি আদার নিষিদ্ধ করা যাইতেছে। এই বিধির উল্লঙ্ঘন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত ও আইনভুক্ত হওয়ার হইবে।’

মনে হয় সংবিধানের এই অঙ্গচ্ছেদের প্রতি হিমাচল প্রদেশ-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ আকৃষ্ট হয় নাই। আকর্ষণ সেখানে জী-বিক্রয় এবং বেগার পাটানো ইত্যাদি সবই চলিতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের জড় টাকা আদায় জী-বিক্রয়েরই সাহায্য। এ কথা বখশ লিখিতেছি তার মাজেই দিন আসে আশ্রয়ের লক্ষ্যে দিবা রোক্তমান। একটি ঘেরকে পুলিশ বহিরা লইয়া গেল। তাহার বিক্রেতা গুরুরেষ্ঠ ছিল এই : তার একাধিক পতি ধামার অভিযোগ করিয়াছে,—সে না বলিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। ভর্তুকীর পতিকে লিঙ্কাসা করিলাম—‘ব্যাপার কি?’ উত্তর পাইলাম :

‘জী অপর কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাই বাপের বাড়ী চলে গেছে।’

‘তোমরা তাকে রাখতে চাও, এই না?’

‘না।’

‘তবে কি চাও?’

‘যার কাছে এ বেতে চায় তার কাছে থেকে আমাদের টাকা নিয়ে দিক, বাস, এই আমাদের কথা।’

‘কত টাকা?’

‘শাজীকী, আপনি ত জানেনই যে আজকাল সব কিনিষই মাগুসি; ছোট একটা হাঙ্গী তা-ও এক ন’ টাকার কম মেলে না। বিয়েতেও খরচ হয়েছে। টাকার অকের কথা করতে যান ত এই জীর জড় আমাদের দাবি কম পকে ছ’ হাজার।’

‘জী ত গুরু-মোষ নয় যে এরূপ দাম তুলি করছ? বিয়েতে খরচ হয়েছে ত তার জড়ে জী দারী কেন হবে? ভাল, সে ত তোমাদের ঘরে অনেক দিন ছিল। সে তোমাদের কাজ করেছে। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। মূল্যই যদি বার্য করবে ত এ সবের মূল্যও তোমার ঘরতে হবে।’

‘শাজী মহাশয়, আপনি নুতন আইনের কথা বলছেন। আমাদের পাহাড়ে চিরকাল যে আইন চলে এসেছে তাই চলবে। জীদের কাছ থেকে যদি এরূপ আদার না করা হয় ত তারা স্বাধীন হয়ে যাবে। একের অধিক পতির কাছে

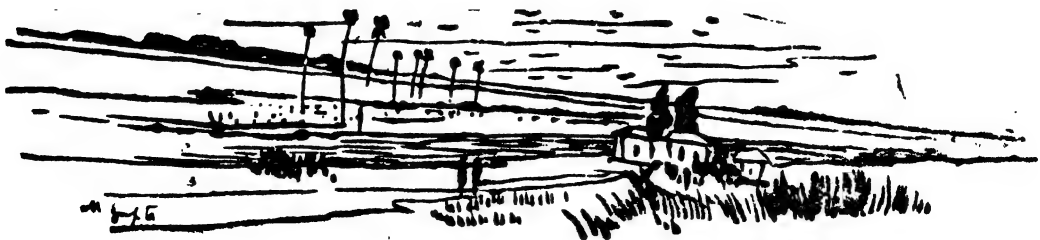
থেকেও জী আজ ভালক চাচ্ছে। আপনি ত সবই জানেন। মূল্যবস্তির জড় এখন ঘেরে ও ঘোষের দাম বড় আচ্ছা।’

এ কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমার কানে ধ্বনি হইতেছে ‘ঘেরে ও ঘোষের দাম বড় আচ্ছা।’ ইহা জী-বিক্রয় নয় ত কি? জীদের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিতেই হইবে; স্বাধীনতা ও সমান্যিকারের ভিত্তিতে রচিত নুতন সংবিধানোক্ত সুবিধাও এদের দিতে হইবে।

হিমাচল প্রদেশ প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রশাসিত স্থান। অতএব এই দিকে কেন্দ্রীয় সরকারেরই দৃষ্টি নিতে হইবে। নুতন বিধান দেশের পুরানো আইন-কানূনের রহবদল করা হইয়াছে। ভ্রষ্ট পুরাতন দেশীয় রীতি-প্রথারও আবৃত্তিক পরিবর্তন করা কর্তব্য। এই সব প্রথা আদালতে আইনের মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। যে সব স্থানীয় প্রথা নুতন সংবিধানের বিরোধী যাহাতে সেগুলি আদালতে গ্রাহ্য না হয়, অন্ততঃপক্ষে এ নির্দেশ ত আদালতগুলিকে দেওয়া চাই-ই।

অভিশপ্ত নারী

অধোপার্জনের উপায় হিসাবে কিয়দ-দেশে নারীর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তার নিজের স্থান মেহান্তই ছীন। পুরুষ লালল ঘরে ও কুড়াল চালায়। বাস, ইহার অধিক কিছু সে করে না। সব কাজ জীলোকদেরই করিতে হয়। কেতে ভাল করার পালা যদি রান্নিতেও পড়ে ত সারা রাত আগিয়া জীদেরই সে কাজ করিতে হয়। এ কাজটাও ঘেরেঘেরই। হাঁকা টানিতেই পুরুষেরা সন্ধ্যা ওত্তান। যে পুরুষ নিজে কেতে কাজ করে, লোকে তাকে কুপার চকে ধেঁধে—তাবটী এই : আছা! পরীব বেচারী কি করে। ঘরে ত তার মেয়েমাছুষ নাই, তাই নিজ হাতেই করতে হয়।’ সকাল পাঁচটা হইতে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করিয়াও জীর মিডার নাই। রান্না নিজ ঘরে একাধিক পতির সন্তোষবিধান তাহাকে করিতে হয়।—যে নারী এত কাজ করে, যাহার আর্থিক গুরুত্ব এত বেশী, সে বহু নিঃব। ভাল-বদ কোম রক্তের বাজী এখানে নাই যে প্রসব-কালে সহায়তা পাইবে। সুতরাং প্রসব-কালে বহু জীলোকের অকালমৃত্যু ঘটে।



কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা সত্যই আশ্চর্যবৃত্ত। শুধু তাই নয়, তুলে যাওয়া আমাদের খেন বতাব। মইলে মাজ বারো বছর পূর্বে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী মারা গেছেন, এর মধ্যেই আমরা তাঁকে তুলতে বসেছি। অথচ তিনি ছিলেন বাংলার একজন খাঁটি কবি।

কবি ভুজঙ্গধরের পিতৃনিবাস চক্ৰিশ-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাট গ্রামে। ১৮৭২ সনের আগষ্ট মাসে পিতার কর্মস্থান মেদিনীপুরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে পুরীতে। পুরীর সমুদ্র সৈকতেই ভুজঙ্গধরের কবিত্ব-শক্তির উদ্বোধন হয়। এগার-বারো বৎসর বয়সে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন।

পুরী থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। তারপর কলকাতার আসেন কলেজে পড়তে। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজ কবিদের কাব্যের প্রতি তাঁর মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। শেলী, বাররন, কীটস ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর বহু কবিতার রচনাকাল ১৮৯০ সন। এই সময়েই ভুজঙ্গধর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর বছর ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাস করেন।

ভুজঙ্গধর আইন পরীক্ষার সাক্ষালাত করে ওকালতী করবার জন্ত ১৮৯৭ সনে জলপাইগুড়িতে যান। সেখানে ছিলেন ১৯০০ সন পর্যন্ত। ভুজঙ্গধরের কবি-মামস কিন্তু সর্বত্রই সক্রিয় ছিল। এই জলপাইগুড়িতে বসেই শব্দভূষণ নিরোপীর সহায়তার “দ্বিপ্রোভা” নামক একখানা মাসিক পত্রিকা তিনি কতিপয়ের সহিত সম্পাদনা করেছিলেন। এর পর তিন মাস মাত্র হাকারিবাগে ছিলেন, ওকালতীতে সেখানে সুবিধা হয় কিনা পরখ করবার জন্তে। এর পরেই তিনি নিজ মহকুমা বসিরহাটে চলে আসেন।

বসিরহাটে ভুজঙ্গধর ওকালতী আরম্ভ করলেন। তিনি যদি শুধু ওকালতী করতেন, বটমধ্যে অল্প দশ জনের মত তথাকথিত বক্তৃতা হতে পারতেন। কিন্তু এতে তাঁর মন উঠল না। কাব্যলক্ষীর সেবাতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে মিলেছে নিরোপিত করলেন। পত্রী-জননী তাঁর সরস মন-প্রাণ জুড়ে ছিলেন। যত্নাকাল পর্যন্ত তিনি বসিরহাটেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। হারারোগ্য অশুখের চিকিৎসার জন্ত শেষ সময়ে মাস দুয়েক তাঁকে কলকাতার থাকতে হয়। ব্যাধির ক্রিকে উপশম হলোই তিনি বহুমে কীরে বাবেন এই ছিল তাঁর কামনা। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর অশুখের আরোগ্য হ’ল না। ১৯৪০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ভুজঙ্গধর বসিরহাটে বাস করে-

ছিলেন। তিনি এখানে থেকেই বরাবর সার্থকভাবে কাব্য-লক্ষীর আরাধনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর বহু কবিতা দেশবহু চিত্তরঞ্জন দার্শ-সম্পাদিত নারায়ণে, এবং মানসী ও মর্ষবাণী, তারতী, হিন্দু পত্রিকা ও অন্যান্য বহু খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ সন থেকে যত্নাকাল কিছু পূর্বে পর্যন্তও তিনি অবিরত কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রচিত কবিতা ও কাব্য-সমূহের কিয়দংশ মাত্র পুস্তকে প্রবিত্ত হয়েছে।



কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

বসিরহাট ক্রমে বাণী-চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভুজঙ্গধর ‘বাণী-সম্মিলনী’ নামে একটি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্মিলনীর সভাপতিরূপে জলধর সেন, শিবিলমাধ রায়, শরণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী ও ঔপন্যাসিক বসিরহাটে গিয়েছেন। ভুজঙ্গধরই ছিলেন তাঁদের প্রধান আকর্ষণ। তিনি ‘পত্রীবাণী’ নামে একখানা মাসিক পত্রও অতি যোগ্যতার সহিত বহু বৎসর ধরে সম্পাদনা করেন। পত্রীবাণীর আধি-ব্যাধি, আশা-আশঙ্কা, সুখ-দুঃখের কথা ‘পত্রীবাণী’ দিকে দিকে প্রচার করত।

ভুজঙ্গধর পণ্ডিত-প্রবর হীরেন্দ্রনাথ সঙ্গ এবং দেশবহু চিত্তরঞ্জনর প্রীতিলাভ করেন বিশেষভাবে। তাঁর আধুনিক বৈক্য কবিতাবলী দেশবহুর বড়ই প্রিয় ছিল। সংকল্প শাস্ত্রএহে ভুজঙ্গধরের পাণ্ডিত্য দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথের বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর ‘সীতা’র (পত্নাহ্ববাদ, প্রকাশকাল ১৩৪০) ছবিটাই শুধু লেখেন নি, এর পূর্বে

১৩২০ সালে প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক ‘ছায়াপথ’ের ছবিটার তিনি ভূজঙ্গধরের কবি-প্রতিভারও প্রশংসা পেরেছিলেন।

এবার আমরা তাঁর কবিতাবলীর আলোচনা করি। ভূজঙ্গধরের কবিতাকে আমরা প্রথমতঃ দু’ভাগে ভাগ করতে পারি—মৌলিক কবিতা এবং অহুবাদ কবিতা। আগেই বলা হয়েছে, যেমন ইংরেজী ভেদনি সংস্কৃত সাহিত্য তিনি পড়ার ভাবে অহুশীলন করেছিলেন। বাংলা আবার মাধ্যমে, অহুবাদের ভিতর দিয়ে এর সারবস্তু সরস করে পরিবেশন করতে তিনি সমর্থ হন।

ভূজঙ্গধর কবিতা রচনা করতে গিয়ে শিশু ও কিশোরদের ভোলে ন। আমরা ফুলে পাঠকালে একবার এবং কলেজে দ্বিতীয়বার ঐর ‘এলিজি’ পড়েছি। ভূজঙ্গধর এর যে রসসিক্ত অহুবাদ “পল্লীসমারি-পাখা”র (১৩২৫) দিয়েছেন তা সত্যি অহুপম। এর দুটি শুবক মাত্র আপনাদের শোনা। ফুলের সন্ধে মিলিয়ে নেবেন।—

“কত নিরবল রতন উজল অগাধ অতল আঁধারময়
রহে জলধির পোপন পরতে লোক-লোচনের চুরে,
ময়ন আঁড়ালে ফুটরা বিরলে মত্তরা কত কুহুমচর,
বিলার সুরতি উদাস পবনে বিকল ময়ুর পুরে।

হেথা চিরতরে হরত বা কোম ফুল এম্মা শিবাকীর
জন্ম বাহার দমিতে কেজ-বাকীর অভ্যাচার,
হেথার মৌনী অধ্যাত-নামা কবি কালিদাস রাখিল শির,
বকন-শোণিত-করণ-মুক্ত প্রতাপাদিত্য আর। (পৃ. ৪)

এই অহুবাদে ‘ক্রমওয়েল’ের বদলে ‘শিবাকী,’ ‘মিষ্টমের’ পরিবর্তে ‘কালিদাস’ ও ‘হাম্পডেনের’ হলে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ লক্ষ্যীয়। সংস্কৃত এছাড়া থেকেও তিনি বিস্তর পদ্যাহু-বাদ করেছিলেন, এর ভিতরে মাত্র ‘সত্যী’ (১৩৩৪), ‘গীতা’ (১৩৪০) ও চণ্ডী (১৩৪১) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ ‘গীতা’র ছবিটার বলেছেন, ভূজঙ্গধর আক্ষরিক অহুবাদের পরিবর্তে তাবাহুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এর ভাল-মন্দ দু’দিকই আছে। কিন্তু ভূজঙ্গধরের অহুবাদ, নিজে কবি বলে, বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। শারদীয়া সমাগত। ভূজঙ্গধর-কৃত চণ্ডীর অহুবাদ থেকে একটি শুবক মাত্র আপনাদের শোনাচ্ছি :

মদল বাহা	ভারি মদল-রূপ
কল্যাণি। শুব	কল্যাণভর রূপ
পরম শান্তি	অধর তুমি শিবা
মিশান্ত রূপা	তুমি আমল দিবা।
অৰ্ধ-সাবিকা	অবন্তের তুমি দাজী
তুমি না কীর	পরম শরণ পাজী।

তুমি না পৌরী ছোড়ির তুমি না ছোড়ি
জিলোক জিঙণ জিদেবের তুমি গতি।

অর অর জিদরনী।

মমি তোমা মারারনি। (পৃ. ১৫১)

ভূজঙ্গধরের মৌলিক কবিতার মধ্যে ‘শিশির’ (১৩১৮) কিশোরদের জন্য রচিত। ‘মঞ্জীর’ (?), ‘পোখুলি’ (১৩১৮) ‘ছায়াপথ’ (১৩২০), ‘রাকা’ (১৩২৩) তাঁর করেকথানি প্রসিদ্ধ কবিতা পুস্তক। শেষ পুস্তকের নামানুসারে তিনি ‘রাকার কবি’ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। ‘মঞ্জীর’-এর কবিতানিচর অধিকাংশই ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ সনের ভেতরে রচিত। ঝাঁকুড়ার অবস্থানকালে ৯/৩/৯৩ তারিখে রচিত ‘রাধাবীলতা’ শীর্ষক কবিতার প্রথম ক’পংক্তি এই :

“কোমল ও তহু দিয়ে জুতা’য়ে
সমস্ত শরীরখানি নিখ-বিটপীর
ভিক্ত প্রাণ সিক্ত কর প্রেমরস ঢালি’

কে তুমি গো প্রেমময়ি ?” (পৃ. ১৩৬)

আবার ‘পোখুলি’ কাব্যে ‘শরৎ’ শীর্ষক কবিতার পাই :

আফুল করিছে মদী অক্ষর পবন বহি’
পুষ্পতার-মত শাখে মধুপ-বন্ধার,
মধুর শিরাসে অলি ফুটাইছে ফুল-কলি,
প্রিয়া-বিরহিত চিতে জনমে বিকার।

যেথ-গুণ্ড মুক্ত করি’ চন্দ্রমুখী বিভাবরী
কোহনা-হুকুল পরি’ করে বলমল,
কণ্ঠেতে ভারার মালা মরি কি রূপসী বালা
বিকচ যৌবন-রসে করে টল টল। (পৃ. ৭৮)

‘রাকা’র কবি-চিত্ত যেন সকল দিকেই পরিণতি লাভ করেছে। অধ্যাত্ম-চিন্তা তাঁর মনকে সাধারণের অনবিসন্ন্যস্ত করে নিয়ে যায়। আবার বৈক্য সাহিত্যও তাঁকে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করে তোলে। তাঁর আত্ম-জিজ্ঞাসা বেড়ে চলে। এখানে এসব কথা বিশদ ভাবে আলোচ্য নয়—মাত্র ‘রাকা’র প্রথম কবিতাটি (পৃ. ৩) আপনাদের স্মরণে বতাব-কবি ভূজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ সাক্ষ্য করি :

“না কুরাতে সঙ্গীতের দ্বিতীয় চরণ

কেম গেল ঘানি ?

না আসিতে অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন-তপন

কোথা গেল ঘানি ?

কেম ফুল পড়ে ঘসি না হইতে বাসি,

কার অভিলাষে ?

বসন্তের হাবখানে কেম বর্ষা আসি

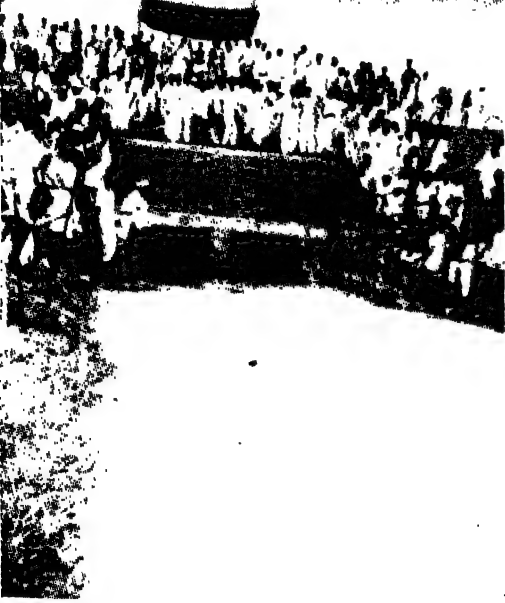
সহসা বিলাপে ?”

* অল্-ইতিহাস রেডিও-কলিকাতা কেন্দ্রে কবিতা ও বেতার-কর্তৃপক্ষের অহুবোধনক্রমে প্রকাশিত।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার উন্নয়ন

শ্রীকেশবদাস চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে বাঁকুড়া জেলার স্থান। এই জেলা এক দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অল্পম, অন্য দিকে ইহার অধিবাসিগণ যুগব্যাপী অনাবৃষ্টি, প্রাচীন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্ভিক্ষ ও নিদারুণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। জেলার আদি অধিবাসীদিগের এক অংশ দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মানভূম ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খাদে কাজের চেষ্টায় চলিয়া যায়, অন্য দিকে দামোদরের বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়ায় আরও বহুলোক সর্বস্ব বেচিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।



ভক্তের দাঁড়ার সেনালীর মুখ

এইভাবে লোকস্বয় হওয়ার ফলে এই জেলার অনেক জমি পতিত হয় এবং দেশের সাধারণ শ্রম-সম্পদ ক্রমেই কমিতে থাকে। বর্তমানে জেলার আয়তন অল্পপাতে কৃষিক্ষেত্র শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র এবং উহার কয়ল ও রেশমী কাপড়, তাম'-লোহা-পিতলের বাসন ও স্বর্ণপাতি ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ কুটীরশিল্প ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

বিষ্ণুপুর-রাজের অধীনে এই অঞ্চল শোণ্যবীর্ষ্যে দুর্ভিক্ষ বলিয়া ইতিহাস-প্রখ্যাত ছিল। মোগল-পাঠান, বর্গী-মরাঠা, কেহই ইহাকে বশে আনিতে পারে নাই, এবং সেই গৌরব-

ময় অতীতের স্মারক গাথা-কাহিনী ও স্মৃতিচিহ্ন আজও এই দেশের রাজধানীর আশেপাশে রহিয়াছে। কিন্তু ১৯০৫



শ্রীভূপতি মহেশদার কর্তৃক ভক্তের দাঁড়ার জলমুখ উন্মোচন

সালে বি. এন. রেলওয়ের লৌহবস্ত্র দেশের জলনিকাশের পথ নষ্ট করে এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া মহামারীর ন্যায় দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যে বাঁকুড়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও হাজারিবাগ ছোটনাগপুরের ন্যায় স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাগদি, রজপুত, মাল, লোহার ইত্যাদি জাতি অতি মূল ও শক্তি-শালী ছিল, আজ সেখানকার লোক রোগক্লিষ্ট, উন্মত্তবিহীন, জীর্ণশীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সর্বোপায় দেখিতে হয় বাঁকুড়াবাসীর এই নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ কি?

বাঁকুড়ার শ্রীসম্পদ ছিল কৃষি, কুটীরশিল্প, অরণ্য ও পশুচারণ ভূমিতে। বাঁকুড়ার ভূপৃষ্ঠ বাংলার অন্যান্য জেলার মত সমতল নহে, রাঢ়ের অন্য অঞ্চল অপেক্ষাও ইহা অধিক গিরি-উপত্যকা ও পার্বত্য নদ-নদীপূর্ণ। জমি সমতল না হওয়ায় বর্ষাকালের জল কৃষিক্ষেত্রে অল্পই দাঁড়ায়,



শুভকর দাঁড়ার বাধ

ভাঙ্গা বা ঢালু জমিতে একেবারেই থাকে না। সেইজন্য এই অঞ্চলের চাষী জল ধরিয়া রাখিবার জন্য উঁচুনীচু জমি ধাপে ধাপে বাঁধিয়া রাখে (terrace cultivation) এবং বিষম কায়িক পরিশ্রমে জলের আগম-নির্গমের পথ সুসংবদ্ধ করে। এ অঞ্চলের নদ-নদী স্রোতস্বতীতেও জল বেশী দাঁড়ায় না, কখনও বা নদীতে প্রচণ্ড বন্যা, কখনও বা তাহার জলরেখা শীর্ণ ও ক্ষীণ।

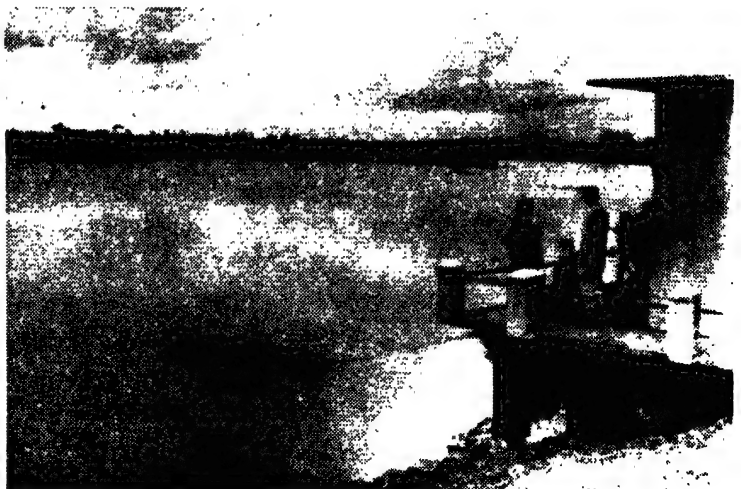
পূর্বেকার দিনে বাঁকুড়ার গিরিমালা ও অধিত্যকা বনরাজ্যপূর্ণ ছিল। বর্ষার জল বনের বৃক্ষগুলোর পাতায় ডালে ও শিকড়ে বদ্ধ হওয়ায় ধীরে ধীরে মুক্ত হইত, ফলে নীচের জমি ঐ জল অনেক দিন পাইত ও সরস থাকিত। সে সকল বন মাল্লুষের অদূরদর্শিতার ফলে আজ নিখুঁত হইয়াছে, শালের বন রেলের স্রিপার, কয়লার খাদের খুঁটি ও জালানি কাঠে পরিণত হইয়াছে। যে কাটিয়াছে সে ভবিষ্যতের দিকে তাকায় নাই, সুতরাং চাষা রাখিয়া বন বাঁচাইবার চেষ্টা হয় নাই। এখন বর্ষার প্রবল বারিপাতের জল দ্রুত গড়াইয়া নদী-নালায় জোরে পড়ে এবং সেখানে প্রচণ্ড গতিতে বান ডাকাইয়া সমুদ্রের দিকে ধাইয়া যায়—চাষার প্রয়োজনের সময় নদীতে থাকে বিশাল বালুতটের মধ্যে অতি ক্ষীণ জল-রেখা। শুধু তাই নয়, ঐরূপ প্রচণ্ড বেগে জল নামিবার ফলে উঁচু

জমির বৃক্ষ চিরিয়া ফাটল দেখা দেয়, প্রশস্ত ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের চিহ্নে—“খোয়াইয়ে” ভরিয়া যায়, পথ-বাট লোপ পায়—ঐরূপ ভাঙন ফাটলের ফলে ক্রমে শস্তের ক্ষেত্রও যায় খোয়াইয়ের কুক্ষিতে। এই ভূমিক্ষয় (erosion) ও জলাভাব বাঁকুড়ার চাষীর মারণাস্ত্র।

অতীতেও ছিল এই জলসমস্যা, কেননা বন-জঙ্গল জলধারার গতিবেগ হ্রাস করে, জল ধরিয়া রাখিতে পারে না। অথচ জল পাইলে চাষী একই জমিতে দুই ফসল, এমন কি তিন ফসল ফলাইতে পারে। সেই কারণে আগেকার দিনের রাজা ও বিত্তশালী লোকেরা দরিদ্র প্রজার সহায়তার জন্ত ঐ জলের পথে বিরাট জাঙ্গাল বাঁধিয়া বিস্তৃত জলাধার “বাধ” রচনা করিয়াছিলেন।

উপরন্তু ঐ সকল জলাধার এবং বর্ষার জলে ক্ষীত নদ-নদীবক্ষ হইতে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য সুন্দর ও স্থপরিকল্পিত সেচখাল—যাহা এ অঞ্চলে “দাঁড়া” নামে পরিচিত—কাটা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ান গণিতশাস্ত্রবিদ্যারদ, কায়স্থকুলতিলক শুভকর রায়ের “শুভকর দাঁড়া” বিখ্যাত।

ঐরূপ ব্যবস্থার ফলে চাষী সম্বৎসর জল পাইত এবং পরিশ্রমের পরিবর্তে তাহার গোলা ধান, সরিষা, গম, কলাইমটরে পরিপূর্ণ থাকিত। চাষীর অর্থের অনটন ছিলনা, সুতরাং কামার, কুমার, কাঁসারী, ছুতারের ক্রেতার অভাব



শুভকর দাঁড়া—জলাধার

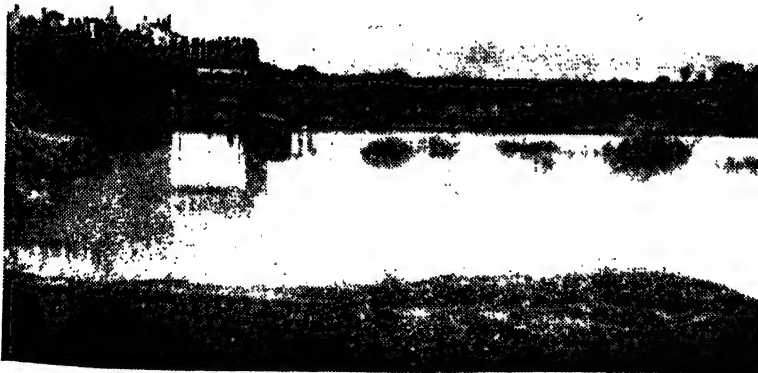
ঘটিত না; বনে প্রান্তরে পশুচারণের
বিশীর্ণ ক্ষেত্র ছিল, স্ততরাং দুধ ঘি
ছাড়াও ভেড়ার পশম প্রচুর পাওয়া
যাইত; বনে তসরেঃ গুটি ছিল
অপর্যাপ্ত, উপলব্ধ নিপুণ কুটীরশিল্পী
ঘরে তুঁত পাতায় গরদ-বেশমের গুটি-
পোকা পালন করিত। কার্পাস জন্মিত
বড় নদ-নদীর পাড়ের জমিতে। স্ততরাং
দেশে অল্প-বস্ত্র এমন কি নীতবস্ত্র ও
উৎসবের বস্ত্রও ছিল প্রচুর। মাত্র
বিশ বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়ার বহল,
বিষ্ণুপুর সোনামুখীর গরদ-তসর ছিল
প্রসিদ্ধ, সস্তা ও টেকসই।



পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, যখন ভাবী
ছদ্মের ছায়ামাত্র দেখা দিয়াছে,
আমরা দেখিয়াছি বাঁকুড়ার চাষীকে
উন্নতদেহ, সবল সুপুষ্ট ও শ্রমপটু,

গৃহস্থকে দেখিয়াছি অভাবমুক্ত ও প্রসন্ন, যদিও তখনই
অতীতের উত্তরাধিকার আমরা হেলায় ও নিশ্চিন্ত ভাবে
ক্রম খোয়াইতে চলিয়াছি।

এই সেদিন এক বিদেশী-শিক্ষার ছাপযুক্ত, বিচার-বুদ্ধি-
হীন বাচাল উচ্চকণ্ঠ বলিতেছিলেন, “চতুর্দিকে, বাজারে
বার-লাইব্রেরীতে, লোকে বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা বিদেশী
সরকার ছিল শতগুণে ভাল।” যদি তাঁহার ক্ষীণ মস্তিষ্কের
ক্ষমতা থাকিত বিগত দেড় শতাব্দীর স্মৃতি ধারণ করার,
যদি তাঁহার চপল বুদ্ধির শক্তি থাকিত বিদেশীর শেখানো
বুলি উচ্চারণ করার বাহিরে, তবে তিনি বুঝিতেন ঐ কথা
বলা কত বড় মূর্থতার পরিচায়ক।



বিভাইয়ের জলাধারের এক অংশ

বিভাই ঝালের সেচনালীর মুখ

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ ইংরেজ কোম্পানীর সহজ অর্থাগম
ও ইংরেজ বণিকের ধনলুপ্তনের পথ স্বগম করিবার জন্য
নির্মিত হয়, ঐ রেলের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের পথঘাট অবহেলায়
নষ্ট করা হয়, কেননা যদি পথ-ঘাট ঠিক থাকে তবে দ্রবিত্ব
দেশের শ্রমপটু লোক পয়সা খরচ করিয়া রেল চড়িবেই বা
কেন, মালই বা রেলপথে পাঠাইবে কেন? যাহারা প্রসিদ্ধ
“অহল্যাবাঈয়ের সড়ক” ও বীরভূমের শিউড়ি-হেতমপুর-
ইলমবাজারের পথ অল্পদিন পূর্বেও দেখিয়াছেন তাঁহার
একধার মর্ম্ম বুঝিবেন। তারপর ই. আই. রেলপথ বাঁচাই-
বার জন্য দামোদরের বদ্ধমানের পাড়ে উঁচু বাঁধ দেওয়া
হইল। ইহাতে জল চলাচলের
পথ নষ্ট হওয়ায় বদ্ধমান ম্যালেরিয়ায়
বিস্ফোজ হইল। সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ
বিধা জমি জলবদ্ধ হইয়া রোগের
আকর হইল, শস্তের ফলনও গেল
রসাতলে। অন্য পক্ষে বাঁকুড়ার
দিকে বাঁধ দেওয়া হইল না, কেননা
সেদিকে রেলপথ বা অন্য বিদেশী
স্বার্থের নিদর্শন ছিল না। দামোদর
এক পারে বাধা পাইয়া অন্য দিকে
রুদ্ধদীর্ঘা আরম্ভ করিল। বাঁকুড়ার
বিস্তৃত অঞ্চল বৎসরের পর বৎসর
বন্যায় ভাসিল। শুধু তাই নহে,
বাঁকুড়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেচনাল
বন্যার বালি ও পলিমাটিতে মজিতে
লাগিল।

দেশের বিশাল দীঘি-বাঁধের সংস্কার পূর্ব্বেকার দিনে রাজ-কোষ হইতে চলিত। বিদেশী-রাজের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা আরও কঠোর হইল, কিন্তু রাজস্ব-ব্যয়ের খাতে চাষী বা গৃহস্থ-সাধারণের প্রয়োজনের কথা উপেক্ষিতই ছিল। সুতরাং সংস্কার অভাবে সেগুলিও মজিল। দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে আমা-দেরও উত্তম ও বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, সুতরাং আমরাও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিলাম না, কেবলমাত্র বিদেশীকে এবং নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আজও সেই দাসত্বের বীজাণু আমাদের শিরায় শিরায় রহিয়াছে, তাই গালি ও নিন্দায় আমরা পঞ্চমুখ।

সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বাকুড়ার এই জলসেচ ও পথ ঘাটের সমস্তা অতি জটিল, কেননা এই অঞ্চলে সমতল ভূমি অল্প, গিরি-অধিত্যকা উপত্যকায় চতুর্দিকে বিস্তৃত। সুতরাং ঐ সমস্তার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা বিশেষ প্রয়ো-জন, সেই সঙ্গে চাই প্রাদেশিক সরকারের সজাগ ও ক্ষিপ্ৰ কার্যকারিতা এবং দেশের লোকের সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা। কোন একটি বিরাট সেচ-পরিকল্পনা সমস্ত জলসেচ-সমস্তার সমাধান সম্ভব নহে, কেননা জল নীচের



ভালুকা-কোড়ের জলাধার

দিকে যায়, উপরের জমিতে জলপ্রবাহ সাধারণভাবে লওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সমস্ত জেলা অনেকগুলি ছোট-বড় অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির জন্য পৃথক জলাধার গঠন ও ছোট-বড় জলনালী কর্তন ভিন্ন উপায় নাই। পথ-ঘাটের ব্যাপারে প্রাচীন, সহজে নিশ্চিত গ্রাম্য পথগুলির কিছু অংশ সংস্কার এবং সম্পূর্ণ নতুন সুগঠিত রাজপথ (Arterial Roads) গঠন নিতান্তই প্রয়োজন।

বহুদিন হইতে জেলার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন। “প্রবাসী” সেই আন্দোলনের মুখ-পত্র ছিল ও আছে। কিন্তু ইতিপূর্বে বিদেশী ও বিদেশীর অনগ্রহপ্রাপ্ত লীগ সরকারের অবহেলায় এবং আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় কিছুই হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকার কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইহার ভার সেচমন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদারের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশে সেচ ও পথ-ঘাটের কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি এই দুই বৎসরের কাজের ফলাফল দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। প্রায় আড়াই শত মাইল ঘুরিয়া যাহা দেখিলাম তাহার সংক্ষিপ্ত-বিবরণ দিতেছি।



ভালুকা-কোড়ের বাঁধ

প্রথমেই বলি সেচের কথা। পূর্বে বলিয়াছি বাকুড়ায় ভূপৃষ্ঠ বেক্স অসমতল তাহাতে এই জেলায় ময়ুরাকী পরিকল্পনা-জাতীয় একটি বিরাট সেচ-পরি-কল্পনায় কৃষিসমৃদ্ধা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইজন্য অসংখ্য ছোট-বড় বাঁধ ও সেচ-খালের প্রয়োজন। বর্তমানে দুইটি মাঝারি ও কয়েকটি ছোট পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে বা শেষ হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি, "শুভকর দাঁড়া"র দশ-আনি ছয়-আনি অংশ ও বিড়াই-খালের এক অংশ।



শুভকর দাঁড়ার দামোদরমুখী অংশ "দামোদর উপত্যকা" পরি-কল্পনার অংশ, স্ততরাং তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অহ-গ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। যে অংশের নাম "দশ আনি ছয় আনি" তাহারই উদ্ধার, তাহার জন্য বিশাল জলাধার গঠন ও নালী-প্রণালী সংযোগের কার্যই এ বৎসর শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দুই বৎসর পূর্বে এই প্রাচীন কীর্তির নিরর্থক ধ্বংসাবশেষ মাত্র ছিল। এখন চতুর্দিকের জলপথের মুখ বাঁধিয়া ও ফিরাইয়া, একটি বড় বাঁধ দিয়া, জলাধার গঠিত হইয়াছে এবং সেই জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেচ-খালের পথে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। এ

ভালুকা-জোড় সেচপথ

বৎসরই প্রায় ১৮০০০ বিঘা জমিতে উহার সাহায্যে চাষ হইয়াছে।

আমরা যখন ঐ অঞ্চল দেখি তখনও বৃষ্টির অভাবে চতুর্দিকের ক্ষেত খা খা করিতেছে, মাত্র চার-ছয় আনা জমিতে চারা রোপণ হইয়াছে বা হইতেছে। শুভকরের দাঁড়ার দুই পাশের জমিতে কিন্তু পূর্ণ আবাদ হইয়া বহুদূর-ব্যাপী হরিৎ ক্ষেতের শোভা দেখা যায়। আমরা উহার যেখানেই গেলাম চাষী দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল। বিড়াইয়ের জলাধার আরও বিস্তৃত ও গভীর হইবে।



ভালুকা-বালুকা হাওড়া

এ বৎসরই ১৫০০০ বিঘায় জল পাইয়াছে ও আবাদ হইয়াছে। বিড়াইয়ের পথে ওন্দা থানার নিকট দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জলাভাবে আবাদ হয় নাই দেখি-লাম। বিড়াইয়ের জলাধারের নীচে আবার দেখিলাম ধানক্ষেতের শ্রামল শোভা। বিড়াইয়ের বিস্তার-রের ব্যবস্থাও দ্রুত চলিতেছে নজরে পড়িল।

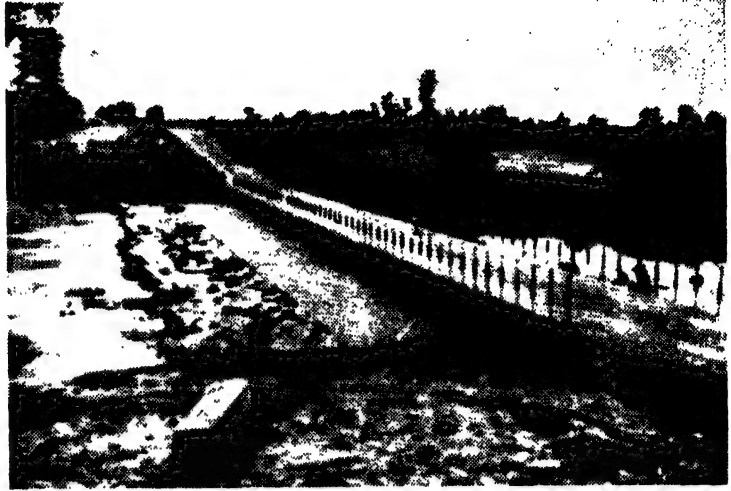
ঐ দুইটি ছাড়াও দেখিলাম ছোট বড় অনেকগুলি বাঁধ, বাহা ছোট ছোট জোড় বা নালার বাঁধ দিয়া জলাধার প্রস্তুত করিয়া জল-নিধামক বস্ত্র বসাইয়া সেচকার্যে লাগানো হইয়াছে। ঐরূপে ভালুকা জোড়ের মুখে বাঁধ গঠন করা হই-

রাছে বাহাতে এ বৎসরই প্রায় ৩০০ বিঘার পূর্ণ জলদান সম্ভব হইয়াছে।

ইহা ভিন্নও বহু ছোট বাধ ও নালা দেখিলাম, তাহার কিছু কৃষি-বিভাগ হইতে নির্মিত বা পুনর্গঠিত হইয়াছে। এগুলিতেও বহু গ্রামের ক্ষেত জল পাইয়াছে ও পাইতেছে।

এই সকল অঞ্চল পরিদর্শন করিতে কয়েক ক্ষেত্রে পথের অভাব বুঝিলাম। সেখানে জিপগাড়ীকে নদী-নালায় পাড় বাহিয়া ডাঙ্গা ময়দানের উঁচু নীচু জমির উপর দিয়া চলিতে হইল। কিন্তু বড় বড় রাজপথগুলির সংস্কার করা

হইতেছে দেখিলাম এবং কয়েক স্থলে, যেখানে কখনও পথ ছিল না সেখানে দেখিলাম সেতু ও কজওয়ে-যুক্ত প্রশস্ত রাজপথ তৈয়ারী হইয়াছে। তালভাঙ্গরা-বানসা রাজপথ উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। তাহার এক অংশে ১৪ মাইল পথ সরলরেখার মত পাহাড়-উপত্যকার উপর চলিয়া



জয়পাণ্ডা 'কজওয়ে'

গিয়াছে। উহা যেখানে জয়পাণ্ডা জোড়ের উপর গিয়াছে সে স্থানটি বড়ই স্বন্দর।

দেখিলাম অনেককিছু, আর বুঝিলামও অনেককিছু। সে সকল কথা বাগান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

কোজাগরী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

বহু সুদূর বঙ্গালু মতে পূর্ণ চাঁদিনী লেখা,
মৌন প্রকৃতি নীরবে দাঁড়াবে কা'র আগমন লাগি';
জ্যোৎস্না-প্রাবৃত বনুবার বৃক্ষে কা'র পুত পদ-রেখা,
পুষ্পিতা বরা বরিষে তাহারে তাই কি র'য়েছে জাগি'।

অসীম উজ্জ্বলি' করিছে চাঁদিনী ভামল বনানী-শিরে,
ভরল বর্ণ-বারার আকুল বরণী যে অবগাহি'।
শারদ-রাগীর শুভাশিস্ বরে দ্বিধা নিশির-নীরে,
অলব-অমিরা নামিছে বরার দীপ্ত কোহনা বাহি'।

বনপথে কোটে শুভ শেকালি বগ্নিল বাসে ভরা,
মনে পড়ে যার দূর অতীতের বিস্তৃত বস্তু স্মৃতি,
মালতী রজনীগন্ধা-সুবাসে সুরভিত আঁকি বরা,
সারাটি পৃথিবী হাসিরা উঠিছে শান্ত প্রাণের গতি।

কোহনা-উজল আঁকি এ নিশার শারদ-লক্ষ্মী আঁকি,
নামিবে মরতে মানবের লাগি' দীপ্ত-কনক-রথে;
কল্যাণ-দানে তরিতে ভুবন কিছুই হবে না বাকি,
কত না শান্তি, সুখের জাগিবে বরণীর হৃদিপথে।

কোন্ সে অতীতে কোন্ সে ললনা এমনি জাগিরা নিশি,
পেরেছিল তাঁর বহু-বাহিত হৃদয় দরশন;
কে আহ জাগিরা এমনি সাধিরা কত শত দিনি দিনি,
শারদ-লক্ষ্মী কিরেছিল যবে গৃহে গৃহে অগণন।

আবার এসেছে আঁকি সেই নিশা, ওগো বধু ভূমি আজ,
নিজাবিহীন মননে তোমার ছেপে থাক সারা রাত্তি;
মন্দির তব মুক্ত থাকুক রেখে দিও শত কাক,
বরুক শেকালি, সুটুক দোপাট, অলুক কনক-বাতি।

পূর্বপুরুষের নামকীৰ্ত্তন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পিতৃপক্ষে পূর্বপুরুষের নামে জলাঞ্জলিদান আত্মষ্ঠানিকভাবে এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই অত্মষ্ঠানের একটা মূল্য আছে বাহা উপেক্ষণীয় নহে। স্বয়ংস্বরের মধ্যে এক পক্ষকাল কিম্বা অন্ততঃপক্ষে মহালয়ার একদিন পূর্বপুরুষের নামমালা যথাযথ স্মরণ করিয়া পারিবারিক ইতিহাসের মূল উপাদান অংশতঃ পরিরক্ষিত হয়। সারা বৎসরটা বিষয়কর্মে মগ্ন থাকিয়া, ক্ষণকালের জন্ত এই পবিত্র কার্যে সকলেরই রুচি হওয়ার কথা, কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অথবা বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম ঠিকমত বুঁজিয়া বাহির করা এখন ষের ঘরেই প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সেকালে প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে এক পৃথক ঘটকসম্প্রদায় এই সকল নামমালা রীতিমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহ অধুনা বিলুপ্ত ও অনাদৃত হওয়ায় পারিবারিক ইতিহাসের প্রামাণিক ও মূল্যবান উপকরণরাজি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার স্থান অপ্রামাণিক ও কৃত্রিম রচনা দ্বারা পূরণ হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়েব পূর্বপুরুষের বিশুদ্ধ নামমালা কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৮)। তদ্ব্যতীত যাহাদের কোতুল উদ্ভিক্ত হইয়াছে তাঁহাদের গোচরার্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চারিজন বাঙালী মহামনীষীর পূর্বপুরুষের নামমালায় যে অল্পপেক্ষণীয় ভ্রম চলিয়া আসিতেছে তাহা সংশোধন করিয়া লিখিত হইল। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহাদের বর্তমান বংশধরগণ কেহ এ বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনীর অংশবিশেষও ভ্রমপ্রমাদশূণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখিত হইল—ও তত্ত্ব পরিবার মাত্রেব মনস্তৃষ্টির জন্ত নহে।

১। ভূদেবের পূর্বপুরুষ

স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১২৩৩-১৩০১ বঙ্গাব্দ) মহাশয়ের কুলপরিচয় ছিল “কামদেব পণ্ডিতের সন্তান”। যুববংশের এই দারার সাংকেতিক সংজ্ঞা “বিং মুং” সমস্ত কুলপঞ্জীতে পরিগৃহীত হইয়াছে—বিশ্বেশ্বর (সংক্ষেপে বিশো) নাম হইতে তাহার উৎপত্তি। আমরা পূর্ববং বাটায় সামাজিক ইতিহাসেব যুগজ্ঞয় ধরিয়া নামমালা বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সর্বস্বত্ব একটা যাবদ্ব্যক ভ্রমের কথা বলা আবশ্যক। ভরদ্ব্যজগোত্র বাটীয়

ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিপুরুষ “শ্রীহর্ষে”র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং এক সময়ে এই শ্রীহর্ষ নৈবধকার কিনা তদ্বিষয়ে বহু বাদানুবাদ চলিয়াছিল। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার যে আজ শতাব্দিক বৎসর মধ্যে একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেন নাই, প্রামাণিক লেখানুসারে এই শ্রীহর্ষ মোটেই গোড়দেশে আসেন নাই। সর্বপ্রথম আসিয়াছিলেন শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র “মেধাতিথি” এবং এই মেধাতিথির শ্রীহর্ষ নামে কোন পুত্র ছিল না। স্বতরাং আদিশূরের সভাগত মেধাতিথি হইতে নামমালা কীৰ্ত্তিত হইলে শ্রীহর্ষের নাম তন্মধ্যে পড়ে না। নবদ্বীপে আমরা ধ্রুবানন্দ-রচিত অতি-দুর্লভ “মহাবংশাবলী” নামক গ্রন্থের কতিপয় পত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ “মুখয়টীকুল” প্রায় সম্পূর্ণ আছে। এডুমিশ্রের কারিকানুসারে (১৫ শ্লোক) মেধাতিথি আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দের উক্ত গ্রন্থানুসারে বঙ্গালী আদিকুলীন উৎসাহ মেধাতিথির অপরন্ত একাদশ পুরুষ। যথা, মেধাতিথি—আবর ত্রিবিক্রম—বাক—ধাধু (“মুখে গাতঃ”)—জলাশয়—বাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—শুক্রি—আচার্য্য মাধব—উৎসাহ; লক্ষ্য করা আবশ্যক, মেধাতিথির পঞ্চম পুরুষে প্রথম ‘গাঞি’ সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক কুলপঞ্জীতে বাহা পাওয়া যায়, এডুমিশ্র-ধ্রুবানন্দের নবাবিষ্কৃত লেখা দ্বারা তাহা অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে (২য় স’, পৃ. ১৪১) দুই জন “মেধাতিথি” কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মেধাতিথির নাম বলপূর্বক ছন্দোভঙ্গ করিয়া পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক হরিমিশ্রও মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষের নাম লিখিয়া যান নাই। এই ১১ পুরুষের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। কেবল উৎসাহের সম্বন্ধে লিখিত আছে, “উৎসাহন্ত্য সমঃ পুত্রিক্রমসাহো ভূবি বিস্রুতঃ”।

লক্ষ্মণ সেনের অভিষেককালে উৎসাহ জীবিত ছিলেন না। তন্নিমিত্ত প্রথম সমীকরণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহিতের নাম শীর্ষস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসাহের ১৬ পুত্র ছিল—তন্মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ছিলেন “মহাদেব”। তিনি পঞ্চম সমীকরণে ভ্রাতৃপুত্র লোলিকের সহিত একসঙ্গে পূজিত হইয়াছিলেন। মহাদেবের কুল-কারিকায় ধ্রুবানন্দ (মহাবংশ, পৃঃ ৫) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া—

ছেন—“নহুজমাথবেনাসৌ রাজা পূর্বং পুরস্কৃতঃ।” এডুমিশ্র প্রভৃতি সামাজিক-প্রধান ব্যক্তির সহিত লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেন “ভূরুকের” ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া “বঙ্গে” নহুজমাথবের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন—এই অতি-মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য স্বয়ং এডুমিশ্র লিখিয়া গিয়াছেন (৩২-৩৩ প্লোক)। সম্ভ্রতি (দামোদরদেবের পুত্র) “অরিরাজনহুজ-মাথব ত্রিদশরথদেবের” একাধিক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় কেশবসেনের সমকালীন ঐ রাজার সভা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এডুমিশ্র ও ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলচাৰ্য্যদের গ্রন্থের প্রামাণ্য সম্যক্ প্রতিপালিত হইয়াছে। অথচ অদ্যাপি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই কুলপঞ্জীর প্রামাণ্যে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন।

মহাদেবের অশ্বস্তন ৮ম পুরুষ কামদেব। যথ, মহাদেব—বিশ্বেশ্বর (মহাবংশ, পৃ. ৭)—ভব (পৃ. ১২)—পশো (পৃ. ১৮)—কৃষ্ণ (পৃ. ৩৩)—মহেশ্বর (পৃ. ৫৮)—হরি (পৃ. ৮৪)—কামদেব (পৃ. ১০৭)। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সমীকরণভূক্ত প্রধান কুলীন ছিলেন। কামদেবের ১১ পুত্র, তন্মধ্যে মধুসূদনের কারিকা ধ্রুবানন্দ লিখিয়া গিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। লক্ষ্য করা আবশ্যক, ধ্রুবানন্দ মধুসূদনের পুত্রস্বয়ের নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে, ঐ পুত্রদ্বয় (অনন্ত ও সন্তোষ) ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কুলপঞ্জী-সমূহে কামদেবের অশ্বস্তন বংশধারার অতি বিস্তৃত পারিবারিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা সম্যক্ পরীক্ষা না করিয়া “ভূদেবচরিতে” যে নামমালা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বয়জনক ভ্রম পরিষ্কৃত হয়। বিশ্বয়ের হেতু হইল এই যে, ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ কুলগ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন (ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, পৃ. ১৬) এবং স্বয়ং ভূদেবও বহু ঘটকের সংস্পর্শে আদিয়াছিলেন। আমরা সংশোধনপূর্বক একটি বিশুদ্ধ নামমালা সঙ্কলন করিতেছি। কামদেবের উপাধি ছিল “পণ্ডিত” এবং তাঁহার একমাত্র উপাধিদারী পুত্র ছিলেন “মধুসূদনাচার্য্য”। মধুসূদনের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তোষের উপাধি ছিল সমস্ত কুলগ্রন্থানুসারে “মুকুট রায়”—তৎকালে এই উপাধি রাজকাৰ্য্যে মন্ত্রিত্বাদি প্রধান পদাধিকারীর জন্য প্রচলিত ছিল। তিনি আলিবর্দী খার বিরুদ্ধে “ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত মিলিত হন” (ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, পৃ. ৩)—ইহা সম্পূর্ণ প্রামাণ্যকল্পিত একটি আকাশ-কুসুম। সন্তোষ আলিবর্দীর আয় ২০০ বৎসর পূর্ববর্তী ছিলেন। এবং তদ্বিয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ধ্রুবানন্দকর্তৃক তাঁহার নামোল্লেখ ব্যতীত অপর একটি

মূল্যবান প্রমাণ কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি। সন্তোষের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র অপুত্রক “চণ্ডীদাসের” নাম কুলপঞ্জীতে প্রায়শঃ লিখিত পাওয়া যায় না। বর্দ্ধমান অঞ্চলের একটি পুথিতে (১২২১ পত্র) তাঁহার নাম ও বিবরণ আছে—“হড়সার্কভৌমস্ত কন্তাবিবাঃ।” এই হড়সার্কভৌম ছিলেন ইছাপুরের চৌধুরীবাংশীয় স্থপ্রসিদ্ধ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রামভদ্র সার্কভৌম এবং রামভদ্রের পৌত্র প্রতাপশালী “রাজা রঘুনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী”র প্রদত্ত ১০৭০ সনের (১৬৬৪ খ্রিঃ) দানপত্র আমরা দেখিয়াছি (নদীয়ার ৪৩২৮৩নং তায়দাদ)। চৌধুরীদের পরমাত্মীয় সন্তোষ মুকুট রায় চৌধুরীদের সঙ্গে মোগল-পাঠান সংঘর্ষকালে কোনপ্রকারে বিপন্ন হইয়া থাকিতে পারেন, যদি বস্তুতঃ ঐরূপ কোন কিম্বদন্তী সন্তোষের সম্বন্ধে প্রচারিত থাকে।

সন্তোষের দ্বিতীয় পুত্র রমাকান্ত (রামকান্ত নহে) এবং তাঁহার দশ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র গোপীবল্লভ (অথবা গোপীজনবল্লভ) প্রথম কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। যথা, “পশ্চাৎ ৮ কামদেব রায়স্ত কন্তাগ্রহণান্তঃ ততঃ কন্যা অপাত্রে গত” (অশ্বমিকটে রক্ষিত পুথির ১৫০১২ পত্র)। “বিভো-চট্ট” বাংশীয় এই কামদেব রায় নদীয়ার চৌধুরী ছিলেন, তখনও নদীয়ার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। গোপীবল্লভের পুত্র রামকানাই কুলভঙ্গ করেন (ভূদেবচরিত, পৃ. ৩)—এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গোপীবল্লভের রামকানাই নামে কোন পুত্রই ছিল না এবং গোপীবল্লভ স্বয়ংই কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই ভুলের জন্য সম্ভবতঃ দ্বায়ী “সম্বন্ধনির্ঘয়” (৩য় সং, পৃ. ৬৪১)। গোপীবল্লভের সাত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন “নকড়ি” (নামান্তর কাহ্ন)। একটি গ্রন্থে তাঁহার বাসস্থান লিখিত আছে “সাং চানক”। বোধ হয় গোপীবল্লভই কুলভঙ্গ করিয়া সমাজস্থান “খড়দহ” পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্রগণ নানাস্থানে বসতি স্থাপন করেন। নকড়িরও সাত পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র “রামনাথের” দশ পুত্রের অন্যতম “রামকানাই ন্যায়বাগীশ”ই ভূদেবের পূর্বপুরুষ। যথা, রামকানাই—রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ—হরিনারায়ণ সার্কভৌম—বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (১১২২-১২৭৩ বঙ্গাব্দ)—ভূদেব। গণনা অনুসারে আদিশূর আনীত মেধাতিথি হইতে ভূদেব হইলেন ঠিক ৩০ পুরুষ। হরিনারায়ণ পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন (ভূদেবচরিত, পৃ. ৫)। ভূদেবের ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গত হন (ঐ, পৃ. ৬-৭)। কিন্তু ইহা ঠিক কিনা সন্দেহ। হরিনারায়ণের ৮ পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথের জন্মকালে তাঁহার বয়স হইয়া পড়ে ৪৬—ইহা একান্তভাবে অসম্ভব না হইলেও

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ঘটনা এবং বিশ্বাস করা কঠিন। ভূদেবের উর্দ্ধতন চারি পুরুষ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন।

বহ্মিচন্দ্রের পূর্বপুরুষ

বহ্মিচন্দ্র স্বয়ং ‘সঞ্জীবনী-সুখা’য় লিখিয়াছেন : “অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীন-দিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।” এই ক্ষুদ্র পরিচয় তিনি নিঃসন্দেহ লালমোহন বিদ্যানিধির নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্টে (বংশাবলী, পৃ. ২৪০-২৪) এই পরিচয়ই বিবৃত হইয়াছে, কেবল বিদ্যানিধির মতে “ইহার হরিপালের অধিবাসী ছিলেন।” বিদ্যানিধি প্রকাশিত নামমালা স্বভাবতঃ প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থেও (২য় সং, পৃ. ২৬০) তাহাই লভাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থে (বহ্মিচন্দ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০) একটি অতিরিক্ত পুরুষের নাম (“পীতাধর”) দৃষ্ট হইতেছে। বঙ্গলার যে কোন সমাজের যে কোন কুলগ্রন্থ একবার দেখিলে এই বহুকাল প্রচারিত বংশলতার বিশ্বয়জনক ভ্রম সংশোধন করা যায়। গঙ্গানন্দ অতি প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধরের বহু বিবরণ কুলপঞ্জীতে সুপ্রাপ্য।

আদিশূর আনীত কান্তপগোত্র বীতরাগের বংশে প্রথম বঙ্গালী কুলীনের নাম “বহুরূপ” (মহাবংশ, পৃ. ১)। তাঁহার ৮ পুত্রের অগ্রতম ছিলেন “গাহী” (পৃ. ৫)। তৎপুত্র সর্বেশ্বর “অবসথী” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :

মারা সর্বেশ্বরঃ ষ্ঠাতো দানৈঃ কল্পমহীকরঃ।

অবসথীতি বিখ্যাতো বজ্রাবলম্বপালনাং। (পৃ. ৯)

ঘটনাটি এই—ঘোষালবংশীয় “আভোক” নামক সামাজিকের বজ্রশালায় সর্বেশ্বর ও তাঁহার সমকক্ষ কুলীন ঘোষালবংশীয় “পণ্ডিতে”র শাস্ত্রীয় বিবাদ হইয়াছিল এবং তদবধি উভয়েরই “অবসথী” খ্যাতি হয়। কিন্তু পণ্ডিত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া একা সর্বেশ্বরই ঐ মর্যাদাভাজন হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত সমানোহনো চট্টসর্বেশ্বরঃ কৃতী।

আভোক-বজ্রশালায় বিবাদে ঘরেরপি।

অবসথীতি বিখ্যাতপুত্রো ন চাভবৎ। (পৃ. ৮)

ইহা খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা এবং তখনও সময় বাগবজ্রাদির অল্পাধীন এবং বজ্রবিদ্যার অল্পাধীন চলিত ছিল। কুলগ্রন্থের এই সকল প্রামাণিক কথা স্মৃত হইয়া বর্তমানে অবসথী শব্দের নানারূপ কল্পিত খ্যাতি অনেক করিতেছেন। গঙ্গানন্দ ছিলেন সর্বেশ্বরের

অধস্তন নবম (অষ্টম নহে) পুরুষ। বধা, সর্বেশ্বর—তেকড়ি (পৃ. ১৫)—সিধো (পৃ. ২৫)—লখো বা লক্ষীধর (পৃ. ৪৫)—দিগম্বর (পৃ. ৭২)—জগন্নাথ (পৃ. ১৬-১৭)—শ্রীগর্ভ (পৃ. ১১৮)—ভগবান্ (পৃ. ১৪২)—গঙ্গানন্দ। ভগবানের কারিকায় গঙ্গানন্দের নাম ঋবানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান্ সর্বশেষ সমীকরণের কুলীন ছিলেন।

গঙ্গানন্দের অধস্তন নবম পুরুষ বহ্মিচন্দ্র। বধা, গঙ্গানন্দ কৃষ্ণবল্লভ—নন্দরাম (ভঙ্গ)—রামজীবন—রামকান্ত—রামহরি—শিবনারায়ণ—যাদবচন্দ্র (১২০২-৮৭ বঙ্গাব্দ)—বহ্মি (১২৪৫-১৩০০)। রামজীবন পর্যন্ত নাম বহু কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণবল্লভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে নন্দরাম (নন্দগোপাল নহে) ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি কুলভঙ্গ করিয়া নানাস্থানে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে এমন গ্রন্থিকর কথা আছে বাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার পুত্রসংখ্যা বারোই কম নহে—তন্মধ্যে কুজাপি রামকান্তের নাম নাই, আছে রামজীবনের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথিতে রামজীবনের সাত পুত্রের মধ্যে রামকান্ত এবং তাঁহারও চারি পুত্রের নাম আছে—“রামহরিশ্রীহরিগঙ্গানারায়ণজগন্নাথঃ” (২৭০-৭১ পত্র)। সুতরাং যিনি রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়া কাঁটালপাড়া আসিয়াছিলেন তিনি রামজীবনের পুত্র রামকান্ত, নিশ্চিতই রামকান্তের পুত্র রামজীবন নহেন। ঘটকের প্রামাণিক লেখা অগ্রাহ্য করিয়া, কি করিয়া এই অদ্ভুত নাম-বিপর্যয় সাধিত হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। যাদবচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামজীবন নিশ্চিতই রঘুদেব ঘোষালের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পূর্ববর্তী ছিলেন। কোন গ্রন্থেই পীতাধরের নাম নাই।

গঙ্গানন্দের বাসগ্রাম ঠিক কোথায় ছিল এখন নির্ণয় করা অসাধ্য। তাঁহার এক পুত্র “বিশ্বেশ্বর” ফুলিয়ার রামেশ্বর ঠাকুরের কন্যা “গঙ্গা”কে বলপূর্বক স্বগৃহে আনিয়া ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থে কৌতুকজনক কথা আছে—“তস্তাং স্ত্রীয়াং বিশ্বেশ্বরপুত্রং রামনাথেন বিমাতৃমৃতস্তাং দীর্ঘগদ্যে শ্লাঘ্যং কৃতং” (কামালের পুথি, ফুল্যাপ্রকরণ, ১৬২ পত্র)। এতদ্বারা অহুমিত হয়, গঙ্গানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ অধুনাতন বৈদ্যবাটার সংলগ্ন প্রাচীন দীর্ঘগদ্য অথবা দিগদেব অধিবাসী ছিলেন।

আভোতোষের পূর্বপুরুষ

কুলশাস্ত্রে লক্ষপ্রবেশ স্বসাহিত্যিক স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সর্বপ্রথম আভোতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষের নামমালা বহু পরিভ্রমে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ

করিয়াছিলেন (সন্দর্ভসংগ্রহ, ১৩০৫, ৫ম প্রস্তাব)। তাহাই সম্বন্ধনির্ণয়ের ৩য় পরিশিষ্টে (১৩২১, পৃ. ২৬০) সংক্ষিপ্তাকারে পূর্বতন বংশলতার সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সংশোধনপূর্বক সম্পূর্ণ নামমালা লিখিতেছি। আদিপুরুষ কতক আনৌত ভরস্বাজগোত্র মেধাতিথির অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ আহিতের পুত্র “উধো” (মহাবংশ, পৃ. ৪), তৎপুত্র শিষো “বজ্র” (পৃ. ৮), শিষোর তিন পুত্র হইতে মুখবংশের তিনটি প্রসিদ্ধ সমাজস্থানের উৎপত্তি—নৃসিংহের ফুলিয়া সমাজ, রামের “স্বল্পফুলিয়া” ও দ্যাকবের কাঁচনা। রামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ “গোপাল ঘটক” স্বনামে মেল করিয়াছিলেন। যথা, রাম (পৃ. ১৪)—স্বস্তো (পৃ. ২২)—জয়পতি (পৃ. ৪০)—গদাধর ঘটকাচার্য্য (পৃ. ৬৬ ৭)—গোপাল (পৃ. ১১)। তৎপুত্র মাধব “লঙ্কর” (পৃ. ১১৪) এই বংশেরই ধনপতির পুত্র মাধব হইতে পৃথক বান্ধি। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশতঃ ধনপতির পুত্র হইতেই বংশ বর্ণনা করিয়াছেন (লালমোহন মুখোপাধ্যায়-রচিত মুখবংশ, পৃ. ৮২)। ঘটকের পুত্রের “লঙ্কর” উপাধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যিক, ঋবানন্দও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্বারা পাঠান আমলে রাজ্যতন্ত্রের সেনা-বিভাগে মাধবের উচ্চপদাধিকার স্মৃতি হইতেছে। ঋবানন্দের কারিকায় (পৃ. ১১৪) মাধবের ছয় পুত্রের নাম আছে। বিদ্যানিধির মতে (সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট, বংশাবলী, পৃ. ১৩১) জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বরানন্দের দ্বারায় আশুতোষের জন্ম। ইহা কোন পুথিতেই পাওয়া যায় না, স্বতরাং ভ্রমাত্মক। পরবর্তী ঘটক গ্রন্থসূত্রে মাধবের পুত্র “বসু লঙ্কর” ভিন্ন অপর পাঁচ পুত্রের “কুলাভাব” ছিল। বসু সম্বন্ধ করিয়া মালাধরখানী মেলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র “কুমুদে”র সম্বন্ধে লিখিত আছে, “কুমুদস্য বিবাহদোষঃ কল্যা অপাত্ত্বা” (অমরীয় পুথির ৮০১ পত্র), অর্থাৎ, তিনিই প্রথম কুলভঙ্গ করেন।

কুমুদের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ “পুরুষোত্তম তর্কবাগীশ” দিগ্ভূই নিবাসী ছিলেন। নামমালা যথা, কুমুদ—হরিদেব—রামনারায়ণ—কৃষ্ণবল্লভ—পুরোষোত্তম। কোন কোন গ্রন্থসূত্রে হরিদেব ছিলেন কুমুদের ভ্রাতৃ দেবীদাসের পুত্র (কুলকল্পদ্রুম, মুখবংশ, পৃ. ২১৫)। ভগলী কালেক্টরীর ৪৫২৭নং তথ্যদানে পাওয়া যায়, (সার্বর্গ-চৌধুরবংশীয়) বিদ্যাপ্রদায় মুখবংশীয় পুরুষোত্তম তর্কবাগীশকে দীর্ঘস্থি গ্রামে ভূমি দান করিয়াছিলেন—১২০২ সনে তাহার অন্যতম দখলকার ছিলেন “হরেকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর”। পুরুষোত্তমের এক পুত্রের নাম রাজারাম—রাজারামের জ্যেষ্ঠপুত্র বলরামও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মহেন্দ্র-

নাথ বিদ্যানিধির মতে তাহার উপাধি ছিল “ন্যায়ালঙ্কার”, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পুথিতে (৩৫৬১ পত্রে) আছে “বলরাম ন্যায়বাগীশ”। এই পঞ্চমুই কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়। অতঃপর মহেন্দ্রনাথের পরিশ্রমসাধ্য লেখাই আমাদের উপজীব্য, বলরামের তিন পুত্র—হরেকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগর), রামজয় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্থতির পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। রামজয়ের ১১২৬ সনে অল্প বয়সে মৃত্যু হয়—তৎপুত্র বিশ্বনাথ (জন্ম ৪ কার্তিক ১১২৪, মৃত্যু ১ কার্তিক ১২৫৬) গঙ্গাপ্রসাদের পিতা এবং আশুতোষের পিতামহ। মেধাতিথি হইতে আশুতোষ ঠিক ৩২ পুরুষ।

রামানন্দের পূর্বপুরুষ

স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীতে যে বিস্তৃত বংশাবলী লভ্যাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার প্রথমংশ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই বংশের প্রকৃত পরিচয় হইল “নান্দোর চট্ট” সংক্ষেপে (‘নাং চং’), কিন্তু ঐ চট্টবংশ ঠিক কোন্ দ্বারায় অন্তর্গত তাহা অজ্ঞান্যাসে নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও আমরা তাহাতে অসমর্থ। যে দ্বারায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। নাং চং মহাকালের পুত্র পদ্মগর্ভের নাম ঋবানন্দ লিখিয়াছেন (মহাবংশ, পৃ. ২২৫)। পদ্মগর্ভের পুত্র হরিরাম। হরিরামের ছয় পুত্র—রামশঙ্কর, রামনারায়ণ (ভঙ্গ), সীতারাম (ভঙ্গ), বাত (নিঃসন্তান), মাধব ও সন্তোষ। এই সন্তোষ রামানন্দের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন না। তাহার বংশ অদ্যাপি “নিকষ” কুলীন এবং নামমালা কুলপঞ্জীতে সুপ্রাপ্য। যথা, সন্তোষ—রামচন্দ্র—বিশ্বনাথ—ধনজয় প্রভৃতি ছয় পুত্র (বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল)। সকল গ্রন্থসূত্রেই রামচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র ছিল বিশ্বনাথ। যদি সন্তোষের পুত্র রামচন্দ্র এই বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া চিহ্ন-প্রচলিত প্রবাদ বা প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অসুমান এই সন্তোষ পুরোক্ত পদ্মগর্ভের এক বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইতে পারেন। যথা, পদ্মগর্ভ—অভিরাম (ভঙ্গ)—লোকরাম—সাতু বা কৃষ্ণজীবন—সন্তোষ। কিন্তু এই সন্তোষের পুত্রাদির নাম আমাদের পরীক্ষিত কোন গ্রন্থে নাই। পদ্মগর্ভের উচ্চতন পুরুষের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ কুলগ্রন্থে সুপ্রাপ্য—তিনি আদিকুলীন বহুরূপের অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা, বহুরূপ—গোবিন্দ—চক্রপাণি (চাকু)—পুরুষোত্তম (পুরো)—নন্দন—জগন্নাথ—জলোচন (ভিলাদী)—চন্দ্র (চাঁদ)—মধু—মহাকাল—পদ্মগর্ভ। কুলগ্রন্থসূত্রে পুরো নদীকুলবাসী ছিলেন বলিয়া ‘নান্দো’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

তিব্বতের টাকাকড়ি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ভারতের টাকাকড়ি তিব্বতে চলে; কিন্তু তিব্বতের নিজস্ব মুদ্রাও আছে। তিব্বতের বাজারে আমাদের টাকার কদর আছে। ষ্ট্রট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকা বা ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকার আদর সবচেয়ে বেশী। আমাদের আধুলি সিকি বড় দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি পূর্ব-তিব্বতের কোথাও কোথাও নাকি একমাত্র ভারতীয় টাকার সাহায্যেই কেনাবেচা হয়। উহাকেও নাকি তিব্বতীয় প্রথায় কাটিয়া অল্পমূল্যের মুদ্রার কাজ চালানো হয়।

তিব্বতের মুদ্রা আগে নেপাল হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিত। খানের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে এখন লাসাতেই টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার টাঁকশাল যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা যদি মনে করেন যে, তিব্বতের টাঁকশালও ইহার অনুরূপ তাহা হইলে ভুল করিবেন। উহা বাংলা দেশের কানারশালার বড় সংস্করণ।

তিব্বতে প্রচলিত মুদ্রার নাম “ত্রঙ্গকা”। উহা পাতলা ও গোলাকার—রূপা ও তাম্রা মিশাইয়া তৈয়ারী হয়। এক ত্রঙ্গকার ক্রয়মূল্য আমাদের ছয় আনার সমান। তিব্বতের অবস্থানকালে কিন্তু আমি হাটেবাজারে ভারতীয় এক টাকায় তিন ত্রঙ্গকা পাইতাম। তিব্বতে কয়েকপ্রকার ত্রঙ্গকার প্রচলন আছে, যথা (১) গ্যন্ডেন্ পোডজ্ ত্রঙ্গকা, (২) কোজ্-কার ত্রঙ্গকা, (৩) টুঙ্গ্-ট্যঙ্গ্ ত্রঙ্গকা (৪) চোতজ্ ত্রঙ্গকা, (৫) পা-ন্যিজ্ ত্রঙ্গকা। এগুলির মধ্যে প্রথম প্রকারের ত্রঙ্গকারই প্রচলন বেশী। উহার এক পিঠে লেখা আছে “গ্যন্ডেন্ পোডজ্ চোলে ন্যন্ গ্যল্”। ইহার অর্থ বাংলায় করা যাইতে পারে—“সকল দিক হইতে বিজয়ী পবিত্র প্রাসাদ”। অপর পিঠে লেখা থাকে “ট-পি টগ্যু” অর্থাৎ সৌভাগ্যের অষ্ট লক্ষণ।

একবার লাসা গবর্ণমেন্টের সহিত রেটিং গোন্দার বিবাদ বাধে। তাহা মিটাইতে আসেন চীন হইতে একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। টুঙ্গ্-ট্যঙ্গ্ ত্রঙ্গকা তাহারই নাম অনুসারে হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্বোক্ত ত্রঙ্গকার মত ইহারাও এক পিঠে সৌভাগ্যের অষ্টলক্ষণ আছে, কিন্তু অপর পিঠে কিছু লেখা নাই। আছে কেবল শোভাবর্ধক কালকর্ষ্য।

কোম্পান্য ত্রঙ্গকাতেও কোন লেখা নাই। কেবল এক পিঠের মধ্যস্থলে চতুর্কোণ আকিয়া উহার মধ্যে একটি তিব্বতী সংখ্যা লেখা আছে।

চো-ট্যঙ্গ্ ত্রঙ্গকা আসলে নেপালী মুদ্রা। ইহা নেপাল

হইতে তৈয়ারী হইয়া আসে। উহাতে নেপালের রাজার নাম, সন, তারিখ ইত্যাদি লেখা আছে। ইহার নেপালী নাম ‘মোহর’।

তিব্বতে ত্রঙ্গকা কাটিয়া অল্প মূল্যের মুদ্রার কাজ চালানো হয়। গ্যন্ডেন্ পোডজ্ ত্রঙ্গকা সাধারণতঃ কাটা হয় না। চোতজ্ ত্রঙ্গকাকেই বেশী কাটা হয়।

এক ত্রঙ্গকার মূল্য আমাদের ছয় আনার সমান। কাজেই উহাকে ঠিক অদ্বৈক করিয়া কাটিয়া তিন আনার মুদ্রা করা হয়। তখন উহার নাম হয় “চি-কো”। তিন ভাগ রাখিয়া কাটিলে উহা চারি আনার কাজ চালায়, এবং তখন ‘সো-কজ্’ নামে পরিচিত হয়। এক-তৃতীয়াংশ মাপে কাটিলে উহার নাম হয় “কম্বা” বা “কবুম্বা”। উহার মূল্য দুই আনা।

ত্রঙ্গকাকে কাটিয়া অল্প মূল্যের মুদ্রা তৈয়ারী করিবার সময় কর্মকার যে লোভে পড়িয়া কিছু ধাতু না রাখে তাহা নহে। উহাতে বাস্তবিকই অল্পবিধা আছে। এই অল্পবিধা দূর করিবার জন্য তিব্বত গবর্ণমেন্ট দুই পয়সা (খক্-চে) ও এক আনা মূল্যের (খক্যজ্) তাম্রমুদ্রার প্রচলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এক টাকা দুই আনা মূল্যের “অঙ্গ-চেড্” এবং দুই টাকা চারি আনা মূল্যের “স্যাঙ্গ-ক্যজ্” এই দুই শ্রেণীর রৌপ্যমুদ্রারও চলন হইয়াছে।

চীন হইতে আমদানি করা রৌপ্য-পিণ্ডও তিব্বতে মুদ্রার কাজ চালায়। ধাতুর ওজন হিসাবে উহার মূল্যের তারতম্য হয়।

তিব্বতে পণ্যবিনিময়েও কেনাবেচার কাজ চলিতেছে। মৃগনাভি, গমচূর্ণ, যব, চা প্রভৃতি মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে চলে। যেমন, প্রায় নয় পোয়া যব এক টাকার প্রতীক। পণ্যবিনিময়ে কেনাবেচা করা বিষয় বকমারি ব্যাপার। প্রথমতঃ কাহার কি প্রয়োজন তাহা বাহির করিয়া যোগস্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর দরকষাকষি। ইহাতে অথবা অনেক সময় নষ্ট হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুইই স্ব স্ব পণ্যের গুণকর্ত্তন ও অপরের দ্রব্যের গুণহীনতা প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য বক্তৃতা করে।

জনৈক তিব্বতী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মুদ্রাসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কি আপনারা এখনও অনুভব করেন না?”

তিনি বলিলেন, “অল্পভূতি জাগিয়াছে—সংস্কারের বেশী দেয়ী আছে বলিয়া মনে হয় না।”

বর্তমানে তিব্বত চীনের ঠাবে আসিবার পর নতুন চীনের মুদ্রাও তিব্বতে চলিতেছে।

বাংলা ও বাঙালী

শ্রীশ্রীলচন্দ্র ঘোষ

১

বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনালোকের বাংলা ও বাঙালী আজ ধ্বংসের পথে। আনন্দমঠের ব্রহ্মচারীকে যখন মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “মা কে”, তখন ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন “আমরা তাঁহার সন্তান।” মহেন্দ্র আবার যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কে তিনি”? ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন “সময়ে চিনিবে।” পরে মহেন্দ্র এক “অপরূপ সর্কানসম্পন্ন সর্কাভরণাভূষিতা জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি” দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “ইনি কে?” তখন ব্রহ্মচারী উত্তর দিয়াছিলেন “মা বা ছিলেন।”

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রহ্মচারী যখন বলিতেছিলেন “আজি দেশের সর্বত্রই আশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী” তখন তাঁহার চোখে দর দর ধারা পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে সেই ব্রহ্মচারীর ন্যায় সর্কাত্যাগী নেতা কোথায়? আর মহেন্দ্রের ন্যায় সেই দেশপ্রেমিকই বা কোথায় বাঁহারা আবার বাংলার রূপ বদলাইতে পারেন?

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা প্রদেশই প্রকৃতিদত্ত সম্পদে অধিক সমৃদ্ধশালী হইলেও ভারতের অল্প সমস্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙালী জাতি আজ দরিদ্র। বাংলার সহস্র সহস্র কাধ্যক্ষম উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে পাইতেছে না। যে জাতি এতদিন সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সমগ্র ভারতের চিন্তার ধোঁরাক জোগাইয়াছিল সে আজ অল্প প্রদেশবাসীর নিকট সকল বিষয়ে অবহেলিত। রাজনীতিবিদ স্বরেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র এক সময় সারা ভারতবর্ষে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবার মত নবীন বাংলায় কাহাকেও আজ দেখা যাইতেছে না কেন তাহা ভবিষ্যৎ কথায়।

একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, এই যুগে সারা বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তা একই সূত্রে গাঁথা। পূর্বে পরাধীন ভারতের কখনও পুরাপুরি ভাবে এই সমস্তার সম্মুখীন হইবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু এ যুগে যে জাতির অর্থনৈতিক শক্তি নাই রাজনীতিক্ষেত্রে সে জাতি কখনও মাথা তুলিতে পারে না। এই কারণেই আজ বাংলা ও বাঙালী অসংখ্য প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর অনেক পিছনে পড়িয়া আছে এবং দিনের পর দিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে আগাইয়া যাইতেছে।

ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসী ও নেতারা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থ অগ্রে বজায় রাখিবার পর তবে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করেন। তাঁহারা এ মনোবৃত্তিকে “প্রাদেশিকতা” বলিয়া মোটেই মনে করেন না। কিন্তু অধুনা বাংলার প্রায় সকল নেতাই বঙ্গমাতাকে ভুলিয়া একমাত্র ভারতমাতার বন্দনায় ব্যস্ত। তাঁহাদের মতে বাংলার স্বার্থ অগ্রে রক্ষা করিলে উহা নিছক “প্রাদেশিকতা” হয়।

বাঙালী জাতিকে যদি আবার মাথা তুলিয়া বিশ্বের দরবারে দাঁড়াইতে হয় তাহা হইলে অগ্রে এই কাল্পনিক “প্রাদেশিকতার” কলরবকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ব্যবসা ও বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহাকে বাংলার বাহির হইতে ও ভারতের বাহির হইতে অর্থোপার্জন করিতে হইবে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থ বাহাতে বাহিরে চলিয়া না যায় তাহার অল্প যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম তখনও বাংলাদেশ হইতে যত টাকা বিদেশীরা লইয়া যাইত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ টাকা ভারতের অপরাপর প্রদেশে চলিয়া যাইত। ইহার মোটামুটি হিসাব আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর ইহা হ্রাস পাওয়া দূরের কথা বরং এই টাকার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থার জন্য কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের দোষ দেওয়া কোনমতেই উচিত হইবে না। যদি গুজরাট, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অধিবাসীরা বাংলাদেশে আসিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতে পারে তবে বাংলার অধিবাসীরা কেন তাহা পারিবে না? একটা জাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমুন্নত করিয়া তোলা অল্পসংখ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। দেশের সমগ্র অধিবাসীর প্রাণের সঙ্গে এই আকাজক্ষা জড়িত থাকে একান্ত আবশ্যক। এজন্য বাংলার প্রত্যেক সন্তানকে মানসপটে সূজলা সূফলা শস্ত্রশ্রামলা বঙ্গমাতার আরাধনা করিতে হইবে। তবেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গভীর হৃৎখে লিখিয়াছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেব হে মৃদা জননী;

যেথেষ্ট বাঙালী করে মাহুঁষ করোনি।

বাংলার নবীনরা কি এখনও কবির এই মর্মব্যথার অনুভব করিতে পারিতেছে না?

নারায়ণী সেনা

ঐতিহ্যবাহী মুখোপাধ্যায়

সমস্ত দিন সমস্ত রাত গাছের উপর কেটে গেল।

সমস্ত দিন বলাটা একটু ভুল, কেননা দুপুর পর্যন্ত আমরা ছিলাম হাতীর হাওদার উপর। আমি আর নলিনীবাবু। পূজার ছুটিতে আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে এসেছিলাম আমাদের উভয়ের বন্ধু আনন্দের বাড়ী, নলিনী-বাবু কলকাতা থেকে আর আমি এদিক থেকে।

আনন্দের পুরো নামটা হচ্ছে আনন্দকিশোর খাপা। ওরা তরাইয়ের নেপালী জমিদার। ওর পাঠ্য জীবনের কতকটা কাটে পাটনায়, এবং কতকটা কলকাতায়। বরাবরই বাঙালী-ঘেঁষা, তাইতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় পাটনায়, আমরা উভয়েই তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বি-এ পাস করে আর আমার কাছে বিজ্ঞানাগরের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। সেখানে এম-এ পড়ে চার বছর, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, তাই বোধ হয় সরস্বতীর উপর ভক্তিটা মরে এসেছিল। কিন্তু এম-এ না পাস করে ও বাড়ী ফিরে গিয়ে আমায় যে চিঠিটা লিখেছিল সেটি একেবারে ঘরোয়া বাংলায়। তাইতেই প্রথম কাঁছনী গাইলে—একলা পড়ে গেছি, বনবাস, নিশ্চয় আসবি একবার, যত শীগগির পারিস—শিকারের লোভ দেখান ছিল, আবার এ একই চিঠিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে 'বনবাসে'র শাস্ত নিরুদ্বেগ জীবনের উচ্ছ্বাসিত গুণ-গানও ছিল।...বি-এ ক্লাসেই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে লেখক হবার পায়তারা তাঁজছি, আনন্দকিশোর সেটা জানত।

তারপর এক বছর ধরে এই রকম চিঠি মাঝে মাঝে বরাবর এসেছে; কিন্তু চারদিক দিয়ে প্রলুব্ধ হলেও এতদিন গিয়ে উঠতে পারি নি।

আর কখনও বাওয়ার দুর্ভাগ্যও না হয় যেন। প্রথমতঃ দূরত্ব এবং পথের দুর্গমতা। রূপনগর নিকটতম রেল-স্টেশন থেকে আঠার মাইল। রাস্তা নেই বললেই চলে। ভারতের সীমানার মধ্যে মাইল তিনেক একটা কাঁচা সড়ক, তারপর সীমানার একটা খাল পেরিয়ে তার আদলটা কিছুদূর পর্যন্ত গেছে বটে, কিন্তু সেই কোন্ যুগে প্রথম তোয়ের হবার পর তাতে আর কখনও মাটি পড়েছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, অল্পপরিসর, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর ধরস্রোতা। জল পড়ে গোটা-পাঁচেক, তার মধ্যে ছোটো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। রাস্তা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায় নি বটে, তবুও খানিকটা ভেতরে যাবার পরই গভীর অন্ধকার; কতকটা এই ধমধমে অন্ধকারে, কতকটা একটা অজানা আশঙ্কায়, বেরিয়ে

আসবার পর মনে হয় যেন পুনর্জন্ম হ'ল। গ্রাম খুব দূরে, পাহাড়ের দিকে যতই এগুনো যায় আরও এসেছে কমে, আর এই যে নিজের-মনে-গড়ে-ওঠা রাস্তা এটা হয়ে উঠেছে উঁচুনীচু, জায়গায় জায়গায় পাথুরে, আর সেটাকে খণ্ডিত করে যে সব নদী বয়ে গেছে তাদের সংখ্যা গেছে বেড়ে।

যানবাহন হাতী, ভারতসীমানা পেরিয়ে খানিকটা পর্যন্ত একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, বৈচিত্র্য হিসাবে। হাতীই চরম বৈচিত্র্য মনে করে আমরা যাবার সময়ে স্টেশন থেকে নেমে তাইতেই সওয়ারী হই। ভুলটা যখন বোঝা গেল তখন আর গরুর গাড়ির পথ নেই।

কতকটা স্থবিধা আছে শেষের দিকে। গ্রাম থেকে বোরয়ে প্রায় মাইল চার পর্যন্ত খাপা-পরিবারের জমিদারির তরফ থেকে একটা আবার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে, বিজুরিয়া বলে একটা নদীর ধার পর্যন্ত; বাড়ীর দিকে রাস্তাটা মাইলখানেক পাকাও। এইটুকুতে আনন্দ-কিশোরদের মোটরটা যাতায়াত করে। মোটরটা আদৌ এখানে পৌঁছেছিল কি করে সে একটা আলাদা কাহিনী।

এই হাড়ভাঙা অভিযানের পর কিন্তু আমরা যে দশটা দিন ওখানে ছিলাম, বড় আনন্দেই ছিলাম। রূপ-নগর জায়গাটা খুব মনোরম। গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়ে গেছে, তারপর স্তরে স্তরে উঠে একেবারে শেষ দিকে তুষারমুক্ত। সকালে, আর বিকেলে একটু নয়ম হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর যে রক্তাভা পড়ে তার উপমা হিমালয়ের এদিকে কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আনন্দকিশোরের পিতা দ্বগৎ-কিশোর সৌখীন লোক, নিজের গ্রামটুকুও বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন। শরতের স্বচ্ছ আকাশের নীচে রূপনগরকে একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় নীলাশ্রমীপরা কোন্ মায়েদের কোলে সাজগোজ করা একটি শিশু যেন শুয়ে রয়েছে। এখানে থাকাই আনন্দ, তার উপর নিত্য হজুগ। আজ শিকার, কাল বিজুরী-অভিযান, পরশু পাহাড়ের উপর গিয়ে পিকনিক; ছোট ছোট শিকার ছাড়া একদিন হাতী নিয়ে, লোকলস্কর সঙ্গে করে একটা বড় শিকারও হয়ে গেল—ছোটো চিতাবাঘ গোটা পাঁচ হরিণ, ছোটো বুনো শূকর। এর উল্লাস সামলাতেই হ'দিন গেল কেটে। আহা! তো শেষ পর্যন্ত একটা দৃষ্টিক্রমই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—জল অত ভাল হওয়া সত্ত্বেও।

তবুও যে কেন বলছি আর বাবার দুর্ভাগ্যটি কেন না হয় তার দ্বিতীয় কারণটা এবার বলি।

সাতটা দিনের প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। ওঁদের অল্পরোধ-উপরোধে সেটাকে আর একটু বাড়িয়ে আমরা দশ দিন সকালে যাত্রা করলাম। বিজুরী নদী পর্যন্ত পরিবারের এক বকম সকলেই মিলে আমাদের মোটরে পৌঁছে দিলেন—পর্দা নেই, আনন্দকিশোরের স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি কয়েকজন মেয়েছেলে পর্যন্ত। নদীর মাঝখানটুকু নৌকায় পেরিয়ে আমরা এপারে এসে হাতীর ওপর চড়লাম।... শেষ দৃশ্যটুকু যেমন অপূর্ণ তেমনি বিবাদময়। হিমালয়ের ভূধারমূর্তি, তার নীচেই ঘনারণের নীল রেখা, তার পর খানিকটা সমতলভূমি, বিজুরীর উত্তরতটে আনন্দকিশোরের দাঁড়িয়ে রয়েছে, গৌরবাস্তি মেয়েদের রংচঙে পোশাক, আনন্দকিশোর আর কয়েকজন রুমাল নেড়ে বিনায় জানাচ্ছে, নীচেই বিজুরীর উপলহত উজ্জল জলস্রোত আর সমস্তটুকুর উপর শব্দপ্রভাতের বলমলে রোদ।

হাতীটা খানিকটা এগিয়ে এলে নলিনীবাবু বললেন, “এবার ঘুরে বহন শৈলেনবাবু, যা ছেড়েই আসতে হবে তার দিকে এরকম করণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা বীর ধর্ম নয়।”

নলিনীবাবুর কথা বলা হয় নি। একটি জটিল চরিত্র, কিন্তু সঙ্গী হিসাবে চমৎকার; আমদে, গল্পগ্রবণ, যে অবস্থাতেই পড়ুন তার মধ্যে থেকে রস বের করে সেটাকে উপভোগ্য করে নেবার ক্ষমতা আছে; মোটের উপর নামে-ধামে-স্বভাবে এক জন আদর্শ কলিকাতার মানুষ, আসবার সময় উনি না থাকলে যে কি অবস্থা হ’ল, আর বাবার সময়ও যদি উনি না থাকতেন তো...

কিন্তু সে কথা পরে হচ্ছে; এখানে মাত্র এইটুকু বলে রাখি যে ওঁর থেকে থেকে ঐ ‘বীর-ধর্ম’ কথাটা ব্যবহার করবার বাতিক আছে। একবার রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করতে বললেন, “শৈলেনবাবু, ভেতো বাঙালী, এসেছি এমন দেশে যেখানে সবার কোমরেই একটা খুরকি ঝুলছে, এখানে জিভের ডগায় অন্ততঃ একটা ধারালো কথাও না নিয়ে থাকলে মানাবে কেন?”

বললাম, “কিন্তু আনন্দ তো আমাদের স্বরূপ চেনে।”

উত্তর করলেন, “জিগোসও করেছিল এনতুন মুন্ডা-দোষের কথা, বললাম, খেতে অভ্যেস করেছি, নইলে তোর মান থাকবে কেন?”

আরও কীর্তি আছে নলিনীবাবুর, কিন্তু সে কথাও স্বাধানে। সকালের দিকটা আমাদের বেশ কাটল। স্নানাদি সেবে বেশ ভালভাবে জলযোগ করে বেরনো গিয়েছিল, হাওদার উপর দুলতে দুলতে, গল্প করতে করতে,

সিগরেট পোড়াতে পোড়াতে আর নস্তি নিতে নিতে আমরা দুপুর পর্যন্ত গ্রাম থেকে প্রায় মাইল বারো দুবে রামফেরী জঙ্গলের ধারে এসে পড়লাম।

খিদে পেয়েছে, খাবার সময়ও হয়েছে, তা ভিন্ন জায়গাটা এমন অপরূপ যে এইখানে বসে হিমালয় তরাইয়ের শেষ নিদর্শন হিসাবে এটাকে মনে গেঁথে নেবার ইচ্ছাটাও প্রবল হয়ে উঠল। আমাদের ডান দিকে উঁচু-নীচু জমির উপর নিবিড় শালবন, সেটা যেখানে পাতলা আর সুরু হয়ে এসেছে সেইখান দিয়ে আমাদের রাস্তাটা। আমাদের বাঁ দিকে একটা ছোট পাহাড়, সমস্ত জায়গাটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছলে এসে যেন এই শেষ ঢেউয়ে থেমে গেছে, এর পরেই তরাইয়ের সমতল, উঁচু জমিতে রয়েছে বলে কতদূর পর্যন্ত যে দেখা যায় তার হিসাব নেই। সমস্ত জায়গাটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে একটি ছোট নদী। জায়গাটা উঁচু-নীচু বলে মাঝে মাঝে তার স্রোত গেছে আটকে, জল হয়েছে জমা, তার পর সেই সঞ্চিত জলের চাপেই সেটা তোড়ে বেরিয়ে এসেছে; চার দিকে ঝরঝর, ঝরঝর শব্দ; একটি নদীই ঝরণার মালা গেঁথে চলেছে, একটি নৃত্যচপল মেয়েরই পায়ে নুপুর, হাতে তালি, কণ্ঠে সঙ্গীত।

মাছত করুন বাহাদুরকে বললাম, “হাতীটাকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে চল, ঐ গাছতলাটার নেমে আমরা আহারটা সেবে নেব।”

ঠিক যে বললাম তা নয়, খানিকটা ইদ্রিত, খানিকটা হিন্দী আর এইখানে দশ দিনের চেটায় ওঁদের ভাষার গোটাকতক শব্দ যে আয়ত্ত করেছিলাম তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু দিয়ে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দিলাম। বেশ বুঝল, কিন্তু না এগিয়ে খানিকটা ভাষায় আর খানিকটা ইদ্রিতে জানিয়ে দিলে যে সমতলে নেমে খানিকটা এগিয়ে ওর একটা ভাল জায়গা জানা আছে, সেইখানেই বাচ্ছে। সাধারণতঃ নেপালীদের মুখটাই হয় অত্যন্ত গম্ভীর আর ভাবলেশহীন; সেইজগ্রেই, আর তার বক্তব্যটা পুরোপুরি বুঝতে না পারার জন্যেও নিশ্চয়, আমাদের মনে হ’ল লোকটা অস্বাধী জিদ করছে। তাই আমরাও গম্ভীর হয়ে গিয়ে ওকে আমাদের নির্দেশ পালন করতেই হুকুম দিলাম। এদের আর একটা দোষ চট করে চটে যায়। আর কিছু বললে না, হাতীর মুখ ঘুরিয়ে গাছটার দিকে চালিয়ে দিলে, তার পর বেশ বধন কাছাকাছি এসেছি, এই হাত পক্ষাশেকের মধ্যে, হঠাৎ দাঁড় করিয়ে জানালে যে জায়গাটার বাঘের ভয় আছে, বনের শেষে এই ঝরণা, প্রায়ই ওরা জল খেতে আসে এখানে।

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক এইভাবে সঙ্কটের

সামনে এনে ফেলে কণাটা প্রকাশ করার জন্যে লোকটার উপর একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু ঠিক এই ধরণের লোককে আর চটানো বিবেচনার কাজ হবে না বুঝে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

নলিনীবাবু বললেন, “শাস্ত্রে এর ভাল ব্যবস্থা আছে শৈলেনবাবু—যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু এ হতভাগা আমাদের পরীক্ষা করছে, তায় সেদিন একটা বাঘ মারবার যশটা আমিই নিয়েছিলাম, মারি আর নাই মারি—তাই ভাবছি কি করে অর্ডারলি রিটিউট করা যায় যাতে বীর-ধন্য রক্ষা হয়।”

সাহসী বলে আমরাই যে খুব নায আছে এমন নয়, তবে ভরা মধ্যাহ্ন, জঙ্গল প্রায় নেই বললেই চলে, এমনই কেমন ভয় আসে না, তার উপর একটা ভাল বন্দুক রয়েছে শৈলেনবাবুর হাতে। আমি একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করলাম, “এক কাজ করা যাক না মাঝামাঝি, গাছ-তলাটাতেই যাই, তার পর হাতীর পিঠ থেকে না নেমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেই হবে।”

মনের কথাটাও বললাম, “শেষে জলখাওয়াটা শুধু ঐ ঝর্ণার জলে সারবার ইচ্ছে আছে নলিনীবাবু, নইলে আপশোষ থেকে যাবে।”

নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন, বললেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করে ক্যান্টের ক্রিটিক্ অব পিওর রিজন—এতগুলি বইয়ের মধ্যে আসল বই কথামালাটাই আপনার বাদ পড়ে গেছে শৈলেনবাবু? আমরা নীচে জল খাচ্ছি, আর উপর থেকে বাঘ যদি বলে—ওরে অর্ধাচীন, তুই আমার পান করিবার জল ঘোলা করিতেছিস কোন্ সাহসে?—তখন?”

হো হো করে হেসে উঠলাম। হ'লও ভাল, বিপদের মুখেই হাসি, বীর-ধন্য ভাল করেই বজায় রইল, সঙ্গে সঙ্গেই করণ বাহাদুরকে ইসারা করলাম হাতীটাকে এগিয়ে দিতে।

করণ বাহাদুর হাতীর কানের গোড়ায় হাঁটু ছুঁতে চেপে ‘অঘঃ’ না ঐরকম কি একটা শব্দ করলে—সামনে যাবার। হাতী কিন্তু এগল না। তিন-চার বার ঐরকম করবার পরও ঘন অগ্রণর হ'ল না তখন কান থেকে অঙ্কুশটা খুলে নিয়ে মারলে উন্টো দিক দিয়ে একটা বাড়ি, তার পর গতেও নড়ে চড়ে না দেখে দিলে খোঁচার দিকটা খানিকটা দিয়ে। হাতীটা আর্জনাৎ করে উঠল, কিন্তু নড়ল না। তার পরই তার ভক্তি গেল বদলে, শুঁড়টা চালাতে লাগল, বীরটাতে আঙুটে আঙুটে দোল দিতে লাগল, একটা যেন ঐরকম নৃতন ধরণের ভাব। করণ বাহাদুর সামনে গলাটা

বাড়িয়ে কি যেন পরীক্ষা করছিল, হঠাৎ হাতীটা সামনে হন হন করে এগুতে আরম্ভ করলে।

করণ বাহাদুর মাথাটা একবার ঘুরিয়ে বললে—“হজুর, কবে হাওরা ধরে থাকুন...”

“কেন রে?”

“হাতী পাগল হবে...হয়েছে...”

বলতে বলতেই হাতীটা গাছের নীচে এসে পড়েছে, ধারেই একটা নীচু ডাল ছিল, হাওদায় লেগে মটাস্ ক'রে গেল ভেঙে, আমরা হাওদার পাদানের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম বলে বেঁচে গেলাম, সরু ডাল বলে হাওদাটাও নষ্ট হ'ল না, কিন্তু বেশ খানিকটা একপেশে হয়ে গেল। করণ বাহাদুর মার ছেড়ে আদর খোসা মোদ ধরেছে, আমরা গাছের মাঝখানে একটা বেশ মোটা ডালের নীচে এসে পড়তেই বললে—“এই ডালটা ধরে উঠে পড়ুন হজুর, আর কোন উপায় নেই, ক্ষেপেই উঠেছে।”

আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে বাঁ হাতটা পেছনে করে ক্রমাগতই তাগাদা করতে লাগল—উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাল ধরে উপরের মোটা ডালটা চলে যান—নইলে ..”

আমরা আর বিলম্ব না করে ডালটা জড়িয়ে উঠে পড়লাম। সেই ডালটা থেকে একটা ফাঁকড়া বেরিয়ে উপরে একটা বেশ মোটা ডাল ঘেঁষে উঠে গেছে, সেইটে বেয়ে আমরা তার উপর গিয়ে বসলাম। হাতীটা তখন একেবারে ক্ষেপে গেছে, প্রথমে শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে হাওদা আর মাহুত দুটোকেই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে, হাওদাটা একেবারে পেটের কাছাকাছি নেমে এল, করণ বাহাদুর কিন্তু ঝুঁকে পড়ে পর কানের গোড়া ছুঁতে ধরে চেপে পড়ে রইল। হাতীটা শুঁড়টা আছড়াচ্ছে ওকে ধরবার জন্তে, কিন্তু অল্প জায়গার মধ্যে এমন ভালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে যে ওকে স্পর্শই করতে পারছে না ভাল করে।

আমরা প্রায় উঠে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা এ ডালটার তলা থেকে সরে গিয়েছিল, ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার ফিরে এল, তারপর আমরাও চৈতিয়ে উঠেছি ‘তুমিও উঠে এসো করণ বাহাদুর’ বলে, সেও ঘাড়টা কি ভেবে একটু তুলেছে, এমন সময় হাতী ডালটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পরলে, বার তিন চার ছলিয়ে ছলিয়ে যেন দেখে নিলে কতটা শক্ত, তারপর একটা প্রচণ্ড নিনাদনের সঙ্গে মড় মড় করে ডালটা ভেঙে ফেললে। নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন—“শাস্ত্রব্যাক্যের মূল্য আছে শৈলেনবাবু।”

বললাম—“ভাবছি, করণ বাহাদুরও উঠে এল না কেন—”

“বোধ হয় শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ বলে..আমাদেরই প্রথম চাপ্স নিতে দিলে, যুধের নানা দোষ তো...”

ডালের গোড়াটা তখনও শুঁড়ির সঙ্গে লেগে রয়েছে, হাতীটা সেইটে চেপে চেপে ধরতে লাগল নিজের গায়ে, অর্থাৎ করণ বাহাদুরকে পিষে মারতে চায়, হাওদাটা দিতে লাগল বাধা, পেট থেকে বুলে পড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে আর সেইজন্যই শরীরের সঙ্গে ডালটার একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছেই। শেষ পর্যন্ত কি হ’ত বলা যায় না, কিন্তু কতকটা এই রকম টানাটানিতে এবং কতকটা নিজের ভারে ডালটা এক সময় আলাদা হয়ে গিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। হাতীটা আবার ছলিয়ে ছলিয়ে তুলে নিয়ে দেখলে সত্যবহর করা যায় কি না, তারপর আবার একটা চীৎকার করে হন্ হন্ করে গাছের তলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। করণ বাহাদুর একবার ঘাড়টা একটু বঁকিয়ে কি বললে—“আহু-ইহু” দিয়ে হলও বেশ বুঝলাম, বলছে—ভয় ক’রো না আছি।

নলিনীবাবুরও পরিহাস-প্রিয়তা বন্ধ হয়ে গেছে, বললেন—এত ভয়ের মধ্যে লোকটা এখনও শুধু আমাদের ভয়ের কথাই ভাবছে মশাই! কি কাণ্ড! কি খাতু দিয়ে এরা তৈরি!”

হাতীটা বাড়ীর দিকেও না, ষ্টেশনের দিকেও নয়, বাস্তা একেবারেই ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের সমতলের দিকে এগিয়ে চলল। শেষ যা দেখলাম—একখানি প্রায় মণখানেকের পাথরের টাই তুলে নিয়ে পেছন ঘেঁষে ছুঁড়ে মারলে। পাথরটা করণ বাহাদুরের হাতকয়েক দূর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাওদাখানিকে চূরমার করে দিলে। এর পর গোটা দুই আওয়াজ ছাড়া হাতীর খবর আর কিছু পাওয়া গেল না, শেষটা মনে হ’ল, মাইল দুয়েক দূরে কোনখান থেকে এল যেন।

এবার চিন্তা হ’ল কি করা যায়। হাতীর আওয়াজ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যা দেখা গেল তার পর নামতে আর কাকুর সাহস হচ্ছে না। করণ বাহাদুর ভরসা দিয়ে গেল, কিন্তু সেও নিতান্ত অনিশ্চিত একটা ব্যাপার, হাতী যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাকে শেষ করে না কেলে, তবু ও-হাতীতে চড়ার আর কথাই উঠতে পারে না। এক, যদি ওটাকে কোনরকমে রূপনগরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেখান থেকে তাঁরা তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করবেনই।

গাছেই বসে আছি, শরতের ছোট বোলা, দুপুর গড়িয়ে

বিকেল এসে পড়ল, বোধ হয়ে উঠল হলদে। প্রচণ্ড ক্ষিপে পেয়েছে, কিন্তু উপায় কিছু নেই। যতই সময় বেতে লাগল, আলোর সঙ্গে আশাও হয়ে আসতে লাগল স্তিমিত; এই ভয়টাই মনে অধিকার বিস্তার করতে লাগল—নিরঙ্ক উপবাস দিয়ে সমস্ত রাত্রিটা গাছের উপর কাটাতে হবে নাকি! একটা কোন ব্যবস্থা করে নিতেই হবে যে।

গাছটা চেনা গাছ নয়, কোনও ফলও নেই যে চেনা না হলেও পরীক্ষা করে দেখা যেত। গাছের নীচেও মাত্র লম্বা লম্বা ঘাস, মত্ত হাতীর দাপটে বিমদ্বিত হয়ে রয়েছে। সম্বলের মধ্যে সিগারেটের টিন, আর আমার নস্তির ডিবে। এক সময় একটা সিগারেট টানতে টানতে নলিনীবাবু বললেন—“এ অবস্থায় নিশ্চিন্দ হয়ে সিগারেট টানার মধ্যে একটা বীরতাব আছে বটে, কিন্তু তাতে চলবে না। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল, একবার নেমে একটু সন্ধান নিতেই হবে। পাহাড়ে আতা থাকা খুব সম্ভব, তার কয়েকটা গাছও আমি দেখেছি আসতে আসতে...দাঁড়ান হয়েছ, একটা জায়গাও আমার মনে পড়ছে, পথের ধারেই, বেশী দূরও নয়...”

এ ডালটা বেশ মোটা, মাঝখান থেকে অনেক ছোট বড় ডাল বেরিয়ে যাওয়ায় পড়বারও ভয় নেই। নলিনীবাবু একটা ডাল ধরে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নীচের দিকে দৃষ্টি পড়তে এক রকম চোঁচিয়ে উঠলেন—“শৈলেনবাবু জোর বরাত—উত্তোগিনপুরুষসিংহম্—কি যে বলে..এ দেখুন।”

ওঁর তর্জ্জনী অহুসরণ করে দেখি অন্তপ্রায় সূর্যের রাঙা আলো পড়ে ঘাসের ভেতর কি একটা চিকচিক করছে। একই লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম—আমাদের টিফিন কেরিয়ারটা। তার একটু দূরেই আর একটা কি চিকচিক করে উঠল, ঠাহর করতেই বোঝা গেল আমাদের বন্ধুটো—হাওদা কাং হতেই ছুটে নিশ্চয় নীচে পড়ে গিয়েছিল।

আমি নলিনীবাবুকে ধরে ফেললাম, বললাম, “আপনি কলকাতার মানুষ, মছমেট হল আপত্তি করতাম না, কিন্তু গাছে উঠা-নামা করাটা আমারই এলাকার মধ্যে পড়ে, বহন আপনি।”

একই অহুযোগের দৃষ্টিতে চাইলেন নলিনীবাবু, বললেন, “আমি দেখলাম, আর আপনি আশ্বাস্য করবেন, তার পর ‘আমার কলকাতা আর আপনার বেহারের পেট’ এই ছুতোয় বড় ভাগটা দখল করবেন—এ বীর-ধর্ম হয় না শৈলেনবাবু...”

ডালপালার মধ্যে দিয়ে শুঁড়ি পর্যন্ত বেশ গেলেন নলিনীবাবু, তার পরে নামতে যাবেন, কি যেন একটা দেখে

ধমকে গেলেন, তার পর যেভাবে অতি সন্তর্পণে পা কেলে ফেলে ফিরে এসে আবার বসলেন আমি বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, “ব্যাপারখানা কি নলিনীবাবু, ফিরে এলেন যে।”

বেশ বোঝা গেল গলা শুকিয়ে গেছে, টিনটা আমার কাছে ছিল, বললেন, “সিগারেট একটা।”

দু-একটা টান দিয়ে বললেন, “সরুনাশ হয়েছে শৈলেন-বাবু, আর ফিরে যেতে হবে না—”

“সে কি!”

একটা চরম ভয় আর নিরাশার জগ্নেই বোধ হয় নলিনী-বাবুর স্বভাবসিক্ত কৌতুকপ্রিয়তা আবার ফিরে এসেছে, সিগারেটেও বোধ হয় একটু কাঙ্ক্ষ হয়েছে, বললেন, “পুরুষ-সিংহ চিতার পাল্লায় পড়েছেন, হুন্দরী আবার সদ্য-প্রসূতি...”

“কোথায়?”

নলিনীবাবু নীচু হয়ে এক দিকে চাইলেন। ঠর দৃষ্টি অন্তরঙ্গ করে দেখি প্রায় শ'খানেক হাত দূরে একটা ছোট, ছাততিনেক ঊঁচু টিলার উপর হামাগুড়ি দিয়ে একটা চিতা বসে মাঝে মাঝে লেজ আছড়াচ্ছে আর ছুটি বাচ্চা সেই লেজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করছে।

অন্তমিত সূর্য্যের আভাষ একটা দুর্লভ-দৃশ্য, কিন্তু সে দেখবার আর সময় নেই। আমরা যে ডালটা ধরে উঠে-ছিলাম এই বড় ডালে, তাড়াতাড়ি সেটি ধরে নীচের ডালে নেমেই কোমরের ব্যাপারটা খুলে ডালে বাঁধতে আরম্ভ করলাম। শৈলেনবাবু প্রশ্ন করলেন—“ব্যাপারখানা কি? অভিযান্য বাচ্ছেন? আরে, সেই রাজা কি, তাঁর মন্তন অতিথি-সৎকারটাই তো ভালভাবে করা যাবে—”

বললাম, “আপনিও নেমে আসুন তাড়াতাড়ি এই ডালে, গেরোটা চেপে ধরুন, বন্ধুটা নিয়ে আসি, অত ঘুরে যাবার সময় নেই।” উনি আসতে আসতেই আমি ব্যাপার ধরে পা-টা নামিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আর এগুনো গেল না।

এখান থেকে দৃষ্টির আর কোন প্রতিবন্ধক নেই; মনে হয় হাতীর ব্যাপার থেকেই চিতাটার বোধ হয় এই জায়গাটির উপর লক্ষ্য ছিল, ব্যাপারটা খুলে পড়তেই বোধ হয় একটু সতর্ক হয়ে পড়েছিল, আমার পা নামতে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। তার পরেই হস্তমানের মত আগে পিছে ছলে ছলে অগ্রসর হ'ল। আমি যে উপরের ডালটা পর্য্যন্ত পৌছতে পাবলাম, তার কারণ নিশ্চয় বাচ্চায়া পিছু ডেকে দিয়ে থাকবে। একটু পরেই শাবক দুটিকে সঙ্গে করে আধ-ছোট্টা হয়েই এসে ঘাড় তুলে একটা আওয়াজ করলে।

নলিনীবাবুর চরিত্র দেখে বিস্মিতই হয়ে গেলাম, সমুখ বিপদের মধ্যে ঠর কৌতুকপ্রিয়তাটুকু যেন আরও ফুটে বেরিয়েছে। বোধ হয় এইটে বজায় রেখে উনি চিতার পথটা রাখছেন পরিস্কার। বললেন, “শৈলেনবাবু, মশাই, সামান্য একটা চিতা-বাঘিনীর ভয়ে হাত-পা আলগা হয়ে পড়ে যাওয়া বীর-ধর্ম্ম হবে না, তার চেয়ে এক একটা ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখি আসুন ব্যাপার দিয়ে।”

বললাম, “চিতা তো কিন্তু গাছে গুঠে।”

“জানি, বাধা থাকলে আমাদের লড়বারও সুবিধে হবে, ‘উই স্কল ফাইট উইথ আওয়ার ব্যাক টু দি’ ডাল।... নিন্ এইবার এই ক'টা হাত দিয়ে বেশ ভাল করে গুঁড়ো করুন দিকি। আপনার তো বেহায়েম খৈনি দলা হাত।”

টিনে গোটা চল্লিশ সিগারেট ছিল, অর্ধেকগুলো আমরা দিলেন, প্রশ্ন করলাম, “একি হবে?”

“বাকর, আপনার নস্তির ডিবেটাও উজোড় করতে হবে। কিছু নাও হতে পারে, তবু কোন জিনিসই অবহেলার নয়, একেবারে সামান্যামনি এলে, দু'মুঠো ঝেড়ে দেব, চোখে নাকে যদি যায় তো দিতেও পারে কাজ। বেটি তো পণ্ডিতবংশের মেয়ে নয়—নস্ত্র নাও বরদাস্ত হতে পারে।”

নীচে থেকে একটা আওয়াজ হ'ল, “হুম্!” একটু গা ঢাকা হলে বোধ হয় বেশী খোলে।

নলিনীবাবু চাপা গলায়ই উত্তর করলেন, “বেশ-তো, বসে বসে শাস্ত্র আলোচনা করা যাবে।”

আমরা বেরিয়েছিলাম ত্রয়োদশীর দিন। দিনটাও শুভ, আর অন্তত পূর্ণিমাটা বাড়ীতে কাটাও এই রকম ইচ্ছা ছিল। সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ হয়ে উঠল স্পষ্ট।

সৌন্দর্য্যে ভীষণতায় অত অপরূপ পৃথিবীকে আর কখনও দেখি নি। আমার মনে হয় সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতর করে বিকশিত করবার জন্যে তার পেছনে চাই একটা ট্রাজেডি। তাই হয়েছিল সে রাতে, আর তো তোমায় ছেড়েই যাচ্ছি হে মুন্সে ধরণী—হে চির-নবীন পুরাতনী...

না, এ কথাটা বোধ হয় একটু বেশী রকম ভাবালু হয়ে পড়ল। আমরা যে এত নিবিড়ভাবে সেদিন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পেরেছিলাম তার আরও একটা কারণ ছিল—যতই রাত এগুতে লাগল ততই বুঝতে লাগলাম বাঘিনীর গাছে উঠবার কোন অভিসন্ধি নেই। আশ্চর্য্যই বোধ হতে লাগল—প্যাছারই হোক, লেপার্ডই হোক, গাছে উঠা চিতাবাঘের রপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমাদের নৈশ অতিথির কোন রকম তাগিদ নেই। একবার সমুখ গোড়ার দিকে গুঁড়ির কাছে এসে ঘাড় উচুনিচু করে যেন তদারক করে গেল, তারপর আর কিছু নয়। ঠিক বুঝতে পারা

যাচ্ছে না; হতে পারে, উপরে বখন শত্রুই রয়েছে, বাচ্চাগুলোকে একা ফেলে রেখে যেতে চায় না, এও হতে পারে যে মাহুশ-শত্রুই অভিজ্ঞতা আছে। কিংবা এও হতে পারে ভেবেছে—শিকার ত মুঠোর মধ্যে কিসের তাড়া। এত, অববোধের দ্বারা শত্রুকে কবতলগত করা বাক না।

জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটেছে, আমাদের সামনে গভীর অ-ণ্য, ওদিকে বিস্তীর্ণ সমতল, মাঝখানে আমাদের এই কতকটা পাতলা পাহাড়-বন। আমাদের গাছটা খুব পুরনো, কিন্তু খুব ঘন ডালপালার নয়, দিকচক্রবাল পর্যন্ত সমস্তটুকুই আমাদের দৃষ্টির সামনে ঝলমল করছে। রাত্রির প্রথম অংশটা ছিল শুক, তারপর যতই গভীর হতে লাগল ততই এদিকে ওদিকে এক একটা যে আওয়াজ উঠতে লাগল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ক।

আমাদের পায়ের নীচে আমাদের মৃত্যু। স্থানিষ্ঠিত, বেশ জানি, একটু যে অনিশ্চয়তার কথা ভাবছি সেটা একটা সাস্থ্য নাজি, যতক্ষণ খাস ততক্ষণ আশও তো।

নলিনীবাবু বললেন, “শৈলেনবাবু, বাঘিনীই তে’, নোলা আছে, আমাদের জ্যোৎস্নায় জারিয়ে নিয়ে তারপর থাকবে।”

এক সময় ডি. এল. রায়ের সেই গানটাও ধরলেন—
আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো...বেশ উন্মুক্ত গলাতেই।

নীচে থেকে মাঝে মাঝে বাঘিনী—হুম্ হুম্ করে সাহ্য দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সঙ্গত।

এক সময় ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন—“শৈলেনবাবু, মরবার আগে ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে বাই আর বেন মাহুশ হয়ে জন্মাতে না হয়। বড় কুৎসিত আমরা! চেয়ে দেখুন নীচে, কি অদ্ভুত স্থান! ভাবছি, মাহুশ আমরা কাপড়-জামার ফাঁকিবাঁজির সৌন্দর্য নিয়ে লোপাটাই হয়ে গিয়ে ওদের জায়গা ছেড়ে দিই না কেন এবার, বুদ্ধির যুগের বোকাখিটা দেখাও তো হ’ল অনেক, এবার একটা সৌন্দর্যের যুগই আসুক না।”

ভোর হ’ল। আমরা মাহুশের জগতে ফিরে এলাম। আবার একটা অদ্ভুত ধরণের আশা বাঁচতে হবে, উপায় বের কর।...আদি যুগ থেকে যে বিবস্মান মাহুশকে এসেছেন বাঁচিয়ে, বেদ-সঙ্গীতে নিয়ে এসেছেন পূজা, তাঁকে যুক্তকরে অভিনন্দন করলাম।...হে দেব, বাজি, তবু মাহুশের হয়ে তোমায় যে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার অবসর পেলাম, এও তো পরম সাস্থ্য না।

আজও বাঁচালেন, দিবালাকে রহস্তটা প্রকাশ পেল।

সকাল হতে বাঘিনীর চেহারা গেল বদলে।...এ কি রকম কথা!—সমস্ত রাত ছাঁ-পো নিয়ে উপোসী বসে আছি, কিনা শ্রেফ গান গেয়ে রাত কাটিয়ে দিলে!

লেজ আছড়াতে লাগল আর উপরে চেয়ে চেয়ে হুকার, তার পরেই ছুটে গিয়ে তব তব করে গুঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে গেল। তার পর কিন্তু সেখান থেকে এক লাফে নেমে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে থাকা দিয়ে মুখ আঁচড়ে আবার বাচ্চাদের মধ্যে এসে বসে হাঁকাতে লাগল। আমাদের অবস্থা সহজেই অহুমেধ, দু’জনেই কাঠ হয়ে বসে আছি।

বারচায়েক এ রকম হয়ে গেলে, নলিনীবাবু উঠলেন, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুনলেন না, বললেন, “এ বীর-ধর্ম নয় শৈলেনবাবু, স্থান্যী আসতে পারছেন না, দেখতে হয় তো সিংহদ্বারে কি বাধা পাচ্ছেন।”

পরে টের পেলাম আন্দাজটা করে নিয়েছিলেন বলেই এত সাহস। নিষ্কম্প পদে প্রায় ডালের গোড়ার কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন, তার পর খানিকক্ষণ ধরে দেখে দেখে চীৎকার করেই উঠলেন একরকম—“শৈলেনবাবু, নারায়ণী সেনা! শীগগির দেখে যান—ভয় নেই...” বাঘিনীও খানিকটা এগিয়ে এল, কিন্তু তারপর আর কেন এল না বলতে পারি না, সেইখান থেকেই একটা হুকার ছাড়লে। নলিনীবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন—“খামু মাগী, বোঝা গেছে মুরোদ!”

এমন কিছুই নয়, কাঠপিঁপড়ে, কিন্তু এত যে সমস্ত গুঁড়িটি যেন হলদে করে রেখেছে। একটা চাপ, আস্তে আস্তে উপরেও যাচ্ছে নীচেও আসছে, কিন্তু প্রয়োজন হলে যে কত ক্ষিপ্ত—তাও দেখে নিলেন নলিনীবাবু, পকেট থেকে ক্রমালটা দিলেন সেই চাপের গায়ে ছুঁড়ে। কে যেন লুফে নিলে ক্রমালটা, মিনিটখানেকের মধ্যে সেটা একটা হলুদের স্তূপ হয়ে গেল।

নলিনীবাবু বললেন আর ভয় নেই। এইবার শুধু যুক্তটা আরম্ভ করে দেওয়া।

বিস্মিতই হয়ে গেছি, প্রশ্ন করলাম, “সেনারা তো আমাদের দিকেও আসতে পারে, আসেই নি বা কেন?”

নলিনীবাবু বললেন, “ঠিক বলতে পারছি না মনে হয় মাঝের গুঁড়িটার উপরই কোন বড়গোছের ভোজ পেয়েছে...আমাদের সন্ধান পায় নি এখনও এটাও ঠিক। বাক, তাড়াতাড়ি লড়াইটা আরম্ভ করে দেওয়া বাক।... খুব কিন্তু তরল হতে হবে আর খুব সাবধান...”

একটা লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে তার মাথাটা পিঁপড়ের চাপের উপর ধরলেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সামনের পাতার অংশটা হলদে হয়ে গেল; নলিনীবাবু গোড়াটা

আমায় ধরিয়া দিয়ে বললেন—“আলগোছে খরে নিয়ে গিয়ে শীগগির বেটির সামনে ফেলে চলে আসুন।”

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডাল ভেঙে নিলেন।

বাধিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডালটার উপর, কে জানে, বোধ হয় আমাদেরই একজন পড়ল ভাবলে।

অবস্থাটা বুঝতে না বুঝতে একেবারে গোটা চার ডাল তার ঘাড়ে পিঠে গিয়ে পড়ল ঝপ ঝপ করে।

তার পরই সে কি আছড়ানি আর চীৎকার! গাছের গোড়াটা যেন চষে ফেললে, তার পর উঠে আর বাচ্চাদের দিকে নজর না দিয়ে সোজা দৌড়, ঝর্ণা ডিঙিয়ে, পাশাড

ডিঙিয়ে সমতলের দিকে, তার পর ভুলটা বুঝতে পেরে ঘুরেই সোজা শালবন।

আর দেবি করা নয়, বন্দুকটি আগে হাত করা দরকার। ডালে আলোয়ান বেঁধে আমরা নেমে এলাম, খুলে আনবার উপায় পরে ভাবা যাবে।

বাচ্চা দুটো কিরকম হকচকিয়ে গেছে, মায়ের অবস্থা দেখে শুদিকে এগোয়গু নি, একটাকে তুলে নিয়ে নলিনীবাবু বললেন, “গেরো দেখুন না, এখন শুঁব ছেলেমেয়ে মানুষ কর তোমরা ব’সে ব’সে !...”

আগে চল

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে বিশ্বজন, শোম শোম আক নিমন্ত চলার গান,
গেয়ে চলে কবি, কণ্ঠে কণ্ঠে হটক সে চলমান।
বিদ্যাপতি সপ্ত অথ হর্যোর রথ টামে
চলে অবিরাম দিগ্দিগন্তে আধারের সন্ধান।
রথচক্রের অর্ধরে ওঠে পতিবেগ চকল
আলোকের ধূলি ঠিকিরিয়া পড়ে আলোকিয়া নভোভল।
দিনের হর্য নিশীথে দীপ্ত উদয়-অস্ত নাই,
আকাশ হইতে পৃথিবীতে পড়ে আলোক সর্বদাই।
অবিরাম পতি অকর জ্যোতি পৃথিবীর সমল
চলমান ধরা, যথুআবাদী চলার অমৃত ফল।
হর্যোর পানে চেয়ে দেখি তার অরন অব্যাহত
অচলারতনে কাগে সন্ধান, ভমিশ্র পরাহত।
হুট্টির আদি হ’তে চলা তার দিনেকণ্ড বিরাম নাই,
অন্তএব চল আগে চল সবে, আরো আগে চলে যাই।

যে মদী বহিরা চলে অবিরাম নির্মল তার বারি
যে বীণার তারে অনাহত সুর মহাকাশে ঠাই তারি ;

যে কুলের রঙে দাপ ধরে নাকো, সে কুলে দেবতা পূজি’
অস্তর মাঝে আমার আমিরে ভগ্নর হরে বুজি।
যমিতে যমিতে চন্দন দেয় অগন্ধ মনোলোভা।
প্রবল প্রবাহ কীণ ভরদে বাড়ায় মদীর শোভা।
শরানে থাকারে বলি কলিকাল, দাপর জাগিয়া ওঠা,
উঠিয়া দাঁড়াই সেই ত্রোতাঙ্গ, সত্যযুগই ত কোটা।
দেহ-আত্মার চরম বিকাশ নিমন্ত চলার মাঝে
সব পাপ সব হীনতা নাশিয়া আপনি মুক্তি রাখে।
বসিয়া বসিয়া দিন গগে যাত্রা হারার স্রোত বন
পাপ ঢোকে তার জীবন-রঞ্জে, ত্রীহীন শ্রান্ত জন ;
অগ্রগামীর সখা সহচর দেবতা দাঁড়ান পাশে
যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্য বসিয়া বসিয়া হাসে ;
যে উঠে দাঁড়ায় তার সাথে তার ভাগ্য দাঁড়ায় উঠে
হারানো দিনেরে কিরারে আনিতে বৃথ য়ে বৃথা হুটে।
অন্তএব চল, আগে চল তাই, চেরো না পিছন কিরে
দেখ সম্মুখে উদয় হর্য, জীবন-সাগর-তীরে।





রাজা রঘুনাথ মল্লের বয়স ও শক্তি অস্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন ওজনবাহী ব্যায়াম সরঞ্জাম, যে লৌহদণ্ডে গাঁট
লাগাইয়া আবার ধুলিয়াছিলেন তাহা এবং হাতের চাপে যে লৌহদণ্ডকে
বক্র করিয়াছিলেন তাহার আলোকচিত্র

[কটো—সেখক]

রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালঘণ্ডেব বাহাদুর

ত্রিবিধুভূষণ জানা

বাড়গ্রাম মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা নহর। অতীত
কালে ইহা উড়িষ্যাশিপতির শাসনাধীনে ছিল। প্রায় চারি শত
বৎসর পূর্বে রাজা রঘুনাথের পূর্বপুরুষ রাজা সর্বেশ্বরনারায়ণ
মল্লদেব সিজী কতেপুর অঞ্চল হইতে পুণীর ত্রীক্ষেত্র পর্য্যটন
করিতে আসিয়া এই মহকুমায় বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে
তিনি বাড়গ্রামে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা
উগালঘণ্ডেব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ইঁহার
বংশধরেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিজেদের বাহবলে রাজ্যের
স্বাধীনতা অক্ষুর রাখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে দাম দাঙ্গ
রাজ্যে ইঁহার ঈশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করেন।

এই বংশের রাজা সর্বেশ্বর একজন বিখ্যাত পালোয়ান
ছিলেন। তিনি বিভিন্ন হুদে ও শক্তি-পরীক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব
লাভ করিয়া রাজন্যবর্গের দ্বারা 'মল্ল' উপাধিতে ভূষিত
হইয়াছিলেন। ইঁহার অবশ্যম প্রায় অষ্টাদশ পুরুষের রাজা
রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উগালঘণ্ডেব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার
জাতিতে কজির।

রাজা রঘুনাথ একজন অমিত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।
তাঁহার শক্তি-কৌশল যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এদেশের
শরীরচর্চার ইতিহাসের একটি সৌরভময় অধ্যায়। বর্তমান
কালের কীর্ণকীবী ও ছর্ব্বলদেহীদের নিকট তাহা বিস্ময়কর
মনে হইবে। কারণ আজকাল সাধারণ ভাবে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ত
মানুষ বাংলাদেশে অতি বিরল। সামান্য ও মহাত্ম্যরতোক্ত
বীর-শ্রেষ্ঠদের কাহিনী আমাদের নিকট এখন নিছক গল্পে
পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেক পান্ডিত্যের ভাণ্ডে ও রাশিয়ার
কোমারের শক্তির পরিচয় বিস্তৃত হইয়াছেন। এবং আমাদের
দেশের ভ্রাম্যাকাত, ভীম ভবানী ও রামকৃষ্ণের কাহিনীগুলিও
গল্পের ভার বোধ হইতেছে। এমন কি শ্রদ্ধের ত্রীমুখ পোষর
বাবুর কথাও যেন লোকে ভুলিতে বসিয়াছে।

আমি রাজা রঘুনাথের সম্পর্কে পুথানুপুথরূপে অল্পসন্ধান
করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। রাজপরিবার ও
প্রতিবেশী প্রাচীন মাভস্করদের দ্বারা তাহা বাচাই করিয়া
লইয়াছি। আমি আরও দুই জন অনভিনায়ায় শক্তিশালী



বাড়গ্রাম ৰাজপৰিবারেৰ প্ৰাচীন ব্যাৰামাগাৰ। উচ্চ-উপাল পৰিবেষ্টিত ৰাজপ্ৰাঙ্গাদেৰ বহিৰ্ভাগে অবস্থিত
[ফটো—লেখক]

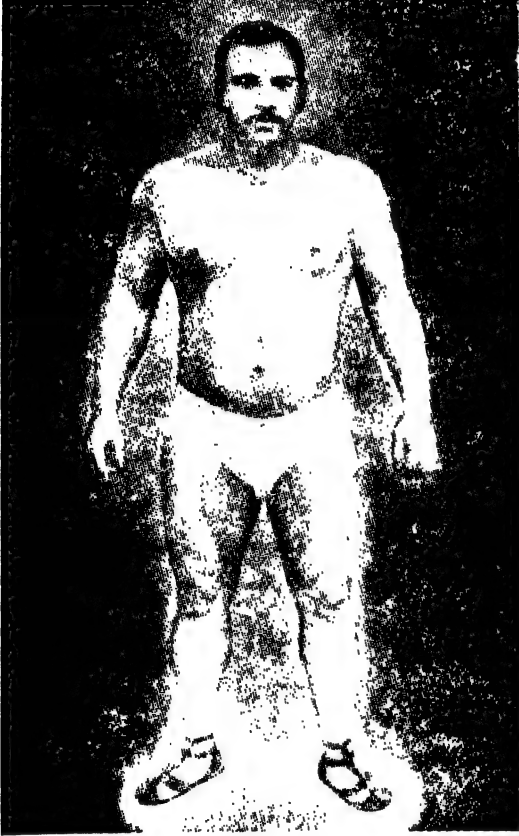


ব্যাৰাম-সৰঞ্জাম। প্ৰস্তৰ নিৰ্মিত একটা বৃহৎ বাল। ইয়া তায়-উড্ডোলনেৰ ব্যাৰামে ব্যবহৃত হইত।

১ম দিকের এক কোটা মুণ্ডরের ওজন একমণ পচিশ সের, ২য় কোটার ওজন একমণ বজ্রিশ সের।

ৰাজা ৰঘুনাথ এই সৰঞ্জামতলি লইয়া ব্যাৰাম কৰিতেন। [ফটো—লেখক]

পুরুষের বিষয় জানিতে পারিরাছি। এ সমস্ত আমার সংগৃহীত তথ্যের পরিপোষক। অহুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষে এরূপ আরও শক্তিমান পুরুষের পরিচয় পাওয়া যাইবে।



রাজা রঘুনাথনারায়ণ মল্ল উপালযুগের বাহাদুর

রাজা রঘুনাথ ১২৭২ সালে আষাঢ় মাসে রথোৎসবের পূর্বে-দিন ঝড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় এক দিন তিনি কোন কারণে ঝড়গ্রামে কিরিবার গাভী ঘরিতে পারেন নাই। মেদিনীপুরে রাজি-বাগনের অস্থিবা বুরিবা পদক্ষেপে ঝড়গ্রামে রওনা হইলেন। মেদিনীপুর হইতে ঝড়গ্রামের পথ জললাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র ভল্লকের আবাসস্থল, সুভরাং সন্ধ্যার পূর্বেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার জন্য তিনি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দৌড় বন্ধ করিলেই এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে রাজি হইয়া যাইবে এই আশঙ্কার ভীতাক্ষে অবিরাম দৌড়াইতে হইয়াছিল। তিনি নিজ গড়ে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে সকলে বিস্ময়ভিক্ষিত হইয়া যায়। ইহা লক্ষ্যপাশী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায়,

তিনি একাধিক বার অবিরাম দৌড়ে এই দীর্ঘ ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বাল্যকালবয়সে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী।

রঘুনাথ আঠার বৎসর বয়স হইতে ঝড়গ্রাম গড় পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ ও সু-উচ্চ উপালের বহির্ভাগে 'ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে' তাঁহাদের প্রাচীন আশ্রমের নিয়মিত শক্তিকর্মাধীন মনোযোগী হন, তিনি প্রথম মণ্ডার অধিবাসী হুয়ারী চোবে নামক একজন প্রসিদ্ধ মল্লকে নিযুক্ত রাখিয়া মল্ল-কীড়ার সদী করেন এবং ক্রমে ক্রমে শক্তি-চর্চার অস্বাভাবিক পরিবেশ স্থির করিয়া পঞ্জাবের গোলাপ খাঁ ও সাহাদাদী খাঁ, গুজরাটের বখরি মিঞা, এটোয়ারা সুলতান সিং এবং কাশীর শালগ্রাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতিক প্রায় পন্থ-কুড়ি বৎসর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ইহাদের সহিত প্রায়ই তাঁহার শক্তিপরীক্ষা হইত। রাজবাড়ীতে যে-কোন উৎসবের সময় মল্লযুদ্ধ ও নানাবিধ শক্তি-কীড়ার প্রদর্শনী একটি বিশেষ অঙ্গাঙ্গী পরিগণিত হইত। রাজা রঘুনাথ প্রায় এক মণ করিয়া দুইটি যুগের দুই হাতে তালিতেন। আড়াই মণ ওজনের পাথরের 'পাল' এক হাতে মস্তকের উপর উত্তোলন করিতেন। কাঠনির্মিত বহু 'জাকাল' (প্রায় তিন মণ) দুই হাতের সাহায্যে মাথার উপর তুলিতে পারিতেন।

রাজা রঘুনাথ এক মণ ওজনের যুগ্মকে একটি হস্তাঙ্গুলির উপর রাখিয়া থেলা দেখাইতেন। খোঁট খেঁজুর ও তাল গাছের জট ঘরিতা অনায়াসে উৎপাটন করিতেন। বহু তাল ও নাল গাছের উপরের কিছু শিকড় ও মাটি উঠাইয়া মূলদেশে শিকল বাঁধিয়া অবনত দেহে তাহা নিজ স্বদেশে জড়াইতেন এবং সোজা তাবে ঠাঁড়াইয়া যুক্তকৈ ও উৎপাটিত করিতেন। চারিটি অঙ্গুলি ওঁড়িকাঠের খুঁটির উপর দুইটি বহু কাঠের বীম সমান্তরালভাবে রাখা হইত। তাহার উপর হাতী উঠাইয়া, বীমের নীচে নামিয়া—বীম দুইতে পৃষ্ঠদেশ লাগাইতেন। অতঃপর বীম সহ হাতীটিকে পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া ভারসাম্য বজায় রাখিতেন। দুই হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য ও ৬'' ব্যাসের লৌহদণ্ডে দড়ির তার গাঁট দিতেন। এক সময় মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যাতিষ্ঠার কীরোদ বিহারী মল্ল মহাশয় ঐ প্রকার একটি লৌহদণ্ড আনিয়া রাজা রঘুনাথকে গাঁট দিতে বলিয়াছিলেন—রঘুনাথ অনায়াসে তাহাতে গাঁট দিয়া কীরোদ বাগকে হস্তবাক্ করিয়াছিলেন। কীরোদবাবু এই গাঁট দেওয়া লৌহটিকে পাশ্চাত্যের কোন এক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য যতটুকু ভদ্রপেক্ষা একই অধিক ব্যবস্থানে অবস্থিত দুইটি খামে, দুইটি বক্ষে অথবা দুইটি বহু খুঁটির মধ্যে উপুড় তাবে শয়ন করিয়া পদব্রজ দ্বারা ও হস্তদ্বয়ে ধাম দুইটিকে তৈলিয়া কঁক করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় সবে সবে ছুঁমির সহিত সমান্তর

ভাবে শরীরকে ধাম ছইটির শীর্ষদেশে উত্তোলন করিতেম ও ভূতলে নামাইতে পারিতেম। একবার একটি বিশাল মিশ্র-বৃক্ষের ছইটি বিপরীত দিকে প্রসারিত শাখার ব্যবধানে এই প্রকার প্রচাপন দেওয়ার বৃক্ষের মূল কাণ্ড ছই শাখার সহিত বিধাবিভক্ত ছইয়া গিয়াছিল। তিনি বৃক্ষের উপর পন্নর-বোল মণ ওজন গ্রহণ করিয়া মানাবিধ ক্রীড়া দেখাইতেম। তিনি টাঙ্গ-অফ-ওয়ারে একক একদিকে থাকিয়া প্রায় একশত শাখার ব্যক্তির গতিরোধ করিতেম।

তিনি কেবলমাত্র শক্তি-সাধনার কৃতিত্ব অর্জন করিয়া ছিলেন তাহা নহে, বস্তুতঃ তিনি বিভিন্ন বিদ্যারও সকলতা-

লাভ করিয়াছিলেন—জ্যোতিষ বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ও বাতবজ্ঞেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

রঘুনাথের দৈহিক ওজন ৩ মণ, উচ্চতার ৫'-১১" ইঞ্চি, বাহ ২০ ইঞ্চি, হাতি ৫২ ইঞ্চি ছিল। তিনি বাং ১৩১৭ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজা রঘুনাথের পৌত্র রাজা মনসিংদেব নিজ বদান্ততা যুগে বাঙালী রাজেরই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। তিনিও একজন কৃতী ব্যারামবীর এবং শিকারী, তিনি প্রগতিশূলক ও জাতীয় কলাপকর বহু প্রতিষ্ঠানের স্থাপনিতা এবং একজন বিভোৎসাহী ব্যক্তি। বর্তমান সময়ে তাঁহার তুল্য দাতা ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল।

রাজনগর

শ্রীনীমাধব চৌধুরী

৭

বঙ্গদেশী ও বঙ্গকট আন্দোলন, সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন, অসহযোগের ভীতি, বাংলার হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা, তারতবর্ষের অত্যন্ত কয়েকটি প্রদেশে বাঙালীর আন্দোলনের প্রতি সহায়ত্ব, কিছুই সরকারী নীতির পরি-বর্তন করিতে পারিল না। ১৬ই অক্টোবর হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলা বিভক্ত হইবে স্থির হইল।

বাঙালী জাতির একতা ও অবিভাজ্যতা প্রমাণ ও অরূপ করিবার জন্ত ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) বাঙালীকে রাবীন্দ্রনাথ ঊনসব ও প্রতিগৃহে অরুণ ব্রত পালন করিবার উপদেশ দিয়া রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্টজন পাল, রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির স্বাক্ষরে সংবাদপত্রে এক আবেদন প্রচারিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা দিলেন, উত্তর বঙ্গের মিলন-চিহ্নরূপ পরস্পরের হাতে রাবী বাঁধিয়া মগ্ন বলিতে হইবে—

তাই তাই এক ঠাই, তেদ নাই তেদ নাই—

আমরা এক, আমরা অখণ্ড।

বাংলার সর্বত্র হিন্দুরা ৩০শে আশ্বিন শোক-দিবস পালন করিলেন। কোম গৃহে উন্নত বলিল না।

কলিকাতার কি তাহে ৩০শে আশ্বিনের রাবীন্দ্রনাথ-ঊনসব পালন করা হইল আশিবার জন্ত দেবানন্দ ও তাহার বন্ধুরা ব্যগ্রভাবে সংবাদপত্রের অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতার সংবাদপত্র আসিলে দেবানন্দ আগে একখানি কাগজ সংগ্রহ করিয়া এই বিবরণ পড়িতে বসিল। সে পড়িল রাজধানীতে মোকামপাট, বাজার, বাসবাহন চলাচল সব বন্ধ ছিল।

সকালের দিকে দেখা গেল এক অতৃপ্তপূর্ণ দৃশ্য। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, ছাত্র, মাষ্টার, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, ভদ্র ও সাধারণ উত্তর শ্রেণীর অসংখ্য লোক খালি পায়ে গমন করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। গোটা কলিকাতা শহর যেন রাস্তার বাহির হইয়া আসিয়াছে। মোড়ে মোড়ে সওয়ার পুলিশ, সার্জেন্ট, কমেটবল টাঁড়াইয়া, তাহাদের ভাব দেখিয়া যেন হয় যেন শহরে একটা বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছে তাহারা।

ফেডারেশন স্ট্রীটের মার্চে বিরাট সত্কার অবগু বঙ্গতবসের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। সত্কার পৌরোহিত্য করিবার জন্ত ক্রম, যত্নপথযাত্রী আদম্মমোহন বহুকে আরাম ফেদারার শ্রদ্ধান অবহার সত্কারে আনা হইল। সত্যশেষে ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও আন্ততঃ্য চৌধুরী। ছাত্র ও ছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে গান করিল—

বাংলার মাটি, বাংলার কল,

বাংলার বায়ু, বাংলার কল,

পুণ্য হটক, পুণ্য হটক, পুণ্য হটক হে ভগবান।

বাঙালীর গণ বাঙালীর আশা,

বাঙালীর কাজ বাঙালীর তাহা,

সত্য হটক, সত্য হটক, সত্য হটক হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,

বাঙালীর ধরে বত তাই-বোন,

এক হটক, এক হটক, এক হটক হে ভগবান।

বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে বালক ও যুবকগণ প্রতীতি সঙ্গীত গাহিয়া মগ্ন ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করিল; বালক,

বুধ, বুধক পরম্পরের হাতে রাবী বাঁধিয়া দিল। সকলে মিলিয়া বদেশী-এহণ ও বিদেশী-বর্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। বাংলার আকাশ-বাতাস সেদিন বন্দোবস্তরক্ষণনিতে একশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। বন্ধত্বের বেদনার গোষ্ঠীগত ভাবে সেই প্রথম অভিজুত উত্তর বনের বাঙালী দেশের হাটে, মাঠে, বাটে ঘোষণা করিল :

তাই তাই এক ঠাই,
ভেদ নাই ভেদ নাই।

প্রাদেশিক ও অর্থনৈতিক রূপ অতিক্রম করিয়া বন্ধত্ব-বিরোধী আন্দোলন সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল সেই শ্রবণের ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন হইতে।

বাংলার প্রবল উত্তেজনার ভরস উৎকল, মাল্লাজ, বোম্বাই, পঞ্জাবে শিক্ষিত-সমাজ ও হাজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা আসিল। দূর দৌশেরা, রাওরালপিন্ডি, ফিরোজপুর হইতে বদেশী সত্যের সংবাদ আসিতে লাগিল। একখানি কাগজ লিখিল—বদেশী আন্দোলন ভারতবর্ষের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিতে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবে মনে হইতেছে।

মাল্লাজে ছর হাজার হাজ সত্য করিয়া বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহায়ত্ব জ্ঞানাইয়া টেলিগ্রাম পাঠাইল। মধ্যপ্রদেশ হইতে ধবর আসিল অমরাবতী সরকারী স্কুলের কয়েকজন হাজ বদেশী-সত্যের বোগ দিয়াছিল বলিয়া শিক্ষকগণ তাহা-দিগকে বেজপ্রহার করিয়াছেন ও স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। খালি পায়ে স্কুলে বাইবার অপরাধে ঢাকা কলেজ ও স্কুলের ২৭৫ জন ছাত্রকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির করিয়া দিবার ও বাকী ছাত্রদের নিকট কৈকিয়ত চাহিবার ধবর পৌছিল। বাংলার ছাত্রমহলে বিকোভ দেখা দিল।

দেবানন্দ বরিশাল কলেজে তর্জি হইয়াছিল। কলেজের ছইট ছেলের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধিতা জন্মিয়াছিল। ইহাদের নাম মহেন্দ্র ও অতুল। অতুল ছিল শক্তিম্যান, স্পষ্ট-বাদী ও সাহসী, ইংরেজের উপর হাড়ে হাড়ে চট। মহেন্দ্র ছিল মিঠাবান, বর্ণপ্রবণ ছেলে। সে ভাল গান করিতে পারিত। রাজনীতি চর্চাতেও তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাহার প্রিয় কাগজ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা। তাহা ছাড়া হিত-বাদীতে কাব্যবিশারদ কি বদেশী কবিতা লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ নুতন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিলেন—এ সকল সে সাগ্রহে সংগ্রহ করে ও বন্ধুদের পড়িয়া শোনার।

কলিকাতা ও মক্‌সলের অনেক স্থানে বদেশী প্রচারের জন্য ছাত্রকমিটি গঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার কমিটি ছাত্র-সমাজের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া বিবৃতি প্রচার করিল। এই বিবৃতি প্রকাশের কলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষভাবে ছাত্র-সমাজের উপর পড়িল এবং কৃত্যাত লারন ও কারলাইল সায়কুলার বাহির করিবার প্রস্তাব উঠিল।

নুতন বংসরের প্রথম দিকের কথা।

কলেজের হোটেলে অতুল ও মহেন্দ্রের ঘরে অথবা হোটেলের পিছনের দিকে বকুলভলার মাঝে মাঝে স্থানীয় ছাত্র কমিটির বৈঠক বসিত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলের ঘরে বৈঠক বসিলে অতুল পকেট হইতে কয়েকখানা ছাওবিল বাহির করিল। বলিল, দেবানন্দ, তুমি কেবল খুঁতখুঁত কর কোম কাছ হচ্ছে না, এই দেখ।

সে চোঁচাইয়া একখানি ছাওবিল পড়িতে লাগিল—

“বাংলার ঘরে ঘরে বদেশীমন্ত্রের প্রচার।

বদেশীভূত পালনের উদাত্ত আস্থানে দেশবাসীর অপূর্ণ সাতা।

বন্ধত্বের মর্মান্তক বাঙালীর বজ্রকঠোর পণ।

মিশনরী স্কুলের ঐষ্টান শিকরিজীগণ জুতা ও মোজা ত্যাগ করিয়া খালি পায়ে স্কুলে যাওয়াতে পাদ্রীপুত্রদের কোঁধ। মৈয়মনসিংহের মুচীগণ বিলাতী জুতা মোরামত করিতে অস্বীকার করিল। বোপাদের নুতন বিলাতী কাপড় কাচিতে অস্বীকার। কালীঘাটের বোপারা আর বিলাতী কাপড় কাচিবে না। বাবরগঞ্জের উজ্জিয়া পাচক ও ভূতোরা সত্য করিয়া জানাইয়াছে যে সকল বাড়ীতে বিলাতী জিনিস ব্যবহার ছর তাহার। সেখানে কাজ করিবে না।

আরও শুধুন—বিলাতী সিগারেটের ধূমপাতী বাহু-তারাকে বোড়ার পাড়ীর পাড়োয়ান পাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। বিলাতী কাপড় বেচিতে না পারিয়া মাড়োয়ারীদের মাথা হাত। বঙ্গ-কুলললনাগণ কাঁচের চুড়ি ও চীনা মাটির খেলনা ত্যাগিলেন। নেটিভ ঐষ্টান সমাজ বিরাট সত্য করিয়া ঘোষণা করিলেন—বিলাতী জিনিস বর্জন ও বদেশী গ্রহণ। ভাটপাড়ার পণ্ডিতস্কুল-চুড়ামণির বিহারের জেলায় জেলায় বদেশী প্রচার।”

অতুলের পড়া শেষ হইলে সকলে হাততালি দিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিল। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এ ছাওবিল কোথায় পেলেন?

অতুল—নদীর ধারে ছোট ছোট ছেলেরা বিলোচ্ছিন্ন।

নির্মল নামে একটি ছেলে বলিল, অতুলদা, আজকের ‘প্রতিজ্ঞা’ কাগজে একটি গ্র্যাণ্ড কবিতা বেরিয়েছে, শুনবেন?

অতুল—কি বলেছে কবিতার আগে বল শুনি।

নির্মল—বলেছে বিলাতী মার্কেটদের মালতর্জি জাহাজ-গুলো বন্দোপসাগরের জলে ডুবিয়ে দাও।

অতুল হাসিল। বলিল, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া বটে। কবি ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুত বল? ইতিহাস নিয়র এই কবিদের সম্বন্ধে কি বলেছে শুনবে? বলেছে, বাবা-সকল, বদেশীর জন্ম, বাবীনতার জন্ম আন্দোলন কর, তালই কিছু বস্তা বস্তা ছাড়ু টেলে স্নরেক ক্যান্ডেল বন্ধ করবার, পটকা মেরে কোর্ট উইলিয়ম দখল করবার প্রস্তাবগুলো আর করো না,

বক্তৃতা-মঞ্চ উঠে পাপলা দরবেশের মাচ দেখিও না আর।
সবাই হাসে এতে।

নির্মল অতুলের হাসিতে ও কথার সুর হইল। অতুল বলিল, তুমি চটো না নির্মল, তোমার এই “মাচ নাচ চাহুতা” আর “হে মাতঃ হুগী অসুন্দরনী” এই জাতীয় আফালম আমি সহ করতে পারি নে। মা মা করে চীৎকার করলে লিভার-পুলের লবণ আর ম্যানচেষ্টারের কাপড় বোকাই জাহাজগুলো ভুস করে তলিয়ে যাবে বঙ্গোপসাগরে?

নির্মল চট্টা গেল। বলিল, আপনার কানে এ ছাড়া আর কিছু পৌঁছায় না দেখছি। ভাল কাম হুটো তৈরি করেছেন অতুলদা। রাজপুত বীরদের দৃষ্টান্ত অসুরণ করবার জন্ত আবেদন, বাংলা মায়ের হুঃখমোচন করবার জন্ত চীন ও জাপানের পথে চলবার আবেদন—এ সব কানে পৌঁছায় না। শিবাজী মহারাজের গৌরবসাধা আপনি শুনে পান না।

নির্মলকে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে মহেন্দ্র বলিল, অতুল ষোর নাশিক, ওর কথা ছেড়ে দাও। বদেশীভ্রত সকল করবার জন্ত কালীঘাটে পুজা এবং হোমের কথা শুনে ও হাসে। মা কালীর সামনে বদেশী ভ্রত পালন করবার প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে শুনে ওর হাতের উদ্বেক হয়। কিন্তু ইংলিশম্যান কাপড় রাগে কাঁপছে, বলছে—বাঙালী বাবুর দল বদেশী ভাঙতা দিয়ে নিরক্ষর জনসাধারণকে বিপথে চালাচ্ছে, গবর্ণ-মেন্টের উচিত এর প্রতিবিধান করা।

দেবানন্দদের ছাত্র কমিটির কাজ তেমন ভাল চলিতেছিল না। ফুলারী-শাসনে দমননীতির চাকা কোরে ঘুরিতে লাগিল। শীঘ্রই ফুলারের বন্দেমাভ্যন্তরম-বিরোধী সারকুলার জারি হইল। তারপর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের লয়ালটি সারকুলার, ফারলাইল ও লারনের সারকুলার। অনেক অভিভাবক তর পাইলেন, অনেক ছাত্রের উৎসাহে ভাটা পড়িল। ইতিমধ্যে কলিকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এন্টি-সারকুলার সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ও মঞ্চগুলের অনেক শহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইল। দেবানন্দ, অতুল ও মহেন্দ্র পুরাতন ছাত্র-কমিটির কয়েকজনকে লইয়া একটি শাখা স্থাপিত করিল।

ইহার কয়েকদিন পরে লালমোহন ঘোষ দিনাজপুরে তাঁহার বিখ্যাত অসহযোগের বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আইন-সভার দেশী সভ্যরা, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ম্যুনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের সভ্যগণ এবং ইউনিয়ন পকারেংগণ পদত্যাগ করুন, দেশের সকল লোক এক বংসরের জন্ত শোক-চিহ্ন ধারণ করুন, সকল রকম আনন্দ-উৎসব বন্ধ রাখুন।—এই বক্তৃতা কয়েকদিন ধুব উত্তেজনার সঞ্চার করিল দেশের মধ্যে। কিন্তু উত্তেজনা কোম হারী কল এসব করিল না।

দমননীতির চাকা আবর্তিত হইতে লাগিল। রংপুরের

কীর্ত্তিমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সন বদলী হইয়া আসিবার পর হইতে শহরের হাওয়া গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে-দিন সমস্ত শহরময় উত্তেজনার বক্ক বহিতে লাগিল। মিঃ এমার্সনের আদেশে বন্দেমাভ্যন্তরম ধ্বনি দিবার অপরাধে কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলেকে বেত্র-প্রহারে জর্জরিত করা হইয়াছে, খবর রটিল।

সন্ধ্যার দিকে হোট্টেলে অতুলদের ঘরে কয়েকজনের মধ্যে অভ্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল। দেবানন্দকে সকলের অপেক্ষা বেশী উত্তেজিত দেখাভেছিল। অতুল ওম হইয়া ভাহার শুভ্রপোষের উপর বসিয়া ছিল।

মহেন্দ্র বলিল—ফুলার, এমার্সন ও কেম্প মিলে বরিশালকে শেষ করবে ঠিক করেছে। সুনলাম সেদিন কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে সেটলমেন্ট অফিসার মিঃ জ্যাকের বোট লফা করে নদীতে নাকি মাটির ঢেলা ছুঁতেছিল। এই অপরাধে বানরীপাড়ার পিটুনি পুলিশ বসাবার আদেশ দিয়েছে ফুলার সাহেব। বরিশালে বন্দেমাভ্যন্তরম ধ্বনি দেওয়া বন্ধ করবার জন্ত গুর্খা সৈন্ত আমদানী হচ্ছে। তাও শুনেছি।

দেবানন্দ বলিল—ছেলেরাও চুপ করে বসে নেই। বন্দেমাভ্যন্তরম বলার ধমকে দিলে গুরিয়েটাল সেমিনারীর ছেলেরা ফুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ঢাকার চার হাজার ছেলে সরকারী স্কুল কলেজ ছেড়ে চলে এসেছে। আসাম-সোল স্কুলের ষাট জন ছেলেকে এই অপরাধে বের করে দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের বহু ছেলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবানন্দ আবার বলিল—তোমরা এমার্সনের আদেশে বন্দেমাভ্যন্তরম বলবার জন্ত ছেলে-দের বেত মারার ব্যাপার শুনে উত্তেজিত হও, কিন্তু তোমরা জান না সেদিনকার বদেশীসভার যোগ দিয়েছিল বলে জেলা স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের প্রত্যেক ছেলেকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করবার আদেশ দিয়েছে এমার্সন। এদিকে মানারি-পুরে কি হয়েছে জান? এক সরকারী চাপরাশির সঙ্গে বন্দে-মাভ্যন্তরম বলা নিয়ে ছেলেদের কথা কাটাকাটি হয়েছে। চাপরাশির ধমকামিতে উত্তেজিত হয়ে ছেলেরা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিরাছিল। কলে ফুলারের আদেশে ছাত্রদের প্রকাণ্ডে বেতমারা হ’ল আর জরিমানা হ’ল দেখশো টাকা।

ধাক্কাটা রাত করিয়া দেবানন্দ সে দিন বাড়ীতে কিরিল। জীবানন্দ আপিসঘরে তখনও কাজ করিতেছিলেন। পূরকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া বাইতে দেখিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। ধীর স্বরে বলিলেন—কাল থেকে সকাল সকাল বাড়ী ফেরবার চেষ্টা করো। সময় ভাল নয়।

দেবানন্দ দাঁড়াইয়া শিবার কথা শুনি, তার পর ভিতরে

পরদিন জীবানন্দ চাকুরিহলে চলিয়া গেলেন।

মাতৃশ্রদ্ধ শেষ করিয়া জীবানন্দ রাজনগর হইতে চাকুরি-
হলে করিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে জগদ্ধাত্রীর অনুধেয়
আবার বাড়াবাড়ি হইল। ইহাতে হরিনারায়ণ বিশেষ চিন্তিত
হইলেন।

বড় ছেলে এসরের অন্তর্দানের পর হইতে জগদ্ধাত্রীর শরীর
ভাদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পূর্বের বাহ্য আর কিরিয়া পাম
নাই। কিছু দিন হইতে হরিনারায়ণের বাহ্যও একটু একটু
করিয়া ভাদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহা প্রবেশিকা পরীক্ষা
দিয়া কল বাহির হইবার জ্ঞপ্তি অপেক্ষা করিতেছিল। বৈবরিক
কাজে মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়িত। জগদ্ধাত্রী প্রভাব
করিয়াছিলেন ইহাকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া এবার বিষয়-সম্পত্তি
দেখিবার কাজে বসাইয়া দাও। হরিনারায়ণ বলিয়াছিলেন
—তুমি তুমি কেন তার লেখাপড়া বন্ধ করব? আমি বতদিন
আছি সে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করুক।

স্বামীর শরীর ধারাপ হইতে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী তার পাইয়া
সিরাহিলেন। স্বামীর আগে যেন তিনি যাইতে পারেন
ভগবানের কাছে মনে মনে নিয়ন্ত এই প্রার্থনা করিতেন।
মাঝে মাঝে ভাবিতেন ইহাদের বোঁ আনিয়া তাহাকে সংসার
বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিবেন। বড় ছেলের কথা
তাঁহার মনে পড়িত। বিবাহ হইয়া সে না চলিয়া গেলে এত
দিনে তাহার বোঁ আনিয়া সংসারের হাল ধরিত। তাঁহার
গত জন্মের পাপের শাস্তি পাইয়াছেন। এ জন্মে ত কোন
পাপ করেন নাই—আগের জন্মের পাপ না থাকিলে কপালে
এত শাস্তি লেখা ছিল কেন?

ইহাদের সম্বন্ধে স্বামীর কথার উপর তিনি আর কিছু
বলিলেন না। স্থির হইল, পাস করিলে সে সম্বন্ধে পড়িতে
যাইবে।

ইহা এখন উত্তরদেহ, বলিষ্ঠ তরুণযুবক। আগেকার
উচ্ছ্বাস-প্রবণতা খানিকটা চলিয়া গিয়াছে, তাহার জায়গায়
আসিয়াছে চিন্তাশীলতা ও গভীরতা। অন্তরঙ্গ জন্মের সঙ্গে কথা
বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, চাপা
হাসিতে বলকাইয়া উঠে, চিরুকের তীক্ষ্ণতা কোমল হইয়া
আসে। বাহিরের কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাহার
মনে হয় ইহার কৈশোর এখনও অভিজ্ঞ হইয়া নাই।

জগদ্ধাত্রী অনুহু হইয়া পড়িবার দিন হই আগের নিজের ঘরে
বসিয়া দেবানন্দের সঙ্গে চিঠি-পত্রে যে সব আলোচনা চলিতে-
ছিল ইহা তাহাই ভাবিতেছিল। পুলিশের অভিযানের কলে
বদেখী আন্দোলনে যেন তাঁটা পড়িয়াছে, এখন কি করা কর্তব্য
দেবানন্দ সেই কথা লিখিয়াছিল। দেবানন্দের কথাগুলি নিজের
মনে আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল
সর্বস্বদলার যুজ্জ্বল দিনকয়েক আগেকার কথা।

তাঁহার অনুধেয় সময় ইহা প্রতিদিন খবর লইবার জ্ঞ
টোলপাড়ার যাইত। প্রথম দিন গিয়া লক্ষীকে দেখিয়া সে
একটু অবাক হইল চিনির বিয়ের পরে লক্ষী আর তাহাদের
বাড়ীতে বিশেষ যার না। কয়েক মাস পরে ইহা তাহাকে
দেখিল।

লক্ষী এখন আর অমূল কথা বলে না। তাহাকে দেখিলে
—এই যে ইন্দির দাদা বলিয়া সম্ভাষণ করা অনেক দিন হইল
সে ছাড়িয়াছে। আজকাল দেখা হইলে চকিতে একবার
চাহিয়া সে খাড়া হেঁট করিয়া থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে
হুই-একটি কথায় জবাব দেয়। তাহার এই নূতন গাভীর্য
দেখিয়া সে হস্ত কখন-সখন একটু ঠাটা করে। ঠাটা শুনিয়া
সে যুহু হাসে, আগের মত পাটা ঠাটা করিবার চেষ্টা করে না।
পথে-বাটে হঠাৎ দেখা হইলে সে যেন একটু জড়সড় ভাব
দেখায়। পাস কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ডাকিলে
দাঁড়ায়, কিন্তু মাথা নীচু করিয়া এমন অশক্তির ভাব দেখায় যে,
ইহা আশ্চর্য্য বোধ করে।

প্রথম যেদিন সে সর্বস্বদলাকে দেখিবার জ্ঞ টোলপাড়ার
গেল সেদিন তাহাকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণ না করিয়া লক্ষী
এমন অন্তভাবে সরিয়া গেল যে ইহা বিস্মিত হইল। পরের
দিন লক্ষীদের বাড়ীতে চুকিতে গিয়া সে দেখিল লক্ষী বাহিরে
কোথায় যাইতেছে। সে পাস কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে,
ইহা তাহাকে ডাকিল। লক্ষী দাঁড়াইল। ইহা জিজ্ঞাসা করিল,
লক্ষী, তোমার কি হয়েছে? আমার সামনে তুমি অমন কর
কেন? - বিস্মিত হইয়া সে দেখিল লক্ষীর মুখ সিঁহরের মত
লাল হইয়া উঠিয়াছে। অতি ধীরে সে বলিল, কিছু ত হয় নি।
তারপর যাইবার জ্ঞ পা বাড়াইল। কি ভাবিয়া কিরিয়া
দাঁড়াইল। ইহাদের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া
ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি কি
রাগ করেছেন আমার উপর? ইহা অপ্রত্যাশিতাবে বলিল, না
না, রাগ করব কেন? লক্ষী কিরিয়া চলিল। কয়েক পা
গিয়া একবার কিরিয়া চাহিল। ইহা দেখিল তাহার চোখ-মুখ
বুগীতে বলমল করিতেছে। বতকণ তাহাকে দেখা গেল ইহা
সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে
প্রবেশ করিল।

এই সামান্য ঘটনাটা প্রায়ই ইহাদের মনে পড়ে। তাহার
মনে হইত একান্ত সহজ ব্যাপারটার আড়ালে কি যেন একটা
ঘটনা গেল। লক্ষীর এত বুগী হইবার কি ছিল, সে রাগ করে
নাই এই কথা করটি শুনিয়া? আর সেই-বা এই ভুল ব্যাপার
লইয়া এত মাথা ব্যাড়াইতেছে কেন? কিন্তু তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া
দিলেও কথটা প্রায়ই তাহার মনে পড়ে।

জগদ্ধাত্রীর অনুধেয় বাড়াবাড়িতে এ সব চিন্তা কোথায়
চাপা পড়িয়া গেল। সম্বন্ধে সাহেব ডাক্তার আসিল,

চিরবীর খণ্ডর বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনা হইল। চিরবীর বড় বোন যুগবীর গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। নিজের সংসার কলিরা সে মাতার যোগশস্যার পাশে দিন-রাত বসিয়া রহিল। দিদি শুধু বসিয়া বসিয়া কাঁদে, তিনি ছেলে-মাছুষ, ইহা নিজে টোলপাড়ার গিন্না জিনরনীকে ডাকিয়া আনিল। হরিনারায়ণ জীর অশুখে ফেরন অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাহার নিজের শরীরও ভাল নয়। সমস্ত দায়িত্ব ইহাদের কাঁবে আসিয়া পড়িল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া জিনরনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কয়েক দিন যমে মাছুষে চানচানি করিয়া জগদ্ধাত্রী এই বাক্য একটু যেন সামলাইয়া লইলেন। হরিনারায়ণ জীকে বলিলেন, বা ভয় পাইয়ে দিচ্ছেছিলে তুমি। তোমার শরীর আর একটু ভাল হলে বাইরে গিয়ে মাস কয়েক থাকব। চুনায় কিংবা বিছাটলে বাড়ী নেব ঠিক করেছি।

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন, তুমি যত শুধু খাওয়াও, ডাক্তার দেখাও—আমার শরীর আর ভাল হবে না। তা ছাড়া রাজনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

হরিনারায়ণ—কি স্বপ্ন?

জগদ্ধাত্রী একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তারপর বলিলেন, স্বপ্নে দেখলাম আমি যুত্যাংবার। কিসের আশার বেন প্রাণ বেরুচ্ছে না, অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। হঠাৎ চোখ মেলে দেখলাম ছারার মত কে একজন এসে আমার শিরেরে দাঁড়াল। তোমাদের কারো নজর পড়ল না তার উপর, আমি দেখেই চিনলাম তাকে। আমার বড় ধোকা। বললাম, ধোকা কিরে এলি বাবা? আমি যে তোর হাতের আঙনের পিত্যেণে মরতে পারছি নে। আমি উঠে বসে তাকে আদর করতে যাব এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল। ধোকা নিশ্চয় কিরে আসবে। রাজনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলিলেন। আজ কর বৎসর হইল প্রগর চলিয়া গিয়াছে, জগদ্ধাত্রী এখনও দিন-রাত কেবল তাহার চিন্তা করেন।

জিনরনী প্রতিদিন আসিয়া ভদ্বির করিতেন। তিনি তার লগুনাতে ইহা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিল। এখন মাতা একটু সুস্থ হইয়া উঠায় সে কিছু অবসর পাইল। সে সকালের দিকে কিছুসময় বিষয়-সম্পত্তির কাজ দেখিত, তারপর সারা-দিনের অবসরে রাক্ষের চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিত।

ইহা নিজের মনে হুঃখ করিত দেবুদার মত তাহার মনের জোর নাই। সে বড় হুঃখ প্রকৃতির মাছুষ। বাপের কথা ভাবে, মায়ের কথা ভাবে, সংসারের কথা লইয়া মাথা ঘামায়। সংসারের ভাবনা এত বেশী তাবিলে কি আর বেশের কাজ করা যায়? তাহার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইত। ভাবিত—

হয়ত তাহার আর পড়াশুনা করা হইবে না। সকালে বিকালে কাছারিতে বসিয়া নায়েবের সঙ্গে বকাবেকি, মাঝলা-মোকদ্দমার পরামর্শ, মোড়লদের দরবার শোনা এই করিয়া তাহাকে সারাজীবন কাটাইতে হইবে। তাহার পিতা অবসর সময়ে পড়াশুনা, সঙ্গীতচর্চা, শিকারচর্চা করিয়াছেন। আপদে-বিপদে গরীব লোকেদের সাহায্য করিয়াছেন। আত্মীয়-বন্ধনের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে সালিশী করিয়াছেন। সমাজ, সংসার সকলের দাবি তিনি সাধ্যমত মিটাইয়া দিয়াছেন বরাবর। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশের দাবি উপস্থিত হইলে তাহাও পূরণ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কর্তব্য পালনে তাহার কোথাও কোন ত্রুটি নাই। সে ভাবিত, তাহা হইলে সে কেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সে এই প্রশ্নের একটা সমাধানের স্বপ্ন পাইল দেবানন্দ্রের কয়েকদিন আগের এক পত্র হইতে। দেবানন্দ্র নিজের মনের স্বপ্নের কথা তুলিয়া লিখিয়াছে, তাহার পিতার মত বয়সের দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের কাছে দেশের দাবি যেভাবে আসিয়াছে তাহার কাছে ত সেভাবে আসে নাই। শুধু তাহার কাছে কেন, তাহার যুগের, পুতন শতাব্দীর কোন বাঙালীর ছেলের কাছে সেভাবে উপস্থিত হয় নাই। তাহার পিতা যে যুগের মাছুষ সে যুগের মাছুষদের কাছে স্বদেশী আন্দোলন আসিয়াছে মরা গাঙে হঠাৎ আসা জোয়ারের মত। আর দেশ যখন এই জোয়ারের জলে প্রাণিত তখন তাহাদের জন্ম। জোয়ারের জল সরিয়া যাইতেছে, এই প্রাবনের মধ্যে বাহাদের জন্ম হইয়াছে, বাঁচিবার জন্ত তাই আজ তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা ভাবিল—ঠিক কথা, কিন্তু রাজনগরে বসিয়া, সংসারের তার কাঁবে লইয়া সে কি চেষ্টা করিতে পারে? দেবুদা কি চেষ্টা করিতেছে তাহাও সে কিছু খুলিয়া লেখে নাই।

ইহা সংসারের কাজকর্ম করে, পিতার কাছে, মাতার কাছে দুই বেলা নিঃশিত বসে, জিনরনী রোঙ্গির সম্পর্কে বাহা করিতে বলেন তাহা করে, কিন্তু সর্বদা তাহার মাথার এক চিন্তা থাকে—সে কি করিবে? জিনরনীর সঙ্গে লক্ষী তাহাদের বাড়ীতে আসে, হরিনারায়ণের সঙ্গে আলাপ করে, জগদ্ধাত্রী আরামের জন্ত নানা রকমের ব্যবস্থা করে। নিজের চিন্তায় ইহা এত অগ্রমনস্ক থাকে আজকাল যে, কোনদিন তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা বলে, দুই-চারি দিন আবার তাহাকে লক্ষ্যই করে না। মাঝখানে কিছুদিন লক্ষীর কথা যখন তখন তাহার মনে পড়িত, মাতার অশুখে, নিজের মনের অনাড়ম্বরে সে সব কবে চাপা পড়িয়াছে। ইহাদের সত্বে লক্ষীর মনোভাব অনুমান করা কঠিন, সে দিকে যে সে সত্বে সচেতন ছিল তাহা তাহার ব্যবহারে কিছু বুঝা যাইত না। কিন্তু ইহাদের প্রতি

সে যে দুটি রাখিত তাহার পরিচয় পাওয়া গেল শীঘ্রই। সে লক্ষ্য করিত যে ইহা সর্বদা অতঃপূর্ব, কি একটা ভাবনা রহিয়াছে তাহার মনে। একদিন সে চিন্তারীক বসিল,

—চিহ্ন, ইচ্ছাদান সারা দিন কি ভাবেন এত? ছোঁঠাইয়া ত অনেকটা ভাল হয়েছেন তবু কি ভাবেন এত?

চিন্তারী হাসিয়া বলিল—তুই জিজ্ঞেস করলেই পারিস। দাড়া কি ভাবে তা মিরে তোর এত ভাবনা কিসের?

লক্ষী একটু বিব্রতভাবে বলিল, ভাবনা আবার কিসের? কণ্ঠাটা মনে হ'ল তাই বলছি। তুই ছোট বোন, তুই জিজ্ঞেস করতে পারিস মে?

চিনি—ছোট বোন গিরে জিজ্ঞেস করবে, হাঁ দাড়া, তুমি দিবানিশি কার ঘাম কর বল না তুমি? তাই না? দাড়া যদি বলে, যা যা কাঙ্ক্ষিত মেরে, তোর অত ধবরে কাজ কি, তখন?

লক্ষী—তা কেন বলবেন? তুই ভাল করে জিজ্ঞেস করবি।

চিনি—ভাল করে জিজ্ঞেস করব মানে? গলায় আঁচল দিয়ে হাত ছোঁড় করে বলব? না পা জড়িয়ে ধরে বলব? বরং তুই গিরে একটু মিষ্টি করে হেসে বললে কাজ হবে। দেখবি হয়ত বলে কেলেবেন, লক্ষী গো, আমি দিবানিশি তোমারই—

লক্ষী চিনির মুখে হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, তুই বড় যা তা বলিস চিহ্ন। মুখে কিছু বাধে না।

চিনি লক্ষীর হাত সরাইয়া দিয়া তুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, একটা কথা বলবি তাই? দাড়া—

লক্ষী বলিল, ঠাণ্ডা তাই, বহু ছোঁঠাইয়াইকে ভাবাক দিয়েছে না পড়ে পড়ে ঘুরছে দেখে আসি। চিনির হাত ছাড়াইয়া সে চলিয়া গেল।

চিন্তারী বস্ত্রবাকী হইতে হঠাৎ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাকে লইয়া বাইবার জড়। তাহার শাওড়ী বড় কড়া লোক। অল্প পিভাঝাতাকে দেখিবার জড় তিনি পুত্র-বধূকে পনের দিনের ছুটি দিয়াছিলেন। তাহার হুকুম ছিল পনের দিনের দিন বাপের বাড়ীর লোক যেন তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া যায়। চিন্তারী একথা বাড়ীর কাহাকেও বলে নাই। সন্তের দিনের দিন কড়া পজ লইয়া লোক আসিতে তাহার খেয়াল হইল। দাতা এখনও শয্যাশায়ী, পিভার শরীর ভাল নয়, তাহার এখন বাইবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পজের শাওড়ীর বেজাঙ্কের আভাস পাইয়া সে আপত্তি করিবার সাহস পাইল না। ইহা চট্টয়া লোক কিরাইয়া দিতেছিল, সে নিষেধ করিল। বলিল, ছোড়দা, যাদের ঘরে আমাকে দিয়েছেন তাঁদের চট্টয়ে কি হবে? তবু আমার লাহনা গল্পনা বাড়বে বইত নয়?

মুগ্ধ হইবার আগে চিন্তারী মাভার কাছে গিয়া বসিল কিছুকণ একথা ওকথা বলিয়া শেষে বলিল, যা, আমার একটা কথা শোন। সংসারের এই অবস্থা। তোমাকে, বাবা দেববার লোক নেই। দিদির নিজের সংসার আছে, সে আ ক'দিন করবে? আমার অবস্থা ত জানই, ছোড়দার বিয়ে দাও।

অগভীর বলিলেন, আমি সে কথা ভেবেছি চিহ্ন। ওঁতে দেববার এক জন লোক না হলে চলছে না। আমি বিছানা পড়ে আছি, ধমক-ধামকে কি চাকর দিয়ে কাজ করাতে হয় নিজে হাতে কিছু করতে পারি মে। ওঁর কি হবে ভেবে মরতে ভরসা পাচ্ছি মে। ভাল মেয়ে গেলে ছোট বোকা বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বৌজখবর করে কে?

চিন্তারী—এত বৌজখবরের দরকার কি মা, ভাল মেয়ে তোমার হাতের কাছেই রয়েছে। রূপেও গুণে ওরকম মেয়ে কোথার পাবে?

অগভীরী অনুমান করিলেন মেয়ে কাহার কথা বলিতেছে তবু তিনি বলিলেন, কার কথা বলছিস তুই?

চিনি—তোমার কি চোখ মেই? লক্ষীর কথা বলছি।

অগভীরী মুখ বিরস হইল। কিছুকণ তিনি কোন কথা বলিলেন না, শেষে বলিলেন, ছেলের বৌ করব সমান ঘরের মেয়ে এনে। টুলো পণ্ডিতের ঘরের মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারব না, তা মেয়ে বড় ভালই হোক। বংশের পৌরব নষ্ট করব?

চিন্তারী রাগ করিল। বলিল, এ তোমার অভ্যাস কথা মা। তা ছাড়া কাকাবাবু ত টুলো পণ্ডিত নন, তিনি বড় চাকুরে।

অগভীরী—চাকুরের আবার ছোট বড় কি? যে চাকুরে সে-ই চাকর। ও-ঘরের মেয়ে আমি আনব না।

চিন্তারী রাগ করিয়া বলিল, কেমন তুমি ভেমন দিদি। তাকে বলতে সেও তোমার মত নাক সিটকালো। কি যে বংশের বড়াই তোমাদের। অমন সোমার প্রতিমার মত মেয়ে—। আমি চললাম, কিন্তু এই বলছি তোমাকে, দেখো গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে। এক দিন হয়ত ঐ মেয়েকেই যেচে—

অগভীরী বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, বাবার সমস্ত কি যে অলক্ষ্যে কথা বলিস চিনি।

চিন্তারী উদ্ভীর্ণ পিভার ঘরের দিকে বাইতে দেখিল লক্ষী আসিতেছে। কাছে আসিয়া লক্ষী বলিল, আমার দেবী হয়ে গেল তাই আসতে। তর হয়েছিল তুই দুকি চলে গেছিস।

চিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুই যে আবার আসবি আমি তাবি দি। সকালে কাকীমাকে প্রণাম গেয়ে তোর লড়ে দেখা করে এলাম, কি জানি সময় যদি না পাই, যা তাড়াহুড়ো।

লক্ষীর হাত ধরিয়া সে মিছের ঘরে আশ্রিত। বলিল, বাবার আগে তোকে একটা কথা বলব বলে এ ঘরে আশ্রিত। শোন, মুখ তুলে তাকা দেখি আমার দিকে।

লক্ষী মুখ তুলিয়া চাহিল। চিরায়ী বলিল, তুই ছেলেবেলা থেকে শিবপুজো, ব্রত, নিয়ম কত কি করছিল। ঠাকুরের কাছে বর চাইবি—ঠাকুর, এতদিন ঘরে ভোমাকে কত ফুল ফুলো দিলাম, চিরায়ী ছোটদার সঙ্গে আমার বিয়ে ঘটবে নাও। পারবি বর চাইতে ?

লক্ষীর মুখ হইতে যেন সবটুকু রক্ত সরিয়া গেল, সে কোন উত্তর দিল না।

চিরায়ী তাহার গালে ঠোকা মারিয়া বলিল, জবাব দে। বর চাইতে পারবি না ?

দেখিতে দেখিতে লক্ষীর চোখ হইতে এক কঁোটা জল পড়াইয়া পড়িল। চিরায়ী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিল। বলিল, তোর মনের কথা আমি জানি। মনে মনে ঠাকুরের কাছে এই বরটা চাস তাই। আমি বাবার সম্মত তোকে মাথার দিয়া দিচ্ছি।

একটু পরে তাহার হুই জনে বর হইতে বাহির হইয়া হরিমায়ার ঘরে ঢুকিল।

কথন:

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দের দেহাবসান হয়। ইহার বৎসরের কাল পরে শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সার্থক হইতেছে না দেখিয়া, একবার বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাবর্তনের মূল স্বত্রের অব্ধেদ, দুর্ভাগ্য-বশত: বাঙালী জাতির পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের সহিত শ্রীঅরবিন্দের জীবন যে সমস্মৃতি গ্রন্থিত, ইহা তলাইয়া না বুঝিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার এই যুগ-পর্কট। চির অজ্ঞাতই থাকিয়া বাইবে। বেদান্তের কেশরীগর্জন তুলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন, অল্পকাল পরে শ্রীঅরবিন্দ সবাসাচীর স্তায় বাংলার কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মই প্রচার করিয়াছিলেন, সে ধর্ম ভারতেরই ধর্ম। সে ধর্ম ভারতের সনাতন যোগতত্ত্ব। শ্রীঅরবিন্দ একাধারে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুইকেই আশ্রয় দিলেন; কেননা রাষ্ট্রও ভারতের রাজধর্ম। ভারতের স্বাধীনতা অভিনব উপায়ে আসিবে—মহাত্মা বিষ্ণু ভাস্কর লেলে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তর-সাধনা ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম-যোগপথে সেই সময় হইতেই মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জাভায়ারী সামন্তল আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ ধৃত হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বীরেন্দ্রের গুরু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বন্দী হইয়া ইংরেজের আদালতে অভিযুক্ত হন। বীরেন্দ্রনাথের ফাঁদী হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী। শ্রীঅরবিন্দ ২১শে

ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন। যতীন্দ্রনাথ প্রমাণভাবে মৃত্যুলাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত করার প্রয়াস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অতঃপর “কর্মযোগিনে”র প্রবন্ধের জন্ত রাজ-দ্রোহের মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। সেই প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহা “An open letter to my countrymen” শিরোনামায় প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীঅরবিন্দের “Last political will and testament” বলিয়া জাতীয়তাবাদিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। তদানীন্তন ব্রিটিশরাজ ইহা রাজদ্রোহ-মূলক বোধে শ্রীঅরবিন্দ ও প্রকাশক মনোমোহন ঘোষকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন। নিম্ন আদালতের বিচারে মুক্তাকর মনোমোহন ঘোষের দণ্ড হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারে তিনি বেকসুর মৃত্যুলাভ করেন। উপরন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক নহে বলিয়া উচ্চ আদালতের বিচারপতি রায় প্রদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রতিদিন অপরাহ্নে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎকার হইত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু অনেক সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার মুখে তাঁহাকে পুনরায় ধরিবার আয়োজনের কথা শ্রবণ করেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাকে কোনও বিদেশী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। পরে নিজ অন্তর-বাণী পাইয়া উক্ত প্রস্তাব তিনি সিদ্ধান্তরূপে

বরণ করিয়া লন। রামচন্দ্র মজুমদার ধর্ম ও কর্মবোগিন্ আপিসে শ্রীঅরবিন্দের সহকারীরূপে কাজ করিতেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আহিরীটোলার ঘাটে এক পাল্লী ভাড়া করিয়া তাঁহার চির প্রস্থানের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গী হন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ও স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই চন্দননগরের রাণীর ঘাটে তাঁহার নৌকা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। চারুচন্দ্র রায়ের নিকটে স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মারফত তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরিত হয়। চারুচন্দ্র আমাদের লইয়া সম্ভ্রান্তি সারস্বত উৎসব সমাপনান্তে বিজ্ঞাম করিতেছিলেন। সামন্তল আলমের মৃত্যুর পর চন্দননগরে এই প্রসিদ্ধ সারস্বত উৎসব সম্পন্ন হওয়ায়, বিপ্লববিগ্ণ এই কার্য চারুবাবুর অতীত বিপ্লবকর্মের উপর চুপকাম করার নীতি বলিয়া রহস্ত করিয়াছিলেন। মনে হয়, চারুচন্দ্র জেল হইতে ফিরিয়া স্বদেশ-সাধনের সাংস্কৃতিক পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সারস্বত উৎসব তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। বাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দের আত্মগোপন ব্যাপারে চারুবাবু আর কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের থাকা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই স্বরেশচন্দ্রকে ফিরাইয়া দেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কানাইলাল দত্তের অতি-নিকট বন্ধু। এই দুই জনেই চারুচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই কথা চারুচন্দ্র রায়ের মুখে শুনিয়া অতি ক্রুত আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আমি তাঁহার কাছে সকল কথা শুনিয়া, শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাড়ীতেই আশ্রয় দিই। এই কথা অনেক ক্ষেত্রে উক্ত হওয়ায়, তাহা আর এখানে বিস্তৃত করিয়া বলার প্রয়োজন বোধ করি না। আমার স্ত্রায় একজন অপরিচিত মানুষের হাতে শ্রীঅরবিন্দকে রাখিয়া স্বরেশচন্দ্র ও শ্রীনলিনীকান্তও যে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিদায় লইয়াছিলেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যয় আমার উপর কতখানি হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করিবার জন্তই এখানে আসিয়াছিলেন এবং কোথায় ভবিষ্যতে যাইবেন, তাহা নির্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই বাস করিতে চাহেন। ইহাই আমার রাজনৈতিক বিপ্লবীদের চন্দননগরে আশ্রয় দানের প্রথম দীক্ষাস্বরূপ হয়। শ্রীঅরবিন্দ আমার বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলেন, তাঁহার অম্মুরাগের স্পর্শ আমি পাইয়াছিলাম। লোক-জানাঝানির ভয়ে তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিতে হইয়াছে। তিনি এক রাত্রি আমার এক বন্ধুর পীড়াপিড়িতে তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন।

কিন্তু একরাত্রি বাসের পরই বিরক্ত হইয়া পরদিনই আমার ভবনে চলিয়া আসেন। তারপর গোন্দলপাড়ার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে তাঁহাকে রাখিয়া আসি; সে বিবরণ অতিশয় বিচিত্র।

কেমন করিয়া নিজেব আস্তাবল হইতে গাড়ী-ঘোড়া বাহির করিয়া, নিজেই চালক হইয়া গাড়ী ছুটাই, তাহার বৃত্তান্ত আমার “জীবন-সঙ্গিনী” গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। গোন্দলপাড়া হইতে কটকগোড়ায় কয়ের বাগানেও তাঁহাকে কিছুদিন রাখা হয়। সেখানে বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধে অনেক কথাই হইয়াছিল। তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সাধনার কথাই শুধু বলিতেন, কিন্তু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সহিত রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেন। আমার অন্তরের প্রবণতা কোন দিকে, শ্রীঅরবিন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনায় তিনি আমায় উদ্বুদ্ধ করিতেন।

গোপনে রাখার দায়িত্ববোধে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহাকে লইয়া আসা হইত। কয়ের বাগানের পর আমারই বাড়ীর নিকট শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র একতলা বাড়ীখানি ছিল তাহা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে সর্বশেষে সেখানে গোপনে রাখা হয়। তাঁহাকে এই সময় বিপ্লবী স্বদর্শন চক্রবর্তী নামে এক তরুণ যুবককে লইয়া আসা হয়। স্বদর্শন কলে চাকুরী করে বলিয়া এই বাড়ী ভাড়া লয়। প্রত্যহ প্রাতঃ ৯টা বাজিলে সে সদর দরজায় তালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত ও সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিত। শ্রীঅরবিন্দ সারাদিন এইখানে বন্দী থাকিতেন। এই সময়ে তিনি আহার করিতেন কিসমিস, বাদাম আর পেস্তা। সারাদিন বন্দীজীবনের পর রাত্রে চন্দননগরের বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই অজ্ঞাত-বাসকালের তিনটি ঘটনা আমার মনে বিশেষ ভাবে আঁকা আছে।

আমার বাড়ী হইতে তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে গোন্দলপাড়ায় প্রস্থান করেন। এই কয়দিন আমি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার প্রাণপণ প্রয়াস করি। কিন্তু এক জনের নিকট তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই কথাই এখানে ব্যক্ত করিতেছি।

সেদিন আমার বাড়ীর কয়েকটি অব্যবহার্য্য গৃহ বে-মেয়ামতে চেয়ারের গুদামে পরিণত হইয়াছিল। গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতাম। এক দিন ইহা ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। আমি শ্রীঅরবিন্দকে একটি

কৃত্ত ককে রাখিয়া আমাদের চেয়ারের কারখানায় বথারীতি কর্ত্ত করিতে গিয়াছি। উৎকর্থা সীমা ছিল না। যথাসময়ে তাঁহাকে বাহির করিয়া বৈঠকখানায় আনিলাম। তাঁহাকে সেযুগে দেখিয়াছি আত্মভোলা শিবের ভ্রাতা; চলিতেছেন বেন মাটিতে পা পড়িতেছে না। যখন খাইতেন তাহাও শব্দহীন। হাত-পা নড়িতেছে; কিন্তু কে যেন তাঁহার নিয়ন্তা। শ্রীঅরবিন্দকে আনিয়া অবধি এইরূপ আত্মহারার ন্যায় দেখিয়াছি। তিনি এই সময়ে আত্মসমর্পণ-যোগের কথাই বলিতেন। নিজের হাতখানি উপরের দিকে উঠাইয়া বলিতেন, তুমি মনে করিও না আমি হাতখানি উঠাইতেছি, আমার মধ্যে কোন এক তৃতীয় শক্তি কাজ করিতেছে—আমি বিশ্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহার অপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতাম—তিনি আর ইহজগতের মানুষ নহেন; শুধু দেহটা এই বিধে বিচরণ করে ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধনে। সেদিন তাঁর চোখের দৃষ্টি আরও অপলক। আমি তাঁহার অপরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নত শিরে তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলাম। ভুলিয়া গেলাম তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছে। এই ঘরেই তাঁহাকে স্নান করাইতে হইবে। নতুবা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িলে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখার এত প্রয়াস সব বার্থ হইয়া যাইবে যে; শ্রীঅরবিন্দের মুখে বাণী সঞ্চিত,—তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “মতি! আমার কালী-দর্শন হইয়াছে। আজ মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি।”

এই দিন হইতে শ্রীঅরবিন্দ আমার নিকট “কালী” রূপে পরিচিত। তাঁহার অসংখ্য পত্রের শিরোনামে “ডায়ার এম” (Dear M); তাহার পর পত্র শেষ করিয়া “Kali” এই শব্দটি লিখিলেন। তখনও বুঝি নাই শ্রীঅরবিন্দ এই “কালী”—সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতেই চলিতে শুরু করিয়াছেন। এদিকে আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা-মাত্র আমার পত্নীর মুখে শুনিলাম—তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে চেয়ার বোঝাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে চেয়ার সাজানো, তাহার মধ্যে অরবিন্দের আসন পাতা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যান-নিমগ্নিত নেত্রে সেইখানে উপবিষ্ট ছিলেন। চেয়ার সরানোর শব্দে চাহিয়া দেখিলেন। আমার দ্বী তখন অসম্ভবতা। তাঁহার হাতে সম্মান্জনী ছিল। তিনি অকস্মাৎ এই গৃহমধ্যে এক পুরুষমূর্ত্তিকে দেখিয়া সলজ্জ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্ত্তন করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নিনিমেষ নয়নে তাঁহার

দিকে চাহিয়া থাকেন। আমার স্ত্রী এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া পরক্ষণেই সসঙ্কোচে গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হন। এই গোপনতার ব্যবস্থা যে আমারই কীর্ত্তি, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সব কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সেবায় অকুণ্ঠ হইয়াছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দেরই অহুরোধে সম্মান পণ্ডিচেরী যাই। সে কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। বালাকাল হইতেই কিছু-না-কিছু লেখার অভ্যাস আমার ছিল। তখন সবে “উদ্বোধন” নাটকখানি লিখিয়া এক রাত্রে বাড়ীতেই আমার কতিপয় বন্ধু মিলিয়া অভিনয় করিয়াছিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দ্বিবা সন্ধ্যাক্ষের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আত্মসমর্পণ যোগের কথাই এই নাটকে লিখিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আগাগোড়া তাহা শুনিলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, “তোমার লেখার অভ্যাস আছে; আমার ইচ্ছা ‘ধর্ম্ম’ পত্রিকায় তুমি নিয়মিতভাবে লিখিবে।” রামচন্দ্র মজুমদার তখন সাপ্তাহিক “ধর্ম্ম”র পরিচালক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে আমি ‘ধর্ম্ম’ লিখিতে আরম্ভ করি। রামচন্দ্র হয়তো মনে করিতেন লেখাগুলি শ্রীঅরবিন্দের। বস্তুতঃ লেখার দীক্ষা শ্রীঅরবিন্দই আমায় প্রদান করেন। এইবার সর্ব্বশেষ ঘটনার কথাই বলি। আমার বাড়ীর অতি নিকটেই তিনি বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি বেশী দেখা শাক্ষাৎ করিতাম না। নিজের সাধন-ভঙ্গন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার সকল প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্বটুকুই আমার ছিল। স্তম্ভনের মধ্য দিয়া তাহা বথারীতি সম্পন্ন করিতাম। একদিন শ্রীঅরবিন্দ আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাত্রে তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। তিনি আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন আছ?” আমি বিষয়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তখন ব্রহ্মচর্য্য বন্ধার দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়াছি। সংসমের মাত্রা যেন আর বন্ধ হয় না। অন্তর-দর্শী শ্রীঅরবিন্দ যেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি আমার অবস্থার কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তিনিও অনেক উপদেশ দিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি কালই চলিয়া যাইতেছি। শ্রীশচন্দ্র কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তোমাকেও কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।”

আমি শুনিলাম—তিনি পণ্ডিচারী যাইবেন। পণ্ডিচারী ফরাসী রাজ্যের রাজধানী। সেখানে তিনি নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। শুনিয়া বুকটা বেন ভাকিয়া গেল; দুই মাস তিনি ছিলেন, হৃদয় যেন পূর্ণ থাকিত। অকস্মাৎ

তাঁহার মুখে প্রস্থানের কথা শুনিয়া আমি সবিশেষ বিচলিত হইলাম।

তার পর দিন তাঁহার বিদায়ের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ; সহজভাবেই রাজিযাপনের জন্য স্বধাসময়ে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলাম। শয্যাও গ্রহণ করিলাম। নিদ্রা হইল না। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিল। অঙ্ককার-গৃহ, নতুবা পত্নীর নিকট ধরা পড়িতাম। মধ্যরাত্রে শ্রীশচন্দ্রের গলা শুনিলাম। পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রিকালেও কি তোমার অবসর নাই?” আমি তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-বার্তা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “মাহুঘটির শেষ বিদায়ের দিনে তোমার এইরূপ নিশ্চিন্ততা—সকল কাজেই শেষ রক্ষা করতে পার না!”

আমি ঘরের বাহির হইলাম। জ্যোৎস্নায় সর্সদিক্ উদ্ভাসিত। শ্রীশচন্দ্রের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমারই প্রতীক্ষায় ঝাড়াইয়া আছেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি দুই বাহু দিয়া আমায় বুকে ধরিলেন। সেই স্পর্শ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তার পর বাঁধন খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, “তোমার হবে। যোগ তুমি পাবে। আমার কথা মনে রাখিও।”

মর্থ বিদীর্ণ হইয়া ভাব। বাহির হইল, “আপনার সহিত আবার কি দেখা হবে?”

তিনি স্নেহে উত্তর দিলেন, “হবে হবে। অনেক কাজ তোমার সঙ্গে আমার করার আছে।”

তার পর তিনি নৌকায় গিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্না রাজি,

বতদূর দৃষ্টি চলে—নৌকাখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তার পর ঘরে ফিরিলাম ভগ্ন হৃদয়ে। কি হইল, তাহা অবর্ণনীয়!

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাস শেষ হয়। সংবাদ না পাইয়া শ্রীশচন্দ্র আসিয়া জানাইল, “ব্যাপার কিছু বুঝা বাইতেছে না, স্বদর্শনকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দিব মনে করিতেছি।” স্বদর্শন পণ্ডিচারী গেল। স্বধাসময়ে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে তাহার একখানি জাঁটা-খাম। খামের উপরে আমার নাম লেখা। খামখানা খুলিলাম, সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনটি মন্ত্র তাঁহারই হাতে লেখা—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের। মনে পড়িল তাঁহার অজ্ঞাতবাসকালে পার্শ্বের কক্ষে পত্নী-বালকদের লইয়া হাজার বার চীৎকার করিতাম—‘জ্ঞান, শক্তি, প্রেম দে।’ এ সেই জ্ঞানের মন্ত্র, শক্তির মন্ত্র ও প্রেমের মন্ত্র। তিনি নির্দেশে দিয়াছেন—“প্রত্যেক মন্ত্রটি ১০০৮ বার জপ করিতে হইবে।” শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই সময়ে ধ্যান করিতেন, মন্ত্র জপ করিতেন স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমারও গুরুমন্ত্র ছিল, সাধনাও ছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই মন্ত্রদানে আমার অন্তরে দ্বন্দ্ব বাধিল। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রই সাধিলাম। সেই পত্রের পাশে একটি ঠিকানা লেখা ছিল, ইহা পণ্ডিচারীর কোন ভ্রাতৃলোকের ঠিকানা। স্বদর্শন বলিয়াছিল, “অতঃপর এই ঠিকানায় তিনি পত্র দিতে বলিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং ধর্ম্ম সকল বিষয়ক নির্দেশই আপনাদের নিকট আসিবে, আপনি শ্রীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ত্ত্ব করিবেন।” সে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন—আমি পূর্ব্ব-দীক্ষিত হইলেও, শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষা সর্কাস্তঃ-করণে গ্রহণ করিলাম।

দেবতা হইয়া জাগো

শ্রীনীলরতন দাশ

শয়ৎ প্রভাতে শেকালিকা বয়ে শিশিরসিক্ত হালে,
সবুজ বানের নবীন স্তম্ভে বর্ণ-কিরণ হালে।
চারণের হল চন্দনা-স্ত্রীরা বন্দনা গায় বদে,—
অন্তরে কত কারনা যে জাগে, কত ভাব আসে মনে।
কত না হচ্ছে সে ভাব প্রকাশ করি আগমনী গানে,—
তবু কি জননী সাতা হাও তা’তে? জাগো কি মোদের প্রাণে?
তোমার প্রতিমা পড়িয়া বোধন করি যোগে দশভুজা,—
ঘোড়শোণচারে মহানবারোহে করি যোরা ভব পূজা।
মুখে ভক্তির বচা যে বহে, অন্তরে বহুভূমি;
সকলি হলনা, সকলি মিথ্যা, সব কাঁকা,—জানো তুমি।

লালসা-কারনা-কল্লুবকালিয়া-হিংসার জর্জর
অনুরের লীলা-কেন্দ্র আদিকে মাহুঘের অন্তর।
অনুর সেবার নাচে তাতব হাসিয়া অউহাস,
প্রেক্ষ-শিখাচেরা উল্লাসে কলে কল্লুখিত মিঃখাল।
শুক পাষণ উষর হৃদয়ে নাহি তক্তির ঠাই,—
দেবতারে হুয়ে পরিহরি’ মোরা দানবেরে পুজি তাই।
অনুর-নাশিনী। দহুদহলনী। লভ্যাবে করি’ কমা
কল্লুপাশপিনী জননীর বেশে এস যোগে বিরূপমা।
বহুদীরপে নৃতন চেতনা হাও চিন্ময়ী যোগে,—
দানবীর এই দানবের মুখে দেবতা হইয়া জাগো।

তপোগিরি বা রামটেক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে হয়, দুইশত ও প্রচারের অভাবেই মধ্যভারতের বিখ্যাত তীর্থস্থান রামগিরি বা রামটেক সারা ভারতের তীর্থযাত্রীর কাছে বিশেষ পরিচিত হয় নি। পুরাতন বিবরণীর মজিরে এই রামটেক যে-কোন বড় তীর্থস্থানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে।

মধ্যভারতের প্রধান শহর নাগপুরে পৌছেই মনে হ'ল রামচন্দ্রের রামটেক যেতে হবে। ক'দিন আগে কাঠিক মাসে উৎসব হয়ে গেল, কিন্তু উৎসবের তিড়ে সব জিনিষ ভাল-ভাবে দেখা সম্ভব নয়, তাই সে সময়ে যাওয়া হয় নি। ধ্যান করতে হলে নির্জনতার প্রয়োজন। যেখানে বহুলোকের হৈ চৈ সেখানে দেবতা অপেক্ষা তার পাণ্ডা ও তাদের আত্মস্বই মনকে দেবতার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়।

রামটেকের দূরত্ব নাগপুর থেকে উত্তরপূর্বে ২৮ মাইল। এই ক্ষুদ্র শহরটি জঙ্গলাকীর্ণ আবাদপত্র পরিত্যক্তগীর দ্বারা প্রায় অর্ধস্বত্বাকারে পরিবেষ্টিত। রামটেক পর্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটি শাখা লাইনের যোগ আছে। রেলপথ ছাড়া ভাল রাস্তা দিগন্তেও বোণাবোণ আছে—নির্কারিত সময়ে বাস চলাচল করে। শহরটি রামটেক পাহাড়ের পাদদেশে বেশ সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে—দেখে মনে হ'ল ক্রমবর্ধমান। শহরের ভিতর সরকারী তহশিল আশিস আছে। রেল ষ্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় ২ মাইল।

বহুদূর থেকে রামটেক পাহাড়ের উপরে সাদা সাদা মন্দিরগুলি দেখতে পাওয়া যায়—রামটেক ষ্টেশনে মেয়েই এই মনোরম আবহবাহিনীর মধ্যে কিছুক্ষণও অতিবাহিত করা যাবে এই ভেবে মনটা খুশি হয়ে উঠল। সঙ্গী জৈনধর্মাবলম্বী বহুটি বললেন, শাস্তিনাথের বিখ্যাত মন্দির, বিগ্রহ, গুরুকুল ইত্যাদি দেখে সোজা পথে পাহাড়ে উঠা যাবে। শাস্তিনাথ-দেবের বিগ্রহাদি দেখে যাওয়াই ঠিক হ'ল।

শাস্তিনাথদেবের মন্দির ও গুরুকুল রামটেক পাহাড়ের পরেই একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ভগবান বুড়ের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বে বর্ধমান মহাবীর আর্ধ্যধর্মের শাখা বিশেষরূপে জৈন-মতাবলম্বী এক সম্রদার গঠন করেন—অহিংসাই তাদের মূলমন্ত্র। কথিত আছে, ঋষভদেব এই সম্রদারের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিন্নমদনাথ, শাস্তিনাথ প্রভৃতি চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীরই শেষ তীর্থঙ্কর।

তিন শ' বছর আগেও শাস্তিনাথদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। তৎকালে সেখানে হানীর কয়েক ঘর আদিবাসী

ছাড়া বিশেষ লোকজনের বসতিও ছিল না। প্রায় সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তখন ঐ সকল স্থান নাগপুরের ভোঁসলে মারাঠাবংশের আশ্রা সাহেবের অধীন ছিল। আশ্রা সাহেব একদিন মন্ত্রী বর্ধমান শাহজীর সহিত শ্রীরামজীর দর্শনে রামটেক আসেন। ভোঁসলে রামজীতার পূজা শেষ করার পর প্রসাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু মন্ত্রী শাহজী বলেন যে, কোনও জীনমূর্ত্তি দর্শন না হলে তিনি জলগ্রহণ করতে পারেন না। শাহজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে নিকটের কোথাও ভগবান তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে, কারণ জৈনশাস্ত্রে লেখা আছে, শ্রীরামচন্দ্র একজন তত্ত্ব জীন ছিলেন। আশ্রা সাহেব শাহজীকে তাঁর হাতী নিয়ে কমাটির জৈনমন্দিরে যেতে বললেন, কিন্তু শাহজী মনের বিশ্বাসবশে আদিবাসীদের জিজ্ঞাসা করার জানতে পারলেন যে, ছোট পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক নগ্নমূর্ত্তি আছে। শাহজী জঙ্গল পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে লোক নিযুক্ত করেন এবং ভক্তের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়। পর দিন প্রায় ২০ ফুট উচ্চ শাস্তিনাথদেবের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। খোঁজ শীর্ষক শাস্তিনাথদেব-মূর্ত্তি আবিষ্কার করার পর শাহজী জলগ্রহণ করেন। এই লুক্কায়িত তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আবিষ্কার করার শাহজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আশ্রা সাহেব এই মন্দির-সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। বর্ত্তমানে এই মন্দির নাগপুরের দিগম্বর জৈন-সমাজের কর্ত্তব্যাবলীতে আছে।

পার্বনাথ, শাস্তিনাথ, আদিনাথ—এই সকল তীর্থঙ্করের মূর্ত্তিসমেত আটটি মন্দির আছে। প্রধান মূর্ত্তি শাস্তিনাথ-দেবের। মন্দিরগুলির বরস হ'ল বছরের কিছু বেশী হবে, কিন্তু শাস্তিনাথদেবের মূর্ত্তিটি আনুমানিক ২' হাজার বছরের পুরাতন। কাঠিক মাসের মাঝামাঝি যখন রামটেকে মেলা হয় তখন এখানেও মেলা বলে এবং বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

দিগম্বর জৈনসমাজ শিক্ষা-বিভাগের জ্ঞান মন্দির-সংলগ্ন একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে শ্রীশ্রীশাস্তিনাথদেব গুরুকুল (বিদ্যালয়) ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। এই গুরুকুল ১৯৪৩ সালের ১৪ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পাক্ষাত্য শিক্ষাবিত্তারই প্রধান লক্ষ্য নয়—প্রাচ্য সংস্কৃতি, বিশেষ করে জৈনশাস্ত্র শিক্ষাদানই প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্র-সংখ্যা কম, বর্ত্তমানে ত্রিশটির বেশী নয়। ছাত্রদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির জন্য কিছু খরচ দিতে হয়। অবশ্য গভীর ছাত্ররা এই খরচা দেওয়া থেকে রেহাই পায়। আমাদের নিজস্ব আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার যে মহতী প্রচেষ্টা এখানে চলছে

দেখে খুব আনন্দ হ'ল। ছাত্ররা ইংরেজী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে আ' সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বা কান্টন 'বিশারদ' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, নাগপুরের বিখ্যাত সমাজস্বয়ং শেঠ কিশোরী-লাল দ্বারেকীর অর্থে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

সারা সকাল শান্তিনাথদেবের আশ্রয়ে কাটল। মন্দিরের লেবক ও বিভাগের ছাত্রগণের মধুর ব্যবহারে বেশ আনন্দ পাওয়া গেল। প্রধান ঋষি রামগিরি, তার সৌন্দর্য আশ্রয়ের মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল।

অমরা রামগিরি অতিথিতে রওনা হলাম। ছোট পাহাড়টির পরেই বড় রামটেক পাহাড়। শহরের বস্তী-সীমানা এখান পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পাহাড়ের গা দিয়ে একটা সরু রাস্তা উপরে উঠেছে। এটা ঠিক তীর্থযাত্রীদের রাস্তা নয়, স্থানীয় লোকেরা এই রাস্তায় পাহাড়ে উঠানামা করে, পোচারণ করে নজরে পড়ল। পাহাড়ের গা বেঁসে ছেলেরা খেলা করছে, বিদেশী নৃতন লোক দেখে কোন কৌতূহল নেই। এরকম যাত্রী দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাধারণতঃ তীর্থস্থানে অভ্যস্তভাবে হাত পাভার নমুন দেখে বিরক্তি লাগে। কিন্তু এরাও দরিত্র তবু আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে, মা-বাপের কাছে হাত পেতে দাঁড়াবার শিক্ষা পাশনি।

পাহাড়ের গা বেঁসে রামজীর দর্শনে এগুনো গেল। রামটেক পাহাড় বিচিত্র নামে পরিচিত—রামগিরি, সিঁধুরাগিরি, ভপোগিরি ও শৈবালগিরি। উইলসন সাহেব প্রভৃতির মতে রামটেকই মেঘমূর্ত্তের রামগিরি। সেখানে :

যক্ষকক্ষে জনকভনয়ান্নানপুণ্যোদকেসু
ত্রিকঙ্কারা তরুসু বসতিং রামগির্যাশ্রমেসু।”

কেহ কেহ অবস্ত বলেন, রামগড় বা অমরকটক পাহাড়েই কালিদাসের রামগিরি আশ্রম। যা হোক, দৃষ্ট দেখে মনে হয় সত্যই কালিদাসের মত কবির কাব্যপ্রেরণা আগাবার উপযুক্ত স্থান। ‘কান্ডা বিরহগুরুণা’ বক ‘শাপেনাভংগমিত-মহিমা’ বর্ষকাল এই পাহাড়ে অবস্থান করেন। সেই ‘কণ্ঠা-প্লেষপ্রণয়িনী’ বিরহী যক্ষ তাঁর প্রণয়িনীর কাছে ‘প্রিয়ান্নাঃ সন্দেশং মে হর’ এই বলে অলকাপুরীতে প্রিয়ার নিকট মনের ভাব প্রেরণের বাসনা জানান। অনবস্ত মল্লকান্ডা হৃদে এরূপ কাব্যরস-পরিবেশন স্থান-মাহাত্ম্যেই সম্ভব মনে হয়। রামটেকের নিকটেই নন্দর্দন বা মগর্দন নামে একটি গ্রাম আছে, এই গ্রামটি চতুর্ধ শতাব্দীতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। মনে হয়, এটি সেই সময়ের কিছুকাল বিদর্ভদেশের রাজধানী ছিল। বিদর্ভদেশের এই রাজধানীতে অবস্থানকালেই কবি কালিদাস রামটেক পরিদর্শন করেন ও সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে মেঘমূর্ত্ত রচনা করেন।

পাহাড়টির অপর এক নাম সিঁধুরাগিরি। পাহাড়ের

পাথর ভাঙলে পাথরগুলি লাল রঙের মনে হয়—এবং হিরণ্যকশিপুর রক্তে এগুলি লাল হয়ে গেছে। হিরণ্যকশিপু ও তাঁর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের পৌরাণিক কাহিনী সুপরিচিত।

রামটেক পাহাড়ের প্রধান ঋষি—‘ভপোগিরি’ এই নামের সঙ্গে যুক্ত। কথিত আছে, ত্রীশচক্রের রাজত্বকালে শব্দক নামে এক ভক্ত শূত্র এই পাহাড়ের উপর কঠোর তপস্তা আরম্ভ করেন। শূত্রের পক্ষে এরূপ কঠোর তপস্তা করা তখন ছিল অশাস্ত্রীয়, এবং এই অশাস্ত্রীয় কাজের জন্যে এক ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকালমৃত্যু হয়। রামরাজত্বের সময়ে রাজার নিকট যে-কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাবার অধিকার প্রচার ছিল। বহু অঙ্গস্বাক্ষরের পর শব্দকের সেই অশাস্ত্রীয় তপস্তার কথা রামচন্দ্র জানতে পারেন ও রাজা রামচন্দ্র তাঁর চক্রবাস তরবারির সাহায্যে শব্দকের যুক্তিসঙ্গত করেন। হির মন্তক উর্ধ্বে উঠে রাম নাম জপতে থাকে। ভক্ত শব্দককে রামচন্দ্র বর প্রদান করতে চাইলে শব্দক প্রার্থনা করেন তাঁর তপস্তার দ্বারা উন্নত এই পাহাড়—যা ভপোগিরি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেইখানে রামজী যেন চারি যুগ বসবাস করেন। অন্য বরে শব্দক নিজ দেহের শিবলিঙ্গপ্রাপ্তি কাহনা করলেন। রামচন্দ্র ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। সেই শিবলিঙ্গই এখন শূত্রেশ্বরশিব নামে প্রসিদ্ধ। রামজীর অবস্থিতির নিদর্শন হিসাবে এই মন্দিরের উপরে মাঝে মাঝে সকালের শুকতারার তার এক জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায়। ভক্ত হিন্দু এই জ্যোতি-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আকুলভাবে ত্রীশচক্র ও ভক্ত শব্দকের কথা স্মরণ করেন।

এই পাহাড়টিকে শৈবগিরি বা শৈবালগিরিও বলা হয়, কারণ শব্দক মহাদেব এই পাহাড়ে অবস্থানের জন্য আপন ভক্ত বহু শৈবকে আনেন। শূত্র শব্দকের শান্তিবিধানের পর ত্রীশচক্র অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসেন, কিন্তু তাঁর জ্যোতিঃ-বৃষ্টি ও পদচিহ্ন নিদর্শন হিসাবে সেখানে থেকে যায়। রামগিরি পাহাড়ের উপরে যে ত্রীশচক্রের পদচিহ্ন ছিল তা কালিদাসের মেঘমূর্ত্ত পাঠে জানা যায়। যক্ষ তাঁর অলকা-পুরীতে অবস্থিত। প্রিয়ার নিকট সন্দেশবাহী মেঘকে বলছে—বট্ট পুংসাং রত্নপতিপদৈরকিতং মেঘলাসু। এই পদচিহ্ন কালিদাস কর্তৃক পূজিত হয়েছিল অস্বাভাবিক। এই পদচিহ্নের কথা আরও স্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় প্রতাবতী গুপ্তার তাত্ত্বিকল থেকে। দ্বিতীয় চক্রগুপ্তের (অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের) কন্যা প্রতাবতীর বিবাহ হয় বিদর্ভের ভেঙ্কটরাজবংশের দ্বিতীয় ক্রতসেনার সহিত। বিবাহের কয়েক বৎসর পরই ক্রতসেনার মৃত্যু হয় এবং প্রতাবতী গুপ্তা শিশু পুত্রের নামে রাজত্ব চালাতে থাকেন। বেরায়ে বংশধরদের এক তাত্ত্বিকলকে আছে যে, ১২ই কার্তিক ভক্ত তারিখে রামগিরির ভগবানের পদচিহ্নের পূজার উদ্দেশ্যে প্রতাবতী দেবী অন্ন দান করতেন। মহা-

কবি কালিদাসের রচনা ও প্রভাবতী গুপ্তার বিবরণ থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও এই পাহাড়ের উপরে ভগবান ক্রীষ্ণচন্দ্রের পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কালক্রমে তা লোপ পেয়েছে, অথবা প্রত্যক্ষ চিহ্ন বিলুপ্ত করে ভারত উপর মন্দির তোলা হয়েছে। এরূপ প্রত্যক্ষ চিহ্নের বিলুপ্তির কথা বহু প্রাচীন ভীর্ণের পূর্ব-ইতিহাসে পাওয়া যায়। রামসীতার মন্দিরের পরে অত্যন্ত বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এটাই সাধারণের অজ্ঞান। রামকী ও সীতাদেবীর পুরনো বিগ্রহ দুটি মুসলমানগণ কর্তৃক ভগ্ন ও কলুষিত হলে দেবতার বর্ণা-দেশের কলে এই স্থিতি দুটি পাওয়া যায় দুঃখসাধ্য পুষ্করিণী থেকে। ভাতকলকের তারিখ অজ্ঞানসারে শুদ্ধ কার্তিকের শেষে এখনও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সময়ে রামটেকে প্রায় এক সপ্তাহকাল মেলা হয়। মধ্যপ্রদেশ হাফা ভারতের অত্যন্ত অকল থেকেও কিছু কিছু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। প্রধান উৎসব দিনে মধ্যরাত্রে হলদে রঙের (সীতাহর) বস্ত্র রামচন্দ্রের মন্দিরের উপরে পোড়ান হয়। পুরাণে আছে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্ত দেবানন্দেব মহাদেব জিপুয়ানুর দৈত্যকে হত্যা করেন, সেই সীতাহর দাহ ব্যাপারটি সম্ভবতঃ মহাদেবের জিপুয়ানুর-হত্যার আরক হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীষ্ণচন্দ্রের জন্মদিবস রামনবমীতেও এখানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়।

শান্তিনাথদেবের মন্দিরে আগে না গিয়ে ট্রেন স্টেশনে হেডকোটে সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যে পথ ধরেন সেই পথে শহর পার হয়েই পড়ে আখালা নামে জলাশয়। এই জলাশয়টি বনানীশোভিত পাহাড়-পরিবেষ্টিত ও জলাশয়টির চতুর্দিকে সাদা সাদা অনেক-গুলি মন্দিরের সমাবেশ। এ স্থানের দৃষ্ট অতি মনোরম। প্রবাদ আছে যে, একদা সূর্য্যবংশীয় রাজা অথ এই পার্বত্য-অঞ্চলে শিকারে আসেন। রাজা অথ ছিলেন কূঠরোগগ্রস্ত, রাজবৈদ্যরা তাঁকে নিরাময় করতে পারেন নি। সে সময়ে এখানে জলাশয় ছিল না, ছিল মাত্র একটি বর্ণণা। কার্ণা অথ বর্ণণার জলপানে পরিভূক্ত হয়ে হাত পা ধুতে পারেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর দেহের যে যে স্থানে সেই গাঁর জল লাগে সেই সেই স্থানে কূঠরোগের চিহ্ন লোপ পেয়ে গিয়ে। এতে মুগ্ধপণ বিস্থিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রাজা এই জল হারা সর্কাল ধৌত করলেন। বিশ্বরের উপর বিশ্বর-ভারপর রাজার দেহে কূঠরোগের আর লেশমাত্র চিহ্নও লেগে না। রাজা অথ কূঠরোগীদের উপকারের জন্ত সেই জল বন্ট করে জলাশয় সৃষ্টি করেন। এই জল স্বর্গের মন্ডাকিনী ও রাণসীরা গঙ্গার তীর পবিত্র। এখানে পূর্ব-পুষ্করের অস্থি বর্জন বিশেষ পুণ্যকৃত্য বলে গণ্য হয়। রাজার নামানুসারে ণশয়ের নাম হয়েছে অখালা হ্রদ।

অখালা হ্রদে স্নান-পূজা সেয়ে রামটেক পাহাড়ের উপরে

উঠতে হয় অনেকগুলি সিঁড়ি ভেদে। পাথরের সিঁড়িগুলো কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নীচু, রাস্তাটি বেশ মনোরম। পাহাড়ের উপর বিরাট দুর্গপ্রাকার বেষ্টিত স্থান, ভারত উপমহাদেশের মন্দির। শিবাজীর মারাঠাশক্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে, রামটেক প্রকৃতি স্থান মাপপূত্রের ভৌগোল্যের অধীনে আসে। সেই সময়ে মুসলমানদের প্রভাব মন্দীভূত হয়ে এলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। তাই ভৌগোল্যকে সর্কাল সজাগ থাকতে হ'ত। এই পাহাড়ের উপর এরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করার দুই উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ স্থানটিকে অত্যন্ত প্রতিরোধ-যোগ্য করে পরিণত করা, আর দ্বিতীয়তঃ রামজীর পদাঙ্কিত ও মন্দিরাদি-শোভিত হিন্দু-তীর্থকে মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা।

বেষ্টনীর প্রবেশ-পথের আগে একটু বা দিকে গেলেই শম্বকের লিঙ্গস্থিতি বুজেন্থর মহাদেব। মন্দিরের কাছেই একটি ক্ষুদ্র বতী ও দোকান—খাবার জিনিষ বেশ পাওয়া যায়। এর কাছেই প্রায় সম্পূর্ণ একটি ছোট মসজিদ নির্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান-অভিযানের সাক্ষরূপে। এই মসজিদটি নাকি সন্ন্যাসী আশ্রমের এক সেবাপতির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, দেশের যুদ্ধের উপর কতই না পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পরবর্ত্তসময় হিন্দু এই স্মৃতিচিহ্নকে যথেষ্ট সুরোপ থাকার সত্ত্বেও ধ্বংস করেনি। তবু শম্বকের বুজেন্থর মন্দিরটি অনাদৃত অবস্থায় আছে, লোকসমাগমও কম হয়।

দুর্গপ্রাচীরের নিকটেই ভগবানের নরসিংহস্থিতি। হিরণ্য-কশিপুকে হত্যার পর নৃসিংহাবতার তাঁর বহু পদা যেনে নিকৈপ করেন সেখানে একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই অভিক্রম করতে হয় বরাহ-দরজা, এখানে একটি বহু বরাহস্থিতি আছে। ভগবানের এই বরাহস্থিতির উদয়ের মি-ভাগে হামাগুড়ি দিয়ে পার হবার মানত থাকে অনেকের, কিন্তু পার হতে গিয়ে কৃতকার্য্য না হলে ভাতক পাণী বলে হয়ে নেওয়া হয়। বরাহ-দরজার পর সিংহপুর দরজা এবং তারপর মারাঠা-কামানশোভিত তৈরব দরজা। সেদিনের রক্ষিণ সম্ভবতঃ মহাদেবের আশিস লাভ করে অস্তিত বিক্রমে এই দরজা রক্ষা করলেন। তৈরব-দরজার পরেই প্রধান দরজা—শোকুল দরজা, অত্যন্তরূপে শোকুলের অধীশ্বর ভগবান ক্রীষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ। এই দরজা পার হয়ে হিন্দু হাফা অত্যন্ত বর্ণাধারণীর প্রবেশ নিষেধ। ক্যামেরা নিয়ে যাবারও নিষেধ নেই—এই সীমার ওপারে। তাই ভপোগিরির রামসীতার ছবি পাওয়া যায় না।

উচ্চ পাহাড়ের উপর সুন্দর শুদ্ধ রামসীতার মন্দির টি—শান্তিনাথদেবের মন্দির বা হুববতী স্থান

বেত কপোতের মত মনে হয়। বিএহের সামনে নাটমন্দিরে ভক্তেরা সমবেত হন, মন্দিরে পূজা হচ্ছে, কেউ কেউ তখন গান করছেন মনের আনন্দে। নাটমন্দিরটিতে ভৌসলে রাজাদের ছবি আছে আর আছে দোহুলামান করেকট ভরবারি, মনে হয় একদা সড়টকালের জুত এদের কিছু প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন কেবল শোভাবর্জন করছে। কষ্টি-পাথরের তৈরী এই বিএহের ভক্তের প্রাণে আনন্দ জাগিয়ে তুলছে কত দুর্গস্থাপত্য বরে।

রামসীতার মন্দির ছাড়া লক্ষণ, কৌশল্যা, হনুমান প্রভৃতির ছোট ছোট মন্দির আছে, সেগুলি বেশী পুরনো মনে হয় না। বারমহাবের মন্দিরটি বরং অপেক্ষাকৃত পুরনো মনে হয়। এই মন্দিরটি ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার উপহিত পুরাতত্ত্ব বিভাগের ভত্তাবধানে আছে। তৈরব-দরজার উপরে ছোট বর ও কাঁকা কারণা আছে। সেখানে বসে শহরের

দৃষ্ট, বিশেষ করে অবলা হ্রদের দৃষ্ট অতি মনোরম বলে প্রতি-
ভাত হয়। মনে হয় যেম এক অপূরণ রাজ্যে এসে পড়েছি।

রামজী ও অজাত মন্দির দেখা শেষ হ'ল, ইতিমধ্যে সূর্যোদয়েও অনেকটা পশ্চিম দিকে নেমে এসেছেন। তাই সূর্যোদয় মহাদেবের মন্দিরের পথ বয়ে অবতরণ করতে হ'ল রামটেক শহরটি ছোট, কিন্তু লোকসংখ্যা দশ হাজারের বেশী। পোষ্ট-আফিস ইত্যাদি সবকিছুই আছে, তাকে হ'লানি চিঠি কেললাম। রামটেক ঠেশমের কিছু দূরে ম্যানানিকের ঘনি আছে—ঠেশমের প্রয়োজন এই কারণে আরও বেশী ঠেশন-মাষ্টার একজন বাঙালী তত্ত্বলোক দেশ থেকে সবে প্রবাসী হয়েছেন চাকরিস্বত্বে। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে গাড়ী প্ল্যাটফর্মে হাজির হ'ল। তারপর রাত দশটার নাগপুরের পাহানিবাসে পৌঁছে, সে রাজির মত আশ্রয় লওয়া গেল।

শিম্পীর ব্যথা

ঐআশুতোষ সাহা

আমারে চেনো না তুমি,—তোমারেও নাহি আমি চিনি,—

সুহৃদর পারাবার আমাদের মাঝে

কল্লোলিছে রাত্রি-দিন।

তোমার ছদরমন মোর কাছে চির অধকার।

ভবু আমি আপনার আনন্দবেদনা, জীবনের অহুতুতি,

আবেগ-উজ্জ্বল

হৃদয়িত ক'রে তুলি সযতনে বসি'

তোমারি লাগিরা শুধু হে আশ্রয় আশ্রীর আমার।

বে-পুলকে উজ্জলিরা উঠে এ ছদর,—

তব মর্মেতটুলে সে কি কতু তোলে কলতান?

সন্ধ্যাপনে

যে হঃখ নীরবে সহি আপনার মসে,—

তোমার অন্তরে কিগো লাগে তার তীব্র বহিভাপ?

অথবা কি সব তুলি?

বার হর্ষ, বার ব্যথা তার তাহা একান্ত আপন?

বিখন্ডন

নাহি পার কতু তার নিগূঢ় আশ্বাস।

এ অক্ষয় সীমাবদ্ধ তাবা

কতটুকু পারে তোমা দিতে পরিচর

মোর বগ্ন আর আকাঙ্ক্ষা?

কি আকৃতি জাগে প্রাণে প্রকাশের লাগি'—কেমনে

বুঝিবে তুমি

বলিবারে চাই বাহা, কতটুকু অতিব্যক্তি তার—এ ছর

কবিতাধামি মোর

বাণবিভ পক্ষী যথা মরে যথা পক্ষ বাপটরা—উর্ধ্বে উট্টিবারে

এ মতো উঠে হিরা আকুলি' ব্যাকুলি'

অভ্রভেদী তাবলোকে করিতে বিহার,—

উড়ে যেতে অহর্গদ মনোলোকে তব

এ হুর্দল করনার পক্ষতরে মোর।

কোথা তুমি—কোথা আমি।

আমার এ ব্যাকুলতা, অশ্রান্ত প্রয়াস

তাহার করুণ ইতিহাস—কেমনে আমিবে তুমি।

কেমনে বুঝিবে তুমি ওগো বহু মোর,—

এ শুধু কবিতা নয়—মর্মে মূহুর,—

জীবনের অবিকল প্রতিবিম্ব মোর,—

এ কেবল হৃদয় নয়—ছদর স্পন্দন।

ধূপের নীরব দাহ দেখ নাই চোখে; শুধু তার ম্রণ

মাতারে তুলেছে তব প্রাণ।

আমি শিল্পী—আমার জীবন

তিলে তিলে পুড়ে-মরা আরতির ধূপের মতন,—

বাহুটুকু মোর শুধু—সৌরভ তোমার।

আমার চীনভ্রমণ

ত্ৰীপরিমল গোস্বামী

আমার চীনভ্রমণের কিছু ছবি আঁকে। এই ভ্রমণ-
ব্যাপারটি আসল রফার ব্যাপার। হুতরাং বিশ্বাসের কিছু
নেই। বকা করে চলায় আমরা অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত।
বা চাই তা পাই না, খুশি থাকতে হয় তার পরের



ল-চং-গী

জিনিসটিতে। ইংরেজীতেই কথাটি শোনার ভাল—next
best। অর্থাৎ যেটি পাওয়া গেল না, তার বদলে তার
অনুক্রম আর একটি জিনিস। চালের অভাবে যেমন গম,
ঘূতীর অভাবে হাক-প্যাট। কিছুকণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি,
তার পর নিশ্চিন্তমনে সব মেনে নিই।

আমার চীনভ্রমণও এই অগত্যা মেনে নেওয়া। বাংলা-
দেশ থেকে সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ১৯৫১) যে সব সৌভাগ্যবান
চীনদেশে রওনা হচ্চেন, বলা বাহুল্য আমি তাঁদের দলভুক্ত
নই, অথচ আমারও চীনদর্শন-বাসনা প্রায় চীনের মতই
প্রাচীন। হয় তো এই বাসনা হাজার দুই বছর আগেকার
চীন-ভারত মৈত্রীর প্রভাব। যারা সে যুগে চীন থেকে
ভারতে এসেছিলেন এবং ভারত থেকে চীনে গিয়েছিলেন
তাঁদের অদৃষ্ট হাত আজও চীন-ভারত মৈত্রীগঠনে সাহায্য

করছে। তাই শুধু আমার নয়, সম্ভবত ভারতবাসীমাত্রেয়ই
মনে চীনভ্রমণের একটি চেতন বা অচেতন বাসনা আছে
অথচ বর্তমান সময়ে এ বাসনা পূরণ করার অসুবিধা আছে
খুবই। বর্তমান চীন তত্ত্ব তৈলকটাহ, ভবিষ্যৎ চীনগঠনের
মশলা ভাজা হচ্ছে সেখানে। এ চীন নিশ্চিন্ত মনে দেখে
চলে না। নিশ্চিন্ত মনে দেখতে হলে দেখতে হয় কনফিউ-
সিয়াস বুদ্ধ লাও-সের চীন, ফা-হিয়েন হিউয়ান-সাঙের
চীন। অর্থাৎ প্রাচীন চীন।

সৌভাগ্যবশত একটা স্বযোগ জুটে গেল বাংলাদেশের



ধাপার জলা অকলে চীনাগের চামড়ার কাজ

নিমজ্জিতদের চীন রওনা হবার পূর্বমুহুর্তে—ল-চং-গী নামক
এক চীনা যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাকে দেখেই
মনে এল সেই ইংরেজী কথাটি—next best।

অবিলম্বে চীনভ্রমণ আয়োজন শেষ করে কেললাম।
এক দিন সকালে গলায় লাইকা কুলিয়ে ছ'জন রওনা হলাম-
ধাপা অভিযুগে। আমার এ চীন ধাপার জলাভূমির চীন,
কলুটোলা, ছাতাওয়ালা গলি, টেরিটিবাজার, ফিয়ার
লেনের চীন। ল-চং-গী বলল ধাপা থেকেই শুরু করা
বাক আমাদের প্রথম পর্ব। ঐখানে এক চীনা শহর
গড়ে উঠেছে চামড়ার কাজ উপলক্ষে। রওনা হতে বেলা
প্রায় ন'টা হ'ল। বেলেঘাটার পথে বাস্-এ গিয়ে হাটতে
হবে মাইলখানেক। পথ অভ্যস্ত খারাপ। বিজ্ঞা চলা
প্রায় অসম্ভব। ভাড়া উঁচুনীচু পথ মেঝামত হচ্ছিল,

সর্বত্রই পাহাড়সমান উঁচু খোয়ার গাৱা। তত্পরি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। চলতে পা কতবিস্কত হ'ল, তত্পরি কাণা এবং জল। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে ষেটুকু রোদ তা প্রায় আগুনের মতো গরম।



ল-খ-হং

ক্রমে এগিয়ে চলেছি আর বড় বড় কারখানা সব চোখে পড়ছে। সবই চামড়ার কারখানা। সমুদ্রের মতো জলাভূমি। জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে পুঁতে কাঠের তক্তা বিছিয়ে প্রকাণ্ড এক একটা মাচা করা হয়েছে। মাচায় একের পর এক চামড়া বিছিয়ে মজুরেরা তাতে বং মাথাচ্ছে। পাশে কতক চামড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রোদে শুকানোর জন্তে। কিন্তু ঘন বর্ষণে কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না।

দুঃখের পথ অতিক্রম করে ল-চং-গী ও আমি গিয়ে উঠলাম ল-চং-গীর এক পরিচিত বাড়িতে। সেখানকার সব বাড়িই ট্যানারির সঙ্গে যুক্ত। আশা ছিল কতকগুলো কারখানা ঘুরে দেখব। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই অগ্রসর, বাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে এল এবং একটু পরেই প্রবল বৃষ্টি। আমরা বেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছেই বাঁশের মাচার এক অংশের মাত্র একখানি ছবি নিয়েছিলাম, দেরি করলে তাও হ'ত না। চলার পথে কারখানাগুলো বাইরে থেকে দেখেছিলাম, তার বেশি আর দেখা সম্ভব হ'ল না। কল চলেছে সব

কারখানায়। কোথাও চামড়া পালিশ হচ্ছে, কোথাও ঘষা হচ্ছে শাদা সোয়েড তৈরির জন্তে। দু'এক জন (অল্পসংস্কৃত) লেপের মত চামড়া গায়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চামড়ার গন্ধ সমস্ত বাতাসে, তবে জায়গাটা একান্তই খোলা বলে গন্ধ উগ্র নয়। বৃষ্টির মধ্যে ঘরের আশ্রয়ে বসে বসে ষেটুকু সংবাদ শুনলাম তা হচ্ছে এই যে, চামড়ার কাজে অথবা জুতো তৈরিতে যারা নিযুক্ত তাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাদের নাম হচ্ছে "খে"। এই খে-সম্প্রদায় বহু প্রাচীন



চাম-চুই-তীর কাঠির সাহায্যে খাতরা

কাল থেকে চামড়ার কাজে হাত পাকিয়েছে। ক্যান্টনের খে নামক জায়গা থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

চীনদেশের এক একটা এলাকার লোকেরা এক একটি বিশেষ শিল্পকাজে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। যেমন ক্যান্টনের আর এক সম্প্রদায় দারু-শিল্পে ওস্তাদ। ড্রাই ক্লিনিং এবং ডায়িং-এর কাজে ওস্তাদ সাংহাইবাসীরা। এমন কি দাঁত তোলা এবং দাঁত বাঁধাইয়ের কাজেও একটি বিশেষ জায়গার লোকেরা বিশেষজ্ঞ। এরা ক্যান্টনের ওপাম নামক জায়গার অধিবাসী। এই যে প্রদেশ বা সম্প্রদায় ভেদে কর্মভেদ এটা এমনই এদের মজাগত হয়ে পড়েছে যে, এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের কাজ করতে গেলে অস্ববিধার সৃষ্টি হয়। যারা পথে পথে কাপড় ফেরি করে বেড়ায় তারাও একটা বিশেষ এলাকার লোক। এরা নাকি শানটুংবাসী এবং অধিকাংশই মুসলমান।

আমার সঙ্গী ল-চং-গীর পরিচয় কোতুহলোদ্দীপক। এর পৈতৃক বাড়ি চীনদেশের আময় প্রদেশে, কিন্তু চীন সে

মেখে নি, বাংলাদেশেই তার জন্ম, বরিশালে। এর পিতার নাম ল-খে-হং। ল-খে-হং-এর বর্তমান বয়স প্রায় সত্তর বছর। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন তিনি তাঁর পিতা ল-চিন-বি-র সঙ্গে আময় থেকে কলকাতা আসেন এবং



কলেজের ছাত্রী ছাং-হ

ছ'বছর কলকাতা বাসের পর বরিশাল যান তাঁরই সঙ্গে। ল-চিন-বি বরিশালে স্থপারি, তামাক ও লকা চালানোর ব্যবসা আরম্ভ করেন। ল-খে-হংও সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের এই তিনটি জিনিস সিঁড়াপুর, পেনাং প্রভৃতি জায়গায় চালান হয়। দীর্ঘকাল বরিশালে কাটাবার পর, দেশ বিভাগ হলে তিনি গত ১৯৪৮ সনে কলকাতা চলে এসেছেন। সুতরাং ল-চং-গীও এসেছে পিতার সঙ্গে। ল-চং-গী বাইশ বছরের যুবক, আজন্ম বাংলাদেশ থেকে বাঙালী হয়ে গেছে, বাংলা লেখে, বাংলায় কথা বলে। গত আই-এসসি পরীক্ষায় পাস করে এখন 'স্পেশাল বেঙ্গলী' নিয়ে বি-এ পড়ছে। ম্যাট্রিকুলেশনে সংকুত পড়েছিল। এদের গৈরিক ব্যবসা এখনও চলছে, সঙ্গে আছেন আর এক জাতি ভাই—নাম চান-চুই-তী। ল-খে-হং বুদ্ধ কিন্তু এখনও অসাধারণ পরিভ্রমী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমার চীনজন্মের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হ'ল এঁদের তিন জনের সঙ্গে। কলুটোলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৌছলাম

চিন্তরজন এডিনিউয়ের এক আধুনিক চীনা বাড়িতে। ল-খে-হং এবং চান-চুই-তী এঁরা দু'জনেই বাংলা বলতে পারেন, ল-চং-গীর বাংলা অবশ্য আরও মার্জিত। সুতরাং এঁদের সঙ্গে আলাপে আমার কোনই অসুবিধা হ'ল না। যে পরিবারটির কাছে গেলাম তাঁরাও বথাসাধ্য আমাকে তাঁদের ঘরের খবর জানায় সাহায্য করলেন। এঁরা প্রায়



আধুনিক চীনা ছাত্র
আং-ম-বা

চার পুরুষ যাবৎ বাংলাদেশে আছেন। গৃহকর্তা বুন-চং বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী এখন বৃদ্ধা, বয়স তিরিশী বছর। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং পোশাক-পরিচ্ছন্ন। বুন-চংও স্থপারি তামাকের ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। তাঁর ছ'টি পুত্র এবং দু'টি কন্যা। দু'টি পুত্র লগুি ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং অল্পরা বিদেশে চাকরি করে। একটি কন্যার তিন কন্যা ও এক পুত্র। এই তিন কন্যার এক জন বি-এ পাস, এক জন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। ছেলোটো ইন্টার-মিডিয়েট পড়ে। কলেজের মেয়েটির নাম ছাং-হ এবং ছেলোটির নাম আং-ম-বা। বুন-চং-এর ছয় পুত্রের তিন জন ক্রিস্চান। দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীরা সবাই ক্রিস্চান। দেখলাম একটি টেবিলে মাতা মেরি, দুটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি হাস্তরত বুদ্ধমূর্তি (Laughing Buddha) সাজানো রয়েছে, একই সঙ্গে বার যেমন ইচ্ছা পূজা বা উপাসনা চলে। দুটি

ধর্ম পাশাপাশি, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই এবং উপাসকেরাও একই পরিবারভুক্ত। এই ঘটনাটি আমার বড়ই ভাল লাগল।



‘পা’ ঢাকমার চিত্র

ঘরে নানারকম চীনা-শিল্প আছে, তার মধ্যে একটি পাত্র দেখতে বড়ই সুন্দর। চীনাভাষায় এর নাম পা। টিফিন-কেবিরারের মতো চারটি গোল কাঠের পাত্র পর পর সাজানো—এবং সেই রকমই হাতে ধরে তোলা যায়। পাত্রগুলি দেড় ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। উপরের ঢাকনায় সুন্দর ছবি। ঢাকনাটা খুলে দাঁড় করিয়ে রেখে একটি ছবি তুলে নিলাম।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে হ’ল।

আমার চীনভ্রমণ পরিকল্পনার আর একটি অঙ্গ এখানকার চীনা মন্দির দেখার। এইখানে আবার আমার সহায় হলেন চান-চুই-তী। ল-চং-গী তো সর্বদাই সঙ্গে আছে।

আমরা তিন জন নানা গলিঘূঁজি পার হয়ে পৌঁছলাম গিয়ে ডেমজেন লেনের প্রাচীনতম চীনা বৌদ্ধমন্দিরে। মন্দিরটির নাম থান-ও-বিও। প্রকাণ্ড বাড়ি। মন্দিরটি দোতলায় অবস্থিত। একটা অদ্ভুত শাস্ত্র আবহাওয়া। দোতলায় খোলা প্রশস্ত ছাদ। তার পর মন্দিরের দালান, তার পর মন্দির। তিনটি সুসজ্জিত দরজা। প্রত্যেকটি দরজায় সুকলিসজ্জতভাবে সিকের চিত্রিত পর্দা ঝোলানো।

একটি দরজায় সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে “হাঁক-কি-ই-পাব।” শুনলাম এর অর্থ “প্রবাসীদের কল্যাণার্থে”।

মন্দিরের ভিতরটা চীনা কাগজের ফুল ও নানারকম চীন-মাটি ও ধাতুনির্মিত মূর্তিতে সাজানো। এক দিকে উঁচুতে ঝোলানো ড্রাম, অন্যদিকে ঘণ্টা। বিশেষ উপলক্ষে এ দুটি বাজানো হয়। মন্দির কেন্দ্রে দু’ধারের ফুলের সজ্জার পিছনে একটু উঁচুতে বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরে কিছুকণ কাটাবার পরেই নিঃশব্দ পদক্ষেপে এক শীর্ণ বুদ্ধ চীনা উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তার বয়স ২০ বছর। এমন



থান-ও-বিও মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি

শাস্ত্র এবং বুদ্ধ তার চাহনি যে দেখলেই মনে হয় এই থান-ও-বিওর প্রশান্ত ও ষাণ্ডাত মূর্তির আবহাওয়ায় আশৈশব বাস করার ফলে সে নিজেই শান্ত এবং আত্মগত হয়ে উঠেছে। বিংবা সেই বুদ্ধ চাহনি সম্পূর্ণ আফিং-এর ক্রপায় কি না কে জানে। এই বুদ্ধ বিশেষ উপলক্ষে মন্দিরের ড্রাম ও ঘণ্টা বাজায়।

ইতিমধ্যে চান-চুই-তী কয়েকটি ঘোমবাতি নিয়ে মূর্তির সম্মুখে জালিয়ে দিলেন। এই বাতিগুলি মন্দিরেই থাকে, চীনে চৈত্রি, গোমে ছবি ঝাঁক। মন্দিরের ভিতরের বা পাশের দেয়ালে কতগুলো তাক আছে। সেখানে চীনাভাষায় লেখা কাঠের অনেকগুলো শ্রুতিফলক ঝাড়া

করে রাখা হয়েছে। বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর মন্দিরে যদি কোন অস্থান হয় তবে তাঁর নাম-সম্বলিত এই স্থতি-ফলক এখানে রাখার নিয়ম আছে। একে বলে "চিন চ্যু:।"

অতঃপর আমরা টেরিটি বাজার স্ট্রিটের আর একটি মন্দিরে গেলাম। এটির নাম "কোয়ান-ইম-কো-বিও"। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত—প্রবেশদ্বারে লেখা আছে। এই মন্দিরটি আকারে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী হলেও

সময় মাছগুলো তাঁকের সঙ্গে মুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কতকগুলো দোকানে চীনা মাটির পুতুল বুদ্ধমূর্তি চায়ের পাত্র



খান-ও-বিওর ভিতরের দৃশ্য

পেয়লা ইত্যাদি আছে। কিন্তু দাম যা গুনলাম তাতে চমকে উঠতে হয়। এই চীনা পল্লীতে কোনো কোনো চীনা



খান-ও-বিও মন্দিরের ১৩ বৎসর বয়স্ক ষষ্ঠাবাদক

এর মধ্যেও চীনা শিল্পের বিচিত্র সংগ্রহ আছে। সজ্জা সবই প্রায় ধাতুনির্মিত। মন্দিরে বাইরের লোকের প্রবেশ রা কোটো নেওয়ার সম্পর্কে কোথায়ও কোন বাধা-নিষেধ নেই বলেই মনে হ'ল, অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দক্ষিণা দিতে হয়েছিল।

এইখান থেকে বেরিয়ে খাটি চীনা পল্লীতে এসে দাঁড়ালাম। চীনা দাঁতের ডাক্তার, ওষুধের দোকান, চীনা-মাটির জিনিসের দোকান। চীনা কাঠের মিস্ত্রী কাঠের কাজে নিযুক্ত আছে কোনো কোনো ঘরে। চীনা ওষুধের দোকানে গিয়ে উঠলাম। দোকানে মেয়ে পুরুষ সবাই কাজ করে। সিঁড়ির উপর বোনে মাছ শুকানো হচ্ছিল। ভেতরালগ্নে শুকনো মাছও বিক্রি হয়। ছবি নেওয়ার



মন্দিরমধ্যস্থ ধাতুনির্মিত সিংহমূর্তি

স্থপারি হলুদ চীনাবাদ্যাদি প্রভৃতি ব্রীচ করার কাজ করে। গুদামের মধ্যে এক শ দেড় শ হুশো বস্তা স্থপারি বা বাদ্যাদি

যেথো সেখানে গন্ধক জালানো হয়। গন্ধকের ঘোঁয়ায় (সালফার ডাইঅক্সাইড) এই সব জিনিসের রং পরিষ্কার করে দেয়, তাতে বেশি দামে বিক্রী করার সুবিধা হয়, কারণ দেখতে ভাল হয়। এক শ বস্তা স্থপারি ব্লীচ করতে সের দশেক গন্ধক লাগে।



ল-চং পরিবারের কণ্ঠ

চীনারা কলকাতা শহরের অন্তত দু'শো বছরের বাসিন্দা। ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সময় মুর্গীহাটা এলাকা ইংরেজ,

করাসী, গ্রীক, আরমেনিয়ান, পোর্টুগীজ প্রভৃতির প্রধান ঘাঁটি ছিল। ক্লাইভ স্ট্রীট, এজরা স্ট্রীট, ক্যানিং স্ট্রীট প্রভৃতির মাঝখানে ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীটটি স্মরণ করলেই বোঝা বাবে শুধু 'চীনাবাজার' নয়, সেটি 'ওল্ড চীনাবাজার'। সে যুগের ব্যবসায়ী চীনাদের মধ্যে চীনা জীবনের খারাপ দিকটাও জাহাজ বোঝাই হয়ে অবশ্য এদেশে এসেছিল, এবং হয় তো এখনও একটা স্তরে তার অস্তিত্ব আছে। জুয়াখেলা, নেশা করা, দাস্তা করা ইত্যাদি। অনেক গল্প শোনা যায় এ বিষয়ে। বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনেছি কোন কোন বাড়ালীও নাকি চীনাভাষা আয়ত্ত করে নিম্নস্তরের চীনা জীবনের অদ্বীকৃত হয়ে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করেছে।

কিন্তু আমি আমার এই চীনভ্রমণ শেষ করেছি মাত্র তিন দিনে। এই তিন দিনে এদের ভাল দিকটাই দেখার চেষ্টা করেছি একান্তভাবে। চিত্রশিল্পে, দারুশিল্পে, চামড়ার কাজে, ডায়িং-এর কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে চীনাদের স্বভাবগত যে নৈপুণ্য আছে এদেশে তার পরিচয় বথেষ্ট মিলবে। এরা আমাদেরই মতো প্রাচীন জাতি এবং বহুকাল আমাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও আমরা ওদের চিনি না, সহজে চেনবার উপায়ও হয় তো কিছু নেই। কিন্তু তবু আকস্মিকভাবে ল-চং-গীদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগল এবং পরিচয়ও কিছু পেলাম। ল-খে-হং, চান-চুই-তী এবং ল-চং-গীর অক্সান্ত সাহায্য এবং সবিনয় ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি এদের ভিতর দিয়ে চীনা জীবনের মধুর দিকটির যে একটুখানি স্বাদ পেয়েছি তা আমার কাছে অবশ্যই অমূল্য।

সাহিত্যের ফুল

ঐকালিদাস রায়

সাহিত্যবাক্যে নাই ফুলের আদর
একথা যে বলে সে ত আসল বীর।
সাহিত্য রসের বস্ত্র রসবার বশ,
যালা শুধু গন্ধ বুকে বুকেমাক রস।
ফুলকপি, দেখ গিয়ে বিক্রী হয় ডের,
বিকার সজিনা ফুল আট আলা সেব।

কুমড়ার মাথা ফুল গোছাবীণা হয়ে
আমা-ঝোকা বিক্রী হয়, যায় সব লয়ে।
বকফুলও বিক্রী হয় সেথা বুঠোবুঠো।
বিকার করলীফুল হ'আমার হুটো।
যাকি বস্ত ফুল ছিল সবি বিলফুল,
অভিযানে হয়ে গেল ভুয়েয় ফুল।

রামানন্দ-স্মরণে

ঐউষা বিশ্বাস

৩০শে সেপ্টেম্বর তত্ত্বজ্ঞান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মহা-প্রয়াণের দিন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর দেহাবসানের পর অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হবে। তাঁর যুগ্ম-বার্ষিকীর পূণ্যতিথিতে তাঁর বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে প্রদ্বাজলি অর্পণ করি। প্রদ্বাজ্ঞত স্বরূপে শ্রয়ণ করি সেই অক্লান্তকর্মী সাধকের কাছে দেশের ও জাতির অশেষ ঋণ। তারতের পরাবীনতার দাপ-পাশ আজ উন্মোচিত হয়েছে। যে সকল মহাপুরুষ আত্মবন তারতের মুক্তিফলে কঠিন সংগ্রাম করে গিয়েছেন প্রদ্বৈর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই অমৃতম। তাঁর মহাপ্রয়াণের পূণ্য দিনটি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন।

আজ আমাদের “সোনার বাংলা”র বোর হৃদয়। ঐযি বক্ষিচক্রেয় ধ্যানে বাংলা-মায়ের যে সুকলা, সুকলা, শত-ভবলা সৃষ্টি প্রতিভাত হয়েছিল তার সঙ্গে বর্তমান বাংলার বাস্তব রূপের কোন সাদৃশ্য বৃদ্ধি পাওয়া যায় না। সারা দেশ জুড়ে আজ নিদারুণ অস্বাস, বজ্রাতাব। অস্বস্তির হৃদয়ের সঙ্গে আজ আর একটি হৃদয়ও একত্রে হরে উঠেছে। সেটি হচ্ছে দেশে প্রকৃত মানুষের হৃদয়। আজকের দিনে সেই জেটে আমাদের তবিত্তের আশা-ভরসা ভরুণদের চোখের সামনে বিশেষ করে তুলে ধরতে হবে বাঁচা মানুষদের জীবন-দর্শকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন বাঁচা মানুষ—যার মধ্যে বৃদ্ধি হয়ে উঠেছিল “ব্রাহ্মণের মনীষা” ও ক্ষত্রিয়ের বীর্য। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ তাঁর জীবনের ছোট বড় অনেক কাজে ও ঘটনার পরিচ্ছূট। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতার অপরূপ সমন্বয় হয়েছিল। যে কেউ তাঁর সম্বন্ধে এসেছেন তিনিই জানেন তাঁর অন্তরটি কত কোমল—কত স্নেহময়তার পূর্ণ ছিল। তাঁর যুগ্মতে ভাই তাঁর পরিচিত অনেকেই আত্মীয়বিরোগব্যথা অস্বস্ত্য করেছিলেন। আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সেই সৌম্য, শান্ত, আত্মসমাহিত ঐযি-প্রতিম মানুষটিকে। তাঁর স্নেহমাণ্য কর্তব্যর আজও যেন কানে বাজে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত স্নেহশীল—মাতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমিক, সন্তানবৎসল ও বন্ধুবৎসল। অথচ সাংবাদিক ও সংস্কারক রামানন্দ ছিলেন অত্যন্তের বিরুদ্ধে কুলীন-কঠোর—বজের চেয়েও কঠিন এবং অনমনীয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি এক জন আদর্শ সাংবাদিক রাজ, দেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাব্যাক্তি ছিলেন? তিনি কি শুধুই একজন একনিষ্ঠ দেশসেবক ছিলেন? তা বললে তাঁকে ছোট করে দেখা হবে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত হলেও সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। মানুষ রামানন্দ

সাংবাদিক রামানন্দের চেয়ে ঢের বড় ছিলেন। আজ সেই আদর্শ মানুষের চরণোদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। কবির ভাবার বলি—

“তোমার কীর্তির চেয়ে ভূমি যে মহৎ,

ভাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যার কীর্তিরে তোমার

বারবার।”

বদেশপ্রেমই ছিল এই কর্মবোদ্ধ সাধকের জীবনের মূল-মন্ত্র। বদেশপ্রেম তাঁর কাছে শুধু তাববিলাস মাত্র ছিল না। নিঃস্বার্থ জনসেবাই ছিল তাঁর কর্তব্যর অনলস জীবনের ভিত্তি। এই স্বার্থলেশহীন জনকল্যাণ-কামনাই তাঁর জীবনে সকল কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁর বদেশপ্রেমে উদ্ভাবনার আভিযাত্র্য বা ভাবোচ্ছ্বাস ছিল না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-রাজ্য যেমন সরল, অমোঘর ও বাহুল্যবর্জিত ছিল, তাঁর কর্তব্য জীবনেও তেমনি এই সকল বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচনার ও বক্তৃতার—কোথাও বাহুল্য বা আড়ম্বরের স্থান ছিল না। কেউ তাঁকে কোনও দিন আবেগময়ী ভাবার বক্তৃতা দিয়ে সভা মাঠাতে দেখেন নি। বদেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন সাংবাদিক। বদেশপ্রেমের পরিজ্ঞ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই তিনি হয়েছিলেন সমাজ-সংস্কারক—দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী। আজ তাঁর তিরোধানের পর বিচার করবার সময় এসেছে দেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি কি অমূল্য দান রেখে গিয়েছেন।

প্রথম জীবনে শিক্ষাত্রস্তা রামানন্দের কাম্য ছিল অধ্যাপনার মাধ্যমে দেশে প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলে দেশসেবা করা। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। কোনও অবস্থাতে পড়েই তিনি তাঁর জীবনের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। ভাই রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য বর্টল। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি হলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক রামানন্দ জনশিকার ভিত্তর দিয়েই গ্রহণ করলেন বদেশসেবার সুরম্যান ভিত্তি। সাংবাদিকের ভিত্তি গ্রহণ করেই তিনি বুঁদে পেলেন তাঁর জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর কর্তব্যক্ষেত্র, মানুষের সেবা ও বদেশ সেবার প্রণভত্তর পথ।

ঐরুপ শান্তা দেবী ‘রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা’ নামক গুণ্ডকে লিখেছেন—“শুধু বুদ্ধিমের হাজের সেবার তাঁহার ভূক্তি ছিল না। তিনি যে পতীর জ্ঞানভাণ্ডার সক্ষর করিয়াছিলেন, যে নামা বিচার সমোহিনী বংশীজনি তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, বেশব্যাপী যে হৃদয়, দায়িত্ব ও শিকাহীনতা তাঁহাকে মর্মে

মর্মে পীড়িত করিতেছিল, তাহাতে তৎকালে কলকাতায় চারিট বেওয়ার্থের মধ্যে বসিয়া ছাড়াবাদের কেবল ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্য পড়াইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। অমৃত্যুর প্রতি আপনার কর্তব্য করিয়াছি এ সাধনা তিনি নিজেকে দিতে পারিতেছিলেন না। যে সেবাস্রবের জন্ম যৌবন প্রায়তে তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সেবার জন্মই তিনি পরেও বার বার লেখনী গ্রহণ করিলেন—সেবার কেন্দ্র তাঁহার বৃহত্তর হইয়া পড়িল। “The pen is mightier than the sword.”—এ উক্তির সত্যতা আজ সকলেই স্বীকার করবেন। দেশের লোকের চিন্তাশক্তি কাপাতে ও জন্মগত পঠন করিতে সাংবাদিকের দায়িত্ব যে কত বেশী তা আজকের দিনে সকলেরই জানা আছে। দেশের পরাধীনতার হুঃসহ গ্রামিণী স্বাধীনচেতা রামানন্দের ভার্য্যনৈষ্ঠ অন্তরে অহরহ বেদনা কাপাত। সেইজন্য তিনি নক্তিশালী বিদেশী শাসক-মণ্ডলীর অত্যন্ত আচরণের বিরুদ্ধে আত্মীয় লেখনী চালনা করে গিরেছেন। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল না। তিনি তাঁর সুপত্নীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝেছিলেন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। তাই দেশের সর্বসাধারণ উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও কাম্য। দেশের এই সর্বসাধারণ উন্নতিসাধনের আদর্শ মনে হয় তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের কাছ থেকে। সংস্কারক ও সাংবাদিক রামানন্দ সামাজিক ইনীতি, অসাম্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও চিরদিন লেখনী চালিয়ে গিরেছেন। তাঁর মতে—“সর্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ” ও “জাতীর উন্নতি সর্ববিধ সংস্কার-সাপেক্ষ”। ভাঙার চেয়ে গড়ার দিকেই তাঁর বেশী দৃষ্টি ছিল। দেশের প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় প্রীতি ও ঐকান্তিক অহুসার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অসাধারণ হুক্তিবাদী। পুরাতনকে ও অতীতকে আঁকড়ে ধরে থেকে নুতনের বিপুল সম্ভাবনাকে তিনি কোন দিনই অস্বীকার করেননি। প্রকৃত প্রগতিমূলক আন্দোলনে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস, তৎকালীন “বিকৃতিতেই আপত্তি”। তাঁর চির তরুণ মন নুতনকে অকুণ্ঠ ভাবে বরণ করে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি। এখানেও তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের, দৃঢ়তার ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই তিনি দেশের যাবতীয় পঠন-মূলক ও সংস্কারমূলক কাজ এবং আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নীরব কর্মী—আত্মপ্রচারে একান্ত বিমুখ।

সাংবাদিক রামানন্দ ছিলেন অত্যন্তের কঠোর সমালোচক এবং তার ও সত্যের পূজারী। স্পষ্টবাদিতা, নিরপেক্ষতা,

নির্ভীকতা ও যুক্তিই ছিল তাঁর সমালোচনার বিশেষত্ব। অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, নিরপেক্ষতা ও বাদিতা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এবং হৃদয় বিদ্রোহী শক্তি দেবে বিশেষের সুবীর্ণের প্রকা আকর্ষণ করেছিল। তিনি নির্ভীক সমালোচনা ও স্বাধীন মতামতের সাহায্যে শি দেশবাসীর চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী বহন করে দেশের স্বাধীনতার পথকে করতে অরুদ্ধ ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। সাংবাদিক তিনি যুগান্তর এনেছিলেন—এক সম্পূর্ণ নুতন আদর্শের প্রচার করেছিলেন। তাঁর তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, তার ও স প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংবাদিক অমুকরণীয়। সাংবাদিক রামানন্দ চেয়েছিলেন তাঁর পিতৃ সাহায্যে দেশসেবা করতে—বিদেশী শাসকবর্গের হাত বিদেশীয়দের বার্ষিক কর্তৃত্ব—বহুদেশের শিল্প, সাহিত্য, ও সংস্কৃতিকে নুতন করে গড়ে তুলতে—বহুদেশবাসীদের বিষয়ে উন্নত করতে। ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সমাজে নারীপ্রগতি প্রভৃতি বিবিধবিধরক রচনা-সম্বন্ধে সর্বদা পত্রিকা ছুটি ভবনকার দিনের মাসিকপত্রের দ্বারা দিচ্ছিলেন।

আজ আমরা একটা যুগসঙ্গিকপে এসে উপস্থিত হ প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার পরে ভারত আজ রাজ্য স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক স্বাধীনতা আজও সে পার নি। আজ সময় দেশকে নুতন করে, সুন্দর করে গড়ে তুলবার। আজ দেশে দেশে রামানন্দ চটোপাধ্যায়ের মত আদর্শ সাংবাদিক বিশেষ প্রয়োজন। দেশের অগণিত হুক্ত জনগণের ও তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁর মনর ঘেহের যত্ন্য কিন্তু তাঁর অবিদ্যার আদর্শের যত্ন্য মেই। তাঁর সেই অমির্জাণ হৌপশিখার মত আজও তেমনি উজ্জ্বল হয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন তাঁর আদর্শের মধ্যে—সেই কর্মী সাধক অবশ্য তাঁর জীবিত কালে বীর সাধনার সাক্ষ্য দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সেই আদর্শ, সেই হুস্তর তপসা ও কঠোর সংগ্রাম কখনই ব পারে না। সর্ব বিষয়ে উন্নত, জ্ঞানে, শিক্ষার ও স পরীক্ষান্ যে গৌরবময় স্বাধীন ভারতের বন্ধ তিনি দে —তাঁর সেই বিরাট বন্ধ যেদিন তাঁর বহুদেশবাসী রূপান্তরিত করে তুলতে পারবেন সেইদিনই তাঁর স্বী করা সার্থক হবে। আজ সর্ব দেশ আদর্শে মহীরান্, গুরুত্ব সেই অনাগত ভবিষ্যতের পানেই ব্যাকুল চেয়ে আছে।

একতারা

ঐকলধর চট্টোপাধ্যায়

১

মাহুঘের অন্তরে যে এত মধু আছে রাজকুমারী শোভা তা জানত না। জন্মের মত নিভা সে হুটে আসে জীবন-কবির পাশে।

অভিযুক্ত জীবন-কবি একতারা বাকিরে গান গায়। যৌবনের গান। উষাদমা ও উদীপনার গান। শোভা শোমেনে। তার রক্ত-প্রবাহে অহুতব করে প্রাণের স্পন্দন ও যৌবনের চাকল্য। আনন্দের আভিষেচ্যে খুঁজে পায় বৈচে-ধাকার সার্বকতা।

যমীর হুলালী শোভা—প্রচুর ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। শোভার মারাগী বসুন্ধরা চাম শোভা তার বন-সম্পদের মাদকতা অহুতব করুক। দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতে শিখুক। কিন্তু শোভা চায়—অতি দীন জীবন-কবির ভাঙা হুটীরে গিরে বসে থাকতে। প্রকৃতির পুষ্কারিণী হতে ও কাব্য-রসে প্রাণমন অভিযুক্ত করতে। মা ও মেরের এ মতবিরোধের মীমাংসা হয় না।

শোভা বলে—কবিকে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গ আমার ভাল লাগে...

অভিযুক্তের প্রতি মেরের এই অস্বাভাবিক অত কোন উপায়ে বিরহিত করতে না পেরে মা বলেন—তা হলে কবিকে ডেকে আন এখানে। তুমি কেন মাঝি সেই নোংরা গরীবের আভ্যন্তর?

এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শোভা কিছু বলতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবে—কবি কি এখানে আসবে?

বিরাহী সৌধ। পুষ্পোত্থানে ঘেরা। কৃত্রিম কোয়ারার উজ্জ্বলিত কলবারার গায়ে রামধনুর সাতরঙা খেলা। মারী ও পুরুষের প্রস্তরমূর্তি দিকে দিকে সাজানো। মাঝে মাঝে লতাকুল ও পুষ্পবীধি সুগন্ধি সুমহাশ্রিত। বসুন্ধরার ইচ্ছা—শোভা এই প্রাচুর্যের দোলায় দোলে। কিন্তু শোভার মন কেন বাহু সুধৈর্য্যে তোলে না?

মিসেস অষ্টাদশী শোভা চারদিকে ঘুরে বেড়ায় যেন এক চকলা হরিণী। বসুন্ধরা তাকে সাজান—নানাবিধ বেশভূষা ও অলঙ্কার দিয়ে। কিন্তু তার মন চার দেহের বিলাস নয়, মনের খোঁজ। সেকথা বসুন্ধরা বোঝেন না। রাজপ্রাসাদে শোভার মন-প্রাণ অভিষ্ট হয়ে ওঠে। বসুন্ধরার প্রতিবাদ অগ্রাহ করে হুটে যায় কবির হুটীরে।

জীবন-কবির হাত ছুঁনা চেপে বসে শোভা বলে—কবি। চলো আমাদের বাড়ীতে। সেখানেই তুমি থাকবে...

কবি হেসে জিজ্ঞাসা করে—কেন বল তো?

—আমি আর হুটোহুটী করতে পারি না...

—তাই মাকি? কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—মা, তা হয় না। এই হুটীরে দীনতাই ভাল লাগে আমার। প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারি না।

শোভা হুঃখিত হয়। ভক্তিজ্ঞান হরে ওঠে। বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি। রাজপ্রাসাদের সুধৈর্য্যকে তুমি এত মূল্যহীন মনে কর কেন? জীবনধারণের সুখ-সুবিধা কি বিরূপক?

শুভ্র কেশে অঙ্গুলি-সকালন করে জীবন-কবি বলে—অর্থ যদি তার কিছু থাকে, সে শুধু অমর বটাবার জেই...

—তার মানে?

—বলতে পার জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য কি? মাহুঘ কি চায়?

শোভা ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু অহুতব করে। এই লভ্যপাতা-ঘেরা দারিদ্র্য-লাহিত জীব হুটীরে এসে কবির পাশে বসলেই তার প্রাণে আগুন আনন্দ। এই আনন্দই ত মাহুঘের কাম্য। প্রাসাদে কেন আনন্দ নেই?

একটা দীর্ঘবাস ভ্যাপ করে শোভা বলে—বুঝতে পেরেছি কবি। তুমি কি বলতে চাও।

—কি বল তো?

—তোমার মনে আছে দৈত্যের অহঙ্কার, তাই তুমি প্রাসাদের প্রাচুর্য্যকে ঘৃণা কর।

—ঠিক বলেছ। দৈত্যের অহঙ্কারই আমার মনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই ত এত পাকা চুলেও বৈচে আমি। কাঁচা চুল নিয়ে তুমিও এখানে হুটে আস—সেই বাঁচার ভাগিদে।

—তাই মাকি?

—হ্যাঁ, ঐরকম প্রাচুর্য্য মরে যাক তুমি। আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবতে চাও কেন? বাঁচতে দাও—আমার বাঁচতে দাও...

—কি সর্বদাশ। এতদিন সেকথা বল নি কেন? কাল থেকে আমি এখানে আসব একেবারে নিরাভরণ। সেই পাথরের বৃষ্টিগুলির মতই নিরুত্তর অঙ্গ-সৌষ্ঠব নিয়ে। কি বল? তা হলে তুমি আমাকে খুব সুন্দর দেখবে তো?—বলেই শোভা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এলিয়ে পড়ে কবির গাধের উপর।

জীবন-কবির একভারার তার হিঁড়ে বার। রক্ত ও
বিপর্যস্ত কবি বিরক্তি প্রকাশ করে। একান্তে সরে গিয়ে,
তার-হেঁচা একভারাটা তুলে নেয়। গভীরভাবে কান বুজে
আবার স্নয় বাঁবে।

আত্মল আগ্রহে জীবন-কবির হাতখানা ধরে শোভা বলে
—মোহাই কবি। অস্তিত্ব একবার চল আমার সঙ্গে। প্রাণসে
নয়।

—তবে কোথায়?

—বাইরের তুলবাগানে।

—কেন?

—তুমি বা চাও, সেখানে তা আছে?

—কি চাই? কি আছে?

—অটুট যৌবন বৃষ্টি হয়ে আছে—নির্ভুত আকর্ষণে। প্রাণ-
বস্ত্র অপূর্ণ সৌন্দর্য। পোশাক নেই, পরিচ্ছন্ন নেই, একেবারেই
নিরাশ্রয় শিল্প-চাতুর্য। বলেই হাসতে হাসতে স্ট্রটোপুট
বার শোভা। কবিকে কড়িয়ে ধরে।

বিপর্যস্ত জীবন-কবি বলে—হিঃ। সেখানে প্রাণ
নেই, আছে শুধু চোখরলসানো রূপের ঠাঁট...আমি যাব না।

২

জীবন-কবি একদিন জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা শোভা।
তোমার নাকি বিয়ে?

—হ্যাঁ।

—বিয়ের পর তুমি এখান থেকে চলে যাবে?

—কেন যাব?

—বর বৃষ্টি এখানেই থাকবে?

—তাই বা কেন থাকবে?

—তবে?

—তবে আমার কি? সেও থাকবে না—আমিও যাব
না।

—তবে ত বিয়ের কোন মামেই হবে না।

—মানে না হলেও মজা ত হবে বুঝ? বিয়ের পর
হু'কমেই হু'কমকে নমস্কার জানাব প্রতিপদের চাঁদের মত,
ভিগ্নি হবে উদয়, আমিও যাব অন্তে।

জীবন-কবি হেসে বলে—আর, আমার এই চোখ বৃষ্টি
লজ্জাতারার মত চেয়ে থাকবে—তোমাদের সেই উদয়ান্তের
লাকী হয়ে?

একটু অতবন্দ্য ভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা
কবি। বলতে পার—চাঁদে কি আছে?

—কোয়াল আছে...

—আর কি?

—কেন?

—সেখানে লাগ আছে, কি বাব আছে, তা কেনে আমার
কি লাভ?

—তুমি তো বেজার ব্যবসায়ার?

—কেন?

—এত লাভ-লোকসানের হিসেব কর কেন?

—তোমার ভিতরে কি আছে—জান শোভা?

—কি?

—অতি বিস্ত্রী ককাল।

—তাই যদি সত্যি হয়, তুমি তা দেখতে চাও না কেন?
তর পাও বুঝি?

—হ্যাঁ তর পাই। শুধু তর পাই না—ককালকে অত্যন্ত
দৃশ্যও করি। তোমার চেয়ে, তোমার ককালটা সত্যিও নয়,
মন্দও নয়। তোমার ওই কমনীয় চোখ দুটো উপড়ে কেলে,
সেখানে একটি কুংলিত গহ্বর তৈরি করার কি কোন মানে
হয়। তোমার ওই রাঙা ঠোঁট দুখানি বাদ দিলে, হু'পাট
মুক্তোর মত হাঁত বে কত বীভৎস দেখাবে—তা আমি জানতে
যাব কেন?

—তুমি জানতে না চাইলেই কি সে মিথ্যে হয়ে যাবে?

—সত্যিও হবে না। বা অমন্দর তাই তো মিথ্যে।
ককাল যখন বাহুরের ভিতর থেকে বাইরে এসে সত্যি হতে
চেষ্টা করে তখন আসে তার বার্কক্য। জরা বা বার্কক্য
মিথ্যে বলেই প্রাণ তাকে ত্যাগ করে। প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে
সর্পিদের যৌবন যখন যেতে উঠে তখন ককাল থাকে চোরের
মত সূঁকিয়ে।

—তুমি অহতব কর বুঝি?

—নিশ্চয়ই। তাই তো আমার নাচের হুল আর গানের
দূর আওয়াজ বেঁচে আছে...

—তা হলে আমাকে নাচ শেখাও, গান শেখাও—আমিও
বেঁচে থাকতে চাই...

জীবন-কবি গায়—

ভেল ফুরানো প্রদীপ আমার

ক'দিন বলো অলবে আর?

তোমার আলো করবে না দূর—

আমার বুকের অন্ধকার।

শোভা বৃহল—যৌবনই সত্য, আর বার্কক্য মিথ্যা।
প্রাণ চায়—জল, বাতাস, আর আলোর পরমাহু। বার্কক্যকে
অগ্রাহ করে যৌবনকে আকর্ষণে থাকে বাক্যই প্রাণের বর্ষ।
আনন্দই যৌবনের উপজীব্য। নিরানন্দ বার্কক্য কেন আসবে
কবিকে প্রাণহীন করতে? যৌবন কেন কণহারা?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি। বলতে পার—

—কি করে বলব? তাকে তো দেখি নি এখনো? সে যদি এসে জিজ্ঞাসা করে—আমার বখুট কেমন হবে? তা হয়ত বলতে পারি...

—বলো তো?

—তাকে বলব?

—আমাকেই বলো...

—প্রশস্তি শুনতে চাও?

—তাতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই। তবে, তোমার কতি করে তোমার বরের লাভ আছে। আমার কি?

—আমার কতি করে আমার বরের লাভ আছে? বলো কি?

—বিরে মানেই তো তাই। বিরের পর দেখবে—হয় সে জিতেছে, তুমি হেরেছ—আর না হয়, তুমি জিতেছ, সে হেরেছে...

হু'লমাই জিতবো না?

—মৌচের বোকা আঙ-পিছু হবেই। তবে বখুটা অনেক সময় হেরেও জেতে। বরেরা জিতেও পারে। বিরের হারজিত বুঝা বাইরে থেকে খুব সোজা নয়। তার হিসেব নিকেশ অন্তরের অহুত্ব দিয়ে—হামে ও অভিহানে, হাসি ও কান্নায়...

—তা হলে আমি বিরে করবো না...

তা কি হয়? বিরে তোমাকে করতেই হবে। বৌবন কণহারাী হলেও—বিরের কামনা মিথ্যে নয়। সুলের পরিণতি যে কল, তা কলবেই...

—তা হলে বলো, আমার বর কেমন হবে?

—আমি তো গণংকার মই?

—তবু বলো...

—একই মাটিতে তেতো নিম, আর মিঠে আঙুর কলে। বেঁটুও কোটে, গোলাপও কোটে। তোমার বর নিম হবে কি আঙুর হবে—বেঁটু হবে কি গোলাপ হবে—বিরের আগে তুমিও তা বুঝবে না...

—যদি নিম হয়?

—হতে পারে, আঙুরের বাদ যে কামে না, বৌবন-রাগে নিমকেই সে মনে করবে আঙুর। বিরে নিফল হবে না...

—কি তরানক কথা।

—কথাটা মোটেই তরানক নয়। জব্ব বখুটা বিরে—অন্ধকারের অদৃষ্টলিপি। জ্বের আগে কেউ যদি সে লেখা পড়তে পারতো, তা হলে দরিদ্র মা-বাপ সন্তানের সুখ দেখত না। সর্প-বংশনে কারও বখুটা হত না। বর-বধু বধ-বধুও তেও বেত না...

৩

শোভার বিয়ের বাড়িমা বেলে উঠে। জীবন-কবি কাম

পেতে পোনে। হুগপত শানাইয়ের হুরে হুর মিলিয়ে নেও পার পান। একভাষাও থাকে। কিন্তু তার বক্তার উঠে না। তবু চলে আঙুলের কসরৎ। আমলে চোখের কল বেরিয়ে আসে।

সুখ্য অন্ত পেছে। রক্ত ঢেলে রাঙিয়ে রেখে গেছে পশ্চিম আকাশ। এই তো গোখুলি? বোব হয় বরের হাতে শোভার হাত বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন কত নিষিদ্ধ—কত মধুর। সে ত শুধু হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধন নয়—প্রাণের সঙ্গে প্রাণের। জীবন-কবি ভাবছে—মিশ্রই শোভা এখন বসেছে বরের পাশে। পাভলা ওভনার ভিতর দিয়ে চুরি করে দেখছে বরের মুখ। কি সুন্দর বর। কি সুন্দরী বধু। সার্বক এই বৌবন-বজের আরোজন। কত পবিত্র এই শুভ মিলন-মহল। বর-বধু সুখী হোক।

একভাষা হাতে নিয়ে জীবন-কবি একলাই মাতে আর গায়—

জাগো, বর-বধু বৌবন-কুঞ্জে—

অন্ধর-মধু-সন্ধানী।

সার্বক এ বৌবন-বজের আরোজন

সার্বক এ মিলনের বাণী।

পরের দিন অতি প্রভাতেই শোভা হুটে আসে জীবন-কবিকে প্রণাম করতে। চিপ্ করে পায়ের উপর মাথাটা রাখতেই—রাঙা রং লাগে কবির পায়ের পাভার। কপালের সিঁহুর লাগে তার পার।

কবি আশীর্বাদ করে—এ সিঁহুর অকর হোক...

শোভা বলে—বামী বে এত সুন্দর, এত মধুর, তা তো জানতাম না কবি।

—তাই নাকি? জীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য্য যে কত, তাও কি বামী ভেবেছেন?

আমলে উৎকল কবির মুখে হাসি ধরে না। শোভা লজ্জার মাথা হেঁট করে থাকে।

কিছুকণ কবির মুখের দিকে চেয়ে শোভা বলে—তা হলে এখন আমি আসি?

—কোথায়, কতদূরে বাছ—তা তো বললে না? হুঃখিত ভাবে কবি জিজ্ঞাসা করে।

—আমি তা কি করে জানব? এখন যদি তিনি যবের বাড়ী নিয়ে যান—তাও যেতে বাধ্য হব—এইটুকু আমি...

বলেই সে চুপ করে যায়। আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি। বামী কি দেশার মন্ত?

জীবন-কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—তার চেয়েও বেশী, তোমার মত মেয়ের কাছে...

—আমার মত মেয়ে, কেন বলছ?

—বোবটা তোমার নয় আমার এই একভাষার। এই

হুয়েই যে তোমার হৃদয় বেঁধেছি আমি। বেশ বুঝতে পারছি—
তোমার বামী নিম্ন হলেও, তোমার মুখে হবে আহুদ।

একতারা বাজিরে জীবন-কবি মেচে মেচে গায়—

বৌবন-কোষারে তাসে ওঠী।

শোভা জিজ্ঞাসা করে—বল ত কবি। আমার বামীও
তোমার মত নাচতে-গাইতে জানে কি না?

—নাচ-গান সবার ভিতরেই আছে। তুমি যদি নাচাতে
পার, তাহলেই নাচবে। গাওরাতে পারলেই, গাইবে।
আম্বহারা হঠাৎ না—তুমি যে প্রকৃতি। পুরুষকে নাচানো
আর গাওরাণো যে তোমারি কাজ...

—তোমাকে নাচায়-গায়ার কে?

—তুমি...

—আমি?...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শোভা চলে যায়। জীবন-কবি
উদাসভাবে চেয়ে থাকে। তার চোখ দুটো কলে তরে ওঠে।

জীবন-কবির মনে অনুশোচনা জাগে—এই ত সে চলে
গেল। কোন্ দেশের সুপুরুষ রাজহুমার এসে তাকে নিয়ে
গেল। বৌবনের গান গেরে গেরে কেন সে শোভার হৃদয়
মনটাকে জাগিয়েছিল। শোভাও তাকে হুমিরে পড়তে দেয়
নি। কিন্তু আজ?

হুমিরে পড়লেই ত কতালটা কেপে উঠবে? কি সর্বনাশ।
জীবন-কবি তরে শিউরে ওঠে। না, না, না, তা হতে পারে
না। এখনও তাকে কেপে থাকতে হবে, তাবীকালের আগমনী
গাইবার জন্তে। নূতন আগন্তুক বধন আসবে তাকে কোলে
তুলে নাচতে হবে—গাইতে হবে। একতারাটা হাতে তুলে
নিয়ে জীবন-কবি নাচে আর গায়—

ওরে আসবে কে তা জানি—

হুলের বুকে কচি হাতে কলের ও হাতছানি,

তারে মানি রে তাই, মানি।

আমার হাতের একতারা সে—হাত বাড়িয়ে ধরতে আসে,
জান্নি আমি হারবো—তবু করবো টানাটানি।

৪

কিছু দিন পরে। জীবন-কবি তার একতারাটা হুয়ে ঠেলে
কেলে দেয়। নাঃ, আর পারি না...

কুটিরের বারান্দার একটা ছোঁড়া মাহুর বিহিরে, চোখ বুঁকে
পড়ে আছে কবি। তার ভিতর থেকে কতালটা যেম মাঝে
মাঝে চীৎকার করে উঠছে—মায় ভুণা হ'।

জীবন-কবি বলে—ওরে অনুন্দর। ওরে মিথো।
বৌবন তোর আবদন গ্রাহ করবে না। গ্রাণ তোর কুংসিত
আচরণ সহ করতে পারবে না। তোকে বেধলেই সে পালিয়ে
যাবে। তবু তোর বাইরে আমার এ দুঃখা কেন? শোভার

কোলে যে মবীনের শুভাগমন হবে, জীবন হাফা তাকে অভি-
নমিত করবে কে? সে যে হবে এই জীবন-কবির অন্তর-মহু।
ওরে বীতংস কফাল। আমাকে বাঁচতে দে—বাঁচতে দে...

হুটো বছর চলে যায়, জীবন-কবি ঢালায় কফালের সঙ্গে
বুঝাপড়া।

হঠাৎ শোভা আক কিরে এসেছে—জিন্ন বেশ, কুম্ব বেশ,
তক বুধ। এ কি। কেন সে এমন নিরাতরণা? কোথায় গেল
তার ঐবর্ষোর অহঙ্কার? সর্বদাঙ্গ অলঙ্কারের উদ্ভল্য? রাজ-
কুমারীকে এমন দৌন-হুঃখিনী ভিখারিণী লাজিরে দিয়েছে কে?

কবির কফালসার দেহটাকে বুকু জড়িয়ে ধরে টেনে
ভোলে শোভা। কেঁদে কেঁদে বলে—কবি ওঠ। ওঠ
তোমাকে বাঁচতে হবে। নাচতে হবে, গাইতে হবে।
আমাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি যে কিরে এসেছি।

—কিরে এসেছ? কেন—কেন শোভা? জীবন-কবি
বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে শোভার মুখের দিকে।

শোভা কেঁদে কেঁদে বলে—সে পালিয়ে গেছে চিরদিনের
মত আমার নাগালের বাইরে। তাকে তো আর কিরে পাব
না কবি।

শোভা বলে কি? জীবন-কবি যেম কিছুই বুঝতে পারে
না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শোভার নিস্ত্রত বলিন মুখের
দিকে।

শোভা কাঁদে। জীবন-কবি লাজুনা দেয়।

হঠাৎ শোভার চোখ-বুধ উদ্ভল হয়ে ওঠে। জিন্নমাণ ও
অবসর কবির কাঁধটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে—আমাকে সে
ভালবাসে নি সত্যি। কিন্তু আমার ভালবাসার প্রতিদানে
আমাকে সে কি দিয়ে গেছে জানো?

—কি?

—তার মৃত্তি। সে কত দুন্দর দেখবে?

—বেধব। বেধব। তাকে বেধবার জন্তেই তো বেঁচে
আছি।

জীবন-কবি লাকিরে ওঠে। তার বুকটা হলে ওঠে। তক
বদনীতেও স্পন্দন অনুভব করে চোখ মুছে তাড়া একতারাটি
আবার ঘেরামত করতে বসে। কণ্ঠে জাগে হুর। পারের
বল কিরে পায়। গানের তালে নাচতে চায়। না, না, কবি
এখন ধরবে না। ধরতে সে পারবে না। কফালকে বলে—
সাবধান। আর চীৎকার করিস নে।

হুঃখিত তাবে শোভা বলে—কবি। খোকা তো
তোমার কাছে আসবে না। তোমাকেই যেতে হবে তার
কাছে... বাবে?

—আমাকেই যেতে হবে?

—তা হাফা আর উপায় কি?

একটু চিন্তা করে জীবন-কবি বলে—বেশ, তা হলে তাই

হোক। আমাকেই নিয়ে চল তোমাদের প্রাণাদে—আমি যাব।

—তুমি যাবে? শোভা উৎক্ল হরে ওঠে। জীবন-কবির হাত ছাড়া চোপে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—সত্যই কি তুমি যাবে আমাদের প্রাণাদে?

—তোমার ভেত্রে যাইনি, কিন্তু তার অন্যে যাব। তোমার মনের মত করে তাকে গড়ে তুলব আমি। সে যে হবে আমারই অন্তর-মণ্ড—আমার এই একতারার মালিক—আমার সুর, আমার গান, আমার বক্তার—এ সবই তো হবে তার...

—প্রাণাদের অহংকার সইতে পারবে?

জীবন-কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—তোমাদের সেই অহংকার চূর্ণ করতেই যাব। ঐ হবে আমার হাতের হাতিয়ার। বহু পরীচ-হংসীকে বধনা করে, তোমার বাপ-ঠাকুরদা যে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণ আহরণ করেছিলেন, সে সবই সে বিলিয়ে দেবে। নিজের বলে কিছুই রাখবে না।

—তা কি করে জানলে?

—সেই কথাই তো বলছি—সে হবে তোমার নয়, আমারও নয়, সকলের। আমি তাকে বাঁচি-মাহুয় তৈরি করব। এই হাতে তারও সুর বাঁধব আমি। তা যদি না পারি মিথ্যে আমার এই একতারার কান-মোচাচো।

বৈধব্যের আলা সইতে না পেরে—শোভা বিষ বেগে মরতে গিয়েছিল। হেলের বুধের দিকে চেয়ে কলে দিয়েছিল হাতের বিষ। কিন্তু মন যে এখনো বিধিরে আছে। বুকের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে উঠছে।

কবির কথা শুনে শুনে—হঠাৎ তার চোখের দীপ্তি কিয়ে আসে। দেবে বেন কোন্ এক নৃত্যন আলো আর নৃত্যন জগৎ। যে জগতের বাঁচি মাহুয় হবে তার সন্ধান। শোভা কি আর মরতে পারে?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি। বলতে পার—বৃত্ত্যর পর সে এখন আছে কোথায়?

—কোথায় আবার থাকবে? তোমার কাছেই আছে...

শোভা চমকে উঠে। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কাছেই আছে, মানে?

জীবন-কবি হেসে বলে—হাতের চুড়ি ভেঙে গলার হার তৈরি করলে সোনা তো সোনারি থাকে। তোমার ভালবাসার আভিনব সইতে না পেরে, সে সরে গেছে। গলার হার হয়ে আজ সে তোমার বুকে ছলবে। দেবে—কত ভালবাসতে পার তুমি? আজ তার দাবি—তোমার স্নেহ। ভালবাসার চেয়ে জেহের গভীরতাও বেশী, মধুরতাও বেশী। বানীকে বা দিয়েছিলে, তার প্রতিদানে পাণ্ডার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তোমার মনে। আজ তুমি দেউলে হয়ে শুই যেবে। পাচবে না কিছুই।

—কেম পাব না? বোকাফে বুকে জড়িয়ে বসে আমি যে আনন্দ পাই—তা কি মিথ্যে?

—কেম তা মিথ্যে হবে? সেই তো সত্যি আনন্দ। সে আনন্দ পাওয়ার ভেত্রে নয়—দেওয়ার ভেত্রে তোপের অন্যে নয় ত্যাগের ভেত্রে। সে আনন্দ মর্গের নয়, বর্গের। হেলে বধন তোমাকে মা বলে ডাকে—তোমার বুক উল্লে উঠে। তুমি কি পার তাকে বাঁচা দিতে?

জীবন-কবি একতারা বাজিরে মেচে মেচে পার—

এই কুটীরে, কাণ্ডন দিনের প্রান্তে—

বাকবে আমার 'একতারা' তার হাতে।

৫

রাজকুমারী শোভার মা রাণী-বহুদরা পুত্রহীনা বিধবা। শোভা বিধবা হলেনও, পুত্রবতী। শোভার পুত্র নরেশ এই দুই বিধবার একমাত্র সন্তান ও শাস্তি।

নরেশকে বাঁচি মাহুয় তৈরি করবার তার নিরুদ্বেগ জীবন-কবি। বহুদরার আপত্তি ছিল। শোভা ছাড়ে নি। জীবন-কবিকে টেনে নিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদে। কবির অভিমত—শিশু-নরেশ শুধু মেচে পেয়েই মাহুয় হবে।

নরেশ দাঁড়াতে শিখলেই—কবি তাকে নাচতে শেখালেন। মুখে কথা ফুটলেই, সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শেখালেন। গুর হাতের একতারার দিকে শিশু খুব মজর রাখে। কখনও বেহুয়ো পার না, বা ভালও কাটে না।

ক্রমে নরেশ বড় হয়ে উঠল। তার কৌমারকে ছাপিয়ে যৌবন আগল। এতদিন গুরুও মেচেছেন শিশুর সঙ্গে। এখন আর গুর পায়ে বল নেই। শিশু একাই মাচে। গুর বম কুরিয়ে আসে—শিশু সুর টেনে রাখে।

চলনে ও রূপলঙ্কার বীরে বীরে নরেশ বেন হয়ে উঠে জীবন-কবির একটু প্রতিচ্ছবি। কবির পাকা চুলের চূড়ার মত—সেও বাঁধে একটা কাঁচা চুলের চূড়া।

রাণী-বহুদরার চোখ ছিল। শোভার চোখ জুড়ার। বিরক্ত বহুদরা শোভাকে জিজ্ঞাসা করেন—বলি, তোমার উদ্বেগ কি? নরেশ কি রাজকুমার লাগবে না? পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য নেই। বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি নাই। ওই মোংরা জীবন-কবির মত নরেশও কি শুধু গান গাইবে, আর মাচবে?

শোভা হাসে। বহুদরা রেগে যান। জীবন-কবির শিক্ষকতার নরেশের এই রুচি-বিকার বহুদরা আর সইতে পারছেন না। প্রচুর ঐর্ষ্যের উত্তরাধিকারী নরেশ। বদ-সম্পদের প্রতি তার এই অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ও আত্মনুবে অবনোমোদিতা, বহুদরা খুবই অসন্তুষ্ট মনে করেন।

উত্তেজিতভাবে বহুদরা একদিন বলেন—মা, মা, শোভা! এ চলবে না...

—কি চলবে না না ?

—মরেশকে জাম-বিজাম খেঁধাতে হবে... সে শুধু মাচ-পান খিবে—এ ব্যবস্থা মানব না আমি।

—বেশ তো জাম-বিজাম খেঁধাও। মাচ-পানের সঙ্গে তো তার কোন বিরোধ নেই। বন্দোবস্ত কর—একজন বিজামী এসে রোজ হ'বটা ওকে বিজাম খেঁধাবে...

—কবিকে ভাড়িয়ে দাও...

শোভা চমকে উঠে। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—তা হতে পারে না না। কবি আছে—তাই মরেশ আছে, কবি না থাকলে, মরেশও থাকবে না...

বিস্মিত ভাবে বহুভরা বলেন...কবি না থাকলে মরেশও থাকবে না? বলিস কি? ওকে আমি বেঁধে রাখব, উজ্জ্বল হতে দেব না...

কোটপ্যাঁট-পরা একজন বিজামী আসে। হাতে তার বেত্রদণ্ড।

পড়ার বরে বলে মরেশ বিজালা করে আপনার হাতে ওট কি সার?

—বেত।

—বেত দিয়ে কি হবে?

পড়ীরভাবে বিজামী বলে—আমার নির্দেশমত না চললে, বা লেগা-পড়ার অবনোযোগী হলে—তোমাকে আমি বেত দারব।

—বেত দারবেম?

—হ্যাঁ, তোমার দিদিমার আদেশ...

—দিদিমা বলেছে, আমাকে বেত দারতে? মরেশ বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে।

—হ্যাঁ বলেছি—আড়াল থেকে সামনে এসে, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বহুভরা।

—কেন দিদিমা? আমার অপরাধ কি?

—তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ! বহু বার বারণ করেছি—ছোটলোকের হেলেনের সঙ্গে মেলামেশা করো না। গাছে উঠো না। নদীতে সাঁতার কেটো না। বধন ভবন, যেখানে সেখানে নাচগান করে বেড়িয়ে না। আমার এ আদেশ কেন শুধু না?

—আমাকে রাজপুত্র সাজতে হবে?

হ্যাঁ, তুমি একজন কোটপড়ির বংশধর। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার বংশমর্যাদা আর আভিভাত্যবোধ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে ঐ মাষ্টার তোমাকে বেত দারতেও দিবা করবে না।

মরেশের মন বিরজিত্তে তরে ওঠে। বুঝে কিছু বলে না।

বিজামী মাষ্টার একটা চেয়ার পেতে বলে। মরেশকে ইমিত করে—সামনের টুলটার উপর বসতে। মাঝখানে একটা ছোট টেবিলের উপর খাড়া, কলম আর বই।

বইখানি হাতে নিয়ে বিজামী-মাষ্টার বলে, শোনো—স্বর্ঘ্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়...

মরেশ বলে—সেকথা আমি স্বীকার করি না। যাঁ করবেম...

—তার মানে? বিজামী বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে মরেশের মুখের দিকে।

মরেশ বলে—আরতমে বড় হলোই সে বড় হয় না। স্বর্ঘ্য ত একটা আগুনের গিতি। দূরে আহেলন তাই রকে। তবুও মাঝে মাঝে কাছে এসে পৃথিবীকে আলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছেন...

একটু হেসে বিজামী বলে—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কবির কাছে শুনেছি—প্রতিপদ থেকে চাঁদকে তিনি চাঁদে তরু করেন। অমাবস্তার রাজ্যে সম্পূর্ণ ঢেকে কেলেম। এ নীচতার কারণ কি? আরো মাস পূর্ণিমা থাকলে আমাদের কি কতিটা হ'ত তিনি? চাঁদ আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।

—তুল বুঝেছ। কবি তোমাকে অবৈজ্ঞানিক তুল কথা বুঝিয়েছেন। স্বর্ঘ্যরশ্মি আছে বলেই আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হচ্ছে।

—কি করে জামলেন? বরম স্বর্ঘ্য নেই। দিমটা হ'ল রাতির। রাতিরে পেলাম আমরা অকুরত জ্যোহনা। শুধু চাঁদ থাকলে, এই পৃথিবী কি তুলন হ'ত? কত ঠাণ্ডা থাকত পৃথিবীর আবহাওয়া? কবি বলেছেন—মাছের মনে সব হুয়াকাজা আর হুস্তগতি জাপিরে তোলার কারণ হচ্ছে—ঐ স্বর্ঘ্যভেজ। চাঁদ আছে—তাই পৃথিবীতে এখনও আছে মাছের প্রাতি মাছের সহায়কুতি। স্নেহ, দয়া ও মার।

—একেবারেই অবৈজ্ঞানিক।

—বিজ্ঞান কি একথা স্বীকার করে না?

—কণ্ঠনো না। চাঁদের যে আলো জ্যোহনা, তাও স্বর্ঘ্যের কাছ থেকে বার করা। স্বর্ঘ্য না থাকলে চাঁদও থাকে না।

—বুঝলাম...

—কি বুঝলে?

একটু হেসে মরেশ বলে—কবির কাছে শুনেছি—আমার দাদামশাই নাকি চাঁদা বার দিয়ে, সুদের সুখ আদায় করে বড়লোক হয়েছিলেন, স্বর্ঘ্য তা হলে আমার সেই দাদামশায়ের মত? আলো বার দিয়ে, অমাবস্তার অন্ধকারে সুখ আদায় করেন? তার চেয়ে চাঁদকে তিনি মুক্তি দিল না? কিছু আলো চাঁদের নিজস্ব হয়ে থাক। আমরাও চাঁদের আলোর মেচে গেয়ে সুখে থাকি। স্বর্ঘ্য-ভেজের এ দাত্তিকতা সহ করি কেন বদুন ত?

বিজামী উত্তেজিত ভাবে উঠে পড়ার। স্বীকার করে

বলে—তবু টানের আলোর বাঁচতে হলে পৃথিবীর লোকগুলো
সব ‘বাইসিলে’ মরে যাবে।

বনুছরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে, কি
হয়েছে?

বিজ্ঞানী বলে—আপনার নাভিকে বিজ্ঞান শেখানো
আমার পক্ষে সম্ভব নয়...

—কেন?

—কবি ওর মাথাটি খেঁচে বসে আছে...

কবি ছিল আড়ালে ঠাঁড়িয়ে। বরষের তায়ে মেরুদণ্ড
ভেঙে ছ্যাক হয়ে পড়েছে। সামনের দিকে হুঁকে-পড়া
মেহটাকে খাড়া রাখবার জেতে দরকার হয়েছে তৃতীয় পা—
একটা মোটা লাঠি।

অষ্টাব্জের মত তদ্বিকে এসিরে এসে, কবি বলে—না।
তা হলে এখন আমি আসি। বিদায়...

শোভা ছুটে এসে বাধা দিয়ে বলে—কেন কবি?

—আর ত দরকার নেই শোভা। নরেশকে আমার
চেয়েও ঢের বেশী পণ্ডিত করে দিয়েছি। আমার বিত্তেও
কুরিরে গেছে, আমিও কুরিরে গেছি...

—না না, তুমি বেরো না...শোভা অস্থিরতা প্রকাশ করে।
বনুছরা গভীর ভাবে ডাকেন—শোভা।

—কি না?

—কবিকে বেতে দাও...

—কেন?

—কবির কৃপিকা নরেশকে চরম উজ্জ্বল করে পড়ে
চুলেছে। আর নয়। কবিকে আর সহ্য করব না আমি...

—দোহাই তোমার, কবিকে তাকিয়ে দিও না...

—সেদিন নরেশ কি করেছে জান?

—কি?

—একজন প্রজা এসেছিল—বাগ্‌মার টাকা পরিশোধ
করতে। সুনাম—নরেশ নাকি ম্যানেজারের হাত থেকে
দাবিলাখানা কেড়ে নিয়ে—তাকে দিয়ে দিয়েছে। আর বলে
দিয়েছে—টাকা দিতে হবে না তাকে...

উৎকর ভাবে নরেশ বলে—আর একটা কাজ কি করেছি
জান না?

শোভা জিজ্ঞাসা করে—কি?

—সেই বুড়ো প্রজাটা, এই পৌষের শীতে ঠক ঠক করে
কাঁপছিল। বিবিয়া আমাকে যে শালের কোড়া দিয়েছিল—
তাই দিয়ে তাকে জড়িয়ে ঐ পেটের বাইরে পৌঁছে দিয়ে-
ছিলাম।

—তাই নাকি? আমনের আভিশব্দে জীবন-কবি নিজের
যুকের ভিতর ঢেপে বসে নরেশকে। আদ্যহারা হয়ে বলে—
বাঃ, বাঃ। তার পর, একভাষার বঁকা দিয়ে গেছে ওঠে—

কে জানে যোর চারা-গাছে,

বরবে এ কল অকালে?

তোদের রবি উঠবে না, যোর—

চাঁদ উঠেছে সকালে।

বনুছরা বমক দিয়ে বলেন—কবি। বাম...

—কেন বামবে? নরেশ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—গাও
কবি। আমি নাচব...

—না। এ প্রাসাদে আর নাচ-গান চলবে না...বনুছরা
উদ্বেজিত হয়ে ওঠেন।

একটু হেসে নরেশ বলে—আচ্ছা দিদিমা। আরতনে বড়
হওয়ার কি সত্যি বড় হওয়া?

—তার নামে?

—না সেদিন বলছিল—তোমার ওজন নাকি হ’ল হজ্জি
সের। কবি আর বৈজ্ঞানিক হ’লমকেই যদি ঠাঁড়িপাল্লার
এক দিকে ভোলা যায়—তবু ওঁরা তোমার সমান হতে পারেন
না। তবে আর দরকার কি? তাকিয়ে দাও—হ’লমকেই।
তুমিই পারবে আমাকে শিখিয়ে দিতে—কি তাবে গরীবের
টাকা কেড়ে নিয়ে, দুধ-খি বেতে হর, আর দুটরে বেতে হর...

নরেশের সেই মারাত্মক মন্তব্য শুনে জীবন-কবি চমকে
ওঠে। বম-পর্কিণী বনুছরাকে আঘাত করবার জেতে নরেশের
তুণে আর কত বাণ আছে তাই বা কে জানে? না না, এখানে
আর নয়। জীবন-কবি মাথা নীচু করে চলে যায় নিজের
কুঠিরে। মনে মনে আর একবার বলে যায়—বাঃ বাঃ।

৬

রাগে বনুছরার চোখ বুধ রাঙা হয়ে ওঠে। ঐ একরকম
ছেলে তাঁকে দি-ছব খাওয়ার পরিহাস করে? শোভা পর্যন্ত
ওঁর সামনে মাথা তুলে কথা বলতে সাহস করে না। সেই
শোভার ছেলে নরেশ। সে করে রাগী বনুছরাকে অসম্মান?

মাঠারের হাত থেকে বেতখানা টেনে নিয়ে বনুছরা বলেন
—মাঠার। এই বেত নিয়ে ঠাঁড়িয়ে থাকব আমি। তুমি
ওকে পড়াও...

—পড় নরেশ। বিজ্ঞানী আবার চেয়ার পেতে বসে।
নরেশও তরে তরে গিয়ে বসে টুলের উপর।

বিজ্ঞানী বলে—পড় নরেশ। উত্তর মেরুতে হ’লস দিন
আর হ’লস রাত্রি...

নরেশ বলে—সেখানে বোম্ব হর হ’লস বাইসিল্ আর হ’
লস কলেজ।

—আঃ। নাকে ব’কো না...

—বাঃ রে। কিছু আপে, আপনিই ত বললেন, দুর্বা-দুর্গি
না থাকলে বাইসিল্ হর...

—আচ্ছা, এ বই এখন থাক। খাড়া কলম দাও, ঝাঁক
কর...

বহুদূর বলেন, হ্যাঁ ঠিক। আঁকু কখাও। টাকা-আনা-পাইরের হিসাব খেঁখাও...আমি একটু ঘুরে আসছি...

বহুদূর চলে গেলে মরেশ বেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। হৃৎকম্পিত হের দিদিমার হাতে বেত দেবে, কোন্‌ সত্যের শিলে না চম্কার?

মরেশ বলে, শুভ্র সার। আঁকুগুলো বেন পচা মর্দমার পোকার মত, আমার মাথার ভিতর গিরে কিলবিল করে। তার চেয়ে শুভ্র শুভ্র করে একটা গান পাই শুভ্র...

—রাণী বহুদূর আমাকে মাইনে দিচ্ছেন, তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। তোমার গানের তাত্ত্বিক করবার জন্যে নয়...বলেই বিজ্ঞানী তার পকেট থেকে সিগারেট-কেসটা বের করে। একটা সিগারেট ধরার।

হাত পেতে মরেশ বলে, আমাকেও একটা দিন না সার।

—তুমি সিগারেট খাবে?

—দোষ কি?

—সিগারেট খেলে লাগু'স খারাপ হয়...

—আপনার লাগু'স নেই?

—বড় অসত্য হলে তুমি...

—বাঃ রে। সিগারেট খাচ্ছেন আপনি, আর অসত্য হচ্ছে আমি?

জামালা-পথে দূর থেকে বহুদূরকে আসতে দেখে বিজ্ঞানী তার সত-বরানো গোটা সিগারেটটা জুতোর ভলার মাড়িরে দেয়।

মরেশ একটু হেসে বলে, আমার পায়েও বড়ম আছে সার। আমিও ওভাবে লুকোতে পারতাম...

বহুদূর এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি হচ্ছে?

বিজ্ঞানী বলে, মরেশ আঁকু কখতে রাজী নয়...

চোখ রাঙিয়ে বহুদূর কৈফিয়ত তলব করেন, কেন মরেশ?

বহুদূর অভিযম দেখিয়ে মরেশ বলে, বড় পেটব্যথা করছে দিদিমা।

—পেটব্যথা করছে? থাক, থাক, তা হলে আজ আর পড়াশুনার দরকার নেই। ওষুধ খাবে এস...বলেই বহুদূর ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

মরেশ ভাবে, তাই ত। এখন কি করা যায়? পিঠি বাঁচিয়েছি পেটের দোহাই দিয়ে। এখন পেট বাঁচাবার উপায় কি?

শোভার কাছে ছুটে গিয়ে, মরেশ তাকে জড়িয়ে ধরে কঁদে কঁদে বলে, মা। আমি মিছে কথা বলেছি। সত্যি পেট-ব্যথা করছে না আমার। তবু দিদিমা আমাকে ভেতো ওষুধ পেলাবে...

—কেন মিছে কথা বললে?

—সত্যি কথা বললে দিদিমা বেত মারত।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ। শোম মা। আজই আমি কবির কাছে চলে যাব। যেখানে সত্যি কথার শান্তি বেত আর মিথ্যে কথা: শান্তি ভেতো ওষুধ, সেখানে আর একটা দিনও থাকব না আমি।

শোভার চোখ কলে ভরে ওঠে। চোখ দু'হে মরেশে: মাথার হাত রেখে সে বলে—আচ্ছা এসো।

—যাব?

—হ্যাঁ, এখানে থাকলে তুমি মিথ্যাবাদী হবে, চোর হবে, ডাকাত হবে।

—তুমি যে আমার জন্যে কঁাদবে।

—মা বাবা। একটুও কঁাদব না। তুমি কবির কাছেই যাও। আমি থাকে থাকে গিরে দেখে আসব। এখানে যদি থাক তা হলে আমাকে দিনরাত কঁাদতে হবে।

মরেশ শোভার পারের দুলো মাথার নিরে উঠে গাড়াভেই সে তার মুখখানা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে কপালে চুবন করে। মরেশ চলে যায়।

এক হাতে ওষুধ আর এক হাতে বেত নিয়ে বহুদূর এসে জিজ্ঞাসা করেন—মরেশ কই?

—চলে গেছে।

—কোথায়?

—কবির কাছে।

—তোমাকে বলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—বাবা দাও নি?

—না।

—কেন?

—কবিই তার মা-বাপ। আমি কেউ নই। এখানে সে থাকবে না।

—সে কথার নামে?

—মানে তোমাকে বোঝাতে পারব না মা। মরেশের আশা তুমি ছেড়ে দাও।

—আশা ছেড়ে দেব?

—হ্যাঁ।

—তা হলে শোম শোভা। তোমাকে আমার বিয়ে দেব আমি।

শোভা চমকে ওঠে। কি ভয়ানক কথা। চোখ হট্টো বড় করে দারুণ বিষয়ে শোভা জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি বলছ মা?

—তোমার এ বৈবাহ্যিক কোন মানে হয় না। পুরো হট্টো বহরও তুমি দাবী নিয়ে সুখী হও নি। আমার তোমাকে আমি বিয়ে দেব এ সঙ্গ আমার দ্বিগ। বিজ্ঞানী। এ

দিকে এলো... বরকার দিকে খুব কিরিয়ে বহুদরা বিজানীকে তাকেন।

বিজানী এসে বসে ঢোকে। বহুদরা তাকে বলেন—শোভাকে বুঝিয়ে দাও তার মত বাল-বিবহার বিয়ে হওয়া উচিত কি না?

সলফোচে ও সবিসরে বিজানী নিবেদন করে—সে বিষয়ে আলোচনা করতে উনি যদি রাজী না হন?

শোভা বলে—হ্যাঁ রাজী আছি। বহুদর আপনি।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উৎসাহিত ভাবে বিজানী বসে। বহুদরা বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

শোভা বেশ বুঝতে পেরেছে—প্রস্তাবটা খুব হঠাৎ আসে নি তার কাছে। এ বিষয়ে বিজানীর সঙ্গে বহুদরার আলোচনা হয়েছে পূর্বেই। বিজানীর প্রত্যক উদ্বেগ নরেশের শিকড়তা হলেও, পরোকে তার দৃষ্টি পড়েছে শোভার প্রতি। শোভাকে পেলেই শু রাষ্ট্রোৎসর্গ পাওয়া হবে? শোভার মনে ভেগেছে বিজানীকে একটু বাচাই করবার কৌতুহল। তাই জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি বিবাহ-বিবাহ সন্ধান করেন?

—নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ আপনার মত বাল-বিবহার বিবাহ না হওয়া অত্যন্ত অন্ত ও অসহ্যত?

—আপনি কি বিবাহিত?

—আজ্ঞে না...

—একটা বাল-বিবহার হুঃখ করবেন?

—নিশ্চয়ই করব। আমার জীবনের একটা পবিত্র সম্বন্ধই তাই। বহু কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আজও অবিবাহিত আছি...

—বহুদর। আজ, আশুদ তা হলে। কাল আবার আসবেন। আমার পরিচিত একটা বাল-বিবাহ আছে। মা-বাপহারা লম্বুঃবিনী। তাকে উদ্ধার করবেন?

—হেবুদ, আমি...আপন'কেই...

—বেরিয়ে যান এ ঘর থেকে...শোভার চোখে-মুখে যেন আশ্রয় আসে ওঠে। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে বিজানী বেরিয়ে যান।

১

কবির কুটীরে গিয়ে শোভা দেখে—কবি হুত্মা-শব্দ্য। নরেশ তার সেবাস্বর্য করছে। গান গেয়ে শোনাচ্ছে। কবির একতারা আজ নরেশের হাতে। চোখ বুজে বন্ধার স্তম্ভে স্তম্ভে কবি বলেন—বাঃ বাঃ!

চাষী-পল্লী থেকে নরেশের সময়সী বহুদরা সবাই এসে ছুটেছে সেখানে। কবির কুটীরে আজ কোনও কিছুই অভাব নেই। কত ফুল, কত কল। হুত্মা বেশ মহোৎসব। জীবন-কবি তার অহুদাশ্রয়ের শিকড় থেকে চির-বিহার মিছে। সকলের

চোখ সজল। কিন্তু কবির বিশিষ্ট মুখে হাসি বেশ বরছে না। এ কি হুত্মার আদম?

শোভা কৈদে খুক তাসাচ্ছে। কবি তাকে সাত্বনা দিতে বলেন—কৈদে না শোভা! আমার কতাল আজ পুতবে—আমার হবে মুক্তি। হুঃখ করো না। হুত্মা কিছুই নয়। আমি শু বেঁচে থাকব তোমার নরেশের মনের মতো।

চোখ মুছে শোভা কিয়ে আসে। বহু হুত্মাবান আসবাব-পত্রে সাক্ষ্যে একটা কক্ষের এক কোণে বসেছে সে। খোলা-জামলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। চলেছে জীবন-কবির শববাহী শোভাখান্দ।

হঠাৎ পিছন থেকে বহুদরা তাকলেন—শোভা!

শোভা খাক কিরিয়ে দেখে—বহুদরার সঙ্গে একটা অপরিচিত লোক।

বহুদরা লোকটিকে দেখিয়ে বলেন—ইনি এনেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে।

—কে উনি?

—একজন বিখ্যাত দার্শনিক ..

দার্শনিক প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—না না, কথটা আপনার ঠিক বলা হ'ল না, বহুদরা দেবী।

—কেমন?

—বহুদর আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন, আলাপ-পরিচয় করতে আপনার ঘরের সঙ্গে...

—একই শু কথ...

—আজ্ঞে না—কথটা এক নয়...তবে, বিজানী আমার বহু। তার সঙ্গে ঠর বিয়েটা বধন ঠিক হয়ে গেছে...স্তবন... আমি মিছে এলেও...

উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে শোভা বলে—না। এ সব কি? তুমি আমাকে কি ভেবেছ বল ত?

—কি ভেবেছি?

—আমি বিবাহ নই। আমাকে আর বিরক্ত করো না...

বিস্মিতভাবে বহুদরা বলেন—বটে! তুমি বিবাহ মও?

—না। তোমরা আমার বামীকে দেখতে পাছ না।

আমি দেখছি—আমার এই বুকের ভিতর বেঁচে আছেন তিনি...তার স্পর্শ আমি অস্বত্ব করি...

—কি সর্কসাপ! এই মেয়েকে বিয়ে দিতে চান আপনি? দার্শনিক বিশ্ব প্রকাশ করেন।

বহুদরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—বিয়ে ওর দিতেই হবে—সে সবচেয়ে কোনও প্রতিবাদ স্তম্ভে চাই না।

দার্শনিক শোভার বিবাসকে সন্ধান করে বলেন—বীর মন বিবাহ হয় নি—তিনি কখনই বিবাহ নয়...একথা আমি বলবই...

বিজানী বাইরে ঠাকিরে ছিল। বহুদরা তাকে ভিতরে

ডাকেন। তৎসময় নূরে বলেন—কেম তোমার এই দার্শনিক বস্তুকে নিয়ে এসেছ ?

দার্শনিক বলে—বিজ্ঞানী মূর্খ বলেই রাজকুমারী শোতাকে চিনতে পারে নি। বিজ্ঞাণা করি—কেম তাকে আপনি নিয়ে দিতে চান বস্তু ন ?

—আমার এই অভুল ঐখর্য্য ভোগ করবে কে ?

—যারা ভোগ করবে—তারা আসছে।

—কারা আসছে ?

—যারা এই শোতা দেবীকে মা বলে ডাকবে। তারা একজন নয়, দু'জন নয়, হাজার হাজার স্তুতিভের দল...

—কোথায় তারা ?

—দেশে কি দেখছেন না স্তুতিকের পূর্বাভাস ? অনারুণী ও অজ্ঞান আরম্ভ হয়েছে। শীগ্গিরই শুভে পাবেন অন্নহীন প্রাণ-সাধারণের হাতাকার। যাদের কারিক শ্রমের মূল্য আহার্য করে গড়ে উঠেছে আপনার এই রাজপ্রাসাদ।

উদ্ভেক্তভাবে বসুন্ধরা বিজ্ঞাণা করেন—বিজ্ঞানী ! কেন এই দার্শনিককে নিয়ে এসেছ এখানে ?

বিজ্ঞাণা বিজ্ঞানী বলে—ভুল করেছি...

—ভুল কর নি বস্তু। এই শোতা দেবীকে তুমি চিনতে পার নি। আমার দৃষ্টি নিয়ে তাকে চিনতে ও বুঝতে চেষ্টা কর। স্বাধ-চিত্তা মানুষকে অধঃ ও অসদত করে...সুদৃঢ়ভাবে দার্শনিক বলে।

বসুন্ধরা বুঝেছেন—এই দার্শনিক একটা বিশিষ্ট মতবাদের সমর্থক, যারা বলে—বনীর সম্পদে নির্ধনের দাবি আছে। কাবও বলত—দার্শনিকও বলছে—বনীর পরম্পরাগামী নয়। দেশে হিতক বা অন্নাতাব ঘটলে বনীর তাগাদবার মূল্য হ্রাস হবে। নিরন্তর অন্ন দিতে হবে। কিন্তু কেম ? এই সব মতবাদী যে অভ্যন্ত পরীক্ষাতর সে বিষয়ে বসুন্ধরার মনে কোমল সন্দেহ নেই। উদ্ভেক্তভাবে বসুন্ধরা বিজ্ঞাণা করেন—দার্শনিক ! তোমার উদ্দেশ্য কি ?

—কোমল উদ্দেশ্য নিয়ে ত এখানে আসি মি...?

—শোতার দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেম ?

—দেখছি...

—কি দেখছ ?

—অপূর্ণ মাতৃহৃদি। স্তুতিভের দল যখন মা, মা, বলে আপনার হাতে এসে কাঁদবে, তখন এই শোতা দেবীর মাতৃ-হৃদয় নিশ্চয়ই কেঁদে উঠবে। তাগাদ-বার মূল্য দিতে বাধ্য হবেন আপনি...

—বাধ্য তব ?

—নিশ্চয়ই। শোতার হেলেধেরেরা অমাহারে শুকিয়ে মরবে, তা কি তত্তে পারে ?

—যাদের অন্ন হুটবে না, তারা মরবে। সে যত্ন তাদের বিধি-নিষিদ্ধ শাস্তি। আমার কি ?

—বিধি-নির্দেশের কথা ভুলবেন না। সে নির্দেশ চিরন্তন নয়, পরিবর্তনশীল। আজ যারা মরবে, মরার আগে তারা জানতে চাইবে—কেম মরছে ? কে তাদের বাঁচার অবিকার হরণ করেছে ? এ প্রশ্নের সমাধান যদি তারা করতে চায়, তা হলে আপনারাও বাঁচবেন না...

—আমরাও বাঁচব না ?

—নিশ্চয়ই নয়। মা মা, বলে কেঁদেও যদি থাকে কাপাতে না পারে তা হলে সে ডাইনী-মাকেও তারা মারবে...

—তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

—যে আজ্ঞে, বাচ্ছি...কিন্তু তুমি কি করবে বস্তু ? বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞাণা করে দার্শনিক।

—বসুন্ধরা দেবী যদি শোতাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেন, তা হলে এই রাষ্ট্রব্যর্থ সরকার দারিদ্র্য আমিই এহণ করব...

—পারবে ?

—কেম পারব না ? এমন সব মারণাধ্য ব্যবহার করব, যাকে অগ্রাহ করা কোন আক্রমণকারীর পক্ষেই সম্ভব হবে না...

—মানুষ-মারা খুব সোজা। কিন্তু তার সমক্ষে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন। উপস্থিত তুমি যে আক্রমণ চালাচ্ছ, তার কল যে কি হবে, তাও তাব একবার।

—আমি আক্রমণ চালাচ্ছি ?

—নিশ্চয়ই। রাণী বসুন্ধরার সাহায্যে বস্তুক নিয়ে যিরে, শোতাকে তরত বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু তার সমক্ষে তুমি পাবে না বস্তু। সে থাকবে তোমার মাপালের বাইরে...মমতার বসুন্ধরা দেবী। আসি তা হলে।

দার্শনিক চলে যায়। শোতার কাছে গিয়ে বসুন্ধরা দেখেন, শোতা বুদ্ধিতা।

বন্দিনী-শোতার বিষের স্বাক্ষর বেছে ওঠে। কবি বেঁচে নেই। কবির সেই নিরামল কুটীরে বলে মরেশ শোনে সে স্বাক্ষর।

অনুরে চাষীপল্লী। সেখানেও আমল নেই। অনারুণীর কলে ম'ঠের মাটি শুকিয়ে পাথরের মত শুষ্ক হয়ে গেছে। চাষীর লাঙল চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে প্রাণ হরে পড়েছে। কঙ্কালসার গরুগুলি কাঁকের লাঙল কাঁধে নিয়েই শুকনো মাটিতে শুয়ে পড়ে। চামতে পারে না। গরুর অপরাধ কি ? তারা মাটি তঁকে তঁকে ঘুরে বেড়ায়। কোথায়ও এক গাছি সবুজ তৃণের সন্ধান পায় না। পুকুর-ডোবার জলও শুকিয়ে আগছে। পল্লীমেয়েরা উলু দিয়ে আর শাঁখ বাজিয়ে পূজনা-দেবের পূজা করছে। হে ঠাণ্ড, জল দাও—জল দাও।

কবির স্মৃতির পর হ' বাল কেটে গেছে। শোতা ত আর একটা বারও আসে নি কবির কুটীরে। মা তার সন্ধানকে

তুলে গেছে? অনাবৃষ্টি তা হবেই। শোভা যে বন্দিনী তা ত মরেশ জানে না। সেই ত্রেহমহীর এই আচরণের কথা তেবে তেবে মরেশের মনে বিষয়ের অভ্যুদয়। আক শোভার বিষের বাজনা শুনতে শুনতে মরেশের মন বিষয়ে তরে যায়। না না, পর্জন্মদেব। তুমি এক ফোঁটা জলও দিয়ো না। এ দেশ জলে পুকে ছাই হয়ে যাক। তোমার শু বজ্র আছে? তার একটা ফেলে দাও ঐ রাজপ্রাসাদের চূড়ার।

মরেশ শুনল চাষীপন্নীতে বিরাট জন্মতার সমাবেশ হয়েছে। তারাক্রান্ত মন নিয়ে মরেশও যার সেখানে। চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে।

সমবেশ চাষীদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন দার্শনিক।

—ওরে অন্নহীন বহ্নীহীন, বুক ও বধিরের দল। তোরা কি শুনতে পাস? না—রাজপ্রাসাদের নহবতে আক কিসের বাজনা বাজে? কান পেতে শোন্—বন্দিনী বিধবা রাজকন্ডার বিবাহোৎসব।

মরেশ চিংকার করে বলে ওঠে—রাজকন্ডা বন্দিনী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্দিনী। দার্শনিক উত্তেজিত ভাবে বলেন—রাজপুরী আক সন্ন্যাসিনী সৈনিক দিয়ে বেণ। আমি জানি শোভা দেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিবাহের আয়োজন। তুরি-তোজনের বিরাট ব্যবস্থা। দেশ-দেশান্তরের বনী-মহাজনরা এসে বিবাহসভার শোভাবর্ধন করবেন। তোমরা অন্নহীন। কিন্তু রাজপুরীতে মণ্ডা-মঠাই গড়াগড়ি যাচ্ছে। এক ফোঁটা ডুকার জল পাও না তোমরা, রাজপুরীতে বয়ে যাচ্ছে অতি উগ্র ও তীব্র পানীয়ের ঢেউ। তোমাদের শ্রমের ফল্য দিচ্ছে ঐ রাজপ্রাসাদটা। পড়ে উঠেছে। কিন্তু কই? কোনো উৎসবেই শু তোমরা নিমজ্জিত হও না সেখানে?

একজন বৃদ্ধ চাষী কপালে করাঘাত করে বলে—আমাদের অদৃষ্ট।

দার্শনিক বলেন—অদৃষ্টকে দেবত্রে চেষ্টা কর, বৃথতে চেষ্টা কর। ঐ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ আছে। রাণী বহ্নীহীন কে? তাঁর নিমজ্জনের অপেক্ষা কেন করবে? হাজারে হাজারে গিয়ে হাজারি হও ঐ রাজ-ঘারে। অন্ন দাও, বজ্র দাও বলে চিংকার কর। এই হৃত্তিকের দিনে বিলাসী-বনীদেব আনন্দোৎসব কি তোমাদের অদৃষ্টকে পরিহাস করছে না? সে পরিহাস তোমরা কেন সহ করবে? অনাবৃষ্টির প্রতিকারের জন্তে যদি পর্জন্মদেবের কাছে জল চাইতে পার, বনী-মহাজনদের কাছে বেঁচে থাকার দাবি জানাতে পারবে না কেন? তাদের সুখৈর্ষ্য কাদের জন্তে?

মরেশ বীরে বীরে এগিয়ে যার দার্শনিকের দিকে। গুব কাছে গিয়ে করকোড়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কে?

—তুমি কে—আগে তাই বল...

—বিধবা রাজকন্ডা আমার মা। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান।

দার্শনিক চমকে উঠেন। বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকেন মরেশের মুখের দিকে। অক্ষুট বয়ে বলেন—তুমি তাঁর ছেলে? তিনি ছেলের মা?

—বিধবা যে পুত্রবতী, তা কি আপনি জানতেন না?

—না। আমার বিজ্ঞানী বহুর কাছে শুনেছি—তিনি নিঃসন্তান। কি আশ্চর্য। তুমি এ বিবাহে প্রতিবাদ করছ না কেন?

মরেশ একটু লজ্জিত ভাবে বলে—কেন করব? আমার মায়ের মনের অবস্থা যে কি তা আমি জানি না? বিবাহে যদি তাঁর আগ্রহ থাকে, আমি কেন বিগ্রহ ঘটাব?

—তুমি বুঝি রাজপ্রাসাদে থাক না?

—না। রাণী বহ্নীহীনের অভ্যাচার সইতে না পেয়ে এই কৃষক-পন্নীতে বাস করছি। ঐ চাষীরাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এদের আমি ভালবাসি...

—তাই নাকি? দার্শনিক উৎফুল্ল ভাবে বলেন—তা হলে চল—ঐ হাজার হাজার কুর্ভিত অন্নহীনের দল তোমার নেতৃত্বেই প্রবেশ করবে রাজপ্রাসাদে। তোমার দাবি মায়ের সঙ্গে দেখা করা।

জনসমুদ্র উল্লসিত হয়ে ওঠে। বহু কঠোর কোলাহলে প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়। সাক, সাক রব পড়ে যায়।

কেউ কেউ সন্দেহিত ভাবে প্রতিবাদ জানায়—আমরা নিরস্ত্র। সন্ন্যাসিনী সৈনিকেরা যদি আক্রমণ করে—তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? সেকথাটা ভাব। যেতেই যদি হয়—চল, তৈরি হয়ে যাই। খোঁজা কোদাল, দা-কুড়ুল, ঝার ঝা আছে নিয়ে এস...

দুগ্ন কঠে প্রতিবাদ জানিয়ে মরেশ বলে—মা, কেউ কোম অস্ত্র নিতে পারবে না। শুধু আমার হাতে থাকবে—এই একতারা। তোমাদের সবার আগে থাকবে আমার এই বুক। বুক দিয়ে সন্ন্যাসিনী ঠেলে এগিয়ে যাব আমি। আমার যত্ন না দেখে, তোমরা কেউ পিছু হটতে পারবে না।

মরেশের সে ঘোষণার সমর্থন জানিয়ে অহিংস অভিযানের মাহাত্ম্য প্রচার করে দার্শনিক। চারদিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বজা বয়ে যায়। জনশ্রোত বাজা করে রাজ-প্রাসাদের দিকে।

১

বহুল্লা অলঙ্কারে আর বেশভূষার শোভা আক রূপসজ্জা করেছে—বেন রাজরাজেশ্বরী। কি অমিন্দ্যমুগ্ধ তার মুখশ্রী। সে বেন বৃষ্টিমতী সৌন্দর্য। হৃৎ দৃষ্টিতে বিজ্ঞানী চেয়ে থাকে, শোভার মুখের দিকে।

শোভা বিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা বিজ্ঞানী! কি মনে কর এই দেহটাই আমি?

—না।

—তবে?

—তোমার মনও আমি চাই...

—চাও? তাই নাকি? কি করে পাবে?

বিজ্ঞান বিজ্ঞানী বলে—দেহকে পেলেই ত মনকে পাওয়া যাবে...

শোভা হাসতে হাসতেই বিজ্ঞাসা করে—তোমার বিজ্ঞান তাই বলে বুঝি?

—হ্যাঁ, শুধু বিজ্ঞান কেন ইতিহাসও তাই বলে। ব্যক্তি বা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসে শুধু দৈহিক সামর্থ্যের জর-বোঝা ছাড়া আর কি আছে? কত বিজ্ঞানী মন শক্তিমানেই কাহ্নে মত্ত হয়ে অবীনতা স্বীকার করেছে।

—সে বর্বর যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। এ যুগে দৈহিক প্রাণত কেউ মানবে না। এখনও সাবধান হও বিজ্ঞানী। মনকে উপেক্ষা করো না। মা-বহুতরার রক্ত চক্ষু আর তোমার কোমরের ঐ পিঙ্গলকে ভয় করব না আমি। —শোভা গভীর হয়ে ওঠে।

—সত্যিই কি তুমি আমার হবে না শোভা? কাতরভাবে বিজ্ঞাসা করে বিজ্ঞানী।

—আমি যদি এক হুকুরো মাংস হতাম—তা হলে তোমার মত হাংলাকে বলিয়ে দিতে পারতাম। আমি যে কি তা তুমি ঠিক বুঝতে পারব না...

—কি তুমি? কেন এমন ছুবনমোহিনী রাজরাজেশ্বরী সেজেছ?

বহুতরা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেন—বিজ্ঞানী! সর্বনাশ হয়েচে...

—কি হয়েছে মা?

—হাজার হাজার ভিবিরি আসছে রাজপুরী আক্রমণ করতে...

—বেশ ত, আলু না। তবু কি? রাজপ্রাসাদ খুব সুরক্ষিত আছে। কেউ হুকতে পারবে না। আমিও বাচ্ছি তাদের অত্যাচার করতে—বলেই কোমরের পিঙ্গলটা হাতে বাগিয়ে নিয়ে, বিজ্ঞানী বেরিয়ে বার ঘর থেকে।

বহুতরা ভিত্তিতভাবে একটা আসনে বসে পড়েন। মাথাটা চেপে ধরেন।

শোভা কাতরভাবে বলে—মা! ভিবিরিদের রক্তে স্নান করে খুব পুণ্যসঞ্চর করবে, না?

—উপায় কি? বোধ হয় নরেশও আছে ওদের সঙ্গে। তাই ত ভাবছি—কি হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নরেশ নিশ্চয়ই আছে—শোভা ছুটে বার

কামালার ঘরে। বাইরে উঁকি দিয়ে আনন্দে আনন্দ হার ওঠে। চীৎকার করে বলে—মা! দেখে বাও—দেখে বাও—আমার নরেশ কি হুম্বর সাজে সেজে এসেছে...

চারী বালকেরা কুল-সাজে সাজিরেছে নরেশকে। গলার তার বিচিত্র কুলের মালা। চূড়াবাণ কেশওছ কুল দিয়ে জড়ানো। কামে কুলের কুণ্ডল। হাতে কুলের করণ। তত্ত-কাকনের মত উজ্জল তার সূক্ষ্মার দেহের দীপ্তি। পর-পাণ্ডির মত বলভরা আরত চোখ দুটি টলমল করছে। মুখশ্রীতে অপরূপ সজ্জার দৃঢ়তা। ছেলে তার মাকে দেখতে এসেছে।

শোভা তার অঙ্গের অলঙ্কার খুলে বরষর হাতিরে কেল। ঘোঁপা খুলে চুল এলিয়ে দেয়। স্নানান বেষকুয়া ছেকে পটবর পরে। বহুতরা চুপ করে বসে দেখেন। কোমও প্রতিবার করেন না।

নরেশের পাশে ঠাঁড়ি, হাররকীদের সন্ধানন করে দার্শনিক বলে, এই তত্ত্ব-কিশোর কে? তোমরা কি চিন্তে পারছ একে?

নরেশকে দেখেই তারা চিনেছে। তার মুখখানি যে শোভার মুখের প্রতিচ্ছবি। হাররকীরা অভিবাধন জানিয়ে পথ ছেকে সরে ঠাঁড়ার।

পিঙ্গল-হাতে বিজ্ঞানী এগে হুকুম দেয়, সদরের পেট বন্ধ কর...

হাররকীরা বিজ্ঞানী হয়ে ওঠে। সে অতার হুকুম তারা মানবে কেন? তাদের ভাবীমনিব রাজকুমার নরেশকে তারা বাধা দেবে তার হুকুমে? বিজ্ঞানী কিয়ে বার বহুতরার কাছে। হাররকীদের সঙ্গে তার কথা-কাটাকাটর ধবর ভনে, বহুতরা ম্যামেকারকে পাঠান, একা নরেশকে সামরে অত্যাচার করে তেতরে আন্দার জতে।

নরেশ সে প্রভাবে রাজী হয় না। যারা তার সঙ্গে এসেছে, তাদের সবাইকে দিতে হবে প্রবেশাধিকার। রাজকতা শোভা ত আজ একা নরেশের মা নন্? হাজার হাজার সন্ধান তাঁর। সবাই এসেছে তাদের মাকে দেখতে। কোম বাধা কি তারা মানবে? বহুতরার হুকুম অমান্য করে সবাইকে নিয়ে নরেশ হুকে পড়ে, সদরের পেট পার হয়ে, প্রাসাদের সন্মুখে, বিজীর্ণ গুপ্তোচ্চানে।

প্রাসাদের দরবার গুলিতরা পিঙ্গল হাতে ঠাঁড়ি নিয়ে আছে বিজ্ঞানী। দূর থেকে তাকে দেখে নরেশ একটা মনভার জানায়। তার পর কয়েক জন সাহসী বহুকে সঙ্গে নিয়ে বীরে বীরে ওঠে সোপান বেয়ে।

বিজ্ঞানী বলে, যদি প্রাণের মমতা থাকে, আর অঙ্গর হাছা না...

উপেকার হাসি ছেনে নরেশ বলে, প্রাণের চেয়েও, মা যে সন্ধানের কাছে কত বেশী প্রিয়—তা কি আপনি জানেন না? আপনায় বোধ হয় মা নেই? জিজ্ঞাসা করে বিজ্ঞানী।

বহুতর্য এসে বলেন, মরেশ। তুমি একলা ভিতরে এস।
ওদের কিরে যেতে বল...

—তা কি হয়? তা হলে আমরা কেউ ভেতরে যেতে চাই না।
আমাদের মাকে একবার বাইরে আসতে বল। তার
পারের খুলো দিয়ে আমরা সবাই কিরে যাব...

বহুতর্য উত্তেজিত ভাবে বলেন, সে এখানে আসবে না,
আসতে পারবে না...

—কে তাঁকে বাধা দেবে? আমি যাব তাঁকে আনতে,
এই চাষীদের ভিমে আশীর্বাদ করবেন...

—সাবধান মরেশ! সে আমার ঘরে...

—কিছু আমার না। আমি তোমার হুঁইবর্ষের প্রত্যাশী
নই। আমার মা যদি আমার কুটীরে গিরে তিথারিণী সাজতে
চায়, তোমার কোন অধিকার নেই তাঁকে বাধা দেবার...

বিভলে শোভার ককটিকে বাইরের দিক থেকে রুদ্ধ করে
এসেছেন বহুতর্য। পবাক পথে একটি পরিচারিকা এসে

টুকি দিয়ে দেবে। পলার বহুবল্য হারহতা পরিচারিকার
পায়ে ছুঁতে ঘেঁরে শোভা নিমিত্ত জানার—দরজাটা খুলে দে—
খুলে দে—তোমার পায়ে পড়ি খুলে...

পরিচারিকাও পূজবতী। মরেশের বুকের দিকে চেয়ে
ভারও মনে পড়ে নিজের হেলের মুখ। কিন্তু কি করবে?
বহুতর্যের ভয়ে সে কাঁপে। ভবু হঠাৎ বধন দেখে, বিজ্ঞানীর
পিতলটী মরেশের বুকের উপর—ভবন আর ছির থাকতে
পারে না। জান্না দিয়ে হারহতা কিরিরে দিয়ে, দরজাটা
খুলে দেয়। তার পর পালিয়ে যাব সেখান থেকে।

উমাধিনী শোভা ছুটে যায়। শাবকহারা সিংহিনীর মত
আক্রমণ করে বিজ্ঞানীকে।

বহুতর্য নির্ঝাঁক ভাবে চেয়ে থাকেন শোভার দেই
তেজোমুগ্ধ বুকের দিকে। কোন কথার বা কাকের প্রতিবাদ
করবার সাহস নেই তাঁর...

মরেশ এসে শোভাকে জড়িয়ে ধরে বলে—মা!

কোশী-বঁধ

শ্রীশিশিরকুমার কর

পত ১৫ই জুলাই হইতে কোশী নদীতে জল বাততে থাকে এবং
বিহারের যে-সব অঞ্চলে দারুণ অস্বাস্যতা তারই ককটী
অংশ কোশীর বতীর সমুদ্রিত জল-প্রাণিত হয়ে তাদের হুঁইপের
উপরে আরও হুঁইপের বোকা চাপিরে দেয়। এইভাবে সাহসার
এবং পূর্ক-বারতাকার এক শতের উপর গ্রাম জলপ্রাণিত এবং
লকারিক লোক বিপর হয়, সমস্ত জারগার বুকসমান জল
কাঁড়িরে যায়। প্রাচীন শতকেজের উপর দিরে বরে গিরে
আগামী বৎসরেও হুঁইকের আগমনবার্তা বোষণা করে
চলেছিল। একমাত্র মৌকা ভিন্ন অত সমস্ত বানবাহন
চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বতীর কলে যুত্যা হাতা,
বহু লোকের সর্গাঘাতে যুত্য়ারও সংবাদ পাওয়া গিরেছিল।
মাধেপুর থানার ভিন্নটি গ্রাম—বা কৈকান দিন বতীর বিধ্বস্ত
হয়নি, কোশী এবার তাদেরও আক্রমণ করেছিল।

এবারকার বতীর অপূরণীয় কতি এই হয়েচে যে, মাধেপুর
মারাগ ভিত্তগবানপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত
রাঘবাচারী শাস্ত্রীর বাড়ীটা সম্পূর্ণ ঘুরে-ঘুরে গেছে। সেই
সঙ্গে তালপাতার উপর হাতে লেখা বহু হস্তাধ্য প্রাচীন
পুঁথি নষ্ট হয়। তার মধ্যে একখানা পুঁথি ছিল বা সাত শত
বৎসর আগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বামদেব উপাধ্যায় কান্ধীর থেকে
মিথিলার এনেছিলেন।

প্রথম পর্য্যায়

কোশীর এই হুঁইনদীর বতাকে প্রতিরোধ করবার জন্তই
কোশী-বঁধের পরিকল্পনা করা হয়েচে। সমুদ্রিত ভারত-দরকার

এই কোশী পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায় শেষ করবার জন্ত লাভে
দশ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। এটা বিহারবাসীর
পক্ষে সত্যই সুসংবাদ। বিহারের অর্থনৈতিক ডাঃ অহুগ্রহ-
মারায়ণ সিংহ কিছু দিন পূর্ক বলেছেন যে, অষ্টোত্তর মাসে
এই কাজ হাতে দেওয়া হবে। প্রথম পর্য্যারে বোদবাগী থেকে
নেপালের বরাহকে প্রাচীর ৪০ মাইল রেল-রাস্তা, কোশীর
উপরে একটি ব্যারাজ, কয়েক মাইল দীর্ঘ সেচের খাল,
প্রত্যেকটি দশ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন হুঁইটি বিদ্যুৎ-
উৎপাদক যন্ত্র সমেত একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র এবং বিহারে
ও নেপালে বিদ্যুৎ-পরিবাহক তার লাগানো হবে। এই কাজ-
গুলি শেষ করতে চার বছর সময় নির্ধারিত হয়েচে।

কোশী ও তার বতী

হুঁইভুক্ত কোশী তার প্রবলদলীলার জন্ত বিহারের আতঙ্ক হয়ে
কাঁড়িরেছে। কোশীর প্রাচীন এমনই হুঁইভুক্ত যে, ২৪ বতীর ৩০
ফুট জল বেতে উঠতে দেখা গেছে। এই প্রাচীনে বছরের পর
বছর কত মানুষ, কত গৃহপালিত পশু, কত গরীবের কুঁড়ে ঘর,
কত ধর্মীর প্রাসাদ, কত গোলাভরা শত্রু, কত শতকেজ
ভেসে যায় তার পরিমাপ করা হুঁইসাহ্য। সময় সময় এই
প্রাচীন প্রায় হুঁই মাইল চওড়া একটি চলমান সমুদ্রের আকার
ধারণ করে। তখন প্রতি সেকেন্ডে ৯,৪০,০০০ ঘন ফুট জল
সবেগে বরে যায়। এই প্রাচীনের কলে বিহার ও নেপালের
এক বিতীর্ণ ভূখণ্ড কয়েক মাস বাবৎ জলমগ্ন অবস্থায় চাব-
আবাদের অস্থাপন হয়ে পড়ে থাকে। চলাচলের রাস্তা বন্ধ

হবে ব্যয়। বহু কারাগার বহু জলাশয়ে পরিণত হয়ে মশক ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড় কতি এই হয় যে, হু'হাকার থেকে ভিন্ন হাকার বর্গমাইল উর্বর শতক্ষেত্রের উপর বালি জমে* তাতে বহু বৎসর পর্যন্ত কৃষির সম্পূর্ণ অংশ-যোগ্য করে রাখে। এইজন্যই কোশীকে “বিহারের হুঃধের নদী” এবং “বিহারের আভর” ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে।

সং ১৯৩৭ সালে এই প্রাচীন নিরোধের উপায় নির্ধারণের কাজ সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে এক কমিটি গঠিত। তাতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“দেশের এমন সর্বনাশ না করে এই অভিরিক্ত জলরাশিকে বের করে দেওয়ার কি কোন উপায় নেই? একটা কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করে এই বিরাট জলরাশিকে দরকারের সময় সেচের কাজে লাগানো কি সম্ভব হতে পারে না?” তার উত্তরে শ্রীযুক্ত ডে. বি. সেন বলেন—“কোশীর এ দাক্ষণ বক্রা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যেখানে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এই নদী মেঘে এসেছে সেখানে একটা বাঁধ বেঁধে দেওয়া, এবং জলরাশিকে একটা ‘উইয়ারে’র মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেওয়া। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, ভেতন কারাগার শুধু নেপালের মধ্যবর্তী পাওয়া যেতে পারে এবং এটা বহু ব্যয় সাধ্য।” দেশ বাণীন হওয়ার পর থেকেই ভারত-সরকার এদিকে সম্যক অবহিত হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা শুধু বিহারবাসীর নয়, সমগ্র দেশবাসীর স্বত্বাদার।

কোশীর ধ্বংসলীলা

কোশীর ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে প্রথমে যে আভাস দেওয়া হয়েছে সেটা সাময়িক এবং অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। এই ধ্বংসলীলা অত্যন্ত ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং এর মূল গভীর। তাই এটা সম্যক ধারণা করতে হলে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

কোশীর ভিন্নটি উপনদী আছে। (১) সান কোশী পশ্চিম-দিক থেকে ৭,৪২৪ বর্গমাইল কারাগার, (২) অরুণ উত্তর-দিক থেকে ১৪,১০৬ বর্গমাইল কারাগার ও (৩) তিযুর পূর্ব-দিক থেকে ২,২৭৮ বর্গমাইল কারাগার সৃষ্টির এবং বরফগলা জল বয়ে এনে নেপালের পবিত্র তীর্থ বরাহক্ষেত্রের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে একই কারাগার এসে মিশেছে। এই ২৩,৮০৮ বর্গমাইল কারাগার মধ্যে ২,২২৪ বর্গমাইল কারাগার চিরতুষারাবৃত অকলের অংশ। নেপালের পার্শ্বভাগ অকল পায় হয়ে কোশী যেখানে ভারতের সমভল ক্ষেত্রে এসে নেবেছে সেখানে এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, হিমালয় থেকে উদ্ভূত বড় বড় নদ-নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্রের পরই তার স্থান। তারপর বেলে এবং দো-আঁশলা মাটির প্রায় সমভল জমির ভিতর দিয়ে কতকগুলি চওড়া নদীগর্ভের (channels) সৃষ্টি করে তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদার সঙ্গে মিশেছে। জলের সঙ্গে কোশী

যে বালি এবং পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসে তা কমে কমে শীতাই এই নদীগর্ভগুলি ভরে ওঠে। কয়েক বছর পরে আবার যখন দিনকয়েক ক্রমাগত অতিবৃষ্টি হতে থাকে তখন কোশী তার পুরাতন পথ ছেড়ে নতুন জমি কেটে নতুন পথ তৈরি করে নেয়। এমনই করে কোশী পূর্বদিকে পূর্ণিমা থেকে পশ্চিম দিকে হারতাল পর্যন্ত বিহারের ২০০০ থেকে ৩০০০ বর্গমাইল উর্বর শস্যক্ষেত্রের ধ্বংস সাধন করেছে। এ ছাড়া নেপালের নষ্ট করেছে ৩০০ থেকে ৫০০ বর্গমাইল উর্বর শস্যক্ষেত্র। এই কারাগার জন-বসতির পরিমাণ হচ্ছে প্রতি বর্গমাইলে ৯০০ জন। তাই কোশী বছরের পর বছর ১৮ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ লোকের সমুদ্র কতি করেছে।* এর পরও কি বিহারের কৃষিকের কারণ খুঁজতে অজ্ঞান যাওয়ার দরকার হয়?

বহুমুখী পরিকল্পনা

এটা একটা বহুমুখী পরিকল্পনা। এতে নেপালের বরাহক্ষেত্রের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে, যেখানে কোশী হাজা মাশক পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুরু পথ করে নেবে এসেছে, সেখানে ৭৮৩ ফুট উঁচু একটা বাঁধ বেঁধে দেওয়া হবে। এতে লক্ষ একর ফুট+ বস্তার জল ধরে রাখবার বন্দোবস্ত থাকবে।

নেপালে এবং বিহারে দুইটা ব্যারাজ, আর সেই সঙ্গে ছোট মাঝা খাল বাদে ১,৬৯৩ মাইল দীর্ঘ বড় খাল কাটা হবে। এই সবগুলি মিলে বস্তার উচ্চতা প্রবাহকে আরও আনতে পারবে। ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে—তার মধ্যে অনেক জমিতে বছরে দুইটা কসল ফলানো সম্ভব হবে। সব সময়ের কাজ নব্বই হাজার কিলোওয়াট এবং ষত্ অস্থায়ী আরও পর্যায়ক্রম হাকার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। জমির কয় বড় হবে। বস্তার বালি এসে জমি মট হওয়া বন্ধ হবে। যে-সব কারাগার বহু জলার পরিণত হয়ে রয়েছে সে-সব কারাগার সংস্কার হয়ে চাষের উপযুক্ত হবে। ম্যালেরিয়া দূর হবে। বিরাট আকারে মাছের চাষ সম্ভব হবে। উপরে দীর্ঘ জলযান চলাচলের সুবন্দোবস্ত হবে। তা ছাড়া এতে করে প্রচুর বাড়ন্ত উৎপন্ন হওয়ার কলে বিহারের লোকে পেট ভরে খেতে পাবে। সম্ভার বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়ার বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং কৃষিক্ষেত্রে বহু লোক কাজ পাবে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

* শ্রীপীণারায়ণ সিংহের মতে উত্তর-বিহারের এই জন-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৫ জন একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল এবং গড়ে মাত্র দুই বিঘা জমির উপরে তাদের জীবিকা নির্ভর করে।

+ এক একর জমির উপরে এক ফুট পরিমাণ উঁচু হলে তবে ‘এক একর ফুট’ বলা হয়।

এ সমস্ত বাদ দিয়েও শুধু বতী নিরোধের জন্য এই পরিকল্পনার পেছনে বত চাকা ঘরচ হবে তা সার্থক হয়ে উঠবে।

কয়েকটি আপত্তি এবং সেই সম্বন্ধে আলোচনা

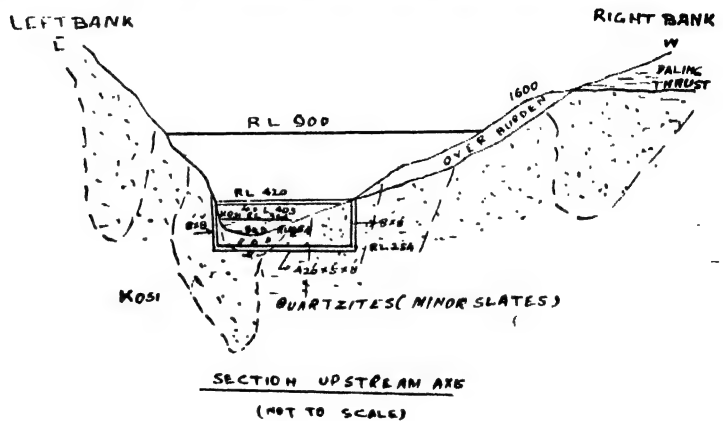
বর্তমানে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি তোলা হচ্ছে। অনেকের মত এটা করেছেন এই বিরাট পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিমাটি ভাঙা না জানার জন্য। আবার কেউ কেউ এটা বিশেষ উদ্বেগ-প্রণোদিত হয়ে করেছেন বলে মনে হয়। প্রথম আপত্তি হচ্ছে—বীথ ধরসে পড়ে কয়েক হাজার বর্গমাইল জায়গা ধ্বংস হবে এবং হাজার কয়েক লোক মরবে।

কেউ কেউ আমেরিকার সার্কা রুজ নদীর উপরের বীথ ভেঙ্গে পড়ার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ষ্টেটসম্যান পত্রিকাও দেখছি অনেকটা সেই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরা বিহারের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন—“অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। এ বীথ যদি ভেঙ্গে যায় তা হলে তামলপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কলিকাতারও কতি হতে পারে।” সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার সংপর্শার্শ অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। আমার মনে হয়, এই সব অহেতুক আশঙ্কা ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষমতার প্রতি অনাস্থাপ্রসূত। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ এত দূর উন্নতিলাভ করেছে যাতে এরূপ ধারণার কোন সম্ভাব্য কারণ আছে বলে মনে হয় না।

এমনি ধরনের ব্যাপার ঘটে শুধুমাত্র যখন বীথের ওজন তার ভারবহন ক্ষমতার চেয়ে বেশী হয়; অথবা বীথের নীচে কিসা হু'পাশে এমন পাথর থাকে যার ভিতর দিয়ে জল চুইয়ে যেতে পারে এবং চোরাবার সময় ঐ পাথরেরও কিছু অংশ বুয়ে নিয়ে যেতে পারে। অথচ ঐ সব ক্ষেত্রে জলনিরোধ করবার এবং পাথরের শক্তি বৃদ্ধি করবার মত বিজ্ঞানসম্মত কোন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। আজকালকার দিনে কোন বীথ তৈরি করার আগে এই সমস্ত বিষয় বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদগণ সমবেতভাবে সম্পূর্ণ অঙ্কনসম্বন্ধ করে এবং মডেল তৈরি করে তার উপরে পরীক্ষা চালিয়ে সমস্ত বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নজর তৈরি এবং বীথের স্থান নির্ণয় করেন।

কৌশলী বীথ লম্বায় হবে ১,৯৮৫ ফুট, ভিত্তির সবচেয়ে নীচ জায়গা থেকে উচু হবে ৭৮০ ফুট। চওড়া হবে তলাতে ৮৪৮ ফুট, উপরে ৩৫ ফুট। বীথের তিন এতদ্বাণি কংক্রিটের তার লইতে পারবে কিনা সেটা পরীক্ষা করেছেন ত্রীহুত কে. কে. বত, এন-এস্টি সহকারী ভূতত্ত্ববিদ, মিঃ জে. বি. অডন্স তত্ত্বা-

বহারক ভূতত্ত্ববিদ এবং ত্রীহুত পি. সি. দে হাজারা বি-এস্টি, (লওন), এ-আর-সি-এস বর্তমান তত্ত্বাবহারক ভূতত্ত্ববিদ। আমেরিকার বহু বড় বড় বীথ নির্মাণ সম্বন্ধে হাজারা মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বীথের ভিত্তির নীচে থেকে ড্রিলিং করে পাথরের নমুনা তুলে এনে এবং বীথের হু'পাশের দিকে বহু ছোট ছোট স্তম্ভ বুঁড়ে, সেখানকার পাথর পরীক্ষা করে তাঁরা যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এই :—“বীথের ভিত্তির নীচে ৫০ ফুট পুরু কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তর আছে। তার ভিতরে ভিতরে সামান্য স্লেটের পরমা এবং কন্ড্রোমারাইট চূর্ণ-



পাথর আছে। এর তার-বহন-শক্তি যথেষ্ট।* এই পাথরের স্তরগুলির অবস্থান এমনি যে তাদের ধরসে পড়ার বা তাদের ভিতর দিয়ে জল চুইয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এটা সত্য যে, কৌশলী অত্যন্ত ছন্দাঙ্গ নদী এবং যে জায়গার বীথের স্থান নির্ধারিত হয়েছে সেটা ভূতত্ত্ববিদগণের উপপত্তিহীন সঙ্গীত। তাই ভূতত্ত্ববিদগণ কৌশলীগর্ভের নিম্নতম স্থান থেকে ৩০ ফুট নীচে দিয়ে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ৪২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ খোঁড়ার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। এ কাজটা কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছে (চিহ্ন দেখুন) এটা হয়ে গেলে ভূতত্ত্ববিদ এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ, বীথের সম্পূর্ণ ভিতটা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্তভাবে পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন। পাথরের ভিতর ভগ্ন সামান্যমাত্র ছর্জলতার বিদর্শন পেলে মাহুয়ের শরীরে ইন্জেকশনের তার পাথরের ভিতর তরল সিমেন্ট চালিয়ে (Grouting) তাদের একীভূত করে ভিত্তির শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া চলবে। তা ছাড়া এই সিমেন্ট চালানোর ফলে ভিত্তির এবং হু'পাশের চারদিকে জল-নিরোধক সিমেন্টের একটা পাতলা পরমা পড়ে উঠবে। কাজেই এই ধরনের আশঙ্কাজনক ব্যাপার যে ঘটবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

* পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই পাথর প্রতি ঘন ইঞ্চিতে ১৪'৪৪ টন তার সহ্য করতে পারে।

একথা এখানে বলা উচিত যে, বাঁধের ভিত্তির সামর্থ্য পরীক্ষার কত মদীর নীচে দিয়ে সুতর খুঁড়ে বেধার মত নিখুঁত অহুসতান অত কোন বাঁধ তৈরির আগে করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। এ সত্ত্বেও এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এরূপ ভীতি-উৎপাদক প্রচারকার্য সভ্যই পরিচালণের বিষয়।

বিভিন্ন আপত্তি—যেখানে বাঁধ তৈরি হবে তা ভূকম্পনের উৎপত্তি-স্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। তাই এক দিন হঠাৎ ভূকম্পনের কলে বাঁধ ভেঙে অমর্য ঘটাবে। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ—বীরা এরূপ বৃহৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাঁরা এত বড় একটা বিষয় জুলে বাবেন এমন ধারণা লোকের মনে আনা সমীচীন নয়। বা হোক, প্রত্যেক বাঁধের পরিকল্পনা করার সময় এর কত অতিরিক্ত সামর্থ্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাৎকালিক বাঁধের কত ভূমিকম্প নিরোধের নিমিত্ত অতিরিক্ত সামর্থ্যের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২০ বছর আগে হাতি টেটে যে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরি হয়েছে তাতেও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা বীরা তৈরি করেছে। তাঁরা যে এ বিষয়টা জুলে যান নি তা এই থেকে বুঝা যাবে যে, ভূতত্ত্ববিভাগ এবং আবহাওয়া বিভাগ (Meteorological Department) সমবেতভাবে এই জায়গার ভূকম্পন বিষয়ক অহুসতান (Seismological Survey) করেছে। বর্তমানে ঐ জায়গা থেকে অনতিদূরে একটা ভূকম্পন রেকর্ড করার কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা চলছে।

তৃতীয় আপত্তি—বাঁধের কার্যকরী জীবনকাল নিয়ে। কোশী জলের সঙ্গে যথেষ্ট বালি এবং পলি নিয়ে আসে। তাই এই জলকে বলা চলে যে, “পান করার পক্ষে বড় পাত্র কিন্তু চাব করার পক্ষে অত্যন্ত পাঁতলা।” সেইজন্য কেউ কেউ বলেন যে, মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এই বাঁধ বালি ও পলিতে ভরে যাবে। তার মধ্যে দশ বছর ত বাঁধ তৈরি করতেই লেগে যাবে। তাই তাঁরা বলেন যে, এ বাঁধের কার্যকরী জীবনকাল হবে মাত্র ২০ বছর। জানি না এটা তাঁরা কোন তথ্যের উপর নির্ভর করে বলছেন।

ভারত-সরকারের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার মায় বাহাদুর অধোধ্যানাব ধোসলা ভারতের এবং ভারতের বাইরে যিশর, আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু দেশের নদনদীর পলিবহন বিষয়ে অহুসতান এবং গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রতি ১০০ বর্গমাইল জায়গা থেকে প্রতি বৎসর যে বোয়ানী মেমে আসে তা থেকে ৭৫ একর জমির উপরে এক ফুট পলি জমতে পারে। কোশীতে এই বোয়ানী আসে ২৩,৮০৮ বর্গমাইল জায়গা থেকে। তাহেই কোশী প্রতি বৎসর পলি বয়ে আসে $\frac{২৩৮০৮ \times ৭৫}{১০০} = ১৭,৮৫৬$ একর ফুট।

কোশী বাঁধের দ্বারা যে জলাশয় তৈরি হবে তার পরিমাণ হবে ৭৩'৭৬ বর্গমাইল। এতে জল ধরবে ১ কোটি ৯ লক্ষ একর ফুট। তার মধ্যে নীচের ২৪ লক্ষ একর ফুট হবে বড় জল (dead storage)। এই ২৪ লক্ষ একর ফুট জায়গা পলিতে ভরে গেলেও বাঁধের কার্যকরী ক্রমতার কোন ইতর-বিশেষ হবে না। প্রতি বৎসর ১৭,৮৫৬ একর ফুট করে পলিতে ভরলে এই বাঁধের অকোশ ২৪ লক্ষ একর ফুট অংশ ভরতে লেগে যাবে ১৩৪ বৎসর। তা হাঁড়া যে-সব জায়গা থেকে বোয়ানী আসে তার মধ্যে চির-ভূয়ারাজ্বর অকল বাব দিয়ে বাকি জায়গার গাছ লাগিয়ে দিলে জমির কয় বড় হবে, কলে বোয়ানীর সঙ্গে পলি, বালি, মাটি ইত্যাদি কম আসবে। তা হাঁড়া বাঁধের জলের উচ্চতম সীমার (highest pond level) উপরে কোশীর ঐ তিনটা উপনদীতে কয়েকটি ছোট ছোট বাঁধ (Check Dams) বেঁধে দিলে এই প্রথম বাঁধের কার্যকরী জীবন বছরদিন বেড়ে যাবে; কারণ ঐ বাঁধগুলি পলিতে না ভরে বাওয়া পর্যন্ত প্রথম বাঁধে পলি আসতে পারবে না।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দীর্ঘ পূকাশ বৎসর পরীক্ষার কলে নির্ধারিত হয়েছে যে, ৬৮০ ফুট উঁচু তাৎকালিক বাঁধের কার্যকরী জীবনকাল হচ্ছে ৩০০ বছর। তখন লোকে কি করে মনে নিতে পারে যে, ৭৮০ ফুট উঁচু (পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ) কোশী বাঁধের কার্যকরী জীবনকাল হবে মাত্র ২০ বছর?

	তাৎকালিক বাঁধ	কোশী বাঁধ
উদ্দেশ্য	জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচ বস্তা নিরোধ	জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, সেচ, বস্তা নিরোধ
কতটা জায়গার বোয়ানী আসে	২২.০০০ বর্গমাইল	২৩.৮০০ বর্গমাইল।
বস্তার কত জল আসে	সেকেন্ডে ১৩২,০০০ ঘনফুট	সেকেন্ডে ২,৪০,০০০ ঘন ফুট।
জলাশয়ের পরিমাণ	৫২ বর্গমাইল	৭৩.৬৭ বর্গমাইল।
বাঁধে জলের পরিমাণ	৭৩,৮০,০০০ একর ফুট	১,০২,০০,০০০ একর ফুট।
বাঁধের উচ্চতা	৬৮ ফুট	৭৮০ ফুট।
সেচব্যবস্থা	৬০ লক্ষ একর	৩০ লক্ষ একর।
প্রধান খাল	২৪০ মাইল	১,৬২০ মাইল।
বিদ্যুৎ-উৎপাদন	৪ লক্ষ কিলোওয়াট	২০ হাজার কিলোওয়াট (সর্বমোট) ৪৫ হাজার কিলোওয়াট (কোন কোন গণ্ডিতে)

কাছের মানুষ শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ ঠিক বাইশ বছর হতে চলল তাঁর চরণছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার। ২২শে নবেম্বর ১৯২৮ থেকে এই ডিসেম্বর ১৯৫০। এতদিন হিলাম তাঁর আলোক-পরিধির মধ্যে, তবু কোন বহু উত্তর পাই নি এই প্রশ্নের যে কি কারণে এমন অসম্ভব সম্ভব হ'ল—কেমন করে আমার মতন চ্যুতিভরা অগুণ সম্ভার মন টানল তাঁর মতন অচ্যুত সত্তা? শুধু টেনে আনা নয়, ধরে রাখা। তাঁর প্রতিভার দরুন? তাঁর হাতে ছিল “দেবতার কীপ”, যুগে উপলব্ধির জ্যোতি—তাই কি? না, বহুদিন ধরে বেজায়ত বিজনবাসের কলে রহন্তের যে এক অনামী মহিমা-মণ্ডল পড়ে ওঠে তার হাতছানি? না, তাঁর চারদিকে যে অপরাধ নৈঃশঙ্কর ঘেরাটোপ পড়ে উঠেছিল তার অভিজুতি—না, তাঁর শক্তিসান্নিধ্য, দৃষ্টির আলো অলোক-লোকের বাণী যে আনত বহন করে? না, সেই শক্তিসমুদ্রের মৌনকল্লোল যা তাঁকে ঘিরে থাকত যেমন প্রলয়পরিধি নারায়ণকে? সংসারে শক্তির কাঙাল নরকে? অথচ—লীলা বটে লীলাময়ের—শক্তি কাছে আসতে না আসতে উঠি আমরা অশান্ত হয়ে :

বতাববিমুখ ধরা ভাবরূপান্তর-সাধনার ;
চিরজন্মের স্পর্শ সূহঃসহ মরতার কাছে :
ব্যোম ও বহির সাথে চিরবিসম্বাদ তার—হেম
বিমুখতা সহে না দেবতা—তাই তার দেবত্ব ;
গুমরে সে অমরার হুঃখহীন সুখে—আলোকের
বর তার যেন প্রায় ঘেঁষতের করে প্রত্যাখ্যান...
আপনার পকে করে ছালোকের দেবদৌত্যে স্নান :
তারিণী স্তম্ভা করুণার কর সাথে সাথে বাদ,
অবতার পুরণে সখিবিরা হস্তার, লাহনে।*

কিংবা জীবন ও মিরতি সম্বন্ধে যে গভীর পাঠ তিনি দিয়ে-
ছিলেন এসেছিলাম তারই টানে—এই বিবাসে যে, ব্যাধির এমন
নিদান দিতে পারে যে মহামানব তারি তো নাম ধবন্তরি :
নিগূঢ় বৈরিতা এক বিশ্বপ্রপতির নিরন্তর
করে আক্রমণ ; চিন্তা ভাষা কর্ণে যার চিহ্ন রেখে :

প্রতি সাধনার চ্যুতি কলঙ্কের ছাপ চিরাক্রান্ত ;

ভাষার অজ্যোতি বিনা হবে শক্তি নিষিদ্ধ ধরায়।†

মনে এ বরণের প্রশ্ন আজও ওঠে বৈ কি—যদিও জানি
না এ-সবের অব্যবহিক। এক সময়ে ভাবতাম বুদ্ধির আলোর
চরম সুশকিল আসানের হৃদিস পাওয়া যাবেই যাবে। কিন্তু
তখন আমার মন ছিল বস্তিরে বুদ্ধিরই পুকারী বলব। কিন্তু
আজ নেই আর বুদ্ধিতে সে অটল আস্থা। থাকবে কেমন করে
—এই বাইশ বৎসর ধরে এমন একটি মাহুঘের সঙ্গে লড়াই
করার পরে (বুদ্ধির) কীট। দিয়ে কীট। তুলতে যার জুড়ি
ছিল না। আমি? আমি, বুদ্ধির তর্কবৈরিতে তাঁর সঙ্গে এঁটে
উঠতে পারতেন কোন্ মহারথী? কার তুণীরে ছিল অমন
যুক্তিহস্তা উপলব্ধির, দৃষ্টির নারায়ণার?

যুক্তির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে আশ্রমবাসের সেই
প্রথম দিককার কথা—যখন ভগবানে সবে একটু তত্ত্ববিবাস
এসেছে—অথচ মন তবু কেন জানি না বুশি হয়ে ওঠে
ভগবানকে কেউ যুক্তিবাদ দিয়ে বিধেছে দেখলে। শ্রীঅরবিন্দ বহু
পক্ষে আমাকে লিখেছেন ভাগবতী চেতনাকে মানবিক চেতনা
বুঝতে পারে না যদি সে তার মানবিক চেতনাকে আঁকড়ে
থাকতে চায়। তাই ত আমরা পদে পদে ভগবানকে তুল বুঝি।
মনে পড়ে শ্রীমার কথা। বুদ্ধের দর্শন তিনি প্রায়ই পেভেন—
বলেছিলেন আমাকে। একবার বুদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন :

“আজ

ওঠে বলকির। আপনার কিরণের পরিমার।

বটিকার কেন তর ?

সমীরণ আমাদের তট হতে ঘুরে ল'রে যার

তবু

এসে দিতে আরো ব্যাপ্ত বিশ্বপরিচর।

ঈশ্বরী করুণা তব উজাড়িয়া দিবে না ছ'হাতে ?

—প্রেমের ঐর্ষ্যা-উৎস পারে কি ফুরাতে ?

কেন কুণ্ডা তবে ?

পাছে তুল বোকে সবে ?

কবে হার

দেখেছ—মানবমন বুঝিরাছে তবে দেবতার ?”‡

সারিত্রীতে গুরুদেবও একথা বারবারই লিখেছেন—যে

† A secret enmity ambushes the world's march;
It leaves a mark on thought and speech and act;
It stamps stain and defect on all things done;
Till it is slain peace is forbidden on earth.

—Savitri: The Book of Fate—SRI AUROBINDO

‡ শ্রীমার করানী অমূল্যেণ থেকে অনুদিত। সমস্ত
প্রার্থনাটি “ঐর্ষ্যা” নামক কাব্যগুচ্ছে ছাপা হয়েছে আশ্রম থেকে।

* Hard it is to persuade earth-nature's change;
Mortality bears ill the Eternal's touch:
It fears the pure divine intolerance
Of that assault of ether and of fire;
It murmurs at its sorrowless happiness.
Almost with hate repels the light it brings . . .
It sullies with its mire Heaven's messengers:
Its thorns of fallen nature are the defence
It turns against the saviour hands of Grace;
It meets the sons of God with death and pain.
—Savitri, Book I, Canto I—SRI AUROBINDO

মাহুঘ মাহুঘ বলেই ভগবানকে চার না বুঝতে। বুধে বলে পারি না বুঝতে। কিন্তু গুরুদেব বলভেন (যে কথা বারবার তৈকে শিখেছি) যে, আমাদের 'পারি-না'-র মধ্যে প্রায়ই 'চাই-না' থাকে সুকিরে। তাই ত ভগবানের ভাগবতী নজিকে ব্যাক করে মাহুঘের এত তুষ্টি, তাঁর লক্ষ সৌরভগৎ-চালিনী প্রতিভার ক্রিয়াকলাপকে আমাদের বেতপোরা বুদ্ধির বাটখারা দিয়ে মাগবার এত স্মৃতি, অহকার। তার উপরে আমি বিজ্ঞান একটু-আধটু পড়েছিলাম, কাজেই ঈশ্বর অসিৎ—“প্রমাণাতাবাৎ” এ ভাষীর বৈজ্ঞানিক আদিশয়ে সাতা একটু দিচ্ছেছিলাম বৈ কি? তাবটা—বিবাস করি বটে, কিন্তু বিবাস না করতে পারলেই বেশি খুশি হই। শুনতে হয়ত একটু অসুত, কিন্তু অকরে অকরে সত্য।

এহেন হুঁমোকার পা দিয়ে বধন পার হতে চেষ্টা করছি সেই সময়ে আনাতোল ক্রাঁসের Dieu Out Soif (দেবতার! তৃষার্ড) উপভাসটি হাতে পড়ে। তাতে ব্রতো বলে একজন রসিক ভাগবত-ক্রীড়ক বলে :

“Ou Dieu veut empecher le mal et ne le peut, ou il le peut et ne le veut, ou il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, il est impuissant; s'il le peut et ne le veut, il est pervers; s'il ne le peut ni ne le veut, il est impuissant et pervers; s'il le veut et le peut, que ne le fait-il, mon pere?”

অর্থাৎ—

“হয় ঈশ্বর করতে পারেন হুঃখ নিরারণ,
তুঃ শক্তি সেই—তা হলে অক্ষম সেজন।
পারেন তিনি বুঝই, তুঃ চান না—যদি হয়,
বলতে হবে এমন হরি হিংসুক নিশ্চয়।
চান না এবং পারেন না এই কথাই যদি ঠিক,
বলব তিনি অক্ষম এবং হিংসুক—বিক, বিক।
পারেন তিনি করতে, তথা চানও—যদি হয়,
করছেন না কেন—পারেন বলতে মহাশয়?”

গুরুদেবকে করাসী প্রস্তুতি উদ্ধৃত করে লিখি : “গুরু। কি বলেন? একটু হাসলেমই বা। আর যদি সম্ভব হয়—একটা জবাব দিন না এ মোক্ষম প্রশ্নের।”

পরদিনই এল জবাব—মোক্শের উত্তর মোক্ষম প্রত্যয় :

“আনাতোল ক্রাঁসের কথা সর্ব্বদাই মহার বৈকি—তা তিনি ভগবানের সবচেয়ে লিখুন, বা ক্রীতানিটির সবচেয়ে লিখুন বা বুদ্ধিবাদী পাশ্বেক মানবতার বুদ্ধির তথা আচরণের বোকাতির সবচেয়ে লিখুন। কিন্তু আনাতোল ক্রাঁসের সঙ্গে বধন ভগবানের যেণা হয় (কোন এক বিজ্ঞপের বর্ণেই হবে, ফাল্‌মার্কসের বর্ণে হবার কথা নয়—যুত্মার পূর্বে তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও) তখন ভগবান তাঁর নিজেরতার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেছিলেন তা তুমি শোমো নি বুঝি?

ভগবান তাঁর কাছে সরাসরি গিয়ে বললেন : ‘ও আনাতোল। তোমার মাতিক ঠাট্টাট্টি মোক্ষম হয়েছে, মানভেই হবে; কিন্তু হয়েছে কি, আমার নিজের থাকার খুব সম্ভব কারণ ছিল। একদিন বুদ্ধিদেবী এসে আমাকে বিষয় বসকালেন : ‘দেখ যে, তুমি আহ এ তাম কর কেন? তুমি বেশ জাম তুমি সেই এবং কোনদিনই ছিলে না। আর যদি তুমি সত্যিই থাক তা হলেও তুমি তোমার হুষ্টি দিয়ে যে অন্যহুষ্টি কাও করছে তারপরে তোমাকে আমরা আর বাহাল রাখতে পারি নে। সেই তুমি সরে যাবে সেই জগৎ হয়ে দাঁড়াবে চমৎকার—সাবাস থাকে বলে। আমার মেয়ে বৈজ্ঞানিকা দেবী ও আমি সব ভোক্তাভোক্ত ঠিক করে রেখেছি। তুমি যেতে না যেতে মাহুঘ তার মীণ শির উঁচু করে চলবে—‘সবার উপরে মাহুঘ সত্য’ এই তথমা পরে, মহিমামিতি ও বাবীন হয়ে, সাম্যতাবাপন, জাতিতাবাপন, পণ্ডিত্তিক হয়ে, নিজের বাইরে আর কারুর মুখ না চেয়ে, বিশ্বজ্ঞাত্তে নিজের চেয়ে আর কাউকে বড় বলে না মেনে। তখন না থাকবে ভগবান না বেবেদেবী, না পাণ্ডাপুরুষ, না বর্ষাচরণ। তখন সূত্বে হবে সব অত্যাচার, দারিদ্র্য, দুঃখবিগ্রহ। বস্তুতাত্তিকতার বয়ে জগৎ প্রাচুর্য্যে উঠবে টাইটুয় হয়ে, বাণিজ্যের হাওয়ার লক্ষীর সোমার পাখা হবে সর্ব্বপানী, বিশ্বব্যাপী শিকার গুণে অজ্ঞান হবে নিশ্চিহ্ন, মাহুঘের মস্তিকে চুচতার বা অমৌক্তিকতার পদার্পণ হবে অবাস্তব। মাহুঘ হবে বিদগ্ধ, বারত, বুদ্ধিবাদী, বৈজ্ঞানিক, প্রাজ্ঞ—সবকিছুই সবটা কেনে শুনে ও বিচার করে পৌঁছবে জনে জনে যথাযথ সিদ্ধান্তে। বৈজ্ঞানিক তথা বিশেষজ্ঞদের তারপর সর্ব্বজ্ঞ পড়বে হস্তিরে—হাতবে না মাহুঘকে পাখি বর্ণে সরাসরি পৌঁছে না দিবে। একেবারে নিখুৎ সমাজ। জনে জনে হবে বাহ্যবান্ অতিবিকশিত; চিকিৎসা ও বাহ্যবিধানের গুণে; সবকিছু হবে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, বিজ্ঞান উঠবে চূ বাপে, হবে অজ্ঞাত, সর্ব্বকম ও সর্ব্বজ্ঞ। শ্রেহেলিকার হয়ে যাবে সমাধান; বিশ্বমানবতার আমদরবার, নিখিল জাতিসম্মের প্রতিষ্ঠা; বিশ্বভবের কলে মাহুঘ, মহতো মহীর্মান্ মাহুঘ, চলবে প্রকৃতির পথে বার চরম পরিণতি হবে মহান্ বেতজাতিদের মধ্যে, মানবিক দর্যাবে হাত বয়ে বীরে বীরে উঠিরে আনবে তারা তাদের কৃক ভান ও পীতাত জাতিপণকে; গাতিঃ, শাতিঃ, শাতিঃ। হুষ্টি, বাবহা, ঐক্য হবে বিশ্বতোহুবা। আনাতোল। এইভাবে আরও কত কি যে তিনি করলেন বোষণ। শুনে আমার হবে হল, ‘বা, বা। কি চমৎকার।’—আর সুবিধেই কি কম? তবে দেখ, আমাকে না হবে কিছু করতে, না হবে কিছু বেধতে শুনতে। কাজেই আমি সব কাজ থেকে নিলাম নিজেকে ওঠিরে—কারণ তুমি জাম, আমি বরাবরই বতাবে একটু প্রহান-প্রবণ, সুদিনের মুগেও নিজেকে একটু পর্দামণীন

করে বা শিখন দিকে রাখতে ভালবাসি। কিন্তু এ কি ভূমি আজ? যে-সব ধরন কানে আসছে তাতে ত মনে হচ্ছে না যে, এমন কি বিজ্ঞানের সাহায্য পেয়েও বুদ্ধিদেবী তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন? যদি না করে থাকেন তবে কেন করেন মি বলবে আমাকে? কারণ কি এই যে তিনি করতে চান মি, না পারেন মি? না, তিনি চানও মি, পারেনও মি? না, তিনি চেয়েছিলেনও বটে, পারতেনও বটে, কেবল যে-জন্মেই হটক হয়ে ওঠে মি। তা হাড়া দেব আমাতোল, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিদেবীর এই সন্ধানগুলি—রাষ্ট্র, বহুভাষিকতা, বহুভাষিকতা—এদের রকমসকম যেম কেমন কেমন লাগে: যেম এক অতিকার রাকস, তার উপর হাতে পেয়েছে বুদ্ধির শক্তিসামর্থ্য অথবা বিজ্ঞানের সরঞ্জাম, লাকসজ্জা। অথচ আশ্চর্য, কই মনে ত হয় না যে, রাজা ও বর্ষের সুগে মাহু বস্ত্রী বাবীন ছিল তার থেকে সে আজ বেশী বাবীন হতে পেরেছে। ব্যাপার কি? কিংবা এও কি সম্ভব যে বুদ্ধিদেবী না সর্কেসকী, না অজ্ঞান—এমন কি আমার চেয়েও বেশী অনাস্থ্যি কাও করে বসেছেন তিনি নবস্থ্যি করতে দিয়ে? তাঁদের কথালাপের রিপোর্ট এই পর্য্যন্তই পেয়েছি আমি; জানি না এর কতটা সত্যি—কারণ যে ভগবানের ছবি আমাতোল জুঁজ এঁকেছেন তাঁকে আমি মিকে চিনি না।*

কিন্তু এই যে দীপ্ত মনীষা, মহ'ন্ ব্যক্তিরূপ তার বিশা দেব কেমন করে তাদেরকে হারা জানে মি এ অপক্লপ মাহুটিকে কোন দিমও? না জানলে তাদের জানানো বাবে কি করে কেন তাঁর পাশে অত সব দীপ্ততম তুচ্ছতম প্রতিভাকেও মনে হ'ত বামন? তা হাড়া জানাতে চাই এ স্পর্ধাই বা কেন—বধন মিভেই ভাল করে জানি না কিসে কি হয়—এমন কি কোন্ টানে এসেছিলাম তাঁর কাছে তারও পুরো ধরন পাই মি মনকে প্রর করে? মৌমাছি ফুলের কাছে আসে মধুর টানে, কিন্তু তার শিখনে থাকে তার প্রাকৃতিক সহজাত সংকার। কিন্তু আমি? আমি কেমন করে টের পেলাম তাঁর জাতারে আছে অকর অযুত? কোন্ সংকার এ? অতত বুদ্ধির মর এ নিশ্চর—কেননা বুদ্ধিই ত ছিল আমার এ বিশ্বাসের পরম ও চরম বৈবী যে একলা যে-মাহু বয়েছে বহরের বহর, না করে দেখা, না কর কথা, না লেখে চিঠি—এহেন মাহু কোনও কাছে আসতে পারে বিশ্বাসবোধের। রাসেলের তক্ত আমি চিরদিন। তাঁর কথা চিরদিনই মনে হয়েছে অকাটা যে, “প্রকৃতি মাহুকে গড়ে তোলেন মি একলা ঠাঁকাবার জতে।”† অথচ কি বলা বাবে এহেন অতুত মাহুয়ের

লাবনাকে যে প্রার অর্জ শতাব্দী কাটরে মিল একটামাত্র হয়ে—কাকুর লকে দেখাশুনা না করে বললেই হয়। জনতে কত কি কাও বটে গেল অথচ তিনি জানলেন না কিছুই। শুনে-হিলাম তিনি মাকি কোনও দিম সিমেশা পর্য্যন্ত যেবেন মি। জলময়ী তেদিস মগরীতে এমন মাহু মাকি আজও মেলে যে চর্খচকে কোনও দিম যোতা দেখে মি। ঐ অরবিন্দের কখনও সিমেশা না দেখা আমার কাছে তার চেয়েও অকল্পনীয় মনে হ'ত। মনে হ'ত বাস্তবপনামুখ। এহেন বগ্নানু মূনির মৌম ব্যাখ্যানে হিরসংখর হবে ক'জন মেধাবী?‡ এভাবে একলা থেকে জনতের উপর কি প্রভাবই বা তিনি বিস্তার করতে পারবেন? অবিশ্টি কখনও কখনও তক্তির আবোধের—মনে হ'ত: পারবেন না বলি কেন? চোখের দেখাকে ত বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে না। কাজেই সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপারে ইজিরপুট বুদ্ধির দারকে প্রামাণ্য মনে করতে গেলাম কি হু:থে? কিন্তু উহ:, ব্যবহারিক বুদ্ধিকে এত সহজে মাকচ করা চলে না। তাই তক্তি-বিশ্বাসের রতীম প্রহর কেটে যেতে না যেতে আসত মেশাতাতার পরের অবস্থা—the morning after—তখন হয়ে আসত মনে বর্ণাচা আবেশের প্রতিক্রিয়া—কিনা মুর সংখর। মনে হ'ত তখন শরৎ চল চটোপাধ্যায়ের কথা: “বিশ্বাসের কি একটা লিমিট থাকবে না মিলীপ?” মনে হ'ত মবীজমাধের কথা: “কবির মুশকিল এই যে অতীজিরমোক্তের গুজবের আত্ম না পারে সে বিশ্বাস করতে, না অবিশ্বাস করতে।”

এই মিরেই বা ভুগেছি কি কম? এক দিকে অবিশ্বাসীর দেহা শুনে পার হাসি, মনে পড়ে ঐ অরবিন্দের আমাকে লেখা একটা চিঠি:

“But if the intellectual mind is inferior (to spiritual experience), how can it challenge, judge, make the Divine stand as an accused or a witness before its tribunal, summon Him to appear as a candidate for admission before a Board of Examiners or pin Him like an insect under its examining microscope?”†

(“বুদ্ধি যদি অধ্যায়ের চেয়ে ছোট হয় তবে কোন্ স্পর্ধার সে ভগবানকে আসামী করে কাঠগড়ার ঠাঁক করাতে

* চিত্রং বটতরোহুলে বৃদ্ধা: শিষ্যা গুরুবুবা।

গুরোত মৌমব্যাখ্যানং শিষ্যাত হিরসংখরা:। (শকরাচার্যের দক্ষিণবৃষ্টি স্তোত্র)

বড়ই আশ্চর্য যে বটবৃক্ষের মূলে শিষ্যোরা বেধি বৃদ্ধ, আর গুরু হলেন বুবা।

গুরুর মৌম বেই হ'ল কিনা ব্যাখ্যা—অথচ তাতেই কিনা শিষ্যদের সংখর হ'ল হির।

† মূল পত্রটি আত্ম আমেরিকান এডিশন *Among the Great*-এ ছাপা হয়েছে: ২৪৫-৫০ পৃষ্ঠা।

* ঐ অরবিন্দের মূল ইংরেজী পত্রটি আমেরিকান সংস্করণ

Among the Great-এ ২৫১-৫০ পৃষ্ঠার ছাপা হয়েছে।

† “Nature did not construct human beings to stand alone.”—*Marriage and Morals*, Chap. 9.

—BERTRAND RUSSELL

চার—যেন ভগবান উদ্দেশ্য, তাঁকে বধাবিধি দেয়া করে তবে বাহাল করা যেতে পারে, অথবা পিন দিগে বিধে বৈজ্ঞানিক নাইকোকেপের সামনে বসে তবে পরীক্ষা করতে হবে।”) অতঃপক্ষে অতিবিশ্বাসীরা দেখি তাহে ঐশ্বরবিন্দু বা ইচ্ছা তাই করতে পারেন (যদিও ঐশ্বরবিন্দু লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, “I do not deal in miracles.” “আমি তোমাকে দিগে করার করি না।”) বসে বসে—তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। এক মাতোয়ারির কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভু এনেই আশ্রমের এক সাধককে বিজ্ঞাসা করলেন : “কোন্ কামরা ?”

—“ঐ দোতলায়। কামলা বোলা ?”

—“বিস্ বরস ?”

—“তব্ ক্যা ?”

চোখ বন্ধ বন্ধ করে মহাবিশ্বাসী বললেন চুপি চুপি : “ক্যা ? উক্ত কাতা ?”

এ ধরনের বিশ্বাস ঐশ্বরবিন্দু চাইতেন না। এ কথা আমি শুধু জোর করে বলা মনে—প্রমাণ করতে পারি—কিন্তু তবু বহু বুদ্ধিমানের মধ্যেও দেখছি বা তা বিশ্বাস করার হৃদয়বীর প্রবৃত্তি—তা আবার বন্ধ বন্ধ স্নোকেব বাক্য উচ্চিৎ—সাধারণ, মইলে—। এঁরা ভাবেন এঁরই মাম বধাব গুরুত্ব, আহুগত্য—লয়ালটি। শুভতে শুভতে প্রারম্ভ আমার মনে হ’ত—আমার মতন ডিসলয়াল শিখ বুঝি ভুতারাতে হুট্ট নেই। বহু ভূগে ও পোত বেয়ে ক্রমশঃ বুঝিলাম—গুরুদেবের আশাস পেয়ে আরও—বে উত্তপ্তপৌরাণিক ও অধ্যাত্মবাদী সমাধিক মর। কিন্তু তবু বুদ্ধির অহঙ্কারে আঘাত লাগতে না লাগতে মন তুলত শিরপা—তথাকথিত মানবপ্রকৃতির বরণধারণ যে খুব ভরসাগ্রহ মর কেনেও এ প্রকৃতির অদলবদল করতে চাইত না কিছুতে। অথচ মজা এই যে, ঐশ্বরবিন্দুকে দেববাহাদুর বা তাঁর চিঠিপত্র পেতে না পেতে মনে কেগে উঠত এমন এক ভাবের কোয়ার যে তখনকার মত সব সংসারের বন্ধকটো পলিমাটি কোথায় যে যেতে ভেসে। উচ্ছ্বাসের সে-কথায় লগে সাধারণ মানবপ্রকৃতি বা লৌকিক বুদ্ধিতে আঁরা হারানোর ভয়ে নিজে একটুও মনে হ’ত না নিরাশ্রয়। বাইরের জগতে হিংসার তুফান চলেছে ত চলেছেই—মাকে মাকে বাঁধ ভাঙে, তার পর হর হর কের মারণ-মোতের বিরুদ্ধে কি ধরনের অতিকার বাঁধ দেওয়া যায় তার অল্পম-কল্পনা।

ঐশ্বরবিন্দুর বুদ্ধিভিত্তিক ধ্যানকট্টা ব্যর্থ হতে না হতে সত্যিই যেন বেবতে পেতাম যে বুদ্ধির বোঝাতে কোনো ছাত্রী শোষণের বা স্বপ্নের কাজ হবে না হতে পারে না। অম্মি মনে হ’ত—তা হলে বুদ্ধি হুট্ট হুট্ট অত কোনো বন্দরে এনে—হেন তিনি অজ্ঞাতে আমার মাজেহাল বোঝাকে টেনে। একথা ব্যর্থ মনে হয় সে বা জানে বলে মনে করে তার চেয়ে বেশি জানে না ত কি ? অত ভাবায়, আমি নিজেকে বা ভেবে এনেছি যদি সত্যি আমি তাই হতাম তা হলে আমার মনোবাসী বুদ্ধি-মত্তের আপত্তিকে নিরস্ত করে আমারই মনোকার কোন্ শক্তি ? কেন আমি এমন অতিভূত হই ঐশ্বরবিন্দুর সাধনমন্ত্র বাণিতে :

মানব। বহন করো এ বিশ্বের বেদনাবিশ্বাস,
হুঃখার্জা ধরার অতি-হর্ষম এ বাজাপথে তব
অবতার মহাশক্তি হোক তব আশ্রয় নির্ভর,
হও উর্দ্ধ সত্যমুখী, প্রেমের শক্তির সূক্ষ্মাণী।
অম্মায় আমল তুমি লভিরাহ মতোলোক হতে,
কণিকের দিব্যলক্ষ্য—দৈনন্দিন মানব-জীবনে,
প্রতিদিন হোক তব ভীর্ণব্রত-উদ্ঘাপন সম।

বুদ্ধির অভিযানে না লাগলে যখনই বাজত তখনই মনে হ’ত তিনি যে বুদ্ধিলোকের মঞ্জীকে চরম দিশারি মনে করেন না একথা কেনেও তাঁর শরণাপন্ন হতে পেলাম কি হুঃখ ? বুদ্ধি বতই কেন ‘না না’ করুক এতে ওতে তাতে—বতই কেন না মনে করি এ নিষেধের রাশ বসে আছে সাবধানী মন—তবু সেই উল্টো পথেই উবাও হতে চাই কেন কেনেভনে যে এ পথের দিশারি বুদ্ধি মর—এ ডাক বুদ্ধির বোধগম্য মর ? তাই না এ ডাকে আমি লাভা দিগেছিলাম লাভা দিতে না চেয়েও। কেনম ক’রে দিলাম তার কিছু হৃদিস দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে এই বিভিন্ন উপলব্ধির উপর একটু জোর না দিগেই পারছি না যে আমার সত্যর যে অংশ তাঁর এ ডাকে লাভা দিগেছিল—আমার অনিচ্ছুক পাণ্ডুবুড়ি সেই পাণ্ডবায়ণিকে মানতে না চেয়েও মানতে বাধ্য হয়েছিল না যেম উপায় ছিল না বলেই।

* O mortal, bear this great world's law of pain,
In thy hard passage through a suffering world
Lean for thy soul's support on Heaven's strength,
Turn towards high Truth, aspire to love and peace.
A little bliss is lent thee from above,
A touch divine upon thy human days:
Make of thy daily way a pilgrimage.

—Savitri: Book of Fate—SRI AUROBINDO



অমৃততাণ্ডন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক রোগার ন্যায় কার্যকরী।

দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাণ্ডন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



স্থাপিত ১৮৯৩

“বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস”

অধ্যাপক ত্রিচিন্দ্রাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পরিমাপের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সমগ্র সাহিত্যের অব্যবহৃত উপর ইহার আমলে পড়ে। কিন্তু শুধু পরিমাপের দিক্ দিয়া নহে মূল্যের বিচারেও ইহার সৌরভ কম নহে। সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা বাদ দিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনে ইহার প্রভাবের অন্ত নাই। বর্মেরূপে আমলে উৎসবে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ইহা ছিল অপরিহার্য। নানা উপলক্ষে অগণিত লৌকিক দেবতার পূজা-প্রসঙ্গে দেবতাদের অলৌকিক কাহিনীপূর্ণ কথা বা পাঁচালি পাঠ বা গান পূজার বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য বা মঙ্গলকাব্যের গান ত মত বড় আকর্ষণ ও উৎসবের বস্তু ছিল। বর্তমানে ইহাদের প্রচলন কিছু কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই—প্রাচ্যকলে ও প্রাচীনপন্থী সমাজে ইহারা এখনও অল্পবিস্তর পরিচিত। শহরের আধুনিক ধরণের লোকের নিকট ইহারা ও ইহাদের সমগ্র পরিবেশ অপরিচিত হইয়া পড়িলেও ইহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—নানা মঙ্গলকাব্য প্রকাশিত ও আলোচিত হইতেছে—বিষয়ভিত্তিক ইহাদের কোন কোনটিকে সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করিতেছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, দৃষ্টিমের করেকজন লোকের মধ্যেই ইহাদের ব্যতিক্রম আলোচনা সীমাবদ্ধ—শিক্ষিত সমাজে ইহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভেদন কোমণ্ড উৎসাহ, আগ্রহ বা সুযোগ নাই। মঙ্গলকাব্যে বিহিত আচারাহুষ্ঠান যে সকল সম্ভাব্যের মধ্যে এখনও অব্যাহত রাখার বিরাজমান তাহাদের সঙ্গে বর্ধিত পরিচয়ের অভাবে—কোন কোন স্থলে সম্ভাব্য-বিচ্ছেদের দরুন বহু জিনিষের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ হুঃসাধ্য। কলে এই বিশাল সাহিত্যের অনেক অংশ এখন পর্যন্ত আমাদের নিকট অশ্লষ্ট—ইহার যে সামান্য অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের বৈজ্ঞানিক নীতি বশাবশতাবে অসুস্থত না হওয়ার আলোচনার পথও সুগম হয় নাই।

এই সব অসুবিধার স্রোত ও বাহারা অসামান্য বৈধ ও নির্ভর-সহকারে এই সাহিত্যের বাস্তবাহিক পরিচর এবং বিবরণ সংকলন ও প্রচার করিতেছেন তাহারা শিক্ষিত সাধারণের বতবাহের পাত্র। দীর্ঘ দিন ধাবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই সাহিত্যের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। বতবতাবে ইহার ব্যাপক-তর আলোচনার প্রয়োজন কেহ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ভূত-

পূর্ব অধ্যাপক ত্রিচিন্দ্র আহুতাব তটীচাৰ্য মহাশয় বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে অগ্রী হইয়া-ছেন—“বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” নাম দিয়া তিনি মঙ্গল-কাব্য সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত করিয়াছেন—এসকলক্ষে তিনি মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবতাদের বরণ নির্ধা-রণেরও চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কথা এই যে, বাঙালী তাঁহার দীর্ঘ সাধন’র এই কল সাধনে বরণ করিয়া লইয়াছে—করেক বৎসরের মধ্যেই তাহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে এবং পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের কত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সন্মানিত পদক প্রদান করিয়া পুরস্কৃত ও সন্মানিত করিয়াছেন। আরও তাঁহাকে ‘অ’দ্বিতীয় অভিনন্দন জানাইতেছি।

শিব, হনসা, চণ্ডী, বর্ম, কালিকা, শ্রীমলা, বস্তু, সারদা, নক্ষত্রার, সুখ প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল কাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহাদের ইতিহাস এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া রচিত যে সব ছড়া ও কাহিনী প্রচলিত আছে, গ্রন্থকারের মতে ‘প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের মর্যাদার ইহাদের আর একখানিও উন্নীত হইতে পারে নাই’—তাই তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে করেন নাই। পঞ্চাশের পঞ্চাশের মহাভারতপূরণ, ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্য ও বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল এই তিনখানি ঐতি-হাসিক কাব্য সম্বন্ধে বতব একটী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অগচ মঙ্গলকাব্যের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পরিচিত-অপরিচিত বিভিন্ন দেবদেবী-বিষয়ক কাব্য ছড়া কাহিনীর সহিত ইহার সম্পর্ক অন্ততঃ বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়া বর্ধিততর সন্দেহ নাই। এই সাহিত্যের মধ্যে কৃষ্ণ-বিষয়ক কৃষ্ণমঙ্গল এবং দেবসদৃশ বোম্ব-দের মাহাত্ম্যবর্ণনাময়ক পৌরকবিবর, গোপীচাঁদের পাঁচালি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা বিভিন্ন পুস্তকের মধ্য দিয়া নিভাত কম হয় নাই। কিন্তু শমির পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি, অরমঙ্গলচণ্ডী, হরিশ্চন্দ্রমঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গলচণ্ডী, ক্ষেত্রপাল, শুভচন্দী, অসমরনারায়ণী, নিরাকুল বামদেব, ইতু প্রভৃতি বিভিন্ন লৌকিক দেবতার যে সমস্ত কাহিনী এখনও মহিলাদের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচলিত সেগুলির সামান্য কিছু কিছু বিবরণ বিভিন্ন অনতিশুলভ পত্র-পত্রিকায় ছড়ান রহিয়াছে—এসবকে সুখলাবত বিশেষ কোন আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। অগচ কোন কোন পাঁচালির রচনার মধ্যে কবিত্ব-

পশ্চিম পরিচয় পাওয়া যায় না এমন মহে—ইহাদের হৃদয়ের চাতুর্য ও শব্দসমিবেশের মৈশূণ্য পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। বৃহত্তর হিসাবে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কালিদাসের সত্যনারায়ণের পাঁচালির উল্লেখ করা বাইতে পারে। কাহিনীগুণির মধ্যেও অনেক স্থলে প্রাচীনকালের বাঙালী-সমাজের সুখ-দুঃখের অপরূপ চিত্র কুটরা উদ্ভিরাহে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালীর লৌকিক বর্ণাশ্রমের ইতিহাসের দিক দিয়া ইহাদের মূল্য সর্বোপরি। এইরূপে নানা দিক দিয়া মূল্যবান এই বিষয়গুলি সবধে একটি অব্যাহত আলোচ্য গ্রন্থ সংযোজিত হইলে ইহা পূর্ণাঙ্গ হইত বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের আলোচনার উপক্রমে গ্রন্থকার লৌকিক দেবতার উপাস্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, লৌকিক বর্ষ সম্বন্ধে যে আশ্রয় গ্রন্থের সুবিধার ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য জানিবার আশা ছিল।

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থগুলি যে অবস্থায়, যে আকারে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহাদের আসল রূপ, রচনাকাল ও রচয়িতাদের পরিচয় নির্ধারণ করা অতি দুঃস্বপ্ন ব্যাপার। বাহা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের পরম্পরের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। আলোচনা-কাহীদের অনোভন পক্ষপাতিত্বের ভিত্তি এসকল আলোচনার কল কোন কোন ক্ষেত্রে বিসদৃশ হইয়া উদ্ভিরাহে। যেমন, একজনদের বহুস্বপ্ন বারণা—‘সংস্কৃতিবিহীন’ পূর্ববঙ্গে কখনও কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় নাই বা হইতে পারে না—প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে বাহা কিছু ভাল ভাষা পশ্চিমবঙ্গের অথবা বাহা কিছু পশ্চিমবঙ্গের তাহাই উৎকৃষ্টতর। এই অদ্ভুত বারণা তাঁহার প্রমথস্বপ্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাকে অনেক স্থলে বিকৃত ও কলুষিত করিয়া কেলিয়াছে—পরমন্ত সম্বন্ধে তাঁহাকে অসহিষ্ণু ও উগ্র করিয়া তুলিয়াছে। সুখের বিষয়, বর্তমান গ্রন্থকারের লেখার মধ্যে এইরূপ ক্রটির সন্ধান পাওয়া যায় না—বিরোধী মত বণ্ডনের সম্বন্ধে তিনি অসংযত ও অসঙ্গত ভাবার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তবে অনেক স্থলেই তিনি অধ্যাপক স্নহ-মায় সেন মহাশয়ের মত বক্তব্য ও সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রতীতি করিলেও রাজ্য বার দুই পার্শ্বিকার (পৃ. ৫১৫, ৬১১) অত এসকল তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। অসঙ্গ সেন মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে একবারও ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম বা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সে বক্তব্য কথা।

হিন্দু বর্ষ ও আচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনেকই শাস্ত্র ও প্রচলিত রীতিবিরোধী কথা বলিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতা এই সব কার্যে অপরিহার্য। ভট্টাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থেও এ আতীর ক্রটি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। ব্যান্ড অপ-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৫, ১৪৭), কাত্যায়নীকে বোদ্ধন-মাতৃকার অতন্তর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (পৃ. ৬৭২)। খুঁটিনাটি হইলেও এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। তাহা হাতা, ‘কন্যকী’ নামটি কোন কোন অঙ্গলে প্রচলিত থাকিলেও ইহা সাধারণতঃ স্ত্রীকায়কী নামে অধিকতর পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অরণ্যদ্বীপের ব্রতকথা বলিয়া গ্রন্থকার কোন বস্তুর ইঙ্গিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। রঘুবল্লভের সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতি ভক্তের অন্তর্গত ভিখিত্ত্বকে ‘রঘুবল্লভের রচিত বলিয়া পরিচিত’ এইরূপে উল্লেখ করার (পৃ. ৫৬) যেহু প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। আত্মকালকার বাংলা গ্রন্থসমূহে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে বর্ণাশ্রমের বাহুল্য যেম একটি নিয়মের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হুঃখের বিষয়, বর্তমান গ্রন্থেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

এই সব সামান্য ক্রটিবিচূড়িত সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সুনিবিদ এবং সুপাঠ্য। ইহার পক্ষে পক্ষে গ্রন্থকারের পরিচয় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্বামোদীর ত কথাই নাই, সাহিত্য-রসিক বাঙালী পাঠকসকলেই ইহা পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।*

* বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীআত্মতায় ভট্টাচার্য এম-এ প্রণীত। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩৫৭। কলিকাতা বুক হাউস, ১১১, কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা। মূল্য মন টাকা।

সভা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্ক জগতে বিরাট বিপণ্যর সম্বন্ধে ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অল্পমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—শ্রীজগন্নাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিদাস ব্যানার্জী

১। অবশ্য এই আলোচনার সকল অংশের হিত, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ও তর্কাতীত বলিয়া মনে হয় না।

দেশ-বিদেশের কথা

কুমুনগর সাহিত্য-সঙ্গীতি

একাদশ বার্ষিক অবিবেচন

গত ১৫ই আশ্বিন সন্ধ্যায় কুমুনগর কলেজ হলে কুমুনগরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সঙ্গীতির একাদশ বার্ষিক অবিবেচন সূচনায় হয়। অধ্যাপক ত্রিহাংতুম্বার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের প্রভাবে এবং ত্রিহাংতুম্বার আচার্য্যের সমর্থনে ত্রিহাংতুম্বার বাগল মহাশয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে পরিচালক ত্রিহাংতুম্বার সঙ্গীতির একাদশ বর্ষের কার্যবিবরণ পাঠ করেন। সঙ্গীতি কর্তৃক অঙ্গীকৃত কবি তারত-



সভাপতিসহ সাহিত্য-সঙ্গীতির কয়েকজন সদস্য

চল্ল অরোপোংসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ যুক্তিরক্ষা বিষয়ে সঙ্গীতির প্রচেষ্টা সাক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কার্য-বিবরণ পাঠের পর অধ্যাপক ত্রিহাংতুম্বার চক্রবর্তী সঙ্গীতির আদর্শ বর্ণন-প্রসঙ্গে আধুনিককালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধনা ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের কথা উল্লেখ করেন। এই দুঃস্বপ্নের প্রতিকারের জন্য তিনি লেখক, পাঠক, প্রসঙ্গকামক এবং সভা সমিতির উভোক্তৃৎগকে সমবেতভাবে ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে আহ্বান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্কট ও তাহার দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করেন। এই বিষয়ে সাধারণের কর্তব্যের কথা তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন।

কবি ত্রিহাংতুম্বার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়ের কথনবাচ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। ত্রিহাংতুম্বার সাতাল, ত্রিহাংতুম্বার সাতাল, ত্রিহাংতুম্বার রেণু ভট্টাচার্য্য, ত্রিহাংতুম্বার মাতুরী আচার্য্য ও ত্রিহাংতুম্বার মীনা চক্রবর্তী কয়েকটি সমরোপযোগী সঙ্গীত গাইয়া সভা সকলের আমন্যবিদ্যাম করেন।

১৫ই আশ্বিন সন্ধ্যায় এই অবিবেচন উপলক্ষে অধ্যাপক ত্রিহাংতুম্বার বহু 'হিন্দু সন্ধ্যা' বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ধামুয়াতে আদিবাসী ও অল্পমত সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন

বাংলাদেশের আদিবাসী ও অল্পমত জাতিসমূহের উন্নয়ন-করে গত দুই মাসে কলিকাতার ভারত মহাকাশি মণ্ডলী নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ধামুয়ার সাধনাপ্রসঙ্গে মহাকাশি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ, আদিবাসী ও অল্পমত সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেখানে একটি সভা হয়। মন্ত্রী ত্রিহাংতুম্বার দত্ত মহাশয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি মহাকাশি মণ্ডলীর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিবৃত করিয়া এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির আহ্বানে ত্রিহাংতুম্বার দত্ত আদিবাসীদের সম্মুখে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রত্যেক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, "মহাত্মা গান্ধী তাঁর গঠনমূলক কর্মবিধির ষোল নম্বর ধারায় আদিবাসীদের সেবার্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কর্মীর অভাব দেখে তিনি 'The harvest is rich but the labourers are few'—অর্থাৎ, 'কসলের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু কর্মীর সংখ্যা বড়ই কম', বলে আক্ষেপ করে-ছিলেন। তাঁর এই আক্ষেপ মেটানোর জন্যে বলে বলে কর্মীদের আকর্ষণ এই সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।"

সভার সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, অবিলম্বে এই শিক্ষাকেন্দ্রে আদিবাসী এবং অল্পমত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষাদান, কুটীর-শিল্পের প্রবর্তন, আশ্রমের পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য্য, লোকসঙ্গীত প্রচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই শিক্ষাকেন্দ্রে কর্মী তৈয়ার করিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, আদিবাসী ও অল্পমত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে। এই আশ্রমে একটি নারীশিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে নারীদের, বিশেষভাবে আদিবাসী জীলোকদিগের লেখাপড়া ও বিভিন্ন হস্তমূলক শিল্পের ব্যবস্থা করা হইবে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির বারী তথ্যনিবন্ধের উপর ধামুয়ার শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার সর্বসম্মত কর্তৃত্বের অর্পণ করা হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টা গত ১৫ই আগষ্ট পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৩০২ সালে মদীরা শান্তিপুত্রের স্মরণাপন্ন প্রাণে কন্যগ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিভাগিকার জন্য তিনি কলিকাতার আসেন। প্রথম জীবনে তিনি স্বাধীনতাবাদী মতাবাদের সহিত কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কার্যে ইত্বকা দিয়া সমাজ-সেবার আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষকতাকার্যে ব্যস্ত হন। পাইকপাড়া দ্বারা দ্বিজেন্দ্র ভাট্টা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের

পথে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্য-সাধনা করিতেন। তাঁহার মনুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। বিশেষরূপে শুধু বঙ্গ শিকার্ত্তীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সুবক্তা ও বৈকবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বাংলার বহু বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকার তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং “বিশ্ব বৈজ্ঞানিক” ও “পাঠশালা” নামক কবিতার বই দুইখনি বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে। সিঁথি বৈকব সন্মিলনের তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত। তাঁহার সভাপতিত্বে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সিঁথিতে বহু বৈকব মহাজনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

କବିରାଜ ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ ରାୟ

গত ২২। আত্র রবিবার হুচুকার লঙ্ঘপ্রতিষ্ঠ কবিভাষ্য ব্রহ্ম-
বল্লভ রায় বর্ণিত হইয়াছেন। ১২৮২ সালের কান্তন্য মাসে
কাঁচকাপাতার সজ্জাত বৈবাহ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার
পিতা কৈলাসচন্দ্র রায় হুচুকার কবিভাষ্য ছিলেন। ব্রহ্মবল্লভ
সহজাত কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। কয়েক বৎসর
হুচুকার ক্রী চার্ক হুলে ও পরে নুলাডোড সংস্কৃত কলেজে
পড়িতা তিনি কাব্যকণ্ঠ উপাধি অর্জন করেন। কলিকাতার
বিখ্যাত কবিভাষ্য লোকনাথ মল্লিকের নিকট তিনি চরকাধি
আত্মর্থেষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে
বাংলার একজন শ্রীহানীর কবিভাষ্যরূপে প্রভুত প্রতিষ্ঠা লাভ
করেন। আচার্য্য অক্ষরচন্দ্র সরকারের আত্মহুল্যে তিনি
সাহিত্যচর্চার বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৭
সালের বৈশাখ মাসে সাপ্তাহিক “সুবোধিনী” পত্রিকা তাঁহার
সম্পাদনার বাহির হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স ক্রিষ্টিবিক
১৪ বৎসর মাত্র। পরে তিনি “বহুদর্শী” নামে পত্রিকাও
সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ଭିବି ମିତ୍ରତର୍କ, ଦୁର୍ବାଂଶ ସମ୍ମିଳନ, ଶକ୍ତ ଶହୋଦୟ, ସାବକ-
ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉପାସନା, ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି

শ্রীমণিনীকুমାର ভট্টের নূতন বই

আদিবাসীদের বিচিত্র কথা

(सचिद्व) प्रमाण-२५

লেখকের এতদক অভিজ্ঞতামূলক মূল্যবান এই। ইহাতে আছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, বিশেষতঃ বাংলা ও আসামের আদিবাসীদের রীতিনীতির বর্ণনা আর খাসিয়া, কাছাড়ী প্রভৃতির মৌরবোজল অতীত ইতিহাসের বিবরণ। আদিবাসীদের হৃদয়-সংগ্রামের কাহিনী এই পুস্তকের সর্বাগ্রধান আকর্ষণ। অক্সফোর্ডের 'কেভা ডোরো'য়ের এবং খাসিয়া সামন্ত-রাজা ভীরত সিং-এর সমস্ত বিদ্রোহ, ভীল-নেতা মোতীলাল তেলাংয়ের পরিচালিত হৃদয়-অশ্বোৎসবের কথা বাংলা ভাষায় এখন এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। নাগ-রাই গাইডিলিট, হুডা-নেতা বীরসা ভগবান সব্বেশ্বর বহু অজ্ঞাত তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দেশবন্ধু বুক ডিপো—৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড, কলি: ৬



ଅକ୍ଷୟାନନ୍ଦ ରାୟ

এবং আত্মকোষের ইতিহাস ইত্যাদি পবেষণামূলক গ্ৰন্থ
লিখিয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রিকাসমূহে তাঁহার বহু রচনা
প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যোৎস্নাময়ী বসু

সভা ২১শে শ্রাবণ সিটি কলেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক
ত্রিবেণবের বনুর সহধর্মিণী স্যোৎস্নামণী বনু রাজ ৪৭ বৎসর
বয়সে পরিবারের এক ভৃত্যের হাতে নিহত হন। তখন তাঁহার
স্বামী নিজের কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি
নিজেও আহাৰ করিয়া তাঁহার কর্মস্থল হাওড়ার একটি
বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছিলেন। এমন সময় এই
শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। শোকভগ্ন কেশবেরকে
আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

বীরেন্দ্রনাথ দাস

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বীরেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার হাইলাকান্দিবৃত্ত বাসভবনে সন্ধ্যা ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথের বাকী গ্রীষ্ট শহরের মিকটবর্তী আশালিচা গ্রামে ছিল। তিনি বহু বৎসর গ্রীষ্ট বেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া গ্রীষ্টের যে সব দেশসেবক হুঃখ ও নির্ধাক্ত ভোগ করিয়াছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্ততম। ত্যাগ, মিষ্টা ও নিঃস্বার্থ দেশসেবা দ্বারা তিনি সকলের দ্রষ্টা ও স্নেহ অর্জন করিয়াছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

পদার্থবিজ্ঞান নবযুগ—শ্রীচাক্স ভট্টাচার্য্য। বিজ্ঞানভী
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক বিষয় সাধারণের উপযুক্ত করে লেখা কঠিন
কাজ। একটি কারণ—পারিতোষিক শব্দ ব্যবহৃত নেই, বা সম্প্রতি সংকলিত
হয়েছে তাও সাধারণের পরিচিত নয়, এবং বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক
বিষয় প্রকাশের রীতিও ভাল করে গড়ে উঠে নি। আর একটি কারণ—
বিজ্ঞান (বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান) চর্চার জন্য যে ভিত্তি অর্থাৎ প্রাথমিক
শিক্ষা আবশ্যিক তাও অনেকের নেই। যারা ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখেছেন
তাদেরও অনেকে বাংলা বৈজ্ঞানিক সম্ভব দুর্গোধ মনে করেন। বাংলা
ভাষার ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যান অপেক্ষাকৃত হুসাধা, কারণ দর্শন-
চর্চার উপযুক্ত ভাষা এবং বহু পারিতোষিক শব্দ আমাদের আছে।

যারা আমাদের মাতৃভাষার বিজ্ঞান লিখে থাকেন তাদের অনেকে
রচনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আরম্ভ করতে পারেন নি। এরা ইংরেজীতে
বিজ্ঞান শিখেছেন, ইংরেজীতেই ভাবেন, এবং ইংরেজী বাক্যরীতির বধ্যবধ
অনুবরণ করেন। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ
অসম্ভব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যরীতির পরিবর্তন করতে হয়, অনেক শব্দের
প্রতিশব্দ না দিয়ে অন্য ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়, এইসব বিষয়ে
অবহিত না হলে রচনা উৎকট হয়ে পড়ে। Sensitized paper স্থানে
'স্পর্শকাতর কাগজ', low protein diet স্থানে 'নীচ প্রোটিন খোরাক'
ইত্যাদি অজুত অনুবাদ অনেক দেখা যায়। সহজে বোঝা বাবে মনে

করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন, যেমন
'কোটকটিয়া জীবাবুর পক্ষে বজুর কাজ করে'। 'যে অপুর মতো বত
প্রকারের বাতাবিক কাপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলোকপার
থেকে কাপন চুরি বেতে পারে'।

যে অল্প করেকজন বাংলা ভাষার সার্থক বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ লিখে
বশবী হয়েছেন, তাদের শীর্ষে আছেন শ্রীযুক্ত চাক্স ভট্টাচার্য্য। বহু
লোকের মধ্যে এর অধ্যাপনার উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা শুনেছি। এর ছাত্র
হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সত্যনার বিষয় এই যে, ইনি কলেজের
পণ্ডিত বাইরে এসে চূপ করে বসে নেই, ধর্ম্মকর্ণেও ডুব দেন নি; নানা
ব্যাপারে ব্যস্ত থেকেও মনোহর মাতৃভাষার আদর্শবুদ্ধিবৃত্তিকে বিজ্ঞান
বিতরণ করছেন।

চাক্সাবুর নবতম গ্রন্থ পদার্থবিজ্ঞান নবযুগ। জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত
বেসব তথ্য আজকাল অসাধারণ লোকের অন্তর্ভুক্ত কৌতূহলের বিষয়, যেমন
ইলেক্ট্রন, বেতার, রেডিয়ম, আটম ভাঙ্গা-গড়া, আটম-বোমা, আপেক্ষিকতা-
বাদ প্রভৃতি, তারই বৃদ্ধান্ত এই গ্রন্থে আছে। পদার্থবিজ্ঞান অর্থ অর্থাৎ
মাণজোখের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনেকে দেশমাত্র অর্থ সইতে পারেন
না। তারিও নির্ভয়ে এই বইটি পড়তে পারেন। গ্রন্থকার অল্প পরিহার
করে অতি সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যা
করেছেন। এই গ্রন্থ পড়লে পাঠক বিশ্বরাশিষ্ট হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে
জ্ঞান ও আনন্দলাভ করবেন।

শ্রীরাজশেখর বসু



সুকোমল কদম্বীয়া কেশবার্ণাশি

সম্বতন পরিচর্য্যার অপেক্ষা রাখবে

ক্যালকেমিকোর ক্যাস্টরল

কেশ পরিচর্য্যার অপরিহার্য্য সম্পদ।



ক্যাস্টরল

সুবাসিত ক্যাস্টর অয়েল

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং. লি: কলিকাতা

কতিপয়—ঈকুয়ারলাল দাশগুপ্ত। ভারতী গ্রন্থ-ভবন। ৫, ভাণ্ডারগে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

যে প্রচ্ছদ চিত্রাধারায় পরিণতিতে মানুষের বহুবিচিত্র জীবনীতির উদ্ভব, কার্যকারণ সম্পর্কের বিচারে সব সময়ে সেগুলি হয়তো স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু অসম্পূর্ণতা, কিছু বা রহস্ত কোথায় বেন লাগিয়াই থাকে। এই সব জট-পাকানো আচার-আচরণ বিষয় এবং কৌতূহলের বস্তু। সবকিছুর এই সূত্রের মধ্যেই কথা-সাহিত্যের পরিপূষ্টি। বিষয়বস্তু নির্বাচনে বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের সংঘাত দুয়ের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। অবশ্য লেখকের দর্শন ও অনুভূতির রসে সিক্ত হইয়া বিষয়বস্তু হৃৎ প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় না করিলে—গল্প উত্তরাইয়াছে বলিয়া রসিকজন খীকার করেন না।

আলোচ্য গল্প-সংগ্রহখানি পড়িয়া এই কথাটিই মনে হয়—লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীমনও যথেষ্ট সচেতন। অতি সুন্দর তুচ্ছ ঘটনা বা বৃত্তিসমূহের বরণ তিনি জানেন এবং সেগুলি সুন্দর করিয়া, পুষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও রাখেন। ...এগুলিতে গল্পের রস আছে—কিন্তু বাধুনিটা নাটকীয়—বর্ণিত নাটকীয় বাস্তব-প্রতিবাস্ত বা চরিত্র-বিকাশের অবকাশ ইহার মধ্যে নাই। কঠোর বাস্তব এবং অবাধ কল্পনা দুটিকেই লেখক চরম পথ্যে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন রচনা হঠাৎ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাটকীয় ভঙ্গীর যাহা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ সংলাপ তাহার গতি একটুও ব্যাহত হয় নাই, তাবকে অনায়াসে বহন করিয়া সে রসলোকে পৌঁছিয়াছে। চিত্রগুলির বেহনা, আনন্দ বা কৌতুক সমজাতীয় নহে। দৃষ্টান্তবরণ 'বাসব' ও 'বনান্তরালে' দুইটি চিত্রের বেশনার তুলনা দেওয়া যায়। একটিতে অতি-বাস্তব ঘটনার রূপ আঘাতে মন ভারতুর হইয়া উঠে, সমাজ-ব্যবহার ক্রটিতে মন বিধাইয়া উঠে, অস্বস্তি বদ্বন্দ্যগতের মধুর একটি আঘাতে মনকে মেদুর করিয়া তুলে। 'রাজপুস্তুর' গল্পে উদ্ভিন্ন-বোঝা অতিসাধারণ একটি মেয়ের মনের কামনা বিধিলের নারী-চিত্তেই প্রতিবিম্ব। 'ভূতের দেশে' পাই যুদ্ধোত্তর যুগের বিকলাঙ্গ ভগ্নমনোরথ বাসনাদিগ্ধ কতকগুলি মানুষকে। 'তিনটি বেজে সাত মিনিট'-এ আছে আনন্দ-জড়ানো জীবনের একটি দিকের সত্যকার পরিচয়। আসলে এগুলি রেখাচিত্র। সমগ্র জীবনের না হোক—জীবনের কোন অংশের সামান্যতম বৃত্তির অথবা বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাঙা-চোরা টুকরা—বেগুলিকে একত্র করিয়া লেখক চিত্রা করিবার ও রস উপভোগের যথেষ্ট অবকাশ পাঠককে দিয়াছেন। সমস্ত ছবিই রং বা রেখা সমান নহে—রসও হয়তো সর্বত্র গাঢ় হইতে পারে নাই, তথাপি এইগুলিতে লেখকের স্বজনী-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে—ভবিষ্যতে পূর্ণতর জীবন-চিত্র অঙ্কনের প্রতিশ্রুতিও বিভ্রম।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিন্থিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্রিমি ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-বাস্তব প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” অনলাভারণের এই বহুদিনের অস্বস্তি দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আ: শিশি তা: মা: সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি:

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭

কোড—সিটি ৮৮৩

ইঙ্গিত—ঈহবোধ বহু। গ্রহাণার, পি-৫৮, ল্যান্ডাউন রোড, কলিকাতা। দাম ২।০ টাকা।

এই উপভাস্থানিতে বর্তমানকালের রাজনীতির ও রাষ্ট্রনায়কদের গতি ও চরিত্রের বহু অংশ প্রতিকলিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা অর্থবান ব্যক্তি—সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করিবার আয়োজনে বেবুজি-কাশলের আনন্দক তাহা ভাষ্যদ্বারা মহাশয়ের প্রচুর পরিমাণেই আছে। হস্তরং পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁহার কার্যকলাপ সমর্থন করেন, লেখকেরা তাঁহার নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমন্তকে সেক্রেটারীরাপে কিনিয়া লীগও তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়াও শ্রীমন্ত বৃষ্টিতে পারে, সমাজ বা অর্থনীতির মূল হুজুট কোথায় বিধৃত রহিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে শ্রীমন্তের অন্তরের ঘন, তাহার ভাগ্যকে কোন পথে লইয়া গিয়াছে—ইহিতের প্রতিপাত তাহা নহে। নেতার নেতার আশ্রয়ভাঙা বলহ, ষষ্ঠনীতির এরোপ, মোত ও ক্ষমতালভের মত্ততা জাতীয় জীবনকে কি ভাবে কলুষিত ও পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, ইহিতের মূল উপজীব্য সেইগুলি। বলা বাহুল্য, লেখক তাঁহার বক্তব্য ভালভাবেই গুছাইয়া বলিয়াছেন। উপভাস্থানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে, নিছক কল্পনার জগতে বিচরণ করিতেছি। আমিকার দিনে যে তিক্ত সত্য মানুষকে প্রায় নিরাশাবাদী করিয়া তুলিয়াছে, ইঙ্গিত তাহারই মর্ম্মকথার উপসর্গিক এবং এই কারণে ইহার চরিত্রগুলিও বাস্তবায়ন। শ্রীমন্ত, গ্রন্থের ভাষ্যদ্বারা, কালীকিত্তর, হস্তরং দেবী প্রভৃতিকে আমরা সকলেই কমবেশী জানি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



= পূজার উঃ

অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ প্রণীত

শ্রীনীগোপাল চক্রবর্তী প্রণীত

তাজার মত ও পথ

ছেলেদের হাতের কাজ

নেতাজীর মত ও পথ নিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের
সাথে মত-বিভেদ ও তার কারণ নিয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণ।
সংবাদপত্রসমূহে ও পাঠ্যকমহলে উল্লেখ্যসিদ্ধ। মূল্য ৩।০

বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে যে সব জিনিস তৈরী করা
যেতে পারে তাদের কথা গল্পের মত সরস ও সাবলীল
ভাষায় লেখা : বহু চিত্রে সুপরিষ্কৃত। মূল্য ২. টাকা।

শ্রীভীষ্মপদ ঘোষ প্রণীত

যতীন্দ্রমোহন বাগচি প্রণীত

শ্রীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১০০

রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য

১৫০

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত

নীল আকাশের অভিযাত্রী

১৫০

যাঁরা ছিলেন মহীয়সী

২১

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত

নলিনী দাশগুপ্ত প্রণীত

পূজার পড়া ১।০

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত

হাসির দেশ ১।০

শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

শ্রীভীষ্মপদ রাহা প্রণীত

সৌম্যপারে ১৫০

স্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপগ্রন্থ। বহুদিন পরে এর পুনর্মুদ্রণ
হয়েছে। রঙিন প্রচ্ছদ শোভিত। মূল্য ১।০

রবিনহুড

২১

পি. সি. সরকার প্রণীত

শ্রীহরেন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্পাদিত

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্তী প্রণীত

দুঃসাহসী ১৫০

রমেশচন্দ্র দাশ প্রণীত

সংক্ষিপ্ত রমেশ-প্রবন্ধমালা

শ্রীনীহারবরুণ গুপ্ত প্রণীত

সাগরিকা (১ম) ১১০

বঙ্গ-বিজেতা

১।০

(১ম) ১১

সাগরিকা (২য়) ১১০

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত

১।০

শঙ্কর (২য়)

১১

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সুবিস্তৃত পদার্থ-বিজ্ঞান

শ্রীভগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত

= বিজ্ঞানের চিঠি =

আচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা সম্বলিত

কতকগুলি পত্রের মাধ্যমে এতে আলোচিত হয়েছে—আলোকের বিকিরণ-লীলা, বিদ্যুচৌম্বক মতবাদ, আলোকজ
বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, পরমাণবিক ভব, মহাজাগতিক বস্তুভব, প্লাস্মা পরিমাণবাদ ও বিজ্ঞানের আরো অনেক ভব।

আচার্য বসু বলেন—“সহজসাধ্য ক’রে লেখা জটিলতম নানা পদার্থ-বিজ্ঞান-ভব পরিবেশিত

এ গ্রন্থখানা বাঙলাভাষী প্রত্যেককেই ভাল ক’রে পড়বার জন্য অত্নমুদ্রণ করছি।”

১৫৭ খানা বর্ণ ও রেখাচিত্রে ভূষিত

::

মূল্য ৮. টাকা

আশুতোষ লাইব্রেরী-পি

৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ০ ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ ০ ৭৮৬, লারেন স্ট্রীট, ঢাকা

মারকে লেঙ্গে—খ্রীস্টীয় দোবাসী। রীডার্স কন'র,
৫, শরৎ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৩। দ্বার চারি টাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল ১৯৩৯ সালে, আর আজ ৫১ সালের শেষ
ভাগ। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে বা লামেশের সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয়
ঘটিয়াছিল আজও তাহার জের চলিতেছে। এই এক যুগ ধরিয়া যে জীবন
আমরা বাপন করিতেছি তাহা সুস্থও নহে, স্বাভাবিকও নহে।

আমাদের এই বিপদাশঙ্কিত ও বিকৃত সমাজ-জীবনেরই ছায়া প্রতিফলিত
হইয়াছে 'মারকে লেঙ্গে'র গল্পগুলিতে। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ এই ছয় বৎসর
গল্পগুলির রচনাকাল। যুদ্ধকালীন ব্র্যাকআউট, চোরাকারবার, পলাশের
মহত্তর এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালের মুসলিম লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম,
ও 'এক হো' জিনীর তুলিয়া উত্তর সম্প্রদায়ের আর্টগার্লি, কাপড়
ও ছাত্তর কট্টোল ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় লইয়া লেখক এই পুস্তকে
কতগুলি রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন। ভূমিকার লেখক বলিয়াছেন—
"গল্পের চেহারাকে লেখকও সবগুলি চিত্র গল্প নয়, ক্যারিকচার বা কাটু'ন
চিত্র।"

১৯৪১-৪২ সালের ব্র্যাকআউটের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ
পর্যন্ত এতই নীতি অনুশ্রুত হইয়া চলিয়াছে। তাহা বহু লোককে
সর্ব্বভাঙ করিয়া মুক্তিযুদ্ধের কতগুলি লোকের স্বাধীনতার নীতি। ইহাই
"মারকে লেঙ্গে" নীতি এবং আজ এই অপধর্ম্মই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যুগধর্ম্ম।
চোরাকারবারের প্রসার, পলাশের মহত্তর প্রভৃতি এই অপধর্ম্মের অঙ্গভূত
কল। যাহা এই অপধর্ম্মের আচরণ দ্বারা মানুষের দুর্গতির বোঝাকে
হাস্য করিয়া তুলিয়াছে তাহার "সবাই এক একটা মুখাপ পরে
বেড়াচ্ছে, যে বা নয় তাই সে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত।" (মারকে লেঙ্গে—
'অন্তিনেতা গাথা')।

পরিমলবাবু তাঁর গল্পগুলিতে এই সমস্ত স্বার্থায়েবীর মুখোশ খুলিয়া
দিয়াছেন, মানুষের অত্যাচার স্বার্থায়েবী, ভাংকানি এবং ভোগ্যিক তিনি
তীব্রভাবে কণ্ঠাঘাত করিয়াছেন। 'ওহ এও পাল' গল্পের মোবর্দীন ওহ এবং
প্রজাত পাল 'পরিমলবাবু ফলের মহাদেববাবু প্রভৃতির লোক-বেধানো
মেশহিওষণার মূলে কোন প্রভৃতি, লেখক তাহা আমাদের চোখে আঙ্গুল
দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

পরিমলবাবু ব্যঙ্গ-রচনার শিখরস্থ এবং তাঁর রসিকতাও ব্যতিক্রম।
মারকে লেঙ্গে 'ছাত্ত' প্রভৃতি কোন কোন গল্প রসরচনার পরাকাষ্ঠা বলিয়া
গণ্য হইতে পারে। গল্পগুলির এই বাহু রূপই হয়তো সাধারণ পাঠকের

আনন্দবিধান করিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু এই বহিরাবরণ ভেদ করিয়া
যিনি গল্পগুলির সর্ব্বমূল প্রবেশ করিতে পারিবেন তিনিই উপলব্ধি করি-
বেন যে, গভীর বেদনাবোধ হইতে ইহাদের জন্ম।—লেখক জীবনের তিক্ত-
তম অভিজ্ঞতাসমূহকে রসিকতার প্রলেপে মিষ্টবাদবৃত্ত করিয়া পাঠকের
নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। মনে হয় যেন দুর্কলের উপর সবলের
অত্যাচার, ধর্ম্মিকের শোষণ, চোরাকারবারীর দুর্নীতি এই সমস্তের কলে
অগণিত সাধারণ মানুষের শোচনীয় ছুরবহা তাঁহার সর্ব্বমূলে যে গভীর
কতের স্পষ্ট করিয়াছে, হাঙ্গা হাসির পরিবেশ স্পষ্ট করিয়া তিনি সেই
কতের আলাকে তুলিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু 'নবযোষণা',
'নতন পরিচর' প্রভৃতি গল্পে সর্ব্ববেদনাকে তিনি লুকাইতে পারেন নাই।
তাঁহার বেদনাবিশীর্ণ হৃদয়ের কত-স্থানটি আমাদের নিকট উন্মোচিত হইয়া
পড়িয়াছে। এই বইয়ের 'কবি-শিল্পী-কথা' শীর্ষক গল্পটির চেহারাই আলাদা
—ইহা ব্যঙ্গ-রচনা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যেমন লেখকের কবি-মানসের,
তেমনি তাঁর আদর্শবাদী মনেরও পরিচর পাওয়া যায়। আদর্শিকার
দুর্ভাগ্যই যে ভবিষ্যতে নবযুগের সূচনা করিতেছে—গল্পটিতে এই আশাস
আছে। লেখক বলিতেছেন—"রত্নধরও কবি সেও শ্রমী, কিন্তু তাঁর
বিষয়বস্তু মানুষ—যে মানুষ মাটির কাছাকাছি বাস করে। বাঘের সে
মেখে পারে চলার পথে, বাঘের সে মেখে নীচের গালে। মানবতার দ্রুত
মানবতার অপমানে সে দৃক হয়। সে দাঁড়ায় জীবনের কারখানার ঘরে।
নিজ হাতে সে নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে লাগে।"

পরিমলবাবু জাত-লেখক। তাঁর রচনা মিতব্যাক্ত। তিনি যেমন চমৎকার
লিখিতে পারেন, তেমনি কোথায় থাকিতে হয় সে কৌশলটিও তাঁর আরম্ভ।
তাঁর রচনা যেমনবন্ধিত, নিঃশব্দত, অথচ যুদ্ধ সাহিত্যিক কালকব্যাক্তিত
—তাঁহাতে বহুটুকু প্রকাশিত হয় তাহার চেয়ে ব্যঙ্গনাথকে অনেক বেশী
রচনার এই সমস্ত গুণ 'মারকে লেঙ্গে'তে স্থপরিষ্কৃত। পুস্তকখানি বাংলা-
সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া রসিকদের দীক্ষিতলাভ
করিবে। বিশেষ একটা কাল-সীমার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাসমূহ লইয়া
গল্পগুলি রচিত বটে, কিন্তু কতগুলি গল্প এমন প্রাণময়তার পরিপূর্ণ যে,
সেগুলি কালোত্তীর্ণ হইবার দাবি রাখে।

বইয়ে সংযোজিত খ্রীশ্চেল চক্রবর্তীর আঁকা কাটু'ন চিত্রগুলি যেমন
ব্যঙ্গনাথ, তেমনি সেগুলিতে আছে স্বাধীন কল্পনার খেলা। লেখার
যে ছবিটি মানস-নেত্র ফুঁরা উঠে, যেখান তা হঠাৎবে রূপান্তরিত দেখিয়া
মনে পুলক-সঞ্চার হয়।

শ্রীনিলিনীকুমার ভট্ট

টোল কোম্পানীর



দাদ ও কার্ডের
মেসার্স মলম

ক্রিউটা-টোল
পোড়া মেদনা ও চর্ম্মরোগের জন্য

নিম্ন মলম
থোস পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগের জন্য



বরানগর, কলিকাতা

কাণ্ডিক

পুস্তক-পরিচয়

বিশ্বেশ্বিতী মহামানব—ঐকম্বক বন্যোপাখ্যায়। এ. বৃথাকি
এও কো সিং, কলিকাতা। পৃ. ২৭৭, মূল্য পাঁচ টাকা।

ঐকম্বোপাখ্যায় "ঐকম্বকের কথা" বলিয়াছেন—
"পুরুষসিংহ রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া হুতাশত্রে পর্যন্ত
যে বিশ্বেশ্বিতী মহামানব অনাপত্ত বাংলায় শিশু এবং কিশোরদের হাতে
তুলিয়াছেন তাঁহাদের জীবন-কাহিনী বাংলায় শিশু এবং কিশোরদের হাতে
দ্বিধার অস্ত্র 'বিশ্বেশ্বিতী মহামানবের' পুরিকল্পনা।" রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ,
বিভাসাচরণ, মধুসূদন, পদ্মহংস, বঙ্কিম, গুরুদাস, সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র
মহীন্দ্রচন্দ্র (মহাত্মা), রবীন্দ্রনাথ, প্রভুচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ
রামানন্দ, চিত্তরঞ্জন, অবনীন্দ্র, অরবিন্দ, শরৎ চন্দ্র, হুতাশত্রে এই কুড়ি
জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সরিষিট হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে বাম
দেওরা ঘোর ক্রটি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ত্রিধর্ম চিত্র সরিষে,

দুঃখ ও বাধাইয়ের দিক দিয়া বইখানি বস্ত চমৎকার হইয়াছে, তথ্যের দিক
দ্বিধা ততখানি নিখুঁত হইলে আশ্রয় আরও বেশী হইতাম। তথাপি
বহুতের বিষয় আলোচনা এবং দেশের কিশোরদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য
রাখিয়া সেই আলোচনা সর্বদাই প্রশংসনীয়।

ব.

অর্থ্য—ঐসরলাখালা সরকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী,
কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।
ঐসরলাখালা সরকার হৃদয়কাল সাহিত্য-দেবা করিতেছেন। পনের
বৎসর বয়সে তাঁহার কবিতা "ভারতী ও বালকে" প্রথম প্রকাশিত হয়।
এখন তাঁহার বয়স ছিয়াত্তর। এমন দীর্ঘ এবং অক্লান্ত কাব্যসাধনার পটভূমি
বিরল। আশ্চর্য্য এই, বয়সের সঙ্গে তাঁহার কবিতা সজীবতা হারায় নাই।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বহু খ্যাতিমান

১১৫০

সর্বদাই পুরোভাগে



ভারতীয় জীবন বীমার অগ্রগতির পথে "হিন্দুস্থান" সর্বদাই পুরোভাগে
রহিয়াছে। যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও সমৃদ্ধি-শক্তি হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য,
১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও তাহাই পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা	৫০,১৬,৬০,৫২৭ টাকা
মোট সংস্থান	১৭,৭০,৭০,৬২৪
বীমা তহবিল	১৫,২৭,৪৭,৫৪৮
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৪০,৪৭,৩০৮
দাবী শোধ (১৯৫০)	৪২,২২,৮৫০

নূতন বীমা

১৩,৭৫,৩৯,৮৫১

কিন্তু হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আস্থা পূর্বাগত তাহার
ক্রমোন্নতির পথে পাথের রূপে সহায়তা করিয়াছে, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ
সম্পদ তাহারই অস্ত্র হিন্দুস্থানের প্রকৃত গৌরব। হিন্দুস্থানও তাহার
ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সেই গৌরব অক্ষুর রাখিবে, নূতন বৎসরে
ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা।

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লি:
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৬

নারী-কবির আবির্ভাব ঘটছিল। লেখিকা আধুনিককাল পর্যন্ত সেই মৌরবয়সে এতিহ্য বহন করিয়া আনিরাছেন। সরলাবালা শুধু কবি নন, বহু গল্প এবং প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। সারাজীবনের কাব্যসকল “অর্থো” নিবদ্ধ হইয়াছে। নারীর আর্থনা, নিবেদিতা, বাস্তবিক, অহল্যা, রক্তকবা, রমণীর ব্রত, গভীর নিশীথে প্রভৃতি কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিল। বিবেকানন্দের উপর লিখিত ‘গৌর-কৃষ্ণ-সন্তোষী’ এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের লিখিত ‘তুমি আমাত্তোরি লোক’—দুইটি বিশিষ্ট কবিতা। বহু কবিতাই অবশেষেই উদ্ধৃত।

“ভালবাসা বিনা নাহি পারে কেহ মরতে দেবতা হ’তে।”

অথবা—

‘তপস্তা সুরতি ধরে এসেছিলে ধরা’ পরে
তপসিনি অরি’।’

অথবা—

‘আকাশে যে তারে তারে গাঁথা তার-হার
অপূর্ণ সে বীণাবাদ্যে, শুনেছি কি কোন দিন
অপূর্ণ বজ্রার?’

প্রভৃতি বহু পংক্তিই মনের উপর একটি গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। “জাগরণী” খণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত কবিতাই একটি অপূর্ণ জাগরণের মূহুর্তিতে উদ্ভূত করে। “অর্থো” পাঠক প্রকৃত কবিতার সন্ধান পাইবেন।

অনাগত—প্রফুল্লকুমার সরকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রফুল্লকুমার সরকার শুধু প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি খ্যাত-নামা উপজাসিক এবং প্রাবন্ধিকও। “অনাগত” উপজাস। ১৩৩৪ সালে

ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ‘প্রকাশকের নিবেদনে’ শ্রীহরেশচন্দ্র রত্নকুমার বলিতেছেন, “পর্যাবীণতার দুঃসহ বন্ধনমোচনের জন্য একদা বাংলার যে সব ভরলভর শ্রমকর্মী পণ করিয়া ক্ষুরধার পথে বাজা করিয়াছিল, তাহাদের জীবন-কথা এই উপজাসের বিষয়বস্তু। পর্যাবীণতার পটভূমিতে এই উপজাসের ঘটনাসংহান হইলেও পার্বীণ-ভারত-গঠনের ইজিত ও নির্দেশ ইহাতে আছে।” উপজাস হিসাবে বাঁহারা “অনাগত” পাঠ করিবেন তাঁহারাও কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং ঘটনার সাবলীলতার আনন্দলাভ করিবেন, প্রতিমা এবং অনিশ্চিততার চরিত্রে মুগ্ধ হইবেন। কিন্তু “অনাগত” শুধু উপজাস নয়, ইহাতে ভবিষ্যতের ইজিত আছে, ভারী রাজনৈতিক মতবাদের সন্দেশ আছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে রচিত এই উপজাসখানির রাজনৈতিক পটভূমিকা এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। রশাসুহৃতির সহিত মননশীলতার সংমিশ্রণ পুণ্ড্রকথানিকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কারাকক্ষে মোহিতের সহিত প্রতিমার শেখ সাক্ষাৎ বড় করণ এবং বর্ধস্পর্শ। “অনাগত” আজিকার দিনের ভরল পাঠককেও প্রেরণা দিতে পারিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস সাহিত্যভ্রম। সাহিত্য-বন্দিত, পাবনা, মূল্য দশ আনা।

‘কবির স্বপ্ন’ রবীন্দ্রনাথের ‘ধেরা’ কাব্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া আজকাল বাজারে বহু সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দুই-একখানির কথা বাদ দিলে এ ধরণের সমালোচনা গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই সরল কথার জটিল ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

অদ্বিতীয় লিভার টনিক

“কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকতর রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। “কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটী অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

কুমারেশ

৭ লিভারক মুখ ৩ সন্তোষ
রাখে—



ও, আর, সি, এল, জি:
সালকিয়া * হাওড়া

ইহাতে সমালোচকের পাণ্ডিত্যভিমান তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু পাঠক ও লেখকের মধ্যে ব্যবধান ছুঁড়র হইয়া উঠে। অখণ্ড সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য রচনার স্বার্থকে পাঠকের নিকট সহজ ও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা—লেখক ও পাঠকের মধ্যে রসোগলটির সংযোগসেতু রচনা করা। আধুনিক অনেক সমালোচনার ধার আছে, পাণ্ডিত্য আছে, বুদ্ধির শাবিত ওজ্জ্বল আছে, কথার তীক্ষ্ণ চাবুক আছে, ভঙ্গীর চটক আছে—নাই শুধু আন্তরিকতা। আর আটপাশ বৎসর পূর্বে রচিত 'খেরা' কাব্যের এই ধরনী সমালোচনা পড়িয়া তাই চমক লাগিল। কি অনাড়ম্বর বলিবার ভঙ্গী, কি সহজ, প্রাঞ্জল ভাষা—রসাবাদনের জন্য কি অকৃত্রিম এবং আন্তরিক আলোচনার ধারা। পড়িতে পড়িতে কাব্যরসের সন্ধাকিনী প্রবাহে পাঠকের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বাখ্যা-বিশ্লেষণের এইখানেই চরম সার্থকতা। দীর্ঘকাল পূর্বে লিখিত হইলেও এই নিবন্ধ-পুস্তকখানি আজও সমভাবে ফুড়ুহলী পাঠকের চিত্তকে রসানুভূতির সহস্রধারার অভিসিক্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে।

শ্রীমদ্রথকুমার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক ভূগোল—পৃষ্ঠা ১৪০।

মূল্য দুই টাকা।

ভারতবর্ষের পরিবহন ব্যবস্থা—শ্রীশিবপ্রসাদ সূচ্য-পাঠ্য। পৃষ্ঠা ৩৪। এইচ. চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

দেশ-বিশ্বাসের পরে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার যে অবস্থা ধাঁড়াইয়াছে

তাহাতে অনেক দ্বিবিধই নুতন কঠিনা গড়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্যে যত্নপূর্ণ পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাহারও পূর্বে খণ্ডিত বাংলা ও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার একটি সম্পূর্ণ ধারণা না লইয়া কার্য আরম্ভ করিলে সকলতাল্লাভ সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক ভূগোলসমূহে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, কৃষি, বাণিজ্যসম্পদ, খনিজ ও আরণ্যসম্পদ, শিল্প, পরিবহন-ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা ধারা শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ পাঠক যে জানলাভ করেন ব্যবহারিক জীবনে তাহা খুবই আবশ্যক। বাংলাভাষার এ ধরনের পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব আরম্ভ হইয়াছে। ইহা খুবই সমরোচিত ও হৃৎকম্প। লেখকের রচিত ইংরেজী বইয়ের আলোচনাকালে আমরা তাঁহাকে এই বিষয়ে বক্তৃত্যবার প্রস্তাব লিখিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। প্রতিকার বাংলাভাষার অর্থনৈতিক ভূগোলবিভাগ প্রচারে ত্রুটি হইয়া বেশবাসীর একটা অজ্ঞাব দূর করিলেন এবং শিক্ষার্থীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত এবং জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ। ইহার বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

লেখকের দ্বিতীয় পুস্তকখানি পরিবহন সম্বন্ধে। এই বইখানি লিখিয়া লেখক বাংলাভাষার একটা অজ্ঞাব দূর করিলেন। ইহাতে রেলপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও জলপথের বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে এবং ছয়টি মানচিত্র দ্বারা বিবরণ বৃদ্ধাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, দেশের পরিবহন-ব্যবস্থা খুবই অসম্পূর্ণ। লেখক সরকারী পরিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু আশার কথা আছে।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত



AMADE'S NEW SHOPS AND OFFICES

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা: আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন্স

প্ৰিন্সিপাল ম্যানেজিং অফিসার
প্ৰিন্সিপাল ম্যানেজার

ফোন. বি. বি. ১৭৬১
গ্রাম হিলিমার্টস

১০৮ ১ বি. বাসবিহারী এডিনিউ কলিকাতা

অন্তরীপ—জীবন বন্যোপাখ্যায়। প্রকাশনী, ১৯৭৭, ভানচরণ মে ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বৃত্তান্তর অতি সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের পটভূমিতে উপজাতিসমূহের চরিত্রগুলি বই হইয়াছে। পুরাতন সমাজ ব্যবহার গতি হাড়াইরা রাতারাতি 'আলট্রা মডার্ন' হইতে বাঙালীর রাসবিহারীর সঙ্গে যে বিপর্যয় দেখা দিল তাহা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

কোড়াসকো অকলের পুরাতন বন্যে পরিবারের রাসবিহারী হঠাৎ একদিন তার পূর্বপুরুষের ভিটা বিক্রয় করিয়া দিয়া বালিগঞ্জে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন। মা বাবা দিরা ছিলেন কিন্তু কল হর নাই। ঘোবনের আশা আর বয়ে তার মন ছিল আচ্ছন্ন, কিন্তু এই আচ্ছন্ন ভাব কাটরা বাইতেই এক দিন তিনি আবিষ্কার করিলেন যে কালের গতির সহিত সমানভাবে পা ফেলিয়া চলিতে তিনি সক্ষম হন নাই—এমন কি তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়েরাও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাসবিহারী আক্ষেপ করিলেন না, কিন্তু নিজেকে এই আধুনিক আবেষ্টনী হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

এই অতি-আধুনিক কতকগুলি মেয়ে এবং পুরুষের চরিত্র আঁকিতে বলিয়া জীমুক্ত বন্যোপাখ্যায় যে ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। মাতৃদেহের পবিত্র মহিমাকে পর্য্যাপ্ত এই উপজাতিতে কল্পিত করা হইয়াছে। কালিঘাটের বজ্রধ্বজাঙ্গার গলির একটি বাড়ীতে যে ভ্রমরজনক দুষ্টের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে মাজাজানহীনতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। অথচ এই অংশটিকে অনায়াসে বাদ দেওয়া চলিত। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সার্থক রচনার অন্ততম শ্রেষ্ঠগুণ সংঘম। তাহার অভাব এই লেখকের রচনার দেখিয়া আমরা হুত্বিত।

ঐতিহ্যবাহী ভূষণ গুপ্ত

গীতায় স্বরাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—ঐতিহ্যলোক্যনাথ চক্রবর্তী। ঐশ্বরীয়া প্রেস, ৫, চিত্তামণি হাус লেন, কলিকাতা-১। পৃষ্ঠা ২৭৮। মূল্য তিন টাকা।

এছকার বন্যেদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করার জিশ বৎসর জিটিশের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। মশ বৎসর বীপান্তর বাসের পর তিনি কলিকাতার আলিপুর জেলে প্রেরিত হন। আলিপুর জেলে থাকাকালে তিনি সমালোচ্য পুস্তকখানি রচনা করেন। ঐশ্বরীয়াচন্দ্র পাণ্ডাঙ্গী 'পরিচিতি'তে এই প্রবন্ধে 'সীতার টীকা' বলিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র সীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলির সরল অর্থবাদ ও বাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ঐশ্বরীয়া মহারাজের সীতাবাখ্যা। কোন প্রচলিত ভাষা বা টীকা অর্থবৎনে লিখিত না হইলেও ইহা সত্যই অভিনব এবং যুগোপযোগী। বাখ্যাতা উপক্রমণিকার সীতোক্ত মূলতঃের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সংক্ষেপে ভূমিকার বাখ্যাতা বাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাণিবানবোশ। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীন ভারতকে সীতার আদর্শে না গড়িতে পারিলে দেড় শত বৎসরের পরাধীনতার যে কুফল আমাদের সম্মুখ হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে না। সীতোক্ত আদর্শ সমাজ-স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে রূপায়িত বা হওয়া পর্য্যাপ্ত দেশব্যাপী কাপুরুষতা, উচ্চ মূল্য ও দ্বন্দ্বীত অপসৃত হইবে না এবং আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশও ঘটবে না।

লেখকের ভাব প্রাণপূর্ণ এবং ভাবাও সাবলীল।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১। সাধন বাণী ২। জীবন সাধনার পথে—

স্বামী আত্মবিশ্ব। ভারতসেবাস্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা-১১। মূল্য বৎসরবে আট আনা এবং এক টাকা।

প্রবোধক প্রবর্তিতে এছকার মানবের বিশেষ কল্যাণজনক এক শক্তির প্রাচলিত বাণী পরিবেশন করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবে 'জীবন লক্ষ্য', 'প্রাণবান' ও 'প্রাণবীর্য' শীর্ষক ত্রিবিধাঙ্গিত অধ্যায়-আলোচনা দ্বারা

পাইয়াছে। আদর্শ জীবনগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অতীব সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ঐউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বৌদ্ধগান ও দোহা—বহানবোপাখ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ টাকা।

সে কাল আর এ কাল—রাজনারায়ণ বসু। মূল্য ১।

পদ্মিনী উপাখ্যান—রজলাল বন্যোপাখ্যায়। মূল্য ১।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩।, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬।

আলোচ্য ভিনখানি পুস্তকই জীমুক্ত ব্রজেননাথ বন্যোপাখ্যায় ও জীমুক্ত মজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র প্রথম সংস্করণ (১৩২৩) বাহির হইবার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. শ্যামসুন্দর, ড. দ্বন্দ্বীতকুমার চট্টোপাখ্যায় প্রমুখ ভাবাত্তাবিদগণ পুস্তকের চর্চাপত্রগুলি সম্পর্কে বহু গবেষণা ও আলোচনা করিয়াছেন। ফলে এ সময়ের কিছু কিছু পাঠ-সংস্কারও সাধিত হইয়াছে। পূর্বে সংস্করণে বাংলাভাষায় চর্চাপত্রগুলির কোন বাখ্যা ছিল না। পরিবর্তন পুঁথিখানার পদ্ধতি জীমুক্ত হারপ্রসাদের ভট্টাচার্য্য বহু আয়াসে উক্ত ভাবাত্তাবিদগণের গবেষণার নিরিখে এবং নিজ বিচার-বুদ্ধিমত্তা এ সকলের বাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এই বাখ্যায় পদগুলির অন্তর্নিহিত রস ও ভাবগাঢ়তা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একারণ ইহা পাঠে বাংলাভাষা শিক্ষার্থীর, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের উচ্চতর ছাত্র ছাত্রীর সাহায্য হইবে। পরিবর্তন এই পোস্তন সংস্করণটি একশে বাংলাভাষী মাত্রেইই যত্নবানদর্শন হইয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল আর এ কাল' সম্বন্ধে মূলত কিছুই বলিবার নাই। এখানিত দীর্ঘকাল বাবৎ অপ্রাণ্য ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ 'জাতীয় সত্কার' রাজনারায়ণ উক্ত শীর্ষক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহাই পরিবর্তিত ও সমোদিত হইয়া বক্তা কর্তৃক পরে পুস্তকাকারে প্রণীত হয়। তাহার জীবনকথায় বহুতর পুস্তকরূপে এখানির দুইটি সংস্করণ মাত্র বাহির হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচাত্তর বৎসরের বাঙালীর হালচাল, শিক্ষাবীক্ষা ও সামাজিক রীতি-নীতির গতি-প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা ইহাতে আছে। রাজনারায়ণ বসুর মনবিশারত পরিচয় তাহার বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনার হৃৎকট। বাংলাদেশের নব-জাতীয়তার উদ্বোধনকরণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানে। যে 'জাতীয় সত্কার' তিনি এই বক্তৃতা দেন তাহা হিন্দু মেলায়ই অন্তর্গত, আর ইহার ভাব-প্রেরণা রাজনারায়ণ বোহাইয়াছিলেন। বর্তমান সমালোচকের 'রাজ-নারায়ণ বসু' এবং 'জাতীয়তার নবমাত্র বা হিন্দুমেলায় ইতিবৃত্ত' পুস্তক দুইখানিতে রাজনারায়ণের মনবিশারত এবং স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি একশে বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য বস্তু সাধারণের নিকট হস্ত হইল।

কবি রজলাল বন্যোপাখ্যায় রাজস্বানের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি বাংলা কাব্যে পরিবেশন করিয়া সেতুগে মনোনিবেশিত বাঙালীর প্রাণে জাতীয়তাবোধের উত্তেজনা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এইরূপ একখানি কাব্য। 'স্বাধীনতা হীনতার কে বাঁচিতে চায়' যে, কে বাঁচিতে চায়' শীর্ষক পাণ্ডিত্যগুলি এই উপাখ্যানের 'কজিরদিয়ে' প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহার একটি অংশ এই:

অন্তঃস্বপ্নে চল দ্বার বাই হে,
চল দ্বার বাই।

দেখহিতে মরে যেই, তুলা তার নাই যে,
তুলা তার নাই।"

অমূল্যে এসকল পুস্তক সাধারণের নিকট সহজপ্রাণ্য হওয়ার বাংলা-ভাষী ও বাংলা-সাহিত্যসেবী বিশেষ উপকৃত হইবেন নিঃসন্দেহ।

ঐব্রজেনচন্দ্র বাগচী

হুত্বাকর ও প্রকাশক—ঐবিহারচন্দ্র দাস, প্রকাশনী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

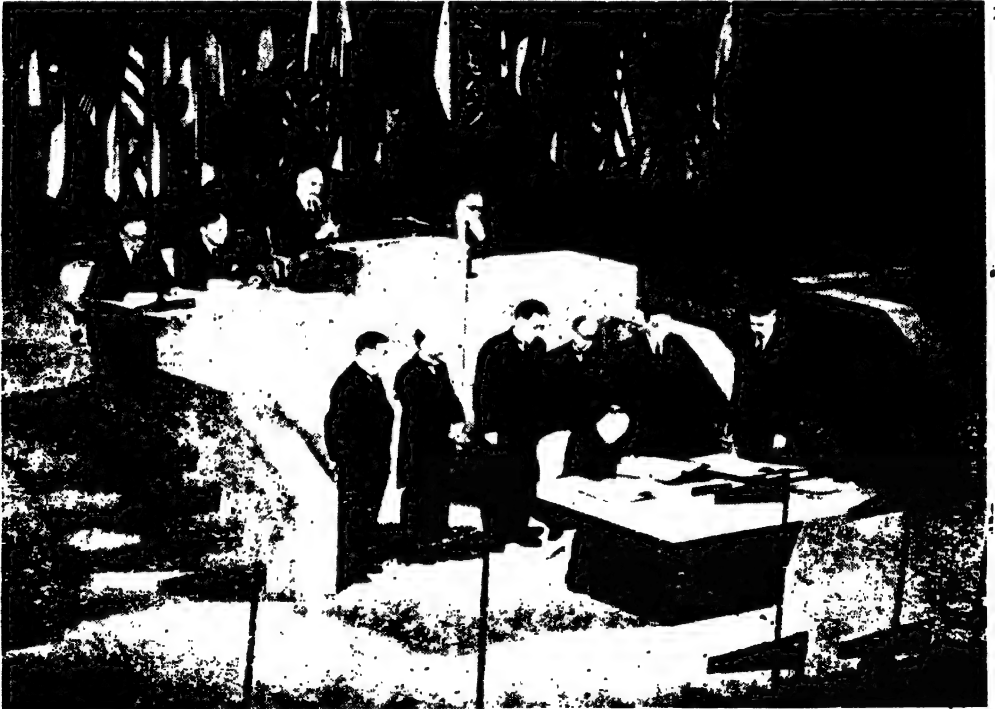


এবাসী প্রেম, কর্ণকাত:

শিকারী
ইন্দ্রেনী প্রসাদ রায়চৌধুরী



দিউ দিল্লীতে চীনা সংস্কৃতি-বিশ্বন, মধ্যাহ্নে রাষ্ট্রপতি বাবু রাভেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার পার্শ্বে শ্রীঅবাহরলাল নেহরু



শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর-রত আপাদের প্রবান মন্ত্রী। একচল্লিশটি রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন

প্রবাস

“সত্যং শিবং সুন্দরং
নারায়ণা বলহীনেন সত্যং”

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী

আগামী সাধারণ নির্বাচনে সকল দলের প্রার্থী-মনোনয়ন তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস-তালিকা সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই তালিকা দেখিয়া আমরা হতাশ হইরাছি। প্রার্থী বাছাই করিবার অত পাঁচটি ‘চালুদী কমিটি’ (Screening Committee) গঠিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা রাজ্য পরিভ্রম করিয়া প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যাচাইয়ের কল দেখিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় নাই বলিলে কম বলা হইবে, সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং কংগ্রেসের উপর অসহ্য ইহার পর আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অবিকাংশ এলাকাতেই লোকে দেখিতেছে যে, তাহাদের অকলের সুপরিচিত, হুমুতি-পন্নায়ন এবং রাজনৈতিক অপাংক্তের ব্যক্তি তালিকার স্থান-লাভ করিয়াছেন। সেখানকার কোন যোগ্য লোক মনোনয়ন তো পানই নাই, প্রার্থী-নির্বাচনের আগে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই।

প্রার্থী-নির্বাচন প্রথমেই করিয়াছে বেলা-কংগ্রেস কমিটি-গুলি। পত্ত পকারেই নির্বাচনে অবিকাংশ কমিটি হুমুতি-পন্নায়ন লোক কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল একথা পণ্ডিত মেহন দিক্কেই বলিয়াছেন এবং বাবু পুরুষোত্তমদাস উত্তরের সহিত তাঁহার বিরোধেরও ইহাই ছিল মূল কারণ। দায়িক কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন লইয়াই মেহন-উত্তম বিরোধের সূত্রপাত। বেলা কমিটিগুলি হুমুতির প্রবান ঝাঁট, চোরাকারবার এবং জালজুয়াচুরির কেন্দ্র বলিলেই হয়—ইহা আজ দেশের লোক জানে। প্রাথমিক প্রার্থী বাছাইয়ের তার ইহাদের উপর পড়িয়াছিল। প্রথমেই ইহার সেই সেই অকলের ভাল লোকদের বাব দিয়া দিক্কেদের লোক লইয়া প্রার্থী-তালিকা রচনা করিয়াছে। কংগ্রেসের কোন্ উপদল কর্তা আদম পাইবে ইহাই লইয়া বা কিছু কলজা হইয়াছে। পণ্ডিত মেহন বাহিরের ভাল লোক আসিবার অত পন্নায়ন দ্বিভা-সিলেন। ইহার তাহা যথাযথভাবে করে নাই। যে করকন

বাহিরের লোক আসিরাছে তাহার হয় একই জেলীর মহিলে প্রায় অতরত। কোন একটি কেন্দ্রেও আমরা দেখি নাই যে, বেলা কংগ্রেস মনোনয়নে ভাল লোক ও হুমুতিপন্নায়ন লোক লইয়া মতভেদ হইয়াছে। সর্বত্র একই কথা—প্রার্থী কংগ্রেসের কোন্ উপদলের লোক, অহুক মার্কী অথবা তহুক মার্কী। এই হাঁকাই শেষ হওয়ার পর তালিকা পেল প্রাথমিক কংগ্রেসে। সেখানেও এই একই ভিত্তিতে তালিকাকে প্রাথমিক রূপ দেওয়া হইল। পত্ত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়ার সময় যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল ছেলবাটা। এবারকার মাপকাঠি হইয়াছে প্রবানতঃ টাকার বলি। তাহার পর স্থান পাইয়াছে, হুমুতিপন্নায়নতা ও হুটিল রাষ্ট্রনীতির সুপোত্ত। দেশের সবথেকে পরিচালনের কমতা ইহাদের আছে কিনা সেদিকে কোন প্রবেশেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। বর্তমান প্রাথমিক সবথেকে দিকে বাহাদুরকে কর্পোরেশন বা বেলা-বোর্ড পরিচালনের অবোধ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তার অত কর্পোরেশন অবিকার করিয়াছেন বা বেলা-বোর্ডের কর্ত-কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনসমত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা তাহিরা-হেন তাহারও কংগ্রেসপ্রার্থী তালিকার স্থানলাভ করিয়াছে।

এই মনোনয়ন-তালিকা তৈরি করিবার পর চালুদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চালুদির কাজ তালোর মনে বিশাদো বস্ত হাঁকিয়া মনকে বাহির করিয়া দেওয়া। আমরা সমস্ত প্রদেশের বেলাতেই দেখিতেছি টীক তার উপ্তা হইয়াছে। চালুদি কমিটি সব করটি তেজালকে সময়ে গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতদের বেলায় অততঃ দেখিলাম যে প্রাথমিক তালিকা এবং চূড়ান্ত তালিকার অতি সামান্য রয়-বদল হইয়াছে। চালুদি কমিটি বসাইয়া তেজাল বাহির করিয়া দেওয়ার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে উহা বলাদো উচিত ছিল বেলা কংগ্রেসে। তাহা না করিয়া শেষপ্রান্তে বসাইয়া চালুদির সার্টিফিকেট দিয়া তেজাল তন্নাইবার চেষ্টায় ইহাই সম্বন্ধ হয় যে একেজো বাছাই করা আসল উদ্দেশ্য নয়, মূল অভিপ্রায় লাকাই গাহিয়া জনমত বিজ্ঞাত করা। নির্বাচনী চালাকির ইহা একটি বড় অক।

কংগ্রেস-তালিকার কংগ্রেসের বিষয়ে স্থলনীতিও রক্ষিত হয় নাই। যেহেতু হুঁশিতিপরাণতা হয় করিবার কথা বলিয়া-
হেন, কিন্তু তালিকার তাঁহারই হাত দিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাচন
বোর্ডের অহুমোদনকমে, অতিশয় সুপরিচিত হুঁশিতিপরাণ,
চোরাকারবারী প্রভৃতি পার হইয়াছেন। মতপার্থী কংগ্রেসের
কার্য্যকরী সভ্য হইতে পারে না। এই শ্রেণীর অনেকে
তালিকার হাদলাত করিয়াছেন। কংগ্রেসকে কোন নির্বাচনে
কেহ পরাজিত করিয়া থাকিলে তাঁহাকে কখনও কংগ্রেস
মনোনয়ন দেওয়া হয় না। এই শ্রেণীর একাধিক ব্যক্তি
মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। বড় বড় বনিক শ্রেণী, বড় বড়
কর্মিদার ষাঁহাদের কোনরূপ ব্যাতি কোন কালেও নাই
তাঁহারা নিষেধ, তাঁহাদের কর্মচারী, উকীল, সলিসিটর,
ম্যানেজার প্রভৃতিও কংগ্রেস-মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন।
কোনরূপ নীতি, ভার বা হুজির উপর ষাঁহারা কংগ্রেস-
তালিকা রচিত হয় নাই। অসামু লোকদের লইয়া উহা প্রস্তুত
হইয়াছে, বাহারা বড় ও শক্তিশালী উপদলের সহিত সংশ্লিষ্ট
তাঁহারা ই অধিকতর পরিমাণে হান লাভ করিয়াছে।

পণ্ডিত মেহরু সেদিন বলিয়াছেন যে, তালিকার বহু
অবাহিত লোক চুক্তিয়া গিয়াছে। তিনি এখন তাহা বুঝিয়াছেন
তবে আর করার কিছু নাই, কারণ বড়ই দেরি হইয়া গিয়াছে।
আমরা এই কথাও মনেতে পারিলাম না। তালিকা রচনার যে
অভার করা হইয়াছে তাহা জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে হইয়াছে
বলিয়া আমাদের সন্দেহ ছিল। কাজেই এইরূপ সাক্ষ্য
আসিলে ইহা আমরা আগেই ভাবিয়াছি এবং পণ্ডিত মেহরুর
ঐ বক্তৃতার আগে সবেমাত্র মাপের 'মর্ডার রিভিউ' এ লিখিয়াছি।
অভার বুঝা গেলে তাহার সংশোধনই নিয়ম। অভার বুঝা ও
জানিয়া সংশোধন না করা অপরাধ। অভার সংশোধনের
কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। যে কোন অবস্থার যে কোন সময়ে
অভার বুঝিবারা যে লোক তাহা সংশোধন করিতে পারে
সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মন্তব্যের অধিকারী। আক বাহাদিগকে
মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে তাহার পাঁচ বৎসর পর্ব্বেন্ট
চালাইবে ইহা ভাবিয়াই তাহা করা হইয়াছে। অযোগ্য,
হুঁশিতিপরাণ ও স্বার্থপর লোকের হাতে পর্ব্বেন্ট পড়িলে
দেশের কি অবস্থা হয় বর্তমান কংগ্রেস পর্ব্বেন্ট তাহার প্রমাণ।
পত সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রার্থীর যোগ্যতা দেখা হয় নাই,
দেখা হইরাছিল কেবল কংগ্রেসের ছাপ। বাণীমতার পর
এই শ্রেণীর লোকের স্থল লোকে হাতে হাতে বুঝিয়াছে।
কাজেই আজ এই ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। কেবল-
মাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী কংগ্রেস হইতে দেওয়া উচিত ছিল।
পণ্ডিতজী যে বুদ্ধিতে বুঝিলেন যে এই নীতি কংগ্রেস-তালিকার
রক্ষিত হয় নাই তৎক্ষণাৎ যদি তিনি উহা বাতিল করিয়া দিতেন
এবং নুতন তালিকা রচনার সময় দেওয়ার ভয় হই বা তিন সপ্তাহ

নির্বাচন পিছাইয়া দিতেন তবে এই স্থল শোধনাইবার ব্যবস্থা
হইত। পাঁচ বৎসর এক দল অযোগ্য লোকের হাতে পর্ব্বেন্ট
সমর্পণ করা অপেক্ষা তিন সপ্তাহ নির্বাচন পিছানো অনেক
ভাল দেশের লোক ইহা বুঝিত। ইহাতে কংগ্রেসের মর্যাদা
অনেক বাড়িত। কিন্তু মেহরু তাহা করিলেন না। আ-
তীর এই স্বীকারোক্তিকে লোকে সন্তোষপূর্ণ উক্তি বলি-
মানিবে না, ইহাকে বরং অধিকতর অপরাধের প্রমাণ বলি-
গ্রহণ করিবে। কন্যাসিষ্ট পার্ট নুতন একটা অভার কা-
করিবার আগে পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্থল হইয়াছে বলিয়া প্রচা-
করিয়া জনমত শান্ত করিতে চার, দলের দুই-চারিটি লোকে
বিভাজিত করিয়া জনমতকে ভাঁওতা দিতে চেষ্টাও করে
পণ্ডিতজী এই পছাই অহুমোদন করিতেছেন ইহা বুঝি হুঃখে
বিষয়। তিনি ভারতের প্রবাসমন্ত্রী, নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার
মতে প্রেসিডেন্ট কাজ করিবেন। বর্তমান তালিকার না
লেখা লোকেরা নির্বাচিত হইলে আগামী পাঁচ বৎসর দেশে
কৃশাসন বটবে বলিয়া তিনি নিজে যেখানে বুঝিতে পারিতে
ছেন সেখানে তার সংশোধনের ভয় আমাদের সে তিনি প্রেসি-
ডেন্টকে দুই-তিন সপ্তাহ নির্বাচন পিছাইবার পরামর্শ দিতে
পারিতেন। ইহা না করার আত্মরিক্ততা প্রমাণিত হয় নাই
প্রমাণিত হইয়াছে এই যে তিনি মনের মধ্যে পাপ লইয়া এ-
কাজ করিয়াছেন। ডাক্তার রায়ও এই দোষে দোষী।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ বাম উর্দ্ধ অধঃ ইন্দ্রান কোণ নৈকত কো-
ইভ্যাদি সর্ব্বদানের পার্টবন্দ তাহাদের মনোমত প্রার্থী
তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। বাহারা একটা প্রার্থী তরাইবার
সাধ্য নাই সেও একশ'টি নাম ছাপাইয়াছে। তাঃ বিধানচল্য রা-
এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, দেশে কংগ্রেস ছাড়া
আর কোন সুপরিচিত রাজনৈতিক দল নাই, কাজেই আ-
কাহারও পক্ষে পর্ব্বেন্ট গঠন করা সম্ভব মছে। বামপন্থী
দলগুলি একমত হইতে পারিতেছে না এ কথাও তিনি বলিয়া-
ছেন। আগামী ব্যবস্থা-পরিষদে যে ভিত্তিতে বাছাই হইত
কংগ্রেসপ্রার্থীরা আসিতেছেন তাহাতে কোন 'Stable' বা স্থায়ী
পর্ব্বেন্ট গঠন সম্ভব হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট
সন্দেহ রহিয়াছে। দেশেবা, দেশের উন্নতি ইহাদের লক্ষ্য
হইবে না, হইতে পারে না, ইহারা তার অহুপবৃত্ত। কংগ্রেস-
দলের একমাত্র লক্ষ্য হইবে স্বার্থসিদ্ধি। ইহাতে বিরোধ
এবং দল ভাঙাভাদি অবশ্যজারী। প্রার্থী মনোনয়নের
বেলাতেই দেখা বাইতেছে যে, যিনিই মনোনয়ন লাভ করেন
নাই তিনিই কংগ্রেস ছাড়িতেছেন এবং নুতন দল করিতেছেন।
নির্বাচনের পর পরিষদ-গৃহের ভিতরে সিভিল সার্ভাইসের মনু-
পাইলে ইহা আরও সহস্র গুণ বাড়িবে। প্রার্থী মনোনয়নে
বামপন্থী নামে পরিচিত দলগুলি আরও শোচনীয় স্বার্থপর

মনোহৃত্তির পরিচয় দিরাছে। নিজের দলের বার্ষ কেহই ছাড়বে না। এই সুযোগে ইউ-এস-ও এবং কন্যুনিট পার্টি অত দলতুলিকে লকে রাবিয়া কলিকাতা ও শিল্লাকলে নিজেরদের প্রাধাত প্রতিষ্ঠার বগ্ন দেখিরাছে, উহা আদৌ সম্ভব কিনা, তাওতা কতদিন টিকিবে, তাহা চিত্তা করিয়া দেখে নাই। করওয়ার্ড রক চার-পাঁচ টুকরা হইরাছে। বামপন্থী একটা দল বেখানে মিকেরা একত্র থাকিতে পারে না, সেখানে তাহারা প্রদেশব্যাপী এক্য গতিয়া তুলিবে ইহা আশা করাও বাতুলতা। কন্যুনিট দল বাহিরে কতকটা মরম ভাব রাবিয়া ভিতরে রীতিমত দরকষাকষি করিতে সিন্না ভালপোল পাকাইরা বসিরাছে। বামপন্থী একের নামে এখন ইউ-এস-ওর অন্তর্ভুক্ত গোটা ছই উপদল এবং কন্যুনিট দলের ছোটকে ঢালাইবার চেষ্টা হইতেছে। দল হিসাবে অবিকাংগ বামপন্থী দলই ইহাদের বাহিরে চলিরা সিন্নাছে। আই-এম-এ পার্টির দোহাই ইহারা দিরাছে, কিন্তু এই দলের কোন অভিজ্ঞ এখন আর নাই। তৌসলে অনেক দিন কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইরাছেন। শাহমওয়ার্ড কংগ্রেস মনোনয়ন লইরাছেন, মহবুব গবর্নেন্টের চাকরীতে সিন্নাছেন, শাহমওয়ার্ড এবং বীলম কলিকাতার ছই উপদলের ছইরা লজিয়া সিন্নাছেন। ইহার পরেও আই-এম-এ পার্টি আছে—বলিতে হইবে? সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যে কন্যুনিট দল মেতাকী মুতাবকে দেশব্রোহী বলিতে ছাড়ে নাই, তাহার সংগ্রামের বাহারা সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল, মেতাকীর ঐতিহ্যের দাবিদার করওয়ার্ড রক বা ইউ-এস-ও এবং আই-এম-এ দলের সহিত সেই কন্যুনিট দলের মিলন ও এক্য কি করিয়া হইতে পারে? কোন আদর্শের জিভিতে এই মিলন ঘটতে পারে না, ব্যক্তিগত বা উপদলগত স্বার্থ এবং লোভের জিভিতেই ইহা সম্ভব।

দেশবাসীকে আজ আর বাম বা দক্ষিণ টিকিট দেখিলে চলিবে না। ভোট দেওয়ার সময় পার্টি টিকিট অগ্রাহ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থীর যোগ্যতা বাচাই করিয়া বেধিতে হইবে। ইহা না করিলে আপাতী পাঁচ বৎসরের ছুঃখাসনের বিরুদ্ধে কাদিবার অবিকার কাহারও থাকিবে না।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নানা ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাবনার অন্ত নাই। ডাক্তারী করিবার সময় তিনি ব্যক্তিবিশেষের রোগের নিধান করিতেছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। রোগী ও তাহার আত্মীয়বর্গ তারতবর্ষের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে দেখাইতে পারিরাহি, এই আশানে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ঘাইতে পারিত। কিন্তু আজ সর্বাঙ্গবোহের নানা রোগ লইরা তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না,

এবং কাহাকে সন্তুষ্ট করিলে যে চোঁচাবেচি কম হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

গত ২৪শে কার্তিক নিজের বাসগৃহে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যে বিবৃতি দান করেন তাহার মধ্যে আমরা উপরোক্ত বিষার ভাব লক্ষ্য করিতেছি। এই বিবৃতির চূষক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইরাছে এবং আমাদের মতব্য হইবে তাহা অবলম্বন করিরা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সমস্তাসমূহ লম্বা বাহা বলিরাছেন তাহা তর্কের বিষয়। আমরা তাহার বিবৃতির চূষক প্রকাশ করিরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বুদ্ধিগুলি বিচার করিবার অন্ত পার্থক্যবর্গকে সুযোগ দিব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন—দেশের লোক আজ তুলিতে পারেন না যে, মধ্যবিত্ত সমতা এবং পূর্ববদ হইতে আগত বিপুল-সংখ্যক মধ্যবিত্ত উদ্বাস্ত সমতাই ভারতের এই সমতাবহল রাজ্যের প্রধান সমতা। অনেক রাজনৈতিক দল কৃষক-প্রজা-মহত্তর, পুঁজিপতি প্রভৃতির কথা বলিতেছেন। কিন্তু কেহই মধ্যবিত্তের কথা বলিতেছেন না।

ডাঃ রায় বলেন, কিষণ ও মহত্তরের জীবিকার ব্যবস্থা আছে; তাহাদের উপার্জনের পথ আছে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের উপায়হীন মধ্যবিত্তের কথা কেহই চিত্তা করেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহ বুদ্ধিজীবীরা যদি ঋণ ও আশ্রয় না পান, যদি তাহাদের সর্কদাই জীবিকার অন্ত চিন্তিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্রমশঃ অন্তবুদ্ধিতে পরিণত হইবেন এবং তাহার কলে দেশের কতিই হইবে। সুতরাং এখন হইতেই মধ্যবিত্তদের অন্ত পতীরভাবে চিত্তা করা দরকার।

ডাঃ রায় বলেন, তিনি এই মধ্যবিত্ত সমতা সমাধানের অন্ত একট পক্ষবাহিনী পরিকল্পনা প্রস্তত করিরাছেন। এই পক্ষবাহিনী পরিকল্পনার মূলকথা হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অন্ত বনতি স্থাপন করা। তিনি আশা করেন যে, উত্তর কলিকাতা বিদ্যাতীকরণ পরিকল্পনা দ্বারা যে অকলে বিদ্যা সন্নিবাহ হইবে সেই এলাকার মধ্যে তিনি কয়েকটি মধ্যবিত্ত বনতি স্থাপন করিতে পারিবেন।

সুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের প্রকৃত সমতা হইতেছে জীবিকা নির্বাহোপযোগী জমির সমতা। সরকার কর্তৃক সংস্কারিত সংখ্যাতত্ত অসুখ্যমন্ত্রী বেধা দ্বারা, এই রাজ্যের বহু-সংখ্যক চাষীকে বৎসরের প্রায় ভিন্ন-চারি মাসের দ্বাখা বাকার হইতে ক্রিভিতে হয়। কাছের এই সমতা চাষীকে অন্ত কাছের নিমুক্ত করিবার সমতাও আছে। চাষীদের অন্ত বহুসংস্পূর্ণ ব্যবহারকরে পশ্চিমবঙ্গে ছুঁমি উন্নয়নের দ্বারা চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্কর্তনের প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে ছুঁমিবর্তনের প্রায়টি এই রাজ্যে কি পরিমাণ জমি পাওয়া যায় তাহা জানা

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যে অবশিষ্ট জমির পরিমাণ খুবই বহু। জীবিকা-নির্ভরহোপযোগী জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে হিলাব অস্থায়ী অমৃত্যু প্রত্যেক চাষীকে ৫০ বিঘা করিয়া জমি দিতে হয় এবং ঐ ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে বহু চাষীকে জমি হইতে উৎখাত করিতে হয়। কাজেই ইকনমিক হোল্ডিংয়ের ভিত্তিতে জমি পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলে সরকারকে জমি হইতে উৎখাত চাষীদের বিকল্প হস্তিতে নিরোপ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাঃ রায় বলেন যে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্য যে সকল রাজ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে তিনি তাহাদের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং চাষীদের জীবিকার উপযুক্ত পরিমাণ জমি অথবা বিকল্প হস্তির ব্যবস্থা করিবার সম্ভাভা হা হা কিভাবে সমাধান করিতে পারেন তাহা বিজ্ঞালা করিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি সরকার এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আজও পর্যন্ত তাহার সমাধানের পথ বাহির করিতে পারেন নাই।

“পশ্চিমবঙ্গের জমিদারপণ্য তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় করিয়া দিতে বিশেষ উৎসাহী—একথা আজ আমি বলিতে পারি। জমিদারী বিক্রয়ের তাহারা খুব খুশী হইবেন।” তিনি বলেন—কিন্তু জমিদারী ক্ষয় করিয়া তাহা দ্বারা চাষীদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা যাইবে কিনা তাহাও সরকারকে এই প্রশ্নে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী রাষ্ট্রীয়-করণের প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন— সাময়িকভাবে তিনি অমৃত্যু জমির কলম বাড়াইবার একটি উপায় করিয়াছেন। অনেকের কাছে জানে না যে, সরকার গত ৫৬ বৎসরে সেচ ও উন্নত বরপেয় বীজ এবং ভাল সার বিতরণের ক্ষেত্রে লাভ কোটি টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন। জমির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাষীদের আর্থিক দিক দ্বারা বরং সম্পূর্ণ করার পথ খুলিয়া দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য ছিল। তিনি আরও বলেন যে, তাহারা এই নিজস্ব সমাধানের উপায় লইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। খালসহলের জমি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ তিনি দিয়াছেন।

এই বিষয়ের মধ্যে ডাঃ রায় ‘মধ্যবিত্ত’ সমস্যাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। হুই লোক বলিবে যে, আগামী ত্রি-চতুর্দশ শতাব্দীর ভাণ্ডার করিবার জন্য তিনি তাহা করিয়াছেন। আমরা মনে করি, মধ্যবিত্তের সমস্যা বহু-বিভাগ দ্বারা জটিলতর হইয়াছে মাত্র। তাহা গত ১০০১০ বৎসরের দাম কাঁচের কল। তৎসম্বন্ধে বিচার্য্য গবেষণা করিয়াছেন তাহারা জানেন

যে, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অপর প্রদেশবাসীদের মত এম হাতিয়াছিল অভাবের ভাণ্ডার বা বাহ্যের অবস্থানে। এই ব্যাখ্যা সহজে বুঝা যাইবে যদি আমরা মোগল রাজত্বের অবসানের কল পর্যবেক্ষণ করি। আদী-ওমরাহ, সেনানী-সৈন্য বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে বা পশ্চিমে ইংরেজের কল্যাণে বেশব নুতন হস্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জন্য বোয়াই, মাস্ত্রাজ, কলিকাতা মগরীতে ও কাছাকাছটার এবং রেলওয়ের কর্ম্মক্ষেপে তাহারা ভিত্তি করিল। অল্পপ অভাবের ভাণ্ডার শব্দ, রাহাভুক্ত প্রকৃতি সম্প্রদায়ের লোক আজ উত্তর-ভারত হাইয়া কেলিয়াছে। ইহার প্রমাণ সরকারী দপ্তরে, সওদাগরী আপিসে জীবিত হইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অমৃত্যু: গত এক শত বৎসর হইতে এই হই অবস্থার দারে ঠেকিয়া পিঠাছিল। কলিকাতার সওদাগরী আপিস, লালদীঘির উত্তর দিকে সরকারী দপ্তর, মকাতীরে অবস্থিত হাইকোর্টের দৌলতে প্রায় ৫০ বৎসর তাহারা একপ্রকার মুখে ও বসিতে কাটায়াছে। আপন জুটল ম্যালেয়িয়া রূপ বারণ করিয়া; তাহাদের এমহাভা করিল। বাহ্যের অবস্থানে তাহারা বাহির হইয়া পড়িলেন বাংলাদেশের বাহিরে।

একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে, সাওতাল পরগণা হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বাঙালী বাহ্যাবেধীরা যে সব বাতীর করিয়াছিলেন তার মূল্য অমৃত্যু: পক্ষে ৩০।৪০ কোটি টাকা। মনে হয়, বি. এম. রেলওয়ের ষ্টেশন ও উত্তীতর বাঙালী বসতি এই হিসাবের অমৃত্যু:। আজ এ সব বাতীর, সম্পত্তির মূল্য কত তাহা সংখ্যাভববিবেচনা বলিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তকে সমাধবেহের এই ব্যাপক রোপের চিকিৎসা করিতে হইবে। কেবল ‘বসতি’ হাপন করিলে রোপ দূর হইবে না এবং সরকারী ‘বসতি’ হাপন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা পিঠাছে, তাহা খুব আশাশ্রম নয়। ‘মুদাতর’ পরিকার গত ১৩ই কার্তিকে প্রকাশিত এক পক্ষে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে :

“পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্কাসন পরিকল্পনা অস্থায়ী পূর্ববদ হইতে আগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাসদের জন্য ২৪ পরগণা জেলায় হাবভার ‘আর্কান’ কলোনী পড়িয়া উঠিতেছে এবং ইতিমধ্যেই এখানে বহু পরিবার সরকার কর্তৃক নির্মিত হই কামরাভুক্ত বাড়ী পাইয়া ভগার বসবালের চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বাড়ী এখনও খালি পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক বাড়ী পাইবার পর সরকারের দিকট হইতে বাড়ীর অধিকার লইয়া বাস করিবার পরিবর্তে ভাল লাগাইয়া বাড়ী কেলিয়া রাখিয়া-ছেন। অনেক বাড়ী এখনও খালি-বস্তু করা হয় নাই। বাড়ীগুলি খালি পড়িয়া থাকিবার কলে, পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের লোকভাবে বিশেষ অস্থবিতা হইতেছে। এই লোক গৃহের

মালিক যে কর্ণে আসিবেন অথবা একেবারেই আসিবেন কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

বাহারা এখানে বসবাস শুরু করিয়াছে, তাহাদিগকে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। আন্দোলনের বিবর কর্তৃপক্ষ দেখিয়া শুনিয়াও এই সকল অসুবিধা দূর করিবার দিকে মোটেই মন দেন না। অনেক বাড়ীর সম্মুখে পুরাতন রাস্তা ভাঙিয়া কলিকাতার কলে যে গভীর গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আজ পর্যন্ত ভরাট করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অনেক বাড়ী এত নীচ হইয়াছে, সামান্য বৃষ্টি হইলেই জল জমিয়া থাকে।

প্রায় পাঁচ শত পরিবার বসবাস শুরু করিলেও আজ পর্যন্ত এখানে পোষ্ট অফিস, হাটী বাজার, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। শোনা যায়, শীঘ্রই স্কুল, বাজার হইবে, টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু কবে যে ইহা বাস্তবে পরিণত হইবে, তাহা কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। তাহা হাড়া কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগের অভাবই শহর-পরিকল্পনা সাকল্যমণ্ডিত হইবার প্রধান অন্তরায়। এখানে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টা হয় নাই, কাজেই এখানকার অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই কলিকাতা মহানগরীতে চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত ছুটাছুটি করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ষ্টেট-বাস সার্ভিস চালু করিয়া অন্যান্যসেই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। কলিকাতা বাতায়নের সহজ উপায় না থাকাতো বাধ্য হইয়া অনেকের পরিবারবর্গকে এখানে রাখিয়া কলিকাতার থাকিতে হয়। কলে, ছই জায়গার ব্যয় নির্বাহ করা এই বাজারে যে কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমের। কলিকাতার সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হইলে তালা-দেওরা বাড়ীগুলির দরজা খুলিয়া বাইতেও দেরি হইবে না এবং পুনর্কাসন পরি-কল্পনাও তখন সাকল্যমণ্ডিত হইবে। আর একটি অসুবিধা পানীর অভাব। ২০।২৫টি বাড়ীর পর মাত্র একটি করিয়া টিউবওয়েল রাস্তার ধারে বসাইয়া পুনর্কাসন-কর্তৃপক্ষ জলের সমস্যা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে কলোনীবাসী-দের যে কিরূপ কষ্টকর অবস্থা পাইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী হাড়া কেহ বুঝিবেন কিনা সন্দেহ। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য অসুবিধা রহিয়াছে।

এই ‘আর্কান’ কলোনী ছই বঙ্গের অধিককাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—।”

পত্রলেখক নিজের নাম দিলে ভাল করিতেন। তিনি যে সব অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ন্যায্যতা আছে। এই কলোনীবাসী কি প্রত্যাশা করিয়া-ছিলেন জানি না। রাষ্ট্রবিপ্লবের কলে যে পরিবার-পরিজন ইয়ত্তি হইয়া পালক জাল ইজিলাস আচ্ছাদিত হয়। সত্য-

বিবৃদ্ধ না হইলে ‘গভীর গর্ত’ বুঝিয়া বাইত, তাহারা সরকারী কোন বিভাগের দিকে চাহিয়া থাকিতেন না। আমাদের এ সব অক্ষমতা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করি যে, পুনর্কাসন বিভাগ নিজের কর্তব্যপালন করেন নাই। সরকারী জাল কিতার মধ্যে তাহারা বেশন আটকাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের বেশন-কারী সাহায্যকারীকেও সেই ভাবে জড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া হঃঃ হয় এবং বাহারা এই বেতাকাল হিঁড়িয়া বাহির হই-বার স্পর্ধা করেন, ডাঃ রায় ও তাহার সান্নিপাত তাহাদিগকে কৌশলে সরাইয়া দেন। তাহার উদাহরণ—১৯৪১ সালে ইউরোপে বাইবার পূর্বে খুব দটা করিয়া তিনি একটি পুনর্কাসন বিভাগ স্থাপন করেন। তাহার পরিণতি কি রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা তিনি কখনই এত শীঘ্র তুলিয়া বাইতে পারেন নাই। সেইজন্য ডাঃ রায়ের বিয়ত্তির মধ্যে আমরা বিশেষ কোন আশার আলোক দেখি না এবং মনে করি যে, কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর “কলোনী” বসাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান হইবে না।

ডাঃ রায় মিছেই স্বীকার করিয়াছেন ন্যূন বৃত্তির সৃষ্টি করিতে হইবে। কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষক যে তিন-চারি মাস কর্তৃহীন বলিয়া থাকে তাহাদের জন্যও; তবেই বাঙালী সমাজ আনন্দ হইবার সুযোগ পাইবে। নানা পরিকল্পনা আছে জানি। ডাঃ রায়েরও একটা থাকিবে না কেন? কিন্তু সে সব পরি-কল্পনাকে রূপ দিবে কে বা তাহারা? একজন গুলজারীলাল নন্দ বা একজন বিধানচন্দ্র রায় কার্ণবীর্ষ্যাক্ষুনের মত সহস্র-বাহ হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না যদি না “দ্বিসপ্ত কোটি কৃষক” এই মহৎ কার্যে সাহায্য করে। অনেকেই তাহা করিতে উৎসুক। কিন্তু সরকারী দপ্তরখানার উত্তম বাতাসে তাহারা মুগ্ধাইয়া পড়েন। ইহা ত বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বাঙালী কৃষকের সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় তাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটামুটি সত্য। তাহাদের জমি বণ্ণেট নাই; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেককে “৫০ বিঘা করিয়া জমি” দিবার পরিকল্পনা অত্যন্ত অবাস্তব। পাঁচ বিঘা করিয়া দিলে দেশের লোক তাহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিবে এবং সেই পরিমাণ জমিও পশ্চিমবঙ্গে আছে কি না তাহা সন্দেহজনক। আমাদের মনে হয় যে, শ্রেণিবিভাগে বিশ্বাস না করিয়াও ডাঃ রায় শ্রেণিবিভাগ করিয়া কলিয়াছেন। সেইজন্য তাহার অসুখ পরিকল্পনাদির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছি। সমগ্র বাঙালী সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় সমাজ ন্যূন করিয়া গণিত করিতে হইবে। অধিবাসী শিশুবর্গের জন্য গান্ধীজীর সে বগ্ন বর্ষ হইতে চলিয়াছে। সেখান “পতিত” অবাহরলাল মেহর প্রধানতঃ দায়ী। ডাঃ রায় কখনও গান্ধীজীর গৌরব বহনকরা জাতি দাণ্ডা মনোভাৱে গান্ধীজীর স্মৃতি-চিহ্ন

বর্ধমান যুগের “বৃহৎ বর”—কলকারখানার বিধানী। নিজের জীবনে তাহার পরিচয় দিয়াছেন বিভিন্ন বরণের শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং তাহাদের সম্ভারনে সাহায্য করিয়া। সেইজন্য তিনি “বধ্যবিত্ত” শ্রেণীর সম্মান হইলেও পুঁজিপতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহাদেরই বার্ষিক সংরক্ষণ করিতে সক্ষম ব্যক্তি।

কিন্তু দেশের হুঁতুগা যে ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাদের একজন—নিজের কথায় অনুসারে কাজ করিতে পারিতেছেন না এবং রাষ্ট্রনীতি কার্যকরী করিতে উৎসাহ পাইতেছেন না। ইহাই পণ্ডিত মেহতাজ ও ডাঃ রায়ের মত লোকের হুঁতুগা। বর্ধমান ভারতের, বাহীন ভারতের, নানাবিধ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপাল

মহাবিশুদ্ধ রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বলবাল দেবীকে আমরা সাধার অভিনন্দন জানাইতেছি।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবন আরম্ভ হয় বিগত সত্যাব্দীর শেষভাগে। কলিকাতা সিটি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশ। তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক প্রকাশ করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। আমরা মনে করি যে, তাঁহার শিক্ষক-জীবনের গৌরবোজ্বল অধ্যায় তাঁহার বিরাট দায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে রাসবিহারী ঘোষ, ভারতকথা পালিত, বিহারীলাল মিত্র—এই তিন জন বাঙালী দাতার পরেই ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র “ক্যালকাটা রিভিউ” (মাসিক) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বেও মনে হয় সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নাম প্রকাশ পাইত। সেই সময়ে সাংবাদিকগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও সম্বন্ধ আরম্ভ হয়। তাহা মধুর ছিল ও আছে। আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। সাক্ষাৎভাবে তিনি কিছু করিতে না পারিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী ও সরকারী কর্মচারীবর্গ পরিচালিত হইবেন, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

শিক্ষকের কর্তব্য ও শিক্ষকের হুঃখ তিনি বুঝেন। আমরা আশা করি যে, তিনি তাঁহার বৃত্তির সম্মান বর্ধন করিতে সাহায্য করিবেন। শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে যে হতাশতাপের বন্যা বহিরাহে তাহা ঘোষণা করিতে তিনি চেষ্টা করিবেন না এ কথা আমরা জানি।

নেপালের মন্ত্রিসভা

মহারাজা ক্রীমোহন শামশের জন্মের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা

গঠিত হইয়াছিল তাহা পদত্যাগ করিয়াছে। ভূগপরিবর্তে নেপালের অধীশ্বর শ্রীজিৎবন্দেব শাহ নেপাল কংগ্রেসের নেতা শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালাকে নৃতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং চূড়ান্ত মন্ত্রিসভাও গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী মাতৃকাপ্রসাদকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

কি কারণে এক মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন হইল এবং আর এক মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইল তাহা জানি না। মোহন-মন্ত্রিসভার কংগ্রেস পক্ষীয় সচিববৃন্দ প্রথমাবধি—১৯৫০ সালের মার্চ মাস হইতে—প্রকৃষ্ট অভিযোগ করিতেছিলেন যে, রাণাবংশের মন্ত্রিবৃন্দ গণতন্ত্রের বিধানাদি অমান্য করিতেছেন, নানাতাবে প্রাচীন “রাণা-শাসন” ও তাহার কৌশলাদি অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। রাণাপক্ষের বক্তব্য আমরা জানিতে পারি নাই। সেইজন্য ছুই দলের অভিযোগ সম্বন্ধে সমতান্ত্র প্রকাশ করিব না। তবে ইহা জানি যে, নেপালের কংগ্রেস ও রাণাবংশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মন-কষাকষি চলিতেছিল।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সম্পদ লইয়া বিরোধ নেপালে নৃতন নয়। প্রায় ২০০ বৎসর রাণাবংশ কি করিয়া রাজবংশকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা জানি। গণ-জাগরণের কল্যাণে এবং রাণাবংশের বর্ধমান প্রতিনিধিদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে আজ মহারাজা জিৎবন্দেব হত ক্ষমতা করিয়া পাইয়াছেন। তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় কয়েকজন রাণাবংশের মন্ত্রী নাম ধারাতা কংগ্রেসী ভালিকার স্থান পাইয়াছেন। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু হইতে ২৯শে কাঠিক যে বার্তা প্রেরিত হয় তাহার মধ্যে আছে এই কথাটি নাম—সুবর্ণ শামশের জন্ম, জেনারেল ফেশের শামশের জন্ম, যেকের-জেনারেল শর্মা শামশের—রাণা বংশের। একজন যেন রাজপরিবারের প্রতিনিধি—শ্রীমহেন্দ্রবিজয় শাহ। অন্যজনেরা বধ্যবিত্ত সম্রাটের প্রতিনিধি। প্রজাপুত্রের প্রতিনিধি কে বা কাহারো তাহা বুঝিতেছি না।

রাণাবংশের শাসনের অবসান হইল। এই বিরাট বিপ্লবে তাহাদের কল্যাণ হউক; নেপালের গৌরব অক্ষর থাকুক, এই আশা ভারতবর্ষের সকলেই করিবেন। মহারাজা জিৎবন্দেব শাহ নৃতন কর্তব্যের দায়িত্ব নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইলেন। নিরন্তরাত্মিক রাজ্য হইবার শক্তি ও বুদ্ধি তাঁহার কার্যকলাপে ফুটিয়া উঠুক, এই প্রার্থনা করিতেছি। কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইতেছে, বাস্তববুদ্ধির প্রেরণায় তাহা চালিত হউক। তাহা না হইলে ভারতীয় কংগ্রেসের মত তাঁহারো নিদানাত্মক হইবেন।

রামমোহন রায়

“দেশ” পত্রিকার ১৯শে আশ্বিন সংখ্যায় চিত্তাঙ্গীল বাঙালী

লেখক জনাব লৈরদ মুক্তবা আলী রাক্বা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কিয়ৎংশ তুলিয়া লিলাম :

“তার পর ভারতবর্ষের যে অবিখ্যাত অবঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাণ্ডি, মজব-মাজাসার সংকট এবং আরবী-কারসী কোনগতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি কোর করে কিছু বলা যায় না।

তার পর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এবং আমাদের পরম রাজার সম্পদ এই বাংলাদেশেই জমায়েন এক বাবা পণ্ডিত, এক অবয়দন্ত মৌলবী—যিনি কি আল-বীরনী, কি দার-শিকুহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

সুখু তাই নয়, নানা বন্দ, নানা সংবাতের উর্ধ্বে যে সত্যশি-ব-সুন্দর আছেন, যার অভিজ্ঞ বীকার করলে পরম্পরবিরোধী সংবাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যসুন্দরশিবকে তিনি হৃদয়ে অহুত্ব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিত্তর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-কারসী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হিব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিব্রু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্ট—এই চার বর্গজগতে তিনি অনায়াসে অতি বহুশ্রমে খাসপ্রাণ গ্রহণ করে, অন্তরের খাত অন্বেষণ করে, যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, সে শক্তি যে শুধু সে-যুগের সূচনা ক্ষততাকে জয় করতে পেরেছিল তাই নয়, সে শক্তির প্রসাধাৎ পরবর্তী বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষে যে সব নব অভিযানের পথ বেরিয়েছিল, তার কিকিং করুনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অতীতকার জীবন্ত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোকার, তার সর্বাসুন্দর ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ত্রুভেদ্রনাথ শিলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুবুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয় নি।

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে সে নিপীড়ন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝতে অনুবিধা হয় না—তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সর্ববর্ষের পণ্ডিতগণ।”

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধ

এই দুই দেশের মধ্যে সম্বন্ধ জন্মশঃই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে কেন ভৎসন্যে আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রাদিতে হইতেছে। আমাদের দেশের মনোভাব অনেকটা “পণ্ডিত” জবাহরলাল নেহরুর সমর্থক। পান্ডিত্য ঐশ্বর্য-শাসিত রাষ্ট্রগুলি চার বে, আমরা তাহাদের কয়ুসিষ্ট-গীতি দ্বারা পরিচালিত হই এবং শোভিবেট রাষ্ট্রের বিরোধী হইয়া উঠি। মতবাদ সম্বন্ধে কখনও ভারতবাসীর কোন

মৌক্তামি ছিল না, এখনও নাই। সেইজন্যই প্রধানমন্ত্রীর নিক্সিরোবী নীতি আমরা লম্বন করি।

যুক্তরাষ্ট্র এই মনোভাব বুঝিতে পারে না। সেইজন্যই মনে করে যে, টাফা-পরমা বার দিরা বর্ধমান বিজ্ঞানের নানা কৌশলাদি শিক্ষা দিরা আমাদিগকে দলভুক্ত করা অবিকতর সহজ হইবে। এই ভ্রম ভাঙিবে কিনা বুঝিতেছি না। আর্থিক সাহায্য দিরা কোন জাতির মন যে বেশী দিন বাঁধিয়া রাখা যায় না, তাহার প্রমাণ চীন দেশ। ১৯৪১ সাল হইতে মার্কিন রাষ্ট্র প্রায় দশ-বারো শ’ কোটি টাকার দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র বিরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। তাহার ফলে কি পাইয়াছে আজ তাহা অজানা নয়। মার্কিনী অর্থ ও বিজ্ঞা-বুদ্ধি চীনদেশে বিখ-বিভালর স্থাপন করিয়াছিল; চীনা যুবক-যুবতীকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিল; হাভার্ড, ইয়েল, প্রিন্সটন, কর্নেল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বৃত্তি দিরা তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। বর্ধমান চীনের শাসকবর্গের মধ্যে এক চিন্তাক্রাই-শেক ও হাও-সে-তুও হাভা প্রায় সকলেই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

এত বড় বিরাট সাহায্যের কথা আজ চীনদেশ তুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সংবাদপত্রে যেসব মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয় তাহার ভঙ্গী শোভিবেট রাষ্ট্রের সংবাদপত্রের বরণ-ব্যরণ হইতে কম অসংযত নয়।

এই পরিণতির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মার্কিন চিন্তামার্কসগণ ও শাসক-শ্রেণী বুঝিতেন কেন চীনদেশবাসীরা চটরাছেন। মার্কিন জাতি তাহাদের বার্ষ-বুদ্ধিকে নিরস্ত্রিত হইতে দিতেছে না। বর্ধমান যুগের পান্ডিত্য রাক্ষসীতির ভিত্ত অতিজ্ঞতা আমাদের আছে। ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে কিছুই করে নাই, এই কথা আমরা মনে করি না। তাহাদের জাতি-বুদ্ধি, সত্যতার অভিমান—এই মনোভাবের প্রেরণার তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে বর্ধমান যুগোপযোগী অনেককিছু দিয়াছিল প্রামাণ্য: নিজেদের বার্ষের বাতিরে। সেইরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পৃথিবীর সকল “অনগ্রসর” দেশে অহরূপ চেষ্টা করিতেছে এবং মার্কিনী সাংবাদিকেরা নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, এরূপ দানে সকলকে তাহাদের অঙ্গপামী করা উচিত। তাহা যে হয় না, এরূপ আশা যে হয়না তাহা যদি চীনের অতিজ্ঞতা হইতে তাহারা বুঝিতে না পারেন, তবে আর কিরূপে বুঝিতে পারিবেন?

সেইজন্য মতল মার্কিন রাষ্ট্রত্ব মি: চেষ্টার বোলস্ গত ১৯শে কার্তিকের একটি বিবৃতিতে যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত মতল পহার নির্দেশ করিলে আমরা সুখী হইব। বাহাতে আমাদের “স্বপ্রাচীন সংকতি” নিব্ব্বাটে থাকিতে পারে তার ক্ষতি ভারতবাসীর সংবাদপত্রের জ্ঞানবিস্তার

হুঁসান বা হুঁসান আছে—“মাল্ড হিন্দুজাতি” (mild Hindu)—এটম বোমার রূপে এই বিশেষণ সন্মানের মর। এটম বোমার ভর হইতে মুক্ত হইবার কৌশল ভারতীয় সংস্কৃতি দিখাইতে পারে—অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাশীল লোক কিন্তু এই বিষয় মনে মনে পোষণ করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন স্বয়ং-ভবন। চেষ্টার বোলনের এরূপ কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা জানি না। তিনি অত্যন্ত কাঁকা কাঁকা ভাবে আমাদের “সুপ্রাচীন সংস্কৃতির” প্রশংসা করিয়াছেন যেমন করিয়াছেন নিকোলের সমাজ ও সমাজত্ব।

আমরা এই দুই সংস্কৃতির তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় দিবার চেষ্টা কদাচ আমেরিকার হইয়া থাকে। আমরা অনেক প্রচারপত্রিকা পাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের আয়তুল্যে। হুইথামি বৈমিক ইংরেজী ও বাংলা পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার মধ্যে পাই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্য-কলাপের নানা কারণের ব্যাখ্যা এবং হুইথামি পত্রিকারই ভারতীয় লেখক তাহার প্রশংসা করিয়া যে-সব পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিতে হয়। মার্কিন সংস্কৃতির ব্যাখ্যা প্রায়ই দেখি না। এমারসন (Emerson) প্রভৃতি “বোস্টন ব্রাহ্মণগণ” (Boston Brahmins) হইতে আরম্ভ করিয়া যে আদান-প্রদান চলিয়াছিল রামমোহন রায়ের সময় হইতে, তাহার কোন উল্লেখ দেখি না। অহুরোণ করিয়া ও—দিল্লী নগরীর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়াও, কল হর নাই, হুই-এক জন বাঙালী সাংবাদিক এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা রাজনৈতিক আলোচনা করিতে চান নাই। কিন্তু দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের কথা বলিবার ক্ষমতা অহুরোণ করিয়াছিলেন এবং প্রথমে মার্কিন সংস্কৃতির পরিচয় দিবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহার কলে হরত ভারতীয় সংস্কৃতির তত্ত্বও নিকের কথা বলিতেন।

পরস্পর ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রশংসা করিলে কোন কল হর না। এই অবস্থার পরিবর্তন বাহ্যবীর। চেষ্টার বোলসু তাহা করিতে পারিবেন কি ?

চীন ও ভারতের সম্বন্ধ

সম্রাট চীনদেশের পক্ষ হইতে একটি সংস্কৃতি শিশন ভারত-রাষ্ট্রের নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী নগরীতে এক সভার (পত ১৩ই ফার্ভি) ভারতের পক্ষ হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতি ছিলেন আলীশঙ্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধ্যক ভট্টর জাকির হুসেন। বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি বলেন : “আমাদের ভারতীয়গণ অপেক্ষাও প্রাচীনতর একটি জাতির, অথচ আমাদের সাধারণতরী রাষ্ট্র অপেক্ষাও নবীনতর একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বপে আপনারা এখানে

অভিনয়িত হইতেছেন। তাহা হাতা আপনাদের এই ভারত পরিদর্শন উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার মূল্য রূপের বচনাবলম্বন ; একত আপনাদিগকে যিগুন অভিনয়ন জাপন করা হইতেছে।”

এই অভিনয়নের উত্তরে শিশনের দেতা জিং সি লিন বলেন, “ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দীর্ঘকালী হউক। আমরা এতদ্যেকই আমাদের দেশগুলির প্রতিটি লোকের সহৃদয় এবং দেশের দিরাপত্তা কামনা করি। ইহার ক্ষত চাই উত্তর দেশের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর করা। ইতিহাস ইহার ভিত্তি প্রদত্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিগত দুই বৎসরে আমাদের উত্তর দেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাই এই দুই দেশের পূর্কোরিষিত মৈত্রীর কাঙ্ক্ষ্যমান প্রমাণ।”

এরূপ শুভ ইচ্ছার মূল্য আছে। কিন্তু তাহা রাজনৈতিক নয়। আমরা বড়াই করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ-ধর্মের জন, বুদ্ধদেবের ধর্ম আমরা চীনকে দিরাছি। চীন-দেশের পক্ষ হইতে এই ধর্ম অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু চীনদেশীর মর-মরীর মনে একটা অভিমান আছে যে, তাহারা কেবলমাত্র পৃথিবীর সর্ক্যাপেক্ষা অধিক লোক-সমষ্টির অধিকারী নহ, তাহাদের দেশ শিল্প-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির অত্যন্ত প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যতসাধারণ অনেককিছু হান করিতে পারে। এক জন জাশ্বান বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, যে জাতির মরনারী যে-কোন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে পারে, বাহারা বা-তা বাইরা জীবনধারণ করিতে পারে, তাহারা অজের।—সেই কথাই এখন প্রমাণিত হইতেছে। ভারতরাষ্ট্র হইতে সংস্কৃতি শিশন চীনদেশে দিরাছিল। তাহার এক জন মন্ত—ঐহাতী সিং বাহা বলিয়াছেন তাহা এই মন্তের সমর্থক :

“...উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী বিদ্যা জানা না থাকা সত্ত্বেও চীনরা কাক করিয়া বাইতেছে। চীনের বিরাট জনসম্পদকে পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় জব্যাদি উৎপাদনের কাছে দিরাপ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তবরূপ বলা বাইতে পারে যে, ২০ লক লোক কোয়ালি হাতে লইয়া হুয়াই নদীর বতামিরোণ পত্রিকরনা কার্যকরী করিতেছে। মাফুরিয়ার বেকার নাই। মূল কলেকের হাজেরা কৃষিজব্য উৎপাদনের সহিত অত্যন্ত জব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বজার রাখার চেষ্টা করিতেছে। সুমি-সংকারের পর চীন খাচো ব্যবলবী হইয়াছে। এখানে দিরাপ একতরকা মন্তবাদের হান নাই। কমপক্ষে আরও ২০ বৎসর ব্যক্তিগত পুঁজির প্রয়োজনীয়তা বীক্ষিত হইয়াছে।

চীনা জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে, সমুদ্রে হর্বৎসর। তবে তাঁহারা ইহাও বীকার করে যে, অতীতের তুলনায় বর্তমান উন্নত। সরকারী অকিলাররা অত্যন্ত লাফালাফা জীবনধারণ করেন। তাঁহারা বেতন পান না, খাচ ও লাফাত কাতা

পান। চেয়ারম্যান হাও-সে-ভুং রাজ ৮ শত টাকা ভাতা লইয়া থাকেন।”

এই উক্তির উপর যতব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

চীন ও ভারতবর্ষের পার্থক্য

নব-প্রকাশিত “নিশান” পত্রিকা এই দুই দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেখা দিয়াছে তার নিদান অঙ্গুসন্ধান করিতে গিয়া বলিতেছেন :

“আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই, চীনের বেলায় অস্বাভাবিক কোন কিছুই হয় নাই। চীন লক্ষ লক্ষ জাতি-জোহীকে বলি দিয়াই আভিকার কম্যুনিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; বুলডজার ও ষ্টীম রোলারের সাহায্যে দেশ পালিশ করিয়া নুতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এখানে তাহা হয় নাই। গান্ধীনীতি অঙ্গুসন্ধান করিয়া বলা হইতে পারে আপোষে স্বরাজ আসিয়াছে। তাই যুগে বলিলেও কার্যাত: একজনও কালো-বাকারী বা কমিটারকে ল্যাম্প-পোষ্টে কান্দা দিতে পারে নাই। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করিয়া প্রত্যেকের জীবন বন-সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য-মান দিয়া তবে ধীরে ধীরে অঙ্গুসন্ধান হইতে বাধ্য হইতেছে, ইনকামট্যাক্স কাকিদাতাকে তাহারা সময় দিয়া দিয়া আপোষে একচল্লিশ কোটি আঠার লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছে। সুতরাং বিপ্লবের পথে চলিয়া দুই বৎসরে চীন বাহা করিয়াছে, গতানুগতিক নিয়মনিষ্ঠার পথে ভত্তবানি অঙ্গুসন্ধান হইতে ভারতের লাগিবে অন্তত: ২০ বৎসর। সুতরাং লক্ষ্যে শুধুই অন্ধকার।”

এই “আত্মলাধবকারী পরমোৎসাহ” (রবীন্দ্রনাথ) সন্দেহে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। চীন যে মূল্য দিয়াছে “স্বরাজ” পাইবার জন্য, আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত হিলাম কি? এখনও আছি কি? গান্ধীজী আমাদের প্রকৃত বুৎভেন বলিয়াই অহিংসার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজনীতি সন্দেহে উৎসাহী বাহারা তাহারা ত নেতাজীকে সাহায্য করেন নাই। করিলে হয়ত তিনি দেশভ্যাগ করিতেন না।

ভারতের এই চারি বৎসর আমরা কি করিতেছি? সকলেই যে আমরা অহিংসাবাদী, বাক্যে, মনে ও কর্ণে অহিংস এমন কথা বলিতে পারি না। তাহাদের মধ্যে কেহ কি কোন কালোবাকারীকে নিজ হস্তে শাস্তি দিয়াছেন? একটা কথা ফুলিলে চলিবে না। যেমন প্রজা তেমন রাজা হয়। কোর করিয়া মানুষকে সং করিলে হিটলারের দশা ঘটে। সেইখানেই গান্ধীনীতির শ্রেষ্ঠত্ব।

বঙ্গশিল্পে ভারত ও জাপান

করেক দ্বাং পূর্বে জাপানী বঙ্গশিল্প পরিচালক সমিতির কোন পত্রিকার একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—বঙ্গ লক্ষ্যে জাপান এই দাবি করিতে পারে যে, সে বঙ্গ-রপ্তানী

করিতে ‘এক বছর’ স্থান অধিকার করে। ইহার প্রত্যুত্তরে সরকারী বঙ্গ নিরক্ষরকারী বিভাগের কোন দারিদ্র্যলব্ধ কর্তারী বলেন যে, এই কথা সত্য নয়; ভারতরাষ্ট্রই এই দাবি করিতে পারে। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি এই তথ্য উপস্থিত করেন, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত হইতে হুল ও জলপথে প্রায় ১২০০ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল; সেই বৎসরে জাপানী হিসাবমতে ঐ দেশ ১০৬৪ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানী করে।

সংখ্যাভেদের এই যুক্ত আমাদের কোন উপকারে আসে না, ভারতের সাধারণ নাগরিক তাহাতে কোন আশঙ্কা পায় না। সরকারী বস্ত্র নিরক্ষর বিভাগ যতই বড়াই করুন, দেশের লোক যখন দেখে যে একজন বৃত্তী বা শাক্তী অথবা এক গজ ‘মার্কিন’ কিনিতে তাহাদের লাইম বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং ২৩ বর্গ অপেক্ষার পর খালি হাতে ফিরিতে হয় তখন জাপান ও ভারতের এই প্রতিযোগিতার সংবাদে তাহারা কেবল গালি দিতে পারে অদৃষ্টকে এবং তাহাদের অর্থে পুট সরকারী নিরক্ষর-বিভাগকে।

ইহার মধ্যে আবার সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃষ্টি কম হওয়ার কারণে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে বিজলী-শক্তি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলে বজ্রাত্যব, কালোবাকারীর লাভ ও সরকারী নিরক্ষরকারীর উপরিপ্রাপ্তি কিছু হইবে। এই একটি রাজ্য কারণে মেহরু সরকার তথা কংগ্রেসী সরকার তৌটুয়ে হারিয়া যাইতে পারিতেন যদি দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর না হইত।

ভারতীয় ভাষা-নীতি

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ নামা স্থানে ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেছেন। ইহা তাঁহার কর্তব্য। এই সমস্ত ক্রমশ:ই যেন জটিল হইয়া উঠিতেছে। আদিতে দেবনাগরী ও উর্দু, লিপি সম্বন্ধে যে তর্ক ছিল তাহা রহিয়া গিয়াছে। এখন প্রতি রাজ্যের স্থানীয় ভাষা ও লিপি নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গপত্রিকর। যতই শিক্ষাক্ষেত্রে অবতরণিকরী বিষয় বলিয়া ত্রিন্দী স্বীকৃত হইতেছে, ততই বিকোভ বাড়িতেছে এবং নামাভাবে তাহা রাজনীতির সঙ্গে জড়াইয়া যাইতেছে। “বিন্দী সাত্রাধ্যবান” ইহার কারণ। আমাদের মনে হয় যে, প্রতি রাজ্যে আগামী তৌট-মুদ্রে এই বিবরট কংগ্রেস শাসনের কলঙ্ক বলিয়া প্রচারিত হইবে।

সেইকম বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি হইতে সমস্ত সমাধানের একটি উপায়ের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। বাংলা “হরিকম” পত্রিকার তার অঙ্গুসন্ধান প্রকাশিত হইয়াছে:

“প্রত্যেক অঞ্চলের তারার বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে প্রাচীন ও অর্ধাচীন সকল প্রকার জাতির ভাষার করিয়া ফুলিতে হইবে, সকল প্রকার শিকার বাহন করিতে হইবে।

স্বাধীন পৰ্বর্ণমেষ্ঠের বত্বের সাধ্য এই কার্বে সাহায্য করিতে হইবে। বর্তমানে ভাবার বেরুপ ও শব্দসম্পদ আছে তাহারই উপর গঠন করিতে হইবে এবং অল্প সময়কালের ভাষা হইতে সহজ ও বাস্তবিকভাবে সম্পদ গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। ভাবার আদি উৎস পাওয়া যায় না—অতএব মূলত কথাতন্ত্রী বা ব্যাকরণের মূলত কোন কিছু গ্রহণ করিব না, এরূপ উচিত-বিলাস ব্যর্থ হইবে। তাহাতে ভাষা সহজ না হইয়া তাহার বৈভবই বৃদ্ধি পাইবে।

তাহা হাতা, হুঠ নাও যদি হয় তথাপি এই সকল অব্যবহৃত ব্যাপারে কয় করিবার মত শক্তি আমাদের নাই। যেশের হারিদ্ধ্য ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য আমাদের সর্ব-প্রকারে নিজ শক্তি রক্ষা করিয়া তাহার সূঁই প্রয়োগ করিতে হইবে। ভাবার ব্যাপারে উচিত রক্ষার চেষ্টার কোন অর্থ নাই, কারণ ভাষা ও ভাবের বাহন, আর কোন শব্দ-প্রতীক যদি কোন ভাবকে সূঁঠুভাবে প্রকাশ করে, তবে সেই শব্দ বৈদেশিক কোন ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে ভ্যাগ করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। তা হাতা কোন অকলের ভাবার বিকাশ সেই দিকেই হওয়া চাই যে-দিকে সেই ভাষা ক্রমসাময়িকের নিকট অবিকল্পিত গ্রাহ ও বোধগম্য হইবে। ভাবার বিষয়বস্তু, লেখনতন্ত্রী ও শব্দসম্পদ সাধারণ লোকের জীবন ও কথনের বস্তু সন্নিকট হয় ততই ভাল। আমি মনে করি, অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠানের মত ভাষাও যদি মাহুকের যুক্তির কাছে পৌঁছে তবেই সত্যক উপকার হয়।

আমাদের দেশ বহু ভাষাতাত্ত্বী। যেশের বিভিন্ন অঞ্চল বাহাতে পরস্পরের সহিত এবং সমগ্র জাতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য আমাদের একটি সাধারণ ভাষা চাই-ই। সত্যক বিবেচনার পর বিবাদ-পরিষদ তারতীয় সংবিধানে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকে তারতের এই সাধারণ ভাষা বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন। তারত ইউনিয়নের সরকারী ব্যাপারে সংখ্যার অধিকতর হইবে বর্তমানে সর্বভারতে চলিত অর্থ।

এই সিদ্ধান্তের কলে কোন অঞ্চল বা সম্রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রত্যেক ভাষাগত অকলের শিকাব্যবহার রাষ্ট্রভাষা শিকার বন্দোবস্ত থাকা উচিত—ইহার চেয়ে বেশি কিছু বলা প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। রাষ্ট্রভাষা শিকার উপর কোর বেত্তরা প্রয়োজন, কারণ তাহা হইলে বাহাদের ভাষা হিন্দী নহে তাহাদের কোথাও কোনও কারণে অসুবিধার পড়িতে হইবে না।”

ভারতরাষ্ট্রে “জাহাজী” কন্ময়ী

ভারতরাষ্ট্রের জাহাজী ব্যবসার লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট চিন্তাশীল হইয়াছেন। এতদিন যে-সব পুষ্টিপত্র,

শেঠ ওয়ালটান হীরাচাঁদ প্রভৃতি ব্যবসায়ী এই ব্যবসার করিভেন তাহার হঠাৎ “সাত হয় না” বলিয়া হাত ওঠাইতেছেন। সিঙ্গিরা ট্রান্স-মেন্টিপেশন কোম্পানী বঠা করিয়া জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন বিশাখাপত্তম পোতাশ্রয়ের নিকটে (Vizagapattam Port & Naval Base)। এখন তাহা সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং সংবাদাদি পাঠে মনে হয় যে, গতাত্তর নাই বলিয়া সরকার তাহা করিতে বাধ্য হইবেন।

কিন্তু এই কার্ণের লোভ হাতা আরও লক্ষ লক্ষ লোক এই জাহাজী ব্যবসার উপর জীবিকা উপার্জনের জন্য নির্ভর করে। তাহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৯০,০০০ হাজার এবং শতকরা ৮০ জন পাকিস্থানী—পূর্ববঙ্গ, সিদ্ধেশ্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের মুসলমান। একটা পররাষ্ট্রের নাগরিকের হাতে জাহাজী ব্যবসারের জীবনমরণের কাণ্ডি রাখিয়া দিবার বিপদ জাহাজীকে বুঝাইতে হইবে না। শুধুও বাধ্য হইয়া এই অব্যবস্থা আমাদিগকে সহ করিতে হইতেছে। কারণ পাকিস্থানীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে তাহা করিতে সময় লাগিবে, এই অভিজ্ঞতা ও কৌশল শিখাইতে সারেনপণ বিলম্ব করিবে।

আমরা জানি যে, বহু হিন্দু স্বক চেষ্টা করিয়া নিজের নামা সংকার অগ্রাহ করিয়া জাহাজী (বালাসী) হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু “সারেনদের সুধানির” অপকৌশলে বার্ষমনোরণ হইয়া তাহাদের কিরিতে হয়। সে আজ বহু বৎসর পূর্বের কথা—বিদ্রবী হুগের কথা। আজ ভারতরাষ্ট্রের অনেক নাগরিক এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু ইহারা মধ্যবিত্ত ভ্রম সমাজের সন্তান। জাহাজী শ্রম ও কষ্ট করিবার শক্তি ইহাদের নাই। “সারেন সুধানির” অত্যাচার সহ করিবার বৈধা ও প্রবৃত্তি নাই। সেইজন্য স্বক শ্রেণীভুক্ত পাকিস্থানী বালাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক—পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক স্বক-জেনী এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের খাওয়া-পরাহ সংকার আর একটা বাধ্য। অথচ এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। কেবল রাষ্ট্রের রক্ষাকল্পে নয়, বিদ্রাট উপার্জনের উপার এই বৃত্তির মধ্যে আছে। তাহার একটা ব্যয়ণ পাওয়া যায় গত ২৩শে কার্তিকের এক সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণে। ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে :

“বর্তমানে এক জন নাগরিকের মূল বেতন মাত্র ৩৬ টাকা। এই আকার বাকারে এই টাকার পরিবার-পরিজনদের ভরণপোষণ করা অসম্ভব। কাজেই বেতন বৃদ্ধি করিয়া অজ্ঞাত ভাতালহ সর্বনিম্ন ১২৫ টাকা বার্ষিক করা উচিত।

কর্তৃত্বাধী নিয়োগের পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষার কোন বাধ্যবাধী, দুই নীতি এই ব্যাপারে অনুসরণ করা হয় না। প্রত্যেক নাবিককে দুই বার করিয়া বোর্ডের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ড, অপরটি জাহাজের কর্তৃপক্ষের তৈরি বোর্ড। আসলে দেখা গিয়াছে, সরকারী বোর্ডের মতামত নাবিকের বোর্ড আমল দেয় না। প্রথমেই বোর্ড জাহাজেও কাজের উপযুক্ত ঘোষণা করিলে পোষাক বোর্ড তাহা মানিয়া লয় না।

ষোড়শ ১০ হাজার নাবিকের নাম এই পর্যন্ত রেকর্ড করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জন পাকিস্তানী এবং বাকী ভারতীয়। ইহাদের মধ্যে আবার এক-তৃতীয়াংশ জাহাজের কাজে নিযুক্ত এবং আরও এক-তৃতীয়াংশ কাজের জন্য বসিয়া থাকে। এই সময়ে জাহাজের কোন ভাড়া দেওয়া হয় না। বাকী ৩০ হাজার হুটতে থাকে। বর্তমানে নাবিকদের দৈনিক প্রায় ১২ বক্টি কাজ করিতে হয়।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, প্রতি মাসে ১০১২ হাজার পাকিস্তানী নাগরিক কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। সেই অর্থ ভারতরাত্রেই কোন প্রয়োজনে লাগে না।

ভারতরাত্রে পাটের চাষ বৃদ্ধি

ইংরেজী সাংবাদিক বাংলাদেশে উপস্থিত এই দ্রব্যের নাম দিয়াছেন “সোনার তন্তু”। সুতরাং ভারত-বিভাগের পর ইহার উপাধান বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। কারণ পূর্ববঙ্গের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা উচিত নয়। স্বতন্ত্রের সকল কাজের মত এই প্রচেষ্টার ভাল-মন্দ দুই দিক আছে। তাহাই “আমদান্যকার পত্রিকা”র বাণিজ্য-সম্পাদক গত ১৩ই ফাল্গুনের সংখ্যায় বলিয়াছেন। শেষ মন্তব্যটির প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আজ পাটচাষের ও বাতশত উপাধানের মধ্যে সম্বন্ধ বাহা ঠিকাইয়াছে তাহা দুই সতীনের মান।—

“প্রথম পূর্বাভাস

জমির পরিমাণ

১৯৫০-৫১ ... ১২,২৭,৪৩৫ একর

১৯৫১-৫২ ... ১৮,২০,১৮১ "

বৃদ্ধির হার—৪৮.৩%।

“শতকরা ৫০ ভাগ পাটচাষের জমি বৃদ্ধি চায়ী, পাটকল-মালিক ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ আশঙ্কের কথা। পাটের দাম এখন খুবই চড়া এবং ধানচাষে যেমন সরকারী বাধ্যতামূলক কলমের পরিমাণের সংবাদ দেওয়া বা সরকারী দাবি মিটাইবার হাঙ্গামা আছে, পাটচাষে সে সম্ভাবনা নাই, বরং সরকারী উৎসাহ আছে, সুতরাং চাষীর পক্ষে পাট চাষ বৃদ্ধিতে আশঙ্কা আছে।

পাটকল-মালিকদের আশঙ্কা—আর পাটের অভাবে কল বন্ধ রাখিতে হইবে না; বরং ভাল উৎপন্ন হউক এবং বে দরই নির্ধারিত করা হউক, ক্ষেতার অভাব নাই, সুতরাং লাভের আর কীভ হইবার সুযোগ উপস্থিত।

পর্বশেষেও লাভবান হইবে। পাটজাত রপ্তানীর উপর যে হারে তফাৎ বসিয়াছে, তাহাতে এই বাত পর্বশেষের প্রচুর আর হইতেছে, সুতরাং পাটচাষ বৃদ্ধিতে পর্বশেষের পক্ষে আশঙ্কিত হইবার কথা।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবসায়ী প্রকান্ত ও তাহা অপেক্ষা অধিক অপ্রকান্ত লাভের আশার উৎকর্ষ হইয়া উঠিবেন, কারণ বর্তমান অবস্থায় পাট সংজ্ঞাত ব্যবসা একেবারে তাঁহাদের নিকট লাক্ষ্য কলমের সমতুল।

ভাবিতেছে তাহারা বাহারা পেট পুরিয়া বাইতে পারা না, পরসার অভাবে সামনে বিক্ষোভ চাউলের তপ বেধিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস কেলিয়া অনাহারী জী-পুষ্ক-কতা প্রতীতি লইয়া কুপীরে দিম বাপন করে। ধান কলিলে হয়ত এক সময় বাক্যের চাউলের দর কম হইত, এখন ধানের অধিক পাট কলিলে বাহারাই লাভবান হউক, তাহার অর্থ-সামর্থ্যের মধ্যে চাউল ক্রয় করিবার সম্ভাবনা কমেই হুইয়ে সরিয়া বাইতেছে।”

বাতশত এবং অর্থকরী শক্তির মধ্যে কি অসুপাত রাখিলে একটা সামঞ্জস্য থাকে সেটা নির্ধারণ করার কষতা বা চেষ্টা তো বাংলা-সরকারের নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবেদারী করিয়া আর কতদিন চলিবে ?

পশ্চিমবঙ্গ কি ঘাট্টি অঞ্চল ?

এই বিতর্ক বহুদিনের; অন্তত ১৯৪২-৪৩ সালের হুঁজুরের সময় হইতে তাহা নামাভাবে আলোচিত হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান বাতশতী ত্রিপ্রকৃষ্ট সেম এই বাট্টি-তন্তু প্রচারে বিশেষ উৎসাহী। তাঁর দেবাদেশি তাঁর বিভাগ ভণ্ড্য-শাস্ত্রে পাতিভ্য দেবাদেশে চেষ্টা করেন। অনেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্তৃত্বাধীও ঐ পণের পথিক হইয়া পড়িয়াছেন দেবিত্তেহি। তাঁহাদের মধ্যে একজন ত্রিইন্দুদ্র চট্টোপাধ্যায়। ধান্যের ভণ্ড্যণ্ডণ বিচারে তিনি কেন্দ্রীয় পর্বশেষের মাসায়নিক ছিলেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গ করিয়া সম্ভ্রতি তিনি একধাণি পুতিকা লিখিয়াছেন।

এই বিতর্ক ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠার অনেক হইয়াছে। আমরা এই বাট্টি-তন্তু সম্বন্ধে সম্বিহান। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও বর্তমানে মন্ত্রী ত্রি আত. কে. সিং মহাশয়ের মতেও ভারত-রাষ্ট্র বাতবিষয়ে বাট্টি নয়। তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা করি-রাছি। ‘আমদান্যকার পত্রিকা’র বাণিজ্য-সম্পাদক লিখিত বিশেষ প্রবন্ধ সিং মহাশয়ের মতের সমর্থক। ইন্দুবানুর পুতিকা সম্বন্ধে এক সংখ্যাতত্ত্ববিদের মন্তব্য আমরা নিম্নে প্রকাশ

করিতেছি। ইন্দুবাধুর সংখ্যার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন :

“১-২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কোন মন্তব্য নাই, কারণ এই করেকটি পৃষ্ঠাতে লেখক পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যবস্থা বুঝাইবার কত কৃমিকার অবতারণা করিয়াছেন রাজ। ২৫ পৃষ্ঠার ১৩৫৭ তালিকাতে লেখক পশ্চিমবঙ্গের ১৫ আউল হিসাবে তত্তুল বাদ্যের পরিমিত দেখাইয়াছেন। বাধ্যপরিমিত আলোচনা করিতে হইলে মোটামুটি তিনটি ক্রিমির সঠিক হিসাব প্রয়োজন—(১) মোট কসলের পরিমাণ, (২) লোকসংখ্যা, (৩) বাদ্যের হার। এই তিনটিতে উপরোক্ত তালিকা আলোচনা করা প্রয়োজন। লেখক প্রথমেই ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫০ সালের গড়পড়তা উৎপাদন বরিবাহা, ইহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উক্ত পুস্তিকার ৯৫ তালিকাতে পশ্চিমবঙ্গের চাউল উৎপাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় :

পশ্চিম বাংলার চাউল উৎপাদন
(হাজার টন)

১৯৪৬	২৮৯৫
১৯৪৭	৩৬৫৮
১৯৪৮	৩৪৫২
১৯৪৯	৩০৪০
১৯৫০	৩৫৩৮

যদি কোন বৎসরে অস্বাভাবিক ভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কম থাকে তাহা হইলে গড় কবিবার সমগ্র তাহা বরাবর হইতেই বৃদ্ধিযুক্ত নয়, কারণ এক বৎসরের সংখ্যা সমস্ত হিসাব সম্বন্ধে ভুল কারণ। বর্তমান তালিকাতে ১৯৪৬ সালে দেখা যায় যে, উৎপাদন অত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা অনেক কম, ইহার জন্যই ১৩ নং তালিকাতে মোট চাউলের উৎপাদন পরিমাণ এক কম আসিয়াছে। চাউলের বাটতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রতি বৎসরের আবাদানী-রপ্তানীর হিসাব লইয়াই করা উচিত, গড় লইয়া হিসাব করিলে তাহার সম্বন্ধে বারগা পরিষ্কার হয় না। তাহার উপর দেখা যায়, ১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ১৬৮৮০ হাজার টন, অতএব তাহার গড় ৩০৭৬.৬ হাজার টন, কিন্তু ৯৫ তালিকাতে তাহা ৩০০০ হাজার টন দেখান হইয়াছে। ১৯৫১ সালের হিসাব অনুযায়ী লোকসংখ্যা বরাবর হইয়াছে ২,৪৮,১৪,০০০। লোকসংখ্যার মধ্যে শিশু, বালক, বুঝা, বৃদ্ধ প্রভৃতি মাঝা মাঝি আছে, বাহাদের প্রত্যেকের বাদ্যের হার বিভিন্ন। লেখক যে এখানে ১৫ আউল গড় হিসাবে বরিবাহা-ছেন, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। লোকসংখ্যা “population studies” হইতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীর কত কত বাদ্য প্রয়োজন তাহা হিসাব করিতে হইবে, নচেৎ প্রদেশে বাদ্যের বাটতির পরিমাণ নির্ণয় করা মোটেই সম্ভব নয়।”

সংখ্যা বিশ্লেষণের ভুল দেখাইয়াও সংখ্যাভিত্তিক মহাশয় মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বাধ্যবস্থা সম্বন্ধে বাটতি অকল। বর্তমানে এই ভুলভুলে লিখ হইতে চাই না। “মুখিদাবাদ সমাচার” নামক “অ-দলীয়” পত্রিকার গত ১লা আবিষের সম্পাদকীয় মন্তব্য আমাদের সুক্তি মোটামুটি সর্বধন করে :

“পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যায় বিভাগের পক্ষে প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবাসিক পত্রিকা ‘বহুধরা’। ইহার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এক খণ্ড হাতে আসিয়া পড়ে। পাতা দুটিতেই ৫৫ পৃষ্ঠার দেখি বক্ত অক্ষরে লেখা—পশ্চিম বাংলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে না ও তাহার নীচে বিভিন্ন কসলের আবাদের পরিমাণ একর হিসাবে দেওয়া আছে। আমন বামের আবাদের পরিমাণ ৭৭,২৫,১১০ একর; আউশ বাম ১৪,৬৯,৬৩২ একর; বোরো বাম ৫৪,৭৮৮ একর ও গম ১,০০,২০৪ একর। প্রতি একরে আমন চাউল ১২ মণ, আউশ ১০ মণ ও বোরো ৭ মণ এবং গম ৯ মণ করিলে মোট উৎপন্ন চাউল ও গমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,২৫,২৯,২৯২ মণ। বর্তমান সেনসাস অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। গড়ে লোকের দৈনিক ১৬ আউল হিসাবে বৎসরে প্রয়োজন হয় প্রত্যেকের সাড়ে চার মণ সমগ্র প্রদেশের কত বৎসরে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ মণ চাউল ও গমের প্রয়োজন। দেখা যায়, এ হিসাবে সমগ্র প্রদেশে উৎপন্ন হয় ১ কোটি ১৯ লক্ষ মণ। উৎপন্ন চাউল ও গমের অপচর লক্ষকরা ১০ ভাগ করিলেও বাটতি তর না। প্রদত্ত লোক-সংখ্যার হিসাবের মধ্যে ২ বৎসর বা অনধিক বয়স্ক শিশু বহিরাহে, তাহাদের সংখ্যাও প্রায় ৫০ হাজার হইবে। মোট লোকসংখ্যা হইতে ইহাদের বাদ দিলে উৎপন্ন পরিমাণ আরও আড়াই লক্ষ মণ বেশী হয়। সুতরাং, বব ও হোলার আবাদের পরিমাণ ৫,২৫,৩৪৪ একর; মগুর ১৯৮,২৮৫ একর। মুখিদাবাদের পুর্বাঞ্চল মদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছোলা, বব ও মগুরের ‘মিশলা’ কুটি খাওয়ার প্রচলন আছে। এই ৫ লক্ষ বিঘা জমি হইতে অন্ততঃ ২০ লক্ষ মণ খাতশস্ত্রের সরবরাহ করা হইতে পারে। সুতরাং দেখা হইতেছে পশ্চিম বাংলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট না ভরার কোনও সম্ভব কারণ থাকিতে পারে না। পবর্ষোক্তের অব্যবস্থা, সরকারী কর্মচারীদের অনেকের অসাবুতা এবং মহাজন ও কোভদার প্রভৃতির অতি লোভ ও চোরাকারবারই এই দেশব্যাপী অনটন ও অতাবের কত দায়ী...।”

যে সংখ্যাভিত্তিক মহাশয়ের মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তিনিও বলেন, “খাত বাটতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অব্যবস্থা সমভাবে দায়ী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাত সংগ্রহ এবং পরিবেশন নীতি, পরিদর্শকের অনিয়মিতবর্তিতা ও

অসাব্যস্তা ষাণ্ড-পরিহিতির কটিলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। লেখক বর্তমান পুস্তিকাতে তাহা সম্পূর্ণ আলোচনার বাহিরে রাখিয়াছেন। আমার ধারণা এই সমস্ত বিষয় আলোচনা না করিলে পশ্চিমবঙ্গের ষাণ্ড-পরিহিতি সম্যক্ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।”

আমরা ষাণ্ড-বিভাগের উদ্দেশ্য প্রত্যাশার আছি। কারণ ইন্দুবাবু তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে অন্যত্র প্রকাশিত “পশ্চিমবঙ্গের ষাণ্ডসঙ্কট” প্রবন্ধটির প্রতিও আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

‘বাকুতা-দর্পণ’ পত্রিকার এই সম্বন্ধে যে একটি তথ্যপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সকলের জানিয়া রাখা প্রয়োজন :

“বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, দেশের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ অরণ্যাবৃত্ত থাকি আবশ্যক। কিন্তু হুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগের ১৪ শতাংশ মাত্র অরণ্যাবৃত্ত এবং এই বনভূমি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিমাকপুর ও ২৪ পরগণা জেলার সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বনভূমিকে প্রধামতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) সরকার-সংরক্ষিত বনভূমি এবং (২) ব্যক্তিগত বনভূমি। সমগ্র বনভূমির মোট আয়তন ২৪,৬৯,৬৮০ একর (৩.৮৫৯ বর্গমাইল) এবং ইহার মধ্যে সরকার-সংরক্ষিত বনভূমির আয়তন ১৬,৯৭,০৬৮ একর (সমগ্র স্থলভাগের ৬৭ শতাংশ মাত্র) ও ব্যক্তিগত বনভূমির আয়তন ৭,৭২,৬১২ একর (স্থলভাগের ৪০ শতাংশ মাত্র)। নিম্নে ইহাদের জেলাগত বণ্টন দেওয়া হইল :

শ্রেণী বিভাগ (Types of forest)

পশ্চিমবঙ্গের বনভূমিকে প্রধামতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা—(১) পত্র-পত্তমশীল বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forest), (২) পার্বত্য অরণ্য (Hill forest) এবং (৩) উপকূলীয় অরণ্য (Tidal or Littoral forest)।

(১) পত্র-পত্তমশীল বা পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (Deciduous forest)—খাল, সেগুন, লোহাফাঠ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ এই বনের বৈশিষ্ট্য। মূল্যবান আসবাবপত্র ও বাসবাহনাদি প্রস্তুত করিতে এই সকল পর্ণমোচী বৃক্ষের কাঠ ব্যবহৃত হয় বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং মেদিনীপুর, বাকুতা ও বীরভূমের পশ্চিমাংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য বর্তমান।

পশ্চিমবঙ্গের মানাবিধ শিল্প—বিশেষতঃ কাগজ ও নিরাশলাই শিল্প—বৃক্ষ বা বৃক্ষজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই প্রদেশে বনভূমির গুরুত্ব অত্যধিক। সুতরাং এই বনভূমির সজ্জাধারণ ও সংরক্ষণ সরকার এবং জনসাধারণের

কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। সুখের বিষয়, সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বনবিভাগের পয় লক্ষকোটি বন-বিভাগ ৫,১২৪ একর ভূমিতে পরিকল্পনামূল্যবান বৃক্ষোৎপাদন করিয়াছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর বনভূমির পরিমাণ ৮,০০০ একরে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি সমগ্র ভারতব্যাপী যে বৃক্ষরোপণ সত্তাহ প্রতিনিয়ত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু বৃক্ষোৎপাদনে উৎসাহবানের জন্ত বাকুতা জেলার তিনটি মার্গারি স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল মার্গারি হইতে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের এক লক্ষ চারি পাঁচ হাজার অধিবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।”

বনমালী খাল

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইতে হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রাম জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় পরীক্ষাধীন হইয়া আছে। সুতরাং নাথ মল্লিক মহাশয়ের অর্থ ও চেষ্টা এই প্রসিদ্ধির মূলে বর্তমান। সেই বাহ্য-ক্ষেত্রের কর্মসংগতও ঐ অঞ্চলেই প্রভা অর্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বনমালী ঘোষ তাহার তার-প্রাপ্ত ভাস্কর ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টিরকার জন্ত হানীর লোক ন্যূন করিয়া একটি খালের নামকরণ করিয়াছেন। সেই উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া “গ্রামের ডাক” পত্রিকা নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন :

“ডাঃ ঘোষ সিঙ্গুর বাহ্যক্ষেত্রের কর্মসংগতকে সরকারী কবিল দপ্তরে বদলিয়া হইতে উদ্বার করিয়া গ্রামসেবার খাতে প্রবাহিত করার স্বপ্ন লইয়া শহরের আরামপ্রদ চাকুরী ছাড়িয়া ম্যালেরিয়া প্রণীত সিঙ্গুর অঞ্চলে তাঁহার কর্মক্ষেত্র বাহিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সে স্বপ্ন তিনি বহুলাংশে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। সিঙ্গুর বাহ্যক্ষেত্রের অধীন শতাধিক গ্রামের সাধারণ বাহ্যের উন্নতির জন্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়া তদনুযায়ী যে কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি তিনি করিয়াছিলেন তাহা সাধারণভাবে যে কোনো সরকারী কর্মচারীর চরিত্রে একান্ত হুল্লুট। গ্রামকে ভালবাসিয়া, গ্রামের মানুষকে আপন করিয়া এবং গ্রামের মানুষের আপন হইয়া তিনি কাজ করিতেছেন। সরকারী দীর্ঘব্রততা, জট মনোভাব ও শাসকের অভিমান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগিয়া তিনি গ্রামের মাটির সন্তান হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক গ্রামে কর্মী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের লইয়া, গ্রাম্য বাহ্যকমিটি গঠন করিয়া, বিদ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখিয়া সরকারী পরিকল্পনামূলিকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন।

ডাঃ ঘোষের ছিল সক্রিয়তার গ্রামবুদী মনোভাব। কর্মীদের সহিত মিলিতভাবে কাজ করিয়া, বিশ্রামের কক্ষে শব্দের কাগজ পাতিয়া দৃষ্টি-হোলার জলযোগ করিয়া আপন-তোলার মত গ্রামের কাজ করিয়াছেন। গ্রামের পথের ধূলায়

পরিবাসের পোশাক ধারণা হইবার সংকোচ তাঁহার ছিল না, শাসকের বিধা আভিজাত্য সুর হইবার তর তাঁহার ছিল না, গ্রামের রোগক্রিষ্ট অবহেলিত মানুষজন হইতে ক্রমি পার্বক্য বজার রাবিবার কষ্টকল্পিত প্রদান তাঁহার দেখা বার নাই। সাধারণ প্যাঁট-কোটের আড়ালেও যে একজন গ্রামিক মানুষের মন বাস করিতে পারে, তাহা বুঝিতে কাহারও এতটুকু কষ্ট হইত না। তিনি যে একজন পরাধীন যুগের সরকারী কর্মচারী, তাহা কেহই মনে করিবার সুযোগ পাইত না।

‘গ্রামের কথা’র নিম্নমিত পার্টকপাট্রিকারুল সিঙ্গুর অফিসের ঊঁঠাণালী, চুলকানী নামে প্রায় হাজার বিঘা পরিমাণ হাজা-মজা-ভূমি জমির কথা অরণ করিতে পারিবেম। এই ভূমি মাঠের জল নিকানের সুযোগ না পাইয়া মাঠের পূর্বে প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত সরস্বতী নদীতে না পড়িয়া মাঠেই জমা হইয়া থাকিত এবং বহু কৃষকের সোনালী বগ্নকে আঘাতের পর আঘাতে চুরমার করিয়া দিত। বিশ বৎসরাধিক কাল পূর্বে একবার এই মাঠের সংস্কারের চেষ্টা হয়; কিন্তু তাহা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নাই। ডাঃ যোব উজ মাঠ দুইটির জননিকাশ করিয়া চতুঃপার্শ্বের গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার বগ্ন দেখিতেন এবং স্থানীয় কর্মীদের এই কার্যে উৎসাহিত করিতেন। তিনি পরলোকে; নতুবা দেখিয়া তীব্র আনন্দ বোধ করিতেন যে, স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের নেতৃত্বে, জাতীয় সরকারের সাহায্যে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় মাঠ দুইটির মজা খাল সংস্কার করা হইয়াছে, ভূমি জমিতে কসল কলিরাছে এবং সবে সবে ম্যালেরিয়ার রাকসী বেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। স্থানীয় কর্মীরাও তাঁহার বগ্নত মহানু আদ্য প্রভি প্রভা জানাইবার ও তাঁহার কর্মের পরীক্ষণ জীবনব্যয়াকে অমর করিয়া রাবিবার জন্ত ঊঁঠাণালী-চুলকানী মাঠের মন সংস্কার খালের আমকরণ তাঁহার মাঝহুসারে করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সভ্যকারের কর্মীদের পরিচর দিয়াছেন।”

পরাজিত বাংলা

এই মাসের একখানি ৪১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। লেখক এক জন সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সাত বৎসর কাজ করিয়া (পেশোয়ার হইতে ইয়কল পর্যন্ত) তিনি কাজে ইস্তফা দিয়াছেন এবং পরাজিতের মনোভাব লইয়া বইখানি লিখিয়াছেন। আমরা ভাবিয়া পাই না ইহা কিরূপ শিকা বাহা বোঝাকে এমন ভাবে মানসিক জরাজত্র করে।

এই পুস্তিকা আজকালকার বিধা-বিহীন বাঙালী মনের পরিচর বের। সেইজন্য লেখকের মনোভাবের সঙ্গে ১০-১৫ পৃষ্ঠার বর্ণিত “হাজরকর্মী”র মনোভাবের সাদৃশ্য নাই। এই কর্মী “খুব বেশী বাজার আশাবাদী”। তিনি বলেন—“দৈন্যত

হজাবোর চেয়ে দুজিহীন আশাবাদকেও আমি ভাল মনে করি...”

তার পর আমরা দেখা পাই—মঃ মুজ্জ অতর ত্রমচারীর। তিনি খুলনার অধিবাসী। ‘সাধক’—পরাজিত বাংলার সাধক। গিরোজপুরের আল্‌তাব মিঞার সঙ্গে ভ্রামবাঝারে হঠাৎ দেখা। তিনি কোন্‌র সঙ্গে বলিলেন—“আমার বদেশ আমার বিশেষ হয়ে গেল...ঈশা খান আলিবর্দির জাত আপন ঐতিহ্য বিশ্বত হয়ে কন্নাতীয় হাসব মেয়ে মিল।...” এই হইল চুনীলালুর “সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার”। সুতরাং তিনি সখিং কিরিয়া পাইবেন, এই তরলা আমরা করিতে পারি। তখন “পরাজিত বাংলা” লেখার জন্ত লজিত হইবেন।

জনশিক্ষা

সরকারের জনশিক্ষা বিভাগ সরকারী চালে এই শিকা বিস্তার করিতেছেন। তার জন্ত মাজ একট বিতাপ পুবিবার নিমিত্ত ভিন-চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ—রামকৃষ্ণ মিশন, মারীশিকা সমিতি, সরোজনালিনী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ বরকশিকা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান—তাঁহার মন ওণ কাজ করিতেছে। অবন্ত সরকার-পক্ষ বৎসরে দু’ হাজার হইতে বার হাজার টাকা সাহায্যব্যয়ন দিতেছেন। তাহার ঘোট পরিমাণ সরকারী বিভাগ পুবিবার ব্যয়ের পরিমাণ হইতে অনেক কম। সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণ না পাইয়াও আমরা এই কথা বলিতেছি।

সরকারী চাল যে কি বস্ত তাহা আমরা জানি। সেইজন্য ১৯৪৯ সাল হইতে আমরা বলিতেছি যে, একট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহার উপর এই ভার দেওয়া হউক। পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে দেখা বাইত যে, তাঁহারাই এই শিকার বিস্তার করিতে পারেন কিনা বেরন করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিষয়ট বরক শিকা কমিটিতে আলোচিত হইয়াছিল। অবিকাণ্ড সত্য তরে তাহা গ্রহণ করেন নাই এ সংবাদ পাইয়াছিলাম। তরের কারণ এই যে, এই নৃতম ব্রত গ্রহণ করিতে বেসরকারী লোক কেহ আপাইয়া আসিবেন না। অথচ তাঁহার জানিতেন যে সরকারের বহু পূর্বে অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের ক্ষুত্র অর্থপতি অহুসারে জনশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। আজ বধন বীকার করা হইয়াছে যে, জনশিক্ষা হাজা গণতন্ত্রের বিকাশ হইতে পারে না তখন এই শিকার তার জনগণের উপর ছাড়িয়া দিলে লক্ষ্য হইত।

আন্তর্জাতিক শ্রমসঙ্ঘ

গত ১৯১৯ সালে ‘লীগ অব দেশমন্’-এর সহযোগী ব্যরত-শালদশীল প্রতিষ্ঠানরূপে আন্তর্জাতিক শ্রমসঙ্ঘের উদ্ব।

হেলসিংগের সন্ধি ও অত্যন্ত শান্তিচুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ইহার মূল নিয়ম-কাহ্নগুলি রচিত।

কর্তব্য

সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে সত্যিকারের বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করাই আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের লক্ষ্য। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্ত এই প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত কার্যাবলী গ্রহণের চেষ্টা করে :

- ১। কার্য-সময় নির্ধারণ (সারাদিনের ও সপ্তাহের সর্বোচ্চ কার্য-সময় স্থির করাও এর অন্তর্গত) ;
- ২। শ্রমিক বোগান এবং বেকার সমতা প্রতিরোধ ;
- ৩। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত প্রয়োজনীয় উপার্জন ;
- ৪। অসুস্থতা, রোগ ও কার্যকালে-আবাতপ্রাপ্ত কর্মীদের রক্ষা করা ;
- ৫। মাতৃ, শিশু ও যুবকদের রক্ষা করা ;
- ৬। আহত ও বৃদ্ধদের জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- ৭। নিজ দেশের বাহিরে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বার্থ-রক্ষা ;
- ৮। একই কাজের জন্ত একরূপ পারিশ্রমিক দেবার নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা ;

৯। সল্লববৃত্তার বাধীনতার নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া ;

১০। কারিগরী ও অত্যন্ত বৃত্তি শিকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ;

১৯৪৪ সালে কিলান্ডেলকিরার অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম-সংঘের এক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, জাতি-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের বাধীন ও সম্মানজনক ভাবে তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কক্ষে এবং আর্থিক নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এই ঘোষণা পরে আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের গঠনতন্ত্রে সংযোজিত হয়। এই ঘোষণার আরও বলা হয় : শ্রম কোন পণ্য নয়, বাধীন মতামত প্রকাশ ও সল্লববৃত্তা উন্নতির সহায়ক। কোন হানের দারিদ্র্য প্রত্যেক সমৃদ্ধ হানের বিপরীত বৃষ্টি করে এবং অতাবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া অমিত বিক্রমের সঙ্গে কাজ করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নীতি হওয়া উচিত। এই ঘোষণার সংঘের নিয়ম-কাহ্ন মানিয়া লইয়া পৃথিবীব্যাপী এক ব্যাপক কর্ম-ভালিকা গ্রহণ ও তাহা রূপায়িত করার জন্ত নিয়ন্ত্রণ কাজ করিয়া যাওয়ার কথাও স্বীকার করা হয় :

- ১। পূর্ণ কর্ম সংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা ;
- ২। কর্মী তার মৈথুণ্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায় এমন জীবিকা সংস্থান ;
- ৩। শ্রম শিকা ও শ্রম বদল করার সুযোগ রাখার ব্যবস্থা করা ;
- ৪। মজুরীর নীতি, সময় ও সকলের উন্নতির সহায়ক

কাজকর্মের ভারসমত সর্ব এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের সর্বনিম্ন মজুরী ;

- ৫। উৎপাদন-কমতা, বৃদ্ধির জন্ত কার্য পরিচালন ব্যাপারে সহযোগিতার স্বীকৃতি ;
- ৬। সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ;
- ৭। প্রত্যেক বৃত্তির শ্রমিকদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা ;
- ৮। শিশুকল্যাণ ও প্রযুক্তিদের রক্ষা ব্যবস্থা ;
- ৯। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসগৃহ এবং সাংস্কৃতিক ও আমোদ-প্রমোদের সর্বস্বত্ব সুযোগ-সুবিধা দান ;
- ১০। পুষ্টিগত ও কারিগরী শিকার ব্যাপারে সমান সুযোগ দান।

এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনসাধিত করিয়া ভুলিবার জন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘ শ্রমিক, পরিচালক ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত সকল সত্যের জন্ত সর্বনিম্ন মান স্থির করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য জগতের প্রধান সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই দুই প্রবল শক্তির মধ্যে পড়িয়া ব্রিটেনের কি দশা হইবে, তৎসময়ে ব্রিটিশ চিন্তামায়কেরা পর্য্যন্ত ভাবিত হইতেছেন। গত অক্টোবর মাসের “এম্পায়ার রিভিউ” পত্রিকার ইষ্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে দার্শনিক ডব্লিউ জোন্সারের একটি বক্তৃতার চূবক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, “পশ্চিমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পূর্বে রাশিয়ার বৃহৎ জাঁতাকলের (great mill-stones) মধ্যে পড়িয়া আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইব—যুগ কেবল বতর্টা নয় সংস্কৃতির কেন্দ্রে ভগ্নশেখা অনেক বেশী পরিমাণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তাসাইরা দিরাছে তাহার ছায়াচিত্র, তাহার বেতার বক্তৃতা, তাহার খাতনত ও বিলাস দ্রব্যের বত্বার ছায়া।” ইহার কলে “ব্রিটিশ যুবক-যুবতী ভবিষ্যৎ সময়ে নিরাশ হইয়া প্রৌঢ়বে পৌঁছিবেন ; তাহার উপর আছে তৃতীর বিশ্বযুদ্ধের ভয়।” এই মনোভাব রোধ করিতে যিনি বা যে দল পারিবেন, এই পরাজিতের মনোভাব রূপায়িত করিতে পারিবেন, তাহারাই হইবেন সব-ব্রিটেনের স্রষ্টা। ১৬ বৎসর বয়সে উইন্সটন চার্চিল এই দুঃস্থ কর্তব্যের বোকা খাড়ে তুলিয়া লইয়াছেন আর আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসর বয়সে জানবাব, সুভাষা, বিভলালী লোক ভোট-মুখে মাটিতে সাহস পান না। এ পার্থক্য কেন জন্মিয়াছে ? এই দিম্পূহতাযের সঙ্গে রাজ্য-বাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি ? বামী বিবেকানন্দ প্রকৃতির জীবনকথা অনুধাবন করিয়া তাহাও লভ্য বলিয়া মনে হয় না।

ঋণশোধ উপলক্ষে দরকষাকষি

যুদ্ধের সময়ে ৭৭ ও ইকারা চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে সকল সমর-সরঞ্জামাদি দিরাছিল তাহার মধ্যে ভিন্নধানি বরকভাদা কাহাজও ছিল। উহার মধ্যে হুইথানি কেবল দেওয়া হইবে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়াছে। আগামী মাসে আর্জেন্টিনার অন্তর্গত ব্রেনারহ্যাভেন নামক বন্দরে কাহাজ হুইথানি কেবল দেওয়া হইবে।

কাহাজ হুইথানির নাম ‘মর্থ টইও’ ও ‘ওয়েষ্ট টইও’। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অহরোধের উত্তরে রাশিরা কয়েকবার জানাইয়াছিল যে, কাহাজ হুইথানি ল্যাপল্যাও সমুদ্রে বরকে আটক পড়িয়াছে। ১৯৪৪ সালে উত্তর মহাসাগরের ভূযায়ত প্রবেশ-পথ পরিষ্কার করিবার জন্ত এই ভিন্নধানি কাহাজ দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় কাহাজখানি ইতিপূর্বেই কেবল দেওয়া হইয়াছে।

৭৭ ও ইকারা চুক্তি অনুসারে আমেরিকা কর্তৃক রাশিরাতে প্রদত্ত যে সকল দ্রব্য যুদ্ধের পরেও অবশিষ্ট ছিল এবং বাহা শান্তিকালীন কার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা কেবল চাহে এবং তাহা লইয়া গন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া উত্তর দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যে আলোচনা চলে। বরকভাদা কাহাজ করখানি হাভাও চুক্তি অনুসারে আমেরিকা রাশিরাতে আরও ৬৭২ ধানি কাহাজ ও অত্যন্ত প্রকারের জলবান প্রদান করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলিও কেবল চাহিয়াছে।

৭৭ ও ইকারা চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিরাতে যে সকল দ্রব্য প্রদান করে তাহার মোট মূল্য হইবে ১০৮০ কোটি ডলার (প্রায় ৫ টাকার এক ডলার)। যুদ্ধের পরে শান্তিকালীন কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ যে সকল দ্রব্য রাশিয়ার ছিল তাহার মূল্য বাবদ ৮০ কোটি ডলার ও ঐ কাহাজগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল চাহে; এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে দ্রব্যাদির সদত মূল্য বলিয়া আমেরিকা যে পরিমাণ অর্থ দাবি করিয়াছে রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই।

ইরাণ ও মিশর

এই দুইটি রাষ্ট্র লইয়া পাক্ষাত্য শক্তিবর্গ বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেছেন। ইহা সুবিধার জন্ত পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের কথা তোলা নিম্নরোজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটিশরাজ হুর্সল হইয়া পড়িয়াছে। তার উত্তরাধিকারী রূপে দেখা দিরাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। ইংরেজ তার বগোজ উত্তরাধিকারীকে হিংসা ও ভয় করে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী সোভিয়েটকে ভয় করে। কিন্তু তার বগোজকে হাঁটরা

কেলিতে পারিতেছে না, কারণ হুর্সল ব্রিটেনের সুদৃবল ও অভিজ্ঞতা এখনও তার কাছে লাগিবে—এই আশায় সে ইরাণ ও মিশরের সত্যাগ্রহ ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে আমল দিতেছে না। সোভিয়েট রাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধের সুযোগ লইতেছে।

ইহাই হইল বাহ্যিক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কারণ। ইরাণ ইংরেজের হাত হইতে তার তৈল যুক্ত করিতে চায়। বর্তমান শাহের শিতা রেজা শাহ পহ্লাবী চাপ দিয়া ইংরেজ তৈল কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিশজির বলে ও কৌশলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাষ্ট্র এই কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই অপমানের দ্বারা ইরাণী মরনারী ফুলে নাই।

মিশরের বিবাদ ইংরেজের সঙ্গে। ১৮৮২ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজের লাপট মীল নদের তটভূমির অধিবাসী সহ্য করিয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে মিশর “স্বাধীন রাষ্ট্র” বলিয়া ঘোষিত হয়। ঐ অসুগ্রহ-প্রভু স্বাধীনতা মিশরের আত্মসম্মানে আঘাত করে। অত্যন্ত কারণের মধ্যে সর্বাঙ্গেক্ষেপে অপমানজনক ছিল মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি। সেই সৈন্যবাহিনী আন্তে আন্তে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহারার সুরেজ খালের তীরবর্তী অঞ্চল হইতে সরিতে চাহিতেছে না।

কেন—তার কোন সহুত্তর পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার জন্ত নুতন ভাবে জোট পাকাইতেছে। এই আয়োজন-উদ্যোগে বোণদান করিবার জন্ত তুরস্ক ও আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী নিমন্ত্রিত হইতেছে। মিশর দর-কষাকষি করিতেছে নিজের বিশেষ স্বার্থের প্ররোজন। অতঃপর আরব রাষ্ট্রগুলি তাহাকে পূর্ণ সমর্থন করিতেছে না। বাহিরের দর্শক আরব মিশরের স্বাধীনতার ব্যাপারে বোণ দিতে পারি না। বিশেষ করিয়া হুদান দেশের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হুমকাকার আদায়ের সহায়ত্ব দিতে পারি না। হুদানের জনসংখ্যার মধ্যে হাবশীরা সংখ্যাগুরু। তাহারার মিশরের প্রভু চায় না। এই অবস্থার ইংরেজ এক নুতন সুযোগ পাইয়াছে। তাহারার হাবশী জাতির স্বাধীনতার রক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হুতরাং রাষ্ট্রপুঞ্জ-পরিষদের বঠ অবিবেচন উপলক্ষে প্যারিস হইতে অনেক সুখরোচক সংবাদ পাওয়া যাইবে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আপোষের চেষ্টা হইবে মিশর। তার কলাকল সবচেহে সন্দিহান হইলেও, তারভের সহুদেহে সবচেহে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ সামগ্রিক শান্তি হাজা এই অঞ্চলে আদায়ের কোন স্বার্থ নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব

ঐমম্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের প্রাধান্য বিশেষ কিছু নতুন কথা নহে। বাংলা দেশের বহু শিক্ষকই রেমন্টের *Principles of Education* নামক পুস্তকে বহুকাল পূর্ব হইতেই পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন :

Incessant activity is a law of the child's being, and the first requisite of a wise system of control is that this activity should be directed into desirable channels.

ডিউই, ব্যালার্ড, এবট, উড প্রভৃতি শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মনীতির অপরিহার্যতা বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকেরাও শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে এই সত্য একেবারে ভুলিয়া যান নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি বখন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যতালিকা হইতে হাতের কাজ, সেলাই, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বর্জন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল তখন ব্রিটিশ সরকার এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন :

There are strong objections to the omission of these subjects from the course. The three R's are only a means to an end. To attempt nothing more than Reading, Writing and Reckoning would create a dislike in the mind of the child for other works which would be sufficient to combat in later years.

প্রকৃত পক্ষে শিশুশিক্ষায় কাজের নীতি (activity) বহুকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সেই নীতিকেই ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন।

কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষায় পৈশিক কর্মের উপর অর্থাৎ হাতের কাজের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কর্মপ্রধান অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক ততটা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যধারার বিশিষ্ট ধারক ডাক্তার কুমারান্না লিখিয়াছেন :

The whole of basic education was founded on and woven round work for the young, work for the adult and work for the old; work developed human personality and when they neglected it they sank to the level of life that sustained on violence.

ইহার সহজ অর্থ হইল এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মই হইতেছে একমাত্র মুখ্য বস্তু এবং এই কর্মের 'by-product' বা অঙ্গসিদ্ধান্ত রূপে বাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহার

অতিরিক্ত আর কিছু শিক্ষণীয়ও নয়, গ্রহণীয়ও নয়। আর সকলই একান্ত গোপ। শিক্ষণীয় বাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই হাতের কাজের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে, কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কাজকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া আর একমাত্র কাজের মধ্যেই সমগ্র শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা এক কথা নয়। এবট অথবা উড, ডিউই অথবা ব্যালার্ড হাতেকলমের কাজকে শিশু-বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু শুধু হাতেকলমের কাজকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত খুব স্পষ্ট নহে। শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের দাবি স্বীকৃত হওয়ার পর ইংলণ্ডের সাক্ষোকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে, চিলিতে, গুয়াতিমালায়, অষ্ট্রেলিয়ার ট্যাসমানিয়া ও ভিক্টোরিয়ায় 'এরিয়া স্কুল' নামে যে সকল আদর্শ গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে সেগুলির সকল ক্ষেত্রেই গ্রাম্য শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমান আসন পাইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই শুধু শিল্প বা হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পিত হয় নাই। তবে বুনিয়াদি শিক্ষায় অন্ততঃ নীতিগতভাবে তাহাই করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনার সমর্থনে বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। কিন্তু বাহা এই নতুন বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রবর্তনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বুনিয়াদি শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের অনেকেই অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ। কিন্তু তথাপি মনে হয়, তাঁহারা বুনিয়াদি শিক্ষার সমর্থনে যে সকল মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই একদেশদর্শী এবং অসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

কাজ করা শিশুজীবনের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি, সুতরাং কাজকে কেন্দ্র করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা স্বাভাবিক এবং সহজ হইবে। এই যুক্তি বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু কাজ বলিতে বখন শুধু হাতেকলমের কাজকেই বুঝান হইয়া থাকে তখনই যুক্তিটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। শিশুর কর্মপ্রচুরের পক্ষেই শৈশব হইতেই যে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এমন কি বিশেষ এক প্রকারের

মানসিক শক্তি অনবরত কাজ করিয়া থাকে, এই মনস্তত্ত্ব-টুকুকে ইচ্ছা করিয়াই তাহার উপেক্ষা করিয়াছেন; শারীরিক ক্রিয়ার মত মানসিক ক্রিয়াও যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির একটি অঙ্গ একথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

বুবার সাহেব তাহার *From Birth to Maturity* বইয়ে শিশুদের ক্রিয়ায় যে বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, দেড় বৎসর বয়স হইতে শিশুর পৈশিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। শিশুর পৈশিক কার্যকলাপের এই পর্যায় ছয় বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই সময় সে ইটের ঘর, কাঠের পুল, কাগজের নোকা এবং আরও কত কি বস্তু তৈয়ার করে। ইটের ঘর বনন সে তৈয়ার করিতে বসে তখন প্রতিদিনকার দেখা ঘরের একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার মনে ভাসিয়া উঠে। সেই অস্পষ্ট ছবি হইতেই সে ঠিক করিয়া লয় কোন ইট-খানার উপর কোথায় কি ভাবে অপর একখানা ইট রাখিলে তাহার পৈশিক ক্রিয়ার ফলটি তাহার মানসছবির অল্পরূপ হইয়া উঠিবে। এই সময়কার শিশুজীবনের অধিকাংশ পৈশিক কর্মই এইরূপ কোন-না-কোন মানসিক ছবি ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ চিন্তা বা কল্পনার ফল। এই সময় হইতেই শিশুর মানস-ক্রিয়ার উদ্ভব হয়; লক্ষ্যহীন পৈশিক বিক্ষেপ ক্রমশঃ লোপ পায়। অজ্ঞাতসারে এবং অস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য তাহার পৈশিক ক্রিয়াকে সচেতন করিয়া তোলে। পৈশিক চাঞ্চল্য শিশুর পক্ষে যতখানি স্বতঃস্ফূর্ত, এই মানসিক ক্রিয়াও তাহার পক্ষে ততখানি স্বাভাবিক। হাতের কাজ যদি শিশুশিক্ষায় মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে হয় তাহা হইলে এই মনের কাজও তাহার পক্ষে মনস্তত্ত্ব-বহিস্কৃত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া হয় হইতে পারে না। এ যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজ তথা শারীর-ক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করায় এক প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মনের কাজকে উপেক্ষা করিলে শিক্ষায় অপর এক-প্রকারের দোষ বর্তিবে। এই উভয়বিধ কর্মকে কেন্দ্র করিয়াই শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ আপাততঃ যতই স্বল্প ও স্বল্পর হউক কালক্রমে ইহার ভিতরে পুনরায় পঙ্কজ দেখা দিবে। পৈশিক ক্রিয়ার জন্ত যেমন হাতের কাজের প্রয়োজন, মানসিক শিক্ষার জন্তও সেইরূপ বিশ্বের জ্ঞানী ও গুণী লোকদের পূর্বাঙ্কিত অভিজ্ঞতার আবশ্যক। এইখানেই শিক্ষাকে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষায় হাতের কাজের মত ইহাও অপরিহার্য।

মনস্তাত্ত্বিকগণ বলেন, শিশুর মধ্যে প্রচুর সহজাত শক্তি (instinctive energy) রহিয়াছে। শিশুর কাজের যথা দিয়া তাহাই স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশলাভ করে। এই কাজ বাহাতে সমাজ-পরিপক্বী বা অসামাজিক না হইয়া

সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় তাহার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং শিক্ষা কর্মক্ষেত্রিক হওয়াই মনস্তত্ত্ব-সম্মত। কিন্তু কাজের যে একটা মানসিক দিকও আছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং পৈশিক কর্ম বা হাতের কাজই শুধু শিক্ষার বাচন হইতে পারে না। জীবনের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির তুলনায় মানসিক কর্মও শিশুর কাছে কম প্রয়োজনীয় নহে। ১৯৪৭ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ক্রিয়ুত অনাধনাথ বহু বলিয়াছেন :

Contemplative gratification (of instinct) is relatively passive in as much as it utilises other people's experiences in a second hand manner.

কিন্তু অপর লোকের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে বলিয়াই কর্মশক্তির মানসিক তৃপ্তি যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে একটি গোণ বস্তু মাত্র এবং পৈশিক কর্মের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ইহা স্বীকার করিতে কষ্ট হয়। প্রাক্তন অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে কাজে লাগাইবার যোগ্যতাই সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। উৎপাদনমূলক কর্ম-ক্ষেত্রিক শিক্ষাও এইরূপ অভিজ্ঞতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইতে না পারিলে কর্মক্ষেত্রিক শিক্ষারও অপর্যত্ব অবশ্যস্বাধী। তুলা কতখানি পিজিয়া লইলে উহার পাজ করা যায় তাহা ঠিক করিয়া লইবার জন্ত অপরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। নচেৎ উপযুক্ত পাজ তৈরি হওয়ার পূর্বে প্রচুর পরিমাণ তুলার অবধা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং পুনঃপুনঃ বার্ষতার দীনতা শিক্ষার্থীর মনে গভীর বিতৃষ্ণাও হয়ত সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে। তাই হাতের কাজ করিতেও অপরের অভিজ্ঞতাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে হয় এবং অপরের অভিজ্ঞতা সঘন্যে সম্যক জানলাভ করারই নাম পুস্তকক্ষেত্রিক শিক্ষা। ইহা “অগ্রাহম্” এবং “অপেয়ম্” কোন অবাস্তব বস্তু নহে।

আবার কতকগুলি সহজাত বৃত্তি রহিয়াছে যাহা শুধু হাতের কাজের যথা দিয়া, শুধু স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া আর্মৌ পরিপুষ্ট বা পরিত্যক্ত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। আত্মগত্যা, বিরক্তি, সঙ্কলিপ্সা, আবেদন, সহানুভূতি, ঘৃণা, লক্ষা, ভয়, আনন্দ, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৃত্তিকে সমাজহিতকর করিয়া তুলিতে হইলে মুখ্যতঃ যে বস্তুটির সহায়তা প্রয়োজন তাহা হইল মন। শিক্ষক এতৎসম্বন্ধীয় বহুজননক অভিজ্ঞতাকে কতখানি আবেগময় করিয়া শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করিলে শিক্ষার্থীর অল্পতবশক্তি প্রতিক্রিয়া-চকল হইয়া উঠিবে—তাহারই উপর এই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ (“sublimation”) নির্ভর করিবে।

অপরের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীর মন এখানে গৌণ ত নহেই বরঞ্চ অত্যন্ত প্রধান।

শিশুর স্বভাব আক্রমণাত্মক। এই আক্রমণাত্মক শিশু-প্রকৃতির সঙ্গে বহির্জগতের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহার ফলে শিশুমনে একপ্রকার অপরাধ-বোধের সঞ্চার হয়। এই অপরাধবোধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে শিশু-মন বৃদ্ধির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজে শিশুর এই অপরাধ-বোধ বা দুঃখ-বোধের লাঘব করিয়া মনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি পূরণ করিয়া দেয়। শিক্ষাতত্ত্বজগণ বলেন :

Constructive work gratifies one of the deepest needs of child.—namely the needs of restitution.

কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ একমাত্র হাতের কাজের মধ্য দিয়াই হয় না। যে শিশু অন্যায় করিয়া তাহার ছোট বোনটিকে ব্যথা দিয়াছে তাহাকে যদি দশটি অঙ্ক করিতে বা দুইটি জ্যামিতিক কূট সমাধান করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলেও অন্যায় করিবার ফলস্বরূপ তাহার মনে যে অপরাধ-বোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অনেকখানি লাঘব হয়। অবশ্য হাতের কাজের বা শৈশবিক কর্মের ক্রিয়া এই ব্যাপারে গভীরতর এবং দ্রুতফলপ্রসূ।

কিন্তু অপরাধ-বোধ ও তজ্জনিত অশুশোচনাকে পরিপূর্ণ ভাবে মন হইতে ঝাড়িয়া-মুছিয়া ফেলিবার নীতিটি সামাজিক মনের সূত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক কিনা সে কথা ভাবিবার আজ সময় আসিয়াছে। অতিরিক্ত অপরাধ-বোধ মনের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করিয়া মনকে বিকার-গ্রস্ত করে ইহা যেমন সত্য, অপরাধ-বোধের ঐকান্তিক অভাব, অপরাধের প্রতি অপরাধীর ঘৃণা হ্রাস করিয়া দিয়া তাহার মনের অপরাধপ্রবণতা বাড়াইয়া দেয় ইহাও তেমনই সত্য। দেখা গিয়াছে, বাহারা দিনের অধিকাংশ সময় কার্যিক পরিভ্রমে নিযুক্ত থাকে তাহারা নিঃসঙ্কোচে যে পরিমাণ অপরাধ করিতে পারে অপর লোকেরা ততটা নিঃসঙ্কোচে তাহা পারে না। ইহার মনস্তাত্ত্বিক কারণ এই যে, নিরন্তর শৈশবিক কর্ম তাহাদের অপরাধ-বোধ লোপ করিয়া দেয় এবং তাহাদের কার্যের অবশ্যস্বাভাবী ফলস্বরূপ অপরের স্বত্বই ক্ষতি হউক অথবা নীতির মানদণ্ড যতই অবনমিত হউক তৎপ্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠে। সুতরাং অপরাধ-বোধ হইতে মানুষকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা শিক্ষার মাধ্যমে করা উচিত হইবে কিনা সেই বিষয়ে আজ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার শৈশবিক কর্মের আতিশয্য আছে। ইহার ফলে মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয় অর্ধোপার্জন করিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ অপরাধপ্রবণতাও বৃদ্ধি পাইতে

পারে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আতিশয্যে পৃথিবীর মানুষ কর্মঠ, লাভজনক, উৎপাদনবহুল অথচ হৃদয়হীন একটি বৃহৎ বস্ত্রে পরিণত হইয়া বাইতে পারে। আধুনিক জগতে যে সকল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে রাশিয়া ও আমেরিকা উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া সম্পর্কে নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টকর। কিন্তু আমেরিকা যে ক্রমশঃ একটি নিয়মনিষ্ঠ প্রাণহীন বস্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ আছে। বহু পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা হইতে মিসেস ম্যানিং বলিয়াছেন, আমেরিকা একটি বিরাট দেশ, কিন্তু তাহার হৃদয় নাই। এই পরিণতির জন্য হাতের কাজের প্রাচুর্য কতখানি দায়ী তাহা ভাবিবার অবকাশ আমেরিকা-বাসীদের জীবনে আজ দেখা দিয়াছে। তাই জীবনযাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সার্বজনীন শিল্পশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে হইতে আমেরিকা যেন ধমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনযাপনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। আজ সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বোধ করিতেছে মানবতার ক্ষুধা।

আধুনিককালে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই মহীশূরে অস্থিতি ১৯৪৮ সনের সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতি রামস্বামী মুদালিয়ার এই সার্বধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আজ যদি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি এই অশোভন পক্ষপাতিত্ব হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে না পারা যায় তাহা হইলে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপিয়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সুদীর্ঘ পদ্ধতির মধ্যে যে দানবীয় মনোভাবের সৃষ্টি হইবে তাহা আমাদের সমগ্র সভ্যতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবে। একদা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিদেশী বর্বরদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসের দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই স্বর্থে আসিয়া বর্তিবে। শিক্ষাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ রবার্ট হাচিন্স সত্যই বলিয়াছেন:

Other civilisations were destroyed by barbarians from without we creed our own.

বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষা এবং বে-জস্ত শিক্ষা, এই দুইটি বস্তু নাকি অদ্বাদ্বিভাবে সংবদ্ধ। ইহার ফলে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, শিক্ষা প্রীতিপ্রদ এবং সহজ হয়। যে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সবচেয়ে শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদের ধারণা

অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মনে হইবে, নচেৎ মানব-জীবনের বিস্তৃতি সহজে তাঁহাদের চিন্তাধারা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করিতে হইবে। কাপড় বোনা বা অহরুপ দুই-তিনটি হাতের কাজই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে শিক্ষায় বর্তমান পৃথিবীর সার্থক মানুষ তৈয়ার হইবে কিনা সন্দেহ। মাধ্যম রূপে নির্ধারিত কর্মকে শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করিলে আপাতদৃষ্টিতে আর্থিক সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভব হইলেও ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর আকর্ষণ বেশী। তাহার ইচ্ছা ও ঐশ্বর্য্য উহার প্রতি তীব্রতর হয়। ইহার একটি কারণ এই যে, কর্ম শিশুর সহজাত শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ-মাত্র। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, কর্ম অর্থ শুধু হাতের কাজই নহে; কর্মের একটা মানসিক দিকও রহিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া অসুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষ্য শিক্ষার সমগ্র লক্ষ্যের একটি দিক মাত্র; সমগ্র লক্ষ্য নহে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত লক্ষ্য চোখের সম্মুখে অহরহঃ সুস্পষ্ট থাকিলে দৈনন্দিন এক্ষেত্রে কর্মতালিকার মধ্যেও উৎসাহ এবং আগ্রহের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছবার পথটি যদি সূচীর্ণ হইয়া উঠে তাহা হইলে লক্ষ্য বতই না সুনির্দিষ্ট হউক, পথ চলাটা শিশুর পক্ষে কৌতূহল ও উৎসাহ-জনক না হইয়া একান্তভাবে ব্যস্তিক হইয়া যাইবে এবং কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক বুনিয়াদ ধসিয়া পড়িবে। সুস্পষ্ট লক্ষ্যের গেরো বধন ছিঁড়িয়া যায় তখন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কর্মও এক্ষেত্রে হইয়া উঠে। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে ইহার আর তখন বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ঠাকুর-পূজা বধন দৈনন্দিন অসুস্থানে পরিণত হয় তখন ঐ পবিত্র কর্মটির প্রতি সাধারণ মানুষের না থাকে নিষ্ঠা না থাকে অন্তরের গভীরতা। তখন বেতনভূক পুরোহিতের উপর এই ভারটি স্তম্ভ করিয়া দিতে সে উৎসুক হয়। তুলার পাজ করা বধন বহুদিন ধরিয়া দৈনন্দিন কাজে পরিণত হইয়া যায় এবং ঐ কাজ করার মধ্য দিয়া বধন শিশুকে প্রত্যহ একই প্রকারের কড়াকিয়া, সেরকিয়া প্রভৃতি শিখিয়া লইতে হয় তখন তাহার ঐশ্বর্য্য ও আকর্ষণ বজায় রাখিতে কোনও প্রকার নূতন প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কাজ শিশুরা ভালবাসে, ইহা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। কিন্তু

একই কাজ পুনঃ পুনঃ করিতে বা একাদিক্রমে বহুদিন ব্যাপিয়া করিতে শিশু বিতৃষ্ণা অহুভব করে। ইহাও মনস্তাত্ত্বিক সত্য। বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তি শুধু পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষারই প্রাপ্য নহে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষারও ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে কোনও শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের পক্ষে আনন্দদায়ক ও স্বথকর হইবে কিনা তাহা শিক্ষাপদ্ধতির উপর বত না নির্ভর করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষাপদ্ধতিটি মাটির ঢেলা মাত্র। কৃষকদের কৃতিত্বানুযায়ী তাহা হইতে ভয়ঙ্কর দানবও নির্মিত হইতে পারে আবার কোলে-তুলিয়া-লওয়া কোমল পেলব লক্ষ্মীরও সৃষ্টি হইতে পারে। পদ্ধতিটা করণ কারক। শিক্ষকই প্রকৃত কর্তা।

শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজের প্রচলন অপরিহার্য। শিক্ষাকে সকল দিক দিয়া সুন্দর ও মজলময় করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পৈশিক কর্মকে একটা বিশেষ স্থান দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু হাতের কাজ বা পৈশিক কর্মের মধ্যেই সমগ্র শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করার যে পরিকল্পনা তাহা ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে পুরাপুরি কল্যাণকর হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার যে সকল দোষত্রুটি রহিয়াছে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও তাহা হইতে মুক্ত নহে। ইহার একটি মাহুষকে বস্ত্র-দানবে পরিণত করিবে, অপরটি মাহুষকে সমাজ জীবন-বাগানে একান্ত অসুস্থগুক্ত একটি জীবে রূপান্তরিত করিবে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই মাত্র শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। হাতের কাজ ও মনের কাজের মধ্যে এমন সঙ্গতি রাখিতে হইবে যেন একের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া অপরের গুরুত্বকে হ্রাস করা না হয়। পুস্তককেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক এই উভয়বিধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষাকে মুখ্য এবং অতীতের বহুজনলব্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাকে গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমরা হয়ত আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার সংস্পর্শ হারায়াই এমন একটি স্তরে গিয়া পৌছিব যেখান হইতে ইউরোপ ও আমেরিকা সভয়ে পশ্চাৎপদ হইবার উদ্ভোগ করিতেছে।

ভারত-মহিমা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ধন্য আমি এ পুণ্য-বিশাল
ভারতের সন্ধান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি আমি
পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি
আমি করি তর্পণ,
করি যে সর্বকর্মের ফল
শ্রীহরিরে অর্পণ,
মধু রাজসিঁদ্ব।
গোটা ভারতের আরতি করিয়া
জলে মোর গৃহদীপ।

২

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি
শুদ্ধ ও সিক,
ভক্তের পদ পরশে নিত্য
সে অপাপবিক্র।
এখানে বুঝায় অপ-শক্তির
দম্ভ-সোধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশিবে
বাহুকী নাড়িলে মাথা।
নাহি কোনো ভয় নাহি।
আলামুখী-শিখা সর্কারিষ্ট
সর্বদর্প দাহী।

৩

মন্দির ভাঙি উপলব্ধও
বাহারা পিরাছে লয়ে,
সে দেশ সে জাতি রহিবে না দয়
বাবে আপনার হয়ে।
প্রজা তাদের থাক্ বা না থাক্
না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে
শিবের প্রতিষ্ঠা।
অশেষ কষ্ট সহি'
বিকলে তাহারা পাষাণের ভার
লয়ে যায় নাই বহি।

ভারতের ধনবদ্ধ লইয়া
বাহারা করিছে ফেরী,
কতি কিছু নাই বিনিময়ে তারা
হয়ে গেছে আমাদেরি।
সপ্ত নদীর বন্যার জল
প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির
প্রসারিত সেখা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী,
হরণ করেছে, বরণ করিতে
করিবে না বেশী দেহী

৪

আনন্দ মোর কতই নিবিড়
কি বিপুল হর্ষ,
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু
এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়া, কালী, আমি অযোধ্যা
পুরী ও বুলাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কান্মীর,
সোমনাথ পত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি,
কিন্তু বিরাট ওই হিমাশ্রি
আমার গোত্রপতি।

৫

ভারত-তনয় অমৃতপুত্র
আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্যবাহিনী গঙ্গা আমাকে
আদরে অঙ্গে লয়।
হোক ইউরোপ, হোক আফ্রিকা
হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিত্তার অগ্নি যেখানে
সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ
হয়ে যাবে সেই ঠাই।

পিতৃস্নেহ ও তার স্বরূপ

ঐনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

মাতৃস্নেহের মন সীমাহীন গহন অরণ্যের মতই রহস্যময় ; কোথায় এর আরম্ভ আর কোথায়ই-বা এর শেষ কিছুই বুঝবার উপায় নাই । এ অরণ্যের ভিতর সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না, কাজেই স্পষ্ট করে কিছু প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয় । শুধু অস্তঃসন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের নিজের মনের যে অংশটুকু দেখা যায় তা অবলম্বন করেই মাতৃস্নেহ অপরের মনঃপ্রকৃতি সম্বন্ধেও অনুমান করে নেয় । নিজের মনের উপর আত্মসন্ধানের আলো ফেলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মানব-মনের কত দুজ্জের রহস্যের খোঁজখবর সংগ্রহ করেন । মাতৃস্নেহের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণের উৎস সন্ধান করতে গেলে মনের নিবিড় গহনে প্রবেশ করতে হবে । যে নদী আমাদের ঘরের কাছ দিয়ে কুলকুল স্ববে বয়ে যায়, তার উৎস সন্ধান করতে হলে যেতে হবে বহু দূরের তুষারক্ষেত্রে ; যে শতদল জলের উপর পাণ্ডি বিকাশ করে সৌরভে বাতাস মগ্ন করে দেয়, তার মূল স্ফূর্তিতে হবে জলের তলায়, মাটির নীচে । তেমনি আমাদের আচরণও অদৃষ্ট সংযোগসূত্রে মনের বিভিন্ন ভাব-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত । আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃদ-নৈরাস্ত, কল্পনা-বাসনার যে ভাব-বুধু নিরন্তর মনের তলায় আলোড়ন তুলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ মাতৃস্নেহের আচরণে । এই ভাব-কামনাগুলির তীব্রতা কমবেশী থাকলেও সকল মাতৃস্নেহের মানসক্ষেত্রেই এগুলি বিরাট করে । তাই আমরা নিজের মন দিয়ে অপরের মন বুঝতে পারি, নিজের ভাবাবেগের অনুকৃতি থেকে অনুরূপ অবস্থায় অপরের ভাবাবেগ কিরূপ হতে পারে তা অনুমান করে নিই । এ অনুমান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য হয় এইজন্য যে, মনের মৌলিক উপাদানগুলি সকলেরই এক ; একই রূপ সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) এবং প্রকোভ বা ভাবাবেগ (emotion) মনের পর্ভীরে থেকে মাতৃস্নেহকে নানা আচরণে উদ্ভূত করেছে । এদের স্বরূপ বুঝতে পারলে জীবের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে মাতৃস্নেহের জ্ঞাননেত্র খুলে যায় ; তখন অন্যের মনের গহনেও সে আলোকপাত করতে পারে ।

স্নেহের উৎস কোথায়

সন্তানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি, জীবের রক্তের সঙ্গে এ মিশে আছে । অপত্যস্নেহ জীব-মাত্রেই স্বাভাবিক ধর্ম । প্রকৃতি সকল জীবের মধ্যে এই

সন্তানবাৎসল্য এমন মাত্রায় ছিঃছেন বাতে তারা সন্তান-সন্ততি বাঁচিয়ে রেখে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখতে পারে । অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে পশুমাংসেই সন্তান পালন করে । বাদে পালনশক্তি কম তাদের সন্ততির সংখ্যা দেখা যায় প্রচুর । মাছ-ব্যাঙ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের প্রাণীর অসংখ্য ডিম হয়—এক-একটি মাছ বা ব্যাঙের ডিমের পরিমাণ হবে কয়েক কোটি । এদের বৃদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানদের রক্ষার ব্যবস্থা এরা করে, কিন্তু এই সংগ্রাম-সঙ্কুল জীব-জগতে বেঁচে থাকা বা শৈশব পার হয়ে আসা অতি অল্পসংখ্যকের পক্ষেই সম্ভব হয় । ইতর প্রাণীদের জগতে দেখা যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীজাতিদের মধ্যেই বেশী প্রবল । জনকের কবল থেকে সন্তানদের বাঁচাতে জননী ব্যাকুল হয়ে ওঠে । শিশুসন্তান নিয়ে সে কিছুকাল লুকিয়ে কাটায়—প্রাণিজগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয় ।

সন্তানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জীবের সত্তায় মেশানো রয়েছে ; বাইরে থেকে এ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে হয় না । সন্তানের জন্ম হলে স্বাভাবিক নিয়মে জনক-জননীর মনে এর স্ফূরণ ঘটে । তখন সন্তানকে অবলম্বন করেই এই আদিম প্রবৃত্তি একটি নূতন রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে । সন্তানলাভের পূর্বে অপত্যস্নেহ পুরুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না ; স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও একথা খাটে, তবে তাদের মন স্বভাবতই কোমল বলে এদিকে প্রবণতা বেশী এবং সন্তানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে সন্তানকে কোলে পাবার আগে থেকেই বাৎসল্যরসে তাদের মন স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে ।

অপত্যস্নেহ মাতৃহৃদয়ে কতকগুলি প্রবল প্রেরণা জাগিয়ে তোলে ; তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল সন্তানকে রক্ষা করার তীব্র বাসনা ও উত্তম । অসহায় কচি শিশুটি যেন তাঁরই দেহমনের একটি অংশ, যেন তাঁরই অভিনব সৃষ্টি । এটিকে বৃকে জড়িয়ে ধরে, স্তন্যপান করিয়ে তাঁর পরিতৃপ্তি । স্তন্য-পায়ী শিশুটি একান্তভাবে যে তাঁর উপরই নির্ভরশীল এ ভাব নিজের অজান্তসারেই জননীর মনে গর্ভমিশ্রিত পুলক-শিহরণ সঞ্চার করে । সন্তান স্ত্রী, কি কুৎসিত, স্ত্রীম কি অজহীন এ সব বিচার করে মাতৃস্নেহ কম বা বেশী উৎসারিত হয় না । জননীর স্নেহকাজল মাখানো চোখে সন্তানমাংসেই অপূর্ণহৃদয়ের দেবদূত ; এদের মঙ্গলকামনাই তাঁর অন্তরের নির্ভাকার জপমন্ত্র । সংকুত সাহিত্যে

সন্তানের প্রতি নির্মল উদার আশীর্বাদ শুভে পাই কবির
কথায়—পুত্রনামা আত্মা অসি স্বঃ জীব শরণঃ শতম্।
তুমি আমার আত্মা, পুত্ররূপ ধরে এসেছ; তুমি শতবর্ষজীবী
হও।

পিতৃস্নেহের বৈশিষ্ট্য

সন্তান যখন অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে থাকে তখন
ক্রমে ক্রমে তার উপর মাতৃস্নেহ কমে আসে। জীব-
জগতের এই নিয়ম। শিশু স্বাবলম্বী হয়, তাকে পালন
করার, রক্ষা করার দায়িত্ব আর জননীর উপর থাকে না।
স্বস্থ সবল আত্মনির্ভরশীল সন্তান অপেক্ষা দুর্বল, কণ্ঠ,
আত্মশক্তিহীনতার প্রতিই মায়ের স্নেহ স্বভাবতঃ প্রবলতর
ভাবে প্রবাহিত হয়।

পিতৃস্নেহের স্বরূপ কতকটা ভিন্ন। অসহায় ক্ষুদ্র শিশুকে
শেখে তার প্রতি জনকের সমতার উল্লেখ হয় সত্য, কিন্তু
তা জননীর স্নেহের মত এত প্রবল এবং সক্রিয় নয়। পুত্রের
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পিতার স্নেহ তাকে অব-
লম্বন করে নানা বৈধে উঠতে থাকে; পিতার আশা-
আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করতে
চায়। এই কামনার মধ্যে দুইটি ভাবের মিশ্রণ ঘটে—
নিঃস্বার্থভাবে পুত্রের কল্যাণ কামনা ও আত্ম-অহমিকা
পরিভূষ্টির কামনা। পিতৃস্নেহের মধ্যে এই দুইটি কামনা
এমন ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে যায় যে, পিতা ক্রমে পুত্রকে
নিজ থেকে অভিন্ন করে ভাবতে থাকেন। পুরুষ কারও
কাছেই পরাজিত হতে চায় না; তথাপি পিতা পুত্রের
কাছে পরাজয় কামনা করেন, তার কারণ পুত্র বিজয়ী হলে
সে বিজয়গৌরব তার নিজেরই। পুত্রের গুণগরিমার জন্য
তিনি যেমন আত্মতৃপ্তি অকৃত্রিম করেন, তার দোষত্রুটি এবং
পরাজয়ের গ্লানিও তাঁর বুকে সমান ভাবে বাজে। বিখ্যাত
মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেছেন :

... whatever is admissible about it (child) brings
satisfaction to his (father's) positive self-feeling;
whatever is defective humbles him, excites his negative
self-feeling; its shame or disgrace is his shame, its
triumphs are his triumphs.—William McDougall:
Social Psychology, p. 143.

অর্থাৎ, সন্তানের মধ্যে যা-কিছু প্রশংসনীয় তা পিতার
মনে আত্মগৌরবের সন্তোষ আনে, সন্তানের দোষত্রুটি
তাঁর আত্মগ্লানিকে হীন করে; সন্তানের লজ্জা ও
অপমান তাঁর পক্ষে লজ্জা ও অপমান, সন্তানের সাকল্যে
তাঁর সাকল্য।

পুত্রকে অবলম্বন করে পিতৃস্নেহ এবং পিতৃহীনতার
বাসনা মূর্ত হতে চায়; প্রয়োজন হলে পুত্রের সঙ্গে একই

দুঃখসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুত্রের সমদুঃখভাগী হতেও পিতা
সুস্থিত নন। বহুসাময় মনোজগতের এই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ
পুত্রস্নেহাত্মক ধৃতরাষ্ট্রের বেদনাক্লরু কণ্ঠে অনন্তকরুণীর ভাবার
রূপ দিয়েছেন। কপটদ্বারে রাজ্যলাভ করে দুর্বোধন
পিতাকে প্রণাম করতে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের যুধি-
ষ্ঠিরস্বারে দুর্বোধন ক্লরু হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে
বনবাসে বাণীর ইচ্ছা প্রকাশ করলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন :

হার বৎস অভিমাত্রী। পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি হৃকটোর
হৃদয়ের নিশ্বাসকা,—হইত কল্যাণ।
অথমে দিগেছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর
এত স্নেহ।...
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা
দিশু তোর নিজ হৃদে ধরি তার কথা
অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে এলরতিমিরে
চলিমাছি।...

আসন্ন বিপদে

কটকিত কলেবর, তবু যুগ করে
ভরকর স্নেহে বন্ধে বাঁধি লয়ে তোরে
বাঁধুবেশে অন্ধবেশে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি যুগ যুগ অটহাসে
উদ্ধার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—

...

...

...

কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি হবে আর
শুধু হবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ আর নহে কেহ।

(গান্ধারীর আবেদন—“রবীন্দ্র-রচনাবলী”, মে খণ্ড, পৃ. ১১)

ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়তঃ রাজ্যের অধিকারী হয়েও শুধু অন্ধের
বিকলতার জন্য সিংহাসন থেকে বঞ্চিত। তাঁর রাজ্য-
লোভাত্মক স্বভাবের চিরবঞ্চিত কামনা পুত্রের সাকল্যের
ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। দুর্বোধন এই
অন্ধ পিতার ক্লরু কামনারই মূর্ত বিগ্রহ; পিতা এবং পুত্র
এদিক দিয়ে অভিন্ন।

গান্ধারী যখন ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে পাণ্ডী দুর্বোধনকে
ত্যাগ করতে আবেদন জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র তখন বললেন :

পাণী পুত্র তাক্সা বিধাতার,
তাই তারে তাক্সিতে না পারি,—আমি তার
একমাত্র, উদাত্ত তরুণ-মাতৃবাণে
যে পুত্র সঁপেছে অন্ধ তারে কোন্ গ্রাসে
হাড়ি বাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তবু তারে প্রাণপণে বন্ধে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক সাথে ঝাঁপ দিরা পড়ি,
এক বিনাশের তলে ভসাইয়া ধরি

অকাডরে, অংশ লই তার ছন্দ তির,
অর্থ কল ভোগ করি তার ছন্দ তির,
সেই তো সাধনা মোর,—

পিতা বখন শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে পুত্রকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে চেঁটা করতে থাকেন তখন থেকে পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ঘনীভূত হতে থাকে। পুত্রের সার্থক আত্মবিকাশে তাঁর চেঁটা, উদ্যম, স্বার্থত্যাগ তাঁকে নিবিড় ভাবে পুত্রমুখী করে তোলে। তিনি বেন কোন একটি বড় ব্যবসায় তিলে তিলে মূলধন নিয়োজিত করছেন। এর সাফল্য পিতাকে যেমন আনন্দিত করে তেমন আর করবে কাকে? তেমনই এর ব্যর্থতার বেদনা পিতার চেয়ে আর কারো বুকে এত নিদারুণ হয়ে বাজে না।

শিক্ষক হিসাবে পিতা

আমাদের নিজস্বের অভিজ্ঞতা থেকে জানি—কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও—পিতা নিজ সন্তানের আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না। এর কারণ এ নয় যে, তিনি সন্তানের শিক্ষায় উন্নতির জন্য আন্তরিক চেঁটা ও পরিশ্রম স্বীকার করতে নারাজ। আসল কারণ বরং এর বিপরীত। তিনি কামনা করেন তাঁর সন্তান ক্রম সকল বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠুক—পুত্রের সাফল্যে তাঁর অহং ভাব হয় পরিতৃপ্ত। সন্তান তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না

পারলে পিতার অহংবোধ আহত হয়; তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যে বিষয়টি তাঁর কাছে এত সহজ সেটি সন্তান কেন বোঝে না এবং এটুকু বুঝতে না পারলে সে কি করে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করবে এ চিন্তা তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই মনের আকাশে ঝিলিক দিয়ে যায়; অধীর হয়ে তিনি ছেলের বই খাতা ছুঁড়ে কেলে দেন আর না হয় মারমুখো হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ পিতার সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য; সন্তানের মঙ্গলের জন্য যিনি অতিমাত্রায় আগ্রহী তাঁর পক্ষে আরও বেশী প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে সন্তান যদি মোটামুটি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তো পিতা মনে করতে পারেন, তাঁর পুত্রের মত বুদ্ধিমান শিশু খুব কমই আছে। তাঁর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। পুত্র যদি পিতার এই মনোভাবের আভাস পায় তবে সেও মনে মনে গবিত হয়ে উঠতে থাকে। এতে ফল ভাল হয় না। স্নেহ ও শাসন এ দুটির মধ্যে মধুর এবং সুসমঞ্জস মিলন সাধিত না হলে সক্রিয় পিতৃস্নেহ অনেক সময় মঙ্গলের চেয়ে পুত্রের অমঙ্গলই সাধন করে বেশী। পুত্রের কল্যাণকামী পিতাকে একথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।*

— আবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "আপনারও তো ছেলেমেয়ে আছে" শীর্ষক প্রবন্ধের ক্রমানুবর্তন।

স্মরণীয়

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

স্মরণ্য আজিকে আপনার মনে তোমার নামটি প্রিয়,
পেরেছি তাহার অধির বাহুরী স্মরণ রমণীয়;
ভূমি কাছে নাই, দূরে চলে গেছে, তবু ত তোমার লাপি,
আপনার মনে তোমারেই ভাবি, তোমারি বিরহে আগি।

আমার হৃৎকাননে সেদিন যে ফুল ফুটিয়াছিল,
মোদের মিলন-সুখভির রেণু বাহারী লুটীয়া মিল,
তোমার আমার প্রেম-পারিজাত বেসেছিল বারা ভালো;
তারা আজি হার শূন্য আশার ব্যথার বিষেতে কালো।

আকাশে যে তারা আগিরা সেদিন দেখেছিল অনিমেষে,
মোদের দেহের কানার কানার সুধার পান্ডুলিকে,
আজি রজনীতে হুঁজিতেছি যথা, কোথাও না পাই তারে,
হারাণপ হাড়ি, অন্তল হুদীলে, ভূবারেহে আগুনবারে।

আমার হৃকের 'পরেতে বধন সেদিন আহিলে ভূমি,
অণু পরমাণু হয়েছিল লয় অঙ্গে অঙ্গে ভূমি';
অতহু সে প্রেম উহসি উট্টিছে তোমার মাথোতে প্রিয়,
দুকারেহে তারা, ওকারেহে ফুল, তবু ভূমি স্মরণীয়।



বাঁশী

শ্রীতারাপদ রাহা

বুড়টা হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেমনই যেন হয়ে গেল। মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে উৎকর্ষ হয়ে উঠল। বাসটা আরও বানিকদূর এসিরে এসে ধাবল। বুকের মাঝে অনেক দিন আগের তুলে বাওয়া একটা পুরানো বেদনা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল : একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। এবার স্পষ্ট শুনে পাচ্ছি তার সুর, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার রূপ আর চেহারা। সাতাশ আটাশ বড়কোয় জিন বৎসর বয়সের এক যুবক, কপালে ছোট একটা কাটার দাগ, কাঁখে সুলাম একটা বলে ভরতি নানা সাইজের মানা রকমের বাঁশী। বিক্রী করতে এসেছে নিশ্চয়, কিন্তু বিক্রীর কথা তার মনেও নেই। আশে পাশে তার যেসব লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে—তাদের মাঝে জেরে লোক হুঁচকার জন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাদের দিকে সে কিরেও তাকাচ্ছে না একবার—চক্ষু মুগ্ধিত করে দেখে উর্ধ্বদে ভাবের ভরস উৎকর্ষ করে সে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে।

বাঁশীওয়ালারা পথে কতই ত বাঁশী বাজিয়ে থাকে, কিন্তু কৈ মনটা ত ঠিক এমনি করে ওঠে না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী, তাই বলে কি ? না, তাও নয় : বংগীবদন কত বাঙালীরই ত বাঁশী শুনেছি, মনটাকে এমনি করে আচ্ছন্ন মুগ্ধিতপ্রার করে তুলতে পারে নি ত কেউ, তা ছাড়া শিল্পকে হেঁকে প্রাদেশিকতাকে বড় করে দেখবার মত মন ত আমার নয়।

চক্ষু দুটি বাপাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, বুকের মাঝে কেমন যেন একটা বেদনা বোঝ করছিল। এই সব অসুস্থতির সঙ্গে সঙ্গেই মন বিচার করে চলেছিল কেন এমন হ'ল, এ কি ? হঠাৎ মনে হ'ল, এই সুরটা—সুরটারই এই গুণ। ছেলেবেলার একটু-আধটু সঙ্গীত-চর্চা করেছিলাম, বুঝতে কষ্ট হ'ল না লোকটা আশোয়ারী বাজাচ্ছে, হাঁ, ঠিকই, আশোয়ারী নইলে মনকে এমনি উদাস করে তাসিরে নিয়ে যেতে আর কোন সুর পারে ? কিন্তু আশোয়ারীও ত আরও কত শুনেছি—কত বড় বড় ওতাদের রূপে, মনটা এতখানি অভিভূত হয়ে পড়ে নি ত কোনদিন।

আরও ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করলাম। হাঁ, আশো-
য়ারীর সঙ্গে আরও কি যেন বেশানো রয়েছে, ঠিক যে কি ধরতে পারছিলাম না, তবে আছে, তাতেই সুর যুঁজি এত মধুর হয়ে উঠেছে। হয়ত এ ছাড়া আরও কিছু আছে : শিল্পীর দৃঢ়, তার ভদ্রতা অথবা তার নিজের মনের গোপন কোন

বাণী, হয়ত এও সব নয়, এ ছাড়া আরও কোন কিছু বার ঠিক সন্ধান পাচ্ছি না আমি—

বাস ঠাঁট দিলে। চলতে শুরু করলে বাস। নিজের বয়সকে শত বিচার দিলাম মনে মনে : কিশোর বা যৌবনের প্রথম দিক হলে এই ডবল ডেকারের উপর থেকে বটাখট নক করে এক দৌড়ে নীচে মেঝে গিয়ে বাঁশীওয়ালার পাশে গিয়ে দাঁড়াইতাম।

বাঁশীর সুর ক্রমে আমার শ্রবণের আরম্ভের বাইরে হয়ে গেল, কিন্তু মনের মাঝে সে তখনও ভরস তুলছে। সেদিন রাঙে তরে কারও সাধ একটু কথা বলতে পারি নি—অনেক-
কণ পর্যন্ত মুগ্ধে পারি নি।

এর পর থেকে মহানগরীর পথে ট্রামে-বাসে যেতে বাঁশীর সুর কানে গেলেই লোকটাকে খুঁজি। সুর শোনার পর অবশ্য আর লোক বোঁকার প্রয়োজন থাকে না, কারণ মন কানে ও সুর শুধু একমনের বাঁশী থেকেই বেরতে পারে। তাগ্যচক্ষে আর একদিনও বাসে আসতেই লোকটার দেখা মিলল। ছুর থেকে বাঁশীর সুর কানে যেতেই বুঝতে পেরে-
ছিলাম—এ সেই। বাঁশীতে বাকছিল সেদিন পুরিমা, রাজি আটটার কাছাকাছি মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউটের নৃত্যদ-
কেনা বাড়ীটার সামনে। বাজীতে ডবল ডেকার ঠালা, বেশিকণ দাঁড়াল না বাস। তা ছাড়া প্রথম দিনের মত অতটা শিহরণও আগে নি মনে। বাঁশীওয়ালো অতটা আয়তারা হয়ে বাজাচ্ছে না সেদিন, বিক্রীর দিকে বেশ বানিকটা মন রাখতে হয়েছিল তার। বেশ একটু রাগ ছিল লোকটার উপর, কিন্তু তখনই বিচারবুদ্ধি এসে মনকে ধমক দিলে : যেতে হবে না ওর—রোজগার না করে কেবলি তোমার বাঁশী শোনাও।

বাসে আসতে আসতে আমি বেশ উপলব্ধি করলাম—
বাঁশী শুনে লোকটাকে আমি ভালবেসে কলেছি, আরও সুখলায় প্রেমের বিতীর স্পর্শ প্রথম স্পর্শের মত অত মায়ারক নয়।

আমার এই নৃত্য ম্যাগনেটটিকে আরও হুঁহিম পথে দেখলাম বাঁশী বাজাতে নয়—বিক্রী করতে। বাজনা হয়ত একটু আগে শেষ হয়ে গেছে, সেটা সম্ভবতঃ ওর পণ্যজন্মের বিজ্ঞাপন। শিল্পীকে ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে করনা করতে স্পর্শ-
কাতর মন মায়াজ হয়ে ওঠে, তবু লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ একেবারে যায় না।

একদিন রাত্রি দশটার কাছাকাছি—পড়িরাহাটার মোড়ে বাস থেকে নামতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুই থেকেই ওর বাঁশী শুধু ছিলাম—সেদিন বেহাগ বাজাছিল। বাগ মোড়ে থামতেই ওর বাজনা থেমে গেল : ‘কে একজন বাঁশীর দর-দস্তর করছে। শ্রুতগায় বাগ থেকে নেমে আমিও যন্ত্র-চালিতের মত এগিয়ে গেলাম’ কাছে। ক্রোতাকে দরদস্তর করতে দেখে ও বহু হেসে বললে, এক দামে বিকী তাই, এই সময় কি দর-কবাকবি করবার সুরসং পাবেন আপনারা ?

এই কথাগুলির মাঝে লোকটার শিকা ও কুচির বেশ বেশ বামিকটা পরিচর পেলাম আমি। হাসিটাও বড় মধুর, দাঁতগুলিও সুবিত্ত বকবকে। লোকটিকে এত কাছে পেয়ে কথা বলার আগে তার চোখে বুধে সর্কান্দে একবার ক্রত চোখ বুলাবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিলাম না। চেহারাটা এমন কিছু কল্পণের মত নয়—তবে সুন্দর। চোখে বুধে বুড়ির দীপ্তি, আর শিরশ্চিহ্নতার জৌলুস। গায়ের রংটা হরত একদিন করসাই ছিল, কিন্তু এখন তাহাটে। মাথার চুল ঘন এবং অনেক দিন কাঁচি পড়ে নি—তাই একটু দীর্ঘ, অবিত্ত। এসব দিকে তার খেয়াল আছে বলেই মনে হয় না।

যে ঘেলেট বাঁশী দর করছিল সে পাঁচ সিকে দিয়ে একটা ‘বি-ক্লুট’ কিনে দিয়ে চলে গেল। এর পরই আমার পালা। একটু লজ্জা করছিল। মনকে কয়ে বমক দিলাম, অত্যন্ত যত্নের মত বাঁশীও একটু সুর-বদল, বেহালা তুমি বাজাও, আর বাঁশীতেই এমন বোব করলে।...আগে অবস্ত আমার ধারণা ছিল বরস হুড়ি পেরুলেই আর কারও বাঁশী বাজান উচিত নয়। ঐ বরসের পর আমি দিকেও বাঁশী ছেড়েছি কিনা।

বাই হোক শিল্পের বোহাই দিয়ে মনে কোর এনে স্কোচ কাঠের কোম রকমে বলে বললাম, “G” আছে ?

উনারা না দুদার, বাবু ?

উনার।

আজ ও উনার। আর বেই বাবু—হুটো ছিল বিকী হয়ে গেছে, বলেন ও কাল এসে দিতে পারি।

কত দার ?

তাল বাঁশের তাল কিসিস করা বোটা ‘বি’ একটা হু’ টাকা পড়বে, আর অর্ডিনারি সাত সিকে।

বেশ, ভালটাই আনবেন—

লোকটা কেমন একটু গ্রাম সলজ্জ হাসি হেসে বললে, আমাকে আপনি বলছেন ?

বিসিত হয়ে বললাম, কেন, আপনি বলব না কেন, না বলবার কারণ কি ?

লোকটা আর একটু বিদর হাসি হেসে বললে, বড় কেউ বলে না কিনা, তাই বলছি।

না বলবার ও কোন সলজ্জ কারণ নেই—চেহারা দেখে মনে হয় আপনি ভজলোকের ঘেলে।

লোকটা কোম উত্তর না দিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

তা হাতা মনে হয় লেখাপড়াও কিছু করা হয়েছে—

বলেই একটু হকচকিয়ে গেলাম : আমার বাক্যবিতাসটা আপনি আর ছুটির মাঝামাঝি হয়ে গেল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা শুধরে নিতে বললাম, বেশ কোথায় আপনার—পূর্ববঙ্গে বোব হয় ?

গ্রাম হেসে লোকটা বললে, আজ্ঞে হাঁ।

আপন-পাপনে তেমন লোক ছিল না, কেতাও কেউ আসছিল না, সুতরাং আমার এই নুতন ম্যাপনেটের সঙ্গে পরিচরের এই সুযোগ। বললাম, আপনাকে আমি আপনও লক্ষ্য করেছি, বাজনাও শুনেছি। বৌবাঝারের ওদিকেও আপনি বাম।

আজ্ঞে হাঁ, কলিকাতার সর্কজই আমার বাতাহাত, সুবাবেও হাতে মাঝে বাই—

বুলার অহুমান আমার মিথ্যা নয়—লোকটা লেখাপড়া সত্যিই জানে। বললাম, হাঁ, একদিন ডবল ডেকারে আসতে বৌবাঝারের মোড়ে আপনাকে বাঁশী বাজাতে শুনেছি, আশোনারী বাজাছিলেন। বড় ভাল লেগেছিল আমার। ‘এমন বাঁশী আমি’—বলতে বাজিলাম ‘জীবনে আর তুমি নি’, কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম, ‘জীবনে কম শুনেছি’—

কথাটা শুনে দেখলাম ম্যাসের আবহা আলোড়িতও বুধটা তার একটু লাল হয়ে উঠল। হুজ করে চুই হুট অর্ধবৃত্তিত করে সে কাকে প্রণাম জানাল।

বুলার না এ আমাকে, না তাঁর শুককে, না কোন দেবতার উদ্দেশে। বললাম, বেশ শিখেছেন আপনি। এ কোন্ শুকর কাছে শেখা—না শুধু নিজের চোঁটাতেই ?

প্রথম পরিচরের আড়ষ্টতা ক্রমে কেটে আসছিল লোকটার। বললে, এ আমার বাবার কাছে পাওরা, বাবু। শিখেছি আমি অবস্ত নিজের চোঁটাতেই, কিন্তু প্রেরণা পেয়েছি, উত্তরাধি-কারহুজে পেয়েছি আমি এ বাবার কাছ থেকে। তিনি খুব শুণী লোক ছিলেন, প্রায় সব রকম বদ বাজাতে পারতেন, বাঁশী অবস্ত তিনি বাজাতেন না, বাজাতেন সব তারের বদ—রাগ-রাগিনী সবই তাঁর কাছ থেকে পাওরা। বাঁশী বাজানো আর বানানো অবস্ত আমি নিজের চোঁটাতেই শিখেছি—

এই সময় একজন বরিদার এসে দরদস্তর করে তরফ ফিদিট সময় আমাবের মঠ করে দিয়ে গেল,—কারণ বাঁশী সে ফিসলে না। বাঁশী না কিনে শুধু শুধু কথা বললে যদি ব্যাপারীর সময় মঠ করা হয়,—তবে আমার বেলাহও এ লজ্জা।—মনে হতেই একটা ডি-বাঁশী বের করতে বললাম লোকটিকে।

দাম কত ?

বেশ টাকা ।

পকেট থেকে টাকাটা বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, বাণীটার একবার এক কলি বাড়িয়ে দিন আপনি, আওয়ারটা একবার দেখে নি ।

কথাটা বলা হরত আমার ঠিক হর নি । লোকটী হু হুয়ে বাণীটা একবার বুখে তুলে নিলে । পরকণ্ঠেই মনে হ'ল—আকাশ থেকে আমার কানে বেন এক পখলা হুবাহুটি হরে গেল ।

বেশী ভয়ে চাওয়া উচিতও নয়, তার সুযোগও মিলল না । আর একটা ভলভেডকার এসে গেল, তা থেকে বাজী নামল এবং দুটি তরুণ এসে বাণীর দরদর হুকু করলে । নিজের বাণীটা হাতে নিয়ে, পরের দিন মোটা জি-বাণী আমবার কথা মরণ করিয়ে দিয়ে আমি সেদিনকার মত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিলাম ।

পরের দিন সন্ধ্যার লোকটির কাছ থেকে মোটা 'জি' কেমবার সময় তার নামটি ভেমে নিরেছিলাম । পুরো নামটা অবশ্য প্রথমে সে আমার বলতে চায় নি । প্রথমে বললে বি, গুহ ।

হেসে বললাম, এ ত ঠিক দেশের দস্তর হ'ল না—বংশের নামের চেয়ে বাপমায়ের দেওয়া নামটাই এখানে কদর বেশী—

সামান্য একটু স্কোচ—তার পরেই সলজ হাসি হেসে বললে, তৈরব গুহ ।

নামটা একটু সেকেন্দ্রে ভেবে হরত লোকটি স্কোচ বোধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল অত কথা । জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার জন্ম হয়েছিল বুঝি প্রভাতে ?

হাঁ, কি করে জানলেন ?

আর নাম রেখেছিলেন বুঝি আপনার বাবা ?

লোকটি আশ্চর্য হয়ে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে বললে, হাঁ, কিন্তু সব আপনি ঠিক ঠিক বলছেন কি করে বুঝি না ত ।

সেকবার জবাব না দিয়ে বললাম, বড় সুন্দর নাম রাখা হয়েছে আপনার, নামকাতার শিরজান আর কুটির প্রাংলা করতে হয় ।

কথাটা শুনে লোকটি ভেতর খুশি হয়েছে বলে মনে হ'ল না । ঙ্গ-হুট তার ইংগিত হুকে উঠল, বললে, কেম বদু ম ত ?

বললাম, আপনি এত সঙ্গীতচর্চা করেছেন আর এটা বুঝলেন না ? তৈরব হচ্ছে প্রভাতের একটা রাসের নাম, অন্য কথার বাক্য বলে তারো, প্রভাতের বন্দনার গুর—বিরহেবতার বন্দনা, বড় দিয়া গভীর এর রূপ ।

এক দুহুর্থে লোকটির বুকের বিরক্তি আর অবতির রেখা—গুলি নিঃশেষে হুছে গেল, বললে, তাই ত, এতদিন ত কথাটা ভেবে দেখি নি—

করেকটি মৃত্যু ক্ষেতা এসে ঠাঁড়িয়েছিল, আর বিশেষ কথা সেদিন হতে পারল না ; কথার প্রয়োজনও আমার ভেতর নয়, প্রয়োজন আমার ওর বাণী শোনা, আর সে-ও যে সে রাগ-রাগিণী নয়—সেদিনকার মত সেই আশোয়ারী—কিন্তু সে ত করমাস দিয়ে বেগানে সেগানে হতে পারে না, লোকটির সঙ্গে তাব রেখে একদিন তাই শোনার সত্তাবদাই হু তু বক করে রাখতে চাই ।

আর এই সত্তাবদাই আর একদিন আমার জীবনে কেমদ আশ্চর্য রকমে সকল হরেছিল সেই কথাই আজ বলব ।

তৈরবের সঙ্গে আরও দু-এক বার আমার অবশ্য দেখা হয়েছে, তার কাছ থেকে আদি আরও হুটো বাণী কিনেছি, আমার পরিচরও সে কিছু কিছু পেয়েছে, কিন্তু কোথার থাকে সে, সে খবর আর আমি রাখি নি ।

বিজয়ার হু'দিন পর একটা কলোনীতে গিয়েছিলাম প্রণাম করতে আর শ্রীতি জানাতে । সেখানে আমাদের করেকজন আত্মীয় আত্মা পেতে বাস করছেন । আত্মীয়-বাড়ীতে বৈকালিক জলযোগ সেরে এমিক-ওমিক একটু হুয়ে দেখছিলাম । এসব জায়গার হুহুতে আমার বেশ লাগে । বাইরের সবকিছু থেকে বকিত হয়ে কেবল আত্মপক্তি মাত্র সখল নিয়ে মাহু মিকেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যে আরোজম করছে তা দেখে সত্যিই আনন্দ লাগে । অথবা মাগরিক ক্রিমিতার খোলস-খসা বাংলার বিভিন্ন অঙ্গলের বিভিন্ন রূপের এক অপূর্ণ সমাবেশ এখানে দেখতে পাই ।

কিছুকণ এমিক ওমিক ঘোরার পর বাস-টপের সামনে এক চায়ের দোকানে চুকে পড়লাম । বাস আসতে একটু দেহী আছে—তা হাতা সন্ধ্যার দিকে বাসে ভিত্তি থাকে বুঝি । একটু দেহী করেই বাব ঠিক করেছিলাম । আসল কথা এখানে এই চায়ের দোকানে বলে লোকের কথা ভনতেও আমার বেশ ভাল লাগে । সুতরাং পেরালার পর পেরালা করে অভ্যস্ত ভিন চার কাপ চা আমার এখানে অনায়াসে চলতে পারে ।

দোকানে বলে সবে প্রথম পেরালার চুহুক দিয়েছি এমন সময় 'ও নয়ন্দর'—বলে ঘরে চুকল কে । কঠোর বেন পরিচিত । চেয়ে দেখি তৈরব । বুখ থেকে অবনি বেরিয়ে গেল—আরে আপনি ।

তৈরব আমার দিকে চাইতেই খুশিতে উজালিত হয়ে উঠল তার বুখ । সঙ্গে সঙ্গে তার বুখ থেকেও বেকল—বাহু, এখানে ।

তৈরবের বুখে বাহু কথাটা অবশ্য আমার ভেতর ভাল লাগল না । তার সঙ্গে বত পার্শ্ব্য আমি রাখতে চাই, অথবা

আমার বিচারমতে বতৰী পার্শ্বক হওয়া উচিত, বাবু কণাঠী যেন সে সব ওলটপালট করে দেয়। তবু তখনকার বত কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে বললান—হাঁ আমার কয়েকজন আত্মীয় থাকেন এখানে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলান—বিজ্ঞানার পর—

তৈরব মিমতির সুরে বললে—তা বাবু আমার ওখানেও একটু পারের খুলো নিতে হচ্ছে যে, আপনি এসে দোকানে—
বললান, তা কি হয়েছে—এখানে আমার বড় ভাল লাগে। ...আপনার বাতীও এখানে বুঝি ?

তৈরব হাসল : বাতী আর কি করে বলি, বাবু, একটু মাথা গুঁজবার স্থান করে নিয়েছি।

দোকানের দ্বারে আর প্রাণ ধুলে কথা বলতে পারছিলান না তৈরবের সঙ্গে। চারের দাম মিটরে বাইরে আসতেই তৈরব আবার চেপে ধরল, চলুন বাবু—কাছেই আমার বাতী—পেরেছি বনম আপনাকে, কিছুতেই ছাড়ছি না।

তৈরবের আন্তরিকতার মুখ হছিলান আমি—কিন্তু তেবে পাছিলান না—এমন কি পেয়েছে সে আমার কাছ থেকে যাতে সে আমার এমন তক্ত হরে উঠতে পারে। যাই হোক—তৈরবের আস্থানে ‘না’ করতে পারলান না, তা ছাড়া মনে মনে কৌতূহলও হরত ছিল—বাতীতে কি জীবন সে বাপন করে তা দেখতে।

গতিয়াহাটা যেন রোড ছেড়ে গলিতে চুকে তৈরব আর এক বার বাবু বলতেই আমি বমক দিয়ে উঠলাম—দেখুন তৈরববাবু, আপনি তক্তলোকের হলে লেখাপড়া জানেন—আমাকে এমন বাবু, বাবু—করা আমি পছন্দ করি না। আমার পরিচরও আপনি পেরেছেন—তখন কিছু হোমরা-চোমরা আমি নই। দরকার হলে আমাকে কল্যাণবাবু ডাকতে পারেন—আর যদি বেশী আপনার বলে মনে করতে পারেন—তা হলে দাদা বলতে বাবা দেখি না।

বেশ, তা হলে আমাকেও আপনি বলবেন না আপনি, শুধু তৈরব বলে ডাকবেন—আমি শু আপনার কত ছোট।

আচ্ছা, তাই হবে।

মনটা খুশি তরই উঠল : তৈরবের সঙ্গে এই রকম অন্তরঙ্গতাটা চাইছিলান আমি। কিন্তু একটু পরেই মনটা আমার আবার হঠাৎ বিচড়ে গেল—বনম কানে এসে তৈরব ডাকছে—দাদু, ডাইনে—এইবার এইদিকে কিরতে হবে আমাদের।

মদের উদ্দা আর চেপে রাখতে পারলান না—বললান, দেখ তৈরব, এই দাদু, দাদুটা বিজী লাগে আমার কানে, তুমি আমার কল্যাণ-বা—অথবা শুধু দাদা বলে ডাকলে খুশি হবে।

তৈরব আমার উপর রাগ করলে কিনা কে জানে। কথা

বললে সে একেবারে বাতীর সামনে এসে : এসে দেখি, দাদা, আপনি এক সেকেন্ড দাঁতান—দেখে আসি আমি কি অবস্থার কাছে।

বেশীকণ দাঁতাতে হ’ল না আমার—প্রায় পরকণেই কিরে এসে কেমন একটু হেসে বললে, আহুন দাদা, আহুন—

হাসছ যে।

আর বলবেন না—কাপড়টা পালটাতে বলছিলান—তা ও কিছুতেই শুদলে না, বলে—বেমন আহি তেমনই থাকব—কাপড় পালটানো শু আটকিসিয়ালিট—

আমিও হাসতে হাসতে ওদের বয়ে চুকলাম। চুকেই থাকে দেখলাম তাকে দেখেই কারো বৃত্তে অনুবিধা হয় না—তৈরব এরই মুখের কথাটা হবহ আনুভূতি করে তুমিয়েছে আমার অর্থাৎ ইংরেজী শব্দটিও এরই উচ্চারিত। দেখেই মনে হ’ল আর মরলা কাপড় পরে দেবী সরস্বতী দাঁড়িয়েছেন আমার চোখের সামনে।

মুখে মধুর মিত হাসি। হাত কোঁচ করেই মমতার করলে ঘেরেটি। প্রতিমমতার করলান। তৈরবের সঙ্গে তুমি বলে কথা বলতে শুরু করেছি, কিন্তু বরসে এত ছোট হলেও রীতিমত তাবতে হয় এর সঙ্গে কথা বলতে মধ্যম পুরুষের কোমল শব্দটি ব্যবহার করা উচিত—শিলা এবং কুচির এমন একটা দীপ্তি রয়েছে এর মুখে।

তৈরবের দিকে চেয়ে বহু হেসে বললান, তৈরব, আমার এ ছোট বোনটির নাম কি ?

ঘেরেটি হাসল। বড় মধুর সে হাসি। সে-ই অবশ্য দিলে, আমার নাম শান্তি।

শান্তিই বটে—মনে মনে তাবলাম আমি : চারদিকে তখন দ্রুত একবার চোখ ঘুলিয়ে নিয়েছি আমি। স্বাণীগঞ্জের টালি ছাওয়া বাঁশের বেড়া বেওয়া ছোট বরখানির এক পাশে এক তক্তপোষে শান্তিতত্ত্ব একটা বিছানা পাতা—তারই দীচে একটা বলচৌকীতে সোনার বত করে মাঝা মাঝা বতী বাটী গেলান, বক্ককে পেয়লা ভিশ। বেতার গারে ছাদ থেকে একটা খুলাম বাঁশের আলমার আবহরলা ও করলা করেকটা জামা কাপড় লাড়ী রাউজ সারা। বেরিকে তক্তপোষ তার উঠো দিকে একটা ছোট বেঞ্চে ঢাকনা দেওয়া একটা হারমোনিয়ামের বাজ ও একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরে একটা টাইমপীস্, আর ওদিককার দেয়ালে ঢাকনা দেওয়া একটা সেতার খুলামো। ওদিকে মজর পড়তেই বলে বললান, বউমা বাজান বুঝি ?

শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এই যে একটু আগে বললেন, আমার বোন, বলে বহু হাসল।

বোন আর বউমাকে তাকাং কি আছে ?

তা আছে বই কি—বউমা বললে ঠুঁর সম্পর্কটাই বড় হয়ে ওঠে, আমি হয়ে বাই ছোট।

ওঃ—

বলে হো হো করে হেসে উঠলাম—হার মানলাম দিদি।

শান্তি বললে, আর একটা ছল করলেন দাদা, আমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ‘বাকাম’ বলা আপনার উচিত হয় নি, বলা উচিত ছিল, বাকার; বোনের সঙ্গে আপনি আপনি করে কেউ কথা বলে না।

তুমি মনটা যেমন ছুঁড়িয়ে গেল, বিশ্ববোধ করলাম ততোধিক। হেসে বললাম, হার মানতে হ’ল, বোমট।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তৈরব হাসতে হাসতে বললে, হার মানতেই হবে আপনাকে, উনি যে সরবতীর মানসকতা, যুক্তিতে পেয়ে উঠবেন না ওর সঙ্গে, আমাকে কথার কথার—

জা কুঁচকে অপার দৃষ্টিতে শান্তি শাসন করলে তৈরবকে, তার পর আমার দিকে চেয়ে বিহ্বান দেখিয়ে বললে, বহুদ, দাদা আপনি, আমি একটু চারের জল চাপিয়ে আসি—

তৈরব অবনি ট্রান্সি কাটলে, দাদা, দাদা ত করছ, কিন্তু এদিকে যে হাত কোঁচ করে মমকার করলে দাদাকে, বিজয়ার পরে একটা—

শান্তি অবনি লজ্জা পেয়ে ছুটে এসে পারের কাছে এক সতর্ক প্রণাম করে গেল।

শান্তি বারান্দার চারের জল গরম করতে গেল, আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, শান্তি গাম বাকনা হুই-ই জানে বুঝি?

তৈরবের চোখ বুখে যেন একটু লাল ভাতা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, বললে, গাম বাকনা মোটামুটি এক রকম সবই জানে, তবে সবচেয়ে বড় কথা, সুরের একেবারে পাগল। একটা ভাল সুর শুনে একেবারে কাঁদতে বসে যাবে।

বারান্দা থেকে বাকার এল, দেখ, ভাল হবে না বলছি—

তৈরব যুহু হেসে উত্তর দিলে, না না, ও সব আর বলছি না আমি। তার পর আমার দিকে চেয়ে অহুচ কণ্ঠে বললে, ওর পরিচয় শুধু এইটুকু নয়, লেখাপড়া ওর কাছে বসে দশ বৎসর আমি শিখতে পারি : ও এন্ট্রয়েট আর আমি আই-এ অবনি পড়েছি—

শান্তি এবার অলভ একথানা কাঠ নিয়ে উঠে এল, দেখুন ত দাদা।

আমি হেসে উঠলাম, না না, শান্তি ভুলি কিরে বাও, আমি ওকে শাসন করে দিচ্ছি : একজন এন্ট্রয়েট করুনও একজন আই-এ পড়া হেলেকে দশ বৎসর পড়তে পারে, বত সব ইয়ে—

‘আপনিও ওর পক্ষ নিলেন’—বলে অভিমানের কান্নার সুর নিয়ে শান্তি বারান্দার কিরে গেল—

আমি হাসতে হাসতে তাকে সাহুনা দিতে বারান্দার বেরিয়ে এলাম। দেখি শান্তি হেঁট হুখে উল্লসের গারে বলে সত্যিই কাঁদছে—

বিশ্বের আমি ওকে সাহুনা দিতে তুলে গেলাম, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি আছ যেন একই বগ্নলোকে এসে গেছি, অথবা সত্যিই বগ্ন দেখছি।

করেক সেকেন্ড পর আমি আমার পূর্ণস্বিং কিরে গেলাম, ওকে সাহুনা দিবারও কিছু নেই, ও ত এ হুখের কান্না কাঁদছে না। ওর কান্নার মূল কারণ যন রহতে আবৃত।

এই বার ওর উল্লসের দিকে মজর পড়ল। আল দিচ্ছে ও পাহাড়ে ভরল বাঁশের কুচি দিয়ে, যে বাঁশ দিয়ে তৈরব তার বাঁশি তৈরি করে। বারান্দার অপর পাশে পাঁচ-ছয় হাত লাগির মত লম্বা ঐ বাঁশেরই বোকা বাঁধা রয়েছে।

শান্তির এ কান্নার আমার কিছু করবার নেই বুকে আমি বেকুবের মত আবার ধরে কিরে এসে বললাম। তৈরবকে লিজাসা করলাম, আছ আর বেরোও নি—না?

না। লক্ষীপুজোর আগে আর বেকুব না। এ সময়টা আমাদের দেশে আজীবরকনেরা সব দেখাভানো করতে আসেন—মিছেদেরও যেতে হয়।

হেসে বললাম, আমি, আমিও ত তোমাদেরই মত ও অকলেরই লোক।

কোথার বাঁকি ছিল আপনার?

বশোর।...শান্তির শিড়কুলের বাস ছিল কোথার?

তৈরব একটু গভীর হয়ে উঠল যেন : ঠুঁরা এইখানেরই লোক।

শান্তি বারান্দা থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না, দাদা না, আমাদেরও আমি নিবাস ছিল করিদপুরে।

করিদপুরে, কোথার?

দাদারীপুর সাবডিভিশনের রতনডালা।

রতনডালা। রতনডালার ত আমার মাতুলালর। রতন-ডালার কারা বল ত?

শান্তি বারান্দা থেকেই উত্তর দিলে, রতনডালার সমাতন বাঁড়ুকের নাম শুনেছেন? আমার বাবা তাঁরই বংশধর। সমাতন বাঁড়ুকে ছিলেন আমার প্রপিতামহ—

বিশ্বের মাদ্রা জমাই বেড়ে চলেছে : সমাতন বাঁড়ুকে। বাঁড়ুকে, আর এ দিকে হচ্ছে শুহ—ব্রাহ্মণ আর কারহ।

মিছেকে সামলে নিয়ে শান্তির কথার জবাবে বললাম— হাঁ, সমাতন বাঁড়ুকের নাম শুনেছি বই কি—তিনি ত ওখানকার ডাকসাইটে কমিয়ার ছিলেন। পরকণ্ঠেই একটু কৌতুকের লোভ সংবরণ করতে না পেয়ে তৈরবকে বললাম, তোমাদের তা হলে দেখছি এ ‘লাভ ম্যারেজ’, সবই ‘আর্টিষ্টিক’

তোমাদের—বলেই একটু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলাম। তৈরব তেরম গভীর হয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না।

আমিও এর পর—কি বলতে কি বলে বলব—তবে কিছুকণ চুপ করেই রইলাম। শান্তি পেলাম। নিতে বসে এল। নিচ্ছে হাতে তৈরি খাবার বের করলে। একটু পরে একখানা খালার উপর হু' কাপ চা আর এক প্লেট খাবার নিয়ে বসে এল। এককণ চুপ করে থাকার পর এবার আবার কথা বলবার সুযোগ পেলাম আমি। খাবারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে শান্তিকে বললাম, এ সব তৈরি করতে কাম ছুঁি ?

হু হাঙ্গল শান্তি : কিছু কামতাম, বাকী শিখে নিরেছি।

প্রথম দিন এসেই এদের অনেক কিছু খেয়ে নিরেছি বলে বোঝা হয় একটা অপরাহ্নের ভাব মনে চেপে বসেছিল। আলাপ বেশ সহজ হয়ে উঠছিল না, শুধু কোর করে শান্তিকে বললাম, আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বিরক্ত করতে চাই না, এর পর যেদিন আসব পান বাজনা শোনাতে হবে কিংবা।

শান্তির মুখ থেকে হেলেনাহুটির ভাব কেটে গিয়ে আবার সেই প্রথম দেখা স্মৃতির দীপ্তি আর পাভীর্ষ্য ফুটে উঠেছে। কোন রকম ভাওয়ানি না করে শান্তি কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, আসবেন, যেটুকু পারি শুভমতে চাইলে শোনাব বই কি, শুভমতে চাইলে তাদের গুহার বেড়ে বার আমি তাদের দলে নই।—বলে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তৈরবের দিকে চাইলে।

তৈরব অমনি কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললে, মিছে অপবাদ, কেম, শোনাই যে আমি তোমার বাণী ?

তা বটে।

অভিমানে কে খেদ ঝট করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

সাত্বে ম'টা বেড়ে গিয়েছিল। আর দেহী করলে বাস পাব না। শেষ বাসখানা ১-৪৫এ আসে। সুভরাৎ উঠতে হ'ল। হারিকেম বসে শান্তি আমার এগিরে দিতে এসে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে, আবার আসবেন দাদা—রবিবার সন্ধ্যার পর উনি বাকী থাকেন—

পান শোনাতে হবে কিংবা।

—বলতে বলতে এগিরে বাজিলার। শান্তি ওখান থেকেই বললে, শোনাব—আপনার লেখা বই দিতে হবে কিংবা আমার, নইলে আচ্চি—

কণ্ঠবরে আবার সেই বাসিকার সারল্য কিয়ে এসেছে। যেতে যেতেই হেসে উঠলাম : আচ্চা, আচ্চা সে হবে'ধন। মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল, আমার সম্বন্ধেও কিছু কিছু শুনেছে তা হলে তৈরবের কাছ থেকে। নিখোঁও বোঁদ-ধবর রাখে দিচ্চ, লেখাপড়া ত জানে।

তৈরব আমার সঙ্গে সন্দেই ছিল—এগিরে দিতে এসেছিল।

বাসে উঠবার আগে তাকে বলে এলাম, লামনের রবিবারে নয়, এর পরের রবিবারে আবার আসব।...বড় আমনে কাটল তোমাদের এখানে—

তৈরব প্রচ্যুতরে বললে, আমাদেরও যে কত আনন্দ হ'ল এখন বোকাতে পারব না—পরে এলে বুঝবেন। আসবেন দাদা—

আসব—

বাস ছেড়ে দিলে। এদের এখানে বা যেখে পেলাম—সে রাজে তারই স্মৃতি আমার একটা পানের সুরের মত অভিভূত করে রেখেছিল।

নির্দিষ্ট রবিবারে ওদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের লেখা ছাড়া বই দিয়ে এসেছি—শান্তির পান বাজনা শুনে এসেছি। তৈরবকে বাণী বাজাতে বললাম, সে কিছুতেই রাজী হ'ল না, বলে 'হুড' দেই দাদা।—শান্তির পানের সঙ্গে অবশ্য সে বাণী বরেন্ছিল, কিন্তু তাতে ঠিক তৈরব গুহের সেই বাণীর সুর আসে না।

কবে তার হুড আসবে সেই আশার প্রায় প্রতি রবিবারেই ওদের ওখানে যাওয়া সুরু করলাম। তা ছাড়া ওদের হু-কমকেই আমি দস্তুরমত ভালবেলে ফেলেছিলাম। তাদের এই অদ্বৃত্ত রহস্তময় জীবনও আমার কাছে কম আকর্ষণের ছিল না। বড় দিন বাজিল ভতই খেদ আরও বেশী রহস্তময় হয়ে উঠছিল।

এদের জীবনের অনেক কথাই আমি বীরে বীরে খেদে নিরেছি। এদের বিরেষ্ট' যে অসবর্ণ লেখা অবশ্য আমি প্রথম দিনই বুকে গিরেছিলাম, কিন্তু শান্তির দিক দিয়ে সে যে কি হুঃসাহসিক সাধনার সিদ্ধি তাবলে অবাক হতে হয়। আমারই মত সেও তৈরবের বাণী শুনেই প্রথম আকৃষ্ট হয়—আকৃষ্ট হয় বললে হরত কিছুই বলা হয় না—সে একেবারে পাগল হয়ে যায়। প্রথম দিন তৈরবের বাণী শুনে ড্রাইডারকে বলে সে মোটর বামিরে শুক হয়ে বসে থাকে। সে রাজে নাকি হুহুতে পারে নি। পরে সন্ধ্যার পরে বেড়াবার ছলে মোটর দিয়ে সে পথে পথে তৈরবের বাণী শুনার জন্যে ঘুরে বেড়াত—কোন দিন তাগো বাণী শোনা ভুঁত, কোন দিন বাণী বিজয়-রত তৈরবকে সে ঘুর থেকে বেখেই কিয়ে যেত।

বড় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্ণের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শান্তির বাবা প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকতেন। শান্তি আর তৈরবের মধ্যে কি করে যে আলাপ পরিচয় এবং পত্র বিবির সুরু হ'ল সে অনেক কথা। নির্দিষ্ট ছবার পর প্রায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পত্র লেখার পালা চলে। তৈরব জানিরেছিল তার দৈতের কথা, শান্তি তার উত্তরে বসেছিল, ওলব কোনো

কিছুই বরকার দেই...শান্তি একদিন তৈরবকে সিঁড়ি মায়েক
এই অহুসারে বিরে করে বলল।

বিরে হয়ে বাওরার পর মিঃ ব্যানার্জি প্রবাসে শান্তির চিঠি
পেলেন—বাঁবা, ভালবেসে আমি এক সুর-সাধককে বিরে
করেছি। রাগ করো না—আশীর্বাদ করো আমার। বেন সুখী হই।

মিঃ ব্যানার্জি পাকা লোক। অতঃপরে সে পেলেন বাইরে
বিরণ ভাব দেখান মিঃ তিনি। জামাইকে নিজের কার্ণে
চাকরি বিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কি কারণে
বুললাম না তাঁর সে চেষ্টা সকল হয় মি। ব্যাপারটা
খাম্বাচী রহতের মতই হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। আর
আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে, এদের সব কিছুই রহতমর।

ওদের জীবনের কোন কথাই ছোর করে জানতে চেষ্টা
করি মিঃ আমি। এক দিন হঠাৎ কেন জানি না, সেই দুর্ঘটনা
হয়ে গেল। সে রবিবারে কলোনীতে আমার সাবক আদ্যীর-
বের সঙ্গে দেখা করে একটু সকাল সকাল এসে গিয়েছিল।
ওদের ওখানে। তৈরব সবে মাত্র বাঁকী ক্রিয়ল আর শান্তি
বেরিয়েছে বাঁকার করতে। ওদের হৃৎকমের কাছেই ঘরে
চুকবার আলাদা চাবি থাকে।

তৈরব আমার ভেত্রে নিজেই চা তৈরি করে বিরে এল।
চৌরনী থেকে কিছু কাঁচু বাঁদার কিনে এনেছিল তৈরব;
শান্তি না কি এ বেতে বড় ভালবাসে।

বাঁদার সহযোগে চা খেতে খেতে হঠাৎ বলে বললাম,
শান্তি তা হলে কাঁচু বাঁদারের কথা কুলতে পারে মি?

তৈরব হেসে উঠল : না।

সুযোগ পেয়ে বললাম, আচ্ছা, তাই, একটা কথা আমি
প্রাইই জাবি, কিন্তু ঠিক বুকে উঠি না।

তৈরব বিজ্ঞাপ্ত মেয়ে তাকাল।

কথাটা হচ্ছে...মানে দেখতে পাচ্ছি শান্তি তার পূর্ব-
জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ্যের আদ্য একেবারে ভুলতে পারে মি,
অথচ এ সব ভোগ করবার সুযোগও তার ছিল। তোমার
বস্তুর না কি তাঁরই কার্ণে তোমার চাকরি দিতে চেয়েছিলেন,
সেটা মিলে ত আর—

তৈরব আমার সুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস
খেতে বললে, কি করব, বাঁবা, ও কিছুতেই রাজী হয় না, বলে
তা হলে আমি তোমাকে হারাণ, সে আমি কিছুতেই সহ
করতে পারব না। আগিলের বাবু বা বড় ব্যবসায়ীকে বিরে
করতে চাইলে ত আমি অন্যায়সেই করতে পারতাম। সে
ত আমার বরং নয়। যে রূপে তুমি আমার দেখা দিয়েছ—
সেই রূপকেই আমি চিরদিন আমার জীবনের প্রবর্তার করে
রাখতে চাই। তোমার অত সুখিতে কলনা করতে পেলোই
আমি মারা বাব—

অবাক হয়ে গেলাম আমি তৈরবের কথা শুনে। বললাম,
তাকে বললে না কেন, এ যে অতাবের জীবন, এ যে
মারিডোর জীবন।

মাম হেসে তৈরব বললে, সে সব বলতে কি কিছু বাব
য়েবেছি, বাঁবা—

কি বলে ও?

ও বলে, তাতে হুঃ কি, এ জীবন ত আমার বেচ্ছাযত।
ওর বারনা আমি অত কিছু করলেই ওর বরং ভেঙে যাবে,
আমি আর ওকে তেরমি করে বাঁশী শোনাতে পারব না।

কিন্তু এ জীবনেও ওকে ঠিকমত বাঁশী শোনাতে পার
কি, বা ক্লাস্ত হয়ে আস—

আবার মাম হাসি দেখা দিলে তৈরবের মুখে : পাতি
কি না জানি না—ভবে চেষ্টা করি—

কবে, কখন?

মামে একবার, পূর্ণিমার রাজিতে—রবিবার সন্ধ্যার ছাড়া
পূর্ণিমার রাজিও আমি বরের বার হই না, সেইদিন আমি
ওকে বাঁশী শোনাই, ও আমাকে—

বলতে গিয়ে একটু ধেমেল গেল তৈরব।

মামলে কেন, বল, বল—

আপনি বাঁবা, তবু আপনার কাছে আমারের পোপন
কিছুই নেই, সেইদিন ও আমাকে নিঃশেষে নিজেকে উজাড়
করে বিরে ভালবাসে, আর উন্মত্ত দিন ও আমার শুধু
অভিপ্রায় বন্ধ, সাধী—

কিছুকণ শুক হয়ে শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে
রইলাম। তার পর এক সময় নিশ্চিন্তা ভঙ্গ করে বললাম,
তাই তৈরব একদিন আমি তোমার বাঁশী শুনেই তোমার দিকে
আকৃষ্ট হয়েছিলাম—বহুদিন আমি তোমার সে রকম
বাঁশী শুনি মি—একদিন পূর্ণিমার রাতে শান্তির মত আমাকেও
শ্রোতা করবে তোমার বাঁশীর?

হাসল তৈরব : আপনার কোন অহুরোধে কি আমি
'না' বলতে পারি—

কি, কি অহুরোধ হচ্ছে বাঁবার? বলতে বলতে ঘরে
চুকল শান্তি। সহসা আমার কৌতুকবোধ বেগে উঠল—
বললাম, বলো না বলো না ওকে তৈরব, হঠাৎ আমার ওকে
একেবারে চমক লাগিয়ে দেব।

এর দিন পাঁচেক পরেই এক পূর্ণিমা পাওয়া গেল। মামের
পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় একটু পরেই আমি ওদের ওখানে গিয়ে
হাজির ছলাম। রাজির রাজা শান্তি আদ্যেই সেয়ে য়েবেছিল।
আমি গেলে শুধু আর এক বার চা করলে।

সবাই বেন কেনন পতীর। আমি নিজেও তেরমি দেই

কথা বলতে পারছিলেন না। বহুপ্রত্যাশিত দিনের আকাঙ্ক্ষার বেন মনে মেশা ঘনিরে আসছিল।

বাইরে সেদিন—‘ঢল ঢল কাঁচা আঁদের লাবনি অবনী বহিরা বার।’ আবারের প্রাণ ছিল—এই মধুর, ভরা ছোঁছোঁয়ার রেল লাইনের পাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে বাঁশী তবন, কিন্তু বিদ্যার মেবার আগে শিউটে। সেদিন আবার একটু বেঁকে পড়েছিল তাই প্রাণটো আবারের পালটে দিতে হ’ল।

পরম কাপড়ের শাটের উপর একটা জাম্পার এঁটে তৈরব খাটের এক পাশে একটা বুঁটতে তৈস দিয়ে বসল, আমরা বললাম তার অপর পাশে হুই কোণে। কথা বলছে না কেউ। তৈরব চুই চুই মুজিত করে বসেছে...বীরে বীরে এবার সে বাঁশীট তুলে নিলে মুখে। আবার পুরানো বুকটা স্পন্দিত হতে চায় বেন—শান্তির দিকে চেয়ে দেখলাম একবার সে হাত দুটো কোলের উপর তুলে নিয়ে ব্যানহ হয়ে বসেছে—

ঘরের সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সহসা বাঁশী বেজে উঠল। প্রথমে অনেক টানা টানা কেমন বেন এক কান্নার মত...না, না—কান্না বললে ঠিক হবে না, কেমন বেন মন উদাস করা, তাও নয়—কেমন বেন এক গভীর অহুতাপের সুর। বীরে বীরে সুর জলবে অঙ্গের হতে থাকলে বোকা গেল পুরবী বাজছে...

সারা দিনটা কেটে গেল—করবার মত কাজ কিছু করা হ’ল না, সূর্য উদিত হয়ে দিবা আলো বিকীরণ করে তাপ দিয়ে আবার-সবুজে মিলিয়ে গেল। এমনি করে আবারের জীবনস্বর্গাও অভয়িত হতে চলেছে, কিছুই যে করা হ’ল না জীবনে—জরটা যে বৃথাই কেটে গেল।

সুর উদাত হতে হতে এক সময় হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। বৃকে রইল শুধু তার কন্ডার।

কিছুকণ শুধু তব্বতা।

মিনিটখানেক পরে তৈরব আবার বাঁশী মুখে তুলল। এবারের সুরে—আগেকার সেই ভাবটাই যেন গভীর, আরও গভীর করে তুললে, তার সঙ্গে আরও কি যেন মেশানো আছে। সুবলার পুরিমা বাজছে...শেষে বাজল বেহাগ।

মিনিট পনের পরে বেহাগের কান্নাও শেষ হয়ে গেল...। তৈরব বাঁশী ধামিরে একবার শান্তির একবার আবারে মুখের দিকে চাইল। শান্তি মুগ্ধোখিতের মত ভক্তিত কণ্ঠে বললে, সেইটা—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—বৌবাক্যের মোড়ে যে সুরটা বাজিয়েছিল সেই—

কথা বলা আর আবার শেষ হল না,—তৈরব তব্বন চোখ বুজে বাঁশী তুলে নিয়েছে মুখে—কম্পিত বকে তাবতে লাগলাম, আবার মিনিট সুর বাক্যর যদি শান্তির লাগবে আবার, আর শান্তির ইমিতমত বাক্যর ত আমি পাব মনঃকণ্ঠ—

বেশীকণ তাবতে সময় পেলাম না। পরমুহুর্তে দেখি তৈরব আমার সেই অতিপ্রিয় প্রথম দিনের শোনা আশোয়ারী সুর করেছে। এক মুহুর্তের ভ্রত শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিরক্তি বা অসন্তোষের আভাস তাতে বিন্দুমাত্র নেই। পরমুহুর্তে শান্তির মত চুই মুজিত করে আমিও এক মহা আবির্ভাবের আশার দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে রইলাম। বাঁশী বাজতে সুর করেছে—সুদূর থেকে যেন কার আহ্বান আসছে। সংসারের সকল চাওয়া পাওয়া, সকল বাধন ছাড়িয়ে মেওয়ার আকুল আহ্বান। উদাস করা সেই পরম প্রিয় বেন ক্রমেই কাছে আসছে—বড় কাছে এসে গেছে সে। জগতের সকল বাধন বেন আলগা হয়ে যাচ্ছে, স্নানগুলি সব ধুলে ধুলে যাচ্ছে, এ কি হ’ল আমার, আর একটু হল সকল অহুতুতিও যে হারিয়ে কেলব আমি। বুকটা হুই হাতে চেপে ধরতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে শক্তিও আর নেই...মিঠুর বাঁশী বেজেই চলেছে—

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাঁশী বাজল। একটু স্থির হয়ে চেয়ে দেখি শান্তি তব্বনও আধা উন্মুক্ত হয়ে হুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, বাইরে চেপে রাখলেও অন্তরটা আমারও ঠিক অমনি কান্নার তুলে তুলে উঠছিল—তৈরবের দৃষ্টি শুধু বহির, ব্যানভিমিত।

সে রাত্রে বিদ্যার মেবার আগে ওদের সঙ্গে কথা বলা আর সম্ভব হ’ল না, মুখ থেকে বেক্সস শুধু, ‘চলি’—



অসুর জাতি

ত্রিশৈলেন্দ্রবিজয় দাসগুপ্ত

বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর অঞ্চল বহু আদিম জাতির বাসভূমি। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক কম পরিচিত এবং জনসংখ্যায় লঘু অসুর জাতি। অসুর নাম ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নয়, কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অসুরদের সঙ্গে এই অরণ্যবাসীদের কোনরূপ যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

রাঁচি ও পালামৌ জেলা এবং হরগুজা টেটের প্রান্তবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে ইহারা বাস করে। পল্লী বলিলে অবশ্য এগুলির গৌরবই করা হয়, কারণ অধিকাংশ পল্লী চার বা পাঁচ ঘর বাসিন্দা লইয়া গঠিত। এক ঘর লোক বলিতে সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা বুঝায়। এক পল্লী হইতে অপর পল্লীর দূরত্ব ন্যূনাধিক চার-পাঁচ মাইল এবং উচ্চতার ব্যবধানও স্থানে স্থানে এক হাজার হইতে দেড় হাজার ফুট। বাসস্থানের এই দুর্গমতা অসুর জাতিকে বর্তমান জগৎ হইতে এত দূরে রাখিয়াছে যে, উরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি পার্শ্বত্যা জাতিকে আমরা যে অর্থে অরণ্যচারী বলিয়া থাকি এই সব জাতি ও অসুরদেরও সেই অর্থে অরণ্যচারী বলা চলে। জঙ্গলের কলমূল আহরণ, বস্ত্র পশুপক্ষী শিকার, জঙ্গল কাটিয়া শস্তোৎপাদন, গোচারণ ইত্যাদি জীবনধারণের বাবতীয় কার্যে শৈশব হইতে বার্তব্য পধ্যস্ত জঙ্গলের সঙ্গেই ইহাদের ঘনিষ্ঠ সঞ্চ। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে স্থানীয় অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ইহাদের মিল অনেকখানি। তথাকথিত সভ্য মাহুঘের সমপর্যায়ে স্থান না দিলেও কঠোর সরল জীবন যাপনে রত এই মাহুঘগুলিকে জঙ্গলের পরিবেশে বেশ মানায়। “বনোরা বনে সুন্দর” কথাটি মনে হয় ইহাদের বেলায় খুব ভাল খাটে।

অসুররা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) বীর অসুর বা জাত অসুর এবং (২) সোইবা অসুর অথবা বিরঝিয়া অসুর। উভয় দলের জীবনযাত্রা-প্রণালী এক প্রকার হইলেও বীর অসুরেরা অনেকই প্রাচীন পদ্ধতিতে লৌহ নিক্ষেপন করে এবং বিরঝিয়ারা কেহ কেহ লৌহ নিক্ষেপন করিলেও জঙ্গল কাটিয়া পাহাড়ের গায়ে বেণ্ড চাষ করাই ইহাদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। ভারতের পূর্বদীর্ঘান্তে এই প্রকারের চাষকে জুয় চাষ বলে। এই দুই অসুর শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদির আদানপ্রদান নাই।

যে তাহার ইহারা কথা বলে পতিতেরা তাহার নাম

দিয়াছেন অসুরী ভাষা। মুণ্ডা ও সাঁওতালী ভাষার সহিত ইহার মিল অনেকটা। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অসুর আবার বুদ্ধবিনীতা ছোটনাগপুরী হিন্দীতে কথা বলিতে পারে।

বীর অসুর নিজেকে বিরঝিয়া অপেক্ষা বড় মনে করে। কারণ তাহার পূর্বপুরুষ “বীর অসুর” ঘোড়ার লাগাম তৈয়ার করিবার জন্য ভগবান ছদ্ম কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং অসুর ভগবান-ই বীরকে সেই প্রয়োজনে লৌহ নিক্ষেপন-প্রথা



একটি অসুর রমণী হুল ভূমিতে

শিখাইয়া দেন। বীর মুদ্রাঘাতে বড় বড় শ'লগাছ কুপাতিত করিয়া তাহা পোড়াইয়া কাঠ-কলস তৈয়ার করিত এবং তাহার সাহায্যে ছোট ছোট চুড়ীতে লৌহময় প্রস্তর গলাইয়া লৌহ নিক্ষেপন করিত। সেই লৌহ পিটাইয়া লাগাম তৈয়ার করিত এবং গলা লোহার পিণ্ডই তাহার খাদ্য ছিল। সেই আদি পিতা বীর হইতেই বংশপরম্পরাক্রমে লৌহ নিক্ষেপন-প্রণালী বর্তমান অসুরেরা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বখাবথ রূপ বাড়িয়াছে। এই সব মূল সিদ্ধ খাইয়াই এক-প্রকার চলিয়া যায়।

এ সকল ছাড়া প্রতি অম্ল-গুহেই পালিত শূকর, ছাগল, গরু, মুরগী ইত্যাদি দেখা যায়। চরম অস্ত্রাবের সময় ইহারাও কম সাহায্যে আসে না। বেঁহ কেহ আবার বাশের চুবড়ী, শাল, সেগুনপাতার কুড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করে। ঘরের কাজেও লাগে, হাটে বিক্রয় করিতে পারিলে মদ ক্রয় করিবার পয়সাও যোগাড় হইয়া যায়।



বিবাহযোগ্য অম্ল যুবক
(গলার ময়ূরপুঙ্খের হার)

হাটে বাওয়া ব্যাপারটা সংজ্ঞাধ্য কাজ নয়। কারও অম্লপত্রী হইতে ইহার দূরত্ব ছয় মাইল হইতে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় প্রতি হাটে অবস্থিত সরকারী ভাটিখানা পথম আকর্ষণের স্থান। তাই দেখা যায় কেহ কেহ প্রত্যাঘে হাটের উদ্দেশে বাজা করিয়া গভীর নিশীথে অথবা পরের দিন বাড়ী ফিরিয়াছে। অবশ্য এই সময়ের অধিকাংশই কাটিয়াছে পথ হাঁটায়।

মদ চোলাই করা নিষিদ্ধ কাজ। কিন্তু মহা মূল ফুটিবার সময় বোঁপঝাড়ে লুকাইয়া দুই-এক বোতল মদ চোলাই করিয়া রাখে না এইরূপ পরিবার কম। সারা বৎসর হাড়ভাড়া পশ্চিম করিয়া দুই বেলা যাত্রা পেরে উঠিয়া খাটতে পাবে না মদের নামে তাহারা সব ভুলিয়া যায়। মদ কেবল তাহাঁদের জীবনের কঠোরতার বিপরীত নয়, ইহা তাহাদের ধর্মজীবনের অপরিহার্য উপকরণ।

অম্লরতা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পথে জীব মৃত্যুপূর্ব আকৃতি লইয়াই পৃথিবীতে থাকে। দেহটিই কেবল হাওয়া-বাতাসের মত স্পর্শ করা যায় না। মৃত পূর্বপুরুষেরাই তাহাদের পরম আত্মীয় এবং তাহাদের নিমিত্ত প্রতি অম্লগুহে একটি প্রকোষ্ঠ পৃথক করা থাকে। তাহাকে "ওয়া ভিতং" বা ভিতর-ঘর বলে। এই ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি রাখা যায়, কিন্তু রাজে কেহ শোয় না। পরবে-পার্কণে গৃহকর্তা এই প্রকোষ্ঠে মুরগীর বাক্সা বলি দিয়া মদ পরিবেশন করিয়া মৃত পূর্বপুরুষগণের তৃপ্তিবিধান করে। তাহাদের বিশ্বাস জীবনের প্রতি মুহূর্তে মৃত পূর্বপুরুষেরা অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন সম্মতিগণের কল্যাণসাধন করে। ইহা ছাড়া অম্লরতা বিশ্বাস করে প্রতি গিরিশৃঙ্গ, গভীর জঙ্গল, নদীনালা, বড় গাছ, পর্বতগুহা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রত্যেক জিনিসেরই একটি করিয়া অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে। ইহাদের কেহ কেহ মাহুঘের শুভাশুভাচারী, কেহ কেহ শত্রু-ভাবাপন্ন, আবার কেহ কেহ বা নিরপেক্ষ। সেই জন্য এই সমস্ত দেবতার তৃপ্তার্থে সারসার অথবা "ভিতর-ঘরে" প্রতি পরব উপলক্ষে ছোট মুরগীর বাক্সা বলি দেওয়া হয় ও মদ নিবেদন করা হয়। সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অশুভদেবতা দুইটি— (১) বাঘুত ও (২) চুয়াইল। প্রথমটি ব্যাভ্রাচার নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মা এবং দ্বিতীয়টি মৃত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা। ইহাদের পরিতুষ্টির জন্য বইগা নামধের বৈভ



মৃতপ্রেরিত তৃপ্তিবিধানেরত বইগা বা পুরোহিত

বা পুরোহিত আছে—তুচ্ছতাক আছে। বস্তুতঃ মদ না হইলে এই সমস্ত রূঢ় হয় না। অথচ ভগবানই নাকি তাহাদের আদিপুরুষকে মদ তৈয়ারীর প্রণালী শিক্ষাইয়া ছিলেন। বেণ্ড চাষই ত ছিল তখন প্রধান উপজীবিকা। সেই বেণ্ড বড় বড় শলা উৎপন্ন হইত। এই শলার এক মূখ কাটিয়া রাণু (Ferment) সাহায্যে মদ তৈয়ার হইত।

চাউল, ভুট্টা, মহুয়া ইত্যাদি হইতে মদ তৈয়ারি করা
পরে শিখিয়াছে।

ভাষান্তর কার্যের উপর পরলোকবাসীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে
বিশ্বাস ইহাদের জীর্ণনে এত প্রগাঢ় যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদি
বাবতীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া
যায়। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাদির সংঘটন সমস্তার
সমাধান সহজেই হইয়া যায় মহাদেব ও তদীয় সহধর্ম্মিণী
পার্ব্বতীর কাহিনী অবতারণায়।

এত সব সম্বন্ধে আপাত দৃষ্টিতে ইহাদের সমাজ-বাবস্থায়
ক্ৰটি কমই লক্ষিত হয় নাই। পরিবারের কঠোর কথাই
সর্বোপরি। তাহার কথাই অন্যদের মানিরা চলিতে হয়।
আবার কয়েকটি পল্লীর বৃদ্ধ পুরুষদের লইয়া পঞ্চায়েৎ আছে।
পঞ্চায়েতে ঝগড়া, বিবাদ, অনায় কার্যাদির বিচার হয়,
শান্তিবিধান হয়—সমাজে থাকিতে হইলে এই বিধান
শিরোধার্য্য করিতে হইবে। আবার সামাজিক রীতি-

নীতির বিশেষ কোন ব্যত্যয় হইলে “কুটুম্বায়েৎ” ডাকা
হয়। অল্পর জাতির সমুদয় পরিবার হইতে বয়স পুরুষ-
প্রতিনিধির এই কুটুম্বায়েতে উপস্থিত থাকা নিয়ম। এই
সমাবেশে বাহ্য ঠিক হইবে তাহাই সমগ্র জাতির নির্দেশ
বলিয়া গণ্য হইবে। কুটুম্বায়েৎ আহ্বানকারী “লোটালাব”
আছে। সে এক লোটা জল লইয়া পল্লীতে পল্লীতে অল্পর
মাতব্বরদের আহ্বান করিয়া আসিবে। সমাবেশে বয়স,
বাকচাতুরী এবং আর্থিক অবস্থা বিশেষ প্রাধিক্যের বিষয়।
এই তিন বিষয়ে যে ব্যক্তি উচ্চ সে-ই এই সব সমাবেশে
নেতৃত্ব করে। সাঁওতালদের মত সুপরিচালিত সমাজ-
শাসকগোষ্ঠী ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও শত শত বৎসরের
সংস্কার ইহাদের মধ্যে জাতির প্রতি অল্পরগণ ও বস্ততা-
স্বীকারের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। স্তবরাং জাতীয়
সংহতিরক্ষায় ইহাদিগকে অধিক বেগ পাইতে হয়
না।

রাজগৃহ

ক্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভাষাপত, আজ এসেছি তোমার স্মৃতি-বিপ্লুত দেশে,
আবার কি ভূমি নুতন করিরা দাঁতাবে সমুখে এসে ?
স্নিগ্ধ শান্ত পতীর কণ্ঠে তোমার অমর বাণী
মনে হ'ল যেম ঘনিয়া উঠিবে, দূরেবে সকল গ্রামি।

সিরিহুজেরে গিরেছি আমরা পক পাহাড় ঘেরা,
সুহৃদ অতীত নিকটে এখনো যেথা করে ষোড়াকেরা।
ভীষ্মার্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ করাসন্দের পুরে
আসিল পোপনে কি ময়বেশে, কোন্ গিরিপথ ঘুরে।

বিবিলারের রাজধানী হেথা—রপের অধিপতি,
বুড়ের রাজশিল্প প্রদান, পরম বর্ণে মতি,
লভিল তাঁহার অপর করুণা দুপতি ভাগ্যবান।
গৃহকূটের নির্জন গুহা—সে যে পুণ্য স্থান।

এইখানে সেই অমিত্যত আসি বিতরিল উপদেশ—
অয়ত-ভারতী—শিখবর্ণে করিরা যে উদ্দেশ।
ভাঙেছি কি আমি ? মনে হ'ল যেম হেথা বেগুনে এসে
অনিভেছি বাণী বুড়ের পানে চাহিরা নির্নিমেষে।

অজ্ঞাতশত্রু রচিল প্রাকার—আজো যেম দুর্জয়,
কত যে চৈতন্য, কত স্পৃহ, হুগ-হুগায়ে নাহি কর।
যেথা বয়ে যায় ভিমিত ভপোদা দুর্গপ্রাকার-মূলে,
আবাস নিরেছি সেই মহুর সন্নবতীর কূলে।

জানের তীর্থ—হোথা মালিন্য বিশ্ববিভালর
লাঠা পৃথিবীর বিভাবীর চিত্ত করিল অর।
শ্রেষ্ঠ আসন—শীলভজের কোন্ শিলাসমধানি,
প্রাচীরে প্রাচীরে প্রহত আজো কি দীপকরের বাণী ?

প্রাচীন অতীত আজো জীবন্ত এই রাজগৃহ মাঝে,
কত সহস্র বর্ষ হেথার বৃষ্ঠ হইয়া আছে।
লক রপের চক্রচিহ্ন-অঙ্কিত রাজপথ,
মন্দের মন্দের গরিয়া তাহার আসিছে বগবৎ।

মহাবীর তাঁর বর্ষ প্রচার করিল হেথার এসে,
শত সাধকের সাধনার স্মৃতি বাতাসে বেতায় ভেসে।
বুড়, তোমার শরণ লইল কত রাজ-মহারাজ,
খাঁকডেছি সেই চরণের রেণু এই ধূলিকণা-মাঝে।

নন্দদা অঞ্চলে শারদীয় উৎসব

ঐঅমিতাকুমারী বসু

শরৎ এসেছে তার লোমালী আকাশ আর মিষ্টি বাতাস নিয়ে। চার দিক থেকে বেন আগমনী-স্বিতি ভেসে আসছে। মনটা হঠাৎ আমনে ভরে গেল, কিন্তু তার পরই এল অবসাদ, সুস্থর বাতোরার পাণ্ডববনে আমলমহীর আগমন হবে কি? মনে পড়ল সুকলা সুকলা শতভামলা বাংলামারের কথা। যদিও আজ রাক্ষসভিত্তিক কারণে বাংলা বিবর্তিত, বাংলার বুকের উপর দিয়ে বহু অভ্যাস, বহু রক্তপাত হয়ে গেছে, তবু সর্বহারা রক্ত বাঙালীর বুকেও কীণ হাসি ফুটে উঠবে।

কিন্তু এদেশে সে উৎসব নেই। শরতের প্রারম্ভে গণেশ-চতুর্থী এল, মহারাত্রীর আর হিন্দুস্থানীদের ঘরে ঘরে গণেশ-উৎসব জাঁকজমক করে শেষ হ'ল। তারপর দুর্গাপূজা। বিবস্বজী চলে গেল, লগুনী চলে গেল, অষ্টমীর দিন মনে হ'ল এক বার হুঁকে বেধতে হবে এ অঞ্চলে শারদোৎসবের কোম আভাস পাওয়া যায় কিনা। জামলায় এ সময়ে শহরের বাইরে সুস্থরে একপ্রান্তে ভবানীর মন্দিরে উৎসব চলে। একবালা ট্যান্ডি ভাড়া করে সেদিকে চললাম, শহর ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটল মন্দির অভিমুখে। শহরের দৃষ্ট ভেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অপরিচ্ছন্ন অলিগলির রাস্তাও অনেক আছে; শুধুতো অতিক্রম করে প্রায় রাস্তা ঘরে গাড়ী চলল। রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর টুকরো টুকরো কালো পাথর বসিয়ে তৈরি, বেয়ালের গায়ে সিরিমাটি দিয়ে বিবিধ চিত্র এঁকে রেখেছে, ঘরের চালে হুঁকটা কুমড়া পাছ, বিড়োপাহ লতিনে উঠেছে, হুঁচাট শিত এবার ওবার খেলছে, পরনে ছরত রাউজ খাবরা, মরত ইজের তুর্ডা। মন্দির-প্রাঙ্গণে গাড়ী এসে থামল। অর্ধ জলকীর্ণ হাঘের মধ্যে ছোটো-খাটো মন্দির।

মন্দিরের সামনেই দীপমালা। পাথরের একটি অচ্ছন্ন ভদ্র, তার চারদিকে দীপ রাখবার জন্ত হকের মত ইট বেঁধে রেখেছে। পূজার ও দেওরালীতে যখন এর ওপর প্রাণীপ আলাম হয় তখন বহু স্তম্বর দেবার—প্রীক বেন একটি আলোক-ভদ্র। চারদিকের অলংঘ্য মাটির প্রাণীপের আলোকশিখা হাওয়ার হলে অপূর্ণ শোভার সৃষ্টি করে।

ভবানী মন্দিরটি অতি পুরানো, ছোট ও বিশেষবহীন। মন্দিরমধ্যে কালো পাথরের ভবানীমূর্তি ঠাঁড়িয়ে আছেন। প্রবাহ, কালাপাহাড়ের আমলের এই মূর্তি—কালাপাহাড় নাকি দেবীর নাক কেটে দেয়। তখন থেকে দেবী “নাকটি ভবানী” নামে আখ্যাত হয়েছেন। দেবীর এই নামের কারণ লভ্য কিনা পুজারীকে জিজ্ঞাসা করার বললে, শুধুতো বলে কথা। বছরের

পর বছর দর্শকেরা দেবীর কপালে ও নাকে সিন্দূর হলুদ বসে আসছে, যথতে যথতেই দেবীর নাক কর হয়ে গেছে ও দেবী ‘নাকটি ভবানী’তে পরিবর্তিত হয়েছেন। দেবী নাকি বহু কাপ্রভা।

বিজয়া দশমী! বাংলাদেশে আজ মারের বিসর্জন। সারা বছরের প্রতীক, আশা আশ্বাসের অবসান করে আজ না পত্তিগৃহে রাজা করবেন। বিকেলের দিকে অবসর নেই, প্রত্যেক পুজামণ্ডপে মারের আরতি করে পাদবন্দনা হচ্ছে। তারপর বাতভাতের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে জগদ্ধমনীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল মদীতীরে। সারি সারি বহু স্তম্বর প্রতিমা ঠাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিসর্জনের জন্ত। চারদিকে ভিত, হৈ চৈ—শিতরা স্তম্বর স্তম্বর পোশাক পরে এসেছে বিসর্জন দেখতে। ছেলে বুড়ো সবক হৈ চৈ-এর মধ্যে দেবীকে বিসর্জন দিয়ে স্নান সুখে ঘরে করে। সমবয়সী সমবয়সীতে হয় কোলাহুলি, বড়দের করে প্রণাম। মারেরা সবাইকে মিষ্টবুধ করিয়ে আপ্যায়িত করেন। এই দিনে এই কণে সবাই ছুলে ঘর মনোমালিন্য হিংসা-বিষেয়।

কিন্তু এ অঞ্চলে আগমনীস্বিতিও নেই, বিহারস্বিতিও নেই, তাই মাতৃবিদায়ের সুস্থর্ভ মমকে বেদনার কল্পন করে তোলে না, তার পরিবর্তে এদেশবাসীরা আমনে দশেরা উৎসবের জন্ত তৈরি হতে থাকে। সুস্থর বাতোরার যে ৮।১০ বর প্রবাসী বাঙালী আছেন, তাঁদের মধ্যে ভৎপরতা দেখা যায়। শিতরা উৎসুক হয়ে ওঠে নৃত্যন জামাকাপড় পরে। সবাই বেরিয়ে পড়ে বাতী বাতী গিয়ে প্রবাসে মিলনকে রুপ্নর করে তোলবার জন্ত।

এ অঞ্চলের নিরশ্রোণীর অধিবাসী টমচ ও বন্ধুরা। এদের দশেরার দিনের বিশেষ উৎসব “ভুজরিয়া”। এদের প্রবাস দেবী হচ্ছেন শীতলা দেবী। শহরের বাইরে বটের ছাত্রার শীতলা দেবীর মন্দির। মারের পরিবারে শীতলা মাই-এর আবির্ভাব হয়েছে, মাদের মনোমত বিয়ে হচ্ছে না বা মারা নামাধিবা সাংসারিক অসুবিধার ভুগছে, তারা এই দেবীর কাছে আশ্রয় করে। “মওরাজের” সময় সবচুর্গা যখন বটে অধিষ্ঠিতা হয়, তখন এরা মিছেদের পুছাকনে কবি মিকিয়ে তাতে একটা নৃত্যন মাটির কলসী রাখে, তাতে সারমাটি, পোষর ইত্যাদি পূর্ণ করে গম বুনে রাখে। দুববার আগে গমগুলি করেকদিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, সারমাটিতে পড়ে শীতলা সেই তেজা গবের অছুরোপন হয় ও সেগুলি মর দিনের ভিতর স্তম্বর সবুজ ছোট কিশলয়ে পরিণত হয়। এই কটি কিশলয়-

তলিকে লোকচক্ষুর আভালে রাবণার ভক্ত একটি কাপড় পর্কার মত টাঙিয়ে রাখে। বীয়ে বীয়ে আত্মীয়স্বত্ব অভিধি অত্যাগত আসতে শুরু করে, উৎসব ভবে ওঠে। পর্কা সরিয়ে লোকে-দের এক পাশে বসতে দেওয়া হয়, তাদের গরের সবুজ চারা-গুলো দেখান হয়, এগুলোকে “ভুজরিয়া” বলে। ভোগ দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া হয়, পান বাজনা চলে, যে যে বাতীতে মানত করা হয়েছে সেই সেই বাতীর এক এক জন বরক পুরুষ বা মেয়ে নয় দিন উপোস করে থাকে—সুচু চা, হু, কল নামমাত্র খায়। খায় শরীরে দেবীর আবির্ভাব হয়, সে ভবন বাসারকম প্রায়ের উত্তর দিতে থাকে। নয় দিন পর দশেরার দিন মহা হু-ধাম করে তারা চলে শিভলা মার্দি-এর পূজা দিতে। মাদলের মত বাজনা বাজতে থাকে। ঘেরপুরুষ সবাই স্নান করে আসে। ঘেরেরা স্নান রতীন শাক্তী পরে পরমাপীঠতে সেজে গুজে বের হয়। চার জন বট বড় কলসীর “ভুজরিয়া” ছোট চারটি মাটির কলসীতে ভাগ করে মাধার তুলে নের। অত ঘেরেদের কারও হাতে হুচি থাকে তাতে হু বৃণ ছাড়াতে থাকে। কারও হাতে একটি থালাতে থাকে হলুদ, সিন্দূর ও প্রদীপ।

মাদল বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ সবাই শোভাযাত্রার বেরিয়ে পড়ে। খার উপর দেবীর তর হয়েছে সে বাজনার তালে তালে প্রবলবেগে নাচতে থাকে। বটরা “ভুজরিয়া” মাধার মিরে পান পাইতে পাইতে চলে, আর খারা মানত করেছিল সেই মেয়েরা রাজপথের উপর সাত্তাক প্রণাম করতে করতে শিভলা দেবীর মন্দিরে পৌঁছে। সেখানে দেবীর চরণে “ভুজরিয়া” রেখে পূজা দেয়। দেবাবিষ্ট লোকটিকে স্নান করার, ভবন তার শরীর থেকে দেবীর তিরোধান হয়ে খার—তারপর তারা ঘরে কিরে আসে।

বিকেলের দিকে রাবণ আলাদো উৎসব শুরু হয়। এটা হ’ল জনসাধারণের আমন-উৎসব। আমাদের বাতী থেকে প্রায় আশ মাইল দূরে একটি খোলা ময়দান আছে। সন্ধ্যার রাজপথটা বেঁকে তারি পাশে চলে গেছে, রাতার হ’ পাশে লাগি লাগি বড় বটগাছ তালপালা মেলে রাতাটিকে স্নানর স্মৃতিস্তল হারাকীর্ণ করে রেখেছে, সেই রাতা ঘরে চললে খোলা ময়দানে পৌঁছানি খার। সেখানেই মেলা বসবে ও লম্বার “রাবণ আলাদো” হবে। বিকেলের দিকে টাকার মোড়ার, হ’ল পাড়ীর বইলের গলার সুতুরের টুং টুং আওরাজ রাতা ব্রিহত করে তুলল। দলে দলে মেলে, বুকা, হুক, মারী লেহে রাবণ আলাদো উৎসব দেখতে। এদেশে সব আমন-উৎসবেই পুরুষদের মত ঘেরেদেরও অবাধ গতি। কত ঘেরের, কত বয়সের ঘেরে, তাদের পোশাকই বা কত রকমের। কট বা খাখরা ওড়না পরেছে, কেউ বা কাছা দিয়ে আঠারো পাঁচ শাক্তী পরেছে, কারও বা পরবে খালোয়ার পাঞ্জাবী। দেব অবিকাপ্শই পরেছে রংবেরঙের শাক্তী হিন্দুস্থানী প্রধার।

মাকে মাকছাতি বা মথ, কানে বড় বড় মোনা রপার ফুল, পায়ে মোটা মোটা পাইকোর, নির্দিতে লম্বা করে টানা তপতপে সিন্দূর, চোখে কাকল, পালতরা পান, মাধার রতীন ওড়না, মনে করিয়ে দেয় এরা অবাঙালী।

খানবাহনও বিচিত্র রকমের। বইল পাড়ীগুলি বড় সুদৃষ্ট। সবচেয়ে রকিত ছটপুট বইলগুলি টাকার মোড়ার অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ছোট একখানা কাঠের ভক্তা চার চাকার উপর বসে বসে বসান আছে, হ’পাশে লম্বা সুরু সুরু কাঠের কালি। রংবেরঙের ডোরাকাটা কাপড়, বা ফুলতোলা রতীন কাপড় দিয়ে হ’কিনারা ও উপরটা ঢেকে দিয়েছে, হু থেকে মনে হয় একখানা রতীন মোকা। পাড়ীর মধ্যে সত্তরকি বিহিয়ে, মত বড়ের বিচালী হুতিয়ে গায়ের বৌকিরা বসে উৎসব দেখতে এসেছে। আব কপাল ঢাকা মোমটার নীচে মাঝে মাঝে এক একখানা কোমল হুণ কখনও কখনও তেসে ওঠে। সেই হুণত্ৰী দেখলে অবাধ হতে হয়। গরীব চাষীদের বরংও কেমন স্নানর ঘেরে।

কোন কোন বইল পাড়ী দেখতে ভারী মজা লাগে। হ’ চাকার উপর সুদৃষ্ট একখানা রেলিং দেওয়া কাঠের ভক্তা বসানো, তাতে ছোট্ট খোকা জুতে আরোহী বরা ঘরে পাড়ী চালাচ্ছে, দেখে মনে হয় বেন অতীত যুগে কিরে গেছি।

উদ্বুদ্ধ প্রাণের মেলা বসে গেছে। মেলাতে স্নানর স্নানর কাগজের ফুল পাখী, কাঠের তলোয়ার, বাঁশি ও রকমারি মাটির খেলনা ইত্যাদি শিশুদের আমনবর্জন করছিল। মেলাপথে শিশুরা তাদের কচি কচি হাতে ওগুলো আকড়ে হাসিমুখে বাতী কিরছিল।

ময়দানের একপাশে একটা বরণার কীর্ণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে, তার পাশে একটা ছোট মন্দির, মন্দিরট হুমানকীর। ভিতরে খেত পাথরের তৈরি হুমান। সেই মন্দিরের একটু দূরে এক বিরাট স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভটি ৩০।৪০ ফুট উঁচু, আর তার পরিধিও প্রায় ১০।১৫ ফুট। স্তম্ভটির কাঠামো খালের তৈরি, তার উপর লাল নীল সবুজ কাপড় জড়িয়ে সুদৃষ্ট করা হয়েছে। এই বিরাট স্তম্ভটি হ’ল হুয়চাং রাবণের। দশেরার দিন রামচন্দ্রজী রাবণ বধ করেছিলেন, তারই স্তম্ভ-রক্ষার্থে বছরের পর বছর এই বিরাট রাবণ তৈরি করে দশেরার দিনে আলাদা হয়। বড় বর্ণক মেলাতে আসে সবাই তাতে ঢিল ছুঁতে আমন পায়। সন্ধ্যার সময় সুতুল তাতের ভিতর রাবণের স্তম্ভে আঙন দেওয়া হ’ল, লোকেরা পালিপালাজ করে আর ঢিল ছুঁতে তাদের মনের রাগ-বিষেব প্রকাশ করছিল। বছর থেকে রাবণের আঙনের হলুদা আর বোরা দেখা যেতে লাগল। হুণ হুণ ঘরে রাকসরাজ রাবণের কান্নকি স্তম্ভের অপমান করে আর হুয়দও দিয়ে উত্তর-তারতের জন-সাধারণ নীতানাই হরণের প্রতিশোধ তুলছে। এই অমৃতান

যেহেতুই বুঝা যায় রাজচক্রবর্তী আর সীতামাই-এর উপর জন-
সাধারণের কি এগারি ভক্তি আর বিশ্বাস।

উৎসব শেষ হলে হলে হলে হলে হলে আর পরিচিতির
‘চাঁদসোনা’ (অল্পম পাতা) দুটি ভরে নিয়ে এল লক্ষ্মীর
হাতে হাতে ‘চাঁদসোনা’ নিয়ে বিজয়ার সাহস সত্যকণ
জামাতে।

বাগোয়ার পুজার আমল ভবনও মেবে মি, তারপরই
এল কোকাদগরী পুর্ণিমা তার রক্তভক্ত কোকাদগরী হৃদয়ে।
এল অমাবস্যা, পাট আঁধারে মগ্নী ডুবে গেল, অবিবাসীরা
ঘরে ঘরে দীপমালা পরিবে মগ্নী আলো করে তুলল।
চারদিকে রোশনাই, পটকাবাঁজী, আভলবাঁজী, রক্তমারি
বাঁজী বাগোয়ার আকাশ-বাতাস বারুদে ভরে ফিলে। বড় বড়
মেঠেঘর আবাসগৃহ আর বোকামশাট আলোকমালা পরে
ফলফল করতে লাগল। রাতার রাতার ব্যাওপার্টের সুমিষ্ট
বাত শহর স্তম্ভরম করে তুলল, সন্ধ্যা সন্ধ্যা বোকামে
বোকামে জাঁজজরক করে পান সুপারির উৎসব চলল।
কল্যাণমগ্নী বোম্বের মেহবারার অভিজিত হয়ে তাইদোক
(জাত্মবিজীতা) উৎসবও শেষ হ’ল।

আবার এক দিন বিকেলে দামায়া বেকে উঠল, শিকার
আওরাজ কানে আসতে লাগল, আজ ঘোষের লড়াই।
আলপাশের গ্রাম বেকে চাষীরা ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা তাদের
খলিষ্ট মোষগুলোকে নিয়ে এসেছে ঘোষের টকরের
জন্ত। এবেশে বলে “হেলার টকর”, যানে ঘোষের
লড়াই।

এক-একটা ঘোষ ঘেঁষবার মত, ঘেঁষে ঘেঁষে সুপুট, মধুরকান্তি।
তাদের মালিকেরা ঘোষের কপাল মাথা হলুদ আর সিন্দুর
নিয়ে রঞ্জিত করে রেখেছে, শিংগুলো রং দিয়ে লাল করেছে,
ঘোষের কালো সূচসূচ রঙের উপর হলুদে আর লাল রং
দিয়ে অদ্ভুত চিত্র করে রেখেছে, এক-একটাকে দেখলে আতঙ্ক
লাগে, মনে হয় অগজমদীর হাতের বর্ণাঙ্কন হয়ে মহিষাসুর
খুঁবি বাগোয়ার বরদানে অবতীর্ণ হয়েছে।

সারা হুপুর রক্তমারি বাজনা বাজতে লাগল। লোকেরা
মোষগুলোকে বেশ করে বেশি মদ বাইরে টকরের জন্যে তৈরি
করতে লাগল। বেলা পাঁচটার মধ্যে বলে বলে জী পুরুষ

এলে মরহাম ভরে ফেলল। পুলিশের লোকেরা চারদিক ঘুরে
ঘুরে জনতাকে ঘুরে সরিয়ে মরহাম খালি করে দিলে যাতে
মোষগুলি বেশ ভাল করে লড়াইতে পারে, আর দুটো গিরে
জনতাকে আহত করতে না পারে। খেলোয়াড়রা মোটা
রক্তমের বাঁজী রেখে বেলে, যার ঘোষ জিতবে, সেই এই
বাঁজীর টাকা পাবে। হু’পকে বিশেষ প্রতিযোগিতা চলে,
নির্দিষ্ট সময়ে শিলা ফুঁকল, বাজনা তালে তালে বাজতে
লাগল। দুটো তীব্রগাহিত “হেলা” নিয়ে তাদের মালিকরা
মগ্নমগ্নে এলে দাঁড়াল। উত্তরে উত্তরে মোষকে শিষ্ট চাপতে
মিষ্টি মিষ্টি ভাষার উৎসাহিত করে সরে দাঁড়াল। মর্শকেরা
উদ্বীণ হয়ে বেলা দেখতে লাগল।

হেলা দুটো কীভাবে চূপ করে নির্দিষ্ট করে দাঁড়াল,
তীব্র দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল, তারপর মাথা দুইয়ে
শিং ঝেঁকিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করলে, শিঙে শিঙে
ঠোকাঠুক লাগল। একটা হেলা আর একটা হেলাকে শিং দিয়ে
ঝাঁক দিতে লাগল প্রাণপণে। দুটো হেলাই সমান কোমল
হলে, সাধারণতঃ শিঙের উপরই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে।
একটা হেলা আর একটা হেলার শিঙের ভিতর মিকের শিং
আটকে প্রবল বেগে ঝাঁক মারতে মারতে শিঙে হঠাৎ দেবার
জ্বা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। দুটো হেলার পারের
দাপটে কবিত্তে ঠকাঠক আওরাজ হুজিল, চারদিকে ধুলো
হিটকে পড়তে লাগল, মর্শকেরা ভয়মিশ্রিত আমলে চেঁচামেচি
শুরু করে ফিলে। যারা বাঁজী রেখে বেলেছিল, তাদের মুখ
আশা-নিরাশার উজ্জল ও মান হয়ে বেতে লাগল। ঘোষের
মালিকেরা গ্রাম্য কথার মোষগুলোকে বাহবা দিতে লাগল,
কোরে কোরে বাজনা তালে তালে বাজাচ্ছিল। হঠাৎ
একটা হেলা এক নিমেষে অপর হেলাটাকে শিঙের ভাঁতো
ঘেরে কাবু করে শিঙে হঠাৎ ফিল। সেটা প্রাণপণে দৌড়তে
লাগল। তারপর জ্বরী হেলা বিজয়গর্বে হুগু ভদীতে ফিরে
দাঁড়াল—চোখ দুটো লাল টকটকে, মাসাহক্ক কীত। মর্শকেরা
কোরে হাততালি দিতে লাগল, ঘোষের মালিক হাসিমুখে
লগৌরবে তার পালোদান মোষ আর বাঁজীর টাকা নিয়ে
ঘরে ফিরে চলল—বাগোয়ার শারদোৎসবের শেষ পর্ব
সমাপ্ত হ’ল।



“কে দিল আবার আঘাত...”

ঐবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

১

লক্ষপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বিমান। বৌবনের প্রায়শ্চেষ্টে লিখেছে প্রেমের উষ্মের গল্প, বৌবনে আলোচনা করেছে গভীর প্রেমভক্ত আর আত্ম অপস্মিরহীন বৌবনে লিখেছে বসে উর্দাস প্রেমের কাহিনী। এত যে লিখেছে মরমারীর প্রেমকথা, এক দিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হবে তা সবই প্রায় কল্পনাপ্রসূত, শুধু ঐ প্রথম দিকের প্রেম-উষ্মের অধ্যায়টি সত্য। সেটা ছিল তার নিজের বাস্তব জীবনের আলোচ্য।

২

বিমানের মুখে সাধা দিয়ে পালিয়েছে শিখা। বেন সে বিদ্যাবিশিখাই। দীর্ঘ তার কণিকের, কিন্তু তা স্বর্ণমূল্যবান। কত বিন্যাস কত সুকোচুরি করে পাওয়া তার দেখা। সখীর বাক মুখে কত গাহতলার বসে কত সত-রচিত কবিতা, গল্প-পাঠ। পাঠক ও শ্রোতার মন বিবর্ত করে মিশে একাকার হয়েছিল, সে কি কাহিনীর ভয়ঙ্করটি বিষয়টি অবলম্বনে, না ভয়-ভয়বীর সারিয়েতার মোহনমন্ত্রে?

পাহাড়ের পারদর্শনে সেই শুভ্র পাথরখানি নিশিরদ্বারা হয়ে মুক পেতে আত্মও যে অপেক্ষা করে আছে তা বিমান দেখেছে মাঝে মাঝে গিয়ে। এখানেই তাদের শেষ দেখা। ঐ বশবশে সাধা পাথরের এক প্রান্তে সেদিন শিখা বসে বিমানকে বলেছিল, আকাশের রং বেবেছ?

একটু বেবে একটা দীর্ঘবাস টেনে আবার বললে, বসো একটু এইখানটায়, কাল শু চলেই যাব।

এই চলে যাওয়া যে চিরকালের অন্তেই যাওয়া তা সেদিন কে জানত। সেই সন্ধ্যার তারা হ'লমে বসে বসে হৃদয়ত বেবেছে একসঙ্গে। সত্যি কত সৌন্দর্য্যভরা রাত আকাশ-খানি অত সীকের স্নানিমার অন্তরাল ছিল সুখি কত অব্যক্ত বাসি-সম্মিলিত। সেদিন তাদের সুখ দিয়ে কথা কোটে নি বেশী, শুধু ছিল তাদের বিদায়-আবেগে ভরা। বাতাসও ছিল না সুখের সে সন্ধ্যার। বিবৃতিতে বৃহ্ণ তারণের গুঞ্জন ছিল শুধু। কি তার অর্থ কেউ ত বোঝে নি।

৩

তার পরেই সেই স্বর্বাঙ্গিক রেল-হর্বটনা। গুলের উপর থেকে ট্রেনের পিছনের কেরকথানা কামরা লাইমচূড় হয়ে একেবারে মধীর মুকে। কত লোকের অভিন্ন আর্দ্রনাথ, কত ঘরে হাহাকার। পর পর ভিন্ন ভিন্ন ঘরে হুত ও আহতদের লাম বেঁকেতে লাগল কাপড়ে। হুতদের তালিকার শিখার দান।

সেই হতে বিমান জীবনের সফল করেছে কলমকে। কিন্তু সে লেখনীনিঃসৃত রস শুধু আর সখুদ মর, বিবিধ রঙের। এই দীর্ঘ জীবনভোর তারতীর চরণে কতই না রং-বেরং ছোপ লাগিয়েছে।

ব্যাপ্তি পৌছেছে দেশ ছাড়িয়ে সুখের বিবেশেও। বিবেশেও যে এত বাঙালী পাঠকপাঠিকা থাকতে পারে তা জানা গেল এই বাংলা লেখার বৌলতে। কত সমর্থদায়ের চিঠি আসে, কত লোক দেখা করতেও আসে।

সেদিন অপরাহ্নে বেধা করতে এলেন আমেরিকার একটা তারতীর মিশনের ব্রহ্মচারিণী ভগিনী ভেদামন বাই। ঐর সঙ্গে অনেক দিন হতে পজালাপ চলেছে। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। বিমান প্রত্যাক্তবে অভ্যর্থনা করে বসাল। নীতিদীর্ঘ কিন্তু বন শুভ্র কেন্দ্রাশোভিত গাতীর্ঘ্যপূর্ণ অপূর্ণ সুখাবরণ। তার সন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বেন বিমানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট। বিমান অবাক হয়ে তার শান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল। পৈরিকপারিহিতা আশ্রয়বাসিনীর সঙ্গে শুধু যে গভীর তত্ত্বই আলোচনা হ'ল তা নয়। বিমানের গল্প লেখার কথা সহজেই উঠে পড়ল। বস্ত্ত: তাদের পজালাপ শু ঐ গল্প হারকতই। সন্ধ্যাসিনী হলেও সন্ধ্যাস-বর্ণাবলম্বিনী বেন মনু ভিগি। সংসারের মরমারীর সুখ-হুঃখের প্রতি মরমকেও তার বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। তাই তিনি তার চিঠিতে বিমানের অনেক বইয়ের স্মৃতি সন্মালোচনা করে পাঠিয়েছেন। আত্মও সেই সব আলোচনা চলতে লাগল সাক্ষাতে। বিমান বহুদূর হত এই মহীয়সী মহিলার কথা শুনছিল। এত দুট্টরে এমন মন দিয়ে তার লেখা কেউ পড়ে তা তার জানা ছিল না। নিজের বা কিছু বলবার ছিল তা বেন আত্ম তত্ত্ব। তার মনে হচ্ছিল কি একটা আকর্ষণে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে তার মন এই মহিলার প্রতি। প্রভা? তা হবে। এই রকম একটা প্রভার শক্তি তার উপর আরোপিত হয়েছিল—সে বহুকাল আগে। শিখা? হ্যাঁ, শিখারও শক্তিপ্রভাব তার মুকে তীরের মত আত্মও বিবে আছে। যেদিন শিখার প্রতি প্রভা তার অন্তরে সঞ্চারিত হচ্ছিল, বিমানের মনে হয়েছিল তার কৈশোরে হারানো মায়ের কথা। আর আত্মও এই কনে মনে হচ্ছে মায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে শিখার স্মৃতিও চিত্তে

জানেন। এ কি অগুরু আলোকন অন্তরে। নকল প্রচার
আবার কি একই হয়ে গাঁথা ?

হঠাৎ এক সময় অন্ধকারিণী বললেন—আজ উঠি তবে।
বিমান চমকে উঠল। তাই ত সে ছিল কোন্‌ রাহো ?

৫

এতকণ অন্ধকারিণী পাঠার্থী রক্ষা করেই কথা করেছেন
যদিও তাতে বসিষ্ঠতার দ্বিধা স্পষ্ট লেগেছে কণে কণে, কিন্তু
একবারটিও তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে নি। প্রথম দর্শনের
অভিযান দুই হতে বোঝ করে যতক হেলমেই সমাধা হয়েছে,
কিন্তু এখন বিচারবেলায় তেহামান বাই উঠে এগিয়ে এসে
দক্ষিণ হাত প্রসারিত করে ছিলেন পুরোপুরি পাক্ষাত্য প্রচার
এবং সকে সকে অতি মন্থর আবেগতর। হাসির ছটীর সমগ্র
আনন্দবাণি হয়ে উঠল উদ্ভল। বিস্মিত, ভিত্তি বিমান সেই
উদ্ভল হাসির আলোকে চিনে কেলে চীৎকার করে উঠল—
“শিবা।”

পরমুহুর্তেই শিবির প্রসারিত হাতবাণি নিজের হই হাতের
মুঠোর চেপে ধরে বললে, বল বল, ব্যাপার কি বল ত ?

৬

বলছি শোম, সব বলছি। সেই যে ছুঁনি হাতব্যাপটা
আমার উপহার মিলে মাঝার দিন, সেইটাই প্রথম মথরের
গোল পাকিয়েছে। ব্যাপটার মধ্যে টাকাপরস। মোটবুক
সবই পুরে নিরেছিল। ব্যাপটা এত সুন্দর ছিল যে টেনে
বলে বেই একবারটি মুঠুফেস হতে বার করেছি, অমনি আমার
সামনের বেকির একটা মেয়ে বলে উঠল “বাঃ। কি সুন্দর
ব্যাপটা আপনায় ? দেখি না একবারটি।” বিলার ওর
হাতে।

তার পরই যে কি হয়ে গেল কে জানে। হঠাৎ যেন এক
সকে পাতালে প্রবেশ করলাম। আমার যখন জান কিরে
এল তখন দেখি আমি একটা ডিভি নৌকোর। বেলেরা
পাল তুলে তবু তবু করে নৌকো চালিয়ে চলেছে। হাতের
দিকে তাকিয়ে দেখি চুঁকি নেই। কানে হাত দিয়ে বুঝলাম
হলও গেছে। কেলে তো নয়, এ যে দেখছি ডাকাত।
ওদের রক্তসকলমেও বুঝলাম দুহুতিসিদ্ধি। তবে আবার
আমার প্রাণ উড়ে গেল। চূপ করে পড়ে রইলাম, চোখ
রাখলাম নৌকার বাইরের দিকে। একটু পরেই দেখলাম
উপ্তো দিক হতে একটা নৌকা আসছে। কাছে আসবার
একটু আগে থাকতেই চীৎকার করে উঠলাম, “বাঁচান, বাঁচান,
ডাকাত ডাকাত।” মুহুর্তের মধ্যে একটা কেলে এসে আমার
মুখ ও গলা চেপে ধরলে। আমি তবুও অসুট কর্তে চীৎকার
করতে লাগলাম। ওদিকে সেই নৌকাও আমাদের
কাছাকাছি এসে পড়ল। তাদের ঠেকাতে এরা লড়াই শুরু
করে দিলে। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় বেশী। কেলেরা

নিরুপায় বুকে আমার ধরে ছুঁতে কেলে মিলে ললে। আমি
আবার অজান হয়ে পড়লাম।

এবার যখন জান কিরে এল তখন দেখি একটা হাসপাতালে
কিন্তু আমার কথা বলবার শক্তি নেই। আর আমাকে কথা
বলাতে চেষ্টাও কেউ করছে না। বোঝ হর ডাকাতের বারন
ছিল।

পরদিন দুপুরে দেখি মাস' একটা ববরের কাগজ পড়ছে।
আমি হাত বাড়িয়ে কাগজটার দিকে ইলিত করলাম। মাস'
তা দেখেও যেন বুঝল না। কিন্তু বুকেছিল টিক, কিছু পরে
তার নিজের পড়া শেষ করে আমার হাতে কাগজটা দিয়ে
গেল। সেই কাগজে পড়লাম, “য়েল-হুর্টমার আর একটা
মাত্রীয় বক্তবেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যেহটা ঘটনার তিন
দিন পরে, প্রায় তিন শত মাইল দূরে এত গলিত অবস্থায়
পাওয়া গিয়াছে যে তাহা সমাজ করা কঠিন, তবু তাহার
হাতের মুঠোর প্রাণ একটা ব্যাপ পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে
একটা মোটবুকে মাঝ লেখা আছে ‘শিবা সোম’।”

বিস্মিত বিস্মারিত মনে বিমান অসুট কর্তে বললে, কি
আশ্চর্য। তার পর ?

তারপর যখন আমার কথা বলার শক্তি কিরে এল,
এতকণ গৈরিকবসন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় এসে আমার প্রের
করতে লাগলেন। একে আরও কয়েকদিন দেখেছিল।
আগে হাসপাতালে। বুঝলাম হাসপাতালটা কোন আশ্রয়ের
প্রতিষ্ঠান।

আমার মনে তখন আলোকন চলেছে। তাবছি—শিবা
সোম ত মথরে, আপন হুকেছে। এখন তবে এই মৃতন
জীবনটা মৃতন তবে চালাই। তাঁর প্রেরের উত্তরে বললাম,
আমার কোন মার নেই, -বার নেই, আত্মীয়বন্ধন আর কেউ
নেই প্রু। আপনারা বাঁচিয়েছেন আমার, এখন আপনরাই
আমার সব। আপনাদের আশ্রয়ের কাছে যদি করা করে
আমার লাগান তবে এ হতভাগিনীর জীবন বত হয়ে যায়।

তিনি এইভাবে বুঝলেন, হিন্দুমাত্রীয় সফটমর অবস্থা। যে
বালিকা একবার হুর্ভবের হাতে গিয়ে পড়েছে সে যদি
তাদের হাত থেকে উদ্ধারও পার তবু হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর
সমীক বৃষ্টি হতে উদ্ধার পাবার বো নেই। সেই তেবেই হাত
আমি আর সমাজ বা সংসারে কিরতে চাইছি না। তার
কোন হৃদিসও দিচ্ছি না।

বিমান অধৈর্য হয়ে এইখানটার বলে উঠল—কিন্তু আমি
ত ছিলাম শিবা।

হ্যাঁ, ছুঁনি ছিলে, কিন্তু—

এইটুকু বলেই উদাস ভাবে কাদামার কাঁকে আকাশের
দিকে তাকিয়ে থাকে শিবা।

“কিন্তু কি ? বিমানের বৈর্য জানে না—বল বল কিন্তু

কি ? ওঃ ! তুমি বুঝি ভাবলে সেই পুরাকালে রামচন্দ্রই যদি সীতাকে গ্রহণ করতে পারলেন না, তবে আমি কি আর—

বাণা দিয়ে শিখা বললে, না না, তা নয়। আমি বিশ্বাস করি অতীতের রামচন্দ্রের চেয়ে আধুনিক অনেক রামচন্দ্র উন্নত। কিন্তু তবু—

এই পর্য্যন্ত বলে একটু বেগে আমার আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন কোন অতীতের মাঝে দিকেদিকে ভুবিরে গীয়ে অভি শান্তভাবে বলতে লাগল, তবে আমার জীবনের আর একটা অব্যাহত তোমার কাছে আঁক খুলে বসি বসু।

আবার চুপ করল। বিমান রক্ত মিথাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

শিখা আমার দূর করল, আমি তোমাকে যেমন নিষিদ্ধ ভাবে ভালবেসেছিলাম তেমন করে অত মেরেরা ভালবাসে কি না আমি না। আমি যেন তোমার প্রাণ করে কেলতে চেয়েছিলাম কিংবা যেন তোমার পারের খুল হয়ে পড়তে বাছিলাম। কতবার দিকেদিকে সাহসাত্তে গিরেছি, কিন্তু পারি নি। কাছে থেকে তা হবার যেন ছো ছিল না। কত বিচার দিয়ে দিকেদিকে বলেছি—যাকে ভালবাস তার উন্নতির পথের কীটা হয়ো না। কিন্তু বিকলেই তা বলা। রমণীহীনত ঈর্ষা এতই প্রবল ভাবে এই চিন্তে সঞ্চিত হতে লাগল ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে তুমি আগ্রহ করে তোমার লেখা বর্ধন পোমাতে আমার, আমন হ'ত খুবই সন্দেহ মেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দুর্জয় হিংসা ও অতৃপ্তি ভূকসিমীর মত মাথা তুলতে থাকত। মনে হ'ত তোমার প্রাণমন ত অক্লপ তোমার লেখাতেই পড়ে থাকে, তার মধ্যে আমার স্থান কোথায় ? আর যে লেখা লিখছ বসে, যদিও তা আমাকে একবার পোমাছ, কিন্তু তা ত আমার তরেই নয়। হায় ! বিধে দেবে তা বিলিয়ে। আর

তোমার ব্যাতির কাছে তুমি বাবে বিকিরে। আমি থাকব কোথায় পড়ে ? অভিমানের অন্তর অন্তরে উঠে বলত, তাই হোক তবে। মনে হতে লাগল আমার এ পোতা মন যেন বরুতুমি। তোমার কাব্যরস এর উক মিথাসে গুচ্ছ হয়ে বাবে।

তাই এক এক সময় মনে করতাম হুয়ে সরিয়ে কেলি এই হতভাগিনীর জীবনকে। সরিয়ে তোমার মুক্তি দিই এই সংকীর্ণ মনের বাঁধন হতে। কিন্তু সেও বড় কষ্টম। 'হাতাতে গেলে ব্যথা বাজে।' সে বে বিবদ ব্যথা।

এমন সময় দৈব উপায় করে দিলে। আমার হৃত্য-সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। মনকে মিথাক্রপ শক্ত করে অজ্ঞাত-বাসের এ সুযোগ ছাড়লাম না। বিচ্ছেদের তীব্র বেদনা তেজ করে একটা পরম তৃপ্তি—আত্মপ্রসারের কোয়ারা এ জীবনকে সিক্ত করতে লাগল আশ্রয়ের আশ্রয়ে গিরে।

এ পর্য্যন্ত বলে থামল এবং ছুই হাতের মাঝে মাথাটা গুঁজে দিল বুঝি উন্নত অক্ষ সংবরণ-চেষ্টায়।

বিমান পাথরের মত ছিল এতকণ, এইবার আন্তে একধামি হাতে শিখার অবমমিত পৃষ্ঠদেশ বেঠম করে চুপ করে বলে 'রইল—ব্যাক্যহার। শিখা একটু পরেই খুঁপ তুলে নোকা হয়ে বিমানের দিকে তাকিয়ে সহাত্ত দুপে বললে, আছ সত্যি মনে হচ্ছে তপতায় আঙুনে প্রেদের সব কষ্টকজাল পুড়িয়ে শুধু কুহুমটা কুটরে তুলতে পেরেছি। তপঃস্নিষ্ট ভালবাসার এই অবস্থাটা বুঝি লগতে অতুলনীয়।

অক্লান্ত মিত ও প্রদীপ্ত সুখধামির দিকে বিমান বিশ্বরে তাকিয়ে রইল।

আকাশের আলো মিলিয়ে যেতে লাগল। তখন সন্ধ্যা লগ্নাগতপ্রায়, তাবের জীবনেরও। দ্বিধা সমীয়ে তেলে আসছিল দেবদারু প্রেদীর শাখা হতে বিবিধ বিহঙ্গমকাকলি।

প্রণাম

ঐশাস্ত্যশীল দাশ

আমার প্রণামধামি রেখে বাই তাহাদের তরে,
বাহাদের নাম কেহ কোনদিন করে না স্মরণ ;
ইতিহাস বাহাদের নামগুলি রাখেনিকো ধরে,
নিঃশেষে হুছে গেছে তাহাদের সব বিবরণ।

অক্লপ পৃথিবীর বুকে বারা এলো অসহার,
মাহুদের অন্তরে একটুও পেল না সে ঠাই ;
পড়েছিল এক পাশে অমায়ের আর অবতার,
বাহাদের তরে নাম কোনদিন কেহ রচেনাই।

জীবনের দূর হ'তে বারা শুধু করেছে সংগ্রাম,
মিরতির পরিহালে বার বার হয়েছে বিকল ;
আলোর পিছে পিছে হুয়ে বারা করে অবিস্মার,
সারাট জীবন বয়ে বাবের রয়েছে আবিজল।

কত আশা করেছিল, কিছু বারা পেল নাকো হার,
বাবের জীবনগুলি বরণিতে হ'ল ব্যর্থকার ;
ক্লান্ত জীবন বহি' চলে গেল কোন অজানার,
অজানা তাবের লাগি রেখে বাই আমার প্রণাম।

বাংলাদেশের মন্দির ও মন্দিরলিপি

ঐপকানন রায়, কাব্যতীর্থ

মন্দির দেশ বা জাতির জীবন্ত ইতিহাস। ইহা যেমন ঐতিহ্যাত্মক ধর্মভাব, স্মৃতি, দার্শনিক প্রকৃতির পরিচয় দেয় তেমনই গঠনবৈশিষ্ট্য, অলঙ্কার-পদ্ধতি ও পুস্তলিকা-বিভাগ-কৌশলে সকলপ্রকার সামাজিক বিষয়বস্তুকে নিজদেহে ধরিয়া রাখে। আবার মন্দিরলিপিসমূহ সাহিত্য, ইতিহাস ও সেই সেই কালের অক্ষর-লিখনভঙ্গীকে রক্ষা করে। প্রাচীন পুথিতেও আমরা অতীত যুগের হস্তলিপির নিদর্শন পাই, কিন্তু পুঁথি অপেক্ষা মন্দির-লিপি দৃঢ় পটভূমিতে গঠিত হইলে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় বলিয়া আমরা উহাতে বহু প্রাচীন



হাওড়া জেলার বেল্যাক গ্রামের রূপনারায়ণ
নবভীরব ত্রিগোপালকীর অষ্টশাল মন্দির।
রাজা মুহম্মদশাহ রায়চৌধুরী কর্তৃক ১৫৭০
শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত

লিখনভঙ্গীর সহিত পরিচিত হই। মন্দির ও মন্দিরলিপি দেশের গৌরব ও প্রামাণ্য বলিল। এখানে বাংলার কয়েকটি মন্দিরের লিপি ও তাহা হইতে গৃহীত তথ্য সংক্ষেপে লিখিতেছি।

হাওড়া জেলার গড়কানানীপুরে মণিনাথ মহাশয়ের যে অষ্টশাল মন্দির আছে উহার লিপি সম্ভবতঃ বাংলাদেশে

প্রাচীনতম। লিপিটি এই : শ্রীভগবতো বাহুবোব নারায়ণত।
সুভমন্ত শকাব্দা: ১৩০৬।২১ প্রাবণ।

ইহা হইতে আমরা প্রায় ছয় শত বৎসর আগেকার অক্ষর ও সংখ্যালিখনপ্রণালীর সামান্য আভাস পাই। এই লিপি ও নিম্নোক্ত সকল লিপির বর্ণাক্ষরে।

মেদিনীপুর জেলার বাঁটালস্থ বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে সিংহবাহিনীর চতুঃশাল নির্মিত মন্দিরে লিপিবদ্ধ দুইটি ফলক আছে। উহাদের পাঠোদ্ধার কষ্টকর, কিন্তু "সুভমন্ত শকাব্দা ১৪১২" সহজে পড়া যায়। ইহা প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন।

হাওড়া জেলার মেলাক গ্রামের প্রাচীন গোপালজীর

প্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক স্থাপিত। উচ্চ বত্থানি নিয়েও তত্থানি প্রোথিত বলিয়া এখনও অটুট আছে। -

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী লালগড়ে পূর্বে যে নবরত্ন মন্দির ছিল তাহাতে কৃষ্ণপ্রস্তরে উৎকীর্ণ স্থায়ী লিপি ছিল। লিপিবদ্ধ প্রস্তরফলকটি এখন চন্দ্রকোণার বর্জমানরাজের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। উহার লিপি :

সুভমন্ত শকাব্দা: ১৫৭৭ শাক্তেহবিবুনি বানেন্দো বৈশাখে শুক্লপক্ষকে।
তৃতীয়ায়া শুক্লমিনে শ্রীভোজভূতাবহ (?)। হরিনারায়ণ-মুপ্ত পত্নী
শ্রীলক্ষ্মণাবতী। শ্রীরাধাকুরো: শ্রীভো নবরত্নমিনঃ নমো। রাধাকু-
পদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানোবধু। খ্যাত-শ্রীহরিশুভেন্দ্র বসিতা
শ্রীহোলনারায়ণত। মাতা শ্রীমত মিজসেন মুপতেবিখ্যাত কীর্ত্তি: কিতো।
শ্রীনারায়ণ বররূপ ভগিনী রম্য নমো মন্দির। গিরিধারিপদাভোনে
নবরত্নমিনঃ শুভম্। নির্দ্বার বহু বয়স সমর্পিতবর্তী মুদা। পৌরাণিক
শ্রীমোহনচন্দ্রবর্তী গোবিন্দদাস।

লিপিটি চন্দ্রকোণার লুপ্ত ভান রাজবংশের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। সম্ভবতঃ মোহন চন্দ্রবর্তী উহার রচয়িতা ও গোবিন্দদাস মিত্রী। লিপির অর্থ : বীরভানুর বধু, হোল-
রায়ের কস্তা, রাজা হরিনারায়ণের পত্নী, রাজানারায়ণ মজের
ভগিনী ও রাজা মিজসেনের মাতা শ্রীলক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭
শকের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় গিরিধারীর প্রীতির
নিমিত্ত সানন্দে এই রম্য মন্দির দান করিলেন। লিপিতে
অষ্টরূপ ও শাক্তলবিকীড়িত ছন্দ আছে। শাস্ত্র রস ইত্যাকে
কাব্যের রূপ দিয়াছে। ত্রীলোকের নামের পূর্বে শ্রীমতী
না লিখিয়া মাত্র শ্রী ব্যবহৃত হইতে ইহা লক্ষ্যীয়।

চন্দ্রকোণা হইতে পাঁচ কোশ দূরে বাঁটাল বাইবার

রাজার পাশে নবগ্রামে যে নানা গুপ্ত ককবিশিষ্ট প্রাচীন পকরস্থ আছে, উহার লিপি : “মবেদরস-মুজেশাকেটৈব নিশাপত্তে। গোপীনাথস্ত বেন্দ্রোৎ ভক্তিভো মন্তবানহম্।” মর্ম—১৩৪০ শকাব্দে গোপীনাথের এই মন্দির ভক্তি-পূর্ব্বক দান করিলাম। লিপিটি সরল শাস্তরসপূর্ণ ও শিলা-কলকে উৎকর্ষ।

বাংলার বাহিরে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাহুদেব মন্দিরে রাজা হরিবর্ষার মন্ত্রী ভট্টভবদেবের শিলালিপি দুইটি সুপ্রাচীন বাংলা লিপির নিদর্শন।

পুরীধামে মার্কণ্ডেয় সরোবরের ঘাটে বাংলার নিজস্ব রীতির ইষ্টক-নির্মিত চতুঃশাল মন্দিরটি বর্ধমানরাজ্য কীর্তিচন্দ্র-নির্মিত। উহার বলাকরে রচিত প্রস্তরলিপিটি এইরূপ : “শ্রীশ্রীহরি। শুভমস্তম্ভকাব্যঃ ১৬৬৬ বডসদর্শন মিতেহে। পঙ্কোদ্ধরত (?) সৌধ সোপানং। রূপ কীর্তিচন্দ্র জননী জনিতং। প্রেষিত হরে কৃষ্ণাতঃ (?)। লিপির ‘ড’ ‘ড্র’ হইলেই অর্থসঙ্গতি হয়। মর্ম সম্ভবতঃ এই : রাজা কীর্তিচন্দ্র ১৬৬৬ শকাব্দে এই সরোবরে পঙ্কোদ্ধার, ও সৌধঘাট নির্মাণ করাইয়া মাতৃঋণ শোধ করেন। জলাশয় ধ্বনন ও ঘাট নির্মাণে মাতৃঋণ শোধ হয় প্রাচীনগণ এরূপ ধারণা করিতেন।

মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বাহুদেব-পুরের (পোঃ সদরপুর) মুক্তারাম ভট্টাচার্যের পকরস্থ মন্দিরের লিপি : মহনবমনগরৌসম্মিতে শাক বর্ষোক্তির নিলয়মেতৎ শ্রীল-দামোদরায়। কুলকুম্ভকলেশঃ শ্রীলমুক্তাভরামো। বহুল-পরমভক্তোক্তভূর্ধোদ মাং। ১৭২৩ শকাব্দাতে কুলরূপ কুমুদেবচন্দ্র মুক্তারাম এই মন্দিরটি দামোদরকে দান করেন। লিপিটি পোড়ামাটির, দুই পংক্তিতে সমাপ্ত। ইহার ছন্দ মালিনী, ভাবা সরল, অলঙ্কারপূর্ণ ও শাস্তরসযুক্ত।

নদীয়া জেলার গোরাড়ী কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী মন্দিরের লিপি :—বেন্দ্রোদ্ধরণ গোত্র কৈরব কুলাধীপে শকে শ্রীযুতে। কৈলাসপ্রতিরূপ কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ গিরীশোৎসবে ॥ নানানন্দ-ময়ী শুভেহনি মহামায়া (?) মহাকালভূৎ। রাজা শ্রীল গিরীশচন্দ্র ধবলীপালেন সংস্থাপিতা ॥—রাজা গিরীশচন্দ্র ১৭২৬ শকাব্দে কৈলাসভূত্য কৃষ্ণনগরে শুভ গিরীশোৎসবে আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠা করেন।

মেদিনীপুর জেলার রাধাকান্তপুরে (পোঃ সদরপুর)

দাসবংশের হঠাম, পুতলিকাবহল ও অলঙ্কারমণ্ডিত আল-গোছ টুকী মন্দিরে পোড়ামাটির আটটি কলকে নয় পংক্তিতে বাংলা পদ্যালিপি :

রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দদাস বর্গে বাস এই সে কারণে : মহা মহা পুণ্যবলে সপ্তপুত্র ক্রিতিভলে কোটপুত্র জ্ঞানদাস নামে : যিনি দাতা পুণ্যোদয় প্রকাশিত মহাশয় মহাম তৃতীয় সহোদরে : বর্ধমানে পাঠাইয়া গোপীনাথে আনাইয়া স্থাপন করিলা এই ঘরে : নবাব পৃথিবীপতি তার ভয়ে ব্যস্ত অতি সীমানা ঘেরিরা খুলিলা গড় : দানাদা দরজা পরে জয় চতীর কৃপাবরে পুষ্করী খুলিলা তার পর :



মেদিনীপুর খাটালের সিংহবাহিনী মন্দির

চতুঃশালরীতি—প্রতিষ্ঠানক ১৪১২

সন্ধান গাইলা যদি সভাসিংহ নরপতি সেই হেতু কড়া না আইসে : কল্পবান্ধু কোষতরে আজ্ঞা দিলা অন্তরে হান শির পদাভিক রেখে : বিপক্ষ হইল কাল কাল হৈল পরকাল কিছু না জামিল মহাশয় : তাহাতে ছেদিল সুগু দুর্গা দুর্গা ডাকে তুণ্ডি রাজা মালিলা বিস্ময় : কবিতা করিতে তার এই ভানে আঁটা তার হ'ল দুই শতক বৎসর : রীতি নীতি পিতৃকীর্তি এই বংশে অভাববি বন্ধনাই হতেছে মুখর : আপদ হইল ইথে বৃদ্ধ হৈল মন্দিরেতে সারাইতে সাধ্য নাহি কার : দারাপদালের বংশে মহামহাদীর অংশে বজ্রধর জয়েছিল সার : সন ১২৫১ সালে দোণ্ডীর সহিত মিলে নানাবুদ্ধি করে জনে জনে : তেহ বলে লয়া কর কেহ বলে একেই সার বজ্রধরের কিছুই না লয় মনে : পিতৃকীর্তি ডুবাইয়া কেমনে করিব ইহা সারাইব বা থাকে ভায়েতে : ভদ্রলোকে ডাকাইয়া হীর মিত্রী আনাইয়া উত্তোর করিল সারাইতে : সন ১২৫১ সালে দোণ্ডীর সহিত মিলে মন্দির করিলা বেরানতি : হিসাব করহ সবে ইহাতে নিকাস পাবে কবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি :

অর্থ সরল। বাংলার শিবাজী সভাসিংহের আদেশে অনানন্দদাসের মন্তক ছেদন হইলে কাটামুগু দুর্গা দুর্গা

বলিয়াছিল। বে মন্ডর একটি কড়ি পারিজমিকে কাজ করিত ভাহাকে কড়া বলে। লিপিতে কোলন বিয়াম চিত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। লিপির বর্ণাঙ্কি শোধন করিয়াছি।



মেদিনীপুর জাধাকাতপুরের কালেদের পোশিমাথ মন্দির
(একরয় বা আলগোছ ইদী রীতি অতুলারে নির্মিত
স্বর্গীয় বাংলা পতলিপিরূপ)

ঐ গ্রামের একটি উৎকলরীতির মন্দিরের লিপি :
ঐত্রীকানীশ্বর মহাদেব স্থাপন। শকাব্দ: ১৭৬৭ সন ১২৫২
সাল মাহ আবাচ। জেই হেতু মহাদেব কানীশ্বর নাম :

কমললোচন দত্ত গিয়াছিল গয়াধাম : শিতার কর্ণপরে
কাশী গমন বাসনা : কিন্তু গ্রিহে ভাজিগণ করিল মানা :
ঐত্যাগমনেতে সিব স্তাপন করিবে : কাশী গমনের ফল
তাহাতে পাইবে : এই হেতু প্রকাশ হইল কানীশ্বর :
মন্দির সমান কাম মোদক কিংকর : (৭)

বর্ণাঙ্কি লক্ষণীয়। শেব পংক্তির অর্থ অম্পট। কোলন
বিয়ামচিত্র রূপে ব্যবহৃত।



চতুয়া বাসুদেবপুরের ডলাব দত্তের শিবমন্দির।
মন্দিরের উর্দ্ধভাগ পঞ্চাঙ্কি বলিয়া ইহা
ইসলামীয় রীতিতে নির্মিত

মন্দিরের মত অনেক রাসমঞ্চ ও বহুতলবিশিষ্ট চূড়া ও
পুস্তলিকাবহন এবং লিপিসূক্ত। মেদিনীপুর-পাশকুড়ার
ইটোরা মাললোই গ্রামের একটি অষ্টকোণ, ত্রিভুজ, ত্রয়োদশ
চূড়ার স্তম্ভায়, সোপানযুক্ত, পুস্তলিকাবহন মঞ্চের লিপি—
ঐত্রীকানীশ্বরমোদর জীউ। শুভমন্ত শকাব্দা: ১৭৮০ সন
১২৬৬ ইকরাজি সন ১৮৫০ সাল। ঐতাকুরদাস মাইতি।

মন্দিরলিপিতে শকাব্দ ও বাংলা সনই ব্যবহৃত হয়।
এই লিপিতে ঐতাক ও ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা অভিনব।



বাংলা ও বাঙালী

ঐশ্বরীলচন্দ্র ঘোষ

২

বাঙালীর আর্থিক ও রাজনৈতিক অবনতির কারণ অল্পসন্ধান করিতে হইলে প্রথমে পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক সঙ্কোচন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। শিল্পের প্রসারের জন্য ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশেরই তাহার আয়তন এবং লোকসংখ্যার অনুপাতের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য থাকা দরকার। তাহা না হইলে সেই প্রদেশবাসীর আর্থিক দুর্ভাগ্যতার প্রতিকার করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

কোনও প্রদেশের প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার চাপ অর্থাৎ বসতির হার যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় ভূমির অভাবে খাদ্যোৎপাদন ও শিল্পসম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই হেতু সেই প্রদেশকে বিদেশ হইতে এবং অপর প্রদেশ হইতে খাদ্য ও অন্যান্য বহু নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। ইহার ফলে সেই প্রদেশবাসীর অর্থ অন্য প্রদেশে ও বিদেশে চলিয়া যায়। একমাত্র শ্রমিকশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার মাটি এই শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও ভূমির অভাবে এই প্রদেশে ইহার প্রসারণ হইতে পারিতেছে না। ফলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা চিনি অপর প্রদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। আয়তনের দিক হইতে বর্তমান পশ্চিম বাংলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা নিয়ে দেখান হইল :

প্রদেশ	আয়তন বর্গমাইল	১৯৪১ সালের আদমশুমারী অনুসারে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার চাপ
মাত্রাজ	১,২৬,১৬৬	৩২১
উত্তরপ্রদেশ	১,০৬,২৪৭	৫১৮
মধ্যপ্রদেশ	৯৮,৫৭৫	১৭১
বোম্বাই	৭৬,৪০০	২৭০
বিহার	৬২,৭৪৫	৫২১
আসাম	৫০,২২৬	১৪৭
পূর্বপঞ্জাব	৩৭,০৫৮	৪০৮
উড়িষ্যা	৩২,১২৮	২৭১
পশ্চিম বাংলা	৩০,৬৮২	৭৫১ (১৯৪১) ৮০৮ (১৯৫১)

এই হিসাবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যে, আয়তনের দিক হইতে পশ্চিম বাংলার স্থান কেবলমাত্র সর্বনিম্নেই নহে, অধিকন্তু প্রতি বর্গমাইলে তাহার বসতির সংখ্যাও অত্যধিক। বাস্তবতার দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পশ্চিম বাংলার প্রতি বর্গমাইলে বসতির হার উত্তরপ্রদেশের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই প্রদেশের অন্ন-বস্ত্র সমস্তা অপেক্ষাও আয়তন-সমস্তাই গুরুতর। ইহাকে জীবনমরণ-সমস্তাও বলা চলে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর বেশীর ভাগ প্রদেশেরই আয়তন, পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্যগুলি সংযুক্ত হওয়ার ফলে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ন্যায়সঙ্গত দাবি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার সঙ্গে কেবলমাত্র দুইটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশীয় রাজ্য—কুচবিহার, জিপুরা এবং একটি ছোট শহর চন্দননগর এই প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। একেই পশ্চিম বাংলায় তাহার প্রয়োজনানুসারে চাউল উৎপন্ন হয় না, তাহার উপর বঙ্গবিভাগের পর পাটের অভাব হেতু ধানের চাষ কমাইয়া সেই সব জমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে পাট চাষের ব্যবস্থা প্রদেশ-সরকার করিয়াছেন। অধিবাসীদের অস্বাভাব অপেক্ষা পাট-কলওয়ালাদের পাটের অভাবের জন্য তাহারা অধিকতর চিন্তিত। বাংলাদেশে “অধিক খাদ্য কলাও” অভিযান ও “বৃক্ষরোপণ-উৎসব” একটা প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে। ভারত-সরকার পরবর্ত্তী সমস্তা লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত, প্রদেশ-সরকার নীরব, প্রদেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্দোষ-দৃষ্টিতে মাতিয়া আছেন। প্রবীণ বাংলা উদাসীন এবং নবীন বাংলা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। যত দিন বাঙালী তাহার দুঃস্বপ্নের এই মূলগত কারণ অর্থাৎ স্থানভাব ঘুচাইতে না পারিবে তত দিন তাহার অস্বাভাব, অধিবাস, স্বাস্থ্যভাব প্রভৃতি কোন অভাবই দূরীভূত হওয়া দূরের কথা, বরং দিন দিন বাড়িয়াই বাইবে।

ঐম্বিক সমস্তা বাংলার আর্থিক দুর্ভাগ্যতার আর একটি কারণ। অর্থাভাবে ও অস্বাভাবে বাঙালী জাতি আজ ক্রমেই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে এবং এ কারণে এই প্রদেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও বন্ধ্যা-রোগে প্রাণ হারাইতেছে। বাঙালী জাতি আজ করিলু। এই কারণে চাষের কার্যে বেশীর ভাগ বাঙালী ঐম্বিক

অল্পবয়সী হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার কলকারখানা ও ক্ষেত্রের কার্যে নানা কারণে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া বাইতেছে, সীওতাল পরগণা ও রাঁচির শ্রমিকদের দ্বারা বৈশীরা ভাগ কৃষিকার্য্য আত্মকল চালাইতে হয়। পাটকল, কাপড়ের কল ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় প্রায় শতকরা নব্বুই জনের অধিক শ্রমিক অপর প্রদেশবাসী। কলিকাতা শহরে নানা কার্যে নিযুক্ত প্রায় সমস্ত শ্রমিকই ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত; তাহার নাই হইলে চলে না। ১৯৪৮-৪৯ সালের সরকারী বিবরণে প্রকাশ, বাংলা ও আসাম হইতে প্রায় ৩৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মণি অর্ডারবোনে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হইয়াছে এবং সেই সময়ের মধ্যে বাংলায় ও আসামে ৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার মণি অর্ডার আসিয়াছে। অর্থাৎ ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা ও আসাম হইতে বাহিরে বেশী পাঠানো হইয়াছে। যদি মোটামুটি ইহার শতকরা ১০ ভাগ টাকা আসাম হইতে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশ হইতে উক্ত বৎসরে এই প্রদেশবাসীর প্রায় ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বাহির হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত টাকা মণি অর্ডার-বোনে পাঠানো হয় তাহার বেশীর ভাগই কৃষি ও শিল্পকার্যে

নিযুক্ত শ্রমিকেরাই পাঠাইয়া থাকে। বাৎসরিক প্রায় পাঁচ কোটি টাকা প্রদেশের বাহিরে চলিয়া যাওয়া কম কথা নহে।

খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্যও পশ্চিম বাংলা হইতে বাৎসরিক মোটামুটি কত কোটি টাকা অন্য প্রদেশে চলিয়া যায়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে দিব।

বাধীনতালাভের পর আর্থিক ক্ষেত্রে বাংলার আর একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়াছে। বহু বিদেশী কোম্পানী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিদেশবাসীরা ভারতীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যত দূর জানা যায়, বাংলাদেশেই তাহার সংখ্যা বেশী এবং অপর প্রদেশবাসী ধনীরাই ইহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পূর্বে বহু বাঙালী কেরানী এবং অনেক ছোটবড় বাঙালী ব্যবসায়ী নানারূপ মাল সরবরাহ করিত। তাহারাই এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিত তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য প্রদেশবাসীদের হাতে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত কাজ এবং ব্যবসা হইতেও বাঙালীদের হটিয়া বাইতে হইতেছে। ইহার পরিণাম কি ঠাড়াইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত

ক্রিবেণু গদোপাধ্যায়

জানি জানি মিলাইবে আমনের সুহৃৎ চকল।
আজিকার কুলোৎসব এক দিন হইবে মলিন,
পুষ্পারিত প্রাণলতা বহুকাল হরে বাবে জানি,
এও জানি, আজিকার তুমি আমি রব না নবীন।

বৌবদ-চৈতন্যে তরা উগ্রগদী প্রেম-পরিমল
সুন্দরে স্মৃতি করি হবে বহু আর বহুদর।
প্রেমের এ পরিণতি সত্য বলে জানি আর জানি।
আজিকার হাতোচ্ছল এ আনন্দ, এও মিথ্যে নয়।

মিথ্যে নয় সুখোন্মুখি এই বস, এই কথা কওনা,
মিথ্যে নয় চোখাচোখি, আলিদম, প্রগাঢ় চুম্বন।
সত্য হুঁই স্বপ্নের রলোচ্ছল তাব বিমির।
অতি সত্য আজিকার পরিপূর্ণ এ আনন্দকণ।

সত্য তুমি, সত্য আমি, সত্য এই আনন্দ চকল।
সুন্দর এ দাম্পত্য-প্রেমের লীলা-পতঙ্গল।



পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট

ঐশিবব্রত বোষ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট ক্রমশ যেক্রম প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে শীঘ্রই এ রাজ্যে পঞ্চাশের মস্তকরের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। রাজ্যে আজ অন্ন নাই, যাহা আছে তাহা জনগণের ক্রয়-শক্তির বাহিরে। জনসাধারণ সরকারের নিকট অন্নের দাবি জানাইয়া ব্যর্থ হইতেছে; ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুর্ভিক্ষের এবং অনশনে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই খাদ্যসঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের খাদ্য-সমস্যার কারণ জানা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-মন্ত্রিগণের বিবৃতি, হস্ততা, বেতার-ভাষণ প্রভৃতি হইতে আমরা জানিতেছি পশ্চিমবঙ্গ ঘাটুটি রাজ্য। অর্থাৎ এখানকার অধিবাসি-গণের যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা এ রাজ্যের উৎপাদনের পরিমাণ কম এবং এজন্য পরিশ্রম-বীল হইয়া রহিয়াছে। সরকার ইহাই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যভাবের প্রধান কারণ বলিয়া প্রচার করেন। খাদ্য-মন্ত্রা স্বয়ং সরকারী অভিমত অম্লান্ত বলিয়া প্রকাশ দিলে জনগণের এ বিষয়ে বলিবার বেশে কিছু থাকে না। এই কারণে আমাদের অস্থসঙ্কট ক্রিয়া দেখা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ঘাটুটি অঞ্চল কিনা।

কোন অঞ্চল ঘাটু বা উৎকৃষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে লে প্রথমে ঐ অঞ্চলের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ, উহার জনসংখ্যা এবং জনগণের অল্পপাতে চাহিদা স্থির করা যাজন। অতএব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাৎসরিক উৎপন্ন দ্যর পরিমাণের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। চমবঙ্গের খাদ্যবস্তু বলিতে প্রধানতঃ চাউলকেই বুঝায়। রাজ্যে তিন জেলীর চাউলই উল্লেখযোগ্য। সরকারী দাবের সাহায্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কোন জেলীর ল কি পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং মোট উৎপন্ন চাউলের মাণ জানিতে পারি। নীচে ঐ হিসাব দেওয়া গেল :

১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন

হাজার টন হিসাবে

আউশ	৩৩৬
আমন	৩৫৫২
বোরো	১৫

মোট ৩৯১০*

উপরের হিসাব হইতে দেখা বাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০-৫১ সালে মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার টন অথবা ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ২৫ হাজার মণ। চাউল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে আরও নানারূপ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গম, বব ও ভুট্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ রাজ্যে এই তিন প্রকার শস্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নীচের তালিকা হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইবে :

১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন (হাজার মণ হিসাবে)

গম	১১২৭
বব	৬৭৫
ভুট্টা	৬৪৮
	১৪৫০

দেখা বাইতেছে সকল প্রকার খাদ্যবস্তুর সংখ্যে পশ্চিম-বঙ্গের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বাৎসরিক পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটি মণের মত।

ইহার পর আমাদের জনসংখ্যা ও প্রয়োজন নির্ণয় করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের খাদ্যমন্ত্রী অল্পপাতে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ হইয়াছে। এই ২৪৮ কোটির মধ্যে শিশু কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের লোক রহিয়াছে। উহা ভাঙাও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিধবা এবং এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা দৈনিক একবার অন্নগ্রহণ করেন। এই কারণে মোট জনসংখ্যা হইতে প্রথমে আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা বাহির করিয়া তাহা হইতে বিধবা এবং অনাক্ত যাহারা একাহারী তাহাদের সংখ্যা বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উহার পর ৫ বৎসরের শিশু হইতে ১৫ বৎসরবয়স্ক কিশোরগণের এবং ৫ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের সংখ্যা বাহির করিতে হইবে। জনসংখ্যা স্থির করিবার পর উহাদের চাহিদা নির্ণয় করা যাইবে।

মোট জনসংখ্যা	২ কোটি ৪৮ লক্ষ
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার	
শতকরা ৫২.২ জন হিসাবে	১,৪৬,৪১,৬০০
প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা একাহারীর সংখ্যা	
শতকরা ৮.৩ জন হিসাবে	২০,৫৮,৪০০
প্রাপ্তবয়স্ক একাহারীর সংখ্যা	
শতকরা ৬ জন হিসাবে	১৪,৮৮,০০০

৩৫,৪৬,৪০০

* Indian Trade Journal, Sep. 8, 1951, page 802.

দৈনিক দুই বার অন্নগ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্কের

মোট সংখ্যা ১,১০,২৫,২০০

৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা

জনসংখ্যার শতকরা ২৫.২ জন হিসাবে ৬২,৪২,৬০০

• হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা

জনসংখ্যার শতকরা ১৫.৫ জন হিসাবে ৩৮,৪৪,০০০

বিভিন্ন শ্রেণীর জনসংখ্যার হিসাব উপরের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই। এক্ষণে উহাদের খাত্তের প্রয়োজন কি পরিমাণ তাহা স্থির করা যাক। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য গড়গড়তা দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক বা আধসের চাউল

যথেষ্ট। প্রাপ্তবয়স্কদের ৮ ছটাক হইলে যাহারা এক বেলা অন্নগ্রহণ করেন তাঁহাদের ৪ ছটাক, ৫ হইতে ১৫ বৎসর-বয়স্কদের ৬ ছটাক এবং শিশুদের জন্য ২ ছটাক বরাদ্দ করিলেই চলিবে। এইরূপ বরাদ্দের ফলে প্রাপ্তবয়স্ক, একাহারী, কিশোর এবং শিশুগণের মাথাপিছু বাৎসরিক খাত্তের চাহিদা দাঁড়ায় বৎসক্রমে ৪২, ২৬, ৩৬ এবং ১৬ মণ। এখন হিসাব করিয়া আমরা দেখিতে পাইব পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক মোট খাদ্যশস্ত্রের প্রয়োজনের পরিমাণ কিরূপ। উহার পর বাৎসরিক উৎপাদন ও চাহিদার সামঞ্জস্য করিলে দেখা যাইবে এ রাজ্য প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্ত না ঘাটতি অঞ্চল :

মাথাপিছু বাৎসরিক ৪২ মণ হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের মোট প্রয়োজন ৪,২২,২৮,৪০০ মণ

" " ২৬ " " একাহারীগণের " " ৭২,৭২,৪০০

" " ৩৬ " " কিশোরগণের " " ১,১০,২২,৪০০

" " ১৬ " " শিশুগণের " " ৪৩,২৪,৪০০

বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রয়োজন ৮,৩৮,২৪,৭০০ মণ

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১১ কোটি টনের কিছু অধিক এবং চাহিদা ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২৪ হাজার টন। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাউতেছে, প্রতিবৎসর আমাদের রাজ্যে প্রায় ২৬ কোটি টন খাদ্যশস্ত্র উদ্বৃত্ত থাকে। অবশ্য বীজ প্রভৃতির জন্য কিছু অংশ মোট উৎপাদন হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উহার পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ হিসাবে ধরিয়া ৫০ লক্ষ টন ধরিলেও পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক উদ্বৃত্ত ২ কোটি টন অবশ্যই থাকে।

উপরের সরকারী পরিসংখ্যানগুলি হইতে ইহাই নিঃসংশয় প্রমাণিত হয় যে, এ রাজ্যে খাদ্যশস্ত্রের কোন ঘাটতি নাই। ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত দেখা যাউতেছে অথচ বৎসরের পর বৎসর সরকারী ভাবে এ

রাজ্যকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া প্রচার করিবার কারণ কি ?

ঘাটতি অঞ্চল না হইলেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা বহু বৎসর হইতে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহাও কারণ কি হইতে পারে ? এই খাদ্যসঙ্কটের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী সরকারী-অব্যবস্থা, জোতদার ও ব্যবসাদারগণের অতি-লোভ এবং কালোবাজারীদের প্রতি সরকারী উদাসীন্য। যে খাদ্যসঙ্কট বর্তমানে বাংলাকে ধ্বংসের দিকে টানিতেছে তাহা মনুষ্যকৃত সঙ্কট বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সংস্কার ও জনসাধারণ যদি সমাজদ্রোহী কাষাকলাপ দমন এবং সমাজদ্রোহী ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে বর্তমান সঙ্কটের হাত হইতে নিস্তারলাভের আশা সূর্যপরাহত।



বন্দী যাত্রা

ঐরামপদ মুখোপাধ্যায়

১১

অমলেন্দু খবর দিলে—একটা বড় রকমের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাকিস্তানে কাপড় আর চিনির অভাব বড় বেশী—পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওগুলি নাকি কালোবাজারীরা চালান দিচ্ছে পাকিস্তানে।

কেম—সীমানার পাহারা নেই—তুফ-আপিসের কর্তারা করছেন কি?

পাহারা আছে—তত কড়া নয়—আর তুফ অফিসার সবাই তো সাধু নয়। এ হাফা চোরাকারবারীরা বা কৌশল করছে তাতে বরাও নাকি মুশকিল।

একখানি কাপড় বার করে তার পাতাগুলি সামনে মেলে ধরলে অমলেন্দু। এই দেব জলের ওপর ভাসছে বাজী-বোঝাই নৌকো—জলের তলায় দেব জল আটকানো ট্রাকের মধ্যে রয়েছে মতুন কাপড়; নৌকার নীচে শিকল দিয়ে কোলানো ট্রাক দিবা জলের তলা দিয়ে তিন্মুহান থেকে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। আর এই দেব ছবি—রেলগাড়ির ল্যাভেটরির মাঝার জলের টাক—এতে জল নেই, আছে মতুন কাপড় বোঝাই করা। দিবা জু খুলে কোড়া কোড়া হুতি সাকি এর মধ্যে সাকিরে রেখেছে। দেব—গাড়ির তলায় চাকার পাশের লোহার রডে কোলানো—বড় বড় বস্তা। এই দেখছ বোমটা দেওরা যেহেট—কালের হুটপুট হেলেট নিয়ে এ সীমানা থেকে ও সীমানার কাছে—বাহ্মনের ওর হুটপুট থোকা কাপড়ের বাণ্ডিল হয়ে যাচ্ছে—ভেমনি কত রোগা লোক সহসা মেঘহৃদিত্তে বেমানাম হয়ে উঠছে। জ্বির তলায়—উকুতে কোমরে বুকে শিঠে জামার নীচের কোথার না এই লুকোচুরি খেলা। চোখ এড়িয়ে এপার থেকে ওপারে গেলেই বন বিপ টাকা লাভ।

প্রভাত বললে, এ তো সবই দেখছি বরা পড়ে ছবিতে উঠেছে—তবু চলছে?

হঁ—। কোথা থেকে কোথায় বার জিম্মি তার সন্ধান কিছু আমাদের গলিতেই পাওয়া যাবে।

কে—কে—?

কিন্তু তারা হুমাণু'ট নয়—তাদের বরতে গেলে জাল শক্ত হওয়া বরকার।

আমরা চেষ্টা করব। যদি কোটপতিও কেউ থাকেন এর মধ্যে—

কোটপতিদের সাহসই বেশী। রপোর তীর ঘেরে অব্যেককে মারেন করাই তাদের রীতি। অমলেন্দু হাসল।

প্রভাত উত্তেজিত হয়ে বললে, সরকার দিল্লির এর টেপ মেবে—কাপড় যোক বেরুচ্ছে—দেশের শত্রু চোরাকার-বারীদের ধরিয়ে দাও—

কিন্তু বরবে কে? আইন কোথায়। আটায় তেঁতুল-বাঁচি আর মরম পাথরের গুঁড়ো; হাজার হাজার বন বরা পড়েছে—কিন্তু কেউ শান্তি পেলে কি না জানতে পারি নি। আইনের কাঁক নাকি ওদের কারদা করতে পারছে না—মতুন আইন তৈরি হচ্ছে। শোন তা হলে।

একদিন কাপড় দেখলাম—ওনুকের দোকানে ওনুব কিনে ক্যানমেনো চেয়ে মেবেন—মেনো না দেব মিকটবর্ডী পুলিশকে জানাবেন। আপনিও চোরাকার দমনে অনারালে সহায়তা করতে পারেন যদি ভাষা বুল্য দিয়ে কিনিম মেন, আর ক্যান-মেনো দিতে বাধ্য করেন দোকানীকে।—ওনুব কিনে মেনো চাইলাম, দিলে না। পুলিশকে জানলাম সে বদলে, বামার ইন্চার্জের কাছে যান। ইন্চার্জ বললে, আম্মা জিমিসটা রেখে যান—এনকোয়ারী করব। পীড়াপীড়িতে একটা তারেরিও লিখলে। বললে, আমার অফিসারকে জানাব—কিভাবে কেসটা টেক আপ করা বার হু'মিন পরে আসবেন। গিরে শুনলাম, কেসটা দায়ের করতে হবে আপনাকেই—আমরা সাকী হিসাবে...বল দেখি তাই চার টাকার ওনুব কিনে আদালত করা উকিল যোক্তার এসব পোষাবে কি আমাদের মত গরীবের?

অমলেন্দুর কথাগুলি তাববার মত বটে। বার শান্তিপ্রিয় মিঠীহ লোক—বাবসা বা চাকরি বা ছোটখাটো কাজ করে দিন গুজরণ করে তারা কেন পোষাতে যাবে এই বড়াই। এমমিতেই তো দেখা বার—পকেটবার বরা পড়লে কিংবা কেউ ট্রাম বাস বা মোটর চাপা পড়লে সহযাত্রীরা সহজে আইনের আওতার আসতে চান না। তাদের সাকীর অভাবে কত হুহুতি যে চাপা পড়ে বার। না—অনগণের বারের জন্য অনগণ কোমদিন সচেতন নয়। তাদের হুংরাকানের অকস্মতর মত তাদের উদ্যমের এবং মার্গনিক স্বরকার বোঝে যদি উগ্র হ'ত?

অমলেন্দু বললে, আমি অনেক তেবেছি তাই—এর একটা মাত্র উপায় আছে, তবে সেটিও খুব ঐতিফর নয়।

এমন উপায়? প্রভাত হাসল।

অমলেন্দু বললে, একদিন রাসে লেকচার শুনছিলাম, বিবেশ থেকে এসেছিলেন এক বিবকল্যাণকারী। তিনি বলছিলেন, বাহ্মনের পূর্ণ-বিকাশ হয় বাহ্মনকে দিয়ে। প্রাণি-

কণ বা পক্ষিকণভেদে একটু লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাবে—পরম্পরের সহযোগিতায় জীবনধারণ সুখের হয়, জীবন পরিপূর্ণ হয়। বাস্তব কিছু প্রতিযোগিতা চোখে পড়লেও সহ-যোগিতা না থাকলে সৃষ্টির কোন অবধি থাকে না।

প্রত্যন্ত বললে, ওকথা শুধু ঐষ্টানরাই বলেন নি, আমাদের শাস্ত্রেও—

মিস্ত্র। বাবা একটু সতীর ভাবে চিন্তা করেন—তারা ই আমের কাটকে বাব দিয়ে—

তোমার কথাগুলিও উপদেশাত্মক মত ঠেকেছে অমলেন্দু।

অমলেন্দু ঈশ্বর উদ্ভেদিত হয়ে বললে, ই—কারও আমার কাকুর ভক্ত ভাবি না—বড় বেশী সেলেক-সেন্টার্ড। কোন কোন দেশের লোকে পোড়া চুরুটের টুকরো—হেঁচা কাগজ বা লাম্বাড জঙ্কালও পথের মাঝে কেলেন না—আবার কোন কোন দেশে আর বা কলা বেয়ে তার খোসা পথে কেলেন চলে যায় মিস্ত্রিকার ভাবে। আমার বাঙালার সঙ্গে তোমার অঙ্ক-হামির বন্ধন সম্পর্কই নেই—

বাম—বাম। বা নেই প্রকৃতিতে—তা এক দিনে চোখ জাতিয়ে বা লাগি পিটে—টুক করে দেওয়া বাবে না। সে চেষ্টা আমাদেরই করতে হবে।

কি করে করবে ?

এস না—সামিতি বে গড়লাম—সেকি কতকগুলো মিরম-কাকুর খাতার টুকরা বারবার ভেঙে ? সেকি ব্রিক খেলা—আর লেখের লাগোচকো কিংবা সৌখিন হঃখোচনের হিটেকোটা দিয়ে মিলেয়ে কুলির রাববার ভেঙে ?

কথাটা ক্রমে হৃদয়ের পড়ল।

এক দিন অমলেন্দুও স্বেচ্ছা বসে পরামর্শ করছে কোন্ উপায়ে এই দুর্নীতি ঘোষ করা যায়—এমন সময় শশী হাজরা এলেন সেখানে। তাঁকে দেখে প্রত্যন্তরা রীতিমত বিস্মিত হ'ল। এই কয়েক দিন আগে—ওঁরই এক কণ্ঠস্বরীকে... কয়েক বক্তা চিনির ভক্ত তারা যথেষ্ট অপমান করেছিল—শেষ পর্যন্ত কেনটা পুলিশের হাতে ভুলেও দিচ্ছে এরা, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারে নি। পুলিশ-ভদ্রে ব্যাপারটা কতদূর অগ্রসর হ'ল—কিছুই জানতে পারা যায় নি। আটার পাথর-ভাঁড়ো ওঁতুলবীচি-চালে কাকুর মেশামোর ভদ্রত্বের মত ব্যাপারটি মেশায়েই চলছে। কাগজে এক দিন বে রিপোর্ট পড়ে বাহুব উদ্ভেদিত হয়—তার কলাকলের ভক্ত আরও কিছুদিন দে হয়ত অপেক্ষা করে—কিন্তু পৃথিবীতে বটনা তো ঐ একটাই নয়। জীবনধারণের কত সমস্তা কত দিকে টানবে বাহুবের হৃদিকে, কাজেই বেশ কিছুদিন পরে সে কোতুল কোথার নিশ্চিন্ত হয়ে বার তার টিকটিকানা থাকে না। বাবা বাহুবের হৃদয়লভার সুযোগ নিয়ে উপরে উঠেছে

তারা আমের মনভয়ের এই স্রষ্টা—তাই কখনও কখনও ল-উদ্ভেদনার বৃহত্তরলিকে দুই পাড়বার ভেঙে দীর্ঘ মীরবতার বাওয়াই প্ররোপ করে থাকে। অমলেন্দুও আগে জানত না এসব তথ্য—আজকাল জানের পরিধি তাদের বিস্তৃত হচ্ছে।

শশী হাজরা লোকটি প্রিয়বর্ষন না হলেনও—হাতখুব। সে হাসি কখনও ব্যবসারীগুলত ধূর্ততার টোটির ঝাঁক দেখার ঝাঁকে ছুটে ওঠে—কখনও শিওরুলত কোতুলকে হয় উজ্জ্বলিত। কথাগুলি তাঁর মিষ্ট—বাপু বাবা ছাড়া কাউকে সহোদয় করেন না—সবাই তার বৈকল্যবাহিত বিময়ে সর্বদাই বিপ্লবিত হয়ে আছেন। আর পাকা আর কাঁচা কদমাইটা চুল—সুন্দর-ওকফীম গোলগাল ভরাট খুব—নবর কান্তি—মেঘে বল-বলে নয়—প্রোটিন ভিটামিনে লাবণ্যযুক্ত। গারে একটি হাতকাটা কতুয়া—অধিকাংশ দোকানীর মত আবহরণ নয়—আগে সেটা লংকুথ বা টুইলের ছিল—এখন বছরে টাতিয়েছে—মাথার গাফী টুপিও একটি, টুপিতে ভিন্ন রঙা স্ফাগ। একখানা আদমবাকার আর একখানা বহুরঙাও প্রত্যাহ মেঘ। বলেন, হ'রকমের দুখানা কাগজ না মিলে লবকিছু জানা যায় না। বক্তব্যাকারের বাকার চক—একটা একখানি ছোট বর ভাড়া করে বাৎসারের পতন করেন—আজ তার লাগাও চার পাঁচখানি বতে সে ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যবসার শুধু সেটখানেক সীমাবদ্ধ নয়—পাতাভেঙে ছোট মুদ্রাশ্রমার দোকানটি আটা চাল চিনি কেরোলিন কেলের রেশম নিয়ে কেঁপে উঠেছে। এই দোকানের চিনির কতকট বক্তা নিশ্চিত রাতের মীরবতার স্বানান্তরিত হবার কালেই বটেছিল বিপত্তি।

শশী হাজরা এসেই বললেন, এই যে বাবাতা সব এইখানেই এসে—আমিও তাবতে তাবতে আসছি—সবাইকে এক কারবার পাব তো ? চল—শ্রীকরির ইচ্ছার...

অমলেন্দু অগ্রসর হয়ে বললে, আমাদের সবাইকে কি আপনার দরকার ?

‘মিস্ত্র—না হলেন ছুটতে ছুটতে আসছি কেন?’ অভ্যাস-বশতঃ হাজরা মশারের হাত ছুটি কোঁচ করাই থাকে—অপরিচিত কেউ দেখলে তাববে অজানা ক্রটিজনিত অপরাধে সদাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। একটু ভেবে বললেন কেন আসছি জান ? শুভলাভ—তোমরা একটি সমিতি গড়ে—

অমলেন্দু ব্যঙ্গমেশন করে বললে, আজ শুভলেন ?

না—আজ কেন শুভব। আমার দোকান থেকে বেদির চিনির বক্তা পাচার হচ্ছিল—সেই দিনই শুভলাভ...খুব উত্তম কাজ করেছে বাবা। তোমাদের মত হেলেনা যদি পাড়া মকা না করবে তো পাড়ার বাস করব কোন্ ঘরে ? হরি হে—সবই তোমার উজ্জ্ব। উদ্দেশে হুত কর উর্ধ্বে তুললেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলেন বললেন, ওই করেই দোকানটির দকা নেবে

আবহিল—হতভাগী। একটা মর বাবাজী—আরও আছে—
হুব কলা দিবে যে কালসাপ পুথি—তা জানি, কিন্তু হাতে-
নাতে বরতে পারি না বলে জবাব দিতেও বাধে। ভাবি
ককের কী—ওকে যদি জবাব দিই—ওর পরিবার হেল-
ঘেরে থাকে কি? তাদের হুংবে কলে আমি কেন নিমিত্তের
ভাগী হই। থাক—না বলতে এসেছি শোন। তোমাদের
কাজ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি—গোবিন্দের ইচ্ছার এই
মতিগতি তোমাদের বজার থাক—তোমরা হুর্জমকে সাজা
দেবার কথটা সত্য কর।

প্রভাত হেসে বললে, কিন্তু হাজরা মশাই—হুংবে এই
হুর্জমরা নিজেদের হুর্জম বলে বীকার করে না। তাঁদের
হুর্জমির দ্বারে আমরাই হর তো সাজা পেয়ে যাব।

না—কখনও না। হাজরার কণ্ঠের অন্তর বাণীর পর্যায়ে
উন্নীত হ'ল। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে মর। তোমাদের
লম্বিতিকে বতহুঁকু পারি সাহায্য করব। অবশ্য গতরে পারব
না—নে কখনও নেই, কিন্তু টাকার ভেত্রে তোমরা তেবো না—
আমার বসাবাস্য—

কিন্তু এতে তো আপনাদের বিপদ কম মর?

বিপদ। কিছুকণ বিনয়ের চেয়ে থেকে হেসে উঠলেন
তিনি। হাঁ—বিপদ অনেক রকমের আছে। তবে এও
জানবেন—সংগে থাকলে আদ্যেক রাতেও অন্ন হয়—এ
বিশ্বাস আমি রাখি। বাবলনগীর মূলধন হ'ল সত্যতা—গোবিন্দের
ইচ্ছার এই সত্যতা ব'দ ব'দার রাখতে পারি কোন দিকটাকে
তরবার কিছু নেই আমার।

কতুরার কেব থেকে একটা লাল রঙের ডাকডার ব্যাগ
বার করলেন হাজরা মশার। পাকানো হুতোম আলগা
কাঁস বুলে তা থেকে বার করলেন একখানা একশো টাকার
নোট। নোটখানি এগিরে দিবে বললেন, নাও ধর—আমাকে
তোমাদের সত্য করে নিও। বলেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন,
যদিও আমি বোরভর অন্তা—লেখাপড়া জানি না।

প্রভাতরা বিম্বিত হ'ল। এটা পরীক্ষা মর তো? হাজরা
মশার কোন্ কোণলের জাল পাতবার জন্ত বহাতভার অভিনয়
করছেন।

অমলেন্দু বললে, আমরা হুংবিত হাজরা মশার যে
আপনাকে সত্য করতে পারলাম না।

কেন? বিনয়ের ঘোর কেটে হুংবে তাঁর বেদনার দ্বারা
পাতুর হ'ল। এক নিমিষ্ট হুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস
কলে তিনি বললেন, বুঝি—আমাকে বিশ্বাস করতে পারব
না তোমরা? তাবহ বার দোকান থেকে স্ন্যাকমার্কেটে
চিনি চলে যাব, বার কর্ত্তারীমর নামে পুলিশে ফেল দায়ের
করেছে তাকে কি করে...

প্রভাত বললে, সেটা সত্য মর কি?

হাঁ—বুঝি ভাষা কণা। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস কর বাবা—
সে কর্ত্তারীমর সঙ্গে আমার কোন সন্ধ্য নেই—তাকে খুব
করে দিয়েছি দোকান থেকে। আর তোমরা বল ত হুংবির
দ্বারে তাকে ফেল খাট্টেরে সাজা দেওয়াই। মরুক তার দ্বী-
পুত্র বুড়ো বা বাবা—তাদের জম্বাতরের কর্ত্তকল ভোগ করুক
তার—অন্যকনের সাজা হোক।

সে বা ইচ্ছা করুন গে—আমরা আপনাকে নিতে পারলাম
না—একত হুংবিত।

হাজরা মশার সবেদে ললাটে তর্জনী স্পর্শ করিয়ে
বললেন, সবই গোবিন্দের ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।
তবে তোমাদের এ তুল একদিন ভাববে বাবা—তখন বুঝবে
তুমু বাইরেটা দেখে মাহুয়ের বিচার করা কত বড় তুল।
আচ্ছা আসি।

তিনি চলে যেতেই মশার বললে, তুল করলে প্রভাত—
টাকাটা মেওয়া আমাদের উচিত ছিল।

তুমি জান না মশা—এও এক রকমের হুং। অমলেন্দু
প্রতিবাদ করলে।

তুপতি বললে, কেন আমরা যদি সন্ধ্যের টিক থাকি কিনের
ভর? টাকাটাও বিশেষ বরকার।

হাঁ—টাকাটা সব সময়ই বরকার—সব কাজেও। সেই
জতই তো হুমিয়ার এত চোরাকারবার চলছে—আর এত
রকমের আটমকাহন পড়েও তাদের চৌকাতো পায়া বাচ্ছে
না। প্রভাত হুচ বরে বললে।

তুপতি বললে, তুমি একটা দিকই দেখছ প্রভাত—কিন্তু
দেখ ত ঘেঁষি টাকা হাত! কোন ভাল কাজ কি হয়েছে
পৃথিবীতে।

ওটা এক দিন ভিবেট করবার জন্ত থাকুক তুপতি—আর
একটা সত্য আস্থান করা যাবে।

তুপতি লজ্জিত মুখে বললে, বাই বল—এ কথা সবাই
বীকার করে।

আমরাও বীকার করি—তবে এই মুহূর্ত্তে মর। হাজরা
মশারের কেসটা শেষ হোক—টাকা মেওয়ার বাধ্যবাধকতা
কাটলে পর কাউকেই বিমুখ করব না তাই।

২০

মনটার কি যে অস্বস্তি লেগে রইল—কিছুই ভাল লাগছে
না। সংগ্রামের শেষ অব্যয়ে নতুন করে সংগ্রাম হুটী—তাই
কি করবে মনের প্রাণান্তিকে নষ্ট। এতে কার কতটুকু লাভ
প্রভাত জানে না—কিন্তু অকারণে শঙ্কবৃত্তি হচ্ছে। অভাবের
বিক্রমে প্রতিবাদে বা বুঝে মনের মাঝে যে আনন্দের উদ্ভব হয়
তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ আনন্দে নিজেদের ধানিকটা
উঁহুতে মনে হয়। কর্ত্তব্যের কঠিন দায়িত্ব বহন করে
মাহুয়ের প্রাণশা অন্যারানে লকর করা বার পরম কঠোর এই

হয়তো চরম পুরকার, তবু মন বলে—এও মিথ্যা। তোমার কাপানো পৌরবে পৃথিবী যদি পারের তলার মামল—তুমি কি পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন না। নাই থাকল যদি পৃথিবী তোমার মূল্য বীকার করবে কে? পৌরবে উপরে উঠে সবাইকে কাছে টানবে এ দুঃখাশা জগৎপট্টির প্রত্যম থেকে মাহবের মনে আশ্রয় নিয়েছে; কিন্তু শাসন নয়—সেবার দ্বারা মাহবের সন্নিকটে পৌছানোর সহজ উপায়টি বার বার তুলে বাও কেন? পট্টির অহঙ্কারে প্রমত্ত না হলে দুঃখাশা-আবিল দৃষ্টিতে তোমার জগৎ বঙ্গপেই উদ্ভাসিত হ'ত। তুমি বুঝতে পারও উপরে কেউ নয়—কারও কৃতিত্বও কারও বলল নয়—যে সার্থক হবার সাধনা নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে, পাওনার দর তাকে খালি রাখতেই হবে। সে ঘরের অন্ধ পূরণ করার কৃতিত্ব তার নয়।

আসতে পারি কি তার? বৃহৎ সঙ্কটিত কর্তৃ। প্রভাত বাইরে আসতেই ছেলেটি প্রাণের ভরিতে ইঁদং হুঁকে পড়ল। প্রভাত তার হাত ধরে বললে, থাক থাক, কিছু দরকার আছে তাই? ও তোমার নাম শুভব্রত না?

ই। সন্নিবনে বললে ছেলেটি। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?

না কাজ আর কি—বেকুব তাবহিলান।

তবে থাক—ওবেলাই আসব। শুভব্রত কেরবার উত্তোপ করতাই প্রভাত তার কাঁধের উপর হাত রাখলে। বললে, চল বলবে।

আপনার কতি হবে না?

কতি। প্রভাত হাসল।

এ জীবনে সন্নিবনে কতি কর—কতি তবু হয় না কোমরতে।

সত্যি বলেছেন।

আমি নয়—বলেছেন আমাদের কবি। করের সঙ্গে কতির কোন সম্পর্ক নেই—এর চেয়ে বড় আশা কেউ আমাদের দেন নি তাই। এস।

হুঁকনে ঘরে এসে বলল। ঘরের মধ্যে দেখবার কিছু নেই তবু শুভব্রত উৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালে। বর্ণহার্য দেওয়ালে যে ক'খানি ছবি টাঙানো আছে—স্নাতস্নেতে দেওয়ালের স্পর্শে তাদের হু—একখানির বিষয়বস্তু হুর্কোয়া হয়ে উঠেছে এবং বাকিগুলিও অচিরে হুর্কোয়া হয়ে উঠবে তার হুচনা দেখা দিয়েছে। বিবেকামন্দের পাগড়ী থেকে রাখা পর্যন্ত একটি সাদা দাগ নীচের দিকে মাঝে—স্ববীজ-মাথের দুখখানি কাপসা হয়ে আসছে তাঁর শুভ্র শ্রুতির বৈধ্য উপর দিকে প্রসারিত হওয়ার ভর। বইয়ের সেলুকটার কোন ঐ নেই—বাখানির খুন্সের কাঁকে সাদা শুভোর প্রলেপ—খুণ রয়েছে, আর তারি সামনে যে টিপটি রয়েছে তার উপরের বাতিজানটার হুর্কোয়া তর মন। নেটী লতা আশাবী টেবিল-

ল্যাম্প—শিতলের কলাই উঠে নীচের টিনটী আনন্দপ্রকাশ করেছে। একবারে পাভা রয়েছে ছোট একখানি শুভাপোষ তারই আধ-মরলা চারের উপর হুঁকনে বলল।

প্রভাত বললে, কবিরের খোঁজাক এ ঘরের কোথাও পাবে না—

শুভব্রত বৃহৎ বললে, হুণে হুণে লবকিছু বহলান, কবিরের রসদও এক থাকে না।

প্রভাত বিমিত হয়ে বললে, তাই নাকি? এ হুণের রসদ কি?

বেশী করে লজিত হ'ল শুভব্রত। বললে, আপনি যেন কিছু জানেন না। আপনার লেখা আমি পড়েছি।

প্রভাত বললে, ই। এক সময়ে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য ছিল ওর রসদ, আজ অন্ন-বস্ত্রের কুজুতার আগহে ওর প্রাণ। অন্নচিত্তা চমৎকার। এ নিয়ম আজ খাটে না।

কিন্তু একি শুধু কান্না নয়? শুভব্রত জিজ্ঞাসা করলে।

কান্না।

ই।—কবিতা লিখে আমরা হাসতেও পারি—আবার কাঁদতেও পারি। মানে আমি হরত টিক বুঝতে পারব না, তবে আমার মনে হয় কবিতা লেখার উপকরণ বহলে যাওয়াতে উপভোগেও বাধা পড়েছে।

বুঝতে পারলাম না।

মানে—সবাই হুঃখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে হুঃখের কবিতা পড়বার সময়ই বা কই। আজকের জীবন মাহবকে সব সময়ে তাকনা করছে—খামলে পরে কোথায় কি যেন কতি হয়ে বাবে। কিন্তু না খেয়ে ছুটতে ছুটতে—

প্রভাত হেসে বললে, তবু আমরা কবিতা লিখি এবং পড়ি আর শুনিও। শুভব্রত শুভব্রতে আমাদের অহুতি হুঃখ বা আমলে প্রের হয়। আমরা উপভোগ করি বৈকি শুভব্রত।

শুভব্রত বললে, এ লেখার কোন সার্থকতা আছে?

সে উত্তর দিকেই আশা করি পেরেছ। মইলে তুমিই বা কবিতা লিখবে কেন। পট্টী এমন অতুত যে, যে বা চার না তাকে তাই করতে হয়। আমল সব খিসিসের বীজের মত—হুঃখও সে আছে, হুঃখও আছে। কৈ বার কর তোমার বাভা।

পড়তে পড়তে শুভব্রতের সজোচ কেটে গেল। গলার হয়ে কম্পন আগল—উজ্জ্বল বা আবেগ তাকে ঠেলে নিয়ে চলল মর্ভ্য থেকে কল্প-চারণার। সে লোকে পৃথিবী রইল পারের তলার—হুঃখ রইল বিতির—প্রহমকণের। হুতিময় দেহ নিয়ে তার চারিবারে আমল-রশ্মি ছড়তে লাগল।

হুঃখ হুঃখের সাগর পারেরতে বৃহৎ তরঙ্গ দলে

জীবনের ব্যথা জীবন-শিল্পী হুটায় যে অবহেলে।

তোমার আমার অতি সাধারণ জীবনের ব্যথা নয়,

দ্বিবিদ-মামল ব্যাংলোকে দার জয় এবং লয়।

বন্ধু—তোমার যেমন আমার মর্মে রহিল লাগি
উপর অরুণ দেখিব বলিয়া সুখীর্ণ নিশি জাগি।
শিশিরে গলিয়া হুঃখের মেঘ নদীতে নামেও বহি
রূপালী চেতনেষ্টে বন্দী অরুণ করে দিবে হারানিবি,
তৈল টানিয়া সলিভার মুখে অরি উজল হয়,
মহনের কালে তিমিরে লেখে সে আপনার পরিচয়।
মারের ডাকে বগ্ন-বগ্ন থেকে বিচ্যুত হ'ল প্রভাত।
অপ্রতিভ শুভ্রভ্রত ভাঙাভাঙি খাতা বন্ধ করে বললে, মিহিমিহি
আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম।

প্রভাত হলে বললে, সময় তো নষ্ট হবার জুটেই।
হুঃখের বাইরে এল। শুভ্রভ্রত হাত তুলে নমস্কার করতেই
প্রভাত তার হাত চেপে ধরলে। কোমল হাত—ওর মুখের
মতই সুন্দর। স্পর্শে আত্মীয়তার সুর বেজে উঠল। যেম জহ-
জহাভয়ের চেমা মাহুব—বাকে পর বলে ব্যবধান বৃষ্টি করতেও
লক্ষ্যেচ বোধ হয়।

শুভ্রভ্রত আকৃষ্ট হ'ল এই স্পর্শে। বললে, একদিন আসবেন
আমাদের বাড়ীতে?

প্রভাতের মুখে হারা নামল—বললে, কিন্তু ওই বাড়ীটাই
তো তোমাদের?

কয়েকদিন আগেকার ঘটনা শুভ্রভ্রতের স্মৃতিপথে এল।
বুঝলে ও-বাড়ীতে পা দেবার সঙ্কেত কেন প্রভাতের। সে
মাথা নামিয়ে উত্তর দিলে, হাঁ—ওই বাড়ীটাই। অবশ্য যেক-
জ্যোত্স্নাইর সঙ্গে পার্টিশন হয়ে গেছে। বলতে বলতে লজ্জার
ওর সুপৌর সুখখানি লাল হয়ে উঠল।

প্রভাত ভাঙাভাঙি তার শিঠি চাপড়ে বললে, আচ্ছা বাব।
আমি এসে ডেকে নিরে বাব আপনাকে। কাল আসব?
এসো।

প্রভাত বাড়ী চুকতেই অনন্ত বললেন, আবার ওর সঙ্গে
মাথাখানি কেন—ও পাঠ তো একদম শেষ করেই দিয়েছে।

প্রভাত বুঝতে পারলে না—পিতা এ ভাবে বক্তোক্তি
করছেন কেন।

অনন্ত বললেন, বাও তেল মেখে মেখে মাও, আজ আমাদের
আপিসে একটা ইক্যারিভিট দিয়ে আসবে।

প্রভাত বহু ঘরে বললে, চাকরি আমি করব না।

অনন্ত সহসা চটে উঠলেন, তবে কি লাটসারেবি করবে?

না—লাট-সারেবরাও বেশী দিন এখানে থাকছেন না।

অনন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তুই ভেবেছিল কি বলত?
তোকে যে এতদিন লেখাপড়া শিখিয়ে মাহুব করবার চেষ্টা
করছি সে কি কথার অব্যাহত হবি বলে? আমাদের অবস্থা
তুই বুঝবি না—কি করে সংসার চলে তা কি কোন দিন
জানতে চাইবি না?

প্রভাত বললে, বাবা, লংগার যে করে চলে সে জানি—

কিন্তু লংগারের মধ্যে আমাকে নষ্ট করে দেবার জুটেই কি
লক্ষ্যবান হয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন?

তোর কথা আমি বুঝতে পারি না প্রভাত। তুই বড়
হেলে—সংসারের অবলম্বন। তোকে লেখাপড়া শেখানি
বেশী করে উপার্জন করতে পারবি বলে—আমাদের মত
ডাইনে আমতে বাঁয়ে তুলোর না গোছ সংসার চালানোর
জুটে নয়।

কিন্তু চাকরি করে এর চেয়ে ভাল সংসার চলে না বাবা।
আর চাকরিতে খুব বেশী লেখাপড়ার দরকারই বা কি।

সে বুঝি আপিসে চুকে। সারেরের সঙ্গে হরদম ইংরেজী
চালাতে পারি, কিন্তু একটা মোট দিতে গেলে কলম তেনে
যায়। কত বড় বড় বিষয় মাথাতেই ঢোকে না। ওরে
আগেকার দিন আর নেই যে ইয়েল তার বলে কাক চালিয়ে
দেবে।

একটা বছর আমাকে মাপ করবেন বাবা—আমি চেষ্টা
করে দেখব—চাকরি ছাড়া আমরা ঠাঁজতে পারি কিনা।

চাকরি ছাড়া করবি কি—ব্যবসা? সে খুঁজি আছে
তোর?

ব্যবসার কথা ত তাহবি না আমি—

তবে কবিতাপাঠি করে সংসার চালাবে বুঝি?

প্রভাত ভাঙাভাঙি সরে এল সেখান থেকে। বাবা অত্যন্ত
উত্তেজিত হয়েছেন। উত্তেজনা বাড়লে ওঁর লম্বুগুরু জাম
থাকে না—বা মুখে আসে বলেন। হুঃখা মারের চেয়ে তার
ব্যথা বড় ভয়ানক। এমনই কল্পলোকের পুণিবী কুংসিত হয়ে
উঠবে। অরবিন্দের কল্পুতার কুংসিত নয়—শালীনতা ও সন্ত্রম-
বোধ-মুক্ত মাহুকের নির্লজ্জ আচরণে কুংসিত। পুষ্টির আমল
বুহুঁড়ে বিষিয়ে ওঠে—যখনই বাঁধের উলঙ্গ প্রকাশ বৃষ্টিকে
আঘাত করে। মনে হয় সংসারে জীবনধারণের মত কদর্য
জিমিল আর নেই। এখানে স্নেহ-ভালবাসার বেলান্তি নিয়ে
সবাই চলাকোরা করছে।

চলতে চলতে কখন সে এসে পড়েছে হীপাবের বাড়ীর
সামনে।...কখন যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনিবেশ তার হাত
ঘরে টানছে, বলছে—এখনও তোঁথে তোর কবিতার বোর
লেপে রয়েছে যে। এত ভাকলার বোতলার জানালা থেকে
একবার মুখ তুলে চাইলি না পর্যন্ত।

অনিবেশকে অহসরণ করে প্রভাত গেল—কিকে নীলরঙা
বলবার ঘরে—একবারে তার বিলাতী ব্রোকেডে বোকা নুহুড
সোকা—কৌচ—অত ঘরে টাকবাখোলা সুহুং অর্পণ।
মাকধানে পালিশ করা টেবিলে মোমাবাবানী ফুলদারীতে
পোলাপ আর পীয়ার তোকা—মাথার উপর লাকা রেডের পাখা
—আর লাল কাহবে বিজলী বালব বেদ লাল পাপড়ীর
সুহুড একটা ফুল—সাবা কোরকটিকে লম্বা তেকে মেখেছে

তার বুকের মধ্যে। বেওয়ারিসের হস্তমিলিতে এখনও শুকনো কুলের মালা লুটানো—বাণীমতা দিনের ভিন্নতা নিশান—
তাও খুলে দেখা হয় নি। কেন খুলে দেবে? ওদের বাণীমতা তো একটি দিনের নয়—প্রতিদিনে তাকে চেঁচে চেঁচে উপভোগ করছে ওরা। এই করে বসে প্রতিদিনই তাবতে পারা যায়—আমরা বাণীম বাণীম। রাষ্ট্র কিংবা সমাজ—
কিংবা সংসার—কোনকিছুর অন্তরালে সুখ-বিস্ময় সঞ্চিত
পোচর হবে না এই করে বসলে। যে তার যে সমতা প্রত্যাহার
বের গৃহসীমানার বর্ষন তখন বড় তুলছে—এই গৃহ সেই
পরিধির বাইরে।

প্রত্যাহার পাণ্ডুরা দীপাকে আশ্বাস করল। সে বললে,
আজকাল বড় বেশী সস্তার হয়ে যাচ্ছেন প্রত্যাহার—শেষ-
কালে না হার্ষনিক হয়ে পড়েন।

প্রত্যাহার উত্তর দিলে, বরষ বাতলে বর্ষনের পুঁজিও বাড়ে,
হার্ষনিক হওয়া আশ্চর্য্য কি।

উক্তিটা বেশরো লাগল। দীপা ভাড়াভাড়া সামলে নিয়ে
বললে, আচ্ছা প্রত্যাহার—এবার হার্ষনিকের জাহাজি হবে ত?
কেন হবে না?

আমরা তো বাণীমতা পেরে গেলাম—তাই বলছি।

সত্যিই কি বাণীমতা পেরেছি আমরা?

বাঃ রে—পাইনি ত ব্রিটিশ এমেন হেডে যাচ্ছে কেন?
এক বছর পরে দেখবেন—ওদের একটি সৈন্তও এবেশে থাকবে
না।

তাই নাকি? প্রত্যাহার হো হো করে হেসে উঠল।

দীপা ক্রুর কণ্ঠে বললে, কানকে তা হলে মিথ্যে লিখেছে?
না না, মিথ্যে লিখবে কেন। প্রত্যাহার হাসতে হাসতে
বললে, তবে রাষ্ট্র চালানোর জন্যে ওদের রীতিনীতি, আইন
কানুন ভাঙা—

অমিমেব বললে, তুমি কি রাতারাতি সব বুঝে ফেলতে
চাস?

আমরা বা চাই—তা পাই কি? আমরা সবকিছুর জন্যে
মূল্য দিয়েছি—তবুও এখনও পোষ হ'ল না।

প্রত্যাহার উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল।

দীপা আর অমিমেব হ'লবেই চমকে উঠল। এমন ভিত্ত
কর্কণ হাসিও হাসতে পারে প্রত্যাহার।

সত্যিই এর পর আলাপ করল না। দীপার কৌতূহল
ভিন্নিত হয়ে এল—অমিমেব অন্যমনস্ক হবার ভান করলে।
প্রত্যাহার এই ধরনের হাসিকে ওরা ভয় করে।

দীপার মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। যেদিন
প্রাইভেট টিউশানি নিতে প্রত্যাহারকে ও বারণ করেছিল—তার
পরের দিনের কথা।...

সেদিন সকালে প্রত্যাহার এ বাড়ীতে আসে নি। সন্ধ্যায়
বুঝে দীপাই যেম ওকে ধরেছিল পথের মাঝে। বলেছিল—
গেলেন না বে সকালবেলা। তাবলেন বুঝি কালকের
ব্যাপারটা নিয়ে না জানি কি কাণ্ডটাই বাধবে।

বুঝলার—ম্যানেজ করে দিয়েছ তুমি?

আপনি ত ভেবেছিলেন পারব না।

অকস্মাৎ হেসে উঠেছিল প্রত্যাহার। এমন উচ্চ আর কর্কণ
হাসি। সে ক্ষমিতে দীপার আনুভূতি ধাম ধাম হয়ে তেলে
গিরেছিল। কথটা কি আনুগোহবের মত শোনাল।
ব্যাপারটা ঠিকমত জরুর করতে পারে নি দীপা। তবু মনে
হয়েছিল প্রত্যাহার নিষ্ঠ বক্তাবের পরিবর্তন হয়েছে।

এর পর দিনকয়েক প্রত্যাহার তারের বাড়ীতে আসে নি।
যেদিন বাড়ীতে এসেছিল সেদিনও কণোপকণের বারতাই
ছিল সংকীর্ণ—বাঁকা। হঠাৎ কিছু না বলে ও চারের আসর
ত্যাগ করেছিল।

আজও হঠাৎ হাসি ধামিয়ে প্রত্যাহার বললে, আচ্ছা আসি।

প্রত্যাহারের অবকাশ না নিয়ে ও বার হয়ে গেল।

দীপা বললে, ব্যাপার কি ছোড়না?

অমিমেব বললে, বুঝতে পারলাম না। ও নাকি পড়তে
চায়—কিন্তু পুঁজি করতে পারছে না। তার জন্য ওর মেজাজ
বিটবিটে হয়েছে।

কেন?

কেন—তুমি জানিস না?

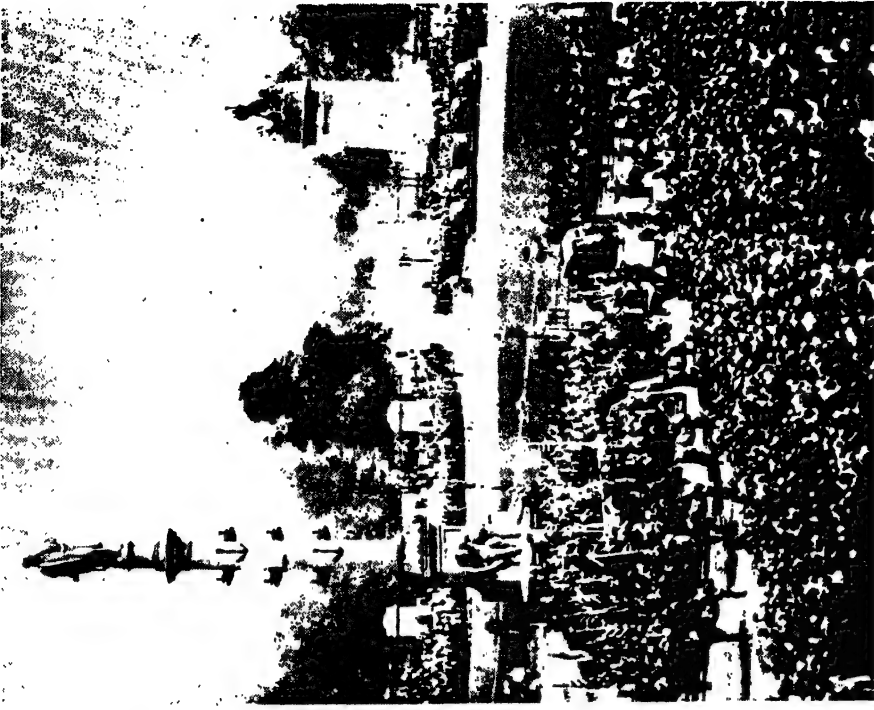
ওঃ—দীপা লজ্জিত হয়ে বুঁক ফেরালে।

(জবাবঃ)

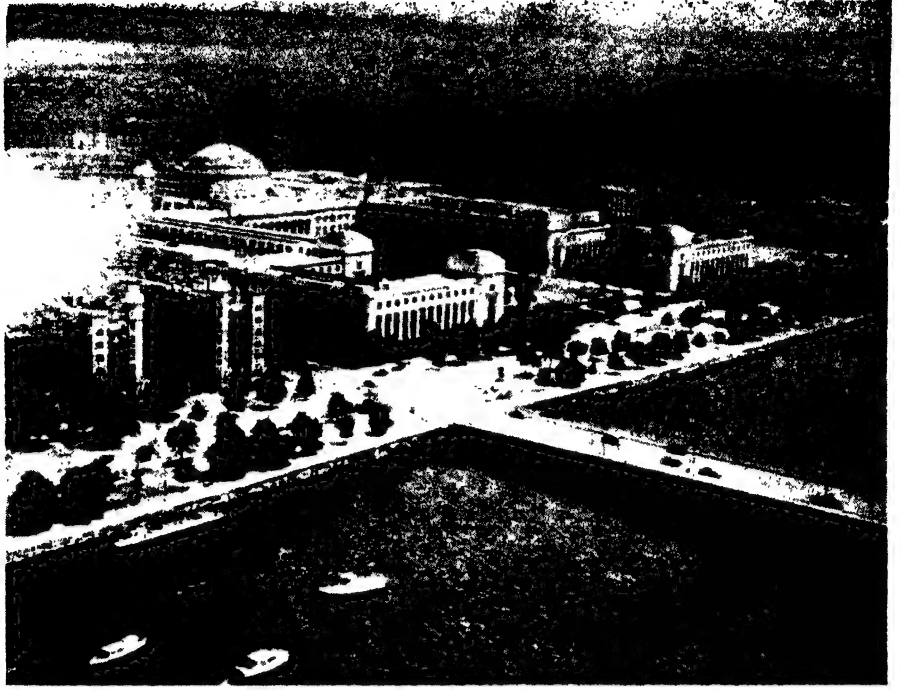




ওয়াশিংটনে টমাস হেকারসন নভি-সৌর পরিদর্শন-রত ভারতীয়
'মেবার অকিসার' গাথান



আমেরিকার নিউইর্কে কলম্বাসের স্মৃতিস্তম্ভের পাশে কলম্বাস দিবস উদ্‌যাপন



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শ্রম-প্রতিষ্ঠান—ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বায়াস্টিউট



সিউলের পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনীত চাল বিতরণ

ইলদীঘাটের যুদ্ধ

অধ্যাপক শ্রীশ্রীদত্তভূষণ রায়

আকবরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেবার বেন। যোতন।
আকবর বর্ষ পতকে এই রাজ্য কোটা হইতে চুনারপুত্র, ওয়া
হইতে সিরোহী এবং সিরোহী হইতে বিত্তর পৰ্য্যন্ত, মৈত্রে
আনুমানিক ১৫০ মাইল ও প্রস্থে ১০০ মাইল বিস্তৃত ছিল।
আরাবলী ও লাভপুরা পর্বতমালা এবং ইহাদের শাখাশাখা
হাকে বেমন সুরক্ষিত, তেমনিকররমর ও অহরর করিয়া
আঁটিয়াছে। বেবারবাসীদিগকে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা পত
আপান করিতে হয়। ইহারা বেমন বলিষ্ঠ ও বীর্যবান
তরুণই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং নির্ভীক। এই শিশোদীর রাজপুত-
দলের বীরস্বকাহিনীর এক অধ্যায় বর্ণনা করিতেছি।

পাণিপথের বিজয় যুদ্ধের চারি বৎসর পর (১৫৬০)
আকবর বহুতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ক্রমে মালব, যেতলা
পতরোনা (১৫৬২) কর করিয়া তিনি চিতোর হুর্প অবরোধ
করেন (১৫৬৭)। এই চিতোর কর (১৫৬৮, ২৩ ফেব্রুয়ারী)
গরতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আকবর হুর্ডে
হস্তর (সুপততপুর) ও কালিঙ্গর হুর্প অধিকার করিয়া
(১৫৬৮) এবং মায়বান-বিকালীর-অঙ্গসলহীর রাজ্যকে নিজের
অধীনে আদরন করিয়া ১৫৭৪ সালে সবত্র রাজ্যহাসে আ-
লুখ প্রভিষ্ঠা করেন। একমাত্র বেবারের রাণা প্রতাপসিংহই
তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হন।

তিলেক্ট এ. শিব আকবর-প্রতাপ সংঘর্ষের কারণ নির্ণয়
করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"Pratap's patriotism was his offence. Akbar had
won over most of the Rajput chiefs by his astute
policy and could not endure the independent attitude
assumed by the Rana who must be broken if he would
not bend like his fellows."

বস্তুতঃ বরেনপ্রীতিই প্রতাপের কাল হইয়াছিল। নিজের
বিশ্বপন্থা ও মুহুরিকোশলে আকবর রাজপুতানার সুপতিদের
দ্বারা অনেককেই বশীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ তাঁহাদের
তাঁহা অধীনতা স্বীকার না করিয়া বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া
সিঙিতে থাকায় আকবর তাঁহার পক্ষি হুর্প করিবার লক্ষ্য
করেন। পতিতপ্রবর পৌরীশকর হীরাটাব ওয়া মন্তব্য
করিয়াছেন, প্রতাপ মামসিংহের সহিত একত্র পাদাহার না
করিয়া তাহাকে অপমানিত করার আকবর এক ক্ষুভ হন যে,
রাণাকে শায়েতা করিবার লক্ষ্য কছাখা সেনাপতিকেই তাঁহার
বিক্রমে প্রেরণ করেন।"২

হুইট মন্তব্যেই আকবরের ব্যক্তিগত বাগবা কোতকেই
যুদ্ধের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজ্য কর করা
ও রাজবর্ষ।

হকত্, আল্লিয়ারা বসিরদ বাবদাহ্,

হামদুমান্দ মরবনদ আল্লিমে দিগর।

অর্থাৎ, লাভপুরা রাজ্য কর করিতে পারিলেও বাবদাহবিরণের
অত্র রাজ্য করের বাসনা প্রবল হয়। ইহাও মাহুলি পং। দিল্লী-
বেবার যুদ্ধের ইহা অন্ততম কারণ বটে, কিন্তু শেষের বিজয়
'কিলিপ' বা প্রেতিহিংসাপরায়ণ জনীর কার আইতাদের তার
আকবর কেবল নিজ পক্ষি ও মর্যাদা হুহির লক্ষ্য লালায়িত
হিলেন না। তারতের বিভিন্ন জাতি বর্ষ ও বর্ষের লোক-
দিগকে একত্রিত্রে প্রবিত করিয়া সকলকে রাজকাণ্ডে সমান
অধিকার দিয়া তিনি একত্বাধীততার সৌব পতিয়া হুলিতে
চাহিয়াছিলেন। আর এই মহান্দ আত্মপক্ষে বাতবে জনপতিত
করিতে তিনি কত বলা ও লাভনাই না দাবার পাতিয়া
লইয়াছিলেন। সুপার পর আত্রা প্রাসাবে করিবার পথে
সম্রাট আকবর বেহিন পীর থালা হুইহুতীম চিশ্জী লাহেবের
তরুণদান-রত এক হল ককিরকে বেহিতে পান সেই দিবট
টার জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বৎসরই তিনি আশের-
রাক তাবমলের কতার সহিত পরিণয়গ্রহণে আবদ হন। একই
বাইশ বৎসর বঃকরকালে সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যিক তেহ-
হুহিপ্রহৃত জীর্ঘ-কর ও বিজিয়া করের বিশোপদাধন দ্বারা
সকল প্রজাকে একই রাজকীর বিধান ও শাসন ব্যবহার
অধীনে আদরন করিয়া উদারতা এবং অসাম্রাজ্যিক মনো-
ভাবে পরিচর প্রকাশ করেন। প্রতাপ ও অতাত সুপতিদিগের
বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা বিশোপ ব্যতীত আকবরের পক্ষে নিজের
আত্মপক্ষে বাতবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। ইহাই দিল্লী-
বেবার সংঘর্ষের প্রকৃত বা হু্য কারণ।

আকবর বেবারাধিপত্যকে কুটনীতিবলে নিজের অধীনে
আনিবার লক্ষ্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ১৫৭৩ সালের এপ্রিল
মাসে তিনি মামসিংহকে শুকরাট হইতে উত্তরপুরের পথে
আত্রা করিয়া বাইতে আশেপ করেন।৩ বেবারে তব্ব
রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হইয়াছে। রাণা উত্তরের
বর্গায়েহণের পর (১৫৭২) প্রতাপ তাঁহার কবিত্ত জাত
অগুনালকে বিভাজিত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ
করিয়াছেন, আর অগুনল বাহী কপার জাগির পাইয়া জাহাজ-

* V. A. Smith: Akbar, the Great Mogul, p. 151.

২ রাজপুতনা-কা-ইতিহাস, তৃতীয় বঃ, পৃ. ৭৩৯।

৩ আকবরনামা, মূলগ্রন্থ, এনিমিটিক মোমাইট কর্তৃক
প্রকাশিত, তৃতীয় বঃ পৃ. ৪০।

ভাকিয়া ভিজালা করিলেন, “আজ্ঞা, সত্যি কি আপনি বুড়ে বাইতে চান?” বদায়ুদী সবিস্ময়ে নিবেদন করিলেন, “হাঁ হুজুর, এই যে আমার কালো ‘দহায়েম’ (বাড়ী), তাহা আপনার বেদমতে রক্ষিত করিতে চাই” এবং বিরোদ্ধত কথিবাটী আয়ত্তি করিলেন :

কারে তু মখাতরা আহত্ খাহম্ করম্

তা হোরম্ হুমম্ যোরে আক্ তু ইয়া পরহম্ ।

অর্থাৎ, “আপনার সেবার কাজটিতে বিপদ থাকে থাকুক, হরত আমার দুখমণ্ডল রক্তাত, না হর গ্রীবা রক্তাপ্লুত হইবে।” বদায়ুদীর ভক্তিতে বাদশাহ পরম শ্রীত হইয়া বলিলেন, “ইন্শা আল্লাতাহাহ আপনি খোশ থবর লইয়া কিরিয়া আসিবেন।” এই বলিয়া ‘কাতেছা’ পক্তিতে পক্তিতে বাদশাহ অথচালনা করিতে উত্তত হইলেন। আমদের আতিশয্যে বদায়ুদী কদমবুদী করিবার লজ্জা বাদশাহের পদকমলের দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন, আর বাদশাহ রেকাবস্থিত পা উর্কে উত্তোলন করিয়া এক অঙ্গুলি আশ্বস্তি ইয়ার সাহেবের হাতে ঢালিয়া দিলেন। বদায়ুদী বিদ্যার পাইয়া ‘জেহাদী’ বলের সহিত বেবার অতিরূপে বাজা করিলেন। ১১

শাহী কৌলের মওলগড় আগরম-সংবাদে বিন্দুমান বিচলিত না হইয়া প্রতাপ কদমবুদী রক্তাকলে ভংগর হইলেন। পিতৃপুরুষদিগের পুণ্যপারম্পর্শে পুত্রে মেবারের প্রতিটি মূলিকণা ছিল তাঁহার নিকট পবিত্র। মেবারই ছিল তাঁহার সকল ধর্ম, কর্তব্য, চিন্তা ও ব্যাসের মূলে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বের মেবার দিল্লীর সমকক্ষ ছিল। রাণা সজ ভারতের রাজবৃক্ট মন্তকে ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে তুলতান ইব্রাহিম লোদী ও বাবর বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু হুজুরিগ্রহ ও মানা বিপর্যয়ের কলে রাণা উদয়ের আমলে মেবার এক সুপ্রসারিত পরিণত হয়। কি অর্থ-সামর্থ্যে কি লোকবলে শাহী পক্ষের তুলনার তদানীন্তন মেবার ছিল নগণ্য। তাই প্রবল শত্রুপক্ষের আক্রমণকে কি উপায়ে সূত্বভাবে প্রতিরোধ করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার লজ্জা প্রতাপ তাঁহার আশ্রিত রাজা ও ভৌমিকদিগকে এক মন্ত্রণা-সভায় আহ্বান করেন। সর্বসম্মতিক্রমে ১২ ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, তাহাদিগকে শত্রুপক্ষের সপুতীন হইতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে মেবারের সিরিকদারের সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে হামসিংহ মওলগড় হইতে বাজা করিয়া মোহী-গ্রাম হইয়া প্রতাপের নিকটস্থ গোমতা হ্রদতীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল রাজ হর হাজার সৈন্য।

কদলাকীর্ণ হ্রদ পার্শ্বভ্যে প্রবেশ ‘হুদুয়া’ বা চক্ৰবৃহৎ অরণ্যবোমী বনে করিয়া সুকৌশলী সেনাপতি অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ বেবারসিংহের বিবরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপ গোমতার অবস্থান করিয়া কদমবাহ সেনাপতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অনেকের মনে এই ধারণা বহুল যে, প্রতাপ এমন গোঁড়া ও বাজাত্যাভিমাদী ছিলেন যে, তিনি হামসিংহের সহিত কেবল পানাহারে বিরত হন নাই পরন্তু বন্যের সঙ্গে বিদ্যি আত্মীয়তাহুজে আবদ্ধ তাঁহার সংশ্রব অন্তি মনে হওয়াতে তিনি উদয়নাগরের ভীয়ে যে স্থানে হামসিংহকে ভোজ্যবস্ত পরিবেশন করা হইয়াছিল সেই স্থানটী বনম করাইয়া সেখানে গন্ধাকল সিকনের ব্যবস্থা করেন এবং “আকবর তাঁহার হুকা” এই গালি দিয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। “রাজ-প্রশস্তি মহাকাব্য” ও “জঙ্গসিংহ-চরিতে” এই উক্তির উল্লেখ নাই, পরন্তু বেবার রাণাদের রাজমহন্তলে যে তুলনামান রাজারা, বাজবাহাহর, পোলদাদ করিমারক ইসমাইল ১৩ এবং পুররাজবংশীর ছেকিমা খাঁ পুর প্রভৃতি রাজ্যচ্যুত তুলনামান রাজারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অবিসংবাহিত সত্য। যদি তাঁহাদের অবস্থিতিতে ও দামাপানি গ্রহণে মেবারের পুত্রে আবহাওয়া কলুষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কদমবাহ সেনাপতির অগ্রগ্রহণে কি করিয়া উদয়-নাগরের ভীয়ে স্থিতি হয়? ব ব চৌকার ব-পাকতোজী রাজপুত চারণপণের মন্তিকেই যে এই ধরণের করণা গজাইয়াছিল, তাহা অস্বাভাবিক করিতে বিলম্ব হয় না। হলদীবাট রণাঙ্গনে বাহারা প্রতাপের লজ্জা জীবন পণ করিয়া লড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ছেকিম খাঁ পুর ছিলেন অগ্রগণ্য। আর তিনি রাণার এমন অস্বস্ত ছিলেন যে, সৈন্যবলের এক ভাগের কর্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে তত হয়।

তখন জুন মাস ১৪ প্রথম রোজ-দীপ্ত রাজস্থান তপ্ত কঠাহের ভার উত্তপ্ত। পার্শ্বভ্যে নদী-নিবহিণী তখনও বিতপ্ত;

১৩ আকবরনামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১৯

১৪ আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড। পৃ. ১৭৪

তিন জন ঐতিহাসিক কর্তৃক রচিত একটি কলেকপাঠ্য পুস্তকে এই যুদ্ধের তারিখ এপ্রিল মাসে দেওয়া হইয়াছে। আর “Pratap was defeated”—এই এক কথার মেবারাধিপতির সংকার করা হইয়াছে। ডিবেল্ট এ. সিং বলিয়াছেন, “The imperialists narrowly escaped suffering a total defeat.”—Akbar, the Great Mogul. পৃ. ১৪৩।

আবুল কজলের মতে এক প্রহর মেবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু মেবারস্থিত অগণীর্ণ মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে ইহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়।

তুণ্ডভরণপূত পৰ্বতগাত্র রুক। এই নিরাশ্রয় প্রীতকালে ১৫৭৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি রানসিংহ গোষ্ঠা হুর্নের অমতিদূরে বনান নদীর তীরে অবস্থিত বনমোর গ্রামে পৌঁছিলেন।^{১৫} এতাপ কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত কচ্ছবাহ শিবির হইতে তিন মাইল দূরে হলদীবাট গিরিসঙ্কেতে রাজ্য তিন হাজার সৈন্তসহ আগ্রসর হইলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র বলকে দুই তাপে বিভক্ত করিয়া এক তাপ পরিচালনার ভার রাখিলেন নিজ হস্তে, অপর তাপ দিলেন হেকিম বীর উপর।

অপরপক্ষে রানসিংহ সৈন্ত-সমাবেশ করিলেন পক্ষীর আকারে। এই পক্ষীর ভার আকৃতিবিশিষ্ট বাহিনীর চক্রেতে ছিল সৈরন হালিম বারহার অধীনে একবল সৈন্ত, মধ্যক্বে জগদ্বাণ কচ্ছবা এবং আসক বীর অধীনে অপেক্ষাকৃত অবিকল-লংঘ্যক সৈন্ত, পূর্বে রানসিংহ বরং, আর হকিম পক্ষে সৈরন আহমদ বারহা ও বান পক্ষে মোস্তাফা কবি বী, এবং পুছবেশে (rearguard) বেহতর বী। ১৬ই জুন (৭) তারিখ উত্তর পক্ষ হলদীবাটের প্রান্তরে পরস্পর পরস্পরের লগ্নুদীন হইল।^{১৬} প্রথমে আক্রমণ সৈন্তাধ্যক্ষ হেকিম বী বিদ্যাবেশে পশ্চিম দিক হইতে শাহী^{১৭} কোরের চক্ৰ বা অগ্রগামী বল দুইটির উপর আপতিত হইলেন। হানটি ছিল বহুর ও কণ্টকাকীর্ণ। তাই বিভক্ত বল দুইটি একত্র লম্বিলিত হইতে না পারিয়া শক্রসেনার আক্রমণে বিপথ্য হইয়া পড়িল। তাহাদের সাহায্যার্থ শাহী সুলবাহিনীর অধ্যক্ষ রানসিংহ বলবলসহ আগ্রসর হইলেন, কিন্তু হেকিম বী অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া প্রচণ্ড আঘাতে এই অংশের বান পার্শ্ব হিরতির করিয়া কেলিলেন। অন্তোপার হইয়া এই পার্শ্বের সৈন্তাধ্যক্ষ রাজা লোকরন স্বপক্ষীয় অগ্রগামী বলের সুবর্তন করিয়া আশ্রয়ের জন্ত হকিম পার্শ্ব আহমদ বী বারহার অধীন সৈন্তবলের দিকে দাবিত হন। তখন বাবরান প্রতাপসিংহের পক্ষীয় রাজপুত ও পলায়নপর (লোকরনের) অধীন রাজপুতদের মধ্যে ভারতব্য করা কঠিন হইয়া উঠিল।

এদিকে রুজাহিব মোস্তাফা বহাদুরী আসক বীর পার্শ্ব হান গ্রহণ করিয়া শান্ত ও সংবত চিত্তে নর নিক্ষেপপূর্বক কাকের-বিসর্কে “জাহারুন্নে” (মরকে) পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু স্বপন উত্তর পক্ষীয় রাজপুত ওঃপ্রোভ ভাবে মিশিয়া গেল, তখন

১৫ বনমোর গোষ্ঠা হইতে তিন কোশ দূরে অবস্থিত ছিল। রাজপুতানা-কা ইতিহাস, পৃ. ৭৪০। বনমোর হইতে হলদীবাট তিন মাইল দূরে, এই স্থানের মাটি হলুবর্ণের। তাই হলদীবাট নাম। ঐ পাবলিকা, পৃ. ৭৪৩।

১৬ আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৪

১৭ “আক কেবল কুইয়া”। লো (Low) সাহেবের অনুবাদ গ্রিক নর।

আসক বী বহাদুরীকে বিভ্রান্তা করিলেন, “বী সাহেব, এই নরর আশা ও বেগানা (শত্রু ও মিত্র) রাজপুত লম্বাক করা ও বত হুশকিল। কি করা বার?” তিনি উত্তর করিলেন, “আরে তীর হাতিতে থাকুন ও, হুশবন কাকের বে পকেই নিপাত হর, হটক, ইসলামের ও লাভই।”^{১৮} বহাদুরী বোশমেজাজে যদুজ্ঞানেনে অবিরাম তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ‘পেজার হোয়াব’ হাসিল করিলেন।^{১৯}

মোস্তাফা সাহেব স্বপন বিপরীত্বলের ধ্বংসসাধনে রত, প্রতাপ তখন উচ্চর ভার শাহী বাহিনীর বান পার্শ্বের উপর পতিত হইলেন, আর হেকিম বী হকিম পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। দুই তখন চরমে পৌছিল। রাজপুত অঘায়েহিসপের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়া বান পার্শ্ব অবস্থিত সিক্তীর সেবগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সমরাসন হইতে বহু দূরে পলাইয়া গেল।^{২০} এই বলের সৈন্তাধ্যক্ষ কাকী বান শত্রুসৈন্তের পতি-রোধ করিতে বধাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হকিম হস্তে তরবারির আঘাত পাইয়া হৃদয়ত দুহনদের (মঃ) একটি উক্তি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনিও “মোহাজের” (পলাতক) হইলেন। হকিম পার্শ্বের অতন্তন সেনানায়ক সৈরন হালিম বারহা হেকিম শূরের আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া অথ হইতে পড়িয়া গেলেন। সৈরন রাজুর সাহায্যে তিনি পুনরায় অঘা-রোধ করিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই এই পার্শ্বকে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে প্রতাপ বান পার্শ্ব ও কেন্দ্রস্থিত বান অংশ বিধ্বস্ত করিয়া শত্রুসৈন্ত দ্বিধিত করিতে করিতে রানসিংহের লগ্নুদীন হইলেন। মেবাররাজ কচ্ছবাহ সেনাপতিকে লঘোবদ করিয়া বলিলেন, “তুমি সে অহা তব্ হো সকে বহাদুরী দিবাও, প্রতাপ সিংহ আ পহচা হৈ।”^{২১} অর্থাৎ, প্রতাপ আগত। আপনার সমরহুশলতা এখন প্রদর্শন করুন। প্রতাপ তাহার প্রের অথ চৈতকোপনি উপবিষ্ট, আর বান হতীর উপর আসীন। রাজপুতেরা কাহোরা সেনাপতিকে বধ করিয়া তাঁহার তত্ত শোষিতে হুচের আলা মিটাইতে চেষ্টা করিবে এই তাবিয়া, বান কালরপোতিত হাওরা পরিত্যাগ করিয়া হতীচালকের হানে উপবেশন

১৮ হর তরককে কাকের হুশতা মোস্তাফা, হুদ-ই-ইসলাম বাবদ।

১৯ “শিহত নর আন্ আন্ হুন্ হুহ্ আহলান্ বতা নরি শোন্ও হোয়াব-ই-পেজা হাছিল শোন্” অর্থাৎ, বহাদুরীর পর-লভান পর্ত্তোপন বিশাল সৈন্তসমূহের উপর অব্যর্থ হইল এবং বর্ষবৃক্ষের পুণ্য সঞ্চিত হইল। (হুতবাব-উত-তাতারিখ, ঐ পৃ. ২২৯)

২০ হুতবাব-উত-তাতারিখ, ঐ পৃ. ২৩২

২১ রাজপুতানা-কা ইতিহাস — পৃ. ৩৫১

করিলেন। ২২ তীর ও বর্ষা বারিবার তার তাঁহার উপর নিক্ষেপ হইতে লাগিল, কিন্তু মান কখনও মতক অবনত করিয়া, কখনও চালের লাহাবো পরব্রুটি হইতে আশ্রয়কা করিলেন। ক্রমে চৈতক পূর্তান্নত প্রভুর রণোদ্যমের উত্তেজিত হইয়া মান-নিবেহের তীর সসীপবর্তী হইয়া অগ্রবর্তী পা হুটী তাঁতের উপর তুলিয়া বসিল, আর প্রতাপ নামকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন। তাগ্যক্রমে দৌহরজিত হাওদার প্রতি-হত হইয়া উহা মাটিতে পড়িয়া গেল। ২৩ শাহী সৈন্তের অবস্থা তখন বড়ই সঙ্কটাপন্ন। সৈন্তদ্বয়ের 'চঞ্চু' কর্তৃত্ব, 'বার পক্ষ' তর, 'দক্ষিণ পক্ষ' অবসাদপ্রাপ্ত এবং 'পৃষ্ঠদেশের' এক দিক অচল। শাহীপক্ষের এই বোর অত্যাচারে একমাত্র মানসিংহই বিক্ষিপ্ত দীপনিধার তার উৎকল। দূর হইতে তাঁহার শৌর্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া মোজা বদায়ুনী বিমোহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হুহুদ শুলের-ই-ইল্লাহ কনু"—অর্থাৎ, হিন্দু ইসলামের ভয়বারি চালাইয়া করিতেছেন।

২৪ হুর্ঘোগের সময় দূরে, বহু দূরে যের-পর্জনের তার তৈরবদার উৎখিত হইল, তখন প্রতাপের সৈন্তদ্বয়ে প্রচারিত হইল বাদশাহ সৈন্যে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু যিনি এই হুর্ঘোগে প্রত্যাশমণ্ডিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি পক্ষান্তরণের সৈন্তাধ্যক্ষ যেরতর খাঁ। তাঁহার অবাঁহ ভেৎগোদুগু সৈন্তদলের বেগবানের কলে হুদের গতিতে সহসা এক অত্যাশীর্ষ পরিবর্তন ঘটিল।

আবুল কবলের উক্তি হইতে জানা যায়, "যেরতর খাঁ আগমনের পূর্বে প্রতাপের সৈন্তদ্বয়ের দত্ত ও আফালনের সীমা ছিল না; তাহাদের স্মৃতি জন্মেই বৃদ্ধি পাইতেছিল", কিন্তু অতর্কিতে এই পক্ষান্তর সৈন্তদলের যোগদানের কলে হুদের গতি বিপরীতবুদী হইল। এই নূতন পরিহিতিকে আরও আশিবার লজ প্রতাপ তাঁহার রণ-হস্তীতলিকে শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। লোনা দার্ক হস্তীটি অনেক শাহী দাতককে পরীভূত ও শত্রুসৈন্ত দলিত করিয়া সর্কশেষ গজবৃত্তা হাতীটিকে বারেল করিল, কিন্তু সহসা লোনার দাহত তলীর আঘাতে নিহত হওয়ার লোনার আক্রমণের বেগ বন্ধীভূত হইল। ২৫ হুহুর্ঘোগে প্রতাপের সর্কশ্রেষ্ঠ হস্তী রামপ্রসাদ লোনার শূভ স্থান পূর্ণ করিল। এই মত দাতক তত্ত আফালন

ও শত্রুসৈন্তদের দলিত দলিত করিয়া রণক্ষেত্রে এক প্রলম্ব-কাণ্ডের সৃষ্টি করিল। শাহী পক্ষের হুইট হস্তী 'পক্ষরাক ও রণবদার' ইহার সহিত ঝাঁটরা উঠিতে পারিল না। কিন্তু এবারও পরনিক্ষেপপূর্বক শাহীপক্ষ রামপ্রসাদের চালককে নিহত করিয়া কৌশলে হস্তীটিকে রণক্ষেত্রেই কবলিত করিয়া কেলিল।

প্রতাপ তখনও রণভাঙবে মত। তাঁহার সহকারী সেনাপতিগণের অনেককেই, যথা—গোয়ালিয়ারদাক রামশাহ ও তাঁহার ভিন্ন পুত্র খালিাবান, তবানী সিংহ এবং প্রতাপ সিংহ, ২৫ অবসরের পুত্র বাটোর রামদাস, শরদাস, খালা-বীরা ও মানসিংহ, ভীষসিংহ সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন। শত্রুসৈন্তেরা প্রতাপকেও বেষ্টন করিয়া শিলাব্রুটির তার পর-নিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহার সর্কাদ রক্তরঞ্জিত, বাহন চৈতকও কতবিকৃত। যেরতর-পরিবৃত্ত মেবারদাক এই সময় বিপর্যয়ে অক্ষেপমান্ন না করিয়া অবিচলিত চিতে হুদ পদ-চালনা করিতেছেন। এমন সময় নূতন সৈন্তবলে বলীরাহ শাহী বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব হেকিম খাঁর দলকে তাহার সৈন্ত-শ্রেণীর উপর ঠেলিয়া কেলিল। সৈন্তদ্বয়কে রণরাজ অবলম্ব ও বিপর্যাত দেখিয়া মেবারাধিপতি আর শক্তিকর না করিয়া হুদকে হুইতে অতর্কিত হইলেন। ২৬ মনে মনে হির করিলেন আবার নূতনভাবে প্রস্তুত হইয়া শাহী-বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। সৈন্তগণ তাঁহার পক্ষান্তরসংগ করিল—এমনিভাবে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হুদের বনদিকাণ্ড হইল। এই হুদে প্রতাপপক্ষে নিহত হইল ভিন্ন শত আশী জন ও শাহীপক্ষে এক শত বিশ জন মত ও ভিন্ন শত জন আহত।

হলদীবাটের হুদে মেবারদাক বে সাহস, বীরত্ব এবং সৈন্ত-পরিচালনার বে বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত অধিরা দিয়াছেন তাহা হুদে হুদে তারতবাসীকে উদ্ভূত করিবে।

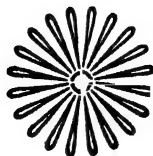
২৫ আকবরদাহার তবানী সিংহকে তম সিং কর্তা হইয়াছে। ওবাজী এই ৮ সংশোধন করিয়াছেন। রাজ-পুতানা-কা ইতিহাস, ১৪০।

২৬ মেবারদাক জগদীশ বলিরে উৎকীর্ণ এক স্নোকে প্রতাপ হুদে অরলাত করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লিখিত আছে। স্নোকটি দ্যাববোধক। এক অর্ধে এইরূপ বুঝার বে, প্রতাপ প্রাতঃকালে ভরবা রহতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রামপকীর সৈন্য হিরতির হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

২২ হুহুদার-উত্ত-তওয়ারিখ, পৃ. ২৩২-৩৩

২৩ রাজপুতানা-কা ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫১

২৪ আকবরদাহার পৃ. ১৭৪-৭৫।



পূর্ব বাংলার ব্রতকথা

ঐশ্বরীচন্দ্র রায়

ঐতিহাসিকেরা অস্বীকার করেন, পূর্ব-ভারতের অবৈদিক আধ্যাত্মবীর্গকে বৈদিক আধ্যাত্মবীরা যুগের ঢকে দেবিত ও তাহাদের অভিহিত করিত ‘ব্রাত্য’ বলিয়া। উক্ত নীহাররঞ্জন রায় এই ব্রাত্যদের কিয়তকিছু ব্রত বলিতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, “আমাদের গ্রাম্যসমাজে বিশেষভাবে মারীদেব ভিতর যেসব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অত্যাশ্রয় এবং মূলত শুষ্ক বাহ ও প্রজন্মমণ্ডিত পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। গবেষণা হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন বর্ষাষা, বর্ষাহ্র, কোথাও কোন্ প্রচলিত ব্রতের উল্লেখ পর্যন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণবর্ষ যে এই বর্ষাহ্রষ্ঠানকে বীকার করিত না এ তথ্য পরিষ্কার।” তাহার এই অস্বীকার ও ঐতিহাসিক বৃত্তি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে পরবর্তীকালে ব্রতকথার মধ্যে যে পুরাণের কথা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যম হর, পূজার দিক হইতে ব্রত মতবিশেষই থাকুক, ব্রত ও তাহার কথার মধ্যে দিয়া যে মেয়েদের মন প্রভাবিত ও প্রকাশিত হইত ইহা পণ্ডিতেরা অস্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রত উদ্ভাপন করিতে ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। মেয়েরাই এখানে প্রধান। কোন মন্দিরে ইহা অনুষ্ঠিত হয় না; সেইজন্য হামের স্থিরতাও নাই। সমস্ত ব্রতই যে সমবেত ভাবে করা হয়, তাহা নহে। সমবেত ভাবে যেগুলি উদ্ভাপন করা হয়, তাহার স্থান—চৌমাঝার রাতার কিংবা বটের তলার। কিন্তু গৃহের আসিনার মধ্যেও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া মেয়েরা ব্রত উদ্ভাপন করে।

ব্রত উদ্ভাপন বাহারা করেন, তাহাদের মধ্যে বিধবা, সখা এবং কুমারীরা বিশেষভাবে যোগদান করেন। কতকগুলি ব্রত আবার পৃথক পৃথক ভাবেও আছে।

উপকরণের মধ্যে কোন্ বৃত্তিপূজার প্রচলন নাই। কিন্তু কয়েকটি ব্রতে আলিঙ্গন দিয়া পুতুল-চিহ্ন আঁকা হয়। কতকগুলিতে অশ্লষ্ট ভাবে পিটুদী-বা কীর দিয়া গন্ধবাহুর নির্মাণ করা হয়। সুবচনী ব্রতে গোবরের উপর শিলনোক্তার মোড়া স্থাপন করিবার রীতি আছে; পাটাই পূজার দেবি বনের গাছ আনিয়া বাঁধিয়া বৃত্তির মত করা হয়। যম হর, ব্রত উদ্ভাপন বিবৃতি না হইলেও ইহাতে বৃত্তির ধ্যান নাই।

কুল-কল-মূল, হরিজা, পান, সুপারি, কসা, বাস, হুঁসী প্রায় প্রতি ব্রতেই প্রয়োজন। সুবচনী ব্রতে তেল লিঙ্গের বিশেষ উপকরণ। ‘ভাল’-এর প্রচলন সব ব্রতে না থাকিলেও

কয়েকটি ব্রতে ডালের মৈষেব্য দিতে দেখা যায়। যম-হর-ব্রতের তেলম হান নাই। বর্ষ রৌপ্য ব্রত দানও বিশেষ দেখি না।

গ্রামের পরিবেশ ছাড়া ব্রত উদ্ভাপিত হইতে বড় একটা দেখা যায় না। ব্রতের কথাগুলির মধ্যেও গ্রামের হরিজ সংসারের কথাই বেশী। তবে গ্রাম ছাড়া ব্রত বর্ষম নগরে রাজপুত্রীতে স্থান পায় তখন হইতেই ব্রতের দেবী জাগ্রত হন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রত পালনের কিয়তকিছুর কথা বিশেষ আলোচনা করিব না। আমরা সাধারণভাবে ব্রত-কথাগুলিকে লইয়াই আলোচনা করিব।

এই ব্রতকথার মধ্যে দিয়াই বন্দনারীর মানস-সংকল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মানস-সংকল্প কেন, ভদ্রানীতন কালের সামাজিক দিকের উল্লেখও ইহাতে যথেষ্ট আছে।

কিন্তু ব্রতকথার রূপভেদ আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নাম পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বলিয়াই ব্রত-পূজার মূল অর্থের সহিত কথাগুলির বিরোধ। কিন্তু কথাগুলির বৃত্তি বন্দনারীর মনের রূপ আবেগের দৃশ্য।

ব্রতপূজার দুইটি প্রধান অঙ্গ—(ক) ব্রতপূজা আর (খ) ব্রতকথা। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রতকথাই প্রধান হইয়া উঠিল। এবং সেইজন্যই আজও ব্রতপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতপূজার মূল কারণ ছিল বাহ্যমন্ত্রের প্রজন্মমণ্ডিত ও কৃষিকর্মের পূজা। কিন্তু ব্রতকথার উৎপত্তির কারণ হইল, মাতার মেহের প্রকাশ, সখীদের সহিত মনবন্ধুর প্রাণের কথার বিমিশর এবং মনবন্ধুর প্রতি শাস্ত্রীর অভিযোগ।

ব্রতকথা অনেক লক্ষ্যম করিয়াছেন। কাশীনাথ ভট্ট-বাসিন একখানি ব্রতমালা লক্ষ্যম করিয়াছিলেন (১৮৬৭ খ্রি:), কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত ও পুরাণ ইতিহাসের গল্পই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বাংলার সমাজ হইতে এই কথাগুলির উৎপত্তি হয় নাই। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণদের খাতির করিবার কথাও প্রচুর। ইহা ব্রতপূজার আসল অর্থের সহিত মোটেই খাপ খায় না।

পরবর্তীকালে আরও অনেক ব্রতকথা লক্ষ্যম করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কাহিনীটুকুই স্থান পাইয়াছে, গ্রামের মেয়েরা স্থান পায় নাই। অর্থাৎ, এই কাহিনীগুলি সাপ্তাহিক রূপান্তরিত হইয়া কতকগুলি সুবিশদী পদের সমষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রতকথার আলাদা এক স্তর আছে। ইহার বাক্যগুলি হলে হলে এখিত—যুব লহকে হৃদয় স্পর্শ করিবার মত। কিন্তু

এই হল আবার আকলিক ভাবার হৃদয়েই বেশী মাত করে। কাজেই আকলিক ভাবকে বর্জন করিয়া ব্রতকথা সকলম করা যায় না; করা উচিত নয়।

পূর্ব বাংলার ব্রতকথাগুলিই এখানে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। কিন্তু পূর্ব বাংলা বলিতেও আমরা একটি বিস্তৃত অঞ্চলকেই বুঝিয়া থাকি। এই বিস্তৃত অঞ্চলের ব্রতকথাগুলির রূপ বিভিন্ন প্রকার। সেইজন্য এই ব্রতকথাগুলির কেন্দ্র মূলতঃ পদ্মা-চন্দনা-যমুনাভীর তীরের অঞ্চলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইল।

চন্দনা নদীর কণা বর্ডমানে অজ্ঞাত থাকিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও ব্রোকেস নদনদীর নদীর এবং রেনেলের মানচিত্রে পাওয়া যায়। ব্রোক চন্দনাকে বশোরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ডমানে ইহার নাম অজ্ঞাত কীর্ণ। এখন চন্দনা বশোরের অনেক পূর্ব দিয়া প্রবাহিত হইল। পদ্মার গতিও পূর্বে অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত ছিল। কাজেই ঢাকা হইতে বশোর পর্যন্ত ভূখণ্ডের লোককেই এই অঞ্চলের মধ্যে বসিতে পারা যায়। এখানকার নববাসীদের ইতিহাস আলোচনা করাও বড় কষ্টের। ব্রত-কথার কোথায়ও মূলমাম আমলের কথা পাওয়া যায় না এবং বণিকসভ্যতার সময়ের কথাই বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। বনপতি সওদাগর আর চাঁদসওদাগরের আমল ব্রত-কথার মধ্যে পরিস্ফুট। কিন্তু নগর-সভ্যতার বিশেষ ইঙ্গিত নাই, সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশ। কৃষিকর্ষের কথা এগুলিতে প্রধান।

ব্রতকথার বুদ্ধ-কাহিনীর বর্ণনাও নাই। মনে হয় ব্রতপুজার মূলধারা অঙ্গসরগ করাই ছিল কথার প্রথম প্রয়োগ; কিন্তু পর-বর্তীকালে অভ্যুত্থিকার ব্যক্তিগত হৃৎকষ্ট কথার মধ্যে একটু একটু স্থান পাইয়া বসিয়াছিল। এই ব্রত কাহিনীর সর্বজনীনতা আছে। তবে বিভাবিত বর্ণনার মধ্যে অঞ্চলবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি ভূষণ-মারুপুত্র প্রভৃতির ঐতিহাসিক কাহিনী স্থান পায় নাই।

আকলিক ভাবাও ব্রতকথার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক নতুন রূপ লইয়াছে। গোবালন্দ মহম্মদের বস্তুরবাড়ীতে মাগরা বা ঢাকা মাণিকগঞ্জের ঘরে বিবাহিতা হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে গলিত পেটরা, বেতের কাঁপি আর ব্রতকথার তুলি, হরত পাবনা প্রভৃতির ঘরে আসিল কানুখালির বাঁশের বাঁড় আর বেতের-পোলের দেশে। ইহারা ভাবা হাফিয়া দিয়া আসিত। কাজেই এই উপায়েও ব্রতকথার করুণা এবং ভাবার মিলন ঘটাইয়া গিয়াছে।

এই ব্রতকথার মধ্যে এমন একটা স্তর আছে বাহ্যিক বলা হইতে পারে ‘আগমনী’ নামের পরিপূরক। আগমনী নামে যারের কান্না ঘরের ভিতর। বাংলার ঘরের আঁট

বহরে বিবাহ হইয়া পরের ঘর করিতে বাইতে হইত। লেবানে কত কষ্ট। যারের প্রাণ বৎসর আঁটে তিন দিনের জন্য ঘেরকে ঘেঁষিতে পাইবে বলিয়া কত ব্যাধ। কিন্তু আগমনী নামে সেই বালিকা বহুটির রণরসিনী শান্ততীর উদ্দেশ্য নাই। আগমনী নামে কতর জীবনের এই পৃষ্ঠাটি উঠে।

কিন্তু ব্রতকথার সেই কত মজল শান্ততীর ঘরে, বোধ-পরিবারে, তার অপারগতা লইয়া কি করিয়া বিন কাটাইয়া থাকে, তাহাই চোখের জলে, ছোট ছোট কথার, অলকার-বর্জিত ভাবার বলিয়া থাকে। পাটাই পুজার কথার আছে, ‘শান্ততী উদ্দেশের বিকে পরম হাতা মিরে আসে বটর বিব-হের ঠাঁ’সে দ-হোরলেম।’ অর্থাৎ, শান্ততী উদ্দেশ হইতে পরম হাতা লইয়া আসিয়া বোয়ের দ্বিহার ঠাঁসিয়া বসিলেম।

অবশ্য বহুদের সম্বন্ধে ধারণা কথাত বে না আছে তাহা নহে। শান্ততীরাত সেই সম্বন্ধে অনেক গল্প তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু কোন বহু যদি তেমন ‘অলপের’র (অল্লাহু) কাজ করিয়াই থাকে তবে তাহা অনেকটা বেতের শীষের মত। তার কাঁটার শক্তি খুব কম, পথিকের পথের বিরত তেমন ঘটায় না, শুধু আলগোরে একটু উজ্জ্বল করিয়া লয় মাত্র। বলিতে পারা যায়, তার অভ্যয়ের বেদনা পল্লবের ‘পেলব’ তরীতে একটু সহ্যহুতি আকাঙ্ক্ষা করে মাত্র। আকুত বজীর বোয়ের হুঁতাপা, অশোকবজীর ‘দামনী’র হুং, মনসা-ব্রতের ‘সিরতের’ বটরের কাহিনী মানারকম ভাবে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। চৈত্র মাসে হয় অশোক-বজী। অশোকবজীর অশোকের মাতা এক বিষমকর মেয়ে। ব্রাহ্মণদের সমাজে যে হুং হইতে মেয়ের সমতা বড় হইয়া উঠিল সেই হুংের চেহারা এই। ব্রাহ্মণের কেবল কত-সত্যনই হইত, পুত্রসত্যন আর হইত না। কিছুদিন পূর্বেও পাড়ারীয়ে ইহার ব্রত কতাপ্রভৃতির হুঁতাপের আর অভ ছিল না। ব্রতকথার ব্রাহ্মণ তাই ব্রাহ্মণকেই দাবী করিলেন, শাসাইয়া পেলেন এবার কত হইলে ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া দিবেম।

—একদিন বাউনী পোরাডী। বাউন বলিলে, ‘এই বাউনী। ইবার বতি মিরে আর, তর মিরে মিরে আর তোর মিরে ভাভারে দেবা।’—কিন্তু কতাই হইল। ব্রাহ্মণ তখন পুজা করিতে গিয়াছেন।

“উনি কি করেন?”

—মিরে হুং খাওয়ায়ে, তেল-কাহল দি-ই-য়ে, বিবি ক’রে এক মন্থন পাতিলির মদি ভাভারে একধেন চেলির কাপড় মিরে ঢাক-এ, লরা হুঁবির উপের মিরে, নদীর জলে তাসারে দিলেম।—

কতটিকে বিলম্বনের সময়েও যারের ঘেহ কতর আত্ম-হুতি করিয়া দিল। আকাল এইগুলিকে আমরা সহজে

বসিরা বর্ধনতা বলিব, বলিব যে, বেয়েয়ের উপর বাবীয়েয় এ কি অভ্যাচার। কিন্তু তবু বলিতে হইবে—বাংলার সমাজে এই রকম করেকটা রূপ সিরাহে। আকিত কত কারণে, এই গৃহলক্ষ্যীদের আশ্রয় কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হরত হৃদয়র তিতার পাকে আশ্রয় ভুলিয়া বাই। তাহারা ব্রতকথার ব্রাহ্মণটির মত মূল বর্ধনতা করেন না, তাহারা হরত বা ইবসেমের ‘ডলস হাউসের’ অহরণ ব্রত আর সত্য অভ্যাচার করিয়া থাকেন।

যে সব কাহিনী লইয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, সেই রকম একটি কাহিনীই এই অপোকাবধী, এই কাহিনীকে লইয়া হরত ‘অপোকা মঙ্গল’ লিখিয়া ফেলা বাইত।

গারম্ভী সংকান্তির কথার বহুটি ব্রতকথার মর্জিনা বিশেষ। অলম্বী বা সতীমকে নানা কলী আঁটিয়া ভাঙাইল, সত্যমদের মঙ্গলসাধন করিল। ইহার পর্বাভেদগণপতি অপূর্ণ। শূকরের ব্যবহার যেখিয়া গারম্ভী ব্রতের মর্ম বহিতে পারিয়াছিল।

—উনি গৃহাটে চান করতি পেছেন। বাঁরে বেধেন যে, একটা শূরের বাক্সা নিয়ে বেড়ায়ে বেড়াতেছে। বেড়াতি বেড়াতি দৃ-হাদের ক্যাতে বা-রে দৃ-হান বাঁলো। দৃ-হান বাঁরে আঁলে বাক্সার হুব দিল, আর বাক্সাগুলো সব হঁরে পেল।

তার পর ভয়েরটা আবার কিছুকণ পরে কচু খ্যাতে পেল। বায়ে কচু ধারে আঁলো। কচু বাইরে আইলে বাক্সাগুলো ভঁকল, আর বাক্সাগুলো ভাঙা হঁরে উঠল।

যৌ ঠাঁড়ারে ঠাঁড়ারে ঐ বেবল। মনে মনে ভাবল, ‘ভালি ত গারম্ভীর বিন ভাত বালি সত্যান বাঁচে না, তা আরুও আর দৃ-হাত ধাব না।’—আরুও বড়ীর বহুটির বুদ্ধির তারিক করিতেই হর। দাসী হরিণের বদলে দালী বাহুরের মাংস কাটিয়া রান্না করায়। তাহাই ব্রাহ্মণদের বাইতে দেওয়া হইবে। বহুটি চের পাইয়া এক কলি আঁটিল—দাসীকে বলিল, —তুমি এক কাণ কর। পুঁই নিয়ে আস। পুঁই হেঁচে পর্বোয়ের সাধে বর ভলভলে করে লেপে ধোও।—দাসী তাই করল।

ব্রাহ্মণরা আতে বাতি বদল। পাতা করে করে বসে পড়িছে। যৌ মাজার কাপড় জড়ারে দৃ-হাতের থালা হাতে করে বাচ্ছেন। বাতি বাতি পিছলেনে ঠাঁস হরে পড়ে পেল। পড়ে বায়ে ঠাঁস লাগে যৌ অজান হরে পেল। ভাত অপহ-জাতিতে গৃহর ভরে পেল। ব্রহ্মতোক্তি মট হরে পেল।—

হোটিপাটো বুদ্ধির এই পরিচয়, বহুদের এই কৃত্তিম কথার মধ্য দিয়া হুতাইয়া নিজেদের উপর আস্থা কিরাইয়া আশিত। আত্ম-সাম্বোধ্যের (self-assertion) ইহা এক বিচিত্র প্রকাশ। বাহির হইতে বাবা পাইয়া পাইয়া, কথার মধ্য দিয়া নিজেদের বিশেষ পরিচয় তাহারা রাখিতে চাহে।

এই সব বহু কোন দিন সাহিত্য রচনা করিতে চাহে

নাই। হুঃখের সময়টা তাহারা কি ভাবে, কার কাছে, কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে এ তাহারই ইতিহাস। তাহারা বিগ্রহ করিতে পারে নাই।

সধীরের কাছে মনের কথা বলিবার জন্য তাহারা ‘শাতর কর’, ‘পাচালী পাচাল পাড়ে’ আর ‘পোবর-পোলা বিয়ে’ বহু বহু বেরত কথা বলে। ব্রত অতে ‘সদ্বা’ হলে তেল সিন্দুর ‘অদ্বা’ হলে ‘বান-দুখে’ বিয়ে ঘরের কাছে লাগিয়া যায়।

এমনি করিয়া ইহাদের জীবন কাটে। পাণ্ডে জল পড়িলেও ইহারা আশা পায় না, নদীতে ‘চোত’ আসিলেও ইহারা ভাবনা করে না। বাবী প্রবাসে থাকিলে সোনারী, বয়ে কিরিলে ঠাকুরপের হলে। এই ‘ব্রহ্মবর’দের নিকট হইতে তাহারা অনেক কেজ্জই সাহুনা পায় নাই, পাইয়াছে সতীম। শকার মত পারে কাঁটা থাকিলেও গলা মরম, অন্তরে অভিযোগ থাকিলেও শকার কাঁটার মতই সেইগুলিকে গুলার করিয়া বাকাইয়া চলিতে হয়। ব্রতকথাগুলি তাহাদের সেই শকার কাঁটা। ইহারই মধ্যে তাহারা সত্যানের জন্য কীর-বারা লকর করিয়া চলিয়াছে। ‘চাপড়বধী’র বহুটির শূরের জন্য মমতা সত্যই অতি করুণ। ‘চাপড় বার তালো, বোকা আদে হাঁতে।’ কথটির মধ্য দিয়া এমন লকরণ আহ্লাদ হারানো সত্যানটির প্রতি রহিয়াছে যে, শাবত মাতৃহৃদি ইহাতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

যত মঙ্গল, তাহা সব ‘করে করে’ ‘পেরতর’ কল্যাণ হুদি করিয়া ভবিষ্যৎ বংশকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ‘অপোকাবধী’ ‘সম্পদ-মারাগির’ ব্রত, ‘বাটবধী’ লম্বিকিহর মধ্যে মাঝের প্রাণ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

খণ্ডবাকী হইতে বাপের বাকী হরত বেহারাদের এক কাঁধের ব্যবধান। কিন্তু ‘আবাসীর বিট’রা সেই তুলি বা সোনারীর সত্যান জানে না, অথচ এক মিনিটের মোটপে তাহাদের চিরকালের জন্য বাপের বাকীতে থাকিতে হইতে পারে। মাথার উপর এই বাঁতা বহন করিয়া তাহারা সত্যান পালন করিবে, গৃহস্থের কল্যাণ চিত্তা করিবে, পাড়াপড়শীর ‘আরে ‘কান’ করিবে। ‘বতরে’র সময় হুনিষজনের হাঁতি হাঁতি ভাত রাঁবিতে হৈসেলে আঙন ঠেসিবে, বর্গাবারের মলম-মলার পর তাহারা তুলা লটরা বান উড়াইবে, বান পোলায় তুলিবে, বান লিচ করিবে, হুতু তাঝিবে, চিঁড়ে কুটিবে। ইহারই মধ্যে সময় করিয়া শিতের সকালে তেমাধার বা মতপের আভিয়ার অববা আপ-হুয়ায়ে ‘শিতি টির টির’ করিতে করিতে ব্রতের সরঞ্জাম লইয়া বসে।

অথচ ইহাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী নয়, পরম সূব হুখিতে ইহারা মুখিত মাঝের কোল। মঙ্গলব্রতের মাপ পক্ষীর বিনে বহুদের ইচ্ছা হইতেই তাহাদের চিরক বোকা যায়। লাভটি

বহু বিশ্বের বিশ্বের সেরা ইচ্ছার কথা জানাইতেছে। তাহাদের লক্ষ্যের কথাই আর এক রকমের। সন্তান বহুটির কথা—‘আজকের মত দিন হয়, বাপ মার বাড়ী হয়, উপেনে মাহ পুতা বিয়ে পাড়া তাত বাএ তরে হুম বার।’—একটু অলসভাবে হইবার ভ্রত ইহারা একান্ত মনে কামনা করিত।

ইহুপুকার উন্নয়ন-সুমনী কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মাতৃহীনা ভরী হুইটির অভ্যুত্থি। পিতার প্রতি তাদের স্নেহ অগাধ, বিবাহ না হইবার হুঃখ পিতাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়াইরা মিটাইতেছে। উন্নয়ন-সুমনীর বাবা যদি মমোবিদ্ হুইভেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, ইহা তাহাদের সন্তান-কার কথা নহে ইহা তাহাদের মানসিক অভিক্রোশ (projection)। এই কথার রাজ্যবাহাশয়ের অবিবাহিতা কতাকে লইয়াও এক সমতা। ইহুপুকাটি অবিবাহিতা কতাদের হুঃখকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। ভবু ইহারা বাপমায়ের বিরুদ্ধে কোম অভিযোগ পোষণ করে না। বরং তাহাদের উপর ইহাদের গভীর ভক্তি। বাপমায়ের হুঃখ বুঝিবার মত বুঝি ইহারা বিভিন্ন হুকার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। একটি হুকার—

আম-কাঁঠালের পিড়ি খানি

বি ম’ ম’ করে

ভান্নির উপর বাপ বুড়ো

কতা মান করে।

বাপ বার রে মার মার

বুড়ো বার রে তরে (ভীরে)।

শিশু কালে বিয়ে দিলি

মহার আগুন অলে।

অভয়ও দেখিতে পাই—

হুমহুমহুম বাত বাজে

সাজিরে ক’নে মতুন সাজে

না বাপে ঘেন বরের করে

কতই মনের সাধে।

মা-বাপ কামনা করেন—

তালো বরে তালো বরে

দিবেন ব’লে কি—

কপাল যদি মন্দ হয়

মা বাপে তার করবেন কি ?

ইহাদের এই সব মনের কথা বাহির হইতে প্রকাশ পাইত না। সকল আবেগ রুদ্ধ করিয়া ইহারা পাখা-বুড়ির মত হইয়া পড়িত। এইজন্যই বোধ হয় আগমনী গানে আছে, ‘শিঙাবোবে বেরে পাখা হ’ল।’

এই সব ব্রতকথার মধ্যে বাঙালীহুও ভক্তি পরিহার। বাঙালীর ভাতিত্ব লম্বা মনীবীরা সাধারণতঃ বে কলটি বিবরে একমত তাহা হইতে মনে হয়, বাঙালীর বনিয়াদ নিম্নোক্ত—

অগ্রিক, ভাবিত ভাবাতারী, আলুপী, আদি নর্তকদের লইয়া। এই মিশ্রণ দ্বারা ই বাংলার সুহু অতীতে সমাজ-ভিত্তি গঠিত হয়। অতএব বর্তমান কালের বাঙালীদের নির্জান মনে সেই আদিম মনোভূতি হান পাওয়া বাতাবিক। ভাতির এই নির্জান মন (unconscious mind) উপেক্ষণীয় নহে। ভাতির রক্তধারার প্রাচীন সংস্কার রহিতা পিরাছে। ব্রতকথার মধ্যে কলের প্রতি মোহ, বনানীর প্রতি আকর্ষণ বেশ পরিলক্ষিত হয়।

মিঞোবুই আর অগ্রিকেরা সনুয়ের বারে বাস করিতে ভালবাসিত, প্রয়োজনও বোধ করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল শিকারের মাংস, বনের কলহুল, মাছ ইত্যাদি। ব্রতকথার মধ্যে মাছের আর কল হুলের উল্লেখ ছুরি ছুরি দেখা যায়। পারসী সংস্কৃতিতে কলহুলের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। পুকার লাগে, আলা-কাঁচকলই—ভালের আঁটি—ডাবের কল আর ডাবের সঙ্গে চৌক শাক।

ঐপকমী আর বিজরা-মশরীতে কোড়া-ইলিস মাছ কুটরা বরে লইতে হয়। সেই ইলিসের আঁইস মাড়িছুড়ি প্রভৃতি আবার বরের এক কোণে বিশেষ অস্থান করিয়া পুঁতিয়া রাখিতে হয়।

আদি বাঙালী হরিণ শিকার করিতে ভালবাসিত। আঁকুত বজীতে পুড়ুরী টুঙ্গল উপলক্ষে হরিণ-মাংস খাওয়াবার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। এই আঁকুত বজীতে দেখা যায়, সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক বাস করিত বাহারা গোহত্যা বা গোমাংস ভক্ষণ বিশেষ গর্হিত মনে করিত না। অথচ ইহার মধ্যেই দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা শ্রেণীভেদ বিশেষ ভাবে মানিতেন। সমাজের ইহা এক মিশ্র-সুগের কথা।

সনুয়ের প্রতি আকর্ষণ মদল রতের মধ্যে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়।—‘আজাইরাক, মনি-রাক মা-পন্নার বাহন, উরা এক ডুবি লাভ সনুহু পার অরে মা-পন্নার কোলে ব’সে হুণ খাবার লাগলেন—’

এই ব্রত কথার ভক্তি সরল করিয়া মাহুয্যভাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ বে কোন্‌ যুতি হইতে কাত তাহা ভাবিতা দেখিবার মত। মা-পন্নার বলিলেন, ‘সর্গমাশ। ওরা হ’ল মানুসির বাচ্চা; ওরা পেট ভ’রে খায়, বন ভ’রে হাণে—ওরা মাছ খায়, মিছে কর; উরা কি দেবপুত্রীয় মন বোঝে? উরের আমে’ কাষ নাই।’ ইহা বেশ বেয়েদের আলিঙ্গন অঙ্গন। হাতের এক একটী লীলার টাঁকার থলি, সিঁদুক, ঘেবীর চরণ আর কুঁট কল আদ্যপ্রকাশ করে। মাহুয়ের ব্যবহারের প্রতি বিরূপতা কত প্রচণ্ড ভাবে থাকিলে বে এত সংকীর্ণ বিজ্ঞপ বর্ণন করিতে পারা যায়, তাহার গভীরতা কে বাশিবে? দেবপুত্রী কোন্‌ ভাবি না। হয় ত বা নানা খাণ্ডাভি বা ‘কতবে’ প্রাচুর্য আর

উৎপাতে তাহার। ক্রমশঃ তাহাদের যে অতীতকে তুলিয়া
বাইতে বসিয়াছে সেই অতীত লোক সবচেয়ে তাহাদের এত
করনা। অরণ্যকে তাহার। পবিত্র বনে করিত, শুধু আহাদের
জুই জীবন মছে, উদ্ধার আনন্দকে বাঁচাইয়া রাখাই তাহাদের
কার্য। জল, পাহাড়, অরণ্য তাই এত পবিত্র তাহাদের
মিকট। মনের হুঃখ বেশী হইলে এই হুঃখের বাঙালী অরণ্যে
সিরা কঁপিতে বসিত, পাখরে সিরা মাথা হুঁকিত। অরণ্যের
এতি যুকপলব যে তাহাদের পূর্বপুরুষের আত্মা। এইজন্য
বিদ্যা প্রয়োজনে ইহার। পলব তাড়িত না, তাহার। দল
পাকাইত না, সংহতিশক্তি তাহাদের ছিল না, আপনার বেদনা
আপনি উদ্ধার করিয়া ঢালিয়া দিত বনদেবীর পারে। সেই
চরিত্রই পরবর্তীকালে বাংলার বালিকা বহুদের ব্রতপার্বণের
মধ্য দিয়া বেগা মিল। মনের হুঃখ স্বামীকে বলে না,
পড়শীকেও বলে না, সম্রাটের মিকটও প্রকাশ করে না।
ভট্টর দুর্নীতিভূমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, “লাগব স্বীকার করার
মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল, এই প্রাণশক্তি মানা
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়াও যত হয় নাই।” ব্রতের মেঘেদের
বতাবেও এই পরিচর পাওয়া যায়। মাপসকরীর সপ্তম। বহুটির
চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে অবাক হইতে হয়। তাহার
রূপ এবং আচরণের মধ্যে যেন একটি বৃহৎ মন আশ্রিত হইয়া
আছে। ইহু-পুত্র উন্নয়-সুমনীর চরিত্রের প্রথম অংশ
আখিও বাংলার মেঘেদের মধ্যে অরবিত্তর বেগা যায়।

অষ্টিকদের আর মেট্রিটোদের এই আরণ্য তাবটি তাহারা
মিল জাবিত গোষ্ঠী। জাবিতদের রহস্যবাদ, আধ্যাতিক
বিদ্যা, শিরবোনের আত্মস ব্রতকথাও মধ্যে কতক পরিমাণে
পাওয়া যায়। হঠাৎ কুঁড়েবরের বনলে ইয়ারত নির্মিত হওয়া,
ব্রত ব্রতের প্রাণসকার সবই সেই রহস্যের মূলে।

একটি ব্রতকথা আছে, “সুমনা বনে আশ্রয় বেছে।
বিলি হরে গেছে, চাকচিকেমি জল আইচে মাঠের মদি। তার
মদি আত্মাইয়াক মনিরাক জুব পারতেছেন।” ইহাতে এমনি
একটি প্রাকৃতিক চিত্রের নির্মিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

যে মেট্রিট ব্রতকথা বলিতেছে সে তাহার বহু দৃষ্টি তুলিয়া
বহিয়াছে পাওনের বৃষ্টির দিনে পথের দিকে। এক লহয়ার
চারিদিক সে দেখিয়া লইল। মাঠের মধ্যকার জল যে
চিকচিক করিতেছে তাহাও তাহার মূখ্য দৃষ্টি একাইয়া যায়
নাই।

কিন্তু এমনি করিয়া দুঁটির দুঁটির জাবির অতীত বৈশিষ্ট্য
বাহির করা সহজসাধ্য নয়। পলিমাটির বাস্তুকণা তুলিয়া কে
প্রমাণ করিবে ইহা অযুক্ত পাহাড়ের অযুক্ত পাথরটার কথা ?
তবু আবহমান কাল বহিয়া আমাদের মনের মধ্যে যে সংকার
বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহাকে যে আমরা অস্বীকার করিতে পারি
নাই—তাহাই প্রমাণ করে এই ব্রতকথাতলি। অতীত আমা-
দের মধ্যে এখনও কিরাশীল, সেই অতীতকে বুজিয়া গাইতে
আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্নর জাতি

ঐশ্বর্যদেণ শাস্ত্রী

অম্ববাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

২

ক—অপ্পুততা : অপ্পুততা নামক

দেবিলাম কিন্নর দেশেও গাভীকীর নাম পৌছিয়াছে।
কিন্তু তাহার হরিজন-উন্নয় প্রচেষ্টার কথা পৌছায় নাই।
মাহু বৃষ্ণার মাহুয়ের ছাত্রা পর্য্যন্ত মাহুয় না একথা পড়িয়াই
আসিয়াছি এত দিন, বচকে দেখি নাই, এবাংমে তাহা
দেবিলাম। কিন্নর দেশে আজও এই ব্যাপার চলিতেছে।
সবর্ণ জাতির কোন লোক—স্রী বা পুরুষ—জল ভরিয়া রাত্তা
বিদ্যা বাইতেছে এমনভাবে তাহার উপর যদি হরিজনের ছাত্রা
পড়ে ত জল অমনি অপবিত্র হইয়া যায়, ইহাই সবর্ণদের
বিশ্বাস। তাই কিন্নর দেশের হরিজনদের রাত্তা মাংসবাসে
চলিতে হয়। শ্রীপতী ও আমি চীনী বাইতেছিল।
পথে কয়েক জন লোক বেশ খানিকটা হুঁকিতা আমাদের
সম্ভাষণ করিল, আর রাত্তা হাতিয়া বিদ্যা দীতে গিয়া ইচ্ছাইল।

ঐরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার। বলিল,
“আমরা হরিজন, তাই।” উচ্চবর্ণের ঘরে আমার জন্ম একথা
মনে হওয়ার অন্তরাত্মা আমার বিকারে তরিয়া গেল। আমি
যদি হরিজন হইতাম তাহা হইলে আমাকে পথ হাতিয়া
বেওয়ার গ্রামি ইহাদের ভূমিতে হইত না। যে হরিজন নিম্নরাত্ত
কারিক প্রাণে পেটের অন্নসংগ্রহ করে, হিংস্র অন্তরে যে
ভর করে না, বহুলাংশে বন-জঙ্গলে একাকী বিচরণ করে, সেই
হরিজন যে, কোন আদম। সবর্ণকে দেখিয়া কাঁচুমাচু হইয়া যায়,
ইহা সবর্ণদের পক্ষে পৌরবের কথা নহে। ইহা যে তাহাকে
হিংস্র অন্তর অন্ন করিয়া দেয়।

এতদরূপ হরিজন

রাজপুত বা অন্য কোন সবর্ণ জল ভরিয়া রাত্তা বিদ্যা
চলিত। পথে পড়িল হরিজন। উপায়। হরিজনকে
যে লোকা তাকিয়া বলিবে—‘নরে ইচ্ছা’ সে ছো-ও নাই।

ভাতেও যে জল অপরিষ্কৃত হওয়ার ভয়। তাই রাত্তার পাখরকে লক্ষ্য করিয়া সর্বর্ণ বলিয়া থাকে, 'দ্রোণা,' শুভদ্রিঃ, সরে বা, আমার জল মট্ট হয়ে যাবে। ইহা হইতে হরিকম্ব বুঝিয়া লভ, জল ভরিয়া কোন সর্বর্ণ আসিতেছে, তাকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া বাইতে হইবে। গ্রাম্যকলে যে বাওড়ি হইতে সর্বর্ণ জল তবে, হরিকম্বেরা সেই বাওড়ি হইতে জল ভরিতে পার না। শুনিতে পাইলাম, রামপুরে কয়েকজন দাহসী দক্ষিণ সর্বর্ণদের বাওড়ি হইতে জল আমিয়াছিল। এই জন্য সর্বর্ণেরা মহারাষ্ট্র পন্থসিংহের কাছে মালিশ করে। দক্ষিণের বিস্তৃত গ্রাম্য চলে, আর তাদের প্রভোক্তের দল টাকা জরিমানা হয়। রামপুরে এখন সেই বাধা মাই, কারণ রাজ্য বিলীন হওয়ার পরে রামপুরের হরিকম্বেরা সেই বাওড়ি হইতে জল ভরিয়া পুরাতন প্রধার অবসান ঘটাইয়াছে। রামপুর ত শহর। সেখানে সব বাবুদাই আছে। কিন্তু সুদূর গ্রামে ডাকা বিহারের জন্য ভাল কোন বাওড়ি হইতে জল আনিবে এমন স্থানও কোন হরিকম্বের মাই। বাওড়ি যে কি তাহা এখানে বলা মরকার। পাহাড়ে যে সব স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা ভূমি হইতে উৎসারিত হয়, জল আটকাইবার জন্ত সেই সব জায়গায় বাসিন্দারা গর্ত করিয়া চাতিবার একটু উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গা নিম্নেও দিয়া রাখা হয়। ইহাকে পাহাড়ের লোকেরা বাওড়ি বলে। কোন পাহাড় ডুবাওয়া জল তুলিতে হয়। বাওড়িতে হরিকম্বদের ছায়াও পড়িতে মাই।

হরিকম্ব ও মন্দির

কিন্নর দেশের প্রায় সব মন্দিরেই কিন্নর কু-সম্পত্তি আছে। কনবেশী পঁচিশ হাজার টাকা উহার মন্দির পার। তাই মন্দিরগুলিকে কনসারভেশনের সম্পত্তি বলা বাইতে পারে। রাজকোষ হইতেও উহার নির্মাণকার্যে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং ঐ সব মন্দিরে প্রবেশের দাবি হরিকম্বদের বোল আলা আছে। হরিকম্বদের মন্দিরে প্রবেশ আইনতঃ বীজত হওয়া চাই এ কথা অনেক হরিকম্বকে জোর দিয়া বলিতে শুনিয়াছি। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এবিধ তেদাতের এখন আর থাকিতে পারে না।

রামারণ পাঠ ও অপরাধ

হিমালয় প্রদেশে রাজ্য বিলীন হওয়ার পূর্বে মহারাষ্ট্র রাজ্যে হরিকম্ব বালকদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল। পোরা হইতে রামপুরের পথে চৈতরায় নামে এক হরিকম্বের সঙ্গে দেখা। চৈতরায় বলিল, সে পোরাই এক ইংরেজের চাপরাসী ছিল। কোন যোদ্ধার সাক্ষ্য দিতে সে সময়ে তাকে রামপুরের মহারাষ্ট্রের আদালতে হাজির হইতে হয়। প্রতিপক্ষের লোকেরা মহারাষ্ট্রের কাছে মালিশ করিল, "হুজু, এই চৈতু হুলা মাথার চড়েছে। কাজে হুলা হইলেও এ

পড়াওনা করে। ইংরেজের মকরি করতে করতে কারও কাছে এ রামারণ পড়তে শিখেছে। এর রামারণ আছে, আর একে তা আমি পড়তেও দেখছি।"

এই কথা শুনিতেই মহারাষ্ট্রের মন যোদ্ধার মূল বিষয় হইতে সরিয়া গিয়া, কোলী হইয়াও চৈতু রামারণ পড়ে এই অবস্থার ক্যাডভাবে শিবহ হইল। রক্তচক্ষে তিনি বলিলেন, "বরমাদি স্ত্রু করেছ। রামারণ পড়বে ত খেলে পুণ্ড। বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করে। এ কথা আমার শুনে পাই ত বাইরে আর যেতে দেব না—খেলে পাঠাবে।"

মহাংস বাইতেই হইবে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে কিন্নরদের দৃষ্টি মাই। এখানে রাজপুতদেরও ঘেরে পুরুষে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ মাই—মলভাগের পরে শৌচ করে না। জললে দাঁতম মিলে, কিন্তু দাঁতম কেহ করে না। তবু'চ এ কথা বলিতেই হইবে যে, হরিকম্বেরা আরও অধিক অপরিচ্ছন্ন। তাহাদের অপরিচ্ছন্নতার মূল মুখ্যতঃ দাহিয়া। স্ত্রী বা পুরুষ কোন হরিকম্বের পরিধানেই নিখুঁত কাপড় দেখিতে পাইবেন না। তাহাদের চোলিতে পর্যন্ত তালি, মাটির ত কথাই মাই। বিছানা ও গারে চাপা দেওয়ার কবল ছিন্ন চট হইতেও জীর্ণ এবং অবয়। কাছের কাঁকে বসনই কুরসত পার তখনই কাপড় হইতে উকুন মারিতে তাহারা বসিয়া যায়। এই উকুন দ্বারা ব্যাপার ঘটায় পর ঘটায় ধরিয়া চলিতে থাকে। হরিকম্বেরা মরা গরুর মাংস খায়, চামড়া ছাড়ায়, তাই ত তাহারা হরিকম্বদের ঘৃণা করে, ইহাই সর্বর্ণদের কথা। বৃত্ত জন্তর মাংসাহার ও তার-জমক সন্দেহ মাই। কিন্তু কোন হরিকম্ব মরা মাংস খাইবে না টিক করিলে সর্বর্ণেরা তাহাকে তাহা খাইতে বাধা করে। পথে এক কোলী বুকের সহিত আলাপ। কার্যাব্যাপকেন্দ্রে সে রামপুর গিয়াছিল। কংগ্রেসের কোন বক্তার বক্তৃতায় সে শোনে যে মরা গরুর মাংস খাইতে মাই। কথাটা বুকের মনে ধরিয়া যায়। বাকী কিরিয়া কে প্রতিজ্ঞা করে মরা গরুর মাংস আর সে খাইবে না। অহুকে মরা মাংস খাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এই কথাটা গারে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সর্বর্ণেরা প্রমাদ গণিল। মরা মাংস খাইবে না, তার মাংস চামড়াও ছাড়াইবে না। মরা গরু বলহ তবে অপসারণ করিবে কে? তা বাদে সাক-সুতরা থাকিতে আরম্ভ করিল যে তাহা বাবীম হইয়া খাইবে, নিজ পারে দাঁড়াইবে, আমাদের দাসত্ব অধিকার করিবে। গ্রামবাসীরা পকারেড ডাকিল। পকারেডের সম্মুখে কোলী বুকের শব্দ হইল। পকারেড ও কোলী বুকের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তাহা এই :
"তুমতে পাছি মরা মাংস আর মাফি বাবী না?"
"হী, যেচেছি, হিন্দুদের মরা মাংস যেতে মাই। গরু মাংসের জুলা।"

‘তবে কি তোর বাপ-ঠাকুরবা হিন্দু ছিল না; তুই মজুম হিন্দু হতে বাছিস?’

‘বাপ-ঠাকুরবার কথা জানি না। এখন থেকে আর ও বাংলা ধাব না।’

‘মহা বাংলা তাকে খেতেই হবে, মরত গ্রাম হাততে হবে।’

‘নব্বি! গী হেতে বাওয়ার কারণ আমার আছে কি? আপনাদের কাছে মিস্তি মহা বাংলা থেকে আমার কোর করবেন না।’

‘তা হবে না। কংগ্রেসওয়ালাদের কথাই তুই মাঝার চকতে বসেছিল। তোর বাকা-বাওয়ার ব্যবস্থা তারাই করবে।’

সুবককে পরে একঘরে করা হয়। সেলাই কল আনিয়া সে দক্ষিণ কাজ করিতেছে। এখানেও বাহ সাধারণ—কলটা তার হাতছাড়া করার চেষ্টা চলে। কিন্তু তাহা কলবতী হয় নাই। মাষ্টার অহুলালজী পরিচালনা করিয়া বুকাইয়া বেওয়ার সর্বদেয় উৎসাহে তাটা পড়িয়া যায়। মাষ্টার অহুলালজী মজুম গ্রামের সম্মানিত সর্ব—হরিজন-হিতৈষী বিঠাবান কর্ম্মী।

কোন হরিজন ভাল কাপড় পরিলে অথবা পরিচালনা-পরিচয় থাকিলে তাকে গালমন্দ সহিতে, ধমক, এমন কি কখন কখনও মারও বাইতে হয়। এরূপ আচরণের কারণ দুশ্চেষ্ট। পরিচালনা-পরিচয় থাকার কথা তাহারা ভুলিয়া যাক, চিরদিনের মত মোংরা থাকুক, সর্বদেয় ইহাই চাহে।

এক হরিজন বনবিভাগে কাজ করিত। তাহার কার্যকাল যখন শেষ হইল তখন বন-বিভাগ হইতে সে কতকগুলি বেব-হারুর তক্তা পায়। তক্তাগুলি সে তার ঘরে লাগায়। তাহা গাঁয়ের লোকের অসহ্য হইল। বেচারাকে তাকিয়া তাহারা বলিয়া দিল—‘তক্তাগুলি বুলে কেল।’ ‘বুলে কেলতে হবে কেন?’ এই বেরাদবির কৃত তার প্রশ্নের মিলিল। সর্বদেয় একথাও বলিল—‘তুই ত কোলী। তোর ঘর বেবহারুর তক্তার তৈরি হয় ত তোর আর আমাদের মধ্যে তকাং থাকল কোথায়? বাপ-মাদা যেমন চলতো তেমন চলতেই তোর কল্যাণ লাটসায়েব হতে গিয়েছ ত ময়েছ।’ আপন হাতে সে তক্তা বুজিল না, বেবিয়া গ্রামের সুবকেরা তার বাতীতে গিয়া ঘরের চাল কাটিয়া নীচে লাগান তক্তাগুলি বুজিয়া হুয়ে কেলিয়া দিল।

হরিজনেরা জনসভা করিতে পার না। করিলে পুলিশ ও সর্ব-জনতার হাতে তাহাদের মারপিট বাইতে ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মনে হইল সর্বদেয় মধ্যে এমন অনেক এমন বিবেচক লোক আছেন তাহারা হরিজনের প্রতি সম্মানবোধ করিতে চাহেন। শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব পুট হইতেছে।

গ্রামপুরের জনসভার হরিজনদের আদি বলি, ‘কোলী ইত্যাদি বাহাদের বৃত্তি চামড়া ছাড়াও, তাহাদের আদি বলি, চামড়া ছাড়াইতে আপত্তি করা তোমাদের উচিত নহে। চামড়া দেশের সম্পদ। চামড়ার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। অতএব বৃত্ত পত্তর চামড়া যদি মট হতে দিই ত চামড়ার মত লাঞ্ছনা পত্তর গ্রাম বাবে। যে সব কোলী এখানে ছুতা তৈরি করে তাহাদের মতও ত চামড়া চাই। বৃত্ত পো-মহিষের চামড়া যদি তারা নিজেরা না ছাড়ার তা হলে নিজেদের প্রয়োজনেই ত বাইরে থেকে তাহাদের চামড়া আনাতে হবে। তবেই যেথতে পাছ, হু’দিক দিয়েই কতি হবে।’

বেথানেই কোন কোলীর সহিত কথা হইরাছে, বলিয়াছি—‘চামড়ার কাজ হীন নহে। সর্বদেয়ও আদি ‘মদী বুট হাউস’, ‘অগ্রবাল বুট হাউস’, নাম দিয়ে চামড়ার ব্যাপার করছে। তোমরা যারা চিরকাল চামড়ার কাজ করে এসেছ, চামড়া পাকা ও রং করতে শিখে কাঁচা চামড়াকে দারী চামড়ার পরিণত করাতেই তোমাদের কল্যাণ। তাতে সমাজে তোমাদের স্থান উচু হবে।’

কোলীদিগকে চামড়া পাকান ও রং করিতে শিক্ষা দেওয়ার মত গ্রামপুরে ছল খোলা দরকার। এসমতঃ বলিব যে সর্বদেয় আচরণ অদ্বিত। পর ও বলদের কল্যাণে আজীবন তাহারা লাভবান হইলেও বৃত্ত পো-বলদকে তাহারা অপরিচয় মনে করিয়া থাকে, হৌরও না। অতঃপর পত্তর তাহারা আবার বাতাত বলে। বৃত্ত পোমাতার গতি বাহারা করে তাহাদের অসুখ করিয়া রাখা এবং তাহাদের কাজকে হীন মনে করা তাহাদের শোভা পায় না।

এমন যে আবর্তক কাজ তাকেও হের চকে দেখার সংকার সর্বদেয় মজাগত হইয়া গিয়াছে। অতএব বৃত্ত দিন এই সংকার হয় না হইতেছে তত দিন শিক্ষিত হরিজনেরা তাহাদের এই পুরাতন বৃত্তিকে হীন মনে করিবেই। হিন্দুধর্ম ছাড়া অত কোন বর্ষে এমনটি দেখা যায় না।

জনসভা করার অধিকার আইনতঃ সকলেরই আছে। আয়ত্তা চাই যে হিমালয় প্রদেশ-সরকার, বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগ এই মৌলিক অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত না করে। ততঃ সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

অসুখতার মত অসুখেরাও দারী

কোটগড়ের এক সভার রেফ (ভালী) জাঁতির একট লোকের বিরুদ্ধে অনেক কোলী অভিযোগ করে যে, সে তার হাতের জল ধায় না। অভিযোগের উত্তরে রেফ বলিল, ‘কোলীরা আমার হাতে জল ধায় কি? যে আমি ধাব?’

কোলীদের মধ্যেই, তাহারা চামড়ার কাজ করে না তাহারা চামড়ার কাজ করে এরূপ কোলীদের সুপার চকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—হুকা, জল বদ করিতেছে। বৃত্ত বলিয়া

গণ্য হইতে হইলে মিছেদের অপেক্ষা বাহারা ছোট ভাহাদের ঘৃণা করিতে হয় এ শিক্ষা বস্তুতঃ অবর্ণেরা সর্বদেবের কাছ হইতেই পাইয়াছে। তাই পরস্পর সমান হইলেও বড় বলিয়া গণ্য হওয়ার ভাগিদে ইহারা অপর কাহাকেও ছোট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যে হরিজনকে ‘অস্পৃশ্য’, বাহার হারার নাকি হল ‘অপবিত্র’ হয়, সেও পর্য্যন্ত সমপর্য্যায়ের তাইদের ঘৃণা করিয়া নিজকে বড় দেখানোর বন্ধ দেখিতেছে।

হরিজনদের চারি বিভাগ

হরিজন বলিতে সাধারণভাবে কোলীদেরই বুঝায়। আর্থিক অবস্থার দিক হইতে হরিজনদের চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। হালী—কোভদার কোন কোলীকে প্রেক্ষাপাচ টাকা দিয়া হালী করিয়া লয়। কোভদারের ক্রিতে সে লাভল দেয়, অতঃপর আসে তাকে বাটতে হয়। হালীকে যেদিন কোভদার কাছে লাগার সেদিন তাহাকে সে প্রতি বেলা দুই-খানা করিয়া তিন লছ্যার হরখানা কুটি দেয়। একখানি কুটি ওজনে প্রায় তিন হটাক। তা ছাড়া কোভদার শ্রিতের কল হইতে বিশ সের ও গ্রীষ্মের কল হইতে বাইশ সের গম দিয়া থাকে।

২। রেগতু—কোন কোলী বিশ-চল্লিশ টাকার ধনের দ্বারা মুখ-বাবদ বধন কোভদারের কাছ করে তখন তাহাকে ‘রেগতু’ বলে। রেগতু এক প্রকারের কীভদাস। রেগতুকে কোভদার, লকাল, হপুয় ও লছ্যার দুইখানা করিয়া কুটি বাইতে দেয়। পুরাতন হেঁড়া কাপড়ও সে পায়। তার পাঁচটার তার কাছ আরও হয়, আর শেষ হয় রাজি দশটার। কাজা সত্তর বকী কাছ করিয়া কোভদারের কাছে সে দুটি পায়। বাতী সে করে খালি হাতে, মলিন রূপে। ললাটের লিখনের দোষ দিতে দিতে সে পথ চলে। নিজ সামাজিক অবস্থার কথা অরণ করিয়া তার অন্তরে চাপা ক্রন্দনের রোল উঠে।

রেগতু কোলীর অবস্থা বস্তুতঃ পশুরও অধর। অস্থখ হইলে বা কাছে না আসিলে কোভদার তাহাকে খাইতে দেয় না। টাকা দিয়া কোভদার তাহাকে বরাদ্দ করিয়াছে, এণ পরিশোধ করিতে পারিলেই তবে গোলামি হইতে তার অব্যাহতি। কিন্তু এণ পরিশোধ করা তার পক্ষে অসাধ্য। অতঃপর কোভদার তাহাকে সে কাছ করিতে পায় না। সে উপায়ও নাই। অপর কোন কোভদারের রেগতু হইলে তবে তাহাকে টাকা দিবে।

৩। বৈটু—কোভদার তাহাকে সামান্য কিছু অধিকার জরি দেয়—অর্থাৎ নিজ খেতিতে বসার, আশ্রয় দেয় ও কাছ চলার মত কিছু এণও দেয়, তাহাকে কোভদারের বৈটু বলে। হাল দিতে বা অতঃপর কাছ করিতে কোভদার বধনই ডাকিবে তখনই বৈটু আসিতে বাধ্য—নিজ কাছ কেলিয়া যদি আসিতে হয় তত্বও। অতঃপর জমির পাকা কল কাড়িয়া লইয়া

কোভদার তাহাকে ডাড়াইয়া দেয়। কাছের মত কোভদার যে দিন বৈটুকে ডাকে সেদিন সারাদিনের আহার বাবদ সে চার হটাক আটা বা চাল পায়।

৪। স্যার—কোভদারের বাতীতে যে দিনমজুর হিসাবে কাজ করে তাকে স্যার বলে। মজুরী বাবদ মগধ কিছু সে পায় না। তিন বেলা দুইখানা করিয়া হরখানা কুটি সে খাইতে পায়। তদতিরিক্ত দুটির সময়ে আরও দুইখানি কুটি দেওয়া হয়। তাহা সে বাতী লইয়া যায়।

একটি গ্রামের সকল লোকের হুজির অঙ্গলদান আমদানি করি। গ্রামে চৌধুর কোলীর বাস। তার মধ্যে একটি পরিবারের কেবল নিজ জমি আছে। অবশিষ্ট সকলে হালী বা রেগতু। একটি পরিবার পাইলাস—তার চারজন লোকের একজন হালী, একজন রেগতু, একজন বৈটু আর চতুর্থ জন স্যার।

কোন কোন কোলী সম্পত্তি দ্বিজের কাছও বরিয়াছে। তাঁতি ও কামারের কাছও হরিজনদেরা করে। কিন্তু অবস্থা তাহাদের সকলেরই সমান শোচনীয়। কারিগর হইলেও জমিদারের কবলস্থ তাহারা নহে। পরিপ্রতিক বাবদ যে ধান গম তাহারা পায় তাহাতে তাহাদের লঙ্গার চলে না। এণগ্রন্থ হরিজনদের কাছে স্বাধীনতার কথা, সমান সুযোগের প্রতিশ্রুতি অর্থহীন।

বৈষম্য

পাহাড়ের দেশে সর্বদেবের জন্ম-মৃত্যুতে ও তেহার পর্বে রাজনা বাজান হয়। হিমালয়ের হর্গন হামেও বর-বাজার ও শব্বাজার বাজা বাজিয়া থাকে। কিন্নর দেশে হরিজনদেরা বাজনা বাজায়। কিন্তু মিছেদের সমাজে জন্ম-মৃত্যুতে বাজনা বাজাইবার অধিকার তাহাদের নাই। বাবো কেবল সর্বদেবেরই অধিকার। অথচ বাতবন্ধ পকারেতের সম্পত্তি, কারণ সর্ব অধর সকলেরই একতঃ চাফা দিতে হয়।

কিছু দিন আগের কথা। হরিজনদের একটি বরবাজা রাজী হইতে লাড়সা বাইতেছিল। বরবাজার লাড়ী ও লাড়া (বর কমে) দুই-ই ছিল। লাড়সা পৌঁছিতে, জমিদার শোভা-যাত্রা ক্রমিল—অপরাজ, বাধ্য বাজিতেছিল। বরবাজীর উপর লাড়ী চলিল—বরও বাদ গেল না। বর্ষধরীরা তাহার দ্বাধা কাটাইতে বাতী রাখে নাই। দ্বাধপুর আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিতেছে।

দত্তনগরে গ্রীষ্মী দজাজর মহারাজের মন্দির। মন্দিরের আশিনার হুল বসে। পাঠশালার শিক্ষক সজ্জবর লোক, হরিজন-হিতৈষী। তাহার চেষ্টায় এগার জন হরিজন বালক পড়িতে পাইতেছে। পাঠশালার চুকিতে বাইতেছি, বেঁচি বরবার বাহিরে তিন চারটি পায়খানা স্থাপিত। জিজ্ঞাস করিলাম, ‘পায়খানাগুলি এখানে কেন?’ উত্তর পাইলাম

পারজামাগুলি হরিজন হাজিরে। হরিজন বালকদের পারজামা পরিচা বন্ধিরের চতুঃসীমানার প্রবেশ করার অধিকার নাই। মেটে পরিচা বাইতে হয়।

বন্ধিরের কর্তৃকর্তাদের অত্যাচার করিলাম, ‘বালকদের পারজামা পরিচা পাঠশালার আসিতে দিন।’ নামে বন্ধিভেদি তাঁহারা আমার এই অত্যাচার রক্ষা করিয়াছেন।

হরিজনদের দাবি

তাহারা চাহে :—

১। জমি তাহাদের হটক। যে জমি তাহারা ভোগ করিতেছে তাহে তাহাদের মালিকানা কাগজপত্রে স্বীকৃত হটক। হস্তচ্যুত জমি তাহাদের কেন্দ্র দেওয়া হটক। আর যেহেতু তাহারা কৃষিহীন সেইহেতু জমির নুতন বিলি-বন্দোবস্তের সময়ে হরিজনদের দাবি সর্বপ্রায়ে বেশ বিবেচনা করা হয়।

২। সর্বসাধারণের কুচা বা বাওড়ি হইতে জল করার সমান অধিকার এবং অপর শ্রেণীর লোকের তার বন্ধির-প্রবেশের ও বাধ্যতাও সহকারে বরখাস্তা ও শবদাজার সমান অধিকার।

৩। জমসদার অবাধ অধিকার তাহাদের বেশ বিলে।

৪। দ্বাঃ মাংস বাইতে তাহাদের কোরবরহুতি না করা হয়।

৫। এ পর্যন্ত হরিজনদের সেবাগড়ার বাধা ছিল। তাই অবিকসংখ্যক হরিজন হাজকে হাজরুতি দিয়া সরকার এই দিকে উৎসাহ দান করুন।

৬। সংখ্যাগুপ্তে পকারেতে হরিজনদের কত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৭। হরিজনদের বরহুতার নিরতিশ্রম জীর্ণ। বর বেদাঃ মন্ডের জন্ত বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা।

খ—চাষবাস ও জীবিকা : জমি জল

যে মাসে আমি কিয়র দেশে সিরাভিলায়। সেই সময়টার কলের অভাব থাকে না। সারা বছর তথার পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায় এ কথা বেশ পাঠক মনে না করেন। বস্ততঃপক্ষে কিয়রদেশে বৃষ্টি হয় না। শীতকালে বরক পড়ে। গ্রীষ্মকালে বরক পলিরা জলস্রোত বহিতে থাকে। বুদ্ধিমান কৃষক ঐ জল ক্ষেতে বরিয়া রাখে। প্রায় সর্বত্র জুন মাসের মাঝামাঝি বরক পলিরা শেষ হইয়া যায়। তখন পানীর কলের পর্যন্ত অভাব ঘটে।

এক বৃহ চাবীর সঙ্গে দেখা। সে বলিল, ‘তগবান ত সব জায়গার আছেন। তগবান অত সব জায়গার বৃষ্টি দেন। আমাদের এখানে বর্ষা-বতুই নাই। বাৎসরিক তক বৃষ্টি হয়। তার পরে এদিকে কেন যে তগবান বৃষ্টি দেন না।’ বস্ততঃ উত্তর-পূর্ব মহাসুদের দিক হইতে দেখিলে এই প্রবেশ কোরেটা-বেলুচিস্থানের মত শুষ্ক দেশ। সন্দের তিক্ত দেশও অল্পরপ

তক অকল। তাই তিক্তের কৃষির অবস্থা কিয়র দেশেরই মত। কোনের পর কোন বরিয়া জল ও অধিকার কৃষি। আবাদী কৃষি কম। বাজা উচ্চ পাহাড় বেশী। আবার কুখ্য-পাতও হয় অধিক। সুতরাং খেতির পক্ষে অনুবিধ।

কলের চাষ

তগবান এ দেশটাকে বেশ কলের জন্তই বৃষ্টি করিয়াছেন। আমার এজিয়ার থাকিত ত কিয়র দেশে আমি প্রেক কলের চাষই করাইতাম, আর কলের বিনিময়ে সরকারকে এখানকার অয়ের ব্যবস্থা করিতে বলিতাম। তাহা হইলে শুষ্ক আব-হাওয়ার যে সব কল করে সে সব কল কোরেটা-বেলুচিস্থান হইতে আমদানি করার আর প্রয়োজন থাকিবে না। তার অর্থ রাষ্ট্রপঠমে কিয়র দেশের বাহা দেওয়ার আছে তাহা দেওয়ার সুযোগ সে পাইবে, আর তার ভিতর দিয়া সে মিছে উন্নত হইবে। চমম (বেলুচিস্থান) অপেকা পাণা-বাটিতে অনেক বেশী কল উৎপন্ন করা বাইতে পারে।

কিয়র দেশে বৃষ্টিপাত কম। অতএব কিয়র দেশ প্রকৃত পক্ষে চাষ-আবাদের বা বন-বৃষ্টির অনুকূল নহে। শুষ্ক আব-হাওয়ার কল—আজুর, আপেল, গুয়ামানী, বাধান, আবরোটি ইত্যাদির চাষের উৎসাহ এখানে বেওয়া উচিত।

কিয়র সীমান্ত প্রদেশ

সুতরাং চীনী পর্যন্ত ত মোটরের রাস্তা হওয়া চাই-ই, আর মচার পর্যন্তও তাহা প্রসারিত করা একান্ত সরকার। কল রপ্তানির সুবিধা তাহাতে ত হইবেই; অত কারণেও তাহা আবশ্যক। কিয়র দেশ তিক্ত সীমান্ত অবস্থিত। হিমালয় প্রদেশের রাজধানী সিমলায় সহিত মোটর ও টেলিকোন দ্বারা এই সীমান্ত প্রদেশের সংযোগবিধান রাষ্ট্ররক্ষার দিক হইতেও প্রয়োজন।

কিয়র দেশ পরিভ্রমণ কালে এ সম্বন্ধে বহু কিয়রের সহিত কথা হইয়াছে। কিয়র দেশের ব্যবসার তিক্তের সঙ্গে। তিক্ত হইতে রাসপুয়ে সোহাগী, পশর, লবণ ও কিছু ঔষধ আমদানি হয়। আর ভারত হইতে রপ্তানি হয় চাউল, কাপড় ও গুড়। তেজা ও হাগলের পিঠে এই সব পণ্যের আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। কিয়র-ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার টাকা তিক্তে বাটিতেছে। তিক্তী ডাকাতেয়া সমর সমর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপরে হানসা করিয়া থাকে। আমা-দের বিবেচনার চীশীর আরও ওদিকে ভারত-তিক্ত সড়কের পর অবস্থিত ভারতের শেষ সীমান্ত প্রায় মগম্যার পুলিশ-টৌকি লংহাপন করা আবশ্যক। উহার সহিত টেলিকোনের যোগা-যোগ ব্যবস্থা করাও সরকার।

পশম উৎপাদনের পক্ষে অত্যাচার

কিয়র দেশে দেবদার ও চীত পাথের বন বৃষ্টি করা হয়।

আমার বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে। যে সব গাছের পাতা ভেড়া-ছাগলের খাদ্য গ্রহণ বুকের বন সৃষ্টি করাই এখানে সঙ্গত। মনে রাখিতে হইবে যে, ভেড়া-ছাগল এ দেশের প্রধান সম্পদ। দেশের লোকের শীত দিবারণের নিমিত্ত কিয়তেরা শত শত মণ পশম উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইহা লাভজনক প্রাচীন শিল্প। হুংঘের বিঘর, কিয়তের উন্নতির পথে আজ নানা বিঘ সৃষ্টি হইতেছে। বন-বিভাগ হইতেছে সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য। ভেড়া-ছাগলকে বনের শত্রু মনে করা হয়। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আবুল পরিবর্তন হওয়া চাই। যেখ ও ছাগ-পালন ব্যবসায় যাহাতে সুরক্ষিত হয় এবং উত্তরোত্তর উন্নতি উন্নতি হয় সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। এই ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে হিমালয় প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব যাহাতে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে একযোগে কাজ করে, ইহাদের মধ্যে থাকিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিয়ত দেশ আজও এই ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহা সরকার অন্য সরকার সচেতন না হইলে, এই ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। নষ্ট হইলে আবার নুতন করিয়া আরম্ভ করা কঠিন হইবে। তাই এই দিকে সতর সন্নিহিত চেষ্টা হওয়া সরকার। গ্রীষ্মকালে যেখপাল লইয়া কিয়তেরা বর্ষন বাড়ী করিতেছিল তখন মেঘের পালে সংক্রামক বুরে-বা রোগ বেধা ঘের আর তার কলে বহু ভেড়া মরিতেছিল, নিক চক্কেই তাহা আশ্রয় দেখিয়াছি। এইরূপ সময়ে একটু কিনাইল পাইতে পারে রাত্তার কোথাও রাষ্ট্রের তরক হইতে সেই ব্যবস্থা নাই। শীতকালে কিয়তেরা ভেড়া লইয়া নীচে নামে, আর গ্রীষ্মকালে ভেড়া লইয়া তাহার বগুঁহে করে। এই দুই সময়ে কিছু দিনের জন্ত রাত্তার চিকিৎসার সাধারণ

ব্যবস্থা করিলে শত শত ভেড়া রক্ষার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

কিয়তের সম্পদ পত

কিয়তের পত ভালবাসে। পত তাহাদের সম্পদ। মিলেরা বরং অমাহারে থাকিবে, কিন্তু তাদের তাহার কখনই অমাহারে রাখে না। মিলেরদের শিকসজান পারে হাঁটরা পথ চলিয়াছে, আর কিয়তী পোড়ার বাচ্চা শিঠে বহিয়া চলিয়াছে, এ দৃশ্য চক্কে পাড়িয়াছে। গরু-বলদ দেখিয়া মনে হইয়াছে, ওগুলি সবয়ে পালিত। কিয়তেরা এক নুতন জাতের বলদ সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা হইতেছে তিনতী ইয়াক ও ভারতীয় গরুর সহযোগ-জাত সত্তর। নাম তার 'কো'। 'কো'-এর গিঠের লোম লম্বা, আর গোটা লেজটা লম্বা লোমে ঢাকা। সাধারণ বলদ অপেক্ষা কো চারগুণ বেশী কাজ করে। কিন্তু মে মাসের পরে কো রামপুরে যাইতে পারে না—রামপুর গরম কারণ। কিয়তেরা বোড়া এবং গাভাও পোষে। কিয়ত দেশের বোড়ার এসিডি আছে। বোড়াকে দামা বেওয়া হয় না। জলের ঘাস-পাতা খাইয়া তার পেট তরে। কার্তিক মাসে রামপুরে একটি মেলা বলে। ঐ মেলায় কিয়ত, তিনত ও ফীতির লোকেরা বোড়া বিক্রয় করিতে আসে।

কিয়ত দেশের অন্ন-সংস্থান

বগুঁহা কিয়তদেশের প্রধান অন্ন। বগুঁহার রং কাল—রাইয়ের মত ক্ষুদ্র একরূপ শস্যের দানা। বব, গম আর কোথাও কোথাও ধানেরও চাষ হয়। মিলেরদের ব্যবহারের জন্ত কিয়তেরা আপুও জমায়। কিন্তু এখানে সর্বসাকুল্যে হয় মাসের বোরাক মাত্র জম্মে। বাকী হয় মাসের তিন মাস তাহাদের চলে কলের উপরে, আর তিন মাস তাহার কাঠার বন্য কলমুল-কল খাইয়া। এরূপ দারিদ্র্য অন্য কোথাও আমি দেখি নাই।

ক্রীশুনীলচন্দ্র রায়

দব তুলে তুল, পোলমাল করে বসেছি,
মিশার গতিতে সমাধি মিলের রচিছি,
হুয় বাসুচরে চক্কে যোব পড়েছিল তাই বেবেছি :
মরীচিকা তাকে মরী বলে ভালবেসেছি,
দব পোলমাল হিজিবিজি করে
অতুল সাগরে তেসেছি।

সামারপে এক পড়েছিহু কবে মারা হরিণের গর,
বে হরিণ বরা-হোয়ার বাইরে, বে হরিণ হুয় কর,
সে সোমা-হরিণে লোভ করে আমি মনে মনে শুধু পুতেছি,
দুগদা-মেশার বহুর ছিলে অসংখ্য বাণ জুতেছি,

ভীরঙলি গেছে এদিকে ওদিকে লক্ষ্য হয়নি স্মৃত,
পিছনের দিকে করে দেখি হার তুগীর হয়েছে মিঃব।
একদা বিকর বগে বগে দিন-রাত হিহু মর,
অভিযান শেষে লম্বুবে দেখি বিঘর-তোয়ন ভর,
কোথার অরতি ? লম্বা মনে। এ কি তুল পবে হুটেছি,
তবু আভনের কুলুং হয়েই হুটেছি।

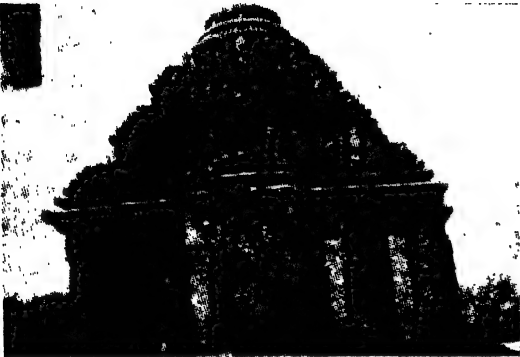
একটি কীবন পেয়েছিহু তাকে বাণী করে বুঝা বেলেছি,
হেয়ে গেছি আমি বত বায় দান কলেছি।

কোনারক

ত্রিগোপী রায়

পুরী থেকে কোনারকে—স্বাভাবিক—হুট পথ আছে। একটু পো-বানে—বিশ-বাইশ মাইল, অপরটু বন-বানে—ছায়ায় মাইল। কোনারকের রাজী আমরা মাত্র তিন জন। এতটুকু পথ বিজয় রাজে গরুর পাড়ীতে পাড়ি দেওয়া মুক্তিসদত মনে হ'ল না, বাসে বাওয়াই ছিল হ'ল।

বিকেলে বাস ট্যাঙে গিরে ঘেমে এলাম বাস হাতবে সকাল ছটায়। এখনও হাতে প্রচুর সময়—এই অবসরে কপমদেবের মন্দির আর একবার দেখলে মন্দ হ'ত না। সন্ধ্যাও আমার প্রভাব সম্বৰ্ণ করলেন। মন্দিরে ঢুকে মনে হ'ল এই সময়ে মন্দিরে আলোই সব দিক দিয়ে প্রসৃত। রাজীর তিত্ত ভত বেণী নেই, পাণ্ডার অত্যাচার নেই, গোল-মালত গা-সহা শোহের, শান্তিতে সব কিছুই হুটরে বেধা বার। অথচ গত কাণ্ডিক মাসে সকালের দিকে মন্দিরে এসে পাণ্ডার অর্ঘ্যদ্রব্য তার মরুম বারবার আমাদের কি নাচেহালই না তে হয়েছিল।



পাণ্ডারের গীর্জা দ্বারা বহু কপমদেবের প্রাণ কটক

সন্ধ্যার সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে হুঁচরটে জিনিস কিনে নিয়ে ব'টা সাপার ছোট্টলে কিনে এলাম। রাজীট এক ঘুমেই পার করে দিলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষে বধন ছোট্টল ত্যাগ করলাম, তখন বড়িতে পাঁচটা বাজে। নামনে অনন্তপ্রণারিত সহুত্র টাঙের আলোর উজ্জ্বলিত হয়ে পতঙ্গহস্ত চেঁচিয়ে ফুলে আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের অত্যাধিক ভাবি চমৎকার লাগছে। যোমাক লাগছে তোরের হাওয়ার পথ হুঁচতে। কোয়াংরাহাত জন-বিরল উঁচুহুঁচ পথ দিয়ে আমরা চলছি তিন জন—ককিরবা, আনি আর শৈলেন্দ্র ভাড়া।

বাসে বধন আসন গ্রহণ করলাম, তখন হুঁচ বাজে। শহরে বীরে বীরে আলো ফুটেছে। বিরাট বাংলার মত পূর্ণিমার চাঁদ চলেছে অভাচলের দিকে। বাতাসে এখনও শীতের আবেশ রয়েছে। বাসের হর্ণ বেজে চলেছে। এবার বাজা শুরু। আমরা তিন জন হাতা ভাটপাতার এক তল্লোক এবং একটু তরুণী শেষ মুহুর্তে বাসে এসে উঠলেন। এঁরাও যাজ্ঞেন কোনারক।

টিক সাভটার সময় বাস ছুটে চলল পিচালা রাস্তা দিয়ে। প্রভাতের আবহাওয়া অন্ধকার আভে আভে কেটে যাচ্ছে। গাছপালা সবকিছু পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লোকচলাচল শুরু হয়েছে পথে। দোকানপাট খুলছে একটর পর একট। পথে রাজী ওঠে, বাংলার বাংলার বাস থামে এবং আমরাও এই অবসরে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেধি, টুকরো টুকরো আলাপ চালাই। পথের হুঁচারে কনসার্বিভ গাছের শ্রেণী, মাঝে মাঝে বেধা বার বোরো বাংলার ক্ষেত। গত কাণ্ডিক মাসে এই ক্ষেতগুলি জলময় দেখেছিলাম। এখন কি চমৎকার সতেজ সবুজে গাছগুলি প্রাণবান হয়ে উঠেছে। পথে আর কোম বৈচিত্র্য নেই—সবুজ মাঝে মাঝে হুঁচরবাঁদা চালাবার বেধা বার, কোথাও চোখে পড়ে ছোটখাট মন্দির—পঞ্চাশী হুঁতিন জন পণিক।

পঁচিশ মাইল পথ অভিক্রম করে আমরা শিপলিতে এসে পৌঁছলাম। এইখান থেকেই পথ ভান দিকে বেঁকে গেছে নিরাপত্তা হয়ে কোনারকের দিকে আর সোজা পথ চলে গেছে ভুবনেশ্বরে। কোনারকের রাজী এক উজ্জ্বল তল্লোক শিপলিতে আমাদের সঙ্গী হলেন। তল্লোক বধরবারী এবং অসামিক প্রকৃতির—বাংলাও মন্দ বলেন না, থাকেন গজানে।

শিপলিতে পাড়ি দাঁড়াল আশবস্তী। আমরা এই অবসরে এক এক গেলস জল খেয়ে গলা জঁজিয়ে দিলাম। ভুবনেশ্বর থেকে যে বাস কোনারক যায়, অহুরে তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তখন আমাদের যন্ত্রণা বহুরা নামনে এসিয়ে চলল। এইবার শুরু হ'ল পুলিশের কাঁচা রাস্তা। কিছুকণ উঁচুহুঁচ পথ পার হয়ে বাস হুঁচৎ কাঁকানি দিয়ে জাবিরে দিলে যে, এইবার সাবধান হওয়া উচিত—এই ভাবে বেতে হবে গ্রিন মাইল। সকালের আলোর এই যে দীর্ঘ রাজা এর কোথায় বেশ এতৎকারের মেশা মুকিরে আছে।

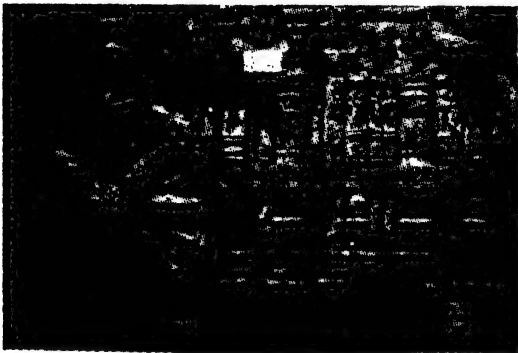
সন্ধ্যার হুঁচারে দিক বাসক্ষেত। মীল আকাশে ইতস্ততঃ বিকিণ্ড শাখাশাখা টুকরো বেধ। হুঁপাশে বেধা বার ছোট ছোট দারিকেন্দ্রের—কোষটতে কনোলদ

হয়েছে, কোমটতে হয় নি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বেহাতি হ'টার অবলোক, হ'একটা চালা। এর মধ্যে হঠাৎ পাড়ির গতি বদল হয়ে এল। নীচে বেধা গেল দীর্ঘ একটি নদী, নাম ভার্গবী। উঁচু থেকে রাজা ক্রমশঃ নীচু হয়ে নীচের দিকে য়িপেছে। নদী থেকে এক হুট উঁচু সেই নীচো এবং তা পার হতে হবে বাস্তবপূর্ণ বলে করে। বাই হোক, বীরে বীরে বাস নদী পার হয়ে আরও উঁচুতে উঠল।

বাস চলেছে একেবেঁকে। একটা বোলমকড় পার হয়ে গেল। কিছু পরে নিরাপাতার এসে বাস বাসল। এমমা-পাতা একটি বড় গ্রাম। বাসা আছে, ছল আছে, ঠাবার দোকান আছে, আর আছে হোটেল। ভনেহিলাস, এখানে খুব ভাল কীরকম পাওয়া যায়। আমাদের চোখে কিছু কিছুই পড়ল না।

শরীর খুলিখুলিত, মন প্রান্ত বিপর্যস্ত। একঘেরে বাস্তবিক আওরাক তুলে পুনরায় বাস সামনের দিকে ছুটে চলল। এতকণ পর ককিরবাবুর অধীর প্রশ্ন শোনা গেল—‘আর কত দূর?’

গোপে এসে পৌছান গেল। এটিও একটি বড় গ্রাম। তবে নিরাপাতার মত নয়—তার সঙ্গে আকারে না হোক, প্রকারে অনেক প্রভেদ। এখানেও বাসা আছে, কোমট



মন্দিরের নক্সা এবং চক্র

আকার আছে, একটি ঠাবারের দোকানও আছে। এখান থেকে কোনারক তের মাইল। ভালপাহের কীকের মধ্য দিয়ে বেধা বাজে কোনারকের মন্দিরের আভাস—অনেকটা প্যাগোডার মত। অনেক দিনের সবরপোষিত বাসনা তা হলে পূর্ণ হবার পথে।



সদীপনসহ লেখক (বাম দিকে)

ভান পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছে। তার প্রায় সব-ই হুই বালি, একটু ছল। বাবে মাঝে তার সঙ্গে চকিতে বেধা হয়, আবার কোথার লুকিয়ে যায়। নদীটির নাম কুশভজা। বাসিক পরে আবার একটি পুলের উপর এসে পৌছলাম—ভার্গবীর পুলের মত। পুল পার হবার পরেই বেধা গেল পথের হ'পাশে চলেছে মন বাউয়ের সারি। এবার পথে আর থুলো দেই। যে দিকে তাকাও শুধু বালি আর বালি। আগে লজ্জা যে কোনারকের মন্দিরের কাছেই ছিল, এই স্মরণশক্তি বাস্তবায়নি বেবেই তা আশ্চর্য করা যায়।

যৌর চত্বরে। প্রভাতের সোনালী আবেশ কেটে গিয়েছে। বাটির মত উপুড় করা আকাশ থেকে সূর্য হয়েছে রৌদ্রালোকের অক্স প্রাথম। বেলা এগারোটার আশ্রয় পৌছলাম মন্দিরের পাথরপে। ঠাবারের কোলা, ‘ওয়াটার বটল’ দিয়ে বালি তেঙে তেঙে এসে দাঁড়ান মন্দিরের চতুঃসীমার ভিতরে। চারদিকে শুধু শিকবকালো পাথর আর পাথর—তেঙে-পড়া মন্দিরের এককালের সহস্র বিবর্ণম। কালের সাক্ষী হিসাবে আজও কোন মকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে অগম্য মন্দির। অগম্য বিরহে সূর্যমন্দিরে হুততে হ'ত।

দূর থেকে অগম্যকে একটি অভিকার রথের মত দেখান। চকিট চক্র এবং সাতটি অক্ষ সমন্বিত যে মন্দির ছিল দ্বিরাট আকারের আজ তার সামান্যমাত্র বিবর্ণমই অবশিষ্ট আছে। অগম্যবে বোধ হয় বায়োটি চক্র—হ'একটি অবিভক্ত, বাসিকগুলি তার। মন্দিরের এক দিকে হুট অথ বেশ গভীর প্রতীক, এক দিকে হুট হুটী, অত দিকে হুট বাস।

এবার আশ্রয় তলার পাথরের সিঁড়ি তেঙে অগম্য মন্দিরের উপরে উঠতে লাগলাম। বাসিকহু দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

সামনে লাপলাস, দুর্বারেবতার বেলীর উদেশে একেবারে পাতালপুরীতে। ফুলতাপাতা-গোড়িত হতীম্ব খোদাই-করা চমৎকার একটি পাথরের বেদী দেখা গেল। গাইড বললে যে, এখান মন্দিরের নির্মলম্বরূপ এই বেদীটাই বর্তমান আছে। এর উপরেই অবস্থিত ছিল দুর্বারেবতার মরনাভিয়ার মূর্তি। অতীত অনেক স্মরণ জিনিসের সঙ্গে সে মূর্তিও আজ অপস্থত। কেউ বলেন—পুরীর অগ্নিগাহ

করা। অবিকার্যই তার বা বিপত্নী—কতকগুলি মূর্তি অবশ্য অতীত অবস্থার আছে। এই তার মূর্তিগুলির মধ্যে প্রাচীন



হর্যামূর্তি ও তার পাথরের মূর্তিগুলি

মন্দিরের একটি কক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থার কোণে যে মূর্তিটি দেখা যায়, সেইটাই আসল হর্যামূর্তি। পুরীর মন্দিরে ঐ মূর্তিটি আরও দেখেছি। আসল মূর্তি না হলেও ওটি যে কোনারকের মন্দিরের কোন মূর্তি তাতে সন্দেহ নেই। কেননা পাথরের রঙ, মূর্তির গঠনমৈপুণ্য কোনারকের মূর্তিগুলিরই অঙ্গরূপ। কোনারকের অঙ্গরূপ ভবনটিও তার প্রতিচ্ছায়া থেকে অপসারিত করে অগ্নিগাহ মন্দিরের প্রবেশ-পথের লাভনের দ্বাভার এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অতীত কক্ষ থেকে দূরত্রে দূরত্রে পুনরায় উপরে উঠতে লাপলাস। অনেক উঁচুতে উঠেছি, লাভনের বিদে অবস্থিত পুতলা, নিচে গাছপালাগুলো ছোট দেখাচ্ছে, মন্দিরগায়ে অসংখ্য মূর্তি। কোনটি বাহুবলী মত, কোনটি বোহিনীমূর্তি, কোনটি বা দ্বী-পুত্বেব কিম্বদন্তি, মূর্তিগুলি এসবাই পাথরে খোদাই



কোনারকের একটি তরঙ্গীর্ষ হর্যামূর্তি

উচ্চতার ভাবব্যাপ্তির যে নির্মল দেখতে পেলাম, তাতে বিশ্বের অভিজ্ঞত হয়ে পেলাম। এই নির্মল প্রান্তরের মধ্যে মন্দিরগায়ে কি অগ্নি শিরমূর্তিই না করে পেয়েছি সেফালে শিরীষ। মন্দির পর দিন, বঙ্গের পর বঙ্গের লোকচক্ষুর অভ্যাসে যে সব শিরী মূর্তির প্রেরণার ও অঙ্গরূপ সাধনার পাথরকে বুঝ করে তুলেছিল, আজ কোথায় তারা আর কোথায় বা তাদের উত্তরসারক বংশধরগণ।

অগ্নির উচ্চতা একশ' পঞ্চাশ ফুট। এখান মন্দির ছিল এরও চেয়ে উচ্চ। এত উঁচুতে এই বিরাট বিরাট পাথর তাঁরা কেনন করে বহন করে নিয়েছিলেন, তা ভাবতে মন বিশ্বের আশ্চর্য হয়ে ওঠে। বেকালে কেন ছিল না, সেই সময়ে এত উঁচুতে এই বিশাল আকারের পাথর কেনন করে উত্তোলিত হ'ল। তবে কি এমন কোন বহন ছিল বা আতকের কেবেরই অঙ্গরূপ?

ছোটখাটো মূর্তি ও হাজারে হাজারে মন্দিরগায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে। তা হাজার হাজারে মন্দিরগায়ে অনেক মূর্তি—কোনটি বোহিনী, কোনটি হরকবাবিনী মাদী, কোনটি মিলন-মত দ্বী-পুত্বে—কোনটিই অতীত বা অতীত নয়। আরও কয়েকটি বিরাট আকারের হর্যামূর্তি নজরে পড়ল, মূর্তিগুলির শিরমৈপুণ্য এবি চমৎকার যে, চাক্ষু না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বেবন দ্বাভার দৃঢ় ভদ্রী, তেমনি তার ব্যক্তা, এলাত

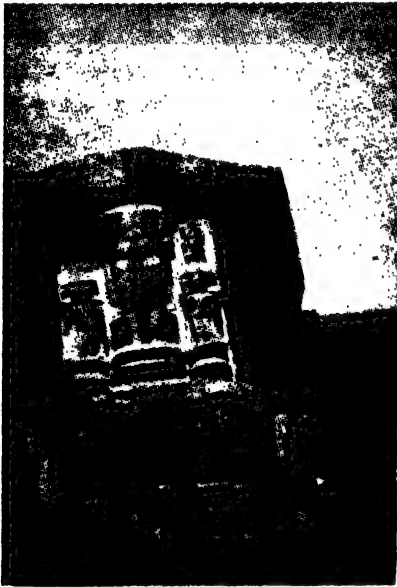
উপবীত, কটতে অপন্ন কটীকরণ, পারে পাহা। হুঁতিলি
যেখানে বাধা জ্ঞাত তত্ত্বিত অবনত হয়। সেগুলি সব
পাথরে ধোঁকাই করা। কারও হাত ভাঙা, কোমট হুওহীম।

অগ্নয়ের আকার একটি বিরাট রথের মত, যে কয়টি ঢাকা
ফালের তুল হতাবলেন এড়িয়ে আঁকও নিজ নিজ অস্ত্র বজার
যেবেবে, সেগুলি বিশাল আকারের। ঢাকাগুলিতে অনেক
রকমের মক্কা রয়েছে। মদিরটি সবচেয়ে কাঠ। কাঠী পাথর
বিরে তৈরি; একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর; অবচ
কি নির্মূলত ভাবেই না হুঁতিলি মিল খেয়ে গেছে—তু ধোঁকের
চিহ্নটি হাত। প্রথম সোপানশ্রেণী অভিক্রম করে মদিরে
উঠতে হয়। সোপানগুলির শেষভাগেই এবান কটক। এটি
এবন পাথরের গাঁপুনি বিরে বহু করে রাখা হয়েছে। কটকের

নামা অলঙ্করণ, অনেক ছত্র ছত্র হুঁত। হুঁতিলিটার পারের
তলার আরও একটি ছত্র হুঁত। শিরহুটির দিক থেকে এটির
তুলনা দেই। হুঁতিলির গঠন-কৌশল ও শির-সুবনা বেবে হুঁত
হলার।



মদিরের উপরকার একটি হুঁত



অপর একটি হুঁত

হ' পাশে এবং মাথার সবুজ পাথরে উৎকীর্ণ অনেকগুলি ছত্র
ছত্র হুঁত সজরে পড়ল। দীতে থেকে ঠাঁড়িয়ে মদিরদীর্ঘের
দিকে তাকালে আরও কতকগুলি হুঁত চোখে পড়ে। মনে হয়
একটি গুরুত পক্ষী, একটি লক্ষ্মী। স্পষ্ট ভাবে ছুঁনি থেকে
যেখা যায় তু বিশাল হুঁতিলিগুলিকে।

একটি হুঁত তারি ভাল লাগল। এই হাতভাঙা বিরাট
হুঁতিলি হুঁ পাশে হুঁতিলিগতক হুঁ হুঁ হুঁতকরে হাঁই গেছে
বলে আছে, তার হ' পাশে হুঁ মতায়মান বামনহুঁত; তার হ'
পাশে আরও হুঁ হুঁত। মাথার হুঁত, কর্ণে আভরণ, হুঁত-
হুঁতিলি মতই গলায় উপবীত, কটতে কটীকরণ। একজনের
হাতে উজ্জ্বল তরবারি, অপরটির হাত ভাঙা। হুঁতিলির উপরে

অগ্নয় পরিষ্কার শেষ করে এবার দীতে মেয়ে এলাহ।
আহারাদির পর পুনরায় উপরে উঠার পালা। হাতে সমস্ত খুব
বেশী দেই। এর মধ্যে মাদিমির ও ভোপথর বেবে মিতে
হবে। নৈলেজ তারা বিশ্রামের বাসনা জানালে আমি আর
কফিরবার হ'কমে রওনা হলোম ডাকবাংলোর দিকে। মদিরের
বেটনী-প্রাচীর হাত্তাওঁই সামনে চোখে পড়ল অনন্ত-
বিস্তৃত বালুকারাশি। সবুজের আভাস দেখা যাচ্ছে ছুরে।
সবুজ এবান থেকে প্রায় তিন মাইল সরে গেছে। মধ্যস্থলে
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দ্রাঙ্গা মন্দিরটি—সেখানে প্রতি বৎসর মাঘী
সপ্তমীতে এক বিরাট মেলায় আয়োজন হয়। দিনকয়েক
আগে সে মেলা হয়ে গেছে, এবংও এবানে সেখানে তার চিহ্ন
দেখা যাচ্ছে। এবার মাকি লক্ষাধিক লোকের সমাগন হয়ে-
ছিল এই মেলায়। আর না এগিরে আমরা ডাকবাংলোর
হুকলাম বাংলোর পক্ষান্তে একটি নৃত্য বনানো হুঁতিলি
দেখতে।

ডাকবাংলোটি বেশ চমৎকার, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন।
এখানে লক্ষ্যকণের মতে মালী আছে, যে-কেউ এবানে থাকতে
পারেন। কিন্তু একটা বিষয় এবানে এই প্রদেয় বিদ্যেবজাতি

উন্নত করা-প্রয়োজন। এখানে আসতে হলে বাবার-বাবার
[কলের বোতল বা ক্যাঙ্ক প্রকৃতি নিয়ে আসা অবশ্যই উচিত।

এইবার নাটমন্দির এবং ভোগঘর দেখবার পালা। ভোগ-
ঘরের ইমারতের কোনও অংশই আচ্ছাদিত বাঁকা বেই।
পাথরের তার ভিত্তিগুলি ইতস্ততঃ বিকৃত রয়েছে। কতকগুলি
ভক্ত বাঁকা-আছে, কোন কোনটি ভাঙা, কোনটি বা



ডাক বাংলোর দিক থেকে অগ্নমন্দির ছবি। সন্ধ্যার তার ভিত্তিগুলি
কংসপ্রাপ্ত ভোগঘরের নিদর্শন

।। নাটমন্দিরটিও ভেঙে গেছে। তবে এখনও এর
চারপাশের বেতাল এবং মেঝে ও সিঁড়ি অটুট অবস্থায়
রয়েছে। নাটমন্দিরের রঙ লাল, মন্দির-পাশে বাতাস-
বাহনরতা মাঠীমুষ্টি উৎকীর্ণ। এক দিকে আছে অখারত
স্বর্গদেবতার বীরস্বাক্ষর একটি মূর্তি। মূর্তিটির বামে একেবারে
ছবির কাছেই আছে একটি বিকটাকার স্তম্ভের মূর্তি। এর

কাছেই ছিল এককালে স্বর্গদেবের সহস্রাবিধী ছায়া বা ছায়া
দেবীর মন্দির। এখান মন্দিরের নদে যে মন্দিরটিও কালের
করাল এসে কংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

অগ্নমন্দিরের ভিতরে কি ছিল, আচ্ছাদিত তা জানার
কোন উপায় নেই। পাশে নগ্ন মন্দিরটি কংসপ্রাপ্তে পরিণত
হয় সেই কারণে ভিতরটা বাদুপে পূর্ণ করে বাইরে থেকে
পাথরের গাঁদুনি দ্বারা প্রবেশপথগুলি
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দ্বারা বা
ছায়াদেবীর মন্দির স্বর্গদেবীর নদেই
নিষ্কৃত হয়ে গেছে। বিশাল বাদুকা-
তপের মধ্যে বেঠনী-প্রাচীরটুকুই বর্তমান
রয়েছে। দাচঘরের ভগ্নাংশ এবং অগ্ন-
মন্দির বহিরংশই কারুকার্যবচিত। স্বর্গ-
দেবের নগ্ন-অবচালিত স্তন্যর মধ্যে
ততোবিক স্তন্যর এবং অপূর্ণ কারু-
কার্যবচিত চকগুলির কয়েকটি নান্ন
বিভিন্ন। তন্মধ্যে নান্ন দু-একটি অতর
অবস্থায় আছে, বাকিগুলির কারুকার্য
মক্সা এবং অলঙ্কারের কিছু কিছু শ্রীহীন
হয়েছে, কিছু বা ভেঙেছে। শুধু অতর
অটুট অবস্থায় দেখা যায় সবগ্রহের
মহামাতিয়ার মূর্তিগুলি। কলিঙ্গদেশের
প্রাচীরবাহী প্রতি মন্দিরের সন্ধ্যাবেই
প্রতিষ্ঠিত থাকত সবগ্রহের মূর্তি। রবি,
সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র,
শনি, রাহু ও কেতু—এই সবগ্রহের মন্দির
মূর্তি একটি একাও সন্ধ্যাবেই পাথরে
আঁকাআঁকি ভাবে উৎকীর্ণ। মূর্তিগুলির
অনিবা তারি চমৎকার।

এইবার মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্প
স্বর্গে হ'একটি কথা বলছি। প্রথম
বড় দেউল বা পুরুষ দেউল (গভীরা),
বিভীরা—অগ্নমোহন বা স্ত্রী-দেউল
(দর্পকের হান বা ভজ দেউল)। এই
দুইয়ের মিলনের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যের
ঐক্য বিকশিত হয়েছে। বড় দেউলের
মতক গোলাকৃতি, দ্বারা নিরঙ্গণ,
অগ্নমন্দির মতক ভরে ভরে বিকশিত,
বেগী চূড়া অধিকতর বিকৃত।

ভিন্ন মতক পাথরে মন্দিরটি নির্মিত। বেলে পাথর,
মাকড়া পাথর এবং হুগলি পাথর যথাক্রমে স্তম্ভদেবীর ও
আটপক, স্তম্ভদেবীর, বুঁকা ও নীলসিঁড়ি থেকে আনীত।

স্বর্গদেবের মতককে আবর্তন করনা করে মন্দিরটি পরি-
কল্পিত হয়েছে। মন্দির হ'পাশে বার ঘোড়া যখন চক্ৰ বার
দানের প্রতীক। এক দিকে বাঘটি-ভক্তপক, অপর দিকে বাঘটি

কৃপক। হৃদয়ে লাভটি বোকা রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তা লাভ রথির বা লাভ ব্যয়ের প্রতীক। কেউ কেউ স্বর্গের বেহবর রথকে লাভটি বৈবিক হলের—বধা পারিজী, উকিক, অষ্টপু, হৃদয়ী, পংক্তি, জটপ ও অগতীর সঙ্গে তুলনা করেন।

হৃদয়ের নক্সার সারিগুলি অতি মনোরম। তাদের মাঝে বিভিন্ন। (১) শাকের ডালি বা পাগড়ি ডালি—কল-হুল-শোভিত লতাপাতার নক্সা।

(২) মাগবহিহল—হারের বেহের দীতে সর্পাকৃতি মাগ-মাসিনী পরস্পরকে কড়িয়ে আছে।

(৩) বহুহল—হুই পার্বে বহুকা (দ্রী-পুরুষের মিলন) তার উপরে নর্তকীদের নৃত্তি।

(৪) পোলবাই ডালি—এতে দেবা দার একটি লতা বেকে ডেউ তুলে এগিয়ে গেছে, প্রতি ডেউয়ের মধ্যে একটি শিত নৃত্ত্য-তলিয়ার দাঁড়িয়ে। তার উপরে পৃষ্ঠে পুরুষকে বহন করে পরীকতার উকে চলেছে।

(৫) শাকরহল—আলকারিক নক্সা—উপরে নৃত্ত্য ও বাতঃতা নারী নৃত্তি।

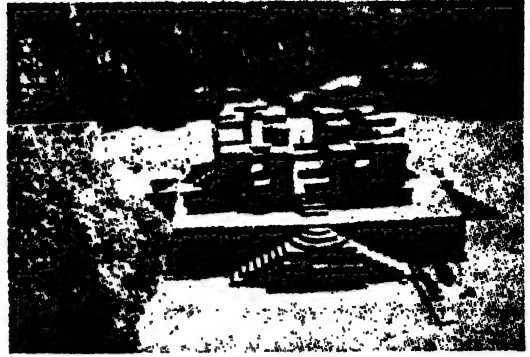
(৬) শিখরহল—দ্রী-পুরুষের মিলন—উপরে নৃত্ত্য ও বাহনরতা নারী।

(৭) বহুকাএকি—এক প্রকার জলজ পুষ্প—মালার আকারে চিত্রিত।

(৮) কাতি পাখুরা—হুলের পাগড়ির চিত্র।

(৯) নটিকাছুলা বা কেশর পাখুরা—আলকারিক নক্সা।

হৃদয়ের নক্সার মধ্যেও মানা রকরের হাপত্য হল আছে, যেমন—



অগমনের উপর থেকে দাঁটনদিয়ের দৃশ্য

(ক) গঙ্গামিনী—নামাতাবে বিচরণরত অনেক বত হতী।

(খ) হংসলহরী—বিভিন্ন তলিয়ার চিত্রিত হংসের হল।

(গ) মহুতলহরী—বহু মাহুয়ের বিবিধ তলিয়ার চিত্র।

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। বিহারকালে কোনারকের পূণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে—আধুনিক সভ্যতার মোহ কোথার আমাকের তৈলে নিয়ে যাচ্ছে। উভয়গর বতসিরি দেবলায়, উভয়সিরি দেবলায়। দেবলায় কোনারক—যেখানেই সিরিরি মন প্রত্যাশিত্বের আশ্রুত হয়ে উঠেছে। কয়েক শতাব্দী আগে দ্বারা দীর্ঘল পাবানে এই বিভিন্ন রূপহীত করে বেছেল আক কোথার তাঁদের উত্তর সাধকের হল।

• আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

স্বর্গ চাহি না আমি

ঈনীরতন দাস

হুগ হুগ হ'তে এ বরার সাধে জীবনের বহন,
হাটির পরশে ভাই ভাগে প্রাণে পুষ্কর পলল।
যেরি' পুণিবীর রত্ন-উৎসব অস্তরে বোর ভাগে কলরব,
ভাষা সবারোহে হৃদয়ে আহার ভোলে বীণা-বকর—
চল হৃদ্য বোর করে, হৃদে আলোকের পারাবার।

আকাশ হুহু করি না কাহনা; পুষ্পিত এই বরা
আকারি লাসিকা রূপে রলে গানে গছে বরণে ভরা।
স্বর্গের প্রেম শ্রুতি ভালোবাসা পুরায়েছে সাধ, স্বপ্ন ও আশা,

মাহুয়েরে তুলি' দেবতারে ভাই করি নাই লভা—
হাট ও মাহুয়ে বন্দনা করি' রচিয়াছি মোর পাশ।

জীবনের নাকে আলো দ্বারা আছে, তবুও পুণ্যী মন।
চিত্তের ভূখা নিত্য মিটার বর্ণের হুবা নয়।
অবতার পাশে আছে হলহল, আছে আশিলতা হৃৎকোলাহল,
তবুও চিত্র এ মহাতীর্থে হুগ দিবসবারী—
মর্ত্যের দ্বারা মোহ কাটাইরা স্বর্গ চাহি না আমি।

রাজনগর ঈননীমাধব চৌধুরী

১৯০৬-এর বার্ষিক বাণেশ্বর বাজার। অনেক ভবিষ্যৎ-আশা করা জীবনব্যয় হুটু পাইলেন। সাময়িক উদ্বেগ ও অশান্তিতে তাহার স্বাস্থ্য যে কতখানি ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহা জানিতে পারিলেন স্বাস্থ্যগতরূপে আসিয়া। দিন যখনক বাইতে না বাইতে তিনি গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তার পাইয়া জিনিসদ্বী দেবানন্দকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। হরিদাসাচরণ সহরে টেলিগ্রাম করিলেন তাকাদেবর জন্য। তাকাদেবর টেলিগ্রাম পাইয়া দেবানন্দ পরদিন রওনা হইল।

শেষ রাজির দিকে অংশন-টেশনে গাড়ী বহল করিতে হয়। তাহাদের গাড়ী আসিতে তখনও কিছু বেগী আছে। মালপত্র এক আশপাশ রাখিয়া দেবানন্দ গ্যার্টকরনে পারচারি করিতে লাগিল।

সে বেগীতে আসিয়াছিল তাহা চলিয়া বাইবার পরে হুগলি গ্যার্টকরনের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। পান, সিগারেট ও বাবারের কিরীতলাসহাও নিক নিক জিনিসের বাসের পাশে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মত অপেক্ষমান বাজীরা কেহ গ্যার্টকরনের উপর নতরকি পাতিয়া শুইয়াছে, কেহ বেজিতে বা নিজের ঠাঁক, বিছানার উপর বসিয়া হুগলিতেছে। অভবত অংশন-টেশনটা সারা দিনের ক্রান্তি ও হটপোলের পর বেগ বিমাইতেছে।

গাড়ীতে পরম ও ভিত্তে বড় কষ্ট হইয়াছে। বিরবিরে হাওরা বিতেছিল গ্যার্টকরনে। কিছুকণ পারচারি করিবার পর দেবানন্দের শরীর জুড়াইয়া গেল। কিছুকণের মধ্যেই টিকিট-বরের কাছে আসিয়া সে থামিয়া গেল।

টিকিট-বরের কাছে একটা বড় কাঠের বাস রহিয়াছে। তাহার উপরে দুই জন লোক, বোম্বর হর টেশনের হুগি কি তেজর, পাশাপাশি দুমাইতেছে। নীচে বাসের পাশে টেশন দিয়া দুই জন বিহারী পুলিশ বসিয়াছে। একজনদের মাথায় লাল পাগড়ি কপালের উপর নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের নতুবে একবারা মরলা জিপলের উপর চারিট হেলে জুড়ী পাড়াইয়া দিয়া বাইতেছে। তরলোকের হেলে। দেবিরা মনে হয় বার হইতে চৌকর মধ্যে বসল। কোমরে এতোকের হুগি বাবা, হাতে হাতকড়া। তাহাদের হুগের উপর টিকিট বরের বাহিরের বেরালের আলো পড়িয়াছে দেবানন্দ দেখিল একটু হেলের হুগবাশি নিত্যত কৃতি। সেইটিকে হেলের মধ্যে লকলের হোট, বলিয়া মনে হইল। হেলের কোমরের

হুগির অপর প্রান্তে কনষ্টবল হুইট নিবেদের পারের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আলাদা পালাইবার চেষ্টা করিলে পারের টান পড়িলে, তাহারা আসিয়া উঠিলে।

দেবানন্দ কিছুকণ দাঁড়াইয়া হেলেকলিকে দেখিল। কোমর হেলের নীচের ক্রানের ছায়া হরত। নতবতঃ বনে মাতরনের মত মারাত্মক কথা উচ্চারণ করিবার জন্য অথবা কোমর কোমরকারকে “বিলাতী লবণ বেচিও না তাই” বলিয়া কোমর হাতে অহরোহ করিবার জন্য প্রবলপ্রতাপাধিত সরকারের আদেশে তাহারা প্রেতার হইয়াছে। বিচার হইবে বটা করিয়া। শান্তি হইবে বেত, করিমানা বা কারাবত। হুগ-কর্তৃপক্ষ মহামান্য ইন্সপেক্টরের আদেশে করিবেন রাষ্ট্রকেশন। দেবানন্দ আবার পারচারি করিতে আরম্ভ করিল। বটা বাজিয়া উঠিল। হুগি, তেজররা এবং হুগর বাজীরা সকলে উঠিয়া বসিল। কিছুকণ কাটিয়া গেলে গাড়ী আসিয়া পড়িল। জিনিসপত্র লইয়া দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিতে বাইতেছে পিছনে তুলিল “বনে মাতরম্”। “বনে মাতরম্”। কোমরে হুগি-বাঁধা হুইট হেলে কামরা হইতে গ্যার্টকরনে নামিয়া “বনে মাতরম্” লম্বি দিতে লাগিল, তাহাদের হাতেও হাতকড়া। ব্যত বাজীরা এদিকে ওদিকে বাইবার সময় চাহিয়া দেখিতেছে। হুগে টিকিট-বরের দিক হইতে আবার শব্দ আসিল “বনে মাতরম্”। হুগর হেলে চারটিকে কনষ্টবলরা বাঁধা দিয়া আপাইয়াছে। এই গাড়ীতে তাহাদের বাইবার কথা। পুলিশ কোমরের হুগি বরিয়া ভিতের মধ্যে দিয়া তাহাদের লইয়া চলিল গাড়ীর দিকে।

দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া গ্যার্টকরনে বাজীদের টেলিগ্রাম হুগাহুগি দেখিতে লাগিল। মাথার মত পাগড়ী বাঁধা, হাতে ভারী বোট লইয়া একজন বাজী হুগ হুগ করিয়া বাইতেছিল। দেবানন্দ কানালার দাঁড়াইয়া তাহার দিকে অনামনকভাবে তাকাইয়া তাবিত্তেছিল মত বড় পাগড়ী বাহার মাথায়, বোম্বর হর সে পঞ্জাবী হইবে। কানালার কাছে আসিয়া লোকটী একবার উপরের দিকে চাহিয়া একটু দাঁড়াইল, তার পর আবার পা বাড়াইল। দেবানন্দ ততকণে লাকাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। সে আপাইয়া দিয়া বাজীটিকে পিছন হইতে জুড়াইয়া বসিল। বলিল—সতীদ-বা।

সতীদ বাজীরা দিয়া দেখিল দেবানন্দ। বোট নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে জুড়াইয়া বসিল, বলিল—আরে, দুই কতটা বড় হরে গেছিল বেগু। কানালার কোকে বেগে মনে হুগ

যেন তেনা লোক। কম আলোতে ভাল দেখতে পাই নি।
তুল হতে পারে তেবে তাকি নি।

দেবানন্দেব মাঝার শিঠে হাত দুলাইয়া বলিল—তার পর
বাহিন কোথায়? কলেজ চলছে না?

দেবানন্দ জানাইল তাহার পিতার অন্তঃকরণে বদর পাইয়া
বাড়ী বাইতেছে। ভিজালা করিল—আপনি কোথায় বাসছেন?

সতীন্দ—আমি বাছি রাজসাহা, সেখান থেকে আরও
অনেক কারবার বাব। তোদের বাড়ী এর ক'টা ঠেগন পরে
বলত?

দেবানন্দ—তিমটে ঠেগন পরে। বটী বেড়েক লাগে।

সতীন্দ—বহলি হবার পর আর তোর বাবার সঙ্গে দেখা
হয় নি। আমি তাঁকে বড় প্রণাম করি। তোর সঙ্গেও কত
দিন পরে দেখা হ'ল। তাবহি—

দেবানন্দ সাগ্রহে বলিল—কি তাবহেন সতীন্দ-দা?
বাবাকে একবার দেখতে বাবেব?

সতীন্দ একটু চিন্তিত ভাবে বলিল—তাই তাবহি, কিন্তু
হাতে অনেকগুলো কাজ আছে। তা থাক। চল এক দিনের
জন্য তোদের ওখানে ঘুরে আসি।

দেবানন্দ আমন্দে যেন আনন্দহারা হইয়া গেল। তার পর
তাহার মোটরী তুলিয়া লইয়া, দিকে বে কামরায় উঠিয়াছিল
সেই কামরায় সতীন্দকে উঠাইয়া তাহার টিকিট কিনিবার জন্য
নামিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া ফিরিল। হুই জন
পাড়ীর এককোণে পাশাপাশি বলিল। পাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দেবানন্দ ও সতীন্দ যখন রাজসাহার রোড ঠেগনে নামিল
তখন রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঠেগনঘরের দিক
হইতে লঠন হাতে এক জন লোক আগাইয়া আসিল তাহাদের
দিকে। কাছে আসিয়া সে লঠন তুলিয়া ধরিয়া দেবানন্দকে
বেগিয়া সেলাম করিল। বলিল—বাবু আইছেন? রাঠান
পাড়ী পাঠাইছেন।

দেবানন্দ চিনিল তাহাদের বাড়ীর বাঁধা পাড়োয়ান
ইসরাইল। সে ভিজালা করিল—বাবা কেমন আছেন জান
ইসরাইল?

ইসরাইল বলিল—আজ্ঞার দোয়ার কর্তা ভাল আছেন আজ
হুই রোজ। কাল বিয়্যাদের পাড়ীতে সররের তাকার সাহেব
কিয়া গ্যালেব।

সতীন্দেব প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ইসরাইল বলিল—এ বাবুরে
ত চেনলাই না। এনি কি তাকার?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—না, ইনি আমার বাটার মশার।
মশার অন্তঃকরণে বদর শুনে দেখতে এসেছেন।

ইসরাইল বলিল—সেলাম বাবু। কর্তার শক্ত ব্যারাম
হইছে শুনি। আপুনি দেখতি আইছেন ইট বড় লরিক কাম
হইছে। এখন চলেন। পাড়ীতে শুয়া ঘুর তাম, পড়

খানেকের হতি পৌছা বাবান। মালপতর আমার বাটার
তুল্যা দ্যান।

দেবানন্দ ও সতীন্দ পাড়ীতে উঠিয়া পাশাপাশি তইল।
বহিরের পাড়ীর বাহুনি সত্তেও হুই চারিটা কণাবাড়ার পরে
তাহারা বুঝাইয়া পড়িল। একটা উঁচু কার্টের পুল হইতে
পাড়ী পড়াইয়া নামিবার সময়ে হুই জনের বেহে বাতা লাগিতে
তাহাদের ঘুর তাকিয়া গেল। তাহারা উঠিয়া বলিয়া হাসিতে
লাগিল।

চারদিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, বিহুত চবা কার্টের
ওপারে আকাশের এক অংশ উন্মল দেখাইতেছে। একটু
পরে বর্ষা উঁকি দিবে। দেবানন্দ বাহিরের দিকে চাহিয়া
বলিল—সতীন্দ-দা, চলুন এবার বেবে পড়ি। ঘুমিরে প্রায়
অর্ধেক পথ এসে গেছি।

তাহারা হুই জন নামিয়া পাড়ীর আগে আগে হাঁটরা চলিল।
কিরকিরে হাওয়া দিতেছিল। হাওয়ার সঙ্গে ঘূব বোলারেন
একটু দিষ্ট পড়।

তাহারা হাঁটতে লাগিল। রাতার পাশে চারীঘের বাড়ী,
বাঁশের বাড়, আম, কাঁঠাল, কলার বাগান, তামাক, লতা,
বেতনের কেত, বাসের ঘরই নকরে পড়িল। এই প্রায় ছাড়াইয়া
আবার হুই বায়ে খোলা মাঠ। কিছু দূর গিয়া দেবানন্দ
বাঁ দিকে কার্টের ওপারে ঘুরে ঘুরলী বিলের দিকে সতীন্দেব
দৃষ্ট আকর্ষণ করিল। বলিল—এ যে ঘুরে বর্ষার আলোতে
চিক চিক করছে দেখছেন ওটা ঘুরলী বিল। মত বড় পরবন
আছে বিলে। বিলে ঘূব বাহ। আর শীতের সময় কত
রকমের পাখি যে আসে তার সেখাখোখা নেই।

সতীন্দ বলিল—কি নাম বলিল? ঘুরলী বিল? তোদের
বিলের মাঝ ত বড় কবিরূপ। তোদের আলোতে কেমন
কলমল করছে ওদিকটা দেখ।

দেবানন্দ বলিল—আপুন, এ বটপাছটার নীচে বলি।

সতীন্দ বলিল—আরে, রাতার মধ্যে বিজ্ঞান করলে বাড়ী
পৌছতে ঘেরি হয়ে বাবে।

দেবানন্দ বলিল—ঘেরি হবে কেন? আমরা ত এসে
গেছি প্রায়। এ যে গারে গারে গাহের সার দেখছেন এ পাঁচ-
ভলোর ওঘারে রাজসাহার। আর পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলে
কালীবাড়ী দেখা বাবে।

হুই জনে বটপাছের নীচে ঘুরলী বিলের দিকে ঘূব করিয়া
বসিয়া পড়ীর শান্ত্রী উপভোগ করিতে লাগিল।

এনি ভাবে কিছুকণ কাটিলে পর সতীন্দ বলিল—ওরে,
এবার ওঠে ঘেরি।

হুই জন আবার হাঁটতে লাগিল। কিছুকণ পরে ভিজলী
নদী দেখা গেল। তার পর কালীবাড়ী পিছনে রাখিয়া তাহারা

হাতের সঙ্গে পৌছিল। নতীন বলিল—প্রাণী কখন আসবে ঠিক আছে ?
কখন না ?

বেদানন্দ হাসিয়া বলিল—প্রাণী কখন আসবে ঠিক আছে ?
ইসমাইল খুন বিচ্ছেদ আর মোব হুটো বেদানন্দ ইকইক
করে আসছে। চন্দন আমরা এসেই।

এদের মধ্যে হুঁকিয়া কিছুক্ষণ আগাইতে বেদানন্দ দেখিল
ইল আসিতেছে।

ইল আসিয়া বেদানন্দকে জড়াইয়া বলিল। বলিল—কেন
আমি বেহুতা ? কাকারানু ভাল আছেব।

বেদানন্দ ইয়ের হাত ধরিয়া বলিল—ইনি কে জানিস ?
ইনি নতীন-না, আর কথা তোকে কত লিখেছি।

ইল হাত জড়াইয়া লইয়া নতীনকে প্রণাম করিতে গেল,
নতীন তাহাকে বাহবদনে আবর করিয়া বলিল—থাক তাই,
প্রণাম করিতে হবে না। তোমাকে বেধবার আকাঙ্ক্ষা মনে
ছিল অনেক দিন।

ইল খুব খুশী হইল নতীনকে পাইয়া। বেদানন্দকে বলিল
—এঁকে কোথায় পেলো বেহুতা ?

বেদানন্দ-হাসিয়া বলিল—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—তাই
না নতীন-না ?

নতীন ইংগিত দিল।

গল্প করিতে করিতে তিন জন টোলপাড়ার বেদানন্দদের
বাড়ীতে পৌছিল। দোতলার বায়ান্না হইতে তাহাদের
মেঝিতে পাইয়া লম্বী দৌড়াইতে দৌড়াইতে বীচে মাঝিল।
নিজের বীচে তাহার হাতে বেধিয়া বলিল—না, দাখা এসেছে।
নদে কে একজন আছেক। বাবাকে বলব ?

জিন্নরনী বলিলেন—আমি বলছি। তুমি বীচের বৈঠকখানা
অঙ্গে বলতে দে। হাতখুব গোবার হল দিতে বড়। লম্বী
বাহিরের খোলা রকে আসিয়া দেখিল তিন জন উঠানে
বাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে।

লম্বী বাহিরে আসিতে বেদানন্দ বলিল—নতীন-না, এই
তরফিলাটিকে চেনেন কি ?

লকলে হাসিয়া উঠিল। বেদানন্দ বলিল—ইনি জিন্নরনী
লম্বী মেসী, এর কথা আপনাকে বহবার বলেছি।

নতীন সপ্রশংস মুষ্টিতে লম্বীর দিকে চাহিল। বেবকতার
মত লাবণ্যময়ী মূলকণা মেঝেটিকে দেখিয়া সে খুঁচু হইল।
বলিল—তোমাকে আমি চিনি লম্বী-বিদি। আবাকে ত
তুমি চেন না ?

লম্বী ললক কর্তে বলিল—আমি আপনার কথা শুনেছি।
আপনার এই বয়ে মনে মনে। আপনি বড়।

রকের এক পাশে রকিত কলনী বড় বালকি ও কলকৌকি
কলকৌকি বলিল—আপনি হাত খুব কোমল ওরারে। আমি
কলকৌকি, পলকৌকি সব আকর্ষণ

লম্বী ভিতরে চলিয়া গেল।

হাতখুব খুঁচু কলকৌকি লম্বী নতীন ইল ও বেদানন্দকে
লকলে উপরে গেল জীবানন্দকে দেখিতে। নতীন প্রণাম করিয়া
বলিল—বেহুতা কাছে আপনার শক্ত অশুভের খবর শুনলাম
ষ্টেনে। তাই একবার দেখতে এলাম আপনাকে।

জীবানন্দ শুইয়াছিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—
তোমাকে দেখে বড় খুশী হলার বাটার। অনেক দিন বয়ে
তুপে তুপে শরীরে আর কিছু নেই।

নতীন জিজ্ঞাসা করিল, তাকার কি অশুভ বলে ?

জীবানন্দ বলিলেন, তাকার তো একটা পালতরা নীর
বলে গেল। আমি বলি শরীরের চাইতে মনের অশুভ বেশী।
সে কথা থাক। তুমি এসেছ, বেহু এসেছে, তোমাদের কাছে
অনেক খবর পাওয়া বাবে। ভাল কথা বাটার, তুমি কি
এখনও চাকরি করছ, না চাকরি ছেড়ে কোন দলে ভিড়েছ।

নতীন বেদানন্দের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল,
চাকরি হাতব কেন তর, এখন ভাল চাকরি। বয়ং হোটেলটি
ফুলার বলেছেন, হেলেরা ড্রিল ও ব্যারাম করক। তাঁর
আপত্তি শুধু বলে মাতরমে। আমি ত হেলেরের বন্দে মাতরম
বলতে লিখেছি করি।

জীবানন্দ বলিলেন, লিখেছ কর ? কেন বল ত বাটার ?
তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন।

নতীন হাসিতে লাগিল। বলিল, আপনি উঠবেন না,
তর থাকুন। আররা বলছি।

বেহুতে পিডল পাট বিহানো ছিল। লকলে তাহার
উপর বলিল। লম্বী একটা সাধা পাখরের বাটতে বেদানন্দ
রল আসিয়া পিতার পখ্যার পাশে বাঁড়াইল। রহু বয়ে
বলিল, দাখা বেদানন্দ এসেছে, বা রল করে দিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন, বেদানন্দ রল ? হাত।

পিতাকে রল বাওরাইয়া বাট হাতে লম্বী বয় হইতে
বাহিরে গিয়া তখনই কিরিল। বলিল, বাবা, খোঁটাখানাই
এসেছেন।

হরিনারায়ণ বয়ে প্রবেশ করিলেন। নতীন এই শাল-
প্রাণ্ড মহাভুজ বিরাট পুরুষকে দেখিয়া বিম্বিত হইল। তাবিল,
তাহার জিনদাটিক-করা বেহুকে এই মাহুটী ইচ্ছা করিলে এক
আহাতে হাতু করিয়া দিতে পারেন। নতীন ও বেদানন্দ
হরিনারায়ণকে প্রণাম করিল। হরিনারায়ণ তাহাদের মাথার
হাত বিরা আশীর্বাদ করিলেন। বেদানন্দ নতীনের পরিচয়
দিল। জীবানন্দ বলিলেন, বেহু বাটারের যে পরিচয়টি দিল
সেইটেই তার সবটুকু মর। এর অত একটা পরিচয় আছে।
বাটার, বখন এসেছ হ'টার দিন থাকবে ত ?

নতীন বলিল, হঠাৎ আসা...

হরিনারায়ণ বলিলেন, বাওরাটা হঠাৎ হবে না। তোমরা

নব বসে। কি কথা হচ্ছিল আমি আসবার সময় ?

জীবানন্দ বলিলেন—মাঠার বলছিল সে হেলেনের বনে মাভরম্ বলতে নিবেশ করে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা কর-
হিলাম।

হরিনারায়ণ বলিলেন, সতীনের নিবেশের কারণ কি আমি জানি নে, তবে এ সববে একটা কথা আমার মনে হয়েছে। লায়ন সাহেবের এটি বন্ধে মাভরম্ সারকুলার অর্থাৎ কয়াকে বুঝ্য হান দিলে আমাদের আন্দোলনকে খুব বেশী দিন টকিরে রাখা যাবে না। এহার, জেল, জরিমানা, রাষ্ট্রকেন্দ্রন, অভিযাৎক ও শিককদের তাতে আরবার ভর দেবিরে আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা হচ্ছে।

জীবানন্দ বলিলেন, সেদিন শুভলাল কোথার এক বরখাজী দলের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিচ্ছে বরখাজীরা বন্ধে মাভরম্ বলতে পারে এই ভরে।

হরিনারায়ণ বলিলেন, বরখাজী কেন হরিনসতীর্ভমও কোন কোন জায়গার ঐ আশকার বন্ধ করা হয়েছে। এদিকে ঢাকার ব্যাবিক্ত কুলার বে উপার আবিষ্কার করেছেন তাতে বদেপী আন্দোলনের অনেক কিছু ওলটপালট হতে পারে।

আরও কিছুকণ আলোচনা চলিবার পরে হরিনারায়ণ বলিলেন, রোপীর বরে এত কথাবার্তা ভাল নয়। এল, আরও উঠি। সতীন, আমাদের গ্রামটা বোম্ব হর, এ পর্য্যন্ত ঘুরে বেবনি।

জীবানন্দ বহুদ্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমি ত এখন ভাল আছি।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, বিকেল তক ভাল থাকলে আমার কথা হবে।

পথে বাহির হইয়া সতীন বলিল, আপনি কুলারের স্তম্ভ উপার আবিষ্কারের কথা বলছিলেন। কি উপার আবিষ্কার করেছে ? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধবষ্টির চেষ্টার কথা বলছেন কি ?

হরিনারায়ণ বলিলেন, সেই কথা আমার মনে উঠেছে বটে। বদেপী আন্দোলন আরও হবার সময়ে এ অকলের মুসলমানরা কতকটা বদেপীতাপার হরছিল তা আমি লক্ষ্যও করেছিলাম। এখন যেখনি তাদের বারগা হয়েছে যে, সরকার বাহাদুর তাদেরই সুবিষের ভেত্রে বাংলাদেশকে হুই বৎ করে-য়েন। কি সুবিষে হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। ঐই বারগা থেকে বিলেতী লবণ, তিসি, কাপড় কেনবার ভেত্রে রদের আঁহ বেড়েছে।

এসকাতরে আসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, তোমার যবে কিছু কিছু থবর আমি ইন্ডের কাছে বেবুর চিঠিগুলোতে মাগে পেতাম। সে এখানে এক আন্দোলতি সমিতি গঠেছিল, মুসলিমের উৎসাহকে সমিতির কাজ বহু হয়েছে, অনেক মেলে

পালিয়েছে তবে আর অভিযাৎকের তাকনার। সব জায়গাতে বোম্ব হর এই অবস্থা ?

সতীন বলিল, কোন কোন জায়গার এই অবস্থা হয়েছে বটে। কাকের পততির কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হর পড়েছে। ঐই উক্রেতেই আমি কতকগুলো জায়গার বোম্ব দিতে বেরিয়েছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন, এখানেও বোম্ব মাও। এখানকার হেড মাঠার উৎসাহী লোক। ইন্ড হেড মাঠারের বাতীতে তোমাকে দিরে মাবে। আক বেলা হয়েছে। ইন্ড, তুমি বরং রাজেনবাবুকে একটু থবর দিরে এস বিকেলে তিসি যেম জীবানন্দের বাতীতে আসেন।

ইন্ড বলিল, এখন গেলে তাঁকে বোম্ব হর, বাতীতে পাওরা মাবে। বাব ?

হরিনারায়ণ—পাবে কি ? দেখে এস। চল সতীন, আমাদের বাতীতে একটু থববে।

সতীন—আমিও ইন্ডের সঙ্গে একটু ঘুরে আসি না।

হরিনারায়ণ—আচ্ছা যাও। ইন্ডের সঙ্গেই কিরে এসো।

দেবানন্দ, ইন্ড ও সতীন পন্ন করিতে করিতে হেড মাঠারের বাতীর দিকে চলিল। সতীন কুলের হেলেনের ও মাঠারের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। করণপুত্রের পাশ দিয়া বাইবার সময় ইন্ড বলিল, চলুন সতীনদা, মদলচতীর বাতীতে একটা এখান করে বাই।

মদলচতীর মনিরের কাছে দিয়া তাহার দৈবিল মনিরের বাহিরে বাঁধানো চাতালের এক কোণে একজন বৈরাগী বলিয়া একতারা বাজাইয়া শুন্ শুন্ করিয়া গান করিতেছে। তাহাদের হুই জনকে দেখিয়া সে গলা ছাটিয়া গান বলিল :

বাবু, বুঝবে কি আর মলে

তোমার কাঁবে লাগা সূত চেপেছে

একজন দকা লাগলে।

ছিল বান গোলাতরা, বেত ইন্দুরে করলে লাগা

চোখের ঐ চন্দ্রা জোড়া দেখ না বাবু ধুলে—

বান নিরেছে, বান নিরেছে, হাত নিরেছে কুলে

বাবু, বুঝবে কি আর মলে।

ইন্ড ও দেবানন্দ ঐ বৈরাগীকে আগে রাজমগরে করণও বেধে নাই, বৈরাগী-বোষ্টনের বুঝে এ বরণের গান কোথাও পোনে নাই। দেবানন্দ সতীনকে বলিল, রাধেকক হেডে বৈরাগী স্তম্ভ রকমের গান গাইছে শুনছেন সতীন-দা ?

সতীন শুনিয়াছে। ইহার আগেও গ্রামাকলে বেড়াইবার সময়ে ঐ রকম বৈরাগী হুই চার জনকে সে বদেপী গান গাহিতে শুনিয়াছে। বৈরাগিণিও বরিশাল অকলে ইহাদের বেশী দেখা যায়। গ্রাম হুইতে গ্রামে চাষী, মজুর, রাখাল, দোকানী, নৌকার মাঝিদের মধ্যে, বরিয় পুছরের হুগীরে

ইহারা বাড়ীর আন্দোলনের নৃতন বার্তা পৌছাইরা দিতেছে।

সতীন বৈরাগীর কাছে গিয়া বলিল, এ গান কোথায় শিখলে বাবাজী ?

বৈরাগী বলিল, লোকের মুখে মুখে শুনে শিখেছি বাবু।

সতীন—এ রকম গান আর ক'টা জান ?

বৈরাগী—বেশী জানি না, হুঁচরট ভাতর শুনে শুনে শিখেছি। শুনবেন আর একটা ?

সতীন মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বৈরাগী আবার গান বলিল :

হেঁকে হাও কাঁচের চুড়ি বদমাশী

কতু হাতে আর পরো না।

জাগো গো ও জমদী ও ভগিনী

- হোহের ঘোরে আর থেকো না।

সতীন ইজের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, শুনলে ইজ ? বাবাজী, এ গানও কি লোকের মুখে শুনে শিখেছ ?

বৈরাগী—আজ্ঞে বাবু। নইলে আর কোথায় শিখবো ?

সতীন পকেট হইতে একটু সিকি বাহির করিয়া বৈরাগীকে দিল। বলিল, তুমি কি আজই চলে যাবে এখান থেকে ?

বৈরাগী—হ'তিন দিন থাকবো বাবু। সারা গাঁয়ে গান শুনিতে তাকে করব। তারপর তিন গাঁয়ে যাব।

ইজ—তুমি এখানে বলে থাক একটু। আমরা এখনই কিরব। তোমাকে আমাদের বাড়ী গিয়ে যাব। সেখানে গান শুনিতে তাকে নেবে। কেমন ?

বৈরাগী হাসিয়া বলিল, জর রাখে কুক। তাই হবে রাজাবাবু।

মকলচতীকে প্রণাম করিয়া তাহার হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিল। ইজ বাড়ীর ভিতরে গিয়া শুনিল তিনি ফুলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রীকে পিতার অল্লরোষ জানাইয়া সে করিয়া আসিল। মকলচতীর বাড়ী হইতে বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ীতে করিল। হরিমারায়ণ তাহাদের জড় অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈরাগীকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এটাকে হুঁচরবেলা কোথা থেকে আনলে ?

বৈরাগী নিজেই উত্তর দিল। হরিমারায়ণকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, বাবুদা গান শুনে ধরে আনলেন। বললেন, কর্তাবাবুকে গান শোনাও।—বলেই গান বলল :

রাধা বলেন, তুমি লখি আর আমি বাবো না পথে।

দুলা বলেন, কেন গো রাবাতাগি, কেন আর যাবে না পথে ?

রাধা বলেন, লখি পথে বড় ভর—পথে বড় ভর

জাতি, দান, গ্রাণ দিয়ে হবে যে সংসার।

সাদা বালুরে তুমি ছেয়ে গেল বেশ,

মুটে-মুটে কেঁকে হিঁকে করল সকল শেব।

পথে বাটে হাটে হাটে করে অত্যাচার

রেলগাড়ীতে কত বেয়েয়ে দিল হারবার।

শুনলে সে সব কথা লাগে প্রাণে দারুণ ব্যথা,

তবু বেণো বেশের মাহুদ অথোরে দুয়ার

ওরে অথোরে দুয়ার।

বৈরাগী গান শেষ করিয়া বলিল, জর রাখে কুক। কর্তা বাবু, হুট তাকে দিতে আজ্ঞা দেন। কত কারাগার ঘুরতে হবে।

হরিমারায়ণ শুধু হইয়া গান শুনিতেছিলেন। বৈরাগীর কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি এই রকম গান কতগুলো শিখেছ, আমি সব শুনব। এখন বেলা হয়েছে। তুমি কাহারি-বাড়ী গিয়ে বলো। ভাষারায়ের প্রসাধ পাবে। বিকেলবেলা গান শোনাও। কাল সকালে তাকে নিয়ে যেরো।

তিনি একজন চাকরকে ডাকিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন। সে বৈরাগীকে সঙ্গে লইয়া কাহারি-বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বৈরাগী চলিয়া গেলে হরিমারায়ণ বলিলেন, এই জিনিসট নৃতন দেখলাম।

সতীন বলিল, এ দিকটাতে বোধ হয়, এই আরম্ভ হয়েছে। কোন কোন কারাগার বদেগী আন্দোলনের মূক থেকে এর চল হয়েছে। অনেক কারাগার ভ্রমলোকের খেলেরা বদেগী গান গেয়ে বেড়ায়। মৈমনসিংগে তাহদের নাম হয়েছে চারণ-দল, কোথাও বলে ভাট। আরও হুটো জিনিস কোন কোন কারাগার আরম্ভ হয়েছে—বদেগী রাজা ও কথকতা। পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে বদেগী ভাব প্রচার করা হয়। এখনও পুলিশের চোখ পড়ে নি এখিকে।

হরিমারায়ণ বলিলেন, বেশের লাভারণ লোকের মধ্যে নৃতন ভাব প্রচার করবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। বক্তৃতা দেশের ক'জন লোক শুনে আর ধবরের কাগজ কর কমেই বা পড়ে ?

কিভাবে রাজসংগে বদেগী রাজা ও কথকতার প্রবর্তন করা যার তাহা লইয়া হরিমারায়ণ ও সতীনের মধ্যে অনেককণ আলোচনা হইল। সতীন বলিল, বদেগী পালার বিভারিত বিষয় সংগ্রহ করিয়া সে পাঠাইবে।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া সতীন ও দেবানন্দ উঠিল।

লঙ্কার পরে হরিমারায়ণ ও রাজেন্দ্রবাবু আলিয়া জীবানন্দের ঘরে বলিলেন। দেবানন্দ ও ইজকে লইয়া সতীন রাজসংগে ফুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার বতীনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল। বতীনবাবু যে এক জন বলের লোক সতীন সে ধর রাজসংগে আলিবার আগে পাইয়াছিল।

কথার কথার রাজেন্দ্রবাবু মৈমনসিংগে গোলমালের কথা

ভুলিলেন। বলিলেন, আমার এক উকিল বহুর চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, সেখানকার মুসলমানদের বারণা হয়েছে নব্বইশতকোটি তাদের পক্ষে। তিনি এই বর্ণে লিখেছেন—মুসলিম নেতারা প্রকৃতভাবেই বলেছেন যে, সরকার হিন্দুদের বিরোধী বলে মনে করেন, কাছেই মুসলমানরা কোন শান্তির ভর না রেখে তাদের উপর অত্যাচার চালাতে পারে।—মৌলবীরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব শীঘ্র শেষ হবে এবং আবার মুসলমান রাজত্ব কারেন হবে। কি কারণের অত্যাচার হচ্ছে চিঠিতে তার একটা কিরিস্টি দেওয়া হয়েছে—মিথ্যা অপবাদ রটনা, রাজ্যভাঙে রাজাজাদি, ভীকাজি, বোকান সূঁচ, আঙন লাগান, হিন্দুদের খাজনা অপবিজ্ঞ করা, হিন্দু বিবাহদের ভোর করে বিফা করবার ভর দেখান ইত্যাদি।

আরও কিছুকণ আলাপের পরে হরিনারায়ণ ও রাজেন্দ্রবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন।

রাজে হরিনারায়ণের গৃহে সতীম ও দেবানন্দে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল।

আহারের পর হরিনারায়ণ আসিয়া বৈঠকখানায় বলিলেন। সতীম, ইন্দ্র ও দেবানন্দ সেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, দেখ সতীম, এখানে বালক-সমিতি নার দ্বিগুণ একটা সমিতি হয়েছিল তোমাকে বলেছি বোঁব হয়। পরে এর নাম হয়েছিল আত্মোন্নতি সমিতি। এই সমিতির হেলেনদের বলা হ'ত ভাষামাল ভলাষ্টিয়ার দল। লোকের আপদে-বিপদে সাহায্য করা, দুই লোকের উপর মজর রাখা, বুদ্ধিতিকা ও চালা ভুলে ফুলের গরীব হেলেনদের সাহায্য করা, বদেদী পান গেয়ে লোকের মধ্যে বদেদী জিনিস কিনি করা, হাটেবাড়ারে বিলাতী জিনিস না কেনবার জন্য লোককে অস্বস্তি করা—এই সব ছিল মেশভাল ভলাষ্টিয়ারদের কাজ। পুলিশের অত্যাচারে ও মুসলমানরা বিপদে পড়ে এদের কারো কারো নামে বোকান্দা আঘাতে ভলাষ্টিয়ার দল প্রায় ভেঙে গেছে। যে নামেই হোক একটা অরগানাইজেশন না থাকলে বদেদী ভাব বাঁচিয়ে রাখা কষ্টের হবে। তোমরা ত কর্মীলোক, এর কোন ব্যবস্থা করছ ?

সতীম—এই পুরোনো মেশভাল ভলাষ্টিয়ার দল নিয়ে ঢাকার পুলিশবা অফিসের সমিতি গড়ে তুলেছেন। করিবপুরে জাতী-সমিতি, বরিশালে বদেদীবাদক সমিতি, মৈমনসিংগে মুজদ ও সাধনা-সমিতি এই ভাবে পড়া হয়েছে। কলকাতার মি: মিডলের অফিসের সমিতি পোকার এইভাবে আরম্ভ হয়েছিল।

কি তাহারা সে ধামিরা গেল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, এখানে দেবানন্দ ইন্দ্র এদের বড় হলে আছে, তাবনা কি ? মুজদ জিনিস গড়ে উঠতে দেবী হবে না।

সাদা রক্তের আলাপ চলিল। বতীখানেক পরে হরি-

নারায়ণ বিদায় লইয়া শরম করিতে গেলেন। সতীম ও দেবানন্দ তৌলপাড়া রওনা হইল।

দেবানন্দের শরমঘরে সতীমের বিছানা হইয়াছিল। অনেক রাজ পর্য্যন্ত দুই ক্রমে মধ্যে কথাবার্তা চলিল। পিতার অনুরোধে সংবাদ পাইবার আগে বরিশালে আসিবার সময় নিজের মানসিক অশান্তির কথা দেবানন্দ সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বলিল, সে সময় আপনায় ও দেবেন পণ্ডিত মশায়ের কথা বার বার মনে পড়ত। আপনাকে চিঠি লিখে সব জানাব ভেবেছি কতবার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয়ে ওঠে নি। আপনি ঋণিকটা শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন, কোন্ পথে বাব বলে দিলেন না। পণ্ডিতমশাই কীক দেবেন বলে আশাস দিলেন, তারপর নিজের সাধনার ভ্রমে গেলেন, আমিও চলে গেলাম অত ব্যর্থপার। তিনি বৈশ্যায়ন অসুর-মর্দিনীর আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন। আমি দেখছি বৈশ্যায়ন অসুর সব সৃষ্টি লগতও করতে চলেছে, কিন্তু অসুর-মর্দিনীর আবির্ভাবের কোন লক্ষণ নাই।

দেবানন্দের উত্তেজনা দেখিয়া সতীম হাসিল। বলিল, কোন লক্ষণ নেই তাই না কি ভাবছিল তাই ? ওরে অবিদ্বানী হোস না। অত্যাচারের রাজ্য পূর্ণ হলে তবে না দেবীর আবির্ভাবের শুভ মুহূর্ত আসবে। তোর পথ তোর সামনে প্রসারিত রয়েছে দেখ, সময় হলে কুশাশার পদ্মা সরে যাবে, সেই পথ দেখতে পাবি।

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। সতীম আবার হাসিয়া তাহার মাথার, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। বলিল, অবৈধ্য হলেই কি কাজ এগিয়ে যাবে ভাবছিল ? অবস্থা অসুস্থ, সময় অসুস্থ হওয়া চাই। চল, এখন শুয়ে পড়া থাক, অনেক রাত হয়েছে।

দুই ক্রমে শয্যা গ্রহণ করিল।

পরদিন জীবানন্দ ও হরিনারায়ণের কাছে বিদায় লইয়া সতীম ঠেশমের পথে রওনা হইল। দেবানন্দ, ইন্দ্র ও বতীম-বাবু গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত আসিলে সতীম তাহাদিগকে করিতে বলিল। বলিল, এবার ভোরা ঘরে বা। তারপর ঠেশমের পথে পা বাড়াইয়া দিল।

৯

অগভীর শরীর ঋণিকটা সারিয়াছিল রাজ, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। তাহার নিজের বারণা হইয়াছিল যে শীঘ্রই ওপার হইতে তাহার তাক আসিবে। এইজন্য ইজকে পড়াশুনার নিষিদ্ধ অতঃপাঠাইতে তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পূজকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য বাবীর আগ্রহের কথা তিনি ভাবিতেন, তাই তাহাকে লগত করিবার জন্য ইজের বাইবার প্রভাবে মত দিতে হইল।

ইজের ইচ্ছা ছিল সে কলিকাতার পড়িবে। হরিদাসারূপ তাহাতে রাজী হইলেন না। কলিকাতার বর্তমান উত্তমক পরিবেশে ইজকে ছোট্টেলে রাখিয়া পড়াইতে তিনি ভয়সা করিলেন না। সদর টাউনে তাঁহার নিজস্ব বাড়ী আছে। হির হইল সেই বাড়ীতে থাকিয়া সে কলেজে পড়িবে। মাকে মাঝে তিনি ও ভগদাসী দিয়া সেখানে থাকিবেন। ইজকে আশাস দিয়া তিনি বলিলেন—এক-এ পাগ করিলে তোমাকে কলিকাতার পাঠাইব।

শিতাবাজার অস্থগতি পাইয়া ইজ কলেজে ভর্তি হইল। হরিদাসারূপ একটু ভুল করিয়াছিলেন। উত্তমক আবহাওয়া সে সময়ে কলিকাতার হাজিমহলেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বাংলায় হাজিমহল তখন উত্তমকর মধ্যে বাস করিত। পড়াশুনা বন্ধ না হউক, ইজ শীঘ্রই সব রকম হাজ-আন্দোলনের একজন পাণ্ডা হইয়া উঠাইল। মকবল মহরে পুলিশের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়। ইজের সহজে কিছু ধর পাইয়া পুলিশ তাহার উপর নজর রাখিল। হুই এক বার তাহাকে হাকানার জড়াইতে ডেতা করিল, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষের হুত্বার জন্য সকল হইল না। অব্যক্ত ইজকে ব্রহ্ম করিতেন। তাহার বিপদাশঙ্কা করিয়া তিনি হির করিলেন হরিদাসারূপকে পক্ষ লিখিবেন ইজকে অশ্রদ্ধ সরাইয়া লইবার জন্য।

শিতাকে হুই হইয়া উঠিতে দেখিয়া দেবানন্দ তাড়াতাড়ি কিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। জীবানন্দের ইচ্ছা ছিল বহির্শাল কনকারণে শেষ হইয়া গেলে দেবানন্দ কিরিবে। কিন্তু দেবানন্দ কলেজ কানাই হইবার অজুহাত তুলিতে তিনি আর কিছু বলিলেন না। দেবানন্দ যেদিন রওনা হইবে তাহার আগের দিন বহু অতুলের এক দীর্ঘ পত্র পাইল। এই পত্র পড়িয়া তাহার কিরিবার আগ্রহ আরও প্রবল হইল। অতুল লিখিয়াছে—তাই দেখু, আমার বোধ হয় আর পড়াশুনা করা হবে না। বাবার অস্থগ লায়ছে না, আর লায়বেও না মনে হয়। সবাই বলছেন নিজের চাষবাস, কাজ কারবার দেখ, বোনদের বিয়ে দাও, ছোট্ট তাইদের মাহুত কর। বাপ অক্ষম হয়ে পড়েছেন পেকেজে বড় ছেলে ছুঁই, সব দার ও তোমারই। মোট কথা, আভে আভে সংসারের সব ভার এসে বাড়ে চাপছে।

পড়াশুনা হবে না, সেজন্য হুঃখ করি না। পড়াশুনা করে কি বা করব? স্কুলার সাহেবের স্তন্য নারস্কুলারের কল্যাণে হিন্দুদের চাহুরি কোটা কটিন হবে। আমল কথা মন যেমন অস্থির হয়ে উঠেছে তাতে সুবোধ ছেলের মত সংসারের ভার কাঁধে বসে দিম কাটান পড় হবে মনে হচ্ছে।

এক এক দিন এমন সব ঘটনা চোখে পড়ে, এমন সব ধর কানে আসে যাতে হির থাকা বার না। পুলিশের ভাণ্ডারি বক্ষম হিন্দু গৃহহেয়া সর্বদা গরত। কখন কার বাড়ীর ভিতরে হুকে পড়ে, মেয়েদের অলসান করে, জিনিসপত্র হুরি করে—

লকলের এই ভয়। এমালদের শাসনে অবস্থা আরও বায়াপ হয়েছে। মনে হচ্ছে ঠিক যেন মগের হুতুকে বাস করছি।

সলিহুয়ার কাছারি-বাড়ী মোরারের আড্ডা হয়েছে। ঢাকা, মৈমনসিং, মোরাখালি থেকে এসে এখানে আড্ডা পেতে তারা আশপাশের আরপাতসিতে আনাপোনা করছে। পুলিশের কর্তৃত্বাধীনের সেখানে বাতায়ত করতে দেখা যায়। পোনা বাজে মৈমনসিংও হুসলমানদের মধ্যে কোয় হিন্দুবিষেব প্রচার করা হচ্ছে, সরকারী কর্তৃত্বাধীরা রয়েছে এর পেছনে।

তাই, এমন অবস্থার মধ্যে মাহুত কি করে হুই বাতাবিক জীবন বাপন করবে? আনাদের পাণের শান্তি ভালভাবেই আরম্ভ হয়েছে। মনে হচ্ছে দেশে আশ্রম শীঘ্রই বলে উঠবে। সে আশ্রমে কত জন পুকে মরবে, কত পরিবারের সর্বনাশ হবে বাবে তাবতে ভয় হয় মনে।

সেমিন বদেশবান্দব সমিতির একজন ছেলের কাছে এক-খানা কাগজ দেখলাম। মাস দুই আগের কাগজ। একটা কারগার চোখ পড়ল। জ্যাক (যাকে ঠাঠা করে ‘জ্যাক দি কারেট-কিলার’ বলা হয়), এমাল, টমসন, কার্গাইল ও রিকলের উল্লেখ করে লিখেছে লোকের মনে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিষেব ও বৈরিতাব জাগিয়ে তোলার জন্য এদের মত আরকেউ দারী নয়। গবর্ণমেণ্ট যদি বাংলার বদেশী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য কৃষিয়ার গবর্ণমেণ্টের মত মনমনীতি চালামোই হির করে থাকে তা হলে তাদের এ সভাবনার কথাও মনে রাখতে হবে যে, কৃষিয়ার মনমনীতির বিরুদ্ধে কৃষিয়ার প্রকারা যেমন প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করেছিল এদেশের লোকেরাও তাই করতে বাধ্য হবে।

তাই দেখু, তোমার ও অনেক পড়াশুনা আছে। কৃষিয়ার প্রকারের এই প্রতিরোধ-নীতির বিস্তারিত তথ্য দিতে পার? বদেশবান্দব সমিতির অনেক ছেলে আমার কাছে জানতে চেরেছে।

দেখু, ভিন্ন ভিন্ন আগে চিঠিটা এই পর্যন্ত লিখেছিলাম, আরও কিছু লিখব বলে ডাকে কেলি মি। একটা সেধবার মত ধর আছে। পরও হুসনা থেকে একজন আত্মীয় আনবেদন বলে শীয়ার-বার্টে গিরেছিলাম। যেখি বাটে পুলিশের বিশেষ সবারোহ। ভাবলাম উচপবহ কোম সরকারী কর্তৃত্বাধী আসবে বোধ হয়। ভনি, তা মর, কলকাতা থেকে করেকজন বনেদাতরমওরাল আসবে বলে পুলিশ ধর পেয়েছে, তাই এই অত্যাধার আরোজন। বনেদাতরমওরাল কে এসেন জানিনে তবে আমার আত্মীয় আর তাঁর সঙ্গে এসেন এক অতি দীর্ঘকার ব্যক্তি যেন একটা সচল শালভক্ষ। বাত্মীরা মেমে এতুচ্ছে আর পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে—কাঁহা সে আতা? সেই সাহেব-বেশী শালপ্রাণ্ড লোকটির দিকে তাকিয়ে পুলিশ হুসি পাণ্টে বললে—“আপ?” বাত্মীই মলার হঠাৎ প্রচত পর্জন পোনা

গেল, “রতী সোয়াইন, পেট আউট!” চমকে উঠে পুলিশ পথ থেকে সরে হাঁড়াল। আশপাশের বাড়ীরা পর্যন্ত সে গর্জনে ভড়কে গেল।

তাবহি এ কাকে লদে নিয়ে এসেন আমার আত্মীয়? একে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে উঠবেন নাকি? পেছন থেকে সেই গলা বললে, এসিয়ে বাও না হে বাপু। ভাল বেবে গাভী ঠিক করে। আমার ভত। বাবে খার্ড ক্লাস গাভী করে না।

তবে আমার পিতা বলে গেল। আজ্ঞা লোককে লদে এনেছেন বেবহি।

ভিন্ন জন গাভী করে বাড়ীর বিকে রওনা হলো। গাভীতে উঠে ভত্রলোক আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, কি হে ত্রাহার, বাতচিং শুনে ভড়কে গেলে? রংটা তেমন কসাঁ নয় বটে, কিন্তু আমি এক জন পাভা সাহেব, জন ফুলস ওন ত্রাহার।

এই জন ফুলস ওন ত্রাহারটিকে জান? হুড়োয়ার লাগিয়ে জিংনারায়ণ ওরকে জিহুবা। এর বিস্তারিত পরিচয় পরে দেব। আপাততঃ এইটুকু জানাচ্ছি যে এঁর প্রকৃত পেশা একটা বিলেতী কোম্পানির ট্রাভেলিং এজেন্টসিরি, আর অপ্রকৃত পেশা সিক্রেট প্রোপাগান্ডা ও অরগানাইজেশন। আমার আত্মীয় এঁর সভ্য পরিচয় জানেন।

জিহুবাতে গেলে আমি অকূলে ফুল পেলাব। বদেধ-বান্ধব সমিতির ছেলেরা তাঁকে হেঁকে ধরেছে। পথের নিশানা পাবার ভত তারা ব্যাকুল।”

দেবানন্দ বহিরাগলে কিরিতা আসিরা ছোট্টলে বোঁজ লইরা জানিল অকূল তাহার এবে চলিরা গিরাছে, কবে আসিবে ঠিক নাই।

কনকারেলের ভত ভলাকিয়ার হল গঠন করা হইতেছিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া দেবানন্দ ও মহেন্দ্র তাহারের হলবল লইরা এই কাজ লইরা পড়িল। সভ্যর দিকে দেবানন্দ বদেধ-বান্ধব সমিতির আড্ডার কাটাওত, অকূলের চিঠিতে উল্লিখিত জিহুবার লসকে সে আরও অনেক নৃতন ভদ্রা সংগ্রহ করিল। সে সুবিধে পাবিল এই ভত্রলোক বদেধবান্ধব সমিতির

লভ্যদের এখানে একটা নৃতন প্রেরণা আনিরা দিরাছেন। কলিকাতা, করিমপুর, ময়মনসিং, ঢাকা, কুশিরা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নৃতন নৃতন লোক আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। সমিতির লভ্যদের লদে তাদের আলাপ-পরিচয় হইল। স্পষ্ট করিয়া কিছু না বুঝা গেলেও চারিদিকে যেন একটা প্রভৃতির আয়োজন শুরু হইয়াছে দেবানন্দের এই রকম মনে হইল।

পরীক্ষা আসিতেছে, পড়াশুনা বিশেষ হয় নাই। বিকিও মনকে জ্বাইয়া দেবানন্দ পড়িতে বলিবার চেষ্টা করে। সেদিনও সভ্যর পরে সে বই খুলিরা বলিরাছিল এমন সময় মহেন্দ্র আসিরা তাহার ঘরে ঢুকিল। তাহারের বাড়ীতে তাহার বহুলা বত একটা আসে না। মহেন্দ্রকে এত রাতে হঠাৎ আসিতে দেখিরা সে বিস্মিত হইল। মহেন্দ্রের বুকের দিকে চাহিরা সে চেয়ার ছাড়িরা উঠিরা দাঁড়াইল, ব্যক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হরেছে মহেন্দ্র, তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?

মহেন্দ্র বলিল, এই মাত্র চিঠিতে খবর পেলাম যেবন পতিভমশাট মারা গেছেন।

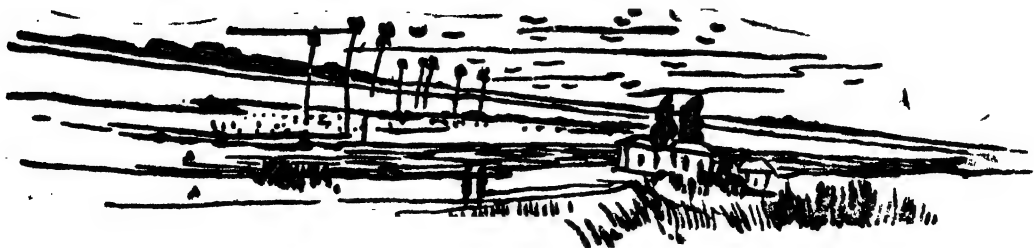
দেবানন্দ শুনিয়া অভ্যস্ত বিমর্ষ হইরা পড়িল, বলিল, মাস দুই থেকে তিনি সকলের লদে দেখাশাফাং বত করে-ছিলেন। অনেক আশঙ্কা করেছিলেন এই রকম একটা ব্যাপার শেষ পর্যন্ত হতে পারে।

মহেন্দ্র বলিল, আমি শুনেছিলাম তিনি মারা রকম বিতীবিচা দেবতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর শরীরও একেবারে তেড়ে গিরেছিল। হুত্মার আগেও নাকি তিনি এই রকম বিতীবিচা বেবে অজান হয়ে যান।

উত্তরে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিরা রহিল। অবশেষে দেবানন্দ বলিল, দেখ তাই, আমার কেমন মনে হচ্ছে পতিভ মশারের হুত্মা আসার বতের লসকে। আরও মনে হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ প্রভত হবার আগে বত উঠে বিপর্যয় ঘটাবে।

দিনকরেক পরে দেবানন্দ লভীদের একটা চিঠি পাইল। যেবন পতিভ মশারের আকস্মিক হুত্মাতে হঃপ্রকাশ করিরা দেবানন্দ, যে আশঙ্কার কথা জানাইরাছিল সেও সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করিরাছে চিঠিতে।

কমল:



পণ্ডিত্যরীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যক্তিগত অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। আমি এই দিক দিয়া অতিশয় সতর্কতার সহিত শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কথা বলিতে চাহি, তাহা হয়ত অন্যের অবদিত। এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার মাহুষ এক জন আছেন, তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পত্রাদি হইতেই তাঁহার সহিত আমার অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ ও তাঁহার রাষ্ট্রীয় মতামত প্রমাণিত হইবে। ইহা আজ বাঙালী জাতির জানিবার বিষয় বলিয়া আমার এই বিষয়ে লেখনী ধারণের আগ্রহ।

শ্রীঅরবিন্দ বিহার লইলেন। চন্দননগরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রহিল। স্বদর্শনের কথামত তাঁহার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পত্র দিলাম। পত্রোত্তরে তিনি জানাইলেন তাঁর পণ্ডিত্যরী-আগমন-সংবাদ তাত্‌কালীন সরকারের সংশয়-ভাজন শ্রীনিবাস আয়েঙ্কার, ডি. ডি. এন্স আয়ার ও তামিল কবি ভারতীর উদ্যোগে বিপুল জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে আসায় ঘটনাটি সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই তিনি যে বাসা-বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর সম্মুখে সর্বদাই ইংরেজ পুলিশের ঘাঁটি বসান হইয়াছিল। তিনি এই পক্ষে আরও জানাইয়াছিলেন শ্রীনিবাসের ভ্রাতা পার্শ্বসারথি শীত্‌রই কলিকাতায় বাইতে-ছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করারও নির্দেশ পড়ে ছিল। পার্শ্বসারথির ছদ্মনামই তিনি পত্রযোগে জানাইয়া-ছিলেন। রাষ্ট্রগুরুরূপে তিনি এই বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারী মিঃ ডেনহাম ভ্রমে মিঃ কাউলির গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষেপ্ত হয়। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি ধৃত হন তাঁহার সাক্ষ্যে ধৃত অল্প দুই ব্যক্তি উভয়েই চন্দননগরের নিকট প্রতিবেশী। আমার সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু এই সময় হইতেই পুলিশের অহুচরবৃন্দ ছায়ার ভায় আমার অহুসরণ করিত। কাজে কাজেই তাহাদের ক্রাঞ্চি দিতে অনেক সময়ে আমার কলিকাতার পথে গা ঢাকা দিয়া চলিতে হইত। আমি এই ভাবেই পার্শ্বসারথির সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেক কথার পর স্বামী বিবেকানন্দের কোন একখানি পুস্তকের নির্দিষ্ট পাতায়

অংশবিশেষ হইতে একটি কোড্ অর্থাৎ আক্ষরিক গুপ্তলিপি রচনা করিয়া আমার গোচর করেন, এবং বলেন এই কোডে শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিবেন; আপনিও তাঁহাকে এই কোডেই পত্র দিবেন। যদি পুলিশ আমাদের পত্র হস্তগতও করে, তাহারা কিছুই বুঝিবে না। এইরূপ নিরাপদ পত্রব্যবহার শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার অনেক দিন চলিয়াছিল।

চন্দননগর করাসী রাজা হওয়ায় করাসী পোষ্ট আপিসের ভিতর দিয়াই আমি পত্রাদি প্রেরণ করিতাম। পত্র শ্রীঅরবিন্দের নামে বাইত না। এক মাদ্রাজী ভল্ললোকের নাম দিয়া পত্রগুলি প্রেরিত হইত। তিনি আমায় কোডেই পত্র দিতেন। সেট গুপ্তাক্ষরে লিখিত পত্রাবলী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্তার চার্লস্ টেগার্ট আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করার সময়ে পোড়াইয়া কেলিতে হয়। নতুবা শ্রীঅরবিন্দের তদানীন্তন রাষ্ট্রনির্দেশ কিরূপ ছিল, তাহা প্রমাণ সহ আজ উপস্থিত করিতে পারিতাম। চন্দননগরের বিপ্লবমণ্ডলী শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হয় নাই। সে যুগে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিতচেরীতে থাকিয়া চন্দননগরের মধ্য দিয়া যে রাষ্ট্রনির্দেশ দিতেন, তাহাই বাংলার বিপ্লবী-ল পালন করিত। পরে তিনি ইহা হইতে বিরত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত তাঁহারই নির্দেশে বাংলার বিপ্লবীগণ পরিচালিত হইত। তাঁর এই বৈপ্লবিক নির্দেশের মূলেও ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মসাধনার সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার অহুপ্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে প্রস্থানকালে শিরিসচন্দ্র ঘোষের নিকট এক ব্যক্তির নাম দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত সংযোগস্থল স্থাপন করি। তিনি পরলোকগত স্বরেশচন্দ্র দত্ত। মণিকতলা সম্পর্কিত বোমা নির্মাণের গুরুরূপে হেমচন্দ্র দাসের (কাছনগো) নামই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মণিকতলার বোমার মামলার পর একমাত্র এই স্বরেশচন্দ্র দত্তই বাংলার বোমা নির্মাণের কর্ণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি এম্-এলসি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তার পর তিনি রিপণ কলেজের অধ্যাপক হন। তাঁহারই সাহায্যে চন্দননগরে এম্-এলসি ক্লাসের ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক বোমা প্রস্তুতির কৌশল শিক্ষা করেন, এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির গুপ্ত কারখানা স্থাপিত হয়।

স্বদেশচন্দ্র দত্তের নাম শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম, পরে বোম্বা নির্বাণের ব্যাপার লইয়াই তাঁহার সহিত চন্দ্রনগরের সংযোগ স্থাপিত হয়। স্বদেশচন্দ্রের শিক্ষাকৌশলে ও যশীজনাথের প্রতিভায় চন্দ্রনগরের বোম্বা শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ভারতের বিপ্লব-ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশেষত্ব অর্জন করিয়াছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিতারীতে বসিয়া বাংলার বিপ্লবীদের স্বাধীনতা নির্দেশ দিতে লাগিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষে আমি দুই জন করাসী রাজপ্রতিনিধির সহিত পণ্ডিতারীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের আগমনে শ্রীনিবাস আয়েজার প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের জন্ত শহরে ইংরেজ পুলিশের বিশেষ উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। বিশেষতঃ বাড়ালী দেখিলেই এই সকল গুপ্ত পুলিশ তাহাদের চক্ষে চক্কে রাখিত। আমি করাসী রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত রুদ্দেশ্য। বাজারের সন্নিকটে রাজাপুলের প্রসিদ্ধ ভবনে অবস্থান করিয়াছিলাম। এক দিন অপরাহ্নে নিকটবর্তী পণ্ডিতারীর প্রসিদ্ধ ওদকল মাঠে যে ফুটবল খেলা হইত, তাহা দেখিতে বাহির হই। এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনী, স্বদেশচন্দ্র ওরফে মনি ফুটবল খেলার বোণ দিতে আসিতেন। শ্রীঅরবিন্দের স্কালক সৌরীন্দ্রনাথ বসুও এই মাঠে পদচারণা করিতেন। এইখানেই স্বকৌশলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। আমার পণ্ডিতারী আগমনের কথা পূর্বেই পত্রবোণে শ্রীঅরবিন্দকে জানাইয়াছিলাম। সৌরীন্দ্র আমাকে দেখিয়াই সঙ্কেতে আমার মাঠ হইতে দূরে যাইতে আহ্বান করিলেন। কোম্পানী বাগানের এক পথে দুই জনে মিলিত হইলাম। আমরা এক খেলার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বোসেফ ডেভিড নামে এক মাস্তাজী ছাত্রের সহিত আমার এই বাড়ীতে পরিচয় হইল। ইনি পরে পণ্ডিতারীর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও মেয়র হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া সৌরীন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় আমি বোসেফ ডেভিডের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একখানি পুশ্, পুশ্, ভাড়া করিয়া আমার শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া চলিলেন। তিনি আমাকে এক জন রমণীর মত সর্বদা মাস্তাজী চামরে মুড়িয়া পুশ্,পুশ্ চড়াইয়াছিলেন। বোসেফ ডেভিড এক জন নারীকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন, এই যেহু পুলিশ প্রহরীদের এ বিষয়ে কোনই মনোবোণ আকুট হইল না। আমি দেখিলাম—বাড়ীর অপর ধারে এক দল গোয়েন্দা পুলিশ হুলা করিতেছে,

আমার একপ্রকার নারীবেশ হওয়ার তাহার কিছুই মনে করিল না। আমরা দুই জনে এই বিশাল ভবনে প্রবেশ করিলাম। নিয়ন্ত্রণেই নলিনীকান্তের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহার অপারিষ সৌহার্দ্য সেদিনও অস্বত্ব করিয়াছি। তিনি বলিলেন, মনি অর্থাৎ স্বদেশচন্দ্র আজ আমাদের সৈয়দী।

আহাৰ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে শুনিলাম, খেচরার হইতেছে। অন্ধকারের মধ্যে একটি কেমাসিন তেলের ডিবা মটি মটি আলো জলিতেছে। স্বদেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, “রক্তনের বাংলাই বিশেষ কিছু নাই। আমরা রাজে খেচরারেই উদরপূর্তি করি।” ইহাদের ছবিস্বাক্ষর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি দ্বিতলে গিয়া উঠিয়া হলঘরের সম্মুখেই শ্রীঅরবিন্দকে দেখিলাম। বহু দিন পরে আবার তাঁহার হৃদয়ের স্পর্শ পাইলাম।

সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন আছ? সাধন কেমন চলিতেছে?” ইতিপূর্বে তিনি বৌগিক সাধনের কয়েক খণ্ড টাইপ করা বাগজ চন্দ্রনগরে আমার পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহার প্রথমেই লেখা ছিল—“you need not make ashan”। কথাগুলি আমার পক্ষে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিত। আমার সাধন ছিল চেষ্টা-প্রসূত। তাহা হইতে বিরত থাকার আদেশ তিনি এই কয়েক খণ্ড কাগজে দিয়াছিলেন। আরও তাঁহার কথা ছিল, “মুক্তিঃ সর্বভূগানি যৎপ্রসাদাৎ তদ্বিস্তৃতি।” এই মন্ত্র আমাকে অনেক কষ্টে ভরসা দিত। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, “ন যে ভক্তঃ প্রণততি”। তাঁহার এই কথায় আমার যত্নভাবও দূর হইয়াছিল। কোন কথায় প্রচেষ্টার সাধিত না হয়, তাহার জন্ত নিজেকে সর্বদাই স্থির রাখিতাম। সাধনার কথা বলিতে বলিতে দুই জনে হলঘরের এক পার্শ্বে কয়েকখানি ভাড়া চেয়ার ও একখানি পুরাতন টেবিলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি টেবিলের এক পাশে উপবেশন করিলেন। আমাকেও তিনি বসিতে বলিলেন। দেখিলাম টেবিলের উপর কয়েকটা মটর ভাজা পড়িয়া আছে। অপরাহ্নে ইহাই চর্কণ করিয়া তিনি চা পান সমাপ্ত করেন। তাঁহার দিকে আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া মনে হইল—বেন তিনি অনেক শীর্ণকার হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রনগরে তাঁহার যে শ্রী দেখিয়াছিলাম, এখানে বেন সে কান্তি বহু পরিমাণে হীন হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষের দীপ্তি মনে হইল আরও বর্ধিত হইয়াছে। তিনি আমার অন্ধতল ভেদ করিয়া বেন প্রসারিত দৃষ্টিতে সাধনার অবস্থার কথা জানিয়া লইলেন। তার পর বাংলার বৈপ্লবিক কষ্টের সকল বিষয়ও

অবগত হইলেন। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, “প্রতিদিন এখানে আসা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। তোমাকে বাংলার কিরিয়ান অনেক কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে। সপ্তাহে দুই দিন মাত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবারে আবার আসিও, অনেক কথা হইবে।”

আমি তাঁহার তৎকালীন অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমি নীচে নর্মিবামাত্র বন্ধুদের হস্তগতবে সব ঘেন মুখরিত হইল। স্বরেশের খেচরার রন্ধন শেষ হইয়াছে। সে হাঁড়ীর কানা ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। সৌরীন্দ্র বলিলেন, “নারীর বেশে আপনি যে পরিমাণে নিম্নাপদে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই অবস্থায় তাহা যদি পুলিশের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহারা আপনার অহুসরণ করিবে এবং আপনাকে পতিচারীতে থাকিয়া বাইতে হইবে। তিনি আপনাকে গোপন পথেই প্রস্থান করিতে বলিয়াছেন।” নলিনী ও সৌরীন্দ্র আমাকে গোপন পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা একটি গাল পথ। এই দিকটা অন্য লোকের বাড়ীর প্রাচীরে রুদ্ধ হইয়াছে। সেই গৃহের আবর্জনারাশি এইখানেই নিকিপ্ত হয়। সেই পথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে সোজা পথে উঠা যায়। সৌরীন্দের কথামত আমি এই গোপন পথ দিয়া বাহির হইলাম এবং নিম্নাপদে রাজাপুলের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিবার সময়ে সৌরীন্দ্র বলিয়া দিয়াছিলেন—মধ্যাহ্নে গুল্ললের নিকট কোম্পানীর বাগানে সাক্ষাৎ করিবার জন্য। আমি বথাসময়ে বাহির হইলাম। কোম্পানীর বাগানে গিয়া সৌরীন্দের মুখে তাহাদের দুইবছর কথা বিশেষভাবে অবগত হইলাম। সৌরীন্দ্র বলিলেন, “রাজাজের ধনী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—কোন এক ভদ্রলোকের সাহায্য এক বৎসরের জন্য এই কয়েকটি প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে, তাহার পর যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সাহায্যে আর ভেতন ভাবে মিলে নাই। বৎসামান্য বাহা কিছু তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমরা একবেলা কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিতে পারি। এই বিষয়ে আপনি কি করিতে পারেন আমাদের জানাইয়া বাইবেন।”

আমি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার নঙ্গিণের জীবনোপায় নির্ধারণের চিন্তার প্রবৃত্ত হইলাম। সৌরীন্দ্রকে বলিলাম, “চন্দ্রনগরে গিয়াই আমি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিব। এই বিষয়ে আমরা এতদিন নীরব ছিলাম। ইহাই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। বাংলার কর্ণধার

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষে আসিয়া কিভাবে আছেন, ইহার খবর আমরা রাখি নাই। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।” এমিকে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সেই গোপন পথেই আমি শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতাম। বিগ্নবাস্তব কর্ণপ্রচেষ্টার কথা দুই-চারি দিনেই শেষ হইল। তার পর অধ্যাত্মসাধনার কথাই সপ্তাহে দুই দিন তাঁহার মুখে অনঙ্গল বাহির হইল। আমি কান পাতিয়া তাঁহার কথাগুলি দ্বয়ে গ্রহণ করিলাম। হঠাৎবাগ, বাজবাগ, তন্ত্র, সহজিয়া—সকল সাধনার উপরে তাঁহার মুখে প্রীতার “আত্মসমর্পণ-বাগ” মত্রে আমার চিত্ত আলোকিত হইল। “You need not do Asan and Pranayam”—তাঁহার কথার আসন, প্রাণায়াম দূর হইয়াছে। তাঁর দেওয়া ত্রিময় জপের সহিত “স্বা স্বীকেশঃ হৃদিস্থিতেন বধা নিবৃত্তোহস্মি তথা ক্রোমি”—এই শ্লোকটিও আমার জপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। “স্বীকেশ” বলিতে তখন নিত্য শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আমি আর কাহাকেও মনে করিতে পরিভাম না। থাইতাম, শুইতাম তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া। অতি সঙ্কটময় কর্ণে আগুয়ান হইতাম এই প্রত্যক্ষ স্বীকেশেরই আদেশে। রোগ হইলে এই স্বীকেশকেই অহুসরণ করিতাম। বিদায়-কালে আমার কথা তিনি মর্ম দিয়াই অহুতব করিলেন। তার পরে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “তোমার সাধনার নির্দেশ ইহা হইতে আরও বিশদরূপে পাইবে। পূর্বে যে সাধনার কথা টাইপ করিয়া তোমার পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আমার নিজের নহে। আমি ধ্যানযোগে রাজা রামমোহন রায়ের বাণী যেমনভাবে পাইয়াছিলাম, তদনুসরণ উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর এই লেখাগুলি আমার নিজেরই উপলব্ধির কথা। তুমি ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।”

আমি বাসায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার টাইপ করা কাগজগুলির মাধার “Yoga and its object”—এই শিরোনাম লিখিত। এই গ্রন্থই “লীলা” নামে গ্রন্থাকারে আমি বাংলার তাঁহার প্রথম অহুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার প্রথম পুস্তকখানিও বৌদ্ধিক সাধন নামে বাংলার মুদ্রিত হইয়াছে।

আমি অনেক রাষ্ট্রনৈতিক নির্দেশ এবং সাধন-রহস্তের কথা বুক লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। কিছুদিন পরেই তিনি পত্রযোগে জানাইলেন—“Situation just now is that we have Re. ½ or so in hand.” অর্থাৎ, অবস্থা এক্ষণে এমন হইয়াছে যে আমাদের হাতে মাত্র আট আনা পরশা আছে।

আমি আসিবার সময়ে কয়েকটি টাকা সৌরীন্দের

হাতে দিয়া আসিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ সেই টাকার কয়েক দিন চলার পর শ্রীঅরবিন্দ এমনই ভাবে অভাব-রাক্ষসীর তাড়নায় খোরতর বিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার পত্র পাইয়া আমার চক্ষে জল আসিল। এই সময়ে আমার হাতে কিছু টাকা চেয়ারের কারবার হিসাবে ছিল। তাহা হইতে পকাশ টাকা লইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে তাঁহার আর এক পত্র পাইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তিনি পুনরায় জানাইলেন—“I must ask you to procure for me by Will Power or any other power in heaven or in earth”। অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে চাহিতেছি যেমন করিয়া পার আমার জন্ত অর্থ সংগ্রহ কর। তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই হউক অথবা স্বর্গের বা মর্ত্যের যে শক্তির সাহায্যে পার, অর্থ আমার জন্ত প্রেরণ কর।”

আমি বিহ্বলচিত্ত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকার নিফল হয় নাই। আমি যে তাঁহার কত

আপনার ইহা জানিয়াছিলেন বলিয়াই এইরূপ দাবি তিনি আমার উপর করিতে পারিয়াছিলেন। সাধনার ইতিহাসে এই তত্ত্বের মূল্য শুধু আমার কাছে অনেকখানি নহে, প্রবর্তক সত্যের সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে এই দাবির তাৎপর্য কতখানি শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অসুখাবন করিয়া আমি কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে বিহ্বল হই।

অতঃপর চন্দননগর হইতে যথারীতি তাঁহার জীবন-যাপনের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্য নিম্নে আমি ধন্য মনে করি। পরবর্তী সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় তাঁহার পত্রাদির মারকতই কিছু কিছু সুনাইবার প্রয়াস পাইব। ইহা ভারতাত্মার বাণী। ভারত-সংস্কৃতির অসাধারণ ঐতিহ্যের এই অধ্যায়টুকু না জানিলে যেমন শ্রীঅরবিন্দের পূণ্যময় মহাজীবনের একটি অংশ অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে, তেমনি ভারতের জাতীয় সাধনার তাঁর স্মৃতি অবিদ্যমানেরও অনেকখানি মর্ম-পরিচয় অপ্রকাশিত থাকিবে।

খুন

কৃষ্ণ দাস

অনুবাদক—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

টবের পর্বা আঁটা লোহার পেটটার ওপাশে জরনঃ ভিত্তি বাঁচে। বাহুয় জরনঃ কাতারে কাতারে। দুই থেকে দেখা বাঁচে শুধু এক দল কালো মাথার অরণ্য।

মাঝখানে পেট, হ'পাশে লম্বা উঁচু পাঁচিল। যেন কোন মকবলের খেলখানা। উঁকি দিয়েও দেখবার জো নেই এমিকে কি আছে না আছে, কিই-বা হচ্ছে না হচ্ছে। মধ্যের উঠানের এক পাশে সপের টবের ফুলগাছগুলোর আড়ালে কি একটা চট-ঢাকা পড়ে আছে।

ভর-হুগুরে কালুর তরতর পর্জনে চার পাশ শিউরে উঠেছিল। কিছুক্ষণ বাদে আর কোন আওয়াজ না পেয়ে যেন কিলের বোঁজে কালো মাথার ভিত্তি তখন সব একে একে এগিয়ে আসছিল। অদূর এক আদমি অহুত্বের আকর্ষণে পেটের সামনে ওরা থমকে দাঁড়াতে লাগল। চোখ টান করে বাঁধা ফুলে এ ওর বাঁকে প্রার লাগিয়ে পড়ে কি হুঁজুছিল দাক টেনে টেনে। হাতগুলো সব অদূর লম্বা—কেমন হাটীর দিকে ফুলে সটান হয়েছিল।

তৎকালে সারা বাতীর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে বললে বীরেশ। নিজে অনেক দূর থেকে আসিগড়ের ভালা হাতে এগিয়ে গেল পেটের কাছে। ভালার ঢাবি লাগিয়ে

পেছনের পাঁচিলের চোরা-দরজা দিয়ে বর্ষন শিঠি হুঁজো করে গলে বেরুতে গেল—অমনই সারা শরীর অজানা আশঙ্কার ধর ধর করে কেঁপে উঠল।

দীর্ঘ চাকরটা কালুকে আগেতাপেই পার করে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শক্ত শিকল হাতে ধরে। কালুও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক দেখে তার আনন্দ প্রকাশের ডাক-গুলো আর গলা দিয়ে বেরুল না। বিষংপ্রমাণ লক্ষ্যে লোভাতুর জিতটাও যেন পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে; চোখ-জোড়ার আকর্ষণ মীরবতার হাঙ্গ।

দীর্ঘ বললে—দাধাবা, পাশের গলিতে ট্যান্ডি ডেকে য়েবেছে ক্যান্ডি বি, সরে পড়েন শীগগির।

—হুই কোথার চললি।—গলা কেঁপে উঠল বীরেশের।

—দেখে আসি, মেজ বা দরজাগুলো ভাল করে এঁটেছেন কি না।—দ্বিতীয় কথার আগেই অ্যান্ড্রুজ ভীরের মত ছুটল দীর্ঘ। পেছনের দরজার বাঁকা দিয়ে অহমান করলে তেভর থেকে বিল ভাল রকমেই আঁটা আছে। এখানেই দাঁড়িয়ে ডেকে বললে—মেজ বা, বাবুকে কোম করেই আসছি, দরজা যেন কাঁচ কথায় ফুলো না।—বলেই দীর্ঘ পদারপার।

তেভরের লাভার প্রতীকা না করে দীর্ঘ যেমন সরে পড়ল,

ভেতর থেকেও ভেদনই সাক্ষাৎ! এল না। তার কথা কারও কানে
গেল কিনা তাও বুঝবার কোঁ হইল না।

মাঝের ঘরে কণিকা শিউরে শিউরে উঠিল। দেয়াল
ঠেস ঘিরে নিজের বেহের তারল্য বন্ধার মাথতে চাইছিল।
উপরে নীচে, চার পাশে নিশ্চিন্ত পাকা ইঁটের বহুবৃত্ত আশ্রয়
অবলম্বনেও যেন তার ব্যক্তি ছিল না। ভীতিগ্রস্ত হুস্তিতার সে
সারা হয়ে বাহিল। একি লক্ষ্যমান, কাছটী কি করে বলল।

কণিকা ভাবতে পারে না—এমনও বটাতে পারে কুহুরে।
হোঙ্ক বিলেতী কুহুর, ডাকবি ডাক, চোর-ডাকাত ভাঙা কর
বত ইচ্ছে। দিন-রুপরে কি সাংঘাতিক কাণ্ড এ। কণিকার
চোখের উপরে ঘটনাটী এখনও ভাসছে,—টেবিলে বসে
সে আর বীরেশ বাহিল। বৌদি-ঠাকুরপোতে আলোচনা
হাছিল কাল রাত্তিরে সিনেমার বাওয়া ঘিরে। অকস্মাৎ সেই
বল-লক্ষ্যমান আর লদে লদে অতঃপরী আর্দ্রতার উঠতে না
উঠতেই খাবার-ঘরের টেবিল-চেয়ারগুলোও যেন চমকে
লাকিয়ে উঠল। এঁটো হাতেই হুটে বেবরের পেছনে পেছনে
বাইরে যেতেই বেবলে—চোপ ট্রিকরে বেরিয়ে আসা একটা
বিহ্বল রূপ, কীণ দেহের লক্ষ্য গলা, হ'পাটী দাঁতালো সঁতানির
চাপে শেষ পর্যন্ত কেটে বসে গেছে। হুটো বোলা শির
বেক্সনো হাতের কঁকে দানা দানা এক দলা ভাত—মাংসের
টুকরোটা পাশে পড়ছে। এচও আকস্মিকতার আঘাতে
কণিকার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। প্রার-চেতনালগ্ন হতভম্ব
বীরেশও যেন পাথর হয়ে গিরেছিল।

লহসা সে বাঁকা দিলে বীরেশকে, বললে—দেখ কি
ঠাকুরপো, হাফাত।

ভক্তকণে নীহ চাকরটা এসে পড়েছে হুটে হুটে।
আরা হাঁকাচ্ছে। ছেলেনেয়েরা ভাগ্যিন কেউ ঘরে নেই—সবাই
ছলে গেছে।

এখনও রক্তে রক্তে যেন বাঁকা লাগছে। ভাতগুলোর সেই
চেহারা। কেবল কোমপ্রকারে হাত ঘিরে বেরেছিল ভিখারী
বুড়ী। ভোগে এল না, লদে লদেই—।

পাশে কি একটা গা হুঁরে যেতেই কণিকার যেন চকিতে
শরীরের বোলা খেয়ে গেল। ও যেন গিরেও গেল না।
পায়ে পায়ে লেগে রইল। নিশ্চিন্ত কপাট-বাঁটা অচক্যে
কিছুই ঠাঁহর হাছিল না, কিংবা হরত মানসিক উত্তেজনার
চোখের কেমদ হতভা এসে পড়েছিল; তার পাশ ঘুরে যে
বেবলে সে মনেই হ'ল না। তাই কিছুকণ নিশ্চিন্ত অহের মত
কাটাতে লাগল। তারপর কখন সে তবু অহমান করলে—এ
হোঁরা হাছবের। কিছ কি ভীষণ ঠাঁতা।

—বিবি নাকি? বীরেশের বুকা বোন হাফাত এখন ঠাঁতা
হত এ বাড়ীর আর কার হবে। কিছ কোন উত্তর এল না।
আরও বেবে এল যেন দেই শীতাতুর লক্ষ্য।

—আরা নাকি?—আবার অসুখ কঠে এর করলে
কণিকা।

—আরা দেই।—গলা কাশল বুক করে, যেন আরও কি
বলতে চাইছে কিছ গলা ঘিরে বেরুচ্ছে না।

বাইরের কালো মাথার ঐ অরণ্য এখন হুঁর থেকে বেগাচ্ছে
আরও ভরকর। একটা অরিকাতের পরে আধ-পোকা অকারের
তুপ যেন হুঁকে পড়ে রয়েছে পথের ঐধানটার।

বিবিকে পাশে পেয়ে লাহস আস হ কণিকার বটে।
আপাণোকা ঘটনার ছবিটা আবার মনের পর্দার প্রতিবিম্বিত
হচ্ছে। কেপে উঠছে ব্যক্তিতে।

কত করে পেটে হোঙ্ক তাল দিতে বলে আসছে; সে কি
আজ থেকে, কাছকে আনা অববি বলছে—ভাণ ঠাকুরপো,
ও কুহুরকে বিধান দেই, ওয় বা আওয়ার, ওয় হুকারে
তোমার হাধারই ভর করে। কি জামি কবে কাকে
কামকে বসবে, হাধার পড়তে হবে। তার চেয়ে পেটে
তাল লাগাও—অপরিচিত কেউ আসতে চায়, অপেকা
করবে। নীহ তাল বুলে দিলে তবে না হয় আসবে।
একটুখানি অপেকা করলে সে তোমার বে না—কিছ
কাছ কামতালে ছেল-হাফাতও ত হ'ল পারে। কেবল
তোমাকেই ত মর—তোমার হাধাকেও ঘিরে টান না পড়ে ত
কি বলেছি।—সেই তাল শেষ পর্যন্ত লাগালেই এক দিন
আপে লাগালে কি এমন কতি হ'ত। হোঙ্কই ত বেবলে
ঠাকুরপো, ভিবিরা বুড়ী পেটটার কাছে জবুজু হয়ে বসে থাকে
—ওয় কি ভেমন নতার সাধ্য আছে। না হয় বুড়ীকে ভাঙা,
তবে ত নিশ্চিন্ত। ও কথা বললেই ঠাকুরপোর অমনি গলা-
বাহি—থাক না বলে বৌদি, তোমার অত মাথাব্যথা কিনেয়।
হ'ল ত এখন।

ঠাকুরপোর কি কিছু কম শরতানি, অতঃপর বলে উঠল
কণিকা। কতকাল লক্ষ্য করেছে—কাছকে খাবার দিলেই
বুড়ী মাটিতে শুয়ে কি কল্পন দৃষ্টিতে তাকার। তলার ওই
কাঁকটুহু ঘিরেই বা একটু-আবটু বেগা যায় কাছ থাকে। ওকি
এমনি তাকার, তাকার ওয় পেটের আলার। পেটের যে কি
আলা সে ত হাধা-বৌদির ঘোঁসতে ঠাকুরপো বুঝলে না।

—ও বট পেট মড়ছে যেন—নীহ গেল কোথায়?

—আর আলিও না বিবি, ছুদি যেন কিছু জান না—নীহ
গেল কোথায়?—বিহ্বল কঠে কণিকা যেন নিজের অতি
অহতব করতে চাইল।

—বিহে রোগ করিল, আমি কেমন করে জানব, জিজ্ঞেস
করলেও জলবি—আলাভদ।

খপকা করতে চায় নাকি বীরেশের বিববা বুকা বোন।
কণিকা লাহলে নেয়। চার পাশে যেন অহুত বিপদ তার ঘিরে
আসছে। না হলে আশ্চিত্য লাভ্য কথার এমনি তাহে

টটে। অতঃপর অতঃপর শুধু হয়ে বার সে—তার অতঃপরে।
হলেমেরে, ওই অমন বাবী, ওদের তবিত্যং।

মিথের মনের অহুমান বাচাই করে নিতে বুঝা আবার
লে ওঠে—কেনন বেন আওরাক পাছিস না...ওই ওই বেন
কে ঠেলেছে।

—রেহাই বাও মিদি, ঠেলে ও পেট ভাঙবে কে শুনি।
কপিকার চোখের সামনে মাথা তুলেছে এক প্রচণ্ড বাবা—
সোহার গেষ্ট, মাথার ওপরে বেত হাত উঁচু পাঁচিল, ভাঙা কাঁচ
নার হঠাৎ লোহার পেরেক পৌতা। তা হাতা ওরা কি
হানতে পেরেছে, বুড়ী ভিগারিণীকে ঘেরে কেলছে কাছ।
কেনন করে কামবে। দেখতে পাবে কি করে। এক গাছে
টটে। কিন্তু কুলের টবের আড়ালে বুড়ীকে এমন করে ঢাকা
দিয়েছে দীহ। এক কৌটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কুলে-
তা চামড়ার তলার ঐ মরা হাতে রক্ত আসবেই বা কোথেকে।
মনে মনে অনেক কুজির অবতারণা করে কপিকা।

পেটের ওপাশে শুভতা কেটে বেতে চাইছে বেন।

ওমিকে দীহ ছুটে চলেছে। সে কোন করার কথা কুলে
সিঁয়েই ছুটেছে। তার আগে-পাছে কারা বেন আসছে। ভীষণ
রক্ত-বজ্রার পূর্ব-বুহুর্ভের মত ওদের চেহারার বেন এলয়ের
নাভাল ধরধর করছে।

বীরেশের চেহারে গিরে বগাল করে দীহ মেবের ওপরে
বলে পড়ল। গা দিয়ে তার কালখাম ছুটেছে। কুলগুলো
ধাক্কা হয়ে উঠেছে। চোখ বেন ঘেরিরে আসছে, হাড় কাঁপছে
ঠক ঠক করে।

—কি রে, তোর এমন চেহারা কেন ?

উত্তর দিতে পারে না দীহ। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে
মাছে।

বিরক্ত হয় বীরেশ। বেক্রবার মুখে বেন এক আপদ এসে
ছুটল। সে চীৎকার করে উঠল—কি হয়েছে বলতে পারছিল
না হতভাগা।

অভিত কঠে এখানে বলতে লাগল দীহ—আজ্ঞে...সেই
খিরা বুড়ী...কেনন করে পেট দিয়ে ঢুকে—

বীরেশ হকার দিয়ে বললে—চুপ করেছ ত।

—আজ্ঞে না...। আজ্ঞে, কাছুর ধাবারে হাত দিয়েছিল...।

কাছুর কানতে দিয়েছে।

—বেশ করেছে।

—আজ্ঞে...বুড়ী মরে গেছে...সদে সদে।

অবৈধ্য হয়ে বীরেশ চীৎকার ছাড়ল—বুড়ী মরেছে—তা
কামছিস কেন ?

—বাবু।—কথা বলতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল দীহ।
কেনন করে বলবে সে—নালাবাবু ভিগারিণী বুড়ীকে পুসিলে
মিতে চেয়েছে—ও তাকে পারে পড়ে মিত্ত করছে। কেনন
করে প্রকাশ করবে—কেন ঐ বুড়ীরা তার শহরের সকল বাতী
হেতে দীহ চাকরের হনিবের বাতীর পেটে পড়ে থাকে। বাবু
মোটরে হর্ণ দিলেও কেন সরে না। ভিগারিণী কেবল তাকার
ক্যাল ক্যাল করে—কেন নালাবাবুদের কাছে হাত পেতে ও
পরলা চার না। কেউ কামে না; সেই আকাল থেকে সে
কাল, সে বোবা...একমাত্র দীহ হাত। তার চোখ কেটে
চৌচির হতে চাইছে, এখনই বুঝি কিম্বা দিয়ে রক্ত ছুটবে
তীরের মত।

বীরেশ উদ্ভাসের মত কি বেন বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ
দীহর উপর চোখ পড়তেই থমকে গেল। ওর চোখে বেন
ভিত্তস্তা জলছে।

আশ্রয়কার জেত মিথেকে বুহুর্ভে প্রস্তুত করে মিলে
বীরেশ। হরত এর কোন প্রয়োজনই ছিল না—হৃতিকের বছরে
বুঠো বুঠো ভাত দিয়ে কিনে মেওরা চাকর বৈ ত মর।
তবু বিবাস নেই—হ' বেল। পেট তোর খেয়ে খেয়ে সেদিনকার
জীর্ণ দেহ লোকটা ঘোড়ান হয়ে উঠেছে।

দীহর রক্তলোলুপ দৃষ্টি আশ্রম হয়ে উঠল। প্রাণপণে
চীৎকার করে সে কি বলতে চাইছিল। কিন্তু—‘ও না’,
বলতেই বিকট এক আর্জনাগের সন্দে সন্দে তার দেহ গড়িয়ে
পড়ল।

প্রচণ্ড এক ভয়ের শিহরণ আচ্ছন্ন করে কেলল বীরেশকে
—যেমন অপ্রত্যাশিত ভেমনই ভয়কর।



ভূমি-সেনা

ঐদেবেজ্ঞনাথ মিত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রে “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইবে। গত ২৪শে জুলাই হুগলী জেলার ঐরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জালীপাড়া থানার আটপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইয়াছিল। তৎপরে এই আগষ্ট কৃষি ও বাধ্যসচিবী ঐপ্রকুলচন্দ্র সেন



আটপুরে মনগঠিত ভূমি-সেনা দলকে ঐপ্রকুলচন্দ্র সেন
পাটগাছের পোকার আক্রমণ দিবারণের লক্ষ
ঔষধ ছিটানো দেখাইতেছেন

মহাশয়ের কলিকাতার আবাসে ভূমি-সেনার দ্বিতীয় দল গঠিত হয়। এই দলে কলিকাতাবাসী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ) যোগদান করেন। তৃতীয় দল গঠিত হয় ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে, কলিকাতার বেশবহু পার্কে অবস্থিত ভ্রামবাজার টেনিস ক্লাবে। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই দলে যোগদান করেন। গত ২৫শে আগষ্ট বর্জমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বর্জমান জেলার প্রথম “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হয়। এই উৎসব দুইই আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় কৃষি ও বাধ্য-সচিব মাননীয় শ্রী কে. এম. মুন্সী, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কৃষি ও বাধ্যসচিব ঐপ্রকুলচন্দ্র সেন, সরস্বতী-মন্ত্রী ঐনিকুণ্ডবিহারী মাইতি, শ্রম-মন্ত্রী ঐকালীন্দ্র নুগোপাধ্যায়, সেচ-মন্ত্রী ঐভূপতি মল্লিকার, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ঐদেবেজ্ঞনাথ পাণ্ডা এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন।

গত ২৬শে আগষ্ট হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামেও এক-দল ভূমি-সেনা গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্যবি আর কোন স্থানে ভূমি-সেনাদল গঠিত হইয়াছে কিনা জানি না। বাঙা ও কৃষিমন্ত্রী ঐপ্রকুলচন্দ্র সেন এক ভাষণে বলিয়াছিলেন

“প্রতি ইউনিয়ন, প্রতি থানা, প্রতি মহকুমা ও প্রতি জেলার এই ‘ভূমি-সেনাদল’ কৃষি-অধিকর্তার নির্দেশে একই আদর্শে অনু-প্রাণিত হয়ে কাজ করবে। দুইই আশা হয় যে, এইরূপ সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার অচিরেই আমরা জয়যুক্ত হব; পহা বতাই বজুর হোক না কেন, লক্ষ্যে গিয়ে আমরা পৌঁছবই। আজ কৃষির এই হৃদয়ে দেশে চাই ভূমি-সেনা। বিবেকানন্দের দেশে ত্যাগী ও কর্মীর অভাব হয় নি। আজও আশা করি বেঙ্গালেশবঙ্গের অভাব দেশে হবে না।”

মন্ত্রীমহাশয়ের ভাষণ অনুযায়ী প্রতি ইউনিয়ন, প্রতি থানা, প্রতি মহকুমা ও প্রতি জেলার ভূমি-সেনাদল গঠিত হইয়াছে কিনা, কিংবা গঠনের চেষ্টা হইতেছে কিনা তাহাও অবগত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে কৃষি ও বাধ্যসচিব মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পল্লী অঞ্চলে যদি “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হয় এবং সেই দলে যদি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল সকল সম্প্র-দায়ের প্রকৃত কর্মী যোগদান করেন তাহা হইলে সরকারী কৃষিবিভাগের পক্ষে কৃষির উন্নতি ও বাধ্য উৎপাদনে বিশেষ



বর্জমান কৃষিক্ষেত্রে ২৫শে আগষ্টের অহুষ্ঠানের একটি দৃষ্ট সহায়তা লাভ করা সম্ভব হইবে। তবে ভূমি-সেনাদলকে সর্বপ্রথমই তাহাদের কর্তব্য লব্ধে উপযুক্ত শিকা ও প্রেরণা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু সেইরূপ শিকা এবং প্রেরণা দিবার ও পরিচালনা করিবার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া

হবে হয় না। আটপুরে ও কলিকাতার যে “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইয়াছে তাহার সহিত আমি কিয়ৎপরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং ভূমি-সেনাদলের কর্মীরা বাহাতে অতি সস্তর শিকা পায় ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হয় সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-অধিকর্তার নিকট পত্রও লিখিয়াছিলাম, মৌখিক আলোচনাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার দপ্তর হইতে কোন নির্দেশ আসে নাই, “ভূমি-সেনাদলের” গঠন, শিকা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিরমাবলী আজ পর্যন্ত কোন স্থানে পৌছায় নাই। চুঃখের বিষয়, কয়েক মাস হইল আটপুরে প্রথম “ভূমি-সেনাদল” গঠিত হইয়াছে, তাহার ‘ব্যাঙ্ক’ ও কোদাল পাইয়াছে—কিন্তু কোদালের ‘সম্ভাবহার’ হইতেছে কিনা কেহই দেখিবার নাই। এই কারণে অনেকেই বলিতেছেন, ভূমি-সেনা গঠন একটা “হুজু” মাত্র। কিন্তু



বর্ধমান ভূমি-কেন্দ্রে নবগঠিত ভূমি-সেনার দল



বর্ধমান ভূমি-কেন্দ্রে সাঁওতাল রমণীগণের ভূমি-সেনা দলে যোগদান

বাতবিক পক্ষে সুগঠিত ও সুপরিচালিত ভূমি-সেনাদলের সাহায্যে কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত পরী-অঞ্চলের অভাব উন্নতিও সম্ভবপর। ইহাদের সাহায্যে পরী-অঞ্চল বহুলাংশে সম্বর হইতে পারে।

ঐপ্রসূরজ্ঞঃ সেন মহাশয়ের এক ভাষণ হইতে ভূমি-

সেনাদলের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। তিনি বলেন, “দেশসেবার মহান আদর্শে উৎসাহ এই ভূমি-সৈনিকদল গ্রামে গ্রামে, ধানার ধানার, প্রতি ফেলার মিরে বাবে আশা ও কর্মের বাণী—খাদ্যসম্ভার সমাধান করতে করবে সাহায্য। ভূমি-সেনা-বাহিনী শুধু যে কৃষিকার্যে সাহায্য করবে বা কৃষিযোগ্য জমির পুনরুদ্ধার করবে তাই নয়, এরা উদ্বৃত্ত করবে কৃষিকার্যের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, যার অভাবে দেশে শতকরা ১০ ভাগ কৃষিজীবী থাকতেও দেশবাসীর খাদ্যের সরুলায় হয় নাই, তাই ভূমি-সেনার কাজ হবে কৃষকের কৃতিত্ব বৃদ্ধি করা—কৃষক-সংখ্যা বাড়িয়ে তোলায়, উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করা, শুধু পরিকল্পনা করা নয়। অনেক ভুল-কলেজে বেদন দেশভাল ক্যাডেট কোর

রয়েছে সেই রকম ল্যাণ্ড এগ্রিকালচারিষ্ট কোর-এর প্রবর্তন করা দরকার। এই দলভুক্ত ভূমি-সেনারাই শুধু দেশবাসীকে সচেতন করে তুলবে কৃষিকে উন্নততর ভিত্তিতে স্থাপন করতে, তাদের শিকিত কৃতি মিরে করবে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের সাধনা, তারা আগিরে তুলবে দেশের মাঝে কারিক প্রবের

মর্যাদাবোধ। এরা শিকার আলোক ভুলে গিয়ে চুরি করে
লংকারের অভ্যাস, সম্ভার পদ্ধতিতে গঠনমূলক কাজ করে



বর্জমান কৃষিকেজে লাটকা আউশ ধান

দেশকে আনাবে তার উৎকর্ষ, এমনভাবে একযোগে দেশের
কৃষি, পশু-পালন, সেচ-ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি
কাজ করে দেশের এক সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি এনে দেবে। দেশের
বিভিন্ন গবেষণাগারে কৃষির উৎকর্ষমূলক অনেক তথ্য

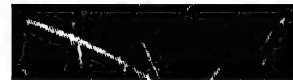


বর্জমান কৃষিকেজে ছুঁ-সেদাশন কর্তৃক কম্পোষ্ট প্রস্তুত

আবিষ্কৃত করেছে ও তথ্যে, কিন্তু গবেষণাগারে উদ্ধৃত কর-
পদ্ধতির সঙ্গে চাষীর যোগাযোগ সব সন্থে ঘটে ওঠে না।
গবেষণালব্ধ ফলের সুবিধা কৃষিকীবীরা বোঝে আনা প্রহণ করে

শতাংশপারনে পূর্ণোত্তমে অগ্রসর হতে পারছেন না। আনাবের
ছুঁ-সেদাশন এই যোগাযোগ রক্ষা করে উন্নততর বৈজ্ঞানিক
কৃষি-প্রণালী প্রবর্তনে চাষীদের সাহায্য করবেন। তাঁদের
এই কাজের উপরূত করে তোলার লব কৃষি-বিভাগ বিশেষজ-
দের দ্বারা বর্জমান শিকারান করবেন। যে সব বিষয়ে শিকা-
লাভ করে ছুঁ-সেদাশন কৃষি কাজে অগ্রসর হবে সেগুলো
হচ্ছে (১) বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা, (২) আবর্জনা-সার তৈরী
করা, (৩) শাক-সব্জীর চাষ, (৪) কলসের রোগ ও কীট নষ্ট-
নয়ন, (৫) গবাদি পশুর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও উন্নতি-বিধান, (৬)
আগাছা রক্ষন, (৭) সম্ভবমত সম্ভার-পদ্ধতিতে চাষবাসের
সম্প্রসারণ, (৮) ছোট ছোট সেচ-পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও
কার্যকরীকরণ, (৯) মাছের চাষ বাড়াও, (১০) শক্তির কলম
বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সংগঠন, (১১) উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির
উপায় প্রভৃতি।

জাতিবন্দনিক্রিষ্টে কৃষি ও এম উন্নয়নে উৎসাহ



বর্জমান কৃষিকেজে লাটকা আউশ ধান

বে-কোনও লোক এই ছুঁ-সেদাশন কৃষি-প্রণালীতে যোগদান করতে
পারবেন। কে-কোন বিভাগভনের হাজ-হাজীরাও এর সম্ভ
হতে পারবেন। ফল-ফলস্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সেই
অবসরে এক একজন শিকারের মেত্রে হাজ-হাজীরা গ্রামাঞ্চলে
গিয়ে চাষবাসের অনেক সহায়তা করতে পারেন। দেশের
বাড়ি ও দেশের দায়বের লগে বসিষ্ট বেলোদেশার মিডেবের

জানবুড়ির দিক হাড়াও আর পাঁচ জনকে এতে সহজেই সূতন ভাবে উকীণ করে তোলা যায়। এনে বা পহরভলীতে বেধানে হানাতাব দেই, সেই সব অকলের হাজরাহীরা দুটির অবসরে শাকসব্জী ও কলের চাব আরম্ভ করে বাতলমতা লম্বাধানে উকীপনা বন্ধ করতে পাণে। ইউরোপ ও আমেরিকার পহর-বালী ছেলে-মেয়েরা এইভাবেই হল বেঁধে এনে এনে হুড়িরে পক্ষে গ্রামবাসীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বোপহুজ হাপন করে তাদের মাঝে শিকা ও সংকতি বিভাগে সহায়তা করে থাকে।”

কৃষি ও বাত-সচিবের তাবণ খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সুগঠিত ও সুপরিচালিত কুমি-সেনা-বলের উপর পন্নী-অকলের লম্বি বহলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু কৃষি ও বাত-সচিবের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিতে

হইলে কুমি-সেনাবলের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত তাহা তাঁহার বিতানীর কর্তব্যচরীপত্রের উপলব্ধি করা অত্যাশঙ্কক।

পরিশেষে পন্নী-অকলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে অহরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন ব ব এলাকার “কুমি-সেনা” পঠনের চেষ্টা করেন। পন্নী অকলে বহু সুবক কর্ণের অভাবে আলভে দিমাতিপাত করিতেছেন, তাহাদিগকে কাজে লাগাইলে অনেক দিকেই দেশের উন্নতি লাভিত হইবে। নেতৃত্বের অভাবেই আজ পন্নী অকলের চরম দুর্গতি ঘটনায়ে। সকল কাজেই সরকারের সুপাশেকী হইয়া থাকিলে দেশ কসিনকালেও উন্নত হইবে না। অতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সমীচীন নহে।

সে দিন

জিকালিদাস রায়

সে দিন গিরেছে চলে কিরিয়ে না আর,
ধীমভার আবরণে সে প্রভুলভার।
কর বটে ছিল আর হিহু হুবে তাতে তার,
ছিল না বাতের বার এত করতার।

পথে পথে আইনের ছিল না বাঁধন,
হাম দিরে ছিল মাকো সাধ্যসাধন,
জিনিস কিনিতে যেরে ওজন দেবিনি চেরে,
হ'ত না হালদা দিরে হুবেলা বাঁধন।

ফ্রেনে গ্রামে পথে বাটে ছিল মাকো ভিত্ত,
ছিল না বাহার এত রঙিন শাড়ীর।
মেরেরা ছাচেদি লাভ বয়েদি নহুদী লাভ,
অকারণে হ'ত মাকো বাতীর বাহির।

মাহুদ হুয়নি এত বর্ষবিবুধ,
কবিতার রসগাণে ছিল উৎসুক।
আকাশে আছিল রবি আলোকিত ছিল সবি,
ছিল দেশে রসিকতা হাসি-কৌতুক।

কাব্যে হুদ ছিল ভক্তি গানে,
কর্ণে শিঠি ছিল কুণ্ডি এগণে।
ছিল না সিনেমা মোহ এমোদের লম্বায়োহ,
কালো বাজারের দান ভলিনি কানে।

হুবারা পাখারা নর, পরিভ বৃত্তি,
ছিল না তাদের কোন নবী বা হুতী।
পথে যবে এত হুবি নিত না ঢালিয়া হুবি
তাহাদের মোহামলে নিতি আহতি।

সার্কজমীন পুজা, মালের নামে
ছিল না এ মাতামাতি ডাইনে বানে।
অভিনেতা কীতাবীর ছিল না দেবতা পীর।
তুচ্ছে নিত না কেউ উক্তদানে।

বাগেদি লড়াই হি'দু-হুললমানে,
মেখনা হুধর ছিল ভেটেলী গানে।
বিহারী উক্তিরা বারা পর ছিল মাকো তারা,
বাকালীই ছিল প্রু সকলধানে।

ভাড়াটরা হুয়নিকো বাতীর মালিক,
ভাড়াভ না বাস। হতে শুকরে মালিক।
হুয়ীর হুয়নি টেকি, চলিত না এত বেশি।
চোখ রাঙাত না এত মালিক হালিক।

সে দিন গিরেছে চ'লে কিরিয়ে না আর।
মাই সেই সুধর স্তত সংসার।
বকে পাশাপ হসি' ইংরাজ গেছে চসি'
যেবে গেছে তার সেই কুরো কালুচার।

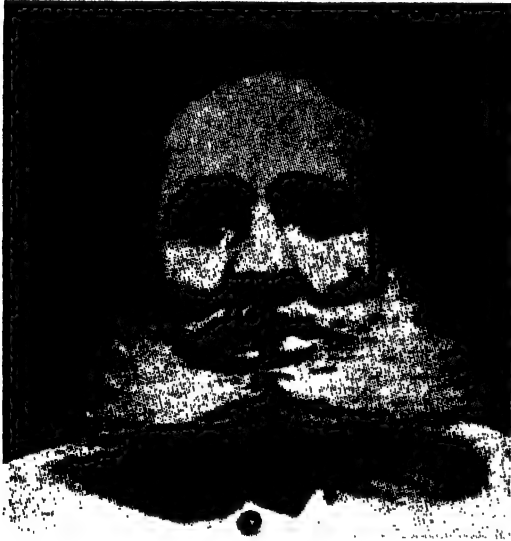
ভীলজাতির মুক্তিসাধক মোতীলাল তেজাবৎ

শ্রীমলিনীকুমার ভদ্র

১

ভীলরা ভারতের এক প্রাচীন প্রাচীন জাতি। সামান্য, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে এই আদিম জাতির কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে, দ্রোণাচার্যের ঐতিহ্যের সময়ে তিনি বহুবিধ অত্যাচার করতেন সেই একলব্য ছিলেন ভীলজাতির। শুধুকে দক্ষিণাধরপ একলব্যের অস্থূর্তদানের কাহিনী স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভীলদের বীরত্ব সাহস ও দেশপ্রেম অভূলনীয়। পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রাজপুত রাণাদের আমল পর্যন্ত এদের বহু বীরত্ব-কাহিনীর সহিত আমরা পরিচিত আছি।



ভীলনেতা মোতীলাল তেজাবৎ

বহুদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকরে রাণা প্রতাপ বেদিন মুষ্টিবের সৈন্যদল নিয়ে প্রবল প্রতাপাধিত দিল্লীর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেদিন রাজপুতানার আদিবাসী ভীলরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল—রাণার চরম দুর্ভিক্ষেও তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। সেদিন এই আদিম জাতির লোকেরা যে বীরত্ব, ত্যাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও প্রকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠার তা বর্ণাকরে জাঙ্ঘল্যমান থাকবে।

রাণা প্রতাপের সঙ্গে ভীলদের সম্পর্কের কথাই শুধু সাধারণের জ্ঞান আছে। কিন্তু রাজপুত জাতির রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রায়তকাল থেকে ভীলরা কত ভাবে যে তাঁদের

সহযোগিতা করেছে তার আর অন্ত নেই। কথিত আছে, যে, রাজপুত-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাপা রাবলকে রাজা তিন বৎসর বয়সের সময় ভীলরা অকলে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করে। পরে বংশানুসারে তারাই তাঁকে সিংহাসনে বসায়। হেলেনবেলার বেবা আর বালিরা নামে দু'জন ভীল তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করত।*

ভীলজাতির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এদের স্বাধীনতা-প্রীতির উল্লেখ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভীলদের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সেইজন্মেই আধুনিককালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আঙ্গানে ভীলজাতির চিত্ত সহজেই লাঞ্ছিত হয়েছে। পৌরবর্মের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভীলরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করে অবর্ণনীয় দুঃখস্বপ্না বরণ করে নিয়েছে, মলে মলে পুলিশের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছে। দুঃখের বিষয়, তাদের সেই ত্যাগ, ভিত্তিক ও বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা অনেকেরই পরিচিত নই।

ভীলরা ভারতের নামা প্রদেশে ছড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভীলসম্প্রদায়ের মধ্যে বীর দেশপ্রেমিকদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল রাজস্থানের ভীলদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করব—তাও অত্যন্ত সংক্ষেপে।

আধুনিক কালে ডুন্দরপুরের ভীলদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। শ্রীশিবলালকী কোর্টজিরা তাঁর ডুন্দরপুর রাজ্যের ইতিহাসে বলেছেন যে, উদবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে গোবিন্দ গুরু নামক জনৈক সাধুর নেতৃত্বে 'ভীল-সুবার' আন্দোলন শুরু হয়। তিনি স্বজাতিরদের বর্মার এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কার্যপ্রণালী নির্দেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টার স্বপ্ন জাতির মধ্যে জাগরণের সূচনা দেখা দিলে তখন কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যে তাঁরা হলেন বহুপরিকর।

কিছুকাল পরে একদিন দামগড়ের মহাত্মা নামক স্থানে প্রায় সমগ্র বাগড় (ডুন্দরপুর, বাঁশবাড়া আর দক্ষিণ বেবাড়) অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভীল কোনো উৎসব উপলক্ষে জমায়েৎ হলে, উপরোক্ত তিনটি স্থানের পশ্চিমের সৈন্য আনয়নী

* হমারি আদিম জাতি—শ্রীঅবিল বিনয়, পৃ. ১১২

+ ডুন্দরপুর : এক সিংহাবলোকন

করে তাদের উপর নির্দিষ্টারে ভলি চালাবো হ'ল। এই ভলি চালানার কলে প্রায় আট শ' লোক দ্বারা গেল, বহু লোক হ'ল আহত। এই প্রকার মৃগসং আচরণ দ্বারা শাসক-সম্রাটের সামরিক ভাবে ভীলদের আন্দোলনের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন।

১৮৯৪ সনে ডুন্দরপুরের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক রিজেন্সী কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। অতঃপর এই রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে এক মন বিধান প্রবর্তিত হ'ল। এই 'মজা কাহুন' অহুসারে ভীলজাতি এক শ্রেণীর অপরাধপ্রবণ জাতি (দারারমপেশা কৌর—Criminal tribe) বলে গণ্য হয়।

প্রথমতঃসবুহের বাধা অতিক্রম করে গিরিনির্ভরিত প্রবাহ যেমন সময় সময় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, তেমনি মাঝে মাঝে সরকারী বিধিনিষেধ অগ্রাহ করে ভীল আন্দোলন প্রচণ্ড ভাবে আত্মপ্রকাশ করত, সবে সবে সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে সে আন্দোলনের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করবার অভিভূত হয়ে উঠতেন। তারতবর্ষের বাবীনভালাতের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও ব্রিটিশ সরকার ভীলদের উপর পুরোদমে দমননীতি চালিয়েছিলেন। তাঁরা বার বার বহু ভীলকে প্রেক্ষতার করেছেন, ভীল জনমভাদের নির্দোষিত করেছেন, কোনো কোনো জারগার জনতার উপর বিনা দোষিত্যে করা হয়েছে লাঠি চার্জ, কলে শত শত লোক আহত হয়েছে। ভীল ভাষার প্রকাশিত প্রচারপত্র পুড়িকা ভাষণ এবং হুতাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে—১৪৪ দ্বারা প্রয়োগ করে প্রভাতকৌরী হয়েছে নিষিদ্ধ, কোনো কোনো অকলে লাঠা আইন জারী হয়েছে, পুলিশের হস্তে ভীল মহিলারা পর্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু এত লাহন্য অপমান এবং নির্দোষ সত্ত্বেও ভীলজাতি নিজেদের আদর্শে রয়েছে অবিচলিত, তাদের বাবীনতা-স্বহাকে দমন করা ব্রিটিশ পর্বশেষের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

২

এই বাবীনতাগ্রস্ত ভীল জাতির মধ্যে বর্তমান রূপে এমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যার আদর্শনিষ্ঠার হুলা মেই। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ বহুদেশপ্রেমিকদের সবে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য—যার তাঁর মোতীলাল ডেকাবৎ। কিন্তু হুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে ভারতের এই অতত্তম শ্রেষ্ঠ ভূতিকাধক সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো মালোচনা হয়নি।

১৮৪৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে বেবারের তৎকালীন মগরা জেলার এক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ভীল-পরিবারে মোতীলালের জন্ম হয়। ইনি মোতীরাউ একরকম লেখাপড়া শিখা করেন

এবং হিন্দী ভাষার বাহুলি জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু নিজের অস্তর থেকে ইনি যে শিকালাত করেন পুণিসত্ত বিদ্যা তার কাছে ছুছ। অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশের বাহুবলকে ভালবাসতে শেখেন—শেখপ্রেম এবং মানবতার আদর্শে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জারগীরদারেরা সকলেই থাকেন ব্যক্তিগত দ্বার্স নিয়ে মগ, কিন্তু মোতীলালের বেলার এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। প্রজাদের উপর জারগীরদার, তথা সরকারী কর্মচারীদের হুমকিবরদভির বিনষ্ট পরিচয় লাভ করে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল—কি তাতে হৃদয় প্রজাদের হুঃখমোচন করা যার তাই হ'ল তাঁর একমাত্র ভাবনা। ১৯২১ সালে তিনি প্রথম ভীল আন্দোলনের 'বীতা উঠালেন'।* তিনি বিভিন্ন স্থানে মেলা ও উৎসবাদির আয়োজন করে বক্তৃতা দি দ্বারা সমবেত জনমতলীর সম্মুখে তাদের অপরিণীম অভাব, দৈহত এবং হুঃখহৃদনার চিত্র সূচিত্তে ভুললেন। 'বেবার পুকার' নামক দেশায়বোধ-উদ্বীপক পুস্তিকা প্রামে প্রামে বিস্তরণ করতে লাগলেন। এই সমস্ত প্রচার-কার্যের কলে অগণিত ভীল মরদারী বাবীনতার অগ্রিময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত করলে। "মারব না হয় মরব",—এই আদর্শে তারা হয়ে উঠল অহুপ্রাণিত। এমনি তাতে ভীলদের বাবীনতা আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেখে জারগীরদার আর সরকারী কর্মচারীরা সমস্ত সমস্ত দাবিতে গেলেন এবং বিরোধীদের দমন করবার অভিভূত হয়ে উঠলেন। সিরোহী, বেবার আর ইতা এই তিনটি অকলের কোনও কোনও গ্রাম আঙন দিয়ে আলিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯২২ সালের ১ই মার্চ ইডরে বহুসংখ্যক ভীল শহীদ হ'ল।

এই আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে তখন মহাত্মা গান্ধীর তরফ থেকে জীমণিলালজী কোঠারী সিরোহীতে গমন করলেন। মণিলালজীর মধ্যস্থতার ভীল-বেতা ডেকাবৎ আর ব্রিটিশ অফিসার হালিডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা আপোষ-সকর ব্যবস্থা হ'ল। হালিডে ভীলদের হুমতম দাবি পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করার ডেকাবৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন। কিন্তু একেজ্ঞেও ব্রিটিশের চিত্রচিত্রিত নীতির ব্যতিক্রম হ'ল না—'রাজপুতানা একেজী' বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলেন। কলে ভীলরা আবার পর্বশেষের উপর বিরূপ হয়ে উঠল, আবার তারা মাথা কাটা দিয়ে উঠবার উপক্রম করলে। এবার

* আগেকার দিনে পশ্চিম ভারতের কোন কোন অকলে কোন হুঃসাহ্য কর্ণে প্রমুখ হওয়ার পূর্বে পানের খিলি তুলে নিয়ে হুঃখ বেওয়ার রেওয়ার ছিল। একেই বলে বীতা উঠানো। এর থেকে 'বীতা উঠানো' কথাটি পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে প্রবাদ-বাক্যের রূপে প্রচলিত হয়ে গেছে।

আন্দোলনকে অদূরেই বিনষ্ট করবার জন্য সরকার কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ১৯২২ সালের মে মাসে বোহেরা তহনীলে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পুনরায় তলীবর্ণ করলে—তুলা আর ধলোলিলা নামে দুটি গ্রাম আলিয়ে দেওয়া হ'ল। এই ঘটনার অভ্যন্তর বিচলিত হয়ে 'রাজহান সেবাসল্'র কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রতিনির্ভর প্রেরণ করে স্থানীয় লোকদের দিকট থেকে এ সম্বন্ধে বোদ্ধাব্যবস্থা নিতে লাগলেন। গ্রাম্য পকারেভের প্রযুক্তি এবং অভ্যন্তর হয়ে তাঁরা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের যে সমস্ত কাহিনী জানতে পারলেন তার তুলনা হেলা তার। তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশিত হ'ল যে, উক্ত দুটি গ্রামে ৩২৫টি পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর ১৮০০ লোকের গ্রামহানি হয়েছে, ৬৪০টি ঘর আলিয়ে দেওয়া বা বিনষ্ট করা হয়েছে, ৭০৮৫ মণ ধান্যসামগ্রী আর ৬০ গাভী বাস আলানো বা লুট করা হয়েছে, নিহত এবং অগত্যা পড়ার সংখ্যা ১০৮টি। যে সমস্ত মাল লুণ্ঠন করা বা আলিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মূল্য ১০,০০০ টাকা।

এই অকথ্য অত্যাচার করেও ব্রিটিশ গবর্নেন্ট কান্ড হলেন না, তীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্য তাঁরা মোতীলাল ভেজাবৎকে সাত বৎসরের জন্যে কারাবন্ডে দণ্ডিত করলেন। মোতীলাল কিন্তু ব্রিটিশের চোখে মূলো দিয়ে কেঁদার হয়ে যান এবং পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে বরবার জ্ঞে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। তাঁরা আর এক ব্যক্তিকে মোতীলাল ভেজাবৎ মনে করে ধরে নিয়ে এল—ব্রিটিশের তার বিচারে সে বেচারার হ'ল প্রাণদণ্ড। যাতে তীলদের মধ্যে নৈরাত্তের স্ফূর্তি হয় এবং তারা জানতে পারে যে তাদের নেতা আর ইহকালে নেই, সেই উদ্দেশ্যে গবর্নেন্ট সেই ব্যক্তির ছিন্ন মূর্তি বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করতে লাগলেন।

এবার আর সুকিরে থাকা ভেজাবৎের দিকট সমীচীন বলে মনে হ'ল না—জাতিতে আশ্রিত করবার জন্যে আত্মপ্রকাশ করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। ১৯২৯ সালের ৩রা জুন তিনি বেহারার ইত্তর রিহাসভের খেতলাস নামক স্থানে ব্রিটিশ গবর্নেন্টের দিকট বরা বিলেন। বিচারে তাঁকে সাত বৎসরের জন্যে কারাবন্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। উত্তরপুর সেন্ট্রাল জেলে নির্দিষ্টকাল কারাবন্ডে ভোগ করবার পর ১৯৩৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মোতীলাল কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের কলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজের ভাবে বসে বসেইলেন না। তীলজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনকে তিনি জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। দিনকতক বিজ্ঞান

করে আবার তিনি মৃতদেহ উত্তম কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ১৯৩৮ সালে মেবার প্রজামণ্ডল স্থাপিত হওয়ার পর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃ-প্রচেষ্টার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, কলে পুনরায় তাঁর কারাবন্ড হয়। স্বাধীনতার জেল থেকে তিনি স্বাভাৱ্য পেলেন বটে, কিন্তু গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় বিবাহ। এই জন্মান্তরের অদৃষ্টে লেখেন মি। '৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় তীলজাতিও যখন "করেদে ইয়ে ময়েদে" মন্তে উদ্ভূত হয়ে উঠল তখন তাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মোতীলাল। তাঁর কঠোর শ্রমিত হয়ে উঠল বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। বেগতিক দেখে সরকার ১৯৪০ সালের ২৪শে জানুয়ারী পুনরায় তাঁকে উত্তরপুর সেন্ট্রাল জেলে পুরলেন। এবার তাঁর দেহ বৎসরের কারাবন্ড হ'ল।

জাতির মুক্তি-সাধনার উৎসাহীত্ব প্রাণ এই তীল-নেতার জীবন একটানা হৃৎস্পন্দনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সুদীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে তাঁর কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে আর অজান্তবাসে। বিভ্রাটের আরম্ভের হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যৌবনেই তিনি বিশংসহুল কণ্ঠকাকীর্ণ পথকে বেছে নিয়েছিলেন, তারপর থেকে কণ্ঠক-মুক্তি সাধার পরে সেই বহুর পথেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। চরিত্রবল এবং আত্মত্যাগের দ্বারা স্বজাতির নঃ-মারীর ক্ষমকে তিনি নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তীল মরমারী তাঁকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে তা রাজপুতানার বিখ্যাত লেখক অখিল বিনয়ের উক্তিতে সুপরিষ্কৃত। তিনি লিখছেন : "হর্মে করবরী ১৯৫০ ম' আপকে দর্শন করনে কা সৌভাগ্য প্রাপ্ত করা বা। আপ কোটরা ভোপট (উত্তরপুর) ম' ১২-১৩ করবরীকে আদিবাসী সম্মেলনকে স্বাগতাব্যাক্তি। আপকী বিনয়তা ঔর সেবা ভাব দেব কর হয় মুক্ত হো গরে। হর্মে দেখা কি তীল পুরুষ ঔর রিহা। স্বাভাবিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা মে আপকে চরণ ম' প্রণাম করতী বী", ঔর আপকা আশীর্বাদ পামে কী ইচ্ছুক রহতী বী। ইসনে হামুহ হতা কি তীল লোগ আপকে দেবতা সম্বন্ধে হৈ, ঔর আপকে নাম পর তরহ-তরহ কী মনোভী রা মন্ত মানতে হৈ।"

অর্থাৎ, "১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। উক্ত বৎসরের ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইনি উত্তরপুরের কোটরা ভোপটে অসুস্থিত আদিবাসী সম্মেলনের অধ্যক্ষী সমিতির সভাপতির পদে বৃত্ত হন। ঐর বিনয়তা আর সেবার ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে বাই। আমি দেখলাম যে, তীল জী-পুরুষেরা আন্তরিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে তাঁর চরণে প্রণাম বিবেচন করছে—তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্যে তাদের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এসব দেখে শুনে আমার প্রতীতি হ'ল যে, তীলরা তাঁকে দেবতা বলে মনে করে, তারা নবর নবর তার নামে বিবিধ প্রকারের দানত পর্য্যন্ত করে।"

মোতীলাল তেজাবতের মেতুসে তীলদের অভ্যুত্থানের কাহিনী আধুনিক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি পৌরবর্ষ অধ্যায়, কিন্তু পরিভাষার বিষয়, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সে কাহিনী স্থান পায় নি। ইংরেজ যখন দেশের মালিক ছিল তখন তারা আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন নৃষ্টি করবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অকল নৃষ্টি করে তারা সেগুলিতে বহুতর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। আদিবাসীদের নৃষ্টি-আন্দোলনের কথা হয় তারা কৌশলে চেপে রেখেছে লতুবা তার অপব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। খাসিরা-বিজোহের নারক ভীরত সিংকে তারা চিত্রিত করেছে ‘রক্তপিপাহ’, ‘বুনো’ ‘বুনী’ রূপে, বাগরাই গাইডিলিউকে দিয়েছে বাহুকরী আখ্যা, অজ্জের কেতা ভোরা বিজোহের নারক আত্মিক শ্রীয়ার রাজাকে (দীতায়াম বাজু) কারাগারীদের অন্তরালে নৃশংসভাবে ভুলি করে হত্যা করেছে।

দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার বধ্যবধ ইতিহাস রচনার পথে যে সকল বাধা ছিল সেগুলি এখন বহুলাংশে অপসারিত। আজ তাই মৃত্যু করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন। এই মৃত্যু ইতিহাসে দেশের জন্তে আদিবাসীদের দুঃখবরণ ও বলিদানকে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এ কথা তুললে চলবে না ভীরত সিং, গাইডিলিউ, ভারতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তক মুতামেতা বীরলা ভগবান, মেতা নির্মল মুতা, আগষ্ট-আন্দোলনে প্রাণদত্তে দত্তিত আগাদের কমলা মিরি, কাছাড়ী মেতা মনুবা, তীল জমনারক মোতীলাল তেজাবৎ প্রভৃতির সক্রিয় দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের কাহিনী বাদ দিয়ে ভারতের নৃষ্টিসংগ্রামের সর্বাকসম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।*

* লেখকের প্রকাশিতব্য ‘আদিবাসীদের বিচিত্র কথা’ নামক পুস্তকের একটি অধ্যায়।

চারি বেদের পৌরোপৰ্য্য

শ্রীবাসনা সেন, এম-এ, বেদান্ত-তীর্থ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর বেদ। অপৌরুষেয় বেদের উপর ভারতের প্রায় সমস্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত। বহু দিন হইতে আমাদের দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বধ্যবধ আলোচনা দি না হওয়ায় অনেকের মনে এই অথও বেদ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। আজকাল আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে একরূপ কথা শুনিতে পাই যে, ঋকসংহিতা সকলের পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং তার পর যজুঃসংহিতা ও সামসংহিতা রচিত হয়। অথর্বসংহিতার রচনা বহু পরবর্তীকালে, যেহেতু ইহার ভাষা ঋকসংহিতা অপেক্ষা সরল ও সহজ। তার পর ঋকসংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল বহু পরবর্তী, কেননা ইহাদের ভাষা অগ্রাঙ্গ মণ্ডল অপেক্ষা সরল এবং বৈদিক সংস্কৃতির ন্যায় তুচ্ছ নহে। এই সকল যুক্তি যে সম্পূর্ণ অর্থহীন তাহা আমরা এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া যদি আমরা বেদ সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করি তবে যে তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং আভিযুক্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বেদ সম্বন্ধে নানাবিধ

মতামত যে বধ্যবধ অধ্যয়নপ্রসূত নহে তাহা বুঝা যায়। এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঋকমন্ত্র ও সামমন্ত্রে এইমাত্র প্রভেদ যে, ঋকমন্ত্রগুলি গীত হইলে তাহাই সামমন্ত্র হইয়া থাকে। সামগানের আধারীভূত মন্ত্র ঋকমন্ত্রই বটে। সামের আধারীভূত ঋকমন্ত্রকে ‘যোনিঋক’ বলা হয়, ঋকমন্ত্রই যজুর্জাদি স্বরসংযোগে গীত হইলেই তাহাকে সামমন্ত্র বলে। ‘তেষামৃগং যজুর্জাৎ যশেনপাদবাবহা’ (জৈমিনি সূত্র ২।১।৩৫), ‘গীতিষুদমাখ্যা’ (জৈমিনি সূত্র ৩।১।৩৬), ‘শেষে যজুঃশব্দঃ’ (জৈ. সূ. ৩।১।৩৭)—এই তিনটি সূত্রদ্বারা ভগবান জৈমিনি ঋকমন্ত্র, সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রের লক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য অথর্বসংহিতার মন্ত্রগাণি ঋকমন্ত্রই বটে। শান্তি, পৌষ্টিকাদি দৃষ্টকল কর্মের অভিধায়ক ঋকমন্ত্রগুলি একত্র সঙ্কলিত হইয়া অথর্বসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আথর্বনিক মন্ত্র ঋকমন্ত্রই বুঝিতে হইবে।

ঋকসংহিতাতেও যে যে স্থলে মন্ত্রধারা গানের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত স্থলে সামমন্ত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। অপ্রগীত মন্ত্রই ঋক এবং প্রগীত ঋকমন্ত্রই সাম। এজন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে যে ‘তন্মাত্র ঋচি অধ্যুতঃ সাম গীরতে’ (ছা. উ. ১. ৬. ৫)।

সংহিতা এই প্রবন্ধে গীতিবৃত্ত মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া ঋক-সংহিতাতে সামমন্ত্রের সত্তা দেখাইতেছি।

ঋকসংহিতা পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য বেদ সকল পরবর্ত্তীকালীন রচনা এই বৃত্তি অত্যন্ত ভ্রান্ত। তাহার প্রথম কারণ 'সামানি' এই শব্দ ঋকসংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। যদি সামসংহিতা পরে রচিত হইয়া থাকে তবে ঋকসংহিতার মধ্যে তাহার উল্লেখ কিরূপে সম্ভব? অথর্বসংহিতা বহু পরবর্ত্তী ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। অথর্বসংহিতার ঋত্বিক 'ব্রহ্মা' শব্দ ঋকসংহিতায় উল্লিখিত আছে। তিন সংহিতার একত্র উল্লেখ বহবার ঋকসংহিতার মধ্যে দেখা যায়।

অথর্বসংহিতার মন্ত্রসকল ঋকসংহিতায় আদ্যাত বহিয়াছে বলিয়া অথর্বসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত হইল না। অন্যথা ঋকসংহিতার মধ্যে এই দুই সংহিতার এবং এই দুই সংহিতার ঋত্বিকগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋচাঃ যঃ পোষমাস্তে পুণ্ডরান্
গায়ত্র্যঃ যো গায়তি শক্রীর্যু।
ব্রহ্মা যো বদতি ভাতবিভাঃ
বজ্রতমাজ্জাং বিসিরীত উষ। (ঋ, সং ৮. ২. ২৪)

এই ঋকমন্ত্রে ঋক, সাম, অথর্ব এবং বজ্র এই চারি সংহিতার উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মা অথর্বসংহিতার ঋত্বিক, তাহার নাম এই মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। বজ্রবেদের ঋত্বিক অথর্ব্যুকে বজ্রের মাজ্জা নির্মাতারূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া যাস্ক বলিয়াছেন—'ঋত্বিক কর্মনাং বিনিয়োগমাচষ্টে' (নিকৃন্তম্, উপোদঘাতপ্রকরণ ১৮)।

ঋকসংহিতার পুরুষসূক্তের মধ্যে 'তন্মাত্রাং বজ্রাং সর্বহতঃ ঋচঃ সামানি জজিরে। ছান্দ্বাংসি জজিরে তন্মাত্রাং যজুস্তন্মাত্রাৎ অজারত।' (ঋ. সং. ৮. ৪ ১৮)। এই পুরুষসূক্তের মধ্যে ঋক, বজ্র এবং সামের কথা একত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

'সাম দিবর্হা মহিতিগৃহীতঃ সহস্ররেতা
বৃষভম্বিয়ান্।' (ঋ. সং. ৪. ৫. ৩)
বজ্রেরধর্মী প্রথমঃ পথন্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপাথেন
আজনি (ঋ, সং ১. ৩. ৪)

সামসংহিতার মধ্যে অথর্বসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'তাময়ে পুত্রানমধ্যধর্মী নিরময়তঃ সূর্যো বিবত বাবতঃ।
তসু ষা লঘাভঃ ঋচিঃ পুত্র ইমে অথর্বগঃ বৃষহণঃ পুরন্দরন্।'
(সাম বেদ ১. ১. ২)

অথর্বসংহিতা যদি বহু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়া থাকে তবে তাহার উল্লেখ সামসংহিতার মধ্যে পুনঃ পুনঃ কিরূপে সম্ভব হইল? অথর্বসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত না হইলে সামসংহিতায় অথর্বশব্দ ব্যবহৃত হইল কেন? ঋক-

সংহিতায়ও এই মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। (ঋ. সং. য. ৬. ১৬. ১৩-১৪), (ঋ. সং. অষ্টক, ৪. ৫. ২৪)।

ঋকসংহিতার বহুস্থানে সামের উল্লেখ হইয়াছে। 'স্বমর্কেতিভুং সামভিভুং গায়ত্রৈশ্চর্ষণয়োঃ' (ঋ. সং. ৩।১২২) এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে চর্ষণিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অর্চনামন্ত্র দ্বারা বর্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে এবং গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে।

'অর্চন্ত একে মহি সাম মমত ভেন সূর্য্যমবোচ'
(ঋ, সং. ৩।২৩৭)

এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যকে দীপ্ত করেন।

'বৃহদিত্যার গায়ত মরতো বৃহহস্তম (ঋ, সং. ৩।৩১২)
বজ্রবর্দ্ধক বিশ্বদেবগণ দ্যুতিমান ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এই গান দ্বারা দীপ্ত সর্বদা জাগরুক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়া-
ছিলেন।

'উল্লাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সযনেষু শংসি
(ঋ, সং. ২।৮১২২)

অর্থাৎ হে শকুনি। উল্লাপাতা বেরূপ সামগান করে সেইরূপ তুমি গান কর। বজ্র ব্রহ্মপুত্রের দ্যুত শব্দ কর।'

সায়নাচার্য লিখিয়াছেন—বোল জন ঋত্বিকের মধ্যে 'ব্রহ্মণাং শংসী' নামে বজ্রের একজন ঋত্বিক ছিলেন।

'প্র ব ইন্দ্রার মাদনং হর্ঘ্যবার গায়ত' (ঋ, সং. ৫।৩১৫)
অর্থাৎ হে সধাগণ। তোমরা সোমপারী হর্ঘ্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে মদকর স্তোত্র গান কর।'

'বা বিবাসাং জনিতারা মতীনামিত্রাবিকৃ
কলশাসোমধানা'

এবং নিরঃ শতমানা অবন্ত প্রতোবাসো গিরমানাসো অর্কৈঃ
(ঋ, সং. ৫।১১৩০)

অর্থাৎ 'হে ইন্দ্র ও বিকৃ। তোমরা সমস্ত জ্ঞতি উৎপাদন করিয়া থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসধরণ। উচ্চাধাণ স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোত্রগণ কর্তৃক গৃহমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক।'

'বি বধাচ কীত্তাসো ভরন্তে
পংসন্তি কেচিগ্নিবিধো মনানাঃ' (ঋ, সং. ৫।১১১০)

'বধন মেধাধিগণ জ্ঞতি উচ্চারণ করেন কেহ কেহ জ্ঞতি করতঃ বিবিশ্বেসু পাঠ করেন।'

অগ্নির্জাগার তমুচঃ কামরন্তে
অগ্নির্জাগার তমু সামানি বজ্জি। (ঋ, সং. ৪।২১২৫)

'সভজাত কোবল প্রকৃতি অগ্নিকে স্তোত্রের সহিত হব্য প্রদানপূর্ব্বক পোষণ করিয়াছেন।'

'বেমি বা পুন্নর জসে বেমি স্তোতব আয়ুশে' (ঋ, সং. ৫।৩১৩০)
'হে পুবা। তোমাকে প্রসাদিত করিতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিবৃত্ত। তোমার জ্ঞতি করিতে ইচ্ছা করি।'

ঋকসংহিতার মধ্যে চারি বেদের চারি জন ঋত্বিকের নাম বহবার 'উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋত্বিক হোতা, সামবেদের ঋত্বিক উদগাতা, বজ্রবেদের ঋত্বিক অথর্ব্যু এবং

অধৰ্ববেদের ঋত্বিক ব্রহ্মা। এই চারি জন ঋত্বিকের নাম ঋগ্বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য সংহিতাসকল ঋক্‌সংহিতার পরবর্তী রচনা নহে। বজ্রবেদের ঋত্বিকের (অধ্বর্যু) নাম ঋগ্বেদে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রা, প্রিয়ং বকন্তে নিহিতং পদং বৈ’—এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, পাঁচ জন অধ্বর্যুর সহিত সাত জন হোতা গমনশীল অগ্নির প্রিয় স্থান বক্ষা করিতেছেন। এস্থলে যে অধ্বর্যু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বজ্রসংহিতায় উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। এই অংশও বেদের রচনাবিভাগ কেবলমাত্র ভাষার দিক হইতে করিতে গেলে বহু ভ্রমপ্রসাদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

উত্তিষ্ঠতিমিবো দ্যাহতৌনি মায়াবান ব্রহ্মা দহ্যত।

(ঋ. সং. ৩।৫।১২)

অধৰ্বসংহিতার ঋত্বিক ব্রহ্মার নাম ঋক্‌সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

‘অজুহানো যুতপৃষ্ঠং পুষক-ধক্ষৰ্যাবো হবিষামৰ্জধক্ষম্।

‘হে অধ্বর্যুগণ। যুতপৃষ্ঠ, হুলবিলুপ্ত বহিঃহোমকরতঃ প্রদাহ কর।’

ঋক্‌সংহিতার ২, ৬, ১৩।১৪ বর্গে যে বারটি ঋক্‌মন্ত্র

আছে তন্মধ্যে ১১টি মন্ত্র অধ্বর্যুগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আয়াত হইয়াছে।

‘অধ্বৰ্যাবো ভরতেশ্বার গোম বামজৈভিঃ সিকতা ময়্যগচ্চঃ’—

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, হে অধ্বর্যুগণ! ইন্দের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর।

‘অধ্বৰ্যাবো বো অপো বত্রিবাংসং বুজঃ জধানাশন্তেব বুক্‌ব্।’

‘হে অধ্বর্যুগণ। যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বুজকে অশনি দ্বারা বুদ্ধের দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সোমভিলাষী ইন্দের জন্য সোম আহরণ কর।’

এইরূপ ১১টি ঋক্‌মন্ত্রে অধ্বর্যু শব্দ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

‘অধ্বৰ্যাবোহপ ইতা সমুদ্রমপানপাতঃ হবিষা বজ্রধক্ষম্।’

‘হে অধ্বর্যুগণ। জলের সমুদ্রে গমন কর। ‘অপানপাতঃ’ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যাদ্বারা পূজা কর।’

এই সকল বৈদিক মন্ত্র হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিরাট বজ্রকে সমুখে রাখিয়া এই চারি সংহিতা রচিত হইয়াছিল। বজ্র ব্যতিরেকে এই চারি সংহিতার রচনা করিতে গেলে ঋত্বিক কর্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে। চারি ঋত্বিকের একত্র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, চারি বেদ যুগপৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা ঋত্বিকগণের উল্লেখ যদি ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া যায় আর সেই সেই ঋত্বিকগণ যে যে সংহিতা অজুযায়ী বজ্রাদি সম্পন্ন করিবেন তাহা ঋক্‌সংহিতার শরে রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয় তবে এই যুক্তি অত্যন্ত জাতিমূলক হইবে।

শাস্ত্রান্তা পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের ১ম ও ১০ম মণ্ডলকে পরবর্তীকালীন রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহারাই এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, ১ম ও ১০ম মণ্ডলের মন্ত্র সকল সরল ও সহজবোধ্য। এস্থলে আমরা ১ম ও ১০ম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে এগুলি সরল তো নহেই, উপরন্তু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং নিক্কটকার ব্যাক এগুলিকে দুরূহ বলিয়াছেন।* ঋক্‌সংহিতার ১০ম মণ্ডলে ‘স্বণোর জর্জরী তুর্জরী তু’ (ঋ. সং. ১০. ১০. ৬) ইহা দ্বারা আপাতঃদৃষ্টিতে কোন অর্থপ্রতীতি হয় না।

‘অম্যাক্ সা ত ইন্দ্র ঋষিরমে সনমোহং বরতো জনতি’—

(ঋ. সং. ১. ১০৯. ৩)

ইহাও প্রথম মণ্ডলের মন্ত্র। নিক্কটকার ব্যাক এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ‘অবিশ্রষ্টার্থা ভবন্তি’। এইরূপ বহু মন্ত্র ১ম ও ১০ম মণ্ডলে পাওয়া যায় বাহার অর্থ সহজ-বোধ্য নহে। অপরপক্ষে ২য় হইতে ৯ম মণ্ডল পর্যন্ত ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে বহু সরল ও সহজবোধ্য মন্ত্র আছে। (ঋ. সং. ৩. ৪২. ৪-৫, ৩. ৪৪. ১, ৪. ৪২. ৩, ২. ১১, ২. ৮৪, ৫।)

তার পর শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে : ‘অন্ত মহতঃ কৃতস্ত নিঃসিস্তমেতদ্ ঋগ্বেদবজ্রবেদার্থধাক্ষিরসেতিহাসপুত্রাণ ইত্যাদি। এখানে ‘মহতঃ কৃতস্ত’ শব্দের দ্বারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং চারি সংহিতার একত্র উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে ঋগ্বেদ পূর্বে সৃষ্ট হয় নাই। এই চারি বেদ মহান-কৃত যে ব্রহ্ম তাহারই নিঃসাস্বরূপ। এখানে বুঝিতে হইবে যে, নির্দিষ্ট প্রণালী অহুসারে বিশিষ্ট রচনাসম্পন্ন বেদ পূর্বেও বিদ্যমানই ছিল, সেই বিদ্যমান বেদই পুরুষ-নিঃসাসবৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপূর্বক বিরচিত হয় নাই; এই কারণে বেদ স্বার্থ-প্রতিপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-ভাবে প্রমাণ, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য-নিষ্ঠার জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না; ইহা স্বতঃপ্রমাণ। বিশেষতঃ পরমাত্মার উপাধিকৃত নাম ও রূপই ব্যাকৃত্যবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জল ও তাহার ফেনার ন্যায় নাম ও রূপকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না। যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই নাম ও রূপ লইয়াই সংসার। এমন্য এখানে কেবল নামকে (শব্দরাশিকে) নিঃসাসবৎ উৎপন্ন বলা হইল। কারণ তাহার নির্দেশই অপরেরও—

* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০.১০.১২৭) রাজিশুক্ত উক্ত হইয়াছে।

এই আটটি মন্ত্রের অর্থ অতীব দুরূহ।

রাত্রী ব্যাখ্যায়তী পুরুরা দেব্যাক্তিঃ বিধা অবি জিরোহমিত। (১) ওর্ভা অমর্ত্য্য নিবতো দেব্যুযত যোতিস্তা বাহতে তব। (২) ইত্যাদি।

রূপেরও নিঃশব্দ উৎপত্তি প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। লোকের নিঃশব্দ বেক্স অবস্থাপ্রসূত অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যের কলমাত্র তজ্জন বেদরাশিও পরমপুরুষের নিঃশব্দ অনায়াসপ্রসূত। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ বেক্স লোকের চেষ্টাসাপেক্ষ, বেদ সেক্স নহে, এইজন্যই ইহা স্বতঃ-প্রমাণ।

যে কোন মন্ত্রসংহিতা অধ্যয়ন করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতিপাত হইবে যে, কোন বক্তাবিশেষ আরম্ভ করিয়াই সেই বক্তে অপেক্ষিত ব্রব্য-দেবতার গুণকীর্তন, স্তুতি প্রভৃতি এবং বক্তে বক্তমানের শুভআশংস প্রভৃতি বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্য কোন অর্থ বেদমন্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলে নানাবিধ ক্লিষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ আলোচনা করিলে এই কথাই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ঋকমন্ত্র বহুবীর সোমযাগের প্রাতঃ সবন, মাধ্যহ্নিক সবন ও তৃতীয় সবন এই তিনটি সবনের বিশেষ পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋত্বিকগণের নানাকর্মের উল্লেখ এই ঋকমন্ত্র-সমূহে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রোতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের সর্বাঙ্গক্রমনি প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিলেও কোন বক্তে কোন দেবতার উদ্দেশে কোন সময়ে কোন মন্ত্র বিনিযুক্ত হইয়াছে তাহাই সর্বাঙ্গক্রমনিকারও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বক্ত প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ আলোচিত হইলে বেদের অধিবক্ত অর্থ প্রথমতঃ পরিস্ফুটিত হইবে। ত্রৈমিনির মীমাংসা দর্শনও এই পক্ষের অঙ্গুল। অথেষা চরতি ঋত্বৈষ বাচং শুক্রা। অকলামপুশ্যাম—৮:২:২৪ ঋ. সং. এই ঋকমন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও ভগবান বাহু উপোদ্যাত প্রকরণে বেদের

প্রাথমিক প্রথমাবগত বক্তরূপ অর্থকেই বলিয়াছেন। অধিবক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বেদমন্ত্রার্থ গৃহীত হইলে পরে অধিদেবতাকে বেদার্থালোচনিতার পরিচয় জন্মিবে। কারণ দেবতার উদ্দেশে হবিঃ ত্যাগই যজ্ঞ। এই দেবতাস্বের সহিত পরিচয় হইলে সমস্ত মন্ত্রভাগ যাহা অধিবক্তরূপে প্রতিপাত হইয়াছিল তাহা অধিদেবতরূপে ভাসমান হইবে। অধিদেবততত্ত্বে নিম্নাতপুরুষ আধ্যাত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিবে। এজন্য বেদমন্ত্রসমূহই সাধারণতঃ ত্রিবিধ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া পরিসমাপ্তিলাভ করিয়া থাকে।

অধিবক্ত, অধিদেবত, অধ্যাত্ম—প্রথমটি উপায় দ্বিতীয়টি উপেয়; এজন্যই উক্ত মন্ত্রে যজ্ঞ, অধিবক্ত, অধিদেবত অর্থকে পুশ্য ও অধ্যাত্ম অর্থকে ফল বলা হইয়াছে। ফল উপায়, ফল উপেয়। ইহাই সাধারণতঃ বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ। যজ্ঞের ঋত্বিকগণের পৃথক পৃথক কর্ম বিভিন্ন সংহিতায় আশ্রিত হইয়াছে। যেমন ঋকসংহিতায় হোত্র-কর্ম, সামসংহিতায় গুণাত্মক কর্ম, যজুঃসংহিতায় আধ্বর্য্যক কর্ম এবং অথর্বসংহিতায় ব্রহ্মকর্ম আশ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি যজ্ঞেই এই ঋত্বিক চতুষ্টয় অপেক্ষিত এবং ইহাদের কর্মও বিভিন্ন রূপ। এজন্য সোমযাগাদি প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া ঋত্বিক চতুষ্টয় ঋত্বিককর্মাদ্বারা মন্ত্রসমূহ চতুষ্টয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কোন মন্ত্র বা ঋত্বিক পূর্ববর্তী বা পরবর্তী এরূপ বলার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। অতএব আমরা ঋকসংহিতার মন্ত্রেও অন্য বেদমন্ত্রের ও অন্য ঋত্বিকগণের কর্মের উল্লেখ দেখাইয়াছি। মন্ত্রসমূহের পৌরুষার্থ স্বীকার করিলে ঋকসংহিতাতে পঠিত মন্ত্রসমূহের আনর্থক্য হইয়া পড়িবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ বেদমন্ত্রের পৌরুষার্থ স্বীকার করেন নাই।



ফরাসী-কবি লেকঁ দে লীল্

ত্রিনিশ্বলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত ফরাসী-কবি লেকঁ দে লীল্ (Leconte de lisle) ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রি-ইউনিয়ন' গ্রীপে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ফরাসী-পাঠকসমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন এবং আজও তাঁর কাব্যাবলী বিশ্বের কাব্যরসিকমণ্ডলীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কীৰ্ত্তিত কালে কবি লেকঁ দে লীল্ ফরাসী-কবিসমাজে বিশেষ আদর ও মৰ্য্যাদা পেয়েছিলেন; বড় বড় সমালোচক, সাহিত্যবিদ মতিভ ও মনীষিগুণ্দের নিকট থেকে তিনি প্রকৃত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

উদ্বিগ্ন শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে এক বিশিষ্ট কবিদলের আবির্ভাব হয়; এঁরা Les Parnassiens নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি সুসুন্দর কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসক ছিলেন এবং অতিমন আনন্দে কাব্যে এক সম্পূর্ণ নুতন ধরনের সুর সৃষ্টিতে তুলতে চেয়েছিলেন। আলফ্রেস দে লামার্তিন্ (১৭৯০-১৮৬৯), আলফ্রেস দে ভিকি (১৭৯৭-১৮৬০), আলফ্রেস দে ম্যুসে (১৮১০-১৮৫৭), জ্যুলি প্র্যাদম্ (১৮০৯-১৯০৮), জে.-এম. দে হেরেদিয়া (১৮৪২-১৯০৫), ফ্রান্সোয়া কপ্পে (১৮৪২-১৯০৮) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-কবিগণ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। লেকঁ দে লীল্ এই পানাসিঁয় (Parnassien) নামক ফরাসী-কবিগুণ্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, কাব্যে হবে বিজ্ঞান ও কলার পরিমিশ্রণ, বৈজ্ঞানিক বৃত্তিবাদ ও ভাবানুভূতির মিলন। যন্ত্ররূপ ও রূঢ় বাস্তবের সন্মুখীন হয়েও তাই তিনি কামনা করেছিলেন ভাবজগতের সঙ্গে, সৌন্দর্য্যলোকের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন; তাঁর কাব্যেও সেইজন্য দৃষ্টমান জগতের সঙ্গে অদৃষ্ট স্বপ্ন জগতের সহজ সংযোগ সাধিত হয়েছে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাবারীর সাহায্যে তিনি পৃথিবীর প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং মানবের আশা-আনন্দে সুখে-সুখে ভরা এই মর্ত্য-জীবন নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর অপূর্ণ কাব্য।

লেকঁ দে লীল্ *L'univers Visible* অর্থাৎ দৃষ্টমান বিশ্বের সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে মনের কল্পনারাজির সংমিশ্রণে অপূর্ণ কাব্যাবলীর স্রষ্টা করেছেন। এই প্রকৃতির মধ্যে বা কিছু সত্য, বা কিছু স্বপ্ন, বা কিছু রহস্যময় তা তাকে আকর্ষণ করত; তাঁর মনোদর্পণে প্রতিকলিত হয়ে সেগুলি অপূর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত হ'ত; হৃদয়বোধের রঙীন আল্পনার স্রব্ধিত করে তিনি সে সকল ভাব প্রকাশ করতেন। মানব-স্বপ্নের চিরন্তন সুখ-সুঃগ তাঁর স্বপ্ন-বীণার বিভিন্ন

সুরে বেজে উঠেছিল; তাই কখনও তাঁর কবিতার ভূমি আমন্দময়ী আশা-রাগিণী, আবার কখনও বা অতৃপ্ত কবি, সেখানে বহুত হয়েছ মৈরাঙের সুর। কখনও তাঁর কবিতা মিলনের আবেগে আগ্রহারা, কখনও ভা মন্দভেদী বিচ্ছেদের হাহাকারে অভিধ্বনিত। কোথাও তিনি অদৃষ্টবাদের জয়গান করেছেন, কোথাও বা তিনি হয়ে উঠেছেন হৃদয় আশাবাদী, আবার কোথাও তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে আদর্শবাদ, কোথাও বা তিনি হয়ে উঠেছেন হঃস্বাদী, কিন্তু সবকিছুকে অভিক্রম করে অবশেষে তিনি সেই আমন্দময় স্বপ্নেরই বন্দনার আগ্রহারা হয়ে পড়েছেন।

লেকঁ দে লীল্-এর কাব্যের অগাধ অন্তলম্পর্শী ভাববোধ, মতঃপ্রসারী অসীম চিন্তাবারী, সুনির্ধারিত পাণ্ডীত্বপূর্ণ শব্দসমূহ, পরিমার্জিত বহু সতেজ ভাষা, লালিত্যপূর্ণ বক্তারমর ক্রান্তি-ময় হৃদয়—এ সমস্তই তাকে মহান গৌরবের অধিকারী করেছিল ও শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ভাবপ্রবণ কবি, বিচক্ষণ দার্শনিক এবং অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ছিলেন। প্রাচীন কাহিনীসমূহে ও পুরাতত্ত্বে তাঁর দখল ছিল প্রগাঢ়। প্রাচীন যুগের গ্রীক, ল্যাটিন ও হেব্রায়িক সংস্কৃতি সম্পর্কিত পুস্তকাবলী তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে এ সকলের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এই সকল কারণে ফরাসী-কবিসমাজে লেকঁ দে লীল্-এর স্থান ছিল অনেকটা Maître বা গুরু মত।

লেকঁ দে লীল্-নিজে কিছু তাঁর শিষ্য-কবিতার পাঠক-যুগের মনে কোমরগ্ন স্থায়ী আবেদন জাগাতে সচেষ্ট হন নি। তাঁর কবিতা যেন অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ের কণিক বর্ণসুন্দর, বাসন্তী হাওয়ার সুর হতে হঠাৎ ভেসে আসা প্রস্ফুট উদ্যান-লতার সুরভি, দক্ষিণের সাময়িক চকল-বাতাসের হিরোল, কিরণ-কণের জন্য পূর্ণ-চাঁদের জ্যোৎস্না-কিরণ।—বা পড়ে বিমুগ্ধ পাঠকের হৃদয় কণিকের জন্য উদ্ভাব হয়ে উঠবে, কিছুকণের জন্য তার মনকে দোলা দিয়ে যাবে কবিতার ঘোঁসল হৃদয় আর অপূর্ণ ভাষা। কুল বেদন রূপে-সৌরভে গৌরবে সৃষ্টি উঠে আবার কিছুকণ পরে ব'য়ে পড়ে যার—তবু বরাদ্দ যুকে যেবে যার তার সুবাসিত কীর্ণমুখি—Parnassien কবি লেকঁ দে লীল্-এর শিষ্য-কবিতাগুলি হ'ল সেই রকম; হরি-দ্রাভ বা তদ্রূপে-পুষ্পে বিরতিত এই কাব্য-লতার এইখানেই হ'ল আসল পৌরব। অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবাদই হ'ল এই শিষ্য-কবিতা করটির মূল-কথা।

লেকঁ দে লীল্-এর এই অতিমন কাব্যবারী ভাবানীতম

অনেক করাসী-কবির মনে লাভা ভুলেছিল; কাব্যে লেকঁৎ বে লীল্-এর অঙ্গগামীর সংখ্যা তাই কম নয়। ঐ কবিরোগীর বিখ্যাত কবি স্যুলি প্র্যেদন্ লেকঁৎ বে লীল্-এর মত পরিচায়-পরিচয় বহু-সভেজ ভাবার পক্ষপাতী ছিলেন। স্যুলি প্র্যেদন্ ছিলেন দর্শন নামে সুশীলিত; রচিত বিখ্যাতও তাঁর অগাধ অধিকার ছিল। *Les Stances et Poemes* (১৮৬৫-৬৬) নামক গ্রন্থরচনা করে এই করাসী কবি প্রথম বারের নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পার্শ্বাসিঁ-কবি জে. এম. বে হেরেদিয়া লেকঁৎ বে লীল্-এর রচনাতন্ত্রী বিশেষ যত্নের সঙ্গে আরও করেছিলেন। হেরেদিয়া ‘কিউবা’ বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব ভাল সমেট লিখতে পারতেন। *Les Trophees* (১৮৯০) নামক গ্রন্থরচনা করে তিনি দশবী হয়েছিলেন।

লেকঁৎ বে লীল্-এর কবিতার উপর ধীরে সাহায্য প্রভাব পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন করাসী-সাহিত্যের অন্য কবি ও ঔপন্যাসিক ভিটোর হিউগো। আল্ফ্রে বে লাম্বার্তিন, আল্ফ্রে বে ভিকি ও আল্ফ্রে বে হ্যুসে এই তিন জন কবি ছিলেন উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার রচয়িতা; কাব্যে লেকঁৎ বে লীল্-হানে হানে তাঁর পূর্ববর্তী এই কবিদ্বয়ের সাহায্য অঙ্গরূপ করেছেন ও তাঁদের গীতি-কবিতার বারী বকার সাধতে সচেষ্ট হয়েছেন। লেকঁৎ বে লীল্-এর এই সব কবিতা নিয়ে ভিটোর হিউগো ও স্যাং ব্যত্ হ্যুয়াবান আলোচনা করেছেন। প্রতীকতন্ত্রী (Symbolist) দলের বিখ্যাত কবি পোল্ জেরার্দেঁ-এর লেকঁৎ বে লীল্-এর উপরে লিখিত একটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। শক্তিশালী করাসী-সমালোচক মাজিন্ করবঁ বাতাবিক মৈনুপ্যের সঙ্গে লেকঁৎ বে লীল্-এর কাব্য বিচার করেছেন। আমাদের দেশের গৌরব—বাঙালী মহিলা-কবি তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) খুব অল্প বয়সে লেকঁৎ বে লীল্-এর কবিতার চমকপ্রদ সমালোচনা করে এক অপূর্ণ এবং রচনা করেন। তবে তা বাংলা ভাষার লেখা নয় বলে সাধারণ বাঙালী পাঠকেরা রচনাটির রসাবাদে বঞ্চিত হয়েছেন।

১৮৫০ সালে ৩৫ বৎসর বয়সে লেকঁৎ বে লীল্-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পোয়েন্ আঁতিক্’ (*Poemes Antiques*) প্রকাশিত হয়। তার নয় বৎসর পরে ১৮৬২ সালে ৪৪ বৎসর বয়সে লেকঁৎ বে লীল্-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘পোয়েন্ বাহ্বার’ (*Poemes Barbares*) বার হয়; সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ১৮৮৪ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে লেকঁৎ বে লীল্-এর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘পোয়েন্ ড্রাগিক্’ (*Poemes Tragiques*) ছাপা হয়। কবির শেষ কবিতাগুলি ‘ডার্মিয়ার পোয়েন্’ (*Derniers Poemes*) নামক গ্রন্থে সম্মিলিত হয়। ‘পোয়া বে পোয়েন্’ (*Choix de Poesies*) নামক পুস্তকে কবির সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে বাছাই করা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি চয়ন করা

হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কাব্যগ্রন্থ রসবেত্তা পাঠকমহলে বিপুল সমাদরলাভ করেছিল, এবং এগুলির কাব্যরস অতাপি রয়েছে অব্যাহত।

খ্যাতনামা প্রাচ্যবিভাবিশারদ হ্যুদ্রনুঙ্ ছিলেন কবি লেকঁৎ বে লীল্-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। হ্যুদ্রনুঙ্ প্রাচীন ভারতী ও ভারতীয় গ্রন্থ হতে অঙ্কন করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় ভাব, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। এই হ্যুদ্রনুঙ্কের শিকার ও সাহায্যে লেকঁৎ বে লীল্ ভারতীয় পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন। সেইজন্য লেকঁৎ বে লীল্-এর কাব্যের উপরে ভারতীয় ভাব ও ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ের বহু ভাবধারণা বা তথ্য লেকঁৎ বে লীল্-এর অধিগত করেছিলেন। এ সমস্তই হ্যুদ্রনুঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কল, কেননা তাঁর নিকট হতেই লেকঁৎ বে লীল্ পেয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির দীক্ষা। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উপরে লিখিত লেকঁৎ বে লীল্-এর কবিতাগুলি তাঁর প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে গাঢ়তম পরিচয়ের নিদর্শন। হিন্দুধর্ম তাঁর মনে বিশেষ ঘোলা দিয়েছিল; তাঁর ‘ভাগবৎ’ (*Bhagavat*), ‘সূর্য্য’ (*Surya*), ‘ব্রহ্মদৃষ্টি’ (*La vision de Brahma*), ‘শিব’ (*Civa*), ‘শিববহু’ (*L'arc de civa*), ‘মায়’ (*Le Mayn*), প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে তা বুঝা যায়। ‘বম’, ‘অরি’, ‘কাল’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘গদা’, ‘সাবিত্রী’, ‘মৈত্র্যের’, ‘মারদ’, ‘অদিত্য’, ‘কৈলাস’, ‘বেদ’, ‘তপস্বী’, ‘ধর্ম’, ‘অপসর’, ‘কিরর’, ‘হিমালয়’, ‘বাস্তবিক’, ‘দশামন’, ‘লঙ্কার রাবণ’, ‘রাকস’, ‘দশরথ’, ‘রাম’, ‘লক্ষণ’, ‘সীতা’ প্রভৃতি পুরাণে উল্লিখিত, আমাদের একান্ত সুপরিচিত নামগুলি যখন লেকঁৎ বে লীল্-এর মত একজন করাসী-কবির লেখার দেখতে পাই তখন কোতুল-মিশ্রিত আমনে আমাদের হৃৎ করে ওঠে। এই সব কবিতার লেকঁৎ বে লীল্-এর আগ্রহ ও আত্মরিকতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য-সম্পর্কে তাঁর *L' Orient* ও *Bouddha* কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। ইসলাহ সম্পর্কেও কবি যথেষ্ট উৎসুক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর *Le Suaire de Mohammed-ben-Amer-al-Mancour* ও *Les roses d'Ispahan* কবিতা দুটির নাম করা যায়। তা ছাড়া ‘লর’ ও ‘মজ্হ’র প্রখ্যাত কাহিনী কবি লেকঁৎ বে লীল্-এর হৃদয়তন্ত্রীতে যে বিচিত্র বকার ভুলেছিল তার বহু বেশ তাঁর দু-একটি কবিতার সুপরিচ্ছট।

বিভিন্ন কালের পণ্ড ও পক্ষী কবি লেকঁৎ বে লীল্-এর বিশেষ প্রিয় ছিল। জীবনকালের উপরে লিখিত তাঁর কবিতার সংখ্যা তাই কম নয়। পণ্ড-পক্ষীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেকঁৎ বে লীল্ যখন তখন চিন্তা করতেন। তিনি মনে করতেন যে,

পত্নী বাহুবের অপেক্ষা নির্ভেয ও সরল মনের অধিকারী।
'জাগুয়ারের স্বপ্ন' "Le reve du Jaguar", 'হতীস্বপ্ন' "Les Elephants", 'কৃক চিত্রব্যাঙ্গী' "La Panthere noire" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি তাঁর শিরনৈমণ্ডলের পরিচায়ক।—
একটি বৃহত্ত পশুর স্বপ্ন-বাসনা ভেদে মিশ্রণ হাতে কবি লেক্টে
দে লীল্ কুটির তুলেছেন তার নিদর্শন-রূপ এই সম্পর্কে তাঁর
সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাটির "Le reve du Jaguar"
কিরদংশের মধ্যভাবদেওতা গেল :

"শেহালা-জীর্ণ শুক-দীর্ণ বৃক-শাখার পাশে—
শ্রান্ত শরীরে ক্রুর হৃদয়ে জাগুয়ার রোজ আসে,
লেহন করিতে নিজ লাঙ্গুল রাগে দংশন করে,
দীর্ঘকণের সুধার আলার স্মৃতিটি ওঠারেরে।—
... ..

সুবিপুল বন অরণ্য, বেধা নিবার বিপ্রভরে
পল্লব আর পত্র-লতিকা রহিরে গোপন করে,
আছাড়িয়া সেখা পড়ে জাগুয়ার মরম মাটির 'পরে,
সমুদ্রের ধাবা লেহন করিয়া সুপরিষ্কৃত করে;
ভঙ্গাতে ক্রমে দুগ্ন দুগ্ন চোখ, জাগুয়ার বোকে ঝাঁপি,
বর্ণাত হুই মরমের তারা কাঁপিতে বপ্ন রাপি।
ত্যা করা প্রয়াস সংজ্ঞা হারান, শুটু ঘুরে তারে
লাঙ্গুল কতু সরিতেছে তার, মাঝে মাঝে ধাবা নড়ে।
... ..

বপনে বেধিছে—সুপুটে গাভী হরিৎ-বনেতে চরে;
বেগে জাগুয়ার পড়ে লাফাইয়া সেই গাভীটির 'পরে।
ভসিত সেই শান্ত গাভীটি কুড়ারে আর্জবরে,—
মথরের মাঝে জাগুয়ার তার ধাবাতে শোণিত ভরে।"

লেক্টে দে লীল্ যেন নিবিড় আত্মশক্তির বলে কাব্যরাজ্যে
প্রবেশ করেছেন; তাঁর অন্তর্লোকের প্রগাঢ় সৌন্দর্য-চেতনার
দ্বারা তিনি কাব্যের দেহ হেতে প্রাণের উপর নির্ভর করেছেন।
তিনি তাই আড়ষ্ট লজ্জাপূর্ণ কবিতাকে দিচ্ছেন শক্তিপূর্ণ
সকল জীবন; হৃদয়ের মাধুর্যকে, শব্দের বাহ্যনাকে সর্কেসর্কী
করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন সুপরিচিত কল্প-বিলাসপন্থী
(romantic) কবিতা। লেক্টে দে লীল্-এর কবি-প্রাণ
স্নেহভর, অহুতাপের ও আবেগের কেন্দ্র; সেই কবি-প্রাণের
মাঝে এক বর্ণাঢ্য রঞ্জনী বৃত্তি, সুগভীর রসলিপা—বা কাব্য-
বস্তুকে সুবর্তাবে করে রচীন। মনের উপভোগের জন্ত তিনি
প্রথম বর্ণ-বিচিত্র কাব্যবস্তুর সৃষ্টি করেছেন যার মূল-কথা হচ্ছে
ইন্দ্র—যে হচ্ছে কবি-প্রাণের অপূর্ণ-আদম্য লাভ-লীলার
ইন্দোলিত হচ্ছে। লেক্টে দে লীল্-এর লক্ষ্য-কবিতার ছিল
একটা "সুতীক্ষ্ণ ভাবোন্মাদ" বা Lyric Enthusiasm; বা
তাঁর "Les Elfes" বা 'পত্নীল' কবিতার ইন্দ্রকালের মত
বিস্ময়করভাবে সৃষ্টি উঠেছে। তাই তাহার হচ্ছে কবিতাটি

সুতীক্ষ্ণ মোহকর। প্রথমেই অপরাধ দৃষ্ট নয়নগোচর
হয় :

"নিবিড় বনেতে জ্বলিছে বেধার হরিণেরা বলে বলে,
কৃক বোটকে একেলা সেধার অখারোহী সে চলে।
বর্ণচিত্রিত পাংছা তাহার নিশিবে উজলি' উঠে;
বন অরণ্যে জ্যোৎস্না-কিরণ বেধানে পড়িছে লুটে,
প্রতাপিতা সেখা দীপ্তি ভাঙিছে দীর্ঘ বনের মাঝে,
ভেদিয়া ভিন্নির অখারোহীর বলসে শিহের ভাঙ।
বনলতা আর শুভ কুহুম বতনে আবরি কেশে,
মোহিনীর বল মৃত্যু-উল্লব বনেতে বেড়ার হেসে।
... ..

স্বপ্নল-আত্মসে বাতাসেতে তালে পত্নীরা মৃত্যুরতা
কিরিয়া কিরিয়া সুমিরা বিরিয়া সাগর-উর্ধি বধা।
—'ওগো বীর হুবা। এত পরে তুমি এ হেন নিশিবেকনে
বলো, কোথা বাও ?—অপত্নী রাণী কহে বিশ্বর-মনে :
'হলে হলে বত অন্তত-আত্মা কিরিছে সুধিত-মনে;
এইখানে কোরো, হু'জনে মিলিয়া এসো মাচ কতি বনে।'
ভরুণ অখারোহী বীর তার বাগ্‌মন্ডা-প্রিয়ার মুহাতিবুধে
ক্রত অব চালিয়ে যাচ্ছে, তাই মৃত্যুরতা পত্নী-রাণীর সাধর
আমরণ উপেক্ষা করে সে বললে :

'না, না। মোর প্রিয়া রয়েছে চাহিয়া আবারি আসার পথ,
আপামীকলা চালাব আমরা মিলনের মনোরথ।
সমুদ্রে ধাবার পথ ছাও মোরে, বনচাতী পত্নীল,
পার পথ যার চরণ-চিহ্ন মূলভরা বনভল;
মোর বিলম্ব করে রিহো নাকো, প্রিয় মোর জেগে রহ,
চাহিয়া দেখ পো, উবার আত্মস ভেগেছে রক্তমীর।—

যৌবনমুগ্ধা পত্নীরাণী তবু মদির-আছাদ্য জামাল :
—'অখারোহী গো, দাঁড়াও কণেক। এনেছি তোমার ভয়ে
পরম-মানিক সুগন্ধি-মংলা—বাহাতে আলো না বয়ে।
সৌরব আর তাপা-মতন দানিষ তোমারি করে,
আমার বদন করেছে বরম চন্দ্র-কিরণ বরেন'।—

কিছু :

'না।' বলিল বীর।—'বাও তবে।' কোপে তুষার-
আতুলে পত্নী
হুবার বক পরশিল, বীর চমকিয়া যার সরি'।

এর পরে দৃঢ়পটী ক্রত পরিবর্তনশীল, এবং চরম রহস্যময়
বটমার চিত্রটি বিমণ্ডিত। ভরুণ-বীরের কালো বোতা লবেগে
সমুদ্রে অগ্রসর হ'ল, কিছু :

চমকিয়া উঠি' অখারোহী সে সহসা সমুদ্রে চার;
পথ 'পরে হেরে, আসে সেখা এক মূর্ত্ত তুষারকার
কিছু বাহি বলি' বীরের পানেতে সে যে বাহু মেলি' বদে
—'প্রৈতিনী, দানবী, অন্তত-আত্মা, আটক কোরো না মোরে।'।

হৃদয়ে দৃষ্ট এবার করুণতর হয়ে উঠল :

‘বোরো না আমারে, দেহহীন হারা—অপরা-অপদেবতা ।
আমার প্রিয়ার আঁখিট কাগে যে, কাল মিলনেরি কথা ।’
‘ওগো প্রি়তম, বন্ধু আমার ।’ সে কহে করুণ বয়ে,
‘মিলন মোদের হবে অনন্ত সমাধির অন্তরে,
আমি আক হুত ।’—বার্তা শুনিয়া বীর ওঠে চকলি,
যাতনায় প্রেমে সমাধির ‘পরে চিরতরে পড়ে চলি ।’

যার উদ্দেশে এই বিপৎসমুদ্র গহন-অরণ্যে যাত্রা সেই
প্রার্থিতা প্রিয়তমা নারী অব্যাহারী সন্মুখে প্রত্যাখ্যাতা পরীর
প্রতিহিংসার কলে হুত অবহার শেষ বেধা মিল ; তরুণের
অব্যাহারী জীবন সাদ হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির উপরেও
পড়েছে রহস্যময় বনিকা ।

লেক্টং দে লীল্ শেষ পর্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক-লোকের
উদ্দেশে যাত্রা করেছেন । বহির্গতের ব্যর্থ অনুসরণ না করে
মানস-অনুভূতিকে হিরণ্যবে রূপ দিয়েছেন । অর্থাৎ, আর-
প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক-সমুদ্র লাভ করেছেন,
মানসাত্তর চৈতন্যকে কাব্যে রূপদান করেছেন । তাঁর মনের
পর্দার রূপলোক আর অরূপলোকের অপূর্ব মিশ্রণ হয়েছে ;
সেখানে ফুটে উঠেছে ‘সুমনান বগরাজি’ ।

দুঃসময় প্রকৃতির রূপ-বর্ণনার কবি লেক্টং দে লীল্
বিশেষ সাকল্য লাভ করেছেন ; পৃথিবীর বাহুদুঃ তাঁর
বাহু-লেখনীতে বুর্জ হয়ে উঠেছে । বখন পড়ি :

“বিপ্রহর, অরিরাজ, সুবিভূত বরিজীর বৃকে,
উজ্জ্বল সুনীলাকাশে বসি’ হুতাইল হৌজকর,
বীরব পৃথিবী । উজ্জ্বল প্রজ্বলিত অগ্নিস্থে,
আশ্রম-বসনাত্মা পৃথ্বী সংজাহারা নিরন্তর ।

বসুধরা সীমাহীন, কাতার করে না ছায়াধাম,
উৎসাহীন নদীবকে পাণ্ডুরল তৃকা-বারিহীন ;
অরণ্য সূর্যে, বার কীপপ্রান্ত পরিদৃষ্টমান,
নিশ্চন্দ-নিশ্চন্দ আক, সুগভীরে চির-তল্লালীন ।”

কিংবা বখন পড়ি :

“সুত্যের রেশ দূর-সমুদ্রে, সন্ধ্যার বায়ু হেমন্তের,
কখন অবধা সহসা ব্যথিত বিদারের সুর সঙ্গীতের

কেলিয়াছে ঢাকি’ বরষীর বৃক ; বীরব ব্যথার কালিমা হার
রক্ত-রঙীন রূপ বরিয়াছে অন্ত-রবির রক্তিমার ।

বিশাল-মন্ডলের বকে শিথিল শাখারল বৃহ আন্দোলিছে ;
সাগরের বৃক রক্তিমার হার ; সমীরণ-হিরা কি কলিছে ;
অলস গভিতে সন্ধ্যা আলিছে, বনার সন্ধ্যা তল্লা সাধে,
বিহ্বল-নীচ মান-শাখারলে জড়ারে পড়িছে সুনীল-রাতে ।”

তখন লেক্টং দে লীল্-এর অসাধারণ বর্ণনাত্মক
পরিচয় পাই । প্রাকৃতিক দৃষ্টের বর্ণনা তাঁর করণার
সংমিশ্রণে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তার
মধ্যে সুপরিষ্কৃত এক নূতন সুর, নূতন হৃদয়, নূতন ভাব ও
নূতন জীবন । তাঁর চমকপ্রদ বর্ণনার শুধে প্রাকৃতিক দৃষ্ট
আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে । যাকে যাকে
তাই তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মনে হয় :

“সে যেম সুদীর্ঘকাল সুচির প্রতাপ যদি হ’তে,
বিভিন্ন শব্দের শীর্ষে জাপিতেছে মর্ম্মরের প্রার,
কোন এক কলোচ্ছ্বাস বীর-বির মহিমার মধ্যে,
ধূসর দিগন্তপ্রান্তে অবসর বিবুর্জিত হার ।”

জীবন-মর্যাদা প্রাক-কবি লেক্টং দে লীল্ মর্ত্য-মানবের
প্রতি বলেছেন :

“হে মানব, যদি তব আত্মায়ে বা কোতে পরিপূর,
চলিরাহ যিপ্রহরে প্রতাপ কাতারে স্বর্য্যকরে,
বাও । এ প্রকৃতি নিঃব, পান করে রবি তৃষাভূর :
জীবিত যে মেহ হেবা, হুধে-সুধে বাবে তাহা মরে ।”

বিশাল-বরিজীর চরম-সত্যটি মর্ত্য-মানবের উদ্দেশে জানিয়ে
অমর কবি লেক্টং দে লীল্ আবার পরমুহুর্তেই সাত্বনার
আশাস-বাণীতে বলেছেন :

“অশ্রু আর হাত কিন্ত, তুমি যদি পার গো তুলিতে,
থাকো যদি তুলে মেতে চপল-পৃথ্বীর এ কামনা,
সমতুল্য জান যদি শাপে-বয়ে, মার্কানা-প্রীতিতে,
বরি’ লবে যদি তুমি বিরাট ও বিবর বাসনা,—
তা হলে :

“এসো হেবা ! স্বর্য্য তোমা’ কহিবে গো বারতা মহান ।”



যাত্রী

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটা একটানা ভীত বাঁশি বাজিয়ে সাতকীরার গীতার বধন খুলনাঘাট ছাড়ে তখনও রাতের অন্ধকার আশেপাশের সব-কিছুকে কুহেলিকার মত কড়িয়ে থাকে। রাজের অন্ধকারে যারা আগে থাকতেই ডেকের উপর বাস ভোরদ সাঝিয়ে নিচ্ছেদের গতি টেনে নিয়ে গুয়ে থাকে, তারা অনেকেই সে শব্দে চোখ মুহুতে মুহুতে উঠে বসে। যারা অভ্যস্ত তারা পাশ কিয়ে পোয়। কেবিনের সামনে বেতের চেয়ারটার উপর গলা পর্যন্ত একটা পাভলা র‍্যাগ কড়িয়ে সুমিলা সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। গীতার ছাতার সঙ্গে রাজির লজ্জা তেড়ে সেও একটা ছোট্ট হাই তুলে টিক হয়ে বসে। তৈরব মদীর জলকল্লোলের সঙ্গে গীতারের চাকার শব্দ, ইঞ্জিনের বসবসানি প্রথমটা তার ভালই লাগে—কিন্তু তারপরই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা এমনি বিক্রী বিরক্তিকর হয়ে ওঠে—সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের মাঝে এমন একটা অসাড়তা এনে দেয় যে গীতারের মত সেও যেন কাঁপতে থাকে। এ সুমিলায় বহু বারের অভিজ্ঞতা।

সুমিলা সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—কেমন করে কালো অন্ধকার ধীরে ধীরে নীল হয়ে ওঠে...কেমন করে সেই নীলের মাঝে আলোর ঢেউ এসে লাগে...পাড়ের বোপঝাড়ের মধ্য থেকে জমাটবাঁধা অন্ধকারও কেমন করে আত্মপোষন করে। জেলেডিকিঙলো সব জলের ওপর তেলে পড়েছে—এক দল ছুট ছেলে তাদের ডিকি নিয়ে গীতারের সঙ্গে পালা দিয়ে ঠাক বাইবার চেষ্টা করে—কিছুক্ষণ পরে না পেরে উচ হাসির সঙ্গে কি যেন বলে ঠাক ছেড়ে দেয়। ছুট ছেলে একটু ডিকি নিয়ে গীতারের পথ আগলে ধরে—গীতারের বাঁশি বেজে ওঠে—অদ্ভুত কিপ্রকার তারা পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে বুড়ো আবুল তুলে কুতিত্বের নিদর্শন দেখায়—সারেকের গালাগাল শোনা যায়।

বসে বসে এই বিচিত্র জীবনের ছবি দেখতে খুবই ভাল লাগে। গীতার বধন বাটের ধারে এসে লাগে—সারেক ছাতের দড়িতে টান দেয়...চং চং করে বগী বাজে...বিচিত্র গতিতে কখনও আগে কখনও পরে যার...ইঞ্জিন করে বন্ধ...এমন কৌতুক লাগে সুমিলায়, প্রত্যেক বারই যেন হয় বাটের কিনারে ডিকিবার সময় কাঠের পাটাতনগুলি খুঁচি তেড়ে বাবে। তারপরে জেলেরা মাহ নিয়ে আসে, চাবারা ডিকি বোকাই করে নিয়ে আসে ডাব। যাত্রীদের সঙ্গে বরকবাকবি শুরু হয়...কেউ কেনে, কেউ কেনে না। গীতারের বগী আবার বাজে, বাঁশির গভীর আওয়াজ প্রতিকবির সঙ্গে

মিলে কাঁপতে থাকে...চাকার শব্দ শুরু হয়...যারা আসে তারা ডিকি নিয়ে সরে যায়। গীতার চলে, কাহায়াবা উলদ ছেলের দল কাঁকড়া শিকার কলে ছাততালি দেয়। প্রতিবারই সুমিলা ছাতের বইখানি পাশে রেখে এই বিচিত্র বিশ্বলীলা দেখে। বিশ্বভূমির মাঝে এই বাজাইছ ওয় কাছে এক খণ্ডকাব্য বলে মনে হয়।

সেদিনও জলসার গীতারঘাটে এমনি রেলিং ধরে দেখে—ঘাটে পাকী করে বোঁ এসেছে, শতরবাড়ী বাবে বোঁব হয় বিয়ের পর প্রথম বামীর ঘর করতে। চকচকে টিমের একটা ক্যানবাস আরও কি কি যেন কিনিস ছুট ছেলে বরাবরি করে গীতারে তুলে দেয়—হরত বোঁটির ওয়া ভাই। বিচ্ছেদের সময় বত মিকটবর্তী হয়ে আসে সদের মেয়েটির সহিত বোঁটির কথা বলা যেন আর শেষ হয় না। সুমিলা ওদের পরস্পরের সম্পর্ক আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। যা ত নয়ই, কারণ বরসটা মানার মা...বত বোন বোঁব হয়, বোমটা পরা মেয়েটির মুখ ভাল দেখা যায় না, সুমিলায় ভাব মনে হয় ওদের হৃৎকণের দুপের আদলে মিল আছে, বত বোমই বোঁব হয়—বোঁব হয় কেন, মিস্তরই। চোখের জল মুহুতে মুহুতে মেয়েটি বোঁটিকে গীতারের উপর তুলে দেয়। তারপর গীতার আবার ছাড়ে—বোঁটির বাপের বাড়ীর গাঁ ছবির মত আকাশের পটে আঁকা থাকে। বিচিত্র কিছু নয়, আকৃষ্ট হবার মত কিছু নেই, মনবধু বামীর ঘর করতে বাজে, ভাব কেন জানি না কি একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা সুমিলায় চোখ হঠাৎ হলহল করে ওঠে। বিহৃত মদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলি রোদ লেগে বকবক করে মাহের আশের মত। মিক্চকবালে আকাশের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে—পাকা বানের কেতের উপর সুর্যের আলো পড়ে অপূর্ণ সন্দর্ভ দেখায়। কোথাও বাবকাটা শুরু হয়েছে—কর্মব্যস্ত মিহুঁত পল্লীজীবন। গীতারের উপর দিয়ে এক ঝাঁক জলচর পাখী উড়ে যায়, গীতারের শব্দে তাদের ডাবার শব্দ ভাল শোনা যায় না—ভাবু সে তাদের পানে চেয়ে থাকে, তারপর চোখ ক্রিরিয়ে নিয়ে দিশন্তপ্রসারী মাঠের দিকে উদাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—একটু আগে কি যেন তার হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ পিছনে চেয়ার টানার শব্দে ক্রিয়ে থাকে দেখে, সারা সুমিলায় বিষয় এক সঙ্গে মিললেও সে বোঁব হয় তার চেয়ে অধিক বিবিত হ'ত না। বাঁশ বহর আগেকার বেণী—তা হোক ভাবু তাতাতই ত—দাক চোখ মুখ সব টিক তেমনি আছে শুণ্ড পরিণত বয়সের গাভীরামর মাথুর্যে তা বম্বম

করবে। চোখে চন্দ্রা, তা থাক মুমিহ্র'কেও আজকাল পরতে হয়; অর্ধেক চুল পেকে গেছে, তা থাক তার মিকেরও ত কম পাকে নি। হ্যাঁ ও শুভাংগ, মিকেরই শুভাংগ—সন্দেশের অবকাশ থাকে না। একটা বিহ্বলতা, ষ্টিক তার রূপ নেই, তাই নেই ওকে বেশ জ্বালায় করে। একজন অগ্নিরিচিত পুরুষকে সন্দেশের বিধি ও জড়তার কথা ভুলে গিয়ে ও বলে—“শুভাংগ”—কঠে একরাশ বিষয়। সে লোকটি ওর ডাকে আরও বিম্বিত হয়ে বলে—“হ্যালো, মুমিহ্রা তুমি এখানে?” ওর উজ্জল কণ্ঠস্বরে মনে হয় এ বেশ ওর নৃত্য আবিষ্কার—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে কিছু কম নয়। সে স্ত্রীমারে উঠে এক ভদ্রহস্তিলাকে রেলিং ধরে ঠাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, কিন্তু সে যে মুমিহ্রা, বাইশ বছর আগেকার মুমিহ্রা...না না, বাইশ বছর পরের মুমিহ্রা তা কি করণ্য করতে পেরেছিল। পুরুষ হলে এতকণ্ঠে বোব হয় বিষয় আর আমলের আভিনব্যে তাকে কড়িয়ে ধরত। মুমিহ্রা সরে এসে বলে—“আমিও যে সেই কথায় ভ্যামতে চাই শুভাংগ। তুমি এখানে?” যুহু হেসে একটা চোরার সামনে টেনে শুভাংগ বলে—“বস। বলছি।” মুমিহ্রার হুকের ভিতর তোলপাড় করে ওঠে, আবার সেই স্ত্রীমারের সঙ্গে সঙ্গে হাত পাগুলোর বিজ্রী কাঁপুনি। শুভাংগ মুমিহ্রার দিকে তাল করে চেয়ে বলে, “তুমি যে একেবারে দুড়ী হয়ে গেছ মুমিহ্রা।” মুমিহ্রা হেসে বলে—“আর তুমি?” শুভাংগ বলে—“বাতবিক, উঃ। ইউনিভার্সিটি থেকেছি সেই ১৯২০-এ, আর আজ ১৯৪২। উঃ কাইন—ব.হ.র। হ্যাঁ কি বলছিলাম। আমি একটা সরকারী কিনারী ভীম নিয়ে বাংলার নামা কারগার আপাততঃ সার্ভে করে বেতাজি—কিন্তু তুমি?” মুমিহ্রা ভেবনি হেসে বলে—“আমি খুলনার ইজপেট্টেস অব ফুলস—সাতকীরার টুয়ে বাজি।” “ও-হ্যাঁ-ই—” ঙ্গ কঁচকে শুভাংগ বলে, “সতীশ একবার বলেছিল বটে—যে তুমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরী পেরেছ। তাল কথা—সতীশ, সতীশের কথা তোমার মনে আছে মুমিহ্রা। যে কলেজের সব কটি মেথেকে সমান ওকনে তালবাসত—আর অসীম বৈধব্যসহকারে তোমাদের কাছ থেকে সমান ওকনেই ব্যক্তিবিজ্ঞপ সহ করত—সতীশ মারা গেছে।”—ব্যবার শুভাংগের গলাটা ভারী হয়ে আসে। মুমিহ্রা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে—“মারা গেছে? বল কি?” “হ্যাঁ তাই। শুধু কি তাই, ঠুপিত বিয়েও করেছিল—বোঁ, আর হঠাৎ হেলেনমেরকে পথে ব'লিয়ে হতভাগাটা সন্স।” মাতীমূলত সহানুভূতিতে মুমিহ্রার মন তরে ওঠে, প্রশ্ন করে, “তাদের অবস্থা কেমন?”

শুভাংগ বলে—“হোপলেন্স। শতভর্য নিরামকুই জন্ম বাঙালীর ঘরে বা হয় একেজ্ঞেও হয়েছ ষ্টিক তাই—নামে

বাপের বাড়ী, তাইদের বিশেষ করে ঙ্গ'ভুগুদের গল্পনা—বোব হয় আত্মহত্যা করত ব'দি-না হেলেনমেরে হঠাৎ থাকত। তাল কথা”—একটু বেমে শুভাংগ বলে—“মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস—হাতের কাছ সেলাই-টেলাই মন্দ জানে না, তুমি চেষ্টা করলে বোব হয় তাকে এই মীনতা থেকে রক্ষা করতে পারবে।”

“আচ্ছা দেবব—কিন্তু আপাততঃ তোমার হাত দিয়ে কিছু সাহায্য পাঠালে দোষের হবে কি?—আহা সতীশ। বাস্তবিক আমরা তার ওপর ভারী অবিচার করেছি।”

“বিলকণ, আপত্তি কিসের”, একটু হেসে বলে, “কিন্তু ‘পেনাল্টি’ নাকি? কিন্তু তাতে কি সুবিধে হবে মুমিহ্রা—সে ওই তাই ব্যাটারাই মেয়ে দেবে। বাক, ওকথা মেতে দাও, তোমাদের সেই কথা মেয়েটির খবর বল, মোট ইন্টাচেঞ্জ, সেই যে অদ্ভুত ভাবে মেতে মেতে চলত—আর কলেজের কোম হাজকে দেখলেই চূড়িতে ধোঁকা ছোট কুমালটা টেনে দুধটা একবার বেঁকে দিত।” মুমিহ্রা তবে—ষ্টিক সেই আগেকার শুভাংগ—সেই উজ্জল প্রাণস্পন্দ বা লকোচের গতীকে ভেদে বহুদূরকে নিবিড় করত। হেসে বলে—“তোমার চুলগুলো পাকলে কি হবে তুমি আজও ষ্টিক ভেবনি ‘সিলি’ আহ। কথা এখন আর সেই কলেজের মেয়ে নয়—বল মেয়ের মা। এম-এ কেল করেই ওর বরাত খুলে পেল—এখন ব্যারিষ্টারের বোঁ, ওর হেলেই ত খাড়া ইয়ারে পড়ছে—আর মেয়েটি, বাস্তবিক শুভাংগ, চলবার ভলীটা ষ্টিক মারের মত পেরেছে, ভেবনি মেচে মেচে চলে।”

“আচ্ছা প্রকেশর গুণের কথা শুনেছ? বুড়ো বরসে আবার বিয়ে করেছেন—ওঁকে ছেলে দেওয়া উচিত ছিল। আর আজকাল পোষ্ট প্রোভুরেটের হেলেগুলো একেবারে লাইক-লেস, আমরা হলে ওঁর প্রকেশরী হাতাভুহ—তবে অত কথা।”

“তা পারতে।” মুমিহ্রা দুধ টিপে হেসে বলে—“সেবারে তোমাদের সেই সৌমেন হেলটিকে...উঃ হি হি...শেষ পর্যন্ত তাকে কলেজ হাফিরে তবে হাফলে...আমি কিন্তু তোমার উপর ভারী চটে'বলু।” হঠাতির হাসি হাসে শুভাংগ। মুমিহ্রা বলে—“আচ্ছা তোমাদের নামের খবর কি? রিমলেন্স চন্দ্রা পরে ‘মিষ্ট মিষ্ট কবিতা লিখত—আর সতীশের সঙ্গে কথার কথার বগড়া করত। একবার একটা মোটা কবিতার খাতা আমার দিবে বলেছিল, পড়ে অভিমত লিখে দিতে—পেবে লাগা পাতা আছে। আমার মনে আছে আমি লিখে-ছিলাম, ইম্পাত না হলেও হাজলে খবলে বার হতে পারে—উঃ বেচারী প্রায় কঁদে কেলেছিল। তোমাদের নাম কোথার?” শুভাংগ হেসে বলে—“সামের খবর রাখ না? আরে, সে যে এখন মন্ত বক্ত বাবসাদার—শেতার মার্কেটের কত বক্ত দালাল, লাখ টাকা ববদ-ভবদ বার করে বিতে পারে। রিমলেন্স চন্দ্রা

এখন আর পরে না, মোটা লেলের চন্দ্রমা পরে—আর পরীক্ষা এখন আর ভয় নেই, একেবারে বপুতে পরিণত হয়েছে। তবে এটা সত্যি সুমিমা যে তোমাকে বিয়ে করবার জড় ও বেচারী একেবারে তেপে উঠেছিল—আর করলেও বোধ হয় ঠিকত না।—তেসে শুভাংগু কথা শেষ করে।

“সিঁলি”—কপটী ক্রোধের সঙ্গে সুমিমা বলে—“কিছু বেলো ত বেশ হচ্ছে—আজকে কি আর খাওয়া-দাওয়া হবে না?”

“না হলেও আপত্তি নেই, কারণ আমি ও কাজটা সেয়েই উঠেছি—তবে তোমার আভিযা যেওয়ার সৌভাগ্যকে”—কথা শেষ না করে সুমিমার পানে চায়। সুমিমা লজ্জিত হয়ে উঠে যায়।

খাওয়া-দাওয়া বৎসামাত। প্রৌঢ় বরসের ভীষ থেকে ওর কলেজ জীবনের উজ্জল দিনগুলিতে কিরে এসেছে—কত প্রিয়দায়ী এল, গেল—কে উঠল কে নামল তার খেয়াল নেই। সেই হাসি, সেই গর, কীপদুটি অধ্যাপক বোসের মোটা চন্দ্রমার কাকের মধ্য থেকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে... প্রোকেশার বামাক্ষির অদ্ভুত উচ্চারণতরী...বিশ্বের পদ্মপত্রীর গলার ডাক অস্বপ্ন করণ করা একেবারে হবহ...হেনাকে বিস্তর চিনেবাদাম হুঁকে রাখে...সভীশের সঙ্গে মারামারি...মীরা...শোভনা...রঞ্জিত আক তার। জীবনের কে কোন্‌ ভরে অধিষ্ঠিত, এ সকলের সুখের বর্ণনায় বাইশ বছর আগেকার হুঁট অস্বপ্ন হাজ-হাজী আবার যেন প্রথম যৌবনের আমল-বেহনা-রসে উজ্জল দিনগুলিতে কিরে এসেছে। হঠাৎ শুভাংগু বলে—“কি সুমিমা আজকাল আর কবিতা লেখ না, আচ্ছা তোমার সেই কবিতাটা মনে আছে—বেটা তুমি আন্ততঃ্য হলে ‘বিশ্ব-সাহিত্যের পরিণতি’ বলে প্রবন্ধ তুমি উজ্জ্বলিত হয়ে লিখেছিলে, কিন্তু লাহস করে মীচে নাম দাও নি—তোমার মনে আছে সুমিমা?” সামনে হুঁকে শুভাংগু প্রশ্ন করে। ‘বাত জামি না’ বলে সুমিমা লজ্জিত মুখখানি কিহিরে দেয়।

আমার কিছু হবহ মনে আছে, এমন কি হুটো বানাম তুল করেছিলে তাও—তুমি, শোম—

বর্ষার আশীষ তুণ উল্লসিত গিরিচরী তুমি—

প্রাণের বজ্রের বেগে বাঁচাইবে এই মর্দা তুমি
বাণা দিবে সুমিমা বলে—“হরেহে, থাক।”

“থাক কি সুমিমা—জান ? ইতিহাসে বা কখনও বটে নি বা কেউ কখনও করণা করে নি, তুমি ভাই করেছিলে...মেয়ে হয়ে হেলেকে উদ্বেগ করে কবিতার প্রহা নিবেদন করেছিলে। কিন্তু মনে আছে—সেবার তোমার কি ভীষণ অস্ব করেছিল। সেই কবিতা হাতে কোরিভারে তোমার চ্যালেঞ্জ করে বলে—‘বিশ্ব, পোট-প্রাচ্যবেষ্টের সেক্রেটারি কাছের মালিন করব।’ সত্যিই তোমাকে সেদিন কি মার্জান হতে বেবেছিল। সুমিমা—বাক্যে আমরা ভাল বাংলা বলি বেপশ্বতী—এতে-

বারে টিক ভাই। তার পর তোমার আখান দিবে আমি যে কবিতা কিহিরে দিবেছিল।—মনে আছে?”

“আছে—বেধতে চাও”—সুমিমা গভীর হয়ে বলে।

“কি পাগল—তুমি কি আজও তা বেধে দিবেহ”—বিশিষ্ট হয়ে বলে শুভাংগু।

সুমিমা সে কথার উত্তর দেয় না। বলে—ভাল কথা—পাগলামি করতে করতে তোমার আসল কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি—তোমার বোঁ, তোমার হেলেনেয়ে...পূর্ণ চুটিতে সুমিমা শুভাংগুর দিকে চায়।

শুভাংগু হো হো করে হেসে বলে—“ওমলি ইন ড্রিম্‌স্‌ (কেবল স্বপ্নে) সুমিমা—ওমলি ইন ড্রিম্‌স্‌।” তার পর মিছের আখ পাফা আখ কাঁচা চুলগুলোর মধ্যে আতুল চালিয়ে বলে—“কিন্তু এখন যে অনেক ঘেরি হয়ে গেছে।” একটু পরে শুভাংগু কেমন গভীর হয়ে যায়, বলে—“তোমাকে বেধেও মনে হচ্ছে যে তুমিও বোধ হয় এই কাজটা করবার সুযোগ করে উঠতে পার নি, কিন্তু তবু তোমার ক্র্যাকলি বলি এ হুঁকুদি না হলেই ভাল হ’ত।”

সুমিমা ওর দিকে একবার চেয়ে চোখ কিহিরে দেয়। শুভাংগু মিছের খেয়ালে বলে চলে—“দেখ সুমিমা, সত্যি কথা বলতে কি—“আই ভোট সে ম্যাচ কিল কর এ ওয়াইক বাট, বাট আই লং কর এ চাইল্ড—এ চারিং চাইল্ড”—(স্বীয় অভাব শুভাংগু আমি অস্বপ্ন করি না, কিন্তু হেলে—একটি সুন্দর হেলে আমি চাই)। একমাথা কৌকতামো চুলওয়াল। একটি সুন্দর শিশু আমার ‘বাবা’ বলে গলা জড়িয়ে বহছে—ওঃ, হাটু ডু আই কিল কর ইট, এও কিল হাটু প্যান্টমেলি (আঃ, কেমন করে—কি ভীষণ তাবে আমি এ অভাব বোধ করছি), হোট সুন্দর শিশুর দিকে চাইলে চোখ কেহাতে পারি না...‘হোয়াট এ পিট’ ” (কি শোভনীর অবস্থা)।

সুমিমা শুভাংগুর দিক থেকে মুখখানা একেবারে শিহন করে বাইরে জলের দিকে চেয়ে থাকে। শুভাংগু কিছুক্ষণের জড় আদমনা হয়ে যায়। তার পরে মিছেকে সামলে দিয়ে কথার সুর পাটে বলে—“আচ্ছা। তোমার সেই বহনেকাজী দ্বারাট এখন কোথায়, যদি যে-কোম হেলে আর যেহেকে কথা কইতে বেবেলে পৃথিবী রসাতলে বাছে মনে করতেন।” সুমিমার দিক থেকে কোন সাক্ষা আসে না—শুভাংগুর রসিকতাও টিক করে না, ও আন্তে আন্তে রেলিং হয়ে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পরে কথা আরম্ভ করবার চেষ্টা করে বলে—“ইন্‌ সুমিমা, তোমার চুলগুলি বাতবিকই বেশী পেকে গেছে—আমার চেহেও—আচ্ছা চলত আমার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি কার বেশী পেকেছে”—কথাটা একটু হুঁকে অস্বপ্নের সঙ্গে বলতে গিয়ে বেধে, সুমিমার হুঁ চোখ দাঁপিয়ে কৌটার পর কৌটা জল করে পড়ছে। ব্যত

হয়ে উঠে শুভাংক বলে, “হি হি—আমি কি তোমার মনে আঘাত দিলাম সুমিলা—তারি অভাব হবে সেল ভ।” একটু প্রবোধ দেবার হলে বলে, “বেধ, পাকা হুল বলে লভিই তোমার ব্যাদ করতে চাই নি—বরং এই বরলে হুলগুলোয় কাঁচা থাকাই যে অপৌরুষের সুমিলা।” ওর ইচ্ছে করে সুমিলার মাথার উপর হাত রেখে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু টিক সাহস পায় না। এক একবার মনে হয় এই পাকা হুলের প্রাচীর কি এই সহায়হুতির স্পর্শকে ভাঙাবিভ শিষ্টাচারের গভীরে অটুট রাখবে না। ঝোলো বাতাস লেগে সুমিলার হুলগুলো—বিশেষ করে পাকা হুলগুলোই যেন উড়ছে বলে মনে হয়। সুমিলা কারা আর কিছুতেই চাপতে পারে না, বুধে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে গিয়ে কেবিনের দরজা বন্ধ করে। শুভাংক কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়—ওর কথার বা আচরণে সুমিলাকে কোথার ব্যাধা দিলে রেলিং বরে ঠাকুরের ঠাকুরের বিষয় মনে সেই কথাই ভাবতে থাকে। হঠাৎ প্রিয়ারের বীণার গভীর বর বাট যে অদূরবর্তী সেকথা ঘোষণা করে। আদালী এলে বলে, “আলাহুদী এল, মাঝতে হবে।”

শুভাংক সুমিলার ক্রন্দন ধরে আঘাত করে বলে, “সুমিলা ঘোর খোল—এবার আমার মাঝতে হবে।”

সুমিলা ঘোর ধুলে বেরিয়ে আসে—চোখে সুস্পষ্ট জলের দাগ, চাপবার চেষ্টা করে না। ভারী গলায় বলে, “তুমি নাভকীরে বাবে না?”

“যাব, তবে হু’ তার কাছাকাছি ঘুরে যেতে হবে”—অজ হেসে শুভাংক উত্তর দেয়।

“কেমন?” অজ রকমের বলে সুমিলা।

অদ্বুত প্রশ্ন। শুভাংক উত্তর না দিয়ে ওর হৃৎকের দিকে তাকিয়ে বলে, “বাতবিক আঘাতের দিনটি তারি অক্ষর ফাটল—যেন বগ্নের মত। উঃ! বাইশ বছর আপেকার দিনগুলোকে কিরে পাওরা—আকর্ষণ! বাইশ বছর আপেকার সুমিলা……আজ্ঞা সুমিলা, তুমি যখন ইলপেকতনে যাও যেহেতু তোমার ভয় করে?”—তার কণ্ঠে থেকে উঠে আসল বিদারের হ্রস্ব।

সুমিলা এসব কথার উত্তর দেয় না, বলে, “লভীনের বৌয়ের টিকানাটা যাও সে কি বাইরে চাকরি করতে পারবে?” শুভাংক বলে, “শিফরই”—তারপর নোটবুক থেকে একটা কাগজ খিঁচে নিয়ে টিকানাটা টুকে দেয়। সুমিলা দেখে সেই বাইশ বছর আপেকার লেখা একটুও বদলায় নি। লেখবার সময় নীচের ঠোঁটটাকে টিক ভেদনি করে কামড়ায়।

প্রিয়ার ঘাটে ভিড়ল। শুভাংক টুপিটা মাথার দিতে দিতে বলে, “আসি সুমিলা।”

সুমিলা জলতরা শ্রান্ত চোখ দুটো হুলে ওর পানে তাকায়, তারপর চোখ মত্ত করে কি যেন বলবার ইচ্ছে করে—ওর ঠোঁট দুটো শুধু কঁপে ওঠে—কিন্তু কিছুই বলা হয় না। শুভাংক মেনে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। নদীর জলের উপর শেষ সূর্যাস্তের আলো কলমল করে, আর একটা কোন্ ঘাটে সেই বহুট মেঘে যায়। এবারও সুমিলা চেয়ে চেয়ে দেখে বটে, কিন্তু সে আর ওর মনকে স্পর্শ করে না। অন্ধকার হয়ে আসে, প্রিয়ারের সার্কলাইটের আলো ঘুরে ঘুরে হু’পাড়ের উপরে পড়তে থাকে। নদীর উপর নৌকার বুক হীপ বলে, প্রিয়ারের চেউ পৌছাবার আগে পর্যন্ত আলোর হারা জলের তলে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তারপরে চেউ লেগে ভারী তেড়ে যায়—নৌকাগুলো হুলতে থাকে…হীপশিখা হ্রস্ব আকাশে ভারী মত্ত মিট মিট করে। জীরের উপর গ্রাম থেকে শাঁখের আওয়াজ তেলে আসে…আকাশে সন্ধ্যাতারা দপ্ দপ্ করে জলতে থাকে…সুমিলা চেয়ে চেয়ে এমনি এমনি একটু সংসার রচনার স্বপ্ন বেধে, বাহী, পুজ, কড়া…একরাধা কৌকড়া হুলওয়ালা হুল্লর শিশু ওর কোল থেকে দৌড়ে গিয়ে কার গলা জড়িয়ে যেন ‘বাবা’ বলছে…চকিতে মনে পড়ে শুভাংকের কথা—‘আই লং কর এ চাইন্ড…এ চাইন্ড চাইন্ড…’

সুমিলা চমকে উঠে সোকা হয়ে বলে। তারপরে ভাবা-হীন উদাস দৃষ্টিতে বোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে; ডেক চেয়ারটার হেলান দিয়ে—চলৎ-শক্তিহীন রোগীর মত।



নেপালে ভাইপূজা

ত্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

নেপাল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বহু দূরে হিমালয়ের নিহৃত কোকে সুরক্ষিত দেশ। কিন্তু যখন এদেশের আচার-প্রথা, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি লক্ষ্য করি, তখন বাংলার সঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। এই এক্ষণে আরও সুস্পষ্ট করে উঠে যখন নেপাল ও বাংলার ভাষা তুলনা করা যায়। তুলনামূলক আলোচনার ফলে নেপালী ও বাঙালী-দেহের অভীত বসিষ্ঠ সর্গদেব সম্ভাবনার কথা মনে জেগে ওঠে।

আজ ‘ভাইপূজার’ বিবরণ বলব। বাংলাদেশে যে পার্বণকে ‘দ্রাঘিষীতীরা’ বলে নেপালে তাকেই ‘ভাইপূজা’ বলে। এই পার্বণের উদ্দেশ্য ও মাধুর্যের কথা তাবলে বহুই মনে হয় আমাদের এই সবজাপরণ—এই জাতীয় একতা সাধনের দিনে ইহা ভারতের জাতীয় উৎসব বলে গণ্য হওয়া উচিত।

নেপালে সকল জাতই গ্রীক একই প্রথাভঙ্গারে ‘ভাইপূজা’ করে না। ব্রাহ্মণ হজী প্রভৃতির নিয়ম এক রকম, আর মেওয়ারদের প্রথা ভিন্ন। আমি আজ মেওয়ারদের ভাইপূজার কথাই বলব।

ভাইপূজা হয় সন্ধ্যার পর। ভাইপূজার প্রথমে ঘরের বেবেতে প্রত্যেক ভাইয়ের হস্ত এর একটি মণ্ডল ঝাঁকতে হবে। মণ্ডল ঝাঁকবার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে কলের আলপনা দিয়ে তার উপরে তেলের দাগ দিতে হবে। এই তেলের দাগের উপরে আবার শুকনা চালের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রেখা ঠান্ডে হবে। মণ্ডলের বাইরে চার কোণে এবং ভিতরে গ্রীক দ্বারদ্বায়ে কিছু কিছু ধান রেখে তার উপরে আঁত চাল রাখতে হবে। এই চাল তৈরি করতে খুব সাবধান হতে হয় যেম একটুও না ভাদে। সেই চালের উপরে কুল ও ধুনা রাখতে হবে। এই সব রেখে তারপর সকলের উপরে রাখতে হবে ‘বজম্কা’। আজুলে তৈরি হুতোর ছোট্ট পৈতার দান ও বেশের ভাষার বলে ‘বজম্কা’।

এর পরে ভাই মণ্ডলের দিকে সুখ করে বসবে। বোন তখন ‘সগুন’ বা ‘সগুন’ এনে একে একে ভাইদের হাতে ছুঁলে দিবে।† বদ, মাংস, ডিম, আদা, রসুন ইত্যাদি মিশিয়ে

ভাতিক-ময় পাঠ করে ‘সগুন’ তৈরি করা হয়। ভাই ভক্তি-তরে ওটা হাতে নিয়ে আপন মাথায় স্পর্শ করাবে, এবং সেই সঙ্গেই (বোন বড় হলে) প্রণাম করবে। বোন যদি ছোট হয়, তবে বোন ভাইকে প্রণাম করবে। তারপর ভাই সেই সগুন খাবে। খাওয়ার নিয়ম—এক একটি কিনিম নিয়ে তার সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাবে। পরিমাণ অবশ্য খুবই কম। যারা বীক্ষিত তাঁদের প্রত্যেকটি কিনিম খাবার সঙ্গে সঙ্গে ময় উচ্চারণ করতে হবে। কোনটু আগে কোনটু পরে খেতে হবে তারও নিয়ম আছে—প্রথমে ডিম এবং শেষে আদা খাওয়ার নিয়ম। ‘সগুন’ দেওয়া হলেই বোন ভাইকে ‘গীকা’ বা ‘সিন্’ (অর্থাৎ কৌটা) দেয়। যেভচন্দন, ‘অকতা’ (চাল), দুই এই ডিম কিনিম দিয়ে কৌটা দিতে হয়। আগে চন্দন দিয়ে, তারপর দুই ও অকতা দিয়ে কপালে কৌটা দিতে হবে। যারা বজ করেন তাঁরা বজতম্ দিয়ে সবচেয়ে আগে কৌটা দেয়। ‘সগুন’ খাবার সময় বোন দুই এবং দান কলের ইচ্ছা ভাইয়ের মাথায় এমনভাবে ঢেলে দেবে যেম সেগুলি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর মাটিতে বা পড়ল তা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর একটি খালপাতার ‘বোনা’ বা ‘টপরা’ বা ‘ঠাহরে’র (ঠোঙাকৃতি) মধ্যে দান রকম কল (তার মধ্যে আঘরোহী অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ‘বিনিরা’ লেবু ঝাড়া দরকার), একটি সুপারি, পরলা, ‘বজম্কা’ (এটি ব্যবহারের উপযুক্ত) এবং কুলের দানা রেখে সেই ঠোঙাট ভাইকে দিতে হবে। ভাই তা গ্রহণ করে রেখে দেবে।

এর পরে কয়েকটি পলতে একত্র করে তার দুই রূপে আগুন বরিয়ে বোন তা হ’হাতে করে ভাইয়ের নিকট আনবে। ভাই সেই আগুন স্পর্শ করে হাত মাথায় হৌরাবে। বোন তারপর সেই পলতেগুলি মণ্ডলের উপর আঁতাত্তি করে এমন ভাবে রাখবে যেম চার কারাগার বানের উপর অলতে থাকে। তখন মণ্ডলের উপর ধূপ আলিয়ে দিতে হয়। এর পরে ঝাঁট দিয়ে সব পরিষ্কার করে কেলতে হবে। কিন্তু পলতে রাখার পরে এবং পরিষ্কার করার মধ্যে বাতি দিতে পারবে না।

সব পরিষ্কার হলে ভাই নিয়ন্ত্রণ খাবে। এই খাওয়ারটা দেবে বোন। কিন্তু এ নিয়ন্ত্রণে ভাত খাওয়া চলবে না। যে সব কিনিম খাওয়া হয় তার মধ্যে ভিঁড়িই প্রধান।

খাওয়ার শেষে ভাই বোনকে শাকী ও টাফা ইত্যাদি উপহার দেয়।

ভাইপূজার দিন বোন সারাদিন উপবাস করে আচার-পর্ক শেষ হলে তারপর খায়।

* যে কোন কুল রাখলে চলবে না। পাহাড়ে থাকে “তপারি” কুল বলে ভাই প্রণত। তা না ছুঁলে “হাইপরি” বা গীকা কুল দরকার।

† মেওয়ার ভিন্ন অত ভাতের ভিতরে ‘সগুন’ খাওয়ার নিয়ম নাই।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলার উন্নয়ন

ঐক্যদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, “দেখিলাম অনেক কিছু আর বুঝিগামও অনেক কিছু। সেকথা বাস্তবতার বলিবার ইচ্ছা রহিল।” এখন বলা যাক সেই সকল কথা।

দেখিলাম বাহা তাহাতে সন্দেহ রহিল না যে, মাহুঘের ইচ্ছা যদি সম্বৎসর চেষ্টার সহিত যুক্ত হয় তবে এ জেলার উন্নয়ন অসাধ্য নয়। বাহা প্রয়োজন তাহার তুলনায় বাহা হইয়াছে তাহা সামান্য, কিন্তু তাহা পরীক্ষণক দৃষ্টান্তরূপ অমূল্য। সেচ যেখানে হইয়াছে সেখানেই সোনার ফল ফলিতেছে এ তো স্বচক্ষেই দেখিলাম, আরও দেখিলাম যে, জলের সমস্তাপূরণও অসম্ভব নয়। সমস্তা এই মাত্র, কি করিয়া বৃষ্টির জল সংগৃহীত রাখা যায়। অবশ্য এ সমস্তা “এইমাত্র” বলার অর্থ এ নয় যে, উহা অতি সহজসাধ্য। বরং ইহাই বলা উচিত যে, অল্প অর্থব্যয় এবং প্রভূত পরিশ্রম ভিন্ন তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, পিতৃপিতামহগণ এ বিষয়ে যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও সঠিক এবং কাঙ্ক্ষকরী।

কিন্তু শুধু অর্থব্যয়ে যদি এ কাজ করিতে হয় তবে কুবেরের ধনও তাহার অল্প পথ্যাপ্ত নহে। বিদেশী ঠিকাদার, বিদেশী মজুর ও সরকারী ধনদৌলতের সাহায্য ও চেষ্টার অপেক্ষার যদি দেশের লোক বসিয়া থাকে তবে বাঁকুড়ার এ ক্ষয় কোনদিনই বাইবে না। কেননা উহাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা বাংলা সরকারের তহবিলে নাই ও আগমনের সম্ভাবনাও স্বপ্নপর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন তাহার এক-দশমাংশও জুটিবে না এবং কেন্দ্রের সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও কম, কেননা কেন্দ্রীয় লোকপরিষদে বাঁকুড়ার কথা বলিবার লোক কেহ নাই।

পথঘাটের ব্যাপারেও দেখিলাম উপযুক্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা যদি থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি স্বল্প ভাবে পুঁজি বিভাগের কাজ চালানো হয় তবে বাঁকুড়ার দুর্গমতম অঞ্চলও জগম করা সম্ভব হয়। এ জেলার মতি শক্ত ও বহুবহল স্বতরাং পথঘাট নির্মাণ—বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে—অতি স্বন্দর ভাবে হইতে পারে। যে অঞ্চলে নতুন পথ নির্মিত হইয়াছে সেখানকার কৃষি ও কুটীরশিল্পের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে হইবে স্বতরাং পথ নির্মিত হইলে পরে তাহা সংস্কার করা দুষ্কর হইবে না।

খোয়াই তো চতুর্দিকেই রহিয়াছে এবং বুদ্ধি পাই-

তেছে। আজিকার শস্ত-শ্রামল ক্ষেত সামান্য কয় বৎসরেই ধূলার ধূসর অমর্যব প্রাপ্তবে পরিণত হইতেছে। চাষীর সাধ্য নাই একাকী খোয়াই বোধ করে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় দেখিলাম দুই-এক স্থলে তাহার স্বল্প প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে এখানেও সে এক কথা, বাহা প্রয়োজন তাহার তুলনায় হইয়াছে অল্পই এবং যে ভাবে ও যে উপায়ে ইহা হইতেছে তাহাতে সমগ্র জেলায় সমস্তা-পূরণে যে সময় বা অর্থ লাগিবে তাহা কল্পনারও অতীত। আরও কয়েক স্থলে দেখিলাম, যেখানে চাষী এখনও অপেক্ষাকৃত স্বস্থ ও কর্মঠ আছে এবং সেখানকার স্থানীয় ভদ্র গৃহস্থ শ্রেণী শহরের মোহে পড়েন নাই, সেখানে সেচ ও সংরক্ষণের চৌ গ্রামের লোকেই করিয়া চলিতেছে এবং সেখানে এই দুই বিষয়েই স্থানীয় লোকের অবস্থা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উন্নত। সেখানে সরকারী সাহায্য বধ্যবধ রূপে প্রদত্ত হইলে তাহার উন্নয়ন সহজ ও দ্রুত হইয়া যায় এবং সরকারী সাহায্যের প্রদোষ শুধু যে বধ্যবধ হওয়া প্রয়োজন তাহা নহে উহা সময়মতও হওয়া আবশ্যক নচেৎ এখানকার চাষীও ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া ধ্বংসের পথে চলিবে যেভাবে অন্য অঞ্চলে ইতিমধ্যেই হইয়াছে।

দেখিলাম স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নও কিছু অসাধ্য ব্যাপার নহে। ম্যালেরিয়া দমনের বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুই-এক অঞ্চল এ উপায় চালানোর ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিশেষভাবে কমিয়াছে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়ার সেখানকার চাষী পূর্বদমে ক্ষেতের কাজ চালাইতেছে এবং তাহাতে তাহার দুর্দগাও দূর হইবার আশা বাড়িতেছে। এ ক্ষেত্রেও সমস্তা একই—অর্থ, লোকবল ও বধ্যবধ চেষ্টার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে এক দিকে প্রয়োজন মশক-ধ্বংস ও ঔষধপ্রয়োগ ব্যবস্থা, অন্য দিকে চাই পুষ্টিকর খাদ্য। পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যাপারে বাঁকুড়ার সাধারণ সম্পদ ছিল গোধান এবং দো-ফসলা জমি, যেখানে ডাল, সরিষা ও গম জন্মাইত প্রচুর। চাষী স্বস্থ ও সবল না হইলে বাঁকুড়ার জমিকে স্বকলা করা অসম্ভব। আবার সেচ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থানা হইলে দুইটি ফল স্বপ্নেরও অতীত। জল নিষ্কাশন হওয়ার কাঠের বদলে ঘুঁটের প্রচলনে ক্ষেতে সারের অভাব যথেষ্ট। আবার কৃত্রিম সার শহর হইতে দূরে লইতে হইলে পথঘাটের

৯ ভাব খবচ ও পরিভ্রমণ শেষে এবং কলস কলিলেও যদি বহনের খরচে তাহার দাম চরমে উঠে তবে চাবীর আয় হয় কিসে ?

সুতরাং সমস্তা বহুমুখী। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া বুঝিলাম যে, সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্তা রহিয়া গিয়াছে দেশের লোকের মানসিক অবস্থার মধ্যে। চতুর্দিকের সমস্তা ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য যে প্রচেষ্টার আবশ্যক তাহার একান্ত অভাবই দেখিলাম সর্বত্র।

যদি দেশের লোককে একথা বুঝান যায় যে, তাহারা নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টা করিলে তাহাতে আরও দশ জনের এবং সরকারী সাহায্যও পাইবে, যদি নিজস্ব লোককে সজীব করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে কণ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক দল জোটে তবে সরকারী হাজার টাকায় এখন বাহা হইতেছে তাহা তাহার এক পঞ্চমাংশেই সম্ভব হইবে। বহুদিন পূর্বে বাঁকুড়ায় ঐ চেষ্টা গুরুতর দত্ত মহাশয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী সাহায্য একেবারে না আসায় তাহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ব্যাহত হইয়া যায়। সেচের কাজ, পথঘাট নির্মাণ সবকিছুই মাল্লবের কায়িক পরিশ্রমে হয় ভাগ, অল্পই হয় বস্ত্র-সাহায্য, বাঁকুড়ার মত দেশে যেখানে বেশীর ভূমিপুষ্ঠ অসমতল।

আজ বাঁকুড়ার লোকের বৈরূপ মানসিক অবসাদ, বৈরূপ নিদ্রাকণ বর্মবিমুক্ততা, তাহাতে দেশের লোকের মনে নূতন বল আনা সহজ নয়। দেশে নেতৃত্ব নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে একথা আমাদের দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে।

যে নূতন পথটি বাঁকুড়ার অতি দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়া চবিশ মাইল সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে তাহার দুই পাশের গ্রামে অসংখ্য দরিদ্র লোকের বসতি। আমরা পথ দেখিতে যখন গিয়াছিলাম তখন এক স্থলে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা জীপ খামাইয়া বর্ষাতি পরিত্যাগিলাম এমন সময় এক দল জীলোক ছুটিয়া আমাদের সামনে পথ পার হইল। তাহাদের সকলেরই বস্ত্রের অভাব—জীর্ণ নতছিন্ন কাপড় বৃষ্টির জলে ভিজিয়া বাওয়ায় লক্ষা নিবারণের উপায় নাই। এই বস্ত্রাভাবের প্রধান কারণ অর্থের অভাব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা টাকা গুলিলে চোরা-কারবারীর কাছে কাপড় পাওয়া যায় এ কথা সকলেই জানে।

যে পথটি ঐ জীলোকের দল ছুটিয়া, মুখ ফিরাইয়া পার হইল তাহা সবেমাত্র নির্মিত হইয়াছে এবং নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা স্থলিকামিনকে দিতে হইয়াছে। অথচ শুনিলাম, সে সকল মজুরদের প্রায় সবই ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনিতে হইয়াছিল। স্থানীয় দরিদ্র লোকের ঘরের জীলোকের

লক্ষা নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলেও পরিভ্রমণের বিনিময়ে অর্থোপার্জনে প্রস্তুত নয়।

ঐ একই কথা বীরভূমে গুনিয়াছিলাম ময়ূরাক্ষী পরি-কল্পনার কাজে। সেখানে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়াছে গল্পাম অঞ্চলের উড়িয়া, মজুর ও মজুরনী এবং বাঁকুড়ার লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছে মানভূম ও ছোট-নাগপুরের গুঁরাও, মুন্ডা ও কোল।

দেশের অশিক্ষিত ও দক্ষিণ লোকের বুদ্ধি অল্প, তাহারা আবলম্বনের পথ তখনই দেখিবে যখন শিক্ষিত গৃহস্থের সম্ভান সেকথা তাহাদের বুঝাইবে। সে চেষ্টারও অভাব বেশী ল্পষ্ট দেখিলাম, যে কয়জন উৎসাহী লোক এ বিষয়ে চেষ্টিত তাহাদের সাহায্য করা দূরের কথা, সহায়ত্বাতিও কদাচিত্র দু-একজন প্রকাশ করেন।

তবে বাঁকুড়ার উন্নয়ন কি করিয়া সম্ভবপর? সম্ভব তখনই হইবে যখন ইহার উন্নয়নে বহুপরিচর হইয়া দেশস্থ কয়েকজন গণসেবক প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহাদের প্রয়োজন প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবল। তাহার জন্ত উভয় স্থলেই তাহাদেরই নির্বাচিত লোক থাকা প্রয়োজন। তাহাদের প্রয়োজন জেলা বোর্ডের ও জেলা পরিচালকের ভারপ্রাপ্ত অধিকারী-বর্গের সাহায্য। স্বেচ্ছা ও তাহাদের সম্মত ভাবে উপযুক্ত লোকের জন্য দাবি করিতে হইবে। সর্বোপরি তাহাদের প্রয়োজন দেশের লোকের কায়িক ও মানসিক উত্তম। ইহার জন্য তাহাদের আবশ্যক ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন।

যদি উপযুক্ত নেতৃত্ব তাহারা লাভ করিতে পারেন তবে সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। তবে বহুদিন বাবং বাঁকুড়া ঘুরিয়া দেখিয়া বাহা বুঝিয়াছি তাহাতে নেতৃত্বের একান্ত অভাবই স্পষ্ট।

বাঁকুড়ায় কংগ্রেসী দল দুই ভাগে বিভক্ত—নিজীব ও সজীব। নিজীব দলে সৎ লোক আছেন বাহাদের সদিচ্ছা ও সত্বর মনের মধ্যেই থাকে। সজীব দলে স্বার্থাঘেবণ ভিন্ন অন্য কিছু খুবই কম। সুতরাং কংগ্রেসের দ্বারা বাঁকুড়ায় সমস্তাপূরণ তখনই সম্ভব হইবে যখন উহার বর্তমান কাঠামো বিসর্জন দিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা হইবে।

অন্য দিকে বিভিন্ন দল পরস্পরের বিরোধ সত্ত্বে চিন্তা ও কংগ্রেসের ধ্বংস-চেষ্টার বাহিরে কিছু ভাবিবার অবকাশ এত দিন পান নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

বাঁকুড়া জেলা ক্ষয়ের মুখে চলিয়াছে কেন সে কথা ভো বলিলাম। কিন্তু আশার আলোক যে একেবারে নাই তাহাও নয়। ইতিমধ্যেই দু'চার স্থলে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হইতেছে শুনিলাম। তাহায়াই দেশের আশা ভরসা।

অখিল ভারত প্রাচ্যবিজ্ঞান মহাসম্মেলন

বোম্বে অধিবেশন, লক্ষ্যে

অধ্যাপক শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর

বিগত ১৬ই আখিল হইতে লক্ষ্যে শহরে অখিল ভারত প্রাচ্য-
বিজ্ঞান মহাসম্মেলনের ভিন্ন দিন ব্যাপী বোম্বে অধিবেশন
হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ
ইন্দোনেশিয়া, চীন, তুরস্ক, ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে
প্রাচ্যবিজ্ঞানোদ্ভী সন্তোষা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মূল সভাপতি অধ্যাপক কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী বীর
সুচিহ্নিত অভিভাষণে দেশে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবিক সভ্যতার-
প্রসারের আনুশঙ্গিক কুল, বাণীমতা লাভের পরবর্তী বিভিন্ন
সমস্যা ও মৈত্রিক অবনতি, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভেদ-
ব্রহ্মের কৃপাসাহস্বে বারণা প্রকৃতির তীব্র সমালোচনা এবং এই
সভ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির সত্য চর্চার উপযোগিতা
বর্ণনা করিয়াছেন—পাক্ষাত্যের অর্থ অনুকরণ পরিহার করিয়া
সত্য, বর্ষ ও অহিংসা পুত্র বীর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তিকে দৃঢ়-
প্রতিষ্ঠিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন—নিখিল ভারতীয়
গবেষণা মন্ডির স্থাপন এবং প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও
সংরক্ষণের প্রতি সরকারের সক্রিয় সহায়কৃত্য কামনা করিয়া-
ছেন—বিচারপূর্বক হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে
উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণের সপক্ষে ও ভাষার ভিত্তিতে
প্রদেশ পটনের বিপক্ষে যত প্রকাশ করিয়াছেন—পরিশেষে
ভারতে এবং বিদেশে প্রাচ্যবিজ্ঞান চর্চার কয়েকটি বিশিষ্ট
উদাহরণের উল্লেখ ও প্রমাণসা করিয়াছেন।

স্বাগতকারিণী সভার সভাপতি আচার্য্য ত্রীনন্দন দেব
প্রাচ্যবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আলোচনাপূর্বক ভবিষ্যৎ পাক্ষাত্য
পতিভবনের দান প্রকার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং
ভারতীয় জনগণের উৎসাহ ও পতন, শক্তি ও দুর্বলতার প্রকৃত
ইতিহাস রচনার প্রয়োজন বিবৃত করিয়াছেন।

প্রারম্ভিক বক্তৃতার উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মানসী
ত্রিপোবিদ্যবর্ত পহ বর্তমানের পটভূমিকায় প্রাচীন ভারতীয়
সংস্কৃতি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া ভবিষ্যতে অগ্রগণ্য
সর্বভৌমবী সংস্কৃতিপটনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

সম্মেলনে শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ-
সমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং কৃত কর্মের আলোচনা ও
কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে
সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা-সভাপতির অভিভাষণসমূহ বিভাগ
করিতে গিয়া প্রত্যেকের কৃত মাত্র আদ্য বর্তী সময়ের ব্যবস্থা
করা হইয়াছিল। অথচ অধিকাংশ অভিভাষণই উচ্চ সময়ের
মধ্যে সমাপ্ত না হওয়ার সন্তোষা সকল সভাপতির ভাষণ

প্রবণের পূর্ণ সুযোগ পান নাই। তদুপরি বেশীর ভাগ শাখা-
সভাপতির ভাষণ সুশ্রুত না হওয়ার বিশেষতঃ লৌকিক সংস্কৃত
শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রী কে. কে. হাতিগী মহাশয়ের
সুচিহ্নিত ভাষণ অতি অল্প সংখ্যার পরিবেশিত হওয়ার বিশেষ
অসুবিধা অনুভূত হইয়াছিল।

বিভিন্ন শাখার নানা বিষয়ে প্রায় পৌনে ভিন্ন পত্র প্রবন্ধ
পঠিত অথবা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনেক শাখার
প্রবন্ধসংখ্যা বেশী হওয়ার পাঠ এবং আলোচনা বিশেষরূপে
ব্যাহত হইয়াছিল। প্রবন্ধ-সম্পর্কে ভবিষ্যতের কৃত কর্তৃপক্ষ
কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। এ পর্যন্ত প্রবন্ধ ও
তাহার সারাংশ প্রেরণের সময় নির্দিষ্ট থাকিলেও তাহা বধ্যবৎ
ভাবে অনুস্থত হইত না। একত সারাংশ মূল্যে বিশেষ
অসুবিধা হইত। সূত্রে ব্যবহার প্রবন্ধ ও তাহার সারাংশ
অধিবেশনের অন্ততঃ চারি মাস পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট
পৌঁছাইতে হইবে। তাহার অধিবেশনের এক মাস পূর্বে
পুস্তকাকারে মুদ্রিত সারাংশগুলি সমস্তদের নিকটে পাঠাইবেন।
সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠের ক্রম এবং সময়সূচী নির্দিষ্ট থাকিবে।
এই নিয়ম অনুস্থত হইলে সমস্তবর্গের বিশেষ সুবিধা হইবে
আশা করা যায়। প্রবন্ধের সারাংশের সঙ্গে মূল সভাপতি ও
শাখা সভাপতিদের অভিভাষণসমূহ মুদ্রিত হইলে আরও
ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান ব্যবহার একবার মুদ্রিত
ভাষণ সভার বিতরণ করা হয় এবং পরে কালক্রমে কার্য-
বিবরণে মুদ্রিত হইয়া উহা বিভীষিকার সমস্তদের নিকট পৌঁছে।
প্রস্তাবিত ব্যবহার হই বার হাপাইবার অসুবিধাও হয় হইতে
পারে।

অধিবেশনে হায়দরাবাদের অন্তর্গত শিতলকোরা এবং
পাটনার অন্তর্গত কুমারহাটের আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে
আলোকচিত্র সহকারে হুইট ভাষণপূর্ণ বক্তৃতা বিশেষ উপভোগ্য
হইয়াছিল। জাতীয় শিকা ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যের স্থান
এবং রাষ্ট্রভাষার বরণ নির্ণয় ও উন্নয়ন সম্পর্কিত হুইট
আলোচনা সভারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অভ্যাগত সমস্তদের আমন্ত্রণবাদের কৃত লক্ষ্যোরে
প্রসিদ্ধ সূত্র ও সন্দীভের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভট্টনারায়ণের বৈষ্ণবসংহার নামক
সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় উপভোগ্য
হইয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মৌলিক উদারপরিধি সর্বত্র
অনুস্থত না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাচীন প্রোভার কাছে স্থায়ী

‘প্রত্যাহৃত সংকত উদ্ধারণ ক্রিতিকুই বোধ হইবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও প্রাচ্যবিভাগসমেলনের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের বিভাগীয়ক হিন্দী নাটক কলগুপ্ত বিক্রমাবিত্য অভিনয় করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর গ্রন্থালায় একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহাতে সম্মেলনের সমস্তেরা বহু মূল্যবান সংকত ও কারসী পুঁথি দেখার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

মিরভম শ্রেণীসমূহ হইতে বাধ্যতামূলক সংকত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিভাগমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ, পুণা ভাণ্ডারকর গবেষণাগার এবং হোসিয়ারপুর বিভাগমন্দির বৈদিক গবেষণাগার হইতে প্রকাশ্যমান মহাত্মারত এবং বৈদিক শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্পাদনের জন্ত সাহায্য দান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনার বোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিংহলে বৌদ্ধবিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত সিংহলের জনসাধারণ এবং সরকারকে অহরোধ, মিথিলা সংকত গবেষণামন্দির, রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, জয়গওয়াল গবেষণা মন্দির এবং মগধ পালি গবেষণা মন্দির স্থাপনের জন্ত বিহার সরকারকে বত্ববাদ জাপন, রাজস্থানের ইতিহাস সফলনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উদ্বুদ্ধ করিবার

জন্ত বেশীর রাজত্ববর্গকে অহরোধ এবং রাজস্থান পুরাতত্ত্ব মন্দির স্থাপনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে প্রত্যাব বৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য পরিচালন প্রবৎ এবং প্রত্নতত্ত্বে ইংরেজীর সহিত হিন্দী ভাষার ব্যবহারও বিবিধ করা হইয়াছে।

সম্মেলনের পরবর্তী অবিবেশন আগামী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আচার্য্য ত্রিভুক্ত সুমীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহ্রমদাবাদে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলন পঞ্চদশ শাখার বিভক্ত এবং ইহার কেন্দ্র এত বিস্তৃত যে দ্বাদ্ধ তিন দিন সময়ের মধ্যে সুস্থভাবে ইহার সকল কার্য সম্পাদন সম্ভবপর নহে। কলে এবার পূর্ক বিভাগিত হারদই ভ্রমণ কর্তৃহুটী হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেস এবং ইতিহাস কংগ্রেসের সহিত অবিকার বিভাগ করিয়া লইলে সম্মেলনের তার লাঘব এবং প্রয়োজনীয় কেন্দ্রে বিস্তৃতি সম্ভবপর। হস্তলিখিত পুঁথি সম্পর্কে সম্মেলনের একটি বত্ব বিভাগ থাকি অনেকই আবশ্যক মনে করেন। অথচ বর্তমান ব্যবস্থার তাহার সরিবেশ অসম্ভব।

সম্মেলনে বঙ্গীয় সমস্তসমূহের সংখ্যালগ্ভা অনেকই হুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গের ব্যাভামা পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহার সহিত যুক্ত হইলে সম্মেলনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

সমস্যা—পথ কোথায় ?

শ্রীবীণা রায় চৌধুরী

কি কষ্টম সমতা চারিদিকে ! অত্যাব ও হুঁসিতি চলছে পাশাপাশি। মাহুকের তার-অতার বোধের চেতনা ক্রমে লোপ পেরে যাচ্ছে। তাবহি অক্ষমতার কি বিপুল বোকা আমাদের বইতে হবে, যদি না অগণিত হেলেনেদের সামনে তুলে ধরি উচ্চ আদর্শ, যদি না পরিচালিত করি তাদের প্রকৃত পথে।

মিরামার অন্ধকারে আজ মন আজর তাই পথ খুঁজছি ব্যাকুল উৎকর্ষ। বিদ্যালয়ে, গৃহে বা সমাজে যে সব সমতা কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের মনে আশকার উল্লেখ করে নি, আজ সেই সকল সমতা প্রতিমিরতই আমাদের বিপর্য্যত করে তুলছে। তাই চাইছি পথ-নির্দেশ, খুঁজছি বেদনার অভিকার-পহা।

যারা কল্বিত মন মিরে তাবিরে তুলেছে আমাদের আর সমাজ এবং রাষ্ট্রের চরম সর্বনাশ করছে—তাদের সবচে

আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। তাদের সংস্পর্ক ও কুশিকার প্রত্যাব থেকে আমাদের হেলেনেদেরের রক্ষা করতে হবে। যারা মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দেশ ও সমাজকে তবিততে যারা নৃত্তন করে গড়বে তাদের প্রতি আছে আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা। জ্ঞান ও শিকার, শক্তি ও বৃত্ততার এগিরে চলছে, তারা মহান আদর্শের নিকে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ তবু শিতামাতারই নয় দেশ ও জাতির আশা-ভরসা তারা। তাদের জন্য তাবনা নেই, কিন্তু সমতা আমাদের হুর্কলমতি-দের মিরে তাদের মধ্যে হয়েছে অন্যায়ের বীজ উগ, যারা পারছে না সমাজ ও বৃত্ত আয়শক্তি যারা প্রলোভনকে জয় করতে। শিকাকেজে আহি দীর্ঘ কাল যাবৎ, আবার বহু পরিবারের সন্দেশ হয়েছে মিবিত পরিচর। হাকার হাকার হেলেনেদের সংস্পর্কে এলায় এ জীবনে। এদের সুখ-হুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবলতা-হুর্কলতা এবং সেই সন্দেশ বহু কেন্দ্রে

এদের পারিবারিক পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হ'ল। ক্রম পরিবর্তন ঘটছে এদের চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে। পরিকার-পরিকল্পনা, শৃংখলা ও নিয়মাবলী—এই সমস্ত সঙ্গুণ ক্রমেই যেন এদের মধ্যে লোপ পেরে যাচ্ছে। কত জন হচ্ছে উদ্বাস্তু, তাই আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছি—কি করে রক্ষা করব এদের। কি করে লভ্য পথ দেখাব? দেশের বাহা প্রবাস আশা-ভরসাহুল সেই ছেলেমেয়েরা যদি সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী না হয়, রাষ্ট্র যদি বিপর্যয় হয়ে পড়ে বিকৃতবুদ্ধি নাগরিকদের অপকর্মে দগ্ধ, তা হলে আমাদের দেশ যে অগতির কাছে কতটুকু হের হয়ে যাবে সে কথা মনে করে আমাদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

বর্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা বলব সেগুলি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। আশা করি, সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরাই এই সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করে দ্রুত দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাববেন। প্রথমেই বালিকা এবং কিশোরীদের—যাদের সংস্পর্শে প্রিন্সিপালই আসছি—দিয়ে আলোচনা করি। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন—যেদের বয়স বয়স ১১ থেকে ১৩ বা ১৪ তখন তাদের মন স্বাভাবিক: এই একটু ভাব-প্রবণ হয়ে ওঠে। এই বয়সে তাদের উপর গৃহে পিতামাতার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষিকীর বিশেষ দৃষ্টির দরকার। এই সময় তারা পড়ে বই, গল্প, কবিতা বা অষ্টম শ্রেণীতে।

বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্রীদের উপর কঠিন শাসনের বিষয় প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে বিষয়ে কিছু কিছু বলতে চাই শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সকল পিতামাতাই যেন উনার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সন্তানদের বিচার করেন। রেহ ও রুহ শাসন ইইয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু সর্কা-পেকা অধিক প্রয়োজন পিতামাতার বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ আর সন্তানদের মনস্তত্ত্ব বুঝবার আন্তরিক চেষ্টা। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে অনেকটা পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধেই অনুরূপ। আমরা আদর্শ শিক্ষিকী হইতে নই, তবু একথাও বলি যে, যে সব ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের বৎসরের পর বৎসর কাটে, যেসব গুরু মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমল-বেহমার সঙ্গে পরি-চিত হচ্ছি প্রতি দিন, তাদের আমরা যথার্থই স্নেহ করি, তাই চাই তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ—এই আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করি যে, তাদের পরিচয়ে হোক আমাদের পরিচয়—তাদের সুদামে আমাদের সুখ উজ্জ্বল হোক। সেবাপত্র সবাই যে সমান উন্নতি করবে তা আশা করা যায় না, তবে এটাই একান্তভাবে কাম্য যে তারা চরিত্রবলে দেশের সুখ উজ্জ্বল করতে পারে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যেন আদর্শ সহধর্মিণী এবং জননী হতে পারে। সময় সময় মেয়েদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন অভিভাবকদের দিকট

আমাদের ডাক পড়ে। অনেক সময়ই আশঙ্কা হয়, পাছে তাঁরা কঠিন শাসন করে আরও সর্বনাশ করে না বলেন। তাই অভিভাবকদের কাছে এই অনুরোধ তাঁরা যেন বৈধব্যচ্যুত হয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করে বলেন। অনেক বলতে পারেন, “এই উপদেশ দেবার প্রয়োজন কি, আপনারা কি পিতামাতার চেয়ে বেশী ভালবাসেন মেয়েদের?” তা হইতে নয়, তবে ছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পিতামাতার চেয়ে বেশী বুঝি আর দীর্ঘকালের সাহচর্যে গুরু মনের অগ্নিগণির সঙ্গে পরিচয়ও আমাদের গভীর। পিতামাতার সম্পর্ক শুটকরেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে আর আমরা ছাত্র ছাত্রীর মেয়ের সংস্পর্শে এলায় জীবনে।

অতিরিক্ত কঠোর শাসনের কলে অনিষ্ট যে মেয়েদের ফিল্প হয় সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলছি—একটি ছোট মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে, সে পরীক্ষার নকল করে। আমরা সাধারণতঃ এর প্রতিকার করি মিছেরাই মেয়েকে বহুনি দিয়ে আর ভালভাবে বুঝিয়ে—কিংবা তার মন্বর কেটে দিয়ে। প্রয়োজন বোধ করলে গুরুজনদের ডেকে জানিয়ে দিই। এক কক্ষে মেয়ের পিতাকে জানানো হ'ল। অবশ্য তিনি যে ধরনের শাস্তিবিধান করলেন তা ছিল সম্পূর্ণই আমাদের অপপ্রত্যাশিত। মেয়ের বাবা করলেন কি, শাস্তিবস্ত্রপ মেয়েকে তুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে ঘর-সংসারের কাজে লাগিয়ে দিলেন, আর বাজীর বাইরে তার কোথাও বেরুশো বন্ধ করে দিলেন। কলে হ'ল কি—বাজীতে বসে থেকে ৩ দিনরাত শাসনের চাপে মেয়েটির মন বিগড়ে যেতে লাগল, সে হয়ে উঠল একান্ত অবাধ্য। সেবা-পত্রার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল জন্মের মত। একেই পিতা যে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে ঝুট করেছেন সে কথা বলা বাহুল্য।

এর ঠিক তির বরণের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মেয়ে ছয় বিষয়ে কেল করে প্রোপ্রেস রিপোর্টে সব মন্বর পাঠে বাজীতে বাবার হাতে রিপোর্টটি দিলে। পিতা এলেন পরদিন তুলে। “সেখুন এ কেন প্রমোদন পেলেন না? সব বিষয়ে পাস-মার্ক হয়েছে ত?” অবাক হয়ে গেলেন এত বড় তুল করেছি কি! যেটি বুক এনে মিলিয়ে দেখি কোনটাই মিলেছে না। তবে কি তুল হ'ল তুলতে? পর পর চেকিং চলতে লাগল—ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল—সবই কি তুল হ'ল? পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল সব মন্বরের উপর কালি দিয়ে লেখা—০ কে ৪, ১ কে ৪, ২ কে ৫ ইত্যাদি। মেয়ের পিতাকে দেখানো হল। তিনিও বীকার করলেন over-writing (খাল করা হয়েছে)। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমোদনের জন্ত তিনি অনুরোধ করতে লাগলেন। বললেন, “আপনি এর প্রমোদনের জন্তে এ অত্যাচার অনুরোধ করছেন কি করে?”

কিছু কথাকাটাঁকাটির পর সেদিনকার মত তিনি বিদায় হলেন। পরদিন আঁপিস কামাই করে এলেন আবার, অত্যন্ত কাজের চাপ, বহু অভিভাবক এসেছেন যেহেতু প্রায়শঃমের জন্ম আবেদন জানাতে। পুরোনো ভ্রমলোকটি পুনরায় এসে মেরেকে প্রায়শঃম দেবার জন্ম পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বহু অহুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি অকৃত-কার্য্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত স্ক্র মনে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যে শিতা জীবনে সব পরীকার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনিও আসেন চার বিষয়ে ফেল করা যেহেতু জন্ম অহুরোধ করতে। এতে যে প্রকারান্তরে মেরেরই অমিষ্ট করা হয় সেকথা যে এঁরা তুলে বান খেইটেই আশ্চর্য্য।

আমাদেরই কতাহানীরা কতজন রয়েছে, কেহ কর্ণ-হলে, কেহ পরিবারে বহু বা সহবান্ধিগণে, সময় সময় যাদের পরিচর দিতে লজ্জা বোধ করি, এ ত গেল এক দিক। কিন্তু আমাদের প্রথম শিকার স্কুলের দৃষ্টান্ত যখন দেখি তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে। এমন কত-হাজী রয়েছে যাদের কথা মনে করে আমরা গর্ক বোধ করি।

যে সমস্ত কিশোর-কিশোরী আজ জাত পথে চলেছে একান্তভাবে তাদের কল্যাণ কামনা করি বলেই তাদের সম্বন্ধে হুঁএকটি অপ্রিয় সত্য বলতে বসেছি। যে সকল মাদার্সক দোষত্রুটি আজ তাদের মজাগত হয়ে গেছে, সেগুলো সংশোধন করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই হার মানতে বাধ্য হচ্ছি। বস্তুতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান আচরণের অভ্যাস যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে তাতে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে নৈরাশ্যের স্কার হয়। শিককতা-কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে তা মর্য্যাদিক। ছোট ছেলেমেয়েরা বাহিমার টাক চুরি করছে, একের কলম, ছাতা, বই, সেলাই আছে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। অপরাধীর অসুস্থদান করতে ও অভিভাবকের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরা হর-রাগ হয়ে যাই। কিন্তু এ সকলের প্রতিবিধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে এ রকম এবং এর প্রতিকার কি—এ সম্বন্ধে শিকক-শিকরীজী, অভিভাবক-অভিভাবিকা প্রত্যেককেই আজ গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে—হাজীহাজীরা যাতে উদারগামী না হয় সেজন্য সব সময় রাগতে হবে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। কত ছেলেমেয়ে যে ভুলে যাবার দায় করে রশট। থেকে চারটা অজ্ঞানপার আড্ডা মারে কিংবা সিনেমা দেখে, করজন পিতামাতা তার বোঁক রাধেন। আমরাও অনেক সময় বোঁক পাই না। বিলাসিতা এবং প্রসাধনের দিকেও আজকাল ভুল-কলেঙ্কের মেয়েদের অসন্তব রকম বোঁক দেখা যাচ্ছে। অনেক সেকে-গুকে সারাদিন টো টো করেই কাটিয়ে দিচ্ছে। বা বাবা শিষ্ঠিত দিল্লিকার। কত মেয়ে যে দিনের পর দিন এগি দিয়ে এদিক সেদিক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কত বিভার্মনীই

না মোট বই হাতে নিয়ে ভিটোরিয়া মেমোরিয়েল, চ্যাপেল রোডে পারচারি করছে। এ ধরনের বহির্ভূবী বিকিও মন নিয়ে তো বিভাজ্যাস হয় না, হয় গিঁতার বা অভিভাবকের কষ্টার্জিত অর্থের প্রাচ। সব রকম হাজী আন্দোলনে কিন্তু এদেরই দেখতে পাবেন অগ্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের হারু কম বলে ‘হাজীমেব চলবে না’, ‘অভিভাবক বলি চলবে না’, এই সমস্ত ধ্বনি করে বাতা উড়িয়ে এসেছেন বের করছে নিঃ-সঙ্কোচে।

উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সকল বিষয়কের বীজ আজ অহুরিত ও পরবিত্ত হয়ে উঠছে আমরা চাই তা উৎপাটিত হোক, কিন্তু কিতাবে হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না। চাই হাজীহাজীদের পিতামাতার সহযোগিতা, চাই প্রাণপণ চেষ্টা। হরত সকল হব না সকল ক্ষেত্রে তবু প্রতি-কারের পথ খুঁজতে হবে। তরুণ-তরুণীদের মাহু্য করবার গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর তত। আমাদের কর্তব্য তাদের সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরা, অজ্ঞানের প্রাণ তাদের মনে স্থাপন করা, সংস্কৃতির প্রতি অহুরাগ জাগানো। আমাদের হাতে তুলে দেওয়া মেয়েদের চরিত্র এমনভাবে আমাদের পঠন করতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী হয়ে পরিবারের সুখ উদ্ধল ও জাতিতে পৌরবান্ধিত করতে পারে। অবশ্য আজ যে আমরা আমাদের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি সেজন্য অনেকটা দারী আধুনিক সমাজ-জীবন ও বর্তমান জীবন-সংগ্রাম। এ ছাড়া সময় এবং ইচ্ছার অভাবও কতকটা দারী। এ কথা জানি যে, পিতামাতার বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও কত ছেলেমেয়ে ভুল করে বিপথে যার। এর ভুল থাকে অনেক কারণ, কিন্তু তবু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এদের যেমন স্নেহ করতে হবে তেমনি শাসনের দানও শিথিল করে দিলে চলবে না। এদের আনন্দের ধোরাক ও লদ দিতে হবে, ভাল সঙ্গী খুঁজে দিতে হবে এদের জন্ম। প্রতিবন্ধক যে কত, জীবন-সংগ্রাম যে কি প্রচণ্ড সবই জানি, কিন্তু কুসন্তানের জন্ম ও জননী হয়ে থাকা যে আরও বেশী মর্য্যাদিক।

অনেক দূর এগিয়ে চলে এসেছি জীবনপথ বেয়ে, আমাদের স্নেহের ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল আপকার আমরা অহুতি বোধ করছি, তাই বার বার এই কথাই মনে জাগছে, সমস্তা কঠিন—পথ কোথায় ? আমাদেরই চোখের সামনে কত তরুণের হচ্ছে সর্গনাশ, কত তরুণী করছে মহাভুলের প্রারম্ভিত, কত পিতামাতা প্রতিদিন অশ্রু বিসর্জন করছেন। আমরা কখনও মর্য্যক, কখনও বা ভুলভোঙ্গী—অকমতার বোকা বহন করছি শুধু। কখনও বা প্রারম্ভিতও করছি আপন দিহুঁদিতা ও সন্তানের ভুলের অপরাধের। তাই বলি সময় থাকতে প্রতি-কারের পদ্য আবিষ্কারের জন্ম মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।



আলোচনা



“রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন”

ঐগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

উক্ত শ্রীযুক্ত প্রবন্ধের (প্রকাশী ১৮৫৭) আলোচনা করিয়া (প্রকাশী ১৮৫৮) ঐকীমেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি উক্ত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

রামনারায়ণের “তর্কপঞ্চানন” উপাধি ঘোটেই ছিল কিনা এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য আমাদের দৃষ্ট রামনারায়ণের গ্রন্থের “ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তী” উপাধিটিই আছে। প্রবন্ধে কালিদাস দত্তের প্রবন্ধে ও “বঙ্গ দাক্ষিণাত্য বৈদিক” গ্রন্থে তর্কপঞ্চানন উপাধির উল্লেখ বিখ্যাত হইতেই গৃহীত হইয়াছে। রামনারায়ণের বংশধরগণের মধ্যেও, তাঁহার যে ‘তর্কপঞ্চানন’ উপাধি ছিল পুরুষাবৃত্তরে সেই ধারণাই চলিয়া আসিতেছে। এত দিনের প্রচলিত সত্যরূপে গৃহীত তথা যে একেবারে অমূলক তাহা মনে হয় না। রামনারায়ণ যে নবদ্বীপে তার অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহাও সর্ববাদীসম্মত এবং তাঁহার যে ‘তর্কপঞ্চানন’ উপাধি একেবারে ছিল না তাহাও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

রামনারায়ণের সমসাময়িক রূপে উল্লিখিত পাঁচ জন পণ্ডিতের মধ্যে রামেশ্বর তারাবাঈয়ের সমপঞ্জিকা আমরা পাইরাছি। তাহাতে তাঁহার জন্ম ১৮২২ শকাব্দরূপে উল্লিখিত আছে। উহা রামনারায়ণের সমকালবর্তী (১৮০৫ শকাব্দ)। অতীত পণ্ডিতের নাম পুরুষাবৃত্ত-নিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

রামনারায়ণের ‘ভুল ভাগবত’ রচনার আখ্যায়িকাটি আমাদের নিকট সত্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ সারা দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচলিত রূপে বৃত্ত হস্তার একাধিপত্য তাঁহার বংশধরগণই ভোগ করিতেছেন। দক্ষিণ অঞ্চল কেন্দ্রীয় রায় চৌধুরী

কমিয়ারী। যদি কলকাতার পূর্বে কাহারও উক্ত মর্যাদা প্রাপ্তি সম্ভব হয় তবে তাঁহার জ্ঞাতার বংশধরগণের মধ্যে বর্তমানে ইহার গ্রহণযোগ্যতা সম্ভবপর এবং রামনারায়ণের পুত্রদের মধ্যে যদি কেহ পাইরা থাকেন তবে অতীত পুত্রদের বংশধরগণের মধ্যে তাহা বিদ্যমান থাকা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়। কিন্তু তাঁহার কোন পক্ষই বর্তমানে দৃষ্ট হয় না। রামনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং নিতান্ত লিপিবদ্ধ প্রমাণাভাববশতঃ উক্ত প্রচলিত ধারণার অসত্যতা প্রমাণিত হয় না। উহা সত্য হইলে কমিয়ার কেন্দ্রীয় রায় চৌধুরীর সন্তিত রামনারায়ণের পিতার সম্পর্কের কথা একেবারে অমূলক নয়। পরন্তু উক্ত কমিয়ার কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ‘মন্দির বাজার’ নামক স্থানে একটি শিবমন্দিরপাশে খোদিত লিপি তইতে জানা যায় যে, ১৬৭০ শকে (১৭৪৮ খ্রিঃ অবঃ) তিনি জীবিত ছিলেন। লিপিত এইরূপ “আকাশচিরস কোশীমিতে শকে শিবালয়ঃ। স্থপঃ ঐকেনবো-কার্য্যোদয়দেবেন শিলিপনা” (Vareadra Research Society's Monographs No. 4, “The Antiquities of N. W. Sundarban”,—Kalidas Dutt. পৃঃ ৯)। কলকাতার বংশধরগণের পুত্র রচিত একটি পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১৬৮৬ শকেও তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং বর্ষ বিলাবেও কলকাতা কমিয়ার কেন্দ্রীয় রায় চৌধুরীর সমসাময়িক। উক্ত সত্যাপত্তি থাকাকালীন কলকাতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি আখ্যায়িকা তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কলকাতা যে প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন এই উক্তি একেবারে অমূলক নয়। পুত্র রামনারায়ণ যখন হাজীবদার নবদ্বীপে প্রত্যাগমন গ্রহণ করেন (১৮০৫ শক) তখন কলকাতার বার্ষিক্যবস্থা। ১৮৮৬ শকেও তাঁহার জীবিত থাকার কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং কথিত বার্ষিক্যবহার পর অন্ততঃ ৫১ বৎসর জীবিত ছিলেন।



অমৃততাঞ্জিন
সর্বপ্রকার বেদনায় ‘আণবিক রোমার’ ন্যায় কার্য্যকরী!
দাদের মলম
চর্ম রোগে ‘পরিমার্গ শক্তির’ ন্যায় কার্য্যকরী!
অমৃততাঞ্জিন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮-২৫-কলিকাতা ৭

স্থাপিত ১৮৯৩



তাঃ বিবাহস্বপ্নের উক্ত রামনারায়ণ যদি বুনো রমানাথ এবং ককতালের গুরু হন তবে আমাদের আলোচ্য রামনারায়ণ বিচ্ছিন্নই তিনি নন। এই রামনারায়ণ কখনও সববীণে অব্যাপনা করেন নাই, মজিলপুরেই তাঁহার টোল ছিল। এ বিষয়ে তট্টাচার্য মহাশয়ের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মজিলপুরের রামনারায়ণ যে তাঁহারের সমসাময়িক তাহা নিঃসন্দেহ।

কারিকাবলি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা যে প্রকৃতই মজিলপুর-নিবাসী রামনারায়ণ (কোদালিরাবাসী নন) তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রামনারায়ণের পুত্র রামকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার বহু পুঁথিতে 'মজিলপুর' কথাটি লিখিয়াছেন এবং পৌত্র রামপোপাল তর্কালঙ্কার রচিত 'ভেদজ্ঞান তিমির মিহিরোদয়' নামক দার্শনিক গ্রন্থের (১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত মুদ্রাবদ্ধে মুদ্রিত) পুঁথিকার আপনাকে মজিলপুরবাসী রূপে উল্লেখ করিয়াছেন (সৌর মাসের বিংশাংশে মজিলপুর দেশতঃ—

পৃঃ ৬০)। রামপোপালের পুত্র রামরূপ তর্কবাণিন বাংলা পরায় হলে এখিত, রচিত "ক্যোতীষতাবাহুতাবলী" গ্রন্থে আপনাকে মজিলপুরবাসীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন— "মজিলপুর নিবাসী ঐরামরূপ তর্কবাণিন তট্টাচার্য প্রমাণ-হস্ত এখিতারাং ক্যোতীষতাবাহুতাবল্যাং ৩৩৩ পঞ্চবিংশ-এখিঃ।" উক্ত রামরূপ বিদ্যাবাণিশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামসেবক শিরোমণি (১২২০ সম) কোদালিরাবাসী রামনারায়ণের ভ্রাতা মজিলপুর নিবাসী যাদবানন্দ বিদ্যারত্নের সমসাময়িক এবং যিনি (কোদালিরাবাসী) রাধা রাধাকান্ত দেব বাহাহুতাবলী সমসাময়িক, তাঁহাকে কারিকাবলি রচয়িতা (১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ) রূপে কল্পনা করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নয়। রামনারায়ণের ছয় পুরুষ অধস্তন, ত্র্যম্বকৈবর্গপূরণ ও পদাধাহাওয়ার বদাহ-বাদক, 'তিথিকৃত্যাম্' শীর্ষক সংস্কৃত ব্যুত্থিগ্রন্থের ও মৃগটিকায় প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কবিতার রচয়িতা বিখ্যাত শার্ণগ বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যারত্ন কয়েক বৎসর পূর্বেও মজিলপুরে জীবিত ছিলেন।



M.B. SIRKAR & SONS

**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ মি ১৬৭ মি/১. বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১. বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে আমহার স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
১৩ মাস

সুপ্রসিদ্ধ নিউজপেপার ও লেখকের নির্মাণে
ও বহুবাজার স্ট্রীটের

ব্রাঞ্চ-হিকুয়ান স্ট্রাট বালিগঞ্জ
১০২ ১ বি. বাসবিহারী এডিনব্রু কলিকাতা

ফোন, বি.বি. ১৭৬৮
গ্রাম ব্রিটিশম্যান্স

পুস্তক পরিচয়

১। বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)।

২। বাংলার জ্ঞানশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিবিসিভাসংগ্রহ। বিবিসিভারতী, কলিকাতা। ১৩৫৬, ১৩৫৭। পৃ. ৭০, ৫০।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ব্যারার সহিতপুণ্ডরিত করাইয়া দিবার জন্য বিবিসিভারতী হইতে বিবিসিভাসংগ্রহ শীর্ষক যে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিষয়ের বৈচিত্র্যে, লেখক-নির্বাচনে ও রচনার মনোপ্রাণিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—জনশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা—এই সংগ্রহের দুইটি পুস্তিকার শ্রীকৃত যোগেশচন্দ্র বাগল, যার পরিসরের মধ্যে ও ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম পুস্তিকার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনশিক্ষার লুপ্তপ্রায় ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া, বঙ্কমান ও শ্রীমঙ্গলপুরের পাঠশালা হইতে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্ভোগে জনশিক্ষার বিস্তার, এডাম সাহেবের এডুকেশন রিপোর্ট, হার্ভিঞ্জ স্কুলসমূহের স্থাপন, ইংরাজ বিজ্ঞানশিক্ষার পরিকল্পনা ও নর্মাণ স্কুল প্রতিষ্ঠা পঞ্চাশ জনশিক্ষার বিস্তার ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত, কোন প্রয়োজনীয় কথা বাত না দিয়া মাত্র ৭০ পৃষ্ঠার মধ্যে, অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়া জনসাধারণের জ্ঞান ও আগ্রহের জ্বলন্ত পথ হুগল করিয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তিকার বাংলা সংস্করণের বেবু (বটন) স্কুল প্রতিষ্ঠা পঞ্চাশ বাংলাদেশে জ্ঞানশিক্ষার প্রথম উদ্যোগের যে আনন্দিক বিবরণ দিয়াছেন তাহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইবে। গভ হুগল সমাজ ও শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের মত অভিজ্ঞ ও সাবধানী লেখক বিরল। বাংলা ব্যক্তির উপরই এই দুইটি লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (সপ্তম খণ্ড)—শ্রীব্রজেননাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দী-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা-৬।

শ্রীকৃত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিত এই গ্রন্থমালায় সপ্তম খণ্ড, পূর্ব-খণ্ডগুলির মতই, তথ্য-নির্বাচনে ও সংগ্রহ-নৈপুণ্যে কেবল সুপাঠ্য নয়, সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ হিসাবে অপরিসীম হইয়াছে বলিলেও চলে। বর্তমান খণ্ডে বোল জন গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচনার পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত সেন, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বনামাখ্যাত লেখকদের বৃত্তান্ত। ব্রজেননাথের অল্পসংখ্যক ও তথ্যনিষ্ঠার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অসামান্য। বর্তমান খণ্ডে তাহার প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র দূর হয় নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—সঙ্গীত-সাহিত্য-সংসদ। বহুমতী সাহিত্য বন্দী, ১৩৬, বোম্বাইয়ের স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ভারতীয় সঙ্গীতের পদ্ধতিতে একটি বিরাট ইতিহাস রহিয়াছে। ইহা সঙ্গীতশাস্ত্রী দ্বারা পত পত হরপ্রসাদ ও সঙ্গীতসাধকের কঠোর সাধনা ও সঙ্গীতমোহী সুপতিদিগের উৎসাহ এবং পুণ্ড্রসাধকতার ফলে নব নব রূপে রূপায়িত হইয়াছে। সঙ্গীতকলার এই ক্রমবিকাশ বিবেচনা করিয়া

সঙ্গীতসাধকগণ সঙ্গীত-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন। সঙ্গীতকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেওয়াই প্রকৃত সঙ্গীতসাধকের লক্ষ্য থাকে উচিত।

সঙ্গীতের এই ক্রমবিকাশকে গ্রন্থাকারে পরিবেশন করা বিপুল ক্রমসাপেক্ষ, কারণ এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার মত নির্ভরযোগ্য পুস্তক বিরল। সেই হেতু সঙ্গীতশাস্ত্রের গোশেষের বাবুর এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গীতকলার সাধকসমাজ বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন।

'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস'-এর মধ্যে বাদ্যন হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যন্ত অর্থাৎ দিল্লীর পৃথুরাজের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আহম্মদ শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে সময়ের হরপ্রসাদের আবির্ভাবের তাহাদের নাম ও পরিচয় এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতকার-গণের রচিত প্রায় একশত গীত ও সেগুলির বরলিপি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শঙ্করানন্দ, নারকগোপাল, বিবেকানন্দী, রামনাথ, হরনাথ, ভানসেন, জ্ঞানকোদাস, সত্যরাজ, অদ্যরাজ, মিরাজুলমানবী, শেরী, তুলসী-দাস, মীরাবাদী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা বাইতে পারে।

এই গ্রন্থের মধ্যে ক্রন্দ, টম্বা, খেরাল, ঠুংগী প্রভৃতি বাবতীর উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সমাবেশ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া কিরূপে কাহার কাহার রাজত্বকালে একটির পর আর একটির উৎপত্তি হইল তাহা, এবং একের সহিত অপরের প্রভেদ ও প্রভেদটির বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যে কেবল সঙ্গীতশাস্ত্রেরই আনন্দের রসদ যোগাইবে তাহা নহে, ইহার ঐতিহাসিক দিক এবং সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া ভাব ও ভাবের বিবর্তনের দিকটি সর্বসাধারণের জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়

কালো আকাশ—শ্রীচন্দ্রনাথ বোস। প্রেসিডেন্সি পাবলিশার্স

৩০-এ, হুগলচন্দ্র মিডল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

নগরোপকণ্ঠের শিল্পীদের আকাশ বসন্ত-বাসনের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ধূম-মলিন। এই আকাশের নিচে বাস করে যে সব মানুষ তাহাদের জীবন কারখানার নাগপাশে বাঁধা—যন্ত্রের সেবা করিয়া তাহারাও হইয়াছে সুখস্বপ্নে উদ্ভাসিত যন্ত্রের দ্বারা। এমনই এক ক্রমিক অধ্যয়ন—যৌবনের প্রারম্ভে গ্রন্থ হইয়াছে তাহার জীবনবৃত্ত, পঞ্চাশোর্ধ্বে পৌঁছিয়াও সে যন্ত্রের বিরাম নাই। সঙ্গারের সঙ্গীত, বেকার ও উচ্চ মূল্যে, মরণোন্মুখী ছোট একটি মেয়ে, অর্থ নাই, বাহ্য নাই, শাস্তির বাণীও মরীচিকা। এই সংসারেরই একটি ছেলের মনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বৃহত্তর জগতের আলো ও বার্তা। অশিক্ষা ও অজ্ঞানকে সে অনুভবের আশা বলিয়া বাসিয়া লয় নাই—ধনসামান্যদের গ্রন্থটি তাহার মনে তীব্র হইয়াই আসিয়াছে। নূতন সংসার আর যোগদান জীবনের বর্ণ দেখিয়াছে। সঙ্গীত জননী এবং মরণোন্মুখী মেয়ের মনেও বর বাবার বসন্ত। শৈশবকালের বারবৃত্ত, খেলাধুলি ও পুতুল-শ্রীতির মধ্যে গৃহীতপন ও মৃত্যুর বিকাশ। এই যন্ত্রের সঙ্গ বারবৃত্তের সংগত। এই একটি মাত্র পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লেখক পহরতলার কালো আকাশের ছবি আঁকিয়াছেন। ছবির পরিবেশ যেমন বিবাদমান, রেখা ও রঙ ভেদনি ছিল—কাহিনীতে কেবলমাত্র ছবি রাখা নাই। এই কাহিনীই ইনাইদা বিনাইদা কল্প রস

অগ্রদূত

পুস্তক-পরিচয়

ভাইরা যেওরা নতুন লেখকে পক্ষে আঁতড়িত। কিন্তু লেখকের কাহিনী আরও কঠোর ও তথ্য ও ভাবকে আঁতড়িত। এইতে লেখক অন্তত সাধারণে রক্ষা করিয়াছেন। কারণ—এইখানের গরিব ও দুঃস্থবৃত্তি পীড়িতরা ও হুশিয়ারি। আর্থিকতা ও মৃত্যু সবকিছুর উপরই তিনি আনন্দোৎসাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তা'রীতি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে সমস্ত চরিত্র বিকসিত হইবে। পূর্ণ হযোগ পায় নাই, তথাপি রেখার টান বেটুই ফুটাইতে তাহাতে চরিত্রগুলি সজীব হইয়াছে—সার্থক হইয়াছে।

কুটিলতা তাহাতে চরিত্রগুলি সজীব হইয়াছে—সার্থক হইয়াছে।

ঈরামপদ মুখোপাধ্যায়

বৈদিক দেবতা—ঈশ্বরীপদ ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়।
বিদ্যারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্গিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

যেহ হিন্দুর পরম প্রভাব বস্তু—ইহা তাহার সমস্ত ধর্মকর্তার নিয়ামক-রূপে স্বীকৃত। অর্থাৎ বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বর্তমান হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের প্রভেদ রয়েছে। বৈদিক দেবতা ও আধুনিক হিন্দু দেবতার মধ্যেও এই প্রভেদের বিদ্যমান আছে নাই। বর্তমান হিন্দু সমাজে আমরা যে সমস্ত দেবদেবীর সাহিত নিত্য-পরিচিত তাহাদের অনেকের কোন সম্ভাব্য বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাহাদের উল্লেখ যেনে পাই

১১৫০



সর্বদাই পুরোভাগে

ভারতীয় জীবন বীমার অগ্রগতির পথে "হিন্দুস্তান" সর্বদাই পুরোভাগে য়িয়াছে। যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও সঙ্গতি-শক্তি হিন্দুস্তানের বৈশিষ্ট্য, ১৯৫০ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও তাহাই পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা	৬০,১০,০০,৫২১ টাকা
মোট সংস্থান	১৭,৭০,৭০,৬২৫
বীমা ভহবিল	১৫,২৭,৫৭,৫৪৮
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৪০,৪৭,০৩৮
দাবী শোধ (১৯৫০)	৭২,৩২,৮৫০
মুত্তন বীমা	১৩,৭৫,৩২,৮৫১

কিন্তু হিন্দুস্তানের উপর অনসাধারণের যে অকুণ্ঠ আস্থা পূর্বাঙ্গর তাহার ক্রমোন্নতির পথে পাথরের রূপে সহায়তা করিয়াছে, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহারই অর্থাৎ হিন্দুস্তানের প্রকৃত গৌরব। হিন্দুস্তানও তাহার ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সেই গৌরব অক্ষুর রাখিবে, নুতন বৎসরে ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা।

হিন্দুস্তান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লি:
হিন্দুস্তান বিল্ডিংস, কলিকাতা-১৬

পরবাসী—ঐআদিভাষ্যকর। ১৩, রিচি রোড, কলিকাতা।
মূল্য তিন টাকা।

কাহিনী শুরু হইয়াছে সত্যোদের সংগ্রামের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া। এম-এসি পাস করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উচ্চাশার মন বধন পরিপূর্ণ এমনি সময়ে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে, সংসারের সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল বাইশ বছরের যুবক সত্যোদের স্বন্ধে। শহর হইল। দুই একটা ক্যাট্টরিতে সহকারী কমিষ্টের পদে সে বাহাল হইল। গল্পের নায়ক সত্যোম ময়, বিকাশ—তার পরিচয়-নৈপুণ্য, অপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, অপরিণীত সংসীলতা, দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ। ২. রহস্যময় চালচলন, প্রাণ-ধোলা বাবহার ক হিনীকে আগাগোড়া প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বিকাশ ক্যাট্টরির কোরম্যান। ফলতঃ, ক্যাট্টরীর বড় ছোট সকলেই তাহার অনুগত। সত্যোম এখানে নবাগত হইলেও তাহার উপর বিকাশের কি জানি কেন একটা বিস্ময়কর আকর্ষণ দেখা বাইত বাহার কলে এই দুজনের চরিত্রের লোকটির যেন অনেক ওখাই তাহার কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

বিকাশের ভিতরকার সত্যিকারের মানুষটির পরিচয় বখন সত্যোম পাইল তখন সে নিজের কাছেই যেন ছোট হইয়া গেল। অথচ বিকাশ সব বুঝিয়া এবং সব জানিয়াও কত সহজে বসিতে পারিল—‘ভুল ত মানুষই করে সত্যোম।’

বিকাশ ছাড়া আরও যে কয়টি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে চাক কমিষ্ট বোম্বের দ্বা “বোদি” মনে ছাপ রাখে। একটি খাঁটি বাঙালী ঘরের ছবি নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তার মাতৃ, ভগ্নী ও ভ্রী-প্রকৃতি বিভিন্ন রূপের মধ্যে।

স্বনীতির স্বন্ধে সব সময়ই পাঠকের মনে একটা কোতূহল জাগিয়া থাকে। পুস্তকের শেষে তাঁর সাক্ষাৎ বিলে ক্যাট্টরির ম্যানেজারের ক্রী-রূপে বখন ম্যানেজার বিকাশকে ভুল বুঝিয়া আঘাত করিতে উদ্ভত আর সেই আঘাত প্রতিহত করিতে বিকাশ বখন রুখিয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে। অত্যন্ত সাবধানী এবং দীর্ঘশর একটা ঘের। কিন্তু এরাই ভ্রত বিকাশ সর্বস্বত্যাগী। স্বনীতিকের না পাইয়া সে গোটা ছবিয়ার মানুষকে পাইয়াছে।

পুস্তকখানি সুধাপাঠ্য এবং আকর্ষণীয় হইয়াছে। সহজ এবং বহুলক্ষ্য ভাষা। কিন্তু বইখানিতে শরণ চন্দ্রের একখানি উপভাষ্যের প্রভাব বেশী করিয়াই পড়িয়াছে মনে হয়।

ঐবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১। ঐশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথা, ২। ঐশ্রীবিষ্মকর্ষা

পূজা ও কথা—ঐউদ্দেশ্য চক্রবর্তী। প্রাতিহান—১২০.২, আগার সারকুলার রোড, কলিকাতা-২। মূল্য প্রত্যেকখানি মন পরমা।

পূজা-পার্কণ, ব্রতউৎসব বাঙালী হিন্দুর ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। লেখকের প্রণীত পূজা ও ব্রতকথা বিষয়ক পুস্তকসমূহবারা সাধারণ বাঙালী গ্রন্থের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। অল্পকাল মধ্যে ঐশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে এই-খানি যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। শিল্পকর্মের দেবতা বিষমকর্ষা। যন্ত্রশিল্পী ও কার-শিল্পীগণ কর্তৃক প্রতি বৎসর তাঁহার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে লেখক এই পূজার কথা বড়ই চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রে শিল্পীদের স্থান সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নবোক্ত হইয়াছে।

ঐনলিনীকুমার ভদ্র

শরণ চন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী
—ঐব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। ২০.৩.১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

ফুডি-একুশ বৎসর পূর্বে একটি সাহিত্য-সভার যোগদানের সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেখানে সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে উপস্থিত কয়েকজন মনীষী শরণ চন্দ্রের রচনা সম্পর্কে অস্বাভাবিক ও প্রতিকূল উত্তর মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত ছিলেন, তাহা শরণ চন্দ্রের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে। বর্তমান ‘রচনাবলী’তেও ইহার ছাপ হুপটে। বাংলাদেশে বাংলাভাষার খ্যাতি-অখ্যাতি, দীর্ঘস্বামী অম্বাধু এমন পর-পত্রিকা খুব কমই ছিল বাহাতে কোন-না-কোন সময়ে শরণ চন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয় নাই। বিনিই আলোচ্য পুস্তকখানির পাতা উন্টাইবেন তাঁহারই চক্ষে প্রথমেই তাহা ধরা পড়িবে। ইহা হইতে আর একটি বিষয়ও আমাদের স্মরণে মনে উদ্ভিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের পর-পত্রিকা হইতে রচনা সংকলন করিয়া প্রথম সাধ্য ব্যাপার! কিন্তু ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক অনুসন্ধান দ্বারা এই-প্রথমসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল রচনা—যাহার অধিকাংশই হয়ত বর্তমান পাঠক সমাজের অগোচরে থাকিয়া বাইত, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার বাংলা-সাহিত্যের যেমন মর্যাদা বাড়িয়াছে, বাংলা-ভাবীরাও ততোধিক উপকৃত হইয়াছেন।

টোল এন্ড কোম্পানীর



দাদ ও কাউন্সেল
মেম্বার্স ফেলম

কিউটা-টোল
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন ফলম
থোস পাঁচড়া ও ফলকানীর জন্য



বরানগর, কলিকাতা

এই রচনাসমূহের প্রায় সমুদ্রই ১৩১১ সাল হইতে ১৩৪৪ সাল মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত হয়। একখানি সমাপ্ত ও দুইখানি অসমাপ্ত উপভাষা ও একটি রূপকথা বাসে অপর সকলই, এক কথায় বলিতে গেলে মনন-সাহিত্যমূলক রচনা ও ভাবন। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাইহাতে নানা রূপে ভর পাইয়াছে। ‘উপভাষিক’ শব্দ চন্দ্র কেন যে ‘অপরোহ’ হইয়াছেন তাহার মূল কারণ এই সকল রচনাপাঠে অনুভব করি। শব্দ চন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল বহন বিচিত্র, তাঁহার আহরণও ছিল তেমনি প্রচুর। নৃত্য, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, বৈদেশিক সাহিত্য তাঁহার বিশেষ পড়া ছিল। এই সকল আহরণকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া তিনি ধীর রচনাকে রসপূর্ণ করিয়াছেন। তবেই তো তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়াছে। ‘কানকাটা’ প্রবন্ধে উড়িয়ার কানকাটা এবং বাইবেল-কর্তা কানানাট জাতির সাদৃশ্য [?] একটি চমৎকার উপমাধারা তিনি বুকাইয়া দিয়াছেন। ‘দর্শনাত্মক’ এবং ‘দশাশ ভাবটির মধ্যে যে দিন ‘কানানাইট’ ও ‘কানকাটা’র মধ্যেও সেইরূপ মিল। শব্দ চন্দ্র মহাশয় গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগের ঐকান্তিক অনুসরণী ও সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তাঁহার কার্যাবলীর পর শব্দ চন্দ্র ‘মহাশক্তি’ প্রবন্ধ লেখেন (‘নারায়ণ’—বৈশাখ ১৩২৯)। ভারতবর্ষের ‘বাণীনতা’ অপেক্ষাও সত্যাপ্রহ তথা ‘অহিংসা’কে গান্ধীজী কেন উচ্চ স্থান

দিয়াছিলেন, তাহার একটি সুস্ব স্বাধা লেখক ইহাতে দিয়াছেন। ‘সত্যাপ্রহী’ ও ‘বর্তমান’-এ মুসলমান সম্রাট তিনি মাতৃ সহজ শব্দে ঐটি সত্য কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রের মাতৃ স্বাভাবিক সন্তব এ ধারণার প্রতিও তিনি কশাঘাত করিতে ক্রটি করেন নাই। ‘মুসলমান সাহিত্য’ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এপ্রিধানবোধ। এই পুস্তক এতোক বাংলাভাষীর বার বার পঠ করা কর্তব্য।

রামমোহন-প্রবাসী (১ম খণ্ড)—সম্পাদক: শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতকার দাস। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পরিব্র, ২৪৩১, আশা সারস্বতীর রোড, কলিকাতা ৬। মূল্য সাড়ে চারি টাকা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন-প্রবাসীর তিন খণ্ড পূর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে বঙ্গীয় এই চারি খণ্ড বাহির হইল। এই খণ্ডে রামমোহনের বেদান্ত হু, বেদান্ত সার এবং পক্ষো-পরিব্র (তলবকার, চন্দ্র, কঠ, মতুকা ও মুক্তক) প্রদত্ত হইয়াছে। ‘বেদান্তগ্রন্থ’ ও ‘বেদান্তসংগ্রহ’ প্রভৃতিপাঠ বিষয়ের প্রতিবাদে পণ্ডিত ব্রহ্মপুত্র বিজ্ঞানকার ইংরেজী অনুবাদ সহ ‘বেদান্তচক্রিকা’ প্রকাশিত করেন। তাঁহার উক্ত রামমোহন সেন ‘ভট্টাচার্যের সঠিত বিচারে’। ব্রহ্মপুত্রের উক্ত বাংলা প্রতিবাদ এবং রামমোহনের জবাব দুইই এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। এতদিন রামমোহনের উক্তির সঙ্গে মাত্র পাঠক সাধারণ পরিচিত ছিলেন। বর্তমান সংস্করণে উক্ত-প্রবন্ধের সুত্রিত হওয়ার এক দিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের সম্রাট ও মনোভাব জানা যাইতেছে, অন্য দিকে রামমোহনের বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ইহা বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। সম্পাদকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে রামমোহনের জীবিতকালে প্রকাশিত মূল পুস্তকসমূহের সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া প্রবাসী প্রকাশ করিতেছেন। রামমোহনের কোন কোন নবাবিকৃত পুস্তক বাহা ইতিপূর্বেকার সংস্করণগুলিতে স্থান-পায় নাই, ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, আবার কোন কোন রচনা অপরের সঙ্গেই যুক্তিত হইয়াছে। এই শোভন ও পরিপূর্ণ সংস্করণটি শুধু রামমোহন-অনুসরণীদেরই নহে, বাংলাভাষার সম্রাটদেরও বিশেষ কাজে আসিবে। বাংলা-গদ্যের ভ্রমোত্তরিত ধারা নির্বাকরণে এরূপ পুস্তক প্রকাশের বিশেষ সার্থকতা আছে।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভর-খাদ্য গ্রাস্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুখিা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিরের-টোল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আজী রোড, কলিকাতা—২৭

ফোন—সাত্ব ৮৮

সভতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নির্দ্বন্দ্ব ব্যাক্স অক্স বাবুড়া নিমিটেড

বাংলার ব্যাক্স জগতে বিরাট বিপণ্যর সম্বন্ধে ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অস্বাভাবিক পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শ্রীশ্রী বখারীতি প্রকাশিত হইবে।

চোরামান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীহরিনন্দন ব্যানার্জী

বর্ষপঞ্জী, ১৩৫৮—শ্রীমদ্বৈতানন্দ সেনগুপ্ত ও শ্রীমোপাল ভৌমিকের যুগ্ম-সম্পাদনার প্রকাশিত। এম. আন. সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ৬, চিত্তরঞ্জন এডিনিটি, কলিকাতা-১৩। মূল্য চারি টাকা।

ইন্দ্রাবীঃ যে ধরণের বর্ষপঞ্জী বাহির হইতেছে, ‘প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্ব স্বয়ংক্রিয়’ এই পত্রিকা-নিষ্ঠে তাহার কিছু বাস্তবিক দেখিলে মৃগ হইল। কৃষি, শিল্প বিজ্ঞান, রাজনীতি, বাণিজ্য, জীবন-বীমা, শিক্ষা, বাহ্য, বর্তমান ভারত, বহির্ভারত, শোলাখুলা, খাণ্ডসম্রাট, চলচ্চিত্র, ব্যক্তিগত প্রভৃতি নানা বিষয়ের অধ্যয়নই ইহাতে করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই ভ্রমের বিষয়, কিছু কিছু ভারতম হইলেও কোনকিছই বিশদ বা বিশেষ বিবরণ পাইতেছি না। ভারতের শিক-বাহবা মাত্র নয় পৃষ্ঠার শেষ হইয়াছে। ‘পৃথিবীর ইতিহাসে অস্বাভাবিকতার’-এ দেখিতেছি, ‘সত্যি-এ প্রাণ’ উদ্ভেদ হইয়াছে ‘১৮২৮ সনে। ইহা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭শ বিখি-দ্বারা প্রসিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এতগুলি বিষয়ের পরিবর্তে, দুই চারিটি অত্যাবৃত্তক-বিবরণ লইয়া এক একখানি বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইলে ভাল হয় না কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল



বেঙ্গলিতে ছুগোংসব

এবার উত্তর প্রদেশের বেঙ্গলিতে বিপুল সমারোহে ছুগোংসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এইচ. কে. ভর পূজা-কর্মটির লক্ষ্য প্রতি নির্ধারিত হয়।

গুলির মধ্যে চারটি বুদ্ধিমতী পছন্ডিতে চলে। এগুলির শিকড়েরা ওয়ার্ডা অথবা বলরামপুরে বুদ্ধিমতী শিকার শিকার-প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যালয়গুলিতে বোর্ড যে সাহায্য বেশ তাহা বৎসরান্ত। তাই পূর্বে বৎসরের বহু এবারও শিকড়ের



বেঙ্গলিতে ছুগোংসব

স্থানীয় লোক ও প্রবাসী বাঙালীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় এবারকার পূজাহুতান সর্কাদপুলের হইয়াছিল। বেঙ্গলিতে লম্বা পত পূর্ববকের উদ্বোধনের কীর্ত্তনও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

হরিজন সেবক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় বোর্ড

(১৯৫০-৫১)

৩১-৩-৫১ তারিখের এক বৎসরের কার্যবিবরণী

এই বৎসর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানকর্তৃক ৪০টি হরিজন বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩১টি পশ্চিমবঙ্গে এবং বাকি ৯টি পূর্বে পাকিস্থানে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৬৮৪ জন হয়। পূর্বে বৎসর ঐ সংখ্যা ছিল ১৪০০। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-

বৃদ্ধির সহিত মাসিক ৫৭ হারে বাগুপি ভাতা অনেক কমে দেখা যায়। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন কারণে আটটি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে, দুইটি নূতন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। নূতন বিদ্যালয়গুলির একটি হাওড়া জেলায়, অপরটি বেদিনী-পুরে। বোর্ডের পক্ষ হইতে সবধরণে দুই বরক মহিলা-শিক্ষা কেন্দ্রও চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির সাহায্য বাবদ বোর্ড ৮,২৬৯ টাকা ও বাগুপি ভাতা বাবদ ১,৩৬৬৫১০ সাহায্য দিয়াছেন, পূর্ববকের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ২,৬১৫ টাকা। বিদ্যালয়ে সাহায্যের পরিমাণ মোট ১০,২৫০৫১০ টাকা। ৩টি হরিজন ছাত্রকে বৃত্তি বাবদ ৩২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

দুই জন উৎসাহী কর্মী পাওয়া গিয়াছে। একজন বিদ্যালয়-গুলি পরিদর্শন করেন। অপর জন আত্মাধ্যাপন চরকা-শিক্ষক।

শহরের মেধারদের কল্যাণ-চেট্টার এই বৎসর ৪৭১৪০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। হাওড়ার একটি মেধারবন্ডিতে সেবার্কাচ চলিতেছে। হরিজনদের সামাজিক মর্যাদালাভ হইবে এই আশা লইয়া এ এচেষ্টা শুরু করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রের উৎসাহী কর্মী জিলালবিহারী প্রবাস ওয়ার্ডার শিকা-এহণের বৃত্ত দিয়াছেন। পরে এই কেন্দ্রে জিন্নাহুদ্দীন জীবান্তব গত ৯ মাস বাবং ভগবতী বন্ডিতে সাকাই ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসসৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। এই কর্ণে প্রতিবেশীদের সহায়ত্বটি পাওয়া হইতেছে। সম্মতি এই হানে একটি বরক-শিকাকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

প্রচারকার্যে ৩০১৫০/০ টাকা খরচ হইয়াছে। পাণ্ডী কর্মজী দিবস, পাণ্ডী প্রায়ণ দিবস, ঠকর বাপার অনুষ্ঠান ও মৃত্যু দিবসে সন্দের পক্ষ হইতে জনসভার আয়োজন করা হয়। একটি সভার উত্তর কৈলাসনাথ কাটু এবং আর একটিতে ভূতপূর্ব কংগ্রেস-সভাপতি জিন্নাহুদ্দীন টাউন সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বোর্ড ৩,৫০০ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ঠকর বাপার পরলোকগমনে সন্দের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে বকীর হরিজনদের দারুণ হুম্মিশাকের দিনে এই বৃদ্ধ জনসেবক বাংলার হুটরা আসিয়াছিলেন। ঠকর বাপার দেহাবসানের পর জীবিতগণ হরি হরিজন সেবক সন্দের সম্পাদক হইয়াছেন। তিনি কলিকাতার আসিয়া সন্দের কলিকাতা ও হাওড়ার বন্ডি শিকাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সন্দের সহযোগী হরিজন উদ্যান বোর্ড এবং হরিজন পুর্নবলতি বোর্ডের পরিচালিত হুইট পাঠশালা পরিদর্শন করেন এবং বকীর বোর্ডের সভ্যদের সহিত মিলিয়া হরিজন সেবা বিষয়ে পরামর্শ দেন।

এই প্রতিষ্ঠানের বকীর বোর্ডের সম্পাদক জিন্নাহুদ্দীন সেন।

বাঁকুড়া জিরাফকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

আলোচ্য বর্ষে মঠে ১৫২টি বর্ষসম্বন্ধী ক্লাস এবং নিম্নমিত্ত-ভাবে জিরাফকৃষ্ণ সংকীর্ণন করা হইয়াছে। পুস্তকাগার এবং সাধারণ পাঠাগারও হুইটভাবে পরিচালিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকের সংখ্যা ১৭৪২।

মিশন বিভাগ : মিশনের ভদ্রাবাসনে বাঁকুড়া শহরে হুইট এবং রামহরিপুর গ্রামে একটি মোট ৩টি হাভব্য চিকিৎসালয় আছে। আলোচ্য বর্ষে এই তিনটি চিকিৎসালয়ে মোট ৬৬০৪৫ জন নুতন ও পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং মোট ১৫২ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

বাঁকুড়া মিশন প্রাথমিক রোগিগণের অগ্রাধী আবাদে মোট ৩০৮ জন রোগী অবস্থান করিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিভাগের মোট সাত জন ছাত্র শিকালত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২ জন ছাত্র হোমিওপ্যাথিক বিভাগের ডিগ্রীলাভ করিয়াছে।

সারদামল ছাত্রাবাসে থাকিয়া ৮৭ জন ছাত্র অব্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই বৎসরে রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মধ্য-ইংরেজী বিভাগের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬০। একটি বালিকাও এখানে শিকালত করিয়াছে।

মিশন বিভাগ আলোচ্য বর্ষে মোট ৪০ জন ছাত্র ব্যক্তিকে ১৬১৫/০ আদা সাহায্যদান করিয়াছে। মিশনের ১৯৫০ সালের মোট আয়, ৬৮৮১৫০, ভদ্রাব্যে বিভিন্ন জনহিতকর কর্ণে ব্যয় হইয়াছে ৬৭৪০২৫ পরস।

মুক-বধিরদের সমাবেশ

কলিকাতার মুক-বধির বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশ ভব্য ভাষ্যবর্ষে মুক-বধির শিকা-এচেষ্টা শুরু হয় গত



মুক-বধিরদের সমাবেশ

শতাব্দীর শেষ দশকে। মুক-বধির বিভাগের অততম প্রতিষ্ঠাতা বামিনীমোহন রত্নদার দীর্ঘকাল ইহাদের সেবার রত্ব ছিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহ কেহ এই কার্যে বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। জিন্নাহুদ্দীন মলিনীমোহন রত্নদার মুক-বধিরদের সাধারণ ও শিল্পশিকা শিকাদান বিষয়ে উত্তাপী। তিনি সম্মতি বীর ভবনে মুক-বধিরদিগকে শিকা ও লম্বাকর্ষণ মূলক ছাত্রাচিহ্ন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ আয়োজনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

ডক্টর শৈলেশচন্দ্র সেন

জৈনশৈলেশচন্দ্র সেন সম্মতি "Sugarcane Chemistry (ইচ্ছ রসায়ন) শব্দে থিসিস লিখিয়া ডি-এন্সি ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন। ডক্টর সেন যারতাক। কেলার পুখা ইচ্ছ পবেষণা-কেন্দ্রে কর্ণে নিযুক্ত আছেন। বিহারে 'ইচ্ছ রসায়ন' বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী আর কেহ নাই। তার জন রাসেল, ডি-এন্সি

এক. আর. এল., ডক্টর ডব্লিউ. বি. ওপ, ডি-এসসি. এক. আর. এল. ও অব্যাপক রিচার্জ ড্রেডকিন্ড—এই তিন জন বন্দী ডক্টর লেভের খিলিস পরীক্ষা করেন।

ডক্টর হুসীলচন্দ্র রায়

ভারত পূর্ণমেচের ঐতিহাসিক সমীক্ষার ফেলো অীহুসীল-চন্দ্র রায়, এম-এ, "প্রাচীন কালীরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি" সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হইতে ডক্টর অক ফিলসফি ডিগ্রী পাইয়াছেন। তাঁহার খিলিস অব্যাপক ডক্টর শীহাররঞ্জন রায়, অব্যাপক আলটেকার ও অব্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী কর্তৃক পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। ডক্টর রায় হুঁচুতার ব্যাভমাধা ব্যবহারকীবী অীহুবীরচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র।

পরিমল রায়

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে পরিমল রায় পরলোক-গমন করিয়াছেন। দিল্লী ছিল তাঁহার কর্ণহল। অর্থনীতিতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কর্ণব্যস্ত জীবনের কালেক কালেক তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করিতেন। বাচিয়া থাকিলে বাংলা-সাহিত্যে রসরচনার ক্ষেত্রে তিনি

একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিতেন। তাঁর লেখার যে সংখ্যের পরিচয় পাওয়া হইত তাহা প্রশংসনীয়।

মণীন্দ্রভূষণ সিংহ

গত ২২শে আশ্বিন বীহুতার জনপ্রিয় বেশলোকক মণীন্দ্র-ভূষণ সিংহ ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বীহুতার তাতুল প্রেমের রাবিকাপ্রসাদ সিংহের দ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। শৈশবে দ্বৈতবরে উচ্চ ইংরেজী শুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন এবং বিহার প্রদেশ হইতে রাজ্যদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুজিলাত করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া ল কলেজে আইন অব্যয়নকালীন ইতিহা পূর্ণমেচের 'করেন' আশিলে চাকুরি গ্রহণ করেন। তৎকালে করেন আশিলে এদেশীয় কর্ণচারীর সংখ্যা ছিল অল্প। আশ্ব-সম্মানে আশাত লাগিলে ইংরেজ সহকর্মীদের তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না, সেইজন্য তাঁহাদের সহিত প্রায়ই তাঁর বচসা হইত। ইউরোপের প্রথম যুদ্ধের সময় তিনি সহসা চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতার ফিরিয়া আসেন। সেই সময় হইতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করি-



সৌন্দর্য্য

অপারিত

শীতের কক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালিতা বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মে কোমলতা অক্ষুণ্ণ রাখে। দিবাভাগে লাগি মো ও রাতে লাগি ক্রীম ব্যবহার্য্য।

লাক্ষ্মী
স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কোসমিক্যাল



বার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে আগ্রহক হয়। মহাত্মা গান্ধীর আকাঙ্ক্ষাে তিনি তাঁর অকল্পিত বীজভার বোম-সেবার আত্মনিয়োগ করেন। ঐকমিলবরণ দ্বারের সহিত যুগ-সম্পাদক হিসাবে তিনি কংগ্রেসের সেবা করেন। ১৯২৮ সালে তিন বৎসরের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বার বার তাঁহাকে আটক রাখা হয়। তিনি পনের বৎসরকাল বীজভা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বীজভা সন্মিলনের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। বীজভা স্কুলবোর্ড, বীজভা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, বীজভা সোভাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, হিন্দু স্কুল কার্যনির্বাহক সমিতি এবং আরও অনেক সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং ঐ সময় কংগ্রেস এসেম্বলি পার্টির সম্পাদক মনোনীত হন।

গণেশচন্দ্র তলা

কাঁথির প্রবীণতম সাংবাদিক গণেশচন্দ্র তলা পরলোক-গমন করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বেহীলীপুর বেলার বন কোমও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল না সেই সময় কাঁথিতে জামালোক বিভাগের অগ্রদূত পরলোকগত মহুদন কান্না মহাশয় ‘নীহার প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘নীহার’ (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভবনকার দিনে কাঁথির তাঁর একটি হুবহু, দুর্গম কুত্র শহরে সংবাদপত্র পরিচালনা হুগোলের কাক ছিল। এখন হইতেই গণেশচন্দ্র এই পত্রিকার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন এবং বহুবার পূর্বে পর্যন্ত তাহা তিনি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। যবেই আন্দোলনে ‘নীহার’ পত্রিকার কোণদৃষ্টিতে পত্রিকা-ছিল, কিন্তু সে কারণে মহুদন বা গণেশচন্দ্র কেহই দেশসেবার পন্দাংগন হন নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ ‘নীহার’ তাঁহার একমিষ্ট সেবা পাইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার দী ও সত্য-সত্যের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করিতেছি।

সত্যকিরণ মিত্র

কলিকাতা ছোট আদালতের সুপরিচিত ব্যবহার্যকীবী ঐনসত্যকিরণ মিত্র গত ১৫ই কার্তিক তাঁহার ২৯এক, জীক মোহিত বালভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বহুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ ২৭সং হইয়াছিল।

পাঁচদশলের সুপরিচিত মিত্র পরিবারের দায়বাহ্যহর দায়কামাণ মিত্রের কোঠ পুত্র সত্যকিরণবাবু কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালভ করেন। অসাময়িক হিসাবে সত্যকিরণের বিশেষ সুখাম ছিল এবং তিনি ভাল খেলোয়াড়রূপেই পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি হেয়ার স্পোর্টিং ক্লাবে ক্রীড়ন খেলিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সালে সন্ধ্যাসন্ধ্যোপে আক্রান্ত হইবার পর তিনি আইন ব্যবসায় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

পাটনার ১৯৩৭ সালে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহার চতুর্থ বৎসর পরে পাটনাবাসী বাঙালীরা আবার বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৪১ সালের অধিবেশন পাটনার অহুষ্ঠিত করিতে স্থির করিয়াছেন। ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর—এই তিন দিন সম্মেলনের অহুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

সুল সম্মেলনটি আটটি শাখার বিভক্ত। ডাঃ জিতান্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। ঐকমিল-চন্দ্র ও গুপ্ত মহাশয় সুল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আটটি শাখা ও প্রত্যেকটির নির্বাচিত সভাপতির নাম নীচে দেওয়া হইল :

সাহিত্য শাখা—আচার্য্য ঐকিত্তিমোহন সেন (শান্তি-মিকেতন), মলিনকলা শাখা—ঐকিত্তিপত্রার দার (পতিচেরী), বিজ্ঞান শাখা—অধ্যাপক ঐনসত্যেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বৃত্তান্ত-বঙ্গ শাখা—ডাঃ ঐরমেশ-চন্দ্র মহুদার (কাঁথি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়), ইতিহাস শাখা—অধ্যাপক ঐনসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ হিংহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), মহিলা শাখা—(সভামেজী নির্বাচন এখনও হয় নাই), শিশু-সাহিত্য শাখা—ঐনসত্যেন্দ্রচন্দ্র সরকার (কলিকাতা), মিশল ভারতীয় সাহিত্য শাখা (আলোচনা)—পতিত ঐহাকারী-প্রসাদ বিবেদী (কাঁথি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)।

সম্মেলনে বাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রমোদাছুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হইবে।

ব্যায়িটর পি. আর. দাশ এবং পাটনা হাইকোর্টের জজ এস. কে. দাশ এই অহুষ্ঠানের হই কম বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। ঐরমেশপতি ও গুপ্ত ও অগ্রপত্রার দার ইহার যুগ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্মেলনের কার্যালয়ের ঠিকানা লালকুঠি, এমকিবিদ্যন রোড, পাটনা।



হালুকা হাওয়া।
শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৭ই আগস্ট, ১৮৭১

মৃত্যু : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ স্বৰ্গম্”
বলহীনের লভ্যঃ”

১৩শ ভাগ }
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৮ } ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের আর একজন কৃতী সন্তান দেহত্যাগ করিলেন, যিনি কেবল রক্তের সম্পর্কে নয়—ভাব-চিন্তা-আদর্শের সম্পর্কে কবিত্বের সমর্থন ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তিনি কতভাবে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন “জোড়াসাঁকোর ধারে”, “ঘরোয়া”, “আপন কথা” প্রভৃতি বইয়ে। চিরকালের জন্য দেশের বালকবালিকাদের আনন্দবিধানের আয়োজন করিয়া গিয়াছেন তিনি “রাজকাহিনী”, “কীরের পুতুল” প্রভৃতি পুস্তকে। ভারত-সংস্কৃতির ধারক এবং মরমী ব্যাখ্যাতা অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা পাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের “বাগেশ্বরী” বক্তৃতামালার মধ্যে।

তাঁহার বাংলায় তথা ভারতের অন্তরাত্মকে বিদেশীর ঘৃণা ও অবহেলার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, শিল্প-শ্রুত অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের শিল্প ও ললিতকলাকে ধূলিসূপ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরীকর প্রাচীন গৌরবে অভিষিক্ত করিয়া, রত্নকল্প উজ্জল রূপে প্রতিষ্ঠা করার কৃত্তি বহি কাহারও প্রাপ্য হয় তবে তাহা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের।

আচার্য্য শব্দের ব্যবহার আমরা জানি না, তাই বোণ্য অযোগ্য সকলকেই আমরা ঐ আখ্যা দান করিয়া থাকি। যিনি কোনও শাস্ত্রে কোনও নূতন বিধান বা সংজ্ঞা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি মনীষিগণের সম্মুখে নূতন জ্ঞানের পথ নির্দেশ করিয়াছেন বা যিনি কোনও বিচার বা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নূতন আলোকের আধার স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আচার্য্য।

ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ললিতকলার স্থান নির্দেশ ও তাহার উদ্ধারের পথ প্রদর্শন বাংলার এই সন্তানেরই পুরুষকারে সম্ভব হয়। তিনি যে শুধু পথ নির্দেশ

করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার উপদেশে ও ব্যাখ্যায় এবং তাঁহার অমৃতময় তুলিকার সক্রিয় সঞ্চালনে ভারতের ললিতকলা নূতন জীবনলাভ করে। দেশে-বিদেশে তাঁহারই চেষ্টায়, তাঁহারই উদ্যোগীয় ভারতের চিত্রকলা খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়। সুতরাং আচার্য্য আখ্যায় তাঁহার অধিকার সুপ্রাপ্তি এবং তর্কের অতীত।

হুঃখের বিষয়, বর্তমানে কতিপয় বিদেশীর পদলেহী “লম্বাটপটাবৃত্ত” মুখ, বাচালতার দ্বারা তাঁহার গৌরবকে ম্লান করার চেষ্টা করায় দেশবাসীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটয়াছিল। কিন্তু সে বিভ্রম ক্লমিক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার তুলিকা ও তাঁহার লেখনী স্বর্ণাক্ষরে বাহা লিখিয়াছে এবং আলোধ্য অঙ্কিত করিয়াছে তাহা অজ্ঞেয় ও অক্ষয়।

বাংলার আকাশ আজ তমসাক্ষর। যে কয়টি তারকার আলোক আমাদের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতের আশাপথ নির্দেশ করার জন্ত অবশিষ্ট ছিল তাহার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতিষ্ক আজ অপসারিত হইল। আমাদের নিকট রহিল কেবল স্মৃতি। বাহা নহয় তাহা পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাহা অক্ষয়, অমর, বাহা পুরুষকারে এবং অজ্ঞেয় বিশ্বাস ও অদম্য প্রয়াসে অর্জিত, তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে বাংলা মায়ের মানসপটে। আত্মবিশ্বস্ত বাঙালী এখনও বুঝিতেছে না সে কি হারাইল, যেদিন বুঝিবে সেই দিনই দেখিবে যে, সেই অমরজ্যোতি বাহা আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের বস্তু ও উদ্যোগীয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ম্লান হইতে পারে কিন্তু নিকীর্ণিত হইতে পারে না।

এই মহামানব গত ১০শে অগ্রহায়ণ বুধবার রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

কীৰ্ত্তিৰত্ন স জীবতি।

বাংলায় নির্বাচন

বাংলায় এবারকার নির্বাচনে ভোটদাতাদের সমূহে এক বিষয় সন্ভা দেখা দিয়াছে। প্রার্থীদল সকলেই নির্বাচিত হইলে পরে বাংলাকে কুখ্যে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা দিতেছেন। নিজের বা নিজ দলের কৃতিত্বের পরিচয় দানে সকলেই পতনুৎ। কংগ্রেস ও দলপন্থ ও সমষ্টিগত ভাবে নির্বাচনে দাবি করিতেছে যে, দেশকে দাবীদার করা হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে সমষ্টিগত করিয়া দেশবাসীর দখলে আনা, ভূমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা, হৃতিক তৈকাইরা রাখা, বাতহারা পুনর্কর্ষণ করা, সমস্ত পূর্ববরকের ভোটাবিকার দান, দেশে বাধ্যতাহূলক প্রাইমারী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, মধ্যপান নিবারণ, গ্রহর বাধ্য উপাধন, সেচ-ব্যবহার প্রতিষ্ঠা, বর্ণ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন ও অধ্যুৎ-উদার ইত্যাদি সব কিছুই ইহা করিয়াছে। এ বিষয়ে সর্বিশেষ আলোচনার অবকাশ করকন নির্বাচকের হইয়াছে আমি না।

দাবীদারতা হুতে দেশবাসীর পূর্নপুরুষগণের দান অতি বিরাট এবং জাতির কনক মহারা পানীর অবদান অতি মহান একথা কে অস্বীকার করে? কিন্তু এ পৌরবের দাবি ধাহারা করিতেছেন তাহাদের কৃতিত্ব ইহাতে কতটুকু? দেশীয় রাজ্যের উদারে সর্বার প্যাটেলের অংশ পৌরবর কিত সেই নকে কংগ্রেসের বাহিরের বহ লোকের ক্ষুদ্র-বহুৎ অংশে কীর্তির ইতিহাস কংগ্রেস প্রচ্ছিন্ন রাথিতে চাহিতেছে। ভূমিদারী উচ্ছেদের ব্যবস্থা ও আরম্ভ হর ব্রিটিশ আমলে এবং ইহার ব্যবহার বাসপন্থীদের প্রারস ও নির্দেশ কংগ্রেস অপেক্ষা কোমল অংশে কম নহে। হৃতিক নিবারণে কংগ্রেস সমর্থ হইয়াছে। কিত যেভাবে তাহা করা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত দেশ সখিবহীন এবং হুরারোগ্য কলুৎ ও অনাচারে কর্করিত হইয়াছে। বর্গমানে এইমাত্র বলা বার যে, হৃতিক সাময়িক ভাবে তৈকানো হইয়াছে কিত রোগ অপেক্ষা তাহার প্রতিকার তীব্রগতর হইবার নিদর্শন দেখা দিয়াছে এবং যেভাবে কংগ্রেসের অধিকারীবর্গ ব্যবস্থা করিয়া চলিতেছেন তাহাতে কংগ্রেসেরই বেহ অবশ্যভাবে কলুচিত ও অকর্ষণ্য হইরা পড়িতেছে। অত সকল দাবি ও ব্যক ও কৌতুকের ব্যাপার। শিক্ষা, দানক নিবারণ, বাতহারা পুনর্কর্ষণ, প্রাইমারী শিক্ষা, সেচ ও বাত উপাধন প্রার প্রত্যেকটাই অবোধ্য লোকের হতে ব্যত। বাদের কলের গ্যার অর্থব্যয়ে সামান্য কলই দেখা বাইতেছে। অধ্যুৎ-উদার ও বর্ণ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের কীর্তি ধাহার তাহার অলু্য দীবন রকার তেটা মাত্র ও বাহারা করে নাই তাহারাই সেই পৌরবের সন্ভটাই দাবি করিতেছে, ইহা তারতের অদুটের পরিচয়।

অন্য সকল দলও আনা কীর্তির দাবি-বাওরা করিতেছেন, তাহাও অনেকের কেরে অলীক ও অবৌতিক।

দাবি দাতারা প্রতিজ্ঞার প্রেরে আনিলে দেখা বার অবস্থা আরও অদুত। “আবার দলকে রাষ্ট্রের বতহুতের অধিকার দাত, আমি তোমাকে রাখা করিয়া দিব”—এ প্রতিজ্ঞা সকলেই দিতেছেন, শুদু মাত্র সাধারণের রাখপন লাভের পথার নির্দেশ বিভিন্ন। তাহার পর বতর প্রার্থীর প্রতিজ্ঞা। ইহাও অংশে ও বিভিন্ন। যে বাহা ধুনী অস্বীকার করিতেছে, “ভৎপরে বদভবিষ্যতি ভদভবিষ্যতি”। কলে নির্বাচন একেবারে প্রহসনের পর্ধ্যারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নির্বাচকবর্গও, অততঃ তাহাদের অধিকাংশই এই নির্বাচনকে প্রহসন বা সামাজিক নিরন্ত্রণের বতই দেখিতেছেন। করকন হুরিতেছেন যে, তাহারা বহি চকুলক্ষার বাতিয়ে, বা তাবের বশে, বা হেলাবেলার অবোধ্য প্রার্থীকে নির্বাচনে সমর্থন করেন তবে বাংলা ও বাঙালীর চিতার আর একট কাঠবত বোগানই হইবে, বতপ্রার বাঙালীকে প্রাণদান করা হইবে না।

বাংলা ও বাঙালী আক হতসর্কব, শোথিত, দলিত ও মরণোদুৎ। আরও পাঁচ বৎসর বহি এইভাবে বার তবে বাংলার সন্ভাদের বতমেহের উপর অশ্রপাত করা তির অত কিছু করার থাকিবে না। এ সকল কথা দেশবাসী হুরিয়া দেখুন ইহাই আদারের সর্বির্ভব অদুরোব।

যে লোক বাংলার ও বাঙালীর হুঃবকট প্রতিমিরত অহতব করে, যে লোক বাংলার হুর্দনার প্রতিকার-তেটার মিকেকে উৎসর্গ করিয়াছে এবং নর্কোপরি ইহার প্রতিকার-কলে বাহার হুতি, কনতা ও দ্বার্কত্যাগ আছে সেই লোকই নির্বাচনের বোগ্য। অকন বা বার্বণর লোক অবোধ্য ও বিষবৎ পরিচ্যাত্য।

যে লোক চরিত্রবান, হুচতোতা ও সাহসী, সে-ই নির্বাচনের বোগ্য। অশক্ত ও সুবিবাবারীর অবোধ্যতার সন্ভেহের অবকাশ নাই।

ভোটদাতা বিচার করুন, এখনও সময় আছে যে কুরা প্রতিজ্ঞার মূল্য কতটা। যদি বা ধাহারা প্রতিজ্ঞা দিতে-ছেন তাহাদের সে প্রতিজ্ঞা রকার কনতাই বা কতটুকু এবং তাহাদের অতীত ইতিহাসে তাহার নিদর্শনই বা কি আছে?

ভোটদাতার আনা প্রয়োজন যে, তাহার ভোটদানের অধিকার কণিকের মাত্র, কিত তাহার কলাকল তাহাকেই, নগোদী ও সবাভবে, ভোগ করিতে হইবে দীব পাঁচ বৎসর বহিয়া। হুতরাং প্রার্থীর বোগ্যতা বিচারের অধিকার তাহার আছে ভোটদানের পূর্নহুর্দ পর্ধ্যত। “কথা দিরাহি” বা “একটা ভোট অবোধ্য লোক পাইলেই বা কি”—ইহা বহি তাহাদের বিচারহুতি আছর করে, বা অতবিবাল তাহাদের হুটি সর্কণ করে তবে আগামী পাঁচ বৎসর কোমল অভিযোগ করার অধিকার তাহাদের থাকিবে না।

কংগ্রেসী সেকুলারিজ (ধর্ম-নিরপেক্ষতা)

“(১) আমিন নামে একটি লীগপন্থী মুসলমান ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রত্যেক সংগ্রামের সময় এরূপ ‘মুখ্য্যতি’ অর্জন করেছিল যে, মুরাব্বীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠার। এবং সেই সময় অসংখ্য অভ্যুত্থান ও অসুচার সে দিকে ও তার সহকারীরা করিরাছে। ঐ সকল অপরাধ অসুষ্ঠান করছে এরূপ বহু ছবি আঁকত হুঁজলে পাওয়া বাবে। দেশ বিভাগের পর সে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল। গত বছর সে ফিরে আসে। আর তার কোথা, Prodigal son করে এলো। ঘরের ঘোঁটাসোটা বাছুরটি কাটি এবং স্ত্রী ও ভোজের ব্যবস্থা কর। কংগ্রেসের সেকুলারী মহাপুরুষগণ তাকে লুকে মিলেন। আমিন হ’ল বঙ্গপুত্র কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি। হাস হয়েক হ’ল এহেন রত্নটিকে শুভাকার অবৈতনিক এবং শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। কারণ? আমিনের হাতে ৪,০০০ মুসলমান ভোট রয়েছে।

“(২) বুদাবক্স হচ্ছেন লীগপন্থী ব্যবস্থা-পরিষদ-সদস্য। প্রত্যেক সংগ্রামের সময় তিনিও ছিলেন মুরাব্বীর অঙ্গভূত হত। সেকুলারী রাজত্বের পর লীগপন্থীদের স্বাভাবিক নিয়মে তিনি আসেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসপন্থীরাও তাকে লুকে মিলেন। গত বছর পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য এই তত্ত্বালোককে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকার হিসাব চাওয়া হলে আনা গেল তার কোন পাতা নাই। পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দিলেন, আমি কোন হিসাব নিই নি। আরও চেপে বরা হলে বরং ডাক্তার বিধান তার এগিয়ে এলেন তাঁর পক্ষপুষ্টে বুদাবক্সকে বাঁচাবার জন্য। ‘বুদাবক্স লোকটি ভালই—তবে যে লোকগুলিকে তিনি টাকা দিয়েছিলেন, তারা যদি পাকিস্তানে পালান তা হলে তিনি আর কি করবেন?’

“তত্ত্বালোক আগর নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিট পেয়েছেন।”

ঐক্যবাহিনীরা লেহেজর যে “ভান-পানী” তার একটু প্রমাণ উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না যে, কোন রাষ্ট্রের নর-নারী যে বর্ণ-বিশ্বাস বশে চলে এবং ঐ বিশ্বাসের নির্দেশে যে সব আচার-অসুষ্ঠান পালন করে তৎসময়ে সেই রাষ্ট্র কি করিরা নির্দিকার নীতির অনুসরণ করিতে পারে। কোন রূপে তাহা সম্ভব হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্র বর্ণ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিরা বড়াই করিরা থাকেন। তাহা যে মিথ্যা তার দুইটি প্রমাণ পাওয়া যায়, আর পর্যন্ত কোন ক্যাথলিক ঐষ্টান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি মনোনীত হইতে পারেন নাই এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে কোন অ-কম্যুনিষ্ট কোন উচ্চপদে নিয়োজিত হন নাই।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিকল্পনা

গত বছরের “প্রবাসী” পত্রিকার সম্পাদকের বক্তব্যে আমরা

বলিয়াছিলাম যে, তারতরাত্রেই নর-নারীর জীবনকে দূতন করিরা গঠন করিবার জন্য অনেকের অনেক রকম পরিকল্পনা আছে, যতরাং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরই থাকিবে না কেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত সমস্যার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৎসময়ে একটু ব্যাখ্যা করেন। তার চার-পাঁচ দিন পরে আর একটি সম্মেলনে তিনি আশা সংখ্যা-ভণ্ডা-বহুল একটি বিবৃতি দান করেন, এবং তার প্রভাবে আগামী নির্বাচনে জয়লাভের আশা করেন। যদি পরি-কল্পনা পেশ ও পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকিত, তবে ডাঃ রায়ের মহৎ উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য আমরা দেখিরা বাইতে পারিতাম।

কিন্তু বিষয়বাস্তবে সাধারণতঃ তাহা হয় না। ডাঃ রায় ভাগ্যবান লোক, তাঁহার বেলার এই বিধান উল্টাইরা গেলেন আমরা বুঝি হইব। তবুও সংসদী মন ইতিহাসের শিক্ষা অগ্রাহ করিতে পারে না, এবং সেইজন্যই নিজের সংস্কার অনুসারে বলিতে বাধ্য হয় যে, সংখ্যা-ভণ্ডার সংগ্রহ ও সমাবেশে মন, তাবের পবিত্রতা, কর্তব্যের সকলতা ও ইচ্ছার একাগ্রতা পরিকল্পনাদিকে আশানুরূপ রূপদান করে। এই ভিত্তির সম্ভাব্য বা সম্মিলন আমরা দেখিরা বাইতে পারিলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মন খুলিরা অভিনন্দন জানাইব।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাংলাদেশে শহর ও গ্রামগুলি নিত্যতঃ খাপছাড়া ভাবে গড়িরা উঠিরাছে। ইহাদের পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না। কলে গ্রাম্য জীবনের সহিত নাগরিক জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে বাঙালী জমির উপর একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইরাছে। কলে চাষের উপর অধিকাংশ লোক নির্ভর করিরাছে, কিন্তু পরিণামে কৃষিকে উন্নত না করিরা জমাগত অবনতির পথেই লইরা গিয়াছে। কারণ শহরের সহিত অবাং বাঙালীর সহিত যোগাযোগ না থাকার দালালের মারকত কাক করিতে হয়, যতরাং লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বাহারা অপেক্ষাকৃত কৃষী ও উদ্যোগী তাহারা শহরে নূতন জীবিকার অন্বেষণে বাহির হইরাছে। বাহারা অকল তাহারা এইমত চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। অপর পক্ষে শহরগুলি এমনভাবে গড়িরা উঠিরাছে যেখানে এই সকল গ্রাম-ভাগী মধ্যবিত্তকে বাসস্থান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। শহরের অপ্রত্যক্ষ বাসস্থান ও বস্ত্রী জীবন তাহাদের কৃত্রিম জীবনধারায় বাধ্য করিতেছে। টাঁকা বাতরব্যয়ের ও দূত আলোচনার অভাবে শহরবাসিনগ বাস্তবীন ও জীবনীয় হইরা পড়িতেছে।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন গ্রাম ও শহরগুলির মধ্যে একটি অর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুযায়ী জনপদ পর্বতের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা পঞ্চাশ-বার্টিট গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রামসমষ্টি পর্বতের সুপারিশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার বিচার করিয়া বলা যায় যে, এইরূপ এক-একটি গ্রামসমষ্টিতে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক থাকিবে এবং তাঁহার পরিবি হইবে আনুমানিক ৭৫ বর্গমাইল। এই সব-পট্টিত শহরগুলির প্রত্যেকটিতে এক হইতে দুই হাজার মধ্যবিত্ত পরিবারের পুনর্কলসনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল শহরে তাহাদের কোম-মা-কোম প্রকার কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সেখানে শিক্ষা পাইয়া তাহারা নামাশ্রমিক শিল্পপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে। এই সকল দ্রব্য ঐ পঞ্চাশ-বার্টিট গ্রামের লোকদের মধ্যে আবার বিলি-বন্টন করিয়া দিতে হইবে। গ্রামাকলনের লোকের চাহিদা মিটাইয়া যদি কিছু উৎস থাকে তাহা তখন করলা, কেরোলিন, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি দ্রব্যের বিমিশ্রণে রপ্তানী করা হইবে। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সর্ব-প্রকারেরই ব্যবস্থা থাকিবে এবং জনসাধারণকে সকল বিষয়েই সুযোগ দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অন্ততঃ বিশটি ক্ষুদ্র শহর স্থাপনে সক্ষম হইবেন। প্রত্যেকটি শহরের উন্নয়নের জন্য মোট চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ও অন্ততঃ বিবিধ প্রয়োজনে আরও বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। আদর্শ নগর নির্মাণের জন্য প্রধান প্রধান ব্যয় হইবে এইরূপ :

- ১। ৫ শত একর জমি দখল (একর প্রতি ২ শত টাকা)— ১ লক্ষ টাকা।
- ২। ১ সহস্র গৃহ নির্মাণ (প্রত্যেকটি ১১০ হাজার টাকা)— ১৫ লক্ষ টাকা।
- ৩। পথ বাট, খল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরঃপ্রণালী— ৫ লক্ষ টাকা।
- ৪। ১ হাজার লোককে বিভিন্ন ব্যবসারে শিক্ষাদান (প্রত্যেকের পিছনে ৭৫০/- ব্যয়) ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ
- ৫। কলকারখানা নির্মাণ— ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ
- ৬। ৬ মাসের কলকারখানার লাভসরঞ্জামের ৮ লক্ষ টাঃ
- ৭। বিবিধ ব্যয় ... ২ লক্ষ টাঃ

মোট ৪০ লক্ষ টাকা

৩০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য এইরূপ ব্যয় হইবে :

- ১। রাজ্য ২০ মাইল পাকা, ১২০ মাইল কাঁচা ১২ লক্ষ টাঃ
- ২। খুল ও চিকিৎসালয় স্থাপন ২ লক্ষ টাঃ
- ৩। গ্রামগুলির জন্য খাল খনন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ
- ৪। মাথাপিছু ৭৫ টাকা হারে ৬ হাজার

গ্রামবাসীকে কৃষি সাহায্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাঃ

মোট ২০ লক্ষ টাকা

অতএব প্রত্যেকটি নগর নির্মাণ করিতে ব্যয় হইবে ৬০ লক্ষ টাকা এবং এইরূপ ২০টি নির্মাণ করিতে ব্যয় হইবে অন্ততঃ ১২ কোটি টাকা। এই টাকার এক অংশ রাজ্য সরকার ৭৭ ব্যবহৃত হিবে। অবশিষ্টাংশ ব্যক্তিবিশেষ বা মলবিশেষের নিকট হইতে তোলা হইবে।

এইভাবে সুখ্যমতী মহাশয় বাংলার মধ্যবিত্ত সমতার সমাধান হিঁহ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিত্তের সমতা এত বিরাট যে কয়েকটি ‘ভাটেলাইট’ শহর ও কলোনী নির্মাণ করিয়া ইহার সমাধান হইবে না। দেশের যেখানে যে মধ্যবিত্ত আছে—সে পূর্ববঙ্গের উজাড়ই হউক বা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাই হউক—তাহাদের সকলকে এক জায়গায় জড় করিয়া শহরে পুনর্কলসন করিলে কোন সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। কোমও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাহাদের সকলকে একত্রে পাওরাও যায় না এবং সে চেষ্টাও বাতুলতা। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-চাষী ও বনী এই তিন শ্রেণীকে লইয়াই দেশ। ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক বাসস্থানে সীমাবদ্ধ অবস্থার রাখিলে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল হইবে না। উহা সম্ভবও নহে। দেশের সহিত মাটির সংযোগ না থাকিলে দেশ যেমন মরু, গ্রাম হইতে হিঁহ মধ্যবিত্তের জীবনও তেমন বিধা। শহরের কেরানীর পঙ্কাজে যে দুহুং মধ্যবিত্ত সমাজ আছে তাহাকে অধীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ভাটেলাইট টাউন পঠন সমতার সমাধান নহে।

মধ্যবিত্তের সমতা আজ অধোপার্জনের সমতা। মধ্যবিত্ত সমাজে দুবক শ্রেণীর চাকুরী নাই। সরকার তাহাদের চাকুরী দিতে পারিতেছে না। তাহারা শিল্প বা ব্যবসারে যোগ দিতে পারিতেছে না—কারণ তাহারা ক্ষতকর্মক, তাহাদের পুঁজি নাই। বড় বড় ব্যাক হইতে তাহারা টাকা বার পায় না, ছোট ব্যাক তাহাদের টাকা বার দিতে সাহস পায় না। ইহাই তাহাদের প্রধান সমতা। তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এত কাল কেহ তাহাদের করিয়া দেয় নাই। তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রেরণার নিজেদাই করিয়াছে।

তাহাদের বর্তমান সমতার সমাধানের উপায়—তাহাদের উপার্জনের পথ বিস্তৃত করিয়া দেওয়া। এখানেই সরকারের

নিম্নলিখিত সাহায্য করিতে পারে। তাহার অতঃপর প্রথমে প্রয়োজন বিহীন সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিহীন উপাদানের যে সকল পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলিকে লম্বয় কার্যে পরিণত করা সরকার। তাহার দ্বারা প্রথমে লভ্যের বিহীন সরবরাহ করা সহজ হইবে। কলে মান প্রকার জুগীর্ণ পদ্ধতি তোলা বাইবে—যেখানে প্রায়ের অসংখ্য দ্রব্য ও মধ্যবিত্তের অয়ের সংস্থান হইতে পারে। ইহার লক্ষ্য লক্ষ্য প্রয়োজন লক্ষ্য দেশের একটি অর্থনৈতিক সার্ভে করা—কোন স্থানে কি কি কাঁচামাল সহজলভ্য এবং কি ধরনের শিল্প সেখানে পদ্ধতি উন্নীত পারে ইত্যাদি ভাব্য সংগ্রহ করা। অবশ্য এই ধরনের অনুসন্ধান একাধিক বার করা হইয়াছে এবং তাহা লিপিবদ্ধ আছে। তারপর বিভিন্ন আঞ্চলিক শিল্পের উপযোগী টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া সেখানে শিকারীদের শিকার ব্যবস্থা করা। শিকার অস্ত্র তাহার নিজ নিজ প্রাণে পিঠা যোগ্যতা অনুসারে ক্রয় করিবে। সরকারী সাহায্যে ব্যাক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অসংখ্য শাখা প্রায়ের মধ্যে এই সকল শিল্প বা কৃষি অঞ্চল-গুলিতে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। তাহার বিমানবন্দে মূল্যবান বার দিয়া এই সকল শিকারীদের শিল্পে বোমদানে সাহায্য করিবে। বর্তমান টাকা পরিচালনা না হইবে তত দিন ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ ইহার উপর তদারক করিবেন এবং সং ও সুপারিশ দিয়া শিল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করিবেন। তত দিন নূতন শিল্প ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ব্যবসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

প্রাচ্যে কাপাস একমাত্র জুগীর্ণ শিল্পের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সমতা মিটাইয়াছে। কার্খানীতে পোরেরিং-প্ল্যান্ড ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সনে শুরু করিয়া আজ চার বৎসরের মধ্যে পোরেরিং-প্ল্যান্ডে কার্খানীর মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক চেহারা আনন্দ পরিবর্তন সাধিত হয়।

একটি আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের কত উপকার সাধন করিতে পারে অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্যাঙ্ক (Rural Bank of New South Wales) তাহার প্রমাণ। এই ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে, সাধারণ ব্যাঙ্কিং বিভাগ ও সরকারী একেদী বিভাগ, যেখানক বিভাগটি সরকারের অধীন চলে। ইহার কাজ কৃষি, শিল্প, গরু-ভেড়া পালন প্রভৃতি প্রয়োজনে কিংবা গৃহনির্মাণ, শিকার, চিকিৎসা ইত্যাদির অল্প কেহ ঋণ চাহিলে তাহাকে ঋণ দেওয়া হইতে শুরু করিয়া বাণিজ্যিক কাজের অল্প জনসাধারণকে সাহায্য করা। ব্যাঙ্কের ৫০ জন অভিজ্ঞ ক্যাড্রার আছেন। কেহ ঋণ চাহিলে ইহারা তাহার সিকিউরিটির মূল্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু এইখানেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হয় না। কোন কৃষক ভাল উপাদান না করিতে পারিলে,

তাঁহারা উন্নতির উপায় বিধে পারিলে নিজেরা বলেন লভ্য অল্প বিভাগ হইতে পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ব্যাঙ্কের একটি পাবলিক রিলেশন অফিসার আছেন। তাহার কাজ উন্নত কৃষিকার্যে কৃষকদের শিক্ষাদান এবং কিসে প্রদেশের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহার লক্ষ্য সংগ্রহ ও প্রচার। এইভাবে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা জনসাধারণকে সাহায্য করিতেছেন। দেশের প্রকৃত মঙ্গলকারী হইলে এ কাজ এমন কিছু রহস্য নহে, আমাদের দেশেও ইহা অনায়াসে করা হইতে পারে। অর্থাত্ত্বের ওজুহাত কোন কাজের নহে, সরকার উদ্বুদ্ধের অল্প দক্ষ দক্ষ যে অর্থ পরমাতী দিতেছেন তাহাতে না হইতেছে সরকারের লাভ, না দেশ-বাসীর, না উদ্বুদ্ধের ক্ষেত্রে। এই অর্থদ্বারা এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে ইতিমধ্যে অনেক কাজ পাওয়া হইত বলিয়া আমরা মনে করি, এখনও সরকার শিল্পে মূল্যবান সরবরাহের অল্প ক্ষেত্রে ঋণ করিয়া, বা শেয়ার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। প্রাদেশিক সরকার অক্ষম হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এরূপ ঋণ দেওয়ার অল্প বাধ্য করাইতে পারেন। অল্পবিত্তের মধ্যেই এই ঋণ পরিচালনা করা হইবে।

ডাঃ বিধান দ্বারের পরিকল্পনাতে ২০টি তাটেলাইট শহরের অল্প ১২ কোটি টাকা খরচ হইবে। কিন্তু এই অর্থ যদি উপযুক্ত উপায়ে খরচ করা হয় তাহাতে অধিকতর অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের আর্থিক সমতার সমাধান হইবে।

ভূমি-সংস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র দ্বার সংবাদপত্রে বিবৃতি-প্রসঙ্গে গত ১৮ই মেঘের রবিবার কমিটারী প্রাণা বিলোপ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, চাষ এবং চাষীদের বর্তমান দুর্ভাগ্য কারণ কমিটারী বা মধ্যবিত্ত বন্ধ নয়। এই প্রকার উচ্ছেদ হইলেই যে শতাব্দীর পরিমাণ বাড়িবে ইহাও ভুল ধারণা, যদি তাহা হইত তবে যে সকল অঞ্চলে রাস্তাঘরারী ব্যবস্থা আছে তথায় বা এই রাস্তার বাসনমতের অন্তর্গত ভূমিতে শতাব্দী-পাশব্দ বৃদ্ধি পাইত। ইহা ব্যতীত বর্তমান মালিকানা ও ভূমিধর্ম উৎখাত করিতে হইলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইহাদের কতিপয় দিতে হইবে। এই কতিপয়দের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার জমির উপর পড়িবে এবং জমি হইতেই তাহা আদায় করিতে হইবে। সুতরাং নূতন ভূমিব্যবহার চাষীর প্রকৃত উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। বিতীর্ণতঃ বর্তমান ব্যবস্থাতেও কৃষক যদি বেশী উপাদান করে তবে তাহা কৃষকেরই প্রাণ্য, যেহেতু কমিটারীর আর আইন দ্বারা নির্ধারিত।

কৃষি উপাদান বৃদ্ধির জন্যই ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজন, ভূমির মালিকানা বন্ধ চাষীর হতে অর্থাৎ আর্থিক ও ভাগচাষী

এই উত্তর প্রকার চাষীদের হাতে অশিত হইলেই খতোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না, কারণ প্রত্যেক চাষীকে বিলি করার জন্য পরিমিত চাষের জমি আবাদের নাই। পতিত জমি বাহা আছে তাহার অধিকাংশই বন্যাকলের বা জলপ্রোতে ভাসিয়া না যায় সেজন্য অথবা গো-মহিষাদির বাতের জন্য বাসের জমি হিসাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। অবশিষ্টাংশকে চাষের উপযুক্ত করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানেই আবাদের জমি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং বহু উৎপাদনের ইহাই প্রধান কারণ। জুনি-ব্যবহার পরিবর্তন করিয়া চাষীকে জমির মালিক করিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি আরও বহু বিভক্ত হইয়া বাইবার সভাবনা আছে এবং এই পরিস্থিতিতে কোন আইন দ্বারা বন্ধ করা বাইবে বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুদ্র জমি হওয়ার জন্য ইহা আরও দ্রুত মহাজনদের করতলগত হইবে, কারণ জীবিকা নির্বাহের জন্য তাহাদের মহাজনদের কাছে গণ গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার প্রতিকারের উপায় স্বরূপে তিনি বলেন যে, ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ জমির উপর হইতে অন্য দিকে চালনা করিতে হইবে। একদমই পল্লীবাসীদের জুনির-শিল্পাদি লাভ-জনক কার্যের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন এবং চাষীদের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আয়তনের জমি চাষ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়টি এমনই অটল ও ব্যাপক যে তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র বিষয়টি একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর দ্বারা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার প্রতি উদ্যোগী নহে। তাহার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করিতে-ছেন। ইতিমধ্যে সেচ-ব্যবস্থা, উন্নত বীজ, সার প্রভৃতির সাহায্যে জুনি-ব্যবহার উন্নত করিতে চেষ্টা হইতেছে এবং জুনির-শিল্পের উন্নতিবিধানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার কলও এখনই পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জুনি-সংস্কারের এ সকল সমস্তার কথা মনে রাখিয়াই সুন্দর-বনের সরকারী জমিতে এই পরিকল্পনা প্রথম কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছেন।

দুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বর্তমানে জমিদারী প্রণালী উচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। জমিদারী প্রণা যে কৃষির হ্রাসের একমাত্র কারণ নহে তাহা সত্য। জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে যে পরিমাণ অর্থ কতিপয়পুত্রের জন্য প্রয়োজন তাহা সরকারের নাই ইহাও সত্য। জুনিবন্ধের নুতন ব্যবস্থার কলে নুতন সমস্তার উদ্ভব হইবে ইহাও কাল কণা। জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ সরাইয়া শিল্পের প্রসার করা প্রয়োজন তাহাও বহুদ্রুত ব্যক্তি। কিন্তু কণা হইতেছে ইহার প্রতিকারের কি কোন ব্যবস্থা বাস্তবিকই

নাই, না সরকারের বলিষ্ঠ মনোভাব ও দ্রুতগতির কর্মসূচীর অভাবে প্রতিকার ব্যাহত হইতেছে? আমরা জানি এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যবস্থা করা বাইতে পারে যদি সরকারের মনোভাব সেরগ হয়। দুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, জমির মালিকানাধীন চাষীর হাতে অশিত হইলে তাহা আরও বিভক্ত হইবে এবং মহাজনদের হস্তগত হইবে। এ ক্ষেত্রে আমরা পঞ্জাবের Land Alienation Act-এর নিদর্শন দেখাইতেছি। সেখানে জমি কেবলমাত্র প্রকৃত চাষীই ক্রয় করিতে পারিবে। চাষের সঙ্গে প্রত্যেক ভাবে জড়িত নহে এমন লোক জমি ক্রিয়ারে পারে না। আবাদের বাংলাদেশেও কলমুল হক মহাশয়ের মন্ত্রিত্বের আমলে অল্পপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৪৩ সালের হুজিফের পর বধন দেখা গেল যে, অধিকাংশ জমি মহাজনদের কবলে গিয়াছে তখন হুজিফীভিত্তি চাষীদের মধ্যে বাহারা জমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহাদিগকে জমি ফেরত দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। ইহা দ্বারা জমি চাষীর হাতেই থাকিবে—ইহার বহুবিধিকারীর পরিবর্তন হইবে। তাহাতে চাষের কোন ক্ষতি হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার জমিদারী প্রণালী বিলোপ করিয়া এই ব্যবস্থার দ্বারা মহাজনদের হাত হইতে জমি রক্ষা করিতে পারেন। অপর পক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমি বিভক্ত হওয়ার যে সভাবনা আছে তাহার প্রতিকারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। ইহার প্রতি-কারে আবাদের উত্তরাধিকারের আইনের পরিবর্তন করা অসম্ভব হইলেও অন্য ব্যবস্থার দ্বারা ইহার প্রতিকার করা যায়। বর্তমানে রাশিয়া প্রভৃতি অত্যন্ত অনেক দেশে বহু বিভক্ত মালিকানাধীন সম্প্রদিত চাষের পক্ষে অন্তরায় হয় নাই। সম্ভার সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন চাষীর জমিকে একত্রে চাষ করার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই। ইহাতে চাষী তাহার নিজস্ব বহু রক্ষা করিয়াই কসলের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। পঞ্জাব, মাজাখ ও বোখাই প্রদেশে আইন দ্বারা জমি একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (land consolidation acts)। কিন্তু যদি জমিদারী প্রণা রহিত না হয় তাহা হইলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে সরকার উত্তেজিত হইয়া কার্যারম্ভ করিলেই অতীত কল লাভ করা বাইতে পারে।

পতিত জমি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। পতিত জমির পরিমাণ আবাদের কম নহে। সে জমির উদ্ধারের দ্বারস্থ সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত-সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তাহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু একেবারে দেখা যাইতেছে যে চাষীর উপরই সে গুরু ভারি দাপ্তরিক করা হইয়াছে। জমির মালিকানাধীন জমিদারের হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চাষীর

াতে হাতিরা মিলেই সরকারের সকল কর্তব্য শেষ হইবে না।

ভূতীয়তঃ, কৃষির উপর নির্ভরতা হ্রাস করিবার জন্য প্রয়োজন কৃষিরশিখের প্রসার। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনার দ্রুত সম্পাদন। গাছাদি দ্বারা এলাকাসে শিল্পের বিস্তার করা সহজ হইবে। তাই হইতে লোক সরাইয়া শিল্পে নিয়োগ করিয়া আপাততঃ আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে সম্ভব। কিন্তু কৃষি যদি উন্নয়ন অবস্থার দিকে তাহা হইলে তবিত্তে আরও সচেষ্ট হইবে। আমাদের দেশে কৃষি একক ভাবে কোন দিকে সম্পূর্ণ ছিল না। চিরদিনই কৃষিরশিখ চাষীর অন্যতম ঐক্য ছিল এবং চাষের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহা দ্বারা পার্জন্য করিত। বর্তমানেও একমাত্র কৃষি কৃষকের অভাব সচেন করিতে পারিবে না। তাহাকে বাবলখী করিতে ইলে সবে সবে আমাদের কৃষিরশিখের উন্নতি করিতে ইবে এবং এই দুইটি ব্যবস্থা একই সন্ধে করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর বিরতিতে কানা গেল যে মুদ্রাবন অকলে সরকারী বাসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষী অস্থায়ী কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার কলও পাওরা বাইতেছে। এই কলের রূপ জনসাধারণ আশঙ্কিত ভাবে পারিতেছে না। ইহার দ্বারা বাংলার ক্ষুদ্রতম ছেলারও বাতাতাব হ্রাস করা হইবে মিত্রা ভূমিতে নিশ্চিত হইতাম। তাহা হাকা সমস্তাটা সমগ্র দেশের। তাহাকে একটি মাত্র সরকারী বাসের মধ্যে সীমিত রাখিলে বিশেষ লাভ হইবে কি? অবশ্য বলা হইবে—সীমিত। কিন্তু স্বাধীনতার চারি বৎসর পরেও যদি সীমিতের কথা ভাবিতে হয় তবে বড়ই বিপদের কথা। দেশের উন্নয়ন পরিহিত্তিতে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ বড় মৈত্রাত্বজনক। তার নির্দোষের প্রাকালে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীর কংগ্রেসের স্বাধীনতার বিপরীত বর্মা ভাব ও নীতি প্রকাশ কংগ্রেসের পক্ষে ভিত্তিক হইবে না কি? কংগ্রেস যে দিন হইতে মিত্রকে জনগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবি করিয়াছে সেই দিন হইতে তাবধি তাহার ভিত্তিক প্রধান উদ্দেশ্যে তাহাদের কর্তৃপক্ষী অন্যতম প্রধান নীতি হিসাবে রক্ষা করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অজ্ঞ জনসাধারণের দিকে ইহা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় কৃষি ঋণদান প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আট মাসব্যাপী একটি সম্বন্ধপূর্ণ অহলদান-কার্য পরিচালনা করা হইবে। এই সার্ভের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যীয় সরকার

তাহাদের ব ব কৃষি ঋণদান বিভাগ সুগঠিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় ইউনিয়নের ২০টি রাষ্ট্রে এই সার্ভে অসুষ্ঠিত হইবে এবং ১৯৫২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রিপোর্টের বসতা সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছু দিন সময় লাগিবে বলা হইয়াছে।

এই কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে কৃষির অবস্থা অনুসারে ৩০টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতগুলি জেলাকে এবং প্রত্যেক জেলা হইতে আবার অল্প উপায়ে আটটি করিয়া গ্রামকে বাছাই করা হইয়াছে। সর্বমুমে ৬০০ শত গ্রামকে এই সার্ভের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রধানতঃ প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের চাষ বা ঐ সংক্রান্ত কার্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করাই হইবে সার্ভের প্রধান কাজ। বিশেষতঃ বর্তমান অর্থ-মৈত্রিক পরিহিত্তিতে তাহাদের আর, ব্যয়, ঋণ, লক্ষ্য ইত্যাদি সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই ইহা করা হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক গ্রামে ১৫টি করিয়া পরিবারকে বাছাই করা হইয়াছে।

কৃষি ঋণদানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষী ও নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা করা হইবে এই সার্ভের দ্বিতীয় কাজ। কৃষকের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি কতদূর সক্ষম—কার্যক্ষেত্রে তাহাদের কি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়—কোন ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অসুবিধার প্রতি-কার্য করা যায়—ইত্যাদি সকল বিষয়েরই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইবে।

ইহা ব্যতীত কৃষি ঋণ সম্বন্ধীয় বেওয়ারী আইন ও লরি কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রাণের বিভিন্ন কৃষি ঋণদান ব্যবস্থার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে তাহারও অহলদান এই সার্ভেতে করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রতি চারটি গ্রামে একজন করিয়া ‘ইনভেস্টিগেটর’ নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার সকল তথ্য সংগ্রহ করিবেন। তাহাদের প্রতি দুই জনের কার্য পরি-দর্শনের জন্য একজন করিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার আবার রিজিওনাল কন্ট্রোলারদের অধীনে কাজ করিবেন। একজন পাঁচ জন রিজিওনাল কন্ট্রোলার ও চার জন ডেপুটি রিজিওনাল কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই ভাবে সমগ্র কৃষি ঋণের একটি সম্পূর্ণ সর্বভারতীয় পরি-সংবাদ সংগৃহীত হইলে তবিত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কৃষি বিভাগের কার্যের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং দেশের বহু দিনের একটি অভাব হ্রাস হইবে।

বলিয়া আশা করা যায়। ইহার দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব অভাব-অতিবোধ অবগত হইয়া ঋতু প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে।

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বণন গঠিত হইয়া ভবনই ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের সুব্যবস্থা করার জন্য দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয় জাতীয়করণের পূর্ক পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট বলিয়া ছিল। বাহা হউক, ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে। আর ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তাহারাই এই বিষয়ে লেচেন্স হইয়া সবেমাত্র তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল। রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগেই কর্তৃত্বপূর্ণতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাতির বর্তমান সমুদ্রে ইহা বড়ই হুঃখজনক।

জমির সার উৎপাদন

ধানবাহ হইতে ১৪ মাইল দূরে গও গ্রাম সিল্পগ্রী। তাহা আজ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমির সার উৎপাদনের কেন্দ্ররূপে স্ফাটয়িত হইতেছে। গত ১৪ই কার্তিক এমোনিয়াম সালফেট সারের উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষ অস্থানদের আয়োজন করা হয়। এই কারখানার ইতিহাস জানিয়া রাখা ভাল।

“প্রায় দশ মাইল দূরে এক শহরের পত্তন হয়েছে; সরকারী পরিচালনার এবং সরকারী মালিকানার এক বড় কারখানা ভারতবর্ষে আর নেই। একটি মাত্র কারখানা থেকে এই পরিমাণ অর্থাৎ দৈনিক হাজার টন, এমোনিয়াম সালফেট তৈরির ক্ষেত্রে, পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানাগুলির মধ্যেই সিল্পগ্রির স্থান।

“সিল্পগ্রির রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের ইতিহাসে দুইটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হ’ল, ব্রিগেডিয়ার এম. এইচ. কজ। তিনি এই পরিকল্পনার প্রথম উপবেষ্টা রূপে কাজ করেছেন। অপর নাম মিঃ জে. এইচ. হল। তিনি কারখানাটির পরিকল্পনা করেছেন এবং তা গড়ে তুলেছেন। মিঃ হল এখন এই কারখানার রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ব্রিগেডিয়ার কজ এটির চেম্বারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কারখানার চেম্বারেল ব্যাবেজার পদে নিযুক্ত হয়েছেন মিঃ বি. সি. সুবার্জি। ইনি উচ্চতম সরকারের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন।

“ব্রিটিশ আমলে ভারত-সরকার ১৯৪৩ সালে বাতনত উৎপাদন হ্রাস উপায় উদ্ভাবনকরে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে নাইট্রোজেন-পুট জমির রাসায়নিক সার উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করা হয়। তিন জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের উপরে এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার ভার বোঝা হয়। তাহারাই একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের এবং সেখানে বৎসরে লাখে তিন

লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের বড় সুপারিশ করেন। যথাক্রমে একটি ব্রিটিশ ও একটি দাক্ষিণ প্রান্তিকের সঙ্গে ভারত-সরকার চুক্তি সম্পাদন করেন পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। বরপাতি এবং বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি আনানো হ’ল ব্রিটেন ও আমেরিকা থেকে। ভারতবর্ষ সরবরাহ করল বর-বাড়ী তৈরির লোহা-লতক, মাল-বন্দলা, লোকজন এবং প্রয়োজনীয় অর্থাদান করলেন এই তিনটি রাষ্ট্র।

“স্থান নির্বাচন, জমি ধরিত, যন্ত্রাদি পরিষ্কার করা, উঁচুদুঁচু মাটি কেটে সমান করা ইত্যাদি পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলি আরম্ভ হয় ১৯৪৫ সালের মার্চমাসে; কারখানার ইয়ারত গড়া আরম্ভ হয় ১৯৪৬ সালের নব্যবর্তী কালে। পাঁচ বৎসরেই এই বৃহৎ পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষকে বাত সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলবার উদ্দেশ্যের পক্ষে এই কারখানার গুরুত্ব খুব বেশী। সমগ্র পরিকল্পনাটির অর্থাৎ শহরসমূহে কারখানাটি তৈরি করার ব্যয় পড়েছে ২০ কোটি টাকা।

“বিশেষ থেকে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন করে এমোনিয়াম সালফেট বর্তমানে ভারতে আমদানি হচ্ছে। যদি বৎসরে লাখে তিন লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন করা যায় তা হলে প্রতি বৎসর ৯ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার মত ভারত-সরকারের আমদানি ব্যয় বেচে যাবে।

“এখান থেকে যে সার তৈরি করা হবে তা খুব সভা হয়ে চাষীরা বাতে ক্রমশে পার তার ব্যবস্থা হয়েছে।

“কেবল জমির সার তৈরি করার কাজের মধ্যেই কারখানাটি সীমাবদ্ধ থাকবে না। মূলতঃ একটি ভারি রাসায়নিক উৎপাদনের কারখানা হবে ঐক্যাবে। কাঁচা করলা থেকে পোড়া করলা (কোঙ্ক) তৈরি করা বণন এই কারখানার লক্ষ্যবশত হয়ে উঠবে তখন তাপগা, আলকাতরা, বেনজিন এবং গ্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত সহজাত উৎপন্ন প্রযোজ্য এবং এখানে তৈরি করা যাবে। তা ছাড়া সিমেন্ট তৈরির পক্ষে গরম প্রয়োজনীয় একটি বড়—ক্যালসিয়াম কার্বনেট স্লাজ (গার) এখানে তৈরি হবে ঠিক এমোনিয়াম সালফেটের সম-পরিমাণেই, সহজাত উৎপন্নরূপে, প্রতিদিন ১০০০ টন। এমোনিয়াম সালফেট ছাড়া প্রায় ৩০০ টন এমোনিয়াম এই কারখানার প্রতিদিন তৈরি হবে।”

কম্যুনিষ্ট ও বিড়লা শ্রেণী

গ্রীষ্মকালের বহু মেতাকীর একজন একনিষ্ঠ সহকর্মী; তিনি পশ্চিমবঙ্গে “করওয়ার্ড রুকে”র অন্যতম নেতা। সংবাদ-পত্রে দেখিতে পাই এই হল স্রি-বারার বিতর্ক। তিনি উত্তর-কলিকাতার কংগ্রেস কমিটির পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে নির্বাচিত হন। গত বৎসর কংগ্রেসী সু-শাসনের প্রতিবাদে হল ত্যাগ করেন; পরিষদের সভা পদেও ইত্যাৎ বেন।

তিনি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার কর্তার, তার নাম 'কর্মীদল'। সেই পত্রিকার ওরা অগ্রহারণ তারিখে বামপন্থী মেলের মিলন সম্ভব হইল কেন, তৎসব্ধে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে কল্যাণিষ্ট হল ও বিতলা প্রবীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তারতরাত্রেই অগণিত জনমতের প্রতিফলি ইহাতে ওমা যায় :

“আজ বাহারা কুয়া বামপন্থী একোর নামে যেতাকী হুতাবের কলক আরোপকারী বিদেশী হালালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাইতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে সাবধান রাণী উদ্ধারণ করিয়া আমরা একথাই বলিব যে, কল্যাণিষ্টদের সাপচকে তাহারা যেন পা না দেন। এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নাই—বা আমরা সেই মহান রাষ্ট্রের প্রতি পক্ষ-স্বাপন্নও নই। কিন্তু তারতীর কল্যাণিষ্ট পার্টর চির পুরাতন ঐতিহাসিক আমরা কোনমতেই সমর্থন করিব না—করিতে পারি না। বহি কল্যাণিষ্ট পার্টর মেতা ও কর্মীয়ের তারতের রাষ্ট্রীয়তার প্রতি—তারতের মহা মনীষীদের প্রতি—তারতের জনগণের প্রতি দরদী মন লইয়া সংগঠনের পথে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহা হইলে সারা তারতের লালিত গাছের স্নেহপুষ্ট সমর্থন তাহারা অবশ্যই পাইতেন—আমরাও তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রভা জানাইতাম। কাজেই রাজ্য যে-পথে তাহারা তাহাদের ‘কর্মচক্র’ নির্ধিক্ত করিয়াছেন, সপথ অতি কর্তব্যশীল—এদেশের প্রতি তাহা পদে পদে প্রতিফল। কাজেই কংগ্রেসী ভাষা ও মূল সাধারণীদের ঐতিহাসিক বিরুদ্ধে আমাদের লেখনীসারা হুকীর গতিতে টুটা চলিবে।

“আমাদের সম্পর্কে বাহারা অজানা আশঙ্কার শব্দিত ইয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে আমরা একথাই বলিব যে, আমরা কোনরূপ অভ্যর্থনের পথ ধরিয়া চলি নাই। কাজেই সমস্তের প্রতিবাদে আমরা যে কোন বিপদকে বরণ করিয়া ইহাতে প্রস্তুত আছি। যে দেশের লোকের হাত মাংস খাইয়া বিতলা আজও রক্তচক্ষু করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী জীকে ‘Purchasable Commodity’ বলিতে সাহস পায়, য় দেশের বাসসকল শোষণ করিয়া বিতলা ঔষ্য করিয়া লিতে সাহসী হয় যে, “আগামী নির্বাচন আমরাই চালাইব, জীবনমূল্য আমরাই পঠন করিব”, সেই দেশের প্রবাসমন্ত্রী হুত গোপন কারণে ইহার উপহুত জবাব দিতে কার্ণ্য দ্বিতে পারেন, কিন্তু যে বাঙালীর বেহমানে আজও সংগ্রামী লীবনের স্রোত ভিমিত আকারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ঠিকে এইরূপ ধুটতা—এইরূপ অনিষ্ট উক্তি কি করিয়া সহ ওমা সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসমন্ত্রীকে এই কথাই আজ

বেহমার হয়ে দিচ্চা করিতে ইচ্ছা হয় যে, বিতলা যেদিন দাতিকভাবে এই ঔষ্যচক্র উক্তি করিয়াছিলেন, সেই দিন তিনি কি করিয়া উহা সহ করিয়াছিলেন? বাঙালীর বিরোধী আরা—আজবর্ষের তেজঃপ্রভা কি তাহার বেহমানে—তাহার বদনীতে, শিরার শিরার সেদিন কম্পন জাগার নাই? “বিতলার ঔষ্যের জবাব দিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসমন্ত্রী কার্ণ্য করিলেও—বাঙালী করিবে না। কারণ, বাঙালী আজও মরে নাই—তাই আমাদের কৈকিরং হিসাবে সকলের উদ্দেশ্যে বলিতে চাই যে,

রক্ত বহাতে পারিনে তো একা

তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা

যাহা কেতে খার তেজিণ কোটি মুখের আস

এ লেখার বেন লেখা হয় তাদের সর্বনাশ।”

আমরা তেমন্তবাহুর শব্দিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমাদের হুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, “Purchasable Commodity” কংগ্রেসের বাহিরেও আছে, মহিলে বাংলার নির্বাচন হুত অভ্যর্থন ধারণ করিত।

মানভূমির অবস্থা

এই কেলার প্রসিদ্ধ জনমতো জীঅরদাপ্রদা চক্রবর্তী বিহার ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছেন। সম্ভ্রতি তিনি সন্ধান গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রাচীন ‘সংগঠন’ পত্রিকার (সাপ্তাহিক) সম্পাদকরূপে যেন ও দেশের সেবা করিতেছেন। এই পত্রিকা পাঠ করিলে এ সকলের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার ‘বুজি’ যে কার্যে আত্মনিরোপ করিয়াছে, তাহাই সংগঠন করিয়া বাইতেছে।

এই পত্রিকার ১১ই অগ্রহারণ সংখ্যার বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিভাগের নামে যে অপচেষ্টা চলিতেছে, অধিনীত দাখা-সহুকে দাখাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া আমাদের সহযোগী বাহা বলিয়াছেন তাহা বিহার রাজ্যের সীমানার বাহিরেও দাখাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা তাহাই করিতেছি :

“বিহার রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার একটা বিপর্যয় আসিল। সম্ভ্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার তারার মাধ্যম সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু ইংরেজী নয়, উড়িয়া বাংলাকেও লরাইয়া একমাত্র হিন্দীতেই প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের উত্তর-পত্র লিখিতে হইবে। এই পরিবর্তনে বিহার রাজ্যে কার্যতঃ অগ্রবিহার বৃষ্টিই করা হইল। ইহা বাণীম তারতের গণতন্ত্র-বিরোধী। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কেমন করিয়া এই নিয়ম প্রবর্তন করিলেন তাহা আমাদের হুকৌধ্য।

“মানভূমি কেলার সদর মহত্বা দাতা সর্বত্র দাঁড়াবার

আদালতের কাজ চলিবে বলিয়া সরকারী ইত্তাহার জারি হইয়াছে। এই সংবাদ দেবিতা বানবাহ মহকুমার বহু হলিল লেখক আশাভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বানবাহ মহকুমার হিন্দী ভাষার কবি হলিলই লেখা হইয়া থাকে। নাহুদের সময় লক্ষ লিখক ভাষাকে বাদ দিয়া এই অভ্যাচার সরকারী জুলুম ব্যতীত কিছুই নহে। ইংরেজ আমলে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা ছিল, পরন্তু বাংলা ভাষাতেই মানহুনের সর্বত্র কোর্টের কার্য পরিচালিত হইত। অথবা গণবিকোক্তের খুঁটি কোন সরকারেরই মুহু নভিকের লক্ষ্য নহে।”

রাষ্ট্রপতি রাভেনপ্রসাদের অনুমতিতে আর কতকাল এই অদ্যচার চলিতে থাকিবে? এই প্রশ্ন আমরা প্রশ্ন প্রতি মাসেই করিতেছি। তাহার লহুতর এখনও পাই নাই।

“মুক্তি” পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ পূর্তিসংখ্যা

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে পুন্ডলিন্যার “মুক্তি” দ্বাদশ বর্ষ অভিক্রম করিল। এই পত্রিকা রাষ্ট্রপতি রাভেনপ্রসাদ, বোলানা মহকুমার-অল প্রমুখ মেভুবর্ণের সহকর্মী নিবারণচন্দ্র দান প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিচর ভায়তবর্ষের বাবীনতা-সংগ্রাহের ইতিহাসে অক্ষর অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আজ নিবারণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “লোকসেবক সন্ম”-ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্দোষে মামিয়াছেন এবং “মুক্তি” তাহার সপক্ষে মুক্তি বোণাইতেছে। কি অবস্থার পড়িলে সহকর্মীর বিরুদ্ধে ঠাঁড়াইতে পারা যায় তাহা করনা করা কঠিন নয়। লোকসন্মের পরিচালক ত্রিঅতুলচন্দ্র বোষ সন্মের মূল নির্দোষী কর্মনীতিসমূহের মধ্যে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

“লোকসেবক সন্ম পকারেং চেতনার ভিত্তিতে নির্দোষ পরিচালনা করিবে।

সন্মের প্রতিনিবিশণ কেলার পকারেংগুলির কাছে দারী থাকিবে।

জাতীয় আর্থিক মানের দৃষ্টিতে সন্মের প্রতিনিবিশেষ ব্যয় ভ্যাগের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

ভোট আদায়ের নীতি পরিহার করিয়া জন-চেতনার ভিত্তিতে সন্মের নির্দোষী প্রচার চলিবে।

জনগণের জীবনকে সন্মের সেবা ও সহায়তার বোণ বেধানে রহিয়াছে সন্ম সেখানেই প্রাণী মনোমনদের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাপক কেন্দ্র প্রচারের সময় অভিভাবে সন্ম অর্ধের সহায়তা বর্ধন করিয়াছে।

নির্দোষী কৃষক প্রমিক প্রজা সাধারণের ভক্ত বোণ্য প্রতিনিবিশেষ উপযুক্ত অংশ প্রদান করিয়াছে।

নির্দোষী জীবনে ব্যাপক জনশক্তি ও মুক্তি-প্রদান পত্রিকার মধ্যে সন্ম সামগ্রিক বিধানের পথ অনুসরণ করিতেছে।

কেলার শাসন-ব্যবহার নির্দোষ ও প্রতিনিবিশেষ ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কনভার অংশ জাতের লক্ষ্য সন্মের রহিয়াছে।

বিকেন্দ্রীকৃত আশ্রয়সন্মের ভিত্তিতে প্রামসমূহের ভক্ত পকারেং শাসনকনভা অর্জনের লক্ষ্য সন্ম রাখিয়াছে।

গান্ধীবাদের আদর্শ ও কর্মনীতিই সন্মের মূল কর্ম নির্দেশ-রূপে থাকিবে।”

নির্দোষী নির্দেশ-পত্রে তাব ও কর্ম পত্রিকার বিশদ ব্যাখ্যা আছে :

“মুক্তির নির্দোষী দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক কর্মী গভীরভাবে ইহার বিষয়গুলি পাঠ করিয়া জন-গণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের কার্য করিতে বিপুল উত্তম অগ্রসর হউন। মুক্তির নির্দোষী সংখ্যার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া কনিগণ জনচেতনা জাগুতির ভক্ত বৈধের সঙ্গে কাজ করুন। লোকের বাহা কিছু প্রশ্ন বুঝাইতে চেষ্টা করুন। প্রচারের সময় এইগুলিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

(১) শাসনের অদ্যচার বেধিতা লোকে ভোটের বিষয়ও বিবরণ হইয়াছে—ইহা দূর করিতে হইবে। লোকে উদাসীন হইলে বাণীবোষীদের ভোট পাইয়া অযোগ্য লোক নির্দোষী হইয়া কতি করিবে। ভোট রাষ্ট্রের অধিকার। ইহা প্রয়োগ করিয়া বোণ্য লোক বাহিয়া দেশের শাসন ভাল করিতে হইবে। সর্বদা বোণ্য লোক বাহাই করিবার চেষ্টা না রাখিলে দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে কি করিয়া? (২) কিছু লোকে কংগ্রেসের শাসনে বিরক্ত হইয়া ব্রিটিশ সরকারের রাজত্ব করিয়া পাইতে চাহিতেছে। এই মনোভাব কতিকর। জন-গণকে বুঝাইতে হইবে তাহা সম্ভবও নয় এবং বাবীনতার মর্যাদার অনুযায়ীও নয়। কষ্ট হইলেও বাবীন জীবন প্রের—বাবীন থাকিরাই নিজেদের শক্তিতে অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছে সরকারকে ভোট দিব অর্থাৎ ব্রিটিশকে ভোট দিব। বুঝাইতে হইবে তাহা সম্ভব নয়—ব্রিটিশ আর ভোটে ঠাঁড়াইতে পাইবে না। দেশের যে কোন লোককে ভোট দিতে হইবে। কংগ্রেসই এখন সরকার হইয়াছে, সরকারের পরিবর্তন চাহিলে কংগ্রেসের পরিবর্তন চাই। তাহা হইলে দেশে ভক্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। (৩) ভোটের আইন-কনুন ও অধিকার ভালভাবে বুঝাইতে হইবে। সরকারী কর্মচারীদের শাসনে বা চাপে কেহ ভোট দিবে না; এইভাবে কর্মচারীরা কাজ করিলে ভক্ত হইবে—জনগণের মুক্তি সরকার। (৪) ভোটের আশার অপরে বিখ্যা প্রচার বাহা করিবে তাহা বক্তনের প্রতি মনোবোণ রাখিতে হইবে। (৫) ভোটের তারিখ, স্থান প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তের বিখ্যা প্রচার সাবধান থাকিতে হইবে। (৬) লক্ষ্য

আশ্রয় করিয়া, সঠিক সংবাদসমূহ লইয়া কর্মীরা প্রচার করিবেন। (৭) অপরের প্রবল বিরোধিতা ও বাগ্মজালে কর্মীরা হির থাকিয়া নিজেদের বাহা হুক্তি তাহা দৃঢ়ভাবে ও বিচারপূর্বক আত্মবিশ্বাসের সহিত জানাইতে থাকিবেন। (৮) জরুরীতেই কর্মীরা ব্যাকুল হইবেন না। নিজের কাক প্রিকমত করার মধ্যেই আশ্রয়ের কর। হিরচিত্তে বিপুল উত্তমে প্রচণ্ড কর্মশক্তিতে কর্মীরা কর্ম করিয়া চলুন—ইহাই কামনা।”

কাপড় লইবার ক্রেতা নাই

গত ৩১শে ভাদ্র সংখ্যার মানত্ব রামচন্দ্রপুর হইতে প্রকাশিত “সংগঠন” (সাপ্তাহিক) একটি অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই অবস্থা কাহার সৃষ্ট তাহা অজ্ঞাত নয়; ভারতের ভাষা জনতের শ্রেণীসমূহ মানুষের খাওয়া-পরাইর জরুরী লইয়া যে বেলা খেলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের ধরনের দিকে তৈলিয়া দিতেছে। সাধারণের বিষয়ের পাজ হইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না—এই সামান্য কথাটা তাঁহারা কবে বুঝিবেন?

সংগঠনের মতব্য উপলব্ধ করিয়া এই কথাটি শ্রবণ করাইয়া দিতে চাই। গ্রামবাসী ও শহরবাসী কেহই কটের হাত হইতে উদ্ধার পাইতেছে না, তাহাও মনে রাখা প্রয়োজন। “দোকানে দোকানে কাপড়ের তুপ—গ্রামবাসীদের তাকা হইতেছে কাপড় লইয়া যাও—তাহারা আসে না।” মানুষের কাপড় নাই, ডাক হইতেছে তবু তাহারা কাপড় কিসিতে আসে না—কারণ কি? মাত্র আট গজ কাপড় প্রতি পরিবার পাইবে তাহাও লইতে পারে না। কর্তৃপক্ষের কৈকিরং স্মরণ; কাপড়ের প্রাচুর্য ক্রেতার অপ্রাচুর্য—তবু দেশ “ভাংটা”।

“গ্রামের বিশপিতে যে কাপড় আসিতেছে তাহার মূল্য ও রকম বাহা, তাহা গ্রামবাসীদের পক্ষে ক্রয় করা সাধ্যাতীত। গ্রামের লোকের প্রয়োজন মোটা কাপড়, টেকসই কাপড় এবং বাহার মূল্য মূলত। তাহার পরিবর্তে আসিতেছে চক্কা ময়ের মিহি কাপড়। তবু তাহাই নয় ৮ গজ কাপড়ের মধ্যে ৫ গজের একটি হুঁত বা শাড়ীর সঙ্গে ৩ গজ হিট লইতেই হইবে। অনেকেরই হিটের প্রয়োজন হয় না। বাহাদের হিটের প্রয়োজন হয় না তাহারা হিট লইয়া করিবে কি? তাহার বদলে যদি তাহাদের ৮ হাতি কাপড়ও হুঁত দেওয়া হয় তাহা কাজে লাগে। সরকারী কর্তৃপক্ষের এগুলি চিন্তা করা উচিত।”

রেলওয়ে উপার্জন ও ভারতরাষ্ট্র

‘যোগাযোগ’ কলিকাতা রেলওয়ে-সমষ্টির প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। তার একটি সংখ্যার নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের বাণী—‘বর্তমানে ভারতীয়

রেলওয়ে রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।’ ইহা সত্য। কিন্তু ইহা আরও সত্য যে, দেশের মর্যাদার কলস্রোত সংবত ও সুপরিচালিত হইলে রেলওয়ের উপার্জন অপেক্ষা বহু ভগ্ন অর্থ রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে আসিত। কল্যাণে শতহানি ও বতার ধ্বংসলীলার অবসান হইত। এই কথা মনে রাখিয়া নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যের ও হিসাবের বিচার করিতে হইবে :

“বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার আরব্যার প্রায় ভারত-সরকারের বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা চারিটি প্রধান রাজ্যের বাজেটের, অথবা ছোট আটটি রাজ্যের আর-ব্যয়ের সমষ্টির সমান। এতদ্ব্যতীত জাতীয় অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা বিধান রেলওয়ের সহিত অলাদী ভাবে জড়িত আছে।

এই রেলওয়েতে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কর্মী কাজ করেন এবং মান্যভাবে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখে আশ্রয় দেয় ভারতীয় রেলওয়ে। ভারতীয় রেলওয়ে যেন ছোটখাট একটি পুণিবী; এখানে প্রাদেশিক সতীর্ণতা ও জাতিবৈষম্য নাই, এখানে যেন সকলেই পারম্পরিক বন্ধুত্ব হচ্ছে আবহ।

১৯৪৭ সালের পরে রেলওয়েতে তাকা বাতান হয় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে শতকরা মাত্র ৪৬ এবং ৭৩ ভাগ তাকা বাতান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার তুলনার রেল পরিচালনার খরচ বহু অংশে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে জরুরীর দাম চারি শত ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। কোরিয়ার হুচ আরম্ভের পর হইতে জরুরীর দাম জেরেই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে যে পরিমাণে তাকা বাতান হইয়াছে তাহা যারা প্রাক-হুচ সময়ের তাকার মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ পাওয়া যায়।

১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভারতীয় রেলের ৭২৮৯৫, ৮০৪৯৮ এবং ৮২২৪৫ লক্ষ টাকার মূল মুজির মধ্যে ই. আই. রেলের অংশে যথাক্রমে ১৯০১৪, ১৯,৬৯৯ এবং ১৯,৮৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল।

ভারতীয় রেলের তৃতীয় শ্রেণীর এবং অত্যন্ত দেশের রেলের তৃতীয় শ্রেণীর তাকা মিয়ে প্রদত্ত হইল :

তাকার পর্যায় প্রতি মাইলে তাকা (পাই হিসাবে)	
ভারত	৫
ইউ. কে.	২৬'০৪
ইউ. এস. এ.	২১'৩৬
কানাডা	২০'০৪
নুইজারল্যাণ্ড	৩০'৯৬
ফ্রান্স	১৮'১২
ইটালী	১০'৪

পতপততা বাজীর নিকট হইতে
এতি বাইলে কত পাওয়া যায়

৪'৫৭

১'৩৯

২২'৫

২২'৩

...

...

...

মাথা শির

আর

২৭০,

৩৩৭২,

৩২০২,

৪১৩২,

৪০৩২,

২২৮৯,

...

ইক্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ম্মা নংখ্যা

একটা হিসাবে দেখিলাম যে, ১১ বৎসরে এই রেলওয়ের কর্ম্মালংখ্যা অতি দ্রুত বর্ধিত হইয়াছে, পূর্বে পূর্বে বৎসরের তুলনায় বর্ধমান ই. আই. রেল কত বেশকর্ম্ম কাজ করেন তাহা নিয়ে প্রবৃত্ত হইল :

১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ— ১৩০৫২৫

১৯৪২ ১৩৩৩৮৭

১৯৪৩ ১৪০২০৬

১৯৪৪ ১৫৭৩৩২

১৯৪৫ ১৬৪৭৫১

১৯৪৬ ১৭১৪৪৩

১৯৪৭ ১৮২৭৮০

১৯৪৮ ২২২১০৮

১৯৪৯ ২২২৫২০

১৯৫০ ২১০৪০৪

ভাগীরথীর তুর্দশা

পত এই কার্তিক “মুর্শিদাবাদ সন্ধান” পত্রিকার কলিকাতা মগরীর আলয় বিপদ সবচেয়ে বাহা বলা হইয়াছে তাহা অজানা নয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যেই সন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। নামোদয় বাঁধ সম্পূর্ণ হইলেও এই বিপদ দূর হইবে না। কোম কোম ইঞ্জিনিয়ারের মতে কলিকাতার বিপদ বৃদ্ধি পাউতে পারে। এই তর্কে বোঙ্গানাম করিয়া লাভ হইবে না। কিন্তু তবুও আমাদের সহযোগীর আলোচনা সম্বোধনযোগ্য হইয়াছে, অর্থাৎ হইলে চলিবে না।

“করেকদিন পূর্বে সেন্স-সচিব শ্রীকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় কলিকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাগীরথী নদীর বর্ধমান হ্রদস্থায় কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

“ভাগীরথী নদীতে যে তাবে পলি পড়িতেছে, তাহাতে আর কয়েক বছরের মধ্যেই নদী সরিয়া যাইবে এবং কলিকাতার বন্দর বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

“সেন্স-সচিব যথার্থই বলিয়াছেন যে ভাগীরথী নদীর বোহমার নিকটে এমন বিরাট চর পড়িয়াছে যে গঙ্গা নদীর

সহিত বর্ষাকালের কয়েক সপ্তাহ ব্যতীত ভাগীরথীর কোন সংযোগ থাকে না। উত্তর তাপে জল সরবরাহকারী উপনদীর সংযোগ আর, আকারও মগর্য। যদিও দিকে মজুমদারী, অমর, জলাশয় বা চূর্ণা নদী দিয়া যে পরিমাণ জল ভাগীরথীতে পড়ে উত্তরের ছোট নদীগুলি দিয়া সেখান জল আসে না। কলে ভাগীরথী শুকাইতেছে, চর পড়িয়া নদীর মুক ভরাট হইয়া যাইতেছে। এই বৎসর ভাল বান হয় নাই। অভ্যন্তর বৎসরের মত ভাগীরথী এবারে কানার কানার পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, আশি মাসেই চর পড়িয়া নদীবন্ধ করিয়া দিয়াছে। ঐয়কালে ভাগীরথী-বকে জল থাকিবে কিনা বলা কঠিন। কলে ভাগীরথীর উত্তর পার্শ্ব যে কয়টি নদীর মুর্শিদাবাদ জেলায় পড়ে, সেখানে ঐয়কালে পানীর জল সরবরাহের ব্যবস্থাও বন্ধ না হইয়া যায়। সুতরাং বোহমা হইতে শক্তিশালী পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল ব্যাপী ভাগীরথী-বকে বেতাবে বালুকা ও মিয়াছে, তাহাতে নদী সরিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অথচ গঙ্গার তীরে মুর্শিদাবাদ নদীর গঙ্গার তীরে নিশ্চয় হইয়া গেল।

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে করাচীর বাঁধ দিয়া ভাগীরথীকে সর্বসময় প্রবাহমান রাখিবার যে প্ল্যান করিয়াছেন, পত ভিন্ন বৎসর হইতে সেই প্ল্যান মত কি তাবে কার্য্যাবলি চলিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। করাচী-ব্যারেজ লইয়া ভিন্ন বৎসরে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার কথাও শ্রীকৃষ্ণ মজুমদার বলিয়াছেন। ভিন্ন বৎসর ধরিয়া Data সংগ্রহ করা হইতেছে বটে, অথচ নদী যে শুকাইতেছে তাহার কোন বিহিত এখানে হয় নাই।... করাচীর বাঁধ দিয়া ভাগীরথীকে সুশাস্য ও প্রবাহমান করিবার সত্যকারের চেষ্টা আজও হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কি বিত্তক ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? নদী একেবারে শুকাইয়া গেলেই কি করাচী-ব্যারেজ বাঁধ হইবে?”

মূল কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নজর বাংলার উপর নাই। যে ব্যক্তি সম্মতি কেন্দ্রীয় অর্থ-বিত্তাঙ্গের অধিকারী তাহার বাঙালী-ঐতি তো সকলেই জানে। সুতরাং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের “দৃষ্টি আকর্ষণ” করার চেষ্টা যথ্য। অত কোন্ পথে সে কাজ করিতে হইবে তাহাই বিচার করা প্রয়োজন।

তেলের প্রতিযোগিতা

রাজনীতি এক অদৃঢ় ভিত্তি। তাহা এক গোপীক লোককে একেবারে ভিন্ন করিতে পারে না, আবার তাহাদের যাবতের মিলও কখনও হয় না। ইরানের তেল লইয়া যে বঙ্গভা বাবিতাছে, তাহা মধ্যে যেখানে পাই, মার্কিন মুক্ত-রাষ্ট্র অর্থ ও সামর্য্য দিয়া ব্রিটেনকে সাহায্য করিতেছে, মসলিত ভাতিসনে তাহারা একযোগে কাজ করিতেছে;

তাহারা নানা প্রভাবের সম্বন্ধক। এদিকে আবার এই ভেলের ব্যাকার লইয়া বেশ একটা 'চাপা' বিরোধ চলিতেছে। অতঃ ইহাই হইল ঠালিমের মত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিরোধের বার্তা নানা ভাষায় অতি আনন্দের সঙ্গে আবারের শুধাইতেছে এবং আবারের মনে এই বিষয়ে বেশ কোন সন্দেহ না থাকে তার মত পরিসংখ্যানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মারগবল্লগুলির টেকনিক্যাল উন্নতি ভেলের প্রবোধন ও গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় পুঁজিবাদের সাধারণ সত্ত্বের অধারে বন্যাতান্ত্রিক বেশগুলির মোট উৎপাদন বহন বংশোদ্ভূত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন ভেলের উৎপাদন বাড়িয়াছিল অসম্ভব।

বন্যাতান্ত্রিক হুমিয়ার তৈল উৎপাদন সম্পর্কে নীচের এই সংখ্যাগুলির (১০ লক্ষ টন হিসাবে) সবিশেষ প্রবিধান-বোধ্য :

১৯১৩	৫২
১৯২৫	১৪৮
১৯৫০	৪৮০

ভেলের উৎসগুলি লইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের জয়বর্তমান সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের লড়াইটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিরোধের তীব্রতা ভালভাবে বুঝিতে হইলে বন্যাতান্ত্রিক দেশগুলির তৈল ক্ষেত্র ও তৈল উৎপাদনের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

ইউইট প্রধান তৈল অঞ্চল আছে। একটি আমেরিকা মহাদেশ, আর একটি নিকট-প্রাচ্য। আমেরিকার উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন; তবুও ২৭ কোটি টনই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে। নিকট-প্রাচ্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৯৫০ সালে নিকট-প্রাচ্য হইতে সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক হুমিয়ার মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তৈল উৎপাদিত হইয়াছে। অবশ্য এই তথ্য হইতে নিকট প্রাচ্যের তৈল সম্পদের স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে না। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব অনুসারে নিকট-প্রাচ্যে আছে সমস্ত পৃথিবীর তৈলসম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ। একমাত্র সৌদী আরবেই ৩০০ কোটি টন তৈল আকর আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী। তবু সে নিকট-প্রাচ্যের তৈলসম্পদ করারত করিতে চায়।

বিভী মহাযুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধের পোকার দিকে মার্কিন তৈলপতিরা কুওয়েট ও ইরাকে ব্রিটেনকে কোণঠাসা করিয়া কেলিতে লক্ষ্য হন। তাহারা কুওয়েটের তৈল উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ এবং ইরাকের তৈলের শতকরা ২৩.৫ ভাগ

আবার করিয়া লইলেন। ইহা হাভা এংলো-ইরানিয়ান আরেল কোম্পানীর উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ তাঁহাদের কাছে বিক্রয় করিবার মত ব্রিটেনকে তাহারা দাবি করাইতে লক্ষ্য হইলেন। সৌদী আরব ও আবিসিনিয়ার আমেরিকানরা তৈল উৎপাদনের একচেটকা অধিকার আদায় করিয়া লইলেন। সৌদী আরবে প্রচুর তৈল আছে। ১৯৪৪ সালের মশ লক্ষ টন হইতে এই অঞ্চলের তৈল উৎপাদন বাড়িয়া গিয়া বর্তমান বৎসরে তাহা তিন কোটি টন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এই ভাবে নিকট প্রাচ্যের তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলে-কোশলে ব্রিটেনের মাপাল ধরিয়া কেলিয়াছে। নীচের সংখ্যাগুলি হইতে এই কথা পরিষ্কার হইবে :

নিকট-প্রাচ্যের তৈল-উৎপাদন (মশ লক্ষ টন হিসাবে)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	এইট ব্রিটেন
১৯৩৮	২
১৯৫০	৪০'৪
	৪৪'২

এই হিসাব হইতে দেখা যায় ভেলের প্রতিযোগিতা কিরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভেলের উৎপাদন সহজে কোন আভাস পাইলাম না। ট্যালিন ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন নাই।

চীনের বর্তমান উন্নতি

কয়ানিষ্ট ইই জন বাঙালী অধ্যাপক ত্রিনিদাদ ভট্টাচার্য ও ত্রিনিদাদি চক্রবর্তী সম্প্রতি চীন দেশ হইতে কিরিয়া আসিয়াছেন। বিশ-পঁচিশ দিন ভ্রমণ করিয়া তাহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহা সভা-সমিতিতে পরিবেশন করিতেছেন। তাহাদের কথার বিচার করিতে চাই না। আমরা সকলেই মিথের মিথের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে তথ্যাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তাহারাও তাহা করিয়াছেন।

গান্ধীপন্থী অধ্যাপক জোসেফ কণেলিয়াস কুমারান্না "হরিজন" পত্রিকার তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন। ১৬ই অক্টোবর তারিখের বাংলা "হরিজন" হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"যাও সর্বত্র বধেই পাওয়া যায়। অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বেশ পাওয়া যায়। দাম বেশ সস্তা। তাঁকার কাপড় হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা অতিক্রম করিবার উপায় পর্বদর্শন লইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থা সুস্থিপূর্ণক চলিতেছে। লোকের উহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা আছে। সকল কর্মচারীরা লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া চলে। সকলে একই প্রকার কাপড়-চোপড় পরে, এক ভাবে বাস করে। উর্বর ও নিরতনের প্রভেদ খুব বেশী নাই। চীন দেশের সভ্যপতি মাত ২,৮০০ কাণ্ডি দোয়ার (এক কাণ্ডি = ১'৩ পাউন্ড = ৫১ তোলা), থাকিবার একটি বাড়ী ও ব্যবহারের

কিন্তু একটী বোটরফার পান। উহা এখনে মাসে উৎপাদে ৬০০ টাকার বরা বার। হুই লব কেবিনেট মন্ত্রীর সহিত কথা বলি। তাহার মাসিক প্রায় ৪৫০ টাকার সমান বেতন পান। যে বেচ্ছাসেবকেরা আমাদের বেখাতনা করিতেছিল তাহার উহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় চীন দেশ এমন নারকদের পাইয়াছে তাহার লোকের জীবনযাত্রার মিলিয়া মিশিয়া থাকে। যে মনোভাব এখানে চলিতেছে তাহা কতকটা আমাদের দেশে ১৯৩০ সালে যেমন ছিল সেই রকম। আমরা চীনের উপর ক্রমশঃ অপ্রতিভ প্রভাব চলিয়াছে কল্পনা করিয়া থাকি। ঐরূপ প্রবল ক্রমপ্রভাব সেখানে নাই। বৃহৎ শিল্পে ছুরি উৎপাদন, আর সকল সম্পত্তির রাষ্ট্রভুক্তি—ইহাই সোভিয়েট কন্যামিজমের মূল। কিন্তু চীন সীমান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার এবং কৃষিকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে আহাশিল। চীনের মূলমন্ত্র হইল ভূমি-ব্যবহার সংশোধন ও কৃষি উন্নয়ন। মূলমন্ত্র এইরূপ পার্থক্য থাকার হরত চীন দেশের অর্থ অসুসরণ না করিতে পারে। সেলদোর প্রদেশের মজুরী দিবস আরি যে পরিকল্পনা ও সুস্থ বস্ত্রিয়ারি এখানকার পণ্ডিত অনেকটা সেইরূপ দেখিয়া আমার ভাল লাগিল। শ্রমিকরা বাসস্থান, পরিবেশ ও অন্ন পায় এবং হাতবরচ মাসিক প্রায় ১০ হইতে ১৫ টাকার সমান পায়। সেলদোর সুবহর খাঁড়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহা অধিক বিজ্ঞানসম্মত। তবে এখানকার ব্যবহার সহিত উহার সাদৃশ্য চমকপ্রদ।

“ভূমি-ব্যবহার সংশোধন বিষয়ে আপনারা ধর চাহিয়াছেন। ইহারা এই বিষয়ে বাস্তব পথে অগ্রসর হইয়াছেন মনে হয়। পরমাণু জমিদারত্ব লোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পদ চাষী তাহার চাষ-আবাদ করে তাহাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত প্রকারে উৎপন্ন কসলের ৫০ হইতে ১০০ শতাংশ জমিদারকে ভাগ দিত। ইহা বন্ধ হইয়াছে। চাষী এখন প্রদেশের কল মিছে ভোগ করিতে পায়। ভূমিহীনদের পরিচালনা উৎপন্ন কসলের প্রায় ১০ শতাংশ। ঐ রাজস্ব পড়েই সংগৃহীত হয়। টাকার কাপড়ি কসাইবার ইহাই অন্যতম প্রধান পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়াছে। সবচেঁড়ি জমী কর্তৃত্বী ও শিকড়গিনকে পণ্যে বেতন দিয়া থাকেন। সম্মান স্তম্ভের ব্যাপার নাই। তবে যে সব জমিদার বল-প্রয়োগে বিরোধ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদিগকে কঠোর-ভাবে দমন করা হয়। তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। তাহার চাষ করিতে চাহিয়াছে তাহাদিগকে অপর চাষীদের মতই পুনর্বাসনের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

“সোবিয়তে”র নদী : আজ ও কাল

“বিশাল সোবিয়ৎ ভূমি বণ্ডবিবণ্ড করে বয়ে যায় লক্ষাধিক

নদনদী। সব কটী নদী এক সঙ্গে জুড়ে গিলে বৈরা দাঁড়ায় ২০ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি, অর্থাৎ লক্ষে ১২ লক্ষ মাইল। বাতাসাত ব্যবহার নদনদীগুলি বিশিষ্ট স্থান অবিকার করেছে। নদর ও রশ্মর শতাব্দীতে যে সমস্ত নদী জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলির মধ্যে লক্ষ্যপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নীপার, তরা, ওকা ও কামা (তরুলগার উপনদী), দম, উত্তর হিমা এবং বেতা। বর্ষিক সাগর থেকে ককসাগর হয়ে কলভাভিমোপল পর্যন্ত বাণিজ্য-পথ ছিল নীপার। পরে তরা, ওকা ও কামার জলপথ হিসাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দম নদী মিস্ককে মিশিয়ে দিয়েছে আঙ্গব সাগরে। উত্তর হিমার জলরাশি গ্রহণ করেছে বেত সাগর। নেভার মোহানা বর্ষিক সাগরে। এর সব কটীই সোবিয়ৎ ভূমির ইউরোপীয় অংশে প্রবাহিত।

উল্লিখিত নদীগুলির জলযান ব্যবস্থা উন্নত করার কিছু কিছু কাজ আর-শাসিত ক্রমিয়ার হয়েছিল। তদ্ব্যতীত হুজ করা হয়েছিল নেভার সঙ্গে এবং উত্তর হিমার শেষ ভাগে কতকগুলি খাল কাটা হয়েছিল এবং লকপেট নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেশের জলসম্পদকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাবার উত্তোষ সোবিয়ৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে আর হয় নি।

মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পূর্বে জলবিদ্যুৎ শ্রেণম নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয় নি বললেই ঠিক হয় যদিও দেশে জলশক্তির বিশুদ্ধতা অত্যন্ত ছিল না। সোবিয়ৎ শাসন কায়েম হওয়ার পরেই দেশে জলবিদ্যুৎ শ্রেণমের জাল বিস্তারের কাজ শুরু হ’ল। ইউরোপের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ শ্রেণম নির্মিত হ’ল নীপারের উপর। তার পর তরার উপর ভিনটী শক্তিশালী জলতড়িৎ কেন্দ্র এবং ককেনিরা, দম্য এশিয়া ও অত্যন্ত অকলের অনেকগুলি নদীর উপর আরও কতকগুলি বিদ্যুৎ-শ্রেণম মাথা তুলে দাঁড়াল। তার পরে বদন করা হ’ল কতকগুলি জলপ্রাণী যেমন বেত সাগর, বার্শিক সাগর খাল (কিমিশ উপসাগরের সঙ্গে বেত সাগরকে যুক্ত করেছে) এবং নকো—তরা খাল। নীপার, তরা এবং অন্যান্য নদ-নদীর উপর বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ-শ্রেণম নির্মাণ করার কলে জলযান চলাচলের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। আগেকার দিনে যে সব নদী ব্যবহার করা হ’ত না সেগুলি ব্যবহার যোগ্য হয়ে উঠল।

নদী, খাল ও জলাধারের কিম্বদন্তি নদ্য নদ্য বদল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। অনেক নগর সেগুলির দিকটে জলের কোন অভাবই নেই ভবিষ্যতে সেগুলি জলসিক্ত হয়ে উঠবে। সোবিয়ৎ রাজধানী নকো হ’ল সমুদ্রের বদল হয়ে উঠবে। নদ্য নদ্য বাতীবাহী ও মালবাহী জাহাজপথ বোলার আরোহন চলছে। আগামী বৎসরের গোড়ার দিকেই তরা-দম খালে জাহাজ চলাচল শুরু হলে এই নদত জাহাজপথের

জমিতে কাজ আরম্ভ হবে। একদা মনুস বরণের আধুনিক বাজীবাহী ও মালবাহী কাছাকাছি নির্মিত হচ্ছে।

আশা করা যায় যে বঙ্গবন্ধুর মতো সোবিয়তে নদীসমূহের যাত্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া হইবে। তার কলে জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে অনেকখানি সুবিধা হবে, কারণ রেলপথে যাত্রার চেয়ে জলপথে যাত্রার চেয়ে খরচ অনেক কম। জলপথে নির্মিত হলে তদ্বারা বয়ে বহন মাল যাত্রার ক্ষেত্রে পারবে সমান নৈবেদ্য রেলপথে তার ৪০ ভাগের এক ভাগের বেশী-বেঁচে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।”

গত ৪ঠা অক্টোবরের “সোবিয়ৎ দেশ” পত্রিকার উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অনেক জামিয়ার ও ভাবিয়ার আছে।

রামকৃষ্ণ নগর

“ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামানুসারে গড়িয়া উঠিয়াছে কাছাকাড়ের প্রথম উন্নত উপনিবেশ রামকৃষ্ণ নগর। তার আশেপাশে বহু জনপদ। হারী অধিবাসী যারা তারা ভাবিতেও পারে নাই এত সহজে স্বজাতির মধ্যে তাহাদের সাহায্য ও সহায়তকে কেন্দ্র করিয়া আগন্ত উন্নত ভাই-বোনই চেষ্টা করিয়া গড়িয়া তুলিবে জনসাধারণ উচ্চতরিত এমন একটি নুতন উপনিবেশ। দিনের পর দিন হারী অধিবাসী ও উন্নতদের সমবেত প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে এই রামকৃষ্ণ নগরের ভিত্তি গৃহীত হইয়াছে। সবাই বুঝিতে পারিয়াছে ঠাকুরের নামের সার্বভৌমতা আছে আর বুঝিতে পারিয়াছে—চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এর পর ধীরে ধীরে এই উন্নত উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে হাইস্কুল, পোষ্টাফিস, বাজার প্রভৃতি আরও কত কিছু। তার পর বিপদ কেন্দ্রকারী দালালদারাদার আগন্ত উন্নতদের সুদীর্ঘকালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছাকাড় পাখার উন্নত সুদীর্ঘকাল ও সাহায্য বিভাগ এখানে বিপুল সংখ্যার ঐকান্তিক আশ্রয় করিয়া আশ্রয়-শিবির পত্তন করেন এবং তাহাদের জন্য একটি হারী কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ইদানীং সরকার এই কর্মক্ষেত্র তুলিয়া লইবার এক ন্যায় বেওয়ার এত বড় একটি পটভূমিক কার্যে সহসা গাথাপ্রাপ্ত হওয়ার কর্মী, উন্নত ও হারী অধিবাসীদের মনে কতটুকু আশঙ্কা লাগিয়াছে তাহা প্রত্যেকদর্শীরা বুঝিতে পারিয়াছেন।

“তার পর রামকৃষ্ণনগর বিভাগী। আত্ম পরম সৌভাগ্য—সরকারের কথায় যে রামকৃষ্ণনগর আদর্শ বিভাগী হুগল আসাম-সরকার ও ভারত-সরকারের সাহায্য ও সহায়ত লাভ করিয়াছে। এই দিকে হারী অধিবাসী ও উন্নতদের সরকারের কাছে পরম হৃদয়। কিন্তু এত যে আশঙ্কা, এত

যে উৎসাহ ভাষাশি ইহার মধ্যে প্রাণ নাই। তাহার বর্ষ অধ্যয়ন করিতে গিয়া আমরা বুঝিয়াছি জনসাধারণের আত্ম আবেগন, তাহাদের প্রাণের ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভের পরও, রামকৃষ্ণ মিশন উপেক্ষা না করিলেও সর্বশেষ মনোযোগ দিতেছেন না। জনসাধারণ চায় যে রামকৃষ্ণ বিভাগীকে আদর্শ বিভাগের পরিণত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ইহার পরিচালনার তার দিকে এগুন করুন। আর্থিক, পারি-পারিক অবস্থা ও শিক্ষার ভেদে প্রয়োজনীয় সব কিছু আত্ম বিভাগীকে আছে বলা চলে। এমনভাবেই যারা আত্ম এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে দিচ্ছেদের হাত থেকে অপরের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাহাদের সদিচ্ছা ও ভাগ্যকে অভিমুখিত ও সাধনের বরণ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের এই আদর্শ বিভাগী পরিচালনাতার এছাড়া পক্ষে লক্ষ্য ও বিচার অবকাশ কোথায়?”

করিমগঞ্জের “সবারূপ” পত্রিকা কংগ্রেসের সমর্থক। তাতে এই উপনিবেশ ও বিভাগী সম্বন্ধে বাহা প্রকাশিত হয়, তার চূড়াক আমরা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা ঐরামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের নিকট হারী জনগণের মনোপত্ত ইচ্ছা প্রকাশের সাক্ষ্য কামনা করি।

কাশী-লঙ্কো-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ভিত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে নামা আলোচনা হইয়া থাকে। সম্রতি উত্তর-ভারতের নামা পত্রিকার একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর প্রদেশের রাজ্য-পাল মিঃ হোডি হির করিয়াছেন যে, এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাধ্যক্ষ (Vice-Chancellor) থাকিবেন না। তিনি নিজেই তাদের অধ্যক্ষ। রাজ্যপালের ক্ষমতা ব্যবহার করিবার কার্য জানা যায় নাই। নামা জরুরী-কর্মসমূহ মধ্যে একটি কথা শোনা যায়। লঙ্কোর আচার্য্য মরেন্স বেবের শরীর সুস্থ নয়। তিনি কিন্তু আবার কাশী বিভাগের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যাপার কি? আচার্য্যজী একটি বিষয় দিলে সুবিধা হয়।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হইতেছে। বর্তমান উপাধ্যক্ষ ডব্লিউ কে. কে. ভট্টাচার্য্য নিজের পক্ষে থাকিবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজন কিছুতেই মিটিতেছে না। অঙ্গনবাসন কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার পর তার একটি সুব্যবস্থা হইবে। সাধারণভাবে একটি গোঁজামিল বেওয়া হইবে। টাকা প্রাপ্তির আশায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই দেখিতেছি রাষ্ট্রের হাত-বরা হইয়া পড়িতেছে। তার কল কি হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ ঐশ্বর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় বেতন গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ মাসিক প্রায় ৩ হাজার টাকা ব্যয় থাকিবে। যে লব

আশা-আকাঙ্ক্ষা করা হইতেছে তাহার পরিণতি সম্বন্ধে। সুতরাং বৈধ্য বহিরা থাকিতে হইবে।

জামসেদপুর মজুর আন্দোলনের নূতন রূপ জামসেদপুরের “নব-ভাষণ” পত্রিকার ৩০শে ভাদ্র সংখ্যায় মজুর ইউনিয়নের পুরাতন নেতৃবর্গের অপসারণ সম্বন্ধে যে আশা-আশঙ্কার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রমিথানবোধ্য। আমরা আর্থিক প্রেক্ষণ-বিভাগ বা প্রেক্ষণ-সংগ্রহ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক বুলির সত্যতা স্বীকার করি না। তবুও লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মজুরী সম্বন্ধে হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেন তাৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

“গত ৮ই সেপ্টেম্বর কেবল ইউনিয়ন হইতে ত্রিকনের অপসারণ জামসেদপুর মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এবাং জামসেদপুরের মজুর আন্দোলনের গতি অনেকবার বদল হইয়াছে, আবার পরিবর্তিতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের গাভতনী পৃথক ছিল। বিপরীত ভাষায় লোক অথবা বল দ্বারা জর-পরাক্রমের লড়াই হইয়াছে, কিন্তু একই দলভুক্ত হই উপদলের জর-পরাক্রমের পালা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কংগ্রেসী ত্রিকন, গোপাল ও সিংহের চৌবুরী উপর অনাধা প্রভাব গৃহীত হইলে তাহাদের হুমতি-বিক্ত হইয়াছেন কংগ্রেসী ত্রিকিশোরীমোহন উপাধ্যায় ও ত্রিবারাণসী সুখোপাধ্যায়। উত্তর দলের লোকেরাই নিজেদের সক্রিয় কংগ্রেস সদস্য বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন।

কেবল ইউনিয়নের গণিতে এই আরোহণ ও অবরোহণ জামসেদপুর মজুর কেন্দ্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়া মনে হয়। অব্যাপক আবহুল বারীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মজুর সংগঠনের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা দ্বারা তাহা চিরতরে ভাঙিয়া গেল। আবার ত্রিকনের মজুর কেন্দ্রে অপ্রতিরোধ্য প্রভাবও বর্ষ হইয়া গেল এবং কিছুদিন হইতে তাহার নেতৃত্বে যে বিশ্বাসের অভাব দেখা বাইতেছিল তাহা এইবার প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করিল।”

সিরিয়ায় ও থাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রবিপ্লব

জলপথে ও স্থলপথে এই দুই রাষ্ট্রের ব্যবধান তিন-চার হাজার মাইলের কম হইবে না। আকাশবানে এই ব্যবধান ৩০০২ নটর অভিক্রম করা যায়। দুইটি দেশের বর্ষ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন।

কিন্তু এই দুইরূপ ও পার্থক্য রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে কোন বাধা জন্মায় নাই। দুই রাষ্ট্রেই প্রথম সেবাদপতি—আবিব এল শিখাফলি ও শিম চুন আহ-ওয়ান—রাষ্ট্রপতিতে আটক করিয়া পরত্যাগপত্র আবার করিয়াছেন—গণভরের দামে। পশ্চিম-

এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ার আরও উদাহরণ আছে। ইরানের প্রথম মন্ত্রী ও সর্বপ্রথম বিচারপতি নিহত হন মসজিদে। ঐজ-কর্তাদের রাজ্য আবু-রাও দেইতাবে নিহত হন। পাকিস্তানের প্রথমমন্ত্রী নিহত হন এক জন পাকিস্তানী আকসানের হাতে। যেমন পাণ্ডীকী একজন হিন্দুর হাতে নিহত হন। ত্রাং-দেশের প্রথম মন্ত্রী আউল সাম নিহত হইয়াছিলেন সমবেত মন্ত্রিসভার মন্ত্রণাগারে—নিজের দলের লোকের হাতে। ইন্দোচীনে গৃহযুদ্ধ চার বৎসর ব্যাপিয়া চলিতেছে। চীন-রাষ্ট্রে সংগ্রাম একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব অন্তর্বিপ্লবের শেষ কোথায় অবিস্তব্যই জানেন।

সমস্ত বিশ্ব ভাবের রাজ্যে, বিশ্বাসের রাজ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অন্তর্বিপ্লবে অভিভূত। ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, উহার বিভিন্ন অকল পক্ষ ও বর্ষ শতাব্দীতে এরূপ হুঁপার পড়িয়াছিল। লোকে বলিত পৃথিবীতে সাধু-সত্তা ঘুাইতেছেন। বিংশ-শতাব্দীতে আমাদের সে সাধুনাও নাই।

সংস্কৃত পুঁথির তালিকা

ভারত গবর্নমেন্টের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় এবেনের সকল সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রকাশের জন্য মাজাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ-সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

প্রাচ্য সম্পর্কিত হৃদিত ও গবেষণার জন্য ঐরূপ তালিকার আবশ্যকতা বহু দিন ধাবং অস্বীকৃত হইতেছে। টি. এস. আরেট্টেস ১৮৯১-১৯০০ সনের চেষ্টার সর্বপ্রথম সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন।

গত ১৯০৫ সনে কয়েকটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রপ্রেরণার মাজাজ বিশ্ববিদ্যালয় নূতনভাবে সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে। উহার সনিকটবর্তী সরকারী প্রাচ্য হস্তলিপি প্রকাশাগারে অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথি আছে। কলে ঐ কার্য মাজাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সহজতর হয়। ১৯৪২ সনে তালিকা প্রণয়নকার্য বহু দ্বাধা হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উহা পুনরায় আরম্ভ করা হয়। তালিকাটির প্রথম বৎ গত ১৯৪৯ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়।

টি. এস. আরেট্টেসের ১৯০৫ পৃষ্ঠার তালিকাটি প্রণয়ন করিতে ১২ বৎসর সময় লাগে। নূতন তালিকা প্রণয়ন করিতেও মাজাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-পরিচালক সময় লাগিবে। ইহা ১৬টি বৎ প্রকাশিত হইবে এবং ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা হইবে ৮,০০০। ইহা প্রণয়ন করিতে অন্তর্বিপ্লবসংখ্যক কর্তব্যচর্চা, যুদ্ধ ও অত্যন্ত ধরত ব্যবহ আত্মহানিক ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

কি নাম রাখা যায় ?

ঐগিরীন্দ্রশেখর বসু

ছেলেমেয়ে হইলে তাহার কি নাম রাখা হইবে ইহা লইয়া কোন কোন বাপ-মায়ের চিন্তার অবধি থাকে না। তাঁহারা এই প্রশ্ন নিজেরা সমাধান করিতে না পারিলে হয়ত বা কোন সাহিত্যিকের নিকট উপস্থিত হন এবং নামটা পছন্দমত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তোলেন। এরূপ ক্ষেত্রে যে নামের উপর পিতামাতা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন তাহা না বলিলেও চলে। 'নামেতে কি আসে যায়' একথা ইহারা স্বীকার করেন না। সাধারণ লোকে নামকরণে তত মনোযোগী না হইলেও এ বিষয়ে যে কতখানি সাবধানতা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ খুবই অবহিত ছিলেন। মহাসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নামকরণের বিধিনিষেধের আলোচনা আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :

তত্ত্ব নাম কুর্বাণ পিতৈব দশমেহনি ।
দেবপুত্রং নরাখ্যং হি শব্দবর্ণাদি সংযুতম্ ।
শব্দেতি ব্রাহ্মণতোক্তং বর্ণেতি ক্ষত্রসংগ্রহম্ ।
গুপ্তদাসাশ্রয়ং নাম অশ্রয়ং বৈষ্ণবশূদ্রয়োঃ ।
নার্হহীনং নবাপত্যং নাপশব্দযুতং তথা ।
নামদ্বয়ং জুগুপ্সং বা নাম দুর্ধ্যায়ং সমাক্ষয়ম্ ।
নাতিদীর্ঘং ন ব্রহ্মং বা নাতি গুৰ্বাক্ষরযুতম্ ।
স্বখোচ্চারিতং তন্নাম কুর্বাৎসং প্রবণাক্ষরম্ । ৩।১০।৮-১১।

অর্থাৎ, জন্মের পর দশ দিন অতিবাহিত হইলে পিতা নামকরণ করিবেন। নামের প্রথম পদ কোন দেবতার নামানুযায়ী হইবে। নামের শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা ইত্যাদি যুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণের নামে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস যোগ করিতে হইবে। অর্হহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গলবাচক এবং বীভৎস রূপ নামকরণ করিবে না। নামের অক্ষরগুলি যেন সম অর্থাৎ যুগ্ম হয়। নাতিদীর্ঘ, নাতিদ্রুত, অধিক যুক্তাক্ষরযুক্ত, স্বখোচ্চার্য এবং শ্রুতিমধুর নাম রাখা উচিত।

শ্লোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দরকার। জন্মের পর দশ দিন অতিবাহিত হইলে শিশুর নামকরণের ব্যবস্থা আছে, কারণ প্রাচীনকালে দশ দিন পরে নবজাতকের অশৌচান্ত হয় বলিয়া ধরা হইত। কেহ কেহ বা বার দিনে অথবা এক মাস পূর্ণ হইলে অশৌচান্ত ধরিয়া নামকরণ করিতেন। এ সম্বন্ধে শ্লোক আছে, যথা :

নামধেয়ং দশম্যাক্ কেচিদ্বিশ্ভি পার্ধিব ।

দ্বাদশম্যথবা ত্র্যয়্যাসে পূর্ণং তথা পরে ।

অপরে পুণ্য তিথি বা মুহূর্ত্ত কিংবা নক্ষত্রাদি বিচার করিয়া

নামকরণ করিতেন। অন্নপ্রাশনের সময় অধুনা নাম রাখা হইয়া থাকে।

নামের আন্তে পুরুষবাচক কোন দেবশব্দ রাখার উপদেশ আছে। অনেকে দেবতা বলিতে কুলদেবতাই বুঝিতেন। নামের আদিতে দেবতাবাচক শব্দ থাকায় তৎপূর্বে 'শ্রী' লেখার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল অসুমান করা যায়, যথা, শ্রীকালিদাস .শর্ম্মা। এখানে কালিদাস শব্দটি পুরুষবাচক এবং কালী কুলদেবতার নাম। বিশিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারেও নামকরণ হইয়া থাকে, যেমন, শ্রীনায়দুর্গা রায়, শ্রীগোতম দত্ত ইত্যাদি। আজকাল যে প্রকার তিন পদের নাম পাওয়া যায় পূর্বে তাহা অধিক প্রচলিত ছিল মনে হয় না। 'শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস' এখন এইরূপ নামের চলন হইয়াছে। পুরাকালে ইহা অপেক্ষা অল্প পদ যুক্ত নাম বেশী চলিত ছিল, যথা, শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা। শ্রী কথাটার আর পূর্বের মর্যাদা নাই। রেডিওতে আজকাল 'শ্রীচাচিল' ইত্যাদি নামও শোনা যায়। কেহ কেহ ত শ্রী একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিন শব্দের বড় নাম হইলে আর এক অঙ্গবিধা দেখা যায়। লোকে অনেক সময় সমাসবদ্ধ পদ ভাঙিয়া ব্যবহার করেন। যেমন, 'স্বমতিকুমার গুপ্ত' এবং 'দেবেন্দ্রমোহিনী দাসী' সংক্ষেপে শ্রীমান স্বমতি ও শ্রীমতী দেবেন্দ্র হন। ছোট নামের যথা, দুর্গাদাস এবং বিষ্ণুপ্রিয়ায় ঐরূপ দুর্গতি হয় না।

অর্হহীন নাম রাখা অবিধেয় কিন্তু আজকাল এমন অনেক নাম দেখা যায় বার অর্হ হয় না, যথা, রিপেন্দ্রকুমার, বিবনামোহিনী ইত্যাদি। অপ্রশস্ত নাম, যথা, মাপিকলাল, দিগম্বর, স্কাংটেশ্বর, প্রাণনাথ ইত্যাদি। দেশজ শব্দযুক্ত অথবা লজ্জাবহ নাম এই বর্গের অন্তর্গত। অপশব্দযুক্ত নামে অশ্লীল ভাবের উদয় হয়। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, 'অপশব্দং গুহ্যকেশাদি'। ইহার আধুনিক নমুনা, যথা, দিগম্বর, বিবসনা দেবী। অমঙ্গলবাচক নাম, যথা, শ্মশানপতি, রাহু ইত্যাদি। যে সকল নামের সহিত কোন বিপদ, দুর্ভোগ বা দুঃখজনক ইতিহাস জড়িত আছে তাহা ইহার অন্তর্গত। সীতা নামের বহু প্রচলন দেখা বাইলেও ইহা অমঙ্গল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। জুগুপ্সিত নামে স্থগার উদয় হয়। হাতিমল নাম মারোয়ারীদেবীর মধ্যে বিশেষ সম্মানার্থ কিন্তু কেহ যদি বাঙালীর এই নাম রাখেন তবে তাহা জুগুপ্সিত বলিয়া

বিবেচিত হইবে। ভূরিবর্মসেন, জরৎকার, অসিত ইত্যাদিকে এই পর্বায়ে কোলা যায়।

দুই অক্ষর বা চারি অক্ষরযুক্ত নাম অসম তিন অক্ষর বা পাঁচ অক্ষরের নাম অপেক্ষা প্রশস্ত। নামে অধিক যুক্ত অক্ষর বা অধিকসংখ্যক অক্ষর না থাকিলে তবেই তাহা সুখোচ্চার্য হয়। বেকটেখর, ঝঞ্জনিল প্রভৃতি নাম মোটেই স্বমধুর নহে। সরোবরে-হাস্তমুখী-নলিনীসুন্দরী নাম প্রবণমধুর হইলেও অনেক অক্ষরযুক্ত বলিয়া পরিভ্রাজ্য।

পূর্বে যে সকল কথা বলিলাম তাহা ডাকনাম সম্বন্ধে খাটে না। বাড়ালীর প্রায়ই দুইটা নাম দেখা যায়, একটা পোশাকী ও অপরটি আটপোরে। আটপোরে বা ডাকনাম আত্মীয়স্বজন আদর করিয়া রাখিয়া থাকেন। ঘটু, পচা, গলা, ধসা প্রভৃতি নাম বাপ-মায়ের যতই আদরের হউক তাহা অপ্রশস্ত বা জুগুপ্সিত। অনেক সময় ডাকনাম চলিত হইয়া যায়, তখন সাধারণে ঐ নাম ব্যবহার করে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা চক্ৰি বৎসরের প্রৌঢ়কে ধোকা-বাবু বলিলে বিসদৃশ শোনায। কিছুদিন আগে রেডিওতে হোনাবাবু এই নাম শুনিয়াছিলাম। বক্তা নামটি উচ্চারণ করিয়া নিজেই বলিলেন 'কি নাম রে বাবা!'

শাস্ত্রে বিপরীত বিধান থাকিলেও প্রাচীনকালেও অনেকেরই এখনকার ডাকনামের মত অর্থহীন অপ্রশস্ত বা জুগুপ্সিত নাম ছিল। বহু উপনিষদোক্ত ব্যক্তির নাম এই প্রকারের। নচিকেতা, রৈক প্রভৃতি নাম অর্থহীন। গর্গ (অর্থাৎ বাঁড় বা কৈচো), বক, মণ্ডুক, তিত্তির, যেতাখতর প্রভৃতি নাম অপ্রশস্ত। হুম্মান, জাম্বুবান, কুজুর ইত্যাদি নামও এই শ্রেণীর। ঐতরের প্রভৃতি নাম জুগুপ্সিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজাদের নাম অনেক সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হইত, যথা, রজি, দিলীপ, রঘু, অজ, বৃগ, পাণ্ডু, মক, কুরু ইত্যাদি। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সকল নামের পূর্বে ত্রী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না যদিও রাম এবং কৃষ্ণের পূর্বে ত্রীর উল্লেখ আছে। অঙ্করাজগণের ও তাঁহাদের অধীনস্থ সামন্তশাসকগণের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, কেবল রাজারাই ও রাজবংশীয় শাসকেরা ত্রী ব্যবহারে অধিকারী ছিলেন। যতই প্রতাপশালী হউন না কেন সাধারণ শাসকগণের নামের পূর্বে ত্রী যোগ করা নিষিদ্ধ ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে কেবল পুরুষদেরই নামকরণের বিধিনিষেধ আছে এবং পিতাকেই পুত্রের নাম রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মনুসংহিতায় পুরুষের নামকরণ বিধি বিষ্ণুপুরাণের অঙ্কুর। জীলোকের নামকরণ সম্পর্কে মনু ২।৩০ শ্লোকে বলিতেছেন :

দ্রীণাং সুখোচ্চরুং বিশ্ণুর্দার্যঃ মনোহরঃ।

মললাঃ দীর্ঘবর্গতমশীর্বালাভিধানবৎ।

অর্থাৎ, যে নাম সুখোচ্চার্য হয়, নিষ্ঠুরতাবাচক না হয়, যে নামের অনায়াসে অর্থ বুঝা যায়, বাহা মনোহর এবং মঙ্গলবাচক, বাহার অন্তে দীর্ঘ স্বর থাকে ও বাহা উচ্চারণে আশীর্বাদ বুঝায়, জীলোকের এই প্রকার নাম রাখা উচিত। যশোদা, সুখদা ইত্যাদি নাম এই হিসাবে প্রশস্ত। মনু পুনশ্চ ৩২,১০ শ্লোকে বলিতেছেন :

নক্ষত্রকনদীনাদ্রীঃ নাত্যপর্বতনামিকাঃ।

ন পক্ষাহিপ্রোথানাদ্রীঃ ন চ ভীষণ নামিকাঃ।

অব্যাক্রান্তৌ সৌম্যনাদ্রীঃ হংসবারণ নামিনীঃ।

তদ্বলোমকেশলননাং সুবলীমুখহং শ্রিয়ঃ।

অর্থাৎ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, অন্ত্যপর্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসস্ববাচক অথবা ভয়াবহ নামধারণীকে বিবাহ করিবে না। যে জী অবিলাসী, মনোহরনাদ্রী, হংস বা গজগামিনী, বাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দস্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী জীলোককেই বিবাহ করিবে। এই নিয়ম অনুসারে বোহিণী, রেবতী, বিশাখা, কৃত্তিকা, গজা, যমুনা, সুপর্ণা ইত্যাদি নাম অবাহনীয়। এক্ষণ নিষেধের কারণ বুঝা যায় না। অন্ত্যপর্বত অর্থে যে পশ্চিম দেশীয় পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যায়। কুল্লুভট্ট স্বীয় টীকায় অন্ত্যপর্বত শব্দের অর্থ করিয়াছেন স্নেহপর্বত।

ভীষণনাদ্রী জীলোককে বিবাহ করিবে না বলা হইয়াছে। মনে হইতে পারে পিতামাতা যখন নামকরণের জন্য দায়ী তখন নিরপরাধ কন্যার উপর এ অবিচার কেন? অসুখাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে শাস্ত্রকার বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। যে বাপ-মা কন্যার অবাহনীয় নাম রাখেন তাঁহাদের মানসিক অস্বাভাবিকতা হুস্পষ্ট। এক্ষণ ক্ষেত্রে যে কস্তার অথবা সেই কন্যাজাত সন্তানের বংশজ মানসিক রোগের সম্ভাবনা আছে তাহা সহজেই অসুমেয়। অভূত নষ্ট রাখাও মনের বিকারের লক্ষণ। শ্রীমহম্মদ টমাস পূর্ণানন্দ পাল এই নাম পিতামাতার উৎকট ধর্মসম্বন্ধ আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক।

এক এক যুগে এক এক প্রকারের নামের সমধিক প্রচলন দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালে বাঁড় অভিসম্মানিত প্রাপ্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বয়ং মহাদেব বৃষবাহন নামে খ্যাত ছিলেন। অনেকে বলবান বৃষে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন। বৃষাকপি, ঋষভ, বৃষকেতু প্রভৃতি তখনকার দিনে অতি প্রিয় নাম ছিল। প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অর্বাচীন কাল পর্যন্ত যে সকল রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন পুরাণে তাঁহাদের নাম গুণ্ড হই-

যাচ্ছে। এই তালিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, নাম-করণে রাজারাও যুগপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। যুদ্ধাদ কার্য ও বাহন হিসাবে কালক্রমে অশ্ব বুকের স্থান অধিকার করে। সেই সময়ে রাজগণের নামে অশ্ব শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যথা, বিশ্বগশ্ব, যুবনশ্ব, বৃহদশ্ব, কুবলয়শ্ব, দৃঢ়শ্ব, বার্বিশ্ব, সংহতশ্ব, ক্রুশশ্ব, পৃথদশ্ব, বোহিতাশ্ব ইত্যাদি। অশ্ব শব্দের প্রাধান্ত কমিলে রথ শব্দের প্রচলন হয়। তখনকার রাজাদের নাম, যথা, সুরথ, দশরথ, মৌরথ, সত্যরথ, বৃহদ্রথ, ভানুরথ, চিত্ররথ, শুচিরথ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে যখন পৌরাণিক লৌকিক মানবকল্প শেষ হইয়া দ্বিতীয় কৃত বা সত্যযুগ আসিয়াছিল তখনকার রাজাদের নামে কৃত বা সত্যশব্দ যুক্ত দেখা যায়, যথা, কৃতঞ্জয়, সত্যজিত ইত্যাদি। পরে আরও কিছুকাল গত হইলে মিত্র শব্দযুক্ত নামের প্রাচুর্য দেখা দিয়াছিল, যথা, পুষ্পমিত্র, অগ্নিমিত্র, বহুমিত্র, বজ্রমিত্র, ভূমিমিত্র ইত্যাদি। শেষ অন্ধরাজগণের কালে বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল। তখনকার নাম, যথা, শিবশ্রী, যজ্ঞশ্রী, চন্দ্রশ্রী, বেদশ্রী, শক্তিশ্রী ইত্যাদি। আজকাল রাজা ও জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের নামের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই নারায়ণ শব্দটি যুক্ত দেখা যায়, যথা, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, জগদ্বিন্দ্রনারায়ণ, রামেশ্বরপ্রসাদনারায়ণ ইত্যাদি। সাধারণের মধ্যে এখন ইন্দ্র এবং নাথ অথবা চন্দ্র কিংবা কুমার সংযুক্ত নাম লোক-প্রিয় হইয়াছে, যথা, দেবেশ্বনাথ, কার্তিকচন্দ্র, নরেন্দ্রকুমার, ইত্যাদি। স্বদেশকুমার, চরখায়াগী নামে স্বদেশীযুগের প্রভাব লক্ষ্যীয়। অনেক সময় একই বংশের সম্ভানদের সমার্থবাচক নাম রাখা হয়, যথা, চারি ভ্রাতার নাম চন্দ্রনাথ, সোমনাথ, শশিনাথ এবং শশাঙ্কনাথ।

সংস্কৃত ভাষা বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার জননী। এ সমস্ত ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ দেখা যায়। আশ্চর্যের কথা এই যে, সংস্কৃত শব্দ অন্তান্ত ভাষায় যত বিকৃত হইয়াছে বাংলায় তত নহে। ইহার কারণ বাহাই হউক না কেন ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাংলা নামে প্রায়ই শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। বাঙালী নাম রাখে দেবেশ্ব, বিহার বা উত্তর প্রদেশে তাহা দেবিন্দ্র হয়। কোন কোন প্রদেশে নামের সহিত পিতৃপরিচয় ও আদি বাসস্থানের নির্দেশ থাকে। কুশলচাঁদ চুণিলাল জয়পুরিয়া—এই নামে বুঝা যায় যে, কুশলচাঁদের পিতা চুণিলাল এবং তাঁহার জয়পুরের অধিবাসী। যোগল আমলেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে; যথা, ভীমসেন বৃহানপুরী, অর্থাৎ বৃহানপুরের ভীমসেন। প্রাচীনকালে অনেকে বংশের বা প্রদেশের নামে পরিচিত হইতেন, যথা, রায়ব অর্থাৎ রঘুবংশজাত, কৌশল্যা অর্থাৎ

কৌশলদেশীয়া। মাতার নামানুযায়ীও নামকরণ হইত, যথা, কৌন্তেয়, গৌতমীপুত্র, ঐতরেয়। এখনও এইরূপ নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল যে অল্প প্রদেশের লোকের নামেই আদি বাসস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা নহে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙালী ব্রাহ্মণদের পদবী, যেমন গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি স্থান-নির্দেশক। বৃত্তি অনুযায়ী পদবীও কোন কোন স্থলে দেখা যায়, যথা, কাছনগো, মহলানবিশ, আচার্য, দুখওয়ালা, বুনবুনওয়ালা ইত্যাদি।

নাম দেহের প্রতীক। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, নাম তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিন স্থায়ী। মানুষ গত হইলেও তাহার নাম রহিয়া যায়। কীর্তিধ্বজ স জীবতি। কীর্তিমান পুরুষ মৃত হইলেও নামের মহিমায় বাঁচিয়া থাকেন। নামের স্থায়িত্ব কীর্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। কাহারও নাম দুই-এক পুরুষ গত হইলে লোকে ভুলিয়া যায়, কাহারও বা নাম সহস্র বৎসরাধিক কালেও লোপ পায় না। পুরাণে গল্প আছে মহারাজ ইন্দ্রদ্রায় পুণ্যকাজ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। বহু যুগ পরে তাঁহার স্বর্গভোগ কাল শেষ হইয়া আসিলে দেবভাৱা তাঁহাকে বলিলেন, ‘মহারাজ, এইবার আপনাকে মর্ত্যে বাইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু যদি পৃথিবীর এক প্রাণীরও আপনার নাম স্মরণে থাকে তবে আপনাকে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতে হইবে না।’ অতঃপর দেবগণ মানুষী তত্ত্ব ধারণ করিয়া ইন্দ্রদ্রায়ের সঙ্গে ধরাধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনেক লোককে প্রশ্ন করিলেন কিন্তু কেহই বলিল না যে ইন্দ্রদ্রায়ের নাম শুনিয়াছে। অবশেষে এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বলিলেন, ‘আপনারা ভূষণ্ডি কাককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি জানিলেও জানিতে পারেন ইন্দ্রদ্রায় কে। আমরা চিরকাল দেখিতেছি তিনি ঐ বটবৃক্ষে বাস করেন, তাঁহার বয়সের ইয়ত্তা নাই।’ দেবগণ ও ইন্দ্রদ্রায় ভূষণ্ডি কাকের নিকট গেলেন। ভূষণ্ডি বলিলেন, ‘আমি ইন্দ্রদ্রায়ের নাম শুনি নাই। নদীতীরে তিস্তিড়ী বৃক্ষে এক বক বাস করে। তাঁহার নাম তালজজ্বা। তিনি আমার অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।’ ভূষণ্ডি দেবগণ ও রাজাকে সঙ্গে লইয়া তালজজ্বার নিকট গেলেন। তালজজ্বা বলিলেন, তিনিও ইন্দ্রদ্রায়ের নাম শুনে নাই। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, দূরবর্তী এক জলাশয়ে অকুপার নামক এক কূর্ম বাস করেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক প্রাণী ইহজগতে আর নাই, তিনি হয়ত ইন্দ্রদ্রায়কে চিনিতে পারেন। তালজজ্বা পথ দেখাইয়া তাঁহাদের সকলকে লইয়া অকুপারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবগণ

অকুপারকে প্রদত্ত করিতে তিনি আবেগভরে বলিলেন, 'মহারাজ ইন্দ্রদ্রায়ের নাম কে না জানে। তিনি পূর্বে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাশ্বরূপ ব্রাহ্মণদের এত গাভী দান করেন যে, তাহাদের ক্ষুরাগ্রে যুক্তিকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক মহান্ সন্ন্যাসবরের সৃষ্টি করে। আমি সেই সন্ন্যাসবরে

এখন পৰ্ব্বস্ত স্থখে বাস করিতেছি।' সকল কথা শুনিয়া দেবগণ ইন্দ্রদ্রায়কে বলিলেন, 'মহারাজ আপনি ধন্য; এখন পৰ্ব্বস্ত জগতে আপনার নাম কীর্তিত হইতেছে। আপনার স্বর্গবাস অক্ষয় হউক।'

জননী জন্মভূমি—

ত্রিনিশ্বলকুমার রায়

দক্ষিণে নাতিউচ্চ রাজমহল শৈলমালা, উত্তরে অতিবিস্তৃত বালুচর, ইহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত গঙ্গা। বর্ষায় আবর্ত-ময়ী গঙ্গা দুকূলব্যাপী জলোচ্ছ্বাসে দিগন্ত প্রাবিত করিয়া গ্রাম, জনপদ গ্রাস করে আর শীতে ও গ্রীষ্মে ক্ষীণ জলধারা-সমূহ অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ চর সৃষ্টি করিয়া আপন গতিপথকে স্পিল করিয়া তোলে। ভাঙা-গড়ার, বিনাশ ও সৃষ্টির এই কাজ যুগ যুগ ধরিয়া চলে।

ওপারে সক্রিয়গলি ঘাট, এপারে মণিহারি ঘাট। ওপারে বড় লাইনের বড় গাড়ী, এপারে ছোট লাইনের ছোট গাড়ী। নদী পারাপার ঈমারে করিতে হয়। বাক্সী-সাধারণ ভারত বিভাগ ভুলিয়া বান, কিন্তু একা নদী বিশ কোণের ব্যবধান সহ্য করিতে চান না। সক্রিয়গলি-মণিহারি পারাপারের কষ্টে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা রেল-কর্তৃপক্ষকে যে সব স্তম্ভুর সম্ভাবণে আপ্যায়িত করেন তাহা গল্পে লিখিবার মত নয়।

রাজিতে দিনে, বর্ষায় শীতে, প্রাবনে শুকতায়, ঈমার ঘাটে লাগে। সম্মুখেই ট্রেন দাঁড়াইয়া থাকে। সেই খড়ের ঘর, ইলেক্ট্রিক লাইট, ছোট ইঞ্জিনের তীব্র টিংকার, মজদুরদের হুড়াহুড়ি; মণিহারি ঘাট। কর্ম্মীরা জানে আজ যেখানে মণিহারি ঘাট কাল সেখানে প্রকাণ্ড চর। কাল যেখানে ঘাট আজ সে জায়গাটা গঙ্গার গভীর জলতলে। ছয়-সাত মাইল ব্যাপিয়া মণিহারি ঘাটের বি'ভিন্ন ঋতুতে এই স্থান পরিবর্তন।

ফাস্তন মাস। পলাশে শিমূলে, কোকিলে মলয়ে বসন্ত আসিয়াছে, কিন্তু সে কোথায়? ধূ ধূ করে বালুচর। দিনেব প্রচণ্ড তাপে ভোর হইতেই বালি ভাতিয়া উঠে। একটু বেলা হইলেই ধূলির ঝড় বহিতে থাকে। রৌদ্র-তাপ, ফাস্তনের লু উপেক্ষা করিয়া মজদুরের দল মাল

উঠায়, নামায় আর রেল-কর্ম্মচারীরা পাট, চা, চিনি, চাল, আটার হিসাব রাখে। স্বাস্থ্যকর পশ্চিমের অধিবাসীরা এই সময়ে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রাস্থথ উপভোগ করেন আর কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রসমাজ বৈদ্যাতিক পাখার নীচে ও খস্‌খস্‌-পর্দার পশ্চাতে আগিসের কাজ করেন। রেলের কিন্তু দিন-রাত্রি নাই, শীত-গ্রীষ্ম নাই, মলয়-লু নাই। রেলের চাকা চলিতে থাকে, রেলের মজদুর কর্ম্মচারী খাটিতে থাকে।

এমন সময় আসিল উষাস্তর বন্যা। ফাস্তনে জলের বন্যা নয়, এ মাহুঘের বন্যা। দলে দলে, দিনে-রাত্রিতে, উষাস্তর দল মণিহারি ঘাটে নামিতে লাগিল। কোথা হইতে আসিতেছে ইহার? চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল। তারপরে শিয়ালদহ স্টেশন, তারপর এ ক্যাম্প দে ক্যাম্প। তার পরে? কে জানে কোথায়? জল-পাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, আসাম।

হঠাৎ সন্ধ্যায় খবর আসিল রাত্রি আটটায় উষাস্ত-বোঝাই এক ঈমার আসিবে, সারা রাত্রি মণিহারি থাকিয়া ভোরে বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে যাইবে। একে ঘাটস্টেশন তাহাতে রাত্রি, ইহার থাকিবে কোথায়, খাইবে কি?

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ঝড় বহিয়াছে, চতুর্দিক বালিতে বালিময়। কর্ম্মচারী, মজদুর, ঠিকাদার সকলে অবসর। কিন্তু রেলের কর্ম্মচারীরাও মাহুঘ। মাহুঘ মাহুঘকে না দেখিলে কে দেখিবে? স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইল; চাল ডাল জোগাড় হইল; বালুচরে অজস্র চুড়ীতে আগুন জলিয়া উঠিল।

বধাসময়ে জাহাজ ঘাটে ভিড়িল। দলে দলে নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-মুখা নামিতে লাগিল। অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্ত, রৌদ্র-জলে ক্লান্ত, পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র; হাতে, মাথায়, কাঁখে পোটলা-পুঁটলি, হাড়ি, বাসন, কাঁধা, পাটি, হাঁকা,

মুখে অভ্যাস নিরাশা; গায়ে বিষম গন্ধ। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সাদা বালু বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তাহার উপরে দলে দলে সারি সারি কাহারো চলিতেছে? মাহুঘ, না মাহুঘের জীবন্ত কঙ্কাল? হৈ চৈ ডাকাডাকি, ছুটাছুটি, চট্টগ্রাম হইতে বরিশালের ঐশ্বর্য্যময়ী বাংলা ভাষার অপূর্ণ বৈচিত্র্য!

খাওয়ার পালা আরম্ভ হইল। এমন কুশকায় মাহুঘ এতগুলি খায় কি করিয়া। খিচুড়িতে ষতটা চাল ডাল ততটা মণিহারির বালি। কিন্তু কে তাহা গ্রাহ করে? কান্তনে এদিকে কলেবার প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। ইনজেকশন, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ডাক্তার, মেথর ঘাটকে স্তম্ভ রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এত রাজিতে কে কাহার কথা শুনে, কে স্থান-অস্থান বিচার করে?

রাজি একটায় হঠাৎ একজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া বলিল, ‘ডাক্তারবাবু, শিগগীর আসুন। একটি জীলোকের অবস্থা ভাল নয়।’ ডাক্তার হাতে ব্যাগ লইয়া দ্রুত বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, ‘ব্যাটারদের দুই মাসের খাওয়া এক দিনে খাওয়া চাই, চল।’

চরের উপরে এক অতি কুশকায় নারীদেহ পড়িয়া আছে। বয়স ১২ হইতে ৩২ যাহা কিছু হইতে পারে। পরিধেয় লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়...

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল দেখিয়াই বলিলেন, ‘আর ঘেরী নয়, একে কোথায়ও নিতে হবে; প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।’

স্বেচ্ছাসেবক দুইটি শিহরিয়া উঠিল। এই বিস্তীর্ণ বালুচর, অসংখ্য লোকের ভিড়। খড়ের তৈরি বিজ্রামাগারে তিলমাত্র খরণের জায়গা নাই। একে কোথায় লইয়া যাইবে? কিন্তু উপায় নাই। অনতিদূরে ছিল টালি ক্লার্কদের খড়ের ব্যারাক। রোগীর চেয়ারে তুলিয়া যতপ্রায় জীলোকটিকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। আত্মীয়স্বজন কেহ আছে কিনা জানা গেল না। থাকিলেও

তাহারা বুদ্ধিমানের মত গা-ঢাকা দিলেন। কি বজ্রাট এই অসময়ে, এই অস্থানে!

ব্যারাকে উপস্থিত হইয়াই ডাক্তার পথম বস্ত্রে জীলোকটিকে বাশের মাচার উপরে শোয়াইয়া দিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, ‘গরম জল আর ঘরে মাত্র একজন স্বেচ্ছাসেবক। না ছিল বস্ত্রপাতি, না ছিল অন্য কোন ব্যবস্থা। বাহিরে সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ঘণ্টা দুই পরে নবজাত শিশু তীব্র ক্রন্দন-ধ্বনিতে আপনার আবির্ভাব ঘোষণা করিল। চতুর্দিকে দিগন্তবিস্তারী বালুচর, সম্মুখে ক্ষীণস্রোতা বহুধা-বিভক্ত গঙ্গা, ওপারে নীলাভ রাজমহল পর্ব্বতমালা, উপরে অনল আকাশে খণ্ড চাঁদ—নবজাত শিশুর তীব্র চীৎকার-ধ্বনি বালুচর পার হইয়া, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রাজমহল গিরিশ্রেণীতে প্রতিহত হইয়া বুঝিবা সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। জগতে জগতে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মানবশিশুর জন্ম-বার্তা ছড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিল, একটি সুন্দর শিশু জন্মিয়াছে কিন্তু মাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।

রাখি প্রভাত হইল। পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে যতদেহ সংস্কার হইল। একটি উদাস্ত-দম্পতি শিশুটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইল। সকলে মিলিয়া শিশুর নাম রাখিল মনোহর। ভোরের গাড়ীতে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, উদ্বেগহীন দম্পতি আর একটি বোঝা ঘাড়ে লইয়া চলিয়া গেল।

মনোহর বাঁচিয়া থাকিবে কিনা জানি না। যদি এক দিন সে তাহার জন্মভূমি খুঁজিতে আসে, পাইবে না। হয় তাহা আবর্তময়ী যোজনপ্রসারী রাক্ষসী নদীগর্ভে, নয় তাহা দূরবিস্তারী, আকারপ্রকারহীন অতিবিরল বনঝাউ-আচ্ছাদিত চরের যে কোন জায়গায়। আর তাহার জননী—?



সূর্যরথ ও সূর্যসংজ্ঞা 'সপ্তসপ্তি'

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"সপ্ত সূর্যভক্তি রথসেকচক্রমেকো অথো বহতি সপ্তনাভা ।

ঋষেয় ১.১৩৪.২ ।

—(ভাষ্যানুবাদ) একচক্রযুক্ত সূর্যরথ সপ্ত অশ্ব বহন করে । এক অশ্ব অর্থাৎ এক বায়ু সপ্ত নাম বা সপ্ত রূপ ধরিয়া সূর্যের রথ বহন করে । অথবা একচক্র রথ অর্থাৎ একচারী বা অসচায়াভাবে সকারী আদিত্যমণ্ডলকে সপ্তসংখ্যক রশ্মি বহন করে ।

একচক্র রথ—ঋকের তৃতীয় চরণে "ত্রিনাভি চক্রম্"—এই ত্রিনাভির বর্ণনায় সায়ণ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"বদ্যপি ত্রিণি চক্রাণি তথাপি ত্রেণামেকরূপত্বাদেকচক্রমিত্যুচ্যতে," অর্থাৎ যদিও তিন চক্র, তথাপি তাহারা একরূপ বলিয়াই একচক্র বলে ।

বাক্যবদ্য শুক্লযজুর্বেদ-লাভার্ধ স্তবগান করিয়া সূর্যদেবের উপাসনা করিলে, আদিত্যদেব প্রদয় হইয়া বাক্তিরূপ বোগি-বরকে অবাভবাম, অর্থাৎ অন্যের অজ্ঞাত বজুঃসমূহ দান করিয়াছিলেন (ভাষ্যবত ১২.৬.৭২) । নির্ঘসাগর-মন্ত্রে মুদ্রিত শুক্লযজুর্বেদসংহিতায় এ বিষয়ে যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে সূর্যরথ একচক্র ও সপ্তাশ্ববাহন ; সায়ণের ভাষ্যা-হুসারে একরূপ ত্রিচক্রযুক্ত নহে ।

সংস্কৃত কাব্যাদিতে একচক্র সূর্যরথের প্রয়োগ পাই নাই, আছে কিনা জানি না । হুতাবিত রত্নভাণ্ডাগারে সূর্যরথ বিষয়ক নিয়োক্তৃত শ্লোকটি আছে :

"একচক্রেণ রথো বক্তা বিকলো বিবাহা হয়াঃ ।

আক্রানতোব তেজসী তথাপার্বো নভস্তলব্ধ ।"

অর্থাৎ, সূর্যের রথ একচক্রযুক্ত, সারথি অরুণ বিকলাদ, অর্থাৎ অনুক-উরুবিহীন, অশ্বাণ বিষমসংখ্যক, অযুগ্ম সপ্ত-সংখ্যক, তথাপি, অর্থাৎ সেইপ্রকার রথাদি হইলেও তেজসী সূর্যনভস্তল আক্রমণ অর্থাৎ উদ্গমন করেন । তাৎপর্য,—তেজস্বীর তেজই মুখ্য সহায়, অন্য সহায়ক গৌণ ।

বাংলায় কাব্যে ইহার অনেকগুলি প্রয়োগ পাওয়া যায় :

১ । ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সূর্যবন্দনায়,—

"একচক্র রথে, আকাশের পথে, উন্নয়গিরি হইতে ।

বাহ অন্তর্গিরি, একদিনে কিরি, কে পারে শক্তি কহিতে ।"

২ । মাইকেল মধুসূদনের 'ভিলোক্তমা-সম্ভব' কাব্যে—

(ক) "জাগন অরুণ যবে উবা সাঝাইতে

একচক্র রথ ।"

(খ) "একচক্র রথ

উদয় আদিত্য কবে উদয়-অচলে ।—সেবদানব

(গ)

উদয়-অচলে

দিবাযুখে একচক্রে দিলা দরশন,

অন্তরীমালা গলে

বিতরি স্বর্ণরশ্মি চৌদিকে তপন ।"

—"সূর্য ও মৈনাকগিরি—মাইকেল প্রহ্লাদী ।

৩ । সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কুহ ও কেকা'র—

"সংহর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র রথের ঠাকুর ।

প্রীতের দর ।

উদ্ধৃত কবিতাংশে সর্বত্র 'একচক্র' শব্দ 'একসংখ্যক চক্র' অর্থে গৃহীত হইয়াছে, 'একরূপ ত্রিচক্র' অর্থাৎ 'একাকৃতি তিন চক্র' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা একচক্র শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ ।

সপ্ত অশ্ব—(ভাষ্যানুবাদ) (১) অন্তর্বিদ্যুৎসংখ্যক বায়ুর অধীন বলিয়া সপ্তনামধারী বায়ু—এক অশ্ব বা সপ্তনাভা অশ্ব ; অথবা (২) সর্পণশক্তি বা সপ্তসংখ্যক রশ্মিসমূহ—সপ্তপ্রকার কার্বে অসাধারণ বা পরম্পরবিলক্ষণ বড়ঋতুগণ, এক সাধারণ ঋতু—এই সপ্ত ঋতু সপ্ত অশ্ব ; অথবা (৩) মাসদ্বয়াত্মক বড়ঋতু, অপর অধিমাসাত্মক এক—এই সপ্ত ঋতু সপ্ত অশ্ব ।

সায়ণ-ভাষ্যে "আদিত্যমণ্ডলকে সপ্তসংখ্যক রশ্মি বহন করে"—এই অর্থ করিয়াছেন । সূর্যকিরণে ভাস্কলেট প্রভৃতি সপ্ত বর্ণ* আছে ; ত্রিভল কাচকলকের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে সূর্য-রশ্মি ঐ সপ্ত বর্ণে বিভক্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয় । সূর্যরশ্মি বৃষ্টিকালে জলবিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থিত মেঘখণ্ডে পতিত হইলে ঐ মেঘে নানা বর্ণে রঞ্জিত যে রামধনুর উৎপত্তি হয়, তাই সপ্ত বর্ণে চিত্রিত । ঐ সপ্ত বর্ণ সূর্যের সপ্তাশ্বরূপে কল্পনা করিলে, নিতান্ত অসঙ্গত হয় না বোধ হয় ।

"আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ" (ঋষেয় ৫.৪৫.২)—এই ঋকের 'সপ্তাশ্ব' শব্দ বিশেষণ, বহুব্রীহিসাধিত শব্দ—'সপ্ত অশ্ব বাহার' । সূর্যের বিশেষণ এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দ হইতে সূর্যের সংজ্ঞারূপে গৃহীত বিশেষ্য 'সপ্তাশ্ব' শব্দ অভিধানে ধৃত ও কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে । 'অশ্ব' ও 'সপ্তি' শব্দ সমার্থক—সূর্যের অন্য সংজ্ঞা 'সপ্তসপ্তি' শব্দ এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দেরই প্রকৃতিগত রূপান্তর ।

* সপ্তবর্ণ—violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red (সংক্ষেপে—vibgyor) ।

প্রশ্ন

ঐপ্রমাত্মর আতর্থা

আজ আশ্বিনের শেষে আগমনীর স্বর স্বর হতে না হতে বর্ষ। এসে দাঁড়াল আকাশ-প্রাণে, তার মিশকালো ওড়না উড়িয়ে। বিনায়ের আগে তার যত কিছু সমারোহ নিয়ে নর্তন স্বর করে দিলে। সকাল থেকেই অবিশ্রাম বর্ষণ চলেছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। শুনে শুনে আমাদের মানস-আকাশেও তার ছায়া এসে পড়ল—কি জানি সেখানেও কি কারণে স্বর হয়ে গেল বর্ষণ। কোথা থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এসে জমতে লাগল সেখানে, অজানা ব্যথার অন্তরলোক করুণ হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ এই অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎফুরণের মত একখানি মুখ একবার চমকে উঠে মিলিয়ে গেল—বিচিত্র এই মাহুঘের মন।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমরা এক ক্লাসে পড়তুম, তখন আমাদের বয়স এগার-বার-তের। সে ছিল স্থূলকায়, শুধু স্থূলকায় বললে ভুল বলা হবে, সে ছিল বিপুলকায়। শুধু আমাদের ইস্কুল নয়, কাছাকাছি তিন-চারটে ইস্কুলের মধ্যে তার মত দশাসই চেহারার বালক আর একটিও ছিল না। সেইজন্য তাকে সে পড়ির ছেলেবুড়ো সবাই চিনত। নাম না জানলেও চেহারার বর্ণনা শুনেই লোকে বুঝতে পারত তার কথা বলা হচ্ছে।

বিশ্বনাথেরা ছিল ব্রাহ্মণ। বিশ্বনাথ মুখুন্ডে তার পুরো নাম। কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা, শুধু ক্লাসের ছেলেরা কেন—সারা ইস্কুলের ছেলেরা তাকে মোটা বিত্ত বলে ডাকত। বিশ্বনাথের চেহারাটাই শুধু অমন ছিল না, সেই শরীরে ঐ বয়সেই একেবারে হস্তীর মত না হোক, হস্তীশিরের মত শক্তি ছিল। আমরা ক্লাসের ছেলেরা তো কেউ তার সঙ্গে পারতুমই না, তিন ক্লাস ওপরের ফাষ্ট ক্লাসের কেউ তার সঙ্গে পারত না। অত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার মেজাজটি ছিল শরীফ। কখনো তাকে রাগতে কিংবা মারামারি করতে দেখা যেত না, হাজার কারণ সত্ত্বেও। ক্লাসের ছেলেরা তো প্রায়ই বলত—ভাগ্যে বিশেষ শালা ছিল। কিংবা—বিশেষ বেটা আজ ছুরি আনে নি, পেন্সিল কাটি কি করে—ইত্যাদি।

কিন্তু বিত্ত নির্বিকার! সে ওসব সম্ভাবনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না।

মেজাজের মত আহার সম্বন্ধেও তার ঔদার্য ছিল অপরিমিত। আমরা জিজ্ঞাসা করতুম—ই্যারে বিশেষ, তুই নাকি একটা ছোটখাটো পাঠা একাই সাবাড় করতে পারিস?

কিন্তু ইয়া না কিছু না বলে শুধু ছা-ছা করে হাসতে থাকত আর বলত—কেন যে এক দিন খাওয়াবি নাকি?

তার খাওয়ার কথা শুনেই আসছিলুম, একবার একটা উপলক্ষ্যে চক্ষুর্ধ্বের বিবাদভঞ্জন হ'ল। মহারাজা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষ্যে সরকার থেকে এখানকার ইস্কুলের ছাত্রদের এক দিন তুরিভোজনের আয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেক ইস্কুলের ছাত্রের সংখ্যার অনুযায়ী গবর্নেন্ট টাকা দিয়েছিলেন, আর প্রত্যেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছিলেন। বেলা দুটো কি আড়াইটার সময় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে বিশ্বনাথের খাবার মাত্রা দেখে আমরা তো অবাক, এমন কি মাষ্টারেরা পর্যন্ত ছুটে এলেন। ইস্কুল স্বরু ছেলের খাওয়া হয়ে গেল, তখনও সে মাংস আর লুচি ওড়াচ্ছে। চার পাশে ছেলে ও মাষ্টারের দল দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে বিত্ত একা বসে ভোজন চালিয়েছে—সে এক দৃষ্ট। শেষকালে অস্থির করবে বলে মাষ্টারেরা তাকে এক রকম জোর করে তুলে দিলেন।

মনে আছে ঐ তুরিভোজনের পর সে চল্লিশটি পানতুরা খেয়েছিল। বা হোক সেদিন আহারাদির পর আমরা বাড়ীতে না গিয়ে বিত্তর বাড়ীতে গেলুম দাবা খেলতে।

বিকেল নাগাদ খেলা বখন খুব জমে উঠেছে, তকাতকি প্রায় মারামারিতে পৌছয় এমন সময় বিশ্বনাথের পাড়ার জনকয়েক ছেলে এসে তাকে ধরল। তাদের সঙ্গে যেতে হবে তাদের ইস্কুলে খেতে। বিশ্বনাথের এই বন্ধুরা পড়ত তখনকার জেনারেল এসেম্বলির ইন্সটিটিউশনে। এখন বার নাম হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজ। তারা বিত্তর সঙ্গে আমাদেরও টানাটানি করতে লাগল। আমরা কিছুতেই বাব না—শেষকালে বিশেষ বললে—ওয়া যদি না যায় তো আমিও বাব না। ফলে হ'ল কি তারা এক রকম জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে চলল।

সেখানে গিয়ে পৌছনমাত্র ছেলেদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল মোটা বিশেষ এসেছে বলে। খাবার জায়গা তৈরিই ছিল, আমাদের ধরে তখনই বসিয়ে দেওয়া হ'ল সেখানে। অল্প ঘর থেকে ছেলেরা লাকিয়ে এসে আমাদের ঘরের পংক্তিতে ঠেসাঠেসি করে বসে যেতে লাগল। সকলের আগ্রহ মোটা বিত্তর খাওয়া দেখবে। হু-তিন জন মাষ্টারও এসে উপস্থিত হলেন। ছেলেরা বলতে

লাগল—স্মার মোটা বিস্তকে ধরে এনেছি, ও আসতে চাইছিল না। মাষ্টাররা বললেন—বেশ করেছ।

সকলে মিলে বিশ্বনাথকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, সবাই উৎসাহ শুনে সেও উঠল ক্ষেপে। খাওয়ার সূত্র থেকেই সে যেন মরিয়া হয়ে উঠল।

হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপার! পরিবেশন ইত্যাদি তেমন কাছন্ন মাকিক হচ্ছিল না, প্রথমে চারখানা করে গরম লুচি পাতে পড়ল—চারখানায় কি হবে, চারখানায় কি হবে করে ছেলেরা আরও চারখানা লুচি তার পাতে গছিয়ে দিলে। ভরকারি আসতে মিনিট কয়েক দেরি হয়েছিল—ইতিমধ্যে বিশেষ ছন্ন দিয়েই আটখানা লুচি আড়ে মেরে দিলে। ছেলেরা বিশ্বর কাণ্ড দেখে হৈ হৈ করে উঠল। তার পর প্রত্যেকটি পদ বেশ ভাল করে অর্থাৎ আর বার বসেছিল তাদের সবায়ের চেয়ে বেশী তো খেলেই, উপরন্তু বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে আধ ইাড়ি দৈ সাবাড় করে দিলে ভাল হজম হবার জন্তে।

ইস্কুলের কাছেই ছিল বিশ্বদের বাড়ী। টিকিনের সময় বাজে কচুরি জিলিপি না খেয়ে সে বাড়ীতে গিয়ে ভাত খেয়ে আসত। টিকিনের পরের ঘণ্টায় আমাদের ট্রান্সলেশ্যন হ'ত। বাংলা বইয়ের খানিকটা তর্জমা করতে দিয়ে মাষ্টারমশায় অস্ত্র কাজ করতেন। সেটা ছিল বিশ্বর ঘুমোবার ঘণ্টা। সে ডবল বেঞ্চির ওপর দু'হাত দিয়ে তাতে মাথা রেখে ঘুমোত—আর আমরা চার-পাঁচ জন পালা করে তার শিঠ চুলকে আরাম করে দিতুম। তা না হলে বিশ্ববাবু ঘুম হ'ত না। তার ঠাকুরমা ছেলেবেলা থেকে এখনো পর্যন্ত ঘুমোবার সময় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে এমন অভ্যাস করে দিয়েছেন যে তা না করলে সে ঘুমোতে পারত না। দিনের বেলায় এই নিদ্রাটি না হলে তার বড় কষ্ট হ'ত এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় হ'ত না।

এক দিন কি কারণে জানি না, আমাদের ট্রান্সলেশ্যন-এর মাষ্টারমশায় এলেন না। মাষ্টার না এলে যা হয় অর্থাৎ ক্লাসে খুবই গোলমাল হতে লাগল। পাশের ক্লাসের মাষ্টার এসে দু-তিন বার বারণ করে গেলেন। ফলে মিনিট দুই চূপচাপ থেকে আবার গুণ্ডগোল শুরু হ'ল। এক বার আর এক ক্লাসের মাষ্টার এসে খুব ধমকধামক করে গেলেন। তারই কিছুক্ষণ আগে কালীচরণ ও নিবারণের খুব তর্ক লেগেছিল। মাষ্টার চলে যেতেই আবার তর্ক শুরু হ'ল। ক্রমে কয়েকজন কালীচরণের ও কয়েকজন নিবারণের দলে জুটে গেল। প্রথমে তর্ক, তার পরে শুরু হ'ল গালাগালি। আমরা তখন নতুন নতুন খাবার কথা শিখেছি, কিন্তু সে সব প্রয়োগ করবার ক্ষেত্র পাই না। একটা

উপলক্ষ্য পেয়ে এইখানে খুব তোড়ে চলল সে সব। এক পক্ষ একটা বলে তো ও পক্ষ বলে চারটে। বারা নিরপেক্ষ ছিল তারাও বাহাদুরি দেখাবার জন্য মুখ ছোঁটাতে আরম্ভ করে দিলে। প্রতিবোধিতার গালাগালি শুরু হয়ে গেল। ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। মাষ্টারমশাই একরকম ছুটতে ছুটতে ক্লাসে এসে বললেন—কি ব্যাপার কি?

মিনিটখানেক সব চূপচাপ, কেউ কোন কথা বলে না। কিন্তু মাষ্টারমশাই নাছোড়বান্দা, তিনি টেবিল চাপড়ে হকার ছাড়লেন—কি হয়েছে। এত চেঁচামেচি কেন হচ্ছিল?

উভয় পক্ষ উঠে অন্য পক্ষের নামে দোষ দিতে আরম্ভ করলে। শেষকালে আবার এক হট্টগোল হবার উপক্রম দেখে মাষ্টারমশায় চেঁচিয়ে উঠলেন—সায়লেন্স।

আমাদের বিশ্বনাথ বাবাজী এতক্ষণ তাঁর সেই সনাতন 'পোজে' হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, মাষ্টারমশায়ের হকার শুনে ধড়মড় করে উঠে ঠিক হয়ে বসলেন। মাষ্টারমশায়ের কি দুর্মতি হ'ল, তিনি বিস্তকে ডাকলেন—বিশ্বনাথ, কাম হিয়ার (এখানে এস)।

বিশ্বনাথ উঠে গুটিগুটি তাঁর কাছে গেল। মাষ্টারমশায় বললেন—আমি জানি এবং আশা করি তুমি মিথ্যে কথা অথবা কাকুর পক্ষ টেনে বলবে না। এতক্ষণ কি হচ্ছিল বল ত?

বিশ্বনাথ কাকুর দিকে না চেয়ে বলে যেতে লাগল—কি করে প্রথমে কথাকাটাকাটি হতে হতে ঝগড়া শুরু হ'ল। তার পরে কে কে কার দিকে বোগ দিলে ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে যেতে লাগল। অথচ আমরা সকলেই দেখেছি সে দু'হাতে মুখ লুকিয়ে মাথা নিচু করে ঘুম মারছে। বেশ বুঝতে পারা গেল দিবানিত্যের অসুবিধা হয়েছে বলে বিশ্ববাবু সবার ওপরেই চটে গিয়েছেন।

এতক্ষণ তো বা হোক চলছিল একরকম। কিন্তু মাষ্টারমশাই যখন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কে কে গালাগালি করেছে, বিশ্বনাথ তখন সলজ্জ কিশোরীর মত ঘাড় নিচু করে নখ খুঁটতে খুঁটতে উত্তর দিলে—বলব স্মার? কিন্তু আমার বড় লজ্জা করছে।

মাষ্টারমশায় বললেন—নির্ভয়ে বলে বা, লজ্জা কিসের? বিশ্বনাথ বলতে আরম্ভ করল—স্মার প্রথমে কালীচরণ নিবারণকে বললে—

একটা অত্যন্ত খারাপ কথা।

বিশ্বনাথের মুখ থেকে বাক্যটি বেরোনো মাত্র ক্লাস-শুধু ছেলে হো হো করে হেসে উঠল। মাষ্টারমশাই—এই চোপ—চূপ কর—সায়লেন্স—বলে চীৎকার পাড়তে আরম্ভ

করলেন। পাশের ক্লাসের মাষ্টার কৌতূহল চাঁপতে না পেয়ে উঠে এলেন—পেছন পেছন সে ক্লাসের গুটিকয়েক ছাত্রও উঁকি দিতে লাগল।

একটু ঠাণ্ডা হওয়া মাত্র বিশ্বনাথ বললে—তার পর স্তার, কালীচরণের ঐ কথা শুনে (কথাটি বিশ্বনাথ আবার উচ্চারণ করলে) নিবারণ বললে—

ক্লাসশুদ্ধ ছেলেদের আবার হাসি।

শেষে প্রায় ইস্কুলস্থল মাষ্টার ও ছাত্র আমাদের ক্লাসে এসে হাজির হ'ল আর তার মাঝে বিশ্বনাথ দাঁড়িয়ে গভীর-ভাবে একটার পর একটা খারাপ কথার মালা গাঁথতে চলল। শেষকালে অন্য ক্লাসের একজন মাষ্টার বিস্তকে খামিয়ে দিয়ে বললেন—খুব হয়েছে, বাও বাবা বিশ্বনাথ এখন নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বস গিয়ে।

বিশ্বনাথ গট গট করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সেটা ছিল ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা। এই ঘণ্টায় আমাদের যিনি পড়াতেন তিনি ছিলেন অতি ভালমাস্তুষ। বিশ্বনাথ গিয়ে নিজের জায়গায় বসতেই অন্য ক্লাসের ছাত্র ও মাষ্টাররা চলে গেল। ক্লাস একেবারে চুপচাপ—মাষ্টারমশাই চুপ করে নিজের জায়গায় বসে রইলেন। তিনি কারকে তিরস্কার বা একটি কথাও বললেন না। পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞানবৃক্ষের যে সব শাখাপ্রশাখার বিবরণ দেওয়া আছে, ছাত্রদের মধ্যে তারও অতিরিক্ত জ্ঞানের এই প্রসার দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বসে রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে—বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে।

সেদিনকার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমরা প্রায় দু'বছর পড়েছিলুম। সেবার বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পূজোর ছুটির কিছুদিন আগে এক দিন বিত্ত এসে আমাদের জানালে যে তার এক কাকার সঙ্গে সে পাটনা চলে যাবে। পরের দিনই বিত্ত ট্রাঙ্ককার নিয়ে চলে গেল। সেখানে পৌঁছে একখানা পোষ্টকার্ড আমাদের লিখেছিল বটে, কিন্তু ওপরে ঠিকানা না দেওয়ায় তার আর জবাব দেওয়া হয় নি। অবিশ্রিত তার বাড়ী থেকে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে পারা যেত, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

প্রায় বছরতিনেক বাদে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে সিনেট হলে বিত্তের সঙ্গে দেখা। সেও পরীক্ষা দিতে এসেছে। বিশেষ বললে সে প্রায় বছরখানেক হ'ল কলকাতায় কিরেছে। বাপরে বাপ—সে কি মোটাই হয়েছে—। যেমন মোটা তেমনি লম্বা। দেখা গেল পাটনার সস্তার খাবারের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। বা হোক, টিকিনের সময় বিত্তের বাড়ী থেকে খাবার এল, সে প্রায়

চার-পাঁচ জনের খাবার। আমরাও চার-পাঁচ জনে মিলে তার সবই মেরে দিলুম। বিত্ত দোকান থেকে গোটা দুয়েক ডাব আর দু-তিন বোতল লেমনেড কিনে খেলে। চার দিন বেড়ে কাটল। তার পর ছুটির প্রায় তিন মাস বিত্তদের বৈঠকখানায় আমাদের দুম আড্ডা চলল। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে দেখা গেল আমরা সদলবলে ফেল করেছি।

পরীক্ষার খবর বের হবার প্রায় মাসখানেকের মধ্যে বিত্ত চাকরিতে ঢুকে গেল। তার এক বড়লোক আত্মীয় কলকাতার কোন বড় ব্যাকে কেশিয়ারের কাজ করতেন। সে তাঁর অধীনে কাজে লেগে গেল। সে সময় বিত্তের বয়স সত্তের, দেখলে মনে হ'ত পঁচিশ বছরের যুবা। মাইনে হ'ল মাসে তিরিশ টাকা। তখনকার বাজারে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি নেহাৎ ফেলনার ব্যাপার ছিল না। এর পরে বিশ্বনাথের সঙ্গে বছরদশেক আর দেখা হয় নি।

সে সময় কলকাতায় এমেচার থিয়েটার ক্লাবের খুব মরশুম পড়েছিল। আমরা জনকয়েক মিলে একটা ক্লাব করেছিলুম। আমাদের মধ্যে সেই পুরোনো দিনের ইস্কুলেরও কয়েকটি বন্ধু ছিল। এক দিন রাত্রে আমরা বিজ্জেন্দ্রলালের নাটকের মহলা দিচ্ছি, সপ্তাহখানেক বাদে পাব্লিক ষ্টেজে প্রে হবে। রিহাস্যাল খুবই জমেছে—দুর্গাদাস বলছে—জাহাপনা দুর্গাদাস সে শ্রেণীর লোকের ওপরে—

—কতখানি ওপরে হে—বলেই বিশাল লম্বাচওড়া একটি লোক ক্লাব-গৃহে প্রবেশ করলে।

আরে বিশেষ বিশেষ বিশেষ—বিশেষ আয়, বিশেষ আয়—আমরা সকলে হৈ হৈ করে উঠলুম। বিশেষ বললে—তোরা যে ক্লাব করেছিস তা অনেক দিন থেকেই শুনছি, আজ মনে হ'ল দেখে আসি কি বকম রাজা উজির মারছিস।

অনেক দিন বাদে তাকে পেয়ে সত্যি বড় ভাল লাগল। বিশ্বনাথ বললে—কিন্তু বাবা! ক্লাব করবার সময় বিশেষকে তো একবারও মনে পড়ে নি। ভাগ্যে আমি এলুম।

তার পর প্রায় পাঁচ বছর একাধারে বিশেষের সঙ্গে খুবই দহরম মহরম চলল। বিশ্বনাথ একাই ক্লাবের সর্বসর্বা হয়ে উঠল। যত পরিভ্রমের কাজ, আমরা সবই তার ঘাড়ে চাপাতুম এবং সে অগ্নানবদনে করে যেত। তার পর এক দিন ক্লাবও উঠে গেল, তার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

প্রায় দশ বছর এমনি চলল—কখনো বা তার সঙ্গে ট্রামে দেখা হয়,—বিশেষ ভাই তুই আরও মোটা হয়েছিস।

—মোটা হয়েছি বলিস নি, বল রেহে সেরেছি।

কখনো বা একই ট্রামে চলেছি, মাঝখানে নিশ্চিহ্ন ভিড়। দু'জনে চোখে চোখে ইসারা হয়েছে। এরই মধ্যে দু'চার বছর অন্তর রবিবার বিকেলে সে আমার বাড়ী এসেছে, কখনও বা আমি তার বাড়ী গিয়েছি। এক দিন বিশেষ জিজ্ঞাসা করলুম—তোর ছেলে কত বড় হ'ল রে?

বিশ্ব বললে—এবার এম্-এস্‌সি পাস করেছে।

—বলিস কি? কোন ক্লাস পেলে?

—ফার্স্ট ক্লাস।

—বা বা বেশ ছেলে।

বিশ্ব বললে—মাইরি তাই ভাবি, আমার ছেলে হয়ে বেটা এম্-এস্‌সি পাস করলে কি করে!

বিশ্ব আরও বললে, কোন একটা কোম্পানী তার ছেলেকে তিন শ' টাকা মাইনে দেবে বলেছে, বছর দুই বাদে তারাই বিলেতে পাঠাবে।

তার পরে আমি চলে গেলুম বিদেশে। পাঁচ-ছয় বছর আর তার কোন সংবাদই রাখি নি। ফিরে আসবার পর এক দিন ট্রামে দেখা। দেখলুম সে ভয়ানক রোগা হয়ে গিয়েছে—বিশ্রাণ মুখুজে বলে তাকে আর চিনতে পারা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে এত রোগা হয়ে গিয়েছিল কেন?

বিশ্ব হাসতে হাসতে বললে—চিরদিনই কি একরকম খাকা ভাল? রোগা হয়ে বুঝতে পারছি মোটা হওয়ার কত অসুবিধা ছিল।

বললুম—কিন্তু হঠাৎ এরকম রোগা হয়ে যাওয়া তো ভাল নয়! ডাক্তার-টাক্তার দেখাচ্ছিল?

—ওরাই তো না খেতে দিয়ে রোগা করে দিলে। বলে ভায়বিটস হয়েছে, কিছু খেয়ো না—ধাঁ ধাঁ করে রোগা হয়ে গেলুম। এখন অবিশি সবই খাচ্ছি, ওদের কথা শুনে গেলে আর বাঁচা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম—এখনও ব্যাকে চাকরি করছিস তো।

বিশ্ব হ্যা হ্যা করে হেসে বললে—ব্যাকে এখনও চাকরি করছি নটে, তবে সে ব্যাক নয়। সে ব্যাক ফেল মেরেছে, শুনিস নি?

—না তো। তোর কিছু গেল নাকি?

বিশ্ব বললে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ছিল ওখানে। শুনছি লিকুইডেটররা শতকরা পঞ্চাশ টাকা ক্ষেরত দেবে, আপাতত। টাকা আজ না হয় কাল, না হয় পঞ্চাশ বছরে ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু তুং এই যে তিরিশ বছরের চাকরিটা গেল। সেই মনে আছে ষোলো-সত্তেরো বছর বয়সে ওখানে ঢুকেছিলুম—আর ছেচল্লিশ বছর বয়সে শেষ

হ'ল। বখন ঢুকি তখন নোট গুনতুম, মাইনে হয়েছিল তিরিশ টাকা। ক্রমে এন্টিস্ট্যান্ট কেশিয়র হয়েছিলুম, পাঁচ শ' টাকা মাইনে হয়েছিল।

বিশ্ব একবার হ্যা হ্যা করে হেসে বললে—ধম্মে সইবে কেন, আমাদের মত লোকের অত উন্নতি। কি বলিস?

বললুম—যেতে দাঁও বন্ধু, যা বরাতে ছিল তা হয়ে গেছে, তার জন্য আপশোষ করে কি হবে?

—ক্লেপেছিস তুই! আমি করব আপশোষ? এক হস্তার মধ্যে চাকরি ঠিক জুটিয়ে নিয়েছি। তবে মাইনেটা একটুক কম হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কত দিচ্ছে এখানে?

—এক শ' টাকা।

বলেই আবার সেই হ্যা হ্যা হাসি। তার পর বললে—টুকতেই তো তারা কিছু পাঁচ শ' টাকা আমায় দেবে না? কি বলিস?

সেদিন এইখানেই শেষ হ'ল। তিন-চার দিন পরে আবার ট্রামেই দেখা তার সঙ্গে। কথায় বার্তায় বুঝতে পারলুম, ওদের পৈতৃক সম্পত্তিও ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ জেরা করে এও জানা গেল যে সম্পত্তির ন্যায্য পাওনা ও পায় নি। তার কাকা অন্যায়ভাবে তাকে ফাঁকি দিয়েছেন।

বললুম—কাকার নামে নালিশ করলি নি কেন?

বললে—তুই কি পাগল হয়েছিস? কাকার নামে নালিশ করব! আমার ছেলেবেলার বা-কিছু আবদার সব চলত কাকার কাছে। আমার খেলবার যা কিছু—গুলি, লাট্রু, খুড়ি-লাটাই, লজ্জুস, চানাচুর—এ সবেরই পয়সা জুটিয়েছে কাকা অমানবদনে, কখনও না বলে নি। আমাদের সেই সম্বন্ধ কাকা দশজনের প্ররোচনায় পড়ে ভুলে গেল বলে আমিও ভুলব?

বড় রাগ হ'ল। বললুম—বেশ করেছ, দু'আনার গুলি ও চানাচুরের বদলে লাখ টাকার সম্পত্তি দিয়ে খুব বাহাদুর করেছ।

আমার কথা শুনে এবার বিশেষ এমন হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল যে ট্রামস্ক লোফ চমকে উঠে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল।

সেদিন সেইখানেই শেষ হ'ল। তার পরেই আমাকে কিছুদিনের জন্যে আবার বিদেশে যেতে হয়। বছর দুয়েক পরে নানান তাড়ায় দেশে ফিরে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম, বন্ধুবান্ধব কাকরই খোঁজ নিতে পারি নি।

সে সময় শীতকাল। বিকেলে কবিরাজের বাড়ী থেকে কিরছি—শরীর এত খারাপ যে একটু চললেই অবসর বোধ

হয়। একটু ঘুরে যেতে হলেও মনে করলুম 'বিশেষের বাড়ীতে একটু বসে:সেখান থেকে একখানা রিক্সা ভাড়া করে ফেরা যাবে। বিশ্বর সঙ্গেও দেখা হবে।

দোরগোড়াতেই বিশ্বর খুঁড়তুত ভাই লোকনাথের সঙ্গে দেখা। ওদের বাড়ীর সবাই আমাকে চেনে, আমিও প্রায় সবাইকে চিনি। লোকনাথ আমাকে দেখে খুশি হয়ে বলে উঠল, আসুন দাদা আসুন। কেমন আছেন, কবে এলেন—ইত্যাদি সারা হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বিশে এখনও কেরে নি বুঝি?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকনাথের মুখের ওপরে বিষ্ময়ের একটা চমক খেল গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা সামলে নিয়ে বিষয় মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে সে বললে—বড়না আর আপিস থেকে ফিরবে না দাছ।

—তার মানে?

—আপনি জানেন না বুঝি? বড়না ত নেই। তার গুপ্তির আর কেউই নেই। এক বছরের মধ্যে সব সাফ হয়ে গেছে—এই বছর ছুই আগে।

লোকনাথ বলতে লাগল, ইদানীং বড়না যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি রকম? তাকে ত সারাজীবন একই রকম দেখছি।

লোকনাথ বললে—হ্যাঁ, বাইরের লোকেরা বুঝতে পারত না, কিন্তু ইদানীং বড়না একেবারে বদলে গিয়েছিল। অমন লোক যে কি করে এ রকম হতে পারে আমরা তাই বলাবলি করতুম।

—কি রকম হয়ে গিয়েছিল?

লোকনাথ বললে—বড়না ব্যাঙ্কে বড় কাজ করত জানেন ত—সেই ব্যাঙ্ক গেল ফেল হয়ে বড়নার চাকরিটাও গেল। বড়না অন্য জায়গায় কম মাইনের একটা চাকরি জুটিয়ে নিলে। অবিশিষ্ট চাকরি না জুটলেও তার ভাবনা কিছু ছিল না, কারণ তার ছেলে সোমনাথ তখন 'পাঁচশ' টাকার ওপর মাইনে পায়। চাকরি যেতেই বড়না বাড়ীর সব খরচ কমিয়ে দিলে। জানেন ত সে কি রকম খাইয়ে লোক ছিল। নিজে খেয়ে আর লোকজনকে খাইয়ে সে 'পাঁচশ' টাকা মাসে ছুকে দিত। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু দু'বেলা বাড়ীতে বিরিয়ানি কাবাব উড়ছে—এই ছিল তার ব্যবস্থা। বাপের নূতন ব্যবস্থা দেখে ছেলে বললে—বাবা এবার থেকে বাড়ীর খরচ সব আমার। বাপ বললে—খবরদার, ওসব লবাবি করতে চাও ত অন্যত্র যাও। আমি বতকণ বৈচে আছি ততকণ আমার আমদানি মতে বাড়ীর সবাইকে চলতে হবে।

হঠাৎ বড়নার এই হালচাল দেখে বৌদিও ভড়কে গেল—সেও কিছু বললে না। তারপরে একেবারে কালিয়া পোলাও থেকে দু'বেলা ভাত ডাঁটাচচ্চড়ি। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে কোনও জিনিষ আনবার জে নেই—কে এনেছে? কেউ কোনও জিনিষ কিনতে পারবে না—কে কিনেছে? সোমনাথের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছে, জামা নেই—কিন্তু কারও কেনবার হুকুম নেই। আগের দিনে যেমন ষার যা খুশি করত বড়না সবজাতাই খুশি, সবজাতাই তার হাসি—এ যেন একেবারে তার উন্টো, তার ইচ্ছা ছাড়া আর কারও কোনও ইচ্ছা খাটবে না। বড়নার শরীর ত ভেঙে পড়েইছিল, দেখতে দেখতে বৌদি আর সোমনাথও একেবারে কাঠির মত রোগা হয়ে গেল। ছেলেও বাপের এমন বাধ্য যে, বাড়ীতে যে শাকচচ্চড়ি ভাত হয় তা ছাড়া বাইরে আর কোথাও খায় না, বাপ বারণ করে দিয়েছে। আর বড়বৌদি, তিনি বড়নার চেয়েও ভালমাহুষ ছিলেন। বড়না যদি ঠাট্টা করে বলত—সরকারের হুকুম হয়েছে আজ থেকে লোকেদের মাথা দিয়ে হাঁটতে হবে, বড়বৌদি বলত—এ রকম হুকুম কেন*হ'ল বল দিকিন?

এই রকম চলতে চলতে এক দিন সোমনাথ আপিস থেকে জর নিয়ে বাড়ী ফিল। প্রথম কয়েকদিন তালে-গোলেই কেটে গেল, তারপর জর এক দিন বেশি হতেই বড়না একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে আনল। ডাক্তার রোগী দেখে বললেন—জরটা ঝাঁক বলে মনে হচ্ছে, কোনও বিশেষজ্ঞকে ডাকা দরকার।

বিশেষজ্ঞকে ডাকতে হলেই টাকার দরকার। বড়না কিছুতেই ডাকবে না। শেষকালে আমাদের জেদ ও বৌদির কার্নাকাটিতে ডাক্তার ডাকতে হ'ল, আর সেই সোমনাথের টাকায় হাত দিতেই হ'ল। ডাক্তার সব দেখে বললেন—রোগের সঙ্গে লড়বার শক্তি রোগীর নিজের নেই। ওষুধে বতদূর হয় আমগা তা করব।

কিন্তু কোনও ওষুধেই কিছু হ'ল না। দশ-বার দিন রোগভোগ করে এক দিন শেষরাত্রে সোমা মারা গেল।

ভোর হবার আগেই আমরা সোমার শব্দেই নিয়ে বেরিয়ে গেলুম, এদিকে বড়না করলে কি সেই শব্দায় শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল। এই ক'দিন দিনরাত সে ঠায় সোমনাথের শিয়রে বসে ছিল, নেহাত দরকারে এক-আধবার ওঠা ছাড়া সে কোথাও যায় নি, কোনও দিন খেয়েছে, কোনও দিন জল পর্যন্ত খায় নি। অনেক বলা-কওয়ার পর বড়না তখনকার মত উঠল বটে, কিন্তু ঘর ধোয়া-পোছা হয়ে গেলেই সে আবার গিয়ে ঠিক সেই

জায়গাটিতেই শুয়ে পড়ল যেখানে সোমার বিছানা ছিল। বড়দা খায় না-দায় না দিন-রাত চোখ বুঁজে পড়ে রইল। ওষুধ কিংবা পথ্য দিলে থু করে ফেলে দেয়। একেই রোগে তার শরীর আগে থেকেই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল এখন এই অত্যাচারে মাসখানেক বেতে না বেতেই সে হয়ে গেল সারা। বড়দা মারা যাবার পর বৌদি বোধ হয় মাসতিনেক ছিল, কিন্তু সেও ঐ রকম অত্যাচার করেই মারা গেল। একটি বছরের মধ্যে সব ফরসা।—

এই অবধি বলে লোকনাথ চূপ করলে। মুখ তুলে দেখলুম তার ছুঁচোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে—আলাদা হয়ে গেলেও বড়দাকে তারা সবাই খুব ভালবাসত।

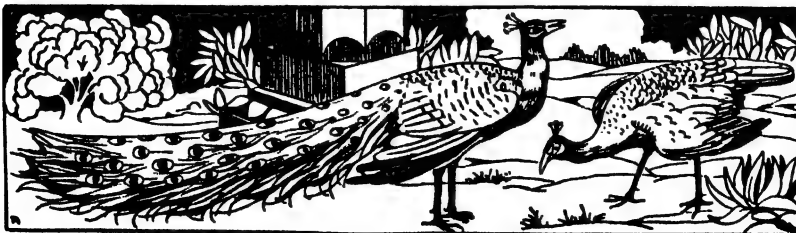
আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম বিশ্বনাথের কথা। তাকে আমি বতটা জানতুম সেই বার-তের বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে আর প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি—জীবনের কোনও খানটাই লোকনাথ-বর্ণিত তার শেষ-জীবনের সঙ্গে মেলে না। সে ছিল উদার অপার সাগরের মত। লোকের একটুখানি হাসিমুখ দেখবার জন্যে সে সব ত্যাগ করতে পারত। মনে পড়তে লাগল, আমাদের ছেলেবেলার দাবাবড়ে খেলবার কথা—আমরা তিন বার করে চাল ফেরত নিতুম, কিন্তু বিশ্বনাথ একবারও চাল কেবত নিতে গেলে আমরা এমন গোলমাল লাগাতুম যে, সে হেসে বলত—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা—আমি চাল ফেরত নেব না, এই রেখে দিচ্ছি—। বয়স বাড়ার সঙ্গে তার এই ঔদার্য বাড়তে বাড়তে একেবারে অপরাধের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এজন্য কতবার তাকে কত তিরস্কার করেছি, কিন্তু সবই সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে—আরে যেতে দে, কি বলিস। মনে পড়তে লাগল কি সমারোহের সঙ্গে এট সংসারে সে এগিয়ে চলেছিল আর কি বিলী ভাবে সে বিদায় নিলে। সমস্ত জীবন ধরে সে নিজেকে বিলিয়েই দিয়ে এসেছিল। যে যা চায়, তার সাথে বতটুকু কুলোয় সে কখনও কাককে বঞ্চিত করে নি। এই বিরাট ত্যাগের মধ্যে কোথায় কেমন করে এক বিন্দু অভিমান লুকিয়েছিল

একটি ঘটনার আঘাতে তা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে প্রিয়জনদের মৃত্যুর কারণ হ'ল এবং নিজেও এক রকম আত্মহত্যা করলে।

নানা চিন্তা ও প্রিয়-বিরোধব্যথায় আত্মহারা হয়ে আছি এমন সময় লোকনাথ বললে—দাদা, অনেক দিন বাদে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, বুঝতে পারছি আর বোধ হয়, কখনও আসার সুবিধাও হবে না—বহুন একটু চা খেয়ে যাবেন।

লোকনাথ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। আমি বসে ভাবতে লাগলুম বিশ্বর কথা, আমাদের ছেলেবেলার কথা—মাষ্টারের অদ্ভুত জটিল জীবনের কথা। ভাবছিলুম মাষ্টার কি ঘটনাগ্রবাহকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না? তা যদি না পারে তা হলে ঘটনার আঘাত থেকে আত্ম-রক্ষার উপায় তাকে আবিষ্কার করতেই হবে। একথা কখনই সত্য নয় যে, যে মহাশক্তি অতি নগণ্য কীটাত্ম-কীটকে বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যে রূপান্তরিত করেছেন তিনিই আবার তাকে এই স্ব-দুঃখ শোক-তাপ লজ্জা-ভয় অভিমান-ঈর্ষার পুটপাকের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছেন?

লোকনাথের ওখান থেকে চা খেয়ে যখন বাইরে বেরোলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা ও ব্র্যাক-আউটের সঙ্গে শীতের ধোঁয়া মিলে বাইরে যে অন্ধকার জমাট হয়েছিল তারই ভেতর দিয়ে এক রকম হাতড়ে হাতড়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। একেই কথ শরীর ঠেলে চলতে কষ্ট হয়, তার ওপরে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বর মৃত্যুসংবাদ শুনে মনের ওপরেও একটা বিরাট ভার চেপে বসেছিল। কখনও দাঁড়িয়ে হাঁপাই, কখনও ধীরে ধীরে চলি। এরই মধ্যে একবার যেন মনে হ'ল সেই জমাট অন্ধকার ঠেলে বিশ্ব আমার পাশে দাঁড়াল। আমি অভিকৃন্তের মত তার দিকে হাত বাড়ালুম কিন্তু ঘনান্ধকারে সেই অশরীরী অস্বচ্ছতির কোনও শরীরী স্পর্শ মিলে না।



জনশিক্ষা

শ্রীহরিহর শেঠ

আমার এখানে আলোচনার বিষয় জনশিক্ষা। জনশিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার আবশ্যকতা, প্রসারের সহজ ও সম্ভবপর উপায় এবং তাহার কার্যকরী পন্থা নিরূপণ আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে দেশের অসন্তুষ্টি প্রতিরোধের অছিলায়ই হউক আর বৈদেশিক রাজশক্তির স্বার্থ-প্রণোদিতই হউক তাহার সংস্কার ও উৎকর্ষসাধনের অন্তঃসারশূন্য একটা প্রয়াস মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তাহা সরকার-নির্দ্ধারিত এক একটা কমিশনের আকারেই দেখা যায়। র্যালেকমিশন স্কাডলার কমিশন প্রভৃতি তাহারই উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির পর শতাব্দীর একপাদ না বাইতেই তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের অসন্তুষ্টি হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের চাপে লর্ড রিপনের শাসনকালে আর উইলিয়ম হাণ্টারের অধিনায়কত্বে সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। তদবধি এতাবৎকাল মধ্যে মধ্যে শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কারের একটা বাহ্যিক চেষ্টা দেখা গেলেও আমাদের ঠিক উপযোগী শিক্ষা ও তাহার প্রসার হয় নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট, কর্তার ইচ্ছায় কৰ্ম। বাহারা যখন দেশের মালিক থাকেন, তাঁহাদের প্রয়োজনে, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বাহা কিছু করিবার চেষ্টা হয়। তাহা তাঁহাদের কার্যসিদ্ধির সহায়ক হইলেও, তাঁহারা যদি বিজাতীয় হন তবে তাঁহাদের প্রবর্তিত শিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের উন্নতি, জাতীয়তার বিকাশ বা উদ্বোধন তদ্বারা হয়ই না বরং অনেক সময় বিপরীতই হয়।

সংসার সমাজ ও রাষ্ট্র মধ্যে বাহা কিছু প্রতিষ্ঠা বা প্রবর্তিত করা যায়, তাহার মূলে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকেই। এতাবৎ আমাদের যে শিক্ষা চলিয়াছিল এবং বাহা ধারা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে, তাহা প্রবর্তনের প্রথম কাল হইতে তাহার মূলে কি উদ্দেশ্য ছিল? তাহা কি আমাদের জন্য কোন শুভ উদ্দেশ্য লইয়া আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? না তদ্বারা শিশু-হৃদয়ের বা জনগণের সূক্ষ্ম মানসিক শক্তির অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিবার কোন প্রয়াস ছিল? শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য—মনুষ্যজন্মের মর্যাদায় সমুন্নত করিয়া মানুষের কর্তব্য পালন দ্বারা জনগণকে নিজ নিজ সমাজ ও দেশের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। শাসকবর্গ সে উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, তাঁহাদের রাজত্ব কি করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত

হয় ও স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে, নিজেদের পণ্য এদেশে চালাইয়া কি উপায়ে তাঁহাদের দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে, মাত্র এই সকল উদ্দেশ্যই তাঁহাদের ছিল।

লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গকে সূত্র করিয়া যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে রাজা-প্রজার স্বার্থের পার্থক্য স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। প্রকারান্তরে যদিও আমাদের মোহ ঘুচিয়া পথের সন্ধান আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও বৈদেশিক স্বার্থমূলক দীর্ঘ শাসনের ফলে আমাদের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। তাহা আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত যেন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ জয় করিয়া আমাদের যতটা না পদানত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রবর্তিত শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনকে জয় করিয়া মানসিক সহজাতবৃত্তিসমূহকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই আজ দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমরা সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না।

আমাদের সুশিক্ষা দান করা, স্বাধীন মনোবৃত্তি উন্মেষের উদ্দেশ্য তাহাদের ছিলই না, শিক্ষার প্রসারও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং বাহা ছিল তাহা শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করা। ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম আমলে সরকারেরই প্রচেষ্টায় এডাম সাহেবের দ্বারা দেশীয় শিক্ষার যে বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায়, তখন এক বাংলাদেশেই প্রায় এক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে প্রায় তাহার শতভাগের এক ভাগে দাঁড়াইয়াছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেযুগের পাঠ্যপুস্তকাদিতে জাতীয়তার উদ্বোধক বিশেষ কিছু বাহাতে স্থান না পায় সে বিষয়ে যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বিত হইত।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আদর্শ ও কল্পপন্থা আমাদের জাতীয়তার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নৈতিক বিনিয়াদের উপর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীতে বাহা উপযোগী, সংস্কার দ্বারা তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যে সে বিষয়ে অবহিত আছেন, অধিকার হস্তগত হওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাধাকৃষ্ণ কমিশন গঠন তাহার একটি উদাহরণ। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা এই কমিশনের

মতেই হইয়াছে। ইহা হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা বা ইহা কতটা কাজে আসিবে তাহা এক্ষণে বলা যায় না, অথবা কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে আলোচনার এখানে আবশ্যক নাই। তবে যদি এই ব্যয়-বাহুল্য করিয়া আশাহুরূপ ফললাভ নাও হয়—ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য সফল হইলে সন্দেহ করিবার যখন অবকাশ নাই, তখন দোষ-ত্রুটি যদিই থাকে পুনঃসংস্কারে কাম্যফল পাওয়া সম্ভব ইহা মনে করিয়া নিশ্চিত থাকি যাঁহাতে পারে। কিন্তু ভাবিবার কথা, এই ব্যবস্থার মধ্যে বা উক্ত কমিশনে ব্যাপক জনশিক্ষার সফল হইলে তেমন কিছু স্থপষ্ট নির্দেশ না থাকে তবে তাহার জন্য কি করা যাঁহাতে পারে?

কিন্তু বায়, ইউরোপ আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষর বলিতে প্রায় কেহ নাই, সেখানে দশ বৎসর পূর্বেও সমগ্র ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ২০ আর বাংলায় ছিল প্রায় ৭২। ভারতের প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কথা বলিতেছি না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বৈদিক যুগের কথাও ছাড়িয়া দিই। বহু পরবর্তী যুগে গ্রাম, কাছোজ হইতে গাছার পর্যন্ত বিশাল ভারতের বিরাট সংস্কৃতির কথা ক্রমে ভুলিতে বসিলেও আমাদের নালন্দা, ওদন্তপুরী, তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি আজিও প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। এক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভারামসমূহে কম-বেশী দশ সহস্র ছাত্র ও তাহাদের অধ্যাপকগণ অবস্থান করিয়া বিদ্যাদান ও গ্রহণ করিতেন। তখনকার দিনের এই বিরাটত্বের কল্পনা কি স্বপ্নের মতই নহে? প্রাচীন ভারতে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হইত তাহা এখন আমাদের শুধু কল্পনারই বস্তু। সংস্কৃত একটি শ্লোক আছে—

যো দভ্যাং জ্ঞানমজ্ঞানম্
কুর্ধ্যাং বা ধর্মদর্শনম্,
স কুংত্রাং পুণিবাং দভ্যাং,
তেন তুলাং ন তদন্তবে।

পুরাকালে আমাদের দেশের এই জ্ঞানাহরণ-প্রবৃত্তি কতকটা সহজাতই ছিল। আহার নিদ্রার ন্যায় ইহা মানুষের অবশ্যকরীয়ে মধ্যস্থ পরিগণিত হইত। স্তব্রাং সেজন্য তখন অন্তরের দরদ ছিল। পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ অদম্য চেষ্টায় নিরক্ষরতা দূর করিয়া এক্ষণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষা প্রসার বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধনই ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূল কার্য-হইলেও, রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্বাস করেন, উচ্চশিক্ষার প্রভাবে শক্তি-স্মৃতি হইয়া পরিণামে তাহা হইতে দেশের কল্যাণই

সাধিত হয়। সেইজন্যই তাহারা শিক্ষার পথ সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকমুক্ত করিবার জন্য এত আগ্রহশীল।

সেখানকার রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্য শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার বিষয়ে যে প্রয়াস তাহা আমাদের এই শিশু গণ-তাত্ত্বিক রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়া তোলার জন্য আবশ্যক। বলিতে গেলে ইহাই এখন এখানকার অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্রকে গড়িবে সরকার, সেই সরকারকে গড়িবার ভার যখন জনসাধারণের উপর তখন সেই জন-সাধারণ যদি নিজের সত্যকার সম্ভাব্যতা বোধ-বিবজ্জিত থাকিয়া স্বার্থজ্ঞান বিরহিত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের কাম্য স্বথ-শান্তি উপভোগ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একান্ত জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই প্রথম ও প্রধান কার্য, কারণ জনশিক্ষাই গণতন্ত্রের প্রাণ। বলা বাহুল্য, এ কার্য-রাষ্ট্রের হইলেও এই রাষ্ট্রকে যাহার যেমন শক্তি সে বিষয় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই ব্যাপক শিক্ষার রূপ কি এবং তাহার প্রসার সহজে কি উপায়ে হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। বিশেষজ্ঞগণই সে ভার লইতে পারেন। অনেকেই মনে করেন, এই উভয় বিষয়েই পাশ্চাত্যের অনুকরণ আমাদের ঠিক উপযোগী হইবে না। নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য যথাসম্ভব অভিযান আরম্ভ করা আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা বিনা ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হওয়া একান্ত দরকার। একান্ত আড়ম্বর-পূর্ণ অট্টালিকা অথবা ট্রেনিং-প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট না হইলে যে হইবে না এমন কোন কথা নাই। প্রশস্ত চালাঘর, অনেক সময় বুকতল এবং শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা স্থলিক হইলেই হইতে পারে।

উচ্চ ইংরেজী স্কুল বা কলেজে বাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে এবং করিতে সক্ষম তাহাদের শিক্ষা বা শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া সমালোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জনগণের শিক্ষাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। সমাজবদ্ধ হইয়া স্বর্হভাবে জীবনধারণ করিবার জন্য নৈতিক বিনিয়াদকে ভিত্তি করিয়া যে সব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার দরকার স্কুলতঃ তাহা লাভ করার নামই শিক্ষা। আক্ষরিক বিদ্যার দ্বারা তাহা লাভ হওয়া অনেকাংশে সহজ হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়াও বহুপ্রকারে শিক্ষালাভ করা যায়। এদেশে সে উদাহরণের অভাব নাই।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বৈদিক যুগের স্থান ছিল বহু উর্দ্ধে, কিন্তু কন্যা বায় তাহা

ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ। পুৰিণজ বা গ্রন্থাদির প্রচলন তখন কমই ছিল। তখনকার লোক যে শিক্ষিত ছিলেন না একথা বলা চলে না।

প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিই, বেশী দিন নয়, অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেও আমরাই যৌবনকালে দেখিয়াছি কবির গান, কথকতা, বাত্ৰা, পাঁচালী প্রভৃতি সচরাচর অল্পশ্রুতি হইত এবং লোকে তাহাতে যথেষ্ট আকৃষ্ট হইত। তদ্বারা মনুষ্যজন্মের চরম ধর্ম যথা তাগ, সত্যপালন, দান, সত্যধর্ম-পালন, কর্তব্যপালন প্রভৃতির জলন্ত উদাহরণ রাজা হরিশ-চন্দ্র, বাজ্রবাহু, কর্ণ, দধীচি, রামচন্দ্র, সীতা, শৈব্যা, শিবি, নচিকেতা প্রভৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া আনন্দ উপভোগের সহিত তাহা অতি সহজে অন্তরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত। আর অনেকেই অশেষ শ্রদ্ধার সহিত তাহা আজীবন স্মরণ রাখিতেন। তাহা হইতে কত সহজে অলক্ষিতে নৈতিক চরিত্রকে সজল করিয়া মনুষ্যজন্মের দ্বারা সমগ্র জাতীয় চরিত্রের মান উন্নত করিত তাহা চিন্তার অবসরও এখনকার নগরসভ্যতাবিলাসী শিক্ষিতাভিমাত্রীদের নাই। বাহিরের সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের সহিত যদি ভিতরের সজ্জতি না থাকে তবে তাহার পরিণাম কখনও শুভ হইতে পারে না।

বাত্ৰা, কথকতা প্রভৃতির কথা যাহা উক্ত হইল সে সবার উদ্দেশ্যই ছিল আনন্দদানের সহিত লোকশিক্ষা প্রচার। সাধারণের নৈতিক জীবনকে গড়িয়া তোলাই পালা-চরিত্রাদেব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহাকেই লোক-নাহিত্য বলিত। স্বল্প ব্যয়ে সহজে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্ভব সিদ্ধ হইত, অধুনা শিক্ষাক্ষেত্রে তদনুরূপ কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। আরও এক কথা, এখনকার স্কুল স্কলেজের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা শিক্ষা-মন্দিরের সংস্কারভাতির সঙ্গে সঙ্গে বিনা চর্চায় যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন গাছা হইতে পারিত না। তাহা একেবারে হ্রস্ব-মনে ক্ষমূল হইয়া উত্তর-জীবনে কার্যকরী হইত। এখন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঐহাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়গুলিতে যত যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাহার চর্চা না থাকিলে তাহা আর বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

যাহা জীবনে পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারা যায় না, মন শিক্ষার মোহ সকলের পক্ষে শোভন হইতে পারে। মনুষ্য-জীবনে জ্ঞানলাভের সহিত যদি বিশ্ব-জ্ঞানলাভের উচ্চশিক্ষা অর্জন করিয়া মানব-কল্যাণের হায়ক হইতে পারা যায়, তদপেক্ষা মানুষের কাম্য আর হইতে পারে? কিন্তু নানা কারণে কলেজের শিক্ষালাভ

উপস্থিত অবস্থায় কমসংখ্যক যুবক যুবতীর পক্ষেই সম্ভব। আমার বক্তব্য, মানবতার সাধনা ভুলিয়া শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিয়া মোহে ভুলিয়া থাকিলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কখনও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের যুবসম্প্রদায়কে মনুষ্যজন্মের সহিত জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাতির কথা ভাবিতে হইলে একথা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না যে, শুধু শহর লইয়াই জাতি নহে। পল্লীসমাজকে অবহেলা বহুপ্রকারে আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির মূল। শহরের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার অহমিকায় সাধারণ অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের স্বখ-দুঃখে উদাসীন।

মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল চিন্তাশীল মনীষীর কথা—পল্লী-সমাজের উন্নয়ন ব্যতিরেকে, তথাকার অধিবাসীদের মানুষের মত বাঁচিবার জন্ত সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার, স্বযোগ করিয়া দিতে না পারিলে পাশ্চাত্য সভ্য দেশসমূহের দ্বারা তথাকথিত গণ-তন্ত্রবাদ শুধু ধনিক ও কতিপয় শিক্ষিতের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে যখন নগরসভ্যতা এতটা বিস্তৃতিলাভ করে নাই, যখন দরিদ্র ও ধনিকের মধ্যে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য এত প্রকট হইয়া উঠে নাই, তখন সাধারণ পল্লীর অবস্থা এখনকার অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা বাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও সেই গ্রামমুখী হওয়া ভিন্ন আমাদের শ্রেয়ঃ নাই। কিন্তু তাহা যদি কালপ্রভাবে হয় ত আবার কোন দিন হইতে পারে; নচেৎ নাগরিক স্বথস্ববিধা ছাড়িয়া কয়-জন বাইতে চাহিবেন জানি না। স্বতরাং এখন পল্লীর সমৃদ্ধির জন্ত চেষ্টিত হইতে হইবে। সেজন্য প্রথম আবশ্যক সরকারী প্রচেষ্টায় জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

জনশিক্ষা ব্যাপক করিতে হইলে দেশ কালকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে সেই প্রাচীন যুগে কিরিয়া গিয়া শুধু সেই সেকালের গ্রামীণ শিক্ষার আশ্রয় লইলেই চলিবে না। এক্ষণে অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট বয়স অবধি কিঞ্চিৎ আক্ষরিক বিদ্যালয়লাভ করা সকল ছেলে-মেয়ের একান্ত দরকার। সেজন্য প্রথমে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা আবশ্যক এবং তাহা অনুসরণ করিয়া আধুনিক প্রণালীতে পাঠ্য পুস্তকাদি হইতে শিক্ষার সহিত আধুনিক বচিসম্মত কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে অনেক উপকার হয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যখন রেডিও সাহায্যে রজন,

সীমন, সঙ্গীত এমন কি ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইতেছে তখন ম্যাজিক লঠন, বায়োস্কোপ বিশেষ করিয়া সিনেমার সহায়তায় যথেষ্ট কাজ পাওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক অল্পরূপ ফিল্ম প্রস্তুত করাইয়া, শুধু পুরাণ উপপুরাণাদি হইতে আদর্শ বিষয়গুলি দেখান বা শুনানই নহে, তদ্বারা বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানাদি বিষয়েরও অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হইলেও শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অল্পপাতে গ্রামাঞ্চলে যথাসম্ভব সর্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও নৈশ বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিয়া ও তাহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যক। এ সবার জন্য চাই সরকার ও জনসাধারণের শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত আন্তরিক প্রচেষ্টা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বহু ব্যয়সাধ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃত রূপ কি জানি না। মনে হয়, তাহা কার্যে পরিণত হইলে শিক্ষা বিষয়েও বহু গলদ নিরসন হইয়া প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বিকাশের সহায়তা হওয়া দূরে থাক, শরীর ও মনের উৎকর্ষসাধনের জন্য যে সব শিক্ষার আবশ্যক তাহাও ঠিকমত লাভ করা সম্ভব হয় না, হয়ত সেসব বিষয় সহজসাধ্য হইতে পারিবে। উত্তর জমিকে উর্বর করিবার সুযোগ দিবার জন্য প্রাথমিক কাজ হিসাবে যেমন হীরাবুগু, দামোদর, ময়ূরাসী

প্রভৃতি পরিকল্পনা রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে গবর্ণমেন্ট কৃতসঙ্কল্প হইয়া কাজে লাগিয়াছেন সেইরূপ দীর্ঘ অবসাদের ফলে যে জনসাধারণের হ্রদর আলোকহীন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করাইবার জন্যও প্রথম বিরাট পরিকল্পনার আবশ্যক তাহার পর শিক্ষারূপ আবাদের জন্য কর্ষণ, বপন, সেচনঃ কথা।

সমগ্র ভারতের কথা এখানে না-ই ধরিলাম। বাংলাদেশ পরীক্ষামুহে, যেখানে শতকরা ৭৮ জন বাস করে—তথাকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি।

শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের চিন্তা ও প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য তাহাদের এদিকে অবহিত হওয়াই এখন আবশ্যক। অল্প বয়সের নিমিত্ত যেমন দেশব্যাপী আন্দোলন স্বতঃই সৃষ্ট হইয়াছে এজন্য সেইরূপ সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষার সখ্য অবচ্ছেদ্য। গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে আদর্শ স্থির করিয়া কর্ষণস্বা গ্রহণ করা আর প্রয়োজন। তবে ইহাও স্বীকার্য, তাহাদের সদিচ্ছা ও সঙ্কল্পের সহিত বেসরকারী উদ্যম এবং সহযোগিতা প্রয়োজনীয়তা আছে।*

* হগলী ঘুটিয়াবাজার শ্রুতি-মন্দিরের (দি হুল অব্ কিলিক্যা কালচার) পারদোৎসব ও জনশিক্ষা বিভাগের উদ্বোধন সভায় সভাপতি অভিভাষণ। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৫৮।

পদ্মা

শ্রী দুর্গাদাস সরকার

পদ্মার জল ? বাহুরের আঁখিজল।

পদ্মার বুকে কল্পন ছলাৎছল।

এই পদ্মার ছিল পদ্মের বন,

নাথের হুরে ছিল কি অহরহন।

আমরা সবাই উজ্জ্বল পদ্মার

মারেতে ভেসেছি সকালে ও সন্ধ্যায়।

পদ্মার বুকে ভাসায়েছি ঘান বই,

সেই পদ্মার চিহ্ন তাহার কই ?

হাফা হাওয়ার কাঁপা পদ্মার ঢেউ

মাঝেমি এমন আছে ভো জানি না কেউ।

সেই ঢেউয়ে আজ অদ্ভুত অভিলাপ ;

পদ্মার ঢেউ—পদ্মার ঢেউ সাপ

জন্মে জন্মের বুকেতে জন্মের এসে,

আজো কান্নি তবু পদ্মাকে ভালোবেসে।

পদ্মার জল ? বাহুরের আঁখিজল।

পদ্মাতে হুর কল্পন ছলাৎছল।

ত্রিসাধনা চট্টোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ; তথাপি গাড়ীতে গরম অলস বোধ হইল। একে সমুদ্রের তীরে শীত জমাট বাঁধিবার সময় পায় না; তার উপর আমরা ক্রমশঃ বিমুগ্ধতার নিকটবর্তী হইতেছি। পথের দৃশ্য মনোহর। পাহাড়ের বাকের বাকের লাকানো শক্তকেন্দ্র, ভারল বন্যায়ী পশুচরী মুকরাকি, স্থানে স্থানে আত্ম, কদলী ও নারিকেলবৃক্ষ-বীধি—সমস্তই চকু জুড়ায়। দেয়। পথে কয়েকটি ‘টামেল’ পড়িল। ইহার মধ্যে দুই—একটি বেশ বড়। উজ্জল দিবালোক হইতে লহসা নিবিড় অন্ধকারের কালগ্রাস মনকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে।



ফুইলম হইতে সমুদ্রকে প্রায় লম্বী করিয়া চলিয়াছি।
কখনও ঘন বৃকশ্রোণীরের আড়ালে সমুদ্র হারাইয়া পিঠাছে,
আবার কখনও মারিকেলফুজের কাঁকে তাহার ভট্টরেণা
সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

নারায়ণদেবের ভাণবৎ শরীর পিতল জলে দ্রব হইল।
কিছু নদে নদে অষ্টদ্বারিণি আলো ব্যক্তিভে লামিল। উভয়-

সকালে বহর লইয়া জামা গেল, 'ট্রেট এন্ড এন্ড' বাস
বেলা পৌনে ভিন্নটার সময় জিব্রেন্স হাটিকা লগ্না লাক্তে
পাঁচটার কতাক্ষাতিকার পৌছিবে। জিব্রেন্স হইতে
কতাক্ষাতিকার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল ; সিমেন্ট কংক্রিট বীণাম
হাতা প্রায় চল্লিশ মাইল। পরিবেশও বনোয়াম।

জীবেন্দ্রেরে বর্ণনীয় বিশেষ কিছু মাই। লক্ষ্যভীরে
 সুভদ্রের অভাব। সর্বাঙ্গেকা ভাল লাগিল 'পরমাভে'র
 মন্দির। দক্ষিণ-ভারতীয় ঝাঁতে প্রভুরনির্ভিত অতি বৃহৎ
 মন্দির। মন্দিরের দেবতা বিষ্ণু অমৃত পয়সে। বৃষ্টি অতি
 বৃহৎ—কিছু মন্দিরের অভ্যন্তর বধারীতি অদকারময়।
 তেলের বাতি সে অদকার হুয় করিতে পারে না। ঠাহর
 করিয়া বৃষ্টির অবহান বুঝিতে হয়। তথাপি বৃষ্টি ও পরিবেশ
 ভাল লাগিল।

মন্দিরটি সন্তানসম্ভাবনের জন্য নির্মিত হইলেও ইহা রাজকীয় মন্দির। মন্দিরে জিবাহুদের মহাভাজা আসিয়া পূজা করেন, ইহা বহুবিদের সীতি। দ্বারদেশে 'বেরদেট' হস্তে সিপাহী থাকে। ইহা রাজকীয় প্রভাবের নিদর্শন।

পুরুষব্যক্তিগণ কঠিনশ্রমের উপরিতাপ হইতে বহু উদ্ধৃত
কমিষা বলিবে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা বহু প্রাচীন রীতি,
ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় না। সম্যক
আবস্থার বহু দুল্লভ। পুরোহিতের বল অপেক্ষাকৃত নিম্নগত,

আর দক্ষিণায়ই লম্বাট থাকে। এখানে তুমিট হইয়া এখান
করিবার গীতি নাই, হুজুহতে সম্ভার করিতে হয়।

সরকারী বাস-এর ব্যবস্থা ভাল। ইহা সমরসত্ত্ব হাফে,
অনিরমিত তাবে হাতার দাঁটার না, আর সুনিরমিত গতিতে
চলে। বসিবার ব্যবস্থাও উত্তম, 'সিট' পূর্ণায়ে বিচার করা
সরি।



বাসা বিবেকানন্দের মাঝে উৎসাহিত মন্ডরান শৈলসুগল

জিবেজম রেল-ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ হইতেই কতাকুহারিকার
বাস হাফে। আতাই বটীর বাজা। তারতবর্ষের দক্ষিণ
প্রান্তের শেষ সীমা দেখিবার ভক্ত প্রাণ চকল হইয়া আছে।
মনে মনে জলনা-কলনার ভক্ত নাই।

পথের চারিদিকে সন্দের শোভা-সভার। সতেজ সবুজ
বাগের কেত মাটির সহিত গলাগলি করিতেছে। পাশে
কলসীফলের সারি আর তার পাশে নারিকেলছত্রের বন
বিভার। একিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে,
কোনট শৈবাল ও লক্ষ্মণানল, আবার কোনট রক্ত ও বুলর।
পথে কয়েকটি বাজার পড়িল, তাহারের মধ্যে সর্কপ্রধান
'মাপের করেল'। এখান হইতে রাজ্যের 'টিনেভেলি'
জেলার নবর টিনেভেলি নহের বাইবার হাতা আছে।

কবে বাস কতাকুহারিকার দিকটবর্তী হইল। একিকে-
ওদিকে হই-একটি বাড়ী। তার পর ছোট ছোট দোকান—
চতাই হাতা, আর পোট আপিসের কাছাকাছি 'আসিয়া
চতাই শেষ হইয়াছে। সেই চতাইয়ের সীমার পৌছিয়া যে
হুজু চোখে পড়িল তাহা সত্যই অনির্ভরশীল। সমুখে ভারত-
মহাসাগরের উত্তর জলোচ্ছাস, বামে বন্দোপসাগরের আবর্ভ।
আর লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দক্ষিণে আরব সাগরের উজ্জল
ভরদ। অবন্ত মহাসাগর, সাগর আর উপসাগরের সীমারেখা
কোথায় নাই—এক দর্পকের মনে হাতা। সমুখে চান্দ্র হাতা
দোকাঁ পিরা যেম সমুজের বুকে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। পাশেই
দেখী কতাকুহারীর মলিন, তারপর বিখ্যাত হ্রদের বাট—
মাত্তীর্ঘ।

সরকারী বাস সরকারী হোটেলের প্রাঙ্গণে আসিয়া

ধামিল। আদানের এখানেই থাকিবার কথা। কিন্তু
আসিবার পূর্বে থর টিক করা হয় নাই। হোটেলের লাবায়ণত:



কতাকুহারিকার আরব সাগরে হর্ব্যাত

ভিত্তি বেশী হয় না। কিন্তু এখন হুটির সময়। এখান-ওখান
হইতে কয়েকটি পরিবার হুট কাটাইবার ভক্ত কতাকুহারিকার
আসিয়া হুটরাছে। ভবাপি ভাগ্যক্রমে একখানা বর হুটরা
গেল। হোটেলের ব্যবস্থা ভাল। বিজলীবাতি ও
পাখা আছে—হোটেলের দিকের ভারমামোতে চলে। তবে
হ্রদের মলের অভাব।

হোটেল হাতাও এখানে একটি সরকারী ডাকবাংলো
আছে। আর আছে একটি বেসরকারী হোটেল ও বর্ধশালা।
বর্ধশালার বাজীর ভিত্তি বধেট।

কতাকুহারিকা একটি ছোট গ্রামবিশেষ। গ্রামে বাজার
নাই—অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি দোকান আছে। দশ মাইল
দূরবর্তী 'মাপের করেল'—এ সমস্ত সরকারী ভিষি পাওয়া যায়।
কলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—হুটিট আদারল। বহুপ্রকারের কলা
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সর্কাপেকা অহুজ বস্তুটিকে
অখাণ্ড বলিয়া মনে হইল।

কতাকুহারিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্য নয়ন হুজু করে।
ভিন্ন দিক বেহিয়া অগাধ জলরাশি। তীরে মাঝে মাঝে
সমুদ্র নারিকেলছত্র। তীর হইতে একটু দূরে সমুজের মধ্যে
উত্তপির উপলব্ধ। অহুজ দিক্চক্রবালে বেঘের আভাল
হইতে প্রত্যন্তে দিনমণির আদ্যপ্রকাশ আর সন্ধ্যার নিভরদ
সমুদ্রবকে তাহার আদ্যবিলোপ; এই বর্ধ্যোদর ও হর্ব্যাত
যে একবার দেখিয়াছে সে আর তাহা জীবনে তুলিতে পারিবে
না। কিন্তু প্রকৃতির সন্দে একার না হইতে পারিলে এই
সৌন্দর্য্য সবপ্রত্যয়ে উপভোগ করা সম্ভব নহে। এই অনির্ভ-
রশীল সৌন্দর্য্যে হুজু হইয়া খ্রিষ্টেততবেব এখানে তাবে সমাহিত
হইয়াছিলেন। মাত্তীর্ঘে অবগাহন করিয়া বানী বিবেকানন্দ
আগরদীঘর উত্তরণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রবকে হুইট সমান
আকারের উপলব্ধ উত্তপিরে বানীজীর নাম এখনও বহন
করিয়া রাখিয়াছে।

কতাকুমাৰিকা হিন্দু শ্ৰেষ্ঠ ভীৰৱৰ অভ্যন্তৰ। 'সমুদ্ৰ' ভীৰে দেবী কতাকুমাৰিকায় মন্দিৰ। হৰিণাপৰেৰ অভ্যন্তৰ মন্দিৰেৰ ভুলনাৰ এই মন্দিৰ অপেক্ষাকৃত ছোট। প্ৰায় হাজাৰ বৎসৰ পূৰ্বে প্ৰভু-নিৰ্মিত এই মন্দিৰ জ্যোতিৰ্ভাৱেৰে নিৰ্দেশন বহন কৰিছে। দেবীৰ মূৰ্তি কালো পাথৰে নিৰ্মিত। অগুৰু তাহাৰ সৌন্দৰ্য, সৰ্ব্বদেহে লাবণ্য বেদ মূৰ্তি বৰিছে। জ্যোতিৰ্ভাৱেৰে ভাৱেৰে শিলেৰে হান বে কত উচ্চ হিল তাহা এই মূৰ্তি দেখিলেই বুঝা যায়। দেবী কতাকুমাৰীৰ কল্পনাটিও চমৎকাৰ।

দেবী কতাকুমাৰী ছিলেন বৰ্ণেৰ অঙ্গৰ। দেবাদিদেব মহাদেবেক পতিয়ে বৰণ কৰিতে তাহাৰ বাসনা হয়। তিনি মহাদেবেক তাহাৰ আকাঙ্ক্ষা নিবেদন কৰেন। কিন্তু মহাদেব তাহাকে গ্ৰহণ কৰিতে অস্বীকৃত হয়। তিনি বলেন যে, মহাদেবেৰ পত্নী হইতে হইলে যে শাৰীৰিক ও মানসিক ঐশ্বৰ্য্য থাকা উচিত তাহা তাহাৰ নাই। সেৱত তপতাৰ দৰকাৰ।



দেবী কতাকুমাৰী

দেবী কুমাৰীৰ মন্দিৰে বাইবাৰ স্নাত্ত

দেবী কতাকুমাৰী তপতা কৰিবাৰ আশ্রয় প্ৰকাশ কৰেন। তাহাৰে তাহাকে তাহাৰ আবাস কৈলাস হইতে বহুদূৰ সন্তবৰে গিয়া তপতা কৰিতে বলেন। কলে, দেবী কুমাৰী গৰভেৰ শেষপ্ৰাণে আসিলা তপতাৰ মৰ হন। আকাঙ্ক্ষিত হইতে বহুদূৰে থাকিলা তাহাৰ প্ৰতি অল্পৰূপ বৃত্তি কৰা ক হুহুহ সাধনা। সেই সাধনা, সেই তপতাই দেবী কুমাৰীৰ। বীৰ সে সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় নাই—মহাদেবেৰ আশীৰ্বাদ পাও এখনও তাহাৰ অমূৰ্তে বটনা উঠে নাই।

আৱত্তিৰ সময় দেবী কুমাৰীকে সুলল বেণে সাকান হয়। তে পৰিবেশটি অগুৰু একটী কাহিনীৰ মত মনে হয়। বৰ্ষকেৰ লে মন্দিৰ ভৰিছে। মনে মনে তাহাৰ দেবী কুমাৰীৰ ইচ্ছা সাধনাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰকাশিবেদন কৰে। দেবীৰ মহাদেবী ইয়াৰ সাধনা বাহাৰে সুলল হয় তাই তাহাৰ কামনা কৰে।

মন্দিৰেৰ মণ্ডো অভ্যন্তৰ ভাৱতবৰ্ণকে পুণ্যৰ বেদ কিৰিছে

পাওনা যায়। সহস্ৰ বৎসৰ পূৰ্বে এই দেবালয়ে ঠিক যে প্ৰকাৰে দেবীৰ পূজা হইত এখনও পূজা সেইৰূপেই হয়। পূজাৰ বিধি বা পদ্ধতিৰ কোনও পৰিবৰ্তন হয় নাই। অবশ্য একবা দাক্ষিণাত্যেৰ প্ৰত্যেক দেবালয় সম্বন্ধেই বাটে।

'মাতৃভীৰে' পুণ্যস্থান হিন্দু বহু আকাঙ্ক্ষিত। পৰম্পৰাৰ মাতৃহত্যা কৰিছে মহাপাতক কৰিছেছিলেন। সেই পাপ হইতে বচা পাইবাৰ কত তিনি এই ভীৰে স্নান কৰেন। সেই স্নানপুণ্যে তাহাৰ মূৰ্তি হয়। মাতৃভীৰে স্নান তাই "সৰ্ব-পাপৈঃপ্ৰমুচ্যতে"—সকল পাপ হইতে মুক্ত কৰে।

মাতৃভীৰে অবগাহনেৰে হানট বতাই মনোৱন। উম্মুক্ত সমুদ্ৰকে হইলেও বাটেৰ চাৰিপাশ উপলব্ধে ভৰা। বাটে চেউৱেৰ আঘাত লাগে না, আৰ লাগিলেও তাহাৰ প্ৰচণ্ডতা থাকে না। বাটেৰ সিঁতি বাধানো, মনে হয় পুহুৰেই স্নান কৰিতেহি। বাটেৰ উপৰে বলিবাৰ কত একটী শোলাকৃতি চৰম আছে—তাহাৰ হাৰ পাথৰেৰ। বহু দূৰ হইতে চৰমটি দেখা যায়।

পূৰ্বেই বলা হইয়াছে, কতাকুমাৰিকা একটী স্ত্ৰী প্ৰায় মাজ। লোকসংখ্যা অল্প, বসতিও বন মছে। অধিবাসীৰা দখিল। তাহাৰে উপকীৰিকা—ছোটখাটো ব্যৱসায় ও কৰি। অৱ কিছু মণ্ডকীৰীও আছে। তাৰা ভামিল।

হিন্দু মন্দিৰেৰে সহিত সামন্ত্য ৰাখিৰাই বেদ এখানে একটী নীৰ্দ্ধা তৈয়াৰী কৰা হইয়াছে। নীৰ্দ্ধাটি পুণ্যতন।



ঠেঁ ধোঁটেলের পাশ হইতে সন্দের দৃশ্য

অশিক্ষিত ও ভয়ানকভাবে নির্বোধিত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টি-বর্ণপ্রচার করাই নাকি ইহার উদ্দেশ্য।

মাতৃভাষা সন্দের, দেবীদর্শন, প্রভৃতি ও সন্দের সন্দেরকে হিন্দুধর্মের উন্নয়ন ও অস্ত্র দেবীতে দেবীতে করেকটা দিন যেন যথেষ্ট মত কাটায়া গেল। ছোট্টেলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই দাক্ষিণাত্যের লোক। একটা ইউরোপীয় সম্প্রতিও ছিলেন।

দেবী কুমারীকে প্রণাম করিয়া আবার ভ্রাম্যমাণ হইলেন। এবার টমেন্টেলের পথে সাহসার।

গোলআলু-সংরক্ষণ

ঐদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পরিপূরক খাদ্য হিসাবে গোলআলু অতি উচ্চ হান অধিকার করে; বিশেষতঃ বর্তমান খাদ্য-পরিস্থিতিতে গোলআলুকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার। ইহার চাষের বিস্তৃতির পথে বর্তমান সময়ে যে সকল অন্তরার আছে তাহা যথাযথ ভাবে দূর করাও দরকার ও সেতুস্থানীয় ব্যক্তিগণের কর্তব্য। আলুর চাষ ও সংরক্ষণের জন্য খুবই সাবধানতা অবলম্বন করাও উচিত। আলুর শক্ত অনেক; মানানিধ পোকা ও রোগ আলুর খুবই ক্ষতি করে। কেবল যে এই সকল পোকা ও রোগ কেতে আলুর অনিষ্ট করে তাহা নহে, আলু কেত হইতে উঠাইবার পর যখন শুকায়ে রাখা হয় তখনও কতক পরিমাণ খুব বেশী। সময়মত বস্ত্র ও সাবধানতা অবলম্বন করিলে কেতে ও শুকায়ে আলুর ক্ষতি অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যায়। কেতে যখন আলু কুমার ভবন হইতেই এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কি প্রকারে আলু কিতাবে উৎপন্ন করিলে তাহা উহার কতক পরিমাণ কম হইবে সে বিষয়েও জ্ঞান থাকা দরকার। এ সময়ে পুণী জেলার কুমার খুবই পারদর্শী।

যে সকল কুমার আলু সংরক্ষণ করিতে চান, আলুর কুমারে জলসেচন সম্বন্ধে তাহাদের সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই দরকার। এই বিষয়ে পুণী জেলার কুমারের পদ্ধতি এইরূপ : আলু চাষের প্রথম দুই মাসের মধ্যে ১১০ দিন অন্তর একবার আলুর কেতে জলসেচন করা হয়; পরে হয় দিন অন্তর একবার সেচ দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে সময়মত এবং পরিমাণমত জলসেচনের ফলে কুমারে ‘কাটল’ বয়ে না। কুমারে সাহায্যে ‘কাটল’ না বয়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; কারণ ‘কাটল’ বয়িলে মাটির নিম্নে নুতন উৎপন্ন

আলু বাহির হইয়া পড়ে এবং সূর্য্যকিরণ ও বায়ুর সংস্পর্শে উহাদের রং সবুজ হয় এই অবস্থায় এক কুমার প্রকাপতি (tuber moth) উহাদের চোপের উপর ডিম পাড়িয়া যায়।

ভয়ানক কুমারের মধ্যে এই ব্যাধিও প্রচলিত আছে যে, পরিমাণমত ও উপযুক্ত সময়ে সেচের অভাবে মাটির নিম্নে আলু ‘গরম’ হইয়া যায়; এবং এইরূপ ‘গরম’ আলু বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। আলুর গোড়ার মাটি দেওয়া ব্যাপারেও সতর্ক হওয়া দরকার। একটাও আলু যেন মাটির বাহিরে না থাকে। সাধারণতঃ আলুর পাতা যখন হলুদে হইয়া যায় এবং শুকাইয়া যায় তখনই আলু উঠাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু আলু গাছের ডাঁটা (haulms) সম্পূর্ণরূপে ‘হত’ হইয়া গেলে আলু যদি উঠানো হয় তাহা হইলে এইরূপ আলুও বেশী দিন শুকায়ে সংরক্ষণ করা যায় না; এই ব্যাধিও কুমারের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইরূপ আলুতে শীত ‘পচ’ বয়ে। মাটিতে যখন প্রচুর আর্দ্রতা থাকে তখনই আলু উঠানো উচিত।

আলু সংরক্ষণ খুবই কঠিন ও সাবধানতার কাজ। আলু উঠাইবার পর কেতে যখন আলু এক এক হানে ভাঙ করিয়া রাখা হয় তখনও তাহাদের চোপের উপর প্রকাপতি ডিম পাড়িয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থাতেও আলু অনাহুত রাখা উচিত নয়। শুকায়ে রাখিবার পূর্বে আলু দোঁজে রাখিলে উহা ‘উত্তম’ হইয়া যায়। ইহাও আলুর পক্ষে কঠিন।

পুণী জেলার কুমার সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ করেন। কেতের নিকটে যখন গাছের ছাড়া-

মুজ এক শীতল হানি আলু সংরক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত। এখন রৌদ্রের সময়ে যেন সোকাহুজি ভাবে ঐ হানে রৌজ না আসে। সহজে এইরূপ হান পাওয়া না গেলে গাছের নীচে চালাবর নির্মিত করা হয়। এই বয়ের চারি বায়ের বেলা মাটি হইতে এক ফুট বা দুই ফুট উচ্চে থাকে, বাহাতে বয়ের ভিতর অবশেষে বারু চলাচল হইতে পারে। ফুকের বা চালাবরের তলদেশ করেকটি খণ্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক খণ্ড ৪.৫ ফুট প্রশস্ত। আলুর পরিমাণের উপর খণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। খণ্ডের প্রশস্ততা পাঁচ ফুটের বেশী করা উচিত নয়। ইহার বেশী হইলে খণ্ডের মধ্য-ভাগের আলু অতি শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক খণ্ডের চারি বারে এক হইতে দশ ফুট প্রশস্ত এবং ছয় হইতে আট ইঞ্চি পতীর একটি কলের মালা



পুণ্য এই বরবের চালাবরে গোলআলু সংরক্ষিত হয়

কাটিয়া দেওয়া হয়। মালা কাটিবার সময় যে মাটি পাওয়া যায় তাহা বার মালায় পাক প্রস্তুত হয়। ইহার পর প্রত্যেক খণ্ড কলে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। দুই-এক দিন খণ্ডটি এইরূপ ভাবে রাখিলে মাটি জল শুষিয়া লইবে। খণ্ডটি সম্পূর্ণ শুষাইয়া গেলে লত-উষিত আলু কিংবা পুরের উঠানো আলু খণ্ডের উপর পাতা করিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ পাতা চার ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। পাতাটি একটি পাতলা দিমপাতার আবরণে আবৃত করা হয়। ইহার পর পাতাটি সম্পূর্ণ ভাবে তিকা বাসের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে, আচ্ছাদনটি ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি পুরু হইবে। আচ্ছাদনটি কলের মালায় পাড়ের বাহিরে আসিয়া পড়িবে। পাতাকে বাসের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করা খুবই কৌশলের কাজ। ইহা উপযুক্তভাবে করিতে পারিলে পাতার মধ্যে প্রকাণ্ডতর প্রবেশ বহুলপরিমাণে নিবারণ করা যায় এবং সংরক্ষিত আলুও 'ঠাণ্ডা' থাকে। এইরূপ ভাবে বহু পাতা পাশাপাশি করা হইতে পারে। কখনও কখনও পাতার উপর অল্প পরিমাণ চিনি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার কলে পিপীলিকার আবির্ভাব হয় এবং উহারা প্রকাণ্ডতর ভিন্ন, পুতলি প্রভৃতি বাইরা কলে।

বাসের আচ্ছাদন দিবার পর কেবল মাত্র দেখিতে হইবে যে পাতার ভিতরকার তাপ খুব নিম্নে যেন থাকে। সাধারণতঃ

মালার জল তড়ি করিয়া এবং তিন-চার দিন অন্তর বাসের আচ্ছাদনের উপর জল ছিটাইয়া দিয়া তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই জল বধন বাসে পরিণত হয় তখন উত্তাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং পাতার ভিতরের তাপ নিম্নে থাকে। মালার জল মাটি চোরাইয়া গিয়ে চলিয়া যায় এবং পাতার তলদেশের মাটিকে আর্দ্র ও শীতল রাখে। পাতা যদি ভাল ভাবে প্রস্তুত করা যায় এবং উহার ঠিকমত তত্ত্বাবধান হয় তাহা হইলে পাতার ভিতরের তাপ ৮° ক. ডিগ্রীর উপরে উঠে না। এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষিত আলু 'বামিরা' যায় না, শুক এবং শীতল থাকে। মালার জল যেন পাতার প্রবেশ না করে, কারণ তাহা হইলে কলের সংস্পর্শে আসিয়া আলু অতি শীঘ্র পচিয়া যাইবে।

বিক্রয়ের সময় না আসা পর্যন্ত পাতা এইরূপ ভাবেই রাখা হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলক মাঝে মাঝে পাতা খুলিয়া দেখেন এবং পাতার মধ্যে যদি কোন আলুতে পচ ঘরে তবে তাহা বাহিরা কেলিয়া যেন। দেখা গিয়াছে, এই ভাবে আলু সংরক্ষণ করিলে তিন মাস, এমন কি ইহার বেশী সময় পর্যন্ত ইহা ভাল অবস্থাতেই থাকে।

বিপদ হুকের সময় উপরোক্ত প্রণালীতে আলু সংরক্ষণ করিয়া "ডিকেল ডিপার্টমেন্ট"কে সরবরাহ করা হইত। কতর পরিমাণ খুবই কম ছিল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈরাগ্যের বাণী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তখন অধ্যাপনা করতাম শান্তিনিকেতনে। ইংরেজী ছাত্রিণি কি সাতাশ সাল হবে। গুরুপত্নীতে বাবার রাস্তায় আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে কবির শিলাইদহের জীবন সম্পর্কে যে কথা হয় তা স্মৃতির ভাণ্ডারে আজও জমা আছে। নন্দলালবাবু বলেছিলেন, কবির সঙ্গে একবার তিনি শিলাইদহে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময়ে ভোরে উঠে এক দিনও তিনি দেখেন নি কবিকে বিছানার শুয়ে থাকতে। কোন্ ভোরে উঠে কবি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বেশ মনে আছে নন্দলালবাবু এই প্রসঙ্গে পুষ্পিত পাদপের কথা এনেছিলেন। গাছ ফুলে ফুলে কত স্বন্দর! এই ফুল ফোটারো পিছনে রয়েছে ভিতরে ভিতরে গাছের স্বকঠিন তপস্তা। এই তপস্তা চলেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। কবির তপস্তার দিকটাও খুব অল্প লোকেই জানত। শিলাইদহের আর সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়ীর মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দে তিনি ডুবে আছেন। কেবল বাইরে থেকে বার্ষা তাঁকে দেখেছে তারা ভারতের পায়ত না কি বিরাট তপস্তার আগুন ছিল তাঁর সাহিত্য-সাধনার পিছনে।

নন্দলাল কবির যে-তপস্তার কথা আমাকে বলেছিলেন সেই তপস্তায় কবি বিশ্বাস করতেন। ‘বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’—নৈবেদ্যের এই পংক্তিটি আউড়ে অনেককে বলতে শুনেছি, আত্মপ্রকাশের জন্য কঠিন তপস্কর্য্যার প্রয়োজন আছে বলে কবি বিশ্বাস করতেন না। যে শুদ্ধ বৈরাগ্যচর্চা জীবনকে অস্বীকার করে, উড়িয়ে দেয় এই জগৎকে মায়া বলে তাকে তিনি নিশ্চয়ই সন্দেহের চোখে দেখতেন। ‘মরিতে চাহি না আমি স্বন্দর ভুবনে’—এ তো ছিল কবিরই কথা। তিনি ছিলেন জীবন-পূজারী—মুক্ত, শুদ্ধ পূর্ণ জীবনের পূজারী। এই মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ জীবনের গোরবে পৌছান সম্ভব শুধু ত্যাগের মধ্য দিয়ে—এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় ছিলেন। বার্ষা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তাদের পথকে কবি যেমন স্বীকার করতে পারেন নি, তেমনই স্বীকার করতে পারেন নি তাদের পথকে বার্ষা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি হয়ে অরূপের রূপের লীলাকে কেমন করে তিনি অস্বীকার করতে পারতেন? সৌন্দর্য্যকে, ভোগকে, আনন্দকে কখনই তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন আনন্দলোকে উপনীত হবার জন্য নিরাসক্ত হওয়ার বিপুল প্রয়োজনকে। নিরাসক্ত হতে পেয়েছে বার্ষা, কবির ভাষায়, ‘তারি ভোগবতী পার

হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে।’ আত্মপরিত্যে কবি অনন্তকরণীয় ভাষায় লিখেছেন :

“ইশোপনিষদের যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেরেছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যজেন ভুগ্নীনাঃ, যা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারি মধ্যে চিরন্তন, সোভ কোরো না। কাব্যসাধনার এই মন্ত্র মহাবল্য। আসক্তি বাকে যাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে শ্রানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অরুচিই সে শ্রান হয়।”

‘বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়’—এই কথা বে কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল তিনি কিন্তু আসক্তিকে কোথাও প্রাশ্রয় দেন নি। ভোগকে শোভ থেকে এবং সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে উদ্ধার করবার কথাই তাঁর সাহিত্যে আমাদিগকে বারংবার শুনিয়েছে এবং সেইজন্যই তাঁর সাহিত্যে অনায়াসে মহৎ সাহিত্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি তাঁর *A Study of History*’র এক জায়গায় লিখেছেন :

We have now, perhaps, established the truth that ease is inimical to civilisation.

মাহুষের সভ্যতার আর প্রগতির পথে আরাম যে প্রচণ্ডতম বিঘ্ন—এই কথাটা টয়েনবি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন এবং আপন উক্তিকে ইতিহাসের নানা নজির দিয়ে প্রমাণিতও করেছেন। রবীন্দ্রনাথেরও একই কথা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ জনৈক শিষ্যকে লিখেছিলেন : “ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছে?” বিবেকানন্দের অভিধান জড়তার এবং আরামপ্রিয়তার বিরুদ্ধে। তাঁর কণ্ঠে দুঃখের, সংগ্রামের আর মহাবীর্য্যের জয়ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের মতই মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন, দুঃখবরণের ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আসে নবজীবনের প্রাবন। তাই জাতিকে অমৃতের তীরে পৌঁছে দেবার জন্ত তার কানে তিনি শোনালেন মরণের জয়গান।

“কিসেরই বা হৃৎ, ক’দিনের প্রাণ ?

এ উঠিয়াছে সংগ্রামগার,

অবর মরণ রক্ত চরণ

নাচিছে সঙ্গীরবে।”

রবীন্দ্রনাথ—বঙ্গের ও সকের

হৃদয় তুবনকে তিনি সমস্ত স্বপ্ন দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে ছিল আনন্দের মন্ত্র, জীবনের প্রতি তাঁর অতীত ছিল প্রবল এবং প্রচুর। বৈরাগ্য মুক্ত মহাজীবন তিনি কামনা করেছিলেন নিজের জন্য—জাতির জন্যও তাই কামনা করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি যখন জীবনের আস্থানে দিক থেকে দিগন্তের চলেছে তখন তাঁর স্বদেশ-কর্মকীর্তিহীন হয়ে পড়ে থাকবে পথের এক পাশে—এই চিন্তা কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু প্রগতি সত্ত্ব গুণ চণ্ডার মধ্য দিয়ে। কোথায় সেই বীরের দল যারা চলবার সাহস রাখে জানা থেকে অজানায়, কূল থেকে অকূলে, বন্দরের নিস্তরঙ্গ জলরাশি থেকে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্কুল বকে? সমাজের প্রবণ ‘পাকা’দের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না—একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। বিবেকানন্দের মতই তিনি নবীনদের কাছে পাঠালেন তাঁর দুর্জয়ের আস্থান। তাদের ভবিষ্যৎ খুব নিরাপদ—এমন মিথ্যা আশার কথা তাদের তিনি শোনালেন না। বাপ-পিতামহের প্রতিশ্রুতি হবে না বারা, পুথির কথা না কপটে বারা বলবে উন্টো কথা তাদের নিম্না দেশে দেশে ঘটেবেই, তাদের বিপদ পদে পদে ঘটবেই। রবীন্দ্রনাথ তাই জাতির যৌবনকে শোনালেন জীবন-রাত্রির বজ্রনাগের কথা। ‘কান্তনু’তে সর্দার বলেছে ‘সকট থেকে সকটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দারি’। দেশের আসল ‘সর্দার’ তো কবিরাই। কবি ছইটম্যানের ভাষায় কবি হচ্ছেন “The leader of leaders”। কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা পায় ভাব থেকে আর এই ভাবসম্পন্ন জাতিকে দান করে কবিদেরই রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈপ্লবিক ভাবের প্রেরণা দিয়ে স্বদেশের যুগসমাজকে পরিচালিত করেছেন সকট থেকে সকটে যেখানে নেই ঘরের আরাম, নেই নারীকণ্ঠের প্রেমগুঞ্জন, নেই বন্ধুজনের প্রশংসা, নেই লক্ষ্যের আশীর্বাদ।

‘বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়’—এই কথা ধীর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তিনি কিন্তু কচকে দেব-বানীর ভূতবৃদ্ধনের মধ্যে কিছুতেই বাধা পড়তে দিলেন না। পুরুষকে তিনি নারীমায়া থেকে মুক্ত রাখলেন দেবতাদের সঙ্গীতবী বিভা দান করবার জন্য। কচের কথাগুলি কি চমৎকার, কি মর্যাদাপূর্ণ!—

আমার বা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। বর্গ আর বর্গ বলে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনভলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ যুগল,
চির তৃপ্তা লেগে থাকে দক্ষ প্রাণে মন,
সর্বকর্ম্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে

স্বপ্নভ্রম সেই বর্ণধানে। সেব সবে
এই সঙ্গীতবী বিভা করিয়া প্রাণ
মৃত্যু দেবতা দিগা তবো ঘোর প্রাণ
সার্থক হইবে, তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার স্বপ্ন।

‘চতুর্দশের’ শতীশকেও তিনি ঘর বাঁধতে দেন নি। দামিনীর যৌবন শতীশের বিবাগী মনকে টানতে পারে নি বাসরঘরের চতুঃসীমানার মধ্যে। দামিনীকে নিয়ে ঘর বাঁধল শ্রীবিলাস, শতীশ নয়। বিবেকানন্দের বীরবাণীতে আছে: ‘আগুয়ান, সিঙ্কুরোলে গান, অশ্রুজল পান, দূর কর নারীমায়া।’ বিবেকানন্দ অবিবাহিত জীবনের উপরে জোর দিয়েছিলেন। দেশে দেশে সত্যের জন্য লড়াই করবে বারা, স্বদেশকে বারা জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে তারা হবে সর্বভাগী তপস্বী। রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের মত ডাক দিয়েছিলেন তাদের বারা ঘর বাঁধবে না, আরাম খুঁজবে না, নাম চাইবে না, তপস্তার মধ্যে বারা ডুবে থাকবে, বারা দেশবাসীর সম্মুখে আনবে নিজাম পুরুষের হৃদয় শক্তিরূপ। তাঁর ‘তিন সঙ্গী’ আসল রবীন্দ্রনাথকে চেনবার পক্ষে দীপশিখার কাজ করবে। এই গল্পের নায়ক নবীনবাবু নায়িকা অচিরাকে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তা হলে মেয়েদের স্থিতি কেন। উত্তরে অচিরা বলেছে:

“বারো আনার চলে, যেহেঁরা তাদের জন্মেই। কিন্তু বাকি হাইব্রিটি, বারা সব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদের চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে যেহেঁরা যেন চোখের জল ফেলে রাখা ছেড়ে দেয়। ...যে যেহেঁরা যেহেলি, প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী; তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ স্বার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠার। মাথা তুলছে দুটি-একটি করে।”

মাহুঘের চরম অভিব্যক্তি তপস্তার মধ্য দিয়ে—এই কথাই রবীন্দ্রনাথ শুনিয়ে গেছেন নতুন ভারতবর্ষের কর্ণ-কুহরে। স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে বর্ষের মাহুঘ হবে দেবতা—এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের বাণী। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। ভারতের উপনিষদ্ জীবনকে অস্বীকার করতে বলে নি, বরং বলেছে জোরের সঙ্গে বাঁচতে। এই বাঁচার আনন্দকে অহুত্ব করবার জন্যই মনকে নিরাসক্ত করবার দরকার আছে আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নিরাসক্ত যৌবনেরই জয়গান। নিজের যিনি তপস্বী ছিলেন তপস্তার প্রয়োজনকে তিনি বারংবার স্বীকার করে গেছেন ব্যষ্টির এবং সমষ্টির জীবনকে গৌরবোজ্জ্বল করবার জন্য।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৮-১৯০৯

ঐতিহ্যবাহিনী বঙ্গোপাধ্যায়

কালের কি বিচিত্র গতি! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পালে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসমালা বাঙালী গল্প-পিণ্ডাস পাঠকসমাজকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়াছিল, বাংলার অন্তঃপুরের সহস্র সহস্র পাঠিকার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী হইয়াছিল, আজ যাত্রা চলিষ বৎসরের ব্যবধানে আমরা তাঁহার নামমাত্র আর শুনিতে পাই না। কালের নিকষে যোগেন্দ্রনাথের রচনা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একদা সাময়িকভাবে সেগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বাংলার সাহিত্য-সাধক সমাজে তাঁহাকে আজ আমরা স্মরণ করিতেছি। সাময়িকপত্র-জগতে যোগেন্দ্রনাথের ‘কল্পনা’ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার সন্ধে ইহাও স্মরণীয়।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

১২৬৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৫৮) মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাওয়া গ্রামে মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রনাথ জন্মিষ্ট হন। তাঁহার পিতার নাম—গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ বখন ছয় মাসের শিশু, সেই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়।

বিদ্যালয়িক

যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পিতৃব্য প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চাঁপাতলার বাসায় থাকিয়া নয় বৎসর বয়সে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্তমান মহারাজার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অন্তঃপর তিনি জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করিয়া এক. এ. শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদশা হইতেই যোগেন্দ্রনাথের মাতৃভাষার প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সাময়িকপত্র পরিচালনে ব্রতী হন। তাঁহার পরিচালিত তিনখানি সাময়িকপত্রের কথা আমরা জানি; সেগুলি—

‘সুধাকর’ : ইহা একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, ১২৮৪ সালের ভাদ্র (১৮৭৭, আগষ্ট) মাসে প্রকাশিত হয়।

‘সুধাকর’ প্রকাশ করেন যোগেন্দ্রনাথ; সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল—হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

‘কল্পনা’ : মাসিক পত্র; ইহাও যোগেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রকাশিত; সম্পাদন করিতেন হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ বর্ষের (১২৯৬ সাল) পত্রিকায় সম্পাদকরূপে যোগেন্দ্রনাথেরই নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

‘অবকাশ’ : ১২৮৮ সালের মাঘ (ইং ১৮৮২) মাসে কল্পনা-কাৰ্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই নামের একখানি ‘নবন্যাসপূর্ণ মাসিকপত্র’ প্রকাশিত হয়।

যোগেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কথাসিদ্ধী ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা বড় কম নহে। আমরা কয়েকখানির উল্লেখ করিতেছি :—

১। প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়বদনা (ইং ১৮৮৬), ২। প্রণয় পরিণাম (১৮৮৭), ৩। তত্ত্ব দলপতি দত্ত (প্রহসন, ১৮৮৮), ৪। ক’নে বউ (১৮৯০), ৫। বিমাতা (১৮৯৩), ৬। স্ত্রী ও স্বামী (১৮৯৪), ৭। বড় ভাই (১৮৯৪), ৮। কলঙ্কিনী (১৮৯৫), ৯। আমাদের বি (১৮৯৫), ১০। উয়াদিনী (১৮৯৬), ১১। প্রসন্নকুমারের উইল (১৯০০), ১২। চাঁ-কুলীর আত্মকাহিনী (১৯০১), ১৩। জঙ্গলী মেয়ে (১৯০২), ১৪। প্রতিশোধ (১৯০৪), ১৫। পাহাড়ী বাবা (১৯০৬), ১৬। খুড়ী-মা (১৯০৭), ১৭। শোভাসিংহ (১৯০৮)।

মৃত্যু

১৯০৯ সনের ২২এ ফেব্রুয়ারি (১৬ মাঘ ১৩১৫) যোগেন্দ্রনাথ, ৫১ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ‘জন্মভূমি’ দীর্ঘ শোক-সংবাদ লিখিয়াছিলেন; উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের আর একটি নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ উপভাস-লেখক বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ ইহলংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।—তাদৃশ উদার প্রকৃতি সঙ্গল বহুবৎসল পরোপকারী নির্মলবৃত্তাব সজ্জন বহু অধুনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।—জাতীয় সাহিত্যে অগাধ অনুরাগ থাকিতে তিনি ক্রমাগত ২৪ খানি উপভাস পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সকলগুলিই সুপাঠ্য, বিশেষতঃ ‘ক’নে বউ’ ও ‘খুড়ী-মা’ সর্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গীয় সমাজকে তিনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিলেন, তৎপ্রণীত সাময়িক উপভাসগুলি প্রকৃত প্রকৃতির মধ্যাহ্ন রক্ষা করিতেছে, সমস্ত পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হুল্ললিত।—তাঁহার বিরোধে সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-সংসার বিভাভ শোকাহুল হইয়াছেন, আমরাও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।” (পৌষ ১৩১৫)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণ

অধ্যাপক জীন্স্বাংসুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ভাম, মালয় উপদ্বীপ, তিরেংনাম (ইন্দোচীন) ইন্দোনেশিয়া (ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) এবং কলিঙ্গপাইন দ্বীপপুঞ্জ—এই সাতটি দেশ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গঠিত। কাহারও কাহারও মতে সিংহলকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বিত্তীয় বিষয়বস্তুর পূর্ণ পর্যাপ্ত সাম্রাজ্যবিকারী বিভিন্ন পাক্ষাত্য জাতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই বিত্তীয় ভূত্বাঙ্গের ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র ভ্রাতের স্বাধীনতা অক্ষুর ছিল। সুদোস্তর যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং কলিঙ্গপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন্য-লাভ করিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাঁকিয়া বলিয়াছে। ১৭৯৬ সালের ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে হল্যান্ড ফরাসীপক্ষে যোগদান করে। কলে হল্যান্ডের অধিকৃত সিংহল দ্বীপ ইংলণ্ডের হস্তগত হয়। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৮৫ সালে সংঘটিত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লয়। ১৮৮৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্যে—প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯১০ সালের মধ্যে সমগ্র ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজগণের হস্তগত হয়। ১৮৮৪ সালে ফরাসীরা টংকিন এবং আনাম অধিকার করে। ১৮৯০ সালে ভিয়েতনাম তাহা-বের হস্তে লাগুন অর্পণ করেন। ইহার পর ১৯০৭ সালে ফরাসীরা কাম্বোডিয়া এবং কোচিন চীন অধিকার করিয়া নইল। এই ভাবে সমগ্র তিরেংনাম ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হইল। ১৮৮৮ সালে বোর্নিও দ্বীপে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিঙ্গপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত স্পেনের উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীভূত ছিল। ঐ বৎসর স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কলিঙ্গপাইনের জাতীয় আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইংরেজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভ্রাতের স্বাধীনতা অক্ষুর ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা তাহারও ছিল না।

বিষ-অর্থনীতি কেন্দ্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটি বিশেষ ক্ষয়পূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিগত যুদ্ধের পূর্ণ পর্যাপ্ত সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপন্ন যথায় এবং আশ্রিত উদ্যোগের যথাক্রমে দশ-

দশমাংশ এবং সাত-দশমাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সমরসাহ করিত। যাত্রাভ্রমণের দিক হইতে এশিয়ার যে সমস্ত দেশ বাটতি অকল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তাহাদিগকে চাল বোগাইত। এতদ্ব্যতীত এই অকলে প্রচুর চা, চিনি এবং ভাতাক উৎপন্ন হইত। বিশ্বের কুইনাইন এবং মসলার মোট চাহিদার দুই বৃত্ত একটা অংশও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই মিটাইত। এই অকলের আয়ব্যয় এবং বণিক সম্পদও উপেক্ষা করিবার মত নহে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও জাগরণের সাক্ষাৎ ভেদন ভাবে অনুভূত হইত না। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইত যে, সাম্রাজ্যবিকারী যন্ত্রণাভিযুক্ত বহুকাল নিরীহবাহে এই অকলে রাজদণ্ড পরিচালনা করিবে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সময় হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল।

এক দিন না এক দিন পরাবীম জনগণের আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। শাসকশ্রেণী যদি অধীন জনগণকে বিশ্বাস না করেন, যদি তাহাদিগকে ক্রমাগত উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা করিয়াই চলেন, যদি কোনদিনই তাহাদিগকে মিত্রবাদের সমকক্ষ মনে না করেন, তবে শাসিত জাতি যত নিরীহ, নিরীহবাহে এবং শান্তিপ্রিয় হউক না কেন, এক দিন না এক দিন তাহারা অবশ্যই স্বাধীনতালাভে সচেষ্ট হইবে। কূটনীতি এবং বাহুবলের সহায়তায় কিছুকাল তাহাদিগকে দাবাইরা রাখা যায় সত্য, কিন্তু বাহুবল এবং কূটনীতিদ্বারা প্রত্যুৎপন্নোদয় করা চলে না। জাগ্রত জনগণের রোষ-বলি শিথিল হউক, আর বিলম্বেই হউক, বিপ্লবের অগ্নিশিখার আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। বিদেশী শাসনাধীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সরকারী নীতি যেতাদ শাসক জাতিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তাহাদের ইচ্ছাতে পরিচালিত হইত। নীতি নির্ধারণে দেশবাসীর মতামত গ্রহণ করা হইত কণা, মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ পর্যাপ্ত তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। সুতরাং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতির মধ্যেই যে তাহার ক্ষয়সের বীজ নিহিত ছিল, সে-কণা বলা মিত্রয়োজন।

মিত্রবাদের প্রয়োজনে বিদেশী শাসকবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাক্ষাত্য শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কালক্রমে পাক্ষাত্য শিক্ষা কতকটা বিস্তারলাভও করিয়াছিল। এই শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে এশিয়াবাসী মনে করিত যে, যে শক্তিবলে যন্ত্রণাভিযুক্ত সমগ্র জনগণে প্রাণহানিতে মগ্ন হইয়াছে, তাহা কোন দিনই এশিয়াবাসীর আশ্রয়ে আসিবে না। কিন্তু

পাশ্চাত্য শিকার শিকিত তরুণ এশিরাবাসী পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-সম্বন্ধ ভাঙারে বেতজাতির শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রবল জাতীয়তাবোধই পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে হুর্কর শক্তিতে শক্তিশালী করিয়াছে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এশিরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিগত করিতে পারিলে সেও পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষতা লাভে সক্ষম হইবে এবং পাশ্চাত্য সমাজে তাহার সমকক্ষতার দাবি স্বীকৃত হইবার পথে কোন বাধাই থাকিবে না। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনার কালে এশিরাবাসী আবিষ্কার করিল যে, জাতীয়তার প্রেরণার অতীত জাতি অসাব্যসাবন করিতে সক্ষম। এই মূলক জ্ঞান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাগরণে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ভার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও পাশ্চাত্য শিকিত-সমাজ্যের মধ্যেই প্রথম জাতীয়তার উদ্বেগ হইয়াছিল। এই সমাজ্যের কেহ কেহ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিতেন। অতীতের পুনরুজ্জীবনই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। অতেরা আবার ব-ব মাতৃভূমিকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিবার সাধনার আশ্বিন্যোগ করিলেন। জাতীয়তার মনমত্তে উদ্বুদ্ধ বহু দক্ষিণ-পূর্ব এশিরাবাসী প্রথম প্রথম শাসকজাতিকে হিতাকাজী বহু মনে করিয়া তাহাদের পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষের পোখলে, কিলিপাইনের ডাঃ রিক্স এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাজনৈতিক সংস্থা 'বোহি উতোমো'র প্রতিষ্ঠাতারা এই পর্যায়ে পড়েন। ইহারা কেহই বিপ্লবের আশ্রমে আশ্রয়ান ছিলেন না এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, পাশ্চাত্যের দিকট হইতে অনেককিছু শিখা করিবার আছে। শাসক জাতির সদিচ্ছা এবং উদারতা সত্বেও তাহারা কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না এবং বিশ্বাস করিতেন যে, সংস্কারের পথেই তাহারা এক দিন স্বাধীনতা লাভ করিবেন। কিন্তু এই ভুল ভাবিতে বেশী দিন লাগে নাই। তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশী শাসক কোন দিনই বেঞ্চার বীর শাসনাবীর দেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালিক বিভিন্ন বেতজ জাতির মধ্যে উদার মনোভাবসম্পন্ন হুঁচার জন পরাবীন দেশের বুড়ীকীর্ষী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহায়বৃত্তিগুলি হইলেও একথা বুঝিতেন না যে, উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতাই ঔপনিবেশিক শাসনের স্বাভাবিক এবং অবশ্যস্বার্থী পরিণতি। জাতীয়তাবোধের বিকাশ ব্যতীত স্বাধীনতালাভ সম্ভব নহে। এই বিকাশের

কত গণজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যকার্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবোধগণ কিছু দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করিলেন যে, গণ-সমর্থন এবং গণ-সংগঠন ব্যতীত তাঁহাদের স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। জন-সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় সংগঠনের কালে সরকারের সহিত সংঘর্ষ যে অবশ্যস্বার্থী একথা বুঝিতেও তাঁহাদের বাকী ছিল না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিরাবাসী বাবতীর রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। তরুণের সমষ্টিগত ভাবে তাহাদিগকে বেতজাতির তুলনার নিম্নেই মনে করা হইত। এইজন্য তাহাদের মধ্যে তীব্র কোতের সঞ্চার হইয়াছিল। অতাব-অতি-যোগের প্রতিকারের কত জনসাধারণকে সর্বদাই ঔপ-নিবেশিক সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইত। এই প্রতিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলম্বিত হইত। যে আনন্দাত্মিক শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রতিকারের ভার তত ছিল, তাহার উপর জনসাধারণের কোন প্রভাবই ছিল না।

শাসক এবং শাসিত উভয়ের বাস্তববোধের অভাবে ঔপনিবেশিক সমাজ জটিলতর হইয়া উঠিতেছিল। ইহারা সকলেই অস্বভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেন। কালে বহু ক্ষেত্রেই সমাজের সমাধান হওয়া দূরের কথা তাহার জটিলতা বর্ধিত হইয়াছিল। এইজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই চরমপন্থী হইয়া উঠিল। দেশান্ত্র-বোধে উদ্বুদ্ধ এশিরাবাসী বুঝিল যে, রাজনৈতিক স্বাভাব্য ব্যতীত প্রগতির পথ চিরদিনই বিষমচুল থাকিরা বাইবে। বহু জাতীয়তাবাদী সহিংস আন্দোলনের প্রতি হুঁকিরা পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন যে, একমাত্র সমাজ-ব্যব বা সাম্যবাদই তাঁহাদের বাবতীর হুর্গতির অবসান ঘটাইবে। অন্যেরা আবার অজ জনসাধারণের স্বাধীনতা এবং বহিরাগতের প্রতি বিদ্বেষের অধিতে ইচ্ছন বোগাইতে লাগিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জাপানের দিকট রাশিয়ার পরাজয় এশিয়ার সর্বত্র জাগরণের বেগ ও তীব্রতা বর্ধিত করিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিম্নরূপ রাজনৈতিক জীবনেও ইহার কালে চাকল্যের শিহরণ জাগিয়াছিল। ১৯০৮ লালে ইন্দোনেশিয়ার সম্ভব জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপাত হয়। ঐ বৎসর কতিপয় রাজ এবং বুড়ীকীর্ষীর মিলিত প্রচেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (বোহি উতোমো—মহান প্রচেষ্টা) সংগঠিত হয়। প্রথম বিকে ইহার কোন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ছিল না। বোহি উতোমোকে গণ-প্রতিষ্ঠান মনে করা হুল হইবে। বহু বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ শিকিত ববরীপবাসীগণই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেন। রূপ-আপান দুয়ের পর হইতে এবং

প্রধানতঃ ইহারই কলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রগতিশীল জনমত এই সংস্কারে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং আরও বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছিল। শাসকগোষ্ঠী পরাধীনতার স্বীকৃতি-কাহনাকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতার বিরোধিতা করিলেন। তাহারা মনে করিলেন—অন্ততঃ যুগে বলিলেন এবং এখনও বলেন যে, কমতা হস্তান্তরিত করিলে উপনিবেশগুলির সর্বনাশ হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতিরই যে ভুলের মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া লইবার অধিকার আছে এই ঐতিহাসিক সত্য তাহারা বিশ্বাস করিলেন। কলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অতিক্রম্য দাবী রাখিয়া উঠিতে লাগিল।

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বিক্ষোভের বিশেষ কোন বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। তরুণ সম্রাটের গভীরগতিকতার বোহুভূত হইয়া নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

শাসকগোষ্ঠীর কমতা, কর্তৃত্বশীলতা এবং সামরিক শক্তিতে তাহা বিদেশী শাসনের প্রধান ভিত্তি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের নতিজ্ঞতা এই ভিত্তিতে কাটল বরাইয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের এই ভিত্তিকে একেবারেই হুমিলা করিয়া দিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে বিজয়দুস্ত্র জাপানিহীন প্রচণ্ড আক্রমণের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। স্ব-শাসনাবলী জনগণকে নিদারুণ সঙ্কট এবং দুর্গতির মধ্যে কলিয়া বিদেশী শাসক ‘স্বঃ পরায়তে সঃ কীরতি’ নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করিলেন না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-সীমার স্থিতিতে বাকী রহিল না যে, তাহাদের শাসকগোষ্ঠী পরিচালনা স্বাধীন ব্যতীত আর কিছুই নহেন। তাহারা বুকিল, বিদেশী শাসনের কলে আত্মরক্ষার কমতা হারায়া তাহারা পরাজিত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী বহুদিন পূর্বেই অভিযোগ করিয়াছিলেন—ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতীয় জাতির বৈরিত্ব ত্যাগিয়া দিয়া নিরীহা দিয়া কেলিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শাসনের চরমপ্রহ লাফা এবং মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের চাকলায়ক সামরিক বিপর্যয় বেত-

জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ব্যর্থতা যে একাডেমি ভিত্তিহীন চোখে আত্ম দিয়া তাহা দেখাইয়া দিল।

কেবল তাহাই নহে। এশিয়ার একমাত্র সাম্রাজ্যবাদিকারী শক্তি জাপানের আক্রমণ হইতে মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মিলে মিলে আশ্রিত জাতিসমূহকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহাদের এই অসামর্থ্যকে জনগণ বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে করিল। যেত এবং পিতৃ শাসনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা এই শিক্ষালাভ করিল যে, ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ এবং নিপীড়নেরই নামান্তর। সাম্রাজ্যবাদিকারী জাতিগুলি এত কাল বলিত যে—এখনও সুযোগ পাইলেই বলিতে থাকে না—তাহারা স্ব-ব উপনিবেশের অধঃপতন, দুর্বল অধিবাসীদিগের ম্যাসকক মাত্র এবং বিভীষণ-নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শাসন পরিচালনা করিয়া তাহারা উপনিবেশগুলির শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে; ইহার পশ্চাতে কোন স্বার্থহীন নাই। কিন্তু এই বাস্তব আর টিকিল না। আর এই তুল্য জাতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দাসত্ব-মুক্তি দুলিয়া পড়িতেছে।

দুর্ভাগ্যে চিন্তামাত্রকরণ আগেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইবার কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের ৩০শে নবেম্বর মিঃ সামনার ওয়েলস একটি ভাষণে বলেন যে, মাহুসমাত্রই যে স্বাধীন এবং সে যে কাহারও তুলনার হীন নহে এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিবার দিন আসিয়াছে। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় মানবজাতির বন্ধন-মোচন করিবে। সাম্রাজ্যবাদের দিন চলিয়া গিয়াছে। জনগণের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করা ব্যতীত গভীরতর নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত উপনিবেশই স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ক্রিষ্ট এধমও হাল হাকে নাই। ইংরেজ ও ফরাসী আকু ও মালর এবং তিরেং-নামে তির রূপে এবং তির নামে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে বহুপরিশ্রম। জাগ্রত জনসাধারণ এই শাসনের অবসান ঘটাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এই ছোট্ট দেশের বর্তমান পোল-যোগকে যে নামই দেওয়া হউক না কেন, তাহা যে যুগান্তঃ স্বীকৃতি-সংগ্রাম তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* "... the nature of defeats suffered by the Western nations in 1942 dealt a final blow to any concept of white superiority that still remained."—*Time for Decision* by Sumner Wells, p. 238.



বন্দী যাত্রা

ঐরামপদ মুখোপাধ্যায়

২১

দীপাবের বাড়ী থেকে বেরুতেই অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা। ওর হাত বরে অমলেন্দু গলির অভ প্রান্তে টেবিলে নিয়ে এল। বললে, সেই থেকে তোমাকে খুঁজছি। ববর আছে।

ববর? কিসের?

কালোবাছারীর। চুনোপুঁট মর—একেবারে কুই-কাতলা।

ববরটা তখনও প্রভাত বিশেষ উৎসাহিত হ'ল না। বললে, রিপোর্ট বখাছামে পাঠিয়েছ?

তোমাকে না জানিয়ে—

আমি পরে জানলেও কতি হ'ত না।

অমলেন্দু বললে, ব্যাপারটা হাতে-নাতে ধরার মত নয়। কাদ পাভতে হবে। একটু থেমে বললে, তা হাফা তোমার মতামত না নিয়ে—

কেন অমল? ওর ইচ্ছাতঃ তাব দেবে প্রভাত বিম্বিত হ'ল।

কারণ আরও বন হয়ে দাঁড়াল অমলেন্দু। গলা আরও নামিয়ে বললে, তুমিও ত বাতারাভ করছ এতদিন—কোন লসেহ হয় নি?

কোথার বাতারাভ করছি? কিসের লসেহ? বিষয়ে প্রভাত বেশী কিছু বলতে পারলে না।

মামে—এই ইরে, একটা টোক গিলে অমলেন্দু এক নিঃশ্বাসে বললে, এই যে গলির মধ্যে উড়ে-বতি উড়িয়ে ভিম-তলা প্রাসাদ খাড়া হ'ল—এর গোড়াকার কথা জানবার ভত কোন দিন কোঁতুল হ'ল নি তোমার? এই বাকারে যাত্রা হঠাৎ লাখপতি কোটপতি হয়ে ওঠে তাদের বসিয়ারের কোন কোন কারগার যে অলৌকিক কিছু আছে এ লসেহ হয় নি তোমার?

প্রভাতের পারের নীচেকার পৃথিবী লহসা হ'লে উঠল। বন লকরের স্নে কোন কেড়েই কি অব্যবসার আর লভতার লকর খাড়া অবিস্বাত এই সুপে? বিশেষ করে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের কলে বাহুবের নীতি কি আবুল বললে গেছে? নিজের বেশ বলে—জাতি বলে—জাতিগোত্র বলেও একটু মনতা বা লমবেদনা জাগছে না বাহুবের মনে? কোথার গেল বাহুবের জবর—বা কালে কালে বেদনার বিগলিত হয়ে খুঁটি করেছে মহত্বকে, সূক্ষ্মকে, অনির্কচনীরকে? জবরের ওপর তেপে বসেছে মতিফ—কুটুম্বির পণ্যে ভরা মতিফ, বার বিচারে পৃথিবীর ঐবর্ষ-লকর ব্যতীত আর লব লকর অকিকিৎকার।

মূল ঐবর্ষ—জাগতিক সুখসুবিধাগুলিকে বার বার জর করা লভব।

প্রভাত বললে, লসেহ হয়—লসেহ তদ্বন কর। কিন্তু আমি ত জানি না—

বাণা দিয়ে অমলেন্দু বললে, আলোর নীচের লবচেয়ে বেশী অত্কার, প্রভাত।

ওরা পথ অভিবাহন করতে লাগল। পথের দু'ধারে কত সুত্তম অটালিকা বা প্রাসাদ। এই লব লস্পদের অত্মরালে অকীর্টির কাহিনী মিস্তর আছে। বিশেষ করে মরম-লোভন সৌবগুলির জন্ম-রহস্ত লসেহাতীত মর। চলতে চলতে মনে হলে ওদের সংখ্যাও ত কম মর। তবে কি সারা শহরে হুড়িয়ে পড়েছে ব্যাবি? কোন্টিকে বাদ দিয়ে কোন্টির কথা সে ভাববে? কার হুড়তির মালিশ—কোন্ তার বিচারকের আদালতে পেশ করবে। চালে কাকর, আটার তেঁতুলবীতি, চিনিতে মরম পাথর শুঁড়ো, সরিষার তেলে শিরালকাঁটার বীজ—মারিকেল তেলে হোয়াইট অয়েল, পোরালার হুবে শুঁড়ো হুবের তেজাল, শুঁড়ো হুবেও অকুজির মর। শিতর খাড হুয়লিক্স, রোপির পথ্য বালি লাগুদানা, ইন্ডেকশনের সিরার...না—না—গলিত হুবিত পৃথিবীতে বাহুব মরপোংসবে যেতেছে—বাহুব বন লকরের মেশার মাতাল হয়েছে। এক দিকে পরমাণু বোমা, অত দিকে তেজাল আর কালোবাছার; পাইকারী ও বুচরা হারে যুত্মদেবতা বিভরন করছেন ব্যাবি। জলপ্লাবনে একদা ধ্বংস হয়েছিল খুঁটি, এবারও ধ্বংসের আয়োজন চলছে সূচাক্রভাবে। একে লমর মত ক্রবতে না পারলে—

অমলেন্দুর কাঁধে ঝাকানি দিয়ে প্রভাত বললে, এর প্রতিকার করতেই হবে।

সুত্তম করে ভাবতে বসল প্রভাত। ঠিকই বলেছে অমলেন্দু—আলোর নীচের বেশী অত্কার। সে অত্কারকে আমরা চিনি অত্চ দ্বণা করি না। সেই অত্কার সর্কাকে হারাপাত করলে একটুও বিচলিত হই না; কেননা তার আসল চেহারা থাকে জামের আগোচরে। কিন্তু সারা হুনিয়ার লোককে লসেহ করবে আবার হুনিরাতে লোককে বেধাবে সেবার আএহ—এর চেয়ে পরস্পর-বিরোধী কার্য আর কি আছে। কোন্টা তার, কোন্টা অতার এই বোধ ত লকলের লমান মর। বাহুবের খাবারে তাগ বসার যে পত তাকে নির্ধাতন বা হত্যা করা অবর্ষ মর এক প্রদেপে—অত প্রদেপে সেই পতর বেধোচিত পুখা মহাসমারোহে লস্পর

হয়। কতি হু' জারগাতেই ঘটে, কিন্তু পুরাকালের এক মহতী কীৰ্ত্তিকলাপের কথা শ্রবণ করে মানুষের কৃতজ্ঞতা ভাতে দেবদ্ব্য আয়োগ করে কৃতজ্ঞতাৰ্হ হয়। এমনই বিচিত্র বিবান দেশে-বিদেশে।

আজ মনের প্রসন্নতা যেন বঠ হয়েচে। অকারণে রক্ততা প্রকাশ করে দীপাদের সে আহত করেছে। সভ্যই কি তার মনের গভীরে ওদের ঐর্ষ্যের প্রতি বিতৃষ্ণার তাব লক্ষিত রয়েছে? অবশ্য ওদের লজ তার ভাল লাগে। ওদের নব্যভিত্তির বার্তার মন তার বিষর হয়ে উঠল কেন!...যেন এই অপমান ওদের মানার না। যে কলকসাগরে আজ লার্ণ-পতি কোটিপতিরা ভাসছেন—দীপারা আছে তার নাগালের বাইরে। সম্পদ লক্ষ্যে মাইই যে মরযাতনের হরণমের কালিমা-লিপ্ত নয়—এই সভ্য প্রচারের দিন এসেছে। ঞ্টি-বিচ্যুতি নিয়ে পরিহাস নয়, শাসন নয়, উদ্ভট পক্ষ্য বাক্য প্রয়োগ নয়। সহযোগিতা—সেবার আকাজ্—প্রীতি এ সব উপচার না থাকলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না মনুষ্যত্বে, এই স্বাধীনতা অর্জনের আগে এক মহামানব মহৎ দুষ্টান্ত দিয়ে অহুপ্রাণিত করেন নি কি? সাম্রাজ্যের শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে—একান্ত ধীনবেশে তিনি অপমানিত লাহিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হুফুতকারীকে ভীত তৎসনা করেন নি—তার কথা-স্বন্দর বাণী অহকারলেশহীন আচরণের দ্বারা হুঁকিয়েছিলেন...বিশেষে মানুষকে উর্ধ্বে তুলে মহিমা প্রচার করা তার না—কৃতিত্বের সমস্ত দ্বারা চালিত হয়ে যে গৌরব রচনা করা যায়, তা না কৃতিত্বের না বা সমাজের মঙ্গল সাধন করে। কুলা দেশাত্মবোধে কথার অহেতুক দ্বণা—মিছকে উর্ধ্বে উঠিয়ে অতকে পারের তলায় মানাবার হুঁকার কাননা। এই বর্ণ্যাবোধে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে—বলদুগ্ধ কার্ণাম জাতি হয়েছে পহুঁদন্ত। কিন্তু লমতা এই, সেবার শক্তি সত্তর না করে সেবার আগ্রহ দেখালে বশবদ দাস হাড়া অত কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সুন্দরনী বাইরের ঘরে এসে ডাকলেন, প্রভাত।

কি না?

ওমা—তুই একা অন্ধকারে তরে আছিস? শরীর ধরাপ হয় নি তো?

না—ভালই আছি।

তবে চট করে একবার ডাকার বাকী ঘুরে আর বাবা। উর কলিকের পেনটা বেছেছে যেন।

খ্যা—কখন হ'ল?

অপিল থেকে এসেই বললেন—আজ রাতে কিছু খাব না—পেটের মধ্যে খিন খিনে ব্যথা বোধ হচ্ছে। তার পর মলতে না বলতে—

প্রভাত হুটল পরিচিত ডাকার বাকী। অবশ্য ডাকারকে

সে আসবার অহরোধ করলে না—জানে অহরোধ করবার সম্ভি তার নাই। ডাকারও জানেন সে কথা। চাকরীকীবী—দিন-আনা-দিন-খাওয়ার দল—পারতপকে ডাকে না ডাকে। আপনে বিপদে হুটে আসে তার কাছে—পরামর্চ চায়, ব্যবহাপজ লিখিয়ে নেয়—একবারে কল না হলে ব্যয় ব্যয় আসে। একজন ডাকারকে ডাকার অর্ধ—কম করে চারটি টাকার মত বহন করা। সে অর্ধ ঔষধ পণ্যে ব্যয় করলে—

অনন্তর এ ব্যাধি নুতন নয়—ব্যবহাপজও ঘোঁটানুটি জানা। তবু ডাকারের সম্ভি নিয়ে প্রত্যেক ব্যারে ঔষধ আনতে হয়। পরম্ব কলের সৈক—আর গোটা ছই বকী—লম্বা একটি ঘুরের লকে যন্ত্রণার অবসান হয়।

আজ কিন্তু কলের সৈক ও বকীতে কোম কল হ'ল না—প্রভাত আবার হুটল ডাকার বাকী।

হ—একটা ভাল ওষুধ আছে—ইমকেকশন। কিন্তু সাধা ব্যাকারে ওষুধটা পাওয়া যাবে কি?

চেষ্টা করব।

বেশ তো—। কিন্তু ওষুধ ঙ্গোপ করতেই হবে। বেশী-কণ এভাবে বহণা পেলে হাট কেল করতে পারে।

কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হুটল প্রভাত। কেট বললে—ঔষধ নাই, কেট বললে—অত জারগা থেকে আনিরে দিতে পারি—দাম বেশী পড়বে। কেট বা বললে, আমার মনাই লোকা কথা—কিপটি পারসেন্ট লাভ দেব—ক্যানমোমো পাবেম না।

কয়েক দিন আপেকার একটা বিজাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ঔষধের ভাব্য দামের বেশী দেবেন না—ক্যানমোমো দাবি করুন। বেশী দাম আদায়কারীদের নাম দাম টিকানা আনিরে দিন—

যত সহজে এগুলি বিজাপিত হয়েছে—এত সহজে অহুজা-গুলি পালন করা সম্ভব নয়। কালোবাকারীর হাতে পড়ব না বললেই—তাদের কবল থেকে অব্যাহতি লাভ সহজসাধ্য নয়। বহণা আর হুত্বকে সামনে রেখে তার পথে চলবার হুঁসাহস ক'টি লোকের থাকে। কালোবাকারে হাত মেলাতেই হবে—না হলে বহণা তো কমবে না, হুত্বও আসবে এগিরে।

বেশী দাম দিয়ে প্রভাত ঔষধ মিলে—কিন্তু হুঁমিতি দমনে সাহায্য করবার কোম প্রমাণই সংগ্রহ করতে পারলে না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেও—তা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার মনোবল তার থাকবে কি করে। বিপদে সাহায্য হুত্বা বেশী নিরে যে পরম উপকার করলে—তাকে অহুতজের মত বহিরে দেওয়া...কৃতজ্ঞ মন বতাবতঃই মত হয়ে পড়ে—হুক্তি দিয়ে লতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস তার থাকে না।

বড় কালোবাঝারীকে বরবার প্রতিজ্ঞা করেছে প্রভাত, কিন্তু জীবনের নিত্য প্রয়োজনের অংশে হোট কালোবাঝারী যেভাবে জঁকিয়ে বসে আছে তা থেকে দিক্‌তি পাবার পথ কি? এ দুগের জীবনটাই কি হীনতির তারে পজু হয়ে যাচ্ছে না? উত্তর মল্লভূমিতে কয়েক কলসী জল টেলে জ্বির উর্ধ্বতা বৃদ্ধির মত হুকুর চেঁচা। ঢালাচ্ছে না কি প্রভাতরা—এবং প্রভাতের সমপোজীরেরা?

২২

তিন দিন বয়েও কলিকের ব্যাথাটা কমছে না অনন্তর। ব্যাথাটা অবস্ত একটানা থাকছে না—কিন্তু আসছে প্রার বণ্টার বণ্টার আর প্রত্যেক বারের দ্বিতিকালও দীর্ঘ হচ্ছে।

অনন্ত বলছেন, আর পারি না—একটু আকিং বেশী করে দাও—আলা জুড়োই।

ডাক্তারের আশ্রয় মক্কা—তাই বার তিনেক ফুঁড়ে বেওয়া হয়েছে। বরণা উপশম হয়েছে সামরিক ভাবে। যতকণ আছে তার থাকে বরণাটা অহুত হব না, কিন্তু তার পরেই—

ডাক্তার বলেছেন—কোন বড় হাসপাতালে তপ্তি হবার ব্যবস্থা করতে। কেসটা অজ্ঞাপচারের—শিক্তকোষে পাথর জন্মেই বরণার উৎপত্তি। পাথর অপসারিত না হলে বরণার দিক্‌তি হবে না।

তারে কোন কারণ নেই তো?

আজকাল আর্থার হচ্ছে। কত লোকে ভালও হচ্ছে।

সবাই ভাল হচ্ছে কি?

সুমনীর অবাধ প্রস্নে ডাক্তার হেসেছেন। ভাল হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করলে—

সুমনী মনে মনে সজ্ঞ করেছেন—সবই যখন সেই মিরতার হাত তখন তাঁরই কাছে প্রার্থনা জামালে কি হয়। দৈব বশ্য—দেবমির্দেখ কত পবই তো বোলা হয়েছে। কাছে-পিঠে তারকেই আছেন—হাজার রকমের বার-ব্রত—লাহু-সন্ন্যাসী হয়েছে—এর কোন একটা কি—

এক দিন তিনি এহাচার্যের হুয়ারে বরণা মিলেন। বাবা এর প্রতিকার কি?

পাঁজপুঁথি খুলে এহাচার্য বললেন, সবপ্রহের কবচ বারণ করাও—শান্তি-বস্ত্রয়ন করাও—

ব্যর বা হবে তা ডাক্তারের সঙ্গে পালা দেওয়ার মত। তবু একবারই হবে।

কয়েকটা টাকা আঁচল থেকে বার করে দিয়ে তিনি কাহুতি করলেন, বেশী কিছু দিতে পারব না বাবা—এই নিয়ে বা হয় করব।

আচ্ছা—আচ্ছা—অনন্ত পক্ষে যে বিধান আছে তাই করে দেব। মনে ভক্তি—আমবে—বিধান করবে—

প্রভাত শুনে বললে, টাকা ক’টা থাকলে সংসারের কাজে লাগত—

কিন্তু উনি ভাল হয়ে উঠলে—টাকার তাবনা কি?

হাসলে প্রভাত। টাকার তাবনা নাই সত্য—কিন্তু যে টাকা আসে মাসকাবারে—তাতে তাবনা ঘোচে কতটুকু সময়ের জুত। নাই নাই যব—বার কর্ণ—এ সংসার থেকে বুহে গেল কি কোনদিন? উত্তরাধিকারহীন এই সম্পত্তি তাকেও বর্জাবে। সে উপার্জনের কেজে মাঝবে—সংসার পাতবে—সংসারের সুখসকল মনোনিবেশ করে দুঃখের বোঝা ভারী করবে। বেহের বাহ্য ও মনের আদম্ব বিসর্জন দিয়ে অসংখ্য দরিদ্র রিক্তের সংখ্যা বাড়াবে মাত্র। আজ সংসারের বা অবস্থা তাতে তার উপার্জন একাত্ত প্রয়োজনীয়। এ সংসার তার মর মনে করতে পারে কি সে? মারের উপর, হোট তাই বোনদের উপর, কুর বাপের উপর তার কোন কর্তব্য নাই কি? আজ যদি ধবরের কাগজের হকারিটও থাকত।

প্রভাত বুঝতে পারে, অহেতুক সজ্ঞ-বোধের বাবা না জামালে—কিন্তু বুঝতে পারলেই কি মিথ্যা আদম্ব-সম্মদ-বোধকে বিসর্জন দেওয়া যায়। সমাজের যে ভরে প্রভাতরা আছে—হেলোবেলা থেকে যে আচার-আচরণে ওরা অভ্যস্ত—তার মোহ সহজে ত্যাগ করা কি এতই সহজ?

দ্বিতীয় দিন কাগজ কিরি করার সময় সামনে পড়লেন বাবার আপিসের এক ভদ্রলোক। তাঁদের সঙ্গে প্রভাতদের বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। ওর হাতে কাগজের গোছা দেখে প্রশংসাত্মক হাসির সঙ্গে বললেন, বাঃ, চমৎকার। আমি যখন-তখন ছুতো আর নেটুকে (ওঁর ছেলে) বলি—বেথগে বা প্রভাতকে—হীরের টুকরো ছেলে। ভাগ্য করেছিলেন বটে অনন্তর। খালি লেখাপকাতেই মর—লোকের আপদে-বিপদে, ভালর-মন্দে কোথায় না আছে। তা কোথাও লাইব্রেরি করেছে, না গরীবদের বিলোবার জুত এত কাগজ বরে নিয়ে যাচ্ছে?

তিনি অবস্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নি। আপিসের সময়—মাহুকে বিভাগ করা চলে কেমন আছ? কিন্তু তার কুশল অকুশল শুনে নিশ্চিত বা উত্তর হওয়ার অবলম্ব কোথায়।

আর এক দিন সামনে পড়লেন এক আত্মীয়। বললেন, কাগজের আপিসে কাজ নিয়েছ তুমি? তা বেশ।

তৃতীয় দিনের আত্মীয়টি কিন্তু প্রভাতের কর্ণবারা দেখে ভিত্তি হয়ে বললেন, তোমার এই কাজ। ভদ্রলোকের ছেলে, মেহাং দুখা-সুখা মত—বি-এ পাস করেছে, তোমার এমন হুঁসি হ’ল কেন। বাপ আপিসের চাকরো, একটা ফেরা-গিরিও কি ছুঁয়ে দিতে পারলে না? হি।

ভারপর দিন বাসি হাতে বাড়ী আসতেই লক্ষী বললে,
নাও সব কাগজ খুঁজি বিক্রি হয়ে গেল ?

না—আজ কাগজ বিই নি।

কেন ?

এ কাগজ আমার খাওয়া হবে না—আমি সত্যিই অপরাধী।

লক্ষী খুসী-উপচানো করে বললে, তালই হয়েছে—আমি
রত দিন ঠাকুরকে বলেছি—দাদার সুস্থিতি হাও।

প্রত্যন্ত অকৃত দৃষ্টিতে লক্ষীর পানে চেয়ে বললে, তোর
গাছুর তারি জাগ্রত।

কিন্তু বলে থাকলে ত চলো না—এর পর অনেক বোঝ
হবে প্রত্যন্ত হুটো টিউপনি নিয়েছিল। একটা ভাববাক্যে,
সব একটা গোঁরাবাগানে। হুটু বেনী নয় বলে, সন্ধ্যার
র বটীভিমেক সময় ব্যার হ'ত। মাইনে এক জারপার তালই
—জিন টাকা।। গণ্ডাহে হাজ ভিন দিন পড়াতে হয়। আর
ক জারপার প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়, মাইনেও কম—
কি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের হাজ বলে অভিযোগের অবসর কম।
অভিযোগ অবশ্য প্রত্যন্ত করে নি—কয়েকদিন পড়ানোর পর
দেয় দিক থেকেই শুরু হ'ল সেটা।

এক দিন পড়ার পর এসে বললেন হাজের বাবা—খানিক
ভার বরণ লক্ষ্য করে বললেন, দেখ—মাঠার, (বরসে বড়
লে উনি—এই ভাবেই সন্ধ্যাও করেন, কিন্তু প্রত্যন্তের স্পর্শ-
পাতর মনে—এই সন্ধ্যাও টিক রেহের সুর বাজে না, কেনন
এম উঁচু-নীচু ভেদের খুঁটি করে), বটী মিনিট পরে পড়ালে
লেকে টিকমত শিকা দেওয়া সম্ভব কি ? মাঠারের উচিত
কি হাজকে সব পড়া তৈরি করিয়ে দেওয়া ?

প্রত্যন্ত মরম পলার বললে, সব পড়া তৈরি হলেই ত—

না মাঠার, কাল ছুটি চলে গেলে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম
ভিহালের পড়া, ও বললে, ওটা ক্লাসে টিক করে দেবে।

হাজের পানে তাকালে প্রত্যন্ত। হাজ বললে, ইতিহাস ত
টা খুঁজ বলতে হয় না—

বলি গরুটাও ত খেয়ে রাখা দরকার। আমি বরম জিজ্ঞাসা
রলাম, ভারতে বিদেশীরা আসত কোন্ পথ দিয়ে আর কেন
। লজ—তুই হাঁ করে রইলি কেন ?

বাঃ রে—ও ত ক্লাস কাইতের পড়া—

হঁ—ক্লাস লিঙ্গ'এ বেমান্ন হুলে বলে আহ। পড়াটা
হচ্ছে শুধু পরীক্ষা পাস করা—মনে রাখা নয়—নয় ?

প্রত্যন্ত বললে, ঘোঁড়াখুঁটি পরীক্ষা পাস করতে পারে—
টুইই ত তৈরি করতে হবে হেলেদের—

ও শিকা আমার শিকা। হঁ। হেলের বাবা অগ্রসর
র হকার দিয়ে উঠলেন। বললেন, বাই হোক—বটী মিনিট
র পড়িও না, একটু কেয়ার নিয়ে—বাতে হেলেটা কিছু
বতে পারে—

আমার অভ জারপার টিউপনি আছে, এর বেশী সময়
দেওয়া ত সম্ভব নয়। প্রত্যন্ত গভীর করে বললে।

হাজের পিতা অবশ্য খুঁজে কিছু বললেন না—কিন্তু ককাতর
থেকে ঠর কই মতব্য শোনা গেল, আজকাল বেমন হয়েছে
ইকুল—ভেমনি হয়েছে মাঠার। শ্রেক্ ব্যবসা—ব্যবসা।

ইচ্ছে হ'ল এই মুহুর্তে কাজে ইত্তকা দিয়ে চলে আস।
অনেক কষ্টে আয়সম্বরন করলে প্রত্যন্ত। সন্ধ্যাবোধ উএ হলে
আর্থিক অন্তবিধা বটবেই—এই বাস্তব সত্যকে মর্মে মর্মে
উপলব্ধি করছে ও।

বিভীরা বাড়ীর ব্যবহার আরও বিচিত্র। এখানে হাজিট
উঁচু ক্লাসের—কিন্তু মেধাবী নয়। বাপের পরস্যা আছে—
আছে কাজ-কারবার, বিজ্ঞানশিক্ষা শুধু দেশ-বিদেশের
বাণিজ্যকে সম্বল করার জন্ত। একটু শিকা না থাকলে
কপংটাতে তাল করে চিনে দেওয়া ও তার সঙ্গে তাল
রেখে চলা কঠিন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিভার সঙ্গে অর্থ উপার্জন
অদ্বাদীভাবে জড়িত নয় বলেই—বিভাবান ব্যবসায়ীর হেলেট
বতাবতঃই বিদ্যাবিশুখ।

প্রথম কয়েকদিন হেলেট পড়ার মনোযোগ দিলে—অন্ততঃ
মনোযোগ দেবার তাম করালে। বক্রকে বাঁধানো বই—
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাতা—অদ্ভুত দামী কাউন্টেন পেন—
চমৎকার করে সাজানো ঘর—বিভা এহণের আবহাওয়ারটা
তাল বলেই বোধ হ'ল।

এক দিন হেলেট বললে, মাঠার মশার—আজ আর
পড়তে তাল লাগছে না—আজ্ঞে একটু গরু করি।

কিন্তু তোমার ক্লাস—

কাল ক্লাসে না গেলেও চলবে। আজ মাঠার মশার,
এবার কোন টিহের কবিশেষণ তাল বসুন তো ? ইষ্টবেলন
না মোহনবাগান ?—

—আমি জানি না।

—জামেন না ? হাজ এ ভাবে বিশ্বর প্রকাশ করলে—
বেম বেলার কথটি না জানা একটা অমার্জমীর অপরাধ।
হেলেট মতব্য করলে—স্পোর্টস শুধু শরীর পঠন করে না—
মনকে তৈরি করে। সুহ বেহেই সুহ মন—

প্রত্যন্ত বললে, আজ তা হলে পড়বে না ?

বললাম তো তাল লাগছে না। হেলেট আবারের
ভদ্রীতে বললে।

তা হলে উঠলাম।

প্রত্যন্তকে উঠতে দেখে হেলেট বললে, চন্দ্র না
কেন—এক জারপার হুয়ে আসি। একটা বই এসেছে—
চমৎকার—বোম্বের বড় সেহা ঠার—মানে হুগা খোটে—
মার্গিন, মিলীপুহুয়ার—অশোকহুয়ার—মলিনী বরম—

প্রত্যন্ত বললে, আমি যাচ্ছি। ও লোকা বেয়িয়ে গেল।



উপর হইতে নীচে : বাম দিকে— ১। পাহাড়, ২। একটি রাজসংঘের মূর্তি ;



দক্ষিণে—৩। জুতার নিউকিয়ন, ৪। গ্র্যান্ড ডিলা। কলকর্ত

বেবেশ বলে এক বছর কাছে কথা-প্রসঙ্গে এক দিন কথাটা পাকলে।

বেবেশ সাগ্রহে বললে, আছে এই রকম পাঠ টাইমের কাজ। করবি?

কোথায়?

আমি যে কার্কে কাজ করি তার। একটা নতুন বিজ্ঞেন্স টার্ট করেছে, এক জন করেস্পন্ডেন্স ক্লার্ক চায়। দেশ-বিদেশের সঙ্গে করেস্পন্ডেন্স—রেলের সঙ্গে ক্রেম সেটেল আর কন্স পুরণ, বকেরদের কোটেশন দেওয়া—এমনি সব কাজ। করবি?

অনেক সময় বাবে যে।

আরে—না না, শুভে যেমন, কাজে যেমন নয়। হু-হু হ' বকী, সফোর পর। পারবি না?

বেশা বাক, পারি কিংবা হারি। প্রত্যন্ত হাসলে।

বেবেশ বললে, পারবি না কি রে? আবারের মত মন-ম্যাট্রিকরা যদি হ'নো আড়াই শো কাবাই করতে পারে—

আজ্ঞা রাজী।

কাজটা হাতে নিয়ে বেবেশে বিশেষ কিছু শক্ত নয়, বাবা-বরা নিয়মও যেমন কিছু নাই। খানকরেক টিট্রি জবাব দিতে হ'বটাও লাগে না। মনিব অবন্ত লেখাপড়া কিছুই জানেন না—কিন্তু কোথায় কি তাবে জবাব দিতে হবে তার নির্দেশ যেন অদ্বুত তাবে। আশ্চর্য্য দক্ষতা তাঁর। ব্যবসা যেন তাঁর জরগত জিনিস। বিত্তা শিকার এ যেন নতুন একটা বিক। তা হাতা লোকটও ভাল। প্রত্যন্তকে আগাম কিছু টাকা দিলেন।

এক দিনে সে সংসারের প্রয়োজনে এলো। নিজেই মনে হ'ল—হু-হু হারহুত। কিসের দার তার কাঁধে চেপে ছিল—সে জানে না—হর তো কর্তব্যবোধ—হর তো বা

পরাজয়ের প্রাণির তার। নিজের উপার্জন সংসারে দিয়ে নিজেকে বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে। সংসারে দেওয়া জিনিসটা সত্যিই আনন্দ আছে—আত্মবিশ্বাস বাড়ার—দেওয়ার হীনতা থেকে বাঁচার।

একই সময়ে উঠে অনন্ত বললেন, এইবার বেবেশ তখন একটা ভাল চাকরি দে।...পাকা মত একটা আশ্রয় হোক।

না—এতেই আপত্তি প্রত্যন্তের। পাকা মত আশ্রয়ে এনে নিজেকে বন্দী করতে সে রাজী নয়। কাজ করার আনন্দ কাজের বন্ধনের মধ্যে নয়—কোনরূপ বাধ্যবাধকতা যেন তার মধ্যে না থাকে। তার মুখের কট্টর রেখার পানে তাকিয়ে অনন্ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। কি জানি কেন, কোমল অথচ অমরমীর প্রত্যন্তকে তিনি মনে মনে ভর করতে শুরু করেছেন। প্রত্যন্ত প্রতিবাদ করে বিনীত তাবে—কট্টর স্নেহোক্তির সংকিশিট উত্তাপহীন উত্তর দেয়। কিন্তু যুক্তি বা জোর কিংবা অভিযোজনের ভর—কোন কিছুতেই তার সেই সংকিশিট ভাবনের ব্যত্যয় ঘটে না। যে ছেলে বেশী বকে—অন্যতেই উক হয়ে ওঠে—বেকায়ে বার রুক্ষতা—তাকে যবনে আশা সহজসাধ্য—এটা বহু জায়গায় তিনি বেবেশের, কিন্তু পরিমিতবাক্—নর প্রকৃতির ছেলেরাই সবচেয়ে বেশী মারাত্মক, তাদের একত্রেই মেরির ভুলমাই হয় না।

প্রত্যন্ত চলে যেতে দুমরমী বললেন, ওকে শক্ত কথা না বলে বেশ মরম করে বুঝিয়ে বল না কেন।

অনন্ত মুখ বিকৃত করে হাসলেন, হাঁ, সেই ছেলেই বটে তোমার। কথার বলে না—'ভেল দাও সিঁহর দাও ভবি ভোলবার নয়'—এও হয়েচে তাই। মরবে, নিজেই মরবে, আমার কি?

এমনি করে হাসের পর হাস কেটে গেল—প্রত্যন্ত পাকা চাকরীর মত আগ্রহ প্রকাশ করলে না।

অনন্ত:

শেষের মধ্যে অশেষ আছে

ঐশ্বরীলকুমার লাহিড়ী

সজীত হতে কোমল বাণীর হলভলি—

বরে বার,—তবু কেলে বার পিছে স্মৃতির তার;

মনের মাঝারে ব্যাভুল ব্যথার কেঁবে কেয়ে সুর-কাঁপন তার।

রজনীগন্ধা শুকাইয়া বার ফুলে আয়ু,

পরিমল তারি ভেগে রর তারি নিশাসবাহু।

শেলির "Music when soft voices die" কবিতার আবাহবাণ

পোলাপ ফুলের সজ্জিত রাঙা হলভলি,

বরে বার যবে চিরস্মৃতি লাবে মরবে তার।

বরা পাণ্ডিত্য রচি' দেব শেষে প্রিয়র কোমল শরদাবার।

ভূমি হুয়ে গেলে তোমারি ভাবনা পোপন ভর,

প্রেম হরে দোর মনের মাঝারে ফুরায়ে রর।

ত্ৰিযোগেশচন্দ্ৰ পাল

ওজরাট ভাষার সে গান গাহিরা গেল। ওজরাট বলিতে পারি না, কিন্তু কিছু কিছু বুঝি। বুঝিলেও কবিতার হৃদয় বোকা সহজ নয়, তবু যত দূর সম্ভব বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বুকের বোরে জামহারা হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শুনা হইল না। বিকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে গেলাম। সেখানে গিয়াও রাখাল বালকদের বুকে শুনিতে পাইলাম নানক দেবীর গান। ভসিভাই সঙ্গে গিয়াছিলেম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেম যে, কাথি-ওজাড়ের বেথান্দেই বাই না কেন, বিশেষ করিয়া ওজাড়ের রাখার সর্কুই বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের বুখেই এই নানক দেবীর গান শুনিতে পাইব। পরে কাথিওজাড়ের বহু স্থানে গিয়াছি, সর্কুই দেবিরাছি নানক দেবীর গান আকাশবাতাসে সুধরিত করিয়া ছুলিয়াছে। যেমন পূর্বে রাখপুতানা ও মধ্যভারতের সর্কুই ঝাঁগির রাণীর বশোপাণা শুনিতে পাওয়া যায় তেমনি কাথিওজাড়ে শুনা যায় নানক দেবীর বশোপাণা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁগির রাণী যেনকো বাবীন করার ভৃত্য যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে তাহাে দেশের ভৃত্য, দেশের ভৃত্য, ভারতের স্বাধীনতার ভৃত্য আত্মবিশ্বাসে দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বীর রমণী এবং স্বাধীনতার উপালিকা হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন। তাই রাখপুতানার বরুহল ও

নব্য ভারতের বনজবন ও প্রান্তর কাঁপাইয়া ঘোল
উঠে :

“চমক উঠি লন সীতরম ধৈঁ বহু তলোয়ার পুরাণি বী,
বুন্দেলে হয় বোলোঁকে বহু হরনে শুনি কহানী বী,
খুব লজী বর্ণানী বহু তো বাসিওরানী রাণি বী।” ইত্যাদি
টিক এননি তাবেই নামক দেবীর লীল লতীতের গৌরব-
পাখার কাখিওরাতের আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠে।

কাখিওরাতের এক ক্ষুদ্র বাণীন হিন্দু রাজার রাণী হইলেন
নামক দেবী। রাণী নামক দেবী ছিলেন রূপবতী, আর
সাধারণ লোকের নিকট তিনি ছিলেন এক রহস্যবহী অপসরী।
অপের নিক হইতেও তিনি এক মহান্ চরিত্রবলে বলবতী
ছিলেন, আর এই চরিত্রই তাঁহাকে মহীরসী করিয়া তুলিয়া-
ছিল। এই চরিত্রবলের কতই তিনি সকল জ্ঞেয় লোকের
প্রভা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আর রূপ, গুণ ও চরিত্রের
দ্বাণ্ড্যে তিনি সারী হইয়াও সকলের নিকট দেবী হইয়া
উঠিয়াছিলেন। রাণীর সুবাসের মত তাঁর গুণ-পরিমা ও রূপ-
লাবণ্যের কথা সারা গুজরাটের ঘরে ঘরে হুড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গুজরাটের তুলসীমান নবাব। সারা গুজরাটের মালিক
তিনি। গুজরাটের হোট বহু হিন্দু রাজ্যগুলি তাঁর অধীনতা
বীকার করিয়া লইয়াছে। যে সব রাজ্য এখনও বাণীন
রহিয়াছে, তাহারা বাণীন থাকিলেও প্রবল পরাক্রান্ত নবাবের
বিক্রমে কোম কিছু বলিবার বা করিবার সাহস পায় না।
নবাবের প্রভাপ ও পরাক্রম অপরিণীম। গুজরাটের এই
পরাক্রান্ত নবাবের রাজ্যের নিকটেই নামক দেবীর বাণীর
রাজত্ব। রাজ্য হোট হইলেও তিনি বাণীনতা রক্ষা করিয়াই
চলিয়াছেন। এই রাজ্যের কজির রাজা কোম দিন কোম
ব্যাবাত বটান নাই বলিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির প্রতি নবাবের
দৃষ্টি পড়ে নাই।

রাজ্যবিভাগের ইচ্ছা না হইলেও এক দিন নবাবের মজর
পড়িল এই ক্ষুদ্র বাণীন হিন্দু রাজ্যটির উপর। রাজ্যের রাণী
নামক দেবীর রূপলাবণ্যের জমজন্ম নবাবকে প্রসুত
করিয়া তুলিল। রাণীর অসাধারণ চরিত্রবলের কথা শুনিয়া
নবাব হাসিয়া উঠিলেন। সারীর আবার চরিত্রবল কি ?
পতিশালী পুরুষের নিকট সে নিশ্চয়ই মাথা নত করিবে,
ইতিহাস তার বহু সাক্ষী। শর্ভার নবাবের বুক তুলিয়া উঠিল।
নবাব হির করিলেন, এই রূপবতী সারীকে তিনি তাঁহার বেগম
করিবেন, তাঁহার পতিমতীর কাছে চুম্বার হইয়া বাইবে রাণীর
চরিত্রবল ও গর্ভ, আর সারা গুজরাটের মরনারীকে দেখাইয়া
দিবেন যে কেমন করিয়া নবাই পতির কাছে মাথা নত
করে, কেমন করিয়া অপরাধ স্তম্ভী সারী বিলাইয়া দেয় তার
রূপ, বোধন, নাম, গর্ভ এবং গর্ভের বন লতীত এক পতিশালী

পুরুষের কাছে—নামক দেবী তো সাধারণ একজন কাকের
রাজার রাণী নই অত কেষ নর।

নবাবের মনে ঈর্ষা পূর্ণরাজার আসিল। সারা গুজরাট
ব্যাপি যে সারীর এত রূপ, এত লাবণ্য, এত গুণ এবং এত
বহিরা, সে অতের অতশাসিনী হইতে পারে না—সে হইবে
তাঁহারই। তার পর নামক দেবী অত বেশের রাণী হওয়া
সঙ্গেও তাঁর রূপগুণের পরিমা তাঁহার রাজ্যের প্রকার বুঝে
বুঝে, ইহা তাঁহার অলঙ্ক হইয়া উঠিল। দেশের জ্যেষ্ঠ সারী যদি
তাঁর বেগম না হইল তাহা হইলে তাঁহার নবাবের দ্বন্দ্ব কি ?
নবাব নামক দেবীকে পাইবার আশার প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন।
নামক দেবীকে তাঁর মরবারে পাঠাইবার অত নামক দেবীর
বাণীর কাছে হুত পাঠাইলেন।

রাজা মরবারে বলিয়াছিলেন, এমন সময় নবাবের হুত
আসিয়া তার আগমন বার্তা ও গৌরব জানাইল। হুতবুঝে
বার্তা শুনিয়া সত্য নিশ্চয় হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্য-
সময়ের চোখে বুঝে একটা বিজলীর বলক খেলিয়া গেল।
রাজা কোম প্রকার অমৌজত প্রকাশ না করিয়া বীর হির ও
পতীর ভাবে জবাং দিলেন যে, নবাব বেশ বারন হইয়া তাঁর
ঘরিবার আশা না করেন। হুত সেলাম জানাইয়া সত্যকক
হইতে বাহির হইয়া গেল।

হুত সময়মত রাজার নিকট হইতে জবাং লইয়া নবাবের
কাছে আসিল। নবাবকে সেলাম জানাইয়া হুত রাজার উত্তর
ব্যক্ত করিল। উত্তর শুনিয়া নবাব হাসিয়া উঠিলেন, যেমন
করিয়া হুতাহতির আশ্রম বলিয়া উঠে। সানাত একজন
রাজা তিনি তাঁর আজ্ঞা লম্বন করিবেন—ইহা তাঁহার লহের
অতীত। নবাবের হুকুমে রাজবাণীতে সাক সাক রব পড়িয়া
গেল। সহজে বাহা সত্য হয় নাই তাহা তিনি পতিপ্ররোপে
করিবেন। নবাব নিজে তাঁহার সৈন্তসামন্ত লইয়া নামক
দেবীকে হুত করিয়া লইয়া আসিতে চলিলেন। কেবল নামক
দেবীকে বেগম করিয়াই তিনি কাজ হইবেন না, ঐ ক্ষুদ্র হিন্দু
রাজ্যটিও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

নামক দেবীর সারী রাজা হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও, তিনি
ছিলেন কজির। হুতের নিকট নবাবকে যে জবাং তিনি
পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম তিনি ভাল করিয়াই
জানিতেন। যখনই তিনি এই কথা চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার
মেহের কাজরজ টপ্পণ করিয়া উঠে। সকল প্রকার বিপদের
সম্মুখীন হওয়ার ভয় তিনি প্রমত্ত হইলেন। ধবর পাইলেন
তাঁর রাজ্য আক্রমণ করিবার ভয় নবাব সৈন্ত লইয়া
আসিতেছেন। রাজা নিজে তাঁহার সৈন্য লইয়া অর্ধপথে
নবাবের গতিরোধ করিলেন। হুত আরম্ভ হইল। রাজার
সৈন্য নবাব-সৈন্যের তুলনার সংখ্যার অভি অল্প। তাহাতে
কজির রাজা ভীত হইলেন না। অসির কনাংকরে আকাশ-

বাড়ান কাপাইরা তিনি তাঁর কজির সৈন্যগণ লইয়া নবাব-সৈন্যের মধ্যে কাপাইরা পড়িলেন। হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। নরহুমির প্রান্তর রক্তের স্রোতে বহিয়া গেল। বুকের শেষ পরিণাম স্বাক্ষর জানাই ছিল; কিন্তু কাজরক্ত ভাঙাতে ভীত হয় নাই। কজির বীরের তরবারি সকালন্দের কৌশলে বহু নবাব-সৈন্য হির তির হইয়া গেল। সে বুকে কজির বীর-গণ স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের কথা ভুলিয়া গেল, ভুলিয়া গেল নিজের জীবনের মাত্র। তাহারাই বীরবিক্রমে বুদ্ধ করিল, হাজার হাজার নবাব-সৈন্যকে বরাভলে শারিত করিল, নিকেরাও শরম করিল অন্তকালের জ্ঞত।

রাজা বরং বুদ্ধ করিলেন। এ বুদ্ধ রাজ্য রক্ষা করার জ্ঞত নয়, এ বুদ্ধ কেবল বাণীমতা রক্ষা করার জ্ঞত নয়, এ বুদ্ধ পরস্বাক্ষ্য গ্রহণ করার জ্ঞতও নয়—এ বুদ্ধ ছিল হিন্দু এক শাস্ত্র মহিমার আদর্শের সম্মান রক্ষার জ্ঞত। রাজা তাঁর দেহরক্ষী সৈন্যগণের সহযোগে অমিতবিক্রমে বুদ্ধ করিতে করিতে বহু নবাব-সৈন্য হতাহত করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে বুদ্ধ করিতে করিতে সংখ্যার বহু গুণ নবাব-সৈন্যের ব্যুহ ভেদ করিয়া রাজা বরং নবাবের সন্মুখে নবাবকে পর-মারীহরণের নির্গম শিকার দেওয়ার জ্ঞত উপস্থিত হইলেন, তখন অভ্যকিতে এক নবাব-সৈন্যের তালার আঘাতে রাজা তাঁহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। নবাবের আদেশে রাজা নবাব-সৈন্যের হাতে বন্দী হইলেন। রাজার অবশিষ্ট সৈন্য আহত রাজাকে উদ্ধার করার জন্য শেষ চেষ্টা করিল, অসীম বিক্রমে নবাব-সৈন্য হিরতির করিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য, বাণীমতার জন্য এবং তাহারের মহীয়সী রাণী নামক দেবীর জন্য বুদ্ধকে প্রাণ বিলম্বন ছিল।

বুদ্ধকে হইতে রাজধানী ছিল অনেক দূর। রাজার পরাকর ও বন্দী হওয়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছানোর বহু পূর্বেই নবাবের অবারোহী সৈন্য ক্রতবেগে গিয়া পুরী আক্রমণ করিল। পুরী রক্ষার জ্ঞত যে সামান্য কজির ঘোড়া ছিল, তাহারাই অমিতবিক্রমে পুরীর প্রবেশদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিল না। বুদ্ধের মধ্যে পুরীর প্রবেশদ্বার ভদ্র করিয়া নবাব-সৈন্য পুরীতে প্রবেশ করিল। তাহারাই পুরী রক্ষার জন্য ছিল, তাহারাই বুদ্ধ করিল, নবাব-সৈন্যদিককে মারিল এবং নিকেরা মারিল। রাজার বালক পুত্রের হির থাকিতে পারিল না, বুদ্ধ ভলোয়ার হতে পুরী-রক্ষকদের সহায়তার অগণিত নবাব-সৈন্যের মধ্যে কাপাইরা পড়িল। কিন্তু কতকণ। নবাব-সৈন্যের নিকট তাহার আহত অবস্থার বন্দী হইল।

রাণী নামক দেবী ও তাঁহার পুত্রের সহিত বন্দী হইলেন। নামক দেবীর বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া নবাব পূর্বে উত্তম হইয়া উঠিলেন এবং বাস্তবিকতার হাসি হাসিলেন। আজ তিনি

হুমিয়ারকে দেখাইয়া দিবেন যে, নতীনের তেজ গর্জিতা মারী কেমন করিয়া সবলের কাছে তার বেহ, মন ও নতীনের অহকার সূচাইয়া দেয়।

বেধানে বসিয়া রাজা তাঁর দরবার করিতেন, সেই দরবার-কক্ষে নবাবের সন্মুখে বন্দী নামক দেবীকে ও তাঁহার আহত বন্দী পুত্রকে আনা হইল। নবাব দেখিলেন যে, তাঁহার সন্মুখে এক অপরাধ মারী কাপাইরা আছেন; তিনি ত রূপবতী মারী মন, মারীরূপে অলভ লোহনলাকা। নবাব সে রূপের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। স্বর্ঘ্যের আলোক বর্ণনে প্রতিবিম্বিত হইয়া চোখে আসিয়া পড়িলে চোখ যেমন বলসিরা যায় তেমনি সে রূপের ভেঙ্গে নবাবের চোখও বলসিরা গেল। আপনা আপনি নবাবের মাথা নত হইয়া আসিল। বুদ্ধের মধ্যে নবাবের দান্তিকতা রাণীর রূপের জ্যোতির কাছে ম্লান হইয়া পড়িল। নবাব এক বর্ণীর দীপ্তির কাছে হার মানিলেন।

কিন্তু কতকণ। আবার নবাবের মনে জাগিয়া উঠিল রূপের মোহ ও ভোগের স্পৃহা। নবাব শান্ত হয়ে নামক দেবীকে তাঁর বেগম হওয়ার জন্য অহুরোধ জানাইলেন। নবাবের কথা শুনিয়া নামক দেবীর আহত ও বন্দী পুত্রের তাহারের মন্তক মন্ত করিল। পুত্রের সন্মুখে মাতার অপমানে বন্দী পুত্রের মনে বিষম অভ্যর্জা জাগিয়া উঠিল। আজ রাজপুত্র বালক বন্দী; তাই মাথা নত করিয়া সজ করিল নিজের মাতার অপমান। কিন্তু দুপার, অপমানে ও কোপে বন্দী নামক দেবী সিংহীর মত গর্জিয়া উঠিলেন এবং বিজলী চমকের মত হঠাৎ অগ্রসর হইয়া নবাবকে পদাঘাত করিলেন।

কোপে, অপমানে, লজ্জার ও পরাক্রমের আলার নবাব উত্তম হইয়া উঠিলেন। কষ্ট কষ্টে নবাব নামক দেবীকে বলিলেন যে, হয় তিনি বেজার তাঁর বেগম হইবেন, না হয় তাঁহার সন্মুখে তাঁহার পুত্রকে হত্যা করা হইবে। হয় বেগম হওয়ার, না হয় তাঁহার পুত্রের মন্তকদান ইহার একটা রাণীকে বাহিয়া লইতে হইবে। আহত সিংহীর মত গর্জিয়া উঠিলেন নামক দেবী এবং অটোহত হাসিলেন। সবে সবে নামক দেবীর পুত্রও হাসিয়া উঠিল অপমানের ভূতপ্রোভের অটোহাসি এবং সারা দরবার-গৃহে খেলিয়া গেল বিভীষিকার এক ভক্তি-প্রবাহ। এই বুদ্ধ নবাবের অলহ হইয়া উঠিল। রাণীর পুত্রকে হত্যা করার জ্ঞত আদেশ করিলেন। আদেশ পাইবার সবে সবে হই জন পাঠানের হইবানি শাপিত অসি কোববুদ্ধ হইল; সবে সবে হইবানি বুদ্ধ অসির কলক বিজলী খেলিয়া বাওনার মত সূতে উপিত হইয়া বুদ্ধের মধ্যে মারিয়া আসিল আহত, বন্দী রাজপুত্রের কাছে; আর হইট হির মন্তক ভূতলে সূচাইয়া পড়িল।

রাণী চকু বুজিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন বালক-
ঘরের বেহ হইতে কিম্বা দিয়া উঠা রক্তের স্রোত। কণিকের
কণ্ডু রাণী একটু হুঃ ধরিলেন না। নিজের সতীত্বের
বিনিময়ে মরণম নবাবের কাছে পুত্রঘরের প্রাণ ত্যাগ করিলেন
না। হুই চোখ দিয়া তিনি হুই কোঁটা চোখের জলও
কেলিলেন না। অচল অটল অবস্থার বিস্ময়িত মননে
পুত্রঘরের হত্যা দেখিলেন; চাহিয়া দেখিলেন খুলাস পুটানো
পুত্রঘরের হিন্ন মন্তক। তারপর বীর হির তাবে লুটাইয়া পড়িয়া
পুত্রঘরের তপ্ত রক্তের তাঁহার সারা অঙ্গে মাখিলেন।

কবির-রঞ্জিত রাণীর বৃত্তি দেখিয়া নবাব ভীত হইলেন।
তখন নবাব দেখিলেন রাণীর মধ্যে সতীত্বের ভেদে দীপ্ত এক
মহীয়সী নারী; আরও দেখিলেন তিনি নারীত্বের সর্বোৎকর্ষিত
অলঙ্কার লৌহবস্ত্রের তার জ্যোতির্ভর এক হিন্দু নারী।
অধিকতর সে জ্যোতির্ভর বৃত্তি নবাব দেখিতে পারিলেন না;
রাণীকে পাকীতে তুলিয়া রাজধানীতে লইয়া বাইবার জন্য
হুকুম করিলেন। নবাবের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পাকী-
বাহকগণ পাকী লইয়া উপস্থিত হইল।

পাকীবাহকগণ রাণীকে পাকীতে তুলিয়া লইয়া নবাবের
রাজধানীর দিকে ছুটয়া চলিল। পাকীবাহকগণ স্রুতবেগে
চলিতে লাগিল; ভিতরে রাণী বলিয়া আছেন, কোন সাক্ষা-
ৎকার নাই। পাকী লইয়া বাহকগণ অনেক দূরে এক প্রান্তরে
চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ রাণী পাকীর ভিতর হইতে অটহস্ত
হাসিলেন—সে যেন মহা স্রাব্যের শিবাকলরব। পাকী-
বাহকগণ সে বর শুনিয়া ভীত হইল। মুহূর্তের মধ্যে পাকীর
ভিতর একটা ভীষণ সর্জন আরম্ভ হইল; সে যেন পিঙ্করাব্দ
আহত সিংহীর সর্জন। পাকী-বাহকগণ পাকী নামাইয়া
শিহনে পড়া নবাব-সৈন্যের ও নবাবের প্রতীক্ষা করিতে
লাগিল। ভিতরের সর্জন ভীত হইতে ভীতভর হইল, পদাঘাতে
রাণী পাকীর দরজা আঁড়িয়া কেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লাকাইয়া
বাহির হইয়া রাণী উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। বাহকগণ কিং-
কর্ডব্যবস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া রাণীর অপরাধ বৃত্তি দেখিতে
লাগিল; সে বৃত্তি নারীবৃত্তি নয়, সে বৃত্তি দামবদলনী বৃত্তি।
তাহারা রাণীকে বাধা দিল না, বরিবার চেষ্টা করিল না—
তাহারা তাহাদের কর্তব্যের কথা তুলিয়া গেল। রাণী উর্দ্ধ-
্বাসে ছুটিতে লাগিলেন—কোন্ দিকে, কোথায় তাহা তিনি
জানেন না। জনহীন প্রান্তরে তিনি কেবল ছুটিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রান্তরের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া,
কণ্ঠকিত বনের ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার পরমুগল
কন্ডে, পাথরে ও কণ্ঠকে কতবিকৃত হইল; ভাষাি তাঁহার
ছুটবার বিরাম নাই। এইভাবে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে এক
স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া
দেখিলেন। অবশেষে তাঁহার পরীর আঁড়িয়া পড়িতেছিল; কিন্তু

অবসার কর্তব্য তুলাইতে পারিল না। মাঠ, প্রান্তর ও জঙ্গল
হইতে শুক কাঠ সংগ্রহ করিলেন এবং চিতা লাকাইলেন।
চিতা লাকাইলেন; কিন্তু আগুন নাই। কোথায় আগুন
পাইবেন। এই প্রান্তরে কে দিবে আঁক তাঁহাকে একটু আগুন
তাঁহার নারীত্ব ও সতীত্বের সন্মান রক্ষার জন্য। কোথাও
কোন আগুা যখন মিলিল না, তখন তিনি বুজিয়া বাহির
করিলেন একটুকরা পাথর। দ্বিতীয় পাথরের টুকরা তিনি
বুজিয়া পাইলেন না। নিজের পাথরের বুড়ানুষ্ঠ সেই পাথরের
টুকরায় খসিয়া আগুন আলাইলেন এবং চিতার শুক কাঠে
লাগাইলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতা অগ্নিরা উঠিল।

এদিকে রাণীর পলায়ন দেখিয়া বাহকগণ কিছুকালের জন্য
কিংকর্ডব্যবস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর যখন তাহাদের
চেষ্টা করিয়া আসিল, তখন তাহারা রাণীর পলায়ন-সংবাদ
স্বাধা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া
নবাব-সৈন্য সেখানে আসিল, এবং নবাব নিজেও সেখানে
আসিলেন। নবাব বাহকদের কথা শুনিয়া সব বুজিলেন,
এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করিয়া রাণীকে বরিবার জন্য নবাব
তাঁহার অঝারোহী সৈন্য চারিদিকে পাঠাইলেন এবং তিনি
নিজেও কয়েকজন অঝারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অঝারোহে
ছুটয়া গেলেন। বন, জঙ্গল, মাঠ, পাহাড় প্রভৃতি সকলে
বুজিল। নবাব নিজেও বুজিলেন। কিন্তু রাণীর কোন সন্ধান
মিলিল না।

এই ভাবে বুজিতে বুজিতে সকলে যখন নিরাশ হইয়া
পড়িল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। সারা বিবে অন্ধকার
নামিয়া আসিয়াছে। নবাব এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া
দূরে দেখিলেন এক বিরাট অগ্নিবিধা। মনে করিলেন
কোন চিতা অগ্নিতেছে। সেখানে গেলে হয়ত রাণীর
সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তাই সেই দিকে বোতা
ছুটাইলেন।

নবাব সেই চিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।
দেখিলেন সেই প্রজ্বলিত চিতার এক পাশে কয়েকটি
দাঁড়াইয়া আছে কয়েকজন পাহাড়ী; যেন তাহারা কোন
দেবীর উপাসনা করিতেছে। আর দেখিলেন অলঙ্কার
চিতার উপর চকু বুজিয়া পরাসনে বসিয়া আছেন এক
অপরাধ নারী। চিতার চারিদিকের আগুন লোল
জিহ্বা বাহির করিয়া সেই রক্তবসনা নারীকে ঘিরিয়া
বসিয়াছে। নবাব এই নারীকে চিনিলেন। এই নারীই
রাণী নামক দেবী। নবাব তত্বিত হইলেন। তাঁহাকে
বাঁচাইতে কোন চেষ্টাই করিলেন না। পরাক্ষর ও অপমানের
আলার তাঁহার অন্তর গ্রাসিতে তরিতা উঠিল। কিন্তু হিন্দু নারীর
ভেদ, নারীত্ব বোধ, সতীত্বের আদর্শের মহিমা এবং বৈবাহিক
পরাকর্ষ্য দেখিয়া নবাবের মন প্রাণ স্রজ ও তত্বিতে তরিতা

উঠিল। নবাব চিতার উপবিষ্ট নারীর প্রতি চাহিয়া মাথা নত করিলেন।

বেহালায় মানক দেবী চিতারোহণ করিয়াছিলেন সে হাবের উপর একটি শ্রুতিমন্দির আছে। এই স্থান ওয়ার্ডন মহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। সে এক তীর্থক্ষেত্র। পরদিন ভগ্নিতাইকে লগে লইয়া এই শ্রুতিমন্দিরটি দেখিতে গেলাম। ঘেঁষিলাম, বহু নারী পুজোপচার লইয়া আসিয়াছে, মানক

করিতেছে, শ্রুতিমন্দিরে লিঙ্গর মাথাইতেছে, ধূপ ধূনার আরতি করিতেছে আর ভক্তিতরে প্রণাম করিয়া প্রাণের নিবেদন জানাইতেছে। অনেকজন ঈতাইয়া রহিলার। আদর্শ চরিত্র মানক দেবীর কথা ভাবিয়া প্রাণ মন তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রচার করিয়া উঠিল। তারপর মাথা আগনি নত হইয়া আসিল। শ্রুতিমন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই অশরীরী নারী রাই মানক দেবীর প্রতি প্রচা নিবেদনের জন্য হাতকোঁড় করিলার।

রূপের কথা

ঐকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চেনে না জানে না যে জন তাঁহাকে
সেও জানে নিরাকার।
পরিচয়ে আর আছে কিবা দরকার ?
ধ্যানী, অহুবাগী, রসিক তাঁহারে জানে,
তাঁরি প্রীতিকামী, কিরে তাঁর সন্ধান,
সত্যদৃষ্টি তাহাদেরি বাণী
তুনিবার শোনাবার।

২

তখন হয় যে রূপে তাদের
লিঙ্গ শিল্পীমন,
সেই রূপ তাঁতে করে যে দ্রবীকণ।
কখনো বা ভিমি বরাহ, কমঠ, মীন,
কুরুপের মাঝে মহারূপ সমাসীন,
ভক্ত মধুশ সব ফুলে করে
মধু যে আকর্ষণ !

৩

কখনো শিউল, চুড়ুচুড় বা
কখনো পঞ্চমুখ,
পদারবিন্দ পূজিয়া কাহারো হৃৎ।
কেহ তাঁরে দেখে রক্ত ভরস্কর,
কেহ মনোহর চির-ভামহুন্দর,
বহুবল্লভ অনন্ত রূপ
বাতে বার ভরে যুক।

৪

কোনটি তাঁহার খাঁড়ি রূপ বটে
কোনটি তাঁহার নয় ?
ভক্তই তাহা করে দের নির্ণয়।

যখন যে রূপে দেখেছে সত্য তাঁই,
অসত্যের যে প্রবেশ সেখানে নাই,
ধ্যানের সে রূপ-পরিমণ্ডলে
সব অমৃতময়।

৫

রূপ নাই তাঁর অঙ্কণ বলে,
দেখে সে অঙ্ককার।
রূপ দেখে সেই বিপুল ভাগ্য বার।
যে রূপের লাগি তৃপ্তিত নয়ন ফুরে,
যে রূপ দেখিলে বচন নাহিক ফুরে।
সজ বাহার, সাধনার ধন—
কুই তপস্তার।

৬

সেই তাঁরে চেনে, সেই দেয় নাম
তাকে 'জয় জগদীশ'।
যোগ্য বার তাঁর সঙ্গে অহর্নিশ।
পটে ও পাবাণে যে রসমুষ্টি আঁকে—
সত্য সে রূপ, ভক্ত দেখেছে তাঁকে।
রূপের পরিধি খুঁজিছে বাহার
নয়ন নিনিমিষ।

৭

সে রাগের পথে এক সাথে হয়
রূপ ও কথার শেষ,
রংগীই তাঁর করে পথ নির্দেশ।
সকল চিন্তা চিন্তামণির রাঢ়ে,
সব দর্শন ফুরায় তাঁহার কাছে,
সব রস এক রসিকে-যেরিয়া
রুঢ়ে রূপ-পরিবেশ।

কিন্নর জাতি

ঈশ্বরদেব শাস্ত্রী

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

৩

প—শিক্ষা, পার্শ্ব, অভাব-অভিযোগ

আমার বিবেচনার কত রকম ঠাঁই হইতে সরহানে একটি হাসপাতাল খোলা উচিত।

শিক্ষা ও চিকিৎসা। সুখের বিষয়, সম্রাট শিকার হিকে কিন্নরদের আশ্রয় বাড়িয়াছে। সেখানেই গিরাহি, লোকে হুল খুলিতে আশ্রয়ের অহরোধ করিয়াছে। সারা কিন্নর-দেশে নরট হুল—সাতটি প্রাইমারী, একটি মিডল ও একটি সেনিয়ার মিডল। শ্রী-শিকার হিকে কিন্নরদের মজর কম। এহিকে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। শ্রী-শিকার বিস্তার ব্যতীত কিন্নর-দেশের উন্নতি হইবার নহে। চীনীতে একটি বেশ সুন্দর হাসপাতাল দেখিলাম। কিন্তু ডাক্তার নাই। কেন নাই এ সময়ে অসুস্থতায় করিয়া জানিতে পারিরাছি যে, এত দূরে কোন ডাক্তার আসিতে চাহে না। চীনীতে জিমিষপজ মহাৰ্ঘ। সিমলার লবণের দর চার টাকা, চীনীতে চল্লিশ টাকা। পকাশ টাকা মণ মরেও চীনীতে মণ দুইপাশ ছিল। আমার মনে হয়, এই দূর দেশে যে সব কর্মচারী আছেন তাঁহাদের অত বিশেষ ভাঙার ও রেশমের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্নর-দের মিকেরেই লংবংসরের খোয়াক নাই।

চীনী কিন্নর-দেশের রাজধানী। এখানে একটি মিডল হুল আছে। রামপুর এখান হইতে সড়ক বাইল। সেখানে হাই হুল আছে। চীনী ও চীনীর আশপাশের লোকেরা হেলেনের রামপুরে পাঠাইতে চার না। তা ছাড়া হাজরদের তথার মাথা-পিছু চল্লিশ টাকা খোয়াকী খরচ পড়ে। তাই চীনীতে অবিলম্বে হাই-হুল খোলা আবশ্যক। রামপুর হুলকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করার কথা চলিতেছে। তামিলা শিকার বিভাগের ডিরেক্টরও এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন।

রামপুরে ঘেরেরে অত মিডল হুল

রামপুরে ঘেরেরে প্রাইমারী হুল আছে। উহাকে মিডল হুলে উন্নীত করা দরকার। সুযোগ না থাকায়, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক ঘেরে লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। মনে হয় ঐক্যবাসীরা সহশিকার পক্ষপাতী নহে। চীনীর হুলে ঘেরেরে ইতার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা বাইতে পারে। চীনীতে কোন ঘেরেকে আমরা হুলে বাইতে দেখি নাই।

শ্রীরোগ চিকিৎসা

শ্রীরোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। অত হানে বাই গাকে। এখানে (কিন্নর-দেশে) বাই পর্যন্ত নাই। তাই ঈশ্বরকালে অনেক শ্রীলোকের অকালমৃত্যু ঘটে। শ্রীরোগ চিকিৎসার অত এখানে একটি হাসপাতাল একান্ত প্রয়োজন।



চারপ-ছুরি পথে

হিমাচল প্রদেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের চিকিৎসা-বিত্ত শিকার অত বিশেষ হাজরতি দেওয়া সরকারের কর্তব্য। তাহা হইলে এখানকার প্রয়োজনমত ডাক্তার ও লেডি ডাক্তার পাওয়া বাইবে।

পুরু-পার্কিং ও বেল

কিন্নর-দেশে সৌর বর্ষ প্রচলিত। প্রায় সব তেহারই লংজাতিতে হয়। এখান এখান পুরু হইতেছে :

১। বিত্ত বৈশাখ লংজাতি দিন। ২। কান্তনী হোলী। ৩। দেওরালি—অতঃপূর্বে সময়ে অহুতিত হয় তার এক মাস পরে। ৪। কু লৈচ—বপহরা। ৫। জাগতা—২০শে ভাদ্র তারিখে। ৬। ভবরেন—প্রাণ-লংজাতি।

পুরু উপলক্ষে লোকেরা নাচে, গায় ও নক্ত অহুসারে ভাল খায়বার। জাগতার দিনে সারারাত আগিরা থাকে। ঐ উপলক্ষে বেল বসে। বেলোতে দেবতা আনা হয় এবং তাঁকে নাচান হয়। শ্রীলোকেরা গহনা পরে। বহু-পতি এখা প্রচলিত বলিয়া সব ঘেরের বিবাহ হয় না। এইরূপ অবিবাহিত ঘেরেরে কেহ কেহ এই সময় বেহারা প্রেম-পরিণয় করিয়া থাকে।

রামপুরের প্রাণ প্রাণ মেলা

রামপুর কেবলমাত্র কিয়ত-বেশেরই বড় বাজার মছে; কুহু, কীতি, ভিক্ত, কোন্দার-বাড়ের এবং হিমালয়ের অপর হু হু হানেরও তাহা প্রসিদ্ধ বাজার। এখানে ভিন্ন ভিন্ন মেলা হয় :

১। ২৪শে কার্তিক তথা বোটারুট ১১-১২ই নবেম্বর একটা বড় মেলা বসে। এই মেলার ভিক্ত হইতেও পশম বিক্রয়ার আসে। লাখ লাখ টাকার জিনিসের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। এই মেলাকে লোক মেলা বলা হয়। বিক্রয়ের-কত বহু বোতাও আসে।

২। হোলী—এই মেলার কিয়ত, বুধবার ও কুহু হইতে বহু লোক আসিয়া থাকে। এটা বয়োর মেলা। দেবতা এই মেলার আদেশ।

৩। ২৪শে বৈশাখ—উপরি-উক্ত সব রকমের জিনিস এই মেলার বিক্রয় হয়। তারত হইতে লোকে জিনিসপত্র লইয়া প্রাণ হইতে ভিক্তে যায়।

গৃহ-নির্মাণ

কিয়ত-বেশের ঘরের বেওয়ার পাথরে তৈরি, কিন্তু কাঠের ব্যবহারও কম নয়। এখানে কাঠে উই লাগে না। গর ভবা ঘানের গোলা গৃহক করিয়া বাসানো হয়। সাধারণতঃ বাস-গৃহের নীচের ভলার পত্তদের রাখা হয়। গৃহ বোতলা বা ভেতলা। দরজা মেহাত ছোট। গৃহ নয় শু বেন দরজা-কানাল। বহু রেলের একোঠ। ঘরের ছাদ ভিন্ন একাধের। চৌরার আশপাশে স্টেট-পাথরের ছাদ দেখিয়াছি। সেখানে পাথর পাওয়া যায়। ঐরা হইতে বাগত পূর্বাত কাঠের ছাদ। পরে দাঁটির ছাদ, কারণ সেখানে বর্ষা নাই। এই সব ছাদ দেখিয়া পশ্চিম পঞ্জাবের কথা মনে পড়ে।

সরকারী ব্যবস্থা

সরকারী কর্তব্যবস্থা ভিন্ন একাধের :

প্রত্যেক গ্রামে এক জন সর্দার থাকে। সে জাতিতে সর্বার। আর থাকে হরিজনশ্রেণী হইতে এক জন হরমতী। ইহাদের বেতন নাই। সরকারী লোক আসিলে লোকজনকে ধর বেওয়া, লোক ঢাকা ইত্যাদি তাহাদের কাজ। গ্রাম-বাসীদের পীড়ন করিয়া সরকারী লোকেদের কত তাহারা বে খাত সংগ্রহ করে তার ভাগ তাহারা পায়। তাহাই তাহাদের বেতন।

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটা বোতা। প্রত্যেক বোতীতে একজন ময়রদার থাকে। ময়রদার অভিভাভ-বংশের হওয়া চাই। রাজবের শতকরা পাঁচ টাকা তাহাদের প্রাপ্য। কিন্তু তাতে কি তাবের চলে। জনগণকে, বিশেষ হরিজনদের উদ্ধৃত করার তাহা লাইসেন। লাইসেন বিলে সরকারের লাভ হয়। এ কেহে হয় কতি—এইটু ব্যবধান।

কতকগুলি বোতীর সবটিকে পরগণা কহে। পরগণার কর্তা হইতেছে কেলদার। কেলদার গরীব লোকের পক্ষে লাক্য বম্বরপ। তাহার উৎপীড়নে লোকে শশব্যস্ত। কেলদারও অবিকার্য্য হলে অভিভাভ-বংশের লোক। এই ব্যক্তিও রাজবের একটা গণ পায়। প্রায় সব পরগণাতেই এক জন পাটোয়ারী থাকে। পাটোয়ারীদের এলাকা বস্ত্র। কতকগুলি পরগণা লইয়া একটা তহশীল। তহশীল তহশীলদারের অধীন। কিয়ত-বেশে সর্কসমেত পঁচানব্বইট গ্রাম। কুড়ি বোতীতে তাহা বিভক্ত।

বরাত বলিতে হইবে, রামপুর ও চীনীর তহশীলদারেরা জনপ্রিয় যোগ্য লোক। তাহারা হই কমেই বুধবারের লোক—তাল দাখ।

নাম বৈচিত্র্য। সিমলাতে এক কিয়তের সহিত দেখা—শিকা-বিভাগে এলিটেট ডেপুটি ইন্সপেক্টর। তাহার নাম বাগ ডুপ স্লিং। তত্রলোক বি-এ, বি-ট। চীনীতে একটা গ্রাম ছাজের সহিত দেখা, সে নিজ পরিবারের লোকের নাম এইরূপ বলিয়াছিল। ছাজের নাম—কক্ক ছেরিং। পিতার নাম বেশিম ছেরিং। মাতার নাম গবে জামী। বোদের নাম কবল জামী। কক্কবংগ গ্রামের ছাজ নিজ পরিবারের নাম বাহা বলিয়াছিল তাহা এই :

ছাজের নাম ঠাকুরদার। পিতার নাম (১) ইলজিং, (২) ভিলকরার, (৩) রতুল, (৪) পরস দাল। মাতাদের নাম (১) গদাধানী, (২) বর্ষাধানী।

কিয়ত-বেশের যে সব পরিবারে লামাদের প্রভাব সে সব পরিবারে ভিক্তী তাহার নাম রাখা হয়। চীনীর মিডল সুলে দ্বিতীয় তাবারপে ভিক্তী পড়ান হয়। উহা পড়ান রামজীদাল। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। খুব সংলোক।

কিয়ত-বেশের কৈলাস

কিয়ত-বেশে তন্নানক শীত। আমরা চীনী সিরাহিলায় যে আসে। পথে প্রায় সর্কজ উক্ত শিবরগুলি বরকে ঢাকা দেখিতে পাই। হিমালয় বেন চাবির গহনা পরিয়াছিল। কিয়ত-বেশের সর্কোচ্চ শিবর কৈলাস। তাহা সারা বছর বরকে ঢাকা থাকে। কৈলাসের সর্কোচ্চ ভাগের উচ্চতা সূর্য্যভল হইতে ২১২৫০ ফুট। উহার নাম বালডংগ। নামস সরোবরের নিকটই কৈলাস আর এ কৈলাস এক নহে। তার উচ্চতা ২২০০০ ফুট। কিয়ত-বেশের কৈলাসের শোভার তুলনা নাই। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পরে কৈলাস বেন নব-বহুর সাজে সজ্জিত হয়। বারিক পরে পরে নুতন নুতন শাড়ী পরিয়া নব নব রূপ ধারণ করে।

সূর্যাসেন হইতে একটা হিমাহ্মিত উক্ত শিবর দেখা যায়। দেবকীন্দন তারবাক বলিলেন পাহাড়ীরা ঐ শিবরকে হংলবেশক বলিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস জীব দ্বিরা

ওখানে যায়। উপনিষদের ধর্মেরা জীবকে হংস বলিরাহেন। তারও আগে ধর্মেরে ঐরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

যুদ্ধ কিন্নরদের বিজ্ঞান করিলে তাহারা বলিবে, পাণ্ডবেরা বর্ণারোহণের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রবৃত্ত হইতে রওনা হইয়া হিমালয়ের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে তাহারা কিন্নর দেশের কৈলাসে আরোহণ করেন ও তথায় দেহত্যাগ করেন। আর তাই এই শিখরকে কৈলাস বলা হয়। যুদ্ধ শব্দে হলে বর্ণবাস বা কৈলাসবাস কথাটি ভারতবাসীরা হামেশা ব্যবহার করিয়া থাকে।

জন্মের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত

কিন্নরেরা অতি প্রাচীন জাতি। হিমালয়ের এই সব অল্পসংখ্যক আদিম অধিবাসীরা সমস্তের প্রগতির অতি পক্ষেতে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের এক কোণে অবস্থিত কিন্নরদের দ্বারা হুঃখানুভূতি আছে। তাহাদের মধ্যে জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আয়ুবিকাশের জন্য তাহারা ব্যাকুল বলিলেই ঠিক বলা হইবে। কিন্তু জাগ্রত সমুদ্রত অপর দেশবাসীর সহায়তা ব্যতিরেকে ইহাদের বিকাশ হইবার মতে।

অশিক্ষা কিন্নরদের মুখ্য সমস্যা। চঃখের কথা, স্কুলের অভাবে কিন্নরেরা ইচ্ছা থাকিলেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারিতেছে না। ঘরের কোণে হইলেও ইউরোপ-আমেরিকা অপেক্ষা কিন্নরদেশে ব্যাভাষ্য কষ্টসাধ্য। ভাষার-বৈত নাই, তাই ঠেকিয়া কিন্নরেরা স্তম্ভপ্রভ ও দেবতার শরণাপন্ন, অনুধাবিত্ব তাহারা তাহাদের ভরসা। জীলোকের অবস্থা শোচনীয়। হরিজনদের অবস্থা পশুর অপেক্ষাও অধম। হিমালয় প্রদেশের আর কম। অতএব কিন্নরদেশের শিক্ষা, বাহ্য ও পথ-বাটের সুব্যবহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই সবিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিকাশাহীন অবস্থা সত্ত্বেও কিন্নরদেশ সব দিকে অল্পসংখ্যক। গাভী-পুতি ভাণ্ডার, কস্তুর বা ট্রাউ ও ভারতীয় আদিমজাতি সেবক-সম্ম ইত্যাদির কর্তব্য—দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত এই সব উপেক্ষিত নৃক দেশবাসীর উন্নয়নে অবস্থিত হওয়া।

কুমারসেনের দিকে এবার আমাদের যাত্রা শুরু হইল।

কুমারসেন একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। তাহা আজ নবগঠিত হিমালয় প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ১০ই মে কুমারসেনে পৌঁছলাম। নারকুণ্ড হইতে কুমারসেন দূর মাইল। নারকুণ্ড নর হাজার ফুট উঁচু; কুমারসেন রাজ পাঁচ হাজার পাঁচ শত ফুট উঁচুতে।

এখানে সকলের বুকেই ব্যাভাষ্যের অভিযোগ শুনিলাম। স্থিতিতে পারিলাম, সরকারী কর্মচারীদের কাছে গ্রামবাসীরা রেশমের জন্য আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। পরিধানে বন্ধ দেখিয়া নারকুণ্ডের এক কাঠুরিয়া আমাদের বলে, ‘পঞ্জাবে ত হাজারো বস্ত্র গম যাবে,

এদিকে হিমালয়বাসী আমাদের কংগ্রেস-সরকার অমাহার্যে মারছে। বে নাম দিতেই আপনি প্রভু বাতুন না কেন,



দত্তাজের মন্দির

নারকুণ্ডে গম বা বান আপনি পাবেন না।’ নারকুণ্ড হইতে কুমারসেনে যাইতে যাইতে মনে সংশয় জাগিল, অবস্থাটি কি এতই সন্দীপ। কিছুদূর অগ্রসর হইতে সামনে দেখিলাম গম-ক্ষেত। দূর হইতে মনে হইল ফলম ভাল হইয়াছে। সব-কিছু নিজ চক্ষে দেখা অভ্যাস। রাস্তার ধারের একটা ক্ষেত্রে গেলাম। পশু পাকিয়াছে বলিয়া মনে হইল। হুটী পীষ ছিঁড়িয়া লইলাম, হাতে ডলিলাম; ভাঁড়া হইয়া গেল। একটি দানাও তাহাতে ছিল না। এক্ষণ হওয়ার কারণ বিজ্ঞান করিলাম। তন্মিতে পাইলাম, গম ফুলিবার সময় বৃষ্টি হয় নাই তাই ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীজ রাগার মত গম পাওরা যাইবে কিনা সন্দেহ। দেখিলাম পশু হুর্দল, আর মানুষ নিরীষ। একটি লোকের সহিত দেখা। সরকারী চিঠির বলে নারকুণ্ড হইতে ছোলা লইয়া কিরিতে-ছিল, রাজ পাঁচ সের। যাইবে সাত জন। সাত জনের জন্য সাত দিনের ঐ বরাদ্দ। আর তার জন্য তাহাকে পুরা দুই দিন ব্যয় করিতে হইয়াছে। সে আমাদের বলিল, ‘পরমা ঘিরেও গম, বব, বান, ছোলা কিছুই মিলে না। পাঁচ সেরে সাত জনের সাত দিন চলে ? তহশিলদার এর বেশী দেয় না।’

কুমারসেনে পৌঁছিতেই রেশমের অব্যবহার সন্দেহী হইতে হইল। কোন বোকানেই ব্যতপত ছিল না। ঐদেবকীন্দন

তরবার আশাদের ব্যবহা করিলেন, মরত আশাদেরও মুশকিলে পড়িতে হইত।

‘এই রাজ্যের রাণা জীসোমেশ্বর সিং উদীরমান হুবক। মহাত্মা গান্ধীর বৃত্তি রক্ষাকল্পে ইনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কত ভিন্ন হাকার টাকা দিরাছেন। হিমাচল প্রদেশের সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই জী-শিকা বিষয়ে উদাসীন, তাই রাণা সাহেবের এই দান খুবই বাহাদুর্যপূর্ণ। আশাদের পরামর্শে কুমারসেনের অধিবাসীরা কতরবা বুনিরাদী কড়া বিদ্যালয় খুলিবেন স্থির করিরাছেন। আশা করি, তাহাদের অভিপ্রায় শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। লিখলাতে হিমাচল প্রদেশের চীক কমিশনার ই. পি. হুদকে এ বিষয়ে বলিরাছি।

অনুলেপ

কুমারসেনে পৌছিলাম। এখানেও আশাদের দেবিত্তেই লোকের মুখে সেই ‘হা অর’ শ্রুতি। রাজাবাসের হাজ, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, কৃষক, বালক, জী-পুত্রব, সকলে বাস ও আত্মীয় (চুহুরজাতীয় কল) খাইরা দিন কাটাইতেছে। একাত্ত বিন্দু লাগিল। একজন হরিকন্মকে দেখিলাম। পত পমর দিন সে অমাহারে; মারকুতার জীবনের সহিত বিন-করেক পূর্বে সে দেখা করিরাছিল। সকাল-সন্ধ্যা ছদ্ম-চা খাইরা সে দিন কাটাইতেছে অথবা ধীরে ধীরে মরিতেছে।

পরের দিন সন্ধ্যা হইরা চাতান গ্রামে গেলাম। সন্ধ্যা জীপদীর্ঘকী ছিলেন। চাতান কুমারসেন হইতে মাইল চারেক দূর। গ্রামের কাছে সরকারী সমিতির ইন্সপেক্টরের হিত আশাদের সাক্ষাৎ হইল। জীদেবকীন্দনকীর অহুরোবেইং সতিমি গ্রামটি দেখিতে আসিরাছেন। সেখানে সাক্ষা আকালের পরিচয় আমরা পাইলাম। পত ভিন্ন দিন সন্ধ্যা গ্রামবাসীরা অমাহারে আছে। কিছু বালের পাভা সিদ্ধ করিরা খাইতেছে। এক হরিকন্মের ঘরে গেলাম। ঘরে তাহাদের একটি দান পমত ছিল না। উমান লেপা-পৌছা, আশুদ ললে মাই।

গ্রামবাসীরা সকলে আসিরা আশাদের ঘিরিরা ঝাঁড়াইল। তাহাদের ব্যয়ণা আমরা রেশদ লইরা পিরাছি। এক বিধবা ব্রাহ্মণী আশাদের তাঁহার ঘর দেখিতে অহুরোব করিতে আসিরাছেন, তাঁহার পন্ডাতে ভিনটি ছোট ছেলে কঁদিতে কঁদিতে আসিতেছে। জীলোকটি তাহাদের আশাস দিরা বলিতেছিলেন, ‘সবুর কর, ধাম, সরকার অয়ের একটা ব্যবহা করবেই, আমি কি করব?’ একই বামিরা বেচারী বিধবা আরও বলিলেন, ‘বাব কোথা? পমরা ছিল, তা ত ঘেরে পের করেছি। আছে সবল পরণের কাপড়। তা বেচেই ভোদের খাওরাব।’ দারুণ লাগিল। ব্রাহ্মণীর ঘরে গেলাম। উমানে আশুদ ললে মাই। ঘরে কিছুই ছিল না, বাসদ-কোলদ আগেই বিক্রী হইরা পিরাছে। সকলেই আশাদের বিদ্ধ নিজ ঘর

দেখিতে বলিতেছিল। সমাজকে চাবী অর বোণার। তার এই হুর্শা। লক্ষার মরিরা গেলাম। জীহগদলাল তাই বোকাডে গেলে; কিছু তাকা ছোলা আসিরা গ্রামবাসীদের দিলেন। গ্রামে তাহাদের কল আসিল। বুঝিতে পারিলাম, গ্রাম-বাসীদের সব সবল মিঃশের হইরা পিরাছে, কেমার পতি তাহাদের অত্যন্ত কীণ। চাতানে ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, মোহমসিং নামে এক বৃদ্ধ কুমার আলা হইতে নিভুতি পাওরার কত পতক্রতে ঝাপ দিতে পিরাছিল। টের পাইরা গ্রামবাসীরা মদীর কিনারা হইতে ঘরিরা আসিরাছে। সেই দিন বিপ্রহরের আহারের পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবু, চিক কমিশনার ই. পি. হুর্ন, অররামদাস দৌলভরান, জীসোমেশ্বরী মেহক ও প্রেস ট্রাষ্ট-এর নামে এক লখা তার প্রেরণ করি। ভূপদেব নামে একটু উৎসাহী হুবক তাহা পাঠাইতে কোটগড়ে যায়। কোট-গড় কুমারসেন হইতে চার মাইল।

খাইলাম, আমদমা তাবে। যেখানে লোকে অমাহারে মরে, সেখানে অন্ন কুচে কি? সন্ধ্যা হইতে কুমারসেন কিরিরা আসিলাম; আবার সেই ‘হা অর’ হব। রাজাবাসের হাজদের কাছে আসিলাম, তাহাদের কোম দিন দুইখানা, কোমদিন বা সওয়া দুইখানা দ্রুট কোটে, কুমার তাহাদের পাচ-খামার। হাজের সংখ্যা ৫২।

এক বুড়ী আসিল। হাতে তার লবণ, মাটি-মিশ্রিত, আধ লের হইবে। দাম ভিন্ন আনা, বুড়ী বলিল, ‘কিছু দাস বেটে ললে শুলে লবণ দিরে খাব। দাসও এখন দুখাত।’ কুমারসেনের লোকেদের আর একটা কষ্ট, তাহাদের হাই ফুলকে মিডল ফুলে অবনমিত করা হইরাছে। তাই বিবিধ কুমার তাহারা ক্রিষ্ট—ভৌতিক ও মানসিক। হাই ফুল বদ হওরাতে সাতাশ জন হাজহাজী বসিরা আছে। উহাদের হই জন মেরে ও চার জন হরিকন্ম। এই ফুলকে প্রাইমারী হইতে হাই ফুলে উন্নীত করিতে জীদেবকীন্দনকীকে মাধার বাম পায়ে কেলিতে হইরাছিল। তাই ইহার অবনতিতে তিনি অতিশয় বিষয়। গ্রামবাসীদের অন্নকষ্ট আর হাই ফুলের কষ্ট দুই-ই সমান ভীত। কুমারসেনের শিকার কুমার দ্রুটে হিমাচল প্রদেশের শিকার কুমার ঝাঁচ করা বাইতে পারে। উন্নীতেও তার পরিচয় পাওয়া গেল। গ্রামের পমরটি ছেলেমেরে আশাদের কাছে আসে। তাহারা পড়িতে চার, কিন্তু ফুল মাই বলিরা পত চরার। উন্নীর দশ মাইল দূরে কিলওয়ারে ফুল আছে। ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষে প্রতিদিন তত দূরে যাওয়া সম্ভব নহে। তাওয়ারে ফুল আছে, হাজসংখ্যা পরজিখ। বর মাই। গাহতলার ক্লাস বলে। শিকার কুমার ইহাও পরিচায়ক। লেখাপতার আগ্রহ থাকে লঙ্ঘেও ঘেণের বালক-বালিকারা নিয়কর থাকিরা খাইতেছে। যেখানে পিরাছি, আর বাহার লকেই কথা হইরাছে—সর্বজাই এক অহুরোব—‘আশাদের ফুল দিন।’

চীনী হইতে কিনিবার পথে বতনগরে আসিয়া (৩০শে মে) ভূমিতে পাইলাম, কুমারসেন ভুলকে দুই বছরের বড় পুত্ররায় হাই ভুল করা হইবে। খুশী হইলাম। সারকৃত্তার পৌত্রিমা বধন বধন পাইলাম যে, কুমারসেনের অকষ্ট হর করার নিমিত্ত হিমাচল প্রদেশ-সরকার দ্বারা ব্যবস্থা করিরাহেন—লোকে রেশন পাইতেছে, তখন যোদ্ধাগ্রাণ্ডিসম আমল অহতব করিলাম। চিক কনিশমর জীবন ও তাঁহার সখীনন্দ রাজকর্ত্তচারীদের বতবান জানাইলাম।

বনৌলী কুমারসেনের লাগোয়া গ্রাম। ভবার একটি আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবার উৎসাহী যুবকেরা হিমাচল প্রদেশ সেবা-সল্য নামে একটি সল্য গঠন করিয়াছে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞ জীয়ারবাব সিংহীর নাম উল্লেখযোগ্য। চীনীতেও এইরূপ একটি সেবা-সল্য গঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনগ্রসর প্রদেশের জাগৃতির পরিচয় মেলে।

মচার হইতে পৌড়া করিতেছিলাম। পথে এক বৃদ্ধের সহিত দেখা। দেবিলাম লোকটি ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন।

পারীধকী ভগবানের নাম করিতে করিতে ধানিকচুর আগাইয়া গিয়াছিলেন। অভিবাদন অর্থে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার নিবাস ?” “অঙ্গু”। অঙ্গু, চীনী হইতেও ধানিকচু। হুয়ে—ও-পাশে। বৃদ্ধ আরও বলিলেন—“হিমাচল-প্রদেশ হইতে না, আমার কিনিরেরা মরেছি। আগে সিমলা হইতে বত ইচ্ছা লবণ, গুড়, চাল, কাপড় ইত্যাদি আনা বেত। কোন প্রতিবন্ধ ছিল না। গ্রীষ্মে বাতী কেরবার সময় ভেড়া-ছাগলের পিঠে মাল চাপিয়ে দিলেই ত’ত। হিমাচল-প্রদেশ হওয়ার পরে আমাদের পক্ষে সিমলার বাতীর বত হয়ে গেছে; কিনিরেরা ঠার মরেছে।” বৃদ্ধের নাম বর্ধপাল। বর্ধপাল দুই বছরের মহারাজাকেও একহাত লইতে ছাড়িলেন না—“মহারাজা আপন খুব ত বুঝেছে, সরকারের সহিত আমার গতা বিলিয়ে ভাতা ঠিক করে দিয়েছে। দিন দিন কুলছে। আমাদের হুঃখের কথা সে কি ভাবে। বধন রাজা ছিল তখনও আমাদের জিজ্ঞাসা করে রাজা হয় নি, আর আজ হিমাচল প্রদেশেও আমাদের জিজ্ঞাসা করে আসে নি। এমন বিপদে আমরা কখনও পড়ি নি।”

বর্ধপালকে বলিলাম—“রাজ্য এখন প্রকার, কোন ব্যক্তি-বিশেষের মত। হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্র সিমলা, পূর্ব-পঞ্চাব সরকারের অধীন, এ কথা ঠিক। সিমলার কতকটা ভাগ হিমাচল প্রদেশের হাতে থাকলে আপনাদের খুব সুবিধা হ’ত সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরাশ হবেন না। অল্প দিন হয় হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছে। নতুন বর, ওহাতেও একটু সময় লাগবেই। আপনাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে বধন

সেবা-সেবা করবে তখন আপনাদের অধিক লাভ হবে। হিমাচল প্রদেশ হওয়ার্তে কতি হয় নি লাভই হয়েছে।”

উৎকোচের অভিযোগ

হুইট মেঘ-শাবক পিঠে লইয়া একজন কিনির লায়দ বাইতেছিল। সারক চীণীর চৌক মাইল ওদিকে, তিনকত-সীমান্তবর্তী গ্রাম। মেঘের পাশে বুয়ে-বা রোগের মতক দেখা গিয়াছিল। ভেড়া তখন কে কিনিবে। এক একটা ভেড়া বাতী কিনিয়া লইয়া বাওয়ার বড় উমানুখ প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মেঘগুলি দুই পা দার আর বলিয়া পড়ে। একবার আদর করে, আবার রাগ করে; মেঘগুলিকে লইয়া একটু দার, আর ধামে—এই ভাবে উমানুখ পথ চলিতেছে। উমানুখের অল্পবয়সী মেয়ে, মায়ের পিঠে তার সরহানের চড়াই পার হওয়ার কথা। মাতা-পিতার বোকা না হইয়া, তাহাদের বোকা হাল্কা করার বড় এক মনোভাব মেঘ-শাবক কোলে করিয়া সে পারে হাঁটরা চলিয়াছে। উমানুখের পত্নীর কথা আর কি বলিব। সে বেশ তখন মেঘ-হাসপাতালের অব্যাক। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলাম। আগ্রহ হইল উমানুখ ও তার ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলি। বলিলাম—“তোমাদের এ বিপদে তোমাদের বড় কিছু করতে পারি কি ? কি কাজ করব বল ?” এ কথার জবাবে উমানুখ বাহা বলিল তাহাতে আমার অবশি আরও বাড়িল। সে বলিল—“বাড়বারি কেন্দ্র গ্রাম করতে শুরু করলে কি আর বাটার আশা থাকে। এখন সময় এমনই পড়েছে যে সরকারী চাকুর্যে মাজই হুঃখের হয়ে গেছে। পরগা ছাড়া তারা পত্নী আশা-দের সঙ্গে কথা কর না। যে বত বত অকিসার তার দুবের বহর ভত বেশী। কারও কাছ থেকেই আমাদের আশা নেই। এক রাতই রাজ্য এখন ভরল।”

কহিলাম—“খুব দাঁত বলে না খুব দেয়। নইলে দেয় কার লাভ।”

“লোকে কি পারে পড়ে দেয় ? সরকারী কর্মচারীরা আমাদের কিছু আশীর নহে।”

এ কথা বলিয়া সে পারিত অহুঃ ছাপের কাছে চলিয়া গেল।

বাড়তুর ছয় মাইল দূরে শতক্রতীয়ে রাণরী নামক গ্রাম। ভবার চট্টতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের সহিত দেখা। পাশের গ্রামে চুরির ভয়ে সে বাইতেছিল। দুই দিন আগে এক করেট-চৌকি হইতে খাট চুরি হইয়া গিয়াছে। ইন্সপেক্টর বলিল—“এখানে এসে মহা খুশিকলে পড়েছি। তবে এক মাস এখানে (চীনীতে) এসেছি। জিন চাকা বিয়ে সিমলা থেকে নতুন কুতো দিয়ে এসেছিলাম। এক মাসেই তা ছিঁড়ে শেষ। বাধ্যত্ব্য ত কিছুই মেলে না। সঙ্গে কুড়ি সের গম নিয়ে এসে-

হিলাম। কুরিয়ে গেছে। এবার না গেছে থাকার পালা। অধিবাসীদের মিছেদেরই খাবার দেই ত আমার দেবে কোথা থেকে।”

সরহান, গৌরা, চৌরা ও চীনের ডাকবাংলোর তাকীর ব্যবহাও আছে। কিয়র দেশে একাক্ষ করে রেচ বাড়ির হরিজদের। ঐ সব কারণার তাকীরা মালিশ করিল যে তাহার। রেশম পাখ না। রোড ইন্সপেক্টর ত্রিলক্ষীটাকে জমাদারদের অহুবিধা ছুর করিতে বলিলে সেই মিছের অহুবিধার কথা পাকিল। রামপুরে রেশমের অহুসী ব্যবহা আছে। তারপরে আর ওমিকে দোকানদারের কাছেও খাচল মিলে না। সরহানে বরের আটা টাকা টাকা সে, আর চাউল এক সেরের দাম দেড় টাকা। সরহানের ওপানে কোন বাড়ী যায় ত তার পক্ষে উপবাসের পুণ্য অনারাগ-লভ্য। রোড ইন্সপেক্টরকে যেখানে অনাহারে থাকিতে হয়, সেখানে মেঘরদের আর কথা কি?

হিমাচল প্রদেশ-সরকার যদি সিমলা বা নারকুণ্ডার পদ-বান ইত্যাদি মজুত করিয়া রাখে ত কিয়রের। যে ও হাগের পিঠে তাহা চীনী, আর চীনের ওদিককার সব স্থানে অনারাগে লইয়া বাইতে পারে। কিয়র দেশে বর্ষা হয় না। এ স্থান কলচায়ের উপযুক্ত। গত দুই বৎসর হইতে এখানে তরানক ধান্যাতাব চলিতেছে। যেখানে এক মণ লবণের দাম পঞ্চাশ টাকা সেখানে আকাল নয় ত কি?

‘পার্লের’ পার্শ্ব

রোগী একটি গ্রাম। চীনের নিকটে। পরীক্ষকে লদে লইয়া আচার্য্য সন্তোষদাসজীর বাড়ী বাই। সেখানে বিদ্যার্থী শেরসিং থাকে। দুই বছর আগে অলোক আশ্রমের বিভাগলয়ে সে আমার কাছে পড়িত। সন্তোষদাসজী ওখানকার প্রভাব-শালী ব্যক্তি। কিয়র দেশের উন্নয়ন কি তাবে হইতে পারে তৎসংঘে তাঁহার সহিত আলোচনার প্রযুক্ত হইব, এমন সময় দীর্ঘাকৃতি একটি লোক আমার পাশে আসিয়া বলিল। পরিচয় নাই, কথা নাই, বার্তা নাই সে বলিল—“চার হেলে ও চার বিধা কমি আমি সরকারকে দিছি। আপনি দিন। হেলেদের কৌড়ে তর্প্তি করে দিন। আমার কমি হচ্ছে চীনের পাশে হিন্দুস্থান-ভিক্ত রোডের সংলগ্ন।” দিচ্চা করিয়া আচার্য্য সন্তোষদাসজীর কাছে জামিলাম লোকটি এক লাখ। দাম তার সমরপারা জদ। চিকিৎসা-ব্যবসায়ও সে করে। দুই মিনিট পরে লাখা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। তৃতীয় বারে গৌকে তা দিয়া বলিল—“আমার মত দাতা কে? চার চার হেলে আর চার চার বিধা কমি দিবে দিছি। আমার যদি পদমুটি হেলে থাকত তাহের সকলকেই আমি দিবে দিতাম।” লাখা আমাদের কথা হইতে ছিল না। একই

কথা সে এবার বার বলিতেছিল। তুক তুক করিয়া তার দুখ হইতে মদের পদ আসিতেছিল।

বলিলাম—“লামাজী, মহাত্মা বুড ও মহাত্মা গান্ধী মদের অপেক্ষা মিলা করেছেন। মদ আর খাবেন না।”

“হী, ঠিক কথা। কিন্তু আমার কথা টুকে নাও—চার হেলে আর চার-ছ বিধা কমি।”

মাটবুকে তার নাম লিখিয়া লইলাম তবে না অব্যাহতি।

জল ও বরাদ

বিরোগ রমণীর স্থান, শিমলা-নারকুণ্ডা রাস্তার উপর অবস্থিত। এখানে হাই স্কুল, হাসপাতাল ও আদালত আছে। বিরোগে টাউন-এরিয় কমিটি আছে। লোকসংখ্যা দেড় হাজারেরও অধিক। পয়স শত লোকসংখ্যাকে পাহাড়ে খুব বেশী বলিতে হইবে। জলের এখানে তরানক অভাব। শীতকালে বরফ পড়ে। গ্রীষ্মকালে বখন বরফ গলিয়া পড়িতে থাকে তখন চারিটি চৌবাচ্চার তাহা ধরিয়া রাখা হয়। এপ্রিল, মে, জুন তিন মাস জলের এখানে মিতাকরণ কষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ে চৌবাচ্চার ভালো খোলা হয়, তখন রেশমের মত বরাদ্ধমাকিক জল মিলে। মে’র শেষ সপ্তাহে আমরা বখন চীনী হইতে কিরিলাম তখন শুমিলাম যে এক টাকার এক কলসী জল বিক্রী হইতেছে।

আমাদের মনে হয়, হিমাচল প্রদেশ বিরোগ কমিটিকে একটি মোটর কিনিয়া দিলে এই জলাভাব দূর হইতে পারে। নারকুণ্ডাগামী মোটর-রাস্তার উপরে আট মাইল দূরে জল আছে মোটরে তাহা লইয়া বাওয়া সম্ভব। অত একটি ব্যবহাও হইতে পারে। বিরোগের দুই মাইল দীর্ঘে বাঁও আছে। মল বলাইয়া ইঞ্জিন সাহায্যে সেখান হইতে জল তোলা বাইতে পারে। মোটর দ্বারা জল-বহনের প্রদ ব্যবহারিক ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাপেক্ষ। প্রয়োজন বোধ করিলে ঐ জল পরলা লইয়াও বিক্রয় করা বাইতে পারে। এক কলসীর দাম এক টাকা পড়িবে না। অনেক কম হইবে। এখানকার আবহাওয়া শীত ও বায়ুপ্রদ, কমি খুবই উত্তম। আর ইহা শিমলাও নিকটবর্তী। পরীক্ষকী ও আমি বখন বিরোগে বাই তখন কোন লোককে বলিতে শুনিয়াছিলাম—“অত সব দিক হইতে বিরোগ বর্গ, জলের কথা বলেন ত মরক।”

মরমেদের বলি হরিজন

মহাপুরুষ দত্তাশ্রয়ের দানে শতক্রতীরে দত্তনগর নামক গ্রাম। এখানে ২৮ বর লোকের বাস। তার মধ্যে কুচি ৯ বর কোলী (হরিজন) আর চার বর ব্রাহ্মণ। দুইটি দোকান। দোকানদার অনন্তরাম হালবাঈ আদর করিয়া আমাদের

দত্তাশ্রের বামীর ও দেবীর মন্দির দেখাইল। কথিত আছে, পরশুরামজী সত্যযুগে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। দত্ত-নগর হইতে ১৮ মাইল দূরে শতদ্রু তীরে নরমণ্ড (কুর্জুর বয়ং পরশুরামজীর মন্দির বর্তমান। তামিলাম বার বছর পর অন্তর্গত) পর দত্তনগরে নরমেঘবজ্র অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরের ছাদ হইতে একটি ঘোঁটা দড়ি ঝুলিতেছে। লোকের তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যে লোক দড়ি চড়িবে, যজ্ঞের ছর নাস আগে নিজ হাতে সে ৫৬০ গজ লম্বা একটি দড়ি পাকাইয়া বলির জড় প্রস্তুত হয়। বলির দিনে লাখো লাখো লোক তাহা দেখিতে আসে। দড়ির এক দিক উচ্চ শিখরের একটি খুঁটার বাঁধা হয়, অপর প্রান্ত মন্দিরের পাশে ময়দামের অপর একটি খুঁটার। যে বলি হইতে চার সে ঐ উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দড়িতে উপবিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ে উপর হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মিনিটকয়েক

মধ্যে ৫৬০ গজ ব্যবধান দড়ির উপর দিয়া সে অভিক্ষম করে। কানকি মেহাতই তরাবহ। রুত্যাও বটিতে পারে। অনেক সময় বর্ষণের দক্ষম দড়িতে আগুনও বরিয়া যায়। তাই দড়ি যে চড়ে তাহার পিঠে একটি জলাবার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইতে কীণ বারার জল পড়িতে থাকে। যে লোক এতটা দূর নিরাপদে পৌঁছিয়া যায়, জনসাধারণ, এমন কি মহারাজ বয়ং তাহাকে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। বারি-পাতের জড়ই মাঝি এই নরমেঘ যজ্ঞের অহুষ্ঠান। অবিকাংশ হলে হরিজন প্রেয়ীর লোকেরাই নরমেঘ যজ্ঞের বলি হয়।

আমাদের ভ্রমণ-কথা এখানেই শেষ হইতেছে। এই জনএসর সীমান্ত প্রদেশে কত কাজ যে করার আছে, এই লেখা পড়িয়া, আশা করি, লোকহিতভ্রমী সংস্থাসমূহ তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন, আর পারম্পরিক সহযোগিতা-স্বত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই কার্যে অগ্রসর হইবেন।

বৃহত্তর ভারত

ঐকরুণাময় বসু

ভ্রামল বনত্রী বীণ

বেন কাঁচপোকা টিপ

সমুদ্র-মেঘলা রূপসীর,—

বোবন হেবার নভশির

শতে কলে প্রাচুর্য্য সম্ভারে,

বসন্তের পুষ্প উপহারে।

প্রশান্তির স্রব বাণী

উৎকীর্ণ রয়েছে আমি

পর্কভের খোদাই অকরে,

মন্দিরের কারুশিল্পে, পরভের বহু নীলাধরে

ছায়াঙ্কিত বনের পাতার,

টান উঠা ব্যোৎসর্গরাত্রে ফুলের লতার।

বহুদিন

এই বীণ রয়েছে নবীন

গভীর প্রাণের রসে,

লগিত ভ্রামল রঙে, প্রেমের পরশে।

অকস্মাৎ উঠিয়াছে বড়,

সেই করোণিত বর,—

ভীর হ'তে ভীরে

ধ্বনিত করিয়া কিরে

জীবনের স্রুতির বারতা;

বিদ্রোহের সেই কথা

অকস্মাৎ

করেছে আঘাত

ভারতের মর্গ-উপকূলে;

আত্মীয়তা লভিলাম আঙুলে আঙুলে।

প্রাণ বারাদিভে জানে,

প্রাণের নিষিদ্ধ যোগ তাহাদের টানে,—

এই সত্য করিহু স্বীকার।

আজ তাই করি অস্বীকার

ভোম্বাদের কাছাকাছি

আমরাও আছি,

জর হটক ইন্দোনেশিয়ার।

দুরাশা

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

এসে নবীর মোহনা। বিপুলবক আটলাটিক মহাসাগরে এসে বিশেষে প্রশস্ত হলবার। এগারে একটা নৌ-আত্মনা, সিনেট কংক্রিট দিয়ে সুশীত তার পোতাশ্রয়গুলো। লক্ষ্যচ্যাবী সাবমেরিনগুলো সেখানে এসে আশ্রয় পায়। হু-চায় দিন বিলম্ব করে, তেল-রসদ গুলি-বারুদ বোকাই করে দেয়, আবার বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে মাঝ বরিরায়। কলের তলা দিয়ে পথ কেটে চলে হিংস্র হুঁশিয়ার কলকাতার মত। আত্মনার কাছাকাছি এসে যখন হঠাৎ কলগর্ভের তলদেশ থেকে তেলে ওঠে উপরে তখন তাদের কালো কালো ইম্পাত-কঠোর চেহারা দেখলে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয় অতিকার হিংস্র সানুজিক প্রাণী মুখ। বীরে বীরে ইউ-বোটগুলো এসে আশ্রয় নেয় তাদের নিখিট বোলের মধ্যে।

ডাকার আছে হাড়া হাড়া ভাবে ছোট ছোট দালান-কোঠা বরবাড়ী; তাদের হাদের উপরিতাপ মানাবণে বিচিঞ্জিত আকাশ থেকে শত্রু-বৈমানিকেরা বাত্রে সহজে চিনতে না পারে জারগাটার আসল চেহারা, সেইজন্মেই ঐ কোশল। এ আত্মনাটা আগে ছিল না, লড়াইয়ের প্রয়োজনেই গড়িয়ে উঠেছে হালে। শহর এবং লোকালয় থেকে বেশ বামিকটা দূর, তারি নির্জন জারগাট। কেবল তারাই এখানে থাকে যারা সংশ্লিষ্ট এই নৌ-আত্মনার কাজকর্মের সঙ্গে। তাদেরই জন্মে তৈরি হয়েছে ঐ সব ছোটখাটো বরবাড়ী। এই ক্ষুদ্র একই জনপদের ওপাশ থেকে ব্রহ্ম হয়েছে বনছবি।

একটা লাইট রেলওয়ে একেবেঁকে চলে গেছে শহরে প্রায় বিশ মাইল দূরে, একঘেরে নির্জনবালে যে সব কর্মী ক্লাভ ও অবসর বোধ করে, লগ্নাহে হুঁশি এক দিন চলে যায় শহরে, লাচগাম, আদোদ-আফাদ করে, প্রচুর সব ধার, তারপর ফিরে আসে যে-বার কাজে। এমনই করে চলে এখানকার প্রাণহীন জীবনযাত্রা, কঠোর নিয়মের মুখল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মাহুতগুলো যেন একটা প্রকৃত বস্তুর ছোট ছোট ঢাকা। মনে যেই কল্পনার প্রসার, কর্মে যেই বকীরতা, আচরণের মধ্যে যেই সূতনয়, সকলেই যেন এক হাঁচ চালা, একই কারখানার তৈরি।

ওপারে সারাদিন বাঁধা থাকে হুখানা ড্রেজার (মাট-কাটা কাছাক), আর করেফটা টহলদারী জাহাজ। টহলদারী জাহাজগুলো একটার পর একটা পালা করে ডিউটি দেয়—উপকূলের ধার বেঁধে তারা চকিম বকী দেয় পাহারা। শত্রু অথবা সন্দেহজনক জাহাজ বাত্রে কাছে ভিত্তে না পারে সেইজন্মে তাদের এই লক্ষ্যতা।

উজানের দিকে নবীর তাকন ব্রহ্ম হয়েছে, তাকে ঠেকাবার জন্মে বিনমরাহি খাটছে এক হল প্রমিক আর তাদের ইঞ্জিন-মীরা। রেলওয়ে ট্রাকের উপর এসেছে একটা আটকাল বয়লার, তার সঙ্গে খাটছে একখানা গ্লান-হ্যাটার। হ্যাট-হ্যাট করে শিটে শিটে বক বক মনওরেজিমান ওক কাঠের খুঁটগুলো দেবতে দেবতে বলিয়ে দিচ্ছে মাটির মধ্যে, তার পেছনে এসে পড়ছে বক বক ব্যালাইট ট্রেন বোকাই পাথরের বোল্ডার। ঠোঙর খেয়ে কলের শ্রোত দুরে বেঁকে যাচ্ছে; দিমের বেলার ভেতর একটু হয় না বাস্তবিক হাড্ডির শব্দ, কিন্তু রাজিবেলার বহু দূর পর্যন্ত তেলে যায় তার তীক্ষ্ণ কর্ণ প্রতিক্রিয়া।

আত্মনার অধ্যাক ক্যাপ্টেন কোরাফিহু শ্রীর বিপত্নীক হুতো মাহুত; নির্ভরতা বতাব; নির্জনতার ক্লাভ অথবা কানু হবার পাঙ্গ তিনি নম। মদের অভ্যাগ আছে, যবে বলেই পান করেন; শহরেও যান না, অথবা মাতলামিত করেন না। বৌবনমুলত মততার অতীত তিনি এখন। গভীর মন্থর বতাবের লোক, কঠোর মিঠাবান কর্মী। ইষ্ট-প্রশিমান ভূখানীদের মত আছে এককোন্টা বিপুল গৌক; যেন দৃঢ়তা এবং সজ্ঞের প্রতীক।

পোতাশ্রয় থেকে বামিকটা ডকাতে ক্যাপ্টেন শ্রীরের বাংলা। লড়াইয়ের বালা বেরন হয়ে থাকে আর কি। আভরহীন শাখাসিমে বরণের কুটী। তারই সংলগ্ন তাঁর আপিস। তার পেছনে আছে প্রকৃত হুতো বোতার-লক্ষ্যের মাতল। আপিসের মধ্যেও আছে নানা রকম কলকাতা, হরেকরকম সানুজিক দামচিঙ্গ। দিমের মধ্যে বেশীর ভাগ লম্বই ক্যাপ্টেনের কাঁটে আপিস বরের মধ্যে। লক্ষ্যের উপর বিভিন্ন জাহাজ থেকে বিভিন্ন রকম সাংকেতিক ববর এসে পৌছাচ্ছে সেখানে, লেখলো চালাদ বাচ্ছে হেত কোরাট্টারে, আবার হেত কোরাট্টার থেকে যে সব ববর আসছে তা বিলি হচ্ছে লক্ষ্যে। ক্যাপ্টেন রিসিতার কামে দিয়ে বদ বদ সংবাদ সংগ্রহ করছেন আর ম্যাপের উপর ঝাঁকঝাঁক করছেন। এই ওর কাজ, এই কাজেই উনি বিনম্রাত মনগুল। পানের আলমারিতেই থাকে মদের বোতল আর গেলাস, কলিং-বেল বাজালেই বেরালা এসে চলে দিয়ে যায়।

ক্যাপ্টেনের কতা ম্যারিহা, থাকে তার বাপের সঙ্গেই এই পোতাশ্রয়ের বাংলাতে। বিবিয়া কুটুটে চেহারা, ভবী তরুণী। বহর বাইশেক হবে বোধ হয় বরন, মাখার এক ডাঙ্ক রেখন-চিহ্ন মন্থন কেন, তাতে দোদালী আতা, মজিন

শৌর্যবর্গ, নীলাভ হুট চকু, বেন আকাশ আর সবুজের সীমানার প্রতিবিম্ব। ম্যারিয়ার কোন প্রয়োজন নেই এই নৌ-আভাষার নির্জন নির্জনানের মধ্যে পড়ে থাকবার। কোন কাজ করে না এখানে সে, তবু থাকে বাপের কাছে। শহরে বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে অনার্সানই থাকতে পারে। ওর বরলে এমন একঘেরে নির্জনতা হয়ত মানার না ঠিকমত; হয়ত আবোধ-আহ্বান আর মাচপানের মজলিশেই ওকে মানার। কিন্তু ম্যারিয়া বেঁচে না সেরিকে, এই জমহীন সবুজতট তাকে বেন মারাত্মক করে রেখেছে। একা একা ঘুরে বেতার নদীর পাড় দিয়ে বনের কিনারে কিনারে। চূপচাপ ঠাঁড়িয়ে থাকে জলের পারে, উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কত মৃত্যু মৃত্যু আহ্বান প্রবেশ করছে নদীর বোহমার, আবার কত কত বাজে বেরিয়ে। মনে হয় কোন একটি বিশেষ আহ্বানকে সে ধোঁকে।

সত্যি তাই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ম্যারিয়া এই নির্জন নৌ-আভাষার প্রতীক করে বসে থাকে বিশেষ একখানি ইউ-বোটের জন্ত, একটি উজ্জ্বল কালো রঙের সাবমেরিন, তার নম্বর U-59, কমান্ডারের নাম জোদলে। বলিষ্ঠ করণ, নিভীক, হুঃসাহসী বোঝা। কমান্ডার জোদলে মাঝে মাঝে কিয়ে আসে পোতাশ্রয়ে, বোঝাই করে মের তেল-রসদ গুলি-বাকর, আবার তার ইউবোট নিয়ে উবাও হয়ে বার দুই নীল সবুজে। জলের তলা দিয়ে পথ কেটে চলে, শত্রু-আহ্বানের সম্মান পেলে টর্পেডো মেরে ছুঁবিরে দেয়। রসদ কুরালে কিয়ে আসে আভাষার। যেবার সবুজের উপরেই কোন আহ্বান থেকে রসদ পার সেবার পোতাশ্রয়ে কিয়ে আসতে দেয়ি লাগে হুই-ভিন সপ্তাহ। তা মইলে পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে এক কি দেড় সপ্তাহের মধ্যেই। প্রায় পনের দিন আগে কমান্ডার জোদলে বেরিয়ে গেছে তার আহ্বান নিয়ে আজও কিয়ে আসে নি। মনের মধ্যে একটা রুড উৎসেগ নিয়ে ম্যারিয়া একা একা ঘুরে বেতার সাগর-বোহমার বিভীর্ণ বেলোজুভিতে। মাঝে মাঝে সাগ্রহ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুই সবুজের সীমানাহীন জলরাশির মধ্যে। হয়ত কোন কালো বিন্দু কেপে উঠেছে সেখানে, হয়ত বা কোন আহ্বান। সাঁ সাঁ করে আসে বাতাসের শব্দ, তার সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের গর্জন, বেধতে বেধতে দেই জ্বল কালো বিন্দু হারিয়ে যায় কোথায়।

বাপ জানেন মেরের মনের কথা; কিন্তু কঠোর বিরমন্টি 'মিলিটারিমান' তিনি। জেহ-মমতার চেয়ে 'ডিউটি' তাঁর কাছে বড়। তাঁর আচরণের মধ্যে আভাস নেই কোন আবেগ অথবা হুর্জলভার। ইউবোট (U-59) সবুজের কোন অবস্থায় কোথায় কখন থাকে সে ধর তিনি প্রতিদ্রষ্ট পেরে

থাকেন বেতার-সংবাদে। কিন্তু সচরাচর মেরেকে জানান না কিছু। তবে মাঝে মাঝে যে হুঁ একটি ধবর না জানান তেমন নয়। যেমন ম্যারিয়া তেমনে তার বাপের কাছ থেকে পাঁচ দিন আগে U-59 ছিল হেলিপোল্যাড্ বাইটের কাছাকাছি; হুই-এক দিনের মধ্যেই যে আহ্বানবান পোতাশ্রয়ে চুকবে এ ব্যাধা খুবই সঙ্গত। প্রতিদিন প্রত্যুবে উদ্ভীব আশা নিয়ে ম্যারিয়ার ঘুম ভাঙে। সে ভাবে কমান্ডার জোদলের প্রত্যাবর্তনের শুভসংবাদ আককে নিশ্চর পাবে।

অবশেষে এক দিন সত্যিই কিয়ে এল কমান্ডার জোদলে। হাসিহাসি মিষ্টি মুখে অভিনন্দন জানার ম্যারিয়াকে—কমলিন ম্যারিয়া সুপ্রভাত।

—হেইল জোদলে। আচ্ছা সে আবেগে ম্যারিয়া জড়িয়ে ধরে তট-প্রত্যাগত নৌ-সৈনিককে; এক নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করে—এবার এত দেরি হ'ল যে।

তেমনি হাসিমুখে জবাব দেয় জোদলে—এবারকার চকরটা ছিল খুব লম্বা। প্রথমে গেলার অর্কনিজ, সেখান থেকে সেটল্যাডস্, ফাপাক্সো হয়ে মরওরের দরিত্রা ঘুরে তবে এলাম, পথে একটা কোণামদার আহ্বানের সঙ্গে দেখা হওয়ার রসদ নিয়ে নিরেহিলার তাই আর অস্থিধের পড়তে হয় নি।

এবার যে প্রশ্ন করতে গেল ম্যারিয়া তাতে তার নিজেরই যুক্তবান একটু কেঁপে উঠল। একটু ঘেম ইতস্ততঃ করছিল, তবু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে কেললে—ক'খানা আহ্বান তোবালে এবার?

—সঠিক হিসেব দেওয়া শক্ত, তবে সবুজ আট-দশখানা হবে বোধ হয়। সব সময়ে তো নিশ্চিত প্রমাণের জন্ত অপেক্ষা করা যায় না, শত্রুর আক্রমণের ভয়ে তৎকণাং পালিয়ে আসতে হয় টর্পেডো হুঁতেই। হুঁ-একখানা আহ্বান লক্ষ্যজট হয় বৈ কি।

ম্যারিয়ার মুখের উপর একটা করণ বেদমার ছাড়া নানে, মজ় মিনতির মুখে বলে—আচ্ছা, সত্যিই কি, একটুও অহুঙ্কা, একটুও দর্রা হয় না তোমাদের মনে। নিরীহ নিরপরাধ রাজীদের অকূল সবুজে ছুঁবিরে লাগে।

—দর্রা দেখাবার কোন আইন নেই আমাদের ম্যারিয়া, আমরা শুধু জানি হুকুম। আমাদের নির্দেশ দেওয়া আছে শত্রুর মাল অথবা রসদ আছে এমন কোন আহ্বান বেধলেই ছুঁবিরে দিতে। কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ সে বিচারের তার নেই আমাদের হাতে। আর তেমন বিচার করতে গেলে লড়াই করা চলে না। শত্রুর বিমান এসে যখন আমাদের বড় বড় মগর অথবা কান্ডখানার উপর বোমা কেল, তারা তো নির্দ্বিচারেই কেল, রেহাই দেয় না দারী, শিশু অথবা নিরপরাধকে। লবার উপরে কমজুনি, দেশ, দেশের জন্ত হত্যার পাণ নেই, বৃত্যুও শৌর্যজনক।

ম্যারিষা বলে—দেশের উপরেও মনোভব।

কোঃ কোঃ করে অটহাত করে ওঠে কোদলে—তোমার মুখে মানার না এমন কথা। তুমি হচ্ছে সৈন্যব্যাকের ঘের। তোমার বাপ ক্যাপ্টেন শীতার সেনাবিভাগের এক জন প্রধান বীর। মেয়ের মুখে এমন কথা শুনলে নিকট তিনি হেসে পুন হবেন। বাক ও সব, বাবে তো আমার সঙ্গে আজকে বিকেলে শহরে বেড়াতে।

টোট টটে ম্যারিষা বলে—শহরে গিয়ে সেই মদ খাওয়া আর নাচনাচি করা তো। ভাল লাগে না ও সব আমার, আমি বাব না।

—আরে না, না, আজকে মদ খাব না তোমার কথা মিছি। বাব এক বার হাসপাতালে, “পল”কে দেখতে। সেই যে এর আগের চালানে একজন আহত সৈনিককে আমি ঘিরে ঘিরে গিয়েছিলাম, মনে নেই বুঝি তোমার। ঐ যে ছেলেটা টিপে তো হুঁতুতে গিয়ে আঙনের হকার পুকে গিয়েছিল।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ম্যারিষা। কোদলের সঙ্গে তার খুব ভাব। U-59 সামুদ্রিক সক্রিয় শেখ করে পোতাশ্রয়ে গিয়ে এলে হুঁকনের দেখাশাফাং হয়। অনেক কথা হয় হুঁকনাতে। আসন্ন বিদ্যায়ের পটভূমিকার কণিকের মিলনটুকু তরে উঠে বেদনার ও নিবিড়তার। ম্যারিষা হুঁটরে হুঁটরে জিজ্ঞেস করে কোদলকে তার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, বিপদ-আপদের সবিতার বিবরণ। ওরা একসঙ্গে বার শহরে বেড়াতে। কিন্তু কোদলে একবার মদের আড্ডার চুকে পড়লে তলিয়ে যায় সেখানে। কার সাধ্য তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ম্যারিষা ভবন একা একাই গিয়ে আসে নো-আভানার। তীরে এসে যে ক’দিন ছুটি পায় কোদলে, সে তার মদ খেয়ে আর স্মৃতি করে উড়িয়ে দিতে। ম্যারিষা তার তাকে শান্ত এবং তরুণ জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে, যথেষ্টাচার ও মাতলামির পথ বন্ধ করতে। কিন্তু সহজ নয় সে কাজ।

ম্যারিষা জিজ্ঞেস করে—কেমন মদ খাও অভ বল তো। উল্খলতা এবং ব্যতিচারে নিজেকে যে একেবারে উদ্ধৃত করে কেললে।

—মদ না খেলে লড়াই করা যায় না ম্যারিষা। কোন একটা বেশা এবং উত্তেজনা সৈনিক-জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। প্রতি যুদ্ধেরে বাহা যুজ্য-বিভীষিকার মধ্যে বাস করে, জীবনের প্রতি মনোভা এবং আশা তাদের কর্ম। তাদের ক্রটি এবং আকাঙ্ক্ষা সহজেই মেয়ে আসে পাশবিকতার স্তরে। সহজেই তারা হয়ে ওঠে উদ্ধাম, মাদকতা এবং উদ্বাহনার বলেই তারা উপেক্ষা করে যুদ্ধতর। মচেন সহজে কি কেউ মরতে চায়।

বাগিকটা নিজের মনে কি যেন ভেবে গিয়ে ম্যারিষা বলে—ছেড়ে দাও এই সৈনিকবৃত্তি, কি হবে এমন হরহাফ

উল্খলতার ডুবে গিয়ে, তার চেয়ে বরং সংযত শান্ত জীবনের মধ্যে গিয়ে এসো।

আজ্ঞার হেসে জবাব দেয় কোদলে—আমি ছাড়লেও দেশের আইন আমার ছাড়বে কেন? বহু দিন দেহে শক্তি-সামর্থ্য থাকবে শুভ দিন আমি লড়াই করতে বাধ্য। হঠাৎ হত্যা বাধা সাংঘাতিক কখন না হলে মুছের কবল থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আর ছাড়বই বা কি করে এ পথ লোন্ঠে বলবে ভীক কাপুরুষ, সে অপবাদ সহিব কেমন করে?

ক্রমলিন ম্যারিষা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে থাকে কোদলের দিকে; কোন জবাব দেয় না। সেদিন বিকেলে ওরা হুঁকনে গিয়েছিল শহরে মিলিটারি হাসপাতাল দেখতে। ম্যারিষার মাথা ঘুরে যায়, অবশি বোম্ব করে। উঃ, কি মর্মান্তিক দৃষ্ট। সারি সারি খাটটার উপর শুয়ে আছে শত শত আহত বোম্বা। কারও মাথার ব্যাণ্ডেজ, কারও পা উড়ে গেছে, কেউ বধির, কেউ পঙ্গু, কারও বা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, কেউ কান্ডরাজে, গোষ্ঠাজে, হুঁকট করে। কারও জীবনদীপ কীণ হয়ে এসেছে, অচিরেই নির্দোষ হতে পারে, তাকে আলাদা করে সরিয়ে কেলবার জড় ট্রেনার-বাহকেরা এসে হাজির হয়েছে। ম্যারিষার বুক কাঁপে, অবশি বোম্ব করে, বলে—চল, আর ভাল লাগছে না।

বাইরে এসে যুক্ত হাওয়ার ও যেন নিবাস কেলো বাঁচে। আইডোকরম আর ওসুয়ের গড়ে হাসপাতালের আবহাওয়াটা যেন কেমন জরাজীর্ণ আর ভারী, তার সঙ্গে বিকলাহ আহতদের আর্গমাহ মিলিত হয়ে কেমন যেন একটা হুঃসহ বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

তার পর দিন আবার ওরা গিয়েছিল শহরে। প্রথমে কথা ছিল, কোদলে মদ খাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি সঙ্কল্প রক্ষা করতে। একটা মাচ-বরের সামনে এসে মিশে গেল মদের আড্ডার। তরুণী নর্তকীদের দেহসজ্জা ও অলংকারে যৌবন-মাদকতা কেমিল হয়ে উঠেছে। তাদের ঘিরে ঘিরে ভিক কমেছে বদেশ-প্রত্যাগত পণ্টনগুলির, যেন গের্বে-ওঠা মদের উপর একদল তুর্কার্ড মারি। কোদলের মনের ভলার যে তুঘিত এবং বুজুহু লোন্ঠপতা অসাড় ও শিথিল হয়ে পড়ে থাকে দিনের বেলার সত্যতা ও তরুণতার চাপে, সে যেন হঠাৎ মাতাল হয়ে কেপে ওঠে—শুলত মারী ও সুরার গন্ধ পেয়ে। সমুদ্র-পর্বাটক বরহাফা মাবিক, দীর্ঘ উপবাসক্লিষ্ট জামোনারের মত কিন্তু হয়ে ওঠে তোক্যাবতর সন্ধান পেয়ে। কোদলে মিশে যায় মাতালদের ভিড়ে, ম্যারিষা নিজেকে সরিয়ে রাখা মজ-লিলের এক পাশে।

পোতাশ্রয়ে কেলবার শেষ পাকী রাত্রি এগারোটায়। একবার মজলিলে হুকলে হুমিরাহুত ভুলে যায় কোদলে। বেদলাই ছিল না যে কালকে সকালেই আবার বেকতে হবে

জাহাজ ঘিরে সজ্জ-বাজার। বে হু'বিসের হুট পেরেছিল তার মেহাৰ আকই রাত তিনটের পর থেকে হু'বিরে বাবে। কাকেই আক রাজেই তার পোতাশ্রয়ে কিয়ে বাওয়া একাত প্রয়োজন। কবাটা ম্যারিরা নিজেই আকই করে জাহাজ কোদলে। জাহাজ হলেও সৈনিক সে, ডিউটির সময় আসয় হয়ে আসছে এ খেয়াল হতেই হঠাৎ বেশ সখিৎ কিয়ে গেলে, তখুনি খেরিয়ে পড়ল মাচবর থেকে, মদের শেষ গেলানটা এক চুককে শেষ করে। বে করেই হটক রাজি এগারোটার ট্রেন বরতেই হবে। কাল প্রভাতেই আবার শুরু হবে সজ্জ-বাজার, আবার সেই সীমাহীন মীল জল আর লক লক তরকের শব্দ। তারই মধ্যে গা-ঢাকা ঘিরে চোখে দুয়বী লাগিয়ে দিবারাজ টহল দিতে হবে শজ-শিকারের সন্ধান।

মাচ-বর থেকে খেরিয়ে কমাভার কোদলে সোজা চলে এল ট্রেনে, সঙ্গে তার ম্যারিরা। গাভী হাততে আর বড় ঘেরি নেই। হুপুর-রাতের গাভী, বাজীর তিক নেই বললেই চলে। পোতাশ্রয়ের টারমিনালে ওরা বথম এসে পৌছল, তথম নির্জন নিভৃত অন্ধকার অঘাট বেঁধে মেমেছে। হুরে ডক আর মৌ-আভার ইলি-লাগান বিজলী বাতিগুলো টিম্ টিম্ করে আলছে। রাইকেলবারী ষ্টিল-হেলমেট-পর্যায় নৈশ প্রহরী মাঝে মাঝে বেণা যায় হু'এক জন। রাজ হু'জন বাজী, কোদলে আর ম্যারিরা নামল ট্রেনে। বামিক হুর বেতে হবে হু'জনকে একসঙ্গে, তারপর হবে হাভাহাতি।

সত্যি কথা বলতে গেলে ম্যারিয়ার মনে মনে যে ভর একটু না করছিল এমন নয়। বলিষ্ঠ পুরুষ কোদলে, তার ওপর মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে। জনহীন রাজির অন্ধকারে হঠাৎ ওর নংঘর ও শিটাচারের বাঁব ভেদে পড়তে কতক্ষণ।

ম্যারিয়ার ভর বিখ্যা নয়। মদের মেশার সঙ্গে মিস্‌ল ডকুদীর নিভৃত সাগিধ্য হঠাৎ বেশ ওর মগজে আশ্বন বরিয়ে দিল। নিজেই সে কিছুতেই সামলাতে পারল না। হুচ হুটতে থপ করে ম্যারিয়ার হাত চেপে বরে বলে, ম্যারিরা, তুমি ডকুদী, মগলী, এই নিবিষ্ট অন্ধকার রাজিতে আমার পাশে একাকিনী, আর আমি হুজি একজন তুখার হুক। তুমি কি মনে কর আমার পকে সংঘত ঝাকা এতই সহজ।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে প্রথমটা কেমন বেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ম্যারিরা। কোদলে ওকে স্পর্শ করতেই তার লর্দাধ থু থু করে কঁপে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেই নামলে ঘিরে বেশ হুচ এবং কটিন কঠেই জবাব দিলে, কোদলে তুমি তুলে বাছ আমি কে। আমি তোমার প্রু কোরাকিন শিয়ারের কতা। আমাকে অপমান করবার জত তোমাকে বখাযোগ্য শাস্তি পেতে হবে। তুমি তোমার মিলিটারী ডিসিগ্রিন (সামরিক বিরত-সুখলা) অমাত করহ।

বিকারপ্রভ রোগি বেশন হঠাৎ চমকে ওঠে, ক্যান্টেন শিয়ারের নাম শুনে তেমন চমকে উঠল কোদলে। তার শিখিল হুটী বলিত হয়ে পড়ল, ম্যারিয়ার হাতের কখি থেকে। ওরা নিঃশব্দে চলল, বাকী পথটুকু কেউ একটা কথা বললে না। চৌরাতার কাছে এসে কোদলে চলে গেল রেট-ক্যান্পের দিকে আর ম্যারিরা কিয়ে এল বাংলাতে।

পরদিন সকালেই ঘুম ভেঙেছে ম্যারিয়ার। মনের মধ্যে কেমন বেশ অশান্তি জমে উঠেছিল। গত রাজির অশ্রীভিকর ঘটনামূলো ওর মাঝার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাছিল, এমন সময়ে তৃত্য এসে থবর দিলে, কমাভার কোদলে এসেছে— বেণা করতে চার। ম্যারিরা তাকে সোজা ভেতরে আসবার জতেই থবর পাঠাল। সামনে এসে ঠাকাল কমাভার, বেশ ককের শেষে নিশ্চয়দ শাস্ত সজ্জ। কোম আলোকন, কোম চকলতার চিক পর্ধ্যন্ত নেই। হির মাথুরের স্নিগ্ধ হুটী তার চোখে; হুরের ওপরে মেমেছে সৌম্য স্ত্রীতার আভা। ও বেশ সম্পূর্ণ তিন মাথুর, গত রাজির প্রমত্ত মতপাত্রী কোদলের সঙ্গে এর বেশ কোন সন্দেহ নেই। বিনীত মন্ত্র কঠে কোদলে বলে, আমি কমা চাইতে এসেছি ম্যারিরা, গত রাজির আচরণের জত সভ্যই আমি অনুভূত। আমি তখন হিলাম মাতাল এবং অন্ধ। চলে যাবার আগে কমা চেয়ে বাই আমার আচরণের জত, মনে কোম গ্রামি রেখে না তুমি—এই আমার অনুরোধ।

কোদলের কথা শুনে চোখে জল ভরে উঠল ম্যারিয়ার। কমাভারের হাত বরে বহু করে সে তাকে ঘিরে বলল একটা চেয়ারে, বললে, তুমি বলবার আগেই আমি কমা করেছি কোদলে। বিশ্বাস কর, আমি তোমার সত্যিই ভালবাসি।

বামিককণ মাথা নীচু করে কি যেম ভাবে ম্যারিরা, আবার বলে—অনেকটা থগত উজির মত, তবে কি জান, আমি অন্ধরের সঙ্গে কামনা করি, তুমি শাস্ত ও স্তম্ভর হয়ে বাতাবিক জীবনে কিয়ে এস। তুমি ভ্যাপ কর তোমার ঐ প্রমত্ততা, লোলুপতা ও বর্জিততা। আমার জীবনের থগ, একখানি অমাতকর গৃহ, তার প্রু হবে তুমি আর আমি হব গৃহিণী। আসবাব উপকরণ মাই-বা ঝাকল প্রচুর, সেখানে থাকবে অসুরত ভালবাসা, অপরিসীম ভ্যাপ ও বৈধ্য। আমরা হব ঈর্ষা বিবেষ ও প্রতিযোগিতার অতীত; আমাদের জীবনের ব্রত হবে পরসেবা। তেমন একটা শান্তির নীক আমাদের পকে কি একেবারেই অসম্ভব কোদলে?

অবিশ্বাস আর কল্পনার হাসি হুটে ওঠে কোদলের হুখে। সে বলে, তোমার থগ স্তম্ভর ম্যারিরা, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু তা লকল হওয়া এ হুগে হরতো একেবারেই অসম্ভব। তখনতে ভাল লাগে তোমার কথা, মনে একটা কণিকের আবেশও বটী করে, কিন্তু তবু তা আমাদের হুগের মাপানের বাইরে। আবিপত্য আর ভাভাকাতাই এ হুগের মূলকথা।

পরলেবা নয়, আদলেবাই আমাদের লক্ষ্য।—একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, যদি সেবে কোদলে বলে, যাক ওসব ব্যর্থ আলোচনা। এবার তা হলে উঠি, আটটার সময় আমার জাহাজ ছাড়বে।

কোদলে উঠে চলে গেল। হুয়ারের চৌকাঠ ঘরে উল্লাসীম দুটিতে আকাশের পানে চেয়ে করেক মিনিট মিল্পন হয়ে থাকিবে রইল ব্যারিরা।

এপ্রিল মাসের শেষাংশে এক দিন বিকেল বেলায়, বর-ওয়ের উপকূলের অদূরে বার্মেন বন্দরের দক্ষিণে U-59 টিহল ঘিরে কিরছিল। সমুদ্রের জলে কেমন যেম কালো বস্বেমে হারা, আকাশের রং বোলাটে, ভরদগুলো ক্রমেই অধিকতর কীডকার ও গর্জনশীল হয়ে উঠছিল। মাঝিকেরা বুঝল বড়ের পূর্বাভাস, ব্যারোমিটারের চাপ কমে গেছে। হরতো সন্ধ্যার আগেই সাইক্লোন উঠবে, এমন সময়ে হাইড্রোকোমে বরা পড়ল একটা জাহাজের শব্দ। একখানা ব্রিটিশ ডেইরার হুটে চলেছে কিএ বেগে, হরতো বড় আসবার আগেই কোম বন্দরে আশ্রয় চায়। জাহাজের শব্দ শুনেই ইউবোটের মাঝিকেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ তাদের করভে হ'ল না। পেরি-কোপের দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ল পতাকার। ভিন্ন-চার জন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, “ব্রিটিশ ক্র্যাগ”, বাস আর কিছু বল-বার বরকার মেই। মাঝিকদের কান আছে বধাকর্ষ্য। প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজের নিজের কাকে, আক্রমণের ভয় সকলেই প্রভত। টর্পেডো টিউব তর্প্তি হয়ে গেছে ইতি-মধ্যেই। সাবমেরিনখানা দুই কিলোমিটারে গিয়ে ওৎ পেতে বলল ডেইরারের পথের উপর। টর্পেডোর রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়বার অপেক্ষামাত্র, তারপর নিকিণ্ড হবে সেই ভরকর বজ্রবাণ।

ঐ যে এসে পড়েছে—ঘেরি মেই, সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টেপা হ'ল টর্পেডো টিউবের, একবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বিবীর্ণ হয়ে গেছে ডেইরারখানা। ডুবছে ধীরে ধীরে, ইউবোটের মাঝিকদের বুধে উল্লাসের হাসি। কিন্তু লহনা এ কি। সমুদ্রের তলদেশ থেকে যেম বিপুল এক জলভন্তের প্রচত শক্তি সাবমেরিনটাকে হ হ করে ঠেলে তুলে দিচ্ছে আকাশের দিকে। সর্গদ্বান, পক্ষ তেপ্-চার্জ (জলবোমা) ঘেরেছে। সত্যিই তাই,

ইউবোটখানায়ও অভিন্ন দশা। বার পার্শ্বভাগ কেটে গিয়ে হ হ করে জল ঢুকছে। বাঁচবার আশা নেই। সমুদ্রের উপর তখন বড়/ঘনিষে এসেছে, বাতালের জ্বল গর্জন মুহূর্হ হেঁকে চলছে, তার সঙ্গে বাতাল হয়ে কেপে উঠেছে উচ্চ ভরদবল। ভুবন ইউবোটের ভেতের উপর থেকে ওয়ারলেস অপারেটর ক্রমাগত বেতার-সংকেত পাঠাতে লাগল S.O.S.....S.O.S... S.O.S.....(আমাদের জীবন রক্ষা কর)।

সেই বর্ষভর সংবাদ এল নদীর মোহনার নৌ-আভানায় ক্যাপ্টেন শ্রীরের উঁচু বেতার হাঙলেও বরা পড়েছিল। তখন সেখানেও চলছে প্রচত সাইক্লোন। সাগর-সৈকত আর অরণ্যময় প্রান্তরের উপর ঘিরে বাতাল হাওয়া দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেনের আদেশ পেয়ে তৎখুনি হুটল এক দল রেসুই শিপ (উদ্ধারকারী জাহাজ) বড় তুকান অগ্রাহ করে বজ্রজ্বল সমুদ্রের মধ্যে।

ব্যারিরা শুনেছিল তার বাণের কাছে, কমান্ডার কোদলের জাহাজ ডুবছে কাগারর্যাক প্রণালীর কাছাকাছি। ব্যারিয়ার বুকের মধ্যেও বড় ঘনিষে এল, আকাশ ও দিপ্তমহোতা বড়ের সঙ্গে আক ওর অন্তর ও বাহির একাকার হয়ে গেছে। উৎকর্ভ ও উবেগে তার প্রতিটি মুহূর্হ হয়ে উঠল হুর্কিবহ।

পরদিন বড় ঘেমে গেছে। আকাশ হয়েছে উদ্ভল সুনীল-সোনালী রৌদ্রে চারদিক বলমল করছে। বিপদের আশঙ্কা আর নেই। সাহুজিক পক্ষী ‘লী-গাল’ সার বেঁধে আকাশের গারে ডানা ছড়িয়ে অলস মেঘের মত বহুর গতিতে ভেসে চলেছে সূর্য সমুদ্রের পারে। হাওয়ার দাপট লইতে না পেয়ে কয়েকটা স্রুপ আর কিসিংটলার আশ্রয় নিরেছিল নদীর মোহনার, তারাও কবে কবে বোদর তুলে ছেড়ে যাচ্ছে। একে একে কিলে এল রেসু-শিপের বহর। U-59-এর কয়েক-জন মাঝিক রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু কমান্ডার কোদলের কোম বোঁজ পাওয়া গেল না। সে ভলিরে গেছে আইলাস্টিক মহা-সমুদ্রের অন্তল গর্ভে।

সেদিন ব্যারিরা সারা সকাল ঘরে সমুদ্রতট আর অরণ্য-প্রান্তরের মধ্য ঘিরে পাগলের মত একা একা টিহল ঘিরে বেড়াতে লাগল। বারংবার তার চক্ষু হুট অন্ধ-প্রাণিত হ'ল, আর বারে বারে সে বুছে ফেলল।



পণ্ডিত্যরীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১২ এবং '১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের হৃদয় কিন্তু গোপন পরিচালনায় বাংলার বিপ্লববাদ পুরাণে চলিয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ পত্রই "কোডে" (সাহিত্যিক অক্ষরে) আসিত। আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতাম। তিনি অর্থ সম্বন্ধে অথবা অল্প কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিপন্ন মনে করিলেও, আমাকে পত্রযোগে তাহা জানাইতেন।

আমি তাঁহার অর্থাত্বের কথা পণ্ডিত্যরী হইতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম। শুধু অর্থাত্ব নহে—বস্ত্রাভাষের অভ্যন্তর দুঃখও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আমি অতি দ্রুত তাঁহাকে কিছু টাকা এবং বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন, "তারযোগে তোমার টাকা এবং পত্র ও বস্ত্রাদি বাহা পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়াছি।"

"Your money by wire and letter and clothes reached safely."

এই সময়ে তাঁহার বে দারুণ অর্থকষ্ট, দূরে থাকিয়া তাহা সম্যক বুঝি নাই। তিনি এক প্রকার নিঃস্ব অবস্থায় পণ্ডিত্যরী পৌছিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি চিরদিন ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চলিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সঞ্চয়-প্রবৃত্তি তাঁহার কোনদিন ছিল না। গীতার মন্ত্রভাব—ভগবানের উপরেই যোগ-ক্ষেমবহনের ভার দিয়া চলার সাধন-নীতিটাই বেন তাঁর তখনকার জীবনে অক্ষরে-অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমার নিকট তাঁহার যেটুকু অর্থ চাওয়া, তাহার মধ্যেও ঈশ্বর-প্রদানই ছিল—নতুবা তাঁহার সেই দাবিটুকু-পূরণ করার প্রাণ লইয়াই আমার পক্ষে নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না।

পণ্ডিত্যরী গিয়াই তিনি কোন এক বন্ধুর কিছু সহায়তা পাইয়াছিলেন—সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে কতখানি দিতে পারিব, সে বিষয়ে সবিশেষ ধারণা করার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চিন্তা বাধ্য হইয়াই করিতে হইত; কিন্তু কোথা হইতে অর্থ তাঁহার নিকট আসিবে; তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তবে তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থ এক দিন আসিবেই—এই বিষয়ে কোনরূপ সংশয় তিনি শোষণ করিতেন না। এক মাস্ত্রাজী বন্ধু ১০০০ টাকা তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং বাহাতে পণ্ডিত্যরী বাসকালে অর্থাত্বের তাঁহাকে কোনরূপ কষ্ট

পাইতে না হয়, তাহারও চেষ্টা করিবেন, আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুটির প্রতিশ্রুতি ও আশা কোনটিই সফল হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে পত্রযোগে আমার জানাইয়াছিলেন:

"The last time he came, he brought a promise of Rs. 1000 in a month and some permanent provision afterwards, but the promise like certain predecessors may not yet be fulfilled and we sent him for cash. But though he should have been here three days ago, he has not returned and even when he returns, I am not quite sure about the cash and still less sure about the sufficiency of the amount."

শ্রীঅরবিন্দ শিশুকাল হইতেই ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন; সেকথা পূর্ক-পূর্ক পড়িচ্ছে বলিয়াছি। এই পত্রও তিনি আমায় লিখিয়া জানাইলেন সত্যত্বকে তাঁহার নিঃস্বের মনেই কথা—"ভগবান যে ব্যবস্থা করিবেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই; কিন্তু তাঁর এই দ্রুত স্বভাবটুকু দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পধ্যস্ত অপেক্ষা না করিয়া ছাড়েন না।"

"No doubt, God will provide, but He has contracted a bad habit of waiting till the last moment."

আমি তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া অবাধ অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কোন প্রকারে তাঁহাকে কিরূপে অর্থিক অর্থ পাঠাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার বৎসিকিং টাকা ও কিছু বস্ত্রাদি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। শুনিয়া আসিয়াছিলাম—তাঁহাদের পাঁচ জনের স্ত্রী প্রতি মাসে অন্ততঃ ৭৫ টাকা খরচ হয়, আর শ্রীঅরবিন্দের নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য অন্ততঃ ১০ টাকা হাতে থাকা উচিত। আমি এই ৮৫ টাকা প্রতি মাসে পাঠাইবার জন্য অল্পপ্রাণিত হইলাম। আমার আশা পূর্ণ হইল এবং প্রথম দফা টাকা যথারীতি প্রেরিত হইলে তিনি লিখিলেন:

"ভূমি এবারকার ৮০ টাকা এবং মার্চ মাসের জন্য ৮৫ টাকা পাঠাইয়াছ দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দ হইলাম।"

"It is a great relief to us that you are able to send Rs. 80/- this time and Rs. 85/- for March."

শ্রীঅরবিন্দের এই আকৃতি আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সেবার অবদান যোগাইবার প্রেরণা জাগাইয়াই তিনি ধীরে ধীরে প্রকাশ করিলেন—আমার মধ্য দিয়া কত অর্থসংগ্রহ ও অর্থদানের উপায় সৃষ্টির প্রয়াস—তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হই। সে যুগে

তাহার অর্থসংগ্রহের সকল প্রচেষ্টাই আমাকে কেন্দ্র করিয়া সাফলালভ করিয়াছিল। বাংলায় রাষ্ট্র-সাধনায়ও যেইকু সাফলালভ করিয়াছি তাহাও শ্রীঅরবিন্দের করুণায় সম্ভব-পর হইয়াছিল। আমি তাঁর কত আপনার জন মনে করিয়া তিনি আমার উপর একরূপ ক্ষুদ্র দাবি রাখিতেন, সে কথা ক্রমে বলিতেছি। তিনি চাহিতেন প্রচুর অর্থ। আমি তাহার কতটুকু দাবিই-বা পূরণ করিয়াছি—তাহার চাওয়ার মূল্য সেদিন তেমন করিয়া বুঝি নাই। আজ ভাবিয়া সে চাওয়ার কুলকিনারা পাই না। সেদিন কিন্তু বুঝি আমায় সাধনা দিবার চলেই তাহার দাবি পূর্ণ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস-ইকুই তাহার নিকট যেন যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি আমার নিকট মাসিক ৮৫ টাকা পাইবেন—এই সামর্থ্যসৃষ্টির পর, তিনি আমায় তাঁর এক পত্র লইয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ী ম্যাকা দাব্বারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য লিখিলেন :

“এম’ অর্থাৎ মারাঠা বন্ধুকে একখানি পত্র দিলাম—আমার জন্য যদি তিনি কিছু দেন, অবিলম্বে তাহা আমার নিকট পাঠাইও।”

“I send enclosed a letter to our M. friend. If he can give you anything for me, please send this without the least delay.”

শ্রীযুক্ত ম্যাকা দাব্বার একজন অবাঙালী ভ্রাতৃলোক। কলিকাতার বড়বাজারে তাহার কাপড়ের গুদাম ছিল। তিনি বাস করিতেন বালিগঞ্জে। আমি খুঁজিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রথমে আমায় পুলিশের চর বলিয়া বিভ্রান্ত দিলেন, শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানি কিন্তু সন্নে রাখিলেন। তাহার পরদিন আমি আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। এবার বুঝিলাম তিনি সংবাদ লইয়া আমার কথা বিশেষ ভাবেই অবগত হইয়াছেন। তার পর শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন চন্দন-নগরে কি ভাবে ছিলেন এবং কিরূপেই বা পণ্ডিত্য গমন করিলেন, বিশেষ ভাবেই তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু টাকা তিনি আমার হস্তে দিলেন না, সহাস্তে বলিলেন—“আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেছি না, ইহা আপনি মনে করিবেন না। শ্রীঅরবিন্দের নামে অনেক টাকাই মধ্যবর্তী লোকের হাতে পড়িয়া শেষ হইয়াছে—ইহা বুঝিয়াই আমরা স্থির করিয়াছি, মোজাহাজি ভাবেই তাহার হাতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিব, অন্য প্রকারে নহে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন। তাহাকে লিখিয়া জানাইতে পারেন—আমি ১০০০ টাকা তাহাকে ‘গ্রীওলে কোম্পানী’র মাধ্যমে প্রেরণ করিব।” আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চন্দননগরে ফিরিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এই

কথা জানাইলাম। তিনি বখাসময়ে ‘গ্রীওলে কোম্পানী’র নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত ম্যাকা দাব্বারের টাকা পাইয়া তিনি এইবার পুরাতন বাড়ী পরিভ্রাণ করিয়া ৪১ নং রু দে ফ্রান্সোয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। পূর্ববর্তী বাড়ীওয়ার ১২০ টাকা ভাড়া বাকি ছিল। এই সময়ে বাড়ীওয়ার বিরুদ্ধে কোন এক পাওনাদার নালিশ রুজু করায় এই টাকা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই হাতেই রাখিয়াছিলেন—এই কথাও তাহার পত্রেরেই জানিয়াছিলাম।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি চন্দননগর ফিরিয়াই শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় বিপ্লবের কাজে প্রবল ভাবে লাগিয়া যাই। শ্রীঅরবিন্দকেও এই কাজে কতকটা জড়াইয়া ফেলি। তখন অনন্তোপায় হইয়াই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সেই সময়ে পণ্ডিত্যরী “ক্রী পোর্ট” বলিয়া বিশেষ হইতে বহু দ্রব্য আমদানী হইত। আমার বিপ্লবী সহযোগি-গণ স্থির করিলেন—পণ্ডিত্যরী হইতে রিভলভার আনা হইবে। ইহার ব্যবস্থার ভার বন্ধুরা আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমায় বাধ্য হইয়াই এই বিষয়টি শ্রীঅরবিন্দকে জানাইতে হইল। তাহাকে ছয়টি রিভলভার ক্রয় করিবার জন্ত নিবেদন করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমার দাবি অপূর্ণ রাখিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিক সতর্কতার বশে, রিভলভার-গুলি হস্তগত হইলে তাহা তিনি মাটিতে পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এইগুলি আমাদের নিকট পাঠাইবার স্বযোগ বহুদিন মিলিল না। পণ্ডিত্যরীতে অনেক বন্ধু তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের নিকট তিনি যে তথ্য বোগ-সাধনের নিমিত্তই আসিয়াছেন, এই কথাই বলিতেন। বাংলার বিপ্লবীদের সহিত তাহার যে সংযোগ থাকিতে পারে, এই কথা তিনি একেবারেই গোপন রাখিয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে দিয়া ঐ রিভলভারগুলি অতি সম্ভরণে ও সুরক্ষায় লইয়া আসা হয়। কিন্তু মাটিতে এক বৎসরকাল প্রোথিত থাকায় যন্ত্রগুলি একপ্রকার অকেজো হইয়াই যায়। শ্রীঅরবিন্দ অতি সতর্কতার সহিত বাংলার বিপ্লব-সংহতির সহিত বোগ রাখিয়া চলিতেন, তাহার পত্রই এই কথার সাক্ষ্য দিবে :

“I do not write to you this time about the despatch of the books, because that is a long matter and would delay the proofs, which have already been too long delayed. But I shall write a separate letter on that subject. I have also to write about your Tantric Yoga. But I think I shall have to await what else you have to tell me on that subject before doing so.”

ইহার অর্থ অল্প কেহ বুঝিবেন না। আমি বুঝিলাম

তিনি 'এর' অর্থাৎ রিভলভারগুলি পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন এবং আমাকেও তিনি তাত্ত্বিক বোংগ অর্থাৎ বৈপ্লবিক কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন শুধু সাংকেতিক ভাষায় নয় বিপ্লবের রাষ্ট্রসাধনাকে বথার্থই বোঝাচারী শক্তিসাধনা বলিয়াই গণ্য করিতেন আর তাহার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির নয়, জাতির সমষ্টিগত মুক্তি ও তুষ্টি। তাঁহার সম্মুখে সেদিন কত বৃহৎ কর্ম প্রতীকারত, তাহা বুঝি নাই এবং সেইজন্যই তাঁহার চিন্তা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। তিনি যেরূপ আদেশ করিতেন, তদনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াই আমার স্বভাব ছিল। আমার বিপ্লবী বন্ধুগণ কিন্তু আমায় পণ্ডিত্য হইতে রিভলভারগুলি আনাইবার জন্ত ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিলেন। আমি পরিশেষে তাহা কিরূপে আনাইয়াছিলাম, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সময়ে শ্রামহৃৎসর চক্রবর্তী মহাশয় আর. এস. শর্মা নামে এক ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান। আমি সেদিন বুঝি নাই এই শর্মা পুলিশ বিভাগেরই একজন গুপ্তচর। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠান হয়। এই শর্মা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ পর পত্রে জানাইলেন :

"Your R. S. Sarma I hold to be a police-spy. I have refused to see him, because originally when he tried to force his way into my house and win my confidence by his extravagances, I received a warning against him from within which has always been expected. This was confirmed afterwards by two facts: first, that the Madras police betrayed a very benevolent interest in the success of his mission; secondly, that he came to Pondichery afterwards as sub-editor of a new Pondichery paper, 'The Independent' subsequently defunct and replaced by another, the 'Aryan,' belonging to the same proprietor, who has been acting in concern with the British police agents in Pondichery. In the paper he wrote a very enervating and deprecatory paragraph about me (not by name but by allusion), in which he vented his spite at his failure."

অর্থাৎ,

'তোমার প্রেরিত আর. এস. শর্মাকে আমি একজন পুলিশের গুপ্তচর বলিয়াই মনে করি। আমি তাহার সহিত দেখা করি নাই; কারণ প্রথম যখন সে আমার বাড়ীতে ছোর করিয়া চুকিতে চার ও অভিশ্রোত্রি দ্বারা আমার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করে তখন তাহার বিরুদ্ধে আমি অন্তর হইতেই সতর্ক হইবার সঙ্কেত পাই। এই সঙ্কেতেরই সর্বশ্রম মিলে পরবর্তী হুইট বটমার। প্রথমতঃ, রাজ্যী পুলিশ যে শর্মার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাপারে বেশ উৎসাহশীল, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত-নায়েই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার পরে সে যখন আমার

পণ্ডিত্যে আসে, তখন অধুনা-বিদ্রুত "বি ইতিপেতেট" নামে এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। পরে সে ইহার হলান্তিভিত্ত "এরিয়ান" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এইরূপ বলে। এই শেবোক্ত পত্রিকাখানিও একই স্বাধিকারীর কাগজ, যিনি পণ্ডিত্যের ব্রিটিশ পুলিশ-প্রতিকূলের সহিত একাত্রে সংযুক্ত হইয়া কাজ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পত্রিকায় ঐ ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ না করিয়াও আমার উদ্দেশ্যে একটি খুব হীনভাষনক নিমোজিত প্রচার করে, বাহাতে তাহার ব্যর্থতাই আলা প্রকাশিত হয়।"

শ্রীঅরবিন্দ এই সকল কথা জানাইয়া, ভবিষ্যতে এই প্রকার অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে আমার নিষেধ করেন। এই সময়ে পণ্ডিত্যে যে সকল রাষ্ট্র-নৈতিক পলাতক বাস করিতেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ পুলিশের অহুযোগে করাসী গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হন। শ্রীঅরবিন্দকেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তদানীন্তন করাসী পণ্ডিত সাহেব ও জঙ্গসাহেবের সহায়তায় এই প্রয়াস ব্যর্থ করেন। এই বিষয়েও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার এক পত্রে আমার লিখেন :

"Other difficulties are disappearing. The case brought against the Swadesies (No one in this household was included in it, altho' we had a very charmingly polite visit from the Parquet and Judge d'Instruction) has collapsed into the nether region and the complainant and his son have fled from P.T. (Pondichery territory) and become like ourselves 'political refugees' in C'lore (Cuddalore)"

ভি. ভি. এস. আয়েকার নামে একজন তরুণ বিপ্লবী পণ্ডিত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইংরেজ পুলিশ করাসী গবর্ণমেন্টের নিকট তাহাকে ধৃত করার জন্ত অহুরোধ জানায়। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী বলিয়া বাহার্য পণ্ডিত্যে ছিলেন, তাঁহাদের সকলের উপর করাসী গবর্ণমেন্ট তদন্ত শুরু করেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও তাঁহার অতুল প্রতিভায় স্বদেশীরা সে বাজার রক্ষা পান এবং দীর্ঘ দিনের জন্ত পণ্ডিত্যে স্বদেশীদের নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়।

আমি বিপ্লবের কর্মে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকিতাম, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ চাহিত সাধনার নির্দেশ। শ্রীঅরবিন্দকে শুধু আত্মসমর্পণ বোগের গুরুস্থানীয় ভাবিয়াই পরিভূষ্ট হই নাই, তাঁহার কার্যে আত্মনিবেদন করার জন্য আন্তরিক বৃত্ত করিতাম। তাঁহার কর্ম শরীর, প্রাণ, মন দিয়া সিদ্ধ করিতে পারিলে, আপনাকে তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছি বলিয়া মনে হইত। আমি পত্রেই তাঁহার সাধন-নির্দেশ প্রার্থনা করিতাম। এক

পড়ে তিনি এই সময়ে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার অন্তরে চির-গ্রথিত হইয়া আছে। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন তিনি যে কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না, ভগবৎপ্রেরণাই তাঁহার জীবনকে পূর্ণ শূন্যলিত করিয়া লইতেছে—পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, তাহা পাঠক-পাঠিকারা অনুভব করিতে পারিবেন। তিনি লিখিলেন :

"There is no reason for not writing to you. I never now-a-days act on reasons, but only as an automaton in the hands of another. Sometimes He lets me know the reasons of my actions, sometimes He does not, but I have to act or refrain from action all the same, according as He wills."

I shall write nothing about sadhan, etc., until I am out of my present struggle to make the Spirit prevail over matter and circumstances."

তাঁহার বাস্তব অভাব কতখানি তাঁহার ইচ্ছা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তিনি মণিকতলা বাগান বিক্রয়ের টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে পরে কিছু লিখিব। তাঁহার বস্ত্রাভাবের পরিচয় তাঁহার পত্রাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"There is the pressing cry for clothes in this quarter, as these articles seem to be with us to remind us constantly the paucity of matter."

এই বস্ত্রাভাব দূর করার জন্ত মাঝে মাঝে আমি কাপড় ও পাঠাইয়া দিতাম। তিনি মাক্ষা ঘাবসারের ১০০০ টাকা পাওয়াও আর্থিক ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। আমিও বাস্তব পাঠাইতাম, তাহা তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। আজ বিশ্বয় বোধ হয়—জাতির নিকট হইতে কতটুকু দান গ্রহণ করিয়া তিনি ভারত তথা বিশ্বের মানব-জাতির জন্য কি অসাধারণ প্রতিভার অবদানই না রাখিয়া গেলেন!

এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের *Soul of India* নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাহা হাতে পাইয়াই আশ্রয় জানাইলেন—ভগিনী নিবেদিতার *My Master as I saw him* পুস্তকখানিও তাঁহার নিকট যেন প্রেরণ করা হয়। আরও তিনি চাহিলেন, রমেশচন্দ্র দত্তের ঋণেদের অমুবাদ। তিনি ভবিষ্যৎ কক্ষের জন্য, বিপ্লববাদের অন্তরালে নিজেকে কি ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার পত্রের চিত্রে চিত্রে তাহা প্রকাশ পাইত। আমি ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্কেতগুলিই বড় করিয়া ধরিতাম—আর তাঁর বৈপ্লবিক নির্দেশগুলি বিপ্লবীদের জানাইয়াই কান্ড ধাক্কা দিতাম।

এই সময়ে রাসবিহারী বহু আমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার নিবিড় সম্বন্ধের কথা বিদিত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দের পত্র হইতেই

"automaton" তথ্যটি আহরণ করিয়া তিনি আমার নিকট বিশেষভাবে তাহার মর্ম বুঝিয়া লন। ইহার পর এই 'automaton' বা যন্ত্রাধনা তাঁহার জীবনে কি ভাবে বৃদ্ধি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ভারতের রাষ্ট্রসাধনার ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে চিরদিন অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

রাসবিহারী বহুর হাতের বস্ত্রের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই তিনি বসন্তকুমারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী ঋতিমুখে যাত্রা করেন। দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে নগর-প্রবেশকালে লর্ড হাভিলের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি আহত হইলে উৎসব বন্ধ, দিল্লীর দরবার পও হইয়া যায়। আজ বলিতে বাধা নাই যে, এই বোমা নিক্ষেপ করেন নারীবিশেষ তরুণ বসন্তকুমার আর রাসবিহারীই ছিলেন পার্শ্বসারথির মত তাহার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক। এই ঘটনার জন্য আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ নির্দেশ গ্রহণ করি নাই; কিন্তু ঘটনাস্থে তিনি খুলী হইয়াই যে কথা লেখেন, তাঁর পত্র হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"I welcome it as a sign of some preliminary effectiveness thro' you. In this direction, in which hitherto everything has gone against us, also as we have proof of several, . . . that the quantity of your power and your work is greatly improving in effectiveness and success."

অর্থাৎ,

"তোমার ভিতর দিয়া কিছু প্রাথমিক কার্যকারিতার লক্ষণরূপে ইহাকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। এই দিকে যেখানে এতাবৎ সবই আমাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে, সে ক্ষেত্রে ইহা তোমার শক্তি ও কর্মের গুণোৎকর্ষ প্রমাণ করে—তোমার কর্ম কার্যকারিতার সাক্ষ্যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে।"

রাসবিহারী বহু ও ঢাকার অমূল্যলীন সমিতির সাহায্যে ধীরপদে আমবা বিপ্লবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এদিকে রমেশবাবুর ঋণেদের অমুবাদ শ্রীঅরবিন্দকে পাঠানো হইল। তিনি পুনরায় আমার পত্রযোগে জানাইলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর নিকট হইতে তাঁহার জন্য কিছু অর্থ ভিক্ষা করিতে। আমি শ্রীঅরবিন্দের পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেশবন্ধু অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর আর এক দিন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে বলিলেন। আমি বথাকালে—তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "সাগর-সঙ্গীত" গ্রন্থখানি বাহির করিয়া বলিলেন—

"শ্রীঅরবিন্দ যদি ইহার ইংরেজী অমুবাদ করিয়া দেন, তবে আমি সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে এই কর্মের জন্য দিব।" শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলে, তিনি "সাগর-সঙ্গীত"

গ্রন্থখানি চাহিয়া পাঠাইলেন। মিত্রাকরে ও অমিত্রাকরে “সাগর সঙ্গীতের” দুই গ্রন্থ ইংরেজী অঙ্কুবাদ শ্রীঅরবিন্দই করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু এই বাবদ উপরোক্ত অর্থসাহায্যও বখাকালে করিয়াছিলেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট বাংলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। মুঘলধারে বৃষ্টি—বর্ষণের বিরাম নাই। কুপ তড়াগ পুঙ্খবিলী ডাঙিল। দামোদর নদে প্রবল বন্যা দেখা দিল। পূর্বকুলের অধিবাসিবৃন্দ গৃহহীন হইল। বাংলার বিপ্লবী তরুণগণ সেবাত্রিতে তৎপর হইলেন। শ্রীযুক্ত বি. কে. লাহিড়ীর উদ্যোগে উত্তরপাড়ার শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ঢাকার শ্রীযাখনলাল সেন মহাশয় সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলাম। এই সময়েই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহিত আমার প্রথম পরিচয়। এই বাঘা যতীনের কথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেই আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম। তিনিও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বীর। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পরবর্তী ঘটনাগুলি স্মরণে এই ক্ষেত্রে উল্লেখ নিম্নয়োজন। বর্ধমানের কাজে আত্মনিয়োগ করার কালে আমি দারুণ ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হই। বেহেশ জরারস্থায় আমি শ্রীঅরবিন্দ হাজরা ওরফে শ্রীশশাঙ্কের উদ্যোগে বর্ধমান হইতে চন্দননগরে নীত হই। আরোগ্যলাভ করিলে, পূজার পর বিপ্লবিগণের এক সভায় স্থির হয় যে, পতিচারী হইতে আমার ইন্সপেক্টর হইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরিত রিভলভারগুলি নষ্ট হওয়ায় এবং পতিচারী হইতে অস্ত্র-সংগ্রহের কাজ বিশেষ অগ্রসর না হওয়ায় ইন্সপেক্টর হইতে প্রচুর অস্ত্রাদি বাহাতে চন্দননগরে আসিয়া পৌছায়, তাহার আরোজন আমাকে করিতেই হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-বোগ সেদিন আমার পাইয়া বসিয়াছে। তাঁহার আত্মসমর্পণ-বোগে জীবনের যমতা রাখিতে নাই। আমি ভাবিয়া স্থির করিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অঙ্কুমোদন পাইলে, আমি ইন্সপেক্টর হইতে গমন করিব। বন্ধুদের এই কথা শ্রুতি জানাইলাম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা শেষ হইলে, আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। আমার পুরা-দস্তর সাহেব সাজান হইল। স্তম্ভিকণ গুন্ডরাজি বিসর্জন দিয়া মুখমণ্ডলের শ্রী পরিবর্তিত করা হইল। স্বর্ণশর্শ চট্টোপাধ্যায় আমার আদালী সাজিয়া মাত্রাজ মেলে আমার তুলিয়া দিল। মাত্রাজ টেপনে গাড়ী পৌছিলে আমার পূর্বপরিচিত বন্ধু পার্শ্বসারথির বাসায় গিয়া উঠিলাম। প্ল্যাটফর্মে আত্মকৃত অপরাধে যে বিপদ

ঘনাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহাতে এই ক্ষেত্রে নিরাপদ বিশ্রাম সম্ভবপর হইল না। মাত্রাজের প্ল্যাটফর্মে গাড়ী পৌছিলে এক ব্যক্তি আমার বখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আমার নাম M. Ray (এম্. রে), কলিকাতার চুণাগলি অথবা চৌরঙ্গীতে আমি বাস করি না, চন্দননগর আমার বাসস্থান ও আমি একজন হিন্দু—এই সংবাদ-বিদ্যুৎ-গতিতে পুলিশের নিকট গিয়া পৌছায়। অল্পকাল-মধ্যে পার্শ্বসারথির বাড়ীটি পুলিশ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়। আমার খিড়কীর দ্বার দিয়া পার্শ্বসারথি বাহির করিয়া টেপনে এক গাড়ীতে তুলিয়া দেন। তারপর অতি প্রত্যাষে পতিচারী যখন পৌছাই, তখন প্রবল বৃষ্টিধারা নামিয়াছে। আমি সাহেবী পোশাকে সরাসরি শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনে উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। পার্শ্বসারথির জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনিবাস স্মারকর এই সময়ে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে পতিচারীতে বাস করিতেছিলেন—তাঁহারই নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনিও আমার এক বিন্দু কালহরণ করিতে না দিয়া, শ্রীঅরবিন্দের বাস-ভবনে পৌছাইয়া দিলেন। শুণ্ডচরবৃন্দ আমার দেখিল, কিন্তু একজন সাহেব আসিয়াছে, এই সংবাদই ব্রিটিশ পুলিশ আপিসে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীঅরবিন্দের আবাসস্থলে প্রবেশ করিয়াই আমি সন্মুখে এক তরুণকে দেখিলাম। তাহার নাম শুনিলাম অমৃত। সে আমাকে বিজয় নাগের সহিত দেখা করাইয়া দিল। তারপর আসিল নলিনী, মণি ও সৌরীন—ইহারা সকলেই আমার পরিচিত বন্ধু। আমার সাহেবী বেশ দেখিয়া সকলেই সর্বোত্তম তারিফ করিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দ ঘর হইতে বাহির হইলেন। আমি নতজাহ্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইতে পারিলাম না, সাহেবী পোশাকে তাহা বাধিল। তিনি আমার দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, মস্তক আচ্ছাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিরাপদে আসিয়াছে ত?”

আমি তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, “সাহেব সাজিয়া গোপনে আসিতেছ, নামটাও তো ভাঁড়াইতে হয়। আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার গর্বটুকু যদি রহিল, তো সাহেব সাজার প্রয়োজন কি?” আমি অপ্রস্তুত হইলাম। নিজের নির্কৃদ্ধিতার জন্য নিজেকে দিকার দিলাম। তারপর বেড় মাস কাল শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে তাঁহার সান্নিধ্যে পতিচারীতেই থাকিতে হইল। ইন্সপেক্টর হইয়া বাওয়ার অন্য তাঁহার আদেশ মিলিল না।

বাংলা ও বাঙালী

ঐশ্বরীলচন্দ্র ঘোষ

৩

পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত কুটীরশিল্প আছে, নানা কারণে সেগুলির অবস্থা একরূপ মৃতপ্রায় বলা চলে। উপস্থিত যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে ক্রেতার অভাবে এবং অত্যধিক দামের জন্য তাহাও কাটুতি হইতেছে না। পূর্বে যে সমস্ত কুটীরশিল্প ছিল তাহাদের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে এবং এখনও যেগুলি আছে সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে হইলে পল্লী-অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক শক্তি সরবরাহ করা দরকার, নচেৎ উৎপাদন-ব্যয় কমিবে না। তাহা ছাড়া এই সমস্ত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যাদি বাহ্যতে উপযুক্ত দামে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থাও প্রদেশ-সরকারের করা আবশ্যিক। শ্রম-শিল্প ও বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় এ বিষয় পরে আলোচনা করিব। বর্তমানে সাধারণ বাঙালীর অর্থ-নৈতিক দুর্গতির প্রধান ও স্থম্পট কারণ নিয়ে দিতেছি। আর এই কারণেই এই প্রদেশকে একটি সমস্তা প্রধান প্রদেশ বলা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ পাট ও কয়লা ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু পণ্যদ্রব্য অপর প্রদেশে রপ্তানি করে না, পাট ও পাটজাত দ্রব্য বাহা অপর প্রদেশে এবং বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার মূল্যের সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পায়। কয়লা বাহা উৎপন্ন হয় তাহার বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে ভারতীয় রেলপথে ব্যবহৃত হয়, কতকটা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং সামান্য পরিমাণ অপর প্রদেশে চালান যায়।

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে রেল ও নদীপথে পশ্চিমবঙ্গে আমদানীকৃত কয়েকটি খাদ্য ও

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের হিসাব

দ্রব্যের নাম	আমদানীকৃত দ্রব্যের পরিমাণ	প্রকাশিত মূল্যভর	মোট টাকা
		বাজার ও কন্ট্রোল দর	
হোলা	১,৪৩০,৫০৬ মণ	২০৭ টাকা প্রতি মণ	২৮,৬১০,১২০
ধান্য	১১৪,৩৯৫ "	" "	১১৫,১৬০
চাউল	৪৫৩,৬৮৯ "	১৭৭ "	৭,৭১২,১১৭
গম	১৯,০৪৭ "	১৬৭ "	৩০৪,৭৫২
আটা	৪৫,৯৬৭ "	১৬৭ "	৭৬৫,৪৭২
বাদাম তৈল	৩৪৭,৫২৫ "	৭৪৭ " (পাইপ নম্বের)	২৫,৭১৬,৮৫০
অন্যান্য তৈল	৪৬৯,৩৭৯ "	৭০৭ "	৩২,৮৫৬,৫০০
বাদাম	২৩৩,২৯৭ "	৩৪৭ "	৭,৯৩২,০৯৭
সরিষা	৫,০০৪,৪৫৭ "	৩৩৭ "	১৬৫,১৪৭,০৮৯
চিনি	৩,৬৩২,৭১৯ "	৩৫৭ "	১২৭,১৪৫,১৬৫
জুও	১,৯৬৩,৪৮৪ "	২৪৭ "	৪৭,১২৩,৬১৬
নারিকেল তৈল	২৫,৩৭৭ "	১০৭ "	২,৫৮৮,৪৫৫

মোট ৪৪৬,৭৮৮,০১৯

নির্মে প্রদত্ত হিসাব হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসরে উপস্থিত বাজার ও কন্ট্রোল দর অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের জন্যই অপর প্রদেশে চলিয়া যায়। উক্ত হিসাবের মধ্যে পাকিস্থান হইতে রেল ও ষ্টীমারযোগে এবং বিদেশ হইতে সমুদ্রপথে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য আমদানী করা হয় বথা—চাউল, গম, ময়দা ইত্যাদি, এবং বাহা এই প্রদেশে ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্য ধরা হয় নাই। তাহা ছাড়া অপর প্রদেশ হইতে সূতীবস্ত্র, লবণ, সূত, মাখন, মৎস্ত, ফল, আলু ও নানারূপ তরিতরকারী বাহা বাহা আমদানী করা হয় তাহার মূল্যও ধরা হয় নাই; কারণ কোনও সরকারী পুষ্তিকার উহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। এই সকল দ্রব্যের মূল্যও বহু কোটি টাকা হইবে। এই বাৎসরিক অর্থক্ষয় কোন সময়ই রোধ করিতে পারা যাইবে না কি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচুর দুগ্ধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে নানারূপ পরিকল্পনা করিতেছেন। ইহা অর্থের সন্ধ্যায় মোটেই বলা যাইতে পারে না। যেখানে খাদ্যোৎপাদনের আবশ্যিকমত জমির অভাব সেখানে গো-চারণ-ভূমি ও গবাদি পশুর খাদ্য কোথা হইতে আসিবে? “অধিক খাদ্য ফলাও”, “বনমহোৎসব” কর এবং প্রধানমন্ত্রীর

নূতন অভিব্যক্তি "খনসম্পদ বাড়াও" পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিকট একটা নির্দাক্ষণ পরিহাস যাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "মৎস্ত ফলাও" অভিব্যক্তির একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। কিছুদিন পূর্বে একটি কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মৎস্তচাষের সরকারী মহকুমা কর্মচারীকে তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া পুষ্করিণীগুলি দেখিয়া তাহাতে মৎস্তচাষের বিষয় উপদেশ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে কর্মচারীটি সেই প্রতিষ্ঠানের লোকদের তাহার অর্পণপত্র দেখা করিয়া উপদেশ লইতে বলিয়াছিলেন। পরে জানিতে পারা যায়, টাকার অভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্তচাষের কর্মচারীদের বাতায়াতের ভাতা কমাইয়া দিয়াছেন এবং সেইজন্যই মৎস্তচাষের সরকারী কর্মচারীরা পুষ্করিণী না দেখিয়াই আপিসের চেয়ারে বসিয়া উপদেশ দেন। এই প্রদেশে "খাত ফলাও", "মৎস্ত ফলাও", "দুগ্ধ ফলাও" এবং "বনমহোৎসব কর" এই সব অভিব্যক্তি ও পরি-বহনকার জন্য বেশীর ভাগ বরাদ্দ টাকা ছোট বড় কর্মচারীদের বেতন দিতেই ফুরাইয়া যায়।

পূর্বে লিখিয়াছি, এই প্রদেশে ধানের জমিতে পাটচাষ করান হইতেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি পাটকল আছে সেই পরিমাণ পাটচাষের জমি নাই। কিন্তু পাট-করের বেশীর ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অপর প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। আশা করি, প্রদেশ-সরকার এই বিষয় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে বসতির চাপের হার বৃদ্ধির জন্য প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর স্থায়ী ক্ষতি এবং অসুবিধার বিশদ বিবরণ নব-গঠিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিশনের কাছে তাহাদের লাবিসহ পেশ করিতে তুলিবেন না।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু পররাষ্ট্র বিষয়ে বেরুপ মনো-যোগী, নিজরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাংলাদেশে তিনি যে আয়ের-গিরির সৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাহার সেরূপ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও নানা অশান্তি দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে দিলে ভারত-রাষ্ট্রের এশিয়ার একটি বৃহত্তর "বলকান" হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক প্রদেশের আয়তন তাহার প্রতি বর্গমাইলের বসতি চাপের সঙ্গে সমতা রাখা করিয়া ঠিক করা দরকার। কেবল বক্তৃতা, নূতন নূতন পরিকল্পনা, অগণিত "বাণী" ও মুখবোচক শ্লোকের দ্বারা ইহার কোনরূপ সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

ভারত বিভক্ত হইবার কালে পণ্ডিত নেহরুর বাসভূমি উত্তর প্রদেশের আয়তন ১,০৬,২৪৭ বর্গমাইল, বোম্বাই প্রদেশের আয়তন ৭৬,৪৩৩ বর্গমাইল এবং বিহার প্রদেশের

আয়তন ৬২,৭৪৫ বর্গমাইল দাঁড়াইয়াছে। আর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়াইয়াছে যাত্র ৩০,৬৮২ বর্গমাইল। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গের কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা উত্থাপন করিলেই কেন যে ইহা প্রাদেশিকতার দোষে দূষিত হয় তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না।

পূর্বে প্রবন্ধে বাংলার প্রতি বর্গমাইলে বসতির হারের বিষয় আলোচনা করিবার সময় লিখিয়াছিলাম যে, ভারত বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কুচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুইটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা ঠিক নহে। ত্রিপুরা রাজ্য এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং উহা পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হয় নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন মোট বর্গমাইল যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিকই আছে।

পূর্বে বাঙালী জাতি সর্বক্ষেত্রে ও সর্ববিষয়ে সমগ্র ভারতের অগ্রগণ্য ছিল। একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ভারত আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার ভিত্তি প্রধানতঃ দেশপ্রমিত বাঙালী যুবকদের নিঃস্বার্থ আত্ম-ত্যাগের উপর স্থাপিত। সে সময় বাঙালী জাতিকে অপর প্রদেশবাসীরা বেরুপ প্রকার চক্ষে দেখিত এখন তাহা প্রায় ইতিহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমোলনের সময় বিখ্যাত রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় আইন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড কার্জনের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাংলা আজ বাহা ভাবিতেছে—সমগ্র ভারত কাল তাহাই ভাবিবে।" আজ বাঙালীর অরবস্ত্র ও অস্ত্র সমস্তার সমাধান একরূপ ভারত-সরকারের উপরই নির্ভর করিতেছে একথা বলিলে অত্যাক্তি হয় না। এমন কি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারত-সরকারের প্রভাব অঙ্কুরিত হয়। ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর এই কারণেই ঐবিবাক্য "শাস্ত্রম্ শিবম্ অধৈবম্" পর্যন্ত তাহার নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

গত অক্টোবর মাসে *Engineering News of India*'র সম্পাদক ডি. সি. ড্রাইভার "A Tiger looks at India" নামক একটি হুচিস্তিত প্রবন্ধে বাঙালী জাতির বর্তমান অবস্থার বিষয় বাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"In India the Symbol of the State should be strength or Shakti. If there is strength, truth will prevail; otherwise it will take refuge in subterfuge. Look at poor Bengal. Once like a tiger it led. What Bengal roared at new moon other Provinces would bleat at full moon. The tiger spirit of Bengal is gone. Now ferocious tigers only appear in West Bengal, painted on its buses."

নিরে ইহার বজ্রবান দিলাম :

“ভারতবর্ষের প্রতীক হওয়া উচিত শক্তি। শক্তি থাকিলে সত্যের জয় অবশ্যজারী; অন্যথায় ইহা চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। চূর্ণশাস্ত্র বাঙালার দিকে তাকাও। এক সময়ে উহা ব্যাভ্রের দ্বারায় নায়কত্ব করিয়াছিল। অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে বাংলা বাহা সদর্পে গর্জন করিয়া বাহা প্রকাশ করিত, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাত্ত রাত্রে অন্যান্য প্রদেশ তাহা যুদ্ধের মাত্র ব্যক্ত করিত। কিন্তু আজ বাংলা তাহার ব্যাভ্রদর্প হারাইয়াছে। এখন সেই বীণাবান ব্যাভ্র-

সমূহের যুগ্মি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালিত মোটর-বাসেই শুধু অধিত্ত রহিয়াছে।”

ড্রাইভারের উক্তি যে নিদারুণ সত্য তাহা বলাই বাহুল্য। ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতি তাহার এই জীবনমরণ সমস্তার সমাধান না করিয়া কত দিন বে চূর্ণ করিয়া বলিয়া থাকিবে তাহা অসুমান করা শক্ত। যদি আমাদের দেশের নেতারা বাংলার সমস্তাগুলির দ্রুত সমাধান না করেন তাহা হইলে মনে হয়, হয়ত এক দিন সমগ্র বাঙালী জাতি আবার “মাছুষ আমরা নহি ত মেঘ” বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিবে এবং নিজেরাই প্রতিকারের চেষ্টা করিবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঐশ্বরেশচন্দ্র দেব

আজ আমরা যে লোক-শিক্ষকের ৮ম বার্ষিক তিরোধান-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতে সমবেত হয়েছি তাঁর জীবনের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া দুষ্কর। কারণ তিনি নিজেকে নিজের কর্মের পশ্চাতে এমন করে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সে গোপনীয়তা ত্বর্জিত বললে অসঙ্গত হবে না। অথচ এই লোকটি নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট ছিলেন হাসি-খুসীর আধার। গভীর মুখে হাসির উৎস-মুখ খুলে দেবার কৌশল তিনি জানতেন। শান্তিনিকেতনের অনেক বন্ধুর নিকট তা শুনেছি। গান্ধীর্ষ্য ও পরিহাস-নৈপুণ্যের এই সমবার বিধাতৃদত্ত একটি গুণ।

“প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকা দুখানির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক রামানন্দ—নিজের কাজের মধ্যে নিজের নাম দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজল্যমান রাখবার ব্যবস্থা করে গেছেন। একজন ভারতীয় সাংবাদিক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বিলাতের “রিভিউ অব রিভিউজ” পত্রিকায় রামানন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এই একজন সাংবাদিক যিনি রাজনীতিবিদ বলে অভিহিত হতে পারেন, Journalist as a statesman। সেই সাংবাদিক এখনও বেঁচে আছেন; তাঁর নাম সন্ত নিহাল সিংহ।

আমার নিকট রামানন্দের প্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি ছিলেন লোক-শিক্ষক। আজীবন এই কর্তব্য পালন করেছেন—কলেজের অধ্যাপকরূপে বা সম্পাদকরূপে এবং এই কর্তব্য পালনে এমন একটা নিষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন যা বর্তমানযুগে বিরল। পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম।

পণ্ডিতের বক্ষণশীলতা বা গৌড়ামি তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে তিনি কোলিক সনাতন আচার-আচরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সমাজে পণ্ডিতের যে স্থান ছিল, লোকের শিক্ষা-দীকার দায়িত্ব তাঁরা যেমন করে ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকার করতেন, রামানন্দের জীবনে সেই নিষ্ঠা ও নির্লোভতার পরিচয় পেয়েছি প্রচুর, তাঁর সঙ্গে ধারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, এই স্বল্পবাক্য লোকটির মধ্যে জ্ঞানের কি অমূল্য ভাণ্ডার সূক্ষ্মায়িত ছিল। এই ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে দেশ-বিদেশের গুণী ও পণ্ডিত লোকেরা তাঁর চারপাশে সমবেত হতেন এই পাড়ার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গৌড়ীর সেবার নিবেদিত-প্রাণ এই আইরিশ-তনয়া সিটায় নিবেদিতা নামে পরিচিতা ছিলেন লোক-সমাজে। “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকার প্রতিষ্ঠালাভের মূলে এই বিদেশী নারীর দান ভুলবার নয়। সেইরূপ কত খ্যাত অখ্যাত লোক, তাঁকে সাহায্য করতেন।

রামানন্দ যখন “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ” বের করেন, তখন ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশ বিপ্লবী আন্দোলনের বন্যায় পরিপ্লাবিত। এর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা এখনও জানা যায় নি। বতীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিটায় নিবেদিতা প্রভৃতি বিপ্লবীপ্রধানদের সঙ্গে রামানন্দের ঘনিষ্ঠ সাক্ষ্য ছিল। এই কথা তখনও লোকে জানত; ইংরেজের পুলিশেরও জানা ছিল। এই

আত্মবিলোপকারী লোকটি কি করে এই আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে চালাতেন, লোকে এই সব বিপ্লবজনক সম্পর্কের কথা জানত না; শাস্ত সমাহিত চিত্তে তিনি নিজের দৈনন্দিন কর্তব্যাদি করে যেতেন। তা তাঁর শক্তির পরিচায়ক ছিল, এবং এ সব সম্ভব হ'ত না যদি তাঁর সহধর্মিণী তাঁকে সাহায্য না করতেন। রামানন্দের জীবনে ও কর্মে মনোরমা দেবী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্বে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমার পূর্ববর্তী বক্তা (শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়) তাঁর অভিভাষণে বর্তমান ভারতের সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন মনে করি। হতে পারে, বর্তমান যুগের শিক্ষিত-সমাজ কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তা হলেও যে সর্বত্র তাদের কানে এই কথা শুনানো হবে যে তারা অযোগ্য, তারা হয় এটা সমীচীন নয়।

এরূপ কথা শুনে শুনে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, সত্যই তারা অযোগ্য, তারা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ একটি কথা বলে এরূপ উক্তির নিন্দা করে গেছেন। আয়ারল্যান্ডের ছেলেদের বিদেশী শাসকবর্গ প্রায়ই নাকি শুনাতে, "Pat, you are no good" "প্যাট, তোমরা কোন কাজের নও।" শুনে শুনে প্যাটদের মনে এই ধারণা লুট হইতে লাগল যে তারা সত্য সত্যই অকেজো, অপদার্থ। কিন্তু সেই প্যাটেরাই যখন মার্কিন মূলুকে পদার্পণ করলে, তখন এই থিক্কাবের কথা তাদের কানে বাজত না, এবং এই প্যাটদের মধ্য থেকেই দেখা দিলেন অনেক শিক্ষক-অধ্যাপক, পণ্ডিত গবেষক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের নেতা ইত্যাদির নাম ইতিহাসে জল্ জল্ করছে। আমাদের দেশের ছেলেরাও সেরূপ উৎসাহ পেলে তাঁদের মত কীষ্টি রেখে যাবেন।

● গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রামানন্দ স্বস্তি-সত্য প্রদত্ত বক্তৃতার সারসংক্ষেপ।



বেনারসী হাস চতুর্দশী কর্তৃক রাষ্ট্রপতি রাভেন্দ্রপ্রসাদকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-গ্রন্থ "রামানন্দ ও অর্জুনভাষীর বাংলা" উপহার প্রদান। রাষ্ট্রপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভাইরীকালিদাস দাস

প্যারিস

ঐশিকালী নন্দী, এম-এ

লণ্ডন—ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে পাড়ী ঘরে প্রথম পেলাম হায়েন পোর্ট-এ। সেখান থেকে ছোট একখানি গিয়ার আমাঘের দিগে গেল দিগেপ বন্দরে, আমরা পৌহলাম ক্রালে। ছোট গিয়ার, হুদুনি অভ্যন্তর বেনী, তার উপর তৃতীয় প্রেইর বাজী বেনী হওয়ার ভিত্তির কটটা অস্থতব করলাম বেশ ভালই। আবার ডাকার মেবে উঠলাম পাড়ীতে। বেশ বোকা গেল ক্রালে এসে পড়েছি, হু'দিকে অপূর্ণ সন্তুধের সমারোহ—তারই মাঝে মাঝে ক্রালের রাশি। হাতস্থতর মরমারীর কোলাহল, সব মিলে মনটা প্রসন্ন করে তুলল। সন্ধ্যা ছয়টার পৌহলাম প্যারিসে; ষ্টেশনটির নাম সেণ্ট লসজার। ছোট্টেলের সন্ধ্যানে বের হলার। ঠাই মাই কোথাও। সর্বত্র বিদেশী-বিদেশিনীদের ভিড়। সেখানে পাওয়া যায়, সেখানে প্রবেশ

পড়লাম কিছু বাবারের সন্ধ্যানে, তার সঙ্গে কিছু উপহাসাত হবে—কয়েকটি সন্ধ্যার ও হুই-একটি সন্ধ্যা হানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

কোট্টেলের নীচেই একটি য়েভোর' ছিল। সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। এত বড় এবং এমন বন্ধুকে চারের ষ্টল ত কই কোন মিন দেখি মি। তার দিক দিয়েই লোক প্রবেশ করছে, আর তার দিকেই বাবারের লারি। ব্যাপারটা বানিক পরেই বোঝগয়া হ'ল বধন দেখলাম আমিও প্রবেশ করছি আবার বিপরীত দিকের সন্ধ্যা দিয়ে। দোকানটি বিভাভই ছোট—আর তার দেয়াল বলতে কিছুই নেই। সন্ধ্যার দিকটা বার দিয়ে ভিন্ন দিকেই হাদ থেকে মেবে পর্যন্ত কেবল বন্ধুকে আয়নার ঢাকা। কলে যেদিকে তাকাই মনে হয় এর সীমা নেই। কেউ বা ঠিকিয়েই তরল পানীরের সন্ধ্যাবহার করছে, কেউ বা বসেছে, কেউ বা প্রতীক্য করছে কাকুর ভত। আমি একটা টেবিল দখল করে বসলাম, এবার স্তব্ধ হ'ল ভাষা-সমস্তা, কি করে বোঝাই আমি কি চাই। একটি 'ওয়েটার' এসিয়ে এল, তাকে বোঝাতে চাইলাম 'চা ও কিছু বাবার', সে কেবল তাকিয়ে রইল সন্ধ্যা বুঝে। হঠাৎ মাধার বুদ্ধি এল, উঠে গিয়ে চারের পাঞ্জটি দেখিয়ে দিলাম আর কুটি ভিন্ন। সে খুশী হয়ে বানিক পরে এবে হানির করলে।



হুই জন বিদেশিনী সহ লেখিকা

করা সাধারণ তারতীরের পক্ষে হু:সাধ্য—বর্ণবিষেব নয়, অর্থ-সম্পদ। লণ্ডন মহানগরীতে এক সন্ধ্যা বাস করতে হলে সাধারণ ছোট্টেলের দক্ষিণা আহবানিক এক পাউণ্ড, তারতীর স্ত্রীর প্রায় ১০৮/০। প্রথম বধন এক পাউণ্ড তাকিয়ে করানী কাগজে ১৬০ ক্র'। পেলাম, আমার আনন্দ দেখে কে? মনে হ'ল খুব কম পরচার প্যারিস বেগা সেয়ে কিয়ে আলব। কিন্তু "বাহিরে যার হানির হটা ভিতরে তার চোখের জল।" কে জানত যে প্যারিস মহানগরীতে এক সন্ধ্যার বিহানা-তাকা ১০০০ ক্র'। বহু কটে একটি সাধারণ ছোট্টেল পাওয়া গেল সেখানে মাত্র কয়েকটি বর খালি ছিল। প্রতিটি ঘরের দর্পনী ৪১০ ক্র'। বাকু তবু মনের ভাল। মাল বলতে ত ছোট্ট হুই ব্যাগ, সেগুলো ছোট্টেলসন্ধ্যার সন্ধ্যার বেবে দেখিয়ে

ভোজনপূর্ণ কোমরকমে সন্ধ্যা করার পর হাম সেবার বেলার সে দিকেই আর একটি ওয়েটারকে দিয়ে এল সঙ্গে করে। সে সুবিধে মিলে কাগজে লিখে যে আমি দেখেছি চা ৪৫ ক্র', কুটি ৩৫ ক্র', ভিন্ন ৩০ মোট ১১০ ক্র'। আমার ত চকুস্থির। ব্যাপার দেখে ওয়েটার ত হেসেই বাঁচে না। সে আমাকে আতুল দিয়ে দেখিয়ে মিলে, প্রত্যেকটি জিনিষের নীচে দাম লেখা আছে। দেখলাম একটি সাধারণ কলার দাম ৪০ ক্র'। অর্থাৎ আমাঘের বেনী স্ত্রীর দাম আনা। কোন জিনিষ ২০ ক্র'র নীচে বিক্রী হয় না। শুপাকার কাগজের টাকা দিয়ে কোন জিনিষ কিনতে হয়। শুধুই কাগজের হতাছাড়া। লোনা বা স্পার বার বায়ে না, এর হাত হতে ওর হাতে জন্ম: কাগজ টিকে বাড়ে আর জীবনধারণের পরচা জন্ম:ই চড়ে বাড়ে, স্ত্রীকীতি অসম্ভব বেড়ে গেছে। তার ভত কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে ত মনে হ'ল না। অবস্ত আমি হিলাম রাজধানীতে, তাই হস্ত বিভাভ গরীব ও সাধারণ জীবনযাত্রা সেবার সৌখ্য হয় মি, কিন্তু রাজধানীতে কৈ চিত্তাকুল হুই ত বেখলাম না। লকলেই সন্ধ্যা বুঝে আপন

কাজ করে যাচ্ছে, বাবার সময় হোটেলের রেস্তোরাঁর চুকে
বেবে নিচ্ছে, বকবকে ভকভকে পোশাক-পরা, জীবনটাকে
বেদ নিভাত খেলার মলে ভোগ করে হুমিয়ার সবটুকু সুখ
নিংড়ে নিতে চাইছে। এরাই সত্যিকার সুখী। এ বেদ “মদ



সেন্সাই গ্রান্দ-নংলর জুজ শ্রোভবিনী

বা পাও, ভোগ করে নাও, বাকীর বাতায় শূত থাক।” এমন
আর একটি কাজ দেখেছিলাম—পেমিশ সেটোর। আফ্রিকার
উত্তর কোণে জুজ বন্দর। ওখানকার অধিবাসীরা বেদ শুধু
হাসতেই পৃথিবীতে এগেছে। কোন চিন্তা, হুঃ, ভাবনা বেদ
ওদের স্পর্শ করেনি। জীবন ওদের হুস্তিতার বোকা বয়ে
ভারাকাত্ত হয় নি। পেমিশরা সবচেয়ে প্রাণ-চকল কাজ বলে
বিখ্যাত, তার পরেই করাসীরা। জীবনকে ওরা নিরেছে
নিভাত সহজভাবে। তাই অনবর্ক হুস্তিতার বোকার এরা
ভারাকাত্ত নয়।

টুটব ঠেপনে এসে মদহ করলাম কনকর্ড দেখতে বাওয়া
মাক। দিগেপ থেকে প্যারিস আলার পথে এক করাসী
ভজমহিলার সঙ্গে আলোপ হয়, তিনি করেকটি ঝটব্য হানের
শায় বলেছিলেন, তার মধ্যে কনকর্ড একটা। তাবা
বিজাট এভিরে বধন এখানে এসে পৌছলার মাত্ত তখন ম’টা।
অবাক বিনয়ে তাকিরে হইলাম প্যারিসের প্রশস্ত রাজপথের
মিকে। এত বড় এবং এত কনাকীর্ণ রাত্তা যে কোণাও
থাকতে পারে তা বেদ করনার বাইরে ছিল। হরটি রাত্তা
এসে বিশেষে বেধানে সেখানে একটি বৃত্তভত—না কনকর্ড।
এখানে বেদী এতিভনেট, চতুর্ধন সুই, বোভন সুই এবং আরও
কয়েকজনকে ‘গিলোটিন’ করা হয়। সেই রাত্তাত্ত বৃত্তি জাল
ভুলতে পারে নি, বা তাকে এবে দিগেছিল যাবীনতার
আশীর্বাদ। এতিট রাত্তার হই পার্শ্ব অগুর্ধ আলোকমালার
নারি আর এতিট রাত্তা দিগে সেকেকেও অন্ততঃ হুতিট বোটর
চলেছে গভব্যহল অতিবুখে। অনেকজন চেষ্টা করলাম রাত্তা
পায় হবার ভত। কিন্তু কার সাধ্য এই বিংশ শতাব্দীর গতির
দাবনে এগিরে যায়। অনেক ইতভতঃ করে বারকরকে

হোট্ট বেবে বধন রাত্তা পেরিরে পেলান দিগের চোথকে
বিধান করতে ইচ্ছা হ’ল না। বেদিকে হু’চোখ বার লম্বু
বাসের বেলা, বহু করে তৈরি করা ভুলের রাশি। যাকে
যাকে হোট্ট হোট্ট চোরার জাত পথিকের বিশ্রামের ভত



সেন্সাই গ্রান্দ

সাজান-গোছান পরিহার-পরিহার পার্ক বেবে মদে হ’ল এরা
জানে কি করে মাহুকের চোথকে তৃপ্তি দিতে হয়। বিধাতার
দান এরা হু’হাত ভরে নিতে পেরেছে, পেরেছে সে
আশীর্বাদের ধারাকে শিঙেদের তৃপ্তির হৌয়ার সার্থক করতে।

পর দিন ভোরবেলা—অবস্ত আমাদের ভোর নয়, পন্ডিমের
সকাল বেলা মশটার আবার বেদ হলান সূতার মিউজিয়নের
উদ্যেপে। পথ জানি না, তাবা জানি না, শুধু জানি গভব্য
হানের দাধ, তাও ভাল করে উচ্চারণ করতে পারি না। কারণ
জানি বিদেশী, বিদেশীর তাবা শুধু পড়তেই জানি, তার বদেষীর
উচ্চারণ লোকের মুখে মুখে কতটা পরিবর্তিত হয়েহে তার
ধর রাশি না। তাই বধন শির্কান্দব প্যারিসের রাজপথের
পথিককে জিজ্ঞাসা করলাম সূতার কোণার, কেউ বা তাকিরে
হাসল, কেউ বা বললে, ঐ মিকে। যাকে বেধলে মদে হয়
এ হরত ইংরেজী বুঝবে তাকেই জিজ্ঞাসা করি, কেউবা জবাব
বেদ, কেউবা বিদেশী বেধে কপা করে আভুল দিগে বেধিরে
বেদ অতকে জিজ্ঞাসা করতে, কারণ সে আমাদের তাবা জানে
না। অনেক হুগতি ভোগ করার পর হুঁজ পেলান আবার
গভব্যহল প্যারিসের অতীত বৃত্তি-ভাতার—সূতার মিউজিয়ন।

পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ অটালিকা এই সূতার। করাসী
বিগ্গবের পূর্ক পর্য্যন্ত এটা ছিল জ্ঞানের রাজপুহী। ৪৮ একর
করির উপর চতুর্দিকে বিস্তৃত এই অটালিকা করাসী হাপত্য-
শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। করাসী বিগ্গবের পর এই অটালিকা
ব্যবহৃত হয় করাসী সাত্তাক্ষের শিলাগার হিসাবে। সাত্তা
বিভাগে বিভক্ত করে এক-একটি অংশে করা হয়েহে এক এক

কাতীর শিরের সমাবেশ। তাকর্য-শিরের অপূর্ণ বিবর্ণন তেমন-ডি-বেলো—এক তাকরের পাথর কেটে গড়া নুষ্ঠি তেমন ঠাঁড়িরে আছে অপক্লপ মহিয়ার, শিল্পী হয়ে গেছে অকামার অভকারে, কিন্তু তেমন সগৌরবে ঘোষণা করছে শিরের অরণ্য। কালের জুড়ি উপেক্ষা করতে পারে নি, নুষ্ঠির হাত দুটি ডেও গেছে, শিঠের হানে হানে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্য বা অপক্লপ লাভ্যের হানি হয় নি। দ্বিত হাতে অশেষ লাভ্যারহী তেমন অগন্তের লমকে ঠাঁড়িরে বলছে, “আমি বাহুবের সেরা হুষ্ঠি।” লোকচক্র



দুতার মিউজিয়ম

অন্তরালে নির্ঝবে বসে যে শিল্পী এমন অপক্লপ প্রতিমা গড়ে তুলতে পারে তার শক্তির কথা তাবলে বাহুবের শির-প্রতিমার প্রতি প্রতাই আসে। ভিল ভিল করে গড়ে তোলা ভিলোভমা—অগন্তের বত লাভ্য বত কোমলতা সবই কি একত্রিত হয়েছে এই তেমনের সুখে, বকে, বেহ-অসহার। বিবাতার হুষ্ঠি এ মর, এ বাহুবের প্রেবে বাহুবের শক্তিতে বাহুবের আপন মনের বাহুরী মিশিরে হুষ্ঠি হয়েছে যে।

দুতার মিউজিয়মের আর এক অংশে এক তাকর্যের আরও হুঁ একটি নুষ্ঠি পাওয়া যায়। একটি বিববিখ্যাত এপোলোর নুষ্ঠি আর একটি দেবী মিনার্ডার। একটি পাথরের নুষ্ঠির গারে আর একটি রতীন পাথর—দেবীর গারে চাহরের বত করে বলাব হয়েছে। অধিকাংশ বর্ধননুষ্ঠির বিশেষ এই যে, তাদের বেহের প্রতিটি বেধা বর বা বেহাবরণের প্রতিটি ভাঁক সুন্দর হারে সুটে উঠেছে শিল্পীর নিপুণ হস্তে।

মিউজিয়মের অত একটি অংশে আছে সেরা রতীন চিত্র। তাদের প্রেই ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন শির-রীতি অনুসারে। বিভিন্ন দেশের চিত্রাবলী তাদের নির্দিষ্ট কারণার রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে তা তিকির হবি, হাকারেলের বাহুনুষ্ঠি প্রকৃতি অগন্তের বত সেরা চিত্র। এই হুটো গ্যালারী বেধা বরন

শেষ করে ঘেরিরে এলাব ভবন লভ্যা মেবে এনেছে প্যারিসের হুকে। দুতারের অত অংশে কি আছে বেধার আর লম্ব হ'ল না। 'এই শির-বদির কালের হতাবলেন উপেক্ষা করে আহ্বান করেছে অগন্তের সকল শিল্পাহারীকে তার অপক্লপ সংগ্রহ দেখবার অত।

পরদিন অনেক বোঝাপুঁজি করে একটি আগিল বার করা গেল বেধাম থেকে বিদেশীভের প্যারিসের বিভিন্ন অকলে মিরে বাবার ব্যবহা করা হয়। তাদের লকে থাকে ইংরেজী-তাবা কান্না গাঁহিত। ওদের লকে ব্যবহা করলাম, একবেলা বেধাবে ঐতিহাসিক প্যারিস, একবেলা আধুনিক প্যারিস আর বেধাবে



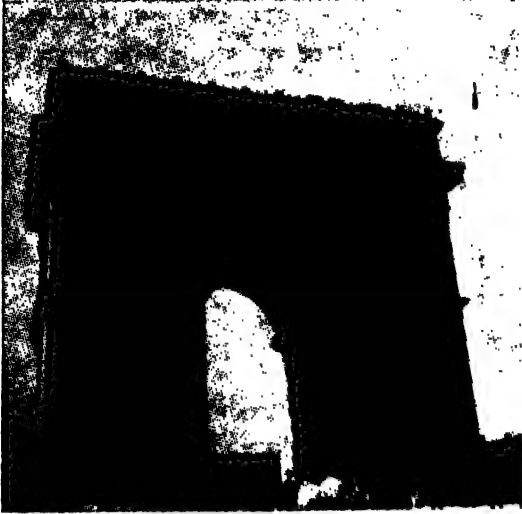
মেশোলিয়ারের লমাবি

বিববিখ্যাত ফ্রেন্সাই নিকেভন। সকাল ১১টার রওনা হওয়া গেল প্যারিসের ঐতিহাসিক স্থতিবিভূতি অকলের উৎসে। প্রথমেই পেলাম সেন্ট ম্যাপডেলিন সীর্কা—সগুদন শতাব্দীর এই সীর্কাটি বহন করছে এক তাকর্যের বিবর্ণন। সীর্কার মধ্যে করেকটি প্রস্তরনুষ্ঠি সত্যিই সুন্দর। এর পর আমরা বেধতে পেলাম মেশোলিয়ারের লমাবি-বদির। লমাবিহানটি মেবে থেকে প্রায় হুঁ ফুট বীচে। ঐটের বন জন শিরের প্রস্তরনুষ্ঠি লমাবি-হানটির চার পাশে ঠাঁড়িরে আছে। উপরে বেধানে ঐটের প্রতিনুষ্ঠি রক্ষিত আছে সেই বেধীর উপরিভাগ (অনেকটা আনাকের-বেধতার চতুর্কোণার বত) হতে আলো ঠিকরে পড়ছে সোমালী চিত্রের ভিতর থেকে। কোম রকম আলো বা হুঁয়ালোক হাতাই বেশ পরিষ্কার বেধা বাজে। পিছন দিকের একটি ককে রক্ষিত আছে বিভিন্ন জাতির পতাকা বা করানীর। জন করেছিল মেশোলিয়ারের মেত্বে। বদিরের আর এক কোণে মেশোলিয়ারের প্রথম দ্রী বোলেকাইমের বর্ধন-নুষ্ঠি।

এর পর বেধতে পেলাম হুঁ-স্থতিভত। এই ভতের চতুর্দিকে গত হুঁ বতাহুতে নিহত করানী সৈন্যদের নাম বোঝাই করা আছে। এক পাশে প্রথম বিববিখ্যতির তারিখ আর

অপর পার্বে বিস্তারিত বহুসংখ্যক। মাঝখানে প্যারিস বার্গারের
লাহায়ে অবস্থিত উদ্ভূতী অধিশিখা নয়ন করিয়ে দিচ্ছে সেই
শহীদদের কথা—মাঝে মাঝে কেউ এসে ফুলের মালা দিয়েও
এদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

প্রাচীরপাশ, এমন কি ককের হৃদোত্তম লীলিং পর্যন্ত অগুরু
চিহ্নবর্তিত—মোপোলিয়ারের করোমেন্টন, ‘দুই’দের ও তাঁদের
প্রেরণীদের প্রতিচ্ছবি প্রকৃতি মালা চিত্র। একটি ককে রক্ষিত
আছে সেই টেবিলটো যাতে জেনার্নাই লিপিপত্র থাকরিত হয়।



আর্ট অফ ট্রাফিক

‘প্যারিসিয়ন’ করাসী জাতির বরণ্যদের সমাবিস্থান।
এখানে আছে ভিক্টর হিউগো, এমিল জোলা প্রভৃতি বিখ্যাত
ব্যক্তির সমাধি। প্রবেশপথের উপরিতাপে লেখা আছে, “জান
তার জাতির বরণ্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ।”

বিষবিখ্যাত মোতদ্দু হাম সীর্জা পথিক শিল্পের নিদর্শন।
মোতদ্দু হাম এবং সেন্ট ম্যাগডেলিন উভয় সীর্জাতেই কয়েকটি
‘পোলাপ-জানালা’ অর্থাৎ পোলাপের পাগড়ির আকারে ঝাঁকা
কীচের জানালা আছে। হুকের সময় এগুলি সরিয়ে নেওয়া
হয়েছিল।

‘একেল টাওয়ার’ পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। আশাবাদের
পাইড বললে, “Eiffel Tower represents Paris more
than anything else”। রাত্তার এক পার্বে একেল টাওয়ার
আর এক পার্বে নরনলোভন উজান। প্যারিসের আশেপাশে
যেখানে একটু কাঁকা জারগা আছে সেখানেই অগুরু লবুজ ও
লোভনীর ফুলের মেলা। এমন পুষ্পপ্রিয় জাত বোধ হয় আর
নেই।

লিন নদীর উপরিস্থিত লেভু পার হতে রওনা হলার
জেনার্নাইয়ের উদ্দেশ্যে। চতুর্দশ লুই জুতার প্রাসাবে থাকা
পছন্দ না করার সত্ত্বে উঠেছিল এই জেনার্নাই প্রাসাদ। এমন
হলবীর প্রাসাদ মোটা ইউরোপে বিরল, এতিম ককে অপরূপ
লজা, জ্ঞানের বিখ্যাত শিল্পীদের অধিত মালা চিত্রে স্মৃতিভিত্ত



ইকেল টাওয়ার

সবচেয়ে আশ্চর্য জেনার্নাই প্রাসাদ-সংলগ্ন উজান। চার
পাশের মাশারকম ফুল ও বাগের বিলা-করা গালিচার নীচে
হিরে মেয়ে গেছে পথ—সেই পথ বয়ে এসিরে চললাম। রাত্তার
হুই পাশে মালা জাতীর হুকের সারি—কোনটো উঠেছে লম্বুহি
থেকে, কোনটো-বা মেয়ে গেছে অনেক নীচে। তারই নির বির
বয়ে চলছে ছোট একটি মোতবিনী, বাগে বাগে নিরাবতরণ
করেছে তার প্রবাহ। পকরণ লুই-এর কীর্তি এটি। মাঝে
মাঝে জোৎস্না রাত্তে সজোলায় চড়ে রাত্তা বেক্রভেন জল-
বিহারে, তাই প্ররোজন হয়েছিল এই বহুলসিলা প্রবাহের।
উজানের এতিম বুক নাকি টবের উপর স্থাপিত। কার্য
নজাট দিনের হুই বেলায় বাগানের একরকম রং পছন্দ করতেন
না—তাই বাতে তার ইচ্ছাছায়া বাগানের রং বদলানো যায়
এই ব্যবস্থা।

রাজ-প্রাসাদের অমতিহুয়ে রাত্তাত্ত:পুত্রিকারের থাকবার
কত ছোট একটি অটালিকা—চার পাশে উজানের বনোয়ন
পরিবেশে হালট লোভনীর, ছোট মোতলা বাড়ী, কিন্তু গৃহ-
লজার জেনার্নাই প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রাসাদের সর্ব
শেষ অধিকার ছিল মেরী এটিওনেটের—তারই পরিবার ও
বহুবর্গের হবি ও নজাট বোতল লুই-এর আবক প্রতিবৃষ্টিতে
স্মৃতিভিত্ত। বিশেষ করে মেরী এটিওনেটের লজা, টেবিল,
প্রাসাদ-কক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পেভি-প্রায়দম থেকে কেয়ার পথে বেধতে গেলাম
‘ক্যারেক মিউজিয়ম’ অর্থাৎ সন্মার্টবের শকটখানা। দুইবেল
কয়েকটি ঘানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেনোপোলিয়ারের ব্যবহৃত
হুইট কারুকার্য বহিত অর্থবান। একটি ব্যবহৃত হয়েছিল
বেনোপোলিয়ারের প্রবাসী পত্নী বোলেকাইনের বিবাহে, আর
একটি দ্বিতীয় পত্নীর বৃত্ত।

জেন্সাই প্রাসাদ থেকে কেয়ার পথে মনে হ’ল, করাসী
সন্মার্টেরা কীমনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছেন। দিকের

হুইটকী থেকে কীবনের যে অর্থ উদ্ধার করেছিলেন তার হুলা
মিতে হয়েছিল শেষ সন্মার্ট ও সন্মার্টকে। করাসী সন্মার্টের
অর্থগণ যখন হুইটকার চরম সীমার পৌঁছেছিল তখনও যেহী
একিওনেট তাঁর প্রাসাদে বিতোর হয়ে চর্চা করেছেন
শিল্পকলায়। প্রকার হিতে বা বাধে উদ্ধার কি
করেছেন সে বিচার না করে একথা বলা বার—তাদের
প্রচেষ্টার বা পক্ষে উঠেছে তা আদ্য পৃথিবীর দর্শনীয় হয়ে
আছে।

কবির ব্যাধা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বেহে পড়ত বেলা পেকে আলো সব চুল
হুখে কুম্ববল ঝাঁতগুলি মের হুট,
তবু কীবন-ভরতে গাহে মোর মূলমূল
মোর মনের কুঞ্জে মূল করে সূটোপুট।
বেহে পিতৃব্যর্জর দারিদ্র্যআলাভরা
তবু স্নানয়ে বেধে প্রাণ করে আদুতান,
যত হুঃখেরি বিবে হইরা হুঃখহরা
হব গেয়ে ওঠে কেন আমি না হুঃখি গান।

ওরে সজল মরনে ধরপীর পানে চাহি
বেধি স্নানর এবং স্নানরীনের মেলো,
আমি নরি সৌরবে আমার বৈত বাহি
মোর সৌরতে তরে ওঠে বিকারের বেলা।
হঠাৎ বিকার-বেলাতে আগমনীপান গেয়ে
বীধি পোলাপের নাথে কীবনের হিম্মোল,
নারা হুঃখীলার কীবনোৎসবে চেরে
আমি কুলে বাই নথি মরণের কলরোল।

নারা চিত্ত আমার স্নানয়ে বিশেষ বার
বেধি ভগবান বেন মোর পাশে কাছাকাছি,
এই মিথিল হুঃখিরা সকলেরি চিত্তায়
আমি সবারি মনের বৌবনে বেঁচে আছি।
এই কুবনপয় কুটেছে যেদিন থেকে
ওরে তারো আগে থেকে তার হাওক হিহু আমি,
সেই লীলাশব্যাত্তে এই মনোবেহে রেখে
বৌহে হিহু এক নাথে আমি ও অর্থবানী।

কবে হঠাৎ একরা বেলালী সে ভগবান
তার দেহালী আলিতে সাব হ’ল মনে মনে,
নারা অগৎ হুঃখিরা করিল সে বীপবান,
আমি কবি হয়ে নাথে রহিহু সন্মোপনে,
সেই অগৎশিল্পী বেলালে দেহালী আলি
নারা অগৎ হুঃখিরা রচিল হুঃখিমেলো,
তার সেই থেকে চলে অর্থন ধামবেলালী
আমি কথা গেঁথে করি ভালবাসাবালি বেলা।

সে যে লীলার মর সবারি আকাশে রহি’
হেথা বরা-হৌরা সে যে বের না কাছারে কতু,
আমি আঁখির সনুখে বাহুরের কুণা বহি’
লিখি তারেরি বেরনা—চিনিল না তারো তবু।
আমি তারেরি লারিরা আলিহু আমার আলো
যত মরে ভালোবেলে লিখিহু তারেরি লেখা,
তবু তারো চিনিল না, বাসিল না ভালো মোরে
তাই সকলের নাথক মনে মনে কিরি একা।

তাই বান করি আমি নির্ভবে এক কোণে
মোর লকী পাখিরা হুঃখী কুললীবন,
মোরে বারা হেলা করে তাহারেরি বন্দনে
একা বলে বলে বীধি বাজাই অহুতন।
এই সন্মার্টকালেতে ভালোবে রেখেছি লীপ
হার অহুতনকে বহি কেউ আসে কাছে,
আমি তাহার সন্মার্টে পয়াইরা বিব টপ
যদি জানিগো নতি কেউ ভালোবাসিরাহে।

১ রাজনগর

ঐননীমাধব চৌধুরী

ইজ্রের জেলার সদর টাউনের আলবার্ট পার্কে বক্তৃতা হইতেছিল। কয়েকজন বদেশী প্রচারক আসিয়াছেন বাহির হইতে, তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছিলেন। পার্কের বাহিরে রেগুলেশন লাগিবারী কয়েকজন পুলিশ হাঁড়াইরাছিল। ইজ্র কয়েকটি হেলেকে সঙ্গে লইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল।

বামরীপাকার পিটুনি পুলিশের অভ্যাচারের প্রতিবাদে সভা হইতেছিল। বক্তার পরে বক্তা উঠিয়া সে অভ্যাচারের কাহিনী শ্রোতাদের বলিলেন। একজন বলিলেন—বরিশালে মণের আমল কারেন হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা কুলারের আবেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সংবাদ বেলজী কাগজে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা সেন্ট্রাল আপিসে সে টেলিগ্রাম আটক করা হয়েছে। কুলারের তাঁবেদার বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের আদেশে গুর্বারা এক ডক্লমেন্টের বর ভেঙে দিয়েছে। তাঁর অপরাধ—সেই বরে বন্দে মাতরম্ প্রসি দেওয়া হয়েছিল। হারাক্ষরের মধ্যে এগার বছরের একটি হেলে বন্দে মাতরম্ বলেছিল। সেই অপরাধে কালেক্টরের আদালতের সামনে হুইপিং ট্রাঙ্কেলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে তাকে বেত মারা হয়েছে।

আর এক বক্তা বলিলেন—কুলার ঘোষণা করেছে সে মাকি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেখে মেবে। ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ও অজ্ঞাত সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের পরিবার অস্ত্র পাঠাতে। সরকারী কর্মচারীদের হুকুমে গুর্বারা মাকি হাজ্রে ডক্লমেন্টের বাতীর ভেতরে পর্যন্ত ঢুক অভ্যাচার করে। গুর্বা সৈন্যদের কার্টেদের কাছে মালিশ করলে সে জবাব দেয়—তাঁর কথা গুর্বারা শোনে না, সে কি করবে? ডেপুটির বোঠাইওয়ালাদের আদেশ দিয়েছে গুর্বারা বা চাইবে দেবে, দাম চাইতে পারবে না। হুই জন দোকানদারের দোকানঘরের বেড়ার বদেশী বিজ্ঞাপন ছিল। তারা সেই বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলতে অস্বীকার করার তাদের বেত মেরে গুরুতর জখম করা হয়েছে।

তৃতীয় বক্তা উঠিয়া বলিলেন—মৈমনসিতে ছোট ছোট হেলেরা কুটবল খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে বন্দে মাতরম্ বলে চীংকার করছিল। শুনতে পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ‘ক্লার্ক’ তাঁর চাপ-রাসীকে আদেশ করলে হেলেরদের বরে আনতে। হেলেরা চাপরাসীকে আসতে দেখে ছুটে বাতীর মধ্যে পালিয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট ভবন নিজে তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগল। হেলেরদের বরবার জত সে লোকের বাতীর অন্তর-মহলে ঢুকতেও ইতস্ততঃ করলে না। পুলিশ পুলিশ লাহেব

দোকানদারদের শাসিয়েছে, তারা দোকানে বিলেজী জিমিন না রাখলে বরিশালের মত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। সিরাজগঞ্জে হাজ্রদের এক সভা ভাঙতে গিয়ে পুলিশ শহরের পথে বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে, শ্রীলোক, শিশু পর্যন্ত বাধ যায় নি। রংপুরে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য কুলারের অভ্যর্থনার জন্য ভোট দেন নি তাঁদের পেনশাল কমেটবল করা হয়েছে।

চতুর্থ বক্তা বলিলেন—বর্করোচিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন কুলারকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের মসমদে বসানো হয়েছে। অভ্যাচারী কুলার হয়েছেন সন্ত্রাসের প্রতিমিথি। কুলার জন বলেছে, আমি রক্তপাতের জতও প্রস্তুত। অতি সংবাদ। দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সকল দেশেই রক্তপাতের কলে জাতীর আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে কুলারের কুশাসন তার জন্য দায়ী। কোন সভ্য দেশে এই কুশাসনের তুলনা নেই।

শ্রোতাদের দিকে চাহিয়া বক্তা বলিলেন—আপনাদের একখানা চিঠি পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছেন এক জন মৌলবী। তিনি লিখেছেন, কসাই বধন একটা তেড়াকে জবাই করার পরে সেই রক্তমাখা হাত আর একটা তেড়ার পায়ে আদর করে কুলার ভবন বেচারার প্রাণে ভর হাটা আর কি তাব হতে পারে? সরকার বধন আদর করে মুসলমানদের শিঠে হাত কুলার সে আদর কি তাদের ভাল লাগবার কথা? সরকারী কর্মচারীরা প্রকৃত্ত ভাবে দেশের লোকের মধ্যে বিভেদবৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ইউরোপের কোন জাতি, এমন কি আমেরিকার লোকেরা পর্যন্ত কখনও কি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছে কোন দিন? মুসলমানদের বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ইংরেজ ভেদনীতি—

সভার এই সময় বিষম হটগোল আরম্ভ হইল। লাগিবারী পুলিশের দল ইহার আগেই পার্কের মধ্যে চুক্তিয়াছিল। বাক-বাতি করিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিয়া তাহারা লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল। বেপরোয়া লাঠি চালনার কলে সভা ভাঙিয়া গেল। গোলমাল বাবিল সুল ও কলেজের হেলেরের লইয়া। ইজ্রকে কেন্দ্র করিয়া গোলমালের বৃষ্টি হইল।

ইজ্র রাজনগর হইতে সবে বাহিরে আসিয়াছে। পাতিপূর্ণ সভার উপর এই বরষের পুলিশী আক্রমণ ও দির্বিচারে লাঠি চালানো এই সে প্রথম দেখিল। হরত সময় পাইলে সেও নিজের সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া বাইত, কিন্তু সে সমতটুই পুলিশ তাহাকে দিল না। পিছন হইতে লাঠির ভঁতা শিঠে লাগিতে

সে কিরিয় পাড়াইল। ইন্ড অসীম বলশালী বুঝ, রাজনগরের
প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, লাঠিয়াল আত্মাহার সর্গারের
প্রিয় শাগরেন্দ্র। তুমি খাইরা সে আহত ব্যক্তির মত লাকাইরা
উঠিল। চোখের নিম্নে পুলিশের হাত হইতে লাঠি ছিনাইরা
লইরা সে এক লাথিতে তাহাকে বরাশারী করিল। সন্ধ্যা-
দ্বিপক্ষে পার্কের রেলিং টপকাইরা চলিয়া যাইতে বলিয়া সে
সেখানে পাড়াইরা রহিল। পার্ক প্রায় খালি হইরা আসিয়া-
ছিল। জনপাঁচেক হেলে হাক্তা বাকী হেলেরা ইন্ডের কাত
দেখিয়া বত শীত পায়ের সরিয়া পড়িল। আট-নয় জন পুলিশ
লাঠি টাটাইরা তাহার দিকে ছুটয়া আসিল। কাছে আসিয়া
ইন্ডের চেহারা ও লাঠিহাতে তাহার পাড়াইবার ভলী দেখিয়া
তাহারা সরিয়া পাড়াইল। তাহাদের বুঝিতে দেয়ী হইল না,
ইহাকে পাটানো দুবুড়ির কাত হইবে না।

ইতিমধ্যে পুলিশ-দলের তারপ্রাণ দারোগাটি সেখানে
উপস্থিত হইল। হতভম্ব পুলিশটি তাহার অভিযোগ জানাইল।
দারোগা আদেশ দিল—উহার লাঠি কাড়িয়া লইরা প্রেতার
কর। বয়োবৃদ্ধ এক জন কনেটবল বলিল—হেই বাবুজী,
লাঠিটো হাতসে কেলিরে দিন।

ইন্ড হাসিয়া বলিল—লাঠিটা কেলি দিই আর তোমরা
লাঠির পারে আমার মাথা তাকো, কেমন? এস, লাঠি কেড়ে
নাও।

দারোগা অবস্থাটা বুঝিয়া লইল। ইন্ডের চেহারা
ও হাসি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। সে বলিল—লাঠি হেড়ে
দিন মশাই। কেউ আপনাকে হৌবে না। তবে দর কর
আমার সঙ্গে থানার যেতে হবে।

ইন্ডের সন্ধ্যা কয়েক জনের দিকে চাহিয়া সে বলিল—
আপনারাও আসুন। এক ব্যাক্স পুথক কল হওয়ারটা ঠিক
নয়।

ইন্ড লাঠি কেলিয়া দিয়া দলবল সহ থানার চলিল।
দারোগা কাতের বেলার খুব হুঁশিয়ার। ইন্ড ও বাকী পাঁচ
জন হেলের মধ্যে কেহ থানা হইতে বাকী কিরিতে পারিল না।

পরের দিন পুলিশকে কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া ও
পুলিসকে প্রহার করিবার অভিযোগে ইন্ডের ও সেই ব্যাপারে
লাহাব্য করিবার অভিযোগে বাকী পাঁচ জনের বিচার হইল।
সন্ধ্যাসরি বিচার। ইন্ডের হয় মাস ও আর সন্ধ্যার হই মাস
করিয়া সন্ধ্যা কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ইন্ডদের এন্ট্রের
উকিল সংবাদ পাইয়া বখন ছুটয়া আসিলেন তখন বিচার শেষ
হইরাছে। তিনি আপিলের অস্থবতি ও আপিল সাপেক্ষে
জামিনের প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট অস্থবতি দিলেন,
কিন্তু প্রার্থনা অগ্রাহ করিলেন। ইন্ড দলবল সহ বেলোঁ চুকিল।

উকিলবাবু আপীলের বরখাস্ত করিলেন। তার পর
বিচারিত বটনা জানাইয়া হরিদারায়ণকে টেলিগ্রাম করিলেন।

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আদালতের কাত সারিয়া তিনি
কিরিয়া দেখিলেন ইন্ডের এক জন ভৃত্য একখানি খোলা
টেলিগ্রাম 'হাতে তাঁহার অপেক্ষার বলিয়া আছে। তাহার
হাত হইতে টেলিগ্রামখানি লইরা পড়িয়া তিনি মাথার হাত
দিয়া বলিয়া পড়িলেন। হরিদারায়ণ টেলিগ্রাম করিয়াছেন—
ইন্ডকে অবিলম্বে রাজনগরে আসিবার জন্য, তাহার মাতার
অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পাড়াইরাছে। শহরের বত
ডাক্তারকে সঙ্গে লইরা সে যেন কালবিলম্ব না করিয়া রওনা
হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিয়া থাকিয়া আদালতের পোশাকেই
তিনি ডাক্তারের বাড়ী ছুটিলেন। সমস্ত অবস্থা জানাইয়া
তখনই ডাক্তারের রওনা হইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহাকে
বলিলেন—হরিদারায়ণবাবুকে বলবেন আমি যেমন করে
পারি ইন্ডকে জামিনে খালাস করে রাজনগরে পাঠাবার চেষ্টা
করব।

পর দিন ডাক্তার বখন রাজনগরে পৌছিলেন তখন
জগদ্বাদীর দীর্ঘ রোগভোগের শান্তি হইরাছে—বড় হেলের
জত কয়েক বৎসর ব্যাপী বিলাপ থামিয়াছে, স্বামীকে ছাড়িয়া
পাছে এক দিনের জতও বাঁচিয়া থাকিতে হয় এই উৎকর্ষা
শান্ত হইরাছে। শেষ নিঃশ্বাস লইবার আগে স্বামীর পায়ের
মাথা রাখিয়া জগদ্বাদীর বখন চোখের ইন্দ্রিতে বিদ্যার-সন্ধ্যাবণ
জানাইলেন, হরিদারায়ণ তখন মনে মনে বলিলেন—ভূমি
আমার আগে যাবে এ প্রতিজ্ঞা রাখলে, কিন্তু তোমার অত্যা
কি আমি সহ করতে পারব? কবে আমার সময় আসবে?

বৃত্ত্যর কয়েক বর্ষ আগে জগদ্বাদীর বাকরোব হইরাছিল।
তাঁহার হই চোখের তারা এরিক ডমিক দুইয়া নীরবে
কাহাকে বেন অবেষণ করিতেছিল। তাঁহার হুইট হেলে,
কিন্তু এমনি বরাত বে, বৃত্ত্যশবার পার্শ্বে উভয়েই অস্থপস্থিত।
এত ভাতাভাকি সব শেষ হইয়া গেল যে ছোট মেয়েটিকেও
লোক পাঠাইয়া আনিবার সময় হইল না।

ডাক্তার আসিয়াছিলেন জগদ্বাদীর চিকিৎসা করিতে,
হরিদারায়ণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা
করিতে হইল। বীরভাবে ডাক্তারের সুখে তিনি ইন্ডের বখন
তুলিলেন। তার পর দ্বীয় শেষকৃত্য সারিয়া আসিয়া শব্যা-
গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার
রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইরাছে। হার্টের অবস্থা ভাল
নয়।

ডাক্তারবাবু বখন ইন্ডের প্রেতার ও বিচার শেষে উকিল-
বাবুর সুখে শোনা কথাগুলি হরিদারায়ণকে বলিতেছিলেন,
তখন জীবানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়
তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। জগদ্বাদীর অস্থবতির সংবাদ
পাইয়া দ্রীক সঙ্গে লইয়া তিনি সেই যে এ বাড়ীতে আসিয়া-

ছিলেম এ পর্যন্ত আর বগুহে কিরিতে, পায়েন নাই।

হরিনারায়ণের অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার সেবা-ভ্রমার কত লক্ষ্যকে আনাইলেন। হরিনারায়ণের বড় ঘেরে যুগ্মী শোকে এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে দেখিবার কতই লোকের দরকার, পিতার সেবা সে আর কি করিবে? চিররীকে বস্তুরবাতী হইতে আনিবার জন্য জীবনন্দ লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

এই সব ব্যবস্থা করিয়া তিনি ভাবিতে বলিলেন ইজের সবধে কি করা যায়। উকিলবাবু আশাস দিয়াছিলেন বটে ইজকে জামিনে খালাস করিয়া রাজমগরে পাঠাইবেন, কিন্তু জীবনন্দ জামিনেন এ কাজ তখন সহজে হইবে না। বদেশী-ওয়াল ফুল ফলেজের ছাত্রদের উপর শাসকসম্রদায়ের যে প্রকার বিবেচ্য ভাব তাহাতে পুলিশ কাহাকেও একবার কোন উপলক্ষে বসিতে পারিলে তাহার নিকৃতি পাওয়া দুর্ভট। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, ইজের আপীলের বিচার যে ফেলা জজের কাছে হইবে তিনি পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। যেজার তিনি শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগে বদলি হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে ইঁহার অধীনে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। কিছু দয়্যাতাও হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে। তজ্জলোক জাতিতে আইরিশ, ইংরেজ জাতি সবধে তাঁহার মনে যে একটা বিরূপ ভাব আছে জীবনন্দ তাহা সেই সময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

জীবনন্দ হির করিলেন, তিনি নিজে সহরে বাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ফেলাজজ উভয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া ইজের জামিন সবধে চেষ্টা করিবেন। জীকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। জিন্নরনী সাগ্রহে বলিলেন, তুমি আজই যাও। বিলি অকালে চলে পেলেন। কর্তার যা অবস্থা দেখি তাঁর ভালমন্দ কিছু হলে এত বড় সংসারটা ভেসে যাবে। ইজকে এখন কাছে পেলে হরত উঁর অবস্থা ভালোর দিকে যাবে। এমন বিপাকে একটা সংসার পড়তে পারে ভাবাও যায় না। একই ধামিয়া বলিলেন, চিরকাল আমার এঁদের কাছ থেকে উপকার নিয়েছি, এখন এঁদের এই বিপদে যেটুকু সাধ্য করতে হবে। জেলের মধ্যে ইজ বধন যাহের যত্নসংবাদ পাবে—

কথা শেষ না করিয়া জিন্নরনী আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিলেন। ইজের অবস্থা মনে আসিতে তাঁহার চোখ ছাপাইয়া বল পড়িতেছিল।

তিনি কিরিয়া না আসা পর্যন্ত ডাক্তারকে রাজমগরে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া জীবনন্দ সেই দিন বিকালে সহরে রওনা হইয়া পেলেন।

উকিলবাবুর লিখিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে তিনি ফেলা

জজের সঙ্গে দেখা করিলেন। পুরাতন আলাপ-পরিচয় কালাইয়া লইয়া ও পারিবারিক কুশল-প্রশ্নাদির পর ফেলা জজ হাসিয়া বলিলেন, আই সি রার বাহাছর, অনুরোধ মান করে আপনি বাবু অস্থিরী দস্তের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন। ইট ইজ বিকমিং রায়হার ওয়ার্ম দেয়ার। (সেখানকার হাওয়াটি কিন্তু বেশ গরম হয়ে উঠেছে।)

জীবনন্দ একটু হাসিলেন। বলিলেন, আমি একটা ব্যক্তিগত কাজের জন্ত এসেছি। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সতর্কতা বোধ করছি।

ফেলা জজ হাসিয়া বলিলেন, আপনি পুলিশের লোক, নিশ্চর কোন বদেশীওয়ালার জন্য কিছু বলতে আসেন নি। তবে আর সতর্কতা কিগের? নির্ভয়ে বলুন।

জীবনন্দ বলিলেন, ভায়, আমি একজন বদেশীওয়ালার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি।

ফেলা জজ—‘কি বললেন? আপনি না একজন ডি. এল. পি. এবং রায় বাহাছর।’

জীবনন্দ স্নান হাসিলেন। বলিলেন, আমার কথাটা দরজা করে শুধুন ভায়।

জীবনন্দ ইজের এপ্রতার, তাহার বিচার ও শাস্তি, তাহার মাতার মৃত্যু ও পিতার শারীরিক অবস্থার কথা বলিলেন।

বীর তাবে সব শুনিয়া ফেলা জজ বলিলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি রায় বাহাছর?

জীবনন্দ—সেটা আপনি বিবেচনা করে বলবেন ভায়। আমার কথাটা আগে বলে দিই। প্রথমতঃ ইজের মাইন্ডে-করা উকিল আছে এখানে। তবু ‘ডিকেলের’ (আত্মপক্ষ সমর্থনের) কোন সুযোগ না দিইে আব বন্টার মধ্যে সরাসরি তার বিচার করা হয়েছে। আমার আপীলের দয়্যাত করায়েছি। আপীল মজুর হলে তার মাতার আকস্মিক মৃত্যু ও পিতার শারীরিক অবস্থার কথা তেবে এবং তার সামাজিক দয়্যাহার কথা বিবেচনা করে জামিন দিতে গবর্নমেন্টের আপত্তি হবার কথা নয়। তবুও পুলিশ আপত্তি তুলতে পারে। এবার আমার ব্যক্তিগত মিয়েরনটা জানাচ্ছি। ইজকে মুক্ত করা আমার কর্তব্য। আমাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আজ হু’দিন হ’ল ইজের যাহের মৃত্যু হয়েছে। তার পিতা গুরুতর অস্থির। ইজ তাঁর একমাত্র পুত্র। ইজের পিতা আমার বাল্যবন্ধু, আমার একান্ত হিঁটবী তিনি। আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, আমাকে ইংরেজী শিখা দিবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আমার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার ইজের পিতা বহন করেছেন। মৃত্যুশয্যার শান্তিতে আমার পরম বন্ধুর পক্ষে একমাত্র সাহুদ্য তাঁর পুত্রকে কাছে পাওয়া। এই সাহুদ্যই হাতে তিনি পান সেই ব্যবস্থা করে দেবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

বেলা অন্ধ লহরীছড়িগ লগে জীবানন্দের কথা শুনিলেন। বলিলেন—আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি বলুন।

জীবানন্দ—ইন্ডের অপরাধ প্রমাণ করবার মত যথেষ্ট লাক্যপ্রমাণ আছে কি না আপনাদের বিচারের সময় দেখা যাবে। আপনাদের ভদ্রমহি হতে দেরি হবে। কিন্তু আপনি জানেন প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যকর্তব্য মাতৃভ্রাতৃ সম্পন্ন করা। কাজেই এই সময় ছাড়া পাওয়া ইন্ডের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমি আপনার কাছে এই অশুভসংস্কার চাইছি।

বেলা অন্ধ বলিলেন, তার বাহাদুর, কাগজপত্র না দেখে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারছি নে। তবে জানিয়ে—আজ্ঞা আপনারা কি জানিয়ে দরখাস্ত করেছেন?

জীবানন্দ—আজ করা হবে।

বেলা অন্ধ—তাই করুন। কি করা যার দেখব। আই কিল ম্যানার সরি কর ইন্ডের ক্রোধ (আমি আপনার বন্ধুর মত সীতিমত হুঃখবোধ করছি।)

জীবানন্দ ভাবিতেছিলেন, ম্যাগিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আছে কিনা সে কথা অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু তাঁর শেষের কথা শুনিয়া হির করিলেন উহা অনাবশ্যক, বরং কল ধাওয়া হইতে পারে। তাহাকে বক্তব্য দিয়া জীবানন্দ উদ্ভিষ্টেছিলেন, বেলা অন্ধ বলিলেন—বহুন, এ সম্পর্কে আমি আপনাকে একটু উপদেশ দিতে চাই।

ঈশ্বর হাসিয়া তিনি বলিলেন—জানেন, তার বাহাদুর, আমার চৌক বহরের হেলে এক জন হবু 'সিন কিনা'র। কে জানে এক দিন আমার অবস্থা আপনার বন্ধুর মত হবে কি না। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর হেলেটির বরস কত হবে?

জীবানন্দ—বহর সন্তের-আঠারো হতে পারে।

—আপনার বন্ধুর আর্থিক অবস্থা কেমন?

জীবানন্দ—যমেনী জমিদার ঘর। অবস্থা বেশ সম্বল।

অন্ধ—আমি একটা কথা বলছি। বিক এবাউট ইট (এ বিষয়ে তেবে দেখুন)। আপনারদের দেশে যোল থেকে হুজি-বাইশ বছর পর্যন্ত হেলেদের পক্ষে সফট-সমর। আপনাদের সমাজে হেলেদের বিবাহ করানোর পক্ষে আঠারো বছর উপযুক্ত বরস মনে করা হয়, নয় কি? হেলেটিকে চটপট বিয়ে করিয়ে কেদুন। ইট উইল বি এ গ্যারান্টি অব সেক্টি কর কিউচার (এটা হবে তবিত্তের নিরাপত্তার একটা অব্যর্থ উপায়)। তাকে বরস আপনার আমার মত চাকরি করে খেতে হবে না তখন তাবনার কথা কি? আপনার পছন্দ হ'ল কথটা?

জীবানন্দের কথটা খুব মনে লাগিল। তিনি বুঝিলেন অন্ধ বিচকণ লোক। হরিমারায়ণের সাংসারিক অবস্থা বেরপ ঠাটাইয়াছে ইন্ডের বিবাহ করা প্রয়োজনও বটে। চট করিয়া একটা পুরাতন কথা তাঁহার মনে পড়িল। হরিমারায়ণের

বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহার পিতা, হরিমারায়ণের পুত্রের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা কি তাঁহাকেই করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, আপনার বুল্যাবান উপদেশের মত বক্তব্য। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আমি এই উপদেশ পালন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বেলা অন্ধ—ইয়েন, ইট সুত ডু ইট (হাঁ, তাই আপনার করা উচিত।)

জীবানন্দ উদ্ভিষ্টলেন। সাহেবকে বক্তব্য দিয়া বলিলেন, হেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমি আজ অপেক্ষা করব তার।

সাহেব একটু হাসিয়া জীবানন্দের করমর্দন করিলেন, তাঁহার কথার স্পষ্ট উত্তর দিলেন না।

১০

চিরমী বক্তব্যবাহী হইতে আসিয়াছে। বাড়ীতে পা দিয়াই সে মায়ের ঘরে গিয়া মেঝের পড়িয়া কীদিতে লাগিল। লক্ষী তাহার আসিবার খবর পাইয়াছিল। এ-ঘর ও-ঘর হুঁজিয়া অবশেষে তাহাকে জগন্নাথীর ঘরে পাইল। চিরমীর পাশে বসিয়া সে তাহার মাথা, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে উদ্ভিষ্টা বসিয়া চিরমী লক্ষীর গলা জড়াইয়া বসিয়া কীদিতে কীদিতে বলিল—মাকে শেষ দেখা দেবতে পেলার না তাই, এ হুঃখ বে আমার মরলেও যাবে না।—লক্ষীর চোখ দিয়াও জল পড়িতেছিল।

তিনি একটু শান্ত হইলে লক্ষী বলিল—চির চন্দ্র, কোঠা-মশারের কাছে গিয়ে একটু বসবি। তোরা কীদছিল, উর চোখে এক কোঁটা জল নেই। কেমন বেশ হয়ে গেছেন—উর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে।

তিনিকে লইয়া লক্ষী হরিমারায়ণের ঘরে চলিল। লক্ষী এই কয় দিন এ বাড়ীতেই আছে। হরিমারায়ণের সেবার তার তাহার উপরে। জিন্নরনী সকালে বিকালে আসেন, ভাতারের মতামত শুনিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন, গুহিণী-মুত সংসারের ব্যবহার কোন জট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। ইন্ডের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন সর্দধা হার হার করে। তাবেন, বড় তাই নিক্রদেশ, অকালে না চলিঃ পেলেন, চোখের বেধাটুকু পর্যন্ত হইল না, এদিকে বাণের অবস্থাও এখন তখন। সংসারের এই হাল আর হেলেটা মিছে হইল হেলে আটক।

তিনিকে লইয়া লক্ষী হরিমারায়ণের কাছে বলিল। মেয়েকে দেখিয়া হরিমারায়ণ একটুটে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি তাহার পারের উপর উপুড় হইয়া কীদিতে লাগিল। একটু পরে লক্ষী চাহিয়া দেখিল হরিমারায়ণের চোখের কোণ দিয়া জল পড়াইয়া পড়িতেছে। হরিমারায়ণের চোখে জল দেখিয়া তাহার মন যেন একটু হাল্কা হইল।

সে উদ্ভিষ্টা ঠাটাইয়া ঘরের চারদিকে চাহিয়া দেখিল। হরি-

নারায়ণের প্রিয় সেতারট একবারে অবহে পড়িয়া আছে, ফুল জমিরাহে সেতারের পায়ে। ছোট টেবিলের উপরে ফুল-দানিতে ফুল কবে শুকাইয়া গিয়াছে। বড় টেবিলটার উপরে অনেকগুলি বই ছড়ানো রহিয়াছে। রূপার গড়গড়ার পায়ে ফুল সজিত হইয়াছে। মাঝার বালিশের ভোয়ালেখানা ময়লা হইয়াছে। লক্ষী ঝাঁচল দিয়া লাগামে সেতারের ফুল মুছিয়া তাহার ঢাকা পরাইয়া সেটিকে ধরাছায়ে রাখিল। ফুলদানি বারান্দার লইয়া গিয়া বালি, শুকনো ফুলগুলি কেলিয়া দিল। হরিনারায়ণের খাস খামসামা বারান্দার চুলিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া বাগান হইতে ফুল আনিতে বলিল। গড়গড়ার ফুল মুছিয়া, মল ফুলিয়া সেট দুইয়া মুছিয়া আবার মল পরাইয়া রাখিল।

কাক শেষ করিয়া সে চাহিয়া দেখিল চিনি তখনও মাথা শুষ্কিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মনে পড়িল, চিনি খুন্স-বাড়ী হইতে কাল রঙনা হইয়াছে, পথে কিছু ঝাঙরা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহাকে কিছু ঝাঙরানো দরকার। সে চিনির পিঠে হাত রাখিয়া ঘূহ বরে বলিল—চিহ্ন আর, হাত-ঝুৎ ঘুরে এসে বসবি।

হরিনারায়ণের খামসামাকে সে বরের মধ্যে বসিতে বলিল। তার পর চিনিকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাইবার আগে হরিনারায়ণের কাছে গিয়া বলিল—ছোটামশাই, চিহ্নকে কিছু খাইয়ে আনি, ওর বোম্ব হর সারা-দিন খাওয়া হয় নি। হরিনারায়ণ ঝড় ঝড়িয়া লম্বাতি জানাইলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা হরিনারায়ণকে পথ্য দিয়া, লক্ষী কাপড় ছাড়িয়া মগপ দালানে প্রণাম করিয়া অন্দরের আলিমার তুলসীভলার আসিল। দেখিল বেদীমূলে প্রদীপ জালিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রদীপের সলিটাট উন্কাইয়া দিয়া, গলার ঝাঁচল জড়াইয়া সে প্রণাম করিল। প্রণাম সারিয়া উঠিতে দেখিল তাহার পাশ দিয়া কে এক জম চলিয়া বাইতেছে। লক্ষী একটু চমকিয়া বলিল—কে?

বে বাইতেছিল সে কিরিয়া জড়াইল। বলিল—কে, লক্ষী?

লক্ষী দেখিল ইন্দ্র। অন্ধকারে ইন্দের মুখের চেহারা ভাল দেখা গেল না। তাহার গলার বর লক্ষীর মনের মধ্যে আঘাত করিল।

ইন্দ্র আপাইয়া আসিয়া বলিল, বাবা কেমন আছেন?

লক্ষী বলিল, আপনাকে যেতে দিয়েছে? ছোটামশাই আজ একটু ভাল আছেন। চিনি কাল এসেছে। চিনি বড় কামাকাটি করছে।

একটু থামিয়া সে বলিল, আপনি ছোটামশায়ের কাছে যান। আমি চিনিকে নিয়ে তাঁর বরে যাবি।

ইন্দ্র চলিয়া গেল। সে চোখের আড়ালে গেলে লক্ষী গলার ঝাঁচল জড়াইয়া আবার তুলসী-বেদীতে প্রণাম করিল। একবারে তাহার তৃপ্তি হইল না, তিন চার বার সে বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া সে ঝাঁচলে চোখ মুছিল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

গাভী হইতে মাথিয়া জীবানন্দ ইন্দ্রকে বলিলেন, তুমি নানার বরে যাও, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।

ডাক্তার বৈঠকখানার একটু বরে ছিলেন। জীবানন্দ বরে চুক্তিতে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিনারায়ণবাবুর হেলে এসেছে?

জীবানন্দ বলিলেন, সে জারিবে ছাড়া পেরেছে। আপনাকে শুভামির সময় উপস্থিত হতে হবে। ডাক্তার বলিলেন, সে সব পরের কথা। উপস্থিত থাকে যে হেতে দিয়েছে সেইটেই টের অনুগ্রহ করেছে বলতে হবে। হেলেকে কাছে গেলে হরিনারায়ণবাবুর বাহ্যের পক্ষে ভালই হবে। তাঁর ছোট মেয়ে আসবার পরে থেকে কিছু উন্নতি দেখছি। আপনার মেয়ের প্রশংসা কিতাবে করব জানিমে দারবাহার। এই বরসে অমন বুদ্ধিমতী, শান্ত বক্তাবের কাকের বেয়ে আমার আর চোখে পড়ে নি।

জীবানন্দ ঘূহ হাসিলেন মেয়ের প্রশংসা শুনিয়া। বলিলেন, এ বাক্সা দালা সামলে নিতে পারবেন মনে হচ্ছে কি?

ডাক্তার—হেলেমেয়েরা কাছে থাকলে বীরে বীরে সেয়ে উঠবেন ভরসা করছি। তবে রীতিমত ঘূহ হয়ে ওঠা—নানে আপেকার বাহ্য কিরে পাবেন কিনা সন্দেহ। উঠে হেটে বেড়াতে পারলে তাঁর স্থানপরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে। সে যা হোক, এখনকার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে গেলেম। আপনি এসেছেন এইবার আমাকে দুটো দিন।

জীবানন্দ—আজ রাতটা থাকুন। কাল ওকে ভাল করে দেখে ব্যবহার কথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। আমার শরীরটাও ঘূহ নয়। আমার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আপনার ব্যবস্থা এখনই করছি। সারা জীবন খেটেছেন, এখন একটু বিজ্ঞান নিম। আপনার প্রয়োজন পরিপূর্ণ বিজ্ঞান।

ডাক্তারের বর হইতে বাহির হইয়া জীবানন্দ হরিনারায়ণের বরে গেলেন।

রাজে আহারের পর জীবানন্দ খীকে বলিলেন, তুমি ভাড়াভাড়ি বেয়ে নিয়ে ওপরে এস। অনেক পত্রাঘর্ষ আছে।

নিজে খাইয়া হেলেমেয়েদের তইতে পাঠাইয়া জিনিসদ্বী বধন বরে আসিলেন জীবানন্দ তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। জিনিসদ্বী পারের পক্ষে তাহার ঘূহ ডাকিয়া গেল। তিনি

উঠিয়া বলিলেন। বলিলেন, এক গ্রাস জল দাও ত, তেঁটা পেয়েছে।

জল খাইয়া তিনি বলিলেন, ঠিক হয়ে বস বিছানায়। অনেক কথা আছে।

জিন্নরনী বিছানার বলিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, কি কথা বল।

জীবামন্—হাতে আরও হুঁমাস দুটো আছে। তেবেহিলাম একটু সুস্থ হলে কোন ভাল কারবার গিরে হাস্যবানেক থেকে আসব। কিন্তু সে আশা ছেড়ে দিচ্ছি। হরিদ্রানারগণার এই বিপদের সময় তাঁকে কেলে বেতে পারি নে। এখন হাতে দুটো কাছ রয়েছে। একটা ইজের সবচে, দ্বিতীয়টা—

জিন্নরনী—মেরের বিয়ে।

জীবামন্—ঠিক রয়েছে। ও বাড়ীর চিনি আর লক্ষী এক বরসের নয় ?

জিন্নরনী—লক্ষী হুঁমাসের বড়। আর তাকে রাখা যায় না।

জীবামন্—তাই বলে না দেখে শুনে বিয়ে দেব ? তা হবে না। আমার ইচ্ছে কি ছিল জানো ? একগুদে বেবু আর লক্ষীর বিয়ে দেব। কিন্তু বেবু বা ভাবগতিক, চট করে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি নে। তাই ঠিক করেছি মেরের বিয়েটা দিবে কেলা ভাল। এবার চেষ্টা আরম্ভ করব। এখন ইজের কথা বলছি—শোন। জ্বল সাহেবের লকে আলাপ করে বা খুবলার ভাতে মনে হয় সে ছাড়া পেলেও পেতে পারে, মতেং নামমাজ শান্তি হবে। কিন্তু তার পরেও ইজের বিপদ কাটবে না। পুলিশের মকর পড়েছে ওর ওপর। লোকে বলে বাখে হুলে আঠাঘো বা। বাবের চেয়ে পুলিশ সাংখ্যাতিক জীব। পুলিশে হুঁলে হয় বজ্রিণ বা। সবাই একথা জানে। জ্বলসাহেবও জানেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, ‘হেলেটাকে যদি নিরাপদে রাখতে চাও তা হলে ওর বিয়ে দিবে কেল।’ এই পরামর্শমত কাজ করতে হলে প্রথমত ইজের বাপের মত হওয়া চাই, তার পর ইজের নিজের রাজী হওয়া চাই। ওর বাপকে হরত বর্ডমান অবস্থার রাজী করানো বেতে পারে, কিন্তু ইজ নিজে যদি বেঁকে বলে ? হেলেদের কার পেটে কি আছে বোঝা হুফর।

জিন্নরনী—ইজকে আগে থেকে বলবার সরকার কি ? সে ছাড়া পেলে ওবাড়ীর বইটাহুর বলবেন। তাঁর কথা সে কেলতে পারবে না।

জীবামন্ হাসিয়া বলিলেন—তুমি ঠিক বলেছ। আজ রাতেই কাটুক, ভাল হরিদ্রানারগণাকে সব কথা বলব।

জিন্নরনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। জীবামন্ বলিলেন, আর কি ভাবছ ? যেটুকু পোলমালের আশা ছিল তার দীবাংলা ত তুমি মিছেই করে দিলে।

জিন্নরনী—ভাবছি ইজের বিয়ে দেবার তার ত নিছ, কিন্তু

ওর বাপের পছন্দমত মেরে বেবে বিয়েটা ভাড়াভাড়ি দিতে পারবে কি ? বইটাহুরের শরীরের অবস্থা ভাল নয়।

এবার জীবামন্ ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা সত্য। ইজের পিতা অসুস্থ। বাহা করিবার অর্থাৎ পছন্দমত মেরে দেখিয়া বিবাহ দিবে করিবার কাজ তাঁহাকেই হরত করিতে হইবে।

জিন্নরনী—একটা কথা বলছি, তুমি কি ভাববে আমি নে, তবে আমি না, অনেক দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয়। সে সব কথা তুমি বুঝবে না।

জীবামন্ একটু আশ্চর্য বোধ করিলেন। বলিলেন—কি বলবে বল না, আমার কাছে বলতে যদি অত ভাবতে হয়—

জিন্নরনী—ভাবছি একদা যে কথাটা শুনে তোমার কেমন লাগবে আমি না। তুমি এখানে থাক না, নিজের চোখে কিছু দেখবার সুযোগ হয় নি। অত কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি বলি কি—

জীবামন্ বুঝিলেন জিন্নরনীর বক্তব্য বাধিয়া বাইতেছে তিনি কি ভাবে কথাটা লইবেন তাহা ভাবিয়া। তিনি দ্বীপ পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তোমার মনের কথা বল। সে কথা বাই হোক না কেন, আমি কিছু মনে করব না।

জিন্নরনী স্বামীর কথা শুনিয়া সুস্থ রাস হাসি হাসিলেন। বলিলেন—বলছি। আমি বলি কি আমাদের মেরেকে কি ইজের হাতে দেওয়া যায় না ? অন্য কোন দিক তেবে আমি একথা বলছি না কেনো, আমি না বলে অনেক দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয় কিনা ?

জিন্নরনীর কথা শুনিয়া জীবামন্ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয়, দ্বীপ কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিন্নরনী বলিলেন—ইজের জেলে করের হবার সংবাদ বর্ডন শুনল তখন মেরের এমনি অবস্থা হ’ল যে তার বুকের দিকে আমি তাকাত্তে পারি নি, শুধু ভগবানকে ডাকলাম মনে মনে। বললাম, ঠাহুর, মেরে আমার বড় হয়েছে, এ কি খেলা খেলছ তুমি ? ছোটটি থেকে হ’ল মনে মেলা-মেশা করছে, হাসিবুণী, গর, ঠাট্টা-মকরা, ঝগড়া-কাট কতই হয়েছে। দোষ আমাদেরই, কেন আরও আগে মেরের বিয়ের জতে চেষ্টা করি নি। এত দিনে সব জুলে বেড। বরহা মেরের মনে এমন দাগ বসেছে, ভাবতে আমার বুক কেঁপে ওঠে। মেরের সুখ বেশ আনন্দ, নিজের হরত ভাল করে বোঝে না হেলেবেলার চাঁদ কোথায় এসে ঠাকিরেছে।

জীবামন্ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেলিলেন। বলিলেন—তোমার কথা এবার খুবলার। আমাদের কষ্ট হয়েছে মেরের। এত দিন বিয়ে না দেওয়া। এবার আমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করব, বত শীঘ্র পারি। কিন্তু তুমি যে প্রস্তাব করলে তা হতে পারে না। অত কথা ছেড়ে দিলেও একটা কথা থেকে

যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, ওরা আমাদের উপকারী বজরান বংশ, আমরা ওদের বৃত্তিভোগী পুরোহিতবংশ। ওদের দেওয়া ব্রহ্মোত্তর আমরা এখনও ভোগ করছি। ওরা নিজে থেকে নিজে না চাইলে আমি এ প্রস্তাব করতে পারি নে।

এবার ত্রিময়নী দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিলেন, বলিলেন—তুমি বাপ, তুমি বা ভাল মনে কর তাই হবে।

ভায়পয় হাসিয়া বলিলেন—তুমি শোও, আমি বাতাস করি একটু।

জীবানন্দ শয়ন করিলেন।

পরের দিন জীবানন্দ হরিমন্দিরগণের নিকট ইন্ডের বিয়ের কথা জুলিলেন। তিনি সহজেই মত দিলেন। বলিলেন, হেলের বিয়ে দিতে পারলে আমি শান্তিতে মরতে পারি তাই। তবে খুব ভাতাভাতি তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল মনে বুকে বের করতে পারবে কি এত শীত? আমি অশক্ত হয়ে পড়েছি, সব তার তোমার ওপর।

ভাল মনের কথা উঠিতে জীবানন্দ একটু বিম্বা হইলেন। তখনই সে ভাব কাড়িয়া কেলিয়া বলিলেন, আগে হেলটাকে ছাড়িয়ে আমি। মেরের ভাবনা কি?

বংশানন্দের অগভীর প্রাণ মিটমা পেল। হরিমন্দিরগণের শরীর আর ধারাপের দিকে যার মাই।

জীবানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হরিমন্দিরগণ হির করিলেন আপীলের কলাকল দেখিয়া ইন্ডের বিবাহের কথা পাকাপাকি হির করা হইবে। বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার কোন পাজীপকের সঙ্গে কথা হির করা ঠিক হইবে না। ইন্ডের কারাদণ্ড হইলে কেহ কেহ হরত মেরে দিতে ইচ্ছাভক্ত করিবেন।

হরিমন্দিরগণ পুঙ্খক বিবাহ করাইবেন একথা প্রচার হওরাত্তে হুই একটু করিয়া সঙ্কট আসিতে লাগিল। হরিমন্দিরগণ বৃদ্ধ নায়েবের উপর প্রাথমিক কথাবার্তা চালাইবার ও মেরে দেখিবার তার দিলেন। তিনি ভাবিলেন, উপযুক্ত মেরের সন্ধান পাইলে জীবানন্দকে মেরে দেখিয়া সঙ্কট হির করিতে অহরোধ করিবেন।

রাজমগরে কিরিয়া মাতার আকস্মিক বৃষ্টির শোকে ও শিতার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া ইন্ড করেক দিন দুঃখান হইয়া রহিল। এপ্রকার, সন্ধানের বিচার ও কারাদণ্ডের আবেশ তাহার মনে সত্যের রেখাপাত করিয়াছিল। আজ এক বংশের উপর বংশী আন্দোলন মরনের লজ পুন্সী হুহু, মরকার-ভোরগকারী এক শ্রেণীর লোকের বিরোধিতা, সাধারণ লোকের ঈর্ষাসীত—এই সব ধীরে ধীরে তাহার মনে মৈত্রাতের ভাব সঞ্চিত করিতেছিল। তাহার মনে কেমন একটা ব্যর্থতা কমেই বহুত্ব হইতেছিল যে, বংশী আন্দোলনে তাটা পড়িয়াছে। এখনে এই আন্দোলন লোকের মনে বেতাবে হোলা

দিকারিল সেই হুহুনি ধারিয়া গিয়াছে। লোকের মন আবার পুঙ্খকার ঈর্ষাসীতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পারিবারিক শোকে আঘাতে মনের এই ভাবটা আরও বনীভূত হইল।

ইন্ড যতাবতঃ আবেগপ্রবণ, উত্তমশীল ও বিশেষ বুদ্ধিমান। শীতই সে বুঝিতে পারিল, পারিবারিক শোকে আঘাতে যে মানসিক দুর্বলতা আলিয়াছে সেই দুর্বলতা, ও শিতার বাহ্য একেবারে তাড়িয়া পড়ার তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে সেই অনিশ্চয়তা তাহার দৃষ্টিকে ও বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে ভাবিল, হরত তাহার জেল হইবে। জেল হইতে বাহির হইয়া সে কি করিবে? কোন্ পথে সে চলিবে? এই অজ্ঞানতার কবলে পড়িয়া সে ভাবিল, যদি মন খুলিয়া কথা বলিবার ও পরামর্শ করিবার মত কাহাকেও পাওয়া যাইত। সত্যের কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহার ঠিকানা ত সে জানে না। অনেক চিন্তা করিয়া সে দেবানন্দকে চিঠি লিখিতে বলিল। ভাবিল দেবুলা তাহার আবাল্য পরামর্শদাতা ভক্ত, তাহার সর্বোত্তম সুহৃদ, দেখা যাক সে কি পরামর্শ দেয়।

অনেক রাত কাপিয়া সে দেবানন্দকে চিঠি লিখিল। বর্তমান পারিবারিক যে সমতা তাহাকে ব্যাহুল করিয়াছে তাহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিল। বর্তমান অবস্থার বেশেবেবার কার্যকরী পছা কি এই প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া কিনাইয়া করেকবার জিজ্ঞাসা করিল। পরদিন চিঠিখানি তাকে দিয়া সে একটু বতি বোব করিল।

বিকালের দিকে পিতাকে ঈর্ষ বাওরাইয়া সে একটু বেড়াইতে বাহির হইল। চিরায়ী ও ইন্ড উভয়ে মিলিয়া শিতার শুভ্রবার তার লইয়া লক্ষীকে বিপ্রানের অবকাশ দিয়াছে। লক্ষী এখন বাড়ী হইতে প্রতিদিন বিকালে আসিয়া হরিমন্দিরগণকে দেখিয়া যায়।

ইন্ড হারবাগানের পাশ দিয়া বনহুগাভলা হইয়া দুইলী বিলের পারে রাঠে বাইবার পথ বহিল। বনহুগাভলার আসিয়া কি ভাবিয়া সে একটু ঈর্ষাইল, তারপর ধী-দিকে বিলের পথে অগ্রসর হইল। সেই সময়ে চৌলপাড়া হইতে ইন্ডের বাড়ীর কি হুতীর মা লক্ষীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিল। চিরায়ী লক্ষীকে আনিবার লজ তাহাকে পাঠাইয়াছিল। হুতীর মা আগে আগে আসিতেছিল। বনহুগাভলার ইন্ডকে দেখিয়া সে ঈর্ষাইয়া মাথার কাপড় টানিয়া মিল। ইন্ড তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার পিছনে লক্ষীকে দেখিতে পার মাই। করেক পা গিয়া হুতীর মার গলায় শব্দে কিরিয়া চাহিতে ইন্ড দেখিল বনহুগাভলার ঈর্ষাইয়া লক্ষী তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তোখাচোখি হইতে লক্ষী যাক হেইট করিল, এবং হুতীর মার পিছনে অগ্রসর হইল।

নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়া ইন্ড চলিতে

লাসিল, তাবিল, লক্ষী বাবাকে বেধিতে বাইতেছে। এবার এক দিন বরিতা লক্ষী বাবার বে সেবা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। লক্ষীর বে এত গুণ সে কখনও তাবে নাই। তাহার মনে হইল লক্ষী বেশ আরও বড় হইয়াছে, আরও সুন্দর হইয়াছে। তিনি ওর একবারনী, কিন্তু তাকে কত হেলেনাহুট দেখার। হঠাৎ তাহার মনে হইল লক্ষী ওখানে ঠাঁড়াইয়াছিল কেন? তার কি তাহাকে কিছু বলিবার ছিল? সে দুইরা ঠাঁড়াইল, হুই এক পা আগাইয়া বাসিল। তাবিল লক্ষী আনকাল তাহার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, সে শিরা কি করিবে? কিছু বলিবার থাকিলে চিহ্নকে বলিবে। সে আবার বিলের পথে চলিতে লাগিল।

লক্ষী আন সকালে হরিদারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিল। শরীরটা একটু খারাপ বোধ হওয়ার বিকালে আর বাইবে না স্থির করিয়াছিল। কিন্তু দুকীর না আনিয়া বলিল, ছোট দিমিদিনি তাহাকে পাঠাইয়াছে সঙ্গে করিয়া লক্ষী দিমিদিকে লইয়া বাইবার জন্য। লক্ষী মনে করিল হরিদারায়ণের সেবা-শুশ্রূষা সবধে বোধ হয় তিনি কোন পরামর্শ করিতে চাহে তাহার সঙ্গে। সে কামিত না চিরতী তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া অভ্যস্ত ব্যগ্র তাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল বটে, কিন্তু পিতার সবধে কোন পরামর্শের অভিপ্রায়ে নহে। সেদিন সে জীবানন্দ কাকাকে তাহার বাবার কাছে বলিতে শুনিয়াছিল যে, পক্ষকোণ্ডিতে একটি ভাল হেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শীঘ্রই তিনি পক্ষকোণ্ডি বাইতে-ছেন। বর বর পছন্দ হইলে তিনি মেয়ে দেবিবার জন্ত পাত্রপক্ষে নিমন্ত্রণ করিবেন ও ছুটি শেব হইবার আগে লক্ষীর বিবাহ দিবেন। হরিদারায়ণ বলিয়াছিলেন—মেয়ে বড় হয়েচে, বড় শীঘ্র সম্ভব দারভুক্ত হওয়া ভাল। তুমি পক্ষকোণ্ডি থেকে কিরে এস, ইজের জন্ত একটি ভাল সবধ এসেছে, মেয়েটা তোমাকে এক বার কষ্ট করে দেখতে যেতে হবে। বড় বর, নারেককে ওখানে পাঠাতে পারি না।—এই কথাবার্তা শুনিবার পর চিরতী অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না হাঁহা এমন অর্থ কেন, কেন নিকটের বড় চোখ তুলিয়া না দেখিয়া হুয়ে হাতড়াইতে

বাইতেছেন। লক্ষীর মনের কথা সে কিছু কিছু জানে। সুতরাং লক্ষী কোথাও বাহাতে লক্ষীর বিয়ের কথা চলিতে না পারে যে চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। তাহার মনের কথা মনে পড়িল। কুল-সৌরবে অর্থ হইয়া তিনি তাহার প্রভাব কানে ভোলেন নাই, নিজের সংসারের কিসে হিত হয় বুঝিতে চাহেন নাই। আজ তিনি বর্ণে, তাঁহার ঘোব বরিতে নাই। তাহার বাবার মনোভাবও কি ঐ রকম? বোধ হয় তাই। নচেৎ লক্ষীকে এক দিন বরিতা দেখিয়া, তাহার সুন্দর বতাবের এত পরিচয় পাইয়াও দাদার সঙ্গে লক্ষীর বিবাহের কথা বলেন না কেন? সব পুরুষ মাহু অর্থ। তাহার দাদাও কি অর্থ?

চিরতী সত্তর করিল যেমন করিয়া হটক সে জীবানন্দ কাকার পক্ষকোণ্ডি বাওয়া বড় করিবে, তাহার বাবার কাছে কথটা পাড়িবে। সে বুঝিতে পারে জীবানন্দ কাকা নিজে হইতে বাবার কাছে প্রভাব করিবেন না। তাবিতে তাবিতে এক বার তাহার মনে হইল, আচ্ছা, দাদার নিজের মনেও যদি মায়ের মত, দিদির মত কুলের বকাই থাকে, যদি লক্ষীর উপর সত্যি টান না থাকে তাহা হইলে সে কি করিবে? আগে দাদার মনের ভাবটা বুঝিয়া লইয়া বাবার কাছে কথা উত্থাপন করা উচিত। এখন দাদার মনের ভাব বুঝিবার কি উপায় করা যায়? দাদাকে দেখিয়া মনে হয় তাহার মাথার কি সব চিন্তা ঘুরিতেছে। ইহার আগে মায়ের অন্তর্ভেদ সময় বখন সে আসিয়াছিল তখনও দাদাকে এই রকম চিন্তাক্রিষ্ট দেখিয়া-ছিল। সে সব সময়ের উদ্মনা থাকে। সেদিন কাকীমাও তাহাকে বলিয়াছিলেন—চিহ্ন, ইজ এত উদ্মনা হ'ল কেন? তোমার বড় ভাই সন্ন্যাসী হয়ে বর ছেড়েছে। ইজের এই ভাবটা আমার ভাল লাগছে না। তোমরা বড় শীঘ্র পার বিয়ে দিয়ে ওকে বাঁধবার চেষ্টা কর। ও যদি পালার তোমার বাবা সেই দণ্ডে মারা যাবেন।—কাকীমা বখাৰ্ণ ছিঁতৈদ্বিগীর মত কথা বলিয়াছেন। আর দেরি করা ভাল হইবে না।

অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পরে তাহার মনে হইল লক্ষী আন বিকালে বোধ হয় আসিবে না, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাই। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া দেখি। ক্রমশঃ



শিশিরকুমার ঘোষ ও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ

ঐয়োগেশচন্দ্র বাগল

জাতীয়তার উদ্বোধক প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গেই “অমৃত বাজার পত্রিকা”র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। হিন্দুমেলার সঠিতও তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে।

হিন্দুমেলার ন্যায় রঙ্গমঞ্চকেও শিশিরকুমার জাতীয়তার উদ্বোধন তথা স্বদেশ-সেবার অন্যতম প্রধান বাহন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে জ্যোষ্ঠ বসন্তকুমার একথানা আধুনিক ধরণের বাজার বই লিখিয়াছিলেন এবং নিজ গ্রাম অমৃত বাজারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নির্দোষ আমোদ এবং সত্যকার শিক্ষা—এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা ইহা আরম্ভ করেন।

দৃশ্যনাট্যের মধ্য দিয়া জাতির মর্ষবেদনা ও মর্ষ-কথা স্বরূপ প্রচার করা যায় এরূপ আর কিছু দ্বারাই সম্ভব নহে। এতদিন কলিকাতা এবং মফস্বলের ধনী ও বিত্ত-শালী লোকেরা সখের থিয়েটার বা নাট্যালা প্রতীষ্ঠা করিয়া সাময়িক ভাবে সে যুগের সামাজিক ও অন্যবিধ বহু সমস্যাগুলক নাটক-প্রদর্শন অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে উহাদের বন্ধু-বান্ধব এবং নিমজ্জিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে, প্রথমে ঢাকায় এবং তাহার অব্যবহিত পরে কলিকাতায় এই সাধারণ-অধিগম্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নামে অভিহিত হয়। শিশিরকুমার কলিকাতায় আগমনের পর এইরূপ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আয়োজনের বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ উৎফুল্ল হন এবং যে সব যুবক ইহার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, “অমৃত বাজার পত্রিকা”র শিশিরকুমার ইতিপূর্বেই অন্যত্র যে-সব অভিনয় হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিতে থাকেন। সুবিখ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটকের অভিনয় লইয়াই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইল। যখন এই নাটক অভিনয়ের মহলা চলিতেছিল তখনই শিশিরকুমার উজ্জ্বলতার কাহারও কাহারও সঙ্গে পরিচিত হন। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বহু উজ্জ্বল ও অভিনেতাদের

অন্যতম ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের কথা বলিতে দিয়া লিখিয়াছেন,

“যুব উৎসাহের সহিত আমাদের [‘নীলদর্পণ’র] রিহাসার্সাল চলিতে লাগিল। আমি তখন থিয়েটারে গা ঢালিয়া দিয়াছি। একদিন রসিক মিথোপরিষ বাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটি ভক্তলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেবল আমার ঠিক মনে নাই।...আমি একাকী তাহাকে সেবন করিতেছিলাম। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া আমি সমস্তই দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘যুব মিথোপরিষ এই বাটীতে থিয়েটারের রিহাসার্সাল হয়?’
‘আজ্ঞে হাঁ।’

‘তুমি কি সেই দলের একজন প্রেমার?’

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম।

‘আজ তোমরা এখনও রিহাসার্সাল আরম্ভ কর নাই কেন?’

‘আজ আমাদের রিহাসার্সাল বন্ধ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নাই।’

‘তাই শু, আমরা এতদূর তোমাদের রিহাসার্সাল দেখতে’—

‘আমুন ভিতরে বসুন, তামাক খান।’

‘থাক, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পারচ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারীমোহন রায়।’

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদগুলি লইলাম, অক্ষর বাবুকে ও প্যারীমোহন বাবুকে নমস্কার করিলাম।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার নাম কি?’

‘অমৃতলাল বসু।’

‘তুমি কি সাধবে?’

‘সৈয়দী।’

‘আজ্ঞা, সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাই হ’ল, তুমি সৈয়দীর পাঠটা আমাদের একটু শোনাও?’

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম।...আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—‘আমি আগমার সেবা পড়েছি, আগমার প্রতি আমার প্রভা ও ভক্তি যুব বেশী, আপনি যখন বলছেন তখন আমি আমার পাঠ একটু আপনাকে শোনাতে পারি।’

আমি মরীমদাসের যত্নবাহার পার্শ্বে সৈয়দীর অ’ভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া কিরিয়া গেলেন।”

• পুরাতন প্রদ (দ্বিতীয় পর্যায়)—বিশিষ্টবিহারী গুপ্ত।

১৩৩০। পৃ. ১০০-১

২

শিশিরকুমার জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অতঃপর অমৃতলাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বাহা লিখিয়াছেন তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

“সেদিন কিরিয়া বাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—‘এখন আমি বোঝাঝারে হিদারাম ব্যাঙ্গার গলিতে থাকি; তুমি আমার বাসার আমার সঙ্গে বেথা ফোরে।’ তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার বসিষ্ঠ সম্বন্ধ ঠাঁড়িয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে বাতায়ত করিতে লাগিলাম। বেথুন সেদিন দুনিভাঙ্গিট ইন্টিটিউট হলে আমি শিশিরবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—‘তিনি একজন আত্মবাকালী ছিলেন। একথাটা যে কত সত্য তা’ আপনারা বোঝ হর অজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তিনি বেশের সমস্ত অহরহাতির ভিত্তর দিয়া বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নৃত্যম থিয়েটার খোলা হইল, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম তাম্রনাল থিয়েটার দেওরা হইয়াছে, তখনই তিনি তাবিলেন,—ইহার ভিত্তর দিয়া কি বাঙালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না? এই যে democratic টেক, ইহা ত আর বনী গৃহস্থের খোরালের উপর নির্ভর করিবে না; বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ ভাব-পুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন? ইহারা ত সাহস করিয়া ‘নীলদর্পণ’ লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের দর্শন্যন হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাহার সহিত সমবেদনার ভক্ত লং সাহেবের কারাবাস হইল, সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সচুঁড়ি প্রণোদিত হইয়া কার্য করে, তাহা হইলে ইহাদের দিকট হইতে ভবিষ্যতে বদেশ অনেক আশা করিতে পারে।...কিছু দিন পরে শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটারের একজন ভাইরেটর হইলেন।”

প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা-চিংপুরস্থ মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাশন্যাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হইল ‘নীলদর্পণ’। শিশিরকুমার অভিনয় দর্শন করিয়া পরবর্তী ১২ই ডিসেম্বর ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র নিজ মন্তব্যসহ দীর্ঘ বিবরণ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একারণ এখানে এই বিবরণটি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,

“নীলদর্পণ নাটক বেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অমেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে পঞ্চ শনিবার নীল-

দর্পণের ‘দববোবন’ হইয়াছে। বেতাদর্পণের পক্ষপাতত্ব ও অভ্যুত্থার অমেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু ভাষাণি সেই সকল কার্য রঙ্গমুখিতে অভিনীত দেখিলে একরূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে। সংসারে মানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে, কিন্তু ইহা গো চরিত্র রঙ্গমুখিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ঘোরতর ঘৃণা জন্মে। নৃত্যম কৌতুহারী কার্যবিধি আইনের কলাকল বিচার অমেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গমূলে যখন নবীন-মাক্ষ বলিলেন যে, ‘আবার যে নৃত্যম আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্জনশ’ বাক্য কয়েকটি উচ্চারিত হইয়া-মাজেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে যোমনে কল কি?”

শিশিরকুমারের দৃষ্টি শুধু কলিকাতাবাসীদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি মনে করিতেন বাঙালী জাতির হিত করিতে হইলে কলিকাতার ন্যায় মফস্বলের জনসাধারণকেও জাতীয় ভাবে ভাবিত করিতে হইবে। হিন্দুমেলায় অষ্টাঙ্ক-বর্গকেও এইজন্য তিনি মফস্বলে কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বেলাতেও তিনি নীলদর্পণের এই প্রথম অভিনয়ের পরেই মফস্বলে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃকর্তাদের উপদেশ দিলেন। তবে এবারে ইহার কারণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ছিল। শিশিরকুমার লিখিলেন,

“আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাধাতে গরিব রাইরত দুলাবপুষ্টিত হইয়া উচ্চবরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উচ্চবরে হাতধনি উঠিল। কয়েকটি পত্রী-প্রাণের তত্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহার ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণদর্পণে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার যববান কমিটার-গণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহার এই অভিনেতৃগণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর শিশীকৃত আর মাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব?”

জাতীয় রঙ্গমঞ্চে ‘নীলদর্পণ’ কয়েকবার অভিনয়ের পর অন্যান্য নাটকও অভিনীত হইতে লাগিল। বড় বড় নাটকের সঙ্গে প্রহসনও অভিনীত হইতে থাকে। তখন প্রহসন-সাহিত্য সবে গড়িয়া উঠিতেছিল। মধুসূদনের কয়েকখানি প্রহসনই ছিল তখন একমাত্র সম্বল। অভিন-

নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রহসন-রচনার তৎপর হইলেন। এই প্রহসন-সাহিত্য রচনায়ও শিশিরকুমার পত্রিকা দ্বারকৃত যুবকদিগকে কিরূপ প্রেরণা দিতেছিলেন, অমৃতলাল বসু তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,

“এই প্রহসন-সাহিত্য সম্বন্ধে আবার অনেক কথা বলিবার আছে।... ক্যাবল সাহেবের আমলে সব তেপুটী তৈয়ার করিবার জন্ত ছল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany, Chemistry, আইন, জরীপকরা, সতরণ, জিম্ভাষ্টিক প্রভৃতি নামা বিভাগ আরম্ভ করিতে পারিলে তবে সব তেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গভর্ণমেণ্টের সাক্ষার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অল্পত বাজার পত্রিকার একটি চহংকার Cartoon বাহির হইল; কয়েকজন জিম্ভাষ্টিকের পোষাকপরা বাঙালী যুবক সার গাখিয়া দণ্ডায়মান—তাহাদের কানে চিমে, কোমরে শিকল। সব তেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্তমান। আমাদের থিয়েটারের জন্ত প্রহসনের সুন্দর মাল মসলা পাওয়া গেল। বেশ মজাদার কাল রচিত হইয়া গেল।”*

৩

যুবকদের এই সাধু প্রচেষ্টায় শীঘ্রই বিয় উপস্থিত হইল। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতান্তর ঘটিতে লাগিল। এই সময় শিশিরকুমার পরম্পরের বিবাদ মিটাইবার জন্ত সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইলেন। ১৮৭৩ সনের ১২শে জানুয়ারী তাঁহার সভাপতিত্বে বিবর্তমান যুবকদের লইয়া এক সভা হইল। সভায় উপস্থিতমত বিবাদ-মীমাংসা অসম্ভব বিধায় তিনি একটি সালিশী কমিটির উপর ইহার ভার অর্পণ করিলেন। এই কমিটিতে ছিলেন তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল হুয়, অমৃতলাল পাল এবং রাজেন্দ্রলাল পাল। বাহা হউক, কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাদ মিটিয়া গেল। ইহাতে শিশিরকুমারের কতখানি হাত ছিল, পরবর্তী ৩১শে ফেব্রুয়ারি ‘ইণ্ডিয়ান মিররে’ প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে তাহা সম্যক জানা যাইতেছে,

Sir,—Now the rupture among the members of the National Theatrical Society has, happily, come to a close. Selfishness, distrust, dictatorial tone and unwillingness to cringe are some of the causes which gave rise to it. This collision would have proved destructive of national entertainments, had not the well-known Editor of the *Amrita Bazar Patrika* intervened between the contesting parties. His good advices and solicitations gradually conquered the obstinacy and party-feeling of each party and at last brought the matter to a happy end. Such is his desire to give the National Theatre a firm stand that

he, in addition to his hard labor as an Editor, willingly embraced all the privations to write a Natuk for them and at last produced the pleasing *Noisho nupera* on the stage the week before last. The three directors of the Theatre now are the Editor of the *Amrita Bazar Patrika*, Babu G. C. Ghose, and another Native gentleman.

We wish prosperous career to the National Theatre. The members of the N. T. Society must feel grateful; that the Editor of the *Amrita Bazar* has meddled in its affairs and when he is there we doubt not the matters will be managed smoothly.

Yours etc.,

A friend to the National Theatre.*

এই পত্রখানি হইতে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্মকর্তাদের বিবাদ ভঞ্জে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার জানা যাইতেছে। উক্তোক্তারা যুবক, তাঁহাদের উপরে চালক থাকা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ উক্তোক্তাদের আগ্রহাভিষয়ে এবং শিশিরকুমারের পরামর্শে তিন জন ডিরেক্টরের উপর সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হয়। এই তিন জন ডিরেক্টর হইলেন শিশিরকুমার স্বয়ং, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উক্ত পত্রে শিশিরকুমারের ‘নয়শো নুপেরা’ নামক নাটক রচনা ও অভিনয়ের কথাও জানিতে পারিতেছি। এই নাটকখানি জাতীয় রঙ্গমঞ্চে ১৮৭৩, ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অভিনীত হয়। বঙ্গ প্রৌঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ কন্যার পণগ্রন্থা হেতু দিন দিন কিরূপ অধঃপাতে যাইতেছিল এই নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। শিশিরকুমার কঠিন সমস্তার বিষয়ও হাস্যকৌতুকের সমাবেশে সরল করিয়া তুলিতেন। ‘নয়শো নুপেরা’ শুধু নাটক নহে, একটি সার্থক রস-রচনাও। শিশিরকুমার ‘বাজারের লড়াই’ ও ‘নিমাই সন্ন্যাস’ নামে আরও দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

থিয়েটারের কর্মকর্তাদের মধ্যে আবার বিবাদ আরম্ভ হইল। ৮ই মার্চ তারিখে শেষ বারের মত অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট হইতে ইহা বিদায় লইল। কর্মকর্তারা কিছুকাল পরে দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল ‘ন্যাশন্যাল থিয়েটার’ নাম বজায় রাখিলেন, অন্য দল ‘হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার’ নামে পরিচিত হইলেন। শিশিরকুমার অতঃপর ইহাদের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লব রাখেন নাই। তবে উভয় দলেরই অভিনয়-কাহিনী তিনি বধারীতি পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে লাগিলেন।

* বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ঐজ্ঞেয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় ভাগ। পৃ. ১১৩-৪। এই পুস্তকে এ বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪

শিশিরকুমার নাশন্যাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরই মফস্বলেও অভিনয়াদির আয়োজন করিতে উদ্ভে ক্রান্তের পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়াছি। ইহার দুই ৪-ল বিভক্ত হইয়া মফস্বলে—ঢাকায় ও অন্যান্য গিয়া অভিনয়াদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু নাশন্যাল থিয়েটার অল্প দিন পরেই গ্রেট নাশন্যাল থিয়েটার নামে অভিহিত হইতে লাগিল, এই সময়ে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার এবং বেঙ্গল থিয়েটার নামে আরও দুইটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল থিয়েটারেই সামাজিক ও স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিভিন্ন নাটক অভিনীত হইতেছিল। 'ভারতমাতা', 'স্বদেশ বিনোদিনী', 'শরৎ সরোজিনী', 'বীরনারী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মোহনেশ্বর এই কি কাজ', 'হীরকচূর্ণ নাটক', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রভৃতি সমন্বিতপন্থাগী বিষয়াদি সম্পর্কেও নাটক গ্রহণ করিত হইয়া অভিনীত হইতে লাগিল। এ সকল নাটকে উল্লিখিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর শিশিরকুমারও পত্রিকায় লেখনী চালাইতেছিলেন। তিনি পূর্বের ন্যায় অভিনয়াদির সমালোচনা করিয়া রচয়িতা ও অভিনেতাদের উৎসাহিত করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পথে শীঘ্রই বিঘ্ন উপস্থিত হইল। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'ের (পরে নাম পরিবর্তন করিয়া 'হুমান-চরিত') অভিনয়ে সরকার হইতে ঘোরতর আপত্তি হইল। ১৮৭৬ সালে যুবরাজ (পরে, সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আসিলে হাইকোর্টের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের ভবনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পুরনারীদের দ্বারা শাস্ত্র ও উলুধনি সহকারে

বরণ করান। এই ব্যাপারটিকে বাজ করিয়া উক্ত গ্রহণ লিখিত। পুলিশ ইহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিল। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক তিন মাসের জন্য বাংলা-সরকারকে বাবতীয় অস্বীকৃত, মানহানিকর ও রাজস্বোপহাস্যক অভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা দিয়া ১৮৭৬ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক অভিনয় আইন জারি করিলেন। পরবর্তী মার্চ মাসেই Dramatic Performances Control Bill নামে একটি আইনের খসড়া আইন-সভায় পেশ করা হয় এবং বৎসরের শেষের নিকটে সাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহা আইনে পরিণত হয়। শিশিরকুমার বরাবরই এরূপ স্বাধীনতা-হস্তারক আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ১৮৭৬ সনে ১৪ই ডিসেম্বর পত্রিকায় লেখেন,

"নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিবিধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিবিধ না হয় এইজন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিবিধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা পূর্বমর্মে আমাদের উপর আর একটা শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে মিলিত হইয়াছি। পূর্বমর্মে যদি আমাদের মিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিরা ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে পদম করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের জুড়ীতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সূর্য গেল স্বর্ণরথে। অস্ত রবি দিয়ে গেল ডাক,
অবনীর বাজা হুক অজাত সে অনন্তের পথে।
উদ্ভাসিত মুক্তি ধার মহিমার অগ্নি আলোতে
সম্মুখে আনত মৃত্যু সে জ্যোতির সন্মুখে নির্ঝর।
ভিন্ন রুচি, স্তম্ভি, বন্দ, শোক, দুঃখ—সংলি মিলাক।
রচনার মাঝে শুধু নহ ত জীবন্ত কোন মতে,
শুধু গৌরব তব চিত্রময় এ মহা-ভারতে,
অমর ভূমি যে, ওঠে জয়ধ্বনি, বেজে ওঠে শাঁখ।

প্রাণ আনিয়া দিলে, হে বিপ্লবী, ভেঙে দিলে বাঁধ,
কর স্রোত মুক্ত হ'ল, মুক্তধারা বহে চারি ভিতে।
কলা-সরস্বতী তাঁর দিল ঢেলে সব আশীর্বাদ,
দিল প্রাণে বহুশিখা এ জীবন সকল করিতে।
জাগে চিত্ত, জাগে দেশ, নীলাকাশে জাগে পূর্ণ চাঁদ,
বসন্তের আবির্ভাব নবশ্রী-প্রসঙ্গ অবনীতে।

দিনাজপুর জেলায় পল্লীর আর্থিক জীবনের রূপান্তর

। জীনরেন্জননাথ রায়

পরিবর্তনশীল জগতে বাঙালীর আর্থিক জীবনও নিম্নত পরিবর্তিত হইতেছে। নদীমাতৃক বাংলার সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান সময়ে রেলপথকে কেন্দ্র করিয়া উঠা নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই নতুন গতির আওতায় আসিয়া বাঙালীর আর্থিক জীবনেরও বহুপ্রকার ভাঙগড়া শুরু হইয়াছে। বাংলার যে-কোন জেলায় সমাজগড়নের রূপান্তর লক্ষ্য করিলে এই পরিবর্তন পরিষ্কৃত হইয়া দেখা দিবে।

দিনাজপুর বাংলায়ই একটি জেলা। ধানই দিনাজপুরের প্রধান কৃষিসম্পদ। বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট ধান এই জেলায় উৎপন্ন হয়।

এই জেলায় পূর্বে ধানভান্ডা হইত ঢেঁকিতে। ঢেঁকি-ছাটা চাউলই চালান হইত পল্লী হইতে গঞ্জে এবং গঞ্জ হইতে নৌকায় দূর দূরান্তরে। জেলায় চাচার হাজার ঢেঁকি ছিল। ঢেঁকিতে ধানভান্ডা ছিল পল্লীবাসীর অর্থ উপার্জনের একটি বড় উপায়। একজনের এক মণ ধান ঢেঁকিতে ভানিতে প্রায় দেড় দিন লাগিত, এবং খরচ পড়িত প্রায় দশ হইতে এগার আনা। জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে ধানের আবাদ ও ঢেঁকির কাজ বহু পূর্বে সাঁওতালদিগকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছিল।

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সাত-আট লক্ষ মণ ধান-চাউল কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গা বন্দর দিয়া কলিকাতার দিকে রপ্তানি হইত। তখনকার দিনে পুনর্ভবা, কুলীক, নাগব, আড়াই, যমুনা ও করতোয়া নদীপথে ধান চাউল বাংলার অন্যান্য জেলায় ও বিহারে চালান হইয়া বাইত। এখনও জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমে রেল-স্টেশন হইতে দূরে ধান-চাউল নৌকায় রপ্তানি হয়। পুনর্ভবা ও আড়াই নদীর তীরে কাঁটাবাড়ী, নাজিপুর, নীথপুর, গোপালগঞ্জ, আমশালি, শিহোল ও কালিকামোরা ঘাটে ঘাটে নৌকায় ধান বোঝাই হয়। আড়াই নদী বাহিয়া ধানের নৌকা বাইত প্রায়ই পূর্ববঙ্গে। পুনর্ভবা নদীতে ধানের নৌকা চলিত মুন্সিরাবাদ, বিহার ও বালিয়ার দিকে। ইটাহার ও বংশীহারি থানা এলাকায় ধান চালান হইত মালদহের দিকে গরুর গাড়ীতে।

ধানের পরই প্রধান ফসল পাট, আখ, সরিষা, লক্ষা, ও পেঁয়াজ ইত্যাদি। আড়াই নদীর তীরে কৃষির বন্দর হইতে এককালে পাটও রপ্তানী হইত নৌকায়। ডালিম-গাও ও কালীয়াগঞ্জের সরিষা ও পেঁয়াজ, এবং সেতাবগঞ্জ ও

কাহ্নুলের গুড়ও নৌকায় রপ্তানি হইত। নাজিপুর ছিল গুড়ের বড় বন্দর। বৎসরে প্রায় ৭০৭৫ হাজার মণ গুড় নৌকায় চালান হইত।

নৌকাগুলি নারিকেল, কড়াই, এনামেলের বাসন, লবণ, ময়লা, কাপড়, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি নৌকায় দিনাজপুরের বন্দরগুলিতে ভিড়িত, এবং বাইবার সময় ধান চাউল, গুড়, পাট, লক্ষা ও অন্যান্য বেসাতি লইয়া নদী পাড়ি দিত।

সেকালে পুনর্ভবা নদীর কূলে বড় গঞ্জ ছিল নীথপুর। কুলীকের তীরে রায়গঞ্জ, টাঙ্গননদীর উপরে কালিকামোরা এবং আড়াইয়ের তীরে তীরে ছিল মর্মবায়া, চাঁদগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, পতিরাম, রাজামাটি; যমুনার কূলে হিলি, এবং করতোয়ার তীরে ঘোড়াঘাট।

এই জেলার নদীগুলি যে কেবলমাত্র কৃষি ও বাণিজ্যের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নহে, দেশবাসীর ধর্ম, সমাজ-জীবন, এমন কি সভ্যতার মূলেও ছিল নদীর গভীর প্রভাব। পূর্বে নদীগুলিও বর্তমানের মত মৃতপ্রায় শীর্ণকায় ছিল না। যোগল-পাঠান যুদ্ধের সমকালেও করতোয়া নদী এরূপ বিস্তৃত ছিল যে এক তীর হইতে অপর কূল পরিষ্কার দেখা যাইত না।

নদীগুলি ক্রমশঃ হাজিয়া মজিয়া বাওয়ায় আগের মত নৌকায় ধান চাউল ইত্যাদি চালান দেওয়া বাহত হইতে-ছিল। কাজেই এই জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভাঙা-গড়া শুরু হইয়াছিল, এবং রেল চলিবার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-ক্ষেত্রও পরিবর্তন হইতেছিল। হিলি হইতে পার্শ্বতীপুর পর্যন্ত ছোট রেলপথ হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। পার্শ্বতীপুরের পূর্বাংশে রেল চলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং পশ্চিম দিকে রেল চলিতে আরম্ভ করে ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। দিনাজপুর-রুহিয়া রেল লাইন খোলা হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। জেলার ভিতর দিয়া রেল চলিবার পর হইতেই নদীর তীর ছাড়িয়া রেলের ধারে ধারে গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যাপারীদের বস্তি।

রেল-লাইনকে কেন্দ্র করিয়া দিনাজপুর, তিলি, চরকাই, ফুলবাড়ী, বিরল, বাকালবাড়ী ইত্যাদি রেল স্টেশনেও কাছে কাছে এবং উত্তরে শিবগঞ্জ ও সেতাবগঞ্জে প্রায় ৬৮টি চালের বস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিলির নিকটেই ১৪টি কল। এই জেলায় প্রথম চাল-কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরণ চন্দ্র রায় মহাশয় উহা প্রতিষ্ঠা করেন। জয়গুংহাট, জামালগঞ্জ ও আফেলপুর

- (১) ১/৫ আনা ও দুই বার খোঁরাক।
 (২) ১/০ " " " "।
 (৩) ১০ আনা খোঁরাকি নাই।
 (৪) ১২/১০ " " (স্ত্রীলোকদিগের)
 ১/১০ " " (পুরুষদিগের)
 (৫) ১/০ " " (স্ত্রীলোকদিগের)
 ৬০ " " (পুরুষদিগের)
 (১) (২) (৩) নং মজুরির হারই কতকটা স্থায়ী, এবং

জেলার প্রায় ৩ ভাগ স্থানে ইহার চলন আছে। (৪) নং হারের চলন প্রায় ২০।২৫টি গ্রামে পাইয়াছি। চালের কলেই (৫) নং মজুরির হার চলে। ইহা ছাড়া ধান ও পাট কাটিবার সময় মজুরির হার জেলার সর্বত্রই বাড়িয়া ১২ হইতে ১০ পর্যন্ত উঠিত। তখন সাধারণতঃ উহা ৬০ আনার নীচে নামিত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান—বাহার নিজের গাড়ী বলদ আছে—সেও দৈনিক প্রায় ১১০ টাকা উপার্জন করিত।

ধান ও পাট কাটিবার সময় বিহার ও বাংলার অন্যান্য জেলার মজুর আসিত। ফসল কাটিবার সময় অঞ্চলের কৃষক বিদেশী মজুরের সাহায্য লইয়া থাকে। যখন ধান পাকিতে আরম্ভ করে তখন তাড়াতাড়ি অনেক বিঘা জমির ধান কাটিতে হয় বলিয়া বিদেশী মজুরের সাহায্য লইতে হয়। ‘গাতা’ প্রথা, অর্থাৎ পল্লীর সকলে বা বহুলোকে মিলিয়া একজনের শস্ত কাটিয়া দিবার রীতিও প্রচলিত আছে। এই জেলার প্রমিত দেখিতে খুব শক্ত ও জোয়ান হইলেও সাধারণতঃ প্রমতিবিশুণ্ণ। মেয়েরাও বাহিরের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। পদ্মপ্রথা নাই।

বর্তমান সময়ে খোঁরাকি ছাড়া মজুরির হার ৬০ আনার নীচে নাই, এবং ১১০ টাকার উপরে সাধারণতঃ উঠে না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ চাউলের দাম বাড়িয়াছে প্রায় পাঁচ গুণ। অথচ মজুরির হার ১৯২৬-২৭-এর তুলনায় বর্তমান সময়ে বাড়িয়াছে প্রায় তিন গুণ। মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি সমান তাহে হয় নাই। অথচ ঠাট ও কিছু বাড়িয়াছে। ফলে আর্থিক কষ্ট ঘরে ঘরে।

নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবযুক্ত হইয়া রেল-প্রভাবের আওতায় আসিয়া এবং বস্ত্রপহার পা বাড়াইয়া এই জেলার নর-নারী আর্থিক সচ্ছলতা প্রায় হারাইতে বসিয়াছে।

পল্লীশিল্প বাহা ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নদীকে কেন্দ্র করিয়া যে সব উপার্জনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও প্রায় সবই মৃত। অথচ রেলকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই জেলার পল্লীবাসীগণ নানাকারণে যোগ দিতে

পারিতেছে না। কৃষিক্ষেত্র ও পূর্ব আবাস ছাড়িয়া দূরে গিয়া নতুন বসতি স্থাপন করিবার সুযোগ কয়জনের আছে? ভিটার মায়ায় ক্ষেতখামার আঁকড়াইয়া ধরিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াই রহিয়াছে বেশীর ভাগ নরনারী।

এই জেলার—এই জেলার কেন, বাংলার প্রায় সর্বত্রই পল্লীবাসীর আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন পল্লীতেই উপার্জন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি। উহা সম্ভবপর হয় যদি পল্লীতেই কৃষির ভিত্তিতে পল্লীশিল্প ও কারখানা গড়িয়া উঠে। আমরা এমন একটা যুগে আসিয়া পড়িয়াছি যে এখন আর কল ছাড়িয়া ঢেঁকি অন্য কিছু আশ্রয় করা সম্ভবপর নহে। কাজেই যে অঞ্চলে যে কাঁচা মালের যোগান বেশী সেই সব পল্লীর নিকটেই তৎসংলগ্ন কারখানার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। অতীতে এই নীতি অমূল্য করিয়াই পল্লীশিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছিল। যে অঞ্চলে পাটের আবাদ ভাল সেই সব পল্লীতেই দিনাজপুরের বিখ্যাত চটশিল্পীদের আবাস ছিল। কিন্তু বর্তমানে পল্লী-সমাজের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত নাই। বর্তমানে কুটীর-শিল্পেরও জন্ম হয় ধনী বা গবর্ণমেন্টের খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া। কাঁচামালের যোগান ও স্থানীয় লোকের প্রতিভা এবং দক্ষতার কথা বিবেচিত হয় না। পল্লী-সমাজের গড়ন ও আদর্শ বজায় রাখিয়া যদি পল্লীর বিভিন্ন স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহা হইলেই পল্লীবাসী কৃষি ছাড়াও নতুন উপার্জনক্ষেত্র পাইতে পারে।

পল্লীকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে সরকারী আপিস শিল্প-কারখানা প্রভৃতিও কিছু কিছু পল্লীতে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। পল্লীবাসী কৃষকের জন্য যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র তাহাও রহিয়াছে জেলা-শহরে, পল্লীতে নহে। এই সব আপিসকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লীতে উপার্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে। কলিকাতার ছাত্রের ভিড় কমাইবার জন্য সরকারী সাহায্যে পল্লী-অঞ্চলে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকার ছাত্রদিগকে আহ্বান করিতেছেন শহর ছাড়িয়া পল্লীতে যাইতে, আর সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় বাবতীয় আপিস ও উপার্জন-প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত করিয়া এসব ছাত্রের অভিভাবকদিগকে এবং ছাত্রদিগকেও আকৃষ্ট করিতেছেন শহরের অভিমুখে। এইরূপ অবাস্তব নীতি অমূল্য করিয়া পল্লীর এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। উপার্জনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশময় পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া না দিতে পারিলে, এবং বৈদেশীয় সংস্কৃতির অমূল্যরূপে সহজ জীবনের আদর্শ প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শুধু শহরবাসীর মুখনিঃসৃত “পল্লীতে কিরিয়া যাও” উপদেশে পল্লীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না।

মুক্তার জন্মকথা

ঐবীরেন্দ্রকুমার রায়

অন্ধকার স্যাৎসেতে একখানা ঘর, সব সময় এমন একটা অশান্ততা জড়িয়ে থাকে যে অনভ্যন্ত লোকের বুকে ওঠা দুশকিল দিন ও রাত ঠিক কোন সময় আসে বা যায়। বড়িতে সময় প্রায় ন'টা। শেকালী ভাতাভাতি কোন রকমে জলসিক্ত যেহেতু কাপড়ে জড়িয়ে পাশের ছোট বাথ-রুমটা হতে যেহিঁরে এল এবং ওই অন্ধকার ঘরেই একটা বিবর্ণ আঁহমার সামনে ঠাঁড়িয়ে তার মনে পড়ে গেল তেলের শিশিটা একেবারেই কাঁকা। সুত্তরাং চিকুইটা একটু অতিরিক্ত কোর দিহেই কক চুলগুলোর মধ্যে ঢালাতে ঢালাতে বলল—আমার ভাতটা ভাতাভাতি নাও না, আজকে আবার দেহি হরে বাবে মনে হচ্ছে।

না অপর্ণা কিছুটা সন্তুটিত সুরে জবাব দিলেন—তাই তো বেবি, আজ আমার হারারও এমন দেহি হ'ল। সকালে উঠে রেশম আমবার টাকা ত ছুই দিহে গেলি না, আমার হাতের সব কুরিয়ে গেছে। অনেক বুঁকে পেতে ছুটো চাল কোপাক করে আমলার।

অনভ্যন্ত লোক অবাক হরে বাবে, অপর্ণার কথার মর, তার উপহিঁতিতে। এই ঘরেই তিনি এককণ বসে আছেন এবং সেখানে একটা জলত উহুনও আছে।

শেকালীর মনটা এ খবরে বড় বুঝে পড়ল এবং তার চোখ ছুটো আবার বড়ির পানে গেল। কিবেও পেয়েছে তার বুঝ, কিন্তু আর আকোপ বা অপেকা করা চলে না। রেশমে বা চাল পাওরা যার ভাতে সগ্ঠাইটা পুরো চলে না, আবার কিছু একটা ব্যবহা করতে হর। সুত্তরাং অপর্ণা বা খবর দিলেন সেটা। সন্তুন কিছু মর, শুধু আর একটু সময় মত দিলেই হ'ত। একেবারে যেহিঁরে বাবার পোশাকে তৈরি হতে হতে শেকালীর বুখে একটা গ্লাস কোঁড়কের ভাব জাপে—আর বেহিন চাল কুরোর সেই দিমই বুঁকি রেশমের দিম।

অপর্ণা অন্ধকারের মধ্যেই একটা সঠিক দৃষ্টিপাত করে সব বুকে দিহে ব্যাও কঠে বললেন—কাঁকা, বাসনি বেবি, আর দিহিট পনেরোর ভাত হরে আসছে।

সময়ের হিসেব এই সব ঘরেই নিখুঁত। সময় এত কম যে মান-অভিহামের প্রস্তও ওঠে না। শেকালী হিসেব করতে লাগে দিহিট পনের হতে, অনভ্যন্ত দিহিট মশেক কুতোতে ও খেতে—এই দিহে প্রায় আষ বড়ার ব্যাপার, অনভ্যামি সময় পাওরা অনভব। বুড়ী বেত মিট্রেসটি অলবরণী শিকরিজীহের ওপর কি রকম বেশ সব সময় চটা। প্রথম শিরিরতে দু-এক দিহিট বেহি হলে এমন কিছু কতি হর না, কিন্তু বোঁটা

বেওয়ার সুযোগ ওতেই হর। শেকালী এই বোঁটা হরম করার ব্যাপারে এখনও অনভ্যন্ত হতে পায়ে দি, সুত্তরাং এবেলার মত ভাত খাওরাটাই তার মূলত্ববী রটল। দুশকিল এই যে, না একবা কোনদিমই বোরেন না, তাঁর বিবাস হ'ল, যে না খেহে মাহুয কাজ করতে পারে। আর তা হলে কাজ করাটাই বা কিলের জত ?

ছোট ব্যাগটার কিনিযগুলো জহিহে মিডে মিডে শেকালী বলল—ভুঁমি কেবো না না, আমি কোথাও কিছু গেহে দেব, ভাতটা ঢাকা দিহে রেখ, ওবেলার এসে খাওরা বাবে।

এক গ্লাস জল পেলে হ'ত। সকালে শুধু সেই এক কাপ চা, তার পরে টিউশির সেই এক রাশ বহুনি, গলাটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে। অখচ জলের কুঁজোটা মার দিকের কোপটার এবং জলের সঙ্গে খাবার মত কোন কিছুই বয়ে যে নেই তা শেকালী জানে, কারণ তা হলে না মিডেই একেজে তা জাপে জাপে তার সুবুখে হাজির করতেন। অখচ সব কেমনেমনেও যদি শেকালী এখন এক গ্লাস জল খাবার উভোগ করে তা হলে তিনি হাঁ হাঁ করে উঠে এমন বোঁকা-বুঁজি লাগিয়ে যেবেন যেটা ঐ হেডমিট্রেসের বোঁটার মতই শেকালী সইতে পারবে না।

অপর্ণা তখনও ব্যাকুল দৃষ্টিতে তারই পানে চেহে, আজ চোখে চাইতে সিয়েও শেকালীর চোখ পড়ে যার। বাবার বুখে এই রকম বমকে ঠাঁড়ানোর কৈকিরত বরপই সে যেন বলে—হ্যাঁ দীলু দীলু সময়মত চুল বার বেশ। গলির বোঁকে বেলছে যেখে এসেছি, সকালে পড়তে বসেছিল ত ?

অপর্ণা পূর্কিবং আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভ করেন—হ্যাঁ, কিন্তু ভুই...আচ্ছা আর। হর্গা হর্গা...

শেকালী ভতকণ অমেকটা দূর এসিহে গেছে।

প্রথমে আপিসে ঢুকেই সে শুমনতে গেল হেডমিট্রেস তাঁর সহকারিণীর সঙ্গে অদূরে ঠাঁড়িয়ে ভরিতরকারীর রজনতত্ত দিহে গল্প করছেন। বুতো বরসে ভীরয়তি আর কি। কেন, আপিসটা ভোরার রাহাযর না কি। সে মিঃশকে খাতার মার সই করতে করতে একবার আড়চোখে দেখে, হেডমিট্রেস ততোবিক আড়চোখে বড়ি দেখা শেষ করেই তার পাখে ভাকাবার চেষ্টার দিহুজ। তাদের এই সোপন কটাকের মিলন হতেই তিনি বললেন—কি শেকালী, আজ বত সকাল সকাল যে, ব্যাপারখানা কি।

শেকালী বোঁকে তার প্রতি লক্য রাখবার জতই আপিসের কোনে এই রাহাযর মসলা-ভত্ব বিদেযণ। সে এর উত্তরে একটা

অল্ট হ' বলে ক্রানের বাতাবানি নিয়ে চলে এল নিম্নেবের বরে। তা ছাড়া আর বলবারই বা কি আছে? এক হর তাকে এই মসলার আলোচনার বোগ বিতে হর। তার চেয়ে শেকালী নিম্নেবের বরে বলে প্রাণতরে বল বাবে, তার অনেক সময় আছে।

ক্রানেও সেই রকমের এক বকমারি। একটা ছোট্ট ঘেরে অনেকটা ঘেরি করে ক্রানে এল, শেকালী বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল—এত ঘেরি কেন? উত্তরে ঘেরেট একটু ইতস্ততঃ করে বেশ সহজভাবেই জবাব দিল—না রান্নার ঘেরি করে দিল, আমি কি করব?

হতভাগা ঘেরেটা? কেন সংসারে আর কি কোন কথা ছিল না? একেবারে সবল পরক্কেপে ক্রানে হুততে হুততে সে যদি বলত রান্নার মাঝখানে পড়ে পা ভেঙে গেল তাই ঘেরি, তা হলেও শেকালী খুঁচি এতখানি বিরক্ত হ'ত না।

ক্রানগুলো রোজই এই রকম লাগে, আজকে যেন একটু অতিরিক্ত একঘেরে আর লখা মনে হয়। শেকালী অভ্যাস-মত বকে হার বটার পর বটা এবং বতাই সময় হাঙ্গে শেকালী ততই সচেতন হয়ে উঠেছে, তার ক্রান্তি যেন বাইরে না ফুটে বেরোর।

শেষের একটা শিরিরডে এসে সে কিছ একটু বেসামাল হয়ে পড়ল। পড়া ছিল উটের কথা, সে মাকি একেবারে বহু দিনের জল সত্তর করে রাখতে পারে, এমন আরও কত কি। শেকালী বরাবরই ছাত্রীদের বিভ্রাসাবাদের বাধীনতা দিয়ে থাকে। একটা ছাত্রী জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দিদিমনি, আর কোন প্রাণী আছে যে এমন না খেয়ে থাকতে পারে। শেকালী বলে—শোনা বার সাপ মাকি সারা শীতকালটা না খেয়ে ঘুমিয়ে কাটরে ঘের। একটা ঘেরে তৎকণাৎ ও কোণ থেকে বলে উঠল—আমি বলব দিদিমনি? সবচেয়ে বেশী সময় না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ। আপেকার খুনি-গমিরা মাকি বছরের পর বছর...

শেকালী মাঝপথেই কেটে পড়ল—কথা হচ্ছিল সাপ আর উট নিয়ে, ভূমি কোথেকে নিয়ে এলে মানুষ, খুনি-গমি কত কি...

এমন উপহাসের ভঙ্গীতে সে কথাগুলো উচ্চারণ করল যে, এর পরেও একটা ঘেরে লস্কোচে প্রশ্ন না করে পারল না—তা হলে ওগুলো কি সব মিছে কথা?

শেকালী বিরোধিতার ভঙ্গীতে অস্বাভাবিক কোর দিয়ে আর চীৎকার করে উঠল—সব মিছে কথা, সব...

আর একটা জিনিষ নিয়েও শেকালীর মনটা টকিমের পর ছেড়েই ধারণা রাখিল। হেডমিষ্ট্রেস তাকে টকিমের সময় তেঁকে পাঠিয়েছিলেন—টুক বে সময়ে শেকালী চারের মদ্যনে সন্ধীদীদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। এটা ওটা দেখা পাটটা

কথা মিলিয়ে তিনি শেকালীকে পরিচয় ভাবে জামিয়ে দিলেন ক্রানে পাঠের বাইরে অভ বাকে জিনিষ আলোচনার লাভ নাই, কারণ পাস করাটাই সবচেয়ে আগের কথা। এমন ভাবে কথাটা বলা হ'ল যে শেকালী চমকে উঠল, যেন কাটকে পাস করতে না দেওয়ার জটাই তার এই বক্তব্য-মূলক শিক্ষাবান বিধি। বেশ তাই হবে। সঙ্গে সঙ্গে টকিম-শেষের বটা থেকে উঠল এবং শেকালী আজ সম্পূর্ণ বার্ষপরের মত অস্থব করল—পরের মানসিক উন্নতিবিধানের শিক্ষণ তর্কবিতর্ক করে তার নিজের বাধ্য মদ্যনের সময়টাই নষ্ট হয়ে গেল।

তার এই বার্ষপরতাই খুঁচি শেষের শিরিরডে জলহ হয়ে ব্রহ্মরুদ্ভ ভেদ করে একেবারে উড়ে খুনি-গমি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল। কলির আর কোন ভেদ না থাকুক ক্রবার ভেদ মিকালবিত্ত।

ছোট্ট হতেই শেকালী সন্ধীদীদের একটু আড়াল ঘিরেই বাড়ীর পানে হাঁটল। কিবে তার এমন তেমন মনে হয় না কিছ আলো কিছুতেই আর সইছে না। কিছুতেই না। মাঝপথে একটা ছোট্ট ঘেরে এসে বাধা দিল, বললে—না আপনাকে আজ আবার তেঁকেছে দিদিমনি, সময় হবে, যাবেন কি? সোজা না বলতে ইচ্ছে হর শেকালীর কিছ তরত্ব হয়। টিউশনি এমন সভা নয়। শেকালী ঘেরেটির সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের বাড়ীতে ঢোকে।

গৃহবাসিনী অভ্যর্থনা জামিয়ে তাকে বরে মিরে বদান এবং সময়মত কালের কথা পাড়েন। ঘেরেটকে পড়াতে হবে এবং পড়ানোর চাইতে তার মনটিকে সেইভাবে গড়তে হবে, শেকালীর এ বিষয়ে তিনি গৃহমার তত্ত্বেহেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শেকালী বোকে বদীগৃহের সেই এক অল্পবোপ, সব আছে শুধু মনটা টুক করে লাগ এবং মনে মনে একটু হালে, মন টুক করে দেওয়ার লোক বরা হয়েহে বটে।

চা খাওয়ার এক কান্ডে গৃহবাসিনী আবার বলেন—আর মেয়েট এত জেদী হয়েহে, বেখুন না ও বেলায় দিদিমনি একটা হবির বই নিয়ে যেতে রইল, বত বলি ইচ্ছলে বা তত গো বরে হবি দেখা তার চাই-ই। তকে মিরে আপনাকে একটু হর্তোগ পোরাতে হবে মনে হয়।

ঘেরেট অহুর্ বরের কোণে বলে একটা হবির বই ওপ্টাচ্ছিল, এ কবার হ'জনের চোখাচোখি হয়ে গেল। শেকালী চিনতে পারল কার্ট শিরিরডের সেই ঘেরেটই বটে এবং ঘেরেট দেখল সে বরা পড়েহে, ভাড়াভাতি বর ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল। শেকালীর মনটা এ কবার আর একটা যেন চানুক বেল।

কি হুশকিল। মিথ্যা সাক্ষাতে বললেও বদী-গৃহের কাজ-কর্মে পোবার না, গদীবের বরের বিপর্দানগুলোকে বরে টান

মায়তে হয়। হবি দেবতে ঘেরি হ'ল বলা চলে না, বলতে হয় তাত পেতে ঘেরি হয়ে গেল।

হবেই না বা কেন? ওসব বয়ে সবই ত মিথ্যা লেখে বলে আছে, মিথ্যে বুঝে বার করা ওখানেই ত সবচেয়ে সোজা। শেকালী ভাবে মেয়েটি বোকা, ওতে ওর লজ্জার কি আছে? যদি কারও লজ্জা পেতে হয় ত সে শেকালী মিছে।

আজকে এমন অসমর করলি যে। যে তাতাতাড়ি হাত পা বুয়ে বোল আর, তাত ত একেবারে জল হয়ে পড়ে আছে, ধোয়ে নে। অপর্ণা দরজা খুলে দিচ্ছেই বলতে থাকেন।

শেকালীর মাথাটা এমন বয়ে আছে যে কিছুকণ শুষ্ক হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু উপার নাই, না বাওয়া পর্য্যন্ত না তাকে শান্তি দেবেন না। তার ওপর দীপু নীলু বেঞ্চের বলে পড়ছে, অমর্যক কথা কাটাকাটিতে ওদের ব্যাধাত হবে। সে নিঃশব্দে বেশখুয়া বদলে মিরে খাবার কারগাটার গিরে বসল। অপর্ণা কাছে বলে তাত বেতে দিতে থাকেন।

টিউপনির স্নগংবারটা মাকে শোনাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু অপর্ণাই মাথাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আপেকাগে আরও করেন চাপা কিস্কিনামির সুরে—আজ ত এ বেলার মোটে রান্না হ'ল না।

শেকালী চমকে উঠল, চোখ হুটো তার সোজা পড়ল ঠাণ্ডা উজ্জ্বলতার উপর ও তারপরে পাঠরত তাই হুটর উপর। সেও তেমনি চাপা সুরে প্রশ্ন করল—তা হল তোমরা খাবে কি?

এমন হতাশভাবে শেকালী কথাগুলো উচ্চারণ করল যেন তার নিজের খাওয়াই সংশয়প্রাপ্ত। অপর্ণা তাতাতাড়ি চকিত হয়ে বললেন—সে তোকে ভাবতে হবে না তুই বা দিকি। তারপরে একটু বেবে আবার বললেন—ও বেলারই বেশী রান্না করেছিলাম, ওই বাসি দিচ্ছেই হয়ে গেল। দীপু নীলু ধেরেধেরেই পড়তে বসলে, আর আমি রাঙে খাব না, বিদে দেই।

শেকালী সবই বুঝল, সুতরাং বেতে আরও করে দিচ্ছে রহস্যের বলল—এবং থাকলেও কোম উপার দেই না না? তা এস না, হ'লেনে একসঙ্গে কিছুটা ধেরে দিই।

অপর্ণা বললেন—না যে বেবি সত্যিই বিদে দেই। ও বেলার তুই না ধেরে খাবার পর থেকে মনটা ভাল লাগছিল না, তাই অনেকগুলো এবিক ওবিক কাজ করার পর বেতে সেই হুপু পড়িয়ে গিয়েছিল। আর পেটটা সত্যিই কেমববারা তার করে আছে।

আজ লারাদিদের মধ্যে এই একটা কথার শেকালীর মাঝার তার অনেকটা করে যায়। সে এবার পরিতৃপ্তি,

হেলেনাহুদি ততে মাথাটা একটু কঁকিরে বসল—বেশ তাই হ'ল, কিন্তু এই বেশী রান্নার কথাটা, সেটাও কি সত্যি?

অপর্ণা এবার হরত সত্যিই রাগ করেন—তোমার আজ হয়েছে কি বল ত বেবি, ইচ্ছা হতে এসেই এই তার সত্যের আমার পেছনে লেগেছিল, ভাল করে হুটো বা দিকি আগে।

শেকালী তাত খাওয়া খুলে মায়ের এই অপরাধ বুঝি ধোবে। শেকালী জানে তিনি মিস্তরই লারাদিন কিছুই খান নি অথচ অত বড় মিথ্যা কথাটা বলেও তাঁর চোখে বুঝে সৌন্দর্যের কি হুচাহুচি। তার নিজের সমস্ত অভিযোগগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁর ওই ক্লান্ত মূর চাহমিতে। টোটে তার একটা অল্প আবিষ্কারের পরিতৃপ্ত হাসি ফুটে ওঠে, বেটা পরকণেই প্রচণ্ড উজ্জ্বলতার বিল বিল শব্দমতো বরষা হুড়িয়ে পড়ে।

অপর্ণা আবার জুড়ুট করেন, দীপু নীলু কিরে তাকার কিন্তু এবারে শেকালী মায়ের জুড়ুট সম্পূর্ণ উপেকা করে হাঁক পারে—দীপু নীলু দোঁড়ে আর বেবি, এই তাত হুটো ধেরে আমার উদ্ধার করে দিবে না তাই।

অপর্ণা ব্যত হয়ে পড়েন—সে কি, তুই যে একেবারেই বেশি না, দে দে আর হুটো বুঝে দে দিকি, ততক্ষণে হোট তাই দীপু এসে দিয়ার আসনের এক পাশ অবিকার করে বসেছিল, শেকালী তার ব্যগ্র বাড়টা বা হাতে সোজা করে কড়ির ধরে খাইরে দিতে থাকে এবং মায়ের অহুবাগের উত্তরে এবারে সে সম্পূর্ণ মিস্তরতার লগে বহু হেসে বলে—বললাম ত বড় মাথা ধরছে, বিদে একেবারে দেই। দীপু তার বরলোচিত সঙ্কোচ মিরে অত পাশে বসে পড়ে, অপর্ণা হাঁড়ির অবশিষ্ট তাত হুটো তার সামনে এসিয়ে যেন। তিনি পরিকার বুঝতে পারলেন শেকালী তার একটা কথাও বিবাল করে নি। শেকালীর খাইরে বেওয়ারি নিবিড় তদির দিকে তাকিরে দেবতে দেবতে তাঁর মনে একটা অপূর্ণ নির্ভরতার যোষাক আগে।

ওদিকে শেকালী সমস্ত শরীর দিচ্ছে অহুতব করে দীপুর তাত খাওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ, ও বড়ীর ওই হোট হবি-বেখা বেচোটর কথা মনে পড়ে যায়, সেই তার হবির মধ্যে মর তমর আগ্রহতর তদিত। কাল হতে এদেরকে আর সত্যোবেলার পড়া বলে বেওয়ার সমর হবে না। এটা কি স্নগংবার।

হেলেন আর তার লর না, একটু ঠাণ্ডা বাপু, ময়ে ময়ে বা—অত্যধিক আগ্রহসহকারে হুঁচালমার কলে এবং শেকালীর কনিক অভয়সহকারে দরুন তার একটা আত্মলে দীপুর কামত পড়ে যায়, শেকালীর সমস্ত শরীরে একটা সমতার শিহরণ আগে।

দীপু একটু অপ্রতিভ হয়ে বা হাতে মাথা চুলকে গিলতে গিলতে বলে—তোমার লাগল দিহি?

শেকালী তার হোই মাথার রক্ত চুলের গোড়ার হাত
বুলোতে থাকে, গলাটা তার মাথার মতই বরে আর্শে, একটু
পরে বলে—বা বড়ি হয়েছ! ই্যা রে নীলু, আক টিক সমরে
ক্লাসে বেতে পেয়েছিলি ত? নে, হাঁ কর।

নীলু এককণে বুঝি দিকিকে শোনাবার মত একটা
কথা পায়। অত কাহাকাহির মধ্যেও বতটুকু অন্যতম
সম্ভব, সবটা করে মিলে নীলু ভাতটা পিলে মিলেই বেশ
ইঁপাতে ইঁপাতে বলে—পায়ব না তবে? এমন ছুটে
দিয়েছিলাম, দাদাকে জিজ্ঞেস কর না কেন। তবে ক্লাসে
বলে প্রথমটা পেটে কিছুকণ লাগছিল আর হাতের লেখার
খাতাখানাই মিলে বেতে তুলে গিয়েছিলাম—বলতে বলতে
তার হঠাৎ বেশ মনে পড়ে যায়, বলে—আচ্ছা দিদি, তুমি
ধেরে যাও দি কেন, অস্থব বুঝি? আচ্ছা, তোমাদের
ভাষি মকা না দিদি, দেরি কর আর বাই কর কেউ বক্বার
নাই, না?

শেকালী বোকে হাতের লেখার দ্রুত নীলু বহুনি বা

আরও কিছু ধেরেছে। মাঠারেরই বা কি দোষ, তিনি
কেনম করে জানবেন যে, নীলু কতখানি প্রাণপণ করেও
কর্তব্যচ্যুত হয়েছ। সে এক হাতে শেখ এল ক'টা মাথতে
মাথতে ও বা হাতটা তেমনি তার মাথার বুলোতে বুলোতে
আখাসদামের তদ্বিতে বলল—সে হবে, তোরাও লেখাপড়া
নিখে বড় হোস।

কিন্তু সন্ধ্যা সন্ধ্যা সমস্ত অন্তর দিয়ে সে ভগবানের কাছে
প্রার্থনা করে—এ মকার হাত হতে ওদের রক্তে ক'রো প্রভু,
তুমি উপার ক'রো।

নীলু শেকালীর হাতের পামে চেয়ে ছিল, তাত মাথা
হতেই সে যেমন মুখ বাতাতে বাবে অমনি তার গালের
উপর এক কোঁটা গরম জলের স্পর্শ অস্থব করে চমকে উঠে
উপর পামে চাইবার চেষ্টা করল, আন্দাজের সুরে বলল—
দিদি তুমি...

শেকালী তার মাথার উপর একটু চাপ দিয়ে ভাতাভাতি
বলল—ও কিছু মর তুমি খা দিকি।

অনুরোধ

ঐ অমূল্যচন্দ্র ঘোষ

রূপে রূপে প্রেরসি আমার।
তুমি আনিয়াছ আঁখি বসন্ত কুহর রাখি
মোর করে দিতে উপহার।
আজিকে পূর্ণিমা রাত্রে কোন দিন তব সাথে
ছিল কিনা মোর পরিচর
আমি যে পিয়াহি তুলে, তুমি তাহা হুতুহলে
দেখিতেছ যানিরা বিশ্বর।
অজলিতে তরা কুল, পল্ল আঁখি সমতুল,
ব্যথা কপ্প, হুহু হুহু হিয়া,
চকল দখিনা বারে অকল দুটায় পারে
বহুলের সুরতি মাখিরা।
আজিকে ব্যাকুল মন থেকে থেকে অস্থবন
খুঁজে কারে আকাশে বাতালে,
কার আঁখি মোর ভরে চির অস্থবর ভরে
অপলক চার মোর আশে।
নবীন কান্তন মোরে বিশ্বস্তির দুব বোরে
মিলে আঁখ বগনের বোলা,
কহা কি করিবে নাকে? যদি তুমি বুকে থাকে
কেন কেপে আঁখি আঁধ-তোলা?
উভলা নাবনী দিশি, উছলিত মন দিশি,
উভরোল হিয়া ব্যথাভূর।

হে প্রিয়া! নয়ন মেল— পাণিরা ডাকিরা গেল—
তদি আঁখি বিরহ-বিধুর।
আঁখি মব আনন্দের বসন্তের অন্তরের,
বুহুলের আঁধ-জাগা আঁখি
যদি এ ব্যথিত প্রাণে তরে' দেহ গানে গানে—
উচাটন হিয়া থাকি থাকি—
তুমি কি গো অভিমানে চাহিবে না মোর পামে—
রোষি' বার নাহি দিবে সাক্ষা?
যানিনী বিকলে বাবে শিক যবে কুহরিবে
উচ্ছলিত পাগলের পারা?
তবু নিমেষের তুলে তোমার চরণ নূলে
যদি ক'রে থাকি অপরাধ,
আমার বেদনা নিরা তোমার ব্যথিত হিয়া
হুচাইবে না কি পরমাহ?
উছল যানিনী, হার, বরে' পড়ে বেদনার
কার ভরে বিহ্বল, ব্যাকুল;
ব্যথিত অন্তর মন কেটে পড়ে আকাশম—
প্রিয়া লাগি কাঁদিয়া আকুল।
নবীন কান্তন বার ডাকিরা কিরিয়া বার—
পিয়া! আঁখি তোল একবার!
যদি সোহাগের তাকে ও বুকে সন্ধ্যা আগে—
পুলো তবু অন্তরের দার।

সখি মুখ চন্দ্র ছবি

স্বরলিপি—শ্রীগুণকরনাথ চট্টোপাধ্যায়—

(রাগ খাঙ্গাবতী)

(আহ্বায়ী) সখি মুখ চন্দ্র ছবি যব আই বিহারী

মান ধরম সবকো গুমাই ॥

(অস্তুরা) প্যারে প্যারে নৈনা ওটে ওটে ধারলে

চিতবন মে বশ গেই চিতবতকি আই ॥*

[খাঙ্গাবতী খাঙ্গাজ অঙ্গের রাগ, ইহাতে ছই নিখাদ ব্যবহৃত হয়, অত্যাশ্চর্য স্বর শুদ্ধ। বাদী মা, সংবাদী সা। আরোহণে গান্ধার্য ধৈবত বর্জিত। অস্তুরা উঠাইবার সময় ধৈবত বর্জিত রাখিয়া শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার করা হয় যথাঃ—মা পা না না সা। অবরোহণের গতি বক্র ও সাতটি সুরই ব্যবহৃত হয় বলিয়া খাঙ্গাবতীকে বক্র সম্পূর্ণ রাগ বলা হয়। খাঙ্গাবতীর আরোহণে, মাড়, দেশ, সিঙ্কড়া ও অবরোহণে বাগেশীর রূপের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ধা মা ও মা সা সঙ্গতি খাঙ্গাবতীকে উক্ত রাগসমূহ হইতে পৃথক করিয়াছে।

খাঙ্গাবতীর মুখ্য অঙ্গ—রা মা পা ধা সা—গা ধা পা ধা, মা গা মা সা

নিষিদ্ধ বিভাস { মা গা রা সা, গা মা রা সা, রা গা মা পা,
সা না ধা পা, পা ধা না সা, গা ধা না সা, ধা না সা রা

আরোহণ—সা রা মা পা ধা সা। অবরোহণ—সা গা ধা পা, ধা মা গা মা, সা

রাগবাচক তান—সা রা মা পা ধা সা রা সা, গা ধা পা ধা মা গা মা সা।

খাঙ্গাবতী—তেতালা

১	পা	গমা	পা	ধা	+	সা	।	।	।	।	গা	।	ধসা	গা	0	ধা	।	পা	।	।
স	খি	মু	খ			চৌ	০				জ	০	০	০		ছ	০	বি	০	
১	পধা	পা	।	মা	+	মা	গা	।	রা	।	গা	।	সা	।	0	গা	সরা	।	।	।
যব	আ	০	ই			বি	হা	০	০		আ	০	রী	০		আ	রে	০	০	
১	মা	।	মা	পা	+	মপা	পা	ধা	ধা	।	মা	পা	।	।	0	পধা	স'রা	।	।	।
মা	০	ন	ধ			অর	ম	স	ব		কো	০	০	০		ও	০	০	০	০
১	রা	গা	।	রা	+	সা	।	নসা	গা	।	ধা	সা	গা	।	0	ধা	গা	ধা	গা	।
ও	ও	০	ও			মা	০	০	০		আ	০	ই	০		ই	ই	ই	ই	
১	ধা	মা	পা	ধা	+	সা	।	।	।	।										
স	খি	মু	খ			চৌ	০	০	০											

০ স'গা ধা, ধা পা | ধা মা পা ধা | স'ী † † † | ধ'গা স'গা ধ'পা ম'গা | (তান)
 ০০ জে, ছ বি স থি মু থ চৌ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ র'মা প'ধা স'ী † | গ'ধা স'গা ধ'স'ী গ'ধা | স'গা স'গা ধ'পা ম'গা | র'মা প'ধা প'মা গ'মা |
 আ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ধ'মা প'ধা স'ী † | ধা মা পা ধা | স'ী † † † | ধ'স'ী র'গ'ী স'র'ী গ'স'ী
 আ ০ ০ ০ ০ স থি মু থ চৌ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ স'গা ধ'স'ী গ'ধা প'মা | স'গা স'গা ধ'পা ম'গা | র'মা প'ধা প'মা গ'মা | সা, সমা র'মা প'ধা
 আ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ, আ ০ ০ ০ ০

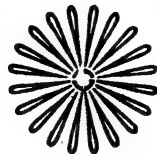
০ ধ'মা প'ধা স'ী † | ধা মা পা ধা | স'ী † † † |
 আ ০ ০ ০ ০ স থি মু থ চৌ ০ ০ ০

৩ প'গা ধ'পা, ধ'মা গ'মা | ০ র'মা প'ধা প'মা গ'মা | ১ ধ'মা প'ধা স'র'ী স'গা | + ধ'পা ম'গা ম'মা স'সা
 আ ০ ০০, ০০ ০০ আ ০ ০০ ০০ ০০ আ ০ ০০ ০০ ০০ আ ০ ০০ ০০ ০০

৩ স'স'ী ধ'ধা, গ'গা প'পা | ০ ধ'ধা ম'মা, প'পা গ'গা | ১ ধা মা পা ধা | + স'ী † † †
 আ ০ ০০, ০০ ০০ আ ০ ০০, ০০ ০০ স থি মু থ চৌ ০ ০ ০

৩ ধ'স'ী র'গ'ী, ম'মা স'স'ী | ০ র'র'ী ন'না, স'স'ী ধ'ধা | ১ গ'গা প'পা, ধ'ধা ম'মা | + প'পা গ'গা ম'মা স'সা
 আ ০ ০০, ০০ ০০ আ ০ ০০ ০০ ০০ আ ০ ০০, ০০ ০০ আ ০ ০০ ০০ ০০

৩ স'রা ম'পা ধ'স'ী র'স'ী | ০ গ'ধা প'মা গ'মা স'সা | ১ ধা মা পা ধা | + স'ী † † †
 আ ০ ০০ ০০ ০০ আ ০ ০০ ০০ ০০ স থি মু থ চৌ ০ ০ ০



বাংলায় কার্পাস-চাষ

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্তী

বস্ত্র-সম্বন্ধ ও তাহার প্রতিকার

বর্তমান বস্ত্র-সম্বন্ধের দিনে বয়ে বয়ে সারাতে পরিমাণ কমিতে কার্পাস কমাইয়া চরবার প্রচলন হারা সহজে বস্ত্রাভাব হয় হইতে পারে। বাংলার কার্পাস সহজলভ্য নয় বলিয়াই দীর্ঘ দিনের চেষ্টায়ও এখানে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে সকল প্রদেশে কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার শিত্তরাজ্য কীভাবে চরবার কাটিয়া আদম্ভ পার। বস্ত্র-শিল্পে বস্ত্র-মূল্যের দশ আনা তুল্য ধরিত্তে ব্যয়িত হয়। শিল্পে কার্পাস কমাইলে নিখরচার সহজে ইহার সমাধান হয়। প্রত্যাহ কতক সময় পাড়ার কয়েক জনে মিলিয়া চরবার হুতা কাটিলে এবং এক জনে তাহার রামায়ণ মহাভারতাদি কিংবা কোন পত্রিকা হইতে আকর্ষণীয় অংশ পাঠ করিলে সময়টা বেশ আমন্দে কাটিয়া যায়।

বাংলার কার্পাস-চাষ লোপ পাইবার কারণ

যে বাংলার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস উৎপাদিত সেখানে দীর্ঘদিন ইহার চাষের প্রচলন না থাকায় ক্রমশঃ ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট দ্বৈট ইতিহাস কোম্পানীকে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে আছে :

"The district of Dacca produces the best cotton in the world. The fibres are fine, silky and strong."

দেখ নত বঙ্গের পূর্বে ইংলণ্ডে হুতা ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা হইলে এখানে সে সকল আমদানী হইতে থাকে। বিলাত হইতে আমদানী হুতা অনেক লভা বলিয়া ক্রমশঃ চরবার প্রতিযোগিতার হুতরা হইতে বাধ্য হয়। চরবার কাটা বন্ধ হইলে তুলার চাষও উঠিয়া যায়। দীর্ঘদিন ইহার চাষ না থাকায়, বাংলা যেন কার্পাস-চাষের অল্পবোঙ্গী হইয়া পড়ে। পাঠ্য পুস্তকাদিতেও এ প্রকার অল্পবোঙ্গিতা বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার বহু পাঠকল আছে। ইহার অবিকাংশের মালিকই ইংরেজ। বাংলার কার্পাস-চাষ ব্যাপক ভাবে হইলে পাটের চাষ কমিয়া যাইবে এই আশঙ্কা হেতু ইংরেজ বণিকগণ, তথা গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে অবহিত হন নাই। বাংলার এখন চলিত-পকাশটি কাপড় ও হুতার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুলার আশ্রয় অত্যন্ত এক ইকির লাভ-অষ্টমাংশ লভা না হইলে

কলে ব্যবহার চলে না। বাংলার এ প্রকার তুলার চাষ নাই বলিয়া এ সকল মিলের আবর্তক তুলার অভাব প্রদেয়—পাকিস্তান, আমেরিকা, আফ্রিকা, যিশর প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

কার্পাস-চাষ-প্রচেষ্টা

ঢাকেশ্বরী কটন মিলিং নামা দেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুলার বীজ আমদানী করিয়া তাহাদের এগ্রিকালচারাল অফিসার হিমায়ে আমাকে দিয়া তাহার চাষ করাইয়া ভাল কল পান। সরকারী কৃষিবিভাগও এ বিষয়ে অল্পরূপ সাহায্য লাভ করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া বদীর মিল-মালিক সমিতি ও গবর্ণমেন্টের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং অর্থসাহায্যে ১৩৩৮-৩৯ সন হইতে বিভিন্ন পরিকল্পনামান্বিত সরকারী কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন জেলার দশ বৎসর ইহার চাষ হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় কটন কমিটি অর্থসাহায্য ও উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বর্ষায় কল দাঁড়ান না এপ্রকার ঘোষণালা মাটি কার্পাস-চাষের বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার চাষে বিব্রাভি পকাশ-বাটী ঢাকার নত বরচ করিয়া কার্পাসমূল্য বাবদ এক শত পচিশ হইতে এক শত পকাশ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।



শিত্তরাজ্য কীভাবে চরবার হুতা কাটতেছে

কলম বিধাওঁতি ভিন্ন মণ হইতে পাঁচ মণ কার্পাস বা এক মণ হইতে দুই মণ তুলা ও দুই মণ হইতে ছয় মণ বীজ পাওয়া যায়। মিশরীয় কার্পাসের মূল্য অত্যন্ত কার্পাসের তুলনায় বিত্তপূর্ণও অধিক এবং ইহা বাংলার বিশেষ উপযোগী



কেতে উৎপন্ন একটি মিশরীয় কার্পাস গাছ

কলম। উপরোক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনাব্যবহারী উৎপন্ন কার্পাসের বীজ বিনামূল্যে হাটাইয়া তুলা ও বীজ বিক্রয় করতঃ উৎপাদক-দিগকে মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্বির বিদ্যা মূল্যে সার, বীজ দেওয়া হইত। পারিতোষিক প্রদান ও কতিপূরণ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। কার্পাস হইতে বীজ হাটাইবার জন্য একটিমাত্র কল থাকিতে উৎপাদকদিগকে বহুদলে মূল্য দিতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিত। একত অবশেষেই পর বৎসর আর ইহার চাষে উৎসাহ থাকিত না। এ সকল অনুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল এমন সময় বদ-বিভাগ হইল। ইহার পর কি পর্ব্বমেন্ট, কি মিল-মালিক সমিতি কিংবা চাকেরদারী কটন মিলস কেহই বাংলার কার্পাস-চাষের উন্নতি জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। আরি পশ্চিম বাংলার

ইহার চাষের কথা বহুরকমে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা প্রচার করিয়া আসিতেছি। এ সময়ে আমার বহু দিনের প্রত্যক অভিজ্ঞতা আছে—মহীরা কোলার সুলিরাবররা গ্রামে আমার কল কার্পাস চাষের কাজে লাগাইয়া উৎপাদক-দিগকে আবশ্যকমত বীজ সরবরাহ করিতে প্ররুত হই। মিশরীয় কার্পাসের চাষে এতদিন কেবল আমিই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। চাকার করেক রকম উৎকৃষ্ট তুলার বীজের মত, ইহাও বাহাতে বাংলা হইতে বিলুপ্ত না হয়, তাহাই ছিল আমার মূল্য উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সনের ১৬ই এপ্রিল বাংলার রাজ্যপাল আমার চাষ দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ব্যক্তিগত চেষ্টার কোন দ্বারী কলের আশা না থাকার পর্ব্বমেন্টের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতে থাকি।

বর্তমান বঙ্গ-সম্রাট ও কার্পাস-চাষ আন্দোলন

দেশ-বিভাগ ও অত্যন্ত কারণে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার মিলগুলি আবশ্যকমত কার্পাস না পাওয়ার বহু হইবার উপক্রম হয়। ১৯৪২-৪০ সালের বিভিন্ন সময়ে দিল্লী ও বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কার্পাস-চাষের প্রসারকল্পে করেকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। চাষের প্রসার দ্বারা বাহাতে ভারতবর্ষকে কার্পাস বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে না হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান সেক্ট্রাল কটন কমিটিকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। এ সময়ে বাংলার মিশরীয় কার্পাস-চাষ প্রচলনের উদ্দেশ্যে ভিন্ন বৎসরের কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া প্রচার করি। ইহা কৃষিবিভাগের নিকট প্ররুত হইলে পর্ব্বমেন্ট সুপারিশ করিয়া ১৯৪০-এর কেন্দ্রদারী মাসে কেন্দ্রীয় কটন কমিটিকে পাঠাইয়া দেয় এবং ১৯৪০-৪১ সনে আমি বাহাতে ইহার চাষ চালাইয়া বাইতে পারি এবং ১০২০ টাকা সাহায্য করেন। ইন্ডি-মধ্যে কৃষিবিভাগ হইতেও বাংলার লক্ষ আশের কার্পাস-চাষ প্রসারের উদ্দেশ্যে ভিন্ন বৎসরের জন্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আর একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কটন কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। পশ্চিম বাংলার সরবরাহ-সচিব বাংলার কার্পাস-চাষোপযোগী করেকটি স্থান পরিদর্শন করেন। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু পণ্ডিত জমি মন-মনর হাজার টাকা খরচ করিয়া সেচব্যবস্থার সাহায্যে ক্রিভাবে চাষোপযোগী করা দ্বারা ভূমি তাহার একটি বিবরণ দেখ। যে সকল উচ্চ বোম্বাইলা মাটিতে পাট ও আত বাণের চাষ হয় সে সব স্থলেও কার্পাস জন্মানো বাইতে পারে। এই বাণের বিস্তার জমি বীরভূম, বাঁহুতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পণ্ডিত আছে। এই প্রকার ৫০০০ একর পণ্ডিত জমিতে কার্পাস-চাষ প্রচলন করিবার ব্যবস্থা হয়।

ইন্ডিয়ান সেক্ট্রাল কটন কমিটি—বোম্বাই

এই কমিটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক মিল এবং সেগুলির প্রয়োজনীয় তথ্য-ভাণ্ডার কার্গাসের উন্নতি ও চাষের প্রসারের লক্ষ্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি-বিভাগ কার্গাস-চাষ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলে কমিটি উপদেশ ও অর্থসাহায্য দ্বারা সর্বতোভাবে তাহাদের কার্যে সহায়তা করে। সেখানে কার্গাস-চাষ সম্পর্কে গবেষণা ও অভ্যাস কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে বহু বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মিল-মালিকদের প্রতিনিধি, কৃষি-বিভাগের প্রতিনিধি ও অভ্যাস বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত এক কমিটি ইহার কার্য পরিচালনা করেন। ভারত হইতে রপ্তানি তুলী এবং মিলে বর্ষিত তুলার উপর যে কর আদায় হয় তাহা এই কমিটির ব্যয়নির্বাহার্য দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত সরকারও অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

পশ্চিম বাংলার ছুইটি কার্গাস-চাষ
পরিকল্পনা ও তাহাদের কার্য
(১৯৫১-৫২)

পশ্চিম বাংলা হইতে আমার প্রথম মিশরীয় কার্গাস-বীজ-বৃদ্ধি পরিকল্পনা এবং কৃষি-বিভাগ প্রথম লক্ষ্য আশ্রয় কার্গাস-চাষ-প্রচলন পরিকল্পনা ভারতের কেন্দ্রীয় কার্গাস কমিটির সভ্যদের দ্বারা বিবেচিত হয়। তাহারা কমিটির সেক্রেটারীকে নবেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে পশ্চিম বাংলার সিন্ধা কতকগুলি কার্গাস-কেন্দ্র পরিদর্শনাতে এই বিষয়ে তথাকার কার্গাস সাব-কমিটির সভ্য ও স্থানীয় অভ্যাস বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করেন। পরে তাহাদের সম্পাদককে ১৯৫০-এর ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে এখানে পাঠাইয়া দেন। অবতারণার পরিকার বিশেষ সংবাদদাতা ৯/১২/৫০ তারিখের কাগজে এই বিষয়ে তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পাদক মহাশয় এই প্রদেশে তিন-চার দিন অবস্থান-কালের মধ্যে এখানকার কয়েকটি কার্গাস-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি কুলিয়ারবরয়ার আমার উৎপাদিত মিশরীয় কার্গাস ও কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এবং সরকারী রূপ-রিসার্চ অফিসারকে লইয়া দেখিয়া আসেন। ইহার পর প্রাদেশিক কার্গাস কমিটির কতিপয় সভ্য ও অভ্যাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিয়া কৃষি-বিভাগ প্রথম কার্গাস-

চাষ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। আমার প্রথম মিশরীয় কার্গাস-বীজ-বৃদ্ধি পরিকল্পনাটি তাহাদের দ্বারা সাময়িক ভাবে বর্জিত হয়। আমি প্রাদেশিক কটন সাব-কমিটির একজন সভ্য থাকি। সত্ত্বেও আমার বক্তব্য বিষয় জানাইবার কোন সুযোগ যে আমাকে দেওয়া হয় নাই—ইহা পরিতাপের বিষয়। সে দ্বারা হটক, শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক পর্বর্গমেন্ট আমার পরিকল্পনা-



কার্গাসগাছের কাছে দণ্ডায়মান লেখক

জ্বারী তিন বৎসরের স্থলে এক বৎসরের লক্ষ (১৯৫১-৫২) ইহার চাষের খরচ ১৫৮০, বন্ধুর করেন। আমার পারিভ্রমিক বাবদ তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে মাসিক বৃত্তির লক্ষ রূপায়িত করিলেও তাহাদের মজুরী টাকার মধ্যে ইহার কোন ব্যয় নাই। বাংলার মিশরীয় কার্গাস-চাষের অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, প্রাদেশিক পর্বর্গমেন্টের উক্ত সিদ্ধান্ত বৃদ্ধি-সদত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক আমি কুলিয়ারবরয়ার (মদীরা) প্রায় তিন বিঘা জমিতে মিশরীয় কার্গাসের চাষ করিতেছি।

কৃষি-বিভাগ প্রথম তিন বৎসরের কার্গাস-চাষ পরিকল্পনাতে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন। এই পদ্ধতি

কলনানুযায়ী এ বৎসরের কার্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নবীয়া প্রভৃতি জেলায় ১৯৫১-৫২ সালে প্রায় ৩,৫০০ একর জমিতে পার্কী নামক লম্বা আশের কার্পাসের চাষ হইতেছে। যে সকল জমিতে আশ বাস কিংবা পাট চাষের সম্ভাবনা ছিল না, সম্ভবমত সে সকল জমিতেই কার্পাস-চাষ হইতেছে। একত বহু জমি কৃষিবিভাগের ট্রাষ্টের সাহায্যে সাধ্যমত চাষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চাষের কত যে ফল হইয়াছে উৎপাদকগণ কার্পাস কনাইরা তাহার মূল্য হইতে তাহা শোধ করিবেন। এতদ্বির অন্ন মূল্য লইয়া সার, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। এবার কার্পাসের মূল্য বাহাতে অবিলম্বে পাওয়া যার সেই উদ্দেশ্যে বদীর মিল-মালিক সমিতি বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কার্পাস-বীজ-হাফান কল (ginning machine) প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এতদ্বির উৎপাদকদিগকে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কখনও এত ব্যাপক ও কার্যকরী পরিকল্পনা লইয়া কার্পাস চাষের ব্যবস্থা হয় নাই। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের উত্থাপে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে কর্ণে নিম্নুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারী কৃষি-কর্মচারীরা প্রায় প্রত্যেকেই ইহার লাকল্যের কত সাধ্য-মত চেষ্টা করিতেছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহাতে পরিকল্পনানুযায়ী যে হয় জন ডিসনষ্ট্রেক্টর ও কটন সুপারভাইজিং অফিসার নিম্নুক্ত ছিলেন, তথ্যভীত কৃষি-বিভাগের অত্যন্ত কর্মচারীদের এই কার্যে আশাহুত উপসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। আগামী বৎসর চাষের জমির পরিমাণ বর্তমান বৎসরের তুলনায় বিস্তারিত অধিক হুতি পাইবে আশা করা যায়।

একটি বিশদীর কার্পাসগাছ

এ সকল গাছে গড়ে ১০০টি করিয়া গুটি হয়। লাগাই-বার পর পরবর্তী চাষের সুবিধার কত চার হাত অন্তর পংক্তি করিয়া পংক্তিতে দুই হাত অন্তর বীজ পুতিলে প্রতি গাছে এক পোয়া কার্পাস হয়। এই একই ব্যবস্থানে এক বিহার ১০০ গাছ হইতে ৫ মণ কার্পাস বা ১১০ মণ তুলা পাওয়া যায়। মণপ্রতি ৩০০/- দর হইলেও ইহাতে ৪৫০/- পাওয়া যায়। চাষের পর ১০০/- টাকার বেশী হয় না।

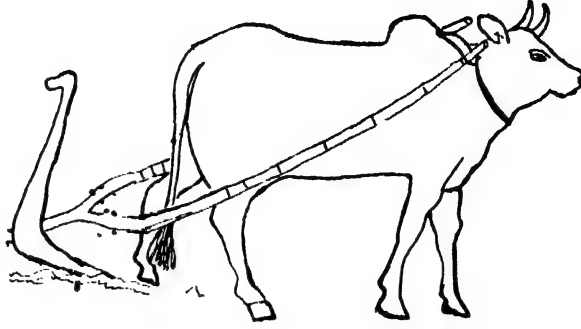
বাংলার বিশদীর কার্পাস-চাষ

বিশদর বেশে কাজ কার্পাস পৃথিবীর নব্যে শ্রেষ্ঠ কার্পাস বলিয়া গণ্য। ইহার মূল্যও অত্যন্ত কার্পাসের বিস্তারিত অধিক। বাংলাদেশের আবহাওয়ার সহিত বিশদর আবহাওয়ার কোন মিল নাই। পাকিস্থানের সিদ্ধপ্রদেশের সহিত বিশদর আবহাওয়ার কতকটা মিল থাকার তথাকার সরকার

ইহা উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ভাল কল পাওয়া যায় নাই। কাজেই বাংলার ইহার চাষের লাকল্যাতের পথে বহু বিঘ্ন থাকা স্বাভাবিক। বোল বৎসর পূর্বে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের এগ্রিকালচারাল অফিসার হিসাবে আমি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ করি। প্রথম চার-পাঁচ বৎসর খুবই ভাল কল পাইরাছিল। ইহার ফল শক্ত আশ বৈধে হইরাছিল প্রায় দেড় ইঞ্চি এবং এই তুলা ৮০-১০০ মণ হতা প্রভৃতির উপযোগী ছিল। বদীর মিল-মালিক সমিতির সম্পাদক “ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদ্বুতপূর্ণ” বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। কলমেও বিধাপ্রতি পাঁচ-ছয় মণ কার্পাস বা প্রায় দুই মণ তুলা পাইরাছি। এ সকল বীজ ব্যবহার করিয়া বদীর কৃষিবিভাগ ফুলসই লাভ করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির সম্পাদক ঢাকেশ্বরী কটন মিল কম্পাউন্ডে উৎপন্ন কার্পাস পরীক্ষা করিয়া ইহার উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইরাছিলেন। বাংলার যে এরূপ উৎকর্ষ কার্পাস হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। বিদেশীয় এই শ্রেণীর উৎকর্ষ কার্পাসের বীজ ব্যবহারের পূর্বে বেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশোধন করিয়া লওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ তাবে সতর্ক করিয়া দিরাছিলেন। আমরা কিন্তু তখন প্রতি বৎসর বীজ বিশোধন না করিয়াই বপন করিতাম। ইহার পর বৎসর (১৯৪১ সালে) ইহাতে এক রকম হজক রোগ (fungus disease) দেখা দিরা বাবতীর কলসই মট হয়। ইহাতে বদীর কৃষিবিভাগ বাংলার মাটি সূত্থানে এই কার্পাস উৎপাদনের অনুপযোগী মনে করিয়া ইহার চাষ হইতে বিরত হন।

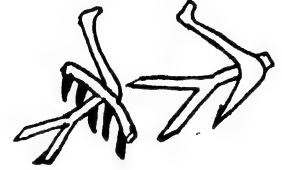
ঢাকেশ্বরী কটন মিল ও বদীর মিল-মালিক সমিতি এ প্রকার একটি অর্থকরী উৎকর্ষ কার্পাসনির রকাকরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহুত্ব্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রতিকারের কত বস্তবান হইবেন এই ভরসা প্রদান করেন এবং ১২০০০/- ব্যয়ে ৫ বৎসরের কত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বদীর মিল-মালিক সমিতির অর্থাহুত্ব্যে কাজ আরম্ভ হয় ও দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই উত্তোক্তা কার্পাসের এই রোগ দূর করিতে সক্ষম হন। তাহাদের গবেষণালব্ধ প্রণালীদ্বারা বিশোধিত বীজ প্রতি বৎসরই মার্চে আমি বপন এবং চাষের ব্যবস্থা করিতাম। তাহারা এ কাজ পরিত্যাগ করিবার পরেও গত পাঁচ বৎসর দাবং বধানন্তব তাহাদের প্রণালীতে বীজ বিশোধন করিয়া উক্ত বীজ রকাকরে প্রতি বৎসর ইহার চাষ করিয়া বিশেষ ফুললাভ করিয়া আসিতেছি। বীজগুলি আট-বশ মিনিট লালকিউরিক এসিতে ডুবাইয়া পরিষ্কার করে ধোওয়া হয়। তার পর সেগুলির মধ্যে কলে ডুবাইয়া থাকে এ প্রকার বীজ বপনের কত দাবা হয়। এই বীজগুলি ৪ বটা ৬০° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিয়া পরে

সুযোগমত বুনিতে হয়। এভাবে উত্থাপে রাধিবার ভর, ইনকিউবেটরের অভাবে আমি সাধারণতঃ বীজগুলি চার বর্গা বোঝে রাধি। ইহার চাষ-প্রণালী এইরূপ : কৃষি বার বার চাষ করিয়া ও মই দিয়া বণমোপযোগী করিয়া এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে বৃষ্টি হইবার পরে, আর জল না হইলে কৃষিতে সেচের ব্যবস্থা করিতে হয়। তার পরে মাটির কো হইলে বীজ পুঁতিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বীজমত বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে কৃষি কোপাইয়া কার্পাসপাছের পোকা ঝাঝিয়া দিতে হয়। জুন, জুলাই মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পরে বীজ বুনিলে যে সকল পাছ উৎপন্ন হয় সেগুলি প্রায়ই মুছ থাকে না। উদ্ভিদভ্রমবিদদের দ্বারা বীজমত অহুসদ্ধানের পর এ বিষয়ে নীতি



এক-পদ্ধতিলিত লাঙ্গল

দিক্‌নে—এক প্রকার কৃষিযন্ত্র



নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার বর্তমান কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার মল্লী মহাশয়ের চেষ্টায় টালিগঞ্জে সম্প্রতি কৃষিবিষয়ক একটি বড় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েক জন কৃষী বুকের ভদ্রাবাসনে এখানে কৃষি-সম্পর্কিত বিবিধ কার্য হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুই-এক জন ব্যাভনামা অব্যাপক প্রথমে ডক্টর আগার-কারের অধীনে কার্পাস-বিষয়ে গবেষণা করেন। পরে লতন হইতে বিশেষজ্ঞ হইয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ইহার সম্প্রতি এখানে কর্তৃক নিযুক্ত আছেন। কার্পাস-চাষ-প্রসার পরিকল্পনামুযায়ী ইহার কার্যভার ডক্টর পি. কে. প্রেমরী পিএইচ. ডি. মহাশয়ের উপর ভর্তুকি আছে। উদ্ভিদবিভাগ তাঁহার পতীর ব্যুৎপত্তি আছে এবং তিনি দীর্ঘকাল বাংলার কার্পাস-চাষ প্রসারকল্পে কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়াছেন। মিশরীয় কার্পাসের মত একটি অর্থকরী কসলের বীজ বিজ্ঞান-সম্বত উপারে বিতরণ রাধিয়া দেশে উক্ত প্রেগীর কার্পাসের প্রসারকল্পে সর্বতোভাবে সাহায্য করা ইহাদের একান্ত কর্তব্য।

গত বৎসরে মল্লীয়া জেলার সুলিরাবরমাতে (১৯৫০-৫১) যে মিশরীয় কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আশের দৈর্ঘ্য ১.১৬ ইঞ্চি। প্রসিদ্ধ মিলকর্মা এম. এল. সাহার মতে মোহিনী মিলস-এ ঐ কার্পাস হইতে ৮০ মং তামার হতা প্রস্তুত হইতে পারে। বর্তমান বর্ষের (১৯৫১-৫২) উৎপন্ন কার্পাস সম্বন্ধে কেশোরাম কটন মিলস তাঁহাদের ২৪।১১।৫১ তারিখের পক্ষে ইহার দৈর্ঘ্য ১.১৬ ইঞ্চি এবং কার্পাস বুবি ভাল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতীত কার্পাসের মতই ইহাও উৎপাদন করিতে প্রায় সমান ব্যয় ও চেষ্টা এবং প্রায়

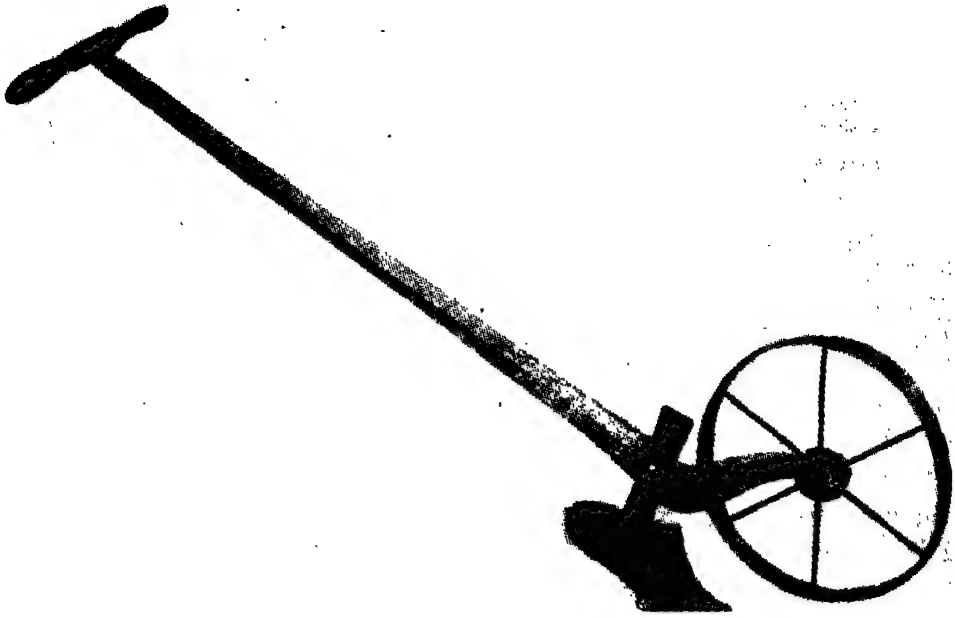
একই রকমের খরচ পড়ে, কিন্তু কসল হইতে দ্রুতগের অধিক আয় করা সম্ভব হয়।

এখন মিশরীয় কার্পাস-চাষের প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা বলিতেছি :

১। বাংলার সাধারণতঃ যে সকল কসল কবে তাহাদের তুলনায় কার্পাস উৎপন্ন করিতে অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু কার্পাস-উৎপাদন-সম্পর্কিত কতকগুলি অল্প পরি-প্রমের কাজ যেমন মিঠান, পোকা বাছা, কার্পাসসংগ্রহ প্রভৃতি পরিবারের ছেলেমেয়েরাও করিতে পারে। ইহাভারা কৃষিও অধিকতর সমর্য আবহ থাকে। তাহাদের সব কাজ মনু করিয়া করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে ইহার লাভজনক চাষ হওয়া কঠিন।

২। ইহা মিশ্রিত কসল হিসাবে আত বাম, চীমাবাদাম, কলাই, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্রে জন্মান উচিত। আত-বামের সহিত উৎপন্ন করিতে হইলে প্রথমে আত বাম বুনিবার বিশ-পচিশ দিন মধ্যে কৃষিতে কয়েকবার মই ও বিনে বেওয়ার পর ভিন-চার হাত অন্তর অন্তর সারি করিতে হয়। তার পর সেই সকল লাইনে হুই হাত আতাই হাত ব্যবধানে মাটি কোপাইয়া মিড়াইয়া এবং বালাতে সার মিশাইয়া পাঁচ-ছয়টি করিয়া বীজ বুনিতে হয়। বাম, কলাই, মুগ প্রভৃতির সহিত একত্রে কার্পাস জন্মাইয়া আমি সুকল পাইতেছি।

৩। পূর্বে হইতে তৈরি কৃষিতে মে-জুন মাসে বৃষ্টি হওয়া-বাম কার্পাস বুনিতে হইবে। কার্পাস বীজ বুনিবার পর প্রায় ভিন মাস ইহাতে কসলের প্রয়োজন। কসল বরিলে পর মাটি শুক থাকে আবহত। এখন বাংলার গুরু ইহার চাষের পক্ষে



সাধারণ হাত লাদল—মূল্য ৩৫৯

বিশেষ অঙ্গুল। বর্ষার জল সহজে সরিয়া যায় এই প্রকার মোর্শাশলা মাটিই কার্পাস-চাষের বিশেষ উপযোগী।

৪। বাংলাদেশে বর্ষার সময় বাতুতি বাস ও আগাছা হ্রীকরণের জন্য অল্প খরচে বাহাতে কাক হর তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুনিবার পর বেত মাস প্রায়ই হাত-লাদল ও বিদে এবং পরে গন্ধকারা চালিত লাদল ও বিদে ব্যবহার করিয়া কচি পরিষ্কার রাখিতে হয়। হাতে কোপাইলে ও মিটাইলে ইহার চার-পাঁচ জন খরচ করিয়াও ক্রত কাক লমাণ হয় না বলিয়া কচি আগাছার পূর্ণ থাকে। বর্ষার সময় ক্রমাগত বেনী দিন বৃষ্টিপাত বহু থাকে না বলিয়া, কচির 'কো' অস্থায়ী মিটান এবং বোঁড়ার জন্য সময় কম পাওয়া যায়। এ সময়ে আত বাস ও পাট মিটাইতে প্রচুর লোক আবশ্যক বলিয়া এই কাজের জন্য লোক পাওয়া কঠিন এবং লোক যদি বা সংগ্রহ হয় তাহা হইলেও অনেক সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়ায় কাক অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই বহু করিতে হয়। আমেরিকার সাধারণ চাষীরা একটি বজর-চালিত লাদল ও বিদে সাহায্যে কুচি-পটিল বিদা কচিতে কার্পাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। লেবানকার আদর্শে আমাদের দেশেও কার্পাস-চাষে এইপ্রকার কুচি-বজারির প্রচলন না করিলে ইহাতে অতিরিক্ত

খরচ হয় বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও অনেক ইহাতে ভত উৎ-সাহিত হইবে না।

৫। এই প্রদেশে কার্পাস-চাষের ব্যাপক প্রচলন দুতনভাবে হইতেছে বলিয়া কল-মুল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কার্পাস-সংগ্রহে ব্যয়িত হইবে। যে সকল প্রদেশে কার্পাস হর তথায় মগধ টাকা না দিয়া মগধরা চার-পাঁচ সের কার্পাস মজুরীতে বেওয়া হয়। এখানে লোকে একায়ে অনত্যন্ত বলিয়া দৈনিক /৫ পাঁচ সের আশ্রয় কার্পাস সংগ্রহ করিবে। এ কার্যে ঠিকা মজুরীতে বধাসত্তব জীলোক ও অন্নবরকদের নিযুক্ত করিয়া খরচ কমান যায় কিনা চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। দেশে আশাহ্রমণভাবে কার্পাস-চাষের প্রসার এখনও হয় নাই। বর্তমানে বিদা খরচার বীজ ছাড়াইয়া তুলা বিক্রি করিয়া উৎপাদকগণকে বধাসত্তব লব্ধ মূল্য পরিশোধ করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা থাকা পর্য্যন্ত বাহাতে বৃদ্ধি হিসাবে এক শ্রেণীর লোক এই কার্য অবলম্বন করে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমানে পাট-বাদ্যের মত এদেশে অল্প পরিমাণে ইহার বিক্রির মত বাধার নাই। লব্ধে বিক্রির ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কার্পাস-চাষ এখানে হারী হইবে কিনা বলা কঠিন। এবারকার ৩৫০০ একর কচিতে উৎপাদিত

অনুভূত: ১৪০০০ মণ কার্পাসে ৪৫ মণ হিসাবে (জুলায় মণ প্রায় ১১০) ৬,৩০,০০০ মূল্যের মধ্যে মণকরা মূল্যকরে ৫ হিসাবে কার্পাস সংগ্রহ ও বিক্রির ব্যবহার জট মজুরী বরিলে এই উদ্দেশ্যে ১০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। কাজেই এখন হইতে নিয়মিত প্রচার করিলে এ প্রকার কাজে বহু লোক যে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। কার্পাস-চাষের আরব্যার বিষয়ে একটি হিসাব সংগ্রহ করা আবশ্যক। জমি প্রভুত, বীজ বপন ও পরবর্তী কাজ—কলসসংগ্রহ প্রভৃতি বাবদ বিভিন্ন সময়ে কত খরচ হয় বিভিন্ন উপাদানের নিকট হইতে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব লওয়া এবং কার্পাস-চাষের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের মতব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। কার্পাস-উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধিস্বাধীন ব্যক্তিদের লইয়া এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করিলে কি ভাবে চাষের খরচ কমানাইয়া ইহার আর বাড়াইবার তাহার পন্থা স্থিরীকৃত

হইতে পারে। আমেরিকার কার্পাস উৎপাদনকারী সমিতির লোকদের (Cotton Growers' Assn.) মধ্যে এভাবে আলোচনার কলে তথ্য কার্পাস-চাষের অনেক উন্নতি হইরাছে।

৮। কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর এই মূল্যবান মিশরী কার্পাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশ: ইহার উৎকৃষ্ট বীজের পরিমাণ বাড়াইয়া চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা আবশ্যক। এভাবে দেশে পার্কারী প্রভৃতি লম্বা ঝাঁপের কার্পাস চাষের পরিবর্তে এই অর্থকরী কলসের প্রবর্তন সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। ইহা করিতে পারিলে প্রচুর লাভ কেবল সাধারণে হারী ভাবে ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইবে। এখন মিহি কাপড় প্রভৃতির উপযোগী কার্পাস এদেশে জন্মে না। মিহি কাপড়ের চাহিদা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এই কার্পাস বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া দেশে উৎপন্ন করিতে পারিলে চাষীদের ও দেশের প্রভুত কল্যাণ হইবে।

ছোট ঘর

ক্রীসাবিজীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোথার তোমারে মিরে হারিরে পেলাম ;
অচেনা পথের মাঝে কুড়ারে পেলাম
হবেও বা আর কারো হারাম মাপিক,
চেনা চেনা মনে হল অচেনা ধানিক।

তবুও হ'লনে তাই কুড়ারে মিলাম,
মূল্য হারাই পাছে তোমারে মিলাম।
আমাদের ছোট ঘর, ছোট এ উঠান,
এক কালি আকাশের ছোট ব্যবধান
বুচাতে পারি না তাই সরবে মরি,
তুমি যে রয়েছ মোর হৃদয় তরি।
আকাশের এত আলো, এত অবকাশ,
তার মাঝে তবু বেম পড়েমাক' বাস।

তুমি আহ কাহে কাহে, বাহিরে জনতা,
সেবার কলহ বাকে, ভিতরে মনতা।
একখানি ছোট ঘর, মোরা দুই প্রাণী,
বাতাসে ভণিতে পাই চলে কানাকানি।

হারাম মাপিক কা'র পেয়ে হারামাম,
কিবা ভাতে আসে বার ? আজ ঠাণ্ডালা

মুখোমুখি হইলনে আভিয়ার এসে
মাথার উপরে চাঁদ গলে পড়ে হেসে।

ছোট ঘর তাই তুমি বাহিরে এলাম,
পরিসর ছোট তবু ঠাই ত পেলাম।
সীমানা হারারে বার হাতারে বেয়াল
যেখি ঘুরে পড়ে আছি, হয় নি বেয়াল।

সবুবে অশেষ পথ, মাথার আকাশ
সীমা নাই, শেষ নাই, আলোর আভাস
কোনোখানে কিছু নাই, দু'খু মরীচিকা,
তবু বেম মনে হয় কোনো অবাসিকা।
আমারে তুলাতে চার, কাঁধে তোমারে,
এ বেলা লাগে না ভাল, আলোকে-আধারে।
তবে চল কিরে বাই সেই ছোট ঘরে
হ'লনে সাক্ষারে তুমি প্রেম বয়ে বয়ে।

সে প্রেমে বাসর-মন্ডা সে প্রেমে মূগুতি
সুগন্ধে তরিতা দিবে মিলন-আরতি,
হ'লনে কিরিব চল, থেকো না একেলা,
চল বাই কিরে বাই শেষ ক'রে বেলা।

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

ব্রহ্মচারী রমেশ

‘প্রবাসী’র প্রাচীন সংখ্যায় “বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার” লব্ধে আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্ববৈশ্বের চারি ভাগ সন্ন্যাসী-সমাজ বহির্ভারতে ভারতের মহান্দ বাণী প্রচারের জন্ত ভারত সেবাপ্রদ সঙ্গ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা হকিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে বহির্ভারত দ্বীপে অবতরণ করেন। তাঁহাদের প্রেরিত পত্রাদিতে প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক পরিবেশ, রাজনীতিকক্ষেত্রে তাঁহাদের সাকল্য এবং আর্থিক উন্নয়নে তাঁহাদের প্রচেষ্টা লব্ধে আমরা যে বিবরণ পাইয়াছি তৎসম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বহির্ভারত ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব তেত্রিশ শত মাইল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের আয়তন ১১২ বর্গমাইল লোকসংখ্যা সাত্বে চারি লক্ষ; ভাষা হিন্দু আড়াই লক্ষেরও অধিক। দ্বীপটি পার্শ্বভাগে, অধিকাংশ স্থানই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮ শত থেকে ৩ হাজার ফুট উচ্চ। এই স্থানের আদিম অধিবাসিগণকে ফিরল বলে এবং তাহাদের ভাষা ফিরল নামে পরিচিত।

বহির্ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিকগণ এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে। তখন এই স্থানে লোকবসতি ছিল না। বৈদিক নাবিকের দ্বারা তাহাদের এই দ্বীপটির দারকরণ করা হয়—ম্যানকারেন। ভৌগোলিকগণ ইহাকে কারনি আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইহার কতকংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া হল্যান্ডের সুব্রাহ্মণ্যের নামে এই দ্বীপের নাম রাখা হয় “বোরনিং”। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ এই উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস আনাইয়া দ্বীপটিকে বসবাস ও কৃষির উপযোগী করিয়া গতিয়া ভূমিবার জন্ত সচেষ্ট হয়। অবশেষে এই স্থানের কোম প্রকার উন্নতি হইবে না মনে করিয়া তাহারা তাহাদের গতিয়া ভোলা গুহাবি ও উপনিবেশের অভ্যন্তর দ্বারা ভাঙা ভাঙা করিয়া চলিয়া যায়। ওলন্দাজগণ এই দ্বীপ ত্যাগ করিলে ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ইহা করাসী অধিকারে আসে এবং ইহার নতুন দারকরণ করা হয়—“লেডি কাস”। করাসীগণের অধীন চেষ্টার এই ক্ষুদ্র উপনিবেশ ক্রমশঃ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। এই সময় ইংরেজগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে নতুন পাতি দিতে শুরু করিয়াছিল। তাহাদের নতুন দ্বীপ ইহার উপর পড়িল। ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতগামী একটি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অভিযানগণ কর্তৃক এই দ্বীপটির ক্রয়বন্দ

অধিকৃত হয়। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তির ফলে দ্বীপটির শাসনভার সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশের অধিকারে আসে এবং এখানে করাসী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশের অধিকারের পর দ্বীপটির নাম দেওয়া হয় বহির্ভারত।

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে প্রবাসিকার ক্রীতদাসপ্রথা রহিত হয়। তখন আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাসরূপে প্রমিত আনয়ন বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে প্রমিত সংগ্রহ করিতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই বহির্ভারত, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কিঞ্চিৎ প্রকৃতি স্থানে ভারতীয়গণের আগমন আরম্ভ হয়। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বহির্ভারতের সর্বপ্রথম বিহার, মুজাফফর ও মাদ্রাস হইতে প্রমিত আনয়ন করা হয়। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় প্রমিতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ হাজার। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে জন-ভার্সন কমিটি বহির্ভারতের জনসংখ্যার বহুলতা, কৃষির উপযোগী কৃষির বহুলতা, কলোনিয় আর্থিক বিপর্যয়, প্রমিতের সংখ্যাধিক্য এবং তাহাদের প্রমিতবুদ্ধতার ওজুহাতে ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধভাবে প্রমিত আনয়ন বন্ধ করিবার সুপারিশ করেন। ইহার ফলে কিছুদিনের জন্য প্রমিত আনয়ন বন্ধ থাকে।

বহির্ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ ৮০ হাজার; ভাষা ভারতীয় হিন্দু—২ লক্ষ ৩০ হাজার, মুসলমান ৬৭ হাজার, ভারতীয় খ্রিষ্টান ১০ হাজার, চীনা ২৫ হাজার, করাসী ১০ হাজার এবং আফ্রিকান ও বৈদ্য প্রায় দশ লক্ষ।

এই স্থানে অধিবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা ইক্ষুচাষ। এই ইক্ষুচাষের জন্যই ভারতীয় প্রমিতগণকে এই দেশে আনয়ন করা হয়। এই দ্বীপে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন অপেক্ষা কিছু বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইক্ষু হইতে পর্করা উৎপাদনের কলগুলি করাসীদের একচেঁটা এবং ইক্ষুচাষের কৃষির অধিকাংশও তাহাদেরই। কাজেই করাসীগণ এদেশের প্রকৃত বনী এবং প্রবাসিকার আর্থিক উন্নতি তাহাদের উপর প্রায় বোল আলা নির্ভরশীল। মুসলমান ও চীনারা এদেশে ব্যবসাকেজে অগ্রসর। অম্যান্য অনেক মসীজীবী, আবার অনেক কৃষি-শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে বহুসংখ্যক ভারতীয় হিন্দু ব্যবসাকেজে দাঁড়িয়াছে। তবে অধিকাংশ ভারতীয় হিন্দু কৃষিকেজে অথবা পর্করা উৎপাদনের কলের প্রমিত। হিন্দুগণের মধ্যে বসিকজেই মাই বলিলেও চলে। তাহারা বেশীর ভাগই বহির্ভারত। তাহাদের কৃষি-প্রাচীরে চতুর্দিকে কিছু কিছু কৃষির উপযোগী কৃষি আছে দাঁড়। বৎসরে আট-নয় মাস দ্বীপপুঞ্জ সকলেই কোম-না-কোম কার্যে

নিরুক্ত থাকে। প্রতিদিন এক একট পরিবারে দ্বী-পুরুষে পাচ-ছয় টাকা উপার্জন করে। বৎসরে তিন মাস কাল শ্রমিকগণের প্রায়ই কাজ থাকে না। বর্ডমানে জমসংখ্যা যুধি পাইতেছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও অবনতির দিকে। তাহাদের তাগে পুষ্টিকর খাদ্য খুব কমই কোটে। ইহার উপর প্রায় অধিকাংশ লোক বড়পানাসক্ত। বড় খুবই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। ওদিকে কিন্তু উৎপন্ন গমের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়। কল ও শাকসব্জী প্রচুর জন্মে। গৌ-হুই এখানে প্রতি সের ১০০ মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। প্রায় সকলেই চা পান করে।

কন্নাসী ভাষা এখানকার রাষ্ট্রভাষা ইহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রায় সকলেই কন্নাসী ভাষায় কথা বলে। সংবাদ-পত্রগুলি কন্নাসী ভাষায় মুদ্রিত হয়। বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র কন্নাসী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দী ভাষায় অহরাসীনের বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠের শেষে পুথক ভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া হয়। আফ্রিকান প্রভৃতি অভ্যন্তর অনেক অধিবাসী কন্নাসী ভাষায় অপজ্ঞানকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। বর্ডমানে হিন্দীর বহুল প্রচারের লক্ষ্য ভারতীয় প্রচারকগণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের প্রচেষ্টার হিন্দী অবতারণা ও পত্রীকার অত্যন্ত বিস্তারিত পুঙ্খ হইবে বলিয়া মনে হয়। অন্তর্য সমস্তের মধ্যে এখানে হিন্দী-ভাষায় কয়েকজন কবি ও লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। দুই-একটি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। এখানে কেবলমাত্র প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশিক্ষার্থীদের ভারত অথবা ইংলও বাইতে হয়। সেইজন্য উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখানে বিরল।

আমাদের দেশে যেমন বর্মীর অসুষ্ঠামাদি প্রতিপালিত হয়, এখানেও তেমনি কোন কোন স্থানে বর্মীরা পাঠ-ব্যাবসাদি হইয়া থাকে। এখানকার শ্রমজীবী হিন্দুগণও ইহাকে পুণ্যকর্ম বলিয়া মনে করেন। বর্মীভরিত-করণ এদেশের একটি লক্ষণীয় বিষয়। বহু হিন্দু আর্থিক উন্নতি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির লক্ষ্য প্রলোভনে পড়িয়া বর্মীভরিত হয়। জনগণের মধ্যে হিন্দুদের মহান্ ভাবনারানুহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইলে হিন্দুগণকে ভিন্ন বর্মীবলবদের হাত হইতে রক্ষা করা বাইতে পারে। স্থানে স্থানে গঙ্গমচুর্বা বিশাল সীর্বা রহিয়াছে। এই স্থানের অধিকাংশ খ্রীষ্টান ক্যাথলিক মন্ডলারের। খ্রীষ্টানগণ সীর্বার আত্মক বা নাই আত্মক, মিশ্রিত মন্ডলার বিশেষ শ্রদ্ধা-লক্ষ্যে সীর্বার বার ও প্রার্থনাদি করে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুদের সাধারণ উপাসনার কোন নির্দিষ্ট স্থান এখানে নাই। অথচ ভারতের বাহিরে সর্বাঙ্গেকা অধিক-লংখ্যক হিন্দু এখানে বাস করে। সীতাতনন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রহ আছে; বাহিরের আগন্তুকগণ এখানে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করে।

শাসনতন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ভারতীয় হিন্দুদের অধিকার মণ্ড্য নয়। এখানে প্রকৃত প্রস্তিতি



ইক্ষুক্ষেত্রে এখানী ভারতীয় শ্রমিক

হইতেছে। গত ১৯৪৮ সনে এখানকার শাসনতন্ত্রাহারী মৃত্যন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক মরমারী বাবীন মত প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে। কলে ১৯ জন লবন্তের মধ্যে ১১টি আসন হিন্দুদের লক্ষ্য সংরক্ষিত হয়। অবশিষ্ট ৭ জন স্থানীয় জীৱল এবং ১ জন ইউরোপীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত হইয়াছেন। এই স্থানে জন্মঃ রাজনৈতিক চেতনা প্রাপ্ত হইতেছে এবং শ্রমিকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

মরিশাসের ইতিহাসে ভারতীয়গণের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানী ভারতীয়গণের প্রাণপণ চেষ্টার ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি আজ সুসংহত। চাষের জমি বাড়িয়াছে, গ্রামের সংখ্যা বাড়িয়াছে এই ভারতীয়গণেরই অধ্যবসায়ের কলে। আবার রেলপথ এবং পর্কতের ভিত্তর দিরা রাস্তাঘাট নির্মাণ, অললাকীর্ণ স্থানে শহরের গড়ন—সবই ভারতীয়দের চেষ্টার কল।

মরিশাসের পারিপার্শ্বিক দৃষ্টিও মনোরম। ভারত সেবাপ্রম সন্মের সাংস্কৃতিক মিশনের সত্যগণকে অত্যর্ঘনা জাপনের লক্ষ্য শহর হইতে ২৫ মাইল দূরে মিউগ্রোভ নামক স্থানে একটি সত্যার আয়োজন হয়। এই ২৫ মাইল পথ অভিক্রমের সময় মিশনের অত্যন্ত লম্বা ব্রহ্মচারী রাজকৃক এই স্থানের দৃষ্টাবলীতে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—“চিরহরিং পর্কতময় দ্বীপের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে করিতে আমরা মিউগ্রোভ অভিমুখে চলিয়াছি; কোথাও রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সারিবদ্ধ আখের ক্ষেত, আবার কোথাও লম্বা বনরাজির অত্যন্ত সুসংহত শহর। প্রত্যেক শহরের সৌন্দর্য্য যেমন কোন চিত্রকরের সুমিণুণ তুলিকা-ল্লপ্নে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে ‘বাংলো’ প্যাটার্নের

হোট হোট বাড়ী ; প্রসন্ন অঙ্গনে নানা প্রকার নান্দ-না-নান্দ
সং-বেরঙের ফুল ও পাভাবাহারের গাছ। এক প্রকার
হোট সারিবদ্ধ বীণের স্বাক্ষর বিরাট প্রাঙ্গণ ভরা বাৎসল্য
যেরা। এখানে বর্ণবৈবন্ধ্য না থাকায় যে-কোনও
হানে ভারতীয়গণ বাস করিতে পারে। শহরের বহু
হানে যেতান ও ভারতীয়গণকে পাখাপাখি বাস করিতে
দেখিলাম। তবে যেতানদের অল্পসংখ্য ভারতীয়গণকেও
বাংলা করিতে হয়।”

ভারতীয়গণ দীর্ঘকাল বাবং হাডুহুবি হইতে বহু দুঃখভর্তী
এই দেশে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আচার-আচরণে
পরিবর্তন ঘটাইতে। ভারতের মহানু ঐতিহ্যের কথা তাহারা
ভুলিতে বলিরাছে। কিন্তু এই দুঃখ প্রবাসে থাকিয়াও তাহা-
দের বেশেয়ে ভাটা পড়ে নাই। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের আগমনে
তাহাদের মধ্যে অতীতপূর্ব জাগরণ দেখা গিয়াছিল। স্বাধীন
ভারতের লব্ধিছু আশিবার ভর তাহারা উৎসুক ; সন্ন্যাসী-

প্রচারকদের দিকট তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্তব্য পতিত
কবাহরণাল, এবং সর্বদা প্যাটেল-এ নবদে নানা কথা আনিতে
চার ; যেতানীর সংবাদ আনিবার ভর তাহাদের কতই না
আগ্রহ।

শিশুদের সন্তানগণ রাজ হুই দিন এই বীণে অবস্থান
করিয়াছিলেন। তাহারা প্রাঙ্গণের প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা
পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভারতের মহানু আদর্শের
প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া ভুলিবার প্রয়াস পান। স্বাধীন ভারতের
সর্বদা ত্যাগ ও সেবা, বৈজ্ঞানিক ও শান্তির আদর্শ প্রচারের
উদ্দেশ্যেই ভারত সেবাস্রম সন এই প্রচারকবাহিনী বহির্ভারত
প্রেরণ করিয়াছিলেন।

• সাংস্কৃতিক শিশুদের সন্তানগণ গত ১৯৫০ সালের ১২ই
ডিসেম্বর মরিশাস বীণে অবতরণ করেন। ঐ সময় সর্বদা
প্যাটেল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রবাসদলী।

উদ্ভাস

ঐরাজকিংকুমার সেন

অকস্মাৎ চেয়ে দেখি আকাশে উড়েছে চিল
যেখ ফেটে গেছে।
অন্ধকার স’রে গিয়ে জ্যোৎস্না মেঘেছে।
পূরনো বিষয় দিন : শোণিতসিক্ত দিন
অপসন্ন আঁখ ;
জ্যোতির আভাস আগ্নে, ক্লান্ত চোখে কিয়ে আসে
আলোর বরষা।
যেখ ফেটে গেছে আঁখ যেখ স’রে গেছে,
মহির মগ্ন হেতে রজনীগন্ধা-বনে
জ্যোৎস্না মেঘেছে।

এমন চাঁদের দিন দেখিনি কি আর বার
সুখ-পূর্ণিমা।
এমন জ্যোৎস্না সে কি হানে নি কো প্রেরণীর
হাসির আভাস।

ছিল তো ঐতিহ্য মীল
আলো-হাসি অব্যবহিত
আমাদের অভিষেক প্রাণ-পঙ্কজে,
ভারপর কোথা কবে
যেখের পাঁচড়ে সে কে
হুঁছে ছিল সব তার শোণিতাকরে।
ইতিহাস তোলে নি তো, বত করি কমা,
বহু ব্যথা বহু অশ্রু
পাতা ত’রে আঁখ তার হ’রে আছে ভরা।

এসেছে আলোক,
অকস্মাৎ উদ্ভাসিতা ওঠে মনোলোক ;
অজস্র হৃদয় শিলা শেরিয়ে আবাস
স্পর্শ পাই দ্বিভ এক সব পূর্ণিমা।
যেখ ফেটে গেছে আঁখ যেখ স’রে গেছে,
মহির মগ্ন হেতে রজনীগন্ধা-বনে
জ্যোৎস্না মেঘেছে।

প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ঐশ্বখাংশুমাহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঙ্গ ও আধিন নামের 'প্রবাসী'তে ঐশ্বজ্ঞ গদ্যশব্দে বিবাসের (সাতাল) "বিবর্তনে কামতা রাজ্য" প্রবন্ধটির শিরোনাম দেওয়া মনে হইয়াছিল যে, প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধেই তিনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। এই মূলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া জানা গেল—বৰ্ধমান কোচবিহার রাজ্যের ইতিবৃত্ত সকলমই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে প্রাচীন কামতা রাজ্য সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিতেছি।

কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে যে, মরুত বিবেহরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করিয়া কিরাতরাজ খোঁটককে নিহত করেন। মঃ মঃ পরমাণু বিজা-বিমোদের মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে বহু জ্ঞান ও কার্যের বাস ছিল। হিউয়েন সাং এখানে শত শত দেবমন্দির এবং মন্দিরায় কবিত ভাষার সহিত কামরূপীয় ভাষার বর্ণেই লক্ষ্য দেখিয়াছিলেন। নিধানপুর তাম্রশাসনে তাকর বর্ণনাকে "প্রকৃষ্ট আৰ্য্য বর্ণের মরুত ও শশিশেখর প্রিয় শিলাকিনের ভক্ত" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ধমান বর্ধদেবের প্রথম তাম্রশাসনেও প্রথমে প্রণাম করা হইয়াছে তাঁকে যিনি আদিদেব অর্ধ হুবতীধর, ধীর গলায় এক দিকে ঘোলে লীলাপদ, অত দিকে উত্ততকণা সর্প, ধীর বরবপুর এক দিক হুবতীমূলত শুভভারনত্র, আর এক দিক তাম্রাঙ্কিত—যিনি শূদ্রায় ও রোজরসের প্রভীক। বাণ এবং অনিষ্টক-উষার কাহিনী, উলুপী ব্রহ্মবাহন চিঙ্গাদহার কথাও আরও পড়িয়াছি। বর্ধন রাজবংশের পর স্রেষ্ণবংশের শালভুগ রাজারা কামরূপে রাজত্ব করেন, তাহার পরে আসেন পালেয়া। বঙ্গদেশের পালেদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানা নাই—ইঁহাদের বলা হইত ভৌর পাল ও বারাহীপাল। শালভুগ বংশের রাজারা "কামেশ্বর মহাপৌরী"র উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেখরের মন্দির তাঁহারা ই নিৰ্ম্মাণ করেন।

কামরূপে এই সময়ে লুইপা, সরহপা, মীনপা, গোরকপা কামপা, ভিন্নোপা, ভাঙ্গিপা, কহুরী, ভুসুর, ভোদী প্রভৃতি চৌরাসী সিংহাচার্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। জিয়ার্স-সংগৃহীত গাণিকচক্রের গান, মরুমামতীর গান কামরূপেও প্রচলিত ছিল। ডাঃ শহীদুল্লাহের মতে হিন্দী, মরাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতেও নামগীতিক পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষার "তেজুরে" ত আছেই। কালিকাপুরাণ ও যোগিনী-তন্ত্রে যেখানে বার যে, ঈশ্বর দশম-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-রাবনে বিকৃত ভদ্রবাহ, সহজিবাহ ও নাগবাহ কামরূপে

বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিতদের মতে আসামে প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অষ্ট্রিকভাষী জাতিদের সময়ে। মাতৃ-ভদ্রপ্রধান কবিপ্রধান গ্রামীণ সভ্যতাই অষ্ট্রিক সংস্কৃতির বাহক ও বাহক। বহু যুগ পরে এই মাতৃভদ্রবাহ সহজিয়া ও বৌদ্ধ ভাস্করিকতার শক্তিবাদের সহিত বেমানাম মিশিয়া গিয়া কামরূপী সভ্যতাকে এক নতুন রূপ দিয়াছিল। দেবী কামাখ্যা তাহারই প্রভীক। তাঁহাকে অষ্ট্রিক ভূমতাই বলি, (কা-মেই-বা-ই) বলি বা শক্তির যোগিনী-পীঠহানই বলি মূলে তিনি এক আৰ্য্য-অনার্য্য অষ্ট্রিক বড়-সংস্কৃতির মিলিত প্রকাশ। কোচবিহারের আই পুঁকা তৎকালীন শক্তিপুঁকারই চিহ্ন।

অহমকোষে আসামকে বলা হইয়াছে পণ্ডিত কার্যের দেশ বা কলিতা কিংবা কুললুপের দেশ। এইরূপ কিয়দমতী আছে যে, পরম্পরায় বহন তাঁর কজিরমিষন বড় আরম্ভ করেন তখন কামরূপের রোব হইতে পরিজ্ঞান পাইবার জন্য অনেক কজির নিজেদের কলিত বা কুললুপ বলিত। গুপ্তদের সময় "প্রাগ্-জ্যোতিষভূজি" গুপ্ত সম্রাটদের শাসনাধীন একটি প্রদেশ ছিল। বর্ধমানের সময়ও কামরূপ পালসম্রাটদের প্রভাবাধীন ছিল। কবিশরঙ্গের কবিতার লক্ষণসেনদেবের কীৰ্ত্তি-বর্ণনার কামরূপের উল্লেখ আছে—

"জ্যোতিষ পৌতলক্ষ্মীং জয়তি

কলিমাঙ্কং কলিমাং

বিমরুতে কামরূপাভিমানং।

কালিদাসের রত্নর সিরিষরঙ্গসঙ্গেও কামরূপের উল্লেখ আছে।

দান্দ্যার অনুশাসনে বর্ণিত রাজা যশোবর্ধের সাজাজ্যও-কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যমতীর শিঙা হর্ষদেব তদন্তবংশ-জাত বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার বামী লিঙ্কবীরা ক বিত্তীর জয়দেব গৌড়, ওড়, কলিক ও কোশলাধিপতি ছিলেন।

পৌড়াধিপ রামপালের সময় কামরূপ বিজিত হয়। বাঙালী সেনাপতি-প্রতিষ্ঠিত মরুমামত আত্মও কামরূপ বিজয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। নৃপতি তিল্যদেব সারভদ্র বীকার করিয়া বর্ধমান তেজপুরে (বাণরাজ্যের শোণিতপুর) রাজধানী পরিবর্তিত করেন। তিল্যদেব পৌড়সাজ্যের অবীমতাপাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে পৌড়রাজমন্ত্রী-পুত্র বৈভদেব পুনরায় কামরূপ বিজয় করেন। বৈভ্যদেব প্রথমে রাজপ্রতিনিধি ও তাহার পরে বাবীম তাবে কামরূপরাজ্যের পশ্চিম দিকে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজ্যই কামতা রাজ্য। বৈভ্যদেবের পর রারিদেব, তাকরদেব, বরুতদেব, পুণ্ডুদেব প্রভৃতি কয়েকজন মরুপতির নাম পাওয়া যায়। এই সময়

বাংলাদেশে সেমরাজ্যের প্রতিপত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের মতে গৌড়ালপাড়া জেলার অভয়াপুরীর সন্নিকটবর্তী লালমাটির ধ্বংসাবশেষ এই স্থানের। হলেবরের নৃত্যপরাগণ গণেশ ও ভদ্রা এবং তেজপুরের স্বর্ষ্যবৃষ্টি বাংলার ও কামরূপের সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয়। ঢেঁকবীর ঈশ্বর ঘোষ কামতারাচ্যের একজন সাক্ষ্য দরপতি ছিলেন। পৃথুদেবের রাজত্ব পৌনঃপুনিক মুসলমান অভিযানের ভয় বিখ্যাত। প্রথমে মুসলমানরা পরাক্রম হইয়া পলাইয়া যায় এবং তাহার আরক-রূপ পৌহাটির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে কামাই বরশিবোরা নামে পাখাণ-পাঞ্জে বোধিত একটি শিলালিপি আছে :

“শাক্যে ভূরণে যুগ্মেণে মধুসান জরোদশে
কামরূপং সমাপত্য ভূরভাঃ করমারমুঃ।”

পৃথুদেবের রাজ্যের পর কামতারাচ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কায়স্থ ক্ষত্রিবংশ পশ্চিম দিক অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমানদের আত্মগত্যা বীকার করেন। পূর্বে অংশে অর্থাৎ ময়ং ও কামরূপ জেলার পূর্বভাগে প্রাচীন পালবংশের বারাহীশাখার রাজারা পুনরায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাবারণকার মাধব কন্দলী এক মহামানিক্য বারাহী রাজার সত্যকবি ছিলেন। এই বারাহী রাজা জিপুরাধিপতি, করমীরাধিপতি বা কামপুররাজ তাহার সঙ্গিক নির্গণ এখনও হয় নাই।

কবিরাজ কন্দলী যে আশাকে সে বুলি কর
মাধব কন্দলী আরো নাম
সগোনে বাচিতে মঞ্জি জামে কার বাক্যে মনে
অহমিষি চিন্তো রাম নাম।

ক্রীষ্ণমহামানিক্য বারাহী রাজার অহরোবে তিনি রামায়ণ রচনা করিলেন।

জরোদশ শতাব্দীর কামতাপুরাধিপতি হর্লভনারায়ণের নামও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে খল খল করে। “কামতা-মণ্ডল, হর্লভনারায়ণ, মৃগবর অহুপম”—তাঁহার রাজসভার হেম-সরস্বতী ও হরিহর বিপ্র নামে দুই জন কবি ছিলেন। হেম-সরস্বতীর প্রজ্ঞাদ-চরিত্র বিখ্যাত :

মৃগশিরোমণি দেব মহামানী
হর্লভনারায়ণ রাজ।
তাহানু ভবন ইন্দ্রনারায়ণ দেব
মহাবীর বীর বতাব গভীর
মিতে কৃত্য হরিদেব।

হর্লভনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ “পাক পৌরষের” ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে ছোটশিলা নামে এক গ্রামে কায়স্থপ্রবর চক্রপাণি শিকদারের পুত্র কবিরায় সরস্বতী নামে আর এক কবি ছিলেন। তিনি মহাত্মারতের জ্যোৎস্না কর্তব্য করেন।

জ্যোৎস্না কর্তব্য
কৌতুহলে নিপদতি

এই সময়ের রচিত পত্রপুস্তান নামে একটি আধ্যাত্মিক পাণ্ডুরা যার বাহাতে হাঙ্গেন হলেমের সহিত দেবী পদ্মাবতীর ভক্তদের বোর যুদ্ধ হয়। হাঙ্গেন হলেম বাংলার হলেম শাহ।

আই পুজার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমস্ত কামরূপ জুড়িয়া, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে (যেমন ফুলবাড়ী) আই পুজার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কাছাড়ীদের বুঢ়া বুঢ়ী (হরধার্মভী) কেচাইখাতীর ভাত্রেখরী, কামাখ্যাপুজার প্রচলন, কদম্বের কাহিনী, বারভুঞার আইগোলানী পুজা প্রাচীন অষ্ট্রিক মাতৃভবাদের সহিত ভক্তোক্ত শক্তিপুজা মিশিয়া এক মাতৃভববাদে পরিণত হইয়াছে। তখন কামরূপের সীমানা ছিল :

জিংশদ্ যোজম বিতীর্ণ লীর্ধেন শতযোজমং
কামরূপং বিজানাহী জিকোণাকারমুত্তম
মেপালভকাকমাত্রি ব্রহ্মপুত্র সন্মম
করতোরাং লম্বাশ্রিত্য বাবদিকরবাসিনী।

বৌদ্ধভাস্করিক বজ্রযোগিনী সাধনার অর্থাদানের পদ্ধতিতে লিখিত আছে :

“পশ্চাৎ পুমরশি ওজিরান পূর্ণগিরি কামাখ্যা সিরিহট
ইত্যমেন পুজয়েং ওঁ ওঁ ওঁ সর্ববুদ্ধ ভাকিনীয়ে
বজ্রবর্ণনীয়ে বজ্র বৈরোচনীয়ে, হুং হুং হুং কট কট কট
বাহা। (সাধনমালা গাইকোয়াক সিরিক দ্বিতীয় ভাগ ৪৫৩ পৃ.
সাধনসংখ্যা ২৩২।)

ওঁ কামরূপ বজ্রপুণ্ডে বাহা
ওঁ জীহট বজ্রপুণ্ডে বাহা
ওঁ মম সর্বগুরু বুদ্ধবোবিসত্ত্ব বজ্রপুণ্ডে বাহা।

ভক্তসায়েও মূল্যবোধে কামরূপের উল্লেখ আছে। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মগধ গৌড় প্রভৃতি দেশ হইতে বিতাড়িত অনেক বৌদ্ধসন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে হুজীনের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কামাখ্যা শক্তিপুজার পাদপীঠ—প্রাচীন অষ্ট্রিক মাতৃভবাদের বোধিপুজার সঙ্গে মিশিয়া বিকৃত ভক্তবাদ এক ধরনের মাতৃপুজার আরোহণ করিয়াছিল। কিছু অমার্য-প্রভাব, কিছু লিদপুজা এবং শৈববাদও মিশিয়া গিয়াছিল। বৈদিক ক্রমকে অমেকে Syncretic দেবতা বলিয়া অভিহিত করেন। ক্রমকে বলা হইত বজ্রবর্ণ। কীথের মতে, তামিল ভাষার শিব বলিতে বুঝাইত বজ্রবর্ণ মাহু। ক্রম ছিলেন অমার্যদের দেবতা, পতপালম তাঁর পেশা। ক্রমের পতপতি নাম কি তাহাে আসিল ঐতরের ভ্রাতৃপে তাহার কাহিনী আছে। ঋগ্বেদে ক্রমকে পতপ বলা হইয়াছে। পৌত্তিল গৃহস্থের ক্রমের হান পশ্চাতে। বর্কুর্কবীর শক্তকরীয় ভোজে ক্রমকে দত্ত্য বকক ভক্তর প্রকৃতির প্রিয় দেবতা বলা

হইরাহে। আবার উপনিষদে কল্পকে পরম ভূতরূপেও বোধি।

অসমীয়া সাহিত্যে “আইয় মাম” বলিয়া কতকগুলি প্রাচীন কবিতা আছে। এই আই “হুইয়ার পুতলা” তাঁর অপর নাম শীতলা “দি বোরা বুক জুয়াই”—তাকে পেলে বুক জুড়িয়ে যায়। তক্ত পোশানী জিজ্ঞাসা করিতেছে—
কি দিরা তোমার পুকা করিব—কল, হুণ, বন, বল, অর, বন, বন, চিত্ত—আই উত্তর দিতেছেন,

যেই বস্ত দিও মাত্ সেই বস্ত চুবা

আপোনের নামে মাত্ লঙঠ হোবা।

আইকে বলা হইতেছে :

আই ভগবতী আই, তোমার মাম স্মরী নাই।

অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকা এইরূপে কুরা বেড়াই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “আইদেবী” অম্বিকা, চণ্ডিকা, ভবানী কালিকারই অত রূপ। দিনের শেষে পোখুলিতে মহামায়া রূপে আই আসিতেছেন। সোমার বাঁশি বাজিতেছে, তাঁর হাতে কমলের কুল “হুইয়াটল পেলাই দিছে সুখিল কুলর মালা”।

এক দিকে মুসলমানদের আক্রমণ, অত দিকে তাইশাখার অহমদের আগমন, অভ্যর্থনা, হুঁঞাদের গৃহবিবাদ সমস্ত

কামতা এবং কামপুৰহাণ্যকে হ্রিভিন্ন করিয়া নক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময়েই চিকনা নামক হায়ে গোয়ালপাড়া জেলার বড়কাটীর কোচ-মুণ্ডি বিশ্বসিংহের অত্যাচার হয়। ঈতি-রামায়ণ ও বেহলা আখ্যান রচয়িতা কবি হুর্গাবর কোচবিহারবিপতিকে ‘কমতা-ঈশ্বর’ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন :

কমতা ঈশ্বর বলে। বিশ্বসিংহ মুপবর

আটচলিশ মহিষী বলে। ওঠর কোঙর

মিজের বিবরণ লব্ধে তিনি বলিতেছেন, “ক্রীকারহ চন্দ্রবর ভামপুৰ হুর্গাবর, বিরচিল পিত বিতোপন”। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। তিনি নব্য আসামের কামতাতা বলিলেও অত্যাচারিত হইয়া না। তিনি শুধু তক্ত, সাধক, হুণ-প্রবর্তক বিরাট পুরুষ ছিলেন না, কবি, সুরকার, পাঠক ও নাট্যকারও ছিলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবন কোচ-মুণ্ডিভেদে আশ্রয়ে কাটান ও সমগ্র কোচবিহারে তাঁহার প্রভাব সঞ্চারিত ছিল। কথিত আছে যে, বীর চিলাবীর (ভক্তদ্বন্দ্ব) তাঁহার আশ্রয় কামলপ্রিয়া দেবীর মূৰ্ত্তে শঙ্করদেবের “পামর মন রামচরণে চিত্ত দেহ” এই গানটি শুনিয়া শঙ্করদেবের ক্রীচরণে আশ্রয় লয়। কামতা রাজ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করমোসা

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

সম্প্রতি ভারতবর্ষ জাপ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে ও সাম-জাতিসংঘে শান্তি-সম্মেলনে যোগদান করিতে অধীকার করিয়াছে। এই অসম্মতির অন্ততম কারণ হইতেছে কর-মোসাকে চীনের হাতে প্রত্যর্পণ না করা। ভারত-সরকার মনে করেন যে, শান্তি-চুক্তিতে করমোসাকে চীনের নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতের বারণা যে, উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা কোন দেশের শান্তি আসিতে পারে না। করমোসাকে নিজেদের অধীনে রাখা এই সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর; সুতরাং ইহাতে ভারতের সর্বদল থাকিতে পারে না।

করমোসাকে চীনের হাতে ফিরাইয়া দিবার সুক্তির মূলে যে বারণা রহিয়াছে তাহা হইতেছে—ইহা চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুতঃ ইহার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই করমোসা চীনের অধিকারে ছিল। এই বিষয়টি লব্ধে এখানে কিছু বলিব।

ইতিহাস : স্থানীয় ভাষায় করমোসার নাম “তাইওয়ান”। করমোসা নাম ইউরোপীয়দের দেওয়া, ইহার অর্থ স্মরণ। পূর্বেই নাবিকেরা এই স্থান দিয়া বাইবার সমুদ্র স্রুত হইতে এই স্মরণ বীপটিকে দেখিয়া ‘করমোসা’ অর্থাৎ ‘স্মরণ’ এই নাম রাখিয়াছিল।

এই বীপটি চীন দেশের সন্নিকটে; সুতরাং বহু প্রাচীন কাল হইতে চীনারা ইহার ব্যবহার রাখিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রয়োজন না হওয়ার তথ্য তাহারা এখানে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। খ্রীষ্টীয় বোতশ শতাব্দীতে পূর্বেই ও স্পেনীয়রা প্রথম এই বীপে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। ১৬২৪ সনে ওলন্দাজরা ইহার পূর্বে-উপকূলে জেলাভিতা নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে ৩৭ বৎসর বহিয়া বসবাস করিতে থাকে। এই সময় চীন দেশে ‘মাঞ্চু’-রা সিংহাস্ত্র-বদল পরাজিত করে। এই পরাজিত সিংহবংশের অহুগত কতিপয় লোক কোকিলদা নামে পরিচিত এক বন্যপতির

নারককে করমোসার ওলকাকরিককে বিভাজিত করে এবং ইহার একটি বৃহত্তর অংশ দখল করিয়া বসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার 'মাকুয়া' করমোসার এই অংশকে আর-সমর্পণ করিতে বাধ্য করে। সেই হইতে ইহা চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চীনারা এখানে ক্রম চলিয়া আসিতে থাকে। কলে তাহাদের সহিত করমোসার আদিম অধিবাসীদের বিবাহ শুরু হয়।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টেবেন্সিমের চুক্তির কলে তাইওয়ান ও তামসিন নারক করমোসার দুইটি বন্দর বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সন্দেহ নাই যে এই বন্দরবাহকেরা তথায় বন্দ্রপ্রচাদের জন্য আসিয়া জুটিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে করমোসার উপকূলে একটি জাপানী জাহাজ ডুবিয়া যায়। এই জাহাজের কোম মাঝিককে এখানকার আদিম অধিবাসীরা মারি হত্যা করে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ জাপানীরা এই দ্বীপটিকে আক্রমণ করে। কলে চীনের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়, কিন্তু কোনক্রমে এই যুদ্ধ এড়ান হইয়াছিল। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও চীনের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন করমোসার করমোসাকে আংশিক ভাবে অবরোধ করিয়া কয়েক মাসের জন্য কীলাং অধিকার করে। ইহার পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে করমোসা সিমোমোসেনিক চুক্তির বলে জাপানের হাতে সমর্পিত হয়। কিন্তু সেখানকার চীনা অধিবাসীরা ইহাতে প্রতিবাদ করিল এবং সেখানে গণতন্ত্র ঘোষিত হইল। অতঃপর জাপানীরা ইহা বলপ্রয়োগ দ্বারা দখল করে—এই বিদ্রোহী করমোসাকে বন্দে আনিতে তাহাদের কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

ভৌগোলিক বিবরণ : করমোসা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের নিকটস্থ একটি দ্বীপ। চীন ও ইহার মধ্যে যে প্রশান্তী বিন্যাস তাহার নাম করমোসা প্রশান্তী। ইহা ৯০ মাইল চওড়া এবং দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের আরও অধিক বিস্তৃত। করমোসার উত্তর ও দক্ষিণে যথাক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সমুদ্র অবস্থিত। করমোসার আকৃতি ডিম্বের মত। ইহা দৈর্ঘ্যের ২২৫ মাইল ও চওড়ায় ৬০-৮০ মাইল এবং ইহার ক্ষেত্রফল ১৩,৪২৯ বর্গ-মাইল। ইহার লোকসংখ্যা ৬৪,০০,০০০ জন (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী)। ইহার রাজধানী তাই হোঙ্ক ও অন্যান্য নগরের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ :

তাই হোঙ্ক	... ৩,২৬,৪০৭ জন
তাকাও	... ১,৫২,২৬৫ "
তাইমান	... ১,৪২,১৩০ "
কীলাং (কীরাম)	... ১,০০,৫১১ "
কাপি	... ৯২,৪২৮ "

করমোসার উত্তর হইতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত উচ্চ পর্বত-

মালা মেরুদণ্ডাকারে অবস্থিত এবং এই পর্বতমালা ইহার দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার প্রধান জলবিভাজিকা পূর্ব প্রান্তে। এই দিকে পর্বত খাড়া ভাবে সমুদ্রে নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনেক স্থানে প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সমান্তরালভাবে ১৫০০ হইতে ২৫০০ ফুট উচ্চ পার্শ্ব প্রাচীর খুঁটি হইয়াছে। কয়েকটি সমতল ভূমি বিশেষতঃ সিরম এই দিকে অবস্থিত এবং ইহার দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলের সহিত সমান্তরাল ভাবে একটি উপত্যকা আছে। সেই উপত্যকার দক্ষিণে একটি হেলপথ নির্মিত হইয়াছে। করমোসার অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গের দৈর্ঘ্যমিরিসম (নীটাকারামা) ১৪,৭২০ ফুট ও সিলভিয়া (সেটজু জাম—১২,৪৮০ ফুট) উল্লেখযোগ্য। করমোসার পশ্চিম দিক সমতল ভূমিতে পরিপূর্ণ এবং ইহা ২০ মাইল চওড়া।

কর্কট ক্রান্তি (Tropic of Cancer) ইহার দক্ষিণে দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কিউরোসিও নামক উচ্চ সমুদ্রপ্রান্ত ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া এখানকার জলবায়ু উষ্ণতলের অনুরূপ।

করমোসার প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং এই দ্বীপটি সারা বৎসর সমান বৃষ্টি পায়। অবশ্য ইহার দক্ষিণ ভাগ শীত-কালে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে অর্থাৎ কম বৃষ্টি পায়। জলবায়ুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত হেতু আর্দ্রতা এই দুইটি কারণে এখানে মূল্যবান উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। ইহার বেশীর ভাগ ভূমি শস্য ও তৃণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পার্শ্বত্যা অঞ্চলের বৃহত্তর ভাগ ব্যাপিয়া সমুদ্র বন্দরাজি প্রসারিত। এই বন্দর তাল বট কর্ক (হিপি), কর্পূর ও ফাং বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

চাউল, ইক্ষু, চা, পাট, মিষ্টি আলু, লিম, চীনাবাদাম প্রভৃতি করমোসার প্রধান কসল। এখানে চাউল বছরে দুই বার করিয়া করে। ১৯৪০ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানকার উৎপন্ন-ক্রয়ের একটি তালিকা দেওয়া হইল :

চাউল	১,৪৫,৪০,০০০ টন (৪,৪৮,০০,০০০ বু)
মিষ্টি আলু	১৪,০০,০০০ "
চিনি	১২,৭০,০০০ "
চা	১৫,৪০০ "

এখানে কলা এবং কমলাও প্রচুর উৎপন্ন হয়। পশুপালনেও করমোসাবাসীরা খুবই উৎসাহ।

কীলাঙে করমোসার ধনি আছে এবং লিমকোর নিকটে বর্ষ পাওয়া যায়। এখান হইতে বর্ষ রপ্তানী হয়। রৌপ্য, তাম্র, গন্ধক, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি ধনিজ দ্রব্য করমোসার পাওয়া যায়।

১৯৪০ সালে করমোসা ৪০,০০,০০,০০০ ইরেন মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করে এবং ৩৪,০০,০০,০০০ ইরেন দানের দান আহবানী করে। ইরেন জাপানী মুদ্রা। এই ইরেন এখানেও

মুক্তারূপে ব্যবহৃত হইত। পরে চীনা জাতীয় মুক্তা ব্যবহৃত হইতে থাকে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে করমোসার বোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

রেলপথ (সরকারী)	৮৭৯ মাইল
" (বেসরকারী)	১,৬২৪ "
ট্রাম রাস্তা	৫০০ "
অভ্যন্তরীণ রাস্তা	১০,০০০ "

করমোসার পূর্বে উপকূলে অবস্থিত লান বিমানঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর উপকূলে চিলাং ও তাইগী হইয়া পশ্চিম উপকূলে গিয়া তাওমুয়াম সিন্চু, তাইচুং, চিরাই, তাইমাম ও কাওসিয়াং হইয়া পিংটাং পর্যন্ত রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। আর একটি রেলপথ পূর্বে উপকূলের মধ্যভাগে হুয়ালিনচিয়াং হইতে তাইচুং পর্যন্ত বিস্তৃত।

করমোসার তাইগী, তাওমুয়াম, তাইচুং, পিংটাং প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাট এবং অংশাং, তাইগী, তাইমুয়াম, সিন্চু, তাইচুং, কাওসিয়াং, পিংটাং, হেংচুন, তাইচুং, হুয়ালিনচিয়াং ও লান-এ বিমানঘাট করা হইয়াছে। এখানে চিলাং, কংগান প্রভৃতি বন্দর আছে।

আদিম অধিবাসী : করমোসার জাপানী ও চীনা ব্যতীত দুই শ্রেণীর আদিম মানুষ বাস করে। একটিকে বলে হাভা। ইহারা চীনের অভ্যন্তরভাগস্থ কোয়াংচাও প্রদেশের উপজাতির সহিত সম্পর্কিত। পেপাহুন বা বনিকুত বুদো এবং চীন হুন বা বড বর্কর এই দুই শ্রেণীর আদিবাসীর মধ্যে প্রথমোক্তরা চীনা রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছে, সেমোক্তেরা পূর্বেদিকস্থ পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের সহিত মালয়-বাসীদের সম্পর্ক বিচলমান। এই আদিম অধিবাসীরা ফিলিপাইন ও ওলন্দাজ অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মেলিসিট অর্থাৎ বৈপিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের গায়ের চামড়া বাহাদী রঙের ও মাথা লম্বা। তাহাদের সহিত ইন্দোনেশীয়দের ভাষা ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে নরনৃত্যশিল্পকার প্রচলিত আছে এবং ইহা তাহাদের সামাজিক মাম নির্ণায়ক। বিবাহের সময় এই নৃত্যসংস্কার্যকে পাজের

গুণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখানকার লোকেরা উকি পরে। কপালের মাঝখানে দিয়া একটি মীল রেখা লেখের মত অঙ্কিত করে ও নীচের ঠোঁটের মাঝখানে হইতে অল্পরূপ একটি রেখা খুঁতনির মধ্যভাগ পর্যন্ত কাটে। মেয়েরা উপর ও নীচ উত্তর ঠোঁটে ও গালে মামারকম উকি কাটে এবং তাহাদের কান পর্যন্ত একটি মীল রেখা ক্রমশঃস্বারমান করিয়া থাকে। তাহারা বৌবনে পদার্পণ করিলে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে হেলে মেয়ে উত্তরেরই উপরের দুই কবের দুইটি কৃত্তম দস্ত বা রাজদস্ত ভুলিয়া ফেলা হয়। এখানে অবিবাহিত পুরুষেরা আলাদা বাড়ীতে থাকে। এই বাড়ী সাধারণতঃ কাঠের খুঁটির উপর নির্মিত হয় এবং তাহাকে 'অবিবাহিতের বাড়ী' বলে। ইহাদের কেহ কেহ লবণকে মুক্তা হিসাবে ব্যবহার করে এবং ইহাদের মধ্যে 'পূর্বপুরুষ পূর্বা'র প্রচলন আছে।

ইহারা যে ক্রমে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায়। উক্ত বৎসরে এখানে ১,০০০ প্রাথমিক বিভাগে ১২,০৭৬ জন শিক্ষক ও ৭,৪০,৬৯৩ জন ছাত্র ছিল এবং হরটিন ম্যাল স্কুলে ২২৫ জন শিক্ষক ও ২,৫০৭ জন ছাত্র ছিল। এখানে চারটি কলেজে ২৩৬ জন অধ্যাপক ও ১,৩৮৫ জন ছাত্র এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৪৫ জন ছাত্র ছিল।

বর্তমান অবস্থা : ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর হইতে করমোসা জাপানের উপনিবেশ হিসাবে রহিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে জাপান হুঁদে পরাজিত হওয়ার কালে করমোসাকে জাপানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া চীনের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে চীনা জাতীয় সরকার কর্তৃক জেনারেল চেন জী এখানকার গবর্নর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

করমোসার কুয়োমিনটাং দলই প্রবল। বর্তমানে চিলাং কাইশেক সদল বলে এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। কুয়োমিনটী চীনারা এই দ্বীপটিকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে, অপর পক্ষে ইহাকে বাধা দিবার মত আমেরিকা চিরাভের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছে।

মহিলা-সংবাদ

গত ১৯৫০ সালের কাব্য উপাধি পত্রীকার ত্রিভূতী আশালতা নন্দচৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বলীর সংস্কৃত শিকা-পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত "গৌরীমাধব মাইতি পদক" লাভ

করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বাগবাড়ার চতুশ্রী পণ্ডিত কালিদাস শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্রী।

উদ্বাস্ত-সমস্যা

ঐ অজিতকুমার ভট্টাচার্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত-সমস্যা আবার নতুন করিয়া তন্ময় হইয়াছে। এক দিক দিয়া নহে, ইহার বহুগুলি দিক তাহিতে পারা যায়, এই সমস্যা ক্রমশঃ ছোট পাকাইয়া যাইতেছে। বঙ্গবিভাগের পুরাতন কানুনি না খাটিয়া আমরা ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের অনিবার্ণ সমস্যা রূপে গ্রহণ করিয়া লইয়া আলোচনা করিব।

প্রাথমিক ভাবে উদ্বাস্ত-সমস্যা সমাধানের দুইটি প্রধান দিক আছে। একটি অস্থায়ী সাহায্য, দ্বিতীয় পুনর্বাসন। অর্থাৎ পুনর্বাসনের পূর্বে উদ্বাস্তদের অস্থায়ী সাহায্যের বাতাবিক ভাবেই একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিবির সংস্থাপন করিয়া সাময়িক ভাবে সাহায্যদানের পর তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া পার্শ্বস্থ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করানোতেই এই বিরাট সমস্যার সুরাহা করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তদের সম্পর্কে এই কার্যক্রমই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ধীরে ধীরে তাহাদের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করাইতেছেন। বর্তমানে ঝাড় ও উদ্বাস্ত সমস্যার দাক্ষিণ্য এই প্রদেশে খুব বেশী বিদ্রুত। এই দুই দিকেই সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য দিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে অতি সামান্যই বলিবার আছে। যেটুকু বলিবার তাহা বিতানীর কোম-কোম কর্ণচাকী সম্পর্কে। সরকারী নীতি ও কার্যক্রম তত্ত্ব-সত্তিতে সম্পন্ন করিতে না পারিলে সমস্ত পরিকল্পনা ও কার্যবারা বিপর্যস্ত হইতে বাধ্য। তাহার ফলে কোথাও কোথাও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সরকারকে ঘোষের ভাগী হইতে হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের দিকটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সুদূর পরিকল্পনার সহিত এই কার্য সমাধা করিতে না পারিলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। শহরে যে সব পুনর্বাসিত হইবে, তাহাদের শহরের উপযোগী জীবিকার সংস্থান হওয়া প্রয়োজন। যুগে শিল্পে, সওয়াগরী আশিলে, দোকান প্রভৃতি স্থানে বাহারা নিরুজ্জ হইবার উপরুজ্জ, তাহাদের শহর কিংবা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস থাকা দরকার। মজুরা অনুবিবার সৃষ্টি ঘটবে এবং তাহাতে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। অপর দিকে, যে সকল পরিবারের গ্রাম্য পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ করা চলিতে পারে, তাহাদিগকে অনর্থক শহরে ভিড় না করাইয়া গ্রামে বসবাস এবং কৃষি বা কুটির-শিল্পে নিরুজ্জ করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া

আসিবে। এ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। সরকার প্রতি ইউনিয়ন বোর্ড দায়কত দেখানো দেখানো সম্ভব—কৃষক, মজুর, রত্নিধারী ও কুটিরশিল্পীদের বসবাসের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনত্ব ও চাপ এত বেশী যে, শুধু এই প্রদেশের মধ্যে সুদূর পুনর্বাসিত সম্ভব নহে। তাই সরকার পার্শ্ববর্তী রাজ্য-সরকারগুলির সহিত যোগাযোগ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যার বহু উদ্বাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি দ্রুত আছে, তাহার উপর উদ্বাস্তদের বাঙালী-প্রবণতা বিহার ও উড়িষ্যার মাটিতে গিয়া না যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বিকল্প প্রচারও আছে। এই সব মিলিয়া অষ্টম বর্টাইয়াছে অর্থাৎ বহু উদ্বাস্ত পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্তমানে হাওড়া ষ্টেশনে যে-সব শরণার্থী ভিড় করিয়া আছে, তাহারা সকলেই বাংলার বাহিরের প্রদেশ-প্রত্যাপন। তারত-সরকার ইহাদের সম্বন্ধে খুব কঠোর মনোভাব পোষণ করিতেছেন; দায় পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তাহারা তাহাদিগকে শহরের বাহিরে কোম স্থানে লইয়া যাইতে চাহিলেও তাহা কেহ ভাবিতেছে না, ফলে কিছু অর্থ ধরুয়াতি বাবদ ধরচ হইতেছে। আমরা এই অবস্থার আত্ম নিরসন কামনা করি। প্রদেশ-কংগ্রেস-সভাপতি ঐ অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় এই অবস্থার অবসানকরে পশ্চিম বাংলার সহিত সংলগ্ন অন্য রাজ্যের বাঙালী-প্রবাস স্থানগুলি পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ দাবি জানাইয়াছিলেন। সুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আগামী নির্বাচনের ভোক্ত-ভোক্তের জন্য সে সব দাবি আপাততঃ চাপা পড়িয়া আছে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে যেমন দুর্নীতি ও অশান্তির প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, উদ্বাস্ত-ব্যাপারেও তেমনি। প্রথম দুর্নীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে উদ্বাস্তদের প্রকারভেদে। এমন বহু ব্যক্তি উদ্বাস্ত বলিয়া সরকারী বাতায় নাম লিখাইয়াছে, বাহারা তাহার সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী অংশতঃ বা মোটেই নহে। এক দল পূর্ববর্তী ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে বহুকাল যাবৎ চাকরি বা ব্যবসায়সূত্রে বসবাস করিয়া আসিতেছিল। বৎসরে এক বার বা দুই বার দেশের বাড়ীতে গিয়াই গ্রামের প্রতি নিজেদের কতব্য শেষ করিত। তাহারা গ্রাম পশ্চিমবঙ্গবাসী—সরকারী অফিসের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে ওরাকিবহাল থাকার সুযোগ লইয়া উদ্বাস্তদের ভিত

নির্ধারিত যাবতীয় সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অপ্রয়োজনীয় সুবিধা লাভ করিলে বাহা হর, তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ এই ধরণের বহু ব্যক্তি সুবিধালাভের অপব্যবহার করিয়াছে। সকলেই জানেন যে, উদ্বাস্তদের পূর্ববর্তির জন্ম প্রচুর পরিমাণে টেট-তোলা টিমের প্রয়োজন হইতেছে। উদ্বাস্ত হিসাবে পাওয়া টিম ও অত্যন্ত জরুরিও চোরাবাণীকে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারটি আরও দুর্নীতিপূর্ণ। পূর্বপাকিস্তান হইতে বহু ‘ভল্লোলক’ দারী ও বালকবালিকাদের ‘লইয়া’ পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সাহায্যে বাস করেন, সমস্তপ্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন; অপর দিকে দেশের কর্মজমা ও বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার জন্ম বাতীতে দুই-এক জন লোক থাকে। অর্থাৎ বাহাকে বলে ‘গাছেরও ঝাওরা, ভল্লারও কুড়ানো’—তাহাই ঘটতেছে। এই পর্বারে পক্ষে সরকারী কর্মচারী, চাকুরিয়া, ব্যবসাদার, ছোটখাটো কর্মিদার প্রভৃতি মনোবৃত্তি ও শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকে।

অন্য আঙ্গলে বাহারা শরণার্থী, সভ্যকারের হিরন্মল বিঃসহল উদ্বাস্ত, তাহারা ই আক সর্বাঙ্গেকা বক্তিত। অতি সাধারণ ভরের ও নিয়-মব্যবিত্ত পরিবারের ব্যক্তি ইহারা—সহায় নাই, আশ্রয় নাই, একমাত্র সখল সরকারের দয়া ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সহায়ত্বিত। কিন্তু তাহাও বৃনি ‘শিক্ষিত’ উদ্বাস্তদের কীবনযাত্রার করেকটী তুল নীতি ও কিছু মতলববাক লোকের ধ্বংসাত্মক তথাকথিত রাজনীতির প্রতি-ক্রিয়াধরুপ ইহারা হারা হইতে বসিয়াছে।

কিন্তু ইহা তো হইবার কথা নহে। প্রথম স্বঘন ১৯৪৬ সালের হাদামার কলে এবং পরেও মলে মলে হিন্দুনা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র হিন্দু-সমাজ তাহাদের জন্ম অকাতরে হৃদয় চালিয়া দান করিয়াছে—অমি দিয়াছে, ধর দিয়াছে, সেবা করিয়াছে, নিজেদের ভাগ হইতে খাত সরবরাহ করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝাওয়াইয়াছে। সেদিনকার লেকখা কর্ণনই জুলিবার নহে। কিন্তু আজ কেন এত ভীত ভাবে পূর্ব-পশ্চিম মনোভাব দানা বাঁঝিয়া উঠিয়াছে? মুসলিম লীগ আমলে যে-কোন সরকারী চাকুরিতে মুসলমান অফিসারগণ মুসলিম সুবকদের অধিক সুযোগ দিবার কলে বেহন শিক্ষিত ও মব্যবিত্ত হিন্দু এবং মুস-লিম সমাজে একটা বিজাতীর বিবেকের স্রষ্টী হইয়াছিল, আজও ভেমনি বহু অফিসার দেশবিতাপের কলে পূর্ববঙ্গীয় হওয়ার ঠাছারা পূর্ববঙ্গীয় সুবকদের বেশী সুযোগ-সুবিধা দিতেছেন বলিয়া পূর্ব-পশ্চিম মনোভাব উত্তর বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজে দানা বাঁঝিয়া উঠিয়াছে। তাহা হাতা, অত কোন কালে, সরকারী কর্মচারিগণ কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তিকে সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্ম ব্যত্ হন। ইহার

কলে এই মনোভাব দিন দিন হুড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা হাতা আমাকলে সরকারী কার্বে অবস্থানকারী কোন কোন পূর্ববঙ্গীয় কর্মচারীকে বলিতে শোনা যায়—‘সব হারা ইয়া আসিয়াছি, আমাদের ২৮ততি কিছু উপার না করিলে চলিবে কেন?’ বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী পূর্ব-বঙ্গাগত এবং জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের অবজা ও ঈর্ষানীতির মনোভাব অতীব দুঃখজনক।

কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে ইহাদের মনের এত পার্থক্য ঘটিল কেন? সেখানে ত কার্ণের কোন বিঘোব বাবে নাই। বরং বহু গ্রামে সাদরে বহু উদ্বাস্তকে বসবাসের জন্ম আস্থান করিয়া লওয়া হইয়াছে। রোগ অতঃ, সাধারণতঃ উদ্বাস্তদের ‘কলোনী’ করিয়া বিবেচনীর মত বসবাসের ধারা অমেকাংশে দারী। বিতর্প পতিত জমিতে কলোনী গড়িয়া তোলা হাতা উপার নাই। কিন্তু সেখানে গ্রামের মধ্যে দারী গ্রামবাসীদের মতই একই মাটির সন্তান হইয়া বসবাস সন্তব, সেখানেও এই মনোবৃত্তি থাকিয়া গিয়াছে। বাংলার বাহিরে অত্যন্ত প্রদেশের ‘বাতানী-টোলা’র বাতন্ত্রের মত এই মিথ্যা বাতন্ত্র্যও বিতের স্রষ্টীর সহায়ক। তুরা সাংস্কৃতিক বাতন্ত্র্য, সামাজিক অসাম্য প্রভৃতির দুরা তুলিয়া এই যে বিতেরের প্রাকার গড়িয়া তোলা হইতেছে, ইহা নুতন করিয়া সমস্তকে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ঘটিলভর করিয়া তুলিতেছে। ইহা বাতীত প্রতিবেশীদের সহিত, বাতীওরালার সহিত, কর্মি-দারের সহিত তুচ্ছ কারণে বা অকারণে বগতা-বিবাদ এত বেশী বাবিত্তেছে যে, তাহা সভ্যই শোচনীয়। কোণার সমাধান, না নুতন সঙ্কটস্রষ্টী।

ইহার উপর তথাকথিত বৈপ্লবিক ও বামপন্থী রাজনৈতিক-দের দাপটে উদ্বাস্ত-সমস্যা আরও খোঁচাল হইয়া ঠাড়াইয়াছে। এই সমস্যা এত বেশী ব্যাপক ও গভীর যে, যে-কোন সরকারকে ইহা লইয়া হিমসিম খাইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মত সর্ব দিক দিয়া বাটতি প্রদেশে ইহার ভার গুরুতর রূপেই পড়িয়াছে। এই সঙ্কটের সুযোগ লইয়া বাঁধসিঁড়ি-রত রাজনৈতিক নেতারা যে-কোন প্রকারে বিশৃঙ্খলা স্রষ্টী করাইয়া সরকারী ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিতে সর্বদা সচেষ্ট। বাতহারাঙ্গের কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যে যে ইহার মধ্যে মিহিত আছে, ইহা এতদূরত্ব সভ্য বলিয়া মনে হয় না। আসল উদ্দেশ্য—আগামী নির্বাচনে হাতের ভাস হিসাবে ইহাদের কাজে লাগাইয়া ভমতা ধবলের প্রয়োগ। রাণাঘাটে উদ্বাস্তগণ কতক পর পর ভিন্ন ভিন্ন ট্রেন চলাচল বহু করার মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে বানচাল করিয়া দেওয়া ও এই সুযোগে রেল বহু করিয়া চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে অরাজকতা স্রষ্টী করিয়া তথাকথিত ‘বিপ্লব’ ঘটানই ঐ শ্রেণীর নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দাগরিকদের অগুচ ও সুসংহত প্রতিরোধের কলে উহাদের

এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ার কালে যে অভ্যর্থনের ব্যক্তি হইতে চলিয়াছে, তাহাতে কি বাস্তবতার দের কোন কল্যাণ সাধনের আশা করা সম্ভব? বাহ্যিক নিঃস্ব হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী, মানবতার নামে তাহাদের সমস্ত অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া বধ্যাবধ ব্যবস্থা করিবার ভক্ত সরকার অগ্রণী, জনসাধারণও সহানুভূতি-শীল। পশ্চিমবঙ্গবাসীর একান্ত কামনা—পরগণত তাই-বোনেরা তাহাদের দায় ও ভারস্বগ্রহণ না হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের সহায় ও সম্পদ হইয়া উঠুক। তাহা না হইলে,

কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না। তাই এই দুঃস্থ সমতার সমাধানে উদ্বাস্তুগণকেও আগাইয়া আসিতে হইবে তুয়া নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া। সরকারী ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার পথে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাভাবিক সহানুভূতিকে কাজে লাগাইয়া এই দ্বিষ্টের সমাধান হইয়া যাইতে হইবে। ভিটীর মায়া ভোলা যায় না সত্য, কিন্তু বাহা আর পাইবার নহে, তাহার আশা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিষ্ট ও বাস্তবকে আপন করিয়া লইয়া বাস করিতে হইবে। এই পথেই পূর্ব-পশ্চিমের বিভেদ দূর হইয়া যাইবে।

ষাটের পরে

প্রীতালিদাস রায়

ষাটের উপরে জন্মে বয়স বাড়িছে মোর যত
নানা দুঃখ আশি ব্যাধি আশি ক্লেশ জুটিতেছে তত।
ইহাদেবো আছে প্রয়োজন,
ইহারাই একে একে ছিড়িতেছে মর্জ্যের বাঁধন।

বিবাতার করুণার পাণি

সবের আভালে আছে মানি আর মাই আশি মানি।
বুঝিয়াছি ইহাদের লক্ষ্যকতা। বিভূতা জীবনে
আগাইতে চলিতেছে ইহাদের চক্রান্ত গোপনে।

ইহারা হরিছে মোর অবাহিত আশু,
তুলিছে অসহ করি এই বরণীর বলবাসু।
হৃদয়-বিত্তীবিদ্ধ। মোর হরিতেছে এরা মোরে ঘিরে,
করিতেছে মরণের বরণীর স্পৃহণীর বীরে।

বিশ্বভির অভলে মাঝিতে

ইহারা লোপান হ'রে দ্ব্যপথে দেয় না বাহিতে।
ছিন্ন করে সব শিষ্টাঙ্গ,
মরণ আগারে আসে পরিজাতা বহুই সমান।

নব আশ্বাস

প্রীতালিদাস চক্রবর্তী

কুহেলীমলিন হলুদ চাঁদের হাসি
তরু রাত্রি শীতের মন্ত্র জপে
নির্জন পথে সহসা পদধ্বনি
দূর বীথিকায় বায়ু ওঠে নিঃশ্বনি।

দূর বীথিকায় বায়ু ওঠে নিঃশ্বনি
আখো তন্ত্রার নরম আবেশ ভাঙে
জাগ্রত চোখে শত স্বপ্নের ভিড়
মনের গহনে ব্যর্থ বীণার মীড়।

মনের গহনে ব্যর্থ বীণার মীড়
তবু তারি মাঝে নব আশ্বাস জাগে
সোনার সূতার গাঁথা মুক্তার মালা
কার কথা ভেবে ঘুমে হাসে রাজবালা।



“রামেন্দ্র-রচনাবলী”

ঐয়োগেশচন্দ্র বাগল

তখন স্কুলের বর্ষ শেষে পড়ি। ‘ভারতবর্ষের’ পুঠার রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেণী মহাশয়ের ‘প্রজ্ঞার জর’ পড়িলাম। পড়িরাছি এই পর্যন্ত মনে ছিল, ইহার বিষয়বস্তু কি পরবর্তীকালে তাহা চেষ্টা করিবাও গ্রহণ করিতে পারি নাই। এবারে পুনরায় পাতা উন্টাইতে গিয়া বুঝিলাম, কেন ইহা সেই কিশোর মনেও দাগ কাটিয়াছিল। কঠিন বিষয়, কিন্তু এমন সরল ভাষা, বাচনভঙ্গী এত চমৎকার। কৈশোরের কণ্ঠ ঠাকুরের কণ্ঠকতা যেন শুনিতেছি। এ তো প্রবন্ধ নয়, এ যে কথকতা। লেখক পাঠককে যেন সমুখে রাখিয়া সকল খুঁটিনাটি তথ্য পুষ্পপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া বলিয়া বাইতেছেন। রামেন্দ্র-রচনা বতই পাঠ করিবেন, এইটি ততই উপলব্ধি হইবে।

রামেন্দ্রবাণু বিভার সাধক ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্যোপাধায় সতাই বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রচন্দ্রের “একটা মিশন লইয়া সারা জীবনটা কাটাঁইয়াছেন। ‘নবজীবনের’ প্রথম সম্ভব লেখার সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ‘মিশন’ বা এই সাধনা তাঁহার জীবনের প্রবর্তার বস্তু ছিল, কখনই তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে বাইতে দেন নাই। রামেন্দ্রচন্দ্রের যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিবেচন করিলে এই জীবনব্যাপী সাধনার কথা বেশ ফুটিয়া উঠে।” রামেন্দ্রচন্দ্রের অসংখ্যরকম পরিভ্রম করিতে পারিতেন। পাঁচকড়িবাণু বলিয়াছেন, “রামেন্দ্র বিনিত্র রজনী আগাগোড়াই বেদ ও তন্ত্রের আলোচনায় কাটাঁইয়া দিতেন। এই উৎকর্ষ পরিভ্রমের কলেই তাঁহার বক্ষু রোগ হয় এবং সেই রোগেই তাঁহাকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়।”

বন্যোপাধায় মহাশয়ের উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা পরিব্যং-প্রকাশিত এই রামেন্দ্র-রচনাবলী পাঠে সম্যক বুঝা যায়। এবাবৎ পাঁচ খণ্ড বাহির হইয়াছে; সম্পাদকবর বলিতেছেন, এখনও যে সব রচনা প্রণীত হয় নাই তাহা একত্র করিয়া ছাপাইলে আরও এক খণ্ড হইবে। এই পাঁচ খণ্ডেই রয়েল আট পেজী আকারের প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার রামেন্দ্র-রচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। রামেন্দ্রচন্দ্রের শ্রৌতকালে-মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে তিনি যে কত বিষয় চর্চা করিয়া গিয়াছেন তাহািলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ছিলেন বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক। বিধের জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে তাহা পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং লিখিয়াও গিয়াছেন যে, এমন দিন করুনা করা মোটেই অসাধ্য নয় যখন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষার উচ্চতম শিক্ষাও প্রাপ্ত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষাকে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রায় তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। রামেন্দ্রচন্দ্রের ছিলেন বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, কিন্তু বিজ্ঞানের এমন শাখা নাই যে সম্বন্ধে তিনি পরিপক্ব জ্ঞানলাভ করেন নাই, এবং সেই জ্ঞান মাতৃভাষায় পরিবেশন করিয়া তাহা গোড়জনকে উপহার দেন নাই। আবার সাহিত্য, দর্শনেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বাংলা-সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শন তাঁহার লেখনীর অধরে যেন একান্ত মনবীর হইয়া বাইত। ভাষার রূপ লইয়া তাহা যখন আমাদের সমুখে উপস্থিত হইত তখন মনে হইত, যে বিষয়টিকে এত দিন খুঁই কঠিন বলে হইয়াছে, এখন যে তাহা একবারে জল হইয়া গেল।

রামেন্দ্রচন্দ্রকে বাঙালী জাতি এত দিন জ্ঞানর সহিত সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাহার জন্য রামেন্দ্রচন্দ্রের আবার কাকে এক ‘দ্বন্দ্ব’, তাঁহার সেই সাহিত্য ও রচনা দ্ব্যাপ্য থাকিয়া সাধারণের

নিকট নান্দেয়্য পর্ষাবসিত হইয়া পড়িতেছিল। এই সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহা পুস্তকাকারে প্রণীত করিতে সক্ষম করিয়া ‘পিতৃবর্গ’ পরিপাথে অগ্রসর হন। বঙ্গ সময়ে তাঁহার পাঁচ খণ্ডে রচনাবলী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঁহার বাঁহার চেষ্টার ও অর্থে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহার সকলেই বাঙালী মাত্রেয় ধন্তবাদী। এই বিষয়ে সম্পাদকবরের উৎসাহ ও পরিভ্রম বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুস্ত্রাপ্য পুস্তক-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণের পুস্তকের পাঠ তাঁহার গ্রহণ করিয়াছেন। যে সব গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, তাহাও যে-যে পত্রিকার পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে পাঠ মিলাইয়া সংশোধনান্তে মুদ্রিত হইয়াছে। আবার কোন কোন লেখা যেমন ‘ব্রাহ্মণ কি পুত্র?’—অমুসন্ধানান্তর সম্পাদকবর ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে রামেন্দ্রচন্দ্রের দুইখানি মৃদুস্ত চিত্রও সন্নিবেশিত আছে।

এত কথা বলিয়াও রচনাবলীর সামান্ত পরিচয় দেওয়াই এখানে সম্ভব। প্রথম খণ্ডে আছে—প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বঙ্গলক্ষ্যের ব্রতকথা। পুস্তকাকারে প্রণীত হইবার পূর্বে কোন কোন পত্রিকার এগুলি বাহির হইয়াছিল, ভূমিকায়, স্ট্রীপেজে বা প্রবন্ধশেষে তাহার নির্দেশ আছে। এইরূপ নির্দেশ পরবর্তী খণ্ডত্রয়েও দেওয়া হইয়াছে। কর্ণ-কথা, চরিত-কথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রাপ্ত হইয়াছে—শক-কথা, বিচিত্র জগৎ, বঙ্গ-কথা। পোষাক পুস্তকে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-চ্যান্সেলর সারু দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অনুমোদনে লিখিত ও বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে পঠিত হয়। চতুর্থ খণ্ডে রহিয়াছে—নানা কথা, জগৎ-কথা, পুণ্ডরীকচুলকীর্তি-পত্রিকা। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ নামক স্মৃতিগ্রন্থে প্রাপ্ত লইয়া পঞ্চম খণ্ড। পাঠক পুস্তক-গুলির নাম হইতে রামেন্দ্রচন্দ্রের জ্ঞানের পরিধি কিরূপ প্রসারিত ছিল তাহার আঁচ করিতে পারিবেন। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু রামেন্দ্রচন্দ্রের যে সরল মনোহারী ভাষার তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা করজ্ঞানের রচনার মধ্যে পাই? দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষা-সাহিত্যের আলোচনায় সারল্য এবং প্রাঞ্জলতা একান্ত কাম্য, কেননা লোক-শিক্ষার পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যিক। ‘লোক-শিক্ষক’ রামেন্দ্রচন্দ্রের রচনাবলী এহেতু শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও পুস্তক-প্রণেতাদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। নূতন অবস্থায় যে সকল সমস্তার আশু সমাধান প্রয়োজন, রামেন্দ্রচন্দ্রের রচনাবলী, বিশেষতঃ ‘নানা কথা’র প্রবন্ধসমষ্টির মধ্যে তাহার সম্মান মিলিবে। রাষ্ট্রপরিচালক ও শিক্ষানায়কবৃন্দেও এগুলি পাঠ করা অত্যাশঙ্কক।

রামেন্দ্র-রচনাবলী বিভিন্ন প্রকাশার, শিক্ষালয় ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রে বিস্তারিত স্থান পাইবে। ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বাহ্যতে এই সকল গ্রন্থ বধ্যবৎ ভাবে প্রচারিত হয় সে বিষয়েও উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রামেন্দ্র-সাহিত্যের অনুশীলন জাতির জীবনে নব-বলের সঞ্চার করিবে।

* রামেন্দ্র-রচনাবলী (১ম-৫ম খণ্ড)—ঐয়োগেশচন্দ্র বাগলোপাধ্যায় ও প্রীতমজীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ১৯৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য বঙ্গাক্রমে—৮, ৮, ১০, ১০, ১০ ও ১০।

পুস্তক পরিচয়

রাজগৃহ ও নালন্দা—ডক্টর জীবনলাল সেন। ভারত বিভাবিহার। ২১, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

জৈনধর্ম—ডক্টর জীবনলাল সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার। ২, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

রাজগৃহ ও নালন্দার নাম শুনেই শিক্ষিতগণের চিত্তে কৌতুক জাগিয়া উঠে। এক দিন এই দুইটি স্থানের গৌরব নানারূপে এই একাধারেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থকার একজন এসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইনি ঐ দুটিতেই ঐ দুই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং বহু দিন সেখানে বাস করিয়া সেখানকার বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ হারা ঐ দুই স্থান অন্বেষণ করিতে চান তাহারাও ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

জরদেবের বিববিভাসগ্রন্থে গ্রন্থাবলী প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, ইউরোপের ভ্রম আমাদের দেশেও সহজ ভাষায় ও অল্পের মধ্যে বিবিধ বিভাগে বাঙালী পাঠকদের নিকটে উপস্থিত করা। বর্তমান পুস্তিকাখানির দ্বারা জৈনধর্ম সম্বন্ধে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। জৈনধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই। লেখক জ্ঞানীর সুপ্রসিদ্ধ জৈনতত্ত্ববিদ গুপ্তি সাহেবের ছাত্র। ইনি তাহার সর্বত্র সুবিদিত “জৈনমত” নামক পুস্তকখানি পাঠ করার দ্বিবাও এই পুস্তিকা-রচনার লাভ করিয়াছেন। পাঠকেরা ইহাতে উপকৃত হইবেন।

ঐ বিধুশেখর ভট্টাচার্য

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ—জীবনহরলাল নেহরু। *Glimpses of World History* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। জে. এক. হোরাবিন অফিস ১০ খানি মানচিত্র সংলগ্ন। ১৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১২।

এই বিশ্বখ্যাত ইতিহাস-পুস্তকখানির বিষয়বস্তু ও রচনাশিল্প নতুন করিয়া বিচারের অপেক্ষা রাখে না; ভারতের প্রধান মন্ত্রীর লেখা বলিয়া

নহে, এক জন ভারতীয়ের লেখা বলিয়া ইহা ভারতেরই গৌরবের বস্তু। মূল পুস্তকের চিঠির আকারে লেখা ভাষা এবং সাহিত্যশূন্য ইংরেজী এই ইতিহাসগ্রন্থখানিকেও সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছে। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী এইরূপ একটি বিরাট ও বিখ্যাত গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। বাহ্যিক-তাহার পক্ষে এই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। প্রকাশনী ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে শুধু অনুবাদের দিক্ দিয়া নহে, মূল্য ও গঠনের দিক দিয়াও ইহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অক্টোবর ১৯৩০ হইতে আগস্ট ১৯৩৩-এর মধ্যে কারাগারে বসিয়া জবাবদারি করিয়া ইন্দিয়াকে পত্রগুলি লেখেন। উপকরণের অভাবে স্বতঃই তাহাকে অসুবিধার পড়িতে হইয়াছিল, ফলে ইতিহাসখানি সর্বত্র সমান সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পরবর্তীকালে তিনি সংস্কারের দ্বারা অনেক অপরূপতা দূর করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমান বাংলা সংস্করণে আমরা লেখকের শেষ সংশোধিত পাঠই পাইতেছি।

বইখানি বাঙালীর দ্বারা উপকারে আসিবে। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী এরূপ দুর্লভ একাধিক কাজে হাত দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। শুধু একটি বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলি। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে স্বাভাবিকই অনেক হাতের সহযোগিতা আছে, কিন্তু সামগ্র্যবিধারক দৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে। ফলে “সাধে” ও “সঙ্গে”র ক্রমবাহক সংমিশ্রণ লক্ষিত হইল। ভাল কাজে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ঐ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মগের মূলুক—ঐ অজিতকুমার সেনগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা-১। মূল্য তিন টাকা।

ছোট গল্পের বই নাকি বাজারে তেমন কাটেনা—অথচ ছোট গল্প নহিলেও মাসিক পত্রিকার অঙ্গহানি হয়। কথাসাহিত্যের আসর জমাইয়া রাখে ছোট গল্প। জাতির আর্থশক্তি সভ্যতা সংস্কৃতি সবকিছুকেই প্রকাশ করার মূলে ইহার কৃতিত্ব অনেকখানি। বাংলা-সাহিত্যের এই দিকটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল—অজ্ঞাত: বিশ্বসাহিত্যের পাশে অকুণ্ঠ সাহসে সে দাঁড়াইতে

ডোলার



বরানগর

দাদ ও কাউন্সেল
মেম্বার মালম

কিউটা-টোন
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মালম
পোড়া ও চর্মরোগের জন্য

DR. D. O. & C. S. V. L.
DR. D. O. & C. S. V. L.
DR. D. O. & C. S. V. L.
DR. D. O. & C. S. V. L.

পারে। এই ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের দানও উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পের আসরে তিনি যে সব চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করেন সেগুলির মধ্যে অপরিচয়ের দৃষ্ট নাই, তাহার অসাধারণও নহে। নিত্য চোখে দেখা মানুষ, প্রতিমুহুর্তে সংঘটিত সব ঘটনা অথচ তাহাদের বিশেষ করিয়া জানিবার বা ব্যাখ্যাকরণের সম্পর্ক লইয়া ভাবিবার অবসর অল্প লোকেরই আছে। শিল্পীর তুলিকার তাহাদের অকপট অতিবাহিত বিস্ময়কেই শুধু বাড়াইয়া তোলে না, অতি আপনাদের জনকে হাটের ভিড় চাইতে তুলিয়া ঘরের মাঝখানে বসাইয়া আনন্দ উপভোগ করায়।

কিন্তু শুধু পরিচিত মানুষই নহে, অপরিচিতেরাও মাঝে মাঝে গল্পের মাঝে উঁকি মারে—তাহাদের আচার প্রথা নিয়ম নীতি আমাদের বিস্ময়-বর্ধন করে। বস্তুি এ আচার-নিয়মগুলিও একান্ত বাহিরের বস্তু। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ যে মন এবং সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সেই মনের লীলা-প্রবাহ ভাঙ্গা জাতিগতের গভী ছাড়াইয়া নিখিলের মানব-সত্তাকে প্রকাশ করে অপূরণ মহিমায়। এই মহিমাই 'মগের মূল্য' গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। পক্ষমার পরিবর্তন, আগুনে পুড়িয়া সোনা খাঁটি হওয়ার উপমাতেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আর একটু অশূদ্ধ চিত্র পাই 'গঙ্গাবাত্রা' গল্পে। বাংলা-বিভাগের অভিশাপ উদ্ধাত্ত-জীবনে এমন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বাহার তুলনা অন্তর প্রায় মেলে না। বাটর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড় এবং মুছোত্তর জগতে সদবৃত্তির বিনাশ কি দ্রুত ও মর্মান্তিক ভাবেই ঘটতেছে 'গঙ্গাবাত্রা' গল্পে তাহা সূচিত্রিত হইয়াছে। 'গার্ড সাহেব' গল্পটিতেও বার্থ-সকীর্ণ-চিত্র এক ভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট্যের মাঝে সহসা নিজেকে আবিষ্কার করিয়া—সূত্রকালে নহে অনন্তকালের

নবজীবনে বেন উত্তীর্ণ হইয়া দিয়াছে। গল্পের পরিবেশটিও চমৎকার। অন্তর গল্পগুলির মধ্যেও পরীক্ষার হ্রস্ব ও দৃঢ় ও তপোভাষ্যে অতি, পরীক্ষার রীতি, কথোপকথনের ভঙ্গি, প্রবাসবাক্য বা উপহার ঘটনা হ্রস্ব হইয়া পরীক্ষার পরিবেশ ও মানুষগুলিকে বখাৎভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

ইঙ্গিত—শ্রীযুক্ত বসু। প্রবাস, পি-৮, ল্যান্ডাউন রোড, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

বর্তমানকালের রাজনীতির পটভূমিকার রাষ্ট্রনায়কদের চিত্র উপভাস-ধানিতে পাওয়া যায়।

প্রচুর ভাষা অর্থশীলী ব্যক্তি—সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রসারিত করার কল্যাণকর তিনি ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি-কৌশলে পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাহার গুণকর্তন করেন, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকেরা তাহার নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমন্তকে সেক্রেটারীরূপে কিনিয়া লওয়াও তাহার পক্ষে অসাধ্য হয় না।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়াও শ্রীমন্ত বুদ্ধিতে পারে সমাজ বা অর্থনীতির মূল সমস্যা কৌশল বিধৃত রহিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে তাহার মানসিক চেষ্টার সুর এবং সে চেষ্টা শ্রীমন্তের ভাগ্যের গতি কোন পথ ধরিয়াছে তাহা অবশ্য লেখক বলিয়াছেন—কিন্তু 'ইজিতে'র প্রতিপাদ তাহা নহে। নেতার নেতার আত্মবাস্তী কলহ, ক্ষমতালাভের মত্ততা, দৈহিকতার প্রয়োগ জীবনকে কি ভাবে কলুষিত ও পঙ্কিল করিয়া তোলে—ইজিতে মূল উপজীব্য এইগুলি। বলা বাহুল্য, লেখক তাহার



সৌন্দর্য রক্ষায় অপরিহার্য

শীতের রক্ষতা দ্ব্য করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য ও লালিতা বৃদ্ধি করে এবং গাভ্রচর্মেব কোমলতা অক্ষুর রাখে। দিব্যভাগে লাভনি স্নো ও ক্রীম লাভনি ক্রিম ব্যবহার্য।

লোভনি
স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল



বক্তব্য ভালভাবেই শুধাইয়া বলিয়াছেন। উপভাসবাদি পড়িয়া মনে হয় না শুধু কল্পনার জগতেই বিচরণ করিতেছি।

আজিকার দিনে যে ভিত্ত সত্য মানুষকে প্রায় নৈরাশ্রবানী করিয়া তুলিয়াছে—‘ইজিত’ তাহারই মর্দার্থ বহন করিয়া পাঠকমণ্ডে কোঁতুলল সন্কার করে। সন্দের মধ্যে কিছু রোমান্টিক উপাদান থাকি সত্ত্বেও ইহার সব করটি চরিত্রই বাস্তবাসুগ।

ঈরামপদ সুখোপাধ্যায়

নিশান নাও—ঈরামপদ সুখোপাধ্যায়। ভবানীপুর বুক শুলো, ১-বি, রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

ঈরামপদ সুখোপাধ্যায় “কুটীরের গান” লিখিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন। তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য আছে। “নিশান নাও” ভেইশটি কবিতার সমষ্টি। অভিকার না হইলেও এই অবস্থায় প্রায় অতর্কিত প্রায় সকল কবিতাই কবিত্ব উদ্ভল এবং দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ। যে যুগ এক দিন তরুণের মনে উদ্ভাসনার সন্কার করিয়াছিল ইহার অবিকার্য কবিতা সেই যুগে রচিত। যুগ ভরত বিগত, তাহার আবেগ কিন্তু এখনও শেব হয় নাই। সেই উদ্ভাসনার অপূর্ণ দিনের স্মরের রেশ রচনার মধ্যে পাওয়া যায় :

সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার মিশ্রণ

ব্যাক্স অফ্ বাঁকুড়া

লিমিটেড

বাংলার ব্যাক্স জগতে বিরাট বিপ্লব সত্ত্বেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অসম্মতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—ঈজগরাজ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ঈছরিদাস ব্যানার্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্রিমি ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভর-বাহ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুখি হ্র করিয়াছে।

মূল্য—৪ আ: শিশি তা: মা: সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লি:

১১ বি, গোবিন্দ আজী রোড, কলিকাতা—২৭

কোন—সাঁউব ৮৮১

“বুজি চাই! বুজি চাই!

মৃত্যু পণ! জীবন পণ!

হয় বিজয়! নয় মরণ!

কর গাহ আজি দেশবাতার!

কর গাহ আজি স্বাধীনতার!”

অত্যাচারক্লিষ্ট জনগণের ব্যথিত আহ্বান বাজিয়াছে :

“তাই আজি নিপীড়িত মানবান্না ডাকিছে তোমার,
হে সারথি, আনো রথ, আনো শব্দ, আনো হৃদয়ন!”

এর জাগিয়াছে :

“কে এসেছে তরুণ পথিক, হৃৎসাগর কূলে?”

উত্তর আসিয়াছে :

“এলর রাতি এসেছে আজ।

মৃত্যু-মণানে প্রাণসাধনার প্রাণের পূজারী এসেছে বীর,
শৌর্য্যে-বীর্ঘ্যে মুছে দাও রানি, কালি কলঙ্ক শতাব্দীর।”

সকলকে ডাক দিয়া ধনি উঠিয়াছে :

“আজি বস্তার সব ভেসে যায় পুঞ্জিত জঞ্জাল,
চূড়িত হ’ল মিথ্যা শিকল—প্রাণহীন কঙ্কাল।”

ভুবন ভরিয়া সাড়া পড়িয়াছে :

“বেলেছে পাকজন্ত!

বুকে ক’কে জাগে পঞ্জরভাঙা মহা-উদ্বাস দোল,

শুধুই অহি, শুধু কঙ্কাল, শুধু গর্জন-রোল।”

সেই শৌর্য্য কোষায়, সেই হিলু কই, কোথা রেল সেই বীর জাতি,
বলিয়া কবি গ্রন্থ করিয়াছেন :

“বিদেশের বীরনারী চলে একা হিমালীর দেশে।
আমাদের পুরুষেরা শত্রু-হাতে অন্ধকার ঘেসে
দাঁড়িয়েছে সতর্কপে।”

অতএব :

“এস ধূর্ত মেঘজটাজুট উড়ানে

উগাদ বেগে ক্রুর বিধ জুড়ানে,

বহি-নরনে এস এস শত্রু,

উচ্ছ্বল কেনজাল সেলি এস এলরুদর।”

মহাপুরুষের “শেব বাজা”র কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :

“তাঁহার ললাটে জ্বলে আত্মার অগ্নি জরতীক।

সংসার তিমিরচ্ছেরী নিশাস্তের বহির্বার্ণে লিখা

বিষাদের প্রবলোক্তি লিখা।

‘হের দিগন্তে উহার আভাস, রাতি শেব’—এ কথা বলিয়াও সংসার জাগিয়াছে :

“অবীনতা-পাশ ছিন্ন হয়েছ, কই স্বপ্নান?

কই নবদ্বন্দ্ব, নূতন প্রাণ,

কণ্ঠে কণ্ঠে প্রজাতী গান?”

বাতা শেব হয় নাই

“যেমনো এখন, যর আরবার চলার ছর।”

হৃদয়ের সাবলীলতার, শব্দের বহুরূপে, প্রাণের আবেগে এবং আন্তরিকতার কবিতাগুলি কাব্যপ্রিয় পাঠকের চিত্তকে উদ্দীপিত করিবে।

ঈশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আফগানিস্থানের শিনওয়ারী বিদ্রোহ—ঈজিত-নাথ রায়চৌধুরী। রায়চৌধুরী ‘এক কোম্পানী, ১১২, আন্ততোর বুখার্জি রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪১। মূল্য তিন টাকা।

এখন বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেব হইবার কিছু পরেই, ১৯১৯ সনের

যে মানে আকগানিহানের সহিত ব্রিটিশের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপই আকগানিহান প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার পূর্বে এই দেশ নামে মাত্র স্বাধীন এবং ব্রিটিশের অর্থভোগী রাষ্ট্রমাত্র ছিল। সক্রিয় সর্ভাঙ্গুয়ারী আধার 'আকগানিহানের রাজা' আখা পাইলেন, বেশ অত্যন্ত রাষ্ট্রের ভার স্বাধীন সার্কভোম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ করিল, ড্রাগ ও রেখা পরিবর্তিত হইয়া ভারত ও আকগানিহানের মধ্যে দুতন সীমারেখা নির্ধারিত হইল। কর্ণাটী বন্দর আকগানিহানের শুদ্ধবিধান বন্দররূপে স্বীকৃত হইল, ড্রাগ ও রেখার উভয় পার্শ্বের ভাতিসমূহকে (ট্রাইব) স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হইল। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব নিয়োগ বিষয়ে আকগানিহান নিরুপকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইল। কিন্তু ইংরেজ এই সকল সর্ভে স্থখ হয় নাই। রাজা আমামুন্না খাঁ তাঁহার দেশে যে নবজাগরণ আনিতে চাহিলেন তাহাতেও ইংরেজ আনন্দিত হইল না। এমিকে আকগানিহানের গৌড়া মুলমানেরাও আমামুন্নার বিপ্লবী সংস্কার প্রচেষ্টা-সমূহকে হুমকিরে দেখিল না। সুতরাং তুরন্তে কামাল পাশ বাহা করিতে পারিয়াছিলেন আকগানিহানে আমামুন্না তাহা করিতে সক্ষম হইলেন না—তাঁহার পতন, রাজ্যভাগ অবশ্যস্বার্থী চইয়া পড়িল। গ্রন্থকার সমসাময়িক ঘটনা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ শিন-ওয়ারী বিদ্রোহের নেতা বাচ্চা ই সাকোর অভ্যুদয়ের সকলতার বিবরণকে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। লেখকের মতে দহা-সর্দার বাচ্চা-ই সাকোকে পরাজিত করিবার শক্তি আমামুন্নার ছিল। কিন্তু দেশবাসীর রক্তপাত এড়াইবার জন্যই তিনি 'ইহা' হইতে বিরত হন। নাদির খাঁ (পরে শাহ) দেশকে দহা-সর্দারের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ও হীরে হীরে জাতিকে আমামুন্না-প্রবর্তিত সংস্কারের পথে চলিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে আকগানিহান ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে এশিয়ার অন্ততম শান্তিরক্ষক। আমামুন্না, নাদির শাহ ও জাহির শাহ প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে আকগানিহান চলিয়াছে বলিয়াই এরূপ সম্ভব হই-রাছে। এই ক্ষুদ্র বইখানি একাধারে তথ্যপূর্ণ ও সুপাঠ্য।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

ব্রহ্মসূত্র—শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত বাংলা বাখ্যা।
বিত্তীয় সংস্করণ। সংস্কৃত গ্রন্থে ডিপটিটিরি। ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শব্দ ও রামানুজ কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্রভাবে পূর্বেও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ক্রমশঃ মূলসূত্র, তাহার বঙ্গানুবাদ এবং শব্দ ও রামানুজ ভাষ্যসুসারী বাংলা বাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে শব্দ ও রামানুজের মতভেদ আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে উভয় মতের স্বার্থ বিবৃত হওয়ার বেদান্তমতে প্রবেশাধীনের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের শাস্ত্রনিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্য পরিদৃষ্ট। বাংলা ভাষায় পরিমিত ধর্মসংখ্যক দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য পুস্তক-খানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর

মন তোর—শ্রীরাধালাল সোম। ডি. এন্. লাইব্রেরী,
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকারের 'বৃন্দ' এবং 'বালাল শীট' ইতিপূর্বে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থেও তাঁহার কল্পনা ও চিত্তশীলতার পরিচয় হুগুট। বইখানি টাইক, কলিগাথর, বঙ্গ শ্রীকল, রাবণ ও ময়—এই ছয়টি গল্পের সমষ্টি। গল্পই বলি, কেননা সাধারণ গল্পের মত



স্বপ্নের সন্ধ্যা

উপার্জননের ক্ষমতা এবং সন্ধ্যার
স্বপ্নের আভা আছে, কাল নাও
থাকিতে পারে। তখন আপনায়
অনুভূতি হইবে যে, সময় থাকিতে
আপনায় নিজের ও প্রিয়জনদের
জন্য সন্ধ্যার প্রয়োজন ছিল।
হিন্দুধর্মের বীমা-পত্র এই সন্ধ্যার
সহায়ক। আজই তাবিয়া দেখুন।



হিন্দুধর্ম

কো-অপারেটিভ ইন্সটিটিউট
সো সা ই টি, লি মি টে ড.
৪৮, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা

না হইলেও এগুলিতে রঙ্গের রস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অথবা, বসিতে পানি, জীবনের কয়েকটি খণ্ড চিত্র। ঘটনাংশ সামান্য, কিন্তু কথাবার্তার মধ্য দিয়া জীবনের রূপ ও মনের রহস্য চিত্তাকর্ষক হইয়া দেখা দিয়াছে। 'পরিচয়' লেখক বলিয়াছেন: "তুমি, আমি, রাম, ভ্রাম, শশিষ্ঠা, শকুন্তলা—এদের সবাইকে নিয়েই আমার মন। সেই মানসসমুদ্রেরে জানাখী—তুমি, আমি, সবাই।" বিভিন্ন লোকের মনের কথা লেখক বাহিরে টানিয়া আনিতে পারিয়াছেন, ইহা কম কথা নয়। প্রথম গল্প 'ষ্টাইকে' ছাত্রধর্মঘট উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি কচিমন এবং শিক্ষক-জনের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা যেমন উপভোগ্য, তেমন শিক্ষাগ্রহ। স্থানে স্থানে রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে তিনি ভাবিবার কথা বলিয়াছেন। তাহার রঙ্গরসিকতা কাহাকেও আঘাত করিবার ক্ষমতা নহে, জাতিকে সচেতন করিবার নিমিত্ত। প্রসঙ্গক্রমে দেশবিশেষের সমাজ এবং রাজনীতি বিষয়ে তিনি একটু আধটু তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অযৌক্তিক নয়।

বিধুর বিভব কাব্য—শ্রীপকানন কবিরত্ন। শৈলশ্রী—১১৯, বঙ্কিম চাট্জো স্ট্রিট। কলিকাতা-১২। ২য় সংস্করণ। দাম তিন টাকা।

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্য। ৩৮নাট্যটি প্রাচীন। এ যুগে পৌরাণিক কাব্য বিরল। বাঁহারা বাদ বদলাইতে চাহেন, তাহার পড়িয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাঁচপত (নাটক)—শ্রীঅতুলানন্দ রায়। এম. সি. সরকার এন্ড সন্স। ১৭, বঙ্কিম চাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।
বহাভারতের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'পাঁচপত' নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নাটক যদি লোক-লিঙ্গার অভ্যন্তর খেঁচ মাখান বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে 'পাঁচপত' নাটকখানি সিংসন্মুখে তাহার সার্থকতা প্রমাণিত করিয়াছে। বর্তমানের সমাজ-কুসংস্কার নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, 'পাঁচপত' পৌরাণিক নাটকে অনুরূপ ছায়াপাত লোকমনকে সচেতন করিয়া তুলিবে। খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন, "নাটকখানিতে নাট্য-মুহূর্ত্ত স্থগিত কৃত্তিষের পরিচয় পাই। ভাবা শুধু সহজ ও সাবলীল নয়—রতিবেদেরও অধিকারী।"

রিফিউজী (নাটক)—শ্রীবীজনাথ ভৌমিক। প্রান্তিহান শ্রীশঙ্কর লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল নরনারীর দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সামাজিক নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দেশভাগের কলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যে অবস্থার মধ্যে বাস্তব্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী-কালে যে জীবনাবেগের প্রেরণার নিজ নিজ আশ্রয় অনুসন্ধানী নুতনভাবে বসতিস্থাপন ও আশ্রয়-সম্ভারের চেষ্টা করিতেছেন তাহারই একটি খণ্ড-চিত্র এই নাটকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লেখকের আন্তরিকতা আছে, কিন্তু নাটক-রচনার পক্ষে শুধু আন্তরিকতাই একমাত্র মূলধন নয়।

শ্রীমদ্রথকুমার চৌধুরী



M.B. SIRKAR & SONS

**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রিট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রিটের
বিপরীত দিকে, আমহার স্ট্রিট
ও বহুবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
১৩ সন্ন

সুসজ্জিত শিল্প-নির্মিত ওয়েল্ডার নির্মিত
ও ইলেক্ট্রিক্যাল

ব্রাহ্ম-হিন্দুস্থান মোটো বালিগঞ্জ
১০২/১ বি. বাসবিহানী এডিনিউ কলিকাতা

ফোন, বি. বি. ১৭৬৮
গ্রাম, ব্রিলিয়ান্ট স



বাংলা-সাহিত্যে গবেষণার জন্য পুরস্কার

১। পরলোকগত অধ্যাপক অমরেন্দ্র যুগোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অঙ্গসন্ধান-কার্যে উৎসাহ-দানের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি সম্মিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই তহবিলের আর হইতে প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সম্মতি গ্রহণ করিয়া বঙ্গোপাধ্যায়কে, পত্নী শ্রীমতী সত্যবতী সাহিত্য-সাধকদের সম্বন্ধে সুপ্রস্তুত উদ্যমে উৎসাহ দিবার জন্য পরিষদ এক শত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। বঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐ টাকা পরিষদকেই দান করিয়াছেন।

২। মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের পরিভাষা সম্বলনের জন্য "কঙ্গদীপচন্দ্র বসু স্মৃতি তহবিল" হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, লাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি প্রণীত মনোবিজ্ঞানের ত্রিপুরীকরণের বস্তুকে হয় শত টাকার একটি স্মৃতি দিয়াছেন। পরিভাষাগুলি অচিরে মুদ্রিত হইবে।

৩। দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকস-এর গ্রীষ্মকালীন বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য "উদ্বোধন সভাকীর্ত্রে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ" সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত 'দীপা বাংলা রচনা পুরস্কার' (১৯৫১) লাভ করিয়াছেন।

যামিনীভূষণ অক্টাল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়

ও যক্ষ্মা হাসপাতাল

হৃদয়বদ্ধ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়, কবিরহস্য, এম-এ, এম-বি মহাশয় কর্তৃক ১৯২৩ সালে উপরোক্ত আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধী ইহার নিজস্ব গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র দেশপ্রিয় বতীজমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। ইহার পর ডাঃ কে. এন. বৈদ্য প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত যক্ষ্মা হাসপাতালের গৃহ-নির্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ২৫,০০০, সাহায্য পাওয়া যায়। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাতিগৃহের যক্ষ্মা হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ৪৫০০০, টাকা ব্যয়ে ইহার গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ইহা কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বার্ষিক ২৫০০০, সাহায্য পায়। যক্ষ্মা হাসপাতালে বর্তমানে

৫০টি 'বেড' বা রোগী-শয্যা আছে। আয়ুর্বেদীয় ও পাশ্চাত্য উভয় পদ্ধতিতে এখানে রোগীদের চিকিৎসা করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে যক্ষ্মারোগের ষে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আশাহরুপ রোগী ভর্তি করা সম্ভব হইতেছে না। গ্রীষ্মকালীন অসুস্থতার সময় যক্ষ্মারোগের উক্ত হাসপাতালের সংলগ্ন একটি ক্ষিত্রস্থ গৃহনির্মাণ সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানে ক্ষিত্রস্থ বেড-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যক্তি রোগীদের রাখিবার ব্যয়-সঙ্কলনের কোনরূপ উপায় এখনও হয় নাই। যামিনীভূষণ অক্টাল আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একজন জাতীয় সরকার, রাজ্য-সরকার এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্যদান করিলে তাহা যে প্রকৃত বদেপদেবা হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এতোকেরই ইহাতে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করা



কর্তব্য। অবতাবাহুর পুত্রের নামে দ্বিতীয় পুত্রের নাম বেওয়া হইয়াছে 'বেবরত হাসপাতাল ভবন'। পশ্চিমবঙ্গ-এদেশপাল ভট্টর ঐহয়েজকুমার সুযোগাধ্যায় গত ১৭ই নবেম্বর ইহার দায় উদ্বাটন করিয়াছেন।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বীহুতা হেলার লকপ্রতিষ্ঠ আইন-ব্যব-সারী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আইন ও অজ্ঞাত বিষয়ে প্রগাঢ় পাতিভ্য হাভাও তিনি বহু লগুণের অবিকারী ছিলেন। তিনি বপ্রায়েবর বহু সুবক্কে নিজ গুহে স্থান দিয়া বিচারকনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আদ্যর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরমহংসদেবের পরম ভক্ত, দার্শনিক মন্মথনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় গত ২০শে অগ্রহায়ণ ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মনোহর-পুত্র রোতহ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধ পাতিভ্য ও বর্ষপ্রবণতা তাঁহাকে বহুকাল পূর্বে ঐহরবিনের সংস্পর্শে আনিয়াছিল, এবং তৎকালে তিনি "বন্দেবাতরহ" পঞ্জিকার সহিত বসিঠভাবে সংগিঠ ছিলেন।

কবি কায়কোবাদ

হেয়চন্দ্র, নবীমচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের লসসাননিক কবি কায়কোবাদ পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙালী সুসলমান কবি কায়কোবাদ হবীজ-পূর্ক সুগের শেষ প্রতিমিবি ছিলেন।

"মহান্মশান", "অশ্রুমালা", "শিবরসিক" তাঁহার কবিত্ব-শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বইগুলির নামকরণ হইতে তাঁহার ভাববাহা ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতার একজন সুসলমান ব্যাখ্যাকার বলেন, "তিনি সুসলমান হরও লগুণ শতাবীর শ্রেষ্ঠ আতীর কবি আলাওলের বহু এদেশের দাট্টর সহিত নিবিষ্ট ভাবে সংযোগ

স্থাপন করেছিলেন, এদের আদর্শ গ্রহণ করে এদের ভানে ভবন হবে, এদেশের উপরা দিবে সাহিত্য-বৃষ্টি করেছেন।"

"মহান্মশান" কাব্য কায়বালার স্থানান হোলেনের হত্যা-কাও অবলম্বন করিয়া লিখিত। একরা "বিদ্যাব-লিঙ্গ" হুগের বহা বৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কায়কোবাদের "মহান্মশান" কাব্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চিত্র বর্ডমান হুগের ভায়তীর মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কায়কোবাদের অনেকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় হুটাইয়া আছে। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এহাকারে বুদ্ধিত করিলে তাঁহার কৃতির প্রতি বর্ষাৎ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা এই কবির কৃতির উদ্যেপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শোকবাজার একাংশ
(বিবিধ প্রসঙ্গ জটব্য)

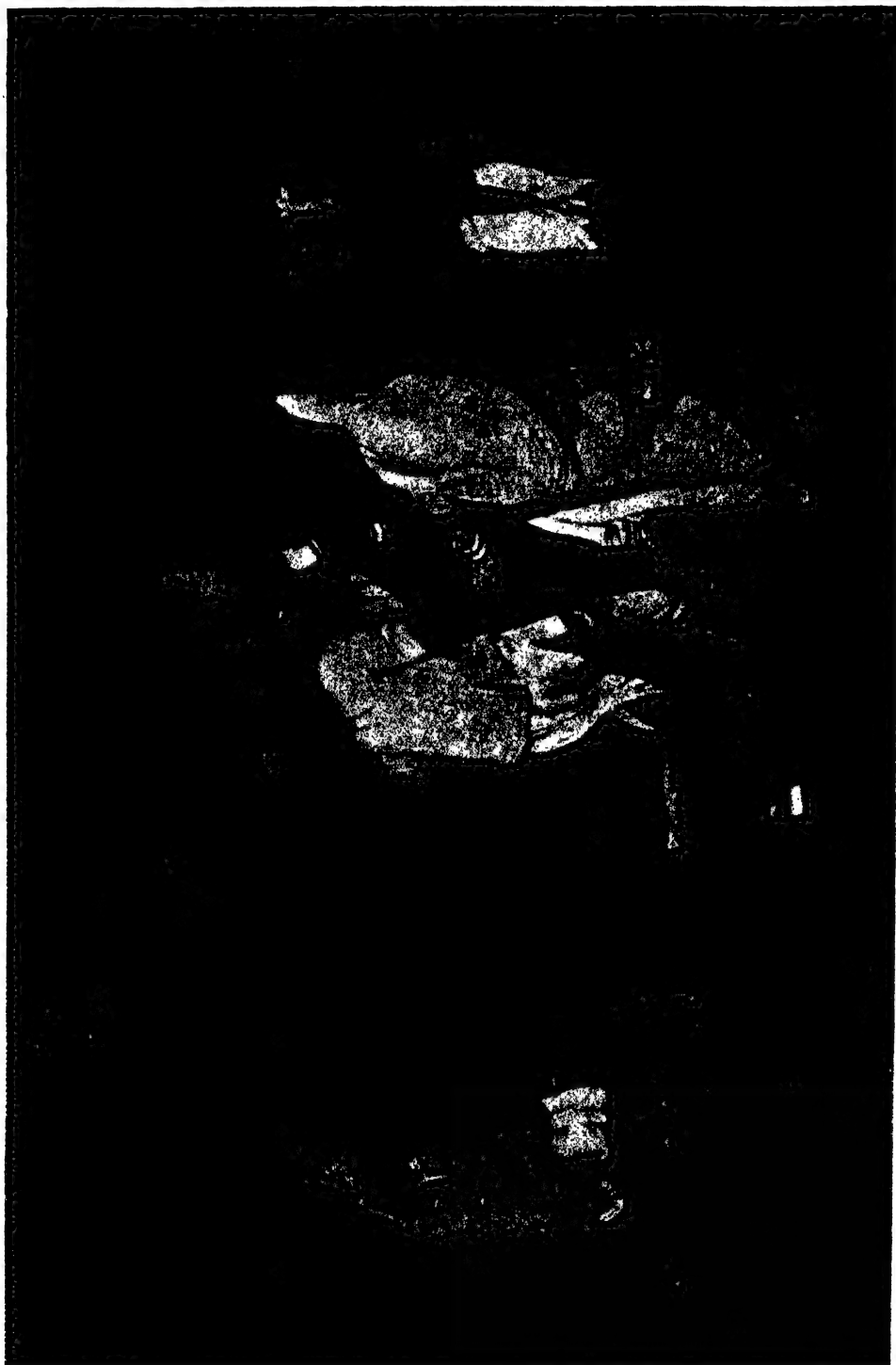


অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বোম্বার ন্যায় কার্যকরী!

দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী!
অমৃততাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকতা ৭

স্থাপিত ১৮৯৩





অবশী ঘেস, কলিকাতা।

বান প্রস্থ
ঐতিহ্যবাহীন সন শুধু



প্রসাধন [শ্রীবিপ্র মহাশি



রাজপুতানী [শ্রীহৈমন্তী সেন



শরশয্যা

[শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রবাস

“নত্যাং শিবং স্মরয়
নারদায়া বলহীমেদ নতাঃ”

১৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাস, ১৩৫৮

৪৫ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায় নির্বাচনী অভিযান

বাংলায় এখন নির্বাচনের খুব পড়িয়াছে। বিভিন্ন দল সকল কেন্দ্রে ও সকল ছেলার ভোট-সমরাক্ষেপে নামিয়াছেন। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি বহু বক্তে বিভক্ত এবং পরস্পর হস্ত-ফোলাহলে ব্যস্ত। কংগ্রেসের ভাগ্যবিপর্বার বাহা হইতে পারিত তাহা অনেকটা ঐ কারণে কাটিয়া গিয়াছে। অবাধি লোকসভ কোন দিকে বাইবে তাহার কোনও স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া বাইতেছে না। ওজন নানাপ্রকার শোলা মাল, তাহার সভ্যদিগ্য নির্ণয়ের উপায় নাই, নির্বাচনের কলাকল বাহির হইলে তাহা বুঝা বাইবে। ঘোড়ের উপর বলা বাইতে পারে অত প্রদেশে অবাধিত বাসগৃহী এবং প্রকৃত বাসগৃহী দলের বগড়া-বিবাদের কলে কংগ্রেসের আশা যেখানে ব্যক্তিরাছে, বাংলারও তাহার পুনরাবুত্তির সম্ভাবনা আছে।

কলাকল বাহাই হউক, নির্বাচন ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিপদের মতবাদ এটার বেতাবে চলিতেছে এবং যে দৃষ্টিকোণ দিয়া নির্বাচনের বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় এই নির্বাচনে বাংলার ভবিষ্যতের অধিকার কিছুমান কাটিবে না, বরক পাচতর হইতে পারে। যেখানে এই কেবলমাত্র মলমলত বাধের বা ব্যক্তিগত বাধের সেখানে দেশবাসীর মঙ্গলের কথা স্থান পাইতে পারে না, ইহা বিগত পাঁচ বৎসরের ভিত্তি অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

বাংলার বর্তমান অবস্থার নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল এক দিকে বোপ্যতা ও কর্তৃত্বকতা এবং অত দিকে লাহল ও সভতার পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বি মনোমরম করা। বোপ্যতার বিচারে অতীতের ত্যাগ ও নির্বাচন ভোপ বা আন্দোলন-পরিচালন-করতা একবার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা সর্বকেন্দ্রে ঠিক নয়। কেননা এই নির্বাচন পেলন ভোপের অত বা পুরকার বিতরণের অত নহে, ইহা যেনের অধিকতর পঠমে লক্ষির অংশ গ্রহণের বোপ্যতা ও কর্তৃত্ব নির্বা-রূপেরই ব্যাপার। অতীতে যিনি তির কেন্দ্রে দক ও ক্রিয়ামূল

হিলেন, তিনি যে সকল কেন্দ্রেই বর্তমানের তার গ্রহণে লক্ষ্য একথা কি করিয়া বলা যায় ?

কংগ্রেস এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরাধী, সেখা আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি। কেননা দলের আহুতত্ব বা অর্থ-সামর্থ্য তির অত কোমল বোপ্যতার পরিমাণ কংগ্রেসের অধিকারী-বর্গ গ্রহণ করেন নাই। বোপ্যতা ও সভতার কষ্টি-পাথরে কংগ্রেসের মনোমীত প্রাধিপত্যের অধিকাংশই বেকি বা বিষম বাধ-যুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

হুঃখের বিষয়, বিরোধী দলের কেন্দ্রেও অধিকাংশ দলে ঐ একই পরিমাণ বীভূত হইয়াছে। কয়েকজন বোপ্য লোক এবং তাঁহাদের দল পঠমে বহুসংখ্যক অযোগ্য বা লামাভ বোপ্যতাহুক্ত লোক লইয়াই বিভিন্ন দল নামিয়াছেন। এইরূপ পহার কলাকল শুধু যে অমিচ্ছিত তাহা নহে, ইহা জন-কল্যাণের পরিপন্থী। বোপ্যতার বিচারেও টিকিটের স্থলাই কোর করিয়া তুলিয়া বরা হইতেছে, ব্যক্তিগত অণাওপের কোনও প্রশ্নই আসিতেছে না।

কংগ্রেসের তাপ্যে যদি কমতাপ্রাপ্তি বটে তবে পুঠুভাবে রাষ্ট্র-চালনার তাঁহাদের মনোমীত দুঃস্বপ্নবর্গ প্রতি পদে, বার্ষের তাক্তমার, প্রতিবন্ধকের সৃষ্টিই করিবেন। কেননা যেখানে বোপ্যতার অতাব সেখানে হার্বই প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়— ইহা আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার সুবিধা। বাংলার বিগত পাঁচ বৎসরের রাষ্ট্র-চালনারও ঐ একই অভিজ্ঞতা আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অযোগ্য দল অযোগ্য মন্ত্রী নির্বাচন করিবে এবং অযোগ্য মন্ত্রী প্রতিদিন যেনের অমঙ্গল সৃষ্টি করিবেন, ইহাই ত বাস্তবিক।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলও ত সেরগ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিযেদ মনে হয় না বাহাতে যেনের ও যেনের বার্ষ বজার থাকে। তাতম দিয়া পঠমের কাছ হয় না ইহা ত বতঃসিহ কথা এবং বেধা বাইতেছে যে, নির্বাচনেই প্রত্যেক দলসমষ্টিতে পঠম অপেক্ষা তাতমের কাছই অধিক চলিতেছে।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অভিভাষণ

বর্তমান ভগ্নভে সমাজ তথা জাতির কল্যাণের জন্ত ব্যক্তি-বাহীনতা ও ব্যক্তিব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করিবার যে এক চরম আর প্রহর পরিলক্ষিত হইতেছে, ভারতের দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ও দৃষ্টিমাত্র ভারতের রাষ্ট্রতত্ত্ব ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বাবুপুত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সমাবেশে অসুস্থতায় তাহার সমালোচনা করেন। জাতির মঙ্গলের জন্ত ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর কোর দিরা তিনি বলেন যে, ব্যক্তিই সকল সৃষ্টির মূল উৎস। ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাহার ভাষণে বলেন যে, দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে, দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, কারিগর ও পুণ্ড্রবিদের প্রয়োজন যে সর্বাঙ্গিক। অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। ইহাদের সহযোগিতা ভিন্ন জাতি অগ্রসর হইতে পারে না। রাজনৈতিক বাহীনতার সঙ্গে সঙ্গে কোন দেশেই আর্থিক বাহিন্য আসিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাক্ষ্য ও কর্তৃত্বশক্তির পরীক্ষা হইবে দেশের অবৈতিক ও শিল্পগত উৎকর্ষের দ্বারা। অসংখ্য নিরাশ্রিত কৃষিত জনতার কত জনের অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান সরকার করিরাছেন, বয়োবৃদ্ধ, কৰ্ম্মজীবী, কমসংখ্যাবিক্রয় এবং বয়স্কতার তাহার কতটা প্রতিকার করিরাছেন—ইহাই আজ বিজ্ঞাত। এই পরিস্থিতিতেই সরকারের সার্বভৌমতা নির্ণীত হইবে। ইহাই বিচারের চরম তুলান। কারণ বুদ্ধ-জন্মসাধারণকে লইয়া কোন মহান জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দেশের মানাঙ্গণ অতাব অনটনের উন্নয়ন করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা অবিরাম ষাণ্ডোংগামন হৃদিত কথা, ভূমি সংস্কারের কথা শুনিয়া আসিতেছি তথাপি প্রতি বৎসরই আমাদের সমস্ত লক্ষ টন ষাণ্ড-শত বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। প্রশ্ন এই, ভূমিকম্প, বন, বন্য-বন্যপাণ্ডের বনবটী কি কেবলমাত্র সমস্ত দেশের আকাশকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে? হৃদের দাবানলে বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি কি তাহা তাহাদের পূর্বেকার অব-নৈতিক অবস্থা এবং ষাণ্ডাবিক পরিস্থিতি কিরাইতে লক্ষ হইরাছে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগ্ন এক বিপ্লবের দ্বা দিরা অগ্রসর হইতেছে। কেবল অসন্তোষ নহে, সর্বত্র আকোশ ও বিক্রোহের ভাব আপিয়া উঠিরাছে। বিবেচন সর্বত্র ইহা পরিব্যাপ্ত। দেশের নেতৃত্বকে দেশের ও বিবেচন এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং ইহা সমাধানের জন্ত তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, এই কলেজ প্রতি বৎসর বহু সংখ্যার পুণ্ড্রবিদ ও কারিগর সৃষ্টি করিতেছে। এই সকল কর্ম্মী দ্বারা দেশের দাবাবিধ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইবে। ইহাদের প্রশ্ন ও বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি সকল হওয়া অসম্ভব।

তিনি বলেন, এই বিচারভবনের প্রতিষ্ঠার সময় ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ ইহাকে বাহুবলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা করিরাহিলেন। বাহুবলের অন-নিহিত মানবতাকে বিকশিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানববর্গী কোন বিশেষ ধরণের বাহুব নহে, প্রত্যেক বাহুবই তাহার বীর ক্ষেত্রে মানববর্গী। বাহুবের শিক্ষা বা তাহার ব্যবহারিক হৃতি এই মহত্ত্বের বিকাশের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। বাহুব যে কোন কাজে বক্ষতা অর্জন করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার মানববর্গ কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। বাহুব হইতে, বাহুবের হৃতি হইতে বাহুবের মহত্ত্ব প্রেরিত। সুতরাং সর্বভৌমতাবে প্রেরিত বাহুব সৃষ্টি করা, অর্থাৎ মানবতার সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতের শিক্ষার আদর্শ। এই মহত্ত্বকে বিকাশ করিতে হইলে বাহুবের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। কারণ ব্যক্তি-বাহীনতা বিনষ্ট হইলে মহত্ত্বের প্রকাশ সম্ভব নহে। ব্যক্তিকে বর্ধ করিয়া সমস্ত কোন উন্নতি করা করা বাহুল্যতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে শিক্ষা, যে পরিকল্পনা বাহুবের আদ্রাকে বিনষ্ট করিয়া সমাজের প্রগতি কামনা করে, সেই পরিকল্পনাকে সম্ভাবনামক বলা চলে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, প্রগতিশীল দেশগুলিকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা ব্যতীত তাহাদের অত কোন কর্তব্য নাই তবে তাহাদের আশ্বিনবিশ্বালের অতাব প্রমাণিত হইবে। অত দেশ আমাদের অনুপ্রেরণা দিতে পারে, কিন্তু সে দেশ ত এদেশের জাতীয় আদর্শের পথ নির্দেশ করিতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য, আমাদের হৃতি হইতেই আমাদের জাতীয় আদর্শকে উদ্ধৃত করিতে হইবে।

এই আদর্শ কি তাহা বিশ্লেষণ করিতে দিরা তিনি বলেন যে, ভারতীয় জাতীয় পতাকাই ভারতীয় জীবনাদর্শের সূত্র প্রতীক। পতাকার দ্বা দ্বলে অবস্থিত চক্র জীবনের অগ্রগতির প্রতীক। ভগ্ন পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনই অগ্রগতির নিদর্শন। বাহুবকে এই গতিবেগের সহিত সব পক্ষকে অগ্রসর হইতে হইবে। পতাকার চক্রটি বেত-পটুত্বিকার উপর অবস্থিত। বেত অনন্ত কালের প্রতীক। অনন্তের পটুত্বিকার সংসার চক্র আবর্তিত হইতেছে। ইহাকে ভুলিলে চলিবে না—মনে রাখিতে হইবে জীবনের এখানেই সমাপ্তি নয়, জীবন অনন্ত কালের। পতাকার গৈরিক অংশ ভাগ ও সংবহের

নির্ধারণ। ভ্যাগ ও সংঘর দ্বারা লোককে ভয় করিয়া জীবনকে সুস্থল করিতে হইবে। হরিদ্রাংশ সন্ধানের প্রতীক। এই পৃথিবীকে সন্ধানিতে, প্রাচুর্য্যে আনন্দন করিয়া ভুলিতে হইবে। জাতীয় পতাকার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাই জাতীয় শিকার আদর্শ।

খাদ্য

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ তাঁহার অভিতাষণে একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, “আমরা বহুবার বহুভাবে কলন বৃদ্ধি ও কৃষি-সংস্কারের কথা শুনিতেছি, তথাপি প্রতি বৎসরই সমস্ত লক্ষ টন খাদ্য-শস্য আমাদের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে।”

এই প্রশ্নটি এমন একটি স্থান হইতে করা হইয়াছে বাহা রাজনৈতিক বলাদলির বহু উর্দ্ধে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে।

শত চারি বৎসরে বাংলার খাদ্যব্যবস্থা এমন এক ভয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সমস্ত বিষয়টির আত্মপূরিক বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাতিতে এক মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। কেবলমাত্র বৌদ্ধিক আক্ষেপ করিয়া বা সরকারের ঝুটবহুল খাদ্য-ব্যবস্থাকে দোষারোপ করিয়া কর্তব্য সন্ধান করিলে আজ আর চলিবে না। দেশের প্রত্যেক চিত্তাশীল ব্যক্তিকে আজ দেশের কেন এ অবস্থা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের উপায় স্থির করিতে হইবে। কারণ এ সমস্তা কোন শ্রেণী বা বর্গ বিশেষের নহে, ইহা আজ সমগ্র দেশবাসী প্রত্যেকের। মান্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার কথা শুনিয়াও কেন যে আমাদের খাদ্য আমদানী করিতে হয় তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এবং বাহারা ইহার ভর দায়ী তাহাদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যুদ্ধের মধ্যে হইতেই আমাদের খাদ্যভাব দেখা দিয়াছে এবং তারত বিতাপের পর হইতে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরের দয়্য ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি। সরকারী মহলের অভিন্ন এই যে, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করিতে পারি না এবং বতরুহুও আমরা উৎপন্ন করিতে পারি তাহাও প্রকৃতির বিরুদ্ধতার ব্যাহত হইতেছে, কলে আমাদের খাদ্যের ভর বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। আর এই খাদ্য বাটুতির ভরই আমাদের কাপড়ের অভাবও ঘুটিতেছে না। খাদ্য ভলার অকল হইতেই বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ভলারের লক্ষ্য কম, সুতরাং ভলার উপার্জন করিতে আমাদের কাপড় রপ্তানী করিতে হয়।

দেখা হইতেছে, খাদ্য সমস্তা আমাদের অটোপালের বহু

আঠেপুঠে জড়াইয়া বহিয়াছে। বক্তব্য: বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদই এই খাদ্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া আছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা।

আমাদের দেশে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইবার উপায় কম আছে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ জমি বর্তমানে চাষ হইতেছে তাহাকেই আরও ভাল ভাবে চাষ করা সরকার। অর্থাৎ, এই জমিতে ভাল সার, বীজ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া যদি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির দ্বারা চাষ করা হয় তবে কলন বাড়ানো হইতে পারে। একত যে সকল জমিতে জলাভাব নাই সেখানেই প্রথমে কাজ শুরু করা আবশ্যিক। কারণ এসব জমিতে জলের ভর বড় বড় প্রায়ের অপেক্ষা করিতে হইবে না।

এখানে সরকার কিছু ছোট ছোট খাল, পুকুর অত্যাধিক কয়েক শত টিউবওয়েল, আর ভাল জাতীয় বীজ ও সার। ইহার ব্যবস্থা করিবার ভর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ রহিয়াছে এবং সার ও বীজ বণ্টনের ভার আছে কৃষি বিভাগের উপর। কলিকাতার দক্ষিণে সোনারপুর হইতে ক্যানিঙের মধ্যে এক লক্ষ বিঘা জমি জলে ভুবিয়া অনাবাদী হইয়া রহিয়াছে। চার বৎসরের মধ্যে একটা খাল কাটরা এই জল নিকাশ করা গেল না। এই জমি পরিকার করিয়া সার দিয়া চাষ করিলে এখানে ৩০ লক্ষ মণ ধান পাওয়া হইত। বর্তমান শহরের আদালতের সংলগ্ন বাহুইবিলের মাঠে বিঘা প্রতি ১৮ মণ ধান কলিত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বাকারপুর তালার পর এখান হইতে মাটি লওয়ার উছা জলাকীর্ণ হয় এবং এখানে ৮৯ বৎসর ধাবৎ কলন কলে নাই। ইহার ব্যবস্থা সেচ বিভাগ করিতে পারিত। ইহাতে বিশেষ অর্থ বা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে।

সার ও বীজের ক্ষেত্রেও একই ইতিহাস। কলন বৃদ্ধি আন্দোলনের নামে প্রতিটি বৎসর কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে কিন্তু কল কিছুই পাওয়া হইতেছে না, ইহাতে কোন প্রকার নিয়ম বা পরিকল্পনা আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। পর পর ছুই তিন বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খরচের বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার লাভ নাই। কখনও গদের বীজেই বেশী ব্যয় হইল, কখনও তালের বীজ দেওয়া হইল, কখনও বা ট্যাণ্ডিওকা চাষাই বিলি করা হইল হাকার হাকার টাকা। কখনও পারশিয়ান ঢাকার গুণগান আরও হইল, কখনও আবার পাম্পের প্রেট্রাই প্রচার শুরু হইল। প্রয়োজন অনুযায়ীই ব্যবস্থা করিতে হয়, যে মাটিতে যে শত ভাল উৎপন্ন হয় সেখানে সেই বীজ না দিয়া অল্প বীজ দিলে তাহাতে কলন উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি পাইবে? তার পর কখনও বা বীজ আছে, সার নাই। সারের পারমিট মিলিল কিন্তু ভাল নাই—বা ভাল পাইতে চাষের সময় উত্তীর্ণ হইয়া

সিরাহে, ভাগ্যক্রমে যদি সারও পাওয়া যায় ত ভাল নাই—
তখন আবার ক্যামেল কর্তৃপক্ষ ভাল হাতিতে সারাদ। এসব
কারণে অর্থ বাণেশ্বরের অনেক মত বরচ হইতেছে, কিন্তু বাতরূপ
পরমার্থের সন্ধন হইতেছে না।

চাষের জমি বাতানো যায় কি না সে সম্বন্ধে ভাবিবার
কথা আছে। পশ্চিমবঙ্গে আবারবোণ্য পণ্ডিত জমির পরিমাণ
১৪,২৬,০০০ একর। ইহার বেশীর ভাগ জমি অনাবাদী
থাকার কারণ জলাভাব ও আগাছা জাতীর অসল। জলাভাব
উপরোক্ত উপায়ে দূর করা যাইতে পারে। আগাছা
নির্মূল করিবার বর ট্রাউট। এ সকল জমি বস্তুর সাহায্যে
অতি অল্প সময়ে চাষের উপযোগী করা যায়। রাণাঘাট
অঞ্চলে বহু জমি এই ভাবে পণ্ডিত আছে। এই সকল জমিতে
কিছু উষ্মাভয়ের পুনর্জাগরন হইয়াছে। তাহারা সেখানে
চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না এই হই কারণে।
মহীরা, বীরভূম, বাঁকড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাউট দ্বারা চাষের
উপযুক্ত এক চাপে ৩৪ শত বিঘা জমি অনেক আছে।
ই-আই-আর, বি-এম-আর প্রভৃতি রেল লাইনের হই দিকে
পর্বতের লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি অসল্যাক্ষী হইয়া আছে।
চাষের ব্যবস্থা করিলে উহার কলমেই দেশ বরং সম্পূর্ণ
হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র খাদ্য
উৎপাদন বাড়িলেই আমাদের জুলাইয়া বাইত। সাধারণতঃ
একর এখানেই কাঁচের সাগানো বার এরূপ জমি পশ্চিমবঙ্গে
আছে কিন্তু সরকারের হাতে ট্রাউট আছে মাত্র ৩১টি। ১৯৫০
সাল পর্যন্ত ছিল মাত্র ১০টি, তারও ৫টির লোকল ছিল না। এই
জমিতে উন্নত বরনের চাষ করিলে ২০ লক্ষ মণ ধান বাড়িত।

কমল বৃদ্ধি আন্দোলনের ব্যয়ের আরেকটি বিশেষত্ব এই
যে, কর্ত্তারী, দারোয়ান, চাপরাশি, তাহাদের ভাতা, বাতান্যত
বরচ, আশিনের বাড়ী ইত্যাদিতেই প্রায় বেশীর ভাগ বাহির
হইয়া যায়। অবশিষ্ট বাহা থাকে তাহাতে এটা হরত ওটা
হর না। খাত বিভাগের এবং কৃষি বিভাগের বাজেটে অত্যন্ত
বিভাগের তার কর্ত্তারীদের বেতন ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করা
থাকিলে বরচ বৃদ্ধিতে সুবিধা হইত। কিন্তু উন্নয়ন পরি-
কল্পনার বরচ তালা হিগাবে দেখানো হয়। তাহাতে বরচের
বিশদ হিসাব পাওয়া যায় না। কল হইতেছে কি না তাহাও
বুঝা যায় না।

বাংলাদেশে প্রতি একরে চাউল সাধারণতঃ ১৮ মণ
ভরে। বাতমহী প্রভৃতি সেন বলিতেছেন, প্রতি একর জমিতে
১৫ মণ উৎপন্ন হয়।

জাপান হুদে পরাক্রমের পরে ধানচাষ বহু গুণ বাড়িয়া
কেলিয়াছে। চীনের উৎপাদন আমাদের আড়াই কি তিন গুণ।
ইহারা এত অল্প সময়ে রাজনৈতিক ও প্রাজ্ঞতিক বদলার মধ্যে
বাহা করিতে পারিতেছে আমরা কেন তাহা পারিতেছি না।

দীর্ঘ মেয়াদী জটিল পরিকল্পনার শিরমে যে সময় ও অর্থ অপচয়
করিতেছি তাহার সঙ্গে তুল্য তুল্য পরিকল্পনা আন্তরিকতার
সহিত আরম্ভ করিয়া দিলে এত দিনে অত্যন্ত: বাংলার অন্ন-
সমতা দূর হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বৃহৎ কোম গ্র্যাম
সম্পূর্ণভাবে করিতে গেলে বৎসে ১৪ মণ ও অর্থের প্রয়োজন।
কিন্তু আমাদের বরন অপেক্ষা করার মত সময় ও ব্যয় করার
মত বেশী অর্থ নাই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প বরচের ব্যবস্থাই
এখন করা উচিত ছিল। পর্বতের যদি এতদিন বহরে একটি
করিয়া দেলারও উন্নতিতে সর্লক্ষিত নিরোগ করিতেম তাহা
হইলে পাঁচটি দেলাকে অত্যন্ত দূর করিতে পারিতেম। আজ
বিক্রীচনের মুহূর্ত্তে বেশবাসীর কাছে বলিবার কিছু কথা তাহা-
দের থাকিত। চার বৎসরে সর্লক্ষীণ উন্নতি করা হুঃসাধ্য কথা
নামি, কিন্তু প্রতি বৎসর কমল বৃদ্ধির মাঝে যে বিপুল অর্থব্যয়
হইয়াছে তাহা দ্বারা বহরে হুইটি দেলার উন্নতি করাও ত
অসাধ্য ছিল না। তাহা হইলে এই চার-পাঁচ বৎসরে বাংলার
চেহারা কিরিয়া বাইত।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

সম্প্রতি ব্রিটিশ ইন্সুরমেন্ট সার্ভিসের একটি পুস্তিকা
আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে পৃথিবীর খাদ্য ব্যবস্থার
একটি তথ্যপূর্ণ হিসাব পাওয়া সিরাহে। ইহার এক অংশে
বিভিন্ন দেশে সাধারণ দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিন জাতীয়
খাদ্য বরাদ্দের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আমরা কয়েকটি
বিশেষ দেশের হিসাব এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

সাধারণ দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিনের বরাদ্ :

	ক্যালোরি		প্রোটিন	
	১৯৪৯-৫০-এর		১৯৪৯-৫০-এর	
	তুলনার		তুলনার	
	১৯৫০-৫১		১৯৫০-৫১	
	শতকরা		শতকরা	
	১৯৪৯-৫০	পরিবর্তন	১৯৪৯-৫০	পরিবর্তন
দেশ	দৈনিক বরাদ্		দৈনিক বরাদ্	
কানাডা	৩,১৩০	+ ১.৫	৯৩	+ ১
আমেরিকা	৩,১৭০	+ ১.৫	৯১	+ ১
আরজেন্টাইন	৩,১৬৯	— ১	১০২.৬	— ১
বেলজিয়াম	২,৮৯৫	+ ১	৮৫	—
ডেনমার্ক	৩,১৬০	+ ৪	১০২	— ২
নুইজারল্যান্ড	৩,১৯৫	+ ৩	৯৮	+ ৩
চীন	২,০২০	+ ১০	৬২	+ ১০
ইন্দোনেশিয়া	১,৮৮০	+ ৩	৪২	+ ২
জাপান	২,১০০	+ ২	৫৩	+ ২
ফ্রান্স	২,৩৪০	+ ৭	৭৩.৫	+ ৮
ভারতবর্ষ	১,৭০০	— ৬	৪৩	— ৫

কেবলমাত্র আরকেন্টাইন ব্যতীত ইউরো-আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশেই ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যের উন্নতি হইয়াছে। আরকেন্টাইনের অধিবাসীরা মেরু-বহুল হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া তাহাদের কিছু কমানো হইয়াছে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া সকল দেশেই খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া হইয়াছে। চীন সমস্ত পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু সেখানে সাম্প্রতিক পরিমিত বাতাবিক হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভারতের অপেক্ষা শান্ত বলিয়া শোনা যায় না। সেখানেও তাহারা জাতির বাহ্যিক বিবৃত হয় নাই। পুষ্টির খাতির অভাবের অর্থ যে জাতির স্বাস্থ্য, বিপন্ন হইলেও ইন্দোনেশিয়া তাহা ভাল তাবেই জানে। ভারতবর্ষে ক্যালোরি করিয়াছে শতকরা হয় তাগ আর প্রোটিন শতকরা পাঁচ তাগ। আমাদের প্রত্যেকের সপ্তাহে ৩'৫৬ গের খাদ্য দরকার হয়। রেশনের বর্তমান বরাদ্দ সপ্তাহে ২'৬২ সের এবং ইহাতেও খাদ্যপ্রাণ কতটুকু থাকিতেছে তাহাও উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে। ইহাতে জাতির বাহ্য যে দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে আশঙ্ক্যের কি আছে। রেশন-ব্যবস্থার পূর্বেই আমাদের পুষ্টির খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে স্বাস্থ্যহার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। রেশন চালু হওয়ার পর তাহার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই অন্বেষণ করি।

ভোর কমিটির তদন্তে আমাদের বাহ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানা দরকার।

জীবন-স্বাস্থ্যের তুলনামূলক তথ্যসমূহ

দেশ	স্বাস্থ্যহার	শিশুস্বাস্থ্য	জীবনের আশা	
			পুরুষ	স্ত্রী
নিউজিল্যান্ড	৯'১	৩১	৬৫'০৪	৬৭'৮৮
অষ্ট্রেলিয়া	৯'৪	৩৮	৬৩'৪৮	৬৭'১৪
দক্ষিণ-আফ্রিকা	১০'১	৩৭	৫৭'৭৮	৬১'৪৮
কানাডা	১০'২	৭৬	৫৯'৩২	৬১'৫৯
আমেরিকা	১১'২	৫৪	৫৯'১২	৬২'৬৭
ব্রিটেন	১২'৪	৫৮	৫৮'৭৫	৬২'৮৮
জাপান	১৭	১০৬	৪৪'৮২	৪৬'৫৪
ভারতবর্ষ	২২'৪	১৬২	২৬'৯১	২৬'৪৬

ভারতে স্বাস্থ্যহার ও বিশেষ করিয়া শিশু ও বয়োবৃদ্ধের স্বাস্থ্য-হার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক। প্রকৃতির অপরিসীম খাদ্য গ্রহণ ও শক্তিক বাইরের অভাব ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

শিশু (জাতির তথ্য) স্বাস্থ্য হার

এক বৎসরের	১-৫	৫-১০
কম বয়স	বৎসর	বৎসর
ভারতবর্ষ	২৪'৩	১৮'৬
ব্রিটেন	৬'৮	২'১

স্বাস্থ্যের অভাব ও মাতার বাহ্যহীনতাই ইহার জন্য দায়ী। আমাদের দেশে শিশুর জন্য দুধ পাওয়া দুর, বাহ্যও পাওয়া যায় তাহা হ্রাস ও ভেজালমিশ্রিত।

প্রকৃতি-স্বাস্থ্যের সঠিক হিসাব আজ পর্যন্ত হয় নাই। ভোর কমিটির মতে মোট প্রকৃতি-স্বাস্থ্যের সংখ্যা বার্ষিক দুই লক্ষ ও প্রসবজনিত রোগপ্রভা জনমীর সংখ্যা কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ।

সাধারণভাবে রোগের প্রকোপের অনুমান এইরূপ :

(১৯৩২-৪১ এই কয় বৎসরের গড়পড়তা বার্ষিক হিসাব)

কলেরা—	১,৪৪,৯২৪
বসন্ত—	৬৯,৪৭৪
শ্লেগ—	৩০,৯০২
জ্বর (প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া)—	৩৬,২২,৮৬৯
আমশর ও পেটের অস্থির—	২,৬১,৯২৪
বম্বা—	৪,৭১,৮০২
অন্যান্য—	১৫,৯৯,৪৯০
মোট—	৬২,০৯,৪৩৪

অবশ্য এই স্বাস্থ্যহার সম্পূর্ণ নহে। আমাদের প্রাথমিক মরিলে পরে সংবাদ লিখাইবে এতদূর শিক্তি এখনও হয় নাই। প্রকৃত স্বাস্থ্য হার সঠিক সংগ্রহ করা কঠিন। ভোর কমিটিও কঠিনে পারেন নাই।

রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান। আকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে ম্যালেরিয়ার স্বাস্থ্য লক্ষ্যজনক ব্যাপার। ইহার একমাত্র চিকিৎসা কুইনাইন। একজন রোগীর জন্য ৭৫ গ্রাম কুইনাইন প্রয়োজন মরিলে মোট কুইনাইন দরকার বৎসরে বোল লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে বড়জোর দুই লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন আমরা পাই। ভারতবর্ষে কালিম্পং এবং নীলসিরিতে আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কুইনাইন প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু কিনাবুরো নামক একটি ডাচ কোম্পানীর বার্ষিক ইংরেজ ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে এদেশে কুইনাইনের পর্যাপ্ত চাহ হইতে দেওয়া হয় নাই। বাহা হয় তাহা বৎসরান্ত এবং কংগ্রেস-সরকার উহার মূল্যও বাড়াইয়াছেন এবং শক্তিও হ্রাস করিয়াছেন। কিনাবুরো কোম্পানী বৎসর দামে জাতীয় কুইনাইন বিক্রয় করিতেছে। গ্রীস কেবলমাত্র তিন তিন টি হুজাইরা ম্যালেরিয়া ভাড়াইয়াছে। আমাদের দেশে সরকার সেভাবে যদি অস্বস্তি: বৎসরে একটি হেলার ম্যালেরিয়াও হয় করিতেম তাহা হইলেও এত দিনে অনেক কাজ হইত। ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত ১০ কোটি লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ মরে বটে, কিন্তু ঐ ব্যাধিবাহী ৯ কোটি ৯০ লক্ষ লোককে জীবন্ত করিয়া রাখে। বম্বা, কলেরা, বসন্ত, আমশর প্রভৃতি যে কোন রোগের সংস্পর্শে আসিলেই ইহার আক্রান্ত হয় এবং মরিয়ণ্য যায়। কিন্তু দেশের লোক হৃতিকপীড়িত ও বাহ্যহীন হইয়া থাকিলেই তাহাদের শোষণ সহজ ও সম্ভব হয়।

অত্যন্ত রোগের অবস্থাও কম তর্যাবহ নহে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ইতিহাস মেডিকেল সেন্টারে বঙ্গ-রোগে রক্তের নিরোক্ত হিমাণ বাহির হইয়াছিল :

এতি এক লক্ষ লোকে রক্তহীন

প্যারিস	১৭৭	কামপুর	৪৩২
মেক্সিকো	১৭০	লক্ষৌ	৪১৯
নিউইয়র্ক	১২৮	মাদ্রাজ	২৯০
বার্লিন	১২০	কলিকাতা	২৩০
লন্ডন	৯৬	বোম্বাই	১৪০

ডাঃ বেঞ্জামিনের মতে বৎসরে গড়ে ৫ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে বঙ্গারোগে মারা যায়। কিন্তু তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা এইরূপ :

বঙ্গা হাসপাতাল ও ডািমিটোরিয়াস

ডািমিটোরিয়াস		বঙ্গাহাসপাতাল		অন্য হাসপাতাল	
সংখ্যা	বেড	সংখ্যা	বেড	সংখ্যা	বেড
আলাহ	১	২৮	—	১০	৯৮
বাংলা	২	৫১	৩	৩১৮	২৭
বিহার	১	১৩০	—	১০	৯৭
বোম্বাই	৮	৫৯০	৫	২৩৯	১৫
মধ্যপ্রদেশ	১	১৫১	—	৭	৯১
মাদ্রাজ	৫	৫১০	১	৬২	১৭
উত্তরা	—	—	—	৩	১৩
পঞ্জাব	১	৬৫৪	৩	১৬০	১৪
উত্তর প্রদেশ	৫	২৯৫	—	৮	১৮৪

বাহ্যাহীনতার কারণ সবচেয়ে ভোর করিষ্ট বলিতেছেন, “দেশের অধিকাংশ স্থানেই পরিচ্ছন্নতা খুব কম, জনসাধারণের একটি বড় অংশ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বীর্ষাহীন, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিভাত কম, শিকার অভাবে দেশের লোকে অবাস্ত্যকর পারিপার্শ্বিক এবং রোগ সবচেয়ে উদাসীন।” যে সকল গ্রামে বীজাণুযুক্ত পানীয় জল, মরলা জল অপসারণের অভাব পরঃপ্রণালী ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে তাহাকেই আমরা বাস্তুকর গ্রাম বলিতে পারি। শতকরা একটি গ্রামেও এই ব্যবস্থা নাই। ডাঃ বিবান দাস পশ্চিম-বাংলার ৭০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৮১টিতে ৮১ সেট ডাক্তার, কম্পাউন্ডার নার্স বসাইয়াছেন। কিন্তু এখানে অভাব আছে কেবল ঔষধ এবং পথ্য।

মকবলের মেডিক্যাল স্কুলগুলি উন্নীত মিরাছে। ঔষধ আরও হস্তাপ্য ও হৃদ্য হইয়াছে। টাইফয়েডের অব্যর্থ ঔষধ ক্লোরোফাইলিন পাকিস্থানে আট টাকার পাওরা যায় (শত শতকরা ৫—৭১ ভাগ), কলিকাতার উহারই দাম ৩২ টাকা (শত শতকরা ৪০ ভাগ)। গরীবের পক্ষে এই রোগের

চিকিৎসা অসম্ভব। বাংলাদেশে মকবলে মেডিক্যাল স্কুল থাকার গ্রামের লোকের ঘেঁষু হবিবা ছিল, সেগুলি তুলিয়া দেওয়ার আরও অনুবিধা হইয়াছে। একটু কঠিন রোগ হইলেই মকবলে চিকিৎসার আর কোন উপায় আশঙ্কাল না থাকার বাধ্য হইয়া কলিকাতার আশিতে হয়। এখানে হাসপাতালে স্থানান্তর, বাহিরে জারণ পাওরা কঠিন, ডাক্তারের কী, মলমূত্র পরীক্ষা, এন্ডরে ইত্যাদির কী অধিক। অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অধিকাংশ চিকিৎসা-যোগ্য রোগে লোক মরিভেছে। সরকারী হাসপাতালের জি বেডের সংখ্যা শতকরা ৬৬ ভাগ কমাবো হইয়াছে। যে যে হাসপাতালে ‘এণ্টোমেন্ট’ হইতে জি বেডের ব্যবস্থা—(School of Tropical Medicine, Lake Hospital প্রভৃতি) ছিল তাহা অর্ধকরী করা হইয়াছে।

ডিসপেনসারিতে আউট-ডোর রোগীদের কি ভাবে দেখা হয় তৎসম্বন্ধে ভোর করিষ্ট বলিতেছেন যে, এক বর্টার গড়ে ৭৫ জনকে দেখা হয়, অর্থাৎ এক জন রোগী দেখিতে ডাক্তার ৪৮ সেকেন্ড মাত্র সময় দিতে পারেন। এই তো রোগী দেখার মনুমা। ঔষধের অবস্থাও ভয়ঙ্কর। দুই-তিনটা ঠক মিক্শার ছাড়া বিশেষ কোন ঔষধ ডিসপেনসারিতে থাকে না।

মাকে মাকে বেতার বক্তৃতার বা ব্যবস্থা পরিষদে পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা দিয়া উহা পাওয়ার পরামর্শ অনেক দিয়া থাকেন। কিন্তু একথা বুঝেন না যে দুটিমের কয়েক জন ভাগ্যবান ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এই বাজারে এক সপ্তে হর, মাহ, মাংস, ডিম, মাখন সর্কিবিধ খাদ্য গ্রহণ করা কত অসম্ভব। বাধ্যতাব ও পুষ্টিহীন খাদ্যের বহুদিন বাবৎ ব্যবহারই দেশের বাস্তুহীনতার কারণ।

দেশের বাহ্যের উন্নতি করিতে সরকারের নরম কত তাহা যে-কোন বৎসরের “চিকিৎসা ও বাহ্যেয়ত্বের বরাদ্দ” বিশ্লেষণ করিলেই বরা পড়ে।

মিরে ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে এই বাবদে কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহার হিমাণ দেওয়া গেল :

১৯৪৯-৫০	১৯৪৯-৫০	১৯৪৯-৫০
বাজেট	সংশোধিত	অডিটকরা ধরত
টাকা	টাকা	টাকা
লক্ষ হাজার	লক্ষ হাজার	

গ্রাম্য ডিসপেনসারি ও

হেলথ ইউনিট ৮০ — ৭১ ৪৫ ২৩,৫২,৮৬৪

চালু হাসপাতালের

উন্নতি ১৫ — ৭ ৮২ ৫,৫৮,১৬২

কলিকাতার লজ্জাকর ব্যাধি

চিকিৎসার হাসপাতাল ৩ — ২ ৫০ ১৬,১০০

নৃতন এন্থ্রাক্স মার্ডিন ৬ — ১৩ ৬৮ ৪৫,৪৫৯

বঙ্গা হানপাতাল	১০ লক্ষ — ১১ ২৭ ১,৫১,৪৯৫
নীলমতন সরকার মেডিকেল	
জুল	১০ — ৪ ৪০ ২,৪২,৭২৫
কার্বেসি শিকা	২৫ — ৫০ ১,১০০
হেলথ এডুকেশন	১
ভাষাশাস্ত্র ইনকার্বেসি বঙ্গা-রোগীঘর	
অভ্যাস সরানো (২০০)	৪ ৫০
আইর্কেসিক কলেজ	১৫ ৫০ ৫০,০০০
বীভের মেডিকেল কলেজ	৩ ১ ৫
এমডি ও শিশু কল্যাণ	২ ১ ৫১,২০১
ফুট চিকিৎসা	২ ২৪ ১ ৮১ ৩০,৬৫০
ম্যালেরিয়া নিবারণ	২

বাংলাদেশে যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে তাহার অনেক কম খরচা হয়। বর্তমানে খরচ হয় তাহারও বেশী ভাগ 'এটারিশমেন্ট' ব্যবস্থাই দায়, ঊষধ ও পথ্যের অবস্থা তো দেখাই দেন।

দেশের সর্বক্ষেত্রে যদি এই ভাবে কাজ চলিতে থাকে তাহা হইলে জাতির ধ্বংসের আর বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভারত-মার্কিন চুক্তি

গত ২১শে পৌষ দিল্লী হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :

"ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত কারিগরী চুক্তির পূর্ণ বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল :—১৯৫০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভাতে ভারত-সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত কারিগরীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তিতে বীকৃত হইয়াছে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন মতবাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুদ্রিত অর্থনৈতিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐক্য ভারতের সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ঐ চুক্তিতে সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং বীকৃত হইয়াছে যে, উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বহুবিদ্যা, বহু-বিশেষজ্ঞ ও কারিগরী প্রণালী সম্পর্কে পারস্পরিক আদান-প্রদানের কলে উভয় দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর। ভারত-সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা বৃদ্ধির জন্য এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেকোনোভাবে তাৎক্ষণিক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বনকরে একযোগে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে—ইহা বিবেচনা করিয়া কারিগরী পরিকল্পনা সহযোগিতা এবং ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়োক্ত উপায়ে কার্যে পরিণত করিতে সম্মত হইয়াছে :—

১ম অধ্যক্ষ—এতদ্বারা ভারত-সরকার যে সমস্ত কারিগরী এহণ করিলেন ঐগুলি যথাবিধি নির্দিষ্ট একজন মন্ত্রী সাহায্যে পালিত হইবে। এতদ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাধ্য-বাধকতার আবদ্ধ হইলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন পরিষদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্ততম প্রতিষ্ঠান) মারকত তাহা কার্যকর হইবে।

(১) ভারতে কারিগরী সহযোগিতা ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য উক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদের ভারতস্থ প্রতিনিধি কারিগরী সহযোগিতা বিভাগের ডিরেক্টররূপে কাজ করিবেন। তিনি এবং তাঁহার বিভাগের কর্মচারীসমূহ ভারতে মার্কিন ফুটনৈতিক কর্মচারীদেরই অন্ততম। ফুটনৈতিক প্রতিনিধি এবং অত্যন্ত ফুটনৈতিক কর্মচারীসমূহ যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন উক্ত অধিকারিক এবং তাঁহার কর্মচারীগণই তদনুসরণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) কারিগরী ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ-বিশেষজ্ঞ-দ্বিগণকে লইয়া গঠিত একটি প্রত্যক্ষ সহযোগী ও সাহায্যকারী দল প্রেরণ করিবেন। এই সাহায্যকারী দল উক্ত (ডিরেক্টরের) পরিচালনাধীনে কাজ করিবেন। মার্কিন সরকারই ডিরেক্টর এবং বিশেষজ্ঞগণকে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু ভারত-সরকারের দিকটাই এই সকল ব্যক্তি এহণযোগ্য হওয়া চাই। যে সমস্ত পরিকল্পনা সাহায্য পাইবে সেগুলি কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে সহযোগিতা এবং ইহা পরিদর্শনের জন্য ভারত-সরকার উক্ত কারিগরী পরিকল্পনা সহযোগিতা সম্পর্কিত ডিরেক্টর এবং সয়েকমিন সাহায্যকারী বিশেষজ্ঞ দলকে যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা দিবে।

(৩) ভারত-সরকার স্বীকার করিতেছেন যে, যেহেতু অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন পরিষদ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের আদালতে অন্তর্ভুক্ত না হইবার সুবিধা প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিগণ ভোগ করিয়া থাকেন এই পরিষদের লোকজনও তাহা ভোগ করিবেন।

২ম অধ্যক্ষ—উভয় পক্ষের 'সীকার করিয়া লইতেছেন যে, ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা তহবিল নামে একটি অর্থভাণ্ডার গঠিত হইবে। এই তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৫২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত উভয় পক্ষের অহমোদিত পরিকল্পনাগুলির ব্যয় নির্বাহার্থে কোটি ডলার জমা দিবে। ভারত-সরকার কর্তৃক যথাবিধি নিযুক্ত অফিসার এবং (মার্কিন) কারিগরী সহযোগিতা পরিচালন সম্পর্কিত ডিরেক্টর কর্তৃক যোগ্যভাবে এই তহবিলের অর্থ কারিগরী সহযোগিতা সম্পর্কিত অহমোদিত পরিকল্পনাসমূহ

কার্যে পরিণত করার জন্য ব্যবহৃত হইবে। উক্ত অস্থানের বিভিন্ন বিভাগে বণিত বিধান অনুযায়ী এই তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ হইবে। উক্ত অস্থানের এই তাপে বণিত হইয়াছে যে, (ক) অর্থভাতার হইতে সন্মিলিত অর্থভাতারে অর্থহস্তান্তর অথবা অন্যভাবে ব্যয় অনুমোদন করা চলিবে। উত্তর পর্বতের সন্মতিক্রমে করেকটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঐগুলির জন্য ভারত-সরকারের অনুমোদিত হারে ঋণ ব্যবহৃত এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার জন্য পঞ্চম অস্থানে বণিত চুক্তির সর্গাধারী অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। এই চুক্তি অনুযায়ী যে অর্থ বরাদ্দ হইবে তৎসম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার (ক) অর্থভাতারে যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া হইবে সে সম্পর্কে ভারত-সরকারকে মাঝে মাঝে জানাইবে।

ভারত-সরকারের একটি বিশেষ উন্নয়ন তহবিল রহিয়াছে। ইহার পরিমাণ পঁচিশ কোটি টাকারও বেশী। ভারত-সরকার সম্মত হইতেছেন যে, ভারত-সরকার এককভাবে অথবা ভারতের রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতার প্রত্যেকটি বণ্য-বিধি অনুমোদিত পরিকল্পনার ক্ষত দ্বিবিভক্ত হারে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের ক্ষত 'ব' তহবিল হইতে অর্থব্যয় অনুমোদন করিবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত উত্তর সরকারের অর্থানুসূচ্যে যদিও উক্ত তহবিল গঠিত হইবে, কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ ও তাহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে ভারতের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থার হস্তে তত্ত্ব থাকিবে। চুক্তির সর্গ অনুযায়ী ব্যবহার মার্কিন পরিচালক বিনি হইবেন, তিনি ভারতস্থ মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীভুক্ত হিসাবে থাকিবেন এবং পরিকল্পনা নির্ধারণ ও তাহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবেন।

৩ম অস্থান—(১) উত্তর পর্বতের সম্মত হইতেছেন যে, ভারতের বাহির হইতে উত্তর পর্বতের কর্তৃক বীকৃত মাল, উপকরণ ও ট্রাকার সংগ্রহের ক্ষত 'ক' তহবিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্বতের দের অর্থের একাংশ ভারত পর্বতের সন্মতিক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাখিয়া দেওয়া বাইতে পারে; এইভাবে যে অর্থ রাখিয়া দেওয়া হইবে তাহা 'ক' তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) পরিকল্পনাগুলির কাজ চালাইবার জন্য যে অর্থ বিতরিত হইবে, তাহা সাহায্য অথবা ঋণ অথবা একসঙ্গে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে দেওয়া বাইতে পারে। যদি ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়, তবে তাহা টাকার ভারত পর্বতের প্রত্যর্পণের নর্ডে দিতে হইবে; এইভাবে ঋণ শোধ হইতে ভারত-সরকার যে অর্থ পাইবেন এবং এই কারিগরী ন-

যোগিতা চুক্তি অনুযায়ী আর্থদানীকৃত বিক্রয়যোগ্য মাল বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা 'ব' তহবিলে জমা দিতে হইবে। এই চুক্তি বর্তমান বলবৎ থাকিবে, তৎকাল একমাত্র উত্তর পর্বতের মধ্যে বীকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৩) উত্তর পর্বতের সম্মত হইতেছেন যে, পরিকল্পনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্বতের যে সকল অতিরিক্ত কারিগর নিযুক্ত করিবেন, তাহাদের সকলের বেতন ও ব্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্বতের যে সকল ভারতীয়কে ভারতের বাহিরে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিবে তাহাদের বাহিরে ভ্রমণের ব্যয়, মাল বেতন, ও অন্যান্য খরচ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্বতের যে-সরকারী প্রতিষ্ঠান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিবে তাহার ব্যয় 'ক' তহবিলে প্রদেয় অর্থ হইতে না দিয়া অন্য তহবিল হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বহন করিবেন। অপরপক্ষে ভারত পর্বতের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আবর্তক মত ও চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা দিবে এবং যেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত চুক্তি অনুযায়ী যে সকল কারিগর ভারতে আসিবেন তাহাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাটকে কাঠের গুদ হইতে অব্যাহতি দিবে।

৪ম অস্থান—(১) একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটি একটি সাধারণ পরিস্থিতি স্থির করিবেন এবং কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি অনুযায়ী যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে, সেগুলি তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিবেন।

ভারত পর্বতের এই কমিটির সম্মতপক্ষে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের সংখ্যা সাত জনের বেশী হইবে না।

১। এই কমিটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ক্ষত দায়ী থাকিবেন। তাহারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে কাজ করিবেন।

অন্যকল্যাণ পরিকল্পনা

উত্তর সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সাময়িকভাবে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত তহবিলের অর্থ সাহায্যে যে সকল পরিকল্পনার কাজ হইবে, তন্মধ্যে একটি হইবে অন্যান্য পরিকল্পনা।

অন্যকল্যাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫০ টি শহর-পল্লী উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চল ২ লক্ষ লোকের বসতিমূলক গ্রাম ৩ শত গ্রাম লইয়া গঠিত হইবে। এইরূপ অনেকগুলি অঞ্চল দ্বীপ উন্নয়ন পরিকল্পনা এলাকার এবং মল্লভূমি বন পরিকল্পনা এলাকার অন্তর্গত গঠিত হইবে।

আমাদের মধ্যে অনেক আশা প্রকাশ করিতেছেন যে, এইরূপভাবে মার্কিন ঋণ গ্রহণ করিলে আমাদের মার্কিনের প্রভাবে পড়ি। তাহাদের সান্নিধ্য মার্কিনের

মধ্যে জটাইরা পড়িব; আমাদের “নিরপেক্ষ” নীতি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। যদি ইহাই আমাদের ধারণা হয়, তবে আমরা বাণীবজা লাভ করিয়া কোন শক্তি অর্জন করি নাই, এবং শীঘ্র তাহা হুজি করিয়া নির্ভীক হইবার সম্ভাবনা খুব কম। নিজের জাতি সম্বন্ধে এইরূপ হীন ধারণা আমাদের নাই এবং হুজির অভাবও আমাদের জাতিগত নহে। রাজ-নীতির নামা কৌশল আমরা বুঝি ও শিখিতেছি।

যুদ্ধের অপরাধী

কোন ব্যক্তি মরহত্যা করিলে তার কান্সী হ'ব বা যাবজীবন তাহাকে কারাগারে কাটাইতে হয়। বিজয়ীরা ১৯১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধ হইতে এক নূতন নিয়ম করিলেন যে, রাষ্ট্রপতি ও তাহার পরামর্শদাতারা যখন বিরাট মরহত্যার অপরাধে দোষী ভবন তাহাদেরও কান্সী দিতে হইবে। ভবন খ্রিষ্টানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লরেন্ড কর্জ। তিনি ধূম তুলিলেন—“সবাই উইলিয়মকে কান্সী দিব” এবং এই প্রতিশ্রুতি-বৃদ্ধি প্রচার করিয়া যুদ্ধান্তে একটি ভোট-যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

সেইরূপ বিভিন্ন মহাযুদ্ধের “হিটলারকে কান্সী দিব”—“হুমোলিনিকে কান্সী দিব”—এইরূপ ধারণা লোকের মনে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইল, বিশেষ করিয়া কুশিয়ার। কিন্তু মিঃ চার্লিস এই বর্বরতার ব্যর্থতা দেখিয়াছেন এবং কতিপয়বার দাবি করিয়া যে লাভ হয় না তাহা দেখিয়াছেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরে কেতাকে বাঁচাইরা রাখিতে হয় বিজিতকে টাকা দান দিয়া। ঠালিম কিন্তু এসব হুজি মানিতে চাহিলেন না। তিনি তেহেরান (ইরানের রাজধানী) নগরীতে রুজ-ডেন্ট, চার্লিস ও ঠালিমের বা হুজি পরামর্শ হয় ১৯৪৪ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে, তাহাতে প্রস্তাব করেন যে নাংলি দলের যেতা ও সামরিক নেতৃবর্গকে কান্সী দিতে হইবে। এই সামান্যক প্রস্তাবের বিবরণ চার্লিসের “বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে” বাহির হইতেছে।

“নিউ ইয়র্ক টাইমস্” পত্রিকার তার সার মর্শ অবলম্বন করিয়া কোন মার্কিন সাংবাদিক এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। চার্লিসের কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য তার অস্থায়ী করিয়া লিখা। “কথার কথার ঠালিম বলিলেন: ‘জাৰ্মানীর সামরিক নেতৃবর্গকে ধ্বংস করিতে হইবে; হিটলারের সমস্ত শক্তি নির্ভর করে এই ৫০,০০০ বিশেষজ্ঞের উপর। যদি তাহাদের হুজিরা পাতিয়া বরা বার, তবে যুদ্ধের পরে তাহাদের গুলি করিয়া মারিয়া কেলিতে হইবে; এই ভাবে জাৰ্মানির সামরিক শক্তি ধ্বংস করিয়া বিশ্বশান্তির পথ মুক্ত করিতে পারা যাইবে।’”

চার্লিস এই কথার অত্যন্ত অনন্ত হইলেন। ভবন রুজডেন্ট ব্যাপারটি লম্বু করিবার জন্য বলিলেন যে, ৫০,০০০

হাজার মর, ৪৯,০০০ হাজারকে গুলি করিয়া মারিলেই চলিবে যদিও এলিরট রুজডেন্ট ঠালিমের প্রস্তাব সর্বাঙ্গতঃ করণে সমর্থন করেন। ঠালিম ও মলোটভ চার্লিসকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—‘আমরা ঠাট্টা করিতে-ছিলাম মাজ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।’

চার্লিস এখন বলিতেছেন: “আমি ঠিকই তাবিয়াছিলাম; ব্যাপার ঠাট্টা বিজ্ঞপের মর।” এই সম্পর্কে লেখক পোলিশ সামরিক কর্মচারীদের কথা তুলিয়াছেন। প্রায় ১৯২০ হাজার লোককে কাট্যন জবলে হত্যা করা হয়—নাংলি হত্যাকাণ্ডের পর বাহারা অবশিষ্ট ছিলেন। ইতিপূর্বে বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে “হুলাকদের ধ্বংস” করিবার নামেও প্রায় ৩০ লক্ষ মরমারীকে না খাইতে দিয়া মরণের পথে তৈলিয়া দেওয়া হয়। ঠালিমের হুজি ছিল একটা, “হুলাকদের (সম্পন্ন চাষীদের) প্রয়োচনার এই লোকসমষ্টি নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্য তাহাদের গুলি হইতে তেতা হাঙ্গল বিনা প্রয়োজনে মারিয়া কেল। কোন রাষ্ট্র তাহা সহ করিতে পারে না। রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে চলিবার সাহস থাকিলে তাহা হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দেয়। আমাদের কন্যুনিষ্টদের সেই সাহস আছে কি?”

জাতিসঙ্ঘে কৃষিপ্রসঙ্গ

রাষ্ট্রসংঘে সম্মিলিত প্রতিনিবিশ্বদ কৃষি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বর্তমান অবিশেষণে সর্বাঙ্গপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলিয়া মনে করেন। বর্তমান সত্তাহে এই প্রস্তাবটি রাষ্ট্রসংঘের অর্থ-নৈতিক কমিটিতে উপস্থাপিত হইতেছে। প্রতিনিবিশ্বদের এক জন সদস্য এইরূপ আভ্যন্তর প্রকাশ করেন, কৃষি-সংস্কার সমস্তার আওতাধীন না হইলে ইহা অবৈধনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং বিশ্বের মর-মারীর দৈনিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত করিবে।

কৃষি-সংস্কারপ্রসঙ্গে ব্রাজিল, বাইল্যাণ্ড, হুজরাই ও পাকিস্তান কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের অবৈধনৈতিক কার্যটির বর্তমান অবিশেষণে বিবেচিত হইবে। কৃষি-সংস্কার সমস্তার সমাধান সমস্তারের দায়িত্ব সমধিক। সমস্তারের নিকট হইতে ব্যাহিক সাহায্য এ বিষয়ে প্রকৃত কার্যকরী হইবে। সমস্তারের সহযোগিতার প্রয়োজন্য পরিকল্পনার দ্বারা দিয়া কৃষি-সংস্কার সমস্তার সমাধান করা যাইতে পারে।

গত ২২শে পৌষ তারিখে, প্যারিস হইতে যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, উপরোক্ত সংবাদটি তাহার মধ্যে আছে। পরিকল্পনা বিরাট হটক, সামান্য হটক, তাহার সাক্ষ্য নির্ভর করে ব্যক্তির উপর। কোন রাষ্ট্র কেবল তার অর্থবলের সাহায্যে তাহা আশ্রিত পারে না। তারতরাষ্ট্রের সাংগঠিকবর্গের নিকট ইহাই প্রথম সমতা। “বৃহৎ বয়ের” সাহায্য না পাইয়াও প্রাচীন বিশ্ব, প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন মোলো-

পট্টেয়া ও প্রাচীন চীনের লোক তাহাদের দেশের চেহারা বদলাইয়া বিরাহিল। তাহার ইতিহাস হইতে বর্তমান যুদ্ধবর-যুদ্ধ নয়-নারীর অনেক শিখিবার আছে।

একটা কথা প্রায়ই ভুলিতে পাই। প্রাচীন জগতের এই সব নদী-মালা দাস-শ্রমিক দ্বারা করানো হইত। আকাল তাহা করানো হয় না। কিন্তু তাহারা এই সব পরিকল্পনার ধর রাখেন, তাহারা জানেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান ইহার মধ্যে বেশী নাই; পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গেলে ব্যক্তির স্বাধীনতা কম-বেশী সঙ্কুচিত হইবে। প্রাচীনকালে দাস-শ্রমিক হরত পলাইয়া বাইত। আক শ্রমিক হর “বর্নবট” করে, না হর কাজে ইতকা দেয়। যুদ্ধের মধ্যে পাণ্ডক্য খুব বেশী নাই।

ভারতবর্ষের নৌবহর

গত ৬ই শৌর ভারতবর্ষাণী “নৌবহর দিবস” প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারত-সরকার একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান (ইংরেজ আমলের) কথা তাহার মধ্যে ছিল। আর ছিল এই যুদ্ধেরের সূত্রে ব্যবহার করিবার জ্ঞান নিক্ষেপে প্রভুত করিতে স্বাধীন ভারত কি করিয়াছে তাহার কথা। আমরা তাহার মর্মার্থ নিয়ে তুলিয়া দিলাম :

ভারতীয় নৌবহরের সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। কিন্তু আধুনিক কালের যে ইতিহাস আমরা জানি ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়।

ঈষ্টার শতক আরম্ভ হইবার পূর্বে হইতেই যে ভারতীয় পোত সমুদ্রে বিচরণ করিত প্রাচীন বর্ণগ্রন্থ, ইতিহাস এবং শিল্পকলার নিদর্শনগুলিতে তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে। যদিও ইহাদের অধিকাংশ বাণিজ্যপোতই ছিল, তবু দীপগুলি জয় করিবার সময় কাহাজের সাহায্যে নৈভবাহিনী পাঠ করা হইত ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। ভারতে কাহাজ-নির্মাণ শিল্পও উন্নতিলাভ করিতেছিল। নদীতে ঢালাইবার উপযুক্ত তবু নৌকাই যে তৈরি হইত তাহা নহে। সমুদ্রগামী পোত নির্মাণও অপ্রচলিত ছিল না।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও এই নৌশিল্পের চর্চা বৃদ্ধি পায়। বোম্বল আমলে, বিশেষতঃ আকবর নৌশিল্পের উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বাংলার ঢাকা শহরে তাহার নৌ-বিভাগের সদর দপ্তর ছিল। আকবরের উত্তরাধিকারীরাও নৌশিল্পকে অবহেলা করেন নাই। দিল্লীর উপকূলের চোতাগণও (মালদ্বীপ) তাহাদের নৌশিল্পের জ্ঞান উপকূলে দীর্ঘকাল বাবৎ আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল। উৎকল ও অঙ্গ রাজ্যে রেলার ভারতসমুদ্রে যে প্রাণত হাপন করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাঙালীর নৌবহর রাজা রঘুকে পর্য্যন্ত চমকিত করিয়াছিল।

ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল : ১৬১০ ঈষ্টাবে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বন্দন ভারতীয় নৌবাণিজ্যের প্রবর্তন করিলেন এবং এই সব পোতে কাজ করিবার জ্ঞান ভারতীয় কর্মচারীদের নিয়োগ করিলেন তখন হইতেই ভারতীয় নৌ-বহরের প্রকৃত উৎপত্তি হইল বলা চলে। এই সব পোতে উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী হিসাবে কোম্পানীর বাণিজ্যপোতের লোকদের নিয়োগ করা হইলেও নিম্নতম কর্মচারী এবং ডক শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়।

ভারতীয় নৌবহরের নাম পরিবর্তন করিয়া পরে বোম্বাই নৌবহর রাখা হইয়াছিল এবং বোম্বাইতেই ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে কোম্পানীর যে সব যুদ্ধ হয়, তাহাতে এই নৌবহর বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু শুধু সামরিক ও অসামরিক কাজেই কোম্পানী তাহাদের জাহাজগুলিকে নিয়োগ করেন নাই। বোম্বাইতে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানাও তাহারা গড়িয়া তুলিতে-ছিলেন। বোম্বাইয়ের বর্তমান ভকট ১৭০৫ ঈষ্টাবে অবিস্কৃত এবং ক্রমে ইহা জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানা হইয়া উঠে। ১৭৭৫ ঈষ্টাবের মধ্যে এই কারখানাটি এত উন্নতিলাভ করে যে, পৃথিবীর তৎকালীন যে-কোন শ্রেষ্ঠ কারখানার সঙ্গে তুলনা করা চলিত। ওক কার্টনির্মিত এই জাহাজগুলি ইউরোপের যে-কোন কারখানার জাহাজের অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর বলিয়া তখন সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করে।

১৮৫৭ ঈষ্টাবে ভারতীয় নৌবহর ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট হস্তান্তরিত হয়। অবশ্য তাহার পূর্বে বহুবার ইহার নামের পরিবর্তন হইয়াছে। ১৮৯২ ঈষ্টাবে অবশেষে ইহাকে রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক অবিস্কৃত হইবার পর হইতে ভারতীয় নৌবহর রাজকীয় নৌবহরের একটি শাখা হিসাবে কাজ করিতে থাকে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের বহু নৌযুদ্ধে সহ-যোগিতা করে। ১৯০৪ ঈষ্টাব হইতে ভারতীয় নৌবহর রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীরূপে আখ্যাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌবহরকে বহুলাংশে প্রয়োগিত করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার উচ্চ ও নিম্নতম কর্মচারীদের সংখ্যা ২ হাজার মাত্র ছিল। যুদ্ধের সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ হাজারে উঠে বহু আধুনিক জাহাজও ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়।

স্বাধীনতার পরে : ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর দেশ বিভাগের কালে ভারতীয় নৌবহরের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ৪৮৮৮ জাহাজ, ২৮৮৮ ক্রিগেট, ১৮৮৮ কনভেট, ১৮৮৮ সার্ভে-ভেসেল, ৮৮৮৮ ট্রলার মাইন স্ফীটার (বোমা তুলিবার জাহাজ) এবং ১৮৮৮ জাক্‌টাইং মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ৩ হাজার

মাইল উপকূল রক্ষার কাজে ইহাকে মোটেই পর্যাপ্ত বলা চলে না।

সুতরাং নৌবহর প্রসারের পরিকল্পনার ভারতকে বধেই কাজ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রথম হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইয়াছে। ঐ বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে এ সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল তাহার কলে সে ১০৩০ টনের ‘একিলিস’ নামে একখানি জুঝার পার এবং ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইহার ‘বিল্লী’ নাম দেওয়া হয়।

এইভাবে ভারতীয় নৌবহর বৃদ্ধির স্রব্ধপাত হয়। ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারত ক্রমে “রাকপুত” “রনজিং” ও “রাণা” নামে তিনখানি জুঝার লাভ করিয়া একটি ফ্লোটিল পঠন করে। এই সঙ্গে দেশ বিভাগের কলে যে ক্রিপেটগুলি ভারতের অংশে পড়ে সেগুলি লইয়াও ভারত একটি ক্রিপেট ফ্লোটিল গঠিয়া তোলে। প্রত্যেক বছরে ২ শত কর্ণচারী আছে। সম্ভ্রতি মাইন সুইপার ফ্লোটিলও পঠন করা হইয়াছে।

শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা : ভারতে নৌবহরের প্রসার পরিকল্পনার শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার কলে ভারতীয় নৌবহরের যোগ্যতা ও স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশ বিভাগের পর ভারত তিনটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র এবং বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞকে হারাইয়াছিল। অবশ্য এডমিরাল দণ্ডের সাহায্যে প্রাথমিক অনুবিদ্যাগুলি কাটাইয়া উঠা গিয়াছিল। ভারতীয় নৌ-কর্নচারিগণকে দলে দলে শিক্ষা দেওয়ার ভার উঁহারা গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডগামী ভারতীয় শিক্ষাবলীণদের জন্ত একটি স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিভিন্নপ্রকার উন্নয়নমূলক কার্য : ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে নৌবহরের নামের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই দিন হইতে দীর্ঘকালের ‘রাকপুত’ শব্দটি ত্যাগ করিয়া ইহাকে শুধু ভারতীয় নৌবহর নামে অভিহিত করা হয়।

জামদগর ও বোম্বাইয়ের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি সম্ভ্রসারিত করা হইয়াছে এবং কোচিন ও বিনাথাপত্তমমে নুতন শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের নৌবিভাগীয় কোরাড্রন ও জাহাজ ভিড়াইবার স্থান সম্ভ্রসারণও প্রয়োজন হইয়া গঠিয়াছে। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে তাহা করা যাইতেছে না। ১৯৪৯ সনে শিক্ষাবোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ হইতে ৪৬-এ উঠে। ১৯৪৮ সালের মাকামারি ‘বিল্লী’ জাহাজে সমগ্রই শিক্ষিত কর্ণচারী পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু এডমিরালদের সাহায্যে নৌবহর বিভাগের সমস্ত প্রয়োজন মিটান সম্ভব নহে। তাই নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গঠিয়া তুলিতেও ভারত গবর্নমেন্ট মনো-যোগী হইয়াছেন।

সম্ভ্রতি নৌবিভাগের বিমানবহরের জন্ত সমুদ্রের উপকূলে খাটী নির্মাণ করা হইয়াছে।

নৌবিভাগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্ত এক জন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার অধীনে গবেষণাকার্য্য চালান হইতেছে।

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা-সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৩ই পৌষ পাটনা নগরীতে নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা সম্মেলনের ২৭তম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। মূল সভাপতি ছিলেন ত্রীঅভূলচন্দ্র গুপ্ত। হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল, সাহিত্যরসিক ও ব্যাখ্যাকাররূপে তিনি বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের একজন মিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

উঁহার বক্তৃতা ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্যের প্রতি নুতন করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে :

“পূর্বে পশ্চিমে যথার্থে ছিন্ন হলেও মহাদেশের মত প্রকাণ্ড দেশে আমরা এক মহাদ্বীপে গড়ে তুলেছি—বাইয়ের চাপে নয়, নিজেকে প্রয়োজনে ও ইচ্ছায়। এ মহাদেশের ঐক্য কি কেবল হবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, শাসন নৌকর্ষ্যের ঐক্য—যা ইংরেজের আমলে ছিল। যদি তাই ঘটে তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক প্রকাণ্ড সম্ভাবনাকে আমরা ব্যর্থ করব। সে সম্ভাবনা হচ্ছে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র এই মহাদেশে জাতিতে জাতিতে যে মিল তা রাষ্ট্রীয় ও সাংসারিক প্রয়োজনের গভী হাণিরে অভ্যয়ের ঐক্যে পরিণত হবে।...”

সাহিত্য ও সমাজ : ছুইট চরম মতবাদ

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধের প্রশ্ন বহুই উত্থিত হয়। সেদিক থেকে ছুটি চরমপন্থী, বিপরীত মতবাদ সম্ভবপর। প্রথম মতানুসারে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কার্য্য কারণ বা অঙ্গাদী সম্বন্ধ নেই। সমাজের পরিধি বাস্তব জীবনের মূল পরিবেষ্টন। সাধারণ জীবনের কার্য্যকলাপ, চিন্তাপ্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সমাজের কার্য্যবার। ব্যক্তিমণ্ডলী নিয়েই পরিবার, পরিবারগোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। সেজন্য ব্যক্তি-গত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্ভা, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, অতি মূল মূল বিষয় নিয়েই সমাজকে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকতে হয়। কিছু পরিমাণে ব্যক্তিব্যক্তির বিসর্জন না হিলে পরিবারের পঠন সম্ভব নয়। একইভাবে বিভিন্ন পরিবারমণ্ডলী নিয়ে যখন হয় সমাজের ভিত্তি সংস্থাপন, তখন পরিবারের অপেক্ষাকৃত সর্গীয় গভীও হয়ে যায় পুঁসরার বিতৃপ্ততার এবং সার্কজনীন স্তরের নিকট ব্যক্তি ও পরিবারের নিজস্ব বার্ষ হয়ে যায় অপেক্ষাকৃত অর্থহীন। তা সত্ত্বেও যে কোন ছিন্ন-প্রতিষ্ঠ সমাজেই পরিবারের তথা ব্যক্তির হাণি উপেক্ষিত হবার নয়—কার্য্য পরিবার ও ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাহের বাহ্য নিয়ে নয়। কিন্তু এই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে হিত্যের—কাব্য বর্ণন বর্ণের—সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে? সমাজ জন্ত

পৃথিবীতেই চিরকাল প্রৌথিত—প্রাত্যহিক জীবনের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়, অন্ন-মৃত্যু-বিবাহ, দাবি-অবিচার-আইন প্রভৃতির বিচার ও সিদ্ধান্তেই সে নিরন্তর ব্যাপ্ত। কিন্তু সাহিত্যের চির-অন্নান শতদল প্রস্তুত হয় সেই অপার্থিব মানসলোকেরই চির-শোভন মানস-সরোবরে। দিবাযাত্রাহে যেমন শতদলের শতদলই শুষ্ক হয়ে বয়ে পড়ে, বাস্তবতার প্রধর তাপে তেমনি সাহিত্যের প্রাণবন্তও হয়ে যায় বিনষ্ট। সেজন্য সাহিত্যের কমলাসম থাকবে পাভা সেই অবাস্তব সৌন্দর্যালোকেই মাত্র যেখানে পৌছাতেই পারে না কোমল পাণ্ডিত্য শোকতাপের দীর্ঘশ্বাস, যেখানে পড়তেই পারে না বরষীর ধূলার মলিন ছায়া, যেখানে শুষ্ক হয়ে যায় আর্গতিক বিবাহ-বিসংবাদের কর্কশ কোলাহল।

উত্তর চরম মতবাদের সমন্বয় সাধন

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড। অসংখ্য রক্তকণা, স্নায়ু, মাংসপেশী, ইলিফ্যান্ট সম্বলিত মহাম্যদেহ বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অংশের সমাবেশ হলেও কি এক অপূর্ণ কৈবিক নিয়মাত্মসারে একটি সমগ্র অখণ্ড বস্তু। অতঃপর জীবনধারণ হয়ে উঠত অসম্ভব। ঠিক একই ভাবে, অসংখ্য চিন্তা, অল্পভূতি, প্রবৃত্তি প্রমুখ বিভিন্ন—আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, মানসিক ভাব-সম্বলিত। মানব-মনও কি এক আকর্ষণ আধ্যাত্মিক নিয়মাত্মসারে এক অভিন্ন সমগ্র সত্তা। মজুত একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ত কথার কথা। এরূপে শুধু মানবের কেন, সমগ্র জগতেরই ইতিহাস অল্পমাত্রাও আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বস্তুর মনোভাব একের, বিরোধের মনোভাব সামঞ্জস্যের, বিচ্ছিন্নের মনোভাব সমগ্রের আবিচার ও প্রকাশই জীবন, স্থিতি ও স্রুতির কারণ। সেজন্য অর্ধ ও বাস্তবের মনো বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মনো একটি সংযোগ সংস্থাপনের প্রচেষ্টাও মানুষের পাখত প্রচেষ্টা। বাস্তব জগতেও দৃষ্ট হয় যে, চরম আদর্শবাদী ধর্ম এবং চরম বস্তুবাদী তৌহীদ সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যপন্থীদের সংখ্যাই অধিক। মহামাজীবনের এই সমন্বয়ের চিন্তাও মহাম্যদেহ দর্শন, সাহিত্য ও নিরাকার পরিষ্কৃত হয়েছিল। তারই কলে উপদ্রি-উক্ত দুই চরম মতবাদের মনোভাব আশ্রয় পেয়েছি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আর একটি তৃতীয় সমন্বয়বাদ, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার, আকাশ ও পৃথিবীর, আত্মা ও দেহমনের সংঘর্ষিত হয়েছিল এক অপূর্ণ মিলন। প্রথম চরম মতাত্মসারে দর্শন, ধর্ম, কাব্য প্রভৃতি বস্তুসংখ্যক ভীষণী দার্শনিকের এবং উদগ্র করুণাবিলাসী রসিকদের আশ্রয় বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পদবাচ্য নয়। যে লেখন সম্পূর্ণই অবাস্তব ও স্বকপোলকল্পিত, যার সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পূর্ণই শূন্য মততলে, তা সেই বস্তুসংখ্যক ব্যক্তিকেও কতকাল কত পরিমাণে প্রকৃত ভূমিপ্রদানে সন্নিহন হয়, সেইটাই চিত্তদীর্ঘ। সন্দেহ নেই যে, কেবল মনেরই সঙ্গে

এই একাকী, উদগ্র বেলায় মনই বরং অচিরে প্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই অবসার থেকেই সৃষ্টি হয় misanthrope বা মানব-বিরোধী দার্শনিকপ্রবরের ও lotus-eater বা দিবাংগবিলাসী অলস, অকর্মণ্য কল্পভূপের।

সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা অত্যাধুনিক কালে ভারতবর্ষের মনকে স্রবণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন পৃথিবীর অস্ত সব বেশে তেমনি ভারতবর্ষে আজ আশ্রয় কর্তব্য। অন্নবস্ত্রের কটে ও চিন্তার জ্বাতি প্রস্ফুটিত। যেমন অন্য, দেশে তেমনি ভারতবর্ষেও আশ্রয় অনেক বলছি সূত্রে যিনি যেনে আমাদের হৃৎস্পর্শের দিন এসেছে। এ হৃৎস্পর্শ যিনি যেনে একটা প্রধান কারণ যাদের সূত্রে অন্ন কি পরনে কাপড় আছে কিনা সে বৌদ্ধ দেওয়ার সূত্রে লোকের প্রয়োজন হ'ত না, সেই অন্নবস্ত্রহীনদের মল আর আর কাকেও মিলিত থাকতে দিচ্ছে না। তাদের দাবি যেটার চেটা না করে উপায় নেই। এই চেটার পূর্বভূমি সূত্রে পৃথিবীর সম্রাট ও বসন্তর তেজে পড়ছে। চারদিকে নৃত্যময় সৃষ্টির বেদনা। কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের দাবিই কি এদের চরম দাবি? সে দাবি যখন মিটবে তাদের অন্তরাত্ম তখন দ্বিজ্ঞানসা করবে না ততঃ কি? যেমন আককের সভ্যসঙ্কমেতা শুধু শরীরের দাবি যেটামতে পূর্ণ সূত্রে অবস্থা মনে করেন না, সভ্যতার যে সব অন্তরীক্ষী সৃষ্টির আনন্দ না হলে তাদের জীবন উচ্ছিন্নহীন ও অপূর্ণ মনে হয়, তার দাবিও আককের অন্নবস্ত্রের কাপালেরা পরত করবে। সভ্যতার যে সব সৃষ্টি সাংসারিক কাজে লাগে না, কিন্তু মানুষের বা অত্যা সন্দেহ, তার দাবি যদি তারা না করতে দেখে তবে এই চিরবিকিটেরা আবার বকিত হবে। ইতি-মনো তাদের অন্নবস্ত্র কোণার বাস্তবতার সভ্যতার অস্বত্বতাও তুলি যেমন আশ্রয় না তাতি। মানুষের সাহিত্য সেই অস্বত্ব-তাতেও একটি।”

এই ব্যাখ্যান দুগোপযোগী হইরাছে। অত্যাধুনিক-সমিতির সভাপতি জীহুবাংগুয়ার দান এই সত্যই অত ভাষার বলিষ্ঠা-হে। ভারতবর্ষের সম্মুখিত্ব বহির জন্য বাংলা সাহিত্য বাহা করিরাছে এবং বাহা করিতে পারে সেই আদর্শের কথাই তিনি বলিরাছেন। শিশু-সাহিত্য পাখার সভাপতি ছিলেন জীহুবাং-চন্দ্র সরকার। তিনি এতৎসম্পর্কে লোক-সাহিত্য, পাখা, গল্প, রূপকথা ও কবিতার উল্লেখ করেন। শিজাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথের অবদান অস্বীকার। বোম্বেন্দ্রনাথ সরকার ও সূর্য্যনারায়ণ আধুনিক রূপের শিশু-সাহিত্যের স্রষ্টা। আজ বাহারা প্রৌঢ়ে পৌহিরাছেন পৌহ-পৌহী সৌভাগ্যে তাঁহাদের হিংসা হয়।

সূর্য্যবাহু একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান করিরাছেন :

“যিনি যিনি সাহিত্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত করে পড়ছেন। আককের যিনি কেবলমাত্র বইয়ের পাতার মনোই শিশু-

সাহিত্য সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। বেতার ও সিনেমার ভিতর দিয়ে মানা দেশে এক অভিন্ন শিশু-সাহিত্যের ধারা বহু হচ্ছে। এই ক্ষুদ্র বয়সের সাহিত্য—যদি তাদের সাহিত্য আখ্যা দেওয়া চলে—খুবই অল্পতাবে সরল শিশুচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করছে। এই প্রভাবের ভিতর শিশুদিগের চিত্তকে বিজ্ঞাত করার যেমন অনেক পথ আছে—তেমনি ভালো দিকে নিয়ে যাবারও বহু উপায় আছে।”

সম্মেলনের এই অধিবেশন সার্থক হইয়াছে যখন দেখি যে নিখিল-ভারত সাহিত্য শাখার সভাপতি বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীহাকারিপ্রসাদ দ্বিবেদী বলিতেছেন :

“যত দিন আমরা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচিত না হইছি তত দিন এমনে এমনে সত্যিকার শ্রীতি-বন্ধন দৃঢ় হতে পারে না।”

ব্যয়ুগে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ বাতায়নের এত সুবিধা সত্ত্বেও তাহা হইতেছে না কেন তাহাই প্রশ্ন। অতীতের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :

“বাংলা ভাষা, মৈথিলী, ব্রজবুলি সাহিত্যের একসঙ্গে আলোচনা করলে বৈকুণ্ঠ সাহিত্যের আলোচনা পূর্ণ হতে পারে। আসামের অক্ষয়ানারের পরম্পরার এবং নেপালে প্রাপ্ত নাট্যসাহিত্য পরম্পরার মৈথিলী ভাষার প্রভাব দেখান হইবে। মণিপুর, বাংলা এবং উড়িষ্যাতে গৌড়ীয় বৈকুণ্ঠ মতের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং বুদ্ধাবন থেকে তার প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে কিছু কিছু এসে পড়েছিল। গৌড়ীয় বৈকুণ্ঠ আচার্য্যদের সিদ্ধান্তগুলি পরে অমোঘ্যর অনেক রামাওত সম্বন্ধকারকে প্রভাবিত করেছে। দক্ষিণের বৈকুণ্ঠ সাহিত্য যে আমাদের উত্তর-ভারতের সাহিত্যগুলিকে মন-প্রেরণা দিয়েছিল সে বিষয় সকলেরই জানা আছে।”

পশ্চিম বাংলার রেশনের দোকান

এই বিষয়ে, সিদ্ধ চাল ও আতপ চাল সরবরাহের ব্যাপারে কতকচির শেষ হইল না। কেন এক দোকানে, বিশেষতঃ গবর্নেন্টের দোকানে, আতপ চাল পাওয়া যায়, অত দোকানে পাওয়া যায় না, তার রহস্য বুঝা শক্ত। সেই কথাই “আমদ বাকার পত্রিকা”র ২৬শে পৌষ সংখ্যার আলোচিত হইয়াছে। এই বিরক্তিকর ব্যাপারের অবসান কবে হইবে?

“কলিকাতার খাদ্য রেশন সরবরাহে কিরপ অব্যবস্থা হয় সম্প্রতি তাহার একটি ঘটনা আমাদের পোচরে আসিয়াছে। উত্তর কলিকাতার আমহাট্ট গ্রীট এলাকার রেশনগ্রহীতাদের অনেককে কেবল আতপ-চাউলই দেওয়া হইতেছে; আর বড়-তলা এলাকার রেশনগ্রহীতাদের মধ্যে বাহাদের আতপ-চাউল একাত্ত প্রয়োজন তাহারা তাহা চাহিয়াও পাইতেছে না। পাশাপাশি অবস্থিত এই দুই এলাকার যে এইরূপ সরবরাহ-

বিজাট ঘটতেছে, তাহা উপরওয়ালাদিগের অবহেলা ও মনো-যোগের অভাব প্রমাণ করে। উত্তর এলাকার লোককে এই-রূপ ভাবে বিভ্রত ও বিরক্ত না করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি আমহাট্ট গ্রীট এলাকার আতপ চাউলের কিছু অংশ বড়তলা এলাকার এবং বড়তলা এলাকার সিদ্ধ চাউলের কিছু অংশ আমহাট্ট গ্রীট এলাকার পাঠাইতেন, তাহা হইলেই তাহাদের কর্তব্য পালন করা হইত। কোন্ রেশন দোকানে মাসিক কি পরিমাণ আতপ চাউলের প্রয়োজন হয় তাহার একটা হিসাব আছে। রেশন দোকানের ম্যানেজারেরা যখন প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য কর্তৃপক্ষের তথন তাহাতে নিশ্চয়ই “ইহার” উল্লেখ থাকে। উপরওয়ালারা তদনুযায়ী কার্য করেন না কেন—এই প্রশ্নের জবাবদিহির প্রয়োজন। আতপ চাউলই বাহাদের একমাত্র ব্যবহার্য্য ভাতাদের আতপ চাউল সরবরাহ না করার অর্থ আহার হইতে বঞ্চিত করা।”

এই বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রবুলচন্দ্র সেনের দায়িত্ব সুস্পষ্ট। ডেপুটি সচিব ব্যন্ত থাকিলেও তাঁর ত একটা আশিষ্ট আছে; তাঁরা কি করিতেছেন? এতৎসম্পর্কে সহযোগী “রূপবানী” গত ২৭শে পৌষ সংখ্যার অপব্যয়ের সংবাদে উপর যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁর প্রতি খাভমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

“রেশন কার্ড বদলাইবার নিয়ম

টেটসম্যাম, হিন্দুস্থান ষ্টাভার্ড, অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে রেশন কার্ডের স্লিপ আঁটবার বিজ্ঞাপন খুব বড় করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বেশ কয়েক হাজার টাকা খবরের কাগজগুলার পকেটে ঢালা হইয়াছে। রেশন কার্ডের মোহর যথাসময়ে কুরার এবং যথারীতি বাহুলী কারবার রেশন স্লিপ আঁটরা দেয়। কবে কখন কোথায় কি ভাবে কাহারো স্লিপ আঁটবে তাহা ২৫ টাকা ইকি দরে দৈনিক ২০০ টাকা এক একট কাগজে বরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। রেশন দোকানে একটা বোতিল টাকাইরা মিলেই বধেই, না মিলেও কথা নাই। আসল, জাল, মকল সব রকম রেশন কার্ডের মালিকরা মিথ্যেদের পরজ্জই স্লিপ আঁটাইরা লইবে। যে টাকাটা এই ভাবে খবরের কাগজ-গুলোকে দেওয়া হয় সেটা কার টাকা? কেন দেওয়া হয়? ইলেকশন অফিসার এবং আর পাঁচটা সরকারী মুখপাত্রের পাটোয়ারী বুড়ির হাতকর বিয়তি ছাপিবার অভ্যই কি এই সুখের ব্যবস্থা?”

জিপুরা রাজ্যে গমনাগমনের সুবিধা

আগরতলা-পাণবরগান্ধি পথে জিপযোগে (অত কোন বাদে নয়) অল্পতর পথ হিসাবে ডাক চলাচল শুরু হইয়াছে এলা জাহুয়ারী হইতে। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহা বাহির হই-রাছে। পথটি এখনও শুধু Zeepable, পরের দুই বাণ অর্থাৎ

formation cutting ও metalling এখনও ঘেরি আছে। ভারত ব্যবচ্ছেদের পর ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। আগরতলা হইতে পাণ্ডুরানির দূরত্ব ১৪৬ মাইল। পাণ্ডুরানি হইতে কুসিনগর, বরদপুর দিয়া আসাম লিঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ অতঃপর সহজসাধ্য হইবে।

সাবরম ত্রিপুরার অভ্যন্তর বিভাগ—প্রধান নগর (গ্রাম ?) সাবরম হইতেই বিভাগের নাম। কিন্তু এইট বেদ পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। চট্টগ্রাম ও মোরাখালী জেলা ইহাকে দক্ষিণ-প্রান্তে বেঁধেন করিয়া আছে। আগরতলা হইতে সাবরম বাইবার হইট পথ। (১) আগরতলা হইতে বাসযোগে বিশাল-গড় (পথ একপ্রকার); তথা হইতে বাসযোগে উদয়পুর; উদয়পুর হইতে সাবরম (হাঁটা পথ, অতি কষ্টে জিপ চলে)। (২) ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গের ই-বি-রেলওয়ের আবাউরা অংশ হইতে চট্টগ্রামের পথে ঘূষ ট্রেন; তথা হইতে নৌকা যোগে ২২ মাইল সাবরম।

কলকলিয়াবাট হইতে বর্ধমান পর্যন্ত একটি রেলওয়ে লাইনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারে দাখিল করা হইয়াছে। এই সব সুখবর। আশা করি, ত্রিপুরা রাষ্ট্রের অকুর্ত প্রাকৃতিক তাড়ার এখন মুক্ত হইবে।

বাংলা ভাষা ও পাকিস্থানের শিক্ষানীতি

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের যে একটি হুকৌম্বা নীতি আছে তাহা পাকিস্থানের নাগরিকবর্গের পর্যন্ত বিস্তারিত বিষয় হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ঢাকার “আজাদ” পত্রিকার গত ২৪শে কাষ্টিক সংখ্যার হুকুল আক্বাহ নামে একজন লেখক বাহা বলিয়াছেন তাহা এনিধানযোগ্য। প্রবন্ধের শিরোনাম “শিক্ষা বিভাগের কীর্তি”। আমরা লেখককে জামি না। কিন্তু “আজাদ” বহন হুকুলম শিরোনাম দিয়া প্রায় তিন কলমব্যাপী প্রবন্ধ হাপাইয়াছেন, তখন মনে করি তার একটা মূল্য আছে।

লেখক পূর্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর হুদয়-ই খোদার প্রতি হুর্ব্যবহার সম্বন্ধে যেভাবে কোড প্রকাশ করিয়া-ছেন তাহা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি :

“ওপরের দিকে তাকালে দেখতে পাই—ভাঙার (?) হুমুরতে বুহার মত লোক বিসি একাধারে ডি-এসসি, পি-আর-এস, কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রথম বিভাগে প্রথম, বহু এম-এণ্ডেতা...তার মত লোকের হান পূর্ব পাকিস্থানে হ’ল না। নানা বিপাকে পড়ে তাঁকে একেবারে হিটকে পড়তে হ’ল করাটীতে। বেশে কিরে আনবার চেষ্টাও যে তিনি করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁর অপরাধ অনেক।

নব চাইতে বড় অপরাধ বুদ্ধি এই যে, শিক্ষা বিভাগের কনৈক সিলেটবাসী কদমতীকে তিনি তাঁর বিভাগে পূর্ববঙ্গের

অসংখ্য সুবক ও বেশিকাল চাকরী করেছেন এমন সব কদম-চাকরীকে ডিকিরে সিমিরের লাডিস দিতে রাজী হন নি।”

এখানে মরণ করিতে হইবে যে পূর্ববঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী বোলবী আবদুল হামিদ একজন খ্রিষ্টবাসী। এবং পাকি-হামের প্রতিষ্ঠা হইলে খ্রিষ্টবাসী বহিষ প্রভৃতি উক্ত পদ ও সরকারী চাকরীতে অনেক সুবিধা পাইবেন এই প্রলোভনেই অনেক গণভোটের সময় পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দেন। খ্রিষ্টের মুসলমানসমাজ শিক্ষার বেশ অগ্রসর এবং বংশধর্যাদার তাঁদের হান প্রায় হুটিকে। তাঁদের অনেকেই ভারতরাষ্ট্রে উচ্চপদ অধিকার করে আছেন। এখন তার মত তাঁরা অত জেলাবাসীর হিংসার পাত্র।

হুকুল আক্বাহ সাহেব ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ ও ব্যক্তিগত আলো-চনা করিয়া ব্যাপারট লম্বু করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহারও প্রয়োজন আছে; অনেকের গুণাগুণের কথা জানা যায়। মূল-নীতি সম্বন্ধে অগ্রহারণ মাসের “ইমরোজ” বাহা বলিয়াছেন তাহা জামিয়া রাখা ভাল :

“বংসর চারেক আগে পূর্ব বাংলার শিক্ষা সংস্কার কমিটি বলে যে কমিটি গঠিত হয়, তাঁরা এতদিনে তাঁদের বিচারিত রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কিন্তু শিক্ষাবিদদের কমিটি যে বিষয় ছেলোদের বাড়ে চাপাতে সাহস করেন নি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে একেবারে বাধাতামূলক করে তুলেছেন। প্রাইমারী শিক্ষার মধ্যে আমরা আরবী তথা উর্দু হরকের প্রচলনের চেষ্টা ও তার সাক্ষাৎ পাওয়ার কথাই বলছি।

মন্ত্রিদের গদী বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের মত সমস্ত জ্ঞানের আধার কিনা জামি না, তবে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে উপেক্ষা করার মত কোন মুক্তিসদত কারণ আমরা খুঁজে পাই নি। শিশুর মস্তিষ্কও শিশুই, তার বাড়ে চাপালেই সে হুমিয়ার সব জ্ঞান বহন করতে পারবে একথা আমরা বিশ্বাস করি না। মন্ত্রী সাহেব বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে তাঁরী নাগরিকদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেছেন বলে মনে করতে পারছি না।

তু পূর্ব পাকিস্থানেই নয় কেন্দ্রীয় পাকিস্থানের মন্ত্রীর গদীতেও যে আলকেনি মেই এতদিনে আমরা তা একটু একটু বুঝতে পারছি। বাংলার বা পূর্ব বাংলার কোন কালে নাকি টাকার আট মণ চাটল বিক্রী হয়েছিল। এবার লবণ ১৬ টাকা লের দরে বিক্রী হয়েছে। তখনকার শাসনকর্তাকে কোন জবাবদিহি করতে হয়েছিল কিনা জামি না, তবে তিনি খুশিতে গদগদ হয়েছিলেন। এবারকার ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী খুশী হয়েছেন কিনা জামি না, তবে জবাবদিহি করেছেন। এ জবাবদিহিতে কেউ লজ্জা হয় নি। পাক ভারতের বাক-সুভেই ধারা কাহাজ খাটতির দোহাই দিতে পারেন, কারণ হুতে তাঁরা কি করবেন সে শুধু অহমানই করা যেতে পারে—লেখা যায় না।

পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হবে এ কথাই যদি ইসলামের অঙ্গবর্তীরা অতি বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইসলামী কার্যকাহ্নম প্রবর্তন করতে চান তাহে তাঁদের ঘোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কথা হ'ল কোন্টো ইসলামিক আর কোন্টো ইসলামিক নয় এর একটা বিবিধ্যবস্থা হওয়া উচিত। কটো বড়দের লুভ বিলিনকত অতের পকে নয়, ঘোড় ঘোড় করাচীতে বিলিনকত ঢাকাতে নয়, বলভাল বড়দের জন্য ইসলামিক রাষ্ট্রের রাজধানী ঢাকা, করাচী, লাহোরে বিলিনকত অন্য স্থানে নয়, এমনি নিয়ম হতে পারে না।

তবে মধ্যযুগের প্রকৃ-ননভট্টিকর বর্ণব্যাখ্যাই ষায়া সত্যিকার ব্যাখ্যা বলে চালাতে চান তাঁদের বিশ্বাসকে এতটুকুও অব্যাহা না করেও বলা চলে যে সেটা সঠিকও নয় সত্যও নয় এবং বিংশ শতাব্দীতে সে একেবারেই অচল ও মর্যাদাহীন।

সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব বাংলার সেক্রেটারিয়েট ভবনকে সংরক্ষিত স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানকার বত কর্মচারীকে বাকরিত কটোনহ এখন এতে চুকতে হচ্ছে। সেক্রেটারিয়েট ভবনকে সংরক্ষিত স্থান ঘোষণা করার কি বৌদ্ধিকতা আছে জানি না। তবে এতে গবর্নমেন্টের Red-tapism-এর ১৮ মাসের বঙ্গের যদি বাতাবিক বঙ্গেরে অর্থাৎ ১২ মাসের বঙ্গেরে পরিণত হয় তা হলেই আমরা খুশী হব। সে বাই হোক, এর মধ্যে যে ইসলামিক কার্যকাহ্নমের কথা উঠে পড়েছে, সেটাতেই আমরা বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। প্রকাশ, কতিপয় কর্মচারী কটো ভোলা অ-ইসলামিক বলে এতে আপত্তি জানিয়েছেন।

মধ্যে হুটা নুতন ইউনিভার্সিটি (রাজসাহীতে ও চট্টগ্রামে) খোলার কথা শোনা যাচ্ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে নানা কারণে সে প্রস্তাব বাতাস চাপা পড়ে গেছে। শিকার এমনি অবস্থাতে আমাদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনাই সুস্পষ্ট।

বাংলার খাদি গুরুকুল

নিখিল-ভারত চরকা সন্মেল বর্ধমান অব্যক্ত ক্রীদেয়মাণ মজুরদার এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নিরলিখিত বিবৃতি দিরাছেন। বাংলা "হরিজন" পত্রিকার ১৩ই পৌষ সংখ্যার তাহা বাহির হইয়াছে। পাদীকীর পঠনমূলক কার্যাবলী নানা পরীকার কল; স্বত্ব্য পর্ধ্যন্ত তিনি তাহা করিয়া নিরাহিলেন এবং ভারত-বর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি বাহা করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন বিদেশী ব্যাখ্যাকারগণও তাহার বৃত্তি বীকার করিয়া-ছেন। সজ্জতি মার্কিন সাংবাদিক ডিউর সিহান তাঁহার "Lead kindly light"—"নিব্য জ্যোতি আমাঘের পরি-চালনা করুক"—এই নামের পুতকে তাহাই করিয়াছেন। রিচার্ড এণের এলিভ বইয়ের নামের উল্লেখ মাই-বা করিলাম।

বীরেনবাবু বলিতেছেন যে, "বর্ধমান শিকার ব্যর্থত বাংলার জনসাধারণের অজান্ত মর।" আমরা বলিতে চাই যে সারা ভারতবর্ষের, তথা সারা হুনিয়ার জনসাধারণ তাহ বুঝিয়াছে।

"এই রকম সমাজ গঠনের জন্য বর্ধমান শিকার-পদ্ধতি আত্মল পরিবর্তন আবশ্যক। কারণ রাষ্ট্র গঠনের মূলই শিকার! বর্ধমানের ইংরেজ-প্রবর্তিত কেমাবী শিকারপদ্ধতি শিকিত সজ্জদারের বৌলিক বৃত্তি ও শক্তি বিকাশের প্রবান অন্তরায়! ইংরেজের শাসন চালাইবার পক্ষে এই পদ্ধতি ঠিক ছিল। তখন শিকিত সজ্জদারের দ্বারা বৃত্তিপূরক ইংরেজের শাসন ও শোষণ বর চালাইই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বাবীন ভারতের পক্ষে এই শিকার ঘোটেই আবশ্যকতা নাই। আজ রাষ্ট্র গঠনের জন্য এমন বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক মজুর দরকার যাহারা শারীরশ্রমের দ্বারা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বৈত্তব বাড়াইতে পারিবে।

এই কারণেই পাদীকী শিকার সহিত শারীরশ্রমের গুরুত্ব দিতেম বাহাতে প্রত্যেক শিকিত বুক কর্মঠ, বাবলদী ও হুশলী নাগরিক হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নিখিল-ভারত চরকা সন্মেল প্রার দুই বঙ্গের হইল বেদিনিপুর ছেলার বরিদা গ্রামে খাদি গুরুকুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গত দুই বঙ্গেরের কাজ খুবই সন্তোষজনক ও উৎসাহপ্রদ। দেখা যায় ছেলেরা আকরিক জানে প্রত্যেক বিষয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শারীরশ্রমের দ্বারা নিজেরের বাবতীর খরচের শতকরা ৪৮ ভাগ বাবলদী হইয়াছে।"

বাংলা "হরিজন" পত্রিকার পরিচালকবৃন্দের নিকট একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। বাংলা কাগজে ইংরেজী ভারিখ কেম থাকিবে তাহা বুঝি না। আর যদি তাহা রাখিতে হয় তবে বাংলা ভারিখও তার সঙ্গে দিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক প্রেস ইনষ্টিটিউট

২৪টি দেশে মনগঠিত আন্তর্জাতিক প্রেস ইনষ্টিটিউটের (সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের) কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া উহার একজিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান লেটার মারকেল ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ ২৪টি দেশের প্রতি দেশে একটি করিয়া জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে—ঐ কমিটিগুলি কেন্দ্রীয় দপ্তরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। সুইকার-ল্যাণ্ডের কুরিখ শহরে এই দপ্তর অবস্থিত।

বিখের সর্বত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রসারিত করিবার কার্য এই প্রতিষ্ঠান করিবে। সংবাদের আদান-প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে সজ্জতি বৃত্তি করাও ইহার অন্যতম লক্ষ্য। রক্ষেলার ও কোর্ড কাউন্সেল নামক মার্কিন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানঘরের অর্থ-

সাহায্যে ইহার কার্য চলিয়া থাকে। ভিন্ন বৎসরের বড় উক্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রের বাণীবত্তা আজ প্রতি দেশে বিপন্ন। কোম দেশের রাষ্ট্র সোকারজি তাহা নিরস্ত্রিত করে, কেহ করে না। বেকীর ভাগ দেশে ব্যক্তিগত অর্থ বা প্রতিষ্ঠানের সক্তি ভাতার মাধ্যমে উপায়ে তাহা করিয়া থাকে। ভারতরাষ্ট্রেও তাহাই চলিতেছে।

দার্শনিক সম্মেলন

দিল্লী নগরীতে সম্প্রতি এই অসুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এরূপ সম্মেলনের যে ইতিহাস বেখিলাম তাহা পাক্ষাভ্য দেশের ইতিহাস। লেখক নৈমিষ্যারণ্যের কথা শুনেম নাই; বৌদ্ধলন্ডের কথা শুনেম নাই বা বলেন নাই। ইসলামের দার্শনিক সম্মেলনও অসুষ্ঠ। চীন দেশে “বহু হু”।

অনুও এই ইতিহাসের মূল্য আছে।

“দেশ-বিদেশের দার্শনিকদের এইভাবে সম্মিলিত হইয়া আলোচনার প্রথম আরোজন করেছিলেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। রাষ্ট্রসন্দের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের আনুত এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দার্শনিক প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জাতীয় দার্শনিক সম্মেলনের আরোজন প্লেটোর পরবর্তীকালে আর হয় নি। বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক ভাবধারার আদান-প্রদানের একটি যোগসূত্র হ’ল রাষ্ট্রসন্দের এই প্রতিষ্ঠানটি।”

বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর “অংশীদার”

পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ এবং শান্তি ও বৈজ্ঞানিক হৃদয়ের আদর্শ লইয়া ইউনাইটেড নেশন্স জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইউ এন চার্টারের সুবন্ধে লেখা আছে যে, তবিস্যং বংশীসগপকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করা উহার প্রথম উদ্দেশ্য। এই আদর্শ পৃথিবীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল করিতে হইলে ভরুণ-ভরুণীদের ইউ-এন-ওর কার্যকলাপ এবং উহার সাক্ষ্যের পরিচর জানানো বরকার। মিলিয়া-মিশিয়া মাহুয়ের প্রাথমিক সমভাসনুহ সন্যাসনের চেষ্টা যতই সকলের মধ্যে দৃঢ়-মূল হইবে, যুদ্ধ ভতই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইজন্য ভরুণ বয়স হইতে বিশ্ব-জাতুদের আদর্শ অঙ্গরণ একান্ত আবশ্যক। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পত্নী জীমভী এলিয়ানর রুজভেল্ট এই বিশ্বরীতে বিশেষ মনোযোগ দিরাছেন এবং হেলেন জেরিলের সহযোগিতায় “পার্টনার্স: ইউনাইটেড নেশন্স এণ্ড ইউব” নামে একটি চরুকার বই লিখিয়াছেন। বাধ্য, শিকা, বাহ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে ইউ-এন-ওর বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপের পরিচর গল্পের মত করিয়া বইটিতে দেওয়া হইয়াছে। বিবে পুস্তক আদর্শ, বিশেষত: পারম্পরিক বৈজ্ঞানিক ও সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করিতে হইলে ভরুণ বয়স হইতেই তাহা করিতে হইবে ইহাতে যিনত থাকিতে পারে না। এই বইখানি ভরুণ-দের উপযোগী হওয়ার সেনিক দিয়া বিশেষ কার্যকরী হইবে।

যুক্ত কোম্পানী বইখানি প্রচারের ভার লইয়াছেন। দুই টাকা দাম খুব কম করিয়া বরা হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

বাহু রাঙ্কেনপ্রসাদ মাকি আপানী হ’ ভিন্ন মাসের মধ্যে তাঁর উচ্চপদ হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছেন। শরীর তাঁর ভাল বাইতেছে না। চির-রুগ রাঙ্কেন-প্রসাদ যে তাবে এতদিন লোকসেবা করিয়াছেন। তাহা কেবল মনের জোরে। আজ এই বয়সে যদি তিনি বিশ্রাম করিতে চান, তবে আমরা তাহাতে হৃষিত হইব না।

যতাবতই তাঁহার স্থলে কাহাকে মনোনীত করা হইবে তৎসম্বন্ধে জননা-জননা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দার্শনিক ব্যাখ্যান্ত অধ্যাপক সর্গপন্নী রাবাকুন্দের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। তাঁর আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে আমাদের মন নিঃসন্দেহ নয়। রাঙ্কেনপ্রসাদ যে ভাব ও কর্মধারা অধ্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অধ্যাপক রাবাকুন্দের সম্বন্ধ অত্যন্ত ভাসা ভাসা; তাহা তাঁহার বুদ্ধিগ্রাহ, হৃদয়গ্রাহ বলিয়া কোম পরিচর পাই নাই।

অবস্থা দেখিরা মনে হয় যিনি ভারতরাষ্ট্রের প্রথম মন্ত্রী হইবেন রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে তাঁহার মত হইবে অপ্রগণ্য। এক জনের নাম যতাবতই মনে হয়। তিনি মহারাষ্ট্রের উত্তর মুন্সুরাম জরাকর। তাঁহার ত্রণ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন মনে করি না। আর এক কথা। “সেকুলারিজম”—বর্ধনরপেক্ষ —প্রমাণ করিতে হইলে কেবল হিন্দুধর্মোদ্ভব নয়-মারীর মধ্যে এই পদ একচেটিয়া করিবার কোম বৌদ্ধিকতা নাই। মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, দ্বিতীয়বাকী যে কেহ এই পদের উপযুক্ত মনে হওয়া উচিত। উত্তর আবেদকরের নাম করা বাইতে পারে। আচার্য্য বিনোব ভাবেকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব। অবশ্য তাঁর মনোনয়নে “পণ্ডিত” মেহেরুদ এই পদের মর্যাদা সম্বন্ধে যে বিদ্রুটে ভাব আছে তাহা প্রমাণ বাধা হইবে।

পতৌদীর নবাব

গত ২০শে পৌষ ক্রিকেট-বীর পতৌদীর নবাব ইক্‌তিকার আলি গোলো খেলিবার সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার প্রাণভ্যাগ করেন। বিশ্বের ক্রিকেট-ইতিহাসে তিনি সুপরিচিত। উইলিংডন হাসপাতালে তিনি যত্নানুবে পণ্ডিত হন। ১৯১০ সালের ১৭ই মার্চ তাঁহার জন্ম হয় এবং লাহোর এডিলস কলেজে তিনি বাল্যকালে অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডের গুরু হইয়া তৃতীয় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে খেলিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। গ্রিন বলীপ সিংখীর দ্বারা টেষ্ট খেলার যোগদান করিয়াই তিনি পতাবিক রাণ করিতে সক্ষম হন, কিন্তু তরুণ্যের জন্ম অসময়েই ক্রিকেট খেলা

পৌরাণিক গাথা

ঐগিরীশশেখর বসু

পুরাকালে ভারতবর্ষে যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম, কীর্তিকলাপ এবং বংশ-বৃত্তান্ত কালনির্দেশ সহ পুরাণে দ্রুত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীনকালের ‘হিষ্টরি’ বা ইতিবৃত্ত। পুরাণকার তাঁহার ইতিবৃত্তীয় বিবরণে পৃথিবী কবে ও কিরূপে সৃষ্টি হইল এবং মানবের উৎপত্তি, প্রভৃতি বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন; এ সকল তিনি তাঁহার কথ্য জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী লিখিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতের সহিত তাঁহার কথ্য অনেকাংশে মেলে। পুরাণকার কি করিয়া ঋগ্বেদের লয় হইবে ও সেই সঙ্গে কিরূপে সকল ইতিবৃত্তের অবসান হইবে তাহারও বিবরণ দিয়াছেন। পুরাণমতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্তন ঘটে। পুরাণে আতরঙ্গন থাকিলেও পৌরাণিক কাহিনী অবিশ্বাস্য নহে। পুরাণের প্রামাণ্য অগ্রজ আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে যে সকল রাজার নাম আছে ও তাঁহাদের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা বাস্তবিকই এক দিন জীবিত ছিলেন। বিশিষ্ট রাজ্যের চরিত্র-কাহিনী কোতুলোদীপক ও সর্বথা প্রশংসোগ্য।

পুরাণ আদিতে পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত ছিল। সৃষ্টি, লয়, বংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশবিবরণ, তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ এবং মনুষ্যের বা কালনির্দেশ এই পাঁচটি বিষয় পুরাণের পঞ্চ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। কালক্রমে পুরাণে অগ্রজ প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে। পুরাণ একাধিক। পুরাণার্থবিশারদ কৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাস পুরাণগুলির সার-সংকলন করিয়া পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন এবং নানা আখ্যান, উপাখ্যান, ভ্রাক্ষ-কল্পাদির বিবরণ ও গাথা তাহার সহিত যোগ করিয়া দেন। ইহাতে পুরাণ অধিক লোকপ্রিয় হয় এবং তাহার ইতিবৃত্তীয় মূল্যও বৃদ্ধি পায়। নিজে দেখিয়া যে সকল বিবরণ দেওয়া যায় তাহা আখ্যান, পরের মুখে শোনা কাহিনী উপাখ্যান। ভ্রাক্ষ প্রভৃতির বিবরণের আর এক নাম কল্পকল্পি। মৃত মহাপ্রাণের রচিত শ্লোক বা গীত গাথা। গাথাগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কতক গাথা উপদেশমূলক; কতক গাথায় বিখ্যাত রাজাদের গুণাবলী এবং কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে; কোনও রাজার কোন বিশেষ দোষ থাকিলে তাহাও কখন কখন গাথায় ঘোষিত হইয়াছে। দুই-একটি ব্যতীত গাথাগুলির রচয়িতার কোন সন্ধান মিলে না। ছড়া ও লোকসঙ্গীত

রচকের মত গাথাকার আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছেন।

যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী কোন অর্বাচীন পুরাণকারের রচিত এক বিখ্যাত গাথা আছে। গাথার ভাব ও রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর। মনুষ্য-জীবন ও রাজ্য ঐশ্বর্যাদির নশ্বরতা এই শ্লোকগুলিতে গীত হইয়াছে। গাথাটি উদ্ধৃত করিলাম: তন্তং ভগো যৈ: পুরুষপ্রবীরৈরুদ্বাহতির্বর্ধমানমেকান্। ইষ্টাঙ্গ যজ্ঞা বলিনোহভিবীর্ধা: কৃতান্ত কালেন কথাবশেষা:। পৃথু: সমন্তান্ প্রচাচার লোকামব্যাহতো বোহরিবিকারিচক্ষ:। স কালবাত্তাভিহতো বিনষ্ট: কিশ্রং যথা শাশলিতুলমর্ঘে। য: কান্তবীর্ধে বুদ্ধজে সমন্তান্ দীপান্ সমাক্রম্য হত্যরিচক্ষ:। কথাপ্রসঙ্গে স্ততিবীরমান: স এব সংকল্প বিকল্পহেতু:। দশানমাবিক্শিতরাধবামাঐশ্বর্যবুদ্ভাসিত দিগ্‌ব্থানাম্। তদ্যপি যাতং ন কথং কণেন দ্রুতপাভেন বিপত্তকৃত্। কথাসরীরম্বসাপ বটৈ মাভাতুমাযা তুবি চক্রবর্তী। তদ্যপি ভং কোহপি কহোতি সাধূর্মম্বসাপ্তপি মন্যচেতা:। ভগীরথাজা: সগর: ককুৎস্থো দশাননো রাঘবলক্ষণৌ চ। যুধিষ্ঠিরাশ্চ বভূবুরেতে সত্যং ন মিথ্যা ক হ তে ন বিদ্য:।

বিষ্ণু। ৪।২৪।৭০-৭৫।

শ্লোকগুলির ভাবার্থ, যথা ‘পূর্বে যে সকল মহাপুরুষ উদ্ধবাহ হইয়া অনেক বর্ষ তপস্তা করিয়াছেন এবং যে সকল শক্তিমান ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছেন কাল তাঁহাদের কথা মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সব শেষ করিয়াছে। যে পৃথু অরি দলন করিয়া অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতেন তিনি কালবাহুদ্বারা আহত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শিশুল তুলার মত বিনষ্ট হইয়াছেন। কার্তবীর্ষ বিপুল নিহত করিয়া দুই নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশ আয়ত্তে আনিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু এখন কথ্য-প্রসঙ্গে তাঁর নাম উঠিলে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বাস্তবিক ছিলেন কিনা। দশানন, অবিক্রিত ও রাঘবদের ঐশ্বর্ষে দিকসকল উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত কিন্তু দিক্, কালের দ্রুতগতিতে তাহা ক্ষণমাত্রই ভস্মসাৎ হইয়াছে। মাভাতু-নামা পৃথিবীর চক্রবর্তীরাজ আজ কথাসরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা শুনিয়া কে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন যিনি অল্প বৃদ্ধিশেষে নিজের উপর মমত্ব করিবেন। ভগীরথ প্রভৃতি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষণ, যুধিষ্ঠির আদি সকলেই ছিলেন একথা সত্য, মিথ্যা নহে, কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায় আমরা জানি না।’

দেখা বাইতেছে আমরা এখন কেহ কেহ যেমন পুরাণোক্ত রাজাদের অন্তিবে বিশ্বাস করি না পুরাকালেও সেরূপ লোকের অভাব ছিল না। মাছাতা প্রভৃতি রাজগণ বহুকাল হইতেই কথাসরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক যুগেও এই প্রকার অবিশ্বাস দেখা যায়। অনেকে মনে করেন শেক্সপীয়ার নামা কোন ব্যক্তি ছিলেন না।

কাণ্ডিকের এখন তারকাস্বর বখের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সিদ্ধবন্দিকিররগণ এক গীত গাহিয়াছিলেন। পুরাণকার ইহাকে গাথা বলিয়াছেন যদিও গাথার বিশিষ্ট রূপ ইহাতে নাই। ইহা পুরাণকার-রচিত। পুরাণ বলিতেছেন, তারকাস্বর চিন্তাকুল ও বিন্মিত চিত্তে অদূরে ঈদৃশ জয়বিদায়ক, করুণাকরময় গীত শ্রবণ করিতে লাগিল :

অর অচলশক্তিধর্মিষ্ঠশিঙ্গর-
 দুঃখবচনচরণরতন।
 অথব হুদয়কাননবিকাসনেন্দো
 কুমার অর দিতিঅকুলবহোদবিবতবানল।
 বগুণ বহুরব বহুরব
 অরবুটকোটবটচরণ বদাহুরবহালন।
 অর ললিতচূড়াকলাপনববিমলদল
 কমলকান্ত দৈত্যবংশজঃসহদাবানল।
 অর বিশাখ বিতো অর লকললোকতারক
 কল অর পৌরীন্দন বটাপ্রিয়।
 প্রিয় বিশাখ বিতো দ্বতপভাকপ্রকীর্ত
 পটল কনককুণ্ডলকরদিকরজ্বর।
 অর ললিতসঙ্গবলীলাসুখাখিলারান্তে অর
 লকললোকতারক দিতিআসুরবরতারকান্তক।
 কল অর বাল লগবালর অর
 চুবাবলিনোকবিনাশন।

৪৭৩।১৫৯।৪০-৪৩।

এই গাথার কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আজকাল যেমন যুদ্ধ-যাত্রাকালে জাতীয় সংগীত গীত হইয়া থাকে পূর্বে সেইরূপ হইত না। তখনকার দিনে সেনাপতিরই প্রশস্তি গাওয়া হইত। যুদ্ধে নানারূপ বাস্তব সহিত ঘটনাও বাজান হইত। কাণ্ডিকেরকে ঘটাপ্রিয় বলা হইয়াছে। ঘটীর প্রচলন ক্রমে উঠিয়া যায়। ভারত-যুদ্ধে শম্ভু, ভেরী, পনব, আনক, গোমুখ ইত্যাদি নিনাদিত হইয়াছিল কিন্তু ঘটীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাণ্ডিকের অতি তরুণবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাত্র সাত বৎসরের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা ছিল এজন্য তাঁহাকে গাথার 'বাল লগবালর' বলা হইয়াছে। তাঁহাকে তারকাস্বর বলিয়া-

ছিলেন 'তুমি কি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি বালক মাত্র। তোমার এখনও কন্দুক লইয়া খেলা করিবার বয়স যায় নাই। তুমি সমর-জীবন যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বদিগকে দেখ নাই তাই এ বুদ্ধিবিলম্ব ঘটয়াছে।'

ব্যাতি-গাথা পুরাণে প্রসিদ্ধ। এই গাথা রাজা ব্যাতির নিজের রচিত। বিষয়বস্তুভোগ দ্বারা কামনার বিনাশ হয় না ইহাই গাথার গীত হইয়াছে। গাথাটি খুবই লোকপ্রিয় ছিল মনে হয়। একাধিক পুরাণে ইহা গৃহ হইয়াছে। গাথার প্রথম শ্লোকটি এখনও অনেক লোকের মুখে শোনা যায়।

ন কাহু কাহঃ কামানারুপভোগেন শাস্যতি।

হবিষা ক্রকবদ্যে ব চুর এবাতিবর্জতে। বিষ্ণু।৪।১০।৯।

গাথার সাতটি শ্লোক আছে। বায়ু ও বিষ্ণুর ব্যাতি-গাথার কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যে শ্লোকগুলি উভয় পুরাণে অল্পরূপ তাহার ভাবার্থ দিলাম। 'বিষয়বস্তুর ভোগে কামনার উপশম হয় না, অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন তাহা না কমিয়া অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয় সেইরূপ ভোগের ফলে বিষয়-বাসনা বাড়িতেই থাকে। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পদ্ম, এবং স্ত্রীলোক আছে তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিস্রাব মিটে না, সেজন্য অতিতৃষ্ণা ত্যাগ করিবে। চর্ম্মভিগ্ণ বাহা ত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও বাহা জীর্ণ হয় না বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিলে স্ব্থের দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, দস্ত জীর্ণ হয় কিন্তু তাহার জীবনের আশা ও ধনের আশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না।'

আগুনে ঘি ঢালার উপমা এই গাথার ব্যাতি কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়; এখন তাহা সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়াইয়াছে। ক্রকবদ্য অগ্নির আর এক নাম, কারণ জ্বলে আগুন দিলে আগুন নিজ পথে ক্রকচিহ্ন রাখিয়া যায়। পুরাকালে বন সাক করিবার জন্য এই উপায়ের বহুল প্রচলন ছিল। গাথার ক্রকবদ্য কথা ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। বেদেও অনেক স্থলে ক্রকবদ্য কথা আছে। এখন একথাটার চলন নাই।

পুরাণে আর এক অতি প্রাচীন গাথার উল্লেখ আছে। ইহার রচয়িতা ভগবদ্গীতোক্ত উশনা। ইনি আদি করি বলিয়া কথিত। ঐব ও তাহার মাতা স্ত্রীতির মহিমা এই গাথায় কীর্তিত হইয়াছে। গাথার ভাবার্থ বখা, 'অহো, ইহার তপস্তার বল, অহো ইহার তপের ফল বাহার প্রভাবে ইহাকে সমুখে রাখিয়া সপ্তবিগ্ণ অবস্থিত আছেন। আর এই ঋষের স্ত্রীতি বা স্নুতা নারী মাতা, ইহার মহিমাই বা পৃথিবীতে কে বর্ণনা করিতে সক্ষম, যিনি ঋষকে গর্ভে

ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ জিলোকের পরম স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অচকলরূপে অবস্থান করিতেছেন।’

মাক্ষাতার নামে এক গাথা প্রচলিত আছে। মাক্ষাতা চক্রবর্তী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল। এখন যেমন বলা হয় যে ইংরেজ রাজত্বে সূর্য কখনও অস্ত যায় না, সেইরূপ মাক্ষাতার সম্বন্ধে বলা হইত :

যাবৎ সূর্য উদেতি ন যাবচ্চ প্রতিষ্ঠতি ।

পৰ্বৎ ভদ্রবোবনাশত্ বাহাভুঃ ক্ষেত্রবৃত্যতে । বিষ্ণু । ৪।২।১৮। অর্থাৎ, ‘সূর্য বেধান হইতে উঠেন ও বেধানে অস্ত যান তাহার অন্তর্গত সমুদয় প্রদেশ যুবনাশপুত্র মাক্ষাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হয়।’ এই স্লোকের রচয়িতা কে তাহা জানা নাই।

ভগীরথ সম্বন্ধে গাথা আছে, ‘ভগীরথ কর্ণবলে গন্ধাকে আনয়ন করিয়াছিলেন এইজন্য বংশবিদ্ ব্যক্তিগণ গন্ধাকে ভাগীরথী বলিয়া থাকেন।’ নাভাগ বংশে মরুত নামে এক অতি ধনশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে গাথা আছে, ‘মরুত রাজার যজ্ঞের ন্যায় যজ্ঞ পৃথিবীতে আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্বপ্রকার যজ্ঞসামগ্রী স্বর্ণনির্মিত ছিল; স্বর্ণপাত্রে সোমরস পান করিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হন, ব্রাহ্মণগণও দক্ষিণায় সন্তোষলাভ করেন। এই যজ্ঞে দেবতার সন্ত হইয়া পরিবেশকের কার্য করিয়াছিলেন।’ রাম সম্বন্ধে যে গাথা কীর্তিত হইয়াছে তাহা প্রধানত প্রশস্তি-বাচক। ইহাতে রামকে লোহিতচক্ষু, সুরম্য, সিংহস্বভা এবং মহাতাজ বলা হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে বেদপাঠের শব্দ এবং ধর্ম্মকের টংকার অবিচ্ছিন্ন শোনা বাইত এবং নিয়ত দায়িতাং ভূজ্যাত্ম্য রব উখিত হইত, ইত্যাদি। কাশিরাজ-গোত্রে ধর্ম্মবির বংশে অলরু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে গাথা আছে, ‘অলরু ব্যতীত অপর কেহই যুবায় ত্রায় উৎসাহ সহকারে বাট হাজার বাট শত বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে রাজ্যভোগ করেন নাই।’ বাট হাজার বাট শত বৎসর উপলক্ষ্য প্রয়োগ, ইহার প্রকৃত অর্থ ছেয়টি বৎসর। এত দীর্ঘ রাজ্যকাল কদাচিৎ দেখা যায়। মহা-রাণী ভিক্টোরিয়া চৌষটি বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার নামে গাথা না থাকিলেও তাঁহার রাজ্য-ভোগের বাট বৎসরে হীরক ‘জুবিলি’ অমুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্মরণীয় কালের মধ্যে অপর কোন নৃপতির এ সৌভাগ্য দেখা যায় নাই। ভীষ্মের পিতা শত্ৰুঘ্ন বা শান্তনুর আসল নাম জানা নাই। তাঁহার নামের নিরুক্তি তাঁহার সম্বন্ধে রচিত গাথায় পাওয়া যায়। ‘রাজা সময়পূর্বক যে যে জরাগ্রস্ত পুরুষকে স্পর্শ করিতেন সেই সেই পুরুষই পুনরায় যৌবন-লাভ করিত এবং পরম শান্তি পাইত এইজন্যই ইহার নাম

শান্তনু।’ তিনি মহাভিষ অর্থাৎ মহাচিকিৎসক নামে পরিচিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে লোকে এখনও বিশ্বাস করে যে, king’s evil অর্থাৎ গুণমালা রোগ রাজার হস্ত-স্পর্শে সারিয়া যায়। শান্তনু যেমন ‘মহাভিষ’ উপনাম পাইয়াছিলেন সেইরূপ মূলক নামে রামের এক পূর্ব-পুরুষ ‘নারীকবচ’ নামে সাধারণে খ্যাত হইয়াছিলেন। পরশুরামের আক্রমণকালে ইনি নারীবেশ ধারণ করিয়া বিবস্ত্রা নারীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে রক্ষা করেন। তৃণবিন্দু প্রভৃতি আরও কতিপয় রাজার নামে গাথা প্রচলিত আছে কিন্তু তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। রাজা জ্যামঘ একজন বহুবংশীয় নৃপতি। তাঁহার সম্বন্ধে একটি বড়ই মজার গাথা প্রচলিত আছে। জ্যামঘের কাহিনী এইরূপ :

রাজা জ্যামঘ অল্পবয়স্ক এবং অপূত্রক ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম শৈব্যা; কোন কোন পুরাণে তিনি চিত্রা বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। শৈব্যা জ্যামঘ অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এখনও রাজপুতানায় রাজন্যবর্গের মধ্যে এইরূপ অসম বিবাহ প্রচলিত আছে। এক বংশের পুত্র জন্মিলে অপর বংশে যে কন্যা হইবে তাহার সহিত বিবাহ দিবার কথা পূর্ব হইতেই ঠিক থাকে। হয়ত কন্যার আগে জন্ম হইল এবং তাহার অনেক বৎসর পরে অপর বংশে পুত্র জন্মিল। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তি অমুসারে সেই পুত্র ও কন্যার বিবাহ হয়। অনেক সময় কন্যার বয়স বর অপেক্ষা কুড়ি বৎসরেরও বেশী হইতে দেখা যায়। জ্যামঘের বোধ হয় এই প্রকার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বয়স্ক পত্নীর খুবই অমুগত ছিলেন। পুত্র না হওয়ার জ্যামঘের মনে খেদ ছিল কিন্তু তিনি শৈব্যার ভয়ে অন্য বিবাহ করেন নাই। একবার জ্যামঘকে যুদ্ধে বাইতে হইয়াছিল। তিনি অশ-গজ ইত্যাদির সম্বর্জননিত ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সমস্ত শত্রু-সৈন্য পরাজিত করিলেন। চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। এমন সময় জ্যামঘ স্তম্ভিত হইলেন কোন নারী ‘আমাকে রক্ষা কর’ বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। জ্যামঘ নিকটে বাইয়া সন্ধান লইয়া জানিলেন যে, ঐ কন্যা রাজকন্যা; তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছেন। অত্যন্ত ভয় পাওয়ার কন্যার আয়ত নয়নবয় বিক্ষারিত ও চকল হওয়ার তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন ‘আমার পুত্র-সন্তান নাই, আমার স্ত্রীও বয়স্ক, আমি যদি এই কন্যাকে বিবাহ করি তবে সন্তানলাভ করিতে পারি। বিধাতা স্বয়ং বুঝি আমাকে এই কন্যারহস্ত দিলেন। ইহাকে এখন নিজ রাজধানীতে লইয়া বাই ও পরে শৈব্যার অমুমতি-ক্রমে ইহাকে বিবাহ করা যাইবে।’ তখন রাজা কন্যাকে

যথে তুলিয়া লইয়া নিজ নগরের দিকে বাজা করিলেন। অনন্তর দেবী শৈব্যা অনেক আত্মীয়স্বজন, অমাত্য পরিজন ও ভৃত্যগণসহ বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার বাম পার্শ্বে কন্যাকে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে অধরণস্বয়ং ফুরিত করিয়া বলিলেন, 'হে অতিচলচিত্ত, এই বধে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?' রাজা অতিশয় ভয়ে আমতা আমতা করিয়া কি উত্তর দিতেছেন তাহা না বুঝিয়াই বলিলেন, 'এই কন্যাটি আমার পুত্রবধু।' শৈব্যা বলিলেন, 'আমার পুত্র হয় নাই তোমারও অন্য পত্নী নাই তবে কি প্রকার পুত্রের সখকে ইহাকে পুত্রবধু বলিতেছ?' রাজা নিজেকে সামলাইবার জন্য বলিলেন, 'তোমার যে পুত্র জন্মিবে ভবিষ্যৎকালে ইনিই তার ভাৰ্গবী হইবেন।' এই কথা শুনিয়া

শৈব্যা দ্রবং হান্তসহকারে বলিলেন, 'আজ্ঞা তাহাই হইবে।' কথিত আছে, রাজা ও রাণীর মধ্যে পুত্রজন্ম সখকে যে আলাপ হইয়াছিল তাহা দৈবক্রমে অতি 'শুদ্ধ লগ্ন হোরাংশকাবয়বাদিতে' নিশ্চয় হয়। ফলে শৈব্যা সন্তান-প্রসবোচিত বয়স অতিক্রম করিলেও অল্প দিনের মধ্যে গর্ভবতী হইলেন। এই গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার নাম বিদর্ভ। কালে বিদর্ভের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। জ্যামঘ সখকে গাথা আছে,

ভাৰ্গবভাত্ত যে কেচিত্তবিত্ত্যাবধা যতঃ।

ভেদান্ত জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিবহুত্বং।

অর্থাৎ, জগতে যত স্ত্রী পুরুষ জন্মিয়াছিলেন এবং গত হইয়াছেন অথবা যাহারা জন্মিবেন তাহাদের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ।

কবির স্মৃতি

জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবিতা লিখিয়া পাই নি অর্থ,
পাই নাই কোনো খ্যাতি।
ইয়েছি স্বপ্ন-বিলাসী, অলস,
অভ্যযোগ কর সাধী।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ,
ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন মান লাগি কবিতা লিখি না,
আমি মরি সেট দেমাকে।
কল পেতে হলে চাষ করিতাম,
ব্যবসা—চাহিলে অর্থ,
মন্ত্র ধরিতে জাল ফেলা চাই,
আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ।

অনটন দেয় আঘাত নিত্য
মচুকাই তবু ভাঙি না,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাহি মোর,
ফুলে আলো করে আভিনা।
আঁধার বধন কাটিতে চায় না,
একা বসে বড় ভাবি যে,
অরুণ আমার এসে উঁকি যাবে,
আকাশ ভরে যে আবীরে।
বিদ্বান পাই, নিন্দাও পাই,
নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব ভুয়াপোকা প্রজাপতি হবে
আমি থাকি সেই আশাতে।

কি অর্থ খ্যাতি পাইবার লাগি
ঝুঁকাবে পিক পাণিয়া?
কি পায় সাধুরা গিরি-গহবরে
কঠোর জীবন যাপিয়া?
চিন্তামণির ধনে ধনী যারা
তারি কি মুক্তা মণি চায়?
বিস্ময়ে দেখে বিস্ময়কে
নিতি প্রতি অণু-কণিকায়।
আমি সেই স্মৃতি সেই সে তপ্তি—
আমি সেই প্রেম-ভিখারী,
আলোক মাগি যে, আতপ চাহি যে,
সেই হোমানল শিখারই।

ভুবন আমার অমৃতময়,
শুধু আনন্দ আলোকের,
কীর নবনীর অবনী সে মোর
আমার অবনী বালকের।
সোনার নূপুর গুঞ্জে যেথা,
বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব ছুঁষ মোর স্বপ্ন মনে হয়
সব ব্যথা বাই পাসরি।
লিখি হিজিবিজি কি পাই তাহাতে?
বন্ধু কহিব কিবা আর—
সেই স্মৃতি পাই, রামধনু আঁকি
উপজে যে স্মৃতি বিধাতার।

মনস্তত্ত্বে এডলারের দান

জীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে এডলারের দানের কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই ফ্রয়েডের কথা কিছু বলা আবশ্যিক; কারণ এডলার প্রথমতঃ ফ্রয়েডের সহকর্মী ছিলেন এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের নির্জ্ঞান মন এবং অবলম্বন সম্বন্ধে মতবাদগুলি খানিকটা গ্রহণও করিয়াছিলেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে ফ্রয়েডের মতানৈক্য আছে। ফ্রয়েডের বিশ্বাস আদিম যৌন কামনাই বিভিন্ন রূপে নির্জ্ঞান মন বা সংজ্ঞান মনের ভিতর দিয়া আমাদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। এডলার কিন্তু যৌন কামনাকে অতটা গুরুত্ব দিতে চাহেন না; তাঁহার মতে শক্তির আকাঙ্ক্ষাই (will to power) আমাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এডলার বলেন, জাতককে জীবনের পথে চলিতে হইলে তিনটি ব্যাপারে জীবন-পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হয়। প্রথমটি হইতেছে সমাজের সহিত, দ্বিতীয়টি পেশা ও কর্মজীবনের সহিত এবং তৃতীয়টি প্রেম ও প্রেমাস্পদের সহিত। এই তিনটি ব্যাপারে সে শৈশবে ও বাল্যে যেমনভাবে সাহায্য বা বাধা পায়, সেই অঙ্গুসারে তাঁহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে।

এডলার বলেন, মানুষ শৈশবে অত্যন্ত অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই অসহায় ভাবটি আমাদের নিকট দুই ভাবে পীড়াদায়ক হইয়া উঠে; প্রথমতঃ অল্পপুষ্ট ব্যবহার বা অল্পপুষ্ট পরিবেশের জন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ দেহবল্লগত দুর্বলতা, হীনতা বা অসম্পূর্ণতার জন্ত।

মাজাতিরিক্ত ভাবে তিরস্কার করা, “আত্ম আত্ম” করা, “নাই” দেওয়া, একচোখোমি করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া, অহেতুক শাসন তাঁড়না করা ইত্যাদি অল্পপুষ্ট ব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে। অল্পপুষ্ট পরিবেশ নানা ভাবে হইতে পারে; কেহ হয়ত পরিবারের মধ্যে বংশের প্রদীপ, আত্মরে ঢুলাল একমাত্র পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিল, কেহ হয়ত পিতার বৃদ্ধ বয়সের শেষ-কুড়ান ছেলে হইল, বাড়ীর আত্মরে চতুর্থ বা পঞ্চম কন্যাটি হয়ত হঠাৎ একটি ভাই লাভ করিয়া তাহার আদর-মর্যাদা হারাইল। কেহ হয়ত পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিল, কেহ বা বিমাতা-প্রতিপালিত বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া ‘মাতৃহ’ হইল। ইহাদের সকলেরই গৃহ-পরিবেশ স্বস্থ সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের অঙ্গু-কূল নহে।

ইহা ছাড়া দেহবল্লগত অসম্পূর্ণতা বা হীনতাবোধও মানুষের সামাজিক আচরণের অসঙ্গতি ও প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে একটা প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দেহগত অসম্পূর্ণতা জাতকের মনে একটা ভয়, অসহায়তাবোধ এবং লজ্জাতুরতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অনেক সময় অস্বভাবী করিয়া তুলে।

এডলার বলেন, এই সমস্ত প্রাথমিক অন্তরায়ের জন্য তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে;—প্রথমটি হইতেছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (successful compensation) দ্বিতীয়টি—পরাজয় বা পলায়নের প্রচেষ্টা (defeat or retreat) এবং তৃতীয়টি—ক্ষতিপূরণের আতিশয্য (over-compensation) জনিত অস্বভাবী আচরণ।

ক্ষতিপূরণের উদাহরণ—বিথোডেন ডিমস্টেনিস প্রভৃতি। বিথোডেন বধিরতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের এই অসম্পূর্ণতার সফল ভাবে ক্ষতিপূরণ করিয়া উত্তর জীবনে তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বরকার হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিমস্টেনিসও তাঁহার বাল্যের ততোতলামিকে জয় করিয়া সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা প্রতিনিয়তই পথে ঘাটে দেখিতে পাই। ইহা যাহাদের মধ্যে ক্রিয়ানীল হয়, তাহারা নিজেদের অক্ষমতা বা অল্পপুষ্টতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জীবন-সংগ্রামের বন্দ ও প্রতিযোগিতা হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং কল্পনার জগতে অথবা গৃহ-পরিবারের অভিভাবকত্বের ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চায়।

তৃতীয় প্রকার প্রতিক্রিয়ার উদাহরণও বিরল নহে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই “হাবা কালা কাণা খোড়ার এক কাঠি বাড়া।” তাই দেখা যায়, ছোট্ট হাঙ্গা ব্যক্তিত্বহীন মানুষটি প্রায়ই আত্মপ্রচারের জন্য আকুল ভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। কুৎসিত মেয়েটি হয়ত সাজপোশাকের চাক-চিকো ও রূপের বাহাহুরিতে লোকের চোখ ঝলসাইয়া দিতে চায়, জীর্ণ দুর্বল ছেলেটি পুরুষোচিত বীরত্বের অভিনয়ে সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে চায়।

এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় একটা সামঞ্জস্যবিধান বা খাপ খাওয়াইয়া লইবার চেষ্টা। এডলারের মতে আমাদের জন্ম ও পরিবেশগত ক্রটির জন্য যথাবধ ক্ষতিপূরণ করিয়া সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যেই আছে স্বস্থ মনুষ্যত্ব। এই সামঞ্জস্যবিধানে একটু একিক-

ওদিক হইলেই মাত্ৰাহীনতা বা মাত্ৰাতিরিক্ততা আসিয়া মানুষকে একটা অস্বাভাবিক দান করে। স্বতরাং আমাদের বাহা কিছু অস্বাভাবিক আছে, তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদের বাল্য-জীবনে পরিবেশ বা প্রতিপালনের দোষে নিজের সন্ধে হীনমন্যতা (inferiority complex) এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেই হীনমন্যতার অল্পভূতি হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা। এইখানেই ফ্রয়েডের সঙ্গে এডলারের পার্থক্য। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের অস্বাভাবিকত্বের মূলে আছে অধিশাস্তা (Super ego) মন বা নীতিবোধের সহিত আনিম বোন কামনার (id) সংঘাতজনিত অবদমন প্রভৃতি, আর এডলার বলেন ইহার মূলে আছে হীনমন্যতা, সমাজ-পরিবারের সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাব। সেই ব্যক্তিই হইতেছে স্বাভাবিক চরিত্রবিশিষ্ট, বাহার ব্যক্তিগত “আমি”টির (ego) সহিত সমাজগত “আমি”র (community feeling) একটি সামঞ্জস্য হইয়াছে।

এই সামঞ্জস্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে জাতকের নিজের গৃহ ও পরিবারের সহিত সামঞ্জস্যবিধান। স্বতরাং যে গৃহে জাতকের আত্মসম্মান রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই, সেখানে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইবে। আবার গৃহের মধ্যে বালকটিকে মহামানী মহাময় দুর্ঘোষন করিয়া মানুষ করিলেও তাহার মনুষ্যত্ব ব্যাহত হইবে। কারণ গৃহের ছোট গণ্ডাটি ছাড়িয়া যখন সে বাহিরের বৃহত্তর সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিবে, তখন সে দেখিবে বাহিরের জগৎ তাহাকে তেমন ভাবে মাথায় করিয়া নাচিতেছে না, তাহার অভীষ্ট মূল্য দিতেছে না। তখনই আসিবে তাহার ব্যর্থতা এবং সমাজ হইতে পলায়নস্পৃহা, গৃহ-মুখিতা, ভীকতা ও লজ্জানীলতা। আবার যে ছেলেকে বহু দিন ধরিয়া “খোকা” করিয়া রাখিয়া “ছোট ছোট নিষেধের ডোরে” বাধিয়া প্রতিনিয়ত আত্ম আত্ম করিয়া মাতাপিতার সতর্ক দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যেই রাখা হয়, সেও জগতের সঙ্গে স্বহৃদভাবে কারবার করিতে পারে না এবং ভীক আত্ম-কেন্দ্রিক ও পলায়নপর হইয়া উঠে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার জীবনে তিনটি জিনিষের আহ্বানে (challenge) সাড়া দিতে হয়,—সমাজ, পেশা ও প্রেম। ইহাদের কোনটিকেই অন্য-নিরপেক্ষ এককভাবে বিচার করা চলে না। বস্তুতঃ মানুষ প্রেমের ব্যাপারেও কি ভাবে আচরণ করিবে তাহা নির্ভর করে আমাদের সমাজ ও পেশাগত জীবনে সার্বকতা এবং ব্যর্থতার উপর।

এডলার বলেন, আমাদের অহমুটির (ego) সহিত

বাহিরের জগতের প্রথম সম্পর্ক হয় গৃহের পরিজনকে লইয়া। কাজেই এই পরিজনের নিকট আমরা বৈরুপ আচরণ বা অভিজ্ঞতালভ করিব, তাহারই উপর নির্ভর করে আমরা বড় হইয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিব। যে বালক দেখে গৃহে তাহার মাতাপিতার মধ্যে সম্পর্কের মধুরতা ঠিক নাই, সে উত্তরকালে দাম্পত্যজীবনে ঠিকমত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিবে না। যে বালক অত্যন্ত শাসন তাড়নের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, সে বড় হইয়া দুর্দান্ত-অথবা ভ্রমী স্বামী হইয়া কিংবা বদমেজাজী পিতা বা গৃহ-কর্তা হইয়া তাহার ক্ষমতার অভিলাষকে চরিতার্থ করিবে। এই ভাবে ক্ষমতার অভিলাষকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আমাদের যে প্রতিক্রিয়া আছে, এডলার তাহার নাম দিয়াছেন “Masculine protest.”

এই প্রতিক্রিয়াটির অভিব্যক্তি নানাজাতীয় হইতে পারে। ইহার ফলে হয়ত ক্ষমতালুকা দুর্বল বালিকাটি নারীমূলভ কর্তব্যকে ঘৃণা করিয়া পুরুষোচিত আচরণ করিয়া তাহার দীনতাবোধকে নাবাইয়া রাখে। আবার ইহারই ফলে হয়ত দুর্বল এঁচড়ে পাকা ছেলেটি সারা জীবনই নারীস্বের অভিনয় করিয়া পুরুষত্বের তেজ শক্তি ও ক্ষমতার পূজা করিয়া থাকে।

হীনমন্যতার প্রতিকার হিসাবে এই “Masculine protest” ছাড়া আর একজাতীয় প্রতিক্রিয়া আছে। ইহার মূলেও ব্যর্থতার ইতিহাস এবং ক্ষমতার জন্য আত্মপীড়া আছে। যে কর্তৃত্ব শক্তির দ্বারা অর্জিত হয় না, তাহা হয়ত অনেক সময় চাতুরী বিশদঘাতকতা ছলনা কপটতা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। এইগুলিকে এডলার স্ত্রীমূলভ অস্ত্র (feminine weapons) নাম দিয়াছেন। অবশ্য এই জিনিষগুলি স্ত্রীমূলভ অস্ত্র হইলেও ইহা একান্তভাবে স্ত্রীলোকেরই সম্পত্তি নহে। যে পুরুষ প্রতিনিয়ত পরাধীনতা ও বশ্যতার দীনতার ভিতর দিয়া দিন বাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যেও এই অস্ত্রগুলি ব্যবহারের প্রয়াস দেখা যায়।

এডলারের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পূর্ববয়স্ক লোকের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার বাল্য-শৈশবের অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। স্বতরাং মানুষকে বিচার করিতে হইলে তাহার গোষ্ঠীগত বা জাতিগত বিশেষত্বগুলি জানিলেই চলিবে না; প্রত্যেক মানুষটিকে এক একটি পৃথক এবং (সমাজ-প্রতিক্রিয়াজাত) সম্পূর্ণ একক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সমস্তা, স্বতন্ত্র ইতিহাস এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে; সমাজের সঙ্গে কারবারের জন্য তাহার স্বাভাবিকতা আছে বটে, এবং সেই স্বাভ-

প্রতিবাদ তাহার ব্যক্তিকে নিরস্ত্র করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ব্যক্তির ইতিহাস এককভাবে তাহার নিজেরই জিনিষ; সেই ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বই না জানিলে তাহার পরিচয় ঠিকমত জানা হইবে না। এইজন্য এডলারের মনস্তত্ত্বকে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব (individual psychology) বলা হয়।

এই ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে তাহার বাল্য-শৈশবের ইতিহাসকে বুঝিতে হইবে, আর বুঝিতে হইবে তাহার পরিবারগত জীবনধারা (family style) এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা (life style)।

বাল্যের অভিজ্ঞতার প্রভাবের উপর অনেকখানি জোর দিয়াছেন বলিয়াই এডলার আমাদের নীতিগর্হিত ও পাপের কাজগুলিকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, বেশ্যাবৃত্তি নারীর ব্যবসায়িত্ব বা উদগ্র কাম-ক্ষুধাজনিত ফল ততটা নহে, বরং বাল্য-জীবনে বঞ্চনা ও ভোগবিভক্ততার মধ্যে ‘মাহুস’ হওয়াতে অতৃপ্ত কামনাকে হৃদে আসলে বেপরোয়াভাবে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা অথবা পুরুষকে প্রতারণা করিয়া নারীর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রয়াস। প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত জীবনেই আছে শৈশবের বঞ্চনা বা লাঞ্ছনার ইতিহাস, সমস্ত অস্বাভাবী মানসতার মূলেই আছে শৈশবের ভ্রান্ত লালনপালন, সমস্ত পাপের মধ্যেই আছে শৈশবের অহেতুক হীনমন্যতাবোধ এবং বিকৃত উপায়ে তাহার প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা।

এইজন্য রোগের প্রতিকারের দিক দিয়াও ক্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সহিত এডলারের মনোবিজ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। মনোবিকলন করিয়া বৌদ্ধধর্মের অবদমন-জনিত জটের (complex) গ্রহিণী খুলিয়া নির্জান মনের স্তর হইতে অসজত এবং অসামাজিক কামনার গোপন ইতিহাস সংগ্রহ না করিয়া এডলার সোজাসজি ভাবে রোগীকে উৎসাহ দেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন যে, জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের ভয়ে সে হীনতর কলাকৌশলের বা কাল্পনিক জগতের আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই তাহার রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিকারের উপায় হইতেছে কল্পনার অবাস্তব জগৎ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাহসের সহিত বাস্তব জগতের সন্মুখীন হওয়া এবং জয়ী হইবার চেষ্টা করা। এই জয়ী হইবার জন্য স্তব্ধ দেহ-বস্ত্রের প্রয়োজনও কম নহে। আমরা সকলেই জানি, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, হাঁপানি, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি অনেক সময়ই আমাদের ‘যেজাজ’ ও আচরণকে প্রভাবান্বিত করে এবং আমাদের অহম ও সমাজের সহিত সামঞ্জস্যের

ব্যাপার ঘটায়। এইজন্যই এডলার মানসরোগের প্রতি-কারের জন্য ঔষধপত্রের ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। ক্রয়েডপন্থীগণ কিন্তু এই ব্যাপারে ঔষধপত্রের চেয়ে মনোবিকলনকে অধিকতর কার্যকরী বলিয়া মনে করেন।

বাহাকে পাপ বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা শৈশবের হীনমন্যতা হইতে কি ভাবে মাহুসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তাহা এডলার নানা ভাবে দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি পাঁচ বৎসরের পাপমতি বালিকার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। সেই বালিকাটি তাহার চেয়ে ছোট ছোট বালিকাদের খেলার আহ্বান করিত এবং স্তবোপ পাইলেই তাহাদিগকে নদীর জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। এই ভাবে পর পর তিনটি বালিকাকে হত্যা করিবার পর সে ধরা পড়ে। পরে দেখা যায়, এই বালিকাটি তাহার জীবনের প্রথম চারিটি বৎসর মাতাপিতার কনিষ্ঠা কন্যা হিসাবে আদরের ঢুলানী হইয়া ‘মাহুস’ হইয়াছিল; তাহার পর তাহার দুইদিন আসিল যখন তাহার আর একটি নবজাত ভগিনীর আবির্ভাব হইল। সে দেখিল সে ক্রমশঃই কোণ-ঠাসা হইয়া যাইতেছে, আদর-বস্ত্র সমস্তই তাহার নবজাত ভগিনীটিই পাইতেছে। ক্রমে সে তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত ছোট মেয়েকেই সে নিজের হস্তব্য শস্ত্র বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল। ইহাই হইল বালিকাটির পাপের ইতিহাস।

অধিকাংশ পাপের ব্যাপারেই এই জাতীয় একটা-না-একটা ইতিহাস আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধূলিধূসরিত হওয়া, অভিমান আহত হওয়া, অবস্থার বিড়ম্বনায় নিজেকে ছোট বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হওয়া, আদর-বস্ত্র বঞ্চিত হওয়া, বাহবা এবং হাততালি পাওয়ার স্তবোপ হইতে বঞ্চিত হওয়া, এই সমস্ত জিনিষই জাতককে সমাজবিরোধী আচরণে প্ররোচিত করে। এইজন্যই দেখা যায়, সাধারণতঃ যে ছেলে পড়াশুনার বাহবা পায় না, সেই ছেলেটিই স্কুলের ধর্মঘটের সময় দলপতিত্ব করিয়া ছাত্রনেতা হইবার চেষ্টা করে, স্কুলের আইনশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া, আসবাবপত্র নষ্ট করিয়া শিক্ষককে অপমান করিয়া বন্ধুসমূহকে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে।

বাহাকে আত্মাবমাননাজনিত জট বা হীনমত্ততা বলে, তাহা কি ভাবে ছাত্রদের পাপের পথে লইয়া যায়, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়। একজন বালক হয়ত ক্রমে অল্প কথিতে পারে না, সহায়ত্বহীন শিক্ষক হয়ত তাহাকে প্রায়ই তৎসনা করেন, তাহার বন্ধুবান্ধবদের সন্মুখে অপমান করেন। কলে বালকের আত্মাবমাননা অসহ্য হইয়া উঠিল এবং বিভ্রান্তিকেই সে হীনমন্যতার কেন্দ্র বলিয়া

মনে করিয়া ফুল পালাইতে আরম্ভ করিল। ইহার পরেই আরম্ভ হইল অভিভাবকের স্বাক্ষর জাল করিয়া চিঠি লেখা। তাহার পরে স্বক হইল ফুল-পলাতক অবস্থায় সম্বন্ধী বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে সিনেমা অভিনয়, বিড়ি ফুঁকিতে শেখা, অসময়ে ঘোনচেতনা লাভ করা এবং ধুলের বন্ধুদের অন্যান্য পাশাচরণগুলি শেখা। ফুলের বাহিরের জগতে সে দেখে অঙ্কের ফুলের জন্য তিরস্কার নাই, ব্যাকরণের ফুলের জন্য বিক্রপ নাই, পদে পদে আত্মাবমাননা ও লাঞ্জন্য ভয় নাই। এখানে নেতাগিরি করিবার সুবিধা আছে, চাল মারিবার সুযোগ আছে। ফুলের পরিবেশ তাহার আমিত্বকে ছোট করিয়া দেখায়, আর ফুলের বাহিরের জগৎ তাহার আমিত্বকে বড় করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত সে ফুল ছাড়িয়া দেয় এবং হয়ত “বয়্যাটে” হইয়া পড়ে। এই বয়্যাটে হইবার পরিণাম বাহাই হউক, ইহার প্রারম্ভ যে ছিল হীনম্যাতার মধ্যেই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এডলারের এই ভঙ্গিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাভাবেই ব্যবহারিক নির্দেশ দিতে পারে। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের অকৃতকার্যতা দেখিয়াও অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত না করেন, বিস্তার তাক লাগাইয়া ছাত্রদের স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা না করেন, “তোর কিছু হবে না” বলিয়া প্রথম হইতেই যদি তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া না দেন, তাহা হইলে অনেক বালকই বিপথে যায় না। বোগ্য শিক্ষক অন্যভাবেও তাহাদের বাঁচাইতে পারেন। যে বালক এক বিষয়ে পথের সন্ধান পাইল না, তাহাকে অন্য বিষয়ে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। ফলে যে বালক অন্ধ করিতে পারিল না, সে হয়ত ভাল গায়ক হইল; যে তাহাও হইতে পারিল না, সে হয়ত ভাল চিত্র-শিল্পী হইল। এইভাবে তাহাকে আত্মাবমাননার হাত হইতে, বর্ষভাব কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। আত্মাবমাননার অসুস্থতা কিভাবে ছেলেদের খারাপ করিয়া দেয়, তাহা এডলার-বর্ণিত আর একটি উদাহরণ হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এই উদাহৃত গল্পটির নায়ক হইতেছে একটি পাঁচ বৎসরের বালক। বালকটির মাতাপিতা বাহিরে বাইবার সময় বাস লিফ্টকে তালোচাষি দিয়া বাইতেন। ইহাতে বালকটি অপমানিত বোধ করিতে লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত মাতাপিতার আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে চুরি অভ্যাস আরম্ভ করিল। আঠারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার এই চুরি-যোগ লাগিল না; সে থ্যাও পড়ে ভবুও চুরি করিয়া

যায়। পিতা বলেন, “দেখো এতে লাভ কি? তুমি বত বার চুরি কর আমি তত বারই ত ধরে ফেলি, এতে আর বাহাহুরি কি?” বালকটি ভখন মনে মনে হার্পে আর বলে, “কুড়ি বার চুরির মধ্যে অন্ততঃ এক বারও ত আমি ফাঁকি দিতে পারি,—ঐখানেই আমার বাহাহুরি প্রতিপন্ন হ’ল।”

এডলারীয় মনোবিজ্ঞান আমাদের এইইকুই বুঝাইয়া দেয় যে, শিক্ষার ব্যাপারে এই বাহাহুরির পথটিকে নানা দিক দিয়াই খুলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে বিপদ আছে। সোজা পথে বালকবালিকারা যদি এই বাহাহুরির পথের সন্ধান না পায়, তাহা হইলে অলিগলির ঝাঁক পথে, পাপের অন্ধকারে এই পথের সন্ধান করিবে। তাহাতে তাহাদের এবং জাতির কাহারও কল্যাণ হইবে না। এই অকল্যাণ হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ভাবীকালের নাগরিক প্রত্যেক ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষাকে বহুমুখী করিতে হইবে এবং তাহাদের বোগ্যতা ও শক্তিকে চিনিয়া লইয়া বখাযোগ্য পথের সন্ধান দিতে হইবে।

এডলারীয় মনোবিজ্ঞানকে অনেকে হয়ত অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিবেন। ইহার মধ্যে জটিলতা কিছু নাই, নূতন কথা কিছু নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু জটিলতা নাই বলিয়া ইহার অন্তর্নিহিত সত্যটি হেলা করিবার জিনিস নহে। ইহার মধ্যে যে একটা ব্যবহারিক দিক আছে, যে একটা আশার বাণী আছে, তাহা হইতে শিক্ষক, অভিভাবক, চিকিৎসক প্রভৃতি অনেকেই উপকৃত হইতে পারেন। এই মনোবিজ্ঞান আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে, দৃষ্টিকে উদার করে। ইহার ফলে আমরা পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে খানিকটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারি; আমরা বুঝিতে পারি আজ আমরা বাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে নিজের দোষে পাপী ততটা নহে, বতটা সমাজের পাপে, লালনপালনের দোষে, দুর্বল দেহবলের ত্রুটিতে। এই মনোবিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, দুঃখপোষ্য শিশুটির পর্য্যন্ত আত্মসম্মানের বখাষণ ব্যবস্থা না করিলে সে ভবিষ্যতে ‘পাপী’ হইয়া উঠিতে পারে। অত্যন্ত অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যার নিকটও আমাদের আচরণকে ভয় ও সংবত রাখিতে হইবে, নতুবা আমাদের আচরণের অভিজ্ঞতা তাহাদের ক্রিয়াকলাপকেও প্রভাবাধিত করিবে এবং ভবিষ্যতে অভদ্র বা অনীতিপরায়ণ নাগরিক সৃষ্টি করিবে।

কথা-সাহিত্যের প্রথম যুগ

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১২৬৪ সাল বা ১৭৭২ শকাব্দা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর কথা-সাহিত্যের এমন তিনখানি সুলিখিত পুস্তক জন্মলাভ করে যাহা বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুস্তক তিনখানি—প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘দুর্ভাগ্যজ্ঞের বুধা ভ্রমণ’ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস; বিষয়-বস্তু, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী—সকল দিক দিয়াই ইহা তৎকালীন বাংলা-সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিতীয়খানি এডভেঞ্চারের কাহিনী, কতকটা আরব্য-উপন্যাসের ধরণে লিখিত; তৃতীয়খানি ডঃ কণ্টার (Caunter)-কৃত *Romance of Indian History—India* অবলম্বনে লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তিনখানি পুস্তকেরই আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল-হিসাবে কেবল সালেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় তারিখ-অনুযায়ী কোনটি কাহার পরে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। বাংলা ১২৬৪ সাল বা ১৭৭২ শকাব্দা ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮১৭ হইতে ১২ এপ্রিল ১৮১৮ পর্যন্ত। অনেকে এই পুস্তক তিনখানির প্রকাশকাল ইংরেজী হিসাবে “১৮১৭” ধরিয়াছেন, ১৮১৮ সনের হিসাবটা ধরেন নাই।

সাল বা শকাব্দের সহিত মাস-তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইংরেজী হিসাবে পুস্তকগুলির সঠিক প্রকাশকাল নির্ধারণ করা দুর্ব্বল হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। সমসাময়িক সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রে প্রকাশিত সমালোচনার তারিখ দেখিয়াও প্রায় নিঃসন্দেহে ইহা নিরূপণ করা যায়।

প্রথমেই ‘আলালের ঘরের দুলাল’ের কথা ধরা যাক। ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল—১২৬৪ সাল। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ইহার প্রকাশকাল “১৮১৭” লিখিয়াছেন। কোথা হইতে তাঁহারা এই ইংরেজী সাল সংগ্রহ করিলেন জানি না, অন্ততঃ পুস্তকে ইহা নাই; সম্ভবতঃ পুস্তকে মুদ্রিত প্রকাশকাল “১২৬৪” সাল হইতেই তাঁহারা এই ইংরেজী সাল অনুমান করিয়া লইয়াছেন। বাহাই হউক, উহা যে ঠিক

নহে, ১৮১৮ সনে যে ‘আলাল’ প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা প্রমাণ করা যায়। ৮ এপ্রিল ১৮১৮ (২৭ চৈত্র ১২৬৪) তারিখের *Hindoo Patriot* পত্রে সম্পাদক চরিত্রের মুখোপাধ্যায় ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

“Those of our readers who have not blessed themselves with this parting gift of the Bengali Year 1264, may obtain that blessing on an application to Messrs D’Rozario & Co. and the earlier the better, for such blessings are apt to be exhausted.”

উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ১২৬৪ সালের চৈত্র, অর্থাৎ ১৮১৮ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ—১৭৭২ শকে প্রকাশিত ‘দুর্ভাগ্যজ্ঞের বুধা ভ্রমণ’। ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার-উল্লিখিত *Romance of Indian History* হইতে সঙ্লিভও নহে; ইহা প্রকৃত পক্ষে একজন বাঙালী সৈনিকের এডভেঞ্চারের কাহিনী। আজকালকার বাঙালী পাঠক যে এই পুস্তকখানির সহিত পরিচিত নহেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত সাহিত্যরত্নী পর্যন্ত শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্তির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই কৃত্ত গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাশ্মীর নয়, বেতাল পশি নয়, তারাপুরও নয়। প্যারীচাঁদও নয়,—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাশ্মীরী আভাস নাই, বিভাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়-কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের প্রাণ সরসতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিন বার পাঠ করিলাম।...

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই কৃত্ত পুস্তিকাখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুর্ভাগ্যজ্ঞের ভাষা বক্ষয়-চন্দ্রের ভাষার জননী।...উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। (বঙ্গ-ভাষার লেখক, পৃ. ২২৫-২৭)

আশ্চর্যের বিষয়, অধ্যাপক শ্রীকুমার বাবু বা ডক্টর স্বকুমার সেন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একখানি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। মনসী বাজেন্দ্র-লাল মিত্র, তাঁহার সুবিখ্যাত ‘বিবিধ-বর্গ-সংগ্রহ’ নামক মাসিকপত্রের আঘাট ১৭৮০ (জুন ১৮১৮) সংখ্যায় ইহার সমালোচনা করেন। সমালোচনার কালটি স্মরণ রাখিলে মনে করা অসম্ভব হইবে না যে, ‘দুর্ভাগ্যজ্ঞের বুধা

ভ্রমণ' মাসিকে সমালোচিত হইবার অন্তত: তিন মাস পূর্বে—১৯৭২ শকাব্দার শেষ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা ১৯৭২ শকের চৈত্র মাস (মার্চ ১৮৫৮) হওয়াই সম্ভব, কারণ পরবর্তী এই বৈশাখ হইতে কৃষ্ণকমল কিছু কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন।

আলোচ্য তৃতীয় গ্রন্থ—‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’। ইহার আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত প্রকাশকাল—১৯৭২ শকাব্দা। ডঃ স্বকুমার সেন ইহার প্রকাশকাল “১৮৫৭” বলিয়াছেন। শ্রীকুমার বাবু ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের ১ম সংস্করণের সন্ধান না পাইয়া লিখিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার “প্রথম আবির্ভাবের তারিখ অনিশ্চিত।” তবে তিনি শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের (‘ভারতবর্ষ,’ বৈশাখ ১৩৪২) নজীরে উহা যে “১৮৫৭” তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই ইংরেজী সাল যে ভুল, সম্প্রতি আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ের পুরাতন উন্টাইতে গিয়া ১৮৫৮, ১৮ই নবেম্বরের

সংখ্যায় ভূদেবের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ের এক দীর্ঘ সমালোচনা পাইতেছি। উপন্যাসখানি ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, একখানি স্থানীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে উহা যে দীর্ঘ এক বৎসর পরে সমালোচিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে মন যায় দেয় না। একে শু তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় বাংলা বই প্রকাশিত হইত, তাহার উপর বইখানি বন্ধুর লেখা; হরিশ্চন্দ্র যে বীর পত্রিকায় উহার সমালোচনা প্রকাশ করিতে অবধা বিলম্ব করিবেন, এইরূপ চিন্তা করা অসমীচীন। ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ ১৯৭২ শকে মুদ্রিত হইলেও কোন কারণে প্রকাশিত হইতে কয়েক মাস বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু উহা যে ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

এই সকল কারণে, আলোচ্য পুস্তকগুলির প্রকাশের কালক্রম আমার মতে এইরূপ :—

- ১। আলালের ঘরের হুলাল : ১২৩৪ সাল (মার্চ, ১৮৫৮)
- ২। হুরাকাতের বুধা ভরণ : ১৯৭২ শকাব্দা (মার্চ, ১৮৫৮)
- ৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস : ১৯৭২ শকাব্দা (ইং ১৮৫৮)

গোপনচারিণী

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

এলয়ের মাঝে হিতি হে বৃষ্টিবতী,
কাজ করে চলো গোপনে গোপনে অতি,
কে গো মাঝাবিনী—রূপ নয়নাভিরাম,
গোপনচারিণী, আমি না তোমার নাম।

নয়নের কোণে মধুর জ্যোতির শোভা,
অবশেষে বাণী মুনিজন্ম-নবোলোভা,
নিয়লকায়ী, তোমার অলবাস—
সমারোহহীন, নাহি বিলাসোচ্ছ্বাস।

অশ্রুজলেরে স্তম্ভর করো তুমি,
চরণ-পরণে পুলকিত বনছবি;
তোমার হাসিতে পাছে পাছে কোটে ফুল,
বনে বনে পাবী কাকলি-কুম্ব-কূল।

মহামিলনের রাঙা রাবী স’রে করে,
আনন্দ-বরা চোরা কটাক তরে

সুরে ও বে-সুরে বেঁধে দাও সেই রাবী
আপনি গোপনে চোখের আড়ালে থাকি।

এ মর মহীতে তুমি চির অমৃত,
বিষাক্তা তোমার রচিতে পায়ে মি চিতা;
শিলাকপাণির এলর-ভরকুণ্ডলি
স্বষ্টির সুরে তব বীণে ওঠে রনি’।

যুগে যুগে তুমি আছিলে, আহ ও রবে
মহীরসী হ’রে লভ্যের গৌরবে;
মিথ্যারে তুমি বরণ করো মি, তাই
এ মর মরতে তোমার মরণ বাই।

কামনা আগারে গোপনে কামীর যুকে
কাম্যের রূপে দেখা দাও লক্ষ্যে,
কে গো মাঝাবিনী, রূপ-নয়নাভিরাম
কহ পরিচয়—‘এম’ কি তোমার নাম ?

শ্রীধর স্বামীর কুল-পরিচয় ও কালনির্ণয়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বনামধন্য শ্রীধর স্বামি-রচিত ভাগবতটীকা ও গীতাটীকা বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপ্রচারিত এবং উক্ত গ্রন্থই বহু স্থানে বহুবার মুদ্রিত হইয়া সকলের নিকট সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। এই শ্রীধর স্বামি-রচিত অপর গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণের টীকাও বহুকাল মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথমোক্ত টীকাটির ত্রায় জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। তত্রিতি “বালবোধিনী” নামক সনৎসুভাষী ব্যাখ্যা বোধ হয় অত্য়পি অমুদ্রিত রহিয়াছে। ভারত-বিখ্যাত এই মহাপণ্ডিত ও যতিবরের নাম না শুনিয়াছেন, এরূপ লোক শিক্ষিত-সমাজে অতীব বিরল। অথচ এই মহাত্মার কোন প্রামাণিক বিবরণ কেহই এতদং সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সংস্কৃত গ্রন্থকারদের পরিচয়াদি ব্যাপারে এই পরাজুখতা ও উপেক্ষাভাব বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেই পরিলক্ষিত হয়। বাঙালীর আত্মবিশ্বস্তির যে সকল উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে শ্রীধর স্বামী তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কীৰ্ত্তিমান। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয়াদি বর্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শ্রীধর স্বামীর পূত্রই বিখ্যাত ভট্টকাব্যের রচয়িতা ছিলেন। এই প্রবাদ “ভক্তমাল” গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

শ্রীশ্রীধর স্বামী জনমে বিদিত।

শ্রীমতাপবত-টীকা কৈল বিচারিত।

শাক্তী বিরুদ্ধ পৌণ-লক্ষণ-ব্যাখ্যান।

হুবিরা হাশিলা শুদ্ধ যত বিলক্ষণ।

গৃহে এক স্ত্রী রাজ পূর্ণ পৰ্বতী।

ভ্যজিয়া বাইতে বস হইল দৃঢ়মতি।

হেম কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।

কালপ্রাপ্ত হৈল তার বালক হাশিয়া।

নাহু উৎকর্ষতা গৃহে রহিতে না পারে।

চিহ্নিত বালক এই কে-বা রক্ষা করে।

ভাবিতে ভাবিতে বৈবে এক দ্যৌঃ-ভিষ।

চাল হতে পড়ে গেল বিনা অবলম্ব।

ভানিরা ভিতর হতে বাহা নিকলিয়া।

বাইল সমুখে এক বক্ষিকা ধরিয়া।

নাহু তাহা দেখি যশে বিচার করিল।

সেই শিশু বক্ষিবে যে ইহারে বক্ষিল।

এতক ভাবিয়া ভ্যজি গমন করিল।

অদাধ বালক এতদ্য লোকেতে পালিল।

সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইল।

ভট্টনামে রাবলীলা লাহিত্য রচিল।

ভট্টকাব্য গুজরাটের অন্তর্গত বলভী নামক নগরে ধরসেন রাজার সভায় রচিত হইয়াছিল। চারি জন ধরসেন রাজার অতিথি শাসনলিপি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—শেষ ধরসেনের রাজত্বকাল প্রায় ৬৫০ খ্রিঃ। সুতরাং ভট্ট-কবির পিতা ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী কিছুতেই হইতে পারেন না। ভট্টকাব্যের পুণ্ডিকায় কবির পিতার নাম লিখিত আছে “শ্রীস্বামী”—তাহার পাঠান্তর “শ্রীধর স্বামী” দুই-এক স্থলে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের পিতাপুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। এই ভ্রমাত্মক করণা নির্কিচাবে অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী গুজরাট নিবাসী ছিলেন, ইহাই প্রচলিত মত।

শ্রীধর স্বামী স্বয়ং তাঁহার টীকাজয়ে যেটুকু আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইরূপ। (১) তাঁহার গুরু নাম ছিল “পরমানন্দ”; গীতাটীকার প্রারম্ভ শ্লোকে তাঁহার ব্যাখ্যা-চাতুর্ঘ্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

শেষাশেষ-সুখব্যাখ্যাচাতুর্ঘ্যং যেকবজ্জতঃ।

দধানবদুতং যশে “পরমানন্দ”-রাববদু।

ভাগবতটীকার বহু স্থলে এই গুরুনাম কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। যথা সর্বশেষে,

ভাবার্থ-কীশিকামেভাং ভগবতভবংসলাং।

“পরমানন্দ”-পাছা-ভূতঃ শ্রীধরোহংকরোং।

“পরমানন্দ”রূপে নামটির পাঠান্তরও স্থলে স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণ-টীকার,

সংলিখিতশ্রীপরমানন্দ-দুহরিঃ শ্রীধরো যতিঃ।

(প্রথমোক্তের শেষে ও দ্বিতীয়াংশের আরম্ভে)

পরমানন্দপদাভ্যন্তর-শ্রীধরঃ শ্রীধরো যতিঃ।

(তৃতীয়াংশের আরম্ভে)

(২) টীকাজয় ৮কাশীধামে রচিত হইয়াছিল এবং তদন্যই ভারতবর্ষের সর্বত্র সহজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কাশীতে রচিত হওয়াতেই কুল্লুকভট্টের মছটীকাও তদ্রূপ সর্বত্র সুপ্রচারিত হইতে পারিয়াছিল।

গীতাটীকার আরম্ভে গুরুবন্দনার পরবর্তী মঙ্গলশ্লোক হইল :

শ্রীমাদবং প্রণমোদ্যামাংসং বিশেষমাধরাং ।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকাঃ মঙ্গলশ্লোক বধঃ,

শ্রীবিষ্ণুমাধবং বন্দ্যে পরমাদম্বিগ্রহং ।

বাচঃ বিবেচনং পদাং পরাম্ভয়ুধান্ নুনৌ ॥

বৈষ্ণবের পক্ষে বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গাঃ বন্দনা নিঃসন্দেহ কাশীবাস স্মৃতিত করে। (৩) শ্রীধর স্বামী “নৃসিংহ”-দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাই প্রচলিত প্রবাদ এবং তদনুযায়ী পৌরাণিক সম্প্রদায়ে শ্লোকার্ছ প্রচারিত আছে :

শ্রীধরঃ সৰ্বলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রলাভতঃ ।

পূর্বোক্ত শ্লোকে স্বগুরুকে ‘নৃহরি’র সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া তিনি স্বয়ং তাহার সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ‘বিষ্ণুমাধব’ের বন্দনা করিয়া তিনি স্বকীয় গুরু-পাটেরও উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের টীকায় ইহা স্পষ্টতরভাবে নিদ্রিষ্ট হইয়াছে :

অৰ্ঘ্যতঃ পঞ্চমাংশে শ্রীকুলীলামহোদয়ঃ ।

বিষ্ণুমাধবভোষার বধামতি বিভক্ততে ।

কাশীর বিখ্যাত ‘বিষ্ণু-মাধব’ তীর্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অধুনা বেণীমাধবের ধ্বজায় পরিণত হইয়াছে। এই পবিত্র-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াই শ্রীধর স্বামী গ্রন্থরচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণুমাধব-ক্ষেত্রের দেবতা ছিল বোধ হয় ‘নৃহরি’ অথবা নৃসিংহ।

শ্রীধর স্বামীর কালনির্ণয় তাঁহার গ্রন্থোক্ত প্রমাণাবলী ও পারিবারিক ইতিহাস হইতে সহজসাধ্য। ভাগবতের টীকায় (৩২৩৩২) তিনি “বিশ্বপ্রকাশে”র রচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (‘কচকং মঙ্গলত্রয়ো গ্রীবাভরণদন্তয়োঃ’)—‘বিশ্ব-প্রকাশের রচনাকাল ১০৩০ শকাব্দ (১১১১ খ্রীঃ)। বিষ্ণু-পুরাণেঃ টীকাঃতে তিনি স্পষ্টাকরে লিখিয়াছেন :

শ্রীমৎচতুঃস্বৰ্ণোপনিষ্যস্চিত্ত-ব্যাপ্যং নিরীক্য স্মৃৎ,
তদ্বর্ণণে ইত্যাদি ।

নানা গ্রন্থকার চিৎসুখাচার্যের অভ্যুদয়কাল প্রায় ১২৫০ খ্রীঃ; তদ্রচিত টীকা ও তৎসম্প্রদায়ের উল্লেখ করায় শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কালের উদ্ধৃতন সীমা ১৩০০ খ্রীঃ অব-ধাতি হয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ গাঞী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন বংশধারা নানা স্থানে অজ্ঞাপি বিস্তারিত আছে। এই ‘শ্রীধর স্বামী বংশ’ নামে পরিচিত সন্ন্যাস পরিবারের প্রামাণিক বিবরণ কুলপঞ্জী প্রভৃতি নানা উপকরণ হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাঁহার সারাসংগ লিখিত হইল। (১)

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খড়দহের নিত্যনন্দবংশীয় স্মরণসিদ্ধ নবদীপ-চন্দ্র বিহারদ্ব গোস্বামী ভট্টাচার্য্য একটি কৃত্ত পুস্তিকা মুদ্রিত করেন (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৭২৬ শকাব্দ)—“আমতভুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণু পূজা হইতে পারে কিনা ?” তৎকালে ইহা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বহু বিদ্‌গোষ্ঠী এ বিষয়ে পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপত্র সকলন করিয়াছিল। “বিষ্ণু-নৈবেদ্য-বিচার” নামে ‘সভাবাজারীয় রাজসভাসদ-প্রণীত’ একটি পুস্তিকা প্রত্যুত্তরস্বরূপ এ সময়ে পৃথক মুদ্রিত হইয়াছিল (পৃ. ৪৭+১)। তাহার শেষে (পৃ. ৪৪) ভরত শিরো-মণিগ্রন্থ ১৪ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। পঞ্চম স্বাক্ষর-কারীর পরিচয়লিপি অবিকল এই :—“শ্রীধরস্বামিবংশাব-তংস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি।” এই ঠাকুরদাস কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। ১২২৪ সনের কাঙ্ক্ষিক মাসে তাঁহার ২৩ বৎসর বয়সে কাশীপ্রাপ্তি হয় (নববিভাকর-সাধাবলী, ২২ কাঙ্ক্ষিক ১২২৪, পৃ. ৬৪৫)। তাঁহার হাতীবাগানের টোলে ‘সর্ব-শাস্ত্র’ পড়ান হইত এবং ছাত্রসংখ্যা এক সময়ে প্রায় ৫০ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু-সম্বাদ ঘোষণা করিয়া “হিন্দুরঞ্জিকা”র লিখিত হয়, “ইহার তুল্য পণ্ডিত বাংলায় আর নাই” (৮ অগ্রহায়ণ ১২২৪ সংখ্যা)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়গুপ্ত (১২৪২-১৩১২ সন) ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র ছিলেন এবং মহেশ-চন্দ্র ঠাকুরদাসের টোলেই প্রথম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন।

(২) আমরা বহু কুলপঞ্জীতে এই সুবিখ্যাত বংশের নামমালা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি। ‘কুলবল্লভম’ নামক ঘটক-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (বন্দ্যবংশ) কিয়ৎংশ মুদ্রিতও হইয়াছে (পৃ. ৩২৭-৮)। এই বংশের বিভিন্ন শাখার বিবরণ বধ্যবধ লিপিবদ্ধ হইলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সাংখ্যভাষ্যার ঘটকবংশীয় ব্যবহারাজীব জনমেজয় ঘটক সেকালের একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনিই সর্ব-প্রথম কুলপঞ্জীতে শ্রীধর স্বামীর নাম আবিষ্কার করিয়া তদ্রচিত “কুলতত্ত্বমর্শন” গ্রন্থে (যশোহর হইতে ১২২৫ সনে প্রকাশিত) লিখিয়াছিলেন :—“স্বরেশ্বর নাম্নার বাড়ুরি নামে খ্যাত, এই বংশে ভট্টনারায়ণ হইতে ১২ পুরুষ অন্তর শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবত ও ভগবদ্গীতার টীকানিকর্তা তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ নার্যাচিগ্রামে বাস, পুস্তকে লেখা আছে কোন জেলায় জানি না।” (পৃ. ৪৮, পাদটীকা)। নগেন্দ্রনাথ বসু (ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমমাংশ, ২য় সং, পৃ. ২৫৭) একটি নামমালা মুদ্রিত করিয়াছেন; ত্ত্বঃখের বিষয়, তিনি শ্রীধরের উপাধি ও গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বাদ

দিয়াছেন। আমরা হস্তলিখিত মূল গ্রন্থ হইতে শ্রীধর স্বামীর উক্তনামমালা বর্ণনাধ্যায় সংশোধন করিয়া লিখিতেছি।

আদিশ্রুতানীত শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশের অধস্তন ৭ম পুরুষ “গাউ”। বধা, ক্ষিতীশ—ভট্টনারায়ণ—বরাহ—বৈনতেয়—স্ববুদ্ধি—বিবুদেধ—গাউ প্রভৃতি। তাঁহার ছয় পুত্র—“হাকুচক নিধো জঙ্গুর্গন্ধাধরভগীরথো। বঠঃ স্বরেশ্বরচাপি গাউকন্ত স্ততা ইমে।” এই স্বরেশ্বর ‘নান্দা’ গ্রাম-নিবাসী ছিলেন (পাঠান্তর নান্দা, নাঁদা, নাঁধা)। কোন কোন কুলগ্রন্থে ‘নপাডী’ বংশীয় অপর এক বহু পরবর্তী স্বরেশ্বর হইতে এই বংশের নামমালা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রাম্যক। স্বরেশ্বরের ধারায় কৌলীন্য ছিল না—কুলগ্রন্থে তজ্জন্য এই আদিবংশজ গোষ্ঠীর উপাধি ‘বাড়ুরি’ লিখিত আছে। কুলপঞ্জীতে আদিবংশজের নামমালা লিপিবদ্ধ থাকে না। এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটয়াছে দুই কারণে—ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিতের প্রতি অসাধারণ মর্যাদা প্রদর্শন এবং মেলবন্ধনের পূর্বে এই বংশের একটি সর্বজনবিদিত কুলক্রিয়া। স্বরেশ্বরের অধস্তন ৮ম পুরুষ, অর্থাৎ ক্ষিতীশ হইতে ১৫শ পুরুষ, শ্রীধর স্বামী। বধা, স্বরেশ্বর—প্রদ্যুম্ন—গুণাকর—গীতাহর—গুণারব—বাদবাচাধ্য (‘কণ্ঠভরণ’ অথবা ‘কণ্ঠহার’ উপাধি)—মঙ্গলানন্দ মিশ্র—শ্রীধর স্বামী। সাংখ্যভাষ্যের গ্রন্থানুসারে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সং পুথির ১১৭১ পৃষ্ঠা) বাদবের পুত্রই শ্রীধর। আমাদের হস্তগত অপর এক পুথিতে বাদব কণ্ঠভরণের পুত্রের নাম লিখিত আছে “মকরন্দ মিশ্র”। এত অকুলীন গোষ্ঠীর নামমালা সব কুলপঞ্জীতে নাই। কিন্তু, বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক, যে কয়টি গ্রন্থে আছে, সর্বত্র স্পষ্টাক্ষরে শ্রীধর স্বামীকে ভাগবতের টীকাকার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অথচ বিশাল রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে মুখবংশীয় কৃত্তিবাস এবং বন্দ্যবংশীয় এই শ্রীধর স্বামী ব্যতীত কুত্রাপি গ্রন্থরচনার নির্দেশ নাই। বেণীসংহার-নাটক, নৈষধকাব্য প্রভৃতি রচনার কথা পরে কল্পিত হইয়াছে—মূলগ্রন্থে নাই। কয়েকটি কুলপঞ্জীর বচন অবিকল উদ্ধৃত হইল। অনন্যজ্ঞেয় ঘটকের পূর্বোক্ত উক্তি কুলপঞ্জী হইতে সংগৃহীত।—

“শ্রীধর স্বামী ভা(গ)বতের টীকাকার”

(আমাদের নিকট রক্ষিত ২ পৃষ্ঠা)।

“শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকাকারক”

(পরিষদের পুথি, ১১৭১ পৃষ্ঠা)।

“শ্রীধর স্বামী ভাগবতের টীকাকার”

(ঢাকার একটি পুথি, ১৬২৭ পৃষ্ঠা)।

উদ্ধৃত নামমালা হইতে শ্রীধর স্বামীর কালনির্ণয় সহজ-

সাধ্য। বন্দ্যবংশে ৬ জন বঙ্গালসেনের রাজত্বকালে “কুলীন” হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে ঈশান ছিলেন স্বরেশ্বরের ভ্রাতা হাকুচের অধস্তন ৫ম পুরুষ এবং জাহ্নল ও মহেশ্বর অপর ভ্রাতা গন্ধাধরের চতুর্থ পুরুষ, অর্থাৎ প্রপৌত্র। সর্বকনিষ্ঠ স্বরেশ্বরের পৌত্রকে প্রথম কুলীনদের সমকালীন ধরা যায়। এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিলেও শ্রীধর স্বামীর জন্ম কোন প্রকারেই ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যায় না। শ্রীধর স্বামী অত্যাধিকাল স্তব্ধতাঃ নিঃসন্দেহে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্রপক্ষাৎ নির্ণয় করা যায়।

শ্রীধর স্বামীর কন্যাকে মুখবংশীয় ফুলিয়ার্মেলের বিখ্যাত কুলীন মনোহর পণ্ডিতের পুত্র বল্লভ বিবাহ করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত মূল কুলপঞ্জী কয়টিতে ইহা লিখিত আছে। পরন্তু বিভাসাগরের ‘বহু-বিবাহ’ গ্রন্থানুসারে (পৃ. ২৬) স্বয়ং মনোহরই এই হানিকর বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে একটি কারিকা নানাগ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে :

মনোহর বিয়ে করে নাঁহার বাড়ুরী।

পরে কুল ভেঙ্গে পায় শোণার আকুড়ী।

এই বিবাহ হইতে ফুলিয়া মেলোৎপত্তির বীজভূত প্রথম ‘নাঁধা’ দোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীধরের অত্যাধিক কাল বিবেচনা করিলে মনোহরের পক্ষেই এই বিবাহ করা সম্ভব হয়, মনোহরের পুত্র বল্লভের পক্ষে নহে। মনোহরের পিতৃব্য ছিলেন কৃত্তিবাস কবি—শ্রীধর স্বামী ও কৃত্তিবাস স্তব্ধতাঃ প্রায় সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। কৃত্তিবাসের জন্ম আমরা ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়াছি (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩০২) এবং সম্ভবতঃ শ্রীধর স্বামী তাঁহার বয়ো-জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রীধর স্বামী অধস্তন বংশধারা অতীব বিস্তৃত—সেহা-খলা, নারীট, ঝিকড়া, হরিপাল প্রভৃতি গ্রামের ভট্টাচার্য্য-গণ এই বংশীয় বটেন। ইহারা প্রধানতঃ শাস্ত্র-ব্যবসারী ছিলেন এবং উক্ত গ্রামসমূহে প্রাচীনকাল হইতে এই বংশে যে সকল পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সমষ্টিসংখ্যা প্রায় ৩০০ হইবে। আমরা বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান উদ্ধারকর্তা নারীটের ভট্টাচার্য্য বংশীয় স্বনামধন্য মহেশ ন্যায়রত্নের ধারাটি মাত্র নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীধর স্বামী একটি মাত্র পুত্র ছিল “শ্রীকর বিভাগর্ব”—সম্ভবতঃ ইহার শৈশবকালেই শ্রীধর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বিভাগর্বের পুত্র (হরিহর) বিভাবল্লভ ও তৎপুত্র রমানাথ বিভানিবাস। কোন কোন পুথিতে বিভাগর্ব ও বিভানিবাসের নাম বাদ পড়িয়াছে। বিভানিবাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ তর্কপঞ্চানন ও তৎপুত্র

জানকীনাথ চূড়ামণি। জানকীনাথের অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন মহেশচন্দ্র। বখা, জানকীনাথ—রাজেন্দ্র সার্কভৌম (২য় পুত্র)—গোবিন্দ তর্কালঙ্কার (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—শ্রীপতি ন্যায়বাচস্পতি (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশ (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—রাধাবল্লভ তর্কবাগীশ—হীরালাল তর্কশিরোমণি—হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত—মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্ত। মহেশচন্দ্র শ্রীধর স্বামীর অধস্তন ১৪ পুরুষ এবং আদিশূরানীত কিতীশ হইতে অধস্তন ২৮ পুরুষ ছিলেন। তন্মধ্যে অস্তুত: পক্ষে ১৬ পুরুষ (কণ্ঠাভরণ হইতে ন্যায়বত্ত পর্যন্ত) অবিশ্রান্ত ধারায় উপাধিধারী শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মহেশচন্দ্রের ধারাটি প্রায় জ্যেষ্ঠাঙ্কমিক—শ্রীধরের জন্ম ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ধরিলেও এই ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ-ধারায় এক পুরুষের গড়পড়তা বয়স “৩৭ বৎসর”। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, চারি পুরুষে এক শতাব্দী বাংলাদেশে কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে কোন কালে লক্ষিত হয় না। মহেশচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের বহু পারিবারিক তথ্য কুলগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। আমরা দুই-একটি উল্লেখ করিতেছি। হুগলীর ১২১০৪ নং তায়দাদে দৃষ্ট হয়, ১২০২ সনে হীরালাল তর্কশিরোমণি এক খণ্ড বৃহৎ নিরুদ ভূমির দখলকার ছিলেন। ছোটফুলিয়ার মুখবংশে হরি মিশ্র একজন কুলীন ছিলেন (প্রবানন্দ, পৃ. ১১৪)। তাঁহার এক অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র পুরুষোত্তম সম্বন্ধে লিখিত আছে—“নান্দাবন্দ্য গোবিন্দ তর্কালঙ্কারস্ত কণ্ঠাবিবাহাৎ নৈকস্ত-ভক্তঃ” (ঘটকেশরীর কুলপঞ্জী, ফুলিয়া প্রকরণ, ৩৩১ পত্র)। এতদনুসারে গোবিন্দের অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় খ্রী: ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পশুপুরনিবাসী বিখ্যাত স্বাস্ত পণ্ডিত কুশারাম তর্কবাগীশ (১১০০-১২১০ সন) প্রথম বিবাহ করেন “নারিটী”-নিবাসী গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশের কন্যাকে—গৌরীকান্তের দৌহিত্রের নাম ছিল রামহন্দর তর্কপঞ্চানন (হুগলীর ২০৮৭১ নং তায়দাদ ভ্রষ্টব্য)। স্ততরাং গৌরীকান্তের জন্ম ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হইয়াছিল।

পুণ্যর ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানে শ্রীধরাচার্য্য রচিত “গীতাসারটীকা”র পুঁথি রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীধর স্বামীর গীতাটীকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে। ভগবদ্গীতার পরিশিষ্টস্বরূপ ‘গীতাসার’ নামক এক ক্ষুদ্র অতি দুর্লভ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্কুরন সন্থাদে তত্ত্বসম্মত গূঢ় বোণরহস্ত-ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে। টীকার পুঁথিকাটি অতীব মূল্যবান্ এবং সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল:

“ইতি শ্রীগীতাসারটীকা ব্রহ্মসংঘোষিনী সমাপ্তা।

কৃতি: শ্রীমরসিংহ-পারমহংস-পদ্মপুত্রপরিজ্ঞাতাং

শ্রীশ্রীধরাচার্য্যণাম্। * * *

কৃষ্ণপারম-জলমিথো ভক্তবোধোপগৃহে

কৃষ্ণকাহিণ্ডিবিবলংপারমহংস-মুঠে।

শ্রীকৃষ্ণমাবিরলবিধ্বামভ্যর্থ্যং বিপাচে

বহুং গীতাসারভূতবৎ সঙ্গসঙ্গাবিতং বৎ।

সংসারেষ্মিন্ ভক্তভাংপর্যভূতৈ, টীকাধ্যাতা ব্রহ্মসংঘোষিনীম্।

“আচার্য্যেণ শ্রীধরেণ জিবেগী-সদ-স্বাম্যকালিতাত্ত্বমেষ।

“রাগাবিষ্টে” বিজ্ঞাবিভ্যাক্ষাৎ, মাঘে স্নিষ্টে সোমবারেণ দর্শে।

সিধে ষোণে বিজ্ঞমক্ষকৃষ্টে, সিধক্রে “মাঘবাহা”বিশিষ্টে।

(১৮৭৫-৬ সনের ৪২৫ সংখ্যক পুঁথি)

নরসিংহের উপাসক এই শ্রীধরাচার্য্য জিবেগীসম্মে স্নান করিয়া মাধব-মন্দির-সমর্ঘিত যে সিদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিষ্ণু-মাধবতীর্থ-সমর্ঘিত কাশী-ধামই বটে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যোগাভ্যাসরত শ্রীধর স্বামীই এই টীকাকার বলিয়া মনে হয়। টীকাটির রচনা-কাল হইতেছে ‘কটপয়াদি’ক্রমে লিখিত “১৪৩২ বিক্রমাব্দ”—ঐ সনে বস্তুতই মাঘের অমাবস্তা সোমবারে পড়িয়াছিল (—২১ জানুয়ারী ১৭৩৬ খ্রী:)। আমাদের নির্ণীত শ্রীধর স্বামীর অভ্যুদয়কাল এস্থলে আশ্চর্য্যরূপে সমর্থিত হইতেছে। তাঁহার প্রধান গ্রন্থসমূহ সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রায় ১৪০০ খ্রী: রচিত হইয়াছিল।



বন্দী যাত্রা

ঐরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৩

এমন করেই কাটল কয়েকটা রাস।

বাগের অস্থানে ভাল দিতে দিতে প্রভাতের উপার্জিত অর্ধ নিঃশেষ হতে লাগল। যে সাধনার ও মনোনিবেশ করবে তেবেছিল তা হইল বহুদূরে। একটা বহুদূর যুগাই গেল—ক্লাস দেওয়ার সঙ্গতি ওর হ'ল না।

আত্মরাতীর প্রথমে অনিবেশের সঙ্গে দেখা। সে উৎক্লম্ব কণ্ঠে বললে, এতদিনে সুযোগ হ'ল তাই—শীগিরই ইউরোপ যাবি।

তোমাদেরও সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।

কি করব তাই—বাবা বললেন, বধন পড়তেই বাচ্ছ না—তখন বিজ্ঞানের আদি অত কিছু যেমন নাও। আজকাল ব্যবসা বলতে বর মিরে থাকলে তো হবে না—পুঁথিবীটা যে এসিয়ে এসেছে। তাই তালিম দিচ্ছিলান এতদিন।

কন্স্যাটুলেসনস্।

কিছু আবার ইচ্ছা শুধু শির-কারখানা দেখা বা ইউরোপের মার্কেট ঠাণ্ডি করা নয়—ওই সঙ্গে ও দেশের সাহিত্য ও মাহুকের সঙ্গে পরিচর লাভ করা।

প্রভাত বললে, এ দেশে বলে ওদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচর লাভ করা হুঃসাধ্য বুরি?

অনিবেশ বিনুমান অপ্রতিভ না হয়ে বললে, মাহুকের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখলে যেমন জানলাত হয়—

তা ঠিক—যাদের সে সুযোগ আছে—তারা কেনই বা তা না জানবে।

অনিবেশ বললে, গিয়ে চিঠি দেব—উত্তর দিতে ফুলবি না তো?

প্রভাত বললে হেসে, আকাশের এক কোঁটা জল পুকুরে পড়লে কি হয় জান তো?

অনিবেশ হেসে উত্তর দিলে, তাই তো পুকুর তরে কোটে পড়ল।...

তোমার জীবনের এই আশা সার্থক হোক।

সত্যই কি আশা লাভ করতে পারলে প্রভাত? ওর মনে কি কোত আগছে না যে বহু পুঁথিবী আজ অনিবেশের বিচরণ-ক্ষেত্র হতে চলছে। কলনার আঁকা সূত্রে নানা বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র বেশধারী সরসারী তাবের রীতিনীতি শিকা লরবি মিরে ওর জগতে এসে ঠাঁকাবে। ও সার্থক হবে—বত হবে। আজ প্রভাত বহি অনিবেশ হতো। না—না—ওর নৌভাগ্য প্রভাতের মনে ঈর্ষ্যার দ্বারা পাত করছে—এ

ঈর্ষ্যাই। এই ঈর্ষ্যাকে বর করতে না পারলে...বত দুর্বল—বত একলা, অভ্যস্ত নিঃশ্ব প্রভাত। প্রবাহ বলে—সকলকারই জীবনে একদিন-না-একদিন নৌভাগ্য দিওহাতে কটাকপাত করে। কিন্তু যাত্রা মাথার বোকা মিরে জমেছে অভাবের সংসারে, পেটের ক্ষুধা ও দেহের লক্ষা মিটলেই তো তারা নৌভাগ্যবান। দূর দূরান্তর ভ্রমণ, জাম-ভুকার শান্তি বা বিচিত্র আশঙ্ক বাদে পরিভ্রমণ হওয়ার হুঃস্বপ্ন তারা কেন দেখে। তারা কন্সয়ার কোন্ প্রয়োজনে এবং বহুদূর পথে যেবে যার কি সম্পত্তি? অথচ সাধারণ বয়ের ছেলেই অব্যবসারে হয়েছো জামজপহী—মহাসাধক—দুর্ভব বোকা, দুঃস্বপ্ন রাষ্ট্রদায়ক—জাতির ভাগ্যনিরতা। সে দুঃস্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু সাধারণ মিরের ব্যতিক্রম এরা।

তাবতে তাবতে ও বত বাতীটার সামনে এসে পড়েছে। বৈঠকখানা থেকে কে যেন তার নাম বলে ডাকলে।

দুহুর্ভে প্রভাতের মন বিচরণ হয়ে উঠল। কিছুদিন আগেকার অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতি ভেসে উঠল মনে। সেই দিন থেকে এ ব্যক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্কই তো রাখেন নি প্রভাত। মাঝে মাঝে বেজ-কোঠাইয়ার কথা মনে হয়—অতীত দিনের কাহিনীর পাতার শক্তিরসী এক নারীর কথা—কিন্তু সেই কাহিনীর পিছনে মাহুকের বার্ষের কুত্ৰী প্রকাশে বতঃই বিমুগ্ধ হয়ে ওঠে চিত্ত। যাবে কি যাবে না এই ইতস্ততঃ—তাব ওর মনকে ঘোলা দিতে লাগল। অবশ্য সময় সব কিছুর ভীততা হয়ণ করে—বহুদূরের অপ্রীতি এই দুহুর্ভে সেদিনকার মত ভীত বোধ হচ্ছে না। ওর চিত্তার মাঝে আর একটা ছুরার গেল ফুলে। এককালের বন-জন-সমুদ্র অটালিকার গর্কোদত সৃষ্টি আজ নাই। কলতার রসি সংহরণ করে হৃদ্য যেন অভ্যন্তরচূড়াবলবী হয়েছেন। তবু অভ্যন্তরগামী সূর্যোর মত জ্যোতির্বিজ্ঞান রচনার সাধ্য এঁদের নাই—এঁদের সামনে রাজির আগর বিতীবিলা। সন্নত গলিটার মালিকানা বর নিঃশেষিত হয়ে এই ভরসৌখে আশ্রয় নিয়েছে—এই সৌখণ্ড তাকে পরিপোষণ করতে পারবে কি? উঁদের মনে বহিই লুপ্ত পৌরব কিরিরে আবার কামনা উগ্র হয়ে ওঠে—সেজন্য শুধু কি উঁরাই নারী? মাহুকের মনে বাসনার আলা বা থেকে হুই হয়েছো—দারী সেই সৃষ্টি। উচ্চাকাঙ্কার আশঙ্ক এমনি করেই পুঁথিরে মাঝে—সুন্দর আবরণে লীনারীত না হলে। আজ প্রভাতও কি বলছে না? কোথায় গেল ওর প্রতিজ্ঞা—উচ্চ শিকা লাভ করবে—এ দেশের বরাতে বতুই পাতরা যার? অনিবেশ চলছে লুপ্ত—

পারে—ওর মনে ব্যর্থতার বেদনা প্রবল হয়ে উঠছে। ও হিংসা করছে অসিবেশের। চারিদিকের বটনা ওকে শিখনে ঠেলেছে প্রবল বেগে—প্রতিকূল শ্রোতে সীতার দিতে দিতে রক্ত হয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত। বহুদূরে ওর তীরত্ব—প্রারম্ভিক হয়ে গেছে—সেখানে পৌঁছবার আশা হুঁশি হুঁশি হ'ল। চিত্ত-রাজ্যের হ্রদে হুঁশি একটি রশ্মি ওর জ্ঞান-বৃত্তিকার সংলগ্ন হ'ল। হাঁ—অকূল দরিদ্রতার তাসে ও—বিক্‌হারা পৃথিবী ওকে তার দেবাঙ্কে—কিন্তু এই অকূলেও একবৎ কাঠ খেন ভেসে আসছে। জিলোচন সেনের ডাক সরাগরি উপেক্ষা করতে পারলে না ও—তাবতে লাগল যাবে কি যাবে না।

ইতিমধ্যে জিলোচন সেন মেয়ে এসেছেন। ওর কাছে ঠাকুরে বলছেন, কি এত আকাশ পাতাল তারহ? আমি ডাকলাম—সুমনে পাও নি? আর আস না কেন? একটি সাহিত্য সভাতে তোমাদের সাহিত্য শাখার কাজ শেষ হয়ে গেল?

এস ভেতরে এস।

প্রত্যন্তকে নিয়ে উনি সিঁড়ির পাশের ঘোঁট বরটতে এসে বসলেন। বললেন, তার মেই, প্রবন্ধ শোনাও না।

প্রত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বললে, কিছু মনে করবেন না।

আরে—না—না, তা হলে তোমাকে তাকতুই না। তুমি ত জ্ঞান না—আমাদের বেছে যে রক্ত বর তার রঙই আলাদা। এই ঘরে বসে তুমি তাবতেও পারবে না—একদুগ্ন আগে আমারই কোন পূর্ক পূরক কথা-না শোনার শক্তি-বরণ অব্যাহত প্রত্যন্তকে এই ঘরের দেওয়ালেই জীবন্ত পেনে কেলবার হুঁশ দিয়েছেন—আর সে হুঁশ তামিলও হয়েছে।

প্রত্যন্ত ভীষণ ভাবে চমকে উঠতেই জিলোচন সেন হেসে উঠলেন উঠে:যরে।

হেলেনাহুঁশ তোমরা—কাঁকা তেজ আছে মনে—কিন্তু যে শক্তির ওপর দাঁড় করালে তেজকে মনে হবে পৌরুষ—তা মেই তোমাদের। ঘোব তোমার নয়—এ কালটাই এই রকম। বাক।—যে কথার জড় ডেকেছি—প্রত্যন্তের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বসলেন, চাকরি করবে? দশটা পাঁচটার হাসপত নয়—ট্রিক পোলারি থাকে মনে কর—তা নয়। কল-কাতা থেকে দূরে আমার একটা মহাল আছে। ঘোঁট মহাল, আর কম—তবু কমিটারির তরাবশেষ। সেখানকার প্রকারা মেহাং চাবী রক্ত নয়—তাদের লগ্ন আছে—শক্তি আছে—কমিটারিকে তারা প্রকারপ্রক বা রক্ত শোষক কোরটই মনে করে না। তবু তাদের চালিয়ে দেওয়াটা সহজ নয়। আমাদের পুরনো নায়েব পারেন নি—তাকে বিদায় করতে হয়েছে।

আশ্চর্য্য, ইনি প্রত্যন্তকে নায়েবি দিতে চান। নায়েবি?

প্রত্যন্ত সজ্জিত হয়ে বললে, নায়েবি করবার মত শিকালোত করিনি ত।

তা করনি বটে—তবু সেকালের শিকার এ কালে নায়েবি চলল না—চলবে না। তার মেই—বাড়ার জমা ধরত তোমার করতে হবে না—চেক দাখিলাও লিখতে হবে না—একটা লই দিও শুধু—মামলা—মোকদ্দমা—আরে যাবতো না—এ কালটাই আলাদা রকমের। ও সব বিতীষিকা ঘোটেই মেই ও মহলে।

তবে—

কথা কি জ্ঞান—শিক্ষা এ কালের—আর মাহুঁশ সেকালের ছিল হর কখনও। হর ত কমিটারিও থাকবে না—আর নায়েবরা তার আগেই সরবে—কিন্তু কথাটা কি সত্যি নয় যে কমিটারি প্রথার উচ্ছেদ করবার জর আইন তৈরি হবে সংসদে?

হর ত হবে। কিন্তু তাতেও কমিটারিরা মোটা রকমের ক্ষতিপূরণ পাবেন।

পাবেন? আহা তাই হোক—হোক এমন আইন। আইন না হ'লে বেজার ত কোন জিনিস ছাড়ে চাইব না আমরা।

কিন্তু কমিটারি প্রথাটা নষ্ট হলে—আপনার ক্ষতি হবে না?

হবে। কিন্তু দারিদ্র থেকে রেহাই পাব।

সে কি? আশ্চর্য্যে প্রশ্ন করলে প্রত্যন্ত।

পাব না? হো—হো করে হেসে উঠলেন জিলোচন সেন। এ কালটাই যে বেরাভা—বা আছে তা নিয়ে মাহুঁশের তৃষ্ণা মেই। মাহুঁশের মন চার দুহু করতে—শান্তি তার চক্ষুপুল।

কিন্তু এমনও ত হতে পারে পৃথিবীর চারিদিকে যে অশান্তি হতান রয়েছে তা দূর করবার জর দুহুের প্রয়োজন।

দুহুের দ্বারা শান্তি! তোমাদের পাকীকী কি বলছেন?

হিংসার দ্বারা হিংসাকে জর করা যায়?

কিন্তু দুহু রাজকেই হিংসা বলছেন কেন?

বলছি এইজন্য যে হিংসা—অহিংসার প্রত্যন্তটা বড় দুহু। তোমাকে আমাকে আরও অনেককে নিয়ে ত পৃথিবী—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার—কিংবা আমাদের সঙ্গে আর সকলের মতের মিল নাই। তুমি দুহু করছ আদর্শ সৃষ্টি করতে—আমি চাইছি সেই আদর্শকে তাকতে। আর এক জন চাইছে আদর্শের সংকার করতে। এমনি বিভিন্ন মতবাদে আদর্শের পৃথিবী তারি হয়ে ওঠে নি কি?

কিন্তু—

তর্ক নয়—যে ক'দিন কমিটারি প্রথা টিকে থাকে—তুমি রাজী কি কাকটা দিতে?

প্রত্যন্তের মন বললে, না। কিন্তু কাছে মেই প্রতিভার ক্ষমিত হ'ল না। সংসারে একেবারে কিছু না করা চলে না।

চেউ ববন এসিরে আসে চোখ বুজে তার স্পর্শ বাঁচান লভব নয়। সংসারে চলাটা যেমন বর্ণ—ভেমনি কর্ণের আশ্রয়ে জীবন রক্ষার বুদ্ধিও আর একটি বর্ণ। এই সব বর্ণ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্তব্য-বশি বিরে অনেক বন্ধকে বেঁধে রাখা হয়েছে—যা থেকে পরিজ্ঞান লাভ সহজ নয়।

সে বললে, আমাকে দিন দুই সময় দিন।

বেশ ত—আহুয়ারির শেখ তারিখে তোমার মত জানিও—অপেক্ষা করব আমি।

ও চলে আসছে—জিলোচন সেন আবার ডাকলেন।

একটা কথা পরিষ্কার হয়ে থাকে ভাল। তোমাকে ডেকে যে কাকটা দিতে চাইছি—আশা করি এর ভুল অর্থ করবে না। হর ত শুনে থাকবে তোমাকে নিকটে টানবার হুলে আমার একটু উদ্বেগ আছে; সে আর এমন বিচিৎর কি। কতাহারপ্রভ বাপেরা স্বতাবতই সং পাজের সন্ধান পেলে খুশী হন—তাকে আপন করে নেবার চেষ্টা করেন—

প্রভাত রাণা নীচু করলে।

লক্ষ্য করে জিলোচন সেন বললেন, এটা কোন পক্ষেরই লক্ষ্যের কথা নয়—সংসারে এ বটেই। কিন্তু একমাত্র সেই উদ্বেগ নিয়েই যদি উপকারকের ত্রুটিকা অভিনয় করতে হয় ত তার চেয়ে লক্ষ্য কি থাকতে পারে। তোমাকে ভাল লাগে—অস্বীকার করি না—কিন্তু তোমার বাবীদ ইচ্ছাকে নতিদত্তা দিয়ে বেঁধে আমার দাঁড় সিঁড়ির অস্থকূলে টানব না এটা নিশ্চিত খেয়। এ বিষয় তুমি সম্পূর্ণ বাবীদ। আচ্ছা—যাও।

পথে এসে প্রভাত ভাবলে, হর ত জিলোচন সেন সরল মনে প্রভাবটি করেছেন—কিন্তু তাঁর মনে যে বাসনা অস্বস্তিত্ব হয়েছে তাকে প্রতিফল প্রতিবেশে মিরে যাওয়া প্রভাতের পক্ষে সম্ভব হবে কি। মনের একটা দরদ অংশ আছে—সবর-বিশেষে বা কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে ছাড বেলার কর্তব্যবোধ। তখন অকারণে রুচ হওয়া চলে না। না—আজ আর এ মিরে ভাববে না সে। হাতে সময় আছে—অনেক ভাববে সে। গভীর ভাবে ভাববে।

২৪

পরের দিন—দীপার একঘণা ছোট চিঠি পেলে সে।

দীপা লিখেছে: আজ দুপুরে একবার আসবেব এ-বাড়ীতে। বিশেষ দরকার। বোধ হয় শুনেছেন—দাদা কঠিনমণ্ডে বাচ্ছেন—ওঁকে একটা অভিমত দরকার নয় কি? আপনাকে কি মত? আসবেন অবিশিষ্ট—অনেক—অনেক কথা আছে। দীপা।

সে অনেক কথা প্রভাত জানে। অতঃপর এই উপলক্ষে বিরাট ভোজের আসর বসবে—মিহ্রিত হবেন এ দুপের লম্বা-মিহ্রোমিহ্র। একদমকে লজাপতি লাগিয়ে—গান-

বক্তা-কবিতাপাঠ-হালি-গল্প-বক্তব্য—সব কিছু মিরমিত চলবে। যেমন সাধারণ সভার হয়ে থাকে—প্রচারের পুরুতুলি ব্যতিক্রিয় মিরে অস্বস্তিত্ব হবে। কিন্তু সাধারণ সভাকে—শোক বা উৎসব যে সভাই হোক, বাহুব যেমন অভ্যস্ত সহজে ও শীঘ্র তুলে যায়—যেমন একটা সভার পর অত সভাটি অন্য হয়ে ওঠে না—যেমন প্রারম্ভ সঙ্গীতে কেউ মনোনিবেশ করে না—বক্তৃতাকে ভাল লাগলেও মনে হয় শুষ্ক হয়ে বলায়, ঐতিহ্যের করে বলায় কোণাল মাত্র—কবিতা পাঠে মিত্রাণ কঠোর ধ্বনি সভারূলে অর্ধহীন হয়েই থাকে—ভেমনি বরণের অস্বস্তান হবে এটা। এসব অস্বস্তানের সার্বকতা কি? কাকে প্রচারের মত এর অবতারণা?—শোককে, আনন্দকে না আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছাকে? আত্মর্য—সুখে বা দুঃখে—সম্পদে বা বিপদে মানুষ সর্বদাই চার প্রসারিত হতে।

ওকে চিন্তায়ুক্ত দেবে দীপা বললে, কি ভাবছেন এত? শরীর কি সুস্থ মেই?

না কিছু নয়। ওরা তখন বড় বারান্দাটা অভিক্রম করছে। হঠাৎ বারান্দার এক প্রান্তে প্রভাতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। মনে হ'ল একজন লোক বারান্দার ঘেঁষে ভেদ করে কুণ্ডে অদৃষ্ট হ'ল। ও বিষয়ে শব্দ করে উঠতেই দীপার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল সেদিকে। বললে, আপনি জানেন না দুই ওই বারান্দার নীচের একটা বড় চোরা কুঠুরি আছে।

কেমন?

মানে বিহারিশের আপানী বোমার কথা মনে আছে তো? তাই থেকে পরিজ্ঞান পাবার একটা আশ্রয় আর কি।

কিন্তু এখন এ আশ্রয়ের মূল্য কি।

দীপা বললে, তবিরতের মত—যদি কখনও হুদ বাধে—

প্রভাত বললে, আরও একটা উদ্বেগ লিড হতে পারে।

কি উদ্বেগ?

যর, কোম বাহুবকে লুকিয়ে রাখার দরকার—কোন জিনিষও হতে পারে—

দীপা বললে, আপনি আজওবি ভিটেক্ট উপভাল বালাচ্ছেন প্রভাতদা।

টিক নয়—কেম না—বাহুবের বদলে জিনিস রাখতে পারলে আজকালকার দিনে লাভ বেশী। কালো বাজারে যে সব জিনিস পাওয়া যায়—সাদা বাজার থেকে হঠাৎ উবাড হয়ে তারা মাটির তলাকেই আশ্রয় করে তো।

দীপা লজ্বরে হেসে বললে, দেবদেব—আমাদের যেম ও হলে টানবেন না।

এই কথার প্রভাত চমকে উঠল। একথা পরিহাস নাও হতে পারে। এই প্রাসাদের জবরহত কে বলতে পারে কুণ্ড-মিহ্রিত ওই বয়েতে দাই।

চলতে চলতে তার বার বার মনে হ'ল—কি আছে পারের
নীচের এই গর্ভ-গৃহে? এ কি শুধু অমাপ্ত দিনের বিপদ-
পাতকে নিবারণ করবার জন্যে তৈরি হয়েছে—না চলতি
কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক সুনিবিড়।

আচ্ছা, তোমাদের একটা প্রশ্ন চলছে না? হঠাৎ এর
করলে প্রত্যাহ।

হঁ—কেন? বই ছাপাবেন? সত্যি যদি ছাপেন কোন
বই—কর্মী পিছু কিছু কলসেন্দন পাবেন।

কাগজ? সে তো আকালকার বাজারে হুপ্রাপ্য।

না—তাও দেব। আমাদের ঠিক আছে—মিরশিত
হুল্যেই—

ওরা সিঁড়ির কাছে এসে পড়ল। সিঁড়ির বুধে অনিবেশের
সঙ্গে দেখা। বললে হালিহুধে—এঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না,
একটা বিদ্যার-অভিনন্দন দেবেনই। আমার ইচ্ছা ছিল কিরে
আসি কিছু নকর করে—

প্রত্যাহ হালসে, নকর না থাকলে কি কেউ বেশী পাবার
অধিকারী হয়? বাবড়ো না—বেতে আসতে হুঁদিকেই
তোমার লাভ হবে।

হো—হো করে হেসে উঠল অনিবেশ। আচ্ছা—আচ্ছা
ওপরে বাত। শীল্ দিতে দিতে সে বেরিয়ে গেল।

আরও কয়েকটি হেসে মেয়ে উপরের ঘরে বসেছিল।
এরা দীপা আর অনিবেশের বন্ধু। এদেরই উৎসাহে অভি-
নন্দনের পরিকল্পনা করা লাভ করবে। কাগজে কলমে
মন্তব্য লিখিব হ'ল। নাচের লজ্জা ফাকে বলা হবে—সদীতে
কে কে অংশ গ্রহণ করবেন—কার কোন কোন মারী
কবিতার আবৃত্তি হবে—আর সভাপতি নির্বাচন—এ নিয়ে
মানা মতের খুঁটি হ'ল।

হঠাৎ দীপা বললে, আপনি তো কিছু বলছেন না
প্রত্যাহা?

আমি। আমি এসবের কিছু জানি না তো। তোমরা
প্রায়ই যাও নব্বুনা-সভার—জলসার—

তা হোক—সভাপতির নাম আপনাকে বলতেই হবে।

প্রত্যাহ বিরত হয়ে বললে, থাকে হোক একজনকে—

সে তো নিশ্চয়—পালি চেয়ারে ফুলের মালা দিয়ে আমার
অর্জুন মুক করব না।

প্রত্যাহ হঠাৎ না বলতে দিয়ে বেয়ে গেল—তার তাবাব
হ'ল এই যে—তাতেই বা কতি কি? এক জনকে উপলক্ষ্য করে
মিছেদের আহির করার কাজে যে কেউ হলেই তো যথেষ্ট।

একটি হেসে বললে, সংবাদপত্রের কোন সম্পাদককে
বললে ভাল হয়।

একটি মেয়ে সোৎসাহে বললে, ঠিক—ঠিক তাতে
রিপোর্টার পুরো এক কলমে পৌছবে।

প্রত্যাহ আর একবার হাসলে মনে মনে। আসল উদ্দেশ্যই
ত ব্যক্ত হয়েছে। সভাটি মিথক বন্ধু-প্রতির মিশ্রণ নয়—

এর পর আলোচনা হ'ল—কোন কাগজের প্রচার সংখ্যা
সর্বাধিক এবং কোন কাগজের সম্পাদক পর-কীর্জন-কৃষ্ণ—
বা পর-কীর্জন-প্রসঙ্গে আত্ম-প্রশংসার শতবুধ। দীপা ছুঁ-
তোকে পরিভূত হয়ে দশ লাইনের বিষয় বস্তুকে হুঁকলমে
বিতারিত করতে পারেন—এই তাবাবের ব্যোরা অভিনন্দন
কেজে তাঁদের যোগ্যতাই নিঃসংশয়ের সর্বাধিক। এর পর
তাঁদের নাম এবং তাঁদের সঙ্গে কার পরিচয় কত নিবিড় এ
নিরে তর্কবিতর্ক হ'ল।

প্রত্যাহের কানে কোলাহলটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও তখন
অত্ন রাজ্যে। ও তাবাবে পারের ভলার যে গর্ভগৃহ তাতেই
কি সঞ্চিত হয়ে আছে মিরশপের কাগজ? রাতের অন্ধকারে
বা পৃথিবীতে উঠে আসে—মিঃশখে চলে যায় হানাতরে—
বিনিময়ে এই প্রাসাদের দেহবৃদ্ধি বাটে। অমলেন্দুর কথাত্তে
কি এরই ইন্দিগ ছিল?

মনে মনে লজ্জা স্থির করে নিলে সে। বিদ্যার মেবার
সময় দীপাকে বললে, তা হলে কথা রইল দীপা—আমার
বই ছাপানোর কাজে সাহায্য করবে তুমি। মনে ছাপার
ধরত—কাগজ—

নিশ্চয়। কিন্তু এক সর্ভে।

সর্ভ। সে আবার কি? প্রত্যাহ বিম্বিত হ'ল।

সর্ভ এই যে বইখানা আমার মনে উৎসর্গ করতে হবে।

দীপার পানে চাইলে প্রত্যাহ। ওর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।
অত্যন্ত কোমল—মর্শাশ্রী দৃষ্টি। এ দৃষ্টির সঙ্গে কোন কালে
পরিচিত ছিল না প্রত্যাহ। এ দৃষ্টির আঘাতে ওর মূতন সভা
বেগে উঠল বেদ। সবল—সুহ পৌরুষের সভা—বা সুপে সুপে
হুর্লকে বল দিয়েছে—আশ্রয়প্রার্থীকে দিয়েছে আশ্রয়—
এবং মারীকে দিয়েছে প্রেরের লজ্জা। দীপার মধ্যে সেই
শাখতী মারী প্রতিভাসিত হয়েছে—ওর দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ-
বতা শাখতীর কণদীপ্তি লভ আরোপের সুহুর্ভে উদ্ভাসিত
হ'ল। প্রত্যাহের সারা অন্তর কেঁপে উঠল।

দীপা বললে, মনে থাকে বেদ।

প্রত্যাহের দৃষ্টিতেও কি বীজিত হুটে ছিল? লজ্জা দীপা
কি করে অসংশয়ের মেলে নিলে তার দাবি গ্রাহ করেছে?

২৫

অতাবদীর সুহুমার সুহুর্ভলি তপদীবী। পৃথিবীর বায়ু-
তরে তার ককচ্যুত নক্সের মত কণদীপ্তির—নীচের বিরাট
অন্ধকার সুহুর্ভে সে জ্যোতি গ্রাস করে দেয়।

সুপতি গ্রাম বুধে এসে হাঁড়াল লামনে। প্রত্যাহা—
একবার আলবে—আমাদের বাড়ীতে? বাবার বক্ত অস্থ-
কি অস্থ?

তা আমি না...কোন কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারতেন না—অবশ্য বস্তাবার ডাক্তার ডাকবার কথা হয়েছে—হাত থেকে বারণ করেছেন।

রোগীর কথা শুনে—রোগ আরাম করা বাবে না—চল বাহি।

গিরে দেখলে রোগট শক্ত। রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন নয়—আজকের মত পড়ে আছেন—কিন্তু ডাক্তারের নাম শুনে তাঁর আঙ্গুর তাবটী কিছুকণের মত নষ্ট হচ্ছে—হাত থেকে কি ইঙ্গিত করছেন। ইঙ্গিতটি নিষেধেরই ন্যায়ভর।

প্রত্যন্ত বললে, ডাক্তার না ডাকলে বয়সী কন্যে না।

রোগী ইঙ্গিতে জানালেন—বয়সী নই।

না হলে জীবন সংসার হতে পারে।

মাথা নাড়লেন ভূপতির বাবা। তাঁর ক্যাকাসে বুধ রান হাসি ফুটে উঠল। জীবনের প্রতি উপেক্ষার কিংবা জীবন ধারণের ব্যকে সে হাসি রহস্যময়।

না হলে আপনার সংসার দেখবে কে? মমতার শক্ত হৃদি ধরে নাড়া দিলে প্রত্যন্ত।

শীর্ণ হাত উপরে তুলে ভূপতির বাবা আবার হাসলেন। অর্থাৎ দেখবেন ওই ওপরে যিনি আছেন—যিনি তোমার আমার—এই বিশ্বজনের সকলকারই প্রভু।

প্রত্যন্ত আপত্তি শুনে না—বাইরে এসে বললে, ডাক্তার ডাকতে চললার।

ভূপতি শুকনো বুধে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, ঘরে কিন্তু টাকা নেই—আজ মালের বাইশে।

তাই ত—এ কথাটা ত প্রত্যন্তের মনেই হয় নি। ভূপতির বাবা বয়সী ভোগ করেও কেন ডাক্তার ডাকার নামে আঁৎকে উঠছেন—এতকণে স্পষ্ট হ'ল রহস্যটা। কিন্তু অর্থাভাবে মাহু ব ডাক্তার ডাকতে পারবে না, রোগবয়সীর ঔষধ পাবে না এ কেমন কথা? স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এটা কলঙ্কের কথা নয় কি?

অবশ্য ডাক্তার এসেন—প্রত্যন্তই নিজের ঘরচে আনালে, তার মারোরাডী প্রভুর বেওরা করেকট টাকা ভবনও পকেটে ছিল। আর টাকা থাকলে মাহু বের কষ্ট বেধা মাহু বের পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাক্তার বাইরে এসে প্রত্যন্তকে আশ্বাস দিলেন না। বললেন, তাইটালিট নেই—চিকিৎসা করব কি?

তবু একটু চেষ্টা করব তার।

চেষ্টা অবশ্যই করব—আমাদের শিকাই হচ্ছে যে কোন অবস্থাতে হাল না থেকে বেওরা—কিন্তু বা ক্যাঁত তা আপনাকে জানালাম, কেননা আপনি তো তাঁর নিকট-স্বাধীন নয়।

এমনটা কেন হ'ল?

ম্যাল-নিউট্রিশন। এ কি আজ মনুষ্য জ্ঞানলেন? আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে শক্তকরা মতর জ্বনের এই কথা। বিশেষ করে বারা চাকরি করে।

ডাক্তারের কথা মনস্ত মন ধিরে মেনে নিলে প্রত্যন্ত—কিন্তু এ হাতা ময়ির ঘরের হেলেনের অবলম্বনীর সহজ হৃদি আর কি আছে। বিনা পুঁজিতে আংশিক নিকিত হওয়ার মত কৌশল তো তাদের জানা নাই। দেবতার হুসারে এই পরম পদ লাভের মত কত দুঃকতরা প্রার্থনা আর সাধারণ হাতা দুই বেওরার প্রতিশ্রুতি করে—সে আর না জানে কে?

ভূপতির বাবা হুই-এক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন—ভূপতির বাকে চাপিরে গেলেন পোস্ততার। হুটী মাবালক তাই—হুটী অবিবাহিত বোন—বিধবা না। অভঃপর চাকরি করব না—এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে পারবে না ও। পারলেও না। পরের দিনই কাচা গলার ঘিরে বাপের আপিসে উমেদারি করতে হুটল। মদাগরী আপিস—অন্ত আইন-কাহনের বড়াই নাই—ইউরোপীয় মনিবের মনে লাগলেই হুহাহা হয়ে বার। ভূপতি চাকরি গেলে—বাপের মরুম কিছু বোনাসও পেলে—আসর পিতৃবার থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় হ'ল।

কিরে এসে প্রত্যন্তকে বললে, তোমাদের সমিতি থেকে নামটা কাটরে দিও—আর ঘরের ধেরে বনের মোব তাকানো চলবে না।

কেন মনস বোণাক করে নিলে কি দেশের কাজ করা বার না?

না বার না। 'আমি' ভিনিসটা সব দিকেই পথ আগলে দাঁড়ার প্রত্যন্তদা। দিকে বীচার কথাই যদি ভাবব মিনরাড—কিন্তু আমাদের কাজ তো পরকে বীচানো নয়, দিকেকেই বীচানো।

সেটা একলা একলাই করে ভাল। আর কিছুদিন গেলে তোমাদের সমিতি—কি তোমার নাম পর্যন্ত লহ করতে পারব না। সত্যি বলছি—যে চোরাবালিতে দুইবে সে করবও চেউয়ের উৎপত্তি-তত্ত্ব ঘিরে মাথা ঘামাতে পারে না।

প্রত্যন্ত অভ্যস্ত বিব্রত হল। ভূপতির মত উৎসাহী কর্মী হলে তাকে থেকে গেল—এই কভির মত নয়। এ বেশ অভিশাপ—হ'শো বছর ধরে বা ভিলে ভিলে আহরিড হয়ে এমনি অকস্মাৎ মেয়ে আসে। তারতবর্ষ অভঃসারশূভ হয়েছে—এ কথাটা বদেদী হুগ থেকে শোনানো হচ্ছে—কিন্তু সেই অভঃসারশূভতা কোথায় আর কি তাবে আরম্ভ হয়ে মর্ষের কতহুয়ে পৌছেছে তা সঠিক বলতে পারে কেউ? ঐবর্ধশালিনী তারতকে সর্করিভা করেয়ে শোবকপৌধী—কিন্তু সে বন তার লকিত মনি হুজা হীরা মাবিক্য নয়—তার শির-মাবিক্য সাময়িক শক্তিক নয়। কেননা এ সব অপমত হল

কালে পূরণ হবার আশা থাকে। ছুটির পথ কেটে দিয়ে সূঁঠেরা তো ছুটিকে চিরবিক্রিত করে রাখতে পারে না, সে নিঃশব্দ তার সাধনিক। কিন্তু চোর সিঁকটি চালিয়েছে গোপন স্তম্ভে—তারতের প্রাণরত্ন অপহরণের চেষ্টা চলছে বহুকাল ধরে। তার শিকা সংকল্পিত রূপকে আবুল বললে দেবার চেষ্টা, তার বণিককে করণিকে রূপান্তরিত করার সাধনা, তার পুত্রের ভুলসী ও শালগ্রাম শিলা সরিয়ে সরস্বতি ফুলগাছ ও নিরীহর বাঘের প্রতিষ্ঠা—সুহৃৎ সবল ও সরল প্রতিবেশ থেকে তাকে সংবাত-সকুল আবর্তের মধ্যে টেনে এনে পরাশ্রয়ের কলকটিক ললাটে এঁকে পৃথিবীতে অভ্যস্ত অলহা আর ভীকু আর অসহিষ্ণু কান্তির পংক্তিতে নামিয়ে আনা না হলে সর্বস্বত্বিহারা হাহুয় সামান্য একটা চাকরির জত এমন আকুলি-বিকুলি করবে কেন? মনের দূরত্ব আশা আর করনাকে সমাধি করে এই ভাবে কোমলতে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার গজলিকা-প্রবাহে ভেসে যাবে কেন? অর হরণ করে—অর ভিকার এই নির্মূর অভিনয়ের মধ্যে কে তারের ঠেলে দিয়েছে?—অলহা—পহু—পরনির্ভরশীল—দাসত্ব-লোভুপ কীবনরূপরাঘব...

প্রত্যয়ের মাথার আগুন অলে উঠল। ঠাঁতে ঠাঁত চেপে ও বললে, পৃথিবীতে হুঁসলৈর হান নাই। শক্তিমান হলেন তিনি আর পদমর্যাদা আছে—আর সে পদমর্যাদার সৃষ্টি করে বিত্ত। স্তম্ভরাং শক্তির মূলতত্ত্বে বিত্ত হাতা আর কিছুকে করনা করা যায় না। এই বিত্তকে বুধে মিনা করেও মন থেকে সরিয়ে দেওয়া কি নক্ত। তাই কি সামান্যদারী এরই মূলে আঘাত হানছে নির্ভর ভাবে। কিন্তু সে তো বাহিরের আঘাত। তারা বনীষের চাইছে গরীবের সঙ্গে এক লাইনে ঠাঁত করাতে কিন্তু বনকে পরিহার করার মন্ত্র তারা জানে না। স্তম্ভরাং বন বর্জন করে সবাই চাচ্ছে সুখী হতে আর এরই মধ্যে জ্বলছে অকল্যাণের অগ্নিকুলিক। বনসাম্রাজ্যই যদি এলো তো শান্তি আসছে না কেন? কেন কাহার বললে লোহার বেহু গড়ে বাইরের আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা।

...মনের গভীরে সৃষ্টি কেসে সংশোধনের কাজ করবেন—এই সমাজ-কতকে স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে আরোপ্য করে ফুলবেন তেমন ভিত্তিক কোথায়?

প্রত্যয়ের বুধমণ্ডল সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আহেন—তেমন হাহুয় তো আমাদের মধ্যেই রয়েছে। তিনি রাজধানীতে বসে দিনের পর দিন বুয়ে আশ্রতভির মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। তাঁর প্রার্থনা-সত্য শুধু রাহ-ভজন-গান-সর্বব—ইহলোকিক পরিজ্ঞাপ কেন্দ্র নয়। ইহলোকে যে সব প্রলোভন হাহুয়কে মনুষ্য থেকে নামিয়ে দেয়—আশ্রয়বর্নের প্রথর আলোর সেইগুলিকে পুখাঁপুখ নিরীকণ করার মন্ত্র।

কমতার অহকার কোন্ হিত্রপথে প্রবেশ করে অভ্যস্ত সং হাহুয়ের অভ্যস্তকেও আবিষ্ট করে তোলে—তারই ইন্দিত বেন প্রাণনাতিক ভাবনগুলিতে পাওয়া যায়। সেই মহান্না বলছেন, কংগ্রেস ভেঙে লাও। কমতার মনে মনে হয়ে ওই পবিত্র প্রতিষ্ঠান আর পূর্ণ মর্যাদা বহন করতে পারছে না। ওর সংগ্রামী মনোরমিতে হিত্রশীলতার লক্ষণ একটু হয়ে উঠেছে। সাংবাদিক লক্ষণ। শুধু সংগ্রহ হাহুয়কে হিত্রাহিত জানপূর করে, সাংসদ্যার নীতিতে সে আহাবান হয়ে ওঠে। আককার অগ্ন বস্ত্তাত্তিকতার মন্ত্র জপ করছে—নীতিজ্ঞান সেকালের কুসংস্কার বলে সমাজতন্ত্রে বাস। বাঁধে। তাই কি মুক্তদৃষ্টি ত্যাগী পুরুষ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে বুধ কিরিয়ে দুই দিশতের নিঃশেষিত নীলিমার অঙ্গুলি সজ্জত করে বার বার উচ্চারণ করছেন—সাবধান বাণী। হুঁসিয়ার পথ ফুল করো না। আপনাকে জান—আপনাকে জান।

তাই আক হিত্রীতে বসে মহান্নাব আর্জবরে বলছেন, কের—কের—অসত্যের পর্জন্ত প্রাণ বোকা জমে উঠেছে তোমাদের হু'পানে। ও বোকার ভলার একদিন সমাধি রচিত হবে তোমাদের—সময় থাকতে যদি সাবধান না হও। সং হও—সাহসী হও। অবধা বনসকরে কালোবাচারকে বলিষ্ঠ করো না। এই অতি ক্রীতি—কেটে হাওয়ার পূর্ণ-হচনা।

সুধু পতি রাধব রাণা রাহ

সব কো সন্মতি দে ভগবান।

শুধু প্রার্থনা কেনে গলা সাধা নয়—সারা মন প্রাণ টেলে লাও এই কর্ণের সাধনার।

কিরিয়ে লাও পকার কোটি হুজা—পাকিস্তানের প্রাণ্য বলে যা বাণি উঠেছে। কিরিয়ে মিরে এস উৎসাহিত ইসলামী জনকে—তারের বর্গ হানকে সংকত করে—বাসস্থানকে বাণা হুজু করে—তারা যেমন নিঃস্বিরে ছিল—তেমন মির্জাবনার মধ্যে পুনঃ স্থাপিত কর তাদের। সত্যকে প্রতিষ্ঠা না মিলে আমার স্বভূয় মধ্য দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে বাব। হুজ্ব প্রতিজ্ঞা তাঁর। হর জীবন—নয় মরণ।

হুজা পরাক্রিত হয়েছে—সত্যপ্রাণী শেষ সংগ্রামে চরছেন করী। তবু তিনি জানেন—এই মূল্য তাঁর জীবনরতার মততা-বশে মিলেছে। এর মধ্যে বস্ত্ত:কূর্ষ প্রাণশক্তির মহিমা মিহিত কিনা এ সংসার তাঁর মনে বেগেছে।

সব কো সন্মতি দে ভগবান।

এই প্রার্থনা প্রতিদিন চলছে—এই প্রার্থনা আজীবন চলবে। এই প্রার্থনার শক্তিতে উজ্জীবিত হবে তারত—বহু—সুহ—ভারত আর তার পদমূলে প্রভা অর্ঘ্য বেবে সত্য-সদ্বাদী অগণিত সন্তান।

২৬

প্রত্যন্ত বসে বসে সমিতির কার্যাবলীর একটা খসড়া তৈরি করছিল—শশী হাজরার কঠোর শোনা গেল ঘরের বাইরে, আগতে পারি কি তারা ?

অমলেন্দু প্রত্যন্তের পাশে চেয়ে হেসে বললে, আহ্নম।

ঘরে চুকেই হাজরা ভিত কেটে হ'পা পিছিরে অভ্যন্ত অপরাধীর মত বললেন, তোমরা কাজে ব্যস্ত রয়েছ জানলে কি দ্বিতীয়মান্য আসি। তোমাদের মূল্যবান সময়—

না—না—আপনি বহুমান। এক মিনিট।

শশী বললে না—ঘরের চারদিকে কোঁচুহলী দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—একটু ইতস্ততঃ করে বললে, একটু কথা বলব—স্বাগত করবে না ত তারা ?

প্রত্যন্ত কাগজটা এক পাশে ঠেলে রেখে বললে, কি কথা ?

এই—বার দুই টোক গিলে হাজরা বললে, পাখীর হাবিটা না রাখলে কি চলে না ? মানে আমাদের বাংলা দেশে—

লবিসময়ে চাইলে প্রত্যন্ত। বললে, পাখীকী বাংলাকে দেখতে পারেন না—এমন অভিযোগ অনেক বার শুনেছি বটে—কিন্তু প্রমাণটা পাই ট্রিক উন্টো।

বোম্ব হর মোরাখালির কথা বলবে। কিন্তু পেছনে সমস্ত সত্যের শাস্ত্রী সেপাই মিরে ও রক্তম খালি হাতে চলার বাহাদুরি—

সে কি—শাস্ত্রী সেপাই—

মিট মিট করে চেয়ে দুচক্রে হাসলে হাজরা। বললে, ও কথা বিশ্বাস করুক কাগজওয়ালারা বার্না রিপোর্ট বানায়—বিশ্বাস করুক বোকারা—বার্না ছাপার হরণে না পড়ে তাই ন্যতি মনে করে—কিন্তু—

হাজরা মশার—আপনার বিশ্বাসে বা অবিশ্বাসে পাখীকীর কতি-বৃষ্টি কিছু নেই—হরত জানেন ভাল করেই। আকাশে গুঁড়ু কেললে সে গুঁড়ু নিজের পারেই লাগে। বাক—দ্বিতীয় ব্যাপারটাই ত দেখলেন।

দেখলেন—মোহলমানদের সঙ্গে চিরকাল উনি আতীত করে আসছেন। এ ঠাঁর একচোখোমি। পাখীকে ভালোমানুষ পেয়ে ওরা যে আমাদের মাথার কাঁঠাল ভালছে এটা বুঝছেন ত ?

কে বুঝে ?

লবাই—বার সঙ্গে দেখা সে-ই বলে—কাগজটা কি ভাল হচ্ছে ? ভালমাহুদী করে অতগুলো টাকা কিরিরে দেওয়া—ওদের বাড়ী বর বোর সারিরে দিচ্ছ করা—এর কল কি হবে জান ? আর একবার ভাগবীটোয়ারা। কথার বলে না—

হিল খাল—হ'ল খুল

কাটতে কাটতে নিখুঁল।

বাকপে—আপনার কোন বরকার আছে কি ?

আছে বলেই ত দুটে এলাম। তোমরা ত তারা দেখে বত বোম্ব নন্দ বোম্বের। কিন্তু এ দিকে যে দেশের দই মারছে সেটা দেখেও দেখছ না।

খুলে বলুন ত।

বলব আর কি—সামান্য মুদিখানার স্যাকমার্কেট দেখে কিন্তু টম টম লোহা—আর রিম রিম কাগজ যে অতকারে পাচার হচ্ছে মাকের উপর মিরে সে বোঁক রাব ?

প্রত্যন্তের মুখ গভীর হ'ল—বললে, আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন ?

বেশ ত—বুড়োর কথার বিশ্বাস না কর—এক দিন সত্যিরে পাহারা দাও না। বেশি দূর বেতে হবে না—নিজের বাড়ীতে বসেই—

আপনাকে থাকতে হবে। ওর হাত চেপে ধরলে প্রত্যন্ত।

শশী হাজরা আতকে উঠল, আরে—হাঙ্ক—হাঙ্ক—আমার কি পারে শক্তি আছে যে লাঠির ২১ সহ করব। ও রাজা-রাজকর বুড়ের মধ্যে উল্ বড়কে টেনে না তাই। সত্যানুসৃত চাও—বাতলে দিতে পারি। কিন্তু—

না, থাকতে হবে আপনাকে। একটু ভেবে বললে, কাগজটা আপনাকে দিই হাঙ্গল করব।

শশী হাজরা সত্যাসে চীৎকার করে উঠল, ওরে বাবা, ওসব ক্যাসাদের মধ্যে আমি দেই। বাই বাই কীসি বাবাই—ও সবের বার বারি না।

না হলে কিছুই হবে না। আপনার মহাজন খ্যাতি আছে—আপনাকে না হলে হবে না। বেশ ত—এই কাগজ করে আমাদের কর্ম্ম-ভালিকা তুচ্ছ হন।

তা কি করতে হবে আমার ?

অমলেন্দু বললে, আপনি বেশ স্যাকে কাগজ কিনছেন—এমনি ভাব করে ওদের মনে বিশ্বাস জন্মাবে। তার পর না করবার আমরা করব।

হাজরা বুঝে খেটে আপত্তি জানালে—মনে মনে লজ্জা হ'ল। অর্ধেক বাঘুর উপর ও মোটেই খুশি ছিল না। লোহা আর কাগজের বিরাট সত্তর আছে ওদের—অত কালো-বাকারের চেয়ে শক্তির জিনিস হাঙতেও পিছপা নয় ওরা। বলতে গেলে ওদের ভেতী কারবারের বা লেপে হাজরার স্যাকের লাভ গ্রা—আসলের কোঠার মেঝে। হাজরার উপর শুধু সরকারের কড়া মজর নাই—পাকার বেকার হেলেরাও বেশ উঠে পড়ে লেগেছে। না হলে এ বাজারে রাবব বোয়াল হওয়া তার পক্ষে আন্তর্ভোয় ছিল না। এখন বাজার শক্ত বহি বাবে মারে—কতি কি। শশী ত আর সত্যের বেসাতি করতে বসে দি—কারও বুঝে সত্যের কথা শুনে ওর মনে হয় বড়ই করছে লোকটা। শশী ক্রুদ্ধ হয়ে বলে,

যেখানে পাল পার্শ্বণ বার ব্রত কুঁহু-অত্যাগত দ্বা-অদ্বার
ঠেকিরে মাছকে মাছহাল হতে হচ্ছে প্রতিদিন সেখানে
লভ্য বলে কিছু থাকতে পারে? তেরশো পকাশে বারা লভ্য-
বাহী ছিল—ভারা না বেতে পেয়ে বর্ণে পেয়ে—আর তাবের
নুনের আর কালোর বেতে বারা রইল পুণিবীতে—ভারাই আজ
ফুলে কেঁপে হয়ে উঠেছে রাজ্য আদীর। ভারাই তো সত্যি-
কারের বড় মাছ।

অবস্ত্র মনের এ উদ্ভা প্রকাশ সে করলে না। তাকে
উন্নতিত বেধে প্রভাত বললে, দান, পরে এ বিষয়ে পরামর্শ
করব।

বাই কর বাবা—এই বুড়োকে আর ক্যাসাদের মধ্যে
কড়িত না। পোষিত হে—সবই তোমার ইচ্ছা।

হাঙ্করা চলে গেলে অমলেন্দু বললে, হাঙ্করাকে বিবাস
কর প্রভাত?

সম্পূর্ণ নয়।

তবে ঠুঁকে দিবে এ কাজ করাবে কেন?

না হলে আর পথ কি?

একটু তেবে বেধলে হতো না। হাঙ্করা যে স্ন্যাক-
মার্কেটের কথা বলছে—ওর বাধা না থাকলে—

প্রভাত অধীর হয়ে বললে, কিন্তু কবে আর কাজ করব
আমরা? দিনকের দিন কি অবস্থা হচ্ছে দেশের বেধে।
কালো বাজারী কাঁপছে—বীচু ভরের বারা ভারাত টিকে
থাকবে—কিন্তু আমরা ধাবিভরা এ ভাবে কতদিন বাঁচব
বলতে পার? ভারতবর্ষের বাণীমতা লাতে বাবের দান
ছিল সবচেয়ে দামী ভারাই এ ভাবে বুঝে বাবে বাণীম
ভারতবর্ষ থেকে।

অমলেন্দু বললে, দেশের দুর্নীতি তোমার আমার চেটার
কতটুকু হয় হবে। ধারা রাজ্যভার নিরেছেন হাতে ভারাই
পারছেন না।

প্রভাত বললে, বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে, পুণিবীতে যে
সহরে সবচেয়ে লভ্যের কাল তাই বাণীমতা পেয়ে অতিক্রম
করতে হচ্ছে। আজ যদি আমাদের ঘরে অরটাও থাকত।

অমলেন্দু বললে, এই অসবকনা হুটি করে তেরশো পকাশে
দেশের দুর্ভাগ্যকে নিজের প্রয়োজনে নিতে পেরেছিল
ইংরেজ। কংগ্রেস মিত্রশক্তির সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা
করলে—হুটিকের ভাঙনার দলে দলে মাছ এসে চুকল
সেদাভাষীমতে। এবারও যে সেই ব্যাপার আবার ঘটবে
না কে বলতে পারে।

কিন্তু হুহ আর শির বাধে না। প্রভাত আশ্বাস দিলে।

কে বললে—হুহের লাভ আমাদের মিটেছে? বারা হুহ
করে তাবের ইচ্ছা কতটুকু—বারা হুহ বাবার ভারাত কোম
দিন লাগবে আসে না।

কিন্তু তাবের চিনি আদর।

চিনি কিন্তু বরতে পারি না—খাতি বিতে পারি না।
আমরা বারা হুহের হাত ঘরে পথ চলছি ভারাত নির্দোষী
পালার বর্ণচোরাদের পক্ষ সমর্থন করছি।

এবার আর তুল করব না।

কেন করব না—একটুকু চালের ববলে—ক্যাসাদের
পালার যদি অলঙ্কোচে আসতে পারি—

কেন আসব?

তাই তো জানি তাই—অপচ বায়ে বায়ে এ তুল আমাদের
হবেই। তুল হয়—কেননা তুল ঠেকাবার সহজ পথ আমরা
যেহে নিই না।

কেন নিই না?

কাটিকে যে বিশ্বাস করতে পারি না।

কেন পারি না?

যাঁকে আপন ঘেমে মাধার তুললাহ—কিছু দিন পরে
বেধি মাধার উঠে সেই আমাদের দুর্ভাগ্য মধ্যে টানে। বলবে
কেন এমনটা হয়? হয় এইকত আমাদের শিকার পোতার
গলব রয়েছে—গলব রয়েছে চারদিকের আবহাওয়ার।
আমাদের মনে মনের মোহ যে পরিমাণে রয়েছে—অন-
কল্যাণের আদা তার শতাংশের এক অংশও নাই। তুমি
আমি আজ বনকে বলছি—পুণিবীর অকল্যাণ—কিন্তু তুমি
আমি যদি যৈবক্রমে লক্ষপতি হই অমনি মনে মনে স্বীকার
করব মনের চেয়ে কল্যাণকর কিছু অগতে নেই। জীবন
ধারণের বড় কিছু সুখ-বাহ্য্য সব অর্থে মেলে—আর ভাল
ভাবে বেঁচে থাকতে চাওরাটাই তো আমাদের সব কামনার
সেরা কামনা। আমরা বকিত বলছি হুহতো মনের দিন্দা করি।

প্রভাত স্বীকৃতি:বাস ফেলে বললে, জানি না তোমার
মনের এটা সত্যবৃষ্টি কি না—

অমলেন্দু হাসলে, তোমার আমার এবং আমাদের বড়
বড় বিভ-বকিত সাধারণ লোক প্রায় সকলকারই মনের এই
বৃষ্টি। আমরা বা পাই না ভারই ঘোষ ভীর্জন করি—পেলে
চূপ করে থাকি। বাইরের দুর্নীতিটা এত ব্যাপক এইকত—
মনের দুর্নীতি আমাদের হুহপনের।

প্রভাত বললে, তোমার কথা শুনে মনে হয়—আমাদের
উদ্ধারের আশা দুখি নেই।

অমলেন্দু হেসে বললে, মাঠে একেবারেই অভকারে
নেই আমরা—মাঝে মাঝে আলো অলহে বৈকি। তাই
তো আমরা বেঁচে রয়েছি এবং ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টাও
করছি। তবে এইটুকু আমার মনে হয়—যে আশাত আমরা
পাচ্ছি তা অগেষ্ট নয়। আরও কতক আশাত না এসে স্বীকৃতি
মানদণ্ড টিক পথে কিরবে না। ভিতর থেকে বাতে
বলতে পারি—সেই শিকা, সেই পথ নির্দেশ আজ আমাদের

অত্যন্ত প্রয়োজন। চল না এক দিন অর্ধেকঘণ্টার কাছে গিয়ে সমিতির উদ্দেশ্য জানাই।

সর্বমুখ—বল কি? প্রত্যন্ত চমকবার তান করে হেসে উঠল, অর্থাৎ বাবের সামনে গিয়ে বলব...বাব মশাই, আপনি আর মিথিহ মেব শাবককে ঘেরে উত্তর পুষ্টি করবেন না—তুণ তোজনে অত্যন্ত হোম।

অমলেন্দু হেসে বললে, উপমা তোমার হুট হ'ল। মাহুয কিছু হিংস্র বাব নয় আর তাকে তুণ তোজনে অহুরোষ জানানোও বিজ্ঞপ হাড়া কিছু নয়।

তা হলে—

আমরা বলব—মাহুযের ব্যক্তিগত সুখ-খাঙ্কনের জন্ত বতটুকু সত্তর আবক্তক তা আপনার আছে—এইবার আপনি—কালোবাজারী পরিভ্যাগ করুন। না অমলেন্দু, এভাবে নাটক হবে—দর্শকের হাততালি মেলে—কিন্তু যে মাহুয দর্শক এবং মাহুয তাকে তোলানো যায় না। বন তুলা আর জলতুলা সমান জিনিস নয়।

তা হলে হাজরার পরণাপর হবেই?

এক মুহূর্ত চুপ করে প্রত্যন্ত কি ভাবলে। বললে, আচ্ছা তেবে দেখি—কি পথ মিলে সুবিধা হয়। ভাল কথা শশাককে দেখছি না করেক দিন পরে?

আর দেখবেও না? অমলেন্দু হাসল।

হামে?

মাহুযারির প্রথমেই সে দিল্লী পেছে—একটা ইন্টারভিউ দিতে।

চাকরির জন্ত?

ভূমি ভাব কি—আমরা সবাই ঘেন্নের সেবা করব—চাকরি করব না?

কিন্তু—

প্রত্যন্ত—চাকরি মিলে বে ঘেন্নের সেবা করা চলে না এ ব্যরণা তোমার তুল।

হবে। আমার একটা উপমা মনে পড়ল। আমার ছুর সম্পর্কের এক পিসিমা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কোন সিদ্ধাবার কাছে তিনি নাকি নয় নিয়েছিলেন। দিলে লক নাম জপ ছিল সে মন্ডের বিধি। পিসিমা ভাই করতেন—কিন্তু সংসারের বাবতীর কাজ—রায়া, বাসন মাঝা, জল তোলা, গর বসতা, হাসি, ঠাটা সবই তাঁর চলত সেই সঙ্গে। তিরিশ বছর পরে পিসিমা মর নিয়েছিলেন আর তিরিশ বছর একটানা তিনি এই সব করেছেন—ছুরি হিসাব করে বল তো আমার, সিঁড়ির পথে কতখানি এসিয়েছিলেন তিনি?

অমলেন্দু বললে, সংসারে থেকে ইঁদুরকে পাওয়ার দৃষ্টান্ত যে নাই—

সে সব অসাধারণদের কথা। আমরা কাদার তৈরি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—আমাদের ভ্যাগের সঙ্গে তোপের মিশেলে ভেদের সঙ্গে জলের মতই অবস্থা ঠিকার। তেল তেলে বেতার ওপরে—

অমলেন্দু বললে, অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমার সন্দেশ তুলন করতে পারি।

আজ থাক। চলতে চলতে ও সুখ কিরিয়ে বললে, কি জানি অমল—আমার কেবলই ভয় হচ্ছে—শেষ পর্যন্ত এই সব নিয়ে তোমার সঙ্গেও আর তর্ক করতে হবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই পথ আলাদা।

কিন্তু সব পথেই কি দিল্লী পৌঁছান যায় না? উঠে:বরে হেসে উঠলে অমলেন্দু।

২৭

মা শুকনো সুখে ঠাঁড়ির ছিলেন মরজার। বললেন, কখন থেকে তোর আশার ঠাঁড়িরে আছি বাবা—শুগ্লির ডাক্তার-বাড়ী বা। ঠাঁড় কলিকের ব্যাঘাটা আবার বেড়েছে।

সারা রাতই ছুটাছুটি চলল। ইন্ডেক্সন—সেক—গরম জল। এ সবের সঙ্গে অর্ধও ব্যার হ'ল যথেষ্ট। মা তাঁর হাতের চুড়ী বুলে দিলেন। বললেন, যে ছুটিতে ভর করে আছি—তা আগে রকে হোক—মুহিন আসে আবার সব হবে।

তোর বেলার যোগী একটু সুখ হয়ে ঢোক বুললে। প্রত্যন্তও বিছানায় শুয়ে পড়ল। অসীম ক্লান্তি মেছে—ভরু হুদ আসছে না। ক্লান্তির চেয়ে তীব্রতর কত চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মা বা বলেছেন—সেই তৎকালিক মুহিন আসবে কি? মধ্যাহ্ন পরে কবে আসে মুহিন—এলেও তার আত্ম কতই বা দীর্ঘ। একটা মাহুযের উপার্জনের হারার অনেকগুলি প্রাণী আশ্রিত। সে প্রাণীগুলিকে সংসারে আনলে কে?...সারহীন জমিতে রিজ বাহ্য গাছও কীণ শাখা—প্রশাখা হাজার—তার রুর শাখার কোটে বতাব-কুজ ফুল—আর তাতে কলে অপরিপুষ্ট কল। সবচেয়ে আশ্চর্য্য সেই অপুষ্ট কলেও থাকে অসংখ্য বীজ আর সে বীজের গর্ভে থাকে অছুর। সব ক'টি তার অছুরিত না হলেও গাছের বৃত্তিকা—রসে ভাগ বলার তার। তার পর তাদের মধ্যে চলে আলো ও রস আহরণের প্রতিবোধিতা। বা: রে—সংসার। খুঁটি-লীলার এই ব্যাঘা না চললে কি খুঁটি লোপের আশঙ্কা বেড়ে ওঠে। এই হুঃখ-বৈষম্য—মোগ-বৃত্তা—এরা জীবনের পাশে পাশে চলে কোন্ মহাজীবনের বার্তা বিবোধিত করে। এদের ব্যাঘা জর করতে পারে না—তাদের জীবনের মহিমাই বা কি। হুঃখের মহিমা। এমনি লক কোটি সংসার নিয়ে ঘেপ—আমাদের বাবীন তারতবর্ষ। হুঃখ-বৈষম্য—অভাব—বৃত্তা—অব হতে বৃত্তা পর্যন্ত একটানা অবিরাম রেশবহনের ইতিহাস,

এই ঘটনা কোন মুহূর্তে আরম্ভ করেছি—শেষ করব কোন কোন মুহূর্তে—কেউ জানে না। এই আশাবাদী বলেন এই নাম মুহূর্ত—জীবনমুহূর্ত। হুঃখ-উত্তরগণের চেষ্ঠা—ও নাকি ভয়পত বৃষ্টি। এতেই জীবনের স্বাদ, শোভা, হরকো বৈচিত্র্য।

বাবার ভালমন্দ কিছু হলে—এত সব চিন্তাও আর থাকবে না। যখন দুনি বড় টুটে—কুটীরে বসে কুটীরবাসী বলে—বড় ধান্ডাও ভগবান—বাঁচাও। বড় বেমে যখন খুলল বায়ে বৃষ্টি নামে ভয়মত তার প্রাণনা চলে—বৃষ্টি বন্ধ কর প্রহু—বাঁচাও। বৃষ্টির পর যদি প্রবল শীত আসে তা থেকে পরিজ্ঞান পাবার প্রাণনা ঐ একই সুরে চলে—আর প্রবল হৌন্দের তাপে অর্জিত হয়েও সে সুর থাকে অব্যাহত। একটা-না-একটা অতাব আর তা থেকে পরিজ্ঞানের বড় পরিজ্ঞাহির বহু—এই চলছে সংসারে। তবু সংসারের মত স্মরণ নাকি কিছু মাই—সংসার থেকে বাবার কল্পনার মাহুৎ কাঁদে। মাহুৎ বলে, মরিখে চাহি না আমি স্মরণ ছবনে। ছুবন স্মরণই বটে!

দাফা।

কি রে? লক্ষীর ডাকে প্রভাত বাতবে মেমে এল। লক্ষী লক্ষীও কি অদ্ভুত তাবে বদলে গেছে। ওর সদাশ্রুত মুখে হুচ্চিভার বন হারা, বেশবাসও কেমন মলিন। যে বিপংপাতের ভরে মাহুৎ সর্বকণ সচকিত হয়ে থাকে—তাই বুঝি ওর চিন্তার চেপে বসেছে।

লক্ষী হুঁহাতের আঙ্গুল দিয়ে ঝাঁচলের প্রান্তে সিঁট ঝাঁচতে লাগল। বললে, একটা কথা যদি রাখ—

কি কথা রে—অত ভরই বা তোর কেন। প্রভাত ঈহৎ হেসে ওর হুচ্চিভা ছুর করতে চাইলে।

ভর করি সাধে—তোমাদের ছেদের তো অত নেই। একটু চুপ করে থেকে বললে, লক্ষীর বলছিল—ওদের ঘোট ছোট হেলেনেরদের পাতাতে পারে এমন একজন আর লেগাপড়া জানা মেয়ে যদি সন্ধ্যা থাকে—

ওঃ এই কথা। তা মেয়ের অতাব কি? বলিল তো কালই ব্যবস্থা করে দিই।

না—তোমাকে আর অত উপকার করতে হবে না। একটা টোক গিলে বললে, আচ্ছা আমিও তো ছোটদের পাতাতে পারি—হুপে বেলা খালি দুমিরে তো কাটাই।

কথাটা বলে আড়চোখে সে প্রভাতের মুখতাব দেখতে লাগল। কিন্তু তার সন্দেহ সত্য হ'ল না। তার প্রভাবে প্রভাতের মুখ গভীর হ'ল না—খানিকটা বিষম আর প্রশংসার আভাসে তা অদ্ভুত দেখাতে লাগল। প্রভাত বললে, তুইও তা হলে সংসারের কথা ভাবিস লক্ষী। একটা ছোট দিবাণ টেনে নিয়ে বললে, কেবল আমিই ভাবি না।

না দাফা, তুমিও তো বণেট ভাব—না হলে পাঁচটার পর মাহোরাভীর কার্বে—

ওরে, সে হ'ল মাদ-বাঁচানো চাকরি। কিন্তু তা করলে চলবে না। পাকা চাকরি আমার নিতেই হবে—

কাজ কি—আর কিছু পড় না।

প্রভাত হাসলে, অর্থাৎ চিরকাল ধোকাই থাকবে—দেব না। বাবার অনুরোধে মা গহনা খুলে দিলেন—যে আসবাবপত্র মাই—পোষ্টাগিসে একটা সেভিংস ব্যাঙ্কের দপর্ধ্যন্ত দেই আর অত অন্ততঃ পাঁচটা টাকা।

তুমি চাকরি করলেই—আমাদের টাকা কমবে।

সেই বদল দেখিস বুঝি লক্ষী?

কেন দেখব না—সবাই দেখে আর আমি দেখলেই ঘোষ টিক কথা! বদল দেখে না কোন মাহুৎ? কল্পনাট ভাঙে প্রাণের রসে উচ্ছল করে তোলে। পৃথিবী পৃথাক্ত হয়ে চির সূতম আর ভিত্ত হয়েও বর্ণময়ী এ শুধু কল্পনারই প্রসাদে আমার কিছু নেই—জটপাকানো বর্ডমান আর দুখ বাসুদ্যাগি বিভিন্ন ভবিষ্যৎ—এটা কণ-প্রভাতি মা হলে জীবনকে বহু বেড়ানো হুঃসাধ্য ততো না কি? এই কল্পনার ছের—এ অগং হাতিরেও টেনে চলতে হয়—এক ভয় থেকে বহু ভয়ে অহুভি একটা সীমাহীন সমুদ্রের মত জীবনের কল্পনা কম আর যত্নার মাঝবাদের অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সতে সংগ্রাম—এই তো চলছে মুগে মুগে।

প্রভাত বললে, ইচ্ছে হলে কাজটা নিতে পারিস—আমি বলি থাকব না। একটা কিছু করতেই হবে আমাকে কয়েক মুর্ত্ত চুপ করে সে বললে, আচ্ছা লক্ষী—বর আমি যদি কোন কাজ নিয়ে হয়ে চলে যাই তোমাদের অনুরোধ হবে না?

বাঃ রে, কত লোকই তো চাকরি নিয়ে কত হয়ে যায়—

টিক বলেছিল। আচ্ছা লক্ষী, আর একটা কথা বর কেউ আমাকে অনেক অনেক টাকা নিয়ে বললে, তুমি আজ থেকে আমাদের হলে—তা হলে কেমন হয়?

সে তো কিনে নেওরা। মাহুৎকে অমনি করে কেউ কেউ নাকি? আজও কি পৃথিবীতে মাহুৎ কেনা-বেচা চলে।

চলে বৈকি। প্রভাত মুখ টিপে হাসলে। তবে সেরে মাসক প্রধার মত ভরকর কিছু নয়। সে প্রধাট বর্ণে লাগিল—কেমন জামিন? যেমন বর একটা লোহার পেটে মাহুৎ হুই কুলের ঝাঁক। বাইরে থেকে যে কেউ দেখবে—বলবে—চমৎকার। লোকে কুল গাছের সবুজ জী বা কুলে লাগা রঙ দেখে—তার ভলার লোহার কথা ভাবে না।

লক্ষী হেসে বললে, এই নিয়ে একটা পল্ল লিখবে বুঝি?

ভাবছি লিখব। ভাল হবে পল্লটা, নয়?

প্রভাতের মুখে মুহূর্ত্ত হাসি দেখে লক্ষীর সন্দেহ হ'ল—এই পরিহাল ছাড়া আর কিছু নয়। তার বৃষ্টি নিয়ে—হেলেনে মাহুৎ নিয়ে প্রভাত প্রারই পরিহাল করে। ওই বদলের হাি

কিন্তু লক্ষীর ভাল লাগে—বহিঃ কল্পিত জোরে ও প্রাণপণে প্রতিবাদ করে যায়। আজ কিন্তু ও রাগলে না—হাসিরূপে বললে, গল্পটা কিন্তু আমাকে শোনালে হবে না—সাহিত্য-লতার পক্ষে হবে।

সাহিত্যরসিকরা কিন্তু বুধ খোলে না—লক্ষী।

ইস—তাইতে বুঝি তোমার হুঃখ? তা তর মেই, এবার সে হুঃখ মোচন হবে। বলে ও দ্রুত বিজ্ঞান হ'ল বর থেকে। অনতিবিলম্বে কিরে এল হাতে একটি নীল লেকাপা দিয়ে। সেটা প্রত্যন্তের কোলের উপর কেসে দিয়ে বললে, পড়।

আশ্চর্য—সিপ্রাই লিখেছে চিঠি। অপ্রত্যাশিত 'বন্ধ'। ওই যেহেতুকে না দেখে ওর মনে যে ছবিটা উদ্ভল হয়ে আছে, সেটা আলমপরাণা সজ্জাসরীর বন্দী হুলালীর ছবি। নেই জড় ছবি যে কথা বলতে পারে...

প্রত্যন্ত তাকাতাকি পড়লে :

তাই লক্ষী—আমার একটি অহুরোধ। তোমার দাবাকে বলবে—বন্দরবার ঘেন বাবার কথা না শোনেন। আজকাল রক্তহীন রোগীকে রক্ত দিয়ে বাঁচান হচ্ছে—কিন্তু যে রোগী সত্যিই বাঁচবে না—তাকে রক্ত দান করাটা নির্বুদ্ধিতা নয় কি? এ রূপে কমিলারী রক্তা করা বাবে না—তোমার দাবার উৎসাহ বুদ্ধি পরিভ্রম কোন কিছু দিয়েও নয়। সুতরাং এ হুস্তেটা ঘেন তিনি না করেন। যদি করেন—নিকোই ডুববেন।

ইতি

তোমার সিপ্রাই

আশ্চর্য—সজ্জাসরীর জড়বৎ যেহেতুও কথা কইতে জানে। চিঠির নামাক কবুট হজের মধ্য দিয়ে সে ঘেন অসামান্য হয়ে উঠল। সজ্জাসরীরকে বার্তা মনে করে ভাষ্য পাঠনা—কিংবা পূর্বকথের সুকৃতির কলে বর্তমান জ্বের ভোগপ্রাপ্তি—এই যেহেতু অজ্ঞতঃ তাদের পোজের নয়। এ ঘেরে পৃথিবীর বুক কালের পরজন্মি তবোহে—আর শ্রোতের গতি কোন দিকে তাও ওর অজানা নয়। প্রাণীদের ক্রুদ্ধ বাতায়ন বুলে এ শুধু নীল আকাশের সৌন্দর্য্য দেখেই বুদ্ধ হয় নি—রক্ত মাটির অসমতল উদ্ভত ভদ্রিতে যে ইকিত মিহিত তার মর্দাধ উপলব্ধি করতে পারে। সিপ্রা আর বাই হোক—হুলালী নয়—প্রাণময়ী একটি ঘের। সাধারণ ঘেরেরা যে ঘরে কথা বলে—যে চিত্তাকাল আপন মনে বোনে—এবং যে সব লম্বা আপন বুদ্ধি দিয়ে লম্বাঘান করবার চেষ্টা করে—সিপ্রা তেমনই ঘের। ওকে জীবনের পথে সঙ্গী পেলে—জীবন হয়ত তারপ্রভ হবে না।

আপন মনে হেসে উঠল প্রত্যন্ত। ঘেন এই বুদ্ধিতে সিপ্রাকে লাভ করবার সব আরোহণই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ঘেন চাকরি দেওয়ার লগে সিপ্রাকে দেওয়াও অত্যন্ত লম্বা।

হাসলে যে? লক্ষী ক্রিডালা করলে।

এমনি। আচ্ছা লক্ষী, তুই বিশ্বাস করিস্ কমিলারী—প্রাণ থাকবে না?

বাঃ রে—আমি কামব কি করে?

তবে তোকেই বা ওকথা জানালে কেন?

লক্ষী হেসে বললে, আমার জবাবিতে জানিয়েছেন তোমাকে।

তুই কিছুই জানিস না তা হলে? প্রত্যন্ত ওর পানে আভ চোখে চেয়ে হাসলে। আচ্ছা—আর একটা কথার উত্তর দে ত। এই বনভ্রম মানে—পাঁচ জনকে ঘেরে একজনের বড় হওয়ার দিন অনেক কারাগারেই শেষ হয়ে আসছে নাকি?

কেন? বিভিন্ন কঠে লক্ষী বললে, তোমার হাতের পাঁচটা আঙুল সমান? না, তোমার বুদ্ধির সঙ্গে আমার বুদ্ধির তুলনা চলে? পৃথিবীতে যার যেমন বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি সে সেই মত কলই ত পার—পারের জোরে এক করে দিলেই সব কিছু এক হয় না।

কিন্তু হচ্ছেও ত। পৃথিবীতে এমন দেশ আছে—

লক্ষী হেসে বললে, না পো মশাই না। ওই পারের জোরে বলছি এক—কিন্তু এক কথনও হতে পারে। একই বহি হ'ল ত আলাদা আলাদা কিনিম ভৈরী হওয়ার মানেটা কি?

এর উত্তরে অনেক কথা বলা যায়। বুদ্ধি ভর্তু প্রাণ দিয়ে বোঝান যায়—প্রকৃতিতে যেটুকু প্রভেদ তা মাহুঘের চেষ্টার অজ্ঞান্যে হয় কথা সম্ভব। এই প্রভেদে শক্তিকে মাহুঘ এমন পর্যায়ের এনেছে—যাতে কল্যাণ অংশ নাই বললেই চলে। বুদ্ধির বলে মাহুঘ উপার্জন করছে—আবার সঞ্চয়ও করছে—আবার প্রকৃত্ব করছে। প্রকৃত্ব অহংকার বাতায়। সে-ও তত হারাত্তক নয়—যত সর্জনশ মাহুঘের প্রতি মাহুঘের ভালবাসাকে তুলে বাতায়। অর্থাৎ হৌপের কটিন বস্ত্র মনের কোমল বুদ্ধির উপর বতাই চেপে বলে মন ততই বেদনদী হয়—মিঠুর হয়। সর্জনশের বীজ এই সকলকে ঘেরে মিছে ওপরে ওঠার মেশার মতোই থাকে। শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা এই সর্জনশকে ঠেকাবার জড়ই কি নয়? কিন্তু লক্ষী তর্কের পাঞ্জী নয়। ওর সহজাত বুদ্ধিরও একটা দিক আছে যা হিন্দু-বর্ধের মূলগত ভয়ের ব্যাপার। এক বিরাট মহান পুরুষের ইচ্ছার বিধৃত রয়েছে এই জগৎ—তার ইচ্ছাতেই লীলার বিকাশ—আর লীলার বৈচিত্র্য সম্প্রায়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন বুদ্ধিমতীর অসংখ্য কুশীলব অগামজ্ঞময় জ্ঞান কর্তৃ প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এসব না থাকলে জগৎ থাকার সার্বকতাই বা কি থাকত। সহজে বহি চেষ্টা না ওঠে—কিনের শোভা।

না...কর্ণহীন জীবনের সবই বিবাদ লাগে। বিবাদ শহরের এই একঘেরে জীবন। উন্নত হতে অত এবং অতের পর নিজার পূর্বকণ পর্যন্ত চারিহিকে একই বৃত্ত—সর্জন

একই চিন্তা আনন্দ বা দুঃখ নিয়ে কালযাপন। একটু দিনের পর আর একটু দিন আসে সাহাতই প্রভেদ নিয়ে—কিন্তু পর পর করেকটি দিনকে পাশাপাশি রাখলেই বৈচিত্র্যের বর্ণ বা বাদ কোথায়। এ থেকে অন্ততঃ মুক্তি চাই। এই গলি থেকে, বাতী থেকে, নিত্য প্রয়োজনের সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে সে অপরিচিত পরিমণ্ডলে—যেখানে নুতন মাহুয়ের ডিকে নুতন জীবন স্পন্দিত হবে...নুতন সৃষ্টিতে যন হয়ে উঠবে

আকাশের নীল—আর সম্পূর্ণ নুতন পরিবেশ—নুতন সৃষ্টি-তরঙ্গের ধারণে প্রতিফলিত করাবে...যম নৃত্যের শ্রোতবাহিত এক অপূর্ণ-বর্ণন বস্তুকে বা অগ্নির মত নিত্যদৃষ্ট হয়েও নিভা ক্রিষ্ট নয়।

প্রত্যন্ত জিলোচন সেমের প্রত্যাবর্তি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখবে স্থির করলে।

কমলঃ

পাশ্চাত্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিচার

অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য

জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে উপনীত হয় নাই, বাস্তব সমস্তার সমুখীন হইয়া মাহুয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতি হুঁয়োগমণী। হুঁয়োগে বিপন্ন মাহুয় অপরের সাহায্যপ্রার্থনা করে। কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন মাহুয়ের সাহায্য অতি মগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন কোন অনন্ত শক্তি-শালী পুরুষের সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া মাহুয় থাকিতে পারে না। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ—ভূকম্পন, বজ্রবাত্যা, বত্ৰ প্রভৃতি—মাহুয়ের মনে মাহুয়ের শক্তির ক্ষুদ্রতা উপলব্ধ করাইয়া অনন্তশক্তিশালী কোন বিরাট পুরুষের কল্পনা জাগাইয়া দেয়। মাহুয়ের কল্পনাপ্রবণ মন প্রথমে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের পশ্চাতে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করে। ক্রমে চিন্তাবারার বিকাশের ফলে মাহুয় বুঝিতে পারে প্রকৃতির বিভিন্নতার পশ্চাতে ঐক্য, একরূপতা বর্তমান। এই উপলব্ধির পর বহু ঈশ্বরবাদ বীরে বীরে একেশ্বরবাদে পরিণত হয়—প্রকৃতির পরিচালক ও নিয়ন্তা রূপে মাহুয় একজন সর্বশক্তিশালী পুরুষের কথা ভাবে এবং বিপদে তাঁহার ধ্যান করিয়া শক্তি প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এই ভাবে সৃষ্ট হইলেও মুক্তিকর্ক দ্বারা মাহুয় সেই বিশ্বাসকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করে। এই বিশ্বাস যে অর্ধহীন মিথ্যা বিশ্বাস নহে, ইহা যে যথার্থ বিশ্বাস, প্রকৃতই যে ঈশ্বর বিদ্যমান ইহা প্রমাণ-উদ্দেশ্যে যে সকল মুক্তি উপস্থাপিত করা হয় আমরা তদ্ব্যয়ে প্রথম প্রথম মুক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

তাবতাত্ত্বিক মুক্তি :—এন্সেলম নামক জর্মন কনফেশ্যনাল বর্ণবাদক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ-উদ্দেশ্যে যে মুক্তি উপস্থাপিত করেন তাহা তাবতাত্ত্বিক মুক্তি (Ontological argument) নামে পরিচিত। ইনি বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এই কথা একমাত্র সূর্য্যরশ্মি বলিতে পারে এবং এই কথা দ্বারা সূর্য্যরশ্মি শুধু নিজেকে 'সূর্য্যমিত্র'ই পরিচর দেয়। ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি

এমন একটি 'মহত্তম সত্তা' বাহা হইতে আর কিছু মহত্তর আছে বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। এই মহত্তম সত্তার অস্তিত্ব যদি বাস্তব না হইয়া শুধু কাল্পনিক হয় তবে সেই সত্তাকে মহত্তম বলা অর্ধহীন। যে সত্তা কাল্পনিক ও বাস্তব এই উভয় জগতে বিদ্যমান সেই সত্তাই প্রকৃত মহত্তম। সুতরাং ঈশ্বরের ভাব বা ধারণা হইতেই তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এন্সেলম-এর এই তাবতাত্ত্বিক মুক্তিটি আধুনিক যুগের কনাসী দার্শনিক ডেকার্ট একটু পরিমার্জিত রূপে উপস্থাপিত করেন। আমরা প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অপূর্ণ সত্তারূপে অনুভব করি, কারণ আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমরা যাহা ইচ্ছা করি কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারি না। আমাদের মনে 'পূর্ণ সত্তা'র ধারণা বিদ্যমান না থাকিলে 'অপূর্ণসত্তা' এই ধারণাটি অসঙ্গত হইতে পারিত না। আমরা যে অপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারি যে-হেতু আমাদের মনে পূর্ণত্বের ধারণা বিদ্যমান। এই পূর্ণ সত্তার ধারণা হইতেই প্রমাণ হয় সেই সত্তা অস্তিত্ববান, কারণ অস্তিত্ব-হীন সত্তা পূর্ণ সত্তা হইতে পারে না। যে সকল গুণ দ্বারা পূর্ণ সত্তার পূর্ণত্ব, অস্তিত্ব তাহার মধ্যে অন্ততম। সুতরাং পূর্ণ সত্তাকে অস্তিত্বহীন কল্পনা করা বহির্বোধী। ডেকার্ট-এর মতে এই পূর্ণ সত্তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্ববান।

এই মুক্তির বিরুদ্ধে আর্থান দার্শনিক ইম্যাচুয়েল কাণ্ট যে আপত্তি উপস্থাপন করেন তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাণ্ট বলেন, তাবলোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে বাস্তবলোকে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান ভাঙ্গনশস্ত নহে। আমি ঈশ্বর নামক একটি পূর্ণ সত্তার ভাবনা করিতে পারি বটে এবং যখন সেই পূর্ণ সত্তার ভাবনা করি তখন তাহাকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়াই ভাবনা করি, কারণ অস্তিত্বকে পূর্ণত্বের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে বাস্তবক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। যখন আমি একটি জিন্তুকের ভাবনা করি তখন জিন্তুকের ভিতরটা কোণ একজো ছই সমকোণের সমান

বলিয়া তাবিতে বাধ্য হই। কিন্তু এই তাবনা হইতে তাবনা-বহির্ভূত বাস্তব জগতে ত্রিভূজ মাধক কোন সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, কারণ ত্র্যামিতি-পরিকল্পিত ত্রিভূজের অস্তিত্ব শুধু তাবনার জগতেই, বাস্তব জগতে নহে। কার্ট-এর মতে তাবতাত্ত্বিক হুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, তাবজগতের বহির্ভূত বাস্তব জগতে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব আছে। অবশ্য আমি যখন ঈশ্বরের কণা না তাবি ভবন আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না। তাবজগৎ হইতে বাস্তবলোকে অসুমান সত্য হইলে আমার কামার পকেটে এক শত মুদ্রা আছে এই তাবনা হইতে বাস্তব এক শত মুদ্রা পকেটে প্রবেশ করিত। যেহেতু এক শত মুদ্রার তাবনা হইতে বাস্তব এক শত মুদ্রা উপস্থিত হয় না, সেইজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের তাবনা হইতে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।

কার্ট-এর পরবর্তী জার্মান দার্শনিক হেগেল তাবতাত্ত্বিক হুক্তিতিকে এত সহজে খণ্ডনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। হেগেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তুজগৎ এবং তাব-জগতের মধ্যে মূলতঃ কোন অসঙ্গতীয় পার্থক্য নাই, কারণ উভয় জগৎ মূলে একই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। সুতরাং বাহ্য তাবজগতে অবশ্যবীকার্য্য তাহা বস্তুজগতেও অবশ্য অস্তিত্ববান বলিয়া বীকার করিতে হইবে। বিশ্বের পরমসত্তা ঈশ্বর তাবজগতে অবশ্যবীকার্য্য হওয়ার বস্তুজগতে তাহার অস্তিত্বের অসুমান অসম্ভব নহে। হেগেলের হুক্তির বাধ্যতা তাববাদী দার্শনিকেরা বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা বীকার করেন না। বস্তুবাদীরা তাবজগৎ ও বস্তুজগতের মূলে কোন বিশ্বচেতনার বীকৃতি দ্বারা এই উভয় জগতের পার্থক্য অভিক্রম করিতে রাজী নহেন। সুতরাং তাবতাত্ত্বিক হুক্তির বাধ্যতা সর্ববাদিসম্মত নহে। কিন্তু হুক্তিটির গুরুত্ব প্রত্যেক দার্শনিকই বীকার করেন। পূর্ণত্বের যে আদর্শকে আমাদের মন উপলব্ধি করে তাহা শুধু আমাদের রাসনিক কল্পনা নহে, প্রকৃতই সেই আদর্শরূপ পূর্ণ সত্তা ঈশ্বর নতিদ্ববান—আমাদের মনের অন্তস্তলের এই দাবিটি তাবতাত্ত্বিক হুক্তিতে প্রকাশিত। পূর্ণত্বের আদর্শ আমাদের অপূর্ণ স্বভাব হইতে সঙ্গাত হইতে পারে না, এই আদর্শ একমাত্র পূর্ণরূপ ঈশ্বরই আমাদের মনে সঙ্গাত করিতে পারেন। আমরা অপূর্ণ-স্বভাব হইয়াও পূর্ণত্বের আদর্শ বা ধারণা সৃষ্টি করিতে পারি—এইরূপ যদি কেহ দাবি করে তবে উত্তরে বলিতে হয়, অপূর্ণ স্বভাব যদি পূর্ণত্বের আদর্শের স্রষ্টা হয় তবে অপূর্ণ ক্রারণকে পূর্ণ কার্য্যের স্রষ্টারূপে গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু ইহা অসম্ভব। সুতরাং ডেকার্ট মনে করেন যে, পূর্ণত্বের ধারণার নতিদ্ব হইতেই সেই ধারণার স্রষ্টারূপে ঈশ্বর বীকার্য্য। বাহ্য হুক্তি, মনোহাতীত প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে তাব-

তাত্ত্বিক হুক্তি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই হুক্তিটি এই সত্যকে সমর্থন করে যে, আমাদের মনের অন্তস্তলে বিদ্যমান ঈশ্বরের ধারণাটি অর্থহীন নহে, ইহা স্বাধাৰ্য্য।

কারণিক হুক্তি :—এই বিবেচনা দ্বারা কিছু ঘটতে তাহারই একটি কারণ বর্তমান, এমন কিছু এই বিবেচনা ঘটতে পারে না যাহার কোন কারণ নাই। জগতের প্রতিটি ঘটনা কার্য্যাকারণ-বন্ধে আবদ্ধ। ইহাই জগতের নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারেই আমাদের তাবিতে হয়, এই জগতেরও একটি কারণ বিদ্যমান এবং সেই কারণই ঈশ্বর। তাহা বীকার না করিলে জগতকে কারণহীন তাবিতে হয়, কিন্তু কারণহীন কিছুই থাকিতে বা ঘটতে পারে না। কারণিক হুক্তিটিকে (causal argument) নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা হয় :—

প্রত্যেকটি ঘটনাই কারণ দ্বারা সৃষ্ট;

এই জগৎ একটি ঘটনা;

সুতরাং এই জগৎ একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট।

এই হুক্তির প্রধান প্রতিজ্ঞাটি বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেকটি ঘটনাই একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট ইহা বীকার না করিলে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। কিন্তু ‘এই জগৎ একটি ঘটনা’ এই অপ্রমাণি প্রতিজ্ঞাটির বাধ্যতা বীকৃতি লইয়া শুরু উঠে। ঘটনা বলিলে এমন একটি ব্যাপার বুঝায় যাহার আদি ও অন্ত বিদ্যমান। কিন্তু জগৎকে আদি-ও-অন্তহীন একটি ব্যাপার বলিতে কেহ কেহ রাজী নহেন। এই জগৎ একটি আদিহীন অন্তহীন ব্যাপারও হইতে পারে—কে জানে। অজবাবীরা অজকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করায় অজজগৎ তাহাদের নিকট অনাদি ও অনন্ত। কারণিক হুক্তিটির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি উঠে কারণ শব্দের অর্থ লইয়া। হুক্তিটির প্রধান প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তে কারণ শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রধান প্রতিজ্ঞাতে যখন বলা হইয়াছে প্রত্যেকটি ঘটনাই কারণ দ্বারা সৃষ্ট, কারণ শব্দটিকে তখন সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে—অর্থাৎ কারণ শব্দটি দ্বারা এমন একটি ব্যাপার বুঝান হইতেছে যাহা অপর একটি কারণ দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু সিদ্ধান্তে কারণ শব্দটি মূল কারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যে কারণ অপর কোন কারণ দ্বারা সৃষ্ট নহে। সুতরাং কারণিক হুক্তিটি ঘাৰ্ণকতাদোষে হুই। আরও একটি আপত্তি উঠে। সেটি এই যে, এই জগতের একটি মূল কারণ আছে বীকার করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। জগতের একটি মূল কারণ আছে সত্য, কিন্তু সেই কারণ অজ ত্রি অত কিছু তাহা অসুমান করিবার কি হেতু থাকিতে পারে। অজবাদীরা জগতের মূল কারণকে ঈশ্বররূপে বীকার না করিয়া অজরূপে চিন্তা করেন। সুতরাং কারণিক হুক্তিদ্বারা জগতের মূল কারণ যে ঈশ্বর তাহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই হুক্তিটির কোন গুরুত্ব নাই একথা বলা যায় না। ইংরেজ দার্শনিক জন লক, জার্মান দার্শনিক

ইম্যাহুয়েল কাণ্ট প্রমুখ মনীষীরা এই হুক্তিটির প্রশংসা করিয়াছেন। কাণ্ট বলেন, এই হুক্তিটি সাধারণ-বুদ্ধি ও বস্তু-বুদ্ধি এই উত্তর ভরের লোকের নিকট সমভাবে শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত। জন লক বলেন, জগতের মূল কারণরূপে এমন একটা কিছুকে স্বীকার করিতেই হইবে যাহা অনাদিকাল হইতেই বর্তমান। কিন্তু অনাদি কাল হইতে বর্তমান ‘একটা কিছু’কে স্বীকার করিলেও সেই বস্তুই যে ঈশ্বর তাহার কি প্রমাণ আছে? সেই বস্তুকে অল্প রূপে না ভাবিয়া ঈশ্বররূপে গ্রহণ করা নিছক কল্পনাও ত হইতে পারে।

সম্প্রতি ডঃ রায়শ্য্যাল নামক কঠিন দার্শনিক কারণিক হুক্তিটিকে ভাববাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত করিয়া ঈশ্বরাত্তিষের প্রমাণ রূপে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, এই জগৎ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বে হইতেই বিস্তারিত এবং যেহেতু ভাববাদ প্রমাণ করিয়াছে যে, কোন কিছুকে বিস্তারিত থাকিতে হইলে চেতনার বিষয়রূপে বিস্তারিত থাকিতে হইবে, সেই হেতু আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের চেতনার অতিরিক্ত একটা বিরাট চেতনা বিস্তারিত বাহ্যর বিষয়রূপে এই জগৎ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বে তইতেই অস্তিত্বসম্পন্ন ছিল। সেই বিরাট চেতনাই ঈশ্বর। সুতরাং নিত্যা অনাদি চেতনারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলে মানুষের চেতনার বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ডঃ রায়শ্য্যাল-এর হুক্তির বাধ্যবাধীতা স্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা এই হুক্তিকে মর্ধ্যাক্ষা দিতে রাজী নহেন। কারণ তাঁহারা একথা স্বীকার করেন না যে, কোন কিছুকে বিস্তারিত থাকিতে হইলে চেতনার বিষয়রূপেই বিস্তারিত থাকিতে হইবে। সুতরাং এই হুক্তিটির বাধ্যবাধীতা সর্বস্বাবিসম্মত নহে।

কারণিক হুক্তিটির আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ রূপে বিচার করিতে গেলে হুক্তিটি ব্যর্থ, কারণ ইহা দ্বারা শুধু একটা অনাদি কারণেরই সম্বন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কারণটাই ঈশ্বর কি না এই প্রশ্নের কোন সমাধান ইহাতে নাই। অত্যাধিক কারণিক হুক্তিটিকে একেবারে অর্থহীন বলা চলে না। উক্ত হুক্তির দ্বারা এই সত্যের সম্বন্ধ পাওয়া যায় যে, জগতের কার্যকারণ-শৃঙ্খলের পশ্চাতে একটা নিত্য বিরাট সত্তা বিস্তারিত বাহ্যকে জাগতিক সত্তার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য মূল কারণ অল্প কি চেতনাময় সত্তা তাহা কারণিক হুক্তি দ্বারা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হয় না।

উদ্দেশ্যবাক হুক্তি :—জাগতিক বস্তুগুলির গঠনমৈনুণ্য হইতে উদ্দেশ্যবাদ ঈশ্বরের অস্বাভাবিক উদ্দেশ্যবাক হুক্তি (Teleological argument) নামে পরিচিত। ‘জাগতিক বস্তুগুলির গঠন-কৌশল লক্ষ্য করিলে যেন হয় এইগুলি কোন বিশ্বশিল্পীর শিল্প। আকস্মিক অকারণ হইতে এই নিপুণতার প্রকাশ করিয়া

করা যায় না। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু—প্রত্যেকেই আপন আপন প্রয়োজনমত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্বিত। প্রকৃতির বকে বাহাতে নিরাপদে আশ্রয়ের সঙ্গে জীবনধারণ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহ গঠন করা হইয়াছে। সুচরম বাহাতে বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের ফুসফুস গঠিত হইয়াছে। জল-চর জীবদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য তাহাদের উপযোগী ভিন্নভাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্তমান। পতঙ্গকীদের বর্ণ-বিভিন্নতার পশ্চাতেও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যে সকল পতঙ্গকী শত্রুর হাতে বিপর্যয় বোধ করে, শত্রুর কবল হইতে পরিভ্রাণের উপযোগী করিয়া তাহাদের বর্ণশৃঙ্খল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে। পক্ষীর অস্থি-গুলি লম্বা নকুড়া তাহারা আকাশে উড়িতে পারিত না; দুর্বল পতঙ্গগুলি অত্যন্ত সতর্ক ও কিপ্র, তাহা না হইলে ইহারা শত্রুর নিকট হইতে আশ্রয়লাভ করিতে পারিত না। এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে একজন বিশ্ব-শিল্পী যেন প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই বিরাট বিধে প্রচ্ছন্ন রূপে মহান শিল্পী যেন তাঁহার অমূল্য বুদ্ধির সহায়তার বস্তুজগৎ ও প্রাণিজগৎকে নিপুণতার সহিত গঠন করিতেছেন। সুতরাং জাগতিক বস্তুগুলির গঠনমৈনুণ্য হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়। ইহাই উদ্দেশ্যবাক হুক্তির মর্মার্থ। এই হুক্তিটির বাধ্যবাধীতা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনেকেরই সমর্থন করিয়াছেন। এমেক্ষেপোরাস প্রাণি-অঙ্গের গঠনবিভাগ দেখিয়া ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির প্রশংসা গাহিয়াছেন। পিথাগোরাস বস্তুনিচয়ের সুসমঞ্জস শৃঙ্খল গঠন-বিভাগ দেখিয়া ঈশ্বরকে বিরাট গণিতবিদ্বৎ আখ্যা দিয়াছেন। প্লেটো *Timæus* গ্রন্থে উদ্দেশ্যবাক হুক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এরিস্টটল জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে বিশ্বশিল্পীত্বাদির ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্দেশ্যবাক হুক্তিটি ঈশ্বরাত্তিষের প্রমাণরূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইম্যাহুয়েল কাণ্ট এই হুক্তিটিকে ‘the clearest, the oldest and best suited to human reason’ বলিয়া প্রশংসা করেন। দার্শনিকপ্রবর প্যলে (Paley) এই হুক্তিটিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় উৎসাহী বর্ষবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণি-অঙ্গের বিভিন্ন উপযোগিতা কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির প্রশংসা আরম্ভ করেন। এই সময়ের ভারউইন্সের জন্মবিবর্তনবাদ প্রচাৰিত হইয়া বর্ষবিজ্ঞানী-দের উৎসাহ অনেকাংশে দীর্ঘায়িত করিয়া দেয়। ভারউইন্স প্রমাণ করেন যে, একমাত্র আকস্মিক পরিবর্তন (chance variations) হইতেই প্রাণিজগতে বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাণিযেহে বস্তুই হইতেই অকস্মিক আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি যদি জীবন-সংগ্রামে প্রাণের

অস্তিত্ব স্বাক্ষর অকৃত্রিম হইতে সেই প্রাণী বাচিয়া থাকে। কিন্তু যদি এই পরিবর্তনগুলি আশ্চর্য্যকার প্রতিকূল হয় তবে সেই প্রাণী প্রকৃতির বন্ধ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পূর্ব-পুরুষের পরিবর্তনগুলি পরবর্তী পুরুষে আসিয়া থাকে। পরবর্তী পুরুষে আবার নূতন নূতন আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সঞ্চিত হইয়া নূতন-জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাণিদেহের পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণই আকস্মিক। ইহার পশ্চাতে কোন ঈশ্বরের অতিপ্রার অহুমান করার হেতু নাই। প্রাণিদেহের অদ্যাত্ম্যদের উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অহুমান করা যায় না, কারণ প্রাণিদেহে শুধু উপযোগী অদ্যাত্ম্যদের সৃষ্টি হয় না, অনেক অসুপযোগী অদ্যাত্ম্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু একমাত্র উপযোগী অদ্যাত্ম্য দ্বারা সর্বদা প্রাণীই জীবন-সংগ্রামে জীৱিষ, অসুপযোগী অদ্যাত্ম্য প্রাণী সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রকৃতির বন্ধ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য ডারউইন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু প্রাণিদেহের গঠন-উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না ইহাই তাঁহার মত। শুধু আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা প্রাণীদের গঠনবৈচিত্র্যকে উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহা ডারউইন স্বীকার করিতেন। কিন্তু অতঃপর কোন কারণ নিশ্চিতরূপে আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আকস্মিকতাকেই আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ইহাই তাঁহার অভিমত। ডারউইন মাস্তিক ছিলেন না। “I deserve to be called a theist”, “আমি একজন আন্তিক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য”—এক সময় তিনি এই উক্তি করেন। কিন্তু প্রাণিদেহের অদ্যাত্ম্যদের উপযোগিতা হইতে ঈশ্বরের অহুমান তথ্যসমর্থিত নহে বলিয়া ইনি উদ্বেগভাবক হুজির বাধাৰ্য্যে আত্মবাসন নহেন।

সম্প্রতি মর্য্যান কেম্প শিব নামক একজন ইংরেজ দার্শনিক উদ্বেগভাবক হুজির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। প্রথমতঃ, এই হুজিতে প্রাকৃত বস্তু ও কৃত্রিম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। কোন একটি কৃত্রিম বস্তুর গঠনমৈথুণ্য হইতে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কোন নির্দ্বাভাকে অহুমান করা যায়, কিন্তু প্রাকৃত বস্তুর গঠন-কৌশল হইতে এরূপ অহুমান হুজিসঙ্গত কি-না তাহা প্রশ্নের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, উদ্বেগভাবক হুজি দ্বারা ঈশ্বরের রচয়িতা শিরী রূপে চিত্রা করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে শিরীরূপে ভাবিলে তাঁহাকে মহত্ব-মূলত-ভগ্ন দ্বারা ভূষিত করিয়া বিরীক মহত্বরূপে কল্পনা করা হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ পরম পুরুষকে এরূপ কল্পনা করা কি বহিরোবী নহে? উদ্বেগভাবক হুজির বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি দার্শনিক মহলে আলোচিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির স্বাভাব্য শুধু যে উদ্বেগভাবক নিপুণতাই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, মৈথুণ্যের পান্যপানি

অমৈথুণ্যও দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি একদিকে বেরূপ সুন্দর, অপূর্ণ-মিকে সেরূপ হুংসিত। প্রাণিকগণের প্রত্যেকটি অদ্যাত্ম্যই যে জীবনস্বাক্ষর উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা নহে, অসুপযোগী, অপ্রয়োজনীয়, আশ্চর্য্যকার পরিপন্থী অদ্যাত্ম্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া অনেক প্রাণী প্রকৃতির স্বাভাব্য হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক অতিকার জীবজন্তু প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আশ্চর্য্যকার অসমর্থ হইয়া চির-বিহার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং উদ্বেগভাবক হুজিটি একদর্শিতামোখে দৃষ্ট।

সম্প্রতি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল উদ্বেগভাবক হুজিটিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উবাণিত করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতিকে যদি আমরা ইচ্ছাহীন, উদ্বেগহীন জড় বলিয়া গ্রহণ করি তবে প্রকৃতি সর্বদা আমাদের স্বার্থ-জ্ঞান সজ্জাত হইতে পারে না এবং স্বার্থ-জ্ঞান সজ্জাত না হইলে প্রকৃতিকে ইচ্ছাহীন উদ্বেগহীন জড় বলিয়াও কোন সাধকতা থাকে না। প্রকৃতি সর্বদা আমাদের স্বার্থ বা সত্য জ্ঞান সজ্জাত হয় স্বীকার করিলে প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্য স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রকৃতি সর্বদা আমাদের জ্ঞান স্বার্থ ইহা আমরা ভগ্নই স্বীকার করিতে পারি যখন আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃতি বৈজ্ঞান্য আমাদের জ্ঞানের ভিত্তির দিয়া স্বার্থস্বত্বাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকৃতি যদি আমাদের জ্ঞানের ভিত্তির দিয়া স্বার্থস্বত্বাবে আত্মপ্রকাশ না করে, অর্থাৎ সত্যের সঙ্গে যদি প্রকৃতির ঐক্য বা সামঞ্জস্য না থাকে তবে প্রকৃতিকে উদ্বেগহীন জড়স্বরূপ বলিবারও কোন অর্থ থাকে না, এই বর্ণনাও মিথ্যা হইয়া পড়িত। সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্বেগহীন কল্পনা করিবার পূর্বে স্বার্থজ্ঞান বা সত্যের ভিত্তির দিয়া প্রকৃতির উদ্বেগপূর্ণ আত্মপ্রকাশ স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সত্য এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঐক্য বা সামঞ্জস্যপূর্ণতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, সত্যের সঙ্গে যদি প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে তবে শিব ও সুন্দরের সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্য বা ঐক্য থাকিবে না কেন? সত্যকে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ বলিলে শিব-সুন্দরকেও প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ বলিতে হইবে। সত্যশিবসুন্দরকে বাস্তবে রূপায়িত করা যে প্রকৃতি দ্বারা সম্ভব হইতেছে তাহাকে উদ্বেগহীন জড়-সত্তা বর্ণনা করা অর্থহীন। সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্বেগপূর্ণ চেতন সত্তারূপে ভাবিতে হয় এবং তাহার উদ্বেগ সত্যশিবসুন্দরের বাস্তব রূপায়ণে পরিস্কৃত। বার্ট্রাণ্ড রাসেল উদ্বেগভাবক হুজির বাধাৰ্য্য এইভাবেই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতির উদ্বেগকে হির নির্দিষ্ট কোন উদ্বেগরূপে কল্পনা করা চলে না। করাসী দার্শনিক বার্লস মনে করেন যে, হির ও নির্দিষ্ট কোন উদ্বেগের স্বাক্ষরটি দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির উদ্বেগকে কল্পনা করিলে প্রাণীদের প্রত্যেক অহুমান স্বাধীন ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির উদ্বেগকে কল্প-

স্বক্যমান ক্রমবিকাশমান উদ্দেশ্যরূপে ভাবিতে হইবে। প্রকৃতি ক্রমবিকাশের দ্বারা বীরে বীরে সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশ্রয় হইতেছে, ক্রমবিকাশের ভিত্তর দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সৃষ্ট হইতেছে।

নৈতিক যুক্তি :—আবতাত্ত্বিক যুক্তি, কারণিক যুক্তি ও উদ্দেশ্যাবক যুক্তি এই তিনটি যুক্তিকে ধ্বংস করিয়া নৈতিক চেতনার ভিত্তিতে ইম্মানুয়েল কার্ট যে যুক্তি উপস্থাপিত করেন তাহা নৈতিক যুক্তি নামে অভিহিত। আবতাত্ত্বিক যুক্তিতে আবতাবগণ হইতে বস্তুবগণে অহুমান, কারণিক যুক্তিতে পরিদৃষ্টমান প্রাকৃত জগতের কার্য-কারণের শৃঙ্খল হইতে অপ্ৰাকৃত মূল কারণের অহুমান এবং উদ্দেশ্যাবক যুক্তিতে কতকগুলি কৃত্রিম বস্তুকে উদ্দেশ্যভিত্তিক লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বিবে উদ্দেশ্যপূর্ণ ঈশ্বরের অহুমান ভারসম্বত বলিয়া কার্ট স্বীকার করেন না। এই যুক্তিগুলির ব্যর্থতার কারণ এই যে, শুদ্ধ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কার্ট মনে করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ একমাত্র নৈতিক চেতনার ভিত্তিতেই সম্ভব। আমাদের নৈতিক চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবি করে, ঈশ্বর অস্তিত্বহীন হইলে নৈতিক চেতনা যথার্থ হয় না :

“Admitting that the pure moral law inexorably binds everyman as command, the righteous man may say: “I will that there be a God. I firmly abide by this and will not let this faith be taken away from me.” (Kant's *Metaphysics of Morals*.)

আমাদের নৈতিক চেতনা নৈতিক আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আত্মগত্য দাবী করে। নৈতিক আদর্শের প্রতি নিষ্কিরোণ অকুণ্ঠ আত্মগত্য হইতেই পূর্ণত্বরূপে আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়। পূর্ণত্বের আদর্শের নিকে অগ্রগতি হইতে পুণ্য এবং সেই আদর্শ হইতে অপসারণের কলে পাপ সঞ্চারিত হয়। পুণ্যবান যদিও সুখের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পুণ্যকার্যে প্রবৃত্ত হয় না তবু পূর্ণত্বের আদর্শকে বিশ্লেষণ করিলে পুণ্য ও সুখ এই দুইটিকে অবিলোম্ব্য অঙ্গরূপে পাওয়া যায়। যদিও পূর্ণত্বরূপ পরম আদর্শে পুণ্য ও সুখ এতদূতরই সমন্বিত তবু ইহজগতে পুণ্যবানকে সর্বদা সুখভোগী এবং পাশাচারীকে সর্বদা দুঃখভোগী হইতে দেখা যায় না। প্রকৃতির রাজ্য যদি নীতির রাজ্যের অঙ্গ হয় তবেই পুণ্যবান সুখী এবং পাশাচারী দুঃখী হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি রাজ্য পরস্পরনিরপেক্ষ ও বস্তু বলিয়া ইহজগতে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নৈতিক চেতনার দাবি অহুসায়ে প্রকৃতিকে নীতির অঙ্গ হইতে হইবে, পুণ্যাত্মা ও পাশায়া যথাক্রমে নিজ নিজ কর্মস্বাক্ষরী সুখ ও দুঃখের অধিকারী হইবে। কিন্তু পরস্পরনিরপেক্ষ প্রকৃতি-রাজ্য ও নীতির রাজ্য একে অপরের অঙ্গ হইতে হইলে এতদূতরের প্রত্যেক ঈশ্বরকে অহুমান করিতে হয় বাহার ইচ্ছাস্বাক্ষরী প্রকৃতি নীতির অঙ্গ হইয়া পুণ্যাত্মাকে পরলোকে সুখী ও পাশায়াকে দুঃখী

করিবে। সুতরাং আমাদের নৈতিক চেতনার দাবি অহুসায়ে পুণ্যবানকে সুখী ও পাশাচারীকে দুঃখী হইতে হইলে দুঃখ-দুঃখের বর্জনকারী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অহুমান অপরিহার্য। ঈশ্বর অস্তিত্বহীন হইলে নৈতিক চেতনার দাবির সার্বকতা থাকে না, নৈতিক আদর্শ অর্থহীন হইয়া পড়ে। কার্ট মনে করেন, নৈতিক চেতনা প্রাকৃত জগতের চেতনার ভারই বর্ধাণ ও বাস্তব, নৈতিক চেতনাকে যারামরীচিকা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং নৈতিক আদর্শের সার্বকতার জন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

জেন্স মাটিনো নৈতিক যুক্তিটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন। প্রত্যেক চেতনাতে আমরা যেরূপ একটি বস্তু বাহ্যসত্তার সম্মুখীন হইয়া সেই সত্তাকে অহুত্ব করি, সেইরূপ নৈতিক চেতনাতেও আমরা একটি মহত্তম সত্তার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নির্দেশ অহুত্ব করি। সেই মহত্তম সত্তাই ঈশ্বর। নৈতিক চেতনাতে আমরা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাই এবং কর্তব্যবাহুসরণের ভিতর দ্বারা তাঁহার নির্দেশ পালন করি। কিন্তু এগু টঠে, নৈতিক চেতনাতে আমরা যে মহত্তম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করি সেই সত্তা সমাজ কি ঈশ্বর তাহা কে বলিতে পারে? ডার্কহিম মনে করেন সমাজই সেই মহত্তম সত্তা যাহাকে আমরা নৈতিক চেতনাতে প্রত্যক্ষ অহুত্ব করি।

সম্প্রতি ডঃ রায়ড্যাল নৈতিক যুক্তিটিকে নূতন রূপ দিয়াছেন। নৈতিক চেতনাতে আমরা যে কর্তব্যনির্দেশের সন্ধান পাই সেই নির্দেশগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপার নহে, নির্দেশগুলি সার্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ। আমরা যদি বিশ্রাম করি প্রাণীহত্যা হইতে প্রাণীরক্ষাই শ্রেয়ঃ, কৃতজ্ঞতা হইতে কৃতজ্ঞতা, স্বাধীনতা হইতে নিঃস্বার্থতাই শ্রেয়ঃ, যদি প্রত্যেকে না হউক, অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় কার্যটিকে প্রথমটি হইতে শ্রেয়ঃ মনে করে, তবেই আমাদের বুঝিতে হইবে নৈতিক নির্দেশগুলি ব্যক্তিসাপেক্ষ মানসিক ব্যাপার নহে, নৈতিক নির্দেশ বস্তুনিষ্ঠ, নৈতিক চেতনার বাস্তব ভিত্তি বর্ধমান। নৈতিক নির্দেশগুলিকে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ রূপে গ্রহণ করিলে কোন এক বিশ্বচেতনার স্বীকৃতি অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে চেতনার ভিত্তিতে নির্দেশগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হইতে পারে। অর্থাৎ, নৈতিক আদর্শের সার্বজনীনতা ও বস্তুনিষ্ঠতা স্বীকার করিলে সেই আদর্শের ভিত্তিরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার প্রয়োজন।

অনেক দোষকট সত্ত্বেও নৈতিক যুক্তি আদর্শ জগতের গুরুত্বকে যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া লইবার দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। নিরপেক্ষ নির্দিকার জগতজগতের বিষয় ও ব্যাপারবি দ্বারা আদর্শ জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না—আদর্শ জগতের প্রতি উপযুক্ত স্বাক্ষর দিতে, আদর্শ জগৎকে

ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহা নৈতিক চেতনার দাবি। কিন্তু নৈতিক দাবিকে বিখ-প্রকৃতি মানিয়া লইবে, এবং নৈতিক দাবির অনুযায়ী ঈশ্বর প্রকৃতিই যে অস্তিত্ববান তাহার কি প্রমাণ আছে। সুতরাং নৈতিক যুক্তিটিকেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলে না। অবশ্য কাণ্টের তার আদর্শনিষ্ঠ নীতি-সর্ব্বব্যাপ্তির নিকট নৈতিক যুক্তিটি ঈশ্বরাস্তিত্বের বখাণ প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহারা আদর্শ-জনকে বস্তুজনদের তার স্তূত্বপূর্ণ মনে করেন না তাহারা নৈতিক যুক্তিকে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। নৈতিক আদর্শ তাবজগতের ব্যাপার। তাবজগৎ হইতে বস্তু-জনকে অনুমান তারসদৃশ নহে বলিয়া কাণ্ট তাবতাত্ত্বিক যুক্তিকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নৈতিক যুক্তিতে কাণ্ট মিথ্যেই তাবজগতের দাবি অনুসারে বস্তুজনকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণে তৎপর হইয়াছেন।

ঈশ্বরাস্তিত্বের উপরি-উক্ত চারিটি যুক্তির আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তথ্যে কোন একটি যুক্তিও নিঃসন্দেহ ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ নহে। বাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিখ্যাতী তাহারা উল্লিখিত যুক্তিগুলি হইতে নিজ নিজ বিখ্যাসের প্রচুর সমর্থন পাইবেন। কিন্তু বাহারা নাস্তিক, ঈশ্বরাস্তিত্বের তাহাদের বিখ্যাস জন্মাইতে যুক্তিগুলি ব্যর্থ। চারিটি যুক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সঙ্গত নহে। তাব-তাত্ত্বিক যুক্তিতে পূর্ণত্বের ব্যাখ্যা হইতে পূর্ণরূপে যে ঈশ্বরের অনুমান করা হইয়াছে, কারণিক যুক্তিতে তাহাকেই জনদের মূল কারণরূপে, উদ্দেশ্যক যুক্তিতে তাহাকেই উদ্দেশ্যপূর্ণ চেতন সত্তারূপে এবং নৈতিক যুক্তিতে নৈতিক রাজ্যের বিখাতা পাপপুণ্যের বিচারকরূপে চিত্রা করা হইয়াছে। যদিও অতীত ও সন্দেহাতীত প্রমাণরূপে বিচার করিতে গেলে যুক্তিগুলির যাবাণ প্রেরের বিষয়, তবু যুক্তিগুলি এক সূত্রে ঈশ্বররূপী একটি পরমসত্তার অস্তিত্বের আভাস দেয়।

শিক্ষার বিবর্তন

অধ্যাপক ত্রিবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবময় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি বিচিত্র-ভাবে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। হয়ত তাহাই অনুসরণ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের বাস্তব নাট্য অভিনীত হইয়া আসিতেছে। আজিকার যুগ-সঙ্কটক্ষেণেও আমবা শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছি। বঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তর হইতে দেখিলে অভিনয়ের জীবন্ত রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া সমগ্রের অহুভূতি ত্রাস করিয়া দেয়। সেইরূপ আজিকার শিক্ষা-বিপর্য্যয় আমাদের মনে হয়ত তত স্পষ্ট করিয়া বোধাপাত করে না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একটি প্রভূত ইজিতপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরিবর্তন মাত্রেই দৃশ্যীয় নহে; বস্তুতঃ পরিবর্তনই উন্নতির সোপান। নব নব পরিস্থিতিতে নতুন নতুন প্রয়োজন অহুভূত হইয়া থাকে। তাহা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতি ও প্রেরণা স্থপথে চালিত করিলে যেমন জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, সেইরূপ বিপথে চালিত হইলে তাহাই জাতির অবনতির কারণ হইয়া উঠে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্রে, শিক্ষাব্রতিগণকে

অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রশক্তিই অনেক সময় প্রবল হইয়া উঠে; নির্বিকল্পভাবে শিক্ষার কথা না ভাবিয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কখনও কখনও শিক্ষার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতির মোড় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, তাহা মঙ্গল-জনক হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে এমন স্বর্ণযুগ আসে যখন রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষাসমস্তা ও শিক্ষা-ব্রতিগণের নিকট উপস্থিত হয় এবং জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকে। তখনই জাতির উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

আমাদের দেশে একবার এইরূপ এক স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজত্বে শিক্ষা ও শিক্ষকে যে সমাদরের সহিত পোষণ করা হইত তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নানা ভাবে ব্যক্ত আছে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারাও তাহা প্রতীয়মান হয়। হিন্দু জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদের অনেক তথ্য এরূপ যে দীর্ঘকালের—হয়ত বংশপরম্পার—অনুসন্ধান ও নিরীক্ষা (observation) ব্যতীত তাহা স্থিরীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজশক্তির পোষকতা ভিন্ন এরূপ তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারিত না। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ দ্বারা সমগ্র দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শিক্ষার কোন ক্রটির জন্ত হিন্দু-প্রতিভা বহিরাক্রমণের নিকট অবনত

হইতে বাধ্য হইল সে ইতিহাস অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করা কর্তব্য। কালক্রমে শিক্ষার ভারকেজি কি অসমতাপ্রাপ্তি হইয়াছিল? শিক্ষা কি বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল? শিক্ষা কি উপর হইতে নিঃসৃত হইয়া সমাজদেহে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিত না?

মুসলমান রাজত্বের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির পোষকতা-বর্জিত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত ও দুর্বল হইয়া পড়িল। আয়ুর্কেন্দ্র ও জ্যোতিষের মত নিরীকামূলক বিষয়গুলির অগ্রগতি পূর্বেই ব্যাহত হইল। পরাধীন জাতির রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চাও অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র স্থিতি কাব্য, জায়, দর্শন ইত্যাদির চর্চা চলিতে লাগিল। সৌভাগ্য-বশতঃ তখনকার দিনে শাসনব্যবস্থার দেশের রক্তে রক্তে প্রবেশ করে নাই। মুসলমান রাজপুরুষগণ রাজস্বগ্রহণ ব্যতীত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। তাই হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে আপন ধর্মসম্মত জীবনযাপন করিবার বিশেষ কোন বাধা হইত না। সমাজপতিগণ কঠোর অজ্ঞানতাবাদ দ্বারা সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় করিলেন; হিন্দু-সংস্কারগুলি বাহ্যতে শিথিল না হয় তৎপ্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে কেবলমাত্র জ্ঞানার্বেষণের প্রয়াসরূপে গ্রহণ না করিয়া জীবনজ্ঞানের অঙ্গ ও ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করার সংস্কার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান প্রেরণা হইল ধর্মসম্মত জীবন যাপন করিয়া, হিন্দু আদর্শ পরিপোষণপূর্বক হিন্দু সমাজকে ধর্মপথে পরিচালিত করা। এই পরিস্থিতিতে ধর্মসোমুখ সংস্কৃত শিক্ষা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগের প্রজ্ঞাবারিসিকনে অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় রক্ষিত হইল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, হিন্দুদিগের রক্ষণ-শীলতা নব্য শিক্ষিত সমাজের নিকট বিজ্ঞপের বিষয় ছিল। আজ আমাদের রক্ষণশীলতা প্রায় অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু রক্ষণশীলতা ব্যতীত হিন্দু সংস্কৃতির তদ্ব্যংগ ও মুসলমান রাজত্বের অবগতি পর্যন্ত জীবিত থাকিত কি না সন্দেহের বিষয়।

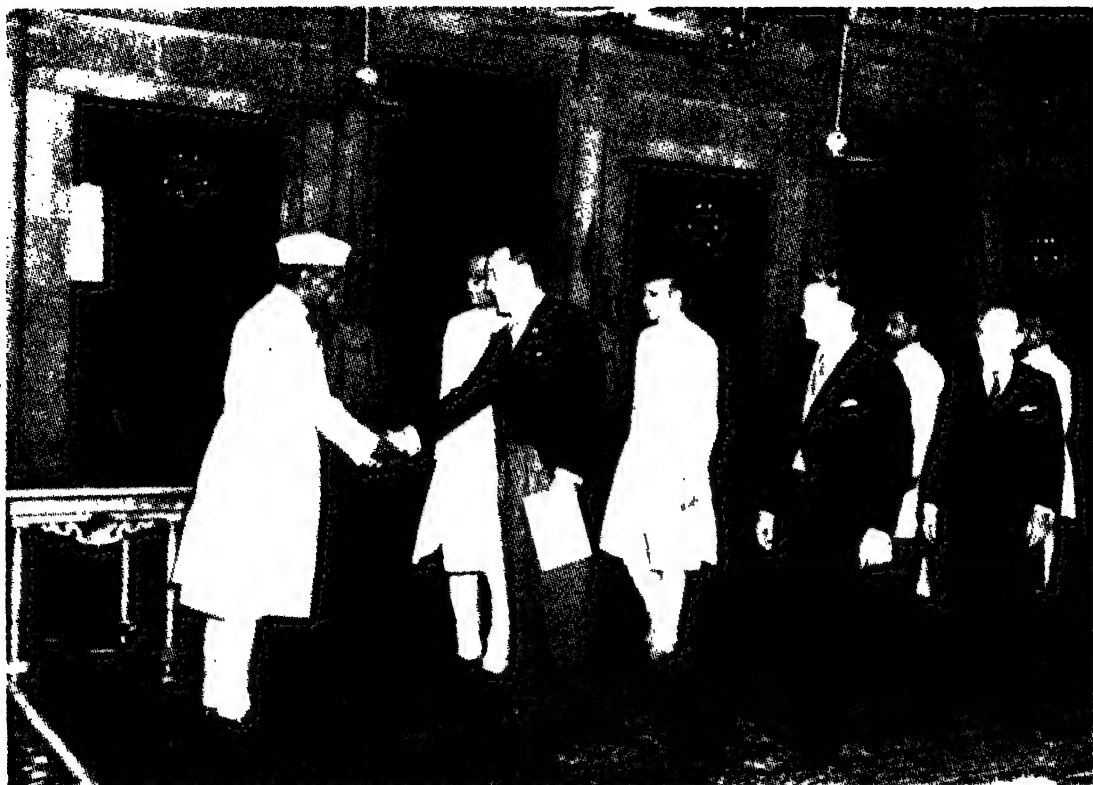
মুসলমান রাজত্বের শেষ অর্ধে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এক অন্ধকার যুগ সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া কেলিয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষা ত জীবন্ত অবস্থাতেই ছিল; মুসলমান রাজশক্তি যে আরবী, ফারসী মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাও মনে করিবার কারণ নাই। রাজকাব্য ফারসী ভাষায় পরিচালিত হইত এবং এইজন্য ফারসী ভাষার চর্চা কথঞ্চিৎ ছিল। কিন্তু বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের

চর্চা—বাহা তৎকালীন ইউরোপকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা বাংলাদেশে একেবারেই ছিল না।

অতঃপর ইংরেজ-রাজত্ব অঙ্গুরণ করিয়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইল। ভারতীয়দের শিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমে হইবে কি সংস্কৃত অথবা আরবী, ফারসীর মাধ্যমে হইবে তাহা লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছিল, মেকলের সুপরিচিত সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার অবসান হইল; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমে পরিচালনা করা স্থির হইল। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানসম্পদ মেকলের নিকট অজ্ঞাত ছিল; সুতরাং তিনি ইহার প্রতি যথোচিত স্তুতিচারণ করেন নাই। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তার পর সংস্কৃত ভাষার পক্ষে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনরূপে কার্যকরী হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ‘প্রাচ্য ভাষায় সকল গ্রন্থ অপেক্ষা নির্ঝাঁকিত কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে’—মেকলের এই উদ্ধৃত উক্তি মধ্য আংশিক সত্য নিহিত ছিল। ইতিপূর্বেই অনেকে ব্যক্তি-গতভাবে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজই মেকলের প্রধান সমর্থক ছিল। অন্যথায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন কখনই সহজসাধ্য হইত না। রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহারেষ্টের নিকট কেবলমাত্র প্রাচ্য শিক্ষার পোষকতা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘একদম শিক্ষা দেশে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিবে’।*

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মেকলের একটি আশা ব্যক্ত হইয়াছিল যে, সমস্ত ভারতবর্ষ ইহার ফলে ঐক্যবন্ধে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। সে আশা নিফল হইয়াছে বাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে মেকলের সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে নবযুগ সূচিত হইল। আমরা নূতন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় প্রবৃত্ত হইলাম ইউরোপীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়া গেল। নিকিত-সমাজের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য-দর্শনের প্রাচল আরম্ভ হইল। বাংলা ভাষাও ইংরেজী সাহিত্যের অঙ্কুরণে বিবিধ ভাব-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। একটি প্রতিজ্ঞা হইল এই যে, হিন্দু সংস্কৃতি প্রতি সমাদর হ্রাস পাইতে লাগিল। নব্য ছাত্রসমাজ হিন্দু রীতি-নীতির উপর বিজ্ঞপবাণ বর্ষণ করিতে লাগি এবং বিদেশীর আচার-ব্যবহারে অঙ্গুরণ হইয়া উঠিল। এ

* ‘Calculated to keep the country in darkness—Selections from Educational Records, Part I by H. Sha Calcutta, 1920—page 101.



রাষ্ট্রপতি-ভবনে মার্কিন হুজুৰাষ্ট্ৰেৰ ভাৰতস্থ রাষ্ট্ৰদূত্ৰেৰ সহিত কৰমৰ্দনৰত উৰ্ত্তৰ ৰাৰেণ্ৰএসাদ



ভাৰত্ৰেৰ এৰণ ৰাষ্ট্ৰীয়ত ও এৰিয়ার বহুতৰ কাৰখানা 'সিহি কাৰটনাইকাৰ ক্যাটৰিৰ' একট বৃশ্য



গেজিয়ার 'হোয়াইট হাইল' নদীর উপর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত গেবেল আউলিয়া বাঁধ



সেচ-পরিষ্করণে অহুসারে কাটাযো গেজিয়ার প্রধান খাল

উচ্চ-অলতা অবশ্যই লঘুচিত্ততা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার মধ্যেও তাহাদের সাধনার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তখনকার ছাত্রগণ আক্ষরিকভাবেই কায়-মনোবাক্যে ইংরেজী শিক্ষার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আজিকার ছাত্রসমাজে শিক্ষার প্রতি যেরূপ নিষ্ক্রিয়তা ও নিকম্যমের লক্ষণ দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় তখনকার ছাত্রদিগের এই পরাহুকরণমূলক মনোভাব নিন্দনীয় হইলেও এক দিক দিয়া প্রশংসারও যোগ্য। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কার। নব্য-ছাত্রসমাজ সাধারণ ভাবে হিন্দুসংস্কারের প্রতি বতই অবজ্ঞাপরায়ণ হউক না কেন, এই সংস্কারটির প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। ইংরেজী রাজভাষা; সুতরাং অবশ্যই অর্থকরী ছিল। কিন্তু শুধু অর্থোপার্জনের উপায় বলিয়াই নহে, আদর্শবাদ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াও ছাত্রগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিত।

আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে এই যুগ বতটা অহুকরণের যুগ, জ্ঞান-সংগ্রহের যুগ, ততটা জ্ঞান-সৃষ্টির নহে। এই সময়ে ইউরোপে নব নব উদ্ভাবনের যে ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহার তুলনায় আমরা নিষ্ক্রিয় ছিলাম। নূতন ইংরেজী শিক্ষা আমাদের কাছে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা মনে করিতাম জ্ঞান-সংগ্রহ করিবার জন্ত ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখেই রহিয়াছে—জ্ঞান সৃষ্টি করিবার কথা তখন একেবারেই মনে উঠে নাই। ইহা সত্য যে, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অল্প সময়ের মধ্যে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সহজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকগণ গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ও ভারতীয়-দিগকে গবেষণার সুযোগ দিবার ইচ্ছা ততটা পোষণ করিতেন কিনা সন্দেহ। কালের গতির সহিত সকল রাষ্ট্রই দেশের নানা প্রকার মজলজনক অহুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেছে। তদানীন্তন কালে, সেরূপ প্রেরণা ছিল না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বিদেশীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সে প্রেরণা স্বভাবতই আরও ক্ষীণ ছিল। নব্য শিক্ষিতকে রাজকার্যের সহায়করূপে পাইবার উপস্থিত প্রয়োজন ছিল; সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থা সেই ভাবেই গঠিত হইল। ইংরেজ শাসকগণ সংশয়হীনরূপে আপন আপন প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা কার্যকরীরূপে প্রবর্তন করিতে জানিতেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করিতেন। শিক্ষা সীমাবদ্ধ হইলেও বাহাতে খাটি হয়, তাহার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল; নিতুলভাবে ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিষয় বুঝিতে এবং নিতুলভাবে

এই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে ছাত্রগণ অভ্যস্ত হইত।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম উদ্দীপনা কাটিয়া গিয়া ইহার অর্থকরী রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল; শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সরকারী চাকুরী লাভ। লোকে অধিকতর সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। বাংলাদেশই ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিল। রাজকার্যের জন্য বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আহৃত হইতে লাগিল। ছাত্রজীবনে পুথির মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়া এবং কর্ম-জীবনে দূরদূরান্তরে কেবলমাত্র ইংরেজ প্রকৃতির মেজাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে দেশের জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এমন কি মুসলমান রাজত্বের আমরা নিভুতে যে গ্রামীণ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, পল্লীর পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজের সংযোগ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় এই বহিঃকেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষা কল্যাণকর হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। হয়ত ইংরেজী শিক্ষার এই সমাজধ্বংসী রূপের কথা মনে করিয়াই রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষা কমিশন 'গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়' (Rural Universities) গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

অতঃপর স্বদেশীযুগ আরম্ভ হইল। শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেই আন্দোলন প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে। এই শুভকণ্ঠেই শিক্ষিত-সমাজ প্রথম জনসাধারণের সহিত যোগস্থাপন করিতে উৎসুক হয়। অপর পক্ষে ইংরেজ শাসকগণও ক্রমে ক্রমে উচ্চতর পদগুলি দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত করিয়া শিক্ষিত-সমাজের মতি গতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন। বাহারা স্বদেশী আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিতেন তাঁহাদের প্রতি, এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্য হইতেও বাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব তাঁহাদের প্রতিও এই অহুগ্রহ বর্ধিত হইতে লাগিল। শিক্ষাবিভাগেই অধিকতর ভারতীয়করণ নীতি প্রযুক্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার বহু পূর্বেই আমরা শিক্ষানৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আমরা এই স্বাধীনতার বখাবধ সম্ভাবহার করিতে সক্ষম হয় নাই।

দেশবাসীর করায়ত্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সংস্কার আশাহুরূপ কল্যাণপ্রসূ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে প্রয়োজন ছিল শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া, নিরীক্ষামূলক ও বহিমুখী করিয়া, সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা—শিক্ষাকে পোশাকী রূপ হইতে

প্রয়োজনীয় শিক্ষার রূপে পরিবর্তিত করা; সরকারী দপ্তরে কেরানী-তৈয়ার করিবার সঙ্গীর্ণ উদ্দেশ্যের উপর শিক্ষাকে স্থাপিত না করিয়া, সমাজ-কল্যাণের প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু কার্যতঃ সংস্কার হইল এই যে, ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার যে কঠোরতা ছিল তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইল; অস্ত্রান্ত বিষয় সম্বন্ধেও কঠোরতা হ্রাস করিয়া ছাত্রদিগের প্রতি অল্পগ্রহ প্রদর্শন করা হইল। দ্রুপ্তিত ফল অবশ্যই লাভ হইয়াছিল; পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থ-ভাণ্ডারেরও অল্পরূপ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় শিক্ষাবিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ক্রমবর্দ্ধমান ‘পাসের’ অল্পপাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। “The Senate views with alarm”—(সিনেট আশঙ্কার সহিত এই মত প্রকাশ করিতেছেন) তাঁহার প্রস্তাবের এই মুখবন্ধ তখনকার দিনে শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে বিজ্রপের সহিত উচ্চারিত হইত; সকলেই ইংরেজকে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী বলিয়া মনে করিত। শিক্ষার ও শিক্ষালয়ের স্মৃষ্টিতর ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইবার প্রস্তাব না আনিয়া, কেবল পরীক্ষায় ‘পাসের’ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ভীত হইলে, ইহা অপেক্ষা উদারতর সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নহে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আজ স্বদেশীঘেরাই সেই নির্দিষ্ট নীতি কার্যে পরিণত করিতেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তখন সিনেটে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া পূর্ব হইতেই সংশ্লিষ্ট সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন ছিল; এখন ছাত্রদিগের মূঢ় অভিভাবক-গণ অর্থের বিনিময়ে ইহা অল্পভব করিতেছেন। তখন শিক্ষার যে ধ্যানির সূচনামাত্র হইয়াছিল—তৎকালে এই নীতি গৃহীত হইলে যে অনিষ্ট রুদ্ধ হইত, আজ তাহা সমাজদেহে পরিপূর্ণ বিবক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাদৃশ্যও আছে; তখন শিক্ষার যে সকল সংস্কার করণীয় ছিল, আজও তাহা করণীয়ই রহিয়াছে।

নূতন শিক্ষা সংস্কারের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্নাতকোত্তর (post-graduate) স্তরের শিক্ষা স্নাতক-পূর্ব (under-graduate) স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত করা হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহার ফল হইয়াছে এই যে, নিয়ন্ত্রকের শিক্ষাবী ও শিক্ষক উভয়েই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া বাইতেছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পর যে দুইটি বৎসর ব্যয়িত হয় তাহা প্রায় ব্যর্থতায় পরিণত হইতেছে। অপর পক্ষে উচ্চতর স্তরে

একাধিপত্যের কুলক্ষণগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি মাত্রা ছাড়াই বাইতেছে; শিক্ষার সৌকর্যের জন্য একাধিক বি-বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্তব্য তাহা শিক্ষাবিদ মাজেই অল্প করিতেছেন; নানা শিক্ষা কমিশন অনেক দিন হইতে অল্পরূপ মন্তব্য করিয়া আসিতেছেন। তথাপি ঠিক সংস্কারটির কথা উচ্চারিত হইবে না। বরঞ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে থাকিয়া যে সকল বিশেষের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নানা স্থানে শিক্ষা-পরিবেশন করিতেছে, সেগুলির কর্তৃত্বও কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রস্তাব উঠিতেছে। কেহ বা এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার দিতে চাহিতেছে কেহ বা যুক্তরাষ্ট্রের অল্পকরণে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্বদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। পর পর একাধিক শিক্ষা কমিশনের মন্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া একরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার গুঢ় উদ্দেশ্য কি? ভারতীয়গণ বতই বৃহৎ প্রতি-পরিচালনায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেছে না, ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইবে কেন? বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার কঠোর পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষার অধুনাতন গতিপ্রকৃতি শিক্ষাসুধাগীর হু অধিকতর হতাশার সৃষ্টি করিবে। মহাত্মা গান্ধী ‘বাসিক শিক্ষা’ (Basic education) সম্বন্ধেই শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত চিন্তা নিঃশেষিত করিয়াছেন; কদাচিত্তি তিনি উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু একদা ওয়ার্ডার ফারেলসে তিনি কার্যতঃ উচ্চশিক্ষার বিরোধিতাই করিতেছিলেন। সার ফিলিপ হার্টগ লিখিয়াছেন:

“A suggestion by Mr. Gandhi that no Government Funds should in future be provided for Universities, except to meet state needs was, I think, fortunately not endorsed by the Wardha Conference. Its adoption would go to kill higher education in India.” (Some Aspects of Indian Education, Past and Present, by Sir Philip Hartog. Oxford Univ. Press, 1939. Preface, page X)

মহাত্মা গান্ধী সত্যসঙ্গ ছিলেন; নিজ মনে অবিকৃতভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার অল্পগাম্যদিগের বাক্যে ও কার্যে মিল স্বতন্ত্র নহে। আজ দেখিতে পাই শিক্ষার বাহ্যিক আড়ম্বরণে শিক্ষার প্রতি অনাস্থা ও অবহেলার প্রবল স্রোত বহিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া নানান জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories) স্থাপিত হইতেছে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সর্বভারতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকতর অর্থসাহায্য দে

হইতেছে। কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষার আদর্শ অপেক্ষা ক্ষমতালোপ্ততার ক্রিয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র শিক্ষিত-সমাজের প্রতি ঋণ্য বিচার করিবার স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া, আপন গোষ্ঠীর পোষকতা করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণভাবে শিক্ষা পণ্ডিচালন ও শিক্ষিতের জীবনযাপন বিড়ম্বিত হইতেছে।

শিল্পপতিগণ এবং বণিকসম্প্রদায় কারিগরি ও কেরানী-গিরি শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনওপ্রকার শিক্ষার প্রয়োজন দেখেন না। এ সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য জগতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে বিচলিত করে না। তাঁহারা দুইটি নীতির উপর তাঁহাদের মূনাফার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও বিদেশী মূলধনের সাহায্যে শিল্প পরিচালিত হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ভারতের চতুর্দিকে শুষ্ক-প্রাচীর উত্তোলন করিয়া তাঁহারা অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিবার অভিলାষী। এমন অবস্থায় শিল্পের উন্নতির জন্য কারখানার অভ্যন্তরে গবেষণার ও সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার হইবে কিরূপে? যে শিল্প-

প্রতিষ্ঠান স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের জীবিকার এবং কর্মশক্তি ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র নহে তাহা দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েক জন শিল্পপতি এবং বিদেশীয় পুঁজিপতির হাতে বিপুল ঐশ্বর্য্য তুলিয়া দিয়া এবং দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী বিশেষজ্ঞের মুষ্টিগত করিয়া দেশের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইবে?

স্বদেশীয়দের শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত কোন্ দেশের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে? হয়ত প্রত্যুত্তর মিলিবে, রাষ্ট্র শিক্ষার বিরাট ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষিতের মর্যাদা রক্ষা, শিক্ষিতের জীবনধারণের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। শিক্ষিতের জীবন বিড়ম্বিত করিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। শিক্ষিতের জীবনের বার্থতা লক্ষ্য করিয়া, কারিগরি ও কেরানীগিরির দিকে শিক্ষার স্রোত বহিতেছে; শিক্ষার স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষা ও সমগ্র দেশ কোন্ পরিণামের দিকে চলিতে থাকিবে তাহা স্বদেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীকেই চিন্তিত করিয়া তুলিবে।

ভ্রষ্টনীড়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

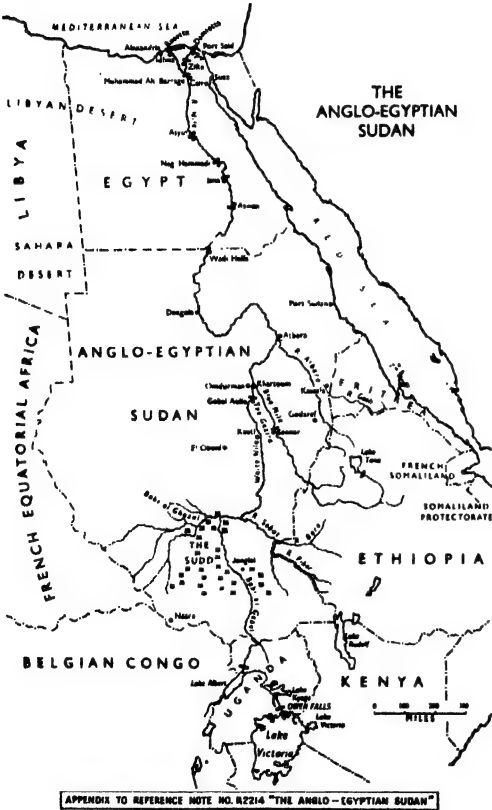
একটি হৃদয় খোঁজে
সতত এ মন
কত পথ করে পর্যটন।
ধূ ধূ বালুচরে—
বিতীর্ণ প্রান্তরে
অবিরাম চরে,
হেঁটে যেতে 'ওয়েসিস'
অন্বেষণ করে—
একটি হৃদয়
যে মরুভূমিতে ঢাকা রয়।
তবু বড়ো-হাওরা
শত সূর্যকণা
প্রদাহের শুধুই লাহুনা
ভিজ্ঞ স্বাদ আনে।
মেনে না হৃদয় কোনোখানে।
তবু এক দিন
এই মরু-আবরণ ছিঁড়ে
একটি হৃদয়
হবে স্রোতোময়,
ধূ ধূ বালু তিড়ে
ঘেবে পরিচয়—

রৌদ্রে গেলে সে প্রান্তর ভেঙে'
এই কথা মনে হয়
হেঁটে যেতে যেতে।
মনে হয় একদিন
এ মরু-প্রান্তর
ছিল যে সাগর
ছিল না শুধুই বালুতুপ—
পিঙ্গল ধূসর।
তখন হৃদয় ছিল
সোরতে উমিল,
পাওয়া যেত জীবনের
অনিবার্য মিল।
সে সমুদ্র আজ নেই—
প্রকৃষ্ট হৃদয়,
কঠিন সময়
বালুতে-করে চক।
পরিণত হয়।
সে সমুদ্র নেই আমি
তবু যে হৃদয়
—'ওয়েসিস' খুঁজে করি
ধূ ধূ মরুভূমি।

সুদান

ঐনলিনীকুমার ভদ্র

সুয়েজ খাল অঞ্চল ও সুদান লইয়া ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে বিরোধ মনকষাকবি ইত্যাদির কলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল সম্প্রতি তাহা এক নুতন পরিস্থিতির সন্মুখীন হইয়াছে। মিশরের পররাষ্ট্র-সচিব সালে-এল দিম পাশা সম্প্রতি কনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে আপোষ-রকার প্রথম সর্গ হইবে মিশর হইতে ব্রিটেনের অপসারণ।



সুদানের মানচিত্র

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদানীদের পরম্পরবরণ মাহ্‌দীর পরাজয়ের পর সুদানের উপর ইং-মিশরীর বৈত প্রভু প্রভিষ্ঠিত হয়। নীলনদকে মিশরের বননী বলা চলে। এই নীলনদের বারি-বিশোধ অঞ্চলের ঐক্যবিধানের উদ্দেশ্যে মিশর আজ সুদানকে নিজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়। ব্রিটেনের ইহাতে আপত্তি।

সুদানে ‘ওয়াব এল নীল’, ‘আশিগ পা’, ‘ইতিহাবিমান’ প্রভৃতি

অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে—তন্মধ্যে কোম কোমন্ট সুদানের মিশরের অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী, কিন্তু এক দল জাতীয়তাবাদী সুদানী মিশর এবং সুদানের পরিপূর্ণ ঐক্যের প্রস্তাব মামিরা লইতে অনিচ্ছুক। বিভিন্ন দলের এই যতাতন-ক্যের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ সুদানেও নিজের চিহ্নাচরিত কৃষ্টি-নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি টাঙাইয়াছে তাহাতে সুদানে ব্রিটিশ কৃষ্টিনীতি বানচাল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সুদানের সমুদয় রাজনৈতিক দল—তন্মধ্যে সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী আল উম্মা দলও আছে—সুদান হইতে ব্রিটিশ এবং মিশরীর সমুদয় সৈন্ত-বাহিনীর অপসারণের পর গণভোট গ্রহণ করা হোক এই মর্মে মহম্মদ সালে-এল দিম পাশা যে প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহাতে একমত হইয়াছে।

মিশরের দক্ষিণ দিকে সুদান অবস্থিত। সুবিখ্যাত নীল নদ ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মিশরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ‘রু নাইল’ এবং ‘হোয়াইট নাইল’ এই দুইটি নদী খাতটুমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলকে আরবীভেরা বলে এল গেজিরা—সমগ্র সুদানের মধ্যে এই অঞ্চলটিই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। মধ্যতাপে ইহা প্রায় মফসই নাইল প্রবৃত্ত।

সুদানের উত্তর প্রান্তসীমাহ লিবিয়া এবং সাহারা মরুভূমি হইতে দক্ষিণের সুদ এলাকার জলাভূমি পর্য্যন্ত সহস্র মাইল ব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য আছে এবং এই ভূতাপের কলসংখ্যা এবং তাদের জীবন-রাজ্য-প্রণালী সুখ্যতঃ এই বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ীই নিরূপিত। উত্তর হইতে বতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া বার ভতই বৃষ্টিপাতের ক্রমবর্ধমান পরিমাণবিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মরু-অঞ্চলের সীমারেখা হইতে পাঁচ শত মাইল দূরবর্তী গেজিরাতেই বৃষ্টিপাত হয় সবচেয়ে বেশী। এই অঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন চারণভূমিতে বিস্তর খাল এবং শতকেজাদিতে বিবিধ মরুশ্রমী কল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বদিকে এরিট্রিয়া এবং লোহিত সাগর পর্বতমালা হইতে পশ্চিমে মরু শত মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত ‘জেক ইকুয়ে-টরিয়্যাল আফ্রিকা’র মধ্যবর্তী—গেজিরা লম্বিত, অঞ্চলটি প্রায় ২০০ শত হইতে ৪০০ শত মাইল প্রশস্ত—ইহার অধিকাংশই উষ্ণক সমতলভূমি এবং গো-মহিষাদি প্রভিপালন করিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে।

সমগ্র সুদানের মধ্যে গেজিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে মিশর হইতে নীল নদের তীরবর্তী যে রাস্তা দ্বারা মধ্য-আফ্রিকার সহিত উহার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহার অবস্থিতি, আবার পূর্বদিকে লোহিত সাগর এবং আরব হইতে পূর্বতঃপশ্চিম ভেদ করিয়া একটি রাস্তা ইহার ভিত্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অতীতে এই সমস্ত রাস্তা দ্বিধাই বিদেশীরা বিজয়-অভিযান পরিচালনা করিয়া এই দেশ জয় করিয়াছে, এই পথ দ্বিধাই বহিরাগতেরা আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।



মাহ্‌দীর বহুতনিত্রিত শেখ বোরাশির সমাধি

ব্রিটিশ শাসনাধীনে মুদ্রার আর্থিক সমৃদ্ধি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার আসল হেতু নূতন নূতন রেলপথ স্থাপিত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারসাধন। এই ব্যবস্থার দরুন সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইয়াছে গেজিরা—রেল-পথের দ্বারা সমুদ্রের সহিত সংযোগ স্থাপিত না হইলে গেজিরা বর্তমান সেচব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অসুদূরপ্রসারিত। উক্ত রেলপথ লোহিত সাগর পূর্বতঃপশ্চিম ভিত্তর দিয়া পোর্ট মুদ্রা পর্যন্ত আসিয়াছে এবং মিশরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। লর্ড কিচেনার কর্তৃক মুদ্রা-বিজয়ের উদ্দেশ্যে এই রেলপথ নির্মিত হয়। সেবার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহার একটি শাখা পথের প্রথম দ্বারকাল এল ওবিদ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে

এবং আর একটি শাখা পূর্বদিকে সেবার দ্বিধা অভিক্রম করিয়া কার্গাস-উৎপাদন-অঞ্চল কাসালার ভিত্তর দিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পোর্ট মুদ্রার সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গেজিরা ভিত্তরে এমন কয়েকটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে যেগুলি অভিক্রম করিয়া মাইজিরিয়া এবং পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের তীর্থযাত্রীরা পুরাতন মুদ্রাকিন বন্দরের ভিত্তর দিয়া মধ্য অভিমুখে যাত্রা করে। আগেকার দিনে বিভিন্ন পরিবারের আবালবৃদ্ধবলিতা দলবদ্ধ ভাবে পদব্রজে আফ্রিকার ভিত্তর দিয়া এই তীর্থযাত্রার বাহির হইত—মারেরা শিশুদের পিঠে বান্ধিয়া লইত। সাম্প্রতিক কালে গেজিরা কার্গাস-ক্ষেত্র হইতে এবং তীর্থ-যাত্রাপথে বিভিন্ন বিদ্যার-দলে মানা প্রকার কারিক পরিভ্রম দ্বারা যে অর্থ অর্জিত হয় তীর্থযাত্রীরা তাহার সাহায্যে সমুদ্রোপকূলে এই ভ্রমণের শেষ পর্বটুকু ট্রেনযোগে সম্পন্ন করে।



মুদ্রার দুই জন অভিজাত-ব্যবসায়ী সহ মাহ্‌দীর পুত্র সায় মৈরদ আবদ এল হহমান (মধ্যস্থলে)

রেলপথের দ্বারা মোটরকারের বহুল প্রচলনেও গেজিরা মাল ঢালাম ও লোক-চলাচল-ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আজকাল গেজিরা সেচ-অঞ্চলের এলাকাভুক্ত গ্রামগুলির ভিত্তর দিয়া বিস্তর মাল এবং লোকজনসহ জমাগত মোটর বাস যাত্রায়াত করে। ট্রেন এবং মোটর বাস ক্রিষ্ট মাল বহনের প্রতিযোগিতা এই ক্ষেত্র-অঞ্চলের সমস্ত বাহন উটকে হটাইয়া দিতে পারে নাই। বরং ক্রয়ের প্রসারের দরুন বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে গেজিরা এবং অত্র মালবহনকারী উট্টের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

গেজিরা লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট মুদ্রার অভ্যন্তর অঞ্চল হইলেও এই দেশের ইতিহাসে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খ্রীষ্টীয় এক সহস্রাব্দ হইতে পাঁচ শত বৎসর কাল গেজিরাতে আলোরা নামে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

ধারাইয়ের ভেতর মাইল দক্ষিণে লোবা নামক স্থানে ছিল ইহার রাজধানী। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক লোবা বিধ্বস্ত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পর ভিন্ন শত বৎসর পর্যন্ত গেলিরার উপর কুং রাজ্যের অধীনস্থ প্রভু প্রভৃতি



উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সহিত শাসন-বিভাগের কর্মে নিযুক্ত উপজাতীয় নেতাদের সাক্ষাৎ

ছিল—তাদের রাজধানী ছিল সেন্নার। অতীতে গেলিরার ইতিহাসের রত্নরূপে বার বার পটপরিবর্তন হইয়াছে। কুং বংশের রাজত্বকালে বহিরাগত আরব এবং বর্বরদেরা এদেশে অভিযানে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদেরকে বন্দীকৃত এবং বহু লোককে হত্যা করে। অবশেষে তাহারা দেশটি দখল করিয়া বসে। ক্রমে ক্রমে গেলিরা এই মণিগত জাতিরই বাসভূমি হইয়া দাঁড়ায়।

কালক্রমে গেলিরা বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মুদামের সঙ্গে ইসলাম-জগতের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। ক্রমে ক্রমে সেন্নার একটি সহস্রাবাসী মগরীতে পরিণত হইল। ইউরোপীয়গণ এই শহর পরিদর্শনে সমাগত হইতে লাগিলেন এবং বীরে বীরে এখানে লাভজনক কার্ণাস-শিল্প গড়িয়া উঠিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কগণ কর্তৃক সেন্নার অধিকৃত হইলে কুং-প্রভু নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়।

শিশুরের অধীনে থাকাকালে বিজ্ঞানভাবের কুশাসন এবং হুর্নীতি ভাবী মাহ্‌দী বিজ্ঞোহের পথ পরিষ্কার করিল—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ধারাইয়ের পতনে এই বিজ্ঞোহের অবসান হইল।

এই সময় গেলিরার বর্তমান গল্পশহর মেন্সিলিবিয়া ছিল দক্ষিণ অঞ্চল হইতে বন্দীকৃত দাসবিক্রয়ের একটি প্রধান বাজার। মুদাম হইতে বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাস—সময় সময়

তাহাদের সংখ্যা বৎসরে ৫০,০০০ হাজারে দাঁড়াইত—মুদাম হইতে চালান হইত।

মাহ্‌দি বিজ্ঞোহের মারক মাহ্‌দী বং গেলিরার কর্তৃক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট বর্বর-মতলীর (টারিগা) অধ্যক্ষ—এখনও গেলিরার উক্ত বর্বরমতলীর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। কথিত আছে, তাহার মৃত্যুর শেখ বোরানীর মৃত্যুর পর তিনি নিজের হাতে তাঁর সমাধি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মুদামের বর্তমান অধিবাসী

বর্তমানকালে মুদামের একই অঞ্চলে এখন অনেক গ্রাম আছে যেগুলিতে বিভিন্ন জ্রেগীর উপজাতীয় লোকেরা বাস করে। তদ্ব্যতীত মাহ্‌দী সৈন্যদের বংশধরেরাও আছে। গেলিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মুদামের অধ্যুষিত একটি জেলা আছে এবং প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলের বহু গ্রামে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির বাস। গ্রামাঞ্চলের আরবদের মুখ্যত্ব এবং দৈনন্দিক গড়ম লক্ষ্য করিলে একথা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের দেহে প্রচুর দাস (মিগ্রোয়েড) রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে।



গেলিরার নীল নদের বুকে ভাসমান বজরা

আগেকার দিনে উপজাতীয়দের মধ্যে প্রায়ই কলহ-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটি হইত। ইহাদের সমাজে নানা কুসংস্কারও ছিল। ইদানীং এ সকল বহলাংশে কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। জাতির অতীত ঐতিহ্যের প্রতি ইহাদের অহুস্রাগ অপরিণীত। ইহারা পোজী-কথা, পূর্ব-পুরুষদের হৃদবিগ্রহ এবং কৃতসমূহের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসে।

এখানকার অধিবাসীরা বড়ই অভিবিসংকার-পরায়ণ। কোনো গ্রামে বেড়াইতে গিয়া গ্রহহবাটী হইতে বাত গ্রহণ না করিলে তাহা শিষ্টাচারবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়।

মুদাম বহু বিশ্রু জাতি দ্বারা আবৃত। এখানে এক দিকে যেমন অভ্যুদ্বি দাস-শ্রেণীর লোকের বাস, অপর দিকে তেমনি দৈহিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিরল নহে। সাধারণতঃ শেখ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যেমন আতি-জাতিপূর্ণ চেহারা তেমনি মধ্যাভ্যন্তরীণ তাঁহাদের আচরণ—তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিও প্রথম।

গেজিয়ার আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা।
গেজিয়ার সুগভীর আমদান করিয়াছে ইহার সেচ-ব্যবস্থা। ইহার দক্ষম এই দেশের এক অংশের জী ফিরিয়া গিয়াছে। সেচ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-বাপন-প্রণালীর আবুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, অবশ্য সমগ্র গেজিয়ার সম্রাট অংশমাত্রই সেচ-ব্যবহার অভ্যুদ্বিত। নীল নদের পশ্চিম দিকে প্রাচীন গেজিয়া। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আশু ও আগেকার আমলের জীবনব্যায়রই অভ্যুদ্বিত করিতেছে।

উত্তরদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বলিয়া উক্ত অঞ্চলে গাছপালা বিরল। দক্ষিণদিকে—যেখানে পাহাড়শ্রেণী সীমা-রেখা রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গাছপালার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে মাইলের পর মাইল বৃষ্টিরা একপ্রকার কাঁটা গাছের বোপ ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

গেজিয়ার অনন্ত-প্রসারিত, উত্তম প্রান্তরে দাঁড়াইলে নজরে পড়ে গ্রামগুলি অদূর দিগন্তে ছেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারিবাঁধা তুপে ছাওয়া স্মৃষ্টি চালাবিশিষ্ট কুটীরসমূহ বিশেষ ভাবে বৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তর অঞ্চলে চাল হাইবার তুপ জমায় না বলিয়া রৌদ্রদগ্ধ বৃত্তিকা দ্বারা সমতল আকারের চালা নির্মিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক কুয়া আছে—পশ্চিম অঞ্চলে মাটি খুঁড়িয়া জল পাওয়া কষ্টকর বলিয়া বৃষ্টির জল বহিয়া রাখিবার জন্ত বিরাট আকারের দীঘি (হাকির) কাটানো হয়।

মবেবর মাসে বৃষ্টিপাতের অভাবে জমি থাকে শুষ্ক এবং অক্ষর। সেচ-অঞ্চলে কার্গাসগাহ প্রচুর পরিমাণে জমে। জাহাজী মাসে কার্গাস-ওট বধন কাটিতে থাকে তখন

পাকা তুলার শুভ্রতা অদূরপ্রসারিত কার্গাসকে স্তম্ভিত করে এক অপর শোভার সঞ্চিত করিয়া তোলে। তুলা-সংগ্রহ-কারীরা দলে দলে মাঠে গিয়া কার্য্যে রত হয়। গ্রহহদের কুটীরে কুটীরে রাখি রাখি তুলা বস্তাবন্দী করিবার ঘুম পড়িয়া



সেচ অঞ্চলের বাহিরের একটি গ্রামের কুয়া হইতে জী-পুষ্ক
চাষকার বলিয়ার জল তুলিতেছে

যায়—ভারপর উটের পিঠে চাপাইয়া সেগুলিকে বীজ ছাড়াই-বার কেন্দ্রগুলিতে লইয়া যাওয়া হয়।

যে বৎসর অধিক হয় সেই বৎসরে বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভূ-ভাগ বিবিধ তৃণলতা এবং শুষ্কবৃক্ষের প্রাচুর্য্যে সবুজ শোভার সঞ্চিত হয়। পল্লীগ্রামের সুক্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া ঝালগুলির ওপারে তাকাইলে নজরে পড়ে বন সবুজ জনারের ক্ষেত মাইলের পর মাইল অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে অদূরপ্রসারিত তৃণক্ষেত্রের উপর শাদা রঙের এক প্রকার কুল অল্প কুটীরা রহিয়াছে—যেমন সবুজের উপর শাদা কুলতোলা বিরাট কার্পেট ভূপৃষ্ঠে বিছানো।

জমায় এই গ্রামে উপর প্রথম বাতশত। মবেবর মাসে কদল কাটা হইলে পর লোকদের বাৎসরিক বাটুনির অবসান হয়। ভাল বৃষ্টি হইলে তাঁদের বাতশাও হয় না। তখন তাহারা তীর্থযাত্রার বাহির হয়। মাকে মাকে জোজের আরোহণও করে। প্রাচীনকালে এই সময় তাহারা বৃদ্ধযাত্রার বহির্গত হইত।

সেচ-ব্যবহার কালে কেবল সেচ-অঞ্চলের মত শুষ্কনির্মিত স্থানসমূহের অধিবাসীদেরও হুগতি এবং হুতিকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হইয়াছে। ইহার দক্ষম অদ্যবর্তী হইলেও ক্ষেতগুলি প্রচুর জল পার বলিয়া কদল সঠক হয় না, উপরন্তু

কার্পাসদ্বারা হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়াও লোকেরা বেশ দু' পরগা যোজনায় করিয়া থাকে।

সুদানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

তুলাই সুদানের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। গত বৎসর তুলা রপ্তানি করিয়া এদেশের প্রায় ২,২০,০০,০০০ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। একা ব্রিটেনই সুদানের নিকট হইতে ১,৮০,০০,০০০ পাউণ্ডের তুলা কিনিয়াছিল। আর ভারতবর্ষ



একজন সুদানী সিপাহী

ক্রয় করিয়াছিল ২০,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের। তুলার দর যে ভাবে চড়িতেছে এবং উৎপাদনও বেরূপ বাড়তির পথে তাহাতে আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরে তুলা রপ্তানি দ্বারা সুদানের আর অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

সুদানের উপর দ্রব্যাদির মধ্যে তুলার পরেই আয়ব্যা কমান্ডের স্থান—হুনিয়ার বাজারে তাহার এই জিনিসটির এক-চেট্টার কারবার। এই বাণিজ্যত রপ্তানি দ্বারা গত বৎসর সুদানের লাভ হইয়াছিল ২,০০,০০০ পাউণ্ড।

এই দেশ একাও একাও মরুভূমি, চারণভূমি এবং বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ—এখানকার উপজাতীর লোকেরাও অল্পসংখ্য। সেইজন্য এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পণ্যদ্রব্য অভাবেরই একান্ত অভাব। কার্পাস-তুলা এবং জনার ছাতা সাহায্য

পরিমাণ চামড়া, বিদেশের চিকিৎসাধারার জট হস্তশিল্প পণ্যপত্রী এখানকার রপ্তানিদ্রব্য।

মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া সুদান জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনাসমূহকে কার্যকরী করিবার বহুপাতি, তৈরি মাল এবং অন্যান্য বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল। গত বৎসর সুদান বিদেশ হইতে মোট ২,৫০,০০,০০০ পাউণ্ডের পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ব্রিটেন হইতে আসে ৮০,০০,০০০ পাউণ্ডের আর ভারতবর্ষ হইতে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ডের—অধিকাংশই বয়স-সম্পর্কিত বহুপাতি।

জাতিগঠনমূলক সরকারী পরিকল্পনা

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সুদান গবর্ণমেন্ট একটি দশ বৎসরের পরিকল্পনা লইয়া জাতিগঠনমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হয়। এই পরিকল্পনার চারিটি অঙ্গ—সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি এবং জনহিতকর কার্য।

বর্তমানে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পরিচালনাবীনে ষাটটুকি ক্যাকাল্টি সম্বলিত একটি উন্নত বরণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১২০০ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট এক লক্ষ। সরকার ষাটটুকি, ওমতারমান এবং অন্যান্য শহরে কলকগুলি শিল্পবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

চিকিৎসা এবং বাহ্যাবিবরণ উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

চিকিৎসা এবং বাহ্যাবিবরণ উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রসারও এই দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত। পরিকল্পনার এই অংশটি কার্যকরী করিতে গিয়া কর্তৃপক্ষকে দুইটি প্রবল প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হয়—প্রথমতঃ, এই কার্যের জট যে বার বরাহ করা হয় তাহার অপ্রাচুর্য আর দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় অধিবাসীদের চিরচরিত অভ্যাস এবং কুসংস্কার। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবন্ধসমূহ বহুলাংশে অপসারিত হইয়াছে। আজ সুদানের প্রত্যেক মগরী এবং মকবল শহরে আধুনিক ব্যবস্থা-সম্বলিত হাসপাতালসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাসপাতালের দৌকাগুলি ওষধপত্র এবং চিকিৎসাবিবরণ অন্যান্য উপকরণাদি সহ নীল মদ এবং তাহার উপদ্রবীসমূহের বৃক্ষের উপর দিয়া বিভিন্ন গ্রামে বাতায়িত করে।

সেচ-ব্যবস্থার ফলে গেজিয়ার যে বিরূপ উন্নতি হইয়াছে আমরা পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

গেজিয়ার উন্নয়ন-পরিকল্পনা

সরকারী কর্তৃপক্ষের অত্রাভ চেষ্টার গেজিয়ার উন্নয়ন-পরিকল্পনা সাক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। গেজিয়ার কবাটার নামে দীপ, কিন্তু এই সুদান গেজিয়ার আসলে একটি উপদ্বীপ। এখানকার প্রায় পাঁচ লক্ষ একর উর্বর জমিতে বৌদ কৃষি

ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সরকার এবং জনসাধারণ উভয়েই এই যৌথ কৃষির অংশীদার। এই অংশীদারী ব্যবস্থা অস্থায়ী কার্পাসের মরসুমে কেত চাষ হইতে শুরু করিয়া চারাগাছ রোপণ—ভুলা সঞ্চেহ, বীজ ছাড়ানো পর্য্যন্ত পর্ব্বমেট্টই চাষীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন। সরকার চাষীর জন্য ক্মির যক্ষোবস্ত করিয়া দেয়—কেতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, চাষীকে বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেয় এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন সম্বন্ধে যথোচিত নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। বাকারে ভুলা বিজ্ঞানের ব্যবহাও সরকারী তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে। চাষীকে প্রয়োজনবোধে সরকারী ঋণ দিবার ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেক চাষী প্রায় চল্লিশ একর ক্মি পায়, তন্মধ্যে অন্ততঃ দশ একর ক্মিতে ভুলা উৎপাদন করিতে সে বাহা—বাকী ক্মিতে সে নিজের মুশীমত ক্মনার, ভরিতরকারী এবং অন্যান্য কসল ক্ময়াইতে পারে।

এমনিভাবে সরকারী ব্যবস্থাবোধে যৌথ কৃষির দ্বারা যে আর হয় তন্মধ্যে সরকার লন শতকরা যাট ভাগ—মূলধন বিনিয়োগ এবং চাষবাসের ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সহায়তা ইত্যাদির দরুন, আর চাষীকে তার শ্রমের বিনিময়ে বেওয়া হইরা থাকে শতকরা চল্লিশ ভাগ।

গেজিরা উন্নয়ন-পরিচালনা এখনো প্রাথমিক অবস্থায়ই আছে বলা চলে। পরিচালিত পাঁচ লক একরের মধ্যে মাত্র দুই লক একর ক্মিতে জলসেচ এবং উন্নত ধরনের কৃষির ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু সমগ্র সুদানে ইহাই লক্ষ্যপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কৃষি এবং অর্থনৈতিক পরিচালনা। দোতিরেট ইউনিয়নের বাহিরে বতগুলি যৌথ কৃষি-বিসয়ক, পরীক্ষাবুলক প্রচেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সবচেয়ে বেশী লাক্ষ্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

কিন্তু ইদানীং ইঙ্গ-মিশরীর রাজনৈতিক বিরোধের দরুন গেজিরা-পরিচালনা এবং সুদানের অল্পরূপ অজ্ঞাত উন্নয়ন-পরিচালনা ব্যাহত হইতেছে। কেননা ১৯২৯-এর নীল নদের জল-রাশি সম্পর্কিত চুক্তি (Nile waters agreement) অনুসারে সুদান নীলনদের জলের কেবলমাত্র শতকরা ত্রিংশভাগ হই ভাগ ব্যবহারের অধিকারী—বাকী সমুদয় অংশ মিশরের এলাকাভুক্ত। দীর্ঘকাল ধাবৎ এই চুক্তির অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলেও কাররো-বারট্রুই-লন্ডনের রাজ-নৈতিক বিরোধের স্তূ নীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

সুদান এবং মিশরের প্রধান সমস্যা হইতেছে নীল নদের

জলের সমস্যা। অনেকগুলি সেচ-পরিচালনাই সুদান-সরকার করিয়াছেন, কিন্তু যে বারিরাশি সুদানকে বিবোধ করিয়া বহিরা যাইতেছে তাহার শতকরা দুই ভাগের বেশী কাকে লাগাইবার অধিকার সুদানবাসীর মাই। সরকারী অহুমতিপন্ন ছাড়া কোনো সুদানী চাষী এই মুক্তগতি নদীর অন্য বারিরাশি হইতে দুই গ্যালন মাত্র জল পর্য্যন্তও নিজে



সুদানী সিপাহীর দ্রী

কেতে পাম্প করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। 'নাইল ওয়াটার এগ্রিমেন্ট' এমনিভাবে তাহাদিগকে আটপুটে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই চুক্তির কলে মিশরও যে খুব লাভবান হইতেছে তাহা নয়। মিশর নীল জলের বাকী ২৮ অংশের অল্পমাত্রই ব্যবহার করিতে পারে—শতকরা যাট ভাগই সরাসরি চলিয়া যায় ভূমধ্যসাগরে। কাকেই নীল-নদের বারিরাশির অংশীদারিত্ব সম্বন্ধে একটা যথার্থ স্তূ চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কি সুদান, কি মিশর কাতারো কল্যাণ হইতে পারে না—এটা উত্তরেরই মরণ-বাঁচনের সমস্যা।

বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্তূ হইয়াছে তাহার দরুন সুদানের স্তূ অর্থনৈতিক মত্রে, শিক্ষাবিসয়ক পরিচালনা-সমূহও বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। বারট্রুই ইউনিভার্সিটি কলেজ সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিকোত্তের সকার হইয়াছে, কলে গত দুই মাস ধাবৎ ইহা বন্ধ। ওমদারমান নগরেরও অনেকগুলি বিদ্যালয় এবং অজ্ঞাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বারট্রুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। সুদানের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা অব্যাহত থাকিয়া যাহাতে দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ লাভিত হইতে পারে সেই জন্ত সুদানকে লইয়া স্তূ ইঙ্গ-মিশরীর রাজনৈতিক বিরোধের আত অবসান একান্ত আবশ্যক।

রাজনগর ঐননীমাধব চৌধুরী

ইন্ড হুইলী বিলের ধারে মাঠে বেকাইতেছিল। মাধব তাহার নামা রকমের চিন্তা। সে এক অচমকৎ যে, হুইলী বিলের ওপারে অন্তর্গামী দুর্বোর শোভা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। হুইতে হুইতে তাহার মনে হইল দুই দেউলীদের ইটের পাঁজার নীচে একজন লোক বলিয়া আছে। দেউলীদের ইটের পাঁজা দেখিয়া তাহার মনে পড়িল কয়েক বৎসর আগেকার কথা যখন সে ও দেবানন্দ প্রায়ই ঐ পাঁজার আড়ালে হুইলী বিলের দিকে খুঁব করিয়া বলিয়া নামা রকম আলোচনা করিত, কবিতা আরতি করিত, লুকাইয়া আমল-মঠ প্রভৃতি বই পড়িত। তাহাদের সেই প্রিয় জায়গাটি কে অধিকার করিল তাহিয়া ইন্ডের কোতুল হইল। সে ইটের পাঁজার দিকে অগ্রসর হইল।

ধানিকটা দূর হইতে সে বিন্মিত হইয়া দেখিল হুইলীর এলিষ্টার্ট হেড মাষ্টার যতীনবাবু একখানি ইটের উপর বলিয়া এক মনে কি যেন পড়িতেছেন। সে কাছে বাইতে যতীনবাবু তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ভাড়াভাড়া হাতের কাগজখানা পকেটে রাখিয়া তিনি বলিলেন—তুমি একা একা এত দূর বেকাতে এগেহ? তোমার বাবা কেমন আছেন?

ইন্ড বলিল—বাবা একটু ভাল আছেন। আপনি মাঠের মধ্যে বসে কি পড়লেন মাষ্টার মহাশয়?

যতীন বাবু তাহার ইষ্টকালন ভ্যাগ করিয়া উঠিয়া উঠাইলেন। বলিলেন—একখানা নুতন কাগজ বেরিয়েছে তাই দেখছিলাম। তোমার বোকম্বার তারিখ কবে?

ইন্ড—তা জানি না। সমরমত খবর আসবে বাবার ভক্ত। কি নুতন কাগজ মাষ্টার মহাশয়।

যতীনবাবু—কাগজখানার নাম সুগাতর। কিছুদিন থেকে বেরুচ্ছে। চলকাতা থেকে একজন একটা মাত্র সংখ্যা পাঠিয়েছেন।

ইন্ড—কাগজখানার নাম শুনেছি মনে হচ্ছে। দেখি কি রকম কাগজ।

যতীনবাবু পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া ইন্ডের হাতে দিলেন। কাগজখানা পুলিতেই ইন্ডের চোখে পড়িল একটা আরগার লাল কালিতে ঘোটা করিয়া দাগ দেওয়া। তাহাতে এই মর্মে লেখা ছিল:

“যে দেশে ৩০ কোটি লোক বিদ্যা আপত্তিতে দাসদের মুখল পরে রয়েছে সে দেশে বীর ক্বাবে কি করে? যে দেশে যুধের প্রাণ তাত থেকে হিমিরে মিলেও, কোর করে

অন্তঃপুরে চুকে মেরেদের মর্যাদাহানি করলেও লোকে অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে, এ দৃষ্ট চোখে দেখেও প্রতিকার করতে এগোয় না সে দেশ বীরের পক্ষে বক্যা। হাজার বার পদাঘাতে কর্করিত হয়েও যে জাতির আত্মনয়ানবোব আপে না সে দেশ মহুত্বহীন। বিলাতের এক সভার একজন ভারতীয় বান্ধী ভারতবাসীদের অতাব-অভিযোগের কথা বল-হিলেন। একজন সাধারণ শ্রমিক বক্তৃতার শেষে তাঁর কাছে এসে কাছে কানে ভিজেন করল—তোমাদের দেশের লোক সংখ্যা কত? তিনি বললেন—খ্রিণ কোটি। শুনে শ্রমিক বলল—তা হলে তোমরা পচে মর গিয়ে। একজন সাধারণ শ্রমিক পর্য্যন্ত ভেবে বিন্মিত হ’ল কি করে এই বিনুলসংখ্যক লোক এক ঘোটে দাসদের তার বইতে রাখী হয়েছে। আর আমাদের দেশের জানী ব্যক্তির একে বলছেন ডিভাইন ডিস-পেন্সেসম—বিষাতার বিষাম। আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কল হেছে এই শ্রেণীর বিষাতার বিষাম। ভগবান এই সংস্কৃতির হাত থেকে দেশকে বাঁচান।”

ইন্ড যতীনবাবুকে বারমন্ ও শেলীর তক্ত রাজনগর হুইলীর এলিষ্টার্ট হেডমাষ্টার বলিয়া জানিত। গোষ্ঠার বদেখী আন্দোলনে যোগদানে তাঁর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। সেবার যতীনবাবু রাজনগরে আসিবার পর হইতে তাঁহার মধ্যে যেন ধানিকটা পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি বেঞ্চালেবক সংগ্রহ ও তাহাদের শিকানান ব্যাপারে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইন্ড তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও জন্মে নাই। আজ তাহার হাতে সুগাতর দেখিয়া হঠাৎ যেন সে মুগ্ধ করিয়া তাহার পরিচর লাভ করিল।

ইন্ড যতীনবাবুকে তাহার পরিভ্যক্ত আসনে বসাইয়া দিলে তাহার পাশে বসিল। তার পর হই জন্মের মধ্যে নামা রকম আলাপ আরম্ভ হইল। অবশেষে ইন্ড তাহাকে নিজের সমস্তার কথা বলিল। বীর ভাবে তাহার সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—সভ্যা হয়ে এস। চল এবার ওঠা বাক। তোমার প্রায়ের উত্তর আমি পরে দেব। উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা দ্বিঙ্গ পড়তে দিতে চাই। আমার একখানা সংগ্রহ-বাতা আছে। দেশের নামা সমস্তা, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের সমস্তা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জাতীয়তা-বান্ধী কাগজে যে সকল মত বোরার আমি সেগুলো সংগ্রহ করে রাখি সেই বাতায়। তুমি বেকা ভিজেন করলে তার উত্তর ধানিকটা করেকখানা কাগজের সাঙ্কেদন থেকে

পাবে। আগে তুমি সেগুলো পড়ে নাও, তার পর আলোচনা করা যাবে।

ইন্ড বলিল—চলুন আপনার বাড়ী গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসি।

বতীন্দ্রবাবু বলিলেন—আজ রাত হয়ে যাবে। তুমি বাড়ী যাও। কাল সকালে আমি খাতাখানা তোমাকে দিয়ে আসব, তোমার বাবাকেও দেবে আসব।

ইন্ডের বাড়ীর লম্বা দিবা বতীন্দ্রবাবুকে তাঁহার বাড়ীতে কিরিত্তে হইবে। বিদ্যার লইবার সময় ইন্ড বলিল—মাষ্টার মশাই, খাতাখানা আনতে তুলবেন না।

ইন্ড কাছারি-বাড়ীর পাশ দিবা বৈঠকখানা দালানের দিকে যাইতেছে এমন সময় বৃদ্ধ নারেন্দ্র তাকাতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিল—ছোটবাবু একটা কথা আছে।

ইন্ড সেখানে দাঁড়াইল। নারেন্দ্র কাছে আসিয়া নিয়কণ্ঠে বলিল—ছোটবাবু, তার এসেছে কাল আপনাকে সদরে যেতে হবে। ও-বাড়ীর রায় বাহাদুর বললেন, তিনি সঙ্গে যাবেন, আর কথাটা যেন কর্তাবাবুকে না জানানো হয়। যা বলতে হয় তিনি নিজে বলবেন।

ইন্ড সব শুনিয়া বলিল—আজ্ঞা।

সে বৈঠকখানা-দালানের মধ্য দিবা পিঠার ঘরের কাছে গিয়া চিখরীয়া গলা শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। চিখরী বলিতেছিল—আমার কথা রাখুন বাবা। যদি এ তালু সংসারে আবার ত্রি কিরিতে আনতে চান... ইন্ডের মনে হইল কাম্যার চিনির কথা বন্ধ হইয়া গেল। পিঠাকে তিনি কি বলিতেছিল তাহা সে অনুমান করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি আর কিছু না বলতে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিল না।

পাশের ঘরের ভিতর দিবা সে অন্যরে গেল। উঠানে একটা লঠম হাতে সুকীর মা দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—বাহার বাড়ী থেকে পাঠেছি কি একজন সড়কে ডাকি, তুমি একটু খাড়াও লক্ষী দিদিমণি। একা কিরতি মোর ভর করবি।

ইন্ড সুকীর সুকীর মা লঠম লইয়া লক্ষীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যাইতেছে। সে বলিল—সুকীর মা লঠম আমাকে দাও। বাইরে থেকে কাউকে ডাকতে হবে না, আমি যাচ্ছি। লক্ষীকে ডেকে দাও।

সুকীর মা মাথার কাপড় দিয়া লঠম মাঝাইয়া রাখিয়া সরিয়া গেল। লক্ষী অপরাহ্নের ঘরে বসিয়া সুগরীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। সুকীর মা তাহাকে ডাকিয়া আমিল। বলিল, ছোটবাবু নিজে যেতেছেন দিদিমণি, আমার বাওরার কাম কি?

ইন্ড আগে আগে লঠম হাতে চলিল, পিছনে লক্ষী। হু' ভয়ে দীর্ঘাক ভাবে পথ চলিতে লাগিল, অবশেষে জীবানন্দের বাড়ীর কটকের সামনে আসিয়া ইন্ড সরিয়া দাঁড়াইল লক্ষীকে পথ দিবার জন্ত। বলিল—আমি এবার যাই।

লক্ষী এক পা ভিতরে সিঁদাছে, ইন্ড বলিল—লক্ষী, একটা কথা বলব।

লক্ষী কিরিত্তা দাঁড়াইল। ইন্ড বলিল—কাল আমাকে সদরে যেতে হবে। যদি আমার জেল হয়, আমি কিরিতে না পারি বাবাকে তুমি আগের মত দেখো। চিহ্ন ওপর বেশী ভরসা করি নে, তারপর হঠাৎ হয়ত তার বস্তুরবাড়ী থেকে লোক এসে পড়বে নিজে বাবার জন্ত। তুমি না দেখলে কিরে এসে হয়ত বাবাকে আর দেখতে পাব না। দেখবে তুমি?

লক্ষী মাথা নোড়াইল। ইন্ড কিরিত্তার জন্ত পা বাড়াইয়াছে, লক্ষী আগাইয়া আসিয়া হেঁট হইল প্রণাম করিবার জন্ত। ইন্ডের পাছের উপর সে মাথা রাখিল, মাথা আর উঠে না। ইন্ড লঠম নামাইয়া রাখিল; লক্ষীর মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিবার জন্ত ডান হাত বাড়াইল। বৃদ্ধ, কোমল স্বরে বলিল—লক্ষী ওঠ।

ইন্ডের নিজের চোখ কেমন যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইল। লক্ষী উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্ডের প্রসারিত হাত তাহার মাথার না লাগিয়া চিবুক স্পর্শ করিল।

জিনহনী দোতলার জানালা দিয়া আলো দেখিতে পাইয়া বলিলেন—কে?

ইন্ড বলিল—কাকীমা, লক্ষীকে পৌছে দিয়ে গেলাম।

জিনহনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ওপরে এসো বাবা, একটু বসে যাও।

ইন্ড—আজ যাই কাকীমা, বাবার ওষুধ দেখার সময় হ'ল, ঘেরী হয়ে যাবে।

লক্ষীর দিকে চাহিয়া সে বলিল—তুমি ভেতরে যাও লক্ষী, আমি যাই।

ইন্ড চলিয়া গেল।

পরের দিন ইন্ডকে সঙ্গে লইয়া জীবানন্দ সদরে রওনা হইয়া গেলেন। তার পরের দিন বাংলার ইতিহাসে একটা অরণীর দিন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক কনকারেন্সের অধিবেশন হইবে স্থির হওয়ার পরে বরিশালের জেলা-কর্তৃপক্ষ বরিশাল “ইন এন্ডেট অব মিউটিমি” বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই বিজ্ঞোহ দমন করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল। দাবা সলিডুজারের কাছারি-বাড়ী রেজলেশন লাট্টিবারী রিকর্ড পুলিশ ও বন্দুকধারী কন্সটেবলে ভরিয়া গেল। শহরে বন্দে মাতরম্ বলা আগেই বন্ধ হইয়াছিল—সভা, সমিতি, শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ হইল।

কনকারেন্সের দিন সকাল আটটার কলিকাতা, বশোহর, খুলনা, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিদের লইয়া টিমার বাটে আসিয়া লাগিল। প্রতিনিধিরা সমবেত রূপে

চিংকার করিলেন—বন্দে মাতরম্। বাটে বহিরাগতের গণ্যমাত্র ব্যক্তিরা উপস্থিত, প্রতিনিবিশের অত্যধিক করিবার ভয়। প্রত্যুত্তরে বাটে হইতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠিল না। সুলতানী সারফুলারে বহিরাগত বন্দে মাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ। এটি-সারফুলার সোলাইটের সত্যেরা বাটে মানিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগিল, সারফারী নিষেধ অমান্য করিয়া সমস্ত রাত্তা তাহারাই ধ্বনি দিতে দিতে চলিল।

রাণা বাহাদুরের হাডেলী হইতে প্রতিনিবিশ সত্যরূপে বাইবার ভয় বাহির হইয়া আসিলেন। আগে চলিলেন সুহেজ-নাথ ও অন্যান্য মেতারা, তাঁহাদের পশ্চাতে এটি-সারফুলার সোলাইটের সত্যরূপ। সহস্র পুলিশ-সাহেব ক্যাম্প ও লাঠিধারী কমেটবলরা আসিয়া সত্যদের বিরুদ্ধাচরণ করিল। ক্যাম্প সত্য-দের হত্যা করিল—ব্যাক খুলিয়া কেল। তাহারাই অধীকার করিল। সবে সবেই আক্রমণ আরম্ভ হইল। রেগুলেশন লাঠিধারী পুলিশ চারদিক হইতে সত্যদের মাথার, পিঠের, বাহুতে আঘাত করিতে লাগিল। প্রহারে অর্জিত হইয়াও তাহারাই ধ্বনি দিতে লাগিল বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্। অনেকের মাথা কাটরা হস্তে যুধ, জামা, কাপড় লাল হইল, কেহ কেহ মাটিতে পড়িয়া গেল ভবু বন্দে মাতরম্ ধ্বনির বিরাম নাই। বালক চিত্তরঞ্জন চিংকার করিতেছিল বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্। তিন জন কমেটবল তাহাকে মারিতে মারিতে এক ডোবার মধ্যে কেলিয়া দিল। ডোবার কলে বালক বধন নিমজ্জমান ভবনও তাহাদের লাঠি চলিতে লাগিল অবিরাম। অবশেষে একজন হিন্দু কমেটবলের লাঠি ধামিয়া গেল। হেলোটী ভূবিরা মরিতেছে দেখিয়া সে তাহাকে বল হইতে উঠাইল। বালক ভবন অটোচন্য।

ইতিমধ্যে পুলিশ সাহেব ক্যাম্প সুহেজনাথকে প্রেরণ করিল। প্রেরণের পরেই তাহাকে ব্যাকিষ্টেটের কাছে উপস্থিত করা হইল। সরাসরি বিচারে তাহার ভবিষ্যৎ হইল। সুপেক্ষমাণ বহু প্রতিনিবিশের উপর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া বটনাহলে আসিয়া অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি পুলিশকে বলিলেন—‘ওঁদের মারছ কেন? আমাকে মার’। একজন কমেটবল বলিল—এই ব্যাটারের মারবার হুকুম নাই।

লাহিড, প্রহারে অর্জিত প্রতিনিবিশ অবশেষে সত্য-রূপে পৌছিলেন। তাঁহাদের সকলের মনে এই লাহিয়ার আগুন অলিভেছিল। তাঁহারাই আবিভেছিলেন পূর্ববন্দে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হইয়া অরাজকতার স্রষ্টা হইয়াছে। এটি-সারফুলার সোলাইট ও ভবানীপুর লেবক সম্প্রদায়ের সত্যেরা সত্যপতির মকের উপর দাঁড়াইয়া গাম ধরিলেন—লাল পাগড়ি ও কাল কোর্টা ছুড়ু তর দেথাও করে? সত্যর উদ্ভবনা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, গাম বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

সত্যপতি এ. রহুলের অলিভাষণ শেষ হইলে কয়েকজন ভক্তলোক সর্বোদে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি বালক ও একটি যুবককে বরাবরি করিয়া সত্যরূপে আনিলেন, তাহাদের সঙ্গে আসিলেন মনোরঞ্জন ওহঠাকুরতা। বালকটি তাঁহার পুর চিত্তরঞ্জন ও যুবকটি মৈমনসিংহ মুহম্মদ সনিত্তির অঙ্কে গাফুলি। মনোরঞ্জন ওহঠাকুরতা স্রোতাদের সন্মোদন করিয়া বলিলেন, “আপনারা মনের চোখে দেখুন পুলিশ এদের কি রকম নির্মম ভাবে প্রহার করেছে। মারের চোটে আমার হেলের প্রবল অর এসেছে, অরের ভাঙলে সে কাঁপছে। আমার হেলে যদি মারা যায় তা হলে আমি পূর্ববোধ করব।”

দ্বিতীয় দিনের অবিশেষণ আরম্ভ হইলে বাগেরহাটের এক উকিলের চিঠি সত্যর পড়া হইল। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী কয়েকটি টাকা ও সোনার বালা পাঠাইয়াছেন পুলিশ যে কারাগার হেলের রক্তপাত করিয়াছে সেখানে একটি স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিবার ভয়। চিঠিখানি পড়া হইলে সত্যর প্রবল উদ্ভবনার সকার হইল। চট্টগ্রামের এক কবিদায় সত্যপতির টেবিলের উপর পাঁচ শত টাকার এক থলিয়া রাখিলেন জাতীর বিশ্ববিভাগের প্রতিষ্ঠার ভয়। মৈমনসিংহের বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারিণী এক মহিলা এক লক্ষ টাকা এবং আরও কয়েকজন মিলিত ভাবে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিবেন জানাইলেন।

এই সময়ে প্রকাণ্ড একটি পুলিশ বাহিনী লইয়া পুলিশ সাহেব ক্যাম্প সত্যরূপের প্রবেশপথে উপস্থিত হইয়া জানাইল, সত্য তাদিরা দিবার ভয় আদেশ হইয়াছে, সে আরও জানাইল প্রয়োজন হইলে ডলি চালাইবে। এই কথা শুনিয়া সত্যর উপস্থিত অনেক অত্যন্ত উদ্ভবিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাই বলিলেন যে, পুলিশ ওলী চালাইয়া তাঁহাদের হত্যা করুক, তাঁহারাই নতিবেদন না। সত্যর পাঁচ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মেতারা মহিলাদের দেখাইয়া বলিলেন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাবিলে বহু লোকের প্রাণ মষ্ট হইবে, মহিলারাও বাদ যাইবেন না। প্রতিনিবিশা ভবন শান্ত ভাবে সত্যরূপে ত্যাগ করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে একটি গৃহে মিলিত হইয়া প্রতিনিবিশা ও স্থানীয় লোকেরা বিরাট এক সভা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বহিরাগত কনকারেলের প্রতিনিবিশের উপর পুলিশের বর্ষরোচিত আক্রমণের সংবাদ দেশব্যপী সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। গোলকীমিতে দুইটি সত্যর সত্যরূপের চক্রবর্তী, সুহেজ সমাকপতি, আন্তোব চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তীর্থ ভাবার পুলিশ ও পূর্ববন্দ-সরকারের আচরণের নিন্দা করিলেন। “আগুন অলিভ, পূর্ববন্দে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান” এই শিরোনামের সংবাদপত্রে পুলিশী আক্রমণের বিবরণিত

বিষয় প্রকাশিত হইল। কোম কোম কাগজ লিখিল—
“দেশের উপর দিবা এলয়কর বড় বহিভেদে, লোকের মনে
শেপেরোয়া ভাব”, “উঠ, আপো তাই সব, শব-সাধনার সিঁচি
লাভ করিবার সুযোগ আসিয়াছে।” কেহ কেহ বরিশালের
পুলিসী ভাওনের নাম দিল—কুলার লু বা ইষ্টার হাণ্ট, কেহ
লিখিল পূর্ববঙ্গের মাধির খাহ কুলার, কেহ লিখিল পূর্ববঙ্গের
মহম্মদ ভোগলক কুলার। লাহোর, মাদ্রাজ, মুম্বা প্রভৃতি
স্থান হইতে সহস্রভূতিবৃক্ষ তার আসিতে লাগিল। দেশের
বহু স্থানে সভা করিয়া কুলারী কুশালনের তীব্র মিন্দা করা
হইল। বেঙ্গলী “দি হিয়ার ইক অন কারার” (“The heather
is on fire”) হেভিং দিবা লিখিল—বরিশালের ব্যাপারে
সমস্ত ভারতবর্ষে বিকোভ দেখা দিয়াছে। যথেষ্টাচারের
প্রতিবাদ করিবার জন্য ভারতবাসী আজ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া
বীড়াইয়াছে।

কলিকাতার লোকের মুখে মুখে ও সংবাদপত্র মারকত
দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইল কাব্যবিখারদের গান—

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'ল লাঠির বারে।
ঐ যে মারের জয় গেরে বার বন্দোভাতম বলে।
রক্ত বইছে শত বার, মাই কো নজি চলিবার
এরা মার খেরে কেউ না তোলে না, সহ্যে অভ্যাচার।
আছে দিবা চকু বার, খোল ভবিষ্যতের বার
সময় হলে পশুবলের দেখবে প্রতিকার।

১১

আপিলের বিচারে ইজের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যদ্বারে
দুই মাস কারাবন্দের আদেশ হইল। ইজদের এন্ট্রের উকিল
করিমানার টাকা দাবিল করিয়া ইজকে সঙ্গে লইয়া আদালত
হইতে বাতীতে ফিরিলেন। জীবামন্দ আপিলের কল তুমিরা
একটা বাড়ির নিবাস কেলিলেন। আর বিলম্ব না করিয়া
তিনি ইজকে সঙ্গে লইয়া রাজমণ্ডরে ফিরিবার ব্যবস্থা
করিলেন। হরিমারায়ণের কাছে ইজকে ফিরাইয়া দিতে
পারিলে তাঁহার একটা গুরুত্বার দারিদের অবসান হয়।

পরদিন রাজমণ্ডরে পৌছিয়া ইজকে সঙ্গে লইয়া জীবামন্দ
হরিমারায়ণের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন যুগ্মী, চিন্নী ও লক্ষী
তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া আছে, হরিমারায়ণ কি
বলিতেছেন। আগে চিন্নীর দৃষ্টি পড়িল ইজের উপর। সে
উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল, বাবা, ছোটনা খালস
পেরেছেন।

ইজ শিকাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কাছে বলিল। হরি
মারায়ণ তাঁহার মাথার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।
জীবামন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ভায়া, তুমি আমাকে
নুতন জীবন দিলে। একটু রহতম্বর হানি হানিরা তিনি

আবার বলিলেন, কিন্তু তোমার ঋণ আমি বাতী রাখব না,
সুদে-আসলে শোধ দেবার চেষ্টা করব।

পিতার কথা শুনিয়া চিন্নী লক্ষীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া
একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, চল, আমরা কাকাবাঘ ও
দাদার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি।

জীবামন্দকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, কাকাবাঘ, আপনি
কল খেরে লক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি লোক পাঠিয়ে
কাকীমাকে খবর দিচ্ছি যে দাদাকে নিয়ে আপনি ফিরেছেন।

জীবামন্দ বলিলেন, আমি স্নান না করে কিছু খাব না।
আমি এখন বাতী বাই, ওবেলা এসে তোমার হাতের সরভাখা
খাব।

লক্ষীকে লইয়া চিন্নী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জীবামন্দ সংক্ষেপে হরিমারায়ণের নিকট ইজের মোকদ্দমা-
সংক্রান্ত সমুদয় কথা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন, দাদা,
এবার জব্বাসাহেবের উপদেশমত কাজ করবার আয়োজন
করুন, আর দেরি করবেন না।

হরিমারায়ণ যুহু হাসিয়া বলিলেন, আমি সে কথা ভেবে
মনস্থির করেছি। ওবেলা তোমাকে সব বলব। রাত খেপে
এসেছ, এবার বাতী নিয়ে স্নান-আস্তিক সেয়ে মাও পে।

লক্ষীকে সঙ্গে লইয়া জীবামন্দ বাতী ফিরিলেন। পথে
লক্ষী বলিল, আপনার মাঝে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে
কাল। মার কাছে রয়েছে, এখনও খোলা হয় নি।

টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া জীবামন্দ একটু ব্যস্ত হইলেন।
বলিলেন, তুমি ত ইংরেজী কিছু কিছু বুঝতে পার, খুলে
দেখ দি কেন?

লক্ষী বলিল, না বললেন, তুমি কি বুঝতে কি বুঝি, এখন
থাক, তোমার বাবা এসে খুলবেন।

বাতীতে ফিরিয়া জীবামন্দ জিমরদীর কাছে মোকদ্দমার
ফিরিতি দিলেন। বলিলেন, আমার কাঁধ থেকে রক্ত বড় এক
বোকা মেয়ে গেল। কত উপকার ওদের কাছ থেকে নিয়েছি,
এবার সামান্য কিছু ঋণ শোধ করবার সুযোগ পাওয়া গেল।
সে কথা থাক। লক্ষী বললে, কাল একখানা টেলিগ্রাম
এসেছে। খুলে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিলে পারতে।

জিমরদী বলিলেন, আজ তুমি না ফিরলে তাই করতাম।
টেলিগ্রামখানা হাতে করে কেন জানিমে আমার মনটা একটু
খারাপ হয়ে গেল। বরিশাল থেকে এসেছে। কত রট্টা সেজত
কাউকে দিয়ে খোলাই নি।

জিমরদী দোস্তলায় নিজের ঘর হইতে টেলিগ্রামখানা
আনিয়া বাতীর হাতে দিলেন। জীবামন্দ খুলিয়া পড়িলেন।
তাঁহার মুখের চেহারার পরিভ্রম দেখিয়া জিমরদী উদ্বিগ্নভাবে
বলিলেন, কি খবর আছে ওতে? কে পাঠিয়েছে?

জীবামন্দ স্নান হাসিয়া বলিলেন, এখানে বসো, বলছি।

একমুঠা বে হবে আমার বুকা উঠিত ছিল। কিন্তু বুকেই বা কি করতে পারতাম ?

জিন্নরনী অস্থির হইয়া বলিলেন, কি খবর আছে ওতে আগে বল না।

জীবানন্দ—খবর বুঝি চমৎকার। তোমার হেলে গ্রেপ্তার হয়েছে।

জিন্নরনী মাটিতে বলিয়া পড়িলেন। বলিলেন, দেবু গ্রেপ্তার হয়েছে ? কেমন ? কি অপরাধ করেছে সে ?

জীবানন্দ হাসিলেন। বলিলেন, ইজাই বা এমন কি অপরাধ করেছিল ? ইন্সপেক্টর তার পাঠিয়েছে। গ্রেপ্তারের খবর দিয়ে লিখেছে পত্র বিস্তারিত জানাচ্ছে। টেলিগ্রাম থেকে শুধু এই সংবাদটুকু জানা গেল যে, দেবু বরিশাল কন্কারেল সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়েছে। তোমরা বরিশাল কন্কারেল সম্পর্কে কোন খবর পাও নি ?

জিন্নরনী বলিলেন, লোকে বলাবলি করছিল কাগজে নাকি খবর বেরিয়েছে পুলিশ কোর করে কন্কারেল ভেদে দিয়েছে, লোককে মারধোর করেছে, অরেন ব'ড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিস যখন মারধোর করছিল হোটলাট ফুলারের প্রীতম প্রস্তুত তখন নাকি নাকি নদীতে ঠাঙিয়েছিল। লোকে ফুলারের মুণ্ডপাত করছে।

জীবানন্দ—মুণ্ডপাত হবে এবার আমার চাকুরির। সে যা হোক, ব্যত হবে কোন লাভ নেই। এমার্গ ও ক্যাম্পের হাত থেকে বাঁচবার জ্ঞান আমি পালিয়েছিলাম। হেলেকে বাঁচবার চেষ্টা করি নি। একবার মনে হয়েছিল ওকে কলকাতা পাঠাই। তাও বলি, অবস্থা এখন সর্বত্র সমান। চিলি না পাওরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ক্যাম্প যখন একবার ওকে বহেছে কিছুদিন জেল না খাট্টিয়ে ছাড়বে সে সম্ভাবনা নেই।

বায়ীর কথা শুনিয়া জিন্নরনী বিষমভাবে বলিলেন, দেবুকে ছাড়বার চেষ্টা করবে না ? তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল।

জীবানন্দ বলিলেন, দেবুর বাপ পুলিশের চাকুরে না হলে চেষ্টা করা চলত। তুমি কি ভেবেছ দেবুর অপরাধের শাস্তি শুধু তার ওপর দিয়ে যাবে ? সে শাস্তির তাগ আমাদের নিতে হবে না ? মন ধরাপ করো না। ওঠ, আমার স্নানের যোগাড় করে দাও।

জিন্নরনী ব্যত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, আমি নিজী ভিজিয়ে স্নানের যোগাড় করে দিচ্ছি। তুমি শুভকণ ছাড়-বুখ হয়ে দাও।

মায়ের কাছে লক্ষী তাহার দ্বার খবর শুনি। ইজ কিনিয়া আসিবার পর হইতে তাহার মুখে কেমন একটু মিষ্ট

হাসির আশ্রয় লাগিয়াছিল। খবর শুনিয়া সে হাসি অর্জিত হইল।

লক্ষীর আগে জীবানন্দ হরিনারায়ণের ঘরে গিয়া বলিলেন। ঘরে তখন আর কেহ ছিল না। হরিনারায়ণ অনেক দিন পরে বেশ ভাল বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জীবানন্দ বলিলেন, দাদা, আপনাকে আচ্ছ অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে। আমার আশা হচ্ছে এ বাতান্টা সারলে উঠবেন।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছ মনটা ভাল আছে তাই বাইরে থেকে দেখে তোমার ঐ রকম মনে হচ্ছে। একটু হাঁটবার চেষ্টা করলে নিজেই বুঝতে পারি কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছি।

একটু থামিয়া বলিলেন, এ সব কথা যাক। একটা কাজের কথা বলছি শোন।

জীবানন্দ—কি কাজের কথা বলুন।

হরিনারায়ণ—ইন্ডের বিয়ের কথা স্থির করেছি একরকম। এখন তোমার মত পেলে কথটা পাকা হবে আর।

জীবানন্দ একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন—হ'মিনের মধ্যে স্থির হয়ে গেল ? ঘরে কোথাকার ?

হরিনারায়ণ একটু হাসিলেন। বলিলেন, হ'মিনের কথা কি বলছ ? এক দণ্ডের মধ্যে স্থির হয়েছে। তবে জানো কি ঘরের বাপ এখনও এ বিষয়ে কিছু আশেপাশে না।

জীবানন্দের বিস্ময় বাড়িল। তিনি বলিলেন—আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে, দাদা।

হরিনারায়ণ কিছুকণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর জীবানন্দের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে লক্ষীমাকে আমি নিতে চাই। বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে মত জানিও।

জীবানন্দ আসন্ন হাঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখে মুখে মুগ্ধপং বিস্ময় ও আনন্দ। তিনি বলিলেন—দাদা, লক্ষী অনেক ভগ্নতা করে এসেছিল, তাই আপনার ঘরে তার ডাক পড়েছে।

হরিনারায়ণ মুহূর্ত্তে বলিলেন—তোমার একথা ঠিক নয় জীব। লক্ষী আমার সংসারের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তার কথা আমি ভুলেই ছিলাম। মিছের মন স্থির করার পরে বুঝিতে পারছি সে আমার অন্তরে কতখানি স্থান অধিকার করে রেখেছে।

একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন—তোমাকে কিছু জানাবার আগে আমাদের হ'মিনের মধ্যে কথা স্থির হয়ে গিয়েছে। অবশ্য চিহ্ন মধ্যস্থ ছিল। বটকালির পাওনা তার প্রাপ্য। বৌমাকে জানিয়ে রেখো।

জীবানন্দ বলিলেন—আমি মনে একটা ভাব নিয়ে এসে-
ছিলাম। এখন সে ভাব হাকা হয়ে গিয়েছে।

হরিনারায়ণ বলিলেন—কিসের ভাব বল ত।

জীবানন্দ টেলিগ্রামের কথা জানাইলেন। শুনিয়া
হরিনারায়ণ কিছুকণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর
বলিলেন—ঠিক হয়েছে। দেখুও ইচ্ছা হই বহু। ইচ্ছা প্রেস্তার
হয়েছিল দেখু কি করে বাইরে থাকবে? এ নিয়ে বেশী মন
খরাপ করো না। আমার পরামর্শ শোন। বাড়ী যাও।
বৌবার সঙ্গে পরামর্শ করে বড় শীঘ্র সম্ভব বিয়ের দিন স্থির
কর। বিয়েটা হয়ে থাক। তারপর তুমি ব্রিটানিাল গিরে দেখুকে
ছাড়াবো আর কি না চেষ্টা করে দেখ। বিয়েটা হয়ে গেলে
আমরা হৃৎনে একটা বড় দার থেকে মুক্ত হই।

জীবানন্দ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—আপনি ভাল
পরামর্শ দিয়েছেন। আমি বাড়ী যাই।

ভিন্ন দিন পরে হরিনারায়ণের গৃহে একজন অপ্রত্যাশিত
অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সতীন।

সতীনের বেশভূষার পরিবর্তন হইয়াছে। সে এখন
পেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। তাহাকে পাইয়া ইচ্ছা অত্যন্ত আনন্দিত
হইল। সতীনকে বলিল—সতীন্দা, কিছুদিন আগে সারাকণ
কেবল আপনার কথা ভাবছিলাম। ঠিকানা জানা ছিল না
নইলে চিঠি লিখতাম।

সতীনের আসিবার খবর পাইয়া জীবানন্দ আসিলেন, এসি-
ষ্টেন্ট হেডমাষ্টার বর্তমানবাবুও হাজির হইলেন। ব্রিটানালের
খবর সে কিছু জানে কি না জীবানন্দ সে বিষয়ে প্রশ্ন করি-
লেন।

সতীন বলিল—কমকারেল ভেঙে বাবার পরদিন আমি
ব্রিটানালে গিয়েছিলেম। খবর সংগ্রহ করবার জন্য বদেপ-
বান্ধব সমিতিতে গিয়ে শুনলাম পুলিশ কমকারেলের প্রথম দিন
দেখু, তার বহু মহেজ বলে একটা হেলে এবং আরও কয়েকটি
হেলেকে প্রেস্তার করেছে। পুলিশ তাদের বেচ্ছাসেবকের
ব্যাক কেড়ে নেয় ও তাদের ঘরে নিয়ে যায়, কিছু মারধর করে-
ছিল। একটা নুতন অভিজ্ঞতা হ'ল ব্রিটানালে থাকতে থাকতে।
আমরা কথা বলছি এমন সময় একটা হেলে ও একটা মেয়ে
দেখানো এল। শুনলাম হেলেকটর নাম অতুল, সে দেখুর বহু।
আমার পরিচয় পেয়ে অতুল বললে, এটি আমার দামাতো
বোস, মাম সুরমা। কমকারেলের দুই দিনের অবশেষেই ও
যোগ দিয়েছিল। ওদের বাড়ী কুঁকলাসের রাজবাড়ী থেকে
প্যাতেলে বাবার রাস্তার ওপরে। নিজের চোখে চিত্তরঞ্জন ও
ব্রজেনকে অসহ্যর ভাবে পুলিশের মার খেতে দেখেছে।
বললে ব্রজেনের মাথার লাঠি। মারবার সময় সে টেচিরে পান
বরল—আমার বেত মেঝে কি না তুলাবে, আমি কি বারের
সেই হেলে—চিত্তরঞ্জনকে কাদার মধ্যে কেল দিয়ে মারছে,

যুধ পুথকে সে পড়ে গেল, কাদার ও রক্তে সারা গা, যুধ ভেলে
বাচ্ছে ভবুও থেকে থেকে সে চিংকার করছে—বলে মাতরম্।
এই দৃষ্ট দেখে সুরমা সারাদিন না খেয়ে কেঁদেছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সতীন আবার শুরু করিল
—সুরমার মুখে শুনলাম, সত্য চিত্তরঞ্জনের বাবা যখন সারা
গায়ে, মাথার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হেলেকে দেখিয়ে বললেন, হেলে
মরে গেলেও তিনি কাঁদবেন না উপস্থিত মেয়েরা তখন যুধ
নামিখে কাঁদতে লাগলেন। কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাস কেল
বললেন, তগবাম, তুমি কি নেই? এতটুকু হেলের ওপর এই
অত্যাচার তুমি কি চোখে দেখছ না?

অতুলের কথা শুনে আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম।
তার চোখে যুধে কেমন একটা হতাশার ছাপ। অতুল বললে,
আমার বাবা যুডু-সবার, ডাক্তার দেখাবার জন্য তাঁকে নিয়ে
লহরে এসেছি। ডাক্তারেরা বলেন, যে-কোন সময়ে শেষ হয়ে
যেতে পারে। তাঁকে কেল আমি কনকারেলে আসতে
পারি নি। সুরমা গিরে বরল, চল তোমার বদেপ-বান্ধব
সমিতির সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আসি। ওর যুধ চোখের
ভাব দেখে বাবার কাছে থেকে উঠে আসতে হ'ল।

সুরমার দিকে কিয়ে অতুল বললে, কি রে, কিছু বলবি?
সুরমা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমার কিছু বলবার আছে।

কিছুকণ কেটে গেল। বুঝলাম, সুরমা কিছু বলতে চাইছে,
কিন্তু বলতে পারছে না। তারপর হঠাৎ সে কোরে কোরে
বললে, চোখের ওপর এই অত্যাচার দেখেও কি আপনারা
সবাই চুপ করে থাকবেন? এত লোক, এত বড় বড় মেঠা,
সবাই কি পড়ে পড়ে মার খাবার ভত এসেছিলেম? এরই
জতে কি হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল সত্য। কত
পুলিস কত গুর্খা ছিল এমাস'নের ভাবে?

অতটুকু মেয়ের মুখে এই কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।
এমন কথা সে ভাবতে পারল কি করে? ভাবতে শিখল
কার কাছে?

আবার কিছুকণ নীরব থাকিয়া সতীন বলিল, এই মেয়েটির
কথা কয়েক দিন পরে আমার মাথার ঘুরছিল। স্থলে পড়বার
সময় একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলেম, A stormy petrel।
কয়েক দিন পরে মনে হচ্ছিল আমি যেন ঈর্ষিপেট্রেলের
পাখার বাপটানি শুনছি মাথার ওপর।

সকলে চুপ করিয়া সতীনের কথা শুনিতেছিল। বতীন-
বাবু বলিলেন, সুরমা বা বলেছিল সেই বরণের চিতা অত
লোকের মনেও ছেপেছে। আমি কয়েকখানা কাগজ দেখেছি।
লম্বা লিখেছে, “আমাদের সামনে এই প্রশ্ন উঠেছে আজ গরু
ও তেঁতার পালের মত চুপ করে মার খাওয়া ভাল না আত-
রকার মত লাঠির বধলে লাঠি ঢালানো ভাল।” অত এক-
খানা দেখলাম লিখেছে, “মা রক্ত চান। রক্ত বিনা মা

সত্যোবলাভ করেন না। যে নির্জঙ্ঘর দল নির্বিবাহে দায় ধার, প্রহৃত হইয়া বাহারা করকোড়ে প্রহরকারীর কাছে সুবিচার তিকা করে না তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না।” একথানা কাগজ আবার লিখেছে, “বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতি হইলে নিঃ এমাসনের মিয়নুত নুলায় লুটাইতেছে দেখিতে পাইতাম। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে এবং নিরীহ বালকদের রক্তপাতের প্ররোচিত করা হইবে ইংরেজের রক্তপাত করিয়া। এই রক্তপাতের পাপের দায়িত্ব আমাদের অত্যাচারীদের।”

জীবানন্দ কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার জ্বরুগল কুচিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারে তিনি মন হইতে হস্তিতা ঝড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, লক্ষণ ভাল নয়—সতীন্দ্র, কি বলো? ইতিহাস মিররের মত ঠাণ্ডা মেজাজের কাগজ পর্য্যন্ত এই মর্মে লিখেছে বেখলায়—কমতামহমদ সরকারের পক্ষে কমসভার বহননীতি চালানো খুবই সহজ, কিন্তু তার কল কি?—কল হচ্ছে শুণ্ড সম্বিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা।

হরিনারায়ণ বলিলেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পঞ্জাবও নাকি বরিশালের ব্যাপার নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কালকার হিতবাহীতে বেখলায় খুব পরম পরম কথা লিখেছে, আর ইতিহাস মিরর বা বলেছে সেই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

হরিনারায়ণের ঘরের চৌকাঠের বাহিরে একটি বালক অনেককণ ঠাঁড়াইয়াছিল। সকলে আলোচনার ব্যাপৃত থাকার কেহ তাহাকে দেখিতে পার নাই। হঠাৎ তাহার দিকে ইন্দের চোখ পড়িল। ইন্দের চাহিতে দেখিয়া বালক হাত নাড়িয়া তাহাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। ইন্দের বাহিরে বাইতে সে বলিল, ইন্দেরালা, না ডাকছেন সন্ন্যাসী-বাবুকে।

সে সতীন্দের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল। তাহার মুখে “সন্ন্যাসীবাবু” কথা শুনিয়া ইন্দের মুখে হাসি দেখা দিল। বালকটি দেবানন্দের ছয় বছরের জ্যেষ্ঠা উদাসন্দ, সকলে আদম বলিয়া ডাকে। ইন্দের ঘরের মধ্যে কিরিতা সতীন্দ্রকে বলিল, দাদা, ও-বাকীতে আপনার ডাক পড়েছে।

সতীন্দ্র উঠিল। মাঠায় বতীন্দ্রবাবুও উঠিলেন। ইন্দের আদমকে বলিল, তুমি বাকী গিরে বল উনি বাচ্ছেন। সে চলিয়া গেল।

তিন জন বাকী হইতে বাহির হইয়া রাস্তার আসিয়া ঠাঁড়াইল। বতীন্দ্রবাবু পকেট হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া ইন্দের দিয়া বলিলেন, এই খাতার কথা তোমাকে বলেছিলাম। কয়েকখানা কাগজ থেকে লফলম আছে এতে। এগুলোতে বাকীর আন্দোলনের এক বিককর দৃষ্টি নির্দেশ করা হয়েছে। পড়ে দেখে আমাকে কেরত দিও।

বতীন্দ্রবাবু ভবনকার মত বিদ্যার চাহিলেন। সতীন্দ্র বলিল, আমি আজ রাতে চলে যাব। একটা কথা আপনাকে বলছি। আপনার চাকার বাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাকে তৈরি করে থাকতে হবে। বরিশাল, করিমপুর, মাদারীপুরে দল গড়ে উঠছে। কিছুদূর লড়ে দেখা হয়েছিল। তিনি রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার ঘুরছেন। এর পর সুমিরা, মৈমনসিং প্রভৃতি জায়গার যাবেন। সবকিছুর তার এখন কিছুদূর হাতে, আমি সূচন পথের সন্ধ্যা দেখিয়েছি।

ইন্দের বতীন্দ্রবাবুর খাতাখানি খুলিয়াছিল দেখিবার জন্য কিন্তু তাহার হুই কাম একাধ হইয়া শুনিতেছিল সতীন্দের কথাগুলি। মাতার মৃত্যু ও পিতার অন্ত্রের জন্য তাহার মনের পুরাতন যে সব চিন্তা চাপা পড়িয়াছিল আবার তাহার মাথা বাড়া দিয়া উঠিল। নিজের মনকে সে প্রশ্ন করিল, আমিও কি সব ছেড়ে দিয়ে, দেশসেবার জন্য নিয়ে সতীন্দ্রদ্বার অনুসরণ করতে পারি নে?

জীবানন্দের বাকী বাইবার পথে ইন্দের নিজের মনের কথা সতীন্দ্রকে বলিতে লাগিল। সতীন্দ্র চুপ করিয়া তাহার কথা শুনি। ইন্দের কানিত না যে, তাহার অনুপস্থিতিতে হরিনারায়ণ সতীন্দের কাছে তাঁহার ছোট্ট পুত্র নিক্রদেশ হইবার কলে তাঁহার জ্বর খাওয়ান ও মৃত্যু, ইন্দের এখনকার মনোভাব, তাঁহার নিজের নারীমিত্র অবস্থা ইত্যাদির কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন, ইন্দের অতি বুদ্ধিমান ও ছদ্মবান ছিলে। দেশের বর্তমান অবস্থার সক্রিয়ভাবে দেশের জন্য কিছু করতে পারছে না ভেবে তার মনে একটা অস্থিরতা এসেছে। আমি যে ওর প্রতি একখানি লক্ষ্য রেখেছি তা সে জানে না। জীবানন্দের মেরের সঙ্গে আমি ওর বিবাহের লক্ষ্য স্থির করেছি। ইন্দের এতে অমত করবে না মনে হয়। তোমাকে সে খুব ভক্তি করে। আমার বিশেষ অনুরোধ, সকল অবস্থা বিবেচনা করে এমন কোন পথ ওকে দেখিয়ে দাও যে, ওর মনে কোন কোভ না থাকে, আর আমার কাছে থেকে সরে যাবার কথা না ভাবে।

সতীন্দ্র হরিনারায়ণকে বলিয়াছিল, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ইন্দের কথা শেষ হইবার আগে তাহার জীবানন্দের বাকী পৌছিল। আদম বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। ইন্দের বলিল, সতীন্দ্রকে কাকীনার কাছে নিয়ে যাও, আমি বৈঠকখানার অপেক্ষা করছি।

সে পকেট হইতে বতীন্দ্রবাবুর খাতাখানা বাহির করিয়া বাহিরের ঘরে বলিল।

সতীন্দ্র ভিতরে গিয়া জিনিসদ্বীকে প্রশ্ন করিয়া বলিল। বলিল, লক্ষ্মীদ্বীকে দেখছি না কাকীনা, সে কোথায়?

জিম্মদারী—সে পানের বাতীতে গিরেছে একটু কাছে, এখুনি আসবে।

জিম্মদারী প্রথমেই দেবানন্দের খবর জানিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কত দিন জেলে থাকিতে হইবে, তাহার হাত পা বা মাথা তামিয়ারে কিমা। দেবানন্দের প্রসঙ্গ ভুলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া কেলিলেন। তার পর ইজের বিচার ও জরিমানার কথা হইল। শেষে হরিমারায়ণ কর্তৃক উপস্থাপিত লক্ষীর সঙ্গে ইজের বিবাহ-প্রস্তাবের প্রসঙ্গ ভুলিয়া বলিলেন, ওঁদের ঘরের বোঁ হওয়া লক্ষীর বহু জন্মের ভগ্নভার ফল। অনেক মত হেলেকে জানাই রূপে পাওয়াও আবার কম ভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু এত আশঙ্কের মধ্যেও মনের ভর কেন যেন বুটছে না বাবা। দেবু আর ইজ একসঙ্গে বদেখীর কাছে মেসেছিল। ইজ জেল থেকে ঘুরে এল। দেবুও জেল হবে জানা কথা। ভয়ের কথা এই যে, অনেক দিন ধরে ইজ বড় উদ্যম। দেখছি—জেল থেকে কিরে ওর ঐ ভাব আরও বেড়েছে। লক্ষীর ওপর হেলেনেলা থেকে ওর টান আছে, লক্ষী ওঁদের ঘরে থাকে, আমরা বিয়ের বন্দোবস্ত করছি, কিন্তু হেলের মুখে হাসি নেই। কর্তার কাছে শুনেছি দেশে মাশা রকম সমিতি গড়ে উঠছে। এর পর বাতী ঘর থেকে কোম দলে গিরে ইজ যদি নাম লেখার মেয়েটা আমার তেলে বাবে। তুমি ওকে একটু ভাল করে বোকাও বাবা, বাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ওদিকে ইজ বলিয়া বাতা খুলিয়া পড়িতেছিল। প্রথমে করেক লাইন মন্তব্য :—“বদেখী ও বরকট আন্দোলন জাতীর আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে প্রথমে যে প্রাণের স্পর্শ ছিল তাহা যেন হুর্দল হইয়া পড়িয়াছে। কিসের জন্ত এমন হইল তাহা চিন্তা করিতে গিয়া করেকখানি জাতীয়তাবাদী কাগজের উক্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই উক্তিগুলি হইতে আন্দোলনের একটা বড় ঝুট চোখে পড়িল। এই ঝুট কি সংশোধন করা যায় না?”

এই মন্তব্যের পরে বিভিন্ন কাগজ হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইজ পড়িতে লাগিল—

১। “আমাদের সাধনার গতি পরিবর্তন করিবার সম্ভব আশিরাহে এবার। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ত জেগীর যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে কি উপারে সেই সংযোগ আবার স্থাপন করা যায় তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আবার আমাদিগকে গ্রামে গ্রামে গণে বাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে দেশের অন্তরের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে। একদিন আমরা ভ্রমলোকেরা শৈবাল ও বাসে আচ্ছন্ন পুষ্করিণীর ধারে পূর্ণহুগীর আশ্রয়ী দেশের অন্তরকে স্থগীভব করিয়া ইংরেজের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলাম। আজ শিখনে কিরি-বার দিন আশিরাহে। আমাদের তরুণের দল গ্রামে গ্রামে

আবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শক্তির চর্চা করিতেছে। গ্রামের ইতর সাধারণের সঙ্গে তাহাদের বসিষ্ঠতা করিতে হইবে।

এই বসিষ্ঠতা স্থাপনের জন্ত পূর্ণহুগীরে গিয়া তাহাদিগকে বক্তৃতা করিতে হইবে না। রেহ ও সহদরতার দ্বারা এই বসিষ্ঠতা স্থাপন করিতে হইবে। প্রতি যুবককে পাঁচ-ছয়টি করিয়া মিস্রশ্রেণীর পরিবারের লেবার তার লইতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে রেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। বৎসরাধিক কাল এই সাধনার অগ্রসর হইতে পারিলে শিক্ত ভ্রমশ্রেণীর সহিত মিস্রশ্রেণীগুলির সংযোগ আবার স্থাপিত হইবে।” (নবশক্তি)

২। বাংলার আজ সমাজ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। সমাজের পদদলিত, উপেক্ষিত শ্রেণীরা উচ্চশ্রেণীর অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহাদিগকে পদদলিত করিয়াছি। যে বিদেশী শক্তি অত্যাচারে অত্যাচারে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছে, আজ তাহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছি সংখ্যায় আমরা দুষ্টিমের। আমরা দুষ্টিমের শিক্ত লোক প্রবল শক্তিশালী বিদেশী বণিক-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেখিতে পাউতেছি আমাদের শিখনে জনসাধারণের সমর্থন নাই। আমাদের যুদ্ধ চালাইবার রসদ নাই, প্রয়োজনীয় শক্তি নাই।” (সঙ্গীবনী)

একবার পড়া শেষ করিয়া ইজ দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল এগুলির মধ্যে মূল্যবান ইঙ্গিত আছে। হরত তাহার ব্যক্তিগত সমতা সম্বন্ধে উদ্ভি-গুলি হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া বাইতে পারে। সে নিবিষ্ট মনে পড়িতেছে হঠাৎ লক্ষী ভিতর-বাতীতে বাইবার উৎকণ্ঠে ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং ইজকে দেখিয়া যেন একটু বিব্রতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল। ইজ যে ঘরে আছে সে জানিত না।

ইজ বাতা হইতে মুখ তুলিয়া লক্ষীকে দেখিল, তাহার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিল। তাহার মুখে বোম্ব হর তাহার অজান্তায় যুদ্ধ কৌতুকহাস্য কুটিরা উঠিল। সে বলিল—যতীন দা ভেতরে কাকীয়ার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা কর’।

লক্ষী ভিতরে গিয়া দেখিল সতীম তাহার মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে। সে কাছে গিয়া মস্তকায় করিয়া তাহার সমুখে বলিল। সতীম বলিল, তুমি এসেছ বিবি, তোমাদের কথাই এতকণ হচ্ছিল। একটা কথা বলি তোমাকে শুনে রাখ। দেবুর জন্ত বন ধারণা করো না তোমরা। তোমরা যে রূপে জন্মেছ সে রূপে বাংলার ঘরে ঘরে এ রকম ব্যাপার ঘটবে। মনকে শক্ত করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। আমি বড় দুখী হয়েছি বিবি যে ইজদের ভাল সংসার কোটা দেবার

অতঃপর তাক পড়েছে। ইজের মত হেলে হর না। ওকে আমি দেখে মতই ভালবাসি। তোমরা হু'লম হু'লমকে পেয়ে সুখী হও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

জিমরনী ঝাঁচলে চোখ মুছিয়া উঠিয়া ঠাণ্ডাইলেন। বলিলেন, বাবা, একটু বস। একটু কিছু সুখে দিবে বেতে হবে।

লক্ষীকে বলিলেন, হু'লম আসন পেতে কল গড়িয়ে দে লক্ষী। ইজ বাইরে বসে আছে, ওকে ডেকে দিবে আর।

জিমরনী উঠিয়া হুইখানি পাথরের রেকাবীতে নামা রকম মিষ্টি লাড়াইয়া আনিয়া আসনের সম্মুখে রাখিলেন। লক্ষী

কল গড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডাইয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, বা ইজকে ডেকে আন। ওর মা নেই, নিজে থেকে বস-আড়ি করতে হবে, লক্ষা করবার অবসর নেই রে।

লক্ষী বয়ে চুকিয়া শুমিল, ইজ ও আমদের মধ্যে দিদির বিবাহের নিমন্ত্রণ-রফা-সম্পর্কিত আলাপ হইতেছে। তাহার সুখ একটু লাল হইয়া উঠিল। মায়ের উপদেশ মরণ করিয়া লক্ষা দমন করিয়া সে বলিল, মা ডাকছেন তেতরে।

ইজ উঠিয়া ঠাণ্ডাইল। একটু হাসিয়া আমদকে বলিল, এস আমদ, এখন থেকে নিমন্ত্রণ খাওয়া শুরু করা যাক। (ক্রমশঃ)

লোকারাধনা না লোকবঞ্চনা ?

দাদা ধর্মাদিকারী

অনুবাদক—ঐক্যবানী

বিবিকরী আলেকজান্ডারের সময়ে ডারোজিনিস নামে এক বিবাহী ছিলেন। এই বিবাহীর মন মনুষ্যজাতির উপর কথকিং ভিত্তি হইয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ভিত্তিবিরক্ত বৈরাগী মনে করিত। তাঁহার সম্বন্ধে এমন তিনটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, বাহা দেশের বর্তমান অবস্থার আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইবে।

একদা দিন-দুপুরে লোকে দেখিল ডারোজিনিস লঠম হাতে পথ চলিতেছেন। লোকে ত তাঁহাকে পাগল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পাগলামি যে এতদূর গড়াইয়াছে তাহা কেহ ভাবে নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই দিন-দুপুরে লঠম নিয়ে কেন ? দিনের বেলা লঠম নিয়ে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি ?” ডারোজিনিস খুব শান্ত ভাবে কহিলেন, “আমি ইমানদার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।”

ডারোজিনিস সহজে ইমানদার লোক খুঁজিয়া পাইতে-ছিলেন না। দিনের আলো বেধানে পৌছার সেখানে বহি ইমানদার লোকের দেখা মিলিত তবে তাঁহাকে লঠম হাতে লইতে হইত না। অগ্রসর হানে ইমানদার লোকের খোঁজ করিবেন বলিয়া নিজ হাতে তিনি লঠম লইয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথা ছিল, কে বলিতে পারে যেচারা ইমানদার লোক কোথায় লুকাইয়া আছে ? কোন্ কোণে ? কোন্ গহ্বর অত্যন্ত ? কোন্ অন্ধকার ঘরে ? তাই ত লঠম লইয়া তিনি বাহির হইয়াছেন।

ইমানদারীর ইচ্ছা

আমাদের প্রধান মন্ত্রী জবাহরলালজীও কংগ্রেসে ইমানদার লোকের খোঁজ শুরু করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “এবার টিকেট তাহাদেরই দেওয়া হইবে বাহারা ইমানদার।” কল

হইয়াছে এই যে, নিজ নিজ ইমানদারী সপ্রমাণ করার পায়া লাগিয়া গিয়াছে। এতোকের মাঝার একটি চিন্তা, নিজেকে অপর সকলের অপেক্ষা অধিক ইমানদার প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কেবল ইমানদার হওয়াই যথেষ্ট নয়। আরও ছুইটি জিনিষের আবশ্যকতা ছিল। একটি এই যে, লোকে উহাকে ইমানদার বলিয়া জানে, অর্থাৎ সে মাতঙ্গণ্য ইমানদার লোক। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, ইমানদারী সপ্রমাণ করার সময় আশিলে সে যেন নিজেকে অযোগ্য প্রমাণিত না করে।

এ ব্যাপারে সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন হইতেছে এই যে এমন ইমানদার লোক জিনিষের কত জন মিলিবে বাহারা একথা বলিয়া ও প্রতিপন্ন করিয়া বেড়াইবে যে, আমার চেয়ে অধিক ইমানদার লোক আর কেহ নাই। যে নিজেকে নিজেই ইমানদার বলে, লোকে তাহাকে সন্দেহ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ইমানদার সে নিজ ইমানদারীর ঢোল শিটার না। সে ইমানদার হয়, আর লোকেও তাহাকে ইমানদার বলিয়া মানে। কেহ যদি তাহাকে ইমানদার না-ই বলে তাহাতে তাহার দ্রুপেক নাই। সুক্তিতর্ক ও দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে আপন ইমানদারী প্রমাণ করিতে সে চায় না।

অপরকে বেইমান লাভ্য করার ইমানদারী

কিন্তু এবার ত ইমানদারীকে টিকেটের সত্বে করা হইয়াছে। অতএব টিকেট বাহাদের চাই নিজ নিজ উর্ধ্বিতে তাহাদের ইমানদারীর নিদর্শন লাগাইতে হইয়াছে। ইমানদারীর মূল্য তাহাদের কাছে বতর্টা বাহুক না বাহুক, টিকেটের মূল্য ছিল ততোধিক। তাহার হাতা পৃথিবীতে অপর কোন ইমানদার লোক নাই, ইহা ত লঙ্গারি বলিবার উপায় ছিল না। আর তাহাদেরই সমান বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসভাজন

লোক নিজ নিদর্শন লাগাইয়া লামনে আসিয়া বা ইতার সে ব্যবস্থা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অত কলা-কৌশলের আশ্রয় তাহাদের লইতে হইল। নিজ নিজ ইমানদারী প্রমাণ করা অপেক্ষা অতের বেইমানি প্রমাণ করার পর্বোক্ত উপায় তাহারা অবলম্বন করিল। নিজের তিল-পরিমাণ গুণকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া পূর্বপ্রমাণ ও অপরের তুণ্যত্বও লামাত দোষকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া সুখলাকার করার কলার পারদর্শিতা লাভে তাহারা লাগিয়া গেল। সজ্জনের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা নিজের তিলপ্রমাণ ক্রটিকে পর্বপ্রমাণ মনে করেন, আর অতের সর্বপরিমাণ গুণকে পর্বতাকার করিয়া দেখেন। কিন্তু ইমানদারীর বর্তমান প্রতিবোধিতার আত্মজ্ঞা আর পরনিন্দাই শালীনতার ও নৈতিকতার মূলমন্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

যথার্থ শ্রেষ্ঠত্বের রীতি

যাবী বিবেকানন্দের একটি আধ্যাত্মিক প্রসিদ্ধ। শুনা যায় যে তিনি এক সময়ে কোন স্থলে যাইয়া থকি দিয়া বোর্ডে একটি রেখা টানেন ও ছাত্রদের বলেন, দেখ, এই রেখাটি না মুছিয়া, নিশ্চিন্ত না করিয়া, না কাটিয়া, ছোট করিয়া দেখাও। বালক-দের কাহ হইতে উত্তর আসিল—সাবধানতার সহিত প্রদত্ত উত্তর। বেশ ধানিক পরে একটি ছেলে মীরবে আসিয়া ঐ রেখার নীচে উহা অপেক্ষা বড় একটি রেখা টানিয়া দিল। বাস, প্রথম রেখাটি ছোট হইয়া গেল। উষেদারদের প্রতিবোধিতার যদি এই দৃষ্ট দেখা যাইত তবে জবাবহরলালজীর পক্ষে তারতম্যে মন্দমকামনে পরিণত করা অসম্ভব হইত না।

কিন্তু হইয়াছে একেবারেই উহার বিপরীত। টিকিটের উষেদারগণ লঠম লইয়া ইমানদারীর সন্ধানে মছে, বেইমানির বোঁকে লাগিয়া গেল আর দেখিতে পাইল যে, তাহারা ছাত্তা দেশের আর সকলেই বেইমান। বতগুলি রাজনৈতিক দল আছে তাহারাও সকলে আপন আপন লভানী আলো লইয়া অপর সব দলের বিশ্বাসভাতকতার উপর রজ্জিপাত করিতে আরম্ভ করিল। কমগণের কাছে সকলে আক একে অতের বেইমানি ও দোষোচ্চাটনে মশগুল। যে দৃষ্ট তাহারা আমা-দের দেখাইতে চাহে তাহা কি মরক হইতে অতির ? হুর্ধো-বনকে বলা হইল, ‘একজন সজ্জন লোক বুঁকে আম।’ এখানে ওখানে হুঁরিয়া হুঁরিয়া শ্রান্ত হইয়া তিনি কিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, ‘কোন সজ্জন মিলিলো ?’ হুর্ধোবন বলিলেন, ‘থাকলে তো পাব।’ বর্ধরাজকে বলিলেন, ‘ভবে তুমিই বুঁকে আম ?’ বর্ধরাজ হুর্ধোবন হইতেই সজ্জন বুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। করিলেন, ‘লোকে থামক একে হুর্ধোবন বলে, এ হুর্ধোবন।’ ইহাই সজ্জনের দৃষ্টির মূল কথা। কিন্তু সমস্তে পাই রাজনীতিতে উহা অচল। না, ঠিক। অ-রাজনৈতিকতাই আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ হউক।

গণতন্ত্রের বিপদ

না এক দিন বলিলেন, যে মোরা চাহিবে না সে মোরা পাইবে। আর কি ? না-চাওয়ার ‘মেনিকেষ্টো’ বাহির হইতে লাগিল। প্রত্যেকে টেচাইয়া বলিতে লাগিল, ‘দেখ, আমি কিন্তু মোরা চাহি না।’ ইহার অন্তত যে অংশ প্রত্যেকেরই মনে ছিল তাহা এই—‘এ কারণেই ত মোরা আমার প্রাপ্য।’ কেহ বা অসুস্থ বরে মনের কথাটা ব্যক্তই করিয়া কেলিল। কথা হইতেছে গণতন্ত্রের ও সজ্জনতার মিলন কি আদৌ সম্ভব নহে ? তাহা যদি সম্ভব না হয় ত গণতন্ত্রের মদল নাই।

সর্বোদয়-নিষ্ঠার সাধনা

আমাদের দেশে কতকগুলি মঠাধীন ও পীঠাধীন মিনে মশাল জ্বলাইয়া চলে। ইহা পকারি সাধন নহে। তাহারা মূনি জ্বালার না, মশাল লইয়া চলে। তাহাদের জিজ্ঞাসা করেন ত খুব সম্ভব তাহারা বলিবে যে, এই সব মশাল সূর্যকে আলো দেওয়ার জর। অজ্ঞানিতে জল লইয়া আমরা কি সমুদ্রকে স্নান করাই না ? ছোট একটি বাতি জ্বলাইয়া সূর্যকে দীপ দর্শন করাই না মাকি ? করাইয়া থাকি, তাহাতে আর সংশয় কোথার ? কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে আরতিতে থাকে আত্মসমর্পণের আকাজকা, আর ইহাতে রহিয়াছে প্রদর্শনের তাবনা। বিভিন্ন দলের প্রাণীরা আপন আপন মশাল লইয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু গণদেবতাকে দীপদানের মিশিত মছে, পরন্তু আপন আপন আলোতে চক্ষু বলসাইয়া দিয়া তাহাদের ধারী লাগাইবার পরছে। ইহা লোকসাহিত্য নহে, লোক-বক্তব্য। লোকসেবার ইহা প্রশস্ত পন্থা নহে। গণতন্ত্রকে যদি লোক-বিপ্লবের বাহনে পরিণত করিতে চাহি ত আমাদের অত সব প্রক্রিয়া বুঁজিতে হইবে। সর্বোদয়ে নিষ্ঠাপরারগদের এই সাধনা হওয়া চাই।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নিবেদন

রাষ্ট্রমেন্তা ব্রীজবাহরলালজী ও বিভিন্ন পক্ষের প্রধান প্রধান নেতাদের পুনঃ পুনঃ বলি যে, নির্বাচনের দেশার আমরা বেশ সভ্যতাকে বিদায় না দিই। কিন্তু সম্প্রতি কিছু দিন যাবৎ কমগণকে ভিন জন নেতৃপ্রধান একে অতের উপর মাথা খারাপ হওয়ার অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে অপরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার কোন ভাল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া মরকার। ইহা যদি পরিহাস মাত্র হয় ত আপত্তির বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অসুগামীরাও তাহাদের এরূপ রসিকতার অসুক্রয় আরম্ভ করিতে পারে। তাহা হইলে ভব্যতার লেশমাত্র থাকিবে না। সুদে এক নেতা অপরকে বলিবে, ‘তোমার বুদ্ধিবৈকল্য ঘটয়াছে।’ উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিবে, ‘তোমার মগজ পচিয়া গেল হইয়াছে, হুর্ধে টেকা দার।’ এরূপ ব্যাপারের পর আবার যে তাহারা

পরশ্বরের উপর সুগতি পুষ্পবৃষ্টি করিবে, ইহা অলীক কল্পনা মাত্র।

পাড়ীকী আমাদের সার্বজনিক বাদ-বিসংবাদকে এক অতি উচ্চ স্তরে উঠাইয়াছিলেন। জনসভাতেও অস্থানসম ও ভাব্যতা যতপূর্বক রক্ষিত হইত। এখন কোন বৈতা যদি অপর কোন বৈতার এগলকে বলেন যে, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ত জনসাধারণের দৃষ্টিতে সকলেরই প্রতিষ্ঠার হানি ঘটবে। তাই শ্রেষ্ঠদের কাছে নিবেদন নির্বাচনের ক্ষমতাও বেন তাঁহারা নিজ নিজ বাণী কলুষিত না করেন।

প্রভু-বাসনা

ডায়োজিনিস সবকে দ্বিতীয় পল এই যে, মিলায়ের জন্ত যখন তাঁহাকে দালের বাজারে রাখা হয় তখন খরিদারেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, “তুমি কি কাজ জান?” তিনি বলেন, “আমি একটি মাছই কাজ জানি, আর তাহা হইতেই মানুষের উপর প্রভুত্ব করা। ইহাই আমার পেশা। বাহার মালিকের প্রয়োজন সে আমাকে কিনিতে পারে।” বিভিন্ন দল হইতে বাহারি নির্বাচনপ্রার্থী, তাঁহারা সাধারণ লোক একথা বেন কেহ মনে না করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি ডায়োজিনিস। প্রভুত্বের বাসনা তাঁহাদের মঙ্গলত, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম বেন নাই তাহা মহে।

মোকরিসিরির উদ্দেশ্য

তবে ডায়োজিনিস ও উহাদের মধ্যে ব্যবধান এইটুকু যে, ডায়োজিনিস শব্দগুলি প্রয়োগ করিতেন উহাদের রূঢ় অর্থে, ইহারা করেন অল্পরূপে। দরবারী ভাষার কোন শব্দ কখনও উহার ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তদনুসারে কোন সরকারী চাকর্যোকেই সরকারী চাকর্যে বলা হয় না—তাঁহাদের বলা হয় সাধারণের ভৃত্য। উহাদের নাম—পার্লি সার্ভেণ্টস্। হিন্দীতে শোফরী, খিদমৎ ও সেবা, এই তিন শব্দের প্রয়োগ তিন অর্থে হইয়া থাকে, কিন্তু এ সবের জন্ত ইংরেজীতে একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়—সার্ভিস্। সংক্ষেপে সার্ভিস্ পর্যায়বাচী শব্দ

হইতেই সেবা। অর্থাৎ যত সব সরকারী চাকর্যে সকলেই লোক-সেবক। যখন তাঁহারা সরকারী চাকরির জন্ত দরখাস্ত করে তখন তাঁহারা সেবার উদ্দেশ্য হন। আর তাহাদের মধ্যে কেহ সেবার অধিকার পাইলে, সাধারণতঃ বিনা সুবে, বিনা সুখবামটার কাজ করেন না। আমাদের প্রতিনিষিদ্ধ আমাদের ‘মোকর’। যখন নির্বাচনপ্রার্থী হন তখন তাঁহারা মোকরিসিরির উদ্দেশ্য হন। কিন্তু মোকর হওয়ার পরে জন-সাধারণকে ইহারা অধিকাংশই দাবালক বা বিধবা স্ত্রীলোকের মত অসহায় মনে করেন। তাই অতি উগ্রভাবে তাঁহারা প্রভুত্ব করিতে থাকেন। আজ তাঁহারা আমাদের সমুখে থাকা হইয়াছেন। তাঁহাদের মাথার উপরে লেবেল আঁটা—বাহাদের সেবক দরকার, তাহারা আমাদের কিনিয়া লউন। কিন্তু এখানে সেবকের অর্থ মালিক। নিরক্ষর জড়তাবাপন মূঢ় জনগণ জিজ্ঞাসা করে, “ইহা কিরূপ বিপরীত পদভঙ্গ?”

প্রার্থীদের প্রতি

ডায়োজিনিস সবকে তৃতীয় জনশ্রুতি এই যে, এক দিন তিনি এমনি বসিয়া আছেন, এমন সময় আলেকজান্ডার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আলেকজান্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” ডায়োজিনিস উণ্টা প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কে?” জবাব আসিল, “আমি পুথিবীজয়ী আলেকজান্ডার।” ডায়োজিনিস কহিলেন, “তুমি আলেকজান্ডার ত আমি ডায়োজিনিস।” আলেকজান্ডার অতিশয় গর্বতরে কহিলেন, “আমি তোমার জন্ত কি করিতে পারি?” ডায়োজিনিস কহিলেন, “স্বর্গকে আবৃত করিয়া দাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইরাছ, সরিয়া গেলে মহা উপস্থিত হইবে।” “আলেকজান্ডার না হইলে আমি ডায়োজিনিস হইতাম”—এই বলিয়া আলেকজান্ডার চলিয়া গেলেন।

তাল, কোন উদ্দেশ্যের এ ধরনের কথা কখনও কি মনে হইয়াছে? পঠন-কর্মরত সেবকদের নিকট ইহাই মাত্র অহর্যোণ যে, কমতাকাজী ও কমতা অধিকারী লোকেরা কৃপা করিয়া বেন তাঁহাদের ও স্বর্গের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

হুসেন সাগর, হায়দরাবাদ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালো জল আর কালো আকাশ
আকাশে চাঁদ,
তারার দল,
হূরে হূরে বলে প্রদীপমালা।
সেতুর উপরে আমরা হুঁশম,
আমাদের মনে আলোক আলা।

মোর মন আর তোমার মন,
উহলে জল,
কে বাধে সেতু?
হাসিছে বশম চাঁদতারার।
শোন অনাথ হূরের বাতাসে
ওপারের চেউ তাতে এপার।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

(সভামূলক নাটক)

পঞ্জাংশ

আনারকলি (পূর্বে আরেবা) নামী কাবুলের মুন্সী মহিউদ্দিনের পরমা হুম্মরী কস্তা যুবরাজ দেলিমের চিত্রবাত্র দর্শনে মোহিত হইয়া, গোপন প্রেমে আত্মহারা হয়। এবং পিতামাতার বহু অনুর সত্ত্বেও অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে অসম্মত হয়। তাহার এই ভাবের বৈলক্ষণ্যের কথা শুনিয়া কাবুলের হিন্দু শাসনকর্তা দেওয়ান মাধব রাও তাহাকে অস্ত্র-মনস্ক করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী পাঠাইবার পণ্যমর্শ ও সাহায্যদান করেন। সেখানে বাইরা সে যুবরাজের বাহিত প্রণয়লাভে সক্ষম হয়, কিন্তু সেই কারণেই আকবর শাহের কোপদৃষ্টিতে পড়ে; এবং বীরবলের মন্ত্রণার ফলে বিচারান্তে তাহাকে জীবন্তে কবর দিবার জীবন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। লাহোরে এখনও আনারকলির হুম্মর সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়, তবে এই নাটিকার বাদ্যবাক্য ঘটনা অনেকাংশে কল্পনামূলক।

নাটকীয় পাত্র-পাত্রিগণ

পুরুষ

আকবর শাহ—	দিল্লীর বাদশা
বীরবল—	ঐ মন্ত্রী
ফৈজী—	ঐ রাজকবি
সেলিম—	ঐ যুবরাজ
কাজী সাহেব—	ঐ বিচারপতি
দেওয়ান মাধব রাও—	কাবুলের শাসনকর্তা
ইলাহী বক্স—	ঐ নগরপাল
মুন্সী মহিউদ্দিন—	ঐ সেরেস্তাদার,

আয়েষার পিতা

ওমরাহগণ, আদালতের কর্মচারীবৃন্দ ও প্রতিহারিগণ।

স্ত্রী

আমিনা—	মহিউদ্দিনের স্ত্রী
আয়েষা—	ঐ কস্তা
মতিজান দর্জিনী—	আয়েষার সখী
রোবেনামা—	কাবুলের কাজীর কস্তা
মেহের-উল্লিসা—	দিল্লীর অন্দরমহল রক্ষী
সাকিনা—	ঐ বেগমবিশেষ

অন্তঃপুরুষগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মাধব রাওয়ের সভাগৃহে মুন্সী, মহিউদ্দিন ও দেওয়ান মাধব রাও আসীন। উভয়পার্শ্বে দুই চোপদার কেরামত ও নেয়ামত দণ্ডায়মান।)

মাধব। মুন্সীজী, সেই কাবুলী বয়েতটী আর একবার

বল ত, যাতে আছে যে “বিদ্যুৎ পড়ুক”, “বিদ্যুৎ পড়ুক” বলতে বলতে বিদ্যুৎ পড়ল। সেটা মনে আছে?

মুন্সী। আছে বই কি, হজুর। সেই অভিলাষে বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক— যদি বিদ্যুৎ পড়ে ধনধান্য জলে যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নয়।

মাধব। আমিও তাই বলতে চাই যে, আমরা যেমন বলাবলি করছিলাম সব বড় চূপচাপ হয়ে যাচ্ছে, একটা লড়াই নেই, একটু লুঠতুরাজ নেই, আমাদের বীরপুরুষেরা তবে বীরত্ব দেখাবে কিসে? তেমনি ভগবান যেন আমাদের মনের আর্জি শুনেই লাগতিকোটাল থেকে খামকা এক দল ডাকাত পাঠিয়ে দিলেন।

মুন্সী। ধোদাবন্দ! তাতে ছেলেদের তাকত দেখাবার সুবিধে হতে পারে বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে একটু মুশকিলের কথা হয়ে পড়ে।

মাধব। কেঁউজী, তোমার ঘরে কিছু মুশকিলের কারণ ষটেছে নাকি?

মুন্সী। মুশকিলও হয়েছে, মুশকিল-আসানও হয়েছে। সেই কথাটা বলতেই ত হজুরের দরবারে আজ সন্মালে ছুটে এসেছি, আর আমার মেয়েকেও আনতে পাঠিয়েছি।

মাধব। তোমার মেয়ে? আয়েষা? কেন তার আবার কি হয়েছে? তার মত হুম্মরী কাবুল শহরে আর একটা নেই।

মুন্সী। সেই ত হয়েছে বিপদ, হজুর। কালো কুৎসিত হলে ত কোন ভাবনাই ছিল না। পাড়ার ছেলেদের জালায় তার একটু জানলার ধারেও দাঁড়াবার জো নেই। আবার যদি বোরখা পরে মেয়েদের সঙ্গে একটু হাওয়া খেতে বেরল ত পড়ল ডাকাতের হুম্মর।

মাধব। (উত্তেজিত) বল কি মুন্সীজী? তাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে? রাখামাধব।

মুন্সী। আজ্ঞে, যদি ধরে নিয়ে যেত তা হলে কি আর হজুরের কাছে মুখ দেখাতে আসতুম? এই, কেরামত!

কেরামত। জী হজুর!

মুন্সী। এক বার দেখ ত আয়েষাবিবি অন্দরমহলে এসেছেন কিনা? বল, মুন্সীসাহেব তাঁকে বাইরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কেরামত। যো হুম্ম মুন্সীজী।

(প্রস্থান)

মুন্সী। যে বীরপুরুষের কথা এখনি হচ্ছেল, তাদের মধ্যে দু'তিন জন যদি পেনিন প্রাণ হাতে করে আরেবাদের উদ্ধার না করত, তা হলে এই বুড়ো বরসে আমার মান-ইচ্ছা সমস্তই ধোঁয়া বেত, আর আমিও দেশত্যাগী হতুম।

মাধব। (উৎকণ্ঠিত) বল, বল কি হচ্ছে মুন্সীজী ; আমাকে আর সংশয়ের দোলায় ঢুলিও না।

(প্রথমে কেরামত, পরে বোরখাপরা আরেবা,
পরে ইলাহী বক্সের প্রবেশ)

মুন্সী। এই যে হজুর, বাদের গল্প তাদের কাছেই এবার ভাল করে সব শুনুন।

মাধব। আরেবাদিদি, তুমি বোরখা খুলে ফেলে ভাল হয়ে বসো। ভয় নেই, তোমাকে লুঠ করে নিয়ে যাবার জন্তে এখানে কোন ডাকাত ওং পেতে বসে নেই !

আরেবা। (বোরখা-খুলিতে খুলিতে) বাবা, তুমি কেন ও-সব কথা হজুরকে বলে দিলে ! আমার বুঝি লজ্জা করে না ?

মুন্সী। তোমার লজ্জা করবার বয়স হয়েছে, সেক্ষা তুমি নিজেকে ভুলিয়ে দাও যে মা ! তা ছাড়া আমি এখনও হজুরকে কিছুই বলি নি, তোমাদের নিজের মুখেই সব শুনবেন বলে তিনি বসে আছেন।

আরেবা। তুমিই তাঁকে গল্পটা বল না বাবা, তুমি ত সবই জান।

মুন্সী। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, সাতটা বেজে যেতেই 'তোমার মা মরিয়মকে পাঠালেন মোতীববির ওখানে, আর মজিদকে পাঠালেন ইলাহী বক্সকে ডাকতে। আর আমাকে কোথায় পাঠাতে চান তা যদিও—পষ্ট করে বললেন না, কিন্তু দিনরাত কেবল লেখাপড়া নিয়ে থাকি আর ছেলেমেয়ের কোন খোঁজখবর রাখি নে বলে বকতে বকতে এমন তুলকেলাম বাধিয়ে দিলেন যে, আমি মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্ত আস্তে আস্তে পাগড়ী আর লাঠি নিয়ে রাস্তায় যেমনি 'বেরিয়ে পড়েছি, অমন দূর থেকে দেখলুম আমাদের ইলাহী সাহেবের সঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসছেন ; দেখে প্রাণটা স্বচ্ছ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যদিও তার খীর গভীর চাল দেখে কারও হঠাৎ বোঝবার সাধ্য ছিল না যে, সে আমাদের এই নাচুনে আরেবারাণী !

আরেবা। আমি কিন্তু একবারও কান্নি নি বাবা, তুমি বরং মোতীববিরকে জিজ্ঞেস কর।

মাধব। না দিদি, আকগান মেয়েরা বিশদে পড়লে কখনও কান্নে না, আর আকগান ছেলেরা ত হালে। কি

ইলাহী বক্স, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনবার জন্ত যে আমরা উৎসুক হয়ে বসে আছি।

ইলাহী। হজুর, বেশি ত কিছু বলবার নেই। আমি'না বিবির অজুরোধে তাঁর মেয়েদের খুঁজতে বেরিয়ে, দেওদার বনের বাইরে আবহুল আর আহমেদকে রেখে আমি ভেতরে ঢুকলুম। ঘুরতে ঘুরতে ফুলের মালা, ভাঙ্গা পেয়াল। প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণে যখন সন্দেহ হ'ল যে, একই আগেই সেখানে আরেবাবিবিরা ও ডাকাতের দলবল এসে' চলে গেছে তখন তাড়াতাড়ি আবহুলদের ডেকে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ছুটলুম। একটু পরেই দূরে দুটো আলো দেখতে পেয়ে উজ্জ্বলসে দৌড়ে গিয়ে দেখি দুই যেটা ডাকাত আরেবাবিবিদের সঙ্গে নিয়ে গভীর বনের দিকে চলেছে। বেগুফুরা আমাদের সাড়া পেয়েই ফিরে দাঁড়াল, আর মশাল ফেলে ছোড়া উঁচিয়ে আমাদের মারতে এল। আবহুল আর আহমেদ তখন চট করে তাদের ডান হাতে এমন জোরসে দুই লাঠির ঘা কসিয়ে দিলে যে, ছোরাগুলি দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তার পর আমরা তিন জনে তিন জনে লাগি মেরে তাদের মাটিতে পেড়ে ফেললুম, আর তাদেরই ছোরা তাদের বুকে বসিয়ে মেয়েদের নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে, আগে তাদেরই পাগড়ী দিয়ে তাদের গাছের সঙ্গে কসে বেঁধে কেলেছিলুম ; বোধ হয় এখনও তারা সেই অবস্থায় সেখানেই পড়ে রয়েছে।

মাধব। আর বোধ হয় মাধমো জুতের ভয়ে ও-পথ দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। ভালই হ'ল—আমার দেবদারু পাছগুলো তা হলে একটু বাঁচবে !

আরেবা। (অনাস্তিকে বাপকে কিছু বলিল)

মাধব। কি, আরেবা-দিদি ! বা বলবার আছে খুলে বল না, লজ্জা কিসের ?

মুন্সী। হজুর, ও বলছে, যিনি এতক্ষণ গল্প বললেন, তিনি আর সব কথা ঠিকই বলেছেন, কেবল নিজের বীরত্বের কথাটা চেপে গিয়েছেন। ডাকাতরা মাটিতে পড়ে যাবার পরেও অত চট করে গাছের সঙ্গে বাঁধা পড়ে নি ; শেষ পর্যন্ত লাগি ঘুরি কামড়, কোনটাই কসাতে ছাড়ে নি। শেষে একজন কোথা থেকে এক চাকুছুরি বের করে ইলাহীর হাতের কবজায় বার বার খোঁচা মারায় ঝুঁ ঝুঁ করে রক্ত পড়তে লাগল ; তবু ইলাহী সেদিকে জ্ঞপেপ না করে, তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে কেলে, তবে রুমাল দিয়ে নিজের হাত বাঁধলে। ঐ যে সেই রক্তমাখা রুমাল এখনও হাতে জড়ানো রয়েছে, দেখুন না।

মাথব। দেখি ইলাহী? তাই ত। আবার ক্রমালের উপর একটা শুকনো ফুলের মালা কেন? এ-কি ব্যথা কমাবার ওষুধ নাকি? কোথায় গেলো? কে দিলে?
ইলাহী। আজ্ঞে, কেউ দেয় নি, আমি আপনিই বন থেকে কুড়িয়ে এনেছি। কিন্তু ব্যথা ত কমে না।

মাথব। সাবাস ইলাহী, তোমার হিম্মতের কথা শুনে আমার বড় মেজাজ খোশ হ'ল।

ইলাহী। আমি কেবল নিজের কর্তব্য কাজ করেছি হজুর, তার বেশি কিছু নয়।

মাথব। প্রজার যেমন কর্তব্য আছে, রাজারও তেমন কর্তব্য আছে। এই, নেয়ামত!

নেয়ামত। জী, হজুর।

মাথব। খাজাঞ্চীকে বল কোতোয়াল সাহেবকে এক হাজার আসুরকী এখনি বক্শিশ করতে।

নেয়ামত। যো হুকুম, হজুর!

ইলাহী। হজুরের অমূল্য অসীম, কিন্তু (আয়েষার দিকে আড়চোখে চাহিয়া) আমার বক্শিশ আগেই মিলে গেছে।

মাথব। নেয়ামতের সঙ্গে বাও, ইলাহী। আর সর্বদা মনে রেখো যে, দেশ তোমার মত সুপুত্রই চায়। কিন্তু শুধু হু জনকে নয়, দলহুদু ডাকাতকেই দেশছাড়া করা চাই, বুঝলে?

ইলাহী। (সেলাম করে)—আজ্ঞার দোয়ায় তাই হবে হজুর। (প্রস্থান)

মুন্সী। এবার তুমি অন্যরে যেতে পারো মা। আমি হজুরের সঙ্গে দুটো কথা বলেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য খবর পাঠাব।

মাথব। মুন্সীজী, তোমার মেয়েকে একটা গান শুনিয়ে বেতে বল না। সকলের মুখেই ত শুনতে পাই ওর যেমন রূপ, তেমন গুণ।

মুন্সী। হজুর, আমাদের দেশে মেয়েদের রূপ থাকলেই বা কি, গুণ থাকলেই বা কি? জ্ঞান হতে না হতে তারা হীরে জহরতের মত লোহার পিছুকে বন্ধ হয়ে যায়, ফুটতে না ফুটতে তারা পোকা-কাটা ফুলের মত মাটিতে ঝরে পড়ে। আয়েষার গলাটি মিষ্টি, কিন্তু কোনরকম শিক্ষা ত পায় নি। এই আমি নিজে যেটুকু জানি তাই শিখিয়েছি, আর আপনার বাড়ীর নাচগানের মজলিস দেখে শুনে এক আধটু বা শিখতে পেরেছে! তবে আপনি যে ওর গান শুনতে ইচ্ছে করেন, সে আপনার মেহেরবানী।

—কেয়ামত! হোসেন খাঁর কাছ থেকে এক জোড়া

বাঁয়া-তবলা আর ঘুড়ুর শীষ এনে দাও ত, আর ঐ দিলকবাটা এগিয়ে দাও। (কেয়ামতের তথাকরণ)

সেই যে কারসী গানটা আমি ভালবাসি, সেটা হজুরকে শুনিয়ে দাও ত মা!

আয়েষা। (দিলকবা বাজিয়ে গান)—

হাল যে রবে রবা।

তু আপনে কজল করি, দবমে রবনাই।

হুপ্রদখ তোর, বাহি খেসরা।

তুদানি, হিসাবে কনো খেসরা।

মাথব। বাঃ বাঃ, বড় সুন্দর। কিন্তু গানটা কিছু গম্ভীর, সুরটিও বড় করুণ। ওর বয়সের উপযুক্ত আর একটু হালকাভাবে একটা কিছু গাইতে বল না মুন্সী।

মুন্সী। আচ্ছা আয়েষা, তোমার ছেলেবেলায় আয়াজী যে নাচগান করে তোমাকে ভোলাত, সেইটে হজুরকে দেখিয়ে দাও না?

আয়েষা। সে ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে হজুর হাসবেন নিশ্চয়। (কেয়ামতের বাঁয়াতবলা ও ঘুড়ুর আনয়ন। মুন্সীর সঙ্গত করণ ও আয়েষার ঘুড়ুর পরা)।

মাথব। তাই ত চাই বিবিজী। আমাদের দেখিয়ে দাও যে ডাকাতরা তোমার হাসিটি চুরি করে নিয়ে যায় নি। তা ছাড়া আমারও ভিতরের ছেলেমানুষটি ত এখনও একেবারে মরে নি, দাড়িগোঁফে ঢাকা চাপা আছে মাত্র। তাকেও মাঝে মাঝে খোরাক দিয়ে জীইধে রাখা চাই ত?

আয়েষা। (নাচ ও গান)

কোন এরসি সখি চতুর না মিলে

মোরে পিকে হুয়ারমে পৌছা দেতি (বারে হাঁ হাঁ)।

মেরে মনমেত আয়া কি খোপন বসু,

আওর মলকে বহুত মদিনে চলু।

সখি হিন্দী কি নগরীমে কাহে রহ,

নেহি জীতকি চৈন অয়া দেতি (বারে হাঁ হাঁ)।

সখি সাত সবুদর পার ভরা,

মেরে জজমেত চলনে ন কোর হাওয়া,

কোই আতি মদিনে সে ঐসি হাওয়া,

নব মলকে আবার কোঁড়া দেতি (বারে হাঁ হাঁ)।

মাথব। (হাততালি দিয়া)—সাবাস! সাবাস! এই ছেলেমানুষির ভিতর আসলী মাল লুকনো রয়েছে, তা কিন্তু বলে রাখলুম। পরে দেখে নিও। আমাদের চোখ এই দেখতে দেখতে বুড়ো হতে গেল, কিসে কি হয় তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। নাও, আয়েষাবিবি, আমার গলার এই হাড়টি তোমাকে বক্শিশ করলুম। বার গলার তুমি মালা দেবে, সে ভাগ্যবান পুরুষ না জানি কোথায় ব'সে দিন গুনছে!

মুন্সী। মা আয়েষা, এবার তুমি বাড়ী বাবার উভোগ কর পে; জানই ত দেরি হলে তোমার আমার কপালে কি আছে।

আয়েষা। তুমি যে চূপ করে থাক বাবা, কাজেই মা বত খুসি বকে যায়।

মুন্সী। তাই ত মাঝে মাঝে হজুরের কাছে পালিয়ে আসি, নিজের গলার আওয়াজ শোনবার জন্যে! আর একটু বড় হও মা, তখন বুঝবে সে বাধা না দেওয়াটাই বুজির কাজ। (হাসিতে হাসিতে আয়েষার প্রস্থান)

মাধব। এমন মেয়েকে তুমি কার হাতে তুলে দেবে মনে করছ মুন্সীজী?

মুন্সী। হজুর, সেই বিষয়েই ত আপনার উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনার মত বন্ধু এই শহরে আমার আর কেউ নেই। আয়েষাকে আমি এত বড় করে ঘরে রেখেছি, পাঁচরকম বই পড়িয়েছি আর গান-বাজনাও কিছু কিছু শিখিয়েছি, এই সব অপরাধে সমাজের মোড়লরা আমার উপর খড়গহস্ত। তবে কি কুক্ষণে যে মেয়েটা রূপ নিয়ে জন্মেছিল, তাই বুড়োরা যাই বলুক, ছেলেরা ওর জন্যে সব খোয়াতে রাজী।

মাধব। তবে ভাল দেখে একটি পাত্রের সঙ্গে এই বেলা ওর সখ্য পাকা করে ফেল না? বত দেরি করবে, ভত বেশি মুশকিলে পড়বে। আমি ভুক্তভোগী কিনা, তাই জানি। আমার ত মনে হয় ওর উপর ইলাহীর নেকুনজর আছে। তোমার কি বোধ হয়?

মুন্সী। আজ্ঞে, আমার বোধ করবার কোন আবশ্যক নেই। বহু দিন বাবৎ প্রমাণ পেয়েছি যে ইলাহী ওর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমার মেয়েকে যে মোটে বাগ মানাতে পারছি নে হজুর, কি করি বলুন? ওর মা আর আমি ওকে বলে বুঝিয়ে, বকে ধমকে, খোশামোদ করে, হয়রান হয়ে চাল ছেড়ে দিয়েছি। এক বাকি আছে জোরজবরদস্তি।

মাধব। না না, তাও কি করতে আছে? হয়ত ওর মনে মনে অল্প কাউকে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু বলতে লজ্জা করে।

মুন্সী। আজ্ঞে না, হজুর, সে খোঁজও নেওয়া হয়েছে। সেরকম কেউ নেই। অথচ আজকাল ওর ঘরের কাজ করতে মনে থাকে না, লেখাপড়ার ভুল হয়ে যায়। আনমনে জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, সাত বার ডাকলে তবে এক বার সাড়া পাওয়া যায়।

মাধব। এ সব ত বড় ভাল লক্ষণ নয়! এ যে আমাদের শ্রীরাধিকার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

দেশে দেশে মানুষের মন সবই এক, কেবল আমরাই ভুল বুঝে “রাম রহিমকে জুলা” করি। যা হোক, চূপ করে বসে থাকলে ত চলবে না, এর একটা কিছু বিহিত করা ত চাই।

মুন্সী। আমার বুদ্ধিতে ত আর কুলে না হজুর। জানেন ত মেয়েজাতটাকে চিরকালই আমি একটু উরাই; ছোট্টই হোক বড়ই হোক, ওদের বেশি ঘাঁটাতে সাহস করি নে। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, তাই করব। তার উপর আবার এই এক ডাকাতির উপজব হয়ে দিন রাতে স্বস্তি নেই।

মাধব। (একটু ভাবিয়া) এক কাজ করলে হয় না?

মুন্সী। আজ্ঞা করুন হজুর।

মাধব। ওকে দিনকতক অন্য কোথায়ও পাঠিয়ে দিলে হয় না? হয়ত একটু জায়গা বদলালে মনের এই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে পারে।

মুন্সী। হজুর আমরা গরীব মানুষ, তবু ছেলেমেয়ে-দের ভালোবাসি। ওকে ছেড়ে থাকা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হলেও, ওর ভালোর জন্যে তাও করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই অল্প বয়সে এমন সন্দেহী মেয়েকে একলা দূরদেশে পাঠানো কি বুজির কাজ হবে? কে ওর সঙ্গে যাবে, কে ওর খবরদারি করবে—শেবে হিত করতে বিপরীত হবে না ত?

মাধব। আমি কি সব দিক না ভেবে-চিন্তে একটা মোৎকরকা কথা বলে বসবার লোক, মুন্সীজী? তা হলে আর এত বড় একটা রাজ্যশাসনের ভার আমার হাতে এতদিন থাকত না।

মুন্সী। আমাকে মাপ করুন, হজুর। স্নেহে মানুষকে অন্ধ করে ফেলে।

মাধব। আমি ভারছিলুম ওকে দিল্লী পাঠালে কেমন হয়? সেখানে এক দিকে যেমন ধুমধাম, জাঁকজমক, আমোদপ্রমোদে ছেলেমানুষের মন ভুলবে; অপর দিকে তেমনি আমি চিঠি দিলে প্রাসাদেও ওকে হেপাজত করবার লোকের অভাব হবে না। কি বল, এতে তোমার মত আছে?

মুন্সী। হজুর বা বলছেন সবই ওর ভালোর জন্যে, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার একলার মতে ত কাজ হবে না; দেখি ওর মা কি বলেন।

মাধব। যদি তোমাদের দু’জনের মত হয়, আর অবশ্য আয়েষা যেতে চায়, তা হলে খাজনা নিয়ে আমাদের যে ডাক শীজই দিল্লী রওনা হবে, সেই সঙ্গে ওকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। ইলাহীকে বলব ওর রক্ষক হয়ে সঙ্গে

বেতে ও থাকতে; আর তোমরাও হয়ত কোন মেয়েকে ওর সজিনী করে দিতে পারবে।

মুন্সী। হজুরের দয়ার শেষ নেই। কি ঠিক হয় কালই আপনাকে জানাব। (সলাম করিয়া প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(মুন্সী মহিউদ্দিনের বাড়ীর অন্তরমহল। আমিনা বিবি সেলাইকার্ঘ্যে রত। দূরে আনালাল খানে আয়েষা বই হস্তে আসীন)।

মুন্সী। (বাস্ত হইয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ) — আমিনা! আমিনা! কোথায় তুমি?

আমিনা। এই যে, এইখানেই বসে আছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে সকাল ত হজুরেই হাজির থাকি, আর যাব কোন চুলোয়?

মুন্সী। (বসিয়া পড়িয়া) তোমাকে ত আমি আর কোথায়ও যেতে বলছি নে। কিন্তু আয়েষার এক জায়গায় বাবার কথা হচ্ছে, তাই তোমাকে বলতে এলুম।

আমিনা। আয়েষা? সে আবার কোথায় বাবে? মেয়েমানুষে ত এক বাপের বাড়ী ছেড়ে শশুরবাড়ী যায় জানি; তা ও-মেয়ের ত সেরকম কোন গতিক দেখছি নে। আর তার পর তারা যায় নমের বাড়ী। তা আমার সেইটেই বাকি রয়েছে; এখন যেতে পারলেই আমি বাঁচি, তুমিও বাঁচ। (চোখে কাপড় দিয়া ক্রন্দন)।

(আয়েষা নিজের নাম শুনিয়া কান ধাক্কা করিল)

মুন্সী। (উঠিয়া দ্বার কাছে আসিয়া) — আমিনা, তুমি হাওয়ার ফাঁদ পেতে ঝগড়া কর কেন? আমি কি কখনও তোমাকে কোন কটু কথা বলেছি যে, তুমি কথায় কথায় মান-অভিমান কাগাকাটি কর?

আমিনা। সেইটেই ত আমার এত অসহ্য বোধ হয়। তুমি যদি আমার কথার পিঠে কথা বলতে, যদি আমার বাগের উত্তরে বাগ করতে, যদি আমার গলায় উপরে গলা চড়াতে, তা হলে ত তবু বুঝতুম যে আমার স্বামী একটা মানুষ, আর আমাকেও সে মানুষ জান করে।

মুন্সী। (হাসিয়া) তোমার স্বামী মানুষ নয় ত কি?

আমিনা। (রাগত:) জানি নে। -দেবতা হতে পারে কিংবা কলের পুতুল কিংবা বইয়ের পোকা। শুধু এইটুকু জানি যে তার বিয়ে করার কোন দরকার ছিল না।

মুন্সী। (শান্তভাবে) এত দিনে সেও বোধ হয় সেকথা বুঝতে পেরেছে। - কিন্তু আমিনা, শুধু একদিন আধ ঘণ্টার জন্যে যদি নিজেকে তুলে পরের কথা, —তাও নয়, নিজের মেয়ের কথা শুনতে পার তা হলে—

আমিনা। কথা বলবার লোক পেলে ত শুনব? বাপ

থাকেন বই নিয়ে, আর মেয়ে থাকেন নিজের ভাবে ভোর। আমাকে কি কেউ পৌছে? আমি চূপ করে মুখ বুজে হয় সেলাই করি, নয় রাঁধি, নয় ছাতে একলা পড়ে পড়ে তারা শুনি—আর কি করব? না আছে একটা কাপড়, না আছে একটা গয়না, না আছে পাঁচ জন ভ্রাতৃলোকের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বাওয়া আসা, না আছে—

মুন্সী। যা নেই তার জন্তে মিছে হা-হতাশ না করে যা আছে তাই রক্ষা করবার চেষ্টা করলে ভাল হয় না?

আমিনা। আমার আবার কি ছাই আছে? থাকবার মধ্যে আছে—

মুন্সী। একটা হতভাগা স্বামী, এই ত?

আমিনা। ছি: ছি:, এমন কথা মুখেও এনো না। আমার স্বামীর মত এমন ভাল লোক এই সারা কাবুলে আর একটি নেই। কেবল যদি—

মুন্সী। তা সে বিষয় তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আর একটা জরুরী বিষয়ে যে তোমার মত জানতে চাই। তোমার একটি মেয়েও আছে।

আমিনা। সে পোড়ারমুখীর জন্তে ভেবে ভেবে আমার ত রাজে ঘুমই হয় না। ওদিকে তুমি ত বেশ নিশ্চিন্তমনে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও।

মুন্সী। সে দোষ আমার আছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার মেয়ে বাপের শাস্তিষ্ট স্বভাবটি পায় নি। বোধ হয় মাতৃকুলের দিকে—

আমিনা। (বাগত:) আর বাঁই কর, আমার মা-বাপ তুলো না, ভাল হবে না বলছি। এখনও আমার বাপের কবরে হিন্দু-মুসলমানে সিন্নি দেয়, তা জান?

মুন্সী। জানি। কিন্তু এমন অপদার্থ লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে কি তিনি স্ববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন বলতে চাও?

আমিনা। কেন আমার স্বামীর নিন্দে করছ? তবে আমি চললুম (উঠিতে উদ্ভত) —

মুন্সী। (ধরিয়া বসাইয়া) না না, বসো বসো। আর ও লোকটার নাম করব না, ভয় নেই। তা যে কারণেই হোক, আয়েষার মন যে আজকাল বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়?

আমিনা। তা আর করি নি? তোমাদের মত কেতাবী বুদ্ধি নাই থাক, আমরা মানুষের মন বুঝি। তার উপর আয়েষা ত আমার পেটের মেয়ে।

মুন্সী। তুমি ওকে পেটে ধরেছ বটে, কিন্তু আমি ওকে হাতে গড়েছি। হৃদেদীপ্ত পড়বার পর থেকেই ও আমার পড়ার সঙ্গী, আমার খেলার সাথী, আমার গানের

সাপরেন্দ্র। কিন্তু এই মাসখানেক থেকে বে ওর কি হয়েছে, কেন হয়েছে, কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছি নে।

আমিনা। এ তো অতি সহজ কথা। মেয়ে বিয়ের ঘৃণা হয়েছে, একটা ভাল মেখে বিয়ে দিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে থাক। তোমাদের পণ্ডিতী মন কি না, তাই সোজা জিনিসটাকে প্যাচালো করে তোলে। আমরা মুখ মেয়ে-মাছুষ হতে পারি, কিন্তু সংসার-জ্ঞানে তোমাদের চেয়ে ঢের পাকা।

মুন্সী। তাই ত তোমাকে না জিজ্ঞেস করে আমি সংসারের কোন কাজেই হাত দিই নে। কিন্তু আয়েষা যে বিয়ের কথা মোটে কানেই তোলে না, তা তুমি বেশ জান।

(আয়েষা ক্রমে অগ্রসর হইল)

আমিনা। মেয়ের মত কেউ কখনো নিয়ে থাকে ? আনার বাবা আমার কত মত নিয়েছিলেন ? একটা ভাল পাত্র ঠিক করে মোজা সাহেবকে ডাক, কল্যাণ পড়ে দিব—ব্যস, চিরজীবনের মত কাজ ফতে। আবার কি ?

মুন্সী। তা ত ঠিক। কিন্তু তুমি মেয়েটাকে কান্না দিয়ে জোর করে বিদায় দিতে পারবে ?

আমিনা। কেন পারব না ? মেয়েমাছুষ ত সারা জীবন কান্নাতেই আছে। জন্মবার সময় কান্দে, বিয়ের সময় কান্দে, মরবার সময় কান্দে। উপায় কি বল ?

মুন্সী। হজুর একটা উপায় করে দিতে চেয়েছেন।

আমিনা। তোমার রাতদিন কেবল হজুর হজুর। নিজের ঘটে একটা বুদ্ধি যোগায় না, জীর বুদ্ধিতে চলতেও সাহসে কুলোয় না, শুধু হজুরের কাছে হাতবোঁড় হয়ে আছে।

মুন্সী। তুমি ত জান কত সময় কত বিপদ থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। সাধে কি তাঁকে যেনে চলি ? কিন্তু আগে উপায়টা বলি শোন। হজুর বলছেন কোন নতুন আরগায় ঘুরে এলে হয়ত মেয়েটার মনের একটা বদল হতে পারে। ওঁদের লোকলস্কর খাজনা নিয়ে শীঘ্র দিল্লী যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ওঁকে উপযুক্ত সঙ্গী দিয়ে পাঠাতে পারেন, বললেন—যবন্ত যদি আমাদের মত হয়। কালই তাঁকে এ বিষয় জবাব দেব বলছি। এখন কি বলতে চাও বল। (মাথায় হাত দিয়া) আমার ত মাথার ঠিক নেই।

আমিনা। কি বললে ? দিল্লী ? সেই জাহান্নামে ঐ দুধের মেয়েকে একলা পাঠাব ? তুমি ঠিকই বলেছ মুন্সীজী, তোমার বুদ্ধিবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি হজুরকে আমার হাজার হাজার সেলাম দিয়ে বলা তাঁর বহুৎ

মেহেরবানী, কিন্তু ঐটুকু মেয়েকে কাছছাড়া করলে পাছে একেবারে হাতছাড়া হয়ে যায় এই আমার ভয়।

মুন্সী। তবে কি এমনি দিনের পর দিন সে কাটা ফুলের মত নেতিয়ে পড়বে, আর আমরা বসে বসে তাই দেখব ?

আমিনা। বলছি ত ধরে বেঁধে একটা ভাল মেখে বিয়ে দিয়ে দাও, সব সেরে যাবে।

মুন্সী। তার আগে একটু ঘুরে ফিরে এলে কতি কি ? জেলখানা ত সামনে খোলাই রয়েছে, যাবজ্জীবন কারাবাসে ঢোকবার আগে পৃথিবীটা একটু দেখে শুনে নিক, তার রূপরস ভোগ করে নিক। অন্ততঃ তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যাক না, সে কি বলে।

আমিনা। (উঠিয়া) আমি বলছি সে যদি আমার মেয়ে হয় ত কখনো দিল্লী যেতে চাইবে না।

মুন্সী। (উঠিয়া) আর আমি বলছি সে যদি আমার মেয়ে হয় ত—

আয়েষা। (বই ফেলিয়া সামনে ছুটিয়া আসিয়া, দুই জনের দুই হাত ধরিয়া) আমি বলছি আমি মায়েরও মেয়ে, বাবারও মেয়ে, আর আমি দিল্লী যাব নিশ্চয়ই।

মুন্সী ও আমিনা। (একসঙ্গে কিরিয়া) তবে তুমি সব শুনেছ।

আয়েষা। তোমরা যে চোঁচামেচি করছিলে, আর না শুনে করি কি ? এইটুকু ত ঘর।

মুন্সী। (কস্তার মাথায় হাত বুলাইয়া) মা, আমরা তোমার উপযুক্ত স্বর-বর কিছুই দিতে পারলুম না, এই দুঃখ।

আয়েষা। (তাঁহাকে আদর করিয়া) না বাবা, তোমরা আমার জন্ত সবই করেছ, আমার কোন অভাব নেই। (থামিয়া) কিন্তু কি জানি আমার আজকাল কি হয়েছে। এই ছোট ঘর, ছোট শহর, ছোট কথার মধ্যে দিনরাত থেকে থেকে প্রাণটা যেন ঝাঁপিয়ে উঠেছে। তোমরা দিনকতক আমাকে ছেড়ে দিয়ে দেখ, আমি নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে ফিরে আসব।

মুন্সী। পাণীর ডানা গজালে তাকে বাসা ছেড়ে উড়তে দিতেই হবে, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু তোমার মা যে সে কথা মোটেই বুঝছেন না, কি করি বল।

আয়েষা। (বাপকে ছাড়িয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া) কেন মা, তুমি আমার জন্ত এত উতলা হচ্ছ ? আমি কি এখনও তোমার সেই কচি খুঁকিটি, বার বাড়ী কিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে তুমি হুশ বার ঘরবা'র করতে ?

আমিনা। (ক'রিয়া উঠিয়া) তুমি আমাদের একলা

কেলে কোথায় যাবে মা? সে সোনার পিঁজরায় যে একবার ঢুকেছে, সে কখনও প্রাণ নিয়ে বেরোয় নি।

আয়েষা। (হাসিয়া) কেন বেরবে না? এই ত কাবুল থেকে নওরোজের জন্তে হুন্দরী মেয়ে পাঠাতে বলেছিল বলে কাজী সাহেবদের রোশেনারা ক'বছর আগে দিল্লী বেড়িয়ে এল। শুনেছি উৎসব হয়ে গেলে বেগম সাহিবারা তাকে কত ভয়কালো পেশোয়াজ, ওড়না, গয়না, খেলনা সব দিয়ে দেশে ফিরে পাঠালেন। আর আমি গেলেই তারা আমাকে খুন করে মাটিতে পুঁত ফেলবে?

আমিনা। ছিঃ আয়েষা, তুমি কি কোন কালেই বড় হবে না?

(মোতীবির প্রবেশ)

মোতী। এ কি কথা শুনেছি চাচীজী? আয়েষা নাকি কাল দিল্লী যাবে? আমার ত কথাটা একেবারেই বিশ্বাস হ'ল না, তাই ছুটে খবর নিতে এলাম।

আমিনা। ওমা, এর মধ্যেই পাড়ার লোকের কানে কথাটা উঠেছে? ধন্য বাপু!

মোতী। না, মরিয়ম তার একটা কুর্তী সেলাই করতে নিয়ে গেল কি না, তাই বললে যে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে শুনে এলাম।

আমিনা। তার মত পাড়া-বেড়ানী আর কে আছে বল? এদিকে তাকে দিয়ে ঘরের একটা কাজ পাবার জো নেই। তা তোমার কাছে বলতে কি বাছা, তুমি আয়েষাকে মায়ের পেটের বোনের মত ভালোবাস, ওর যাবার কথা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও কিছু ঠিক হয় নি।

আয়েষা। হ্যাঁ ভাই মোতীদিদি, ঠিক হয়েছে। বল মা, সব ঠিক হয়ে গেছে, না? আর মোতী, আমরা কাপড়চোপড় বন্ধ করে ফেলি গে। (প্রস্থানোক্ত)

(রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। চাচীজী, আয়েষার নাকি দিল্লী যাওয়া ঠিক হয়েছে?

আমিনা। (গালে হাত দিয়া) মাগো, আমি কোথা যাব। আমরা নিজেই বেকথা জানি নে, সে কথা শহরস্থর রাষ্ট্র হয়ে গেল? কাজীসাহেবের বাড়ী কি এখানে? মরিয়ম কি এর ভেতর সেখানেও ঘুরে এল?

রোশেনারা। মরিয়ম কেন যাবে? এই ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের কতখানি আশা আমার নতুন চোলিটা খলিকা সাহেবের কাছ থেকে আনতে গিয়েছিল, সেখানে বসে থাকতে থাকতে শুনে যে মরিয়ম এই কথা বলছে। আমি ত শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। তাই ডাবলুম বাই একবার ছুটে দেখে আসি গে কি ব্যাপার!

আমিনা। এ কথা ত চিরদিন লুকানো থাকবে না মা, তবে আমরা নিজেরাই এখনও মন স্থির করতে পারি নি। হজুর এইমাত্র বলে পাঠিয়েছেন বটে, তাই ভাবছি—

আয়েষা। ভাবতে ভাবতে যে এদিকে গোছগাছের সময় হয়ে গেল মা।—আচ্ছা রোশেনারা, তুই ত একবার দিল্লী গিয়েছিলি। সেটা কি মগের মুহুক? সেখানে যে যায়, সে নাকি ফেরে না? তবে কি তুই মরে ভূত হয়ে এসেছিস?

রোশেনারা। সে দেশে একবার গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না বটে, সে কথা সত্যি। কি রূপ, কি রং, কি রোশনাই, কি তামাশা! কেবল মা-বাপের জন্য মাঝে মাঝে যা মনটা কেমন করত, না হলে কি আমি আর ফিরতুম? চল, তোর সঙ্গে আমিও আবার যাই ভাই, যদিও তোকে দেখলে আমার দিকে কেউ আর ফিরেও তাকাবে না! কোন্ নবাবজাদা হয় ত তাঁর হাজার বেগমের উপর আর একটি বাড়াবার জন্য শাহেন শাহ'র কাছে দিনরাত আরজি পেশ করতে থাকবেন। আর তুইও সে সব বাদশাহী চেহারা দেখে আমাদের জলদী দেশের মূর্থ রক্ষ লোকদের ভুলে যাবি।

আয়েষা। যাঃ, তোর অত বাজে বকতে হবে না। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি আছে, চল।

রোশেনারা। আচ্ছা, পাড়া, আমাকে বেগমরা যেসব কিংখাবের পেশোয়াজ দিয়েছিল, তা ত বাস্তব তোলা থেকে থেকে পোকায় কাটছে। তারই দু'একটা ভাল দেখে নিয়ে আসি, তোর সেখানে কাজে লাগবে। আর আমার চেয়ে তোকে মানাবেও ভাল। (প্রস্থান)

মুন্সী। মা, তুমি ত নতুন দেশ, নতুন লোক দেখতে চললে, কিন্তু আমাদের সব যে নিয়ে গেলে, আমরা কি নিয়ে থাকব?

আয়েষা। খুশেদ রইল যে বাবা। আর আমি ত চিরদিনের জন্যে তোমাদের ছেড়ে থাকি নে—দেখতে দেখতে দিন কেটে যাবে। বরং তোমাদের জন্যে কি নিয়ে আসব, তাই জিজ্ঞেস কর। মা, আমি এমন সব চমৎকার মোগ্লাই খানা আর সাঁচ্চা কলাবতুর কাজ শিখে এসে তোমাকে শেখাব যে, তোমার কাবাবের আর হুনামের খোশব্ব পাড়াস্থ তুরতুর করবে। আর তোমার জন্যে কি আনব বাবা? মোগ্লাই ছবি না ফার্সী পুঁথি?

মুন্সী। তুমি নিজে ভালোয় ভালোয় ফিরে এস মা, আমি আর কিছু চাই নে। আমিও ত বুড়ো হয়েছি, হয়ত আর দেখা নাও হতে পারে। (কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ)

(পেশোয়ার হাতে করিয়া রোশেনারার প্রবেশ)

রোশেনারা। (হাঁপাতে হাঁপাতে) চাচাজী, আমি বাবাকে বলেছি, তিনি বললেন তোমার যদি মত হয়, তবে আমি আয়েবার সঙ্গে দিল্লী যেতে পারি। কি বল, তোমার এতে কোন আপত্তি নেই ত ?

মুন্সী। দে কি কথা মা, আমরা ত ওর সঙ্গে কাকে দেব তাই ভাবছিলুম; তুমি যেতে রাজী আছ শুনে মন থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। আর তুমি আগে সেখানে গেছ, সব জান, এর চেয়ে ভাল সঙ্গী আমরা কোথায় পাব ?

আয়েবা। তবে আর কি, সব গোল মিটে গেল। এখন আর, আমরা সবাই মিলে আমোদ করে একটা গান করি, তা হলে মনের এই অন্ধকার ভাবটা কেটে যাবে। বাবা, তুমি বাজাও, মা তুমি শোন।

(তিন সখীর গান)

চলো সুসাকের, বাধো পাঁঠরিয়া,
বহুদূর বাসে হোবেগা।
আজ তি বাবা, কাল তি বাবা,
আখের বাবা হোবেগা।
রুপিয়া দৌলত বিখ্যাত হার—
সক্তি দিয়ে রহেগা।
মেহরার লড়কা যো কোই হার
কোই নেই সাধনে বাবেগা।
বিখ্যাত দেব ছুনিয়ামে রহেনা
উৎসাহে মোহকৎ হোবেগা
করো মোহকৎ উসাকোনে
যো নে সাধনে বাবেগা।

কবিতা:

গ্রামবাসী

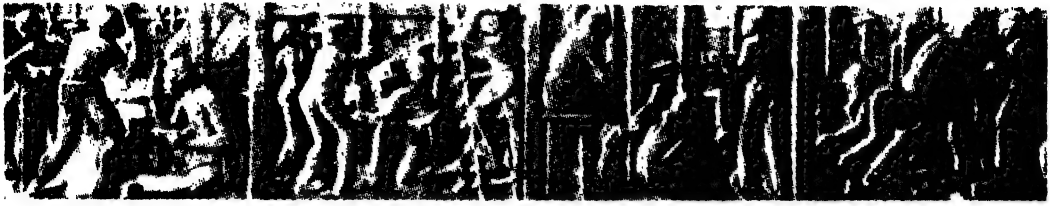
শ্রী আশুতোষ সাংখ্যল

শুণি মানী ওরা কেউ নয় তাই,
আমাদের গ্রামবাসী,
ওরা যে সরল সহজ মানুষ,
তাই এত ভালবাসি।
দেশ ছাড়বার—গেল কে কোথায়—
কোন্ ঘাটে মাঠে বোদরখানায়,
আজি পরবালে তাবি ব'লে তাই
আর আঁখিভলে তাসি।

কানি, উছাদের ছিল না বেতাব,
ছিল মাকো পাড়ী-ছুঁড়ি,
হুকুম করিতে কানিত না ওরা
হুলায়ে বিপুল ছুঁড়ি।
ছিল মাকো কেউ হাকিম তেপুট,
মোহিত কাতলা নয়—হুসোপুট,
বরাখানা ওরা সব তেবে কছু
হেলায় নিত না ছুঁড়ি।

আহা, শুণু ওরা আত্মীয় মোর
নয় নয় কছু পত,
প্রিয়-পরিজন ওরাই আমার—
জীবনের সহচর।
আমার হুঃখে ছিল ওরা হুখী,
মোর উল্লাসে হ'ত কত সুখী,
ওদের লাসিয়া চিরদিন খোলা
ছিল যে আমার ঘর।

হরতো জীবনে উছাদের সঙ্গে
হবে মাকো আর দেখা,
হার বাবীলতা, হার রাকনী,
ছিল এ ভাগ্যে দেখা।
দুস্তির পদয়া খুলি' বার বার—
করবে দরদ শুধু হাহাকার,
এ জীবনে হার, শুকায়ে না কছু
একট কতের দেখা।



ভাষ্যের একটি নিদর্শন

[ঐকান্ত্যের সাক্ষ্য]

সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

ঐবিমল রায়

গত ভিসেবরের তৃতীয় সপ্তাহে সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রদর্শনীর অর্জঠান হয়ে গেছে। উদ্বোধন করেছেন প্রফেসর শিল্পী ঐকান্ত্যপ্রকাশ পাণ্ডা। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এই প্রদর্শনীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে চিত্র-প্রদর্শনীর উল্লেখই খুবই স্থান অধিকার করেছে। প্রদর্শিত চিত্রাদির সমালোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না।

কাব্য, সাহিত্য, নাটক, গান ইত্যাদি ভাল বলে পরিচিত হলে বহু বার সমালোচনা করে সেগুলির প্রশংসা পাওয়া হয়। তাই অথবা সুরে বতটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব, তার চেয়ে চিত্রে অল্পাংশে অনেক বেশী প্রকাশ করা যায়। সাধারণতঃ অনেক শিল্পিত ব্যক্তিকে বলতে শুনি 'হু-টিবি বিশেষ বুঝি না'। একথা শুনে মনে কৌতুহল জেগেছে, সহজেই বা বোঝা যায় সেটা তাঁদের কাছে হুর্কোষ বলে মনে হয় কেন? শিল্পী-মাজেরই এ প্রশ্নের একটা সমাধানের পথ খুঁজে দেখা উচিত। কারণ সহজ বিষয়কে বোঝা-ই কি দর্শকদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিন? তা হলে হুবিও দিন দিন হুর্কোষ হয়ে উঠবে। দর্শক ছাড়া হুবির বর্ষালা হয় না। শিল্পীরাগীর শিল্পরসের অঙ্গারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে শিল্প কমে কমে মরে যাবে। সেই কারণে তাঁদের মনকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে চিত্র-সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যদি একথা সত্য হয় যে, হুবির অর্থ বোঝা হুঁকর, তা হলে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, হুবির মাধ্যমে শিল্পের প্রচলন আমাদের দেশে বেই। সেই কারণে তাহার সাহায্যে বোধোচিত সমালোচনা না হলে হুবি অহুধাবন করা খুবই শক্ত। আমরা আগে দেখি, পরে তাহার প্রকাশ করি। এ ক্ষেত্রে আগে কান্ডে শুধু কি দেখতে বাচ্ছি, তারপর দেখে খুঁজতে পারব—টুক বা শুধুলাব তা দেখা হ'ল কিনা।

সুস্থ অতীতে মানুষ বর্ষন গিরি-গুহার বাস করত, কাঁচা মাংস খেত, রান্নাঘর, বহাভারত, বেবহুত, উত্তরানচরিত রচনার কল্পনাও বর্ষন তার মনে উদিত হয় নি তখনও সে

গুহার ভিতরে হুবি আঁকত। কোমল জাতির সত্যতার বরন নিরুপণে সেই জাতির হুবির উৎপত্তি ও জন্মবিকাশের ধারাট অহুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিণীয়। এ কথা অবনীকার্য্য যে, সত্যতার শীর্ষতানে শিল্পের স্থান।



পুুরী ভগবান-বর্ষন [ঐকান্ত্যের সাক্ষ্য]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—হুবি কাক বলব? তাহার সাহায্যে বর্ষন বাংলাদেশের একটা পুরীর বর্ষন করি, তখন পুুরী বর্ষনার ভেতর দিয়ে সেই পুরীর হুবিটা মনের মধ্যে ভেদে ওঠে। বর্ষন সেই বর্ষিত পুরীকে দেখতে বাই তখন মনের চোখে দেখা পুরীর সঙ্গে সাহুতের অভাব ঘটে, মনে হয়, না দেখলেই ছিল ভাল। প্রকৃতির এক একটা দৃশ্যপটে সৌন্দর্য্য সূকানো

আছে—বেটা তার মাথুর্বা। কাটকে দেখে তার বেহলাবণ্য, তদিয়া, আদল, রং ইত্যাদি ঠিক ঠিক বর্ণনা করা হ'ল, কিন্তু তখনও বাকী রইল আসল জিনিস—সে তার বাতাবিক লতার রূপ বর্ণনা করা। এই লতা তার মাথুর্বা--বাকি ভাল লাগা মাথুর্বের অসম্পূর্ণ অধিকার। মাথুর্ব তাকেই দেখতে ও দেখাতে ভালবাসে।



হুটার-শিল [ত্রিচীন্দ্রীলাল দত্তগুপ্ত]

মনের উপর বর্ণে বর্ণে বর্ণনার ছবি এঁকে দেওয়া—এ হ'ল কথামিটার কাজ। চিত্রশিল্পীর কাজ রঙে দেখার রূপান্তর করে ছবিটাকে একেবারে জীবন্ত করে এঁকে দেখানো। কোনও লেখা ভাষা না আসলেও এ ছবি অন্তরহ হর। তারা কঠরই করা যায়—কিন্তু তারার ভিত্তিতে যে ছবির সৃষ্টি, তার স্থান অন্তরে।

প্রদর্শনীতে অনেক রকমের ছবি ছিল, দর্শকও এনেছিলেন অনেক, মতামতও শোনা গেল বিভিন্ন রকমের। প্রশংসা করে গেছেন প্রায় সকলে। কিন্তু তাঁরা ছবি নিয়ে গেছেন খুব অল্পই। শিল্পীকে সুখ্যাতি করা বাহ্যিক, কিন্তু তার শিল্পকে সম্বাহরে গ্রহণ করে তৃপ্তি পাওয়াও শান্তির কথা, পৌরবের কথা।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, দেশের শিল্প-সম্পদের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়সাধন করা, শিল্প-সম্পদের ভাণ্ডারটি তাদের হাতের কাছে তুলে দেওয়া। প্রদর্শনী মূলত মূলত শিল্পীর প্রতিভা-বিকাশের অস্বল্প কেন্দ্র তৈরি করার সহায়তা করতে পারে। শিল্প যে শিকার মত বড় অঙ্গ, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত, তা স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। দেশবাসীর সঙ্গে শিল্পীদের ঘনিষ্ঠতা এবং শিল্প-পরিচর-সাধন এই প্রদর্শনীর দায়কতেই সম্ভব।

প্রদর্শনী দেখে খুব আদল লাভ করা গেল। শিল্পীরা সবাই ছাত্রছাত্রী—আত্মবর নাই, জাঁকজমক নাই, সৃষ্টির প্রেরণার

নিবেদনের খেয়ালমত বা এঁকেছেন, তাই তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন। ছবিগুলি সুন্দর, কিন্তু দাম অল্প। প্রদর্শনীতে প্রথম



কর্দরতা

[ত্রিচীন্দ্রীলাল দত্ত]

শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং শিক্ষণ-শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ছিল, যেমন ইতিহাস পেণ্টিং, কাইম আর্টস, কমাশিয়াল আর্ট, গ্রাফিক আর্ট, ডাক্তার্য এবং কাল্পনিক এডভান্সে বিভাগের কাজের প্রকারভেদ থাকার এক্ষেত্রেই ছিল না। তবে সংখ্যায় কিছু কম হলে ভাল হ'ত।

বর্তমান বাংলার ছাত্র-শিল্পীদের বহুবিধ বাধা-বিয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অভাব-অদটম, বাগহানের লমতা, রং, তুলি, কাগজ, ক্যানভাস ইত্যাদি শিল্পোপকরণের উচ্চ মূল্য শিল্পচর্চার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলে শিল্পীরা শিল্পকলার চর্চা ছেড়ে দিতে পারেন না। শিল্প-সুযোগীরা হু'একখানা করে ছবি কর করলেই এদের উৎসাহ বাড়বে। বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী মি: কপিন এদেশে জয়নে এসেছিলেন। তিনি প্রদর্শনী দেখে অব্যক্ত আশ্রয়প্রার্থী চক-বর্তীকে প্রচুর প্রশংসা করে গেছেন এবং এই আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বিলাতে সম্ভবপর হতে পারে।

এই প্রবন্ধে যেসব ছবি ছাপান হ'ল, তা ছাড়া এমন আরও ছবি ছিল, যেগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাদেরও দামের উল্লেখ করা গেল।

শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস
শ্রেণীর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র—এর কাজ-
গুলো খুব চমৎকার লাগল। ‘শরৎচন্দ্র’
ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্র-
কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুরস্কৃত
হয়েছে। ছবিটির রেখাবিভাগ, বর্ণপ্রয়োগ,
রচনা এবং প্রকাশ অতি সুন্দর। ছবিটিতে
ভারতীয় শিল্পকলা-পদ্ধতির অঙ্গসংগ্রহ
করা হয়েছে। এতে সংস্কৃত এবং
মাজারাবোধের পরিচর পাওয়া যায়।

শ্রীচন্দ্র দাস, শিল্প-শ্রেণীর ছাত্র—
‘প্রতিকৃতি’ প্যাট্টেলে আঁকা, তুলি ব্যব-
হার করা হয় নি। ছবিটি সুন্দর হয়েছে।
ছবিটি অসাড়বদ, কিন্তু এর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ
রূপে প্রকাশিত।

শ্রীশচীন দাস, কাইম আর্টস পঞ্চম
শ্রেণীর ছাত্র—‘ট্রেনের কামরা’ রঙে
আঁকা ডেচ, খুব ভাল হয়েছে। গাঢ়ী
চলছে, যাক্সের আলো-আলোচনা, গল্প-
গল্প, রাজনীতিচর্চার মনগুল। ছবিতে এই ভাবটি কুটে
উঠেছে। যেন সবটাই চলছে—বেয়ে নেই। এর আর
একখানা ছবি ‘কুটীর-শিল্প’ (কাঠ খোদাই)—কাজে ব্যস্ত দুই
স্ত্রীলোক, কাজে তারা ভয়র এই ভাবটি রচনার প্রকাশ
পেয়েছে।

শ্রীমতী হৈমন্তী সেন, কাইম আর্টস পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী—
‘রাজপুতানী’ তৈলচিত্র—এর কাজগুলো অবিকার্য্যই সুন্দর
হয়েছে। এর কোন কোন ছবি বিশেষ প্রশংসালভ করে-
ছিল। ছবিতে রাজপুতানীকে ঠিকই চেনা যাচ্ছে। ড্রইং,
রং এবং তুলিটানার পদ্ধতি প্রশংসনীয়। এর ছবিতে নৈপুণ্য,
মাপুর্বা কৃতি এবং সাহসের পরিচর পাওয়া যায়।

শ্রীবিপ্রদাস মহাভী, শিল্প শ্রেণীর ছাত্র—‘প্রসাধন’ নুঁঠি
ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রসাধনরতা
স্ত্রীলোকটির দেহতলিমা অনবদ্য ভাবে পাথরে রূপায়িত
হয়েছে। ভাস্কর শ্রীআশুতোষ সামন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র—
কারিগরী শিল্প চার ভাগে বিভক্ত করে দেখান হয়েছে—কোন
প্রসাধনের প্রাচীরগায়ে স্থাপনোপযোগী ভাস্কর্য্যশিল্প। সহজ
সরল ভঙ্গীতে সাধারণ মানুষ কে কেমন করে কি তৈরি করছে
তা দেখান হয়েছে। শিল্প-পরিবেশন-নৈপুণ্য চমৎকার।

শ্রীঅনিত সেন, কমাশিলাল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—‘বাকার’
রেখার আঁকা একটি ডেচ, প্রশংসনীয়। শ্রীরামচন্দ্র
দাস কমাশিলাল বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—‘ভিজিট
পূরী’ একটি নৃত্য বরণের গোষ্ঠার (প্রাচীরচিত্র)—পূরীর পট-
চিত্র অবলম্বনে আঁকা, ভগ্নপ্রাণবোধের স্নিগ্ধবর্ণনের অত



ট্রেনের কামরা

[শ্রীশচীনদাস]

আকর্ষণ সৃষ্টি করবার কলতা ছবিটিতে আছে। শ্রীশ্রীলাল
দত্তগুপ্ত—কমাশিলাল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—‘কুটীর-শিল্প’
ক্যালোভারের উপরুজ ছবি। ক্যালোভার সাধারণতঃ



প্রতিকৃতি

[শ্রীশচীন দাস]



বাড়ার

[ঐক্যসত্তা সেন]

বিজাপুরের লত্জা হাণ্ডা হর। একটা স্নানঘর ছবির মধ্যে বিজাপুরের লত্জা হাণ্ডা নিহিত আছে। একই একই করে একটা হাণ্ডা বোঝা হয়েছে। অনেক রকম অর্থেই ছবিটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ ছাড়া আর যে সমস্ত শিল্পীর ছবি উল্লেখযোগ্য তাদের নাম দাঁতে দেওয়া হ'ল—

ঐক্যসত্তা বসু, মীরা সেন, অজিত বসু, সুভাষ সিংহ রায়, কমল চৌধুরী, সলিলকুমার ভট্টাচার্য্য, ভাস্কর্য্য সেনগুপ্ত, শিউলি রায়, দেবিকা দাস, পদ্মকিৎ বসু, সত্যেন্দ্র কুমারী, সুব্রত সেন, লক্ষ্মীদাস দাস, রমল সেন, রঞ্জিত দে, কামাই কর্ণকর, গোষ্ঠ কুমার, জ্যোতির্ষর মজুমদার, সুবীজ দাসবর্ম্মা, অমলা চৌধুরী, সুনির্ম্মল বসু, রবি সুখোপাধ্যায়, মদন রায়, মনোজ্ঞান ঠাকুর, রঞ্জন সুখোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্ত্তী, সমরেন্দ্র চৌধুরী, নরেন্দ্র রায় চৌধুরী।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঐদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩১২ সালের চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে আমার কৃষি-সম্পর্কীয় প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; তখন আমি সাবোর (বিহার) কৃষি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি। 'প্রবাসী'র কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কাহাকেও তখনও জানিতাম না। যখন প্রবন্ধ পাঠাই তখন আমাদের জনৈক অধ্যাপক ঐক্যনাথ ঘোষ মহাশয় এবং কয়েক জন সহপাঠী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রবাসী অতি উচ্চ স্তরের মাসিক পত্রিকা, ইহাতে নামজাদা ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ব্যতীত আর কাহারও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না; আমার প্রবন্ধ অমনোনীত হইয়া ফেরত আসিবে। সুতরাং আমিও প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমার যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমার এখনও মনে আছে এবং ইহার ফলে যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছিলাম তাহার বলেই আজ পর্যন্ত কৃষি-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিয়া বাইতেছি।

১৩১২ সালের চৈত্র মাস হইতে 'প্রবাসী'র সহিত আমার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু প্রবন্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহার বহুকাল পরে। সন ও তারিখ মনে নাই; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া

গিয়াছিলেন; তখন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহের পার্শ্বে প্রবাসী আপিস অবস্থিত ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি অতি গভীর প্রকৃতির লোক, কাহারও সঙ্গে বিনা কারণে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না, সকল সময়েই লেখা কিংবা পড়ায় ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা তাঁহার প্রথম কথাতেই পরিবর্তিত হইয়া গেল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমার পরিচয় করাইয়া দিবার পরেই তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি কৃষি-বিষয়ে প্রবন্ধ খুব সহজ ভাষায় লিখতে পার; তোমার প্রবন্ধে এমন কোন বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ থাকে না, যা আমার মত লোক বুঝতে পারে না।" তাঁহার এই প্রথম কথাতেই আমার আশঙ্কা ও সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া গেল। আনন্দের আভির্ভাষে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রথম কাগে আমাকে তাঁর "তুমি" সম্বোধন, দ্বিতীয় কারণ আমার প্রবন্ধের প্রশংসা। আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক ও সহপাঠীগণ যে সম্ভেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন সে কথা তাঁহাকে বলিলাম; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কৃষিই যে আমাদের দেশের আগল বস্তু; কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ বত বেশী প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল হবে—আমার কাছে কৃষি-বিষয়

প্রবন্ধ অতি মূল্যবান ; তুমি লিখে যাও ।” তখন কুশিলাম তাঁহার নিকট কৃষির মূল্য ও মর্যাদা কত বেশী ।

আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি । উন্নত কৃষি-প্রণালীর প্রচারের জন্য ইংরেজী ১৯২২ সালে আমি একটি পত্রের বই লিখিয়াছিলাম ; পুস্তকখানির নাম “ভুলের ফসল ।” আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ইহার তুমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন । ‘প্রবাসী’তে পুস্তকখানির সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল । সমালোচনার প্রথমেই ছিল—“লেখক চাষা, লিখিয়াছেন গল্প ।” তখন আমি ফরিদপুরে, জেলা-কৃষি-কৰ্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলাম ; সমালোচনাতে আমাকে ‘চাষা’ আখ্যা দেওয়াতে আমি খুবই মনঃক্লান্ত হইয়াছিলাম । ইহার পরেই সরকারী কার্য্য উপলক্ষে যখন দুই-এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসি—তখন রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে ‘চাষা’ আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদ করি । তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “তুমি যদি প্রকৃতই কৃষিকাজকে ভালবাস, তা হলে ‘চাষা’ উপাধিতে তোমার গৌরব অল্পভব করা উচিত ।” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ‘চাষাই দেশের খাঁটি মানুষ । তুমি সেই রকম খাঁটি মানুষ হবার চেষ্টা কর ।’ তাঁহার সেই হাসি আমার এখনও মনে আছে । তখন হঠাৎই আমি বহু সভায় নিজেকে ‘চাষা’ বলিয়া পরিচয় দিয়াছি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা সকল সভায় বলিয়াছি ।

রামানন্দবাবু আমাকে কয়েকখানি চিঠিও লিখিয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ শব্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রয়োজনেই চিঠিগুলি লিখিত হইয়াছিল । সেই সকল চিঠিতেও কৃষির উন্নতির

অন্য তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম ।

অতি সামান্য দরকারেও রামানন্দবাবুর নিকটে গিয়াছি—কিন্তু তাঁহার নিকট যাইতে কখনও কোন বিধা অল্পভব করি নাই । ১৯২৫ সালে ‘ওয়েষ্টলী এগজিভিশনে’র পূর্বে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল । উক্ত প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগের ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল । ঐ সময়ে কতকগুলি ছবি, চার্ট প্রভৃতির জন্য কয়েকটি ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি দরকার হয় । একটি ইংরেজী শব্দ ছিল “pedigree bull”, আমি ইহার বাংলা অমুবাদ করিয়াছিলাম “বংশ-জানা বাঁড়” । রামানন্দবাবু কয়েকটি ইংরেজী শব্দের অমুবাদ করিয়া দিলেন ; আমার pedigree শব্দের বাংলা অমুবাদ দেখিয়া বলিলেন, “খুব সহজ হয়েছে, আমি এত সহজ লিখতে পারতাম না ।” যে কয়েক বার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, এইরূপ মেধ, প্রীতি এবং উৎসাহ লাভ করিয়াছি ।

১৩১৯ সালের চৈত্র মাস হইতে অন্যান্যবিধ ‘প্রবাসী’র সহিত আমার সম্পর্ক অবিকল্পিত আছে । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রবাসীর বর্তমান সম্পাদক শ্রীকেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার পিতার ন্যায় উন্নত কৃষির প্রবর্তন সম্বন্ধে সচেতন এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের একজন প্রকৃত দরদী । ইহার প্রমাণ পাওয়া বাইবে ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত কৃষিসম্পর্কীয় প্রবন্ধসমূহের সংখ্যাধিক্য হইতে । প্রবাসীর “বিবিধ প্রসঙ্গে”র আলোচনাসমূহ হইতেও ইহার পরিচয় মেলে ।

ইতিহাসে নাম

শ্রীকালিদাস রায়

অনন্তের ইতিহাসে দেখি যুগে যুগে আসে
এমন মানুষ বেশে বেশে,
এই সৃষ্টি বিবাতার করে তোলে ভোলপাড়
ভাতে ছাপ দায় রেখে শেষে ।
এ মানুষ শুধু চার চিরদিন এ ধরায়
ইতিহাসে থাকে বেশ নাম
যে দেশে সে করে হার আশা বিরে ভিনে তার
সে বেশ কত না ঘের দায় ।
লোক লক দারী-মরে প্রাণ ঘের তারি করে
লক লক হারায় সবল,
লক লক গৃহহারী হারায় অপত্য দায়
দায় দেশ হয় হীনবল ।

ভার, বর্ষ, সভ্য মর মিল, দারাপত্য মর
মর পরাবীনতা মোচন,
আশ্র-স্বপ্ন বৃদ্ধি মর বদেশের ঋদ্ধি মর
মর বিবে কল্যাণলাভন,
তবু বিশ্ব-ইতিহাসে দায় রাখিবার আশে
বেশে বেশে আলায় অবল ।
একের খেয়াল বশে সহস্র অবলে পশে
বর্গভূমি হয় রসাতল ।
তবু লোক দাহি যুগে কোটি কোটি ভানে পুড়ে
যুগে বত করে হাহাকার ।
মোহাবেশে মনে করে ভাবেরি কল্যাণ-ভরে
যুগি সে বেবের অবতার ।

পণ্ডিতারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

পণ্ডিতারী-বাসকালে আমরা শ্রীঅরবিন্দ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাকে “অরো” বলিয়া অভিহিত করিতাম। এই সম্বোধন আমরা অতিশয় আদরের সহিত করিতাম। এই “অরো” আমার নিকট কৃত্রিম ছিলেন না, তাঁহার সমুদ্রত মহিমা আজিও অল্পভব করি, বিন্মিত হই। অরোর সঙ্গে এই সময়ে আমরা দিব্যরাজ অভিহিত করিয়াছি। মধ্যাহ্ন-ভোজননের পরে তিনি বারান্দায় বসিয়া আলোপ করিতেন। বোগসাধনার মধ্য দিয়া আমাদের জীবনকে নূতন ভঙ্গীতে ঢালিয়া লইবারই যেন তিনি আলো ধরিতেন। আলোচনা দীর্ঘরাত্রি ধরিয়া চলিত—সারা রাত কোথা দিয়া যেন কাটিয়া বাইত, আমাদের হৃৎ থাকিত না। প্রভাতের পাখীর ডাকের নিকট শ্রীঅরোর গিয়া আশ্রয় লইতাম। সে কি অসাধারণ প্রীতি ও অহুপ্রেরণা, সে কি গভীর স্নেহ-ভাৱে আমাদের বাধিবার অহুপ্রেরণা!

আমি বাল্যকাল হইতে নিরামিষাশী। পণ্ডিতারী আসিয়া দেখিলাম—মৎস্ত ও মাংস ভিন্ন দুই বেলা আহ্বারের অস্ত্র ব্যবস্থা নাই। আমি কয়েক দিন অন্নর সঙ্গে আলুসিক খাইয়া উন্নয়পুষ্টি করিতে লাগিলাম। অরো নিরুপেক্ষ ভাবেই হাসিতেন। মণি, বিজয়, নলিনী প্রভৃতি পরিহাস করিয়া বলিতেন, “এমন করিয়া কতদিন চলিবে? মৎস্ত, মাংস খাইলে আপনি কি জাতিচ্যুত হইবেন?” অরোর মুখে কিন্তু কথা ছিল না—তিনি ভোজনকালে নানা রক-রহস্তে সময় কাটাইয়া দিতেন; আমি কিন্তু তাঁহার অন্তরের বাণী বুঝিয়া লইলাম। অতীতের সর্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি দিতেই তাঁর অহুপ্রেরণা অন্তরে অন্তরে অহু-ভব করিলাম। বিজয় প্রভৃতির বাক্য উপলক্ষ্য বলিয়া মনে হইল। আমি সেই দিনই ভোজনকালে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া বসিলাম, “স্নান হইতে নিরামিষাশী আমি আর নহি। অরোও বাহ্যতে রুচি, তাহাই আমার গ্রহণীয় হইবে।” সহস্রাধিক উল্লসিত হইয়া বলিল, “সাবাস আপনাকে—আপনার সংস্কার, আচার ও নীতি অরোই ভাঙিয়া দিলেন। সন্ধ্যা হইতেই আপনার খাণ্ডপাত্রে সমুদ্র-মৎস্ত দেওয়া হইবে।”

তাহাই হইল। রাত্রে ভোজন-পাত্রে সমুদ্রে বসিয়া দেখিলাম—ভাতের সঙ্গে এক বাটি মাছের ঝোল দেওয়া হইয়াছে। আবাল্যের সংস্কার জ্ঞানভঃ ভঙ্গ করিলাম বটে, কিন্তু অন্তর ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অরো এক বার

আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। বেদনাভরা আঁখি দুটি আমার হৃৎখে যেন জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চাহিয়া-ছিলেন আমাদের নূতন করিয়া গড়িতে, অতীতের সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, “আমি স্নান হইতে মৎস্ত-মাংসভোজী হইয়াছি।” তিনি হাসিলেন। সেই হাসির মধ্যেই আমার সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইলাম। সেদিন অরোর মুখে উঠিল বটে, কিন্তু তৃপ্তি পাইলাম না। ভোজনান্তে বারান্দায় বসিয়া তিনি আত্মসমর্পণের সাধনার কথা বিশদ ভাবে বলিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম—সকল ধর্ম বিসর্জন দিয়াই একের শরণ লইতে হয়। আমিও তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এবার পণ্ডিতারী আসিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ফরাসী পুলিশ কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাস্ত্রাজে মোর্চবাট লইয়া শ্রীঅরোর সারথির সকাশে গিয়াছিলাম। আমি কিন্তু গোপন পথ দিয়া পলাইয়াছি; তার পর শ্রীনিবাস আয়েজারের সহিত শ্রীঅরবিন্দের ভবনে প্রবেশ করায় ও ইংরেজ পুলিশ সম্ভবতঃ ফরাসী গবর্নমেন্টকে তদন্ত করিতে বলায়, পুলিশ কমিশনারের আবির্ভাব। বন্ধুরা সকলেই আমার গোপন স্বায় দিয়া কিছুকণ দূরে থাকিতে বলিলেন—কমিশনার সাহেব বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া প্রমাণ করিলে, পুনরায় বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই চলিবে। এইরূপ পরামর্শকালে অরো আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি কটিনেশে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহারই অর্ধভাগ গায়ে জড়াইতেন। পায়ে এক জোড়া চটিজুতা থাকিত। সেই সৌম্যমুখী মুষ্টি ভুলিবার নয়। তখন তিনি শীর্ণকায় ছিলেন—কিন্তু তাঁহার চক্ষে ছিল অপূর্ণ দীপ্তি, ভাবের মুখমণ্ডল। যুগ্ম হাসিয়া তিনি আমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিব পুলিশ কমিশনারকে?” কিন্তু আমার আর কিছু বলিতে হইল না; তিনি আমার মুখের পানে কিছুকণ চাহিয়া থাকিয়া তার পর অতিশয় গাভীর্ষের সহিত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পুলিশ কমিশনারকে তিনি আমার কথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন। সব কথা শুনিয়া কমিশনার সাহেব কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, “চন্দ্রনগর হইতে যে ভক্তলোক আপনার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত আপনার সম্পর্ক কি?” তিনি স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “He is my disciple” (তিনি আমার শিষ্য)। কমিশনার

সাহেব করমর্দন করিয়া হস্তমুখে গ্রহণ করিলেন। অরো আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “সব চুকিয়া গেল, তুমি এখন আমার নিকট নিরাপদেই বাস করিতে পার।”

এই সময়ে দেড় মাস তাঁহার নিকটে বাস করি। মধ্যে একখানি প্রশস্ত গৃহে নলিনী, মণি ও সৌরীন বাস করিত। শ্রীঅরবিন্দের সম্মুখস্থ কক্ষে বিজয়ের সহিত বীরেন বলিয়া এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। ইহার সম্বন্ধ পরে কিছু বলিতে হইবে।

অরোর মুখে ভারতের পুরাণেতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা শুনিলাম। বেদের মধ্য তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইত। উপনিষৎ ও গীতার সত্য-মর্থ অন্তর দিয়া বুঝিয়া লইলাম। ভারতের বাহুবলবীরের বহু পরিচয় মিলিল—নেতৃগুরুবর্গের পরিচয় পাইলাম। অরো এই সময়েই নিজের বালাজীবনের কথা কিছু বলিয়াছিলেন। আমি তাহা খাতায় টুকিয়া লইয়াছিলাম। সে কাহিনীটুকু আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।

আমার ইন্সপেক্টর সাহেব বন্ধ হইল। বিপ্লবী বন্ধুদের অহরোধ অহুযায়ী রিভলভার আনিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, “ভারতবর্ষ রাজসিকতার মধ্য দিয়া জাগিবে না; ভারতের এক দল মানুষকে গীতার পার্থসারথির কথা শুনিতে হইবে। ভারতের নেতৃগুরুবর্গ হইবেন গীতার মানুষ। তাঁহাদের গুণাভীতি হইতে হইবে। তবেই আসিবে ভারতের মুক্তি।” এই সময়ে তিনি স্পষ্ট করিয়াই আমায় জানাইলেন—অতঃপর রাজসিক কর্ণে আমি যেন প্রবৃত্ত না হই। তিনি ভারতকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। আমিও তাঁর নির্দেশ প্রাণপণে পালন করিব বলিলাম। তিনি আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—মস্তক আভ্রাণ করিয়া বলিলেন, “আমার কাজ তোমার কাজ; তোমার কাজও আমার বলিয়াই গ্রহণ করিও।”

এই সময়ে তিনি যাত্রা সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেন। আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গী হইতাম। আমরা “পীয়ারে”র শেষ সীমানায় আসিয়া বসিতাম। জেটিকে পণ্ডিত্যরীর লোকে “পীয়ার” বলে। জ্যোৎস্নাবিধৌত সমুদ্রতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি অতিশয় পুলকিত হইতেন। আমি গান গাহিতাম, হরেশ ওরফে মণি সেও গাহিত, “অরো” তাল দিতেন। সে রজন-রহস্তের কথাগুলি শ্রবণ করিলে আজও তৃপ্তি পাই। মনে আছে, এক দিন অগ্নিদে বসিয়া তিনি আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন—আমায় ইচ্ছাশক্তির কথা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, “ইচ্ছা সর্বব্যাপী, এই দেখ—আমি will করিব, চিলগুলি তৎক্ষণাৎ ভিন্নমুখে উড়িয়া যাইবে।” সত্যই তাঁহার ইচ্ছামাত্র চিলগুলি ভিন্নমুখী হইল।

বেদিন বিদ্যায়ের পালা আসিল, সেদিন কি ভাবে আমি বাংলায় ফিরিয়া যাইব—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, “যেভাবে তুমি ইংরেজ পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া চলিয়া আসিয়াছ, তোমায় পাইলে তাহার সহজে তোমায় ছাড়িবে না। তোমাকে গোপনেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি তাঁহার আদেশানুযায়ী করাসী কোম্পানীর বাংলায় যে স্ট্রিমার আসে, তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। তারপর নীলাধরাশি বিদীর্ণ করিয়া কলিকাতার বন্দরে বেদিন স্ট্রিমার ভিড়িল, সেই দিনই রাজাবাজার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। অমৃতলাল হাজারী ওরফে শশীকুমোহন প্রমুখ প্রায় ২০ জন বিপ্লবী ধরা পড়ে। আমি ঐ যাত্রা রাজাবাজার যাইতে গিয়া অন্তরের সত্যকেষণায় সহস্রা গতির মোড় ফিরাইয়া চন্দননগরেই উপনীত হই। অরোর আশীর্বাদেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি বলিয়া মনে করিলাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের নূতন বাণী লইয়া “আধ্য” পত্র প্রকাশিত হইল। “বন্দে মাতরম্”—এর ঋষি “কর্মযোগিন” ও “ধর্মের” পর “আধ্য” অপূর্ব অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। “আধ্য” বাহির করার পূর্বে চন্দননগরে ডেপুটি নির্বাচনের আন্দোলনে আমাদের যোগদান শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশক্রমেই হইয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করি—তাঁহার মূল এইখানেই নিহিত ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের করাসী ভারতীয় ডেপুটি নির্বাচনে মঃ লে-ম্যার, মঃ পল ব্রুজ্জ ও মঃ পল রিশার, এই তিন জন প্রতিনিধি পদ প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা এই সময়ে বখাসাধ্য চেটা করিয়া মঃ পল রিশারকে ভোটযুদ্ধে জয়ী করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু মঃ লে-ম্যারই বিজয়ী হইয়া ডেপুটি রূপে নির্বাচিত হন। এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

“The election is over, or what they call an election with the result that the man who had the fewer real votes, has got the majority.”

অর্থাৎ,

“নির্বাচন অথবা ইচ্ছা বাহাকে নির্বাচন বলে, তাহার শেষ হইয়াছে। কলে যিনি সবচেয়ে কম ভোট পাইয়াছিলেন, তিনিই সবচেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী দাঁড়াইয়াছিলেন।”

তাঁহারই পত্র হইতে আরও জানা গিয়াছিল যে, যেখানে মঃ লে-ম্যার মাত্র তিন শত ভোট পাইয়াছিলেন, সেখানে ৩৩০০ শত লিখিত হইয়াছিল। করাসী ভারতের নির্বাচন সম্বন্ধে এই কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তিনি সেই পত্রের আমাদের চোঁটাকেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি অর্থের কথা পুনরায় জানাইলেন।
তিনি লিখিলেন—

"My present position is that, I have exhausted all my money along with your Rs. 60/- and I am still in debt for the Rs. 130/- due for the old rent. I do not like to take more money from Mous. Richard. He has sold one-fourth of his wife's fortune (a very small one) in order to be able to come and work for India."

"তোমার ৩০ টাকা সহ আমার সব টাকাই আমি খরচ করিয়া কেলিয়াছি। পুরাতন বাড়ীভাড়ার বন্ধন আমি এখনও ১৩০ টাকা ঋণগ্রস্ত। বঃ রিশারের নিকট আর টাকা লইতে আমি রাজী নহি। তিনি তাঁর স্ত্রী-বন হইতে (বাহার পরিমাণ বুঝি নয়) এক-চতুর্থাংশ বিক্রয় করিয়া কেলিয়াছেন—তাহা দিরা ভারতে আসিয়া ভারতের কার্য করিবার জন্য।"

এই সময়ে বাগান বিক্রয়ের তাঁহার অংশস্বরূপ ৫০০ টাকাও তাগিদ দিবার জন্ত তিনি আমায় পত্রে লেখেন। কোন বিশিষ্ট নেতার নিকট হইতে দেশের গচ্ছিত টাকা আদায়ের দুঃসাধ্যতা উল্লেখ করিয়া তিনি এই কথা লিখিলেন—

"This habit of defalcation of money for noble and philanthropic purposes in which usually the ego is largely the beneficiary, is one of the curses of our movement and so long as it is continued Lukshmi will not return to this country. I have sharply discontinued all looseness of the kind myself and it must be discouraged henceforth wherever we meet it. It is much better and honest to be a thief for our own personal benefit than under these holy marks."

"উচ্চ ও পরহিতের উদ্দেশ্যে বেধাইয়া অর্থ আদায় করার এই অভ্যাস—বাহাতে প্রবলিতঃ মানুষের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হইয়া থাকে—তাহা আমাদের আন্দোলনের অভিপায়ন; আর ইহা বতর্নিন না হয় হয়, বতর্নিন ভারতে লক্ষী-দেবীর পুনরাবির্ভাব হইবে না। আমি নিজে আমার এই প্রেমের সকল টিলেই তীব্রভাবে বদ্ধ করিয়াছি এবং বেধামেই ইহা দেখি না কেন, তাহার উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের সোজা হুজি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে চোর হওয়াও বরং চোর ভাল আর এইরূপ পুণ্যচিহ্নের আবরণে তাহা হওয়ার চেয়ে চোর সাধু আচরণ হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘদিন অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন ছিলেন, কিন্তু সঙ্কটে কোন দিনই তিনি প্রতিহত হন নাই। ভাগবত কণ্ঠের জন্য অর্ধাঙ্গমের পথ চিরদিন মুক্ত বলিয়াই তাঁর ধারণা ছিল। এই সময়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমায় স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন—

"What you have to do is to make some real arrangement not a theoretical arrangement by which my burden of my expenses may be shifted off your shoulders, until I am able to make my own provision. Meanwhile get me Rs. 150 and the Rs. 500 due to me (garden money). If afterwards we can make no other arrangements, we shall then have to consider the question again."

"তোমার বাহা করিতে হইবে, তাহা হইতেই একটি বস্তুর ব্যবস্থা করা—কোন কল্পনামূলক ব্যবস্থা নয়—বাহাতে আমার ব্যয়ভার তোমার কব্ধ হইতে সরিয়া যার—আমার নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করিতে না পারা পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ১৫০ ও বাগান বিক্রয়ের ৫০০ টাকা আমার পাঠাইও। পরে আর কোন ব্যবস্থা যদি আমার না করিতে পারি, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গ আমার বিবেচনা করিতে হইবে।"

তাঁহার পত্র পড়িয়া আমি নিরতিশয় চিন্তাশ্রিত হইলাম। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দাবি পূরণ করিতে পারিয়াছিলাম। এই জন্য আমার কৃত্তিত্ব অপেক্ষা তাঁহার প্রেরণার মূল্যই অধিক বলিয়া আমি মনে করি।

আমি যখন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট ছিলাম, সেই সময়ে বীরেন নামক এক যুবক ৮বিজয় নাগের সঙ্গে থাকিত—পূর্বেই বলিয়াছি। সৌবীজনাথ তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই আমায় বলিয়াছিলেন এবং সে ব্যক্তি যে পুলিশের এক জন গুপ্তচর, এইরূপ উক্তিও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে এইজন্য আমি সতর্ক থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তদন্তের তিনি লিখিলেন—

"Then for important subjects. You write about Birn being here. I do not hold the same opinion as Sowrin etc. do, who are inclined towards a very black interpretation of his character and action. . . . I fail to find in him, looking at him spiritually, those ineffable blacknesses, which were supposed to dwell in him, only flightiness, weakness, indiscretion, childishness, swattvic impulsiveness and self-will and certain undesirable possibilities present in many young Bengalees, in a certain type, indeed, which has done much harm in the past. All these have recently much diminished and I hope even to eradicate them by the Yoga. In fact, the view of his presence here forced in me by that which guides us, is that he was sent here as the representative of this type and that I have to change and purify it. If I can do this in the representative, it is possible in the future to do so in the class and unless I can do it, the task I have set for myself for India will remain almost difficult for solution. For as long as that element remains strong, Bengal can never become what it is intended to be."

"বীরেন নবকে ছুনি বাহা বলিয়াহ এবং সৌবীজ গ্রন্থ

বাহা বলিয়াছে, তাহা সবইহু লভ্য নহে। বীরেনের ঐ সকল চরিত্রগত ঘোষ আমার অব্যাহতুষ্টিতে পড়ে নাই। তাহার চাপল্য, হুর্ললতা, অবিবেচনা, হেলেনাহুসি, একটা সাহিত্যিক ভাবপ্রবণতা ও বৈশাচারিতা এবং এরূপ কয়েকটি অবাছনীয় লক্ষণবলা দেখা যায় বটে, যাহা এক শ্রেণীর বাঙালী ভ্রমণদের মধ্যে বিদ্যমান এবং অতীতে যাহা যথেষ্ট অনিষ্টই করিয়াছে—এই সকল ঘোষ এখন অনেকটা কমিয়াছে এবং আমি আশা করি যোগের দ্বারা ঐগুলি একেবারেই নির্মূল হইয়া যাইবে।.....যিনি আমাদের নিমিত্ত, তিনি তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন—সেই শ্রেণীর প্রতিনির্মিত্রপে। আর তাহাকে আমার পরিবর্তিত ও বিস্তৃত করিয়া তুলিতে হইবে। একটি প্রতীকের মধ্যে যদি ইহা আঁক সিঁদ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র শ্রেণীটির মধ্যেই তাহা করা সম্ভবপর হইবে। আর তাহা যদি আমি না করিতে পারি, তো যে কাক আমি ভারতের জন্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা সমাধান করা হুঃসাধ্য হইবে। বাংলাও তাহা হইলে যাহা হইবার জন্য চিহ্নিত, তাহা হইতে পারিবে না।”

বীরেন সম্বন্ধে তাঁহার এই আকুলতার মূল্য নিশ্চয়ই অস্বাভাবনীয়। মানুষকে বড় করিয়া দেখার প্রবৃত্তি যে তাঁহার মধ্যে কতখানি ছিল, ইহা হইতেই তাঁহার পরিচয় মিলিবে। যদিও বীরেন্দ্রনাথের সংবাদ আর আমরা রাখিতে পারি নাই তথাপি শ্রীঅরবিন্দের বাঙালীজাতির তথা ভারতের অভ্যুত্থান ও জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্তনকল্পে যে আন্তরিকতা, তাহা চিরদিন আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই বাংলার বৈপ্লবিক অস্থ-
ঠান সম্বন্ধে আমার নিকট যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতোছিলেন, তাহাতে বাংলার বিপ্লবীগণ তাঁহাকে রাষ্ট্র-
নেতার আসন দিতে অতঃপর অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল, কিন্তু আমি তখন যে অবস্থায় তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া হুঃসাধ্য ছিল। তিনি সর্বদাই জানাইতেন বৈপ্লবিক কর্ম্মচ্ছর্পণ হইতে যেন আমি বিবৃত থাকি। তিনি এই সময়ে স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন—

“You must realise that my work is a vast one and that I must in doing it come in close contact with all sorts of people, including Europeans, perhaps even spies and officials.”

“তোমার উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমার কার্য অতি বৃহৎ। এই কার্যের জন্য বহুবিধ লোকের সংস্পর্শে আমার আনিতে হইবে—ভ্রমণো ইউরোপীয়, এমন কি গুপ্তচর ও রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।”

এই প্রসঙ্গে তিনি এক জন ফরাসী কর্ম্মচারীরও নাম করিয়াছিলেন—চন্দ্রনগরে তিনি কর্ম্মোপলক্ষে এই সময়ে

থাকিতেন। আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলেন সে ব্যক্তি একেবারেই বুদ্ধিহীন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি তাঁহার অসাধারণ। শ্রীঅরবিন্দও এক দিন ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, “He is a queer sort of fool”—
সে এক বিচিত্র ধরণের বোকা লোক।

স্পষ্টই বুঝিলাম—মঁসিয়ে রিশারের আগমনের পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে দূরেই থাকিতে চাহিতেছেন—
আমাকেও তাঁহার সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রতি পত্র নির্দেশ দিতেছিলেন। তিনি অতঃপর যে নীতি ধরিয়া চলিতে চাহিতেছিলেন, তাহার আভাস পরবর্তী কয়েক ছত্রে পরিস্ফুট হইবে :

(1) It might be known among our friends that my whole action is about to be such as I have described, so that they may not again repeat that kind of mistake.

(2) Those immediately concerned with me must be aloof physically from Tantrickism: because of the discredit it brings.

(3) Biren and others of that kind must be made to understand that Tantra for us is discontinued until further notices, which can be only in the future.

(4) The written basis of Vedantic Yoga has now become impossible and must be entirely changed and as far as possible, withdrawn from circulation.”

১। আমার বন্ধুদের জানা উচিত যে, অতঃপর আমার সমগ্র কর্ম্ম যেমন বলিয়াছি, সেইরূপ হইবে, বাহাতে যে ভুল তাহার করিয়াছে তাহা আর পুনরায় না ঘটে।

২। যাহারা প্রত্যাকভাবে আমার সহিত জড়িত, তাহাদের তান্ত্রিক কর্ম্ম হইতে তুলত: বিরত থাকিতে হইবে—কারণ তাহাতে অপবাদ ঘটায়।

৩। বীরেনের মত লোকেরের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা ভ্রম্ভাষনা পুনরায় না নির্দেশ পাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছি; আর সে পুনরায়ও সূত্র ভবিষ্যৎ দ্বারা হইতে পারে না।

৪। বেদান্তযোগের সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থাদি এখন অচল হইয়াছে। উহার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং যথাসম্ভব তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।”

তাঁহার পত্র পড়িয়া বাংলার বিপ্লবীরা কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সময়ে পণ্ডিতারীতে ধর্ম্ম-
সাধনার ভিত্তির উপর একটা নূতন সাধকমণ্ডলী গড়িতে উদ্ভত হইয়াছিলেন। মঁসিয়ে রিশারের ইচ্ছাছুবায়ী এই সমিতির কবাসী নামকরণ হইয়াছিল “L'ide Nouvell”
(The New Idea)। এই সমিতি কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

রবীন্দ্র-সংলাপ কণিকা

ত্রিবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরবিজয়

ঠিক মনে নাই, আশ্রমে পূজাবকাশ বা গ্রীষ্মাবকাশ উপস্থিত। ছাত্র আর অধ্যাপকেরা কয়েক দিনের জন্ত স্থানান্তরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। আমি সন্ধ্যার পূর্বে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি বলিলেন—

‘আপনি কোথায় যাইতেছেন?’

‘প্রথমে তো মেদিনীপুর, সেখানে আমার ছোটভাই ইন্দুশেখর জেলা-ইঞ্জিনিয়ার। সেখানে এক বার যাইতে হইবে।’

‘তার পর?’

‘তার পর জামশেদপুর, সেখানে আমার পুত্র ব্রজব্রত থাকে, সেখানে না গিয়া পারি না।’

‘তার পর?’

‘তার পর হরিনন্দ্রপুর। সেখানে আমাদের বাড়ী, যাইতেই হইবে।’

‘তাহা হইলে বলুন আপনি একবারে ত্রিপুরবিজয়ে বাহির হইতেছেন!’

বাইওকেমিক চিকিৎসা

৩১শে আশ্বিন, ১৩৪৪ সাল। গুরুদেব বরাহনগর-কামারহাটির পথে বালি রেলপুলের নীচেই গুপ্ত নিবাস নামে এক বাগান বাড়ীতে আছেন। তাঁহার শরীর খুবই ক্লান্ত। সাম্প্রতিক বিসর্প ব্যাধি হইতে উঠিয়াছেন। লম্বাচুল অনেকটা কাটিয়া কেলিতে হইয়াছে। দাড়িও দুই পাশে উপরের দিকে কতক ছাটিয়া দিতে হইয়াছে। অনেক কথা হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন ‘শরীর বখন আর চলে না তখন অন্যের উপর ভর করিয়া থাকা ঠিক নহে।’ তিনি বলিলেন সেই গুরুতর ব্যারামের মধ্যে কোন কষ্ট অস্বস্তি করেন নি। বাইওকেমিক ঔষধ তিনি নিজের ইচ্ছায় খাইতে চাহিয়াছিলেন—বদী নীলরতন বাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণের অমত না হয়। তাঁহাদের অমত হয় নি, কেননা তাঁহাদের মতে ওটা ওষুধই নয়। কিন্তু কলটা যে ঐ ওষুধেরই হইয়াছিল তাহা বলা চলে না। ডাক্তারেরা বথেই দেখাশুনা করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদক (reporter) বঙ্কিমের স্ত্রীখা লইয়া ডাক্তারদের পরামর্শের স্থানে গিয়া ভাল করেন নি। ঐ ওষুধের বিবরণ

পত্রিকায় বাহির হওয়ায় ডাক্তারদের কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

বাকুসিদ্ধি

গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন। সকলে তাঁহাকে এখন সংযত হইয়া কথা-বার্তা করিতে বলেন, কেননা তিনি এখন বাঁহা বলেন তাহাই কলিয়া যায়। প্রথম প্রমাণ এই যে, তাঁহার উল্লিখিত সাম্প্রতিক বিসর্প। বেদিন রাজে এই ব্যারামটা দেখা দিল তাহারই একটু আগে সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে কারতে তিনি বলিতেছিলেন যে, তাঁহার তো তেমন কোন ব্যারাম হয়ই না। এমন রোগ হয় যে, চারিদিকে সকলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, রাত জাগিতেছে, ডাক্তার-কবিরাজ মাথার কাছে বসিয়া আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে তো বুঝি হাঁ ব্যারাম, নতুবা কিছুই না! ইহা সঙ্গে সঙ্গেই কলিয়া গেল।

দ্বিতীয় প্রমাণ। এই কিছু দিন হইল, একটা খুব বড় রকম ঝড় হইয়া গেল। ইহার দিন দুই আগে গুরুদেব বলিতেছিলেন ‘এখন আর আগের মত ঝড় হয় না। সে-সব ঝড় গেল কোথায়? মনে আছে, কলিকাতায় আছি। এক ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। সকলে ছিলাম ভেতলায়। নামিয়া দোতালার আদিলাম। মাঝের ঘরের একখানা কবাট ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে ভীষণ কাণ্ড। সেই সব ছিল ঝড়। এখন আর তেমন হয় না।’ এই কথার দুই দিন পরে ঐ ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছিল।

তৃতীয় প্রমাণ। গুরুদেব সেদিন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাসায় বাগানবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গল্পগুজব হইতেছিল। গুরুদেব বলিতেছিলেন, ‘আজকাল ডাকাতি হয় না। বদি হয় তো খুব মজা করিয়া দেখা যায়।’ ঠিক ঐ দিনই রাজে ঐ বাসাতেই ডাকাতি হইয়াছিল। গুরুদেবের পাশেরই ঘরে প্রশান্তবাবু ছিলেন। তাঁহাকে বেশ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

নিজের মৃত্যুর পূর্বেই লোকসমূহের তন্মুগ্ধিত শোক জানা গুরুদেবের সহিত কথা চলিতেছে। তাঁহার ঐ অল্পখেরই বিষয়ে বলিতেছিলাম। ঐ সময়ে তাঁহার ব্যারামে দেশ-বিদেশে এত উৎসেহ হইয়াছিল যে, কয়েক হাজার চিঠি ও তার শান্তিনিকেতন ডাকঘরে সহসা বাড়িয়া উঠে।

একজন কৰ্তৃপক্ষকে জন হুই অতিরিক্ত কৰ্মচারী নিযুক্ত
করিতে হইয়াছিল। ইহাই অবলম্বন করিয়া গুরুদেবকে
বলিলাম, ‘আপনার বস্তুত অভাব হইলে, লোকের মনের
ভাব কেমন হইবে তাহা আপনি জানিয়া লইলেন!’
গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, ‘মরিলে অনেকের জন্ত এরূপ হয়,
কিন্তু ইহা মনে করিবার সুযোগ অনেকের হয় না, আমার
সে সুযোগটা হইয়াছে।’

বমের খুঁটিধরা

ঐ গুরুতর ব্যারামে গুরুদেবকে নিজের লম্বাচুলকে
অনেকটা কাটিয়া কেলিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি
বলিতেছিলেন ‘বম আসিয়া খুঁটিটা ধরিয়াছিল, অতঃপক্ষে
ডাক্তারবা আসিয়া দেহটা ধরিয়া বিপরীত দিকে টানিতে-
ছিলেন। ফলে বমের হাতে খুঁটিটা থাকিয়া গেল, ডাক্তারবা
দেহটা টানিয়া রাখিলেন।’

কাঁটা

ঐশ্বর্যমাপদ চট্টোপাধ্যায়

সুলভার লহিত বিকাশের আলাপের আরম্ভটা এইরূপ :
বিপ্লবের গুরুভোজনের পর বিকাশ রাজির আগরণটা দিবা-
নিদ্রার দ্বারা পূরণ করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু
মৃত্যু জামাতাকে বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। রাজ্য এই
কয়েক দিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। ভালক, ভালিকা
এতদূর মনুষ্য সম্পর্কহীনদের মিকট এখনও সে পুরাতন হইয়া
যায় নাই। আহা! সে তাহার জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষ আসিবার
পূর্বেই ভালক-বালিকা ও কিশোরীর দল আসিয়া সেখানে
তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। বিকাশ মনের বিরক্তি চাপিয়া
রাখিয়া তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলিয়া ভুলাইয়া কক্ষ হাতিয়া বাইতে
অস্বস্তি করিল। কিন্তু বাঙালীর গৃহে জামাতা নামক দীর্ঘকালের
উপর বাহাদুরের একটা বিশেষ অধিকার বহুকাল ধরিয়া বীজিত
হইয়া আসিতেছে তাহার। এত সহজে ছলিবার পাণ্ডপাত্রী
নয়। বিকাশকে ভালরূপে আলাভন না করিয়া কেহ চলিয়া
বাইতে সম্মত হইল না।

ইহাদের হাত হইতে নিজের পাইবার আশার বাহিরে
ভাসের আড্ডার গিরা বসিবে কিনা, ইহাই বধন বিকাশ
ভাবিতেছে। ভবন সৌভাগ্যক্রমে শান্তকী ঠাকুরাণী আসিয়া
সকলকে কক্ষ হইতে বিভাজিত করিয়া চলিয়া গেলেন।
বিকাশ বস্তির নিখাল কেলিয়া শয্যার দেহ এলাইয়া বিয়া
চোখ বুজিল। সুখ কিন্তু আসিল না। একটা পরিচিত পদ-
ধ্বনি শুনিতে পাইবার প্রত্যাশার কান হুটী বাজা হইয়া রহিল।
বহুকণ পরে সুখ পক্ষমণি কানে আসিতেই বিকাশ
চোখ হুটীকৈ ভালরূপে বন্ধ করিয়া মিশ্রণে পড়িয়া রহিল।
কিন্তু প্রত্যাশিত স্পর্শ না পাইয়া বাধ্য হইয়াই বধন চোখ
খুলিল ভবন বেধিল, কে একটা বালিকা দীর্ঘ অবশ্রমের
আবৃত্ত করিয়া তাহার শয্যার অতি নিকটে ঠাঁইয়া আছে।

বিকাশ ভাবিল, কেহ বোধ হয় কোন ভালিকাকে বহু

সাজাইয়া তাহার মিকট পাঠাইয়া দিয়া দেখিতেছে। সুখ
হাসিয়া তাই সে কহিল, ওখানে ঠাঁইয়ে কেন? এলো আমার
কাছে বসবে।

বালিকা সে আহ্বানে কর্ণপাত করিল না। বিকাশ
কহিল, না আগবে ত ঘোমটাটা খোল। দেখি কেনমত সুখের
সুখখানি তোমার।

বালিকা তথাপি কোন কথা বলিল না দেখিয়া বিকাশ
উঠিয়া বসিল, শয্যার কিনারে সরিয়া আসিয়া বালিকার ঘোমটা
খুলিয়া দিল। সুখ সুখের একখানি সুখ, হুটীহুটে পারের রং,
মাথার এক রাশি সুকিত অমরত্বক কেশ, সুখী জের নীচে টানা
টানা হুটী চোখ। প্রথম দর্শনেই বিকাশ সুখ হইয়া গেল।
এত দিনের মধ্যে এই সুখী বালিকাটি কেন বে চোখে পড়ে
নাই, তাহা তাহা সে বিস্মিত হইল।

ঘোমটা খুলিয়া দিতেই বালিকার মুখে হাসি ফুটিল।
বিকাশ কহিল, এস খুঁচী, বসবে। কি নাম তোমার?

বালিকা কহিল, আমি সুলতা। তোমার শান্তকী।

বিকাশ কোতুক অস্বস্তি করিয়া কহিল, ও, সুখি আমার
শান্তকী। তাই সুখি ঘোমটা দিয়েছিলে? কিন্তু জামাইয়ের
কাছে কি এতটা ঘোমটা দিতে হয়?

সুলতা কহিল, সুখি ভাল জামাই। তোমার সামনে
একটু ঘোমটা দিব।

সেখানে থাকিয়া বাহারা আলাপ শুনিতেছিল, তাহার।
এইবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুলতা লজ্জিত
হইয়া ঘোঁড়াইয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

বিকাশের স্ত্রী প্রীতি আসিয়া বসিল, সুলতা সম্পর্কে
আমার গিলা হয়। বাবার মনস্পর্কের এক মাঝার ঘের।

ইহার পরের বার সুলতা বধন আসিল ভবন তাহার
ঘোমটার মাজাটা অনেকখানি করিয়াছে। পাভলা টোঁটী হুটী

পান বাইরা লাল ইকুইকে করিয়া বিকাশের পাশে বলিয়া কহিল, জামাই, তুমি ঝপকণা কান ?

বিকাশ হাসিয়া কহিল, না, আমি কানি না। তুমি কান ?

সুলতা কহিল, কানি। কিন্তু দিনে ত বলতে নেই।

রাত্রে বলব। দিনে বললে রাতকাণা হয়।

তাই নাকি ? বেশ রাত্রেই এসো তা হলে—

সুলতা বিকাশকে কি চোখে দেখিল, সে-ই জানে। বিকাশ যখনই একা থাকে তখনই সে তাহার নিকট আসিয়া হাজির হয়। বিকাশের টেবিলে নানা বস্তুয়ের বাসিক পত্রিকা থাকে। সুলতার প্রত্যহ সব পত্রিকার ছবিগুলি দেখা চাই। বিকাশের দস্তাবেজিট সিগারেটের ইকরা ও সিগারেটের খালি বাস্তুগুলির উপর তাহার অপরিচীত লোভ। সিগারেটের বাস্তুয়ের মধ্যে সিগারেটের ইকরাগুলি পুরিয়া এক ছানে রাখিয়া দেয়, বাতী বাইবার সময় সবে করিয়া লইয়া যায়।

প্রবীলা হাসিয়া বলে, কি ভাগ্যি তুমি আসিস, তাই আর ঘর নোংরা হতে পার না।

সুলতা বমক দিয়া বলে, পিসীমার সামনে জামাইয়ের সবে কথা বলতে নেই। তুমি এখন বা এখান থেকে—

প্রবীলা হুটুংকি হাসিয়া বিকাশের দিকে একটা কটাক নিক্ষেপ করিয়া স্নেহ পিসীমার আদেশ পালন করে।

সুলতা নিশ্চিন্ত মনে ছবি দেখে, বিকাশকে নানা শিশু-সুলত প্রর জিজ্ঞাসা করে। বিকাশ কোনটার উত্তর দেয়, কোনটার উত্তর উহার নিকট হইতেই জানিয়া লয়।

সুলতা গভীরভাবে বলে, জানো জামাই, মাহুব বরবার পর কোথায় যার ? তাহার পর মিছেই তাহার উত্তর দেয়, “জানো না খুঁজি ? আকাশে তারা বেবেহ ত ? মাহুব মরলে তারা হয়। আমার বাবা তারা হয়ে আছেন। আমি রোজ দেখি ঐ তারাকে। আমি যখন মরব তখন আমিও তারা হব, বাবার কাছটিকে গিরে উঠব—”

মাহুবের জ্বরহস্ত সন্ধ্যায় তাহার নিজস্ব বত আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিকাশ সুলতার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। তাহার জানা এমন কোনও বিষয় নাই বাহা সে বিকাশকে না জানাইয়াছে। তাহার স্নেহ পারিপার্শ্বিকের সমস্ত দুঃখ-নাটক বিবরণ বিকাশের জানা হইয়া গিয়াছে।

প্রবীলা বলে, সুলতা তোমার কাছেই এমন শান্তিপ্রাপ্তি থাকে। বাইরে ওর হৃদয়পনার অভ নাই। ওর আলাদা পুঙ্খ-খাটে কারও ভেলের বাট্ট রাখবার জো নাই। যেই একটু অভয়বক হয়েছ আমি সে বাট্টহৃদ ভেল ভেলের দিকে হুঁকে দেবে। ছোট্ট ছেলেমেয়ে বেগলে কোলে নিতে যাবে, আদর করবে, চুম্বা যাবে; কিন্তু একটু পরেই বেবে ছেলের পাল কামড়ে। ছেলে যদি কেঁদে উঠেছে ত তবুই তাকে থাকে দিয়ে কেলে দ্বুটে পালাবে।

সুলতার এই সব হুটামির কথা শুনিতে বিকাশের খুবই ভাল লাগে। বলে, “হুটুংকি আর চাঞ্চল্য ছেলেমেয়েদের অলঙ্কার। তোমার যদি ঘেঁষে হয় তা হলে বেশ—” প্রবীলা বিকাশকে কথাকাটা শেষ করিতে দিল না, তাহার খুব চাপিয়া ধরিল।

সেবার যত্নরবাতী বাইবার সময় বিকাশ সুলতার কত করেকটি খেলনা ও করেকখানা ছবির বই লইয়া গেল। সুলতা বই ও খেলনা পাইয়া মহা খুশী। বলিল, জামাই, তুমি রোজ এখানে আস না কেন ?

বিকাশ হাসিয়া বলিল, রোজ আসতে চাইলে যে এখা থাকতে হবে না।

সুলতা গভীরভাবে বলিল, জামাই তুমি রোজ এসো। এখা থাকতে না দেয় আমাদের ঘরে গিরে থেকো।

যত দিন যায়, তত বরল থাকে, বরল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাহুবেক সংসাররূপ জালে জড়াইয়া পড়িতে হয়। বিকাশের কলেজ-জীবন শেষ হইল, কর্মজীবন আরম্ভ হইল এবং তাহাও ধীরে ধীরে মৃত্যুদণ্ডকে পশ্চাতে কেনিয়া আগাইয়া চলিল। প্রবীলা এখন মনবদ্ধ হইতে জনমীর মহিমায় পড়ে উন্মীত হইয়াছে। ছুই ছেলে, এক মেয়ে এবং সাংসারিক নানা কাজ লইয়া এখন সে সব সময় বিব্রত থাকে। বিকাশের পুণ্ডরীক এখন আপিসের সঙ্গীর্ণ সীমার আবহ হইয়া পড়িয়াছে। দলটা পাঁচটা আপিস করিয়াও নিজের নাই; গৃহে কিরিয়াও আপিসের অসম্পূর্ণ কাজ সারিয়া রাখিতে হয়। ছেলেমেয়েরা শিশুর একটু আদরের প্রত্যাশার পাশে ঘোরাফুরি করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের আদর করিবার মত অবলর বিকাশের থাকে না। ছেলেমেয়েরা চীৎকার করিলে, নিকটে দাপা-দাপি করিলে তাহার কাজের ব্যাঘাত হয়, সে বিরক্তি বোধ করে; প্রবীলা বলে, ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি নাভানাভি না করে কি তোমার মত খুব গভীর করে আপিসের হিসেব দেখবে ? সুলতার মত মেয়ে চেয়েছিলে, এখন মেয়ে হুটুংকি করলে এত চটলে চলবে কেন ?

সুলতার কথা কিন্তু বিকাশ তোলে নাই। যদিও এখন যত্নরবাতী কচিং বাঙরা বটগা উঠে, তা সত্ত্বেও যখনই তার যখনই সুলতা তাহার হাতখুব লইয়া বিকাশের লম্বুখে উপস্থিত হয়। এখন সে আর বালিকা নাই, নৌবনের আভাস তাহার সর্বাঙ্গে পরিদ্রুত হইয়া উঠিতেছে। বিকাশের নিকট কিন্তু তাহার লজা নাই। মাঝার লম্বাভ একটু বোমটা টানিয়া সে বিকাশের নিকট আসিয়া পূর্বের মত মিঃসকোচে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে। তবে এখন পত্রিকার ছবি অপেক্ষা গল্প-কবিতার প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, দস্তাবেজিট সিগারেটের ইকরার প্রতি তাহার আর আকর্ষণ নাই।

সেদিন আশিষ হইতে কিরিয়া বিকাশ বৈকালিক অস-
বোধে বনোনিবেশ করিয়াছে এমন সময় প্রবীণা কহিল,
বাঁবা চিঠি দিয়েছেন। খোঁকার বিয়ে। লম্বা ছুটির পরবার
কর।

বিকাশ কহিল, “একঘেরে কাজ করতে করতে আমারও
বিয়ক্তি হবে গেছে। ছুটিও অনেক পাওনা আছে। দেখি
কি হয়।”

ছুটি মিলিল এবং এক দিন বিকাশ লগরিবারে বস্ত্রশালারে
আসিয়া হাজির হইল। বহু দিন আসা-যাওয়া না থাকায় সবই
যেন কেমন একটু অপরিস্ফুট অপরিস্ফুট মনে হইতে লগ্নিল।
বাহারা ছোট্ট ছিল তাহার বক হইরাছে, বাহার বক ছিল
তাহারা আরও বক হইরাছে। অবিবাহিতদের বিবাহ হইরাছে,
যেদের অমনেকই সন্তানের জন্মী হইরাছে। সুলতাকে
বিকাশ যে আর আগের মতট দেখিবে না তাহা বুঝিতে
পারিল। হরত তাহার বিবাহ হইরাছে, হরত সে এখন
বস্ত্রশালারে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শীঘ্রই তাহার অজ্ঞান মিথ্যা হইল। শুনিতে পাইল,
সুলতা বিকাশের শান্তকীকে কহিতেছে, কৈ গো বৌদি, জামাই
কি এনেছে দাও।

শান্তকী হাসিয়া বলিতেছেন, জামাই কি এনেছে, না
এনেছে, তা জামাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর—

“তাই বাই।” বলিয়া সে বিকাশের দিকটে আসিয়া
উপস্থিত হইল। বলিল, “তাল আহ তো জামাই?”

বিকাশ চোখ তুলিয়া সুলতার দিকে তাকাইয়াই চোখ
নামাইয়া লইল। এই সুবতীর সহিত মিসকোচে কথা বলিতে
তাহার বাব-বাব চকিতে লাগিল।

সুলতা কহিল, তোমাকে এবার খুব রোগ দেবোছে।
শরীরের বহু মিছ না সুস্থি?

বিকাশ চাহিয়া দেখিল সুলতার সীমন্তে নিকুর বাই।
বুঝিল, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। কহিল, শরীর
থারাপ হয়েছে বলেই একেবারে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে
এসেছি। তাল করে শরীর লম্বা, তবে বাব।

সুলতা আনন্দোজীৱ কণ্ঠে কহিল, এক মাস থাকবে। খুব
আমোবে বিনতুলো কাটানো যাবে তা হলে।

সুলতার মিসকোচ ব্যবহারে বিকাশেরও হরের সঙ্কোচ
কাটরা পেল। ইহার পর পূর্বের মতই উভয়ের মধ্যে
আলাপ কমিয়া উঠিল। সুলতা এবার বধ্য-ইংরেজী
বিভাগে শিক্ষা লম্বাও করিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত শিকা-
মাতের সুযোগ তাহার হয় নাই। কিন্তু বিকাশ তাহার
সহিত কথা বলিয়া বুঝিল, পড়াশুনার চর্চা এখনও সে হাতে
নাই এবং সে চর্চাও বেহাত নিরন্তরের নয়।

বিনতুলি লম্বাই আনন্দে কাটিতেছিল। দিক্য-লম্বা

সময় আশিষ বাইবার তাক বাই, যখন ইচ্ছা যথ্যা হাজিরা
উঠিতে পারা যায়, স্নান-আহারের সময় কোনও নির্দিষ্ট
নিয়ম না মানিলেও চলে। বিশেষ করিয়া সুলতার আনন্দোজ্ঞান
সাহচর্য বিকাশের অবসর-দিনগুলি অধিকতর মনোরম করিয়া
তুলিতেছিল।

এক দিন সুলতা হঠাৎ বিকাশকে প্রশ্ন করিল, জামা
জামাই, যেদিনাঙ্কের বিয়ে না করলে কি চলতেই পারে না?

বিকাশ এরূপ প্রশ্নের জ্ঞত প্রভত ছিল না। সুলতাবের
সাংসারিক অবস্থার কথা তাহার অজানা নাই। গৃহে বিবাহ
না হাজা বিত্তীর কোনও অতিভাবক নাই। আর্থিক অবস্থাও
এমন সচ্ছল মহে যে, বিবাহযোগ্য এই তরুণকে সংপায়ে
সম্পূর্ণ করা বাইতে পারে। রূপ এবং রূপার পরিপূর্ণ সমন্বয় না
হইলে আজিও আমাদের দেশে কত সংপায়ে করা সহজ
ব্যাপার নয়। সুলতার রূপ আছে, গুণও আছে, কিন্তু গৃহে
রূপার অভাব। কাজেই আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।
কিন্তু তাহার সহিত বিকাশের সামাজিক সম্পর্কটি এমন
বরণের যে, এইরূপ বিষয় লইয়া তাহার সহিত আলোচনা
করিতেও তাহার বাব-বাব চক্রে। তবু সে বলিল, যেদের
বিয়ে না করলে যে চলে না, তা নয়। তবে আত্মীয়
কুমারী হয়ে থাকতে গেলেও তার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের,
আত্মনির্ভরশীল হবার মত বিশেষ শিকার দরকার।

সুলতা স্নান সুখে বলিল, কিন্তু সে পারিপার্শ্বিক আজি
পাই কোথায়, আর সে শিকাই বা আমার ঘের কে?

বিকাশ সে কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। নীরবে
সুলতার চিন্তাকূল রূপের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ে
এতদিন ধরিয়া যে আদম-লোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল
আজ সর্গপ্রথম তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকপূর্ব্য বেরবার
আবির্ভাব হইল। সুলতা অরুণ পরে আবার কহিল,
জামাই, কলকাতার মিলে গিয়ে আমার কোনও কাজে চুকিয়ে
দিতে পারো? যেখানের কাছে কিংবা রোশির সেবার?

এরকম কোনও কাজের লক্ষ্যও বিকাশের জানা ছিল
না। তাই সে এবারও চুপ করিয়া রহিল।...

হারে প্রবীণা কহিল, “দেখ, তোমাকে বলি বলি করেও
বলতে পারি নি। কিন্তু আর না বলেও থাকতে পারছি
না। সুলতা সম্পর্কে আমাদের গুরুজন হলেন সম্পর্কটি খুব
মিকট নয়। ওর সঙ্গে এত বাবাবাধি করলে পাঁচ কমে পাঁচ
কথা বলতে পারে।”

বিকাশ কথাটা অত্যন্ত হাল্কাভাবে লইয়া রহ হাসিয়া
চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু মিকট-সম্পর্কটি না হইলেও শেখতানে সুলতার
নবত তার প্রবীণার শিকাকেই এখন করিতে হইল। সুলতার
না লম্বাও কিছু কমিকনা বাহা ছিল নবত শিকার করিয়া এক

বিপত্তীক বৃদ্ধের হাতে মূলতাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বামীভাগ্য ভাল ছিল না। তাই বৎসরাতেই বিবধা হইয়া সে দ্বারের দিকটী করিয়া আসিল, এবং পর বৎসরই মাকে হারাইয়া প্রাণীয়ার পিতৃ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মূলতার সমস্ত হুঁতাপ্যের কাছিমী বিকাশ চিট্রিপঞ্জের দ্বারকত অবগত হইতেছিল। তাহার এই পরের পুঁহে আশ্রয় লওয়া রূপ হুঁতাপ্যটার জটাই বিকাশ সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হইল।

ইতিমধ্যে বিকাশের ক্রম সংসারে আরও দুই দুতন অভ্যাগতের ভ্রাতাপ্রদন হইয়াছে এবং সকলের সুখ-বাহুদ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়া প্রাণীয়া নিজের শরীরের উপর লক্ষ্য রাখিবার মত সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। কলে তাহার শরীর আভিরা পড়িয়াছে। কতাব অনুহতার সংবাবে উৎকৃষ্ট শিতা কতা-কাতাককে তাহার পুঁহে বাইরা কিছুকাল কাটাই-বার জত অনুদ্যেব করিয়া পাঠাইয়াছেন। পাহাড়-বেরা পল্লীগ্রামটির বাহ্যিকর স্থান বলিয়া ব্যাতি আছে। বিকাশ আর একবার দীর্ঘদিনের ছুটি লইয়া সপরিবারে বহুদালরে গিয়া থাকির হইল।

এবারের মত এমন অন্তরঙ্গভাবে বিকাশ আর কখনও মূলতাকে পার নাই। মূলতা এখন আর পরের বরের মেরে নয়, প্রাণীয়াদের সংসারেরই একজন। তাহার কর্তব্যকতার, মেধামিপূর্ণতার বিকাশ দুই হইয়া গেল। মূলতার সেবার জপে অধিনের মবোই প্রাণীয়ার পাণ্ডুর গতে রক্তিমআতা দেখা দিল, অধি-চর্মসার বেহে পুনরায় লাভণ্যের সকার হইতে লাগিল।

মূলতা না থাকিলে ছোট্ট ছেলের দুটিকে সামলানো^১ দার হইয়া উঠিল। ছেলের সঙ্গে ছেলেরাভব সাজিতে, বোদীর সঙ্গে বোদী সাজিতে, অপরের জত সমস্ত সুখ-বাহুদ্যের ব্যবস্থা করিতে সে কোথার শিবিল, তাহা তাহিরা বিকাশ বিন্মিত হইল। বলিল, “এত বাটুনি বেটেও তোমার সুখে যে কি করে হাসি লেগে থাকে তা কেবে আমি অবাক হই। তোমার এত বাটুবারই কি দরকার? বরে ত লোকজনের অভাব নেই।”

মূলতা হাসিয়া কহিল, “যেহেহেলে হরে বধন কমেছি তখন সুযোগ পেয়েও মেরেবের করণীর কাকগুলো করতে না পারাটাই হুঃখের বিষয়। নিজের লোকের জত যেরে-হেলের খেটে যে কত আদম, তা তোমরা পুরুষেরা বুকে উঠতে পারবে না।”

বিকাশও হাসিল। কহিল, “তা না বুঝি; কিন্তু এটুই বুঝি যে তুমি তোমার শরীরের উপর আর্ন্তে লক্ষ্য রাখহ না। আরদাতে নিজের সুখখানি একবার দেখো, তা হলেই আমার কথা বুঝতে পারবে।”

অকস্মাৎ মূলতার সুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার সুখের হাসি কোথার মিলাইয়া গেল। সে বিকাশের টেবিলে কাগজপত্র শুদাইয়া রাখিতেছিল। জব্বের কোন এক উকাম উদ্ভাসকে প্রাণপণে বদন করিতে করিতে সে হাতের কাক লগাও না করিয়াই কক হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কিছুকণ পরেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কিরিয়া আসিল, কহিল, “হেলেনেহেদের বেহে আমি থাকব কি করে? প্রাণীয়ার শরীরও ভো। এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই। আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে কেমন হয়?”

বিকাশ উৎসাহিত হইয়া কহিল, “খুব ভাল হয়। বস্তুর মশারের কাছে কবাটা পেড়ে দেখি।

বিকাশকে প্রভাব উপাশন করিতে হইল না। বস্তুর মশারই বলিলেন যে, মূলতা তাহাদের সঙ্গে থাক। আরও কিছুদিন সাবধানে না থাকিলে প্রাণীয়ার বাহ্য পুনরায় নষ্ট হইয়া বাইতে পারে।

মূলতার জবর আমল-উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। বাহার আয়োজন করিতে করিতে তাহার মন হাওগার তাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের বদ্বশিকিতা বিবধা সে। সাংসারিক অভিজ্ঞতাও যে তাহার খুব বেশী হইয়াছে, তাহা নহে। নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত সচেতনতাও তাহার আশে নাই। তাহার এই আমল যে কোনও অসামাজিক বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই।...

কিন্তু বাহার দৈহিক দুর্বলতা আসিয়াছে, নিজের সৌন্দর্য্য সবচেয়ে বেশী সল্হান হইয়া উঠিয়াছে, নিজের উপর আস্থা হারাইতে তাহার বেশী ঘেরি হয় না এবং অসংখ্য দুহুর্থে বাহা সে বলিয়া কলে তাহাই তাহার অবচেতন মনের স্বার্থ পরিচর। একদিন হঠাৎ প্রাণীয়ার অবচেতন মনের পছন্দে লকিত অমূলক সন্দেহের পরিচর পাইয়া বিকাশের সমস্ত আদম অবলুপ্ত হইয়া গেল।

প্রাণীয়া বিকাশকে বলিতেছিল, তুমি যে কত দূর অবঃ-পাতে গেছ, তা সুবহার কদমতা পর্য্যন্ত তোমার লোপ গেয়ে গেছে। এত দিন চুয়ে ছিল, এবার কাছে পাবে। আমারও এই শরীর, কবে মরি তার ঠিক নেই। নিজের জত ভাবছি না। বত আমার দুঃখিতা হেলেনেহেদের জত।

কিনিসপত্র শুদান সবচেয়ে কি একটা পরামর্শের জত মূলতা প্রাণীয়ার কাছে আসিতেছিল। স্বামী-স্ত্রীর আলাপ বধন তাহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কি সবচেয়ে আলাপ চলিতেছে, তাহা বধন সে উপলব্ধি করিতে পারিল, তখন তাহাদের অজান্তসারে তাহার আর কিরিয়া বাইবার পথ ছিল না।

প্রাণীয়া বরজার দিকে পিছন কিরিয়া ছিল। সে মূলতার

এবেশ লক্ষ্য করে দাই। বিকাশ লক্ষ্য করিলেও প্রমীলাকে সতর্ক করিয়া দিবার সুযোগ পাইল না।

যাত্রীর দীরবতার প্রমীলার কেমন বেশ সন্দেহ হইল। সে শিহন করিয়া মূলতাকে বেধিয়া নির্ঝাঁক হইয়া খুব মত করিল। নিজের অনবদ্য উজ্জ্বল অচছুরে কোতে, লঙ্কার, অঙ্গশোচনার তাহার ডাক ছাড়িয়া কানিতে ইচ্ছা হইল। মূলতার হাত দুটি ধরিয়া তাহার নিকট কমা চাহিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না।

মূলতা প্রস্তরীভূত মুষ্টির মত একই স্থানে একই রকম ভাবে ঝাঁড়াইয়া ছিল। অসাধারণ রমের ঘোরে সে নিঃশব্দে সামলাইয়া রাখিতেছিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোম কথা বলিতে পারিল না। বিকাশ একটা মাগিকের পাভা উল্টাইতে লাগিল, প্রমীলা মাথা মত করিয়া বসিয়া রহিল, মূলতা ভেমনি ভাবে ঝাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে মূলতাই প্রথম কথা বলিল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংবত করিয়া সে দীর কণ্ঠে বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল— কামাই, এর অত দুনি হুঃখ করো না, বা পদীর উপর

রাগ করো না। সে বা বলে কেলেরে হরতো তা বলবার ভায় ইচ্ছা ছিল না। হরত এক বলতে আর বলে কেলেরে। জিনিসপত্র আমি সব ডহিরে কেলেরে। পদী, থাকিলো তুই বেধে শুনে নে। আমার শরীরটা বজা খায়াপ লাগছে... বলিয়া সে দীরপদে কক হইতে দিক্কাত হইয়া উলিতে উলিতে নিজের ককে প্রবেশ করিল এবং পর মুহূর্তেই তাহার মুষ্টিত বেহ শখ্যার উপর স্টাইইয়া পড়িল।

যাত্রার সময় যখন প্রমীলার মা শুনিলেন যে, মূলতা ঘাইবে না তখন তিনি গর্জাইতে লাগিলেন, কহিলেন, পর কি কখনও আপন হর, মা পরের সুখ হুঃখ বুকে ৭ ক’দিন ধরে কি লোক দেখানো দরবটাই না দেখালে। কামাই বলতে অভ্যাস, হেলেনে-মেরেগুলো কাছে না থাকলে বুধে ভাত রোচে না, পদীর লেখা করতে না পেলো রাত্তে দুখ হর না। আর যেই সত্যিকারের দরকার হ’ল অমনি বলে বসল, আমি বাব না। অমম বেয়েকে বুধে ঝাঁটা মেরে পর থেকে বার করতে হর—

প্রমীলার বাবা বুধে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু মূলতার এই অবাব্যতার তিনিও যে খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল।

বাংলা ও বাঙালী

ঐশ্বরীলচন্দ্র ঘোষ

৪

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, বত দিন পর্যন্ত তাঁহারি বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা বন্টনের একটা মূলনীতি স্থির করিয়া না যেন ততদিন পর্যন্ত দেশমুখ-বন্টননীতি প্রচলিত থাকিবে। দেশমুখ-বন্টননীতি অগ্রাণ্য মূল ভিত্তির মধ্যে প্রদেশগুলির জনসংখ্যার অনুপাতের উপর স্থির করা হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ইহার মূল ভিত্তি প্রত্যেক প্রদেশের প্রতি বর্গমাঠলের বসতির হারের অনুপাতের উপর দাখ্য করিলে অধিকতর ন্যায্যসঙ্গত হইত। কারণ খাটোৎপাদনের, শিল্প-প্রসারণের এবং প্রদেশবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘনবসতি খুবই প্রতিকূল। এই কারণে ঐ সব প্রদেশ-সরকারকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য অপর প্রদেশের তুলনায় বাৎসরিক অনেক বেশী পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহা ভিন্ন বহুবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্তা আরও নানাবিধ কারণে

জটিল হইয়া ঝাঁড়াইয়াছে; কলে প্রদেশ-সরকারকে ইহার জন্য বহু অর্থব্যয়ের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন কিরূপ সমুচিত হইয়াছে তাহা ইহার মানচিত্র দেখিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে। কংগ্রেস-নেতারা বহুকাল পূর্বে ভাবায় ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা পরি-বর্তনের ন্যায্যসঙ্গত দাবি মানিয়া লইয়াছিলেন; ইদানীং পণ্ডিত নেত্র ও অপরাপর কংগ্রেস-নেতারা ঐ সকল প্রতি-শ্রুতি কাব্যভঃ ভঙ্গ না করিলেও ক্রমে ক্রমে ইহার সঙ্গে এমন সব সর্ভ আরোপ করিতেছেন বাহার দরুন কখনও সে প্রতি-শ্রুতি পালন করা সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙালী জাতি যে কেবল স্বাস্থ্যের দিক হইতে ক্ষয়িষ্ণু তাহা নহে। এই প্রদেশকে সকল দিক দিয়াই ক্ষয়িষ্ণু প্রদেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইদানীং প্রধানমন্ত্রী জবাবরলাল বৃহত্তর বঙ্গের আশা-ভরসা একরূপ কল্পনা-লোকে পাঠাইয়া-ছেন বলিলেও চলে। তাঁহার যত্নে কোন প্রদেশের

সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে প্রতিবেশী উভয় প্রদেশেরই মোটামুটি সম্মতি থাকা দরকার। বাস্তব ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থা কখনও সম্ভব হইতে পারে কি? অনেকে মনে করেন যে, এইরূপ ধারণা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। যদি কেহ প্রস্তাব করেন, হিন্দু কোড বিলের বিবাহ-বিচ্ছেদ ধারাতে এমন একটি নতুন সংজ্ঞা যোগ করা উচিত যে উভয় পক্ষ মোটামুটি সম্মতি না দিলে কোন আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবে না, তাহা হইলে এইরূপ প্রস্তাবকে সকলে নিশ্চয়ই প্রলাপোক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন এবং নেহরুজীও যে তাহাই বলিবেন তাহাতে বিমুগ্ধ সন্দেহ নাই। বত দিন পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রদেশের আয়তন ও সীমানা, ভৌগোলিক অবস্থা, লোকসংখ্যা, বসতির হার, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বত দূর সম্ভব সমতা রক্ষা করিয়া পরিবর্তন না করা হইবে তত দিন পর্যন্ত কোন অর্থ কমিশনই এই উপ-মহাদেশকে স্থায়ী ভাবে অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ ইহা ব্যতিরেকে প্রত্যেক প্রদেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার অধিকার আছে কি না তাহা আমার সঠিক জানা নাই, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তুনিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ কমিশনের নিকট কেন্দ্রীয় তহবিল বন্টনের বিষয় যে সমস্ত স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন তাহাতে একমাত্র ঘনবসতির জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের খরচ বেশী হয় এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঘনবসতির জন্য শিল্প-সম্প্রসারণ, খাদ্যোৎপাদন ও নানা বিষয়ের অর্থবিধার কারণে প্রদেশবাসীর এবং প্রাদেশিক তহবিলের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করেন নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও বিশদভাবে তাঁহাদের দাবি অর্থ কমিশনের নিকট দাখিল করা কর্তব্য।

নিম্নে ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট অঙ্গুসারে কয়েকটি প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দূরবস্থা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। এই প্রদেশ-সরকার যদি বখেট পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে না পায় তাহা হইলে কোন বিভাগেরই উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হইবে না এবং প্রদেশ ও প্রদেশবাসীরা দিনের পর দিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে চলিতে থাকিবে।

বাজেট ১৯৫১-৫২

(হাজার অঙ্কপাতে)

প্রদেশের নাম	বাৎসরিক আয়	বাৎসরিক ব্যয়	বাকুতি	বাহুতি
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪,০৪,৫৪	৫৮,৮০,৭৪	—	৪,৭৬,২০
বোম্বাই	৬০,৬৪,২৫*	৬০,৫২,৭৩	৪,৫২	—
মাদ্রাজ	৫২,৬২,৫০	৬০,২২,৭৮	—	৬৭,২৮
উত্তর প্রদেশ	৬১,২৬,০০	৬১,৫১,০০	—	২৫,০০
পূর্ব-পঞ্জাব	১৬,৬৩,৪১	১৬,৮৪,৫৮	—	২০,২৭
বিহার	৩৫,২৬,৭৬*	৩১,১২,২২	৪,৮৩,৮১	—
উড়িষ্যা	১০,৫৬,৩২	১১,৫০,৮১	—	২৪,৪২
মধ্যপ্রদেশ	২০,৪৪,৫০†	২০,৩০,৬০	১৩,২০	—
আসাম	২,৬২,৪০	১০,৬০,২৪	—	২৭,৮৪

সম্প্রতি প্রদেশ-বিধানসভায় ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় নির্বাচন-দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী কিরূপ অসহায় অবস্থায় উপনীত তাহা খুবই পরিস্ফুট হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এত অধিকসংখ্যায় অপর প্রদেশবাসী আসিয়া জমিশিলে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জন করিতেছে যে, বাংলার রাজ্য-বিধান ও লোকসভায় যাহারা মনোনীত হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছেন তাঁহাদের অনেক ক্ষেত্রে অপর প্রদেশবাসীর ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে ও হইয়াছে। বেকরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই প্রদেশের রাজ্য-বিধানসভায় বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ অপর প্রদেশবাসীর স্বনামী ও বেনামী সভ্যদের ইচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করিবে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমস্ত শহরে ও শিল্পাঞ্চলে অপর প্রদেশবাসীর সংখ্যাধিক্য কেবল-মাত্র সেই সমস্ত অঞ্চলের বাসিন্দা নিজ প্রদেশের লোকদের প্রভাবান্বিত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, উত্তর প্রদেশের পণ্ডিত পটেল, উড়িষ্যার শ্রীমুক্ত মহতাবের, বিহারের শ্রীমুক্ত জগজীবনরামের পরিভ্রমণ-সূচী স্থির হইয়াছিল। যে সমস্ত জেলায় এবং যে সমস্ত মহকুমায় ভিন্ন প্রদেশবাসীর সংখ্যা কম সেই সমস্ত অঞ্চলে এই সকল নেতা কেন ভ্রমণ-সূচীভুক্ত করেন নাই ইহা ভাবিবার কথা। এই সমস্ত বেশনেতাই আবার প্রাদেশিকভাৱে গড়ে বিচলিত হইয়া উঠেন। কিন্তু হৃৎথের বিষয় এই নির্বাচন-দ্বন্দ্ব তাঁহারা নিজেরাই কতদূর প্রাদেশিকতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

* মজুত আদানত টাকা হইতে ২০,০০ লইয়াছে।

† মজুত আদানত টাকা হইতে ১১,০০ লইয়াছে।

‡ মজুত আদানত টাকা হইতে ২৬,০০ লইয়াছে।

সাধারণতঃ কোন প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে সেই প্রদেশে নানারূপ বৃহত্তর শিল্পের সম্প্রসারণ আবশ্যক হয় ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিল্প-সম্প্রসারণ বর্তমান অবস্থায় বাঙালীর আর্থের পক্ষে কৃতিকর হইবে কিনা তাহা বিশেষ ভাবিবার কথা, কেননা নানা কারণে ইহা বহু প্রতিকূল অবস্থায় স্থগিত করিতে পারে। আমার মনে হয় সর্বপ্রথমে কুটিরশিল্পের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান করিতে পারিলে বাঙালীকে তাহার আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। বতই নতুন নতুন বৃহৎ বৃহৎ শিল্প পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই অধিকতর সংখ্যায় অপর প্রদেশ হইতে শ্রমিকেরা এই প্রদেশে আসিয়া বসতির চাপ ও সেই পরিমাণে খাদ্যভাব আরও বাড়াইয়া তুলিবে। যখন কেবলমাত্র কৃষিকার্যের জন্যই এই প্রদেশে সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ ও রাঁচি হইতে বহু শ্রমিক আনিতে হয় তখন উপযুক্ত বাঙালী শ্রমিকের অভাবে নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার জন্য অপর প্রদেশ হইতে শ্রমিক লইয়া আসা ভিন্ন গতাস্বর থাকিবে না। পূর্বে মধ্যবিত্ত বাঙালী যোথ কোম্পানিতে অংশ (share) কিনিয়া বহু কোটি টাকা হারাইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা আর অর্থ বিনিয়োগ করিবেন কিনা সম্ভেদ। বিস্তারিত বাঙালীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ডাইরেক্টর হইবার মত অংশ কিনিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে কতিপয় বাঙালী কেরানী ও কয়েকটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবে মাত্র। ভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকগণ তাহাদের উপার্জিত টাকা স্ব প্রদেশে পাঠাইয়া দিবে এবং অপর প্রদেশবাসী বাহারা ঐ সমস্ত কোম্পানীতে মূলধন বিনিয়োগ করিবেন তাঁহারা লভ্যাংশ ভোগ করিবেন। ইহাতে বাংলা ও বাঙালীর লাভ কোথায়? সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬৪০ কোটি টাকা আয়কর আদায় হইয়াছিল। কিন্তু এই আয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দেয় অংশ কতটুকু তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটি অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহাদের অংশ বেশী নহে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোন কোন প্রদেশের কত শ্রমিক কার্যে লিপ্ত আছে তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিতেছেন। যখন এই অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে তখন সঠিক বুঝা যাইবে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গবাসী শ্রমিক ও কার্ধ্যরত ব্যক্তিদের স্থান কতটুকু।

গত ৮ই ডিসেম্বর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভ্রামনগর টেননের নিকট উত্তর-কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, খাত্তোৎ-পাদন বৃদ্ধি এবং দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মফস্বলবাসীদের স্বখ-স্বচ্ছন্দ্যের জন্য এবং বাহাতে শহর ছাড়িয়া লোকে মফস্বলে বাস করিতে আগ্রহান্বিত হয় তাহার জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু মফস্বলে বাস করিয়া লোকে কি ভাবে জীবিকা অর্জন করিবে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা সংবাদপত্রে বাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখি, উপস্থিত কয়েকটি ছোট ছোট শহরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। যদি কেবলমাত্র ঐ শহরগুলিতেই বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত শহরের আশপাশের কৃষিক্ষেত্র-সমূহ কি করিয়া উহার সুবিধা পাইবে এবং কুটিরশিল্পই বা কিরূপে গড়িয়া উঠিবে? যদি ছোট শহরগুলির ভিতরেই কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠে তাহা হইলে অধিবাসীদের স্বখ-স্বচ্ছন্দ্য বাড়িয়া উঠা দূরের কথা বরং কমিতেই থাকিবে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে প্রাদেশিক ও জেলার রাস্তাগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সরকার বাহাতে শহরের বাহিবে ঐ সমস্ত রাস্তার ধারে কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম হয়। আমি জানি উত্তর-কলিকাতা বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগের উপদেষ্টাহুসারে পরিচালিত একটি স্থপরিচিত কৃষি-প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য দরখাস্ত করিয়া এখনও তাহা পাশ নাই, যদিও সেই কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ কোন একটি বাগানবাড়ীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি নিকটবর্তী একটি বাস্তহারা কলোনির অধিবাসীদের দরখাস্ত—বতদূর জানা যায়, এখনও মঞ্জুর হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে কুটিরশিল্প—পূর্বে বাহা ছিল এবং এখনও আছে সেগুলির পুনরুদ্ধার ও স্থপরিচালনার ব্যবস্থার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঙালী যুবক ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের উপযোগী আরও অনেক প্রকার কুটিরশিল্প এই প্রদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে এবং সেগুলির জন্য অপর প্রদেশের শ্রমিকের আমদানী আবশ্যক হইবে না। তাঁহা-শিল্পের ন্যায় গৃহস্থঘরের ছেলেমেয়েরাও এই সমস্ত কুটির-শিল্প প্রসারে সাহায্য করিতে পারে।

রূপ নানা প্রকার ঘড়ি তৈরি করিবার ছোট ছোট কারখানা দেখিরাছি, মনে হয় তৎক্ষণাত্ ছোট কারখানা পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের বিশেষ উপযোগী হইবে। এই সব কুটীরশিল্প শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষে শিক্ষার্থী পাঠাইলে বিশেষ ফল হইবে কি না সন্দেহ, কারণ ইহা বহু সময় ও ব্যয়সাধ্য। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার চীন, জাপান, সুইজারল্যান্ড, ইটালি এবং অন্যান্য কুটীরশিল্পপ্রধান দেশগুলি হইতে কুটীরশিল্পে স্বদক্ষ ব্যক্তিদের আনাইয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অমুসারে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট গ্রামে ও শহরে পাঠাইয়া সেখানকার অধিবাসীদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে এই প্রদেশবাসীর প্রকৃত অর্থ-

নৈতিক উন্নতি হইবে আশা করা যায়। বাহাতে কুটীর-শিল্পগুলি সমবায় পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠে এবং সেইগুলি অর্থাভাবে এবং মহাজনের ঋণের চাপে ধ্বংস না হইয়া যায় তাহার জন্য প্রত্যেক মহাকুমার প্রদেশ-সরকারের দ্বারা পরিচালিত একটি করিয়া সমবায় লব্ধী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থাভাবে ও মহাজনের ঋণের চাপে বহু কুটীরশিল্প হয় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে নতুবা মহাজনের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ফলে লভ্যাংশ মহাজনেরাই যোগ আনা ভোগ করিতেছে। বহির্বিপাক্যে, বৃহত্তর শিল্পে ও অপর্যাপ্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কোথায় তাহা পরে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

জন্ম—১৮৫৭ খ্রিঃ, ডিমেঘর রুহা—১৯৩৬ খ্রিঃ, ৫ই ডিসেম্বর

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

রামমোহনদের আবির্ভাবের কল্যাণপ্রব কল জাতি প্রত্যন্ত করিতে পারিয়াছিল উনবিংশতি শতকের শেষ দিক্ হইতে। অত্বে কালে বাংলাদেশের যে বহু-সংখ্যক ভরণ সেই জ্যোতিষ্ময় অত্যাশ্চর্য্যে অভিনবিত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহাদের অন্তর্গত। ভারতীয় জাতিগঠনে, বাংলার সামাজিক প্রগতি-বিবাসে এবং নিতীকতা ও সভ্যতার সহিত সাংবাদিকের কণ্ঠব্য সম্পাদনে মিত্র মহাশয়ের দাম অবিস্মরণীয়। তাঁহার কর্ম-জীবনের গতি ছিল বহুবুধী। দেশ, জাতি ও সমাজের হিতকর কার্য্যে মিত্রই তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিত। এই সমুদয় কার্য্যকে তিনি ভগবানের প্রিয় কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কর্মজীবন আধ্যাত্মিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি বলিতেন যে, কাজ সা করিয়া বলিয়া থাকে, সে ত যুগ্ম। অস্তির পথ্যার পথের পূর্ক পর্ধ্যন্ত তিনি লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিবেশ করিয়াছিলেন। বসব্যাপ্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মোহ হইতে বমকে সম্পূর্ণরূপে নিমুক্ত রাখিয়া, নিগ্রহ-নির্ধাতমকে তিহুমাত্র গ্রাহ্য সা করিয়া এবং ভগবানে অবিচলিত ভক্ত-বিশ্বাস লইয়া মিত্র মহাশয় আমত্বে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাবিল গ্রামে সন্তান বঙ্গ কান্ত পরিবারে কৃষ্ণকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্কপুত্র বাবরণ জেলার চন্দ্রীপের রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার পিতা গুরুচরণ ছিলেন বাদিক, পরোপকারী, আশ্রিত-বংসল ও সাহসী পুত্র। এই সমুদয় লগুণ কৃষ্ণকুমার তাঁহার

পিতৃদেবের নিকট হইতে যেম উত্তরাধিকারস্বত্বেই পাইয়া ছিলেন। গুরুচরণ ছিলেন একজন দক্ষ অধ্যাপক। বৈদিক বলের সঙ্গে তিনি সামাজিক বলেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-উপদ্রবে বাংলার চাষী-মজুর অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। টাঙ্গাইল অঞ্চলেও মজুর ধারে-ধারে অনেক ‘নীলকুপ্তি’ ছিল। তাঁহার নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী রামদেবপুরে মিঃ বেরি মামক একজন ইংরেজের ‘নীলকুপ্তি’ ছিল। সে বহু অসহ্যর লোকের ধারের কেতে কোর করিয়া নীলের চাষ করাইত এবং অনেক দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কৃষক-প্রবৃত্তীকে বলপূর্কক নীল-চাষের জন্ত বেগার বাটাইত। বিপন্ন নিপীড়িত গ্রামবাসীরা গুরুচরণের পরোপায় হইলে তিনি তাহাদিগকে সম্ভব ক্রিয়া লইয়া বেরি সাহেবের কুপ্তি আক্রমণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। নীল-কুপ্তির বেতাক-পুত্র বইহা জানিতে পারিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের বাবতীয় সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

গুরুচরণ নির্ধাতিত চাষী-মজুরদিগকে লাঠি, বস্ত্র, রাম-বা, কৌচ, লকি ইত্যাদি অস্ত্রে লক্ষিত করিয়া বেরি সাহেবকে দিবালাকেই আক্রমণ করিলেন। তিনি বয়ং অধ্যাপকগণে তাঁহার বলের লোককে পরিচালিত করেন। বেরি সাহেবও অধপুঠে আক্রম হইয়া লজ-বলে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত অগ্রসর হইল। সাহেব বস্তকে লাঠির আঘাতে অজান হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে অধপুঠ হইতে পড়িয়া পেল। তাঁহার বলের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই উর্ধ্বপানে পলায়ন

করিল। গুরুচরণের আদেশে উত্তেজিত জনতা সাহেবের বহু-
বাণী ভাঙিয়া দিল। সেই দিন সন্ধ্যার তাহাকে মৌকার
করিয়া বহুমার অপর পারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। একজন
গ্রাম্য 'সৈনিক' ভাস্কর্য্যকারের হস্তে এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া
সাহেব আদালতে অভিযোগ আনিতে লক্ষ্য বোধ করিল।
পূর্বোক্ত ঘটনার পরে সেই অকল হইতে নীলের চাষ উঠিয়া
যায়। নিপীড়িত অসহায় চর্য্যল মাহুদের ক্ষত বেরনা-বোধ
এবং তাহাদের উদ্ধারার্থ বিপদের সমুদ্রীন হইবার মত মহদুঃখ
ছিল গুরুচরণের বংশগত। কৃষ্ণকুমারের জীবনে তাহা আরও
উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকুমারের বিভাবী-জীবন আরম্ভ হয়
মহম্মদসিংহ শহরের বদ বিতালয়ে। এই শিক্ষারতনে তৎকালে
কোন্নানের বদাহবাক, 'ভাপসমালা' ইত্যাদি গ্রন্থ-প্রণেতা
এবং সর্বাধিক ব্রাহ্মসমাজের বদামখ্যাত প্রচারক সিরিশচন্দ্র
সেন ছিলেন অত্যন্ত শিকক। অপর একজন শিককও ব্রাহ্ম-
বর্ণাবলম্বী ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া অপর হামীর
জেলা স্থলে ভর্তি হইলেন। সেই স্থলের শিককগণের মনোও
করেকজন ছিলেন ব্রাহ্ম। এই সকল আদর্শ শিক্ষারতী তাঁহার
মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে মহম্মদসিংহ শহরে একটি খাণ্ড ব্রাহ্ম সমাজ
প্রতিষ্ঠিত হইল। সমাজের সভ্যদের সম্মত ছিল—“বাহ্য সভ্য
বলিয়া বিশ্বাস করিব, কাজেও ভাড়াই করিব।” এই সম্মতবায়ী
কৃষ্ণকুমারের কিশোর-চৈতন্যে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল।
তিনি পরম আগ্রহের সহিত উক্ত সমাজে যোগদান করিয়া
সভ্যপ্রতী-ভুক্ত হইলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের কর্মধারা
পূর্বোক্ত সম্মত-বর্ণীর দ্বারা নিরানুত ও পরিচালিত হইয়াছে।
সেই সম্মত তিনি জীবনে কখনও ভঙ্গ করেন নাই।

কৃষ্ণকুমার মহম্মদসিংহ ব্রাহ্মসমাজে বাইরা নিয়মিত ভাবে
উপাসনার যোগদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার
বয়স মাত্র চৌক বৎসর। তখন এত অল্প বয়সে হিন্দু-পরি-
বারের কোম হেলেকে ব্রাহ্মবর্ণের আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত
হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার পিতার বহুবাণ্ডব ও আত্মীয়-
বন্ধনের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে 'ভ্যাগ্যাপ্ত' করিবার জন্য
তাঁহার পিতাকে পরামর্শ দিলেন। দৃঢ়চিত্ত রেহীল পিতা
তাঁহাদের পরামর্শমত কাজ করিতে অসম্মত জানাইলেন
তাঁহাকে একঘরে করা হইবে বলিয়া তার প্রদর্শন করা হয়।
গুরুচরণ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিয়া দিলেন যে,
তিনি যত পুত্রের সঙ্গে একঘরে হইয়াই থাকিবেন, এইকথ
তথাপি পুত্রকে বর্জন করিবেন না।

মহম্মদসিংহ শহরে বাসকালে কৃষ্ণকুমার এমন অনেক সঙ্গী
পাইলেন—বাহাদুরের সহিত এক ঘিকে বেরন সমালোচনা
হইত, তেমনই খেলাধুলা এবং ব্যাখ্য-চর্চাও চলিত। সম্মত,

মৌকাতালনা, অধারোহণ, ৪০ ৬০ মাইল দীর্ঘ পথ পারে
হাঁটিয়া যাতায়াত করা ইত্যাদিতে তিনি বহুতা লাভ করিয়া-
ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিবার সময়
সঙ্গীদের লইয়া সীতার কাটিতেন। তৎকালে ঐ নদের
প্রশস্ততা অনেক বেশী ছিল। কৃষ্ণকুমার ও তাঁহার সঙ্গিগণ
সীতার কাটিয়া ব্রহ্মপুত্রের পরপারে বাইতেন এবং পুন্ডরায়
এ-পারে করিয়া আসিতেন। তাঁহার বাল্যকালে মহম্মদসিংহ
শহর হইতে বাবিল গ্রামে বাইতে হইলে বর্ষাকালে মৌকার
মহীপথে যাতায়াত করিতে হইত এবং গ্রীষ্মে পনজবে
৬০ মাইল পথ অভিক্রম করিতে হইত। তাঁহাদের গ্রামে
হাঁটিয়া বাইতে তিন দিন সময় লাগিত। বালক কৃষ্ণকুমার
গ্রীষ্মাবকাশে সঙ্গীর সহিত দীর্ঘ পথ ক্রমাগত তিন দিন হাঁটিয়া,
হিংস্র-খাপন-সম্মত ও মন্থা-উপকৃত মন্থপুত্রের অরণ্যের মধ্য
দ্বিগ্না বগ্নমে বাইতেন এবং অবকাশ-অন্তে শতরে কিরিয়া
আসিতেন। একবার পুন্ডরায় হুটতে মৌকার গ্রামে বাইবার
কালে ভীষণ বজ্রের রূপে পড়িয়া মৌকাডুবি হয়। তাঁহার
সঙ্গী ছিলেন এক ক্যাঠভূতে তাই; উত্তরে এক চরে বাউ
গাহ বরিয়া সারারাত্রি কাটাইলেন। পর দিন প্রত্যন্তে
ভরন-বিক্রম ভরা মদী সাতরাইয়া পার হইয়া অপর
তীরে এক কোলা গুচরের বাকী বইয়া উঠিলেন। মদী-পথে
যাতায়াতকালে কৃষ্ণকুমার মাঝিদের সঙ্গে মিছে মৌকা
চালাইতেন। এমনই ভাবে তিনি বাল্যকালেই সাহসী, কঠোর
পরিগ্রহী ও কষ্টমহিযু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা গুরুচরণ মিত্র বৌবনকাল হইতে বোড়ার
চক্রিয়া বোকাইতে ভালবাসিতেন। কৃষ্ণকুমারও বাল্যকালেই
উত্তম বোড়-সওয়ার হইয়াছিলেন। বৃহৎ বয়স পর্য্যন্ত তিনি
বোড়ার চক্রিতে ভালবাসিতেন। বিরাগি বৎসর বয়সেও তিনি
অধারোহণে টাঙ্গাইল মহকুমার কয়েক স্থানে বহুদূর যাতায়াত
করিয়াছেন। বোড়া ভতই হরত হইত তাঁহার সাহস ও
উৎসাহ ভতই বৃদ্ধি পাইত। বাল্যকালে তিনি একবার একটা
হরত বোড়ার চক্রিতে চেষ্টা করিয়া প্রথমে বিকল মনোরথ
হন। বোড়াটি এমন হরত ছিল যে, কেহ চক্রিতে গেলে
লাক ইয়া উঠিয়া বাধা দিত। তাঁহার বেশ হইল, এই বোড়ার
উঠিবেনই এবং উহাকে নায়েত্তা করিয়া তবে ছাড়িবেন।
তিনি সেই বোড়ার লাগায় একটা গাছে বাঁধিলেন এবং গাছে
উঠিয়া বোড়ার পিঠে লাকাইয়া পড়িলেন; তার পর প্রচণ্ড
বেগে উহাকে অনেক দূর অবধি ছুটাইয়া লইয়া গেলেন।
ইহাতে বোড়াটি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমনই ভাবে
বোড়াটিকে তিনি সারেষ্টা করিয়া ছাড়িলেন।

মহম্মদসিংহ কোলা স্থল হইতে কৃষ্ণকুমার ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে
এবেলিকা (এন্টোল) পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বহু টাকা বৃত্তি
পান। যেতিয়াল স্থলে পড়িয়া তাকার হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার

এবল ছিল; কিন্তু অভিব্যবহের ইচ্ছা ছিল অল্পমাত্র। তৎকালীন তাঁহাকে এক-এ পত্রিকার লেখক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে তর্জি হইতে হইল। কলিকাতার আসিয়া তিনি বিজ্ঞাপন প্রীট ব্রান্সমাথ হাজাৰালে স্থান পাইলেন। বরিশালের স্থানান্তরিত অবস্থায় বহুত ও তখন এই হাজাৰালে থাকিতেন। তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রেসিড ব্যারিষ্টার ভারতবর্ষের আদালতের বহু তথ্য আসিয়া হাজাৰের সহিত বেলারামের করিতেন এবং তাঁহাবিগকে বহুভাবে ও দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সময় অধ্যক্ষ হেরবট্টর মৈত্রেয়, কালীন্দ্রের স্কুল, বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ও বহুত হয়।

বিত্তীয় বার্ষিক প্রেক্ষিতে অধ্যয়নকালে পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণকুমারকে স্বগ্রামে বাইতে হইল। ইহাতে পাঠে ব্যাঘাত জন্মে, কলে সেইবার তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না। পিতা মৃত হইয়া উঠিলে তিনি কলিকাতার কিরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে তর্জি হইলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ সমাপ্তির পরে নানা কারণে তাঁহার এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

ইহার পর কৃষ্ণকুমার ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ প্রেসিডেন্সী কলেজে বিত্তীয় বার্ষিক প্রেক্ষিতে তর্জি হন। মাত্র ছয় মাস অধ্যয়নের পর তিনি এক-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন। চতুর্থ বার্ষিক প্রেক্ষিতে অধ্যয়নকালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন ক্লাসে তর্জি হইয়া ‘প্রীজারশিপ’ (ওকালতি) পরীক্ষার লভ প্রদত্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষাও শেষ পর্যন্ত দেওয়া হইল না। কেম্ব্রিজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ছই বৎসর বি-এ পড়িয়া তিনি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন।

হাজাৰীবনে মরমনিঃ পহরে অবস্থানকালে কৃষ্ণকুমার ব্রান্সমাথের বোগদান করার পরোপকার, সেবারারপতা দুর্গত্বের উদ্ধার করিবার বোগদতি বিপদের উদ্ধার, দুর্ভিক্ষকে রক্ষা ইত্যাদি বিবিধ সদুপদেশের বিকাশসাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতাদৃশ বহুত ওপগ্রাম উত্তরকালে তাঁহাকে বেশ, জাতি ও সমাজের সেবার ত্যাগবীকার ও হুঃব বরণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কলিকাতার তাঁহার কর্তব্যে সন্তোষান্বিত হইল। ব্রান্সমাথের বিদ্যাবলে থাকিরা তিনি জীবনান্তর্য্যকে রূপ দান করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইলেন। সেই বতলে পণ্ডিত শিবদাশ দাশী, আমলমোহন বহু প্রভৃতির তার বরোধ্য মেতা এবং বারকানাথ গাঙ্গুলী, কালীন্দ্রের স্কুল প্রভৃতির বহু সুযোগ্য সহকর্মীর সন্ধান মিলিল। বহুতের অধ্যয়নের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাসংকার ও পৌর অধিকার-বোধ কাণাইবার লভ কৃষ্ণকুমার এবং তাঁহার সতীর্থ-বহু কালীন্দ্রের স্কুল উত্তরবঙ্গে প্রচারকার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন। উক্ত পর্য্যন্ত সে সকলে রেলপাড়াতে চলাচল-ব্যবস্থা হয় বাই,

সেই কারণে বাতারাভের দুই অনুবিধা ছিল। তাঁহার হর্গন পথ অভিক্রম করিরা নানা স্থানে সিঁতা বহুতা বিতে লাগিলেন।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ—এই এগার বৎসর ভারতের জাতীয় জীবনে একটা দার্বক দুপ বলা বাইতে পারে। কলিকাতার টুডেটস্ এসোসিয়েশন, ইতিহাস এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা, সাধারণ ব্রান্সমাথ এবং সিটি স্কুল ও সিটি কলেজ ইত্যাদি এই দুপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ই কলিকাতার ইতিহাস মেশনাল কনফারেন্সের অবিবেশন হয়। ইহার পর ইতিহাস জ্ঞানদাল কংগ্রেসের (ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি) প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা অবিধ কৃষ্ণকুমার একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মরূপে ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আমলমোহন বহু বাংলার হাজাৰগণকে বদেশ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার মহান উদ্দেশ্যে টুডেটস্ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলে কৃষ্ণকুমার তাহাতে বোগদান করেন। এই সমিতির তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী কর্ম্মী। আমলমোহন বহু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টার রাজনীতিক প্রগতি লাভকল্পে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘ইতিহাস এসোসিয়েশন’ (ভারত-সভা) স্থাপিত হয়। ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন আমলমোহন বহু। কৃষ্ণকুমার এই সভার বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন।

ভারতবর্ষের তার বিরাট বেষে—বেধানে নানা জাতি ও সমাজের বান, নানা ভাষার প্রচলন, বিবিধ বর্গবর্গের বিভ্রামতা ও শিকা-নীকার অভাবে বেশবানীর মন দুপকারে জাহুর ও সেধানে জাতির চেতনা নকার করা কেবল বে রাজনীতিক আন্দোলনের বারা লভব মছে তাহা বাংলার তদানীন্তন বেষলেকেরা বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইভত উদবিলম্বতি শতকের শেষভাগে তাঁহাদের কর্তব্যবাহা বিভিন্ন বাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমার ১৮৮১ সনে সিটি স্কুলে দাসিক মাত্র ৪০ বেতনে শিককের পদগ্রহণ করেন। ব্রান্সমাথের উদেষচক্র বহু ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিকক। তাঁহার বহু কালীন্দ্রের স্কুল পণ্ডিত পড়াইতেন। হাজাৰের চরিত্রগঠন, বাহ্যোয়তি, শিকাবান ইত্যাদি কার্য্যে কৃষ্ণকুমার এরূপ বহু লইতেন যে, অল্পকাল মধ্যেই তিনি হাজাৰমাথ ও অভিব্যবহ-গণের শিকট অভ্যন্ত প্রির হইয়া উঠিলেন। আদর্শ শিকাজাতী বলিলে বাহা বুঝার, তিনি ছিলেন তাহাই। কত কল্পবিত-চরিত্র হাজাৰকে উদ্ধার করিরা তিনি ‘বাহুব’ করিরায়েন, কত অমবোধোই বিপদগামী হাজাৰকে বিভ্রামিকার আতর্জ করিরা নংপথে আদিতায়েন সেই সকল বিবরণ তাঁহার ‘আদর্শজিভ’ গ্রন্থে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে এই আদর্শ শিকাজাতীর উদ্দেশ্যে প্রচার লভক আপনা হইতেই লভ হয়।

প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে সিটি কলেজ কলেজে পরিণত হইল, পরবর্তীকালে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পদোন্নতি হইলেও তিনি মাসিক ১০ টাকা অধিক বেতন গ্রহণ করেন নাই। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আনন্দমোহন বসু ও তাঁহার স্ত্রীযোগ্য সতীর্ণণ এমনভাবে পড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, অল্পকাল মধ্যেই ইহা দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণসাধনের একটি সমরোপযোগী সংস্থার পরিণত হইল। কৃষ্ণকুমার এই বিচারভবে সামান্য পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করিয়াই শুধু নিজের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে এবং উক্তিস্থার বাইরা প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তৎকালে রেল-স্টেশনে বাতায়নের ব্যাপক ব্যবস্থা না হওয়ার দুরূহাভবে সমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। একবার তিনি অর্ধ-সংগ্রহের জন্য আগরতলার জিপুরার মহারাজার নিকট প্রার্থনাছিলেন। সিটি কলেজের জন্য মহারাজা তিন হাজার টাকা দান করেন। তখন জিপুরার বাতায়নের জন্য রেলপথ ও স্টেশন ছিল না। নদীপথে আগরতলা হইতে কলিকাতার নৌকাযোগে প্রত্যা-বর্তনকালে এতৎ বড়ের সুখে পড়িয়া তাঁহার নৌকা ডুবিয়া যায়। নৌকাডুবি আসর বৃত্তিতে পারিয়া তিনি মহারাজার প্রদত্ত তিন হাজার টাকার রৌপ্য মুদ্রা ও মোট বাক্স হইতে বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলেন; নৌকাডুবির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাল-ভরদপূর্ণ মেঘমা নদী সাতরাইরা একবন্ধে অপর তীরে উঠিলেন, এবং সেই স্থান হইতে বাঁধি পায়ে করেক কোশ হাঁটিয়া গোয়ালন্দে বাইরা ট্রেনে কলিকাতার করিলেন।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমার সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার এই প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সেবা করিয়াছেন। তিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে বঙ্গদেশ-প্রব্রাজ্য ও বিলাতী বর্জস আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করেন। পরবর্তীকালে সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ললিতমোহন দাসকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত রাখিলে সিটি কলেজের নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। তৎকালীন বিদেশী শাসকগণের দাবী ছিল যে, চাকুরি হারাঁইবার ভয়ে তাঁহার বদভবের প্রতিবাদে আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু ইহার কল হইল বিপরীত। কৃষ্ণকুমার এবং তাঁহার স্ত্রীযোগ্য সহকর্মী ললিত-মোহন চাকুরি ছাড়িলেন, কিন্তু দেশসেবার জন্য ত্যাগ করিলেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজের নেতারা ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই

চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার একজন উৎসাহী কর্মীরূপে বিহারাজ্ঞ অস্বস্ত পরিচয় করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের জাতীয়তাবাদের আদি উদ্যোক্তা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম চতুর্থ কলা লীলাবতীর সহিত কৃষ্ণকুমার পরিণয়যজ্ঞে আবদ্ধ হন। বিবাহ উপলক্ষে সামান্য গোল-যোগের স্রষ্টাপাত হয়। ব্রাহ্মসমাজের আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সেই সমাজের বিধানমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে ব্রাহ্মসমাজ কৃষ্ণকুমারের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন।

লীলাবতী ছিলেন কৃষ্ণকুমারের বোণ্যা জীবন-সঙ্গিনী। পতিব্রতা সহধর্মিণী বলিতে বাহা বুঝায়, তিনি ছিলেন তাহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। ইহাই মন্দিরে প্রথম বিবাহ বলিয়া বহু মরমারীর সমাগম হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘হুইট্ট জবরের নদী’, ‘কপালের পুরোহিত ভূমি’, ‘শুভ দিনে এসেছে ধোঁহে’ ইত্যাদি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহ-সভার গানগুলি গাহিয়াছিলেন—ডাঃ সুনন্দীমোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেশবদাস মিত্র, অক্ষয়কুমার হুনিলাল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সমস্ত ও মুকুট পারকরণ।

কৃষ্ণকুমারের দাম্পত্য জীবন সুখ-খ্যাতিতে কাটিয়াছে। সাক্ষী লীলাবতী যাবতীর সংকার্য্যে বামীর সহযোগিতা করিয়া-ছিলেন। দেশসেবার বামীর লক্ষ্যে নির্ধাতম ভোগের অংশ-ভাগিনী হইতে তিনি কোম দিমই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি একজন সুলেখিকাও ছিলেন। ‘বঙ্গদাহী’—এই রচনামে বিভিন্ন বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার লিখিতেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে কেশবদাসী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বর্ষদ্বয়, বঙ্গদেশ ও বঙ্গভারত সেবার কৃষ্ণকুমারের প্রেতভম কৃতিত্ব ‘সঙ্গীবনী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। তাঁহার সম্পাদনার বাংলা ভাষার এই সাপ্তাহিকখানি এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৩রা বৈশাখ) কৃষ্ণকুমার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পরেশনাথ সেন প্রমুখের সহিত মিলিত হইয়া ‘সঙ্গীবনী’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন বঙ্গলাট মর্ড রিপোর্টের শাসনকাল—ইলবার্ট বিলের আন্দোলন চলিতেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সামান্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা লইয়া ‘সঙ্গীবনী’ পত্রিকাই প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘সঙ্গীবনী’ অর্ধোপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সঙ্গীবনী হইতে যে প্রচুর আয় হইত, তাহা তিনি বর্ষ, দেশ ও জাতির সেবারই ব্যয় করিয়া-

সিরাহেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সঞ্জীবনীর প্রাথমিক কার্যাবলীর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :

(১) ভারতস্থ ইংরেজবিশেষের পরিচালিত ইলবার্ট বিল-বিদ্রোহী আন্দোলনের প্রতিরোধ করিতে এবং দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় স্বাধীনাবোধ জাগ্রত করিতে সঞ্জীবনী-সম্পাদক নির্ভীকতার সহিত লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনীর কল্যাণে বহু বাঙালীর মনে জাতীয় স্বাধীনাবোধ জাগিয়াছিল।

(২) বিদেশী মজুর ব্যবস্থার বাঙালদেশের প্রাধিকারকে খোলা-তাড়ি হাণ্ডল করিয়া অস্বস্তি প্রদায়ক লোকদের মধ্যে মতপাতির অভ্যাসের প্রসার বিতরণে, তখন সঞ্জীবনী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দ-বোহন বসু ভারত-সভার পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে পৰ্ব্বশেষে খোলাতাড়ি প্রথা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

(৩) কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি সঞ্জীবনী ইহার সমর্থক ছিল। দেশের অনেক সংবাদপত্র নতুন ছুগুগু হইল বলিয়া কংগ্রেসকে উপহাস করিতে থাকে। কোম কোম সংবাদপত্র কংগ্রেসকে ‘কলরস’ এবং ‘X’mas pantomime’ বলিয়া বিদ্রোহ করিতে বিধাবোধ করে নাই। সঞ্জীবনীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণ চিত্রাকর্ষক শিরোনামের প্রকাশিত হইত এবং কংগ্রেসকে ‘জাতীয় বজ্র’ ও কংগ্রেসের মারকশব্দকে ‘হোতা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

(৪) বাংলাদেশের বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে অসংখ্য আফিং ও চণ্ডুর আড্ডা বসানো হইয়াছিল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা পর্যন্ত এই সকল আড্ডায় বাইরা আফিং ও চণ্ডু সেবন করিত। সঞ্জীবনীর প্রবল আন্দোলনের ফলে পৰ্ব্বশেষে এই বিবরে তদন্ত করার জন্ত এক আফিং কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের তদন্ত সাহায্য করিয়া সঞ্জীবনী দেশ হইতে আফিং ও চণ্ডুর আড্ডা তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল। আসামে সঞ্জীবনীর মত শক্তিশালী নির্ভীক সংবাদপত্র না থাকায় সেখানকার বহু অধিবাসী আফিং-খোর (‘কামিরা’) হইয়া গিয়াছিল। তদন্ত-কালে পুলিশের সতর্কতার বক্রম অনেক সময়ে কমিশনের সমস্তপন আফিংখোর ও চণ্ডুখোরের আড্ডাগুলি বাহির হইতে ঘুরিতে পারিতেন না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক বরং কমিশনের সমস্তপনকে লইয়া গিয়া লুণ্ঠিত আড্ডাগুলি ঘেঁষাইয়া দিতেন। তাহার ফলে কঠোর আইন পালন হয় এবং দেশ হইতে এই সর্বদূষণ আড্ডা উত্তীর্ণ হয়।

(৫) আসামে চা-বাগানে কুলীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইত, তৎসম্বন্ধে দেশবাসী কিছুই জানিত না। সঞ্জীবনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম সেই অত্যাচারের কাহিনী লগ্নাহের পর লগ্নাহ প্রকাশ করিতে থাকে। সম্পাদকের

সতীর্থ বসু ধারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কত বিপদের মধ্য দিয়া আসামের চা-বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিতেন এবং সঞ্জীবনীতে প্রকাশের জন্ত পাঠাইয়া দিতেন। ক্রমক্রমের অগ্রিম লেখনী তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর সমুদ্রে উদ্বেলিত করিত। তিনি প্রাথমিকভাবে লাহিড়ী অসহায় নিরীহ দেশবাসীর উদ্ধারের জন্ত দেশবাসীকে সচেতন হইতে আহ্বান করিতেন। ‘চা না কুলীর রক্ত’, ‘আসামে লিঙ্গীর বংশ’ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। লিঙ্গী ‘Uncle Tom’s Cabin’ নামক জনপ্রিয় গ্রন্থে বর্ণিত দাসত্বের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারকারী খোদা কর্তৃক। আসামের কুলী চালায় (Indentured labour) প্রায় দশ-ব্যবসায়ের অঙ্গরূপ ছিল। সঞ্জীবনীর একাধিক চেষ্টায় তাহা দূরীভূত হইয়াছে বলিলে অত্যাচার হইবে না। সঞ্জীবনী-সম্পাদক তাহার সহকর্মীগণকে লইয়া আত্মকট্টর ক্ষেত্রে বাইরা আসামে গমনোত্তম কুলী মরমারীকে বুঝাইয়া কিরাইয়া আনিতে এবং সঞ্জীবনী পত্রিকার দ্বারা লব্ধ অর্থব্যয়ে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতেন।

মিঃ মহাপত্রের সাংবাদিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল লব্ধ কার্জনদের বন্ধনভাঙ্গার প্রতিবাদে সঞ্জীবনী পত্রিকার মারকশব্দে বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও দেশী গ্রহণের প্রস্তাব এবং প্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম দেশবাসীর সমুদ্রে উপাধান। এই ঐতি-হাসিক সত্য বর্তমান যুগের অনেকেই জানেন না যে, বহুকষ্ট আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত একটি সম্পাদকের প্রবন্ধ হইতে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ়) তারিখের সঞ্জীবনীতে “কর্তব্য নির্ধারণ” শিরোনামের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রস্তাবিত বন্ধ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া নিম্নলিখিত কার্যক্রম প্রস্তাবিত হইয়াছিল :

“বদের অকল্যাণ হইলে বাঙালীর চিন্তাশীল হইবে।... জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিশেষ দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। কয়কচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। ডক খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।

“জাতীয় অশৌচের সময় বতলাট, ছোটলাট, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে কোম কাছের জন্ত আর অর্থদান করা হইবে না।

“বত দিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, তত দিন রাও-পুন্ড্রবদের আবির্ভাবে ও তিরোভাবে আমাঘের ক্ষেত্র ঘোণ দিতে পারিবে না।

“লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্বনাশ করিতে উত্তম হইরাছেন। যদি তিনি উত্তম থাকা লক্ষণ না করেন, বাঙালী আর রাজ-পুরুষদের সংসর্গে বাইতে পারিবেন না।”

সঞ্জীবনীর উপরোক্ত কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সমর্থন পায়। ইহার ফলে প্রায় চার সপ্তাহ পরে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই আশ্রমের বিরাট প্রতিবাদ-সভার বিলাতী বর্জন বা বরকট প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর হইতে সঞ্জীবনী পত্রিকার বিলাতী পণ্যের কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত না। ইহাতে সঞ্জীবনীর প্রচুর আর্থিক কতি হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, মিত্র মহাশয় ছিলেন উহার পুরোতাপে। তৎকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরূপ লোকপ্রিয়তা ছিল যে, তিনি ‘বাংলার মুকুটহীন রাজা’ (‘uncrowned king of Bengal’) বলিয়া অভিহিত হইতেন। মিত্র মহাশয় ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তবরূপ। বাংলাদেশের যে সমুদয় দেশভক্ত নেতার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মিঃবার্ণ ও নির্ভীক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বঙ্গদেশী বা বরকট আন্দোলন সকল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্ততম।

মিত্র মহাশয় একাদিক্রমে চুয়াব বৎসর কাল নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করিয়া কৃতিত্বের সহিত সঞ্জীবনীর মত সুপ্রচারিত ও সমাজ সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই অর্ধাভাবে সঞ্জীবনীর প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

মাতৃভাষার সংবাদপত্রের সম্পাদনা ব্যতীত মিত্র মহাশয় ‘মহম্মদ চরিত’, ‘বুদ্ধদেব চরিত’ এবং ‘আম্বচরিত’ নামক তিনখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি লাহিত্যকেন্দ্রে সমাদর লাভ করিয়াছে। ‘নামক চরিত’ নামে তিনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ তাঁহার বাকী ধানাতজ্ঞানী কালে পাণ্ডুলিপি লইয়া যায়। সে পাণ্ডুলিপি অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহও পাওয়া যায় নাই।

‘কৃষ্ণকুমার মিত্রের আম্বচরিত’ গ্রন্থে বাংলার সামাজিক প্রগতি ও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মিহিত রহিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তারিত কাহিনীও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা পাঠে সংশয়বাহী বা নাস্তিকের মনোভাবের অন্তরে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। বঙ্গদেশী যুগের ত্যাবী কন্দী আদর্শ শিক্ষাত্রুতী পরলোকগত অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের এক বৃদ্ধা-বার্ষিকী সভার ভাষণ দানকালে বলিয়াছিলেন যে, মিত্র মহাশয়ের আম্বচরিত গ্রন্থখানিকে তিনি বাইবেল বা গীতার ম্যায় পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকার আরম্ভেই আছে :

“গল্পের বহি বৈরাগ্য আশ্রমের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, আর সেইরূপ আশ্রমের সহিত ইহা আত্মোপাস্ত পত্রিকা। গ্রন্থকার মহাশয়ের বাতাবিক সরলতা এবং পুণ্ড্রকখানির সহজ ভাষা আমাকে ইহা অতি অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে সমর্থ করিয়াছে।

“কৃষ্ণকুমার মিত্র বৌধদে ও পরিণত বয়সে যেমন মাহুঘট ছিলেন, তাহার পূর্বাতাল তাঁহার বাল্যকালীন্মেই পাওয়া যায়।

“এই পুস্তকে বর্ণিত অনেক ঘটনা উপভাসবর্ণিত অনেক ঘটনার মত আশ্চর্য।”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকার আরও লিখিয়াছেন :

“সকালে মিত্র মহাশয়ের মত শিক্ষকেরা ছাত্রদের কল্যাণার্থ বাহা করিতেন, তাহা সকল শিক্ষকেরই জাতব্য ও অনুসরণীয়।

“মিত্র মহাশয় ও তাঁহার কোন কোন বন্ধু বৌধদকালেই বর্ধসাধনা ও বর্ধপ্রচার, সমাজ সংস্কার ও সমাজ পঠন এবং রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কর্মঠতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারি বাকসর্ব্বস্ব ও আত্মদানসার ছিলেন না।

“বঙ্গদেশী জীব্য প্রচলনের জন্ত তাঁহারি বাহা করিয়াছিলেন, তাহা অনতিক্রান্ত হইয়া আছে।”

বঙ্গদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে যখন বিদেশী সরকারের দমননীতি প্রবল বেগে চলিতেছিল, তখন পূর্ববঙ্গে কুলারী শাসনকালে ব্রিটিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (Bengal Provincial Conference) অধিবেশন বল-পূর্বক ভাঙিয়া দেওয়া হয়। প্রতিমিষি ও বেঙ্গালসেবকগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দিবার জন্ত পুলিশ দলবদ্ধ হইয়া নিরস্ত শোভাযাত্রীদের উপর লাঠির হাঙ্গা আক্রমণ চালাইয়া অনেককে আহত করে। আরাদের বাবীদতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা সংঘটিত হইয়াছিল ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে—১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। মিত্র মহাশয় পুলিশের নির্ভূত অত্যাচার দিবারণার্থ এবং আক্রান্ত প্রতিমিষি ও বেঙ্গালসেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্ত বীরের ভায় সশস্ত্র পুলিশের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে কন্সটারেল যখন ভাঙিয়া দেওয়া হইল, তখন মেম্বারগের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেই সভা-হল ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বিদেশী সরকারের ঐ অব্যাহত আদেশ অবমান্য করিবার জন্ত দুঃসঙ্কল্প লইয়া বসিয়া রহিলেন। বহুবান্ধব ও সহকর্মীরা তাঁহাকে সভাসংগ হইতে লইয়া বাইবার জন্ত বহু চেষ্টা করিলেন। পরিশেষে মিত্র মহাশয় কেন যে

সভাগুলি ত্যাগ করিয়া গেলেন, তৎসম্পর্কে ‘আত্মচরিত’ হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

“সকলেই সভা পরিভ্রমণ করিলেন, এ অপমান সহ্য অপেক্ষা বৃদ্ধা ভাল ইহা মনে করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সুহৃৎসবাবু আসিয়া আমাকে সভা ত্যাগ করিতে বলিলেন, আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

“আমি বলিলাম, ‘আজ এই স্থানে প্রাণ দিব, কিন্তু এই স্থান পরিভ্রমণ করিব না, আপনারা সকলে প্রস্থান করুন।’ অমাধবাবু আমার হাত বহিরা টানিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে হইল আমি যেন একমাত্র সাহসী পুরুষ। এই ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র আপনাকে অবমত্ত করিয়া অমাধবাবুর সহিত বাহিরে চলিয়া গেলাম।”

মিঃ মহাপ্রসন্ন উল্লিখিত আচরণ ও উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার সত্ত্বগুণাশ্রিত স্বভাবের একটা বিশেষ দিক প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ছিলেন একজন সত্ত্বগুণধর্মী ক্রিয়াবীর—যিনি কান্ডবর্ষ পালন করিতে বাইরাও রক্ষোগুণের প্রতাব হইতে মনকে নিশ্চুঞ্চ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মিঃ মহাপ্রসন্নর জীবনের অত্যন্ত প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩৯৭ রেগুলেশন অনুসারে তাঁহার নির্বাসন। এই সময় আলিপুরের আদালতে হাণিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীজ ঘোষ প্রভৃতির বিচার চলিতেছিল। অরবিন্দ-বারীজ রাজস্বসংগ্রহ বহুর দৌহিত্য; কুরুকুমার তাঁহাদের মেসো-মহাপ্রসন্ন। অরবিন্দ নির্দোষ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষসমর্থনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রথমতঃ মিঃ মহাপ্রসন্নর চেষ্টার দেশবাসীর নিকট হইতে অরবিন্দের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সম্বন্ধে হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। বন্দার-খ্যাত ব্যাসিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মামলা চালাইতে বীহত হইয়াও শেষ পর্যন্ত মামলার শুভানিধি উপস্থিত হন মাই। তিনি টাকাও কেন্দ্র পাইলেন না। তৎপরে মিঃ সি. আর. দাশ (পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) মামলা চালাইতে রাজী হইলেন। যেদিন সি. আর. দাশকে মামলা পরিচালনার জন্ত নিযুক্ত করা হইল, তাহার পরদিনই মিঃ মহাপ্রসন্ন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া নির্বাসিত হইলেন। সেই সময় বাংলাদেশের আরও আট জন মেতাকে নির্বাসিত করা হইল।

মিঃ মহাপ্রসন্নকে আশ্রা জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কায়াগারে নির্জন কক্ষে বৃদ্ধ বয়সে বন্দী থাকিয়া তাঁহাকে

নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়। চৌক মাসকাল এ ভাবে বন্দী থাকার তাঁহার বাহ্য আভিভা পক্ষে, তাঁহার মেহের শক্তি নষ্ট হইলেও মনের বল অক্ষুর ছিল। বন্দীজীবনে তিনি ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময় তিনি পরমেশ্বরের কল্পনার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার তাঁহার যে সত্যোপলব্ধি হইয়াছিল, সেই গুণ্য কাহিনী আত্মচরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মিঃ মহাপ্রসন্ন নির্বাসনে থাকাকালে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিলাতের শ্রমিক দলের নেতা মিঃ রায়সে ম্যাকডোনাল্ড (পরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) সত্রীক ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার উত্তরে কলিকাতার ৬৯৭ কলেজ কোয়ারে (বর্তমানে বকিম চাটাজী ট্রাষ্ট) মিঃ মহাপ্রসন্নর গৃহে আসিয়া তাঁহার পত্নী ও পুত্রকর্তাগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৃহের দেওয়ালে খুলাদো, ক্রমে বাঁধাখো একটি ইংরেজী ‘মটো’র (বুলবুল) প্রতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দৃষ্টি পড়ে। মটোতে লেখা ছিল—“I shall go in the strength of Lord God” নির্বাসিত জনসাধারণের গৃহের প্রাচীরগাত্রে এই মটো দেখিয়া শ্রমিক-নেতার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি তৎপ্রণীত *Awakening of India* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মটোকে মিঃ মহাপ্রসন্নর জীবন-বাণী বলা হইতে পারে।

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুক্তি পাইলেন। কিন্তু পূর্বস্বাস্থ্য তিনি আর কিরিতা পাইলেন না। বন্দী-জীবন হইতে মুক্ত হইয়া বৃদ্ধবয়সেও তরুণ স্বাস্থ্য লইয়া মিঃ মহাপ্রসন্ন বেশ, জাতি ও সমাজের সেবার পূর্বের মায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। জীবনে কোন দিনই তিনি কর্তব্য হইতে অবসর লইতে চাহেন মাই। পর্যায়ে কর্মসম্পাদন ছিল এই বর্ষ-পরায়ণ কর্মবীরের প্রাণবর্ধ। জীবনের সারাংশ বেলায়ও তিনি জাতিবর্ধনির্কীর্ণে নিগৃহীতা ভারীর উদ্ধার ও আশ্রয়ের জন্য “নারীকলা সমিতি” প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাংলার নারীকল্যাণ কঙ্গের ইতিহাসে “নারীকলা সমিতির” কর্মপ্রচেষ্টার কথা অরণীর হইয়া থাকিবে। ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতার বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া কুরুকুমারের কর্মময় জীবনের অবসান হয়। জীবনদীপ নির্বাসনের কিংকাল পূর্বেরও তাঁহার কণ্ঠ হইতে মিঃস্বত হইয়াছে—“হে ইশ্বর, তু ত্রক্ষ তু ত্রক্ষ কৃপাহি কেবলম্, একমেবাধিতীতম্।”

এই যে দেশপ্রেম ইহাকেই বোঝ করিয়া বঙ্গমহাজনের সাহিত্য
লাভ। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি জাতির আঙ্গুণের মন
উদ্ধার করিয়াছিলেন। দৈবাতের বলাবাহুল্য

তত্বকথা বিশ্লেষণ করিতে দিগা সমালোচক দ্ব্যাতলি যে উক্তি করিয়াছেন এখানে তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"The central feeling is the impression of waste. With Shakespeare at any rate the pity and fear which are stirred by tragic story seem to unite with and even to merge in a profound sense of sadness and mystery which is due to this impression of waste. . . . Everywhere from the crushed rocks beneath our feet to the soul of man we see power, intelligence, life, glory, which astound us and seem to call for our worship. And everywhere we see them perishing, devouring one another often with dreadful pain as though they came into being for no other end. All this makes us feel the blindness and helplessness of man. . . . There is no tragedy in its expulsion of evil. The tragedy is that it involves the waste of good."

বঙ্কিমের ট্রাজেডিকালি সবচেয়ে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

শেক্সপীয়ার ট্রাজেডির এই আদর্শ বঙ্কিম তাঁহার কাব্য-সাধনার পরিণত অবস্থার রূপা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার ভারতীয় সংস্কার বাধা দিয়াছে। তাঁহার কবি-জীবনের প্রথম ভাগে, যতাবতঃই বাহা হইয়া থাকে, সৃষ্টি-প্রেরণা ছিল উদার ও উজ্জল; কতকটা অন্ধ। তখন তিনি সর্বোচ্চ শেক্সপীয়ারের কাব্যরসে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার রসে যে সংস্কার মিশিয়া আছে তাহা অপেক্ষা ঐ কাব্যরসাদর্শ তখন অতিশয় প্রবল। কাজেই ঐ কাব্যাদর্শকেই তিনি তাঁহার সংস্কারের উপরে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু কবি-জীবনের পরিণত অবস্থার বধন সৃষ্টি-প্রেরণা বহিঃস্থী না হইয়া অন্তঃস্থী হইয়াছে তখন তাঁহার সেই সুপ্ত সংস্কার সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি শেক্সপীয়ারের কাব্যাদর্শে রাসব-জীবনের যে ব্যাঘাৎ ইতিপূর্বে করিয়াছিলেন তাহাতে শান্তি পাইলেন না। হুঃখ ও যত্নকে—তাহা বড় সভাই হউক, শেষ কথা বলিয়া মানিতে কিছুতেই তাঁহার প্রাণ চাহিল না। যত্নেই যদি সব শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনের আর কি থাকে! এক মহাপ্রত্যাহ্ন কি তাহা হইলে জীব-জগতের শেষ পরিণাম। হুঃখই কি তাহা হইলে সংসারে একমাত্র সত্য বস্তু? এত হুঃখ সহিবার পরে মহত্তর জীবনের বা পরিণতির কোন আশাসই তাহা হইলে নাই? ইউরোপীয় আদর্শে এই হুঃখই পরম সত্য, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কার তাহা মানে না। সেই সংস্কার আদর্শকে হুঃখ নিশার পারে এক মহত্তর ও উজ্জলতর জীবনের ইন্দিব দেয়, বলে হুঃখটা পরিণতি নয়—পহা। যে দিন হইতে বঙ্কিমের ভারতীয় সংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠিল সেই দিন হইতে তিনি শেক্সপীয়ার ট্রাজেডির আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলেন। নিরন্তর নির্ভর লীলাকে বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেই নিরন্তরকে বীকার করিয়া তাহাকেই নয়

করিবার পহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সম্পর্কে বোহিডলালের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"জীবন ও মরণ, আশা ও পরকাল সবচেয়ে আশাবের এমন একটা সংস্কার আছে যে আমরা কোন হুঃখকেই চূড়ান্ত মনে করি না, সব ঠিক আছে, কোনখানে অনিরম বা অবিচার নাই; কোন হুঃখই অস্বলক বা অস্বলত নয়; এমন কি জ্ঞান কিংবা তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিলে হুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আমরা কাদি বটে সেটা জীব-বর্ষ, কিন্তু সেই ক্রন্দনেও সাহসনা আছে। এই সাহসনার প্ররোজন আমাদের প্রকৃতিতে সজ্ঞান ও অজ্ঞানে অতিশয় দৃঢ়বল হইয়া আছে, ... ভারতবর্ষ জীবনের বাস্তবকেই চূড়ান্ত বলিয়াই গ্রহণ করে নাই। সেই বাস্তবকে ভেদ করিয়া প্রকৃতি ও নিরন্তর অন্তরালে একটা যুগন্তর কিছুই বর্ণনামাত না করিয়া সে কাত হইয়া... ইউরোপীয় সংস্কার ইহার বিপরীত, তাহাতে হুঃখটা অতিশয় সত্য। উহার শক্তি অপরিমিত; ভগবানও সেই পরভানের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। ... বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ইউরোপীয় কাব্যরসকে অধিগত করিয়া তাঁহার উপভাসগুলিতেও সেই রস একরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও রূপাণে ভারতীয় বা হিন্দুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয় আদর্শ রূপা করিতে পারেন নাই বা চাহেন নাই।"

যে নিরন্তর-লীলার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা মাহুয়ের তুল-জ্ঞাতিকেই আশ্রয় করিয়া আপনার উদ্বেগ চরিতার্থ করে, শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির উহাও একটি উপাধান। মাহুয়-মাহিকার বহুতকাব্যেই তাহাদের সর্বমাপ অথবা বিনষ্টের বীজ উপ থাকিবে। মাহুয় যে তুল জ্ঞাতি করে তাহা রিপূর ভাঙনাতেই করে। কাম, কোণ, লোভ, ঘোহ, মদ, মাৎসর্ঘ্য—এই ছয়টি রিপূর মধ্যে কামই সর্বাধিক শক্তিশালী। এইজন্য যত্নরিপূর উল্লেখ করিতে হইলে সর্বাধিক কামেরই উল্লেখ করা হয়। এই কাম সৃষ্টির মূলে। ইহা যেমন সৃষ্টির কারণ তেমনই ইহাই আবার সংসারের হেতু—ইহা একাধারে মহৎ ও ভয়ঙ্কর। এই কামপ্রবৃত্তির ভাঙনার মাহুয় যে তুল করে তাহাই তাহার জীবনের সর্বাধিক মর্মান্তিক ট্রাজেডির কারণ হইয়া থাকে। মরনারীর পরম্পরের প্রতি যে অহুয়াস আকর্ষণ ও প্রণয় তাহাই বঙ্কিমের ট্রাজেডির উপজীব্য, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব তাহাই তাঁহার সৃষ্টি মাহুয়-মাহিকার জীবনে ট্রাজেডির ক্রক-বনমিকা টানিয়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব কি? প্রকৃতি একটা অন্ধ শক্তি। সৃষ্টিই তাহার একমাত্র কাজ, তাহার পথিক বা অপথিক কোন সংস্কারই নাই। সে কখন যে কাহার উপর প্রসন্ন হয় তাহারও হিরত নাই। পুরুষ কখনও তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার দয়া-ভিকা করে—কিন্তু পায় না, আবার কখনও বা ক্ষোভিত

ত্র করিতে নিরা। নির্ভর ভাবে নির্ভাতন করে, তাহাতে নারী
বুঝিয়া মরে সত্য, কিন্তু সেই আত্মনের হৃদয় হইতে পুরুষও
নব্যাহতি পায় না; তাহারও সর্বদা অবিবর্তন হয়। প্রকৃতি
যে পুরুষ অপেক্ষা ন্তিমতী ইহাই বন্ধন দেখাইয়াছেন। নারীর
মধ্যে তিনি মহাভাগ্য জনস্বাক্ষর প্রভিষ্টি প্রত্যক্ষ
করিয়াছেন। মানব-জন্মের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—সেই
ব্রহ্মা, মেহ, দয়া, প্রেম, সবেমই অমল আকর ঐ নারী-জন্ম।
সহিত্যের জীবন্ত প্রভিষ্টি নারী, সর্বসংসার বরিত্তির মত অসং-
খ্য-বস্তু নীরবে সহিয়া নারীই পুরুষের ভাগ্য নিরূপণ
করিতেছে। ঐতিহাসিক গোপেনদাসের ভাই বলিয়াছেন,
"The woman pays the debt of life not by what
she does but by what she suffers." নারীর এই
বিশিষ্ট সহিষ্ণুতা বৃদ্ধ হইয়া বন্ধন নারীত্বের বন্ধন। নাম
পাশবর্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রমণী কামারী,
স্বামী, মেহমণী, রমণী ঐশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ,
স্বভাবের দ্বারা; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি দ্বারা। স্রী আলোক,
পুরুষ দ্বারা।" নারীত্বের বর্ণনা করিবার সময় বন্ধনের
স্বাধীনতা হইয়া উঠিয়াছে, চপলতার বাস্পদ্বারা সেখানে
গাই। তিনি যেন নারীর পুঙ্খানুপুঙ্খ উচ্চারণ করিতেছেন।
তিনি বলিয়াছেন, "গৌরীলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল।
স্রী ক্যোতির্গী, অমল প্রকাশালী, প্রভাত শুভ্রতা-রূপিণী
কলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।" এরূপ পংক্তি বহু আছে।

অগ্ন ও জীবন সম্বন্ধে বন্ধনচক্রের দৃষ্টিকোণে যে আলোচনা
করিয়া তাহাই বহি সত্য হয় তাহা হইলে এই ধ্বংসোৎসব
পাতিকে নিশ্চিত বৃত্তার হাত হইতে রক্ষা করিবার এক প্রয়াস
মি পাইলেন কেন? সবই যদি মিথ্যা, দ্বারা, বৃত্ত বা বিদ্যাই
যদি জীব ও জীবনের অনিবার্য পরিণাম অথবা ইহলোক
অপেক্ষা পরলোকই যখন মহত্তর সত্য তখন ঐহিক শুভা-
কর্মের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া চলে কি? অগ্ন ও জীবনের
স্বভাবাবলী পরিণতিই যখন এক বিশিষ্ট মহাপ্রভা তখন
তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলির মধ্যে আর কি সত্য থাকিতে
 পারে? আপাতদৃষ্টিতে ইহার সামঞ্জস্য বুঝিয়া পাওয়া যায়
। বটে, কিন্তু বন্ধন এক হৃদয় অন্তর্ভুক্ত দ্বারা ইহাদের
সম্বন্ধ আবিষ্কার ও সম্বন্ধসাধন করিতে পারিয়াছিলেন।
ই সম্বন্ধ-সাধন বন্ধন-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক।

বন্ধনচক্র দেখিয়াছিলেন অগ্ন ও জীবনের পরিণাম
তাই হটক না কেন দ্বারের ঐহিক অস্তিত্ব কবেকট হৃদয়
স্বপ্নের অধীন—যেমন সে ইচ্ছা করিলেই আত্মহত্যা করিয়া
কল আবার অবসান বা সকল সমস্ত সমাধান করিতে
 পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কাপটিক নিয়মের বশেই
সহ্যাকে বাচিতে হয়। সবে সবে তাহাকে এই বাঁচার সহিত
সদ্ব্যবহারে অভিজ্ঞ সমস্তগুলির, যথা—কুলা, শিপাল, যোগ

শোক প্রভৃতির সম্মুখীন হইতে হইবে। বাচিতে হইবে অথচ
সেই বাঁচার অনিবার্য কলবরণ যে হুঃ-কষ্ট দেখা দিবে তাহার
প্রতিকার সে করিতে পারিবে না—ইহা এক হুঃসহ অবস্থা।
বাঁচাই যখন নিশ্চিত তখন তাহা বস্তু অল্পকালের জন্যই হটক না
কেন পূর্ণ মহত্ত্বের অবিচারী হইয়া বাঁচিতে হইবে, "নারীরা
বলহীনের সত্য:"। অতএব ঐহিক সুখ-বাহ্যস্যের অত বাহা
কিছু প্রয়োজন তাহা অবশ্য করণীয়। এই যে দৃষ্টিকোণে ইহাই
বন্ধনের জীবনবাহ। বন্ধনের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনবাহ
উত্তরই সত্য, কোনটির মধ্যে সংশয় নাই, দ্বিধা নাই, দ্বি-
জ্ঞানের পূর্ণব্যোমিতে ইহার সত্য। এই হুই সত্য পরস্পর-
বিরোধীও নয়। আত্মবিশ্বাসী বন্ধনের দৃষ্টি এখানে পরম নিষ্ঠার
সহিত বাস্তবকে অনুসরণ করিয়াছে। তিনি জীবনকে বস্তুরূপে
বেধেন নাই। তাহা হইলে তাহার জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-
বাহের মধ্যে যে-কোন একটাই সত্য হইত। পঞ্চাশের তিনি
জীবনের একটি সমগ্র ও অগ্ন রূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।
মানবজীবনকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু মানব-অদৃষ্ট
দেখিয়া তাহার অন্তরঙ্গ্য অব্যক্ত বেদনার আত্মনাদ করিয়া
উঠিয়াছে এবং তাহারই ভাঙনার শৈল্পীময়ী ট্র্যাজেডির
আদর্শে তৃপ্তি না পাইয়া তিনি হিন্দু সংস্কারের বশে জীবনের
পরপারে মহত্তর জীবনের সন্ধান করিয়াছেন।

বন্ধনের উপভাসগুলি, বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডিকগুলি
তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানে তিনি হৃদয়
বিহনের মত কল্পনার অমল মীলকালে পক্ষ বিস্তার করিয়া
ভাসিয়া চলিয়াছেন। দ্বার যে কত অসহায়, নিরতির নির্ভর
বিবাদের নিকট সে যে কত দুর্বল বন্ধনচক্র এখানে তাহা
দেখাইয়াছেন। সবই ঠিক আছে, কোথাও কোন ভ্রষ্ট বা
বিচ্যুতি নাই হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটিল তাহার অত সুখের
সংসার হুঃখের দ্বায়ে ভাসিয়া গেল। বন্ধনের ভাবের বলি,
"যেমন বসন্তের আকাশ—বসন্ত সুন্দর, বসন্ত মীল, বসন্ত উজ্জ্বল—
কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ একবার মেঘ উঠিয়া চারিদিক
আঁধার করিয়া কলে।" তারপর বসন্ত-বজ্রা, ধ্বংস-বিলয়ের
অবসানে শান্ত শুভ প্রভৃতির কোচে বলিয়া দীপ্ততারা নরনারী
নিপতপানে চাহিয়া প্রশ্ন করে, "কি করিলে যেমন ছিল তেমনই
হয়।" কিন্তু হার উত্তর আসে না। তাহাদের ঐ প্রশ্ন বাহু-
তরে কণি তরঙ্গের কল্পনমাত্র সৃষ্টি করিয়া মিলাইয়া যায়।
একটি ভুলের জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ভুল যে করে সে
তাহার জ্ঞান ও অনিবার্য পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।
সংশোধনের চেষ্টাও সে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। এক
দিকে বিবেকের অনুশাসন অত দিকে প্রাণের আত্ম আত্ম
এই বোটাধার ঘোড়ে পড়িয়া দ্বার ত্রুণতের মত অকূলে
ভাসিয়া যায়। সহ্যাত জ্ঞানের নীপশিখার বাহাকে অত্যা-
বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারই দুর্বল আত্মানে লাভা বিরা

মাহুৎ অনন্ত হুঃখের সৃষ্টি করিতেছে। বন্ধিনের নিজের ভাবায় বলি, “.....কেহ কেহ এমন পতঙ্গরূপ বে বলত বহিরাগি দেখিয়াও ভয়সা প্রবিত্ত হয়।” একজন একজনের ভক্ত সর্ব্বদা, এমন কি প্রাণ বিসর্জন করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। অথচ বাহার ভক্ত সে এই আদৃত্যাপে প্রস্তুত সে চেষ্টা করিয়াও তাহার এই অজলি গ্রহণ করিতে পারিতেছে না; হরত তাহার হৃদয় তখন আর একজনের হৃদয়ে প্রণয়ভিত্তি করিয়া কিরিতেছে যেখান হইতে প্রতিদানের কোন আশাই নাই। এই যে মানব-অসুখ ইহাই বন্ধিনের উপভাসের মুখ্য উপকীৰ্ত্ত্য।

গোবিন্দলাল, মগেন্দ্র, রোহিণী, কুন্দ, সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, হীরা প্রভৃতি সকলেই একই পথের পথিক। কল্যাণময় অন্তরালোকে তাহারা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল, যে-পথ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে সে পথে কোন দিমই তাহাদের বাহিত বস্ত মিলিবে না; বরং স্পষ্টই দেখিয়াছিল ঐ পথের শেষ যেখানে সেখানে ভীর্ণ-দেবতার দেউল নাই, আরে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল গহ্বর। সেখানে আলো নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। আরে অনন্ত আধার, অসীম হুঃখ, সীমাহীন অশান্তি আর অপরিসীম অতৃপ্তি। সেই চরম-পরিণতি দর্শনে তাহারা শিহরিয়া উঠিয়াছিল; প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল কিরিতে। কিন্তু পারে নাই, কোন এক কুহকিনীর ইঙ্গ-কালে আত্মজের মত তাহারা সেই বিমানের দিকে পূর্বাশেকা দ্রুতপদেই বাহিত হইয়াছিল। আত্মসংবাদের ভক্ত রোহিণী কি প্রাণপণ প্রয়াস না পাইয়াছিল। বিবাতার কাছে তাহার শক্তি-ভিত্তিক কণা পড়িলে পাশাপা-হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়, “হে ভগবদীয়, হে দীনমাণ, হে হুঃখিনীর একমাত্র সহায়। আমি নিভাত হুঃখিনী, নিভাত হুঃখে পড়িয়াছি—আমার রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ প্রেমবন্ধি মিটাইয়া দাও—আর আমার পোকাইও না। আমি বাহাকে দেখিতে বাইতেছি—তাহাকে বতবার দেখিব, ততবার আমার অসহ বরণা, অনন্ত সুখ। আমি বিববা—আমার বর্ষ পেল—সুখ পেল—প্রাণ পেল—রহিল কি প্রভু? রাধিব কি প্রভু? হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে ভগবতী—আমার সুমতি দাও আমার প্রাণ হির কর—আমি এই বরণা আর সহিতে পারি না।” কিন্তু হার, বিবাতার অসীম রূপ-পাশাবার হইতে এক বিন্দু পরিমিত রূপাবারিও রোহিণীর অসুখে মিলে নাই। রোহিণী আত্ম-সংবদ রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার “স্বীত, মৃত, অপরমিত প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয় ধামিল না।” গোবিন্দলালও ঠিক একই ভাবে একই প্রাণনা বিবাতার কাছে কানাইয়াছিলেন, “হা মাধব! মাধব! তুমি আমার এ বিপদে রক্ষা কর।—তুমি বল না বিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি বলিব—ভ্রমর বলিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিত—আমি তোমার বলে আত্মকর করিব।” কিন্তু গোবিন্দলাল ব্যর্থ

হইয়াছিলেন। তিনিও ‘মরিয়াছিলেন’, ভ্রমরও মরিয়াছিল। মগেন্দ্রের অবস্থা তাহাই। কোন অন্তর্ক মুহুর্তে জামি না, কুন্দ-বন্ধিনী মগেন্দ্রের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু বেই কণে তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তখন হইতেই কঠোর হস্তে কুন্দকে সেই আসনচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু পারেন নাই। আত্মজের চেষ্টা এখানেও ব্যর্থ হইয়াছিল। মগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে বলিতেছেন, “সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি বধাও তোমার নিকট বিবাসহতা। বধাওই আমি তোমাকে তুলিয়া কুন্দ-বন্ধিনীতে—কি বলিব? আমি যে বরণা পাইয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ আমি চিত্তবদনের চেষ্টা করি নাই; এমনত ভাবিও না। আমি বত আমাকে ভিত্তিকর করিয়াছি, তুমি কখনও তত ভিত্তিকর করিবে না। আমি পাশাপা—আমার চিত্তবদন হইল না।” সূর্য্যমুখীও কন্দল-মণিকে লিখিত পত্রে ইহা স্বীকার করিয়াছে—“আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই তুমি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।.....” আর কুন্দ? আত্মজের ভক্তই ত সে নিশীথিনীর মীরব প্রহরে মগেন্দ্রের মিরাপদ আশ্রয় ভাগ্য করিয়া অজানা পথে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু হার পারিল না। আবার তাহাকে কিরিতে হইয়াছিল। প্রেমের পবিত্র কুসুমে সূর্য্যমুখী, মগেন্দ্রের ভ্রমর গোবিন্দলালের অর্চনা করিতে চাহিয়াছিল। অদের বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না। কিন্তু সে আশা কি তাহাদের পূর্ণ হইয়াছিল? হীরা অসঙ্কোচে মাতী-কীবনের শ্রেষ্ঠসম্পদ মেঘেন্দ্রের চরণভলে অর্ঘ্য দিয়াছিল। কিন্তু বিনিময়ে সে কি পাইয়াছিল? অপমান আর লাঞ্ছনা। কপালভুলকে নবকুমারের অদের কিছুই ছিল না। তথাপি এই বমবালা নবকুমারের প্রণয়ের উপলক্ষ প্রতিদান দিতে পারিল না। সন্তানের শীতল তরলোদ্ধাসে তাহার সকল সমস্তার সমাবান হইয়াছিল। মানব-কীবনের এই ভয়াবহ পরিণতি এই চরম সর্ব্বনাশ দর্শনে জনৈক ইংরেজ বন্দীরা যে সত্য উপনীত হইয়াছেন এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিতেছেন,

“The purest reality, the purest beauty, the purest love cannot by its own nature, manifest itself here on earth without disaster but in disaster it can.”

সত্যতার জন্মবিবর্তনের সন্দেশে মাহুৎ উন্নত হইবেই। কিন্তু এমন দিন হরত কোন কালেই আসিবে না যেদিন সে বন্ধিনের উপভাসসমূহে বর্ণিত সমস্তাগুলির হাত হইতে মুক্ত হইবে। এ সব প্রায় সাময়িকও নয়, আর বিশেষ সমাজেরও নয়। সর্ব্বকালীন ও সর্ব্ববাসবীর। ইহাঙ্গিকে উপাচানমুদ্রে গ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহার আবেদন সকল দুপের সকল মাহুৎের কাছে পৌছিতে ব্যাধ। যদি কোন সাময়িক সমস্তা বন্ধিনের সাহিত্যের উপকীৰ্ত্ত্য হইত তাহা হইলে তাহা

আবেগন সর্বব্যাপী ও সর্বজনীন হইত না—হান ও কালের
সীমারেখার তাহার পরিধি চিহ্নিত হইয়া বাইত।

বহিন তাঁহার সাহিত্য-সাধনার 'art for art's sake'
নীতিতে এহণ করেন নাই, কারণ ইহা তাঁহার কবিত্বভিত্তিক
সম্পূর্ণ বিরোধী। বার্ণার্ড শ জীবন সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন
বহিনের সম্বন্ধে সেই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য, যথা :

"I am of opinion that my life belongs to the
whole community and as long as I live, it is my
privilege to do for it whatsoever I can. I want to be
thoroughly used up when I die for the harder I work
the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life
is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch
which I have got hold of for the moment and I want
to make it burn as brightly as possible before handing
it on to future generations."

বাহার 'আর্ট'-বিশালী তাঁহাদের সহিত জীবনের সম্বন্ধ
ততটুকু বতটুকু না হইলে উপাধানের অভাবে আর্টের চর্চা সম্ভব
হয় না। জীবনটী তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ পৌণ। পক্ষান্তরে
বহিনের নিকট জীবনই ছিল মুখ্য। তিনি জীবনকে ভাল-
বাসিয়াছিলেন। শত কর্মব্যতা, কষ্ট ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও জীবন
তাঁহার নিকট অবহেলিত হয় নাই, তবু তাই মর আত্মপরাণীর
বাহা বর্ণ—জীবনের একটা মহৎ ও উজ্জ্বল রূপ—তিনি ব্যান

করিতেন। যেখানে তিনি কর্মব্যতা বা কালিদা লক্ষ্য
করিয়াছেন, পাশের কলুষস্পর্শে যেখানে বিব লক্ষিত হইতে
দেখিয়াছেন সেখানে তিনি অনন্ত বেদনাবোধ করিয়াছেন
এবং তাঁহার প্রাণ, মন ও আত্মা তাহার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা
করিয়াছে। অর্থাৎ, তবু বেদনা বোধ করিয়া তিনি নিষ্ক্রিয়
হইয়া বলিয়া থাকেন নাই, নীতিজ্ঞানের দ্বারা সেই কর্মব্যতা ও
পাপকে হ্রস্বীকৃত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। নীতিজ্ঞানকে তিনি
বিসর্জন দিতে পারেন নাই। কারণ পশ্চাতে ছাড়ার ভয়
ইহা তাঁহার কবিত্বভিত্তিক লগ্নের হিসাবে তাঁহার সাহিত্যে
প্রবেশ করিয়াছে। কারণ "জীবন বাহার বিষয় সেই সাহিত্য
আর্টের মত নীতিহীন হইতে পারে না। যদি তাহা হইত
তাহাতে জীবনের রূপসমগ্রতা প্রকাশ পাইত না। তাঁহার
রচনার যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে তাহাতে যদিও আর্ট
স্বয়ং হইয়াছে কাব্যের কিছুমান কতি হয় নাই। কারণ
সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে—ব্যক্তির প্রতিভা; এবং জীবনকে
যে বত বত করিয়া দেখিয়াছে সে-ই তত বত ব্যক্তি, তাহার
যে বাই তাহাই উৎকৃষ্ট টাইল—তাহাই Great Art."
(ক্রীমোহিতলাল মজুমদার)।

উপরের কথাগুলির মধ্যে বহিন-প্রতিভার মূল স্রষ্টা বিদ্যুত
রহিয়াছে।

আলোচনা

“নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা”

ঐপঞ্চানন রায়, কাব্যাতীর্থ

প্রবাসী আবার ১৩৫৮ সংখ্যার প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ ও
প্রবাসী ভাষ্য সংখ্যার প্রকাশিত আলোচনা পত্রিকা সুবিলম্বে এই
প্রবন্ধের প্রতিকার দেবতাপন সম্পর্কে বিস্তৃত অঙ্গুল্যমান হয়
নাই। নিম্নবঙ্গে যিনি বারা ঠাকুর নামে কথিত, তিনিই হরত
বেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের বসাকলে বৃক্ষতলে কিংবা শহরের
চতুর্পাশে নকর সংক্রান্তির সাজিতে বড়ান ঠাকুর রূপে পূজিত
হন। স্থানভেদে ইনিই বড়ান চণ্ডী ও বোকাই চণ্ডী।

বকিণরায় পুণক দেবতা বলিয়াই মনে হয়। রান, বুক,
চৈতন্য প্রভৃতির মত তিনিও হরত মহাব্যবেহবাণী ছিলেন। মহা-
কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণের মাতা
“রায়বাণিনী” রূপে পূজিত। বেদিনীপুর কীরপাইয়ে এই নামের
দেবতা আছেন। এই বংশের প্রথম রাজা বুকরায়ের বকিণ-
রায় নামে যে পুত্র ছিলেন, মূলপ্রবন্ধে তাঁহার নামা দেখি নাই।
তিনিই কি বকিণরায় নামে পূজিত হইতেছেন?

অকরবাবুর আলোচনার “বেদিনীপুরে ঘাটাল মহা-
ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেবতা বড়ান ঠাকুর” শিরোনামের প্রবন্ধে

চেচুয়া বাহুবেনপুত্র, বৈকুণ্ঠপুর, নির্ভরপুর, চাঁদপুর প্রভৃতি এই
মহাকুর বহু গ্রামের সম্মিলিত পীতলা ও মনলা বেলীর সহিত
নিরোক্ত ব্যানের অঙ্গুরণ পকানন্দ বা পকাননের মূর্তি বিত-
মান, উহার দুই পাশে উপদেবতা মূর্তিহীন।

গ্যান :—বিষ্ণুজং কটিলং শাভং করুণাসানরং বিষ্ণু।

ব্যাঘ্রচর্মপরিধানং বজ্রহস্ত সমবিতম্।

লোচনজয় লংঘুতং তক্তাটী কলপ্রবহ।

ব্যাঘ্রীমারীষরং দেবং পকানন্দমহাভজ্যে।

মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের দেবতাটির সহিত ইহার
মিল আছে। বেদিনীপুরের কেপুত গ্রামে ও হাওড়ার আমতা
প্রভৃতি অঞ্চলে বটবৃক্ষতলে বটরূপে পকানন্দ পূজিত হন।
শনিবারই তাঁহার পূজার প্রসঙ্গ দিন। কোন কোন পণ্ডিতের
মতে ইনি বটুকু ভৈরব। প্রবাসে, শিবই পত্নী বলি এহণের
কত পকানন্দ মূর্তি বারং করিয়াছিলেন। কলিকাতার নিমতলা
ও বেদিনীপুর হাটপুরের নির্ভরপুর প্রভৃতি স্থানে পকানন্দ
প্রতাপের দেবতা রূপেও পূজিত। মলীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইনি
পাঁচু ঠাকুর। এই সকল দেবতা সম্পর্কে লভ্য নির্ণয়ের কত
ব্যাপক প্ৰবেষণ প্রয়োজন।

বুড়ো শিব

ঐ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

“হে বাবা বুড়ো শিব, তুমি কেন্দ্র কর মাথ। ওই বোরেরির
পুতের লক্ষ্যমাণ হোক, লক্ষ্যমাণ হোক, লক্ষ্যমাণ হোক।
ওকে সঙ্গে বংশাক দেব—ডে-রাডির বেন না কাটে ভাবতা।
তুমি বেণো, তুমি বেণো, তুমি বেণো।” বগলা বুড়ী মাথা
ঠোকে আর বিকবিক করে আগুতার।

বুড়ো শিবের ‘গামে’ তখন শেখ-চৈতনের বরা রোদ। রোদ
তো নয় আঙন। বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও
রোদের উতাপ এত। বুড়ীর অঙ্গের মাই। পাথরের চাতাল
মোড়ে তাতিয়া আঙন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর
বগলা বুড়ী মাথা ঠুকিতেছে। রতন বুড়ী আমগাছটার ছাওয়ার
কাঁড়াইয়া ঢাকে কাটি মারে আর বুড়ীর বিকে চাহিয়া বেধে।
বুড়ীর মাথা ঠোকা আর শেখ হয় না। বৈকাল হইয়া
আসিলেও এ বারটার এখনও প্রভাত রোদ। পাছপালাও বেশী
মাই—চাতালের ঝাঁপাশে শুষ্ক একটা আমগাছ—কাঁচামিটে
আম। সামনে পালের ঘের বৈঠকখানার ঝাঁপান বাদ্যনা।
তাহারই উপর বাট হাতে ছোট ছোট হেলেনেরের ডিক—
অধিকাংশই নিরঞ্জের। এলায়এলায়। ওবারে একটা
ছোট চালাবর। তাহাতেই একটা উনানে পুজারী ব্রাহ্মণ
তোপ চাপাইয়াছে। পাশে কাঁড়াইয়া বুধুকে-গিরী।

বগলা বুড়ীর মাথা ঠোকা শেখ হইয়াছে। সে উঠিয়া
আসিয়া আমগাছের ছাওয়ার কাঁড়াইয়াছে।

রতন বুড়ী হাসিয়া বলে, কি শিশী, অত মাথা ঠুকছ্যালে
ক্যানো গো?

—মরণ তো হয় না, মরণ মাগছিলুম রে বুধুপোতা। বুড়ী
জবাব দেয়।

রতনের হাসি এবার স্পষ্ট হয়—তা বেশ, তা বেশ।
বুড়ী হাসিয়া ওপাশটার সরিষা কাঁড়ায়।

বুধুকে গিরীর বরল হইয়াছে—চোখে ভাল দেখিতে পান
না। পুজারীকে ডাকিয়া বলেন—ভাণে তো তারক, ওই
আমগাছের ছাওয়ার বগল কাঁড়িয়ে না। তারক উনানে হুঁ
বিত্তেছিল—বুধু তুলিয়া চাহিয়া বেধে। হ্যাঁ গো বগলই।
বসিয়াই আবার ডিকা কাটে হুঁ বিত্তে আরম্ভ করে। বুড়ী
ঐদিকেই বাইতেছিল। বোধ হয় পুহুরে বাইবে। ভোগের
চালার কাছে আসিয়া বুড়ী নিজের হারার বিকে ডাকায়।
নাথবানে হারা কাঁড়াইয়া অএলয় হয়। বুধুকে-গিরী হাঁকেন,
বগল—অ বগল। বুড়ীর কানে সে বর পৌছায় না।—বলি
ও বগল কানের মাথা ধেরেছিল? বুধুকে-গিরী এবার ঘোরে

ঘোরে হাঁকেন। বুড়ী কাঁড়াইয়া পড়ে, বলে, আমি কানের
মাথা ধেতে বাব কেনে, সে ধেরেহে ভোমরা।

কথাটা ব্রাহ্মণ-পুজারী তারককেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা
হইয়াছিল। কারণ আছে। সেদিন বুড়ী হেলেনেরের দহিত
ভোগের এলায় লইতে আসিলে ব্রাহ্মণ এক কোঁটা পারেল
কেলিয়া দিয়াছিলেন। সে নামে মাজ। ব্রাহ্মণের ঘোষ
মাই, মইলে কুলার কৈ। অনেক লাগলাগনা করিয়াও বুড়ী
আর এক কোঁটা পার মাই। রাগটা সেইজন্মই। কিন্তু চোখ
তুলিতেই মজরে পড়িল, এরকম পুজারী ব্রাহ্মণ তো নয়ই—
আর কেহ হইলেও বোধহয় রকম থাকিত, কিন্তু সে বরং বুধুকে-
গিরী। বুড়ী পূর্ণ লম্বের মোহাই পাড়িয়া চট্ট করিয়া কথা
বোঝায়। বহু দিন আগে তাহার ‘মনের কথা’ পাতাইয়াছিল।

—ওমা ‘মনের কথা’ তুমি। আমি বলি কে না কে।
তা তুমি কিছু মনে কোরো না বিধি—চোখেও পাই নে দেখতে,
কানেও পাইনে শুনে। তা—কি বলছিলে?” বুড়ী জিজ্ঞাসা
করে। শ্রেক তুলিয়া দায় এই মাত্র সে বলিয়াছে কানের
মাথা খাইয়াছে অপরে—সে নয়।

বুধুকে-গিরী আর কথা বাড়াইলেন না। গলার বর
একটু উড়ে চড়াইয়া বলিলেন—না বগল, এলব ভাল নয়।
এই ভোর ঘেরের কথাই বলছি। কল্লা রে কল্লা। বুধুকে-
গিরীর বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর এনে উঠে, সে হারাম-
জারীর কাণ্ডটা আছ শোন্। লকালবেলা লবে চান লেরে
আলোচাল ক’টা মিরে এসেছি—বাটে বোব বলে। কাল
ধেকেই মনে করে রেখেছি বাবার ভোগটা আছ আনিই
বোব। চাল ক’টা বুধে লবে দি’কিতে লল করতে মিরে
হাতটা বুছি আর ভোর ঐ আছারী ঘেরে ললাং করে মিলে
পারে লল। ভুই-ই বল না হাতে চাল ক’টা থাকলে আছ
কি ভোগই দিচ্ছুম করে? ও হারামজারীকে বাধন করে মিল।
আর বলতে, বললে কি আনি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ একটু লয়ে মিরে
মুলেই তো পার। বলে কোমর বঁকিয়ে—বুধুকে-গিরীর
ভোবভানো বুধু কিরংকাল বিহত হইয়া থাকে।

বুড়ী এবার নিজের মাথার একটা চক মারিয়া বলে, ‘লবই
আমার অদেই গো। কাকে বাধন করব? আমার বাধনটা
শুনবে কে? সে হারামজারীকে বলতে গেলে আমাকেই উল্টে
বা-কতক বলিয়ে বেবে। শিথি-বীতে কত লোক মরে, আমার
মরণ হয় না।’ বুড়ী পুহুরবাটের পথ ধরে। পুহুরপাড়ে
আম-কাঁঠালের গাছের বন লারি। পৈঠার হারা পড়িয়াছে।
বুড়ী লেখানে বসিয়া অনেককণ কাঁদে। নিজেই অতিশয়

যে—কতর হুত্ব কামনা করে—‘বোরেণীর পুত্রে’র ‘ভে-
রাভিরের’ মধ্যে সর্প-বংশন চাহে। ওবারে ভবন ঢাকের
বাকনা বাধিয়াছে—ভোগ-রতন বোব হয় শেষ হইয়াছে।
এবার ভোগ নিবেদনের পালা। তাহার পরের কাজটুকু
অর্থাৎ প্রসাদবিতরণের অপেক্ষার বুড়ী বলিয়া থাকে।

প্রসাদ খাইয়া, পুত্রে হাত ধুইয়া, বোরেণীর পুত্রে আর
একবার হুত্ব-কামনা করিয়া বুড়ী বাতীর পথ ধরে। এ পথটুকু
বুড়ী মেরেকে গাল পাতিতে পাতিতে চলে। ঘরের উপর
বুড়ীর অভিযোগের আর অভ নাই। বুড়ী তো নিজেই বলে
সবের অসময়ে—কি করব মা, মইলে নিজের প্যাটের মেরে।
কিন্তু ব্যাতারটা বেধে—যেন সতীনের মেরে গো।

২

পূর্ণপ্রাণ লইয়া অনেক হৈ-হল্লোড়ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু
হৈ-হল্লোড় যতটা হইয়াছে কল হইয়াছে তার তুলনার বুঝই
কম। কিন্তু এই যে আন্দোলন ইহাতে বাহ্যিকের মাঝার
আকাশ ভাঙিয়া পড়বার কথা—তাহারা বরপক। কিন্তু
কতাপকও যে পূর্ণ লর এবং পূর্ণপ্রাণবিরোধী আন্দোলন
যে অতি উৎসাহীরা তাহাদের বিক্রমেও চালাইতে পারে এ
হিকটা বোব হয় ভেদন মজতে পড়ে নাই। কিন্তু আন্দোলন
মদি বা চালান যায়, কল বোব হয় কিছুই কলিবে না।
কেননা মিরজেনীর এই সব হিন্দুর মধ্যে বিবাহবন্ধনটা উচ-
শ্রেণীর মত অত লম্বের রক্ষিত তো হয়ই না বরং এ প্রকার
রক্ষণটাই যেন ব্যতিক্রম। সেজন্য বিবাহ হয়—পত্নী বর্ধমান
থাকিতে অপর বিবাহ হয় ত সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহার হুত্বের
পরই আবার নূতন বিবাহের আরোজন চলে। তাহাকে
ইচ্ছা বিবাহ বলে মা—বলে, ‘মিকে’।

বগলা-বুড়ীর ঘরের নাম কমলা। এদের সমাজের নিয়মমত
তাহার বিবাহও হইয়াছিল মবন বর্ষে। কিন্তু স্বামীরা ঘরের পাট
চিরকালের মত সারিয়া বধন সে আবার শিড়খুঁচে আসিল
তখন তাহার বয়স বোল। বোড়নী বুড়ী—এমন ঘেরেকে মা
সর্বদাই আগলাইয়া করে। সবচেয়ে নূতন আশার বগলও বেধে
বগলা-বুড়ী। ঘরে তাহার ঘেঁষিতে বারাপ একথা কম
লোকই বলিতে পারিবে—তাহার উপর এই বয়স। বুড়ী
রতীন হুত্বের জাল বোনে। ‘মিকে’ হইবে কমলার বড় এক
চাবীর হেলে—একট ‘মাতর’ হেলের সঙ্গে। টাকা ত কিছু
পাইবেই আর এমন লামাই পাইলে এত হুঃখ-বাখার আর
কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। কিন্তু বুড়ীর এই যে এত বয়ে
বর্ধিত আশা, একেবারে ইহার হুলে যে কুঠারাবাত করিল সে
আর কেহ নহে, সে তাহার মেরে কমলা মিকেই। বুড়ী তাই
বোঝ লম্বাবেলার আকাশের তারাতলার দিকে চাহিয়া
অনুভূত গালি পাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঘেরেকেও—ঠাকুর কি

‘মেকন’ মিকেছিলে আমার কপালে গো—আর ঐ হতচ্ছাটী
মেরেকে বশে এনে তাত হে ঠাকুর।

এবার আরম্ভ হইল বোরেণীপর্ক। বগলা-বুড়ীর এত বড়
আশার বাদ সারিয়াছিল তাহার মেরেই সন্দেহ নাই, কিন্তু
আত্মবলিক হিসাবে বাহার নাম করিতে হইবে, সে ঐ
বোরেণীদের নিতাই বৈরাগী। শক্ত-সমর্থ কোরান হেলে।
চাষবাসে মন নাই। বুড়ী তাহাকে অনেক বিশেষণেই
আপ্যায়িত করে। কখনও বলে ‘উড়নচতী’, কখনও ‘বান-
হুকো’, কখনও ‘ড্যাংকরা’—এমনি আরও কত কি। ওকে
কমি দিতে চাহিয়াছিল হরেন পাল। লালল গরু সবকিছুর
ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু নিতাই সম্মত
হয় নাই। ওর রক্তে কেমন এক ধরনের উঃ উঃ উঃ আছে,
তাই চাষবাস করিয়া এমন শান্ত জীবন বাপন করিতে সে
চাহে না। কাছের নহরে পাটের কলে সে কাজ করে—
থাকে সেখানেই। মাঝে মাঝে আসে এমেরে। পিছুটান
কিছুই নাই, যেটুকু আছে তাহাকে এক কবার বলা যায়—
তাহা ঐ কমলা।

সেদিনকারই কথা। সকালবেলা কমলা গরু বাহির
করিয়া মাঠে বাঁধিয়া দিতে গিয়াছিল। মাঠের পথে মা
করিয়া সে একেবারে পাড়ার মধ্যে দিয়া আসিল—উড়েতটা
একেবারে চৌধুরীদের বাসন কতটা মাজিয়া দিয়া বাতী করে।
বাটে বাসন মাজিতেছিল—বুড়ী-গরুর গারে কল লাগিয়া-
ছিল তখনই। বাসন মাজিয়া সে ভাড়াভাঙি বাতী করিতে-
ছিল। পথ সংকীর্ণ করিবার উদ্দেশে প্রতিবেশীদের উঠান
বাগান ডিঙাইয়া আসিতে আসিতে বোরেণীর খড়ের ঘরটার
দিকে নজর পড়িল।—পারে এক রান ধূলা, পাশে একছোড়া
নূতন কুতা—লোকটিকে চিনিতে কমলার এক মুহূর্তও ঘেরি
হইল না। সে নিতাই। কমলা এক মুহূর্ত ভাবিল, লোকটা
এত সকালে আসিল কোথা হইতে? থাকে ত বিপ নাইল
হুয়ে—নহরে, রতনগড়ে। হরত রাত্রিশেষে বাহির হইয়া
পারে হাঁটাই আসিয়াছে—বিখাল নাই। এ লোকটা পারে
না এমন কাজই নাই। তাই কমলার আশ্চর্য্য ঠেকিল না
বরং ঐ যে লোকট একটাই ধূলা লইয়া কুতাছোড়াটুকু বুসিয়া
রাখিয়া বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তাহার অত কমলার
মনে আসিল উৎকণ্ঠ।

কমলা হাঁটাইয়া পড়ে। উঠানের একপাশে একটা
শিউলি ফুলের গাছ। এক গাছ ঝাঁটা গাছটির গারে তেঁদ
বেওয়ারো ছিল। কমলা ঝাঁটাগাছটি টানিয়া লইল।
উঠানে একরান পাতা কমলা হইয়া আছে—কত দিন ঝাঁট
পড়ে নাই। কমলার মনে পড়ে—সেবার নিতাই আসিয়াছিল,
তখন হরত শীত। দেটা মাঝ রান—আজ হ’লানের কথা

হইতে চলিল। দীর্ঘ দিনের অল্পশ্রুতিতে বাসগুলি পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, অত্যন্ত ছোট চাষাগাছও আছে। কমলা পাভাগুলি ঝাঁট দিয়া এক পার্শ্বে বড়ো করিয়া রাখিল। বাগরার এক পার্শ্বে একটা উমান তাহাতে কত দিন রতন হয় নাই। উমান পরিকার করিয়া হাত ধুইয়া আলিয়া দেখিল নিতাই বলিয়া হাই তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া নিতাই বলিল—ইস্, এর মধ্যে উঠোন ঝাঁট, উনোন-পাভা হয়ে ত গেল সব। বড় বিদে লেগেছে যে—কি খাব বল তো?...বুড়ো রাগে কমলার সর্কাল আলিয়া উঠিল। কোথায় সাত-সকালে সে বাতী-বর পরিকার করিয়া রান্নার উত্তোপ করিয়া দিল তাহার অত দুটো মিষ্টি কথা বুঝে থাক—উঠিয়াই খাই খাই আরম্ভ করিয়াছে। রাগে দুখ দুইয়া সে বলিল—কি খাব? ঐ যে বাও না, উমানের পাশগুলো বড়ো করে রেখেছি।—নিতাই শুইয়া পাড়িয়া আর একটা বিরাট হাই তুলিল। আতচোখে চাহিয়া দেখিল কমলা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। বলিল—তোকে কে ডেকেছে রে? গারে পড়ে কাক করতে কে তোকে মাথার দিবিয়া দিচ্ছে। যা-যা আমার খাবার ব্যবস্থা আদি করে দেব'খন।

ইহার পর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। অভিমানে কমলার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে। হাতের ঝাঁটাগাছটা অহুড়াইয়া কেলিয়া দিয়া সে অদ্ভুত হইয়া গেল। নিতাই হাসিয়া পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল।

বাতী ফিরিতে বাস্তবিকই দেরি হইয়াছে। বগলা-বুড়ী বাগরার বলিয়াছিল। ঘেরেকে দেখিয়া আরম্ভ করিল—এই যে গরু বাঁধা হ'ল? সকালবেলা ত বেরিয়েছিলে। কোথায় মকরা করা হচ্ছিল তুমি? কমলা কোন কথা বলিল না। বুড়ী বলিল—হারামকাণ্ডী, বিশ দিন বলেছি গরু বেঁধে এসেই আমার ভাত বেড়ে দিবি। বুড়োমাস্থ সকালে কিদে লাগে।

এই এখনি এক আরগার জুবার জবাবদিহি করিয়া আলিয়া কমলার মন মেজাজ ভাল ছিল না। আবার জুবার কথা শুনিয়া সুর চড়াইয়া বলিল—বেঁধে না বেড়ে। রাকোস—সব রাকোস।

বুড়ী লম্বা চটা গলার উত্তর দেয়—কে রাকোস রে হারামকাণ্ডী? সে তুই। শিখিখীতে পড়তে ভর লইল না অমনি বাপকে বলে। বাপ'খানি আবার আমার বলে রাকোস। খাবই ত—মিছেই বেড়ে খাব।—বুড়ী উঠিয়া ঘরে গিয়া চুকিল বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া কমলা ফিরিল। বুড়ী বহু ঘরে ঢেঁচাইতেছে—ওরে লক্ষ্মণী, ও হারামকাণ্ডী—শেকল ধোল, শেকল ধোল। কিন্তু শিকল যে পুলিশে সে ভবন আর-মাগানের পথ ধরিয়া লোকা রানবাতী চলিয়াছে।

বুড়ী ভাত বাড়িয়া খাইয়া বহু ঘরে বলিয়া বলিয়া ঘেরেকে গালি দিতেছিল। হঠাৎ শিকল পুলিশ গেল—সামনে দাঁড়াইয়া অতন্নর মা। 'শেকল তুল কে দিবি?'

আমার প্যাটের মেরে 'বুন্'। ঘেরেকে ভাত বাড়তে বলেছি ত গোসা করে দিল শেকল তুলে। আমার মরণ হয় না গো—বুড়ী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

কঁদে কি কর্বি বোন্। অদেট গো। সব অদেট। মইলে তোমার অমন মেরে—অতন্নর মা সাতুনা দেয়।

অদেট, অদেট, হা অদেট। বুড়ী কপাল চাপড়ায়।

আসি, দিদি আর একটা কথা বলছিহ গো।

কি কথা লো?

আমার অতন্নর মিকে এ মাসের মধ্যেই দেব বোন্। ছেলের বাপের কুড়ি বিধে জমি চাষ। সব খান-জমি। হু'এক বিধে আপুর জমিও আছে। টালির ছাউনি বহু বহু দুখানা ঘর। একটাতে বাপ—একটাতে ব্যাটা। মিন্‌সের পরি-বার অনেক দিন হ'ল গ্যাছে। ছেলের বিয়ে দিরেছিল ওই হরগঞ্জে। তা—বৌটা বাঁচল না। বুড়ো এসেছিল। দিন ঠিক করে কেলছি—এখন কেবল ভালর ভালর মিটে গেলেই বাঁচি।

বুড়ী মিঃখাস কেলিয়া বলিল—আর আমার মেরে। মেরে ত মর বাগারী। মইলে আমারই আবার হুঃ কি গা?

অতন্নর মা কৌসু করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সহাস্রহুড়ি দেখাইল। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তবে, কথা যখন তুলে দিদি বলি শোন। গাল-মন্দ ক'র না, ভালর লেগেই বলছি। এই সকালে ওবারে কি ভেতে পেছি—দেখি মেরে তোমার ঐ বোরেনীর উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। তাবহু—একটু দেখিই না ব্যাপারটা। তা দিদি হু'কমে কত হাসি মকরা—আমি শুট শুট চলে এহু। এখনি যদি মিনহপুর্নে যখন-তখন এমনটি চলে তবে দশ জনের মুখে হাতই চাপা দেবে কি করে? এপাড়ার বা সব মিলেগুলো—তখনই বেকাল করে দেবে। এই বেলা লোকা কর দিদি। পাঁচ জনকে নিয়েই ত সব কাজকর্ম। আর এমন ব্যাপারে পাঁচ জনে ত পাঁচ কথা বলবেই। আমি লম্বা থাকতে তাই বলছিহ দিদি, আর কেন এবার রাশ টেনে ঘর। আসি তা' হলে—রাগ করিসুনি দিদি।

বুড়ী শুধু হইয়া থাকে।

সকালবেলা এই কাতোর পথ বুড়ী এবার বোরেনীর পোকে গালি দিল। তাহাকে খানিকটা গাল পাড়িয়া এবার অতন্নর মাকে লইয়া পড়িল।

ছিরি ব্যাধ না ধারি। বেদন মেরে তেরনি মা। আবার আমাকে তুমি তুমি বলেতে এসেছে। তোমার ঘেরের মিকে তুই দিবি ত আমার কি লা? ময়, ময়, মাগি।

এমন কাজের পরে রাগ নকলেরই হয়। তাই বগলা-বুড়ীর রাগ হওয়া আশ্চর্য নয়। এই বোরেণীর ভাই ও ভাইহার এই লক্ষ্যমান। বোরেণী অবশ্য গায়ে-বয়ে থাকে না। তবে বগলই আসে তাহাকে আলাইরা হাইতে হাতে না। এ পর্যন্ত বোব হয় চার-পাঁচ বার বোরেণী বুড়ীকে আখাস দিয়া গিয়াছে—এবারে নহর হইতে কিরিয়া একেবারে ছুটি লইয়া আসিয়া বিয়ের কাজকর্ম সব সে নিটাইয়া কেনিবে, তাহার মেয়েকে সে নহরে লইয়া হাইবে। আর বুড়ী যদি একাত না বার তবে বাস বাস তাহার নামে পোষ্টাপিসে টাকা পাঠাইবে। বুড়ীর অবশ্য আশা আরও একটু উত্থরের ছিল। বোরেণীর মা আছে ভাল না আছে চুলো। তবে হ্যাঁ নগর পরমা কামার ঝহরের কলে ঐটুকুই বা। তাহার উপর মেয়ের তাহার এমনি পোঁ যে আর কাহাকেও আমলই দিতে চাহে না। বুড়ী তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া থাকে বড় দিয়াছিল। কিন্তু বড় তাহাকে দিয়াছিল তাহার বোব হয়, বড় দুইয়া গিয়াছিল, কেমলা ইহার পর আসিয়া সে আর ওকথা বুধে আনে নাই। বড় হোঁচাটা যে বুঝেই ‘বদ’ তাহা নহে। কেমলাকে তো সায়শি, চিকুনি, চুলবাঁধা কিতে, কাঁটা সবই দিয়াছে। কাপড়ও দিতে চাহিয়াছিল, মেয়ে তাহা লয় নাই—আ মন্-মন্-মন্। তাহাকেও হু-এক চৌকা মতামিঠাইও বাওয়াইয়াছে, কিন্তু ঠায়ের বারে আবার বে-কে সে। ওকথা আর মনেই নাই। গই বুড়ী এই টানা-হ্যাঁচতার মধ্যে পড়িয়া ঐটুকু স্পষ্টই ঝিরাছিল যে, সব অবশেষে বুল ঐ বোরেণীর পো। এই তাবে ইর লিভাতে উপনীত হইয়া সে তাই বুড়ো শিবের ‘বানে’ ঈরাঝির মধ্যে বোরেণীর পোর সর্পৎপনে বৃত্ত্য প্রার্থনা দিয়া আসিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। বুড়ীর বড় ছেলে কেট বাচ্চা লবে গজ সারিরা আসিয়া হাইতে বসিয়াছে। বুড়ী গুহুয়াট ইতে ছেলের হাত ধুইবার ভদ্র পাচ্ছতে বস আনিতে গিয়াছিল। আসিয়া দেখিল স্ত্রীভিত্ত আসল জমাইয়া নিতাই দিয়া গিয়াছে। কেট ও নিতাই মিলিয়া কি একটা পরামর্শ দিতেছিল। বুড়ীকে দেখিয়া আবার সব চূপচাপ। বুড়ী কিছু মনে গন্ গন্ করিতে করিতে হাতবার উপর পাচ্ছায়া রাখিয়া রাখিয়া উঠানে গিয়া বসিল। কেমলা উঠানে পা জাইয়া বসিয়া দিকের পোবা বিভালটিকে আদর করিতেছিল। স্ত্রী বসিয়া পড়িয়া অত দিকে চাহিয়া রহিল—নিতাইকে বিতেই পার নাই, ভাবটা এমনি।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। কেট হাত ধুইয়া হাতবার টে বেস দিয়া বসিয়া আছে—বুড়ী আকাশের তারা শুভিতেছে, বলা বিভালটিকে লইয়া বেন আলাবা জগতের দান্দব। কিন্তু তাই চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

—বানী, অ-বানী। নিতাই হাতের হইতে হাঁকিল।

—কে যে ?

—আমি নিতাই গো বানী।

—এবার কি মনে করে ভালমানুষের ছেলে—

—অই ভাব, বানী বেদ কি ? কোথায় এসেই তোমাদের বোজববর করতে এহ—

—বাক্, বাক্ বাবা, বোজববর আনাদের আনরাই করব। ভুনি খয়ের ছেলে খরে বাও বাছা।

নিতাই আড়চোখে একবার কেমলার দিকে চাহিল। লভ্যার কিকে ছোয়াংহার কেমলাকে বড় রহস্যময়ী লসিতোছে—তাহার পানের রসে রান্ ওঠাধরে এক বলক হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কে আনিত ইহার মধ্যেই হু’খনের নহি হইয়া গিয়াছে।—সত্যই তো নকালের পর বীর্ষ হপূর ছিল। লক্ষিপত্র বাকরিত হইতে কত সময়ই বা লাগে।

নিতাই এবার হাতেরা ছাড়াই উঠিয়া আসিয়া বলিল—কি বানী, অত চূপচাপ কেনে ? আমার উপর পোলা করে আর কি করবে বল ? টাকার ছোপাচ্ছ করতে হবে তো। তোমার কাছে তো বারো গতা টাকার কম কথাই চলবে না। এবার কিছু ছোপাচ্ছ-খাত করেছি—তা’ হলে এই বোশেধেই হয়ে বাক্ কি বল। আমি কলের সাহেবকে বলে দিল হুই ছুটি মিরে আসব। সাহেব পূব ভাল লোক বানী—ওই তো টাকাতলো দিলে।

টাকার কথা বুড়ীর এবার মনেই গেল।—তা বাছা, তোমার ব্যাপার কিছু ভুনি না বাপ্। তোমার কথা ভুনিই বিরহ—ভুনিই তেবেহ। এবার টাকা হাতে পেয়ে—তবে কথা।

—তবে বানী তাই হোক। টাকা হাতে বিরই কথা-বার্তা হোক। কিছু টাকা আমার কাছে বা আছে এমন দিছি। পরে কাজের সময় সব মিটবে বোব।

নিতাই অর্ধেক টাকা বুড়ীর হাতে দিল। বুড়ী নিতাইয়ের মাথার হাত দিয়া বলিল, বাক্ বাবা, তোমার নতি দির হোক—এ তো ভাল কথা। তবে তাই হবে, আর বেরিই কেন। এবার সাহেবকে বলে করে ছুটি মিরে এল। আর আনাকে একটা মজাপাচ্ছ কাপড় কিনে দিতে হবে বলে রাখব বাবা।

পূরা আন বটী বরিয়া তাবী জামাইয়ের নহিত কথাবার্তা চালাইয়া বুড়ী উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে বুড়ী বলিল, হ্যাঁ বাবা বলি কি—এ বেলা আমার কাছেই বাওরা-হাতেরা সেয়ে ম্যাও না কেনে। ওবেলা চারটে কইমাছ বয়েছি—কোল রাখব’ধব।

নিতাই আপত্তি করে নাই—বিশেষ করিয়া তাহার স্ত্রীবেই বা কে ?

বাওরাহাতেরা সারিতে সাজি হইল। তল্লা ছোয়াংহার ওবারে গজরাচ্ছ পাচ্ছটার মাথা ফুলডলা বেন একজ হইয়া

সিঁদায়ে। অবশ্যিভাবে ভুল্লবী নববয়স্ক নতই পাহটকে
দেখাইতেছিল। সেখিকে চাহিয়া চাহিয়া কমলার ভারি ভাল
লাগিল। ভাবী জীবনের যোমাঝমর বগে বিতোর হইয়া সে
উঠান হইতে উঠিয়া বাটের বেড়ানগাছের ভঁড়ির উপর আসিয়া
বসিল।

মিতাই বাসীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া নিজের ঘরে
চলিল। কমলাকে পুছুরবাটে বেধিয়া মিতাই কমলার হই
চোখে আঁচল চাপা দিল। শক্ত কড়া-পড়া হাত, কিন্তু কমলা
বাঁধা দিল না। ধানিক পরে মিতাই নিজেই হাত ছাড়িয়া
বিদ্যা কমলার ডান হাত ধরিয়া টান মারিল।

—উঃ, লাগে না বুঝি।

—লাগে তো লাগে চোখ বোজ্। কমলা—চোখ মুছিল।
মিতাই কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া তাহার হাতে একটা কি
কেলিয়া দিয়া ইঁদং চাপ দিল। কমলা চোখ খুলিল।
জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে—সুগন্ধি একটা কুলের মালা।

পর দিন বৈকাল। তারক বাবুন ভোগ রাঁধিতেছে—
রতন বুড়ী ঢাক শিটাইতেছে—পালেদের বাঁধান বারান্দার
আজ্ঞা এক পাল হেলেনেরের তিক। বুড়ী মাথা ঠুকিতেছে—
বাবা কালক্রুর তুমি তো সবই বোঝে ভাবতা। বোরেশ্বর
শোকে শাপ দিহিলান—সে শাপ কিরিরে হাত দেব। একশো
বছর পরমায়ু হোক ছ্যালেটীর।—হে বাবা কালক্রুর।

—কোথাও কোন পরিবর্তন নাই। পরিবর্তন কেবল
বুড়ীর প্রাণদার। আনগাছটার একটা ডাল বোঝে হর হেলেনের

বাঁধাশাপিতে ভাঙিয়া গিয়া থাকিবে। যৌজোদ্ধল আকাশের
এক ইঁদং বাবার বারান্দার আলিঙ্গা পড়িয়াছে। চক্চকে
সিমেন্টের মেঝের উপর যৌজের সেই এতিকলনইহু প্রতিবিম্বিত
হইয়াছে কালো শিবলিঙ্গটির অনতিদূরে। শিবলিঙ্গ তাই
চক্ চক্ করিতেছে।

বুড়ী মাথা তুলিয়া বুড়ির দিকে চাহিল। কীণবৃষ্টি বুড়ার
নিকট কিন্তু বুড়ির এই ঔদ্ধল্যইহু এড়াইল না। বুড়ী বিড় বিড়
করিয়া নিজেই বলিল—বাবা হাসছে।—তাহার পর বুড়ী
বাড়ীর পথ ধরিল। অতদিনের মত আজ তো তাহার মনে
নাই যে, ভোগ-বিবেশনের পরেই প্রলাদ বিতরণের পাল।
কেন—কে কানে।

৪

বাবার ঘানের সামনে পাল-বাড়ী। পাশে পালেদের
ঘাটমন্দির। ঘাটমন্দিরের দিঘলে একটি স্নান কক্ষে ঝাঁড়াইরা
পাল-গিরী ও তাহার বড় মেয়ে সুবি।

কথা হইতেছে পাল-গিরী ও সুবির মধ্যে। পাল-গিরী
অজুনি নির্দেশ করিয়া মেয়েকে বলিলেন—ইয়ারে ও তো কেউ
বাড়ার বোন্ করলি না। ও-না ও হুঁতীও আবার পেরান
ঠোকে পো।

সত্যই বাবার 'ঘানে'র এক পার্শ্বে গলবস্ত্র হইরা প্রণাম
করিতেছে কমলা। আশ্চর্য্যই বটে। উহাকে কোন দিন
ঘোলালে মাথা ঘোরাইরা প্রণাম করিতে কেহ দেখে নাই।
আজ কেন সে নিবিষ্টচিত্তে প্রণাম করে—কি তাহার প্রাণনা ?

ফিরে দাও

ঐবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফিরে দাও আমার সে সবুজ আশিরে—
কেলিয়া এসেছি ঘারে কৈশোরের জীরে
অজ্ঞবোধ, অমাবিল, সৌন্দর্য্য-পাগল।
সেদিন বিশ্বাস ছিল অচল-অটল
সুধেক-পর্কতল। মনে হ'ত বোর—
তোবার অমৃত ছুটি দ্বিধ বাহতোর
আমার সত্যের বিরে আছে সর্লকণ।
মনে হ'ত বাহা-কিছু করি নিবেশন
সব ছুনি শোশো কানে। দিনে দিনে, হার,
সে কৈশোর স্তম্ভ হয়ে গিয়েছে কোবার।
প্রাণদার সে-দিনের নাই ব্যাঙ্গলতা।
কোথা সেল বিশ্বাসের সেই স্মৃতিতা ?
ফিরে দাও সে বিশ্বাস, সেই দ্বিধা বোর,
ফিরে দাও আমার সে শোবার কৈশোর।

কেন ছেড়ে গেলে

ঐমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এক হল সেমা লুট-পাট করে তনি যে দেশে,
বজ্রের মতো অবেরা তাকে—ইহুতে কেনা :
উদত আর কালো বেশ পরা, নির্নিমেষে—
হাসিয়া চাবুক এলো নির্দর সারথি-সেনা।

তারাজীংকারে হুদের নাম রাখিতাপে,
আমি যুনে কাঁদি শুনিয়া তাবের অটহালি,
বগ্নের মেঘ তারা চিরে ঘের—আশ্রম ভাগে,
লোহা পেটে বেন বুকের উপর—বিষের কালি।

বিজয়-পর্বে সবুজ কেনর নাড়িয়া আসে,
লাগর হইতে তারা এসে নাকি জীরেতে কৌদে।
হে বোর চিত্ত। কতো হতাশাই চিত্তাকাশে,
প্রিরা। প্রিরতনা। কেন ছেড়ে গেলে—কি বোর ঘোষে ?

শিঙ্গাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষে শিঙ্গাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বভাৱে বিগত ৮ই ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্রাফট-এর প্রাক্ষেপে উক্ত শিঙ্গাচার্য্যের অধ্যাপক এবং ছাত্রস্বয়ং কর্তৃক এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অর্থ কলেজের দ্বারা মক্কা কুলে এবং আলপনার সুশোভিত করিয়া, ইহার উপর কলেজেই রক্ষিত অবনীন্দ্রনাথের একটি আঁকা প্রতিমূর্তি স্থাপিত করা হয়। কলেজের অধ্যাপক ত্রিভুজ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মুগ্ধ হুগা সহযোগে এই প্রতিমূর্তিটিতে মাল্যদান করেন। তাহার পর সমবেত ছাত্র এবং অধ্যাপক-মণ্ডলী এই বর্ণিত মহাপুরুষের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিবেদন করেন। তাঁহার বহুবুধী প্রতিভার সন্নিবেশ বর্ণনা করিয়া এই দিনটি তাঁহার। শোকদিবস-বরূপ পালন করেন।

অবনীন্দ্রনাথ একজন এই বিভারতনটতেই ভারতীয় শিল্পের সূত্র সৌরবহন ইতিহাসের মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। যখন সময় ভারতের শিল্পী ও শিল্পসিঙ্কেরা বিদেশীয় শিল্পের অর্থ অস্বস্ত ছিল, যখন ভারতীয় শিল্প দেশবাসীর নিকট অপরিণত এবং অস্বস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইত তখন অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার কাল, লেখার এবং তাঁহার শিল্পমণ্ডলীর দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য আমাদের শুধু বহু-মূল্য সম্পত্তি নয়, ইহা হইতে ভবিষ্যতের বহুবুধী অনুপ্রেরণার সুযোগও বর্তমান। তখনকার দিনে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অথবা তাঁহার চিত্রাবলী এক সবুগের প্রবর্তন আনয়ন করিলেও বহু বিদ্বান, সুবিদ্বান, স্বাধীনচিত্ত তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সন্মান দিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ অর্ধ শতাব্দী কাল পরে আমরা “বাহীন ভারতে” বুঝিতেছি কি অপমান হইতে তিনি আমাদের দেশকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান কথাগুলি আবার দেশবাসীকে স্মরণ করিতে বলি :

“আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সন্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্ব্বাঙ্গে

মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করে-ছেন আত্মনিষ্ঠা থেকে, আত্মরানি থেকে তাকে দিক্‌তি দান করে তার সন্মানে পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অবিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে সুগভীরে অবতারণা হয়েছে চিত্রকলার আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা-দান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষী বরণ করে না মের, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী ব্যাতিমানদের কর



শিঙ্গাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোধগম্য আত্মবিশ্বাস বীকার করে দেয় তবে এই সুগের চরম কর্তব্য থেকে বাতালী জট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলা-দেশে সমস্ত ভারতীয় বরপুঞ্জের আগনে সর্ব্বাঙ্গে আহ্বান করি।”

সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা

[বাংলা “অমৃত বাজার পত্রিকা” হইতে উদ্ধৃত]

ক্রিয়োগেশচন্দ্র বাগল

আমরা বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ইংরেজের কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব আর নাই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা এক দিনের বা এক ব্যক্তির চেষ্টায় লব্ধ হয় নাই। সহস্র সহস্র ভারতবাসীর আত্মদানে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর দীর্ঘ-কালব্যাপী বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে বাংলা ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র নিষ্ঠীক উক্তি সমূহ আজিও আমাদের বিন্ময়ের উদ্রেক করে। শুধু রাজনীতি নহে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও যে আমরা তখন পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে-ছিলাম, এ কথাও বার বার আমাদের কর্ণকূহরে প্রতি-ধ্বনিত করান হয়। জাতির সর্বানুগী উন্নতিকল্পে সত্যকার জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা, জাতীয় সাহিত্যের প্রচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা-গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। ‘পত্রিকা’-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এ সকল বিষয়েও বিভিন্ন প্রবন্ধে আমাদের মনোযোগী হইতে বলিয়া-ছেন। এখানে প্রাচীন বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে জীলিকা, জনশিকা, গ্রন্থাগার, টোল চতুষ্পাঠী, কারুশিল্প-বিদ্যালয়, চিকিৎসাবিষয়ক বাংলা পুস্তক রচনা, বিজ্ঞানসভাদি প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ প্রদত্ত হইল। ইদানীন্তন কালেও প্রবন্ধোক্ত বিষয়সমূহের সারবস্তা আমাদের উপলব্ধি হইবে। এ সকল অমৃতসরণের প্রয়োজনীয়তাও বথেষ্ট রহিয়াছে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে অবস্ত-শিক্ষণের কতিপয় বিষয়

বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এখা অনেক দিন ধাবৎ প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও সাধারণ্যে ইহা সমাদৃত না হইবার কারণ কি? প্রত্যেক বিষয়েরই একটি প্রত্যক এবং গৌণ কল আছে; প্রথমবিধ কলেই মানব-মন অবিক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান জী-শিক্ষা-প্রণালীতে প্রত্যক কল দূরে থাকুক, পরোক্ষ কল লাভ হয় কি না সন্দেহ। যে হইট কলের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তবেই পাঠক-বর্গ বুঝিতে পারিবেন।

বিভার অর্থকরী ও জ্ঞানকরী হইট পজি আছে। অর্থাৎ বিভা দ্বারা কর্তব্য হইয়া লোকে অর্থ উপার্জনে লবণ হয়, এবং বিভাতে জ্ঞান দার্জিত হইয়া নহুতগণ বিমল মানসিক সুখ উপভোগ করেন। যদিও জীলোকদিগকে অর্থোপার্জন করিতে না হইক, তজ্জাত তাঁহারদিগের এমন অনেক বিষয় ‘আমা বিভাত প্রয়োজন দ্বাধাতে কর্তব্য অর্থ দ্বারা সূচকরূপে

সংসারদ্বারা নির্বাহ করিতে পারেন। এবিধ শিক্ষাদান অভাবে জী-শিক্ষার উন্নতি প্রত্যাশা নিফল। গ্রাম বালিকা-বিদ্যালয় মাঝেই দেখা যায়, দুই চারিখানি সাহিত্য, পণিতের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম, একখানি ইতিহাস, এবং কয়েকটি হানের নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কি প্রণালীতে এ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, তাহা আগামীতে বলিতে ইচ্ছা রহিল, সংপ্রতি জীলোকের অবস্ত জাতব্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।...

রত্নম জীলোকদিগের একটি প্রথম জাতব্য বিষয়। সংপ্রতি কল্পে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষক কিবা শিক্ষারীতির উচিত যে তাহারা প্রত্যহ অভ্যাস পার্শ্য বিষয়ের সহিত রত্নম বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। পরন্তু তাহারদিগকে প্রথমতঃ এদেশ প্রচলিত সাধারণ অন্ন, ব্যঞ্জন, দেশীয় শিষ্টক ও দৃষ্টি ইত্যাদি প্রদত্ত করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। পলায় প্রকৃতি প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষা না দিলেও ক্ষতি নাই। কেননা আমরা সেলব সামগ্রী সচরাচর ব্যবহার করি না।...জ্ঞানগত হরটি বক্তৃতা প্রদান পূর্বক, সপ্তম অর্থাৎ অবকাশ দিবসে তাহা পরীক্ষা করিবেন। প্রের দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা আমাদের বিবেচনার বস্ত কলোপহারক হইবে না। সুল গৃহের একপ্রান্তে, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে রত্নম সামগ্রী লইয়া বালিকাদিগের দ্বারা পৃথক কয়েকদিন রত্নম বিষয়ে যে কয়েকটি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল ব্যঞ্জন পাক করাইবেন। বালিকাদিগের জন্ম লক্ষিত হইলে, শিক্ষক তৎকণাৎ সংশোধন করিবেন। সপ্তাহে না হয় পক্ষে অবস্তই এরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এরূপ পরীক্ষাতে ভিন্নটি উপকার লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বালিকারা শিক্ষিত বিষয় উত্তমরূপে কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। দ্বিতীয়তঃ একত্র পানাহার দ্বারা তাহারদিগের পরস্পর বন্ধুতা ও আদোর করিবে। তৃতীয়তঃ এরূপ উপকারী শিক্ষা সন্দর্শনে লোকে আগ্রহের সহিত বীর সত্যদিগকে বিভালয়ে প্রেরণ করিবে। এই প্রণালী প্রবর্তন করিলে অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নাই। অতএব যে স্থানে স্থানীয় শিক্ষা-লবাহ আছে, তাহা হইতে এই ব্যয় প্রবর্ত হইবে, যে স্থলে তাহা নাই দ্বাদীদিগের অভিভাবকেয়া অর্থ বা দ্বব্যাদি প্রদান করিবেন।

রত্নমের পর কলপানি প্রদত্ত করা জীলোকদিগের একটি প্রথম কর্তব্য।...এই শিক্ষা কি প্রণালীতে দিতে হইবে সংপ্রতি তাহাই বিবেচনা করা বাইতেছে। সন্দেহ ইত্যাদি প্রদত্ত

করা হান্না অভাবে পরীক্ষায়ে বটরা উঠে না। অতএব হান্না হান্না যে সকল সন্দেশ প্রভৃত হয় তাহা প্রবর্তঃ শিকা না দিয়া, মারিকেল ও কীর হান্না যে সকল মিঠার হয়, তাহাই শিকা দেওয়া কর্তব্য। তৎপর মিঠাই এবং পরিশেষে হান্নার দ্রব্য প্রভৃত করিতে শিখাইবে। এ সকল বিষয় শিকক অপেকা শিকরিজীর দ্বারা উত্তম হইতে পারিবে। অতএব হান্নার লোকেরা কিংবা বেতন প্রদান পূরক, এতদ্বিষয়ে পই প্রায় কোন শ্রীলোককে নিযুক্ত করিবেন। তিনি হিসের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বালিকাদিগকে এক হানে লইয়া শিকা দিবেন। প্রভৃত সারপ্রীতে বাহাদিগের অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পাইবে, তাহারদ্বিগকে পুরস্কার দেওয়া বিধেয়।

আহার্য বস্তুর ম্যার পরিধের বিষয়েও বালিকাদিগকে শিকা দেওয়া নিত্য কর্তব্য। অনেক সময় ক্ষুদ্র একটি পরিচ্ছদ প্রভৃত করিতে, কিংবা কীর্ণ বস্ত্র সংকার করিতে সুচিকগণকে অনেক পরশা দিতে হয়। পরশা দিয়াও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া হয়, প্রাপ্ত হইলেও সমোত্তম হয় না। অতএব এইকণ বস্ত্রণ বালিকা বিভাগেই কারপেটের কাছ শিকা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে পরিধান, চাপকান, সুকণী ইত্যাদি প্রভৃত করা, এবং দ্বিঃ বস্ত্র “রিপু” করিতে শিকা দেওয়া অত্যাৱতক। এ সকল শিকা লইলে, কারপেট শিখাইলে কোন ক্ষতি নাই।

এতদ্ব্যতীত বালিকাদিগকে ‘শিকা’, ‘তাপা’ ইত্যাদি সর্কস্বা প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রভৃত করান এবং চিত্র-বিভা শিকা দেওয়া উচিত। চিত্র বলিতে কেহ বেন কটপ্রাক, কি লিথোগ্রাক প্রভৃতির কথা আশ্রয় বলিতেছি এরূপ বিবেচনা না করেন। কেননা সেগুলি সাধারণের পক্ষে সুহুরপরাহত, ও আকাশ ক্ষুদ্রবৎ। বাহারা মগরবানী তাহার্য যে চিত্রের কথা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া হাত করিতে পারেন, কিন্তু সেখক বসন একজন পরীবাণী, তখন তিনি পরীপ্রাণের অভাব বিশেষরূপে জানেন। পরীপ্রাণই অনেকগুলি ভ্রতে এবং বিবাহে সর্কস্বাই নানা প্রকার চিত্রের প্রয়োজন হয়। হিন্দু বালিকারা তৎ-সমুদ্র না জানিলে সমাধে অনেক অপবহ হন। অতএব এটিও বালিকা শিকার একটি প্রদান অদ সন্দেশ নাই। ইহাও কোন শ্রীলোক দ্বারা অব্যাপনা কর্তব্য।

এ সকল শিকাতে বালিকারা বস্ত্রণ বৃহৎকণে বিপুণ ও পরিবারে ব্যবহার্য্য হইবে, তজ্জন তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রার্থ্য্য অধিবে।...উপসংহারের পূর্বে বৃচতা সহকারে বলিতেছি, প্রদর্শিত প্রণালী প্রবর্তিত হইলে, শ্রী-শিকার সম্পূর্ণ কল লাভ হইবেই হইবে। বাহা লিখিত হইল, তাহা আমার স্বকপোলকল্পিত নয়, সাধারণের মত। অতএব নির্কর্তৃত্বিকর সহকারে শিকা বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করি,

তাহারা এ বিষয়ে যেন বিশেষরূপে আন্দোলন করেন।
(১৬ কাশ্বন ১২৭৪। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮)

স্বককদিগকে বিভাগ

পর্বর্ষেই সম্প্রতি এক মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত হইয়াছেন। এদেশের শ্রীনাথপায় লোকদিগকে বিভা শিকা দ্বিয়ার দ্বিভিত্ত পর্বর্ষেই তারি উৎসাহ দেবাইতেছেন। সব ঠিক হইয়াছে, কেবল টাকার অপ্রতুলতা।

স্বককেরা এদেশের ছোট লোক। তাহাদের অবস্থাটি কল্পণ, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের বাকী পরী-প্রাণে, আমাদের তাহাদের প্রভৃত অবস্থা জানা সম্ভব। তাহাদের দৈত সকলে জানেন কিন্তু কতদূর দৈত সকলে জানেন না জানেন, পর্বর্ষেই জানেন না।...

স্বককেরা ভোর হইতে দুই প্রহর ১টা পর্য্যন্ত এবং ৩টা হইতে রাত্র ১ প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে। এ তাহাদের নিত্য কর্তব্য। প্রত্যহ ১২।১৩ বটা ঘোরতর পরিশ্রম, এ সাব্যস্ত কাও নয়। কিন্তু পাঠক। স্বককের সম্প্রতি কখন দেখিয়াছ ? আমরা এখানে একটি তালিকা দিতেছি, এ আনুমানিক নয়, আমরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

যর দুইখানা	মূল্য ৬ টাকা
খানা ২	৫০
বহন্য কি বটী ১	১৬
ছোট বটী	১০
বেটে হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি নুতনের মূল্য	১০
চৌকি ১টা	১০
মিঠাদি	১০
কাতে	১০
না	১০
লাদল	১০
মই	১০
বিদে	১০
চরকা	১০
পুঙ্ক ২টা	২০
টোকা	২০
পাঙ্গি ৪টা	১০
কাঁধা ২খানা	১০
বস্ত্র ৪খানা (শ্রী পুরুষে)	২৬
গারহা ১খানা	১০
হকা কলুকে	২৫
বীজ	৫
গহনা	৫০
সদ্য	০

সামান্যতঃ একজন স্বককের বদান্যতার তালিকা উপর

কেওরা পেল। আরও কিছু জবাবি তাহাদের বাড়িতে পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য নাই। আর একটি কথা বলি। যে মূল্য বরা পিতাছে সে সন্ধান ঐ জবাবির মূল্য অবস্থার সময়ে। অতএব তালিকার ক্রয়কের যে সম্পত্তি বেধাম বাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের তত সম্পত্তি নাই।

ইহারা উত্তরপুষ্টি করিয়া আহাৰ করিতে পারে না বলেই ইহাদের পরীক্ষণীর্ণ আমোদ-আলাপ বলে কারে তাহা জানে না, করিবার সময়ও নাই। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাঁঠাল সিঁড়ি, চিনা চুড়া, আর সিঁড়ি তখন করিয়া কীবন বারণ করে, আর প্রায় ভুটে না। পরিবেশ একবাশি বস্ত্র, আর গামছাবাশি সজল। স্নানান্তে গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্র শুধান হয়। তাজ মাসে একটি ভাল আশিয়া তাহাতে পোষাটেক হুণ ও শুক মিশাইয়া উত্তম আহাৰ করা হয়, আর পৌষ মাসে, চালির শুভা সিঁড়ি করিয়া উৎসব করা হয়। এটা বেন কেহ বল্লও না তাবেন যে আশিয়া বাহিয়া বাহিয়া ক্রয়কদিগের মধ্যে অতি বৈভব লোকদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। ক্রয়কদিগের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কাহার কাহার অবস্থা ভাল, কাহার অবস্থা মন্দ। একশত জন ক্রয়কের মধ্যে এক জনের বাড়ি গোলা আছে, আবার তেরনি একশত জনের মধ্যে পঁচিশ জনের আর্কো লাল নাই তাহাদের চিরকাল বাটীয়া খাইতে হয়।

ইহা ব্যতীত তাহাদের অনেক কতি দিতে হয়। মহা-জনের টাকার দুই শতকরা ৩৬ টাকা। বাত প্রকৃতি শক্তের দুই শতকরা ৫০ টাকা। তাহাদের বিবাহ প্রকৃতি ক্রিয়া আছে, কি কোন বৈধ-হুর্কিপাকে যদি তাহাদের বলদের হুচু হয়, কি তাহারা বয়ঃ পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে কাঙ্কেই মহাজনের পরণাপত্ত হইতে হয়। আর, একবার মহাজনের করায়ত্তে পড়িলে তাহার আর অব্যাহতি পাওয়া হুঁকর। যে ক্রয়কেরা নিজে মহাজনি করে, তাহারা ব্যতীত আর সন্ধানই মহাজনের নিকট দায়ী।

উপরে বেরণ বর্ণনা করা গেল, নিয় শ্রেণী লোক মাঝেরই অবস্থা প্রায় সেই রূপ। আশিয়া হুজকর্থে বলিতেছি যে, আশিাদের বেশীর ক্রয়কেরা উত্তরপুষ্টি করিয়া আহাৰ করিতে পারে না। এরূপ লোকদিগকে বিভাধান করিবার পূর্বে আরদান করা কর্তব্য। সুদেব বাবু ও তাঁহার সহচরগণের মধ্যে একনে অনেক গ্রামে পাঠশালা বলিয়াছে। এই পাঠশালাগুলি অভিশর বস্ত্র-সহকারে ও নামাবিধ উপায়ে সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ পাঠশালার ভরলোকের হেলেরা অনেক পড়ে, তবু এ বস্ত্র প্রায় সুদেব বাবুর পক্ষ হইতে, প্রায় লোকদিগের বস্ত্র নাজ নাই, যদিও এখন এখন কিছু বস্ত্র বেধার বটে কিন্তু যে আর দিনের নিমিত্ত। “পেটে নাই ভাত, তা আবার লেখাপড়া

মিশাইব” ভিনুটি ইন্সপেক্টরেরা গ্রামে পাঠশালা বলাইতে গেলেই ক্রয়কেরা এই কথা বলিয়া থাকে।

পৰ্বণমেষ্ঠ ক্রয়কদিগকে বিভা দান করিবার নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় হির করিয়াছেন। কেন টাকাগুলি জলে ফেলাইবেন? এই টাকা দিয়া যদি একটা পিপলস্ ব্যাঙ্ক করা হয়, যদি তাহাদিগকে মহাজনের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তবে তাহাদের বন হুচি হইবে, ও বন হুচি হইলে তখন বিভা চর্চা করিবার অবসরও পাইবে ইচ্ছাও হইবে। তখন কোন ট্যাক্স বলাইতে হইবে না, গ্রামে গ্রামে ডেপুটিদিগকে উপালনা করিয়া বেড়াইতে হইবে না, ক্রয়কেরা আপনাদ্বারা বস্ত্র করিয়া ব্যয়ের নিমিত্ত কুণ্ডিত না হইয়া বিভা শিকা করিবে। পৰ্বণ-মেষ্ঠ যদি এইরূপ একটা কাজ করেন তবেই একালোকের না বাপের মত কাজ করিবেন। কেন নাহ কেদার ভতে পৰ্বণ-মেষ্ঠ এরূপ অনর্থক টাকাগুলি মাটি করিবেন। (৫ তাজ ১২৭৫। ২০ আগষ্ট ১৮৬৮)

সুদেববাবুর পাঠশালা প্রণালী

...সুদেববাবুর প্রণালীতে পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের সন্ধান লাভ ও পৰ্বণমেষ্ঠের ব্যয় কম। হঠাৎ দেখিতে গেলে এ প্রণালীর বোধ পাওয়া যায় না, হঠাৎ কেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এ প্রণালীটি প্রায় সর্বত্র তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। সুদেববাবুর অধীন কর্তৃচাৰীগণের মধ্যে অনেক কর্তৃদক্ষ, যার পরিচরী ও প্রকৃতজ্ঞ। এ সন্ধান লক্ষণে পাঠশালার পরিবর্তন কেন নাই, কেন ডেপুটিদিগের বিভালয়ের স্থানান্তর, পাঠশালা বুধে করিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে হয়? কেন পাঠশালা সংজ্ঞাত সন্ধানই নীরস ও উৎসাহ-বিহীন হইয়াছে? পাঠশালা পরিমর্শনে আর সুখ নাই, পাঠশালার পড়ান আর সুখ নাই, পাঠশালার পড়িতেও আর সুখ নাই।

পৰ্বণমেষ্ঠের ইচ্ছা এই পাঠশালা শুধু দরিদ্র লোকের নিমিত্ত থাকুক, কিন্তু ডেপুটি, গুরু ও হাজারিগণের ইচ্ছা সাহাব্যাকৃত বিভালয়ের সহিত টকর দেওয়া।...এরূপ উচ্চাভিলাষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেই কিছু না কিছু বড় হওয়া যায়, কিন্তু তা বলিয়া হাত কি। টাকা দিবার কর্তা পৰ্বণমেষ্ঠ, তাহার ইচ্ছা ইহার ঠিক বিপরীত। যদি ডেপুটিদিগের পদোন্নতির প্রত্যাশা থাকিত, যদি পাঠশালার নিমিত্ত পুণ্ডক হাজারিও থাকিত, তবে এরূপ বড় হইবার চেষ্টার কাজ দিত, কিন্তু তাহা না হওয়াতে পূর্বে আমরা বাহা বলিয়াছি পাঠশালা সংজ্ঞাত সন্ধানই হুচু্যবং হইয়া উঠিয়াছে।...

পাঠশালার পড়িয়া কি কল হইবে, পল্লীগ্রামস্থ লোকে ইহাই ভাবে, ও এ প্রকার জবাব দেওয়া যায় না। বাহারা ভরলোক তাহাদিগের পাঠশালার পড়িয়া কিছুমাত্র হুণ্ডি হয়

না।...নিতান্ত দরিদ্র লোকও পাঠশালার বাইরা কি করিবে? ছুগোল পড়িলে, তারতবর্ষে কয়েকটি মণী আছে জানিতে পারিলে, কি সেম্বাঝোদৌলা কোন্ সালে কলিকাতা আক্রমণ করেন জানিলে, পেটের ভাতও হয় না, এক বিধা ভসিতে ৭ মণের অধিক বাতও কদান বায় না। দরিদ্রলোকের লভ্যদের পাঁচ বৎসর হইতে উপার্জন করিতে আরম্ভ করে, পাঠশালার পড়িলে এ উপার্জনের কতি, ইহা ব্যতীত গুরুর বেতন, পুস্তকের মূল্য, এমত হলে দরিদ্রলোকের লভ্যমণকে পাঠশালার না পাঠানই লাভ, আর দরিদ্র লোকে বন্দী তার তাহাদের নিজের লাভ বুঝে। তবে পাঠশালার মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরা পড়িতে পারে, ও এইরূপ লোকেই একপে পাঠশালা রাখিতেছে...

পাঠশালা সাহায্যকৃত বিভাগের অধিকারী নয়, বরং ইষ্টকারী। এই পাঠশালা স্থাপনের নিমিত্ত অনেক হাজার মনে বিভাগ্যাসের ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে ও তাহার পরিণামে সাহায্যকৃত বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে, এমত হলে পর্বমেষ্টের এই দুই প্রণালীতে লভ্যতাব করিয়া দেওয়া উচিত। অল্প একটি শুল্ক দিয়া পাঁচিরা দিলে এই দুই প্রণালী উত্তরে উত্তরকে পরি-বর্ধন করিবে। আর মতুবা অমরক বৎসর বৎসর এতটী টাকা কেন জলে কেলিয়া দেওয়া হয়? ছুদেববাবু এই পাঠশালার নিমিত্ত গত বৎসর ১ লক্ষ, ৩১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কানীকাত বাবু ৫১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া-ছেন, ও ব্যয় ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। হয় পর্বমেষ্ট আরও কিছু টাকা ব্যয় করুন, মতুবা পাঠশালা বে পরিণামে বাড়াইতেছেন, তাহা না করিয়া সেই অর্থের দ্বারা শুধু পাঠশালার নিমিত্ত কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি করুন। পর্বমেষ্টের ভয়, এরূপ করিলে পাঠশালা বাহাদের নিমিত্ত স্থাপিত, তাহারাই ইহার কলতোঙ্গী হইবেক না, এটা পর্বমেষ্টের বিষয় ছিল হয়। যদি দরিদ্র লোকদিগকে পর্বমেষ্টে বলপূর্বক বিভা অধঃকরণ করাইতে চাহেন, সে বস্ত্র কথা মতুবা যখন দরিদ্র লোকে বিভাগ্যাসের প্রয়োজন বোধ করিবে (যখন তাহাদের প্রকৃত অভাব বোধ হইবে, তখনই প্রয়োজন বোধ করিবে) তখন ডেপুটিমিস্ত্রকে আর এমত এমত উপাসনা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। একপে আমাদের দারো আদা লোকে উপবাস করে, পর্বমেষ্ট তাহারই টিকানা করুন, তখন কৃষকেরা আপনারা আপনারা পাঠশালা বসাইবে। (২৭শে মে ১২৭৫। ৮ এপ্রিল ১৮৬১)

হুল ও পাঠশালার ডেপুটি ইন্সপেক্টর

পাঠকগণ অবগত আছেন, ছুদেববাবু, উড়ো, মার্টিন, ক্লার্ক নাহেবদিগের দ্বারা ভিত্তিসনাল ইন্সপেক্টর হইয়াছেন। উহার উত্তর-মধ্য বিভাগ তাহার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে নিয়ম ছিল পাঠশালার ডেপুটি ইন্সপেক্টরেরা ছুদেববাবুর

অধীন থাকিবেন, ও ইংরেজী ও বার্মিজুলার হুলের ডেপুটিগণ ভিত্তিসনাল ইন্সপেক্টরের অধীন থাকিবেন। নুতন বন্দোবস্তে এই নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। একপ অবধি এই নিয়ম হইয়াছে, যে কেলা যে ইন্সপেক্টরের অধীন থাকিবে, সেই কেলায় উত্তরবিধ ডেপুটি ইন্সপেক্টরেরা এক ইন্সপেক্টরের অধীন থাকিবেন। আর একটি পরিবর্তন হইয়াছে। ডেপুটিমিস্ত্রের মধ্যে বেতন ও এডের তারতম্য ব্যতীত অত কোনপ্রকার এডের থাকিল না। বাহার পাঠশালার ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন, তাহারাই ইংরেজী হুল ও পাঠশালা উত্তর পরিদর্শন করিতে পারিবেন, আবার বাহার ভিত্তিসনাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন, তাহারিগণকেও পাঠশালা ও হুল নির্দেশে যেখানে যেখানে হইবে। পাঠশালার ডেপুটিরা চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এবং আপাততঃ পূর্বে বেতন ৭৫ টাকা পাইবেন। ক্রমে ইঁহাদের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হইবার আশা থাকিল। এই প্রণালী দ্বারা পরিদর্শন কার্য ও হুলসমূহের উন্নতিসাধন যে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে হইবে তাহাতে আর দুই মত হইবার সম্ভাবনা নাই।...

উপসংহারকালে আমাদের ইন্সপেক্টর ছুদেববাবু লম্বা ছোটকরেক কথা না বলিয়া কাত থাকিতে পারিলেন না। ছুদেব বাবু বেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্যক্ষম তাহা আর নুতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহা দ্বারা ই যথেষ্ট পাওয়া যাইবে যে, সম্পূর্ণ বিদ্যা সহ্যে তিনি এত বহু উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর একটি বিষয়ের কত ছুদেববাবু আমাদের বিশেষ তজ্জির পান। যখন তিনি অভিরিখিত ইন্সপেক্টর ছিলেন, তখন পাঠশালাগুলি অতি বহুর লামণী বরূপ গণ্য করিতেন। অন্যান্য ইন্সপেক্টরেরাও বেরূপ হুলের উন্নতির নিমিত্ত উদ্যোগী, ছুদেববাবু সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। হুল কোন কারণ বশতঃ গ্রীষ্ম হইয়া পড়িলে অন্যান্য ইন্সপেক্টরের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় উহা উঠাইয়া দিতে পারিলে আর হাতেন না, ছুদেববাবু এরূপ অবস্থার বাহাতে পাঠশালাটি পুনর্জীবিত হয়, তাহাই করিতেন। ছুদেববাবুর অধীনে চাকার দুবতী বিভাগও কখন উঠিয়া যাইত না, শালিখার হুলের পর্বমেষ্ট চাকাত কখনও বদ হইত না। ছুদেববাবু অল্পদিন সম্পূর্ণ ইন্সপেক্টর হইয়াছেন। অভাববি পরিদর্শন কার্যে বহির্গত হন নাই। আমাদের গ্রন্থ বিখ্যাস, এতৎ প্রবেশের ইংরেজী হুলগুলি তাহার তত্ত্বাবধানে গ্রীষ্ম হইবে। আপাততঃ একটি বিষয়ের জন্য সাহায্যকৃত হুলের শিক্ষকেরা তাহার অধীনে হুলে আছে। পূর্বে এক মাস দুই মাসের কমে ইন্সপেক্টরের আশিস হইতে সাহায্যের বিল কেরত আসিত না। একপ লাভ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। শিক্ষকের এই নিমিত্ত কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। পূর্বে একবাণি পত্র লিখিলে তাহার উত্তর পাওয়া

হুদুদ ব্যাপার ছিল, হুদেববাবুর শিকট পত্র লিখিবামাত্র উত্তর পাঠ্য বার। হুদেববাবুর লম্বা বোলায়ণের প্রিয় হইয়া উঠিবেন তাহাতে ললেহ নাই। (২৫ আবার ১২৭৬। ৮ জুলাই ১৮৬৯)

পুস্তকালয়

কোন কোন মহোদয় লাহেবের কুণার একপে কেলার কেলার এক একটী কুল পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। বেক্স লাহেব, যিনি প্রথমে এই লম্বার পুস্তকালয় করিবার বন্ধ করেন, তাহাকে নত নত বন্যাবাদ। পর্বণমেন্টের একপে এ লম্বার কুল লাইব্রারিতে বিশেষ দৃষ্টি আছে। পর্বণমেন্টের কাগজপত্র, যুগ্মক, সাংসদিক রিপোর্ট প্রভৃতি লম্বারই এই লম্বার লাইব্রারিতে পাঠান হইয়া থাকে। কিন্তু তবু ইহাদের প্রায় ভাবভেদই ভর দশা। বনোহরের পুস্তকালয় বর বর অবস্থা হইয়া একপে হেভ-মাস্টার উদ্যোগ বাবুর হস্তে সিয়াছে। ইনি বিচার মর্যাদা বুঝেন, দেখি ইঁহা দ্বারা কি হয়। কুলমগর লাইব্রারিও বহু হইয়াছে। বরিশালের প্রায় ঐ দশা। কেবল চুচুড়ার লাইব্রারিটী হুদেব বাবুর হস্তে একটী ভাল আছে।...

আমাদের বাকলাদেশে সংকল্প কলেজের লাইব্রারি, আদি জামসজদার লাইব্রারি, অরুণকবাবুর উত্তরপাড়ার লাইব্রারি, এলিয়ারটিক লোসাইটের লাইব্রারি ও পবলিক লাইব্রারি এই কয়েকটি প্রধান পুস্তকালয় আছে। তাহার মধ্যে প্রধান হইল মিডল কুল, সকলের খেবট লক্ষ্যপেকা হুহং। আদরা নিয়ে অনেক লক্ষ্যসহান করিয়া কুলগলে বহু হুহং হুহং পুস্তকালয় আছে, তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা দিতেছি, পাঠক দেখিবেন যে পুস্তকালয় লম্বা আদরা কত পাহে পড়িয়াছি।

হাওয়ার নাম	পুস্তকের সংখ্যা
ব্রিটেন :	লক্ষ হাজার
ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন	৭
বলভিয়াম লাইব্রারি, (অক্সফোর্ড)	২ ৮২
আভ বোকেটস্ ঐ, (এডিনবরা)	১ ৮০
ট্রিনিটি কলেজ, ঐ, (ডবলিন)	১ ৩০
উনিবার্সিটি, (এডিনবরা)	১
ঐ (গ্লাসগো)	— ৭০
ঐ (সেন্ট আণ্ড্রাস)	— ৬৫
ঐ (আবারডিন)	— ৪৮
সিরন কলেজ (লন্ডন)	— ৫০
কুইল ইন (ডবলিন)	— ৩৫
ব্রিটেনের অন্যান্য হাও	১ ২২

জালা :

ইন্সপিরিয়াল লাইব্রারি (পেরিন)	১১ ৮০
আরসেনাল ঐ (ঐ)	২ ৬
অ্যেবিলেল ঐ (ঐ)	১ ৫৭

ম্যাকারিন ঐ (ঐ)	১ ৫৯
লবরল ঐ (ঐ)	১ ৮১
হোটেলবিলি ঐ (ঐ)	১ ৬৫
জালাবের অন্যান্য হাও	৪০ ৩৩

ইটালী :

ফার্স্ট লাইব্রারি (রোম)	২ —
আব্রুসিয়ান ঐ (মিলান)	১ —
ব্রিগা ঐ (ঐ)	১ ৩০
ম্যারিগিবেটী ঐ (ক্রোয়েজ)	১ ৬০
বোয়াল ঐ (নেপলস)	২ —
সেন্টমার্ক ঐ (বেনিন)	১ ২০
ইটালীর অন্যান্য হাও	৩ ৫০

শেন :

ম্যাক্সিম লাইব্রারি	২ —
---------------------	-----

জার্মেনি :

বোয়াল লাইব্রারি (মিউনিক)	৬ —
ঐ ঐ (ড্রেসডেন)	৩ ২৫
উনিবার্সিটি (গটমন্ডেন)	৩ ৫০
ঐ (ওলকেন বুটেন)	২ —

প্রাঙ্গি :

বোয়াল লাইব্রারি (বার্লিন)	৫ ৫০
অন্যান্য হাও	১৫ —

অষ্ট্রিয়া :

ইন্সপিরিয়াল লাইব্রারি (বিয়ান্না)	৪ —
অন্যান্য হাও	২১ —

এতদ্বিঃ কপিয়ার

বেলজিয়ামে	৫ ২৫
বোয়াল লাইব্রারি (হেগ)	১ —
ঐ ঐ (কপেনহেগেন)	৪ ৫০
উনিবার্সিটি আপলান (সুইডেন)	১ ২৫
ঐ ক্রিটিনিয়া	১১ ৫০
হার্কার্ড কলেজ, বাচাচুসেট্	১ —
কলিকাতা	১ —

এই লম্বার পুস্তকের সমষ্টি প্রায় হই কোটি কুল লক্ষ এবং ইহার প্রত্যেকখানা আতপাত পড়িতে বহি পড়ে হই বটী করিয়া লাগে, তবে এই লম্বার পুস্তকগুলি পড়িতে খুটানদিগের বহু বহুদিন পুঁথিবী স্তম্ভ হইয়াছে ততদিন ও আরো হাজার বৎসর বেশী লাগিবে। (৮ কাল্ডন ১২৭৫। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)

[ইতালিয়ান কুল]

লন্ডনচর প্রভাব করা বহু কটিন, উহা কার্যে পরিণত করা তাহা অপেক্ষা সহজ, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীত। নত লম্বা প্রভাব হইতেছে কিন্তু তাহা লীলিত থাকে কলি।

আমাদের দেশে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল হয়, ইহা অনেক কাল হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে কিন্তু এত দিন পরে ভগবানবাবুকে যত্নে উহা কার্যে পরিণত হইল।

আমাদের পার্থক্যগণের মধ্যে বোধ হয় অনেক অবগত আছেন, যে বর্ধমানের রুগ্ন দরিদ্র ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ভগবানবাবু বিভিন্ন বস্ত্র করিয়াছেন, এমন কি ভগবানবাবু বস্ত্র না করিলে বর্ধমানের যে সর্বশ্রম হইতেন, ইহা বোধ হয় পর্বনমেষ্টের ও লাভারগণের কর্ণপোচর হইত না। ভগবানবাবু বর্ধমানে যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ঐ রুগ্ন দরিদ্রদের সাহায্যার্থে। ভগবানবাবুর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য একেবারে বিতা ও অন্ন দান।

ঐহাৰ বিদ্যালয়ে সঙ্গীত হইতে ছাত্রদের ব্যবসায় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমরা তমিলাম যে এই নিমিত্ত একটি হারমোনিয়ম জর করা হইয়াছে, পোরা মিরা এখানে নিরুক্ত করা হইয়াছে।

ভগবানবাবু যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কৃত-কার্য্য হওয়া না হওয়া অসম্ভব। আপাততঃ এই স্কুলের ব্যয়ের তার আর কাহারও লইতে হইবে না, ছাত্র ও শিক্ষক-দ্বিগের প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রয় করিলেই হইবে। আমরা ভরসা করি যে সদাশয় ব্যক্তিগণ ও পর্বনমেষ্ট ভগবানবাবুকে সাহায্য করিবেন। (২৮ কানুন ১২৭৬। ১০ মার্চ ১৮৭০)

[মবদীপের তোল]

মবদীপে এখন ৩১টি তোল আছে এবং ১০ জন ছাত্র নাম অধ্যয়ন করে। তোলের অনেকগুলি দারদার। তাহাতে মোটে ছাত্র নাই, অধ্যাপকেরা নিয়ন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তি আশার একটি তোল পুলিশ রাখিয়াছেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে ব্রহ্মনাথ বিদ্যারত্ন, হরমোহন ভৰ্কচামণি, রামনাথ ভৰ্কসিদ্ধান্ত, প্রমথ-কুমার ভৰ্করত্ন প্রভাব। (১০ আষাঢ় ১২৭৭। ১৩ জুন ১৮৭০)

[নেটভ ডাক্তার]

এ বঙ্গের মেডিকেল কলেজ পুলিশার উপলক্ষে ডাক্তার চক্রবর্তী; একটি বক্তৃতা দেন। ডাক্তার চক্রবর্তী অভিনয় পণ্ডিত এবং তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহাতে লোকের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। ঐহাৰ বিবেচনার উপরুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব নিবন্ধন নেটভ ডাক্তারেরা চিকিৎসা শাস্ত্রে বোধোচিত জ্ঞান পায় না। এ পর্য্যন্ত কয়েকজন ডাক্তার ধানকরক পুস্তক বাদলার অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, এ বিষয়ে আরো মনোবোগ দেওয়া কর্তব্য। বহুত এদেশীর নেটভ ডাক্তারগণের হাতে পর্বনমেষ্ট বেরুপ ওস্তুর তার অর্পণ করেন, তাহার মত ঐহাৰা কিছুই শিক্ষা পান না। কালেমে ঐহাৰা

যে ভিন্ন বঙ্গের থাকেন, তাহাতে সুবিধা পাইলে ঐহাৰা বিভিন্ন অধ্যয়ন করিতে পারেন। মেট্রিগা মেডিকা, প্রাকটিকাল অব মেডিসিন প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ না করিয়া যদি এদেশের নিজ চিকিৎসকেরা নিজ পরীকার কলসহ রচনা করেন, তবে বিশেষ উপকার হইতে পারে। ডাক্তার চক্রবর্তী হস্ত এত দিন বাদলা তুলে বান নাই, তদ্বির ডাক্তার চক্রবর্তীকে দে, ভগবতু ভক্ত, স্বর্ধ্যকুমার অধিকারী, ভিন্ন কতি কয় প্রভৃতি পুরাতন চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিতে পারেন। (৩১ তার ১২৭৭। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭০)

বিজ্ঞান সভা

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতার একটি বিজ্ঞান উৎসবদ্বিগী সভা সংস্থাপনের উত্তোপ করিতেছেন। তিনি বেরুপ বিদ্যাম বুদ্ধিমান ও উত্তোপী পুরুষ তাহাতে ঐহা কর্তৃক ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। আমাদের দুট বিবাল সুবকগণের উচিত যে ঐহাৰ এরূপ মহোপকারী সংকল্পের সহযোগী হন। (১ মাঘ ১২৭৬। ১০ আষাঢ় ১৮৭০)

ইংরেজী সাহিত্য ও অকশাস্ত্রে এদেশীয়গণ বেরুপ সুৎপত্তি দেখাইতেছেন, তাহাতে আমাদের মনে অনেক সময় সৌরভ উদয় হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তারতবর্ষীয়রা অতাপি তাদৃশ পারদর্শিতা দেখান নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রোপযোগী বুদ্ধিবৃত্তির অভাব কি বধ্যশাস্ত্র এদেশে বিজ্ঞান চর্চা হয় না বলিয়া বাদলার মধ্যে অদ্যাপি আমরা বিজ্ঞানবিৎ কোন ব্যক্তিকে দেখিতেই পাই নাই তাহা নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায় না। বাদলায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে কিয়ৎপরিমাণ বিজ্ঞান চর্চা হয় এবং পরীকাত্রে ঐহা বেরুপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে বাদলার সুবকগণকে এবিষয়ে নির্যোব বলা যায় না, যৌব হয় যে কলেজ ছাডিলে আর বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তাহাদের এবিষয়ে সুযোগও থাকে না, স্পৃহাও অভাব হয়।

ইউরোপীয় কতি অপেকা আশীর কতিয় মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা অপেকাকৃত্ত কর। তারতবর্ষীয়গণ আধ্যাত্ত বিদ্যায় কিছু অধিক তৎপর। তারতবর্ষের জলবাতু প্রভৃতি প্রভৃতিতে বেশীর-গণের মন বিজ্ঞান অপেকা মনস্তত্ত্বে অধিক নিবেশিত করে, কল বাদলা সুবকগণের এ দৃষ্টিটি নিমিত্ত বই ইহাৰ অভাব নাই।

কাধ্যাহুরোবে যখন বিনি বিজ্ঞান চর্চার বাধ্য হইয়াছেন তখনই তাহাতে কিছু না কিছু সুব্যক্তি লইয়াছেন। কানাই বাবু বিদেশীয়গণের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ যত্নী। আডকাল রাজকক বাবুও বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। রাজকক বাবু কালেজের পাঠ সদাও করিবার সুযোগ পান না, সুতরাং এদেশে বতহর সম্ভব ঐহাৰ ততহর এবিষয়ে শিক্ষা হয় নাই এবং কানাই বাবু কালেজের তত বিধ্যাক্ত মন সুতরাং

* ভগবানচন্দ্র বহু, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহুর পিতা। এই সময়ে তিনি বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কমিস্টার ছিলেন।

† ডক্টর স্বর্ধ্যকুমার ভক্ত চক্রবর্তী, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক।

এরা উভয় বধন এবিধের বদেশীর মধ্যে হটক আর বিদেশীর-
গণের মধ্যে হটক কিছু কিছু প্রতিষ্ঠার তাকন হইয়াছেন
তখন বিদ্যালয়ের অনেক ছুকেই এই প্রতিষ্ঠার তাকন হওয়া

জানপুত হইয়া বেড়াইবেন না। (২৮ কাভন ১২৭৬। ১০ মার্চ
১৮৭০)

ঢাকা ইনস্টিটিউট

মহেন্দ্রাব্যুর উদ্যোগে যদি এখানে সারেন এসোসিয়ে-
শনটির সংস্থাপন ও উন্নতি হয়, তাহা হইলে দেশীর যুবকগণের
আশা ভূতির আর একটি নতুন উপার হইবে। সুখ আশা
ভূতির নয়, অনেক যুবকের ইচ্ছা কোন উপারে দেশের কিছু
মঙ্গল সম্পাদন করেন, কিন্তু সুযোগ পান না। এ সত্যটিতে
উাহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ার সুবিধা হইবে।

মহেন্দ্রাব্যুর প্রতিষ্ঠিত সত্যর আকৃতি একগু ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে
অঙ্কিত করেন নাই, সুতরাং ইহা কর্তৃক আর আমাদের কোন
কোন আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভব তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে
বলিতে পারি না। তবে বিজ্ঞানশাস্ত্রটি এদেশের সম্পূর্ণ পণ্ডিত
হুনি। ইহার উৎকর্ষ নিবন্ধন আমরা অনেক লাভের প্রত্যাশা
করি। যদি জগদীশ্বরের কৃপার মহেন্দ্র বাবু ইহাতে কৃতকার্য
হন, তবে জগতে জানিবে ভারতবর্ষে বিধাতা কত রত্ন নিহিত
রাখিয়াছেন। এদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা চাকুরি অপেক্ষা
অনেক বাড়িয়া পড়িয়াছে, এবং বৎসর বৎসর বাড়িতেছে।
ইহার কল হইতেছে লোকের বিদ্যা চর্চার উপর তাজিল্য ও
হতাশা। একগু বাহারা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের ইহার
প্রতিবিধান করা কর্তব্য। সাএল এসোসিয়েশন কর্তৃক এটি
কতক পরিমাণে নিরাকরণের সম্ভব।

এদেশীর হুবা পুত্রগণকে অনেকে অর্থ যুগ, বলিয়া কলঙ্ক
করেন। ইহাদের বর্তমান জীবনযাত্রা প্রাণী দেখিলে এটি
বলিলে নিতান্ত অত্যন্ত হয় না। তাহারা প্রকৃত কালেজ
হাঙিলে পুত্রকের সঙ্গে সঙ্গল সম্পর্ক লোপ করেন এবং
কোথার হুট পরসা পাইবেন তাহাই লইয়া বিব্রত থাকেন।
কিন্তু তাহাদের অপরাধ কি? তাহারা কি করে? সাএল
এসোসিয়েশন কি অত কোন বিজ্ঞান চর্চার সুবিধা হইলে
যুবকগণ বোধ হয়—বোধ হয় কি—নিশ্চয় এরূপ অবলালসার

...ঢাকার নতুন একটি সভা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ পাঠে
আমাদের বেরণ বোধ হইল উহাতে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক
হইবে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চাই যেন সভার প্রধান
উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এরূপ ভাবিতে পারেন যে বাহারা
পর্যায়ী, বাহাদের রাজনৈতিক কোন কথন নাই তাহাদের
বিজ্ঞান চর্চার সুখই বা কি, কলই বা কি? কিন্তু আমরা
তত হুয় বাই না। তবে উহা যদি কুলবরের ডিবেটিং ক্লাবের
মত হয় তবে সংবাদপত্রে উহার বিষয় আলোচনা করা না
সত্যর কর্তৃপক্ষীরগণকে লজ্জা বেওরা। কিন্তু ঢাকা অতি
প্রধান স্থান, এমন কি কলিকাতার নিচেই ঢাকা। সেখানকার
প্রধান প্রধান লোকে যদি সভা করিতে প্রবর্ত হইয়া থাকেন,
তবে ভালই বা কেন না হইবে? তবে বাকালির সভার মত
ভুলিলেই আমাদের ডিবেটিং ক্লাবের কথা মনে পড়ে।
সিদ্ধরের জীবন চরিত্র, আভিসমের রচনা প্রাণী প্রকৃতি
প্রভাবের নাম শুনিলে এখন আমাদের বমন হয়। যদি ঢাকার
অশিক্ষিত যুবকেরা প্রকৃত দেশের মঙ্গল ও আপনার উন্নতি
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সভার হুয়ই গণিত, প্রাকৃতিক
শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ করুন। এক দেশের হুনি অত দেশে
প্ররোগ করা যায় না। কলিকাতার কৃষিনতা কেবল বিদেশীর
হুক এতদেশে প্রভুত করিবার বহু করিতেছেন। কিন্তু কি
উপারে এদেশের হুনি আরও কলবতী হয় তাহার বহু তাহারা
তত করিয়া উন্নতিতে পারেন না। কৃত্তবিদ্যা বাকালিয়া চর্চা
করেন না। বাকালার কৃত্ত অধ্যাপি কেহ ভাল করিয়া
অনুলক্ষ্যনও করেন নাই। তাহার কিছু কারণ আছে বাকালার
বে চর পড়িয়াছে উহার হুড়িকা লংএহ করিতে অনেক বমন
করিতে হয় কিন্তু ঢাকার এই শাস্ত্র চর্চার লক্ষ্যোপেক্ষা সুবিধা।
সেখানে নিরতুহিত আছে পক্ষতও আছে।... (১ বৈশাখ
১২৭৭। ২১ এপ্রিল ১৮৭০)



অমৃততাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক রোগের ন্যায় কার্যকরী!
দাদের মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু শক্তি' ন্যায় কার্যকরী!
অমৃততাঞ্জন লি-পেং বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর
উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে **১ কোটি**
২৫ লক্ষ টাকার উপরাসেই টাকা হইতে
লাভ সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজার
করা বোনাস যোগ করা হইয়াছে :

মেরাদী বীমায়— } ৮ টাকা
আজীবন বীমায়— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য অনিশ্চিত
ব্যয় সাপেক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের ষাথেন্ট ব্যবস্থা
রাখিয়া এবং স্তরের হার অর্জিত হার অপেক্ষা
৩৫ % কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে
হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে স্তদ অর্জন, ছমূল্যের বাজারে
অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা
সঙ্গেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের
অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আর্থিক মজুতি এবং
পরিচালন-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।



- চলতি বীমা ৭০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
- বীমা তহবিল ১৫ " ৯৭ " " "
- প্রিমিয়ামের আয়.. ৩ " ৪০ " " "
- দাবী শোধ ৭ " ২০ " " "

হিন্দুস্থান

কো-অপারেশন ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ



“পুথি পরিচয়”

অধ্যাপক ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রায় সোয়াশ' বংসর পূর্বে হইতে আমাদের দেশে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও আলোচনার সূচনা হয়। সংস্কৃত গ্রন্থের পুথি লইয়া প্রথমে কাজ আরম্ভ হয়। অনেক পরে প্রাচীন সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলির দিকে পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার পুথিও সংগ্রহীত হইতে থাকে। প্রায় বাট বংসর পূর্বে বঙ্গী-সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে বভুলভাবে বাংলা পুথির সংগ্রহ ও আলোচনার সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই প্রাচীন বাংলা পুথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং পরিষৎ পত্রিকার মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকে। পরিষৎ পত্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত কোম কোম পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে নানা পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। পরিষৎ ও অত্যন্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ বভুল পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন স্থানে বিকিষ্ট এই সমস্ত বিবরণের মধ্য হইতে দরকারমত কোম পুথির বৃত্তান্ত খুঁজিয়া বাহির করা হুঃসাধ্য। এই অসুবিধা হ্রাস করিবার জন্য ক্যাটালোগার ক্যাটালোগোয়ার নামক সংস্কৃত পুস্তককোষের অনুসরণে একবাশি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকোষ প্রণয়নের কল্পনা পরিষদের আছে। এই গ্রন্থ সংকলিত হইলে সবল পুথির আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে—প্রাপ্ত পুথির মূল্য নির্ধারণ সুকর হইবে।

পুথির প্রকাশিত বিবরণ পূর্ণাঙ্গ বা প্রয়োজনানুসরণ হওয়ার উপরই এই কোষগ্রন্থের উপযোগিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। কিন্তু হুঃখের বিষয়, এ বাৎ প্রকাশিত বিবরণগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অস্পষ্ট। এ বিষয়ে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমি ইতঃপূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছি (প্রবাসী, গ্রাবণ ১০৪৬, পৃঃ ৫৩৯)। অতি ভদ্র এই প্রাচীন পুথি ইতিহাসের অনুলী উপকরণ। তাই এদিকে ইতিহাসগত ব্যক্তিমানের অবহিত হওয়া উচিত।

বিষয়ভারতী বিভাগবন্দের উপাধ্যায় ত্রিণকামন মণ্ডল ‘পুথি-পরিচয়’ নামকগ্রন্থে সূচন ভাবে পুথি আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন বেশিরা আমদিত হইলার। বিষয়ভারতীর পুথি-শাখার সংগ্রহীত লাক্ষে পাঁচ হাজার বাংলা পুথির প্রথম পাঁচ শত পুথির মধ্য হইতে বাহির ১৮১ বাশির বিশেষ

বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। তবে কি বহু অবলম্বন করিয়া বাহাই করা হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। অজ্ঞাতমান গ্রন্থকারের লেখা বোপাতার বঙ্গমার পুথির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (২২, ৪৫ সংখ্যা), কিন্তু বাহায়াবের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থের একটি পরিশিষ্টে ত্রিভগ্নমহোদয় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উপস্থিত ২১৮ বাশি পুথির মধ্যে ২১৮ বাশি পুথির বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সমস্ত পুথির কোম বিবরণ গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হয় নাই তাহাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আর একটি পরিশিষ্টে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। যে পাঁচ শত পুথি এই গ্রন্থের প্রথম অবলম্বন তাহাদের বর্ণনামূলক নামসূচী ও গ্রন্থকার-সূচী দুইটি নির্ধারিত দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে লিপিকর, লিপিহান, গ্রন্থের মালিক প্রভৃতির তালিকা সংযোজিত হইলে আরও ভাল হইত। গ্রন্থের নামসূচীর মধ্যে পুথির পত্রসংখ্যা ও লিপিকাল উল্লিখিত হওয়ার ইচ্ছা সংকিপ্ত বিবরণের কার্য সম্পন্ন করিয়াছে। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত পুথির বিবরণগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা একটি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকাটি অধ্যাপক ত্রিভুক্ত বতীমহোদয় ওট্টাচার্য সংকলিত, ত্রিহট্ট সাহিত্য পরিষদের এছাপারে রচিত বাংলা পুথির তালিকার প্রদত্ত পুথিবিবরণ-পঞ্জীর সংকিপ্তসার। উল্লিখিত সূচী দুইটিও তাহার পুস্তকে প্রদত্ত সূচীর আদর্শে রচিত বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থের ভূমিকার পুথিসংগ্রহের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে এবং বাংলা পুথির—বিশেষ করিয়া বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থকারের মতে—পুথি সকল করা ছিল ভবনকার দিনের এক প্রথম পেশা। হস্তাকর সুকর হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পেশা অবলম্বন করিতেন। তেরেটপাতা, তোলপাতা, গাহের বাকল এবং চামড়ার লেখা বাংলা পুথির কথাও তিনি বলিয়াছেন। হুঃখের বিষয়, এই সকল উক্তির সর্বক প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না হওয়ার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল অতুপ থাকিরা যায়—উক্তির বাধ্যতাব্য সন্দেহ সন্দেহ হয়। পুথির শেষের দিকে মালিক, লিপিকর, লিপিকাল, লিপিহান, পুথির মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা

* পুথিপরিচয়। প্রথম খণ্ড। বিষয়ভারতী বিভাগবন্দের উপাধ্যায় ত্রিণকামন মণ্ডল, এম-এ সন্থিত। বিষয়ভারতী গ্রন্থালয়, ২ বকিন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা—৭। মূল্য ১০ টাকা।

অল্প উপস্থাপিত করিয়াছি। বিশেষ আশঙ্কের কথা, বর্তমান এইকার্য এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ঐতিহাসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুথির বিবরণ সকলমে সকলরিত্যে মাহুলি ধরণে পুথির প্রায়ত ও শেষ হইতে যদুচ্ছ্রাব্যে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াই কাজ শেষ করেন নাই—এহের ও পুথির বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচিত এহের অল্প পুথি অল্প বর্ণিত হইয়া থাকিলে মাঝে মাঝে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বত্র এইরূপ না করার কারণ বুঝা যায় না। বিবরণের মধ্যে এহের বিবরণ-পরিচয় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য এহে সেরূপ পরিচয়ের অভাব অনেক ক্ষেত্রে অনুবিচার সৃষ্টি করে। ২৮, ৩৫, ও ৬১ সংখ্যক বিবরণ স্রষ্টব্য। ১০ সংখ্যক বিবরণে এইকার্য লিখিয়াছেন—“বিজ্ঞ আশ্রাম সম্ভবতঃ লিপিকর, লেখক সুরুল দিবাসী বিজ্ঞ মহানন্দ।” এই অনুমানের হেতু নির্দেশ করিলে ভাল হইত।

আলোচ্য পুথিগুলির বেশীর ভাগই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ঐহাদের লিপিকাল পুথির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের ভিতর সবচেয়ে পুরাতন বেখানি লেখানি ১০১০ সালে মকল করা। বাকী একাদশ শতাব্দীতে মকল করা আর একখানি পুথি আছে। আধুনিক পুথির মধ্যে বৃহত্তর বিদ্যালয়কারের রাজাবলি ও ঐহুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সভ্য-নারায়ণের পাঁচালি উল্লেখযোগ্য। ছাপা প্রচলনের পরেও কেহ কেহ ছাপা বই মকল করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। উল্লিখিত পুথি দুইখানির মধ্যে প্রথমখানি ববিবা সেইধরণের হয়, বিতীর্থখানি কখনই সেইরূপ নয়। এ জাতীর পুথিকে

পুথিশালার অতুচ্ছ্রাব্য করা কঠোর মুক্তিযুদ্ধ বিচার করিতে হইবে।

যে সকল পুথির সকলের তারিখ দেওয়া নাই তাহাদের লিপিকাল এইকার্যে যৌক্তিকভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কোন পুথি আধুনিক ২২৫ বঙ্গাব্দের পুরাতন। কোনখানি ২০০ বঙ্গাব্দের, কোনখানি ১৭৫ বঙ্গাব্দের, কোনখানি বা ১৫০ বঙ্গাব্দের। কিন্তু লেখা দেবীরা পঁচিশ বঙ্গাব্দের কম বেশী পুরাতন বা নূতন বরা বার কি?

পুথিগুলির অবিক্রাংশই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি—অনেকগুলির কেবল একটি করিয়া পাতা। এগুলি সাধারণতঃ ‘পাততা’ নামে পরিচিত। কতকগুলি পত্র, দরখাস্ত, ছাত্রপত্র প্রভৃতিতেও পুথির মধ্যে হাদ দেওয়া হইয়াছে। পুথির নাম অনেক স্থলেই এইকার্যের নিজের দেওয়া মনে হয়। একই বিষয়ের এহের দুই রকম নামও দেখা যায় (২২, ৪৫)। পদাবলীর পাতাগুলি বহু পুথিরূপে (৯৪ প্রকৃতি) প্রদর্শিত হইলেও কিছু কিছু পাতা একই পুথির বিভিন্ন অংশ কিনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। পাতার মাপের ঐক্য আক্ষরিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ একই পুথির বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে বহু পুথিরূপে রক্ষিত হওয়ার ব্যাপার কোন কোন ক্ষেত্রে বরা পড়িয়াছে।

শতাব্দিক বঙ্গাব্দের বাবৎ সংকৃত পুথি লইয়া আলোচনার পরেও সংকৃত পুথির বিবরণ এখন পর্যন্ত সর্বদা হ্রাস হয় নাই। বাংলা পুথির অপেক্ষাকৃত বহু কালব্যাপী আলোচনার ঐতিহ্যটি আশ্চর্য্যকর মনে। এ বিষয়ে কর্মীর অভ্যুত অভাব—কাজ করিবার আগ্রহ ও উৎসাহ দুইই কম। তাই এই নবীন উদ্যম বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

সন্ধান

ঐশ্বর্য্যধীর গুপ্ত

বাঁহু-পাড়াবার পাড়ি দিতে চার পাণী,
শাখা-বীণ তার আঁবিত্তে লাগার ঘোর;
চলার—ধারার পথ প'তে থাকে বাকী;
কেটেও কাটে না ভাবনের মারা-ভোর;—
অতঃপরে অসীমে উড়ানে তাই,
অবসরে বেন পাণী বলে—‘বাই বাই’।
কোমল কুসুম-পল্লব পাণা মেলি’
মাটির পাণীটি রবিরে ঘরিতে চার;
মাটি হতে তবু বেঁচে ওঠে মাটি টেলি’

মাঝার শিখরে বাঁধা শেবে পড়ে বার;
গন্ধ তাহার তাই বুঝি বায়ে বায়ে
পৌছাতে চার চিরতমের পারে।
ধূলায় ধূলায় উষর ধরার মাঝে
মাটির মাহুতও অরুত লভিতে চার;
বাঁধন এভাবে কিছুতেই পারে না যে,
অহর কণ্ঠে কিয়ে কিয়ে আসে বার।
হলে-গলে তবু তবুহারা প্রাণ,
নীহার করিছে অসীমেরই সন্ধান।

পুস্তক পরিচয়

ভারত রাষ্ট্রতত্ত্ব—শ্রীচাকর চৌধুরী। এম। পাবলিশিং কোম্পানী, ১২০ দি, রাসবিহারী এডিনিউ, কলিকাতা—২২। প্রান্তিক—এস. সি. সরকার এন্ড সন্স লিঃ। ১ম, কলেজ বোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

ভারত রাষ্ট্রশাসনতত্ত্বের ধারণা কি তাহা জানা এতোক নাগরিকের কর্তব্য। অশচ কনষ্টিটিশন অফ ইণ্ডিয়া অধিগত করা ব্যবহারবিধানের পক্ষেই সম্ভব, আড়াই শত পৃষ্ঠাব্যাপী রাষ্ট্রতত্ত্বসম্বন্ধিত ইংরেজী পুস্তকখানির জটিলতা উদ্ধার করা সাধারণজনের সাধ্য নহে। "ভারত রাষ্ট্রতত্ত্ব"র সাধারণ সারল ভাষার পাঠকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গ্রন্থকার একটি ভরতর অভাব মোচন করিয়াছেন। কেবল রাষ্ট্রতত্ত্বের অমুখ্যদে সে অভাব দূর করা যায় না। যে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করিতে পারা যায় শ্রীচাকর চৌধুরীর সে জ্ঞান আছে। তিনি খাতিয়ামা ব্যবহারজীবী এবং বিলাত আমেরিকা ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাই তিনি সহজ ভাষায় ভারত রাষ্ট্রতত্ত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরিচয়প্রদানের জন্য তাঁহাকে পরিভাষা দৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইংরেজী পরিভাষার হিন্দী ও বাংলা প্রতিশব্দের যে সরকারী তালিকা পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নয়, কেননা অনেকগুলি প্রতিশব্দই সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাষ্ট্রসংহতি ও আঙ্গিক রাষ্ট্র, দ্বিতীয় ভাগে শাসনতত্ত্ব এবং তৃতীয় ভাগে বিবিধ বিধান আলোচিত হইয়াছে। ভারত-বর্ষ রাষ্ট্রমণ্ডলও নহে, বৃত্তরাষ্ট্রও নহে, ইহা ইউনিয়ন বা রাষ্ট্রসংহতি। প্রথম খণ্ডে রাষ্ট্রের ধারণা, সংহতি ও আঙ্গিক রাষ্ট্রের পরস্পর সম্বন্ধ, রাষ্ট্রিকতা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতির, দ্বিতীয় খণ্ডে কেন্দ্রীয় এবং আঙ্গিক শাসনতত্ত্ব, লোকসভা, রাষ্ট্রপরিষৎ, আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীপরিষৎ প্রভৃতির, তৃতীয় খণ্ডে আশঙ্কর, সরকারী চাকুরি, সমস্ত নির্বাচন, রাষ্ট্র-তত্ত্বের পরিবর্তন প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত এবং সমস্ত খণ্ডেই অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সরিবেশিত হইয়াছে। এই তিন খণ্ড ছাড়াও পরিশিষ্টে বাংলা-ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা শব্দার্থপঞ্জী এবং অমুক্তমণী দেওয়া হইয়াছে। এই দুখণ্ডী এবং জ্ঞানগর্ভ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কোতুহলী পাঠক ভারত রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাভ

দেশের কথা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। ৫২, বারাকপুর টাঙ্ক-রোড কলিকাতা-২ হইতে শ্রীঅপূর্বকৃত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৭৪। মূল্য তিন টাকা।

দোসরা অক্টোবর, ছাঁকশে জামুয়াসী, কংগ্রেস, বাংলা ও বাঙালী, আমাদের কর্তৃপক্ষীয় খসড়া এবং গান্ধীজী ও হুম্মুনলমান সমস্ত মোট এই ৫২টি অধ্যায় পুস্তকখানি বিভক্ত। বঙ্গের তথ্য ভারতের সাম্প্রতিক সমস্তাগুলি এতই জটিল যে, সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া খুবই শক্ত। চতুর্দশীল গ্রন্থকার বর্তমান পুস্তকে স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কংগ্রেসপন্থী হইলেও তিনি কংগ্রেসের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত নছেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই তিনি আঙ্গিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রগতির ধারাকে বাচাই করিয়াছেন। কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনেককিছুই ঠিক আদর্শ অমুখ্যারী হয় না; কাজেই এ সব ক্ষেত্রে নির্ভুলতা আশা করা যুগ। কিন্তু তাই বলিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশংসা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অজকাল হইল আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। এক দিকে ভুল-ত্রুটি অন্তরিক অসংযততা ও অযোগ্যতা আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। হতভাগ্য পদে পদে এই বাধা দৈলিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এক্ষেত্রে অবৈধ্য হইলে বা কেবলমাত্র সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করিলে চলে না—লেখক এই সমস্তটি পাঠক ও দেশবাসীর সমুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বহু দিন রোগশয্যার কাটাঁইরা দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে যে সব চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরের দরদ দিয়া মর্মস্পর্শীভাবে সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ দেশের চৈতন্যবান ব্যক্তিব্যক্তিরই চিন্তার ধোঁয়া বোঁগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কাজল রেখা—শ্রীমদি বাগচি। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বক্সি চাটার্জি ট্রাট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গর জিনিসটি সর্বকালে সকল বয়সের মানুষের অভ্যস্ত গ্রন্থ—বিশেষতঃ শিশুচিন্তে ইহার অভাব অপরিহার্য। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে এক দিকে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়—অন্তরিক কাজল রেখা তাহার অপ্রতিহত অভিধান এই দুই বিপরীত ধারায় তাহার চরিত্রের বিনিময় হৃদয় হইতে থাকে। আমাদের শিশুরা আজ রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন এবং আমরাও

টোল এন্ড কোম্পানীর



বরানগর, কলিকাতা

দাদ ও কাউন্সেলর
ওয়েথ মলম

কিউটা-টোন
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মলম
খোস পাঁচড়া ও মলমালীর জন্য





বাস্তবকে অত্যন্ত কঠোরভাবে উপলব্ধি করিতেছি, এবং সেই কারণেই হয়তো কল্পনার প্রাণীশে তৈল-নিবেক করিবার উৎসাহ স্বভাবতই আমাদের দ্রাস পাইরাছে। সেকালের মা, ঠাকুরমা, বিবিমা বাঁহার শিশুচিন্তে কল্পনার ইঙ্গিতাল বুলিতে অত্যন্ত ছিলেন তাঁহারাও আজ কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সরসবৃত্তির চর্চা করিবার অবসর বড় একটা পান না, কিংবা বুগের পরিবর্তনে তাঁহাদের রুচিও বদলাইরাছে। কিন্তু একালের ছেলেরা কি সত্যই গর শুনিতে ভালবাসেন না? কঠিন বাস্তবের ভিত্তিব্যবস্থা গ্রহণহীন হইতে অন্ততঃ কিছুকণের জ্ঞাতও নিষ্কৃতিলাভের আকাঙ্ক্ষা কি তাহাদের নাই? গর শুনিবার আগ্রহ শিশুদের নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেই আগ্রহকে কল্পনার উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার আয়োজনটুকুই যে আজ নাই। লেখক চেলসের জন্ম এই আয়োজন করিয়া ধন্তবাহ্য হইরাছেন। সেকালের রূপকথার ভাঙার হইতে বাহিরা চমৎকার চারিটি গল্প তিনি এই সম্বলনে নিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পগুলির নাম—কাজল রেখা, কাকনমালা, বাণিকতার, সোনাভি। এগুলি অঞ্চল বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বহুকাল ধরিয়া কত লক্ষ মাঠাফুরার সুখনিঃসৃত হইয়া কত কোটি শিশুর মনোহরণ করিয়াছে তাহার ইংগিত নাই। আশ্চর্য্যের মারেরেও কাহারও কাহারও বা স্মৃতিগটে এই সব গল্পের ভাঙা ভাঙা টুকরা এখনও হয়তো চূর্ণ হীরকের মত উজ্জ্বল হইয়া আছে। গল্পগুলি শুধু হুনির্বাচিতই নহে, এগুলিকে জুড়াইয়া বলিবার প্রশংসাও লেখকের আপা। তা ছাড়া সুসুগণ ও সুন্দর প্রচ্ছদপটে বইখানি লোভনীয়। পড়িয়া ছেলেরা তো আনন্দ পাইবেই—মারেরাও হারানো গল্পের স্মৃতি ধরিয়া কল্পনামুগ্ধ শিশুদের লইয়া বিগ্রাহিক বা লাঞ্চ আসর জমাইয়া তুলিতে পারিবেন।

ঐরামপদ মুখোপাধ্যায়



মাটির কান্না—জসিমউদ্দীন। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; বাংলাবাজার, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

ক্ষেতখানার কথা, বঙ্গপীরী বৃকের কথা জসিমউদ্দীনের কাব্যে মধুর করণ হুবে বাজিয়াছে। তাঁহার কাব্যলক্ষীর সরল লাবণ্য, সাংঘলী গতি এবং প্রাণের দীপ্তি সহজেই পাঠকের মন কাড়িয়া লয়।

“রাতের বেলায় আঁখরের কোলে সুহাস নদীর চর,
জোনাকী মেয়েরা স্বপনের দীপ বেলায় বৃকের ‘পর’।
শেব রাতের জোছনার রথে পীরী নামিয়া আসি
শব্দ শাসুক বুড়ারে বুড়ারে খেলার হেথার হাসি।”

প্রকৃতির এই সব লীলারহস্তে কবি মুগ্ধ। সমসারের চুঃখলৈল্য অবিচারে তাঁহার হৃদয়ের কোণে একাংশ পাইরাছে কোন কোন কবিতায়। শৈল্পীতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে কথার মাত্রায় হৃদের সজ্জিত রক্ষা করিতে পারেন নাই। যেমন, ‘সোনার মেয়ে’-তে—

“কতটুকু আমি পারিবি করিতে, সাধা কতবা আছে,
মিথানীতি কুসংসার তোর চলিতেছে পাছে পাছে।”

‘নির্বাসিতা’—

“সোনার খাটেতে শয়ন করিয়া পান সে করিত রূপোর গেলাসে জল,
সেই জলে আজি নামান রোগের বীজাণু আনিয়া করিতেছে কলবল।”

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিহত নাজীরের জন্ম তাঁহার ‘সর্ববেদনা পাঠকের হৃদয়ে লাড়া লাগাইবে, কিন্তু তাঁহার ‘পাকিস্তান’-প্রশস্তি অনেকেরই হৃদয়ে বিধাঘাত চিন্তে গ্রহণ করিবেন। দেশবিভাগে অঞ্চল বাংলার ও বাঙালীর কবি উন্নতি হইবেন, ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল।

মহাকবি—শ্রীমজুমদার চক্রবর্তী বি-এ, সাহিত্যবিহারদ, তত্ত্বদ্ব। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

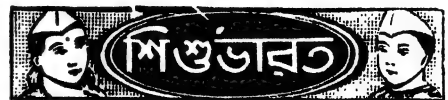
মহাকবি মধুসূদনের জীবনকথা লইয়া বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে একাধিক নাটক রচিত হইরাছে। তথাপি এ গ্রন্থ পাঠককে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নাট্যরচনার লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে।

নক্সী কাঁথার মাঠ—জসিমউদ্দীন। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; বাংলাবাজার, ঢাকা। ৭৭ সংস্করণ। মূল্য ১৮০।

কবিতার প্রতি বাঙালী পাঠকসাধারণের বিরাগসম্বোধ যে কবিতার বইয়ের সপ্তম সংস্করণ হইরাছে, তাহার নূতন পরিচয় অনাবস্তক। জসিম-উদ্দীন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁহার ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ ইংরেজীতেও অনূদিত হইয়া বিদেশে সমাদরলাভ করিয়াছে। বাংলার

জেনে নানা—

যে কোন ১৭ বৎসরের কম ছাত্রছাত্রীকে বিনা টাণায় আজি ডাক খরচ দিলেই গ্রাহক করা হয়। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক লওয়া হবে। সুতরাং সম্ভব যোগাযোগ কর, কারণ আগে এলে আগে পাবে।



ছোটদের সাপ্তাহিক]

[বার্ষিক সত্তাক ৬৮০

পরিচালক—পোষ্ট বক্স নং ২৫৫২ জি. পি. ও. কলিকাতা।

পটীজীবনের, বিশেষতঃ কৃষকজীবনের চিত্র আধুনিক সাহিত্যে আর কেহ এমন করিয়া আঁকেন নাই। এককথিতা কেবল কথার কোশল নয়, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার সমুদ্র, তাই ইহা সহজেই জনকে স্পর্শ করে।

উত্তল নির্জজন—ঐআলোক সরকার। ৪৫-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২০। মূল্য এক টাকা।

কাব্যিক রচনা আর কবিতা—সম্ভবতঃ দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আজকাল কাব্যিক রচনা অনেক দেখি, কিন্তু কবিতা একান্ত বিরল। কৃত্রিম কলাকৌশল এই সব রচনার প্রাণকে আড়াল করে দাঁড়ায়। চন্দ্র নিখুঁত, শব্দবিভাসে চাতুর্য আছে, কিন্তু নেই সেই জিনিস যা সোজাহুজি মনকে গিয়ে নাড়া দেয়। এ বইখানি পাড়তে সেই কথাই মনে হল। “নির্নিমেষ অধেষণ”, “আন্দর্য হাওয়ার হাত”, “তরলিত হেসে ওঠা”, “একমুঠি বসন্তের গান—কিছুই অজাব নেই, কিন্তু সব মিলিয়ে কি হ’ল, সহজে বোঝা যায় না। তরুণ কবিদল নূতন পথ-সন্ধানে উৎসুক, ঠাঁক পথ ছেড়ে কি তাঁরা সোজা পথ ধরবেন না?

আবাহন—ঐধীরেন্দ্রনাথ রায়। ঐভারতী পাবলিশার্স, ২-৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। এক টাকা।

শব্দ ও চন্দ্রের উপর কবির অধিকার আছে।

রহিতে নারিহু ঘরে—ঐকালীন্দ্র ঘটক। বিদ্যালয় ২-৯, ভানুচরণ মে স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কর্তনের দ্বয় ঐবিলাসের মর্মে প্রবেশ করে, তাকে করেছিল প্রেমস্বপ্নে বিভোর। কুটবুদ্ধি রাজ্য চক্রবর্তীর দল হ’ল তার শত্রু। তাদের

শত্রুতানী চক্রান্তে বিপর হলো ঐবিলাস অভ্যয়ের কাছে মাথা নোয়াল না; অন্তরে থাকে সত্য বলে জেনেছিল, তারই অনুসরণে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। শত্রুদের চৈতন্য উদয় হ’ল ঘটনাবিপর্যয়ে। কবিত্বগজি উপভাস, কিন্তু হৃৎপাঠ।

ঐধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অগ্নিসমুদ্র—ঐগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। বিদ্যালয়, ১০, ভানুচরণ মে স্ট্রিট, কলিকাতা-২২। মূল্য ৪০ আনা।

লেখক অনুবাদ-সাহিত্যে স্থান অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার মৌলিক উপভাস। উপভাসের গোড়ারই আমাদের পরিচয় হয় বনামধন্য চিত্রাভিনেত্রী রমিতা মজুমদারের সঙ্গে। ক্রমে এই চিত্রাভিনেত্রীর বিপত্ত জীবনের একটি অতি করুণ অখ্যার পাঠকের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়। আঙ্গিকার রমিতা তখন ছিল সাধুনা নামে পরিচিত। বৈভবের মেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে মিহিরকে বিবাহ করিল বাণেশ্বর অমতে এবং ঘটনাচক্রে এমন একটা সময় আসিল যখন এই মিহিরই নিজের গ্রীকে বিপথগামিনী হইতে বাধা করিল। এখানে সাধুনার অতীত জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল। লোকে জানিল সে মরিয়াছে, কিন্তু সে নমিতা মজুমদার নামে নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। পৃথিবীর সমগ্র পুরুষজাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সে বহুপরিচর হইল—দুঃস্থ হইল তার নূতন জীবন। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে রমিতা—শিক্ষিতা রমিতা উদ্ধৃৎ জীবনকে বাহিরা লইলেও অন্তরে সহিত ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহার দেখে মনে দেখা দিল



সৌন্দর্য রক্ষায় অপরিহার্য

শীতের কষ্টতা দূর করিয়া মুখত্রীর সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করে এবং গাঢ়চর্মে কোমলতা অক্ষুর রাখে। দিবাভাগে লাগনি হো ও রাতে লাগনি ক্রীম ব্যবহার্য।

লোশনি
স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল



বিশ্বব্যাপী। এই সময় তাঃ প্রভুস্বয়ং সরকারের সঙ্গে তাহার সম্মিলিত পরিচয় হইল। প্রভুস্বয়ংকে আশ্রয় করিয়া সে নূতনভাবে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিল। কিন্তু প্রভুস্বয়ং শেষ পর্যন্ত তাহাকে এত্যাখ্যান করিয়া বিদেশে পাড়ি জমাইল। রমিতা বিস্মিত হইল, ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু আশা ছাড়িল না। ঘির করিল, প্রভুস্বয়ংয়ের কর্ণের নখোই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা রমিতার জানা—কিরিয়া আসিয়া একটি বিরাট হাসপাতাল খুলিতে সে কৃতসঙ্কল্প। রমিতা পর পর পাঁচখানা হবি তুলিবার কন্ট্রাষ্ট করিয়া বসিল। প্রভুস্বয়ংয়ের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেখিতে হইলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রমিতার সম্বল এই টাকাটা সে তারই হাতে তুলিয়া দিবে, আর নিজেকে সেবার্ণ প্রহর করিয়া আত্মতা তাহার পাশে থাকিয়া কাজ করিবে।

কাহিনীটি মোটামুটি এই। রমিতার চলার পথে আরও বহু নর ও নারী জড়ি করিয়াছে। তাহার সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের লিপি-সংযম সহজ সাবলীল ভাষা এবং শানিত সংলাপ পুস্তকখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

ঐতিহাসিক ভূষণ গুপ্ত

স্মৃতিমালিকা—ঐক্যলাসঙ্গ স্মৃতিভাষ্য ও ঐশিষিকির কাব্যভাষ্য সঙ্কলিত এবং মুদ্রণাবলি, পোঃ খাগড়া, 'বহরমপুর জুবিলি' টোল হইতে প্রকাশিত। ৩২+৩ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে প্রাচীনকালে স্মরণীয় স্থানাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তেইশটি বিভিন্ন দেবীর তত্ত্ব, দুইটি জাতীয় সঙ্গীত, বহু দেবদেবীর ধ্যান-প্রণাম এবং

যুক্তিবিমুক্ত শিবপূজাবিধি হান পাইয়াছে। অবিক্রান্তেই এমিলি প্রাচীন কালের সংগ্রহ, রাজ্য করেকট প্রথম সঙ্কলকের এবং একটি দ্বিতীয় সঙ্কলকের বিরচিত। জাতীয় সঙ্গীতের প্রথমটি এমি বক্তাবের 'বন্দে-নাটরম' ও দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অবিনায়ক'। প্রাচীন স্তব-গুলি স্মৃতিচিহ্নিত এবং সঙ্কলিতকারের রচিত স্তবগুলিও ছন্দের মাধ্যমে, শব্দের স্বভাবে এবং ভাবের সরসতার সমৃদ্ধ। এই সুপ্রসিদ্ধ মালিকা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই কণ্ঠে পরিচালিত হইবার যোগ্য।

ঐউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

স্তোত্ররত্নম্—ঐচন্দ্রলাল চট্টাচার্য্য-সম্পাদিত। প্রবর্তক পাণ্ডিত্য, ৩১, বহরমপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

ঐবহুনাচার্য্য বিরচিত 'স্তোত্ররত্নম্' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সম্পাদক চন্দ্রলাল চিহ্নিত—“১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কস্মীকরণে 'আশ্রম' আধ্যাত্মিক একটি কনিষ্ঠাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালীন উৎকালীন প্রাচীন বহুনাচার্য্যের 'স্তোত্ররত্নম্' হইতে করেকট স্লোক গঠিত হইত।...স্লোক করেকট ভাবমহিমা ও অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। ঐঐচন্দ্রচরিতামৃতের মধ্যে বহুনাচার্য্যের স্তোত্র হইতে যে করেকট স্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে অপরূপ ভাবাবেশ অনুভব করি এবং সম্পূর্ণ স্তোত্রটির সন্ধান করিতে থাকি।” এই অনুসন্ধানের ফল আলোচ্য পুস্তকখানি। প্রতিটি স্লোকের সঙ্গে সরল বাংলা ব্যাখ্যা থাকায় সাধারণ পাঠকের বুঝবার পক্ষে



M.B. SIRKAR & SONS

**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহরমপুর স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহরমপুর স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহাট স্ট্রীট
ও বহরমপুর স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন

সুদৃঢ় সিংহের ওলফের নির্দেশে
প্রিয়বন্ধু বহরমপুর

ফোন, বি.বি. ১৭৬৮
গ্রাম: ব্রিটিশম্যান্টস

ব্রাহ্ম হিন্দু মুসলিম মাত্রে কলিকাতা
১৭৬৮ সি/১ ব্রাহ্ম হিন্দু মুসলিম মাত্রে কলিকাতা

বিশেষ অধিগাথ হইয়াছে। ভূমিকার বহুনাচারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সম্পাদক মহাশয় দিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের কোন কোন স্থলে ইহা হইতে মোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ভূমিকার পাঠ্যকার তাহারও উল্লেখ আছে। পুস্তকখানি হুস্পাদিত। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে কঠি মিলাইয়া বলি : “বাক্য ও মনের অতীত অথচ বাক্য ও মনের আশ্রয় যে মহৎ সত্যের অপূর্ণ উপলব্ধি এই ভোজের মধ্য দিয়া এতদ্যক তাঁহারই উদ্দেশ্যে আমার শেষ প্রণতি।”

গৌকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (প্রথম ভাগ) - ঐরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর, কে, পাবলিশিং কোং। ১১-এ, গৌকুল মিত্র লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য আড়াই টাকা। সচিহ্ন।

সত্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নিদর্শন ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্ক জগতে বিরাট বিপণ্যর সঙ্গেও ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অল্পমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—ঐজগদ্বাধ কোলে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ঐহরিকান ব্যানার্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অস্বাভাবিক ঔষধ “ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-ভাব্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অস্বাধিগাথ হইয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি তাঃ মাঃ সহ—২৪. আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা—২৭
কোন—সাঁউথ ৮৮

অধ্যাপক ঐযুক্ত মনমোহন বসু পুস্তকের ভূমিকার লিখিয়াছেন যে, লেখক গৌকুল মিত্রের বাণেশ্বর, হুতরাং এই বাণেশ্বর অনেক পুরাতন দলিলপত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি এই সব দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত, এরূপও ভূমিকার বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে গৌকুলচন্দ্র মিত্র-এসঙ্গে কলিকাতার বহু পুরাতন খবর আবার জাগিতে পারি। কিন্তু বিশ্ব-বিস্তারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইলে ইহা অধিকতর অস্বাভাবিক হইত। কলিকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনাকালে এ বইখানির প্রয়োজন হইবে নিশ্চয়।

যে গল্পের শেষ নাই (প্রথম খণ্ড) - ঐদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ। ১২, হারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য এক টাকা চার আনা।

পৃথিবীর অগ্রহস্ত জাতিবার কোতুল মানুষের যথেষ্ট চিরজাগরক রহিয়াছে। হিন্দু, ইহুদী প্রমুখ প্রাচীন জাতিসমূহের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে নানা আলোচনা আছে। বিজ্ঞানও বলিয়া নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি, প্রাণের জন্ম, মানুষের পূর্ব-পুরুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। আবার ‘পাহাড়ের বই’ হইতে জীবজগতের ভ্রমোন্নতি সম্বন্ধেও আমরা নানা নতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। মানুষ তথা নৈরুদ্ভূতবিশিষ্ট জীবের পূর্বপুরুষ ‘মাদ’-ভূমিতে কেমন লাগে। অথচ এই সকল জটিল বিষয় গল্পদ্বারা অতি সহজ ভাষায় লেখক বলিয়াছেন। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে চিত্রাদি সরিষেপিত হওয়ার ইহা চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠে। পুস্তকখানি অল্পবয়স্কদের জন্য লিখিত। এইরূপ সহজ ভাষায় বিজ্ঞান-পুস্তক রচনার বিশেষ আবশ্যিকতা আছে।

নারীর মূল্য—পরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২-৩১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

“ঐশ্বর্যী অনিলা দেবী”—এই ভ্রমণমালা ১৩২০ সালের ‘যমুনা’ মাসিক-পত্রে লেখকের ‘নারীর মূল্য’ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী বাহির হয়। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি একতৃপক্ষে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ। পরচন্দ্র নারী-জাতির প্রতি কিরূপ দরদী ছিলেন তাহা তাঁহার উপভাসসমূহ পাঠে আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে মোটেই আকস্মিক নহে। তিনি নারী-জাতির হৃৎ-হৃৎপ্রাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; আবার ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সমাজতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি পাঠে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের সমাজে নারী-জাতির স্থান সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন। নারীর হৃৎ-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার মনকে একেবারে দরদে ভরপুর করিয়া তোলে। বিভিন্ন উপন্যাসে তাহা যেন উপচাইয়া পড়িয়াছে। পরচন্দ্রের জ্ঞানের পরিধি যে কত বিচিত্র ও গভীর, মনে পরিসরের এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহাও পাঠকের সম্যক উপলব্ধি হয়।

ঐরোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

গত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এখন বিন ভ্রাম্যহুভূতে, আশ্রমবৈতালিকগণের প্রভাতী কীর্তনের পর আশ্রমচাৰ্য্য শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ সিনি আশ্রম-পতাকা উত্তোলন করেন। অপরান্ত্রে সেবায়তন-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কুচকাওয়াজ সহকারে জাতীয় পতাকা অভিবাদন করেন। তৎপরে শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ মহারাজের পৌরোহিত্যে যোগেশ্বর-প্রাক্ষেপে এক সত্য অর্হস্তান হয়। উভয় অর্হস্তানেই আশ্রমের ভক্ত-মতলী ও বিভিন্ন স্থানের বহু মরনাতীরী সমাবেশ হয়। দ্বিতীয় বিন বালকগণের জীবা-প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যার প্রায় দুই শত যোগপন্থাবলী সাধকের সমাবেশে জিরাযোগ সাধন ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা হয়। বেলা প্রচার বিভাগের চলচ্চিত্র প্রদর্শন সকলের আনন্দ বর্ধন করে।

অনিলচন্দ্র রায়

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অতন্তর সৈনিক, বাংলা দেশের অগ্নিসুপ্তের কর্মী, এবং পরবর্তী জীবনে মুক্তাযাবী করোয়ার্ড রকের মেতা অনিল রায় গত ২১শে পৌষ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অন্তর্গত প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। দুরন্ত আত্মিক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য বিশিষ্ট সার্জেন ডাঃ পঞ্চানন্দ চ্যাটার্জির চিকিৎসাবীনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু অস্ত্রোপচারে আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই হুভিতে পারিয়া ডাঃ চ্যাটার্জি অস্ত্রোপচারে বিরত হন। সহবর্গী শ্রীমতী লীলা রায়, ছোট ভাই শ্রীঅমল রায় এবং দুই জন করোয়ার্ড রক কর্মীর উপস্থিতিতে অনিলবাবু তোর ৪টা ৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনিলচন্দ্র ১৯০২ সনে ঢাকা জেলার বাপিকগঞ্জের বিহারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অরুণ রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিকারি। অনিল রায় ১৯২২ সালে ঢাকা হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তুলে ছাত্রজীবন হইতেই তিনি বিরলবাক্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯২১ সালে 'শ্রীসত্য' নামে তিনি এক সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন মেতাকীর নেতৃত্বে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে রাজনৈতিক কারণে এন্টার হইয়া ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৪০ সালে মেতাকীর সহিত করোয়ার্ড রক গঠনে তিনি বিশেষ কর্তৃত্ব-

পরভার পরিচর প্রদান করেন। ১৯৪১ সালে পুনরায় এন্টার হইয়া ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁহাকে কারাবাসে কাটাইতে হয়। ১৯৪৭ সালে 'করোয়ার্ড রক'র সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং পরে করোয়ার্ড রক হুইট ভাগে বিভক্ত হইলে মুক্তাযাবী করোয়ার্ড রকের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

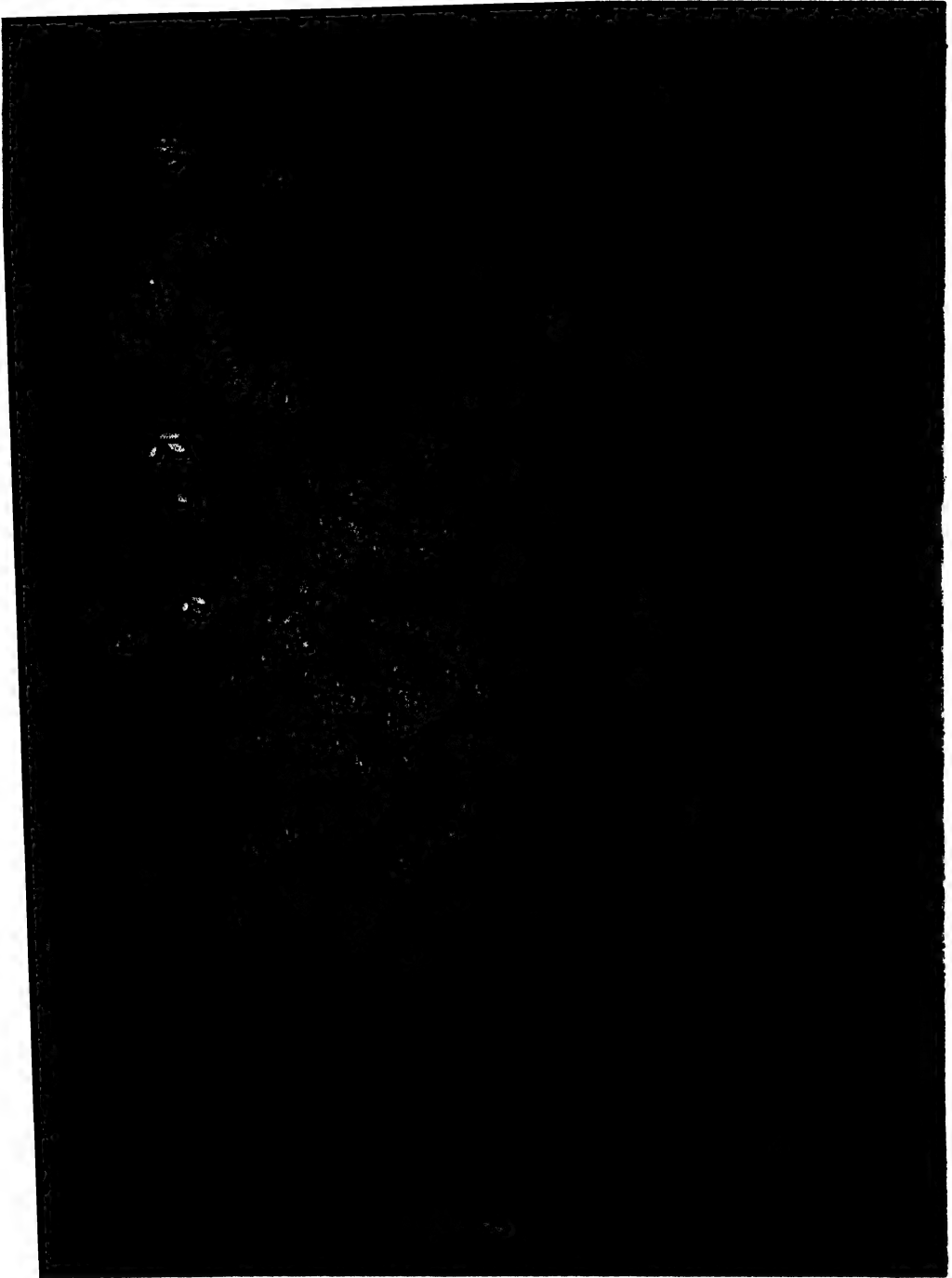
রাজনৈতিক জীবন ছাড়া অনিলচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং মৌলিক রচনার ব্যাতিত ছিল। সঙ্গীত ও কলা-রসিক সমাবে তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল। তিনি অগ্রগামী সত্য নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং "মেতাকীর ডাক" নামে স্তব্য-নাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন। "পাট এও লীডারশিপ", "সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে রাজ্যবাদ", "মেতাকীর জীবন-বাদ" প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় লেখক ছিলেন।

বঙ্গবিভাগের পর তিনি উদ্ভাসের সাহায্য ও পুনর্গঠন-কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা এবং অদ্বারিক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসা ও প্রভা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সুযোগ্য সহবর্গী শ্রীমতী লীলা রায় এবং তাঁহার অত্যন্ত আত্মীয়বন্ধনদের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

প্রমথেশ বড়ুয়া

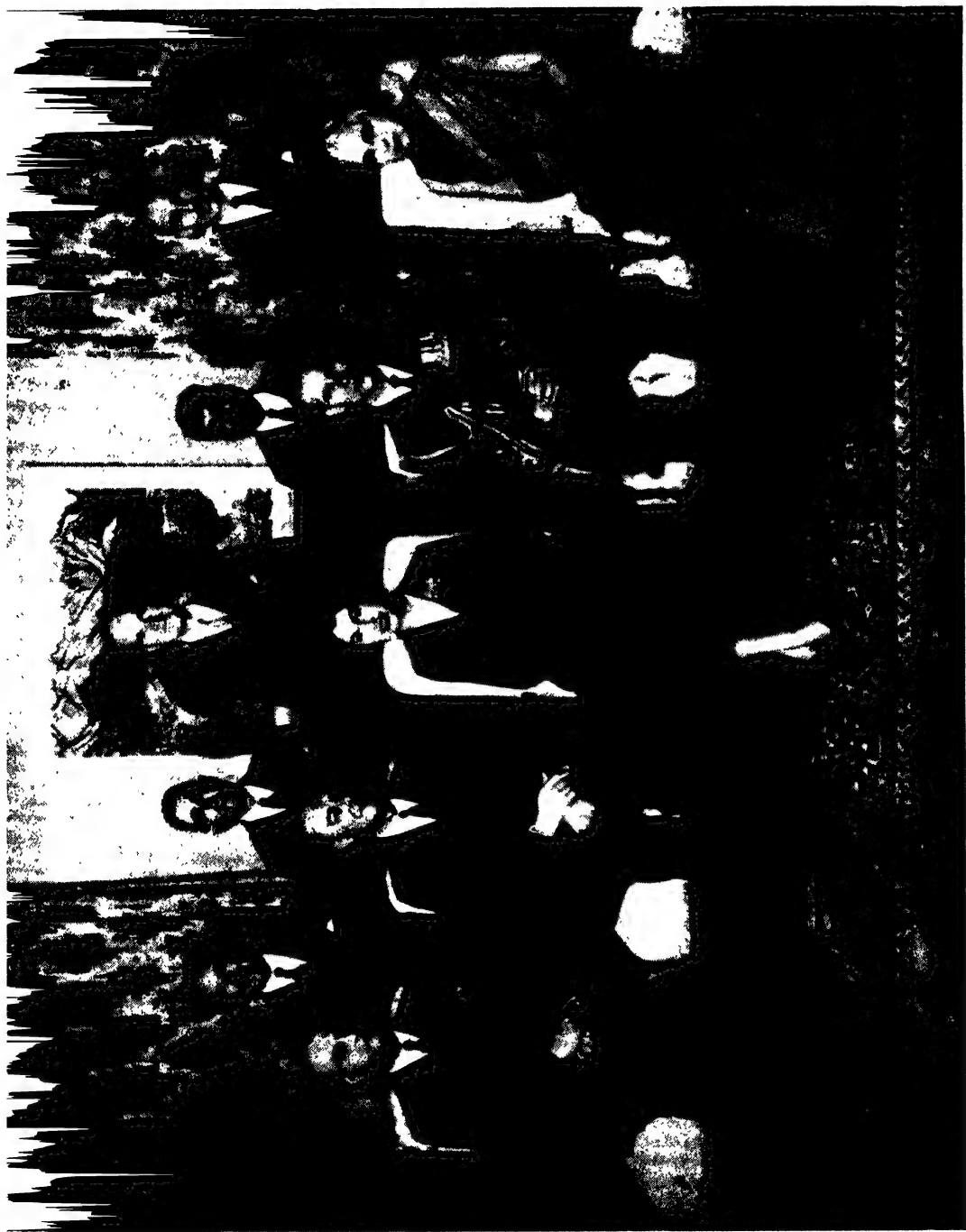
চিত্র-নাট্যকার, চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া অকালে মর্ত্যালোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার সৃষ্টি-রক্ষার ব্যবহার জন্য গত ২২রা পৌষ রক ও চলচ্চিত্র শিল্পীগণ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে এক সৃষ্টি-সভার আয়োজন করেন। শ্রীভাষাধর বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রমথেশ আসামের বুঝীর অন্তর্গত পৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার ছোট পুত্র। প্রভাতচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন পরিপোষক। রত্নপুর সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁহার বহিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ছাত্রাচিন্তের ক্ষেত্রে প্রমথেশের বহু অতিক্রান্তপরিবারের ব্যক্তির আবির্ভাব অনেককে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে প্রচুর সুন্দর এবং সঙ্গীতাত্মক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া বাংলা-দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রমথেশবাবুর পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে সমাহুতি প্রকাশ করিতেছি।



মাসী প্রেস, কলিকাতা

বুদ্ধের বৈরাগ্য
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত



ওভারসিংটনৰ কামাতাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ব্ৰিটিশ কমনওয়েলথৰ অন্তৰ্ভুক্ত দেশসমূহৰ প্ৰতীক সহ স্বাক্ষৰকাৰী এম্বাসেদৰ। সজ্জা হাজা য়ৰ্জ কৰ্ণেল
পৰলোকগমন হেতু তিনি ইংলেণ্ডৰ ৱাই বিতীৰ এম্বাসেদৰ বনিয়া। বিৰোধিতা হাইদায়েন। চিৰেৰ মৰ্জিন পাৰ্শ্ব উপবিষ্ট ক্ৰীষ্টা বিকৰলক্ষী পতিত।

একাত্তর

“সত্য শিবং সুন্দরং

সারস্বতী বলহীনেন সত্যঃ”

১১শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৮

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

বাংলার ভোটযুদ্ধ ত শেষ হইল, এখন তবিষাতে কি লেখা আছে? অবশ্য একথা বলা চলে যে, “নীচের তলার” ব্যাপার শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু “উপরের তলা” এখনও খালি এবং লেখানকার নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত শেষ কথা বলা বা লেখা সুভিস্কৃত হইবে না। উপরের তলার কথা মনে রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, বাংলার তবিষাতে কোনও বিশেষ আলোর রেখা আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই।

নির্বাচন যে তাবে হইয়াছে তাহাতে একথা স্পষ্ট যে, দেশের শিক্ত সাধারণের অবিকাশের হার অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন নয় সাময়িক উত্তেজনার মনে হারিস্বহীন কার্যকলাপ করিয়াছেন। যেভাবে নির্বাচন চলিয়াছিল তাহাতে মনে হয় অনেক স্থলে শিক্ত লোকের মধ্যে শতকরা বশ ক্রমও ভোট দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দেশের তবিষায় সবচেয়ে এইরূপ উদাসীন শিক্ত বাঙালীর একটা প্রকৃতিগত নিরবে ইচ্ছাইয়াছে। ইহার কারণ কি তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। কেমনা উহার প্রতিকার না হইলে আভিত্র ক্রম অবশতি ঘোষ করা সম্ভব হইবে না। এবারের নির্বাচনে বাংলার কোনরূপ প্রকৃত উপদ্রব হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহা দেশবাসীর নিরমশৃংখলার তক্তির পরিচায়ক মতে, বরক্ মিথাক্রম অবসাদ ও অবহেলায়ই পরিচায়ক। বাংলার শিক্ত সমাজ নব্যবিত্ত জেনীভেই পড়ে। এই নির্বাচনে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহার জীবনীশক্তি অতি কীর্ণ এবং চিন্তাশক্তি হারান করাপ্রাপ্ত।

এ বিষয়ের বিশেষ পরিচায়ক বাংলার সেই সকল সংসদ-পন্থা বাহা এখনও শিক্ত বাঙালীর সুখপন্থা রূপে পরিচিত। এই নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সুখপন্থা হই একটা হাফা আর সকলেই অতি লজ্জপূর্ণে দৌনপ্রস্ত অবলম্বন করিয়া “হুল বাঁচাইবার” চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা বিগত গ্রীষ্ম-চল্লিশ বৎসরের

বিভিন্ন নির্বাচনের অভিজ্ঞতার বাংলার সংসদপন্থার এইরূপ নির্জীব ভরতাব কখনও দেখি নাই। ইহাও বাঙালীর জীবনী-শক্তির হ্রাসেরই পরিচায়ক। সংসদপন্থার কথা আমরা বুঝিতে পারি, কেমনা হয়ত সেগুলির পরিচালকবর্গ নিজেদের তবিষয়ের চিন্তা আপো করিয়া কাহাকেও চটাইতে চাহেন নাই; এই ভয় ছিল যে, যদি-বা তাহাদের সর্বদা করি তাহারা হারিয়া বিপক বল কনভাএপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই প্রতিহিংসার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পার্টিবর্গ কি ততোবিক করাপ্রাপ্ত ছিলেন, না হইলে ঐরূপ ব্যবহীন, সারহীন বক্তৃতা তাহারা দিবার পর দিন ক্রমপে গলাধঃকরণ করিলেন? বক্তৃতপক্ষে বাংলার ভাগ্যের এই সন্ধিক্ষণে বাংলার সাংবাদিক গোষ্ঠীর এরূপ কর্তব্যে ক্রটি অভিশর হুঃখজনক।

এবারের নির্বাচনে প্রথম প্রস্তাব্য বিষয় এই যে, অর্জাচীরের জয় প্রায় সকল দলের কেন্দ্রে এবং অনেক প্রায় অকলেও হইয়াছে। তবে সূত্রের বিবরণ, প্রানের লোক বরক্ অনেক কেন্দ্রে হল অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহারা টিকিট না দেখিয়া লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং নির্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছে। তুল-জ্ঞান তাহাদের যে হয় নাই তাহা মনে, কিন্তু দলের লোকের মত বিপরীত বুদ্ধির ব্যবহারে নিজেদের মনের খালা মিটাইবার চেষ্টা তাহারা একটা করে নাই। বোঝ হয় শহরে লোকের তার জ্ঞান-বুদ্ধি সেদরপ না থাকার তাহাদের বুদ্ধিমত্তা একটা হয় নাই।

বাংলার নির্বাচনে কোন দলই ভরহুক্ত হয় নাই, কেমনা নির্বাচনের কলে যদি বাংলার তবিষয়ের অধিকার কিছু লাভ না হয় তবে সে ভয়-পরাক্রমের দ্বারা কি? কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই নির্বাচনের কলে পশ্চিম-বাংলার বিধায়কতা অধিকতর কার্যকর বা সফল হইল বা এই নির্বাচনের কলে বাংলার সমতাপূর্ণ ভাগ্যপন্থা কিছুমাত্র সুগম হইল?

আমরা দেখিতেছি সকল দলেরই মধ্যে যে করতল চিত্রাঙ্গল বা যোগ্যতালম্পর ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভণ্ডের কথা বলিতেছি, দলগত স্বভাবের নহে—তাঁহারা প্রায় সকলেই পরাক্রান্ত হইয়াছেন। ইহার কারণ প্রত্যেক দলেরই প্রবাস চেষ্টা ছিল বিপকের প্রেষ্ঠ লোকবিপক্ষে পরাক্রান্ত করা। এইরূপ হওয়ার ফলে সংযোগবিষ্ঠ দলের মধ্যে যোগ্য লোকের নিরাকরণ অতীব ভো হইয়াছেই, বিরোধীদলের মধ্যেও হারিষজ্ঞানসম্পন্ন লোকও অতি অল্প। সুতরাং রাষ্ট্র চালনার ব্যাপারে অবিকারীভবনের ঝুট-বিচুটি ও অকমতার কারণে দেশের প্রগতি বেরূপে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিল, অত বিপক্ষে বিপকের বিচারপূর্য বাধাবাদনেও দেশের স্বার্থও সেইরূপে ক্ষুর হইবার সম্ভাবনা রহিল। কাণ্ডজ্ঞানপূর্য হলাহলির কল বাহা হয় তাহাই দেশবাসীকে ভতরিন ভোগ করিতে হইবে বতরিন তাঁহাদের এ বিষয়ে চৈতন্যের উদ্রেক না হয়।

মির্জাচন্দ্র পরিচালনা সম্বন্ধে এখন লিখিবার সময় আসে নাই, কেননা কতকগুলি “অলৌকিক” ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাসমত কারণ আমরা এখনও বুঝিয়া পাই নাই, বহিঃ সে বিষয়ে অনুসন্ধান আমরা করিতেছি। স্বাভাবিকভাবে সে সকলের এবং এদের মির্জাচন্দ্রের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে। আপাততঃ এইরাত্র বলা চলে যে, দেশের লোক এখনও মির্জাচন্দ্ররূপ বস্তুর ব্যবহারে অভিজ্ঞতার অভাব সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই দেখাইয়াছে।

কলাকল বাহাই হটক, এখন কিছুকালের মত দেশের লোক মিছেদের ভাগ্য নিরূপণ করিল। বাহারা মির্জাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলেই—যিনি যে কোনও দলের হটক না কেন—যদি বিধান সভার ও লোকসভার পূর্ব হারিষজ্ঞান লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন তবে বাংলার ভবিষ্যৎ এখনও প্রসন্ন হইতে পারে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা

কি পরিবেশের মধ্যে বাংলার ভাগ্যনিরূপণ আগামী কয় বৎসর চলিবে তাহার সামান্য আভাস আমরা দিরাছি। এখন সে বিষয়ে বাংলার সুখ্যবস্ত্রীর ধারণা কিরূপ তাহাও জানা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সেই জাতব্য তথ্যের পূর্ণ পরিচয় পাইবার সময় এখনও হয় নাই। তবে সুখ্যবস্ত্রীর দিকট আমরা তাঁহার আগামী চার বৎসরের কার্যক্রমের একটি মজা পাইরাছি তাহাতে তাঁহার ধারণা সম্পর্কে ইন্দিবত পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যবস্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাক্ষসের কয়েকটি প্রবাস সমতা সমাধানে পরবর্তী চার বৎসর সরকার কি পরি-কল্পনা অনুসরণ করিবেন, তাহার এক চিত্র সাংবাদিকগণের লক্ষ্যে উপস্থিত করেন।

সুখ্যবস্ত্রীর বাসভবনে রবিবার ২৪শে মাস অপরাহ্নে অল্পভিত্র এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথমতঃ উদ্বাস্ত সমতা ও ভৎসনাকর্মে সরকারী পরিকল্পনার কথা অবতারণা করিয়া সুখ্যবস্ত্রী বলেন, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অনুবাদ লাভে প্রকৃত লক্ষ উদ্বাস্তর মধ্যে দৈত্য লক্ষের মত উদ্বাস্তর জীবিকা সংস্থান করিয়া দিতে হইবে এবং গড়ে সকলের বর্ড-বাদ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উদ্বাস্ত সম্পর্কে ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে সমতাপূরণ বিষয়ে আমরা দুঃখ কিছুই পাই নাই। আমরা মিছের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলিতে পারি যে, ঐ সমতাপূরণ ভণ্ডই সমতা হইবে স্বপ্ন ভারত-সরকার পাকিস্থানের হিন্দু সম্পর্কে, সক্রিয়ভাবে চিত্রা করিবেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে উদ্বাস্তদিগের মিছেদেরও এ বিষয়ে সমতাভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন, কেবলমাত্র পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদের অব্যাপ্তি ঝুট হইতে ঝুটভরই হইবে, এবং বর্ডবাদে যে বিবাক্ত হাওয়া অল্পবয়স বহিতেছে তাহারও বৃদ্ধি অচিরেই হইবে। উদ্বাস্ত সমতার সমাধানে যেভাবে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, উহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, তথা তাহার উচ্চতম অবিকারীভবনের, আরম্ভের ও ক্রমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ডাঃ রায়ের এ বিষয়ে বর্ডেতুল ধারণা আছে, এবং এ বিষয়ে সুযোগ্য মন্ত্রী ও কর্মচারী বিরোধেও শৈথিল্য ইতিপূর্বে হওয়ার ব্যাপার ক্ষমাই বিপরীত দিকে পড়াইয়াছে। সুতরাং সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন ডাঃ রায়ের বৃষ্টিকোণের পরিবর্তন।

প্রসঙ্গতঃ তিনি ছোট ছোট শহর মির্জাপুরের পরিকল্পনার উদ্বেগ বর্ণনা করিয়া বলেন, প্রবাসমতঃ পশ্চিমবঙ্গের নব্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং প্রানের সহিত শহরের বনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করাই ইহার মূল লক্ষ্য।

এই ছোট ছোট শহর মির্জাপুরের ব্যাপারে বটটা কাজ হইয়াছে তাহাতে দেখিরাছি সুতরূপ রাক্ষসচরিত্রী ও তাঁহাদের আত্মীয়-বন্ধু গোপীন্দ্রই উপকার অধিক হইতেছে। বাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই সকল পরিকল্পনা রচিত তাহাদের অবস্থা “যে ভিমিরে সেই ভিমিরে।” বস্ততঃপক্ষে বাতবুহুর উৎপাতে যেমন প্রকৃত উদ্বাস্তর মৈত্রাত পাড়র হইতেছে, সরকারী পরি-কল্পনার অনাধু রাক্ষসচরিত্রী ও মন্ত্রিমণ্ডলীর চৌর মনোহতি-সম্পন্ন পার্শ্বচর ও চাইকারের দৌরাহ্মে যেখের মন্যবিত্ত লোকের ব্যর্থতা ও দলের আলা সেইরূপই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বৃচচিত্র মন্ত্রীর পূর্ণ লহরতা এবং বিধান সভার পূর্ণ লহরোপিতা না পাইলে সুখ্যবস্ত্রীর উদ্বেগ এখানে ব্যাহত হইতে বাধ্য।

পল্লিকল্পনার পরিচয় ও সময় নিরূপণ ত এইরূপে বুঝানো সহজেই করিলেন, কিন্তু বিচার্য বিষয় এইটুকু যে, ঐ কার্যবারা কাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। বিদেশী টাকা দিতে পারে, উপদেশ দিতে পারে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাকৃতিক ও টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধানের পথও দেখাইতে পারে। কিন্তু ভারত-সরকারের উচ্চ অধিকারীবর্গের মনো-বৃত্তির পরিবর্তন তাহার। করিতে পারে না, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তৃত্বাধী ও অধিকারীবর্গের মধ্যে সাধু-অসাধু বা ষোণ্য-অযোণ্যের বাহাইও করিতে পারে না। সুতরাং যত দিন তাহার ব্যবহার আকাশ আমরা না পাই তত দিন এই সকল পল্লিকল্পনাই অরবিন্দর আকাশ কুসুমের পর্যায়েই থাকিবে। তাঃ রায় আপন দেখান ষোণ্য লোক কোণার বাহারা এইরূপ পল্লিকল্পনা সৃষ্টভাবে বাস্তবে পরিণত করিতে পারে এবং ইহাও দেখান যে কাহার উপর তিনি এই পল্লিকল্পনার প্রকৃত উদ্বেগ সিদ্ধির বিচার ও ব্যবহার তার হস্ত করিয়াছেন। তাহার পর আমরা বাহবা দিব।

বুখারজী লবণশিল্প ও গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার সম্বন্ধেও সরকারের পল্লিকল্পনা বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকটি পল্লিকল্পনার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাহার। যে কর্তৃক অবকাশ করিয়া দিতেছেন, তাহার আশা আছে বিবিধভালারের পরীক্ষোত্তীর্ণ অথচ কর্তৃত্বভাবে হতান বুৎপন্ন তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

বুখারজী ভারত-সরকারের পল্লিকল্পনার যে সমাজ উন্নয়নের সুপারিশ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, সম্প্রতি ভারত-মার্কিন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতি-মধ্যেই যে পল্লিকল্পনার হাত দিয়াছেন, তাহার সহিত ভারত-সরকারের পল্লিকল্পনার সঙ্গতি আছে। কথা হইয়াছে যে, ভিন-চার শত বর্গমাইল অথবা গড়ে ভিন-চার শত গ্রাম জুড়িয়া এই পল্লিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। এরূপ পল্লিকল্পনাতুচ্ছ প্রত্যেকটি এলাকাকে আটটি বিভাগে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক ৫০ বর্গ মাইল ব্যাপী এক একটি বিভাগে ৫০ হইতে ৭৫টি গ্রাম থাকিবে, ২০,০০০ একর আবাদী জমি ও ৩৫,০০০ অধিবাসী থাকিবে। পল্লিকল্পনার মূল্য গ্রাম প্রতিষ্ঠার কথা নাই, কথা আছে গ্রামীণ-পন্থর প্রতিষ্ঠার কথা।

বুখারজী বলেন, সরকারের ইচ্ছা এইসব পন্থর মন্থরাকী ও কামোদর উপভ্যকার সন্নিকটে স্থাপন করেন। মন্থরাকী অকলে ভিনটি এবং কামোদর উপভ্যকার হুইট পন্থর প্রতিষ্ঠার কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব জলা-ভূমিতে আবাদ সম্ভব নহে সেই সব স্থানে নালার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং জল নিকাশন হইয়া গেলেই সেখানে বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে। মেহিনীপুর অকলে কোন মনী-উপভ্যকা পল্লিকল্পনা নাই, এখানে জমি বহুতর, এই সব কারণের দ্বারা বিবিধ

জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। তৃতীয়তঃ মন্থরাকী বনাইয়া সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ মোট আটটি পল্লিকল্পনার আটটি করিয়া বিভাগ করিলে ৬৪টি বিভাগের কাজ চার বৎসরে শেষ করিবার ইচ্ছা সরকারের আছে। শেষ হইলে দুই লক্ষ গ্রামবাসী এবং ৯৬ হাজার মধ্যবিত্ত পরিবার এই পল্লিকল্পনার আওতার আসিবে। অনেক গৃহ নির্মাণের কাজ পাইবে। সরকারের তত্ত্বাবধানে এক হাজার এবং বে-সরকারী তত্ত্বাবধানে এক হাজার গৃহ নির্মিত হইবে। সংযোগ-রাস্তার লত সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থাও আছে, কেমনা পন্থরাকল হইতে বাহাতে চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-সেবার কার্য্য-বারা সহজেই প্রামাণ্যে প্রবাহিত হইতে পারে তদন্ত এই সড়ক-সংযোগ অপরিহার্য্য।

পল্লিকল্পনা সম্বন্ধে তাঃ রায় আরও বলেন যে, সমগ্র পল্লিকল্পনা ১৯৫৬ সালে শেষ হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে আটটি পল্লিকল্পনার এক একটি বিভাগের কাজ শুরু হইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ঐ আটটির কাজ সমাপ্ত হইলে ২৯টি মূল্য বিভাগের কাজ গ্রহণ করা হইবে। তৃতীয় বৎসর ১৯৫৪-৫৫ সালে ঐ ২৯টি শেষ হইলে আরও ২৭টি বিভাগের কাজ সমাপ্ত হইবে। এইভাবে ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষাংশে ৮টি পল্লিকল্পনাই শেষ হইয়া যাইবে।

বুখারজী বোঝা করেন, সমাজ উন্নয়ন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিভাগ এই সব পন্থর স্থানান্তর করা হইবে। পল্লিকল্পনার বিশদ ব্যবহার লত সরকার একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; কেমনা সরকার বণাশীল এই পল্লিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে উৎকণ্ঠিত। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা হইয়াছে। বাহাতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাজে হাত দেওয়া যায়, তদ্ব্যবস্তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তৃত্বাধীন প্রস্তাবিত এলাকার দুরিরা বেড়াইতেছেন।

বুখারজী বলেন, ‘কোড-কাউন্টডাউন’ কর্তৃত্বাধীন অস্থানে পন্থর এলাকার বুৎপন্নকে কৃষি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ডমানের সরকারী কৃষিকেন্দ্রে বুৎপন্নকে শিক্ষা দেওয়া হইবে; এই বুৎপন্ন স্থানীয় এলাকার গ্রামবাসীকে সেই শিক্ষা দিবে। পন্থর এলাকার কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিচালনার লোক পাওয়া যাইবে; কেমনা গভ ভিন বৎসর দ্বারা আলানসোল, শিবপুর, বাঘবপুর ও অত্যন্ত স্থানে বহু উভাত ভেদন শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত সম্ভ্রমের বুৎপন্নকে বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষাদানের ষোণ্যতা ইহাদের আছে।

ইহার ব্যয় সম্পর্কে তাঃ রায় বলেন, ইহার প্রাথমিক ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করিবেন এবং অবশিষ্টটুকু কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। তাঃ রায় বলেন, সরকার জনসাধারণকে সুযোগ দিবেন, সেই সুযোগ গ্রহণের কাজ জনসাধারণের।

বুখারজী বলেন, প্রতি বৎসর বহু বুৎপন্ন-স্থানীয় বিবিধভালার

হইতে বাহির হইয়া আসে ও কর্তৃত্বাভ্যাসে হতভম্ব হইয়া পড়ে। সরকারের কর্তব্য এই সব সুবক-সুবতীর কর্তৃসংস্থান করিয়া দেওয়া। তাঁহারা তাহাই করিতেছেন এবং তিনি আপা করেন, সুবক-সুবতীগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

তাঃ রায় ট্রিকই বলিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বিখবিতালর হইতে যে সকল সুবক-সুবতী বাহির হইয়া আসে তাহাদের কর্তৃসংস্থান করা সরকারের কর্তব্য। অতীত তাহারা ব্যর্থতার আকোশ ব্যক্ত করিবার জন্য তাহাদের অপরিপক্ব বুদ্ধি ও শক্তি কি ভাবে অকাঙ্ক্ষে ও সূচকভাবে লাগান তাহার পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং তবিত্তে—সুতম নির্দোষতার বিষয় কলরূপে—আরও অবিকল্পিতভাবে পাইবার আশঙ্কাও আছে।

তাঃ রায়ের এই উক্তি পড়ের অংশের সহিত আমরা এক-মত হইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, “তাঁহারা তাহাই করিতেছেন”, এবং সেই লক্ষ্যে ইহাও বলিয়াছেন, “তিনি আপা করেন সুবক-সুবতীগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।”

আমরা বলিতে বাধ্য যে, বিগত কয়েক বৎসরের যে চিত্র আমাদের সন্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বোগ্যভার বিচারে সকল কর্তৃপ্রার্থীর সমান সুযোগের কথা তাবিত্তেই পারি না। অসংখ্য চাকুরী, অসংখ্য সুযোগ অতি অযোগ্য, অতি অকর্ণণ্য লোকে পাইয়াছে। পার্শ্বচর-চাটুকারের গোজিবর্ণ, অবিকারী-বর্ণের অকোষা বেকার আত্মীয় এবং উপরত্ব ভ্যাগী মহাপুরুষ-গণের উন্নয়নরূপ—ইহা হইতে অধিকাংশ কাক পাইয়াছে। তাহার পর পশ্চিমবঙ্গের সভ্যনগরের পথে চতুর্দিকে কাঁটা দিয়াছেন কতিপয় পূর্ববক্তৃত্য উচ্চ অবিকারী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সুবক-সুবতীদিগের নিকট তাঃ রায়ের বিয়তি আরব্য উপভানের অংশবিশেষ বলিয়াই নিবেচিত হইবে।

সর্বশেষে বলিব যে, তাঃ রায়ের বৃষ্টিকোপের বিশেষ পরিবর্তন না হইলে তাঁহার বিয়তিতে আরও হস্তার কোনও কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইব না।

দুর্নীতি দমন

ভারতীয় পার্লামেন্টে আইনসচিব তাঃ কাটজ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের একটি বারার বেরাব আরও বাড়াইবার কত আইন পাস করাইয়া লইয়াছেন। এই আইন পাঁচ বৎসর বলবৎ আছে, উহার সাহায্যে কতকগুলি দণ্ড হইয়াছে, কিন্তু দুর্নীতির উচ্ছেদ ত বহু দূরের কথা, দুর্নীতি দমনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টিও হয় নাই। বরী এবং উচ্চপদস্থ কর্তৃত্বাধীরা এক প্রেয়স অসামান্য বরী ব্যবসায়ীর বাণে দুর্নীতির প্রস্তর দিতেছেন এইরূপ একটি বারণা জনসাধারণের মনে বহুল হইয়াছে। সজ্জিত প্রীত্ব গোড়গালা তাঁহার রিপোর্টে পৰ্যবেক্ষিত সরকারী কর্তৃত্বাধীনের দ্বারা কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্যতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাও

করা হইতেছে না। বরং এইরূপ একটি বারণা কবিত্তেছে যে, প্রতাপশালী বরীনের অসুপ্তীত বড় ব্যবসায়ীদের বাণে হাত দিতে গেলে লং কর্তৃত্বাধীনেরই বিপক্ষে পড়িতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পেন-ট্যাক্সের বটনাট এ বিষয়ে একটি বিশেষ বৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে। বরী ব্যবস্থা পরিষদে বাণি করা হইল যে, বাহারা ট্যাক্স কাকি দিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের কার্যের তদন্ত একটি ট্রিবিউনাল বসাইয়া করা হউক। এখানে একজন স্পেশাল জজ নিযুক্ত করিয়া যে এলিষ্টাক্ট কমিশনার টাকার আনিতে নিয়াছিলেন তাঁহারই বিরুদ্ধে তথ্য কাসের অভিযোগ আসা হইল। স্পেশাল জজ রায়ে বলিলেন যে, আইনানুসারে অভিযোগ বেরণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিবার কথা তাহা করা হয় নাই। তথাপি পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি রায় দিলেন যে, উক্ত অকিসারকে ডিসমিস করা উচিত নয়। ডিসমিস না করিবার কারণ বরণ তিনি বলিলেন যে, একই ট্যাক্স অকিসারকে অভিযুক্তা এবং বিচারক করিবার কলে কিছু আভিযা বটবেই, ইহা পড়তির বোঝ। তাহা হাতা এই অকিসার ট্যাক্স আদায়ের কত খেটুই কোর করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রের বাণের কত, কোন অসামান্য মতলবে গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে পন্থাত করিলে সমগ্র সরকারী বিভাগের মনোবল নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও কাসিমাল সেক্রেটারী এলিষ্টাক্ট কমিশনারকে মোটেশ দেন যে, তাঁহাকে কেন পন্থাত করা হইবে না তিনি বেন তার কারণ প্রবর্ণন করেন। ট্রিবিউনাল সে সকল ট্যাক্সের পরিমাণ গ্রাহ করেন নাই।

ইহার পর ট্রিবিউনাল বসে এবং ট্রিবিউনাল উক্ত কোম্পানীর উপর প্রায় সাত্বে চার লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসান। এলিষ্টাক্ট কমিশনার ঐ ব্যাংকেই এবেক্টের অধীনস্থ পেপার মিলকে ২৬ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন, কটম মিলকে ৪০ লক্ষ এবং মোটর কোম্পানীকে ২৫ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বসাইতে চাহিয়াছিলেন। কোম্পানীর উপর তাঁহার ৪,৩৬,০০০ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া দিয়াছেন। ব্যাংকেই এবেক্টরা ট্যাক্স কাকি বেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল ট্রিবিউনালেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, টাকার পরিমাণের প্রকটাই কেবল বীমালা হইল না। সুতরাং মূলতঃ এলিষ্টাক্ট কমিশনার ট্রিকই বরিয়াছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহার পর পন্থাতের কারণ বর্ণাইবার মোটেশ আসে কিরূপে? এলিষ্টাক্ট কমিশনার হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্ট রায় কাসিমাল সেক্রেটারী এবং পেন-ট্যাক্স কমিশনারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে, কাসিমাল সেক্রেটারী কমিশনারকে চিটি লিখিয়া এলিষ্টাক্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে হস্তানির ও বিলবের অভিযোগ আনেন এবং অসামান্য অভিযোগও করেন। ইহার

উপর হাইকোর্ট মতব্য করিতেছেন, “এই সার্বভৌম অধি-
যোগের ফলে কোন ভিত্তি নাই। দরখাস্তকারী সেন-ট্যান্স
বিভাগের অধি কারিত্বপূর্ণ পথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার
বিক্রমে কোমরপ তথ্য না থাকে নতুন ও এরূপ গুরুতর অধি-
যোগ আদায় হইয়াছে।”

এই সারের পর কান্দীর সেক্রেটারী এবং সেন-ট্যান্স
কমিশনার বহিঃপথে বহাল থাকিতে পারেন তবে এনিষ্টার্ট
কমিশনার ঐচ্ছিক দায় কি করিয়া পছন্দ্য হইয়া আসিয়া তাহা
বুঝিতে অসমর্থ। এ বিষয়ে অব্যবস্থাপন পঞ্জিকা, বৈমিক
বহুসংখ্য এবং লোকসেবক কঠোর মতব্য করিয়াছেন। দেশের
বর্তমান দুর্গতির প্রথম কারণ দুর্নীতি। এইভাবে সং-
স্কারীরা অসামর্থের হাতে বহিঃস্থিত হইয়া এবং পবিত্র
শ্রমোক্তদের প্রেরণ হইতে বহিঃস্থিত হইতে পারেন
না। ভারত-সরকারের ইচ্ছা বিশেষভাবে চিত্তা করিয়া দেখা
উচিত। ঐচ্ছিক দায় অত্যন্ত দৈন্যভাবক অবস্থার পঞ্জিকা বহিঃ
স্থিত হইতে পারেন। বাংলা-সরকারের পক্ষে অত্যন্ত মিস্ট্রিভিতার
পরিচায়ক হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য।

কান্দীর সমস্যা ও ডেভাস'পরিবর্তন

গত ৩রা মার্চ প্যারিস হইতে সংবাদ পাঠান হয় যে,
মিরাপত্তা পরিষদে উক্ত ক্রম প্রাধান্য কান্দীর সমস্যা-
সমস্যার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিচার করা বিবরণ পেশ করিবেন।
তৎসম্পর্কে তিনি বলেন, কান্দীর রাজ্য লইয়া এবং
বিশেষতঃ কান্দীরকে অসামরিকীকরণের প্রেরণ লইয়া ভারত ও
পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ বর্তমান, তাহা একাধারে
ব্যাপক ও বৌদ্ধিক। তিনি সমস্ত সমস্যাকল্পে নিম্নলিখিত
নীতির উল্লেখ করেন:—(১) অসামরিকীকরণের সময়
অন্তে উক্ত পক্ষের সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা বহুতর সত্ত্ব কল্প
করিতে হইবে; (২) ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী হু-
জিব্রি রেখার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত সৈন্যসংখ্যার অস্থাপনে
উপরি-উক্ত সৈন্য হ্রাস করিতে হইবে।

গত ৯ই মার্চ নূতন দিল্লী হইতে সরকারী ভাবে নিম্নলিখিত
বিবৃতি প্রকাশ করা হয় :

“এখানে অতঃপরকারী ভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গভ-
কল্যাণ প্যারিসে অনু ও কান্দীর রাজ্যের অসামরিকীকরণের ক্ষেত্র
যে ডেভাস'পরিবর্তন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভারত-
সরকার কিংবা ভারতের প্রতিনিধি ঐবি, এম, রাও ও তাঁহার
নামরিক উপদেষ্টাবিদকে প্যারিসে আলোচনাকালে একে-
বারেই জানান হয় নাই। গত ১৩ই অক্টোবর তাঃ ক্রম যে
পরিবর্তনটি ইচ্ছার হতে নিম্নলিখিত তাহার সহিত ইচ্ছার
কোনও রকম লান্ধত নাই।

হুজিব্রি রেখার উত্তর পার্শ্বে সৈন্য অবস্থানের বিষয়
নহে, অতঃপর বিষয়ে “ডেভাস'পরিবর্তন”র গুরুতর পরিবর্তন
লক্ষিত হইতেছে। নিম্নলিখিত ভাট্ট সঙ্কল্প বিধান প্রকৃতি
করেক্ট নূতন বিষয় এই পরিবর্তনের সংযোজিত হইয়াছে।”

বোটার্টভাবে বলা হইতে পারে, পূর্ব পরিবর্তনের পাক-
অধিকৃত এলাকার ৭,৬০০ সৈন্য (এই সংখ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত
পাক-সৈন্য ও অসামরিক কার্যে ব্যবহৃত সশস্ত্র সৈন্যকেও বলা
হইয়াছে) এবং ভারতীয় এলাকার ২৮ হাজার সৈন্য অবস্থানের
প্রস্তাব ছিল। নূতন পরিবর্তনের পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকার
প্রায় ৮ হাজার সৈন্য ও ভারতীয় এলাকার ১৪ হাজার সৈন্য
রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেসনোটে

ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেসনোটে বলা
হইয়াছে যে, “ডেভাস'পরিবর্তন” প্রকাশের পূর্বে ভারত-
সরকারকে কোন কথা জানানো হয় নাই। এরূপভাবে পরি-
বর্তন প্রকাশে ভারত-সরকার বিমিত হইয়াছেন। প্রাধান্যের
দ্বিতীয় রিপোর্টের বর্তমান পরিস্থিতি হিসাবে “ডেভাস'পরিবর্তন”
প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে পরিবর্তনটির অংশবিশেষের
বিবরণ প্রদত্ত হইল :

“(১) ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথম
প্রথম বিষয়ে চুক্তির পর দ্বি-দিন চরম সীমা বলিয়া পরিগণিত
হইবে।

(২) হুজিব্রি রেখার উত্তর পার্শ্বে সৈন্য অবস্থানের ক্ষেত্র
তাহা বেবিবার ক্ষেত্র নাথি-মুখলা রকাকরে হামীর সরকার-
সমূহকে সাহায্যের জন্য এবং সৈন্য-বাহিনী সমাবেশের ক্ষেত্র
রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে
এবং জীপ, হেলিকপ্টার ও বোমাবোম ব্যবহার অত্যন্ত
প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে হইবে।

(৩) পশ্চিম দিক হইতে বিনা অসুস্থতিতে বাহ্যতে
কেহ প্রবেশ না করিতে পারে, তৎক্ষণাৎ পাকিস্তানকে আক্রমণ
কান্দীর এলাকার পশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রবেশ বন্ধ রাখিতে
হইবে। বাহাই-করা নিম্নলিখিত বাহিনীর দ্বারা এই কাজ
করিতে হইবে।

(৪) ভিন ব্যাটেলিয়ান দ্বারা সশস্ত্র নিম্নলিখিত পাকি-
হানী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে।

(৫) আক্রমণ কান্দীর সশস্ত্র বাহিনীকে কনাইরা চার
ব্যাটেলিয়ান করিতে হইবে এবং ভারতের নিম্নলিখিত সৈন্যদের
সংখ্যা হ্রাস করিয়া এক ডিভিসন করিতে হইবে।

(৬) নিম্নলিখিতভাবে আক্রমণ এলাকার চার হাজার
অসামরিক ব্যক্তিকে লইয়া একটি পুলিশবাহিনী গঠন করিতে
হইবে :

(১) আক্রমণ বেওরা আক্রমণ বাহিনীর পূর্বতম

লোকজনের মধ্য হইতে ১,২০০ জনকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে।

(২) কখনও আকার বাহিনীতে কাজ করে নাই, এমন ১,২০০ ব্যক্তিকে সশস্ত্র সৈন্য হিসাবে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনও পাকিস্তানী বা পাক-সশস্ত্র বাহিনীর কুতপূর্ব সৈন্যকে ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) তালিরা বেত্তরা আকার বাহিনীর কুতপূর্ব লোক-জনের মধ্য হইতে ৮০০ নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে।

(৪) কখনই আকার বাহিনীতে যোগদান করে নাই, এরূপ ৮শত নিরস্ত্র অসামরিক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে। কোনও পাকিস্তানীকে অথবা পাক-সশস্ত্র বাহিনীর কুতপূর্ব সৈন্যকে ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না।”

এই “পরিষ্করণ” লইয়া নাকি বিশ্ব প্রকাশ করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রনীতির মধ্যে বিশ্বাসের কি থাকিতে পারে? অনন্তা-তায়ণ, সত্যের বিলোপ ও রাষ্ট্রনীতির অন্ধ। চাপকা পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া টুয়ান, চার্লিস, ষ্যালিন, বেহরু, মাত-সে ভুতের মূণ পর্যন্ত এই নীতি অটুট আছে। ডিক্‌সন যেমন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধির নিকট এক কথা আর পাকিস্তানকে আর এক রকম কথা বলিয়াছিলেন, সেইরূপ এাহাম-ভেতানও দুই পক্ষকে দু’কথা বলিয়া একটু বেশিরা লইতেছেন মাত্র।

কান্দীর সনস্যার আলোচনার মধ্যে নূতন ঘটনা হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মঃ জ্যাকব মালিকের বক্তৃতা। তাহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। মার্কিন ও ব্রিটেনের মতামত বিক্রমে অসংলগ্ন বাক্য বর্ণন এই বক্তৃতাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অষ্টেলিরাবাসী ডিক্‌সন ও মার্কিনী এাহাম এই দুই জনেই কান্দীর সনস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কেহ যে তাহা পারিবেম সে বিশ্বাস আশ্বাসের নাই। কি ভাবে ও কোন্ সময়ে তাহা হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। হরত তাহা কান্দীরের ভাগ্যবিধাতা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখিয়া এই রাষ্ট্রের মরমানীয় শক্তি ও বৈবরণ্য পত্তীক্য করিতেছেন এবং আশ্বাসের তরঙ্গা এই যে, কান্দীরবাসী এই পত্তীকার উত্তীর্ণ হইতে পারিবেম।

নেপালে আবার বিদ্রোহ

প্রতি ভারতীয় মাসের বিত্তীয় সঙাহে আজ বেশ বংসর হইতে নেপালে একটা না একটা গণগোল লাগিয়া আছে। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে প্রায় বেশ শতাব্দিক বংসরের ‘রাণাতলে’র অববিকার অসহ বোধ করিয়া মহারাণাবিরাজ জিহুবন মল্লের ভারতীয় হুতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজা চন্দ্র নরসিংজক প্রবাস মন্ত্রীমণে মহারাণাবিরাজের সপক্ষে জনমতের সক্রিয় সমর্থন লক্ষ্য করিয়া একটা আপোষ করিয়া লইলেন। তার পর এক বংসর বাইতে না বাইতে তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভার গণমতের প্রতিনিধি নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি ত্রিভাতৃকাপ্রাস কৈরালার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বিধান পরিষদ গঠিত হইল, হু’তিমটি মলের সমবাসে মন্ত্রিবলী শাসনভার গ্রহণ করিলেন; রাজবংশ, রাণাবংশ, উদারনৈতিক মল ও বামপন্থীরা একত্র হইয়া শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু আরও উপগ্রহী মল গণগোল করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম প্রিন্সি লাভ করিয়াছে। তাঃ কে. আই. সিংহের পরিচয় আরম্ভ পাই নাই। সংবাদপত্রে বাহা দেখিতে পাই, নেপালী সর-কারের নামা ঘোষণার বাহা পাঠ করি তাহাতে মনে হয় এই তরলোক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। বার বার ফেল হইতে পলায়ন করার কৌশল আরম্ভ করিবার শক্তি তাঁহার আছে। পুলিশ বিভাগের ও কারাবিভাগের কর্তৃত্বাধী-বর্গের সমর্থন না থাকিলে তিনি কখনও এরূপ তেলুকিবাকী বেশিতে পারিতেন না। শত শত লোক তাঁহার দলভুক্ত। নেপালী সমাজের একাংশের ক্ষয়ক্ষয় করিতে না পারিলে ইহা সম্ভব হইত না।

গত ১০ই মাস কাঠমুণ্ড নগরীতে “জরুরী অবস্থা” ঘোষণা করা হয়। ১৯৪২ সাল হইতে এই অবস্থার নদে বাঙালীর বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। মুত্তরাং ইহার সুবিধা-অসুবিধার বর্ণনা অনাবৃত্তক। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তে “সর্বমম” কর্তব্য অর্পণ করা হইয়াছে। ২৩শে মাসের বিশ্বরীতে বলা হইয়াছে :

“বিদ্রোহী বেতা তাঃ কে. আই. সিং পলায়নের চেষ্টা করিতে পারেন পূর্ব হইতেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নেপাল-সরকার তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য আদেশ জারী করেন, কিন্তু রকী মলের, উতপবহ কর্তৃত্বাধীরা সেই আদেশ পালন করেন নাই।”

ইন্ডাহারে বলা হইয়াছে যে, তাঃ কে. আই. সিং বর্তমানে প্রবাস হইতে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে রত্না সিংবিদ্রোহী ভিক্ষাতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রত্না হইতে হুঁত মাইল হয়ে ভিক্ষাতের মধ্যে অবস্থিত কারেরংহ ভিক্ষাজী কর্তৃপক্ষ নেপাল-সরকারকে জানাইয়াছেন যে, তাঃ কে. আই. সিং যদি ভিক্ষাতে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাকে নেপাল-সরকারের হস্তে বেত্তরা হইবে।

তার পর হইতে সব বীরব। আশ্রয় এই বিদ্রোহের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই বীরব মন্ত্রিবলীরা মধ্যে মতভেদজনিত—একথা অবিস্মৃত।

“ভোট দাও নাই চিনি ও কাপড় পাইবে না”

“রত্ননাথপুর থানার যে সমস্ত গ্রামবাসী কংগ্রেসকে অর্থ কংগ্রেস-প্রার্থিনী শ্রীমতী বিজলীপ্রভা নতুকে ভোট দেয় নাই, তাঁহার বারী-বেবতা উল্লেখ্যে উক্ত গ্রামবাসীদিগকে চিনি ও কাপড় পাইবে না বলিয়া হাঁকাইয়া দিতেছেন। চিনি ও কাপড় কমসামগ্রীর প্রয়োজনে কো-অপারেটিভ ষ্টোরে রহিয়াছে তাহা কমসামগ্রীর প্রাপ্য। তাহা হইতে কম-সামগ্রীকে বঞ্চিত করিবার অধিকার তাহার নাই। আমরা হানীর সরকারের দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি ও কমসামগ্রী বাহাতে তাহাদের মাথা প্রাপ্য সমস্ত জিনিষ নিরস্তিত হুলো বিনা বাবার পার, তাহার ব্যবহার অন্য অহরোহ জানাইতেছি। রত্ননাথপুর থানার দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবার নামে কমসামগ্রীর উপর অবরোধ, জুলুমবাকী এবং বেজাচারিতা চলিয়াছে। কমসামগ্রীকে সম্বন্ধ হইয়া ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রত্যেক গ্রামবাসী তাহাদের প্রাপ্য প্রয়োজনীয় জীবাদি ন্যায়সঙ্গত হুলো বাহাতে পার তাহার ব্যবস্থা হউক।”

নামকৃত রায়চরণের শ্রীবিজয়চন্দ্র আশ্রম হইতে প্রকাশিত “সংগঠন” পত্রিকা উপরোক্ত অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা হানীর একটি কর্তৃত্বীর ধামধোলাই বলিয়া মনে করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। ২৪ পরগণার আলীপুর মহকুমার পোলিং কর্তৃত্বী আমাদের বলিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনস্থ সকল লোকে অভি সতর্কতা ও সততার সহিত নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহা একটা ভরসার কথা। সরকারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ যদি এইভাবে আপন কর্তব্যে অটুট থাকিতে পারে তবে দেশে নিরাশার বন্যা আটকানো সম্ভব। তাঁহার কথা সত্য হউক।

নেতাজীর স্মৃত্যু-সংবাদ

সম্রাতি নেতাজীর কর্তী উৎসব ভারত ও বহির্ভারতের নানা স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়িতে ভারতীয় চা-বাগান সমিতি ভবনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভট্টর রাণা-বিশোধ পাল অত্যন্ত বৃহত্তর সহিত বোষণা করেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন এবং ঠিক সময়েই তাঁহার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি আরও বলেন যে, নেতাজীর হত্যাসংবাদ কেবলমাত্র বাধাঘেঁষা দলের অপপ্রচার মাত্র।

নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্টি সেক্রেটারি পণ্ডিত শ্রীমতী বাকী নেতাজীর জন্মদিবস পালন উপলক্ষে বক্তৃত্যর-পুর্বে এক বিরাট জনসভার বোষণা করেন যে, নেতাজী জীবিত আছেন। কিছুকাল পূর্বে ভারতের কোষ বিশিষ্ট ব্যক্তি এশিয়ার কোম স্থানে নেতাজীর সহিত লাক্ষ্য করেন। তিনি

আরও বলেন, নেতাজী ভারতে কিরিবার কত সুযোগের অপেক্ষা রহিয়াছেন।

এই হইট বক্তৃতা সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, এক দিকে হই জন বারিফ্রান্সমন্সর ব্যক্তি বৃহত্তর দলে নেতাজীর হত্যাসংবাদ অস্বীকার করিতেছেন অত দিকে আত্ম হিন্দু সরকারের প্রচার-সচিব আচার মহাশয় ততোধিক বৃহত্তর সহিত কেন বলিতেছেন যে ১৯৪৪ সনে আগষ্ট মাসে বিমান-হুমুটনার তাঁহার হত্যা হইয়াছে। প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় একধাণি বই লিখিয়া তিনি তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আচার মহাশয় বর্তমানে বোম্বাই-সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্মী; তিনি আপনাকে পিরাহিলেন এবং সুতম প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছেন। এইরূপ হইট পরম্পরবিরোধী বোষণা দ্বারা কান কি বাধোঁতার হইতেছে, তাহা আমরা বুঝি না। যদি নেতাজী জীবিত থাকেন তবে তিনি কেন এই বিজ্ঞাতিজনক অবস্থা হইতে তাঁহার দেশবাসীকে উদ্ধার করিতেছেন না, তাহাও বুঝিতেছি না।

কম্যুনিষ্ট দলের জয়

বাহুতার “হিন্দু-বাই” (সাপ্তাহিক) ২২শে মাস সংখ্যায় ঐ জেলার নানা রাজনীতিক দলের শক্তিসামর্থ্যের আলোচনা করার পর বলিয়াছেন :

“সর্বশেষ আসে কম্যুনিষ্ট দলের কথা। এই দলও তাহাদের একটি পকেট সংগঠন তৈরি করেছিল সংরুক্ত প্রগতিশীল দল নাম দিয়ে কতকগুলি বেনামী কম্যুনিষ্টের সহায়তার। এই দলের একটি প্রার্থীও জয়লাভ করতে পারেন নি। সবচেয়ে বড় লাগে এই দলের প্রচার-কৌশলে। পরাক্রম অবতর্যাবী কেনেও দিকেরে কর্মী ও বহনসংখ্যক ভোটারদের মনোবল বজায় রাখার জন্য জয়লাভ সুনিশ্চিত বলে প্রচার করে এসেছেন। বাস্তব দিতে এই দল কংগ্রেসকেও হার মানায়। এদের পত আট-দশ বৎসরের কার্যকলাপ লোকে ভুলে নি। ’৪১-’৪২ সালে এই দল সাম্রাজ্যবাদী হুদকে “জনহুদ” বোষণা করে ইংরেজ-আমেরিকার সঙ্গে হুঁত মিলিয়েছিল (এরাই আবার আজকাল অন্য দলকে আমেরিকার দালাল বলে গালি পাড়েন।), ইক-আমেরিকার ‘হিঙ্গ মাষ্টার’ ভরেনস’রপে সেদিন এই দল নেতাজী হত্যারচর ও আত্ম হিন্দু-কৌজকে আপনাদের দালাল বলে চীৎকার করেছিল এবং আত্ম হিন্দু-কৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিয়েছিল। হুললীর জীনের সাম্রাজ্যিক দাবী পাকিস্তান প্রত্যাকে সবচেয়ে আগে সর্ধর্ন করেছিল এই কম্যুনিষ্টরা— তাও আবার হুলজবানদের ‘জাতীয় দাবি’ বলে। রাজ-পোপাল-করহুলার সবচেয়ে বড় সর্ধর্ক ছিল কম্যুনিষ্টরা।

বিশেষ পর বিন ভায়া পাভীকীকে বিহার সরকার বন্ধ্যা দেবার জন্য চীৎকার করেছেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির পরবর্তী ইতিহাস আরও কলঙ্কর। যেদিন পাকিস্তান-বাণিতে হুসেনী লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'প্রত্যাক সংগ্রাম' ঘোষণা করে কলিকাতার রাস্তাঘাটে রক্তপতন ঘটবে ঘিরেছিল, সেই ১৬ই আগস্টে হুসেনী লীগের শোভা-যাত্রার কীবে কীবে মিলিয়ে লীগ ও কম্যুনিষ্ট পতাকার পাঁচ-ছটা বেঁধে অংশ গ্রহণ করেছিল এই কম্যুনিষ্ট পার্টি। তার পর নরহত্যা ও দৃষ্টবশে কলঙ্কিত হুসেনী লীগের বিরুদ্ধে বকীর আইনসভার অনাহা। প্রত্যাব অসীত হলে কম্যুনিষ্ট লব্ধেরা নিরপেক্ষ থেকে পরোক্ষে লীগ-ব্রহ্মসভা তথা হত্যা-কাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন।"

কম্যুনিজমের প্রতিরোধ—কম্যুনিজমের প্রসার

গত ২৯শে শৌব ভারতের সংবাদপত্রে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পানাপানি রাশিয়া পার্টি করিলে বিতীর্ণ বিশ্ববৃদ্ধের পরের জনগণ্যাপী অশান্তির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। কোন মতব্য করিয়া আমরা এই সংবাদের উপর হুঁ কলাইতে চাই না :

নিউইয়র্ক, ১৪ই জানুয়ারী—ভারতবর্ষে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ চেস্টার বোলস্ গতকাল বিরাটোপে লগন হইতে নিউইয়র্ক পৌছান এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও রাষ্ট্রপতির সহিত আলোচনার পর তখনই ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিঃ বোলস্ বলেন যে, তিনি আগামী সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ভারতে কম্যুনিজম প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বোলস্ তিনটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন :—(১) হুজরাষ্ট্র এবং তাহার আশ্রয় সম্পর্কে ভারতকে আরও ভালভাবে ওয়াকিফহাল করিতে হইবে। হুজরাষ্ট্রের ইতিহাস ঐতিহ্য তাহার অমূল্য সম্পদ। (২) ভারতকে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য দান একান্ত প্রয়োজন। চীনে আমেরিকা যে পরিমাণ সাহায্য দিয়াছে ভারতকে সেই পরিমাণ সাহায্য দিলে সাধকতা লাভের পূর্ব সম্ভাবনা আছে। (৩) ভারতবাসীর সমুদ্রে যে সকল সমতা রহিয়াছে বৃহত্তার সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়া এবং জীবনধারণের দান উন্নয়নের দ্বারিত্ব বিশেষ ভাবে ভারতবাসীরই। মিঃ বোলস্ বলেন যে, ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে বহুদূরত্বিত এবং হুজরাষ্ট্র তাহার ভরত অপেক্ষা করিতে পারে না।

বোম্বাই, ১৪ই জানুয়ারী—ভারতবর্ষে ক্রমরাষ্ট্রপতি মিঃ এন. ডি. বোডিকত আজ এখানে বলেন যে, তাহার বেশ ভারতকে যে-কোনও শিল্প-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতে এবং চীফার অথবা আর অন্য যে-কোনও হুমত হুজার তাহার মূল্য গ্রহণ করিতে যাকী আছে।

তিনি বলেন, "ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গতিয়া তোলার প্রথম কেন্দ্র রহিয়াছে। আপনারা যাহা কিছুই কিনিতে চাহিবেন, তাহাই আমাদের নিকট পাইবেন, আর আমরাও আমাদের সরকারী নিমিসপত্র আপনাদের নিকট হইতে কিনিতে যাকী আছে।"

তাঁহার বেশ নিম্নোক্তরূপে দীর্ঘপত্রকে অগ্রসর হইতেছে এবং এই সম্পর্কে অন্য যে-কোনও দেশকে অনেক শিহনে কেলিয়া আনিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর কোন দেশই কারিগরী বিতার তাঁহারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, বৃহত্তর অর্থনীতিকে আমরা পুনরায় গতিয়া জুলিতেছি, অতএব ইহা হুম্মট যে, আমরা হুজ চাহি না। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা আমাদের সরকার। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় বটার আশঙ্কা নাই।

লোভিয়েট সরকার জাতীয় উন্নয়নের জন্য যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন, ক্রম-রাষ্ট্রপতি তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন, "রাশিয়ার সমুদ্রে জনশক্তি হ্রাসের যে আশঙ্কা বেধা দিয়াছে, তাহা হুজীকরণের জন্য যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে। রাশিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুবিধ বস্ত্রপাতির উদ্ভাবন করিতেছে এবং শিল্পই যে শক্ত শক্ত "একক্যাডেটর" এবং ভবনরূপ বস্ত্রপাতি নির্মাণ করা হইবে তাহার দ্বারা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাজ নিশ্চয় হইবে। গত ২৪ বৎসর ধাবং রাশিয়াতে কোমণ্ড বেকার-সমতা নাই। সেখানে বেকার-সমতার সমাধান ১৯২৭ সালেই হইয়া গিয়াছে, তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

একটি প্রশ্নের উত্তরে ক্রম-রাষ্ট্রপতি বলেন, রাশিয়াতে ব্যক্তিগতবীর্যতা নাই, একথা বলা ভুল। প্রথমে একজন শ্রমিক, পরে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং এখন একজন ফুটবলিভিগ রূপে তাঁহার সুদীর্ঘ চাকুরী কালে তাঁহার ব্যক্তিগতবীর্যতা অক্ষুণ্ণই আছে। এইরূপ ব্যরণা যে কেন পোষণ করা হয়, তাহা তিনি হুজিতে পারেন না।

মিঃ বোডিকত বলেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে লৌহাধর্মের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া তিনি আশঙ্কিত এবং তিনি আশা করেন যে, এই সম্পর্ক আরও আত্মিক হইবে।

"রয়েল রিপাব্লিক"

এই নিরোমানার "হুপাতর" (২৫শে মার্চ) বেত কলম ব্যাপী একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের "আজাদী হুঁটা ছার"। হুই একজন ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদের মতব্য উদ্ধৃত করিয়া করেন বিন বহিয়া তাঁহার মতপ্রাপ্ত আবিষ্কারকে মাজাচাচা করিতেছেন। অতঃপর আর পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের সম্মুখি ১৪ই আগস্টের উৎসব উপলক্ষে বিপুলকার "বিশেষ সংখ্যা" প্রকাশিত করিতেছেন।

এর মধ্যে কোন্ট্রী সভ্য দেশবাসী তাহা বিজ্ঞাপন করিতে পারে।

“হুগাভর”এর এই প্রবন্ধের ভাষা ইংরেজী ভাষার অনুবাদ। মিরে তার একটু মনুনা দিলার। তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকেই বিশেষ ভাবে আকৃষণ করিয়াছেন।

“...জাতীয় কংগ্রেসের সেই পবিত্র ও মহান্ প্রতিশ্রুতিকে আমরা সবে অগ্রাহ এবং পদতলিত করিয়া বর্তমান কংগ্রেসের কর্তব্যারণ রাউটব্যাটেন-দম্পতির আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্রিটিশ কমনওয়েলথের রাজকীয় বস্ততা ও আত্মপত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একটা জাতির আত্মসম্মতিবোধ কতখানি অধঃপাতে নামিয়া গেলে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাঝে রাজকীয় বন্দনার এই সুস্থিত দৃষ্টির অবতারণা সম্ভব হইতে পারে, তাহা ভাবিবার মত। এই রুয়েল রিপাব্লিকের প্রথামন্ত্রী রূপে আমরা বাহ্যকে পাইয়াছি, তিনি মাঝে মাঝে মহান্ পণ্ডিতের আদর্শ, এমন কি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মূলি পর্বাত আত্মত্যাগী থাকেন। আসলে ইঁহারা পরাধীন ভারতবর্ষের মহারানী ভিক্টোরিয়ার নীল রক্তের উপাসক এবং ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী অতিক্রান্ত শ্রেণী ব্রিটিশরাজ ও রাজত্বের প্রান্ত দ্বাস মনোভাবের বাহক। অতথা হীন আত্ম অবমাননার এই গ্রানিকর দৃষ্ট চেখিবার আগে কংগ্রেসের কর্তব্য এবং তাঁহার ভাবকল্পের উচিত ছিল আরব সমুদ্রের জলে আত্ম-নিমজ্জন করা।।...”

“হুগাভর” ও “অন্যত বাক্যের পত্রিকা” একই সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের অর্ক। কিন্তু হুইটর পরিচালনার এরূপ পার্শ্বক্য দেখা দেয় কেন?

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নূতন অভিযান

“বিহার সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন—বিহার সরকারী ভাষা আটন (১৯৫০ সাল) বিহারে অবিলম্বে চালু হইবে। অর্থাৎ, দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা বিহারে সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে এখন হইতেই ব্যবহৃত হইবে। তৎক্ষণাত্রে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করা ইবার মলিপত্র দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীতে লেখা হইতে হইবে। থানার থানার অভিযোগের প্রথম এজালা (ডায়েরী) হিন্দী ভাষার লেখা হইবে। ইন্স্পেক্টর, সাব-ইন্স্পেক্টররা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পরীক্ষার মন্তব্য, তাহাদের ও এই সকল স্কুলের হেডমাষ্টারদের মধ্যে পঞ্জের আহ্বান-প্রদান, এসেমব্লী ও কাউন্সিলে প্রেরণের সম্পর্কীয় পত্রালাপ ও বিহার গেজেটের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম ভাগ এখন হইতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষার হইবে। বিচারের আদালতসমূহে হিন্দী ভাষা চলিবে, অর্থাৎ দোকতমার আবেদনপত্র, জবাব দরখাস্ত ইত্যাদি হিন্দী ভাষার লিখিতে হইবে। সদন, বোর্ডিং প্রভৃতি হিন্দী ভাষার

লেখা হইবে ও জারী হইবে। বাকী বিবাকী আদালীর এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য হিন্দী ভাষার লেখা হইবে; এবং হরত হিন্দী ভাষাতে দিতে হইবে। উকীল যোক্তার্নিগকেও হরত হিন্দী ভাষাতেই সওয়াল-জবাব করিতে হইবে। এই সময়ে আসন্ন মিস্ট্রীচমের প্রাকালে এইরূপ একটা অদ্ভুত বিপর্যয়ের ব্যবস্থা কেম করা হইল, তাহা হরত অমেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু গভীরভাবে একটু অনুবাসন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই মিস্ট্রীচমের কাজ হইতে জন-পণের দুষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহা করা হইয়াছে। যে সকল হিন্দীভাষী জনগণ এই মিস্ট্রীচমে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহারা সরকারের দৌলতে তাঁহাদের হিন্দী গোষ্ঠামির অহুতুল আবহাওয়া পাইয়াছেন তাবিরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে কাত হইতে পারেন, এবং যে সকল বদভাষাত্মক এই মিস্ট্রীচমে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের ভাষার উপর এই নুতন আক্রমণের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ ও শক্তি-সামর্থ্য আকৃষ্ট হইলে মিস্ট্রীচমের কাজে তাঁহাদের নৈশিল্য বর্ধিত পাবে—এই অভিপ্রায় ইহার পশ্চাতে থাকা বুঝই সম্ভব। তাহা হাতা ইহাতে বাংলাভাষীকে বিহার হইতে সরূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টাও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহাতে বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে এইরূপ একটা অনর্থের সৃষ্টি করার শক্ত-মিষ্ট সকলেই সরকারের ও কংগ্রেসের প্রতি আরও বিরূপ হইবে।”

উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য পুরুলিয়ার ‘বুজি’ পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষার এই বিভীষিকা গাম্বীজী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হুয় করিতে পারেন নাই। ফলে মহাত্মার তের সৃষ্টি স্মরণপরাহত হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্থান সৃষ্টি এই পাণের এক সৃষ্টি; হিন্দী ভাষা বা অত কোন ভাষার অহমিকা তার অত রূপ। মূলতঃ হুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

বিহার গবর্নমেন্টের অনুদারতা

টাটা কোম্পানী উদার শিরপতিপণের অন্ততম, কিন্তু বিহার গবর্নমেন্টের চাপে পড়িয়া তাঁহাদেরও কতদূর অনুদার হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে ‘হুগাভর’ (নৈমিক) পত্রিকার ২৯শ পৌষ সংখ্যার বাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অজানিত না হইলেও, নুতন করিয়া বিহারী অ-বিহারী সমতাচার ওরূপ আমাদের সন্মুখে জুলিয়া বহিয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

“গত কয়েক বৎসরে টাটা কোম্পানীর মৌলভে জামসেদপুর নহরের অতি ক্রান্ত বিবৃতি ও উন্নতি বর্ধিয়াছে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের থাকার শতরের জনসংখ্যা যেমন ভারতবর্ষের সর্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, জামসেদপুরেও তাহাই বর্ধিয়াছে। কিন্তু এই আধুনিক নহরের ক্রান্ত বিবৃতি নহেও নহরবাসীদের বনবাসের

সমন্বিত হইতে নাই। কলে জমির সমতা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। একাংশ যে, এই অবস্থার টাটা কোম্পানী তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জমির বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থির করিয়াছেন যে, একমাত্র বিহারীদের মধ্যেই তাঁহারা জমি বন্টন করিবেন। এই সিদ্ধান্তের কলে জামসেতপুরবাসী অ-বিহারী নাগরিকদের মধ্যে ঘণ্টে চাঞ্চল্য ও প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি হইয়াছে। জামসেত-পুরের অন্ধ-সমিতি, উৎকল-সমিতি এবং পঞ্জাবী ও বাঙালী সম্প্রদায় সম্মতি কতকগুলি সভা-সমিতি করিয়া টাটা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা বিহারী ও অ-বিহারীদের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা কেবল উগ্র প্রাদেশিকতাই বৃদ্ধি পাইবে না, অধিকন্তু ইহা জামসেতপুরবাসী অ-বিহারীদের মৌলিক অধিকারকে হরণ করিবে। আমরা জামসেতপুরবাসীদের এই প্রতিবাদকে মিথ্যাত্ব হুক্তিসমত বলিয়া মনে করি। কারণ জামসেতপুর কোন “প্রাদেশিক” শহর নহে, ইহা সর্ব-ভারতীয় জনপদের শহর। টাটা কোম্পানীর উন্নতি ও লব্ধির মূলে সর্বভারতীয় শ্রমিক, কর্মচারী, কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারদের হান রহিয়াছে, এই অবস্থার টাটা কোম্পানী তাঁহাদের জমিগুলি কেবলমাত্র বিহারীদের কত সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না। এই দৃষ্টান্ত হইতে কলিকাতা, বোম্বাই কিংবা অন্ত-কোন শহরের কর্তৃপক্ষ যদি তির প্রদেশবাসীর নিকট জমি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ হাঁতাইবে? ইহা কি বন্ধিণ আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দা ও ইউরোপীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতিই প্রতিপ্রসূতি নহে এবং যে নীতির বিরুদ্ধে আজ দীর্ঘকাল ধাবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন চলিতেছে? টাটা কোম্পানীর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাসনভবনের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত নীতির একান্ত বিরোধী। জামসেতপুরে টাটা কোম্পানী এই পর্য্যন্ত বহু জনহিতকর এবং সামাজিক কল্যাণকর কার্য করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা জমি সংক্রান্ত এই অত্যন্ত মিথ্যাত্ব প্রত্যাখ্যান করিবেন।”

এই মন্তব্যের উপর আমরা আর কোন মন্তব্য করিতে চাই না। একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বিহার রাজ্যের অধিবাসী প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব। পাঁচ-হর শত বৎসরের মৌলিক বাঙালীকে তাহা প্রমাণ করিতে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে “ডোমিনাইল্ড” সার্টিফিকেট-রূপী বেতা তিলাই-বার বেগ পাইতে হইতেছে। গাড়ীকী পর্য্যন্ত ব্যর্থবোরণ হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে খাণ্ড ঘাঁটতি কি প্রকৃত?

ভারত-সরকারের “হৃতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এগ্রিকালচারাল কমিশনার” জিইনুফ্রন চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত বিষয়ের আলো-

চনা করিয়া সমরোপযোগী কর্তব্য পালন করিয়াছেন। আজ লাভ-আট বৎসর হইতে—১৯৪২-৪৩ সালের হৃতিক হইতে—দেশের চিত্তাশীল মর-নারী এই সমতা লব্ধে মাথা বামাইতে-ছেন; মিছেদের জ্ঞান-বুদ্ধি মতে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রী কে. সিংহা ১৯৪৭ সাল হইতে বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে বাতে ঘাঁটতি মর। “আমলবাহার পঞ্জিকা”র বাণিজ্য-সম্পাদক সংখ্যাতথ্যের নামা অঙ্ক করিয়া এই কথার সমর্থন করিয়া-ছিলেন ১৯৪৯ সালের যে মাসে। আমরা সেই সময় তাহা সমর্থন করিয়াছিলাম। ইন্দুবাবুর ৩৫ পৃষ্ঠার পুঁতিকা সেই মত পরিবর্তনের হুক্তি দেখাইতেছে।

তবুও বলিতেছি যে, ১ কোটি টন (২৭ কোটি মণ) বাত-শতের ঘাঁটতি দেশবাসীর মুকের উপর যে অটল হইয়া বলিয়া আছে তাহার কারণ কি? সংখ্যাতথ্যের বেলা তাহা প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করিতে পারিতেছে না এবং প্রমাণ বা অ-প্রমাণ করিলেও দেশের মর-নারীর সাত্বনা কোথায়?

সিংহা মহাশয় পত হই লগাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই সুযোগে তাঁহার হুক্তির লপকে মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিলে দেশের মহৎ উপকার-সাধন করিবেন।

ইন্দুবাবু পন্ডিতবদের বাতবিতাসীর মতের সমর্থন করিতে-ছেন। উত্তেহত সাহেবের হৃতিক কমিশনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া মিছের মত হৃত করিতেছেন, এবং বাত-বিতাসীর নামা তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু হৃতিক কমিশনের মন্তব্যটি অীকালীচরণ বোম্ব হৃত “বদমেশে হৃতিক” পুস্তকে সংখ্যাতথ্যের সাহায্যে আলোচিত হইয়াছিল। তখনকার মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার হুক্তি অ-প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আজও এই তর্ক-হুদে কোন পক্ষ দাবি করিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের হুক্তি প্রহণ করিয়া তর্কের অবলাদ হটিক।

ইন্দুবাবু তাঁহার পুঁতিকার শেষ পৃষ্ঠার “সমতাপূর্ণ প্রণালী” (integrated plan) কথটির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কথা ও কালের মধ্যে দূরত্ব বিস্তর। তাহা কে কবাইবেন ইহাই গোড়ার কথা।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্তের চাষ

মবধীপ হইতে পন্ডিতবদ মৎস্তজীবী সমিতির প্রচার-সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গে মৎস্ত চাষের নামা অনুবিবা লব্ধে যে-লব্ধ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তৎপ্রতি মৎস্ত-বিতাপের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পণ্ডিত মীলকর্ষ তত্তি-দুখন বাহা বলিয়াছেন তাহা অভিজ্ঞদন মাত্রেই সমর্থন করিবেন। তিনি লব্ধে মৎস্ত-শিকার লব্ধে বলেন;

বাংলার সন্নিকটবর্তী যে কোলে ব্যবসায়ী চালায়, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথাই বলিরাছেন। “প্রকৃত সমস্তার সন্মুখীন হইতে হইলে আমাদেরকে কিতাবে ও কি পরিমাণে প্রস্তুত হইতে হইবে তাহাই বুল কথা। মন্তব্যে যে মন্তব্যী লাভবান হইবেন এবং দেশেরও ধান্যসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে আমরা সিংসন্দেহ, কিন্তু মন্তব্যের অনুবিধা যদি থাকিয়াই যায়, আর আমরা মন্তব্য কর বলিতেই থাকি—তাহাতে কতি বই বৃদ্ধি মোটেই হইবে না, প্রাচুর্য লাভও দূরের কথা। আমাদের অভাবই ভয়ঙ্কর। তাই এ বিষয়ের বুল সমস্তাগুলির উপর কিছু আলোকপাত করিতেছিলাম। সমস্তাগুলি এই—(ক) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পুতুর, বাঁধ, জলসীতে ও বিলে মৎস্তের জীবনধারণোপযোগী জল থাকে না। (খ) যে সমস্ত দীঘিপুতুর পূর্বপুরুষের বনিত, তাহার ভলমণে বহু জলজ তৃণাদি জন্মিরাছে—উহাতে মৎস্ত চাষ অসম্ভব। (গ) যে-সব বিলে প্রচুর জল থাকে, এমন কি চৈত্র বৈশাখ মাসেও হুই হাত জল থাকে, তাহাতে কচুরীপানা জমে ও ঐ পানার গাছ পাভা শিকড় জলের তলে পচিয়া (ভ্যান্ড) মৎস্ত চাষের অনুবিধা জন্মায়। (ঘ) প্রচুর পতীর জলবিশিষ্ট জলাভে বহু মৎস্তাশী মৎস্তও বর্ধমান আছে। (ঙ) যে কতিপয় জলা (সংখ্যাল মগধা) সর্ক পরিবেশে মৎস্তচাষের যোগ্য তাহাদের জন্ত বৎসময়ের উপযুক্ত মৎস্ত-ডিম্ব বা পোনা সংগ্রহের ব্যবহার প্রাচুর্য্য নাই। (চ) মৎস্তবৃদ্ধির (মৎস্ত-পোষণ) দিকে ঐক্য দিলেই ডিম্ব ও পোনা সংগ্রহকে প্রাথমিক অধিকার দিতে হইবে। মৎস্ত বিভাগের এ বিষয়ে অগ্রগতি অনেক কারণেই আড়ও বর। (ছ) বহু পুতুর, দীঘি প্রভৃতি মৎস্তচাষোপযোগী জলার উপর বহু মালিকানা বহু মৎস্তচাষের বিঘ্নগুলির মধ্যে অন্ততম। (জ) যে জলার যে প্রকারের মৎস্তের বৃদ্ধির ও পুষ্টির সম্ভাবনা অধিক, সে জলার সেই প্রকার মৎস্তচাষে অজ্ঞতা। (ঝ) জলার মৎস্তখাদ্য পরিমাণের অনুসন্ধিৎসার অভাব ও মৎস্যকীটবিপ্লবে অনেক ক্ষেত্রে পরিহার্য করার উদ্যম। উল্লিখিত কারণগুলির আন্ত সমাধান না হইলে মৎস্যচাষে পশ্চিমবঙ্গে কলোদর অসম্ভব।”

পাকিস্তানে হিন্দু

ঐশ্বর্য চট্টোপাধ্যায় পাকিস্তান পার্লামেন্টে কংগ্রেসী দলের নেতা। সম্মতি তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সন্মের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে কলকাতা যাত্রার প্রাকালে বোম্বাই শহরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিরাছেন যে, পাকিস্তান সরকারের হুইট কাবের উপর সেবাদকার হিন্দুদের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ, ‘ই-নেশন থিওরী’ বা হুই-জাতি নীতি পরিচয়, দ্বিতীয়তঃ, যৌথ নির্বাচন প্রবর্তন। তিনি বলেন, পাকিস্তানে বর্ধমান যে সকল হিন্দু এখনও বাস করিতেছে, তাহারা হারী তাইবে সেখানে

বসবাসের ইচ্ছা রাখে। সুতরাং এই হুইট ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেই সেখানে তাহারা শান্তিতে থাকিতে পারে, এই অবিকার অর্জনের জন্তই হিন্দু জনসাধারণের সংগ্রাম করিতে হইবে।

‘আজাদ’ এই সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় লিখিরাছেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার তাহা এখানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইল :

“পাকিস্তান পার্লামেন্টের কংগ্রেসী দলের নেতা মিঃ ঐশ্বর্য চট্টোপাধ্যায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সন্মের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্ত কলকাতা যাত্রার পথে বোম্বাই শহরে এক বিবৃতিতে বলিরাছেন যে, তাহার দল পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনপ্রণা প্রবর্তন এবং ই-নেশন থিওরী বা যৌথ নির্বাচন প্রণাচার চায় ; তাইই পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণ নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলিরাছেন যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু এখনও সেখানে আছে এবং যেহেতু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেখানে হারী বসবাসের ব্যবস্থা করিবে, সেই কারণে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্ত তাহাদের সংগ্রাম করা উচিত।

“মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের বোম্বাই-বিবৃতি তাহার দলের বুল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকেই সচেতন করিবে। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যে কোন দলের প্রকৃত রাষ্ট্রদ্রুপত নাগরিকের নিজ অধিকার অর্জনের জন্ত সংগ্রাম করিবার অধিকার কেহই অস্বীকার করিবেন না—অন্ততঃ এমলায়ের অনুসারীরা অস্বীকার করে না। যদি পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের কোন ভারসমত অধিকার সুর করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অর্জনের জন্ত তাহারা সংগ্রাম করুন, তাহাতে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুদের কোন আপত্তি নাই ; বরঞ্চ যদি সত্যই কোন অধিকার সংখ্যাগুরুরা সুর করিরা থাকে, তাহা হইলে মুহলমাদেরা উহা প্রস্তুত কিরাইরা দিতে সর্ব্বনা প্রস্তুত। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে পাকিস্তানের মৌলিক নীতি-বিরোধী অধিকারের দাবী করা হয় বা পাকিস্তানের ভিত্তিৎসমূলক কোন কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহার আপোষ-হীন বিরোধিতা করাই পাকিস্তানের প্রতিটি রাষ্ট্রদ্রুপত নাগরিকের একমাত্র কর্তব্য হইবে।

“পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনপ্রণা কিংবা বস্ত্র নির্বাচনপ্রণা প্রবর্তিত হইবে, এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু যে যৌথনির্বাচনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা উহার প্রণাচার কাহনা বা দাবী করা বা অন্তত কোন ব্যক্তি বা দল পাকিস্তানে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে চাহিলে কোন পাকিস্তানী নাগরিক উহা সমর্থন করিবে না, করিতে পারে না। সোচ্চা কথায়, এই নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে। যারে পাকিস্তান বা তাপে পাকিস্তান

খা বে কারণেই হউক, ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় কংগ্রেসকে উক্ত নীতির ভিত্তিতে উপরহাদেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বীকার করিতে হইরাছে। পাকিস্তানে বিজাতিতত্ত্ব-বিরোধী প্রচারণাকে রাষ্ট্রের মূল কূঠাভ্যাত করার সারিল বলিয়া গণ্য করা হইতে পারে। পাকিস্তান পার্লামেন্টে গঠনমূলক সম্পর্কিত আদর্শ প্রস্তাব আলোচনার বা অত কোন সময় মিঃ চট্টোপাধ্যায় টু-মেশন বিরোধির বিরুদ্ধে কোন উক্তি করেন নাই। আজ বোম্বাইতে হঠাৎ এরূপ মন্তব্য করিবার কারণ পরিষ্কার বুঝা হইতেছে না।

“বিজাতিতত্ত্বের অবসান হইলেই তবে পাকিস্তানের সংখ্যা-সমূহণ নিষেধের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিবে বলিয়া তিনি উক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কেবল এইটুকু মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, কামিরা দুমাইলে কেহই কাহারও দূর ভাঙাইতে পারিবে না, ইচ্ছাকৃত আতঙ্ক ও আশঙ্কা কোন কালে কেহ দূর করিতে পারে না। এই এসকে তাঁহার এ কথাও মরণ রাখা উচিত যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র একবার পূর্বে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক গোলাবোণ হইয়াছে—তাও আবার দীর্ঘকালব্যাপী বহু ভারতীয় হানাদ প্রতিজ্ঞিরাবরণ। তার পরও গত এক বৎসরের মধ্যে সত্তর বারের উপর ভারতে সাম্প্রদায়িক হানাদ হইয়াছে। পাকিস্তানে পঞ্চাশ সালের সামরিক উত্তেজনা ও হানাদার জড় প্রতিটি পাকিস্তানী সজ্জা অস্বত্ব করেন; তাঁহার নিষেধের ইতিহাস অসলিম রাবিবার জড় সর্ব্বনা সচেষ্টি। ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিম্নরোজন। এইটুকু যথেষ্ট যে, বিজাতিতত্ত্ববাহী পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন, ভারতের তথাকথিত সেতুলারী সংখ্যা-গুরুতা তাহাতে অক্ষম হইয়াছেন।

“পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু এখনও এখানে বাস করিতেছেন। আমরা কামি, হানাদা আছেন তাঁহাদের অধিকাংশ হারীতাবেই আছেন; দেশত্যাগের কল্পনা তাঁহারা করেন নাই। আবার এ কথাও কামি যে, বহু সংখ্যালঘু পরিবার-পরিজন ভারতে রাখিয়া এখানে জীবিকা অর্জনের জড়ই রহিয়াছেন। এঁরা পাকিস্তানী অছেন, যদিও স্বাধীনভিত্তি উদ্দেশ্যে নিষেধের পাকিস্তানী বলিরা চালাইয়া বিবার চেষ্টাও এঁরা ভব করেন না। এ কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কামা নাই বলিয়া আমরা মনে করি না। তবুও পাকিস্তানীরা ইচ্ছাতে আপত্তি করে না বা তাঁহাদের কোন প্রকার অপ্রতিবা ঘটাইবার মত কাজও করে না; বরঞ্চ তাঁহাদের অতিথি বলিয়াই গণ্য করে।

“পুনর্জন্ম সত্ত্বও আবার আমরা বলিতেছি যে, বিজাতিতত্ত্ব অস্বীকার করার অর্থই পাকিস্তানের মূল কূঠাভ্যাত করা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ সম্পর্কে আর কোন বিতর্ক উপস্থাপিত হইতে পারে না। মুক্ত নির্বাচনের প্রেরের সহিত ইহাকে জড়িত করিয়া মিঃ চট্টোপাধ্যায় অহেতুক আতঙ্কজনক সম্ভার অবতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্তানে মুক্ত নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইবে কিনা, তাহা কেবল মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের কংগ্রেসী বর্ণহিন্দুদের মতের বা দাবির উপর নির্ভর করে না—দেশের অত্যন্ত প্রের, এমন কি সংখ্যা-গুরুদেরও এ বিষয়ে বক্তব্য আছে। অধিকাংশের মতের অস্বীকৃতির অর্থ গণতন্ত্র মতে—ক্যানিজম; মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের ইহা বীকার করিতে বোধ হয় আপত্তি হইবে না।

“বিজাতিতত্ত্বের প্রের্টা না হুসিলেই মিঃ চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। মোহলেম জীণ বিজাতিতত্ত্বকে বাস্তব সত্য বলিয়া গণ্য করে। আজ হানাদা মোহলেম জীণের বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহারও এ পর্য্যন্ত ইহা অস্বীকার করেন নাই। বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্তানের বিনিময়—এ সম্পর্কে বিতর্ক অস্বত্ব: পাকিস্তানে নিম্নরোজন, অকারণ, অহেতুক, উপরন্ত রাষ্ট্রহতুল মতে। বিজাতিতত্ত্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে সকলের পক্ষে ব ব বাস্তবতা বজার রাখিরাও পান্যাপানি বাস করা ও বাচিরা থাকা সম্ভব, ইহাই পাকিস্তানের নীতি এবং শান্তি সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। প্রতিটি পাকিস্তানীকে যে-কোন জাতি, বর্ণ, বর্ণাবলম্বী তটক না, তাকে ইহা অস্বীকৃতিতে বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই দৃষ্টিকোণী মতদের উপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রহুগত্যের প্রের নির্ভর করিতেছে।”

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কোন্ মেশন ?

পাকিস্তান বলিতেছে তাহারা হুই-জাতি—‘টু-মেশন থিওরী’র উপর গতিরা উঠিয়াছে, উত্তাতে মুসলমানদের মেশন বা জাতি বা মার্গনিক, হিন্দুরা মতে। আইম-পরিষদে ও মাসম-ব্যবহার পাকিস্তান হিন্দুগিকে মুসলমানদের সমান মার্গনিক অধিকার দেয় নাই। ‘টু-মেশন থিওরী’ অনুসারে হিন্দুরা সেখানে মেশন মতে বলিয়া তাহা দিতেও পারে না। তবে হিন্দুরা কোন্ মেশন, তাহাদের রাষ্ট্র কোন্ট ?

কলিকাতার অসাহরলাল বেহুর্ক বলিয়াছেন পূর্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দুর মধ্যে ভারত-সরকারের কথা বলিবার অধিকার নাই, তাহাদের অবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের সহিত তুলনীয়। পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন হইলে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, ইউ. এম. ও. তাহা করিবে। কিন্তু ইউ. এম. ও.-তে গবর্নেন্টের প্রতিনিধি হাজা কেহ কথা বলিতে পারে না এবং সে গবর্নেন্ট সকলের স্বীকৃত গবর্নেন্ট হওয়া চাই। পাকিস্তান যদি তাহাদের মার্গনিক বলিয়া বীকার না করে, ভারতবর্ষও যদি তাহাদের তানদাল বা মার্গনিক

বলিয়া খীকার না করে তবে ইউ. এন. ও-তে তাহাদের কথা তুলিবে কে ?

স্বতন্ত্র্য পাকিস্থানের হিন্দুদের সম্বন্ধে মূল প্রশ্নই অসীমায়িত থাকিয়া রাইতেছে এবং এইজন্যই পাকিস্থানের হিন্দু সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইতে পারিতেছে না। পাকিস্থানের হিন্দুরা কোন্ রাষ্ট্রের ম্যামলাল—তাহাদের বেশ কোথার, তাহাদের মাদরিক অধিকার কোন্ রাষ্ট্রের উপর রহিয়াছে—ইহাই মৌলিক প্রশ্ন এবং ইহার সমাধান সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন। অতি বিপদাপন্ন লোকও সাময়িকভাবে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আশ্রিত থাকাকালেও তার একটা বেশ থাকে, কোম-না-কোম দেশে তার মাদরিক অধিকার থাকে। পাকিস্থানের হিন্দুরা পাকিস্থানের আশ্রিত একথা মানিয়া লইলে তখন প্রশ্ন উঠে তাহারা তবে কোন্ দেশের, তাহাদের রাষ্ট্র কোন্ট ?

হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি, এই ‘টু-মেশন থিওরী’ মতে পাকিস্থান যদি হিন্দুদের তার ম্যামলাল বলিয়া না মানে, তবে তার ভারতবর্ষের মাদরিক বলিয়া গণ্য হইবে কি না ? পাকিস্থান বলিতেছে যে, তাহারা মুসলমানের জন্য “হোমল্যাণ্ড” চাহিয়াছিল। হিন্দুদের তাহারা চায় নাই। যেহেতু বলিতেছেন, ভারতবর্ষ আকস্মিক ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছে, টু-মেশন থিওরী ভিন্ন মানে নাই। কিয়দংশ টু-মেশন থিওরী অনুসারে ইংরেজ ভারতবর্ষ ভাগ করিয়াছে। ইহার মধ্যে তবে কোন্ট সভ্য ? যাহারা ভারত বিভাগ দাবি করিয়াছেন এবং যাহারা বাঙালীর আগে সেই দাবি পূরণ করিয়া গিয়াছেন তাহারা যে ভিত্তিতে উহা করিয়াছেন তাহা মানিতে হইবে, অথবা মসনদের লোতে বিনি বণ্ডিত ভারত মানিয়া লইয়াছেন তাহার কথা সভ্য বলিয়া গৃহীত হইবে ? টু-মেশন থিওরী কার্যতঃ খীকার করিয়া নুবে অসীকার করিলেই কি উহা বহুদের মত মিলাইয়া যাইবে ?

দিল্লী-চুক্তির সময় কথাটি উঠিয়াছিল। পাকিস্থান তার রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করে নাই, কেবলমাত্র উহা ইসলামিক রাষ্ট্র হইবে—এই মূলমন্ত্রটি পালন করা হইয়াছে। দিল্লী চুক্তির সময় লিরাফং আলি উহা এড়াইয়া যান। সেতুলার ও বিওকেটিক রাষ্ট্রে কিরূপে চুক্তি হইতে পারে এই মূলমন্ত্র প্রশ্নটি অসীমায়িত থাকিয়া যায়। কামেলা এড়াইবার জন্য মেহর সমস্যাটিকে বামাচাপা দিয়াছিলেন, কিন্তু কামেলা তাহাকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সেতুলার ও বিওকেটিক রাষ্ট্রে, অসাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িকতার যে কিরূপ মিলন ও চুক্তি হয় মেহর তাহার পরীক্ষা বতই করিয়া চলিয়াছেন ততই ব্যর্থ হইতেছেন।

পাকিস্থানে যৌথ নির্বাচন দাবী

যৌথ নির্বাচন সম্বন্ধে পাকিস্থানী মূলমন্ত্র বলিতেছে,

কেবল বর্ণহিন্দুদের দ্বারা ইহার সমাধান হইবে না। অন্যায় শ্রেণী অর্থাৎ অধর্ষ হিন্দুদের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণেরও এ বিষয়ে আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত সম্মতত্বের দ্বারা বিষয়টির সমাধান হইবে।

ত্রিযোগেন্দ্রনাথ বসুর পন্থ্যাপণের পর পাকিস্থান মন্ত্রী-সভার একজন হিন্দু মন্ত্রী গ্রহণ করার প্রয়োজন হইলে দায়িত্ব বাকুদীকে উক্ত পথে বহাল করা হয়। আগামী পন্থ্যোচের পূর্বাভাসেই বর্ণহিন্দুগণ পাকিস্থানে পূর্ণ পন্থ্য প্রতীকিত উদ্দেশ্যে যৌথ নির্বাচন দাবি করিয়াছে। পাকিস্থান সরকার মন্তব্য: এই দাবির যৌক্তিকতা অসীকার করেন নাই। কিন্তু বলিয়াছেন যে, যদি সকল শ্রেণী হিন্দু ও মুসলমানেরা ইহা মুক্তসম্মত বলিয়া দাবি করে তবে মুক্তনির্বাচন প্রণয়ন করিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দায়িত্ব বাকুদীর প্রয়োচনার এক শ্রেণীর তপশীলী বস্ত্র নির্বাচনের দাবি তুলিয়াছে। তাহারা সংখ্যার বস্ত্র সামান্যই হউক না কেন, তাহাদের মুক্তি বস্ত্রই অসার হউক না কেন, তাহাদের মতকে পাকিস্থান সরকার প্রাণত দিবে নিজেদের বাধসিদ্ধির জন্য। ইংরেজের তেমনীতিক পাকিস্থান অসাধারণ দক্ষতার সহিত জয়যাত্রা করিয়াছে এবং বাধসিদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করিতেছে। দায়িত্ব বাকুদীকে মূলমন্ত্র করিয়া হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিতেছে, ব্রিটিশ সম্বন্ধে যেমন দ্বিধাকে সৃষ্টি করিয়াছিল, পূর্ণ বাধীমতাকারী ভারতকে দ্বিধিত করিয়া শক্তিশীল করিবার উদ্দেশ্যে, পাকিস্থান সরকারও বিপরীতমুখী সঙ্কট-সমলহীন হিন্দু জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বিত্ব অব্যবহৃত করিতেছে এবং সেদিন যেমন দ্বিধার অভাব হয় নাই আজও সে শ্রেণীর লোকের অভাব হইবে না। তাহারা পাকিস্থানে হিন্দু-সংহতকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করার পূর্ববন্ধের হিন্দুর সম্মুখে এক ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত করিয়াছে—ইহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন বন মান সম্মান সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

বাঙালী

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে—মুণিধাবাব, বহরমপুরের “পণ্ডিত” পত্রিকার উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহা সমরোপযোগী। মনন্যে লেখক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী এতটা কৃপার পাত্র নয়; তাহারা কেবল “ঐক্য” ব্যর্থ না, গঠন করে মৃত্যু জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে।

কাতাল বাঙালী। করিত না গোল, দুইটি মুক্তি থাক, বণ্ডিত ভব হোরেছে অল, তাহাতে কি আসে যায় ? দ্বিধার তোমার যে ব্যাধি কমেছে দ্বিধার দ্বাধারে দ্বাধ,

প্রাথমিকভাৱে প্ৰতিটো ঘৰে না লাগে কাহাৰো গাঁৱ।
বিহাৰে আলামে ঠাণ্ডানী থেয়েও কোৱো না অক্ষপাত,
উৎকল বৰি কৰে উৎপাত, মনে কৰিও না কিছু।
নেতা সেয়ে কৰ নিজেৰেৰে হাৰে নিৰন্তৰ নিশাচাত,
নিজেৰেৰে হোৱে নকলেৰে কাহে বাণ্য ক'ৰে থাক নীচ।
এবেশে এবেশে হাইছে মিশিৱা দেশীয়া ৰাজ্য বত
যোগ্য লৱ হুৱি বসিৱা কৰা ত উঠে না কত।
শ্ৰীপুৰা কিবা কুচবিহাৰেৰে বেলাৰ এমুখ নত
শ্ৰীৱা শ্ৰীৱা কীৰিৱা আকুল বত বত বত এত।
ভোৱাৰেৰে লাগি ভাবিহেৰে তাঁৱা, ভোৱাৰা কোৱো না কৰা।
ব্যত কলক ভোৱাৰেৰে মিশি বাস্তৱ্যৰ দল,
আসাৰে ভুও বাৰিও না বাস, কিও না ভাৱেৰে ব্যাধা;
বাঙালী বেধানে বাহিত নৱ, বেতে বাক্ জল।
ক্যাল কাল ক'ৰে দেখে এই নৱ, মাৱাৰাৰি কৰ বয়ে,
দলবল মিশে বাও বাৱে বাৱে বিজীৱ বৰজাৱ,
লাৱাৰাৰীৰ পাশব-বজা বুলুক মাধাৱ 'পয়ে
কুশিৱাও ভু হাতিও না কত উপদল মহিৱাৱ।

—ঐবিকু সৱন্তী।

সাদা চামড়ার দাপট

ডঃ ডেমিয়েল হালাল হকিং আফ্ৰিকাৰ বেতাক প্ৰকৃষ্ণ
প্ৰতিষ্ঠাৰ ভিন্ন শতাব্দীকী উৎসব অনুষ্ঠানৰে আয়োজনে
ব্যত। সেই সময়ই আৰ একজন বেতাক ৱাষ্টপুৰেৰে সত্য
হাঁহাইৱা হকিং আফ্ৰিকাৰ আভ্যন্তৰীণ অবস্থা নথকে মিশেৰ
অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা-প্ৰসঙ্গে বলিভেহেন বে, ইউনিয়ন পৰ-
ৱে'ষ্ট তাঁহাৰেৰে বৰ্ণ-বিৱেৰলুক নীতিৰ কলে এক গুৰুত্ব
সকলোৰে সন্মুখীন হইতে চলিৱাহেৰে। অবেতকাৰ অবিবাসী-
পণ মনে কৰেন বে, হকিং আফ্ৰিকাৰ বাহুৰেৰে আইম ভাপবং
বিধানকে লক্ষন কৰিতে চাহিতেহে এবং অবেতকাৰ জাতি-
লব্ধ এই প্ৰকাৰ বহুশক্তিৰে বাসিৱা লইবে না, সলবত মিক্ৰিৰ
প্ৰতিৰোধ আন্দোলনেৰে হাৱা তাহাৰ বিৰোধিতা কৰিৱাৰ কত
অগ্ৰসৰ হইবে। এই বেতাকট হইলেন হালাল সরকার কৰ্তৃক
হকিং আফ্ৰিকা হইতে নিৰ্ধাৰিত ইংৱেজ বৰ্ণবাজক বেতাৱেও
নাইকেল কট। ইনি ইতিপূৰ্বে আৱণ্ড হই বাৰ ৱাষ্টপুৰেৰে
সন্মুখে উপস্থিত হইৱা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ৰূপে হালাল সরকার কৰ্তৃক
অনুষ্ঠিত নীতি নথকে লাগ্য দিৱাহেৰে। কিন্তু বৰ্ণ বাহা বলে
বল্ধ, সত্যতা ও মন্তব্য বে মন্তব্য কৰিতে হৱ কলক—তাহাৰ
প্ৰতি কৰণাত কৰিৱাৰ অবকাশ ডঃ হালালৰেৰে বাই; বেতাক-
প্ৰাণত তাহাৰ শাসন ও শোষণেৰে কল্যাণে একটা বিৱাট
জনসংখ্যকে মিঃ ও সৰ্বস্বাত কৰিৱাহে, আইম প্ৰণৱন হাৱা
বাহুৰেৰে প্ৰাণ্য অধিকাৰ হইতে বকিত কৰিৱা তাহাৰিগকে
পূৰ্ণশাসিত পদপালে পৰিণত কৰিতে উভত হইৱাহে। বিশ্ব-
বিধান মসিৱা অজাত একটা বত মানৱ ইতিহাসে ক্ৰিয়া কৰিতে

বেধা হাৱ। সেই বিধান বে লক্ষন কৰে, সেই বিধানৰে হোৱ
তাহাকে হুণ লৱ বহন কৰে। কিন্তু হালাল-কাৰীৰ কীৰ তাহা
জানিৱাও জানিতে চাৱ না; বুজিৱাও বুজিতে পাৱে না।
কলে মিশেৰে ও কোট কোট মৰমাৱীকে হুঃধেৰে লাগে
ঠেলিৱা দেৱ।

মিশর-সুদান-টিউনিসিয়া

আজ প্ৰায় আটবট বংসৰ মিশৰদেশ ব্ৰিটেমের অধীনে
আছে; সেই লগে সুদানেৰে উপৰও কৰ্তৃক বজাৱ হাৰিৱা
চলিৱাহে। বাহাৰিৰ পৰাৱৰ বটে ১৮৯৮ ঈষ্টাবে; তখন
মিশৰকে বাধ্য কৰা হৱ "লব-অধিকাৰ" (condominion)
কীকাৰ কৰিৱা লইৱাৰ কল্যা, বৰিও মিশৰই এই অভিযানেৰে
বাৰ বহন কৰিৱাছিল। প্ৰায় সেই সময়ই কলানী সেনাপতি
মার্চেণ্ট ইংৱেজ সেনাপতি কিচেনাৱেৰে দাপটে ফেলতা
(Fashoda) হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য হৱ। কিন্তু ইংৱেজ
কালকেও চটাইতে চাহিল না। উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ কলানীৰ
অধিকাৰ বিভাৱে প্ৰশ্নৰ দিল।

এই তাৰে একটা কটিলতাৰ সৃষ্টি হইল। ইহাৰ কল আজ
আমরা নকলে ভোগ কৰিতেহি। ১৯০৬ ঈষ্টাবে ব্ৰিটেম
মিশৰকে বাধীনতা দিল। কিন্তু "লব-অধিকাৰট" (condominion)
বজাৱ হাৰিল। আৱাৰ ওলিকে কলানী
সাম্ৰাজ্যবাদ বিতীৰ বিশ্বব্ৰহ্মেৰে কল্যাণে মিশেৰে হুৰ্জল ও
অলহাৱ মনে কৰিতে আৱন্ত কৰিৱাহে। এখন মাকিম ও
ব্ৰিটেমের সাহায্য হাভা তাহাৰ চলে না।

সুতৰাং মিশৰ-সুদান-টিউনিসিয়া সন্নিৱিত ৱাষ্টপুৰেৰে
বিবেচনাৰ বিষয় হইৱা পতিৱাহে। টিউনিসিয়াৰ ৱাজ-
নীতিকেষা আৱব-ৱাষ্টপুৰেৰে বাহিৰে মিশেৰেৰে দাবি-
দাওৱাৰ সমৰ্থনলাভ কৰিৱাৰ চেষ্টা কৰিতেহে। তাহাৱা
বৰিৱা লইৱাহেৰে বে, বৰ্মাৰ বসিৱা পাকিস্থান ত তাহাৰেৰে
পকে আছেই, তাৱতৱাষ্টেৰে সাহায্যও প্ৰয়োজন। সেই
কল্যা টিউনিসিয়াৰ অধিবাসিনী নেতা এল হবিব বোজিবা
এই বিষয়ে চেষ্টা কৰিতেহেৰে। তাহাৰ একধাৰি পদ "স্পট-
লাইটস" (Spot-Lights) পঞ্জিকাৰ সম্পাদকেৰে হাতে
পৌছিৱাহে। তিনি এখন কলানী কাৱাগাৱেৰে বন্দী। তাহাৰ
পৰে তাৱতৱাষ্টেৰে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পণ্ডেৰ
সম্পাদকৰওলীৰ মিকট অনুৰোধ কৰা হইৱাহে বেদ তাহাৱা
তাৱতের জনমতকে তাহাৰেৰে লপকে আৱৰন কৰেন।
পতিত মেজলৰ বিষয়েও বলা হইৱাহে।

আমরা এল হবিবের এই অনুৰোধ সমৰ্থন কৰি। বিদেশী
শাসনেৰেৰে আলা বে হাকে হাকে বুজিৱাহে, তাহাৰ পকে
পৰাধীনতাৰ বিলুপ্তি একান্তভাবে কাম্য। তাহাৰ উপৰ
তাৱতের ৱাষ্টনীতি আজ এক শত বংসৰ হইতে এই অনুপ্ৰেৰণাৰ
চলিৱা ব্ৰিটিশ শাসনেৰেৰে অবলান বটাইৱাহে। তাৱত লকল
বেশেৰে লক্ষ্যকীৰ বুজিৱাৰ অনুষ্ঠ সমৰ্থক।

বাংলার পুস্তক প্রকাশক সমাজ

এই সমাজের কার্যক্রমে বাংলার পুস্তক ব্যবসারে একটা বিশেষ বদ্যাইরা আসিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে হইতে এখন মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের হাতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সকল দায়িত্ব আসিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে নুতন করিয়া গঠিয়া তুলিতে হইবে; তার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষারও পুনর্গঠন প্রয়োজন। এই দুই কাজ একসঙ্গে না করিলে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করিয়া বালক-বালিকার শিক্ষার পোতা ঘুচ না করিতে পারিলে পুস্তকের বোঝা তাহাদের দ্বারা হইতে অসম্ভব হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি অসম্ভব এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পোতা ঘুচ না করিলে দেশের উচ্চশিক্ষার অবস্থার অবসার হইবে; পুস্তক ব্যবসার অগ্রগতি করিয়া চলিতে হইবে। এই ভাবে মানবজীবন এক স্রোত্রে প্রবাহিত।

এই সব কথার মধ্যে নুতনত্ব কিছু নাই, কিন্তু মানব-জীবনের কটনোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। টোল-মন্তব্য ইত্যাদির শিক্ষা বর্তমান জগতের নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাল্যিক সভ্যতার আমলে মানুষ অনেকটা স্বতন্ত্র-চালিত হইয়া বাইতেছে এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ব্যক্তির আত্ম-কর্তৃত্ব আরও সমুচিত হইবে।

এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়া, এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিয়া উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব হইতে রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করেন।

ছাপাখানার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-প্রকাশ এক বিশিষ্ট ব্যবসারে দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে এই ব্যবসারে কতকটা ঠাকা মূলধন রূপে খাটিতেছে তাহার হিসাব দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; তার বাৎসরিক আয় কত ও কত লক্ষ পরিবার এই ব্যবসারের কল্যাণে জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, তাহার একটু বিশদ বিবরণ সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই অবস্থার কলে “বিশ্বভারতী” প্রকাশক সমাজ, এম. সি. সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বড়ী পুস্তক প্রকাশক সমাজ একত্রে করিতেছেন। আচার্য্য বহুনাথ, স্বর্গীয়নাথ প্রভৃতি লাহিড়ীর বিকপালদেব পুস্তক বিজ্ঞের বাবা দিতে বাহাদুর তেঁটা করিবেন, মনে হয় তাহারাই “একত্রে” হইবেন।

এই সমস্যার সমাধান কঠিন নয়। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলী যে সরকারী হয় তাহা প্রমাণ-নাশক। সেইজন্য কোন ব্যবসায়ী সমাজ হাতে এরূপ দায়িত্ব-পূর্ণ কার্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বেতন অস্বীকারী। এই দুই পক্ষের

মধ্যে একটা আপোষ করিতে কেঁ অঙ্গের হইবেন, তাহাই বিবেচ্য। জল যথেষ্ট বোলা করা হইয়াছে, এখন হির-মুড়িতে সমস্তা পূরণ করা কষ্টব্য।

রাজা বর্ষ জর্জ

গত ২৩শে মার্চ ব্রিটেমের রাজা, “কমন্ওয়েলথে”র প্রধান, রাজা বর্ষ জর্জ ৫৭ বৎসর বয়সে মরণগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধা আকস্মিক মর। গত তাল মাসে বধন তাঁহার স্বপ্নের উপর অস্বাভাবিক করা হয়, তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, বর্ষ জর্জের দিন বদ্যাইরা আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশতন্ত্র পরিবর্তন হইল; প্রমিক ব্রিটিশ-মণ্ডলী গিয়া রক্ষণশীল দলের ব্রিটিশ-মণ্ডলী মি: চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত হইল। রাষ্ট্রের পরিচালনে কোন লক্ষ্যের পরিবর্তন দেখা বাইতেছে না। বিলাতের লোকের বাংলার অভাব বিটল না। অন্যান্য বাতজব্য প্রচুর, এবং বিলাতের মন-মাত্রী বাংলার ব্যবহার কদাইতে বাধ্য হওয়ার তাহাদের বাহ্যের কোন অবশ্যক হয় নাই; বরং উন্নতি হইয়াছে।

অপুত্রক রাজার প্রথম কত। রাজকুমারী নির্মিয়ে ব্রিটেমের রাণী হইয়াছেন; কমন্ওয়েলথে প্রধান হইলেন। তাঁহার পিতার সময়ে সর্কাপেকা বিপ্লবকারী ঘটনা হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯০৯-৪৪), যেমন তাঁহার পিতামহের সময়ে ঘটাইছিল প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)। এই দুই ঘটনার প্রায় সারা ইউরোপ বড় হইতে রাজতন্ত্র (monarchy) মুক্ত হইল। রাশিয়ার কার, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার কাইজার, তুরকের সুলতান বরাপূর্ত হইতে মুছিয়া গেলেন। কেবল রাহিলেন ব্রিটেমের রাজবংশ ব্যতি দিবার ভর। এই বিষয়টি একটা আলোচনার বিষয় হইয়াছে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে। তাহার সমস্ত ভেদ করিবার নানা সুক্তির অবতারণা করা হয়। তার মধ্যে প্রধান হইল ইংরেজের রক্ষণশীলতা। ইংরেজী ভাষাতারী মাকিনীরা পর্যন্ত লভনে আসিলে রাজা বা রাণীর সঙ্গে দেখা করিবার ভর ঠেলাঠেলি করে।

এই সমস্ত আর কতদিন টিকিবে তাহা ইতিহাস বলিতে পারে। ইংরেজের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, তাহাদের বেশে বধন রাণীর আবির্ভাব হয় তখন দেশের সমস্তি কাপিতা উঠে যেমন উঠিয়াছিল রাণী এলিজাবেথের সময়, রাণী ভিক্টো-রিয়ার সময়। রাজা বর্ষ জর্জের কত। দ্বিতীয় এলিজাবেথ নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

তাঁহার পিতৃবিরোধে আরও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি, এবং পণ্ডিত বিধানের সাপেক্ষ হইয়াও তাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। আমাদের পক্ষ হইতে আত্ম-ষ্ঠানিকভাবে বাহা করা হইতেছে তার মধ্যে একটু আত্মশয্য থাকিতে পারে, অন্যায় কিছু নাই।

সংশোধন

পুলনা দৌলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল হাঙ্গ, এম-এ নিরলিখিত সংশোধন পত্রটি পাঠাইরাছেন। আমরা তাঁহাকে বক্তব্য জানাইতেছি :

“আপনি লিখিয়াছেন যে “মহাত্মশান কাব্য কবিবালার হাসান হোসেনের হস্তাকৃত অবলম্বন করিয়া লিখিত। একদা ‘বিবাহসিন্ধু’ রূপের বহু পৃষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কারকোবাদের ‘মহাত্মশান’ কাব্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই চিত্র বর্তমান যুগের ভারতীয় মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। হাসান-হোসেনের বিবাহময় কাহিনী বাণীতে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার নাম ‘মহত্ম শানক’ বা ‘আত্মবিসর্জন’ কাব্য; ‘মহাত্মশান’ নহে। মহাকাব্য ‘মহাত্মশান’ পানিগণের তৃতীয় বৃহৎ অবলম্বনে লিখিত। এক দিকে আহমেদ শা-আবদালী ও অত দিকে বিপুল মহারাষ্ট্র শক্তি; এই দুটিকে অবলম্বন করিয়াই কবি মহাত্মশান রচনা করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় মুসলমান বীরপুরুষদের শৌর্যবীর্যের শেষ অস্বিকৃত বলিয়া ইহার নাম মহাত্মশান।”

বাঁকিপুরের সদ্য অহুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আমরা বাংলাদেশে শিশু সাহিত্যের প্রবর্তক জরের নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহাদের নাম প্রবাসচরণ সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

বসন্তকুমারী হোম

যে প্রাণবর্তী সংকতি ভারতবর্ষে এখনও চলিতেছে, তার প্রতি বিরূপ হইয়া কেন আমাদের মধ্যে সন্ন্যাসীর প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল তাহা ভারত-ইতিহাসের অজ্ঞাত রহস্য। বসন্ত-কুমারী হোম এই প্রাণবর্তের সাধনে মিরত থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জীবনে এমন করিয়া পরকে আপন করিয়াছিলেন, হৃদয়ে নিকটে আনিতে পারিয়াছিলেন। ইহা কথায় কথায় নয়। ইহা তাঁর প্রকৃতিগত গুণ, বংশগত ঐতিহ্য।

এই গুণের প্রকাশ পাইয়াছিল বসন্তকুমারীর পিতা কালীনাথ বসু মহাশয়ের মধ্যে। এই লোকটি ছিলেন রাজ-সাম্রাজ্য বহুর শিষ্য, দারকানাথ বিদ্যাহরণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, হর্ষানন্দোহন দাশ, আমলবোহন বসু, দারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি বাবার প্রভাবমণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অজ্ঞাত। বোড়াল-মন্ডল-পুর, জগদগর, চিংড়িপোতা, হরিমান্তি সন্ন্যাস একত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অকলমে মধ্যবয়সে পীঠস্থান বলিলেও অত্যাতি হইবে না। সেইকালে বসন্তকুমারী হোমের নিকট বলিলে কথাজলে তাঁহার নিকট অনেক ভাষ্য পাওয়া যাইত বাহা শিকা-প্রতিষ্ঠানেও

পাওয়া কঠিন। অনেক পদেবক তাঁর নিকট গণি। সেই গণ প্রকৃতি বীকার করা উচিত।

তাঁহার বাবী গণনাজে হোম ছিলেন সুন্দরীমোহন দাশ, বিশিষ্ট পাল, ভারতকিশোর চৌধুরী (সত্যনাথ বাবাকী) প্রভৃতির সহকর্মী। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদের শিষ্যে বরণ করিবার ভর বে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন অগ্নিসাকী করিয়া তাহা জীবনের নামা কেহে তাঁহারা পালন করিয়াছিলেন। অতিথি-বংসল বলিয়া তাঁহার ব্যাতি ছিল। তিনি “সঞ্জীবনী” পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

বসন্তকুমারী ৭৭ বংসর বয়সে তাঁহার প্রাণিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত আমরা শোক করিব না। তাঁহার পুত্রকর্তার উদ্দেশে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

চারুচন্দ্র দত্ত

গত ৮ই মাঘ জীবনবিদ্য আশ্রমের কেন্দ্র পণ্ডিতাঙ্গী মঙ্গলীতে জন্মের ক্রিয়া বহু হইয়া চারুচন্দ্র বসু পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। বিপ্লবী রূপে অরবিন্দের সহকর্মী, সাধনমার্গে জীবনবিদ্যের শিষ্য এই ইহা ভাব ও কর্মের সমন্বয় সৃষ্টি দেখি-রাহি আমরা চারুচন্দ্রের জীবনে।

তাঁহার আর একটা পরিচয় ছিল। তিনি সাহিত্যরসিক, বাংলা ভাষার তাঁহার আশ্রয়িত “পুরানোকথা”র সেই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন মজলিশী লোক, রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তিনি যে প্রশংসা লাভ করেন তাহা অনেকের স্মরণীয়।

তাঁহার পিতা কালিকান্দাস বসু কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। চারুচন্দ্রের জীবন-স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কেন লিখিল সার্বিস পত্রিকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জনের ভর নর বা রাজসম্মানের ভর নয়, কিন্তু এই উচ্চপদের দৌলতে নামা গোপন সন্ধান লাভ করিয়া বিদেশী শাসনব্যবস্থাকে বিকল করিতে পারিবে এই ভরসার চারুচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করেন। এই কুটিল পথে চলিবার সাহস বা শক্তি সকলের থাকে না। থাকিলেও বেশী দিন উচ্চপদ, প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলে, কালেমাহুয পথভ্রষ্ট হয়। চারুচন্দ্র সেই ভাগ্য-বাহকের একজন যিনি হর্গর পথে চলিয়াও কখনও প্রতিশ্রুত হন নাই। চারুচন্দ্র এই সবই হাসিমুখে লব্ধ করিয়াছিলেন।

জীবনের সারাংশে তিনি এই পথ অতিক্রম করিয়া বিপ্লবী যুগের সহকর্মীর হাত ধরিয়া, তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তৃততার লোকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বসু অব্যাহত-ব্যাব্যাহত পুণ কই দেখিরাহি। “দ্বিবা জীবন” (Life Divine) নামক পুস্তকের অস্থাবর তাহার নিদর্শন।

এই বাঙালী প্রবাসের তিরোবানে আমাদের সন্ন্যাস বে কতিপয় হইল তাহা অগুণীত। আমরা তাঁহার পুত্র ও পত্নীর উদ্দেশে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ

ঐবিধুশেখর ভট্টাচার্য

উপক্রমণিকা

শোনা বাইতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতক পরিবর্তন আসন্ন, এবং সংস্কৃত বিভাগেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা বাইতে পারে। আমি এক জন সংস্কৃতানুরাগী ও আত্মীবন সংস্কৃতির ছাত্র; অবসরপ্রাপ্ত আন্ততঃ সংস্কৃতাদ্যাপক ও সংস্কৃতবিভাগের অধিনেতা বলিয়া তাহার সহিত আমার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও আছে। তাই এই সময়ে ইহার সম্বন্ধে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমি কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অমূল্য ব্যক্তিবর্গ ও কর্তৃপক্ষ ইহা এক বার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

সংস্কৃত মূলত বঙ্গিও এই ভারতের ভাষা, তথাপি আর ইহা নিজের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। পৃথিবীতে অগ্রগামী দেশসমূহের অনেকের মধ্যে ইহা বর্তমানে সাদরে অধীত হইয়া থাকে, এবং ইহার বিবিধ বিষয়ে যে বিপুল আলোচনা ও অধ্যয়ন হইয়াছে তাহা কোন অভিজ্ঞ সংস্কৃত-বিদই অবজ্ঞা করিতে পারেন না।

শিক্ষাপদ্ধতি

বৎসর পঁয়ত্রিশ হইবে স্বর্গীয় মহাশয় আশুতোষ বখশ এই বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন, স্পষ্টতই মনে হয়, তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, একমাত্র প্রাচীন বা নবীন পদ্ধতিতে কাজ করিলে চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়ই পদ্ধতিকে বখাৰথ ভাবে স্থান দিতে হইবে। এইজন্য সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের স্থায়ী স্থপতি প্রতীক্সান থাকিলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগটি যোগ করেন, এবং দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপককে নিযুক্ত করেন; প্রথম, প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত, ইহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন কতক ইংরেজীজ্ঞ অর্থাৎ সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ। ইহাদের ইংরেজী জানায় মনে করা হইয়াছিল যে, ইহারা বর্তমান বা নবীন পদ্ধতির সহিত পরিচিত আছেন, অথবা ক্রমে ক্রমে শীঘ্রই পরিচিত হইয়া উঠিবেন, অথবা এই পদ্ধতিতে উপলব্ধ তত্ত্বসমূহকে ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবেন। মনে হয় এই দ্বন্দ্বই প্রথম-প্রথম এই শ্রেণীর শিক্ষকগণের কাজ খুবই লঘু ছিল। শুনিয়াছি সপ্তাহে এক বা দুই ঘণ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে পড়াইতে হইত। মহাশয় আশুতোষের প্রতিপ্রায় ছিল যে, প্রথমে শিক্ষকেরা নিজের প্রগাঢ়

অধ্যয়নের দ্বারা নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া, বিশেষত বর্তমান পদ্ধতিতে ও গবেষণায় সংস্কৃত ও সংস্কৃত-সম্বন্ধ অত্যন্ত বিষয় অধিগত তত্ত্বসমূহ পরিচিত হইয়া ছাত্রগণকে যথোচিতভাবে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

মহাশয় আশুতোষ এই ব্যবস্থা করিয়া মনে-মনে আশা করিয়াছিলেন যে, অল্পকোঁর্ড হইতেও ছাত্রেরা সংস্কৃত পদ্ধতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবে। কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ তো হয়ই নি, হইবারও কোন লক্ষণ দেখা বাইতেছে না।

শিক্ষার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

আমাদের ছাত্রগণকে সাধারণত বর্তমান গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত পরিচিত করা হয় না। ইহার প্রধান কারণ, যে সকল শিক্ষক প্রধানভাবে এই বিভাগের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং মনে করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বর্তমান পদ্ধতির সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সেরূপ হইলেন না, বা সে বিষয়ে চেষ্টাও করিলেন না। ফলে দেখা গেল যে, প্রাচীন ও নবীন শিক্ষকগণের মধ্যে বস্তুত তেমন কোন ভেদ থাকিল না। আমার মনে হয়, ইহাদের অনেকেই এ প্রস্নে এক-বারে উদাসীন। সত্য কথা বলিতে হইলে, বর্তমান পদ্ধতি থাকুক প্রাচীন পদ্ধতিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক অঙ্গসরণ করা হয় না।

সংস্কৃতে অভিজ্ঞতার জন্য প্রাকৃত অপরিহার্য। প্রথম আরম্ভ হইতেই মহাশয় আশুতোষ সংস্কৃত বিভাগে প্রাকৃতের অধ্যয়ন প্রবর্তিত করেন। ঐ সময়েও তাহা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের কাব্যগত ও সাহিত্যিক উচ্চ উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা আলোচনা করিব। সম্প্রতি বহু স্থলেই, বহু টোলেই বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত সংস্কৃতবিদগণের নিকটে প্রাকৃত অত্যন্ত অবজ্ঞাত হয়, কিন্তু প্রাচীন অধ্যাপকগণের নিকট এরূপ হইত না। মহাকবি প্রবর সেনের সেতুবন্ধ, এবং সাত বাহনের পাখা সপ্তশতীর প্রশংসা না-করিয়া বাণভট্ট নিজের হর্ষচিত্রিত আরম্ভ করিতে পারেন নি। এ দুইখানই প্রাকৃতে রচিত। স্থপতি হুবহু বা সর্বদত্তা, বাণভট্ট হর্ষচিত্রিত, দত্তী কাব্যদর্পে, তখনকার

দশরূপকে গুণাত্মক বৃহৎকথার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহা পৈশাচী-নামক একরূপ প্রাকৃতের রচিত হইয়াছিল। চূর্তাগাবশত ইহার মূল আজ লুপ্ত, কিন্তু ইহার তিনখানি প্রাচীন সংস্কৃত অস্থান আছে। যথা সোমদেবভট্টের কথাসরিৎসাগর, হেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, ও বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথামোক্ষগ্রন্থ। প্রাকৃতের জ্ঞান না থাকিলে পূর্বে কেহ সংস্কৃতবিদ্ বলিয়া গণ্য হইতেন না। অতি স্পষ্টতই দেখা যায় পূর্বে সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতও অবশ্যপাঠ্য ছিল। সকলেই জানেন, সংস্কৃত নাটক বা দৃশ্য কাব্যগুলি কেবল সংস্কৃতেই নহে, কিন্তু অংশত প্রাকৃতের অথবা স্থানে স্থানে বিবিধ প্রাকৃতেরও রচিত হইয়া থাকে। সাহিত্যদর্পণের রচয়িতা বিশ্বনাথকবিরাজ “সাহিত্যার্থবর্ণধার” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি আঠারটি ভাষা জানিতেন, এই ভাষাগুলির মধ্যে একটি সংস্কৃত এবং অবশিষ্ট সাতেরটি হইতেছে বিভিন্ন প্রাকৃত। বিশ্বনাথ ইহাকে কবি অনোচিতরূপে বর্ণনা করিয়া নিজেকে বলিয়াছেন “অষ্টাদশ ভাষা বারবিলাসিনী তুচ্ছ।” তাহার পিতা ভাষাৰ্ণবের রচয়িতা নানাবিধ প্রাকৃতের অভিজ্ঞ ছিলেন (“সবভাষা চতুর”—সর্বভাষা চতুর)। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈয়াকরণ-গণ প্রাকৃত ব্যাকরণও রচনা করিতেন। যেমন হেমচন্দ্র ক্রমদীপকর, ও পুরুষোত্তম। ইহাদের প্রাকৃত ব্যাকরণ এখনো প্রচলিত আছে, ছাপাও হইয়াছে।

আমাদের অলঙ্কার গ্রন্থগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, প্রাকৃত না জানিলে অলঙ্কারও ভাল করিয়া জানা হয় না। কোজেরসরস্বতীকণ্ঠভরণখানি দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কিছুদিন পূর্বেও এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

প্রাকৃতের প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না। প্রাকৃত ফিকিয়ার্জও না জানিলে কেহ অতি বড় বৈদ্যাস্তিক বা মীমাংসক হইতে পারেন, কিন্তু হয়তো একথা ভুলিয়া কেহ-কেহ বিস্মিত হইতে পারেন যে, প্রাকৃত না জানিলে কোন সংস্কৃতবিদ্ সংস্কৃতবিদ্ নহেন, কেননা এইরূপ ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে বা অর্ধাংশভাবে বহু কথাই ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। ইহারা অনেক সময়ে “আর্থ প্রয়োগ” বা “ছান্দস” বলিয়া এই সব প্রশ্নকে এড়াইয়া বাটবার চেষ্টা করেন।

অভিজ্ঞগণ জানেন যে, এমন কি ঋগ্বেদেরও ভাষায় বহু প্রাকৃত প্রভাব আছে, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির ভাষায় তো কথাই নাই। মহাকাব্যগুলিরও মধ্যে ইহা প্রচুর।

অযুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহের পাঠ

এই প্রসঙ্গে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক শ্রেণীতে আমাদের দৃশ্যকাব্যগুলিকে যে প্রাণালীতে পড়ান হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক মনে করি। দেখিতে পাওয়া যাইবে, শিক্ষকেরা নাটকের মূল প্রাকৃত অংশ পাঠ করিয়া শিক্ষা দেন না, তাঁহারা ছাত্রগণকে সংস্কৃতের ছায়া শোনাইয়া থাকেন। ইহা স্পষ্টতই বহুস্থলে শিক্ষকের প্রাকৃতের প্রতি অবজ্ঞা সূচনা করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, যদিও ছাত্রগণ খুব ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যখন তাহারা ভবিষ্যতে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয় তখন ঐ বিষয়টিকে ভাল করিয়া পড়াইতে পারে না। এইরূপে এমন একটি ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় বাহাতে মোটের উপর সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষতি হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, বাহা বা তাহা যদি তা না থাকে, তবে তাহার নিজের গুণও থাকে না। দুধ যদি দুধ না থাকিয়া দই হয়, তবে উভয়েরই স্বাদ প্রভৃতি ভিন্ন হয়, দুধের স্বাদ দইএ থাকে না। এইরূপ প্রাকৃতকে যদি সংস্কৃতে পরিবর্তন করা হয় তবে প্রাকৃতের বাহা কিছু রমণীয়তা ও মাধুর্য সবই নষ্ট হইয়া যায়। এই গুণ কথায় বর্ণনা করা যায় না, অভিজ্ঞ ও মর্মজ ব্যক্তিই ইহা অনুভব করিতে পারেন; যেমন দুধ, চিনি ও মধুর মাধুর্য কেমন ইহা কেহ কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, আশ্বাদন করিয়াই বুঝিতে হয়। বাহ্যিক ভয়ে আমি একটিমাত্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাঠকগণের অধিকাংশ প্রাকৃতের সহিত পরিচিত নহেন এই আশঙ্কায় আমি এখানে বিস্তারিত একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

“আজু রজনী হাম ভাগে গোহারনু পেখনু শিরমুখ চন্দা,
জীবন বোবন সকল মাননু দশ দিশ তেল নিরদন্দা।
আজু মনু গেহ গেহ করি মাননু আজু মনু গেহ তেল দেহ।
আজু বিহি মোরে অনুরুল হোরল টুল সব সন্দেহ।

ইহার সংস্কৃত ছায়া এই—

অন্য রজনী মহা ভাগের প্রভাতসংসারনু প্রৈকে শিরমুখ চন্দ্রনু।
জীবন বোবন সকল মনালনু দশ দিশো তুতা নির্দন্দা।
অন্য মন গেহ গেহমাননু অন্য মন দেহো তুতো দেহঃ।
অন্য বিধিনে হনুকুলো কুতকুটিতঃ সর্বসন্দেহঃ।

পাঠকগণ বিস্তারিত মূল ও সংস্কৃত ছায়ার ভেদ নিজেই অনুভব করিয়া দেখুন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে সাধারণ চারী স্ত্রী-পুরুষদের কথায় যে অতিগ্রাম্য ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের অতি উচ্চ ভাষা বসাইলে যে দৃশ্য হইবে, সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের স্থানে সংস্কৃত

বসাইয়া পাঠ করিলে তাহাই হয়। পাঠকগণ এখন মূল ও ছায়ায় ভেদ নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতের এই অবস্থার মধ্যে বধন দেখিতে পাই যে, সঙ্কলিত নূতন পাঠ্যসংক্ষেপে (Syllabus) প্রাকৃতকে সংস্কৃতের সমস্ত ছাত্রের জন্য অবশ্যপাঠ্য না করিয়া ঐ স্থানে ভারতীয় অর্থনীতিক (general principles of Indian politics) বসান হইয়াছে, তখন নিতান্ত বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। ইহা উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদেশেও এই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রাকৃত অবশ্যপাঠ্য।

প্রাকৃতকে অবশ্যপাঠ্য না করায় আমাদের অধিকাংশ ছাত্রের নিকট মহাবস্তু, ললিত বিস্তু, ইত্যাদি বহুবহু বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও অশ্বশাসন প্রভৃতি একবারে অবোধ থাকিয়া যায়। জৈনগণের আগমগুলিরও সম্বন্ধে এই কথা, কেননা এগুলিও প্রাকৃতে রচিত। অতএব এ ব্যবস্থা আমাদের নিতান্ত ক্ষতির জন্য, লাভ ইহাতে কিছুই নাই। তাই ইহা কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। সকলে ইহা শাস্ত ও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বৈদিক সাহিত্য

ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সাহিত্য শিখাইবার বিধান করা হইয়াছে। প্রথম হইতেই ইহা আছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে এখান হইতে এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যাহাকে বৈদিক পণ্ডিত বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারা যায়। শ্রদ্ধাঙ্গদ স্বর্গীয় সত্যজিত স্যামশ্রী মহাশয়ের পর বঙ্গদেশে আর কাহাকেও তাঁহার স্থানে দেখা গেল না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন ছাত্র নিতান্ত দুর্লভ, যে সংহিতা পাঠ হইতে পদপাঠ, বা পদপাঠ হইতে সংহিতাপাঠ করিতে পারে। অথবা যে ঋগ্বেদের এক পঙক্তিও বখোচিত স্বরসংযোগে উচ্চারণ করিতে পারে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ই ভারতের, বিষয়ও ভারতের নিজের, আর ব্যয়ও কিছু কম হয় না।

নবীন ব্যাখ্যা

আমরা ভারতীয়েরা নিজে বেদের কীরূপ ব্যাখ্যা করি তাহা প্রথমে আমাদেরকে অবশ্যই জানিতে হইবে। আমাদের ছাত্রেরা নিষ্ঠার সহিত ইহা করুক। কিন্তু তাহাদিগকে আরও কিছু করিতে হইবে, অন্তথা চলিবে না। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা কোন কথা সম্বন্ধে

নূতন কি বলিতেছেন সেই সম্বন্ধে একবারে অজ্ঞ হইয়া থাকিলে চলিবে না, চলিতে পারিবে না। কোন ব্যাখ্যাকে কেহ সত্য বলিয়া সব সময়ে গ্রহণ করিতে বা না করিতে পারেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কে কি বলেন তাহা প্রথমত জানিতে হইবে, তাহার পর তাহা গ্রহণ করিবেন, অথবা উপযুক্ত যুক্তির উপস্থানে খণ্ডন করিবেন।

বৈদিক যজ্ঞের ভাব

সংস্কৃত বিভাগের সমস্ত ছাত্রেরই, বিশেষত বৈদিক বর্ণের ছাত্রদের জন্য ঋগ্বেদের বহু অংশ অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার সহিত সাধারণ চার্বের ভাষ্যও পাঠ্য। ইহাতে নানা বাগবজ্ঞের কথা আছে। এই বাগবজ্ঞের সম্বন্ধে ছাত্রেরা বাহাতে একটা সাধারণ ভাব পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগে কতকগুলি যজ্ঞম-পাত্র সংগৃহীত করা হইয়াছে, বাহাতে অধ্যাপক উহাদের সাহায্যে ছাত্রগণকে বড়টা সম্ভব কতকগুলি ব্যাখ্যান দিতে পারেন। এই বিভাগে এইরূপ উপযুক্ত অধ্যাপকেরও অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাখ্যান দেওয়া আর হয় না। যে অবস্থা দেখা বাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অবিলম্বে ঐ যজ্ঞ পাত্রগুলিকে সংস্কৃত বিভাগ হইতে নূতন বিভাগে লইয়া গিয়া রাখা করা হইবে।

অবেস্তা

সংস্কৃত বিশেষত বৈদিক সংস্কৃত ও অবেষ্টার পরস্পর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রগণ অবেষ্টার ভাষার দিকে চোখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে না। এই জ্ঞানকে বৎসর পূর্বে অবেষ্টার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বৈদিক (অর্থাৎ বি) বর্ণে পাঠ্য করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা গেল যে, পরিবর্তিত পাঠ্যসংক্ষেপে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কেবল ছাত্রগণের প্রভূত ক্ষতি করা হইল। অন্যান্য ঘটনার সহিত ইহা বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত বিভাগ বিপরীত গতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা ভারতীয় বা ভারতীয়, আর্য বা স্লেজ, এইরূপ চিন্তা বা তদনুসারে কার্য কখনো প্রেরণের নহে, ইহা আত্মঘাতী। অন্তত আমি ইহা বুঝিতে পারি না ভাষা হিসাবে অবেষ্টা পড়িলে কিরূপে তাহা সংস্কৃতের বা সংস্কৃত-ছাত্রের ক্ষতি করিতে পারে।

পাঠ্যসংক্ষেপ (Syllabus)

এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও, বহু পরিবর্তন আবশ্যক

হইলেও সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) বেদান্ত। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বেদান্তের বহিঃ ও বিবিধ সম্প্রদায় আছে, এবং তাহাদের সমস্তই অল্পপেক্ষীয়, তথাপি কেবল শঙ্কর ও রামানুজের ইমত আলোচ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ মাত্র নাই। ইহার কলে এই হয় যে, ছাত্রেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ের আলোচনা হইতে বঞ্চিত হয়।

(খ) বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়। বর্তমান ন্যায় বৈশেষিক-বর্গে অতি সুস্পষ্ট ত্রুটি এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়কে একবারেই অবজ্ঞা করা হইয়াছে, ইহাদের নামও করা হয় নি অথচ ভারতের ন্যায়শাস্ত্রে বৌদ্ধ ও জৈনের দান সামান্য নহে। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, কোন ভারতীয় ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় তর্ক-শাস্ত্র পড়িয়া ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানিবে না।

(গ) সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাঠ্য-সংক্ষেপে বহিঃ ও বড় বড় কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রষ্ট অনেকেই জানেন যে, ব্যাকরণের পড়ান মোটেই সম্ভাব্য নহে। যে প্রণালীতে ইহা পড়ান হয় তাহাতে ইহা সম্ভবও নহে। ইহাতে বহু বক্তব্য আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটি মাত্র কথা এখানে বলা বাইতে পারে। আমার মনে হয়, আলোচ্য ত্রুটিটি ততটা আর কিছুতে নহে বতটা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে। অতএব কর্তৃপক্ষ ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন যে, বর্তমান পাঠ্য স্থলে কা শি কা কে দিলে চলে কিনা। কা শি কা র সাহায্যে পা পি নি র স্ত্র পড়িলে ছাত্রেরা তাহার প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত হইতে পারিবে এবং ইহাতেই দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহজে পা পি নি ব্যা ক র ণ কে তাহারায় আরম্ভ করিতে পারিবে। ইহাকে তাহারায় কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। কেননা ইহা কেবল ব্যাকরণ নহে, ইহা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি বিবিধ চূর্ণ ও জাতব্য বিষয়সমূহের আকর।

পাঠ্যসংক্ষেপ সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা বাইতে পারে। ইহা রচনা করিবার সময়ে পাঠ্য পুস্তকসমূহের তালিকা সকল অশেখা পাঠ্য বিষয়গুলিই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য মনে হয়। ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই বেশী উপকার হইবে। বর্তমানে ইহা হয় না। ইহা বলা বাহুল্য যে, পাঠ্যসংক্ষেপ করিতে, বিশেষত দার্শনিক বিষয়সমূহের সম্বন্ধে বহিঃদর্শীর মহাশয় প্রজ্ঞা না থািলে র পুস্তিকা-

খানিকে *Syllabus of Indian Philosophy in the University*) আদর্শরূপে অনুসরণ করা হয়, তবে প্রকৃত উপকার হইবে।

সংস্কৃত সম্পর্কে তিব্বতী ও চীনা

মহাশয় আ ও তো য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী ও চীনা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এক জন সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে আমি এখানে পুনর্বীর তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। আমাদের সংস্কৃতের যে ধনকোশ নষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবশত আজ প্রধানত তিব্বতী ও চীনা ভাষাতে আছে, তাহার পুনরুদ্ধারের বীজ তিনি ইহার দ্বারা এখানে বপন করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের এই কথা সাধারণত অনেকেই জানেন না। কিন্তু যদি কেহ বৌদ্ধ ত্রিপিটকের চীনা অনুবাদে গ্রন্থসূচী (*Bunio Nanjio's Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, Oxford, 1883) ও পি. কর্দিয়ের রচিত তিব্বতী ভাষায় প্রধানত সংস্কৃত হইতে অনূদিত বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের সূচী (*P. Cordier's Catalogue of the Tibetan Kanjur and Tanjur—Catalogue du fonds tibetan du la Bibliotheque Nationale, Paris 1909, 1915*) এই দুইখানি পুস্তকের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তবে অতি সহজেই এই বিষয়টি জানিতে পারিবেন। তিব্বতীতে যে কেবল বৌদ্ধ বা ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থেরই অনুবাদ হইয়াছে তাহা নহে, বহু-বহু অন্যান্য গ্রন্থকেও অনুবাদ করা হইয়াছে। যেমন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি। যথা যে ঘনুত, কা ব্যা দর্শ, পা পি নি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যত দিন আমাদের লুপ্ত গ্রন্থসমূহ, বাহা তিব্বতী ও চীনায়া এখনো পাওয়া যায়, পুনরুদ্ধৃত না হয়, বা অনুবাদ প্রকৃতির দ্বারা ইহার আলোচ্য বিষয়কে প্রকাশ করা না হয় কোন ভারতীয় তত দিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। একাজ খুব শক্ত, সম্ভব নাই, কিন্তু অসাধ্য নহে। বর্তমান পণ্ডিতগণের পরিশ্রম দেখাইতে পারিয়াছে যে, ইহা কতদূর সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এখানে বহু বহু কৃত অ ভি ধ র্ম কো শ কে পূর্নে সাহেব (*Lois de la Vallee Poussin*) প্রধানত তিব্বতী ও চীনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বেভাবে ফরাসী ভাষায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে পারা যায়।

অতএব ইহা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য যে, আমাদের লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পাঠশালা বা টোলের ছাত্রগণকে একপভাবে স্বযোগ সুবিধা দিয়া উৎসাহিত করা বাহাতে তাহারায় ঐ কার্যে

প্রবৃত্ত হয়, আর তজ্জন্য সংস্কৃতের যোগে চীনা ও তিব্বতী অধ্যয়ন করিতে উৎসাহের সহিত লাগিয়া যায়।

পুনর্বার আমি এখানে মহাশয় আশুতোষকে স্মরণ করিতেছি, কেন না তিনিই নিজে এই জাতীয় কার্য প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ করেন। গত ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক লেভি সাহেব (Prof-Sylvain Levi) শান্তিনিকেতনে অধ্যাপিত (visiting) অধ্যাপকরূপে আগমন করেন। সেই সময়ে সেখানে বিশ্বভারতী বথাবিধি স্থাপিত হয়। মহাশয় আশুতোষ তখন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়কে তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন। ইনি ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করিতেন, অধ্যাপক লেভি তাঁহাকে নিজের সঙ্গে স্বদেশে লইয়া বান এবং বিশেষ ভাবে চীন ভারতীয় বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করেন। মহাশয় আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার অধ্যয়ন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু সেখানে দুইখানি চীন-ভারতীয় অভিধানের সংস্করণ করেন। এই দুইখানিই প্রধানত সংস্কৃত পাঠার্থী চীনা পাঠকদের জন্য। ইহাতে সংস্কৃত শব্দের চীনা অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারতীয় পাঠকেরও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। এই পুস্তক দুইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বলিয়া প্যারিস হইতেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাদের একখানির নাম ফান-য়ু-ং-স-মিউ, ইহার রচয়িতা নি-য়েন। অপরখানির নাম কান-য়ু-ং-সি-ল-সেউ-বে-ন। ইহার প্রণেতা সি-ং-সি।

ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ আরও একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রণয়ন করেন। *Le Canon Buddhique en (hine)*। ইহাতে চীনের বৌদ্ধ সাধকগণের বিবরণ আছে। ইহাও প্যারিস হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা এখানে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের প্রাচীন অলুপাদ ও শত শত বৎসর ধরিয়া ঐ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা মনে করিতে পারি। ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু তথাপি ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি ইহা সেই সময়ে সম্ভব হইয়াছিল, আজকাল কেন তাহা না হইবে। চীন, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা যদি সংস্কৃত শিখিয়া নিজ নিজ ভাষায় অত সংস্কৃত গ্রন্থ অলুপাদ করিতে পারেন, তবে বর্তমানে ভারতীয়েরা কেন সেইরূপই কাজ করিতে পারেন না।

ইহা বলাই বাহুল্য, এই কার্যে সরকারের মুক্ত হস্তে দান ও লাহায্য নিত্য আবশ্যক। অল্পখা কোন বিশেষ

চেষ্টা করা অসম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দিকে কোন অলুপাদ দেখা যায় না। কিন্তু দেশ বধন স্বাধীন তখন এ অবস্থাকে আর দীর্ঘদিন থাকিতে দেওয়া যায় না।

তিব্বতী ও চীনা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা

আমরা জানি, কিছু দিন হটল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বার তিব্বতী ও চীনা ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই, ইহা ভাল। আমার মনে হয় প্রধানত ইহা রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য অথবা এইরূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতাহুবাগী ব্যক্তিবর্গ বতর্কণ চীনা ও তিব্বতী হইতে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহকে পুনরুদ্ধার করিতে না পারিতেছেন তত দিন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন না। সংস্কৃত বিভাগের ইহা একটা বিশেষ কাৰ্য হওয়া উচিত।

সতর্কীকরণ

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থসমূহের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সাংখ্যাই সংস্করণের চীনা ত্রিপিটিকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রন্থকে পোকা ও উই কাটিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। পরে আবার যখন ধারণা ভবনের এক অল্লালোক ঘরের মধ্যে রক্ষিত কাঠফলকে মূদ্রিত (Xylographs) ও বহু হস্তলিখিত তিব্বতী গ্রন্থগুলিকে হুবিদ্যন্ত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থার জন্য আমাকে ভার দেওয়া হইয়াছিল, তখন সেগুলিকে ভাল অবস্থায় দেখা যায় নি।

এখানে ইহা বিশেষ ভাবে বলা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতী গ্রন্থসংগ্রহটি অতি দুর্মূল্য ও অতি দুর্লভ, বিশেষতঃ প্রজ্ঞাপারমিতা কয়েকখানি পুস্তক। এগুলি সোনালী ও রূপালী কালিতে তহুচিত কাগজে লিখিত। এগুলি প্রদর্শনের বস্তু। দেখিলে চোখ সার্থক হয়। এগুলি একবার কোনরূপে নষ্ট হইলে পুনর্বার পাওয়া সম্ভব হইবে না।

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের সংগৃহীত তিব্বতী গ্রন্থগুলিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রহিয়াছে। মহাশয় আশুতোষ ই এসব সংগ্রহ করাইয়া ছিলেন।

বিদ্যার রক্ষা

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিতে পারা যায়। ইহা এই যে, যদি কোম নিত্য আবশ্যক হইলেও অতি-অবজ্ঞাত বিদ্যাকে কেহ বিদেশ হইতে উপার্জন করিয়া

বশেষে আনয়ন করে তবে যতদূর সম্ভব সর্ববিধ উপায়ে তাহাকে রক্ষা করা উচিত, বাহাতে পুনর্বীর কাহাকেও তাহার উপার্জনের জন্য দেশান্তরে গমন ও তাহাতে নানাবিধ ক্লেশ ও অর্থব্যয় বা কালক্ষয় না করিতে হয়, দেশের যে কেহ চাহে অনায়াসেই তাহা পাইতে পারে। বিদ্যার রক্ষা বলিতে, যে ব্যক্তি বিদ্যা উপার্জন করিয়া আনিয়াছেন তাহাকে এমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বাহাতে তিনি নিজের ছাত্রকে উপার্জিত বিদ্যা দান করিতে পারেন, এবং এই ছাত্রও নিজের ছাত্রকে ইহা অধ্যয়ন করাইতে পারেন, বাহাতে এইরূপে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুন্নত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই সংস্কৃত বিভাগেরই একটি ভূত-পূর্ব ছাত্র এইরূপ আছেন। ইনি সংস্কৃতে এম-এ, এবং সরকারী বৃত্তি লইয়া চীনে বান। দশ বৎসর চীনা শিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ইহার আছে। চীনা সংস্কৃতে ইনি কিছু কাজও করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে কাজে লাগাইলে লাভবান হইবেন।

চীনা-সংস্কৃত-চর্চা

চীনা-সংস্কৃত-চর্চা সম্পর্কেও মহাশয় আশুতোষের চিন্তা ও কার্য উল্লেখ করা বাইতে পারে। জাপানের অধ্যাপক বমকমিগেনে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ও জাপানী মূল অবলম্বনে কতগুলি ব্যাখ্যান করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার ব্যাখ্যানগুলি "Systems of Buddhist Thoughts" এই নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে (১৯১২)।

তিব্বতী-সংস্কৃত-চর্চা।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতী-সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ উৎসাহের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি তিব্বতী-সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেমন ডক্টর শ্রী অম্বু কুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় কাব্যাদর্শ (মূল সংস্কৃত ও তাহার তিব্বতী অম্বুবাদ); শ্রী দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জিতারির হেতুতত্বোপদেশ (পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃত ও তিব্বতী অম্বুবাদ); ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, ইহার অনেক পূর্বে মহাশয় আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরো দুইখানি তিব্বতী পুস্তক প্রকাশিত হয়। একখানি ব্যাকরণ, *A Grammar of the Tibetan Language* by H. B. Hanna, 1912), আর অপরখানি অঙ্কি-

ধান, (*An English-Tibetan Dictionary* by Lama Dawasamdap Kazi, 1919)।

ফরাসী ও জার্মান

ইহা অনেকেরই জানা যে, অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় সংস্কৃতেও ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতগণের দান সাধারণ নহে। এইজন্য ঐ দুই ভাষা না জানিলে সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ লাভ করা যায় না এবং তাহা না হইলে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আজ পর্যন্ত গবেষণার সংবাদ রাখিতে পারা যায় না, এবং তাহার অভাবে ঠিক কাজ চলে না। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে ঐ দুইটি ভাষার, অন্তত তাহার অন্যতরটির অধ্যয়ন অবশ্য-কর্তব্য। ইহাতে একটুও বিলম্ব করা উচিত নহে।

সংস্কৃত বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্য

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুন্নত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহার উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিবেন। সংস্কৃত বিভাগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতেই ইহার জন্য বার্ষিক প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করা হয়। সম্প্রতি তো কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু কয়েক জন ছাত্রের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন এই বিভাগে আর কী কাজ হইয়াছে? শিক্ষকগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বা সম্মিলিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ অর্থের বিনিময়ে কী দান করিয়াছেন, বাহাতে তাঁহাদের সেখানে নিয়োগকে সমর্থন করিতে পারা যায়? সংস্কৃত বিভাগ এ পর্যন্ত এমন কি এক পৃষ্ঠাও দিতে পারিয়াছেন বাহা সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে হইতে পারে, যেমন জেকব সাহেবের প্রধান উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা রশাকোশ (*Concordance to the Principal Upanishads and Bhagavad Gita*) বাহা কেবল বাস্তবিক কাজ? মনিঅর সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ ও সংস্কৃতবিদগণের অপরিবর্তনীয় সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান (*Sanskrit English Dictionary* by Monier Williams) প্রভৃতির ন্যায় পুস্তকের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। সাধারণে এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতে পারে।

প্রস্তাবিত ও আরম্ভ পুস্তক

কাহারো কাহারো ইহাও জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে যে, বর্শনকোশ বা ভাষাতীর্থদর্শনমহাকোশের কী হইল? ইহার পরিকল্পনা অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণন স্নাতকোত্তর সাহিত্য শিক্ষণ সমিতির (Council of the Post Graduate Teaching in Arts) তদানীন্তন অধিনেতা শ্রীযুক্ত ভাষাশ্রমাদ সুখোপাধ্যায় মহাশয়কে

অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা গৃহীতও হইয়াছিল। ঐ সময়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছিলেন—“যদি সম্পূর্ণ হয়, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়কে অমর করিয়া রাখিবে।” তুর্ভাগ্যবশত আরম্ভ করিয়াও কিছু দিন পরে ইহা ত্যাগ করা হইয়াছে। কেন?

আরো কয়খানি এইরূপ আরম্ভ উপযোগী গ্রন্থের পরিণাম এই প্রকার হইয়াছে, যথা সাংখ্য-বোগ-কোশ ও কালিদাস-কোশ অর্থাৎ কালিদাসের শব্দকোশ ও কালিদাস-অভিধান। এই সমস্ত কাজ চলিতেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ব ও বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রগণের একটি সমিতির পরিচালনায়। ইহার জন্য কোন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তথাপি ইহাদের কৃত কার্যের পরিমাণ ছিল প্রচুর। বিশেষরূপে ছাত্রেরাই ইহাতে উৎসাহ দেখাইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় এ কার্যও বেশী দূর অগ্রসর হইল না। কেন?

যে কয়টি কাজের উল্লেখ করা হইল যদি সেগুলি বস্ত্ত করার অল্পযুক্ত বলিয়াই কর্তৃপক্ষের মনে হইয়া থাকে তবে অন্য কোন উপযুক্ত কাজের পরিকল্পনা অন্যায়সেই করিতে পারা বাইত, কিন্তু এ পর্যন্ত তো করা হইল না।

আরম্ভ আশুতোষ গ্রন্থমালায় সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে কিছু শোনা বাইতেছে না। সংস্কৃত-পুঁথি সংগ্রহ সম্বন্ধেও ঐ কথা। আশা করি এই উভয়ই ঠিক চলিতেছে।

আমরা সংস্কৃত বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যের কথা আলোচনা করিতেছিলাম, বাহাতে এই বিভাগের শিক্ষকগণের নিয়োগকে ন্যায্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারা বাইত। কিন্তু কোন শিক্ষক কোন উপযোগী ও তেমন উপায়ে গ্রন্থ রচনা না করিলেও যদি তাঁহার অধ্যাপনা অসাধারণ হয় তবে তাঁহার নিয়োগ নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত বলা বাইতে পারে। এতাদৃশ শিক্ষকের লাভে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে গর্বিত ও গৌরবান্বিত মনে করিবেন। যাক্‌ই ভাষায় তাঁহাকে আমরা নিখিগোপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু এরূপ অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগে কয় জন?*

অত্যধিক শিক্ষক

যদিও সংস্কৃত বিভাগের পাঠ্যসংক্ষেপে কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন নতুন বিষয় বোগ করা হয় নি, তথাপি কিছু দিন হইল, সবেতনে বা বিনা বেতনে কতকগুলি শিক্ষককে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? এই সমস্ত নবনিযুক্ত ও পূর্বনিযুক্ত শিক্ষকগণের এক সঙ্গে পড়াইবার ব্যবস্থার জন্য আরো কতকগুলি নতুন

শ্রেণী খুলিবার প্রয়োজন বর্তাবর্তই তীব্রভাবে অনুভূত হয়, এবং এই জন্য এই বিভাগের চিরাচরিত প্রথাকে হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতি শনিবারেও পূর্ণ ছয় ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়।†

এক সময়ে যখন স্নাতকোত্তর সাহিত্যশিক্ষণ সমিতির অধিনেতা শ্রীযুক্ত শ্রীযাত্রী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, এই বিভাগে সপ্তাহে (অর্থাৎ পাঁচ দিনে) আঠার ঘণ্টা করিয়া পড়ান হইতেছে, তখন তিনি তীব্র ভাষায় নিজের অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—“আপনারা কি ছাত্রগুলিকে বধ করিতে চাহেন? আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইহার স্নাতকোত্তর ছাত্র? ইহার কেবল শিক্ষকেরই নিকটে কোন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবে না। ইহাদিগকে পুস্তকালয়ে নিজে-নিজেও অধ্যয়ন করিতে হইবে। কখন ইহার ইহা করিবে?” মন্তব্য অনাবশ্যক।

পরিবর্তমান প্রয়োজন

এই বিভাগের বস্ত্ত প্রয়োজন যে কি তাহা নির্ণয় করা হয় শক্ত, কেননা ইহা সর্বদা পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। কোন পদে নিয়োগের জন্য এক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রাণিগণকে আবেদন করিবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু নিয়োগ করা হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের জন্য। কয়েক বৎসর হইতে ইহাই এই বিভাগের ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ইহা সকলেরই জানা। কিন্তু কেন এমন হয়?

কয়েকটি সম্পাদনীয় প্রস্তাব

পূর্বে যে সমস্ত সংস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলিকে গ্রহণ করা সম্ভব হউক বা নাই হউক, কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, বর্তমান অবস্থায়, যখন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের অধ্যাপনার কোন ভেদ নাই তখন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য কেবল সংস্কৃত কলেজেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায় কিনা। যথা: বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-বোগ ও শ্রুতি-মীমাংসা।

এখন কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ও বর্তমান বন্ধুগণ ধীর ও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখুন কিং ইহার বস্ত্ত কল্যাণ হয়, এবং তাহাই করুন বাহাতে হয় “বিদ্যার অগ্রগতি” (“Advancement of Learning”)। কেননা ইহাই হইতেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।

* ইংরেজীতে সেক্সপিয়রের সম্বন্ধে এ বিষয়ে কীৰ্ত্তন কাজ হইয়াছে পাঠকেরা মনে করিতে পারেন।

† পরে ছাত্রগণের গুরুতর আপত্তিতে শনিবারে পড়ান ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আনারকলি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(দেওয়ান-ই-খাস, আকবর শাহের খাস দরবার।
ডান দিকে শূণ্ড সিংহাসন। আশেপাশে সভাসদগণ। বা-
দিকে অপেক্ষাকৃত সামনে যুবরাজ সেলিম ও রাজকবি
কৈকী আসীন।)

কৈকী। বাই বল, কাল কিন্তু জান্‌কী বাদি আসব
মাত করে দিয়েছিল। একেই বলি নাচ গান। নইলে
চোঁচোতে আর হাত পা ছুঁড়তে কচি ছেলেও পারে—কি
বল হে শাহজাদা? কিন্তু এত রাত হয়েছিল যে (গা মোড়া-
মুড়ি দিয়া) এখনো বেন আমার আলিস্তি ভাঙছে না।

সেলিম। বা' বললে ভাই। দিনকে রাত আর রাতকে
দিন করা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও আমার বেন আজ চোখ
টেনে ধরছে। কিন্তু শাহেন-শার কড়া হুঁম, রোজ এই
ইচ্ছলে হাজিরে-সই দিতেই হবে; তাই তাড়াতাড়ি চোখে
মুখে জল দিয়ে চলে এলুম।

কৈকী। (ঘড়ি দেখিয়া) খুব বে তাড়াতাড়ি করেছে
—তা বলতে পারি নে। জাহাঁপনার আসবার সময় প্রায়
হয়ে এল—বারটা বাজে। একে ত কাল শুভে দেবী হ'ল,
তার উপর বাকি রাতটুকু কেবলি মাথার ঘুরতে লাগল :

(শুন্ শুন্ করিয়া)

গরজত বরষত ভিগত আইলি,

তুইরে মিলন কো আপনে প্রেম পিয়রগুয়া। (আরে হাঁ)
কি হৃদয় গান, আর কি মিষ্টি গলা। কেবল যদি তার
সঙ্গে চেহারাটির মিল থাকত। আমাদের জান্‌কী বাদি একটু
পশ্চিমে চলেছে—একটু মোটা হয়ে পড়েছে—না সেলিম?

সেলিম। তবু মরা হাতী লাখ টাকা। (হাসিয়া)
ভালই হয়েছে, নইলে তেমন তেমন একজন তাজা হৃদয়
বদি সত্যি সত্যি বর্ষাবাজে আমার ছরোরগোড়ায় এসে ঐ
গানটি পাইত, তা হলে তুমি কি করতে বলতে পারি নে—
আমি ত সব ছেড়ে ছুঁড়ে বিবাগী হয়ে তার সঙ্গে খেরিয়ে
পড়তুম।

কৈকী। তা হলে সে বেচারা যে আশ্রয়ের আশায়
এসেছিল তাও পেত না। লাভের মধ্যে দু'জনকেই ভিজতে
হ'ত, আর আমাকে করুণায় পাইতে হ'ত :

এ কাঁহা যাতে হো—ভিজোপে।

স্বপ্নের বিষয়, গানের নারিকা আজকালকার দিনে সশরীরে
এসে হাজির হয় না। আর এলে তাকে দিয়ে কেলবার
মতও আমার কিছুই নেই—এক আমি নিজে ছাড়া। কিন্তু
মেয়েরা উপরি পাওনাটাই কিছু বেশী পছন্দ করে—কি বল
হে? ঐখানেই ত তোমাদের জিত—দেবারও যথেষ্ট আছে,
নেবারও লোক অনেক। কাজেই আমরা পরীষ বেচারারা
মনের দুঃখে একলা ঘরে বসে বসে কবিতা লিখি।

সেলিম। অনেক আছে বটে, কিন্তু—সাধে ন মিলল
এক।

(বাস্তোত্তম সহকারে আকবর বাদশাহ ও মন্ত্রী
বীরবলের প্রবেশ এবং সভাস্থ সকলকে যথাযোগ্য
প্রত্যাহ্বানাদান্তর স্ব স্ব স্থানে উপবেশন।)

আকবর। বীরবলজী, আজ কি জরুরী আরজি বেশী
কিছু আছে? কাল সারাদিন শিকারের পর প্রায় সারারাত
নাচগান চলেছে—তার উপর আজ আর স্নানাহারের
বেশী বেলা না করাই ভাল। বাদশাহেরও মাঝে মাঝে
বিশ্রাম দরকার।

বীরবল। জাহাঁপনা, অর্থাৎ প্রার্থীর অভাব কোনদিনই
হয় না; তবে বেশীর ভাগ আরজি কাল সন্মিলেও চলতে
পারে। কেবল দেওয়ান মাধব রাও কাবুল থেকে যে জরুরী
চিঠি আর খাজনা পাঠিয়েছেন, সেগুলির ব্যবস্থা আজই
করা বিশেষ আবশ্যক।

আকবর। সে চিঠি পড়ে দেখেছি কি? কাল পর্যন্ত
তার জবাব অপেক্ষা করতে পারে না?

বীরবল। আজ্ঞে না, খোদাবন্দ; চিঠির সঙ্গে কিছু
জীৱন্ত মালও পাঠিয়েছেন, বাকি ঠিক খাজনার সঙ্গে তোশা-
খানায় চালান দেওয়া যায় না।

আকবর। কি রকম মাল? মাছ না জন্ত? পোষা
না বুনা?

বীরবল। জজুর, মাছও বটে, জন্তও বটে—অর্থাৎ
নারী। তবে একে যুবতী, তার হৃদয়ী—সুতরাং পোষ
মানবে কি না, তা শেষ পর্যন্ত ঠিক বলতে পারি নে।

আকবর। বল কি বীরবল? তা এতকণ তুমি এ
কথা আমাকে বল নি কেন? তাকে কি তুমি দেখেছ?
তাকে কোথায় রেখেছ?

বীরবল। জাহাঁপনা, আপনার কাছে যে বা পাঠায়,
সবই ত আগে আমার কাছে পেশ হয়ে তবে আপনার

দরবারে পৌঁছায়। এ মেয়েটিকেও আমি দেখেছি। আর আমার এই বুড়ো চোখের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয় ত সে অপূর্ণ স্ত্রী—তেমন স্ত্রী ইতিপূর্বে কখনও দিল্লী সহরে এসেছে কিনা সম্ভব। আপনার হুকুমের অপেক্ষায় তাদের অন্দর মহলের সর্দার সাহেবের জিম্মায় রেখে এসেছি। এখন হুকুমের কি আজ্ঞা হয়?

(সভাস্থলে চাকল্যের লক্ষণ প্রকাশ)

আকবর। তার সঙ্গে আর কে কে আছে? পাঠাবার উদ্দেশ্য মাথব রাও কিছু লিখেছেন?

বীরবল। লিখেছেন কাবুলের সহর-কোতোয়াল, আর এক জন সখীসহ মুন্সী মুহিউদ্দিনের কন্যাকে তিনি দিল্লী দেখতে পাঠাচ্ছেন; তাকে আপনার অন্দরমহলে বেগম-সাহিবারা কৃপাদৃষ্টিতে রাখলে তাঁরা স্ত্রী হবেন, আর আপনিও তাকে দেখে খুশি হবেন।

আকবর। তাদের তিন জনকেই তবে দরবারে ডেকে পাঠাও। দেখছ না তোমার কথা শুনে সবাই অধীর হয়ে পড়েছে—মেয়েরা হিংসায়, আর পুরুষরা আনন্দে।

(বীরবলের প্রস্থান)

সেলিম। জাহাঁপনা, চাঁদ উঠলে যে সমুদ্রের ঢেউ চকল হয়ে উঠবে, এটাও ত স্বাভাবিক।

আকবর। আর চাঁদ উঠলে যে তারার দল স্নান হয়ে পড়বে, এটাও ত স্বাভাবিক।

কৈজী। শাহেন-শা সূর্যের মত চাঁদ তারা সকলকেই আপনার জ্যোতির অংশ বিতরণ করে তাদের স্ব স্ব কক্ষে চালিয়ে ও আলিয়ে রেখেছেন।

আকবর। সাবাস কৈজী, কথাটা বেশ সুরিয়ে নিয়েছ, নইলে আর কিসের সত্যকবি? কথার জাল ফেলে মাহুব ধরাই ত তোমাদের পেশা। দেখ আবার নতুন আলোর ঝিলিক লেগে তোমার মনের মধ্যে নতুন কোন্ ভাবের ফোয়ারা খুলে যায়। কল্পনাকেও মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া চাই ত? নইলে রোজ যে স্তম্ভর মুখ দেখা যায়, নিত্য কি তাতে নেশা ধরে?

কৈজী। হজর ঠিক কথাই বলেছেন। আপনার মনুষ্য-চরিত্রের জ্ঞান যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি গভীর।

আগে বীরবল, পরে লাল পেশোয়ার-ওড়না পরিহিতা আরেবা, পরে সবুজ পেশোয়ার-ওড়না পরিহিতা রোশেনারা, শেষে ইলাহী বস্ত্রের প্রবেশ। বখাবোগ্য অভিবাাদনান্তে আকবরের সামনে শেহোস্ত তিন জনে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। সেলিমের সামনে দিয়া বাইবার সময় আরেবা মুহূর্তকাল ধমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ছুই জনে পরস্পরের প্রতি

বে বিভ্রাৎকটাক হানিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পাইল না।)

(সভাস্থলের আলোড়ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল)।

আকবর। আমার প্রিয় স্ত্রী মাথব রাওয়ের পত্রের মর্ম অবগত হলাম। তোমাদের সকলকে দেখেও অত্যন্ত সম্ভাব্য লাভ করলাম। পথে নির্বিলম্বে এসেছ ত? কাবুল-রাজ্যের সব কুশল ত?

ইলাহী। (সেলামপূর্বক) হুকুমের রাজ্য সর্বত্রই নিরাপদ। দিনকতক হ'ল লাণ্ডিকোটাল থেকে একদল দস্যু কাবুল আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু বেটাদের আমরা এমনি শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি যে, সারা পথ আর কোন উপদ্রব করতে সাহস করে নি।

আকবর। সাবাস এই ত চাই। মাথব রাওয়ের যোগ্য হস্তে শাসন ভার দেওয়া অবশিষ্ট দুর্দান্ত সীমান্তপ্রদেশ সব্বদে আমি নিশ্চিন্ত আছি। কেবল নিয়মিত সময়ে নিয়মিত খাজনাটি আসে, আর কখনও কখনও সেই সঙ্গে কিছু উপরিলাভও হয়—যেমন আজ। বিবিজী, তোমরা বসো, কোন ভয় নেই। (উহার বসিলে রোশেনারাকে নিরীক্ষণপূর্বক)—তোমাকে যেন ইতিপূর্বে দেখেছি মনে হচ্ছে?

রোশেনারা। (করজোড়ে) জাহাঁপনা, তিন বৎসর আগে নওরোজের কম দিন আমি দিল্লীতে এসে বেগম বোধবাজী সাহিবার মহলে ছিলুম। তাঁদের আদর বহু আর সে সময়ের উৎসব-আনন্দ আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

আকবর। তোমার সখীও সে আনন্দে বঞ্চিত হবেন না। আর তিনিও আশা করি, মাঝে মাঝে আমাদের দেখা দেবেন। তাঁকে দেখাই যে নয়নের এক উৎসব। বোধ হয় মনোরঞ্জন-বিভাও তাঁর কিছু কিছু জানা আছে?

রোশেনারা। হজর, আমাদের গরীব কাবুল সহরে আপনাদের রাজধানীর বিলাসকলায় স্মরণ প্রতিক্ষণি মাত্র কদাচ পৌঁছায়। তবু আয়েবাব গলাম্বাভাবত: মিষ্টি বলে মুন্সীজী সাধ্যমত তাকে নিজের গান শিখিয়েছেন; আর দেওয়ানজীর বাড়ীর নাচের মজলিশে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তাই দেখে সে একটু আশু বা শিখেছে।

আকবর। বিবিজীর নাম তবে আরেবা? তোমার নাম ত মনে হচ্ছে রোশেনারা।

কৈজী। (জোড়হস্তে)—গোস্তাকি মার্ক করেন ত বলি খোদাবন্দ, যে, এর নাম হওয়া উচিত ছিল আনারকলি। কেননা আনারয়ের মতই এর গালন্দ,

ঠোটেব, কাপড়ের রং ও রূপ, আনার কলির মতই ইনি লাজুক, নরম ও নবীন।

আকবর। (সহাস্তে)—তা বেশ ত, নতুন জায়গায় এসে ওঁর নতুন নামকরণ হোক, অবশ্য যদি ওঁর তাতে কোন আপত্তি না থাকে। কি বল বিবিজী? আনারকলি নামটিও বড় মিষ্টি, আর সত্যিই ঠিক তোমার সঙ্গে খাপ খায়। দেখ, তোমাকে দেখে আমাদের সভাকবির ভাবের উজ্জ্বল এরই মধ্যে উথলে উঠেছে।

কৈজী। শুধু আমার একলার কেন হজুর, ওঁর ওভাগমনে ফুলদানির ফুলহুত তাজা হয়ে উঠেছে, ঘরের আলোর রোশনাই বেড়ে গেছে, আর বাতাসে স্রবাস ভেসে আসছে। মাহুবের মনের কথা আর কি বলব?

আকবর। ধীরে বন্ধু ধীরে, একেবারে অমন করে সব কবিতার মধু উজাড় করে ঢেলে দিও না। রোস, আগে চক্ষুর্গণের বিবাদভঞ্জন হোক। আনারকলি, তোমার নৃত্যগীতের একটু নমুনা পাব, এমন সৌভাগ্য কি আমাদের আজ হবে? না পথপ্রমে এখনও ক্লান্ত হয়ে রয়েছ?

আনারকলি। (উঠিয়া অভিবাদনপূর্বক)—হজুরের চূর্ণত দর্শনেই আমাদের ক্লান্তি দূর হয়েছে, আর আপনার ইচ্ছামাত্রই আমাদের পক্ষে মহা মাস্ত্র আদেশ। কিন্তু আপনাদের এই বিখ্যাত শহরের আমীর ওমরাহের চিত্ত-বিনোদন করতে পারি, এমন কোন শিকাই আমি পাই নি। পাছে হান্তাপ্পান হতে হয়, সেই আমার ভয়।

আকবর। কোন ভয় নেই, আনারকলি, স্বন্দরের সর্বজ্ঞই জয়। রোশেনারা, তোমার সবীকে অভয় দান কর। আর দেখ সেলিম, থা সাহেবের কাছ থেকে বাঁয়া তবলা ও যুগুর আনতে পাঠাও।

(সেলিম চোপদারকে হুকুম দিতে উঠিয়া গেল, পরে এমন স্থানে আসিয়া বসিল, যেখান হইতে আনারকলিকে ভাল করিয়া দেখা যায়।)

রোশেনারা। (জনান্তিকে)—আয়েবা, মনের জোর কর, দেখ যেন দিল্লীর কাছে কাবুলের মাথা নীচু না হয়। বাড়ীতে বাপমায়ের কাছে যেমন নিঃসঙ্কোচে নাচগান করত, সেই ভাব মনে আনবার চেষ্টা কর।

আনারকলি। (যুগুর পরিতে পরিতে) সেই চেষ্টাই ত করছি, কিন্তু এরা বাপ মায়ের দেওয়া নামটা পর্যন্ত বখান তুলিয়ে দিলে, তখন মাথার ঠিক রাখা মুশকিল। বাক, বা জানি তাই ত করি, তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।

(ফুলদানি হইতে একটি লাল গোলাপ তুলিয়া লইয়া নাচ ও গান)

সাকি গিরে সাগরে হৃৎকো বু হৈ,
কিসি বুতকী আনে কি আরজু হৈ।
ওলেস্তা সে বাকে হরু ওল কো দেখাওয়ে,
ন তেরে এয়সে রঙ, ন তেরে এয়সে বু হৈ।

(নৃত্য অন্তে আনারকলি বাদশাহকে অভিবাদন-পূর্বক তাঁহার সামনে জোড়হস্তে দাঁড়াইলে পর কিছুক্ষণ সভাগৃহ নিস্তব্ধ রহিল, পরে বাহবা ধ্বনির চোটে ভাঙিয়া পড়িল)

আকবর। আনারকলি, তুমি শুধু ওস্তাদী ঢঙই শেখ নি, তাদের ছলাকলাও কিছু কিছু শিখেছ, নইলে এই স্বন্দর নাচ দেখাতে এত বিনয় করছিলে? তোমার নাচের ভঙ্গীতে এখনও ছেলেমানুষি ভাব আছে, সেটা ভালই লাগে। কিন্তু জানকী বাদিরের কাছে আর বছরখানেক তালিম দিলে পর তুমি তাকেও হারিয়ে দেবে, তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি। আজ তুমি আমাদের বে আনন্দ দিলে, তার বক্শিশ স্বরূপ এই চুণীর কণ্ঠি আর এই পান নাও, লালে লাল মিলবে ভাল।

ইন্ লবে নাজুক পে স্বরুখি পানকি আনে ত. নেও।

কোড়ি কোড়ি বিকে বাবে বুদঙ্গাকে চুণি।

এখন যাও বিশ্রাম করগে। নইলে বাদশাহজাদ কবি বনে গেলে রাজকাণ্ডি চলা দায় হবে। মেহেব উঠিয়া, বোধবাস্তি সাহিবর কাছে মেয়েদের পৌছে দিয়ে তাঁকে বলো যে আমি পরে গিয়ে তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। কোতোয়াল সাহেবেরও অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিও।

(একজন ববীয়সী রমণীর কিঞ্চিৎ অগ্রদগতভাবে আয়েবাদের লইয়া প্রস্থান।)

এবার তবে আমরা সভাভঙ্গ করি। বেলা বখেই হয়েছে, কিন্তু যে কারণে শীত ছুটি পেলুম না, তাতে বোধ হয় কারোই আপত্তি হয় নি।

(দলবলসহ প্রস্থান। ক্রমে ক্রমে সভাভঙ্গ।)

কৈজী। কি শাহাজাদা, এত গোলমাল গোর সরাবতের মধ্যে তুমি চুপ করে রইলে যে? কেমন দেখলে বল; মনে ধরে?

সেলিম। (আবিষ্টভাবে)—আমার পানের নায়িকা সশরীরে দেখা দিয়েছেন, আজ আমি ধন্য। (আনারকলির হস্তচ্যুত গোলাপ বুড়াইয়া লইলেন।)

কৈজী। আমাকে বা বলেছ বলেছ, অপরের কাছে কিন্তু এ রকম মনের কথা বেশী বলো না। জান ত দিল্লী

শহরে “প্রেম কি করানা সহেল বড়ানা” নয়। বাড়াবাড়ি করলে শশরীরে অন্যত্র যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

(হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান ।)

২য় দৃশ্য

(জ্যোৎস্নালোকিত অশুঃপুর—উজানের নিরালা স্থানে শ্বেত পাথরের ফোয়ারা। দূরে সানাইয়ে মুহূর্ত্তে বেহাগ রাগিণী বাজিতেছে। এক দিক থেকে সেলিম, অপর দিক থেকে মেহের উরিসার প্রবেশ, এবং মুকাত্বিনয়ে প্রকাশ বেন সেলিম তাহাকে বলিতেছে প্রাসাদ হইতে কাহাকে সেখানে ডাকিয়া আনিতে ; সে বেন প্রথমে নারাজ ভাব দেখাইল, পরে সেলিমের গলার স্বর্ণহারের প্রলোভন দেখাইবার পর নিমরাজীভাবে চলিয়া গেল। সেলিম ওঠা বসি, থমকিয়া দাঁড়ানো, পায়চারি করা প্রভৃতি নানারূপে উৎকর্ষ প্রকাশ করিল, পরে—)

সেলিম। (বসিয়া পড়িয়া)—সে কি মনে করবে ? সে কি আসবে ? সে কি ভালবাসবে ? (গুন গুন করিয়া গান)

বেহাগখান্ধাজ

আওরে বলয়াজ

বিন দেখে নহি পড়ত চৈন

মাগরি রজন মোহে তড়গত জঁজরি,

পলক ন লাগি সারি রাত।

চাঁদ পিয়া বিন নির্দ ন আওরে.

চুক পড়ি জনি ভরস'উ।

(আবার উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে)—এমন অধীর আমি ত আর কখনো হই নি। এ কি নুতনের মোহ, না রূপের নেশা, না প্রথম প্রেমের কুহক-মায়ী ? যে শাহাজাদার একটি কৃপাকটাকলাভের জন্ত শত শত রমণী তিথারিণী ; সে কি না একজন সামান্য প্রকার মত একটি অপরিচিতা বালিকার প্রতীক্ষায় দীনভাবে দণ্ডায়মান। যার দর্শন-মাত্রই আমি এমন আত্মহারা হয়েছি, সে কি আমার এ প্রেমের প্রতিদান না দিয়ে থাকতে পারবে ?

(দূরে মেহের-উরিসার সঙ্গে আনারকলিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেলিম এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। মেহের উরিসা চুপি চুপি কি বলিয়া মাঝপথ হইতে ফিরিয়া গেল। আনারকলি একলা একটু অগ্রসর হইতেই সেলিমকে দেখিয়া সলজ্জভাবে গমনোদ্ভূত হইল।)

সেলিম। (অগ্রসর হইয়া গান)

ঠাঙ্কি রয়ে সেরে আঁখন আগে

(আনারকলি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অভিযান করিল)

সেলিম। আনারকলি, জান আমি কে ?

আনার। (কম্পিত কণ্ঠে) জানি। শাহাজাদা।

সেলিম। এস, আমার হৃৎকনে এখানে বসি। (তথা-করণ)। তোমাকে ডেকে এনেছি বলে ভয় করছে ?

আনার। (অপেক্ষাকৃত ভয়সাহস) আকগান-রমণী ভয় কাকে বলে জানে না।

সেলিম। কাল নাচের আগে ভয় করে নি ?

আনার। কাল ছিলুম বালিকা। আজ আমি রমণী।

সেলিম। এ পরিবর্তন হঠাৎ কিসে হ'ল ? কি করে বুঝলে ?

আনার। কিসে হ'ল জানি নে ; কিন্তু মনে বুঝছি, প্রাণে বুঝছি ; সারা দেহে, সারা হৃদয় বুঝছি।

সেলিম। তোমার কথা বেন আমার কানে গানের মত লাগছে। ঐ কথাই গান গেয়ে বলতে পার ?

আনার। পারি, কিন্তু লজ্জা করে।

সেলিম। কিসের লজ্জা ? এখানে আমি আর এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনী ছাড়া কেউ তোমার মনের কথা শুনেতে পাবে না। তুমি নির্ভয়ে গাও, আমিও নিঃশঙ্কে শুনি।

আনার। (গান)

আজি হরব সরসে কি জোয়ার

প্রাণমে না মিলত কুল কিনারা।

গাও গাও সখি সৌরবগীত,

লীলাচপল রাগ ললিত ললিত।

কোকিল পকম করণ কানোড়া,

গাও গাও মুহু মুহু মনো মনো।

সরম কি বন্ধন খোলহ খোল,

সরম কি পাল তোলাহ তোলা,

প্রেমপবনমে ছোড়হ তরগী,

ভাসি চলি আও প্রাণমে হযারা।

সেলিম। (কিয়ৎক্ষণ পরে) আনারকলি !

আনার। হজুর !

সেলিম। তোমার কাছে আমি হজুর নই, শুধু সেলিম। তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন ?

আনার। মা বাপ ভাই বন্ধু—সকলেই আছেন।

সেলিম। বন্ধু ছাড়া, বন্ধুর বাড়া কেউ নেই ?

আনার। আজ্ঞে না, হজুর !

সেলিম। আবার হজুর ? বল সেলিম।

আনার। আর কেউ নেই, সেলিম সাহেব।

সেলিম। তুমি বলতে চাও তোমাদের দেশে এমন কোন ভাগ্যবান বীরপুরুষ নেই যার জিন্দায় তোমার ছব্বখানি বেধে এসেছে ?

আনার। আমার হৃদয় শিহ্নিয়ে পড়ে নেই, তাকে আমার দূতস্বরূপ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি হুজুর—সেলিম।

সেলিম। (হাসিয়া) তবে তুমি হৃদয়হীন ?

আনার। (হাসিয়া) আমার এক সখী বলতেন, হৃদয়ের বললে আমার বুকে একটা পাথর বসানো আছে।

সেলিম। পাথরও ত দামী হয়।

আনার। আমরা গরীব মানুষ, দামী পাথরের কি বুঝি ?

সেলিম। যদি আমি বুঝিয়ে দিই ? দেখি তোমার হাত (হাত বাড়াইয়া)।

আনার। হাতের সঙ্গে হৃদয়ের কি সম্বন্ধ ?

সেলিম। হাতের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেখেই না পরীক্ষা করে।

(আনার তাহার হাতে হাত রাখিলে সেলিম নিজের আঙুল হইতে খুলিয়া চুপীর আংটি পরাইয়া) এই আংটি দেখনি দেখবে, তখনি আমাকে মনে পড়বে। এখন সম্বন্ধটা বুঝলে ত ?

আনার। বুঝলুম। কিন্তু আমার কোন স্বরণচিহ্নের দরকার নেই।

সেলিম। আনার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

আনার। আদেশ করুন।

সেলিম। তোমার হৃদয়-দূত কি নিরুদ্দেশ-বাত্ম্যর বেরিয়েছিল, না এই আংটির মালিকের কাছে পাঠিয়েছিলে ?

আনার। (নিরুত্তর)

সেলিম। তুমি ত তাকে কখনো দেখ নি ; চিনলে কি করে ?

আনার। ছবিতে দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি।

সেলিম। স্বপ্ন ভাল, না সত্য ভাল ?

আনার। এক এক সময় মনে হয় আমার স্বপ্নই ভাল ছিল ; কেননা তার সঙ্গে ছিল আশা।

সেলিম। আর সত্যের সঙ্গে কি আছে ?

আনার। হয় দুরাশা, কিংবা নিরাশা, কে জানে।

সেলিম। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না, আনার আমার ?

আনার। তোমাকে বিশ্বাস করেই ত বাপ মা, বাড়ী-ঘর, দেশ সব এক মুহূর্ত্তে ফেলে চলে এসেছি।

সেলিম। তবে কাকে সম্বোধ কর ?

আনার। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদভরা লোক, এই প্রচণ্ড রাজদণ্ড, এই গোপন মন্ত্রণা, সবকিছুকেই।

সেলিম। তুমি এরই মধ্যে রাজপ্রাসাদের কি কুটিলতা জটিলতা দেখলে বল ত ? তোমাকে কি কেউ অনাদর

করেছে ? তোমাকে কি কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারে ?

আনার। না, আমাকে কেউ কিছু বলে নি। আর বেগম সাহিবাও আমাকে যথেষ্ট বৃত্ত করেন। আমি খুব সুখেই আছি। কিন্তু এখানকার দেওয়ালগুলো হচ্ছে যেন কিস্ কিস্ করে কথা কর, এখানকার মানুষের মুখের হাসি-কথা আমাদের দেশের সরল হাসিকথা নয়, সেটুকু একদিনেই বুঝতে পেরেছি।

সেলিম। তবে তুমি সত্যই বালিকা নও। কিন্তু আনার, আমিও বালক নই। এই আংটি পরিচয় তোমার হাতে হাত রেখে শপথ করে বলছি—

আনার। সেলিম, শপথে কাজ কি ? আজ থাক, আর একদিন হবে। আজ আমার জীবনের সর্বপ্রথম পূর্ণদিন, আজ কেবল আশা, কেবল আনন্দ, কেবল প্রেমের কথাই হোক। হয়ত বেশী কথা বলবার সময় পাওয়া যাবে না। আজ আমার মনে হচ্ছে ; অগত্বে বেহস্ত অন্দের জমীনন্ত হমিনন্ত ও হমিনন্ত ও হমিনন্ত।

সেলিম। তবে বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করে আর একটা গান গাও, আমার বেহস্তের হরী।

আনার। কি গাইব ? তোমাদের সর্বদা মজলিসী গান শোনা অভ্যাস ; আমাদের পাহাড়ী গান কি তার মত হবে ?

সেলিম। তার মত নয় বলেই ত শুনতে এত ভাল-বাসি। তোমাদের দেশের গজল গাও। কিছুক্ষণের জন্ত তুলিয়ে দাও যে আমি দিল্লীর শাহাজাদা, যে আমার সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, জীবনের প্রত্যেক কাজের উপর সহস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ—যে আমার ভবিষ্যৎ গ্রাস করবার অস্ত শূভ সিংহাসন ই। করে রয়েছে !

আনার।

গান

ফেরাহুদীয়ে দিল হারে, সব জানে কি হাম জানে।

বিহি হার ইশ্ক কি চোমার, লগি হার জানকি বাজি,

গড়া হার চশমকা পাশা, সব জানে কি হাম জানে।

লগি হার ইশ্ক কি বৈড়হি, দিলু' মৈ ইয়ারে কেঁটকন।

কলিজা হার অলতা হার, সব জানে কি হাম জানে।

ইধর পানি ধরমতা হার, উধরু বিজলী চমকতি হার,

একলি দল উলজতা হার, সব জানে কি হাম জানে।

(দূর হইতে মেহের-উরুগা একটু গলার ইজিত করিল)

সেলিম। (হাসিয়া) এরই মধ্যে অন্দেরের দূতী এসে হাজির ? বাও তবে। কিন্তু বাবার আগে আমার আংটির বললে তোমার মাখার ঐ গোলাপ ফুলটি আমার দিয়ে বাও আনার (আনারের তথাকরণ)—আর শপথ করে বলে

যাও যে তুমি রোজ ঠিক এই সময়ে এই কোয়ারার কাছে এসে আমার জন্তে বসে থাকবে। আসবে ত নিশ্চয় আনার—আমার।

আনার। হাঁ, আসব নিশ্চয় সেলিম—সনম্!

(কিরীয়া চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান)।

৩য় দৃশ্য

(বেগম বোধবাঈয়ের মহল। উপযুক্ত গৃহসজ্জা, মহামূল্য আস্তরণাদি। আনারকলি তাঁহার পদসেবা করিতেছে। সামনের দিকে রোশেনারা একদল মেয়ের সহিত ফুলের মালা গাঁথিতেছে। অন্য একদল জরির কাজ করিতেছে।)

বোধবাঈ। থাক আনারকলি, হয়েছে। সেই কখন থেকে পায়ে হাত বুলাচ্ছ, হাত বাখা হয়ে যাবে যে! তোমার হাতটি কিন্তু বেশ নরম, গায়ে দিলে আরাম হয়। যাও ওদের সঙ্গে না হয় ফুলের মালা গাঁথ গে।

আনার। (উঠিয়া রোশেনারার কাছে গিয়া)—তোরা কি করছিল তাই?

রোশেনারা। এই এরা বলছে, আমাদের দেশের মত করে মালা গাঁথতে, কিন্তু আমার ঠিক হচ্ছে না। তোর মনে আছে তাই?

আনার। আছে বই কি। আমাদের নানা রকম বিনি হুতোর হার করে। দেখি?

প্রথম। তোদের দেশে কি হুতো পাওয়া যায় না? তবে সেলাই কিসে হয়?

আনার। হ্যাঁ, এক রকম মোটা রঙীন হুতো তৈরি হয়, তাই দিয়েই সব কাজ চলে।

দ্বিতীয়া। সুনলি ভাই, ওরা নাকি শুধু হুতো দিয়েই সেলাই করে। (হাসিয়া) কেন, সেখানে বুঝি জরি টরি তৈরি হয় না?

আনার। আমাদের গরীব দেশে জরি করেই বা কে, পরেই বা কে? তাই ত তোমাদের কাছে জরির কাজ শিখতে এসেছি।

তৃতীয়া। সেদিন বেরকম সেজেগুজে খাস দরবায়ে নাচলে গাইলে, তাতে শিকার কিছু বাকি আছে বলে ত বোধ হয় না, কি বল জয়না?

প্রথম। হ্যাঁ, আমাদের লজ্জাশিকা পাঁচ বছর বয়সে আরম্ভ হয়, কাজেই চিরজীবন সেটা মনে থাকে। তবে ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রথা।

তৃতীয়া। কিন্তু বাই বল ভাই, যেয়েমাহুঘের একটু

লজ্জাসরম থাকা ভাল। পুরুষ মাহুঘের সামনে ঐ বেহারী-পনাগুলো আমি হু' চক্ষে দেখতে পারি নে।

রোশেনারা। কেন, কিসে তোমরা আমাদের এত নির্লজ্জ ঠাওরালে বল ত?

তৃতীয়া। তোমাকে ত কিছু বলছি নে বোন। তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে কেন?

আনার। (ক্ষুব্ধভাবে)—কি করব, শাহেনশা আদেশ করলেন, কাজেই বা জানি তাই করতে হ'ল।

দ্বিতীয়া। আহা! যেন কচি খুকীটি! তবে মায়ের কোল ছেড়ে এত দূরে এলে কেন? আমরা কিন্তু ভাই অমন কলের পুতুল নই, যে দয়্য দিলেই ঘুরব। তার চেয়ে আসল কথাটা বলেই ফেল না কেন, একঘর পুরুষ মাহুঘের সামনে রূপের ঠমক দেখাবার লোভ সামলাতে পারে নি?

প্রথম। আঃ, কেন ভাই ছেলেমাহুঘকে জালাতন করিস? এখনি গিয়ে বেগমসাহিবার কানে কথাটা তুলে দিয়ে সকলকে বকুনি খাওয়াবে খন।

আনার। (উঠিয়া সেলায়ের দলের কাছে গিয়া)—আমাকে জরির কাজ শেখাবে তাই?

এক জন। আর শিখে কাজ নেই, যা বিত্তে আছে তাই যথেষ্ট! এমনিতেই বলে রূপের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, তার উপর—

আনার। (হাসিয়া)—আমার আবার দেমাক দেখলে কিসে?

অপর। কেন, সারাদিনই ত আয়নার মুখ দেখছ, দেখতে পাই। আমরা ত আর চোখ বুজে থাকি নে, কানও খোলা রাখি। তবে মুখটা বন্ধ রাখাই ভাল।—বড়লোকের কথায় গরীবের কাজ কি?

আনার। তোমাদের যে ভাই চারিদিকেই আয়না, মুখ না দেখে উপায় কি বল? ক্রমাগত নিজের ছায়া দেখতে দেখতে এক এক বার যেন আমার বিরক্ত ধরে যায় সত্যি!

প্রথম জন। দেখ আনারকলি, তোমার ভালর জন্তই বলছি তুমি নতুন এসেছ, কিছু জান না, তাই মান না। আমাদের দেখতে ত কিছু বাকি নেই; অমন কত এসেছে, কত গেছে, কিন্তু আমরা রয়েই গেছি। সাবধান হয়ে চলো, নইলে মহা বিপদে পড়বে।

(আনারকলি অস্থিরভাবে এক কোণে একলা গিয়া বসিল। সাকিনা বেগমের প্রবেশ)

বোধবাঈ। এই যে সাকিনা, এস আমার কাছে এইখানে বস। (তথাকরণ) তোমাদের সেই বাবীটার

অবশেষে কি হ'ল বল দেখি ? এই গোলকধাঁধার মধ্যে কেন বেঁচে কচি কচি সুন্দর মেয়েগুলোকে পাঠায়, তাই ভাবি। আমরাই বা কতদিকে নজর রাখি বল ?

(আনারকলির উৎকর্ষ হইয়া প্রবণ)

সাকিনা। আর হবে কি দিদি,—বা হয়ে থাকে, তাই। আজ সকালে সর্দারনী তাকে ডাকতে গিয়ে দেখে, সে কাঠ হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। মেয়েটা মরে বাঁচল ; নইলে তার কপালে আরও কত লাক্ষ্যনাভোগ ছিল, তাকে বলতে পারে ? তার বুড়ো বাপ মা ভোরবেলা থেকে অন্দরমহলের খিড়কি-দুঘোরে এসে এমন কান্না জুড়ে দিয়েছিল যে, সারাদিন মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে তাই তোমার কাছে একটু বেড়াতে এলুম। (আনারকলিকে দেখিয়া) এটি যে নতুন মুখ দেখছি ?

বোধবাঈ। হ্যাঁ, কাবুল থেকে দেওয়ান মাধব রাও ওকে দিল্লী দেখতে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি হুশীলা বলেই ত বোধ হয়। ওর উপর আমাদের কৃপাদৃষ্টি রাখতে তিনি বিশেষ করে অহরোধ করেছেন।

সাকিনা। তা ত রাখব দিদি, কিন্তু দৃষ্টি যে অনেক রকমের আছে। ও দিল্লী দেখবে, না দিল্লী ওকে দেখবে, তাই ভাবছি। (হাসিয়া) যে দেখবে সেও পস্তাবে, যে না দেখবে সেও পস্তাবে।

বোধবাঈ। (হাসিয়া) ঠিক বলেছ ভাই। রূপ বড় জালা। যেমন জলে, তেমনি জালায়। আমার এ আবার এক কাঁটা হয়েছে। এখন মা-বাপের পচ্ছিত খন মা-বাপের হাতে ভালোয় ভালোয় কিরিয়ে দিতে পারলে ষাটি। আনারকলি।

আনারকলি। (কাছে আসিয়া) জী হজুর।

বোধবাঈ। ইনি আমার বোন সাকিনা বেগম, আদাব কর। (তথাকরণ)

সাকিনা। যেমন মিষ্টি নাম, তেমনি মিষ্টি মুখ।

বোধবাঈ। নামটি আমাদের দেওয়া, কিন্তু মুখটি ওর পৈতৃক সম্পত্তি।

সাকিনা। আর কিছু সম্পত্তি আছে ?

বোধবাঈ। বোধ হয় না। সে খোঁজ নেবার দরকারও নেই। তবে অনেক গুণ আছে ; বেশ নাচতে গাইতে পারে।

সাকিনা। সত্যি নাকি ? কৈ, আমাকে একটি গান গেয়ে শোনাও দেখি ?

আনার। হজুরাণীর মেহেরবাণী।

গান

জরা ওয়াসল্‌ পর হো ইনারা তোমার,
অতি করুণা নামলা হমারা তোমার।

শুনি হৈ আগর কিসীকে চাতে হ'
ও হুশন হমারা পেরারা তোমার।

সাকিনা। আহা, গলাটিও যেন মধুঢালা। এরকম গান সারারাত বসে শোনা যায়। আশীর্বাদ করি যেন এমন বরের হাতে পড়, যে আমারই মত গান শুনতে ভালবাসে। কিন্তু এখানে কাউকে যেন ইনারা টিশারা করোনা, বুঝলে ? তা হলে তুমিও বিপদে পড়বে, আর আমারও লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না, কি বল দিদি ?

বোধবাঈ। বয়সটা যে বড় খারাপ সাকিনা, হাজার বোঝালেও বোঝে কৈ ? ও জয়নাব, আজ সন্ধ্যাটা কি এই রকম চুপচাপ ভাবেই কাটিয়ে দিবি ? নাচগান কিছু হবে না ? কাবুলের কাছে দিল্লীকে হার মানতে হবে নাকি ?

জয়নাব। আমরা ত হেরেই আছি ; সেকথা পাঁচ জনের কাছে জাহির করে, লাভ কি ?

বোধবাঈ। অমনি তোদের অভিমান হ'ল বুঝি ? ছিঃ ; ওরা দু'দিনের অস্ত্রে বেড়াতে এসেছে, ওদের সঙ্গে কোথায় তোরা খুশিমনে মিলে মিশে আয়োদ আহ্লাদ করবি, না রেঘায়েবি রাগারাগি করছিস ? নে, তোদের মালাগাঁথা ফুলতোলা রেখে, সেদিন মীরাবাঈয়ের যে নতুন গানটা শিখলি, সবাই মিলে একবার তাও বাৎলে গা' দেখি ? যতই দরবারী ওস্তাদী গান হোক না কেন, আমার কানে ভজনের মত অমন মিষ্টি আর কিছুই লাগে না, তা বলছি বাপু। গা' তোরা।

মেয়েরা সম্মতবে।

গান

শুনি ময় হরি আগুন কি আগুয়াল।
মহল চড়ি চড়ি বাউ মোরে সজনী, কর্‌ আগুয়ে মহারাজ।
নাহর মোর পপিহা বোলৈ,

কোরোলা মধুরে সাজ।

বরখে মেহরওয়ার, মেহা বোলৈ,

দামিন্‌ ছোড়ি লাজ।

ধরতি রূপা নগরা নগরা ধরিতা,

শিরা মিলনকি কাজ।

মীরা কি চিত মীরা ব মানে,

বেদি আরো মহারাজ।

৪র্থ দৃষ্ট

(দেওয়ান-ই-আম, আকবর শাহের আম দরবার)
আকবর ও বীরবল আসীন। দরবারগৃহ বিশেষ উৎসব-

সজ্জায় সজ্জিত। কিংখাব ও মখমলের আন্তরণ এবং পর্দা, পারস্ত দেশের পালিচা, বোখারার পটবস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্য জহরৎ খচিত পাঞ্জ, ফুল এবং আতর গোলাপজলের ছড়াছড়ি, ছয়লাপ।)

আকবর। কি বীরবলজী, এমন আনন্দ-সম্ভার তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন? ঘরে কিছু তক্তার হয়েছে না কি? বল ত আমি মিটিয়ে কেলি।

বীরবল। জাহাঁপনা, ঘরে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে বটে, কিন্তু সে আমার ঘরে নয়, আপনার ঘরে। কাজেই ভাবনাটা আমার কিছু বেশী।

আকবর। আমারই ঘরে গোলযোগ, অথচ আমি সে বিষয় কিছু জানবার আগেই তুমি জেনেছ—এ কি কখনও হতে পারে মন্ত্রীজী? আমি কি এতই অন্ধ, এতই অলস, এমনই বিলাসী?

বীরবল। শাহেনশাহ কক্ষকুশলতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হিন্দুস্থানের সর্বত্র বিখ্যাত। কিন্তু অনেক সময় বাইরের বড় বড় জিনিষ দেখতে দেখতে ঘরের ছোটখাটো জিনিষ চোখে পড়ে না। সেই জন্তই ঘরের ভার পুরুষরা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে।

আকবর। (ব্যস্তভাবে) কৈ, বোধবাঈ আমাকে সস্ত্রীতি কোন ছঃসংবাদ দিয়েছেন বলে ত মনে করতে পারছি নে?

বীরবল। ধোদাবন্দ মেয়েরা মেয়েদের উপর দৃষ্টি রাখার বত স্থবিধে পান, বড় বড় ছেলেদের উপর—

আকবর। বড় ছেলে? তবে কি সেলিম কোন গালমাল করেছে বলতে চাও? হতেই পারে না! সেলিম আমার সেরকম ছেলেই নয়; তার উপর আমিও তাকে বড় রাশে মাহুয করছি।

বীরবল। হজুর, রাশ হাজার কড়া হলেও তেমন তেমন তেজী ঘোড়াকে সব সময়ে বাগ মানাতে পারে না। মনে রাখবেন, শাহাজাদা আর এখন বালক নয়।

আকবর। বালক ভিন্ন আর তাকে কি বলব বল? সাতদিন ত বাইরে বাইরে সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলো স্বামোদ-প্রমোদ নিয়ে মেতে থাকে, বিষয়কণ্ঠে মোটে মন দণ্ডায়তে পারি নে। বেন ইন্সুল পালাতে পারলে বাঁচে। তার পর সেদিন পারস্ত-রাজের একমাত্র কস্তার সঙ্গে তার ঐবাহের সম্বন্ধ এসেছিল, সে একবার মেয়েটিকে দেখতে বটে পর্যন্ত রাজী হ'ল না; বদ্বিচ লোকে বলে তার ফ্লা রুপসী হিন্দুস্থানে নেই। এতে কি পাকা বুদ্ধির প্রমাণ হয়?

বীরবল। হরত শাহাজাদা হাতের কাছে মনোমত

রুপসী পেয়ে থাকবেন হজুর। এব ছেড়ে অগ্রবে না বাওয়াই ত বুদ্ধিমানের কাজ।

আকবর। হাতের কাছে ত চিরদিনই রুপের রোণ-নাই বাধা রয়েছে, কিন্তু কখনও ত তাকে দু'দণ্ডের বেশী সেদিকে ফিরে তাকাতে দেখি নি। আজ হঠাৎ কি হ'ল?

বীরবল। এসব জিনিষ হঠাৎই হয় জাহাঁপনা—স্বকণ্ঠে বা কুকণ্ঠে। এখন বুঝতে পারছি, আমরা এতদিন দু'দিয়ে সাপ পুবেছি।

আকবর। বিষদীত তুলে ফেলতে কতক্ষণ? কিন্তু এ সাপিনীটি কে?

বীরবল। হত সহজ মনে করছেন, তত নয়। সেটি আমাদের নবীনা অতিথি।

আকবর। কে, আনারকলি? (উত্তেজিত)—গ্যা? অসম্ভব! সে যে নিতান্ত বালিকা! সে ত সারাদিনই অন্দরমহলে বোধবাঈয়ের কাছে থাকে শুনি।

বীরবল। সারাদিন সেখানে থাকে বটে, কিন্তু সম্ভা-বেলা ঘণ্টাখানেক অন্তঃপুর-উদ্যানের ফোয়ারার কাছে বসে থাকে এবং একলা থাকে না—একথা আমি বিশ্বস্ত-স্বত্রে অবগত হয়েছি।

আকবর। দেখ বীরবলজী, আমরা আজীবন রাজ-প্রাসাদের দূষিত হাওয়ায় বাস করে মাহুযকে কেবল সন্দেহ করতেই শিখেছি, বিশ্বাস করতে শিখি নি। আনারকলি একে সরলা বালিকা, তার উপর বন্ধুপ্রেরিত শরণাগত অতিথি—তার নামে হঠাৎ একটা কুৎসিত অপবাদ দেবার আগে ভাল করে অহুসঙ্কান করা কর্তব্য কথাটা সত্য কি মিথ্যা।

বীরবল। হজুর, মন্ত্রণা দেওয়াই আমার ব্যবসা; এই করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলুম। আমি কি আমার কর্তব্য জানি নে, না হজুরকে ছেলেমাহুয পেয়েছি, যে জুজুর ভয় দেখাব? স্বয়ং অন্দরমহলের সর্দারই আমার সংবাদদাতা। বলেন ত আমার সাক্ষীসাবুদ তলব করি—

আকবর। (অস্থির ভাবে)—না, না, না, আজ থাক, আর এক দিন হবে। এখনি সব লোকজন এসে পড়বে। আজকের দিনের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।

বীরবল। হজুর, রাজ্যের মজল-অমজল আমার সকলের আগে দেখতে হবে, তাই এই অসময়েও অপ্রিয় কথাটা তুলতে হ'ল, ক্ষমা করবেন। আজ আর কিছু বলব না, কেবল এই বিনীত নিবেদনটুকু করছি যে, নাচগানের সময় আনারকলির উপর আপনি একটু বিশেষ নজর রাখবেন।

(একে একে অতিথি-অভ্যাগতদের প্রবেশ ও বোধোচ্চিস্ত অভিধানান্তে গালিচার উপবেশন। বধাসময়ে নহবৎ

বাজিরা উঠিলে গায়িকার দল সহ আনারকলি ও রোশেনারার প্রবেশ এবং সিংহাসনের বামপার্শ্বে উপবেশন। সেলিম, ফৈজী প্রভৃতি রাজপরিষদবর্গ সজ্ঞাটের দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া বসিল। রাজকর্মচারিগণ আন্তর গোলাব তাছলাদি বিতরণ করিতে লাগিল। নহবৎ থামিলে পর গায়িকার দল উঠিয়া বাদশায় সিংহাসনের সামনে আসিয়া সজ্ঞতসহ সজ্ঞী মোবারকবারী গান ধরিল।)

সম্বরে গায়িকাগণ। গান

হুপ্রই কানাড়া—রাঁপতাল

শুভ বড়ি শুভ দিন সুহরত

বৈঠে তখত আজ দিল্লীপতি নর রে।

অচল কুয়সী ধরি, চহ চক হব ছাড়ো,

নগ যোতি নগ হীরা ছত্রে জড়ে হ'।

হমায়ু'কি নন্দন, চর যুগ জীবৈ,

শাহানকে বাগশাহে আকবর রে।

(সভাস্থ লোকের বাহবা ধ্বনি করণান্তর কথা র শুভ্রন আরম্ভ। পরে বাদশা কথা কহিবামাত্র সকলে নিমন্তরু হইল।)

আকবর। বাহবা! বেশ, সুন্দর গান করছে। মিঞা তানসেনের শিক্ষা দেখছি বুধায় যায় নি। আনারকলি, এবার তোমার পালা। আনকী বাজিয়ের কাছে মাসখানেক ভামিল দেবার পর কি রকম উন্নতি তোমার হয়েছে, আজ উৎসব-রজনীতে এই সমবেত সমঝদারদের সামনে তার পরিচয় দাও। দেখি শাপরেদ কেমন ওস্তাদের মান রাখে।

(আনারকলি ধীরে ধীরে উঠিয়া সজ্ঞক ভাবে বাদশাহের সামনে আসিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইল, পরে একটু ভাবিয়া নিম্নলিখিত গানসহ সুন্দর নৃত্য শুরু করিল।)

আনারকলি। নৃত্যসহ গীত

শুকবেলাওল—রাঁপতাল

শওরে মিলন দা, চাওরে নি স'ইরো নয়নো,

তেরে মিলন দা চাওরে নি স'ইরো (হী)।

সোনি সোনি হুয়ত, নন পরবশ র ইরো।

নয়নো কি ভগত বুঝাওরে উনিয়া (হী)।

যো লিখ্যা সোই পায়া নি স'ইরো।

কহে রদীরাব, রদী লাবে বনেরা।

নয়নো কি ভগত বুঝাওরে উনিয়া (হী)।

(নাচিতে নাচিতে বধন সেলিমের সামনে আসিয়া পড়িল, তখন আনারকলি মুহুর্তের জন্ত তার দিকে চোখ তুলিয়া দৈবৎ হাসিল; সেলিমও তথৈবচ। ছু'জনের এই গোপন দৃষ্টি ও হাত্তবিনিময় পার্শ্বস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাদশাহের নজরে পড়িল। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুটি-পত্রিকা পত্রিকাভিত্তিক কীকরজারের বিদ্যুৎ বাজিলেন। কাকারক সে

হস্তের ইজিতে বাজনদারদিগকে নিবৃত্ত করিল। হঠাৎ বাজনা থামিয়া বাওয়ার আনারকলি অপ্রস্তুতভাবে নাচ থামাইয়া 'ন যবৌ ন তহৌ' রূপে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। শাহাজাদাও পিতা এবং বীরবলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রমাদ গণিলেন। সভাস্থলে চাকল্য।)

বীরবল। অমাত্যগণ ও বন্ধুবর্গ, শাহেন শা করদিন অনবরত রাজকাণ্ডে ব্যাপৃত থেকে বিজ্ঞামের অভাবে আজ হঠাৎ কিছু অস্থির বোধ করছেন। তাই তিনি আমাকে আপনাদের জানাতে বললেন যে, আজকের উৎসব এখন স্থগিত রইল। তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই এই আনন্দরজনীর অসম্পূর্ণ অছটান সম্পূর্ণ করা হবে, এবং সেদিন তিনি নিকটকল্পে আপনাদের সজ্জ্ব উপভোগ করতে পারবেন। এই আপাত-অশিষ্টতা এবং আপাতজ্ঞ আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন, এই তাঁর বিশেষ অহুরোধ।

(বিস্মিত ও বিক্লিষ্টভাবে সভ্যতক। সেলিমকেও গমনোচ্ছত দেখিয়া আকবর তাহাকে বসিতে ইজিত করিলেন। বীরবল ভিন্ন আর সকলের ক্রমে ক্রমে প্রস্থান।)

আকবর। (উত্তেজিত) সেলিম, এর মানে কি?

সেলিম। কিসের মানে হজুর?

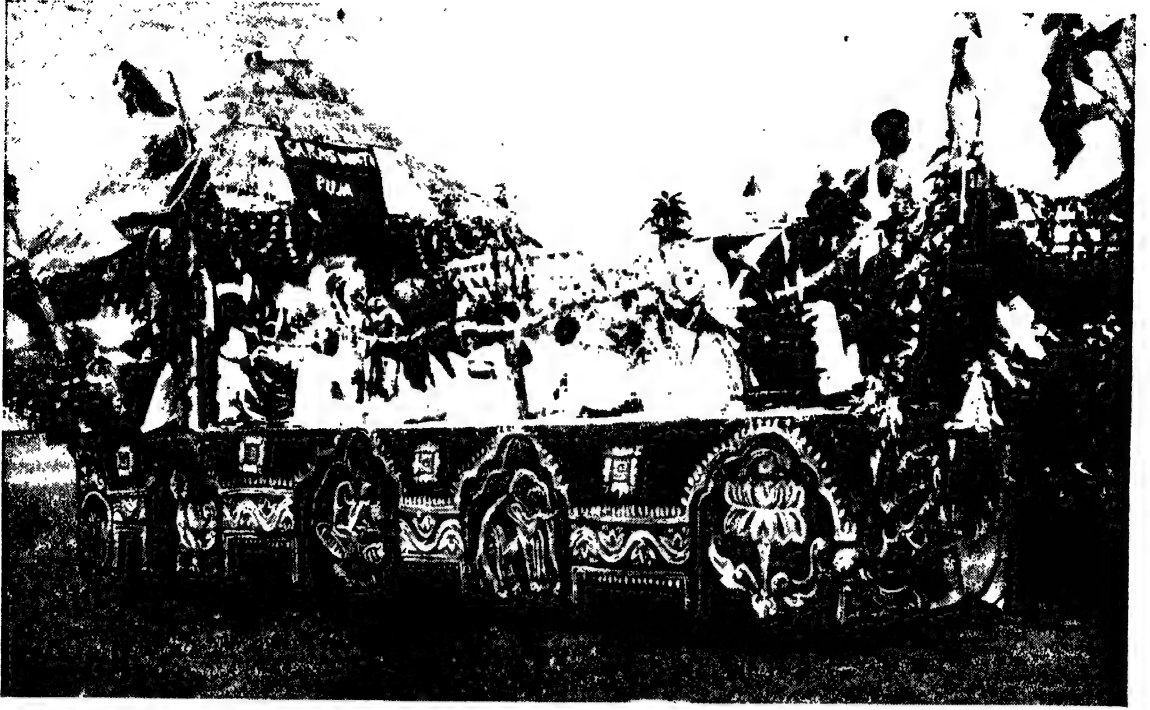
আকবর। (রাগত:) তুমি বেশ জান কি বলছি।

আর আমার চোখে ধুলো দেবার বুখা চেষ্টা না করে সভ্য কথা বল, যদি ভাল চাও। এই অজ্ঞাতকুলশীল নির্লজ্জ বালিকার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

সেলিম। হজুর, আমাকে যত খুশি গালমন্দ দিন, কিন্তু ভদ্রব্রতের নিরপরাধ মেয়েকে অবধা কুকথা বলবার অধিকার আপনার নেই।

আকবর। আমার অধিকার-অনধিকার আমি বুঝব, তোমার কাছে তা শিখতে চাই নে। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে, এই অজানা বিদেশী মেয়েটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত তোমাকে কীদে ফেলবার চেষ্টা করছে; না তুমি তার রূপে মোহিত হয়ে তার আহ্বানমে বাবার পথ পরিভার করছ? এ রোগ ত তোমার ছিল না।

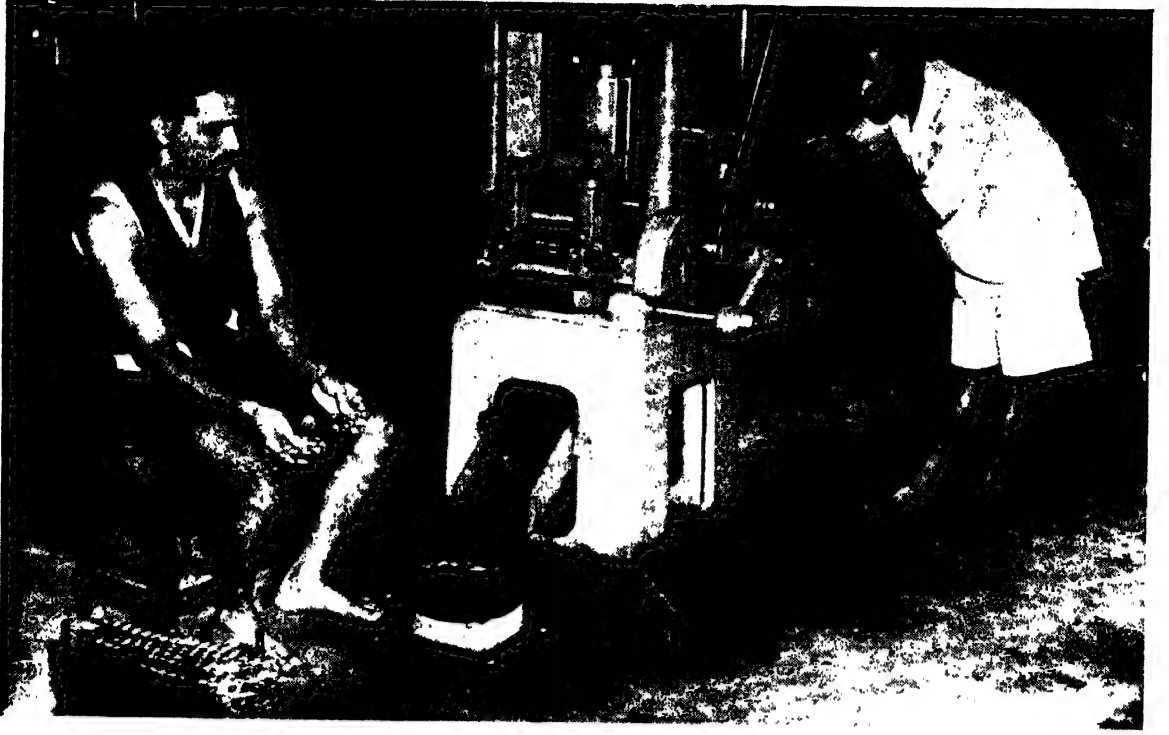
সেলিম। (উত্তেজিতভাবে পায়চারি করত:) এ রোগ নয়নারীর সেই চিরকেন্দ্রে ভালোবাসা রোগ, কখন কাকে আচম্বিতে আক্রমণ করবে, তা কেউ আগে থাকতে বলতে পারে না। যদি ভালবাসা যৌব: হয়, তবে আমি মোবী; যদি সুন্দরকে পাবার ইচ্ছে যৌব হয়, তবে আমি মোবী; যদি সুন্দরকে পাবার ইচ্ছে যৌব হয়, তবে আমি মোবী; যদি সুন্দরকে পাবার ইচ্ছে যৌব হয়, তবে আমি মোবী।



দিব্বাতে প্রজাতন্ত্র দিনসে বাংলার সরস্বতী পূজাচুড়ান দশোর একটি অঙ্গক্ৰতি



কোরিয়াত্ ৬০তম ভারতীয় এম্বলেস ইউনিটের মেডিক্যাল অফিসার সার্জেণ্ট মুখু কৃষ্ণন ও কুশল কুলকণী
প্যারিসের এক অজ্ঞাত নৈনিকের সমাধির প্রতি সত্ধান প্রদর্শন করিতেছেন



টাকশালে একটি আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া ভারতীয় মুদ্রা নিষ্কাশন



এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা—সিঙ্গি 'কারটলাইজার ফ্যাক্টরি'র 'বয়লার হাউসের' অভ্যন্তরস্থ চুল্লীসমূহ

আকবর। তুমি বেশ জান বে, এক জন ইতরশ্রেণীর রমণী কখনোই শাহাজাদার পাটরাণী হতে পারে না।

সেলিম। না, আমি সে কথা জানি নে, জানলেও মানি নে। একটা সল্‌মাতুস্কিপরা জরিজরাবৎমোড়া অচেনা পুতুল রাজকোবে বখেটে পরিমাণ অর্থদণ্ড দিলেই আমার সম্মানিত বধু হতে পারবে; আর আমি বাকে ভালবাসি, বাকে চাই, বার জন্ম রাজসিংহাসন রাজমর্যাদা সব ছাড়তে প্রস্তুত আছি, বে আমার জন্ত তার বাপ মা ভাই বন্ধু সব ছেড়ে এসেছে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেই আমাদের দু'জনকেই অপমানিত লাজিত হতে হবে, এ স্বার্থান্বেষী সর্কার সমাজের নিষ্ঠুর বিধান হতে পারে, কিন্তু কল্পনাময় পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম কখনোই নয়।

আকবর। (অপেক্ষাকৃত নরমভাবে) সেলিম। রাজা-বাদশাহের জীবনের কোন নিয়মটাই বা স্বাভাবিক? এই যে আমরা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে বাধ্য হই; এই যে রাজকার্যের তাড়নায় নিজের পরিবারের সাহচর্য্য দু'দণ্ডে বেশী উপভোগ করতে পারি নে; এই যে প্রজাদের অভিযোগ শোনা, তাদের স্বখখাচ্ছন্দ্য বিধান করবার জন্ত সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়, নিজের আরাম, নিজের অসর কাকে বলে তা জানতেও পাই নে; একি খুব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা? তবু ত আমাদের পিতৃপিতামহ এই মহৎ জীবনযাপন করে গেছেন, আর আমরাও আশা করি যে আমাদের পুত্র-পৌত্রগণ নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে সেই গুরুতার বহন করবে। (কিয়ৎক্ষণ থামিয়া) আমিও এককালে যুবক ছিলাম, আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারি সেলিম; কিন্তু তুমি কি আমার কথা বোঝবার এতটুকুও চেষ্টা করবে না? তোমার পিতৃপুরুষের প্রতি ভক্তি, তোমার দেশের প্রতি কর্তব্য, তোমার বাপমার প্রতি ভালবাসা, বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা, সবই কি এই নতুন প্রেমের জোয়ারে জোতারে মুখে তুণের মত ভেসে গেছে?

সেলিম। (পিতার পায়ে পড়িয়া কাতরস্বরে) জাহাঁ-পনা, পিতা! আমাকে কমা করুন। আমি আপনাদের স্নেহমমতা কখনো ভুলব না, কিন্তু আজ আমি নিজেকেই ভুলেছি। আমি আপনাদের বংশের কল্যাণের, আমি আপনাদের অবোগ্য কুপ্ত। আপনারা আমাকে ত্যাগ করুন, কিন্তু সে নিরপরাধ বালিকাকে ত্যাগ করতে আমার আদেশ করবেন না। আপনাদের অন্যান্য পুত্র আছে, তারা আপনাদের মান রক্ষা করবে, বংশের মর্যাদা রক্ষা করবে। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদে, এই ইন্দ্রপুৰীভূলা দিল্লী শহরে সেই অসহায় বালিকার সর্বনাশ করবার লোক ঢের

আছে, কিন্তু তাকে রক্ষা করবার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সে যে সরল বিশ্বাসে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে বিশ্বাস যদি আজ আমি ভাঙি, তবে দিল্লীর তক্তে কেন, নরকেও আমার স্থান হবে না। আপনি ত পিতা, গুরু,—বলুন, এ কার্য কি ধর্ম্মসঙ্গত হবে—ন্যায়সঙ্গত হবে?

আকবর। (বিচলিতভাবে) সেলিম! ধর্ম্মার্থ, পাপ-পুণ্যের বিচার করতে কখনো শিখি নি; আমরা শিখেছি শুধু রাজকার্য্য, রাজকায়েদা, রাজকীয়মর্যাদা, রাজদণ্ড, রাজ-কর্তব্য। (ভাবিয়া) তুমি এখন বাও, একটু বিশ্রাম করগে। আমিও প্রবোধ মন্ত্রীদেব সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি এ বিষয়ে কি কর্তব্য। যা স্থির হয় তোমাকে কাল জানাব। কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়ে যাও যে, তার আগে তুমি ছলেবলেকৌশলে, কোন রকমেই আনারকলির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টামাত্র করবে না।

সেলিম। (কিয়ৎক্ষণ শুক্ক থাকিয়া) তাই হবে। কৃষ্ণে আমাদের দেখা হয়েছিল, আর দেখা করে পাপের বোঝা বাড়তে চাই নে। কিন্তু পরামর্শের সময় মনে রাখবেন যে, দুটি তরুণ প্রাণের স্বথ দুঃখ আশা ভয় সবই আপনাদের বিচারের উপর চিরদিনের মত নির্ভর করেছে। মনে রাখবেন আপনি আমার স্নেহময় পিতা, কেবল রাজ-নীতির কঠোর প্রতিমূর্ত্তি নয়। কৃমন্ত্রণায় মানুষকে অমানুষ করে ফেলে। (বীরবলের প্রতি বিষেকটাক হানিয়া প্রস্থান। আকবরের মাথায় হাত দিয়া নীরবে অবস্থান।)

বীরবল। (হাসিয়া) শুনলেন ত খোদাবন্দ, আমার প্রতি নিকৃষ্ট বাক্যবাণ! প্রবীণ শিক্ষকের প্রতি অর্কটীন ছাত্রের সম্মানের বহরটাও ত দেখলেন! বাকে জন্মতে দেখলুম, মানুষ করলুম, সেও দুটো কড়া কথা না শুনিতে ছাড়ে না। আজীবন রাজসেবার এই ত বোগ্য পুরস্কার। নাবালক অবস্থাতেই যখন এই মতিগতি, তখন সিংহাসনে উঠলে না জানি কি মুষ্টি ধরবেন! স্বপ্নের বিষয়, তখন আমি আর রাজভরগীর কর্ণধার থাকব না।

আকবর। তুমি হাল না ধরলে এ নৌকো বানচাল হয়ে পড়বে বীরবল। এখনই তার লক্ষণ দেখা বাজে।

বীরবল। হজুর, আমি যতদিন আছি সাধ্যমত আমার কর্তব্যপালনে ক্রটি করব না। কিন্তু আমাদের কাজ ত শুধু হিভোপদেশ দেওয়া, সে কথা শোনা-না-শোনা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছাধীন।

আকবর। তোমার মন্ত্রণা কি আমি কখনো অগ্রাহ্য করেছি বীরবলজী? আমি এতদিন যে-ভাবে চলছি, সেই ভাবেই চিরদিন চলব। আমার প্রাণ থাকতে পিতৃ-

পিতামহের স্তব্ধ বশে কখনো কলঙ্ক স্পর্শ করতে দেব না। সেলিমের এই প্রথম প্রণয়, তাই সে এত অধীর হয়ে পড়েছে। দিনকতক দেখাশুনা বন্ধ থাকলেই এ মশগুল ভাবটা কেটে গিয়ে তার স্বাভাবিক বাধ্যতা ও প্রফুল্লতা ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে আনারকলিকে ফেরত ডাকে কাবুল পাঠিয়ে দেওয়া থাক, কি বল বীরবল?

বীরবল। আপনি যতটা হালকাভাবে নিচ্ছেন হজুর, আমি কিন্তু ঠিক তা পারছি নে। মিলনে বাধা পড়লে প্রেমিকরা খাইবর অপেক্ষা দুর্গম ব্যবধানও অন্যায়সে লঙ্ঘন করে থাকে, ইতিহাসে তার বহু নজীর আছে। ও বিববৃক্ষ নির্মূল করাই ভাল। ঘেরকম বেগতিক দেখছি, প্রাণ থাকতে এ প্রেম বাবে না।

আকবর। (অবসন্নভাবে) তবে উপায়?

বীরবল। জাহাঙ্গনা, আপনি যে এমন জানী হয়েও আজ শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়েছেন, সে কেবল সন্তান-স্নেহের অন্ধ মায়ার। আপনি যান, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে

ঈশ্বরে চিন্তা সমর্পণ করুন, তা হলে আপনার মনের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির স্থিরতা ফিরে আসবে। আপনার শুধু এক সন্তান নয়, সহস্র সন্তানের শুভাশুভ আপনার উপর নির্ভর করছে মনে রাখবেন। আমার উপর ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; এ বিশ্রী ব্যাপারের যথাযোগ্য তদন্ত ও বিচার করে তার ফলাফল আপনাকে অবিলম্বে জানাব। কেবল আপনি কোতোয়ালকে হুকুম পাঠিয়ে দিন যেন বিচার হওয়া পর্যন্ত আনারকলিকে কারাগারে বন্ধ রাখা হয়।

আকবর। বীরবল, তুমি শুধু আমার সুযোগ্য মন্ত্রী নও, আমার পরম স্নেহ ও যথার্থ হিতৈষী। তুমি ঠিকই বলেছ, সেলিমের অভূতপূর্ব ব্যবহারে আমি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েছি। তুমি শীঘ্র এই অলক্ষণা কন্যার বিচারের ব্যবস্থা করে আমার মনে শান্তি দাও, ও বংশের মান রক্ষা কর।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চোখ

ত্রিকরুণাময় বসু

মনে যেই কবে যেন দেখেছি কালো হুট চোখ,
সে কোম লাগর বীণে বহনিন আগে, আহা তাই হোক।
যেখানে উঠেছে বন্ধ, যেখানে বেছেছে বাঁশি,
যেখানে লতার ফুল কায়ে চেয়ে ওঠে মিথালি,—
সেখানে কি দেশ আছে, সেখানে কি আছে কোম বীণ;
পথ চেয়ে কারো চোখে জল আসে, আঁচলে কি ঢেকেছে প্রবীণ?
কতো না গোহুলিকাল যেনে যেনে সোমালি রেখার
ললিত তুলির টানে বিচিহ্নিতা যে হবি আঁকার;
সেই সব মনে রাখা, চিরদিন ভালো লাগা রঙ
জীবনে বাকার হুর পৌড়-সারঙ।
হঠাৎ বদায় যেন : সাই সাই শুভে বালিহাঁস,
যে নীচ ভেঙেছে বন্ধে ওয়ে পাখি মিছে ছুই দুজির। বেতাস।
টিকণ ফুরুর নিচে দেখেছি কালো হুট চোখ,
সে কোম লাগর বীণে বহনিন আগে আহা তাই হোক।

তারপর গেছে কতো কাল,
তোমার আবার মাঝে ইতিহাস ফুলাশর করেছে আঁচাল;
জীরে বসে দেখেছি লাগরের চোট উভাল,
তারপর গেছে কতো কাল।
পৃথিবীতে এলো গেল কতো জয়, কতো পরাজয়,
হাওয়ার উত্থারে দেয় ইতিহাস কালের বলয়।
মনে হয় তুমি আমি কেউ নই, মোরা শুধু খেলার পুতুল,
লতারে কে চেয়ে বসে, বাহুবোরা চেয়ে শুধু ফুল;
তুমি আমি খেলার পুতুল।
সেদিন র'বো না মোরা, শুধু এই চিরজীবী প্রেম
বাহুবের জীবনে জীবনে চিরদিন রাখিরা গেলের।
বসন্ত আসে চিরদিন, কোথায় সে হয়েছে বিনীত
সেকালের বলন্তসেলা,
সরপের মণিহারে প্রেম শুধু গাথা র'বে, তুমি রাখিবে না।
মনে যেই কবে যেন দেখেছি কালো হুট চোখ,
যেখানে উভার আলো করে বলরল,
পাহাড়িয়া বুদো পথে যেনে আসে গোহুলি-আলোক।

যশোহরে নীল-আন্দোলন ও শিশিরকুমার ঘোষ

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

১

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া যশোহর ও নদীয়ায় নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। রায়তদের নামে মিথ্যা মামলা রুজু করা, দানজমি নষ্ট করা, ঘরবাড়ী পোড়ান, গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠনরাজ, জমিদারির কাছারি আক্রমণ, নীলচাষীদের নীলের গুদামে আটক রাখা, নারীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার—একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। জেলায় শাসন-কর্তৃপক্ষ তথা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ইংরেজ কুঠাওয়ালদের নানারূপে সাহায্য করিতেন। ১৮৬০ সনের ১১শ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর শাসকবর্গ চুক্তিভঙ্গের অছিলায় চাষীদের উপর জুলুম-জ্বরদস্তি চালাইতে থাকেন। শিশিরকুমার ঘোষ তখন মাত্র বিংশতিবর্ষীয় যুবক। তিনি এই সময় যশোহরে শিক্ষকতাকর্মে লিপ্ত ছিলেন। তিনি মফস্বল হইতে নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিতেন এবং “M.L.L.”-স্বাক্ষরে কলিকাতার ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’ পত্রিকায় প্রকাশার্থ পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। ‘পেট্রিয়ার্ট’-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাদরে এ সমুদয় পত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি নীল-সম্পর্কিত বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশের জন্য ১৮৬০, ২৮শে এপ্রিল সংখ্যা হইতে “The Indigo Districts” নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খুলিয়াছিলেন। ‘M.L.L.’-স্বাক্ষরে শিশিরকুমারের প্রথম পত্র বাহির হয় ১৮৬০, ৩১শে মার্চ তারিখে। পরবর্তী সকল পত্রই উক্ত বিভাগে স্থানলাভ করে। এই ‘M.L.L.’ যে শিশিরকুমার ঘোষ স্বয়ং সে সম্বন্ধে পূর্বে তিনটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করি। তৃতীয় প্রবন্ধে আমি ‘M.L.L.’-স্বাক্ষরযুক্ত পত্র মূল ইংরেজীতে লব্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি।* শিশিরকুমার এই সকল পত্র লিখিয়া কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারিব।

শিশিরকুমারের উক্ত প্রথম পত্রে ৪২ জন মোড়ল বা

কৃষক-নেতার গ্রেপ্তারের সংবাদ আছে। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকারের নিদেশক্রমে সরকারী ঘোষণা প্রবণের জন্য কালোপোলে আট-দশ হাজার নীলচাষী সমবেত হয়। এই ম্যাজিষ্ট্রেট-পুঙ্খ নীলকর-বন্ধু; উপস্থিত লোকজনকে নীলচাষে প্ররোচিত করিতেই প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে অসম্মত হইলে তাহাদের মধ্য হইতে ৪২ জন নেতাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে স্বীকার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাঙ্গতে রাখেন এবং পরে যশোহর সদরে চালান দেন। সেখানেও নীল বুনিতে রাজী করাইবার জন্য তাহাদের শাসনো হয়, তাহাদের উপর কিছু কিছু অত্যাচারও যে না হইয়াছিল এমন নয়। অবশেষে পয়তাল্লিশ জন মোড়ল নীল বুনিবে বলিয়া একরায়-নামা লিখিয়া দিলে তবে হাজত হইতে মুক্তি পায়। অন্য চারি জনকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী সরাসরি বিচারে ৬য় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার জের যে আরও কিছুদিন চলিয়াছিল পরবর্তী পত্রাবলী হইতে তাহা জানা যাইবে। স্বীকার নীলচাষীদের জঙ্ক করিবার জন্য সরকারে রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, কালোপোলে তাহারা তাহাকে সরাসরি আক্রমণও করিয়াছিল।

যশোহর হইতে ১৮৬০, ৪ঠা এপ্রিল তারিখ সম্বলিত এবং “A Native” স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র ১৪ই এপ্রিল ১৮৬০ সংখ্যা ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্টে’ প্রকাশিত হয়। এখানিও যে শিশিরকুমারেরই লিখিত একরূপ মনে করিবার সম্ভব কারণ আছে। এই পত্রে কালোপোলের ঘটনার উল্লেখ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, সেখান হইতে নয় শত জন রায়ত প্রতীকার-মানসে কলিকাতায় গিয়াছে। এই সময় যশোহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অষ্টাশীটি গ্রাম নীলকরদের বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ হইয়াছিল। গ্রামসমূহের অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা আর নীল বুনিবে না। পত্রখানির নিম্ন-লিখিত অংশ প্রাধান্যযোগ্য :

Is it that we are weak, wretched and poor—that we are their subjects—that we have no other resource than to suffer patiently whatever punishment our masters will please to inflict upon us, that they thus trample upon us, disregarding justice and the tenets of the Bible. How are we to impress upon the minds of the Government that the ryots have neither taken advances, nor drawn contracts? They will never believe it, for the Planters have convinced them otherwise. Woe to the Bengalee that they are sleeping in indolence. When their wretched countrymen are thus

* ১৯৪০ সনের ২৬শে আগষ্ট ‘রবিবারের বুরস্কে’ “পল্লী-মান্ডারার ঘোষ ভ্রাতৃত্ব: শিশিরকুমার ঘোষ”, কাষ্টিক ১৩৪০ সংখ্যা ‘প্রবন্ধকে’ “শিশিরকুমার ঘোষ” (পৃ. ২৮৭) এবং ১৯৪২, ২০শে জানুয়ারী তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় ‘রবিবারের আলোচনী’তে “যশোহরে নীল-আন্দোলনের কথা” শীর্ষক, বর্তমান লেখকের প্রবন্ধের উল্লেখ। সেযোক্ত প্রবন্ধে ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্টে’ M.L.L.-স্বাক্ষরে প্রকাশিত প্রথম পত্রখানি ছাড়া আরও পাঁচখানি পত্রের প্রকাশের তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

sacrificing their lives for their emancipation from Indigo-slavery; they are passing away their time in idle luxury. Rise, Rise, Ye countrymen—with supplicating hands, fall prostrate before the Governor, catch his feet, and do not let him go, unless he has granted your requests. Should the Governor or any other nobleman ever visit the moffusil—the uncontrolled authority of the Planters will make them compare the Sahebs of the moffusil to the Spaniards who once depopulated America.

২

শিশিরকুমারের 'M.L.L.'-স্বাক্ষরে দ্বিতীয় পত্রখানি 'বশোহর, ১৮ই জুন' তারিখ সম্বলিত। ২৩শে জুন ১৮৬০ সংখ্যার 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইহা প্রকাশিত হয়। এখানি দৃঢ়-সকল নীলচাষীদের শাস্তি করিবার উদ্দেশ্যে নীলকর ও ম্যাজিস্ট্রেটের বড়বড়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পত্রখানির মর্ম এই :

"২৯শে কান্তন লালবাবুর নামে পোস্তাখানি কুদ্রি জমৈক ভাসিবার মোলোবীর নিকট পাঁচল্যার কতিপয় অবিবাহীক বিক্রমে এক মামলা কল্ল করে। সে বলে যে, দেহ পত পত্র দিয়া মাফাইয়া বহু বিধা করির নীল তাহার মঠ করিয়া কেলিতেছিল, দেখিতে পার। সে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে মহেশ চাঁটকোর নামের রতি মুখুজ্যের অধীন প্রায় বাট জন লোক জুড় হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাকে বহিরা তাহার মারবরও করে, কিন্তু শেষে সে কোনরূপে পলাইতে সক্ষম হয়। মোলোনী ভৎসনাং তাহারিগের বিক্রমে ওয়ারেন্ট জারি করিলেন। হয় অন্যকে বহিরা আসিয়া হাজতে (নীল-কুদ্রি অধারে) পুরা হইল। সেখানে তাহার মামলাবন্দক থাকে। তারপর তাহারিগকে কারাবন্ডে বন্ডিত করিয়া সয়কারী কোলে পাঠান হয়। ঐ কুদ্রি ভিন জন ভাসিবার ঐ ভাসিবারের লগকে লাক্য দেয়। মোলোনী উহার লাক্যে লগুট হইয়া বিবাহীপকের অপরাধ সম্পর্কে হিরমিন্ডর হন এবং দুই দিনের মধ্যে তাহারে কুচি টাকা করিরাশা, অন্য-দ্বারে ভিন মালের লগর কারাবন্ডের আদেশ বেন। ম্যাজিস্ট্রেট যখন বিচারালয়ে, তখন পোস্তাখানি কুদ্রি সুপারিন্টেন্ডেন্ট দিখ সাহেব তাহার পার্বে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে কখনও উপদেশ এবং বতবাব দিতেছিলেন, কখনও বা তাহার উপর প্রশংসা-বাণী বর্ষণ করিতেছিলেন। বিবাহী হয় জনই অভিযোগ অস্বীকার করে ও লাকীলাবুর আসিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, তাহার অহুসে ছিলই না। কিন্তু মোলোনী এই বলিয়া তাহারে কণা অগ্রাহ করিলেন যে, তাহার সজলেই নীলকরদের বিক্রমে কোট পাফাই-
খানো। তিনি ভাসিবারের কথা বিবাল করিয়াছেন, যদিও

তাহারা নীলকরদের কর্তৃত্বী এবং কুদ্রি প্রভৃতি। তিনি বিবাল করিয়াছেন যে, বাট জন লাকীলাবুর দিলিয়া এক জন লোককে আক্রমণ করিয়া মারপিট করিলেও সে প্রাণতরে পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল, আর বৈবাং ভিন জন ভাসিবার আসিয়া উপস্থিত হইল সশস্ত্র আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লাক্য দিবার নিমিত্ত। এ বোকদমার আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটয়াছে। এই আক্রমণকারী দলের নেতা এবং মামলার প্রধান বিবাহী রতি মুখুজ্যকে চার জন ভাসিবারই লমাক করিল। কিন্তু এক জন লেখাপড়া জানা লোককে অনর্থক লাক্য দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেট মুক্তিযুক্ত বেনে না করিয়া মুক্তি বেন। লাকীরা একবারেই বলে যে, তাহার পূর্বে রতি মুখুজ্যকে চিহ্নিত ও লাকীলাবুরের সর্কারি করিতে তাহাকে ঐ দিন দেখে। কিন্তু অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, রতি মুখুজ্য ঠিক ঐ দিন ম্যাকলীন সাহেবের কাছে ছিলেন। মোলোনী ইহা বিবাল না করিয়া পারেন নাই। যে-সব লাকী বিধা লাক্য দিতে গিয়া এইরূপে বরা পড়িল তাহারে উপরে কিরূপে তিনি নির্ভর করিতে পারেন? বিবাহীপক প্রাণনা জানান বেন ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়া ব্যাপারটির সম্বন্ধে তত্ত্ব করেন এবং এরূপ অসত্যের আদর্শ সংঘটিত হইয়াছে কিনা দেখেন। বরং অহুসবাদ করিলে এই ব্যাপারের সত্য-বিধা তিনি সহজেই জানিতে পারিবেন। সজলেই—তাঁহারে মধ্য ম্যাজিস্ট্রেট এবং নীলকর কেহই বাহ দান না—নিশ্চয়ই জানেন যে, অভি-যোগ ভিত্তিহীন। এ কোলার নব-নিরুক্ত অব বেলী সাহেব এই বোকদমারটির কিরূপ করসলা করেন ভাসিবার বত আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া আছি। যদি এতগুলি লোকের উপরে এরূপ অসত্যের অবিচার করা হয় তাহা হইলে ইংরেজদের উন্নত এবং গণ্যবিত্ত বলিয়া জাহির করার কোনও অধিকার নাই। উপরের বর্ণিত বিষয়গুলি সত্য এবং সবিদ্যে প্রায় অহুসাদ করিয়া দিলাম; আপনি ইহার উপর নির্ভর করিতে পারেন।

"ভানচাং"রও অবার প্ররোগের অন্য লায়বুর সাহেব সর্জন হুগ্যাত। প্রজাদের সাম্প্রতিক কোট পাফাংয়ের বন্ধন তিনি পাগলের মত হইয়াছেন। মুলাবী বিশ্বাসের বাটী পোফাইয়া কেল হইয়াছে। বিবহরি প্রায় পোফাং হইয়াছে। পূর্বে তাফাহতার মধ্য জুল সংবাদ দিয়াছিল। লায়বুর সাহেব বতবাহী প্রায় একেবারে ভুলনাং করিয়া কেলিয়াছেন। বিবহরি, কাকুতিয়া, মামলুকপুরের মত বহু প্রাণের বাসকেত মঠ করিয়া দিয়া সেই সেই ভিত্তি নীল বোনা হইয়াছে। হার্নেল মহোদয়ের উত্তর অকলের প্রজাদের লইয়া কি এতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এদিকে লায়বুর বিবাল সয় পান না?

পুনশ্চ—উক্ত চার জন ভাগিনার কি মিথ্যা লাক্য নামের অপরাধে অপরাধী নয় ?”

৩

শিশিরকুমারের ‘M. L. L.’-স্বাক্ষরিত তৃতীয় পত্রের তারিখ ‘বশোহর, ২৮শে জুন ১৮৬০’। পরবর্তী ৪ঠা জুলাইয়ের ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্টে’ এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। নীলকরদের অত্যাচার-হেতু নীলচাষীরা কিরূপ সংঘবদ্ধ হয় এই পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। আবার কুঠীয়া-দ্বারা জমিদারের কাছারি আক্রমণ ও উভয় দলে এক ভীষণ সংঘর্ষের বিবরণ ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পত্রখানি হইতে মূল বিষয়গুলির তাৎপর্য এখানে দেওয়া হইল :

“...নীলকরদের এখন কাজ হইল দূর দূর গ্রাম হইতে আগত দুর্ভাগ্য রায়তগণকে নুতন নীল-চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করানো। কেনি সাহেবের লোকেরা ঊর্দ্ধভাষণে এই রূপ করিয়া কলে। ইহার কলে সাভান্টি গ্রামের চাষীরা তৎক্ষণাৎ কুঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি শেষ পর্যন্ত তাহাদের নীল বুনিতে এই বলিয়া রাজী করান যে, এবারে নীল বুনিলে পরে তিনি এইরূপ দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিবেন। চাষীরা তাহাদের কথা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কেনির বাণীর চুহুর্দ্ভি চাপিয়া বসে, তিনি তাঁহার কথা রাখিলেন না। এক মাস পূর্বে দুর্গাপুরের কয়েক জন লোক রায়নগর কুঠীর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মালিশ করিতে এখানে আসিয়াছিল। এই ম্যানেজার নুতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করে এবং তাহাদের কয়েকজনকে গুদামে আটক রাখে। এই খেলার জবরদস্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা না করিয়া, সরাসরি মল্লীয়ার লাসিংটন সাহেবের নিকট সিদ্ধান্ত আবেদন করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হয়। লস্জিট (প্রায় নয় দিন পূর্বে) বিজলী কুঠীর (বাহার মালিক মিরাল) ওয়াম সাহেব উম্মেদপুর, ককপুর, পোয়ায়া, বিষ্টুদি, লক্ষণদি, আরোকাবদি প্রভৃতি গ্রামের জনকয়েক মোকলকে ডাকিয়া আনিয়া ভয় দেখায় যে, যদি তাহারা নুতন চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে গুদামে আটক করিয়া রাখা হইবে। তাহারা যেম চুক্তি করিতে অসম্মত না হয়। নীল-চাষীরা বাতী করিয়া ইহার প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। তাহারা বলবদ্ধ হইয়া আদীন ও ভাগিকারদের গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলচাষীদের ঐহিক রক্ষাকর্তারা অত্যাচারীদের দ্বারা উপর তাহাদিগকে হাতিয়া দিয়াছেন। নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্ত তাহারা সর্বশেষে এই অশোষ উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

গত ২০শে জুন মল্লিকপুর গ্রামের জমিদার এবং মীরগঞ্জের ম্যাক্‌আর্থারের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মল্লিকপুর

গ্রামের একটি লামাত অংশমাত্র সে ইচ্ছা লইয়াছিল। সে তাবিয়াছিল, এই হুজ্জে লমএ গ্রামের উপরই আধিপত্য করিতে পারিবে। কিন্তু গ্রামের জমিদার তাহার এই ইচ্ছার বাধা রাখিলেন। ম্যাক্‌আর্থার এই বিষয় দূর করিবার লব্ধ উপায়-বরূপ হই খত লমত লাঠিরালসহ গিয়া তত্ত্বলোকটির কাছারি-বাটী আক্রমণ করিল। এ প্রকার অতর্কিত আক্রমণের জন্ত রায়ভেদা প্রভৃত ছিল না। তাহাদের মধ্যে চার জন ভীষণভাবে আহত হইল, ইহাদের দুই জনকে কুঠীর লোকেরা গাণ্ড করে; অবশিষ্ট দুই জনকে এখানে (বশোহরে) পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই এক জন মারা যায়। ইহার পরেও নীলকরদের আধাঙ্গিক অসং, এবং মিশনরীদের অপেক্ষা নিজেদের উৎকৃষ্টতর ঐষ্টান বলিতেও লক্ষ্যহতব করিতেছে না।

মল্লিকপুর ভরামকভাবে লুণ্ঠিতও হইয়াছে। কীনার এই ব্যাপারের অহুস্হান করিতে গিয়াছেন। অন্ততঃ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি এইরূপই বলিবেন, যদিও সেখানে বাইবার অত্কারণই বলবত্তর। মোরাপাতার মিঃ ট্রাটারের সঙ্গে মীরগঞ্জের ম্যাক্‌আর্থার-কতার শীর্ষই বিবাহ হইবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটেরা নিশ্চয়ই সেখানে মিশ্রিত হইয়াছেন। আমার শ্রমণ হইতেছে, অন্যতকালপূর্বে কীনারের বিরুদ্ধে বশোহরের কয়েকজন রায়ত একটি আবেদনে এই অভিযোগ আমরন করিয়াছিল যে, তিনি নীলকরদের সঙ্গে পানতোজন এবং অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি তখন ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, হোটলাটও তাহার কৈকিহতে সন্দেহ হইয়াছিল। গত সোমবার ২৫শে জুন এই বিবাহ হইবার কথা ছিল। রবিবারে মোলোনী এবং সিবিলা সার্জন এই কুঠিতে বোপনামের মিশ্রিত হস্তবদ্ধ হইয়া সেখানে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ-অস্থান হৃদিত হওয়ার তাহারা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়েন। অন্যত স্মিট চিহ্নে মোলোনী সাহেব কিরিয়া আসিয়াছেন। কীনার সাহেবের একই সময়ে ‘রথ বেগা ও কলা বেগা’ হইট উদ্ভেদ ছিল—হাদায়া লব্ধে ভবত করাও চলিবে, আবার বিবাহের চর্য্য-চোষ্যর আদানও লওয়া বাইবে। বিবাহীপক্ষের অভিযির হতে এ ব্যাপারের কিরূপ নিষ্পত্তি হইবে তাহা বুঝা বুঝি লোকা। সম্ভবতঃ করিয়াদীপক এবং তাহাদের সাক্ষীগণকে মিথ্যা লাক্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাহরের লাবধান হওয়া উচিত, হেলিতে সাহেব কিন্তু আর বাংলার ‘গবর্নর’ নহ্ন।

আপনাকে একটি সুসংবাদও দিতেছি। কালোপোলের সেই কুখ্যাত ‘হাওয়া’, অধাৎ জরেষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কীনারের হেপাফৎ হইতে হাদার হাদার রায়ত কর্তৃক কয়েক জন করেবীকে হিনাইয়া লওয়ার ব্যাপারটা খেলা অভ মিঃ বেলীর বিচারে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। বেলী সাহেব লবে

মাত্র ২১শে জুন এখানে আসিয়াছেন। বর্ডমান নীল-হালায়ার উচ্চ মিথ্যা হামলা লইয়া নীলকর ও তাহাদের বন্ধুরা বেশ একটা সোরগোল তুলিয়াছিল। এ ব্যাপারটি উপলক্ষ্য করিয়াই কীমার সাহেব এই সকল প্রাধবাসী ‘বিজ্ঞোহী’ হইয়াছে বলিয়া লরকারে রিপোর্ট করিয়াছিলেন এবং এই অফিসায় এখানে গৈলসামন্ত পাঠাইবার আকুল আবেদনও জানাইয়াছিলেন। হামলার লিষ্ট সন্মুখে লোকেদের লক্ষ্য করিয়া তাহার এবং সেমাদের ঘোষানে সেখানে তুলি ছোঁকা এবং গর্দান দেওয়ার অভ্যাস হইতে রেহাই পাইবার নিমিত্ত যশোহরের অধিবাসীরা নীলকরদের সঙ্গে আপোষ করতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণের অভিযোগ হইতে দিকেদের মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই হামলার ‘অভিনয়ে’ নীলকরদের বড়ই সুবিধা হয়, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাদের বিরুদ্ধে তাদিরা দিবার একটা মন্ত বক্তৃতা পান। অতঃপক্ষে তাহারা নিরপরাধ রায়ত-গণকে কোমলভাবেই বাগ মানাইতে পারিতেন না। আমি রায়ের মকল পাঠাইতেছি। ইহা দীর্ঘ হইলেও সাধারণের নিকট পেশ করিবার লোক সন্ধান করিতে পারিলাম না। যিঃ বেলী লস্বে কিছু না বলিয়া থাকিবার না। সমগ্র জেলা তাহার প্রাধান্যের সুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই অঙ্গ সময়ের মধ্যে তিনি রায়তদের যে কতখানি প্রিয় হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহাকে এবং যিনি এমন এক জন সুবিচারক পাঠাইয়াছেন, উভয়কেই অশেষ বক্তব্য।”

কালোপোলের হামলা যে যশোহরের জেলা জজ বেলীর বিচারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল, শিশিরকুমার উপরোক্ত পত্রের তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পত্রের সংযোজন-স্বরূপ তিনি রায়ের নকল প্রেরণ করেন। ইহা পাঠে জানা যাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট যে চারি জনকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহাদের এক জনের শাস্তি তিনি বহাল রাখেন, অন্য তিন জন বেকসুর খালাস পায়। বেলীর রায় ম্যাজিষ্ট্রেটদের অবিমুখ্যকারিতা ও নীলকরদের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্বের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ হইয়া আছে।

8

‘M.L.L.’-স্বাক্ষরিত শিশিরকুমারের চতুর্থ পত্রখানি নানা দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ। তাহার বিভিন্ন পত্র বখাৰ্থ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উচ্চ কর্তৃপক্ষ মহলে বেশ একটা চাকলা উপস্থিত হয়। গোপনে গোপনে সরকার জেলা-শাসকদের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে লাগিলেন। এ-দিকে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা কে বা কাহারও তাহাদের অবস্থা-কার ‘কীষ্টি’-কথা ‘পেট্রিষ্ট’-মারফত সাধারণে প্রকাশ

করিয়া দিতেছে তাহারও খোঁজ করিতে আরম্ভ করেন। পত্রখানি যশোহর হইতে ২৫শে জুলাই প্রেরিত; পরবর্তী ১লা আগষ্টের (১৮৬০) ‘হিন্দু পেট্রিষ্টে’ ইহা প্রকাশিত হয়। পত্রের মর্ম এই :

“এখান হইতে লিখিত আমার পত্রসমূহে ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেআইনী কার্যকলাপের কথা প্রকাশিত হওয়ায়, কে তাহাদের এইরূপ বেগ দিতেছে তাহার অহুসন্মানে তাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে? কীমারের ভীত বুদ্ধি এই ব্যাপারে নিরোত্তীর্ণ হইয়াছে। কে কে ‘হিন্দু পেট্রিষ্টে’র গ্রাহক তাহার অহু-সন্মানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, পাবলিক লাইব্রেরী ব্যতীত আর কেহই এখানে ‘পেট্রিষ্টে’র গ্রাহক নহেন। এখন কি করা যাইবে? বাহা হউক, ইহার পরেই বিকরপাহার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্র পাইয়া তাহারা কতকটা সোরাতি পাইয়াছেন। নীলকরদেরই বন্ধু বরদাকান্ত রায় প্রমুখাণ্ড তাদিরা নীলকর-বিরোধীদের অন্ততঃ তিন ডজন নাম তিনি পাঠাইয়াছেন। নামগুলি পাইয়া জেলা কর্তৃপক্ষ যেন গিলিয়া কেলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েক জন তাহাদের পরিচিত, কয়েকজন অপরিচিত। কিন্তু কে যে কাগজে লিখিতেছে তাহা কেমন করিয়া বাহির করিবেন? কিন্তু ইহাদের মধ্যে হইতে আমলবাবু মাজির, বিজুবাবু পোষ্ট মাষ্টার, শিশিরবাবু শিক্ষক, কৃকবাবু, গিরীশবাবু এবং আর একজনকে তাহারা ঐ পত্রগুলির লেখক বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। যিঃ মোলোদী সন্দেহবশে আমলবাবুকে ভীষণ তাবে তিরস্কার করিয়াছেন। কীমারের নিশ্চিত বারণা, শিশিরবাবুই এই কাজ। আবার কৃকবাবুও যে না হইতে পারেন এমন নয়। তাহার ইংরেজী জ্ঞান এবং নীল-বিরোধী মনোভাব সর্বত্র বিদিত। পত্রলেখক যিনিই হউন, গিরীশবাবুও যে ইহার মধ্যে আছেন, এরূপ সন্দেহও তাহারা করিতেছেন। এইরূপ শুকন, আমলবাবুকে বরখাস্ত এবং শিশিরবাবু ও বিজুবাবুকে বেজাবাস্ত করা হইবে; আর কৃক-বাবু ও গিরীশবাবুকে কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। কিন্তু আমি বর্ডমানে নিরাপদে আছি আর হু হইতে তাহাঙ্গা দেখিতেছি। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করা হইতেছে, শুকনও রটতেছে। আমার লস্বে যখন এই সব তুলি ভরন আরও কৌতুক অহুতব করি। মোলোদী অপেক্ষা অধিকতর অবিবেচক এবং হজ্জতপ্রিয় (rash) কীমার সাহেব আপেক্ষার বারণা এখনও পোষণ করিতেছেন। তিনি শিশিরবাবু সম্পর্কে প্রত্যেকটি ভাষা, বেদন বাসহান প্রভৃতি ইচ্ছা লইয়াছেন। আমি আর-প্রকাশ করিব না বতকণ না দেখি যে, তাহারা উপরোক্ত সন্দানিত ব্যক্তিদের কতি করিতে উত্তত হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, প্রতিনিরত আমার বরা পড়িবার আশকা

হইতেছে, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। কারণ তাঁহারা একাবিক বার হোটলাটের অন্তঃস্বত্বজন হইয়াছেন, এবং করলও কর্তৃক বিবেচিত ভারতবর্ষের একজন অধ্যক্ষই ম্যাজিষ্ট্রেট পদ এলা আগষ্ট একেবারে বিলাত পর্যন্ত ছুটিয়াছেন। তথাপি আমার আশা আছে, জজ বেলী—যশোহরে এমন উৎকৃষ্ট জজ খুব কমই আনিয়াছেন—সর্বশক্তিমান ম্যাজিষ্ট্রেটদের কোণ হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রায় প্রত্যাহই উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট কৈকিরং দিতে হইতেছে। এইরূপ একটি কৈকিরং কীনার সাহেব স্বীকার করেন যে, হেলিডের পরামর্শ অনুসারে তিনি কিছু করিয়াছিলেন—তিনি তাঁকে স্পষ্ট করিয়াই এরূপ করিতে বলেন। এই কৈকিরংয়ের একটি বসন্তা আমি দেখিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ইহা উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের অহমতি দেন নাই।

সাক্ষর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলর নীলকরদের বহুরূপে আঘাত হইলেও এখন আর ওরূপ নহেন। তখন এই যে, তিনি একেবারে বলিয়াই গিয়াছেন। এতদিন কোরপূরক দাবাইয়া রাখিলেও, রায়ভেরা বর্তমানে পুনরায় শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। নীল কাটিবার সময় উপস্থিত। বিভিন্ন স্থানের রায়ভগণ এক আবেদনে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, গ্রামে বসিয়া নীল-পাঁটগুলির ওজন করিতে হইবে এবং কুঠীতে লইয়া বাইবার পূর্বেই দান মিটাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ তাহাদের বারণা, তাহারা মূল্যবান এক কর্পসও পাইবে না। টেলর আবেদনে বর্ণিত বিষয়গুলির সুস্থিস্থতা স্বীকার করিয়া ‘মাদাদ’ (‘Madads’) দিতেছেন বাহাতে রায়ভেরা কুঠীঘালের বেজাচারমূলক কার্যকলাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

দীর্ঘকাল কুঠীতে বসি গোলমাল চলিতেছে। রায়ভেরা খুবই উত্তেজিত। মল্লিকপুরের সংঘর্ষের কলে এইরূপ হইয়াছে। আমি পূর্বে লিখিয়াছিলাম এই ব্যাপার গত মাসের ২০শে ঘটয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এটি ঘটয়াছে ১৮ই জুলাই। কীনার বয়ঃ ইহার তদন্ত করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, ‘যতদূর এবং কতগুলি বহু সাক্ষীর বিবৃতির সঙ্গ মিলিয়া বাওয়ার অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একটি সংঘর্ষ নিম্নরূপে বাধিয়া যায়, আর যোঝিয়ারের বাহবরের কতগুলি হইতে প্রমাণিত হয় কুঠীর লোকজনও সশস্ত্র ছিল।’ লোক গাণ্ করায় অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আহত লোকদের লইয়া বাওয়া সম্পর্কিত বিবৃতিগুলি এতই পরস্পরবিরোধী যে, এগুলি বিশ্বাস নহে।’ অকাট্য প্রমাণ থাকার কীনার শেষে এই কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন, ‘প্রমাণিত হইল যে, দীর্ঘকাল কুঠী এবং মজালবাবুদের মধ্যে পাঁচুর বাড়ীতে

বসিয়া, তাহাকে কোরপূরক কুঠীতে বসিয়া লইয়া বাইবার চেষ্টা করার একটি স্মরণিত হইয়াছে; এক পক্ষে পাঁচু শেখ, উকীর মহম্মদ ও বসীফদীন আকবর এবং অন্য পক্ষে সক্রী আহত হইয়াছে; পাঁচু ওরুতর আঘাত পাইবার কলে অব্যবহিত পরেই সারা যায়। প্রত্যেক পক্ষ নিজের আহত ব্যক্তিদের নিজ নিজ হোশাকতে রাখে। প্রতি দলে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ছিল। মজাল-পাকীর লোকদের বিরুদ্ধে লাক্য-প্রমাণ খুবই সামান্য, আর পাঁচু শেখকে বলপূর্বক বসিয়া লইয়া বাইবার প্রমাণে গ্রামবাসীরা যে বাধা দিয়াছে তাহাতে তাহাদের দোষ বেওয়া চলে না। জন ড্রাইভার এই সময় দীর্ঘকাল ছিলেন।’

কীনারের রিপোর্ট আদৌ নির্ভূত নয়, তথাপি ইহাকে সত্য বলিয়া বসিয়া লইলেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, রায়ভেরা শুদ্ধমাত্র আত্মরক্ষার ব্যাপ্ত ছিল। ঐ সময় জন ড্রাইভার কুঠীতে থাকার এ বিষয়ে তাঁহার হাত না থাকিয়াই যায় না। তথাপি কীনার তাঁহাকে ইংরেজ বলিয়াই হতত রেহাই দিয়াছেন। নীলকরেরা হতত শপথ করিয়া বলিবেন, তাহারা বাংলাদেশের হিঠেবী বন্ধু, তাহাদের তরফে অভিচার খুব কমই হইতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা কিন্তু কুড়তোঙ্গি এবং কখনও বলিতে ছাড়িব না যে, কোন দেশেই নিম্নক বর্ণসিদ্ধির জন্য ম্যার বিচার এরূপ ভাবে সেই সব লোকদের দ্বারা পদ-বলিত হয় নাই, বাহারা নিজের সত্যতা ও উন্নততর চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য ব্যস্ত। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এই নিরীহ জাতির নিকট কখনও অভিচারী বলিয়া মনে হইতেন না, যদি না নীলকরণ বিজ্ঞান থাকিত এবং যদি সিবিলাইজেশন বর্ণানির্দিষ্ট কার্য করিতে সক্ষম হইতেন।”

৫

শিশিরকুমার ‘হিন্দু পেট্রিয়ারে’ ‘M.L.L.’-স্বাক্ষরিত পঞ্চম পত্র লেখেন যশোহর জেলার অন্তর্গত তারাগঞ্জ হইতে ২রা আগষ্ট তারিখে। ‘পেট্রিয়ারে’ ৮ই আগষ্ট এখানি প্রকাশিত হয়। তারাগঞ্জ হইতে কেন পত্র লিখিতে-ছিলেন, তাঁহার উক্তি হইতেই সেকথা জানা যাইবে। এই পত্র পাঠে আরও জানা যায়, শোলকোপা, বিজলী, রামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার নীলচাষী রায়ত কুঠীঘাল-দের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কুঠীঘালগণ জোরজব্দন্তি করিয়া নীল তুলিয়া আনিবার জন্য রিভলভার, অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিঘাল সংগ্রহ করিতেছিল; গ্রামবাসীরাও বসিয়া নাই, তাহারাও বর্শা, লাঠি, গদা জোগাড় করিতেছে—প্রতিজ্ঞা, মূল্য না পাইয়া নীল ছাড়িয়া দিবে না। শতখানেক পুলিশও মোতায়েন হইয়াছিল।

ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের আচরণ বিরূপ জঘন্য হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখও এই পত্র-খানিতে আছে। বশোহরের সিভিল সার্জন এলিয়ট সাহেব কারাগারে প্রায় পঁচিশ জন নীলচাষীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহারা আগামী বৎসর নীল বুনিবে, না আবার জেলে আসিবে।' নীলচাষীরা একবাক্যে বলে, 'না সাহেব, তোমরা যদি আমাদের গলা কাটিয়াও ফেল তথাপি নীল বুনিব না। ইহার ফলে আমরা বন্দি-বা কয়েকজন মারাও বাই, আমাদের দেশের লোকেরা তো স্থখে বিন কাটাইতে পারিবে।' এই উত্তর পাইয়া সিভিল সার্জন এলিয়ট খুব রাগিয়া বান, এবং কাছে বে ক'জন দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বেজ্ঞদণ্ড দিয়া তাহাদিগকে পাঁচ-ছয় ঘা লাগাইয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে 'তুম্ লোক্ বদমাস' এরূপ গালি দিতেও ছাড়ি-লেন না। ইহার পর শিশিরকুমার বশোহর ত্যাগ করার কারণ সম্বন্ধে এই মর্মে লেখেন :

"তিনি [কীনার] আমাদের বশোহর সংবাদদাতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছেন। শিকক শিশিরবাবুকে সন্দেহবশে জব্ব করিতে নামা হল খুঁজিতেছেন। তাহার বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করিয়াছেন। কীনার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে চাপরাসী পাঠাইয়া চার জন চাষীকে ধরিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের মুখ দিয়া তিনি এই কথা বলাইরাছেন যে, শিশিরবাবুর পিতা তাহাদিগকে নীল বুনিতে বাধ্য দিয়াছেন। বুঝা বাইতেছে, কীনার উক্ত চাষী-গণকে কিছু দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। মারের-মারোগাকে খ্যাপারট ভবনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, লত্যা হটক মিথ্যা হটক, সে যেন ইহার বাধ্যবাধী প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই সব নয়, কীনার

প্রকাণ্ডে বহু বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ঊঁহাকে বেধিয়া লইবেন ('উস্কো বেধেগা')। বেধা বাক্, তিনি কিরূপে শাস্তি প্রদান করেন। যত জঘন্য লোকই হউক, শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ দিতে পারিলেই সে কীনারের নিকট খুবই সম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়। হঃধের সহিত বলিতেছি, আমার এমন নৈতিক সাহস নাই যে, এইরূপ 'কেপা' ম্যাজি-ষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হই। ইনি বখনই আমার বোঁধ পাইবেন তখনই আমাকে নিশ্চিত ধ্বংস করিয়া কেলিবেন। ("who is sure to ruin me as soon as he has found his man")। সম্ভবতঃ মিঃ কীনারের ভয় হইয়াছে পাছে কুম্ভাত হাম্ভার ওজুহাতে কলিকাতা হইতে যে সকল সৈন্য আনাইয়াছিলেন তাহার ধরচ তাহাকে বহন করিতে হয়— কারণ জেলা জব্ব বেলীর বিচারে ইহা তো মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

পরবর্তী ২২শে আগষ্ট (১৮৬০) সংখ্যা 'হিন্দু পেটিয়ন্টে' 'M. L. L.'-স্বাক্ষরযুক্ত শিশিরকুমারের আর একখানি পত্র পাইয়াছি। ইহার পূর্বে ও পরে "from our Jessore Correspondent" রূপে আরও কয়েকখানি পত্র বাহির হইয়াছে। এসব পত্রপাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়, এগুলিও শিশির-কুমারের লিখিত। তিনি মফস্বলে বিভিন্ন স্থলে ভ্রমণ করিয়া 'পেটিয়ন্টে' সংবাদ পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি ম্যাজি-ষ্ট্রেটদের চোখ এড়াইবার জন্য বশোহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকর-সমাজের সঙ্গে বোগসাজশে প্রজাতুলের উপর বিরূপ উৎপীড়ন-নিপীড়নে লিপ্ত হইয়া পড়েন এই সকল পত্রে তাহার বিবৃত বিবরণও পাওয়া বাইতেছে। আগামী সংখ্যায় এই পত্র-গুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করার বাসনা রহিল।



অজ্ঞানেশ

ঐনলিনীকুমার ভট্ট

গোদাবরী নদীর উপরকার সুবহুং সীকো অভিক্রম করে
মাত্রাক বেল এসে ধামল হোট্ট একট্ট ঠেপনে—দাম কক্কুর।

মোটমোটসহ ট্রেন থেকে নামতেই একজন প্রিরদর্শন সুবক
হরিতপনে কাছে এসিয়ে এসে ইংরেজী ভাষার ভিজেন
করলেন—“আপনি কি ঐতজ, কলকাতা থেকে আসছেন?”
তার কথার কবাব দিবে প্রতিপ্রের করলাম—“শর্দ্বাকী
পাট্টিয়েছেন আপনাকে?”

“হঁ, আমি গাভী দিবে এসেছি, চলুন আমার সঙ্গে।”

হুঁকনে এক ‘বটকার’ গিয়ে উঠলাম।
বটকা হচ্ছে একটি মাত্র গল্পদ্বারা চালিত
এক প্রকার বাববিশেষ। কক্কুরের
মাত্রপনের উপর দিবে আমারের পোষান
দীরমহুয় পতিতে চলতে লাগল। এমনি
ভাবে প্রার আব মাইলটাক চলবার পর
বাক্যারে পৌছে ভান দিকে মোক কিরল
এবং হুই তিন মিনিটের মধ্যেই একটি
মাত্রিরহুং সুবম্য অট্টালিকার সামনে
এসে ধামল।

আমরা গাভী থেকে অবতরণ করতেই
উদ্ভল পৌরবর্ণ, কীণকার প্রোট এক
ভজলোক বিতহাতে আমাকে বাগত
করলেন। পরনে তার ভল্ল বকরেতু
বৃত্তি, আর একখানি চাহরে দেহের
উভমার্জ আবৃত। ইনিই হচ্ছেন ‘অজ্ঞ
প্রমিক বর্ধরাক্য লভা’র কর্ণসচিব,
অজ্ঞানেশের বিখ্যাত বিধান ঐবভেবর
শর্দ্বাকী—এঁরই অভিধি হরে আমি কক্কুরে এসেছি।

শর্দ্বাকী আমাকে সঙ্গে করে তার বহির্বাট্টির একটি ককে
দিরে গেলেন। বামিক বাবে একজন বেজালেকক আমার
কতে ককি ও ‘ইভলি’ দিবে এস। ইভলি হচ্ছে চালের ভঁড়ো
আর কলাই ভাল দিবে তৈরি একপ্রকার শিটে।

বটীথানেক বিজ্ঞাবের পর শরীরট্ট একট্ট ঢাল হলে পর
শর্দ্বাকীর পুত্র ভজবৃত্তির সঙ্গে গোদাবরী নদীর তীরে এসে
উপস্থিত হলার। গোদাবরী কক্কুরের পূর্কপ্রোভ দিবে
প্রবহমান—শর্দ্বাকীর বাতী থেকে নদীতীর মাত্র করেক
মিনিটের মাত্র।

নদীতটে প্রকাও এক নদীকূলের বন পজাম্বাবনের দীতে
প্রাচীন আমলের এক দেবমন্দির। মন্দিরট্ট বেন মজাকালের
হুত লাকী—হুসহুগুহর বয়ে দিহি বিকলভাবে ঠাঁড়ির

নদীপরপারে আকাশ-বনানীর মিলন-লীলা প্রত্যর্ক
করছে।

বেন কিছুকণ নদীর বাটে কাট্টিরে আভানার কিরে এসে
পর আমাকে সঙ্গে বেত্তরা হ’ল লক্ষীপতি মাত্ত নামে একজন
কর্দীর মিসার। তারই উপর আমার আহারাতির ব্যবস্থা করবার
ভার। লক্ষীপতি মাত্ত আমাকে দিবে গেলেন অনেক মাত্রাকী
মাত্রা-পরিচালিত, অমাত্রিহুবর্তী এক প্রকাও হোট্টলে—
হোট্টেলটির আভিজাত্য আছে, হরিশ্রি মাত্তের ঐকেন নয়।



কারিরাপেট্টা লগেলনে আদিবাসীনের মাত্রাকাত্টা প্রদর্শন

বেত্ত পাথরের টেবিলের উপর প্রকাও এক বালায় আহারা
পরিবেশন করা হ’ল। লক্ষীপতি মাত্তের নিকট ভবলাম
মিনি তোক্যলব্য পরিবেশন করছেন তিনিই হোট্টেলের
বহাবিকারী। ভজলোক প্রকাবারে হোট্টেলের মালিক,
পাচক, পরিবেশক সবকিছু—সপরিবারে হোট্টেলেই বাস
করেন। তিনি ভজক্কার ইংরেজী বলতে পারেন।

প্রচুর চাটনি এবং লভার ভঁড়ো লংঘোনে “লবন”
“লবন” প্রকৃতি মজ্জেশীর বাতবত বা’হোক এক রকম করে
বহাবাহানে চালিরে মিলার। প্রচুর দধি, আর এবং বিত্ত পাতে
পকেছিল। কিন্তু হুশকিলে পজলাম ‘বারবাই’ দিবে তৈরি
ভেলার মত এক প্রকার বাতবত দিবে। ভেলুত ভাবার
কিভেভে বলে বারবাই। পরিবেশক বললেন যে, তার স্ত্রী
কিছুকাল তার ভাইয়ের সঙ্গে বাংলা হুদকে মিজেন, ভজল

তিনি বারবাই দ্বিগে এই বাঙালী বরণের দ্বারা নিবেদন এবং বিশিষ্ট বাঙালী অভিনয় করে বহুতে সময়ে এই আহার্য প্রদত্ত করেছেন। কোন্ বদলননা এই রাজ্যী মহিলাটির বদলনের পততির বদলবিতার শিকারী তা আমি না।



একটি অল্পপরিচয় হাটের দৃশ্য

কিন্তু এই মনবৎ যে এক মিহি বকীর ভদ্র-লভ্যদের উপর বদলবিতার দ্বারা 'একপরিচয়' চালাবেন তা বোধ হয় তিনি ভাবতে পারেন নি। বারবাই বুঝে দিচ্ছেই বুঝটা একেবারে বিচার করে গেল—মনে হ'ল যে ভোজনটাই মাটি—এই অপূর্ণ বস্তুটি আসলে প্রচুর তৈল আর লভ্য লভ্যে সিক্ত করে বাটা বিড়ের মত। কালো কালো বীতি আর ঝাঁপ বেবে বুঝতে পারলাম, যে বিড়া পেতে ফুলে একেবারে শিকার আকার ধারণ করেছে তাই দ্বিগে এ অভিনব বস্তু তৈরি, এমিকে ভদ্রলোক একটুটে আহার বুঝে পালে তাকিয়ে আহেন দ্বিগে প্রশান্তি ভাবার ভেত্রে—ভেতরে পর্কার আড়ালে চূড়ির টুং-টাং শোনা যাচ্ছে। বললাম, "কি অপূর্ণ চীৎকার না হয়েছে, মনে হচ্ছে ঠিক বেশের দ্বারা বাজি।" লভ্য লভ্যে পরিবেশক অতঃপরে গমন করলেন আর বদলবিতার অস্ত্রালে চূড়িভলো আরও একটু ক্রতভালে বেজে উঠল। কলে বা অনিবার্য তাই বটল, অতঃপরে থেকে প্রেরিত ভূপা-কার বারবাই আমার পায়ে বদলবিতার শিকারিদের মত খোঁজ পেতে লাগল এবং নিঃশেষে তা আমাকে অবলীলা-ক্রমে উদ্বাহ্য করতে হ'ল। এমিতাবে সেদিনকার মত ভোজন-পর্কের উপলব্ধি হ'ল বটে, কিন্তু মনে আশা যে সে রইল যে কোই না ভোজন-পায়ে বারবাইয়ের আবির্ভাব এমিতার বিপর্যয় ঘটায়।

৮ই জুন লভ্যে ৮টার সময় গোদাবরী নদীতীরে বীর-দ্বিগে লাংভিতক লভ্যেদের আয়োজন হ'ল। এই লভ্যেদের বোদবান করবার ভেত্রে প্রতিক বর্ষরাজ্য লভ্যে কর্তৃক আহুত

বীরদ্বিগের অল্প প্রতিক বর্ষরাজ্য লভ্যে প্রবান কর্তৃক। আমাদের হাটুখমিকে পরাবীলভার মুখলভ্য করবার উভেতে অল্পবেশের যে লভ্যে বীরলভ্যে বীর উল্লস করে পেছেন তাঁদের বৃত্তিকার উভেতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বেশভক্ত' ভেটটাল্লায় এর উদ্বোধন করেন এবং উক্ত দ্বিগেই এই দ্বিগে প্রতিক বর্ষরাজ্য লভ্যে কার্যালয় খোলা হয়। প্রতিক বর্ষরাজ্য লভ্যে আদর্শ হচ্ছে সেবার ভেতর দ্বিগে বেশের অপণিত হুট হুট অপণের লভ্যে বোদবান। এই উভেতদ্বিগে ভেত্রে 'লভ্যে' কর্তৃক উভোদে অল্প-প্রবেশের তাইলাগ, কৃকা, কুরুল প্রভৃতি বিভিন্ন লভ্যে অনেকগুলি 'প্রতিক কল্যাণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু



অন্যকারী

এঁদের কর্তৃক তদু লভ্যে অকলেই লীলাবদ নয়। দ্বিগে বাবৎ অল্পে একেদী এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে বেতাবে এঁরা কল্যাণকর্কের অহুতান করে আসছেন তা তদু প্রশংসনীয়ই নয়, অহুতরণবোধ্যও বটে। বিশাখাপত্তন লভ্যে বহুগোলা এবং অন্তর্দ্বিগে একেদী লভ্যে পার্কত অকল হুতে এঁদের কর্তৃক প্রসারিত। প্রতিক বর্ষরাজ্য লভ্যে কর্তৃক লভ্যে প্রবান এই লভ্যে আদিবাসীর মধ্যে শিকারিভার, মতপান বিবারণ আন্দোলন, চরকার হুতাকাটা, বিভালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিভিন্ন কল্যাণ-কর্কের হুতান করেন লভ্যে তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শজন লাভ করতে লভ্যে হন। গান্ধীজী ১৯৪০-এর ২৫শে আগষ্টের 'হরিনন্দ' পত্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে এঁদের এই লভ্যে কর্তৃকপ্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। এই লভ্যে অহুতানের প্রতি ঠকর বাপারও হুটি আহুত হয়। বিপত কেন্দ্রবাসী মাসে 'বহুগোলা, আদিবাসী কল্যাণ লভ্যে'র উভোদে হুতবশেটা এবং কাহিরাপেটার যে লভ্যে লভ্যে অহুত হয় সেটি বিশেষ লাকল্যবিত্ত হুতছিল।

প্রতিক বর্ষরাজ্য লভ্যে বর্ষরাজ্য লভ্যে প্রবান আদর্শ

এনে পড়েছি—এখন বীরমন্দিরে অস্থিত সন্মেলনের কথা
হুজ করি।



ওয়ালটেমারের একটি দৃশ্য

শান্ত পতীর পরিবেশে বক্ষিহস্তের ‘সন্মেলন’
সদীভের দ্বারা সন্মেলনের উদ্বোধন হ’ল। পানট পাইলে
একটি আদিবাসী যুবক। সূর্য কামিরাপেটার পার্শ্বত অকল
বেকে সে এসেছে এই সন্মেলনে যোগদান করতে। উদ্বোধন-
সদীভের পর বীরমন্দিরের সমুদয় প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে
পাশাপাশি দুটি পতাকা উত্তোলিত হ’ল—ভারতের
জাতীয় পতাকা এবং প্রমিত বর্ণরাজ্য সত্য প্রতীক
প্রমিত পতাকা। প্রমিত পতাকা নীল এবং ক্রমশঃ এই
বিবর্ণরঞ্জিত। পতাকা উত্তোলনের পর সেই আদিবাসী
যুবকটি কর্তৃকই পিত হ’ল তেদুত তাহার রচিত ‘প্রমিত
সদীভ’। তার শেবাংশট এইরূপ :

‘ভাদিকি চৌকুগা, বাট প্রমিতুলা
হুটে ভিপেন্‌চেন’

অর্থঃ—‘প্রমিতের রাজ্য কোন্‌ পথে ?

বিব্রাজ্যের পথে, ঐক্যের আর বিস্ময়জনী পথে।’

সদীভ সমাপনান্তে হুজ হ’ল মন্দিরভিত্তরে হুজভক্তের
অস্থান। তত্ৰ বকর পরিহিত কর্মীরা তার বেঁধে বসে
নিবিষ্ট চিত্তে চরকার হুজ কাটতে লাগলেন—ভাঁবের দিটার
ভাষী মনকে হুজ করল।

সন্মেলনের আনুষ্ঠানিক বিকের আরও কতকগুলি
ব্যাপার সমাপ্ত হলে পর জীবন্তের শব্দ ‘আইনটাইনের
আপেক্ষিকতাবাদ ও প্রমিত বর্ণরাজ্যের আদর্শ’ সম্বন্ধে তাঁর
মৌখিক ভাষণ হলেন। এমন চমককার ভাষণ শোনা
মৌতাপ্যের কথা। প্রোভাদের মনকে তিনি এমন এক ভরে
নিরে গেলেন যেখানে বর্ণন ও বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে এসে
হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুদিন আগে মহামতি বিবেকনাথ
ঠাকুর আমাদের দেশের জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে
“দ্বিধা পারদর্শনের অপত্য দুহি” আখ্যা দিয়েছিলেন।

শব্দার্থী বৈজ্ঞানিক হুজিসমর্থিত পারদর্শ্যবান ভনে মনে
হ’ল এই অভিজ্ঞ এই জ্ঞান-ভাপনের প্রতিও প্রবোধ্য।

পরদিন (১৫ জুন) অপরাহ্ন তার বটিকার সময় বীর-
মন্দিরে এক বিরাট সাংস্কৃতিক সন্মেলনের আবির্ভাব হুজ
হ’ল। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, মহিলাসকল, যুবক ও ছাত্রদের
সমাবেশে বীরমন্দিরে আর ভিলবারণের জারপাইক পর্বাভ হইল
না। হুজা ফেলা প্রভৃতির তার হুজবর্তী স্থান থেকেও
প্রমিত বর্ণরাজ্য সত্যের পাখা-কেন্দ্রসমূহের বহু কর্মী
সন্মেলনে যোগদান করবার ভেত সমবেত হয়েছিলেন।
সত্য বিজ্ঞাপন ভো প্রচারিত হয়েই ছিল, তার উপর
চোল-শহরভেত সত্যের কথা প্রচার করবার ব্যবস্থা করা
হয়েছিল। সত্যমলে বসে চোলের আওরায় আর
বোম্বকের কর্তব্যর কানে আসতে লাগল। শব্দার্থী

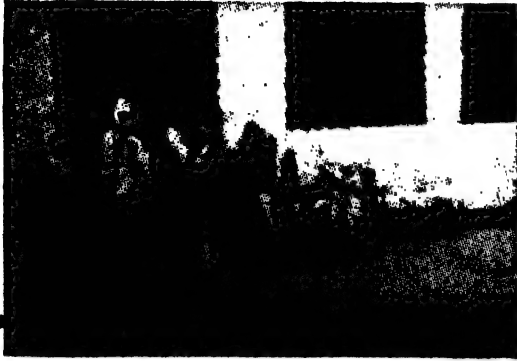


বিশ্বাধাপন—ফেলেন্দীর একাংশ

বললেন—“ভবদী, বহু বংসর আশেকার একটি দিনের
কথা মনে পড়ছে। তখন আমাদের যৌবনকাল। জালিরা-
ওয়ালবারণের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ উপলক্ষে আমরা যে
সত্য আয়োজন করি তার কথা এই লোকটাই চোল বাজিরে
শহরময় ঘোষণা করেছিল।”

যথোচিত গাভীরাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সত্য আরভ হ’ল।
শব্দার্থী সমবেত প্রোভমজীর সহিত আমার পরিচরসাবন
করিয়ে দিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে অহুরোধ করলেন।
ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমার ভাষণটি ছিল দুই অংশে
বিভক্ত। প্রথম অংশে ছিল প্রমিত বর্ণরাজ্য সত্যের আদর্শ
সম্বন্ধে আমার ভাষণ এবং আসামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে
আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আর দ্বিতীয় অংশে
ছিল পূর্ববঙ্গের বাতহারাণের কথা। সন্মেলনের কর্তৃপক্ষ
আমাকে পূর্ববঙ্গের উৎসাহের সম্বন্ধে কতকিঞ্চি বলতে
অহুরোধ করার আমার ভাষণের দ্বিতীয় অংশটি পরে
সংযোজিত করেছিলেন। সত্য একটিকে বেরন বহু শিকিত
লোকের, অতর্কিত তেমনি বহুশিকিত এবং অনেক আকি-

বাণীও লম্বাঘন হয়েছিল সকলের বোম্বোসৌকর্য্যার্থে
বীরবন্দীরের কর্ণসজিব, হানীর সংকট বিভাগীঠের অথাক কে.
তি. এম. আগ্রাও এম-এ আবার ভাবণ বুঝে বুঝে
ভেদ্য ভাবার ভর্জনা করেন। আবার ভাবণের
পর লতার কতকগুলি বক্তৃতা হয়। হানীর হিন্দী বিভাগের
প্রতিষ্ঠাত্রী কে. এম. রতনার বক্তৃতা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল।
রাহি এম আট ঘটিকার সময় সন্মেলনের অবিবেশন শেষ
হয়।



বিভিন্ন লকার লিখিত একটি পত্র
সহ কঠোর তিকারী

পত্রবিন বুঝ ভোরে দুই ভাঙেই যেন পতল বে, আক
আর লতা-সহিত্তির হাকারা মেই, আক আমি অনেকটা
বাণী। এই ভিত্তির সকে লকেই যেন কতকটা হুজির আমল
অনুভব করলাম, গোদাবরীর ভটহুই যেন আমাকে পতীর
ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল—হুইবার সে আকর্ষণ। তাতা-
ভাতি পথ্যাত্যাপ করে উঠে শরীফীর বাড়ীর সুবুধের হাতা
বিয়ে গোদাবরী নদীর ভটভিহুবে চলতে লাগলাম। অতকার
তখনও ভাল করে কাটে নি—হাতার হু'বারের ইটের পাঁচিল-
যেরা বাড়ীগুলি যেন বগুপুত্রীর মত রহতমর—রাহিপেবে সব-
পরিচিত যেনের জনপুত্র অকানা হাতার চলতে যেন বেশ
একটা মোহাকর অহুত্ব জাগছিল। কমে একই একই করে
ভোরের আলো হুটে উঠতে লাগল—হাতার পার্বতী কোন
কোন বাড়ীর বেতেরা কেণে উঠে যরের বারান্দা এবং প্রাক্ষণ
আলুপনা (হুত) হাতা বিচিহ্নিত করতে লাগলেন। কলুরের
যেয়েদের এটি হচ্ছে নিত্যকর। ভোরবেলা এভাবে এই কাকট
নেয়ে তার পর তাঁরা গৃহকর্মে মত হন।

বীরবন্দীর হাতিরে আমাঙ্ক হুতি হুট উঁহু এক
হাকপণের উপরে এসে উঠলাম—এই প্রথম বহুটি গোদা-
বরী নদীর গতিপণের লিহিত লহাত্তরাল ভাবে উত্তর-বকিণে

হাকপণ থেকে নিয়াবহোণ করে গোদাবরীর ভটসংলগ্ন
সুহুপ্রসারিত হুত প্রাভরে এসে হীতলাম। সুবুধে পুণ্য-
প্রবাহিণী গোদাবরীর কটিকরহু বারিরাশির অবাধ বিতায়।
কমে ও-পারের বনজেরীর উপরকার মেঘতপু বিকীর্ণ করে
জবাহুহুসলফাণ বালারূপ আকাশে উঠল, মেঘজাহার প্রভি-
কলনে নদীর বারিরাশি হয়ে উঠল বর্ণবর্ণে অহুরহিত।
আলোর উষেবের লদে লদে উত্তরপূর্বে দিকে নীল আকাশের
পটভূমিকার হুটে উঠতে লাগল সুবীল পাহাড়ের তরকারিত
যেখানসুহের আকরা। কোন্ মহান শিল্পী যেন বহু প্রবধে এক-
ধামি সুবিভীর্ণ নীল ক্যামভালের উপর বিভিন্ন বর্ণবিভাল ও
নিপুণ রেবার প্রয়োগে অপকল্প রূপশ্রুটি করে চলয়েহন।
একতির উদার উনুত কেহে, গোদাবরীর আলোকোচ্ছল বকে
একটি সূতম হিনের জবনীলা প্রত্যক করলাম—নদীর পুণ্য-
লসিলে অবগাহন করে আবারও যেন হ'ল সবকলমাত।

স্নানান্তে অহুরে নদীভটহু তরুসুলে গিরে বসলাম। ওপারের
বাদুতর থেকে রক্তের মত রাঙা লাল বাদুকারাশি বোকাই
করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পালভোলা নৌকাগুলি গোদাবরীর হুকে
পাড়ি জরিরেছে। গোদাবরীর বহীপ নদীর বাট থেকে অমতি-
হুসবর্জী—নদীর প্রবাহ এখানে বহু শাখা-প্রশাখার বিতক্ত।
আন্দাজ আব মাইলটাক হুরে 'গোদাবরী'র পূর্বে ও পশ্চিম
ভীরের মধ্যে বোণহুজ স্থাপন করে হীতিরে রয়েছে—তারতের
বিভীর বহত্তম সীকো 'গোদাবরী ব্রিজ'। কমে নদীর বাটে
স্নানার্থী স্ত্রী-পুরুষের ভিত হতে থাকে। যেরেদের পায়ে ঘোটা
রূপার বাতু, হাতে মাকামবা চকচকে বকবকে জলের
ফলসী। একই বাটে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি অবগাহন স্নান
করেন—অথবা স্কোচ মেই। পৌরকাতি জ্ঞানপেণা একহুত
জলে হীতিরে মবোহিত সুর্য্যের পানে তাকিরে শিতপুরুষের
উচ্চেত ভর্ণধাি করেন, তাঁদের কঠোকারিত বহুজনি যেন
নদীবক থেকে অমত অবহাতিহুবে উপিত হতে থাকে।
এখানকার এই পুণ্যপরিবেশে গোদাবরীর জলকজোলের
লদে লদে আমি যেন তারতের তপতাপুত জাতীর জীবনের
জংলানমনজনি ভ্রমতে পাই।

ঘাটের অমতিহুরে একইহুই জলে হীতিরে ঘোটা জাল বিরে
কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ মাহ বরহে। পুরুষদের পরনে মেংটি,
যেয়েদের বেহে বে অপরিগর বহুতও জতানো লকা শিবারণের
পকে তা লম্পূর্ণ উপবোধি নয়। তাদের পারের মং শিখকালো
—মাকার হীকতা হীকতা হুল। এরা বে এবেশের পার্জত্য
অকলের আবিবাসী তা হুততে বেশ পেতে হ'ল না। আর্ধ্য
তারতের অব্যাদ-মহিমা এবং অমার্ধ্য তারতের অপশিল্পীর
লীনতাকে এমন ভাবে প্রত্যক করবার এরূপ সুযোগ ইতিপূর্বে
আর জীবনে হয় নি। অতত: হু'হাকার বংসর পাশাপাশি

মধ্যে যে কি হুতর ব্যাবধান হয়ে গেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

এখান থেকে কয়েক মিনি বাজ ব্যাবধানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন আমলের আর একটি মন্দির। এই মন্দিরটির নাম পৌতম মন্দির। কথিত আছে যে, এই কক্কুরই ছিল কবি পৌতমের ভগতাহুনি। এখানেই পোদাবরী নদীর তীরে ছিল



‘বার্চ হিলে’র পার্শ্বদেশে বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়ের দৃশ্য

এই মহাভাগ্য কবির আশ্রম। তারতের এই বরদীর কবির স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই স্মৃতি অতীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। পৌতমের লিখিত লিখিত বহু কাহিনী এখনও কক্কুরে প্রচলিত আছে।

নদীতটে এক নিভৃত মনোরম স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত—হুঁধারে হুঁধারি ভালগাহ আরগাটির শোভা বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভগতাহুনি উপস্থিত স্থান বটে। এখানে হুঁধুত বসতেই বেশ মনের সকল চাকল্য ছুঁ হয়ে গেল—মন তরে উঠল একটা পতীর প্রেশাতিতে। মন্দিরের সমুখভাগস্থ আলিনার দীর্ঘবেশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, বীৰ্য প্রাণবিশিষ্ট কবি পৌতমের ব্যামগতীর প্রতিমূর্তি হৃদয়কে প্রভার অভিভূত করে দিলে। প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম রশ্মিমালা স্মৃতিটির মতকে বেশ বর্ণের আশিস্কারার মত অরূপন বাকিণ্যে বয়ে পড়ে।

মন্দিরাত্যন্তরে আছে কবি পৌতমের বেতবর্ণাহুনিরূপিত একটি প্রতিমূর্তি, আর তার পাশেই একটি বেতমূর্তির মতকোণারি একটি প্রভরবিশিষ্ট সর্পমূর্তি কথা বিচার করে বিরাজমান। মন্দির-প্রাক্ষেপের দক্ষিণপ্রান্তের প্রভরবেদিকার উপরে কথাবর একটি দাপমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মূর্তি দক্ষিণ-ভারতে দাপপূজার বহল প্রচলনের পরিচায়ক।

মন্দির পর্যবেক্ষণ করে আত্মনার কিরে এসে বিজ্ঞানের স্নায়োজ্ঞন করলাম।

বিকেন্দ্রে সন্ধ্যাপতি রাওয়ের সঙ্গে পহর-বেশে বের হওয়া

গেল। পহরটি ছোট কিছু ভকতকে বকবকে—বেশির ভাগই ইটের পাটিল দিয়ে ঘেরা পাকাবাড়ী। এখানেই আমরা বাজারে এসে উপস্থিত হলাম। বাজারের ঠিক দাক্ষিণ্যে একটি চালাঘরের নীচে বর্ণকান্তি পাকা আমের ভগ। এবেশের আম বেগতে বেশন সরসলোভন তেমনি বাবেও অরূপন, আবার বাবেও চের সত্য। আমের দানই বা কেমন কবিত্বপূর্ণ—বেশন সুবর্ণরেখা। জাম এবং কলারও হতাছাড়া বেগলায়। জামতালি বেশ পরিপুষ্ট আর মিটোল—জামকে এরা বলে জুহু। কক্কুরের পানও অত্যন্ত সুবরোচক, পানকে এরা বলে ভাহুল, চূর্ণকে চূর্ণবু। এখানকার স্থানের নাম, কলের নাম ইত্যাদি সবকিছুতে সংকত শব্দের হতা-হতি বেধে মন চলে যায় প্রাচীন ভারতে। পহরের উপকণ্ঠে ‘জুহু’-বন বেধে বেগহুতে বর্ণিত, বিজ্ঞাপানে বিদীর্ণ, উপলব্ধির অরুহুতে প্রতিরূপ প্রবাহ রেবানবীর কথা স্মৃতিতে জাগে—মনে পড়ে বেগের প্রতি বকের উক্তি—

ভক্তান্তিভৈৰবগজমহৈৰ্বালিতং বাস্তবন্তি-

জুহুজু প্রভতহতরং ভোক্তাভার গচ্ছেঃ...ইত্যাদি।



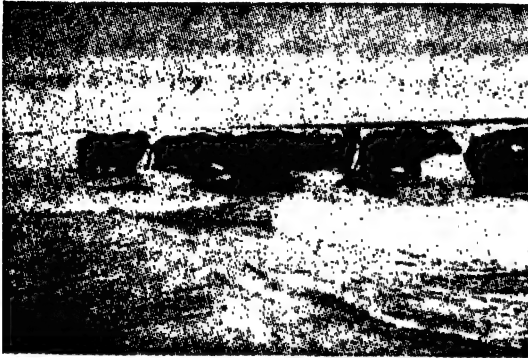
বিশাখাপত্তন পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরভাগ

বাজারে আর একটা দিমিষ বেধে মনটা স্থিতি হয়ে উঠল। প্রত্যেক দোকানেই—তা লে বত ছোটই হোক না কেন, মেতাকী হুতাবচনের একধালা বা একাবিক হবি আছেই। মেতাকীকে অল্পদেশবাসীরা দেবতার মত ভক্তি করে। তাঁর নাম ভায়া উচ্চারণ করে অপরিণীত প্রভার লকে। অল্পদেশে মেতাকীর অরূপারী সংখ্যা কম ছিল না।

এ ছাড়া কত রকমের দানব যে বাজারে লকরে পড়ে তার আর অভ বেই। প্রাচ্য জী-পুরুষের গোশাক-পরিচ্ছদ পহরের সরসারীর চাইতে আলাদা বরণের। বাজারে লম্বাসত অনেক প্রায়বকের দাধার পাগড়ি, কানে শিতলের আভুট, নাকে রিং। প্রাচ্যের জীলোককের মধ্যে অনেকের শাড়ী মালকোঁল দিয়ে পরা। এটা লভবতঃ মরাতী-প্রভাবের কল।

ভরপেদের নর্দানে পরমাণীটির প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের নাকে নাকহাতি (নিরাঠা পুসিরা) এবং একপ্রকার রিং (হুহু পুছুকা), পলার মিনিসোনার তৈরি কর্ণহার (নার), আর প্রথালের মালা। বাজারে অনেক পাছাতী খ্রী-পুরুষও নতবা করতে এসেছে। কইরা নামক পাছাতী যেহেতু বেশ বাস্তবতী, বৈদিক সৌভবসম্পন্ন এবং পরিচায়-পরিচ্ছন্ন—তাঁদের কর্ণ-হুহু পুশুভল্ল বোঝা।

ককুরে একজনও বাঙালী নেই। শহরের উত্তর-পূর্বে-প্রান্তে একটি পৌত্তীয় বৈকুণ্ঠ মঠ আছে। গ্রাম বংসর পূর্বে হর্যাসিত্যত সরস্বতী নামে নবাবীপের অনৈক বৈকুণ্ঠ এই মঠ



একপাল মহিষের লম্ব-হান

প্রতিষ্ঠা করেন—বর্তমানে এই মঠাধীন হচ্ছেন অনৈক উভিচ্যা-শেখর বৈকুণ্ঠ। গত গ্রাম বংসরের মধ্যে নাকি বর্তমান লেবক হাড়া কোন বাঙালী এখানে আসেন নি। তেহুও আর ইংরেজী ভাষা ব্যতীত এখানে আর কোন ভাষা প্রচলিত নেই। এখানে নকল জেবীর লোকই ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারে। নামাত বোকাশহারও কাকচালানো পোষের ইংরেজী জানে। লক্ষ্যতি এখানে হিন্দী ভাষা প্রচারের চেষ্টা চলছে।

পরদিন বেলা ব'টার সময় লক্ষীপতি রাত্রে নকে গিয়ে রাজমহেন্দ্রীপানী ট্রেন ধরবার জন্য ককুর ট্রেনে এসে পৌছলেন। রাজমহেন্দ্রী পোহাবরী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত অল্পদূরের একটি গ্রাম। ট্রেন থামার পরে এসে ট্রেনে পৌছল এবং পোহাবরী নদীর পুলের উপর দিয়ে হু'ভিন মিনিস্টের মধ্যে আবারও ওপারের ট্রেনে গিয়ে পেল। ট্রেনের দায় পোহাবরী।

ট্রেনে যেহেই বেশি করেকজন রূপসাব্যবতী অল্প মহিলা নতবতঃ পরবর্তী ট্রেনের জন্যে বিজ্ঞাতি-তখনে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সাধারণতঃ এবং পোশাক-পরিচ্ছন্নের বর্ণবিচিত্রতা দেখা চললে বিলে। পরনে তাঁদের বিভিন্ন বর্ণের

শাড়ী, অসংখ্যক নতক বিবিধ বর্ণালিচ্ছারে সুবিত—তাঁদের কেশবিতালের তরী সরস্বতীতাম, পৃষ্ঠদেশে বোলায়নাম স্ত্রীর্ষ স্তম্ভক বিহুসিতে চম্পক এবং অত্যন্ত সুগন্ধি পুশালাল্য মতানো, ললাটে হুহু-ভিলক, চোখে কাকল, কটীতে কাকলচিত বর্ণ-নির্মিত নীবিবহ। হঠাৎ বেন চমক লেগে যায়, মনে হয় অজ্ঞাতা অজ্ঞাতিদের কতকগুলি নারী-মুষ্টি কি কারা পরিগ্রহ করে চোখের সামনে এসে টাঁড়িয়েছে।

শ্রেন থেকে আনরা সরাসরি চলে পেলার রাজমহেন্দ্রীর একটি প্রাচীর হিন্দুর দেহতে। হিন্দুরের পূর্বদেশে তবুও, তৈরব, নারব, ব্যাস, ত্বকীশর এবং বতেশ্বর এই ছয় জন ঐশ্বর ব্যাসাদিনে উপবিষ্ট প্রভরমুষ্টি বিশেষভাবে মুষ্টি আকর্ষণ করল। তবুওর দু'খ হবহ বাঁচের দু'খের মত।

আরও কতকগুলি প্রাচীর হিন্দুরাও দেখে শহরের বাজারের ভেতরে এক চত্বর ঘুরে আসা পেল। শ্রেনে কেবলার পথে পোহাবরী নদীর তীরে এক পাহতলার প্রকাণ্ড ভিত্ত দেখে এসিয়ে গিয়ে যে হুত মজরে পতল ভাতে হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। পাহতলার দুনি আলানো, তার এক পাশে ভিনহাত লবা আর হাততিমেক চতুতা, বহুসংখ্যক লোহার পেরেক লাগানো একটি ভক্তার উপর আসনপিত্তি হয়ে নির্জিকার ভাবে বসে আছে অহি-চর্কসার কটাধারী এক পক্ষিমা লাগু। দু'খের অপর পার্শ্বে পৌরবর্ণ বিশালকার লাভোরান আর এক লাগু পক্ষিকার ঘুরে হশদিক আহুয় করে নতবতঃ তশমহাবিতার রূপবর্ণদের প্রদান পাচ্ছে। আরি পেরেকগুলির দিকে নসিষ্ট মুষ্টিতে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ পাঁচার কলকোতে রক্তবহ্ন-তেরী একটি ঠান ঘেয়ে কোরান লাগুট আমাকে চমকিত করে দিয়ে অপরূপ বাংলার বললে, “ও মোশাই, ও বংগালী বাহু, এ মোকোল মত, আলোল পরশবা, ও ভীর্ষ নকী আছে, বিলোরান না ছোর তো পেরেককে লাগু লাগাইয়ে দেখুন।” তনে কোঁতুল হ'ল—হাতের তেলো দিয়ে পেরেকগুলির উপরে নামাত চাপ বিলাম। হাত টুটুন্ করে উঠল। লাগুতী তখন আমার দু'খের পানে তাকিয়ে ইঁষ অবজার হাসি হেসে বা বললেন তার সারমর্ষ হচ্ছে এই যে, তিনি বহুবার কলি-কাতার পেয়েছেন এবং সেই রূপায়েই বদভাষার এতাদৃশ বাহু-পটুতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ভীর্ষ নকীশুর পরশবা কাঁবে করে তিনি লাগু তারত ঘুরে যেতান। লক্ষ্যতি কতা-হুনারিকা থেকে এসেছেন। এখানে কি একটি বক্ত হব। তার পর বাবেন উত্তর-ভারতে। পেরেক-পর্যায় উপবিষ্ট লাগুকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা প্রভুতী, আপনি কি চম্পিন বকী এই পরশবাতেই রূপালীন থাকেন?” ভীর্ষ নকী কবাব বিলেন না, হতবিকার করলেন রাজ। আশ্চর্য্য বোব হ'ল, এর মধ্যে আবার হাসিত আসে। কোরান লাগুতীর দু'খ

আবার বই ফুটল, বললে, “তীব্র নদী বোঁদী আরেহ—কোথা বোলেন না। হাঁ মোশাই, তীব্র নদীকে ইসরে বোলতে ভুতে লব হুহ কোহুতে হুহ।” মনে মনে বললান, “আর হুহি ব্যাটা হুহ হুহোঁধন। এই বেল বেথিরে পয়সা বোঝপার করে হুহ-বট আর ‘বোঁদী বোঁদী বোঁদী’ বেহে শাঁসে হলে ‘পুতুই’ হুহ—আর তীব্র নদী বে বজাহারে আর শরণব্যার ভঁতোর চোটে বিন বিন চিমসে বেহে বাছে সে তো বেচারার চেহারাতেই হুপতিফুট। অভিবশ্য্য লাভ না করা পর্যন্ত বে শরণব্যার হাত থেকে তীব্র নদীর নিভুতি বেই তা হুহুতে পারলান। লোকটার উপর দাড়া হ’ল। তার হাতে একটা আগুলি ভঁকে বিরে সাক্ষ্যমান সাধুতীকে বললান, “সাধুবা, তীব্র নদীকে একটু ভাল করে রসব হুগিও, নইলে বেশীদিন এ বেল বেহাতে পারবে না।” সাধুতী জবাবে কি বললেন তা শুনবার আঁহু হইল না। মনটা ধারণা হয়ে গেল। এবায়েও বে একই নীতি—সেই হুর্কলের উপর এবলের অবশ্যতি। এই বর্ষক্ষেত্র থেকে সরাসরি টেনে এসে কল্লুরগামী ট্রেন বরলান।

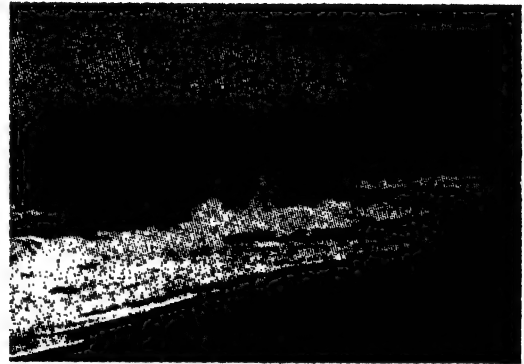
কল্লুর থেকে কেবলার বিন স্মিক বর্ষরাজ্য লতার কর্ণায়া আমাকে ট্রেন পর্যন্ত এসিয়ে গিলেন। বিশাখাপত্তন বর্ষনের আকাঙ্ক্ষা বহু দিন বয়েই ছিল, তাই ওরালটোরের টিকিট কাটলান।

ট্রেন যখন পোদাবরী নদীর উপরকার পুলের উপর বিরে চলতে লাগল তখন কল্লুরকে শেখবারের মত একমকর বেবে বৈবার কতে পেছন কিরে তাকালান। রোজকার মত নদীর বাটে পুণ্যকারীদের ভিত্তি কয়েছে, নদীতীরে ঐ তো ঠাঁড়িরে সেই বিরাটকার মহীকুহ বার দ্বিভাষ্যাতলে যেন প্রত্যক করেছি প্রাচীন ভারতের বিরাট অধ্যায়-বহিষ্যাকে। যেন এমনি একটা অনির্বেত বেহনাপূর্ণ অহুতীত জাগল যেন কি এক অদ্ব্য লম্বা পোদাবরী নদীর ঐ নির্জন ভট্টহুবিতে কেলো বেবে বাছি।

ট্রেন হুট্টেহে এবল বেগে—পোদাবরী চোবের লামনে থেকে অহুত হয়ে গেল। হুঁগারে হুতন হুতপট। কোথাও লাল দাটির প্রাচুর, দাকে হরিং পতকেত্র, কোথাও দাইলের নর দাইল হুতে সারিবাগা ললন লহুত তালীবন, কোথাও বা লহুপ্রদারী তালীবনের শেখপ্রাভে আকাশহোঁরা হুসর পাহাড়, দাকে দাকে পাহাড়ের পায়বেশে তালপাতার হাওয়া হুতাকার ালাবিশিষ্ট পাহাড়তীরের হুতবর, হুহের অবতিহুহবর্জী পতকেত্র দালকোঁচাবারা, রতীব শাজীপরা পাহাড়ী বেহেরা কেত্রের মত। এমনি লব বিচিত্র হুত আর অনেকঙলা ট্রেন লহনে কেলো আবারের ট্রেন বেলা বাহোটার এসে পৌহল ওরালটোর ট্রেনে।

‘বেহলী হোটেলে’র কথা জানা ছিল। একটা বোড়ার গাঠী তাক করে গাছোরাবকে সেই হোটেলেই বিরে বেতে বললান। বিশাখাপত্তনের রাজপথের উপর বিরে অবধান হুটে চলল। হুহুবে পেছনে—তাইনে বাঁহে বেথিকে তাকাই লহরে পতে আকাশহোঁরা পাহাড়জোঁহ—হুহে বার্তা হিলের পায়হুলে বিশাখাপত্তন পোতাঙ্গর চকিতে বেগা বিরেই আবার অহুত হয়ে বার।

হোটেলে পৌহে ধামিক বিজ্ঞান করেই রওনা হলান লহুততীরের উকেনে—বালুবেলার উপর পা হুতিরে বললান। হুহুবে নীলকান্তমণিনীল লহুতের অনন্ত তরলদালা প্রচত পর্কনে হুটে এসে ভট্টহুবির সন্নিকটে পতবা কেটে পতয়ে—তান



বিশাখাপত্তনের লহুততীর—হুহে ‘ভলকিলস বোঁদ পাহাড়’

বিকে হুহ একটু শৈল একেবারে লহুহপর্গে বেহে এসেছে। লহুহ পর্কনহুহর, পাহাড় চিরমৌন। লহুহপর্গোঁথিত এই পাহাড় কত হুগ-হুগাও বহে প্রচত তরলতিবাত হুহ পেতে লহ করছে—কে জানে।

কবে নৈশ-অহুতকারের হুহ বসিকার চরাচর আছুর হয়ে বার—সাকবিরিয়ার জাহাজের হুহে বৈহুতিক আলো যেন লহুহভলবাসী কোন অতিকার বৈভোর রক্ত-চহুর মত অলতে থাকে। বীহে বীহে লোকেহর ভিত্তি কবে আসে। নির্জন লহুহতীরে বালুকা-লব্যার লটান ভহে পতি—লহুহের মহা-লহীতের হুচাৰ্ণ এবার যেন লবএ লতা বিরে উপলভি করতে পারি।

কবে দাত বাততে থাকে। লহুহবেলা লম্পূর্ণরূপে জলমুত হয়ে বার। বালুদ্য্য থেকে উঠে লোকালয়ের বিকে পা চালিয়ে দিই।

অভিসারিকা

ঐতপূর্বক তটীচাৰ্য

আজ এমন দিনে পোঁ কাছে এসে ঘায়ে হুহু হুহু কুকে থেকো না,
ঘায়ে ঘায়ে হুহু হুহু কুকে থেকো না।
ওই ওঠন তব লাজ আবরণে অভিসারকণে রেখো না,
ওপোঁ, অভিসারকণে রেখো না।

অহুৰাগে যদি ভরে ওঠে মন মিছে কেন তব বেদনা,
দীৰ্ঘতা মিছে আপনারে ঢেকে তুলে অকারণে না চেতনা।

ওই অবশেষে তাবা চেপে রেখে আর
ব্যথা বহিও না প্রাণে অমিবার :
ফুরালো সময় দিন শুনিবার
মণিকা। ওপোঁ যগন-পথের মণিকা।

আজ অমন করে ও তোপে তোপ তুলে সরমে আনন ঢেকো না।
ওপোঁ, সরমে আনন ঢেকো না।

হরিণ-সরনা। আশায়ে সরনে
পড়ে তব মন-হারা যে,
তুমি তাবো মুখি তুমি হাতা কেহ জানে না।
আশাযন জ্বি নিরবধি
রচে সরসের মধুহারা যে।

মনোহরণের মণিকা তুলে মোর পানে মন টানে না।
নীল কাজলের রেখা মিছে কেন এণয়ের লেখা লেখো না।
কেন এণয়ের লেখা লেখো না।

বহে যদিও বাতাস, হাতের অঙ্গ করে পড়ে ওপোঁ ললনা,
তুমি ফুলতোরে ধাঁধো পুলকের রাবী কেন লাজ এত বল না ?
হুয়ে আনন বানের বিহারের পানে
বেদনার হুয়ে যদি মন টানে,
হুয় -তলি শুধু বেঁধে রেখো তব প্রাণে
মণিকা। ওপোঁ অচপল অভিসারিকা।
তুমি অমন করে পোঁ মনের হায়াত ব্যাধার পরাণ বেধো না,
মোর ঘরে আসে দীপ তুলে-বহো তারে হুয়ের মোহাণ বেধো না।

মহুয়া

ঐগোপাললাল দে

আবার এলো কি নব বলত কাননের কোণে কোণে,
মহুয়ার ফুলে দোলা দিয়ে ফুলে মধুকর গল্পনে ?
ওপোঁ সুচরিতা, আজ একবার স্বভিহু হুয়ার খোলো,
তোমার আবার সেই পরিচয়। মুখি বা পুরানো হোলো ?
যেদিন তোমারে প্রথম হেরিহু তাবা স্মরণী তহু,
নব বলতে ফুল-মিহুয় করার পুণবহু ;
হুয় বন হ'তে সুবাসিত বাহু জ্বর-বিরুত সনে,
তোমারে আবারে যিহু হুছিল বহনীর এক কোণে ;
লান্নারাত তহু অকোর কোহনা তাবা-দীবে উঠে রাতি,
মারিকেল-শাণে বহু ইন্দিত ; কেনে কেটে' যার রাতি।
তহু মন আবার,
মনে ভেবেহিহু এমনি কাটবে, বিধি বিধে পরমাব।

ফুল ভেঙ্গে গেল রঙ না যেতেই, হেরিহু চকিতহত,
কীবনহুয়ে লণ-লম্বী কোথা ? বিবন বিশিবাহত
হাল হেতে দিই বায়ে বায়ে বত, তুমি ভানে বহো মিতি,
প্রণ বহন, মুষ্টিত হর ঐতি।
এমনি সে হশা ; নব বলত কত আসে কিরে বাহ,
তহু-পীড়িত ক্লান্ত কপোত হিশা হুঁজে সাহি পার।
দিন যায় কীণ আশা,
মিলাইয়া দেবি অনেকখানি যে হারারেহে ভালবাস।

আজিকে আবার বনেবনাতে চলিরাহে কানাকানি,
পুলাবীরা আসিভেহে মুখি ? তারই চলে হাতহানি।
ওপোঁ, ভেবে দেখ, কত নব কান্তনে,
অদন্ত কালে অনাধি কীবনে মিলনের আল ফুলে।
কিহু কিহু করে রসমিহুয় 'হুয়ন-তোমি' অই,
কোতা কোতা হুহু তাবা বহনা অব্যাহিত বাটে হাি,
শিহুলে পলাশে কাকনাশোকে বনাত রঙে হালসে,
মহুয়া বলের মিলনপের বাণি মিলতে তালে।
লাজা হাত ফুলফোল,
মাইলের তালে বদলাদলে বুড়োর কলহোল।
হারাবায় নর আজিকার দিন, ভরোমিহুয়ন,
অমর যে প্রেম বায়ে বায়ে তার হটক উদীবন।

বন্দী যাত্রা

জিয়ামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

বেদন কথা বেওয়ার কথা ছিল—তার আগেই বেধা করলে জিলোচন সেনের সঙ্গে। বললে, আপনার কথার আমি রাজী। কোথার যেতে হবে—আর কবে যেতে হবে বলুন।

জিলোচন সেন বিস্মিত হুবে প্রত্যাহার পালে ধানিক চেয়ে রইলেন। এ যেম তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। এই প্রত্যাহারই না কিছুদিন আগে কপ্তিন মন দিয়ে এই বাড়ী ত্যাগ করে গিয়েছিল। এর মনে সেদিন যে তাপ সঞ্চিত ছিল বারিষ্যের পেথনে তা কি বাপ হরে গেল আবার? ও কি বেকার-জীবনের আল। সর্ব সত্তা দিয়ে অনুভব করছে? হরত মনে মনে বুঝে বাংলাদেশের গৃহহরণের ফেলের এ হাত। আর গতিই বা কি? কোমরতে একটা আশ্রয়—উপরপুত্রি বত কিছু তুলকণা—সারা জীবন অনার্যানে বিকিরে বেওয়া বার...নেই নিরুদ্বিগ্ন হজ্জাহাতার। বাই হোক, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ করে তেবে বেবেহ? হ' মাল, হ' মালের বত নহয় ছেতে অক পাঁজাণীয়ে থাকতে তোমার অহবিধা হবে না?

না—এমন আর অহবিধা কি?—একটু হেসে বললে প্রত্যাহার, অহবিধা বা মনে করি তা একাত ভাবে মনেরই ব্যাপার বই তো নয়।

মানে? জিলোচন সেন প্রতিপ্রসন্ন করলেন। একটু থেমে উত্তরের প্রতীকা না করেই বললেন, মনটাই কি আসল নয়? আমার হিন্দুরা অবত মনের ওপরেও একটা জিনিস বেবে থাকি।

সে জিনিস বাই হোক—বেহকে চালায় যে সকল ইন্ডির তার মধ্যে মনটাই হ'ল প্রথম। মনের জিহ্বাতেই সুখ হঃৎ—লাভ লোকসান—ভাল মন্দ বা বলেন তাই।

বাঃ বে বার্মানিক—এমন মিস্প্রুহ ভাবে যদি জিনিসটাকে বেবতে পেৎ—তোমার হঃৎকট কিসের? তুমি তো—

কিন্তু আমি মনের তত্বকণা শোনাতে আসি নি। এ বিষয়ে আমার জ্ঞানও কম।

বাই হোক—কথাটা বলেছ ঠিক। জানের রাজ্যে মনকে এক পাশে সরিয়ে রাখা কপ্তিন। মনের যে বার। আছে—চিন্তার স্রোত বরে সে বার্যার সর্গকণ চলছে সে। চলছেই চলছে—ঐক্যমার পৌছল কিনা—আর ঐক্যমাতেই যদি পৌছে গেল তো চলাটাই তার শেষ হয়ে গেল যে। তা হয় না।

প্রত্যাহার হুপ করে রইল। মনের তত্ব অহলরণ করে উসি

বে অব্যাহার গোলকর্বাণার হুটি করছেন—তা ওর ভাল লাগছে না। সারা চোখে পৃথিবীকে ঘেঁষে দেখা যায় তারই মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন কবি—অমিত্যতা আবিষ্কার করেন সারাবাদী—সম্পদ আবিষ্কার করেন তোর। এক একটা দিকের হুটি দিয়ে—এক একজন মাহব বিচার করেন পৃথিবীকে—আসলে পৃথিবী বা তাই। সে বললে, কবে নহর হাততে হবে—

আচ্ছা সে বর এক সত্তাহের মধ্যে পাবে। বাস্তব বপতে কীরে এলেন জিলোচন সেন। কিন্তু একটা জিনিস সত্যিই অবাক লাগছে আমার। তুমি সত্যিই কি মনে প্রাণে—

না হলে আপনার কাছে এমনি এসেছি? আমি নহর থেকে বাইরে যেতে চাই—মুক্ত আলো হাওয়া—আর—

কথাটা সম্পূর্ণ করলে না প্রত্যাহার। নহরের হুতি বারুতে মন বিধিরে উঠছে—সুখ জীবনে নহর মারীতর হজ্জাহে—বহ হুত নিরাপদ ব্যবধান হুটি না করলে—

জিলোচন সেন বললেন, বেশ, চাকরি মেবার হুবে তোমার এ সন্দেহ ত হতে পারত যে—দিকের কোন বাব-সিঁদুর বত—

প্রত্যাহার হাসল, হতে পারে—কিন্তু তা ভাবব কেন—বার্ভা আদারও বখন কম নয়।

তোমার বার?

কেন চাকরি। আকালকার দিনে একটা চাকরি পাওয়া—

বস্তির মিথাস কেলে জিলোচন বললেন, তাই বল। কিন্তু হ'মিমে পাঁজাণী যদি একবেহে হয়ে ওঠে—

সেও অনেক হুতের কথা। তা হলে এক সত্তাহের মধ্যেই কি—

হী—তৈরি হয়ে থেকে।

প্রত্যাহার চলে যাবার উপক্রম করতেই তিনি বললেন, আর বার্তার মধ্যে একবার আসবে কি?

বিশেষ বরকার আছে কি?

বরকার, না—হী—সিঁদুর বা যেম কি বলবে বলছিল।

বেশ চন্দ্র।

বিস্মিত হলেনও মনে মনে পুলকিত হলেন জিলোচন। প্রত্যাহার সম্পূর্ণ করলে গেল কি করে? সত্যিই কি নহর ওর ভাল লাগছে না?

বে বরে প্রথম দিন বেবেছিল মেম কোঠাইমাকে সেই বরেই এলে বজালা প্রোফাজ।

সেই স্নেহই আপাততঃ বর হয়ে গেল প্রভাত। সেই স্নেহের
তীর বেয়ে নদীর স্রোত বৃষ্টি নিঃশেষিত হ'ল।

চোখ চাইলে প্রভাত। কোথায় সেই প্রান্দল—কোথায়
সেই কড়া? তবে হাসির ক্ষণিক ঐতিহ্যে লেগে রয়েছে।
লক্ষী শিরে ঝাঁকিয়ে অপরিসীম হাসছে। বলছে, মহাকাশের
মনিরের দীপের বইত যে নদী তারই নাম শুদলায় তোমার
নুখে। তারতবর্ষের নদীগুলির নাম কি সুন্দর বাবা।

পরিহাসে শুদল বর লক্ষীর বর—অথচ ধার্ব্যবোধক এই
উজির ভাংপর্ধ্য প্রভাত বুকে পারলে। যেহেতু থেকে
নেমে এসেছিল হবি—সাহিত্য নিয়ে করেছিল সওয়াল-জবাব।
আত্মসচেতন প্রগল্ভা কিশোরীর অকুণ্ঠ সমালোচনা একজন
কোন জনকে নিয়ে সিরেছিল প্রভাতকে? আশ্চর্য্য—বর্ণ-
জগতের সেই যেহেতু একই জারগার ঝাঁকিয়ে আছে—না তার
হু'পানের বটমার স্রোতও গতিময় হয়ে বয়ে চলেছে? ওকি
কৌতুহলী দৃষ্টি বেলে তার প্রাণরসবারা পান করছে না? ওর
চেতন-লোকে পলাতক বটমা রেখা টেমে টেমে গড়ে
ভুলছে না কি স্মৃতির দেউল? সেই দেউলে হৃদির দীপ
আলিয়ে ও আরতি করছে জীবনের। অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে
সেও অকৃত্য অর্জন করে মি—জগৎপূর্ণে একটি ভাবল অহুয়
প্রাণরসে সজীবিত—আলোক-শিশু অহুয়, সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে
হু'পানে অবহেলার হৃদির দিয়েও শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য রয়েছে
ঐতিহ্যিক। যেহেতু সত্যই অমতা।

লক্ষীর ঠোলা বেয়ে চমকে উঠল প্রভাত। স্নেহের ঘোর
তার সর্দাকে—বিছানা ছাড়তে চাইছে না দেহ।

লক্ষীর বর তখনও কানে ভাসছে, সারসাত বৃষ্টি দুয়োও
মি? কি যে এত ভাবনা তোমার।

সত্য—এ ভাবনার সঙ্গে প্রভাতের পরিচরও নুতন। এ
ভাবনা জীবনের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বহলে দিতে চার—সমস্ত
সমস্তার পারে উত্তীর্ণ করে দিতে চার বাহুবকে।

লোহার পরীক্ষার বাইরে আকাশের হুঁকরের তখন
বর্ণাকাস কেপেছে—একটু পরেই চক্কা রোদে নীল আকাশ
দুগ্ন হয়ে উঠবে। জীবন তখন বাতবের কষ্টম স্পর্শে ভিন্ন
অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হবে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে—দর? প্রভাত আলত তেদে
উঠে বলল।

লক্ষী বললে, বাইরে একজন কে তোমার ডাকছে। কি
অদ্বুত চেহারা তার।

লক্ষী হাজরা হাত ভুলে বললে, আবদরী বয়ে ঠার হুতো
দিল্লি। আক শিভিতে করে বেরিয়েছি বাতী থেকে—হর
এসুপার দর ওসুপার।

কিছু বরকার আছে?

ওরা বলছেন আজই একটা হেফজের হয়ে থাক। বুকে

পারলে না বাবা—ওই যে স্যাকমার্কেটের। কিন্তু আমাকে
কি তোমরা রেছাই দিতে পার না?

আজই—কে বললে?

কেন শশাঙ্কবাবু অবলবাবু স্নেহবাবু লবাই। লবাই
মাকি ঠিকঠাক করেছে—ওদের বাতীতে কি পানবাহনা
আছে—

না না, প্রভাত মিকের বয়ে দিকে চমকে উঠল। এমন
উচ্চ রচ বর তার কণ্ঠ থেকে বার হতে পারে।

তুমি কাঁপছ বাবা—একটু স্থির হও।

না হাজরা শশাঙ্ক—আজ কিছুতেই ও কাঁদ হতে পারে
না। আপনি বলুন পে ওদের—

আমার কথার ওরা বিখান করবে কি—তুমি এসে বরং
বলে যাও।

আজ্ঞা চিঠি লিখে দিল্লি আমি। আর ওবেলা বেখা
করব ওদের সঙ্গে। একটু অপেক্ষা করুন আপনি।

চিঠি লিখে শশীর হাতে দিয়ে বললে, নিয়ে যান।
অবলেন্দুকে বলবেন, ওবেলা বেদ একটা বিটং ডাকে—
বুকেলেন?

আজ্ঞা বাবা।

লক্ষী চলে গেলে প্রভাত আপন মনে বললে, এ আমার
হুর্দলতা নয় কি? আপন মনেই আবাস দিলে, হোক
হুর্দলতা—এতেও বাহুব সময়ে সময়ে আমন পার। একটা
উৎসবের দিনে বিজাট বাধাদে ভর কুটিতে বাবেই।

২৯

অনিমেদের বিহার-অভিদান সমস্ত সে বোগ বেবে না
স্থির করলে। শেষ পর্য্যন্ত ওর সকল বকার হইল না। দীপা
আর অনিমেদ হুঁকমেই টেমে নিয়ে গেল। সমস্তার উত্তোপ-
আয়োজন রাজসিক এবং কুচিসমস্ত। বিভবানদের সবাইকে
প্রভাত জানে না—দীপাদের বাতীতে ও বেবেছে—এ পরি-
বারের ছোট বড় সকলেরই কুচিভান অদ্বুত। মার্জিত
আচরণ—বুড়ি ও জামাঙ্গিত আলোচনা—সবটাতাই পুণীর
সুরটী বকার রাধা এ বেদ ওদের বতাবগত। অতাবের
অবাবতার অদ্বকার যে পৃথিবী—ওরা তার বিপন্নিত মতলে
বাস করে—চির পুণিমালোকের অবিবাসী ওরা। ওদের
গোজে প্রভাতের গোজ মেলে না তবু কোথায় বেদ কোন
ভারে একটা স্নেহের সক্তি আশ্চর্য্য হকদের রয়েছে। বৈদ্যদিন
আভার-বিহারের মুলকেজের উর্দুলোকে আলোবর্দী যে
মামসমস্ত অবলরকণে মাকে মাকে আত্মপ্রকাশ করে তারই
লক্ষ্যবিত্তে ওদের মিতালি। এর অত বহুদের পরিহাস লহ
করতে হর। আর মনে হর সে পরিহাস কত ভুল—বিবেচ
আলাবর। বাইরের প্রভেদটী বাহুবের কয়েক বকবের বাঙ —

কিছু ভিতরে তার অসংখ্য স্ত্রী—অসংখ্য বাসনার সে স্ত্রী-বৈচিত্র্যে বলমূল করছে—অসংখ্য ভদ্রীতে উঠছে সুরের তরঙ্গ, অসংখ্য আগন্তুক যুগি পরিপূর্ণ করে রেখেছে সে পরিমতল। বাইরের লম্বা, দারিদ্র্য, অহংকার, আদম্য, সুখি, বোঝি সবই সেই অন্তর-উদ্ভূত সন্তানের তরঙ্গ-প্রকাশ মাত্র।

একটির পর একটি অহুঁতান প্রমোদ-স্রোতকে অলঙ্কৃত করছে—সুর হ্রদ সলীল আবৃত্তি কথা সব মিলে—অবশ্য আদম্যলোক ঘনীভূত হচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না—প্রচার-বাসনার ক্ষীণ হয়ে উঠল কে—কোন মালাটিকে হৃদয়ভর করবার জ্ঞান নানা জাতীর কুল এহিবৎ হ'ল একটি হ্রদ স্তম্ভ।

প্রমোদ-স্রোত ও আহাৰ হুই-ই সমান ভালে চলছে—এমন সময় বেরার। এসে জানালে অর্ধেক রাত্রে—কে একজন বাইরে অপেক্ষা করছে তার জন্য। প্রমোদ-স্রোত মনো ভাঁকে আনা সন্তত হবে কিনা বুঝতে না পেরে অর্ধেক রাত্রে বললেন, বাইরের বৈঠকখানা ঘূলে বাহুকে বসাত গে—আমি বাছি।

সত্যিই তিনি উঠে বাইরে গেলেন। একে হুইয়ে অমেক-গুলি মিনিট বক্তার অভিব্যক্তি হ'ল—তিনি কিরলেন না। উৎসব-মত কারও চোখে পড়ল না তাঁর অল্পপস্থিতি। হুই প্রাণী শুধু এ সবচে লজাগ রইল। দীপা বার হুই বাইরে উঁকি মেয়ে মেয়ে এল বাবা আসছেন কিনা—আর প্রভাত লক্ষ্য করলে প্রাণ বক্তাব্যমেক হ'ল গৃহকর্তা অল্পপস্থিতি। কেমন অবাঞ্ছন্য বোধ করলে সে। কি জানি কি ঘটল—যে-কথা হঠাৎকাল কাল লক্ষ্যবেলায় তারই হ্রদ পৌঁছল কি প্রমোদ-বাসরে? উৎসবের দীপাবলী স্নান হয়ে এল—হাসি আদম্যের কলবর কোন্ গৌরবমণ্ডলে নিক্রমণ বাজা করলে যেন—ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দীপার কাছে এসে বললে, আসছি আমি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে অর্ধেক রাত্রে দ্বারপথে দেখা গেল। এক বক্তার বাহুরে এমন অদ্ভুত পরিবর্তনও হয়। সৌরবর্ণের মাঝারি গোছের বাহুরে লজ্জা জ্ঞাতার লক্ষণেরই অন্তরঙ্গ বলে মনে হ'ত। তাঁর পাতলা ঠোঁটের অবিচ্ছিন্ন হাসিটি বার বিরে তাঁর মুখে কলনা করাই বার না অর্ধেক সেই মুখ নিক্রমণ পাণ্ডিত্যে বন বন করছে। প্রমোদ-আসনের বাইরে বক্তা-পীড়িত পৃথিবীতে এই মাত্র বক্ত-পতনের বিতীর্ণিকা দেখে তিনি যেন কিরে এসেছেন। তাঁর সৌম্য মুখে হঠাৎ বেদনার কল্পন আভাস লেগে রয়েছে—তবু হুইল হুইতে হুইতে উঠেছে অপ্রত্যাশিত আঘাতজনিত হৃণ ও কোথ—আর সেই কালি-মার কলর বা কল্পন কোন কিছুর চিত্রমাণও হুইপোচর হচ্ছে না। প্রভাতকে হাত ঘূলে ইঙ্গারা করে পিছন কিরলেন তিনি। বক্ত-বন্দীভূতের মত প্রভাত তাঁকে অহুসরণ করলে।

বাইরের ঘরের টেবিল বিরে হু'বনে বুঝেবুঝি বললে। টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি। একটা পিতলের ছোট মুদ-মুঠি বিরে কাগজখানা চাপা রয়েছে—বাড়াসে উড়ে না বার। ঘরের নিমিষপল্লগুলি আশ্চর্য্য রকমে শুভ। খালি রক্ত-বক্টিটা টকাটক পড়ে সেই নিমিত্ততার মুখে আঘাত করছে। সে আঘাত সময়ের মুখে বাজছে—বাজছে বাহুরে মুখে।

প্রভাতের হৃৎশিঙে সেই আঘাত এসে পড়ল—পলা তকিরে গেল—অত্যন্ত তৃষ্ণা অহুতব করলে সে।

তার বুকের পানে চেয়ে অর্ধেক রাত্রে বললেন, টেবিলের ওপর যা রয়েছে তার অর্থ সন্তবতঃ তোমার অজানা নয়। কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে—পৃথিবীতে আশ্চর্য্য বলে কোন বক্তাই কি কল্পনা করতে পারা বার না। বাহুরে এক দণ্ডের বিশ্বাস পর-দণ্ডেই ভেঙে বার।

প্রভাত কি বলতে গেল—তিনি বাবা বিরে গভীর কণ্ঠে বললেন, বা বলবে জানি। কিন্তু একদিন নয়, হু'দিন নয়—মাসের পর মাস বাহুরে সঙ্গে বিশেষ কি বাহুরে চিনতে পারা বার না—না তাকে বিশ্বাস করাও বুঝতা। জানি কারও সঙ্গে কারও নীতি মেলে না—কিন্তু নীতিতে না মিললেই জা যে হু'মীতি হবে এ ধারণা কেমন করে অদ্য—বলতে পার?

প্রভাত আর একবার চেষ্টা করলে কথা কইতে—অর্ধেক রাত্রে উক হয়ে উঠলেন। চাপা তৎসমার কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাসঘাতক—প্রবন্ধের হল। পেছন থেকে ছুরি ঢালায় বারা তার। সং নয়—কাপুরুষ।

প্রভাত বরির। হয়ে বললে, আমার কথা যদি শোনে—কি শুনব? আমি ব্র্যাক-মার্কেট করি—তোমরা সাহু, তাই বরিরে দিতে চাও? তোমরা সন্তার পাণ্ডিত্যের মিনীর ভূলে যেনের মুখে মার কিমতে চাও?

আপনি উদ্বেজিত হয়েছেন।

আশ্চর্য্য কি। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে তোমার বক্তবক্তের রসদ। অর্ধেক তোমাকে অবাধ অধিকার আমি বিরেহিলার অন্তঃপুরে হুকবার—আমার বেথেকে বিশেষ বিরেহি সরল বিশ্বাসে—

আমার বিশ্বাস করুন। প্রভাত নিমতি করলে।

অসম্ভব। আমার সর্জনমালের জন্য কাঁদ পেতে রেখে—বিশ্বাস করুন—

না—না। কিণ্ডের মত চীৎকার করে উঠলেন অর্ধেক রাত্রে। হুই চলে যাও আমার সামনে থেকে। আমি নিক্রমকে কিছুতেই সাধলাতে পারছি না। হাতের কাছেই রয়েছে বন্দুক—হুই চলে যাও—চলে যাও—

প্রভাত আভে আভে বেরিয়ে এল বর থেকে। মনে হ'ল

গেছে লক্ষ্য। ও কেন প্রতিবাদ করতে পারলে না ?
অভ্যর্থক বিক্রমে, অনভ্যর্থক বিক্রমে—কেন ও প্রতিবাদ করতে
পারলে না ? কোন্‌খানে ওর হুর্দলতা ওকে ভীক করে
ছিল। লেকি গোপনতা ? যে দুহুর্দে ও অনভ্যর্থক আবি-
কার করেছিল সেই দুহুর্দে কেন সত্য আচরণের দ্বারা নিজে
নির্ভীক করতে পারে নি ? কিসের সৌভাগ্য—কেন হুর্দলতা ?
অভ্যর্থক গোপন কোণে সন্ধান, অর্থ, সাহিত্য, ক্রটি কিংবা
নাশী—কোন্‌ আশঙ্কি ওকে কর্তব্যনিরূপ ভীক করে ছলে-
ছিল ? আর এই দুহুর্দেও সেই ভীক সম্মুখোন্‌ সে সত্য ভাব
উদ্ধার করতে পারলে না। বেজাহত কুহুরের মত বেরিয়ে
এল ঘর থেকে।

উপরের ঘর থেকে নুপুর-নিচের তালে উজ্জ্বলিত হাসির
ধ্বনি—ওকে পথের প্রান্তে তেলে নিয়ে গেল।

৩০

মা—শহরে আর থাকা চলবে না। যে-কোন উপায়ে
হোক ঘরে পালাতে হবে। বহু ঘুরে—বাংলা থেকে বহু ঘুরে
হর—ভাও ভাল। আজই পাকা কথা দিয়ে আসবে জিলোচন
সেনকে। উনি কালই ঘেন ব্যবস্থা করে ঘেন—কলকাতার
বাইরে গুঁর সেই মহালে থাকবার। সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রকি-
বেশে নিজেকে আত্মপাত পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ
পাবে। কিসের ভয়ে সে সত্যকে অকপটে প্রকাশ করতে
পারে না। সত্য-প্রকাশের বাধা কি জন্ম-বারিষ্টো—কোন-
মতে উন্নয়-পুষ্টির উপাধৃত্য হওয়ার আশঙ্কা, না আজন্মসঞ্চিত
স্নেহমমতার বহন কাটরে অনাড়ম্বর জগতে অত্যন্ত একাকী
হওয়ার হুঃসহ করনার ? এভাবে ভরে ভরে সব দিক বাঁচিয়ে
লভ্যসাধক হওয়ার বড়ই তার সাজে না। কোন বাহুবল
ভরের সঙ্গে সত্যকে জড়িয়ে জীবনের সাধনার জরলাভ করতে
পারেন নি।

প্রভাত।

কে ? চমকে উঠে ও চাইলে—সাহুনে কাঁড়িয়ে অবলেন্দু।
ওর মুখও শুকনো।

ব্যাপার কি ? কোর কি অর্থ করেছে।

পরীক্ষা ভাল নেই। একটু ঘেনে বললে, তা হাতা
আমি টিক করেছি কালই কলকাতা হেতে বাইরে বাব।

কেন—কোন ‘অকার’ পেয়েছিল ?

মা—হী—এক রকম তাই বটে। বোট কথা শহরের
বাতাস আমার সহ হচ্ছে না—আমি বাইরে যেতে চাই।
প্রভাতের কঠোর কাহুতির ঘেন।

অবলেন্দু বললে, যদি কেউ আমাদের বাস্তব-ভীক বলে
তাকে ঘোষ ঘেন না।

প্রভাত প্রতিবাদ করলে না—কেনন বিজ্ঞানের মত চেয়ে
হইল অবলেন্দুর পানে।

অবলেন্দু রান ঘেনে বললে, যে কথাটা আমি বলতে
এসেছিলাম তা আদেই ভুই বলে নিলি। রানে—রানিও
বাইরে বাজি।

ভুই-ও ?—

উপায় কি—কাকা চিঠি লিখেছেন দীর্ঘাট থেকে—ওঝান-
কার মিলিটারী অ্যাকাউন্টস্-এ কয়েকটা পোষ্ট খালি হয়েছে
না কি।

চাকরি—

আমাদের মত বধ্যবিভেদ্য আর কি করবে। সহায় সেই
অত পথ ধরব—সম্পত্তি সেই ব্যবসাতে রাখব।

ইংরেজ সরকার যা শিখিয়েছেন ‘দেড়ন’ বছর ধরে তাই
আবর কেটে চলতে হবে আরও বেশ কিছুদিন।

প্রভাত বীরে বীরে বললে, জাতীর সরকার হয়েছে,
এবার শিকার দ্বারা শিকার বদলাবে।

বদলাক—আমরাও উত্তরিনে জীব হয়ে যাব যে শিকার
পেয়েছি তারই তারে।

আমাদের বংশধর দ্বারা আসবে—

উজ্জল ভবিষ্যতের বগ্ন আমি দেখি না প্রভাত—পৃথিবী
আজ তারি গোলমালের মধ্যে চলছে। এ ঘেন চলছে
পরীক্ষার রূপ—কবে কলকাতা হবে সে আশা’ অবজ গোপন
করা অভ্যর্থক, কিন্তু সেই আশার বর্তমান হুঃসহ কষ্টকে কিছু
না বলাও তার চেয়ে কষ্টম।

কিন্তু এই অস্থিরতা—বিবাসহীনতা—আমাদের বেশ হুর্দল
করে দিচ্ছে, আর রাষ্ট্রও হুর্দল হয়ে পড়ছে। প্রভাত মন্তব্য
করলে।

তবু বৈধ্য আমরা সক্র করতে পারছি না। এত বড়
ট্রাভেডি হরত কোন জাতির তাগে বটে নি। একটু ঘেনে
বললে, বিবাস তাকে কেন জামিল ? যাকে অবলম্বন করে
উঠে ঠাট্টাতে বাই—দেখি সেও পাক দাধা আল্লর—
ভাগ্যি বলে দায় মহতের পানে সর্ব্ব বিক্রিয়ে দিতে বাই,
দেখি তার ত্যাগ ভোগের স্তব্ধপথে গোপন সক্রয়ে মত।
অন্য দুটো ঘেনেই তা ঘন, কিন্তু তার আলো এত ঘুরে আছে
যে, আমাদের বৈমলিন জীবনের সুখ-হুঃসহ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে
স্পর্শ করতে পারছে না।

অবলেন্দুর আক্ষেপ প্রভাতের অন্তর স্পর্শ করলে। চকল
হুমির আর আত্মপের সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট—তারই হাতে
ভূতীর বিবহুকের পক্ষনি পোনা বাজে। বডি-পরিবদে
আলোচনা প্রভাব মুক্তি তর্কে ঘোরালো হয়ে ওঠে—তোটের
ভক্তয়ে আর তেটের সর্গার তা প্রকৃত কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হতে
পারে না। উএ জাতীয়তাবাদের ধ্বংস চাই—ধ্বংস চাই
মতবাদের। বড় হুমির আরতম-বরতার হুয় প্রতিবেদীকে
করেছে দিকট—বৈকটের অন্য সম্বন্ধ অবিবাল প্রবল হয়ে

উঠছে। শ্রোতে ভাসতে ভাসতে স্বপ্ন কলস বতই নিকটবর্তী হচ্ছে বাতু-কলসের বিকে—ভতই তার ভর বাতছে—ভতই সে চাইছে নিজের ভদ্রপ্রবণতা পরিহার করে কোন শক্ত আধরণে অডেত হতে। তার প্রততিতে বাতু-কলসও হুর্ভেত হবার সাধনার মন দিয়েছে। বে হুর্ভেত হতে পারবে এই প্রতিবোধিতার জয় তার অনিবার্য। তাই মরণ ঠেকাতে সাংঘাতিক মায়ণায়ের আবিষ্কারে বন-জন-বিজা-বুড়ির প্ররোপ চলছে পূর্ণমাত্রার। এর শেষ কল—মটির কলনী ভাববে কি শিল্পের কলনী জন্ম হবে তা নির্ণয় করা নয়—পৃথিবীর হুর্নিপাক বে বাতবে—এ ত সুনিশ্চিত।

ভারাক্রান্ত মনে হ'লেন বিপরীত পথ বহলে। হ'লেনই বুঝলে সমিতির কথা তোলা নির্বাক। সমিতি স্ট্রট হয়েছিল বাঘের অবলম্বন কণে—ভারা সময়ের শ্রোতে ভেসে বাচ্ছে—আবার সময়ের শ্রোতেই হয়তো মৃত্যু তুণওজ ভেসে এসে সংলগ্ন হবে সমিতির প্রান্তে। পুরাতনের বিহার ও মৃত্যুর একাশ হুইরের ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবীর বস্তুগুণের অস্তিত্ব। বারা আসে প্ররোচনের তাগিদে তারা গৃহ নির্মাণ করে লক্ষ্যে রূপ দেয়—সমাজ-সমিতিতে করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। তাদেরই তৈরি নিয়ম-কানুনে জীবনযাত্রার পথ বতবাণি সুগম হতে পারে সে চেষ্ঠার ক্রটি হয় না। কিন্তু সময়ের শ্রোত থামে না এক দণ্ডের ভেত, আত্মকের মৃত্যু কাল হয় পুরাতন—সেই কাল-আশ্রিত বিধি-নিয়ম আচার-অর্চন সবই বাতিল হয়ে যায় মৃত্যু জীবনের মান নিরূপণে—মব পত্রোদ্যমে বৃক্ষ-বৃক্ষ থেকে বসে পড়ে যেমন পুরাতন পত্র। পাতা বসে গেলেও তার হিতি-চিহ্নের একটা নিদর্শন রয়ে যায় কিছুকালের জন্য—ক্রমে তাও যায় মিলিয়ে। তারপর তারা আশ্রয় পায় ইতি-হাসের পাতার। এক দিন কলকাতার বাতুর বেগতে বেগতে চার হাজার বছরের মিশরের মনি—ভারও আগের মহেজো-বারো হর্যাকার হুং-শিল, বৌদ্ধ মূর্তির শিলালেখ, স্থাপত্য, তক্ষণ-শিল্প এবং আরও পরের আর্ধ্য-সংস্কৃতির চিহ্নসমূহ ও প্রাঈপ-তিহাসিক মূর্তির অধুনাস্থ অতিকার প্রাণীসমূহের নিদর্শন—এই সবের মধ্যে কালশ্রোতের অব্যাহত বারাটি তার চোখের সামনে সহসা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। মাত্র চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে মৃত্যু ও প্রাণীসমূহের বিবর্তন-বারা—ভাদের জীবনযাপন রীতির একটা অসুট আভাস ভাদের বাসনা-কারবার অভি কীর্ণ একটু তরঙ্গ—টচন্যধারে এমনি অতর্কিতে বিপুল কালের যাত্রাপথের ইন্দিব বয়ে আনে। বিপুলা পৃথিবীতে নিরবধি কালের লীলা এমনি অব্যাহত ভাবেই চলছে। তবু বাতুর নিজের কালটিকেই ভাবছে সর্বোত্তম—বারা গভ হরহে ভাদের চোরে সে সর্বাংশে বোধ্য—বিদ্যার প্রতিভার না হোক নিজ নিজ বুদ্ধিতে ত বটেই। আর তারই জন্য লক্ষ্যকে হাতিয়ে নিজে বত হবার বাসনা—অতি-

সকলের বেশা—ঐশ্বর্যভোগের লালসা, প্রত্ন পরিচালনার পৌরব—এইগুলি ব্যক্তির জীবনে একমাত্র সাধনার বস্তু হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে হ'ল একজন একলা পবিত্র—মহামানব এই সত্যকে জীবনে এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ আয়োজন করছেন।

এঁরা চরম লক্ষ্যে বুদ্ধিতে মূগমতিকে আবির্ভূত হয়ে বিধের কানে তুলে বাতুরা মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন, মনে হয় মাহুকের হুংমিশার অবলম্বন হ'ল, মিশরের পায়ে মব ভাহুর কিরণ-লেখার সবকিছু কোমল ও মনোহর হয়ে উঠল—কিছু হার সে শুধু বস্তু মাজেই পর্ববসিত হয়।

চমকে উঠল প্রভাত। বাতীর হুরারে পা দিতেই কোলাহলটা এলম আকার ধারণ করল। বেশ মায়ের আর্দ্রমাদ—তাইবোমের চাপা কাগা—প্রতিবেশীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাদের ছোট উঠান।

তাকে দেখে একজন লেবেলে বলে উঠল, আহা—আর একটু আগে যদি আসতে? পাঁচ মিনিটও হয় নি হঠাৎ হাট কেল হয়ে—

মুনিবার কালশ্রোতে অনন্তও আজ ভেসে চলেছেন।

৩১

কালশ্রোত চলছে। বসে বসে আকোপ করলে চলে না, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক কর্তব্যগুলিও আপন আপন দাবি মিরে সামনে এসে হাজির হয়। চোখের জল বুছে—ভাবনাকে পিছনে ঠেলে—দায়বুদ্ধির চেষ্ঠা আসে এগিয়ে। দাহকার্য শেষ করে সে কিরে এল বাতীতে। শোকে শুষ্ক বাতী, না ভূমিশবার পড়ে কাদছেন—অবোধ তাই-বোনগুলি ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে আছে। এক দিন শিল্পেই বলে কোন ভিনিস অহুতব করে নি প্রভাত, বরং এর বিপরীতটাই ওকে সংসার লব্ধে অতম্বা করে তুলেছে। মরিত্র সংসারে যদি ওরা মাই আসত কি কতি হ'ত অগন্তের? শিতার আকাজকা হেলে বত হবে—বিধান হবে—বন আহরণ করবে—বশোমাল্য গলার পরবে—বাবাকে দেবে নির্ভরতা। কর্তব্যের শক্ত দৃষ্টি দিয়ে ধীরে ধীরে হেলেকে বেন সে বেকার বলে না থাকে—বেন সে গুরুত্বমন্দের পোষণ করে—নিজের ইচ্ছার অসংখ্য সূত্র দিয়ে হেলের ইচ্ছার গতিনিয়ন্ত্রণ চলে। এই ধারণাকোকেও সে বহু বার প্রত্যাক করেছে। প্রত্যাক করে শিটরে উঠেছে—তাই সংসার লব্ধে ওর বোহ ভেমন প্রগাঢ় নয়। আর সেই কারণেই বাপের প্রতি ভীতি পোষণও করত না। না হোক—এই দণ্ডে মনে হচ্ছে একটা সহায় তার পাশ থেকে সরে গেল। পৃথিবীর সঙ্গে বুঝোবুঝি পরিচয় করিতে হবে এবার।

কি করে চলবে সংসার—মায়ের এই প্রেরণ কোন মন্তব্য

হিতে পারে নি—কি করে দায়বদ্ধ হবে সে সম্ভারও সম্ভাবন করতে পারবে না ও। সামাজিক প্রথা ওকে নিষ্কৃতি দেবে না অসমর্থ বলে বেকার বলে। তৎকালিক বন্দীর অস্বাভাবিক দুঃসম্পন্ন করতেই হবে।

একদিনের আশা ও কর্মমাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে প্রত্যন্ত সাধনে ডাকালে। সংসারের কঠিনত্ব ওকে আঘাত করছে—বটিকা—প্রবাহে ওকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাবে এটি নিশ্চিত। বন্ধুর পৃথিবীতে বারং বন্ধুর বা আত্মীয়তার দাবি নিয়ে এককাল পাশে পাশে চলছিল—ভাবের রূপের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ওকে একলা উত্তীর্ণ হতে হবে হুতর পারাবার।

বাগের আপিসে গেল—দ্বিপদনের মাইনে বাবদ কিছু পাওমা ছিল সেটার তথ্য করতে।

শিখার সহকর্মীরা সহায়ত্ব দিবে উপদেশ দিলেন একবার কর্তৃকর্তার কাছে গিয়ে হুঃখের কাহিনী জানাতে। বাগের পথে না হোক যে-কোন একটা পথে হরতো সে বহাল হয়ে বেতে পারবে। চাকরি ভিন্ন যখন অভ পছন্দ নেই। হেডক্লার্ক বললেন, আসছে সপ্তাহে একবারা বরখাস্ত নিয়ে এস—দেখি সাতেরকে বলে যদি কিছু করতে পারি।

তবে ওর মনে আমন হ'ল না। চাকরি না পেলেই বা কি কতি।

আপন মনে সিঁড়ি দিয়ে নামছে—একটা বিবরণসূচক ক্ষমিতে সে মাথা তুলে চাইলে।

ও নিম্নের কবিতা লিখে আপিসের কর্তৃ-সভার আসে নি।

বললে, তুমি যে ?

আমুন এবিকে। শুভকর ওকে বারান্দার একবারে টেনে নিয়ে গেল। বললে চুপি চুপি, শুভলাব জনহনেক লোক যেনে—তাই একটা বরখাস্ত—

তুমি চাকরি করবে ?

মাথা নীচু করে শুভকর বললে, কিছু উপার্জন তো বরকার। কাগজে কবিতা বার হলে কেউ পারিজনিক যেন না।

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—প্রত্যন্ত সাধনে নিলে। প্রত্যন্ত বনেদি বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে—কেউ কোনদিন তা ভাবতে পারে না। লহিস কোচমাস হারোয়াস—আমলা দুই ও হুতর বরবারে ঠাসা যে বাড়ী—সেই প্রসাধনের একটা উত্তরাধিকারী বন্দবস্ত হুতর তুমিকার নামবে বলে উত্তোপ-আয়োজন করছে। কবিতা লিখে টাকা রোজগার করবে—এই চিন্তাই বা আসে কেন শুভকরের ?

কিন্তু চাকরি করবে কেন ? হুতর বড় প্রসন্ন করলে সে। এইটাই সোকা বলে মনে হচ্ছে—আর তো কিছু জানি না। লাজুক গলায় শুভকর উত্তর দিলে।

তবু হুতর বড় প্রসন্ন করলে প্রত্যন্ত, তোমাদের তো কবিতার আর আছে—

কবিতা। একালে থাকবে কি কাব্য ? পুরোনা বংশ—সবই প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি হরতো জানেন না—এককালে এই গলিটার সবই ছিল আশাবাদের—আজ বাতীধানা পর্যন্ত আশাবাদের নয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলে ও বললে, ঞ্জের দায় যে কি ভয়ানক যদি জানতেন।

প্রত্যন্ত রান হেসে বললে, জানি।

না—ভেমনবারা জানেন না। বাইরের ঠাঁট বন্ধার যেনে আত্মীয়বন্ধন নিয়ে চলা—এইতেই কতর হয়ে গেলেন খোঁটা-মশাই। যে জমি আছে তাও গেল চলে। মহাজন তার টাকা হাটবেন কেন।

এমন অবস্থার মহাজন কেউ আরহন—

যে টাকা বার দেয় সে টাকা আদায় করবার কোণলও জানে—সাধারণ মানুষের চেয়ে বরং বেশীই জানে। আপনি হর তো দেখেছেন গলিটা ক্রমে ক্রমে হাট বদল করছে। একদিন...

প্রত্যন্তের মুষ্টি বুলে গেল। চকলা লক্ষী অভ্যন্ত সতর্কণে শৌণ্ড থেকে শৌণ্ডভরে চলেছেন তাঁর সোনার কাঁপি নিয়ে। মহালের সম্পদকে কারখানার সম্পদ গ্রাস করছে—কিন্তু তার গতি ভেদন ক্রত নয়। আজ পণ্যনিয়ন্ত্রণের সুবিধা নিয়ে বাইতি কিসিসকে কালোবাজারে চালান দিয়ে আর এক জোঁগী অভ্যন্ত ক্রত গতিতে এসিয়ে আসছে। লক্ষীর কৃপাকটাক এদেরই উপরে। পুরাতনকে শিকিহ করবার ক্রত তারা অভ্যন্ত উৎসাহী—বংশ-কোলীত হোপ্য-কোলীতে কিনতে চায় এরা। কিনছেও। কমতাপালী দেবতাকে ভুঁট করবার মত এরা জানে—আইনকে কাঁকি দেবার কোণলও এদের আরতে। এরাই আজ প্রহুয়ের জাল বিস্তার করে এই গলির সমস্ত সম্পদকে আয়সাৎ করবে।

চলতে চলতে ও প্রসন্ন করলে, আর কবিতা লেখ না ?

লিখি।

আকর্ষ্য তো। কি তার বিবরণ ? ওর কঠে কৌতুহল। নানা বিষয়—না আজকাল সবাইকে মাতা দেয়—সবাই অহতব করে।

হুঃখ ? অভাব ?

সে তো চিরকালের—তার একটা মানবত নেই যে মাগতে পারা যায়—কি চিনতে তুল হয়। আর আদায় বা হুঃখ আপনায় তা নয়—

টিক বলছে তাই। তোমাদের বড় বরের মর্যাদা যেন সাধারণ বরের মত নয়—

কিন্তু বড় বরের মর্যাদা আর থাকছে কৈ—পৃথিবীতে সবাই লমান এই লভ্যই তো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কি জানি—নাহব যদি কাব্যর ভাল হ'ত তো একটা হাঁতে কেলে এ লভ্যের পরীক্ষা লভব হ'ত। নাহবে নাহবে জান বুড়ি ও নানান বিষয়ের এত তকাং যে লব দিলিয়ে একটা

সার্বজনীন রূপ দেখা চলেবে না। তথাৎ থাকবেই, না হলে
জীবন-মুহুরের অর্থ কি।

জীবনে যে মুহুরেই হবে তারই বা মানে কি ?

কিন্তু মুহুর না করলে জীবনের বিকাশ কোথায় তাই।
আলোর উজাগ নিরে হুঁতির মধ্যে ফুল করে লতাই ফুল হবার
ভর, তাই ফুল এক মুহুর।

আপনি কবিতা লিখুন প্রভাতরা—চন্দ্রকান্ত উপমা
দিয়েছেন।

এ মুহুরে উপহার ওপর প্রভা নেই কারও—কেউ পড়বে না
সে কবিতা।

কেন ?

ফুলকে বুটেরে দেখার অবসর কোথায় মানুষের। উষ্ম
সময় না গেলে রসবোধ আগে কি মনে ? এই শহরে
প্রকৃতির স্থান কোথায়—সবই তো ইঁট কাঠ লোহা সিমেন্টের
কারবার। সে আরতি করলে :

‘ইটের পরে ইট—হেথা মানুষ কীট।’

সত্যি প্রভাতরা—এ কথা ভাবলে তারি কষ্ট হয় মনে।
আমরা কোথায় চলেছি। রূপের অগ্নি হেঁচে কোম অহুসর
অগ্নিতে।

ওতফরের বর অঙ্গ-আতাসে ধম ধম করছে। সে বেহনা
প্রভাতের মনেও সঞ্চারিত হ’ল। বর্ধমানের অকলখলিত হুঁট
ভাব-সমুদ্র প্রাণ অভীতের স্থিতি-সমুদ্রে ডুবে গেল।

গোলদীঘির থেকে এসে বসলে হুঁমনে। এককণে
আকাশে অনেক মক্ষর উঠেছে—গোলদীঘির বাঁধানো ক্রেমে
ভালছে তার উদ্ভল প্রতিবিম্ব। প্রকৃতির সাহায্য অংশ নীল
সবুজ আর কালের পরবার হুঁতরে আছে। দীঘির চার
পাশের সৌর থেকে আলোর তীর প্রকৃতিকে কতবিকত
করছে—কিরিওয়ালার চীৎকার জীবনমাগনের কর্কশ রীতিকেই
প্রকট করছে। সর্বত্র চলছে শাসন। সত্যই অগ্নি অহুসর।

প্রভাত বললে, চল উঠি।

ওতফর ওর অহুসরণ করলে। বাতীর কাছে এসে কোম
কথা না বলে পরস্পর তির পথ ধরলে। ওদের মনের হুঃখের
আলোর ওরা বেশ গভীর পথ হুঁজে পেয়েছে। কলনার চতা
রঙে সে পথের হুলি নর অপরূপ—আশার বন নীলে সে পথের
আচ্ছাদনী নয় উজাগহর, আনন্দের লবু বাহুতে সে পথ মুখে
হলে লীলাগ্রমভও নয়। বর্ধমান স্বাধীন শোভাঙ্গন পথ—
চলার অহুসরণে তা অভিক্রমের উৎসাহ আগে না—নিভাত না
চললে নয়—তাই স্নাতিকরা দেহকে টেনে টেনে এগিয়ে
দিয়ে বেতে হয়।

সেই পথে অন্যত কালের বাজা হয়েছে সুর।

প্রভাত বলে বলে ভাবছিল—গলার লাড়া দিয়ে ঘরে

হুকলেম অর্ধেকু রায়। ওর পাশে চৌকিতে এসে বসে বললেন,
আমার মাপ করে বাবা—কাল তোমাকে আবার করেছি।

কি জানি কেন—এই কথা-প্রভাতের সবত পজি
নিঃশেষে কোথায় চলে গেল। হুঁহাতে হুঁ চেকে অবোধ
শিশুর মত ও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর কায়া বেবে
অর্ধেকুও সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। আর
কি সান্ত্বনার কথাই বা বলবেন তিনি। জীবন কণতমুর—
আমরা যত্নাহীন—পরলোকে শান্তিতে বাস করার সুখ-করনা
এ সব ভাব দিয়ে শোককে নিবারণ করার হুঁতা তাঁর নাই।
তিনি ভাব হয়ে বসে রইলেন—প্রভাতের শোকের আলা তাঁর
মনকেও তারাকাত করে ফুলল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস কলে
অনেককণ পরে বললেন, কাল সত্যিই আমার অজার
হয়েছিল, সত্যি নিশ্বাস বিচারবোধ হারিয়েছিল।

প্রভাত মাথা তুলে বললে, আপনি অজার করেন নি—

মিস্তর অজার করেছি। তিনি হয়ে ছোর বিলেন। এক
জনের কথায় সাক্ষ্যপ্রমাণ মেনে মিলায় যদি—কিন্তু বাবা,
বোঝ ত বার হুঁজে হাওয়ারটা লোক ঘুরছে—তার
সঙ্গেই সব সময় হুঁতির পথ হয়ে চলে না।

প্রভাত বললে, কিন্তু আপনি যদি অজার হুঁদাকা না করে
থাকেন ত—সঙ্গেই আসবে কেন ?

এ মুহুরে এমন একটা বার—হুঁদাকার ভাব্য অজাব্য বলে
কোন ষ্ট্যাগার্ড নেই। সন্তার বাজারদর বেঁধে দিতে পারেন
নি—বেঁধে দিলেও আককের দরের সনে কালকের দরের
সামঞ্জস্য নেই। বাজারে জিনিসের সরবরাহ নেই—অথচ
এমন কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বা না হলে জীবন-
ধারণ করা চলে না লাভটা বেশী বলে ছুঁনি না মাও—আমি
মেব—আমি না নিই আর একজন মেবে। যত বেশী পারে
মেবে। আমার সন্তার বাজারদর একটুও নাহবে না—
অথচ আমার সন্তার সুযোগ দিয়ে আর একজন হবে বড়-
লোক। নিকেকে এ ভাবে নিকের বামাতে পারে কি কেউ ?

প্রভাত কথা কইলে না। এই মুহুরে এসব নিয়ে ভাব
করতে ওর ভাল লাগছে না। কে তার পথে চলছে—কে
করছে অজার—তা নির্ণয় করার তার ও নয়।

অর্ধেকু আর একটু এগিয়ে এসে ওর কাঁধে ডান হাত
রেখে বললেন, সে বাই হোক—শোকে এমন হুঁতে পড়লে ত
চলবে না। আমরা বধন রয়েছি—পকেটে হাত দিয়ে কি
বেশ অহুতব করে বললেন, ইংরেজীতে একটা কথা আছে—
প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। সত্যি—ধারা তোমার হুঁপানে বিন-
রাতির ভর হয়েছেন—তাদের উপেক্ষা করা মানুষের বর্ধ নয়।

তবু প্রভাত চুপ করে রইল। এমন লম্বাহুঁতীল প্রতি-
বেশী পেয়ে কার না চোখবুধ স্বভাবতার উদ্ভল হয়ে ওঠে।
কে না বলে, আপনি বা করলেন, সে বণ... এই ধান-

বীকারের মধ্যেই সত্যিকারের মহামায়া নিহিত নয় কি ? কিন্তু তাবলেনহীন প্রভাতের পানে চেয়ে তিনি বিম্বিত হলেন। সুকোমল স্তম্ভগুলি কি ওর অন্তরে হৃৎ-নিদ্রা-ভাণে শুকিয়ে গেছে—না দারিদ্র্য নষ্ট করে দিয়েছে সেগুলিকে ? বাই হোক, ধানিক ইতস্ততঃ করে ভারী মণিব্যাগটি পকেট থেকে বার করলেন—দেটা প্রভাতের সাধনে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, টাকাটা দাখলের নয় না হলেও—টাকার অনেক জিনিস পাওয়া যায়। লৌকিকতা বুকের আশীর্বাদের চেয়ে এই ভাবের মতোই কিছু হলে—ব্যবহারিক অংশে..., বলে হো হো করে হাসলেন। হাসি ধামলে বললেন, আমরা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব রাখি বলেই—টাকা-আনা-পাই-য়ের পাজার সবকিছুকেই বেপে থাকি। অবশ্য এটা ঠিক সত্য নয়। বলতে বলতে হুৎনা দশ টাকার মোটা ভুলে নিয়ে প্রভাতের সাধনে রাখলেন। বললেন, এটা রেখে দাও—দরকার হলে আরও—

এক নিমিষে প্রভাতের উদাসীন অন্তরে আবার ভাবের কোয়ার এল। বুকের পেশী শক্ত হয়ে উঠল—সেই সঙ্গে কণ্ঠেরে ফুটল হুতা। এ আপনি করছেন কি ? উঠিয়ে নি—

না—না—আমি তোমার গিড়তুল্য—আমাকে পর ভাব যদি—

মাগ করবেন। আপন হলে এ ভাবে অপমান করতে পারতেন না।

প্রভাতের হৃৎ বর অর্ধেকেরে রূঢ় আঘাত করলে। মিছেকে সাধলে মেবার কোন উপায় বুকে পেলেন না তিনি। তাঁর মনে হ'ল সুবিধা পেয়ে প্রভাত কালকের অপমানের প্রতিশোধ নিলে। প্রভাত সত্যিই প্রতিশোধ নিলে।

মোট হুৎনা নাড়াচাড়া ভুলে নিয়ে তিনি বর ছেকে চলে গেলেন। অন্তরাল থেকে লক্ষী সব দেখছিল—উনি চলে যেতেই সে বরে চুকে বললে, আচ্ছা দাদা—দাখলো কি। টাকা থাকলেই কি তারা ভাবে ছুনিরাটা তাই দিয়ে কিনে নেয়া যায়।

প্রভাত স্নান হেসে বললে, বার লক্ষী। চার দিকে যে সব বটহে—না ববরের কাগজে ওঠে—আর বা লোকের বুকে বুকে রটে সবই হঠাৎ বটহে না বা সেইটাই একমাত্র জিনিষ নয়। ওসব এক একটা কৌটার মত—সুবিধ রক্তের মধ্যে জমার বিপটা—প্রকাশ পায় একটা।

উনি বুঝি ওই বাজীটার মালিক ? আঙুল দিয়ে লক্ষী দীপাদের ভিনডলা বাজীটা দেখালে।

হী, অনিমেব বলে যে ছেলেরি প্রায়ই আমাদের বাজীতে আসে তারই বাবা।

তা তোমাকে উনি টাকা দিতে আসেন কেন ?

আমাদের বাজীটার দিকে কখনও ভাল করে তাকিয়েছিল ? ভাল করে এ বাড়িকে যদি দামতে চান তো এক দিন ওদের

বেদন প্রতিবেশীর মনে দরা আছে তাঁরা এ হাড়া আর কি করতে পারেন।

লক্ষী মাগ করে বললে, তারি তো প্রতিবেশী। টাকা থাকলেই বাহাছুরি মেবার মোত হয়। আমার কি মনে হয় দাম দাড়া—ওই যে মেয়েটি বার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ও মিচ্চর ওর বাবাকে বলেছে—

ও বলতে যাবে কেন—উনি মিছে কি—

না—না—ওই মেয়েটি মিচ্চর বলেছে আমাদের অবস্থা খারাপ, টাকা দিলে আমাদের উপকার হবে—

থাক এসব অসুস্থান তর্ক। এ নিয়ে আলোচনা ভাল লাগছে না। আচ্ছা, লক্ষী তুমি দেখতো কাল পাওয়া বি আমতে হবে কি না। মটরের ভাল, লৈকব হুদ, মালসা এসব আছে তো ? আছে। খালি এক বোকা পাকাটি এনে দিও।

বৈকালে জিলোচন সেম এলেন। বললেন, সবই কর্ককল, কপালের দেখা। না হলে হঠাৎ এমন হবে কেন।

ওর বেদ প্রকাশকে বাবাহুত করবার ভত প্রভাত মীরব হয়ে রইল।

জিলোচন সেম বললেন, এই বিপদ না হলে কালই রওনা হয়ে যেতে পারত। এখন মাসহরেক হয়তো—

প্রভাত বললে, মাসহরেক নয়—হয়তো কোন দিনই আপনার দরা গ্রহণ করতে পারব না।

সে কি। কাজটা মেবে না ? প্রচণ্ড বিষয়ে তিনি তত্ত্ব হয়ে রইলেন।

না। প্রভাত যুহ বরে বললে।

কিন্তু সংসার—

আমাকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে কোন মতে চলে।

কিন্তু চাকরির সামাজ আরে—পোষ্যও তো অনেকগুলি—

সব কথা ভাল করে শুধিরে বলতে পারলেন না তিনি।

সামাজ ভাবেই চলবে সংসার, এমন চলছেও তো অনেক।

না—না—, প্রবল প্রতিবাদ করলেন জিলোচন সেম।

আমরা থাকতে তোমাকে এমন কষ্ট করতে হবে না।

না, কিছুতে নয়।

ওর যুহ হাসির অন্তরালে কটিন একটা প্রতিজ্ঞা বেদ আশ্র-পোষন করে রয়েছে। মনে হয় সামাজ প্রতিবাদে তা উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু স্তম্ভের রাশি দিয়েও তা হুহ করা সম্ভব নয়—এটি অস্বস্ত করলেন জিলোচন সেম। ওর বুহ পাণ্ড হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুহ রেঁলে বেরিয়ে এল। হুঃখিত বরে বললেন, বা ভাল বোক কর। ছুনি হুনিমান হেসে, তোমার আমি কি বোকাবো বল।

তাঁর স্নগ গতি দেখে মনে হ'ল—আশাহত হয়েছেন। ঘোরগোড়ার গিরে তিনি আবার কিরে এলেন প্রভাতের কাছে। গলার বর মাধিরে বললেন, সবর করে যদি পার তো একবার আমাদের বাজী বেও। সিপ্রায় মা'র বুঝি কি

তৃতীয় বিএইপালের নূতন তত্ত্বশাসন

ডক্টর আব্দুল নোশেদ সরকার

বঙ্গরাজ্যিক কাল পূর্বে ভাগলপুর জেলার উত্তরাঞ্চলস্থ বনগ্রাম কলাবতী বিজ্ঞানসম্মেলন শিক্কর গ্রীষ্মকালীয় বা মহাশয় স্মৃতির নিয়ম হইতে একাধিক তত্ত্বশাসন আবিষ্কার করেন। পাঠ্য বিষয়বিভাগের গ্রীষ্মকালীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে এই আবিষ্কারের সংবাদ জানিরা। আমি তত্ত্বশাসন পত্রিকা করিতে ব্যগ্র হই। কিছুকাল হইল বনগ্রামবাসী গ্রীষ্মকালীয় বা মহাশয়ের অগ্রহে আমি ঐ তত্ত্বশাসন পত্রিকা করিতে সমর্থ হইরাছি। মনোবিজ্ঞান তত্ত্বশাসন পত্রিকা ও বিহারের প্রাচীন ইতিহাসের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত করিরাছে। এই লিপি সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ সরকারী এপিগ্রাফিক ইতিহাস পত্র প্রকাশিত হইতেছে। এখানে আমি সংক্ষেপে লিপিখানির ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করিতেছি।

তত্ত্বশাসনখানি মুসলিম পালবংশীয় নরপতি তৃতীয় বিএইপাল কর্তৃক কাকেশ্বরে অবস্থিত জয়দেবাবার হইতে প্রাপ্ত হইরাছিল এবং শাসনোদ্ভিগত ভূমি ভীরভুক্তি অর্থাৎ বর্ডমান ভীরভুক্তি অবস্থিত ছিল। পালরাজগণের জয়দেবাবারগুলিকে তাঁহাদের সামরিক রাজধানী বলিরা গণ্য করা বাইতে পারে। এ পর্যন্ত তত্ত্বশাসনখানি হইতে নিম্নলিখিত পাল জয়দেবাবারের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়—পাটলিপুত্র, মুদগিরি, বটপুত্র, লাহলগণ্ড, বিলাসপুর এবং রাণাবতীমগর। কেহ কেহ হরবার নামক অপর একটি পালজয়দেবাবারের উল্লেখ করিরাছেন, কিন্তু উহা বিলাসপুরের জ্যেষ্ঠ পাঠ্য। তৃতীয় বিএইপালের বর্ডমান বনগ্রামলিপি হইতে আমার কাকেশ্বরনামক নূতন পালজয়দেবাবারের বিষয় অবগত হইলাম। কাকেশ্বর বিহারের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিরা মনে হয়।

বনগ্রামলিপি হইতে তৃতীয় বিএইপালের ক্রমিক অজ্ঞাত-পূর্ব পুত্রের নাম জানা যায়। বলা হইরাছে যে, উক্ত তত্ত্বশাসনের রূপক ছিলেন রাজার পুত্র প্রহসিতরাজ। এই প্রহসিতরাজকে তৃতীয় পিতার সমীক্ষণেও উল্লেখ করা হইরাছে। পালবংশীয় রাজগণের নামান্তে পাল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রহসিতরাজকে কেন প্রহসিত পাল বলা হয় নাই, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পালরাজগণের অবিবাহিতা প্রেরণীপদের গর্ভাক্ত পুত্রগণের এইরূপ নামকরণ হইত কিনা, তাহা বিবেচ্য।

বর্ডমান তত্ত্বশাসন তৃতীয় বিএইপালের নবম রাজ্যবর্ষে প্রাপ্ত হইরাছিল। এই তারিখটির অনেকখানি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। বাংলার ইতিহাসবিষয়ক অত্যন্ত প্রামাণিক এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ইতিহাসে ঐতিহাসিক

গ্রীষ্মকালীয় মহাশয় রাজ্যবর্ষ ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় বঙ্গের তৃতীয় বিএইপালের রাজ্যকাল গণনা করিরাছেন। ইহার কারণ এই যে, তৃতীয় বিএইপালের রাজত্ব রাজ্যবর্ষে আনুমানিক তত্ত্বশাসন প্রাপ্ত হইরাছিল এবং উহার পরে তিনি কত বঙ্গের রাজত্ব করিরা-ছিলেন, এতদিন তাহা নিশ্চিত জানিবার কোন উপায় ছিল না। পালবংশীয় ভিন্ন জন বিএইপাল নামক নরপতির মধ্যে অন্ততঃ এক জন অন্যান্য হাকিম বঙ্গরাজ্য রাজত্ব করিরাছিলেন। কারণ রাজ্য বিএইপালের স্বত্বাধীন রাজ্যবর্ষে পঞ্চকালনামক বৌদ্ধগ্রন্থের একখানি পুঁথি মকল করা হইরাছিল বলিরা জানা যায়। এই বিএইপাল পালবংশীয় প্রথম বিএইপাল হইতে পারেন না। কারণ তিনি মনম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্য আর করেন বঙ্গের রাজত্ব করিরাছিলেন। কিন্তু ইনি দ্বিতীয় বিএইপাল কি তৃতীয় বিএইপাল তাহা নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যদিও দ্বিতীয় বিএইপালের কোন নির্দিষ্ট রাজ্যবর্ষের উল্লেখ তত্ত্বশাসন পাঠ্যে পাওয়া যায় নাই, তবু অনেক স্বত্বাধীন বর্ষাবধিক দীর্ঘ রাজত্ব তাঁহাতেই আরোপ করিরাছেন। গ্রীষ্মকালীয় মহাশয়ের মতে দ্বিতীয় বিএইপাল আনুমানিক ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আঠাশ বঙ্গরাজ্য রাজত্ব করিরাছিলেন। বর্ডমান বনগ্রামলিপি হইতে জানা গেল যে, তৃতীয় বিএইপাল অন্ততঃ সত্তর বঙ্গরাজ্য রাজত্ব করিরা-ছিলেন। সুতরাং স্বত্বাধীন বর্ষাবধিক দীর্ঘ রাজত্ব তাঁহাতেই আরোপ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বিএইপাল আর করেন বঙ্গের রাজ্য রাজত্ব করিরাছিলেন।

বনগ্রামলিপি হইতে জানা যায় যে, ভীরভুক্তি অর্থাৎ উত্তর বিহার তৃতীয় বিএইপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পালরাজগণের সহিত বিহারের অধিকার লইরা ত্রিপুরার কলচুরিবংশীয় রাজগণের দীর্ঘকাল বিবাদ চলিরাছিল। একখানি সামরিক পুঁথিতে দেখা যায় যে, ১০৭৬ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভীরভুক্তি কলচুরি গাঙ্গেরদেবের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মুসলমান লেখক বৈষ্ণবীর বিবরণ অনুসারে ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে বারানসীতে গাঙ্গেরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার ইতিমধ্যে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে বারানসী অঞ্চলে পালবংশীয় মহীপালের লেখ পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারেও মহীপালের কতকগুলি লেখ আবিষ্কৃত হইরাছে। গাঙ্গেরের পুত্র কণ (১০৪১-৭১ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে কানৌর নিকটে হুম্মান করিরাছিলেন। তাঁহার ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিও ঐ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কলচুরিবংশের লেখমালার রাজ্য কর্তৃক গৌড়বাদের বিধেভাঙ্গণে উল্লিখিত দেখা যায়। বিবিধরূপে

পালনিত পরাভূত করিয়া বীরভূমি ফেলা পর্যন্ত অঙ্গের হইরা-
হিলেন, পাইকোড় লিপিতে তাহার প্রমাণ আছে। এদিকে
ভিন্তীর এই হইতে জানা যায় যে, মহীপালের পুত্র নরপাল
কর্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সৰ্ব্ব হইরাহিলেন। যদি
বিহারে নরপালের একখানি লিপিও পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্য-
কর নন্দীর রামচরিত অহুসারে নরপালের পুত্র তৃতীয় বিএহপাল
কলচুরিয়ার কর্ণকে পরাভূত করিয়া তৃতীয় কতা বৌবনত্রীর
পাশিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীরভূজিতে তৃতীয় বিএহপালের
অধিকার এই উক্তির সৰ্ব্বক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই
সময়েও পাল-কলচুরি যন্ত্রের অবসান হয় নাই। কারণ কর্ণের
পুত্র নরপালকে চম্পারণ্য (উত্তর-বিহারস্থিত চম্পারণ্য)
বিহারপের দাবি করিতে দেখা যায়।

তৃতীয় বিএহপালের বনগ্রাম ভাঙ্গনাসনের একটি উল্লেখ-
যোগ্য বৈশিষ্ট্য হুইট স্টোকে রচিত একটি পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টটি
এইরূপ :

কোড়াগারিগিরিয়ার কাছ ইতিহাসে স্ত্রীকর্ণানাম হিতি
স্ত্রীকর্ণানাম হিতি স্ত্রীকর্ণানাম হিতি
আমাদিকহলেন্তি বত্র বিবদো বোগেশ্বরঃ বহুতঃ
খ্যাতস্তন ইতোপি নির্গলবণা বদীশনামাক্ষঃ।
যো বোড়াবিপত্তেরসীমন্তপুত্র রাজো বিধো দিশাং
তুপালেবু বিহার মৈত্রাসনং সন্ততিভাতিতঃ।
কৃতা শাসনমেন্দ্রাক্ষলতঃ কামণ্যবাহুহিতি
বিজ্ঞান্য চ দীনঃখিতজনভাতৃদৈবোজ্ঞানম্।

শাসনের সূচনাংশে দেখা যায়, রাজা তৃতীয় বিএহপাল
কোলাক বা কোতাক দেশে নির্দিষ্ট ইটাছাক বা ইটুছাক গ্রাম
ব্যতীত বর্জকর্ণা নামক আক্রমণকে তীরভূজিহিত হোজের-
বিষয়ভর্গত বহুকর্ণ ব্রাহ্মণের কিরদংশ দান করিতেছেন।
কিন্তু উল্লিখিত পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ ভূমি প্রকৃত-
পক্ষে রাজার বর্জীশ দ্বারা জমৈক আক্রমণ কর্তারী কর্তৃক
তৃতীয় কপীর হইতে প্রদত্ত হইরাছিল। শাসনগ্রহীতা আক্রমণ
কোলাক দেশ হইতে আদিরা তীরভূজিতে বাস করিতে-
হিলেন। শাসনদাতা আক্রমণ বর্জীশেরও একজন পূর্বপুরুষ
ঐরূপ কোলাক হইতে আসিয়া তীরভূজিবাসী হইরাছিলেন।
কোলাকনির্দিষ্ট কাছ; তংপুত্র পোহনক; তাঁহার কতা
ইছহলা; তংপুত্র বিবর; তংপুত্র বোগেশ্বর; তংপুত্র কুদ;
তাঁহার পুত্র ছিলেন শাসনদাতা বর্জীশ। এই পরিশিষ্ট হইতে
স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্বাদশ তীরভূজিবাসী আক্রমণের কোলাক-
দেশের আক্রমণের সহিত তাঁহাদের দূর-সম্পর্কও সন্দেহের
করিতেছেন এবং ভূমিদানাদি দ্বারা কোলাক আক্রমণকে আপ্যায়িত
করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তীরভূজিতে কোলাক আক্রমণের
সামাজিক মর্যাদার এই আভিপ্রাণের সহিত মিথিলাদেশে
কৌলীত এবং কুলপঞ্জিকা দাবিয়ার প্রচার উৎপত্তির বসিষ্ট
লবন রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কৌলীতপ্রচার ভূত বাংলা-
দেশে মিথিলায় নিকট বহি। রিকলি কৃত *People of
India*, 1915, p. 215; কনকাত মিত্র প্রণীত *History
of Maithili Literature*, vol. I, pp. 26ff. প্রকৃতি
জটিল। কিছুকাল পূর্বে মিথিলায় পদৌলী সুলতানীর
আক্রমণের সহিত বাংলা আক্রমণ-সময়ের পাছলীর অভিন্নতা
বিচার প্রসঙ্গে আবারও ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হইরা-
ছিল। এই প্রণের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু উত্তর
দেশে কৌলীতের উৎপত্তি যে একই প্রকারে ঘটয়াছিল,
তাহাতে সন্দেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বাংলাদেশের
কুলপঞ্জিকা অহুসারে রাজার ও বারের আক্রমণের পূর্ব-
পুরুষেরা কোলাকদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বনগ্রাম লিপির
লাক্ষ্য এবং উল্লিখিত কিংবদন্তী মিথিলা ও বাংলার কৌলীতের
মধ্যে একটি যোগসূত্রের সৃষ্টি করে, সন্দেহ নাই। ঠিক এইরূপ
অপর একটি যোগসূত্রের সন্ধান দেয় আদিশূরের কাহিনী।

বাংলাদেশের কুলপঞ্জিকা অহুসারে রাজা আদিশূরের
আমন্ত্রণেই কোলাক আক্রমণেরা বাংলার উপস্থিত হইরাছিলেন।
হঃবের বিষয়, বিভিন্ন কুলপঞ্জিকার আদিশূরের যে বিষয়
দেখা যায়, উহা সর্বত্রই পরস্পর-বিরোধী। ঢাকা বিশ্ব-
বিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৬২৫-২৬
জটিল। এমন কি যে বংশের কোলাক আক্রমণেরা বাংলার
উপস্থিত হন, উহার উল্লেখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে ৬৫৪, ৬৭৫,
৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ১০১৭ শকাব্দের কথা
বলা হইয়াছে। এই কিংবদন্তীসমূহ যে আদিশূরের বহুকাল
পরে লিপিবদ্ধ হইরাছিল, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, ঐষ্টীর
একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ও বিহারে শকাব্দের
ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। বাহা হটক, প্রাচীন বাংলার
সুবংশের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু আদিশূর নামক
কোন নরপতির অস্তিত্ব বাংলার কোন ঐতিহাসিক উপাদান
দ্বারা এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। আন্তর্ভ্যেয় বিষয়, পূর্ব-
ভারতের একমাত্র ঐতিহাসিক আদিশূরের অস্তিত্ব-বিষয়ক
প্রমাণ মিথিলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিত্রের তারবর্তী নামক গ্রন্থ ১৯৮
সংবৎসরে রচিত হইরাছিল। ইহা বিক্রমসংবৎ, শকাব্দ মতে।
কারণ প্রাচীন মিথিলায় শকাব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।
সুতরাং তারবর্তি ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইরাছিল। এই
বাচস্পতি মিত্রের তারবর্তী নামক অপর একখানি গ্রন্থে
আদিশূর নামক, গ্রন্থকারের জমৈক মহাসামরিক নরপতির উল্লেখ
দেখা যায়। বদীশ-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্জিকা, ৫৭৭ ভাগ,
পৃষ্ঠা ৬৮ জটিল। এই আদিশূর মনন শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল-
বংশের স্রোতপনের সময়ভাগে মিথিলা ও তদ্রিক্তবর্তী বাংলার
কিরদংশ শাসন করিতেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

খাত উৎপাদনে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

ঐদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পরীক্ষকাল সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন কৃষি ও খাতসচিব মাননীয় এপ্রক্লরচর সেন বলেন যে, যদিও কৃষিবিভাগ উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ, রাসায়নিক সার বিতরণ, উন্নত বরণের কৃষি-বস্ত্রের সরবরাহ, বিভিন্ন হানে নূতন নূতন পতের চাষের প্রবর্তন, পোকামাকড়, রোগের আক্রমণ হইতে শতরক্ষা প্রভৃতি কাজে অতী আছে, তথাপি এই সকল কাজের বহু কৃষি-বিভাগ কোমলপ কৃতিত্ব দাবি করে না। কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এই সকল ব্যবহার দ্বারা দেশের কৃষি-প্রণালীসমূহের স্বাস্থ্য ও ব্যাপক উন্নতিসাধন হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রয়োজন অস্বাস্থ্যকর কৃষি-বিভাগ কোনকালেই উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত শ্রেণীর বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি সরবরাহ করিতে পারিবে না। উদাহরণ-বরণ তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম বাংলার মোটী-হুটি ভিন্ন কোটি বিঘার ধানের চাষ হয়। এই ভিন্ন কোটি বিঘা কৃষির বহু মোটীহুটি ৫০ লক মণ বীজের দরকার। কিন্তু কৃষি-বিভাগের পক্ষে এই পরিমাণ বীজ সরবরাহ করা মোটেই সম্ভব নয়। সিদ্ধিরিতে রাসায়নিক সার প্রভৃতির কারখানার যে পরিমাণ সার প্রস্তুত হইবে তাহাও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত তিনি দেন।

কিন্তু সমস্তার সমাধান কি—কৃষি ও খাত সচিব এই প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন যে, এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে কৃষক-সম্প্রদায়ের এবং জনসাধারণের কৃষির প্রতি অতীতের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসাধন অত্যাবশ্যক এবং সরকারী কৃষিবিভাগ এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনসাধনের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিরাছে; এই বিষয়ে কৃষিবিভাগের সকলতা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। তিনি তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে বলেন যে, কৃষি বিভাগের উৎসাহে ও প্রেরণার ফলে হানে সম্ভার প্রণালীতে কৃষিকার্যের প্রবর্তন হইরাছে; পল্লী অকলে বাস, জল, আবর্জনা, কচুরি-পান প্রভৃতির দ্বারা ‘কমপোষ্ট’ সার প্রস্তুতের প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইরাছে। কেননা তাঁহারা প্রত্যেক ভাবে দেখিরাছেন যে, এইরূপ কমপোষ্ট সার প্রয়োগের ফলে ধান এবং অন্যান্য পতের ফলন আশাতীত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্বে পত্রে ঔষধ দিটানোর প্রতি কৃষক সম্প্রদায়ের যে কুসংস্কার ছিল তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাসিত হইরাছে। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন অকলে স্থায়ী জনসাধারণের আগ্রহে ও তেঁতার প্রায় ১৫০টি ছোট ছোট লেচ-পরি-

কল্পনা কার্যভারী হইরাছে। কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত অধিকতর খাতপত উৎপাদন প্রতিযোগিতার প্রতি কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎসাহ খুবই বর্ধিত হইরাছে। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ কৃষি ও খাত সচিব প্রদান করেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কৃষির উন্নতিসাধনের এবং অধিকতর পরিমাণে খাত উৎপাদনের জন্য কেবল কৃষক সম্প্রদায়ের নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়েরও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। কৃষিকাজ যে হের মতে, শ্রেয়ঃ—এই কথাটি এখন সকল সম্প্রদায়কেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং কৃষি ও খাত সচিব যে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী-সাধনকে কৃষিবিভাগের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করিরাছিলেন ইহা খুবই আশাসের কথা।

কিন্তু নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল আয়োজন ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহার বিশেষ কোন ইঙ্গিত এখনও স্পষ্ট ভাবে দেখা দাটতেছে না। এই উদ্দেশ্যে যে দুই-একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইরাছে (যেমন ‘কৃষি সেনা’ গঠন), তাহা যেহেতু তাগ কাগজে-কলমেই লীলা-বহু হইরা রহিরাছে। কৃষির প্রাধান্য ও গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বহু রকমের পূজা-পার্বণ অঙ্গীকৃত হইত; অনেক গান, হুতা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল, নানা উৎসবেরও ব্যবস্থা ছিল, এখন সেই সকল পূজা-পার্বণ-উৎসব প্রভৃতি প্রায় অস্তিত্ব হইরাছে; প্রবাদবাক্য, গান, হুতা প্রভৃতি বিন্দুতির গল্পেরে চলিরা পিরাছে।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করিতে হইলে পুনতর কৃষি-সম্পর্কীয় নানা উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে; গান, হুতা প্রভৃতির প্রবর্তন করিতে হইবে; আর একটি বিশেষ কথা এই যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনকে কৃষিযুগী করিতে পারিলেই কৃষির ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল হইবে। কাগজে-কলমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কৃষিযুগী করিবার অনেক ব্যবহার কথা শুনি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার বিশেষ কোন পরিচর দেখিতে পাই না। নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির উপর অনেক লর্ডই আরোপ করিতেছেন যেমন পাকা পায়খানা, পাকা কুঠা, খেলার মাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা, কিন্তু এই সকল লর্ডের মধ্যে উত্থানরচনার উল্লেখ নাই। পল্লী অকলের বিদ্যালয়সমূহে খেলার মাঠের ভেতন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। খেলার মাঠের পরিবর্তে ‘উত্থান’কে প্রাধান্য দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়।

পান্ডিত্য যেনসমূহে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনকে কৃষিযুগী করিবার অনেক ব্যবস্থাই আছে। অমত সে সব দেশেও

অনেক প্রাচীন উৎসব যুগে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বালক-বালিকারা এখনও শতকর্ষমে তাহাদের অতিভাবক-দের প্রচুর সাহায্য করে। বড় বড় হেলেরা ট্রাষ্টের চালায় এবং বালিকারা মাঠের কর্মীদের জন্য খাবার ও ঠাণ্ডা চা লইয়া যায়। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে এই কার্যে বালক-বালিকাদের উৎসাহ দিবার জন্য প্রথমে চা পানের আয়োজন হয় এবং সন্দেশ সন্দেশ বহু রকমের আয়োজন-প্রদান, ভাষা-প্রভৃতি অঙ্গীভূত হয়। এদের কৃষকেরা একত্রিত হইয়া বৃহৎ ভোজেরও ব্যবস্থা করে। এদের মাঠে প্রথমে ক্রিকেট খেলার আয়োজন হয়। ছোট ছোট বালকদের জন্য দৌড় ও অস্ত্র খেলাগুলোর ব্যবস্থা থাকে, এবং প্রচুর পরিমাণে আইসক্রীম ও লেমোনেড সরবরাহ করা হয়। পরে বিতালরে চারের ব্যবস্থা থাকে এবং এই সময়ে হারহাউস বিদ্যালয়গৃহে কলরবে সুবর্ণিত করিয়া তোলে। এই রকম হাসি, কৌতুক, আয়োজন, চীৎকার বিদ্যালয়ে আর কখনও দেখা যায় না। বিতালরের দরজার উপরে শতের মালা বোলাসে থাকে, শতের শিব, লতা, পাভা, ফুল প্রভৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ বিদ্যালয়গৃহটি সুশোভিত করা হয়। বিদ্যালয়ের স্ন্যাক বোর্ড, ডেক প্রভৃতির দ্বায়ে টেবিলের

উপর মানাবিধ বাতাল্য প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়। চারি-দিকেই আপেল, শিয়ার, প্লাম প্রভৃতির বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষকের পত্নী ও কন্যাগণ হেলেরের বে বাহা চাহে বাইতে দেন। ইহার পরেও আবার খেলাধুলা, পানের আয়োজনও থাকে; বাহুর মানাবিধ খেলা খেলা, এই সময়েই "Harvest Home" (বাড়ীতে শত আনন্দ উৎসবের) সঙ্গী-গেতা অধিক উদ্ভাসিত। শতকর্ষনের গান (Harvest hymn) পাওয়া হয়; এই গানটির প্রথম চার পংক্তি হইতেছে—

We have ploughed, we have sowed,
We have reaped, we have mowed,
We have brought home every load,
• Hip, hip, hip, Harvest Home!

আমাদের দেশের প্রথম বাতাল্য কর্ষনের সময় পত্নী সকলে এইরূপ অঙ্গীভূতের ব্যবস্থা করা পুঁই বাহুর এবং এই উপলক্ষে বিতালয়গৃহে দুই-এক দিন হুট দেওয়াও সম্ভব। তবে হুটেতে বিতালয়ের দরজা কানোলা বড় থাকিবে না, শিকড়গণও অঙ্গপরিহিত থাকিবে না; হারহাউসের সহিত মিলিত হইয়া 'হারভেস্ট হোম'-এর অঙ্গীভূত করিতে হইবে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়গৃহে কৃষিসম্পর্কীয় সিনেমা, নাটিকা প্রভৃতির অভিনয়ও হইতে পারে।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শ্রীনিলাসতন দাশ

ভারতগঙ্গাধরে যুগলকিত নিবিড় তিমির মাণি'
ভাস্করলয় ভোমার উদয়, হে ভরুণ সন্ন্যাসী !
পূর্ন-ভোরণে শঙ্কহরণ ডকা বাজালে বসে—
ভজা-অলস মেঘ মেলিয়া চমকি' চাহিল সবে।
রক্ত আঘাতে যুগে কাণ্ডিকে কাপালে যুগে ভেঙ্গে,
যব চেতনার স্পন্দনধ্বনি বকে উঠিল বেঙ্গে।

সমুদ্রে ঘেরি' কোটি কোটি বীম দরিদ্র দারায়ণ
পতিতপাবন বজের ভূমি করেছিলে আয়োজন।
হৃদয়বের বৃষ্টির তরে যেলে দিলে হোমানল,
দীকিত হলো সেবার মরে মৃত্যু করিমল।
'জীব প্রেম করে' যে জন জগতে সেই তলে দীপ্ত—
এ বাণী আশ্বতোলা এ জাতির পরশিল অন্তর।

যেব বেদান্ত উপনিষদের সত্যের মর্মবাণী
তব সাধনার প্রাচ্য-প্রান্তে হ'রে গেল কানাকানি।
বর্ষের লাগে কর্মবোণের সাধিনা সমবর
ভারতাস্থার শাখত বাণী বোঝিলে জগৎবর।
ভিধারীর বেশে বিশ্ববিজয় করিয়া প্রতিভাবলে
কিরিলে বসেবে ছুনি রাজবেশে বিজয়মালা গলে।

ভ্রমোত্তপে তরা যতের মুদ্রকে অস্ত্র বহি' লাগি'
শক্তিলাবনা শিখালে সবাত্রে, হে নবীন বৈরাগি।
নব্য যুগের মহাত্ম্যের তুমি যে নব্যদাতা,
তব আশ্রমে স্বেচছা ত্যজিয়া মাতিয়া উঠিল প্রাণী।
ভগবান্ রামকৃষ্ণের কৃতি শিষ্য বোধ্যতম—
তাব-জগতের বিপ্লবী বীর সন্ন্যাসী মনোমর।

শ্রীশ্রীধীরকুমার সেন

কয়েকদিন ধরে মজা মজা হচ্ছে না। অবিমান পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, ভাল করে হ'হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়, তার পর দৃষ্টিকে স্বাভাবিকভাবে ফিরাতে ফিরাতে ভাব ভাব করে দেখে। পথের অপর পারে দেওয়াল-সংলগ্ন গ্রাফার্ডের হোট হোট লেগাগুলো কষ্ট করে পড়ে। কখনও বা নিজের গলার কাছে, পালের উপরে চিমটি কাটে, বুজপায় দেহ আত্মকিত হতে থাকে তবু হাতে না, তার পর আবার পথ চলে।

কয়েক দিন ধরে অবিমানের মনের মাঝে একটা অদ্ভুত লম্বে থেকে থেকে ছেপে উঠছে। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছে যেন সে ছেপে দেই—যেন এক ভর অন্ধকার রাত্রে ঘুমিয়ে সে বগ্ন বেধেছে, তার চোখের সামনে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন এসে এসে সরে যাচ্ছে, আর তারি সঙ্গে কতকগুলো আশাতীত অসম্ভাবিত আকস্মিকতা। বোধ হয় এ তবু একটা রাতেরই বগ্ন।

পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবিমান চোখ বিক্ষিপ্ত করে এদিক ওদিক তাকায়। চেনা মানুষগুলোর মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখে, চেনা জায়গার সামনে এসে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বিশেষত্বগুলোকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে—যেগুলো অনেকবার দেখে দেখে তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কয়েক বার সে মালতীকে বলছে, 'দেখ, মাঝে-মাঝে আমার মনে একটা অদ্ভুত লম্বে জাগছে। কখনও কখনও মনে হয় কি জানো? মনে হয় যে, আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই সব বগ্ন দেখছি—যেন সবই মিথ্যা।'।

প্রত্যেক বারই মালতীর ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, অবিমান স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে সেই হাসি। নাঃ, মালতীর কাছে এই কথা বলতে গিয়ে সে মেহাত বোকাই বনেছে।

যাপারটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, রাতের পর রাত, তবু অবিমানের মন থেকে লম্বেয়ের ঘোর কাটল না, অথচ তারই ভর তার কত না অস্বস্তি চেষ্টা। পকেট থেকে দুটো দুটো টাকা ফুলে নিয়ে বিছানার উপর যেবেছে, একটা একটা করে শুয়েছে, আবার সাঝিয়েছে, আবার শুয়েছে। সিন্দূকের একপাশে তুপীকৃত মোটা—ঘরে ঘরে লাকান। মোটাগুলো পোনা তার মোজকার কাছ। তার পোনা খেব হলো মালতীকে দিয়ে পোনার হিসাবে কোন গরমিল বরা পড়ে কিনা তাই পরখ করতে। নাঃ, বগ্ন কখনই নয়। তা হলে ছবছ এমন তাবে কখনই মিলে যেত না,

বাড়ী থেকে বেরিয়েই রাঞ্জন কয়ালের সঙ্গে দেখা। হেলেবেলার বন্ধু—একসঙ্গে কম পক্ষে সাত-আট বছর ফুলে পড়েছে, খেলেছে, বেড়িয়েছে। রাঞ্জন বললে, 'প্রায় হ'বুগ্ন পরে দেখা, চিনতে পারিস?'।

চেনবার মত রাঞ্জনের শরীরে কিছু দেই, তার বর্তমান যেন দিহুর ভাবে অতীতকে দিক্‌সম দিয়েছে। সেই কাঁচা সোনার মত রং, মধুর দেহ, হাঁটলে মনে হ'ত যেন মেচে মেচে চলছে—আজকের এই রাঞ্জনকে দেখলে কার মনে পড়বে হেলেবেলার সেই রাঞ্জন কয়ালের কথা। ময়লা কাপড়, কামাটা হিঁড়ে নীচের দিকে মেঘেছে, দাড়ি বোধ হয় সাত-আট দিন কামানো হয়নি, বগ্নে এক ভাড়া মধিপত্র—সুন্ন্য অট্টালিকা হতভ্রী হলো যে রকম হয় ঠিক তারই মত তার অবস্থা। তবু চিনল তাকে অবিমান, বললে, প্রায় কুড়ি বছর পরে, ইল, কি হয়ে গেছিস তুই, কোথায় আছিস তাই?'

'এই যে, এই বাড়ীটার। নীচের ভলার ছপানা বর, তাই ভাড়া নিয়ে আছি।'

অবিমান বিস্মিত ভাবে বললে, 'কবে এলি, কৈ জানি না ত। এই গলিরই ও-মাথার আমি থাকি, ওই যে লাল বাড়ীখানা—'

রাঞ্জনের চক্ষু যেন কেটে বেরিয়ে আসতে লাগল, 'তা হলে তুই-ই সেই অবিমান চক্রবর্তী। ওই বাড়ীতে থাকিস তুই। লটারিতে পকাশ হাজার টাকা তা হলে তুই-ই—'

অবিমান সন্দেহ দৃষ্টিতে একবার চার দিক দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ তাই, আমিই সেই অবিমান চক্রবর্তী—'

তার পর তাকে যেন অতমমত করবার ভর বলে, 'সেই হেলেবেলার মনে আছে ত, এক দিন কি বলেছিলুম—'

রাঞ্জন শ্রবণ করবার চেষ্টা করতে করতে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে বটে মনে, বলু ত—কি বলু ত—'

অবিমান হেসে বলতে লাগল, 'সেই যে বলতুম, বড় হয়ে যদি খুব বড়মানুষ হতে পারতাম, বু-উ-ব—'

রাঞ্জন উল্লাসে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে বটে মনে, বলভিল সত্যি তুই। কিন্তু হ্যাঁ, মিলে গেছে ঠিক অকরে অকরে—পকাশ হাজার। আচ্ছা এখন বাই তাই, বেলা হয়ে গেল, আবার ধেরেই কোর্টমুখো—'

হারিয়ে এক বীতংস সৃষ্টি চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

ঘরে চলছে। মাঝবান ঘিরে ছুটেছে ট্রাম, বাস, মোটর। অবিমান একটা একটা করে বাতাস পোনে, তার পর হঠাৎ বেই হারিয়ে যায়। ভবন গাড়ীর মধ্য দুখুঁ করতে আরম্ভ করে। গ্যাকার্ডগুলোও পড়তে তোলে না।

পরমুহূর্তেই হঠাৎ সে অতমমত হয়ে যায়। কি বেন ভাবছিল, কি বেন মনের মধ্য থেকে হারিয়ে গেল, কিমুহূর্তেই আর তার উদ্দেশ্য পায় না।

বগ্ন ও সত্যের মাঝে এই যে অসংলগ্ন মুহূর্তগুলো—এরা বেন যেতোলে পা কেলে চলছে। চেতনা বুঝি দিগ্ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

তবু অবিমান চলে শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

লালবাখারের পথে নিশাপতির সঙ্গে দেখা। লোকটা কুটীপাথের এক পাশে লম্বা সজ্জিত কতকগুলো লটারির টিকিটের মাঝে কি বেন হাতছাড়ে। নিশাপতি তা হলে আতঙ্কিত হাকে মি। এখনও আশা আছে।

অবিমানকে দেখে নিশাপতি চট করে উঠে দাঁড়াল। বললে, ‘কেমন, বলিনি অবিমানবাবু, লাগবে, একদিন না এক দিন লাগবেই—বাবে কোথা?’

আগিস থেকে হেঁটে বাতী করে নিশাপতি, ট্রামের তাক। আর লালবাখারের পরলা বাঁচার। সেই টাকা দিয়ে জমাগত মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লটারির টিকিট কিনে চলছে—আশা এক দিন না এক দিন বরাত পূলবেই। মাঝে মাঝে পথের পাশে গণকের কাছে হাত ধোঁয়—সাদু-সরাসী গেলে তাবের পেছনে লেগে থাকে। কে জানে, কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে অদৃষ্ট কীরবে।

নিশাপতি উঠে দাঁড়াল। হাতে বামকতক সত্বে কেশা টিকিট। বুক-পকেটের হেঁতা কারণা দিয়ে কতকগুলো টিকিটের কোণ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে সত্যিই মেশার পেরেছে।

নিশাপতি অবিমানকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল, ‘আত্মন অবিমানবাবু, এক কাপ চা খেয়ে মাস, অনেক দিন পরে দেখা—’

চারের বোকাবের হোকরাকে হু’ কাপ চা দিতে বলে অবিমানের কামের কাছে দুখ এনে নিশাপতি কিন কিন করে বললে, ‘এবার বোব হয় টেলিগ্রাম আসবে।’

অবিমান চোখ কপালে ভুলে বলল, ‘কিসের?’

নিশাপতি বুচকি ছেসে বলল, ‘পেরেছি।’

অবিমানের বিস্ময়িত চোখ মারল না। নিশাপতি কি পাগল হয়ে গেল। ‘কি বলছেন আপনি?’

চারের কাশে আর একটা চুচুক দিয়ে নিশাপতি ব্যাপারটা পূলে বললে। কাল রাতে সে বগ্ন বেবেছে, লেট লেখালে

তার মধ্য উঠেছে। একটা-না-একটা এবার লাগবেই—হয় এখন, নয় বিতীর, নিদেনপক্ষে তৃতীর।

ও বেন এক বগ্নচারী, অবাভবের পথে চলতে চলতে এমনই হয়েছে যে বগ্ন থেকে আত্ম আর সে সত্যকে পৃথক করে চিনতে পারে না।

অবিমান উঠে পড়ল।...

কিন্তু কোথায়ই বা বাবে? এই হুমিরা ভরাই ত বগ্নচারীর হল। এই ত সে মিছেই কয়েক দিন ধরে বেন এক বগ্ন রাখে হয়ে বেড়াচ্ছে। তারপর বেদিন হিঁচবে এই বগ্নের আল...

জ্ঞপথে বাতীর দিকে কিরল অবিমান। ট্রাম একটা বাছিল, লাকিরে উঠল।

ট্রাম ছুটেছে। বাতীর পর বাতী, পাড়ির পর পাড়ি, জনতা আলো—

জানাল। ঘিরে বাইরের পানে চেয়ে থাকে অবিমান, এই বগ্নের অরণ্যে কোথায় বগ্নের অবকাশ?

ট্রাম ছুটেছে, কেউ নামে, কেউ ওঠে।

এই—এই ত সেই গলি, এরই শেষ মাথার তার বাতী।

লাক ঘিরে মারল অবিমান। আর, তারপর এমন তাবে হাঁটতে লাগল বেন একটা মুহূর্তের এমিক ওমিক হওয়ার উপরে তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। বাতীর সামনে পৌছেই মরকার থাকার সঙ্গে ভুল চিংকার—‘মালতী মালতী—’

মরকা পূলে যায়।

মালতীর চোখে দুখে বিন্দুর—কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য করার অবকাশ অবিমানের নেই। লাকাত লাকাত হুঁতিন সিঁচি পায় হয়ে সে উঠল দোতলার। চাবি, চাবি কোথায় গেল? মালতী মালতী—

মাঃ থাক, মরকার নেই, চাবি সে পেরেছে। মুহূর্তে অবিমান বগ্নের কোণে গিয়ে সিঁদুকটা খুলে কেলল।

টাকা—টাকা—টাকা। তাকার তাকার মোট বাণ।

এক হুই তিন—

মাঃ ঠিকই আছে। বিখ্যা লেছে।

নিবাক্রণ অবলাবে বাতীর উপর বসে পড়ে অবিমান হাঁপাতে লাগল।

বিকেল থেকে করবার মাহেন এসে অবিমানের বাতীতে কড়া মেতে কীরে গেছে। রাতে পথে দেখা।

রাতেই টাকা চার। একটা নয় দুটো নয়, এক হাজার। আগিলের বাইনে থেকে মাসে মাসে শোব করবে। টাকা-গুলো মেয়ে ধোঁয় কনি মন করে মি। ঐ ত চেহারা, ধোর না হয় বছরখানেক, কি দু’বছর, তার পর ত চকু উপায়ে,

টাকা শোধ করবে কে? হেলেবেলার বন্ধুদের দাবিতে অবিমানকে কতর করতে চায়।

হ্যাঁ, মাহুব বটে নিশাপতি। বলে, ‘আপনার কাছে আসি, হ’লও বলি, তা বলে মনে করবেন না যে কোন্ দিন বুঝি বশটী টাকা বার তেরে বসব। কখনও নয়—হামঃ! আর আমারও ত এল বলে। কে জানে আজ রাতে টেলিগ্রাম হতে পিরন-মহাশয় উদর হয় নাকি। এই বেধুন না—

জিগুরা লটারির টিকিট।—সুত মনিব্যাগটার মধ্যে নিশাপতি সেটাকে লক টাকার সরকারী কাগজের মত সবচেয়ে ঘেঁষে দিয়েছে। কে জানে, কোন্ হুহুর্ভে টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত হয়।

হ্যাঁ, এমন বন্ধু পাওয়াই ত সুখ, এতটুকু নীচতা নেই। সেও ত অবিমানের সঙ্গে এক কলকে পড়েছে, বড় হয়ে একসঙ্গে লটারির টিকিট কিনেছে, হেঁচা কাপড়ে ছিঁচ কাঁচা পায়ে রাতার রাতার ঘুরেছে, ভাঙা কাপে চা খেয়েছে। সুখহুঃখের বন্ধু নিশাপতি। কিন্তু কি উদার। সুখ হুটে কখনও হুঃখের কথা বলে নি, কখনও অবিমানের কাছে একটা টাকা বার চায় নি। অচল, অটল ভাবে খালি টেলিগ্রামের প্রতীক। করছে—ভারও একদিন আসবে।

অপেক্ষা করার সময় ছিল না নিশাপতির—কোণাকার এক লটারির কল নাকি বেরিয়েছে, বাট হাজার টাকা কাঠ-প্রাইজ, কে জানে, বেরি হলে হরত আর টিকিট পাওয়া বাবে না। ছুটল নিশাপতি। সময় পেলে রাতে দেখা করবে।

রাতে নিশাপতি আসে নি, এগেহে আবার রাজেন করাল। মীর অহুধ, মরমর—ভাকার আমে এমন পরস। ঘরে নেই। হেলেবেলার বন্ধু রাজেন করাল, আজ অবিমান না দেখলে কে তাকে দেখবে? যদি সে বেঁচে থাকে, আর কোম রকমে যদি চাকরিটা বজার থাকে, তা হলে বে-করেই হোক সে তার দেখা শোধ করবে। বন্ধুদের অপমান সে কীবন থাকতে করতে পারবে না।

হঠাৎ অবিমানের মাথার বুদ্ধি খেলে যায়। জিব কেটে বলে, সব টাকা ত তাই ব্যাংকে কিন্ত ডিপোজিটে রেখে দিচ্ছি, কি করব বল, পাঁচ বছর না হলে ত—

‘কিন্ত ডিপোজিট।’ রাজেনের কর্তব্যর যেন আর্ড চীংকারের মত শোনা, বুঝি তার চোখের সামনে সমস্ত হুসিরা অন্ধকার হয়ে পেল।

হুসিরা অন্ধকারই বটে। বিছামার তরে তরে অবিমান এই কথাই ভাবে। মাহুদের জীবন। বুঝি এ অন্ধকার রাত্রির বরষা তধু। কোণাও মিল নেই, মল নেই, সাহস্রত নেই। তধু কতকগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বটবার আবর্জনা মাল।

বরের মধ্যে বুটবুট শব্দ হচ্ছে। হুঁহু হলেও হতে পারত—কিন্তু হুঁহু নয়, অবিমান বিবিসি করে বলতে পারে।

মিঃশখে বাসিন্দার তলা থেকে উঠে। বের করে অবিমান খালার, বরের বেঞ্চের, কোণে, ঘরকা ও লিন্ডকটার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো কেল। একটা বেড়াল কানাকান বিকে হুটে গেল।

তোর থেকেই দরকার ভাকাতাকি—চারের কাপটাও শেষ করতে পারে নি।

‘আপনি ত এখন অত্যন্ত ব্যত মাহুব, পাছে ঘেরিয়ে যান তাই তোর হতে না হতেই এলে পড়েছি। এই বেধুন আমাদের এস্পেটাস, মতুন হলে কি হয়, পুরোনোর বাবা। তধু হুজুরিমল ঝাঁকারিয়ারই রয়েছে হু’ লাখ টাকা কিন্ত ডিপোজিট। তবনেন ত এম. বি. তোনের নাম? মত বতলোক—লাখ লাখ টাকার মালিক—হুঃখের বাবারের টাকা ত। ব্যাক খোলার দিন ঘরকা খোলার তর লর না, ঝাঁকারিয়ার রোলন, আর তোস সাহেবের ক্যাভিলাক এলে হাকির, তার টাকা আপে কমা হবে। বধুন ত মশাই, যদি আর লক্ষী কাকে রেখে কাকে চটাই, মতুন ব্যাক আমাদের।’

অবিমান মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, ‘তাই ত।

লোকটার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, বললে, ‘কিন্তু তা বললে ত হবে না, লটল সমতা মশার, কিন্ত হয়ে গেল এক মিনিটে মীমাংসা। একেই বলে ব্যাক-ম্যাসেজারের মাথা। ঠিক হ’ল ঝাঁকারিয়া আর তোস সাহেব, হু’লনেরই নাম এখন ডিপোজিটর হিসেবে ব্রাকেটে থাকবে—হু’লাখ হু’লাখ চায় লাখ।’

অবিমান অসহিষ্ণু হয়ে বললে, ‘কিন্তু আমার টাকা—’

হুঃখের কথা লুকে নিরে লোকটা বললে, ‘আর কোণার রাখবেন বধুন? হুহুভি মেশতাল ব্যাকের মত এত ‘মেক্’ অবত ‘এমন হাই ইন্টারেস্ট’ আর কোণার পাওয়া বাবে?’

লোকটাকে বিচার না করলেই নয়। অবিমান চেয়ার থেকে উঠে ঝাঁকিয়ে বললে, আচ্ছা ‘আপনার এস্পেটাসমালা রেখে যান, সময়মত পড়ে দেখব।’

‘মিন্তাই,’ বলে লোকটা এস্পেটাস সবচেয়ে দ্বিধাবানকৈ কাগজপত্র অবিমানের বিকে এগিয়ে দিলে। ‘বেধবেন পড়ে সময়মত। পড়লেই বুঝবেন যে, পড়েরের সিন্দুক, আর ব্যবসারে লরী—হুটে। বল এক সঙ্গে পেতে হলে হুহুভি মেশতাল ব্যাক এক এবং অবিভীর। আচ্ছা, মনে রাখবেন।’

মরকার করে লোকটা বিদায় নিলে।

তধু সন্ধ্যা যায় না। মনে হয়, এক দিন লটারির টিকিট ফেরার পর যে রাত্রি এগেছিল, তা আর এতাত হয় নি।

হঃধরের শেখ আছে, সুধঃধরের শেখ নেই। কত বিচিত্র অহুতির মধ্য দিয়ে এই মহারাজ্যের বগ্নভদ্র কবে হবে কে জানে ?

নিশাপতি আপিসে বাবার পথে বরকার তাক দিয়ে জানিয়ে বার যে, টেলিগ্রাম এখনও আসে নি। বলে, ‘কালরাত্রে বগ্ন বেৎলায়, টাকারটা পেয়ে গেছি, সাথে বিরাজিণি ছাওয়ার। ছায়, ছায়, সুধের বগ্ন কি চট করেই না তেড়ে যায়।’

অবিমানের বেলারই কি শুধু ব্যতিক্রম।

তবু, এ কি এক অব্যক্তিকর অবস্থা। বগ্ন বেৎলায় বাস্তবের সঙ্গে একাকার হয়ে নিশেছে, অথবা বাস্তবকে যখন বগ্ন থেকে পৃথক করে চেনবার উপায় নেই, সেই অব্যক্তিকর অবস্থায় মনোমাহু কত দিন বাঁচতে পারে ? হারিজোর মধ্যে আশৈশব জালিত অবিমান জীবনের কলে আসা দিনগুলো ছিল বগ্নহীন, চলার পথ ছিল ক্লক, অস্বপ্ন, বাস্তবের ধূলি-ধুলিরিত। আক লটারির টিকিটে টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ কোন্ হেৎলায় বগ্ন এসে তার চোখে আর মনে বাসা বাঁধল। না, বগ্নই সত্য, সৌভাগ্য মিথ্যা; বগ্নভদ্রে আবার যে অবিমান, সেই অবিমান।

রাজেন করালের সঙ্গে তোরবেলার চারের দোকানে বেৎ। হেৎলাই রাজেন গোড়ারই বললে, ‘কিছু মনে করিস নি তাই অবিমান, সেদিন মনের হুঁসল সুহুঁসে টাকা চেয়ে কলে-ছিলাম। তার পর তেবে বেৎলায়, তুই-ই বা দিবি কোথেকে, দিবিই বা কেন ? তুইও শু আকীবন হঃধের সঙ্গে লড়াই করে ভগ্নবানের ইচ্ছের লত সুধের সুধ বেৎলায়। না, টাকা তোর কাছে সত্যিই বার চাই না।’

অবিমান বাক্শজিহীন বিবৃতির মত চারের কাপটা হাৎকেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে আর এক কাপ চা চেয়ে নিলে।

রাজেন চারে হুঁক দিয়ে বললে, ‘সেদিন তোর কাছে টাকা চাওয়ার পর নিজের মনেই অত্যন্ত লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে চেয়েছি তা না বেৎলে তোরও বিবাল হবে না।’ তার পর অবিমানের কানের কাছে সুধ এগিয়ে গলা নামিয়ে বলে, ‘বউয়ের টি-বি। পাঁচটি ছেলেরে তাই, সবগুলোই বলতে গেলে ছবের শিশু। বেৎলাতনো করার একমাত্র লোক হচ্ছে আমার বিববা বোন্—কিন্তু তার বা চেৎরা, বেৎলে মাহু বল কিছতেই মনে হবে না। কি বলব তাই তোকে, সমস্ত দিনটা বেৎ বগ্নের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে,—বোর হঃধগ্ন।’ তার পর চারের কাপটা টেবিলের উপরে সপথে নামিয়ে রেখে বলে, ‘ওঃ। ভগ্নবান বহি তাই।’

রাজেন বিদায় নেয়।

‘অবিমান আবার পথ চলে। তজ্জাহ্ প্রত্যাহ। আকাশ হেরে কি ছুঁয়াগা বেৎবেছে।’...

শহরের দুধ ভগ্নমত ভাল করে তাকে নি। হাতীবাগানের বাজারের পাশ দিয়ে বাবার লম্বা মধ্যরে পড়ে লারি লারি দুমত মাহুয়ের হল, কঠোর প্রবের পর তাঁবের সুখে কি গভীর প্রশান্তি। কাহেই ট্রাবের মজুর, লম্বা রাত বেৎ লাইন বোরমত করেছে।

অবিমান হঠাৎ বগ্নকে দাঁতাল। এক জন দুধের মনো ভান হাৎবালা মাকছে, সুধের উপর একটা স্মিৎ হাসি কুটে উঠেছে। বোৎ হয় সে কোন্ মজুর বগ্ন বেৎবে, বাস্তবের সঙ্গে বার সম্পর্ক নেই। অবিমানও হুঁসত ওরই মত দুধিয়ে দুধিয়ে বগ্ন বেৎবে—যে বগ্নের শেখ নেই।

রাত্রে দুধ নেই, অবিমান অতকারে বারান্দার দুধে বেৎার। কখনও হাৎ, আবার কিয়ে আসে বারান্দার, বয়ে। মাকে মাকে এসে বিছানার শোর, সিগারেট বরাবার অহিলার বেশলাই আলিয়ে মালতীকে বেৎবে নেয়। আঃ কি অনারাল নিজ। মনে পড়ে বার, অবিমানও এক দিন এমনি তাৎবে দুমাত্তে পারত—গভীর শান্তিহারিনী নিজ। সমস্ত দিন হারিজোর সঙ্গে লড়াই, টাকার চিন্তা, আপিসের হাৎতাৎ বাইনি, সত্যার বাতী কিয়ে তাক বেৎলেই চোৎ তেৎ দুধ আসত। হুঁসে হুঁসে অতি কটে বেৎের পড়া বলে দিত, দুধের দৌকে অনেক দিন ভুলও বলে দিয়েছে। তার পর কোন্ রকমেবিছানার গা ঢালতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে দুধে বেৎশ হয়ে পড়ত।

মনে পড়ে, এক দিন ছায় দিয়ে চোর এসেছিল, মালতী সেদিন অনেক ঠেলাঠেলি করেও অবিমানের দুধ ভাৎতে পারে নি। দুধ যখন ভাৎল তখন চোর নিজের বরজা খুলে পালিয়ে গেছে। সেদিন নিজের হেৎ ছিল না, বগ্ন ছিল না, জীবনের ক্লম পথে সন্মহের কোন্ অবকাশ ছিল না। মনে পড়ে, একদিন সে একখানা লটারির টিকিটও কিনেছিল। মনে আছে, সেই টিকিট দিয়ে মালতীর সঙ্গে সেদিন রাজে তার যে ভুঁল বগ্নতা হয়েছিল, তার পরিণতিতে মালতী রাজে তাক বার নি। সে কাহিনী বেৎবার নিজ বাস্তব। কিন্তু তার পরই এল এমন এক দিন, মাকে সে দুধিন না দুধিন বলবে তেবে টিক করতে পারে না। হুঁসে, ‘অবিমানচজ চক্রবর্তী’ এই নামে একখানা টেলিগ্রাম এল। মালতী টেলিগ্রাম খোলে নি, সমস্ত দিন এক অমির্ষিৎ আশকার কেঁপেছিল শুধু। রাজে অবিমান বাতী কিয়ে টেলিগ্রাম খুলল। তার টিকিটের মধ্য উঠেছে। সত্যি, না বগ্ন। কে জানে সেদিন থেকেই বগ্নের হুৎনা হয়েছিল মাকি। তার পর আর এক দিন বগ্ন এল তার বোড়া কাঠ হয়েছে। তেৎ এল পকাশ হাৎবার টাকা। তবু আবহা একটা স্মৃতির মত মনে পড়ে।

ঘেসেঘেসার রিপ্‌ড্যান উকলের গর পড়েছিল অবিদ্যাপন—
লোকটা এক ঘুমে নাকি হুঁত বহর কাটিয়েছিল। কে জানে,
সে নিজেও সেই রকম ঘুমেই কাটাচ্ছে নাকি।

বিদ্যাপন থেকে উঠল অবিদ্যাপন, বারান্দার এসে দাঁড়াল।
আকাশে কালো মেঘ এসে সমস্ত তারা ঘেঁরে কেলোছে।
বাড়ীটার অন্ধকার ঘনঘন করছে। এই অন্ধকারে হাঁড়িরে
অবিদ্যাপনের একটা কথা মনে এল। আজ সকালেই রাজেন
তাকে বলছিল, সমস্ত দিনটা বেন একটা হুঃবগের মধ্য দিয়ে
কেটে যায়। কে জানে, যে টাকা আজ তাকে বগচরী
করেছে, সেই টাকা হয়ত রাজেনের হুঃবগের ঘোর কাটিয়ে
দিতে পারে।

বীরে বীরে ঘরের মধ্যে এল অবিদ্যাপন, পা টিপে টিপে এসে
সিন্দুকের সামনে দাঁড়াল। তার পর কোমর থেকে চাবিটা
বের করে সিন্দুক খুলে ফেলল। চাবি ঘোরানোর শব্দে
মালতীর ঘুম একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ‘হাঃ হাঃ’ শব্দ
করে কল্লিত হাঁহর ভাঙিরে সে আবার পাশ কিয়ে গেল।

মোটগুলো ভেদনি সাঝানো আছে, ধরে ধরে। অবিদ্যাপন
সেগুলো হুঁহাতে খুলে নিয়ে পকেটে পুতে লাগল। তার
পর সে ঘর থেকে বারান্দার এল, বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে
নীচে নামল, দরজা খুলে রাস্তার বেরিয়ে পড়ল। গলির অন্ধ
প্রান্তে রাজেন করালেন বাড়ি।

মাধার বাতাস দিয়ে গ্রীকে একটু ঘুম পাড়িরে রাজেন রাত
আন্দাজ একটার সময়ে শুয়েছিল, কোর বোম হর এক বটা
ঘুমিয়েছে। এত রাতে কে তাকে? জড় পদে এসে দরজা

খুলে বললে, ‘কে অবিদ্যাপন, এত রাতে তাই! কোম বিপদ-
উপদ হয় নি তো?’

অবিদ্যাপনের কণ্ঠস্বর শান্ত। বললে, ‘বিপদ কাটাতেই
এসেছি আমি। এই টাকাগুলো দুই-ই যে রাজেন, যাকে
আমি বগ্ন মনে করেছি, তোর কাছেই তার সত্যের বাতাই
হোক।’

‘টাকা!’ রাজেন করাল ভণ্ডিত হয়ে বললে, ‘টাকা
কিসের!’ গরীব বন্ধুর লগে অবিদ্যাপন হুগুরমায়ে তামাশা
করতে এসেছে নাকি।

কিন্তু তামাশা নয়, অবিদ্যাপনের গলায় বয়ে ‘তামাশায়
বাপ্তও দেই। হির কণ্ঠে সে বললে, ‘আমার লটারির টাকা।
যে তাই, তাড়াতাড়ি বর,’ বলে সে ভণ্ডিত রাজেনের হুঁহাতের
মধ্যে মোটের তাকগুলো গুঁজে দিতে লাগল।

অবিদ্যাপনের হুঃ দিয়ে অনেক কণ্ঠে কথা বেরুল। অকুট
বয়ে সে বলল, ‘এর মানে কি অবিদ্যাপন?’

অবিদ্যাপন অবিচলিত বয়ে বলল, ‘বললুম যে, এর মানে
যাচাই করার তার এখন তোর উপর দিয়ে আমি এই অমণের
বোকা থেকে খালাস হলুম। এত দিন এই চার পাশের
হুমিয়ার সঙ্গে আমার কোন স্পর্ক ছিল না তাই, যেম ঘুমে
মধ্যে হাতকে বেঁকাছিলুম। কাল থেকে আমি আমার
মাহুয়ের মত চলে কিয়ে বেঁকাতে পারব। এই আমার পরম
লাভ। আচ্ছা তাই, আর রাত জাগিস নি, তাড়াতাড়ি শুয়ে
পড় গিরে, আমিও বাড়ী গিরে একটু বতিতে বিদ্যাপন পা
এলিরে দিই।’

বলে অবিদ্যাপন আবার নিজের মনেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

এতটুকু

জীসাবিজী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমি চেয়েছি এতটুকু ঠাই তোমার নিরালা বয়ে,
কেহ থাকিবে না, কেহ শুনিবে না আমার আলাপন,
মিনিটে মিনিটে চলে যে সময় হেলার আলস ত’রে
তাই থেকে কিছু দাও দাও ব’লে করিরাহি আলাতন।

যেদী কিছু নয় এক দুর্ভাগ্য, অথও অবসর
তোমার জীবনে যেবে বিচ্ছেদে আমিও কি ধরনা?
এতটুকু মিলে তাড়াত্রে ভব হ’ত কি আভাস
কর ও কভির অক কবিতা কেবা দিত গল্পনা?

আমি বেধেছি তুমি তোমার মরমে আমার প্রাণীপ অলে,
আমার মরমে বিশ্বভূবন আলো করা ওই রূপ,
বেধি একাকিনী বৈরাগীরে আমার অধর-তলে,
আমার পক ইন্ডিরে মহে কামনা-গর হুণ।

তারি মাঝে আমি চেয়েছি তোমারে কণ অবসর মাঝে
সংসার হ’তে নিজেদের সরায় নির্জনে নিরালার,
সেই দুর্ভাগ্য জীবনে আমার কোট হুণ হয়ে রাজে
এতটুকু পাওরা তারই হোঁরা লাগি’ আহি যে প্রাণীকার।

আমার জীবনে সেই দুর্ভাগ্য দাও দাও প্রিয়তমে
মদী-ভরদ বারেক আহুক লুহু-সদমে।

সাহিত্য ও সমাজ

ডক্টর জিন্না চৌধুরী

সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধের প্রশ্ন স্বতঃই উদ্ভূত হয়। সৈদিক থেকে দুটি চরমপন্থী, বিপরীত মতবাদ সম্ভবপর। প্রথম মতানুসারে, সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে কার্য-কারণ বা অলাভী সম্বন্ধ নেই। সমাজের পরিধি বাস্তব জীবনের স্থূল পরিবেষ্টন। সাধারণ জীবনের কার্যকলাপ, চিন্তাপ্রবাহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সমাজের কার্যবার। ব্যক্তিমণ্ডলী নিয়েই পরিবার, পরিবার-গোষ্ঠী নিয়েই সমাজ। সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, অতি স্থূল স্থূল বিষয় নিয়েই সমাজকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকতে হয়। এ অবস্থায় সত্য যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবৃন্দকে নিয়ে যখন এক একটি পরিবার গড়ে উঠে, তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটি ব্যক্তির অতি সঙ্গীর্ণ গতি বহুল পরিমাণে বিস্তৃততর, ব্যাপকতর হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ কিছু পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিলে পরিবারের গঠন সম্ভব নয়।

একটি পরিবারে সর্ব-সাধারণ-স্তরের জন্ম অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনেক পরিমাণেই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থত্যাগ ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক সংস্থাপিত করতে হয়। এই ভাবে পরিবারে কেবলমাত্র শুদ্ধ ব্যক্তিস্বার্থের স্থানে বৌধ-স্বার্থই হয়ে দাঁড়ায় প্রধানতর। একই ভাবে বিভিন্ন পরিবার-মণ্ডলী নিয়ে যখন হয় সমাজের ভিত্তি সংস্থাপন, তখন পরিবারের অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণ গতিও হয়ে যায় পুনরায় বিস্তৃততর এবং সর্বজনীন-স্তরের নিকট ব্যক্তি ও পরিবারের নিজস্ব স্বার্থ হয়ে যায় অপেক্ষাকৃত অর্থহীন। এক্ষেপে সমাজে ব্যক্তির অপেক্ষা জাতি, স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা সমবায়, একের অপেক্ষা বহুর দাবিই হয়ত মূখ্যতর। তা সত্ত্বেও যে কোন স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমাজেই পরিবারের, তথা ব্যক্তির দাবি উপেক্ষিত হবার নয়—কারণ পরিবার ও ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাদের বাদ দিয়ে নয়। সেজন্য পরিশেষে সামাজিক সমস্যা পারিবারিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ব্যক্তিগত সমস্যা। সমাজের বিধিনিষেধ এক্ষণ হওয়া প্রয়োজন যাতে তা পরিবারের সুখ-সমুন্নতির সাক্ষাৎ কারণ হতে পারে, এবং পরিবারের অলিখিত আইন-কানুনগুলিও সর্বদাই এক্ষণ হওয়া আবশ্যিক, যাতে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তিগত সমস্যার হুঁতু সমাধান এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। এক্ষেপে বৃহত্তর পরিবারের

এবং বৃহত্তর সমাজের ব্যক্তিকে মূলকেন্দ্র—ব্যক্তিগত তথা-কথিত ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলিই সমাজের নিজস্ব সমস্যা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই সমাজের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ও সমুন্নতিই সমাজের সমৃদ্ধি ও সমুন্নতি। সেজন্য পূর্বেই বা বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত দৈনন্দিন আচরণ-ব্যবহার, ভাব-ভাবনা, আদান-প্রদানই সমাজের উপজীব্য বিষয়।

কিন্তু এই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের—কাব্য, নর্নন, ধর্মের—সম্বন্ধ থাকতে পারে কি করে? সমাজ জড় পৃথিবীতেই চিরকাল প্রোথিত—প্রাত্যহিক জীবনের অল্প-বস্ত্র-আশ্রয়, জন্ম মৃত্যু-বিবাহ, দাবি অধিকার-আইন প্রভৃতির বিচার ও সিদ্ধান্তেই সে নিরন্তর ব্যাপ্ত। এই জগতের উল্ললোকে, অপাথিব মানসলোকে, আনন্দময় অমৃতলোকে দৃষ্টিপাত করবার তার অবসর বা সামর্থ্য কোথায়? কিন্তু সাহিত্যের চির-অগ্নান শতদল প্রস্ফুটিত হয় সেই অপাথিব মানসলোকেই চিরশোভন মানসসর্বোবরে। নিদাঘদাহে যেমন শতদলের শত দলই শুক হয়ে ঝরে পড়ে, বাস্তবতার প্রথর তাপে ডেমন সাহিত্যের প্রাণবন্তও হয়ে যায় বিনষ্ট। সেজন্য সাহিত্যের কমলাসন থাকবে পাতা সেই অবাস্তব সৌন্দর্যলোকেই মাত্র যেখানে পৌছাতেই পারে না কোন পাথিব শোকতাপের দীর্ঘশ্বাস, যেখানে পড়তেই পারে না ধরণীর ধুলার মলিন ছায়া, যেখানে শুদ্ধ হয়ে যায় জাগতিক বিবাদ-বিসম্বাদের কর্কশ কোলাহল। সেই দিক থেকে সাহিত্য এক অপাথিব, অচূর্ণম সৌন্দর্য, মাদুর ও আনন্দের পূর্ণ ভোক্তক বার কণামাত্র এই অচূর্ণ জগতে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য স্বভাবতঃই সাহিত্য ইহ-জগতের, এই মর পাথিব জগতের প্রতিচ্ছবি নয়, প্রতিচ্ছবি সে এক অপাথিব মানসজগতের, এক অবাস্তব কল্পনা-রাজ্যেরই মাত্র।

বাস্তবজগতের অনিবার্য কঠোর স্বাভ-প্রতিঘাতে উদ্বাস্ত মানব সাময়িক শান্তি সন্ধান করে মনঃকল্পিত এক স্ব-উচ্চ জগতে—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। রক্তমাংস-গঠিত, জড়মেহেজ্জিয়বান, এবং সৈদিক থেকে পত্তভূলা, মানবের জীবনের অপর একটি দিকও আছে—আত্মার দিক, বিচার-বুদ্ধির দিক, নীতি-বিবেকের দিক—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। বাস্তব জগতের সঙ্গে নাড়ীর টানে আবদ্ধ থাকলেও মানব আদর্শবাদী, সত্য-সন্ধানী, পূর্ণতা-পিরাসী—এর থেকেই হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টি। এক্ষেপে

আদর্শ ও আনন্দ—যে আদর্শ বাস্তব জগতে চির-অপূর্ণ এবং যে আনন্দ “সর্বং দুঃখং দুঃখম্” সংসারে চির অপ্রাপ্য—সাহিত্য-সৌধের মূল স্তম্ভরূপ। কিন্তু সমাজের স্তম্ভ সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেপে সমাজ ও সাহিত্যের মূলভিত্তি-গতই বিরোধ। সেজন্য সমাজের সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে আইন-কানূনের পুস্তক, বিধি-বিধানের ধারা; জাতি সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব; দেশ সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করতে হবে ভূগোল, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

কিন্তু এই সব হচ্ছে “বিবরণী” বা “কাহিনী”ই মাত্র, “সাহিত্য” নয়। সাহিত্য হচ্ছে লঘু দিক থেকে কাব্য প্রভৃতি, গুরু দিক থেকে দর্শন, ধর্ম আলোচনা প্রভৃতি। কাব্যের মাধ্যমে আমরা আশ্বাস পাই এক অনন্ত সৌন্দর্যলোকের এক অনাবিল আনন্দের পীযুষধারা; দর্শনের মাধ্যমে আমরা লাভ করি এক পরিপূর্ণ আদর্শলোকের শাশ্বত শাস্তির অমূল্য ঐশ্বর্যভাণ্ডার। এক্ষেপে আনন্দ ও শাস্তিপ্রদায়ক সাহিত্য নিরানন্দ, অশাস্তিসঙ্কুল জীবন, সমাজ ও জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। এই হ’ল সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে এক চরম মতবাদ।

দ্বিতীয় চরম মতবাদ হ’ল এই যে, সাহিত্য ও সমাজ কাব্য-কারণরূপে অঙ্গাঙ্গী ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সমাজের প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ সবই বাস্তব, নগ্ন ও সাক্ষাৎ ভাবে অঙ্কিত হয় সাহিত্যেরই ছায়ে ছায়ে। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, রক্ত মাংসে গঠিত মানুষেরই সৃষ্টি, দেবতার নয়। মানুষের জীবনে অবশ্য দুটি দিক আছে সন্দেহ নেই—দৈহিক দিক, পার্থিব দিক, এবং আত্মিক দিক ও অপার্থিব দিক। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের দৈহিক, পার্থিব দিকটাই প্রধানতর ও ব্যাপকতর—তাকে পরিবর্তন বা অস্বীকার করে মানুষের মনস্তত্ত্ব হয়ে পড়ে অর্থহীন। সেজন্য যে সাহিত্য মানুষের প্রাণের কথার বাহ্যিক অভিব্যক্তিই মাত্র, যে সাহিত্য মানুষের জীবনের মূলমন্ত্র লিখনাত্মক রূপই মাত্র, সে সাহিত্য যে তার নিত্যনৈমিত্তিক ভাব-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিবেশ-আবেষ্টন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব হয়েই থাকবে, তাই বা কি করে সম্ভবপর হয়? যে কল্পলোকের নিরন্তর আনন্দ-নির্ব্বাণ-ধাতব্য মানুষের কল্পনাবিলাসী, আকাশবিহারী মন বিলাস ও বিহার করতে উদ্গীর, তা বড়ই সাময়িকভাবে ক্ষমধুর হউক না কেন, পরিশেষে কেবলমাত্র “অপ্রোচু, মারা ছু, মতিভ্রমো ছু।” সেজন্য অবাস্তব, স্বপ্নবিলাসী, আকাশবিহারী সাহিত্যও হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ অবাস্তব—শূন্য-

গর্ত বৃক্ষেরই মত তার কপনহারা অবাস্তব জীবন, মূল্যহীন অবস্থিতি। অতএব সাহিত্য আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতিকে উৎপেক্ষা করতে পারে না, বরং এই সর্বের জলন্ত, বাস্তব চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যের ধর্ম।

এক্ষেপে দুটি চরম মতবাদ এক্ষেত্রে পাওয়া যায়—আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ, কল্পনাবাদ ও কঠোর সত্যবাদ। প্রথমটিকে বলা চলে Idealism, দ্বিতীয়টিকে বলা চলে Realism। দর্শনে যেমন সাহিত্যেও ঠিক তেমনি এই দুটি বিপরীতধর্মী স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত দেখা যায়। মানুষের স্বীয় প্রকৃতিতেই যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি নিহিত আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে যুগে যুগে মানুষেরই হৃদয়োথ সৃষ্টি—দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড। অসংখ্য ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী, ন্নাশু, রক্তকণা সম্বলিত মনস্তত্ত্ব-দেহ বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অংশের সমাবেশ হলেও, কি এক অপূর্ব জৈবিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন, সমগ্র বস্তু। অগ্রগণ্য, জীবনধাদপই হয়ে ওঠে অসম্ভব। ঠিক একই ভাবে, অসংখ্য চিন্তা, অহুত্ব, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বহু বিভিন্ন, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, মানসিক ভাব সম্বলিত মানবমনও কি এক আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে এক অভিন্ন, সমগ্র বস্তু। নতুবা, ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ, সমগ্র ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ে কথার কথা।

এক্ষেপে শুধু মানবের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাস কিঞ্চিৎখান আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুর মধ্যেও একের, বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্যের, বিচ্ছিন্নের মধ্যেও সমগ্রের আবিষ্কার ও প্রকাশই জীবন, স্থিতি ও সমুন্নতির কারণ। এই সর্বজনীন, মঙ্গলজনক নিয়মের বশবর্তী মানব-মনও বিপরীতধর্মী ভাব-ভাবনার বিপরীতমুখী আকর্ষণে বিপরীত দিকে চালিত হয়ে উদ্যান্ত হয়ে উঠলেও, পুনরায় তাদের মধ্যেই এক অপূর্ব সমতা, স্থিতি ও স্থিতি লাভ করে। সেজন্য সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি মিলনগ্রহি অহুসন্ধান ও আবিষ্কার করা মানুষের প্রকৃতিগত, স্বভাবজ। এক্ষেপে সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি মিলনের মতের অহুসন্ধান করাও মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম।

বাস্তব জগতেও দৃষ্ট হয় যে, চরম আদর্শবাদী ঋষি এবং চরম বাস্তববাদী ভোগীর সংখ্যা অপেক্ষা মধ্যপন্থিগণের সংখ্যা অধিক। মনুষ্যজীবনের এই সময়ের চিত্র মনুষ্যসৃষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়েও সমভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

তারই ফলে, উপরি-উক্ত দুই চরম মতবাদের মধ্যেও

আমরা পেয়েছি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আর একটি তৃতীয় সমন্বয়বাদ—যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতা, আকাশ ও পৃথিবী, আত্মা ও দেহমনের ঘটেছে এক অল্পমম সংযোগ। এই ঐক্য মতামতসারে, পৃথিবীর মানুষ আমরা, দেহমনোবান্ জীব আমরা—এই মাটির পৃথিবীর বুকেই, এই ধরণীয় ধূলিতলেই আমাদের সৃষ্টি ও স্থিতি। সেজন্য এই মর জগৎকে, এই জড়দেহমনকে আমরা যে শুধু নিঃশব্দ অবজাই করতে পারি না, তা নয়; উপরন্তু, এদের আমরা ভালও বাসি, এদের সঙ্গে আমাদের সম্ভার বোঁগ শাশ্বত ও অচ্ছেদ্য। সেজন্য আমাদেরই প্রাণের জিনিষ সাহিত্যে আমরা প্রকাশ করি, আমরা প্রতীক্ষা করি, এই জড়-জগতেরই সত্য, বাস্তব, জীবন্ত, জাগ্রত রূপটির, এই মর দেহমনেরই স্বপ্নদুঃখ, আশা-আশঙ্কা, আলোড়ন-বিলোড়নের মূর্ত, পূর্ণ, বথার্থ, অকৃত্রিম অভিব্যক্তির।

প্রথম চরম মতামতসারে দর্শন, ধর্ম, কাব্য প্রভৃতি স্বল্প-সংখ্যক তীক্ষ্ণদী দার্শনিকের এবং উদগ্র কল্পনাবিলাসী রসিকজনের আদরের বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে “সাহিত্য”-পদবাচ্য নয়। যে লেখন সম্পূর্ণই অবাস্তব, যার সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পূর্ণই শূন্য নভস্তলে, তা সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেও কত কাল, কত পরিমাণে প্রকৃত তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হয়, সেইটাই চিন্তনীয়। সন্দেহ নেই যে, কেবল মনেরই সঙ্গে এই একাকী, উদগ্র খেলায় স্বয়ং মনই অচিরে প্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই অবসাদ থেকেই সৃষ্টি হয় misanthrope বা মানববিদ্বেষী দার্শনিকপ্রবরের, ও lotus-eater বা দিব্যাবপ্লবিলাসী অলস, অকর্মণ্য জড়মামুষের। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এরূপ অবাস্তব সাহিত্য “সাহিত্য” নামধারী হলেও সাহিত্য নয়। এরূপে একটি গণিতের জটিল তথ্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক অথবা একটি জায়দর্শনের পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষবহল প্রামাণ্য গ্রন্থ অন্যান্য দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান হলেও “সাহিত্য” সংজ্ঞালাভের উপযুক্ত নয় নিশ্চয়ই।

অপরপক্ষে সেই ভাবেই কেবলমাত্র অতি-বাস্তব রচনাও “সাহিত্য”-পদবাচ্য হতে পারে না। কেবল পার্শ্ববিক্ষেপ, কেবল বস্তুক্ষেপ, কেবল জৈবভাবের অপরিসর গণ্ডিতেই কেবল যে মন বিচরণ করে ও আবদ্ধ হয়ে থাকে, সে মন ত জড়োই তুল্য, সৃজনী শক্তি তার কই? সে মন কেবল লেখক, লিপিকর বা গ্রন্থকারই মাত্র—রচয়িতা, স্রষ্টা বা স্রষ্টা নয়। কেবলই বাস্তব জিনিষের বথার্থ বিবরণ, কেবলই কৃত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা, কেবলই সংসারের ক্লেশ-ক্লেশ-মলিনতার বীভৎস, নগ্ন চিত্রণ, কেবলই মামুষের জৈবিক বাসনা-কামনার নগ্ন প্রকটন—

আর বাই হোক, “সাহিত্য” নয়। সেজন্য সাধারণ পাঠ্য পুস্তক, ভূগোল, ইতিহাস, রোগমৃত্যু বিবরণী সম্বলিত চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম প্রভৃতির বাৎসরিক অধিবেশন গ্রন্থ, কামবিজ্ঞান বা ‘বটতলার’ উপন্যাসাদি কখনই “সাহিত্য” বর্ধাঙ্গসম্পন্ন হতে পারে না। তথাকথিত “প্রগতিশীল”, অত্যাধুনিক, “বাস্তববাদী” কবিদের রচনাও সাহিত্যের ভয়াবহ প্রোতাত্মাই মাত্র, “সাহিত্য” নয়। বথা, “ডাউ-বিনে”র উদগ্র গন্ধে আকৃষ্ট, গলিত স্ফোটকাকীর্ণ, শীর্ণ পথের কুকুরের দুর্গন্ধময় মূষিক ভক্ষণ বা প্রায়নয়, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা ভিখারিণীজ্বরের উৎকুন ধ্বংসের বা গাজকণ্ডুয়নের বীভৎস চিত্র—আজ সাহিত্যের নামে সরস্বতীর পুত মন্দির-অলিন্দে প্রবেশের অল্পমতিলাভ করেছে—সেটাই বিশ্বয় ও দুঃখের কাংগ। সাহিত্যে ‘বীভৎস’ ও ‘ভয়ানক’ রসের স্থান আছে, নিশ্চয়ই। কিন্তু তা “রসে” উন্নীত হয় তখনই যখন কেবল অবিমিষ্ট, অত্যাগ্র বাস্তবতার শুক, কঠিন কঙ্করময় ধূলিকণায় লাগে কবিচিত্তের শীতল সঞ্জীবক বারি-ধারার অমৃতময় প্রলেপ। ধরণীয় ধূলিগুঞ্জ আকাশের আশী-ধারায় স্নাত হয়ে সরস হলে তবেই হতে পারে কঠিন কুমণ্ডলের বুক চিরে নবাকুরের শুভ বিকাশ। একই ভাবে এই মাটির পৃথিবীর ক্লেশ-কাঠিন্যের উপর কবি-মানসের সেই অলৌকিক নিরুপধারা-সম্পাতেই জাগ্রত হয়ে ওঠে সাহিত্য-কিশলয়ের প্রথম প্রাণের স্পন্দন।

সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র প্রাক্রিয়া হ’ল এই—বাস্তব ও কল্পনার, বর্তমান ও আদর্শের, ভীষণ ও মৃদুজ্বের এক অপূর্ব সংযোগ, সমন্বয় ও সম্পৃতি। পক্ষ থেকে পক্ষজের, ধূলিকণা থেকে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তির মতই বিস্তরকর এই পার্থিব বস্তু ও তাব থেকে অপার্থিব আনন্দ-রসময় সাহিত্য সৃষ্টি। পক্ষের শত গানি ধন্য করে কোন্ মায়াবীর মায়া-স্পর্শে প্রাকৃতিক হয়ে উঠে সহস্র-দল-বিস্তারী সহস্রদল তার অপরূপ সৌন্দর্যে, সৌরভে, শুভ্রতায়। ধূলির শত মলিনতা সার্বক করে, কোন্ চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র কনকায়মান রূপ-মধুরিমা। একই ভাবে সাধারণ জগতের পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক হাসি-কান্নার, মানব-মনের দৈনন্দিন বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশা, বাত-প্রতিবাতের অতি তুচ্ছ, অবজ্ঞের চিত্রটিও যখন কবির প্রাণের রসে লিপ্ত হয়ে সহস্রদলের মতই বিকশিত হয়ে উঠে; স্রষ্টার মরমী দৃষ্টির অরুণালোকসম্পাতে ইন্দ্রধনুর মতই ভাস্বর হয়ে ওঠে, তখনই হয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রকৃত সৃষ্টি। “সকল কাঁটা ধন্য করে” ফুল কোটবার,—সকল ব্যথা স্বতীল হয়ে” গোলাপ হয়ে উঠবার, সকল কুস্রীতা, মলিনতা, প্রাত্যহি-

কতা ও সাধারণতার সাহিত্য-গৌরবে পরীক্ষান্ হয়ে উঠবার এই ত অপূর্ব ইতিহাস।

এরূপে অসাধারণের অসাধারণত্ব নয়, সাধারণেরই অসাধারণত্ব সাহিত্য চির-পরীক্ষান্। এই অসাধারণত্ব সম্পাদনের মন্ত্র-শক্তিতেই সাহিত্যিকের লেখন উন্নীত হয়, “রচনা” বা “সাহিত্য” আমাদের লেখন পর্ববসিত হয় “বিবরণী” বা “কাহিনী”তেই মাত্র। বুদ্ধি-সর্ব্ব পণ্ডিতের নিকট বস্তু-নিরপেক্ষ, শূন্যগর্ভ মনের আলোকই বথাসর্ব্ব; সাধারণ মাহুয়ের নিকট মন-নিরপেক্ষ, আধার-বিহীন বস্তু-জাতের কঠোর উপস্থিতিই বথাসর্ব্ব। প্রথমটি ‘Form without matter’; দ্বিতীয়টি ‘Matter without form’। কিন্তু সাহিত্যিকের মনোহর্যে হয়েছে ‘Form’ ও ‘Matter’-এর পরিপূর্ণ সঙ্গতি। বাহিরের বস্তুকে তিনি অন্তরের, অপূর্ব রূপান্তরীকরণ শক্তিতে নিজস্ব করে নিতে পারেন। এরূপে সমগ্র বিশ্বজগৎই সাহিত্যিকের মনোজগতে নবরূপে বিদ্যিত হয়ে পুনরায় নবরূপে প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যের স্বর্ণ-মুহুরে। সেজন্য প্রকৃত স্রষ্টারূপে সাহিত্যিক সত্যই বিশ্ব-প্রকৃতিকে বলতে পারেন :

“আমি আমার মনের মাদুরী মিশারে
ভোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি, মম অসীম
গগনবিহারী।”

বস্তুতঃ সাহিত্যিকই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, সর্বাপেক্ষা ধনী—
সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিই তাঁর একান্তই নিজস্ব ধন, মনের
আগুনে বাড়া।

এরূপে নিপুণ শিল্পীর সামান্য কয়েকটি রেখায় যেমন
সাধারণ বস্তুও হয়ে ওঠে এক অপূর্ব চিত্র, তেমনি প্রকৃত
সাহিত্যিকের হাতে সাধারণ গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস,
ভূগোল, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, চিঠি-পত্র প্রভৃতি সবই
হয়ে ওঠে এক অপরূপ সৃষ্টির “সাহিত্য”। দৃষ্টান্তরূপে,
রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতএব সাহিত্য ও জীবন বা সাহিত্য ও সমাজ—
অদ্বাকী ভাবে বিজড়িত হয়েও অভিন্ন নয়।*

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের (পাটনা) মহিলা-শাখার সভা-
নেত্রী অভিভাবকের একাংশ।

বাংলা ও বাঙালী

ক্রীমশীলচন্দ্র ঘোষ

আমার একজন পাঠক-বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,
“বাঙালী” বলিতে তিনি কি বুঝেন? উত্তর দিয়াছিলাম
যে, জাতিধ্বংসনির্কিংশেবে বাহারা এই প্রদেশের স্থায়ী
অধিবাসী আমি তাহাদেরই “বাঙালী” বলিয়া মনে করি।
আর একজন পাঠক-বন্ধুর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা বণ্টনের
বিষয়ে প্রদেশের প্রতিবর্গ মাইলের বসতির হার ও মোট
জনসংখ্যা লইয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল। আমি
প্রতি বর্গমাইলে বসতি-হারের উপর (মোট জনসংখ্যার
উপর নহে) ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থবণ্টনের
প্রস্তাব করিয়াছি। অন্তান্ত পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও
কাহারও এইরূপ ধারণা ও সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া এই
ছুটি বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া প্রথমেই
লিখিলাম।

বিদেশী ও অপর প্রদেশবাসী ব্যবসারীদের সমকক্ষ
হইতে হইলে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের নিজেদের যে সমস্ত দোষ
ও ক্রটি আছে তাহা সর্বাঙ্গ্রে সংশোধন করিতে হইবে।

অপর প্রদেশবাসীরা এখান হইতে কোটি কোটি টাকা
উপার্জন করিয়া লইয়া বাইতেছেন এজন্য তাহাদের দোষ
দেওয়া অন্যায্য। ইহা উটপাখীর মনোবৃত্তি ছাড়া আর
কিছুই নয়। কেবলমাত্র মূলধন ও উচ্চশিক্ষা থাকিলেই
যে শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি করা সম্ভব ইহা একটি ভ্রান্ত
ধারণা। ইহার জন্য চাই কঠিন পরিশ্রম, চরিত্র ও
সততা। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙালীর এই বিষয়ে দুর্বলতা
কতটুকু ও কোথায় তাহা পড়ে আলোচনা করিব।

পূর্বে প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সমস্ত
সম্পাদনের জন্য কুটীর-শিল্প প্রদারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়-
তার বিষয় লিখিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে দেখিলাম যে,
কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কুটীর-
শিল্প প্রসারের ব্যবস্থার জন্য একটি নূতন সংসদ গঠন
করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছুদিন পূর্বে এরূপ
একটি সংসদ গঠন করিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত কার্যতঃ
এই সংসদ কতদূর কি করিয়াছেন তাহার কোন বিশদ
বিবরণ জানা নাই। দেশের বেকার-সমস্তা সমাধান

করিবার পক্ষে কুটীর-শিল্প প্রসারণই অন্যতম উপায়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান বৃত্তরাজ্য যুদ্ধের পর বধন বেকার-সমস্যা লইয়া বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল তখন ইংলণ্ডে প্রমিক গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্ত্রীর ট্যাকোর্ড ক্রিপস্ এই পন্থা অবলম্বন করিয়া সেখানে বেকারের সংখ্যা অনেকটা কমানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রমিক সরকার কর্তৃক ১২৪২ সনে প্রকাশিত *Labour Gazette* হইতে জানা যায় যে, তিনি যুদ্ধের শিল্পগুলির উৎপাদন নানা প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বতটা সম্ভব নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে কুটীরশিল্পের দ্বারা করিয়াছিলেন। এইসব কুটীরশিল্পের দ্বারা যুদ্ধের কলকারখানার আবশ্যক বহরকমের ছোট ছোট অংশ (Parts) ও সরঞ্জাম (Accessories), এমন কি অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যন্তও এই ভাবে উৎপাদন করা হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে।

কুটীরশিল্পের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে। ইহার জন্য একসঙ্গে বেশী মূলধন লাগে না এবং যুদ্ধের শিল্পের ন্যায় প্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও কম। তাহা ছাড়া এই শিল্প পরিচালনার জন্য উর্দ্ধতন কর্মচারীর বিশেষ আবশ্যক হয় না। আর একটা সুবিধা এই যে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অনেক পরিমাণে স্থানীয় ও নিকটবর্তী বাজারে থাকে।

এই শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে:—(১) শিল্পগুলি প্রদেশবাসীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার অঙ্গুল হওয়া দরকার। (২) শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বতদূর সম্ভব নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং চারুকলা সম্পন্ন দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। (৩) বাহাতে মহাজনদের নিকট বেশী হারে টাকা ধার করিতে না হয় সেজন্য মূলধন সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার একটি সুচিন্তিত সরকারী পরিকল্পনার প্রয়োজন। নিউ-জিল্যান্ডের 'Poor Bank'-এর অঙ্করণে প্রত্যেক মহাকুমার প্রদেশ-সরকারের তত্ত্বাবধানে গরিব প্রতিষ্ঠান (Credit Bank) স্থাপন করিতে হইবে। উপস্থিত সমস্যার ব্যাঙ্কের দ্বারা চলিবে না। (৪) শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সম্ভবপর সময়ানের (standardised goods) হওয়া একান্ত আবশ্যক। (৫) গ্রামে ও পল্লীতে বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রসারণের ব্যবস্থা প্রদেশ-সরকারকে করিতে হইবে। (৬) বিভিন্ন কুটীরশিল্পের উপযোগী আধুনিক ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক ও হস্ত-পরিচালিত যন্ত্রপাতি প্রদেশ-সরকারকে বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া শিল্পগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৭) লভ্যাংশের বেশী ভাগ

বাহাতে উৎপাদনকারীরা পায় তদ্ব্যন্থ প্রদেশ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই সমস্ত শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যাদির বিদেশে রপ্তানী করিয়া সরকার কর্তৃক উচিত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা। (৮) আবশ্যক কাঁচামাল বাহাতে নিয়মিত ভাবে ও উচিত-মূল্যে শিল্পগুলি পায় এবং উহা কালোবাজারে কিনিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা; (৯) বিদেশ হইতে প্রদেশের উপযোগী নানা প্রকার কুটীরশিল্পে হৃদয় শিল্পীদের আনাইয়া একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অঙ্গুলারে প্রতি মহাকুমার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের নানা রকমে কুটীর-শিল্পের শিক্ষা দিতে হইবে। স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু ও কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন মহাকুমায় কোন কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে তাহা পূর্বেই স্থির করা আবশ্যক।

সংস্কারপন্থে হেরিলাম বে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের দ্বারা ছোট ছোট শিল্প পরিচালনার জন্য একটি সরকারী শিল্পসাহায্য তহবিল স্থাপন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা যে একান্ত আবশ্যক ও খুবই সমীচীন তাহা লেখাই বাহুল্য; কিন্তু এই তহবিলের টাকা কাহারো বণ্টন করিবেন ও কাহারো মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহার উপরই ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। আশা করি, “হ”-মার্ক সভ্যদের দ্বারা এই টাকা বণ্টনের ব্যবস্থা না হয় এবং আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে উহা বণ্টিত না হয় সেদিকে ডাঃ রায় নিশ্চয়ই বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নচেৎ উপকারের অপেক্ষা অপকারই বেশী হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘড়ি তৈরি শিল্পটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে বলিয়া পূর্বে লিখিয়াছি। ইটালিতে আমি দেখিয়াছি যে, নানা প্রকার লেস (Lace) তৈরি সেখানকার একটি প্রধান কুটীরশিল্প। আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে এই শিল্পটি অনায়াসে গড়িয়া উঠিলে বহু গৃহস্থের আর বখেট বাড়িতে পারে। অবসর সময়ে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে ঐরূপ লেস তৈরি করিতে পারে। তবে ইচ্ছামত নমুনা অঙ্গুলারে উহা তৈরি করিলে চলিবে না। যদি সমস্যার পদ্ধতিতে সূতা সরবরাহ করিয়া নির্দিষ্ট মজুরীর হারে, বিদেশে ও প্রদেশে চাহিদা আছে এইরূপ নমুনা মত লেস তৈরি করিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বহু লক্ষ টাকার লেস, ফিতা ও ঐরূপ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রদেশবাসীরা লাভবান হইতে পারেন। ইহা ছাড়া চুইট ও নানা প্রকার বোতাম তৈয়ারী, চীন ও আপানের যত

চিহ্নিত চীনা মাটির বাসন ও চাক্কলা, চীনা মাটির পুতুল, কমাল, নানারূপ সিকের বস্ত্র, মোজা, গেঞ্জি, জুতার ফিতা, লিথিবার নিব, ছুরি, কাঁচ ইত্যাদি বহুপ্রকারের কুটীরশিল্প বাংলা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। একথা লেখাই বাহুল্য যে, এই প্রদেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বেকার-সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে, প্রদেশ-সরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বতাই চেষ্টা করুন না কেন প্রদেশকে বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। অর্থ কমিশনের নিকট বাংলার বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য কুটীরশিল্প প্রসারণের বিশেষ দায়িত্বের বিষয় প্রদেশ-সরকারের জানান উচিত।

পাটকল, সূতাকল, কয়লার খনি ও চা-বাগান পশ্চিম-বঙ্গের চারিটি বৃহত্তর উৎপাদন-শিল্প। এই প্রতিষ্ঠান-গুলিতে বাঙালীর স্থান কোথায় ও উহাদের সরকারী প্রকাশিত সংখ্যা কত তাহা নিম্নে দিতেছি :

শিল্পের নাম মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

পাটকল	৮০	৪
সূতাকল	৪৪	৩০
কয়লার খনি	২৫৮	১০৫
চা-বাগান	৩৭২ (অবিভক্ত বাংলা) ৩০৪	

চা-বাগানের সংখ্যাগুলি অবিভক্ত বাংলার। উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগানের সংখ্যা কত তাহা জানা নাই। যদিও উল্লিখিত ৩৭২টি চা-বাগানের মধ্যে ৩০৪টি চা-বাগান বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত তথাপি এই ৩০৪টি বাঙালী পরিচালিত চা-বাগানের জমির পরিমাণ মোট চা-বাগানের জমির পরিমাণের শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বাগানই ছোট ছোট। বাঙালীর পরিচালিত কয়লার খনি ও পাটকলের বাৎসরিক উৎপাদন বহু দূরায় তাহা হইলে ইহাদের সংখ্যার অল্পপাতের হার বেশী হইলেও উৎপাদনের হার ঐ প্রকারই কম হয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, বাঙালী-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যেগুলি যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত (Public & Private Ltd. Co.s) তাহার অংশীদারদের মধ্যে কতগুলি বিদেশী ও কতগুলি অপর প্রদেশবাসী আছেন তাহার সংখ্যা ও তাহাদের দ্বারা শেয়ারের টাকার পরিমাণ জানা নাই। তবে অনুমান হয় ইহাও খুব কম হইবে না। এ কথা আরও বলা আবশ্যক যে, কয়লার খনি-গুলিতেও বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম।

বহির্বাণিজ্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

বহুলাংশে নির্ভর করে। কিছুদিন পূর্বে রপ্তানী-বাণিজ্যে বাঙালীর অংশ কতটুকু তাহার মোটামুটি অনুমান করা হইয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে, রপ্তানী-বাণিজ্যে গত ১৯৪২ সনে মোট ২৫১.২৩ কোটি টাকার মধ্যে বাঙালীর অংশ ২৮.৭ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ১১.১৪ মাত্র। ইদানীং ইহার পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়িতে পারে। কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে ইদানীং কয়েকটি বিশেষ দ্রব্য বাহা রপ্তানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে দিলাম :

১৯৪৮-৪৯ সনে বাংলা হইতে বিদেশে পাট ও পাট-জাত দ্রব্য ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ১৩৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ও ১৯৫০-৫১ সনে ১০.৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা রপ্তানী করা হয়।

১৯৪৮-৪৯ সনে বাংলা হইতে ৫০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সনে ৬২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ১৯৫০-৫১ সনে ৬৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চা বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু এই টাকার মধ্যে পাট উৎপাদন-কারীদের অংশ যে খুবই কম তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ ইহার বেশীর ভাগ অংশ রপ্তানীকারী, পাট-কলের অংশীদার ও অপর প্রদেশবাসী পাটের মহাজন ও শ্রমিকদের হাতে চলিয়া যায়। চা শিল্পক্ষেত্রের বেলায় পাট-কলের ভায়া না হইলেও ঐরূপ কতকটা বলা বাইতে পারে।

উপস্থিত ভারত-সরকার দ্বারা অপর কেহ বিদেশে কোনরূপ কয়লা রপ্তানী করিতে পারেন না। কলিকাতা বন্দর হইতে গত ১৯৫১ সালে জাহুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ৭,১৩,৮২১ টন কয়লা বিদেশে (পাকিস্থান ছাড়া) রপ্তানী করা হয়। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা অনুসারে ইহার মূল্য ২,১৩,২৪,৪২২ টাকা হয়। ঐ কম মাসে ২,১৫,৭৭০ টাকা মূল্যের ২,৪৬৫ টন হার্ড কোকও বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন সমুদ্রপথে, রেল ও নদীপথে পাকিস্থানে মোটামুটি প্রতি মাসে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টন নানা রকমের কয়লা ভারত-সরকার চালান যেন। এই চালানী কয়লার উপর ভারত-সরকার কন্ট্রোল দর অপেক্ষা ১২ টাকা টন প্রতি বেশী পাকিস্থান সরকারের নিকট হইতে আদায় করেন। এই সমস্ত রপ্তানী কয়লার মধ্যে কত টন পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার হিসাব সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে উহা মোট রপ্তানীর এক-তৃতীয়াংশ অনুমান করা বাইতে পারে।

উপস্থিত ভারত-সরকার পাট-শুল্কের ভায়া বিদেশে রপ্তানী কয়লার উপর প্রতি টনে নিম্নলিখিত হারে

‘সারচার্জ’ আদায় করিতেছেন। ইহার পরিমাণ বাৎসরিক কয়েক কোটি টাকা হইবে।

রপ্তানী কয়লার উপর ‘সারচার্জ’-এর হার প্রতি টনে :

অস্ট্রেলিয়া	১\
ব্রাহ্মদেশ	৫\
সিংহল	...
নিউজিল্যান্ড	২৪০
জাপান	২\
মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ-পূর্ব বন্দরসমূহ (ব্যাকক, সাইগন প্রভৃতি), এডেন, পোর্ট সুদান, পূর্ব-আফ্রিকার বন্দরসমূহ, ভূমধ্যসাগরের বন্দর-	

সমূহ, গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড...

৭

উত্তর-ইউরোপীয় ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বন্দর-

সমূহ

...

৫\

একথা সকলেই জানেন যে, কয়লা প্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, কারণ কয়লা কাটিয়া লইলে আর পূরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি রপ্তানী কয়লার আদায়ী ‘সারচার্জ’ এবং পাকিস্থানে চালানী কয়লার উপর লভ্যের অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি করেন তাহা হইলে উহা খুবই ভ্রাম্যসত্ত্ব হইবে। আমি বতদূর জানি পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অর্থ কমিশনের নিকট এরূপ কোন দাবি আজ পর্যন্ত পেশ করেন নাই।

ক্রমশ

নিষ্কৃতি

সমারসেট্ট মম্

অনুবাদক—ঐসব্যসাচী রায়

আমার অনেক দিনকার বিশ্বাস যে, কোন ভদ্রমহিলা যখন কোন পুরুষকে বিবাহ করতে সম্মত করেন, তখন ভিলার্ড লম্ব নষ্ট না করে পলারান করা হাতা পুরুষের দ্বারা পাবার উপায় নেই। কিন্তু না, এই পছাও সব সময়ে চল যেত না। আমার এক বন্ধুকে আমি বার বার হ'ল হরেছিল যে বিবাহরূপ অবতরনীর সর্বনাশ লুপ্তহিত, তখন শুধু একটি ইংরাজ মাত্র লসে নিরে সেই বন্ধুকে সে নিকটতম বন্দর থেকে আহাঙ্কের একটি টিকিট কেটে লয়ে পড়েছিল। তার পর বৎসরখানেক দাদা দেশে ঘুরে বেড়াবার পর সে নিজেকে নিরাপন্ন বোধ করল; কারণ সে ভেবেছিল ব্রীজাতির মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব আছে এবং এক বছরের মধ্যে ভদ্র-মহিলাটি নিশ্চয়ই তাকে একেবারে ভুলে যাবেন। কিন্তু আহাঙ্ক থেকে সেই পুরাতন বন্দরে নামতেই তিনি সর্বপ্রথম সোংসায়ে ক্রমাল নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি সেই সুববেহা মহিলাটি হাতা আর কেউ নয়, ঐর কাছ থেকেই আমার বন্ধুটি পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি শুধু এক জনের কথাই জানি যে এরকম অবস্থার পক্ষেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। তার দার রজার চেয়ারিং। রূপ বারলোর লসে যখন সে প্রবেশ পড়েছিল, তখন তার বৌবন অনেক দিন হ'ল অভিজাত হয়েছে; তা হাতা তার আগে সে বৃষ্টি অভিজাতও সঙ্গ করতছিল, যাতে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রূপ বারলোর এমন একটি অঙ্গ ছিল (অথবা এটিকে অঙ্গ আখ্যা না দিয়ে কনভা বলব কি ?) যার মত বাবতীর পুরুষ মানুষই আশ্চর্যকার অসমর্থ হয়ে পড়তেন। এইমতই রজারও তার

বিচারমুহুর্তি, সাবধানতা এবং জাগতিক অভিজ্ঞতা সব বিস্মৃত হয়েছিল।

রূপ বারলোর এই অঙ্গটি ছিল অপরের মনে করণা উল্লেখের কনভা। ঐমতী বারলো হ'বার বিবাহ করেছিলেন এবং হ'বারই বিবাহ হয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটি ছিল গভীর, তাসাতাসা এবং করুণ—যেন এই দুহুর্ভেই তার থেকে জল উপচে পড়বে। তাঁর চোখ বেধে মনে হ'ত যেন সংসার তাঁর পক্ষে একান্ত দুর্ভিক্ষ। তাঁর চোখের পানে তাকিয়ে আপনায় মনে হ'ত: এই তাবের উদর হ'ত—আহা, বেচাৱীর হঃবকট ওর লহের সীমা অভিক্রম করে গেছে। আপনি যদি রজার চেয়ারিং-এর মত লজসমর্থ, বলিষ্ঠ বেহের অধিকারী ও তাঁর মত প্রচুর বিভবান হতেন, তা হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে আপনায় মনে এই ইচ্ছা হ'ত—জগতের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে ঐ অসহায়াকে আপনি আত্মাল করে রাখেন। ঐ বড় বড় করুণ চোখ দুটি থেকে হঃখের সমস্ত কালিদা হুহে ফেলতে পারলে, আঃ, কি মহৎ কাজই না করা হয়। রজারের কথাবার্তা থেকে যা বুঝলাম, তাতে মনে হ'ত ঐমতী বারলোর লসে পৃথিবীর কেউই ভাল ব্যবহার করে নি। তিনি নাকি সেই রকম হতভাগিনীদের অতন্তরা দ্বারা যখনই যেথিকে চার, লাগর তকারে বার। বিবাহের পর তাঁর দ্বারা তাঁকে মারঝোর করত; পেরার-বাঝারে যে দালালকে দিয়ে তিনি কাজকারবার করতেন, সে নির্ধাত তাঁকে ঠকাত। তাঁর চাকর বাহেরই তিনি রাখতেন, তাঁর পাওরা বেত বে, তার পাঁচ দাতাল। যে সুহৃদহানাকেই তিনি পুত্বেন সেটি হ'বিন বাবেই দারা বেত।

রজার যেদিন আমাকে জানাল যে, অবশেষে সে জীবন্তী বারলোকে বিবাহপ্রস্তাবে রাজী করতে পেরেছে সেদিন আমি তাকে অভিনন্দন জানালাম—“আশা করি তোমাদের মধ্যে বেশ ভাবনাব হবে।”

সে বললে, “জান তো ও তোমাকে বানিকটা ভয় করে, ও মনে করে তোমার মধ্যে বরানামা বিশেষ নেই।”

“আমার সম্পর্কে তাঁর এরকম ধারণা হবার হেতু?”

“তুমি ওকে পছন্দ কর তো?”

“নিশ্চয়ই, খুব পছন্দ করি।”

“আহা, বেচারা! জীবন বড়ই দুঃখে কেটেছে। আমার এত মার! হর, ওর জড়।”

“তা ভ বটেই।” আমি বললাম।—এ হাতা আর কি বলব? আমি আমতাম যে জীবন্তী বারলো একটি বুদ্ধিহীনা অথচ কন্দীবাৎ জীলোক। আমার আরও ধারণা হয়েছিল যে, নিজের বাবা-সিঁড়ির জড় তিনি সর্বদা দৃঢ়স্বয়ং।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের কথা মনে আছে।

আমরা সবাই ব্রিঙ্ক বেলহিলার। তিনি আমার ‘পার্টনার’ হয়েছিলেন। আমার সমস্ত ভাল ভাল হাতগুলি তিনি আশ্রয় তৎপরতার সঙ্গে বার বার মাটি করেছিলেন। আমি অবশ্য সাক্ষাৎ দেবহুতের মত ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু কাকুর চোখে যদি জল ভরে উঠবার কারণ হয়ে থাকে তো সে আমারই, রূপ বারলোর নয়। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কাছে অনেকগুলি টাকা হেরে পরে একটি চেক পাট্টিরে দেবেন এই প্রতিক্রিয়া দিয়ে তিনি বিহার মিলেম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনদিনই আর তা পাঠালেন না। অথচ পরে বখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই কেন যে তাঁর চোখে ওরকম আহত অভিমানে ভাব উৎপলে উঠেছে—বেন আরিই তাঁর প্রতি নিদারুণ হৃদয়হার করেছি—তা আমারই মাধার কোনদিনই টোকে নি।

রজার জীবন্তীর সঙ্গে নিজের বহুবাহবের পরিচয় করিয়ে দিলে। তাঁকে অলঙ্কারাদি উপহার দিতে লাগল। তাঁকে নিয়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেড়ানোও শুরু করল। অহুঁর ভবিষ্যতেই তাদের বিবাহ হবে একথা বিভ্রাণিতও হয়ে গেল। রজার নিকটকে খুব সুখী বোধ করছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে একটা খুব ভাল কাজই করতে বাচ্ছে এবং সেটা সম্পূর্ণ নিজের ভাগিদেই। এ রকম অবস্থার সে যে মূর্খির আধিক্যে মাকে মাকে একটু-আটটু বাড়াবাড়ি করে ফেলবে তাতে আর আশঙ্ক্য কি?

তার পর হঠাৎ এক দিন তার টমক মকল। আমি না কি করে এবং কেন। জীবন্তী রূপের প্রেম-কুলম যে তার কাছে পুতোনো হয়ে গিয়েছিল তা মনে হয় না। কারণ জীবন্তী রূপ কোন দিনই বিশেষ কথাবার্তা কইতেন না। হয় ত তাঁর

চোখের করুণ চাটনি আর রজারের দ্বন্দ্বের ভেদন ঘোচত দিতে পারছিল না। রজারের চোখ ধুললো এবং তার বাতাবিক বিচকণতা ও সাংসারিক বুদ্ধি আবার ফিরে এল। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, জীবন্তী রূপই তাকে গৈথে ভোলবার মতলব করেছেন। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সেও প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক সে কিছুতেই এটা বটতে দেবে না।

কিছু কি করা যায়? ব্যাপারটা গড়িয়ে গেছে অনেক দূর। এখন সে সারা চোখে ভাল করেই বুঝতে পারল কোন বাতুতে গড়া জীলোকের সঙ্গে তাকে বোকাপড়া করতে হবে। যদি সে সোকাঅুজি হাতাম পাবার প্রস্তাব করে তা হলে রূপ নিঃসন্দেহে, তাঁর দ্বন্দ্ব-সংশী করুণ চাহনির দ্বারা বেশ মোটা টাকা তাঁর মনোবেদনার সাহুমা হিসাবে আদায় করবেন। তা হাতা কোন ভয়মহিলাকে এভাবে পরিত্যাগ করা বড়ই অশোভন। সমাজে বহন্যম হয়।

রজার নিজের মনের কথা মনেই চেপে রাখল। তাবে কিংবা ভাবার কোন রকমেই সে সুধাকরেও প্রকাশ হতে দিল না যে, রূপ বারলোর প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। রূপের মনোরঞ্জনের দিকে সে সমান মনোবোধী হয়ে রইল। তাকে নিয়ে সে আগের মতই বেলাতুলি, সিনেমার বাওরা, ভিনার বাওরা ইত্যাদি করতে থাকল। নিরমিত সে তাকে কুলের তোড়া উপহার দিয়ে তার এবং সর্বদাই সহায়ত্বভূমি মধুর ব্যবহার করে। কথা ছিল যে, সুবিধামত একটা বাড়ী পেলোই তারা বিয়েটা সেরে ফেলবে। এখন তারা হুঁকমে মিলে বাড়ী খুঁজতে লেগে গেল। বাড়ীর একেউরা অনেক বাড়ীরই খবর দিলে এবং রজার রূপকে নিয়ে সেগুলি ঘেঁষে বেড়াতে লাগল। মনের মত একটা বাড়ী পাওয়া সত্যিই বড় সুখকর। রজার আরও একেউদের কাছে লিখল। বাড়ীর পর বাড়ী তারা ঘেঁষে বেতে লাগল। বেশ ভাল করেই তারা দেখল—করলা মাধার কুঠরি থেকে শুরু করে চিলেকোঠার বর পর্যন্ত তারা খুঁটরে খুঁটরে প্রত্যেকটি বাড়ী দেখল। বাড়ীগুলি হয় বেশী বড়, নয় খুবই ছোট মনে হয়—ট্রিক পছন্দমত আর পাওরাই যায় না। কখনও বা বাজার-হাট অত্যন্ত দূরে পড়ে, কখনও বা একেবারে বাজারের প্রাণ মধ্যেই বাড়ী পাওয়া যায়। হুটোর কোনটাই সুবিধের ঠেকে না। কখনও দেখা যায় তাকা বড় বেশী পড়বে, কখনও বা তাকা সত্যি হলেও দেখা যায় বাড়ীটি বেকার ভাড়া-চোরা। কোন বাড়ীটাকে বড় বেশী চাপা মনে হয়, কোনটাকে বা মনে হয় যেম তেপাতরের মাঠে ঠাঁড়িয়ে আছে। কোনটার বড় বেশী অন্ধকার, কোনটা বড় বেশী ঠাণ্ডা। প্রত্যেক বাড়ী থেকেই রজার কোন না কোন খুঁত বার করবেই। রজারকে খুঁচি করা ছিল শক্ত, অবশ্য তার কারণও ছিল। তার আগের

କ୍ରମେକେ ତ ସେ ଏକଟା ବା-ବା ବାଜିରେ ଯାଏତେ ପାରେ ନା । ସନ୍ଦେହ ନକ ଓ ନର୍କୋଦୟ ବାଜିଟି ତାର ଚାହି-ହି । ଅପେକ୍ଷା ସେ ଚକ୍ର ବାଜି ହୁଏ ପାଠର ନୟ ଓ ପରିକ୍ଷଣ ନାମେକ । ବାଜି ବୋଲି ଏକଟି ଜ୍ଞାନ-ହରହାନକାରୀ କାଳ ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ବିଟିବିଟି ହରେ ପଡ଼ିଲେନ । ଯଦ୍ୟା ତାଙ୍କେ ଆଉ ଏକଟି ବୈଦ୍ୟା ବରେ ଥାକେତେ ଅହରୋଧ କରନ । ଶ୍ରୀକ ତାହେନ ସନ୍ଦେହ ନକ, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଦ ବାଜିଟି ନିକଟରୁ କୋବାଓ ଆନେପାନେଇ ନୁକିରେ ଆହେ ; ଆଉ ଏକଟି ଅବାବନାବ, ଆଉ ଏକଟି ଅପେକ୍ଷା, ତା ହଲେଇ ନିକଟର ତାରା ନେଟି ହୁଏ ପାବେ । ନକ ନକ ବାଜି ଏହି ଥାବେ ତାରା ବେଧେ ବେକାଳ, ହାକାର ହାକାର ନିକି ତାରା ତାଳନ, ଅନନ୍ତା ହାହାବ, ତାହାବର ତାରା ପର୍ଯ୍ୟ-ବେକନ କରନ । କ୍ରମ ଓ କ୍ରମ ହରେ କ୍ରମ ସେବକାଳେ ଏକ ଦିନ ଯଦ୍ୟାକେ ବଲେନ, “ବେଧ, ହୁମି ସିମି ନିମିନି ଏକଟି ବାଜି ନା ଶ୍ରୀକ କର, ଆମାକେ ନକ ଅହାଟା । ତା ହଲେ ଆଉ ଏକବାର ଡେବେ ବେଧେତେ ହବେ । ଏ କି, ଏ ଚକ୍ର ଥାବେ ଚଲେ ତ ଆମାକେ କୋମ ଦିନ ବିରେଇ ହବେ ନା ।”

“ଆହା, ଓ କବା ବଲେ ନା,” ଯଦ୍ୟା ଉଦୟ ଦିଲେ, “ଆଉ ଏକଟି ବୈଦ୍ୟା ବର, ଶ୍ରୀକ । ବେଧ ନା, ଏହିକାଳ ଏକେକିବେନ କାହ ବେକେ ଆଉ ଏକଟା କିରିକି ପେସେରି—ଅନ୍ତତଃ ମୋଟାବାଟେକ ବାଜିର ବର ଆହେ ଏତେ । ଏର ବ୍ୟୋ ଏକଟି ନିକଟରୁ—”

ଆବାର ନୁହ ହ’ଲ ବୋଲାନୁବି । ବାଜିର ପର ବାଜି, ଆବାର ବାଜି । ହ’ବର ଏହିକାଳେ କାଟିଲ । କ୍ରମ ନିକଟାକ ଓ ବୀଜକ୍ରମ ହରେ ପଡ଼ିଲେନ । ତାର ଡୋବେନ ସେହି କ୍ରମ ଚାଟିମି ମେଲ ବରଲେ, ଲେବାନେ ନିକଟର ଆକ୍ରୋମେନ ଥାବ ଏକାଧିକ ମେତେ ନାମଲ । ନାହାବେନ ନହେନ ନୀନା ଆହେ । ଶ୍ରୀବତୀ ବାରଲେ ଅଶୀନ ବୈଦ୍ୟୋର ଅବିକାରିନି ଦିଲେନ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଓ ବୈଦ୍ୟୋର ବୀବ ତାଳନ ।

“ଯଦ୍ୟା, ଏକ କରେ ବଲ ତ ଆମାକେ ବିରେ କରବାର ତୋମାର ନାତି କୋମ ନକଲବ ଆହେ କିନା ?”—ଓରକର ନାମିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାରଲୋର ମଳା ଦିରେ ଏର ଆମେ କବନକ ବେହୋର ନି । ଯଦ୍ୟାବେନ ବହୁ, ନାକ, ଉଦାପହୀନ ବରେନ କିନ୍ତୁ ଲେନବାଜ ବାଜିକର ବେନ

ବେନ ନା, ବଲେ—“ନିକଟରୁ ଆହେ, କି ବଲେ ହୁମି । ସେ ନୁହେଁ ଏକଟି ସନ୍ଦେହ ନକ ବାଜି ପାବ ସେହି ନୁହେଁ ଆବତା ବିରେ କରବ । ତାଳ କବା, ଏହିକାଳ ଆଉ ଏକଟି ବାଜିର ନକାମ ପେସେରି, ସନ୍ଦେହ ହଲେ ଏକଟି ବୋଧ ହର ବେଧନଟି ଚାହି ଡେଧନଟି ହବେ ।”

“ଆବାର ନକୀର ତାଳ ଦେଇ । ଏହିକାଳ ଆବାର ଏକଟି ବାଜି ବେଧେତେ ଘୋଟିବାର ଆବାର ଆଉ କରତା ଦେଇ ।”

“ଆହା, ନାତି ତୋମାକେ ବଡ଼ କ୍ରମ ବୋଧାହେ । ତୋମାର ଉପର ଦିରେ କି କର ମେହେ ।”

କ୍ରମ ବାରଲେ ନାଆ ଏହନ କରଲେନ । ଯଦ୍ୟାବେନ ନକେ ଦେବା-ନାକାଂ ବଡ଼ କରେ ଦିଲେନ । ଯଦ୍ୟାକେ ଶ୍ରୋତା ବାହିରେ ବେକେଇ ତହାବନାମ କରେ ଓ କ୍ରମ ପାଣ୍ଡିରେ ନକଟି ଥାକେତେ ହ’ଲ । ଅବତ ଡାକେ ସେ ବିନୁହାଜ ନାକିଲିକି କରନ ନା । ଯୋକ କ୍ରମେକେ ଚିଟି ଲିବେ ଜ୍ଞାନାତେ ନାମଲ କବନ, କୋବା, କି ଚକ୍ର ବାଜିର ନକାମ ପାଠର ବାହେ । ନକାହାବନେକ ମରେ ସେ ଏହି ଚିଟିଟି ମେଲ :

ଯଦ୍ୟା,
ଆବାର ବିବାନ ହୁମି ଆମାକେ ନାତି ନାତି ଘୋଟିବି ତାଳ-ବାନ ନା । ଆମି ଏକକ୍ରମେକେ ପେସେରି ଦିମି ଆବାର ନକାମ ତାର ସେବାର ଜନ୍ୟ ବିସେବ ଉଦ୍‌ବୀବ । ତାକେଇ ଆଜ ଆମ ବିରେ କରବି ।

କ୍ରମ

ବିସେବ ଲୋକ ନାକକ ଯଦ୍ୟାବ ଅବିଲବେ କବାବ ପାଠାଳ :

କ୍ରମ,

ତୋମାର ଚିଟି ଆମାକେ କ୍ରମାର କରେ ଦିରେହେ । ଏ ଆବାତ ଆମି କୋମ ଦିନି କାଟିରେ ଉଠିତେ ପାରବ ନା, କିନ୍ତୁ ତୋମାର ନୁହ ଆବାର ଶ୍ରୋତ ଓ ଶ୍ରୋତା ଚିତା । ଏହି ନକେ ନାକାଧାନି ବାଜିର ଶ୍ରୀକାମା ପାଠାଳି । ଆକାକେନ ନକାଳେନ ତାକେଇ ଏକାଳି ଏସେହେ । ଆବାର ସନ୍ଦେହ ଏର ବ୍ୟୋ ଏକଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ତୋମାର ମହନ ହବେଇ । ଇତି

ହସତାମ୍ୟ

ଯଦ୍ୟାବ



পণ্ডিত্যরীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত্যরী বাসকালে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মাতা যুগালিনী সঘর্ষে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। মাতা যুগালিনী সঘর্ষে আমি সকল তথ্য অবগত হই বর্ধমানের সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকার সময়ে। বাবা যত্নের মুখেই শুনি মাতা যুগালিনীর কথা। ভূপালবাবু তখন তাঁহাকে স্বীয় গুরু মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মুক্তানন্দ স্বামীর নিকট মাতা যুগালিনী এই সময় যোগশিক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী ডিক্রগড়ে থাকিতেন। ১৯০৭ সনে শ্রীঅরবিন্দ যে তিনটি “পাগলামি”র কথা মাতা যুগালিনীকে জানাইয়াছিলেন, স্বামী নিকটই হওয়ায় সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তই তিনি ডিক্রগড়ে যোগশিক্ষায় নিরতা হইয়াছিলেন। পরে তিনি বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতা যুগালিনীকে তাঁহার পাগলামির কথা শুনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাকে নিক্রদেণ হইতে হয় বলিয়া পত্নীকে তদন্তব্যী প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। আমিই সর্বপ্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত মাতা যুগালিনীকে প্রস্তুত করিয়া লইতে বলি। শ্রীঅরবিন্দ তদন্তের বলেন, যদি তাঁহার পত্নী তাঁহার লিখিত তিনটি প্রসিদ্ধ পাগলামির লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে পারেন, তবে পণ্ডিত্যরীতে আসিয়া যুগালিনী দেবীর পক্ষে বাস করা দুঃসাধ্য হইবে না। আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রমুখ্যৎ এই কথা পণ্ডিত্যরী হইতে শুনিয়া আসিয়া মাতা যুগালিনীর ভ্রাতা শ্রীশিশিরকুমার বসুর সহিত সাক্ষাৎ করি। শিশিরবাবুর মুখে মাতা যুগালিনী সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত্যরী যাইতে সম্মত হন। কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তাঁহাকে পণ্ডিত্যরী প্রেরণ করার সকল আয়োজন যখন শেষ হইয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ-বিরোগের কথা শ্রবণ করি। এই সংবাদ শ্রীঅরবিন্দের নিকট পৌছিবে, তিনি আত্মনাদ করিয়া উঠেন। তাঁহার হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসে অন্তরের বেদনাই নিঃসারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ দেবী যুগালিনীকে ধর্ম-সজ্জিনীরূপে পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। মাতা যুগালিনীরও শূন্য হৃদয় ভরিয়া দিবার অপেক্ষা সহিল না, অকালেই তিনি চির-প্রস্থান করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অনাধিব-যোগশক্তিবলে সারা

বিশ্বের মানব-চরিত্রের পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙালী জাতি এবং ভারতবর্ষ ছিল তাঁহার যত্নকর্মির কেন্দ্র। তিনি যোগশক্তির সাহায্যে বিশ্ববাসীকে অসাধারণ চরিত্রে উন্নীত করিয়া জগতে এক দিব্যজাতি-গঠনের ইচ্ছা (Will) করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমার লিখিলেন—

“The attempt to apply knowledge and power to the events and happenings of the world without the necessary instrumentality of physical action. What I am attempting is to establish the normal working of the *shiddhis* in life.”

অর্থাৎ, জ্ঞান এবং শক্তি জগতের সর্ববিধ ঘটনার প্রয়োগ করিয়া, প্রয়োজনীয় দৈহিক সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীতে কার্য্য করিবার প্রয়াসই আমি করিতেছি। যৌগিক সিদ্ধিগুলিকে জীবনে সংজ্ঞাবে কার্য্যে নিয়োগ করিতেই আমি উত্তম।

বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য আরও লিখিলেন—

“... that is, the perception of thoughts, feelings and happenings of other beings and in other places throughout the world without any use of information by speech or any other data.”

অর্থাৎ, বাক্যে অথবা বাহিরের অন্য কোন প্রকার তথ্যের উপর ভিত্তি না করিয়া সারা বিশ্বের অপর সকল মানুষের এবং স্থানের চিন্তা, সংবেগ ও ঘটনার অহুত্ব লভ।

দ্বিতীয়তঃ—

“The communication of the ideas and feelings . . . To others (individuals, groups, nations) by mere Transmission of will power.”

অর্থাৎ, কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই অপরের নিকট (ব্যক্তি, সমষ্টি, অথবা জাতির) ভাব ও অহুত্ব জ্ঞাপন।

তৃতীয়তঃ—

“The silent compulsion on them to act according to these communicated ideas and feelings.”

অর্থাৎ, অতঃপর এই সমস্ত সঞ্চারিত ভাব ও অহুত্ব অহুত্বী কর্তৃক করিবার জন্য নীরবতার মধ্য দিয়াই তাহা-দিগকে প্রভাবান্বিত করা।

চতুর্থতঃ—

“... the determination of events, actions and

results of actions throughout the world by pure silent will power."

অর্থাৎ, এমন কি তিনি চাহেন জগতের সকল ঘটনা, সকল কৰ্ম এবং সকল কৰ্মফলও নিছক নীরব ইচ্ছা বা বোগশক্তির প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

তিনি এই সকল কথা ধারাবাহিকভাবে আমার লিখিতেন। ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্ধ্যায়ের কৰ্মগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে গুহাইয়া লইতে না পারিলেও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র চতুর্থ পর্ধ্যায়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট করিতে তিনি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা জানাইয়া লিখিলেন, যখন পূর্ণ সাক্ষ্য আসিবে, আমি মনে করিব—

"I have got rid of the past *karman* in myself and others."

—আমি নিজেও যেমন প্রাক্তন কৰ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি, তেমনি অপরকেও মুক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছি।

তিনি কোন দিকে যাত্রা শুরু করিয়াছেন, তাঁহার পত্র হইতে অনুভব করিলাম। তিনি অভ্যন্তর বোগশক্তি প্রয়োগেই বিশ্বের যাহা সং, যাহা হিত, তাহাই সিদ্ধ করিবেন, বুঝিলাম। যৌগিক ক্রিয়াকর্মের উপরও তাঁহার আস্থা কতখানি ছিল তাহাও তাঁহার পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিলেন—

"তুমি যে তান্ত্রিক সাধনা করিতেছ, তাহা হুঃসাহসিক কৰ্ম, লজ্জহ নাহি। যদিও ইহা অভ্যন্তর বোগশক্তির সহিত সম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমশঃ তোমার কর্মের উন্নতি দেখিতেছি, তবুও সর্বপ্রথমে মনে রাখিও প্রত্যেক কর্মের সাধারণ লক্ষ্য হইতেছে মুক্তি এবং মুক্তি "which Tantrics in all ages have pursued" অর্থাৎ—ইহাই হইতেছে সাধকদের চিরন্তন হীতি। কিন্তু বিশেষ অবস্থা এবং কালের ভিত্তি আমাদের কর্ম করিতে হইবে। যে কর্মের ভিত্তি big Kriyas or numerous Kriyas are not always necessary—সর্বদা বৃহৎ অথবা বহু ক্রিয়া এইজন্য প্রয়োজন হয় না। অতীতে বৈষ্ণব শিখিত্ত ভাবে কর্মভিত্তিক কার্যকরী করিবার সেইরূপ কর্ম সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

তোমার কর্মসাক্ষ্য নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : Mantra & Tantra. Mantra the mental part, and Tantra the practical part. এই কর্মের যে তাত্ত্বিক উত্তরণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মনে রাখিও, সর্বদা Angarakshan is as important as Siddhis. হুঃস্বের বিষয় কলিরূপের তান্ত্রিকেরা নির্দিষ্ট বোহে অপরকণ বিষয়ে অভ্যন্তর উদ্যোগী। তাহার নির্দিষ্ট দিকেই অধিক ঝোক দিয়া Devils & Bhutas অর্থাৎ

—ভূত ও প্রেতেরই শিকারে আসে। অপরকণে প্রয়োজন, প্রবর্তনঃ, যথোপযুক্ত সিদ্ধ যন্ত্র এবং সিদ্ধ ক্রিয়ার সংযোগ। বিতীর্ণতঃ, সর্বদা স্বাক্ষরের কবলে না পড়িতে হয়, এইজন্য সতর্কতা অবলম্বন করা। আমি এই সকল কথা তোমাকে বলিতেছি এইজন্য যে, বাহ্যতে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত না হও। যন্ত্র যতকণ অভ্যন্তরের যন্ত্র না হয় ততকণ কর্মে বিরত হইয়া যৌন থাকাই ভাল। বেদ এবং তন্ত্র দুই যন্ত্র যন্ত্র। বেদান্তের প্রচার এবং প্রসারতা তুমি নির্দিষ্টভাবেই করিতে পার; কিন্তু তন্ত্র সবদে সাধকের গোপনীয়তা প্রয়োজনীয়।"

তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন, তাহা বৈষ্ণবিক কর্ম। বেদান্তের সাধনায় তিনি স্বয়ং যে স্থানে উঠিয়াছেন, আমাকেও সেই স্থানে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম আমার বিপ্লবী বন্ধুদের নিকট গোপন রাখিয়া আমি তত্ত্বোক্ত কর্মেই সহযাত্রীদের সহিত আগাইয়া চলিলাম। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বিপ্লব-কর্ম হইতে আমি বাহ্যতে নিরস্ত হই, সেই দিকেই আমার পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় মসিয়ে পল রিশার মানাম রিশারের সহিত জাপান যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিলে "আর্য্য" পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আর্য্য পত্রিকার মধ্য দিয়াই বেদ উপনিষদের মূলতত্ত্ব ও ভারতের সাধন-বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাক্ষান্তে প্রচার করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধন কি ভাবে করিবেন, তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিলেন :

"In this review, my new theory of the Veda will appear, as also translation and explanation of the Upanisadas, a series of essays giving my system of Yoga, and a book of Vedantic philosophy (not Shankara's but Vedic Vedanta) giving the Upanisadic foundations of my theory of the ideal life towards which humanity must move."

অর্থাৎ, এই পত্রিকায় বেদ সম্বন্ধে আমার নূতন মত, উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, আমার পদ্ধতি অনুযায়ী বোগের ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও বৈদান্তিক দার্শনিকতা প্রকাশ করিব। (শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ নহে), বৈদিক বৈদ্যন্তই এই কাগজে প্রচারিত হইবে। উপনিষদের ভিত্তিতে আমার এই আদর্শের পথেই মানবজাতি অবধারিত চলিবে। তিনি আরও বলিলেন—

"It will be the intellectual sides of my work for the world."

ইহাই জগতের জন্ত আমার জ্ঞানমূলক কর্মের দিক।

আর্য্য পত্রিকা প্রকাশের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে আমার লিখিলেন। আমি সাধ্যমত কিছু অর্থ তাঁহাকে

প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ চিরদিনই অর্থো দিক দেখিয়া চলিতেন। তাই আবার লিখিলেন—

"We shall have a sound financial foundation to start with."

পত্রিকাখানি তিনি ইংরেজী ভাষায় ১০০০ হাজার কপি এবং ফরাসী ভাষায় ৫০০ কপি প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার হিসাব মত বার্ষিক ৬ টাকা হারে ফরাসী ও ইংরেজী সংস্করণ মিলিয়া অন্ততঃ ৪০০ কপি সংগ্রাহক যদি স্থির হয় তাহা হইলে ২৪০০ শত টাকার কাগজ বাহির করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে। এই অবস্থায় আমি কত গ্রাহক করিতে পারি, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি দুই শত কপি আর্থ্য বাংলাদেশে বাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব, জানাইলাম। তদুত্তরে তিনি পুনরায় লিখিলেন—

"As to the review, I do not think we can dispense with the 200 subscribers whom you promise. The difficulty only is that, if there are political suspects amongst them, it will give the police a handle for connecting politics and the review and their frightening the public."

অর্থাৎ, তুমি পত্রিকার জন্য যে ২০০ জন গ্রাহক করিতে চাহিতেছ, তাহা আমি নাকচ করিতে চাহি না। মুশকিল এই যে, তাহাদের মধ্যে যদি সন্দেহভাজন রাজনৈতিক থাকে, তাহা হইলে পুলিশ এই পত্রিকার সহিত রাজনীতিক জড়াইয়া সর্বসাধারণের মধ্যে পত্রিকা সঞ্চর্ষে ভীতি-সঞ্চার করিবে।

"There should be no entanglement of this review in Indian politics or a false association created by the police, finding it in the house of some political suspects they search."

অর্থাৎ, ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সহিত এই পত্রিকার কোন সংশ্লিষ্ট না থাকে, অথবা পুলিশ এরূপ মিথ্যা সংশ্লিষ্ট না করে, ইহা বাঞ্ছনীয়। সন্দেহভাজন রাজনৈতিকদের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া এই পত্রিকা পাওয়া গেলে এইরূপ সংশ্লিষ্ট স্বষ্টি করা সম্ভব।

‘আর্থ্য’ সঞ্চর্ষে আমার এত সতর্ক করিতেন এইজন্য যে, আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে যখন মিশিতাম, তখন তাঁহার কথায় প্রচার করিতাম। তৎকালে তাঁহার লিখিত, "Yoga and its objects" এবং ‘যোগিক সাধন’ আদালতে বিপ্লবীদের বিচারকালে বহু সময় উপস্থিত করা হইত। শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণের মন্ত্র এই ব্লগে আমি বিপ্লবীদের মধ্যেই প্রচার করিতাম। আমি যে ২০০ কপি আর্থ্য প্রচারের ভার লইব বলিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হইবে, ইহা বুঝিয়াই

তিনি আরও লিখিলেন, "রাজনীতি এবং পত্রিকা একসঙ্গে থাকিলে জনসাধারণ ভয় পাইবে।" তিনি এই কথা বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আরও লিখিলেন, "তুমি যে গ্রাহক সংগ্রহ করিবে, তাহারা যেন mainly interested in Yoga—তাহারা যেন কেবলমাত্র যোগেরই অন্বেষণী হয়। রাষ্ট্রচিন্তা তাহারা যেন পরিত্যাগ করে। তাহারা যেন পুলিশের ফাঁদে পড় না দেয়।

God save us from all mysteries except those of Tantric Yoga.

পূর্বেই বলিয়াছি, মসিয়ে পল রিশাবের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বিপ্লব-বাদীদের সঙ্গে একপ্রকার সবল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন। আমাকেও তিনি বিপ্লববাদ হইতে অপসৃত করিতে চাহিলেন। আমার প্রতি তাঁর এই অল্পবাপের কারণ, সেই যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে লইয়া সাধনার নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছি সেই স্মৃতি মুছিতে পারেন নাই বলিয়া। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার অপেক্ষা শত সহস্র গুণের মানুষ বাছিরা লইতে পারিতেন। কিন্তু সীমাহীন অল্পবাপের বশেই তিনি আমাকে টানিয়া রাখিলেন। বিপ্লববাদ হইতে কেন তিনি আমায় সরিয়া আসিতে দাবি করেন, তাহা যুক্তি দ্বারা তিনি প্রদর্শন করিলেন। এদিকে কিন্তু-রাসবিহারী বহুর নেতৃত্বে দিল্লী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বৈপ্লবিক সজ্জা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশ তলে তলে সেদিন বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় মুখরিত। এই অবস্থায় ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইলে বাহাদের শ্রীঅরবিন্দের নামে এই কথের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলিব, এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব সেদিন কি ভীষণ ভাবেই আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সঙ্কল্পে অবচলিত। তিনি তাঁহার কল্পনাকে দুই ভাগে ছকিয়া লইয়াছেন। একটি আর্থ্য পত্রিকার মধ্য দিয়া তাঁহার মিশন প্রচার; আর একটি তাঁর ভাষণ—

"The second part of my work is the practical, consisting in the practice of yoga, by an ever increasing number of young men all over Country."

এইজন্য তিনি পুণাতন তত্ত্বের প্রবাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া ম্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন—

"Do not let any add to it by associating Vedanta and Tantra together in an inexpressible fashion."

অর্থাৎ, বেদান্ত ও তত্ত্বকে যেন দুর্বোধ্য ভাবে একত্র জড়াইয়া ফেলা না হয়। তিনি আরও বলিলেন, তাত্ত্বিক কথের কেত্র অতি অগ্রগত, কিন্তু বেদান্ত এমন

এক বস্তু, বাহার ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত এবং সকল প্রকার মানুষই বহু ধারায় ইহা প্রকাশ করিতে পারিবে। অরণ্যখিও তত্ত্ব বেদান্তের মত নহে। তত্ত্বের দ্বারা বস্তুতাত্ত্বিক জয়লাভ হয়। যদিও বর্তমানে ইহা ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত না হইয়া বাহ্যতে মানবজাতিই বোগলাভের সুযোগ পায়, তদুপায়ী পরিচালিত হইতেছে, তবুও আমার প্রার্থ—এই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কৰ্ম করিলে তুমি কি মনে কর আমাদের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? আমার মনে হয়, ইহা সম্ভব নহে। কারণ প্রথমতঃ, পুরাতন তত্ত্ববাদ বিকল্পভাবে ক্রিয়ানীল হওয়ার মনুষ্য-জাতির উদ্দেশ্যসাধনে আর সহায় হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নূতন তত্ত্ববাদ গোড়ায় বিতর্ক ভাবে আরম্ভ হইয়া কতকটা কৃতকার্য হইলেও, পুরাতন অহঙ্কারের জের ইহার গতিকে দৃষ্টি করিতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন অবাহিত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার বিকৃতি ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর বহু কৰ্মসিদ্ধির আশা একেবারেই ব্যাহত হইতেছে। অতএব আমাদের কার্য এখন এক নূতন পর্ধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পর্ধ্যায়ে আমাদের প্রয়োজন—অতঃপর পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এমন ভাবে প্রস্তুত হওয়া বাহ্যতে কৰ্ম ভাগবত শক্তির উপর অন্ধ নির্ভরতায় হাতড়াইয়া না চলিয়া পূর্ণ চেতনার সহিত অগ্রসর হয়। অতঃপর কৰ্ম হইবে ব্যর্থতা অথবা ভুলভ্রান্তিমুক্ত হইয়া নিছক ভাগবত প্রেরণারই প্রকাশ।

“... with the full divine power working out its will conserved in its instrument.”

কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সিদ্ধ হইবে? ইহার জন্য চাই ভারতবর্ষে অন্ততঃ এমন একজন মানুষ, বাহার ভিতর দিয়া ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে। আমি দেখিতেছি আমার মধ্যেই এই শক্তি পূর্ণ সংবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে; অথচ এই গতির সংবেগ নির্ভর করিতেছে কতকটা আমার শরীর-মনের অন্তর্ভুক্তা দূরীকরণের উপর এবং কতকটা আমার বন্ধুবর্গ ও উত্তর-সাধকদের দোষ-ত্রুটিগুলির বিত্ত্বতা সম্পাদনের উপর। আমাকে অধ্যাত্ম-ভাবে এই সকলই বহন করিতে হইতেছে। ফলে আমার ক্ষত উন্নতিও ব্যাহত হইতেছে। সুতরাং বর্তমান পর্ধ্যায়ে সিদ্ধ হইবার জন্য অন্ততঃ কিছু সময় আমার প্রয়োজন। ইহা সিদ্ধ হইলে বাকীগুলি অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। অন্যথায় যে বীজ লইয়া আমরা বোগপথে অগ্রসর হইতেছি তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইবে, অথবা খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হইবে। এইজন্যই আমি যে তোমাকে বিপ্লবের কৰ্ম

হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি, তাহার প্রথম কারণ ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নহে—

That is the first reason why I call you a *Halt*!

ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণবশতঃ আমি বিপ্লবের কৰ্ম থামাইতে চাহিতেছি। তাহা হইতেছে—

“Others should receive the same power and light. In the measure that mine grows, theirs also will increase in power provided always they do not separate themselves from me by the *ahankar*.”

অর্থাৎ, আমি চাহি আমার মতই শক্তি এবং আলো সকলে লাভ করুক। আমার মধ্যে শক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, যদি তাহারা অহঙ্কারবশতঃ আমা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও তদনুরূপ শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন শক্তিশালী সংহতি গড়িতে চাহিয়াছিলেন যে, সংহতি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের মুক্তি আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন,

“The power that is developing, if it reaches consummation, will be able to accomplish its effects automatically by any method chosen.”

অর্থাৎ, যে শক্তি আমি অর্জন করিতেছি, যদি পূর্ণতা লাভ করে, তবে তাহা যে-কোন নির্দিষ্ট পথেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে কার্যক্ষম হইবে।

পূর্বে যে বৈপ্লবিক কৰ্ম গৃহীত হইয়াছিল, তাহা তিনি শেষ হইয়াছে ধরিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নূতন করিয়া কৰ্ম আরম্ভ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য যত্নের অধেষণে এই সময়ে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাকৃত শক্তির প্রবল বিমোহিতায় তিনি যে এই পরমাশক্তিকে আয়ত্ত করিবার পথে সর্বতোভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না, তাহা অতিশয় চিন্তার সহিত অনুভব করিতেছিলেন। বিশেষভাবে আমাদের কৰ্মকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলেন—

“It is specially in the field to which your *kriyas* have belonged and kindred fields that they are still too strong for me.”

আমাদের কৰ্ম তাহার নিকট অতিশয় বেদনাদায়ক বোধ হইল। তিনি চাহিয়াছিলেন সর্বপ্রকার সংশয়মুক্ত হইয়া বাহ্যতে আমি দাঁড়াইতে পারি। তিনি মনে করিতেন, যে শক্তি তাহার মধ্যে অর্জিত হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বকে প্রসূত করিবে। এই শক্তি তিনি আমার মধ্যে ও আরও কয়েক জনের মধ্যে সঞ্চার করিয়া একটি শক্তিশালী

অধ্যাত্ম-বেশ গড়িয়া তুলিবেন এবং এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কাণ্ড করিবেন—তখনই কার্য ক্রম ও সার্থক ভাবে সম্পন্ন হইবে,

"Then a rapid and successful *kriya* can be attempted."

কত ব্যথা ও দরদের সহিত তিনি বাঙালীকে যন্ত্র করিয়া তাঁহার অজ্ঞিত যোগশক্তির সাহায্যে কণ্ঠ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সেদিন সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেরণায় আতি উৎসুক হইবে, এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

লিভিংষ্টোন

ঐআদিনাথ সেন

প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজারেরও অধিকসংখ্যক লোক ফটলডের বাণিজ্যকেন্দ্র গ্রাসগো শহর হইতে সাত মাইল দূরবর্তী স্ট্রাক্টার পল্লীতে ডেভিড লিভিংষ্টোনের জন্মস্থান দেখিতে গিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। লিভিংষ্টোন ছিলেন এক জন স্বাধীনতা, জনকল্যাণকারী কর্তৃক আদর্শ পুরুষ। তাঁহার তার প্রেত ব্যক্তি তবু ফটলড কেন যে-কোন দেশেই বিরল। তাঁহার কর্মজর জীবনের কৃতিসমূহ স্মরণ করিয়া ফটলডের অধিবাসীরা আকণ্ড অহুপ্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। বাহারা অহুসন্ধানী পর্য্যটক বা অগ্রগামী হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহৃদয় প্রসাধনের সহায়তা করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্ততম।

ব্রিটেইনে বসবাস করা বহু আশাসনাধ্য। জীবনযাপন সহজসাধ্য তইলে সাধারণতঃ জীবনযাত্রার রাস উন্নয়নের চেষ্টার প্রেরণার অভাব হয়, যেমন আমাদের ঐশ্বর্যপ্রাধান্য দেশে আবহাওয়া, লোকদের অভিনি-সংস্কারপরাগতা, সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শ ইত্যাদি আমাদের বাঁচিয়া থাকাকে সহজ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বিলাতের অবস্থা অত্যন্ত হওয়ার সেবাসংস্কার লোকদের কর্তৃক ও শক্তিশালী হইতে হইয়াছে। ব্রিটেইনের প্রতিকূল অবস্থার নিমিত্ত, অথবা বৈধ বা অবৈধভাবে নির্ধারিত দেশত্যাগী অনেককে অষ্ট্রেলিয়ার অপরাধীনিবাস বা আমেরিকার 'সিউরিটিয়ান' উপনিবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ব্রিটেইনের অনেক সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

অসংখ্য অনেক বর্ণপ্রচার ও সভ্যতা বিস্তারের অঙ্ক-হাতে বিভিন্ন দেশে আবিপত্য-স্থাপন, বাণিজ্যবিস্তার ও পথোক্তভাবে শোষণের ব্যবস্থা করিয়া ব্রিটেইনের স্বাধীনতার সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ স্বাধীনতাবিশেষতঃ স্বাধীনতার উন্নতি-করে আত্মত্যাগিক অগ্রগতিককে বাহ্যত করা বা অত ব্যক্তির অনিষ্টসাধন বর্জন্যে বিধেয় অপেক্ষ অপাতির কারণ হইয়া থাকিয়াছে। নিজের ব্যক্তির উন্নতির চেষ্টা অতীব প্রাথমিক,

সম্পন্ন নাই। কিন্তু ইহাতে যদি অতের অপকার না হইয়া উপকার হয় তবেই তাহা প্রাথমিক। এই নীতির অহুসরণ



লিভিংষ্টোন

করিয়াছিলেন বলিয়াই লিভিংষ্টোন সমগ্র পৃথিবীর প্রভাব পাত্র। অসংখ্য বোর হারিডোরের সহিত সংগ্রামে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু ভগবানের উপর অশ্রাব বিশ্বাস রাখিয়া এই দেশপ্রেরিত অভিযাত্রার প্রতিরোধে এবং নিরীহ নিম্প্রবিত্ত মানবের কল্যাণচেষ্টার, হুঃ, কষ্ট, আপদ, বিপদ, ব্যাধি, এমন কি বহু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া কর্তব্য পালনের অত্যাশ্রয় দুঃখ রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঃ লিভিংষ্টোনের পূর্বপুরুষেরা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অতিষ্ঠ ছিলেন। কালক্রমে ইংল্যান্ড স্বাধীনতা-সংগ্রামে অতিষ্ঠ ছিলেন।

পশ্চিমের উচ্চভূমি হইতে সমতলে নামিয়া আসেন এবং ১৭১১ সনে স্নাট্টারারে পৌছেন। লিভিংষ্টোনের মাতুল



স্নাট্টারারে এই বাড়ীতে লিভিংষ্টোন জন্মগ্রহণ করেন

বিশিষ্ট বর্ণনাপ্রদায়ক ছিলেন। ১৮১৩ সনে লিভিংষ্টোনের জন্ম হয়। তাঁহার চরিত্রে মাতুল ও পিতৃকুল উভয় দিক হইতে দৃঢ়তা, তেজবিতা বর্ণন্য ইত্যাদির সমাবেশ হইয়াছিল। অল্পবয়সে দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহাকে কারখানার কাছে চুকিতে হয়। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও পতীর মাজি পর্য্যন্ত তিনি পার্শে নিম্নত থাকিতেন।

বহু কষ্টে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লিভিংষ্টোন ভৎসাহাঘো গ্রামপোতে চিকিৎসা বিদ্যা শিখা করেন এবং সেই সঙ্গে বর্ণপ্রচারের কালের জন্ম প্রস্তুত হন। কিন্তু কার্য্যভঃ কোন চেষ্টাই সাফল্যবশিত হইল না। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রচার-কার্য্যে বাইবার জন্ম তাঁহার জন্মের প্রবল বাসনা করে। সৌভাগ্যক্রমে তৎকাল উপনিবেশিক ডাঃ মোকাটের সহিত দেখা হওয়ার, তাঁহারই আহ্বানক্রমে লিভিংষ্টোন আফ্রিকার উত্তরদিকস্থ উপনিবেশ জুর্জামানে গিয়া পৌছেন (১৮৪১ সন)। আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তের উপনিবেশগুলি অপেক্ষা উত্তর দিকে প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন অধিক মনে হওয়ার, ক্রমে ক্রমে

উত্তরাতিথেয়ে অগ্রসর হইয়া তিনি চার বৎসর উক্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। ভৌগোলিক আবিষ্কার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তিনি বর্ণপ্রচারের সুযোগ অবহেলা করিতেন না। ১৮৪৪ সনে তিনি ডাঃ মোকাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে তখন কালাহারী মরুভূমির উত্তর প্রদেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহার ত্রীও সময় সময় বাহীর সন্নিধি হইতেন।

একসময় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে লিভিংষ্টোন স্নাট্টারারে ফিরিয়া আসেন।

ভোগ করেন। অতঃপর তিনি পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া লিভিংষ্টোন নামক স্থানে গিয়া পৌছেন। এই সময় তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৫৪ সনে বিপৎসমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া কাৎসেসী নদীর উপত্যকা হইয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পূর্বাঙ্গ উপনিবেশ লোন্ডোনেতে গিয়া পৌছেন। এখানে শরীর সারিয়া উঠিলে পুনরায় নুতন দেশ আবিষ্কারের নিমিত্ত সমলবলে পূর্বাতিথেয়ে যত্ননা হইলেন। নামা বিপদ-আপদের ভিতর দিয়া কাৎসেসী হইয়া তিনি লিলির টিতে করিয়া আসিলেন। ইহার অনতি কাল পরে কাৎসেসী উপত্যকা বহিরা অগ্রসর হইয়া উত্তরে অবস্থিত একটি বিরাট জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। ইহাই ভিক্টোরিয়া ফলস নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ৪০০০ মাইল পথের মধ্যে বৈদ্যুত তাপই পদক্ষেপে অতিক্রম করিয়া লিভিংষ্টোন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে হইতে পূর্বা উপকূলে আসিয়া পৌছেন। লিভিংষ্টোন ১৮৫৬ সনে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই অভিযানে তিনি বাসপ্রথা বিলোপ করিবার জন্ম প্রাপ-পণ চেষ্টা করেন। তখনকার দিনে আরব ও পূর্বাঙ্গ ব্যবসায়ি-গণ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া



লিভিংষ্টোনের সাহসের পরিচয়ের মডেল—বিপ্লবের বহু হাতে
লিভিংষ্টোন শত্রুদের সখ্যবান

নিষ্ঠুর ভাবে বাহকের কান করা হইত। স্থানীয় লোকেরা সন্দেহ করিয়া প্রথমে লিভিংষ্টোনের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করিত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিত সত্যকৃত্যে পরিচিত হইবার পর কোন কোন দলপতি ও তাহাদের অহুতবর্ণ অবাচিতভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে এবং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ও লক্ষ্যলক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয়।

যেহেতু বিদ্যিয়া লিভিংষ্টোন তাঁহার এই পন্থার-বোধ

বৎসরব্যাপী জমগড়ভাঙ প্রকাশিত করেন। ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি বিপুল ব্যাভিলাভ করেন। অল্পদিন পরিবারবর্গের সহিত আমনে কাটিলে পর লিভিংষ্টোন গবর্ণমেন্টের ভরক হইতে কল্যাণ নিযুক্ত হইয়া আবেদনী নদী ও তাহার শাখাশাখা আবিষ্কারের জন্ত প্রেরিত হন। লিভিং-ষ্টোনেরই আবেদনের ফলে অমতকাল পরেই বিলাত হইতে বিশপ ন্যাকেক্সিয় অধীনে আর একটি অভিযাত্রী দল প্রেরিত হয়। ইহাদের অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া লিভিংষ্টোন ভার্সাস ব্রুদের নিকে পর্ষাটনে যান। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বিশপ ও তাঁহার অনুচরেরা সকলেই অরে মারা গিয়াছে। এই সময়ে অসুখে ভুগিয়া তাঁহার জী গভাস হন। লিভিংষ্টোন নিকেও অরে ভুগিয়া ভুগিয়া হুফল হইয়া পড়েন। এইবার তিনি কাজের মেশার একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। এই সময়েই ভার্সাস ব্রুদ আবিষ্কৃত হয়



মরার দৃষ্টান্তের মডেল—আরব-ব্যবসায়ীর হাত হইতে লিভিংষ্টোন কর্তৃক একদল ক্রীতদাসের উদ্ধারসাধন

এবং ঐ অঞ্চলই দাসপ্রথার কেন্দ্রস্থল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ভার্সাস ব্রুদে একটি জাহাজ রাখিতে পারিলে দাসপ্রথার বিলোপে সহায়তা হইবে, এই বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নিকের ধরচে গ্রাম সর্বাঙ্গ হইয়া লিভিংষ্টোন সমুদ্রের উপকূলে একটি জাহাজ সংগ্রহ করেন, কিন্তু সেটিকে হস্তর জলপথে কোম-প্রকাণ্ডেই ভার্সাস ব্রুদে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। পাছে পর্জুইকদের হাত পড়ে, এই আশঙ্কায় লিভিংষ্টোন উক্ত জাহাজ নিকেই চালাইয়া ২৫০০ মাইল সমুদ্রপথ পার হইয়া বোম্বাইয়ের উপস্থিত হন। এখানে বঙ্গমূল্যে জাহাজটি বিক্রয় করেন এবং এখান হইতেই বিলাতে প্রত্যাপন্ন করেন।

এই দ্বিতীয় জমগড়ভাঙ প্রকাশিত করিবার অল্পকাল পরেই নীল নদীর উপত্যকায় আবিষ্কারের জন্ত রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির আনুকূল্যে লিভিংষ্টোন পুনরায় আফ্রিকায় যান। বেষ্ট সরকারী সাহায্য না পাওয়ার তাঁহার বাল্যবহু মিঃ কেলী ও বোম্বাইয়ের বহুবর্ণ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করেন। সাত বৎসরব্যাপী অভিযানের অবসান হয় তাঁহার স্বভ্রাতৃ। প্রথমে কয়েক বৎসর তাঁহার কোম ধবন না পাইয়া লোকের

ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি নিরুচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। অবশেষে আমেরিকা হইতে প্রেরিত ঠান্ডি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু লিভিংষ্টোনকে কিরাইরা আমিতে তিনি সন্মম হন নাই। লিভিংষ্টোন বলেন যে, তাঁহার কার্য তবৎ ও শেষ হয় নাই। তিনি কিংকাল পরে বাতসভার, ঔষধপত্র, ৫৭ জন বাহক পাঠাইয়া দেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে

টানামাইকা ও ভার্সাস ব্রুদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু হুং-হুগতির মধ্যে লিভিংষ্টোনের দিন কাটিতে থাকে। অবশেষে ১৮৭০ সনে তিনি মারা যান। মরাস ঔষধ দ্বারা রক্ষিত তাঁহার স্বভ্রাতৃ সমুদ্রোপকূলে আনা তর এবং তথা হইতে বিলাতে ওয়েষ্টমিনস্টার এবেতে সমাহিত হয়।

লিভিংষ্টোনের জন্মগৃহে তাঁহার সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত বহু জব্য আহৃত হইয়া সমস্তে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা বহু কক্ষে বিভক্ত। একটি কামরার আছে তাঁহার পূর্ণ-পুরুষদের ব্যবহৃত জব্যাদি। আর একটি কক্ষে আছে লিভিং-ষ্টোনের লাইব্রেরী, হস্তলিপি, চিত্রপত্রাদি।

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক লিভিংষ্টোন গ্যালারি, বাহাতে ছবি ও মডেলের (টারো) সাহায্যে তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেরণা, সত্য, তত্ত্ব, সাহস, দয়া, ভ্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং উৎসর্গ এই সব নামাঙ্কিত মডেলসমূহ আনুষঙ্গিক পটভূমিকার উপরূপে আলোকসম্পাতে সুপরিষ্কৃত হইয়া সকলের বিনয় ও প্রমত্ত উত্তরক করে।



রাজনগর ঈননীমাধব চৌধুরী

১২

সেই দিন বিকালের দিকে সতীম হরিমারাগণের কাছে বিদায় চাহিল। জীবানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হরি-
মারাগণ ও জীবানন্দ উভয়েই আপত্তি করিয়া বলিলেন—বিয়ের
দিন স্থির হয়েছে। আর চার দিন পরে বিয়ে। বিয়েটা
হয়ে গেলে যেও।

সতীম বলিল—আমার অন্তরী কাজ আছে, মইলে থেকে
যেতাম। আপনাদের কাছে একটু থুনেই বলছি। আমার
শুরুষেবের আশ্রম মহারাষ্ট্রে। আজ হর-সাত বছর পরে
সেখানে আমার কাজ পড়েছে। আমার এখানকার কাজ এক-
রকম শেষ হয়েছে। শীঘ্রই বাংলার আন্দোলন শূভম পথ
ধরবে। আমি শূভম কার্যক্ষেত্রের লক্ষ্য করছিলাম এমন
সময় চাক এল। আর ঘের করতে পারছি না। ছুটি মিরেছি
বটে, কিন্তু চাকরি-হলে কিরে আসতে পারব কিনা জানিমে।
যাবার আগে একবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলাম।
দেখুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, ইজেকে বেধে গেলাম।

হরিমারাগণ বলিলেন—অবিস্মৃতে কি করবে স্থির করের ?

সতীম বলিল—কিছু দিন আগে স্থির করেছিলাম, কোম
কারাগার একটা আশ্রম গড়ে দেশের অপিক্তি জনসাধারণের
মধ্যে শুরুষেবের আশ্রম অর্থাৎ বাণীম ভারতের আশ্রম প্রচার
করব। কিছু অর্থসংগ্রহও করেছিলাম। এই কাজ আপাততঃ
বন্ধ বেধে মহারাষ্ট্রে যাছি।

হরিমারাগণ বলিলেন—তোমার লোকশিক্ষার আশ্রম
প্রতিষ্ঠা করা স্থির হলে অর্থের প্রয়োজন হবে। আমাকে
একটু জানিতও তখন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

সতীম বলিল—প্রয়োজন হলে জানাব। আপনারা ইজের
অন্ত উদ্বিগ্ন হবেম না। আমি তাকে এমন কাজ দিয়ে যাব
যাতে তার মনের চাকল্য দূর হয়।

কিছুকণ পরে মাঠার বতীম বাবু সতীমের সঙ্গে দেখা
করিবার কত আদিলেন। ইজেকে ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া
সতীম পথে বাহির হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার দুয়লী
বিলের ধারে মাঠের দিকে চলিল। মাঠে পৌঁছিয়া এক
কারাগার বাংলার উপর সকলে বলিল। ইজ বতীমবাবু বাতা-
খানি বাহির করিয়া উদ্ভত অশ্রুগুলি পড়িয়া শুমাইল। পড়া
শেষ হইলে সে সতীমকে বলিল—মনে হচ্ছে একটা পথের
ইন্দিব আছে, কিন্তু হাতে-কলমে কি ভাবে কাজ করতে হবে
স্থূত্রে পারছি বে। মনটাও সার মিছে না।

উচ্চিভলি শুনিয়া সতীম ঘেঁষিল যে, এতলিতে তাহার

লোকশিক্ষা-আশ্রমের আশ্রমের সমর্থন রহিয়াছে। আশ্রমের
আশ্রম ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করিয়া সে একখানি পুস্তিকা রচনা
করিয়াছিল, উহা ছাপাইবার সময় হয় নাই। সে মনে মনে
স্থির করিয়াছিল এই পুস্তিকাখানি ইজেকে দিয়া বাইবে। মন-
শক্তি, হিতবাহী প্রকৃতি পত্রিকার মতব্য শুনিয়া তাহার সময়
আরও দৃঢ় হইল। সে নিজের মনে বলিল, এই পথই ইজের
উপযুক্ত পথ। ইজের হাতেই তাহার আশ্রমের কার্যকারিতার
পত্রীকা হোক।

নিজের চিন্তার অনুসরণ করিয়া কতকটা মেন বগতোজির
মত ইজ বলিল, মতব্যগুলিতে লোকসেবার আশ্রম প্রচার করা
হয়েছে মনে হচ্ছে। লোকসেবা এর আগে কিছু কিছু
করেছি। বঙ্গেশী আন্দোলনের ম'কালাকি সময়ে বেধেছি,
বাংলার কল্যাণ করতে গিয়েছি তাহাই পুলিশের কাছে গোপনে
ধর দিই বঙ্গেশীওতালাদের ধরিয়ে দিগেছে। লাঠি-সতকি-
বেলা, জিন্দাষ্টকের বরাবর রেওরাজ ছিল রাজনগরে। আজ
এমন অবস্থা হয়েছে যে পাঁচটা মেলেকে একজ লাঠি খেলতে
মেখেলে পাঁচের কতকগুলো কিলেচল লোক শিট শিট করে চেয়ে
বেধে, তার পর পায়ে পায়ে বামার ধর দিতে রওনা হয়।
এধের অন্য কিছু করতে ইজে হয় না, করেও কোম লাভ
নেই।

ধীর ভাবে সতীম ইজের কথা শুনি। তার পর ইজকে
প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে গিয়া বলিল, অত হতাশ হলে চলবে না
য়ে। বঙ্গেশী আন্দোলন দেশে একটা প্রবল বন্যা এমেছিল।
যারা দেশের মুক্তির জন্য আগে থেকে কাজ করছিল তারা এই
ভাবের বন্যাকে কাজে লাগাবার জন্য দেশের জনসাধারণকে
মুক্তি আন্দোলনের সমর্থকরূপে পাবার চেষ্টা করল। সে চেষ্টা
সকল হ'ল না। মুসলমানরা তকাতে সরে গেল। তারতবর্ধের
মাত্র কয়েকটি প্রদেশে লাভ। আগল, অতাত প্রদেশের লোকেরা
বঙ্গেশী আন্দোলন ও তার বাণীকে উপেক্ষা করল, দেশপ্রেম ও
জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের কাছে শূভম ও অযোগ্য জিনিস
বলে মনে হ'ল। তারা ভাবল সমস্ত জিনিসটা বাঙালীর নিজের
সমতা মাত্র। সরকার বাহায্য খোশখোরালে বাংলা ভেঙে দুই
খণ্ড করেছেন, তা মেনে না নিয়ে বাঙালীরা অন্য প্রদেশ-
গুলোকে বলে টানতে চাইছে। তারা এগোল না। কলে এত
বড় আন্দোলনের বার আমা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বেধে আমা-
দের মধ্যে এক হল দেশপ্রেমিক যুবক একটা। অপরিসর কিন্তু
বিপরাক্ষম পথে পা বাতাতে এগিয়েছে। তাদের প্রকৃত উদ্বেষ্ট
মতপাত নয়, তারা চার আত্মাহুতি দিয়ে বঙ্গেশবাসীর উপা-

সীমতা হু করত। তারা বেশগ্রেদের আঙনে পুতে সরহে বেবে মোহপ্রভ বেশের লোক এসিয়ে আসবে এই তাহের আশা।

সতীম একটু খামিয়া ইজের বুকের বিকে চাতিয়া একটু হালিল। ইজ মাথা মীচু করিয়া তাহার কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সতীম বলিল, আমার কথা বুঝতে পারহিস তাই? না ইয়ালি বলে মনে হচ্ছে? আসল কথা কি জানিস, বদেখী আন্দোলনের কলে আমরা খামিকটা এসিয়েছি, মৃতদ বে 'এক্সপেরিয়েন্ট' (পরীক্ষা) হতে চলছে সেটা জাতিকে আরও খামিকটা এসিয়ে দেবে আশা করছি আমরা। আমাদের সরকার বেশের লোকের সহায়ত্বিত ও সমর্থন পাওয়া। এখন্য তাদের মধ্যে খামিকটা রাজনৈতিক চেতনা আগাতে হবে। কি উপায়ে সেটা করা যেতে পারে তার নানা রকম এক্সপেরিয়েন্ট করতে হবে।

ইজ খুঁচলিয়া বলিল, কি রকম এক্সপেরিয়েন্ট?

সতীম সরহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আমি তোকে যে মোট বইখানা দিচ্ছি তাতে সে কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বদেখী আন্দোলনের আগে আমার বা করবার ছিল করেছি, আন্দোলনের সময়ও করেছি। তার পর, মৃতদ উপার সবচে আমাদের হেলেরা যে পরীক্ষা করতে চলছে তার সম্পর্কে আমার যেটুকু সাব্য তা করতে কনুর করি নি। এখন আমি অন্য পথে পা বাড়িয়েছি। অন্য পথ মানে মৃতদ কার্যকরের অহসন্ধান। তুই তোর অবস্থা ও সাধারণত কাজ কর।

সতীম বাবুর বাতা থেকে ঐ অংশগুলো কপি করে রাখে। আমি তোকে যে মোট বই দিলাম তাতে লোকশিকার আদর্শ হাতেকলমে কিভাবে কাজে পরিণত করতে হবে সে সবচে বিস্তারিত নির্দেশ পাবি। কিছু দিন কাজ করে দেখ। বহি আভরিকভাবে ষ্ট্রিকমত কাজ করতে পারিস মনে কোন কোত থাকবে না। এত বড় কর্তব্য আমাদের সামনে রয়েছে যে তার বটুকু সাব্য তাই করে বাওয়া হাতা আর উপার কি?

আরও কিছুকণ আলোচনা চলিল। অবশেষে দু'খা অভ ঘাইতেছে দেখিয়া সতীম বলিল, চল, এবার ওঠা দাক। আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইজের একান্ত অহুরোব সত্ত্বেও সতীম থাকিতে রাজী হইল না। হরিদারায়ণ ও জীবামন্দের কাছে সতীম বতখানি বলিয়াছিল তাহা অপেক্ষা আরও একটু বিস্তারিতভাবে নিজের উদ্দেশ্যের কথা ইজের নিকট বলিতে হইল। সব কথা শুনিয়া ইজ আর বাধা দিতে পারিল না। শুধু বলিল, দেখু দেই, আপনিত চল, গেলেন, প্রয়োজন হলে কার কাছে পরামর্শ চাইব?

সতীম সরহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া হাসিয়া বলিল,

পরামর্শের অভ খুব ভাল লোক পাছ তাই, ভাবনা কি? তুনি আমার লক্ষীবিধির পুরো পরিচর এখনও পাও নি।

একটু গভীর হইয়া বলিল, কোন দিন ওকে অবদার করো না, ওর মনে দুঃখ দিও না তাই।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া সতীম চলিয়া গেল। বাইবার সময় বতীমবাবুকে বলিল, আপনি তৈরি থাকবেন বতীমবাবু, শীঘ্রই আপনাদের ডাক আসতে পারে।

বতীমবাবু বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি।

হরিদারায়ণ ও জীবামন্দের উভয়ের গৃহে বিবাহের হাঙ্গামা। হরিদারায়ণের গৃহ ভগদ্বাজীশ্রুত। তিনি নিকে অনুর, লাঠি বহিয়া কোমরতে একটু-আংটু চলাকরা করেন। জীবামন্দের হেলে বিচারের প্রতীকার বেশ-হাফতে। লক্ষীর বিবাহ উপলক্ষে জীবামন্দের উকিলের হাঙ্গামা বেবাদলকে জানিয়ে খালস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা ম্যাডিস্ট্রেট জানিয়ে আবেদন অগ্রাহ করিয়াছেন।

তুই পরিবারে পরিব্যাপ্ত বিবাহের হাঙ্গামা মধ্যে বতখানি সম্ভব জাঁকজমক বর্জন করিয়া ইজ ও লক্ষীর বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে সকলের অপেক্ষা বেশী উৎসাহ ও আদম্ব চিত্রহীর। লক্ষীকে সে বাস্তবিক নিজের তরীর চেয়েও বেশী ভালবাসিত। তুলো পতিভের ঘরের ঘরে পিতৃগৃহে আসার যত্নহী সম্পূর্ণ সম্ভট হইতে পারে নাই। সে জানিত তাহার ছোট বোন চিত্রহীর পীড়াপীড়িতে অনুর পিতা বাধ্য হইয়া সম্মতি দিয়াছেন। পিতৃবংশের পৌরব এই ভাবে সুর করায় সে চিত্রহীর উপর একটু ক্রুট হইয়াছিল বটে, কিন্তু লক্ষীর প্রতি তাহার মনে বিরূপ ভাব ছিল না। বংশপৌরবের দামতার ক্রটিটুকু হাকিরা দিলে রূপে ভগে সে ইজের বোঁ হইবার উপযুক্ত ঘেবে একথা বলিতেই হইবে।

বিবাহের পর দিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষী বধন বহুবেশে পাকী হইতে তাহারে বাড়ীতে মামিল চিত্রহী তখন ভাড়াভাড়ি গিয়া তাহার গলা জকাইয়া বহিল। তাহার কানে কানে বলিল, তোর শিবপুত্রো সার্থক হ'ল তাই?

বহুবরণ শেব হইলে মৃতদ বৌকে লইয়া সে পিতার ঘরে গেল। বহুরকে প্রণাম করিয়া উঠিল চিত্রহী তাহার মাথার কাপড় সরাইয়া দিল, পিতার পায়ের কাছে হু'জবে পাশাপাশি বসিল। হরিদারায়ণ তুই হাত উত্থের মাথার হাখিরা চোখ বুজিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তার পর বলিলেন, ইজ কোথায় না?

ইজ সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লক্ষী মাথার কাপড় দিতে ঘাইতেছিল, হরিদারায়ণ বলিলেন, থাক না, আমার কাছে তোমাকে মাথার কাপড় দিতে হবে না।

ইহা শিতাকে প্রণাম করিয়া বিছানার এক পাশে বসিল। হরিদারার তাহাকে মাঝার হাত দিয়া শীতবে আশীর্বাদ করিলেন। চিরদী দেবিল এক কোঠা জল পিতার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

পর দিন দুপুরের দিকে জীবামল বরিশাল হইতে উকিলের টেলিগ্রাম পাইয়া জানিলেন যে, দেবানন্দেয় হর মাসের কারা-বন্দের আদেশ হইয়াছে। উকিল লিখিয়াছেন, আপিল করা হইলে তাহাকে যেন টেলিগ্রামে জানানো হয়।

জীবামল তাহাকে টেলিগ্রাম করিলেন, আপিলের প্রয়োজন নাই।

টেলিগ্রামের কথা শ্রীকে জানাইয়া জীবামল বলিলেন, খবরটা বাইরে যেন প্রচার না হয়। ঘরের আত্ম কুলশয্যা। পরে সবাই জানিতে পারবে।

কিন্তু খবর পোপন রহিল না। বাজীতে পিরমকে আসিতে দেখিয়া ও কিছুকণ পরে মাকে কামিতে দেখিয়া আমল ইন্-দেয় বাজীতে গিয়া ইন্ ও তাহার দ্বিধিকে সে সংবাদ দিয়া আসিল। তাহার অজ্ঞান করিল দেবানন্দেয় কোম সংবাদ আসিয়াছে। ইন্ তাড়াতাড়ি জীবামলকে কাছে আসিয়া ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। জীবামলকে বাধ্য হইয়া টেলি-গ্রামের খবর বলিতে হইল। নিজে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন সে কথা আর ইন্কে জানাইলেন না। তিনি তাহাকে বলিলেন, লক্ষীকে আর আর খবরটা জানিও না, সে মন খারাপ করবে।

ইন্ বলিল, সে খবরের জন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে; কি করে তার কাছে পোপন রাখবে?

জীবামল আর কিছু বলিলেন না। জিন্নরনী জানাইকে ভিতরে লইয়া গিয়া কাছে বসাইয়া সাধুনা দিতে লাগিলেন। ইন্ একটু রান হাসিয়া বলিল, আমাকে কি আর বোকাবোন? বিকেলের দিকে গিয়ে ওকে একটু খুঁবিরে আসবেন।

সে চলিয়া গেল।

ইন্ ও লক্ষী ছাড়া দেবানন্দেয় ঘরের খবর ও-বাজীর আর কেহ জানিতে পারিল না।

লক্ষীকে সংবাদ দিয়া ইন্ বাহিরে চলিয়া গেল। দেবু-বার হয় মাস কারাবন্দের সংবাদে তাহার নিজের মন এমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল যে, লক্ষীকে সাধুনা দেওয়ার কথা তাহার মনে রহিল না।

বাজীর বাহির হইয়া হাঁটতে হাঁটতে সে বতীন্দাবুর বাসার উপস্থিত হইল। তাবিল যদি বতীন্দাবুর সঙ্গে কথা-বার্তা বলিয়া মনের ভার কিছু কমানিতে পারে।

বতীন্দাবুর বাসার দিয়া গুলিল, আগের দিন রাতে তিনি হঠাৎ বাহিরে কোথায় গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন কেহ বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল লতীন্দা বতীন্দাবুরকে প্রভুত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,

শ্রী তাহার ডাক আসিতে পারে—ডাক তাহা হইলে আসি-
রাছে?

অনেক বিলম্বে বাজী করিয়া সে মাসেবের সঙ্গে কতকগুলি লক্ষ্মী বৈবরিক ব্যাপারের পরামর্শে ব্যাপৃত হইল। শিতার আদেশে মাসেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বৈবরিক ব্যবস্থাদি সমস্তই এখন তাহাকে করিতে হয়।

এদিকে চিনি দুপুর হইতে দাখার কুল-শয্যার আরোহনে ব্যস্ত। দাখার বিবাহের সকল জিনিস ঘরে তালারত হইয়া পড়িয়া ছিল। ঘর খুলিয়া পুতন বিছানাপত্র বাহির করিয়া বাটে পাড়িল। কুল আমাইয়া বিছানার হুড়াইল। মাসের আলমারী খুলিয়া রূপার কুলদানি, চন্দ্রের বাট, গোলাপপান, আভরদান, রেকাব, গেলান বাহির করিল। গোলাপ জল, আভর, গুণ্ডলের গন্ধ ঘর সুবাসিত; চাপা, গড়দাজ, বেল-কুলের গন্ধে আয়োজিত হইল। রূপার পিলসুকে তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া বাটের পাশে রাখিল। পাথরের টেবিলের উপর রূপার থালায় মিষ্টি সাজাইল, মাসের বাপের বাজীর সোনার পানের তিরা তরিয়া পান রাখিল।

মাসের শাজী ও গহনা দিয়া চিন্নরী লক্ষীকে সাজাইতেছে এমন সময় ছোট ঘেরেকে সঙ্গে লইয়া জিন্নরনী আসিলেন। চিন্নরীর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার আমন হইল। সুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না। তাহাকে ও ঘেরেকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঘরে-জানাইয়ের জন্ত যে পুতন শাজী ও কাপড় আনিয়াছিলেন তাহা চিন্নরীর হাতে দিয়া গেলেন।

লক্ষীকে সাজাইয়া চিন্নরী তাহার চিবুক ধরিয়া সুখবাসি উঠাইল কেমন জানাইয়াছে দেখিবার জন্য। বলিল, আজকার মত দিন আর পাবি না জীবনে। কথাটা মনে রাখিস।

সাজানো শেষ হইলে চিন্নরী লক্ষীর হাত ধরিয়া তাহাকে সুসজ্জিত শরমকে আসিল। ঘরের এক পাশে গদী-কাটা চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া বলিল—এখানে বোস। দাদা এসে হাত ধরে বাটে বসাবে। তুই বোস, আমি দাদাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। কি মজা হবে বল বেবি লক্ষী, দাদা এর কিছু জানে না।

সে লক্ষীর মাঝার কাপড় একটু সরাইয়া দিল। বলিল—অত লজা খোদটা বিস্ না। চুপ করে এখানে বসে থাক। দাদাকে দেখেই গলে বাস্ দি। অনেক খোশামোদ করলে, আদর করলে তবে উঠবি। সুখেহিস্?

ঘর হইতে বাহির হইয়া চিন্নরী দরজা ভেজাইয়া দিল। তারপর বিকে দিয়া ইন্কে ডাকিয়া পাঠাইল। ইন্ উপরে আসিলে চিন্নরী বলিল, আগদি আমার সঙ্গে আসুন। একটু কাক আছে।

ইন্ বলিল—কি কাক রে চিহ্ন যে এমন কথা তলব করেহিস্।

ইজের কত যে দুঃস্থ কাপড় জামা জিনিসদ্বী দিরাহিলেন তাহা দেখাইরা চিন্তা বসিল, এইগুলো পরে কেন লুপ্ত দেখি।

ইজ—কেন রে, হঠাৎ এগুলো পরব কেন ?

চিন্তা—আপনার শাওলী দিয়েছেন আপনাকে পরতে। আজ পরতে হয়।

চিন্তার পীড়াপিড়িতে ইজকে সেগুলি পরিতে হইল।

চিন্তা বসিল, আশ্রম এদিকে।

ইজ চিন্তার সঙ্গে সুসজ্জিত ককে প্রবেশ করিয়া একেবারে অবাক হইল। লক্ষী বসিরাহিল। ইজ ও চিন্তাকে আসিতে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তা বসিল, আজ আপনার কুলশায়া। মনে হইল না বুঝি ? আজ আর ঘর থেকে বেরুতে পাবেন না। আমি শেকল তুলে দিচ্ছি, কাল সকালে তুলে দেব।

ঘর হইতে সে বাহির হইরা গেল।

ইজ বসিল, চিন্তা, একটু শোম এদিকে, ও চিন্তা...

চিন্তা ভক্তকণ বাহিরে আসিয়া দরজার শিকল তুলিয়া দিতে দিতে বসিল, কাল ভক্তকণ ছাড়বে।

ইজ চারদিকে চাহিয়া ঘরের সাজসজ্জা দেখিল। তাবিল তিনি যে এমন চমৎকার সাজাইতে পারে তাহা ত সে জানিত না। তাবিল চিনির সুন্দর রূচি, সুন্দর সাজাইবার হাত। তাহার দৃষ্টি পড়িল লক্ষীর উপর। লক্ষী মাথা হেঁট করিয়া চেয়ারের পাশে দাঁড়াইরাহিল। ইজ দেখিল শাড়ীতে, অলঙ্কারে চন্দ্রে, প্রদীপ্ত রূপে রাধেজয়ীর মত দেখাইতেছে তাহাকে।

ইজ মুখ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশ্যই মৃত্যুকে দাঁড়াইরা থাকিলেও লক্ষী সে দৃষ্টির মাধুর্য্য অনুভব করিল। বীরে বীরে আগাইরা আসিয়া গলায় শাড়ীর আঁচল জড়াইরা হাঁটু গাভিয়া ইজের পারের উপর সে মাথা রাখিল। লক্ষী কতবার তাহাকে প্রণাম করিয়াছে, কিন্তু তাহার আভিকার প্রণতিটি ইজের কাছে অতিমম্ব বলিয়া মনে হইল, বড় ভাল লাগিল। হুই হাত বাড়াইরা তাহাকে বসিয়া উঠাইতেই ইজ দেখিল নবমুখ চোখে অঞ্জুর আভাস।

লক্ষীর চোখে জল দেখিয়া সুসজ্জিত কক, পুষ্পাকীর্ণ শায়া, আভর ও গোলাপজলের স্নিগ্ধ সুবাস অভিক্রম ক্রিয়া ইজের মন উত্তলা হইরা বাহিরের নক্ষত্রবর্তিত আকাশের নীচে, বন অন্ধকারের মধ্যে কোথায় বেদন ছুটিয়া চলিল। তাহার চোখের লম্বুখে আসিয়া উটল কারাগারীর অন্ধকারে, অন্ধকারককের অপরিহার্য পদ্যকপথে হুই আকাশে দীপ্তিমান প্রবতারা দিকে নিভৃত দৃষ্টি স্টিট, শীর্ণ, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আশৈশব পরিচিত এক জানি মুখ।

কঠোর প্রাণে মনের ব্যাকুলতা মম্বন করিয়া ইজ লক্ষীকে বাটে বলাৎরা দিকে তাহার পাশে বসিল। চিন্তুক বসিয়া

তাহার দৃষ্টি নিম্নের দিকে কিরাইরা পরম সান্ত্বনা ও স্নেহের বয়ে সে বসিল—

—তোমার চোখে জল কেন আসি জানি। দেখুনা যেখানে থাকুন, যে অবস্থার থাকুন তাঁর আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। আমি যে তাঁর হাতে পড়া মানুষ লক্ষী।

লক্ষীর চোখের জল উপচাইরা পড়িতে বাহীর মুখে সে মুখ লুকাইল।

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে। জীবানন্দ দরখাস্ত করিয়া ছুটির বেয়াদ বাড়াইরা লইরাহিলেন, সে বেয়াদও শেষ হইরা আসিল। নৃত্য জারগার তাঁহার বদলির আদেশ হইরাছে। দিন চার-পাঁচ আগে হইতে তিনি রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

হরিমারায়ণের শরীর অনেকটা সারিয়া উঠিয়াহিল। তিনি বাহিরে চলাকেন্দ্রা করিতে পাবেন, বৈষয়িক কাজকর্মও কিছু কিছু দেখেন। অগভীর মৃত্যুর পরে সর্দার তাঁহার যে বিমর্ষ ভাব দেখা বাইত তাহা হুই হইরাছে। মুখে একটা তৃপ্তি ও শান্তির ভাব আসিয়াছে। জীবানন্দকে তিনি বলেন, জীব, বোনা আমার সংসারে ত্রী ও শান্তি কিরিয়ে এসেছে। জীবনে যত হুঃখ পেয়েছি তার দাপ মুখ থেকে বীরে বীরে মুছে যাচ্ছে। মাকে মাকে ইচ্ছা হয় আর কিছু দিন যেন বেঁচে থাকি, মাতি মাতমীর মুখ দেখে, তাদের নিয়ে মুখে আল্লাদে করেকটা দিন কাটিয়ে যেন ঘরি।

জীবানন্দের মুখে সন্তোষের হাসি ছুটিয়া উঠে। আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন, আপনি ত ভাল হয়ে উঠেছেন দাদা।

হরিমারায়ণ বলেন, জীব, আমার মনে একটা কোভ রয়েছে দেখুন জ্ঞত। এই রাজলিঙ্গের মাটিতে ওর মত একটা হেলে অথোছে বলে আমার মনে পর্ক ছিল কত। জানি যে হেল থেকে বেরিয়ে ওর মনের গতি কোন্ দিকে যাবে। ও বেরুলে ওকে কলকাতা পাঠিও পড়াশোনা করবার জ্ঞত। একটা উপযুক্ত ঘরের বোঝ করে। কলকাতা পাঠাবার আগে বিয়ে দিবে দিও। এ বহন যে কত শক্ত বহন তা আমার হেলেকে বিয়ে করিয়ে বুঝতে পারছি।

একটা দীর্ঘনিবাস ফেলিয়া হরিমারায়ণ আবার বসিলেন, প্রসন্ন বেয়াদ হুই উঠলে আমার ত্রী তার বিয়ে দিতে বলে-হিলেন। হেলের উজ্জ্বল বতাবে কষ্ট হয়ে আমি লেকবা কানে তুলি নি। হুইত তাঁর কথা শুনলে হেলেরী এভাবে বরহাড়া হুইত না। হেলেও চলে গেল, মনের কষ্টে ত্রীও পত হলেম।

একটু পরে হাসিয়া বসিলেন, ভাল কথা, ইজের সেবকা-প্রদেয় কথা শুনেছ ? অনেকগুলো টাকা আমার করেছে আমার কাছ থেকে—উত্তাপালা, তাকারখানা, লাইট তুল, হেলেরদের আশ্রম, আরও কি লব করবে বলে।

জীবনময় নৃত্যন কর্ণহলে রতন। হইয়া গেলেন। জিনহনী বধন বলিলেন, “তোমার শরীর ভাল নয়, আমিও চলি,” জীবনময় তখন কবাবে বলিয়াছিলেন, আমার পুরোনো ঠাকুর চাকর নিয়ে যাব, অস্থিবে হবে না। তুমি আপাতত এখানে থাক ও-বাড়ীতে লক্ষী একা পড়েছে ছোট নন্দ চলি যাবার পর থেকে। অত লোকজন, কিয়ৎকর্তব্য সব ভাল সামলাতে হয় যেহেতুকে। ছোটো কথা বলবার লোক নেই, হাঁক ছাড়বার অবসর নেই। হাসখানেক পরে তুমি যেক।

জিনহনী তাবিয়া দেখিলেন কথাটা ঠিক। বিয়ে হইয়াই অত বড় সংসারের তার পড়িয়াছে যেনের থাকে, তার উপর অহুহ বস্তর। তিনি হাসখানেক থাকিয়া যাওয়াই হির করলেন।

জীবনময় চলিয়া যাইবার দিন সাতকে পরের কথা।

লক্ষী বালার হুয়ের বাট, কল, মিষ্টি আনিয়া বস্তরকে পাওয়াইতে বলিল। তাহার সকালবেলার আহা। পাওয়া শেষ হইলে সে বাংলা, বাট ও রেকাবি তুলিয়া লইতে-ছিল, হরিনারায়ণ একটু জুতমনকভাবে তাহার কাছ বেধিতে-ছিলেন। লক্ষী বাসনপত্র তুলিয়া লইয়া বর হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, বোমা, ওগুলো আমিহে রেখে একটু বসো। একটা কথা হঠাৎ মনে এল তোমাকে বলি।

লক্ষী বাসনগুলি তাবিয়া বস্তরের পারের কাছে বলিল। হরিনারায়ণ বলিলেন, বোমা, তুমি হেলেনাহব এত বড় সংসারের তার পড়েছে তোমার ওপর। ইজ্ঞও এখন হেলেনাহবই হয়ে গেছে। এই বরগে আমাকেও সংসারের তার কাঁবে নিতে হয়েছিল। আমাকে সাহায্য করেছিলেন তোমার শাক্তী। তিনি সাহায্য না করলে কি হ’ত এই বিবর-লক্ষ্মণের, এই সংসারেরই-বা কি পতি হ’ত ভাবতে পারি না। তোমাকে সেই কাজ করতে হবে বোমা। এই পুরনো বনেদি পরিবারের সব বিধি-ব্যবস্থা যাতে বজায় থাকে, যারা তোমার সুপালকী তারা যাতে সুখ-বাঞ্ছন্য থাকে সেইটে তোমাকে দেখতে হবে।

হঠাৎ বস্তরের সুখে এই বরগের কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেও লক্ষী অবনত মস্তকে তাহার উপদেশ শুনি, বলিল, আমাকে আশীর্বাদ করুন বাবা।

হরিনারায়ণ তাহার মাধার হাত তাবিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করছি না, আশীর্বাদ দিননাওই করছি। আমার বড় আশঙ্ক তুমি আমার বরের লক্ষী হয়েছ।

“লক্ষী তাহাকে প্রণাম করিয়া বাসনগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

জিনহনী পূজা-আহিক সারিয়া উঠিলেন, এইবার রাত্রাঘরে যাইবেন। ইজ্ঞদের বাতীর কি হুকীর না হত-বস্ত হইয়া বাতীর মধ্যে হুকিয়া উঠান হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, অ মা-ঠাকুরাণ, শিশুটির আসেন।

তাহার চীৎকার শুনিয়া জিনহনীর বুকটা বড়াস করিয়া উঠিল। ভাতাভাতি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি হয়েছে যে হুকীর না, অমন করে ডাকহিস কেন?

হুকীর না বলিল, কর্তাব্যব পইক্যা গিয়া ওজান হয়েছেন। আপনি শিশুটির আসেন।

জিনহনী চমকিয়া উঠিলেন। পারে একখান চাকর বড়াইয়া তিনি হুকীর মার সঙ্গে চলিলেন। হুকীর মার সুখে ঘটনা শুনিয়া সুখেতে পারিলেন, হরিনারায়ণ অলমোণ শেষ করিয়া কাহারীবাড়ীর উঠানে পারচারি করিতেছিলেন। তারপর একটু স্নানবোধ করিয়া তাহার ঘরে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ বৈঠকখানা দালানের সিঁড়িতে উঠিবার সময় কিতাবে পা হতকাইয়া সিঁড়ির উপর পড়িয়া যান। পড়নের শব্দ পাইয়া কাহারিঘর হইতে ইজ্ঞ, মারের, পোমতা ছুটিয়া আসিয়া বরা-বরি করিয়া তাহাকে বরে লইয়া আসে। তখন হইতে তাহার জ্ঞান নাই। ডাক্তার ডাকিতে লোক গিয়াছে।

জিনহনী হরিনারায়ণের ঘরে হুকিতে গিয়া দেখিলেন বহু লোক জমা হইয়াছে সেখানে। ডাক্তার হাত বরিয়া মাড়ী পরীক্ষা করিতেছে, ইজ্ঞ পিতার পারের উপর সুখ ভাঁজিয়া আতুল ভাবে কাঁপিতেছে। লক্ষী মাধার কাপড় দিয়া বস্তরকে বাতাস করিতেছে। স্বামী পিতার বুক পূরাতন বি মালিশ করিতেছে। তিনি সুখিলেন, পড়িয়া গিয়া বুক ও মাধার এতও আঘাত লাগিয়াছে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খাপ উঠিতে লাগিল।

বীরে বীরে হরিনারায়ণের জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিতে লাগিল। স্বর্গ্যাভের সময় তাহার আত্মা বেহত্যাগ করিয়া লোকান্তরিতা জীর সঙ্গে মিলিত হইল।

হরিনারায়ণ তাহার জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যে সম্বত রাজনগর ও মধীন রাজনগরের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছিলেন। কাল-প্রভাবে সেই সেতু ভীর্ণ হইয়া করপ্রাণ হইবার উপক্রম হইল। প্রাচীন রাজনগরের ইতিহাসের শেষ পাতার উপর বিদায়-চিহ্ন অঙ্কিত হইল।

কর্মণঃ

নেপালের বৌদ্ধধর্ম

ঐদাশরথি রায়

প্রভু বুদ্ধ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সেই লুম্বিনী উভয় তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চল আজিকার নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নেপাল তরাই নামে আখ্যাত। বর্তমানের নেপাল তরাই অঞ্চলেই প্রভু বুদ্ধ জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ঐষ্টের অধের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের নেপাল উপত্যকার আগমনে, তাঁহার পুণ্যপদস্পর্শে নেপাল যে কতকাল বড়ই হয়েছিল তাহাই বহু, এই সময় হইতেই নেপালের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হয়। অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্র মতে শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্ববর্তী হয় জন্ম বুদ্ধ নেপাল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নেপালের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৌরাণিক কাহিনী রাজ। শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন নেপাল উপত্যকার আগমন করেন তখন ভগ্ন ক্রিয়াভবংশীর রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। ক্রিয়াভবংশীর রাজগণ যদিও হিন্দু ছিলেন তথাপি তৎকালীন ক্রিয়াভ-রাজ জিতেন্দ্রি বোধ্য আভি-ধেয়তা সহকারে প্রভুকে বাগত করেন। নেপাল উপত্যকার লামারা মাঝে যে স্থানে প্রভু বুদ্ধ ব্যাক্রী ভাতক প্রচার করিয়া-ছিলেন ভগ্ন আভিও একটি চৈত্য বিস্তার। প্রভু বুদ্ধ নেপাল উপত্যকার অতি অল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ক্রম সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রচারিত মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া ভগ্নাকার ভাষণ ও ক্রিয় প্রকৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপে নেপালে বৌদ্ধধর্মের যে বীজ তিনি নিক্ষেপে বপন করিয়াছিলেন, তাহা কালে বিরাট মহীক্রে পরিণত হইয়া ভগ্নাকার সহস্র সহস্র লোককে আভিহারাভলে আশ্রয় দান করিয়াছে। ত্রিপিটক হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সমুদয় শাক্যই বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্যাত রাজা বিহুদাত্তের অভ্যাচারে ঐশীকিত হইয়া এই সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাক্যই নেপালের বিভিন্ন ভূগর্ভে পলায়ন করিয়া ভগ্ন আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অধরক্ত এই সকল শাক্যই প্রভুর পরি-নির্বাণলাভের পরও নেপালের জন্মগণের নিকট তাঁহার প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করিতেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণলাভের পরবর্তী কালে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও ভগ্ন ইহার অভ্যুদয় ও পতনের বার-মাসিক ইতিহাস হস্তাশ্রয় এবং পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়। তবে ঐষ্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে যে ঘটনার নেপালে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বিষয় ইতিহাসে বর্ণ-নের লিখিত আছে। এই লালে মহান্ সন্ন্যাসী অশোক নেপাল

পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের অবস্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী প্রথমেই লুম্বিনী তীর্থে গমন করেন। পুণ্যতীর্থ লুম্বিনীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য কুল চন্দন ধূপ ঘূমা গন্ধদ্রব্য ও অত্যন্ত পুষ্পের লাবণ্যী বহন করিয়া চারি দল লৈত সন্ন্যাসীদের সহিত আগমন করিয়াছিল। সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার দীক্ষাভুক্ত তিন উপভূক্ত ও সন্ন্যাসী-কর্তা চারুদত্তীও নেপালে আগমন করেন।



নেপালের লামারা চৈত্য।

এইস্থানে প্রভুবুদ্ধ সর্বপ্রথম ব্যাক্রীভাতক প্রচার করিয়াছিলেন। বরুণপুরাণ-বর্ণিত, সন্ন্যাসীদের লুম্বিনীতীর্থ পরিদর্শন-কাহিনী বড়ই দ্বন্দ্বস্পর্শী। বাহার করুণাকণা লাভ করিয়া চতু-শোক বর্ষাশোক রূপান্তরিত হয় সেই প্রভু বুদ্ধ যেখানে প্রথম পদক্ষেপ করিয়া বরণী পবিত্র করিয়াছিলেন সেই পুণ্যতীর্থ লুম্বিনী পরিদর্শন-কালে অশোকের বিরূপ মনোভাব হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। উভয়ে প্রবেশ করিয়াই উপভুক্ত সঙ্গমে দক্ষিণ বাহ প্রসারণপূর্বক কহিলেন, "মহাসন্ন্যাসী। এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে আমার প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা এই পুণ্যতীর্থে প্রভুর অক্ষর কীর্তি বোধনা করিয়া তুমি এক স্তম্ভ নির্মাণ কর।" ভক্তিসঙ্গত অশোক গুরুর আদেশে তদ্রূপ অধিবাসীদের মধ্যে এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ-পূর্বক ভগ্ন এক স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তদুপায়ে নিয়মিত লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন :

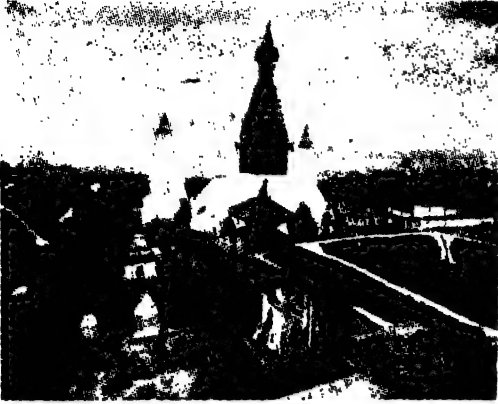
"দেবান পিরেম পিরদসিন লাজিন বিসতি বসাতিনিতেন

"অতম আগাচ মহীরিতে হিব বুধে ভাতে শাক্যমুনীতি

• বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেব দ্বাদশবৎসর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক পদ পা-বিক্রম করেন।

“সিলা বিগড়তি চা কালাপিত সিলাখতে চ উপপাপিতে
 “হিব ভগবৎ জাতেন্তি লুহিনি গাবে উবলিকৈ কটে
 “অট ভাসিরে চ

উৎকীর্ণ সিগির অর্থ : দেবতাদের প্রিয়দর্শী অপোক বিশ
 বংসর অভিবিক্ত হইবার পর এই স্থানে আসিরা পূজা



নেপালের বহুমান্বের বৌদ্ধমন্দির

করিয়াছিলেন, কারণ শাক্যমুনি বুদ্ধ এই স্থানে জন্মগ্রহণ
 করেন। তিনি এই স্থানে একটি অম্বুষ্টিধোমিত প্রস্তর স্থাপন
 করেন এবং একটি শুভ নির্দিষ্ট করান, কারণ ভগবান এই
 স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লুহিনী গ্রামকে কর-
 রতিত করেন এবং (উৎসর জ্যেষ্ঠ) এক-অষ্টমাংশ দিতে
 আদেশ দেন।

সত্রাট অপোক যে কেবল নেপালে ভীর্ণপর্বাটনে আসিরা-
 ছিলেন তাহা নহে, নেপালের বহু অকল তাঁহার বিশাল
 সাক্ষ্যকার অর্জবুজ ভইরাছিল বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক
 মনে করেন। অতএব পৃথিবীর প্রেষ্ঠ বর্ণপ্রচারক সত্রাট
 অপোকের অধীনে নেপালে বৌদ্ধবর্ণের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত
 হইরাছিল তাহা সহজেই অস্তবের। নেপালের বর্তমান রাজ-
 বাদী কাঠমান্ডুর দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় এক কোশ দূরে “পাটন”
 বা “অপোক পাটন” নামক স্থানে অপোক এক রাজবাসী
 প্রতিষ্ঠা করেন। সত্রাট পাটনের কেন্দ্রহলে এক তপ
 নির্দ্বাণ করেন এবং এই কেন্দ্র হুতপের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে
 ও দক্ষিণে একটি করিয়া আরও চারিটি তপ নির্দ্বাণ করাইরা-
 ছিলেন। এই তপ পাটনি আকও বিচরান রহিয়াছে। বৌদ
 বর্ণের প্রচারণের উদ্দেশ্যে মহাসত্রাট তাঁতার কতা চাকু-
 রতীকে পাটনের দেবপাল নামক এক সত্রাভবংশীয় ব্যক্তির
 সহিত বিবাহ বিয়াছিলেন। চাকুরতী পরবর্তীকালে তিব্ব-
 ত্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণপ্রচারের উদ্দেশ্যে
 একটি বৌদ বঠ নির্দ্বাণ করান। চাকুরতী প্রতিষ্ঠিত বৌদ

বিহারটি “চা বাহিল”+ নামে ব্যাত। এইরূপে অপোকের
 মহতী প্রচেষ্টার ফলে নেপালে বৌদ্ধবর্ণ বৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত
 হইল এবং নেপালের তৎকালীন অধিবাসী যেওয়াররা সকলেই
 বৌদ্ধবর্ণ গ্রহণ করিল।

বৌদ্ধবর্ণের যে পৌরবনর যুগ অপোকের সময় আরম্ভ
 হইরাছিল তাহা ঈগীর প্রথম শতকে উন্নতির চরম শিখরে
 আরোহণ করে। ঈগীর অষ্টম শতকে বনদেশে বৌদ-
 বর্ণের শেষ অভ্যুত্থান হয়। তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধবর্ণের পীঠ-
 স্থান প্রতিবেশী বনদেশ হইতে নেপাল ভ্রমারন বা তান্ত্রিক
 বৌদ্ধবর্ণের প্রেরণালাভ করে। মালদা, বিক্রমশিলা
 প্রভৃতি বৌদ বিশ্ববিভাগর হইতে বহু বৌদ পণ্ডিত ও মহা-
 হবির নেপালে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ শঙ্করাচার্য্য নামে
 ব্যাত মহাপণ্ডিত শাক্তরকিত, অতীশ ত্রীজান দীপকর প্রভৃতি
 বিখ্যাত বৌদ্ধবর্ণ প্রচারকগণ বনদেশ হইতে তিব্বতে গমন
 করিয়া তথায় বৌদ্ধবর্ণ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে
 ভারত হইতে তিব্বতে হাইবার পথ ছিল নেপালের মধ্য দিয়া।
 শাক্তরকিত, কমলশীল, অতীশ ত্রীজান দীপকর নেপালের পথে
 তিব্বত গমন করিবার কালে কয়েক বংসর নেপালে অবস্থান
 করেন। এই সকল তান্ত্রিক পণ্ডিত নেপালে ভ্রমারন প্রচার
 করিয়াছিলেন। হইহারের প্রচার ও প্রভাবের ফলে নেপালের
 সেই পৌরবনর যুগ ভ্রমারনের যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নেপালের বর্ণসম্পর্কিত ইতিহাস ভারতীর ইতিহাসের
 ভূম্য। ভারতে প্রথমে ছিল হিন্দুবর্ণের প্রভাব এবং হিন্দু-
 বর্ণের পরবর্তী যুগ হইতেহে বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধবর্ণের পৌরবনর
 যুগ ভারতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কালক্রমে বৌদ্ধবর্ণের
 অবনতি হইরা ভারতে পুনরায় হিন্দুবর্ণের উত্থান হইরাছিল।
 নেপালেও সেইরূপ প্রথম যুগে হিন্দুবর্ণের ও পরে বৌদ্ধবর্ণের
 অভ্যুত্থান হইরাছিল। কিন্তু হিন্দুবর্ণের পুনঃউত্থানের পর
 ভারতে বৈষ্ণব বৌদ্ধবর্ণের শেষ রশ্মি পর্য্যন্ত অস্তিত হইয়াছে
 নেপালে তেমনটি হয় নাই। একথা সত্য যে, নেপালের বর্তমান
 শাসকগণ হিন্দু এবং নেপাল পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুহাষ্ট। কিন্তু
 ব্রাহ্মণ্যবর্ণের বিধান শাসিত নেপালরাজ্য হইতে বৌদ্ধবর্ণ
 বিতাড়িত হয় নাই। আজ তথায় হিন্দুবর্ণ ও বৌদ্ধবর্ণ পাশা-
 পাশি সগৌরবে বিরাজমান। ঈগীর ১৭৭৫ সালে গোরখা-রাজা
 পৃথ্বীনারায়ণ সন্য নেপাল জয় করিয়া তথাকার শাসনভার
 গ্রহণ করিবার পর নেপালে আর একজনও বৌদ রাজার
 অস্তিত্বের কথা জামা বার না, তথাপি আজও বৌদ্ধবর্ণাবলম্বীরা
 নেপালের সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণসম্প্রদায়। নেপালের দক্ষিণ ভাগে
 হিন্দুদের সংখ্যা অধিক, বাকী অর্ভাত স্থানে (পূর্বে, পশ্চিম ও
 উত্তর নেপালে) বৌদ্ধবর্ণেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

+ চা-বাহিল শব্দ ‘চাকু বিহার’-এর অপভ্রংশ

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নেপালী বৌদ্ধগণ আজ যে বর্ষ আচরণ করে তাহা হিব্রুবাদ বা মহাবান কোন পর্বায়ে পড়ে না। নেপালের আজিকার বৌদ্ধধর্ম হিন্দু-বৌদ্ধ এই দুই ধর্মের অপূর্ণ সমন্বয়। নেপালে বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে তাহার কারণ দর্শাইয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, নেপালের আদির অধিবাসী বৌদ্ধ মেওরারগণ বৌদ্ধধর্মের সরল অনাক্রম্য পূজাপাঠে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া হিন্দুদের পূজার সাড়ম্বর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাহার একে একে হিন্দু-পূজাপদ্ধতির সন্মুখর আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে, জাতি-ভেদ প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু সংস্কার মেওরার বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বুদ্ধকে তাহার ভাগ করিল না, কিন্তু মহাদেব, শীতলা, গণেশ ও অন্নাত দেবদেবীকে পূজা না করিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইবার সাহসও তাহাদের রহিল না। পার্শ্বিক ভল্যাণের লোকে নেপালী বৌদ্ধগণ তাহাদের হিন্দু-জাতগণ পুজিত প্রায় সব কষ্টই দেবদেবীকে বুদ্ধের সমপৌরব প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিল। অত দিকে নাবার নেপালের হিন্দুগণ বুদ্ধকেও তাহাদের অন্ততম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আজ তত্ক্ষণেই নেপালের বৌদ্ধমতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবদেবীর বুদ্ধিসমূহ বৌদ্ধধর্মীদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আবার হিন্দু-মন্দিরে বুদ্ধবুদ্ধি অন্নাত দেবদেবীর সঙ্গে পুজিত হইতেছেন। হিন্দু পুরাণ ‘নেপাল মাহাত্ম্যে’ লিখিত আছে—“বুদ্ধের পূজা করা শিবপূজার তুল্য।” আবার বৌদ্ধশাস্ত্র বজ্রপুরাণ নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দুদেবতা পত্ত-পতিমাধ শিবের পূজা করার বিধান দিয়াছে।

অতএব নেপালের আজিকার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, তথাকার হ বৌদ্ধকে আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধকে সহজে পৃথক করিয়া চেনা যায় “শিবমার্গী” ও “বুদ্ধমার্গী” এই দুইটি বাক্যের দ্বারা। নেপালী বৌদ্ধগণ নিজেদের “বুদ্ধমার্গী” বলিয়া পরিচয় দেয় এবং হিন্দুদিগকে তাহার “শিবমার্গী” বলিয়া উল্লেখ করে। অর্থাৎ, নেপালে যেন একটি বর্ষই বিতর্কমান বাহার ১টি শাখা—এক “শিবমার্গী”, অত “বুদ্ধমার্গী”।

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কিরূপ সমন্বয় হইয়াছে তাহার সত্য সত্য জানিবার জন্যে যেমন বাইতেছে। অনেক সময় দেখা যায়, একই দেববুদ্ধিকে নেপালের হিন্দু ও বৌদ্ধরা বিভিন্ন নামে ডাকিতেছে। নেপালী বৌদ্ধরা যাহাকে অবলোকিতেশ্বর বলিয়া পূজা করে—হিন্দুরা সেই বুদ্ধিকেই মহাদেব বলিয়া ডাকিয়া চরণে বিদম্বল দিয়া পূজা করিতেছে। মহাজেন-ব বা মহাজেনমাধ নেপালের জাগ্রত দেবতা। মহাজেন-ব তপস্বান বুদ্ধ পরমাপির অবতার বলিয়া প্রখ্যাত হইলেও

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় ইহার পূজা করিয়া থাকেন। মহাজেনমাধের রথযাত্রা নেপালে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়



নেপালের বৌদ্ধমন্দির বোধমাধ

দ্বারেরই একটি বিশেষ উৎসব। নেপালের প্রধানমন্ত্রীও এই রথ-যাত্রা উৎসবে যোগদান করেন। মহানকাল মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই পূজা দিয়া থাকেন। মন্দিরস্থিত বুদ্ধিটি নিঃসন্দেহ অমিত্যত বুদ্ধবুদ্ধি হইলেও হিন্দুরা ইহাকে শিববুদ্ধি বলিয়া পূজা করে। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ বজ্রপুরাণের মন্দির বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটি অতি প্রাচীন কীর্তি। কিন্তু এই মন্দিরে বৌদ্ধগণ শীতলা দেবীর বুদ্ধিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বজ্রপুরাণের মন্দির ও বোধমন্দির যদিও ভিক্রাতের দ্বালাইলার অধীন তথাপি এই দুইটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরের সংস্কারকার্য হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় করিয়া থাকেন। নেপালী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর সন্মুখে পতনবলি দেয় না বটে, কিন্তু হিন্দুমন্দিরে গিয়া তাহার তথাকার দেবদেবীর উচ্চে হিন্দুদের মতই পতনবলি প্রদান করে।

নেপালের বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সংমিশ্রিত ও বিকৃত রূপ দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, নেপালের বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে লোপ পাইয়া বাইবার সম্ভাবনা আছে। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান বুদ্ধ হইয়া নেপালের বৌদ্ধধর্ম এক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের এই মিশ্রিত রূপ ধর্মান করিয়া অনেক অবস্থাতে নেপালে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারিত আশঙ্কা করিয়া-

যেমন কিত্ত তাঁহাদের এই আশঙ্কা অস্বাভাবিক। বহু দিন বরষাধাণ, বোঝাধাণ প্রভৃতি মন্দিরের চুতার চুতার প্রভৃতির কল্পনাপূর্ণ আঁবি অঙ্কিত থাকিবে, বহু দিন তাহা মাঝে মাঝে লঙ্ঘিত হইয়া

স্বল্পপাণ্য গ্রহণ করিবে, বহু দিন পৃথিবীর চরিত্র কোটি বৌদ্ধ ব্রহ্মারী সুখিনী, শাস্ত্রা প্রভৃতির নাম শ্রবণ রাখিবে, তত দিন মেশালে বৌদ্ধবর্ণের বিস্মৃতি হইবে না।

‘উর্ধ্বশী’ ও ‘বিজয়িনী’

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উর্ধ্বশী ও বিজয়িনী কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ অপরূপ শির-মৈশূর্য্যে সৌন্দর্য্যবোধের তত্ত্বটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বটিকে কবি কোন অভিন্নবোধে আমাদের জ্ঞানপন্য করেন নাই, পরন্তু যে সত্য আমাদের মনোবর্ষে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে, কবি তাহার রসচেতনার তাহা পতীরভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কাছে নিবেদন করিয়াছেন। জীবন-বর্ষের সহিত যোগ থাকার লজ্জা বিষয়টি যেমন এক দিকে বিশ্বব্যাপী সত্যের মর্য্যাদা পাইয়াছে, অপর দিকে ইহা বহুঃই কবিতার মর্য্যাদা দিয়া সহজ ও সর্লক্ষ্যত্বের স্মৃতি লাভ করিয়াছে।

উর্ধ্বশী কি, তাহা বলিতে সিয়া কবি প্রথমেই মেতিবাচক শব্দসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে পরিচয়গুলির মধ্যে আমরা প্রথমে সৌন্দর্য্যকে সবচেয়ে নিবিড় ও পতীর ভাবে লাভ করিতে পারি, সে সকলের উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে, উর্ধ্বশীকে এ সকল পরিচয়ের মধ্যে বাঁধা যায় না, উর্ধ্বশী এই নিবিড় আত্মীয়তার পরিচয়কে ছাড়াইয়া যায়। মাতা, কত, বহু প্রভৃতি বাহাদের আমরা পরিচয়ভায়ে বাঁধি, তাহাদের আমরা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করি। তাহারা একটি বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া থাকে। কিন্তু উর্ধ্বশী যেমন আপনায় একটি বহুস্তর সত্তা লইয়া জন্মদায় রেহ, কতায় দেবা, বহু প্রেম এ সকলকে ছাড়াইয়া একটি মহাব্যাপ্তি লাভ করিয়া আছে। তাহাকে কোন বিশেষ পরিচয়ে বন্ধিতে গেলে তাহাকে যেমন বন্ধনে বন্ধা যায় না। তাই উর্ধ্বশীকে নির্দিষ্ট করিতে সিয়া কবি প্রথমে “ইহা নহে” “ইহা নহে” বলিয়া কাত হইয়াছেন। বহুতঃ ‘উর্ধ্বশী’ কবিতার মধ্যে উর্ধ্বশী কি কবি তাহা আত্মসে ইচ্ছিতে হুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি শুধু উর্ধ্বশীর প্রকৃতি, উর্ধ্বশীর আবেদন ও তাহার জিয়া বর্ণনা করিয়া উর্ধ্বশী লব্ধে একটি বারণা দিতে চাহিয়াছেন নাই। কবিতাটি আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে, বাস্তবিকপক্ষে নানা আত্মসে, ইচ্ছিতে একটি বারণা নাই দেওয়া চলিতে পারে, উর্ধ্বশী কি তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সুকঠিন। ইহা জীবন-বোধের বিষয়, সৌভাগ্য থাকিলে ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। ইহাকে প্রকাশ করা হ্রস্ব ব্যাপ্ত্যয়।

এই উর্ধ্বশীর প্রতিষ্ঠা কোথায়?—কবি বলিলেন, -পোঠে ববে সন্ধ্যা নামে প্রান্তদেহে বর্ণকল টানি
তুমি কোম পুহপ্রান্তে নাহি আল সন্ধ্যা-দীপধানি
দিবার অঙ্কিত পথে কল্পবকে মন্ত্র মেঘপাতে
শিতহাতে নাহি চল সলঙ্কিত বাসর-সন্ধ্যাতে
তব অর্ধরাতে।

কবি আমাদের জীবনের একান্ত আকাজিকত মনুষ্যতম দুইটি পরিবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ধ্যাদীপ-আলা সূর্য্য-ধানিতে আমাদের বৈমল্যিন জীবনের আমল, সৌন্দর্য্য ও শান্তি সরিবেশিত রহিয়াছে, আর প্রিরমিলনাথাসে প্রতিশ্রুত বাসর-সন্ধ্যা তাহার বিশেষ মোহমদিততা লইয়া আমাদের কাছে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রির এবং আকাজিকত এই পরিবেশের মধ্যে উর্ধ্বশী বরা দেয় না। জীবনে উর্ধ্বশীর বধন আবির্ভাব হয় তখন সহসা আমাদের জীবনের সহিত তাহার নিগুঢ় সংযোগটি হুঁজিয়া পাই না, জীবনের মধ্যে তাহাকে সহজ পরিচয়ে মিলাইয়া লইতে পারি না। একটা অভাবমীরতা লইয়া অপরিচিততার পরিচয়ে আমাদের চেতনাকে সে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন দেখি—

উদার উদরসম অববগুঠিতা—

তুমি অকুঠিতা।

জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ হুঁজিয়া পাই না। অথচ “উদার উদরসম” এমন সহজে এমনি মহিমায়, কোম আবরণ কোম কুঠা না রাখিয়া সে আত্মপ্রকাশ করে যে, তাহাকে তুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের চেতনাকে এই উর্ধ্বশী বধনই স্পর্শ করিয়া যায় তখনই তাহাকে নির্জিচ্ছারে মানিয়া লইতে হয়। এ আত্ম-প্রকাশের ইতিহাস নাই, কোম জন্মবিকাশের বার্য্য নাই, “বহুতহীন পুন্সন” এ আপনাতো আপনি বিকশিত হইয়া উঠে।

অথচ কবি জীবনের মধ্যে ইহার বীজতিকে স্পষ্ট করিয়া বহিতে পারিলেন না। তাহার লজ্জা একটি লোকাভিত পট-ভূমিকা সৃষ্টি করিয়া উর্ধ্বশীর আবির্ভাবটি বুঝাইতে চাহিলেন। আমাদের পুরাণে যে উর্ধ্বশীর আবির্ভাবের কথা বলা

হইয়াছে, কবি তাহার সহিত এই উর্কশীর উপমা বিলেম। এখানে সর্বত্রই এই কথাটি জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, পুরাণের উর্কশী আর কবির উর্কশী এক নয়। পুরাণের উর্কশী একটি অলৌকিক কাহিনীর নারিকান্ন এবং কবির উর্কশী সৌন্দর্য-ভক্ত-বরণা, ভাব-বরণা। পুরাণের উর্কশীর মধ্যে যদি এই সৌন্দর্যভক্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে তাহা আমাদের দ্বারাই আরোপিত, পুরাণকার সে অর্থে উর্কশীর পরিকল্পনা করেন নাই। কয়েকটি কারণে পুরাণের উর্কশীর সহিত কবি এই উর্কশীর উপমা দিরাছেন। পুরাণের উর্কশী কাহারও সহিত সম্পর্কিত নয়, তাহার মধ্যে সকল সৌন্দর্যের সমাবেশ, তাহার বৃত্তান্তে বিভিন্ন সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং তাহার এক হাতে রূপাঙ্গ অত হাতে বিষ-ভাঙ। কিন্তু এই কারণগুলিও বাহ্যিক কারণটি হইল রসসুপ্তির প্রয়োজনীয়তা। ইহার কথা পরে আলোচনা করা যাইবে।

কবি বলিতেছেন, উর্কশী বধন আবির্ভূত হয়, তখন সে আপনার মধ্যেই আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় লইয়া আসে। এক দিন এক অক্ষুণ্ণ মুহূর্তে আমাদের জীবন-সাগর মলিত করিয়া স্নান আশ্রয় প্রদান করে। সেদিন আমাদের চেতনার একটি নৃতন বাস জাগিয়া উঠে, তাহা উর্কশী-বোধ বা সৌন্দর্য-বোধ। এই সৌন্দর্যকে আমরা উর্কশীরূপে বৃত্তি দেখি, সেইরূপ আমাদের মধ্যে প্রথম যে সৌন্দর্য-বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তাহাও এই আমাদের চেতনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই উর্কশীর এক হাতে রহিয়াছে রূপাঙ্গ—সে আমাদের কাছে আসন্ন দেয়, আমাদের প্রেমকে প্রবৃত্ত করে। ইহাই তাহার রূপ। তাহার দ্বারা এক হাতে রহিয়াছে বিষভাঙ—তাহাকে লাভ করিতে আমরা বালনা-ব্যাভুল হইয়া উঠি, বিকৃত হই, বেদনা পাই। ইহাই তাহার বিষ। এই হাসি-অশ্রু, পাওয়া-না-পাওয়া, ধৈর্য-হিংসা, রূপ ও বিষের ক্রিয়া একই সঙ্গে চলিতে থাকে এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন সৌন্দর্য্যবোধে লীলায়িত হইয়া উঠে। আমাদের চেতনাকে এই উর্কশী যেদিন স্পর্শ করিয়া যায়, সেই দিনই তাহাকে প্রথম দেখি এবং পরিপূর্ণ হইতে দেখি। তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা নাই, তাহা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পরিচিত হয় না—

“বধনি জাগিলে বিধে বোধমগ্ণতা পূর্ণ প্রকৃষ্টিভা,”

২ সৌন্দর্য্যবোধ বিধের সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত।

ইহুত—

রূপরূপান্তর হ’তে হুনি তবু বিধের প্রেরণা

হে অগুরু শোভনা উর্কশী।

এই সৌন্দর্য-সত্তাকে সুনিগম নিরঞ্জন বৃত্তিতে ব্যাস করেন, আর বধনই তাহাকে রূপের মধ্যে প্রকাশিত দেখেন, তখনই আমাদের ধ্যানভক্ত হয়, তখন রূপের মধ্যে তাহাদের দ্বারাও দেখিয়া তাহারা পূর্বের ভগ্নতাকে তুলে করেন।

সৌন্দর্য-সত্তার নিরঞ্জন বৃত্তি কবির মধ্যে ব্যাধের বিষয়, আর তার রঞ্জনবৃত্তি মানব-সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সৌন্দর্য-সত্তার এই রঞ্জনবৃত্তিকেই কবি উর্কশী বলিয়াছেন, যে উর্কশী তাম হাতে রূপাঙ্গ ও বান হাতে বিষভাঙ লইয়া একদা আমাদের জীবন-সাগর মলিত করিয়া আবির্ভূত হয়। তাহার স্পর্শে জীবন বোধমগ্নকল হইয়া উঠে, রসিকচক্ষে তাহা লুপ্ত করে, সঙ্গীতরূপের করে। বিহ্বালের চাক্ষু্য লইয়া সেই আত্মলাকলা বধন দ্বারা বিভার করিয়া যায়, তখন মিথিল বিষ তাহাকে অহসরণ করে।

এই রঞ্জনবৃত্তিতে উর্কশী বধন আপনাকে নানাতাবে প্রকাশ করে তখন তাহাতে বিভিন্ন সৌন্দর্য-স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

স্বয়মভ্যন্তরে যবে নৃত্য কর পুলকে উন্নতি,

হে বিলোলহিরোল উর্কশী,

হলে হলে নাচি উঠে সিঁহুমাঝে তরঙ্গের বল—

শতশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে বরার অকল

তব স্তনহার হ’তে মত্তভলে ধসি পড়ে ভার

অকস্মাৎ পুরুষের বকোমাঝে চিত্ত আনহার

নাচে রক্তধারা

দিগন্তে মেঘলা তব হুঁটে আচরিতে

অগ্নি অসহুতে।

এই সৌন্দর্য-স্বরূপে পুরুষের চিত্ত, অর্থাৎ রসিকের চিত্ত ভরলারিত হইয়া উঠে, সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া সে আনহার হইয়া যায়। এই যে বিষয়গত বিভিন্ন রূপের মধ্যে কাঙ্ক্ষার জোতনা, ইহা উর্কশীর বিভিন্ন প্রকাশলীলা মাত্র। এই বহুর মধ্যে কবি যে একক ভাব-বৃত্তি দেখিতে চাহিয়াছেন, ইহাই কবির উর্কশী।

এইখানে বিষয়টি একই জটিল হইয়া পড়ে। কবি যদি বিষয়গামী সৌন্দর্য-সত্তাকে অরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে ইহা কাব্যের বিষয় না হইয়া দার্শনিক আলোচনার পর্য্যবসিত হইত এবং বৃত্তিতর্কের মধ্য দিয়া বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু যাহা অদেহী, যাহা বিশ্ব ব্যাপিগা রহিয়াছে তাহাকেই রঞ্জনবৃত্তিতে পরিচিত করিতে চাহিয়া কবি এক দিকে যেমন বিষয়টিকে বোধের বিষয়, তথা কাব্যের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ইহাকে আত্মসে ইঙ্গিতে রাখিয়া দিরাছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কাব্যের মধ্যাঙ্গা সুর হয় নাই।

রঞ্জনবৃত্তিতে প্রকাশিত এই উর্কশী কিরূপ ? সিঁহুমাঝে তরঙ্গের যে আন্দোলন, দক্ষিণ বাতালে শতশীর্ষের যে শিহরণ, মত্তভলে ভারকার যে স্পন্দন, অন্তরবির বর্ণচ্ছটার দিগন্তে লহনা যে সৌন্দর্য্যোদ্ভাসন,—ইহাদের মধ্যে উর্কশীর রূপ-কোয়ালিটি বিকীরিত হইতেছে। এগুলির মধ্য দিয়া আমরা কণে কণে

উর্দুশীর আতান পাই, এগুলি উর্দুশীর লতাকে প্রমাণিত করে, পরিচিত করে। কিন্তু উর্দুশীর বরণ কি? এই খণ্ড বিকিণ্ড সৌন্দর্য-উৎসর্গলি হইতে যে লাভণ্য বিকীর্ণ হইতেছে তাহার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোন্ পরিপূর্ণ বৃত্তিতে বিকশিত, কোন্ লাভমায় তাহা লভ্য?

কবি একটি অসুন্দেহে প্রসঙ্গলি উত্তর দিয়াছেন। ইহাতেই বিষয়বস্তুটি ব্যক্ত হইয়াছে। কবির উত্তরটি জীবন-বোধ হইতে সজ্ঞাত বলিয়া ইহা বুঝিবার জন্যও গভীর বোধের প্রয়োজন। এই অসুন্দেহটি গভীর অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনা-ময়। যদি আমরা বোধ দিরা এই উত্তরটি বহিঃতে না পারি তবে বিচার-ভর্তুকের দ্বারা কখনও ইহা বুঝিতে সক্ষম হইব না। কবিশুদ্ধ এখানে উত্তরটি আমাদের বোধের উপর ছাড়িয়া দিরা সুমহান কবি-কৃতি দেখাইয়াছেন। বিষয়টি বুঝিবার পূর্বে প্রসঙ্গলিকে আর একটি স্পষ্ট করিয়া বুঝিরা লওয়া যাক।

আমরা বিষয়গত রূপের মধ্যে কান্তির যে প্রকাশ দেখি তাহা আমাদের সৌন্দর্য-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আমাদের চেতনার বিকাশে আমাদের সৌন্দর্য-বুদ্ধি গভীরা উঠে। বাহার চেতনার বিকাশ হয় নাই তাহার সৌন্দর্য্যবোধ নাই। সে বিষয়গত রূপকে অভিনয় মূলভাবে দেখে, রূপের অন্তঃস্থিত কান্তিকে সে দেখিতে পার না। রূপ হইল চোখের দেখা, কান্তি হইল মনের দেখা; এই মনোবিকাশ বাহার হয় নাই, পৃথিবী তাহার কাছে রূপের লুপ্তিও মাত্র। এক উচ্চতর মানসিকতার আমাদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্য-বোধটি জাগিয়া উঠে। তখন আমরা বিভিন্ন রূপের মধ্যে কান্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। উর্দুশীর আবির্ভাব আমাদের জীবনে এই সৌন্দর্য্য-বোধের আবির্ভাব। আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের চেতনাকে এক বিন্দু সহসা স্পর্শ করিয়া যায়, আমরা রূপগত কান্তির মধ্যে জাগিয়া উঠি। তখন আমাদের মন-সদৃশে কান্তির ছাতি খেলিয়া যায় এবং বিষয়গত এই কান্তিতে পরিব্যাপ্ত দেখি। এখানে কান্তি একটা ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া’ হিসাবে আমাদের বোধে অনুভূত হয়, ইহা বিচার-বুদ্ধির অতীত। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—“এক হিসাবে সৌন্দর্য্যমাত্রই অ্যাবস্ট্রাক্ট; সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা বা আমাদের অন্তরে রস-সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ উর্দুশী তাহারই প্রতীক। এর মধ্যে কেবল অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু সেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য্য, সেই সঙ্গে তার সঙ্গে বস্তুবস্ত নারীর বোহ আছে।”

উর্দুশী-কল্পনার মধ্য দিরা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের কথাই বলিতে চান। পৌরাণিক উর্দুশীর মধ্যে পূরণকার এই ভূট্ট লিখিত করিয়া নাই,

রবীন্দ্রনাথ উর্দুশীর মধ্য দিরা সেই ভূট্টকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। উর্দুশী বস্তুকণ পৌরাণিক উর্দুশী ভস্তুকণ, “উর্দুশীতে সেই অনির্ভরতীয়তা দেখাবার করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়”। ভস্তুকণ উর্দুশী নারীর বোহ—সৌন্দর্য্যেরই পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ উপরুক্ত পাত্তের মধ্যে দিরা কান্তির উপরুক্ত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যদি ‘বর্নার’ বৃত্তির মধ্য দিরা ভূট্টকে প্রতিষ্ঠিত না করিতেন তবে বিষয়টির কোন কাব্যকৃতি থাকিত না। কাব্যের বিষয় আমাদের রসচেতনাকে স্পর্শ করিবার অপেক্ষা রাখে, নতুবা তাহা আমাদের বোধে সঞ্চারিত হয় না। পৌরাণিক উর্দুশীর উল্লেখমাত্রই আমাদের রসলোকের ছুঁনি প্রস্তুত হইরা যায়, আমাদের মন একটি সৌন্দর্য্য, একটি বাসনার মধ্য দিরা অনেকখানি অগ্রসর হইরা পড়ে—সজির তইরা উঠে। আমাদের চিত্তকে এই সচেতনতা দিবার ক্ষমতা কবি কোশলে উর্দুশী-বৃত্তির আশ্রয় লইয়াছেন। এই যে সচেতনতা ইহা আমরা আমাদের জীবন-বোধ হইতে গ্রহণ করি। এই জীবন-বোধের ছুঁিকার কাব্যের রস আমাদের মধ্যে সহজে সঞ্চারিত হইরা যায়। এই পৌরাণিক উর্দুশী-বৃত্তি বাহা কবি “নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতীক” বলিয়াছেন, ইহা কবির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

যদি কান্তিকে বুঝাইতে দিরা কবি কান্তির আবারটিকেই বুঝাইতেন তাহা হইলে পৌরাণিক উর্দুশীর বর্ণনার কবিতাটির সমাপ্তি ঘটত, কিন্তু যে আবারের মধ্যে কান্তির প্রকাশ, সেই আবারই কান্তির চরম পরিচয় নয়। কারণ আবার সীমাবদ্ধ, কান্তি একটা অনীম ভাব-সত্তা। তাই কবি ইহাকে কোন সীমার পরিচয়ের চরম করিয়া ধারণিতে পারিলেন না। বলিলেন—নহ মাতা, নহ কতা, নহ বস্তু। আবার পৌরাণিক উর্দুশীবৃত্তি কবির উর্দুশীর কাল্পনিক আবার মাত্র। কিন্তু ঐ পৌরাণিক উর্দুশী-পাত্তের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যসত্তার প্রকাশ তাহা ত কোনও ভূট্টর সীমার বস্তু নহে, তাহার মধ্যে ত কোন মূলতা নাই—তাহাকে আমরা রূপের মধ্যে প্রকাশিত দেখি বটে, কিন্তু তার চরম সত্য ত রূপের মধ্যে নাই। রূপ তাহার প্রকাশের আবার মাত্র। আকাশের মাধ্যমে বেদন আলোর প্রকাশ, আলোর রহস্য আমরা জানি না; তেমনি রূপের মাধ্যমে কান্তির প্রকাশ, কান্তির রহস্য আমাদের অনবিসংখ্য। রূপের মধ্যে রহস্যময়তা নাই, রূপের মধ্যে কান্তির যে সৌন্দর্য্য, তাহাতেই রহস্যময়তা রহিয়াছে। কান্তির এই রহস্যময়তার কথাই বলিতে দিরা কবি বিত্তীর বার উর্দুশীর বর্ণনা করিলেন। ইহার লিখিত প্রথম বর্ণনার বিরোধ রহিল না, পরন্তু পৌরাণিক উর্দুশীকেই কবি এই সংযোগনাট্টর দ্বারা আপনার উর্দুশী করিয়া লইলেন। সংযোগনাট্টই এইরূপ :

বর্ণের উদ্যোগলে বৃত্তিমতী ছুঁনি হে উর্দুশী
হে ছুঁনমোহিনী উর্দুশী।

অগস্তের অঙ্গুষ্ঠায়ে বৌত ভব তহুর তমিরা
 ত্রিলোকের হৃদয়কে আঁকা ভব চরণ-শোণিমা
 মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার—
 অরবিন্দ দ্বারধানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
 অভিলুভতার।
 অবিদ্যাময়-বর্ণে অমৃত রসিনী
 হে বঙ্গ-সদমী।

কবি বলিলেন, উর্কশী যেখানে মুক্তিমতী, সে স্থান আমাদের এই লৌকিক জগতে নয়, তাহার পরিবেশ অলৌকিক, তাহা বর্ণের উদ্বাস্তালে, তাহা আমাদের একটি কল্পনার রাজ্য। এই রহস্যলোকে রহতমতী উর্কশী মুক্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। সে মুক্তি কিরণ? তাহা তহু নয়, তাহা তহুর তমিরা, তাহার মধ্যে তহুর একটি স্বপ্ন ভাব বেন রহিয়াছে মাত্র, তহুর সুলভা নাই। আমরা রূপজগতে তহুর মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখি, তাই তহুর ভাবেই তাহাকে ব্যাখ্যা করিতে পারি। উর্কশীর মধ্যে তাই তহুর বেন ভাব রহিয়াছে—তহু নাই। তাহার চরণও বেন কল্পনার আসনে না, চরণ-শোণিমাটি আমরা অমৃতব করিতে পারি মাত্র। উর্কশীমুষ্টির এই দুইটি ইন্দিব মাত্র কবি দিয়াছেন, ইহা অণেকা অধিক বর্ণনা তিনি দেন নাই। কারণ উর্কশী বর্ণনার অতীত, কোন রূপের বর্ণনাতেই সেই ভাব-সত্যটিকে বহিতে পারা যায় না। আরও দুইটি কথা কবি এ এসকল বলিয়াছেন—‘মুক্তবেণী’ ও ‘বিবসনে’। মুক্তবেণী অর্থে বুঝায়, যে সৌন্দর্য্যোপকরণ দ্বারা এই সৌন্দর্য্য-সত্তা স্ৰষ্ট, তাহা সহজ এবং মুক্ত। তাহাতে জটিলতা বা বহুতা নাই। ‘বিবসনা’ কথার বুঝায়—এই সৌন্দর্য্য-সত্তার প্রকাশ উৎকৃষ্ট, কোন আবরণে সে আপনাকে গোপন করে নাই।

এই তমিরা ও চরণ-শোণিমা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? কবি বলিলেন, “অগস্তের অঙ্গুষ্ঠায়ে বৌত ভব তহুর তমিরা।” উর্কশীর তমিরা বিশ্বের অঙ্গুষ্ঠায়ে বৌত, তাহার চরণ-শোণিমা মিথিলের হৃদয়কে আঁকা—আমাদের অঙ্গু, আমাদের হৃদয়কেই উর্কশী-মুষ্টির উপাদান। অর্থাৎ, ইহা আমাদের বোধ-সজ্জাত। রূপের মধ্যে সৌন্দর্য্য-সত্তার প্রকাশ বধন দেখি তখন আমাদের অঙ্গু রূপের মধ্যে হইতে সেই রূপাতীতকে গড়িয়া তোলে, এই সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে আমাদের স্বপ্ন হইতে বহু রক্ত করিত হর আমাদের কল্পলোকে ততই তাহার চরণধামি অহুসিত হইয়া উঠে। আমাদের বেরমার আমাদের অঙ্গুর নির্গমন, পাওয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষার আমাদের হৃদয়কে চরণ। এই আদম-বেদনাতেই বাহা বেহুসী সৌন্দর্য্য-সত্তামাত্র ছিল, তাহাতে বেন বেহের ভাব উপলব্ধি করি, এই হৃদয়কে করণেই বেন তাহার চরণের আভাস পাই। এইরূপে

আমাদের বোধের মধ্যে দিয়া রূপনিবপেক একটি কাড়িমুষ্টি স্ৰষ্ট হইয়া উঠে। অঙ্গুণ সত্যটি রূপের মধ্যে দিয়া আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে এবং আমাদের বোধ তাহাকে একটি রূপের ভাবে কল্পলোকে মুষ্টিতে গড়িয়া তোলে। ইহাই উর্কশীর রক্তমুষ্টি। এই রক্তমুষ্টি প্রকাশ করিবার বিশ্ব নয়, বর্ণনা করিবার উপাদান ইহাতে নাই, শুধু বাহার অঙ্গুষ্ঠায়ে ও হৃদয়কে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা তাহারই একান্ত উপলব্ধির বিশ্ব; বাহারই বাসনা বিকশিত হইয়াছে, সে-ই এই উর্কশীকে বুঁজিয়া বেঁকাইতেছে। আমাদের বিকশিত বাসনার কাছেই রূপসৌন্দর্য্য আপনাকে নিবেদন করে। সেই বিকশিত বাসনা-পদের উপর উর্কশী তাহার ‘অভিলুভতার’ চরণধামি রাখিয়াছে। তাহার চরণ অভিলুভতার, ইহাতে তহুর সুলভা নাই। আমাদের কল্পলোকে বাসনা-পদের আসনে অঙ্গু-ধারার এবং হৃদয়ের রক্তকরণে মুষ্টিমতী এই উর্কশী বিরাজ করিতেছে—সে আমাদের নিত্য বঙ্গসদমী।

ইহার পর কবি বলিলেন, এই যে উর্কশীবোধ, বাহা আমাদের জীবনে এক অহুসিত মুহুর্তে জাগিয়া উঠে, তাহা আর কিরিয়া আসে না। যে রূপের মধ্যে একবার তাহার আবির্ভাব আর তাহাকে সেখানে বুঁজিয়া পাই না। সে আমাদের মধ্যে বিপুল আদম, অপার বাসনা জাগাইয়া দিয়া যায়, কিন্তু তাহাকে আর বুঁজিয়া পাই না, রূপের মধ্যে তাহাকে পুনরায় বহিতে পিরা ব্যর্থ হইয়া কিরিয়া আসি। তাহারই বাসনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাহাকে লভান করিয়া কিরি, একান্তভাবে তাহাকে আশা করি, কিন্তু তাহাকে পাই না। আমাদের সেই একান্ত বাহিত উর্কশীর সহিত একটি চিরকালের বিরোধ সৃষ্টি হইয়া যায়। তাই অগস্তের রূপের মধ্যে যেখানে বহু সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, সে সবই সেই উর্কশীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বহিত সৌন্দর্য্য আমাদের সৌন্দর্য্যের প্রতি তৃপ্তি ব্যাকুল করিয়া রাখে। তাহাকে পাই না, কিন্তু তাহার জট আশা আমাদের জীবনের রাজ্য-টিকে গতিশীল করিয়া রাখে।

পরিশেষে উর্কশী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—‘আদর্শ রমণীকে হুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The Beautiful, এক ভাগে ‘The Good পড়ে।’ উর্কশী কবিতার প্রথমোক্তটির ভাবগান আছে, ‘বর্ণ হইতে বিবাহে’ দ্বিতীয় উল্লেখ পাওয়া যায়। উর্কশী কবিতার আলোচনার এই উক্তিটির তাৎপর্য্য সহজে বুঁজিয়া পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য বধন বরাহোঁয়ার অতীত একটা সত্তা তখন তাহার মধ্যে ভালমন্দ বিভাগ নাই। ভালমন্দ বিভাগ বহুদ্ব্যকৃত আদর্শের অস্বাভাবী। ভালর আদর্শে যে সৌন্দর্য্য-বোধ, তাহাই লক্ষ্যরূপে আমাদের কল্পনার বর্ধ হইয়াছে।

রাহে। নিরঞ্জন সৌন্দর্য-সভা ভালমন্স বিচারের অতীত। আমাদের জীবনে আগে সৌন্দর্য-বোধ, তাহার পর তাহাতে মনোমাহর্ষের প্রতিষ্ঠা। এই সৌন্দর্য-বোধে তাই ভালমন্স, সুবহুঃ, সুখ ও বিষ একত্র সমন্বিত হইয়া আছে। চিত্তার স্ববীজনাথ যে উর্কশীর কথা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ।

কিন্তু পরবর্তীকালে স্ববীজনাথ যখন ‘বলাকা’র উর্কশী ও লক্ষীর একটা তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তখন উর্কশীর এই পৌরসিকতা (priority) রক্ষা করেন নাই। তখন লক্ষীর মান-মতে উর্কশীকে মাগিতে পিরা উর্কশীর অর্থ সংকীর্ণ করিয়াছেন। বলাকার স্ববীজনাথ যে উর্কশীর কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পুরাণের উর্কশী—

একজন ভপোতক করি—

উচ্চহাস-অরিমসে কান্তনের সুরাপাঙ্গ তরি’

নিরে বার প্রাণ মন হরি’—

হুহাতে হুতার তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রমাণে

রাগরক্ত কিংবদন্তে গোলাপে

মিত্রাহীন বৌবদের পানে।

নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ এ উর্কশী তারই প্রতীক। কিন্তু ইহার মধ্যে নিরঞ্জন সৌন্দর্য-সভার ভঙ্গ নাই। চিত্তার উর্কশীর মধ্যেও এ গুণগুলি রহিয়াছে। কিন্তু ইহা হাতাও অতিরিক্ত একটা ব্যাপকতা রহিয়াছে, তাহা সেই নংবোজনাটুহর ব্যাখ্যার দেখাইয়াছি।

তাহা হইলে বলাকার উর্কশী যেমন নারী-সৌন্দর্যের প্রতীক, চিত্তার উর্কশী তত্ত্ব-বরূপা, ভাব-বরূপা বলিয়া তাহাকে কেবল মাত্র নারী-সৌন্দর্যের প্রতীক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কবি কাব্যের প্রয়োজনে পৌরাণিক নারী-মূর্তির সাহায্য লইয়াছেন। কোন পৌরাণিক পুরুষ-মূর্তির কল্পনাতেও কবি কাব্যের বিষয়বস্ত্ত বর্ণনা করিতে পারিতেন, অন্ততঃ কোন পাট্টিকা সেই ভাবে কবিতাটি বুঝিতে চাহিলে, তাহার কিছুমাত্র ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি তাহার মধ্য দিয়া একই ভাঙে পিরা পৌছাইবেন।

বিজয়িনী কবিতাতেও কবি এই নিরঞ্জন সৌন্দর্য-সভার পরিচয় দিয়াছেন। পৃথিবীর পরিবেশে উর্কশী-বোধের যে ভাবমন্স ব্যক্তবাটী সৃষ্টি হইতে পারে বিজয়িনী কবিতার তাহারই কাব্যিক অহুবাধ দিয়াছেন। আমাদের জীবনে যে একটা অহুহুল মুহূর্তে উর্কশী-বোধ আসিয়া উঠে, তেমনই একটা ক্ষণকে কবি এই কবিতার বহিয়াছেন। এখানেও কবি বিজয়িনীর কোন বর্ণনা যেন নাই—যে পরিবেশের মধ্যে বিজয়িনী আপনাকে প্রকাশ করে সেই পরিবেশের কথাই বলিয়াছেন। অথচ এত নৈপুণ্যের সহিত পরিবেশটি বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়িনীর রঞ্জিত মূর্তি যেন আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই।

উর্কশী-বোধের সময় আমাদের জীবনে এখন যেমন এমোহমূর্তির অহুহুল মুহূর্তের আবির্ভাব হয়, বিজয়িনী যখন স্নানে আসিতেছিল, তখনও পৃথিবীতে একটা অহুহুল মুহূর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অজোহ সন্নয়নীয়ে রমণী যে দিন

নাছিল স্নানের ভরে, বসন্ত নবীন

সে দিন কিরিতেছিল সুবদ ব্যাপিরা—

এখন প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া—

কণে কণে শিহরি শিহরি।

উর্কশী কবিতার বক্তব্যটি রসোত্তীর্ণ করিবার জন্য কবি যেমন পৌরাণিক উর্কশী-মূর্তির সাহায্য লইয়াছেন, এখানেও তেমনই স্নানার্থিনীর উল্লেখ করিয়া আমাদের মনের রস-সুখি প্রস্তুত করিয়াছেন। ভরুণী নারীর স্নানলীলার উল্লেখ আমাদের চিত্ত যে সৌন্দর্য-রসে ও বাসনার আগ্রহ হইয়া উঠে তাতেই কবির বক্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায়। আমাদের চিত্তের এই ক্ষিপ্রাট্টিতেই কবির বক্তব্যটি অব্যাক্ত হইয়া উঠে। বিজয়িনী যে সৌন্দর্য-শ্রেষ্ঠা, সে যে আমাদের কামনা-বাসনার কেন্দ্র—কত সহজে, নিপুণতার সহিত কবি সেই সত্যটিকে আমাদের বোধগোচর করিয়া দিয়াছেন।

ইহার পর কবি প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করিয়াছেন। উর্কশী-বোধের সময় আমরা পৃথিবীর যে সূতন, মধুর পরিবেশের মধ্যে, যে কান্তি-ক্লান্তের মধ্যে আসিয়া উঠি, ইহা সেই পরিবেশ। এই অহুহুলমূর্তিতে অপূর্ণ নৈপুণ্যে কবি কান্তি-ময় পৃথিবীর পরিচয় দিয়াছেন। উর্কশী-বোধের সময়েই রূপ-ক্লান্তের মধ্যে এই কান্তির ক্লান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য-বোধ যখন আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন বিধে চতুর্দিকে যেন মধুর রাগিণী স্নানিত হইতে দেখি; তখন পৃথিবীতে যে-সকল রূপবস্ত্তকে এক দিন সামান্য বলিয়া, সাধারণ বলিয়া দেখিতেছিলাম, তাহারা একটা সূতন পরিচয় লইয়া আসে, তাহাদের মধ্যে একটা ভাংপর্ষা, একটা সার্বকতা দেখিতে পাই। তখন সেই বসন্ত-দিনের প্রভাতটিকে তত্ত্ব মূল রূপই দেখি না, কত স্পন্দন-কম্পন, কত শিথাস-উজ্জ্বল, কত তায়-আতাস বরা পড়ে, এ সকলই রূপের অতঃস্থিত একটা তায়-সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। এই সৌন্দর্যবোধের পূর্বে বসন্তকালে তত্ত্ব রূপই দেখিয়াছিলাম, এখন রূপের অতঃস্থিত তাবের সূরণ দেখিলাম। দেখিলাম হাতা ও হৌকর, অরপোর সৃষ্টি এবং পাতার মর্ম্মর; অর্বাং আলো এবং অহুকার, ভয়তা এবং সুধরতা উভয়ের সহিত এই উপকরণ-গুলি মিশিয়া রূপ-ক্লান্তের মধ্যে যেন একটা তাবের কাহিনী রচনা করিয়া চলিতেছে। আচ্ছ যেন আকাশের আলো বেদনার লগ্নীতে বাড়িয়া উঠিতেছে। এমনই বিভিন্ন রূপবস্ত্ত হইতে একটা তাব, একটা সৌন্দর্য সৃষ্টিয়া উঠিতেছে এবং

সকলেই পরস্পরের সহিত একটি সাবলুত ও সক্তি রক্ষা করিয়া এই পৃথিবীর পরিবেশে সুবিন্যস্ত হইয়া আছে। পুষ্পের বিশেষ বৃত্তচ্যুতি, কোকিলের বিকল কাকলি, নিবৃত্তির কল-বৃত্ত, সারসের মধুর স্তম্ভিতলিমা, বলাকার চকল গতি, বনগজ-বঁহ প্রাতঃ বায়ুর উত্তপ্ত প্রবাহ—এ সকল বিভিন্ন রূপ যেন হৃদয়মিল রক্ষা করিয়া একটি অর্থপূর্ণ সুন্দর কাব্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে মন-বেগতা মন তোপে বাধিতে গেল, তখন সে পলাত হইল। এই বিকসিত ত তোপের সীমার মধ্যে বসে দেয় না, এই সৌন্দর্যসত্তা যে বিশ্ব ব্যাপিতা বিরাজমান—তোপে ইহাকে সীমার মধ্যে চরম করিয়া পাইবে কেমন করিয়া। রূপের মধ্যে ইহার প্রকাশ ঘেঁষিয়া আনরা রূপকে ঘরিতে চাই, ইহাতে শুধু রূপের ছায়ায় মাথা ঠুকিয়া মরি মাজ, কান্তিকে বাহুবন্ধনের মধ্যে ঘরিতে পারি না। কান্তি আন-বের চেতনাকে স্পর্শ করিয়া, আনামিকে বালনা-চকল করিয়া

তোলে, আনামের মধ্যে অভিন্ন উপলব্ধি আনিয়া দেয়। কিন্তু কান্তিকে উপলব্ধিই করা যায়, তাহাকে তোপ করা যায় না। তোপের জন্য আনরা তাহার আবারটিকে সৃষ্টির ভিতর ঢাপিয়া ঘরি—বালনা-বিকৃত হইয়া উঠি, আনামের বোবাট ছুর ছুর, কান্তি অন্তর্ভুক্ত করে। কান্তির সহিত আনরা এই উপলব্ধির সম্পর্কট পাতাইতে পারি মাজ—পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সেখানে প্রকাশ, অন্তরের বীজতি বারা তাহাকে এগার জানাইতে পারি মাজ—তোমার ও তোমার সম্পর্ক সেখানে থাকিতে পারে না। ইহা একটি মন মানসিক তোপ মাজ, মূল বেগত তোপ নছে—বেগের মধ্যে তাহাকে আরও করা যায় না। মন-বেগত সৌন্দর্য-সত্তার কাছে এগার জানাইয়াছেন—ইহাই সৌন্দর্যের সহিত সৌন্দর্য-রসিতের স্বার্থ সম্পর্ক। রূপের মাধ্যমে সেখানেই সৌন্দর্যের প্রকাশ মন সেখানেই তোপসিল। কিন্তু যে কান্তি-সত্তা উপলব্ধির বিষয়, কবি মনকেও সেখানে এগত করিয়াছেন।

কান্তন

ঐশৈলেন্দ্রকুমার লাহা

মহান মোহন—পুষ্পাভরণে সজ্জা করিয়া এল,
বিচিহ্নতার চিত্র-বিভবে চিত্ত ভরিয়া এল।
শীতের কুহেলি কাটিয়া গিয়াছে, আকাশ সুনির্মল,
এল প্রকৃত কান্তন, এল মূলে জলে উজ্জল।

কে জানে কখন বহিবে দধিনা অকস্মাতের কূলে,
সারা অরণ্যে শিহর লাগিবে, ছন্দ উঠিবে কূলে,
সুন্দর-নদীতে কলধ্বনিতে বহিবে স্রোতের ধারা,
আগিবে জীবন, চারি দিক পানে চাহিবে আশ্রহার।

ভূমি কি আসিবে, চাহিবে আবার দীঘল ছ-আঁধি কূলে ?
কূলে-বাওয়া কথা কল-গুঞ্জে বলিবে আবার কূলে ?
স্বরের মতন শুনে বাব শুধু, কে করে অর্থ তার !
স্বরের বন্ধু নিকটে আসিবে, ছাড়িয়া যাবে না আর।

মাঝী পূর্ণিয়া এসে কবে বুঝি চ'লে গেছে নাহি জানি,
সেদিন কি-ভূলে চাহিনি উর্ছে, তুমি তোমার বাণী।
সেই বঞ্চিত মুহূর্ত্তগুলি অকলে ভরি' অগ্নি,
এস স্বপ্নের বেদনার পাবে চকলা মায়াময়ী।

এল কান্তন, ফুলে ফুলে তাই কুজ ভরিয়া গেল,
বিচলিত বত শুক পজ শূন্যে ঝরিয়া গেল।
বনে বনে হুক বাতুল বায়ুর ব্যাকুল আন্দোলন,
কোন্ দেবতার স্বাতুল চরণে জীবনের নিবেদন।

ফুল-কোটারোর সজীতে মেলে স্বরা-পত্রের পান,
বাওয়া ও আসার পদধ্বনিতে এ-পথ স্পন্দমান।
এস অশান্ত, এস বসন্ত, এস ভূমি, বারে বারে
জীবনের বীণা বাজিয়া উঠুক অপূর্ণ স্বভারে।

ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ঐহরিহর শেঠ

পূর্বও যেমন গিরি লজনের সাধ হয়, বামনের যেমন টাংগে ছাত্ত দিবার ইচ্ছা হয়, আজ বক্তৃতা আমার নশাও তাহাই। আমাদের দেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রসেবা বলিতে সাধারণতঃ বাহা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি এবং সরকারের নশ কোটি টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর এই বৃহত্তম নির্মাচন উপলক্ষে সর্বত্র বাহা হইতেছে, সংবাদপত্র মাঝকত অনেক বিষয়—অচিন্তিতপূর্ব ব্যাপার বাহা অবগত হইতেছি, রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্ত, রাষ্ট্রের উন্নয়ন-জন্ত দেশসেবক নেতা অ-নেতাদের যে অক্লান্ত চুটচুটি ও অমাহুতিক পরিশ্রম করিতে দেখিতেছি ও হয়ত বা অপখ্যাগু অর্থব্যয় করিতেছেন বলিয়া অল্পতর আসিতেছে, তাহাতে উহা সামান্য ত্রিষ্টিট বোর্ড অথবা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির নির্মাচনের একটা অতি বৃহৎ সংস্কার ভিন্ন আমার দৃষ্টিতে ত আর তেমন বেশী কিছু ঠেকিতেছে না। অতিরক্ত বাহা পাইতেছি, তাহা আর কিছুই নহে—দেশব্যাপী উৎসাহী বিভক্ত ও কণ্ট দেশসেবকদের মধ্যে হু-নীতি, অসাধুতা সম্পর্কহীন খাটি লোকদিগকে বাহিয়া লইবার জন্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা একটা নতুন ব্যবস্থা।

কোথার মনে করিয়াছিলাম, আয়োজনের বিয়াট ব্যবস্থা ভিন্ন বৃহৎ ব্যাপারে নতুন ও অসাধারণ কিছু দেখিব। গাড়ী মোটর কিন্ন করিয়া নির্মাচকদিগকে আনার সঙ্গে এবার হয়ত বা নবীনতর স্নেনের ব্যবহার বা ঐ মত কিছু কিছু দেখিতে পাইব। কিন্তু মুখের স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণীদের বা দলবিপণের মধ্যে বা উদ্দেশে স্পষ্ট কথা-কাটাকাটি, সত্য মিথ্যা গোবারণ প্রভৃতি নানা রকমের প্রচারক, চলিতে পারিলেও নির্মাচকদিগকে সপক্ষে ভোট দিবার জন্ত কোন আকারে অর্থদান ত দূরের কথা, প্রার্থী বা প্রার্থীর হইয়া অপরেরও নির্মাচনের নিমিত্ত নিদিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা গাড়ী মোটর করিয়া ভোটদায়কে ভোটদান কেন্দ্রে আনাও নিষিদ্ধ। পাছে বেহ অসাধু উদ্দেশে একাধিকবার ভোট দিতে চেষ্টা করেন এইজন্য মেবতানানব নিবিশেষে প্রত্যেককেই বাগিয়া দেওয়ার রেওয়াজও নতুন দেখিতেছি।

এক দিকে এই নির্মাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুঃ—প্রার্থী বা প্রার্থীদের কথা বা প্রতিপ্রতিমত নির্মাচনের পর বেশমাতাকে অপরূপ ঐর্ষ্যমণ্ডিত; করার কল্পনা, অল্প দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রদ্বয়ের অবাচিত সাহায্যদানের আগ্রহ

বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই উভয়ের সম্বন্ধে না জানি অচিরে আমরা বেশমাতাকার কি অপরূপ রূপই না দেখিব।

রূপক ছাড়িয়া বাস্তব ক্ষেত্রে বাহা দেখা বাইতেছে তাহার কথা ভাবিয়া আমি বড়ই গোলে পড়িয়াছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনভাগ্যর যেমন অক্ষুণ্ণ, কোন কোন রাষ্ট্রবিশেষকে তাহার আধিক সাহায্য দানে আগ্রহ এবং দেশ সাহায্যের পরিমাণের বহরও তরুণ। ভারতের প্রতি তাহার দমনী ক্ষমতার পরিচয় ইতিপূর্বেও পাওয়া গিয়াছে। আজ কিছু দিন হইতে সংবাদপত্র ও বেত্তিও মাংকত মার্কিন সরকারের আর এক আগ্রহ ভারত-খ্রী-তর যে পরিচয় পাওয়া বাইতেছিল তাহা কাথাতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। একটি চুক্তির দ্বারা স্থির হইয়াছে, ভারতবর্ষকে আগামী ৩-শে জুনের মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্য প্রদান করা হইবে। উদ্দেশ—ভারতের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হ্রদ করা। ইহা অবশ্য নিতান্ত একতরফা নহে। বর্তমান ভারত গবর্নমেন্ট তাহাদের পরবাবিক পরিকল্পনা কাথাকরী করিবার জন্ত প্রার্থী হইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কিছু থাকিবে না।

এই চুক্তির পর কম দিন না বাইতেই পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভারতবর্ষে রাষ্ট্রদূত মিঃ চেটার বোল্‌স বৃহৎ পারিয়াছেন, উক্ত সাহায্যই বংগে নহে। তিনি বলিয়াছেন—গত চারি বৎসরে ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে; তবে মন্থর গতিতে। আগামী চারি বৎসর তাহার পক্ষে অত্যন্ত লক্ষ্যম হইবে। মিঃ বোল্‌সের মনে হয় একজন ভারতকে আধিক সাহায্য করা একান্তই প্রয়োজন, ভারতের পক্ষে এই সাহায্য একরূপ অপরিহার্য এবং যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা করিতে পারেন না। এই উদ্দেশে তিনি সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্ত বিমানযোগে নিউইয়র্ক পৌঁছিয়াছেন এবং তাহার তিনি আগামী চারি বৎসরে ভারতকে এক শত কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য দিবার অভিপ্রায় জানাইয়া স্থপারশ করিয়াছেন। মনে হয়, ভারতের দুঃখ দুঃখইবার জন্ত হয়ত তাহাদের দমনী প্রাণ এই সাহায্যও না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিবে না।

পূর্বের পচিশ কোটি টাকা অর্থ-সাহায্যের চুক্তির উদ্দেশে বর্ণনার স্পষ্টাকরে লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-

সরকার এবং মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে সংযুক্ত ভাবে কাজ করিতে, আবার বিশ্বশান্তি নষ্ট হইতে পারে এমন কোন কারণ দেখা দিলে, ভারতবর্ষ সেই অবস্থা দূরীকরণের জন্য মার্কিন সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা লেখা থাকিলেও নয়া দিল্লীর ঘোষণা হইতে জানা যায় চুক্তির মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কোন সঠিক নাই। হয়ত এই নতুন সাহায্যও এই ভাবের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা-বিবক্ষিত কোন সঠিক গৃহীত হইবে।

এই নতুন মার্কিনী সাহায্য সম্পর্কে একটা কথা না হইতেই, ভারতবর্ষ পোন্ডিচের রাষ্ট্রপতি মঃ এন. ডি. নোভিকোভ-বোঝাইয়ের এক সাংবাদিক বৈঠকে স্থাপিত এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, পোন্ডিচের রাশিয়া ভারতবর্ষকে যে-কোন বহুশান্তি ও বাস্তবিক সাক্ষরতা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং এই সমস্ত বহুশিল্পের মূল্য ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় মুদ্রায় (টাকায়) কিংবা অল্প যে-কোন “মূল্য মুদ্রা” দিতে পারেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে তাহাদের দেশের যে-কোন মাল কিনিতে পারেন এবং তাহাদের যে সমস্ত প্রবোদ প্রয়োজন তাহাও তাহারা ভারতবর্ষ হইতে কিনিতে বাধ্য আছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ করেন যে, রাশিয়াতে বেকার-সমস্যা নাই। পোন্ডিচের সমাজনীতি এমন যে, উহার মধ্যে আর্থিক সমস্যার কোন স্থান নাই, তাহাদের যুদ্ধের বয়সে শান্তি ও নির্ভর্য্যতা প্রয়োজন।

যখন ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে কসকারখানা ও প্রযুক্তির প্রদান করিতে গিয়া নানা রকম বিঘ্নে সম্মুখীন হইয়াছেন, যখন তাহারা একমাত্র আমেরিকার মুখের দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে দিন গণনা করিতেছেন, তখন এই অবাচিত প্রস্তাব নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সংশয় নাই।

একদম দেখা বাইতেছে, এক দিকে ভারতের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হ্রাস করিয়া ভারতের উন্নতির জন্য আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। পড়িয়া লাগিয়াছেন, অন্য দিকে পোন্ডিচের রাশিয়া আমাদের দেশের দৈন্য কোথায় তাহা অল্পসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন এবং তাহা ঘুচাইবার জন্য স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া শুভ প্রস্তাব আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। চুক্তি যদি হয়, জানি না হয়ত বড়জোর ইহার মধ্যেও বিশ্বের শান্তিক্ষেত্রে ভারতকে পোন্ডিচের রাশিয়ার সহযোগিতায় অন্য প্রস্তাব দ্বারা হওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

আপাততঃ এই সব সাহায্যের পরও আশা প্রয়োজনীয় আর একটি বড় সাহায্যের স্থান পড়িয়া থাকে। সেটি আমাদের কৃষির উন্নতি বিষয়। নতুন চীনের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি যে অল্পকালীয় একথা হয়ত অনেকে বলিবেন। চীনের সহিত ভারতের শ্রীতির সম্পর্কও বহু শতাব্দীর। ভারতে অনাবাদী জমির অভাব নাই। কেঁজুনে ভারতের দরদে মধ্যপ্রাচ্য চীনের দরদে না এই সময় কাঁদিয়া উঠে। চীনের অর্থবল কিরূপ জানি না, তাহার জনবল চির-প্রসিদ্ধ। ভারতে সোনা ফলাইয়া অল্পের অভাব মিটাইবার জন্য তাহারাও স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া এই সাহায্যের প্রতি-বন্ধতার যুগে যে নিজ লোকবল লইয়া ভারতকূলে না আগাইয়া আসিবেন তাহা কে বলিতে পারে।

ভারতের অল্পসংখ্য কৃষ ঘুচিবার পর তাহার স কৃষির উন্নতি ও দেশবন্ধার কথা আসে। এককালে যেমন ইংরেজ ‘অসভ্য’ ‘বর্বর’ ভারতকে সভ্য শিষ্ট করিবার প্রয়াস পাঠাই-ছিলেন, তেমনি আজ গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নতির সাধনে রাশিয়া হয়ত উদ্বিগ্ন-পড়িয়া লাগিয়া বাই-বেন, আর দেশবন্ধার স্বপ্ন দিয়া ভারতকে বণদল্য সাহায্যের কাণ্ডে আমেরিকা আত্মনিয়োগ করিবেন।

যদি সত্যই আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের ভারত-শ্রীতি-বশতঃ ভারতের সমৃদ্ধি জন্য সংসা একযোগে সাহায্যের একটা প্রবল প্রতিবন্ধতা উপস্থিত হয় তাহা হইলে এত স্বপ্ন কি গোড়া ভারতের ভাগ্যে সহিবে? তখন তাহার চাপে ভারতের কি দশা হইতে পারে তাহাই আজিকার ভাবনা।





চিল্লা বাহাৰ

পশ্চিম সমুদ্র-বন্ধে

ঐশিকালী নন্দী, এম-এ

৩১শে আগষ্ট ১৯৫১ সন, সকালবেলার সোনালী সূৰ্য্য
রাঙা আলো ছড়িয়ে দিলে আরব সাগরের বন্ধে—ব্রীড়াময়ী
নবমুখর মত রক্তিম হয়ে উঠল তার মুখ। আমাদের
চিল্লা বাহাৰ সাড়ে সাত শত বাজীসহ অকূল সমুদ্রে
পাড়ি জমাল। পাড়ের দিকে একবার চোখ পড়ল—
অনেকেই কামাল নাড়ছে জাহাজের বন্ধ থেকে, কেউ বা
চোখ মুছছে, কেউবা বেরনা চোপে রেখে নান হাসি হেসে
প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ভারতের ম টি ছেড়ে
আমরা অজানা সমুদ্রের বুকে ডাঙ্গলাম।

আরব সাগর পাড়ি দিতে এবার লাগল পাঁচ দিন। প্রথম
ছ'একদিন বাজীরা সবাই বেন আশ্চর্য্যবকম শান্ত, কাকরই
কনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ছেড়ে এসেছে প্রিয়জন,
সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বজনহীন প্রবাস আর দূর সমুদ্র-
বাজী—এ সকল মিলে তাদের করে তুলেছিল বিষম। নানা-
দেশ থেকে এসেছে নানা ভাষাভাষীর দল, সম্পর্ক স্থাপিত
হয়েছে পজার গুজরাট মরাঠা জাতিড় উৎকল বন্ধ সন্তানদের।
কেউ চলেছে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় মণিরাণিক্য আহরণ
করতে, কেউ-বা চলেছে পশ্চিম হতে আলোক-রক্তি নিয়ে
এসে ছড়িয়ে দিতে ভারতের বুকে।

উপকূলবর্তী আরব সাগরের রং নান। সাগর বলতে
বে ছবি ভেসে উঠে আমাদের চোখে তার দর্শন পাই বেশ
খানিকটা হয়ে গেলে পর—বেখানে, কুলের চিহ্ন নেই,

সীমাহীন জলধি মিশে গেছে নূরে দিক্চক্রবালে, ধূসারমান
মেঘের বেধা বেধানে এক হয়ে গিয়েছে প্রিয়ার আলিঙ্গনে।
মাঝে মাঝে উঁকি মেয়ে আমাদের দেখছে উড়ুচ্ছ মাছের
দল। যেটুকু সামান্ত শক্তি আছে ওদের পাখার তাই দিয়ে
হাতখানেক লাফিয়ে বা উড়ে ওরা চেষ্টা করছে জাহাজের
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। বে সামান্ত ডেউ উঠছে
তাতেই বাজীদের মধ্যে কেউ কেউ শব্দ্য নিয়েছে, আবার
বধন সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করলে তখন ধীরে স্তব্ধ
অনেকেই এসে ডকের ওপর বসল। বেদিকে তাকাই শুধু
নীলের মেলা, অপক্লপ রং এই নীল সাগরের—বে নীল পাই
বাংলার আকাশে, বে নীল দেখি পূর্বীর সমুদ্রে, সেই নীলের
বুক চিরে চলেছি আমরা। ক্রমশঃ সমুদ্রের রূপে বনে হচ্ছে
বাংলার কোন ভ্রামল প্রান্তরে নীল আকাশের নীচে বসে
আছি। কিন্তু না আকাশ ত নীল নয়, এমন ধূসর আকাশ
একমাত্র তখনই দেখা যায়, বধন বর্ধনমুখর প্রকৃতি কণিক
বিজ্ঞানলাভের আশায় শুধু মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রোবে গর্জন
করে ওঠে। আরবের উপকূলবর্তী এ আকাশ বেন অভি-
মানী মেয়ে, প্রিয়জনের অনাদরে টোট ফুলিয়ে বলে আছে
পা হুলিয়ে, এই বুঝি গাল বেয়ে বয়ে অঙ্গ।

আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।
একদিন দেখলাম ঠিক বেন একখানি পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশে
মেঘের রং নেই, সূর্য্যের শেষ বিদায়কালীন রক্তাভা নেই,

কেবল সোনালী রঙের একটি গোলাকার বস্তুটিও ধীরে
নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের অভলম্পর্শ পড়ীরতায়। আর একদিন
দেখলাম অস্তরূপ। খানিকটা রক্তিম আভা ও মেঘের
সংমিশ্রণে গলিত লাতার যত সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের
কোলে।



আহাঙ্ক হইতে এডেন বন্দর

আগামী কাল অর্থাৎ এই সেপ্টেম্বর পৌছিব আমরা
এডেন বন্দরে। বাজীরা এবার বেশ প্রসন্ন চকল। বার
বার জিজ্ঞাসা করছে, “কাল কখন পৌছিব?” এই কয়টি
কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে ডাঙার জীব বাজীরা আবার
কবে মাটির মুখ দেখবে। তারই ভিত্তি একটা আকৃতি—প্রাণ

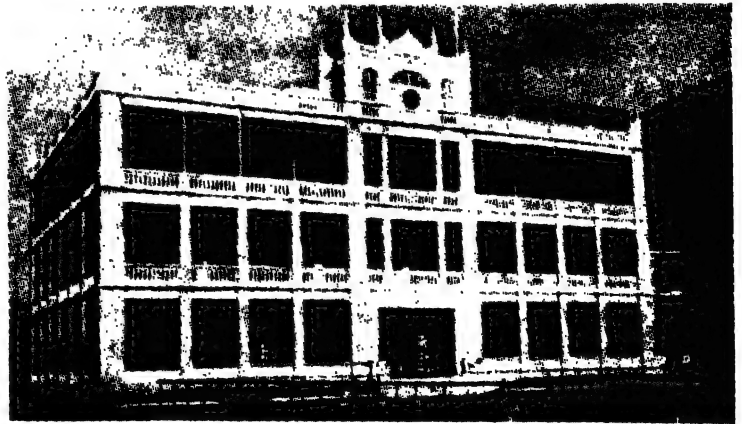
তাদের ঠাপিরে উঠেছে—প্রথম দকার
কি এত দীর্ঘ পাড়ি শোবার? এইজন্মেই
কি পান-কক্ষে বাজীর এত ভিড়?
ঐ যে নিম্নো ছেলেটি এত বেশী
পরিমাণে পান করেছিল কি লাভ
হ’ল তার? টাল সামলাতে না পেরে
বেচারি অস্তিম শয্যা নিলে সাগরতলে।
বিপদজ্ঞাপক তাঁর বাঁশী বাজিয়ে
বাজীদের ঘুম ভাঙিয়ে সকলকে জানিয়ে
দেওয়া হ’ল কি ঘটছে। খানিকক্ষণ
খোঁজাখুঁজিও চলল কিন্তু এই রাজ্যে
সাগরের কোন্ অভলে যে ছেলেটি
সলিলসমাধি লাভ করেছে তার কোনও
পাতা পাওয়া গেল না।

অবশেষে এডেন বন্দরে এসে পৌছলাম। বন্দরটি কিন্তু
দূর থেকেই বেশ দেখায়, যেন ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম।
পাহাড়ের সুকৃষ্টিতে যে বাড়ীগুলো উঠেছে সেগুলি যেন

পটে আঁকা হবির মত। প্রায় সব বাড়ীই নেমে গেল
ছোট ছোট খেরা নৌকার। সকলেই চাইছে সস্তার কিছু
সত্তা করতে, কারণ এডেনে বাণিজ্য-স্তম্ভ নেই বলে
এখানকার জিনিষপত্র বেশ সস্তা। এখানে ভারতীয় ও
বিলাতী উভয় রকম মৃত্তার ব্যবহারই চলে। বারা আহাঙ্ক
থেকে নামে নি তাদের কাছে পণ্যত্রব্য বিক্রয়ার্থ অনেকগুলি
ভাসমান বিপনি এসে আহাঙ্কের চার পাশে ভিড় করে
দাঁড়াল। এদের বা আর তার বেশীর ভাগই আগে বাজী-
দের কাছ থেকে।

বাজীরা বাতে প্রবাস-দুঃখ তুলতে পারে তার জন্য হরেক-
রকম আনন্দের ব্যবস্থা আছে। নানারকম খেলা, গীতকক্ষ,
ধূমপান-গৃহ, তার উপর আছে পানকক্ষ। কীড়াসমূহে
প্রায় সকলেই বোগ দেয়। সব জিনিষই সাধারণ
বাজারের তুলনার চেয়ে সস্তা, তাই কাকরই বিশেষ
অনুবিধা হয় না। সপ্তাহে দু-তিন বার সিনেমা দেখাবার
ব্যবস্থাও আছে।

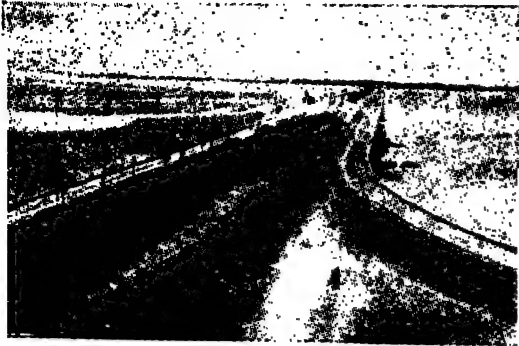
আহাঙ্কের ভারতীয় বাজীরা একদিন সর্বজাতির
লোকদের সহযোগিতায় একটা পানের মজলিস বসাল,
পর পর তিন দিন হ’ল এই অস্থান। কারণ ডেকের উপর
বসন্তগুলি চেয়ার পাতা বার তাতে মাত্র এক তৃতীয়াংশ
বাজীর বসবার ব্যবস্থা হয়। অস্থানটি কিন্তু মোটামুটি
মন্দ হয় নি। বাড়ালীরা আবার আলাদা ভাবে আর একটা
জলসার ব্যবস্থা করলেন। মহাসমারোহে “শেষ বর্ষণ আর
শারদোৎসব” উদযাপিত হ’ল। নিম্নক বাজি—বাইরে বস



জেনারেল হোটেল, এডেন

কয় বৃষ্টির শব্দ, অভলান্তিকের বুকের উপর ভাসমান
‘চিহ্ন’ের বৃকে হৃদয় প্রবাস-বাজী বস-সজানরা কবিত্বের
নাটকের দৃষ্টিকোণ ও প্রতি-গোচর রূপদান করছেন। অপার

প্রভাষ, অস্বস্তি প্রভৃতির দল নির্ভাক, অবাঞ্ছিতীয়া ইংরেজী সাধারণ ও ভাবার্থের এবং অপকল্প স্থরের সমন্বয়ে মুগ্ধ। সমাপ্তির সঙ্গে মুগ্ধ গুঞ্জে শোনা গেল একটা কথা 'অপূর্ণ'।



সুন্দরখালের পাথের হাটা

এবার আমরা লোহিত সাগরে। লোহিত সাগর বিস্তৃত মোটেই লোহিত নয়। বং তার মোটামুটি কৃষ্ণ, কিন্তু তার উষ্ণতা এত বেশী যে বাতীরা কেউই প্রায় কেবল ফিরে যেতে চায় না। কেবিনের ভিতরেও প্রচুর তাপের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু তাতেও গরম কিছুমাত্র কমে না। তিন দিন এ অবস্থায় তাপ প্রধান সমুদ্র উপর দিয়ে আসার পর আমরা পৌঁছলাম সুয়েজ খালের মুখে। অপূর্ণ এর গোড়া। দু'দিক দিয়ে পাহাড় আর পাহাড়, গ্র্যানাইট পাহাড়ের কোল দিয়ে চলে গিয়েছে সুন্দর ছোট সহর। সুয়েজ খালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে "ইগুয়া মেমোরিয়াল"। তারই পাশে বোধ হয় "ব্রিটিশ দূতাবাস" আর তার কাছে কাছে ন'না দেশের পতাকা চিহ্নিত বিহীন কোম্পানির ভবন। লেকের পাড় দিয়ে চলে গিয়েছে সহরের প্রধান রাস্তা, বক্রকে পীঠের রাস্তার উপর আধুনিকতম মোটর-গাড়ীসমূহের সন্ধান। রাস্তার দু'পাশে কাউ পাছের সারি। ভারি সুন্দর আর পবিত্র পবিত্র সহরটি। বাড়ীর ছাদগুলো কোথাও কোথাও বা হলুদ, বেন মনে হয় সূর্য বনের ভিতর থেকে লাল হলুদ লতা। কুটীরগুলো উঁকি মেয়ে আমাদের দেখছে। তার পরই আমরা এসে পড়লাম এমটা লোক—নাম "বিটার লোক"। সুয়েজের চার পাশের এবং অপর প্রান্তবর্তী পোর্ট সৈয়দের কোনরূপ ছবি তোলা নিষেধ এবং আইনঃ দণ্ডনীয় অপরাধ। বারি সন্ধ্যা বন্দর থেকে পরিমিত দেখতে গিয়েছিল তারাও ক্যামেরা সঙ্গে নিতে পারেনি। পিতৃ-মিতের পাপ নিয়েই ত এলাম। কত ১১ বিচিত্র গল্প এবং ঘটনা বর্ণিত আছে এতলোর সঙ্গে, এদের দেখলে জীবনের

নবরতা বেন চোখের সামনে ভেসে উঠে। জীবনকে বেঁধে রাখবার জন্য আয়োজনের সীমা নেই, কিন্তু সত্যিই কি সে স্টো সফল হয়েছে?

১ই সেপ্টেম্বর, রাতে পোর্ট সৈয়দ বন্দরে পৌঁছে দেখি চারদিকে বিপণির সারি, আর বণিকসমূহ অ'হ্রাসনের আওরাজে সে অঞ্চলটি মুগ্ধিত। কর্তৃপক্ষ বাতীরের 'ভিগা' দেওয়ার পর কেন জানি না সকলেই একটু শঙ্কাকুল চিত্তে পাড়ে নামল। বিশেষ দূর যেতে কারুরই আগ্রহ দেখা গেল না। সাধারণ লোকের ব্যবহার খুব ক্ষুদ্রতাপূর্ণও নয়, আবার বৈরিতাভ্যন্তকও নয়। কিন্তু কি একটা অইচ্ছুকী ভীতি যেন বাতীর আর পোর্ট সৈয়দবাসীদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। বেশী দোকমাকবি আর তর্ক বিতর্ক কেউই করতে চাইল না। স্হাটী কিন্তু বেশ সুন্দর। বেকোন বড় সহরের মত চওড়া রাস্তা, দু'পাশে পাছের সারি আর রাস্তার দু'ধারে দোকান, রেস্তোরাঁ আর বেশ বড় বড়



হুয়েটা বন্দর

বাড়ী। অবশ্য রাত বলে সবই আলোর কসল করছিল। এখানকার বিশেষ চিত্তাকর্ষক জিনিষ কিছু দেখলাম না, চামড়ার কাজ মন্দ নয়। অনেকেই অ'গ্রহের সঙ্গে ছবি কিনল। রাত বাটোর আবার তা'সলাম জুম্মা সাগরের বুকে।

বাতীর একটু গভীর হয়ে উঠেছে। মাটির মর্মন আর বেশ কিছু দিন পাওয়া বাবে না। এবার একেবারে টিলবারী বন্দর।

এবার জলের বং নীলাভ সবুজ। প্রেও ডেট, অনেকই শয্যা নিলে। কেবিনে কেবিনে ইয়ার্ড ও টুয়ার্ডস্ এসে মাঝে মাঝে খোজ নিয়ে যায় কার কতটা চোঙাও দরকার। ব'রা সুস্থ তাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ হাস্যকর, তারা অস্বস্তি তারা ভাবছে এখনই যদি এই, বিকে উপসাগরে না জানি কি হবে? এটিকে ভাহাজে জালানির অত্যাঘ দেখা দিলে। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে, জালানি সমুদ্রের জন্য আমাদের আহ্বানকে যেতে হবে জিজ্ঞাসীর প্রণালী

অতিক্রম করে আফ্রিকার উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত বন্দর সুরেটায়। এ খবরে অনেকের মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

যতই আমরা পশ্চিমাভিমুখে এগুতে লাগলাম ততই আমাদের বড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়া হতে লাগল। কোন দিন বা এক ঘণ্টা, কোন দিন বা আধ ঘণ্টা। ভূমধ্য সাগরে সূর্য্য অস্ত গেল বেলা ৭টা ৩০ মিনিটে। ডেওর উপরে যাত্রীর ভিড়—রাতে সূর্য্যাস্ত দেখার জন্য অনেকেই ব্যাকুল।



[সুরেট। বন্দরের একটি দৃশ্য]

১৩ই সেপ্টেম্বর রাতে একটি কুলেটিন বের করা হ'ল। তাতে ১৫ই সুরেটায় নামবার জন্য সকলকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, আরও জানানো হ'ল সুরেটাবাসীরা জ'মা-কাপড়ের সংকীর্ণ থাকে পছন্দ করে না, অতএব কেউ যেন সংকীর্ণ পোশাকে অথবা জানের পোশাকে ভীয়ে না নায়েন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, 'ক্যালি ফ্রেন নাইট'—খাবার টেবিলে কর্তৃপক্ষ একটা করে কাগজের টুপি প্রত্যেককে পরিবেশিতেন, খাবার ঘরটি নানা বং-বেরঙের কাগজ আর বেলুন দিয়ে সাজান হ'ল। প্রতিটি বাত্রীর মাথায় একটা করে টুপি—খাবার টেবিলের দৃশ্যটি দেখবার মত। সন্ধ্যা ৭টা বাজতেই আদেশ হ'ল ছোট ছেলেমেয়েদের অপরাধ পোশাকের প্রদর্শন। একটি মেয়ে—বছর আঠেক তার বয়স হবে, লম্বা পাঞ্জামা, পুরা আত্তিন জামা, কাঁধের উপর দিয়ে জড়ান উড়ুনা আর মাথায় পালক গৌজা পুরো টুপি, পিঠে লেখা "Ready for ceuto" গেলে প্রথম পুরস্কার, আর দ্বিতীয় পুরস্কার পেলে "Scarecrow" একটি ছেলে—ছেঁড়া জামা গারে দিয়ে মুখে বং যেখে আর একটি ছোট পাইপ মুখে নিয়ে তাকে সত্যিকারের খোড়ো মানুষের মতই দেখা দিল। অবশ্য বাত্রীর প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু পুরস্কার

পেলে এবার বড়দের প্রতিযোগিতার পালা, কার মাথায় কত বকম উদ্ভট বস্তুনা খেলতে পারে তার নির্দর্শন দেখতে পেলাম। প্রথম পুরস্কার যিনি পেলেন তার সর্কাদে জড়ানো ছিল, পিছানোর স্বগলিপি।



জাহাজ হইতে সূর্য্য বন্দর

১৫ই সেপ্টেম্বর আমরা পৌঁছলাম সুরেট। বন্দরে। ১২৩০ গালের পর ভারতীয় বাত্রীবাহী আর কোন জাহাজ এ বন্দরে নোঙর করে নি। দু'থেকে লাল পাহাড় দেখে মনে হয় এ বুঝি সূর্য্যাস্তের বং, আসলে কিন্তু তা নয়। গ্র্যানাইট পাহাড় বলে তার বং লালচে বাধামী। পাহাড়ের কোলে সাগর—খচ্ছ তার বারিগাণি, একটি ছুটি মালবাহী জাহাজ, ইতস্ততঃ ভাগমান ছোট ছোট খেরা নৌকা, নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের বুকেচোরা গ্রা—সূর্য্যাস্তের বর্ণ-সমাহোহ, সব মিলিয়ে যেন পে এক বিচিত্র রঙের মেলা। যে দিকে তাকাই দৃষ্টি যেন ফিরতে চায় না।

ছোট এই বন্দরটি বর্তমানে স্পেনীয় মরক্কোর শাসনাধীন। এর বাস্তাব্যটি সবই পড়িকার পরিচ্ছন্ন। এখানকার অধিবাসীরা বেশ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ভারতবাসীদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল ভেটীর উপর দাঁড়িয়ে। ছ'জন পরস্পর অফিসার উঠে এলেন উপরে বাত্রী-দের টাকা পরলা লেন দেনের জন্য। বিলেহী বা ভারতীয় মুদ্রা এখানে অচল। ১১০ পেসেটা এক পাউণ্ডের সমান। প্রত্যেককেই পাউণ্ড ভাড়ি র দেওয়া হ'ল, আর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে বাড়তি বা অবশিষ্ট মুদ্রা ফি-রিয়ে দিয়ে পাউণ্ড নেবার কথা ঐ স্পেনীয় অফিসারদের বলে দিলেন। ভেটীর বাইরে দাঁড়িয়েছিল মোটর বাস আর ট্যাক্সি। বাত্রীগণের দেখানে মূণি বেড়াতে বেরুল। অনেকেই লক্ষ্য হ্রাকারসের আবাদ গ্রহণ, স্পেনীয় পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ আর তাদের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ। এখানকার চারফার কাছ বেশ ভাল। অনেকেই কিনল

কাঠের কবতালের মত এক রকম বস্ত্র বা' নাকি ওয়া ব্যবহার ক'রে গান বা নাচের সময় হাতের ডালুর সাহায্যে ডাল জাপন করে—অনেকটা তুড়ি দেওয়ার মত শব্দ হয় তাতে। যে সকল সুরেটাবাসী দাঁড়িয়েছিল পোতাঙ্গরে তারা মহা কোতুলকের সঙ্গে বাজীদের লক্ষ্য করছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। আসল কারণ ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না—বাজীদের ডাবা জানতে চায়, বাজীরা একটু একটু করে আকার-ইজিতে করেকটা কথা ওদের সমঝে দিলে আর উদ্ধারও করলে ওদের ছু' একটা কথা। হাসি ওদের স্বভাব। যারা সহরে গিয়েছিল—তারা ইতিমধ্যে কিরে এল; তারা যে বর্ণনা দিলে তার সার মর্ম হচ্ছে এই যে, এই ছোট সহরটির অধিবাসীদের ভয়ভা, বন্ধুত্ব আর ঐ-সৌঠবের ভুলনা হয় না।

বাঙালী মেয়েদের শাড়ীর টুকিকে এরা এমন অভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে মনে হয়—ওরা যেন বলতে চায় এটা আবার কোন্ জাতীয় পোশাক। যেখানে দেখা গেছে গজদন্ডের মত শুভ্রবর্ণী, আপানবস্ত্রক বস্ত্রাবৃত্তা সজ্জা মহিলারা এমন পর্দানশীল যে, শুধু কথা বলার সময় মুখের আবরণটি ঈষৎ সরিয়ে থাকে, সেখানেই কিন্তু দোকান বাজারে মেয়েদের দেখে মনে হ'ল স্বীকৃতির এখানে

প্রচুর স্বাধীনতা। এত ভিড়ের মাঝেও কুংসিত চেহারা চোখে পড়ল না। পাথর কেটে তৈরি, পরিষ্কার পিচ্চালা রাস্তাঘাট দেখে নরন পরিভ্রম হয়। রাস্তার দক্ষিণ-অবলম্বী রীতি মনে করিয়ে দেয় আমরা ত্রিটিপ রাজস্বের বাইরে এসেছি। প্রত্যেকটি বাজী উপরে না উঠা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল আমাদের নবপরিচিত বন্ধুরা, শেষে নিতহাস্তে ক্রমাল নেড়ে বিদায় নিলে।

এবার আমরা অতলান্তিকের বুকের উপর। সীমাহীন আকাশ আর অন্তহীন জলধি মনে এনে দেয় অপূর্ণ প্রশান্তি। ঘনকৃষ্ণ বায়িরাশি রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠে—মাঝে মাঝে লক্ষন তরঙ্গমালা জাহাজের পায়ে এসে প্রতিহত হয়। এই ত অতলান্তিকের প্রকৃত রূপ। তরঙ্গহীন সমুদ্র যেন নিশ্রাণ। এবার আমরা চলেছি পর্দুগালের উপকূল দিয়ে। অবশেষে আমরা বিস্ফে উপসাগরে এসে পড়লাম। কিন্তু বিস্ফে:ছিল আশাতীত রূপে শান্ত। চকিশ ঘণ্টার পর ধীরে ধীরে সমুদ্রের রং বদলে গেল। আগামী কাল আমরা যুক্ত-রাজ্যের-ভীরভূমির দর্শনলাভ করব। বাজীরা এখন থেকেই তার ভোড়জোড় করেছে। রাত্রি প্রভাত হ'ল, ২১শে সেপ্টেম্বর জাহাজ এসে পৌছল টিলবারী বন্দরে তার গন্তব্য স্থলে।

দুঃখবাদী

জিসন্তোবকুমার অধিকারী

দিন যায়, দিন বাবে সে ভ' জানি ;
মরবো না তবু রহস্য নয়,
মতে মতে জীবনের রত্ন-মিঃশেষ করি ;
চিন্তনর
হতাশার বেগ জ্বলো হয় আর বিপত্তর।
শূন্যতাতে
বন্দী-জীবন কেঁবে কেঁবে মরে রহস্যর মহা আত্মজ্ঞাতে।
মরবো না তবু।
তোমার চোখে যে বেধা থাকি আছে অবিবাল,
যেখি নি যে আত্ম আত্মরতির শেষপ্রত্যয়ণ সর্বদাশ ;
পলে পলে মত সঙ্করলোণে দিমাত্ত বেবে জমে ঐবার,
অবশের কথা পাথরের যুকে জলে মার সেবে রিক্ততার।

বেঁচে থাকা এই ;
বিক্রম নয়, বিশিষ্ট মতে পাণ্ডু লেখ,
বাঁচি আকাশের ছায়াপথ শুনে প্রত্যাশাকুল নির্দোষ,
তরা বিকলের রক্ত-আলোর ঝাঁকে জীবনের বহুগুলি,
জলে মার লিখি, বায়ুসজ্জার শেষ কামনার দিমার তুলি।
দিন যায়, তার ছায়ালোকে দেখি অদংশরিত আত্মদাশে,
যেখি পোহুলির হলদার প্রিরা, তোমার রহস্য দিক্‌দিক্‌লে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

খাদি রাঙে ভই বেরিতে, নকালে উঠিও বেরিতে, ইহা আমার বরাবরের অভ্যাস। সেদিন দুই তামিতেই কানে আলিল শিশীমার সুতীক্ষ্ণ কর্ণের বন্দ্বনে আঙরান। ইহা প্রায় নিত্যকারের ব্যাপার হইলেও একটু বিস্ময় যে আলিল না, তাহা নহে। শিশীমাই এ বাটির প্রতাবশালিনী বকরময়ী কর্ণী। কিন্তু সেজন্য কোন অসুবিধা ছিল না। পরিবারের মধ্যে বাল করিতে হইলে কাহারও-না-কাহারও কর্তৃত্ব বামিরা চলিতেই হয়, আপত্তি করিলে শৃংখলা থাকে না। সুতরাং সে কিছু বিরা আবারের কোন অভিযোগ ছিল না, কিন্তু পোলযোগ থাকিয়াছে এ বাটির হেলেমেয়েদের আচারহীনতা লইয়া। দুই হেলেমেয়েরা নকাল হইতেই বল বাঁধিয়া চা, বিস্কুট, ডিম প্রভৃতি মিষ্টি পানীয় ও খাদ্যগুলি পো-প্রালে সিলিয়ে...আচ্ছা তাহাতেও না হয় শিশীমার ভেতন আপত্তি নাই। হেলে-নাহুদের অন্ত বিচার করিতে গেলে চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই দুইজন হেলেমেয়ের স্নেহপনা করিবার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে না? তাহারা কি না তাহার ঝিলসহ কক্ষের লম্বুণ হইতে আরম্ভ করিয়া সারা বারান্দা ভরাইয়া স্নিগ্ধতার পূকার ঘরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত স্থান ছুঁড়িয়া বাহা গুলি ধাইবে ও ভূতাবশেষ বগেছভাবে ইতস্ততঃ হুড়াইয়া রাখিবে? রাগ হইবার কথা নয়? একালের হেলেমেয়েদের স্বর্ধাত বতাব ও মোংগামির তীব্র প্রতিবাহ করিতে করিতে সমস্ত কারপাটিতে গোবরফলের ছড়া বিরা পথের উপরের হেঁতা পাতা ও কাগজের টুকরা, কিলের ম্যাকতা ও বড়হুটা একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া ভুলিয়া পথিপার্শ্বের সর্ধমার বিক্ষেপ করিতে করিতে আবারের সন্ধ্যাতা সেকালের শিশীমা পুনরায় স্থান করিতে চলিলেন।

শেখিন পনিবার। কর্ণহল হইতে সকাল সকাল বাজি
কিরিতেরি, কাহাকাহি আলিরাই শুভিলাব শিনীয়ার অত্য
কঠোর দুশখচিত্তিত বকার। ব্যাপার বে শুকতর কিছু মনে,
তাহা পছন্দেই অজ্ঞান করা যায়। বলিলাম, কি হ'ল
শিনীয়া? শিনীয়া তখন রাণে গল্পগু করিতেছেন, আমার
এবের উত্তর বিলম্ব না। কিন্তু গল্প ব্যাপারটি এক নিমিবেই
হুশট হইয়া গেল। বেতকাচার ভিন্ন বহরের ছেলে বিষ্ট,
শিনীয়ার অঙ্কলি ভাল হাতের দুর্ভার বরিয়া তখন অপনপ
অনীতে বহ বহ হাত করিতেছে। তাহার ভদ্র মতে, উদ্ভল
চকে, ঝাককা চলে—কোথাও ভরের সেপহাজ নাই।

ব্যাপারটি এই। বশাকে ও শুভাচারে শিলীরা হবিভ্যাসের
পাছটি উদ্বাহ হইতে দাবাহিতা বস হইতে হাত ধইবার বৃত

বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময় পূর্বোক্ত দিক্‌র পাশ্চাত্য পড়িয়া গিয়াছেন—এবাং কাওজাবহীন অপোগণ্ডি তাঁহাকে ছুটি বাহ বিহা বড়াইয়া বরিয়াছে। কাকীনা বলিলেন, “ও ত বিপদর শিত, বিবি, ওর পরণে ত কাপড়ের কোম বালাই নেই, ও হুঁলে আর বোঝ কি ?” এই গা-ঘলানো বেহিলাবী কথার পিণীনা আরও অধিক বলিয়া উঠিয়াছেন। কথাকাটা শুঁর হিলাব না করিয়া বলা ঠিক হইয়াছে কি ? শিত-বিপদর শুধুই বহি তাঁহার আঁচল চাপিয়া বরিত, তাহা হইলে কি তিনি অভ রাগ করিতেম, না, রাগে তাঁহার নরীক হালা করিত ? তাহা নহে। সে হকিণ হতে অকল বরিয়া আছে এবাং সেই সঙ্গে বাহ হতে দুট দুটিতে তাহার কুল একপাটি লুতাও বরিয়া রহিয়াছে বে। সে বড়টির বোহ সে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

আগে আগে ঘেঁষিরাছি পিসীরা হেলেনের ভালবাসিতেন
 বেশ। ইন্দাণী কেবল তাঁহার আচারপরাধতার উত্তাপে
 তাঁহার জ্বরের শিকড়িতির রগটুকু বেশ মিনেবে বিতক
 হইয়া উঠিতেছে।

উরুক্ষে অভ্যন্ত নমালোচনার মুখেই দুর্লভলি আওতাইতে
আওতাইতে আমাদের শিল্পীরা পুনরাঃ দ্বান করিতে চলিলেন ।

শিক্ষাকার অভ্যাসমত সেদিনও শিসীরা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে
স্নানার্থি লাগ করিয়া ঠাহুতের 'বৈকালকী' সন্ধ্যাপন করিতে
মগ্নিরে হুকিয়াহিলেন। কিন্তু ঠাহার বড় অষ্টকনে টুনিফে
বিবাস করিয়া দূর্য্য করগাছি ভুলিয়া আনিতে বলাই 'কাল'
হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

ইনি আবারের পাতার এক মনঃশূন্যের ঘেরে—এ বাড়ির
হেলেনেঘেরের খেলার সাথী। মধ্য মধ্য সে শিলীয়ার দুই
একট কাই-করমাস খাটরা যেন বড়িরা যায়। অবত, অর্ধ-
বোবে কচাপি দ্বিভ হর না এইরূপ সমাতম করমায়েরই সে
খাটতে পার। আতও সে হুঁসী ভুলিবার অল্পবতি পাইরা
পরমাহ্বাবে দৃত্য করিতে করিতে বহির্কীটে দিয়াছিল
ও প্রাক্ষের চকুড়িকে দুরিরা দুরিরা বাহিরা বাহিরা সন্তজ
হুঁসীবলের মর মর ডগাডলি ভুলিরা আনিরা শিলীয়ার
ভুললীর রেকাবীর একান্তে আলগোহে রাবিরা বিরাছিল।
কিন্ত চক্লমতি হতভাষি ঘেরে ত দুই চোখে ঘেবিরা
কোম কাক করিবে না। হুঁসী সে ভালই আবিরাহে বটে,
কিন্ত সেই সঙ্গে জড়াইরা জীৱ-ভাপত থেকে বনে পড়া এক
ইহুৱা বহু হতাও বে আনিরা বিরাহে। এখন টিহাৱই কাঁক
বিরা কোৱ অতার অতভাচার বে টীহুৱবরে প্রোকেব করিল

ভাহাই ভাবিতে গিয়া পিসীমার পাশ কাটা বিরা উট্টরাহে—
“না পো।” ব্রাহ্মণকতা ও নরঃশূত্র-কতার হৌওরা কাপড়ের
হতা যে একই কার্পাস তুলার তৈয়ারি এবং ভগবান্ তু
মাহুয়ের অন্তরের মিঠাটুকুই বেধেন, বাহিরের নর—এমনিই
কিছু বলিতে বাইব, এমন সময় বেধি, পিসীমা যেন তাঁহার
কুহ দৃষ্টিতে কাহাকে খালন করিতে করিতে, শীতে কাপিতে
কাপিতে নদীপথে চলিলেন।

হৃদয় শীতের সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেদিকে
কাহারও খেয়াল নাই। পূর্ণোত্তমে একটি উপায়ের আলোচনা
চলিতেছিল। আচারহীনতার ভ্রত পিসীমার নিকট সদা-
লাহিতা এ বাড়ির ছোট বড় ওরকে আশ্বাসের আশ্রয়িকা ছোট
কাঙ্কিনা বলিতেছিলেন, “নরঃ আর কি। খালি নাওরা আর
নাওরা। বর্গ থেকে সোনার রথ মেয়ে আসবে ঠেকে তুলে
মেবার করে। হাতে হাঁকা, পায়ে হাঁকা—অচি আর কি।
ভগবান্”—আর বলা হইল না। বেথিলাস, দারপথে সতন্ত্রতা
পিসীমা পঙ্কজ করিতে করিতে বাড়ি চুকিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পরের কথা। শীত ভগনও বাই-বাই
করিয়াও একেবারে দিশেষ হইয়া যায় বাই। হঠাৎ অনমরে
বেথিলাসের অকলে প্রবল বজা আসিয়া বেধিতে বেধিতে প্রাচ্যের
পর প্রাচ্য গ্রাস করিয়া কেলিল। ইহা আপনারা কেহ কেহ
হরত প্রত্যক করিয়াছেন, আর বাহারা প্রত্যক করেন নাই,
তাঁহারা সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। এতহ-
পলকে বন্যমত ব্যক্তিগণের মাঝ সংবোধিত করিয়া রিলিক
কার্যের কর্মীদের সাহায্য করিবার ভ্রত সংবাদপত্রের ভ্রতে
ভ্রতে, ছাওবিলের ছেলে ছেলে হৈ হৈ চলিতেছে। সর্ব্বকর্মে,
সকল সময়ে অএই ছেলের দল পলার হারমনিয়ম ও স্বদন
তুলাইয়া, বঙ্গনী বাজাইয়া নগরের পথে, গ্রামের পথে সময়ে
ললিত গাহিয়া চলিয়াছে—“তিকা দাও পো, তিকা দাও পো।”
রিলিক কার্যের সুবিচার ভ্রত ছোট-বড় করেকটি ভ্রত স্থাপিত
হইয়াছে এবং আরও করেকটি হইবে, তাহার উত্তাপ
চলিতেছে। বানাহান হইতে কর্মীরা আসিয়া ছুটিতেছেন।
আমাদের সদর বাড়ির ছইখানি ঘরের মধ্যে বড় বরটি ও লম্বা
বালানটি তাঁহাদের ছাড়াইয়া বেওরা হইবে, যির হইয়াছে।
ইহা জাঠাঘোষার সন্নিভক্রমেই হইয়াছে। কিন্তু পিসীমাকে
না জানাইয়া বা তাঁহার অস্থিতি না লইয়া কোন কার্য করা
এ বাড়ির রীতিও নহে এবং তাহা সম্ভবও নহে। সুতরাং
না, জ্যাঠাইয়া—কাহাকেও লইয়া কাজ চলিবে না, পিসীমার
বরাভিকা আমাদের করিতেই হইবে। “ইহারা ভ্রতসন্ধান,
হৃদয়দের সেবার তার মাথার লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন
এবং জনসাধারণের সাহায্যভিকা করিয়া যেনে বেধে
কিরিতেছেন”—ইত্যাদি বলিয়া আমি পিসীমার নিকট ইহাদের
বহু প্রাণের একটি সংকিত পরিচর বিজ্ঞাব। আশা হইল,

মিয়র, বঙ্গহীন মরমারীর হৃদয়খার ছবি পিসীমার মনস্তকের
সমুখে তুলিয়া বহিতে সমর্থ হইরাছি। অতঃপর ভ্রতসন্ধান-
পণের আভিবেশতা বীকার করিবার ভ্রত নিয়মিত করেকটি
সর্ভে পিসীমার সহিত সতি স্থাপিত হইল এবং ভ্রতপাং সর্ভ-
গুলি তাঁহাদিগকে জানাইয়া বেওরা হইল। সর্ভগুলি এইরূপ :
(১) আহাৰ্য্য গ্রহণকালে উচ্ছিন্ন পাত হইতে আর বা ব্যক্তদের
কোন অংশ যেন আসবে পতিত না হয়। (২) বাবহতে
দৈবাং অরণ্যের স্পর্শ ঘটিলে, সেই হত যেন তুলক্রমে নিজ
পরিবেশে সংস্পৃষ্ট না হয়। (৩) প্রত্যাবে যেন আর্দ্রবর পরিধান
করিয়া কার্যবিশেষটি সম্পন্ন করা হয় অথবা উক্ত কর্মসম্পাদন
পথে পরিহিত বস্ত্রটিকে যেন রীতিমত সিক্ত করিয়া লওয়া
হয়। চতুর্থ অথবা সর্ব্বশেষ সর্ভটি হইতেছে এই যে, ভ্রতপাং
গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে যেন কতই পর্য্যন্ত হত ও জাহ পর্য্যন্ত
পদবর প্রকালন করা হয়। অপরিহার্য্য এবং অল্পপেক্ষীর
এই সর্ভচতুষ্টয় আগতকরণের ঐতিহ্যোচরীভূত করা হইলে
তাঁহারা হাত সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হাসি খামিলে
এক জন বলিলেন, “আপনারা এই সকল মিয়র যেনে চলেন?”
বর্ষাসম্ভব গাভীর্ষ্য বারন করিয়া বলিলেন, “এই সকল আচার
পালন করা এ বাড়ির মজাগত অভ্যাস। এগুলি পালন না
করার কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি না। তাই বলে
আপনারা ভাববেন না যেন, এগুলো যেনে চলতে আমাদের
কোন কষ্ট হয়। না, আমাদের মোটেই কোন অস্থিতি হয়
না।”

আচার-অস্থিতির ভ্রত মধ্যে মধ্যে মতভেদ হইতে
খাকিলেও বেথিলাস, পিসীমার সহিত রিলিকের ছেলেদের
যেন একটু বসিষ্ঠতা করিয়া উঠিতেছে। বজা করিয়া আসিল।
ছেলেদের এখানকার কাজও প্রাচ্য সুরাইয়া গেল। এ
অকলের বাহারা তিকা দিবার, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত
সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের বাড়িটিকে ভ্রত করিয়া
চতুর্ধিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে তাঁহাদের কার্য লারা হইয়াছে।
তাঁহারা এখন অতঃ পিরা তিকা করিতে চান। সুতরাং
এইবার তাঁহাদের বিহার দিবার পাল। পরমুৎকাতর এই
পরিচরহীন পণের ছেলেগুলির ভ্রত হারের একটি নিতৃতককে
বেধা অস্থতব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিহারবেলার
বেধি, পিসীমা অঙ্গসকলচকে একটি ছেলের মাথার হাত
রাখিয়া তাঁহার কল্যাণকামনা করিয়া বলিতেছেন, তোমাদের
অনেক কষ্টদিয়েছি বাবা, সে সব তুলে বেও, যদি কখনও
এদিকে আস তো পিসীমার সঙ্গে দেখা করে বেও আবার।

বর্ষাশেষ। ম্যালেরিয়াট। এবার যেন কায়েরীতাবেই
চাপিয়া বহিয়াছে বেধিতেছি। বাড়ি বাড়ি অস্থব।

হুটর বার। হঠাৎ এক সময়ে বাড়ি কিয়িরা দেখি, পিসীমার হুটরতী অন্যাতার আমাদের ছোট কাকিমা পিসীমার হবিত্ত নামাইতেছেন। শুভ গরবের পাড়ীর উপর তিলা চুলগুলি এলাইয়া দিরাছেন—চুলের জলে শিঠের ধানিকটা তিঝিরা দিরাছে—তাহার এইরূপ হুটী সচরাচর দেখি না—সচরাচর কেন, কোন দিন দেখিরাছি বলিরা মনে পড়ে না। যথেষ্ট কৌতুকবোধ করিলাম। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি বোধ করিলাম বিস্ময়। পিসীমার হবিত্ত নামাইতেছেন আমাদের ছোট কাকিমা—বাহার হাতের হোঁওয়া জল পান করিতে কুচি হর না, তিনি? এ কি বিস্ময়। অচিন্তনীয় কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিরাই মনে হইল।

ছোট কাকিমা বীরে হুহে বলিলেন, দিহিরিদি আজকাল সকল সময়েই ব্যস্ত থাকেন, সময়মত আসতে পারেন না, তাই আমিই হুটো হুটীরে রাখি। না হলে যে তাঁর বাওরাই হয় না, বাবা।

পিসীমা ব্যস্ত থাকেন? কিসে তাঁহার এত ব্যস্ততা—বার জন্ম তাঁহার আজন্ম বহুতুল সংস্কারের অহুষ্ঠানগুলি উপেক্ষিত হইতেছে? সময়ে আসিতে পারেন না? কেন? কোথায় থাকেন তিনি? তবে কি আজকাল তাঁহার ‘বাড়িক’ বাড়িরা দিরাছে? শুচিবাহুপ্রভৃতা তমিরাছি ক্রমবর্ধমান এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। তবে কি আজকাল তিনি নদীর বাটেই সান্নাতিম কাটাইতেছেন? এইরূপ বহু প্রশ্ন হুহুত মনো বিচ্যুতের মত আমার মাথার খেলিরা গেল। নিম্নেবদ্য। আমি সপ্রশ্ন হুটিতে ছোট কাকিমার বুকের দিকে তাকাইতেই

তিনি আমার মনের ভাব বুঝিরা বলিলেন, “দিহিরিদি এখন কলুপাতার পেছনে, সেখান থেকে বাবেদ বান্ধিবতিতে। বয়ে বয়ে অসুখ। কে কার বুখে জল দেব, তার ঠিকানা নেই। তাই তিনি নিজের হাতে সেই সব অভাগার সেবার তার মাথার তুলে দিরাছেন।” আমাকে বলিতে বলিতে ছোট কাকিমার চক্ষু হুইটী সজল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি অত দিকে রূপ কিরাইলেন।

সন্ধ্যা সইয়া একটি বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। হাঁচা-বাঁশের বেড়া-দেওয়া খোঁকো ঢালা। বাওরার উট্টরা বয়ের মনো উঁকি দিরা দেখিলাম, পিসীমা সেই চির অস্পৃহকাতির ছোট একটি মেয়ের মাথার হাত তুলিয়া দিতেছেন। অপর পার্শ্বে আর একটি বিছানার আগাগোড়া সেপহুঁকি দিরা অসুট বয়ে পৌঁতাইতেছে আর একজন। যেমন মিনেবে আলিরা-হিলাম, তেমনই মিনেবে পিসীমার অলক্ষ্যে কিয়িরা চলিলাম।

দুসর সন্ধ্যা। হাজার মত মিনেবে বীরে বীরে বয়ে কিয়িলেন ঐ আমার সন্ন্যাসিনী পিসীমা। আজ আর কোন বাবা মাই। হুটীরা চলিলাম তাহার বয়ে। তাঁহার পা হুইটীর উপর আমার মাথা রাখিরা বলিলাম, পিসীমা না কেনে অনেক অপরাধ করেছি, আমাকে ছুঁি করা কর। তারপর করেক কোঁটা অবোধ অশ্রু আপনিই বরিরা পড়িরা তাঁহার চরণ হুইটী সিজ করিল।

কুলজী গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান

অধ্যাপক জীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ভারতের জাতীয় জীবনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত অর্ধ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সমস্রাই ছিল জাতীয় জীবনের সর্কাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্রা। ভারতের ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ইতিহাস সবচেয়ে বাহারী কৌতুহলী, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস তাঁহাদের নিকট একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় না হইয়া পারে না। জুগের বিষয়, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক আলোচনাকারীদের মনোযোগ এদিকে উপযুক্ত পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নাই। অধিকন্তু, দেশীয় সাহিত্যে এ বিষয় সম্পর্কে যে অমূল্য উপা-

দান পাওয়া যায়, ভারতের কোন প্রদেশেই তাহা সম্যক্রূপে ব্যবহার হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাংলা-সাহিত্যে বাহা পাওয়া যায় তাহার পুরাপুরি সম্যবহার এখনও করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এবং অন্য কোন কোন স্থলে পুরাতন বাংলা-সাহিত্য হইতে ছুঁচারাটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এমন একটি একদেশ-দর্শিতাপূর্ণ চিত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, বাহা সাহিত্যে প্রতিকলিত বৃহত্তর চিত্রের ঠিক বিপরীত।

বাহা হউক, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সবচেয়ে বাংলা-সাহিত্যের নানা বিভাগ হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া কোন বিকৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যের বিশাল প্রাঙ্গণের এক

নিষৃত ও উপেক্ষিত কোণ হইতে সামান্য কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়া হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষুদ্র একটি বিষয়ণ দিবার চেষ্টা করা বাইতেছে। কুলজী গ্রন্থে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের যে সামান্য পরিচয় ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহার কথাই আমি বলিতেছি। সেকালের ঘটক মহাশয়দিগের রচিত কুলজী গ্রন্থগুলি হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের বংশপরিচয় পরিজ্ঞাপক হইলেও, ঐ শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধীয় যে ছ'একটি ঘটনা অথবা লেখকগণের মন্তব্য দৃষ্ট হয়, তাহা সম-সাময়িক অবস্থার একটা আংশিক ধারণা দিতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত লেখাগুলিতে তৎকালীন মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কী-মোগল শাসক-সম্রাটদের সহিত শাসিত অর্থাৎ হিন্দু সম্রাটদের সংস্রব এবং এই সম্বন্ধে হিন্দু প্রজাসাধারণের মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। কুলজী রচয়িতারা তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদিগকে নিজেদের বিষয়ণ ও মন্তব্যের বাহিরে রাখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সেকালের ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসক-সম্রাটদের সহিত প্রজাসাধারণের যে সম্পর্ক ও তাঁহাদের প্রতি যে মনোভাবের সামান্য পরিচয় কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পুরাপুরি সৌহার্দ ও শ্রীতির জ্ঞাপক হইলে সকলেরই আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, কুলজী গ্রন্থে শাসক-শাসিতের শ্রীতিমধুর সম্পর্কের পরিচয় এই ক্ষুদ্র লেখকের সংগৃহীত উপকরণগুলির মধ্যে পাওয়া যায় নাই। ইংহারা সেকালের শাসক-সম্রাটসমূহকে লেখকগণের ইতিহাস গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া এই সম্বন্ধীয় চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহাদের সহিত কুলজী গ্রন্থের এ বিষয়ে মিল দেখা যায় না। অথচ, বাংলা ভাষায় লিখিত এই শ্রেণীর গ্রন্থবাক্যকে সেকালের বাঙালীর মনের কথার অধিকতর নির্ভর বাগ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়াও উপায় নাই। বাহা হউক, এখন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করা যাক।

তুর্কী-মোগল শাসনের বিরুদ্ধে ধোঁকোড়ি।

বিদেশী ও ভিন্নধর্মাবলম্বী তুংস্ক-মোগলাদি জাতীয় আক্রমণকারীরা হিন্দুসমাজের বিলোপ ঘটাইলে, হিন্দু-সমাজপতিগণ যেমন মনোবেদনা অস্বস্ত্য করিয়াছিলেন, হিন্দুশাসনের অভাবে যে সামাজিক বিপর্যয় ঘটয়াছিল তাচাও তাঁহাদিগকে তেমনি উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করিয়াছিল। “গৌড়ীকথা” নামক বিখ্যাত গ্রন্থের নিম্নোক্ত হজ্জগুলি ইহার প্রমাণ :-

হিন্দুর রাজত্বকালে সর্বত্রই ছিল ভালো
বিভাজ্ঞান্য সর্বত্রই থাকে।

হিন্দুধর্ম অক্ষত, অত্যাচার আবির্ভূত,
সম্মানসম্বন্ধী অত্যাচার।
সদাচারমূলক দেশ, ভিত্তি এক দেশ
অর্থের প্রতি একাত্ম পূবা।
ক-হস্তির সোজাপণে, দাসবিএ এক পণে
বর্ননাশে নাহি বলে আছা।
সবে বন-বনীভূত, সদাচার বহির্ভূত,
নাহেদার কুলীন প্রোজীর।
কুলীনেতে কুলজিয়া, প্রোজির পণের প্রিয়া,
বিভাজ্ঞান্য সকল গোজীর।
সংজ্ঞা আছে ভট্টাচার্য্য বন কথাই বিভাজ্য,
রক্তময় বিশেষ প্রবল।
অর্থকার পুত্রবার, অপবর্ণ অববার,
বর্নকর্ম বিভাজ্য হুর্কল।

বিজ্ঞেতার দাসদের প্রতি সমাজপতিগণের ঘৃণা।

ঘটক-কারিকার মতে, অহিন্দু শাসনের নিষ্পেষণে হিন্দু সমাজে বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার উপর, হিন্দু সমাজের অনেক ব্যক্তি ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসকবর্গের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া স্বজাতিপ্রোহিতা এবং “দহ্যাতা” (অত্যাচার) দ্বারা সেই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কুলজী-রচয়িতারা বলেন যে, এই শ্রেণীর হিন্দুরা “লবণের” (প্রভুগণের) প্রতি আত্মপত্যা দেখাইতে গিয়া “গো-ব্রাহ্মণ” হত্যারও পশ্চাৎপদ হইতে না :-

কেহ কেহ বনবের, সুবিধত লবণের,
প্রধান অমাত্য কর্কর।

প্রধান দাসের পেয়ে, বলার সে দার রেঁয়ে,
সেই ত অমর্থের আকর।

তাই বন্ধু দার রেঁয়ে, দহ্যকার্য্যে বেশ ধেরে,
জলপথে হলগথে বীর।

পাতশায় লৈতগণে, বেজারিত হলদহানে
পোজাঅণ হত্যাতোও হুহির। ইত্যাদি।

তুর্কী-মোগল শাসকদিগের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া যে সকল হিন্দু নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কুল-মধ্যায়া নির্ণয়কারী ঘটকমহাশয়দিগের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর হিন্দুরা কুলজী গ্রন্থে ভিন্নধর্ম হইয়াছিলেন এবং ইহাদের ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রভুর প্রদত্ত উপাধিসমূহ মধ্যায়া অপেক্ষা অগৌরবের চিহ্ন বলিয়াই তখন বিবেচিত হইত। কুলজী-রচয়িতাদিগের মধ্যে “হলো পকানন” সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার দ্বারা রচিত বলিয়া কবিতা নিম্নোক্ত হজ্জগুলি এ বিষয়ে এখানানবোধ্য :-

অতিপাণে মহাপাণে বড় শিরশ্ছেদ ।
 অহুত্রে বাধাযুক্তা এই ত প্রভেদ ।
 এই আত্মা দেব বাবা ভায়া শিখাবরা ।
 যখন রাজের বড় সন্তা পিকোবরা ।
 ভায়ের রাজহে বাবা বী নব্ববরা ।
 দরিক বিখাল আর রায় দরকার ।
 চৌদ্বী দুদী বনী হাজরা তরকার ।
 সমাকার রায় রেঁরে আর কোয়ারহার ।
 * * *

পকানন হলো কর হাসকের কথা ।
 রায় রেঁরে কোজদার অহকার বুধা ।
 সমাকের উচহানে বা বলিতে পাও ।

রাজবর্জারে মোকের বাধাযুক্তাতে বাও । ইত্যাদি ।
 তুর্কী-মোগল শাসনের প্রথম দিকে হিন্দু-সমাজপতিগণ
 বিদেশী ও বিধর্মী শাসকগণের দাসত্বকারী ঐশ্বর্যশালী
 হিন্দুদিগকেও যে শাসক-সম্রাটের সহিত সংশ্লিষ্ট্য বিস্তৃত
 কিন্তু দরিদ্র হিন্দু অপেক্ষা অপবিত্র মনে করিতেন তাহার
 দ্বারা একটি প্রমাণ “মেলমালা” নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় ।
 ঐ গ্রন্থের একটি শ্লোক এইরূপ :—

মহিতা জনমানন্দো বন্ধ বাণী গজেন্দ্রকঃ ।
 ভিত্তী ঐ পরমানন্দমহো রায়াঃ কুলান্তকাঃ ।

“সম্বন্ধ-নির্দেশ” রচয়িতা এই শ্লোকের উপর নিম্নোক্ত
 ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

“এই ভিন্ন ব্যক্তিই (অর্থাৎ শ্লোক উল্লিখিত জনমানন্দ,
 গজেন্দ্র এবং পরমানন্দ) আকবরের সময় রায় রেঁরে পদে
 প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । মুসলমানের দাসত্ব করিতেই বলিয়াই
 বিশেষ নিমিত্ত ছিলেন । কিন্তু অর্ববলে লোকীকুলীন মধ্যে
 র্তা সম্রাট করিয়া সমাজে উন্নিত হন ।...সামাজিকগণ
 যাদের দাস অপেক্ষা বাধীন ব্যক্তিবর্গকে অতঃপূর্ব জান
 করিতেন । সেইজন্য এই ভিন্ন রায় রেঁরকে অপবিত্র ও
 বিশেষরূপে কুলনাশক বলিয়া উল্লেখ করেন ।”

এই প্রসঙ্গে, রাজপুতানার ইতিহাসের কথা স্মরণীয় হইবে
 যেন পড়ে । মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ যে মনোভাবের
 বশবর্তী হইয়া মোগল সম্রাটের প্রিয় ও প্রধান সেবক মান-
 সিংহের সহিত একজ্ঞ ভোজনে আসীন হইতে পারেন নাই,
 বাংলার সেকালের সমাজপতিদের মধ্যেও কতকটা সেই
 মনোভাবই বিদ্যমান ছিল, যদিও তাহার অভিব্যক্তি হইয়া-
 ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাবে ।

অবশ্য, একথাও এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, তুর্কী-
 মোগল শাসকদিগের সেবার রত হিন্দুদিগের প্রতি সমাজের
 এই বিরূপ ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং ভিন্নবর্ণ-
 লবী প্রভুর প্রবৃত্ত সেবকত্বচক উপাধিগুলি পরিণামে

সুগার ভাব যুক্ত হইয়া অন্যান্য উপাধি ও পদবীর মতই
 কেবল বংশচিহ্ন রূপে গৃহীত হইতে লাগিল ।

বাহা হউক, এক্ষণে “মেল বন্ধন” এবং “লবণ দোষ”
 “বন দোষ” প্রভৃতি ব্যাপার হইতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের
 কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখা যাক ।

মেল বন্ধন ।

আধুনিক হিন্দু সমাজে কোন ব্যাপারেই “মেলের” প্রশ্ন
 উঠে না । কল্যাণ উঠিলেও উহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব
 আরোপিত হয় না । কিন্তু সেকালের বিবাহ ব্যাপারে
 “মেলের” প্রশ্ন খুব কঠোরতার সহিত বিবেচিত হইত । সে
 যুগের সামাজিক আবশ্যকতা হইতেই মেল বন্ধনের উৎপত্তি
 হইয়াছিল । “মেলের” ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে
 দেখা যায় যে, অ-হিন্দু শাসন কালে ভিন্নবর্ণাবলম্বী শাসক-
 বর্গের সহিত অবাঞ্ছিত সংসর্গের ফলে হিন্দু সমাজের কোন
 কোনস্থলে যে সকল “দোষ” ঘটয়াছিল, সেগুলিকে বধাসম্ভব
 সীমাবদ্ধ করিয়া সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করাই ছিল “মেল
 বন্ধনের” প্রকৃত উদ্দেশ্য । আধুনিক যুগে কাহারও কাহারও
 দৃষ্টিতে “মেল” হয়ত একটা নিছক খামখেয়ালী ব্যাপার ।
 কিন্তু কুলজী গ্রন্থের বিবরণ দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তখন-
 কার সমাজপতিগণ তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা একটা সঙ্কল্পে
 লইয়াই (অর্থাৎ পুরোক্ত “দোষ”গুলি বাহাতে সমাজের
 সর্বস্তরে প্রসারিত না হইয়া সর্বাঙ্গ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে
 সেইজন্যই) “মেল” স্থাপিত করিয়াছিলেন । “দোষ” যুক্ত
 বংশগুলিকে এক প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে
 অবশ্য “দোষ”শূন্য ঘরগুলিকেও নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত
 করার ব্যবস্থা হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে “মেলমালা” গ্রন্থের
 নিম্নোক্ত অংশ স্মরণীয় :—

মেল কি পদার্থ হয় করহ প্রবণ ।
 মহাজ্ঞানক হল বাবে আলমব ।
 যে কালে লবণ সেল লীলাচলে চলে ।
 হিন্দুস্বাধ্য শেষ হৈল বনমের বলে ॥
 সেকালে দেহেতে বড় হল অত্যাচার ।
 কুলেরে বাধি কিসে, জাতি রাধা তার ॥
 জাতিগত, বর্ণগত, কুলগত বাধ ।
 আর কি বলিব, মেলে এই অবলাধ ॥
 বর্ণেতে ভাঙিয়া হলে, কিছু বাহি হয় ।
 অতপূর্বা করে কুল, আর বিপর্যয় ॥
 পর্যায় লবণ প্রায় কুলে হাতি ছিল ।
 বাধাবিধ বিপর্যয় করিতে লাগিল ॥
 পৌনে ঐশ্বর্য দেখি পৌণ বীকারে ।
 বিবাহ করিতে চলে রায় রেঁরে করে ॥

এইরূপ ভিন্নমত বংশের করে পতি ।
তারপর দেবীর হৃৎসলী লভিত ॥
সেই সব দোষ লয়ে করে এক ঠাঁকি ।
রলে রল ভগ্ন করে, তার ভগ্ন গাই ॥

অতিনু শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত অবাহিত সংসর্গের
কলে এবং তাহাদের দাসত্ব-গ্রহণকারী হিন্দুদের চরিত্র-
ভ্রংশের পরিণামস্বরূপ সামাজিক বিপর্যয় রোধ করিবার
জন্তই যে মেল-বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা “সারাবলি
কারিকা” গ্রন্থেও স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে :

বেল বন্ধনের কিবা কব পরিপাটি ।
লবণ ববমানি দোবে আটা-আটা ॥
বহিষ্ঠা অগদামল পোড়ারি গন্ধেজ ।
ভিৎসাই পরমানন্দ, কষ্ট প্রোজিয়েজ ॥
ববনের দাসত্বে বলায় দার রে'রে ।
করে জাতিবন্ধু নত্যাগতি, দেখ চেয়ে ॥
অজ নিরুদ্বা কুইবে পাঠার লবেরে ।
লবর লৈলব বনি দেখে অলবরে ॥
বিজ্ঞে লুব ব্যবসার ভ্রাঙ্কণ্য বিসত ।
ববনের দাসত্বে ববনেই পণিত ॥
কেহ অশ্রাব্য, অকথা, নীচ পরিবাদে ।
পণিত, ভাঙ্কণ্য থাকে স্পর্ধার প্রমাদে ॥
এইরূপে লোভী বিজ ভ্রষ্ট হয় কাদে ।
কবে তেজে দলে উঠে মজার সমাজে ॥
ইহা দেখি দেবীর নব্য কুল বাঁধে ।
লবদোষী কুলীসেরে এক করে সাধে ॥

“ববন দোষ” ।

শাসক-সম্প্রদায়ের দাসত্বকেই প্রধানতঃ যেমন “লবণ
দোষ” বলা হইত (কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রাঙ্কণ বর্জক লবণের
ব্যবসায়কেও ঐরূপ দোষ বলিয়া ধরা হইত), তাহাদের
সংস্রবে ভোজন অথবা হিন্দুনারীর সহিত তাহাদের
অবাহিত সংসর্গজনিত দোষকে তেমনি “ববন দোষ” বলা
হইত । উভয় দোষই ভিন্নধর্মী শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি
শাসিত-সম্প্রদায়ের প্রতিকূল মনোভাবের প্রমাণ । পরা-
ধীনতার গ্লানি এবং সময়-সময় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা ধর্মের
লাঞ্ছনাজনিত মনোবেদনাই যে এই প্রতিকূল ভাবের কারণ
তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

“ববন” সংস্রবজনিত “দোষ” সম্বন্ধে “মেলমালা” গ্রন্থে
সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে :

হজ্রি মেলেতে, দোষের জালেতে
বেড়িল কুলীন বীন ।
নানা অপবাদে, করি অবলাদে,
বলেতে করিল কীণ ॥

বেকালে পীড়ালি, রাণে কতগুলি,
হইল বিকেরি দলে ।
সেকালে ববন সংস্রবে ভোজন,
কুলেতে গালি বে বলে ॥
একি অলব, যে জাতি বিভব,
বতমেতে রাধা দায় ।
ববন পবন, রহিল ভ্রাঙ্কণ,
তাহা কি লবণ পায় ?

উদাহরণ ।

হিন্দুনারীর “ববন”-সংসর্গের কলে কোন কোন মেলের
উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয় । বধা “ভুভরাজখানী”
মেল । “মেলমালা”য় ইহার যে বিবরণ আছে, “সম্বন্ধ-
নির্ণয়”কার তাহার উপর এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :

“ববন-নীতা কস্তা বিবাহে অ-কৃতপ্রায়শ্চিত্ত । বন্দ্য
মকরন্দ বংশীয় মাধব ভুভরাজ খাঁ প্রধান ।” সময় সময়
“ববন” দোষের মিথ্যা অপবাদ রটনার ফলেও কোন কোন
নিরপরাধ বংশের “দোষ” ঘটিত । ইহার একটি উদাহরণ
“ধাঁধা” দোষ । কোন ভ্রাঙ্কণ-কন্যা নদীতে জল আনিতে
গিয়াছিল । পথিমধ্যে হঠাৎ “ধাঁধা” অর্থাৎ নমুকা বড়
আসিয়া পড়িল । ভ্রাঙ্কণ-কন্যা পথিপার্শ্বে অবস্থিত হাঁসাই
খানাদার নামক মুসলমানের গোয়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য
হয় । বড় কমিলে কন্যা বাড়ী আসিল । বাড়ীর লোকেরা
দেবির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, ভ্রাঙ্কণ-কন্যা
মুসলমানের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল । সমবয়স্কারা এই
ব্যাপার লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করে । ক্রমে ক্রমে ঘটনাটা
অবাহিত ভাবে পল্লবিত হইয়া সমাজে রাষ্ট্র হওয়াতে
কন্যার বংশে “ধাঁধা” দোষ জন্মিল । অনুরূপ আর একটি
দৃষ্টান্ত এই : অনুচা কন্যা একাকিনী নদীতে গিয়া কুড়ীর
কর্জুক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । তাহার মৃত-
দেহ জলে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায় । ইহা লইয়া ববন-
সংসর্গের জনরব রটে । কলে, কন্যার পিতৃকূলে “ববন”
দোষ অর্শে ।

হিন্দুনারীকে বলপূর্বক ধর্ষণ কিংবা অপহরণের একটি
দৃষ্টান্ত “সাহসখানী” দোষ । শাসক-সম্প্রদায়ের সাহস খাঁ
(খান) নামক কোন দুর্দান্ত ব্যক্তি স্কন্যা ভ্রাঙ্কণীকে হরণ
করিয়াছিল । স্বতরাং তাহার বংশে “সাহসখানী” দোষ
জন্মিল । এই সকল ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য এই যে, উল্লিখিত প্রকারের
“দোষ” সম্বন্ধে সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট মাহুগুলিকে সমাজে
কোন না-কোন প্রকারের স্থান দেওয়া হইত ; আত্মকুণ্ডে
নিকিষ্ট উজ্জিষ্ট পত্রের মত লোকগুলিকে হিন্দু সমাজ হইতে
বুঝে নিকিষ্ট করা হইত না । আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে

রণ রাখা দরকার। তাহা এই যে, উপরি-বর্ণিত “দোষ”গুলি বন্ধে কুলজী-রচয়িতাদের মধ্যেই মতভেদ থাকিতে পারে। কোন কোন ঘটক মহাশয়দের বিবরণে তুলও থাকিতে পারে। প্রত্যেক “দোষ” সম্বন্ধে সত্যনির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত অঙ্গসন্ধান এবং গবেষণা করা হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়। সুতরাং বর্তমান যুগের কোন ব্যক্তি কিংবা বংশ যেন মনে না করেন যে, এই সমস্ত মধ্যযুগীয় ব্যাপার তাঁহাদের সম্মান অথবা অসম্মান ঘটাইতেছে। সেকালের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সামান্য কিছু পরিচয় গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রেই ঐ বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে, সামাজিক আন-মর্যাদার তারতম্য নির্ধারণের জন্য নহে।

“পীরালি”।

“পীরালি” ব্রাহ্মণের উপপত্তির যে ইতিহাস “নীলকণ্ঠের পারিকা” নামক ঘটক-কুলজীতে লিখিত আছে (এই বন্ধে ভিন্ন ইতিহাসও আছে), তাহাতেও সেকালের ভিন্ন-বর্ণী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত-সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্কের একটি চিত্র পাওয়া যায় এবং ইহাকে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অবস্থার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিলে তুল হইবে লিয়া মনে হয় না। নীলকণ্ঠের বিবরণটি সংক্ষেপে এইরূপ : দিশাহের নিয়োগপত্র পাইয়া খান জাহান আলী বশোরের সিনকর্তা হইয়া আসিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রধান কক্ষচারীর নাম মামুদ তাহির। অপর নাম পীর আলী। এই ব্যক্তি র্কে হিন্দু ছিলেন। কথিত হইত, তিনি মুসলমান নারীর পৈ মুগ্ধ হইয়া ধর্মত্যাগ করিয়াছিলেন। মামুদ তাহির স্মৃতিয়া পরগণার শাসনভার পাইয়াছিলেন। তাঁহার খানস্ব কক্ষচারীদের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব নামক দুই ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা কোন রোজার দিন মামুদ তাহির জাসদ সহ বসিয়া আছেন। প্রজারা নানা উপঢৌকন নিয়া হাজির করিতেছে। এক ব্যক্তি স্বগন্ধ লেবু নিয়া ভেট দিল, চারিদিক পক্ষে আয়োদিত হইয়া উঠিল। মামুদ তাহির “বাহবা, বাহবা” বলিয়া লেবুটি নাকের কাছে রলেন। কামদেব ও জয়দেব বলিয়া উঠিলেন : “হৃদয়, কেন কি? ব্রাহ্মণেরে অর্ঘ্য ভোজন। আপনাত রোজা ন হইল।” ব্রাহ্মণের জানিতেন না এই কথার পরিণাম রূপ সাংঘাতিক হইবে। কারিকার ভাষায় :

কথার বিজ্ঞপ ভাবি তাহির অহির।

গোষ্ঠাষি তালিতে দৌহের দন কৈল হির ॥

বিন গরে মজলিস করিল তাহির।

জয়দেব কামদেব হইল ভাষির ॥

দয়দারে চারিদিকে ভোজের আয়োজন।

লাভ পত বহুরি আর গোবাংল রহন ॥

পলাতু লভন গরে লতা ভরণুর।

সেই সভার ছিল আরো ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ॥

মাকে বহু দিয়া লবে গ্রন্থান পণিল।

কাকি দিয়া হলে কলে কত পলাইল ॥

কামদেব জয়দেব করি সোধেবন।

হাসিয়া কহিল হৃৎ তাহির তখন ॥

চারিকুরি চৌবুরী আর বাহি বাটে।

জাণে অর্ধেক ভোজন শায়ে আছে বটে ॥

মাকে হাত দিলে আর কাকি ভো চলে না।

এখন যেহে চং আমার লাখে কর খানাপিনা ॥

হুই জনে বরি পীর খাওরাইল পোত।

পীরালি হইল ভারা হইল জাতি মট ॥

কামাল কামাল নাম হইল দৌহার।

ব্রাহ্মণ সমাজে পতি গেল হাহাকার ॥

পীরালি অধ্যাত্তি দিল জাণদাজ দোষ।

সর্বদেশে রাষ্ট্র হল কুগ্রহের দোষ ॥

সংসর্গে পড়িল বারান ভায়াও হজিল।

ওক পীরালি দোষ বলি ঘটকে মুখিল ॥

উপসংহার

কুলজী গ্রন্থ হইতে সেকালের শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত শাসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইল। ঘটককারিক। কিংবা কুলজী গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে। সবগুলি মুদ্রিতও হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও সকল গ্রন্থ সহজলভ্য নহে। এই জাতীয় সমুদয় গ্রন্থ অঙ্গসন্ধান করিলে হয়ত আলোচ্য বিষয়ের আরও অনেক উপকরণ পাওয়া বাইতে পারে। এই প্রবন্ধ-লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অঙ্গসন্ধিস্বপ্নের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস বাহারা রচনা করিতে চাহিবেন, বাংলা-সাহিত্যের সকল স্তরের গ্রন্থ অঙ্গসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহাদের উচিত। মধ্যযুগের শাসক-সম্প্রদায়ের লেখক দ্বারা ফাসি ভাষায় রচিত গ্রন্থ অথবা ইউরোপীয় ইতিহাস-গ্রন্থেতা ও ভ্রমণকারীর বিবরণ অপেক্ষা দেশীয় সাহিত্যেই যে এ দেশের প্রজাসাধারণের মনোভাবের অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি পাওয়া বাইবে, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বলিয়া দিবার দরকার নাই। অবশ্য, যদি কেহ মনে করেন যে, কুলজী গ্রন্থসমূহে কেবল অলৌক কল্পনাগ্রন্থত গালগল্পের সমাবেশ আছে তো তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাহারা বিশ্বাস করেন যে, কিছু তুল কিংবা অতিরঞ্নের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুলজী গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়, তাঁহারা এ বিষয়ে অঙ্গসন্ধান করিলে আরও তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা বাইতে পারে।

শ্রী

শ্রীকৃষ্ণদত্ত মল্লিক

শ্রীটান নহি প্রভু,
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি
অভূতব করি তবু ।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই,
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাই,
কমা-সুন্দর তোমার স্মৃতি
তুলিতে পারি কি কত ?

২

ধর্ম তোমার নিয়েছে বাহারা,
নিয়েছে তোমার চিনা,
সন্দেহ হয় আমার দমাল,
তোমাতে নিয়েছে কি না ?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে ?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে ?
সমতা-বিহীন করিতেছে দিন
বহুদরাকে দীন ।

৩

অপ-বিচারেতে কীসি দিল বার।
আপান আর্পানীতে,
তোমার চেয়ে যে ক্রুশকেই তারা
বড় করে ভাবে চিতে ।
ইন্সপাতে গড়া তাহাদের সব দ্বিধা,
কমাহীন প্রতিহিংসার প্রতিনিধি,
ধরাকে কলুষ কালিমায় চায়
কুৎসিত করে দিতে ।

৪

তোমার আলোকে বাবে কি তাহারা
আধারের পথ বাহি ?
তারা যে আলোক সৃষ্টি করিছে
তোমার সৃষ্টি নাই ।
কি ভল্ল বেশ পরেছে বর্জিততা ।
মুখেতে বিশ্বশাস্তির বড় কথা,
বোহ আবিষ্ট, মন-গর্জিত—
শর্দার সীমা নাই ।

৫

তব প্রেম, কমা, শান্তি রাখো
মেঘ-পালকের দেশে,
মেঘ কোথা ? ক্রুর নেকড়ে ব্যাঘ্র
ভ্রমিছে ছদ্মবেশে ।
রক্ত-পাগল, হীন, হিংস্র প্রাণ,
হে জাণকর্তা, তাহারা পাবে কি জ্ঞান ?
তোমার অর্ডনে বিব-বিসর্গী
কি নদী মিশিল এসে ?

৬

অভীতে বাহারা কণ্টকহার
পর্যাইল তব শিরে,
কণ্টকিত কি করিতে ধরনী
তারাই এসেছে ক্রিয়ে ?
কোনো অপরাধ সাধনে নহেক ভীত,
নহে শ্রীতিকামী, বার্ষলভেই শ্রীত,
করে সমারোহে হিংসার পূজা
দাঁড়ায় তোমাতে শিরে

৭

ক্রুশে আরোপিয়া বলেছিল তারা
হাসি' বিক্রপ-হাসি
'পরম-সিতা তো রক্তিতে হুতে
আসিল না ভালবাসি' ?
রস-বিগ্রহ, জীবন্ত মন্দির
তাণ্ডে যুগে যুগে দূতেরা হুড়ুতির,
লাহনা যাবে দেবতা উঠেন
নব রূপে উদ্ভাসি' ।

৮

বৈকুণ্ঠ মোরা বিশ্বাস করি
তব পুনরুত্থান,
তুমি প্রোক্ষল পাণ্ডৱ দল
লুপ্তিত তুলিমান ।
তুমি আশ্রিত, হে অবিশ্বসনীয়,
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিরো,
অপাশবিত হে বৃদ্ধ প্রেম,
পাহি তব জয়গান ।

ভারতের নিকট যুক্তিকামী টিউনিসিয়ার আবেদন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

টিউনিসিয়ার ক্রাণের অধীনতাপাশ যুক্ত হইবার বড় গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের নেতা সাংবাদিক এল হবিব বোর্জিবা ও বহু জাতীয়তাবাদীকে টিউনিসিয়ার অধুনে একটি বীপে করাসী সরকার নিক্ষেপিত করিয়াছেন। এই পদ্ধতি বোর্জিবা মহোদয় ভারতের উদ্দেশে আরবি ভাষায় লিখিয়াছেন। উহার ইংরেজী অনুবাদ হইতে তাৎপর্য এখানে প্রদত্ত হইল :

“করাসী বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলন হইতে ইকোমেনিরা বাইবার পথে যে ক’দিন ভারতব্রাহ্মে কাটাইয়াছিল তাহা” আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাল বলিয়া মনে করি। এই সময় অনেক মূল্যবান কথাও আমি শ্রবণ করি। ভারতবর্ষে—আমি তুলিলাম ইহা এখন শুধু ‘ভারত’ নামেই আখ্যাত, এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নেতা এবং পবিত্র কর্মচারীর সঙ্গে বেথানাকাতের সৌভাগ্য আমার বটবাহে ধাঁহারা আমাদের বর্তমান বিপদে সাহায্য করিতে না পারিলেও আমাদের প্রতি বিশেষ সহায়ত্ব-সম্পন্ন। করাসী সম্মেলনের পর ভারত সম্বন্ধে যে সমস্ত বার্তা আমার মনে বহুল হইয়াছিল তাহারও অনেকগুলি আমার নিকট জাতিমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিরুদ্ধে আমি পণ্ডিত দেহুজর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি এশিয়ার মুসলমান, এবং বাবীম দেশসমূহে সর্বোপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি। সেখানে আমি শ্রীমন্মন্দের সঙ্গেও দেখা করিয়া-ছিলাম। তিনি পদাধিকার বলে সংগ্রামার্থে বিবার বোধ্য ব্যক্তি। আমার যোনের বড় পরপরমিত এবং পররাষ্ট্র কর্তৃক অবিখ্যাত কর্তৃক কর্তৃত্বিত দেশগুলিকে এইরূপ সং-গ্রামার্থে দিয়া তিনি ভারতের প্রতি তাহানিককে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতেছেন।

কলিকাতার আমি তৎকালীন পর্বর ডটর কাটজুর সঙ্গে আবহবর্তীকাল কাটাই। এ সময়টির কথাও তুলিতে পারিব না। আমার সোররোপন ডটর কীলানি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। ডঃ কীলানি আমাদের উভয়ের মধ্যে যো-জাতীয় কার্য করেন। তিনি উপস্থিত না থাকিলে ডঃ কাটজুর মূল্যবান কথাগুলির মর্ম এতদূর করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমি আশা করি, ডঃ কাটজুর পরামর্শমত চলিতে সমর্থ হইয়াছি। মহান্না গাভীর সহঃ আদর্শে তিনি আমাকে বাবীমতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এইভাবে চলিলে আমরা বাবীমতা-সংগ্রামে সাক্ষ্য-

লাভ করিতে পারিব। ইহার পর হইতে, এই কথাগুলির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া সেইমত কার্য করিয়া আসিতেছি। কীলানির দায়কত কাটজুর মহাশয়ের কথাগুলির মর্ম অনুবোধন করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাকে পুস্কার বতবার প্রদান করি।

এই উপদেশ অনুসারেই আমি আমাদের উপস্থিত রাষ্ট্র



এল হবিব বোর্জিবা

ক্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্যা যতপাশে বাবীমতা আন্দোলন পরি-চালনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও ক্রাণের সঙ্গে আমি যথাসম্ভব ‘মহম’ ব্যবহার করিয়াছি। আপোষকার মনোভাব লইয়াই আমি আমাদেরই দাবি অনেকটা লুপ্ত করিয়া ‘ধাপে ধাপে ভারত-শাসন’ পর্যন্ত নামাইয়াছি। আমার সহকর্মীরা ইহাতে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন জানিরাও আমি কলাকলের প্রতি ভ্রমকেপ না করিয়া এইরূপ বর দাবিই করিয়াছিলাম।

আমি তাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূল্যবান উপদেশগুলি এবং আন্তরিক সহায়ত্বভিত্তিক আত্মবিশেষভাবে শ্রবণ করি। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় ডঃ কীলানি উপস্থিত থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ যোজাতীয় কাজ করিয়াছিলেন এমন একজন লোক যিনি করাসী ভাষার ব্যাংগর মহেহ। বাহা হউক, আমি তাঃ রায়কে আমাদের জাতীয় দাবি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বেরণ বলিয়াছিলাম, মনে হয় তাহা তিনি ছয়রদন করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতার অবস্থানকালে ভারতীয় মুসলমান মেতা মি: আরিকের একটি পার্টিতে এভিনিউবাহিনীর সাংবাদিকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে আমি সন্মত হই। এবার আমার বোতাবীর কাজ করিয়াছিলেন ‘অনুত বাজার পত্রিকা’র ড: এন্. সরকার। তিনি করানী বেশ ভালই আনেন। এই-বিষয়কার ব্যাপারটি আমি বিশেষভাবে শ্রয়ণ করি। আমি মিকে সাংবাদিক; একথা আমি এবং আমার বেশবানীরা ভালই জানি যে, টিউনিসিয়ার বাবীনতা আন্দোলনে ভারতীয় সাংবাদিকদের কথা—‘হিন্দুস্থান ট্র্যাভার্স’, ‘অনুত বাজার পত্রিকা’র সম্পাদকগণ এবং ‘মতর্জ রিভিউ’র ঐক্যদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সন্মত ও সহায়তের উপর আমরা কতখানি নির্ভর করিতে পারি। ড: জীলাদি আমাকে বলেন যে, ‘মতর্জ রিভিউ’ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজী মাসিক।

মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মেহ্‌কর মেড্‌হে ভারতবর্ষ বাহ্যে অর্জন করিয়াছে আমরাও টিক তাহাই চাই। আমরা করানী অভ্যাচারীদের সঙ্গে সন্মত স্পর্শ হির করিতে ইচ্ছুক। আমরা

আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে কি করিতে পারি তাহা আমরাই বুঝিয়া লইব। আমরা আমাদের ভাষ্যবিবাত্ত কোন বিশেষীকে হইতে দিব না।

আমি নিশ্চিত জানি আমরা এই আবেদন পণ্ডিত মেহ্‌কর, ড: কাটক, ডা: হার এবং সাংবাদিক-প্রবাসীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে। আমরা সহকর্মীগণ এবং আমি ভারতবর্ষের বিপদের কথা সম্যক অবগত আছি। কিন্তু তাহার সহজই এইখানে যে, মিকে শত বিপদের মধ্যে থাকিলেও অতঃপর বিপদেরও যথোচিত সাহায্য করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না।

টিউনিসিয়া ভারতবর্ষের বিশেষ সাহায্যপ্রার্থী। আমরা তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি না। মানবিকতার অবিকার বতর্ক তাহার বলেই আমরা তাহার দ্বারে উপস্থিত। দূত বিখাল, ভারতবর্ষের মেড্‌হল আমাদের সাহায্যার্থ এসয় হইবেন।”

যখন রবো না আমিঃ

ঐশ্বরীকুমার সাহিড়ী

যখনে আমার কেঁবো না গো প্রিয়
কেলো না'কো কোটা আঁখির জল,
সন্ধ্যা-শ্রম-শিরের আমার
বিও না গো হাতা পোলাপ-বল।
আমার লাসিরা বিবাদ পাখার
গেরো না'কো কোম করণ ভাল,
সরোর-সারির-চাঁদোরা বিও না
দুশীতল হারা করিতে দান।
তার চেয়ে বন বালের হারার
এ বেহ আমার রহিবে ঢাকা,
বরষাবাতার বোরালো সে তুণ—
শিশিরের মাতা বুকেতে আঁকা।
আমারে বহিলে দুখ যদি পাও
সরিও—ব্যথার তরিও প্রাণ,—

তুলে বাও যদি ? তাতেই কি কতি ?
আমি রবো চির নিরতিমান।
তখনো চলিবে বরষীর বুকে
এই মত আলোহারার বেলা,
ব্যথার ওমরি তাকিবে চাতক
আকাশে তানিবে মেঘের ডেলা।
আমি রহিব না, বেখিব না কিহু
অনুতবাতীত হবে এ প্রাণ,
এত যে আমার মোহিনী মর
করিবে না ঘোরে হরষ দান।
চির-গোহুলির আঁধারে তখন
বগনের সম তোমার দুখ;
হরত যখনে তানিতা উঠিবে—
না-ও যদি ওঠে তাতে কি দুখ।

• কলিকাতা রলেটর “Song” কবিতার আবাহন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতা অধিবেশন

ক্রিমোহিনীমোহন বিশ্বাস, এম-এসসি

পূর্ববঙ্গের মত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবারেও জাহ্নবাগী মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিদীর্ণ প্রাঙ্গণে উক্ত ক্রিয়ামেজমাধ সুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সভার কার্য সম্পন্ন হয়। ভারত বুদ্ধরাষ্ট্রের প্রধামন্ত্রী জীৱাহরলাল নেহরু এই সভার একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে কলিকাতা মহানগরী সর্বাঙ্গগামী প্রচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করেন। জীৱাহরু সর্ববর্ষ বৈজ্ঞানিকগণকে—ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীকেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি সেগুলির প্রাণশক্তি করেন এবং জাতিগঠনের মত ইহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁর মতে আগে বাণীম ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেলামোশা করে, তাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিচয়লাভ করে তার পরে বৈজ্ঞানিকগণকে ব ব বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে কাজে নামতে হবে এবং এরূপ বিজ্ঞানীদের দ্বারা দেশের লোকের হৃৎকোচন হবে।

সভার পশ্চিমবঙ্গের প্রধামন্ত্রী ডাঃ ক্রিবিদ্যালয় রায়, রাজ্যপাল উক্ত জীৱাহরলাল সুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-চ্যান্সেলার ক্রিশ্ণভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা দেন। মার্কিন বুদ্ধরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, পশ্চিম-জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া ও ক্যান্সন থেকে প্রায় চল্লিশ জন ব্যক্তিমাত্রা বৈজ্ঞানিক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সভাপতি উক্ত সুখোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে বলেন—ভারতবর্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সমূহ প্রয়োগ করে শিল্প এবং কৃষিকার্যের উন্নতি সাধিত হতে পারে। তিনি প্রচলিত শিকা এবং গবেষণার দাম উন্নয়নের মত মত প্রকাশ করেন এবং আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবং নিম্নলিখিত-ভারত বহু-বিজ্ঞান শিকা-পরিষদকে এ বিষয় সচেতন হতে বলেন। তাঁর মতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত প্রথম শ্রেণীর কার্যখানাসমূহ রাখতে হবে যেখানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রয়োজনীয় বহুপাঠি উদ্ভাবন এবং প্রস্তুত করতে হবে। ঐ সকল কার্যখানার কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্বারায়মিক লব্যও তৈরি করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সভাপতি বহুপাঠি মৌলিক এবং ব্যবহারিক গবেষণার মধ্যে দুর্লভ্য লীৱায়েণী টানবার পক্ষপাতী নহু। তাঁর মতে সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক-গণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি ভারতবর্ষকে কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের

উপদেশ দেন এবং অল্পরূপ উপায়ে ইউরোপে যেমন উৎপাদিত কসলের পরিমাণ বেড়েছে এদেশেও তা সম্ভব হতে পারে—তরঙ্গা দেন। তিনি কৃষিকা সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধানকার্য চালানো এবং বিশেষ থেকে মৃত্তম মৃত্তম উদ্ভিদসমূহ আমদানী করে কৃষিকার্যে বা উদ্ভাদ-রচনার ব্যবহার করা, অনির আর্দ্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন। পরিণেয়ে তিনি বৈজ্ঞানিকদের এদেশের কৃষকদের সহিত সহযোগিতা করতে আহ্বান করেন। তাঁর মতে কৃষকই হচ্ছে কসল উৎপাদনের প্রধাম কারিগর—বিজ্ঞানী এই কারিগরকে অবহেলা না করে তাকে সঙ্গে নিয়ে এগুন হলে আশাহরূপ কসল উৎপন্ন হতে পারবে। এরূপভাবে বৈজ্ঞানিক-প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করলে অল্প সময়ের মধ্যে কসল উৎপাদন উন্নত রূপে বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

অতঃপর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্য স্বাধীনভাৱে আরম্ভ হয়। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞা, শারীরবিজ্ঞা, গণিত, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখাসমূহের সভাপতিগণ ব ব অভিভাষণ স্বাধীনভাবে পাঠ করেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সভার মধ্যে সমবেত বৈজ্ঞানিকদের সমাবিহৃত ভাষণসমূহ আলোচনা করতে নির্দেশ দেন।

রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন উক্ত আর. ডি. দেশাই। তিনি তাঁর অভিভাষণে বৈজ্ঞানিক বোরার প্রবর্তিত 'ট্রেন থিওরি' ও তার কলাকল সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৮৮৫ সালে ডন বোরার এই থিওরি বা মতবাদ দ্বারা কার্বন পরমাণুযোগে ভিন্ন হতে সাত পরমাণু-সংখ্যা বিশিষ্ট বলরাকৃতি বৌগিক-পদার্থসমূহের গঠন ও স্থিতির সভাব্যতা সুঝাবার চেষ্টা করেন। বলপরমাণুর ক্ষেত্রে এই মতবাদ ভালরূপ কাজ করেছে, কিন্তু যেখানে পরমাণু সংখ্যা দুই বেশী দেখা গেছে সেখানে তা ব্যর্থতার পধ্যবসিত হয়েছে। চৌম্বিক পরমাণুসহযোগে কার্বন দ্বারা গঠিত বৌগিক দ্বারায়মিক পদার্থ এবং কতকগুলি রূপের গ্র্যাও থেকে নিসৃত নাকোন এই মতবাদের বিকৃততা ঘোষণা করেছে। বহু পরমাণুযুক্ত বৌগিক পদার্থগুলি যে পাঁচ বা ছয় পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থগুলিরই অল্পরূপ দ্বারী, কৃষিকা প্রমুখ বিজ্ঞানী তাহা প্রমাণিত করেছেন। এই সমস্ত অনুবিদ্যা হুদীকরণার্থে ইনপোড ও বদ্বপ বোরারের মতবাদ কিকিং সংশোধন করে আর একটা মৃত্তম পরিকল্পনা (বাহুবিসৃতি) পেশ করেন। বাহা হুটক, বোরারের ট্রেন থিওরির প্রবর্তনে বহু কার্বনবলরাকৃতি বৌগিক-পদার্থ সম্পর্কে গবেষণার অনেক সুবিদ্যা হয়েছে। ডঃ দেশাই তাঁর এই মতামত সম্পর্কে নিজস্ব

পবেষণালব্ধ হ'একটি মূল্যবান তথ্যের বিষয় বর্ণনা করেন। পরিবেশে তিনি তারতম্যের রসায়নসম্পর্কীয় পবেষণার ক্ষেত্রগুলির বিষয় উল্লেখ করেন।

পরাধিকার শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এস. রামচন্দ্র রাও। তিনি তাঁর অতিভাষণে 'ফটিকসমূহের চূষক-গুণাবলী' সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন—চূষক-গুণের উপর ভিত্তি করে জ্বালানসমূহকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। ভারাম্যাগমেটিক্স, প্যারাম্যাগমেটিক্স এবং কেরোম্যাগমেটিক্স। চূষক প্রথম শ্রেণীর পদার্থসমূহকে বিকর্ষণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থকে দীপ্য আকর্ষণ এবং শেষোক্ত শ্রেণীকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। এই তিন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে কেরোম্যাগমেটিক্সগুলিই সর্বাধিক মূল্যবান। চূষকগুণযুক্ত পদার্থসমূহ যেতিও ও বিবিধ হুম বজ্রাদি নির্দোষকার্যে ব্যবহৃত হয়। এলনি, এলনিকো এবং এলকোমাক্স প্রভৃতি করেকটি মিশ্র বাতু দ্বারা এই সমস্ত চূষক তৈরি হয়। এই সকল মিশ্র বাতুর 'ফটিক' অবয়ব দেখে তাদের চূষকগুণ পরীক্ষা করা হয়। 'ফটিক'-পদার্থের বর্ণের সহিত উহার চূষকগুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। বিভিন্ন বাতুর 'অক্সাইডের উপস্থিতিই উক্ত বর্ণ এবং চূষকগুণের ভিত্তি দায়ী। 'এমেরিট' প্রভৃতির মধ্যে 'কেরিক লৌহ' পাওয়া গেছে এবং উহাতে যে মীল রং দৃষ্ট হয় উক্ত 'কেরিক' লৌহ বোধ হয় তার কারণ। কভকগুলি 'ফটিকের' মধ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে বিজ্ঞান এবং ঐ সমস্ত 'ফটিকের' মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয়। ডক্টর রাও 'ফটিকসমূহের চূষক গুণ সম্পর্কে উপরোক্ত মূল্যবান তথ্যসমূহ বর্ণনা করেন এবং উক্ত বিষয়ে এখনও পবেষণার বর্ধিত প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন জি.এস. রামস্বামী। তিনি বাত, ইন্দু, তুলা, তৈলবীজ, কল ও শাকসব্জী, উদ্ভিদ কোষসমূহের গঠনপ্রণালী ও তাহাদের প্রজননক্রিয়া সম্বন্ধে যে সমস্ত বহু মূল্যবান পবেষণা হয়েছে তাহা বর্ণনা করেন এবং বিভাগপ্রাচীরের উদ্ভিদসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য এরূপ পবেষণার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ ডি. আর. খানোলকার। তিনি ক্যান্সার রোগ ও তাহার বিবিধ কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে এক বহু মূল্যবান তথ্যসমূহ অতিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—ক্যান্সার রোগের কারণ নির্ণয় এক জটিল সমস্যা। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই রোগের সঠিক কারণ বিতে অক্ষম। নির্দিষ্ট একটি বাহ, দোরগ, পাত এবং দাঁহের এই রোগ হয়, অথচ একই শ্রেণীভুক্ত আর কারণ হয়

না—এই সমস্ত ভেদ করবার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী পবেষণা করছেন। জীবদেহের ভাষাভিক হুম সেল বা কোষসমূহের ক্যান্সার সেলে পরিবর্তন হওয়া এক বিচিত্র ব্যাপার। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই বিষয়ে মূল্যবান পবেষণা চলছে এবং অনেক বিজ্ঞানী ক্যান্সারের উৎপত্তির মূলে এক শ্রেণীর ভাইরাস এবং এনজাইমের কার্যকারিতার উল্লেখ করে পবেষণা করছেন। বাহা হটক, ডাঃ খানোলকারের মতে এখনও এই পবেষণা সম্পূর্ণ হয় নি।

গণিত-বিজ্ঞানের সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর বি. বি. সেম। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে বলেন—গণিতের প্রাচীন কলিত বিজ্ঞানের অঙ্গগতির অনেক সুবিধা হয়েছে। অনেক সময় গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে যে কল পাওয়া গেছে তাতে শিল্প-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে কলিত-বিজ্ঞান আরও বেশী করে গণিতের সাহায্য দেখবে।

প্রাণিকবিজ্ঞানের সভাপতিত্ব করেছিলেন জি.বি. আর. শেখর। তিনি তাঁর অতিভাষণে মিউট্রিক এসিডসমূহের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জীবদেহের গঠন প্রভৃতির জন্য মূলতঃ এই মিউট্রিক এসিডই দায়ী। তিনি আরও বলেন, জৈব এবং উদ্ভিদ সেলসমূহে দুই শ্রেণীর মিউট্রিক এসিড বিদ্যমান—রাইবোজ এবং ডিসিরাইবোজ। শেষোক্ত মিউট্রিক এসিডই জীব-দেহের পক্ষে অধিকতর কার্যকরী এবং যে কোন স্তন্য প্রাণী-দেহে স্ট্রিক মূলেই এই উপাদানের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

ব্যাক্তনামা রাসায়নিক ডক্টর টল আরগট গাছকা সম্বন্ধে নিজের আবিষ্কৃত অনেক মূল্যবান তথ্যসমূহ বর্ণনা করেন। মিউইয়র্কের বৈজ্ঞানিক ডক্টর কেনন্স এটিবায়োটিক্স সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ডাঃ শান্তিবরণ ভাটনগর ভারতীয় 'নবাবাইট ডাঃ'-এর বিবিধ শিল্প-সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বক্তৃতা দেন।

বিভিন্ন শাখাসমূহে বহু মূল্যবান মৌলিক পবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত ও সমালোচিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের একত্র সমাবেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কে সভায়লে এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী অস্থগীদের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন সমাপ্ত হয়। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য জাতীয় সরকার যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, বৈজ্ঞানিকদের উচিত হাতে সেগুলি সফল কার্যে পরিণত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

“জাহানারার আত্মকাহিনী”

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কামুনগো

“জাহানারার আত্মকাহিনী”র অনুবাদক শ্রীধাৰনলাল শাস্ত্রী বাংলা-সাহিত্যে অপরিচিত ব্যক্তি নহেন। তিনি মিশরের অন্-আবহর রাজ্যসার আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, দরবী সাহিত্যিক এবং হুন্সদুটিসম্পন্ন সমালোচক। সম্ভ্রতি তিনি “জাহানারার আত্মকাহিনী”^{*} প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠকের হৃদয়ঙ্গত-ভাজন (?) হইরাছেন।

এই পুস্তকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মনে করিয়াই প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক বর্তমান লেখকের উপর সমালোচনার ভার চ্যুত করিয়াছেন। সমালোচনার বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া চক্ষু-হির; মন দুগুণে আতঙ্ক ও সন্দেহে ভারাক্রান্ত হইল। এই পুস্তক কি অনুবাদ, না অপবাদ? অনুবাদক লিখিতেছেন, “জাহানারার আত্মকাহিনী কান্দীর থেকে পারস্ত-ভাষার প্রকাশিত হয়েছে। আমি বাংলাভাষার বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত করে লিখলাম জাহানারার আত্মকাহিনী।” কোন পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করিবার সময় পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপা বহির একটা হদিস দেওয়া সমীচীন। কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের সুখে এইরূপ কোন আত্মকাহিনীর কথা শুনি নাই। কোন ঐতিহাসিক পত্রিকার ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না; অথচ ‘ঐতিহাসিক’ দাখনলাল শাস্ত্রী দাবি করেন, “জাহানারার করুণ কাহিনী মুঘলযুগের অপূর্ণ সম্পদ। এই কাহিনীতে আছে সৌন্দর্য ও বিতীর্ষিকার অপূর্ণ সমন্বয়, মানবাত্মার শব্দ রূপ।” বঙ্গসাহিত্যিক কাল খোঁজ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম, এইরকম ছাপা বহির অভিধ কান্দীরে নাই। আজিয়া বুটেনশন[†] দ্বারা ইংরেজী অনুবাদের নাম দাখনলাল চাপা দিয়াছেন। ইংরেজ-মহিলার বহিঃ নাম “The Life of a Mughal Princess” (G. Routledge and Sons, London, 1931)।

এ ইংরেজী বহির সহিত অনুবাদ বহু পরিমাণে মিলিয়াই যেবিলাম, উক্ত ইংরেজ-মহিলার বহিঃ-ই বাংলার তর্জমা করা হইয়াছে। “বাঙালী পাঠকের উপযুক্ত” করিবার ওজুহাতে অনুবাদক আসনের উপর দুই কলাইয়া বিরূপ করিয়াছেন, দীর্ঘ ঐতিহাসিক (?) প্রীকটিংসবী বোপ করিয়া একখানা পকর প্রেইর ইংরেজী ঐতিহাসিক উপভাসকে ইতিহাসের বর্ণনায় ব্যবহার প্রদান পাইয়াছেন।

ইংরেজ-মহিলার বহিঃ নিম্নক কাকিবাণী, কান্দী বহিঃ হইতে অনুবাদের দাবি কি তবে একটা বদেশী চাল? অনুবাদক বহিঃ এই তথাকথিত পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপা কান্দী বহির রচনামূলকী সপ্তম শতাব্দীর কান্দী রচনা বলিয়া ঐতিহাসিক-পণের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন তবে নিশ্চয়ের সুখে হুণ-কালি পড়িবে, জাহানারার জাহানার বহিঃ।

শাস্ত্রী দাখনলালের পুস্তক পড়িয়া মনে হইতেছে এই ‘জাহানারার আত্মকাহিনী’ বাবর জাহানীরের জুজু বা মিশরীয়া নহে; কোন্ অংশ কোন্ বংশের লেখা হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই।

পুস্তকখানা আসলে জয়ন্তভাটকে রোমান্টিক ঐতিহাসিক উপভাসের রূপ দেওয়ার প্রলোভনে লিখিত। কি তাই রোমান্টিক জাহানীরের আত্মকাহিনী তিনি আবিষ্কার করিলেন সে লম্বা লিখিয়াছেন, জাহানারার কবরের উপর লম্বা লম্বা দেখিয়া মেমসাংহেবের ভাবাবেশ হইল, সজাট-মসীমীর কেন এই দৈত? কেনই বা কবরের উপর বোধিত শেব লিখেন এই হত্যার অভিমান? আরও কিছু জানিবার জন্ত তাঁহার দরবী প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। আশা হুর্বে বেড়াইবার সময় তিনি যেখান হুসানম বুদ্ধের এক বেত প্রদর্শন প্রাণ পতনোদ্রুণ; হাত বাড়াইতেই আসিয়া পড়িল এক পাণ্ডুলিপি, কিয়ৎকাল অস্পষ্ট ও হির। মরেন লিখিয় মেমসাংহেবের বহির তুরিকা লিখিয়াছেন। উহাতে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা নাই; বহিঃখানা Dryden-দ্বারা Aurangzeb দাঁটক অপেক্ষা মরুশর্পী বলিয়াই তিনি দারিদ্র এড়াইয়া গিয়াছেন। লেখিকা তাঁহার বহিঃ “India”-কে উৎসর্গ করিয়াছেন। আজিয়ার এই মহাদ উদারতা মিল মেমোর বগোজীর উপযুক্তই বটে। জাহানারার সুখ বিধা এই বিদেশী মহিলা আদ্যবিশেষে যে সকল কথা শুনাইয়াছেন, তাহা সত্যের অপলাপ দান এবং অত্যন্ত আপত্তিকর।

সুখবদে ঐতিহাসিক পরিবেশ হুট্টর চেষ্টা করিয়া অনু-বাদক এই মেমী জাহানারার আত্মকাহিনীকে বাবর ও জাহানীরের মিশরীয়া এবং সুলতান বগবের ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমপর্মাণে স্থান দিয়াছেন। যে সমস্ত ঘটনা এই কল্পিতা জাহানারার সুখে শুধা হইয়াছে সেগুলির ঐতিহাসিকতা লম্বা তিনি কোন লম্বা প্রকাশ করেন নাই; পাণ্ডুলিপি বহু মিকের ঐতিহাসিক জানপ্রচার এবং সুল লেখিকার পকরবর্ণনের জন্তই বোপ করা হইয়াছে।

* শুদ্ধকাল চট্টোপাধ্যায় এড এল, কলিকাতা। পৃ: ১৮৫; মূল্য লাভে তিন টাকা।

কিন্তু অহুবাণের বোহাই দিয়া ঐসলামিক ইতিহাসের এক জন অব্যাপক পুণ্যশীলা স্বকী-সাবিকা শাহজাহান-হুজিরা জাহানারার নামে এই প্রেমের সুবরোচক মিথ্যা কুংসা বাঙালী-সমাজে প্রচার করিবার দার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। যে বহির নাম উল্লেখ করিতেও ঐতিহাসিকগণ কুঠা-বোঁধ করিয়াছেন, তাহার বাংলা ভাষার অহুবাণ দ্বারা আর বাহাই হউক, বাঙালী পাঠকের ঐতিহাসিক জ্ঞান হুজি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই আমরা ইতিহাসের নামে এই মিথ্যা-প্রচারের সুখোঁস উন্মোচনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

আমরা এই বহির তুলের কিয়তির এক কিত্তি পাঠকবর্ণের কাছে উপস্থাপিত করিতেছি।

১। “জাহাঙ্গীরের মহিষী রামসিংহের তরী নামবাই” [সুববধ, পৃ. ৫]

প্রশ্ন ১ শাহজাহানের দাতার দার নামমতি বা বালমতি পাওয়া যায় (B. P. Saxena : *History of Shahjahan*, p. 1)।

নামমতি সংক্ষেপে “নামবাই” হইতেও পারে। রামসিংহের তরীর নাম আমরা কোন প্রামাণ্য ইতিহাসে পাই নাই। “জগৎ গোসাইনী” উপাধি, নাম নহে। “গোসাইনী” ফার্সি, সংস্কৃত কিংবা হিন্দী নহে; বাংলার গোসাই শব্দের জীলিক হইতে পারে। *Fuxuk-i-Jahangiri*-র মূল ফার্সি পাঠ গোসাইন—ইহা শুধু হিন্দী।

২। “আকিমের বিষ” [পৃ. ৬, মূল poppy juice, p. 7]

এক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইলেও আকিম ও পোডানা বিভিন্ন বস্তু। এক দীর্ঘ পাদটীকার অহুবাদক লিখিয়াছেন, মোরালির হুর্গে বন্দী শাহজাহানগণকে “বঙ্গরাজার আকিমের জল পান করিতে দেওয়া হত।” আমরা জানিতাম এইরূপ পানীয় মেধাধোয়ের অরুচ, স্বাস্থ্যক্ষতিকারক, সেহেতু হিন্দু

মুসলমানের পক্ষে প্রায় সমান হালাল। বেম-সাহেব poppy juice বা পোড-ভিকাদ জল ট্রিকই লিখিয়াছেন। পাণ্ডিত্য কলাইরা ভদ্রকে অন্তর্ভুক্ত করিবার অবিকার অহুবাণকের আছে কি?

৩। তাঁর [জাহানারার] জীবনীতে হিন্দু-শাহজাহানোচনার বহু পরিচয় পাওয়া যায় (পাদটীকা ১০)।

—যথা? হুই-একটা বহির নাম, কিংবা কোন সমসাময়িক ইতিহাসের মতীর উদ্ধৃত করিলে পাঠকবর্ণ উপকৃত হইতেন।

৪। অহুবাণের মনুনা :—

“In my palace in Delhi I lived like the *dayfly* in the gardens of Shalimar, which seeks in-
toxication in the cups of flowers”.....(p. 11)

“দিল্লীর প্রাসাদে শালিমার বাগে মনুক্ষিকার মত উড়ে বেরিয়েছি”.....(পৃ. ১০)।

বিলাতী ‘ডে-ফ্লাই’ কি অহুবাণের মনুক্ষিক? ইহার পরেই আসিতেছেন, “মনি-মাণিক্যোচ্ছল বর্ণরেণু পাখার মেখেমক্ষিরামি।” কালো বোঁধাতির সোমালী পাখা কেহ দেখিয়াছেন কি?

৫। “হুয়ে ঐ ছাদের অপর প্রান্তে...” (পৃ. ১২; I know of a palace on a hill far away above the lake, p. 12)

বেধিতেছি বেম-সাহেবের “হুয়” অহুবাণে কবাইট হইয়া পাণরের ছাদ হইয়া গিয়াছে, এবং উহার “ঐ শাভ জলরাশির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে” সেই প্রাসাদ।

৬। পুনশ্চ—By the Canal of Firuz Shah—
“কিরোজনার পরিবার পাশে আমার উভানবাটিকা” (পৃ. ১৩)।

কিরোজনাহের পরিবা জাহানারার জন্মের পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল। এই কথা লেখিকা জানিতেন। অহুবাদক খাল এবং হুর্গপরিবার ব্যব্য পার্শ্বক্য নিশ্চয়ই জানেন। দিল্লী

টোল ও কোম্পানীর



দাদ ও কাউন্সেল
মেডিসিনাল

কিউটা-টোন
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

নিম্ন মলম
খোস পাঁচড়া ও চলমানীর জন্য



বরানগর, কলিকাতা

শহরের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমে লেখিকা কর্তৃক উল্লিখিত বাংলার
বাড়ি এখনও আছে, পরিখা কোথায়ও নাই।

৭। বীর পুঠা (পৃ: ২১, ২২)

অহুবাধবের কুপার মহারাণা প্রতাপের প্রিয় অর্থ “চৈতক”
চৈতক হইয়াছে। এইবার প্রস্তুত রাখনলাল শাস্ত্রীর মায়কত
হুই হুই বার আসিলেন বীর পুঠা। কার্শি বর্ণনালার ‘উ’ নাই,
পুঠা হিন্দুস্থানী নয়। বেহলাহেব ‘ত’ বর্ণ স্থানে ঠ উচ্চারণ
করেন; অহুবাধক বেহলাহেবের সুরে সুর বেমাণুম মিলাইয়া
কেলিয়াছেন। এই কিশোর রাজপুত বীরের আসল নাম কি
ছিল জানিতে হইলে কোন ভুলপাঠ্য ইতিহাস কিংবা ওঝা-
কৃত ‘রাজপুতানেকা ইতিহাস’ (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭)
অহুবাধক দেখিয়া লইতে পারিতেন।

৮। বেগম নুরজাহানের ফেসেমিন প্রাসাদে আমার ককে
... (পৃ: ৩১, Eng. p 42)।

আগ্রাহর্গে মুসলমান বক্রজ অর্থাৎ মেমের “ফেসেমিন”
প্রাসাদের সহিত নুরজাহানের কি সম্পর্ক? উহা নির্দিষ্ট হই-
বার কয়েক বৎসর পূর্বেই বিববা নুরজাহান বিবিবিভবনার
লাহোরে নির্মাণিত। এই কথা পাঠ্যগীকার লিখিলে ‘ইতি-
হাসজ্ঞ’ অহুবাধকের সুখচক্য হইত।

৯। সেই বিরাট চীম বিটপীর তলার... (পৃ: ৪৫; the
big *Chena-tree*)

“চীম” বৃক্ষ মহাচীমে থাকিতে পারে, ভারতবর্ষে কদিন-
কালে ছিল না, এখনও নাই। বেহলাহেব নিজেরই সুবর্ণ
কান্নারে “চেনার” বা চেনার গাছের সারি দেখিয়াছেন। দিল্লী
আগ্রাহর ঐ গাছ জন্মার না। অহুবাধক বোধ হয় ঐ গাছের
‘চীম’ এই নামকরণ করিয়াছেন।

১০। “আমি অশুভ্রাকৃতি ভোরণের মধ্য দিয়া মসজিদে
প্রবেশ করলাম”— (পৃ: ৭১; Through *horseshoe-gate*
...p. 79)।

তত্ত্ব গীক—“এই ভোরণের মধ্য দিয়া লাভট হতী পাশা-
পাশি প্রবেশ করতে পারে” (।।)

যোক্তার গুর এবং যোক্তার পারের লোহার মাল (horse-
shoe) কি একই বস্তু? বেহলাহেব সভ্য দরের গাইড-
বুক পড়িয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, বর্তমান সভ্যকীতে স্থানীয়
নিরকর লোকেরা মূল্যবহরওরাছাকে মাল-হরওরাছা বলে।
এইজন্য তিনি কতকটা কন্সার্ব, কিন্তু অহুবাধক অর্থ করিয়া-
ছেন ঠিক বিপরীত। Pointed arch, Horseshoe arch,
semicircular arch ইত্যাদি বিলাসের সংজ্ঞা। মূল্য-
বহরওরাছার মতো কোন “অশুভ্রাকৃতি” বিলাস অহুবাধক
কিংবা অন্য কেহ কি চন্দ্রচক্রে দেখিয়াছেন? ঐ দরওরাছার
নির্মাণ-শৈলী অর্ধগম্বুজাকৃতি বা Semi-dome style। নীচে
যে অংশে নিম্ন কাঠের বিরাট পাতা বলায় হইয়াছে উহা

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে ‘হিন্দুস্থান’-এর
উন্নত ভেতন পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে
১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর।
সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্র
বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা
করা হইয়াছে:

মেরাদী বীমার— } ৮- টাকা
আজীবন বীমার— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অপ্রাপ্ত অনিশ্চিত
ব্যয় সাপেক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা
রাখিয়া এবং স্বদের হার অক্ষিত হার অপেক্ষা
২% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব
নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে স্বদ অর্জন, দুর্মূল্যের বাজারে
অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা
সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী
নিরাপত্তা, হৃদয় আর্থিক সঙ্গতি এবং পরিচালন-
ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল ... ১৫ . ২৭ . . .
প্রিমিয়ামের আয় ৩ . ৪০ . . .
দাবী শোধ ৭ . ২০ . . .



হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪৪২ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

অনেকাংশে মূলনামাণী Pointed arch-এর মত। শুধুকে অল্প অল্প করিয়া এতদূর দূরীত আর কত দেখাইব। অল্প-বাক্য ইহার সঙ্গে এক অভিনব গীতা কৃত্তি বিবাহিত। বাহার। এই মাল-বয়সেরা অভিজ্ঞ করিয়া বলিতে চুকিয়া-হেন তাঁহার বলিবে, লাভট হাতী হুয়ে থাকুক লাভট পক্ষত কিংবা লাভজন হু কিংবালা লোকও পাশাপাশি চুকিতে পারিবে কিনা লবেহ। ইহাকে মাল-বয়সেরা কেন বলে সিক্তীর এককাতরালাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়। যোড়ার ব্যাঘ্রায় হইলে তাহার। যোড়ার মাল কাঠের পারায় বারিরা ঘের।

১১। “ভূকী-বেগমের প্রাসাদ এখনও জলের উপর প্রতি-বিম্বিত হচ্ছে; সেই অপরাহ্নে মহলে প্রত্যেকটি বেত প্রস্তর যেন কোমিত গজদন্ত।” (পৃ : ১১, মূল...*Faery castle...as if red sandstone were ivory*, p. 86.)

কতপূর্ব সিক্তীর মাল মহলের মধ্যে এই প্রাসাদের আশে-পাশে জল কোথায় ?

উর্দু-ভিলোডমার ভাষা ছিল না; সুতরাং অপরা-“পন্নী” হইতে পারে না। বেবলাহেবের “পন্নীমহল” অপরা-মহল হইল কেন ? এই প্রাসাদের কোথাও বেত প্রস্তর নাই। লাল বেলে পাথরকে লাল করিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত এবং ইতিহাসকে অপমানিত করিবার প্রয়োজন কি ছিল ?

১২। বাদাফ্রী বলেন যে আকবরের বাসককের সম্মুখে একটি দোলনার বলে মুকিগণ বোগাত্যাস করতেন। [গীতা পৃ: ১১]

ইহা কি লোকমুখে শুনিরা লেখা হইয়াছে ? বাদাফ্রী এমন আকবর কথ। লিখেন নাই। ভিমিষটী দোলনা নয়, একটি মতিবাণী কৃত্তি। প্রতি সন্ধ্যাতে আরম্ভিত ব্যক্তিকে কৃত্তিতে বসাইরা উপরে শরদককের বাহিরে এই কৃত্তি বাঁধিরা রাখা হইত। মুকিরা বোগাত্যাস করিতেন না, আকবরের সঙ্গে তত্বালোচনা করিতেন।

১৩। সে পুত্র বোণাবাই প্রসব করেন মলিম চিন্তীর ক্রুর কুপীয়ে [গীতা পৃ: ১৬]

মলিমের মাতার নাম কোন ইতিহাসে লেখা আছে কি ? বোণাবাই তথা সিক্তীর বোণাবাই-মহল অসম্ভব, ইতিহাস নয়। প্রসবের পূর্বে সন্নাজী চিন্তীর ক্রুর কুপীয়ে বাস করিতেন না। চিন্তীর বাতীর মলের অধিতে উঁহার মত

নির্মিত হইয়াছিল ক্রুর মলমহাল। ইহার ভগ্নাবশেষ এখন বিদ্যমান।

১৪। হুসেয়া—হুসেয়া বেবলাহেব-কল্পিত কাহানার। প্রথম প্রণয়ী। লেখিকা Explanations-এর মধ্যে তখনে মালির-ই-বন্দর পরিচয় বিবাহিত, অথচ হুসেয়ার কো পরিচয় বেন নাই। সিনেয়ার বহি ও লাটকার বাঁচে এই মালিমলাল বাংলা অল্পবয়সে একটি পরিচয় লিখিয়াছেন। তাঁ হুসেয়াকে “মুনীরাক” হুসেয়া হুসেয়া, বলিয়াছেন। হুসেয়া হুসেয়া “মুনীরাক” মনে, হুসেয়াবৎ অল্পবয়সে ওরফার মাল। বেবলাহেব-বর্ণিত কাহানার মাল। অবসানের কয়েক বৎসর পরে হুসেয়া হুসেয়া লালক হইয়াছিলেন। “হুসেয়া মুনীরাক” মোগল ইতিহাসে “মোগল পাথর-বাটী”। ইহা লখন্য ইতিহাসিক মালিমলাল কোথায় পাইলেন ?

সারুগড়ের হুসেয়া হুসেয়া মোগল বাঁচ সহিত লড়া করিয়া মরিলেন; শিতার সহিত আশ্রয় হুর্গে বন্দী হইলে কাহানার। কয়েক বৎসর পরে দারার হিরমুও উপহারপাঠে মজর পাঠাইয়াছেন শাহজাহানের কাছে শাহজাহান আল-মীর। তখন রাজকুমারীর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কি প্রেমের উদ্যমের প্রাণ কিশোরীর মত চকল। চারিবিতে দুজির পাখা-প্রাচীর। অন্ধকার মামিরা আলিয়ারে হুসেয়া মলমহলে বসিয়া আছেন নীরবে একাকিনী যে সাহেবের কল্পিত কাহানার, নামে কাগজ-কলম। তাঁ বগল বলিলেন, “আজ রজনীতে আমি বাব না সন্নাজে কাছে;...আমি যে আজ আমার হুর্গের কাহিনী আমাকে বলে বাব”—লেখিকা ইহাতেও সত্যকে বিকৃত করিয়া উল্ল কলমার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

কাহানার মিশ্রা অভিনয়ের কৃত্তিকার মামিরাছেন বা আলিয়ার, বক্তব্য বা প্রাণ উভয় ইংরেজী ভাষার সপ্রতিভতার বলিয়া বিবাহিত। বাংলা ‘কাহানার আত্মকাহিনী’ পোতালার হু বলিলে উল্ল প্রাণসা করা হয়। পোতাল। হু জল মিশ্রা, যোড়লের কালি ঢালে না। আমাদের হুর্গ পুস্তক-সমালোচনা করিতে বসিয়া মোগল ইতিহাসের হু বোঝ রচনা করিয়া কেলিয়াছি। মোগল হুর্গের ইতিহাস লম্বা ওরফিবহাল যে লকল পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়া-তাঁহার বলিবে—হুসেয়ার মাতার মিশ্রা-বিত্ত হয় নাই, পুস্তক-বাণির সর্বত্র অজ্ঞ হুসেয়া হুসেয়া হুসেয়া।



পুস্তক পরিচয়

রাবণ বধ—কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিরচিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃ. ৫+১২+৫৪। মূল্য ২।০ টাকা।

‘সত্তাবশতক’র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমন্মথ উদয়চন্দ্র মজুমদারের নিকট সংরক্ষিত কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে বাহিরা শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এই খণ্ডিত নাটকখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দুই-চারিখানি পঞ্চদশশতাব্দীর লেখক হইলেও মজুমদার মহাশয়ের পঞ্চসাহিত্যে খ্যাতি নাই, তিনি যে আবার নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাও সাধারণের গোচর ছিল না। এই আবিষ্কারে কবির সাহিত্য-কীর্তি যে বর্ধিত হইল তাহা নহে; পুরাতন সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে রচিত এই নাটকখানি বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি বিচিত্র নমুনা হিসাবে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করিবে এই মাত্র। ইহাতে লেখক আধুনিক দিনেরময় প্রযুক্ত ‘স্লাম ব্যাক’ পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছেন এবং সিনেমাসম্বন্ধে দৃষ্টপরিবর্তনে স্থান ও কালের বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক আশ্চর্য্য ভ্রমরভিত্তির সঞ্চার করিয়াছেন। মাত্র ৫০।০০ পৃষ্ঠায় মধ্যে সমগ্র রামায়ণের মূল দৃষ্টাবলী পাঠকের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়, ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু ঘটনা লইয়াই নাটক হয় না, দৃষ্ট হইতে দৃষ্টান্তের চরিত্রগুলিরও বিকাশ ও পরিণতি প্রয়োজন। এই নাটকে তাহা হয় নাই, সুতরাং ইহা অভিনয়োপযোগী নহে। ভাবা ক্রিয়াপদে প্রধানতঃ চলতি হইলেও অত্যন্ত ছুরছ বিশেষ বিশেষণে কটকিত। মোটের উপর, এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতেই হইবে। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ মিত্র দীর্ঘ ‘সম্পাদকের নিবেদনে’ নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেন কবির জন্মের তারিখ সম্পর্কে জীবনীকার ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ১২৪৪ সন গ্রহণ না করিয়া ১২৪১ সন গ্রহণ করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কবি ‘হিন্দু হিতৈষিনী’ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন এ খবরই বা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা বতসুর জানি হরিশ্চন্দ্র মিত্রই ইহার সম্পাদক ছিলেন। ‘রাবণ-বধ’ নিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখেন নাই, ভালা অমিত্রাক্ষর—গৈরীশি ছন্দে লিখিয়াছিলেন। হুংবের সহিত শেষে একটি অনুযোগ না করিয়া পারিতেছি না, বইখানি অব্যয়-সম্পাদিত, বহু সূত্রাকর প্রমাণে কটকিত।

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবর্ত—শ্রীমদ্রবণ দাস। গণ-দীপ্যার পাবলিশার্স, ১৭-এ আগার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৫। দাম দুই টাকা।

একটি মনোভাষা ছেলের অবস্থা-বিপর্যয়ের কাহিনী এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে। নানা চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে আবর্ত সৃষ্টির প্রয়াসও ইহাতে আছে—সে সব একাডেমী বাহিরের দিক; মারকের মনোজগতে এই বিপর্যয়ের ছাপ সার্বভাষ্য জাই পাওয়া যায়। পরটি আশাশুভা সমস্তাভুতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হইয়া বেশ খানিকটা দূরেই সরিয়া গিয়াছে। পরিশেষে অবশ্য সন্দেহ চরিত্র ও ঘটনা মিলাইা যথেষ্ট সমাপনের হইয়াছে।

সত্য বাস্তবতার প্রভাবই এই ধরণের গল্প-রচনার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য যে সব বাস্তবিক আঘাতের বর্তমানকে পীড়িত ও

ভবিষ্যৎকে আশাশুভ করিয়া তুলিতেছে—এটি তাহাদের সঙ্গোপিত নহে। ইহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ যথেষ্ট ছিল—পরকে হারাছবির রান্নো ভিড়াইয়া দিবার তাড়াই সে সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছে।

আর্থিক লাভকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সাহিত্য-রচনাকে বিঘন ব্যাধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আজকাল এই ব্যাধির প্রকোপটা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিঘন ব্যাধিতে আক্রান্ত লেখকগণ কিভাবে নিজেরের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন বর্তমান পুস্তকখানি তাহার প্রমাণ।

আমি ছিলাম—শ্রীমদ্রবণ দাসের পুস্তক। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড। ১১২, বর্ধমান স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলা কথা-সাহিত্যে নবশব্দে সেনগুপ্তের পরিচয় দেওয়া বাহুলা। উপন্যাস রচনার তিনি গভীরমুগ্ধিক পন্থা অনুসরণ করেন নাই—কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত চুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সেই সব লইয়া এককালে বাস্তবিকতার অভাব ছিল না। আজ পরিণত বয়সে তাঁহার বচনার সে বিমোহের সুর নাই, ভ্রমোদর্শনে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাহারই নিদর্শন। এটি উপন্যাস হইলেও অত্যন্ত স্পৃহিত-উদ্ভাবনের মধ্য দিয়া বাস্তবকেই যেন মিটাড়রে অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহাকে জীবন-স্মৃতি বলিলেও অত্যাতি হয় না।

ভারত বায়ুতন্ত্র

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী

Indian Constitution এর বাংলা ব্যাখ্যা

...এই গ্রন্থটির অপরিমিত উপকারিতার কথা স্বীকার করা যায় না। —যুগান্তর

...দেশের একটি প্রকৃত অভাব পূরণ করিয়াছেন... এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। —দেশ

...Written in a fascinating and chaste language.....the author's approach and presentation.....clear and vivid. —Modern Review.

দাম আড়াই টাকা, ডাকমাণ্ডল আলাদা।

এম। পাবলিশিং কোম্পানী

১৯০/সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড

১ সি, কলেজ রোড, কলিকাতা—১২

ও অন্যান্য দোকানে পাওয়া যায়।

এ গরের নারক বাসপ্রহর পারে সিদ্ধা পৃথিবীকে ঝানিকটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিরাছে এবং বিচার-বিরোধের ধারা আত্মবরণটি চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিরাছে। ধনজনসমূহ সংসারে তাহার সঙ্গী কেহ নাই—কেহ তাহার সম্মান করে না, তাই অত্যন্তকৈ অত্যন্ত মেহে, সমতার আঁকড়ইয়া ধরিয়া বর্ষব্যয়কে উপেক্ষা করিবার প্রয়াস তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে গরের প্রতি কিছু শিথিল হইলেও রসোপভোগ ব্যাহত হয় না। নারকের অসুখ ইচ্ছার পরিপূরক হিসাবে প্রকৃতির চরিত্রের অবতারণা। তাহার বেশশ্রী ও বলিষ্ঠ সমাজগঠনের প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা চরিত্রের পাশে আশিষ্টা ঝড়াইরাছে এক সমতাময়ী নারী—মণিকা। উত্তরের অকৃত্রিম অনুপ্রাণ ও হৃৎস্পন্দনের সহজে কাহিনী হইরাছে উজ্জ্বল।

সুখ ও প্রসঙ্গতঃ প্রশংসনীয়।

পূর্ণচ্ছেদন—ঈন্সলি দেবী। বঙ্গের হাইকোর্ট। ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

তিনটি মন-নাশীর স্বভাবে ভালাসার আভির্ভাব ও বস্তু এবং আত্মতাপের উপর সেই স্নেহকে প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা-কাহিনী এই উপন্যাস-খানির বিবরণ। এই ধর্মের কাহিনী দেশী-বিদেশী উভয় সাহিত্যেই প্রচুর আছে। আত্মনা এক-লজ্জার কোশলে পুণ্ড্রন পুণ্ড্রন রস সৃষ্টিতে সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তেমন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িল না। তবে যাহারা শুধু সময় কাটাইবার জন্য গল্প পড়িতে ভালবাসেন—এই গল্প তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

ঐরাঃমদ মুখোপাধ্যায়

দাদুবাণী—ঈবোশেনজ্ঞে মজুমদার। বীণা লাইব্রেরী। ১৪০ কলেজ রোড, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০ টাকা।

একবার মধ্যযুগের বিখ্যাত সাধক দাদুর অবরোধী হইতে বাহিয়া দেড় শতটি বাংলা গল্পে অনুবাদ করিরাছেন। তাহার অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সরস। ইহার সাহায্যে পাঠক মূল সৌকর্য্যের রসাবানন করিতে পারিবেন।

খুসির খেয়াল—ঈকুনাস আচার্য্য চৌধুরী। ৮১৩, হরিন চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-২৫। মূল্য আড়াই টাকা।

খেয়াল, সন্দেহ নাই। আধুনিকতার স্বলক দেওয়া কবিতার বই। কোথাও মনোবিজ্ঞানের ছাড়া, কোথাও বাস্তবিকতার চমক। তাৎকালিক নাই, তাৎকালিক আছে। বেতুগে শরীরের ক্ষান্তি আর মনের অনুকূলিত লোকে হালুতা হাওয়ার সঙ্গে শূন্য উড়াইয়া দিতে চায়, হয়তো সেই যুগেই উপযুক্ত চড়া।

“তানাগার ভেসে আসে মাইটকুইনের গন্ধ—

এমারেলিন, পুশিগা, প্রাতিক্ষাণী।

ফেরালের গায়ে একটা টিকটিক—

পদ্মাশাড়ের (?) কুঁহরের বাচ্চা।

মন্তব্য-ডাঃ।

গরেছে চেপে ছুট

সভা, কর্তব্যমিষ্ঠা ও কার্য্য কুশলতার নিদর্শন

ব্যাঙ্ক অফ বাঁকুড়া

লিমিটেড

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপ্লবের সঙ্গেও ভারত সরকার হইতে পঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অস্বমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

চেয়ারম্যান—ঈজগরাজ কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ঈহরিদাস ব্যানার্জি

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

“ভেরোনা হেলমিনথিয়া”

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা আতীত ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে গুরু-বাহ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের অস্বস্থি দূর করিরাছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশি তাঃ মাঃ সহ—২৫০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১১১ বি, পোবিন্দ্র আড্ডী রোড, কলিকাতা-২৭

কোম-সাত ৮১



যেন সুসানি

আমি নিম্নের টুট চেনে

পৌকরী পৌকে দিচ্ছে চাড়া।

কাবের টুট কেহ চাপিরা ধরে নাই তো?

ক্রিয়ারেন্সনাথ মুখোপাধ্যায়

কড় (প্রথম খণ্ড) — ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—ক্রিআশোক
ভদ্র। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬।
মূল্য চার টাকা।

“কড়” এরেনবুর্গের ‘ইর্ক’ নামক ইলিয়ান পুস্তকগ্রন্থটিকে বিখ্যাত
উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। যিশু শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাপী মহাপুত্রের
যে প্রচণ্ড কড় বহিরা বাহ্যিক পটভূমিকার উপস্থাপনা রচিত।

অতীত ও বর্তমান যুগের যুদ্ধের পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সূচী
হইয়াছে। তখন যুদ্ধ হইত বিবর্তমান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত।
একটা সহজ সরল পথেই ছিল তাহার গতি, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ অত্যন্ত জটিল
আকার ধারণ করে। আজ ইহা শুধু একটি দল বা জাতিতে সীমাবদ্ধ
থাকে না, পৃথিবীর চড়াইচড়া পড়ে। তাই পান্ডিত্য সাহিত্যে অনেক
কোরে পটভূমিকা এবং বিষয়বস্তুর উভয় দিক দিয়াই উপস্থাপনিত অভিব্যক্তি
পরিচালিত হইতেছে। উপন্যাসের ঘটনা বঙ্গপরিচয় হানে আবদ্ধ
নাই—বিশ্বভিত্তিক করিয়াছে। এরেনবুর্গ একথা শুধু অনুভবই করেন
নাই, সে অনুভূতিকে সহজ এবং বাস্তবিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন

“পারীর পত্তনে”, আর তাঁর যে প্রকাশ পরিপূর্ণরূপে সাক্ষ্যলাভ করিয়াছে
“কড়”-এ। লেখক শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সত্যকেই একবার উপলব্ধি
হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি যেমন আধুনিক অভিব্যক্তি সংগ্রামের
জটিলতম রূপকে বৃত্তিতে পরিচালিত, তেমনি প্রত্যেক করিয়াছেন তার
মানবীয় বীজবস্তুকে। তিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া
আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃত বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন এবং অপরিণীত
দরম দিয়া প্রত্যেকটি মানুষকে চিত্রিত করিয়াছেন—কোথাও ভাষা
মূল্য দিতে কার্পণ করেন নাই। এত বিচিত্র মানুষের ভিত্তির মধ্যেও
তিনি নিজের আসল সন্তোকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁর নিপুণ
ভুক্তিতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।
যেমন পারীর ভদ্র সমাজকে, তেমনি লাসিয়ে আর বাউ, মালো এবং
লুই, নিভেল, হুমা, কেলার, হিন্ডা, সার্জি ও সীপ প্রভৃতি সকলকেই
লেখক একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়াছেন। পাত্রপাত্রীর চিত্রাচারে
হৃৎ-হৃৎ, প্রেমশ্রুতি, বহু বাহিরের আশঙ্কা—সে বর ভাগিরা বাওয়ার দমন
বাধা, কোনকিছুই তাঁর চোখে এড়ায় নাই।

বালা অনুবাদ-সাহিত্যিক পুঁট করিতে বাহ্যিক বস্তুর হইয়াছেন
ক্রিআশোক ভদ্র তাঁহাদের অন্তরম। আশোচা পুস্তকখানিও নিপুণ
অনুবাদক হিসাবে তাঁর হৃদয় অঙ্গুর রাখিবে। তাহার ভাষা সহজ
সরল অথচ বেগবতী, বলিবার ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক।

ক্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত



সৌন্দর্য্য রক্ষায় অপরিহার্য্য

শীতের রক্ষতা দূর করিয়া মৃদু সৌন্দর্য্য ও লালিতা
বৃদ্ধি করে এবং গাত্রচর্মের কোমলতা অক্ষুর রাখে।
বিষাভাগে লাভিনীসে ও রাত্রে লাভিনীসে ব্যবহার্য্য।

লোভানি
স্নো ও ক্রিম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল



ঐশ্বচীতত্ত্বসুবোধিনী—(১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

ঐশ্বচীতত্ত্বসুবোধিনী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ১৭-বি, ঐশ্বচীতত্ত্ব সেন, কলিকাতা-২৩ হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বাক্সে ১১০, ১১০, ১১০ ও ১১০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঐশ্বচীতত্ত্বের চরিত্র-ত্রয়ের এবং অর্গলা, কীলক, কবচ ও বৈদিক দেবীসুত্বের সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবিশ্লেষণ-বৃত্ত সয়ল ব্যাখ্যার সহিত ঘটচক্রের-রহস্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ঐশ্বচীতত্ত্বসুবোধিনীর লীলামাহাত্ম্য, তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন-পদ্ধতি, চট্টোপাধ্যায়ের নিয়ম, অর্গলা, কীলক কবচ ও দেবীসুত্বের প্রতিপাদ্য মূল বিশ্বাসের আলোচনা এবং বৃত্তিপুঙ্খ-রহস্য বর্ণিত আছে।

তৃতীয় খণ্ডে ঐশ্বচীতত্ত্বের প্রতি যোজকের বঙ্গানুবাদ এবং সুবোধিনী নামক বিশেষ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে পাঠবিধি, বৈদিক রাজিসুত্ব ও দেবীসুত্বসহ বড়ল সপ্তশতী চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতমৌলিকাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। এই চারি খণ্ড গ্রন্থে লেখক ঐশ্বচীতত্ত্বমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায়ের বহুবিধ সংস্কৃত টীকা বা সাধনসমগ্রাদি বৃহৎ বাংলা পুস্তকালয়ের সম্মেলনকাম করা সাধারণ পাঠকের হ্রাসাধা, কিন্তু ঐশ্বচীতত্ত্ব সুবোধিনীর যথোচিত সংক্ষিপ্তসার পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রই বিশ্বজননীর অপার লীলামাহাত্ম্য সম্মেলন করিতে পারিবেন। চতুর্থ খণ্ডে বৈদিক দেবীসুত্ব চট্টোপাধ্যায়ের অন্তর্গত পাঠ্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক রাজিসুত্ব ও দেবীসুত্ব

চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বেই পাঠ্য বলিয়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত আর সকল চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত। শত বারাহী ও মরীচিকিত্ত্বের বিবিধাক। পৌরাণিক এবং তাত্ত্বিক নৃত্যাদি বিষয়েই প্রবোজ্য; কিন্তু পৌরাণিক চট্টোপাধ্যায়ের মূল আকর বৈদ্যের নৃত্যাদি বেদের প্রাচীনত্ব ও সনাতন ধর্মের প্রতি প্রত্যাশা রাখিয়া অত্র পাঠ্যই সমীচীন। চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের ধ্যানমন্ত্রেও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, শেষের দুইটি চরণকে পূর্বাপর উল্টা করা হইয়াছে। ইহা যে ভুল তাহা মধ্যমচরিত্রের মহালক্ষ্মীর এবং উত্তরচরিত্রের মহালক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র দুটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

ঐউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শিবরাত্রি-পূজা ও কথা—ঐউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

ঐশ্বচীতত্ত্বসুবোধিনী কালীমন্দির, ৮৫, আমহার্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা-২। মূল্য দশ পয়সা।

গ্রন্থকার মূল্যে মূল্যে বিবিধ পূজা ও ব্রতকথা প্রকাশ করিয়া হিন্দু বাঙালী গৃহস্থের বিশেষ উপকারসাধন করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকের মোড়ার দিকে শিবরাত্রির পূজা সম্বন্ধে যে তত্ত্বালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা লেখকের পুস্তক শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। এই পুস্তকে পূজার ও ত্রিপুরা হস্তে ব্রতকথা এবং লিলাটিকম্, ঐশ্বচীতত্ত্বসুবোধিনীর বঙ্গানুবাদ, ঐশ্বচীতত্ত্ব-মৌলী আরতি এই তিনটি সংস্কৃত স্তোত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অম্বিতীয় লিভার টনিক

“কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিন্তরূপে আরোগ্য করে। অধিকতর রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। “কুমারেশ” লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটা অম্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

কুমারেশ

৭ মিডলসেক পুথ ও স্টোজ
কম্পেন্ড



ও, আর, সি, এল, সি:
সালকিয়া * হাওড়া



ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগোর সম্মান লাভ

‘রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ সম্মতি লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগোকে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য ‘সার বহুমাধব সরকার’ পদক প্রদান করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপক কানুনগোর গবেষণাও বিশেষ মূল্যবান। ঐতিহ্যবাহী ডিগ্গি, অরপুর্ন রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যাদি যোগল-রাণপুত ইতি-



ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো

হাসের একটি অধ্যাপকদের অধ্যায়ের উপর অভিমত আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। অধ্যাপক কানুনগো একজন শক্তিশালী বাংলা ঐতিহাসিক সন্দর্ভ-লেখক। তিনি শের শাহের ইতিহাস, জাঠদের ইতিহাস, দাঙ্গা শোকোর ইতিহাস প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তকের প্রণেতা।

অধ্যাপক কানুনগো আচার্য বহুমাধবের একজন পুরনো ও প্রিয় শিষ্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

সম্মতি লব্ধ-সভাপতি শ্রীমৎ বাবী সতিদামনজী মহারাজের সভাপতিত্বে লন্ডনের কালিকাতা প্রদান কার্যালয়ে ইহার সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। লন্ডনের সাধারণ সম্পাদক বাবী বেদামনজী মহারাজ লন্ডনের

বিভিন্ন কর্মসমূহের পর্যালোচনা করিয়া ১৯৪৯-৫০ সালের অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন—

আলোচ্য বর্ষে ৬টি প্রচারক-দল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্দ আদর্শ প্রচার করেন। লন্ডন হইতে একটি সাংস্কৃতিক মিশন দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার করেন।

গঙ্গা, কান্ধি, প্রহ্লাদ, হুদাভন, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র-গুলিতে লন্ডন আলোচ্য বর্ষে বহু তীর্থযাত্রীকে অর্থসাহায্য করিয়াছে। এই বৎসর কুরুক্ষেত্রে একটি মৃতদেহ আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে লন্ডনকর্তৃক ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি বিদ্যার্ণব-ভবন পরিচালিত হইয়াছে। লন্ডন হইতে বিভিন্ন ভাষার জাতিগঠনমূলক কর্মসমূহের নির্দেশ-সহিত ৫০খানি পুস্তক, দুইখানি মালিক পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতও হারবারে পরগণাধীরে জন্ম একটি বিদ্যালয় ও কুটীরশিল্প শিলা দেওয়ার জন্য শিল্পশিকার স্থাপন করা হইয়াছে।

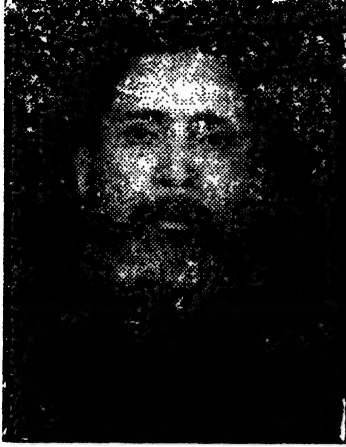
এই বৎসর গঙ্গা, কান্ধি, সাগর, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানে বিভিন্ন মেলায় সেবাকার্য্য করা হইয়াছে। লন্ডনকর্তৃক আসামে ছবিফিল্ম বিক্রেতা অফিসেও সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়। ঐতিহ্যবাহী মহাসম্মেলন ব্যক্তিকে কলকাতা ও লন্ডন প্রতিবেশক টিকা এবং ইংল্যান্ডের লন্ডন, ৪০ মহাসম্মেলন হোষ্টল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাণাঘাটে প্রতীকমান পরগণাধীরে জন্ম একটি সভাসদ খোলা হয় এবং শিলালব্ধ, বনগী, ভারতও হারবারে পরগণা-শিবির পরিচালিত হয়। ভারতও হারবারে একটি শিল্প-শিকারভন প্রতিষ্ঠাও এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য। তা’ হাড়া গঙ্গা সেবাশ্রমেও এই বৎসর পরগণাধীরে আশ্রয় ও সাহায্যদান করা হয়। বহু লোককে হিন্দুধর্মে পুনরানমন, বৈদিক যজ্ঞ ও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

আরব্যের হিসাব নিম্নলিখিত রূপে :

আর—(সাধারণ তহবিল) ৪৯৩,৪০৭৫০ ; ব্যয় ২৫৭০৭ টাকা, সাহায্য-ভাতারে আর—১১৪৪৮৬/০ এবং ব্যয়—৪১৫৪২৯৯ পাই।

প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্তি

কানি বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার হাজরৈক কবিরাজ
ঐপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়কে ডক্টর অব সায়েন্স (আনুর্ক্রেড-



ঐপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

বৃহস্পতি) উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পবেষণার
বিষয়বস্তু ছিল "সায়ান্স অব পালস"।

কবি ভুজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার কবির ভুজঙ্গধর স্মৃতি-তর্পণ
সমিতির উদ্যোগে বসিহাট টাউন হলে বাংলার ললিতপ্রতিভা
কবি ভুজঙ্গধর দারচৌধুরী মহাশয়ের একাদশ মৃত্যু-বার্ষিকী
উপলক্ষে এক বিরাট স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন
করা হয়। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক
ঐযুক্ত যোগেন্দ্র বাগল মহাশয়ের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য
করেন। ভুজঙ্গধর স্মৃতি-তর্পণ সমিতির সম্পাদক ঐযুক্ত
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বিভাবিনোদ মহাশয়
কবির স্মৃতি-তর্পণ সমিতির একাদশবর্ষব্যাপী এগেষ্ঠার বিশদ
বিবৃতি প্রদান করেন।

এর পাঁচ শত সহ-নাগী কবির স্মৃতি-বাসরে উপস্থিত

হইয়া নিজেদের অন্তরের প্রভা বিবেচন করেন। কবির
বিভিন্ন কাব্যাবলী, অনুবাদ-সাহিত্য, পুস্তকালী, বিভাবিনোদ,
যেহুত, চতুর্কাব্য, বৈকুণ্ঠ পদাবলী প্রভৃতি এবং সামাজিক ও
লোকসেবক হিসাবে তাঁহার উন্নত জীবনের ভাবপ্রবণতা,
তাঁহার বিলাসবাসনহীন নিরলস জীবনব্যাপন, ইংরেজী
সাহিত্যের প্রাচুর্য স্বাক্ষরবাহে মৈনুগা প্রভৃতি বহুদূরী প্রভিভার
আলোচনা করিয়া ঐযুক্ত যোগেন্দ্র বাগল একটি সার-
গর্ভ ভাষণ দেন। ঐবিজয়নাথ মজল, যঃ যোগেন্দ্র,
ঐবিবেকের বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐগণেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহুচিত
কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দিয়া ভুজঙ্গধরের স্মৃতি-তর্পণ



কবি ভুজঙ্গধর দারচৌধুরী

প্রভাবলি বিবেচন করেন। সভার দুইটি প্রস্তাব গৃহীত
হয়। প্রথম প্রস্তাব ছিল—কবির সাহিত্যপরিষদে কবি
ভুজঙ্গধরের একশাব্দী তৈলচিত্র প্রকাশ ব্যবস্থা সম্পর্কে
বিভিন্ন প্রস্তাবে তাঁহার কাব্যরাজি হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ
আহরণ করিয়া একশাব্দী সঙ্কলন-গ্রন্থ সঙ্কলনের কথা হয়।
ভুজঙ্গধরের কবিতা হইতে প্রয়োজনানুসারে কয়েকটি সঙ্গীত
গীত হয়। তাঁহার রচিত পদাবলীর কতকগুলি লইয়া কীর্তনও
করা হইয়াছিল।



অমৃতজাঞ্জন
সর্বপ্রকার বেদনায় আণবিক বোম্বার'ন্যায় কার্যকরী!

দাদেব মলম
চর্ম রোগে 'পরমানু' শক্তির 'ন্যায় কার্যকরী!
অমৃতজাঞ্জন লিঃ-পোঃ বক্স নং ৩৮২৫-কলিকাতা ৭



চন্দ্রশেখর সেন

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ সরকারী উকিল চন্দ্রশেখর সেন গত ১৭ই মার্চ ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা হাঙ্গামাবন্দে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরিবার-পরিজন চট্টগ্রামের সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বদ্বিতাপের পর তাঁহার হস্ততল হইয়া পড়িয়াছেন।

যে সকল গুণ থাকিলে আইন-ব্যবসারে উন্নতিলাভ করা যায় চন্দ্রশেখরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি খেলাধুলার বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন এবং গত তিন বৎসর যাবৎ মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যায়, সভাপাল্য, সকল সংকার্যে উৎসাহী এই ব্যক্তির বিরোধে বাঙালী সমাজের অনেক ব্যথা অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রাণিত লোক লাভ হউক।

রমেশচন্দ্র চৌধুরী

অনুশীলন সহিত আর এক জন বিশিষ্ট কর্মীর তিরোবাসে

আমরা আত্মীয়বিরোধ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। বিশ্রবী-কীবনের অনিহন ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে রমেশচন্দ্রের বাহ্য অকালে মট হইয়া যায়। মহম্মদসিংহ—বাহিত-পুরের এক সম্পন্ন পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বদেদী রূপের অব্যবহিত পরেই তিনি বিশ্রব-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। রমেশচন্দ্রের পুত্র ও পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

কিরণচন্দ্র ঘোষ

গত ২৬শে পৌষ ষ্টেটম্যানের কৃতপূর্ব প্রবাস রিপোর্টার কিরণচন্দ্র ঘোষ ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রিপোর্টার হিসাবে উক্ত পত্রিকার যোগদান করেন। পরে প্রবাস রিপোর্টারের পদে উন্নীত হইয়া ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকেন। ঐ বৎসরই কর হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাংবাদিক মহলে তিনি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।



M.B. SIRKAR & SONS

**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহার্ট স্ট্রীট
ও বহুবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন্স

সুশ্রুত নিউজপেপার ডেলিভারি সিস্টেম
গৃহীতক মুদ্রাসহী

ফোন, বি.বি. ১৭৬১
গ্রাম হিলিমার্কস

ব্রাঞ্চ-হেলুয়ান মোট মালিগঞ্জ
১০৮ ১ বি. বামবিহারী এডিনিউ কলিকাতা

ম্যাক্সিম লিটভিনফ

সোভিয়েট প্রচারপত্র “প্রাভদা” বোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুতপূর্ব পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লিটভিনফ গত ১৭ই পৌষ বেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সংকিণ্ত পরিচয় নিয়ে বেত্তরা গেল :

তিনি ১৮৭৬ সালে বিয়েলষ্টকে জন্মগ্রহণ করেন। সত্তর বৎসর বয়সে তিনি বেচ্ছাটেন্সকপে সেমাবলে বোণবান করেন। সেমাবলে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। সেমাবল ত্যাগ করিয়া তিনি ফিরেতে সোভ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিতে বোণবান করেন। ১৯০১ সালে উক্ত পার্টির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত লিটভিনফও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি সুইজারল্যান্ডে চলিয়া যান। কিছুদিনের পর সুইজারল্যান্ডই তাঁহার প্রথম কর্মক্ষেত্র হইয়া উঠে। ১৯০৩ সালে তিনি পুনরায় রাশিয়ার প্রত্যাগমন করেন এবং ভদ্রবধি রাশিয়াতেই ছিলেন।

পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া তিনি রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৯০৭-০৮ সালে হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার পর ত্রিটেন ও ক্রাসের নিকট তিনি যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা যদি গ্রহীত হইত, তবে ইউরোপের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা অন্য পথে বহিয়া চলিত।

সোভিয়েট গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ত্রিটেনে রূপ-হৃত নিযুক্ত হন। কিন্তু এ সময় এষ্ট ত্রিটেন দিমা কারণে সোভিয়েট-রাষ্ট্র আক্রমণ করে। তার মধ্যে ক্রাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। রাশিয়ার ব্রিটিশ এম্বিসিগণকে আটক করা হইলে প্রতিজ্ঞা হিসাবে মঃ লিটভিনফকেও লগনে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের শেষভাগে ফুটনীতিক বন্দীগণকে মুক্তিদানের জন্য উক্ত সরকারের মধ্যে একটি সুযোগ্যতা হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৫ সালে মস্কোতে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে লম্বা লম্বা সোভিয়েট মনোভাব বিশ্বাসীর নিকট ব্যক্ত করেন।

১৯০৯ সালের মে মাসে মঃ লিটভিনফ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং মঃ মলোটোভ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে তিনি আমেরিকায় সোভিয়েট রাষ্ট্রহৃত-পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ইহার পর তিনি সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত কার্যভার ত্যাগ করেন।

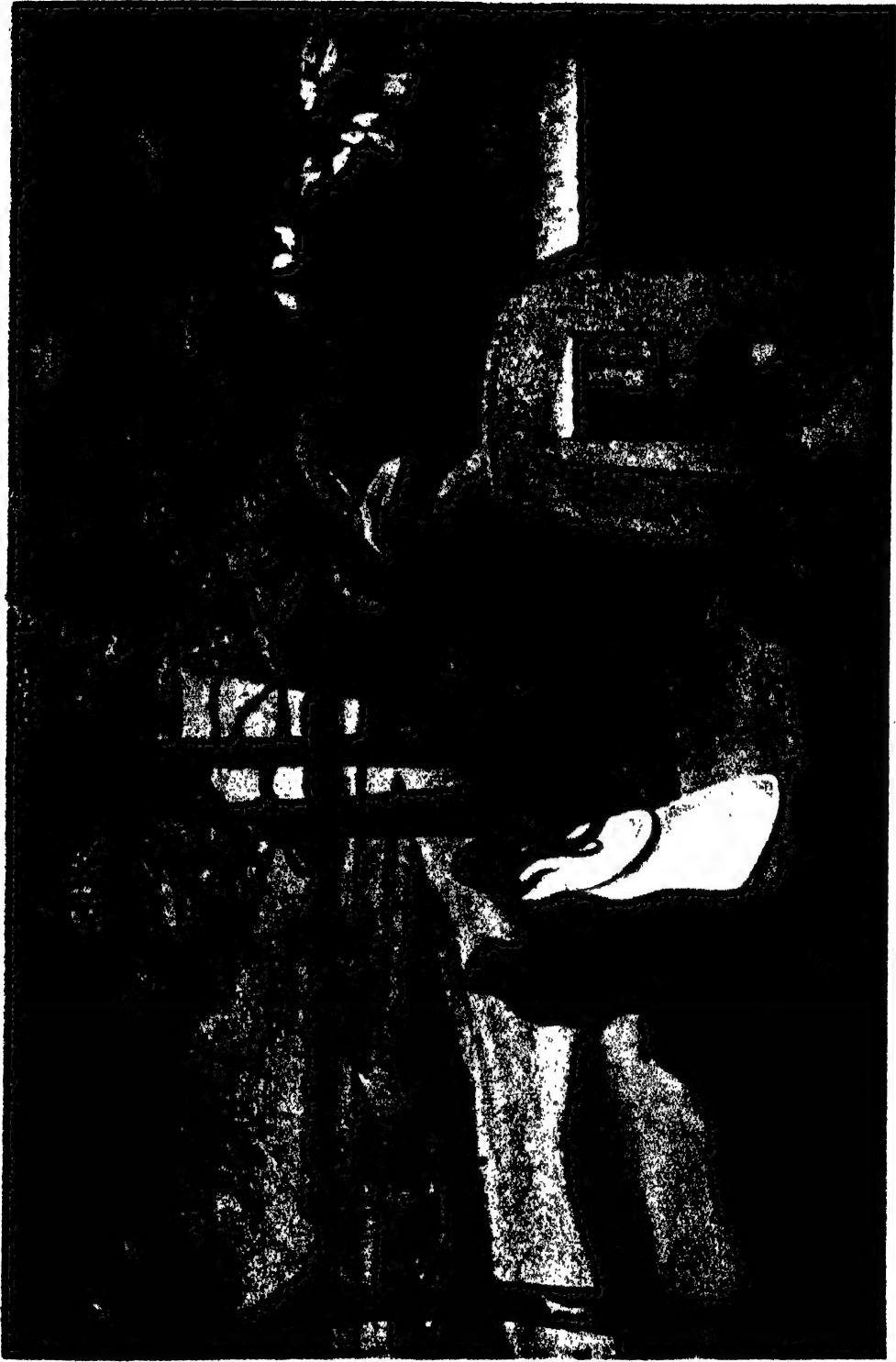
মঃ লিটভিনফ ইংরেজ ব্যারিষ্টার তার সিডনী লো’র কন্যাকে বিবাহ করেন। “শান্তি অবিত্যাক্য” কথাটি তাঁহারই রচিত।

লিটভিনফের সময়েই “কিনোভিয়েভের চিঠি” ব্রিটেনের প্রথম প্রমিত সরকারকে কনতার আসন হইতে দূর করিতে সাহায্য করে। চার্লিল এই বিষয়ে অপ্রীতি ছিলেন। এই চিঠি ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। সেইরূপ ১৯৩২-৩৩ সালে যুক্তাধীতি হইতে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে রায়সে ম্যাক-ডোনাল্ডকে রক্ষণশীল বলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি সম্মিলিত দলিত্ব গঠন করিতে হয়। ভদ্রবধি চার্লিল সোভিয়েটের বন্ধু হইয়া পড়েন, হিটলারের তর তাঁহাকে পাইয়া বসে। তার পরের ঘটনাবলী ইতিহাসের অঙ্গ। বিত্তীয় বিশ্ববৃদ্ধির কল আঙ্গ দেখা দিতেছে।

লর্ড লিন্‌লিথগো

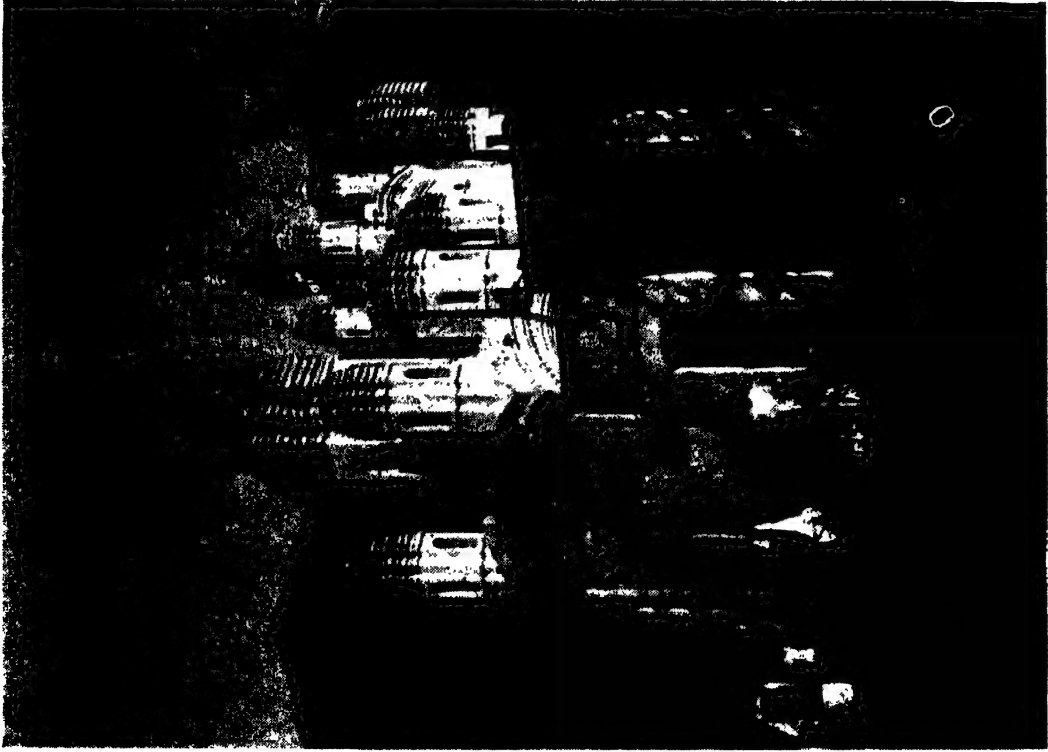
ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্ততম বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো ৬৪ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার নাম ব্রিটিশের অধীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মত দীর্ঘ (সাত সাত বৎসরব্যাপী) শাসনকাল অনেক বড়লাটের ভাগ্যে ঘটে নাই। অবিকৃত এই সময়ের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ক্রিপস মিশন, কংগ্রেসের দ্বারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে “ভারত ছাড় আন্দোলন” (১৯৪২), ১৯৪৩ সালের বাংলার মহতর ইত্যাদি ঘটনা লর্ড লিন্‌লিথগোর সময়ের।

তিনি “গো-দান” একটা ক্যাননে পরিণত করেন। তাঁহার কল একেবারে নিরর্থক হয় নাই। বলিতে গেলে তাল-বন্দ মিশিয়া লর্ড লিন্‌লিথগো ব্রিটিশ চরিত্রের প্রতীক ছিলেন, “জন মূল” বাঁচ বা “মূল ভণ্ড”—বাধা কুহুরের প্রকৃতি মানব-বেহে প্রবেশ করিয়াছিল। আত্ম তিনি দিমা-প্রশংসার অতীত।

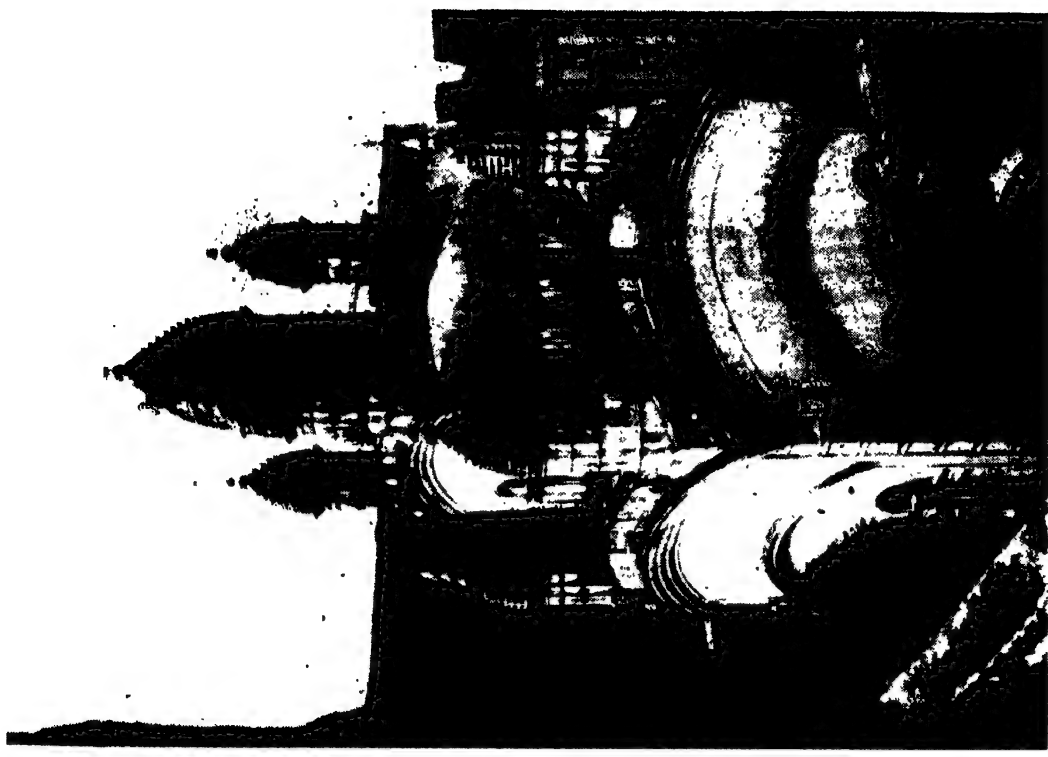


অবাসী প্রেস, কলিকাতা।

কাড়
শ্রীমৎকীরজন স্মরণ



দেও উইলিয়ামের দেওয়ান হিলোকরায় পাকডাশী স্থাপিত
নবরত্ন ও পদরত্ন শিবমন্দির



কলিকাতা বলরাম ঘোষ স্ট্রিটস্থ শ্রীশ্রী ভবতা ব্রহ্ম দেবীর লিপিবিন নবরত্ন
মন্দির। দুই পাশের অষ্টশাল ও সম্মুখের নাট্যমন্দিরের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে

অবাসা

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

সারস্বতী বলহীনেন সত্যম্

১৯৩৩ ভাগ }
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৮

৩৪ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের রূপ

নির্বাচন ও ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ একই কথা—একথা সম্পূর্ণ সত্যও মহে, সম্পূর্ণ মিথ্যাও মহে। সুতরাং এই যে নির্বাচনের পাল্লা প্রায় শেষ হইয়া আসিল উহাতে পশ্চিম বাংলার, তথা ভারতের আগামী পাঁচ বৎসরের ভাগ্যনির্ণয়ের ইঙ্গিত রাস্তা পাওয়া বাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তা ইঙ্গিত পাওয়া যার তাহার বিচার করা প্রয়োজন, কেননা আমরা বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের দ্বারা দৌকার বহর ভাসাইয়া চলিয়াছি। এই দ্বারা আমাদের কোন্ দিকে লইয়া বাইতেছে, কোথায় কখন প্রবল বতাপ্রবাহে ভরী বাসচাল হইতে পারে, কাতারী বাহাদের নিমুক্ত করিবার তাহাদেরই বা কর্ত্তব্যপটী সামলাইবার কৰ্ত্তব্য কতটুকু—এ সকলই বিবেচনা করা প্রয়োজন। অনেক বলিবেন, “বা হইবার তা হইয়াই গিয়াছে, এখন আগামী পাঁচ বৎসর বীরবে কপালে লেখার কলাকল এখন করা হাতা কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই।”

এই নিরুত্থম অদৃষ্টবাদের পথেই বাঙালী বর্ত্তমানে চলিতেছে এবং এই কারণেই সে আজ “গত গৌরব হৃত আসন নত মস্তক লাভে।” নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের মধ্যে এই ভাবই তাহার ছিল, এবং যদি ভবিষ্যতেও এই ভাবই থাকে তবে বাঙালীর অদৃষ্টলিপিতে “সমাপ্ত” লিখিয়া উহাকে চিত্তার নম্রণ ভিন্ন আর কর্ত্তব্য কিছুই নাই। এবারের নির্বাচনে বাঙালীর মনের যে চিত্র আমরা দেখিলাম তাহা এক দিকে নৈরাশ্রমত, অত দিকে অদৃষ্ট।

রূপকের ভাষা হাতিয়া শব্দে কথার বলিতে হয় এবারের নির্বাচনে আমরা দেখিলাম বাঙালীর—বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালীর—মন হয় শিশুর তার অপরিণত, নয় “বাহাদুরের” এত হৃদের তার জরাজীর্ণ ও শৈথিল্যপ্রাপ্ত। কেননা দেখিলাম বাঙালী নির্বাচনের উদ্দেশ্য বুকে নাই, নির্বাচনের কার্যক্রম জানে না এবং এই ব্যাপারে তাহার যে কোনও তরুণপূর্ণ কর্ত্তব্যের আজ্ঞান আছে সে বিষয়ে তাহার কোনও

চেতনাই নাই। বাঙালী যে বাধীন সে কথাও সে ঠিক কতটা বুঝিয়াছে তাহা বুঝা গেল না, তবে বাতস্ত্য স্বকায় তাহার যে কোনও দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিতের কথা বলিয়াছি তাহা রহিয়াছে বাঙালীর এই অদৃষ্ট মানসিক অবস্থার মধ্যে। যদি ইহা আতিপত “dementia praecox” হয় তবে সব শেষ। না হইলে বরতরীর চিকিৎসার যদি দুরাতাব দায় তবে কিছু হইলেও হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস শিক্ত বাঙালী নির্বাচক বুদ্ধিমত্তা হিসাবে বিবেচনায় নির্বাচক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। তবে এরকম অবস্থা হয় কেন?

এবারকার নির্বাচনে শিক্ত বাঙালী পুরুষের মধ্যে শত-করা মন জনও ভোট দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমরা আমাদের উপর নির্ভর করিয়া একথা বলি নাই। কলিকাতার যে সকল অঞ্চলে শিক্ত বহুবিধ লোকের বাস সেখানকার, বর্ত্তমান শহরের ও অন্যান্য ভিন্ন-চারট কেন্দ্রের ভোট-কল আনিবার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি এবং এই বিচার-কল সূত্রিক কিনা বুঝিবার অভ মানা হাথের অনেক তরলোককে এর করিয়াছি, তাহাতেও ঠিক এই হিসাবেই আসে।

প্রস্তোত্তরে তরেকটী বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেগুলির পূর্ণ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়, কেননা তাহার সম্যক বিচার বিরাট ব্যাপার। মানিকপঞ্জের সম্পাদকীরের আরতনে তাহার হাথের একাত্তই অভাব। তদুও কিছু বিচার করা প্রয়োজন।

এক স্থলে অবিকাংশ তরলোকই বলিলেন, “মশার যে দায় লকার সেই হয় দায়ণ, হলে-বলে-কোনলে ভোট ভিকা চলে, ভোট গেলে গেলেই তার পর সব কথা শেষ। যদি কেতে তবে নিজবুদ্ধি ধরে, আর যদি হাথে তবে ছুব ধারে।” একবার দেখিলাম উপহিত আট-মশ জন তরলোক সকলেই ঘোটাছুটি একমত।

হয়ে গেছে, এখন বা হবার ভাই হবে। আমি তোঁট দি নাই নশার, ওলব চাংকা হেল-হোকরার ব্যাপারে কি তল্লোকে বার ?” ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে নানা দুহির নানা মত পাওয়া গেল। বোটের উপর দুহিলার মনের মত লোক, বাহার কথার বিশ্বাস করা বার এরকম, তাঁহাদের অবিকাংক্ষের বিচারেই, প্রাণীকপে দাঁড়ায় নাই, সুতরাং তাঁহাদের তোঁট দিবার স্পৃহাও হয় নাই। অত দিকে উপস্থিত লোক দুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বা প্রাণীদের মধ্যে বোপাতার বিচার করা, এ দুই-ই তাঁহাদের মানসিক অবসাদে তাহে সম্ভব হয় নাই।

মানসিক অবসাদ, চিন্তা করার অনিচ্ছা এ তো আমাদের জাতিগত ব্যাধিতে দাঁড়াইরাছে। উপরন্তু আছে তাবপ্রবণতা, চক্ষুলাল এবং অথবা বিরাগ (prejudice)। এই সকলের প্রতিক্রিয়া ভ ছিলই, আরও ছিল একটা অধবিশ্বাস যে তোঁট দিয়া প্রাণীর মাথা জর করা বার। তোঁটদাতার মাথা জর বা বিজর যে হয় লেখা শিক্ষিত লোক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন, এবং বিচার করিলে বুঝিতেম যে, তাঁহারা যেরূপ হুঁতাবে বলিয়া থাকিলে অপরে তাঁহাদের মাথা পরোক্ষভাবে বিজর করিতে পারে বা প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাদের তোঁট হরণে দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু চিন্তা বা বিচার করিবার মত মহাপাতক করে কে ?

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাগ আছে, অতএব কংগ্রেসের প্রাণীকে তোঁট দিব না এই বিচারে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন পন্থী অতি অযোগ্য লোকের নির্দোষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছেন অনেক। এবারের নির্দোষে ঐ বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন মনের মধ্যে বোপাতার লোকেরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হারিয়াছে, অযোগ্য লোকই অবিকাংক্ষ ক্রমে জিতিয়াছে। বসন্তঃ এবারের নির্দোষ জুয়াবেলার পর্যায়ে পড়িয়াছে।

কংগ্রেস মনের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আছে, তার মধ্যে অনেক কিছু সত্য এবং বেশ কিছু মিথ্যা। কিন্তু সে কারণে বোগা প্রাণী, বাহার ভ্যাগ, আয়োজন ও জীবন পণ করিয়া দেশসেবার ইতিহাস কাহারও অপেক্ষা অধিক কম নহে, এবং এবারকার “ভ্যাগী দেশসেবী” বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রাণীদের মধ্যে মতকরা ৯৯ জনের অপেক্ষা, এবং উপরন্তু বাহার বিপত পাঁচ বৎসরের কার্যক্রমের পরিচরও অতি উজ্জ্বল, এরকম কংগ্রেসপ্রাণীও নীচ লোকের বতবয়ে ও বহুদূতি লোকের “বিজের দাক কাটরা পেরে বান্ধাজদ” করার উৎসাহে, নিজের বেশে সামান্য তোঁটে হারিয়া পেলেন কিরূপে ? সে সকলের শিক্ষিত লোকেরা কি এতই অপদার্থ যে নিজের ও পুত্র-কন্যার ভবিষ্যতের কথা তাবিদ্য মতিও তাঁহাদের নাই ? ভিন্ন পন্থীদের মধ্যেও বাহার সামান্য পথে নিজের কার্যের পরিচর বা জয়িত্ত্বের নির্দোষকরণের

বিচার চাহিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অবিকাংক্ষই হারিয়াছেন। সেইজন্য হারার ভালিকার এমন বহু লোকের নাম পাওয়া বার বাহারের লক্ষক বিজ্ঞেতাধিপণে মধ্যে নাই, সে কংগ্রেস মলীরই হউন বা বামপন্থীই অথবা মধ্যপন্থী বা বতরপ্রাণীই হউন।

বেশের শিক্ষিত তল্লোকের উচিত ছিল নির্দোষে লজির ভাবে অংশ লওয়া। তাহা না করার নীচ কলিবাড়, চতুর জুরাঙ্গী ও কপট ভাগ্যবেধীর বরাত দুহিরাছে। নির্দোষে সাধারণের বিচারে লহারতা করা বাহারের উচিত ছিল তাঁহারা সরিয়া বাইরা অশিক্ষিত ও অবিবেচক নির্দোষকে দুহিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের হাতে। সুতরাং হয় হইরাছে তাঁকার জর নয় হইরাছে জুরা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জর।

একজন বিজ্ঞেতা চাহীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্দোষ হইলে কপটাল দুহিয়া যিবেন বাহাতে চাখী চাল পকান তাঁকা মন হয়ে বিজর করিয়া লাভবান হয়। বাম-পন্থীরা তোঁটারগণকে বামপন্থীকে তোঁট দিলেই হয় হইতে জিন বিবা নিজর কুবি-কুদি পাইবে এই চাল প্রতিক্রিয়া দিয়াছেন। একজন কংগ্রেসবিরোধী অবিবাহিত ব্যক্তি বস্তীর প্রচুর জীতোট সংগ্রহ করিয়াছেন লদে পাঁচ-সিঁহরুজা এক জীলোককে লইরা, যে তার “বাহী”কে জেল হইতে বাঁচাইতে চায় এই কথা প্রত্যেককে বলিরাছে।

তাহার পর যেহী-তোঁট ও মত লোকের তোঁটে ত কেন-ভালি তরিরাছে। উপরন্তু তোঁটদান ও তোঁট-গণনার মধ্যে অনেক দিন—ও রাজি—লম্বা থাকার লক্ষকমহাপ্রণয় বহুক্ষেত্রে ইচ্ছামত তোঁট উতাইরা ভোজবাহীর খেলা দেখাইরাছেন। বলা বাহুল্য এই শেষের বাহুকরী ব্যাপার—যে বিষয়ে আমা-দের লগ্নেহমান নাই—সকল পক্ষেরই চর অহচরবর্গ দুহিবা অহবাহী করিয়াছে।

নির্দোষে আল-জুরাচুরি বিশ্বাসবাদকতার কথা কত বলিব ? এইমাত্র বলি যে, এবারের নির্দোষ নীচতা, জুরাচুরি ও হুঁতবতয়ে পূর্বেকার সকল রেকর্ড ভল করিয়াছে।

অবশ্য একথা সত্য নয় যে, বাংলার শিক্ষিত লোক ইচ্ছা থাকিলে ইহাকে অত রূপ দান করিতে পারিতেন না, এবং একথা আরও সত্য যে, লারা ভারতে যদি কোনও প্রদেশ থাকে যেখানকার ব্যবস্থা পরিমলে উপস্থিত লোকের দিতাত প্ররোজন তবে সে এই আমাদের “লম্বাপূর্ণ” হুঁতাপ। পশ্চিম বাংলা, এবং সেই লদে বলি যে লারা ভারতে যদি অকম অবস্থা কাহারও থাকে তবে তাহা এই অভাগা বাঙালী জাতির।

নিজের প্রবেশে আমাদের কি অবস্থা সে কথা কি কোনও শিক্ষিত বাঙালীকে বলা প্রয়োজন ? অত প্রবেশে তাহা কিরূপ তাহার পরিচর কিছু কিছু নিয়ে উত্তর অংশভালিতে পাওয়া যাইবে :

“বেশের বর্তমান পালন-জীবনে অধীনে দেশের লোকের

যে অবস্থা চলিতেছে—তাহা আজ চারি বৎসর ধরিয়া জন-
বিক্ষোভ ও আন্দোলনসমূহের ভিত্তি দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।
তাহার সহিত মানবজন্মের বিশেষত্বের বিবিধ অভ্যাসের ও
অস্বাভাবিকতার অব্যাহত ধারা সংযুক্ত। এই সমস্ত অবস্থার
এখন প্রবর্তনের প্রয়োজনে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাসমূহ
আকস্মিকভাবে উপস্থিত হইয়া দিমের পর দিম মানবজন্মকে
আন্দোলিত করিয়াছে—তাহারই পরবর্তী অব্যাহতরূপে অস্বা-
ভাবের কতকগুলি সূচক ব্যবস্থা ব্যবহৃতরূপে মানবজন্মে
কার্যময়ী ও স্বাভাবিক ধারার পরিণত হইতে চলিয়াছে। মান-
বজন্মের চতুর্ভুজ দৈর্ঘ্য, প্রাচীরসমূহে ঘুরিয়া প্রত্যেকরূপে
উপলব্ধি হইতেছে যে, জীবনযাত্রার সমস্ত বিভাগে, অস্বাভাবিক
করিবার সমস্ত উপায়গুলি এমন স্বাভাবিকভাবে কার্যময়ী আসন্ন
জন্মাইয়া লইতেছে যে, প্রতিমিত্ত মানবের জীবনযাত্রার উৎ-
পাতের ধারা অব্যাহত চলিয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের কোমল
পথ নাই, সুবিচারের কোমল আশা নাই, কাছাকাড়ি হুঃখ,
অসুবিধা জন্মাইবার, বলিবারও পথ নাই; কারণ ভবিষ্যৎ
কেহ নাই।

“সমগ্র জেলার অবস্থার দিকে তাকাইয়া এই এক ধারা
দেখিতেছি। জেলার ধাতের ব্যবস্থা—জেলার বস্ত্র, জল,
বাজার ও বস্ত্রের ব্যবস্থা—জেলার শিক্ষা, শাসন, আইন
আদালত, অবিকার ও অপরিহার্য্য সর্ব্বস্বত্বসমূহের ব্যবস্থা—
সকল বিভাগে, সকল বিষয়ে এক ব্যবহৃত অভ্যাসের, অস্বাভাবিক
ও শোষণ মানবের জীবনকে নিত্য উত্যক্ত ও হুর্কিবহ
করিতেছে।...

“তাহার পর শিক্ষা-বিভাগ। ইহা জাতীয় কর্ম্মের এক
মহান অঙ্গ—জাতীয় অগ্রগতির আশা ও ভবিষ্যৎ রূপ এই শিক্ষা
লইয়া কাটকা-বাজারের খেলা ও অস্বাভাবিক চলিতেছে। শিক্ষা
বস্ত্রের দার উদ্ভিদা গিয়াছে, ইহা আজ বেকগুমিন, বিল,
এক্সট্রা, এলাওয়েল, রিমিউয়াল, ভিকিটিং রিপোর্টের কারসাজীর
বাজার—প্রাদেশিকতা সৃষ্টির ব্যবহৃত আধা-ক্ষেত্র। দুঃ,
উৎপাত, অস্বাভাবিক ও বিভাগীয় অব্যবহার প্রতিবোধিতার এই
ক্ষেত্র কাছাকাড়ি পিছাইয়া নাই। বহু বাংলা স্কুলের মঞ্জুরী
(বেকগুমিন) উদ্ভিদা গিয়াছে, বহু শিক্ষকের ম্যাব্য পাওমা
প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, বহু তথাকথিত হিন্দী-মূল বিদ্যা দার
বহুদের জন্য রূপার অল্প আহুত্ব লাভ করিতেছে। ইহার
মাঝে পড়িয়া জাতীয় শিক্ষার প্রশ্ন ওঠান। কিন্তু এই হুঃখ
এক হুঃখ নিরমিত ধারার আবর্তিত ও উন্নত হইতেছে—
দেখিবার কেহ নাই।

“এই সকলের মধ্যে জন-জীবন পট্টনের ও তাহার অগ্রগতি
প্রচেষ্টার ক্ষেত্র কিতাবে চলিতেছে তাহাও দেখিবার।
আরম্ভণসময়ের ক্ষত, জন-জীবনের বিকাশের ক্ষত পকারে
প্রকৃতি ব্যবহার যে প্রাণের বেশে করা হয়, সেই পকারে

কর্ম্মব্যবস্থা এখানে জনজীবন বিয়প্ত করিবার ক্ষত। জন-
পণের অবিকারকে বক্তিত করিয়া, সুবিধামত কিছু কিছু
প্রাণে পরকার ধারা নিয়োজিত তাঁহাদের পকারেও করা
হইতেছে—এবং তাহার। পরকারের হিন্দী প্রচার ও বিশেষ
উদ্দেশ্যসমূহের সহায়তার নিয়োজিত থাকিয়া নিজেদের
স্বার্থসাধনে অস্বাভাবিকতার রাজস্ব সৃষ্টি করিতেছে। একটি
বিশেষ ক্রিমি লক্ষ্য করিবার কথা—সমস্ত মানবজন্মে যে
সমস্ত লোক অব্যাহিত বলিয়া বহু বিখ্যাত, সেই লোকগুলিই
আজ বাছাই করিয়া পরকারের বে-পরকারী নিজ লোকরূপে
নিযুক্ত। ইহারা জেলার সর্ব্বজন ভীতি প্রদর্শন করিয়া, শোষণ
করিয়া, আত্মগৌরব করিয়া জনপণের কতি করিয়া
বেড়াইতেছে—ইহাদের অস্বাভাবিকতার প্রতিকার চাহিলে পরকার
কর্ত্ত্বক ইহারা ইত্যদ, নীবাংলা ও প্রতিকারের ক্ষত তারপ্রাপ্ত
হন—ইহাই অবস্থা।”

মানবজন্মের বিখ্যাত সাপ্তাহিক “মুক্তি”র ১৯শে ও ২০শে
কাল্ডন সংখ্যা হইতে উপরোক্ত অংশগুলি গৃহীত। বলা
বাহুল্য, যে যে অকলে এইরূপ বৈরাচার চলিতেছে তাহার
অবিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী এবং সেই কারণেই তাহাদের
উপর, বিদ্যা প্রতিকারে এবং বিদ্যা ভয়ে, অস্বাভাবিক
দল হিংসাত্মক কাজ চালাইতেছে। বাঙালীর হুঃখ বাঙালীই
নিচলিত হয় না, সুতরাং প্রতিকার হইবে কি আবে? যদি
আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিত তবে কেনে এমন লোককে পাঠাইতে
আমরা চেষ্টা হইতাম বাহার হাতে পারে “পার্টার” শিকল
বাঁধা নাই, বাহার হুঃখ বাঁধের বন্ধন নাই, চোখে “প্রাদেশিকতা
মহাপাপ” এই লক্ষ্যে ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হয় নাই।

বাংলার কংগ্রেস ত অতি হীন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এবং
যত দিন জীবানু অতুল্য যৌব প্রযুগ “মেতা” বলীর প্রাদেশিক
চক্রা-চক্রের কেনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন তত দিন ঐ হীন
অবস্থা যাইবার নয়। আজ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস জিতিয়াছে
বলিয়া “মেতা”পণ উরাসে অবীর। কিন্তু সেদিন হুঃখ নাই
বহন লক্ষ্যভাগের পালা বসিবে এবং তখনই হইবে পরীক্ষা।

ডাক্তার রায়ের বোগ্যভম ভিন্ন জন সহকর্ম্মীই নির্ব্বাচনে
হাঁটাই হইয়াছেন। বাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হই
জন অযোগ্যভম, একজন সাক্ষীগোপাল, অত জন সং ও বোগ্য,
কিন্তু অভিজ্ঞতা কম। কংগ্রেস দলে যে ১৪০ জনের মধ্যে
ডাক্তার রায়কে মন্ত্রী হুঃখিত হইবে, তাঁহাদের মধ্যে অজ্ঞাত
মত থাকিতে পারে না একথা আমরা বলি না, এবং লোভ
দেখাইলে বিপদ দলের মধ্য হইতে লোক আসিতে পারে না
এ কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত
লক্ষ্যভাগ প্রদেশে রাষ্ট্রচালনার বোগ্যভা অর্জন করা সহজ
নয়; মুক্তি, বিচার ও লক্ষ্যভা তো চাই-ই, আরও চাই অভিজ্ঞতা
এবং কর্ম্মক্ষমতা। ঐরূপ অনবৃত্ত মনোর কিতাবে সংগৃহীত
হয় তাহা অস্বাভাবিক।

ভারত সরকারের বাজেট

ভর চিত্তাভন দেশস্থ পাল্লার্ষেষ্ঠে ভারত সরকারের বাজেট পেশ করিরাছেন এবং নিম্নিবে তাহা পাল করাইরা লইরাছেন। এই বাজেটে ও দেশস্থপের বক্তৃতার কয়েকটি বিশেষর আছে।

বিগত বৎসরে দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা-এসনে গ্রীষ্মক দেশস্থ বলেন বে, সাধারণভাবে দেশের আর্থিক অবস্থা হ্র্যোগপূর্ণ ছিল এবং দুজাকীতি, দুলায়ুতি, বাজাতাব ইত্যাদি সমতাই ইহার জ্ঞত দাতী। দুলায়ুতির কারণ বরপে দুজাকীতি এবং বর উৎপাদনকেই তিনি দাতী করিরাছেন। দেশ বিতক্ত হওয়ার কলে দেশের উৎপাদন কনতা অনেকাংশে ব্যাহত হইরাছে। ইহা ব্যতীত অভিজুটি অদায়ুটির কলেও দেশের প্রয়োজনীয় জব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং জব্যদুলা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইরাছে। তহপরি কোরিয়ার দুও আতর্জাতিক পটুহিতে বে পরিবর্তন আমদন করে তাহাংর প্রভাবে ভারতের জব্যদুলা আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং দেশস্থপের মতে ভারতের ইহাতে করণীয় কিছু ছিল না বলিরাই দুলাহ্রাসের কথা আসে না। কিন্তু আতর্জাতিক অবস্থার হতক্ষেপ করার অবিকার না থাকিলে, আতর্জাতীণ ব্যবহ অবলবনে বে আমাদের সরকারের পকে হাত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? এই দুলায়ুতি বে বহুলাংশে আমাদের সরকার দৃষ্ট করেকটি নীতির অবততাবী কলবরণ সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিরাছেন। ১৯৪৯ সালে দুলাহ্রাসের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের অধিকরণে ডিত্যাসুয়েতন করার জ্ঞতই বে আমাদের দুলা বৃদ্ধি পায় তাহা আজ আর কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে।

এই দুলাহ্রাসের জ্ঞত সরকার হইতে দুজাকীতিকে দাবাইরা রাবিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪০-৪১ সালের বাততি বাজেট এই ব্যাপারে বধেট সাহায্য করে। রণানী শুক বাতাইরা ও নুতন শুক বলাইরা সরকারের রাজব বৃদ্ধি করা হইরাছে। বিত্তীয়তঃ, আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত পয় বাজারে বিক্রয় করা হইরাছে। ইহাতে জদসাধারণের হাত হইতে সরকারী কোবাগারে টাকা চলিয়া আসিরাছে। সুতরাং টাকার পরিমাণ অনেক করিরাছে। ইহা ব্যতীত ব্যাক রেট পতকরা ও হইতে ৩০ তাপে তুলিরা ব্যাক ক্রেডিটের পরিমাণও হ্রাস করা হইরাছে, কলে সমগ্র ভাবে দেশে টাকার লববরাহ কমান সম্ভব হইরাছে।

কুবি উৎপাদন অণেকাকৃত আশাএর হইলেও অদায়ুটির জব্য বাজাতাব রহিরাই সিরাছে। কল্ল, তজরাট, পোরাট, উত্তর এদেশে প্রকৃতি হানে অদায়ুটির জ্ঞত বাজাতাব বটরাছে এবং ইহার জ্ঞত বহু বাধ্য আমদানী করিতে হইবে বলিরা অর্জনতিব বক্তৃতায় বলিরাছেন। এখানে একটি প্রেরের উপাপন

করা প্রয়োজন। কংগ্রেস রাষ্ট্র-পরিচালনতার প্রহণ করার পর হইতেই কেবল অমবা, অভিজুটি, অদায়ুটি ইত্যাদি কথা শুনা বাইতেছে, প্রকৃতি কি কেবল হ্র্যোগী ভারতের সঙ্গেই বক্তবর করিতেছে, না পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একাবিকবার হানা দিরাছে? প্রাকৃতিক হ্র্যোগ কি ভারতে বা পৃথিবীতে নুতন?

বহির্জাগিজে আমাদের চলতি বৎসরে বিত্তর লোকসান হইরাছে। সার চিত্তাভন দেশস্থ স্বীকার করিরাছেন বে, ডিত্যাসুয়েতন দারা আমরা রণানি বাতাইতে আশাহ্রপ পারি নাই এবং ঘেটুই কল পাওয়ার আশা ছিল তাহাও প্রচুর খাত ও কাঁচা মাল আমদানী করিতে কতক নিঃশেষ হইরা সিরাছে।

ভারতের কলকারখানার অবস্থা এখনও এমন নয় বে, বিশেষে রণানি উত্তরোত্তর বাতাইতে পারে। কারখানার প্রকৃত জব্যের মধ্যে প্রধান রণানি জব্য চট ও বলিরা। কিন্তু পাটের জ্ঞত চটকলকে কিছু অংশে পাকিস্থানের শুভবৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। কারণ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পর্কটা প্রায়ই অনিশ্চিত। পাকিস্থান ডিত্যাসুয়েতন না করার কাঁচা পাটের দাম মিটাইতেই বাততি দুলা ব্যবদ লাভের কিছু অংশ ব্যয় হইরা সিরাছে।

টালিং ব্যালাল সম্পর্কে গ্রীষ্মক দেশস্থ বলেন, ১৯৫১ সালের ডিলেবর মাসে ব্রিটেনের নিকট আমাদের ৭৮১ কোটি টাকার টালিং পাওনা ছিল। দেশস্থ হয় বৎসরের জব্য উহার একাংশ বার্ষিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকার ডিভিতে তুলিবার ব্যবস্থা করিরা দিরাছেন। গ্রীষ্মক দেশস্থ কয়েক সপ্তাহ আগে লভনে কমনওয়েলথ অর্জনতিবের গোপন সম্মেলনে বোগদান করেন। সেখানে তিনি ভারতের প্রতিিনি রপে স্বীকার করিরা আসিরাছেন বে, ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত টালিং রক সমগ্রভাবে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সহিত, অর্থাৎ টালিং রকের বহির্ভূত অকলের সহিত মেমাপাওনা দিয় করিবে। অর্থাৎ ব্রিটেনের বাটতি মিটানোর দারিহ একা-ব্রিটেন না লইরা সমগ্র টালিং রকের বাত তাহা চাপান হইল। ভারতবর্ষের বাততি হইলে ব্রিটেন তাহা প্রহণ করিরা নিজেই বাটতিব একটা অংশ টালিং রকের দেশ হিসাবে ভারতের বাত চাপাইব, বিতে পারিবে।

ডলারের ব্যবস্থা কিছু হ্র্যোগী। আমাদের ৩৫ কোটি টাকার ডলার ব্রিটেনে জব্য আছে। বলা হইরাছে বে, ১৯৫১ সালে “নেট” ৭ কোটি টাকা দুলায় ডলার আমাদের লইতে হইতে পারে। অতদিকে একথাও বলা হইতেছে, ঐ হিলাব হাতাও বিব ব্যাক হইতে দেশের কুবি, রেল এবং বিদ্যুৎ পরিকরনার জ্ঞত ৩১ কোটি টাকা বণ লইতে হইরাছে। এই ডলারের চাপ আমাদের বাতিতেছে না কনিতেছে তাহা দুলা বার না।

রাজস্ব ব্যাপারে চলতি বৎসরের বাজেটে (১৯৫১-৫২) ২৬ কোটি টাকা বাড়তি হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবিক হইয়াছে প্রায় ৯০ কোটি টাকা। ভৎসন্যেও আগামী বৎসরের বাস্তবিক বরা হইয়াছে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের হিসাবে আগামী বৎসরের আর অনুমান করিলে ইহা আরও অধিক হইত। বেশদূর বলিতেছেন—বাস্তবিক illusory অর্থাৎ ভুলো। বর্তমান এই illusory বা ভুলো আরের উপর নির্ভর করিয়া ট্যাক্স কমানো বার না। কারণ আমদানী শুক ৫১ কোটি টাকা এবং রপ্তানী শুক ২৬ কোটি টাকা যে বেশী আদার হইয়াছে তাহাদের উপর নির্ভর করা বার না। ১৯৫০-৫১ সালে আমদানী শুক আদার হইয়াছে ১০৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। তাহা ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে আমদানী শুক কমানিয়া ৯০ কোটি বরা হইল। ইহার কোন সুজিসদত কারণ সুজিয়া পাওয়া বার না। দেশে বহু জব্যের চাহিদা রহিয়াছে, আমদানী লাইসেন্স না কমানিলে মাল আসিবে এবং শুক সমান থাকিবে। আমদানী শুক বেশী আদার হইয়াছে পেট্রল, স্ক্রিকেকটীং তেল, ময়, মোটর গাড়ী, রং, বস্ত্র-পাতি, লোহা, কাগজ, কৃত্রিম রেশম, সুপারি প্রভৃতির উপর। ইহাদের কোম্পানী আমদানী হঠাৎ কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা অর্থনৈতিক জ্ঞান নাই। রপ্তানী শুক আদার বেশী হইয়াছে চট, তুলা, কাপড়, ব্যাকানিক এবং তৈলবীজ হইতে। তুলার অভাবে আমাদের কাপড় হয় না, কিন্তু তুলা রপ্তানীর শুকই আদার হইয়াছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে রপ্তানী শুকের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। কাপড় রপ্তানীতে ১৯৫০-৫১ সালে শুক আসিয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা, এ বৎসরে (১৯৫১-৫২) বেশদূর মহাশয় আদার করিয়াছেন ৩ কোটি ২৫ লক্ষ, এবং আগামী বৎসরের ভূত হিসাব বরিয়াছেন আড়াই কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত কাপড়ের উপর এক্সাইজ ট্যাক্স চাপাইয়াছেন ১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশে কাপড়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও বিদেশে কাপড় রপ্তানী করিয়া মাত্র তিন কোটি টাকা আদার করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বেশবানীর নিকট হইতে লইয়াছেন ১৭ কোটি টাকা, আগামী বৎসরেও ইহাই বরা হইয়াছে। তাহা ১৭ কোটি হিসাবটা illusory হইল কেন ?

দেশের পরীষ ও মধ্যবিভ শ্রেণী হইতে সরকার প্রত্যক তাহা এক্সাইজ ট্যাক্স আদার করেন নিম্নলিখিত পরিমাণ—

বেশলাই	৮ কোটি	৫০ লক্ষ	টাকা
ভাষাক	৩৫	"	"
কাপড়	১৭	"	"

মূল্যহ্রাস

বিব্যাপী মূল্যহ্রাসের বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা

চলিতেছে। পণ্যমূল্য কত দূর পর্যন্ত কমিবে অথবা কোথায় থাকা হইবে তাহা নষ্টক অনুমান করিবার সময় এখনও আসে নাই সত্য, তবে মূল্যহ্রাসের কারণ এখন অনেকটা বুঝা যাইতেছে। চার্লিস-ট্রান আলোচনা হইতে ইহার বহুপাত। ধীরে ধীরে বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, চার্লিস ট্রানকে করেকটি পাঠ কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, সোভিয়েটের পশ্চিমদ্বীপ অভিযান বন্ধ করিতে হইলে তাহাকে মধ্য-ইউরোপেই বাধা দিতে হইবে, সোভিয়েট রাশিয়া বাহ্যে আটলান্টিকের তীরে পৌঁছিতে না পারে তাহা করিতে হইবে। ইহার জন্য বিশেষভাবে ব্রিটেনকে ও ফ্রান্সকে শক্তিশালী করা সরকার। ব্রিটেন ৪৭০ কোটি পাউণ্ডের যে সশস্ত্রীকরণ প্রোগ্রাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা কার্যে পরিণত করিবার সাধ্য বর্তমান অবস্থার তাহার নাই। আমেরিকা Stock Pile আরম্ভ করার কালে বিশ্বের বাজারে সুচোপকরণ এবং রপ্তানী জব্যাবির কাঁচা মালের দাম এত চড়িয়া গিয়াছে যে, ব্রিটেনের পক্ষে এ দামে কিনিবপত্র করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাহার পক্ষে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া নিজের সাধ্যমত বর্তমান অবস্থার খেটুই অগ্র-সজ্জা সম্ভব তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার উপায় থাকিতেছে না। উপরন্তু তাহার কলকারখানার কাঁচা মাল পাইতেছে না। ট্রান এই অবস্থার শুক্ল এবং ব্রিটিশ সুজির সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং Stock Pile বন্ধ করিয়া মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে সম্মত হন বাহ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জব্য-মূল্য হ্রাস হইলে কাঁচা মাল কিনিয়া নিজের অর্থনৈতিক দাম রক্ষা করিয়া সুসজ্জা করিতে সক্ষম হয়।

চার্লিস দেশে করিবার পর ঠালিংকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাক রেট বাড়াইয়া দেন এবং ব্যাক অক ইংলও গণদান কমানিয়াছেন। ইহার কালে ব্রিটেনের টাকার বাজারে গণ-প্রাপ্তি কঠিন হয় এবং কালে বন্ধ বন্ধ ব্যবসায়ীদের পক্ষে আসল বরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। তদিকে আমেরিকা মাল কেনা কমানিয়া দেয়। এই দুই কারণের জন্য জব্যমূল্য কমিতে আরম্ভ হয় এবং সুচোপকরণ ও কাঁচা মালের বাজারে, অর্থাৎ চট, লোহা, টিন, তৈলবীজ প্রভৃতির বাজারে মন্দা দেখা দেয়। আমেরিকা মাল কিনিতেছে না এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনপত্রের বিজ্ঞতা ও উৎসাহকরের মধ্যে প্রতিবোধিতা দেখা দেয় এবং কালে মূল্য আরও কমিতে থাকে। বধা, মারিকেল-তেল Stock Pile এর একটা উল্লেখযোগ্য বন্ধ ছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেন শুকনা মারিকেল ক্রয় কমানিয়া মাত্র সিংহলের মারিকেলের দর পড়িয়া যায়, তখন কোচিন তার সঙ্গে প্রতিবোধিতা আরম্ভ করে। এই ভাবে বাজার নানাইয়া ব্রিটেন তার বিশ্বের প্রয়োজনীয় সুচোপকরণ কিনিবার ব্যয়সাধ্য হইয়াছিল।

এমিকে ভারতের ব্যাংক রেট বাড়িল ও ব্যাংকগুলিকে এ-বাস লক্ষ্যে করার ইঙ্গিত দেওয়া হইল। ইহার কলে বড় বড় একচেট্টা ব্যবসাদারের টাকা হারান পড়িল।

চট্ট, তুলা ও তৈলবীজ ভারতের প্রধান বাণিজ্যবোয় অত্যন্ত এবং ভিন্নভেদেই অসন্তব রকমে কাটকা চলিতে থাকে। পাট ও চট বিঘরে ভারতবর্ষের যে একচেট্টা সুবিধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারত-বিভাগের কলে কাঁচা পাট পাকিস্থানে বেশী গিয়াছে। ভারতে পাট উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু ভাল পাট এখনও অল্পই পাকিস্থানে। চটকল এক ভারত ও ভাতি ভিন্ন আর কোথাও বেশী ছিল না। ভারতেই ছিল বেশী। এখন ক্রাণ ও বেলজিয়ামের চটকল কাজ বাড়াইতেছে। কিন্তু ইউরোপের ভাঙে উৎকৃষ্ট চট ভিন্ন বোটা চট ও বলিচা তৈরি হয় না। ভারতবর্ষের চটকল এই গুলি তৈরি করে। পাকিস্থানের উৎকৃষ্ট পাটই ইউরোপে চালান যায়, কিন্তু বোটা পাট ভারতে ভিন্ন বিক্রয় হইবার উপায় নাই। এই ভাবে পাটের ব্যবসা ভারতবর্ষ, পাকিস্থান ও ইউরোপ এই ভিন্ন স্থানে ভাগ হইয়া যাওয়ার পাট-ব্যবসার ঐকলতা দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানের পাটের বৃহত্তম ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। ইউরোপের চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। ইহাতেই পাকিস্থান জীবন অসুবিধার পড়িয়াছে। পাকিস্থানী টাকার নয় এক পড়িয়া যাওয়ার ইহাই কারণ।

তুলার কল এবার পৃথিবীর সব দেশে ভাল হইয়াছে। কলে কাম কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাজারে তুলার অত্যন্ত ক্ষেত্র। বোম্বাইয়ের তুলার বাজারের কাটকাবাজার বিখ্যাত। এবার সেখানেও দার পড়িয়া যাওয়ার কাটকা-বাজারে এবং বোলাবাজারে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। তুলার মূল্য হ্রাসেও পাকিস্থান খুব আঘাত পাইয়াছে। পাকিস্থানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ মাত্র ভিন্নট—পাট, তুলা ও চামড়া। চামড়ার বাজার এখনও টিকিয়া আছে, পাট ও তুলার বিপর্যয় বটয়া গিয়াছে। তুলা-ব্যবসারীদের বাঁচাইবার জন্য পাকিস্থান ভাণ্ডারাল ব্যাংক চেষ্টা করিতেছে।

পাট, চট, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির দাম পড়িয়া যাওয়ার বাহারা মাল মজুত করিয়াছিল তাহার বিঘন বিপদে পড়িয়াছে। ব্যাঙ্কের ও বাজারের দেনার চাপে তাহার পড়তি দামেই মাল বেচিয়া দিয়া দেনা মিটাইতে বাধ্য হইতেছে। তাহাতে না কুলাইলে সোনা বাহির করিতেছে। ইনফান ট্যাক্সের তরে ইহার ব্যাংক নিজের টাকা রাখে না, মোটের বাড়িল রাখিতেও ভয় পায়, সুতরাং ইহার এক দিন সঞ্চিত অর্থ সোনার ও কাঁচারামে রাখিয়াছে। এবার সেই সোনাই বাহির হইতেছে। একবারে বাজারে বহু সোনা আসিয়া পড়ার সোনার বাজারও হু হু করিয়া নামিতেছে।

পড়তির বুঝে বাজার বন্ধ করিয়া দিয়া সামলাইবার চেষ্টা

করা হইতেছে, কিন্তু এই চেষ্টা স্বাভাবিক হইতে পারে না। বাজার গুলিতেই আবার পড়তি আরও হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে একটা কথা, এই মূল্যহ্রাসে বিশেষ ভাবে মজুতকার ও চোরাকারবাহারাই আঘাত পাইতেছে বেশী। সাধারণ ক্ষেত্র-বের এখনও ভয়ের কারণ বটে নাই। কৃষিকাজ পণ্যের দর উৎপাদনের ব্যয়ের নীচে মাষিবার সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না, তবে এই ভাবে চলিতে থাকিলে তাহা বটা আশঙ্ক্য নয়। সে বিষয়ে এখন হইতেই গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ভারত সরকারের কর্তব্যাক্রমের মধ্যে হরেকত্ব মহাত্মন এবাং মুখ গুলিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ব্রিটেনের ব্যাংক রেট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমদানের ম্যাক রেটও বাড়ান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে কতটা ভাল হইয়াছে তাহা বুঝা যায় নাই। ব্রিটেনে আবার ব্যাংক রেট বাড়িয়াছে। আমদানের রিকার্ড ব্যাংক এখনও উহার অনুসরণ করিতে ভরসা পায় নাই। ভারতে মূল্যহ্রাসের প্রতিক্রিয়া কোথায় গিয়া আবার ঠাঁটাইবে, রিকার্ড ব্যাংক এবং ভারতীয় কিনাল বিভাগকে কোথায় গিয়া বাধা দিও। মোক বুঝাইতে হইবে তাহা সমস্ত বাজারের বাতাবিক কাজকর্ম আরও হওয়ার আগে সঠিক করা যাইবে না। তবে একথা এখন স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, মূল্য-হ্রাসের কর্তব্য ভারত সরকার নছেন, সুতরাং তাহা রোধ করাও তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভারতের মধ্যে নাই। দেশের বাণিজ্য সেখানে বিদেশের মুদ্রাপ্রেক্ষী সেখানে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা-মত মূল্যের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। মূল্যবৃদ্ধির বেলায় ভারত সরকার বেরপ অসহায় ছিলেন, মূল্যহ্রাসেও তাই। কাজেই প্রামাণ্য পতনের জন্য তাহার যে আত্মপ্রসাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভ্রম।

তবে বাজারে এখন জালের অবস্থা চলিয়াছে। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে—বধা সরিষার তেলে—কাঁচা মাল অপেক্ষা তৈয়ারী মালের দর অনেক নামিয়াছে। এইরূপ জাল ধোরে ভারত সরকার অনেক কিছু করিতে পারেন। তাহাতে বাজারের উঠা-নামা কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

কোম্পানী আইন কমিটি

ভারতীয় কোম্পানী আইন কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটির রিপোর্টে ব্যাংকিং একেলি বিষয়ে যে স্পষ্ট প্রতিপাদন আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে ম্যানেজিং একেলি এক অসুতপূর্ণ বস্তু। পৃথিবীর কোন দেশেই এই কিসি নাই। ম্যানেজিং একেলির মধ্যে কোম্পানী পরিচালনের দীর্ঘবাহী হুক্তি, লগত হিলাপণ ক্রিমেবের হুক্তি-রাখার লক্ষ্য এবং

বিভিন্ন কোম্পানীতে একই ব্যক্তির ডিরেক্টর থাক। (Interlocking directorship) এই করণী সর্বপ্রধান দোষ। Interlocking Directorship-এর অপরিহার্য অর্থ Inter-investment of funds। কোম্পানী আইনের ১৯০৬ সালের সংশোধনে এই দোষ দূর করিবার জন্ত কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ নিজেদের গ্রুপ ব্যাক গঠন করিয়া আইনের এই ধারা এড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। তার-তীর শির ও ব্যবসাকেত্রেয় স্বাভাবিক অবস্থা কিরাইরা আশিতে হইলে ম্যানেজিং এক্সেলিউটিভরা দেওয়া দরকার। কংগ্রেস কমতা দখলের পরে এ আই সি-শির অবিশেষণ এই প্রস্তাব পাশও করিয়াছিল, কিন্তু পরে বীরে বীরে কংগ্রেস সর্বশেষে ম্যানেজিং এক্সেলি বীকার করিয়াই লইয়াছেন। কোম্পানী আইন কমিটিও ম্যানেজিং এক্সেলি টুলিয়া দেওয়ার সুপারিশ করিতে ভরসা পান নাই।

কাঁচামাল জর ও শিরহাত পণ্য বিক্রয়ের জন্ত কয়েকটি বাণে নিজেদের কোম্পানীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ম্যানেজিং এক্সেলিউটিভ অনেক টাকা করে। যেমন কোন কংলা কোম্পানীর করলা সেই কোম্পানী নিজে বিক্রয় করিতে পারে না, তার ম্যানেজিং এক্সেলিট বিক্রয় করে। কোম্পানীর ম্যানেজিং এক্সেলিট ১৮ টাকার নিম্নের অধীনই কোম্পানীর দিকট। হইতে সমস্ত করলা কিনিয়া লইয়া বাজারে উঠা ২০ টাকার বিক্রয় করিলে কোম্পানীর অংশীদারদের তাহাতে বাণ দেওয়ার কোন উপায় নাই। কোম্পানী যে করলা বাজারে নিজে ২০ টাকার বিক্রয় করিতে পারে, ম্যানেজিং এক্সেলিটের জন্ত তাহা ১৮ টাকার বেশী দর করিবার কোন উপায় নাই।

ইহা তো আইনসম্মত আদার, যে-আইনি আদারই বেশী চলে। মাল জর প্রথম বাণে বাজার হইতে ১৮ টাকার ম্যানেজিং এক্সেলিটের এক দখর কোম্পানী করে, দ্বিতীয় বাণে কোম্পানী হইতে ২২ কোম্পানী ২০ টাকার মাল কেনে, তৃতীয় বাণে মূল কোম্পানী ২২ কোম্পানী হইতে ২২ টাকার মাল জর করে। ইহাতে কোম্পানীর জর বাজার দর হইতে অনর্থক ৪ টাকা বেশী দর হয়। ১২৫ র. ২২ কোম্পানীর মালিক বা অংশীদারেরা ম্যানেজিং এক্সেলিটের বেদামদার, ইহাদের দারকত বাড়তি টাকাটা উহাদের পকেটে আনে। কেনোরাম কটন মিলে এই ব্যাপারই সেলট্যাঞ্জের এলিট্ট কনিদার নির্মল দার ধরিয়াছিলেন। সজ্জিত ম্যাকলিরড কোম্পানীতেও ইহাই বরা পড়িয়াছে। এ কোম্পানীর হই জন শক্তিশালী ডিরেক্টরকে এইরূপ কার্যকলাপের জন্ত মোব বেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের কমতায়াব করা হইতেছে নোনা বাত।

Interlocking Directorship-এর ক্ষেত্রে বড়টা কত-

কতি করা উচিত ছিল কোম্পানী আইন কমিটি তাহাও করিতে ভরসা পান নাই।

ম্যানেজিং এক্সেলিউটিভ এতদিন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিচালিত হইত। ইহাতে এদের বড়টা দারিত ছিল, স্বাধীনতার পরে ম্যানেজিং এক্সেলিউটিভকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিয়া তাহাও একাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে ম্যানেজিং এক্সেলিউটিভ কমতা বোল আনা বকার রহিয়াছে, কিন্তু দারিত অনেক হাল্কা হইয়া গিয়াছে। কতিগ্রহ হইতেছে ইহাদের উপর মালের ক্ষেতা এবং ইহাদের অধীনই কোম্পানীর অংশীদার।

পূর্ব পাকিস্থানে বাংলাভাষা আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্থানের ভাষা-আন্দোলন অতি তীব্র এবং ব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই আন্দোলনে তাহারা লড়িতেছে, এবং তাহারা প্রচার করিতেছে তাহারা প্রার সকলেই মুসলমান। আন্দোলনের মেত্ব সম্পূর্ণরূপে পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ত মুসলমান সজ্জারের হাতে এবং বর্তমানের তীব্র রূপ ধারণের পূর্বে বহু দিন ধাবৎ ধবরের কানজে ও সভা-সমিতিতে মাতৃভাষার বিমানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জমািয়া আসিতেছে পূর্ব পাকিস্থানের বাংলাভাষা শিক্ত মুসলমান।

পূর্ব পাকিস্থান সরকার বোম হর তাবেন নাই যে, এই আন্দোলন এত ব্যাপক ও প্রচণ্ড রূপ গ্রহণ করিবে, অথবা হরত করাচীর কর্তৃপক্ষ মনে করেন নাই যে, পূর্ব পাকিস্থানের শিক্ত মুসলমান সজ্জার তাহাদের মনের কতি সম্ভব তাবে এরূপ তেজের সহিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। সেই-জন্ত প্রথমে এই সকল প্রতিবাদ তাঙ্গিলের সহিত অবহেলি করার এই আন্দোলন উত্তরোত্তর প্রবল হইয়াছে ও জ্বলি-বাতিয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। পূর্ববঙ্গের শিক্ত-অশিক্ত সকল শ্রেণীর মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা এবং তাহাদের মাতৃভাষার অপমান ধারের অপমানেরই মত। এই অপমানের কলেই শিক্ত মুসলমান করিয়া উঠিয়া সক্রিয় তাবে তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। কলে পাকিস্থান সরকার প্রমাণ গণিতেছেন।

ব্যাপার এই অবস্থার গড়াইয়া আনিবার পর তাহাকে সারলাইবার জন্ত যে অপচেষ্টা চলিতেছে তাহার রূপও কৌশল হই-ই বাতালী হিন্দু কাছে সুপরিচিত। সেই চেষ্টা লব্ধে কলিকাতার “হুদাতর” নিরূপণ মতব্য করিয়াছেন :

“পূর্ববঙ্গ আন্দোলনবাহিনীর প্রধান পরিচালক মিঃ এইচ. এর. কোহা মরমসিনিংহ এক আন্দোলন সমাবেশে বলেন যে, ১৯৫০ সালের পূর্বে যে লড়ন হিন্দু পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া

বর্তমানে পাকিস্তানে বাতারাও করে, তাহারাই পাকিস্তানের পরম শত্রু। শত্রুদের হুঁজিরা বাহির করিবার জন্য আন্দোলনের লক্ষ্য থাকিতে বলিরা মিঃ বোহা আদাম বে, তাহা আন্দোলন ভারতীয় একেটেরের স্রষ্টা, তিনজন হইতে পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই তাহারের উদ্দেশ্য। তিনি আন্দোলনের উত্তর দিকে বাতারাওকারী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করিরা সন্দেহভাজন মনে হইলে পুলিশের হাতে অর্পণ করিতে বলেন।

মিঃ বোহা আরও বলেন যে, পাকিস্তানে হারী তাবে বসবাসকারী অল্পসংখ্যক হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধান পাক সরকারের ‘পবিত্র দায়িত্ব’। পাক সরকার এই পবিত্র দায়িত্ব কি তাবে পালন করিতেছেন তাহা পূর্ববঙ্গের হারী অধিবাসীদের অজানা নহে। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের হিন্দু মহাসম্মেলন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অসহায় অবস্থা সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহারই উদাহরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পাকিস্তান সংখ্যালঘু সমস্যাগুলির নেতৃত্ব দ্বিতীয় সতীন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ বল্লভ পান্ডা ও মনোহর বরকে নির্দিষ্ট কোন কারণ না দেখাইয়া কিহা আদালতে প্রমাণবোধ্য কোন অভিযোগ না করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু হিন্দু অধ্যাপককে পাক-নিরাপত্তা আইনে—বাহাকে সাধারণ লোক বে-আইনী আইন নামে অভিহিত করিরা থাকে—কারাকন্ড রাখা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের তাহা আন্দোলন তাহারের নিজস্ব আন্দোলন। এই আন্দোলন উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান নির্কিংশেবে তাঁহারা বে-পরোয়াভাবে যে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ব্যাপারটাকে বাহিরের ব্যক্তিদের কাছ বলিরা বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা চালানো হইতেছে ও এই সুযোগে হিন্দু নেতা, অধ্যাপক প্রভৃতিক প্রেরণ করিরা সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্কের স্রষ্টা করিয়াছেন। ত্রিত্ব ঐশ্বর্য চট্টোপাধ্যায়ের তার পাক সরকারের বিবর্ত ও অল্পসংখ্যক নেতা ও পূর্ববঙ্গ কর্তৃপক্ষের এই আচরণের প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দানের এই প্রত্যক্ষ অভিযান সত্ত্বেও গর্দভ-চর্চাবৃত নেকড়ে বাঘের তার মিঃ বোহা পাকিস্তানের হারী বাসিন্দা, অল্পসংখ্যক হিন্দুদের নিরাপত্তা-বিধানের পবিত্র দায়িত্বের মূলি আওতাইতেছেন।

পূর্ববঙ্গের আন্দোলন-মারক বোহা সাহেব তাঁহার বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম হইতে যে কোন পূর্ববঙ্গে পরমকারীকে ধানান্তরান করিতে ও জিজ্ঞাসাবাদ করিরা পুলিশের হাতে দিতে বলিয়াছেন। গরিব আদিত্তে বলিলে বাহারা বীথিতা আনে, তাহারের প্রতি এই নির্দেশ কিতাবে কার্যকরী হইতে পারে, তাহা কাহারও অজানা নহে। ইহা যে তাহা-আন্দোলন চাপা দিবার হীন কৌশলমাত্র তাহাও সুবিধে কাহারও বিলম্ব হইবার কথা নহে। কিন্তু অত বিধে ইহার গুরুত্ব

সুহৃৎপ্রার্থী বলিরাই আমরা ইহার আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমতঃ মিঃ বোহার উক্তি যদি সরকারী উক্তি হয়, তাহা হইলে উহা বেহু-নিরাকরণ হুঁজি-বিবোধী। আমাদের আরও সরকার এই ব্যাপারে কি পদা অবলম্বন করিবেন, আমরা এখানে তাহা জানিতে চাই।”

হাবড়া উদ্বাস্ত-কলোনী

ঐশ্বর্য বোম্ব বদীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তিনি একবারি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। তাহার নাম “কমসেবক”। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার পত্রিকার যে সব মতব্য ও পত্রাবলী প্রকাশিত হয়, তাঃ বিধানচক্র দ্বারা ও তাঁহার পরামর্শবাহিতা একেবারে তাহাকে ভাঙিয়া করিতে পারিবেন না, এবং প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে ভগ্নস্বর্থে তাঁহার দায়িত্বও আছে।

এই সব কথা বলিবার পত ১৬ই কানুন পত্রিকার প্রকাশিত হাবড়া কলোনীর অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের বিবরণ পাঠ করিরা। ঐবীরেজকিশোর দ্বারা লিখিতেছেন :

“সরকারী প্রচেষ্টার হাবড়ার বাত্যাগীদের মধ্যে যে জন-পদ পড়ে উঠেছে, সেটা দেখবার সৌভাগ্য হ’ল সেদিন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ নিয়ে গুরু করতে পারেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এতে সম্পূর্ণ সাক্ষালাত নির্ভর করছে জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সরকারী আর্থিক কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর।

আমরা লক্ষ্য করলাম, কতকগুলি বাড়ী দখল দেবার পর কিছু সংখ্যক লোক দরকার ভালা লাগিয়ে চলে গিয়েছে। এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে হারীর লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, সাধারণতঃ পানীর জলের এর এবং হারীর জীবিকা-নির্ভরতার সমস্যা হানত্যাগ করার কারণ।

হারীর লোকদের জীবিকার এরটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণ বেকার হুকুরা অসংখ্যদের অত কোন উপায় না পেয়ে কেউ কেউ হুরি-ভাকাতির দিকে হুঁকে পড়েছে। তাই না ক’জনে পারে ?

যত দিন না কোন অর্থকরী প্রতিষ্ঠান পড়ে উঠে, তত দিন অতঃ কলকাতা দরদর ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবহার উন্নতি ক’রে এ বিষয়ের আংশিক সমাধান করা দরকার।

কলোনী থেকে দিকটবর্তী রেল ষ্টেশন হই নাইল থেকে তিন মাইল। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা লাইকেন-রিজা ঐ পথের মধ্যে ১০ থেকে ৫০ আনা মের। সাধারণ লোকের পক্ষে তা বেওয়া সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে সরকারী বাস অর্থিক /১০ ভাড়ার চালু করা দরকার হাবড়া ষ্টেশন পর্যন্ত।

ভদ্রলাল, কলোনী থেকে কিছু দূরের মধ্যেই একটা বাস বাবে ভালহৌলী পর্যন্ত। কিন্তু বা’ ভাড়া ঠিক হবে, তা বোঝ

হর-লাবারণের সাপোর্সের বাইরেই রাখে। এ সমস্ত হরবারী পথের চাকরীকীর্ষিৎক বার্ষিক রেলের সমান আকারে বাহুলী টিকিটের বন্দোবস্ত করলে যৌব হর কিছুটা সুবিধা হবে। ট্রেন স্ট্যান্ডেরও কিছু সুবিধা হওয়া দরকার। ১০টার বাধের অফিস, তারিখ মাত্র একটি ৮টার ট্রেনের সুবিধা পেতে পারেন, যেটা শিরালদাতে ৯-২৫-এ পৌঁছায়। আরও হুট ট্রেন বেওয়া উচিত, যা সাধারণভাবে ৯-৩০ থেকে ৯-৪৫-এর মধ্যে শিরালদা-বহে যাবে। এই হুট ট্রেন এতোক টেনে না ধেবে হাওড়া-ডাবা-বারান্দা-নবাবগাঁও-নম্বর অংশের মধ্যে শিরালদা-হে পৌঁছলে সময় অনেক কমে যাবে।

শিকারীতার উপর থেকে জনতার চাপ কমাতে হলে এ সমস্ত কলোনীগুলোকে প্রাণবান করে তোলার প্রয়োজন বীকার না ক'রে উপার নাই। হাওয়া কলোনী নির্মাণ পদ্ধতি-বদ সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা বলে তার সাকল্যের উপর প্রাণ-বদীর কথামত ৬৪টি জনগণ পড়ে তোলার সাকল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।"

মুন্সিফার শিকার সংগঠন

পত আধিন কালের "শিকারী" পত্রিকার প্রিন্সিপালম্যান ওর এই বিষয়ের অন্তর ও বহিরক ভাব ও প্রণালী সবচেয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অল্পরূপ প্রবন্ধ হইতে অনেক সময় আমরা "প্রবাসী" পত্রিকার উদ্ধৃত করিয়া থাকি ও মন্তব্যও করি। সাধারণতঃ শিকার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃক আমরা পছন্দ করি না। রাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধান করিয়া অথবা বাসিক বা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য করিয়া ব্যক্তিকে বা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে তৈরিয়া শিবিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, তাহা বহু মহৎই হউক বা তাহাদের কর্তৃক বহু লংই হউন না, ব্যক্তির স্বাধীনতা লঙ্ঘিত করিয়া কেলে। তার কল সমাজের পক্ষে অমিষ্টকর।

অবশ্য, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি লোকের এক হুঁসার আকর্ষণ আছে, বহু লোকের পারের হুলা লইবার ভর বা তাহাদের কর্মকানি করিবার ভর কিবা তাহাদের দেবতার পথে উন্নীত করিবার ভর সর্বকালে ও সর্ববিশেষে বেশণ তৈলাটেলি পড়িয়া বার, তাহা দেখিয়া মানব-প্রকৃতি সবচেয়ে প্রকা রকা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

মুন্সিফার শিকার প্রবর্তককে আমরা কুলের মালার চাকরি কেলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রতিক্রিয়াপে তাহার জীবন অর্ধিত করিয়াছি, অবশেষে তাহাকে হত্যা করিয়াছি। মুন্সিফার শিকার এই মনোভাব হর করিতে পারিলে জনতার সর্বোপেক্ষ উপকার করিবে। এই অন্তর্য ভাবের নিয়ন্ত্রণ লবধে সর্বদা জাগ্রত থাকা উচিত।

বহিরকের কৌশল লবধে অমিলবাসু কাহা বলিয়াছেন তাহার শিকারের মুন্সিফার শিকার :

"(ক) প্রথমতঃ, আমাদের উপাধানে আদর্শ মুন্সিফার করতে হবে। মুন্সিফারী বিভাগের মুন্সিফারের বেলায় এ কথাটা আমরা প্রাণই মনে রাখি না। মুন্সিফারী শিকার মারকতে আমাদের সামনে যে আদর্শ রাখতে হবে তা এমন হওয়া চাই যা আমাদের বীনতম ব্যক্তিও গ্রহণ করতে পারে। গাভীকীর চিত্তাচার্য যে সমাজ-বিপ্লবের পরিকল্পনা পাই এটি তার একটি মূল কথা। আমাদের সামনে আমাদের লোকের পক্ষে সহজসাধ্য কোন আদর্শ দেওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে বুঝতে হবে আমাদের দেবার মত এমিষয়ে মুন্সিফারী শিকার কিছুই নেই। ইট, সিনেট ইত্যাদি ছাড়া যদি আদর্শ মুন্সিফার সম্ভব না হয় তবে আমাদের আদর্শ মুন্সিফারের শিকার দিতে বাওয়া ব্যর্থ হবে।

আর একটি দিক থেকেও বর্তমান অবস্থার হারী বরবাচী তৈরী করার পক্ষে কোন মুক্তি বুঝে পাই নে। কাঁচা বর-বাচীর পরিবর্তন সামান্য সহজসাধ্য, পাকা বাচীর বেলায় তা নয়। আজ মুন্সিফারী শিকার যে কোঠার আছে তাতে এই প্রেমীর বিভাগের মত কোন প্রেমীর কি পরিমাণের বরবাচী সর্বোপেক্ষ উপযোগী তার কোন হুঁচক পড়িলা হয় নি। সে কেলে বিরাট প্রায়ত্তিক ব্যয়ে পাকা বরবাচী তৈরী করার পক্ষে কোন মুক্তি বুঝে পাই নে। কি বিভাগ, কি শিকারের বাসগৃহ আজ তাই কাঁচা হওয়া বাহুলীর বলেই মনে করি। সম্ভাব্য যদি কোন দিন মনে হয় পাকা বর কাঁচা বরের চাইতে উৎকৃষ্টতর এবং যদি তা দেখের সর্বসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করে তোলা যায় তবে সেদিন হরত মুন্সিফারী বিভাগ ও তার শিকারের জন্য পাকা বাচীর ব্যবস্থা করা চলতে পারে। সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য আদর্শ শিকারক্ষেত্র সমাজের সামনে তুলে বসবে এটাই মুন্সিফারী শিকার একটি মূল কথা। মুন্সিফারী শিকার বেলাতেও আমরা বেশ বিম্বৃত না হই পরিবেশকে মূল্য করে তোলার কথা।

এমন মুক্ত আলো-বাতাস এবং জলের অভাব থাকার কথা নয়। শহরের মত কলের ধোঁয়া, বিরাট প্রাসাদের সর্বোচ্চত হুঁচক বাতাসকে আবিল ও আলোকে ব্যাহত করে না। কিন্তু অভ্যন্তর কলে আমরা আমাদের আবহাওয়াকে বিবাজ করে তুলেছি।

পরিবেশকে এই স্বেচ্ছাকৃত্য থেকে রক্ষা করা হবে শিকার-কর্মীর অধ্যক্ষ প্রাণ কাক। আজ বাহুর বনমূল আমাদের সবচেয়ে বড় অভিযাপ। ধোলা মাঠে আমরা বনমূল জগপ করতে অভ্যস্ত। কলে এর লামাংশই হুঁচকর তাপে মট হয়ে কার আর এর ভেতরকার বীজাংশ লবধেই হতাবার সুযোগ পায়। অতি কম পরচেই পারখানা তৈরী করা চলতে পারে। বীশ ও বেহু বা ভালপাতা বিরে আমলকা বেতা

তৈরী করে পাঠ্যবাহ্যি বেরা চলতে পারে এবং এক জারনার মালা কাটার হান ভর্তি হয়ে গেলে যেখানলি গুলে নিয়ে নূতন পাঠ্যবাহ্যি তৈরী করা যায়। বীণের টাচ কিংবা বীণ নিয়ে যুগেও এ রকম বেরা করা চলতে পারে।”

পত্রিকরনা কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ফেল্লীর শিকা দপ্তর সমগ্র ভারতের সুনিরাহী ও লম্বাক-শিকা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি পাঠ্যবাহ্যি পত্রিকরনা রচনা করিয়াছেন। রাজ্য সরকারসমূহের সভামত আনিবার লক্ষ্য এবং তাহাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে উহা প্রত্যেক রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পত্রিকরনার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি কাজের লক্ষ্য ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত সরকার প্রারম্ভিক এক কোটি টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পত্রিকরনার প্রথম পর্যায়ে ফেল্লীর শিকা দপ্তর প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পূর্ণাঙ্গ সুনিরাহী শিকা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন। সুনিরাহী শিকা কলেজের শিক্ষকবিশেষ শিকাবাহনের জন্য একটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিকা-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হইবে। শিকাবাহনের সুবিধার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সুনিরাহী শিকালয় থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবিশেষ শিকার জন্য একটি সুনিরাহী শিকা-কলেজ এবং সেই সঙ্গে দুইটি মিত্র-বাহনের সুনিরাহী শিকালয় থাকিবে। ইহা ছাড়াও থাকিবে পাঁচটি সুপত্রিকরিত বারোয়ারী কেল, পত্রীমেতাবের শিকা-বাহনের জন্য একটি কলেজ, একটি গ্রন্থাগার এবং নির্মী-চিত্ত অকলের প্রাথমিক ও সুনিরাহী-শিকালয়গুলির উন্নয়নের জন্য অর্বালাহ্যের ব্যবস্থা। এইরূপ এক-একটি অকলে প্রায় এক শতটি গ্রাম থাকিবে। পত্রিকরনার সাধারণ উদ্দেশ্য হইল প্রাথমিক স্তরে হইতে স্নাতকোত্তর বিভাগ পর্যন্ত সুনিরাহী শিকার আদর্শ কার্যকরী করা। ব্যয়ের কত অংশ ফেল্লীর সরকার বহন করিবেন, তাহা রাজ্য সরকারসমূহের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করা হইবে।

পত্রিকরনার দ্বিতীয় দফার নির্মীচিত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে শিকার উন্নয়ন করা হইবে এবং সেখানে উন্নত বয়সের শিকাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। শিকা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণা করিয়া উন্নত শিকাব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা থাকিবে। দরিদ্র ছাত্রসমূহ বাহাতে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করিতে পারে, সেজন্য যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রাথমিক শিকা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং তাহার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিবার জন্য বর্তমান বৎসরে একটি প্রাথমিক শিকা কমিশন গঠনের কথা ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। দ্বিতীয় দফার লক্ষ্য ১৯৫২-৫৩ সালে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যয় করা হইয়াছে।

তৃতীয় দফার জন্য ১৯৫২-৫৩ সালে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা

হইবে। সুনিরাহী ও লম্বাক-শিকা কেন্দ্রে শিশুদের ও প্রাপ্ত-বয়স্কদের উপযোগী পুস্তকাধি রচনা এবং অ-হিন্দীভাষী অকলে হিন্দী ভাষা প্রচারের ব্যবস্থা থাকিবে। চিত্র ও বক্তৃতার সাহায্যে শিকাবাহনের বিষয়েও শিকাবাহনের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিকা ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহের কার্যে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পুস্তকাগার প্রভৃতিকে সাহায্যদান, বারোয়ারী কেল, যুবক-যুবতী কর্তৃক পরিচালিত মনল-কেল প্রভৃতির উন্নয়ন চতুর্থ দফার কর্তব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ইহার জন্য বরাবের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম দফার অপরাধপ্রবণ ভরণের শিকাবাহনের জন্য একটি কেল স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পত্রিকরনা কার্যকরী করিতে গিয়া বহুদূর সতর্ক ব্যয় লক্ষ্যে পরিবার জন্য রাজ্য-সরকারসমূহকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সম্ভব সেখানে পুরাতন গৃহাদি কাজে লাগাইতে হইবে। আগামী ১লা মার্চের মধ্যে রাজ্য-সরকার-সমূহকে সভামত জানাইতে বলা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ও ১৬ই মার্চ তারিখে মরারীয়াতে ফেল্লীর শিকা উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠক বসিতেছে। এই সময়ে ফেল্লীর শিকা-দপ্তর বাহাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন, তদ্ব্যতীত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সভামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

১৯৩৭ সাল হইতে সুনিরাহী শিকার সাহায্য হানে অহানে কীর্জন করা হইয়াছে। সূত্রাং ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্টের পর আশা করা গিয়াছিল যে, নূতন লম্বাক-সংগঠনের উদ্দেশ্য লব্ধে ভারত সরকার ইংরেজ আমলের “লাল কিতাব ও বিশেষজ্ঞ”পণের হাতে নিজেদের সমর্পণ করিবেন না। আশাবাদের হুঁত্যাগমনে সে আশা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও দেখা বাইতেছে না। প্রবাসবিশি পুরাতন কর্তৃপক্ষ-মণ্ডলী সুনিরাহী শিকাকে সার্বভৌম অপণিত বেয়ালের মধ্যে একটি নূতন খেলা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। তার পর এই নূতন শিকার লক্ষ্যে যে বিশ্বাস ও নির্ভর প্ররোজন, তাহাদের তাহা নাই। তাইদীর হাতে সভামত সমর্পণ করিলে শিশুর যে অবস্থা হয়, তাহাই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে পড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা প্রত্যেক অভিজ্ঞতা হইতে অনেক বলিতে পারেন। অত্যন্ত তৎপরতার সহিত প্রাই-মারী ও সুনিরাহী শিকা লব্ধে অহলসান ও আলোচনা করিবার লক্ষ্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইল। সভাপতি ঐনুল্লাহ ওয়াজি।

দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দর একজন বেসরকারী সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেয়াল-প্রায় দ্বারী

প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য করিয়া বর্তমান উন্নতি করিবারে সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা ও সুনিরাহি শিক্ষার জন্য একটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রত্যয় করা হইল। সে প্রত্যয়ে প্রায় সকলেই এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ঢালাইবার জন্য যেমন লোকের প্রয়োজন তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে। হাঙ্গবিহারী বোম, ভারতনাথ পালিত, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ, স্বাধীনতা ঠাকুর, নতীন্দ্রনাথ বসুপাণ্ডা ও আত্মতোষ বসুপাণ্ডার এরূপ প্রশ্ন করিতে মন না।

তার পর প্রায় বার মাস পর রিপোর্টও সম্পূর্ণ হইল। সভাপতি মহাশয় তাহার বলকা করিয়া প্রায় প্রতিটি শব্দ কমিটির সভ্যগণের আলোচনার বিষয় করিলেন। কিন্তু সরকারী দপ্তর তাহাদের মনোমত সংশোধন বা বিস্তৃত করিয়া রিপোর্টটি বন্ধ উপস্থিত করিলেন, তখন সময় নাই বলিয়া তাহা মনোমতঃ করিয়া শেষ করা হইল।

একটি বৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবারে। সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী জেলার জেলার ইন্সপেক্টর, মহকুমা-মহকুমা সার্ব-ইন্সপেক্টর প্রভৃতি সরকারী দপ্তরমত সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অর্থের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। বরাবর ৩ কোটি হইতে ১ কোটি টাকার মানিয়াছে। সরকারের নির্ধারণ পরিচয় পাইলাম।

তবে কি বলিব যে, সুনিরাহি শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে? তাহা হয় নাই। কারণ অত্যন্ত লোক—নর-নারী, নির্ভর নকে নুতন মানব সৃষ্টি করিয়া নুতন সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাধনা করিতেছেন। সরকার তাহাদের আশ্রিত ও সহায়ত্বের দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন না। তাহারা ই সুনিরাহি শিক্ষার ব্যয়, তাহার সেবক।

ভাৰ্গব সৰ্দ্ধার ভূপং

গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সৌরাষ্ট্রের বারওয়ালা-বিবাসী ভূপং দাবীর বহু সর্গার সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত চিল্ল প্রায় হইতে সম্মতি লাগপুর্ন হইয়া আসামে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ পর্যন্ত ভূপং ৩০টি ভাৰ্গব করিয়াছে এবং ৮১ জনকে হত্যা করিয়াছে।

দেখালের বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে. আই. সিংহের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে সে আসাম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তিব্বত বাওরার তেঁতার আছে। বিশেষ আশঙ্কায়ই নাকি ভূপং তিব্বত অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, লাগপুর্নের কতিপয় মায়েদারী ভক্ত-লোকের অহুসানে কিছুদিন আগে দ্ব্যপ্রদেশের পুলিশ এই

ভাৰ্গব সর্গারের লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, ভূপং বিপদের ঝাঁচ পাইয়া পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

ইতিপূর্বে ভারত সরকার তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাহার বহুসংখ্যক প্রকাশিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ ইহা অবীকার করে।

ভূপং এবং তাহার সঙ্গীদের আসল উদ্দেশ্য স্বাক্ষরিত। তাহার দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মহিয়ারে—কটি মারোকা বালিকা এবং আহের দেবারেও ঘেঁঠা। এক সংঘর্ষে আহের দেবারেও ঘেঁঠার মৃত্যু হয়। সৌরাষ্ট্রের কারাবাসীরা ও প্রাক্তন রাজা-মহারাজারা নিজ নিজ স্বাক্ষরিত উদ্দেশ্য লাবনের জন্য ভূপংকে স্বতন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। পঞ্জাব সরকার ভূপং এবং তাহার চার-পাঁচ জন সঙ্গীকে প্রেতার করার কাজে সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারী অধিনীত্বারকে সৌরাষ্ট্রে পাঠান। এ সম্পর্কে ভবনগরের মহারাজার তাই কুমার নির্মলকুমারের এবং ঢোলের ঠাকুরের পেশার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ব্যক্তিদের প্রেতারের পরসুহৃৎে পালিরাটানার মহা-রাজার স্বাক্ষরিত লকরের উপর বিলম্ব ও ভয় আরোপ করা হইতেছে।

দ্ব্যপ্রদেশে ভূপংয়ের অহুতের সংখ্যা কমপক্ষে আট শত। ইহাদের অর্ধেকেরও বেশী কুমুনিষ্ট। তাহার দিকট হইতে নির্দেশ পাওয়া যায় সর্বত্র হালা ও অস্বাভাবিক হস্তির জন্য পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

পাণ্ডার বর্তমান পীর ভূপংয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকৃত প্রত্যয়ে পাণ্ডার পীরের উদ্দেশ্য হইতেছে দ্ব্যপ্রদেশকে “কাসিম রেজভী”র দ্বিতীয় হারবারাবাদে পরিণত করা।

ভূপংয়ের বরস ৩৫ বৎসর বয়স। তাহার সুবের উপরের পংক্তির একটি দাঁত ভাঙা। সর্গার সে সমস্ত থাকে। অনেকেরই বলিয়া থাকেন যে, ভূপং অত্যন্ত দ্বন্দ্বহীন। নিজে বর্ণিত বটনা কিন্তু অন্য লোকের বের :

একদিন সৌরাষ্ট্রের কোন এক গ্রামে বিলাহরার দাবীর তাহার এক শত্রুর গৃহে তাহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঢালা বের। এমন সময় সাহরারের পত্নী দরকার আসিয়া ভূপংয়ের পতিপথে বাধা দেয় এবং বলে যে, তাহাকে (সাহরারের পত্নীকে) হত্যা না করিয়া ভূপং (সাহরারের) ঘরে ঢুকিতে পারিবে না। ভূপংয়ের চিত্ত বিভলিত হয়। সে লক্ষ্য রাখা বন্ধ করে এবং তাহাকে বা বলিয়া লম্বোদন করে। সাহরারের জীবন রক্ষা পায়।

সৌরাষ্ট্র ভ্রমের পূর্বে ভূপং তাহার দ্বীপ সহিত লাক্ষ্য করিবার জন্য বের বের ঠী কোলে একটি নতুনোক্ত নিজ

সইয়া লাকায় করে। বিহার লঙ্কার সময় সে গ্রীকে এই মর্মে উপদেশ দেয় যে, বড় বিপদই বটুক, সে বেশ তাহার বাকীর অচল আহুগত্য রাখে। তাহার দীর্ঘ এবং হেলের তরণ-পোষণের জন্য সে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িয়া গিয়াছে। বিহারএরফালে দুপং গ্রীকে দিক্‌রই শুণ্‌বনের লক্ষ্য দিয়া গিয়াছে।

এই ভাফাত লক্ষ্যের বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় যে একজন রাজনীতিক কর্মী। তাঃ কে, আই, লিংহকেও ভাফাত-লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। এরূপ বর্ণনার কোন লক্ষণতা দেখি না। বরং তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বধোপহৃত উপায় অবলম্বন করা উচিত। আর একটা কথা জানা প্রয়োজন, কাশিওয়ার নৌগাইই বা কেন এরূপভাবে বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-রাজতারা বহি রাজনীতিতে বোগ-দান করিতে চান, তবে “পেন্সনভোগী” বলিয়া তাহাদের বারণ করা হইতেছে কেন? ঐতিহাসিক বেনবুথও ত পেন্সন-ভোগী, তিনিও আমাদের আর্থিক ভগ্নতের নিয়ামক।

ভূমিদান যজ্ঞের সূত্রপাত

পত ৩রা কাঙ্কনের “হরিজন” পত্রিকার বিনোবা ভাবের তেলেদামা লতা লব্ধে নিরলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে “ঐ হানের প্রথম লমতা হইল ভূমিদান। লকলের দুইই এক কথা, চাবের কত আমরা কবি চাই। প্রায়ের বোট কবির পরিমাণ ৭,৫০০ বিঘা। জনসংখ্যা ৩,০০০, অর্থাৎ জন প্রতি দুই বিঘার উপর কবি। বর্তমানে সমস্ত হরিজনই কবিত্তে প্রব করে ও তাহার পরিবর্তে উৎপদের ১২০ ভাগ কলস ও একট কলস ও একঝোড়া ভূতা পায়।

বিনোবা ভিজালা করিলেন তাহাদের কত বিঘা কবির প্রয়োজন। কিছুকণ পরামর্শের পর তাহারা জানাইল ১২০ বিঘা কলসো ও ১২০ বিঘা ভিজা কবিরই যথেষ্ট।

ইহা যথেষ্ট কিনা বিনোবা সে বিষয়ে লম্বে প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও ভিজালা করিলেন যে তাহারা লমবারে চাব করিবে, না ব্যক্তিগতভাবে কবিরে? তাহারা লমবারে চাব করিতে ইচ্ছুক। তৎপর বিনোবা তাহাদের একটি দরখাস্ত লিখিয়া দিতে বলিলেন এবং জানাইলেন যে তিনি তাহাদের জন্য চেষ্টা করিবেন। অন্যান্য গ্রামবাসিনগও দেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের লিখিত পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন। তিনি ভিজালা করিলেন :

বহি লমকার কবি না দিতে পারে, তাহা হইলে আপনারা কি কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন?

ঐরামচন্দ্র বেজী ঠাড়াইয়া উঠিয়া জানাইলেন—আমার শিতার ইচ্ছা ছিল ইহাদের কিছু ভূমিদান করিবে। আমি আমার ও তারদের পক্ষ হইতে তিন কত বিঘা কবি দান করিতেছি।

ইহাই প্রথম ভূমিদান এবং এইভাবে এই যজ্ঞের দরপাত হইল।

ঐদিক আরও একটি কাকের দরপাত হইল। বিনোবাজী হরিজনদের ভিজালা করিলেন, আপনাদের মধ্যে কতজন পাবে আসক্ত? উত্তর হইল লকলে। “আপনারা লতা বলিরাছেন, ভালই। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্যাপ করিতে কতদিন লাগিবে।

হরিজন-লক্ষ্য বহুদের লিখিত আলোচনা করিলেন। অল্প পরেই তিনি লতাহলে ঠাড়াইলেন। লকলে উৎসুক আগ্রহে তাহার দিকে তাকাইল।

লক্ষ্যরাজ, আমরা আজ হইতেই লতাপান বড় করা দিয় করিলাম।

একজন চিংকার করিয়া বলিলেন, উছাদের দিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখ করাইরা লওয়া হউক।

বিনোবা তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, লতাপান একটি অভ্যাসের ব্যাপার। উহা ধীরে ধীরে হুই হইবে। উহারা বহি নিজেদের কথা রাধিতে চেষ্টা করে তাহা হইলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় লমতা হইল তাঁতীদের লইয়া। তাহারা যথেষ্ট হতা পায় না বলিয়া অভিযোগ করিল; মানে মাত্র আব বেশ হতা পায়। উহাতে এক লঙাহের কাজ চলে। তিন লঙাহ বলিয়া থাকিতে হয়। তাহারা বিনোবাজীকে বলিল, আপনি অহুএহ করিয়া আমাদের অধিক পরিমাণে হতা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়।

ইহা ত একটি লক্ষ-ভারতীয় লমতা।

তাহা হইলে আমরা কি করিব? তাঁতীরা বিনোবাকে ভিজালা করিল। তিনি বলিলেন, মিল বধন ছিল না—তখন কি আমাদের দেশে তাঁতী ছিল না? তাহারা কি বলিয়া থাকিত, না লোকে উলদ থাকিত? আবার বেধুন, আপনারা নিজেরাই নিজেদের তৈয়ারী কাপড় ব্যবহার করেন না। ভয়ক কি বান চাব করিয়া, চাউল কিমিয়া ধার? আপনারা নিজেরাই নিজেদের কাপ নষ্ট করিতেছেন। বিনোবাজী নিজের হুতি চানর ইত্যাদি দেখাইয়া বলিলেন, এই বেধুন কি লক্ষর কাপড়—সম্পূর্ণরূপে হাতে তৈয়ারী হইয়াছে।

তাঁতীরা বলিল, এখানে তুলা অজার না। বিনোবাজী বলিলেন, ইহা লতা। কিন্তু তুলা কি এখানে কখনই জন্মিত না? আপনারা বহি তুলা চাব হাতিয়া দিয়া থাকেন তবে এখন উহা পুনরায় সুরু করুন। এই লমতা কেবলমাত্র এই-ধানেই লীনাবদ নয়। তারতব্যাপী এই লমতা। আমি তদিত্যহি তুলা চাব করিলে লক্ষর রাজব আদার করিবে না। বর্তমান চাব না হই আপনারা তুলা কিমিতে পারেন। কাপড় কেঁদা অপেকা তুলা কেনা ভাল।

পাঁচটা পর্যন্ত মাল লোক ও বল তাহাদের সমতা লইয়া আনিতে লাগিল। বাসহানের বিপরীত দিকে এক ঘর ও আর পাঁচের ছায়ায় লতা বসিল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে অনেক আদিম-হিন্দু। বিনোবা ঠাকুরা উঠিয়া তাহার তেলুগু ভাষা আরম্ভ করিলেন।

বিনোবা বলিলেন যে, বর্ধমান ভারতে বন্যমণ কর্তৃক অনেক ক্রম অধিকার করিয়া রাখা অন্ততঃ। তিনি গ্রামশিক্ষক ও মহাপ্রাণ নিবারণের উপরও ক্রোধ বিলম্ব। গ্রামের বারিহা ও ভাতীদের সত্যের সমতা বিটবে না, যদি-না তাহারা নিজেরা তুল্য উৎপাদন করিয়া সত্য কাটরা গ্রামে কুলাইবার ব্যবস্থা করেন এবং বন্যমণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন করাইরা লন। মহাপ্রাণ বহু না করিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া কঠিন।

যে ক্রম পাওয়া নিরাহে তাহা বর্ণনের জন্য পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি করা হইল। উহাতে হরিজনদের দুই জন প্রতিনিধি, এক জন গ্রামের মাভকর, অল্প কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রভেদে রোডী ও দাতা রামচন্দ্র রোডী এই পাঁচ জনকে লইয়া কমিটি গঠিত হইল। জানা গেল রামচন্দ্র রোডীর তরী সন্থিত হারদ্রাবাদের কনুনিষ্ট মেতা মাহারাজ রোডীর বিবাহ হইয়াছে এবং উভয়েই গৌড়া কনুনিষ্ট।

এই অশান্ত এবং কনুনিষ্ট অধ্যুষিত অঞ্চলেও বহু লোক বিনোবাজীর সহিত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমূহ লইয়া আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম প্রণেতার উত্তরে তিনি বলিলেন, বর্ণাশ্রম বর্ধ সকলেই সমত্ব যুগে মানিয়া চলিয়াছে। আমাদের তাঁতীর নিকট হইতেই কাপড় কিনিতে হইবে আর গ্রামের তেলীর নিকট হইতে তৈল কিনিতে হইবে। এইরূপেই বর্ণাশ্রম বর্ধ টকিরা থাকিবে। আজকাল লোকে শেষ পর্যন্ত সংসারে অভিভূত থাকিতে চায়।

যুবজনের সেবামণ্ডল

আমরা ইংরেজী ভাষায় লিখিত দুইখানি প্রচারপত্র পাওয়াই। এই মণ্ডল (Indian Youth Service) গত ১৯৫৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র-বৈশাখ (মে, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডব্লিউ কৈলাসমোহ কাটক। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ছিলেন। সহকারী সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। মণ্ডলের সম্পাদক জিহ্মালাল বহু পাকাত্য দেশীয় ফোরেফার মন্ত্রণার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বগোলা সেবা প্রতিষ্ঠানের (Friends Service Unit) একজন বিশিষ্ট সহায়ক। বিশ্বব্যাপী শান্তির বার্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিষ্ঠান

গঠিত হইয়াছে, জিহ্মালাল বহু তাহার প্রত্যেকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই প্রচারপত্রে যে সব কার্যবিবরণী পাওয়া যায়, তাহা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। সম্পাদক মহোদয়ের বিবরণিতে তাহা বীকার করিয়াছেন। প্রতি সভ্যের শুক্রবারে পাঠ-চক্র বসে। ৫-৩০ হইতে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত তাহার কাজ চলে। মাদামি আলোচনা হয় এবং এরূপ ভাব-বিমর্শনের সাহায্যে অনেক পরকে আপন করা যায়। বাল্যলম্বতার বিষয়, দেখা যায়, আলোচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত-বর্ষের মহাপ্রাণ ও ভারতবর্ষে সংস্কৃতির সমগ্র চেষ্টা যুগে যুগে বাহা বটিকায়ে, তৎসম্বন্ধে এই পাঠচক্রের বিবরণিতে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। ভারতীয় সমতা সম্বন্ধে আলোচনা আরও হওয়া উচিত ছিল। এখনও সে চেষ্টা করায় প্রয়োজন আছে।

গণতন্ত্র ও একমাত্রকত্বের (democracy ও totalitarianism) বিরোধের ভাসাভাসা আলোচনা মিশ্রবর্ক। এই দুই মতবাদ দুইটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিত্রব্রহ্মবাক্যও একটি বর্ধ। এই বিষয়ে প্রচার ভাব পোষণ না করিতে পারিলে কেবল কাঁধা হৃৎকমেরই সার হইবে। আমেরিকা ও সোভিয়েট তাহাই করিতেছে। সেইরূপ মানা সমতার আলোচনা করিতে হইবে।

অসংখ্য সেবামণ্ডলের মধ্যে এই মণ্ডলেরও স্থান আছে। এই সমালোচনা করিলাম মণ্ডলের সকলতা কামনা করি-বলিয়াই।

ভারত-ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ঐতিহ্য বহিত করিবার জন্ত লেডি হাউটব্য্যাটেন গত ছয় বৎসর যাবৎ অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বিবীর হাটে-বাড়ারে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের উত্তরাধিকারী বলিলে অব্যয় হইবে না। ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে বিববিধানের অঙ্গ এই নীতি বীকার করিয়া ক্রমতঃ চলিয়া গিয়াছেন। ক্র্যাক, জননন, কিলিকস এবং এখন বোল্‌স—এই কুটনীতিবিদগণ এই কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এই কাজে হাত না দিলে কখনই তাহা সাধক হইতে পারে না। সেইজন্য এখন লেডি হাউটব্য্যাটেন ব্রিটন রোড জন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃ-রূপে প্রতি ছয় মাসে ভারতবর্ষে ও পাকিস্থান ঘুরিয়া থাকেন। মিসেস ক্রমতঃ সেই উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতেছেন।

তিনি করাচী গিয়াছিলেন, মিত্রী লাহোর কলিকাতা দাঙ্গপুর গিয়াছেন। প্রায় প্রতি সভার এই দুই দেশের মধ্যে বোধহয় বৃষ্টি করিবার জন্ত মানা উপায়ের কথা বলিয়াছেন।

ঐ বোম্বের হুট করিতে হইলে প্রথমে কর্তব্য এই হইবে যে নবো জ্ঞানভাণ্ডার নামা তুলি বারগা হুট করা এবং একের সঙ্গে অতের পরিচয় সাধনের ভিত্তিতে স্থাপন করা। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে যে শোষণ ও শোষিত সম্পর্ক ছিল সে কথা ভারতবাসীর তুলিতে আরও করেক হুট লাগিবে। মার্কিন রাষ্ট্র সম্পর্কেও সেই আশঙ্কা আছে এবং ঐ আশঙ্কার ফলে বাস্তব যে কিছু নাই তাহাও নহে। সে ভয়-ভাবনা হুট করিতে হইলে হুই বিক্রেতাই বোম্বের ঐ বোলাগুলি বলা প্রয়োজন। সে আলোচনা সরকারী কর্মচারী বা রাষ্ট্রের উচ্চ অধিকারীর মধ্যে হইতে পারে না। পারে ঐহুতা কলভেন্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হুতা প্রত্যাশালিনী মহিলা বা অল্পবয়স্ক লোকের দ্বারা। পৃথিবীতে আমরা কাহারও শক্ততা চাহি না লভ্য, কিন্তু বহু চাহি না একথা ঠিক নয়। সুতরাং বহুভাবে কেহ আসিলে তাহার সন্ধান প্রয়োজন।

মাহিষ্য জাতির পরিচয়

“মাহিষ্য-সমাজ” নামক একখানি মাসিক পত্রিকা মাঝে মাঝে পাইরা থাকি। প্রায় ৩১ বৎসর পূর্বে হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। গত এক সংখ্যার “মাহিষ্য জাতির পরিচয়” শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বেওয়া হইয়াছে। তার কিয়ৎকিছু তুলিয়া দিলাম :

বাংলাদেশে হুই প্রকার কৈবর্ত জাতি আছে। একটি আর্ধ্য, উচ্চ হিন্দু জাতি ও বিত্ত, অটুত তালিকাভুক্ত জাতি। একটি মাহিষ্য, অটুত মার্গব, একটি বিজয়নী, অটুত পুত্রবর্গী, একটি আচরণীয়, অটুত অমাত্যবর্গী। আর্ধ্য কৈবর্ত জাতির পিতা কল্লি, মাতা বৈতা এবং ইহারা কলিকাতা, সুতরাং কলত: কর্তৃত: ও বর্গত: ইহারা বিত্ত, এইকত ব্রাহ্মণগণ উচ্চ জাতীয়গণ আবহমান কাল ইহাদের জল পান করিয়া আসিতেছেন। ইহাদেরই নামান্তর মাহিষ্য। তালিকাভুক্ত কৈবর্তজাতি নৌকর্ষজীবী ও মৎস্ত-ব্যবসায়ী, ইহারা প্রথম প্রকারের কৈবর্ত হইতে কলত: কর্তৃত: ও বর্গত: পুত্রক—ব্রাহ্মণগণ উচ্চজাতীয়গণ ইহাদের জল পান করেন না—ইহাদের নামান্তর জালিক—ইহারা মাহিষ্য নহে পরন্তু মার্গব বাপ। মনুসংহিতার এই বিতীর প্রকারের কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে এইরূপ পাওয়া যায় :

নিবাসো মার্গবং হতে বাপং নৌকর্ষজীবিন্।

কৈবর্তমিতি যং প্রোহমার্ধ্যবর্গ নিবাসিন: ॥ ১০।৩৪ ॥

ব্রাহ্মণ হইতে পুত্রাভে জাত নিবাস পুরুষের ঔরসে পুত্র হইতে বৈতাভে জাত আরোপন জাতীয় জীতে নৌকর্ষজীবী মার্গব জাতির উৎপত্তি হয়—মার্গবের অপর নাম বাপ—আর্ধ্য-বর্গবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত এইরূপ নামেও ডাকিয়া থাকে।

(মনুজ মার্গব জাতি বাংলাদেশে ভালো নামেও পরিচিত, ভালো ও কলে কৈবর্ত একই জাতি, বিভিন্ন পরিচয় দ্বারা—বিষকোষ ও মনুজ নির্ণয়ের পরিশিষ্টেও এইরূপ উল্লেখ আছে।)

এই শ্লোকে হুইট কথা লিখিত হইয়াছে :

(১) নিবাস হইতে আরোপনীতে জাত জাতির একটি নামোক্ত নাম “মার্গব”, অপর নামোক্ত নাম “বাপ”।

এশিয়াটিক সোসাইটির কোন এক সংখ্যার (১৮৭৭ খ্রি: ১ম বর্ষ) বহুবীণের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল—“বহুবীণের কল্লিগণ মাহিষ্য বা কেবো” অর্থাৎ মাহিষ্য বা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিল। মনুজের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল—মাহিষ্য = মহী-সো-ক = মহিব পতির প্রতীক।

চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য পিতৃমাতৃ সাব্যে একই জাতি—শাস্ত্রেতে নামভেদ দ্বারা। কিন্তু জালিক কৈবর্ত বিভিন্ন পিতামাতার উৎপন্ন বলিয়া মাহিষ্য নহে। চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য উভয়ের জাতীয় বৃত্তি একই। ঔশামল বর্ষশাস্ত্রে কল্লি পিতার ঔরসে ও বৈতা ভাষ্যার গর্ভজাত লভ্যদের মাহিষ্য কি কৈবর্ত কোন সংজ্ঞা নির্দেশ নাই—উভাদের বৈতাভুক্ত দ্বারা জীবিকা নির্দিষ্ট আছে। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বৈতাভুক্তি। আবহমান কাল চাষী কৈবর্ত জাতিও এই বৃত্তিতে অহরহ রহিয়াছে।

“প্রোহমার্ধ্য বা প্রোহমার্ধ্য বা বৈতাভুক্ত্য লক্ষণমিতিঃ”

এই মনু-বচন অহুনারে পিতৃমাতৃ সাব্যে ও বৃত্তিলাভ্য অহুনারে চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য জাতি অতিয়।

বাংলা ও আসামে চাষী কৈবর্ত ও বাস, উত্তিম্যার বতাইত, মাজপুতমার বহু, মাজপুতনা ও ইটোরা অকলে মাহেজী (মাহেবর্গী) এবং ভারতের কতিপয় স্থানে কল্লি মাজপুত জাতিগুলি ভারতের বিরাট মাহিষ্য জাতির এক এক শাখা বলিলে চলে। প্রত্যেকের আলোচনার জন্য বার বার, মনুবা মনীর তীরদেশে এই জাতির প্রাথমিক আবাসভূমি ছিল। এই স্থান লভ্যত: কল্লিগণের। মনুজ হইতেও নির্দিষ্ট মাহিষ্য কৈবর্তগণ মধ্যভারতে গমন করিয়াছিলেন। মাহিষ্য জাতির একজন প্রাচীন কেন্দ্রভূমি মাহিষ্যতী লব্ধে মি: রাইস্ এবং মি: ক্রিষ্টিয়ান এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে বিস্তার আলোচনা করিয়াছেন (এপ্রিল ১৯১০)। মনুবা ও মনুজ হইতে মধ্য ভারতের অধিকার পূর্বপ্রান্ত দ্বারা তাহারা কল্লি ও ভাঙ্গলিগণ প্রবেশ আসিয়া মাজপুতন করিয়াছিলেন।...

হে অনাদি অতীত, কথা কও

কবির এই কথা উদ্ধৃত করিয়া বর্তমানের “আর্ধ্য” (সাংবাদিক) গত ২২শে ফাল্গুন সংখ্যার একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

“মুন্দির আছে গ্রাম” প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি জুলিয়া বিলাস। গ্রামের নাম আকা, তার “সাত বেউলের” ইতিহাস বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন :

“এ গ্রামের কোন্‌ও হাশি মেনে না ইতিহাসের পাঠ্য। লোক-প্রবাককে কেহ করে গড়ে উঠেছে সাত-বেউলের লৌকিক ইতিহাস। প্রবাক আছে সাত-বেউল গুপ্তরূপের। বেউলের শির-চাক্ষুর্ষে প্রকাশমান হয়ে আছে গুপ্ত সম্রাটদের শির-পোষকতার সুবহান নিদর্শন।

গঙ্গদুর্বার মিনারের উত্তর সর্গার সাত-বেউল আজ আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বিলোমবান সুপতিবংশের কীর্তি-মনোমাধার স্থাপত্য সাক্ষরূপে একটা মাল আন ভান্ন বেউল দাঁড়িয়ে আছে। কালের প্রহরী হয়ে আছে দাঁড়িয়ে, গঙ্গ আছে : সাত তাই মাতৃগণ শোষ করতে তৈরী করেছিল এ সাত-বেউল। কে জানে কি যে মাতৃগণ। কেউ-বা বলে : হিন্দু রাজা শালিবাহন ছিলেন আকাপুরের মরপতি। সন্ততঃ, আকাপুরই ছিল তাঁর রাজধানী। আকাপুর, হ্যাচরা, সালমুলা, মীরাপাতা, আনমপুর ছিল তাঁর রাজ্যের চৌহুদি। শালিবাহন রাজার রাজ্যের শেষ নির্দেশ আকাপুরের পূর্ক প্রান্তের সালমুলা জনপদের শিবানী মন্দির।

বেউলের ভাষ্কর্যশিল্পের ভাব-ভঙ্গিমার কোণারক আর জুবনবরের শির-বৈতবের প্রভাব রয়েছে প্রচুর। বেউলের ইটগুলো লক্ষ ও লক্ষ। লক্ষী, দুর্গা, কালী ও বিষ্ণুভূক্তির জ্ঞানসাম্প্রদায় রয়েছে এখানে। বেউলের গঠন-ভঙ্গিমা শিব-মন্দিরের মত, তার চূড়াগুলো শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বেউলের পায়ে বেব-বেবীর মূর্তি, শিল্পীর পরিভাষায় একে বলে ‘টেরাকোটা’ (terra-cotta) অর্থাৎ মাটির মূর্তি গড়ে তাকে আঙনে পুড়িয়ে বেওরালে বেওরা হয় পৌষে। এখানে যে সব মূর্তি রয়েছে তার রূপ এত অকৃত। ঐতিহাসিক মূর্তি-ভারে অভিভূত রয়েছে সে মূর্তির বিকৃতরূপ-বৈকল্য। মাক কান চোখ হাত বুধ পা এদের সব কাটা। লোকশ্রুতি যে, কাল-পাহাড় বনন হিন্দু বেব-বেবীমূর্তি জ্বল করতে শুরু করে তখন এখানেও তার স্রোত এসে পৌছে। মূর্তিগুলোর ঢাকা বোঁচা ভাব ভারই কম।

বেউলের চারদিকে এখন বন জঙ্গল। মন্দিরের মধ্যে যে যেবতা আছে সেগুলি পান না কোন পুঁজ। পুঁজ কাটার সময়, বাতীর তিন বোঁচার কালে ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের হয় আশ্রয়প্রাঙ্গণ। এই জনপদ গড়ে উঠবার কালে তিন-চার মূর্তি মাটির ভেতরে পুঁজের পৈঠা, হাতী বাঁধার শিকল ও পুঁজের হাশি মেনে। গ্রামিকদের মনে যেসে গুপ্ত গুপ্তবনের রূপকথা কাহিনী।

এ গ্রাম তৈরী হয়ে উঠেছে এক নদীগর্ভের মুকের উপর। ১৯৯০ সালের বানে দামোদর তার গতি বের এই পথে। মনে

হয় দামোদরের প্রাচীন বয়ে বাওরা মুকে পড়ন হয়েছে এই নদীম প্রাচ্য লভ্যতা, আর ভারত আগে এরই মুকে স্থাপনা হয়েছিল শালিবাহনের রাজধানী।

গ্রামের কিছু দূর দিগে বয়ে গিয়েছিল বেহলা বা বহুলা নদী। পায়ে চলার পথের সঙ্গে সে এখন গেছে মিশে। একশ’ বছর আগে এক ক্রান্ত পথিক প্রাচ্য বিনোদনের জন্ম টাই গিয়েছিল সাত-বেউলের পাশে। সেখানে বসে একটা কাটি দিয়ে সে আপন মনে মাটির মুকে লিখে চলছিল জীবনের অবোধ্য এক বারতা। মূলোর একটু নীচে সে বেবল সোনার মোহর। আকবরের সময়ে যে আনুগত্য চলতি ছিল, এ বর্ণ মোহর তারই অঙ্কন।

...সাত-আট বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাত-বেউলের বোঁচ মিতে আনা হয়। তাঁরা মিরে মাল এক বিষ্ণু মূর্তি। গ্রামের বিজ্ঞানসাহীরা ঐতিহাসিকদের মূর্তি আকর্ষণ করেছেন।...”

এই বর্ণনা কিন্তু বর্ধমান জেলার বিধান ও পতিতবৃন্দের দ্বারিত্য বৃদ্ধি করিচ্ছে। “আর্যো”র “বনের কথা” চুইকি কথার তাহাদের পরিচয় পাই। বর্ধমানে নদীর-সাহিত্য-পরিবহনের একটা শাখা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। তাহাদেরই এই বিষয়ে অঙ্গী হওয়া উচিত। সকল বিষয়ে কলিকাতার সুবের দিকে চাহিয়া থাকা বাহমীর মত। অতীতকে কথা কহাইতে হয় কি করিয়া তাহা আমিভেদ বহিমস্ত, অকরত্বার, হয় প্রসাধ, নবীজনাথ এবং জামেন আচার্য বহুমাণ ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ। এই ইতিহাসই বেউল।

মুঠি হামসুন

১২ বৎসর বয়সে জনপ্রিয়তায় সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক মরওয়ার মুঠি হামসুন পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ওঠা আগষ্ট তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মর-জনতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় দুটিল। কিন্তু তাবের দ্বায়ে লোকের মনে তাঁহার স্থান অটুট হইয়া থাকিবে, বতদিন বকিত ও সুবার্জের সমতা বিশ্বসংসারকে বিরক্ত ও বিহুত করিতে থাকিবে।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার সাহিত্যিকজীবন শুরু হয়। চাবার মেলে, চাবার মত তাঁহার বদনীতে। সে মক্তের চীন তাহাকে জমির দিকে টানিয়া লইয়া আসে মার্কিন যুগ্মকের বাল-চালকের অবস্থা হইতে। “হাকার” (“বুহুকা”) তাঁহার প্রথম পুস্তক। কোন প্রকাশক তাহা লইতে দিবাযোব করিত, অজাতনাথ ও অধ্যাতনাথ একজন লেখকের প্রথম বই প্রকাশ করিবার সাহস সকলের থাকে না। কোন সাময়িকপত্রে বেবিরাহি যে, এক জন প্রকাশক অত্যন্ত তাহিল্য সহকারে ঐ “বুহুকা” বইখানি দ্বিবিধা দ্বিভাষে বসিলেন, এবং তাহিল্য-

সহকারে সেবিত। বোকায়ে কামকর্ষ শেষ হইলে তাহা হাতে লইলেন। একটি ঘরির অকলের হোটেলে বর্ণনা ছিল তাহাতে। বই পড়িয়া একাশক ছাট ছানহনের হুটরে হুটরা গেলেন এবং কিছু অগ্রিম টাকা বিরা বই একাশের হুটিপথে স্বাক্ষর করাইলেন।

তার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে আলিল বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি এবং বিপুল অর্থোপার্জন। কিন্তু তাঁহার পরিবার-পরিজনকে লইয়া তিনি ক্রমক-কীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

যুতাকালে তিনি দ্বী ব্যারী আভারলেন, হুইট পুত্র ও ভিনট কতা রাবিরা নিরাহেন। তাঁহার বর্ণবিধান কি ছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা দেখি নাই। তাহা অনেকটা ছিল প্রকৃতি-পুত্র (Pantheism) বাহা ঈশ্বর সমাক কর্তৃক মিনা করা হইয়া থাকে। আশ্রয় তাঁহার দ্বী-পুত্র-কতার উদ্দেশে লনবেদনা জাগন করিতেছি।

কালীকান্ত শিরোমণি

করিমপুর জেলার কোটালীপাড়ার উনশিরা গ্রামের বিখ্যাত বৈদ্যাকরণ পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি গত ১৭ই কান্তন তাঁহার ঈশ্বরপুরহ বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গলা-লাত করিয়াছেন।

শিরোমণি মহাশয় বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অর্ববল না থাকিলেও তিনি বহু হাজকে শিষ্যের বাতীতে রাবিরা বিভাধান ও অরহান করিয়াছেন। তাঁহার অমারিক ও মনুর ব্যবহার এবং তাঁহার পাতিভ্যের কলে তিনি বেশই আবালবৃদ্ধ বয়সারীর বিশেষ প্রভা ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসরব্যিক কাল ধরিয়া তিনি কোটালীপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্থান হুট হইবার পর তিনি বেশত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপুরে আসিয়া পুত্ররায় 'আর্য্য বিদ্যালয়' নামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেন ও সংস্কৃত ভাষার সেবার আশ্রয়ব্রোগ করেন। তিনি ঐশ্বিনুদ্য কীবনযাপন করিতেন, তাঁহার তার মিঠাবান ও সহা-চারী ব্যক্তি এই রূপে হুট। শিরোমণি মহাশয়ের হাজরার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ঈহরিহাল সিদ্ধান্তবাসিন, মহামহো-পাধ্যায় ঈকালীপদ ভর্য্যচার্য্য প্রবুধ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষ সন্দীভাহরণী ও পরোপকারী ছিলেন।

তিনি দ্বী, কনিষ্ঠ পুত্র, এক কতা ও বহু পৌত্রপৌত্রী এবং

বৌহিহ ও বৌহিহী রাবিরা নিরাহেন। অগণিত করিব-পুত্রবালী তাঁহার ভিরোবানে আত্মীয়জনবিতোপ-ব্যথা অনুভব করিবেন। আশ্রয় আশ্রয়ের লনবেদনা জাগন করিতেছি।

অমিয়কুমার গাঙ্গুলী

"অনুভবাকার" ও "হুনাভর" পঞ্জিকার দ্বিতীয় সংবাদাতা, তরুণ সাংবাদিক অমিয়কুমার গাঙ্গুলীর মৃত্যুসংবাদে সংবাদপত্র-সেবীরাতেই বিশেষ হঃণ অনুভব করিবেন। দ্বিতীয় ইট-বাইটেড প্রেসের রিপোর্টাররূপে এই তরুণ সাংবাদিক প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অমারিক, মিটভারী, লবাগ্রহু এই দুবকের সহিত বাহাংই পরিচয়ের সুযোগ ঘটরাকে, তিনিই তাঁহার আচরণে হুট হইয়াছেন। নিবিল-তারত সাংবাদিক কেডারেশন গঠিত হইবার পরে এই তরুণ হুবককে দ্বিতীয় সাংবাদিকগণ সম্পাদক পদের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে বরণ করিয়াছিলেন। তারতের সাংবাদিকদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে, বিভিন্ন প্রদেশে সাংবাদিক লগ্ন গঠন করিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না।

যোগের অবস্থা কঠিন হইয়া উঠিলে তিনি অন্নোপচারের জন্য কিছুকাল পুরের কলিকাতার আসিরাছিলেন। তাঁহার বিরোধে তারতের এক জন হুটী সাংবাদিকের দেহাবলান ঘটিল। রাজ্য বজ্রিৎ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। উপাধ্যায়, মগেন্দ্রনাথ ভট্ট, শিতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালী-নাথ রায় প্রভৃতি সাংবাদিকগণ বে ঐতিহ্য প্রভুত করিয়াছেন, অমিয়কুমার তাহার উত্তরাধিকারী। মৃত্যু রূপে এরূপ লোকের প্রয়োজন বহন সর্বাধিক ভবনই ভগবান তাঁহাকে তাঁহার পরপ্রাতে লইয়া গেলেন।

অবনীমোহন রায়

গত ২৯শে কান্তন অরপুরিয়া কলেজের বর্ণনের অধ্যাপক অবনীমোহন রায় শেরশিখাল ত্যাগ করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের কিকিধিক বয়সে তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার পুত্র-পরিবার বিপন্ন হইলেন। মধ্যবিভের ও জনসাধারণের উপার্জনকর লোকের অকালমৃত্যুতে কত লগ্নার বে তাহিরা পড়ে, তাহা সুবিবিত।

অবনীমোহনের শোকার্ণ পরিবারের উদ্দেশে লনবেদনা জাগন করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উদ্ভব

ঐগিরীন্দ্রশেখর বসু

প্রাচীন ভারতে আর্য সভ্যতার উদ্ভব সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে সভ্যতা বলিতে কি বুঝায় প্রথমে তাহার আলোচনা দরকার। কি দেখিলে আমরা বুঝিব এক জাতি অল্প জাতি অপেক্ষা অধিক সভ্য? ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, যে জাতি অধিক সাবান ব্যবহার করে তাহারাই সভ্যতার অধিক উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘ভূত ও মানুষ’ গল্পে সভ্য ভাব্য নব্য ভূত লুলু বলিয়াছিল যে, সে সাবান মাখিতেছে, তাহাকে দেখিলে লোকে এখন কোন বিলাতী ‘গার্ডের’ ছেলে বলিয়া মনে করিবে। কাহারও মতে সংবাদপত্রের সংখ্যার উপর সভ্যতার উৎকর্ষ নির্ভর করে। এটম বোমা তৈয়ারি করিতে পারিলে কি অধিক সভ্য হয়? পোশাক কি সভ্যতার পরিচায়ক? সুদৃশ্য পরিচ্ছন্নধারী চুক্তসেবী চার্চিল সাহেব কি অর্ধনগ্ন গাছীর অপেক্ষা অধিক সুসভ্য? সর্বভূতে সমদণী কোপীন পরিহিত যোগী ভোগবিলাসে নিমজ্জিত ধনী ব্যক্তির অপেক্ষা কি কম সভ্য? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

সভ্যতার মান। সভ্যতার কোন একটি বিশেষ মাপকাঠি নাই। এক জাতি অল্প জাতির অপেক্ষা কতক বিষয়ে বেশী সভ্য এবং অপর বিষয়ে কম সভ্য হইতে পারে। আবার হ্রস্ব সভ্য জাতির মধ্যেও সময় সময় অসভ্যতা প্রকাশ পায়। কোন জাতির সভ্যতার পরিমাপ করিতে হইলে আমাদের সেই জাতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের খবর জানা দরকার। তাহাদের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রাবিধি, ব্যক্তিগত নৈতিক ধর্ম, গাছিয়া সম্পর্ক, বিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অহুশীলন, সমাজধর্ম, শিল্পাদির অবস্থা, রাজধর্ম, যুদ্ধপ্রবণতা ও যুদ্ধকালীন নীতি, গ্রাম নগর বানবাহন ইত্যাদির অবস্থা কিরূপ জানিয়া সমগ্রভাবে সভ্যতার বিচার করিতে হয়। লোকের পোশাক-পরিচ্ছন্ন, ভাষা, ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ। সাবান ব্যবহার শারীরিক পরিচ্ছন্নতার নির্দেশক; খবরের কাগজের সংখ্যা দেখিয়া জাতির শিক্ষা বিস্তারের পরিমাপ করা বাইতে পারে; সুদৃশ্য পোশাক-পরিচ্ছন্ন সুরচিত্র পরিচায়ক; এটম বোমার দ্বারা বুঝা যায় জাতি বিজ্ঞান ও শিল্পের অহুশীলনে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, ইত্যাদি। মানবের নৈতিক ধর্ম সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ। নীতিবিরোধী যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অপর

জাতির উপর অস্ত্রায় কর্তৃত্ব সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়া ধরা হয়। অপর পক্ষে যে জাতি বিজ্ঞানের চর্চা করে না, ঐহিক সুখ-সাধনে তৎপর নহে, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, রোগ-প্রতিষেধক উপায় জানে না তাহার নীতিবোধ ও পারমিতিক ধর্মজ্ঞান চরমে উঠিলেও তাহাকে সভ্য বলা চলিবে না। সকল বিষয়ে সুসমঞ্জস প্রচিতিই (development) প্রকৃত সভ্যতা। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতে কি প্রকার সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার মান কিরূপ ছিল বুঝা সম্ভবপর হইবে।

প্রত্নবিজ্ঞা। কোন জাতির অতি প্রাচীন সভ্যতা কি প্রকার ছিল জানিবার জন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের প্রত্নবিজ্ঞার আশ্রয় লইতে হয়। ক্রীট, ব্যাবিলোনিয়া, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা বাহ্য কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা এই প্রত্নবিজ্ঞার সাহায্যে। পম্পিয়ারী ও হারকুলেনিয়ম নগরীর অনষ্ট ধ্বংসাবশেষ হইতে আমরা পুরাতন রোমক জাতির জীবন-যাত্রা-প্রণালী অবগত হইয়াছি। প্রাচীন মিশরীয়দের সভ্যতা সম্বন্ধীয় বহু তথ্য তাহাদের রাজাদের পুরাতন সুরক্ষিত কবর আবিষ্কার করিয়া আমরা উদ্ধার করিয়াছি। ভারতে মোহন-জ-দরো খননের দ্বারা তদন্ত অধিবাসীদের অনেক পুরাকীর্তি জানিতে পারা গিয়াছে। আরও নানা স্থান খনন করিলে হয়ত প্রাচীন ভারতের অনেক কথাই জানা বাইবে কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞার সাহায্য না লইয়াও ভারতের অতি প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা সম্ভবপর। বেদ ও পুরাণের মধ্যেই এই ইতিবৃত্ত নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে স্থলিখিত ইতিবৃত্ত সংরক্ষিত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীন ইতিবৃত্ত। পুরাণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ‘হিষ্টরি’। পুরাণের প্রামাণিকতা ‘পুরাণপ্রবেশ’ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে সকল কালনির্দেশ আছে তাহা এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

বৈদিককাল। বৈদিক ঋষিদের ও বেদসূক্তে উল্লিখিত নৃপতিদের কাল আলোচনা করিলে দেখা যায় ময়, যম যমীর সূক্তগুলি সর্বাধিক পুরাতন। অবশ্য বেদে আরও অতি পুরাতন ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু বৈদিক যুগের পূর্বে কোন সূক্ত রচিত হইয়াছিল বলিয়া

মনে হয় না। ৩৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত বেদ শ্রুতগুলি রচিত হইয়াছিল। অসিত ও দেবল ঋষি সর্বাংশে অর্বাচীন শ্রুতকারদিগের মধ্যে ছই জন। বৈদিককাল বলিতে এই দীর্ঘ ২৪০০ বৎসরব্যাপী সময় বুঝায়। বেদশ্রুতগুলি সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিব।

পুরাকালে ঋষিগণ ও রাজস্ববর্গ নানা বজ্ঞ করিতেন। বজ্ঞে বিভিন্ন দেবতার আবাহন করিয়া তাঁহাদিগকে সোমরস নিবেদন করা হইত। এই উপলক্ষে ঋত্বিকগণ যে মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহাই বেদে সংগৃহীত হইয়াছে। অল্পমান হয় বান্দ্যকি বেদমন্ত্রগুলিকে প্রথমে বজ্রসূ, ঋক্ ও সাম এই তিন ভাগে ভাগ করেন। বান্দ্যকিকাল ২১০০ খ্রী-পূর্বাব্দ। মোটামুটি বলা বাট্ঠিতে পারে মন্ত্রগুলির গভভাগ বজ্রসূ, ছন্দোময় পদ্যভাগ ঋক্ এবং বে মন্ত্রগুলি পান করা হইত তাহাই সাম। বজ্রবেদের কোন কোন মন্ত্র সর্বাংশে প্রাচীন। পূর্বে অথর্ববেদ বলিয়া কোন পৃথক বেদ ছিল না। কৃষ্ণঐশ্যয়ন বেদব্যাস বেদের কতকগুলি শ্রুত পৃথক করিয়া তাহার নাম দেন অথর্ববেদ। এইরূপে তিন বেদ অর্থাৎ ত্রয়ী কালক্রমে চারিবেদ হয়। কৃষ্ণঐশ্যয়নের কাল ১৪৬০ খ্রী-পূর্বাব্দ।

বেদে পুরাবৃত্ত। বেদ ধর্ম পুস্তক, তাহা ইতবৃত্ত নহে। বেদ হইতে ইতবৃত্ত অল্পমান করিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বেদে রাজাদের যুদ্ধকথা, আর্ষ ও দাসদিগের মধ্যে বিবাদ, তৎকালীন শিল্পাদির অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল উক্তি হইতে দীর্ঘ বৈদিককালের সভ্যতার ইতবৃত্ত সংকলন করা যায়। বেদপাঠে দেখা যায় যে, পুরাকালে ভারতে কৃষির বর্ধে উন্নতি হইয়াছিল, বাণিজ্য ও বিবিধ শিল্পের প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। গো, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, কুকুর প্রভৃতি পশুপালন করা হইত। নাপিতে মস্তক মুণ্ডন করিত, শিল্পীরা বস্ত্র বধন করিত, মেঘলোম হইতে পশমী কাপড়ও তৈয়ারি হইত, লোকে নৌকা করিয়া দ্রুতর নদী পার হইত, খাতব ত্রব্যের বহুল ব্যবহার ছিল, স্রাকরায় স্বর্ণালংকার তৈয়ারি করিত, রথ ইত্যাদি কাঠের ত্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত স্থলক ছুতার মিস্ত্রি ছিল, রথকে মজবুত করিবার জন্ত তাহা গোচর্মের দ্বারা আবৃত করা হইত, রথে ঘোড়া বা বলদ জোতা হইত। বলদ-বাহিত যুদ্ধরথে চড়িয়া মৃগসংস্রাব্যের স্রী ইন্দ্রসেনা অতি কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ধর্মব্রাহ্মণ ব্যতীত বর্ষা তরবারি ও অস্ত্রাশ্রয় অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাতব শিরজ্ঞান ও অঙ্গজ্ঞান ব্যবহৃত হইত। বেদে কৃত্রিম লৌহ নিমিত্ত পদেরও উল্লেখ আছে।

খেলা হিসাবে ঘোড়দৌড় হইত। এখনকার সভ্যজাতির মত ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরা হইত কিনা তাহার উল্লেখ নাই, তবে বাজি রাখিয়া পাশা খেলার বিবরণ পাওয়া যায়। বেদশ্রুতে জুয়াড়ির নানা চুতোঙ্গের বর্ণনা আছে।

পুরুষে অনেক সময় বহু বিবাহ করিত। এখনকার মত তখনও অসং পুরুষ ও অসতী স্রীলোক দেখা যাইত। ঋষিরা বজ্ঞে প্রচুর স্বর্ণ, গো, অশ্ব, দাস ও দাসী উপহার পাইতেন। গোখনের খুব গোরব ছিল। চৌরভয় ও স্বাক্ষসের স্বর্বাংশ লুণ্ঠাটকারী দস্যুদের উৎপাত ছিল। দস্যুদল সাধারণত বনে থাকিত। বনে অনেক সময় দাবানল জলিতে দেখা যাইত।" লোকে আগুন লাগাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিত। বেদে বাসস্থানের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে বজ্ঞশালায় বিবরণ আছে এবং এক বায়গায় বহু স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকার কথা আছে, অশ্বদিগের লৌহময় পুরীর উল্লেখ আছে। বিজ্ঞার বিশেষ আদর ছিল। বেদে অনেক গভীর জ্ঞানের কথা আছে। কাব্য হিসাবে অনেক শ্রুত অতি উৎকৃষ্ট। ছন্দোবদ্ধ, ভাবগভীর ঋক্শ্রুতগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাদের রচয়িতা ঋষিগণের বিজ্ঞা ও জ্ঞান কত উচ্চত্বের ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদ চাবার গান মাত্র। এই ধারণা কেবল পল্লবগ্রাহী হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেই সম্ভবপর। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বাহার পুরাণ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহার নিকট বেদ প্রস্তুত হইবেন বলিয়া আশংকা করেন। পুরাণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদের নানা প্রকার কদম্ব করিয়া থাকেন। পুরাণার্থবিৎ শ্রদ্ধালু জনের নিকটেই বেদ স্বীয় মর্ম উন্মোচিত করেন।

পুরাণ। বেদপাঠে যেটুকু ইতবৃত্ত অল্পমান করা যায় তাহাতে দেখা যায় যে, বৈদিককালে ভারতীয়গণের সভ্যতা উচ্চত্বের ছিল। এ সভ্যতা কিছু এক দিনেই পড়িয়া উঠে নাই, বেদের পূর্বকাল হইতেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই সভ্যতা বিস্তারের ইতবৃত্ত পুরাণ হইতে সহজেই পাওয়া যায়। পুরাণ বেদেরও বহু পূর্ববর্তী। সৌভাগ্যের বিষয় পুরাণে ভারতীয় পুরাবৃত্তের বিখ্যাসংযোগ্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে।—

ঐশ্বর্য সর্বশাস্ত্রাণং পুরাণং ব্রহ্মণ্য নৃতম্।

অনন্তরক বজ্রোক্তো বেদোক্ত বিনিঃস্রতাঃ ॥ বাহু ১।৩১।

অর্থাৎ, সর্বশাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্তৃক নৃত হইল, অনন্তর তাহার মুখসমূহ হইতে বেদ সকল বিনিঃস্রত হইল। পুরাণে ৫০৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা তাহারও পরবর্তীকাল পর্যন্ত অথও ধারায় ভারতের ইতবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। কালে কালে পুরাণকারগণ পুরাণকে অকালোচ্য করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক কাল পৌরাণিক কালের অন্তর্গত।

অনেকে বৈদিক কাল ও পৌরাণিক কালে পার্থক্য দেখেন। তাঁহারা মনে করেন, বৈদিক কাল পৌরাণিক কালের পূর্ববর্তী। এ ধারণা নিতান্ত ভুল। বৈদিক কাল প্রায় ২৪০০ বৎসর বাপী এবং ইহা দীর্ঘতর ৬৪০০ বৎসরের পৌরাণিক কালের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বাণে বেদের পূর্ববর্তী প্রায় ২০০০ বৎসরের ইতিবৃত্ত বৃত্ত হইয়াছে। বৈদিক সময় সভ্যতা এইরূপ ছিল এবং পৌরাণিক কালে এইপ্রকার ছিল এই ধরনের উক্তির কোন মূল্য নাই। অবশ্য যে উক্তি কালনির্দেশসহ করা হয় তাহার গুরুত্ব বিচার করা যায়। আমি ভারতীয় সভ্যতার যে বিবরণ দিতেছি তাহা বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংকলিত।

ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব।

ঐহাদিককে আর্য বলা হয় তাঁহারা ভারতে কবে প্রথম আসেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায় না। তবে আর্যেরা মধ্য এশিয়ার পূর্ব তুর্কিস্থান অর্থাৎ ইলাবৃত্ত বর্ষ হইতে প্রথম কাশ্মীরে আসেন একথা অনুমান করা যায়। পরে তাঁহারা পঞ্জাব ও বিজ্জাচলের উত্তর প্রদেশ ক্রমে অধিকার করেন। অল্প সময়ের মধ্যে আর্যেরা দক্ষিণাপথেও রাজ্যবিস্তার করেন। ইলাবৃত্ত বর্ষ, কাশ্মীর, বিজ্জাচলের ভারত এবং দক্ষিণাপথ বধাক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত এবং পাতাল নামে পূর্বাণে পরিচিত আছে। ইলাবৃত্ত বর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তর ভারত, দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্তলোক অথবা ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন-নামেও পরিচিত ছিল। দেবলোক হইতে দেবগণ প্রথমে যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁহারা স্বর্গাধিপতি ইন্দের অধীন ছিলেন। ইন্দ্র স্বর্গাধিপতির সাধারণ নাম। ভারতে ইন্দের প্রতিভূর নাম হইল প্রজাপতি এবং তৎপরে মনু। প্রথমে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছিলেন। তখনকার প্রজাপতিদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ইহাদের অধীনে প্রজা বৃদ্ধি পাইল না। তখন স্বায়ম্ভুব মনু ইন্দের প্রতিভূ হইলেন। ইনিই প্রথম মনু। ইহার প্রকৃত নাম বিরাজ। বিরাজ মনু প্রজাদিগের পালনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার কাল ৫২৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দ। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরগণ ১০০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল রাজ্য স্বায় প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইহাদের সময় প্রজা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতে ২০০০ বৎসরকাল পর্যন্ত পুরাণমতে সভ্যযুগ। সভ্যযুগে কোন আইন-কানুন ছিল না, লোকে যদুচ্ছা চলিত। আইন-কানুন না থাকায় কোনও কাজই মানবধর্মবিগহিত অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এইজন্যই বলা হয়

যে, সভ্যযুগে ধর্ম পরিপূর্ণ বা চতুশ্চন্দ ছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর পাঁচ পুরুষ পরবর্তী প্রজাপতির নাম ব্রহ্ম। ইহার নাম হইতেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। তাঁহার কাল ৫৮৩৭ খ্রী-পূর্বাব্দ। বিরাজ মনুর বংশেই আনুমানিক ৫১৬১ খ্রী পূর্বাব্দে ঋষ আবির্ভূত হন। পুরাণের রূপায় ইহার নাম অন্যান্যধি কীর্তিত হইতেছে। আনুমানিক ৪২১২ খ্রী-পূর্বাব্দে স্বায়ম্ভুব বংশে বেণ নামক এক প্রজাপতি হন। ইনি ইন্দের বক্তৃতা অধীকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নৃপতি রূপে ঘোষণা করেন। ইহার ফলে তাঁহার ঋষিদের সচিবত্ব কলহ হয় ও তিনি নিহত হন। তখন অরাজক অবস্থা উপস্থিত হয়। বিজ্জা শৈলবাসী নিষাদগণ দেশ অধিকার করে। নিষাদগণ ভারতের এক আদি জাতি। তাহারা হ্রস্বকায়, তাহাদের বর্ণ গোড়া কাঠের ন্যায় ও মুখ খর্বাকার।

নিষাদগণ প্রজাগণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাজ্যের অরাজক অবস্থা দূর করিবার জন্য ঋষিরা পৃথকে বেণের স্নানভিক্ষিত করিলেন। পৃথক নামানুযায়ী ভূমণ্ডলের নাম পৃথিবী হয়। পৃথুই ভারতের প্রথম প্রকৃত রাজা। তিনি কবচ ও ধনুর্ধারণ করিয়া নিষাদদিগকে বশে আনিলেন ও রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। ইতিবৃত্ত প্রস্তুত করাইবার জন্য তিনিই প্রথম স্মৃত ও মাপন নিয়োগ করিলেন। পৃথুর রাজ্যকালে প্রজাগণের প্রথমত কোন কষ্ট হয় নাই। তাহারা প্রচুর গো-দুগ্ধ পাইত এবং একপ্রকার বৃক্ষ হইতে মিষ্ট রস আহরণ করিত। এই রসকে অমাক্ষিক মধু বলা হইয়াছে। প্রজাগণ বৃক্ষের ফলফুল হইতে অলংকার প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিত এবং বৃক্ষই তাহাদের পরিধান বোণাইত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বোধ হয় তাহারা বকল পরিহিত। প্রথমত বৃক্ষের আশ্রয়েই তাহারা বসবাস করিত, ক্রমে বৃক্ষশাখা বিস্তারের অনুকরণে তাহারা কূটীর প্রস্তুত করিতে শিখিল। অধিক অমাক্ষিক মধু আহরণের ফলে মধু বৃক্ষগুলি নষ্ট হইয়া গেল। তখন প্রজাগণ পৃথুর নিকট গিয়া বলিল, ‘অরাজক অবস্থায় ধরিজী সকল ওষধি অর্থাৎ ঔষধ্যশস্ত্র গ্রাস করিয়াছে তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ প্রজাপাল নিরূপিত করিয়াছেন, তুমি ক্ষুধার্ত প্রজাগণকে রক্ষা কর’।

অনন্তর পৃথু নানা স্থান হইতে ঔষধ্যশস্ত্রের বীজ সংগ্রহ করাইলেন, জমি হইতে প্রস্তুতাদি অপসারিত করাইয়া কৃষিকার্যের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত করাইলেন, গো রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং বণিক-পথ নির্মাণ করাইলেন। তিনি নগর ও গ্রামের প্রতিষ্ঠাপ প্রবর্তন করিলেন। ভূমির যে যে স্থান সম ছিল রাজা

সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস করন। করিলেন। পুরাণে আছে, পৃথ্বী পূর্বে এসকল কিছুই ছিল না, বৈষ্ণব অর্থাৎ বেণুপুত্র পৃথ্বী হইতেই এসকলের উৎপত্তি। এত পরিভ্রম করিয়া পৃথ্বী যে সভ্যতার গোড়াপত্তন করিলেন তাঁহার যুগ্মের এক শত বৎসরের মধ্যেই তাহা লোপ পায়। পুনরায় প্রায় সহস্র বর্ষব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়। এই সময় পৃথিবী কুশ ভূপে আবৃত হইয়া গিয়াছিল এবং অরণ্যানী সমস্ত ভূমি গ্রাস করিয়াছিল। অসুস্থমান হয় বৃহৎ প্রাণবনের কলে এইরূপ ঘটিয়াছিল। অতঃপর নদী-তীরবর্তী দেশ হইতে দশ জন প্রচেতা নামধারী ব্যক্তি আসিয়া অগ্নিসংযোগে বনের বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিলেন। তাঁহার্য্য মারিষা নামী এক বন্যজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলেন। দশ জন প্রচেতাই মারিষার স্বামী হইলেন।

প্রচেতাগণের দক্ষ নামে এক পুত্র হয়। দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রজাগণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অসুস্থমান হয় তখন প্রজাগণ পৃথক্ পৃথক্ দলে বাস করিত। হর্ষ নামে প্রায় ৫০০০ ব্যক্তির একটি দল উত্তম বাসস্থান খুঁজিতে গিয়া নষ্ট হইয়া গেল। 'নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আইসে না সেইরূপ তাহার্য্য অদ্যাপি নিবর্তিত হন নাই।' দক্ষের হর্ষ নামক প্রজাগণ নিকড়িষ্ট হইলে শবলাশ নামক ১০০০ ব্যক্তির আর একটি দল পুনরায় এইরূপই বাসস্থান খুঁজিতে গিয়া লোপ পাইল। ভারতের কোন কোন প্রদেশে রোগে, আদিম জাতির উৎপাতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এইরূপ অনেক দল লুপ্ত হইয়াছে। দক্ষের কাল ৩৮৮২ খ্রী-পূর্বাব্দ। দক্ষের সময় হইতে ভারতীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবন হয়। দেবলোক বা ইলাবৃত্ত বর্ষ হইতে যে সভ্যতা ভারতে আসিয়াছিল তাহাই এই সময় হইতে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আজ পর্যন্ত অখণ্ড ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক যুগে প্রথম বধন ইউরোপীয়গণ আমেরিকার বান তখন তাঁহাদের সভ্যতার মান অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে তাহা স্থানীয় পরিবেশের প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া আধুনিক আমেরিকান সভ্যতার রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রকার ইলাবৃত্ত বর্ষের সভ্যতা ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ প্রায় লোপ পাইয়াও পরে নবকলমে উদ্ভূত হইয়াছে।

বৈবস্বত মনুকাল। বিবিধ ধর্ম্মবিধি প্রবর্তন। দক্ষের কন্যা অদিতির এক পুত্রের নাম বিবস্বান। বিবস্বান অতি তেজস্বী এবং পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। স্বধেয়ে তাঁহাকে দগ্ধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি পার্বত্য প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র বৈবস্বত। ইনি মনু অর্থাৎ ভারতীয়দিগের প্রজাপালক নৃপতি হন। বৈবস্বত মনুর

কাল ৩৮১৪ খ্রী-পূর্বাব্দ। এই সময়টা ভারতীয় সভ্যতার এক অতি পৌরবোজ্জল যুগ। বৈবস্বত মনু জ্যেষ্ঠ যুগের প্রথম দিকে আবির্ভূত হন। জ্যেষ্ঠ যুগের প্রায় ৩২৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে। বৈবস্বতের সময় সৃষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনা অসুস্থ্যায়ী সমাজ-সংস্কার, দণ্ডবিধি প্রবর্তন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। এই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মও প্রচলিত হয়, অনেক বিদ্যান ব্যক্তির সহযোগিতা ব্যতীত সর্ববিষয়ে একগুণ আমূল সংস্কার সম্ভবপর হয় নাই। তুণ্ড, পুন্ড, পুন্ডহ, ক্রতু, অদিত্য, মরীচি, প্রচেতা, অজি, বশিষ্ঠ, নারদ এবং অজ্ঞাত-নামা আরও অনেকে বৈবস্বত নৃপতিকে তাঁহার মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার্য্য দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, পাণ্ডগণের ধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বাবতীয় আচার-ব্যবহার বিচার করিয়া বিধিস্থাপনা করিলেন। চতুর্দশ ও চতুরাঙ্গ্য বিভাগ এই সময় প্রথম প্রবর্তিত হয়। ইহার্য্য বজন, রাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া থাকিবেন তাঁহার্য্য ব্রাহ্মণ হইলেন, ইহার্য্য যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও প্রজাপালন করিতেন তাঁহার্য্য ক্ষত্রিয় হইলেন, কৃষি-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির্য্য বৈশ্য হইলেন এবং এই তিন বর্ণের পরিচায়কের্য্য শূত্র হইলেন। ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও পরি-ব্রাজক এই চারি আশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য নিরূপিত হইল। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার, ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ছাত্রের কর্তব্য, চতুর্দশের বিবাহ, বিবাহের প্রকারভেদ, অতিথি-সংস্কার, শ্রাদ্ধাদি, বিভিন্ন প্রকারের জীবিকার উপায়, খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়, অশোচ ব্যবস্থা, কাষ্ঠ বস্ত্র ধাতব দ্রব্যাদির শোধন-ব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মোপায়, বানপ্রস্থ বতি পরিব্রাজকের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম রাজ্যশাসন ও যুদ্ধাদির নিয়ম, গুণদান, সাক্ষ্য, দণ্ডাদির ব্যবস্থা, চৌধ নিধারণ ইত্যাদি বতপ্রকার কর্তব্য সমাজ রক্ষার জন্য আবশ্যিক তাহা সমস্তই বিধিনিষেধের নিয়মাদীন করা হইল। পরমাত্মজ্ঞান ও মোক্ষসাধনেরও উপদেশ লিখিত হইল। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মাবলী সংহিতাকারে একত্রে গ্রথিত হইয়া মনুসংহিতা বা মানব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত হইল। কালে কালে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার যুগধর্ম্মাসুস্থ্যায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইউরোপে দণ্ডনীতি নেপোলিয়নের সময় প্রথম বিধিবদ্ধ করা হয় কিন্তু ভারতীয় দণ্ডনীতি বহু যুগ হইল ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্র এখনও হিন্দুদিগের জীবনযাত্রা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুর স্বাস্থ্যবিধি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, যুদ্ধনীতি প্রভৃতির মান কত উন্নত ছিল তাহা বিভিন্ন পুরাণে এতৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়িলে জানা যাইবে। বলা

বাহ্য, এই সকল প্রবন্ধের মূল উৎস আদি মনুষ্যত্ব। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় মনীষীদের এখন পর্যন্ত পুরাণের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই।

বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে সময় লাগিয়াছিল। সকল ব্যাপারে বিনয় বা নিয়মাসুবর্তিতা সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ। যে জাতি যথেষ্টাচারী তাহাকে সভ্য বলা যায় না। প্রাচীন হিন্দুর বিনয় এক প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, কিন্তু মনুষ্যত্ব রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সকল লোকে নিয়মাসুবর্তী হয় নাই। বিধিসমূহ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু সময় লাগিয়াছিল। কালে বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণের ফলে অনেক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহা-দিগকে সমাজের মধ্যে রাখিবার জন্য বহু নতুন নতুন বিধি প্রবর্তিত করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং মনুকন্যা ইলা বুধের সহিত বিবাহিত হইলেও সূর্য্য রাজার সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন। মনুপুত্র পৃথক আচার-ব্যবহারের দোষে শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর পৌত্র নাভাগ এক বৈশ্বকন্যার প্রেমে পড়িয়া পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে বিবাহ করিয়া বৈশ্ব হইয়া বান। তিনি বৈশ্ব হইয়া রাজ্যদেশে প্রজাপালন পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-বাণিজ্যে নিযুক্ত হন। নাভাগের পুত্র ভলম্বন স্বীয় বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেন। তিনি নিজ পিতাকে সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলে নাভাগ বলিলেন, 'আমি পিতার আজ্ঞাসূত্রে যে রাজ্য একবার পরিত্যাগ করিয়াছি তাহা আর পুনরাহরণ করিব না। আমি বৈশ্ব বৃত্তিতেই অবস্থিত থাকিয়া তোমাকে কর প্রদান করিব। তুমি এই রাজ্য ভোগ কর অথবা ইচ্ছা হইলে পরিত্যাগও করিতে পার।' লোকে বাহাতে নিজ নিজ বর্ণমর্যাদা অতিক্রম না করে পরবর্তীকালের রাজগণ সে বিষয়ে খর দৃষ্টি রাখিতেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, বিস্ময়জনক ক্রিয় বংশে জয়গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, দ্রোণ ও কৃপ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা কেহই সমাজ হইতে চ্যুত হন নাই। মনুর সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসরকাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন বাবাবর দস্যুদল দেখা বাইত। দস্যুদলপতির প্রায়ই নিজেদের দেশে রাজার মত প্রজাপালন করিত। তাহারা অপরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠপাট করিত। পররাজ্য আক্রমণে তাহারা অনায়াস যুদ্ধের আশ্রয় লইত। বাবণ এইরূপই একজন দস্যুরাজ বা রাক্ষসপতি ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও দস্যুত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যার প্রসার। বৈবস্বত মনুকালে

জ্যোতির্বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সময় পূর্বপরিচিত জ্যোতির্কর্ণের নতুন করিয়া নামকরণ হয়। বৈবস্বত-পিতা বিবস্বানের নামানুযায়ী সুর্যের নাম হইল, ধর্মপুত্র সোমের নামে চন্দ্র পরিচিত হইল, ভৃগুপুত্রের নামানুযায়ী শুক্রগ্রহের নাম হইল। সেইরূপ বুধ, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামে গ্রহগণ নাম পাইল। তখনকার দিনে উত্তর দিক উচ্চ দিক বলিয়া কল্পিত হইত। সর্বোচ্চে অবস্থিত নক্ষত্রের নাম ধ্রুবের নামানুযায়ী ধ্রুব হইল। অহুমান হয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৌরোপর্ষ অহুসারে সর্বোচ্চ ধ্রুব হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যোতির্কর্ণের নামকরণ হইয়াছিল। পুলস্ত, পুলহ প্রভৃতি ঋষির নামানুযায়ী সপ্তবিমণ্ডলের তারকাদের নামকরণ হইয়াছিল। দক্ষ কন্তা বা কন্তাস্থানীয়া ব্যক্তিগণের নাম অহুসারে ২৭ নক্ষত্রের নাম হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু মৌহিত্যের নামে চন্দ্রসুর্ষগ্রাসকারী ছায়া রাহু নাম পাইল। রাহু যে বাস্তবিক মণ্ডলাকৃতি পৃথিবীর ছায়া তাহা জানা ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ৮০।৬৩। পৃথিবীর আকৃতি যে গোলাকার তাহাও জানা ছিল। চান্দ্র, সৌর্য, সাবন ও নাক্স এই চারি প্রকার মাস এবং পাঁচ বৎসরের লৌকিক যুগ নির্ণীত হইল। দীর্ঘতরকাল পরিমাপের জন্য ১০০০ যুগ অর্থাৎ ৫০০০ বৎসরের কল্প নির্দিষ্ট হইল। কল্পের অন্তর্বিভাগ হিসাবে প্রতি ৭১ যুগের অর্থাৎ ৩৫৫ বৎসরের 'মনুকাল' কল্পিত হইল। 'মনু' ১৪টি। এই কালের সহিত ১৫টি ২ বৎসরের সন্ধি স্থির করিয়া তাহা ৫০০০ বৎসরের কল্পের সহিত খাপ খাওয়ান হইল। ১৪মনু + ১৫সন্ধি = ১৪ × ৩৫৫ + ১৫ × ২ = ৪৯৭০ বৎসর + ৩০ বৎসর = ৫০০০ বৎসর। স্বায়ম্ভুব মনুকে আদি বৈশ্ব স্থির করিয়া 'মনু' কালের সাহায্যে ইতরভৌত উদ্দেশ্যে কাল গণনা হইত। পরে আরও নানা প্রকার যুগের দ্বারা কালমাপনা প্রবর্তিত হয়। গ্রহাদির নামকরণ ও যে সকল জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় তথ্য বলা হইল তাহা ৩৭০০ খ্রী-পূর্বাব্দের পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

শিক্ষা। শিক্ষা ও ভাবাকে সভ্যতার মানদণ্ড মনে করা বাইতে পারে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রম কাল উপনয়নের বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া, ২৪ এমন কি ৩৬ বয়স পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল। ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহেই থাকিতে হইত। আশ্রমের স্থান লোক-কোলাহল হইতে দূরে শান্ত পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্ট হইত। ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈশ্ব এই তিন জাতিকেই আশ্রমধর্ম পালন করিতে হইত। ব্রহ্মচারীর সমস্ত সময়ই লেখাপড়া,

বিনয়, সদাচার ও ধর্মোচরণ শিক্ষার কাটিত। তাহাকে কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিতে হইত। সর্বপ্রকার আলস্য ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া গুরুসেবা ও গুরুর সাংসারিক কার্যে সহায়তা করিতে হইত। পরিধেয় ও বিছানাপত্রের সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িতে হইত। গোচারণ, কাঠাদি আহরণ প্রভৃতি প্রমসাদ্য কার্য ও গুরুর জন্ত ভিক্ষা করিতে হইত। মোটকথা, ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থাকিয়া শিষ্যের সর্বপ্রকার কায়িক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইত। সব কাজেই, এমন কি ভিক্ষা করাতেও, বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। এখনকার মত অবিনীত ছাত্র তখন প্রায়ই দেখা বাইত না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কদাচিত্ কলহ হইত। কথিত আছে, বাজবল্লভ তাঁহার গুরুর সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। নগর হইতে দূরে আশ্রম থাকায় ব্রহ্মচারীর কোন প্রকার চিন্তাচঞ্চল্যের কারণ ঘটিত না। ছাত্রেরা একমনে লেখাপড়া করিত। গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের সামর্থ্যমত গুরুদক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে যাইত। গুরুগৃহে থাকাকালীন শিষ্যরা গুরুর পরিবারভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইত এবং তাহাদের নিজেদের কিছুই খরচ করিতে হইত না, সেইজন্য আশ্রম ছাড়িবার সময় শিষ্যরা গুরুদক্ষিণা হিসাবে স্বর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাত্রকা, আসন, খাদ্য, শাক, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়া গুরুকে সম্ভর্ষিত করিত। শিষ্য অসমর্থ হইলে অন্তত পক্ষে তাহাকে ছত্র ও পাচুকা দিতে হইত। কোন কোন শিষ্য বিবাহাদি না করিয়া আত্মবিন-কাল গুরুগৃহে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। আবার কেহ কেহ এক গুরুর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অপর গুরুর নিকট নূতন বিষয়ে শিক্ষার জন্ত যাইত। তখনকার দিনে সাধারণত এই কয়টি বিদ্যা শিখান হইত—ব্রহ্মবিদ্যা, বেদ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিকৃষ্ট, ব্যাকরণ, বোদ্ধান্ত, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ, যৌমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ, পার্শ্ব বেদ অর্থাৎ সনাতন শাস্ত্র, নির্দিশাস্ত্র অর্থাৎ ধনরত্নাদি পরীক্ষা বিষয়ক শাস্ত্র, নির্মিত বিদ্যা অর্থাৎ নানা লক্ষণ বিচার করিয়া বিপদের সন্ধাননা অহুমান; যুত্ম, অগ্নিদাহ, প্রাবন, কৃষিকম্প প্রভৃতি ঘটনা এবং বৃক্ষের ফলাফল অহুমান ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত, অর্থ-শাস্ত্র, পণিত, ভূতবিদ্যা, সর্প ও দেবজ্ঞান বিদ্যা অর্থাৎ দেবতা-মানব সর্প প্রভৃতি জাতির নৃতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান, পর্বতাদির সংস্থান অর্থাৎ ভূগোল, বাস্তবশাস্ত্র অর্থাৎ মন্দির বাসস্থান নগর গ্রাম প্রভৃতি নির্মাণ, শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যার বহু পুঁথি ছিল এবং এই পুঁথি ব্রহ্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইত। সংকুত সাহিত্যে বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে

পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাবের লিখিত পুঁথি একত্রিত করিলে তাহার অর্ধেকও হইবে না।

গুরুগৃহে পাঠের সুবিধা এই যে চর্চন প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু গভীর অমূল্য তথ্য সম্ভবপর সাধারণ বিদ্যালয়ে বা কলেজে তাহা নহে। অপর পক্ষে বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য প্রয়োগশালার আবশ্যক হওয়ায় এখনকার ব্যবস্থাই প্রশস্ততর। প্রয়োগশালা না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। সেই সময়কার কোন জাতি বিজ্ঞানে ভারতীয়দের মত অগ্রসর হইতে পারে নাই। আধুনিককালে অন্যান্য সভ্যজাতির তুলনায় ভারত বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় পিছাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী ও শূদ্রাদির শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অনধিকারীর শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্য প্রকার ছিল। স্ত্রী এবং শূদ্রের আশ্রমধর্ম নাই। অনেক সময় গুরুকন্যাগণ অন্যান্য শিষ্যের সহিত পাঠ লইতেন এবং পিতৃগৃহে থাকিয়াই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেন। সাধারণ উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের অবস্থা এই সুবিধা ছিল না কিন্তু তাঁহাদের ভিতর অনেকেও যে নানা বিদ্যা অর্জন করিতেন, তাহার প্রচুর উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বহু স্ত্রী-ঋষির স্মৃতি আছে। কোন কোন পুরাণকার অনার্য স্ত্রীলোক। পুরাণে মদালসা নামী এক ধর্মশাস্ত্র পারদর্শিনী হুশিক্ষিতা রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। যে সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ শিক্ষার সুযোগ মিলিত না তাহাদের এবং শূদ্রদের জন্য নানাপ্রকার লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয় লোকও যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। লোকশিক্ষার ব্যবস্থায় অল্প পরিচয় হইত না বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার কোনও ব্যাঘাত হইত না। প্রাচীন কালে নানা প্রকার ব্রত, পার্বণ এবং দানবিধি প্রচলিত ছিল। লোকে পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যান, উপাখ্যান শ্রবণ করিত। রাজগণের নিয়মিত পুরাণ শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকের ও শূদ্রদিগের এই সকল অল্পটানে যোগ দেওয়ার কোন বাধা ছিল না। ব্রত, পার্বণ ও তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়া অনেক জ্যোতিষিক, ভৌগোলিক ও ইতরবৃত্তীয় তথ্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণে এই সকল ব্রত ও উপবাসসময় বিবিধ দানধর্মকে ‘ধর্ম, অর্থ এবং কাশ-সাধক’ বিবরণ বলা হইয়াছে। মৎস্তপুরাণে যে নানাবিধ ব্রতের বিবরণ দেওয়া আছে তাহা পাঠ করিলেই আমার উজ্জ্বল সার্থকতা বৃদ্ধি হইবে। পুরাণ, আখ্যান প্রভৃতি শ্রবণে লোকের ইতরবৃত্তীয় কৌতুহল ও ধর্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইত। তাহা ছাড়া লোকে ইহাতে সমাজনীতি, স্বাস্থ্য-

নীতি, সমাচার প্রভৃতিরও শিক্ষা পাইত। আধুনিককালেও লোকশিক্ষার অন্য কথকতা প্রভৃতি অল্পবয়স প্রচলন আছে। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠও অনেক লোকে শুনিয়া থাকেন। আমাদের দেশে নিরক্ষর জনসাধারণ এখনও অল্প দেশের নিম্ন শ্রেণীর লেখাপড়া জানা সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত ছিল। এক প্রাকৃত অপরটি সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতি জাত অর্থাৎ কেহই ইহার সৃষ্টি করে নাই। মানুষ স্বভাবত মাতৃকোড়ে থাকিয়া যে ভাষা শিক্ষা করে তাহাই প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা প্রদেশ অল্পসারে ভিন্ন প্রকারের হয়। প্রাকৃত শব্দের আদিম অর্থ অল্পসারে বাংলা, গুজরাতি, হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়া, তামিল, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষা প্রাকৃত। একই প্রাকৃত ভাষার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। পূর্ববঙ্গের বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বিভিন্ন। প্রাকৃত ভাষা বলিতে আজকাল একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত ভাষা বুঝায়। পুরাকালে প্রাকৃত শব্দের এই সর্গীয় অর্থ ছিল না। আমি প্রাকৃত শব্দটি পুরাতন অর্থেই ব্যবহার করিব। একই প্রদেশের স্থানভেদে প্রাকৃতিক ভাষার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সেই প্রদেশের লেখ্য ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় এবং প্রদেশবাসী সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি সেই ভাষা সহজে বুঝিতে পারেন। প্রাকৃত ভাষার কিছু সংস্কার করিয়া লেখ্য ভাষা গঠিত হয়। এই সংস্কার স্বাভাবিক কতকগুলি নিয়মের বশেই হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে একথা সত্য কিন্তু যে সংস্কারের ফলে ইহা এক পূর্ণাঙ্গ ভাষার রূপ পাইয়াছে তাহা অতি সুদূরপ্রসারী এবং সুপরিষ্কৃত। পরিকল্পনা অল্পসারে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃতের বর্ণবিন্যাস ও শব্দ, সন্ধি ও সমাস গঠন ও ইহার ব্যাকরণ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অল্পস্বত হয় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অপর সকল ভাষাতেই বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রিত হইয়া আছে। উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাগও অন্য ভাষায় দেখা যায় না। সংস্কৃতের শব্দ-সম্পদও অতুলনীয়; এই ভাষায় ১,৮০,০০০-এর উপর শব্দ আছে। যে কোন ভাষা ভাব সংস্কৃতে প্রকাশ করা যায়। এক বা একাধিক প্রাকৃত ভাষার আবুল-সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, এইজন্যই ইহার নাম সংস্কৃত। এই ভাষা কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিবাই বুঝিতে

পারিতেন। এখন যেমন লেখ্য বাংলা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির কথ্য হইয়াছে পুরাকালে সেইরূপ অনেকেই সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতেন। ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণ সংস্কৃত ব্যবহার করিতেন। অপর পক্ষে গ্রীলোক এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাকৃতে কথা বলিতেন। প্রাকৃত হইতে অনেক শব্দ যেমন সংস্কৃতে আসিয়াছিল সেরূপ সংস্কৃত হইতেও নানা শব্দ পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষা-গুলিকে পুষ্ট করিয়াছে। বাংলা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতে এখনও সংস্কৃত হইতে শব্দ দোহন চলিতেছে।

সংস্কৃত ভাষা মূলত বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের ভাষা ছিল বলিয়া ইহাকে ব্রাহ্মী ভাষাও বলা হইত। সংস্কৃত ভাষার আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। পরে দেবনাগরী লিপির চলন হয়। সংস্কৃত কোন প্রাদেশিক ভাষা না হওয়ায় বিদ্বানগণের মধ্যে ভাষার আদান-প্রদানের জন্য ইহা ভারতের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই ভাষা সৃষ্ট হইবার পর হইতে বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখিতে লাগিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি সকল বিদ্যার গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত। সংস্কৃত কেবল যে রাষ্ট্র-পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা নহে। অনেক কবি ও বিদ্বান ইহাতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে কাব্য প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারতের মত বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় নাই। বাহ্যিক বস্তু সকল প্রদেশের লোককে শুনাইবার দরকার হইত তিনিই সংস্কৃতে লিখিতেন। এই ভাষার দ্বারা সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মের আচরণে ও শিক্ষার দ্বারা যে মূল ঐক্য দেখা যায় তাহা এই সংস্কৃতের প্রভাবেই। সংস্কৃতের মত এক কৃত্রিম ভাষা যে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা পরম আশ্চর্যের বিষয়। বাহ্যিক এই ভাষা আবিষ্কার ও প্রচলন করিয়াছিলেন তাঁহাদের দূরদৃষ্টি প্রশংসার অতীত। পৃথিবীতে সংস্কৃতের ন্যায় আরও একটি কৃত্রিম ভাষা প্রচলিত আছে তাহার নাম এস্পারান্টো (Esperanto)। ইহা আধুনিককালে সৃষ্ট হইয়াছে। এস্পারান্টো পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধন করিবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা সফল হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। কাহার দ্বারা এবং কবে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন হয় তাহার কোন বখাণ্ড সন্ধান পাওয়া যায় না তবে এ ভাষা যে খুবই পুরাতন সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার ন্যায় ক্রমে পড়িয়া উঠে নাই। বাহায়া ইহাকে চালাইয়াছিলেন তাঁহার প্রথম হইতেই ইহাকে পূর্ণাঙ্গ ভাষারূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ ভাষা লোকসমাজে প্রচলিত না থাকায় তাহার কোন ঐতিহ্য ছিল না সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার ইচ্ছামত গঠনে কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ঐষ্টা ইহার যে রূপ দিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। কালে সকল ভাষাই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয় কিন্তু সংস্কৃতের বেলায় সে কথা খাটে না। বৈদিক ভাষা ও সাধারণ সংস্কৃতের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু উভয়ই কৃত্রিম ও সমকালীন। বৈদিক ভাষা সাধারণ সংস্কৃতের প্রকারভেদ মাত্র। ঋগ্বেদে এক স্থানে ১১০ম। ১১।২-৩৭ উল্লেখ আছে যে, ঋষিরা কোন এক সময়ে ভাষাকে চালুনির দ্বারা ছাড়ু ছাঁকার ন্যায় ছাঁকিয়াছিলেন। ইহাতে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহাতে ‘ভদ্রালক্ষ্মী আসিয়াছিল এবং সপ্তছন্দ তাহার চারদিকে নৃত্য করিয়াছিল। এ ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে নাই। পরে সেই ভাষাকে আহরণ করিয়া বিধানগণ নানা বিদ্যা-মন্দিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন।’ ভাষা সংস্কারের কথা উল্লেখ ঋগ্বেদের এই স্তোত্র বাতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে “এক সময় বেদ ভাষা-সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। পরে সেই ভাষার প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণ সংসাধিত হইল, তাহা ‘ব্যাকৃত’ ভাষা বলিয়া গণ্য হয়। এই মহৎ কার্য ইন্দ্র সম্পন্ন করিয়াছেন। তদবধি ‘ব্যাকৃত’ বাক্য ঋষিদের মুখে অত্য়াদিত হইতেছে”। উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদ প্রবেশিকা, ১৭৮পৃ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতির কাহিনী বলা হইয়াছে।

সংস্কৃতের ন্যায় কৃত্রিম ভাষা চালাইতে বিধানগণের সাহায্য ব্যতীত কোনও প্রবল রাজশক্তির আশ্রয়ও আবশ্যক হইয়াছিল অল্পমান করা যায়। বৈবস্বত মন্বন্তরে পরিকল্পনা অল্পদূরী অনেক বিষয়ে নৃতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। হয়ত সংস্কৃত ভাষা সেই সময়-কার সৃষ্টি। ঋগ্বেদে ঋষিরা অনেক সমসাময়িক ব্যক্তিদের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের অথবা সেই ঋষিগণের কাল অবিকাংশ কেজ্জেই পুরাণ সাহায্যে ধরাধর পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, ইহারা বৈবস্বত মন্বন্তর পরবর্তী। বৈবস্বত মন্বন্তর ৩৮১৪ খ্রী-পূর্বাব্দ। ঋগ্বেদের কেবল এক স্থানে ১১০ম। ১৪৮।। বেণপুত্র পৃথুর রচিত স্তবের উল্লেখ আছে। পৃথু বৈবস্বত মন্বন্তর পূর্ববর্তী। অল্পমান হয়, পৃথুর স্তবের ভাষা পরিবর্তিত করিয়া কোন ঋষি তাহা

ইন্দ্রস্বত রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। পৃথুর স্তবের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে ‘বেণের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে’। ঋগ্বেদের একই স্তব যে বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কখন কখন তাঁহারা স্তোত্রগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতেন। ৮ম। ২। ১০ শ্লোকে শশকর্ণ ঋষি বলিতেছেন, ‘হে অশ্বিনয়, কাকিবাণ ঋষি বেক্রপ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, বেক্রপ ব্যাধ ও দীর্ঘতমা, বেক্রপ বেণের পুত্র পৃথু বজ্রগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপেই আমি স্তব করিতেছি, আমার এই স্তোত্র অবগত হও। রমেশচন্দ্র দত্ত। লকল বজ্জে ঋষিরা নৃতন স্তব তৈয়ারী করিতেন না। পুরাতন স্তোত্রই অনেক সময় গীত হইত। আবার একাধিক ঋষি একই স্তুত হয়ত কখনও ব্যবহার করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১ম। ১০০, ৮ম। ১১, ৮ম। ১০২, ২ম। ১০৮, ১০ম। ১৩৭ ইত্যাদি স্তুতগুলি দেখিলেই এই কথাটা পোষকতা পাওয়া যাইবে। বৈবস্বত মন্বন্তর বহু পূর্বকাল হইতেই যে বজ্র প্রচলিত ছিল এবং ইন্দ্র, বক্রণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নামে স্তব পাঠ হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু এই সময়ের স্তুত সকল বেদে আহরণ করা হয় নাই। হয়ত প্রাকৃত ভাষায় এই সব স্তব রচিত হইত। বেদের আহাব ও নিবদ্ মন্ত্রগুলি অতি প্রাচীন; এগুলির ভাষা কোন পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা বলা যায় না।

সভ্যতা সম্বন্ধীয় কতিপয় তথ্য। বৈবস্বত মন্বন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের কাল পর্যন্ত ভারতে যে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহার সমগ্র বিবরণ দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন পুরাণগুলি পাঠ করিলে এ তথ্য সহজেই পাওয়া যাইবে। এখানে মাত্র কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক কথা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাচীন কালে ভারতে কার্পাস, মসিনার ছাল, রেশম, পশম ইত্যাদি হইতে অনেকপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারী হইত। বস্ত্র যুগের চামড়া হইতে এক প্রকার অতিশয় কোমল শস্যার আস্তরণ প্রস্তুত হইত। ঋষি ও ব্রাহ্মচারীরা বহুল পরিধান করিতেন। তখন চক্রবর্তী সম্রাট খুব কমই ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজারা রাজত্ব করিতেন। রাজত্ব আলাচনায় দেখা যায় যে, রাজারা প্রজাবঞ্ছন করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের বনাম রাজা। এ গুণ না থাকিলে অবিকাংশ কেজ্জেই তাঁহাদের রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছে। রাজপিতাও অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাঁহার শাস্তি হইত, এমন কি প্রাণদণ্ডও দেওয়া হইত। রাজপুত্রের বেলাও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। রাজা নিজেকে প্রজাদের বেতনভুকৃ ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। কোন কোন রাজার আমলে শত্রু আইন

(arms act) প্রচলিত ছিল। চক্রবর্তী রাজা কার্তবীৰ্য্যকূন আদেশ প্রচার করেন, 'অন্যাবধি আমি ভিন্ন যে অস্ত্র গ্রহণ করিবে সেই পরহিংসারত বা নহা বলিয়া গণ্য হইবে এবং সে আমার বধ্য হইবে'। তিনিই একমাত্র গ্রাম-পালক, পশুপালক, ক্ষেত্রপালক, ব্রাহ্মণপালক, তপস্বীরক্ষক ও অৰ্ধপালক হইলেন। তাঁহার সময়ে কাহারও কোন অব্য চুরি বাইত না। মনুসংহিতায় আছে, অপরের তুণ, শাক, মুক্তিকা, ফুল ও জল না বলিয়া লইলেও তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হইবে না। তখন বোধ হয় এই সব দ্রব্যের খুবই প্রাচুর্য ছিল। পরবর্তীকালে এই সকল দ্রব্য বিনা অত্মমতিতে গ্রহণ করা নরকপ্রদ দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

তখনকার দিনেও প্রজা এবং পশু গণনা হইত ও রাজা তাহার হিসাব রাখিতেন। সর্প, পশু ও পক্ষীকে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাইবে না এইরূপ উপদেশ আছে। রোমে গ্যাভিডেটারদের যুদ্ধ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে নিষেধ সন্তে ও মৃগী ও বুলবুলের লড়াই পুরাকাল হইতে অন্যাবধি প্রচলিত আছে। কৃষ্ণের সময় ক্রীড়াঙ্কলে যে মনুষ্য হইত তাহাতেও অনেক সময় প্রাণহানি ঘটিত। মল, মূত্র, রক্ত, খুঁখু, বিষ ইত্যাদি অপবিজ্ঞ দ্রব্যযুক্ত বস্ত্র জলাশয়ে প্রকালন করা নিষেধ ছিল। অপরের ব্যবহৃত বস্ত্র, জুতা বা খড়ম পরা দূষনীয় গণ্য হইত। যে খাদ্যের উপর কেহ হাঁচিয়াছে তাহা কেয়িরা দিবার আদেশ আছে। গণ্য অৰ্থাৎ বহু লোকের জ্ঞাত যে অন্ন পাক করা হয় তাহা গ্রহণীয় নহে। হোটেলের অন্ন গণ্য। গৃহকর্তা নিজ ভৃত্যের সহিত একত্রে খাইবেন ইহাই গার্হস্থ্য ধর্মের উপদেশ। এখনও উত্তর-প্রদেশে কোন কোন পরিবারের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। রোগবহুল গ্রাম পরিত্যাগ করা বিহিত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি কুটুম্ব পালন না করিয়া দান

করে, তাহার দান অসিদ্ধ। পুণ্যে আছে যে, ব্রীকে হাঁচিতে, হাই ভুলিতে বা বদুচ্ছা ভাবে বসিয়া থাকা অবস্থায় দেখিবে না।

খনিজের উপদেশ। প্রাচীন ভারতের স্বমহান ঐতিহ্য আজও আমাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেই ঐতিহ্য স্বরণ রাখিয়া যদি আমরা সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের সাফল্য স্থনিশ্চিত। অতি পুরাকালে খনিজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কাল ৩৬৮৩ খ্রী-পূর্বাব্দ। তিনি এক ধর্মশাসন প্রবর্তন করেন। রাজা খনিজের ধর্ম-শাসন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি :

'সকল প্রাণী আনন্দ উপভোগ করুক। বিজ্ঞান স্থানেও তাহার স্নেহযুক্ত হউক, সর্বভূতের মঙ্গল হউক এবং সকলেই নিরাতঙ্কতা লাভ করুক। প্রাণিগণের ব্যাধি বিনষ্ট হউক। কাহারও ঘেন মনঃকষ্ট না হয় এবং সকল প্রাণী সকলের প্রতি মিত্রতাব প্রকাশ করুক। দ্বিজাতিগণের মঙ্গল ও পরস্পরের প্রীতি, সকল বর্ণের সমৃদ্ধি এবং সর্বকর্মের সিদ্ধি হউক। হে জনগণ, তোমাদের সর্বভূতে সর্বদা মঙ্গল বৃদ্ধি হউক, তোমরা যেক্ষণ নিজের ও পুত্রগণের হিতকামনা করিয়া থাক, সেইরূপ সর্বভূতের হিতকারী হও। ইহাতেই তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে। কে কাহার নিকট অপরাধী হয়? কোন মৃচবুদ্ধি ব্যক্তি কাহারও অহিত করিলে তাহার নিজেরই অহিত হইয়া থাকে, কারণ কর্মফল কর্তারই উপভোগ্য। হে মনুষ্যগণ, তোমরা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও। হে বৃথগণ, তোমরা লৌকিক পাপে প্রবৃত্ত হইও না। এইরূপ করিলে তোমরা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে। যে আমাকে আজ স্নেহ করিতেছে, পৃথিবীতে সর্বদা তাহার মঙ্গল হউক, যে আমাকে ঘেব করিতেছে সেও সর্বদা মঙ্গল উপভোগ করুক।'

নববসন্তে

জীবজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত আসিল আঁধি আমের বুকুলে।
লাজিয়াছে বনভূমি পুশিত শিমুলে।
সজ্জিমার স্তম্ভ হাতে এসয় বহুবা,
দিক হতে দিগন্তে সজীভের সুবা।
আমল-উবেল কটে হকার কোকিল।
দিখিলের অবরুদ্ধ জ্বরের বিল।
ঝিমঝিম গুলিল আঁধি কোন্ বাহকর।
বর্ষারঝিমিতে সারা অরণ্য সুখর।

তোমরা আসিবে সারা পতাবর্ষ পরে—
এমনি বসন্ত-দিনে বনের বর্ষরে
পুলকে চকল হবে তোমাদেরও প্রাণ।
সেদিনও আমের বনে কোকিলের গান
এমনি উঠিবে বাজি। সারসের হিরা
রূপে রূপে একই সুরে উঠিছে কাঁপিয়া।

আনারকলি

ঐন্দিয়া দেবী চৌধুরাণী

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(কাজী সাহেবের আদালত। পুঁথিপত্র সহ কাজী সাহেব উচ্চ মঞ্চে আসীন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে মামলদ্বার, পেশকার, সেরেস্তাদার, নাজির ইত্যাদি ঘিরিয়া বসিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুই চাপরাশী দণ্ডায়মান।)

এক জন চাপরাশী। (বাহিরে গিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক) হজুর বীরবল মজীজী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কাজী। তাঁকে সম্মানপূর্বক ভিতরে নিয়ে এস আর তোমরা সকলে বাইরে অপেক্ষা করো—দেখ যেন কেউ এখন এখানে না আসে।

(বীরবলের প্রবেশ ও কর্তৃচাঙ্গিণের প্রস্থান)।

কাজী। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক, মজীজী। আজ আমার কি সুপ্রভাত! (নিজপার্শ্বে বীরবলকে বসাইলেন।)

বীরবল। সু কি কু, সে আপনার মজ্জির উপর নির্ভর। আমি ত আপনাকে সৎপরামর্শ দিতেই এসেছি; তবে নেওয়া-না-নেওয়া সে আপনার হাত।

কাজী। আমরা রাজভৃত্য, রাজমজ্জীর পরামর্শ রাজারই আদেশ বলে গণ্য এবং মান্য করি। ধর্মের অবিরোধী বা বলবেন তাই করতে প্রস্তুত আছি।

বীরবল। দেখুন কাজী সাহেব, আদালত ও মসজিদ ঠিক এক স্থান নয়। মন্দির মসজিদে লোকে বায় পরমার্থ-সিদ্ধির জন্য; কিন্তু আদালতে আসে স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

কাজী। তা ত বটেই, তবে সে স্বার্থ বাতে ন্যায়তঃ-ধর্মতঃ সিদ্ধ হয়, তাই দেখবার জন্যই ত আমাদের এ জায়গার বসানো হয়েছে মজীজী?

বীরবল। শাস্ত্রীয় অর্থে ধর্ম মানে আইন। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, সংস্লে একই আইনের একই অর্থ করে? বা একই পাপে একই দণ্ড হয়?

কাজী। তা কেমন করে বলব হজুর? নিজ নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বা ন্যায়সম্মত ও আইনসম্মত বলে বোধ করি, সেইরূপ রায় দেবার চেষ্টা করি, এই মাত্র বলতে পারি। কিন্তু আইন সযত্নে আলোচনার ভিতরে বোধ হয়, হজুরের কোন উদ্বেগ আছে।

বীরবল। তা নইলে কি ভিজ়ে ধসধসের চিক-ঢাকা ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরের অভ্যন্তর দিবানিবার অংশখ্যা ছেড়ে,

এই গ্রীষ্মকালের দিনরূপুষের যৌবন ও ধূলা উপভোগ করবার জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি বিষয়ী লোক, এক আঁচড়েই সব বুঝতে পারেন। তাই আর বুধা আপনার অমূল্য সময় নষ্ট না করে, আসল প্রস্তাবে আসা থাক। আজ খোদ রাজপ্রাসাদ থেকে একটি বিশেষ মামলা রুজু করা হয়েছে, তা আপনি অবগত আছেন নিশ্চয়?

কাজী। হাঁ, আপনি যখন এলেন, আমি তারই কাগজ-পত্র উন্টে পাণ্টে দেখছিলাম।

বীরবল। তার থেকে কি সার সংগ্রহ করলেন জানতে পারি কি?

কাজী। আনারকলি নামে একটি আকথান মেয়ে কারুলের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাসাবধি বেগমসাহিবাবাদের আশ্রয়ে থাকে। মেয়েটি বড় আনন্দময়ী ও অনিন্দ্যহৃদয়; মাঝে মাঝে আমার জ্বর কাছে বেড়াতে আসত। তার মোহিনী রূপ দেখে—

বীরবল। কাজীসাহেব, রূপে মোহিত হবার দিন আপনারও নেই, আমারও নেই। কাজের কথা আর কিছু থাকে ত শীঘ্র বলে ফেলুন। কবিরের পক্ষে কাল নিরবধি হতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সময় সীমাবদ্ধ।

কাজী। বাচালতা মাপ করবেন হজুর; তাকে দেখলে আমার একটি বুভা কস্তার কথা মনে পড়ে। আরজিতে লেখা রয়েছে যে মেয়েটি নীচবংশের হয়েও শাহাজাদার প্রতি চোখ তুলতে সাহস করেছে, এবং সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও বারংবার অন্তঃপুর-উদ্যানের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। এমন কি, সে এতই দুর্কিনীতা যে, গত উৎসব রজনীতে শাহেন-শাহর চোখের সামনে শাহাজাদার সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টিবিনিময় করতেও কুঠী বোধ করেনি। তাই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে অসমাপ্ত উৎসব বন্ধ করেন, এবং এই গুরুতর অপরাধের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ রাখতে আদেশ করেন।

বীরবল। আমি এই শোচনীয় দুর্ঘটনার এক জন প্রত্যক্ষদর্শী। সবই বখাও লেখা হয়েছে। এখন আপনি এই গর্হিত আচরণের কি দণ্ড আইনসম্মত মনে করেন?

কাজী। অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতাগ্রস্তত দুইটিই আইন সর্বস্বাই কমার চক্ষে দেখতে প্রস্তুত। এখানে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের প্রয়োজন হবে না।

বীরবল। একে আপনি বলতে চান লঘু পাণ ? যে শাহাজাদা দু'দিন পরে দিল্লীর তক্তে বসবেন, তাঁকে হুকুম জালে জড়িত করে তাঁর মহৎ বংশে কলক লেপন করবার ছরতিসিদ্ধি ত আমার মতে সামান্য বালিকার পক্ষে অসম্ভবীয় অপরাধ, এবং কঠিনতম দণ্ডের বোধ্য।

কাজী। হজুর, আইন রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ মানে না। এই সরলা বালিকা শাহাজাদাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় ছিল, কিংবা তার অজ্ঞতার স্ববোগ নিয়ে তিনিই নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার চেষ্টায় ছিলেন, তার প্রমাণ কি আছে ? অল্পমান ত প্রমাণ নয়।

বীরবল। আচ্ছা বেশ, আপনি আপনার পুঁথিনথি সাক্ষীসাবুদ নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হোন, আমিও উপস্থিত থাকি। কিন্তু নিজের জীপুত্রের প্রতি মায়া বেশী, না এই অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি দরদ বেশী, তাও এই সঙ্গে প্রমাণ হয়ে বাবে, সে কথা মনে রাখবেন।

কাজী। তথাস্তু। চাপরাশী !

চাপরাশী। জী হজুর।

কাজী। আসামী আনারকলিকে হাজির করো— আদালতের কর্মচারীদেরও ডাকো।

(অল্পক্ষণ পরে চাপরাশী কর্তৃক আনীত, মলিনবস্ত্র পরি-
হিতা, ব্রাহ্মণী আনারকলির প্রবেশ, পশ্চাতে রোশেনারা
ও ইলাহীবক্স। আনারকলি কাজীসাহেব ও বীরবলকে
অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে দাঁড়াইল, অন্যরা চাপরাশীর
ইজিতে বসিল। কর্মচারীগণ একে একে কিরিয়ী আসিয়া
বথাস্থানে বসিল।) (কাজী আনারকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন) সত্য কথা যদি বল ত কোন ভয় নেই। তোমার
নাম কি ?

আনার। আয়েষা খাতুন।

কাজী। তবে তোমাকে আনারকাল বলে ডাকে কেন ?

আনার। এখানে এসে আমার ঐ নতুন নামকরণ
হয়েছিল।

কাজী। এ নাম দিলে কে ?

আনার। রাজসভার একজন, তিনি কে, আমি ঠিক
জানি নে।

বীরবল। (জনাস্তিকে) কিন্তু আমি জানি। তিনি
হচ্ছেন রাজকবি কৈফী। (হাসিয়া) ছেলেবুড়ো সেদিন
সকলেই অল্পবিস্তর ঘায়েল হয়ে পড়েছিল; আমি বলি নি
যে, আপনি মেয়েটিকে বত অবলা সরলা ঠাণ্ডেছেন,
সে ঠিক তা নয় ?

কাজী। তোমার বাপের নাম কি, দেশ কোথায়,
বয়স কত ?

আনার। আমি কাবুলের মুল্লী মহিউদ্দিনের মেয়ে,
আমার বয়স ষোল।

কাজী। তোমার সঙ্গে কে কে এসেছেন ?

আনার। এই ইনি, আমাদের শহর-কোতোয়াল
ইলাহীবক্স সাহেব; আর ইনি, আমাদের কাজীসাহেবের
মেয়ে রোশেনারা।

কাজী। রোশেনারা, তুমি বলতে পার তোমার সখীর
উপযুক্ত বয়স হওয়া সঙ্গেও এতদিন বিবাহ হয় নি কেন ?

রোশেনারা। হজুর, মা-বাবা বিয়ে দেবার বখেটে চেষ্টা
করেছেন, আয়েষাই কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয় নি।

কাজী। কেন ? কোন গোপন কারণ ছিল কি ? সব
কথা খুলে না বললে সুবিচার হওয়া শক্ত মনে রেখো।

বীরবল। যে রকম দেখছি, একটি নয়, খুব সস্তর
অনেকগুলি গোপন কারণ ছিল। স্বাধীন জেনানা হতে
পেলে অস্তঃপুরের গারমে কে বন্ধ থাকতে চায় বল ?

ইলাহী। (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া) আয়েষা খাতুনের
নামে কাবুলে কোন দিন কোন কলঙ্কের লেশমাত্র স্পর্শ
করে নি। এখানে যে নরধাম তাঁর পবিত্র নামে আভাসে-
ইজিতে অপবণ আরোপ করতে সাহস করবে, তার জন্য
এই তরবারি মুক্ত রয়েছে, সাবধান !

বীরবল। (হাসিয়া) ভেবেছিলাম কাবুল জঙ্গলী অসভ্য
দেশ, কিন্তু সেখানেও দেখছি নাটুকে ভাবভঙ্গী বেশ প্রভাব
বিস্তার করেছে। গোপন কারণগুলির মধ্যে একটি যে
সশরীরে এখানে উপস্থিত আছেন, তা স্পষ্টই বোঝা
যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকেও সাবধান করে দিচ্ছি যে, একাধিক
বার এরকম অনাহুত সাক্ষ্য দিলে তাঁকে কারাগারের
ভিতরে একেবারে গোপন থাকতে হবে; তখন সাক্ষ্য ও
সাক্ষ্য হু-ই বন্ধ হবে।...কাজীসাহেব, এরকম অর্ধ কত
প্রমাণ পেলে তবে আপনার বিশ্বাস হবে যে, জীলোককে
বিশ্বাস করতে নেই ?

কাজী। শাস্ত্রবচন মানতে হলে ত রাজপুরুষকেও
বিশ্বাস করা চলে না, হজুর। আচ্ছা রোশেনারা, তোমার
বন্ধুর এই বয়সে এমন অস্বাভাবিক বৈরাগ্যের কোন সঙ্গত
কারণ দেখাতে পার কি ?

রোশেনারা। বাড়ীতে তার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে
কখনো আলোচনা হয় নি হজুর, কি করে বলব ?

কাজী। শুধু মুখের আলোচনার মনোভাব প্রকাশ
হয় না, ভাবে হয়, কাজে হয়। এখানে এসে অবধি
তোমার সখীর ভাবে কোন বৈলক্ষ্য্য, কাজে কোন অমনো-
বোগ প্রকাশ পেয়েছে কি ? তোমরা ত সারাদিন এক
সঙ্গেই থাকতে ?

গোশেনারা। হাঁ হজুর, কেবল সন্ধ্যাবেলা বেগমসাহিবা আমাদের মাঝে মাঝে শহর দেখতে পাঠাতেন, তখন ও এতলাই তাঁর কাছে থাকত।

কাজী। তোমরা ত দু'জনেই দিল্লী দেখতে এসেছ তখনতে পাই; তবে আয়েষা বিবি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন না কেন?

গোশেনারা। সে সময়টা ওর প্রায়ই মাথা খরত, তাই যেতে চাইত না; বাপের বড় আছুরে ঘেয়ে বলে কেউ ওকে জোর করে কিছু বলে না।

বীরবল। (জনান্তিকে) আদর দিয়ে দিয়ে যে মেয়ের মাথাটা ধোয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাজী। আয়েষা, তুমি আমার প্রেমের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি কি সারা সন্ধ্যা বেগমসাহিবার কাছে বসে থাকতে?

আনার। না হজুর। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে অন্যরের বাগানে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিতেন।

কাজী। কার সঙ্গে পাঠাতেন?

আনার। সর্দারনী মেহের-উল্লিসার সঙ্গে।

কাজী। তিনি কি বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন?

আনার। না, কখন কখনও গৃহকাজে অন্যরে চলে যেতেন।

কাজী। তখন কি তুমি একলাই বাগানে বসে থাকতে?

আনার। (ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ, বসে থাকতাম, কিংবা বেড়াতাম, কিংবা গান করতাম।

কাজী। তোমার বাবা তোমাকে গানবাজনা লেখাপড়া শিখিয়েছেন শুনেছি। ভাল নাচতে পার, সেকথাও কানে এগেছে—বদিও চোখে দেখবার দৌভাগ্য বোধ করি, কখনও হবে না।

বীরবল। কাজীসাহেব, বাজে কথায় আসল কাজ চাপা দেবেন না। নিজের ও পরের সর্কনাশ করবার জন্য যে কয়টি বিদ্যা জানা আবশ্যিক, তার কোনটিই মুজীসাহেব আদরের মেয়েকে দেখাতে বাকি রাখেন নি, সে বিষয় আরি নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি।

কাজী। বখন বাগানে বসে থাকতে, সেখানে আর কেউ আসতেন কি? সত্য বল।

আনার। (নত শিরে অশ্রুট ঝরে) হাঁ, কখনও কখনও আর একজন বেড়াতে আসতেন।

বীরবল। (হাসিয়া) সাক্ষ্য বায়সেবনটা দেখছি সংক্রামক, তবে সকলের পক্ষে সমান স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে।

কাজী। আয়েষা, লজ্জা করো না, ভয় পেয়ো না, মিথ্যা বলো না। তোমার সাক্ষ্যের উপর রাজবংশের মান ও তোমার জীবন পর্যন্ত নির্ভর করছে মনে রেখো। এ গুপ্তপ্রমোকে কেউ লইয়েছিল, না তুমি কি আপনি উপযাচিকা হয়েছিলে?

আনার। আমার মনই আমাকে এ কাজে লইয়েছে, আর কেউ নয়।

বীরবল। বা হোক, মেয়েটা যেমনই হোক, সত্য কথা বলে দেখে সন্তুষ্ট হলাম। মিথ্যা ত জীলোকের অঙ্গের ভূষণ বা রক্ষাকবচ, বাই বল। কিন্তু ওর আর একটি অঙ্গের ভূষণ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। (জনান্তিকে কাজীসাহেবের সহিত কথা।)

কাজী। আয়েষা খাতুন, তোমার হাতের ঐ আংটিটি একবার দেখতে পারি কি? (আনার আংটি খুলিয়া দিল, তাহা দেখিয়া ও বীরবলকে দেখাইয়া) বিনি আসতেন, তিনিই কি এই আংটি তোমাকে দিয়েছেন? (আংটি ফেরত দিলেন।)

আনার। (নিরুত্তর)

বীরবল। মৌনই সম্মতির লক্ষণ। (হাসিয়া) একেই বলে হাতে হাতে প্রমাণ, বা বমাল প্রমাণ। এর পরেও যদি আমাদের কথায় আপনি অবিশ্বাস করেন কাজীসাহেব, তা হলে কিন্তু আমি নাচাব। বিশ্বাস না করবারও একটা সীমা আছে।

কাজী। (আসামীদের প্রতি) আচ্ছা, এখন তোমরা যেতে পার। চাপরাশী, আসামীর সাজা হওয়া পর্যন্ত ফের কয়েদ করে রাখ।

চাপরাশী। হো হুম্ব হজুর। (আসামীদের লইয়া প্রস্থান।)

বীরবল। এখন কি রায় দিতে আজ্ঞা হয়, কাজীসাহেব? মনের মত প্রমাণ পেলেন ত, না আরও কিছু চাই?

কাজী। প্রমাণে বা বলে, মন যে তাতে সার্য দিতে চায় না।

বীরবল। বিচারকের নিজের মন বলে কিছু নেই, সে আইনের মুখপাত্র মাত্র। এ স্থলে আইন-ই-আকবরীতে কি দণ্ডের বিধি আছে, সেই হচ্ছে কথা। আসামী নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছে, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই?

কাজী। (উত্তেজিত ভাবে) থিক্ এই আইন, থিক্ এই দণ্ড ব্যবস্থা, থিক্ এই পুণ্যের মুখোশ পরে পরের দোষ বিচার করতে বসবার অভিনয়। আজ যদি ঈশ্বর স্বয়ং সত্যই

এই ধর্মাদিকরণে বসছেন, তা হলে আপনি আমি এই বিচারাসনে না বসে ঐ কাঠগড়ার দাঁড়াতাম তা আপনি বেশ জানেন। এটাও আপনি বেশ জানেন যে, আজ ঐ নিরপরাধ, অসহায় বালিকাকে আমরা দুই বুকে মিলে মিথ্যা বাক্যবাহে জর্জরিত করেছি,—তার বা শান্তি হবার তা আগামই দিয়ে দিয়েছি। তবু তাকে আরও শান্তি দিতে হবে?—তা দেব, ভাল করেই দেব। তাকে জীবন্তে পোর দেবার বিধান দেব—হা হা!—বার চেয়ে বস্ত্রিন দণ্ড আমাদের আইনে নেই। কিন্তু আমাকে আজ থেকে অবসর দিতে আজ্ঞা হোক হজুর। আর যে ক’দিন বাঁচি, দেখি যদি গরীবের সঙ্গে গরীব হয়ে থেকে এ নৃশংস পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। (তাড়াতাড়ি একটা কাপড়ে কি লিথিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন।)

২য় দৃশ্য

(প্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রোশেনারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কানিতোছে এবং আনারকলি পাশ্চাৎ করিতে করিতে মাঝে মাঝে জানালায় মুখ বাড়াইয়া কি দেখিতেছে।)

আনার। ইলাহীবন্দ্য ত এখনও এল না রোশেনারা? তাকে কখন পাঠিয়েছ?

রোশেনারা। অনেকক্ষণ, প্রায় দু’ঘণ্টা হবে। এই এগ বলে। একটু স্থির হয়ে বস।

আনার। স্থির? আমি ত স্থির হয়েই আছি, তোমরাই অস্থির হচ্ছে। আমার মনও স্থির, শরীরও স্থির হয়ে আসছে, সমস্ত চলছে না; ঘড়ির দম ফুরিয়ে এসেছে। কেবল একটামাত্র আশা ধরে এখনও বেঁচে রয়েছে।

রোশেনারা। আয়েবা, বোনু আমার, এমন বুড়ো মাছবের মত কথা তোমার মুখে যে শুনতে পারি নে—হুপ কর দোহাই তোমার! এই কি আমাদের সেই ছটকটে মেয়ে, যার হাসি কথা সর্বদা কোণার মত ঠিকবে পড়ত? সে আয়েবা কোথায় গেল? আমি তার বাগমায়ের কাছে গিয়ে কি জবাবদিহি করব? তাঁরা যে তাকে আমার জিন্মায় এই বিদেশে পাঠিয়েছিলেন—এই নির্দয়, নির্ভর, নির্দয় বিদেশে! কেন মরতে এই নরকে এসেছিলে আয়েবা?

আনার। যে জন্যে এসেছিলাম, আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে রোশেনারা; পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু যেটে নি—বোধ হয় এ পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত কিছুই যেটে না বলে। কিন্তু যেটুকু পেয়েছি, তাই নিয়েই হাসিমুখে পরপারে বেতে পারব।

রোশেনারা। কি পেয়েছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমাদের বা দিয়ে গেলে, সে যে বড় ভয়ানক জিনিস। এ আকশোষ, এ অপমান, এ লজ্জা, হুংখ রাখবার স্থান কোথায়? কেবলই মনে হচ্ছে কোন্ মুখে দেশে কিরে যাব? গিয়ে তাঁদের কি বলব?

আনার। মাকে বলো তাঁর দুই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত তেমনি অবাধাই রইল, কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে দেশে কিরে গেল না। আর বাবাকে (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া... পরে মুখ তুলিয়া), বাবাকে বলো তাঁর শেষ অন্তরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, নিজেকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না বলে যেন আমাকে ক্ষমা করেন। বলো আমি কাবুলের মান রেখেছি, মরতে ভয় পাই নি। আর—(আবার জানালায় মুখ বাড়াইয়া) ও যে ইলাহীবন্দ্য আসছে।

(জ্ঞান মুখে ইলাহী প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইলেন)

আনার। (উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কাতর কর্ণে) তবে তোমার বাওয়া বুখা হয়েছে?

ইলাহী। (নত মুখে) হা! শাহাজাদার সঙ্গে তোমার একটি বার শেষ দেখা করবার প্রার্থনা বাদশাহ কিছুতেই মঞ্জুর করলেন না।

(আনার হতাশভাবে বসিয়া পড়িল)

আমি বাদশাহের বড় খয়ের-খাঁর নাম শুনছি, একে একে সকলের কাছেই গিয়ে করজোড়ে বিনীত অন্তরোধ জানিয়েছি, তাই এত দেরি হ’ল। শুনলাম যে শাহাজাদাও পাগলের মত দিবারাত্র ছুটাছুটি করে এই নৃশংস দণ্ড রহিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনই ফল হচ্ছে না। এমন কি, তিনি নিজেই নজরবন্দী হয়ে রয়েছেন। তাঁর স্নেহময় পিতা এ বিষয়ে একেবারে বজ্রের মত কঠিন ও ভীষণ, কারও সাধ্য নেই তাঁর কাছে এগোয়। (সকলে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে কাতর উচ্চ্বাসে) আয়েবা, আয়েবা! তুমি কখনও আমার কোন কথা রাখ নি। আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকে এই শেষ অন্তরোধ করছি, শুনবে না কি? চল, এই রাক্ষসপুত্রী থেকে আজ রাতেই আমরা তিন জনে পালিয়ে যাই। এখানকার সকলেই প্রলোভনের বশ, তা আমি এই অল্প দিনে বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে এই তলোয়ার ছাড়া আর কোন মূল্যবান জিনিস নেই। কিন্তু তোমার ঐ মহামূল্য আংটিটা দিলে নিশ্চয় রাজ্যের প্রহরীরা দ্বার খুলে দেবে, আর ছদ্মবেশে একবার শহরের সিংহদরওয়াজা পার হতে পারলে তার পরে আমার ঘোড়া

হুটিয়ে আমি শীত্রেই তোমাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে পারব।

(করবোড়ে) আয়েবা, এই বয়সে কি তোমার নিজের প্রাণের প্রতি এতটুকুও মায়া নেই? তোমার বাপ-মা, তোমার শৈশবসঙ্গীদের প্রতি একটুও দয়া নেই।

আনার। ইলাহী, অনেক করে মন বেঁধেছি, আবার আমাকে অস্থির করে তুলে না। বার জন্য এ জীবন, তাঁকেই বখান পাও না, তখন সে জীবনের উপর আমার আর তিলমাত্র মায়া নেই। সব মায়াই ত্যাগ করেছি, কেবল এই দুটি জিনিসের (হাতের আংটি ও বুকে-ঝোলানো ছবি দেখাইয়া) মায়া এখনও ছাড়তে পারি নি। এ দুটি আমার নখর দেখের সঙ্গে সমাধিস্থ হবে, পরলোকে আমার অবিনশ্বর প্রেমের সাক্ষ্য হবে।

ইলাহী। আয়েবা, পুরুষত্বাশ্রয় হয়ে আমি হেঙে পড়ছি, আর তুমি এই সেদিনকার কচি মেয়ে, কোথা থেকে মনে এমন অম্বাহুযিক বল পেলে, তাই ভাবছি। আগে তোমাকে মানবী ভেবে আপন করতে চেয়েছি, কিন্তু আজ তোমাকে দেবী বলে পূজো করতে ইচ্ছে করছে।

আনার। ইলাহী, আমি সামান্য মানবী মাত্র, কেবল প্রেমের বলে মনে এমন অসামান্য বল পেয়েছি। (কিয়ৎ-কণ থামিয়া) ইলাহী, মৃত্যুর মুখে সামাজিক লজ্জাদরম সর্বোচ্চ-বিধা জীর্ণ বস্ত্রের মত আপনাই খসে পড়ে যায়। আমি জানি তুমি বহুকাল থেকে আমার অস্থবল ভক্ত, যদিও মুখ ফুটে কখনও সেকথা আমাকে বল নি। আমি তোমার নিষ্ঠার উপযুক্ত প্রতিদান কোন দিন দিতে পারি নি, পারবও না। কিন্তু এত দিনে তার মধ্যাহ্ন বুঝতে পেরেছি। তোমার প্রথম ও শেষ অস্থবোধ আমি রক্ষা করতে পারব না ইলাহী, ক্ষমা কর;—আমি ভীতির মত রাতারাতি এখান থেকে পালাতেও পারব না, আর প্রাণ থাকতে এ আংটিও (ঠোঁটে ঠেকাইল) আর কারও হাতে দিতে পারব না। কিন্তু ছোট বোনের প্রথম ও শেষ অস্থবোধ তোমাকে রাখতেই হবে তাই, বেশেনারা, এদিকে এস ত তাই! (ভথাকরণ) আমি জানি তোমার মন ইলাহীর প্রতি অস্থকুল। বথার্থ বীরপুরুষের হাতে আস্থ-

সমর্পণ করাতেই নারীজীবনের সার্থকতা। ইলাহী, যা পাও নি তার জন্য জীবনকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে, যে প্রেম ও সেবা তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাকে নম্র চিন্তে গ্রহণ কর তাই, তোমাদের দু'জনেরই জয় সার্থক হোক।

(পরম্পরের হাতে হাত মিলাইয়া)

আজ আমি ধর্মশাক্তী করে তোমাদের যে পবিত্র বন্ধনে বাঁধলাম, দেশে গিয়ে তাকে সমাজের সাক্ষাতে পূর্ণ করো, তা হলোই আমার আস্থা শাস্তি পাও জেনো।

(হাত ছাড়িয়া ও ছাড়াইয়া)

আজ বড় বেশী বকছি—চিরকালই বেশী বকতাম। আজ চিরকালের জন্য মুখ বন্ধ হবার আগে (হাসিয়া) বোধ হয় হৃদহৃদ পুষিয়ে নিচ্ছি।

(পূর্ববৎ হালকা ভাব আনিবার চেষ্টা করিয়া)

ইলাহী, বেশেনারা, আজ আমাদের শেষ দেখা। শুনছি এরা কাল আমাকে লাহোরে পাঠিয়ে দেবে। (একটু থামিয়া) মোতিদিককে বল তার কথাই ফলেছে, পতঙ্গ আলোর বেশী কাছে উড়তে গিয়ে পুড়ে মরেছে। কিন্তু সেজন্য তার কোন দুঃখ নেই। সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। বখান আর তা পাবার আশা নেই, তখন মরণই তার পরম বন্ধ।

(বক্তৃতার আলো ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে হইতে শেষে একেবারে নিবিয়া গেল।)

৩য় দৃশ্য

(লাহোর শহরের উপাস্তে আনারকলির সুন্দর কবর সামনে ভুলুষ্ঠিত সেলিম। প্রদীপ হতে স্বাগণ ধীরে ধীরে কবর প্রদক্ষিণপূর্বক গাহিতেছে :)

গজল

ক্যা ক্যা পরী জমান থে, আরে চলে গয়ে।
তার উসকো দেখবে কি ন লারে, চলে গয়ে।
আদম রহী ন কোই, ন পরম্বর রহা ইহী।
জয়ে জমীপে ওয়েতি সমারে, চলে গয়ে।
দারা রহা, ন জম, ন সেকন্দর শা বাবশা।
তক্তে জমীপে পরকড়া আরে, চলে গয়ে।

সমাপ্ত



আমার দেশ

জীবনদাচরণ গুণ

নব্য বাংলা যে নৈরায়িকের দেশ এটা সর্ববাদিসম্মত। এদেশে নানা বিষয়ে নানান মত আজ নূতন নয়। মতামতের ভাঙা-গড়ার জন্যে, বিশেষ করে এই দেশটাকেই ভারতের ভাগাবিধাতা, সুদূর অতীত যুগ থেকে, স্থানিদ্ধি করে রেখেছেন। একে একে আর্থ ও অনার্থের, জৈন-বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যের, মোগল ও পাঠানের, শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংঘর্ষ এবং সমগ্র চূড়ান্তভাবে এই দেশের মাটিতেই হয়ে গিয়েছে। নবাবী অরাজকতায় অগহিষ্ণু হয়ে এই দেশেরই কতিপয় খুবছর বিদেশী বণিকের হাতে এদেশের শাসনদণ্ড তুলে দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আবার বৈদেশিক শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রবৃদ্ধ ভারতের ঐকান্তিক বিদ্রোহের বীজও যে এই দেশেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত এবং অঙ্কুরিত হয়েছিল সে বিষয়েও কোন তর্কের অবকাশ নাই।

এদেশে ভাঙা-গড়ার এই যে প্রবণতা, স্থিতি এবং প্রগতির এই যে দ্বন্দ্ব, এটা মোটেই আকস্মিক নয়। বাংলার মাটি, বাংলার স্বাভূতেই এ প্রাণ পেয়েছে, আর বাংলার জল, বাংলার ফল থেকেই যুগে যুগে এর স আহরণ করেছে। বাংলার কবি তাই নিঃসঙ্কোচে, বোধ হয় গোপন পুলকের সঙ্গেই, বলে ত পেরেছিলেন : “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাই জগৎকে শিখিয়ে গেছেন, “যত মত তত পথ।” বহু মত আর বহু পথ বাংলার পক্ষে নিত্যসঙ্গী স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম যে এদেশে একান্তই অভাবনীয় তা তো “পলাশীর যুদ্ধ”র কবি তাঁর অননুক্রমণীয় ভাষায় বহু পূর্বেই বলে গিয়েছেন। তাঁর উক্তি “স্বর্গ মর্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়, তথাপি বাঙালী নাহি হবে একমত।”

যদিও বাংলার মাটিতে, পূর্বে কিংবা পশ্চিমে, কোথাও স্বর্গ নেমে আসবার আশু সম্ভাবনা আদৌ দেখা যাচ্ছে না ; আর মর্ত্যালোক হতেও স্বর্গের নিঃড়ি তৈরি করবার কোনো জরুরি ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা, ঢাকা কিংবা কলিকাতা, কোথাও গৃহীত হয়েছে বলে আজও জানা যায় নাই, তবুও কিন্তু সর্বত্র একটা বিষয়ে সম্মত। বাঙালী একমত হতে চলেছে শনৈঃ শনৈঃ। বিষয়টা হচ্ছে বাংলার অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতা—এর বিভিন্ন অংশের অচ্ছিন্নতা, অদ্বাদ্ব, অক্লেশ, অশোধ্য অজ্ঞানি ঘনিষ্ঠতা। অনার্যসম্রাজ্য এবং আজ্ঞাসেবিত আকাশ-বাতাসের মত যে দেশস্ববোধ ছিল আমাদের অবচেতন মনে বিলীন, দেশের অতি অল্পসংখ্যক উচ্চ

শিক্ষিতের মনের স্বা ছিল বিলাস মাত্র, বিধাবিভক্ত বঙ্গে তা আজ অবস্থার চাপে ক্রমশঃ গভীর দাগ কেটে উৎকীর্ণ হচ্ছে আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই মনে। রাজ-নৈতিক বিরুদ্ধতা আর সাম্প্রদায়িক সর্পিণতা প্রকৃতির সেই অমোঘ কার্যক্রমকে অনিদিষ্টকালের জন্য ব্যাহত করতে বা স্থগিত রাখতে পারবে এমনটি মনে করবার কোনও সম্ভব কারণই নাই। অবস্থার বিপাকে শ্রোতের জলে বহু আবর্তের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাতে করে তার সমুদ্রাভিমুখী গতি কখনও চিরতরে অবরুদ্ধ হয় না।

বাংলার দুর্দিশা আজ চরমে উঠেছে। যে বাংলা ধন-ধান্যে শুধু স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠিতই ছিল না, উপরন্তু বিপুল শিল্পসম্পদের বহির্সীমানিষ্ঠে সমস্ত ভারতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এক দিন, আজ তার গৃহে গৃহে অরাতাব, বস্ত্রাভাব নিত্যব্যবহার্য তেল-চুন-লকড়িরও একান্ত অভাব। আমাদের এ দৈন্য মোটেই সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। এর উৎসের অন্বেষণ করতে হলে বাংলার ইতিহাসের দ্বারার উজান বয়ে অনেকটা দূরে যেতে হবে।

দেশজোড়া এই দৈন্য যে আমাদের কত গভীর—এর নগ্ন প্রকাশ যে কত লজ্জাকর, কত নির্দম, কত আত্মঘাতী তার পরিচয় আমরা ক্রমাগত পেয়ে আসছি আমাদের স্বরাজ্যের সম্ভাবনা এবং তার প্রতিষ্ঠার পথে থেকেই। পরাধীনতার নাগপাশে আড়ষ্ট এবং আবিষ্ট অবস্থায় দৈন্যের বেদনা আমাদের যতটা ছিল আক্ষেপ ততটা ছিল না। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তা আত্মপ্রকাশ করেছে—শত-শোহৎ সহস্রশঃ—বহুভাবে, বহুরূপে।

আমাদের ধর্ম্মাঙ্কতা, সাম্প্রদায়িকতার উগ্র তাওব, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে পরপীড়নের প্রয়োগ, এমনি-ধারা আরও অনেক পাপ সেই দৈন্যেরই বিকার। এদের উৎপত্তি এবং প্রসার যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের এই ব্যাপক এবং উৎকট দৈন্য থেকেই প্রাধান্য: সম্ভব হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রায় দুই শতাব্দীর একটানা শোষণের ফলে এই একান্ত লক্ষ্মীহীন দেশে কলিরাজ ঘীরে ঘীরে তাঁর সিংহাসনখানি কার্যে করে নিয়েছেন। দেশব্যাপী দৈন্যের সঙ্গে বিদেশী-শাসকের ভেদনীতি আর আমাদের অজ্ঞতা সম্মিলিত হয়ে দেশে যে জ্বাহ্মপর্ণের সৃষ্টি করেছিল তাতে করে এ অকল্যাণ অনিবার্য হয়েই পড়েছিল। যত দিন রাজত্বকে ইংরেজ

সমাসীন ছিল তত দিন ভ্রমতার খাতিরেই হোক অথবা তাদের ১২৪ ধারার ভয়েই হোক কলিরাজ ছিলেন প্রজ্ঞর। আজ তাঁর সার্বভৌম আধিপত্য রাত্রি, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট—বাংলার সর্বত্র সমভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে বাঙালীর ঘর ভেঙেছে, ভাইবোনেরা পৃথক হয়েছে; বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর মনের মত ভালবাসা সবই আজ বিপর্যয় এবং বিকৃত হতে চলেছে।

বাংলার স্বভাবার্থের একান্ত বিরোধী এই সব পরিণতি এবং সম্ভাবনা। এ দেশের অভিব্যক্তির ধারার এদের বিশেষ কোন স্থান নাই। ভাগীরথীর প্রবাহকে ঐরাবত পথপ্রষ্ট করতে পারে নি; অরুণিও তাকে গ্রাস করতে পারেন নি। ক্রমোন্নতির পথে আজ হোক, কাল হোক বাংলাও ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে এ সব পাপ এবং লজ্জা। ভাবী ইতিহাসে এদের কথাও বর্ণনা হাকামা বা ছিয়াত্তরের যক্ষ্মার মতই বাংলার অন্যতম দুঃস্বপ্নের পর্যায়ে পড়বে। বর্তমানের দুর্ভোগ আমাদের বতই হোক না, একথা জানা দরকার যে, এ পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কাজেই অ-চিরস্থায়ী। কলিরাজের প্রতাপ বতই প্রেত হোক না কেন, বাংলার ভাগ্যবিধাতা বলে তাকে মনে করাটা চড়ন-হারকে ঘোড়ার মালিক বলে মনে করার মতই ভ্রমাত্মক হবে।

২

বাংলার মাটি আর বাংলার মনের পরিণতির একটা বিশেষ ধারা আছে। বাংলার কবি বলেছেন, সদ্যস্নাতা, সিক্তবসনা জননী ভায়তবর্ষ স্নানীল জলধি হতে বিপুল হর্ষোজ্জ্বলের মধ্যে অভ্যুত্থিত হয়েছেন। কাব্য হিসাবে তাঁর বর্ণনা অনবদ্য, তাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ও রকম হয় নি মোটেই। ভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রকারে সৃষ্ট হয়েছে।

বেমন সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিশাল মালভূমি আদৌ সিদ্ধ-শীকরসিক্ত হয় নি। উত্তরে ছিল তার সুবিশীর্ণ সমুদ্রের মেখলা। ভারতের সেই আদিম বাস্তবিতা—দাক্ষিণাত্যের ত্রিভুজাকৃতি মালভূমি—কু-সৃষ্টির আদি থেকে নিখর নিকম্প ভাবে অপেক্ষা করছিল সমুদ্রের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ভারতের উত্তরার্ধের অভ্যুদয়ের আশায়। কোটি কোটি বর্ষের প্রতীকার তার ভূবিত তাপিত বন্ধ ভেদ করে উঠেছিল নিদারুণ আগ্নেয়গার। জমাটবাধা তার ‘লাভা’র পুরু আন্তরণ প্রসারিত রয়েছে সহস্র সহস্র বোজনব্যাপী ভূখণ্ডে—আধুনিক মধ্যভারত থেকে দক্ষিণে হারদ্রাবাদ পর্যন্ত।

তার পরে বিপুল আলোড়নে প্রলয়পর্যায়ি মহিত

করে অভ্যুত্থিত হন হিমালয়ের উত্তর প্রাকার। এর দুই প্রান্তে ভারতের দুই সীমান্ত প্রদেশ। হিমালয় দিলে ভারতভূমির উত্তরের সীমান্তখণ্ড টেনে। সেই থেকে উত্তর-এশিয়ার শুষ্ক শীতল বায়ুপ্রবাহের দক্ষিণমুখী অভিযান বন্ধ হয়ে গেল। আর দক্ষিণের বায়ুপূর্ণ মৌসুমী বাতাসেরও উত্তরের নিকক্ষেণ রাজ্যের পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

ভারতের অভিব্যক্তির কিন্তু তখনও পরিসমাপ্তি হয় নি। উত্তরের পার্শ্বভূমি আর দক্ষিণের মালভূমির মাঝখানে ছিল পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গীয় সমুদ্রের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। বর্তমানের আরব-সাগর আর বঙ্গোপসাগরে ছিল তখন একাকার। প্রকৃতির সৃজনশীলতার প্রভাবে কালে এ ব্যবধানও অতিক্রান্ত হ’ল। উত্তরের হিমালয় আর দক্ষিণের মালভূমি যৌত হয়ে রাশি রাশি পলিমাটি এসে ভরাট করে দিলে এই নিয়তুমি। ফলে লবণাক্ত বিপুল সমুদ্র পর্যাবসিত হ’ল গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-সরস্বতী আদি পুতসলিলা স্রোতধিনী-বিধৌত বিতীর্ণ সমভূমিতে। একে একে রাজস্থান, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ইত্যাদি গঠিত হ’ল।

সর্বশেষে বিধকর্ষার ভারত-সৃষ্টি যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হ’ল বঙ্গমাতার আবির্ভাবে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র উভয়ে মিলে নগরাজ হিমালয়ের পুত্র রেণুকণা তিলে তিলে আহরণ করে এনে দশভূজা শতভুজা হয়ে অঞ্জলি দিয়েছে ভারতের এই প্রান্তদেশে ভারতের ভাগ্যবিধাতার পায়ে। তাঁর প্রসন্ন হাসির সঙ্গেই ফুটে উঠেছে এই বাংলাদেশ।

জীব-অভিব্যক্তির ধারা অহুসরণ করে বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয়িত ভাবে দেখিয়েছেন মাহুত এসেছে সর্বশেষে এই পৃথিবীতে। আর ভারতের কু-প্রকৃতির গঠন-বিস্তারের ব্যাপারে বাংলাদেশের স্থান যে সর্বশেষে, বিধকর্ষা যে ভারতের আর আর সব জায়গায় হাত পাকিয়ে সর্বশেষে গড়েছেন বাংলাদেশকে সে বিষয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহ। বাংলার কবি তাঁর জন্মভূমিকে যখন “সকল দেশের সেরা” বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তাঁর কবি-প্রতিভা শুদ্ধমাত্র সত্যকেই আলোকিত করেছে, কোন কল্পলোকের সৃষ্টি করে নাই।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালার উচ্চতম অংশ রয়েছে বাংলার উত্তরে। আর দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগরের জলরাশি। পূর্ব, পশ্চিম উভয় সীমান্তপ্রসারী পর্বতমালা আর সাগরবেলার এমন সমান্তরাল সরিবেশ, কু-প্রকৃতির এমন মণিকাকন বোণ খুব কম দেশের ভাগেই ঘটেছে। বাংলার বত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—এর গ্রীষ্মের কালটাবশ্যী, শরতের ‘হালি, এর বর্ষার ঘনঘটা, হেমন্তের অপরূপ শোভা—সবারই মূলে রয়েছে উত্তরের হিমালয় আর

দক্ষিণের চলোন্নি—এই দুয়ের অল্পময় বোণাবোণ। এদের জিয়া এবং প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফলকেই বৈশিষ্ট্য দেয় নাই; বাংলার মনোজগতেও এই কোমল-কঠোরের প্রভাব অল্প-প্রবিষ্ট হয়েছে ওতপ্রোতভাবে, বার কলে বাঙালী—বাঙালী।

পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অধিবাসীদের দেহমনকে যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে একথা মানব-সভ্যতার নৈশবে যেমন সত্য ছিল আজও তেমনই আছে। অড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতিতে আত্মহার্য হয়ে আমরা মনে করি—অড়প্রকৃতির পরাজয়ের উপরেই বুদ্ধি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। মানবশিশু ইটিতে শিখে যদি মনে করে সে মাধ্যাকর্ষণ জয় করেছে; অথবা গোবৎস যদি মনে করে মাতৃশুনে আশ্রিত করেছে সে দুধ আনছে তা হলে তাদের সেই মনোভাবের মধ্যে বড়টুকু সত্য ধরা দেয়, আমাদের দাবির মূল্যও ঠিক ততটুকুই।

আসলে মানুষ প্রকৃতির হাতে গড়া, প্রকৃতির পাঠশালায় পড়া। কাজেই ভূপৃষ্ঠে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতিও স্বভাবতঃই বিভিন্ন হয়েছে। মেক্সিকোদেশের এস্কিমো আর সাহাবার বেহুইন এদের পার্থক্য চিরন্তন। পার্থক্য শুধু অস্থিমজ্জাগত নয়, মনবুদ্ধিও এদের স্বতন্ত্র।

অল্পকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বাংলা যে স্নজলা স্নফলা শস্তশস্যলা এটা ত প্রত্যক্ষ সত্য। এদেশে শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, অরচিতার তীব্রতাও ছিল না। স্বভাবতঃই এদেশের অধিবাসীদের মনের গতি আর হাতের কাজ দুই-ই বিশ্বের বিশ্বর উৎপাদন করে এসেছে চিরকাল। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির প্রতি অকলে, প্রতি জনপদে সহজেই বাংলার বিচিত্র ভাবধারা অল্পপ্রবিষ্ট এবং প্রচারিত হতে পেরেছে নানা ভাবে, নানা আকারে। কলে অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও এদেশে একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য-বোধ গড়ে উঠেছে। জাতিবর্গসম্প্রদায় নির্কিংশেবে প্রত্যেক বাঙালীর মনের উপরে তার স্থায়ী আপন স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত।

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে আজ একথা সহসা প্রাদেশিকতা-লোষদুষ্ট বলে মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু এর সঙ্গে তথাকথিত প্রাদেশিকতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এ হ'ল অতি অন্তরঙ্গ বস্তু, আর প্রাদেশিকতা হ'ল নিত্য বাহ্য। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অহকারের, সহজ শৌচের সঙ্গে ভূচিবাইয়ের অথবা আশুনের সঙ্গে আশুনের ধোঁয়ার যে পার্থক্য এ ছুই বস্তুর মধ্যেও ঠিক সেই রকমের পার্থক্য রয়েছে। স্বাধীনতা খারাপ সন্দেহ নাই; কিন্তু

স্বাধীনতা শুধু অপরিহার্য নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর বাংলাদেশে এ প্রয়োজনীয়তা, আজকার দিনে বড় বেশী, ততটা এর বহু শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের কোন দিনেও হয় নাই।

৬

বাঙালীর স্বাধীনতা আজ নানা কারণে বিকিষ্ট। বহু সাধনা আর প্রভূত ত্যাগের পরে দেশে যখন স্বাধীনতা এল, আমরা তখন তার পূর্ণ স্বাদ থেকে হল্যম বঞ্চিত। কারণ সেই সঙ্গে আমাদের দেশ হ'ল বিখণ্ডিত।

এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী যে কে তা বলা যেমন শক্ত, এর কারণ যে কি তা বলা ঠিক তেমনই সহজ। দেশ-বিভাগের মূলে রয়েছে আমাদের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ। আমরা যারা অন্তরে এই অবিশ্বাস আর বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেছি, অথবা জ্ঞানে-অজ্ঞানে এর পোষকতা করেছি তারা সবাই এ দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী। বিদেশীয় ভেদনীতির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে আমাদের দায়িত্বের মাত্রা একটুও কমবে না। বিদেশী তার সাম্রাজ্য রাধবার চরম চেষ্টায় বা কর্তব্য মনে করেছে নিখুঁত ভাবে তা করেছে। তার পান্টা আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীন-সংরক্ষককে কি করেছে?

বিদেশীর প্ররোচনায় আমরা তুলে গেলাম—জাতীয় স্বাধীন সাম্রাজ্য-নিরপেক্ষ, তুলে গেলাম—জয়ভূমির প্রতি সবারই কর্তব্য রয়েছে, জয়ভূমির উপরে সবারই সমান অধিকার। স্বাধীনতার উবা আচ্ছন্ন হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক-তার কুয়াশায়। স্বাধীনতার যুদ্ধে বারা ছিল দর্শক, সাম্প্রদায়িকতার যজ্ঞে তারা হ'ল হোতা। বিদেশীর দোদীপ্ত শাসনের অন্ত হতে না হতেই সাম্প্রদায়িকতার ঝড়ে দেশ গেল ছেয়ে।

এমনধারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অরাজকতারই স্বদেশী সংস্করণ। একে একে কলিকাতায় ও নোয়াখালিতে, বিহার ও পঞ্জাবে আমরা সাম্প্রদায়িকতার নামে অরাজকতার তাণ্ডবলীলাই দেখেছি। রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হলে, অশিক্ষিত দৈন্যপীড়িত দেশে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক মনোভাব যখন দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও সংক্রামিত হয় তখনই দেশের সত্যিকারের বিপদ। সে বিপদ আমাদের আজও কাটে নি।

রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতার ছিদ্রপথে অরাজকতার প্রাবন বাংলাদেশের পক্ষে মোটেই নূতন নয়। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সময়ে এদেশে এইটাই নিয়ম। গৌড়রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে, পালবংশের অভ্যুদয়ের আগে স্বরীর্ষকাল ধরে বাংলায় চলেছিল মাংসান্যাস। মাংসান্যাস মানে “মৎস্যের তুল্য

পরম্পর হনন, অরাজকতা ও নরহত্যা"। এক বছর দু' বছর নয়, এক শ' বছর ধরে, সেই যুগের সোনার বাংলায় বা হয়েছিল তার আভিধানিক অর্থ ত বলেইছি ; ব্যবহারিক অর্থের আভাসমাত্রও নিশ্চয় নোরাখালির অত্যাচারের অত্যাধিক্যেও অনেক দূর ছাড়িয়ে বাবে।

পাঠান রাজত্বের শেষের দিকে, মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কামরূপ থেকে কানী পর্যন্ত কালাপাহাড়ী ডাঙবে বা হয়েছিল তার জোড়া ইতিহাসে দুল্লভ। সে ধর্মবেশীর অত্যাচারের মর্মস্বত্ব কাহিনী এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তার পর মোগল রাজত্বের শেষে, কোম্পানির আমলের আগে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা। তার জীবন্ত চিত্র ভুক্তভোগী বাঙালী কবি গজানন তাঁর 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এঁকে গিয়েছেন। দু'শ বছর পরে আজ বাঙালী সে কাহিনী ভুলে গিয়েছে। শুধু ঘুমপাড়ানী ছড়াতেই তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু রয়ে গেছে। ভুলে বাওয়াই বাতাবিক, ভুলে বাওয়াই উচিত। জাতীয় জীবনে ওগুলো সত্য নয়, নিতান্তই দুঃস্বপ্ন। কিন্তু যখন ঘটেছিল তখন ভুক্তভোগী বাঙালী নর-নারীর কাছে সে হাঙ্গামা মোটেই স্বপ্ন ছিল না। 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র কয়েক পংক্তি পড়লেই পাঠক এর বীভৎসতা আর বর্জ্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন :

"নাঠে বেরিয়া বরগী ঘের তবে লাভ।
লোনা-রূপা মুঠে নেয়, আর সব হাভ।
কাক হাত কাটে, কাক নাক কাম।
একি চোটে কাক বধে পরাণ।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক বত ধরিয়া লইয়া বার।
অকুটে বড়ি-বাধি ধের তার পলার।
এক জন হাতে তবে আর কদা বরে।
.....তারা জাহি শব করে।
এই বত বরগী কত পাগল করিয়া।
নেই সব স্ত্রীলোকে বত দেয় সব ছাড়িয়া।
তবে নাঠে স্ত্রীরা বরগী এনে লাগার।
বত বত বরে আসিয়া আশ্রম লাগার।
কাছকে বাঁধে বরগী বিরা পিঠ-মোড়া।
চিং করি মায়ে লাধি পারে কুড়া চড়া।
"রূপী বেহ, রূপী বেহ" বোলে বার করে।
রূপী না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।
কাছকে ধরিয়া বরগী পুথরে ছুবার।
কাকর হইয়া তবে কাক প্রাণ বার।"

এসব কবির অত্যাধিক্য নয়। কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারও বর্গীর হাঙ্গামার বাঙালী নর-নারীর দুর্দশা অচক্ষে দেখে তাঁর সংকুত কাব্যগ্রন্থ 'চিহ্নচন্দ্র'তে লিখেছেন :

"নারীরা কপার কপণ, গর্ভবতী এবং শিশু, ব্রাহ্মণ ও ধর্মজনের ভালোয়ার বিরা কাটরা কেসে, সমস্ত নিবিত আচরণে নিপুণ, তাহারা বাংলার জনপথে বেন ছোট প্রলয় বটাইল, সমস্ত বন এবং লাকী স্ত্রীলোক হরণ করিল।"

এক আশ বছর নয়, বছরের পর বছর—দশ দশ বৎসর এমনিধারা অমাহুতিক অত্যাচারের প্রাবন বয়ে গিয়েছিল এ দেশের উপর দিয়ে।

এর প্রায় পিঠাপিঠিই এল এদেশে 'ছিয়াত্তরের মরহত'। এরও মূলে রয়েছে অরাজকতা। সেদিনকার সে অরাজকতার নগ্নরূপ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন 'আনন্দ মঠে' :

"১১৭৬ সালে বাংলা প্রবেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ ভবন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা থাকবার টাকা আদায় করিয়া লয়েন, কিন্তু ভবনও বাঙালীর প্রাণ-লম্পতি রক্ষণাবেক্ষণের তার পাণ্ডিত্য নরাধম বিবালহতা মহত-কুলকলর মীরজাকরের উপর। মীরজাকর আদায়কার অক্ষর, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাকর ভলি বার ও বুঝার। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেনপ্যাচ লিখে। বাঙালী কাঁধে আর উৎসর বার।"

বাঙালীর সেদিনকার দুর্দশার যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তাতে কল্পনার অতিরঞ্জন নাই—আছে ঐতিহাসিকের সহায়কুতি আর সমীক্ষা। সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্রের প্রমাণপুঞ্জ থেকে সংগ্রহ করে সে দুর্দশার সংক্ষিপ্তরূপ তিনি বা দিয়েছেন তা এই :

"লোকে এখানে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পক্ষ বেচিল, লাকল জোড়াল বেচিল, বীকধান বাইরা কেলিল, বরবাড়ী বেচিল, কোড়জবা বেচিল। তার পরে মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তার পরে হেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পরে স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, হেলে, স্ত্রী কে কিবে? বরিদ্ধার নাই, সকলেই বেচিতে চার। বাতাবাবে গাছের পাতা বাইতে লাগিল, বাস বাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা বাইতে লাগিল। অনেক পলাইল। বাহারা পলাইল, তাহারা বিবেশে গিয়া অনাহারে মরিল, বাহারা পলাইল না, তাহারা অবাধ বাইরা, না বাইরা, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সবার পাইল, অর, ওলাউঠা, কর, বলভ। বিবেশত: বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না, কেহ কাহাকেও বেবে না, মরিলে কেহ কেসে না। অতি রমণীয় বগু অটী-লিকা বধো আপনা আপনি পচে। যে গৃহে এক বার বলভ প্রবেশ করে সে গৃহবাসীরা রোগী কেলিয়া ভয়ে পালার।"

বা হয়েছিল সেটা সত্যই মনস্তর। এর কলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাণ হারাল। বাংলার জমিদার সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হ'ল; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সর্বনাশ হ'ল। বাংলার গৌরব শক্তিমান কৃষককুল মল্লুরে পরিণত হ'ল, সুজলা হুজলা বাংলার মাটির এক-তৃতীয়াংশ চাষবাসের অভাবে জললে ভরে উঠল। এক-আধ বছরের অনাবৃষ্টিতে বা অজন্মায় এমনটা হয় নাই। এর মূলে ছিল বহুবর্ষব্যাপী অরাজকতা, শোষণ আর অবাধ লুণ্ঠন।

ছিয়াত্তরের মনস্তর এসেছিল বাংলার ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাকালে; বাংলায় আর এক ভয়ানক মনস্তর এল ১৯৪৩ সালে—ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্ত হবার অব্যবহিত পূর্বে। এই দুই মনস্তরের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি থাকলেও এদের হেতুর সাদৃশ্য স্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই অরাজকতা আর শোষণ দুই-ই চরমে উঠেছিল। বাদের হাতে ছিল শাসনযন্ত্র তারা জনকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সেকালেও বিধা করে নি, একালেও নয়। সেবারও দুর্ভিক্ষের দরুন রাজস্ব আদায়ে কষ্টের হয়নি, এবারও সারা দেশ বধন প্রাপ্তিভিত, তখনও সমানে বাংলার বন্দর থেকে চাল রপ্তানী হয়েছে—আরব, ইরাক, সিংহল ও আফ্রিকায়। প্রজাকে বঞ্চিত করে তারই অমলক খাদ্য সংগৃহীত হয়েছে সঞ্চিত হয়েছে, বিদেশী সৈন্যের রসদ বলে। কত না তার নষ্ট হয়েছে, কত না হয়েছে চুরি। এ অন্যায় অরাজকতার ব্যাধি প্রতিবাদ করত, প্রাণ দিয়ে এ লুণ্ঠন ব্যাধি প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হতে পারত, বিদেশী সরকার আগেই তাদের অবরুদ্ধ করেছিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। কলে অনশন-মৃত্যুতে পল্লী উজাড় হয়েছে, শহরের হাসপাতালে হয়েছে স্থানান্তর, রাজধানীর পথে পথে অনশন-জীর্ণ মৃত-দেহের ছড়াছড়ি গিয়েছে।

এ দুর্ভোগের অন্ত হতে না হতেই দেশে এল সাম্প্রদায়িক হানাহানি। মূলতঃ এ হানাহানি যে বুজুর্জুর কাড়াকাড়ি ভাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে 'স্বশৃঙ্খল' কুশাসনের অবাধ শোষণের কলে দেশে এল মনস্তর, তারই প্রত্যক্ষ-পর্যায় প্রেরণা এবং প্ররোচনায় হ'ল সাম্প্রদায়িকতার জন্ম, বৃদ্ধি। এদেশে এ উপসর্গ চিরস্থায়ী হবে এমন মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ভেঙেছে; বিদেশীর যথেষ্ট শোষণও বন্ধ হয়েছে। আজ হোক, কাল হোক বাংলা নিজেকে ফিরে পাবেই। আজকার এ আত্মঘাতী মনোভাব তখন দুঃখপূর্ণ বলে মনে হবে—এ অনিশ্চিত। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে আজ ব্যাধি বিধিক ভুলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছেন, আর ব্যাধি

চোবের উপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন, অতীতের জ্ঞান আর ভবিষ্যতের দৃষ্টি দুই-ই তাঁদের সমান আচ্ছন্ন।

৪

কিন্তু কেন এমনখার্য্য দুর্গতি বাঙালীর যুগে যুগে? কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। নিতান্ত কর্মকর্তৃবাচ্যে যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তারও একটা না একটা প্রকল্প কারণ থাকেই। ভূমিকম্প যে এমন একটা আকস্মিক ব্যাপার, তাও দৈবাৎ হয় না। মাটির নীচেকার তাপ আর চাপের বকেয়া হিসাবের বোঝাপড়ার ফলেই নাকি তা হয়। আমাদেরও অমনিখার্য্য বকেয়া হিসাবের জবাবদিহি, আর তহবিল তছরূপের দণ্ড দিতে হয়েছে নানান বকমের দুর্গতির মারফত—জাতীয় বিবর্তনের বাক্যে বাক্যে। ধরিজীর ইতিহাসে ভূমিকম্প নিরর্থক নয়। পৃথিবীর ব্যবস্থিতিতে ওরও প্রয়োজন আছে। বাংলার ইতিহাসের ঐ যে বড় বড় দুর্ভোগগুলো, ব্যাধি কিনা জাতিবর্ণনির্কিশেবে আমাদের সবাইকেই পুনঃ পুনঃ নাড়া দিয়ে গিয়েছে, সে-গুলোও সার্থক হবে, বধন বাঙালী ওদের প্রকৃত ইজিত অস্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে।

চিরকাল প্রকৃতি এদেশের প্রতি সদয়। জীবিকা এখানে এতই সহজলভ্য যে, অতীতে বাঙালী কখনো জাতীয় স্বার্থের জন্ত সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে নাই। মুষ্টিমেয় বিদেশী বধন মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ-কল্পে দুর্গ নির্মাণ করল, বহু বোজনপ্রসারী পথিকা খনন করল, তখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী, বর্ধমানরাজ বিষ্ণুপুররাজ থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় ভূস্বামী সবাই অসহায়ভাবে বুদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। বছরের পর বছর অত্যাচারিত, অপমানিত হয়েও শিক্ষা হ'ল না কান্দুরই।

শৌর্য্যবীর্য্যের অভাব এদেশে ছিল না, কিন্তু সংহতির আর সমবেত চেষ্টার অভাব এদেশে চিরকাল। বারো ভূঁইয়ার কেউই কম ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা সম্মিলিত হয়ে বাংলার বিপুল সমৃদ্ধি আর গণশক্তিকে কার্য্যকরী করবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

বাংলার অনভিদুর অতীতের সমৃদ্ধি কেমন ছিল? আর তার কি ব্যবহার হ'ত সেকালে? ১৭০৬ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান-নাজিম হয়ে ঢাকায় এসে প্রথম পুণ্যাহের পরেই দুই শ' গরুর গাড়ী বোঝাই করে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ নগদ টাকা পাঠিয়েছিলেন দিল্লীতে। এ ছাড়াও 'জায়গিরীর ও খাসনাবিশির টাকা' স্বতন্ত্র পাঠিয়ে-ছিলেন। আর পাঠিয়েছিলেন—“হতী, টাকন ও গুহ

নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রকার পার্কৃত্য অথ, মহিষ, হরিণ, বাজপাখী, জাহাজীরনগরে (ঢাকা) বয়ন করা পাশাশাহের ব্যবহার্য স্ত্রম বস্ত্র, গুত্তার-চর্মের ঢাল, শ্রীহট্টের মাদুর (অর্ণ ও গজদন্তের), মুগনাভি ইত্যাদি ইত্যাদি।”

বাংলার চাল সেকালে নদী-পথে পাটনার, আর সমুদ্র-পথে করমণ্ডল উপকূলের বহু বন্দরে, সিংহলে, মালদ্বীপে প্রেরিত হ’ত। বাংলার চিনি গোলকুণ্ডায়, কর্ণাটে, আরবে, ইরাণে ইরাকে যেত। স্বতী আর রেশমী কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হ’ত বিদেশে।

এত যে ঐশ্বর্য, এমন যে সমৃদ্ধি এর কতটুকু অংশ পেয়েছে বাংলার কৃষক, বাংলার কারিগর? বাদশা-বেগম-নবাব-নাজিম-আমীর-ওমরাহদের বিলাস-বাসনের বখাণাগ্য ব্যবস্থা করে, রাজা-মহারাজা-জমিদার-তালুকদার এঁদের রাজসিক জীবনযাত্রা আর দোল-দুর্গোৎসবের খরচ ছুটিয়ে যা থাকত তার বেশীর ভাগই খুব সম্ভব যেত সওদাগরের সিক্ককে, আর শেঠের কুঠিতে। বাংলার বারা বখার্বাধন উৎপাদন করত তাদের অনেকের দ্বারায়েই খুব সম্ভব হাতী বাঁধা থাকত না। আর তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালীর উন্নয়ন—এ সব নিয়েও কেউ যে বিশেষ মাথা ঘামাত এমনও মনে হয় না। টাকায় আট মণ চাল—তার দু’বেলা আঁচাতে পেরেই মহাহুখে ছিল। তাদের পেটে ভাত ছিল, গায়েও জোর ছিল। ডাক পড়লে ঢাল-সড়কি, লাঠি-সোঁটা নিয়ে রাজার কাজ হাঁসিল করত তার, নিত্যন্ত নির্দিকার ভাবে। কোন উচ্চতর ঐহিক আদর্শের সন্ধান কেউ তাদের দেয় নি।

শাস্ত্রে লেখে—দেবতার দানে সমৃদ্ধ হয়ে যে দেবতাকে তার ভাগ দেয় না সে চোর। বাংলার সেকালের বিস্তালী অভিজাত শ্রেণীর প্রায় সবাইকেই স্বচ্ছন্দে ঐ দলে কেলা যায়। আর তাদের যুগলকিত সেই পাপের দণ্ড তাদের সঙ্গে সমস্ত দেশকেই ভোগ করতে হয়েছে। বর্গীর হাজামায় তার আরম্ভ, আর ছিয়ান্তরের মধ্যস্তরে তার পরিণতি—১৭৪২ থেকে ১৭৭০।

তারপরে এদেশে এল ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজের আমলে অবস্থার উন্নতি ত হ’লই না বরং আরও দ্রুত অবনতিই হতে লাগল। শিক্ষিত-সমাজের মন হ’ল গ্রাম হতে বহিষ্কৃত; আর লক্ষ্য হ’ল ‘যেমন ভেমন চাকরি ছুখ ভাত’। প্রমথিমুখ বাঙালী সহজ উপায়ে অর্থোপার্জনের আশায় ছুটল শহরে, রাজধানীতে—সরকারী শাসন আর শোষণের সহযোগিতায়। বংশপরম্পরায় সৃষ্টি হতে লাগল রেজা থী আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পার্শ্ব্য সংস্কার। কৃষি আর

শিল্প রইল অবজ্ঞাত হয়ে; সর্ববিষয়ে হয়ে পড়লাম আমরা পরমুখাপেকী। ধনরত্ন বত ছিল, বিদেশীর বাহুমন্ত্রণে সব ত উড়ে গেলই; বিল বাঁড় জলা দীঘি সব গেল মজে, নদীনালা গেল শুকিয়ে; আর বহিষ্কৃত গ্রাম সব ভরে গেল জঙ্গলে।

এমনি করে শুধু গণদেবতার কাছেই নয়, ধরিজী দেবতার কাছেও আমরা অপরাধী হয়ে গেলাম। যে-দেশের প্রকৃতির স্বপ্নমা আর ভূমির উর্বরতা চিরদিনই বিদেশীর বিশ্বয় উৎপাদন করে এসেছে; যেদেশে স্বদূর অতীত যুগের কোন ভগীরথের বহু বর্ষব্যাপী তপস্যায় গঙ্গার দুই পাশে, রাজমহল থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত খনিত হয়েছিল অগণিত স্বদূরপ্রসারী খাল; যেদেশের শস্য আর কৃষি-শিল্পসম্ভার অসংখ্য বাণিজ্যতরীতে বাহিত হয়ে সাত সমুদ্র ভের নদীর পারে চলে যেত দেশ-বিদেশে—বছরের পর বছর, সেদেশ আজ সকল রকমে কাঁড়াল হয়েছে।

এর দায়িত্ব সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ আমাদের সবারই। বিগত সার্ব শতাব্দীতে যখন অষ্টেলিয়ার অসুর্কীর মরু, শস্য-শূন্য প্রান্তর আর ফলহীন বনভূমি বিদেশীর অক্লান্ত চেষ্টায় সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছে, ঠিক সমসময়েই ভারতের তথা জগতের সমৃদ্ধতম প্রদেশ এই সোনার বাংলা তার অধিবাসীদের ঐদাসীন্যে দুর্দশার প্রায় অন্তিম প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই পতিত দেশকে সমৃদ্ধির পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

এ কাজে রাজনীতির মন্ত্রের চাইতে কর্মবজ্ঞের সাধনা আর ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ঢের বেশী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য তার রাজনীতি থেকে আসে নি, এসেছে তার শতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত কর্মের ফলে। সেখানে যাহুয়ের যুগ-যুগ ব্যাপী চেষ্টায় সহস্র সহস্র যোজনপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী পরিণত হয়েছে রম্য উপবনে; ধূম্র ‘গ্রেইরি’র তৃণভূমি পরিণত হয়েছে শ্রামল শস্তক্ষেত্রে, আর উর্বর-প্রান্তরে ফুটে উঠেছে শুভ্র কার্পাসের রাশি। সেখানে আহারনিজ্ঞা ভুলে, শীতাতপ অগ্রাহ করে মাহুয দুরধিগম্য পার্কৃত্য প্রদেশে ঘুরে মরেছে বছরের পর বছর খনিজের সন্ধানে। তাদের সেই অদম্য অধ্যবসায় আর বিপুল ত্যাগের ফলে সেদিনকার শ্রীহীন পর্কত আজ লক্ষীর পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। কলম্বাবী দুর্দান্ত নদীর তাওবে তারা সুর-যোজনা করে মহাদেশের মাঝখানে সমৃদ্ধ বন্দরের সৃষ্টি করেছে। জীবদেহে শিলা-উপশিয়ার বিন্যাসের মত, ঐ বিভীর্ণ দেশে প্রসারিত হয়েছে সর্বত্র রাস্তাঘাট, রেলপথ। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই

অখ্যাত অজ্ঞাত ভূখণ্ড মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্যে সভ্যতার আলোকে আজ ঝলমল করছে।

সহস্র সহস্র বর্ষের প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারে গর্জিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বোধ করি এমনধারা ব্যাপক ভাবে কর্মব্যস্তের অহুষ্ঠান কোন দিনই হয় নাই। সকালে অশ্বমেধের ঘোড়া অবশ্য রাজ্যে রাজ্যে হানা দিচ্ছে; কিন্তু সভ্যতার অভিযান খুব সম্ভব রাজ-সিংহাসন ছেড়ে বেশী দূর যায় নাই। বিংশ শতাব্দীর দীপ্ত মধ্যাহ্নেও এ বিষয়ে আমরা যে ভিমেই সেই ভিমিরেই। পূর্বে নিউ-ইয়র্ক আর পশ্চিমে সানফ্রান্সিসকো এই দুই মহানগরীর মাঝে, আমেরিকার বৃক্কে গড়ে উঠেছে অগণিত নগর, অসংখ্য কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, শিক্ষায়তন, স্বাস্থ্যনিবাস। আর, কলিকাতা ও বোম্বাই এই দুই মহানগরীর মাঝে ভারতের বৃক্কে হাজার মাইল জুড়ে কি আছে? আছে, ময়ূরভঞ্জ-কিওঞ্জোর-বোনাই, কাঁকের, বস্তুর-হায়দরাবাদ-রাজ্যের অবত্ৰবদ্ধিত জঙ্গল; তার মাঝে মাঝে আছে আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রাম আর ততোধিক ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র।

কাজেই আজকের দিনে স্বাধীন ভারতে রাজনীতির চর্চার দিক থেকে গঠনমূলক কাজের দিকে শিক্ষিত সমাজের মনের মোড় ফেরান একান্তই দরকার। এদিকে আমাদের যা কাজ তা মুখের কথায় বা কাগজে-কলমে হবে না। এ কাজ হাতে-হাতিয়াবে মন-প্রাণ দিয়ে আমাদের করতে হবে।

পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রিক বিভিন্নতা বাংলায় এই গঠনমূলক কাজের পরিপন্থী খুব সম্ভব হবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উভয় রাষ্ট্রকে সদ্ভাবে অহুপ্রানিত করবে না; তবুও একথা হুনিশিত যে, জাতীয় স্বার্থবুদ্ধিই উভয় রাষ্ট্রের জনগণকে বিপদের পথ থেকে সম্পদের অভিযুগে পরিচালিত করবে।

ইংরেজের অধীনতার যুগের কথা বাদ দিলে, সমস্ত বাংলা

এক রাষ্ট্রের স্বদৃঢ় শৃঙ্খলে একতাবদ্ধ খুব বেশী দিন কখনও থেকেছে বলে মনে হয় না। প্রাচীনকালে রাঢ়, বরেন্দ্র, বল, বগড়ী প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হ'ত। পাঠান আমলেও 'গৌড়-মগল' প্রায়ই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হ'ত। মোগল আমলের পূর্বাফ্রুও বাংলার বার-ভুঁইয়াদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভূম্যধিকারীই ছিলেন। এঁরা ছিলেন নিজ নিজ রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি। এমনধারা রাষ্ট্রিক বিভিন্নতা বঙ্গের সামগ্রিক কৃষ্টি ও সমৃদ্ধিকে বিন্দু-মাত্রও ব্যাহত করে নাই।

চৈতন্যদেব যখন ভক্তির যন্ত্রে, জাতি-বর্ণ-নির্কীর্ণশেষে এদেশের কোটি কোটি নর-নারীকে উদ্ধৃত্ত করেছিলেন, প্রেমের বন্যায় সমস্ত দেশকে প্রাবিত করেছিলেন তখন এ দেশের রাজশক্তি ছিল মুসলমানের, আর বিচার ছিল কাজীর। নদীয়ায় কাজী-নিমাই সংবাদের উপসংহারে কাজী বলছেন নিমাইকে :

“গ্রাম লব্ধে চক্রবর্তী হয় ঘোর চাচা।

দেহ লব্ধ হৈতে হয় গ্রাম লব্ধ সাঁচা।

নীলাধর চক্রবর্তী হয় ভোমার নাম।

সে লব্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

ভাগিনার কোষ নামা অবশ্য লহ।

মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লহ।”

(ঐজীৱৈক্য চরিতাবৃত্ত—আদিলীলা)

পাঁচ শ' বছর আগে এই ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক মনোভাব। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ঠিক এমনধারাই ছিল। আর বছর পাঁচেক পরে আবার ঐ মনোভাবই এদেশে ফিরে আসতে বাধ্য। কারণ তৃতীয় পক্ষ তার ভেদনীতিসহ অপসারিত হয়েছে।

উভয় বঙ্গের মধ্যে যুদ্ধের বিভীষিকা যারা কালে অকালে অহরহ দেখছেন বা দেখাচ্ছেন, তাঁদের বলি প্রজাতান্ত্রিক দেশে আজকার দিনে, সত্যিকারের জনমতকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত হওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে এবং খুব সম্ভব অচিরে তা অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াবে। আর বাংলাদেশ ত স্বভাবতই শান্তিপ্ৰিয়।



বশোহরের নীল-আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

১

প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখি। নীল-আন্দোলনের সঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষের যোগাযোগের বিষয় কতকটা জানা থাকিলেও ইহা যে কত ঘনিষ্ঠ, গভীর ও ব্যাপক ছিল ১৮৬০ সনের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ প্রকাশিত পত্রাবলী হইতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত উক্ত সনের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’র ফাইল হইতে ‘M. L. L.’ স্বাক্ষরযুক্ত ছয়খানি পত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার করার গৌভাগ্য আমার হয়। প্রথম পত্রখানি বাতীত আর সমুদয়ই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সম্বলিত, তন্মধ্যে এই কথা কয়টিও আছে—“from our Jessore correspondent”। এই ধরণের ভূমিকায় স্বাক্ষরবিহীন এমন কয়েকখানি পত্রও সন্ধান পাই যেগুলি ‘M.L.L.’ তথা শিশিরকুমার ঘোষেরই লেখা বলিয়া বুঝা যায়। এই পত্রগুলির পরিচিতিস্বরূপ আমি “বশোহরে নীল-আন্দোলনের কথা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি এবং গত ডিসেম্বর মাসের (১৯৫১) মাঝামাঝি “আনন্দ-বাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনী”তে প্রকাশার্থ প্রেরণ করি। এই প্রবন্ধটি পরবর্তী ২০শে জানুয়ারী সংখ্যায় উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রবন্ধে ‘M.L.L.’ স্বাক্ষরের প্রথম পত্রখানি হবহ উদ্ধৃত করি। উক্ত স্বাক্ষরযুক্ত অগ্রাগ্র পত্রের প্রকাশের তারিখও আমি ইহাতে দিয়াছিলাম। এখন, মূল আলোচনায় আসা বাক্য।

গত সংখ্যায় বশোহরে নীল-আন্দোলন সম্পর্কে শিশিরকুমার ঘোষের ‘M.L.L.’ স্বাক্ষরযুক্ত কয়েকখানি পত্র হইতে তথ্যাদি প্রদান করিয়াছি। উহাতে আরও বলিয়াছি যে, ‘M.L.L.’ স্বাক্ষর ছাড়া এমন কয়েকখানি পত্রও পাইয়াছি যাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-বলে শিশিরকুমারের লিখিত বলিয়াই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। এরূপ পত্র হইতেও কিছু কিছু তথ্য পূর্বে প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছি। এখানেও স্বাক্ষরযুক্ত এবং স্বাক্ষরবিহীন কতকগুলি পত্রের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিব। নীলকর ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের যোগসাজসে প্রজাভুল বিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, এ সমুদয় হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

‘M.L.L.’ স্বাক্ষর ও তারিখবিহীন “from our Jessore correspondent” ভূমিকায়ুক্ত একখানি পত্র ১৫ই আগষ্ট, ১৮৬০ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষাংশে সম্পাদককে সন্ধান করিয়া লেখা হয়, “You know this hand, please give the above a

place in the Indigo districts columns.” অর্থাৎ, “এ হস্তাক্ষর আপনার জানা, অগ্রগ্রহপূর্বক ইহাকে ‘ইণ্ডিগো ডিস্ট্রিক্টস’ স্তম্ভে স্থান দিবেন।” ইহা হইতে বুঝা যায়, পত্রখানি নিশ্চিত শিশিরকুমারের লিখিত। ইহার কিয়দংশের তাৎপর্য এই :

“বর্তমান ঋতুতে বশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেটগণের গতিবিধি বড়ই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রজাদের বদমায়েন স্বাক্ষর কথ্য একেবারে ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা বহু নীলকরদের স্বাক্ষরকার নিষিদ্ধই সমস্ত সময় ও মনোযোগ নিয়োজিত করিতেছেন। এক দিকে যখন তাঁহারা কুখ্যাত মূল্য না লইয়াই নীলগাছ পৌছাইয়া দিবার জন্ত প্রজাদের বাধ্য করিতেছেন, অত দিকে তখন কুখ্যাত হবভেরা তাঁহাদের মাকের উপর উপরই ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। এই [আগষ্ট] মাসের ৬ই মধ্যরাত্রে মাগুরার অন্তর্গত কিনাইনহু নামের কোরালা গ্রামে আসন্ন কাজীর বাতীতে ডাকাতি হয়। তাঁকাকতি, সোমারঙ্গা এবং অত্যন্ত বিস্তারিত নিষপত্র ডাকাতেরা লইয়া যায়। বাতীর লোকেদের উপর তাহারা উৎপাতও করে, কিন্তু ইশ্বর-ইচ্ছায় কোন প্রাণ-হানি হয় নাই।

তদন্তেছি মিঃ কীনার সত্তর জন পুলিশ লইয়া মাগুরার পিয়াহেন রাস্তাদের নীলগাছ কাটিতে বাধ্য করিবার জন্ত। কীনার ও টেলরের উপর ছোটলটি বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। টেলর বর্তমানে মাগুরার মহকুমা হাফিজ। থবর পাইলাম কুখ্যাত-ওয়ারালা ‘নারকীর আইমে’র নীলগাছ নষ্ট করার দ্বারা কেলিয়া রাস্তাদের বিরুদ্ধে পুনরায় মিথ্যা মামলা রুজু করিতেছে। কীনার ও টেলরের পক্ষপাতীয় সকলেই জানেন। তাঁহাদের বিচারে প্রজাদের হুগতির আর সীমা-পরিমীমা থাকিবে না।...নীল-তহরপ মামলাগুলির কি বিচার হয় দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। আমি যদি আপনাকে সংবাদ সরবরাহ করিতে না-ও পারি, আমার বহু এম-এল-এল মিত্রই আপনাকে সকল সংবাদ দিবেন।”

জেলা-কর্তৃপক্ষের আরও কতকগুলি অনাচারের বিষয় এই পত্রে উল্লিখিত হয়। নীলকরদের সঙ্গে তাঁহাদের আহার ও বাস এবং নানা আমোদ-প্রমোদে যোগদান, একজন নিরক্ষর জমাদারের বেতন-বৃদ্ধি, ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে নীলকর ও টেলরের গোমস্তাকে তলব করার কিনাইনহুের দারোগার সাময়িক কর্তৃত্বাতি কালোপোলের মিথ্যা-প্রমাণিত ‘হামলা’র কীনারের সাহায্যকারী এসর দারোগার পন্থায়িত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পত্র-লেখক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। বিশেষতঃ শেখোক্ত ব্যাপারটি জেলা জজের বিচারে বখন মিথ্যা ই প্রমাণিত হইয়াছে তখন দারোগা-পুলবকে একপূ ভাবে সম্মানিত করা ন্যায়ধর্মবিগর্হিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

২

শিশিরকুমারের M.L.L. আকরিত বঠ পত্রখানিতে (হিন্দু পেট্রিফট, ২২শে আগষ্ট) তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৮ই আগষ্ট। তবে ইহা পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি তখন মকমলে দুর্গত রায়তদের অবস্থা সম্বন্ধে তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পরী-অঞ্চলে নীলকরদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্ধাতনের কাহিনী এই পত্রখানিতে আছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকরদের যে তখন বিশেষ সাহায্য করিতেছিলেন তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি। পত্রখানির প্রথমে শিশিরকুমার নিজের সম্বন্ধে এই মর্মে লেখেন : “মিঃ কীনারের কঠোর সন্ধানী-দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে আমি অনবরত স্থান বদলাইতেছি। আমাকে এখন একজন ‘কেরাও’ বলিলেও হয়। আমি মিঃ মোলোনীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকল নীল অঞ্চলে ঘুরিতেছি। বর্তমানে হাজরাপুর কুঠীর সন্নিকটে আছি। মোলোনী সাহেব-ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ডের অধীন একশত জন সিপাহী লইয়া প্রথমে খিনাইনহ, সেখান হইতে মাগুরা এবং এখন, যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে, তদীয় বন্ধু বিজলী কুঠীর ওমানের সঙ্গে রহিয়াছেন।”

ইহার পর শিশিরকুমার নীলকরদের অত্যাচারের মর্মস্বত্ব কাহিনী ব্যক্ত করেন। ইহারও কতকটা এখানে প্রদত্ত হইল :

“বড়ই দুঃখের বিষয় নীল কমিশন এ জেলার আগমনের সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখানে আসিলে তাহারা বুঝিতে পারিতেন—এ জেলার রায়তেরা সুনী ও সম্প্রদায়ী এই মর্মে মিঃ করলং যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কতখানি সত্য। এই উক্তির মত লঙ্ঘ্যকর মিথ্যা আর নাই। কমিশনের সমুদ্রে অত্যাচারের সত্যংগ ও বর্ণিত হয় নাই। এখনও নীল অঞ্চলে গৃহদাহ, দৃষ্টভয়ক প্রভৃতির অবশেষ দৃষ্টগোচর হইবে। আরও দেখা যাইবে—নারীদের উপর কুপ্তিরাবদের অত্যাচার করার দরুন কত পরিবার সমাচ্ছ্যত হইয়াছে, নীলকরদের অবস্থা অর্ণ-কুণা বিটাইবার নিমিত্ত কত বনী ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এটি অতি সত্য কথা যে, পুরুষের অহুপস্থিতিতে গ্রীষ্মকে দিয়া নীলকরদের মাটি তাড়ানো হইয়াছে। ফুলীর অভাবে ভ্রাণ ও কাষহদিগকে বাটাইতেও তাহারা বিধা করে নাই। পুরুষদের নীল চাষ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের স্ত্রী ও কন্যাপ্রপণকে নীলকুঠীর

ওদানে আটক রাখিয়া নিরতিশর হর্ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি যে গ্রাম হইতে এই পত্র লিখিতেছি সেই গ্রামের রায়তহু অধিকারী নারক এক ব্যক্তিকে তাহার বাড়ীতে গন্ত কেন্দ্রারী বাসে হাজরাপুর কুঠীর সাহেব ওটল আক্রমণ করে। রায়তহু পলাইয়া যায়, কিন্তু বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহার অহুসরণ করিতে পারে নাই। লাঠিরাবদের কোণ পড়িল বাড়ী ও আসবাবপত্রের উপর। তাহারা বাড়ীট ভুলিয়া করে, আর আসবাবপত্র লুণ্ঠ করিয়া লইয়া যায়। বাড়ীর স্ত্রীলোকদের প্রেষার করিয়া পরিবেশ বহু হিনাইয়া লইয়া উলদ অবহার ঈত করাইয়া রাখে। অবশিষ্ট কাহিনী লিখিতে আমার সংকল্প উপস্থিত হইতেছে। এই লোকটিকে জাতিহৃত করা হইয়াছে। রায়তহু ওটলের বিরুদ্ধে কীনারের আদালতে মামলা কল্প করে (তুমিভেছি, কীনার ওটলের আত্মীয়), কিন্তু কীনার সংকল্প ইহা ভিস্মিস করিয়া দেন। আর, একটি সন্মানিক পরিবার—লাউভারায় সাহায্য করেক মাল পূর্বে ওটলের হতে অন্তরণ নির্ধাতন ভোগ করিয়াছেন। তাহাদেরও বহু-বাড়ী লুণ্ঠিত হয় ও শেষে পোতাইয়া দেওয়া হয়, কীনারের আদালতে মামলা কল্প হইলে তিনি এটিও ভিস্মিস করিয়া দেন। এইরূপ বহু ঘটনা ঘটয়াছে...আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাহা লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে নীলচাষের কতির কথা ছাড়াইয়া দিলেও এ অঞ্চলে বনী-বিরক্ত, পাণী-পুণ্যারা এমন লোক নাই বাহারা নীলচাষের দরুন ছাড়াও কোম-না-কোম দরুন নির্ধাতন ভোগ করে নাই।...

ইতিপূর্বে ওটল সাহেবের আক্রমণ হইতে আশ্রয়কার নিমিত্ত বাধরি, পানামি, ত্রীরাবপুর, বোগর, রায়চন্দ্রপুর, হরি-শকরপুর, হুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি একতাবদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নীল বুনিবার সময় এইরূপ আক্রমণ সুনিশ্চিত। আরি শুধু করেকটি বহু বহু গ্রামের মাল করিলাম, বহু ছোট ছোট গ্রামেও বিষয় উত্তেজনা দেখা যাইতেছে।... ওটলের কথা ছাড়াইয়া এখন বিজলী কুঠীর ওমান সাহেবের কথা কিছু লিখিতেছি।

নীলচাষী ও কন্যাসধারণ ওমান সাহেবকে নীলকরদের দ্বারা সন্ধ্যাপেকা অন্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার কুঠী এবার প্রায় বদ্ধ হইয়া বাইবার উপক্রম হইয়াছে, যদি-না মোলোনী তাহার সাহায্যার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের লকল কনভা প্রেরণ করেন। তাহার দেওয়ান ঈশানচন্দ্র হুদুম জারি করে যে, গ্রামগুলির লকল বাশবাক কাটিয়া কেলিতে হইবে এবং স্ত্রীলোকগণকে কুঠীতে বরিয়া আনিতে হইবে যদি নীলচাষীরা নীল কাটিতে অবীকার করে। শত শত লাঠিরাব নিহৃত করিয়া বাশগুলি কাটিয়া কেল হইল, কিন্তু হুদুমের দ্বিতীয় অংশ কার্যে পরিণত করিতে বাধ্য পাওয়া গেল। বাহারা বোমবা ছিল তাহারাও নীলকরদের বিরুদ্ধে বোগ দিল। মিঃ

টেলরের বিচারে ঈশানচন্দ্রের তিন মাস কারাবও এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। শোলকোপা গ্রামটি বাংলাদেশের একটি খুব বড় গ্রাম। এখানকার পুরুষ অধিবাসীর সংখ্যাই আট হাজারের উপর। ইহাদের অধিকাংশ দীর্ঘপ্রাণ মুসলমান। বিষ্টুদি, টবেরপুর প্রভৃতি গ্রাম কম বড় নহে। ওমান সাহেবকে এইরূপ আঠাশট ঘোড়ার সঙ্গে হুকিতে হইতেছে।।...

দীরগঞ্জ কুঠিতেও গোলমাল চলিতেছে। চাষীদের কোষ এতদূরও ছাপ পার নাই। শুকন, বিহাঙ্গিন জন সিপাহী সেখানে পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে সঠিক বলিতে পারিতেছি না।।...মিঃ কীনার শিশিরবাবুকে আদালতে অভি-
যুক্ত করিতে হইতেছেন; কিন্তু আমি পুনরায় বলি তাহার মনে রাখা উচিত যে, হালিতে সাহেব এখন আর বাংলাদেশে আসন করিতেছেন না।”

৩

শিশিরকুমার বর্ষাকালে বশোহরের উত্তরে মাগুরা মহকুমা অঞ্চলে ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ও তাঁহার সহকারীদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমটি হইল, ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’র বশোহর সংবাদদাতা সন্দেহে জেলা-কর্তৃপক্ষ অনবরত তাঁহাকে নানা ভাবে মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইতে চেষ্টিত ছিলেন। অন্যতম তাঁহার দূরে দূরে থাকার প্রয়োজন ছিল। তবে দ্বিতীয় কারণই মুখ্য। এই সময় জেলা-কর্তৃপক্ষ মকস্মে গিয়া ‘বিক্রোহী’ প্রজাদের দিয়া নীলগাছ কাটাইবার জন্ত বিভিন্ন অগণকৌশলের আশ্রয় লইতেছিলেন। বহির্জগতের নিকট সে সময় ফাঁস করিয়া দেওয়া ছিল শিশিরকুমারের অভিপ্রায়। তিনি নিদারুণ বর্ষার মধ্যে—যখন উত্তর অঞ্চল স্রবুহু হ্রদে বা ছোটখাটো সাগরে পরিণত হইয়াছে তখন জীবন বিপন্ন করিয়াও নৌকাযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাইতেছিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও নীলকরদের ক্রিয়াকলাপের বিষয় জানিয়া লইয়া ‘পেট্রিয়টে’ প্রকাশ করিতেছিলেন। ১৮৬০, ৬ই সেপ্টেম্বরের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ যে পত্রখানি বাহির হয় তাহা পাঠে জানা যায়, প্রচুর বারিপাত্ত হেতু শিশিরকুমার শোলকোপার বাইতে পারিতেছেন না। সেখানে বাওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ নীলকর এবং রায়তদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ আসন্ন। এ বিষয়ের উল্লেখের পরে শিশিরকুমার এই মর্মে লেখেন :

“শোলকোপা-কুঠির ওমান সাহেব কয়েক শত লাঠিয়াল কোপাত করিয়াছেন। শুকন, তিনি তাহাদের দিকভ্রমণ ও গোলাগুলি দ্বারা লজিত করিবেন। ইহা অনেকটা অত্যাচার

সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তো পূর্বেই লিখিয়াছি যে, ওমান সাহেব পণ্ড কয়েক মাস ধরিয়াই গোলাবারুদ বন্ধক সংগ্রহ করিতেছেন, অধিলা—আমরকা। এ সুযোগ হইত তিনি লাঠিবেদন না। এই সংঘর্ষ যদি সত্যই বাধে তাহা হইলে ইহা সামান্যক রকমের হইবে। হাজার হাজার সশস্ত্র লাঠিয়াল এক দিকে, অত্র দিকে হয় হাজার মুসলমান—বাহারা একেবারে বহিরা হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এক বার এই আসন্ন সংঘর্ষ প্রতিরোধে তৎপর হউন না ?”

ইহার পরে শিশিরকুমার লেখেন যে, তিনি সদর বশোহর হইতে এখন চল্লিশ মাইল দূরে রহিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোলোনী ২রা সেপ্টেম্বর বশোহর ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াও তিনি দ্রুত আশা পোষণ করিতেছিলেন। জেলা-কর্তৃপক্ষ নীলকরদের কতখানি সহায় হইয়াছেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ এই পত্রে শিশিরকুমার দাবোঙ্গা বর্ত্তক সঙ্গপ্রাপ্ত একখানা পরওয়ানারও উল্লেখ করেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই : “যখনই নীলকরদের নিকট হইতে আবেদন আসিবে যে, রায়তেরা সংঘবদ্ধ ভাবে নীলকরদের জব্দ করিবার জন্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হেথা-সেথা বিচরণ করিতেছে তখনই যেন তাহাদের বেআইনী জনতা বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়।” শিশিরকুমার লেখেন, “এরূপ পরওয়ানা গত ১২ই মার্চও একবার দেওয়া হয়। এখন পরওয়ানা পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য—যে সকল রায়ত নীলকরদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবে না, সরকারী সহায়তায় তাহাদের আটক করিয়া রাখা।”

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কীনারের কৌটিকাহিনীর কথাও শিশিরকুমার এই পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ওমান সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হস্ততা। ওমানের বিরুদ্ধে গৃহদাহ, নরহত্যা প্রভৃতির যে সব অভিযোগ আসে তাহা তিনি নিরাক্ষ ভাবে ভিস্‌মিস্ করিয়া দেন। মুন্সিক-পুরের সংঘর্ষকে—বাহাতে এক জন নিহত ও চারি জন গুরুতররূপে আহত হয় আর দুই জনকে একেবারে গাপ্ করিয়া ফেলা হয়—কীনার একটা সামান্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। একদিন দুই শত ঘোড়ল (গ্রাম্য নেতা) তাঁহার নিকট আবেদন লইয়া গেলে তিনি তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। আবার আবেদনকারীদের কারাগারে পুরিয়া রাখার কথা বলিয়াও ভয় দেখান। কালোগোলের মিথ্যা হামলা লইয়া কতই না জাঁক করা হইল। কুঠিয়াল চার্ডন সাহেব একে একে নাম করিয়া দেখাইয়া দিলে মিঃ কীনার উপপকাশজন নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে চালান দিতে হকুম দিয়াছিলেন। ইহার পর শিশিরকুমার লেখেন :

“এহেন কীনারকে ছোটলাট বাহাদুর মিঃ এন্ট কতকাল আর এখানে বহাল রাখিবেন? বহাল রাখি কি বশোহরের হুজি লক অধিবাসীর মঙ্গল চান না? তাহার কি এই অভি-
বৃত্ত বে, এক জন বেতাকের লক লক লক লককার নিপীড়িত
হইবে?”

৪

পরবর্তী পক্ষে শিশিরকুমার ঘোষ নীলকরদের ‘নগদ
রূপেয়া’র মহিমার কথা ব্যক্ত করেন। এ পত্রখানি বাহির হয়
১৮৬০, ৬১ অক্টোবরের ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্টে’। তিনি এই মর্মে
লেখেন,—কিছুপা লাভজনকভাবে টাকার ব্যবহার করিতে
হয় তাহা কেহ জানে তো এই নীলকরেরা। মামলাগুলিতে
তাহাদের জয়লাভের মূলে রহিয়াছে এই টাকা। গুরুতর
অপরাধে অপরাধী হইয়াও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদা-
লতের চক্ষে ধূলা দেওয়া, নিপীড়িতদের প্রতিশোধ লইতে
অনিচ্ছা, গবর্ণরদের মোহাজির করিয়া রাখা, পুলিশকে পোষ
মানানো, জমিদারদের দমন করা, রায়তদের ঘাড় মটকাইয়া
দেওয়া—এ সমুদয়েরই মূলে রহিয়াছে এ যুগের বাহু—
রূপেয়া। নীলকরেরা টাকার ‘সদ্যব্যবহার’ করিতে খুব ভাল
করিয়াই জানে। উৎকোচ, উপঢৌকন যে আকারেই দর-
কার হউক, কুঠীর সিন্দুক অমনি খুলিয়া যায়। গরিব চাপ-
রাশী, স্থপুট সেরেস্তাদার বা অভিজাত সিবিলিয়ান—বধন
বাহার বাহা প্রয়োজন হয়, কুঠীয়াল সাহেব তখনই তাহা
সরবরাহ করিতে মুক্তহস্ত। নীলকুঠীর সাহেবেরা আগে
হইতেই তাহাদের টাকা জোগাইতে থাকে, কারণ কখন যে
তাহাদের সাহায্য দরকার হইবে তাহা তো আর জানা
নাই। যে-কোন সময় নরহত্যা বা অস্ত্ররূপ ঘটনা ঘটিতে
পারে, কাজেই পূর্বে হইতেই তাহাদের হাত করিয়া রাখা
আবশ্যক। যেমন, মামলাকারীরা স্থপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টার
নিযুক্ত করিয়া রাখে।

ইহার পর শিশিরকুমার সাহুতি গ্রাম সম্পর্কে একটি
বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। কালোপোলের কুখ্যাত
প্রসন্ন দারোগার অত্যাচারক্রমে কীনার এই গ্রামে এক
দল পুলিশ মোতায়েন রাখেন এই ওজুহাতে যে, সিন্দুর কুঠী
এবং সাহুতি গ্রামের লোকদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধিবার
আশঙ্কা। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। শিশিরকুমার বলেন,
সাহুতির মথুর আচার্য্য নামে একজন ধনী ব্যক্তির নিকট
হইতে কুঠীয়াল সাহেব জরিমানা প্রকৃতি বাবদে প্রায় পাঁচ
হাজার টাকা দোহন করে। ইহার পর মথুর আর এরূপ
দাসত্ব স্বীকার না করিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে কুঠীর বিরুদ্ধে
দাঁড়ান। নীলকর তাহাদের জব্দ করিবার জন্য অনেক
চেষ্টা করে, বশোহর আদালতেও বহু মামলা রুজু হয়; কিন্তু

বধন দেবিল কিছুতেই গ্রামবাসীদের, বিশেষতঃ তাহাদের
নেতা মথুর আচার্য্যকে জব্দ করিতে পারা গেল না তখন
অস্ত্র উপায় ধরিল। নীলকর তাবিল, এক দল পুলিশ
বহি এখানে স্থিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের উপায়ে
গ্রামবাসীরা শাস্যেত্তা হইবে এবং নীলকুঠীর বস্ত্রতা স্বীকার
করিবে। প্রসন্ন দারোগাকে দিয়া পুলিশ আনাইবার চেষ্টার
ইহাই নিগূঢ় কারণ। কীনার অনেকবার উপরওয়ালার
দ্বারা তৎসিত হইয়াছেন। এবারে পুলিশ স্থাপনের হুঁকি
মিছে না রাখিয়া নদীয়া বিভাগের কমিশনার মিঃ লাসিং-
টনের নিকট কাগজপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৫

‘হিন্দু পেট্রিয়ার্টে’ শিশিরকুমারের শেষ পত্র বাহির হয়
১৮৬০, ১২শে ডিসেম্বর তারিখে। পত্রখানিতে এই বলিয়া
আক্ষেপ করা হয় যে, বশোহরের রায়তগণ পুনরায় ধ্বংসের
সম্মুখীন হইয়াছে। নীলকরেরা যে এক বিধা জমিতেও
নুতন করিয়া নীলচাষ করাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহা নহে,
কিন্তু অস্ত্র দশ রকম উপায়ে তাহারা অত্যাচার উৎপীড়ন
করিতেছে। তাহাদের নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা পূর্-
বগামীদেরও ছাড়াইয়া যায়। যে-সব ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম
প্রথম প্রজাদের সপক্ষ ছিলেন তাহারাও কিরূপে নীল-
করদের বন্ধু হইয়া উঠেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত শিশিরকুমার
উক্ত পক্ষে এইরূপ দিয়াছেন :

“আমরা বাহাদুর মিঃ টেলরের আগমনে প্রথমে বড়ই
সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আদিবার পরই তাহার
অপকপাত ও ভাষা ব্যবহারের পরিচয় পাই। এরূপ লোক
প্রেরণের লক্ষ্য ছোটলাট বাহাদুরকে বিশেষ বতবাহত হি’ এবং
আমরা ধানিকটা আশঙ্কিত হই। কিন্তু হুঃখই বাহাদের ললাট-
লিখন তাহাদের ছোটলাট বাহাদুর কি করিবেন? নতুবা
এই অকলের লক লক অধিবাসী আমরা একজন মাত্র লোকের
অনাচারের বিরুদ্ধে এমন করিয়া কাদিয়া দরিব কেন? বহু
বেশে বধন অস্ত্র আচরণের লক্ষ্য রাজস্বভুক্তা পর্য্যন্ত সিংহাসন-
চ্যুত হইলে সেই সময় আমরা এক জন সামান্য পুলিশ কর্মচারীর
সম্মুখে ছাড়া-বোকা হইয়া থাকি কেন?”

ন’হাটীর মিঃ সত্যি বাবীতে টেলরকে দলে টানিবার
লক্ষ্য এক ভবন সজা হইয়া গিয়াছে। এই সত্যি ওমান, চুয়াও
সত্যি এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। গত ১ই তারিখ
[২৪শে আগষ্ট ’৬০] এই সভা হয়। ইহার পর অবধি টেলরের
অনুভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা বাইতেছে। টেলর সাহেব
সেরেস্তাদার মদন লাহিড়ীকে অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করেন
—ছোটলাট কর্তৃক বরা না পড়িয়া, নীলকরদের সাহায্য করি-
বার সম্পূর্ণ নিষাপন উপায় কি আছে।

বহু লাভীকে বুঝাইলেই ইহার সত্যতা নির্ণীত হইবে। তার দ্বারা এই সময়ের সত্যের দিন হইতে মিঃ টেলর প্রায় চার-পাঁচ জন নীলকর পরিহৃত হইয়া যোহাৎকরা করিতেছেন। তাঁহার ঘৃহ একটি বীতিমত নীলকর সত্য (‘Planter’s Association’) পরিণত হইয়াছে। প্রায় তিনি এই সকল বহু লগে ধান্যাদি করিতে যান। তখন অবস্থ তাঁহার বর দানি থাকে।”

শিশিরকুমার ইহার পর বলেন যে, রায়তেরা নদীয়া বিভাগের কমিশনারের নিকট টেলর ও নীলকরের বোগ-সাক্ষে অত্যাচার-উৎপীড়নের বিষয় জানাইয়া বাংলার এক দীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে। সতি, ওমান, ডুরাও প্রমুখ নীলকরের ইজিত মাঝেই ম্যাজিষ্ট্রেট টেলর রায়ত-দের গ্রেষ্টার করিয়া হাজতে পুরিতেছিলেন। শিশিরকুমার লিখিলেন :

“হুজিৎক আইনের বেয়াব (মাজ হর মাস) কুমাইবার উপক্রম হইলে নীলকরেরা সাতভাতাভাতি রায়তদের বিরুদ্ধে কোঁকরাী আদালতে কতকগুলি মামলা রুজু করেন, আর মিঃ টেলর ইহার প্রত্যেকটিতেই রায়তদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন। ইহা হাতা তাঁহার একলাশে ৪৮ আইন অনুসারেও বহু মামলা রুজু হয়, ইহার প্রত্যেকটিতেই মিঃ টেলর নীলকরের অহুসে তিকী দেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ম্যার-গরায়ণ বেলা অজ মিঃ বেলা শেষ পর্যন্ত সুবিচার করিবেন। তিনি ইতিমধ্যেই প্রথম মামলার মিঃ টেলরের দ্বার বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই মামলার রায়তেরা হাজার বিধা কমি হইতে বেরণল হইয়াছিল। হোটালার্টের খুই মুনাম তনিত্তে পাই। তিনিও কি অবশেষে বরলাইয়া গিয়াছেন, না বিভিন্ন নীল-অকল হইতে যে জনদের রোল উল্লিখিত হইতে তৎপ্রতি দমঃ-সংবোগ করা তাঁহার একাধ পক্ষে অসম্ভব? মিঃ টেলরের হুজি মিঃ কল্‌কন লম্ববে কিছু লিখিবার প্রথম সময় নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ ফেলার এই রকম দুই জন ম্যাজিষ্ট্রেটকে বাহাল রাখিয়া আদালতকে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে নাকি যে, আমরা একটি ভিন্ন জাতি এবং দাবীদার জাতির দ্বারা ব্যবহার আমরা কান্দারও নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি না? উপরোক্ত রায়তদের করেক জনকে ছয় মাসের জেল দেওয়া হইয়াছে। এক পত টাকা করিয়া দিলে ‘আলানী’রা লজব হও হইতে রেহাই পাইতে পারে।”

১৮৬০ সনের শেষ দিকে এক্ষণ অত্যাচার-অনাচার চলিলেও, এই বৎসরের নীলকরের দৌরাণ্ডোর বিষয় নীল কমিশনের সম্মুখে, বিশেষতঃ সংবাদপত্র দ্বারা সর্বত্র

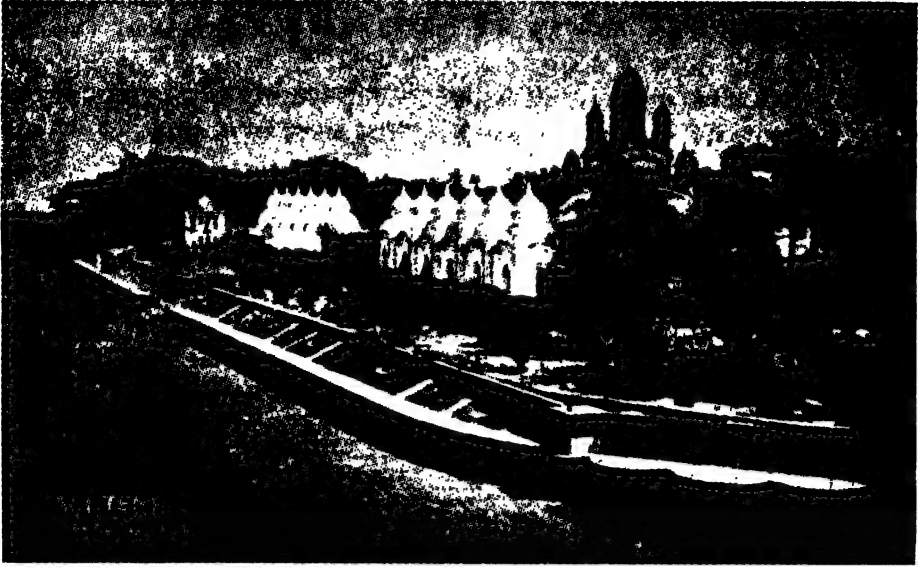
জানাজানি হইল তাহাতে তাহাদের মর্যাদা আর রহিল না। ইহার পরেও বহু বৎসর নীলচাষ বঙ্গদেশে বিস্তারিত ছিল, নীলকরের অত্যাচারও কম-বেশী নানা স্থানে চলে, কিন্তু তাহারা পূর্কগোরব ও প্রতিপত্তি কখনও ফিরিয়া পায় নাই। প্রজাকুল নীলকর সমাজের দৌরাণ্ডো তিষ্ঠিতে না পারিয়াই ঐরূপ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের এই সংঘবদ্ধ প্রয়াস বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অভিনব। নীলকরের ও জেলা-শাসকগণের ব্যাপক অত্যাচার-উৎপীড়নে বাঙালীজাতির অগাধ মেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। প্রায় পনের বৎসর পরে ১৮৭৪, ২২শে মে সংখ্যা ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র ইংরেজী স্তম্ভে (তখন ‘পত্রিকা’র ইংরেজী বাংলা ছই অংশ ছিল) শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৬০ সনের নীল-হাজারী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :

“It was the indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed it was the first revolution in Bengal after the advent of the English. If there be a second revolution it will be to free the nation from the death grips of the all-powerful police and district Magistrates. Nothing like oppression! It was the oppression which brought about the glorious revolution in England and it was the oppression of half a century by indigo planters which at least roused the half-dead Bengalee and infused spark in his cold frame.”

অর্থাৎ, ‘নীল-হাজারী’ই সর্বপ্রথম এদেশীয়দিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিতে শিক্ষা দেয়। বস্তুতঃ ইংরেজদের আগমনের পরে বাংলাদেশে ইহাই প্রথম বিপ্লব। দ্বিতীয় বার বখন বিপ্লব দেখা দিলে তখন পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অত্যাচার হইতে আমরা রেহাই পাইতে পারি। অত্যাচারের মত কিছুই নহে! অত্যাচারের ফলে ইংলণ্ডে সেই গৌরবময় বিপ্লব আসিয়াছিল; বাংলাদেশেও নীলকরের অর্ধপতাকীয়াপী অত্যাচারের নকল অর্ধমৃত বাঙালী জাতি গা-ঝাড়া দিয়া উঠে এবং তাহার অগাধ মেহে আবার চেতনার সঞ্চার হয়।’

৯ কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যা ‘প্রবর্তক’ উদ্ধৃত। এই সংখ্যা ‘প্রবর্তক’ হইতে বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যা পর্যন্ত ছয়টি প্রবন্ধে শিশিরকুমার ঘোষ লম্ববে প্রথম যুগের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’, দ্বিতীয় সৌদামিনীর দ্বিতিলিপি (এখনও অপ্রকাশিত), শিকাবিবরণ লসকারী রিপোর্ট, কবিবর দাবীদার সেদ, হুসলাক অরুজলাল বহু প্রমুখ সমসাময়িক ব্যক্তিদের রচনা ও উক্তি এবং শিশিরকুমারের নিজস্ব প্রবাসী উপর প্রবাসতঃ নির্ভর করিয়া আদি আলোচনা করি।

—লেখক



১২৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত পরমহংসদেবের লাংবর্ণীষ্ট বসুধেবের নবরত্ন কালীমন্দির, অষ্টশাল ও দ্বাদশ শিবালি

কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ

ঐপঞ্চানন রায়, কাব্যাতীর্থ

গ্রাম হিসাবে কলিকাতা নূতন নহে। এখানকার ঘোবাল বংশের ইতিহাসগ্রন্থে কুলগ্রন্থে আট শত বৎসরাধিক প্রাচীন এই গ্রামটির উল্লেখ আছে।* কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায়।† এখানে নগর গড়িয়া উঠে প্রায় দুই শত বাট বৎসর পূর্ব হইতে; কিন্তু নগর পত্তনের অনেক আগেই এখানে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

এখানকার বাঙালী জাতির প্রাচীন মন্দিরগুলিতে প্রধানত: তিনটি মূল রীতি দেখা যায়—(ক) নিজস্ব, (খ) মিশ্র, (গ) বৈদেশিক। এই মূল রীতিত্রয়ের সমগ্র উপরি-

ভাগগুলি এখানে দেখা যায় না। এখানকার মন্দিরগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাদের গায়ে অলঙ্করণ-বাহুল্য কিংবা পুস্তলিকাবিন্যাস বিরল। নিজস্ব রীতির ত্রিচূড় অষ্টশাল মন্দিরই এখানে বেশী। মিশ্ররীতির পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের সংখ্যা তদপেক্ষা কম। একরত্ন বা আলগোছ টুকী নাই। বৈদেশিক রীতির মধ্যে উত্তর ভারতীয় ও বিলাতী পদ্ধতির দুই-একটি আছে। উৎকলীয় আদৌ ছিল না। বর্তমানে নিমতলা ষাট ষ্ট্রাট নিবাসী রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটি খাঁটি উৎকলীয় রীতির মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমার আলোচনা বেশীর ভাগ মধ্য এবং উত্তর কলিকাতার প্রাচীন ও লিপিবদ্ধ মন্দিরগুলিতেই নিবদ্ধ

* “পদ্মপতির সন্ধানপণ কলিকাতার ঘোবাল বলিয়া এসিহ। নুতরাং কলিকাতাকে আমরা অনেক প্রাচীন গ্রাম বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি। অন্ততঃ দুানকরে আট শত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন”—সম্বন্ধ নির্ণয় চতুর্থ পরিশিষ্ট পৃ. ২৭। এই পদ্মপতি রাজা আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ত্রাশ্বণের অতত্তম বাৎস গোজীর হানক হইতে অষ্টম পুরুষ।

† “কালীপাতা মহাহান কলিকাতা কুটিনান, দুই কুলে বলাইল হাট। পাবাণে রচিত বাট, দুই কুলে বাজী ঠাট, কিয়রে বলায় নানা বাট।”—ভাষ্করবীর ভট্টবর্ণন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী। পৃ. ২৯৫। বঙ্গবাসী সংস্করণ।

শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের লেনে কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। উহা অষ্টশাল রীতির ত্রিচূড় ও আমলাযুক্ত একটি বিরাট মন্দির। মধ্যে তিনটি কক্ষের কেন্দ্রস্থটিতে বিশাল শিবলিঙ্গ ও পার্শ্বের দুইটির উত্তরস্থটিতে খাড়ুময়ী দশভূজা দুর্গা এবং দক্ষিণ দিকস্থটিতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে। দুই পাশের কক্ষ দুইটির দ্বারের উপর তিনটি আধুনিক লিপি ও মধ্যের শিবগৃহের দ্বারদ্বীপে প্রাচীন লিপি বর্তমান। লিপিটি খাড়ুমলকে উৎকীর্ণ;

ইহার শেখাঙ্গ আবৃত থাকার পড়িতে পারা যায় নাই।
লিপিটি এই :

ঐশ্বর্যমেশ্বর মহেশ্বরে প্রতিষ্ঠা সন ১০৬১ ভাব ৩১শে
চৈত্র ঐশ্বর্যমেশ্বর দেব দাস সাং দীর্ঘ পদা হাং সাং হুতাবদী
সভাবাকার। ঐশ্বর্যমেশ্বর মহেশ্বরে উক্ত ঠাকুর বাগী সন
১২৬১ সাল ৩১শে চৈত্র তল্য এশোষ ঐশ্বর্যমেশ্বর দেব দাস
এসিহ দাস কলিকাতা সভাবাকার। ঐশ্বর্যমেশ্বর মহেশ্বরী ব্রত
স্থাপন (বীতের হুই লাইন পড়া গেল বা।)।*

নন্দরাম সেকালে জেট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান
ছিলেন। মন্দিরের নিকট দশ বিঘা জমির উপর তাঁহার
সাততলা বিরাট ভবন ছিল। সেকালের কলিকাতায়
“নন্দরাম সেনের বাড়ী” একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া-
ছিল। বর্তমানে তাঁহার অন্যতম বংশধর শ্রীকমলাকান্ত সেন
নীলমণি মিত্র স্ট্রাটে বাস করেন।

বহুবাক্যে ১৮নং কেনডাবডাইন লেনে মিশ্ররীতির
তিনটি মন্দির আছে। মাঝেরটি নবরত্ন। পাশের দুইটি
পঞ্চরত্ন। মন্দির তিনটির চূড়াগুলি বহু খাঁজযুক্ত। তিনটিই
শিবমন্দির। পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন শিবমন্দির বাংলার খুব কমই
আছে। এই কলিকাতাতেই মুক্তারাম বাবু স্ট্রাট, চিংপুর
রোড সংযোগের নিকট আর একটি নবরত্ন শিবমন্দির
অবস্থিত। মেদিনীপুরের কানাসোল গ্রামের বাড়েবরের
মন্দিরটিও নবরত্ন। শিবমন্দির প্রধানতঃ অষ্টশালি দেখা
যায়, এইগুলি তাহার ব্যতিক্রম।

উক্ত মন্দির তিনটি কোর্ট উইলিয়মের দেওয়ান জিলোক-
রাম পাকড়াশী নির্মাণ করাইয়া ইহাদের সম্মুখে একটি বৃহৎ
জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমানে জলাশয়টি ভরাট
করাইয়া বহিঃস্থ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রাচীন মন্দিরগুলি
হইতে স্থানটির নামও মন্দিরতলা হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে
কষ্টিপ্রস্তরের স্তম্ভ ৩৮' বেধ ও ৫২' উচ্চতার শিবলিঙ্গের
বর্তমান। পাকড়াশী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সর্দারমজলা
দেবী ও জামাতা ফুলিয়া মুখুটিবংশীয় রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের
বংশধর ৩১-এ ওয়েলিংটন স্ট্রাট-নিবাসী শ্রীগভীশচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায়, বি-এল, মহাশয় মন্দিরগুলি সংস্কার করাইয়া
উহাদের পশ্চিমেরটির গাত্রে নিম্নের লিপিস্থ বর্ধন-কলক
স্থাপন করেন।

“In 1765 this Navaratna Temple of Maheswaram
has been founded by Dewan Trilokram Pakrasy, the
ancestor of the present *Sevai* Satish Mukhopadhyaya,

* পূর্ণচন্দ্র বে উর্ডেসাগর, বি-এ, মহাশয় এক সময়
লেখককে বলিয়াছিলেন, ঐ মন্দিরলিপিতে ভুল আছে।
নন্দরামের হুই লত বংশর পরে তাঁহার এশোষের সময় বেখিয়া
লিপি অজ্ঞাত দহে বলিয়া দহে হয়।

B.L., of 61 Wellington Street, Calcutta, who repaired
the temple.”

পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজ্যপালের সহিত উক্ত মুখো-
পাধ্যায় বংশের সম্পর্ক আছে।

৩১.২নং বাগবাজার স্ট্রাটে নীলমণি বিদ্যালয়
নীলকণ্ঠ শিবালয় সন ১১৭৮ সালে স্থাপন করেন।
প্রাচীন মন্দির এখন লুপ্ত। নতুন মন্দিরটি ছাদযুক্ত
গৃহ।

শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রাটে রাজা স্ত্রীর রাধা-
কান্ত দেবের দুর্গামণ্ডপের পশ্চিমে যে নবরত্ন মন্দির আছে
তাহাতে বজ্রীয় মিশ্র, মিশরীয় ও তুরস্কীয় রীতির বিচিত্র
সংমিশ্রণ দেখা যায়। চূড়াগুলি কতকটা পিরামিডের ধরণের,
উহাদের শীর্ষে তুরস্কদেশীয় খাঁজকাটা ক্ষুদ্র গম্বুজ, উপরের
চক্রগুলি বটুকোণ। মন্দিরগাত্রে কতকগুলি কলকে মিশরীয়
ফিহুস্ ধরণের পুতলিকা আছে, কিন্তু ইহাতে কোন লিপি
নাই। বর্তমান রাজবংশধরগণের কেহ কেহ মনে করেন
উহা রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্ব নির্মিত। রাজা বাহা-
দুরের জন্ম ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ও মৃত্যু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—ইহা
হইতে মন্দিরের বয়স কতকটা অসুমান করা যাইতে পারে।
পূর্বোক্ত রাজবংশীয়গণ মন্দিরে মিশরীয় প্রভাব স্বীকার
করেন। এইরূপ আর একটি মন্দির চিংপুরে সিদ্ধেশ্বরীতলার
পশ্চিমে আছে। উহাতে ঐ সকল মিশ্রণের সহিত জোড়-
বাংলা বা বিশাল ধরণের ছাদও বর্তমান।

নিমতলা ঘাট স্ট্রাটের শেবাংশের প্রাচীন মসজিদটির
উত্তরে মদনমোহন দত্তের পূজাগণ প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ অষ্টশাল
মন্দির অবস্থিত। ইহার শিবলিঙ্গ কলিকাতার মধ্যে বৃহত্তম।
মন্দিরটির পশ্চিম দ্বারের শীর্ষে কৃষ্ণপ্রস্তরের ক্ষোদিত নিম্নোক্ত
সংস্কৃত লিপি আছে। লিপিটি বঙ্গাকরে, অক্ষরগুলি সেকালে
হস্তলিপির খাঁচের :

“অদৌবদীশ বরগীষরনিতরসি।

প্রখ্যাত শাক সময়ে পিতৃরাজতৈর্যৎ।

সংস্থাপিতঃ মদনমোহন দত্ত-

পুত্রোহঁৎপেবদ্য শিবলিঙ্গমহুং হসোর্গে।

মর্থঃ—পিতা মদনমোহন দত্তের আদেশে তাঁহার
পূজাগণ ১৭১৬ শকাব্দায় উত্তম সৌধে দুর্গেশ্বর নামক শিব-
লিঙ্গ স্থাপন করেন। লিঙ্গে পাদপীঠে “শ্রীসিকলান দাস
দত্তঃ শ্রীহরলাল দাস দত্ত সন ১২০১ সাল” ও “শ্রীগদাধর
দাস ডাক্তরঃ” নামগুলি উৎকীর্ণ আছে। এই বিশাল
লিঙ্গের স্থপতি যে একজন বাঙালী ইহা গৌরবের বিষয়।
নিকটে মদনমোহন দত্ত লেন। ইনি হাটখোলার দত্তবংশীয়
প্রসিদ্ধ জাহাঙ্গীর-ব্যবসায়ী ছিলেন। খ্যাতনামা রামকুমার

সরকার ইহারই প্রসাদে লক্ষ দুই লাভ করিয়া স্বীয় বৃদ্ধি-বলে ব্যবসায় চালাইয়া পরে বিবর্ত ধনী হইয়াছিলেন। মন্দিরচূড়া হইতে একটি বৃহৎ শৃঙ্খল লম্বমান।

সুর্ভিবাগান মন্দির স্ট্রীটের যে মন্দিরটির শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইবার পর ১৯২৬ সালে কলিকাতার কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হাকামা আরম্ভ হয়, তাহা আধুনিক উত্তর-ভারতীয় রীতিতে নির্মিত। মন্দিরগায়ে প্রাচীন বন্ধাকরে কোমিত লিপিটি এই :

শকাব্দ ১৭২৫।

শাকে বাণ সুশাস্তিচক্ৰ পণিতে মেঘোদবিশেষে দিমে।

বারেহুমিসুভক্ত বিপ্রকুলকঃ সৌম্যং দশম্যং তিৰো।

ঐভার্যভিবকো দমো হুহুমী কেত্রোপকর্থে শিব।

ঐত্যে পুণ্যবতো দুহা বরিতয়োঃ পিজোঃ স্বয়ংব্রতঃ।

লিপিগ্রন্থের উৎকীর্ণ। মর্থঃ—ঐভার্য নামক ব্রাহ্মণ-পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় মাতা ও পিতার স্মৃতির জন্য গঙ্গাতীরে ১৭২৫ শকাস্কার বৈশাখ মাসের উনিশে মঙ্গলবার দশমী তিথিতে শিব স্থাপন করেন। নূতন মন্দিরটি ছোট্টোলাল কানোড়িয়ার ধর্মপত্নী ঐজ্ঞানকীবাসী সন ১৩৩২, ৬ই কা্তিক প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠাঠনিয়া কালীমন্দিরের পাশে পশ্চিম দিকে যে অষ্টশাল শিবমন্দিরটি আছে, উহার অস্পষ্ট লিপি :

ঐবন্দিয়ে লম্বাশি ঐমং পুণীশ্বরঃ শিবঃ।

বন্দিয়ে ঐপ্রিয়ানাতা শকাব্দে ২৩৩৩ বর্ষে। (৭)

শকাব্দ ১৭২৮। সন ১২১৩ সাল, ১ বৈশাখ।

মর্থঃ—ঐমন্দিরে ঐপ্রিয়া দাসী উক্ত শকে ঐমং পুণীশ্বর শিবস্থাপন করেন। নিকটে ঐসিদ্ধেশ্বরী কালী-মাতার মন্দির শব্দে ঘোষ কর্তৃক ১২১০ সালে নির্মিত হয়। উহাতে বাংলা ভাষায় “ঐঐঐর্গা। শব্দের দ্বয় মাঝে কালী বিরাজে” দুই পংক্তিতে লিখিত আছে।

কিছু দূরে মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের একটি অষ্টশাল শিব-মন্দিরে এক্ষণ বাংলা পদ্যাংশ :

“ঐঐঐককীর্টর ঐচরণ ভরসা।

ঐমধুসূদন সেনের দ্বয় মাঝে হয় বিরাজে।

সন ১২৫৩ সাল।”

গড়পারের একটি অষ্টশাল শিবমন্দিরের ১২৫৭ সাল লিখিত। এক্ষণ বেধুন রো’র কালীমন্দিরে বাংলা পদ্য :

“ঐঐনিভারিণী করতি।

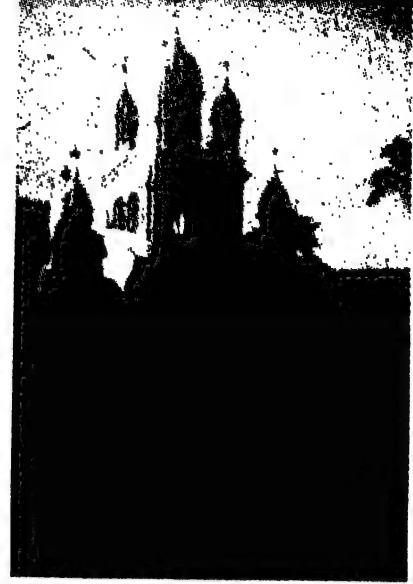
কালিকে চরমকালে ভব মাল্য পায়।

ঐবরের বদ-প্রাণ লকলী মিলায়।

শকাব্দ ১৭৮৭, সন ১২৭২ সাল।”

মন্দিরটি নবরত্ন; সোপানে ত্রিধ্বজ নান কোমল। প্রধান কটকের দুই পার্শ্বে অষ্টশাল শিবমন্দিরদ্বয় অবস্থিত।

আমহাট স্ট্রীট ও সীতাবাম ঘোষ স্ট্রীটের সংযোগস্থলের ৬কেন্দারনাথ শিবের অষ্টশাল সন ১২৭৫ সালের ২রা মাঘ নির্মিত।



কলিকাতা বলরাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ ঐঐঐভবভারিণী মন্দির-সহ দুইটি অষ্টশাল শিবমন্দির [কটো—শিখর দিক হইতে

কৈলাস বস্থ স্ট্রীটের একটি অষ্টশাল শিবমন্দিরের লিপি :

“বহেশ্বর মহেশোঃস্বয়ং ভৎপদাকাজিণী নবা।

প্রতিষ্ঠিতঃ ঐমহেশচক্ৰ সেদেব ভক্তিভঃ।

সন ১২৯০ সাল। মহেশ-পদাকাজী—ঐমহেশ সেন কর্তৃক মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামবাড়ার বলরাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ লিপিহীন নবরত্ন কালী-মন্দির ও অষ্টশাল শিবমন্দিরদ্বয় এবং নাট্যমন্দির উক্ত বলরাম ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র, দেওয়ান ভুলসীরাম ঘোষের গৌড় হরপ্রসাদ ঘোষের সহধর্মিণী কর্তৃক সন ১২৯৫ সালের ৫ই বৈশাখ, বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবরত্ন মধ্যে হরপ্রসাদ কর্তৃক স্বপ্রদৃষ্ট তৈলচিচ্ছাবায়ী পূর্ণাঙ্গ ত্রীভবভারিণী দক্ষিণা কালীমূর্তি কষ্টিপাথরে ও মহাকাল মর্ধ্যেরে নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত। ঐ সঙ্গে ঐধর শালগ্রামও আছেন। অষ্টশাল দুইটিতে ঐহরপ্রসাদ ও ঐহরেশ্বর লিঙ্গদ্বয় বর্তমান। হরপ্রসাদ অকালে পরলোকগমন করিলে তাঁহার পত্নী দয়াময়ী দাসী ও পুত্র সারদাপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণ স্ত্রীম মূর্তি ও মন্দির বন্ধে বিরল। সারদাপ্রসাদের পুত্র ঐকুপেন্দ্র

নাথ ঘোষ পৈতৃক রীতি অনুযায়ী দেবসেবার বস্ত্রশীল।
মন্দিরগুলি তাঁহারা সংস্কার করাইয়াছেন।



পটলভাঙ্গা বেনিয়াটোলায় প্রাচীন অষ্টশাল শিবমন্দির

বহুবাজার কপালীটোলায় কালীমন্দির অষ্টশাল ও উচ্চ
পীঠের উপর গঠিত। উহার লিপি :

“ঐশ্বকালীমাতা জয়তি।

সেবারং ঐশ্বকক দাল ও ৮দ্বারক দাল।

২৯শে কাশ্বন মস ১২৯৬ সাল।”

পটলভাঙ্গা, বেনিয়াটোলায় প্রাচীন অষ্টশালের পুরাতন
দুইটি লিপির কলক আচ্ছাদিতপ্রায় হইয়া দুপাঠ্য হইয়াছে।
নিম্নকলকের “ঐশ্বত জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ও ঐশ্বরমা-
কান্ত” নামগুলি কটে পড়া যায়। এই শিবমন্দিরের কুট্টমে
যে আধুনিক মর্মর-ফলক আছে তাহার লিপি :—৮দ্বারমা-
প্রদাদ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী বাৎ ১৩৫১। শক ১৮৬৬
বিঃসঃ ২০০১। ইং মে ১২৪৪-এ সংস্কার করেন। অপর
কোন মন্দিরে এরূপ সকল প্রকার অল্প ব্যবহার হয়
নাই। মন্দিরের বর্তমান মালিক বেনিয়াটোলা নিবাসী
ঐশ্বগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেবতার বহু অলৌকিক কাহিনী
অবগত আছেন।

কলিকাতার নানাস্থানে ঋগ্ বা ততোধিক শিবমন্দির
আছে। উহাদের কোনটিতেই লিপি দেখি নাই।
আহিরীটোলায় প্রাচীন অষ্টশালের লিপি বর্তমান বিদেশী
মালিকের কুতিতে আবৃত। শোভাবাজারের গঙ্গার নিকটে
একটি প্রাচীন হু-উচ্চ, খাঁজযুক্ত নবরত্ন আছে। উহাতে
কোন দেবতা বা লিপি নাই। বাগবাজারের মোড়ের
অষ্টশালগুলিও প্রাচীন। জগন্নাথ ঘাটের জগন্নাথ মন্দিরটি
পাইকপাড়া রাজবংশের লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। নগরের সকল
মন্দিরের আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

মন্দিরের মত কলিকাতার বহু প্রাচীন চকমিলান বাটার
উত্তর বা পূর্বাংশে চতীমণ্ডপ আছে। এরূপ মণ্ডপযুক্ত
চকমিলান প্রাসাদের চারিদিকের দুই তলেই অলিন্দে যুগ্ম
স্তম্ভশ্রেণী থাকে। মণ্ডপে উঠিবার সোপান কোথাও মধ্য-
স্থলে গোলাকার, কোথাও বা সমগ্র মণ্ডপব্যাপী চতুর্ভুজ।
মণ্ডপের কুট্টমে দুই সারি স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভ আবার বহু
ক্ষুদ্র স্তম্ভের সমষ্টি। কুট্টমের মধ্যস্থলে উত্তর বা পূর্ব-
প্রান্তে দেবতার বেদী। দুই তলেই দুই পাশে চারিটি
বাতায়ন ও দ্বারযুক্ত কক্ষ। নীচের দক্ষিণের বা পূর্বেরটিতে
দেবীর বোধন হয়। অন্য দিকেরটি পূজকের বাসা বা
ভাণ্ডার রূপে ব্যবহৃত। দ্বিতলের বাতায়ন হইতে ললা-
গণ পূজা দেখেন। কোন কোন মণ্ডপের নিম্নাংশেও
কয়েকটি কক্ষ থাকে। ছাদের কার্ণিসের কড়ির প্রান্তে
সূক্ষ্ম দাক্ষিণ্যের নিদর্শন দেখা যায়। ইহাই বাংলার
প্রাচীন সৌধনির্মাণ রীতি। কোন কোন মণ্ডপে লিপিও
আছে। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে প্রিন্স দ্বারকানাথের
বসতবাটার মণ্ডপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমলে “ও তন্
বিক্ষেপঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি বৈদিক বচনসমূহ উৎকীর্ণ
হইয়াছে। তদবধি এখানে আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মে
ব্রহ্মোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। ১১ই মাঘ এখানকার
প্রাক্তনেই মাঘোৎসব হয়। দ্বারকানাথের আমলে মণ্ডপে
সাড়স্বরে দুর্গোৎসব হইত।

১০নং নীলমণি মিত্র স্ট্রীটের মিত্রবাটার মণ্ডপে নিম্নোক্ত
লিপিটি আছে :

“আর্য্যবিরোধে বিজ্ঞেয় দ্বারকাক্ষেপ বা পূজা। প্রবর্তিতা
বহুপূজা দ্বারকানাম মণ্ডপে। অবিচ্ছিন্না চ বা স্তম্ভ পূজা
পৌরাহিত্যিঃ কৃত। জগদ্বা প্রদাদেন প্রাপ্তা লাভ নভং লভাঃ।
১৮০১ শকাব্দাঃ।

মর্ম :—দ্বারকাক্ষেপ মিত্র বে দুর্গোৎসব প্রবর্তন করেন,
তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার পূজ-পৌজগণ কর্তৃক চলিয়া
বিস্মাতার কৃপায় ১৮০১ শকে শতবর্ষ পূর্ণ করিল। এই
মিত্রবংশ ধনকুবের রামজুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ জামাতার
ধারা।

উত্তর কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত দক্ষিণেখরের বিখ্যাত
মন্দিরগুলিও প্রাচীন রীতির। উহার নিকটে আরও এক
স্থানে দ্বাদশ শিবালয়াদি আছে।

মহানগরীর এই সকল মন্দির ও মণ্ডপ বাড়ালীর প্রাণের
দেবতার পীঠ। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের কল্যাণকর
কৃতির পরিচর বহন করিতেছে। বর্তমান পরিবেশে
এগুলির উপযোগিতা অল্পাধিক করা কঠিন। জাতি আবার
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠুক।

পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের উপার্জনের পথ

ঐদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিকাতা শহরের উপর ছোট-বড় অনেক মহিলা-সমিতি বা মহিলা-পরিষদ আছে। ইহাদের কোন শাখা-প্রশাখা পল্লী অঞ্চলে আছে কিনা জানি না এবং যদি থাকে তাহারা পল্লী-অঞ্চলের মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কি ভাবে চেষ্টা করিতেছে অথবা তাঁহাদের কি ভাবে সাহায্য করিতেছে সে সম্বন্ধে নিজের কোন জ্ঞান নাই।

বঙ্গ-ভেদবিশ বৎসর পূর্বে বধন করিদপুরে ছিলাম তখন সেখানকার মহিলা-সমিতির কার্যাবলীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। করিদপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (অধুনা স্বর্গত) মিঃ জে. এন. রায়ের পত্নী শ্রীমতী কনকলতা রায় এই মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা ছিলেন; ইনি পরলোকগত ডাঃ পি. কে. রায়ের কন্যা।

করিদপুর এবং অন্যান্য বহু জেলার পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ পুরাতন কাপড় বারী যে সকল কাঁথা প্রস্তুত করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সকল কাঁথা পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণের “শিল্পীমণ্ডল”র বশেষে পরিচয় দেয়। পুরাতন কাপড়ের পাড়ের সূতার সাহায্যেই এই সকল কাঁথা প্রস্তুত হয়। কাঁথাগুলির উপর নানা রঙের নানা রকমের চিত্র থাকে। অনেক সময়ে দূর হইতে কোন কোন কাঁথাকে ‘শাল’ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল কাঁথা দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং দেশ-বিদেশের বহু প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বাংলা-দেশের পল্লী-অঞ্চলের “কাঁথা-শিল্প”র কথা অনেকই জানেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে পল্লী অঞ্চলের বহু শিল্পকলা যেমন লুপ্ত হইয়া বাইতেছে “কাঁথা-শিল্প”ও সেই অবস্থায় পৌছিয়াছে।

এই সকল কাঁথা দেখিয়া শ্রীমতী কনকলতা রায়ের মনে হয় যে, যে সকল স্ত্রীলোক এইরূপ কাঁথা প্রস্তুত করিতে পারেন তাঁহারা অনায়াসেই নূতন কাপড় এবং নূতন সূতার সাহায্যে নানা রকম ডিজাইনের ‘বেড কভার’ (বিছানার ঢাকনি), ‘টেবিল ক্লথ’ (টেবিলের ঢাকনি) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন। করিদপুরের মহিলা সমিতির কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান কাজ ছিল—পল্লী-অঞ্চলের দুঃস্থ স্ত্রীলোকগণকে ‘বেড কভার’, ‘টেবিল ক্লথ’ প্রভৃতি প্রস্তুতের কাজ শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া উপার্জনের পথ স্বগম করিয়া দেওয়া, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বিনী করা। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের শিল্প-বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিষ্টার এ. টি. ওয়েস্টেন শ্রীমতী কনকলতা রায়কে বশেষে সাহায্য করিয়াছিলেন। করিদপুর মহিলা সমিতির অধীনে এক জন মুসলমান যুবক

নিযুক্ত হয়। ইহার নাম ছিল মকবুল মুখা। শিল্প-বিভাগ হইতে ইনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেন। আমার উপর পল্লী-অঞ্চলের দুঃস্থ স্ত্রীলোক নির্কাচনের ভার ছিল।

শ্রীমতী কনকলতা রায় নূতন কাপড়, নানা রঙের নূতন সূতা এবং নানারকমের ‘ডিজাইন’ আঁকিয়া মকবুলকে দিতেন। ‘বেড কভার’ বা ‘টেবিল ক্লথের’ কি ‘সাইজ’ হইবে, প্রত্যেকটি কি ‘ডিজাইনের’ হইবে ইত্যাদি তিনি মকবুলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন। পল্লী-অঞ্চলের নির্কাচিত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে মকবুল কাজ বটন করিয়া দিতেন এবং বটনের সময় কি ভাবে কাজ হইবে তাহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া বলিতেন। স্ত্রীলোকগণ বধন কাজ করিতেন, মকবুল বাইয়া দেখিতেন কাজ ঠিক-ভাবে হইতেছে কিনা এবং প্রত্যেকের কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেকের কাজ শেষ হইলে মকবুল তাহা সংগ্রহ করিয়া শ্রীমতী কনকলতা রায়কে দিতেন। তখন তিনি প্রত্যেক কাজে কত কাপড় লাগিয়াছে, কত সূতা লাগিয়াছে এবং প্রত্যেককে কাজের জন্য কি পারিশ্রমিক দিতে হইবে তাহা হিসাব করিয়া প্রত্যেক জিনিষের (বেড কভার বা টেবিল ক্লথ) মূল্য নির্দ্ধারিত করিতেন। এই সকল জিনিষ কলিকাতার হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনে প্রেরিত হইত এবং তাহারাই উহার প্রধান বিক্রেতা ছিল। ইহা ব্যতীত শ্রীমতী কনকলতা রায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বহু জিনিষ নিজে বিক্রয় করিতেন। যে সকল উচ্চ সরকারী কর্মচারী করিদপুরে বাইতেন তাঁহারাও শ্রীমতী কনকলতা রায়ের নিকট হইতে না কিনিয়া পারিতেন না। এই কাজের ফলে করিদপুর শহরের নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চলের প্রায় দুই শত জন দুঃস্থ স্ত্রীলোক মাসিক দশ টাকা বিশ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ বাহা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ শ্রীমতী কনকলতা রায়ের করিদপুর হইতে চলিয়া আসিবার পর করিদপুর মহিলা সমিতির সূত্রা ঘটে। আবার প্রায় দুই শত জন স্ত্রীলোককে দুঃখকষ্টের জীবন অভি-বাহিত করিতে হয়।

এইরূপ কত রকমের ফুটার-শিল্পের প্রবর্তন করিয়া পল্লী-অঞ্চলের কত দুঃস্থ স্ত্রীলোককে স্বাবলম্বিনী করিয়া তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারা যায়। কিন্তু কবে কে? আমরা বড় বড় পরিকল্পনা লইয়াই ব্যস্ত; ছোট ছোট পরিকল্পনার আশাযের যে মন উঠে না।

জরা

ঐক্যমুদ্রণ মল্লিক

বিড়ম্বনা কি অভিশাপ নহে জরা,
জরাও বিপুল সম্ভাবনার ভরা।
তাহার প্রধান ভোগই অতীন্দ্রিয়,
যৌবন চেয়ে নহে কম লোভনীয়।
নীরব বহির্জগতের শব্দ,
মুদিত কমলে ভ্রমর আবদ্ধ।

শক্তি তখনো ধরে—
স্বস্তির কোমল স্বর্ণে সে পুনঃ
নব মোচাক গড়ে।

২

জরাই করায় সর্কারত ত্যাগী,
মাছুষকে করে চকোবের স্বধভাগী।
তখন কামনা কিছুই থাকে না আর,
কর্ণে ও ফলে দুয়ে নাই অধিকার।
পাবাণ হইয়া এ থাকার আছে স্বধ
রামচন্দ্রের পেতে পাবে পদযুগ।
দেবীকে রাখে না দূরে—
এ শব-সাধনা নিজ অন্তঃপুরে।

৩

করে তবু হতে অর্ধযুক্ত মন—
অনাখাদিত রসের আখাদন।
অন্ধকারেও আনন্দে রহে জাগি'
নিশীথ-রাতের স্তব্ধোদয়ের লাগি।
এই জীবনের জরা অজাতবান,
অভিষেকের সে এনে দেয় আশাস।
শোখা সে নয় নয়,
বিশীর্ণা যেবা প্রত্যাগর
মুক্তির কথা কয়।

৪

ঙটি কেটে আহা বাহিরিবে প্রজাপতি,
তাহারি লাগিয়া চলিয়াছে প্রজ্ঞতি।
শিশু গরুড়ের পাখায় আসিছে বল,
স্বধার তৃষ্ণা করে তাতে চকল।
সদাগর তার কন্ডায় পণ্যভার
তুফানের পথে পাড়ি তার নৌকার।
ভাবে সে ক্ষণে ক্ষণ—
ভরা গন্ধার তরঙ্গে সব
রূপের নিরঞ্জন।

মায়ের কোল

ঐকালিদাস রায়

বহু সঙ্গী মিলে হেথা করিলাম নানা রঙ্গে খেলা।
পশ্চিমে ঢলেছে সূর্য্য, ঝিকিঝিকি বেলা।
পাখীরা গাহিছে গাহে দিনান্তের গান।
বধূরা 'জলকে চলে', মাঠ হ'তে কিয়িছে কৃষাণ।
ঘরমুখো গরুগুলি, শূন্য হ'ল মাঠ,
যেহে আসে কোলাহল, ভেঙ্গে যায় গ্রামান্তের হাট।
হেলাভরে করি খেলা, এবে ক্ষণে ক্ষণে
মা'র কথা পড়ে শুধু মনে।

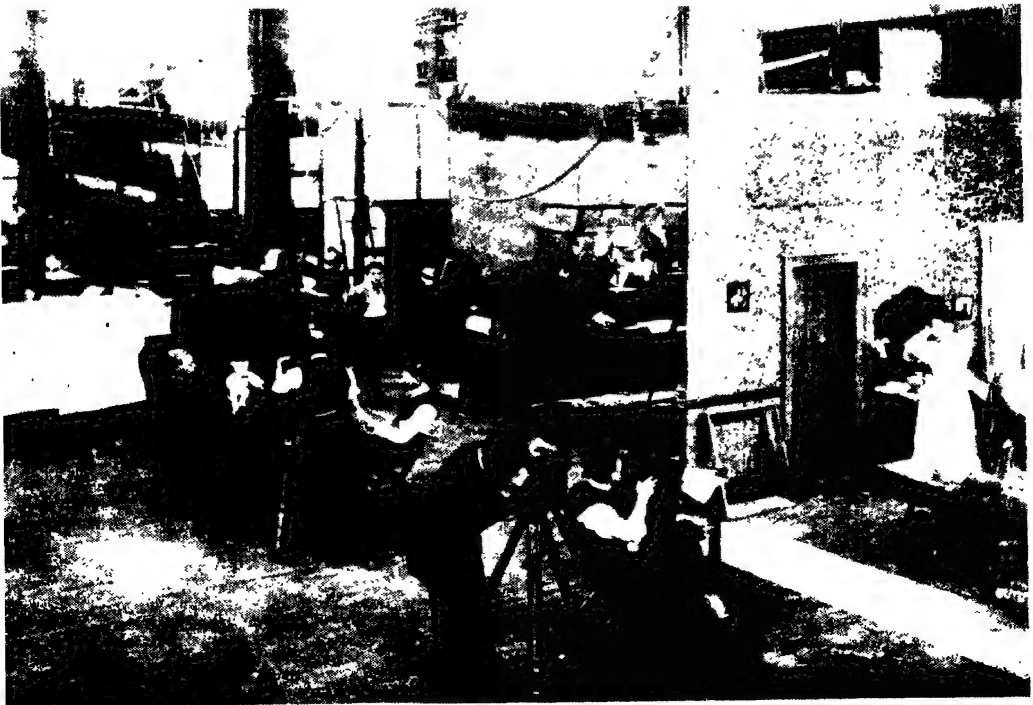
সঙ্গীরা সবাই নাই, অনেকই কিয়িরাছে ঘরে,
মায় কোলে বসি তারা বুঝি গল্প করে।
ক্লান্ত হ'ল দেহ-মন। মন আর লাগিতে না পারি,
তবু খেলে বাই কেন? ভিত্তিনাকো শুধু বাই হারি।

ধরিয়া রেখেছে মোরে নূতন খেলুয়া অকারণে।
মায় মুখ পড়ে শুধু মনে।

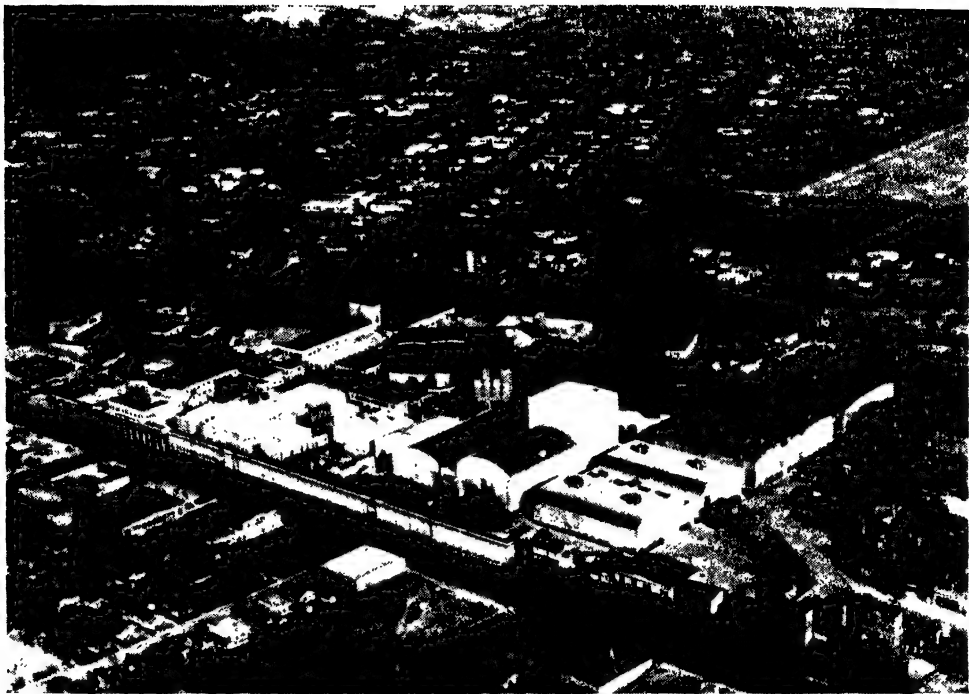
অনেকে কিরেছে ঘরে। এসেছে নূতন সব সাখী,
সাধ যায় তাহাদের সাথে রই মাতি।
রোদের নাইক তেজ, ঝিকিঝিকি বেলা,
আজিকার মত তবে সাক হোক খেলা।
খেলা ভালো লেগেছিল, খেলা যোর মনটি তুলালো।
তবু ভাবি এর চেয়ে মায়ের কোলটি আরো ভাল।
যোর পথপানে চেয়ে আছে মা যে ভূষিত নয়নে,
মায়ের কোলটি পড়ে মনে।



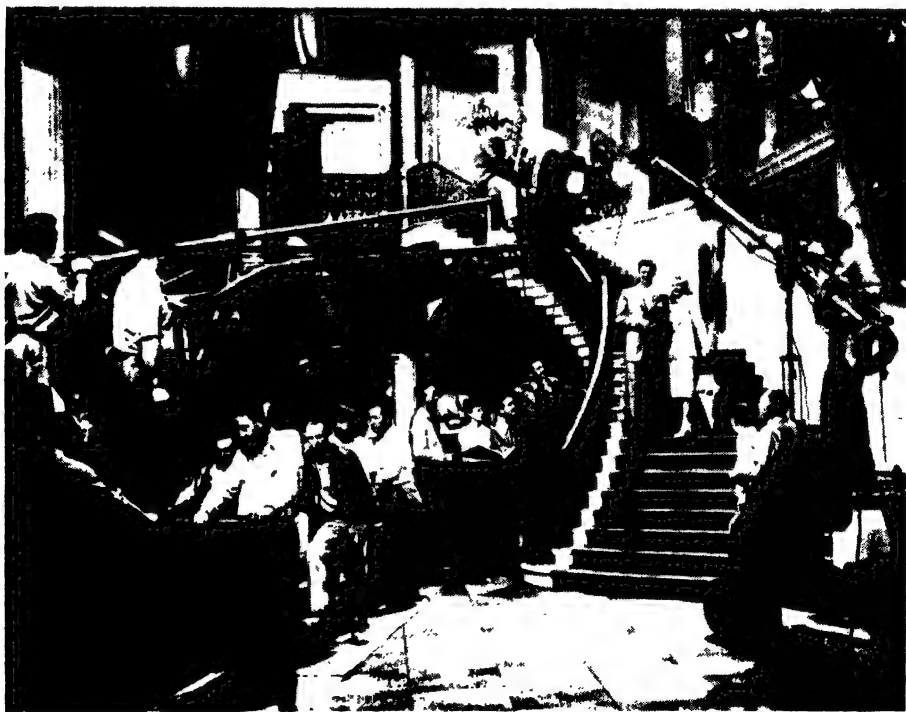
নিউ ভার্সার, ওয়েস্ট অরেঞ্জ-এ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, প্রথম চলচ্চিত্র ষ্টুডিও



১৫ খ্রীষ্টাব্দের, নিম্নাক চলচ্চিত্রের যুগের একটি ষ্টুডিও



এরোপ্লেন হইতে ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার সিটির মেট্রো গোল্ডউটন মেয়ার ষ্টুডিওর দৃশ্য



আধুনিক চলচ্চিত্রের ফিল্ম তোলার দৃশ্য

বন্দী যাত্রা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩৩

পরের দিন বাইরের ঘরে বসে প্রত্যন্ত কর্তৃক তৈরি করছিল—একখানি রিকশায় হুং হুং আওয়াজ তার কানে এল। গাড়ীটা ওদের দরকার এসে বাবল। কোতুলী প্রত্যন্ত হুং হুং বেগেলে এক অবগুণ্ণবতী বয়সী ওদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছেন। বেশ দোহারী চেহারার গৌরবর্ণ এক মহিলা—পায়ের গড়ির সঙ্গে কিছু আভিজাত্য বহন করে চলেছেন। পরিচিত কোন আত্মীয়ের সঙ্গে ঊন-সাদু প্রত্যন্তের মনে আগ্রহে না—অথচ উনি পোকে সহানুভূতি দেখাতে এসেছেন—এটি বিস্মিত। অনতিবিলম্বে লক্ষী এসে সন্মেলন করলে। বললে, দাখা—বেক কোঠাইয়া এসে-ছেন। বড়বাড়ীর বেক কোঠাইয়া।

এ্যা! প্রত্যন্তের বিষয় কাটলে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা ভাল আদম পেতে যে—আর—আর যে কি করা উচিত প্রত্যন্ত তেবে ঠিক করতে পারলে না। ওর আদমকে হাপিরে লক্ষীটা প্রবল হয়ে উঠল। যে লক্ষ্যচরিত্রে অনিবেশকে কোন দিন সাতীর মধ্যে আদ্যায় করতে পারে নি তারই প্রত্যন্তে সে বিহুত হয়ে বসে রইল। কেন এলেন বেক কোঠাইয়া?

একটু পরেই বেক কোঠাইয়া এ ঘরে এলেন। বললেন, প্রত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন বাবা? এ ত আমার বাড়ির হুতোয়ার কারণ নয়—লৌকিকতা করতেও আসি নি।

তবু আপনি এসেছেন—। হুতোয়ার প্রত্যন্তের কঠ অবলম্ব হ'ল—চোখের কোল হ'ল বাপাচ্ছর।

বেক কোঠাইয়া বললেন, না এসে যে পারলাম না বাবা। আদ্য প্রত্যন্তের—পরস্পরের বিপদে আপদে যদি সাহায্য না করি তবে মাহুত হয়ে অবেছি কেন? বল তুমি—হির হও।

হ' চোখের বাপা তরল হয়ে গও বেরে গড়িরে পড়ল। প্রত্যন্ত উঠে এসে প্রথারের তলী করতেই উনি বললেন, অশৌচে প্রণাম করতে নেই—এমনিতেই তোমাদের আশীর্বাদ করছি। এখন আর সব চিন্তা রেখে কি করে দার উদ্ধার হবে সেই কথা ভাব। অবশ্য উপায় একটা করবেনই ভগবান।

আমি একটা কাজ সেরে আসব বেক কোঠাইয়া, লক্ষী বললে।

সে কি রে—আমি কি এখনই বাচ্ছি যে, তাঁর ঘোষা মত তাঁর বাড়িরে থাকনি অবাক হয়ে।—পরে প্রত্যন্তের পানে চেয়ে বললেন, একটা অহুয়োব তোমাকে আমি করব বাবা, বল রাখবে?

বহু।

মানে আর বুঝে প্রাণে ধরত করবে। লোকের কথাই নেচে বাবলাগর, হুতোয়ার করবে না বল।

বাবলাগর? সে সাধ্য আমার কোথার? কোন রকমে ডিল-কাকন সেরে দারহুত হতে চাই।

বেশ ত—কিছু কম লোক বাওয়ালে বা খাটী পালং দাম না করলে, কি হয় না দাপলে পূর্ণপুত্রবেরা কিছু কম উঠতে উঠবেন না। আমি শুনেছি—মাহুতের মিকের কর্ত অহুয়োব যে কল ভোগ করতে হয় তারই কের শুধু লদে বার। মইলে বড়ই সোনা উৎসর্গের আভবর কম না কেন—এমন কোন মল নেই বা মাহুতকে এক কারণে থেকে আর এক কারণে টেসে তুলতে পারে।

কামি বেক কোঠাইয়া—আসল জিনিস হ'ল প্রথা-ভক্তি বা মাহুতকে বহু থেকে একের আশ্রয়ে নিয়ে বার—ক্রমে সেই একও থাকি থাকে না। বাই হোক—সে সব বড় সাধনার কথা আমরা আলোচনা করতে পারি না—কেননা আমরা হুঁচি অমই।

লক্ষী বললে, আচ্ছা বেক কোঠাইয়া—এ ঘরের কর্ত আর এক কেরে কেন মাহুত ভোগ করে? বেহটা ধ্বংস হলো—

বেক কোঠাইয়া হেসে বললেন, এ ত আমার কথা নয় না, —দীরা অনেক কামেন, অনেক বোঝেন—পতিত আর পার্থিক মাহুত—ওবি দীরা—দীরাই বলেন, বেহটা বোলস মাহুত—আচ্ছা অবিনবর—বার বার কর্ত অহুয়োব আচ্ছা সেই বোলস বহলাদ। দীতারও ত বলেছে—জীর্ণ বর হেতে মতুন বর পরিবাদের মত আচ্ছা মিরভই বোল বহল করছেন।

কিন্তু আদ্যাকে ত বেধা বার না।

বেধা ত অনেক জিনিসই বার না—ভাঙেই কি মেনে বেওয়া বার জিনিসট দেই? আচ্ছা বল ত বাতাসের কি রূপ? আবার এমন অনেক জিনিস বেবেছ—বার রূপ বলতে পার না তুমি।

কিন্তু বাতাসকেও অহুতব করা বার।

আদ্যাকে অহুতব করা বার, সে অহুতুতি তোমার আদ্যার হরত আসে না, কিন্তু দীরা পরাবিতার পতিত—দীরা কামেন এ সব।

আমি শুনেছি এই আচ্ছা অরের দীরা হির হয় না, আভনে পোকে না, বাতালে বিহুত হয় না। পরপাতার ঘেমন কলের দাপ লাগে না—কিছুই ভাঙে লেগে থাকে না। তবে কেনন করে অদ্যারের কর্তকল সে বরে নিয়ে বার—আর যে হুতি, যে বাবলা এক কেরে তার কর্তের কল তারী

করে তা অস্বাভাবিক পৰ্য্যন্ত অহসরণ করে? প্রত্যন্ত এর করলে।

বেক কোঠাইয়া বললেন, দেখনা কি আমিই বুঝিয়ে বলতে পারি? তবে যেমন ভবেছি—কথক ঠাকুরের মুখে—সেই মত বলছি শোন। এক দিন কর্ণ আর কর্ণকল দিয়ে কথা হচ্ছিল। অস্বাভাবিক বাসনা কেন্দ্র করে আত্মকে আশ্রয় করে জীবকে সেই কর্ণকল ভোগ করার ভারই কথা হচ্ছিল। কথক ঠাকুর বলেছিলেন, দেহ নষ্ট হলেও বাসনা নষ্ট হয় না। এর একটা সোকা ঘুটাত বিচ্ছিন্ন শোন। যেমন বর, একটা কামালে করেকট গোলাপ ফুল বুকে নিয়ে এসেছে। দু'দিন পরে ফুলগুলি শুকিয়ে গেলে বরেন কলে দিলে কামাল থেকে—তখন ফুল রইল না তো? কিন্তু গন্ধও কি লেগে রইল না সেখানে? তেমনি বাসনা, ওই গন্ধের মত।

প্রত্যন্ত কোঁচুহলী হয়ে এর করলে, কিন্তু আত্মা কি করে নবজন্ম গ্রহণ করেন? তিনি তো আকারহীন কোন পদার্থ—আমাদের বেহটা পকতুতে গতা মান তো? বেশ। এখন কথা হচ্ছে এই আবারে আত্মা কি করে আসেন? আমাদের শাস্ত্রে বলে—দেহ ক্ষয় হলে আত্মা ব্যোম আশ্রয় করে। ব্যোমে জন-সকারী যেখানের সবে বিশেষ স্বভাবের সে নেনে আসে পৃথিবীতে। সেই মাটিতে দেহ বারগোপযোগী শক্ত অমায়। শক্তাধুরে আশ্রয় নের আত্মা—সেই শক্ত-কণা মাহুরের মত মাপে মক্ষারি পোষণ করে।

লক্ষী বুধী-উপচানো হয়ে বললে, বাঃ সুলার তো। আমার এই রকম কথা কিছু শোনাবেন বেক কোঠাইয়া।

সব কথা সব সময়ে কি ভাল লাগে না। মনের অবস্থার কথা কখনও কান দিয়ে মনের মধ্যে পৌছয়, কখনও বা আর এক কান দিয়ে বার হয়ে বার। জানীরা বলেন, কিছুই নাকি নষ্ট হয় না পৃথিবীতে। সিঞা সেদিন কি একটা বই থেকে পড়ে শোনালে—আশ্চর্য্য কথা। নাকি আত্ম অবশি পৃথিবীতে বত দেশের বত মাহুর অধেছে—ভারা বত কথা বলেছে—বত কৈবেছে, হেসেছে—দীর্ঘনিশ্বাস কলেছে—সবই পৃথিবীর বাহু-ভরে রেকর্ড করা রয়েছে। যেমন কথা বা গানের ক্ষমিতে রেকর্ড তৈরী হয় আমরা প্রায়কোনে তা অবিকল শুনি। তেমন শক্তিমাত্র বর তৈরী হলে ইতিহাসের অনেক সত্য আমরা বুঝতে পারব। বাই হোক—কর্ণ অহুসারে বেকল এ তো আমরা হাতে হাতে দেখছি।—বেক-কোঠাইয়া হাসলেন। একটু থেবে বললেন, আমাদের বাতীটাকেই বেধ না।

আপনি তো কত বোঝেন—আপনি কেন—

ঠেকাতে পারি না। কেন্দ্র করে পারব না—কর্ণকল বতন করার লাভ্য তো আমার নেই। ধীরা বাসনার বশে অলক্ষীয় সেবা করলেন—ভীরা লক্ষীর প্রসন্নতা আশা করবেন

কোন মুখে? আমাদের বত হলধরে তো গেছে—ওই ধরেই লক্ষী-বিদ্যার বাসনা প্রথম বেছেছিল। সেই সর্কমাণা ক্ষমি আমি চেষ্টা করেও বত করতে পারি নি। কেন কান?

বাদিক চূপ করে বেক কোঠাইয়া কি বেন ভেবে মিলেন। পরে বললেন, শুনেছ তো ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গল্প। পথ ফুলে ক'জন মেছুনি এক দিন এক বাগান-বাড়ীতে আশ্রয় নিরেছিল রাত্রিকালে। সে বাগানে নানা জাতীর ফুলের গাছ—রাত্রিকালে সেই সব ফুল ফুটে এমন গন্ধ বার হচ্ছিল যাতে করে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় মন্দনকাননের মধ্যেই বুঝি এসে গেলাম। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত মেছুনিরা ঘুমেতে পারে নি সেই সুলার গন্ধে। ওদের মাহুর চুবড়িতে ছিল বাঁসটে-গন্ধওলা ভাকতা—তাই শিররে রেখে তবে তারা ঘুমেতে পারে। আমাদের বাতীটাকেও...আত্মা আর এক দিন বলব সে কথা। আত্ম অনেক বকেছি—এমন উষ্ণ, কেন্দ্র?

উঠবেন। প্রত্যন্ত বেন বাতব জগতে কিয় এল। আরও কিছু বলুন না এই রকম কথা—ভারি ভাল লাগছে।

পাগল ছেলে। এ সব গল্প বেশী শোনে না।

কেন—বেশী শুনে লংসার ভাল লাগবে না?

না বাবা—স্বপ্নাম-বৈরাগ্য আর আসল বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল ভকাং সে আমি জানি। তবে বখন জন্ম কিছুই ভাল লাগছে না—সংসারে টানটানি—উপার্জন কম—জীবনের সাধ-আশা মনে হচ্ছে, সবই নষ্ট হয়ে গেল—তখন এ সব কথা শোনাতেও অকল্যাণ হয়। এসব কথা শুনে কেন্দ্র একটা আলত বেন মনকে ভরিয়ে তোলে—কাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় সংসারের বাইরে, সবাইকে কলে দারিদ্ৰ একামোর চেষ্টা—এইটে প্রবল হয়ে ওঠে। এ তার সন্ন্যাসের মত—কিন্তু সন্ন্যাসীর নয়। এই কাজ থেকে, কর্তব্য থেকে পালানোর তাগতাই মাহুরকে নষ্ট করে দেয়।

তা হলে হুং ভোগ করাটাই বুঝি—

কিসের হুং? বত দিন বাবে বুঝবে—হুং হারী নয়—বেদন মদীর জল বয়ে চলেছে তেমনি হুংয়ের স্রোত। বখন চেষ্টা লাগে তখনই তা বুঝি—বখন চেষ্টা চলে যায় তখন আনন্দ হয়। যেমন অন্ধকার মানে একেবারে আলোর অভাব নয়, কিছু কম আলো; তেমনি হুং হামেও সাগর-পরিমাণ হুং নয়—কিছু কম সুখ। আসলে সুখ বা হুং ওই জলের স্রোত—এক অরগার কখনও থাকে না।

লক্ষী বললে, ঠিক বলেছেন কোঠাইয়া—কাজ করতেই হয়। পিপড়কে বেধ—মৌমাছিকে বেধ—পতঙ্গী অত-আনোদায়—

বেধ প্রত্যন্ত, মেরে আমার কত বোঝে। হুংয়ের অজ্ঞান ঠেলে কেল। বার শু কাদের হাতিয়ার দিয়ে। মেয়েদের

কাক তাই অসুস্থ—আশারও অবশ্য শেষ নেই। আরও
বাঁধ তেতে পড়তাম—তা হলে হা-অরের সংসারে লক্ষী-
পুঙ্খের আয়োজন করত কারা। আচ্ছা, উঠলার।

প্রভাত বললে, একটা কথার উত্তর দিয়ে যান। আমাদের
পাশ কি বলে বৃত্তা সবচেয়ে। কোথার বার বাহ্য—

এক দিন নটিকেন্তা এই প্রশ্ন করেছিলেন বহরাজকে।

কি উত্তর দিয়েছিলেন বহরাজ ?

বৃত্তার দেবতা তিনি—তিনি শুধু জানেন এই তাঁর কর্তব্য।

বে দেবতা সব কিছু সৃষ্টি করেন—বে দেবতা পালন করেন—
যিনি ধ্বংস করেন—তাঁরাও নিজ নিজ কর্তব্য করে যান শুধু।
কেন সৃষ্টি হিতি, কেনই বা লয়—এই জ্ঞানের অধিকারী রাজ
এক জন—নিরাময় শুধু তিনিই—সেই পরম পুরুষকে জানবার
কতই কর্তব্য তত্ত্ব বা জ্ঞানমার্গের তপস্বী।

কেউ কেনেছেন তাঁকে ?

কেনেছেন বৈ কি—কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান দিয়ে তাঁকে
উপলব্ধি বা প্রকাশ করার কথটা কৈ—যে তাঁকে জানতে
পারব বা জানাতে পারব।

ওসব কথা থাক প্রভাত। তোমাদের অর্থ করার যেমন
নিয়ম আছে এসব আলোচনারও ভেতনি নিয়ম আছে। এ
বিষয়ে কিছু পড়াতনো না থাকলে—

তা হলে আমাদের এই শিকা কিছুই নয় বলছেন ?

তাই কি বললাম, তুমি সাহিত্যের রাজ হয়ে যদি
বিজ্ঞানের তত্ত্ব না বুঝতে পার, যদি বর্ণন তোমার কাছে শক্ত
ঠেকে সে ঘোষ শিক্তর তোমার সাহিত্য-শিকার নয়।

সে ঠিক—বার বা লাইন—

শিকার কথার একটা কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে
ওদেশের কোন সারের মাকি বেড়াতে এলেছিলেন আমাদের
বেশে। তিনি শুনেছেন এ বেশে শিকার প্রসার নেই—বিশেষ
করে মেয়েরা সবাই প্রার অশিক্ষিত। সত্য মিথ্যা পরীকার
কৌতুহল দিয়ে সারের গেলেন এক পরীষ ফেরাণীর ঘরে।
সিরে বা দেখলেন ভাতে আশ্চর্য হলেন। তার পর তিনি
চিঠি লিখলেন তাঁর ব্রীকে—তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, বা
তনে এনেছি এককাল তারতবর্ষ সবচেয়ে, তা সম্পূর্ণ ভুল বলেই
মনে হচ্ছে। কল্পনা করতে পার কি একটা দশ-এপারো
বহরের বেয়ে—মত বড় একটা সংসার চালাচ্ছে কি দুন্দর
ভাবে। মেয়েটির বা ঝাঁকুর ঘরে—বাগ করেন আপিলে
চাকরি। আরও হুট হোট তাই—বোন তাদের ঝাঙরানো
আদর আশ্রয় যেটানো এ-সবও আছে। আশ্চর্যের কথা—
ওইই হুট হোট ঘরে বাগকে আপিলের ধাবার দিলে। হোট
তাই—বোন হুটকে মাঙরালে, ঝাঙরালে—মাকে পধ্য দিলে।
বেশম বহর চলে মিহুল—ভেতনি অনারাসে একটা দিন
সুখখলার চালালে সংসার। তুমি কি এখনও বলবে, এ মেয়ের

শিকা-দীকা নেই ? বই পড়ে নি বলে সে সংসার চালাবার
দারিদ্র বহন করতে পারে না ? এমন সম্পূর্ণ শিকা আমাদের
বেশে ত চোখে পড়ে নি—বে শিকার সংসার চলে এমন
অনারাসে। বলতে বলতে তিনি সদর-দরকার এলেন। হেসে
বললেন, তাই বলে মনে করো না আমি বই পড়ার বিশেষ
করাছি, শিকার যে আর একটা দিক আছে—বেটা জীবন-
যাপনের পক্ষে বেশী দরকারী সেইটিকে বার দেওয়া বার না—
শুধু তাই বলছি।

তুমি চলে গেলে প্রভাত লক্ষীর পানে চেয়ে হাসল।
বললে, কথটা আমাদের পক্ষেও খাটে—কি বলিস ?

সন্ধ্যাবেলার ভক্তপোষে বসে বসে প্রভাত ঐ সব কথাই
ভাবছিল। শিকা বলতে কি বোঝার তার অর্থ আজ অত্যন্ত
শষ্ট হয়েছে। মন থেকে অনেকখানি গ্রামিণি গেছে মুছে।
জীবনে মানাম সবটা আছে,—বটমার চাপে গ্রহিবদ্ধ হয়
সেই সব সমস্যা—তাদের হারার পথ হয়ে বার অন্ধকার
—সরল পথ বহু শাখা-বাহু মেলে বিভ্রান্ত করে পথিককে।...

হুঁং হুঁং হুঁং। একখানা দিআ বেশ অসুস্থে থাকল। প্রভাতের
চিত্তাকুল হ'ল। জানালা দিয়ে দেখলে একখানা দিআ থাকল
সিরে ভেতলা বাড়ীটার সামনে। দিআ থেকে নামলেন দুন্দ-
বগু দীর্ঘকার এক বাহ্য। অত্যন্ত বিষয়ে প্রভাত লাকিরে
উঠল ভক্তপোষ থেকে। এ বাহ্যকে যে প্রভাত ভাল করেই
চেনে। অভিযান্ত-পক্ষী বংশ-কৌলীভ-পৌরব-পুঠ ইনি কেন
এসেছেন—কাকিন-কুলীন অর্ধেশু হারের কাছে। এ কি
নিমন্ত্রণের ব্যাপার অথবা—? কৌতুহলী হয়ে পুরো আঁধ
বটী ঠাঁড়িরে রইল প্রভাত। আঁধ বটী আপে যেমন রূপ
তদ্বিভে ও-বাড়ীতে ঢুকছিলেন জিলোচন সেম ভেতনি রাস্ত
পা টেনে বেরিয়ে এলেন। অর্ধেশু হার উদ্ভল হাসির দ্বারা
ওঁকে প্রত্যাশন করেছিলেন—বিদ্যারও মিলেন উদ্ভল হাসি
দিয়ে। জিলোচন সেনের সুখখানা বেধা গেল না, দিআ রাস্ত
অবসর বাহ্যটিকে বহন করে হুঁং হুঁং শব্দে কিরে চলল।

৩৪

ডিসেম্বর প্রার শেষ হয়ে এল। আর একটা দিন রাজ
বাঁকি। সকালটা কেমন শ্রীহীন লাগছে। কাল ছয়তো সে
বগ্নই বেবেছে, কিন্তু তা সুখ-বগ্ন বা দুঃবগ্ন নয়। তারই মনের
চিত্তা মাথা গলি হুঁকি দিয়ে বড় রাস্তার পৌছবার ভয় প্রাণপণ
করেছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে মরেছে সে। এত
সকীর্ণ তার অণং। গলির এ প্রান্তে একটা আবুদিক দৌর
আর মাঝখানে একটা পুরাকালের প্রাসাদ—বন্দীশালার হু'
প্রান্তে হুট কটক—হুটই রুদ্ধ। মাঝার উপরে আকাশ নেই—
পায়ের তলার মাটি নেই—চারিদিকে আছে তরাল অন্ধকার।
সেই অন্ধকারে আঁকড়ের সকালটা পর্যন্ত বিষন্ন হয়ে রয়েছে।

এখনও কেউ উঠেন নি। কলে কল এসেছে—তার বাহার

বোরা তর্কি বেবের পড়ে হত হত শব উঠে—কি বিজ্ঞি শব। কলটা বত করে ও পথে বেরিয়ে পড়ল। শীতের সকাল—গলিটা এখনও নিশুণ। বত জানালার কাঁকে আলোর রেখা—একটা। ভরল বোঁরার চাবর, শীতেরই বাপ বেন—গলিটা সেই চাবর হুড়ি দিয়ে আলত উপভোগ করছে। প্রভাত বার দুই গলিটা পরিক্রমা করলে। গলিটা ক্রমাগত পাশ দিয়েছে। কোম বাতীর জঠরে কচি ছেলের কান্না, কোমটার বা বুড়ো মাহবের কানি—কোমটার প্রভাত—ভোর পাঠে সরসীরা পককতা ও পক পুণ্যলোকের মাঝ ধ্বনিত হয়ে উঠল। এবমি কল-ভলার বাসনের ও বাতীর হুয়ারে হুয়ারে কি-এর কড়া-মাকার কর্ণ ধ্বনিত উঠবে। করলা-ভাকার শব্দ—আর উল্লে আঁচ দেওয়ার বোঁরার বন জালে গলিটা জাহি জাহি ডাক ছাড়বে।

গলির ও-মোক থেকে বেরুলেন এক ভল্ললোক—সর্দার তাঁর আলোয়ানে ঢাকা। মাথার উপরে আলোয়ানটা বোমটার মত রয়েছে—চলার সকে সকে বনে বনে পড়ছে মাথা থেকে—ভান হাত দিয়ে আবার সেটা উঠিয়ে দিচ্ছেন। চলতে চলতে তিনি প্রভাতের সামনে এসে পড়লেন। প্রভাতকে বেবেই চমকে উঠলেন এবং আলোয়ানটাকে টেনে মাক পর্যন্ত ঢেকে কেল পাশ কাটাতে চাইলেন।

প্রভাত তাঁকে চিনতে পেরে ডাকলে, এত ভোরে কোথার চলেছেন হাজরা মশার ?

কে—প্রভাত ? আর বাব কোথার বাবা—রোক প্রাতঃ-স্মান গেরে ভবে বোকানে গিরে বসি। মইলে বে কাকের চাপ—মাওয়ার সময় ত থাকে না। হরেকক—হরেকক—একটু ঠাড়াবেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

না বাবা—তবেলা বরক আসব তোমাদের সমিতি-ঘরে, সেই সময় ভবিরো। এখন বেলা হয়ে গেলে—পোবিল—পোবিল। হম্ হম্ করে তিনি চলে গেলেন। প্রভাত অবাচ হয়ে তাঁর গমগমণের পাশে চেরে রইল। সে বেশ খুসলে—হাজরা মশার ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। উনি যে আর সমিতি-ঘরে আসবেন না এটা নিশ্চিত। কেন ? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত এই রহস্যের উপর আলোকপাত হ'ল। অর্কেন্দ্র হাতে তার লেখা চিঠিখানির আবির্ভাব...টিক টিক লম্বত ব্যাপারটাই দিনের আলোর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরাই লম্বকের শিরোভূষণ—সর্গজন্মমায়। সেকালের পরীক্ষাক আক প্রাণ নিশ্চিহ্ন—এখনকার লম্বাকপতিরা বেশবল করেছেন। তাঁরা চতীষতপে বনে পাতিয় ব্যবহা করেন না—শহরের লবচেরে চওড়া লতকে ঠাড়িয়ে রৌপ্যবৎ ছেলিরে পথ-নির্দেশ করেন। আইসের বার। ওই রৌপ্যবতের স্পর্শে নানাদ অর্ধে প্রকৃত হয়। সামান্য বোঁরীর মত শাসন-বিধানের আছে—অসামান্য বোঁরের পাতি দেবার বিধান আইনে খেই,

কারণ যে বয়নের অপরাধ আক অস্বীকৃত হচ্ছে তা আইনে ছিল অস্বীকৃত।

দীপাবের বাতীর মরকা বুলে কে বেন বার হ'ল। এবিক পাশে সে কিরে চাইল কিনা কে জানে, কিন্তু এবিকে না এসিরে সে বিপরীত পথে চলতে লাগল। মনে হ'ল দীপাই বেন। ভেবনি বহু ভবিবার ও পথ চলছে—মায়ের কার কোট্টা অত্যন্ত পরিচিত।

আশ্চর্য্য। এই হ'বিনে পৃথিবী কি হঠাৎ বহলে গেল। দীপাও তাকে লভাবণ করলে না ? ও কি ঘরে নিয়েছে—প্রভাত ওর বাবাকে অপদহ করবার জন্য সুযোগ অবেষণ করছে। আশ্চর্য্য কি। অসব কেনের জানা-তেনা—সামান্য কুয়াশার এমনি লহনাই অস্পষ্ট হয়ে বার। অনিবেষও থাকলে কি করত, কে জানে।

মাক পুরাতন পৃথিবী এমনি করেই হুছে মাক। তার শোভা, সম্পদ, আমদ, আশা—দৃষ্টিতে বা অন্তরে জাপিরে রেখে কি লাভ। স্মৃতিতে শুধু হুঃখের দাহন। শেষ হোক সে দহন।

মা বললেন, দারটা কি করে উভার হবি ভাবহিন বাবা ? প্রভাত বললে, তেবে কিছু টিক করতে পারি নি মা। আমার গলার হার আছে—সাত্তে তিন তরি লোনা। এত দিন সূকিরে রেখেছিলাম—শত অতাবেও বার করি নি। সেইটে বেচে—

প্রভাত অপরাধীর মত মায়ের পাশে ডাকালে। ওর মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জার। পিতৃবার উভারের পৌরুষ ওর কোথার রইল ? লভ্য পালনের হুচতা—কারও কাছে মাথা হেঁট না করার লজ্জা—অভারকারীকে পাতি দেবার উৎসাহ—বিশ্বব্রাহ্মও ত অবশিষ্ট বেই। ও অত্যন্ত সাধারণ মাহুব—ভীক—অনভোগার—আমিতিভাকর্ষক—লক কোটি বিন্দু মব্যে জ্যোতিহীন একটা বিন্দু—অন ও বৃত্তার চকপথে—উদয়-বিলয়ের বৃত্তে সাভাতমাত্র দাপ কাটতে পারে না। সেই ভাল—লক কোটির মব্যে আশ্রয়পোষ করেই বাংলার লংলার পরিপুষ্ট করবে।

লম্বী বললে, বতমাকে এ সব কথা এখন বলে লাভ কি ? চেষ্টা করলে বাবার আপিসে ওর চাকরি একটা হবেই।

সুন্দরী বললেন, সে আর ক'টা টাকা—

লম্বী বললে, আমিও কাক করব না।

মাকে অবাচ হয়ে চাইতে বেবে ও ছেলে বললে, আপিসের চাকরি নয়,—এই পেরত বাতীর জানা ইজের সেলাই—কাপড়ে চাবরে কুল তোলা—

আর আমি বলে বলে তোদের অন্ন ধ্বংস করব ?...

বাঃ যে—তা কেন ? ছুনিও কাক করবে—মানে বতমা ববরের কাগজ কিনে আমবে—ছুনি চোঁতা বামাবে

বলে বলে। হেলে ধেলে আট আনা পরলা দিম আসবে।

সেই লক্ষী—এতও ভাবতে পারে? পাঁচা সংসারীর মত উপায় বার করছে লংলার চালনার। ও কবে লিখলে এই সব? কীপায় মত অর্গাম সামনে নিয়ে লক্ষীভ-সামনা—অথবা চারের টেবিলে রাজনীতি, সমাজনীতির তর্ককাল-বিভার—বোটর-বিহারের পথে দেশ-বিদেশের কুণোল ইতিহাস বাহ্যভবের অবতারণা—লক্ষীভ-কলা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের সুই আলোচনা—এ সব কি ওর কীবনে নিষিদ্ধ বস্তু হয়েছেই রইল। ও কি এমনি করেছেই অকাল-পুঁহিহীনের উত্তাপে বাতাবিক কীবন-বিকাশের ব্যাধি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে না?

লিখ প্রভাতেরও বয়েষ্ট কর্তব্য রয়েছে। বে ক্রমিতে আশ্রয় পেয়ে যুকের অহুর মাথা তুলেছে—সেই কবির সারে ও সেচে তাকে বাঁচিয়ে—বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্বই না সর্ক-প্রথম। তার পর তার সবুজ পাখা কুলের কুঁড়ি কলের শোভা এই সব নিয়ে মাথা বাধানো চলবে।

আগে কীবন—তার পর রুচি সংস্কৃতি উচ্চাশ।

নিজের ঘরে হুকে প্রভাত কিছুকণ ভক্তি বিস্ময়ে চারি-দিকে চাইলে। কতিকাঠ থেকে দেয়াল—ঘরের আলবাব-পত্র, বই মাথা ছোট বাধারির স্যাক—আব মরলা বিছানার ওরাত্ত—ভুলো—বের-করা বালিশ—ঘরের কোণে চালের আলা—আমাকের পেতে, হাঁকো আর তামাক রাখার টিম। হুটি পড়ল দেয়ালের গায়ে—রবীন্দ্রনাথ, বাবী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী আর বিভাসাগর। কি নির্ভীক প্রভাত হু—হু-কি-প্রোবল হুটি—জান-ভাবের প্রশস্ত ললাট—হুচলকর-আশ্রয়ী—পাতলা অধরোষ্ট। সাধারণ ঘরের হেলে সব—হুগ ও কীবনকে উজল করেছে প্রতিভাসিত হুম নি—সমস্ত কালের উর্ধ্বে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত। সেই কাল—সে কালের কীবন—তপতা—সমস্তই হুবি বক্তা ছিল। হুং ছিল—হুংবের কুংসিত সর্কপ্রাণী গ্রামি হুত ছিল না। সেদিন পৃথিবী নানাহুবি লম্বা ও আর্ভে ছিল না লক্ষ্যহার্য—সমাতন সত্যের রূপটি এমন সর্কান্নক হলনার ধোঁয়ার আবৃত হয়ে বার নি। আক কুয়াশা—ললিন কগতে বদি ঠুঁরা থাকতেন...সে ভালই হয়েছে—আজিকার এই সংবাত-সহুল বার্কলুখিত কুজ সীমাবেরা পৃথিবীকে বেধেন নি ঠুঁরা। ভালই হয়েছে—ওঁদের কালের হুংসহ বেরনা—বাবীন্দর হুয়ালোককে কি মর্শ্বাতিক হয়ে মনের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে—তা অহুতব করতে হর নি ওঁদের। শেষ হয়ে গেছে ওঁদের হুগ—বিংগ শতাব্দীর পূর্সার্ধ, সংগ্রাম-পর্কের সুবর্নুগ। ঠুঁরা কোন প্রেরণাই দিতে পারবেন না একালের-স্রোতে-ভাল বক্ত-হুতোদের—স্রোতে হুয়ে-পতা বেতনলভাবের। ওঁদের সামনে বেধে মিথ্যা আশার প্রবুর হুওরা কেন আর।

ভক্তপোষের উপর উঠে একে একে ছবিতলি নামিয়ে মিলে প্রভাত। এই ঘরে ওঁদের আর নামার না—এই কারা-পারে কোন্ বাবীন্দর বাবী বহন করে ছবিতে বাহুবের উপাত্ত হয়ে থাকবেন। মধ্যবিত্তের কীবনে অভিশাপ মেবেছে—মধ্যবিত্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে বাবে—গণতন্ত্রের হুগে মধ্যবিত্তের কোন প্রয়োজন নেই।

ভক্তপোষে বসে বইয়ের স্যাক থেকে একখানি লাখা কাগজ টেনে মিলে প্রভাত। কলম নিয়ে অতঃপর সে লিখতে বসল। সে লেখা কোন কৌতুহলী পাঠকের চিত্তবিশোদন করবে না।

সে লেখার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নেই—সে লেখার কীবন-ভবের বিস্ময়ও কেউ আশা করবে না। অতি হুয় অহুভুতি আর অশ্রীরা তাব নিয়ে তার তামাকে রহস্যমর ও কেমিল করে তোলার চেষ্টাও সে করছে না। অত্যন্ত স্থল সাহিত্যরসবর্জিত এক আবেদন-পঞ্জের বসতা তৈরি করছে সে। অস্বস্তিকার আবেদন—অত্যন্ত দীন প্রাণনার বশবব ভূত্যের আহুতি কুটীরে সে চাইছে নিজে বাঁচতে—আশ্রিত প্রাণিতলিকে বাঁচাতে। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার হেলে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে আর লোকের হুগে শুনে থাকে আরও করবার আশার ব্যাহুল হয়ে হুয়ে বেকার পথে পথে প্রাসাদের হুয়ারে ও কারখানার—সেই হুতি আরও করবার ভত ওর সর্কব পণ রইল আজ। চাকরি—চাকরি—চাকরি চাই।

ঘরে অস্বস্তিকার মেবেছে—রেডিওটা কোথার বেন আর্ভনার করে উঠল। ওকি—কিসের কোলাহল? রেডিয়োতে অস্বাভাবিক কোলাহল—অনেক অস্বস্তিক কর্তব্য—চাপা কায়ার উত্তর—

উঠে ও আনালার বারে এল। বোষণা চলছে:

আজ অপরাহ্নে প্রাণনাসতার বাবার হুগে মহারা গান্ধী আততায়ীর তলিতে নিহত হয়েছেন। আজ অপরাহ্নে—

বার বার অস্বস্তিক কর্তব্য বোষণা।

পৃথিবীতে অস্বস্তিকার দারছে—সর্কীণ হয়ে আসছে তার পরিবি। হিংসা, লোভ, অসত্য, মিঠুরতা, বার্পণরতা প্রভৃতি মোটা মোটা লোহার পন্নাতলি কারাগৃহের সীমানা নির্দেশ করে স্পষ্টভর হচ্ছে; সেই সর্কীণ ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে বাহব?

৩৫

শোক বত প্রভাতই হোক—কীবন-গতিকে আলোড়িত করে বাসিককণের ভত; ক্রমে তার তীভ্রতা হুস হয়ে আসে। তারতবর্ধের আকাশে-বাতাসে কিছু দিনের ভত প্রতিফলিত হ'ল আর্ভবোধন ধনি—তার পর তার তীভ্রতা ক্রমতে লাগল।...পিতৃবিরোধের তীভ্রতা লহলা লুতন করে

অহতব করলে প্রভাত—শিত্তরাষ্ট্রের বুক এই শক্তিশেলের আঘাত...তবু জাহ্নারি মিরে কেকরারি পড়ল—কেকরারিও একে হুইয়ে এততে লাগল। সংসার মাহুকে বরে রাখতে পারে না—বরে রাখতে পারে না তার শক্তিকে। তবু যে মাহুযন্তলি মহত্বের প্রভাতে বড়তা পরিহার করে চৈতন্তের অভিব্যুৎ নষ্টনৈ: নষ্টনৈ: অঙ্গের হাছিল, কিংকর্তব্যবিবৃৎ হয়ে তারা 'হার হার' করতে লাগল। তার পর এক দিন...

কৃত্তমতক প্রভাত পকেটে চাকরির আবেদনপত্রখানি মিরে আপিলের উদ্দেশে রতনা হ'ল। বেতে বেতে কুটপাতে বেবেলে মানান বরসের কিরিত্তালা জীবনধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় কত কিনিম লাকিরে—জ্ঞেতা আকর্ষণের জত চাংকার করছে। বমকে ঠাঙাল সে। পৃথিবীতে এরাও রয়েছে সমাজের নিয়ন্তরে—জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত কিন্তু বিব্রত নয়। এদের পৃথিবীটা প্রভাতবের মত কি? নিস্তর তা নয়। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্সা এরা অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই পায় এবং যে-কোন উপায়ে উপার্জন করে। তবু প্রঙ্গ থেকে যায়—অঙ্গের কোবের রক্ষণ-কার্য্যই কি জীবনধারণের সর্বোত্তম সমাধান। যে চিত্ত জ্ঞানের আলোর উদ্ভাসিত হয় নি—যে আলোকে আত্মসাৎ করে আপন মিসসকরের আদম্ব এবং সেই মহৎ আদম্ব জগতের বস্তুর উপকরণ মিরে—জগৎভিত্ত করমা ঐখ্যালাভের সাধনার বহু বারার নিম্নেক্রে প্রসারিত করে দিতে পারে নি, সেই হুহু নথর জীবনের আদর্শ তো সকলের নয়। তবু প্রাথমিক কেরে এদের সহজ জীবনীশক্তির বিকাশ প্রভাতকে সূত্র করছে। ওর পারে বহি আক অর্ধকৃত্ততার তারি পাথরটা বাঁধা না থাকত। বহি ওর মাথার না চাপত অসহায় না, বোম, তাইয়ের দারিহ।

প্রভাত পা চালিয়ে দিলে। খালি চিত্তা—চিত্তা—চিত্তা। এ-ও তো বিলাস মাত্র—সামনে চলার পথে বাধা। সে যা হতে পারে নি—কল্পনার তা টেনে এনে নিম্নেক্রে কতবিকত করা তবু। সে তো অনেক কিছু ভাবতে পারে। তার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র-পৌরব তাকে যে-কোন সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার চারপাশে দারা ভিত্ত জমিরে আছে তারা সবাই মহৎ নয়, বিদ্যান নয়, বুদ্ধিমান বা চরিত্রজ্ঞান নয়—অথচ তাদের মোটেরে ব্লা-কাল্য বেধে নিত্য তাকে পথ চলতে হচ্ছে। তারা কুপার চকে বেধে তাকে—দুধা করে তার দারিত্র্যকে। তাদেরই বাড়ীতে দারের শেব নথল হারপারি বাঁধা মিরে শিত্তবার থেকে উজার হয়েছে সে। যে উপার্জন করে সংসারের অভাব পূর্ণ করতে পারে না, তার বিতাহুতি জ্ঞান বীরব চরিত্রজ্ঞাতি সবই মিথ্যা। ওই একটা মাত্র মানদণ্ড আছে যাতে মাহুকে বাচাই করে দেয় সমাজ। গোলাপফুলের নৌদর্ঘ্যে ও নৌদর্ঘ্যে ঐত হুৎ বেবতারা, কিন্তু

মাটির আল্পের আল্পিত না হলে তার রূপ-রস-মহত্তরা প্রাণ-মীলার দহিমা অহতব করতেন কোন্ বেবতা?

আরও দ্রুত চলতে লাগল প্রভাত। পথ জনসমূহ—মাহুকের কবাটবাঁধা লাইম এগিরে চলছে একই দিকে। মাঝে মাঝে বড় রাত্তার ঘোড়ে ট্রাকিক পুলিশের সত্বতে তা বিছির হয়ে পড়ছে এবং সেই অবসরে তার পতির বেগটা চোখে পড়ছে। এই অসংখ্য মাহুয বাজা করেছে মাটির আল্পের-সম্মানে। মাটির রসে মাথা পজ ফুল কলে পূর্ণ-বিকশিত হবার বাসনা তাদের মনে। এই তো জীবন। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝবাদের সময়টুকু। প্রাণি বা পদার্থকে মিরে চৈতন্তের কণকালীন প্রবাহ—মাটির প্রাণীপে ভেল-সলিতার উপকরণে অগ্নি উৎপাদনের রহত। একটানা স্রোত পথে পথে ভেঙে পড়ছে বহু বারার রূপান্তরিত হয়ে—বিরাট অটালিকার অভ্যন্তরে মিশিয়ে বাচ্ছে। লালকীরি চারি বারের বিরাটকার সৌন্দর্য্যেত্তরা আশ্চর্য্য কিপ্রতার প্রাণ করছে এই বারাগুলি।...

প্রভাতের শিত্তবু বললেন, দরখাস্ত এমের? দাও। দরখাস্তের উপর চোখ ফুলিয়ে মিলেন তিনি। একটু হেলেন বললেন, আমরা যে বাবীন হয়েছি তা এর শেব লাইমেই কামতে পারছি। নয় কি? বলে সেখানটার আত্মল রাখলেন।

প্রভাত কিছু বুঝতে পারলে না।

তিনি হাসলেন শক করে, এখন 'ইওর মোট ওবিডিরেট সারভেট' অর্থাৎ বশবধ তৃত্য বললে তুল হবে। লিখতে হবে—'ইওরলু কেবুফুলি' অর্থাৎ আপনার বিখত বুঝলে? এটা কারেক্সন্ করে দাও।

প্রভাত আদেশ পালন করলে। মোহার পেটের মাথার হুই ফুলের ঝাটকে মনে পড়ল। মিষ্টগতী কোমল স্মরণ ফুল—কিন্তু যাকে অবলম্বন করে ওর নৌদর্ঘ্যের প্রকাশ—

দরখাস্ত মিরে বড়বাহু চলে গেলেন। প্রার এক বর্তী অপেক্ষা করতে হ'ল প্রভাতকে। একটু বর্তীর এই অভিমব জগতের কিছু আভাস পেলে ও। এই জগৎ যে জীবনধারণের মাসিহুত নয়—তা বুঝলে।

বড়বাহু কিরে এলেন হাসিমুখে। বললেন, লাকি চ্যাপ, চল—সারের তোহার ডাকছেন। বোম করি কালই এ্যাপরেটমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে। বাড়ী মিরে যাকে বলবে—বেন ঠাকুর-দেবতার পুজো মানত করেন—আর কেরবার পথে কিরিলী-কালীকে প্রণাম করে বেও।...

সত্যিই চাকরিটা হয়ে গেল। পাঁচটার পর জনতার স্রোতে নিম্নেক্রে মিশিয়ে ও বাড়ী কিরিলে। মনে মনে কৃতজ্ঞ হ'ল—কোন ব্যক্তিশেষ বা বেবতা বিশেষের উপর নয়—সমস্ত পৃথিবীর উপর। সঙ্গে সঙ্গে ছির করলেন—এই পথেই

উন্নতি করতে হবে। এই রাষ্ট্র থেকে রস শোষণ করে ও তুচ্ছ বাঁচবে না—সম্ভব হবে। অর্ধের মাঝার ফুটবে গৌরবের ফুল—যশের নৌরতে সে ফুল ফুটতরের লোকের প্রশংসা, ঐতিহ্য আকর্ষণ করবে এবং সেই ফুল এক সময়ে জয়-জ্ঞান উদ্ভাপে পরিণত হবে আত্মতৃষ্ণার সুপক ফলে।

গেল—গেল—গেল। মোড়ের মাঝার দুখানা পাড়ীতে সংঘর্ষ হয়ে গেল—হুঁতাপে বিতর্ক জমজমা হতে লাগল। এ-ও মিথ্যাকার ব্যাপার। বেকীর ভাগ লোকই কিছুকণ ঠাঁড়িয়ে বটনার সংকীর্ণ সারি সংগ্রহ করে আবার লাইন রচনা করলে—ওদের ঠাঁড়াবার সময় দেই। হুঁটনা জীবনে হরত বটে নি—কিন্তু চার পাশে বটেই অসংখ্য বার। যারা হুঁটনার পক্ষে জীবন দিয়েছে কিংবা অদহানির দরুন অকর্পণ্য হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে এবার তাকাং অমেকধানি—এই হুঁটনা-পাঁচটা-পঞ্চ-চলিয়ে চলল। পিছু বাড়িহারি ছেলেরা আপিসে ভিক্ষা করতে এলে—এদের অমেকই অন্ন বদলে বলে, বাপ কর। আমাদেরই বলে কে দেয়।

আজই এমন ঘটনা ঘটেছে আপিসে। পথে ঘটল হুঁটনা, জীবনের পথে পথে এই হুঁটনা। মনে বেদনা জমলে সহজে বার হতে চায় না—আমলকে বহু সাধ্যসাধনার আরোজন করে আনতে হয়।

হাত দুখ দুখ বাইরের ঘরে বসল প্রভাত। যারের মুখে আশ্রয় তাব দেবে—হোট ভাইয়েরা আনন্দ প্রকাশ করেছে। লক্ষী হেসে বলেছে হাতে, বড়না বাবার সময় আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম যে, চাকরি হবে না।

প্রভাত উৎসাহিত বোধ করছে না—চাকরিলোকের কৃতিত্বে ওর এতটুকু আনন্দ নেই। ওর মনে হচ্ছে পৃথিবী আর বাইরে ভিত্তিরে নেই—এই ঘরেতেই শুটবে এল। জানালা দিয়ে বেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে বাঁধা যে ক'ট মক্কা ভাই জগতের সীমা, ওর পরিচয়ের পরিধি। যে করটি মাহু আক আশা আশালে উজ্জল হয়ে উঠল, তাদের চারিদিকে ওকে ঘুরতে হবে দিনের পর দিন। মনে হতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। না—না—না—এভাবে লক্ষীণ হয়ে ও বাঁচতে চায় না—বাঁচতে পারবে না। ওর চাই বাইরের বিস্তৃত পৃথিবী—অসংখ্য আকাশ—সংখ্যাহীন মক্কা—বাবের হুঁটকার কর্মমার গৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে জীবন হবে রসগ্রাহী বিস্তীর্ণ বেগবান ও আনন্দময়।

প্রভাত দা।...

কে ?—

জানালার বাইরে ঠাঁড়িয়ে শুভকর ঢাকলে। ওর ফুল উজ্জ্বল—সুখ শুভকর। ওকি চাকরি পেয়ে ওর কর্মমার পৃথিবীকে হারিয়েছে—প্রভাতের মত ?

এল—ঘরে এল।

শুভকর অত্যন্ত সজ্জিত ভাবে ঘরের মধ্যে এল।

বলো।—

না—বিছানার ওপর বসব না। অশৌচ কিনা।

ওর খালি পায়ের পামে চেয়ে প্রভাত প্রশ্ন করলে, কে যারা গেলেন ?

যেহ কোঠামশাই।

হঠাৎ ?

হঠাৎ নয়—হ্যাঁ—হঠাৎই। একটা ঢোক গিলে শুভকর বললে, আপনাকে ত পর মনে হয় না—শুভকর। তুচ্ছ খানিক ইতস্ততঃ করে সে মাথা নাড়িয়ে কৃষ্ণিত হয়ে বললে, ঠাঁড় বহু ত বাতাবিক নয়—উনি আত্মহত্যা করেছেন।

আত্মহত্যা। প্রভাত জীবন ভাবে চমকে উঠল।

হ্যাঁ—জামেন ত—দেয়ার দ্বারে আমাদের বিষয়-সম্পত্তি আর ত কিছুই নেই। আশাত সইতে পারলেন না...অজ্ঞ-বাপে ওর ঘর অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

প্রভাত কোম প্রশ্ন না করে সেই বেদনাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলে।

অমেককণ কেটে গেল।

বাইরে প্যাসের আলো জ্বলল—ঘরের মধ্যকার অন্ধকার সে আলোর দ্বীপ তরল হ'ল মাজ। কারও মন থেকে অন্ধকার মুছে গেল না।

বহুকণ পরে শুভকর বললে, আপনি বাবেল কি একবার ? যেহ কোঠামশাই বলছিলেন...

লাজুক শুভকর কথা শেষ না করে উত্তর—প্রত্যাশার খানিককণ ঠাঁড়িয়ে রইল সেই অন্ধকার ঘরে। তার পর বীরে বীরে চলে গেল।

৩৬

হলঘরের পাশে হোট ঘরটিতে যেহ কোঠামশাই বসে ছিলেন। তখনও অপরাহ্নের আলো আকাশ থেকে মুছে যায় নি; ঘরের মধ্যে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। এই ঘরটি আকারেও বেহন হোট লক্ষ্যভেদে তেমনি রিক্ত। হোটমত একটা ভক্তপোষ হাফা ঘরে দ্বিতীয় আসবাব নেই। দেয়ালে একখানিও ছবি নেই, পলভারা ওঠা বর্ণহীন দেয়াল। কড়ি-কাঠের আলকাভরা ধূসর হয়ে এসেছে—সেখানে আলোর কাহ্নস ফুলছে না। দীপ আলানোর কোম ব্যবস্থাই এ ঘরে নেই। ভক্তপোষটাও নয়—একটা সতরঞ্জ পেতে ভক্তার কাকগুলিকে অশ্রুত করার আরোজনও কেউ করেন নি। লজ শোকভর বাড়ীটার প্রতীক বেহন এই সর্জনিত ঘরখানি, আর সেই ঘরের মেঝের বসে শুভবদনা যেহ কোঠামশাই—

প্রভাত তাঁর অহরে মেঝের উপর বসল।

যেহ কোঠামশাই বললেন, লবই ত তমোহ। কর্ককল কেউ খণ্ডন করতে পারেন নি আজ পর্যন্ত।

তিনি চুপ করলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলেসেন না, সম্ভবতঃ চোখের জলও নয়। তরল অঙ্গকারে তাঁর শুভ্রবর্ণের বেহুটী সান্নাৎ মড়ে উঠল শুধু। এই একটুখানি চাকল্যের মধ্য দিয়ে বহু হুঃখ-বেদনাকে বেশ বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

প্রত্যন্ত বললে, আপনি অনেক জানেন, আপনাকে আমি—

সব কেসেও মনের ছুরতপনা ধামানো যায় না বাবা। এমনি মারা মহামারার। যাক, তোমাকে কেন তেঁকেছি শোন। আমার আর ক'টা দিন মাত্র এখানে আছি। ঠাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে শহর ছেড়ে বাইরে যাব।

বেশ ত, কিছু দিনের জুত—

কিছু দিনের জুত নয় বাবা—বেশ কিছু দিনের জুত। হরতো...কিন্তু আমার যদি না-ই কিরি ভাত্তেও হুঃখ নেই। এই বাতীর হু' একটু জিনিষ তোমার জিন্সার রেখে যাব—

প্রত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বললে, কিন্তু আমার যে বলবার আছে কোঠাইনা। আমি যদি আপনাকে না যেতে দিই এই বাতী থেকে?

তা তো জুনি পারবে না বাবা।—বেশ কোঠাইনার সুখে রান হাসি। একটু বেমে বললেন, বোঝ করি সব কথা শোন মি জুনি। আর শোমানোর নেইও বিশেষ কিছু। মজীর জল যেমন মীচু জারগা পেলে মেমে যার তেমনি মাঝাল জমিতে পা কেসে এ বাতীর লজীও আজ চলে গেছেন। এ বাতীতে আমার থাকব কোন্ অবিকারে?

কিন্তু কোথার যাবেন? শুক কঠে প্রশ্ন করলে প্রত্যন্ত।

ভগবান দয়া করে মাথা পৌঁছবার একটু ঠাই রেখেছেন—সেইখানেই যাব।

তবু আমি যদি না যেতে দিই আপনাদের?

প্রত্যন্তের উজ্জল চোখের পানে চেরে বেশ কোঠাইনা বিস্মিত হলেন। বললেন, জুনি একথা বলছ কেন বাবা?

কেন—আপনিও তা জানেন। এক দিন আপনাদের কাছে আসতে চেয়েছিলাম। বলেছিলেন, এখন নয়। আজও কি বলবেন—

না—আজ সে কথা বলব না। সেদিন তোমার দিকটাই দেখেছিলাম বাবা—আজ আমার দিকটাত্তেও জুনি ভাল করে দেখ। তা হলেই কোথার জুল—কোথার অসদৃশি বুঝতে পারবে।

না—কোথাও এর জুল নেই। আমার অবস্থা খুব লজ্জল নয়, তবু—

অবস্থার কথা আমি বলিনি, মাদ-সন্ত্রম রাখার কথাও নয়—তবু একটা কথা জুলে যেতো না যে, যে-কোন ভাল জিনিষ পেতে হলে তপস্যাও করতে হয় তেমনি কঠিন। উম। অপর্যায় হয়েছিলেন বলেই শিবকে পেয়েছিলেন।

কিনের তপস্যা?

—সিপ্রায় তপস্যা সবে আরম্ভ হ'ল—

না—না বেশ কোঠাইনা—প্রত্যন্ত আর্দ্র কঠে চৌক্যায় করে উঠল।

কেন নয়? চিরকাল বড়-বাতীর কোলে খুব সুকিয়ে রইল যে, মাদ-সন্ত্রমের কাচের হয়ে রতীন বাতি আলিয়ে—পরাইর ছন্দের মিল পড়লে সুর করে—বাইরের পৃথিবী কেনম সে খবর সে মেবে না? পথে যে কত কান্দা তার হিসেব রাখবে না? তার শিকা শেষ না হলে তোমাকে লাভ করার যোগ্যতা পে পাবে কেনম করে। না বাবা, আজ নয়—সংসারে মাহুবকে টানলেই সে সংসার তরে ওঠে না—সুখেরও হয় না। যে সংসারের যে সুর সেই সুরের পরিচর যে মিডেই হয়। না মিলে জীবন সুখের হয় না—সংসারে শান্তি থাকে না।

সুত বর, তবু প্রত্যন্তের মনে হ'ল সমস্ত বর জুড়ে যা রয়েছে তা এই প্রাণাধের কোন অংশে সুখি নেই।

মাথা নীচু করে প্রত্যন্ত বেরিয়ে এল বর থেকে।

বাতীতে সুরমসী ভবন চৌক্যায় করছেন, আর পারি না বাপু, চিরকালই কি জুতের ব্যাগার পাঠবে। চাকরি হ'ল এইবার বির-বা করে সংসারী হ'। আমার ছুটি বে সংসার থেকে।

এই সংসার। এখানে আগবার জুতও তপস্যা করতে হয়।

টোটেইর কোণে হাসি কুটুতে-না-কুটুতে মিলিয়ে গেল। সভ্যই ত সংসারে আঙ্গুর দেবার জুত তপস্যা করতেই হয়। লজী আর সিপ্রায় যেমন এক নয়—তেমনি ওই প্রাণাধের গোয়ে এই গুহের গোত্রও মিলবে না। ওখানে ভাতা-চোরার মধ্যে যে রানি এখনও লেগে রয়েছে তাকে তপস্যার যারা নিঃশেষে বুঝে না কেসে এখানকার অপৌরব বইতে পারবে কেন সিপ্রায়।—এই ভাতা-কলভলা, অপরিচর উঠান, লজীপ আকাশ, জিন বিকের বেয়াল-বাটা। স্যাভসেতে বর আর ভেল-হুম লকুটির আলাপ...। আঙ্গুর দেবার অহিলার সিপ্রাকে এই কারাগারে বন্দী করার ব্যবস্থা কি সাহসে যে করলে প্রত্যন্ত।

বহুকণ খুব এল না। কেনম বেশ অবস্থিতে হটকট করতে লাগল প্রত্যন্ত।

চোখের উপর আলোর স্পর্শ—কোমল নয় জীভই। সে আলো পড়েই। কিন্তু চোখ চাইলেই নামদের ভিনভলা বাতীর ভেতলার বরটই নজরে পড়বে। ও-বরে লারা রাত বরে কোমল নীল আলো বলে, লারা রাত বরে আকাশ বরে আমে কত বর আর ঐখ্যের লতার—কত করবার বর্ণ ভাতে আর গড়ে। ও-অপং প্রত্যন্তের নয়—ওকে সামনে রেখে নিজা বাওরাও কি কঠিন।

চোখ না চেয়েই প্রভাত জানালার কাছে উঠে এল এবং জানালাটা বন্ধ করেই আবার ঘরে পড়ল।

সকালে কিন্তু জানালাটা খুলতেই হ'ল। তারপর সারাদিন সংসারের কাজ ও মিথের চিন্তার সঙ্গে সাধনের ভিন্নতলা বাতীটাও কখন বিশেষ পেল আশ্চর্য্যভাবে। সন্ধ্যাবেলার কর্ণ-প্রান্ত হয়ে বয়ে আসতেই মনে হ'ল জানালার বাইরে প্রভাতের জীবনেরই একটি অংশ বেন লক্ষ্যপ্রান্ত হয়ে দিটুকে পড়েছে। বিশ্রাম-মুহুর্তে সেই অংশটা বিগ্নবীর স্মৃতিকা নিয়ে ওকে উজ্জ্বল ও উত্তেজিত করে তুলবে। সুতরাং জানালাটা বন্ধ করে দিতেই হবে।

এদীপ-হাতে লক্ষী ঘরের মধ্যে এল। প্রভাতকে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বেবে বললে, ওমা, এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? বাবে বাবে না? আচ্ছ সন্ধ্যা দিতে বড্ড ঘেরি হয়ে গেল। বলতে বলতে ও এসিয়ে গেল বেয়ালের দিকে। এদীপটি উঁচু করে ঘরে বারকয়েক আন্দোলিত করে গলার আঁচল জড়িয়ে এগার জানালে। কার উদ্দেশ্যে এগার জানালে লক্ষী?

কৌতুহলী প্রভাত জানালা থেকে সরে এসে লক্ষীর পিছনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। যা নিত্য অপ্রয়োজনীয় বোঝে সে সরিয়ে রেখেছিল, এই হুগ ও জীবনকে নিরস্ত্রিত করবার বিন্দুমাত্র কষতা বাধের মাই বলে হুচ প্রভৃতি কমেছিল, সেই

সব প্রতিভাবানী কর্তব্যের বরণ্য বাহুবের ছবি আবার বেয়ালের পারে কে টাঙিয়ে দিয়েছে। ওহু টাঙিয়েই বের নি—বেড়ে দুহে পরিপাটি করে সেগুলিকে নৃত্য রূপ দিয়েই অহুতুল। এদীপের আন্দোলিত আলোর স্তম্ভগুলি বেন লক্ষী ব হয়ে উঠল।

এদীপ পিলহুনের উপর য়েবে লক্ষী প্রভাতের পানে কিয়ে বললে, ছবিগুলো ভাল করে বাঁধিয়ে দাও যদি তা হলে খুলো আর পোকার মট করতে পারে না।

আসছে মাসে মাইনে গেলে বাঁধিয়ে দেব—কি বলিস? প্রভাত এসন্ন হাতে জবাব দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের মনে হ'ল—এই হুর্দশাপ্রান্ত সূত্র ঘরে চারিদিকের বেয়াল থাকবে, জীর্ণ লোহার পরাণে দেওরা একটি রাজ জানালাও থাকবে—আর সে জানালাটা বন্ধ করা চলবে না এবং বেয়ালের পারে থাকবে ওই ছবিগুলি। সকালে গলাবল দিটুয়ে ও সন্ধ্যার এদীপ আলিয়ে লক্ষীর মত কল্যাণী ঘেরেরা এই ঘরের অন্ধকারকে ও অন্ততকে দুহে মেবার সাধনাও করবে প্রভাত। মন্দ কি, হুগ-হুগাত্তর বয়ে চলুক না এই জয়-পরাজয়ের বেলা—জীবন-মীলার এবাহ; অন্তত থেকে তকে, তবসা থেকে ছোঁতিতে, বহু থেকে অরুত লোকে উত্তরণের সাধনা।

সমাপ্ত

বিপ্রহর

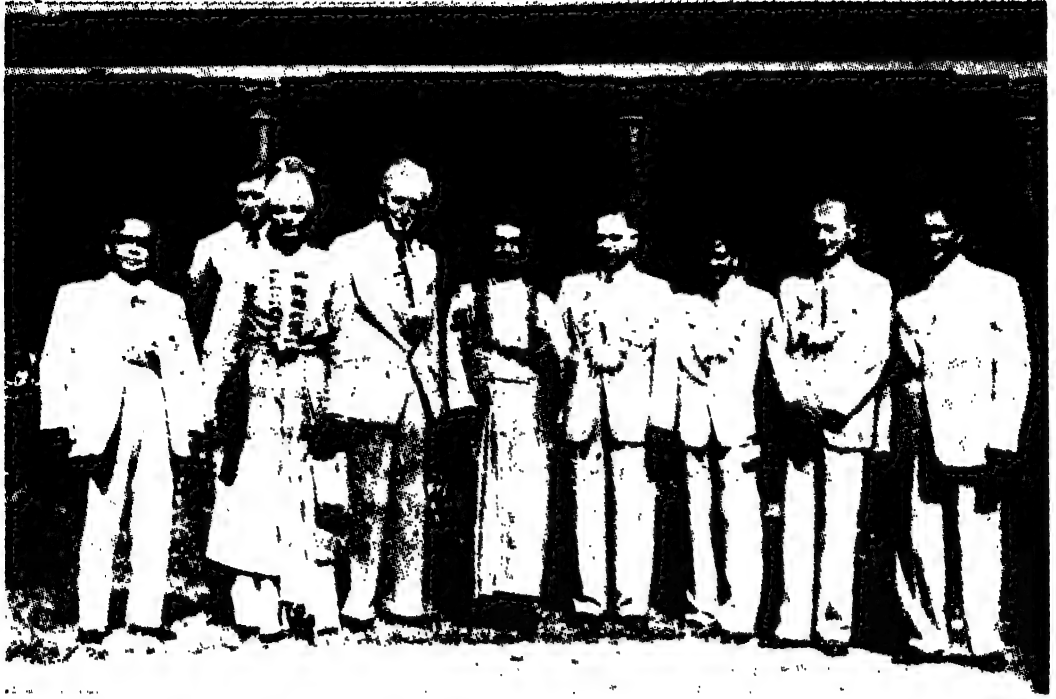
ক্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জানালার পারে হাতছানি দেয় বিপ্রহর,
চোখেতে চলেছে হুগুরের রোদে ছুঁ চোলাই।
লোনা দেওরালের গর্ভেতে চোকে বুদো-জয়র,
জয়রের এই গান থেকে দেখি রকা মাই।

বাঁ বাঁ করে বাঠ, খটখটে বাঠ, শীতাত বাস—
শীতাত সে-বাস থেকে ছাড়া বোঁজে গল্প-বাহুর,
হুপি-হাওয়ার হুলিঘের ওঠে মাতিবাস,
রোদের নেশার কর্ণা-পাতা বার কতো সে হুয়?

হুয়ে কি পড়েছে বহু হুয়ে বন কাঠ-চাপার?
শেরাল-কাঁটার বনে বনে কাঁপে হলদে ফুল।
বরজে বরজে অবশ অল পান-পাতায়,
পান-পাতাগুলি হুয়ে যে পড়েছে—নেইক ফুল।

আকন্দ-বন ছাড়ায়ে তদিকে হুহুর ডাক,
হুহু ডেকে কেয়ে—কঠেতে তার বিরাগি-হুয়।
যেহা হুহুরের কত ঠোঁকরার ঘুঁড় কাক;
গর্ভে বিনার বান-চোর বডো কেত-ইঁহুর।



দক্ষিণ আমেরিকার জর্জ টাউনে ভারত সেবাস্রম সন্মেলন প্রচারক-দলের সংগঠন।
 বাম হইতে দক্ষিণে—ডাঃ জে. বি. সিংহ (প্রথম), ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (দ্বিতীয়), ব্রিটিশ সিনিয়র গবর্নর তার
 চার্লস উলী (তৃতীয়), বামী অধৈতানন্দী (চতুর্থ) প্রভৃতি

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

ব্রহ্মচারী রমেশ

ভারতের বাহিরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য প্রভৃতিতে লিঙ্গ ভারতবাসীর যে একটি মোটামুটি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহা চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি। ভারত মহাসাগর অঞ্চলেই ভারতীয়েরা সংখ্যার দর্জাপেকা অধিক। সেখানকার ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয়। এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত বেশে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা নিত্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের একটি পরিসংখ্যান নিয়ে প্রদত্ত হইল :

ব্রহ্মদেশ	১,০০,০০০
সিংহল ও মালয়	৭৫,০০০
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-আফ্রিকা	২,৫০,০০০
ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	৫,০০,০০০
জিম্বাবুয়ে	২,০০,০০০
ব্রিটিশ সিনিয়র	১,৫০,০০০
ডাচ সিনিয়র	৬০,০০০
আমেরিকা	২০,০০০
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	১,৩০,০০০

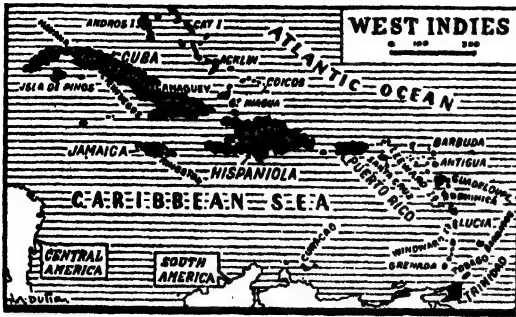
রাষ্ট্রসংঘের

৬০%, সুতরাং ৪০% এবং বাকী ১০% লোক অত্যন্ত দারিদ্র্য

বাস করে। প্রবাসে এই সকল ভারতীয় পুরুষাঙ্গুলে বসবাস করিতেছে। তাহাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বাস করার কালে তাহারা ক্রমশঃ নিজ নিজ আদর্শ ও স্বাভাবিক হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। স্বাধীন ভারতের পক্ষ হইতে সেসকল তাহাদের সহিত যোগদান স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহাদের বর্ণাশ্রম ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বাভাবিক বিধানের দিকে দৃষ্টি বিহার সময় আদ আসিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক হৃতগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের সমাজের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। এশিয়ার বহু অঞ্চলে তাহার নিদর্শন আছে। কেবল এশিয়ার মধ্যে, ইহার বাহিরেও অত্যন্ত বেশে ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যাদির বিস্তারলাভ ঘটাইয়াছে।

কাল-প্রবাহে ভারতের প্রচারকার্য ব্যাহত হয়। সাংস্কৃতিক হৃতের পরিবর্তে হাজার হাজার ভারতবাসী প্রতিক্রমণে গভ নতাকীর প্রথম হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত হইতে থাকে। ইহার কালে আফ্রিকা, জিবি, পশ্চিম ভারতীয় বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে



পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

বহু ভারতীয়কে পুরুষাক্রমে বসবাস করিতে দেখি। এই সকল ভারতীয় মিক মিক পুরুষপুত্রবর্ণের মহাত্ম ঐতিহ্য জুলিতে বসিয়াছে। তাহাদের ভিতর অতীতের আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের পুনরুজ্জীবনের জন্ম বর্তমানে ভারত সেবাশ্রম সল্য বহির্ভারতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সময়ে আমরা পত শ্রাবণ ও গৌর সংখ্যার প্রবাসীতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

সল্য হইতে বহির্ভারতে প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশন বঙ্গাব্দিক কাল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ সিমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য সন্ধান দান। তাৎবে প্রচারকার্য করেন। তাহাদের প্রচারে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ সুকল পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জিমিনাং হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মিকট মিশনের প্রচারকার্য বাহাতে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তৎক্ষণ্যে পত্রও লিখিয়াছেন।

সনের এই সাংস্কৃতিক মিশন পত ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাস

হইতে ১৯৫১ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্রিটিশ শহরে তুরিয়া তুরিয়া প্রচারকার্য করিয়াছেন। তাহারা ৩৬১টি জনসভার ভারতীয় সংস্কৃতির মহান আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টায় ১৪৯টি বৈদিক বক্তা, ১১৩টি বর্ষবিবরণক বিবিধ অস্থান, ১১টি বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, বৈদিক প্রাণা, ভুলসীমাসের স্মারক, সভ্যসভার প্রভৃতি প্রভৃতি

বহুসংখ্যক পুস্তক সল্য বিদ্যালয়ে বিতরণ করেন। ভারতীয়-পণ তাহাদের হাতুতাবা (হিন্দী) প্রায়ই জুলিতে বসিয়াছে। তাই হাতুতাবার প্রতি অগ্রগতি হ্রাসের নিষিদ্ধ মিশনের প্রচেষ্টায় তথায় পাঁচটি হিন্দী পাঠশালা খোলা হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে আটটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের ভিতর মিত্র এই গঠনমূলক কাজ খুবই সমরোপযোগী। এই বিষয়ে “আদ্যমহাভারত পত্রিকা”র ১৩৫৮ সালের ৫ই তার সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে :

“পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জিমিনাং ভারতীয় হিন্দু শ্রমিকগণ চালা জুলিয়া করেকটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। প্রবাসমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সল্যের সাংস্কৃতিক মিশনের প্রেরণাভেই জিমিনাংদের প্রবাসী ভারতীয় হিন্দুগণ তাহাদের সংস্কৃতি অক্ষর রাখিবার এই উত্তোপে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। স্থায়ী ইটরোপীয় এবং মিত্রো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মন্দিরের যারোক্ষাটন অস্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্মের প্রতি ভক্তেহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশজুবি হইতে বহু চুরে এক দ্বীপদেশে অবস্থান করিয়াও দ্রুত ভারতীয় শ্রমিক তাহার সংস্কৃতির প্রতি বে মততা ও প্রভা



ভারতীয় শ্রমিকদের প্রথম অবতরণ-কেন্দ্র—ত্রিখ টাউনের একটি অট্টালিকা।

অক্ষর রাখিরাছে তাহাতে তখু ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্বই মনে, দ্রুত ভারতীয় শ্রমজীবীর সাংস্কৃতিক মহত্বও প্রমাণিত হইতেছে।”

মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই এক দিন ভারতের সংস্কৃতি গতিয়া উঠিয়াছিল। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা, তাত্কার্য প্রভৃতি এমনই সুন্দররূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল যে, তাহার পরিচরে আদিত বিশ্বয়ে

ଅତିହତ ହୁଏତେ ହୁଏ । ତାହା ତାରତ୍ତ୍ୱ ସେବାକ୍ଷର ନାମକ ସାଂସ୍କୃତିକ
ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ଏକ ବହୁମାନ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମଦାନୀର ପର
ସିନେମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୁଏ । ସିନେମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଓପଲକେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବେଳନ, ବୈଦିକ ଶାନ୍ତି-ସଜ୍ଜା, ବିବିଧ ବ୍ୟବସାୟ
ଅବସ୍ଥା, ଉଚ୍ଚ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମଦାନୀ ହୁଏତେ ହୁଏ ।
ଶ୍ରମିକମାନେ ଅବସ୍ଥା ତାରତ୍ତ୍ୱ ହାଉ କମିଶନାର ସମ୍ବେଳନେ ବହୁତା-
ଏମକେ ବଳିଆହୁଏ, “ଏସୀ ତାରତ୍ତ୍ୱଗଣକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା

bring about a general wellbeing of all people irrespective of caste, creed or colour.”

ତାରତ୍ତ୍ୱ ସେବାକ୍ଷର ନାମକ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ତାରତ୍ତ୍ୱ ହୁଏତେ
୧୯୦୦ ବାଉଁଶ ହୁଏ ଅବସ୍ଥା ପଶ୍ଚିମ ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ
ଏସୀ ତାରତ୍ତ୍ୱଗଣକେ ବହୁତା ବ୍ୟାପକତାରେ ହିନ୍ଦୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ହୁଏତେ ହୁଏ । ପୂର୍ବକାର ଶ୍ରମିକମାନେ
ପାରିଲେ, ଏମକେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତା ବାହା ଆମଦାନୀ

ସମ୍ବେଳନ ହୁଏ । ସିନେମାର ଅନ୍ୟତମ
ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାରତ୍ତ୍ୱଗଣକେ
ଏମକେ ପର, ହାଉତାରେ ବସବାସ ଏବଂ
ତାରତ୍ତ୍ୱ ନାମାକ ଓ ନାମାକ
ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକଟି ବିବରଣ ଦିଆହୁଏ । ଆମଦାନୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ତାରତ୍ତ୍ୱ ହୁଏତେ ବହୁତା
ଦିଅଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

୧୯୫୫ ହୁଏତେ ୧୯୧୧ ମସିହା ବ୍ୟାପକ
ସମ୍ବେଳନ ପଶ୍ଚିମ ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମି-
କମାନେ ବିବେକ ଶ୍ରମିକମାନେ । ୧୯୧୧ ମସିହା
ଶ୍ରମିକମାନେ ନାମାକ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିବେକ
ହୁଏତେ ବିବେକ ନାମାକ ହୁଏତେ ଶ୍ରମିକମାନେ
ଶ୍ରମିକମାନେ ହୁଏତେ ହୁଏ । ପଶ୍ଚିମ
ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ (ଶ୍ରମିକ) ଶ୍ରମିକମାନେ
ଶ୍ରମିକମାନେ ତାରତ୍ତ୍ୱଗଣକେ ଶ୍ରମିକ ହୁଏତେ
ବାକେ । ଏ ସମ୍ବେଳନ ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ
ପରିସ୍ଥିତିର ବିବେକ ଦିଆ ଚଳିତେ ବାହ୍ୟ
ହୁଏ । ତାରତ୍ତ୍ୱ ବିବେକ-ଶ୍ରମିକମାନେ ପର ହୁଏତେ
ଏସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ହାଉତାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ



ଶ୍ରମିକମାନେ ନାମାକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ

କମ୍ବେଳନ ଅନ୍ୟତା ଶ୍ରମିକମାନେ ତାରତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ
ବିବେକ କରିବେ । ହୁଏତେ ଏସୀ ତାରତ୍ତ୍ୱଗଣକେ ଶ୍ରମିକମାନେ,
ଆମଦାନୀ ବିବେକ-ଶ୍ରମିକମାନେ ବିବେକ କରିବେ । ତାରତ୍ତ୍ୱ
ଏକ ବିବେକ ତାରତ୍ତ୍ୱ ନାମାକ ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ବେଳନ
ହୁଏତେ ହୁଏ । ବାହ୍ୟତାରତ୍ତ୍ୱ ପର କମ୍ବେଳନ ସେହି ଅନ୍ୟତା-
ବାହ୍ୟତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମ୍ବେଳନ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ।

ତାରତ୍ତ୍ୱ ସେବାକ୍ଷର ନାମକ ତାହା ତାରତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟତା ବ୍ୟାପକ
ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ । ସମ୍ବେଳନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ
ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ବେଳନ ସମ୍ବେଳନ ପର ଶ୍ରମିକମାନେ
କରିବାହୁଏ, ତାରତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟତା ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହ୍ୟତାରତ୍ତ୍ୱ
କମ୍ବେଳନ ଶ୍ରମିକମାନେ କରିବାହୁଏ । ବିବେକ ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ
କମ୍ବେଳନ ଏକ. ଏ. କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ଶ୍ରମିକମାନେ ତାରତ୍ତ୍ୱ
ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହ୍ୟତାରତ୍ତ୍ୱ,

“Hindu religion and culture have always been characterised by its liberal Catholic outlook and as such Indian Cultural propaganda conducted by the Bharat Sevashram Sangha would not only be beneficial to the Hindus of the colony, but it is sure to

bring about a general wellbeing of all people irrespective of caste, creed or colour.”

ପର ଏହିମାନେ ଅନ୍ୟତା ହୁଏତେ ହୁଏ । କମ୍ବେଳନ ବିବେକମାନେ ପୂର୍ବ ପର ତାରତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ
କମ୍ବେଳନ ବିବେକମାନେ ଅନ୍ୟତା ବାହ୍ୟତାରତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ-
ଦାନୀରେ ବହୁତା ପର କମ୍ବେଳନ ହିନ୍ଦୁବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରମିକମାନେ
କମ୍ବେଳନ ବିବେକମାନେ କମ୍ବେଳନ ବିବେକମାନେ ବାହ୍ୟତାରତ୍ତ୍ୱ ହୁଏ । କମ୍ବେଳନ

নিয়োগৰ পৰা প্ৰমিৰ্ণগণকে যে অবস্থায় লম্বুৱীন হুইতে হুইত তাহা অতীব বেদনাক্ৰমক। তাহাদেৱ বাসস্থানগুলি বসবাসৰ উপযোগী ছিল না। ১০০ ফুট দীৰ্ঘ ও ৮ ফুট প্ৰশস্ত ব্যৱস্থাকলিকে ১৫.১৬টি একোঠাে বিভক্ত কৰিবা বতৰুৱ

সুযোগ দান কৰা হয়। কলে তাহাৰা পুৰণকভাবে বসবাসেৱ অভ কৰি পাৰ। তাহাতে সামান্য হুগীৰ নিৰ্মাণ কৰিবা থাকিবাব ব্যৱস্থাও কৰা হয়। কুৰিই তাহাদেৱ এৰাম উপভাৱিকা হইল। হাৱী তাৰে বাস কৰিবাব আকাঙ্ক



হাৰী অধৈতানন্দী কৰ্তৃক জিমিদাদে একট
হিন্দু-মন্দিৰেৱ হাৰোদ্বাটন

সম্ভৱ প্ৰমিৰ্ণক পৰিপূৰ্ণ কৰা হইত। ঐ বৰ পুণ্ডলিতে ভাৰতীয় প্ৰমিৰ্ণগণ কৰেদীৰ্ঘ ভাৱ কীবন বাপন কৰিত। তাহা-দেৱ সাত দিমৰে মৰো এক দিমও কৰে বিৱতি থাকিত না। এতিদিন হয়-সাত আন পাৰিপ্ৰমিৰ্ণক ভেৰ-চৌক বৰ্টা কঠোৱ তাৰে পৰিপ্ৰমিৰ্ণ কৰিতে হইত। চিকিৎসাৰ বালাই ছিল না। অসুস্থতানিবন্ধন কাৰ্য্য অসুপস্থিত থাকিবা কৈকিৰং মিতে বিলম্ব হইলে তাহাদিগকে নিৰ্ম্মণ তাৰে বেজাবাত কৰা হইত।

এৰাৰে বিশেষ তাৰে উৰেখৰোণ্য বে, ঐ সকল প্ৰমিৰ্ণক পঞ্চবাৰিক চুক্তিতে (অৰ্থাৎ, 'পাঁচ বংসৰ পৰে বিম বৰচে তাহাদেৱ ইচ্ছাক্ৰমে তাহাদিগকে বদেপে প্ৰত্যাবৰ্ত্তনেৱ সুযোগ দেওৱা হইবে') লইবা বাওৱা হইৱাছিল। চুক্তিৰ বেৰাৱ শেব হইলে, চুক্তিৰ সৰ্গ পালন কৰা হুৱে থাকুক, তাহাদেৱ সামাজিক দাবিগুলি পূৰণেও কৰ্তৃপক্ষ কৰ্পাত কৰেন নাই। কৰনও কৰনও আবেদন-বিবেচনেৱ পৰ তাহাদিগকে বদেপে প্ৰত্যাবৰ্ত্তনেৱ অসুস্থতা দান কৰা হইত বৰ্টে, কিন্তু তাহাতেও অনেক বদেপে কৰিতে ভৱনা পাইত না, কাৰণ সমুদ্ৰপথে তাহাদেৱ অসাহসিক কষ্ট ভোগ কৰিতে হইত। ইহাৰ পৰ তাহাৰা সম্ভৱ তাৰে আন্দোলন আৰম্ভ কৰে বেন তাহাদিগকে পুৰণ তাৰে থাকিবাব



ভাৰত সেৱাপ্ৰম সন্তেৱ উৰোণে জিমিদাদে মবনিৰ্ম্মিত
একট হিন্দু-মন্দিৰ

তাহাদেৱ ছিল না; ঐ পুৰ্ব্বাসমকে তাহাৰা সাময়িক তাৰেই গ্ৰহণ কৰিৱাছিল। সুযোগ পাইলে বদেপে কৰিৱা আসিবে ঐ আশা তাহাৰা ছদে পোষণ কৰিবা আসিতে-ছিল। কিন্তু তাহা কাৰ্য্যে পৰিণত হয় নাই। তাহাদেৱ সম্ভ ইচ্ছাই ব্যৰ্থতাৰ পৰ্য্যাসিত হয়। সেইবৰ্ত্ত পৰে ঐ দুৱ এৰাসকেই ভাৰতীয়েৱা হাৱী বাসভূমি বলিবা গ্ৰহণ কৰে। পুৰ্ব্বাহুৰ্বে ঐ সুদূৰ এৰাসেই তাহাৰা হাৱীতাৰে বসবাস কৰিতেছে। তাহাদেৱ ঐকান্তিক মিঠাৰ ও অক্লান্ত পৰিপ্ৰম ঐ দীপদেশ কৰণ: পত্ৰভাৱন কৰণদে পৰিণত হয়। বৰ্ত্তমানে ঐ উপনিবেশগুলিৰ অবিবাসীদেৱ কীবন-বাজাৰ দান পৰ্য্যালোচনা কৰিলে বেণা বাৰ বে, আৰ্থিক সম্ভলতা, কৃতিৰ বিচিত্ৰতা এবং শিকা ও পৰিবেশেৱ বন্ধন তাহাৰা ভিন্নটি বিশেষ শ্ৰেণীতে বিভক্ত। এৰণ শ্ৰেণীতে ঠিকিল, ব্যাৱিষ্টাৰ, চিকিৎসক, বৰ বৰ শিৱপতি; দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, কেতের মালিক, সরকারী চাকুরি এবং তৃতীয় শ্রেণীতে অনিচ্ছিত শ্রমিক। শেখোক্ত শ্রেণীই—প্রবাসী ভারতীয়। কৃষিই ইহাঙ্গে একমাত্র সমল। তাহারা শতকেষে শ্রমিক বোণার, ইপনিবেশের উন্নতি



জিমিদ্দাবে হিন্দু-মন্দির

সম্বন্ধিত তাহাদের দান প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহাদের জীবন-যাত্রার দান অতি নিম্ন। কর্তৃপক্ষ তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন না। তাহাদের সমাজ-সম্মতিগণ উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। জিমিদ্দাবের অধিবাসী সাত্বে লাভ লক্ষ। তাহাদের লব্ধ একটিও উচ্চ ইংরেজী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই। ঐ স্থানে ১ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দু বাস। কিন্তু হিন্দুর বর্ষ ও সংক্ৰান্তির অস্থিগত উন্নয়নযোগ্য প্রতিষ্ঠান একটিও ঐ স্থানে দেখা যায় না। শিক্ষাদীকার বঞ্চিত হইলেও আত্ম তাহাদিগের মধ্যে একটা প্রাণচাক্ষুস লক্ষিত হইতেছে। তাহারা বর্তমানে নিজেদের দ্বাবীম ভারতের অধিবাসী বলিয়া গর্ব অনুভব করে। আশা করা যায়, শীঘ্রই তাহারা নূতন আলোকের সমাজ লাভ করিবে।

প্ৰত্যাহিক বংসরের মধ্যে এখানকার ভারতীয়গণের সামাজিক জীবনে গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহারা পান্ডিত্য ভাবে উন্নত হইয়াছে। ভারতীয় রীতি-নীতিও তাহারা তুলিতে বলিয়াছে। কয়েক জন করিয়া নির্ভাবান ব্রাহ্মণ এক-একটি কলোনিতে থাকেন; তাহাদের চেষ্টায়

কোনও কোনও স্থানে বর্ষার অস্থানাদি উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। কোনও কোনও স্থানে শিব-পূজা, মহাবীর পূজা, দ্বিতা ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। ইহা এক স্থানে শিবমন্দির হাটা বর্ষার অন্ত কোনও প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি-গোচর হয় না। হিন্দুদের মধ্যে ক্রান্তিভেদ এবং শ্রেণী-বিভাগও আছে। সমাজনী হিন্দু, আধ্যাত্মবাদী, কবীরপন্থী প্রভৃতিই প্রধান। সমাজবাদীগণ ছুঁৎনার্গকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে এবং আধ্যাত্মবাদীগণ দৃষ্টি পূজার বিরোধী। সেইজন্য কোনও প্রচারককে ভারতীয় সমাজের আদর্শ ও হিন্দু বর্ণের আদর্শক বৈশিষ্ট্য প্রচারের সময় ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

বিদেশে হিন্দুদের সংগঠনী প্রতিষ্ঠা বহুগত হইতে পারে নাই। যদি তাহারা অমৈত্র্য পার্শ্ব্য তুলিয়া সংলব্ধ না হয়, তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক বাহার মাধ্যমে ব্যাভাষাগার, পাঠাগার, ছাত্রাবাস ও জনহিতকর সংস্থানসমূহ পড়িয়া উঠিবে। বর্ষ ও সংক্ৰান্তিরক ভাববারায় ঐগুলিকে সম্মিলিত রাখিবার লব্ধ শিক্ষিত সন্ন্যাসী প্রচারক প্রেরণ করা সরকার। জিমিদ্দাবে ভারত সেবাপ্রদ সন্দের প্রচারক দলের পক্ষ হইতে প্রেরিত এক পত্রে জানা গেল যে, ঐ স্থানে ভারতীয় ভাবার কোনও সংবাদপত্র নাই। সেইজন্য পারম্পরিক সংযোগ স্থাপন ও সহযোগিতাকে দৃঢ় করিবার লব্ধ হিন্দী ভাবার পাকিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহা দ্বারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচারের পথ সুগম হইবে।

সন্দের প্রচারকদল বহিষ্ঠারতে হিন্দু—তথা ভারতীয়গণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। যদিও হিন্দুগণ আপনাদের বর্ষ, সংক্ৰান্তি, রীতিনীতি হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে, যদিও তাহারা মাতৃভাষা তুলিয়া পিরাছে ভবুও ঐ প্রচারক দলের প্রচারের কলে বহিষ্ঠারতে হিন্দুদের তিতর একটি আগরণ আসিয়াছে। বর্ষ ও সংক্ৰান্তির প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় প্রেম, মাতৃভূমির প্রতি মননবোধ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যীয়। সন্দের প্রচারকগণের উদ্যোগে অস্থিগত জনসমাজ তাহাদের কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তাহারা নিজেদের হিন্দু তথা ভারতীয় বলিয়া পরিচর দিতে গর্ব অনুভব করেন। তাহারা ঐ প্রচারক দলকে বহিষ্ঠারতে দ্বারীভাবে প্রচারকার্যে মিয়োজিত রাখিবার লব্ধ সম-কর্তৃপক্ষ এবং ভারত-সরকারের দিকট আবেদন জানাইরাছেন।

প্রায় এক বংসর অধিষ্ঠাত প্রচারের কলে সন্ন্যাসিগণ পশ্চিম ভারতীয় দীপপুত্র ও দক্ষিণ আমেরিকার ২২টি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। জিমিদ্দাবে প্রধান কেন্দ্রের ভাব দ্বাবী পূর্ণানন্দের উপর আঁপিত হইয়াছে। কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত পূজা, আরাতি, বৈদিক লক্ষ্য, বক্ত, ভজনকীর্তন, হিন্দী পাঠ-

খালি নিরমিত চলিতেছে। বামীজী ঐ স্থানে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনাও প্রণয়ন করিয়াছেন।

বামীজী লিখিয়াছেন, “প্রচারের জন্য একটি বোর্ডের পাইরাছি। ৪ মাসে বার্ষিক ৮০০০ হাজার হাইল জমণ



জিমিভাবে ভারতীয় প্রবিকের স্টোর

করিয়া হুঁর হুঁর গ্রামে গিয়া বর্ষা সবচেয়ে বড়তা, শীতাব্যাপা, শিকা সবচেয়ে বড়তা ও উৎসাহদান, হানীর বর্ষা-সংসদে সাপ্তাহিক প্রার্থনা-সভা পরিচালনা, বজ, পূজা, আরাতি সম্পন্ন করা ও করান, আরাধনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দী ফুলগুলি পরিদর্শন, বৈদিক সন্ধ্যা শিক্ষাদান, বর্ষার অহুষ্ঠানাদি সবচেয়ে যে সকল সমালোচনা বা সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, সে সবচেয়ে বিভিন্ন বর্ষাবলবীর সমবেত সম্মেলনে সমালোচনার যথাযথ বীমাংসা, আরাধনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন ও কার্যাবলী সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার পরামর্শ দিতেছি। হিন্দী ফুলগুলি বাহাতে ভালভাবে চলে, সেই দিকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। এক একটি বেলা বরিষা ঘরে ঘরে বাহাতে বর্ষার অহুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার বাহাতে গৃহের সকলে প্রার্থনার যোগদান করে, সেই দিকে চেষ্টা করিতেছি। এই সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ পরিকল্পনা অহুস্তারে কাজ করিতেছি। হিন্দী ফুলের শিক্ষকগণের একটি সম্মেলন আয়োজন করিয়া ফুলগুলিতে একটি বোর্ড গঠনের চেষ্টা করিতেছি। এই বিষয়ে হানীর সরকার ও ভারত-সরকারের হুঁট আকর্ষণ করিতেছি, বাহাতে হিন্দীভাষা এখানকার শিকা প্রতিষ্ঠানে অবতরণ্য তাহারূপে গৃহীত হয়।।...”

সন্দের সন্ন্যাসী প্রচারকগণ পশ্চিম ভারতীয় বীপপুঞ্জে বিশেষ সকলতার সহিত প্রচারকার্য সমাধা করিয়া ব্রিটিশ গিমিতে (বকিণ আমেরিকা) গমন করেন। সেই স্থানেও তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সভ্যগণ এটকিনসন বিমানবাটীতে অবতরণ করিলে প্রদেশের

চীক সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ জম ৩৫, সরকারের খানদ-পরিষদের সভ্য মানবীর ডাঃ কে. বি. সিংহ, ইন্দোপারেমিক ডক্টর উইল সাভিসের সভাপতি মিঃ কে. প্রহ্লাদ, কেন্দ্রীয় সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি মি. এস. শি. সিংহ, সম্পাদক মিঃ বীমদহাল সিংহ প্রমুখ সভ্য জম বিশিষ্ট ভারতীয় তাঁহাদিগকে



জিমিভাবে কোকোর বাগানে কর্তৃত্ব ভারতীয় প্রমিক

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিমানবাটী হইতে একুশ হাইল হুঁরবর্তী কর্ক টাউন শহরে সভ্যগণ নীত হন। শহরে পৌঁছিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে হানীর বেতারকেন্দ্র হইতে মিশনের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয় এবং প্রদেশবাসীর পক্ষ হইতে মিশনকে স্বাগত সভ্যগণ জামানো হয়। মিশনের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রদেশের সর্বত্র ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং বেতারকেন্দ্র হইতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

ব্রিটিশ গিমিতে প্রায় দেড় লক্ষ ভারতীয় প্রবাসী স্বাক্ষরভাবে বাস করে। তদ্ব্যতীত হিন্দুর সংখ্যা এক লক্ষ একুশ হাজার। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ শতাধিক বৎসর পূর্বে এই দেশের চিনির কলগুলিতে প্রমিক হিসাবে আগমন করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ইহাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এই স্থান হইতে তিন লক্ষ ভারতীয় বহুদেশে কিরিয়া গিয়াছে। বহুদিন মাতৃভূমি হইতে দূরে থাকার কলে প্রবাসী ভারতীয়গণ মিসনের বর্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞ। পরিপূর্ণ পাকাত্য আবহাওয়ার তিত্তর থাকিতে থাকিতে ব্রিটিশ গিমির প্রায় বাইশ হাজার হিন্দু বর্ষান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৪১) মধ্যাহ্নে ব্রিটিশ গিমির সর্ববর্ষ ভার চার্লস উলী মিশনের সভ্যগণকে এক সংবর্ধনা-সভায় আগ্যায়িত করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে হানীর টাউন হলে শাপরিকগণের পক্ষ হইতে উলী পৌরোহিত্যে

এক বিরাট জনসভায় মিশনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মিশনের সভাপণের পরিচয় প্রদান করিয়া ব্যারিষ্টার মুঈন সিং ভারত সেবাস্রম সন্মেলন কর্তৃপক্ষকে বক্তব্য জানাইয়া বলেন, “কেবলমাত্র এবাসী ভারতীরগণই বহিষ্ঠায়তে এই



জিম্বাবুয়ে আর্থালমাক হল্লির

সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের জন্য সন্মেলন নিকট থই থাকিবে না,—অন্ততঃ অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে নিকট সম ভাবে থই থাকিবে।” সভাপতি তার চার্লস উলী মিশনকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন, “আজিকার স্মৃতি আমার দীর্ঘকাল নিঃস্বপ্নে অবস্থানের পূণ্যস্থতি আপাইয়া বিত্তেছে। আমি সেখানে ভারতীয় সন্ন্যাসীর যে উদারতা ও মহাত্মবতার পরিচয় পাইয়াছি তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।” তিনি আরও বলেন, “আমরা ভারতের নিকট চিরঞ্জী থাকিব। এই জাতীয় প্রচারক প্রেরণের জন্য ভারতের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। এই জাতীয় সাংস্কৃতিক মিশন—বাহার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্, তদ্বারা কেবল এখানকার ভারতবাসীর নহে, অত্যন্ত সকল সন্তোষেরই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। প্রেম ও বৈজ্ঞানিক ভারতীয় সংস্কৃতির শিক। এই শিকা গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলে বিশ্বের আধুনিক নবুদর সমস্ত সমাধান সহজ হইবে।” পরিশেষে তিনি সন্মেলন প্রচারক-দলকে সর্বপ্রথমে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

কর্তৃক টাউনের মেয়র মিঃ আর. বি. পঞ্চরাজ জনসাধারণের পক্ষ হইতে মিশনকে সংবর্ধনা জানাইয়া বলেন, “আজ হকিম আমেরিকার ভারতের সংস্কৃতির প্রচারকগণকে সাধন অত্যাধিক জ্ঞাপন করিতে সিদ্ধা বিবেকে সৌরবাহিত মনে করিতেছে। কেননা ভারতীয় সন্ন্যাসীর পূর্ণাঙ্গ এই দেশে ইহাই প্রথম।” সংবর্ধনার উত্তরদান-প্রসঙ্গে মিশনের নেতা বানী অইতামনকী বলেন, “মিশনকে সম্মানিত করিবার জন্য আপনাদের যে আহ্বান

আগ্রহ, তাহা ভারতের সমাজের আদর্শ, তথা সভ্যতার প্রতি অন্তরের গভীর প্রচার পরিচায়ক। ভারতবর্ষ হইতে এত দূরে সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়াও ভারতের সংস্কৃতিকে বহিরা থাকিবার জন্য আপনারা যে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভারতবাসী হিন্দুর নিকট আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।” এবাসী ভারতীরগণের দায়িত্ব, তথা কর্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া বানীকী বলেন, “বিশেষে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশকে মাতৃ-ভূমিরূপে গভীর করিয়া তাহার উন্নতি-প্রসতির সহিত মিলে মিলে মিলাইয়া মিশাইয়া দিলেও ভারতমাতাকে বিস্মৃত হইলে বিকারূপ কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করা হইবে। বিশেষে ভারতীরগণকে দেখিয়াই বিজাতীয়গণ ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ ও সভ্যতার বিচার করিবে।”

হানীর সরকারের শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সভ্য ডাঃ কে. বি. সিংহ সন্মেলনে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার আদর্শ, তথা সংস্কৃতি মিশনের দ্বারা পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জে যে নৈতিক ও ধর্মীয় আগ্রহ আনিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। জনসভায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

মিশনের সদস্তগণ চারি মাসকাল হকিম আমেরিকার ব্রিটিশ গির্জাতে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ আদর্শগুরু প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রচারের কলে সকল শ্রেণীর মন-মাতীর মধ্যে অপরূপ সাক্ষাৎ পড়িয়াছে। সকলেই মিশনের নিকট হইতে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও তাৎপর্য জানিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহবিশিষ্ট। মিশনের প্রচারকগণ ব্রিটিশ গির্জার প্রচারকার্য সমাপ্ত করিয়া ভারতের পথে নিউইয়র্ক হইয়া লন্ডন শহরে পৌঁছিয়াছেন। জিম্বাবুয়ের বিমানঘাঁটিতে সদস্তগণকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বহুদূর হইতে শত শত এবাসী ভারতীয়—সদস্তগণকে প্রত্যাগমনের জন্য সমবেত হইয়াছিল। বানীকী তাহাবিগকে মাতৃভূমির মহান্ আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা রাখিবার আবেদন জানাইয়া তাৎপর্য দেন। বানীকী পুনরায় বিশেষে মিশন প্রেরণ করিবার আশা তাহাবিগকে প্রদান করেন। মিশনের প্রচারের প্রত্যাব এবাসী ভারতীরগণের মধ্যে এমনভাবে পড়িয়াছিল যে, বিদ্যাকালে তাহারা অঙ্গসংবরণ করিতে পারে নাই।

কাহ্নারীর (১৯৫২) প্রথম সপ্তাহে মিশন লন্ডন মগরীতে অবতরণ করেন। লন্ডনেও তাঁহারা অত্যধিক জন। ডাঃ বাবর ও ডাঃ ক্রুটি তাঁহাদের প্রচারকার্যের এবং অবস্থানের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। হানীর রাজ-সন্মেলন পক্ষ হইতে সুসজ্জিত মিষ্ট্র এবং দায়িত্বগণের পক্ষ হইতে ডাঃ ক্রুৎকন ক্রুৎকি কর্তৃক মিশনের লন্ডনগণ সংবর্ধিত হয়। ১০ই ও ১১ই কাহ্নারী হানীর ভারতীয় রাজগণের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে মিশনের সভাপণ ইতিহাস টুন্টেন্স বুয়ো, হাবন জিনেট, চিনটাইক, আর্জকোট প্রভৃতি ভারতীয় এবং

বিভিন্ন হাজিরাগণ পরিভ্রমণ করিয়া হাজিগণের সহিত মান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। লন্ডন শহরে মিশনের সভাপতি বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভাসমিতি, বন্দীলোচনা, হাজি-সনাকে নৈতিক আদর্শ ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা দ্বিরা প্রচারকার্য চালাইতেছেন। ২০শে কাছারী মিশনের উদ্যোগে ইতিহাস ইন্ডেক্স বারো হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় হাজিগণের এক সম্মেলনে মিশনের নেতা বারী অধৈতানন্দী 'আদর্শ হাজি-জীবন' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

লন্ডন শহরে প্রচারিত ভারত সেবাস্রম সন্দের সাংস্কৃতিক মিশনের চিঠিপত্রাদি হইতে ঐ স্থানের প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত হইতে আগত হাজিগণ ব্যতীত শতাধিক বংসর পূর্বে হইতে এই স্থানে বহুসংখ্যক হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা দশ হাজারেরও কিছু বেশী, তন্মধ্যে বাঙালী, মাজারী ও পঞ্জাবীই প্রধান। অল্পসংখ্যক গুজরাটী এবং সিন্ধীও আছেন। ব্যবসায়ী, অধ্যাপক এবং বৈ-সাময়িক কর্মচারী হাজিও প্রায় ছয় শত হিন্দু চিকিৎসক আছেন। আর্থিক অবস্থা প্রায় সকলেরই সমান। লন্ডনে হিন্দুর সামাজিক তথা ধর্মীয় চরবহার প্রতি বৈ-কোন বর্ণপ্রচারকের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়।

এখানে অল্পসংখ্যক ভারতীয় মুসলমানের বাস। তাঁহারা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চারিটি মসজিদ পরিচালনা করিতেছেন। প্রতি সপ্তাহে এই মসজিদগুলিতে তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিবার সুযোগ পাইরা থাকেন। অল্পসংখ্যক শিখও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্তের সমবেত হন। কিন্তু হিন্দুর কোন মিলনের স্থান নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহাদি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের স্বাক্ষর আছেন; কিন্তু হিন্দুর বিবাহ, উপনয়ন, প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কোন পুরোহিত নাই।

বহুসংখ্যক হিন্দু বেতাক রমণীর পাপিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দুধর্মিহারাছেন। হিন্দু সমাজে ঐ নবাগতা বেতাক রমণীগণ যদিও হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর আস্থাশীল তথাপি তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্মের মহান বাণী শুধাইবার মত কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই তাহাদের সভ্যমানসজতি হিন্দুধর্মের কোন শিক্ষা লা পাইরা সীতান হইরা বাইতেছে।

হিন্দু এগোসিয়েশন নামে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার কর্তৃপক্ষ অনেক দিন হইতেই একটি হিন্দু মন্দির অথবা মিলনক্ষেত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি ভারত সেবাস্রম সন্দের প্রচারকগণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। প্রচারকগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভার লন্ডনের হিন্দুধর্মের মিলন-

ক্ষেত্রেণে ব্যবহারযোগ্য একটি ভবনের ভূত উপস্থিত চালা সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই তাঁহার উদ্‌ঘাটন-কার্য সম্পন্ন হইবে।

যদিও বিদেশে বহুসংখ্যক হিন্দু একত্রে বাস করেন তথাপি বর্ষ তথা সংস্কৃতির প্রচারের অভাবে শত শত হিন্দু ধর্মভ্রষ্ট



বারী অধৈতানন্দী কর্তৃক জিমিভাবে একটি মন্দিরের
ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন

গ্রহণ করিতেছে। বহির্ভারতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক কোটি হিন্দু স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। তাৎপর্য হইতে তাহাদের সামাজিক তথা ধর্মীয় সত্তা রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং বর্ষদ্বিরপেক রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্ভব হইরা উঠিবেও না। তাই বৈসংসারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে এই সমস্ত বেশে বর্ণপ্রচারক প্রেরণ করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসী হিন্দুগণের ধর্মীয় চেতনা আশ্রয় রাখিতে হইবে। ভারত সেবাস্রম সন্ম বর্তমানে এই প্রচারকার্যে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই প্রচারকার্যকে ব্যাপকভাবে পরিচালনের ভূত উহার প্রধান কর্মক্ষেত্রস্বরূপ কলিকাতার "ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন" নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা সন্দের পরিচালনার গতিয়া উঠিয়াছে।

ধান বনাম পাট

ঐরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নূতন সেলাস প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার লোক-
বল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না। তবে বাংলার সম্মী-
লনোৎসবের বিবৃতি থেকে মনে হয়, পশ্চিম বাংলার আ-
নামিক লোকসংখ্যা এখন আড়াই কোটি। ১৯৩১-৪১ দশকে
লোকসংখ্যার হার বহু হিসাব করলেও এ অনুমানই সঠিক
বলে মনে হয়। ১৯৪১-এর পর লোকসংখ্যা শতকরা দুই
জন করে বহু বেড়েছে বললে পাওয়া যায় :

বর্ষ	লোকসংখ্যা
১৯৪১	২,১১,৯৬,০০০
১৯৪৭	২,৩৭,৪০,০০০
১৯৪৯	২,৪৫,৮৭,০০০
১৯৫০	২,৫০,১১,০০০

সুতরাং আমরা বহু নিতে পারি যে, বর্তমান পশ্চিম বাংলার
সমস্ত হ'ল দু'দশকে আড়াই কোটি লোকের বাওয়া-পয়ার
সংস্থান করা।

১৯৪১-এর সেলাস অনুযায়ী ভারত ইউনিয়নের সমস্ত
রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলারই লোকের বসতি সর্বাধিক।
যদি পশ্চিম বাংলার পরই ব্রহ্মদেশ ও বিহারের
হাট—

রাজ্য	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা
আসাম	... ১৪৭
পশ্চিম বাংলা	... ৭৫১
বিহার	... ৫২১
উড়িষ্যা	... ২৭১
মধ্য প্রদেশ	... ১৭১
ব্রহ্মদেশ	... ৫১৮
মাদ্রাজ	... ৩৯১
বোম্বাই	... ২৭০
পূর্ব প্রদেশ	... ৪০৮
ভারত ইউনিয়ন	?... ৩৬৭

যাণীনতা অর্জনের পর 'প্রদেশ'গুলির নাম পাণ্টে রাখা
হয়েছে 'রাজ্য' এবং তাদের পরিধিও পরিবর্তিত হয়েছে।
অধিকাংশ রাজ্যের পরিধিই বিস্তারিত করেছে, কিন্তু পশ্চিম
বাংলার পরিধির ইতর-বিশেষ কিছুই হয় নি বলা চলে—মাত্র
কোটবিহার রাজ্যের ১০০০ বর্গমাইল সংযুক্ত হয়েছে (এই
আলোচনার কোটবিহারের কথা বলা হয় নি)। পরিধি
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যাও কিছু কিছু

বেড়েছে মিলিয়ে, কিন্তু লোকের চাপ যে সেই অনুপাতে
অত্যধিক হয়েছে তা মনে হয় না। ১৯৫১ সনের সেলাসই সে
প্রশ্নের জবাব দেবে। পশ্চিম বাংলার কথা আলাদা। ১৯৪১
সনের তুলনার লোকের চাপ পশ্চিম বাংলার যে বেড়েছে সে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লোকসংখ্যা আড়াই কোটি হয়ে
হিসাব করলে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ঠাকুর ৮৬০।
লোকসংখ্যার ওজন সম্বন্ধে এতদূর যাব না। সেজন্য
বোম্বাই প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে কর্ণবোম্বাই (কর্ভিত
ও পতিত) জমির পরিমাণ নির্ণয়। এই ভাবে হিসাব
করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত জন লোককে নির্ভর করতে
হয় মাত্র দশ একর জমির উপর। যে দেশে (বিশেষতঃ
যে দেশ কর্ণবোম্বাই) মাত্র এক একর জমির উপর
একাধিক লোককে নির্ভর করতে হয়, সে দেশে লোকবসতি-
সমতা ও বাত-সমতা যে সঠিকভাবে হবে তাতে আর
আশঙ্কা কি ?

অনুমানের কলে অব্যাপক মহলানবিশ সিদ্ধান্ত করেছিলেন
যে, প্রতি সপ্তাহে বাংলার অধিবাসী গড়ে ৩'৫৮ সের বাতশত
গ্রহণ করে। পূর্বপ্রদেশের বাতশীতি এই সিদ্ধান্তের উপর
প্রতিষ্ঠিত। যদি এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বীকার করে নি',
অর্থাৎ, যদি বহু মেওয়া বাত যে বাবা-পিতৃ গড়ে—সাতের চার
দশ (অথবা সপ্তাহে সাতের তিন সের) চাল প্রয়োজন, তা হলে
পশ্চিম বাংলার ২,৫০,১১,০০০ অধিবাসীর জন্য বহু প্রয়োজন
হবে ১১,২৫,৫১,০০০ দশ (বা ৪১,৬৯,০০০ টন) চাল। কিন্তু
লোকসংখ্যা আড়াই কোটির বেশী হলে এতদূর চলাবে না।
পশ্চিম বাংলার ২,৩৫,০০,০০০ একর জমির মধ্যে মাত্র শতকরা
৬০ ভাগ জমিতে চাষ-আবার চলেতে পারে। ১,৪১,০০,০০০
একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় বিশ লক একর জমি চাষ-
যোগ্য হলেও পতিত। একর-প্রতি উৎপাদন-হার ৮০৬ পাউণ্ড
বহু কর্ণবোম্বাই (কর্ভিত ও পতিত) ১৪১ লক একর জমিতে
একমাত্র বামই চাষ করা হয়েছে যদি বহু বেওয়া বাত, তা
হলেও মোট ৫১ লক টনের বেশী চাল আমরা পাই না। এই
কলম পেলে পশ্চিম বাংলার চাহিদা কোন রকমে মিটিতে
পারে। কিন্তু একমাত্র বাম বোম্বাইও চলে না বা জন পতিত
জমি এখনই বামচাষে লাগান যাব না। বাম বোম্বাই হয়
গড়ে ১ কোটি একর জমিতে এবং তা থেকে পাওয়া বেতে
পারে (৮০৬ পাউণ্ড উৎপাদন হার বহু) ৩৬ লক টন চাল
অথচ আমাদের প্রয়োজন দু'দশকে ৪১,৫৯,০০০ টন চালের

সুতরাং বর্ষমান পরিমিতিতে কতকটা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। পণ্ডিত কবি উদ্ধার করে যে বিশেষ সূত্রটি হবে তাও বনে হয় না, কেননা কৃষিযোগ্য পণ্ডিত কবির পরিমাণ পশ্চিম বাংলার সাহায্য—বাহা বিশ লক্ষ একর। অবিকার্য পণ্ডিত কবিই হচ্ছে বাঁকড়া, মেদিনীপুর, সুন্দরগঞ্জ, নদীয়া ও হাৰ্জিলিং জেলায়। স্কাউট কমিটি

মতে—

জেলা	পণ্ডিত কবি পণ্ডিত কবি কৃষিযোগ্য
বীরভূম	৮'০
বর্ষমান	৬'৬
বাঁকড়া	১৫'১
হুগলী	৬'০
হাওড়া	৬'৬
মেদিনীপুর	১১'১
সুন্দরগঞ্জ	১২'৫
নদীয়া	১৪'৬
২৪ পরগণা	৪'৪
হাৰ্জিলিং	১১'২
জলপাইগুড়ি	৬'৮
বিলাজপুর	১৪'০
মালদহ	৮'৯

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চাষযোগ্য সব ক্রমিতেই প্রায় চাষ করা হয়। সুতরাং পণ্ডিত কবি চাষে লানিয়ে কলস বাঁকড়ার কলস অসম্ভব। সেচের ব্যবস্থা, মালার সংস্কার এবং ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায় না করা পর্যন্ত পণ্ডিত কবি উদ্ধারের কলস কলসই থেকে যাবে। তা হাতা বর্ষমান পশ্চিম বাংলা পর্বমেষ্টের অর্থসঙ্কটের কণাও ভাবতে হবে। আর্থিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে কবির উদ্ধার-সাধনের অর্থই হ'ল ব্যয়বাহুল্য এবং তাও সহস্রাব্য হয় যদি নাকি একসঙ্গে একটানা বিহীন কবি পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার যে পণ্ডিত কবি রয়েছে তা ক্রম ক্রমে অংশে বিতরণ, ১০০ একর রক্ত-ওরালা পণ্ডিত কবির পরিমাণ পণ্ডিত ১৫ ভাগেরও কম। পর্বমেষ্টের বহুবর্ণী পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হলে হস্ত পণ্ডিত কবির কতক পরিমাণ উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তার পূর্বে নয়। পণ্ডিতের মন-মদী মনে বাওরার কলে কবিত কবির উৎপাদিকা পণ্ডিত কলসই কমে আসছে, নদীর তল ভাট হয়ে আসার জলপ্রাচীরের প্রাচীরও বেড়েই চলেছে। আর আছে প্রকৃতির ধোঁয়া। তাই কলস না বেড়ে কলসই কমে আসছে। আরও বেধেই নদীগুলির দুই কূলে বড়ই শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে, চাষের অযোগ্য কবির পরিমাণ ভড়ই বেড়ে যাচ্ছে—

জেলা	কৃষকের অযোগ্য কবি	— হ্রাস ও + বৃদ্ধি
কপস্ সাফে	সেটেলমেন্ট রিপোর্ট	
বর্ষমান	৩১৪,৪২৬'০৫	৩০১,৯৯৫'০০ + ১২,৪৩১'০৫
হুগলী সহর	৪২,২০৯'৬৯	৪২,০৯৬'৫৪ + ১১৩'১৫
শ্রীহরপুর	৪২,৪৮৬'০১	৩৮,৯১১'৪৫ + ৩,৫৭৪'৮৬
হাওড়া	৬৬,০৬৭'২২	৬৩,৯৩৬'৮৫ + ২,১৩০'৩৭
মেদিনীপুর	৫৯৭,৬৬৪'৫৯	৫৩৩,০৮৫'৪৭ + ৬৪,৫৭৯'১২
ব্যাংকপুর	২১,৮৭১'০০	১৭,৪৮০'৫৩ + ৪,৩৯০'৭৭
বারাসভ	৩৮,৩৪৬'৫৯	৩৩,৫১০'২২ + ৪,৮৩৬'৩৭
ডায়মণ্ড-		
হারবার	১০২,২৭৮'০৫	৯৯,৫৮৪'৩৯ + ২,৬৯৩'৬৬

উপরের হিসাবগুলি পশ্চিম বাংলার পর্বমেষ্ট কলস প্রকাশিত মি: ইলাকের রিপোর্ট হতে নেওয়া। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কলকারখানা প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কবিত কবি—কৃষকের অযোগ্য কবিতে পরিণত হয়েছে। অত বিবেচনা বাংলা-বিভাগের পর বাঁকড়ার প্রাচীরের কলে নানা মগর গড়ে উঠছে। পর্বমেষ্টের 'স্যাটেলাইট' টাউন পরিকল্পনা কার্যকরী হলে আরও কিছু চাষের কবি নষ্ট হবার সম্ভাবনা। অতএব ঠোক বা দেখছি তা চাষের কবি বাঁকড়ার বিবেচনা নয়, কমে আসার বিবেচনা এবং বাংলাদেশে চাষের কবি হ্রাস পাওয়ার অর্থই হ'ল বাংলার কবির হ্রাস, সুতরাং পশ্চিম বাংলার প্রধান সমস্যা হ'ল কবি চাষের কবির সংরক্ষণ ও পরিবর্তন।

পশ্চিম বাংলার বিত্তীয় প্রধান কৃষিকার্য হ'ল পাট। বাংলা-বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার পাটের চাষ কলস: বেড়ে যাচ্ছে—

বর্ষ	পাটচাষের কবির পরিমাণ
১৯৪৩-৪৪	২৪০'৫ সহস্র একর
১৯৪৪-৪৫	১৯৩'৫ " "
১৯৪৫-৪৬	২০২'৮ " "
১৯৪৬-৪৭	১৫২'০ " "
১৯৪৭-৪৮	২৬৬'৪ " "
১৯৪৮-৪৯	৩৪৯'৯ " "
১৯৪৯-৫০	৪৯৮'০ " "
১৯৫০-৫১	৬৫০'৭ " "

বাংলার প্রধান প্রতিযোগী হ'ল পাট, তাই পাটচাষ বাড়লে বাংলার কবি হ্রাস পায়। পণ্ডিত কবিতে চাষ করার কলে পাটচাষ বৃদ্ধি পেলেও, কিছু পরিমাণ কবি-কবিতের বে পাটচাষ করা হয়েছে তা পশ্চিম বাংলার বাঁকড়ার বীকার করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার পাটচাষ বাঁকড়ার সমতা সমাধানে সহায়ক না হবে, প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে। 'কলস বাঁকড়া' আন্দোলন এবং পর্বমেষ্টের বাঁকড়ার-সংগ্রহ দীর্ঘ কালচাষীকে প্রসূর করতে পারে নি, পাটচাষই তার কাছে

অধিকতর লোকস্বার্থে মনে হয়েছে। অতীতকে আছে পাট-কলগুলাগারের বিপুল অভাব। 'বুট মিলস্ এনোসিয়েশন' তাদের বিপুল অর্থসম্পত্তি নিয়ে পশ্চিম বাংলার পাটচাষ বাতানোর সপক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলন চালিয়েছিল তাতে আমদান্য ভোগ দিয়েছি; 'করেন এজেন্ট' উপার্কনের ঘোষাই দিয়ে সর্বশেষে সেই আন্দোলনে ভোগ দিয়েছেন। আজ তারই কলে হয়েছে বাংলার কেতে পাটের আবির্ভাব। বাত আমদানীর অত চাই 'করেন এজেন্ট', আর পাট বেচে পাই 'করেন এজেন্ট' এবং পাটের ব্যাপকতার অর্থ হ'ল বাত-উৎপাদন হ্রাস। অর্থাৎ কবাটা হাঁড়াল, পাটচাষের কলে বাতের অভাব হ'ল ভীতভর এবং সেই বাতাতাব ঘেঁটতে বেচতে হল পাট।

'করেন এজেন্ট' উপার্কন ভরণই হয় সার্বক স্বধন ঐ অর্জিত টাকার বহলে এমন সব পণ্য আমদানী করা যায় বা বেশের বদলতির সহায়ক হয়, অর্থাৎ যদি ভোগ্য-পণ্য আমদানী না করে উৎপাদন-সহায়ক পণ্য (যাকে বলে প্রোডাকশন্স গুড্‌স্) আমদানী করা যায় তবেই 'করেন এজেন্ট'ের লভ্য হয়। তারতের পক্ষে 'করেন এজেন্ট' উপার্কনের অতম প্রবান উপায় হ'ল পাট বা পাটজ পণ্য রপ্তানী। পাট ও পাটজ পণ্যের প্রবান কেন্দ্র হ'ল পশ্চিম বাংলা। তারত-বিভাগের পূর্বে পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানী করে ভারত যে টাকা উপার্কন করেছে তার একটা মণ্য অংশ ব্যয় হয়েছে বাতপত্র আমদানী করতে।

বর্ষ	কাঁচা পাট ও পাটজ পণ্য রপ্তানি
১৯৪০-৪১	৫৩,২৩,০৬,০০০ টাকা
১৯৪১-৪২	৬৪,৩১,২৭,০০০ "
১৯৪২-৪৩	৪৫,৪২,৫০,০০০ "
১৯৪৩-৪৪	১,৭০,৫১,৫০,০০০ "
১৯৪৪-৪৫	১,৪৩,৭২,১৭,০০০ "
১৯৪৫-৪৬	১,১৩,৯৪,৬৬,০০০ "

১৯৪০-৪১-এ মাত্র শতকরা ২৭ টাকার বাতপত্র (অর্থাৎ ভোগ্য-পণ্য) আমদানী করলেও ১৯৪৫-৪৬-তে তা হাঁড়িয়েছে শতকরা ৭১ টাকার। তা হলে কবাটা হাঁড়াল এই যে, বাবীদতা অর্জনের পর পাট ও পাটজ পণ্য বেচে বা 'করেন এজেন্ট' উপার্কন করা হয়েছে তার প্রায় সবটাই আমদান্য ভোগে শেখ করে দিয়েছি। 'করেন এজেন্ট' অধিকতর পরিমাণে উপার্কনের প্রয়াসে পাট রপ্তানির প্রতি বত অধিক লক্ষ্য দেওয়া হবে, বান উৎপাদনের পরিমাণ ততই হ্রাস পোবে আসার কথা, অর্থাৎ যে পণ্য আমদান্য চলেছি তাতে অল্প ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার পক্ষে বাত লব্ধে বাবলবী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধিমান; পক্ষান্তরে বাত লব্ধে আমদান্যের এই

হ্রাসলভ্যতার সুযোগ নিয়ে রপ্তানিকারক দেশগুলির চড়া দর হাঁড়াত কিছু বিচলিত নয়।

বাংলার অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে বলতে হয় যে, পশ্চিম বাংলার পাট-শিল্পই হয়ে উঠেছে বাংলার আর্থিক বিপণ্যবাহের অতম প্রবান হেতু। যে শিল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা ও লক্ষ লক্ষ লোক বাঁচছে, সেই শিল্প বেশের অর্থনীতিকে বিপণ্যভর করেছে একথা সহজে মন মানতে চার না—সুতরাং কবাটা বিলম্ব করে দেখা যাক। বাংলার অর্থনীতিতে পাট-শিল্পের স্থান কতটুকু? পাটশিল্পে বহু লক্ষ টাকা স্থানকা হলেও বাঙালী পাটচাষীর অবস্থা কি খুব লজ্জা? পাটশিল্পে লাভের যোল আনাই ব্যয় 'মিডলব্যাম' (কতিয়) আর পাট-কলগুলাগারের ব্যয়ে। চাবী পাট উৎপাদন করতে যে অসামান্যিক পরিশ্রম করে তার বদলে পাট বেচে বা পার তাতে সে 'সাবসিটেল লেভেলের' উপরে উঠতে পারে না; পাটের বহলে অপর কোন কল চাষ করলে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রায়ে ঐ 'সাবসিটেল লেভেলের' উপরুক্ত উপার্কন করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সেদিক থেকে পাট-চাষের কলে পশ্চিম বাংলা যে বিশেষ লাভবান হয়েছে তা বলা যায় না। বিতীর্ণতঃ, পাট-কলগুলি পশ্চিম বাংলার অধিষ্ঠিত হলেও তাদের মালিক প্রায় যোল আনাই বাংলার বাইরের লোক। কেন্দ্রীয়-শ্রেণীর কিছু লোক বাদ দিলে প্রমিত শ্রেণীর অন্যান্য অর্ধেকাংশ বাংলার বাইরের লোক এবং এরা বা উপার্কন করে তাও চলে যায় বাংলার

শত ভাল, বহন প্রকৃতি বাতপত্র আমদানী	রপ্তানীর শতকরা হিসাবে আমদানী
১৪,৩৪,৮৫,০০০ টাকা	২৭
১৫,০২,০৩,০০০ "	২৩
৩০,৮৫,০০০ "	১-এর কম
৮৭,৩০,৫২,০০০ "	৫১
৯৯,৫৩,৯৯,০০০ "	৬৯
৮০,২৬,৪৮,০০০ "	৭১

বাইরে। সুতরাং বাংলার আর্থিক সহন্যিতে তাদের স্থান মণ্য।

এ কবার প্রামাণিকতার বিভাবিকা কেউ কেউ দেখলেও এখানে শুধু দেখাতে চেষ্টা বাংলার অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পাট-শিল্পের স্থান কোথায়। তা হলে কি পাটশিল্পের কোন স্থানই নেই বাংলার অর্থনীতিতে? আছে বৈকি। ট্যাক্স ও গুণ ব্যবহ থেকে বা আদায় হয় তার একটা সাহায্য অংশ পশ্চিম বাংলা সরকার পান। পাট বিক্রয় করে সেন-ট্যাক্স ব্যবহ পশ্চিম পাটশিল্প বাংলা সরকার পান আস্থানিক ২৫ লক্ষ টাকা। শুধু হিসাবে পাট ও পাটজ পণ্য থেকে আদায় হয় বছরে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টাকা; অথচ তা থেকে পশ্চিম বাংলার বহু

মাত্র ১০৫ লক্ষ টাকা। আর ইন্কার ট্যাক্স বাবদ পশ্চিম বাংলা-সরকার পান প্রায় ৬ কোটি টাকা। ইন্কার ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ পাট ও পাটক পণ্য থেকে না আদায় হয় তার একটা মণ্য অংশ এই ৬ কোটি টাকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পাট ও পাটক শিল্প থেকে পশ্চিম বাংলার পাণ্ডনা মোটামুটি এক্ষেত্রে প্রায় দুই কোটি টাকা। পশ্চিম-বাংলার শুধু বাত বাকেটই যেখানে ২৫ কোটি টাকার উপর সেখানে তার সবচেয়ে বড় আয়ের পথ থেকে তার প্রাপ্য মাত্র দু'কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলা স্থানীয় অধিবাসী-

দের বাত থেকে বঞ্চিত করে পাট বেচে 'করেন একচেহা' উপার্জন করছে সারা ভারতের বাত-সমতা সমাবাসের লত। আর এই বাতব্যাপের লত সে পাছে পাটশিল্প থেকে আদায় দু'কোটি টাকা মাত্র। পাটশিল্প নিয়ে পশ্চিম বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা এ থেকেই বুঝা যাবে। বাত বাটতির লত প্রতি বঙ্গের যে পরিমাণ বাতশিল্প পশ্চিম বাংলাকে আনয়নী করতে হচ্ছে বাংলা এবং ভারতের বাইরে থেকে, তার মূল্যও সমুল্য হয় না পাটশিল্প থেকে পাণ্ডনা এই দু'কোটি টাকা নিয়ে।

শ্রুতমা

ঐশ্বাম্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

১

শৈলেশ অনেক দিন পরে বাতী করে এসেছে। কিন্তু অত বাত্রে বাতী করে যে আনন্দ সে পায়, আজ তার কণামাত্রও পেলো না। পরপুত্রের পরগুলো যেম ভাবের সৌন্দর্য হারিয়ে কেলেছে, প্রানের নিকটের শালবনের সে আকর্ষণ-শক্তি আজ আর নেই।

শ্রুতমা কিনা বিয়ে করলে অগণীশকে। অগণীশ, বার বার চরিশের কোঠার এসে পড়েছে, মাথাভরা বার টাক, বিভ্রাট পৌকরাতি না কামালে বার দুখ কাঁচাপাকা পৌকরাতিতে বিসমৃশ মনে হয়, সেই বিগতযৌবন বিগতসৌন্দর্য অগণীশকে কিনা শ্রুতমার মত মেয়ে বিয়ে করলে। অর্থাৎ শ্রুতমার সৌন্দর্যের সীমা নেই—সে শিক্তা, সে আনুসিক। যোবের মধ্যে তার না-বাগ নেই, সে মানার বরে মাহব। অর্থাৎ অতাবেই যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে, তা বুঝতে অবশ্য শৈলেশের বাকি নেই। কিন্তু শ্রুতমা তো আপত্তি করতে পারত। বলতে পারত, “আমি বিয়ে করব না।” শৈলেশের সঙ্গে তো তার সেই কথাই হয়েছিল। শ্রুতমা বলেছিল, “আমি তোমার; তোমার হাতা আর কারো হব না।” শৈলেশও বলেছিল, “পড়াশুনা শেষ করে অর্থ উপার্জন করি। তার পর তোমার বিয়ে করা কে ঠেকায়। যদি না বিতে চায়, কোর করে নিয়ে চলে যাব। যাবে ত আমার সঙ্গে?” শ্রুতমা রাজী হয়েছিল, বলেছিল, “ভালবাসা বার এক জনকে। থাকে ভালবাসা বার থাকে হাতা আর কাউকে বিয়ে করাও যায় না। যে মেয়ে এক জনকে ভালবেসে আর এক জনকে বিয়ে করে তাকে আমি অসতী বলতে স্তুতি হব না।” সেই শ্রুতমা সব কথা ভুলে বিয়ে করলে অগণীশকে। শৈলেশের মনে হ'ল আর এখানে থাকা চলে না। আজই সে

চলে যাবে কর্ণহলে। যেখানে শ্রুতমা সেখানে তার স্থান নেই।

শ্রুতমার নাম হরিমোহন ছিলেন মকবল শহরের এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। শৈলেশ সেই কলেজেই পড়ত। এক প্রানে বাতী বলে হরিমোহনের অন্তঃপুরে তার ছিল অবাধ গতি। শ্রুতমাকে সে-ই তার ভুলে পৌছে দিয়ে কলেজে যেত, ছুটির পর আবার তাকে ভুল থেকে বাসায় পৌছে দিত। তাদের বাসার বৈকালিক ভলবোগ আছে শ্রুতমার সঙ্গে এ-ও-তা নিয়ে আলোচনা সেরে একেবারে রাজে সে হোটেলে কিরত। সত্যার এক বর্টা শ্রুতমাকে পড়াতে হ'ত। এ শ্রুতমাগে উত্তরের মধ্যে যে বসিততা হ'ল তা একমাত্র হরিমোহনের মত লোকই উপেক্ষা করতে পারেন। শৈলেশ ছিল আবার কবি। তার লেখা মাঝে মাঝে হ'ল একটা আনুসিক কাগজে প্রকাশিতও হ'ত। তার লেখার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। বিশ্বের লেখার হ্রস্ব বরে শ্রুতমার সঙ্গে শৈলেশের আলাপটা বেশ করে উঠছিল। শৈলেশ বত সব ভরণ সাহিত্যিকের লেখা এনে দিত শ্রুতমার হাতে, শ্রুতমা সে সব পোড়ালে গিলত। তার পর হ'ল শৈলেশের আলোচনা শুরু হ'ত। এই সময়েই প্রেম সবচেয়ে শ্রুতমা একটা বারণা করে দিয়েছিল এবং শৈলেশের প্রেম-নিবেদনের উত্তরে সে তার মতামত প্রকাশ্যে করেছিল।

শ্রুতমা ব্যাটিক পাল করে বখন কলেজে ভর্তি হ'ল তখন শৈলেশের কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে। সে অনেক চেষ্টা করেও পরীকার অকৃতকার্য হতে পারল না। দীর্ঘ-নিঃবাস কলে তাকে যেতে হ'ল কলকাতার এ-এ, পড়তে। ছুটিতে প্রানে এসে হ'ল শ্রুতমার বেধা হ'ত, কথাবার্তা হ'ত; কিন্তু সাহিত্য সময়ে আলোচনাটা আগের মত কবত না। তার

পর শৈলেশের পড়া শেষ হ'ল, সুবর্ণাও আই-এ পাস করে এভাবে এসে বাস করতে লাগল। কিন্তু শৈলেশের অর্ধট্টে এভাবে বাস করা ঘটল না। চাকরি পেয়ে সে কলকাতাতেই থেকে গেল। সওদাগরি আপিস, দুটো বেই বললেই হয়। তাই উত্তরের বেণাশোনাও হয়ে গেল বড়। শৈলেশের সংসারেও এক বিববা শিলীমা হাতা আর কেউ ছিল না যে, তাকে আদ্যকার ভর তামিল দেয়। এক ছিল সুবর্ণার ভাগিন—সে তার মনে। সুবর্ণাকে পেতে হলেও চাই অর্থ, চাই কিছু সঙ্গ। প্রেমের নীচ বাঁধতে গেলেও চাই নীচবাঁধার উপকরণ। সুবর্ণার মাথা তো তার ভিড়ী ঘেঁষেই তার হাতে ভারীকে নমর্গণ করবেন না। তাই হ'চার দিনের দুটোতে বৃথা রেল কোম্পানীকে টাকা না দিয়ে শৈলেশ কলকাতাতেই থেকে যেত এবং মনে মনে ভবিষ্যতের রতিন কল্পনার জাল বুঁদত।

ইতিমধ্যে সুবর্ণাদের সংসারে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। পরনের বস্ত্র সুবর্ণার মাথা বাড়ী এসে বিববা স্ত্রী, মাঝালক পুত্র ও অনুচর সুবর্ণাকে রেখে হঠাৎ মারা গেলেন। মরবার সময় তিনি এক কীর্তি করে গেলেন। হরিবোহনের মধুর বক্তাব এবং পতীর বর্ণজানের ভর এভাবে তাঁর বেসব তক্ত দুটো-ছিল জগদীশ ভাষের এক জন। কয়েক মাস জগদীশের পত্নী-বিরোধ হয়েছিল। হরিবোহনের সঙ্গে আলোচনা করে সে শোকে সাহুবালাত করত। তাই তাঁর কাছে সে প্রায়ই আসত। হরিবোহনের বৃত্তান্তব্যার পাশে নেও ছিল। হরি-বোহন হঠাৎ তার হাত দুটি ধরে বললেন, “বাবা, আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। সুবর্ণার বিয়ের ভর কিছু রেখে যেতে পারলাম না। বড় ভাল ঘরে, ওকে আমি তোমার হাতে দিই গেলো। বল গ্রহণ করলে, তা হলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।” সুবর্ণা বাতুলের এই অগ্রভ্যাশিত প্রভাবে সুবর্ণা বিবৃচ হয়ে গেল। মিকেকে লামলে সে কিছু বলবার আগেই জগদীশ তার হাতখানা নিকের হাতে দিই বললে, “সুবর্ণাকে আমি এই গ্রহণ করলাম। ওর ভর আপনার চিত্তা নেই।” বৃত্তাপথবাজীর পাড়ুর বৃথ কণিকের ভর উদ্ভল হয়ে উঠল। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, তার পর যে চোখ বুজলেন, তা আর খুললেন না। শৈলেশ এক সব কথা জানত না। তার পর হয়ে গেল সুবর্ণার সঙ্গে জগদীশের বিবাহ। বিবাহের আগে সুবর্ণা অনেক বার মনে করেছিল জগদীশকে সব কথা জানিয়ে তার কাছ থেকে হুজিপ্রার্থনা করে। কিন্তু রহস্যের হুজুর লজ্জা এসে তাকে বাধা দিলে। সে কিছুই বলতে পারল না। কৈনোয়ের করুণা আর বৌবনে বাতব রূপ পেলে না।

হুই

শিলীমা শৈলেশের ভর পরিপাটি করে রাখছিলেন। শৈলেশ হারানোর পরে তাকে বললে, “শিলীমা আজ

বিভালের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।” শিলীমা বিবিত্ত হয়ে বললেন, “সে কিরে। কত কাল পরে এই কাল রাতে এসেছিস আর আজ বিকেলেই চলে যাবি? হু'বিন থাক। তার পর কাল তোকে ওরা আশীর্বাদ করতে আসবে।” ‘আশীর্বাদ’ আর ‘ওরা’ কথা দুটো তার কানে গেল কিমা সে-ই জানে। অথবা তার মনের অবস্থা এমন নয় যে, সে ও দুটো কথার সর্ব পরিগ্রহ করতে পারে। সে হু' হু' করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একেবারে রাতার এসে পড়ল। কোথার বাবে তার কিছু হিরতা নেই, সে অভয়নকভাবে লামনের পথ দিই হেঁটে চলল। কিছু দূর এসে তার খেঁজাল হ'ল সে জগদীশের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই জগদীশের বাড়ীর সমরদরজা। একটু ইতস্ততঃ করে শৈলেশ সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলে।

জগদীশ অবস্থাপন্ন লোক। গৃহের চারি দিক ইটের প্রাচীর দিই ঘেরা। মধ্যে সুবর্ণা অদমের অনেকটা স্থান জুড়ে বড় বড় সাত-আটটা ঘরের মরায়। তার পর বসবানের দালামঘর। জগদীশ প্রায়ের উচ্চ ইংরেজী বিভাজনের প্রবাস শিক্ষক। কৃষির আর থেকেই তার সংসার বেশ চলে যেতে পাতে, পরের চাকরি করার মরকার হয় না। কিন্তু জগদীশ তার কেতের সু' সু' চারাতুলি বড় করে বড় আদম পার তুলে ছোট ছোট ঘেলেদের মাস্তব করতের ঠিক ভরই আদম পার। শিক্ষকতা তার পেশা নয়, দেশ। শৈলেশ জগদীশের সদর মরকার পা দিতেই একেবারে জগদীশের লামনে পড়ে গেল। জগদীশ তেল মেখে কাঁবে গামছা দিই বেরিয়েছিল স্নান করতে, আর তার সঙ্গে মাঠে আকের কেতে জলধরানো ঠিকমত হচ্ছে কিমা তার তিরির করতে। আজ রবিবার। তুলে বাবার ভাড়া নেই। শৈলেশকে দেবেই সে একরূপ হেসে উজ্জ্বলিত হয়ে বললে, “আরে, শৈলেশ যে? এস, এস, তার পর ভাল ছিলে ত? তুমিই যে তুমি এসেছ। কাল আমি যেভার তোমার ওখানে।” বলে সে শৈলেশের হাত ধরে তাকে দিই চলল বাড়ীর দিকে। মরায়গুলো পার হয়েই বরের বারান্দার উঠে তাকল, “ওগো, কে এসেছে বেধ।”

সুবর্ণা বর থেকে বেরিয়ে এসে শৈলেশকে বেধে বরকে ধাক্কা। সুবর্ণার ভর তার গতে একটা লোহিতভাড়া এসেই মিলিয়ে গেল। সে মিকেকে সংবত করে বললে, কে শৈলেশ-না, ভাল ছিলে ত? শৈলেশের মনের অবস্থা অবর্ণবীর। সে বৃথ তুলে সুবর্ণার দিকে চাইতে পারল না। বাত মেতে সুবর্ণার কথার জবাব দিলে। জগদীশ বললে, তেল বেধে ফেলিহি। তা না হলে হু'বত তোমার সঙ্গে গর করেই বেভার। আজ আবার আকের কেতে জল ধরানো হচ্ছে। আমি না কাছে থাকলে ভাল করে চারায় জল বেধে না। তুমি ভরকণ গর কর, আমি বৃথ ভাড়াভাড়া আসবার তেটী করব।”

সুখমা শৈলেশকে অপদীপের পত্নীর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, বসলে, তা বাবে এখন? শৈলেশের মুকুট হুত্ব করিতে হুত্ব করেছে। সে বেশ তার বাকুশক্তি হারিয়ে কেলোছে। সুখমা এখন থেকে চলে গেলেই বেশ সে হাঁক ছেড়ে বাঁচে। কোন রকমে শুক কঠে বসলে, তা দিতে পার। সুখমা বর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুখমা তার দিকে শিহন কিরতেই শৈলেশ তার উপর দৃষ্টি ফেলল। এ সে তুল কলোকে পড়া চকল মেরে সুখমা বর,—এ অপদীপের গৃহিণী, বীর হির সুখমা। শৈলেশের মুকুট চিরে একটা জীর্ণনিঃখাল বেলল। একটু পরেই সুখমা চা নিয়ে এল। শৈলেশ তখন অনেকটা লামলে উঠেছে, সুখমার দিকে মুখ তুলে চাইতেও পারল। বাঃ, সুখমার গানের রঙ ত বেশ উজ্জ্বল হয়েছে, দেহতে ষ্টিক আগের মতই আছে, তেমনি কচি, তেমনি মিষ্টি। সুখমা কি কয়ে হেসে বসলে, কি দেব?

শৈলেশের মুখও ধুলে গেল, বসলে, তোমার গৌন্দী।

সুখমা বসলে, ভেবেছিলাম তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু হাত নি দেবছি—

শৈলেশ মুখ আঁধার করে বসলে, কখনও বেশ না ছাতি। কিন্তু তুমি যে কখনও আমার কবিতা লেখা নিয়ে ঠাট্টা করবে, তা করনাও করি নি—শেখের কথার মধ্যে একটা ব্যাধার মূর বড় হ'ল।

সুখমা কিন্তু আলো লক্ষিত বা ব্যথিত হ'ল না। তেমনি হাসিমুখে বসলে, করনা আর বাতবে অনেক তকাং আছে শৈলেশনা। অপদীপ কাব্য নয়।

শৈলেশ বিরস মুখে বসলে, সে তুমি বখন বিরে করছ তমলায় তখনই বুঝেছি—

সুখমার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু লগে লগে মনের চাকলা বমন করে সে বসলে, মেরেদের বিরে করা হাতা আর উপার কি? বিরে করাতে আর কি দোষ হয়েছে?

শৈলেশ কিছুকণ দীর্ঘ থেকে বসলে, তোমার মনে আছে কি না জানি—কিন্তু আমার বেশ মনে আছে : তুমি বলেছিলে একজনকে ভালবেসে যে আর একজনকে বিরে করে সে অসম্ভব।

সুখমার তর্ক করতে দেখা শৈলেশের কাছেই। সে অস্বস্তি ভাবেই বসলে, কিন্তু অপরিণত বরলে কি বলেছি, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। তা হাতা ভালবাসা লম্বা আদি জানতার কি। কতকগুলো বাজে গর উপভাস পড়ে, আর তোমার লগে কাব্য আলোচনা করে প্রেম লম্বা সে বরলে আমার যে ব্যাধা হয়েছে, তা আদি ষ্টিক বলে মনে করি না—

শৈলেশ বেহমার মিস্ত্রীক হয়ে গেল। পরমুহুর্বেই বেহমার হান অধিকার করলে কোথ, একটা শিকল আকোশও

বলা যেতে পারে। সে বিজ্ঞপতরা কঠে বসলে, তা হলে আমারে তুমি কখনও ভালবাস নি। ভালবেসে, এ বিগত-মৌন, বোজবরে, টাকমাথা, টাকাতালা অপদীপকে—

সুখমা সংযত কঠে বসলে, “দেখ, আমার মাঝী লম্বা তুমি একটু লম্বা করে কথা বলা। কেন তাঁকে ভালবাসব না, কিলের অভাব তাঁর? তিনি মিস্ত্রীক তর, সম্পত্তিশালী—আর রূপ-মৌনের কথা বলছ? দেহ ও মনের যে রূপ থাকলে মাহুয় মাহুকে ভালবাসতে, প্রভা করতে পারে সে রূপ তাঁর কাছে।”— বলে একটু থেমে আবার সে বলে চলল, “আর মৌন? মাহুয়ের মৌনের বিচার সব সময় বরল দিয়েই হয় না। মৌনের যে শক্তি থাকলে জীবনকে উপভোগ করা যায়, কর্তে উৎসাহ আছে সে শক্তি তাঁর বধেই আছে। আর, আমার বরলও ত দেহাং কম হয় নি—”

অতিআধুনিক তরঙ্গ সাহিত্যিক এবার অক্লান্ত বিনয়ের মিস্ত্রীক হয়ে গেল। কয়েক মাস বিবাহিত জীবন বাপন করে সুখমার মত মেরের যে এমন পরিবর্তন হতে পারে, তার চিন্তাবারা যে এমনি ভিরমুখী হতে পারে, তা সে ব্যাধাও করতে পারে নি। সত্যিই বাস্তব আর করমার অনেক তকাং।

এই সময় যোল-সতের বছরের একটা তরুণী একটা ডিলে করে কয়েক বিলি পান নিয়ে লারা বেহে রাখ্যের লক্ষ্য জড়িয়ে এসে বর হুত্বল, সুখমা বসলে, শৈলেশকে পানগুলো দে—মেরেই কলিত হতে শৈলেশের দিকে পানের ডিসটা এগিয়ে দিলে। শৈলেশ হুট্টো পান তুলে নিয়ে মেরেইর মুখের দিকে চেয়ে বসলে, ‘মাহুখী না? হুঁস, মত বত হয়ে গেছে যে?’ মাহুখী অপদীপের বোন। সে মুখে লক্ষ্যের আবিহ মেখে বর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সুখমা হেঁকে বলে দিলে, “উজ্জ্বলে ডালে চাণিয়ে এসেছি। তবে গেলে আমিই বিন্—” তার পর শৈলেশের দিকে চেয়ে কোন তুমিকা না করেই বসলে, “মাহুখীকে বিরে করবে?” শৈলেশ উত্তেজিত হয়ে বসলে, “দেখ সুখমা, একজন বা বসলে সব লম্বা করলাম। কিন্তু আমারে এমনবারা অপমান করবার কারণ কি, তা আমার বলবে—”

সুখমা ভালমাহুয়ের মত বসলে, “বা রে। এটাতে আমার অপমানের কি আছে? মাহুখী বেশ মেখে, আমার থেকে চেয়ে বেশী সুন্দরী। তোমার লগে মাঝাবে ভাল।”

শৈলেশ বোঁ হয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না। সুখমা একটু এগিয়ে এসে শৈলেশের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে অহময়ের বর বসলে, “সত্যি বলছি, তাকে তোমার বিরে করতে হবে। আমার এ অহুরোষ তোমাকে রাখতেই হবে।” সুখমার কঠে যে ব্যাধুলতা হুট্টে উঠল তাতে শৈলেশের অন্তর আঁধার চকল হুকে-উঠল। সে সুখমার চোখে নিজের

দুটি হাপন করে বললে, “লভি বলছ তুমি, আমার সঙ্গে পরিচালন করছ না? তুমি বলছ, আমি বাধুদীকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে?”

সুখনা স্বপ্নের উৎকর্ষা বহন করবার চেষ্টা করে বললে, “হ্যাঁ, লভিই আমি সুখী হব।”

শৈলেশ আর একবার সুখনার দিকে তাকাল। তার পর বীরসিংহ কঠে বললে, “বেশ এতে যদি তুমি লভিই সুখী হও তা হলে বাধুদীকে আমি বিয়ে করব। তোমাকে কথা বিলাস।” এক দুর্ভাগ্য নীরবতার পর আবার বললে, “কেনন, সুখী হলে তুমি?”

সুখনা ভক্তকণে দিকে দিক সামলে নিরেছে। সুখনা অভিমন্যুর মত সুখে একরূপ হাসি তেঁবে সে উত্তর করলে, “না রে। সুখী হব না। বরষা আইবুড়ো বোন নিয়ে ঘাবীর যে কি দুর্ভাবনা তার তুমি কি বুঝবে। তোমার মত সংপাশ বিয়ে করতে রাণী হয়েছে আমলে তাঁর আমলের সীমা থাকবে না। অনেক দিন পরে রাতে তাঁর সুমিলা হবে।” শৈলেশের মনে এই একই আগের যে ঈশ্বর রঙের আভা বেধা বিয়েছিল তা মিশেয়ে মিলিয়ে গেল। “ও সেই লজ্জা—” বলে সে উঠে দাঁড়াল, সুখনাকে আর কিছু না বলেই বর থেকে বেরিয়ে গেল। সুখনা অশ্লোক দুটিতে তার গমনপথ স্থির

দিকে চেয়ে রইল। একই পথেই জগদীশ কিরল, বললে, “কি গো, শৈলেশ চলে গেছে? হ’ল বিয়ের লম্বা কোন্ কথা?”

সুখনা হেসে বললে, “এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রাণী হয়েছে। আমাকে বটক-বিদ্যার কি বেবে বল?”

“এই যে দিই—” বলে জগদীশ সুখনার দিকে এসিয়ে যেতেই সুখনা ঘোঁড়ে বর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে শৈলেশ বাকী গিয়ে পিসীমাকে বললে, “পিসীমা, আজ আর আমার বাওরা হ’ল না। তুমি আমার বিয়ের লজ্জা ব্যস্ত হয়েছিলে, ও পাড়ার জগদীশের বোনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পার—”

পিসীমা আমন পদগম হয়ে বললেন, “কথাবার্তা আর চালাতে হবে না, ও ঠিক হয়েছে আছে। কাল যে ওরা আশীর্বাদ করতে আগছে।”

শৈলেশ আশা করেছিল, বাগবন্দে সে একবার সুখনার সাক্ষাৎ পাবে। কিন্তু সারাহিন বেটে সুখনার মাকি শরীর ভাল নেই। কতাসজ্ঞানদের পর সে সেই যে দিকের শোবার ঘরে চুকেছে, আর বার হয় নি।

তাজমহল

জীলরতন দাশ

প্রেমবিহীন বিরহ-পাগল ওগো সন্ধ্যা-কবি,
মর্ষ নিষ্ঠাভি রক্তে রঙিলে কার মর্ষর-হবি?
তোমার মানসী বর্ণ-সীতা কি মহীরসী বিরূপনা—
পাথরে পাথরে স্পারিত হলো দুর্ভিত্তি তিলোত্তমা?
হেমি প্রেমসীর করুণ আঁখির একটু বিন্দু বারি
ক্লম করিতে কালের দুয়ার রঙিলে সন্ধ্যা-ভারি।
মমতাক লাসি’ মমতার গভা পাবাণের দ্বারা পূরী,
ইন্দ্রবজ্র বর্ণে বর্ণে চলে নেবা লুকোচুরি।
প্রেমের পূবানী কেলিল নীরবে বিরহের আঁখিল,
অশ্রু-নদীর গলিলে স্তম্ভল পদ বেত-পতল।
পাতাল হুঁচিয়া উঠিল হেবার অগরা উর্ধ্বশি,
অশ্লোক গোঁধে ভারে চেয়ে বেধে এহ-ভাষা-রবি-শশি।

এ যে কটকের বিরহ-কাব্য রচিত প্রিয়ার সুখে—
বিটায় বিরহী-চিত্তের সুখা সুখাময় সুখে সুখে।
বহুসার ফুলে মর্ষরে গাথা এ বেল শোকের সীতা,
চিরবিরহের লাগরবেলার অলিছে প্রেমের চিতা।
সতী-পথ শিরে করিয়া বাগন তরু গিরির মত
শিলায় বেল হয়েছেন শিব হেথা ভগতা-রত।

ওগো মহারাণ, তুমি মাই আজ, আছে তব ইতিহাস;
পাবাণে পাবাণে কলিতেছে তব বুকের বীর্ষবাস।
বিরহ-কাতর তোমার হিরার ‘অশ্রু কলন’—
মৌন পাবাণ কায়াগার-বারে লভিরাহে বহন।
তাই তব প্রেম-বিরহ যে থাকে নিখিলের যুক যুক,—
বিধ যে হার আকো শোকমর তোমার বিরহ সুখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্রী প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ

বঙ্কিমের বৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রকৃত্তি নিবেদন করিতে দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ‘সাহিত্যে কর্তব্যবোধ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপন্যাস ও মহাকাব্য-সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, ভঙ্গুপন্যাস প্রবেশণা এবং লঘু ছাত্ত ও ব্যঙ্গরচনা—সর্বত্রই বঙ্কিম তাঁহার অসামান্য প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অননুগ্রহের ভাষায়—‘বিপন্ন বলভাষা আর্জবের বেগানেই তাঁহাকে আত্মায় করিয়াছে, সেইখানেই তিনি এসস চতুর্ভূজ বৃত্তিতে বর্ণন করিয়াছেন।’ বঙ্কিমের এই বহুবলী প্রতিভার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; ইহার বঙ্গ-পরিণত পরিবর্তন মন্যে উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ লব্ধে সংক্ষেপে হু’ একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

উপন্যাস রচনার বঙ্কিমের উদ্দেশ্য কি? ‘উত্তর চরিত্রে’র আলোচনা-এসদে বঙ্কিম কাব্যের উদ্দেশ্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার মন্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, ‘কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য বহুস্তরের চিত্তোৎকর্ষ-লাভ—চিত্তভিজ্ঞান। কবিতা...সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ লব্ধের দ্বারা লগ্নতের চিত্তভিজ্ঞান বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ হু’ কাব্যের দুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি সৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি দুখ্য উদ্দেশ্য।’ উপন্যাস রচনার বঙ্কিম এই উত্তর উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কিন্তু বাহা সৌণ উদ্দেশ্য তাহাই কেমন করিয়া বীরে বীরে দুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকেইল, বঙ্কিমের উপন্যাসের আলোচনা-এসদে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উদ্দেশ্য ও ভাবধারার ক্রমবিকাশের দিক দিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসকে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। ‘হর্ষণ-মলিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘হুগলিনী’ প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস। এই সময় বঙ্কিমের প্রথম ও প্রথম লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্য্যহুটি। আরম্ভের সংঘর্ষ, হুগলিনীর পতিভক্তি, কপালকুণ্ডলার সারল্য, মনোরমার সললতা, সংঘর্ষ ও বিতা। সপত্নী-কন্যার প্রতি বিরলার দাত্তবোধ এবং বিকৃত্ত আরম্ভের মন্যে তাঁহার ঐকান্তিক পতিভক্তি, লগ্ন সংঘের পুঙ্খবোচিত বীর্য ও ভদ্রাধ্য, লবলুমারের পরোপকার-প্রবৃত্তি, পকাত্তের কতলু বী ও পতপতির পোচনীর্ জীবনাবদান পরোকে চিত্তভিজ্ঞান সহায়ক হুিতে পারে, কিন্তু এ সকল হলে উপন্যাসের সৌণ উদ্দেশ্য একেবারেই অস্ত্রালে রহিয়াছে এবং আধ্যাতিকার দাব্যে বঙ্কিম কোন বিশিষ্ট-বাহী প্রচার করেন নাই।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে আধ্যাতিকার পরিবেশন-স্ত্রণে কোন

বিশিষ্ট বাহী নহে—মানব-জীবনের প্রতি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি-ভঙ্গীই পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কি? বঙ্কিম অদৃষ্টবাদী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ লগ্নতের অস্ত্রালে থাকিয়া এক অদৃষ্ট মহাশক্তি মানব-জীবনের উপর হুজের প্রভাব বিস্তার করে। এই লভ্য প্রথম হুিতেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথম পর্যায়ের তিনবাহা উপন্যাসেই (‘হর্ষণমলিনী’ ও ‘হুগলিনী’তে অদৃষ্ট গণনার ভিত্তর দিয়া এবং ‘কপালকুণ্ডলা’র হুজতর এবং শ্রেষ্ঠতর উপারে) তিনি এই অদৃষ্ট মহাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই মহতত্ত্বের বিরূপ শক্তি মানবের জ্ঞান শক্তিকে উপহাস করিয়া, কখন কখনও ইহার পতিবোধ-প্রদানী অসহায় অজ মানবকে অলক্ষ্যে হুজার বেগে নিজ নিজ নির্ধারিত ভাগ্যপথে চালিত করিতেছে, কোথাও এতটুকু মল-চল হুইবার উপার নাই। বঙ্কিম ইহার কার্যপদ্ধতির মন্যে কোনরূপ সূখলার স্রজ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; মানবের অদৃষ্টের নিরতা মহাহুজ্জ্বলীন, বিচারহীন অল শক্তি।

কিন্তু বঙ্কিম এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিরন্তিকে বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই লদে বিশ্বাস নীতির দ্বাঙ্ক উপলব্ধি করিয়াছেন। কতলু বী এবং পতপতির জীবনের পরিণতিতে ইহার আভাস থাকিলেও ‘বিশ্বক’ হুিতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই সময় হুিতেই বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে নুতন দ্বারার হুচনা এবং এই উপন্যাসে বাহা নীতির নিয়ম, কবে ভগবত্ভক্তি বিকাশের লদে তাহাই ঐশী বিধানে রূপান্তরিত হুইয়াছে।

‘বিশ্বক’ পানাপানি নিয়তি ও নীতির বিধান লক্ষ্য করা যায়। কপালকুণ্ডলা মনোরমার দ্বার হুজ ও ভাগ্যহতা; পকাত্তের মল্ল, বেবেল ও হীরা নিজ নিজ জীবনে বয়োগিত বিশ্বকের কলভোগ করিয়াছে। এই উপন্যাসে অসংঘর্ষের হুঃখের পরিণতির ভিত্তর দিয়া বঙ্কিম এই লভ্য প্রচার করিয়া-ছেন যে, চিত্তভিজ্ঞান ব্যতীত দুখ নাই এবং ইহার লভ্য প্রাথমিক প্ররোজন সংঘমলিকা। ইহাই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসের বিশিষ্ট বাহী।

‘ইন্দ্রিয়া’, ‘দ্বাধাধী’ ও ‘হুগলাহুদীর’ রচনাকাল হিসাবে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হুইলেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের স্থান বতর। হালুকা গনের দাব্যে ‘বদধর্ষণ’ের পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন এ হলে বঙ্কিমের প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু ‘চল্লশেখরে’ নীতিবেদা বঙ্কিমের কত্বের হুশষ্ট এবং এই উপন্যাসে

শৈবসিনী'র অতি কঠোর প্রতিক্রিয়ার পরিকল্পনার পক্ষেই
রহিয়াছে অসংখ্য-অসংখ্য বক্তৃতির কঠিন অংশসম। এ-
ক্ষেত্রে সানানন্দ বাবী বক্তৃতির নীতিপ্রচারের সুপাণ্ডবত্ব।

‘চন্দ্রশেখর’র গৌণ উদ্বেগ সাধারণভাবে নীতিশিক্ষা দান
নহে, এই উপন্যাসে সর্বপ্রথম হিন্দুধর্মের প্রতি বক্তৃতির
অহুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই ‘চন্দ্রশেখর’র
বিশিষ্ট স্বর এবং পরবর্তী উপন্যাস ‘রজনী’তেও এই বৈশিষ্ট্য
লক্ষ্য করা যায়। ‘চন্দ্রশেখর’ চন্দ্রশেখরের প্রতি সানানন্দ
বাবীর উপদেশ (চন্দ্রশেখর ৩১) এবং ‘রজনী’তে সন্ন্যাসী-
ঠাকুর ও শতীশের প্ররোক্ত (রজনী ৩৬) ‘বর্ষভর’র শুদ্ধ-
শুদ্ধ-সংসার বরণ করা ইহা বের।

বক্তির মিছেই বলিয়াছেন, এবং জীবনে তিনি সত্যিক
ছিলেন। এই সময় তিনি পাশ্চাত্য দ্বিধাবাদী বা সংশয়-
বাদী দার্শনিকগণের চিন্তাবাদ। দ্বিধা বিশেষভাবে প্রকাশিত
হইয়াছেন। কিন্তু ‘প্রথম জীবন’ অনির্দিষ্টকাল এবং বক্তৃতির
কোন উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে ‘না’ত্যাগবী’ নহে। তাহা
হইলেও ‘চন্দ্রশেখর’র পূর্বে তাঁহার অপর কোন উপন্যাসে
হিন্দুধর্মের প্রতি অহুত্বের সিম্পর্ক নাই।

সত্যিক বক্তৃতির মনে কবে, কেমন করিয়া ঈশ্বর-বিবাস
এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অহুত্ব জন্মিল তাহার পূর্ণ ইতিহাস
আজ হস্তে জানিবার উপায় নাই। এ সময়ে বক্তৃতা পূর্ণ-
চন্দ্র ও জ্যোতিষ শতীশচন্দ্র বাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত
অসম্পূর্ণ। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :

‘[বক্তা] যখন হুগলীতে বসলী হইয়া আসিলেন, তখন
কর বঙ্গের শিউরেবের দিকট ঝাঙ্কিয়া বর্ষ সময়ে শিকা পাইতে
লাসিলেন। কিছুকাল হুঁত্বার ঝাঙ্কিতে হইয়াছিল, তথাপি
স্বিধায়ে, স্বিধায়ে কাঁটালপাতার আসিলেন। এইরূপে
বক্তিরচন্দ্রের হিন্দুধর্ম শিকা হইল।...তাঁহার একমাত্র উপবেষ্টা
ছিলেন আমাদের শিউরেব।...’

বক্তিরচন্দ্রের হুঁত্বা ঝাঙ্কাকালেই শিউরেবের হুত্বা বটে
[১৮৮১ খ্রি:]। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার ভিতরে
একটা শুদ্ধতার পরিবর্তন হয়। ইহার পর বাহা লিখিতেন,
তাঁহাই হিন্দুধর্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন, ইহার পর যে
উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই উদ্বেগ ঝাঙ্কিত।*

শতীশচন্দ্রের লিখিত বিবরণ এইরূপ : ‘১২৮২ সালের চৈত্র
মাসে—ইংরেজী ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে—বক্তিরচন্দ্র
হুগলীতে বসলী হইলেন।...এই সময় হইতে তাঁহার জ্বরে
বর্ষভাব লক্ষিত হয়...। ১২৮০ সালের শেষভাগে বক্তিরচন্দ্রের

জ্বরে বর্ষভাব লক্ষিত হয়...বর্ষভাবের হুত্বা পূর্ণ হইতেই
কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে লক্ষ্য জ্বরে
জানিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার কোষ্ঠী কড়া আসন্নবস
তখন তিনি সাধারণতঃ যখনই দিবা ঠাকুরের লক্ষ্যে
পদ্যাসনে বসিয়া লক্ষ্যময় ঠাকুরকে কত তাকিয়াছেন।
লোক-চন্দ্র লক্ষ্যে এই তাঁহার প্রথম তাক। তার পর
হুই-ভিন বঙ্গের বাইতে না বাইতে বক্তিরচন্দ্রকে আবার
কাতর হইয়া সাধারণতঃ চন্দ্রে পড়িতে দেখিলাম।
তখন তাঁহার কোষ্ঠী বৌদ্ধিক কঠিন রোগাক্রান্ত—বরণপণ।
বক্তিরচন্দ্র কীভাবে কীভাবে নিশিচেষ্টে বুঝাইয়া পড়িলেন।
মিহিতাবহার সবুর্কীয়লভ্য বর্ণিবন সাধারণতঃ যখন
দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্দোষ আনিয়া শিউর সাধারণ
হিলেন। শিউ অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। তখনবি
বক্তিরচন্দ্রের জ্বরে বর্ষভাব লক্ষিত হইল।’^১

পূর্ণচন্দ্র ও শতীশচন্দ্র উভয়ের মতে হুগলী বসলী হইবার পর
হইতে বক্তির হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন।
কিন্তু ‘চন্দ্রশেখর’ এবং ‘রজনী’ উভয় উপন্যাসই তৎপূর্বে
‘বদ্বর্ষনে’ প্রকাশিত হইয়াছে। শতীশচন্দ্র যে হুইট ঘটনার
উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাহার লব তালিখ বেন নাই, কিন্তু
তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার হিলাবত
প্রথমোক্ত ঘটনা ১২৮০ সালের হুই-ভিন বঙ্গের পূর্বের কথা
এবং শেষোক্ত ঘটনা ঐ সালের শেষের দিকে ঘটনা থাকিবে।
কিন্তু ইহা কি প্রকারে লভ্য হইতে পারে? বক্তৃতির কোষ্ঠী
কড়া তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর মর্জ্যাত লভ্য এবং তিনি দ্বিতীয়
বার বিবাহ করেন ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে,† অর্থাৎ ১২৬৭
সালের ভৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে। স্ত্রত্যং ১২৮০ সালের পূর্বে
প্রথমোক্ত ঘটনা লভ্য হইলেও, দ্বিতীয়োক্ত ঘটনা হয় ত
ইহার পরের কথা। স্ত্রত্যং শতীশচন্দ্রের হিলাবে কোণাও
কিছু পরিল হইয়া থাকিবে। বাহা হটক, এই উভয় ঘটনার
পূর্বেই ‘চন্দ্রশেখর’ সম্পূর্ণ এবং ‘রজনী’ অন্ততঃ আংশিক
প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কারণ ‘চন্দ্রশেখর’ ‘বদ্বর্ষনে’
সম্পূর্ণ হইয়াছে বক্তৃতির দ্বিতীয় বার বিবাহের কিকিঞ্চিক
চৌক বঙ্গের পরে ১২৮১ সালের তার লংঘ্যার এবং পরবর্তী
লংঘ্য হইতেই ‘রজনী’ প্রকাশিত হইতে থাকে। হিন্দুধর্মের
প্রতি বক্তৃতির অহুত্বের প্রাথমিক সিম্পর্ক হিলাবেও এই
উভয় উপন্যাসের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বক্তৃতির বর্ষভাব
এই সময় পর্যন্ত দ্বিধা বা দ্বিধা উঠে নাই একথা লভ্য, কিন্তু
তিনি লংঘর কাটা ইহা কঠিন বক্তৃতির পদ্যাপন করিয়াছেন।

বাহা ঈশ্বরভিষেক জীবনব্যাপন করেন, এই সময় হইতে
তাঁহাদের শক্তি লভ্যেও বক্তির লভ্য হইয়াছেন। প্রথম

* শতীশচন্দ্র লক্ষ্যময় বরণের ‘বক্তিরচন্দ্র’ এবং স্ত্রত্য : বক্তির
, ১৭১ পৃ.।

† ‘বক্তিরচন্দ্রের বর্ষ শিকা—বক্তিরচন্দ্র, ১৩৬ পৃ.

* বক্তির-জীবনী, ১৩৬-৭ পৃ.।

† ১১৩ পৃ.।

পর্যায়ের উপভ্রমে এবং ‘বিষয়কে’ কল্পনাম্বীনের চিত্রে বাহ্যিক বিবর্তিত হতে ক্রীতমক হান। শেখোক্ত উপভ্রমে মঙ্গলনাথ বরোপিত বিষয়কের কলতোপ করিয়াছেন নত, কিন্তু তিনিও (নিরতি না হইলেও) প্রবৃত্তির নমুণে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। ‘চন্দ্রশেখরে’ এই প্রকার বৃত্তিকীর সহিত নূতন বৃত্তিকীর বিশেষ লক্ষণীয়। এই উপভ্রমে তাগ্যহতা বলবীর পার্শ্বে খেপিতে পাই রামানন্দ বাবীকে, যিনি সাধনা দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনানুসারে শৈবলিনী ও কঠোরের উপর সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘রজনী’তে সন্ন্যাসীভাঁকুর রামানন্দ বাবীর তার অভিমানব মনোব, কিন্তু তিনিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বক্সিসের ভাববাহার ক্রমাবিভ্যক্তির নিদর্শন হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।

পরবর্তী উপভ্রাস ‘কুকফাতের উইলে’ও ‘বিষয়কে’র তার অনন্যবের কুকল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপভ্রাসে বক্সিস প্রবৃত্তির হৃৎসরীরতার উপর একধাবি ছোর বেন নাই; পোবিন্দলাল কতকটা বেজার প্রবৃত্তির বিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মঙ্গলনাথও পোবিন্দলালের চরিত্রাত্মকে এই মৌলিক পার্থক্য পরোক্ষে এবং মঞ্চবর্তকভাবে হইলেও, বাহ্যিকের শক্তিতে বক্সিসের ক্রমবর্ধমান প্রত্যয়ের অভ্যন্তর নিদর্শন এবং ‘পরিশিষ্টে’ সন্ন্যাসী পোবিন্দলালের চিত্র শুধু নীতিবেদ্য বক্সিসের মনো, বিশেষ করিয়া ভগবদ্ভক্ত বক্সিসের পরিচয় দেয়। ‘রজনী’তে নরকভাসী অমরনাথের চিত্রে বাহ্যিক কীপ আভাস, ‘কুকফাতের উইলে’ সন্ন্যাসী পোবিন্দলালের চিত্রে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মরণ সাধিতে হইবে যে, প্রথম সংকরণে উপভ্রাসের পরিসমাপ্তি পোবিন্দলালের হৃত্যুতে এবং ১৮৯২ সালের চতুর্থ সংকরণে, অর্থাৎ ‘আনন্দমঠ’ ‘বেদী চৌহুরাণী’ ও ‘নীতারাণে’র পরবর্তীকালে তাঁহার এই নূতন পরিণতি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই তিনটি উপভ্রাসের ভাববাহার সাহুকের ইহাই মূল কারণ।

‘রাবসিংহ’ দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ উপভ্রাস। এই উপভ্রাসে রাবসিংহ ও ঈশ্বরকর্তব্যের অর-পরাক্রমের মনো বক্সিস ঐশ্বরিক শক্তি করিয়াছেন এবং তিনি ইহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (রাবসিংহ—উপসংহার)। এই প্রকার বৃত্তিকীর পূর্ণভালাভ করিয়াছে ‘বেদী চৌহুরাণী’ উপভ্রাসে ‘সিপাহী হত হইতে বেদী চৌহুরাণীর উদ্যো’র পরিকল্পনার। যিনি তত তাঁহার ‘নকল বৃত্তিভঙ্গিই সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি’, হুতরাং তিনি বক, তিনি ঈশ্বরাত্মবৃত্তি, হুতরাং ঈশ্বরের অহং লাভ করিয়া তিনি ‘শৈবগণিক নিরবের সাহায্যেই অভিনয় বিপর হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে’ সক্ষম হইলেন—এই নত্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই বক্সিস এই চিত্রটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। ‘নমসে শেখোবর, ঈশ্বরের অহং; অবশিষ্ট ভক্তের শিকের দক্ষতা।’ (বর্ণনায় ১১ ব্রহ্ম)। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য বাহ্যিক

হটক, কালবৈশাখীর বত প্রাকৃতিক নিরবেই বটরা থাকে এবং বেদী চৌহুরাণী বেতাবে ইহাকে শিকের প্রত্যোক্ষণে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও সভ্যবের লীলা অভিজ্ঞান করে নাই। কিন্তু ‘কপালকুণ্ডলা’র বক্সিস প্রকৃতিকে নিরোজিত করিয়াছেন নির্বাক প্রসঙ্গকার্যে। এ কেরে সেই প্রকৃতিকেই তিনি ভক্তের উদ্যোকার্যে নিহৃত করিয়াছেন। ইহাও গুঢ়াৎপূর্ণ। ‘নীতারাণে’ উপভ্রাসেও আধ্যাত্মিকার পরিবেশন ভবে মনে হয় যেম চন্দ্রম নটকালে নীতারাণের প্রাণনার লাভা দ্বিরাই ‘নিরুপারের উপার’ তাঁহার এবং তাঁহার শ্রীপুত্র কতার নন্দারকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (নীতারাণ ৩২১-২৩ ব্রহ্ম)।

ঐশ্বরিক শক্তি এবং ঐশ্বরিক বিধানকে প্রাণাত হিতে সিদ্ধা বক্সিস কোম কোম উপভ্রাসে নিরতিকে সম্পূর্ণ বাহ্যিক দ্বিরাছেন, কোম কোম কেরে (বলনী ও মবারকের কীবনে) তিনি নিরতিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে রাখিয়াছেন এবং একটি কেরে (চন্দ্রম-কুহারীর কীবনে) নিরতির প্রত্যাব একেবারেই উপেক্ষণীয়। কিন্তু কোম সন্মরেই বক্সিস নিরতিকে অবীকার করেন নাই। (চন্দ্রমকুহারীর কেরেও অদৃষ্ট গণনা অন্ততঃ ব্যর্থ হয় নাই) এবং তাঁহার শেষ উপভ্রাস ‘নীতারাণে’ ঐশ্বরিক অদৃষ্ট গণনার ভিতর দ্বিরা তিনি নিরতিকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণাত দ্বিরাছেন।

প্রথম পর্যায়ের উপভ্রাসে এবং পরবর্তীকালেও যে নকল উপভ্রাসে নিরতির পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহার কোম কোম কেরে মনো-শক্তির বিরাট অপচয় পাঠককে বিষমবিবৃত্ত করে। মনো-শক্তি ও কপালকুণ্ডলার ব্যর্থ কীবনের সার্বভতা কি? তাঁহাদের এবং মনোনাথ, কুল ও বলবীর কীবনের পোচনীয় পরিণতির পশ্চাতে বিষমভাঁকুর কোন্ সে নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে? পাঠকের মনের এই সন্ধান এবং অল্পরূপ প্রেরণ মনো বিচারবুদ্ধিপ্রবৃত্ত কোম লভ্য নাই। যে নকল মনে নিরতির পরিকল্পনা নাই, ‘সে নকল মনেও যে কোথাও কোথাও কল্পন ট্র্যাঙ্কেতির চিত্র পাওরা যায় না তাহা মনে। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যাপ ও প্রময়ের হৃত্যর উল্লেখ করা বাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি অমূল্য কীবনের পরিণতি বতই হুঃখের হটক, ইহাদের আত্মগোপন নিদর্শক মনে, ব্যর্থতার মনোও ইহাদের কীবনে পরম সার্বভতা রহিয়াছে। নিরতি ও ঐশ্বরিক বিধানের পরিকল্পনার এই মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়।

নামবের অদৃষ্টের মনো শৃঙ্খলার মন আবিষ্কার করিতে সিদ্ধা বক্সিস কখন কখনও নিরতির অনভিজ্ঞানবীরতার সহিত ঐশ্বরিক বিধানের সামন্তত হাপন করিতে চাহিয়াছেন। ‘রাবসিংহ’ মবারকের হৃত্য শুধু নিরতির বিধান মনে; মবারক মনো মনো প্রেমাপনার উপর যে অভ্যাস করিল, বলিত, লাহিত ভালালা তাঁহার প্রতিশোধ মিল। প্রকৃতিক নিরবে

ইহাই অজলমীর প্রতিশোধবিধি (nemesis), ইহাই ঐশ্বি বিধান। 'নীতানামে' তোরাব বীর আক্রমণ হইতে বরণ-রক্ষা ব্যাপারে বহিন পুরুষকার, নিরতিঃ এবং ইব্বরের মল-বিধানের স্বরূপ সম্বরণসাধন করিরাহেন এবং একই উপভানে নদারামের বহু নববে বলা বাইতে পারে যে, এমনিভাবে তদু ঐর অদৃষ্ট-গণনাই সকল হয় নাই, বহিন বেধাইতেছেন যে, নীতানাম করা করিলেও বিধাতার ভার বিচারে নদারাম অব্যাহতি পায় নাই, পরন্তু জাত্বেরে অব হইরা জরতীর সাহায্যে রাজকাব্যে ঐ বে অহুতি হতক্ষেপ করিলেন,† জাতীর হৃত্যর নিমিত্তরূপিত হইরা তাঁহাকে তাহার শাস্তি পাইতে হইল। কিন্তু বহিনের বর্ণাহুতি বাহাই বহুত, বাস্তব জগতের নীতানাম জীবনে মানবের অদৃষ্টের হুজের রহত কোন নীতানাম নৈতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত এই কারণেই তিনি কখনও পুথক পুথক ভাবে নিরতি বা ঐশ্বি বিধানকে প্রাণত দিরাহেন, কখনও উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা করিরাহেন, কখনও দার্শনিকের উভাসন হইতে প্রচার করিরাহেন, 'রূপ হুঃব মানসিক অবস্থা বাহা—রূপ হুঃবের কোন বাহিক অতিথ নাই।' (বর্নতত্ত্ব ২। 'চক্রপেথের' স্তানাম বানীর হুঃব অহরণ উক্তি ভমিতে পাই। চক্রপেথের ৩১)।

'আদমবর্ষ' হইতে বহিনের উপভানে নৃতন সুর লক্ষ্য করা যায়। ইহাই তৃতীয় পর্যায়ের উপভানের বিশিষ্ট সুর। 'আদমবর্ষ', 'দেবী চৌহুদারী' ও 'নীতানাম' তৃতীয় সুরের 'জরী'। জীবনব্যাপী সাধনার কলে বহিন হিন্দুধর্মের গুঢ় তত্ত্ব যেমন বুঝিরাহেন, 'বর্নতত্ত্ব' তিনি বাহা বিশবরূপে বিরেকণ করিরাহেন—'জরী'তে তাহারই মর্মকথা তিনি বহাযোগ্য কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণার ভিত্তর দিরা সাধারণ পাঠকের সমুখে উপস্থিত করিরাহেন। বহিন বলিরাহেন, 'তপবলীভার বাহা উপদেশ, বিহুপুথ্যে তাহা উপভাসহলে 'শ্রীকৃত'।' (বর্নতত্ত্ব ১৬)। তাঁহারই ভাষায় বলা বাইতে পারে যে, 'বর্ন-

তত্ত্ব' বাহা উপদেশ, 'আদমবর্ষ', 'দেবী চৌহুদারী' ও 'নীতানাম' তাহাই 'উপভাসহলে 'শ্রীকৃত'। এই 'জরী'তে বহিন প্রদানতঃ বর্ণোপদেশ। সুতরাং তাঁহার বর্ণব্যাপ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে হই-একটি কথা এ হলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম জীবনে বহিন বে সকল পাকাত্য দার্শনিকের মতবাদে দ্বারা প্রভাবিত হইরাহেন, তাঁহাদের মধ্যে অগত কোমৎ (Augusto Comte) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে তপবলভ্য বহিন এই পাকাত্য মনীষীর মতবাদের সহিত বহালভব সামঞ্জস্য স্থাপিতঃ দীতার বাই অবলম্বনে বর্ণের এমন এক সংজ্ঞা নির্দেশ করিরাহেন বাহা সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক-তার বহু উর্ধে। এই বর্ন মানববর্ষ বা বহুতত্ব। শাস্ত্রীয়িকী, জামার্কনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জনী—এই চতুর্কি বৃত্তির 'উপহৃত' সৃষ্টি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য ইহার পূর্ব বিধান। ইহা অহুণীলমসাপেক এবং অহুণীলমতত্বের মূল কথা এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা তাহাভেরব এইরূপ অহুণীলম করিতে হইবে বাহাতে কোন বৃত্তি অপর কোন বৃত্তিকে সূত্র করিরা অহুতি ও অসঙ্গত বৃত্তি না পাইতে পারে। কিন্তু বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ কি? বহিন বলেন, বহন সকল বৃত্তিই ইব্বরসুখী হইবে, অর্থাৎ বহন কলাকাজী রহিত হইরা ইব্বরাতিপ্রোত বলিরা বাহুব তাহার অহুতের কর্ত্ত সম্পাদন করিবে, তখনই বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য সাধিত হইল সুবিতে হইবে। ইহাই দীতাত্ত মিকান বর্ণের গুঢ়ত্ব, ইহাই তত্ত্ব।† 'জরী'তে বহিন হিন্দুধর্মের শাস্ত্র সত্য এই ভিত্তিতত্ত্ব প্রচার করিরাহেন।

'আদমবর্ষ'ের বহন-পরিণত 'উপক্রমবিকা' বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ এবং এই উপক্রমবিকার বাই সমুখে স্থাপিতঃ আদ-বিশপেক স্তানাম-সম্ভাবার কার্য ও আচরণের বিচার করিতে

* বর্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন পাকাত্য মনীষীর মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে বহিন কোমতের মতবাদের উল্লেখ করিরাহেন। (বর্নতত্ত্ব, প্রোডপার ব) কোমৎ বলেন,

'Religion in itself expresses the State of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical are made to converge towards one common purpose.'

বহিন বর্ণে। এই ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত সত্য গ্রহণ করিরাহেন। কিন্তু মিশ্রবর্ণবাহী কোমৎ ইব্বরের দ্বানে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিরা তাঁহার Gultus of Humanity প্রচার করিরাহেন। পাকাত্যে, দীতার বাইপুত বহিন ইব্বরবিহীন কর্ত্ত সীকার-করিতে পারেন নাই, তাঁহান্ন হুতে বৃত্তিসমূহকে ইব্বরসুখী করিরা বিধান কর্ত্তের অহুতানই বর্ণের বিশিষ্ট লক্ষণ। (বিতারিত আলোচনার জড় হীয়েজনাথ বহু মহাপ্রের 'দার্শনিক বহিনচক্র' ১১, ৩৬-৪০ পৃ. জেইয়া)

† 'বহন সামুদ্রের সকল বৃত্তিসমূহই ইব্বরসুখী বা ইব্বরসুখী হয়, সেই অবস্থাই 'ভক্তি'।' এবং 'ভক্তিশাসিত্যবাহী সকল বৃত্তির 'পাকাত্য'।' (বর্নতত্ত্ব ৩১)।

*। নদার বানী ঐর ভাষা গণনা করিরা বলিরাহেন, 'তোরাব অদৃষ্ট এক পরম পুথ্য আছে।...সমর উপস্থিত হইলে বানী সন্দর্শনে গমন করিত' (নীতানাম ১১৩)। ইহার বৎসরবাসেক পরে তাঁহারই নির্দেশে জরতী ও ঐ জৈবনী বেপে তৎপ্রবৃত্ত বহুপুত (?) জিন্দ হুতে নীতানামের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। (নীতানাম ২৮)। চক্রপুথ্য বানী তৎকর্ত্ত্ব ঐর অদৃষ্ট গণনার সহিত সঙ্গিত স্থাপিতঃ বহাযোগ্য নির্দেশ দিরা আকিবেল এবং পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা মিলনে যে করা বাইতে পারে-যে, ইহাই ঐর 'পরম পুথ্য'র সমর এবং জরতীর আত্মকুলো এই সমর পরোকে তিনি নীতানামের বে সাহায্য করিলেন তাহাই তাঁহার 'পরম পুথ্য'।

† নদারামের জড় মার্কনা তিকা ঘাপারে ঐর বে পরোকে হাত রহিরাহে, তাঁহার কর্ত্তানাম সম্বন্ধে নীতানামের জোর উত্তরে তিনি ঐ কথা অবীকার-করিতে পারেন নাই। (নীতানাম ৬৭)।

হইবে। সত্যানন্দ ঠাকুর (সত্যানন্দসম্প্রদায়ের ইনিই সত্যজিৎ ঠাকুর) সর্বভাষী হইয়া দেশবাস্তবতার সেবার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রীতি বহির্বিশ্বের দেশপ্রীতির পরিচয় দেয়, কিন্তু অত্যন্ত প্রীতিবৃত্তির সহিত সাধারণত রাবিতা তিনি তাঁহার দেশপ্রীতিকে ইবরদুখী করিতে শিকানাত করেন নাই। বহির্বিশ্বের দৃষ্টিতে শিকা ও সাধনার এই অসম্পূর্ণতার জটাই অয়ের দুহুর্থে তাঁহার নিকট বিসর্জনের আহ্বান আসিল। কারণ সাধনার সিদ্ধিলাভের জন্য ‘কীবনসর্গ’ পণই যথেষ্ট নহে, ইহার জন্য চাই তত্ত্ব।

তত্ত্বতত্ত্বের দিক দিয়া ‘আনন্দমঠে’র বেধানে পরিসরাতি, ‘দেবী চৌধুরাণী’র সেখানে আদিত। ‘আনন্দমঠে’ বহিঃ তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর দ্বারা দিয়াছেন, ‘দেবী চৌধুরাণী’তে ‘প্রকৃতির চরিত্রে তিনি তত্ত্বের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিয়াছেন, প্রকৃতির নিকট কণ্ঠ-সাধনার অর্থাৎ তত্ত্বের প্রতীক। দেবী রাজকেই কণ্ঠ করিতে হইবে, কারণ,

সহি কলিৎ কণ্ঠসপি জাহ্নু তিষ্ঠত্যকর্ণকৃতং।

কার্যতে হবশঃ কণ্ঠ সর্গ প্রকৃতিভেদতৈঃ।

ভগবদগীতা ৩।৫

অর্থাৎ, ‘কেহই কণ্ঠ নিকর্ণা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কণ্ঠ না করিলে প্রকৃতিভেদ ভগবদগীতার দ্বারা কণ্ঠ প্রবৃত্ত হইতে হইবে।’ অথচ বিশ্বের ব্যান বিন্যাসের হেতু :

ব্যারতো বিশ্বান্য পুংসঃ সনতেহুপকারতে।

সন্যং সজ্জায়তে কামঃ কাম্যং ক্রোধোহভিচারতে।

ক্রোধাদ্ ভবতি সন্দোহঃ সন্দোহাৎ স্তম্ভবিশ্রমঃ।

স্তম্ভজ্ঞানাহুদ্ভিনাশো হুদ্ভিনাশাৎ প্রপততি।

ভগবদগীতা ২।৬২, ৬৩।

সীতারামের চরিত্রে ইহাই বহির্বিশ্বের প্রতিপাত।

তাহা হইলে কণ্ঠবচন হইতে হুজিলাভের উপায় কি ?
অর্থাৎ কণ্ঠবোধন্য লোকোহং কণ্ঠবচনঃ।

ভগবদগীতা ৩।৯

অর্থাৎ—বজ্রাণ, অর্থাৎ ‘ইবরদুখী বা ইবরোদিত’ যে কণ্ঠ তত্ত্বের অন্য কণ্ঠ বচনবাক্য, সুতরাং অহর্ন্তের নহে। ‘যে কণ্ঠ ইবরোদিত, অর্থাৎ ইবরোদিতপ্রভ, তাহাই অহর্ন্তের। তাহাতে আসক্তিযুক্ত এবং কলাকাজ্ঞাসূচ্য হইয়া তাহার অহর্ন্তা করিতে হইবে।’ (বর্নভব ১৪)। ইহাই কণ্ঠবচন হইতে হুজিলাভের উপায়। ইহাই কণ্ঠসম্মান, ইহাই তত্ত্ব এবং ‘দেবী চৌধুরাণী’তে ইহাই প্রকৃতির কীবন-বাণী।

প্রকৃতির কীবন কণ্ঠের তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিল এবং তাঁহার অসামান্য মনের সোনার কাটির স্পর্শে ব্রহ্মবৈশ্বের সংসারের জটতা হুচিল। পক্ষান্তরে, কণ্ঠভ্যাগের অভিমানের কলে ত্রির নিকট সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গেল এবং ত্রি প্রত্যাবর্তন করিলে এক দিকে সীতারামের আসক্তি, অপর দিকে ত্রির অসামান্য বিকার—উত্তর মিলিয়া সীতারামের কীবনের ব্রহ্ম ব্যর্থ করিয়া দিল। নিকট সাধনার ব্যাঘ্যা হিলাবে ‘সীতারাম’ ‘দেবী চৌধুরাণী’র পরিপূরক : ‘দেবী চৌধুরাণী’তে নিকট সাধনার প্রণালী ও পরিণতি এবং ‘সীতারাম’ এই সাধনার পথে যে সকল অন্তরার রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু তত্ত্বতত্ত্বের বিশ্লেষণ বহু বহু ক্রিয় হউক, আটের বিচারে ইহা উপন্যাসের গৌণ উদ্দেশ্য। ‘জ্ঞানী’তে প্রকৃতিপক্ষে এই গৌণ উদ্দেশ্যই বুঝ্য হইয়া গাঢ়াইয়াছে। ইহা স্রেষ্ঠ শির-স্থিতির অহুত্ব নহে। তাহা হইলেও বোটের উপর বলা বাইতে পারে যে, সীতারামের সাধনার পথে নিকট আদর্শের করিবার উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বের চরিত্র-সৃষ্টি ও প্রতিবেশ-পরিকল্পনা সত্তা শিরী-প্রতিভার পরিচয় দেয়।

উজ্জীবন

অরুণবরণ চক্রবর্তী

বিবীর্ণ হৃদয় নিরে আনো আমি আশার উদ্ব।
প্রবল বজ্রের দ্বাবে অধিকার কীপবাণি হাতে
এখনো চলেছি পথ। কতবার অন্ধকার হাতে
হারিয়েছি দিক। তবু বেবেছি সাহসে ভর বুক।

সহস্র-সমতা-ধেরা কীবনের সাহি কোম বাব।
কোনকালে হই হাতে পথ-কেটে-কেটে অগ্রসর।
তবুও পথের হবে দেখ। সাক সাক কণ্ঠবচন—
জুজি-ব্রহ্ম মানবের সন্ধিমে সে করের সংসার।

“এ কীবন মহাসত্য—তার সার নাই—নাই কণ।”

আমি তো চলেছি গেয়ে কীবনের এই অরণ্য।

শোভিত লাহিত বুক কবচের হুণ-বলী প্রাণ

নতুন আলোর মেয়ে পুনরুজ্জীবিত হাতে হয় :

দিকে দিকে পথে পথে লাগরে বন্ধরে লগৌয়ে।

নতুন-হৃদের স্রব্দ-বাক্যে তবু আপন বিতবে।

সখারাম গণেশ দেউকর

১৮৬৯-১৯১৭

জীবনচরিত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক, নির্ভীক সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক 'দেশের কথা'র রচয়িতা সখারাম গণেশ দেউকরকে আজ আমরা তুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু একদা বাংলা-সাহিত্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। তাঁহার রচিত ইতিহাস, জীবনচরিত্র ইত্যাদি এক দিকে যেমন বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার অগ্নিগর্ভ রচনাকলা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মর্ম্মমূলেও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল।

বাংলা দেশের অধিবাসী জিবেরী, ডকুল, পাড়ে প্রভৃতি উপাধিধারী কর্ণোজিরা ব্রাহ্মণ এবং সিংহ-উপাধিধারী বাক-পুতদের দ্বারা সখারামও ছিলেন জাতিতে অবাঙালী। কিন্তু বাংলা দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির সহিত একাত্ম হইয়া যান। বক্তব্য: এই দ্বিবিভাজ্যধারী মরাঠী ব্রাহ্মণ বে-ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সাধনার জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দ্বারা প্রচার উত্তরক করে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম : বিদ্যাশিক্ষা

সখারাম গণেশ দেউকর মহারাষ্ট্রের এক বিদ্যাহারাগী ব্রাহ্মণ-পরিবারের কৃতী সন্তান। ইহাদের আদি নিবাস—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বড়সিগি জেলার চক্রপতি শিবাজীর আলবান নামক ভূগর্ভের নিকটবর্তী দেউস গ্রাম। সখারামের পিতামহ সদাশিব, ভালকের নিকট হইতে বিবাহের বৌতুকস্বরূপ বৈদ্যনাথের নিকটস্থ করো গ্রাম প্রাপ্ত হন। "করো গ্রামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। গিথোড়ের তৃতপূর্ব মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেন। তিনি গণেশ সদাশিবকে আশ্রয় দেন। ১৯২৬ সালের পৌষ মাসে শুক্লা-চতুর্দশী তিথিতে (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯) তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সখারাম গণেশ দেউকর নামে বাকলা দেশে বিখ্যাত ও দেশবাসীর প্রজ্ঞা-প্রীতির পাত্র হইরাছিলেন।"

সখারাম গণেশ দেউকর—এই নামের মধ্যেই তাঁহার নিজের নাম, পিতৃনাম ও বংশ-পরিচয় নিহিত। তাঁহার নাম সখারাম, পিতার নাম গণেশ এবং বংশের নাম দেউকর। সখারামের জীবন যথেষ্ট-স্বাক্ষর্যে অভিযোজিত হয় নাই। সারা জীবনই প্রতিভুল অদৃষ্টের সন্মেলন করিয়া তাঁহাকে কতবিকৃত হইতে হইরাছিল। এই

দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয় তাঁহার শৈশবেই—সখারামের বরদ বখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার মাতা লোকাভয়িতা হন। সাধী পত্নীর মৃত্যুর পর সখারামের পিতা আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সখারামই ছিলেন—একপত্নীত্বত পুত্রবৎসল পিতার নয়নের মণিধরুপ।

পত্নীবিয়োগের পর সখারামের পিতা নিজের এক তপিনীর উপর এই মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের ভার অর্পণ করেন। সখারামের এই পিতৃহীন বয়স ছিলেন বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাভ্রাসিগী, তেমনই গৃহকর্মে হুনিপুণ। "তাঁহার মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার ছিল। তাঁহারই বয়ে, উপদেশে, পরিচয়ে সখারামের চরিত্র গঠিত হইরাছিল।" এই পুণ্যবতী মহিলার আদর্শ ও শিকারান সখারামের উত্তর-জীবনে পরিপূর্ণভাবে কলগ্রন্থ হইরাছিল। ইনি শিশু সখারামের দ্বারা মরাঠী-সাহিত্যের প্রতি যে অল্পবয়সে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে উক্ত সাহিত্যের রত্নরাশি আহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের সম্পদ-বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

সখারাম শৈশবাবধিই বাঙালী শিশুদের মত বাংলা শিথিতে আরম্ভ করেন। সখারামের পিতা যে কালীতে অল্প কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে কথা আগেই বলিয়াছি। পুত্রকেও বালাকালেই ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদের সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন।

কিছু কাল বেদ অধ্যয়নের পর সখারামকে দেওঘর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। মাইকেলের চরিত্রকার বোঙ্গীন্দ্রনাথ বসু তখন এই স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁহার শিক্ষার শুণে সখারাম বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অল্পবয়সেই উৎসাহিত হইয়া উঠেন। বাংলা ভাষার চর্চায় সবে সবে তিনি মরাঠী ভাষা এবং সাহিত্যও সম্বন্ধে আরম্ভ করিতে শুরু করেন। বোঙ্গীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রটির মনে শুধু যে সাহিত্যের প্রতি অল্পবয়সেই উৎসাহিত হইল তাহা নহে, বালা-বয়সেই বাংলা রচনার তাঁহার হাতে-খড়ি হইল। ইতিহাসচর্চায় তাঁহার অসাধারণ অল্পবয়সে ছিল। সখারাম নানা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ লিখিয়া হাতে পাকাইতে লাগিলেন। এই তরুণ লেখকের রচনাকলা তখনকার প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিক-

পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে তৎকালীন সমাজপতি-সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ লেখা বাহির হওয়া কয় কথা ছিল না। ‘সাহিত্য’ রচনা প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন লেখকেরা বাংলা-সাহিত্যের আসরে জাতে উঠিতেন, একথা বলিলে কিছু মাত্র অভিশ্রোত হইত না। সমাজপতির সমালোচনার কটীপাথরে বাচাই হইয়া সখারামের রচনা যে খাটি সোনা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায়, অল্পদিনের মধ্যে রচনার বিরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশাঙ্ক-বোধের বীজও দেওঘরে এই সুযোগ্য শিক্ষকের প্রবন্ধে ছাত্র-জীবনেই সখারামের হৃদয়ে উদ্ভূত হয়।

কর্মজীবন

পারিবারিক অভাব-অনটনের দরুন সখারামকে অল্প বয়সেই জীবিকার সংস্থানের জন্য মনোযোগী হইতে হইল, তাহার কর্মজীবন আরম্ভ হইল সামান্য শিক্ষাত্রীকরণে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যালয়ে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে সখারাম মাসিক ১৫ বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েও তিনি অবসরকালে রচনাচর্চা করিতেন, ‘হিতবাদী’তে নিরমিত ভাবে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত; একবার সখারাম তাঁহার একটি রচনার বৈদ্যনাথের তদানীন্তন মহকুমা হাকিমের অনার্য আচরণ সন্দেহে অপ্রিয় সভ্য উদ্ঘাটিত করেন। ‘হিতবাদী’র উক্ত প্রবন্ধের লেখক যে সখারাম, বিশেষ কোন সূত্রে তাহা অবগত হইয়া হাকিম-পুত্র তাঁহার উপর ভয়ানক রুষ্ট হইলেন। ঐ হাকিম ছিলেন দেওঘর বিদ্যালয়ের স্কুল-কমিটির সভাপতি। সখারামকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাঁহার প্রতিকূলতার সখারাম কর্মচ্যুত হইলেনই, এমন কি দেওঘরে বাস করাও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি ১৮২৭ সনে সপরিবারে দেওঘর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেওঘর পরিত্যাগ কিন্তু সখারামের পক্ষে শাপে বর হইল। দেওঘরের ক্ষুদ্র সর্দার গভী হইতে কলিকাতার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আসিয়া তিনি নিজের প্রতিভা বিকাশের অঙ্গুল কেন্দ্র পাইলেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন ‘হিতবাদী’র সম্পাদক; তিনিই এই সময়ে বিপন্ন সখারামের সহায়ক হইলেন। সখারাম মাসিক ৩০ বেতনে ‘হিতবাদী’র প্রক-সংশোধকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কর্মদক্ষতাগুণে অচিরেই তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল, তিনি ক্রমশঃ কাব্যবিশারদের দক্ষিণহস্ত-বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৮৩৭ সনে পুড়িত কালীপ্রসন্ন বখন স্বাভ্যাবেধে আপাত বাজা করেন, সেই সময়ে

সখারামের লবল হতেই তিনি ‘হিতবাদী’র পরিচালন-ভার ত্ত করিয়া যান। স্বদেশ-প্রত্যাগমনকালে পমিষ্যে কাব্যবিশারদের মৃত্যু হইলে (৪ জুলাই ১৮৩৭), ‘হিতবাদী’র কর্তৃপক্ষ সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন; তাঁহার বেতন হয় মাসিক ২০ টাকা।

ইহার চার পাঁচ মাস পরেই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশন কিরূপে লোকমুগ্ধ তিলকের অঙ্গুগামীদের দ্বারা দক্ষবজ্ঞে পরিণত হয়, সে কাহিনী সুবিবিত। বেদিন এই কাণ্ড হয়, সেই দিনই সুরাট হইতে হিতবাদীর স্বাধিকারিগণ তিলকের বিরুদ্ধে হিতবাদীতে লিখিবার জন্য সখারামকে তার করেন। তার পাইয়া তেজস্বী মরাঠা ব্রাহ্মণ সখারামের আত্মবধ্যানাবোধ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিলকের নিকট তিনি স্বাদেশিকতার অগ্নিময়ী নীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিলক ছিলেন তাঁহার গুরু। সেই দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গুরুকে হের প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ!—এ কথা চিন্তা করিতেই তাঁহার সমস্ত অন্তর কর্তৃপক্ষের এই অভ্যর্থন অঙ্গুরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রীতিমত তাহারা চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, বরং তিকা করিয়া ধাইতে হয় তাহাও স্বীকার, তবু এ কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না। তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা, পরিবার-পরিজনদের অন্নসংস্থানের কথা—সকলই তুলিয়া গেলেন; সখারাম এক কথায় ‘হিতবাদী’র চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার সখারাম স্ব-মতের প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা সাংবাদিক জগতে বিরল। বাস্তবিকই “মতের স্বাভাব্যে তাঁহার অঙ্গপট অঙ্গবাক ছিল। জীবিকার জন্য তিনি পরমতের অঙ্গবর্তন ও আত্মমতের বলিদানে সম্মত হন নাই।”

ইতিহাসে সখারামের পতীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সারা জীবন প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ইতিহাসের চর্চায় রত ছিলেন। ‘হিতবাদী’র সহিত সখ্য বিচ্ছিন্ন হইবার অল্প দিন পরেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ভাষাশাসন স্কুল—জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

দেশ-সেবা

মহারাজের সম্মান হইয়া সখারাম বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে আপন জন বলিয়া মনে করিতেন। বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত ছিল তাঁহার নাড়ীর যোগ; বাঙালীদের তিনি যখন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার

অজ্ঞান ছিল গভীর। এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় তিনি স্বাধাভাষ্যে আন্দোলন—বাতালীক সর্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। সখারাম 'মুগাভর'ও মাঝে মাঝে লিখিতেন। এই দলের সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্গদেশে ১৯০২ সনে সর্বপ্রথম শিবাজী-মহোৎসবের স্থচনা হয়।

জীবন-সার্যাছে

দুঃখ-নাহিত্য ছিল সখারামের নিত্য সহচর। একে ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার শরীরও ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে আবার গুত্র ও পত্নী—উভয়েই তাঁহার মায় কাটাঁইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশী দিন তাহাদের বিয়োগ-ব্যথা সখারামকে সহ্য করিতে হইল না,—১৯১২ সনের ২০এ নবেম্বর (৮ অগ্রহায়ণ ১৩১২, কাঠিক-চুলাচতুর্দশী) দেওম্বরের কয়ে এামের বাড়ীতে তিনি অকালে দেহরক্ষা করিলেন।

স্বদেশচক্র সমাজপতি ছিলেন সখারামের একজন গুণ-গ্রাহী। সখারামের মৃত্যুর পর তাঁহার গুণকীর্তন করিতে গিয়া স্বদেশচক্র যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে এই দরিদ্র সাহিত্যসেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বেশ একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই কথাগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি—

“পতিত সখারাম গণেশ বেটিকর আর ইহুগণ্ডে নাই। ইনি দেশভাষ্যকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশায়বোধের প্রতিষ্ঠাকরে তিনি বাণীর সেবার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবার আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদ-পত্রের সেবার জন্ম হইয়াছিলেন। সখারাম বাবু কর্মী ছিলেন—ইনি কর্ম করিতেন, কিন্তু কর্মকলের আকান্দা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রের হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাতালীকে আপনায় করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাতালী সাহিত্যের পুঁজীবনকরে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাতালী সাহিত্য কতিপয় হইয়াছে। আমরা সেই কতিপয়ে সর্বাঙ্গত হইয়াছি।...”

সাহিত্যসেবীর চিরতম অভিলাষ সাহিত্য বেটিকরের চির-জীবনের লক্ষ্য ছিল। মৃত্যুপন্থায় সেই সাহিত্যের বাতালী ও রোসের বরণ্য তোগ করিয়া গত ১৫ অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাত্তে তিনি গরায় বসন ছির করিয়া পৃথিবীর স্ব-হঃপের অতীত হইয়াছেন। তদন্য কর্মক্রান্ত, পথপ্রান্ত পথিকের কর্মবস্তু ছির করিয়া ককণায় পরিচর বিদ্যাহেব। পরলোকে তিনি তাঁহাকে পান্নি দান করুন।” (“বহুবলী” হইতে ১৩১৯ সালের মাস-সংখ্যা ‘সাহিত্যে’ উদ্ধৃত)

রচনাবলী

সখারাম তাঁহার কর্মক্রান্ত জীবনের স্বল্প অবসরইহু বাংলা-সাহিত্যের সেবার নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি সরল ও বিস্তৃত বাংলা লিখিতেন। তাঁহার রচনার মারকতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অধোগতির ইতিহাস—‘দেশের কথা’ সমধিক প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকখানি এদেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের ও শোষণের কুকল সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিলে তেজস্বী সখারাম গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, মামলা জনানির পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সখারামের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; বঙ্গনী-মধ্যে উদ্ধৃত সাল-তারিখযুক্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। এটা কোন্ যুগ?। ১৮ ভাদ্র ১২২২ (২-২-১৮২২)। পৃ. ২৪+১ শুদ্ধিপত্র।

“হুগকাল সম্বন্ধে পাঠীর বিচার।” “এটা কোন্ যুগ?” (প্রথম প্রত্যাব)। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধের এই প্রথম প্রত্যাবট পত্র বঙ্গদেশের কাঠিক মাসের ‘সাহিত্য ও বিজ্ঞান’ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে পূর্বপ্রকাশিত প্রত্যাবট সংশোধিত এবং হানে হানে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া তদ্ব্যবধি পত্রিকার প্রকাশিত হয়। সংপ্রতি তাহা পুনঃ সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গেল।...বৈভবাব যেওবর ১২১৯ সাল প্রাবণ।”

২। মহামতি রান্নাডে। ? (২০ জাহুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৩৬।

“এই প্রত্যাবের অবিকার্য পূর্বে প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।”

৩। কাশীর রাজকুমার। ১৩০৮ সাল (২৭ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৬০।

“এই কাহিনীর সংগ্রহে আমার প্রবন্ধ ঐতিহাসিক স্মরণ্য নাতার-রাজের পারদীপবীণ ঐহুত বক্তার বসন্ত পারদীপ মহোবয়ের রচিত ‘মহারাষ্ট্র লক্ষীবাঁইয়ের জীবনচরিত’ নামক উৎকৃষ্ট কাহিনী এই হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি।”

৪। বাজী রাও। ১৩০৮ সাল (২৪ জাহুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ১৬২।

“যাও বাহাদুর কাশীনাথ দারায়ণ নামে বি, এ, (তেজ্যাম কলেজ), ঐহুত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজকুমার ও হুগবর ঐহুত বক্তার বসন্ত পারদীপ মহোবয়ের নিকট আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রয়োজন। ইঁহাবিদের অক্লান্ত চেষ্টায়

মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত হ্রস্ব প্রাচীন কাগজপত্র সংগ্রহীত না হইলে এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে হ:সাধ্য হইত।”

৫। আলন্দী বাজি । ? (২৫ মার্চ ১৯০৩) । পৃ. ২১.÷৮০ ।

“ঐরতী কানী বাই মহারাত্রীর ভাবার আলন্দী বাইর যে অতি প্রকাণ্ড—রয়াল আর্ট পেজী ৪২৫ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন, একেজে তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। উহার সারসংগ্রহ করিয়া ছুতপূর্ন ‘নবী’ পত্রিকার [১৩০৭, মাঘ-চৈত্র, ১৩০৮, চৈত্র-আষাঢ়] আমি ইতঃপূর্বে কয়েকটি প্রকাশ লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে বঙ্গভাষায় পরিবর্তন ও সংশোধনানন্তর তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।”

৬। শিবাজীর মহত্ব। আষাঢ় ১৩১০ (জুলাই ১৯০৩) । পৃ. ২০ ।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরণিত। ইহা প্রথমে “কলিকাতা ১৩০৯ সালের শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে রচিত” হয়।

৭। দেশের কথা :

১ম ভাগ। ১৩১১ সাল (১৬ জুন ১৯০৪) । পৃ. ৩৪২ ।

পরিশিষ্ট ভাগ। (২৩ অক্টোবর ১৯০৭) পৃ. ৩৭ ।

“জাতীয় মহাসমিতির আরম্ভ কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশে ‘দেশের কথা’ প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগ্‌বী সি, আই, ই, ঐরতী দাদা ভাই নোরোজী ও ঐরতী রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, ভারতের হারিজন্য ও শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্তমান পুস্তকের রচনার তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। তাহাদের রচিত গ্রন্থের—মিঃ ডিগ্‌বী *The Prosperous British India*, ঐরতী নোরোজীর *Poverty and un-British rule in British India* এবং দত্ত মহাশয়ের *The Economic History of British India* প্রত্যেক ভারত-সভার অবতারণা। অমেরকেই এই সকল গ্রন্থের নাম প্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অবকাশের অভাবেও অমেরকে এই অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন না। বাহারা ইংরেজী ভাষার অনভিজ্ঞ, তাহাবিগের অসুবিধা আরও অধিক। এই সকল শ্রেণীর পাঠকেরা বাহাতে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির সারসংগ্রহ অবগত হইতে পারেন তৎকালে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সর্বজন-বোধগম্য ভাষায় রচিত হইল। বিবিধ সরকারি রিপোর্ট ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও বহু জাতীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে পরিচিষ্ট করিয়াছি।”—সুস্মিতা।

৮। কৃষকের সর্বস্বাধি। ইং ১৯০৪ (২৮ জুলাই) । পৃ. ২৭-১৪৪ ।

“দেশের কথা হইতে পুনর্দ্রুত।”

৯। শিবাজীর স্বীকা। তার ১৩১১ (৭-৯-১৯০৪) । পৃ. ৪০ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত “শিবাজী উৎসব” কবিতা সহ। শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজী-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরণিত।

১০। শিবাজী। বৈশাখ ১৩১৩ (১-৬-১৯০৬) । পৃ. ২৪ ।

শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে—বিনামূল্যে বিতরণিত।

১১। ভিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। আধিন ১৩১৫ (৪-১০-১৯০৮) পৃ. ২১০+৪০ ।

১২। বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ? আধিন ১৩১৭ (১০-১০-১৯১০) । পৃ. ১২৪ ।

‘ধ্বংসোন্মুখ জাতি’র প্রতিবাদ। “কলিকাতা জাতীয় বিভাগ-সমিতির ইতিহাসাধ্যাপক ঐসখারাম গণেশ বেউকর-এবিত।”

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা :—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় সখারামের এমন অনেক প্রবন্ধ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি :

১২৯৮, আধিন-পৌষ ‘বেদব্যাস’ ককাবতার কোন্‌ মূলে ?

১২৯৯, বৈশাখ ‘সাহিত্য’ মহারাত্রীর ভাবার

প্রাচীন ও প্রেরণ

ভাঙ্গ-আধিন ‘প্রতিভা’ বরজব বব(সমালোচনা),

অগ্র, চৈত্র ‘সাহিত্য’ শাস্ত্রের অন্তর অস্থবান

কান্তন এই পেশওরে বালাজী

১৩০০, আষাঢ়, তার ‘সাহিত্য’ বিবনাথ

ভাঙ্গ ‘ভারতী’ বাকীরাও ও বতানী

পৌষ ‘সাহিত্য’ হরপতি মহাত্মা শিবাজ

মাঘ ‘ভারতী’ সুধিষ্টির আবির্ভাব-

কান্তন এই কাল

১৩০১, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আধিন ‘সাহিত্য’ প্রাচীন মহারাত্রী

চৈত্র ‘সাহিত্য’ শকরাচার্য,

মাঘ ‘বঙ্গী’ মহারাত্রী সাহিত্য

কান্তন এই পূজার আলোচনা

১৩০২, বৈশাখ ‘সাহিত্য’ মহাপ্রোক্ত সমাজের বঙ্গ

জ্যৈষ্ঠ ‘ভারতী’ শিবাজীর বার্ষিক্যাপ,

আধিন ‘সাহিত্য’ মহারাত্রী সাহিত্য

অগ্রহায়ণ ‘ভারতী’ দায়ারন দ্বাওএর ববর

১৩০৩, আষাঢ় ‘ভারতী’ আক্‌বল বীর অভিমান

‘ভারতী’ বৈদিক আলোচনা

‘ভারতী’ দ্বাপান (শাস্ত্রীয়

বিভাগ)

১৩০৪, বৈশাখ	'ভারতী'	বাহুকেবর (১৭৮১ বুটাবে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বিলাতযাত্রা)	১৩১৮, কৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	পৃথিবীদ্বন্দ্ব-মালো
			আবার	এ	ভারতে নক-শোণিত
পৌষ	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ	মাস	এ	মহারাষ্ট্রে নক-শোণিত

রচনার নিদর্শন

১৩০৫, বৈশাখ, কৈষ্ঠ, ভাদ্র, চৈত্র	'সাহিত্য' 'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্র সাহিত্য সমগ্র রামদাস বাবী
১৩০৬, বৈশাখ, কৈষ্ঠ	'সাহিত্য' ভাদ্র আশ্বিন চৈত্র	মহারাষ্ট্র সাহিত্য কিফিয়া আওরঙ্গজেবের বর্ণনাব বদীর নকশাপত্তি রহত
১৩০৭, কৈষ্ঠ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	মহারাষ্ট্রের জাতির অনুভব
আষাঢ়	'সাহিত্য-সংহিতা'	ভাষ্করাচার্য
শ্রাবণ	এ	রাজবংশের আচার ব্যবহার
কার্তিক	'সাহিত্য'	ঐতিহাসিক কাগজপত্র
মাস	'ভারতী'	ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক
১৩০৮, কৈষ্ঠ	'প্রদীপ'	গ্রীকজাতির বাবীমতা- লাভ
ভাদ্র, পৌষ	'সাহিত্য-সংহিতা'	আর্য সাহিত্য
১৩০৯, কৈষ্ঠ	'বদ্বর্ণন'	ভারতে আকাশী
শ্রাবণ-অগ্র	'প্রদীপ'	স্থাপন
১৩১২, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	শিবাজী প্রসঙ্গ
১৩১৩, ভাদ্র	'সাহিত্য'	বোমবেবের পরিচয়
১৩১৫, কাড়ন	'সাহিত্য'	রাণা কুসুমাত
		বটীওকর
চৈত্র	'বদ্বর্ণন'	প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
১৩১৬, শ্রাবণ	'সাহিত্য'	মালবে মহারাষ্ট্র
		অধিকার
কাড়ন	'বদ্বর্ণন'	ওকরাণে মহারাষ্ট্র অধিকার
১৩১৭, বৈশাখ-আষাঢ়	'বদ্বর্ণন'	ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ

প্রাকলভা, সহজবোধ্যতা, প্রসঙ্গগুণ ইত্যাদি যে সকল
গুণে রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া
গণ্য হয়, সখারামের রচনাবলীতে তাহা বিশেষ ভাবে
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রেত গ্রন্থ 'দেশের কথা'
হইতে উদ্ধৃত রচনাংশসমূহে ইহার প্রমাণ মিলিবে—

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটশ শাসনের
—ইংরাজের প্রভু পাশ্চাত্য-শিকার প্রবানভব সুকল। এরূপ
অহুষ্ঠান এদেশে পূর্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা যে-দেশের
সামগ্রী, সেই দেশের রীতির অহুষ্ঠানে ইহাকে পরিচালিত
করিতে না পারিলে, সুকলভাতের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত
হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রকার রাজনীতিক আন্দোলনে যে
আত্ম সুকল-লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, ভ্রমতা প্রজা-
সমাজের নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অভ্যন্তর সহিত
যোগদান করে। আমাদের দেশে অজ্ঞতার ভ্রম অনেকেই
এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্যন্ত রাখেন না, সমাজের
সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ
করেন না। কার্যেই কমতাগিরি বধেচ্ছাচার রাজপুরুষেরা
আন্দোলনকারীদিগের দুষ্টিবেরতা বা সংখ্যার অল্পতা অহুত্ব
করিয়া প্রতীকারে ঔষাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে
জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না, আমা-
দিগের অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল
শ্রেণীর লোকের সহায়তই প্রকাশ পায়, এতদুপলক্ষে যদি
সমগ্র সমাজ আবুল আলোচিত হয়, রাজপুরুষেরা যদি দুষ্টিতে
পারেন যে, মহাসমিতির প্রার্থনাসমূহ সমগ্র দেশবাসীর অহু-
মোচিত, সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তর
পর্যন্ত বর্ণবেদনার বিকোচিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে
তাঁহার কংগ্রেসের প্রার্থনার কর্পাত করিতে অবতাই প্রার্থন
প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অধিশিষ্ট
ও অশিক্ষিত কমসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্জনশীল
হঃপ্রচারিত্রের কথা, আমাদের শোচনীয় অবোপত্তির কথা
তাহাদিগের হৃদয়দল করাইয়া দিয়া, কংগ্রেসের প্রতি সকলের
অহুযোগ-বর্জনপূর্বক এই জ্ঞাতহুষ্ঠানের পত্তি বৃদ্ধি করা প্রত্যেক
দেশহিতৈষীর অবতকর্তব্য। দেশের প্রত্যেক সুসভ্যদের এই
কর্তব্যভার হবে এখন করা উচিত। ১৮৩০ সালের পার্লামে-
ন্টের প্রদীপ দিবানে ও ১৮৫৮ সালের মহারাষ্ট্রের বোমবাগজে
আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে সুশাসনের আশা

পাইয়াছি, তাহা দেশের অনেকেরই সম্যক অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অবসতির বরপ্রাপ্তে ভাগিনা বাইতেছি। বৃষ্টিপাত ভারতের সকল প্রাণ, অতি নির-
শ্রমের প্রাণ। পর্য্যন্ত, বাহাতে আমাদের রাজস্ব প্রকৃত অধি-
কারের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, সে অধিকারের
পূর্ণকলসাতের জন্য বাহাতে সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠে,
দেশের প্রত্যেক দুঃস্থকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞতার
জন্যই এত দিন আমাদের সর্বনাশ দাবিত হইয়াছে। বর্ষার
বহিরাবু বহুদিন পূর্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি
বলিয়াছেন—

‘শ্রুতিক্ত বাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু
বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাকালার সর্বত্র
প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শ্রুতিক্ত অশিক্ষিতের সঙ্গে
না মিশিলে তাহা বটবে না, শ্রুতিক্তে অশিক্ষিতে সমবেদনা
চাই।……বাকালার ছয় কোটি বাট লক্ষ (একশ প্রায় ৮ লক্ষ)
লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে,
বাকালার লোক-শিক্ষা নাই। [বঙ্গবর্ষ ১২৮৫ সাল অগ্রহায়ণ
সংখ্যা—“লোক-শিক্ষা” প্রবন্ধ]

‘একপে বাহাতে সে অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের
আপামর জনসাধারণে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে
পারে, জাতীয় মহাসমিতির সহিত প্রতিকার-প্রার্থনায়
সকলে সাগ্রহে যোগদান করিতে পারে, রাজপুরুষেরা
বাহাতে যুষ্টিমের আন্দোলনকারী বলিয়া আমাদের প্রতি
উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন
করা কর্তব্য। এই সুমহান্ পবিত্র কর্তব্য-সাধনে উৎসাহ
প্রকাশ না করিয়া বাহারা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি
উপহাস বা উপেক্ষা-প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা দেশের
শত্রু ও সমাজের শত্রু বলিয়া চিরকাল সুখী-সমাজের স্থপার
ভাজন হইবেন।

‘বৃদ্ধ ভারতহিতৈষী হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির
বিগত অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবাসীকে যে
সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ
রাখা কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—

‘তোমরা কি বুঝেছ যেমন কখনও কখনও হয় যে, কোন রাজ-
শক্তি বৃত্ত:প্রযুক্ত হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার
প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার তোমাদিগকে প্রদান
করিলে শক্তিশ্রীর শাসকদিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, ন্যায়ের
হিসাবে তোমাদের নহস্ব দাবী থাকিলেও পর্ব্বমেন্ট কি সে
সমুদায় নহস্ব হাতিবেদ? যে কখনও ত্যাগ করিলে রাজার
বশেষবাসিন্দা উভয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, রাজা কি তাহা
বিনা ব্যাক-ব্যয়ে ত্যাগ করিবেন? তোমরা কি বলিবে তাব যে,
ঔদার্য্যবীতিক অথবা যে কোন পর্ব্বমেন্টই হউক, শুধু ন্যায়ের

অহুরোবে তোমাদিগের স্ব:খ-বিমোচনে অগ্রসর হইবেন?
একপ অলীক চিন্তার আশ্রয়-বন্ধনা করিত না। ভারতে এবং
বিলাতে অবিজ্ঞাত ভাবে, অদ্বয় অব্যবহার ও উৎসাহ সহকারে
আন্দোলন করিতে হইবে, বিলাতেই আন্দোলনের রাজ্য
অধিক হওয়া আবশ্যক। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিতা পর্ব্ব-
মেন্টকে যদি ক্রমাগত উদ্ভক্ত ও আলাভন করিতে পার, তবেই
তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে। রাজনীতিক
আন্দোলনের সকলে আমার অধিবাশ নাই, কিন্তু তোমরা
যেহাও উদারীন্দ্র সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই
হইবে না। আন্দোলনে একাধিতা অবলম্বন কর, তোমাদিগের
অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই জাতীয় উন্নতিকল্পে উৎসর্গ কর, ভারতে
সংবৎসর-ব্যাপী মহাসমিতির আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, বিলাতের
প্রত্যেক মণ্ড ও গ্রাম তোমাদিগের প্রার্থনার ক্ষমিতে সুব্রিত
কর, কর্তৃপক্ষের দ্রুতদীতে ভীত হইও না, প্রাণপণে ইংরাজ
জাতির সম্মুখে এই দাবী প্রতিলব্ধ কর যে, তোমরা বাহা
বিরোধ, তাহা কিছুতেই হাতিবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার
পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিতে এক দিনের জন্যও বিরোধ
হিবে না। অগতঃ সর্বত্র প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সমর,
অর্থ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়া সফল-সাধনে প্রযুক্ত
হইয়াছ, কার্য দ্বারা আপনাদিগের বোধ্যতা প্রতিপাদন কর।
যেবিবে, ঐশ্বর্য্যগণে ভ্রুবারের দ্বারা তোমাদিগের উন্নতি-পথের
কষ্টক ভিরোহিত হইয়াছে।

‘ভারতের সংস্কারপন্থসমূহকে প্রায়ই পর্ব্বমেন্টের দোষ
কীর্জন করিতে দেখি। পর্ব্বমেন্টের অনেক দোষ আছে সত্য,
কিন্তু তোমাদিগের নিজের দোষই সর্বাধিক। তোমরা
নিজে কর্তব্য পালন করিবে না, যদ্যপেত্র ও যদ্যবাসীরা
উন্নতিকল্পে সর্ব্ব-পণে আশ্রয়-বিসর্জন করিবে না, শুধু পর্ব্ব-
মেন্টের দোষ দিলে চলিবে কেন? তোমাদিগের উন্নতি
তোমাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সর্ব্ব সাম-
সারিক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস
কর, তথারি ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহাসম্মে
দীক্ষিত হও, হাতিমিন সুলিরা এক মনে, এক ব্যানে উদ্বেত-
সংসারন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অদ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়িতে
কার্য্যে ব্যাপৃত হও, যেবিবে, আন্ত তোমাদিগের কামদা পূর্ণ
হইবে। নচেৎ একপে তোমাদিগের আন্দোলনে যেহাও একা-
ধিতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল রহিয়াছে, তাহা থাকিলে
কিছুই লাভ হইবে না।

‘আবার বলি, পর্ব্বমেন্টকে পালাপালি দিলে, তোমাদের
নিজের দোষ চাপা পড়িবে না; অন্যদ্বায়ে দেশের পর্ব্বমেন্টের
দ্বারা তোমাদের পর্ব্বমেন্টও আপনাকে সর্বাধিকারের সমর্থক
জানবান্ ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। ইহারা ইচ্ছা
করিয়া কখনই তোমাদিগকে এক ভিত্তি অধিকার প্রদান
করিবেন না, বরং উত্তরোত্তর প্রবৃত্ত অধিকারের সত্যোচ প্রদান
পাইবেন। যে দেশে প্রকাশ্যে হীনবল, সে দেশে রাজশক্তির

এইরূপ ব্যবহার ঘটাই থাকে। রাজনৈতিক এমন অত্যাচার-বিধানে প্রজাসাধারণের সর্বনাশ চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিবেক। প্রজারা যদি রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে ঘোষ প্রজাবিপ্লবের—রাজার নহে, একথা স্মরণ রাখিও।

“কলত: আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মি: ডিগ্‌বী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা ছয় পয়সা

পরিণত হয়। অধুনা উহা দৈনিক তিন পয়সায় ঝাঁড়াইয়াছে! অল্পপূর্য্য সন্তানদিগের আর কি চরবস্থা হইতে পারে! অতএব আর ঔদাত্ত প্রকাশের সময় মাই। কমতাপ্রিয় রাজপুরুষদিগের কুটিলতার আমরা যে বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহার পুন: প্রাপ্তির জন্য সময় থাকিতে বন্ধ-পত্রিকর ভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অসুতপ্ত হইতে হইবে। মি: ডিগ্‌বী বলিয়াছেন,—

“India is not far from collapse.” (‘দেশের কথা,’ পৃ. ২৮৫-২১)

নরন্দাতীরের ওঙ্কার মাঙ্কাতা

ঐ অমিতাকুমারী বসু

এইদের এক মনোরম প্রভাতে আমরা নরন্দাতীরে অবস্থিত “ওঙ্কার মাঙ্কাতা” বেবেতে রওনা হলাম। বাতোরা আসার পর থেকে হানীর অষ্টব্য স্থানসমূহের অঙ্গসন্ধান করে জামতে পেরেছিলান যে, প্রায় ৪৮ মাইল দূরবর্তী ওঙ্কার মাঙ্কাতা অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সেই থেকে সেখানকার মন্দিরের বিষয়ে হিন্দী ও ইংরেজী পুস্তক হতে নানা কাহিনী ও জনপ্রবাস সংগ্রহ করতে লাগলাম। এক দিন সে স্থান প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এসে গেল। একজন উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী আমাদের অতিথি হয়েছিলেন, তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নরন্দাতীরস্থ এই প্রসিদ্ধ তীর্থ বর্ণন করা। তাঁরই ভ্রতে হঠাৎ এই রাজার আয়োজন হ’ল।

নরন্দার তীরে যে সকল দেব-মন্দির ও তীর্থস্থান আছে, তার মধ্যে মধ্য-প্রদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত এই “ওঙ্কার মাঙ্কাতা” এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বহুদূর থেকে রাজারা তীর্থদর্শন করতে আসেন। তারা বাতোরা থেকে ইন্দোর লাইন বয়ে ট্রেনে পরবর্তী ট্রেন মোরটকাতে যান ও সেখান থেকে গরুর পাড়িতে, বাসে বা পথভ্রমে মাঙ্কাতা পৌঁছে। তা ছাড়া বাতোরা থেকে সারাদিন মোটর সার্ভিসও চলে। আমরা একবার ট্যাক্সির ব্যবস্থা করেছিলাম।

আমাদের মোটর মিটেবে শহরের অসাকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে বাইরের নির্জন পথ বরল। হ’বারে কোথাও ভাঙ্গল পথকে, কোথাও বা পতিত অসুন্দর ভূমি, মাঝে মাঝে হ’একটা ছোট পাহাড়ী বর্ণা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলছিল। রাস্তার পাশে একটা-দুটো গ্রাম, তারপর বাসিন্দা জল, আবার গ্রাম আবার জল—এভাবে দলত পথটা মাঙ্কাতা পর্য্যন্ত চলে গেছে। কোন কোন গ্রাম বেশ জিন্দার, আবার কোন কোন গ্রাম বিভাভই ছোট। তবে একটা বিশেষ লক্ষ্য

করলাম। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সামনেই বেশ বড় বাঁধানো এক একটা ইঁদুরা আছে, আর তার পারে সংবেরঙের বাঁধা-পরা বহু প্রাণ্য বহু তিক্ত। তাদের কেউ বা বলে বসে শিতলের বড়াকে বলে সোনার মত বকবকে করে তুলছে, কেউ-বা দড়ি দিয়ে টেনে ইঁদুরা থেকে জল তুলছে, কেউ-বা মাথার জলতরা বাগর নিয়ে বন্ধ-পতিতে ঘরে ফিরে চলেছে। বানীকী শালের বচন উদ্ভূত করে বললেন, পথে পূর্ণহুতা নারী দেখলে যাঁরা শুভ হয়।

এক এক স্থানে মোটর বীরে বীরে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। কোথাও বা এক দিকে গভীর ধার, অন্য দিকে নিবিড় অরণ্য, কোথাও বা অরণ্যের স্থানে স্থানে পলাশ-কুল ফুটে বন আলো করে আছে। কোথাও বা শালের বড় বড় পাঁতা শুকিয়ে হাওয়ার ধবে এধার-ওধার বিহিরে আছে, দেবদারু, ধরের প্রভৃতি নানা জলদী শালের কাঁকে কাঁকে প্রভাত-সূর্য্যের সোনালী আলো বঙ্গবন্দু করছে। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিন বর্গ চলে আমরা মাঙ্কাতা পৌঁছলাম। বানীকী দূর থেকে সর্কপ্রধর সেই মন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়ে আমলে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন ও আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন। আমরা আমাদের জিম্বিপজা দিয়ে নেমে পড়লাম। উপর থেকে বাপে বাপে উপলব্ধ সোপান ও রাস্তা অতিক্রম করে বহু দীর্ঘে নামলাম। হ’বারে মোট ছোট বোকান, তাতে হাঙ্গুলকর বাসে কুসুমী, জিলিপি, দ্রুতি এসব ভেঙে শুপীকৃত করেছে।

বানীকী স্থান করে শুভিত্ত হতে পুজো সন্ধ্যায় করে কের-বার পথে এসব দিয়ে জলযোগ করে, কাছেই বোকানীদের এতে প্রচুর অর্পণ হয়।

দীর্ঘে নেমে নরন্দাতীরে বাড়িরে সামনের দূর বেবে চোপ

ভূমিতে গেল। কি মনোরম এই পার্বত্য হান। নিরে বহু-
লম্বা মর্দনা বয়ে বাজে, অপর পাশে “ওকার মাকাতা”র
মন্দির-শিখর অতি উচ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির
হৃদয় থেকে পাট সমুদ্র পাথরের পীণুনি উঠেছে। সারি সারি
বোকামপাট, বর-হরার মন্দির ভরে ভরে পাহাড়ের পায়ে
হবির বহু সাক্ষ্য আছে, আর পাশে দাঁড়িয়ে মাকাতার
রাজপ্রাসাদ। স্রু পাথরের রাস্তা একে-বেকে উপরে উঠে
গেছে। মর্দনাভীরে পাহাড়ের উপর সে সক্রীর্ণ রাস্তা, আর
চুনকান করা সাধা বাতীগুলি অতি সুদৃষ্ট দেখাচ্ছিল।

ভারতের পুণ্যভোরা মন্দিরগুলির মধ্যে এই মর্দনা একটি।
সাধারণতঃ বাজীরা উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে ব্রহ্মা নদীর মাহাত্ম্য
সম্বন্ধে অবিকল্পিত সচেতন হইলেও মধ্যপ্রদেশে মর্দনাকে অতি
পবিত্র মনে করা হয়। কিংবদন্তী আছে যে, মর্দনা গঙ্গার
চেরেও পবিত্র, এমন কি গঙ্গাও বৎসরে একবার ব্রহ্মবর্ণ গাভীর
মুণ্ডিতে এসে মর্দনার অবগাহন করে পাপকালন করেন ও শুভ
হয়ে বেভবর্ণ ধারণ করে বহানে ফিরে যান। এরূপ বলা হয়,
গঙ্গানানে যে পাপ নষ্ট হয়ে থাকে মর্দনা-মর্শমেই সেই পাপ
হু হু হয়ে যায়।

মর্দনা ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে, তার উৎপত্তি ও
বিলয় সবকিছু লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, সে কারণে মর্দনার
তীর্থবাজীরা শুধু মর্দনার অবগাহন করেই ভূপ্ত হয় না, কেহ
কেহ মর্দনাকে পরিষ্কারও করে। তারা এই পুণ্যভোরা নদীর
উৎপত্তি-স্থান অমর কটক থেকে বিলয়স্থল তরোচ পর্যন্ত এবং
পুনরায় তরোচ থেকে অমরকটক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রদক্ষিণ
করে ও মনে করে এরূপ প্রদক্ষিণ দ্বারা শ্রেষ্ঠকল লাভ হয়।
সাধারণতঃ নদীর উৎপত্তি-স্থল অতি হৃদয়। অহর হিমালয়ের
মধ্যে গঙ্গাযমুনার উৎপত্তি-স্থলের সন্ধান কম লোকেই রাখে।
কিন্তু দেশের মধ্যবর্তীস্থলে যে সকল নদীর উৎপত্তি, তাদের
উৎপত্তিস্থল সাধারণ লোকেরা শুধু যে খুঁজে বের করেছে তা নয়
বেহান থেকে নদীর ধারা আরম্ভ হয়েছে, সেটিকে চিহ্নিত করে
আশপাশে মন্দির তৈরি করে তাকে তীর্থস্থলে পরিণত করেছে।

এই মর্দনা যেন রাজ্যে সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর শিখর অমর-
কটক থেকে নির্গত হয়ে মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশের ভিতর
দিয়ে আট শত মাইল প্রবাহিত হয়ে আরবসাগর-সংলগ্ন
কাখে উপসাগরে পতিত হয়েছে। মর্দনা অমরকটক-শিখরের
যে স্থান থেকে অবরোধন করেছে সেই স্থানটিকে লোকেরা
মর্দনাকুণ্ড নাম দিয়েছে এবং তার পাশে কয়েকটি মন্দিরও
তৈরি করে রেখেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে নদীটি হৃদ্যপে
বিস্তৃত হয়েছে। এক ভাগ অমরকটক থেকে প্রায় তিন
মাইল দূরে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, লোকেরা তার
নাম “কপিলবারা” দিয়েছে। জনশ্রুতি, এখানে মন্দিরে যে
ঈদলি বোঝা যায় তা কপিলমন্দির। সেখান থেকে নদীটি বহু
দূর পর্যন্ত জলসাক্ষী হান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অমলপুত্র
নদীর উপকণ্ঠে এসে এক অপরূপ দৃষ্ট রচনা করেছে। প্রায়

ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে জলধারা নিরে পতিত হয়ে একটি মনোরম
জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, তার নাম “দুয়াবারা”। তার পর
মর্দনা হুঁ মাইল পর্যন্ত মর্দন-প্রভবের ভিতর দিয়ে পথ কেটে
চলে গেছে। সে স্থানটিকে “মার্কেল রকস্” বলা হয়। এর



মর্দনাভীরে ওকারেবর মন্দির

দৃষ্ট অতি মনোরম। দেশ-বিদেশের বহু লোক এই মার্কেল
রকস্ দেখতে যায়। কোয়ান্ডা রাজ্যে এই স্থানের দৃষ্ট অতি
চমৎকার দেখায়। মর্দনার প্রায় সেখানে রাজ্য বিশ গজ,
সেখান থেকে নির্গত হয়ে মর্দনা সাতপুরা ও বিজাপুরের
মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিকে উর্বরা ভূমিতে পরিণত করে ছই শত
মাইল প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে এসেছে যেখানে সাতপুরা
পর্বত ও বিজাপুরের ব্যবধান অতি সামান্য।

এক স্থানে নদীটি প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে পতিত হয়ে
ছইটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে, তার একটি মাঝারে ও অপরটি
পুণ্যখাতে। মর্দনা মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে বহুদূর প্রবাহিত
হয়েছে, ভবনূর পর্যন্ত তার তলদেশ প্রভবময়। মধ্যপ্রদেশ
থেকে নদীটি ইন্দোর রাজ্য ও মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে এক
শত মাইল পথ অতিক্রম করেছে। মর্দনাভীরে হোলকার
বংশের রাজধানী প্রাচীন নগর “মণ্ডলেশ্বর” অবস্থিত। সেখানে
রাণী অহল্যাবাই বহু মন্দির, স্থানের বাট ইত্যাদি তৈরি করিয়ে
দিয়েছেন। অহল্যাবাইয়ের সমাধি মঠও সেখানে আছে।

গঙ্গাভীরে বেরূপ বড় বড় শহর আছে, মর্দনাভীরে তদনু-
রূপ বিশেষ কিছু নেই, সে কারণে মর্দনার জল বহু ও নির্মল।
ক্রীমকালে মর্দনা বহু দূর অবধি তকিরে বাওয়ার রক্তন অপরি-
শ্রয় হয়ে যায়, বড় বড় বাসুন্ডার সৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষা পর্বত-
চূড়া থেকে জলপ্রবাহ বধন যেমে আসে, তখন নদীটি বিশুল
জলোচ্ছ্বাসে ফুল্ল প্রাণিত করে প্রবাহিত হয়।

অমরকটকের মর্দনাকুণ্ডের কিছুদূরে একটি বেদালয় আছে,
তার নাম “মর্দনামাইকা মন্দির”, এবং তার কিছুদূরেই আর
একটি শিবমন্দির আছে। এটি বৎসর হাজার হাজার বাজী

শিবস্বামির সময় মর্দনাক্ষতে স্থান করে এই শিবমন্দিরে পুজো দিতে আসে। মর্দনা সবচে পুরাণে লিখিত আছে যে, শিবের তেজ থেকে মর্দনার উৎপত্তি, তাই মর্দনা শিবকথা। সে কারণে মর্দনাক্ষতে স্থান করে শিবলিঙ্গকে বিবরণ দিয়ে যে পুজো করবে, শিবের বরে তারই সুভিলাভ হবে।



মর্দনাভীত্রে সিদ্ধনাথের মন্দির

লোকেরা বলে যে, সময় সময় এই কুণ্ডের জল হুবে পরিণত হয় এবং কুণ্ডের মধ্যস্থিত বেলব প্রভরবৎ আছে, সেলব শিব-লিঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মর্দনা নদীর উৎপত্তি সবচে আরও পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, কলিযুগের পূর্বে মৈকাল দেব নামে এক জন রাজা ছিলেন। তাঁর মর্দনা স্ত্রী একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। তার হেমলা ও রিমলা বলে দুই সহচরী ছিল। মর্দনা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বড় অতুলনীয় ছিলেন, তাই মৈকাল দেবকন্যার জন্য একটি অতি মনোরম উদ্যান তৈরি করিয়ে দেন।

মর্দনা অধিকাংশ সময়ই সহচরীদের সঙ্গে উদ্যানে থাকতে ভালবাসতেন। এক দিন মর্দনা তাঁর দুই সহচরীসহ উদ্যানে বসে আছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর রূপে এক রাজপুত্র, নাম "সোমভদ্র", সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মর্দনার প্রণয়াকাজী ছিলেন এবং সে উদ্যানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। রাজকন্যা রাজপুত্রকে পতিরূপে গ্রহণ করতে বীভূত হলেন এবং সেই অসীকারের লাক্ষ্যস্বরূপ হু'বনে মিলে একটি অতি সুগন্ধিপুষ্পরূপে রূপেণ করলেন। তারা প্রীতজীবন হলেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিরকাল অহরহ থাকবেন—মর্দনা বা রাজপুত্র অন্য কারও সঙ্গে পরিচয়হীন থাকবে না। আর তাদের সেই অসীম প্রেম এই সুগন্ধি পুষ্পের বড়ই গুণে সৌরভ বিতরণ করবে।

এর পর অনেক দিন চলে গেল, অপর এক রাজপুত্র মর্দনার পানিপ্রার্থী হয়ে এলেন। রাজা তাকেই রাজকন্যার পাত্ররূপে

মনোনীত করলেন, শুভবিবাহের দিন বার্ষা হ'ল। তিনি কন্যার মতামত গ্রহণ আবশ্যক বলে মনে করলেন না। রাজ্যে খুব উৎসবের বটী। সেদিন তরুণী মর্দনার শুভ বিবাহ, এমন সময় সন্ন্যাসী-রাজপুত্র সে রাজ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি বিবাহ-লগ্নে লজ্জিতা মর্দনাকে ও তার দুই নবীকে শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করে দিলেন। মর্দনা নদী ও অমরকণ্টকের নিকটবর্তী দুই উপনদী নাকি রাজকন্যা ও তার নবী হ'বনের রূপান্তর।

অমরকণ্টকের এক হাইল উত্তরে মর্দনার একটি শাখা চলে গেছে, তার নাম "সনেশরা"। "সনেশরা" একটি মর্দনীর স্থান। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এই নদীর অমতি-দূরে একটি উদ্যান আছে, সেই উদ্যানকে উপরোক্ত কাহিনীতে বর্ণিত রাজকন্যা মর্দনার উদ্যান বলা হয়। এই উদ্যানটিকেই মর্দনা ও সন্ন্যাসী-রাজপুত্র সুগন্ধি পুষ্পরূপে রূপেণ করেছিলেন। এখনও সে জাতীয় বৃক্ষ সেই উদ্যানে জন্মে থাকে এবং চতুর্দিক উপনদের জন্য তার পুষ্প ব্যবহৃত হয়। এই উদ্যানের কিছু দূরেই চার-পাঁচ মাইল ব্যাপী বিল আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে পৌরাণিক কাহিনীতে উক্ত মর্দনার পিতা রাজা মৈকাল দেবের রাজপ্রাসাদ এখনও সেই ঝিলের অপর পারে অশ্লিষ্ট ভাবে বেধা যায়। কিন্তু কোন মর্দনাই নাকি সে হাদে গিয়ে পৌঁছতে পারে নি।

আমরা মর্দনার বহু শীতল জলে আমলে স্থান করতে লাগলাম। নদীর পূণ্যলিলে অবগাহনে শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। মর্দনার জল হু'হাতে গিয়ে বেলা করতে করতে হঠাৎ চোখের সামনে তেলে উঠল বেশ বিবাহলগ্নে লজ্জিতা তরুণী মর্দনার মূর্তি। মনে হ'ল এইরূপ কাহিনীর স্রষ্টাদের কল্পনা কি মনোরম, কি বিচিত্র।

স্থানান্ত্রে আমরা ওকারেখরের মন্দির অভিরূপে যাত্রা করলাম। নদীর এপার থেকে ওপারে বেড়া মৌক্যার বলে পার হয়ে ওকারেখরের মন্দিরে যেতে হয়। এই মন্দিরটি একটি বীণে অবস্থিত। এই বীণে বহু মন্দির আছে। এগুলো শিবপুরী, ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিনপুরীর চারদিকে নদীটি এভাবে প্রবাহিত হয়েছে, যেখানে মনে হয় বেশ ও এই অকরের আকারে তা বিধিরে আছে, তাই মাঝাতার অপর নাম "ওকার মাঝাতা"। বীণটি আর বেশ মাইল লম্বা, বীণের মধ্যবর্তী সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী একটি উপত্যকা দ্বারা হু'তাপে বিভক্ত। পূর্ব দিকে নদী থেকে ৪০০:৪০০ ফুট উঁচু পর্বতমালা উঠে পশ্চিম দিকে বীরে বীরে ঢালু হয়ে সমভল ভূমিতে মিলে গেছে। মাঝাতার বিপরীত দিকে মর্দনার দক্ষিণ তীর পর্বত-সমাকীর্ণ। হু'পর্বতের তিতর দিয়ে গভীরলিলা মর্দনা বয়ে গেছে। নদীর বহু জলে নানা আকারের ছোট বড় বড় বাহু জলে ভালছে। এগুলো

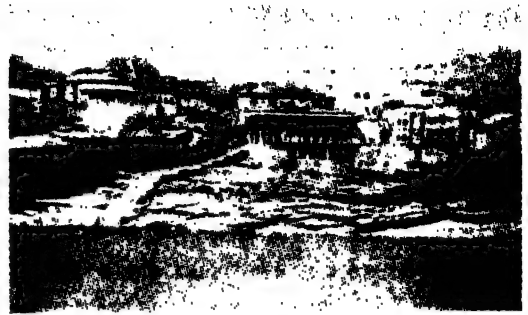
মন্দিরের আশ্রিত, এদের বরা নিবেশ। সব রাজীই হোলা
তাক্য নষ্ট তাক্য কিনে দেয়, আর বলে একটা হুঁট করে
হাততে থাকে। শত শত বাহ বাণা বের করে তা বেতে
আসে। হুঁটগতিতে এরা কলের উপর চলাকেয়া করে,
বাহুবকে ভর করে না। কি হুন্দের মর্দনার বন্ধ বলে বাহের
এই বেলা।

মর্দনার বন্ধিণী তীরে অমরেশ্বরের মন্দির। এ মন্দিরে
ইন্দোর রাজ্য হতে আগত বাইশ জন ব্রাহ্মণ বৈদিক শিবপূজা
করেন। জিন হাকার শিবলিঙ্গ বাঁটি দিয়ে তৈরি করে পূজা
অন্তে নবীতে বিসর্জন করা ছিল তাহের বৈদিক্য কাল।
অমরেশ্বরের মন্দিরের কাছেই বীরেশ্বরের মন্দির—তার প্রবেশ-
দ্বার অতি সুন্দর। বিষ্ণুপুরীতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ
দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত।
লিখনাথের মন্দির বীণের সনুদর মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটি
পাহাড়ের পূর্ব কিনারে অবস্থিত। খুব উঁচু উঁচু স্তম্ভ মন্দিরটিকে
সুদূর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সেই স্তম্ভগুলিতে
ও মন্দিরের উঁচু ভিত্তিগোড়ে বহু হস্তীমূর্তি খোদিত আছে। হস্তী
মূর্তিগুলি বহু হুন্দের তাবে খোবাই করা। অবিকাংখই হুন্দের
তলীতে ঠাকুরি আছে, কোন কোনটার পায়ের নীচে শায়িত
মহুদ্রমূর্তি। মন্দির জীর্ণশায় পতিত হওয়ার কতকগুলি মূর্তি
হানাদিত করা হয়। তার মধ্যে হুন্ট মাগপুর মিউজিয়ামে
রাখা হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের হু'পাশে আঠারটি স্তম্ভ
এবং তার উপর ছাদ। এই স্তম্ভগুলি প্রায় চৌক ফুট উঁচু এবং
সেগুলোতে বহু কারুকর্ম আছে। মন্দিরটি অতর অবস্থার
খুব সুদূর ও বিরাট ছিল সন্দেহ নেই। বর্তমানে মন্দিরের
ছাদ ও চুকা ধ্বংস গেছে এবং অনেক স্তম্ভ ভেঙ্গে কেলা
হয়েছে। ইংরেজ সরকার তার কতক জীর্ণসংস্কার করে উপরে
সাধারণ একটি ছাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

বীণের উত্তর কোণে একটি পুরানো মন্দির আছে, তার নাম
সোমনাথ। মন্দিরে কালো পাথরে তৈরি সুশিখাল এক
শিবলিঙ্গ, বাইরেও ঠিক এই রকম মন্দির বা বাঁড়ের কুকমূর্তি।
কিংবদন্তী আছে যে এই বিরাট শিবলিঙ্গ যেত পাথরে তৈরি
ছিল। মর্দক পরজন্মে কি হবে জানবার ইচ্ছে দিয়ে মূর্তির
টিকে চাইলেই মাকি তা তার চোখের সামনে প্রতিভাসিত
য়ে উঠত। একবার বারশা আগরকদেব এই মন্দিরে আসেন।
এই কথা শুনে মূর্তির বিকে চেয়ে নিজে ভবিতং ভবে কি
বেদ তা দেখতে চান। তিনি ভবন দেখতে গেলেন এক
কর-মূর্তি। রাগে অধ হয়ে তিনি সেই বিরাট মহাকালের
ঠিকে আঙুল লাগিয়ে বেন। সেই থেকেই ঐ যেতমূর্তি
কমূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

এ সব মন্দির বেখে আমরা সেই বিখ্যাত তৈরবশিলা
দেখে বেলাম, যেখানে বহু পূর্বে মরবলি হ'ত। বিষ্ণুমন্দির

ও তৈর মন্দিরের মধ্যে একটি মালা আছে, তার নাম রাবণ-
মালা। সেই মালার তীরে এক বিরাট রাহুসে মূর্তি আছে।
মূর্তির বশট বাহ, লম্বা মূর্তি বশ মূর্তি। কেউ কেউ বলেন,
ইহা রাবের শত্রু রাবণের মূর্তি, আবার কারও কারও মতে



মর্দনা মহাধ বীণের ওপর মন্দিরসমূহ

তৈরবের পত্নী মহাকালীর এই মূর্তি। মূর্তির গলবেশে সাপের
হাট, হাতে তলোয়ার ও মরমুখ। মূর্তির শূন্য উদর মহাব্যরতে
পূর্ণ হবার জন্য উদ্যত। আর সেই উদরের উপর বসে এক
মস্তকমূর্তি।

মন্দিরের বন্ধিণ-পূর্ব কোণে সেই বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ বা
থেকে তৈরবের ভক্তরা লাঙ্কির নীচে শিলাধর পাথরবেশে পড়ে
আবাহতি দিয়ে রাহুসী মহাকালীর রক্তপিপাসা নিবৃত্ত
করত। ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভরত সিং মাহাত্ম্য দখল করেন
তখন সেই মহাকালী ও তৈরবের পূজারী নাম এক জনই
ছিলেন। অন্যেরা তবে পূজার কার্যে অঙ্গুর হ'ত না। সেই
পূজারীর নাম ছিল পৌসাই দরিদ্রনাথ। কঠোর তপতাবলে
দরিদ্রনাথ সেই মহাকালীকে সুনিদ্র এক গহবরে আবদ্ধ করে
রাবেন ও সেখানে অপর এক কালীমূর্তি স্থাপন করে পূজা
করতে থাকেন। দরিদ্রনাথের পূজার কালী সন্তুষ্ট হন।
তৈরবের কাছে দরিদ্রনাথ মানত করেন ও প্রতিজ্ঞাতি বেন—
প্রতি বৎসর মধ্যে মধ্যে তিনি মরবলির ব্যবস্থা করে তৈরব
ও মহাকালীর রক্তপিপাসার উপশম করবেন কিন্তু তার সর্গ
এই যে, তাঁরা রাজীবের প্রাণ হরণ করে যখন ধূসী নিবেশের
উদরমূর্তি করতে পারবেন না।

এই মরবলিপ্রথা যখন প্রচলিত ছিল তখন মাহাত্ম্য বীণ
গোৱালিগড়ের সিদ্ধিয়ার অধীনে ছিল, সুতরাং তদানীতক
ইংরেজ শাসনকর্তারা এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন
না। ১৮২৪ সনে একজন ইংরেজ শাসনকর্তা এই "তৈরব-
শিলা"র মরবলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি :

"সেইদিন মরবলির উৎসব হবে, সেদিন আমি খুব জোরে
উঠে তৈরবের প্রতীক মূর্তির কাছে পেলাম। সে একটি কালো

প্রভবত, তাতে লাল সিঁহর মাথালো আছে। যে তক্ত তৈরবের নিকট আশ্রয়লি বিবে, সে এই শিলার উপর লাকিরে পড়ত। কিছুকণ পর বাহ্যতঃ বাজিরে শোভাবাদ্য করে সেই তক্ত এস, যে আক শিখের প্রাণ বলি বিবে। সে পাথরের প্রতীকের কাছে কিপ্রণবে উপস্থিত হ'ল, তার চোখে বুধে একটা ছুরত উদ্ভাস। আমি কিছু পরে তার কাছে গেলাম, ও তাকে অনেক বুঝিয়ে এই ভীষণ প্রতিভা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। বাকী ভীষন আমি তার রক্তপানেকণ ও তরুণগোষণ করব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমার লগে নৌকা ছিল, আমি তাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনতার নিকট থেকে হুয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সব অহরোধ ব্যর্থ হ'ল, সে ছুরতার সহিত উত্তর দিলে যে, তৈরবের বলি বন্ধ করা সহস্রশক্তির অতীত। বেবলান এই অবস্থার বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। সে বধন তৈরবস্থিতির সমুখীন হ'ল, তখন তার ভিতরের সুসংকারগুলি প্রবল শক্তি ধারণ করল। চারদিক থেকে বর্ষার জনতা টেঁচিরে আর হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে লাগল। সে তার বৃগু অমৃতকী দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে আমার কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে। সে তৈরবের সামনে দারকেন উৎসর্গ করে নৈবেদ্য দিলে। তার পর একটা তক্তনো লাউ বের করে তা থেকে তার সক্তি অর্থ সেবানকার পুকারিণীর সামনে ঢেলে দিল। পুকারিণী একটা দারকেনের মালার কারণ এনে তাকে পান করতে দিল। কারণ দেবার পূর্বে শিখের হেলেকে ধানিকটা বাইরে দেখান যে তাতে বিবাক্ত পদার্থ কিছু বেই। কারণের কতকটা স্থিতির উপর ঢেলে দিয়ে তক্তটি কারণ পান করলে।

“পুকারিণী তক্তকে তার হাতের রপোর আংটিগুলি ধুলে দিয়ে বিতে বললে। আংটি ধুলে দেবার সময় লোকটির চোখে বুধে পতীর হৈর্য্য দেখা গেল। সে তার প্রথম আংটি ধুলে শিখের বুধে রেখে দিল, তার পর একে একে হু'হাতের আংটিগুলি ধুলে পুকারিণীকে দিলে। জনতার মধ্য থেকে একটা লোককে হুঁকে বের করে বললে তার শেষ আংটি তাকে বেঙরা বোঁক; এই লোকটি তার লগে উচ্চরিনী থেকে এসে-ছিল। এই সময় দেখা গেল অনেক লোক তাদের হাতের রপার বাজ, পরমা, সুগারি ইত্যাদি তার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চায়। সে ছিন্ন চিতে তাদের ক্রিয়গুলি নিয়ে বুধে রেখে আবার তাদের কিরিয়ে দিল। অবশেষে পুকারিণী তাকে একটা পান খেতে দিলে। সে পান নিয়ে বৃঢ় পাথকেপে হান ভাণ করলে।

“চারদিকে জনতা হাততালি দিয়ে উঠল। সে বধন পাহাড়ে চক্কিল, তখন নাকে নাকে লজাঙলে তার বেহ ঢেকে বাজিল। অবশেষে সে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার পীড়াল।

বহিও সে বৃড়ার সুখোবুধি দত্তারমান, তবু তার বেহ বধু, তদি বীরদ্ব্যজ্ঞক। কিছু সময় সে আবেগের সহিত হু'বাহ হোলাতে লাগল, মনে হ'ল এর উচ্চারণ করছে, তার পর ছিন্ন হ'ল। হু'বাহ বোঁক করে জনতাকে বিহার অভিনন্দন জানাল। তার পর তার কোষের বলি থেকে দারকেন, আরমা, ছুরি, চূণ ইত্যাদি হুঁতে কেলতে লাগল। করেক সুহৃদের জন্য একটু শিহু হটল, পরসুহৃদেই একাত্ত পৌত্রবের সহিত পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিল। সামনে পা রেখে সে প্রচণ্ড বেগে নীচে পড়তে লাগল এবং অর্ধ পথে একটা টিলার চূড়ার লেগে মাথা নীচু হয়ে পা উঠে গেল এবং সেই অবস্থার ১০ ফুট নীচে পড়ে তৎকণাৎ সে বৃত্ত্যাকে আলিঙ্গন করলে। এই বৃত্তকের ভিতর বা বিশ্বাস ও দৌর্য্য ছিল, তা এ তাবে ধ্বংস না করে সে তা ভগ্নতের বন্ধ কাকে লাগাতে পারত।”

কার্তিক মাসের প্রথম ভাগে দ্বাদ্ভাতার বাৎসরিক বেলা বলত। প্রায় ২৫৩০ হাজার রাজী কন্যারো হ'ত। আর এই সময়ই হ'ত নরবলির আরোহণ। ১৮২৪ সালের পর বধন দ্বাদ্ভাতা ইংরেজের অধীনে আসে তখন নরবলি বন্ধ হয়। সাধারণতঃ এই বেলায় সমস্ত নর দ্বাদ্ভাতার রাজারই প্রাণ্য, কিন্তু পুরানো পদ্ধতি অহুয়ারী ভীল-পরিবারের লোকেরা চার দিন বেলায় নরর বা পারে সৃষ্ট করে নিত। এর কলে একাত্তে রাজার তৃত্যবের ও ভীলবের মধ্যে ধুব হুধ লেগে যেত। বেলায় বহু পূর্বে থেকেই হু'বল হুদের জন্য তৈরি হতে থাকত। উত্তরপক্ষের লোকেরাই নাকি বেশ লম্বা লম্বা নথ রাখত যাতে নরর ও নৈবেদ্য কেতে নিতে পারে।

দ্বাদ্ভাতা এখন একটা ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা হাজারও নয়, কিন্তু এককালে ইহা নরবিসম্পন্ন ছিল। বর্তমান দ্বাদ্ভাতার রাজা যাতে “ভীলালা।” এই রাজারা চৌহান রাজপুত তরত সিংহের বংশধর, ইনি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভীল সর্দারের কবল থেকে দ্বাদ্ভাতা অধিকার করেন। দরিলনাথ গৌলাইয়ের আমন্ত্রণে চৌহান তরত সিংহ এসে দাপু ভীলকে হত্যা করেন ও তার কতাকে বিবাহ করেন। রাজপুতরা ক্রমে রক্ত-পিপাসু তৈরবের তক্ত এই পার্শ্বত্যা জাতির লগে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাদের বংশধররাই বর্তমানে ভীলালা নামে পরিচিত। ভীল বাঁট পার্শ্বত্যা জাতি, কিন্তু ভীলালা হচ্ছে রাজপুত ও পার্শ্বত্যা ভীলের সংমিশ্রণ।

লুদর মলির বর্ণন করে মহাবেবের পুকা দিয়ে আদরা নীচে মেঝে এলাম এবং নদীর বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। অপরাহ্ন রবেয় রক্তির আভার নীল আকাশের লগে লগে সর্দার নীল জলও রাঙা হয়ে উঠল। আদরা বুধ হয়ে এই হাবের অপরাণ শোভা দেখতে লাগলাম। বেধতে বেধতে বনে হ'ল তারতের বেবদ্বানগুলো কি হুদর প্রাকৃতিক পরি-

বেশের মধ্যে অবস্থিত। এক দিকে হাতাতার মস্ত-মস্তমিস্তি মাঝে কার্কাব্যপূর্ণ মন্দির, দেবমূর্তি, সৌর বেলন মনে বিশ্বাসের সৃষ্টি করে, অপর দিকে তেমনি প্রকৃতির অপূরণ সৃষ্টি—গহন কাটার ধূসর পর্বতমালা, মলিনবিপ্লবী শ্রোতবিনী মনকে হুঁক করে দেয়।

হেলেনেয়েরা হাতের লত হোলা মটর তাকা কিসে দিবে-ছিল, ওগুলো রুঠো রুঠো ভরে জলে হুঁকতে লাগল। বাতীকীও শিশুর একজন হয়ে গেলেন, তিনিও পরমানন্দে মিশে যাবার থেকে ইকরো ইকরো করে হাতগুলোকে খাড়াতে লাগলেন। বল বেঁধে সারি সারি ছোট বড় মাঝা আকারের হাত জলের উপর মাঝা জলে ওগুলো বেতে এল। হাতে হাতে হুঁকটো হাত জলের উপর তেনে ভিগবাণী বেঁধে নীচে ভলিরে বেতে লাগল। হিন্দুর আতার ভাবের আশঙলো রূপায় মত ষিকমিক করে উঠছিল। শিশুরা হাতের মাঝা মকর খাবার দিয়ে ও ভাবের বেলা বেঁধে বিশেষ কৌতুক ও তৃষ্ণা বোধ করলে। একজন ছুবনী হেলেনেয়ে এসে আবার দিয়ে ঝাঁকাল। ভাবের বিভিন্ন বেশত্বা ও হুঁকতে কালো দেহের সবল গঠন বেঁধে মনে হ'ল, এরা বোধ হয় ভৈরব

শিলার যে পাহাড়ী তীলতা আনন্দবিদগ্ধ মিত ভাবেরই স্বাক্ষর। তারা গ্রাম্য হিন্দীতে আবারের বলতে লাগল, "তোমরা জলে পরমা হুঁকতে হাত, আদরা জলে আদব।" আদরা কৌতুকী হয়ে পরমা মনোহর হুঁকতে কলতে লাগল। আনন্দে বিহব, ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুব বেঁধে সে পরমাঙলো হুঁকতে বের করে আনতে লাগল। মনীর বহু জন এদের বৌরাহ্মা ভীরের কাছে বোলা হয়ে উঠল। মনীর ভীরে বেশ খানিকজন বিশ্রাম করে আদরা খাটোরা কিরবার উভোগ করল।

আবার সেই পাহাড়ী হাতাতার পাড়ী চলতে শুরু করল। পাড়ীর দোলার ক্লাভ পরীরে ওরা আসতে লাগল। আর সেই ওজাক্তি চোখে চিত্রের মত তেনে উঠল—মর্দকাতীরে সু-উচ্চ ওজারের মন্দির, বহুসলিলা শ্রোতবিনী মর্দক, সেই বিজীকায়র ভৈরব শিলা, এমনি আরও কত বিভিন্ন হবি। মন বিশ্বাসিষ্ট হয়ে হুঁকহুঁক পূর্ণের কোন্ এক অজানা হাতো বিচরণ করতে লাগল। হঠাৎ ঝাঁপি বেঁধে ওরা হুঁক গেল, কেনে দেবলাস খাটোরা পৌছে গেছি। স্বপ্ন হাতো হেতে বাঁধব অন্তে এসে পৌছলাম।

আশা

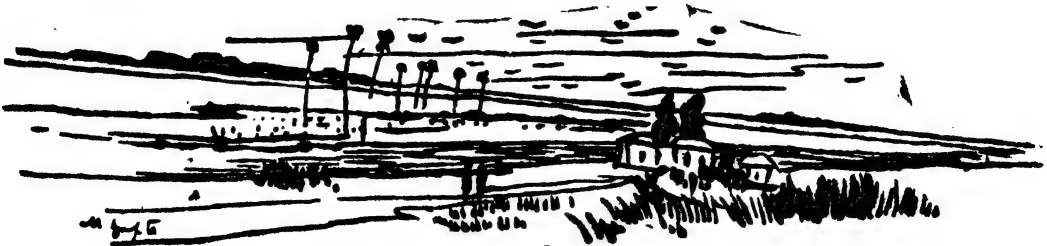
ঐআর্য্য চক্রবর্তী

সবল আকাশ মীল অন্ধ্র যোহ
মোমুলি লরে হাজির সবারোহ,
শক-আকুল হংসবলাকা চলে
ক্লান্ত পাখা মেলে হবিন্ বিলের জলে,
দ্যাব রজনী, বধ্যা প্রতিশ্রুতি,
সেভারের সুরে সক্রমণ বিশ্বতি।

বেব ডব্লু কাল চৈত্রের পথে,
হুঁপিত করে ককচূড়ার শাখা,
বিহ্বল-কশা তীক বরষীর বুধে,

চোখের সৃষ্টি কালো পর্দার ঢাকা ;
উৎসুক চোখ কোনো বাধা নাহি বোকে,
বহুমেহর সৃষ্টি কাহার বোকে।

জলভরক রিভিকিবি বর্ণে
পাগল হাততার এলোমেলো আনাগোনা,
ক্লাভ পরনে দীর্ঘ এহর পোনা :
তাল। বনের স্রাতি রিত মনে।
দ্বিগুণ আবারে রূপালি বস্টা বাবে
আলর উবা নুতন আলোর লাকে।



টমাস আল্ভা এডিসন ও চলচ্চিত্র শিল্প

ঐনলিনীকুমার ভট্ট

বর্তমান যুগে যে সকল আবিষ্কার দ্বারা মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ লাভিত হইয়াছে, যেগুলির মধ্যে সূর্যপ্রসারী সভাবনা বিদ্যমান, তন্মধ্যে অনেকগুলিরই আবিষ্কর্তা বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক টমাস আল্ভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১)। চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সত্য অগণ বিশেষ ভাবে তাঁহারই দিকট ঐক্য।

১৮৮৯ সনে এডিসন কর্তৃক প্রথম তাঁহার চলমান ক্রিয়ারশীল চিত্র এবং তাঁহার অদভিকাল পরে ‘এডিসন কিনেটো কোপ’ উদ্ভাবিত হয়। প্রথম চলচ্চিত্র ইন্ডিয়ান এডিসনেরই আবিষ্কার এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন কোম্পানীর জন্ম কিস্তি চলচ্চিত্র জুলিয়ার উদ্ভেদে ইহা ব্যবহৃত হয়।



টমাস আল্ভা এডিসন

তাঁহার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার দ্বারা পরোক্ষভাবে কিন-শিল্পের উৎকর্ষ লাভিত হইয়াছে সেগুলি হইতেহে—টেলিফোন, বার্ড, প্রেরণাবির পদ্ধতির উন্নতিবিধান, কনোগ্রাফ, ইন্সক্রিপশনিস্ট ল্যাম্প (ভাবের প্রদীপ), ইলেকট্রিক ভারদামো, কিনেটোগ্রাফিক ক্যামেরা এবং চলচ্চিত্রের ক্যামেরার জন্ম কটোগ্রাফিক কিন।

প্রথম বর্ষ বংসর চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র ৫০ ফুট দীর্ঘ কিন-মুদ্রে বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপ এবং স্থানীয় সাময়িক ঘটনাবি প্রদর্শিত হইত। পরে, এডিসন কোম্পানির উদ্যোগে প্রযোজিত “বি লাইফ অব এল আমেরিকান কানারিয়ান” (একজন আমেরিকান কানারিয়ানের জীবন) এবং “বি ট্রেন

রবারি” (ট্রেনে ভ্রমণ) এই দুইটি ছবির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীমূলক চিত্রের প্রবর্তন হয়।

১৯০১ সালে চলচ্চিত্রের ডিরেক্টরের অগ্রণী তেজিত মার্ক গ্রিকিথ প্রণীত মহালাগরের দক্ষিণ উপকূলের লবঙ্গসরব্যাপী চমৎকার আলো এবং ঐতিহ্যের আবহাওয়াসুন্দ পরিবেশে কিস্তি চলচ্চিত্র জুলিয়ার উদ্ভেদে একটি কোম্পানিসহ ভ্রমণ গমন করেন। সেখানে হলিউড এবং ইহার পারিপার্শ্বিক এই নৃতন আর্টের মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট মার্কিন শিল্প জন্মে বিকাশলাভ করিতে থাকে।

১৯২৭ সন পর্যন্ত চলচ্চিত্র ছিল শুধুমাত্র মুক ছায়াচিত্র। কিন্তু অবশেষে টেলিফোন এবং বেতারে বাক্যলাপ ও কথ-



সববাহী মলসরবিত এডিসন “শিপহোল” কিনেটোকোপ বহু দাবির বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কলামোশন উদ্ভাবিত হইয়াছে চলচ্চিত্র শিল্পের সেগুলির প্রবর্তন অপরিহার্য হইয়া গিয়াছিল। ১৯২৭ সনে প্রথম লবাক চলচ্চিত্র “ক্যাপ সিলার” নির্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক, ডিরেক্টর, অভিনেতা সকলেই ব ব মূল টেকনিক বা কলামোশন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা লবদে সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং বিশ্বরকর ক্রমভাৱ লহিত ইহাতে লাকল্যলাভ করিলেন। অতিরিক্ত লংলাপ লকীত এবং লবের “একট” চিত্রের অবিচ্ছিন্ন অদ-বরণ হইয়া গিয়াছিল। প্রমি ভাবে বৌদ ছবিগুলি লুপ্ত হইয়া উঠিল—চলমান মুক ছায়াচিত্র পরিণত হইল লবাক চলচ্চিত্রে।

বাংলা ও বাঙালী

ঐশ্বরীলচন্দ্র ঘোষ

৬

অর্থনৈতিক বিপর্যয় হেতু পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই আজ বেকারসমতা ও তাহার ফলে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা জাতীয় জীবনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাস্তবিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেই কুটীরশিল্পের প্রসার কমিয়াছে ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের অবনতিও ঘটিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, যন্ত্র-চালিত বৃহৎ কারখানায় কুটীরশিল্প অপেক্ষা অল্পসংখ্যক শিল্পী অধিক উৎপাদন করে। এদেশে যখন বৃহৎ শিল্প ও কারখানা বিশেষ ছিল না তখন দেশের জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা এখনকার অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কারণ সেই সময় দেশের আর্থিক কাঠামো গ্রাম্য অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন সাধারণতঃ গ্রাম ছাড়িয়া অর্থ উপার্জনের জন্য লোকদের শহরে ও শিল্পক্ষেত্রে বাইতে হইত না।

আমাদের দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রায় শতকরা নব্বই জন কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকে। যে কয় মাস কৃষিক্ষেত্রে কোন কাজ থাকে না সেই কয় মাস বিনা উপাধানে তাহাদের দিন কাটাইতে হয় অথবা উপাধানের জন্য গ্রাম ছাড়িয়া অন্তঃস্থ বাইতে হয়। সেই সময় নিজ গ্রামে থাকিয়া তাহাদের জীবিকা উপাধানের পক্ষে একমাত্র কুটীরশিল্পই বিশেষ উপযোগী।

সর্বপ্রথম আপানই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে কুটীরশিল্পের উপকারিতা বুঝিয়া একই সঙ্গে তাহার বৃহৎ কারখানাগুলি ও কুটীরশিল্পসমূহ সুন্দরভাবে সুগঠিত করিয়া অল্পব্যয়ী পড়িয়া তুলিয়াছিল। আপানে প্রস্তুত প্রত্যেক জিনিসই বিশ্বের বাজারে এত সস্তায় বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে যে, তাহাতে যুক্তরাজ্যের, যুক্তরাষ্ট্রের, এমন কি জাপানের বড় বড় শিল্পপতিরাও ব্যবসায়ক্ষেত্রে আপানের প্রতিযোগিতা কি করিয়া রোধ করিবে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপান তাহার বৃহত্তর কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের অনেক অংশ নিকটবর্তী গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে বৈজ্যাতিক শক্তি পরিচালিত কুটীরশিল্পগুলির দ্বারা অল্পখরচায় তৈরি করাইয়া দেশ-বিদেশে সস্তায় মাল চালান দিতে সক্ষম হইয়াছিল। স তাহার বৃহৎ ও কুটীরশিল্পে মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা প্রাচ্য

ও পাকিস্তানের সকল দেশের বাজারে নানারূপ রেশম, দেশলাই, ঘড়ি, এবং সাবান ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ভাবে জাপান তাহার জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো যে কিরূপ সবল করিয়াছিল তাহা সুবিদিত। সকল ক্ষেত্রেই যে উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন খরচ কমাইতে পারা যায় তাহা ঠিক নয়। ইহার দ্বারা অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়।

আমি পূর্বে প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যের শ্রমিক সরকার নিজেদের দেশের বেকারসমতা ঐকরূপ মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা সমাধান করিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বাধীনতার দাবী যে বাস্তবিক শিল্পের প্রসার ভিন্ন এবং বাস্তবিক যুগে কুটীরশিল্পের দ্বারা দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারা বাইবে না তাহাদের অবগতির জন্য আমি ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার হইতে প্রকাশিত ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে শ্রমিক সংখ্যাচূপাতসহ মোট কারখানার সংখ্যা নিয়ে দিলাম :

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ শ্রমিক ও কারখানার সংখ্যা :

শ্রমিক সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা	মোট শ্রমিক সংখ্যা (হাজার)
১১-২৪	১৫,৬৪০	২৬২
২৫-৪৯	১২,৭৩০	৪৪৬
৫০-৯৯	৯,৭১০	৬৬৩
১০০-২৪৯	৭,৮১০	১২১২
২৫০-৪৯৯	২,৯২০	১০১৭
৫০০-৯৯৯	১৩০০	৯০৮
১০০০-১৯৯৯	৫২০	৮০১
২০০০-৪৯৯৯	২৫০	৭৪৩
৫০০০ ও তদুর্ধ্ব	৬০	৪৩৮

বৃহৎ ও ছোট ছোট কুটীরশিল্পগুলি হইতে মিশ্র উৎপাদনের দ্বারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাস্তবিক শিল্পোন্নত দেশ যে কতটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা উপরে প্রদত্ত বিবরণী হইতে সহজেই বুঝিতে পারা বাইবে।

এদেশের ছোট ছোট শহরগুলির ও পল্লী-অঞ্চলের উন্নতি-সাধন না হইলে কুটীরশিল্পের প্রসার সম্ভবপর নয়; কারণ এই সব স্থানের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অত্যন্ত স্বল্প-স্বল্পীয় ব্যয় দ্বারা না থাকিলে যথেষ্টসংখ্যক শিল্পী পাওয়া কঠিন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি দ্রুত

শহর (Township) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উহা যে কতটা সাকল্য অর্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। আশঙ্কা হয় বহু অর্থব্যয়ে তৈরি এই সব পরিকল্পনার খণ্ডাগুলি শেষ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরেই থাকিয়া বাইবে। যাত্রা করেকটি আদর্শ নগর তৈরি করিলে প্রদেশের জনসাধারণের কি বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য ইহার দ্বারা পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাণের কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি বাস্তুহারাণের মধ্যে জমি বিতরণের বিষয়ে করেকটি কথা প্রদেশ-সরকারের গোচরে আনিতেছি। গুনিয়াছি যে, অনেক শক্তিশালী ধনী ও মতলব-বাজ লোক বাস্তুহারাণের নামে ভাল ভাল জমি প্রদেশ-সরকার কর্তৃক বন্টন করাইয়া পরে কিছু বেশী মূল্য দিয়া তাহাদের নিকট হইতে অন্যে ও বেনামে হস্তান্তর করিয়া লইয়াছেন ও এখনও লইবার চেষ্টা করিতেছেন। একথা সত্য হটুক আর নাই হটুক, প্রদেশ-সরকার কর্তৃক বাস্তুহারাণের মধ্যে জমি বন্টনের এইরূপ একটা সর্ব্ব থাকা উচিত যে, বাহাদের মধ্যে এই সমস্ত জমি বন্টন করা হইবে তাহারা অন্ততঃ ১০ বৎসরের পূর্বে উহা দান, বিক্রয়, লীজ, বন্ধক দেওয়া অথবা কোনরূপ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। যদি তাহা করেন তাহা হইলে এই সমস্ত জমি উচিত মূল্যে প্রদেশ-সরকারকেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্ব থাকিলে মতলববাজ লোকেরা সহজে বাস্তুহারা-দিগকে অর্থের এলোডন দেখাইয়া সরকার কর্তৃক বন্টিত জমি লইতে পারিবেন না।

যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ড তুলিয়া দিয়া কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এক্ট-এর অধিকরণে একটি 'কর্যাল ইম্প্রুভমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট এক্ট' পাশ করেন তাহা হইলে জন-সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। বেক্স তাহা কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এই শহরের উন্নতি-সাধন করিয়াছে এবং শহরটিকে চতুর্দিকে বেক্স ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত করিতেছে ঠিক সেইভাবেই এই এক্ট অল্পদূরে প্রত্যেক জেলাকে অথবা কতিপয় জেলা একত্র করিয়া করেকটি ট্রাষ্ট গঠনের ব্যবস্থা করিলে প্রদেশের ছোট বড় শহরগুলির ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দ্রুত উন্নতিবিধান করিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ-সরকারকে প্রস্তাবিত ট্রাষ্টগুলির জন্য কোনও ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট যে প্রকারে তাহার ব্যয়ভার বহন করে ঠিক সেই পদ্ধতিতে এই ট্রাষ্টগুলির আয়ের ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা

বাইতে পারে। জেলার ছোট-বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া পল্লী-উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক শক্তির ব্যবস্থা, নলকূপ স্থাপন, রাস্তা তৈরি, মধ্যবিত্তদের বাসের উপযোগী গৃহ-নির্মাণ, পুষ্করিণীর পক্ষোদ্ধার, অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার ইত্যাদি নানারূপ জনহিতকর কার্য এই ট্রাষ্ট অথবা ট্রাষ্ট-গুলির কর্তৃত্ব হইবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান, ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার অথবা ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, স্থানীয় বার এসোসিয়েশন-গুলির সভাপতি, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ হইতে মনোনীত করেকজন সভ্য, সরকার হইতে মনোনীত কতিপয় সভ্য এবং বেসরকারী অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের লইয়া এই সকল ট্রাষ্ট গঠন করিলে ভাল হয়। ট্রাষ্টের ক্ষমতা স্বদূরপ্রসারী হওয়া দরকার বাহাতে সকল রকম জনহিতকর কার্য ট্রাষ্টগুলি সম্পন্ন করিতে পারে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের বেক্স 'ডিবেক্সার' দ্বারা টাকা সংগ্রহের ক্ষমতা আছে সেইরূপ ক্ষমতা প্রস্তাবিত ট্রাষ্টগুলির থাকা দরকার। ইহার দ্বারা স্থানীয় পুঁজিপতিরা এই সমস্ত ডিবেক্সার খরিদ করিয়া একই সঙ্গে ট্রাষ্টগুলির আর্থিক অবস্থা দৃঢ় করিতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে স্ব-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। প্রত্যেক ট্রাষ্টের সভ্য-সংখ্যা যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত, নচেৎ এইগুলি কার্যকরী হইবে না, কেবল রাজনৈতিক দলাদলির যুগ হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রস্তাবিত ট্রাষ্ট ছাড়া, আসানসোলের খনি অঞ্চলে বেক্স হেলথ বোর্ড আছে ও যেভাবে উহা কার্য করিতেছে, বেক্স মাইনিং স্টেটমেন্ট এক্টের অধিকরণে প্রত্যেক জেলার সেইরূপ একটি করিয়া হেলথ বোর্ড স্থাপন করা আবশ্যিক। যদি জেলাগুলিতে কর্যাল ইম্প্রুভমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট এবং হেলথ বোর্ডগুলি পাশাপাশি কার্য করে তাহা হইলে অচিরেই প্রদেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সকল দিক হইতে উন্নত হইবে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এবং কলিকাতা করপোরেশন যেমন একই স্থানে নিজ নিজ কার্য চালাইতেছে, ঠিক সেইভাবেই স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এই সমস্ত ট্রাষ্টের সঙ্গে কার্য করিতে থাকিবে। অনেকে মনে করেন উপস্থিত জেলা-বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ডগুলির দ্বারা জনসাধারণের অর্থব্যয় ছাড়া বিশেষ কিছুই উপকার হইতেছে না।

প্রদেশ-সরকার যদি এই সঙ্গে তাহাদের ট্রেট ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মারফত পল্লী অঞ্চলে সাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলার সদর রাস্তাগুলিতে (Trunk

Road) বৈজ্ঞানিক ট্রামওয়ের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে প্রদেশের বহু স্থানে অনেক ছোট বড় শহর আপন হইতেই গড়িয়া উঠিবে।

প্রায়শঃই প্রদেশের জন্য একটি গরীব ব্যাঙ্কের কথা আমি পূর্বে প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। উহা নিউ সাউথ ওয়েলস্ সরকার-পরিচালিত কর্যাল ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্ নামে পরিচিত (ভুলক্রমে নিউজিল্যান্ড বলিয়া লেখা হইয়াছিল)। অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি শহরে ইহার প্রধান আশিস এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে ইহার অনেকগুলি শাখা আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ৬১½ লক্ষ পাউণ্ডের উপর অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি টাকা এবং সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪৫ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৬ কোটি টাকা মোটামুটি ছিল। ঐ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে। একটি সরকারী এজেন্সি বিভাগ ও অপরটি সাধারণ ব্যাঙ্ক বিভাগ। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার উপর শতকরা ৩ টাকার হারে সুদ দেওয়া হয় ও ব্যাঙ্ক লগ্নি টাকার উপর শতকরা ৪ হইতে ৪½ টাকা হারে সুদ গ্রহণ করে। কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নের উপযোগী পুস্তক প্রকাশ, ফিন্স তৈরি, পড়িবার জন্য বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। তিন জন কমিশনার ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করেন ও অনেকগুলি অভিজ্ঞ ডায়ালগার আছেন যাহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের জমি উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণের জন্য ঋণ দিবার পূর্বে আবেদনকারীর কার্যক্ষমতা বিচার এবং জমি ও সম্পত্তির মূল্য ইত্যাদি স্থির করিয়া দেন। ব্যাঙ্ক ছোট ছোট চাষের উপযুক্ত জমি একত্রীকরণের জন্য (amalgamation of small holdings) টাকা ধার দিয়া কৃষকদের বিশেষ উৎসাহপ্রদান করিয়া থাকেন। গরু, মেঘ, মুরগী ইত্যাদি নানাপ্রকারের পশু-পালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করাইয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের বৃত্তি দিয়া ব্যাঙ্ক বিদেশে পাঠায় এবং তাহাদের ঐসব বিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার ও বহু জনহিতকর কার্যের নিমিত্ত সাধারণকে ঋণ দিবার ব্যবস্থাও এই ব্যাঙ্কে আছে। ব্যাঙ্ক নিজ কর্তৃত্বীদের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে ও ঐজন্য বৃত্তি দিয়া থাকে। ইহার সরকারী বিভাগের টাকা প্রদেশ-সরকার দিয়া থাকেন, সাধারণ বিভাগের টাকার জন্য সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করা হয়। প্রদেশের ও প্রদেশবাসীর বাহাতে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় এবং মহাজনের নিকট হইতে কৃষিকীর্ষী, শিল্পী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের টাকা ধার করিতে না হয় ইহাই ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ-সরকারের সাহায্যে ঐরূপ একটি কর্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের মনে হয়, যদি ঐ ব্যাঙ্কের লভ্যাংশের শতকরা ২০ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখিয়া বাকী শতকরা ৮০ টাকা সরকার অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৪০ টাকা অংশীদারদের মধ্যে নগদ বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট শতকরা ৪০ টাকা দ্বারা ব্যাঙ্ক অথবা প্রদেশ-সরকার কর্তৃক জমি সংগ্রহ করিয়া প্রতি ছয় মাস অন্তর অথবা প্রতি বৎসর অংশীদারদের মধ্যে ১০ বিঘা, ২৫ বিঘা, ৫০ বিঘা ও ১০০ বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি কিংবা বসন্তবাটী নির্মাণ করিয়া লটারি দ্বারা পুরস্কার-প্রাপ্তদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের শেয়ার ধরিয়া রাখিবার আগ্রহ বেশী হইবে। উক্ত লটারিতে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম উঠিবে তাহাদের নিজ নিজ নির্ধারিত গ্রামে ঐরূপ জমি বিতরণের ও গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থা ব্যাঙ্কগুলির করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত 'কর্যাল ব্যাঙ্ক' বাহাতে যে-কোনও নৃতি তহবিল অথবা জনহিতকর ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টীস্বরূপ কার্য করিতে পারে, আইনসম্মতভাবে সেইরূপ ক্ষমতা ঐ ব্যাঙ্কের থাকার দরকার। আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় ও ছোট-খাটো নৃতি তহবিল এবং জনহিতকর ট্রাষ্ট আছে—ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে। যদি ঐ সমস্ত নৃতি-তহবিলের এবং ট্রাষ্ট ফণ্ডের টাকার প্রস্তাবিত কর্যাল ব্যাঙ্কের অংশ ধরিয়া করা যায়, অথবা দীর্ঘকাল মেয়াদে কতকংশ অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় তাহা হইলে নৃতিমন্দির, নৃতিমূর্তি ও নৃতিস্তুত অপেক্ষা ইহাতে দেশের ও দেশের অনেক বেশী কল্যাণসাধন হইবে। মনীষী ব্যক্তিগণের নৃতিরক্ষার ইহা অপেক্ষা মহৎ উপায় আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ নৃতি-ভাণ্ডার ও কবিগুরু-রবীন্দ্রনাথ নৃতি-ভাণ্ডারের পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বেচ্ছানন্দ দানের দ্বারা মঠ ও মন্দির তৈরি করা অপেক্ষা জনহিতকর কার্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'বদেশী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"পূর্বেই বলিয়াছি সন্যাসের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও কিছু বদেশের জ্ঞান উৎসর্গ করিবে। তা হাত্তা প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে প্রামাণ্য প্রকৃতির তার এই বদেশী সন্যাসের একটি প্রাণ্য আবার হুহু বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাত্মক বটেই না। আমাদের দেশে বেচ্ছানন্দ দানে বজ্রা বজ্রা বঠ-মন্দির চলি-

তবে, এবেশে কি লম্বা ইছাপূর্বক আপনার আশ্রয় হাম আপনি রচনা করিয়ে না ?”

যদি প্রস্তাবিত ‘কুগ্যাল ব্যাঙ্ক’র পল্লী উন্নয়ন কণ্ডে আমাদের লম্বা ঐরূপ বেঞ্ছানন্ত দানের টাকা জমা দিবার

ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বাংলা ও বাঙালী বর্ধারই রবীন্দ্রনাথের আকাজ্ঞা পূর্ণ করিয়া অধিকতর উজ্জলভাবে তাঁহার স্বত্তিরক্ষা করিতে পারিবেন।

ভুল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

শান্তকী অরপূর্ণা সকালবেলা পেছিলেন পাশের বাড়ীতে তাঁর কুসীমিতির সঙ্গে কোথার ভাল তেল পাওয়া যেতে পারে সেই নিয়ে কথা বলতে, তখন পুত্রবধূ সুবমা রায়ারই ছিল। কিন্তু কিছুকণ পরে যখন অগ্রসরটিতে কিবে এলেন তখন বেবেশ রায়ারই কেউ সেই, একেবারে খোলা, তবু একবারে তাড়ের হাঁড়িট্ট সোঁ-সোঁ করছে। বেবে ত বনটা পেল আরও বিগড়ে। কথা আরম্ভ হয়েছিল তেল নিয়ে এবং জিনিষটি শিখিল বলেই হোক বা যে কারণেই হোক সেটার মাধ্যমে বাহারের সমস্ত জিনিষের তালময় আলোচনা হয়ে গেছে; এবং আজকে আর কাউকে বলে দিতে হবে না যে জিনিষের তালময় হুটো বিক আর নাই, এখন সব মলসর্কব। বাহারের জিনিষ ত আছেই—তার উপর যত্নের এই বাহুবলিও—

—বলি ও বোঁ, কাণের মাথা বেঁধে বলে আছ নাকি।

এটা অবশ্য অরপূর্ণার চালাকি। এখন যারের তাকেই কেউ আর কথা বলে না। কিন্তু উপার কৈ, বা বরাক গলা তাঁর তাতে বাড়ীর লোক হরের কথা সমস্ত পাড়ার লোক ভনতে পারে অচা মাথা বাওয়ার মত সুবরোচক শব্দটাও প্রয়োগ করতে হয়।

সুবমা যত্নের ভেতরে এক কোণে তার হোট ক্যানবাক্সটার নামনে বলে একটা হোট কাপড়ে লজাপাতাওয়ালা করেকট্ট ফুল ফুলছিল। শান্তকীর হকারে তার দ্রুতচকিত হাত হতে ফেমটা পড়ে গেল, সে ভাড়াভাড়া ‘বাই বা’ বলে জিনিষ-ভলোকে কোষরকনে নামনে রেখে একরকম বৌতে বাইরে এলে শান্তকীর কাছে ঠাঁতাল। বরল তার বোল-দতেরো হবে, বরনের ফুলনার চোবরুণের চেহারা আরও কচি-কচি মনে হয় এবং চলাকেরা ভাবতকী থেকে মনে হয় বহুনি বেতে সে ভালরকম অভ্যস্ত।

শান্তকী তেলের তালময় পরীক্ষা করার মত সুবতকী করে তীক্ষ্ণরূপে অনবৃত্তবেশা বহুর আপাদমস্তক বিল্লবণ করতে করতে বকার দিবে ওঠেন—মুঝোছিলে নাকি ?

সুবমা, দুটানো ঝাঁচলটা এক হাতে তহিয়ে ফুলতে ফুলতে

ও অচ হাতে বাওয়ার একট্ট দুট্টকে লাকীবানার তকীতে ভড়িয়ে বরে অভ্যস্ত লছিতভাবে উভর বের—না ত।

অরপূর্ণা আরও বলে ওঠেন—না। না। না। খুব কথা শিবেহ না হোক। বলি এদিকে ত চোণের মাথা বেঁধে হুটো বরজাই খোলা রেখে বলে আছ, কুহুরে যে সব বেঁধে গেল।

কথা হছিল রায়ারের বেটে বাহান্নার। একথার সুবমা জীবন বিল্লতভাবে ভাড়াভাড়া বরের মধ্যে হুকবার চেটা করে কিন্তু অরপূর্ণা এমনভাবে পথ হুড়ে হাঁড়িয়েছেন যে তিনি একট্ট লরে না ঠাঁতালে বাওয়ার বায় না।

অরপূর্ণা সরবার একট্টও চেটা না করে বরং সুবমার এই বিপর ভাবটা উপভোগ করতে করতে দির্জিকার চিতে বললেন, থাক, এখন আর লোককে তেতেহুড়ে কাক দেখাতে হবে না, খুব হয়েছে। আর না বেলেও, বেতেই বা কতকণ। আর ইহুলের ভাত কখন হবে তনি, ওহা কি আজ না বেঁধেই যাবে নাকি ?

সুবমা প্রায় অকুটবরে জবাব বের—আজ যে রবিবার না।

অরপূর্ণার আর লহ হয় না, একেবারে কপড়ার হুরে বলে কেলেন—বলি না হোক তর্ক শিবেছিলে বোঁমা। ভাই হোক, ওই করেই আজ পেট তরু।—বলতে বলতে তিনি রায়ারের দোরপোতা হেতে পোবার বরের বাহান্নার দিকে উঠে যান।

সুবমা এবার অকমাং অভ্যস্ত ব্যত হয়ে পড়ে, কেবল মন মন শান্তকীর গতিপথের দিকে ভাকার আর ঝাঁচলটাকে এলোমেলোভাবে দিকের হাতের ওপর জতার। কি মারামরক ফুল।

টিক ভাই হ’ল। পোবার বর বেঁকে বধাসময় ভাক আসে—বোঁমা এদিকে এস। বরট্ট এবার কট্ট কিন্তু শান্ত, মনে হয় বজা এবার বলবার মত লটিক কিছু একটা দুঁকে পেয়েছেন।

সুবমা নিয়ে বরে ঠাঁতাল, বেবে শান্তকীর হাতে সেই

ক্রেমটি। তিনি বার বার করে সেট দুইদিকে ক্রিয়ে বেরছেন, দুখানা মোটেই এসে নর। সুবহার পদক্ষেপে দুখ ফুলে তিনি তার পায়ে কিছুকণ অতুত তলীতে চেয়ে রইলেন, তার পরে হঠাৎ একটা জটিল প্রেরের লগুণীয় হওয়ার মত করে বললেন—আচ্ছা বোনা, বাতীখানা কার বলতে পার ?

এর একমাত্র উত্তর হয়, আপনায়—সুতরাং সুবনা কিছুই বলে না।

—বাতী আমার একার নয়, তোমাদের সকলের, কিন্তু বলতে পার আমি একাই বা কেন তোমাদের পেছনে হুতের মত খেটে বরি আর এদিকে তোমরাই বা কেন সবাবের মত জুল লতা পাড়া নিয়ে নর কাটাতে। কেন ? অবন দাও, চূপ করে থেক না।

কিন্তু চূপ করে থাকারাই ত এর একমাত্র উত্তর, সুতরাং সুবনা মতবুধে চূপ করে থাকে। শুধু এক বার এক দুহুতের মত সে অত্যন্ত আতচোখে বেধে নের শান্ততীর হাতে তার অমন লাগের সেলাইটির কি দশা হ'ল।

ওই চোরা চাউনিটুকুই বধেই। অরপূর্ণা ক্রেমতত সেলাইটিকে এক হাতে কটিন পুলিসী তদ্বিতে বরে বললেন—কথা ত এদিকে বার হয় না, কিন্তু কাকের বেলার হাকার মকমের অকাক করতে শিবেহ। কেন, এইটে দিয়ে কার কতটুকু উপকার হবে তুমি ? আর পেরতর বাতী, এ কি এই মকম বিবিশনা করার কারণ নাহি। না হোট গুিকটির মত খেলবারই সময় আছে ? তুমি না বরের বোঁ, পেরত বাতীর ভালমন্ কিলে হয় লেটুকু বোক না ?

প্রতিটি প্রেরের নলে ক্রেমটি অরপূর্ণায় হাতে এক বাপ করে বেশী নিপীড়িত হচ্ছিল, ওদিকে সুবনার অবস্থাও তেমনি। তার কাণ দিয়ে শান্ততীর কথাগুলি বিশেষ বাচ্ছিল না, সে শুধু সেলাইটির অবস্থা নিয়ে বিভ্রত ছিল। শেষের প্রেরে বধন সেটির ওপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়ল তখন সে আর পারল না, এক মকম দাঁতকে উঠে শান্ততীর বিকে হ' পা এগিয়ে এসে বলে ফেলল—ওটা...ওটা...

হী ওটা তোমার মাথা আর আমার মুতু। বাও আর লং হয়ে ঠাঁড়িয়ে থেকো না, রারা বেশ গিরে। আর মনে রাখবে এ সব বেলার সময় তোমার আর নেই। বাও। বলতে বলতে অরপূর্ণা নিজেকে সেলাই সমেত ক্রতপদে নিজের পুখার হোট বরটিতে চলে গেলেন। সুবনা কিছুকণ পাথর হয়ে সেখানেই ঠাঁড়িয়ে রইল, সেলাইট বে তিরবিরের মত তার হাত হাতা হয়ে গেল সে বুঝতে পারল, কিন্তু তার অবন মন শুধু হুটো কথাই বার বার অতুতবরে বলতে লাগল—ওটা...ওটা...ওটা...

বার কোন বাধাযুত লভ্যই বাই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এর বেশী বলাই বা বার কেমন করে। বোঁ হয়ে

শান্ততীকে ত আর বলা বার না বে ওটা। আমার বাতীর মত কবাল করছিলাম, বিশেষ করে বধন মোটে এক বছর বিরে হয়েহে। সে-ও পেরত বাতীর বেরে অর্থাৎ বে সব বাতীতে এ মকম সৌবীন সেলাইয়ের বিশেষ চর্কা বাই, সেখানে সেলাই হয় কাঁধা থেকে আরম্ভ করে দুখ জোর আসন পর্যন্ত, শান্ততীর তাবার বাতে কারও কোন উপকার হয় সেই মকম। কিন্তু সুবনা বেশ হোট বরসেই এই সেলাইটা কোন মত্রে কার কাছে শিবে কেলছিল, কিন্তু সে এমন লাভুক বে বিরের পরে গুরো একটা বছর লেগেছিল তার বাতী শক্তিময়ের এটা আবিষ্কার করতে। তার পরেই তার এই অহুরোব বা আবার বাই বল। সুবনা শান্ততীর আনগতিক প্রথম হতেই চিনেহে। কারণ পরীব বরের বেরে সে এবং বহুমি বেবেই বাহব। তাই সেলাইয়ের লাভ সরঞ্জাম ইত্যাদি সে অত্যন্ত লতর্পণে বার করেছিল এবং একটু একটু করে এই এক লগাহে সে একটুকু হুলেহে। আর মোটে হ'বিন, আসহে শনিবার শক্তিমর বাতী আসবে...ভবন...?

সুবনা ইতিমধ্যে এসে চূপ করে উল্লনগোড়ার বসে পড়েছিল, কিন্তু রারার কোন জিনিষ তার চোখেই পড়ছিল না। হঠাৎ কেনমত তাত উললে পড়ার শবে সে লচকিত হয়ে ওঠে এবং ভাড়াভাড়ি বট হতে ঠাঁড়িতে একটু জল ঢেলে দিয়ে আবার চূপ করে বসে পড়ে। ওঘরে শান্ততীর ঠাঁড়িটুকির নক খোনা বাছে, বোব হয় কোথার কতটুকু কি তাবে আছে বেধেহেন।

শক্তিমর কাক করে কলিকাতার। সাধারণ পরীব পেরত বরের হেলে—কি প্রকার বিভা ও চাকুরি লংএ করতে পারে টোটা লহকেই অহুয়ের। কলিকাতা হতে এ প্রাবটা মাইল চল্লিশেরও ওপর, সুতরাং তেলি প্যাসেঞ্জারি করা লতব হলেও শক্তিমর পারে না, তার পরীব দুখ ভাল নয়। লম্ভতি তার একজন পরিচিত লোক কলিকাতার একটা বিট্টর বোকাব করেছে, সেইখানেই সে থাকার একটু কারণ পেয়েহে। বিনে আপিলে কাককর্ষ আর রাজে বোকাদের হিসেবপত্র বেধা—এই মকম করে কোন মকমে চলে বার। বাতীতে তার না, বোঁ ও হোট হুট তাই, হুলে পড়ে। বাতীতে তাকে কিছু কিছু পাঠাতেই হয়, অতত: তাই হুটোর হুলের বাইনে আর মাকে মাকে বই টাই এটা সেটা কেনার মত কিছু। এই হ'ল সুবনার বাতী আর এই বরের সে মত বোঁ সুতরাং তাবের বরের কাকই হ'ল আলাখা এবং সেট একমাত্র বাতের লংহান করা। কোথার কতটুকু কি তাবে আছে সেট রেবে ঢেকে তহিরে তোলা।

শুধু ত মাকে মাকে এই অকাকের বেশা লমত প্ররোজন-মুদিকে অভিক্রম করে বেগে ওঠে, নইলে শক্তিমর বলবে কেন—

বোঁ, তা হলে কথা হইল ওই রকম একটা কুল কুলে
রাখবে। বেশ তখন ন্যা, কেমন আমি লবাইকে দেখিয়ে
বেড়াব, এ রকম বোঁ কার আছে দেখব তখন, হ্যাঁ।

সুমনা লতা অত্যন্ত তরে উঠেছিল কিন্তু সেও হাতে নি।
কথা হচ্ছিল নত রবিবার শেষ রাত্রির দিকে বিছানার তরে।
এখনি শক্তির উঠে টেনেদের পথে রওনা হবে। সুমনা
অনেকখানি লকোচ কোর করে কাটরে অসুট বয়ে বলে
কেলস—তুমি আমাকে বোঁ বলবে না বল।

শক্তির নকরী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ এ কথার একটু
বিশিষ্ট হয়ে কিন্তু তখনই ব্যাপারটা বুকে নিয়ে সুমনাকে
একবারে বুকের মাঝে টেনে এনে একটা মজার জিনিস
পেরেছে সেই ভাবে হাসতে হাসতে বললে—বাঃ যে তা হলে
তুমি কার বোঁ তুমি ?

না...না...তা...ওরা...সুমনা অস্বাভাবিক মনোভাব লক্ষ্য
লাল হয়ে ওঠে। সে হয় ত বলতে চার তার অনেক বন্ধু-
বান্ধবের কাছে এই নাম ডাকটা শুনেছে এবং সেটা কত ভাল
লাগে।

শক্তির তাকে আরও বিস্মিত ভাবে জড়িয়ে ধরে হাসতে
হাসতে বলে—না, না, না, এ হাতা কি আর কথা দেখনি বোঁ
...খুঁড়ি...সুমনা, তুমি আমার সুমি। হ'ল ?

সুমনার কীভাবে এই বেশ প্রথম নামকরণ হ'ল, সে লক্ষ্য
পালানোর পথ পায় না, বাবীর বুকে সুখ স্মৃতির অর্ধস্মৃতি বয়ে
বলে—হাত। বায়ে, তোমার জিনিসগুলো বেঁধে দিতে
হবে না ?

শক্তির বাহুবল একটুও আলগা না করে ছেলেমানুষি
চঙে মাথা নেড়ে বলে—কি হবে। আমার জিনিস বাঁধাই
আছে।...

এ শনিবার সে বাড়ী আসে নি কিন্তু লিখেছে আসছে
শনিবার আসবেই। তখন ? তখন সে তাকে কি বিবে ?

তারের সময় হয়ে এল, সুমনা হাঁড়িটা নামানোর উত্থাপ
করতে থাকে। তাকে ভালো লাগে হাত' হুটো তার বহু-
চালিতের নত হাঁড়ির ধারে বলে যায়। কিন্তু হাঁড়ি তার
চোখে পড়ে না, ও বেশ ক্রমশঃ সেলাইয়ের কাপড়টা। সুমনা
অত্যন্ত অতনবভাবে হাঁড়িটা বগাছানে বাহিরে মাত পালতে
বলে যায়।

কুল করেছে তার বাবী। এরকম বোঁ বয়ে বয়েই আছে,
এ নিয়ে গরু করার কিছু নাই, তবু আছে হুর্লভার লক্ষ্য।
সুমনা কোর করে হাঁড়িটাকে একরকম নত করে জড়িয়ে ধরে।

তার পর হুপুবেলা। বাওরাদাওরার পাঠ অনেককণ
হুকে গেছে। অপরূপা বকিন দিকের দারাদার বাহুর পেতে
কাঁধ জড়িয়ে যুঝোচ্ছেন, সুমনা শোবার ঘরে ক্যানবাজটির

লাগনে টিক সেই আরপাটিতে বসে চুপচাপ আনালা নিয়ে
বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে বেগানে ঝাপটা এনে পুঁই-
মিটার কাছে মিলে গিয়েছে সেই কোণে অত্যন্ত সুকানো-
লম্বিত ভঙ্গীতে একটা অপরাধিতা লতা তার গুটিকরেক কুল
নিয়ে বীয়ে বীয়ে মিছেকে বাইরের আলোর মধ্যে মেলে ধরছে,
সুমনার দুটি টিক সেইটির উপর নিবন্ধ। ও লতাটি সে মক্কুকে
বিয়ে বোণাক করে কত বয়ে লাগিয়েছে, কতদিন তার তর
হয়েছে শান্ততা পুঁইভাটা হিঁড়তে গিয়ে লতাভর টেনে উপড়ে
না কেলেন। আজ সেই লতা পাতার পাতার কুলে কুলে
বেগে উঠছে, সুমনার বক প্রিয় কুল ওটা, কেবল কুলটা নয়,
ওর লতাপাতা সবভদ্র সবটা নিয়ে। সে বাবীকে একবার
লক্ষ্য বদলের দিকের করেছিল—তোমার কোন্ কুল ভাল
লাগে ?

শান্ত বিন আগের সেই রাত্রিশেষ। শক্তির একটু ভেবে
নিয়ে হেসে বলেছিল—আমি ভাল চিনি না, তোমার যেটা
ভাল লাগে সেইটাই। তবে সবচেয়ে ভাল আমার এই
লক্ষ্যবতী লতা...বলতে বলতে বিস্মিত আবেগে...

বৌদি। ও বৌদি। কোথা হতে হুটতে হুটতে এসে
মক্কু গিহন থেকে তার ছোট হাত হুটো নিয়ে সুমনার চোখ
হুটো চেপে ধরে এবং নিজের চোখ হুটো বগানভব বক বক
করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—জান বৌদি কি এবেদি ? বল
বেদি, তবে সুমি।

কিন্তু সন্ধ্যা সন্ধ্যা হাত হুটো জিহ্নে মনে হওয়ার সে চমকে
ওঠে এবং বৌদির হুটো বতটা সম্ভব নিজের দিকে ঘুরিয়ে
এনে হঠাৎ চিত্তাক্রান্ত ভাবে বলে—কী কেন বৌদি ? কি
হয়েছে তোমার ? অর ?

সুমনা ভাড়াভাড়া আঁচলে চোখ হুটো হুটে মক্কুকে
নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—হু
বোকা, অর হবে কেন। বাইরে তাকিয়ে ছিলাম, চোখে
কি একটা পড়ল এখনি। আজ্ঞা কই কি এবেছিল বেদি ?
চকোলেট খুঁড়ি ?

মক্কু বৌদির কাছে প্রায়ই হ'ল এক পরমা করে বোণাক
করে কিন্তু বিভ্রান্ত বার্ষিকের মত সেটা একা নিজের তোনে
না লাগিয়ে মাঝে মাঝে বৌদিকেও কিছু ভাগ এনে দেয়।
সুমনা এতে মতন অস্বাভাবিক করার কিছু নাই।

মক্কু কিন্তু একটুও বদল না, সন্ধ্যা সন্ধ্যা নিজের প্যাণ্টের
পকেটটা চেপে ধরে বলল—হ'ল না। আমার বল।

—তবে সুমি গাছে কুল ধরতে লেগেছে ? বলতে
বলতে সুমনা অত্যন্ত দ্রুতের সঙ্গে তার কপাল থেকে এলো-
মেলো কুলগুলো উপর দিকে জড়িয়ে কুলতে থাকে। হঠাৎ
তার কপালের এককোণে বেগে একটা ছোট চির ও
একটু রক্তচিহ্ন।

মকু সেটা বুঝতে পেয়ে বলল—ও কিছ নয়, একই ককি সেপেছিল। পারলে না ত, বেশ তবে এই দেখ—বলে সে পকেট থেকে একটা একাত্ত হলপয় বার করল, করে সেটা সুবহার নামনে রেখে হঠাৎ অভ্যন্ত মনোবোপের সকে হ'হাত বাড়িয়ে বৌদির গলাটা জড়িয়ে ধরে প্রায় তার কাপে কাপে বলল—ওটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে, এবার আবারটা করবে ত ?

সুবহা কুলটা দেবেই চমকে উঠেছিল। মকু তার চুরি-করা সেলাইয়ের অভ্যন্ত মনোবোপী লাবী, রোজ ইকুল বাবার আর্পে এবং ইকুল থেকে এসে তার একবার বৌক দেওয়া চাই, কতছর হ'ল এবং রুবিবার দিম এই সময়টা (এইটাই একমাত্র সুবহার চুরির সময়) সে বৌদির কাছে বলে তার কাছ বেধে। পরন্ত বিকলেও তারের মনো হুপি হুপি এই নিয়ে কথা হয়েছিল। সুবহা যে লতাপাতা-ভরালা ছোট ছোট কুল কুলহে সে মকুর মোটেই পছন্দ নয়, সে বলে কুল এমন হবে না হুয় থেকে দেখা বাবে ও দেখান বাবে। কুলের মত কুল, সে কোন্টা ? সুবহা অনেক ভেবে উত্তর দি়েছিল সে রকম বড় কুল হ'ল হলপয়, তবে বুঝ কম দেখা বার। তাই বুঝি ! তা হলে এটা কি ?

মকু মহানন্দে বৌদির গলা হতে একটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে হলপয়টা একেবারে তার বুকের নামনে উঠিয়ে আনে এবং বিকরগর্বে বলে—দেখলে ত ? আচ্ছা, তোমার ক্রেন কই বৌদি, আবারটা এবার আরন্ত করবে ত ?

শেষের কথাটা বড় লাভুক লাভুক পোদার। কিন্তু পরকথের মকু কি একটা ভেবে নিয়ে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং বেশ স্পষ্ট গলায় বলে—আর দেখো ভবন আমার মজাটা হ্যা। আমি ত ওদের বলেই রেখেছি, ভবন দেখব এমন বৌদি ওদের কার আছে, এমন বড় কুল ওদের কার কাছে থাকে। আনো, বপন বলছিল—

সেই এতই কথা ! সুবহা আর সইতে পারে না, মকুকে

একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হুপি হুপি বলে—কিন্তু সেলাই ত আমি জানি না লাবী তাইট আবার।

—আনো না ! আদর বেতে বেতে বড় বড় চোখ করে মকু বৌদির দিকে হুপ ভোলে।

—না রে।

—বাঃ, ওই যে হচ্ছিল। ওটা কোথার দেখি—বলতে বলতে মকু এদিক ওদিক তাকার, তার একই বিশ্বাসও হয় না।

—ওটা কুল হচ্ছিল তাই, ওতে হবে না।

—বাঃ বেশ সুন্দর কুল উঠছিল ত। মকুর কর্তব্যে এবার উষেপ প্রকাশ পায়।

শিঙর এই প্রশংসাও আক সুবহা সইতে পারে না, লাবী অভয় তার কাহার উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আর নয়। সে বখাসভব শান্ত হয়ে বলল—উঠছিল ত। কিন্তু ক্রি রকম করে সব বুলে গেল, বোঝ হয় কোথাও আলগা থেকে বাচ্ছে।

এর উত্তরে মকু সহসা আর কিছু বলতে পারে না, একই চিন্তিত-বিষর তাবে হুপ করে থাকে। সুবহা তার মনের ভাব বোকে, মিকেকে নামলে নিয়ে কুলটা এককণে আদর করে মিকের হাতে কুলে দেয় এবং অত হাতে মকুকে জড়িয়ে ধরে লাভুনার সুরে বলে—তার কি হয়েছে। আবার ত মনে আসবে, ভবন হবে। কি বল ?

মকু মিকের বিকটা। ততকণে নামলে নিয়েছে, তার মনে পড়ে বৌদির বিকটা, সেও তেমনি সুবহাকে জড়িয়ে ধরে বলে—তাই বুঝি হুপি কাঁদছিলে বৌদি। হুয়, তাতে কাহার কি আছে ? আমি ত কত কুলি—বলতে বলতে তার হঠাৎ কি একটা মনে পড়ে যায়, সে আবার বলে—হ্যা আনো বৌদি, বপন কাল বলছিল যে ওদের বাড়ীতে একটা বুঝ ভাল বিলেতী কুল এসেছে, আমাকে একটা ভাল বেবে বলেছে।

কিন্তু বপন ও কথা মোটেই বলে নি। সে বা বলেছিল তা কেউ জানলো না।

একটা ছড়া

ঐবিধুশেখর ভট্টাচার্য

২১শে বৈশাখ, ১৩৫০ সাল। স্বর্গীয় রামানন্দবাবু ভবন বড় কাভর, শব্যশায়ী। ঐ সময়ে তিনি জ্যোষ্ঠা কন্যা ঐশ্বরী শান্তা দেবী ও জামাতা ঐশ্বক কালিদাস নাগের কাছে রাজ্য বসন্ত রায় রোডে থাকিতেন। আমি প্রায়ই তখন তাঁহাকে দেখিতে বাইতাম। ঐ দিনেও গিয়াছিলাম। সেদিন একটু ভাল ছিলেন। কথাবার্তার মধ্যে নিয়লিখিত ছড়াটা আমাকে লিখিয়া লইতে বলিয়া মন্তব্য করিলেন—

তাঁহার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ বোব মহাশয় রোগশব্যায় নিজের বক্তাকে ইহা লিখাইয়াছিলেন। মনে হয় ইহার মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক কথা আছে। ছড়াটি এই :

এক যে রাখাল গরু চরায়

গামছা মাধায় নিয়ে

তার মাকে ধরে নিয়ে গেল

জামান ফকিরে।

শিলিমা কীদে মাসিমা কীদে

চালে নাচে বিঞ্জে।

পুঁঠি মাছটি গান করছে

নেউলে বাজায় শিঞ্জে।

রস্তিদেব

ঐবিধুশেখর ভট্টাচার্য

ঐমন্তাগবতে (২ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে) রস্তিদেবের কথা কুত্র হইলেও অতি উপাদেয়। ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই ইহার মহিমার গান করা হইয়া থাকে (“রস্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ পৃথগ্,” ২, ২১, ২)। ভাগবতকার কেন একরূপ বলিয়াছেন, পাঠকগণ নিজেই তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আমি কেবল কথাটা তুলিয়া দিতেছি।

পুরাকালে পুরুবংশে রস্তিদেব নামে এক অতি দয়ালু ও দাতা রাজা ছিলেন। শিবি ও হরিশ্চন্দ্র হইতে তিনি কম ছিলেন না। তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। বাহা পাইতেন তাহাতেই তাঁহার চলিত, তাহাই তিনি দান করিতেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সপরিবারে কষ্ট পাইতে হইত। তিনি একবারে অবসর হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি দান করা পরিত্যাগ করেন নি। বাহা পাইতেন, কেহ চাহিলে তাহাই তিনি দান করিতেন, নিজের বলিয়া কিছুই রাখিতেন না, তাহাতে তাঁহার খাওয়া হটক আর নাই হটক।

একদিন তাঁহার আহারের কিছুই নাই। সপরিবারে কষ্ট পাইতেছেন। এইরূপে তাঁহার ৪৮ দিন কাটিয়া গেল। এমন কি পান করিবার উপযুক্ত জলও তাঁহার ছিল না। দৈববশে পরদিন প্রাতে কিছু ভাল খাদ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে তিনি সপরিবারে স্নান ও তৃষ্ণার কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর তাঁহার কাঁপিতেছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা সকলেরই মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেন (“হরিং সর্বত্র সংপশ্যন”)। তিনি অতি প্রভা ও আদরের সহিত ঐ লোক খাদ্য হইতেই সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে রাজা বধন অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে বাইবেন, তখন আর একটি অতিথি

উপস্থিত হইল। এ ছিল শূত্র। রাজা ইহাকেও হরি মনে করিয়া অবশিষ্ট খাদ্য হইতে খাওয়াইলেন। এই অতিথি গেলে আর একটি নিকট জাতীয় অতিথি উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কতকগুলি কুকুর। সে বলিল ‘মহারাজ, এই কুকুরগুলি ও আমি বড় ক্ষুধার্ত, অন্নদান করুন।’ রাজা বহমান ও সৎকার করিয়া বাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই দিয়া সেই অতিথিকেও নমস্কার করিলেন।

তখন রাজার নিকটে কেবল একটুমাত্র জল আছে, বা একজনের মাত্র কোনরূপে চলিতে পারে। রাজা তাহাই পান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময়ে একটি চণ্ডাল উপস্থিত হইয়া বলিল, ‘মহারাজ, আমি এক অমঙ্গল ব্যক্তি। আমাকে একটু জল দিন।’ তাহার ঐ করুণাপূর্ণ কথায় রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলিলেন ভাগবতকার তাহা অমৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (“ইদমাহামৃতং বচঃ।” সেই কথাটি এই (২, ২১, ১২)

“ন কাময়েহহং পতিমীশ্বরায় পরা-

মষ্টাঙ্গিসিদ্ধি মপুনর্ভবং বা।

আর্তিং প্রপত্তে হখিল দেহভাজা-

মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যহুঃখাঃ।”

অর্থাৎ—ঈশ্বরের কাছে আমি পরমগতি প্রার্থনা করি না, অগ্নিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি চাই না, আমার পুনর্জন্ম হইবে না ইহাও চাই না, আমি চাই, আমি যেন সমস্ত জীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের হৃৎথকে পাই, বাহাতে তাহাদের হৃৎথ না থাকে। ১১

১। এই কথাটাই অত এক জারগার আছে, বাহা অনেক আরো অনেক লহকে মনে রাখিতে পারেন—

“ন বহুং কাময়ে রাজ্যং ন বর্গং ন পুনর্ভবং।

কাময়ে হৃৎথস্তগাং প্রাণিদাষাঙ্গিমাশ্রয়ং।”

অর্থাৎ, আমি রাজ্য চাই না, বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম হইবে না ইহাও চাই না, আমি চাই হৃৎথস্ত জীবদেহের হৃৎথের মাশ্রকে।



স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পুরিয়া—তেতানা)

এসেছি প্রভু তোমার মন্দিরে দরশন দাও হে
শ্রীম-সুন্দর আজি শুনিব বাঁশী প্রাণ ভরে ।
তোমার অরূপ রাশি ত্রিভুবনে বিকাশে
গোপেশ যাচে রাতুল চরণে রাখ মোরে ॥

^০ ^১ ^২ ^৩
 { শ্রা না ধা শ্রা | গা ঝা না ঝা | গা ঠা ঝা গা | ঝা ঠা সা ঠা | }
 { এ সে ছি প্র ভু তো মা. র য - ও নি রে - ও - }

^০ না ঝা না ঝা | ^১ কা ঝা সা সা | ^২ সা া া সা | ^৩ সনা ঝা সা সা |
 দ র ল ন দা ০ ও হে শ্রা - - য সু ০ ০ ক র

০ সা - জা জা জা | ১ গা খা গা গা | ২ গজা খনা খাঁ না | ৩ খজা খা জা গা ॥
 আ ০ জি শু নি ব বা শী প্রা ০ ০ ০ ৭ ভ ০ ০ ০ রে

^০ গা গা গা গা | ^১ ক্ষা ধা সী সী | ^২ সী সী সী সী | ^৩ না ধী সী † |
 { তো মা ব অ রূ প রা শি ত্রি ভূ ব নে বি কা গে -

০ ১ ২ ৩
না ঋঁ গাঁ ঞাঁ | সঁ না ঞাঁ সঁ | ধা না ঞাঁ না | ধক্কা ধা ক্কা গা ॥
গো পে শ যা চৈ রা তু ল চ র ণে রা থ ০ ০ মো রে

আলাপী তান :—

१। ना - धा - ना - गा । ता ता ता ता । जाः नः धा जा । गा धा गा ता ।
आ ० ० ० - - - - ० ० ० ० ० ० ० ० -

०	१	२	३
२। श्री - ना - धा - ज्ञा	धा ज्ञा गा ण	गा ज्ञा ना धा	ज्ञा गा ना धा
आ ० ० ०	० ० ० -	० ० ० ०	० ० ० ० ० ०

বোলতান :-

୦ ୧ ୨ ୩
 ୭। ଗଜ୍ଞା ଦନା ମର୍ଦ୍ଧା ନର୍ମା | ଦନା ଅର୍ଜୀ ନନ୍ଦା କାଗା | କାନ୍ଦା ନନ୍ଦା ନନ୍ଦା କାଗା | କାନ୍ଦା ନନ୍ଦା କାଗା ଅଗା |
 ଏ୦ ୦୦ ୦୯ ୦୦ ହି୦ ୦୦ ୦୦ ୦୦ ଅ୦ ୦୦ ୦୦ ୦୦ ଭ୦ ୦୦ ୦୦ ୦୦

আশতান :—

৪। ^{২'}নখা গন্ধা ধনা স'স'না | ^৩স'না ধন্ধা গন্ধা গা |
 আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৫। ^{২'}খ'স'না নখা স'না ধন্ধা | ^৩ধনা জাধা জাগা ঝগা |
 আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

আশ ও কল্পনযুক্ত তান :—

৬। ^{২'}খ'খ'না স'না স'স'না নখা | ^৩ননা ধন্ধা গন্ধা গা |
 আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

আশতান :—

৭। ^০নখা গন্ধা গন্ধা গন্ধা | ^১ধন্ধা ধনা ধনা ঝ'না | ^{২'}ধন্ধা গন্ধা ধনা ঝ'না | ^৩ধন্ধা গধা জাগা ঝগা
 আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

আশ ও কল্পনযুক্ত তান :—

৮। ^০নখা গগা ঝগা ঝসা | ^১ঝগা জাঝা গগা গগা | ^{২'}গগা ধধা জাধা জাগা | ^৩জাধা ননা ধনা ধন্ধা
 আ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

^০ধনা স'স'না ননা নখা | ^১জাধা ননা ধন্ধা গগা | ^{২'}ধধা জাগা ঝগা জাঝা | ^৩গগা ন'খা গগা ঝগা
 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

অস্তরার তান :—

৯। ^০গন্ধা ধনা স'না | ^১না | ^{২'}নখা গ'না ঝ'না স'না | ^৩নখা স'না ধন্ধা গা
 আ ০ ০০ ০ - - - - ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০

বাট :—

১০। ^০গন্ধা ধনা স'স'না স'স'না | ^১নখা স'না জা গা | ^{২'}গন্ধা ধনা স'না ধন্ধা | ^৩গন্ধা ধন্ধা গা ঝসা |||
 এসে ছি এ ভুতো মার ম ০ দি রে ০ দর শন দা ০ ওহে শ্রী ০ম হু বর

পণ্ডিতারীতে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীমতিলাল রায়

সে অনেক কথা, প্রায় ১২ বৎসরের ইতিহাস। অতিশয় দীর্ঘ এবং বিচিত্র ঘটনাবলি। শ্রীঅরবিন্দ সঘন্থে যে প্রবন্ধ, যে আশঙ্ক্যর কথা “প্রবাসী” সম্পাদক মহাশয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় “নবসংজ্ঞা”র উদ্ধৃত প্রবন্ধ লইয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ পত্রবাহিনী উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হইতেও মুক্তি পাইব।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমি শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রকীর্ণভাবে গিয়া উপস্থিত হই। তৎপূর্বে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর “রয়েল ক্রেমেলি” ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই অধিকাংশ রাজবন্দী মুক্তিলাভ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই বাবীন্দ্রকুমার, হুজুর্গেশ, উল্লাসকর প্রভৃতি মুক্তি পাইয়া আন্দামান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অস্বল্প অবস্থা লাভ করেন। আমাকেও আহ্বান দিয়া তিনি এই সময়ে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন—

“I have thought to delay your visit for a short time, until I saw my way more clearly on certain important matters, but I now believe that is not necessary and it will be as well for you to come as soon as it may be.”

অর্থাৎ, আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে আমার পথের স্পষ্টতা না দেখা পর্যন্ত তোমায় এখানে আসিতে বিলম্ব করিতে হইবে; কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস যে, আর তাহার প্রয়োজন নাই; তোমার সুবিধামত যত শীঘ্র হয় আসিতে পার।

তাঁহার পত্র পাইয়া আমি তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। এই সময়ে তাঁহার কিছু ভাবান্তর নজরে পড়িল। তিনি বধ্যারীতি বিতলের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করেন। কিন্তু আমার বন্ধুরা কেহই আর সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আমাকেই থাকিতে হয়। তারপর মীরা দেবী আসিয়া উপবেশন করেন। শ্রীঅরবিন্দ উর্দ্ধের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকেন। আমরা উভয়েই নিম্নলিখিত নেত্রে ধ্যান করি। সন্ধ্যায় আলো জলিয়া উঠিলে মসিয়ারে বিশার আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। মসিয়ারে বিশার এই সময়ে তাঁহার রচিত একখানি করাসী গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূবাদ করার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের সহায়তা লইতেন। ইহাই “আর্ধ্য”

পত্রিকায় “Eternal Wisdom” নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইত।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে টাইপ-রাইটার লইয়া দীর্ঘ সময় কার্যতৎপর দেখিয়াছিলাম। তাঁহার শরীর অধিকতর কুশল হইয়াছিল। মীরা দেবীর উৎকর্ষার সীমা ছিল না। তিনি আমাদের একদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, “যে গুরু দুধ শ্রীঅরবিন্দ পান করেন, সেই গাভীটির নিশ্চয়ই কদরোগ হইয়াছে। ঐ গুরুর দুগ্ধপান তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইবে।”

এই সময় হইতেই শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের দাঙ্গিষ মীরা দেবীই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সকলেই ইহাতে প্রীতি অহুভব করিলাম। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বাইতেন। ইহার পূর্বে আমি দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, শ্রীঅরবিন্দ রন্ধ-মাধ্যম স্থান সারিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একটা আয়নার ভাঙ্গা চিত্রপীর সাহায্যে কেশ আঁচড়াইয়া লইতেন। তারপর তিনি ভোজন-পাত্রের সন্মুখে বসিতেন। আমি বসিয়া বসিয়া মাছি ভাড়াইতাম। শ্রীঅরবিন্দ কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিয়াই উঠিয়া পড়িতেন। আমি নির্দ্বাক হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিতাম। মীরা দেবীর তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণের পর হইতে তাঁহার প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, অপরাহ্ন ও নৈশভোজনের সুব্যবস্থা হইল। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমভালা শিবের মত, নিজের স্বপ্নের নিকে কোন দৃষ্টিই তাঁহার থাকিত না। মীরা দেবীর যত্নে শ্রীঅরবিন্দের শ্রী ফিরিল।

এই সময়ে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে আমরা মসিয়ারে বিশারের বাড়ী বাইয়া রাজি-ভোজন সমাপ্ত করিতাম। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি প্রভাষ ও ভক্তিতে মীরা দেবীর অন্তর তখন এমনই ভরিয়া উঠিতেছিল যে, মসিয়ারে বিশার তাহা লক্ষ্য করিয়া অভিকৃতের ন্যায় আমাদের কাছে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, “আমি ক্রমেই মীরার মন হইতে বাহির হইয়া বাইতেছি। মীরার সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছেন শ্রীঅরবিন্দ।”

এক দিন অপরাহ্নে আমরা তিন জনেই ধ্যানমগ্ন। ধ্যান-শেষে মীরা দেবী ও আমি ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়ের কথা প্রসঙ্গ মুখে শ্রীঅরবিন্দ

ভনিতে লাগিলেন। মীরা দেবী বলিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরলোকের অপার্থিব দৃষ্টের কথা। তাঁহার অসাধারণ দর্শনের কথা আমি বিন্দি হইয়া ভনিলাম। আমার ধ্যান জাগ্রত শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া। তাঁহার রক্তচন্দ্র শ্রুত ও জ্যোতির্দয় মুক্তি আমার চিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আমি মাদাম মীরার অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা ভনিয়া যুগপৎ পুলকে ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এইরূপ ধ্যানের শেষে প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, “মতি! তুমি, আমি”—তারপর হস্ত-প্রসারণ করিয়া মীরা দেবীকে দেখাইয়া বলিলেন, “আর এই নারী আমরা তিন জনে সত্য।” তারপর শ্রীঅরবিন্দ সজ্জের ভবিষ্যৎ নির্দেশস্থলে বলিলেন, “এই তিন জনেই আমরা জগতের পরিবর্তন আনিব।” সেদিন আমি মীরা দেবীকে নতুন চক্ষে দেখিলাম। তিনিও যেন আমার বড় আপন করিয়া লইলেন। কিন্তু এক দিনের কথার সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। সেদিন আমার এক বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মীরা দেবী শ্রীঅরবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, পরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমার সহিত আপনি কি সখ্য অল্পতব করেন?” আমি হাসিয়াই বলিলাম—“আপনার সহিত আমার সখ্য ভরীশ্বেয়। আমরা উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের নিকট দীক্ষিত।” তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—“না। না। I like to be Mother.”

আমার মাথার যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আমি কি ভাবে মীরা দেবীকে মাতৃশ্বে বরণ করিয়া লইব, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তত্ত্ব-সহজিয়ার সাধনার আভ্যন্তরিক মহামার্যের কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের ধর্মপত্নী ব্রুণালিনী দেবীকে আমি বাতাবিক গুরুশক্তি স্বরূপেই অধ্যাত্ম-মাতৃশ্বে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতা ব্রুণালিনী পরলোকগমন করিলে, আমাদের ভাতাশালার নাম রাখিয়াছিলাম “ব্রুণালিনী বস্ত্র বয়ন কার্যালয়।” মীরা দেবীর মাতৃশ্বেয় দাবী আমার অন্তিকর মনে হইল। এই দিন হইতেই মীরা দেবীর সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছিল, বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার উপর আঘাত পড়িতে শুরু করিল। বিশেষতঃ এক রাজির ঘটনা এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে আর যেন নিরাসন্ন হওয়ার কোনই আশা রহিল না।

এত দিন আমাদের রাজির অধিবেশন-চক্র বিতলের বারান্দায় হইত। অকস্মাৎ তাহা নিরতলে অল্পভিত হওয়ার, আমার চিত্ত বেদনার ভরিয়া গেল। আপন অন্তরের অল্পভূতি দিয়া হির করিয়া লইলাম—শ্রীঅরবিন্দের

আরোহণ-যুগ শেষ হওয়ার অতঃপর তাঁহার অবতরণের পালাই শুরু হইয়াছে এবং তাহারই লক্ষণস্বরূপ তিনি নিরতলে চক্রাঘ্রাতের আরোহণ করিয়াছেন। তথায় গিয়া উপবেশন করিতেই, শ্রীঅরবিন্দের মুখে নানা অশরীরী আশ্বাস বাণী প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকজন অপরিচিত আশ্বাস কথা আমরা নীরবে ভনিবার পর, ভনিলাম—রাজা রামমোহন রায়ের আশ্বাস আবিভূত হইয়াছেন। তাঁর মুখে অনেক অধ্যাত্মবোধের কথা আমরা শ্রবণ করিলাম। সে এক অপূর্ণ অভিভূত। ইহার পর আসিলেন ঋষি বক্রিমচন্দ্র। শ্রীঅরবিন্দ আমার কিরিয়া আসিলেন আশ্বাসেতনায়। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া পরে তিনি বলিলেন, “আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর নতুন সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কর্ম হইবে উপর হইতে।” তারপর তিনি মাথার উপর প্রায় অর্ধ হস্ত পরিমাণ হাত উঠাইয়া বলিলেন, “এই বিজ্ঞানভূমি হইতেই সকল কর্ম সুসম্পন্ন হইবে।” পরিশেষে আমার দিকে চাহিয়া কল্পনার চক্ষে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন “মতিলালের সাধন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সে আমার কথা বুঝিবে; কিন্তু he puts a wall between him & me,” অর্থাৎ, সে আমার ও তার মধ্যে একটি প্রাচীর রাখিয়া দিতেছে।” আমার মনে হইল, এই কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইলেও, ইহা যেন মীরা দেবীরই অল্পভূতির প্রতিধ্বনি। কারণ শ্রীঅরবিন্দ যে সজ্জের এষণা পাইয়াছিলেন, সেখানে মাদাম মীরা ও আমার মধ্যে একটা সখ্য স্থাপনের কথা ছিল। আমি তাঁহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই বলিয়াই কি শ্রীঅরবিন্দের মুখে এইরূপ পক্ষ বাক্য উচ্চারিত হইল। আমি সেই পক্ষে বিরূপ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা “জীবনগঙ্গিনী” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই সে কথার পুনরুদ্বোধ এখানে নিম্নয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দ অতঃপর এই প্রসঙ্গ লইয়া অবশ্র কোনই আলোচনা করেন নাই। ইহার পরেও মাদাম মীরার সহিতও আমার হৃদয়সখ্য বিলুপ্ত হয় নাই। সেবার বিদায়কালে শ্রীঅরবিন্দ যেমন আমার বুক ধরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন, আমি মীরা দেবীরও হস্ত ধরিয়া ভরীশ্বেয় রেহ-রসায়নে নিজেকে অভিভূত করিয়াই সেখান হইতে ফিরিয়াছি। মসিরে রিশার আমাদের এই বিদায়কালীন দৃষ্ট দেখিয়া বিশ্ব বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে-চোখে এই আভাসই যেন দেখা দিয়াছিল।

মসিরে রিশার ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই চন্দ্রনগরে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত

হন। তখন তাঁর মুখেই মাদাম মীরার সহিত তাঁর চির-বিচ্ছেদ হইয়াছে, তুলিলাম। তাঁহার কথার বুঝিলাম—মাদাম মীরা এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের নিকটই বাস করেন।

মসিারে বিশারের মর্ম্মপীড়া দূর করার যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম। আমার গৃহদেবীও অতি সতর্কতার সহিত মসিারে বিশারের চিকিৎসা-নিবারণের প্রয়াস করিলেন। মাদাম মীরা ১১১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কি ভাবে অন্তরলোকে এক দিব্যপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, বাহ্যকে তিনি সেই কিশোর বয়সেই যতই “কৃষ্ণ” নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন এবং পরে ঘটনাচক্রে তাঁর স্বামীর সহিত কি ভাবে পতিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার হয় ও ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার ঋণদৃষ্ট “কৃষ্ণ” বলিয়াই চিনিতে পারেন এই সকল কথা বিশদভাবে লিখিয়া পতিচারী হইতে আসিবার সময়ে আমার হাতে একটি নিবন্ধ দিয়াছিলেন। আমি তৎকালে মীরা দেবীর ছবির সহিত “প্রবর্তকে” তাহা প্রকাশ করি। ঐ ছবি ও লেখা আমার গৃহে মসিারে বিশার হঠাৎ দেখিতে পাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। আমার সূচ্যাত্ত্ব্য করিয়া সেই যে বাহির হইলেন, আর ফিরিলেন না। তুলিয়াছি তিনি চন্দ্রনগর হইতে শান্তিনিকেতন হইয়া সর্বসম্মতিতে কিছুদিন ছিলেন, তারপর প্যারিস বাজা করেন।

পতিচারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ পক্ষে তাঁহার আদর্শের মর্ম্মবাণী লিখিয়া আমার উদ্ধৃত করিতেছিলেন। একটি পক্ষে তিনি লিখিলেন :

“Our first object shall be to declare this ideal, insist on the spiritual change as the first necessary and group together all who accept it and are ready to strive sincerely to fulfil it. Our second shall be to build up not only an individual but a communal life on this principle”

অর্থাৎ, আমাদের প্রথম কর্তব্য হইবে এই আদর্শের ঘোষণা করা, অধ্যাত্ম পরিবর্তনের উপরে জোর দিতে হইবে সর্বত্র। এবং বাহ্যিক অকপটে ইহা স্বীকার করিবে ও ইহা দৃঢ় করার জন্য প্রস্তুত হইবে, তাহাদের একত্র করিতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য—এই নীতির উপর শুধু ব্যক্তিগত পড়িয়া তোলা নয়, পরন্তু একটা সম্মিলিত ও গড়িয়া তুলিতে হইবে।

চন্দ্রনগর হইতে আমাদের প্রকাশিত *Standard-bearer* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার তিনি যে আদর্শের কথা চরমকার বৃত্তি ও অল্পপ্রেরণাপূর্ণ ভাবের ঘোষণা করিলেন তাহাতেও এই আশার বাণীই ফুটিয়া উঠিল। ইহারই শেবাংশে ছিল :

“It is with confident trust in the spirit that inspires

us that we take our place among the standard-bearers of the new humanity that is struggling to be born amidst the chaos of a world in dissolution and of the future India, the greater India of the re-birth that is to rejuvenate the mighty outworn body of the ancient Mother.”

অর্থাৎ, যে ভাবশক্তি আমাদের উদ্ধৃত করে, তাহারই উপর স্ফূট প্রত্যয় স্থাপন করিয়া, আমরা সেই নূতন মানব জাতির পতাকাবাহীদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছি, যে জাতি একটা বিলীলমান জগতের প্রলয়-বেলনায় নবজন্মেরই তপস্যা করিতেছে। আর সেই ভবিষ্যতের, যে বৃহত্তর ভারতের নবজন্মে আমাদের এই প্রাচীন দেশমাতৃকার জীবদেহ নবমুর্তি ধারণ করিবে, তাহারও প্রবর্তকদের মধ্যে আমাদের স্থান হইবে।

এই সত্য-সৃষ্টির প্রেরণাটিকেই চন্দ্রনগরে রূপায়িত করিতে গেলে, তিনি উৎসাহ দিয়াই আমার আবার লিখিলেন :

“The Samgha at Chandernagore is a thing that has grown up with my power behind and you at the centre and it has assumed a body and temperament, which is the result of this organisation.”

অর্থাৎ, চন্দ্রনগরে আমার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ও তোমাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—এইরূপ সংগঠনের ফলে উহার একটি আকৃতি ও প্রকৃতিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বারীজকুমারের কর্তব্য-প্রচেষ্টা ও দেশের অন্তরাত্ম কর্তব্যের সহিত তাহার পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন :

“Our whole principle is different and you have to insist on our principle in all that you say or do. Moreover, you have got a clear form for your work in association and that form as well as the spirit you must maintain, any loosening of it or compromise would mean confusion and an impairing of the force that is working in your Samgha.”

অর্থাৎ, আমাদের মূল তত্ত্ব অন্য হইতে পৃথক। তুমি বাহ্য বলিবে ও করিবে, তাহা এই মূল তত্ত্বের উপর জোর দিয়াই তোমাকে করিতে হইবে। অধিকন্তু তুমি ইহার অন্য সত্যরূপ যে স্বচ্ছ বিগ্রহ পাইয়াছ, সেই সংস্থা ও এই তত্ত্ব বজায় রাখিয়াই তোমার চলিতে হইবে। ইহা কোন-রূপে যদি শিথিল হয় অথবা কিছু সহিত যদি আপোষ করিতে হয়, গোলযোগ বাধিবে ও যে শক্তি তোমার সম্মুখে লীলারিত হইতেছে তাহা ক্ষয় হইয়া পড়িবে।

পত্র শেষে এই দুই ছত্র আমার পুনরায় উদ্ভাটনের ন্যায় পতিচারীর পথে ছুটাইল :

“Meanwhile your visit may help to get things into preparatory line both in the motor-power and in the outward determination.”

অর্থাৎ, ইতিমধ্যে তোমার উপস্থিতি অন্তরের বিদ্যুৎ-
বল ও বহিঃস্থী সত্ত্ব নিরূপণের সকল ব্যাপারকে পরিণতির
দিকে আনিতেই সহায়তা করিতে পারে।

এবার তাঁর পক্ষে আমার সঙ্গীক পণ্ডিত্যের গমনের
অসম্ভব ও দীর্ঘ দিন ভাষার থাকার নির্দেশ তিনি দিয়া-
ছিলেন। আমি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁর কথার অঙ্গসরণ
করিলাম ও ১৯২১ সনের জুন মাসে উভয়ে পণ্ডিত্যরীতে
গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিতে গেলে আমার
সঙ্গে আমার পত্নীও তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতা
হইলেন। প্রণাম করিতে তিনি একপ্রকার ধ্যানস্থা হইয়াই
পড়িলেন ও তদবস্থায় শ্রীঅরবিন্দও দীর্ঘক্ষণ মুদিত নয়নে
তাঁহার মাথার হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গে
শ্রীঅরবিন্দের চরণধূলি লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, আমার
হাতে এক তাড়া নোট দিয়া শ্রীঅরবিন্দ আমাদের জন্য যে
নূতন বাড়ী লওয়া হইয়াছে, সেই বাড়ীতে গিয়া আমাদের
উঠিতে বলিলেন।

মীরা দেবীর সন্ধান লইতে গিয়া অবগত হইলাম যে,
তিনি উপরেই আছেন—যে ঘরখানিতে গত দুই বার পণ্ডি-
চারীতে আসিয়া আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, সেখানেই
তিনি এখন থাকেন। দ্বার চেলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ
করিলাম। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম তিনি পূর্ববেশ পরি-
বর্তন করিয়াছেন। পরিধানে লালপেড়ে শাড়ী, চরণ-বুগল
অলঙ্কারিত—ভারতীয় মাতৃমূর্তির ন্যায়। আমি তাঁহাকে
প্রণাম জানাইলাম। পশ্চাৎ কিরিয়া সবিনয়ে দেখিলাম—
আমার পত্নী মীরা দেবীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া
আছেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে প্রণাম করিতে বলিলাম।
তিনি তবুও স্থির দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রণাম
করিলেন না।

আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। মাদাম মীরা দ্বার
পৰ্যন্ত আসিয়া কিরিয়া গেলেন। আমি নূতন বাসা-বাটাতে
উপস্থিত হইয়াই আমার পত্নীকে ভিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি
মীরা দেবীকে প্রণাম করিলে না কেন?” বারবার প্রশ্ন
করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোনই উত্তর পাইলাম না।
আমি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে দশম বর্ষীয়া বালিকা বহুকে
ঘরে আনিয়াছিলাম, কথার কথার আমার শাসন
অধিকমাত্রার হইত। আমি ক্রোধ ভরে আবার বলিলাম,
“মাদাম মীরাকে প্রণাম না করিয়া অভিশর গহিত কর্ত্ত
করিয়াছ।”

তিনি উন্নত শিরে বলিলেন, “তোমার মাথা শ্রীঅর-
বিন্দের চরণে নত হইলে, আমিও চেতনাহারার ন্যায়

তাঁহার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু
এখানে তোমার প্রণতি আমার ভাল লাগে নাই।” আমি
পঞ্চকণ্ঠে “কেন? কেন?” বলিয়া তাঁহাকে ভৎসনা
করিলাম। তিনি মাথার সিন্দুর দেখাইয়া বলিলেন, “আমি
মসিারে বিশারের দুঃখ দেখিয়াছি। যে নারী পতিভ্যাগিনী,
তাঁহার স্বামী সৌভাগ্যহীন হয়। তাঁহার চরণে মাথা নত
করিয়া এই পবিত্র সিন্দুর আমি স্নান করিতে পারিব না।”

তখনই বুঝিলাম—আমার পণ্ডিত্যের আসা ব্যর্থ হইবে।
মীরা দেবীকে যা বলিতে হইলে, গৃহদেবীকে ছাড়িতে
হইবে। কিন্তু কেমন মনে হইল—তিনি আমার
অপরিভ্রাজ্য।

প্রতিদিন প্রভাতে সঙ্গীক শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া
বসি। তাঁর মুখে অনর্গল উপদেশবাণী শ্রবণ করি। আমার
পত্নী ধরিয়া বসিলেন, আমাদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দকে একদিন
নিমন্ত্রণে বাইতে হইবে। তিনি নিজেই বলিলেন, “চন্দ্রনগরে
অবস্থানকালে অতি সম্ভর্পণে আপনার আহ্বারের ব্যবস্থা
করেছি। আজ আপনাকে পরিতোষসহকারে ভোজন
করাবার ইচ্ছা হয়েছে।”

শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “হবে, হবে,
তোমার ইচ্ছা সকল হবে।”

আমার স্ত্রী বলিলেন, “কবে হবে?”

শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, “কালই।”

পরদিন আসিল। পর-পর কয়েকদিন চলিয়া গেলেও
শ্রীঅরবিন্দের বাওয়া ঘটিল না। আমার পত্নী নিরতিশয়
ক্লান্ত হইলেন। বোড়শোপচারে শ্রীঅরবিন্দের পূজা
দিবার প্রেরণা তাঁহার ব্যর্থ হইল। তিনি তবুও আশা
ছাড়িলেন না। কথার-কথায় একদিন তিনি আবার
শ্রীঅরবিন্দকে বলিলেন, “আপনি অন্যত্র গিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষার
অসমর্থ, কিন্তু আমি যদি কিছু খাবার পাঠাই, আপনি
খাইবেন ত?”

শ্রীঅরবিন্দ সহাস্তে বলিলেন, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।
নিমন্ত্রণ-রক্ষার আমার অনেক বাধা আছে, খাবার পাঠাইও,
খাইব।”

অত্যন্ত শ্রীতি-সহকারে আমার স্ত্রী নানাবিধ খাদ্য
প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন যে,
তাঁহার প্রস্তুত খাদ্যাদি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং কি জন্য
তাঁহার প্রস্তুত খাদ্যাদি খাইতে দেওয়া হয় নাই, ইহাও
যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে অশ্রু-সাগর উথলিয়া
উঠিল। তাঁহার ব্যাধার ভার বহিয়া পণ্ডিত্যরীতে বাস
করিতে আমিও যেন অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। নানা
উৎপাতে আমারও চিত্ত বিক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু

শ্রীঅরবিন্দের প্রেমে ও মেহে অভিভূত হইয়া আমি তবুও দিনের পর দিন অভিবাহিত করিতে লাগিলাম।

ঠিক এই সময়ে চন্দননগর হইতে তার পাইলাম—
"Won't Kakima come, strong Sangha need."
মথের কথাটি অস্পষ্ট। ভাবে বুঝিলাম, প্রবর্তক সত্ত্ব
উহার প্রত্যাশ্বর্তন চায়। আমার পত্নীও বলিলেন, "আমি
তোমার বাধা হইয়া এখানে থাকিতে চাহি না। আমার
পাঠাইয়া দাও, যোগ-সিদ্ধ হইলে তুমি চন্দননগরে ফিরিও।"

শ্রীঅরবিন্দকে এই কথা জানাইলাম, তিনি আমার পত্নীর
দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তিটির যোগের সিদ্ধি তুমি
ভিন্ন অন্যে আনিবে না, তোমার বাওরা বন্ধ থাকিবে।"

ইহার উপর আর কথা নাই। নানা নির্ধাতন সহিয়া
আমাদের দিন অভিবাহিত হইতে লাগিল। তারপর ঐ
আগটে শ্রীমান অরুণচন্দ্র আবার তাহা জানাইল, "সম্মুখে
১৫ই আগষ্ট, শীঘ্র আপনি আসুন।" টেলিগ্রামের শেষ
কথা—"Our victory is here."—আমাদের সাফল্য
এখানেই।

শ্রীঅরবিন্দকে এই তার দেখাইলাম। তিনি কোন
দিন কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৰ্ম করিতেন না; কিন্তু এই
টেলিগ্রামের উত্তর দিতে তিনি নিজেই আদেশ করিলেন,
"Write a big 'No' there."—এখানে লিখে দাও একটা
প্রকাণ্ড 'না'।

তার পরদিন আবার অরুণ তার করিল—"ফিরিয়া আসুন,
অন্যথা eternal separation অর্থাৎ চিরবিচ্ছেদ। এই
"separation" শব্দের অর্থ যদি সত্ত্ব হইতে বিদায় মনে
হইত, আমি অস্বপ্ন করিতাম না। এমন ঘটনা আমার
জীবনে বহু ঘটনা আছে। কিন্তু আমি এই শব্দের অর্থ বুঝাই
বুঝিলাম। আমি তিন দিন একাগ্রচিত্তে তাবিলাম।
তারপর কে যেন আমার জোর করিয়াই লিখাইয়া লইল—
"অবো! আমি চলিলাম, আজ হইতে আপনার সঙ্গে
হইল আমার eternal separation।"

নিষ্ঠুর বিধাতা এমন করিয়াই পণ্ডিত্যবিশ্বকোষের সহিত আমার
বিচ্ছেদ আনিয়া দিল। আমার স্ত্রী শুনিয়া বলিলেন, "তুমি
ফিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলব্ধ্য। আমি এসে
অবধি দেখছি, অরবিন্দ তোমার আপনজন, কিন্তু তোমার
সাধনার স্থান এ নয়।"

আমি একপ্রকার উদ্ভাসের ন্যায় ১০ই আগষ্ট তারিখের
প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।
শ্রীঅরবিন্দ ব্যথিত স্বরে "আর প্রয়োজন নাই," এই কথা
বলিয়াই নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আমার পায়ের জলা হইতে যেন পৃথিবী অপস্থত হইতে

চাহিল। আমি চলিতে চলিতে বাগার ফিরিলাম। তাঁহার
বাগী আমার মর্ম বিদ্ধ করিয়াছিল—"আর প্রয়োজন নাই।"
কিন্তু উত্তরের মধ্যে যে অজ্ঞেয় সত্ত্ব তাহা কি সত্যই ছিন্ন
হইল? সারাদিন চিন্তা করিলাম। আমার মনে হইল
শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সত্ত্ব মর্ত্যবাসীর চক্ষে হয়তো
চির-বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অন্ততম
অন্তর-যোগ কোন দিন ছিন্ন হইবে না। সে সাধ্য আমারও
নাই; শ্রীঅরবিন্দেরও নাই। আমি এই দিনই সন্ধ্যার
সময়ে আবার শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।
তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার সম্মুখে
দাঁড়াইলেন। আমি গভীর কণ্ঠে বলিলাম, "চলুন, আপনার
ঘরে চলুন।"

তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "না, না।"

আমি তবুও জিদ ধরিয়া বলিলাম, "আমুন, আপনার
ঘরে।" এতক্ষণ তাঁহার গুহ্র শব্দ যেন অন্তরের কোণেও
অভিযানে কল্পিত হইতেছিল। অকস্মাৎ আমার মুখের
দিকে চাহিয়া যেন তিনি প্রশ্ন হইলেন—শিবের ন্যায় শান্ত
মৃষ্টি পরিগ্রহ করিলেন।

তিনি শব্দাগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। আমিও
তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম।
তাঁর চরণে প্রণত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভবিতব্য কল্প-
বীণার বুঝি স্বর বাধিয়াছিল।

আমি কল্পিতকণ্ঠে বলিলাম—বিদায়, আজ আমি চির-
বিদায় লইতেছি।

চারি চক্ষে অশ্রুত নিষ্কার ঝরিল। আমিও কাদিলাম।
শ্রীঅরবিন্দের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। তিনি আমার
আবার বকে তুলিয়া বলিলেন—"একনিষ্ঠ হও। তোমার
মধ্যে সত্য ও আলো আবির্ভূত হোক।"

শ্রীঅরবিন্দের মুখের এই শেষ আশীর্বাদী মাধুর্য
বহিরাই সেদিন পণ্ডিত্যবিশ্বকোষ হইতে ফিরিয়াছি। আজও
সেই স্মৃতি বকে রাখিয়াই কঠোর কৰ্মপ্রবাহে কাঁপ
দিয়া চলিয়াছি। তারপর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২ই ডিসেম্বর
তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগের কথা বকে বজ্রের মতই বিদ্ধ
হইয়াছে। আমার কাহিনীর শেষ এইখানেই করিতে
হইবে।

এক্ষণে "প্রবাসী" সম্পাদকের প্রয়োজনে আমার কি
বলিবার আছে সেইটুকুই অতি সংক্ষেপে বলিয়া আমার
বক্তব্য সমাপন করিব।

তারতের অধ্যাত্মজিহাদে সাধনার নারীবিশিষ্টত্বের
সূচক আছে। অধ্যাত্ম-সাধনার উৎসর্গের দেবীমূর্তি
প্রত্যেক নরনারীর অন্তঃপাঠ্য হইয়াছেন—মাতৃরূপে অধ্যাত্ম

সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পূজা ও অধিনেত্রীরূপে কেহ কেহ বরীয়াও হইরাছেন। অধ্যাপকত্বের আওতায় কি নর, কি নারী, কাহারও পূর্বজীবনের স্মৃতি-সংস্কার থাকে না, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া তাহাকে নবজীবনের আশ্বাস দান করে। এই দিব্যজীবনেরই কষ্টসাধ্য সাধনার আশ্রয় নিরূপণ না করিলে, দিশ্শান্ত জাতির জীবন সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিধাতার নির্দিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু এইখানে আর একটি জিনিসও বুঝিবার আছে। নরনারীর সম্বন্ধে যে অন্ততঃ, তাহা ভারতের সাধনার কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতের গুরু চৈতন্য যেখানে অধ্যাপক লক্ষ্যের সন্ধানে সর্বদা হইয়াই ছুটিয়াছে, সেখানেও পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য সমাজের নিত্য বিধানকে অতিক্রম করিলেও ঘুরে রাখিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করে নাই। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণপ্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষকল্প মহাপুরুষগণ প্রবল ধর্ম্মাবলম্বী বা বিশেষ প্রয়োজনে ধর্ম্মপন্থীর সহিত প্রাকৃত সদ ত্যাগ করিলেও, কোথাও অধ্যাপক সঙ্কল্প বর্জন করেন নাই। তাই গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদামাধক ভারতের সাধননিষ্ঠ নর-নারী বা ভক্ত সাধনগোষ্ঠীকুল কেহই বিন্দুত হইতে পারেন নাই—সাধনার জন্যই গুরুশক্তিরূপে তাঁহাদের আজ পর্য্যন্ত পূজার যোগ্য অর্ঘ্য দিয়াই আসিতেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম স্বভাবতই আমাদের অন্তরে প্রশ্ন সৃষ্টি করে—আর প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত ভারতের অন্তর্দৃষ্টিবান সাধন-প্রাণ হইতে আশঙ্কা-সংশয়ের ছায়াও মুছিবার নয়। ভরী নিবেদিতার ন্যায় একনিষ্ঠা মহানারীও মনে-প্রাণে অন্তরাস্ত্রায় ভারতের তত্ত্ব নীক্ষিতা, অবগাহিতা ও উৎসর্গীকৃত হইয়াও, ভারতীয় দেহ বা রক্তধারার অভাব কি মর্ম্ম দিয়া অহুতব করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্যিক জানেন, তাঁহা হাই বুঝিবেন—ভারতের এই বিধার মর্ম্ম কি। শ্রীমতী মীরা দেবীর উৎসর্গ ও যোগ্যতার কথা আমি কোনদিন অস্বীকার

করি নাই—তাঁর অলৌকিক প্রতিভা ও সাধনার মহিমা বোল আনা স্বীকার করিয়াও আমি উদাত্ত কণ্ঠে এই কথাই বলিয়া বাইব—শ্রীঅরবিন্দের গুরুমহিমা যে ভারত স্বীকার করিবে, সেই ভারত মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তাঁহার পুণ্যাহ্নি ও তপস্বীতার ভারতের সন্তসরিধারার জন্যে বিসর্জন দিয়া, সন্তসাপরকে তীর্থে পরিণত করিয়া যে পৌরব অহুতব করিবে অথবা পুণ্যচন্দনচর্চিত্ত যোগিদেহ পদ্মাসনে বসাইয়া মন্ত্রোচ্চারণে স্থলে বা জলে সমাহিত করার যে সনাতন ভারতীয় বিধান, তাহারই অহুতবর্ডনে যে হুখ ও সাধনা পাইব, তাহা মীরা দেবীর নির্দেশমত শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাবাগীর দেহ কবিন-শরনে কবরস্থ করিলে ভারত কখনও অহুতব করিবে না—করিতে পারে না।

আমি এইজন্যই আশ্চর্য্যে আরও বলিব—শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তার স্বরূপে, ভারত-প্রতিভার সিদ্ধ বাণীমূর্তিরূপে চিরদিনই আমাদের ও প্রত্যেক ভারতবাসীর পূজা ও অহুতসরগীর রহিবেন—শ্রীঅরবিন্দের ঈশ্বরত্ব ও নিরঞ্জন তাঁর অতীন্দ্রিয় ও অতিমানস যে “বিন্দু-নাথ-কলাতীতং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং” অপ্রাকৃত গুরুত্ব ও গুরুত্বরূপ, তাহাও আমাদের নিত্য স্বীকার্য্য ও নিত্যারাম্য হইবে। মীরা দেবীর উৎসর্গসিদ্ধ জীবনের অবদানও ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত বহুদিন স্মরণ করিবে ও বহন করিবে, কিন্তু আধ্যাত্মতার গুরুশক্তি ও মাতৃশক্তি বিনি হইবেন, তাঁহাকে ভারতীয় রক্তধারা ও ভারতীয় সত্যবিকৃতি অদে লেপন করিয়াই আবিস্কৃত হইতে হইবে।

ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক সংস্কৃতিরূপে বিদ্যার দিয়া বা কণামাত্র অবজ্ঞা করিয়া যে অভিনব নীতির প্রবর্তন অথবা বিশ্বমিলনের চেষ্টা ও আয়োজন, তাহার পশ্চাতে বত বড় শক্তিশালী মহাপুরুষেরই সমর্থন থাকুক, বুদ্ধকে মাধার রাখিয়া তাঁহার বৌদ্ধবাস ও সংহতির বিদ্যার ন্যায়ই, ভারতাত্মার অস্বীকারেই কালক্রোড়ে তাসিয়া বাইবে। মহাভারতের সংগঠনে তাহা প্রধান ও কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে কখনও সার্থক সহায় হইবে না।

স্কুলে ছেলের স্বাস্থ্য

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

আমি শিকক। পশ্চিম বঙ্গের হইল স্কুলে শিককতা করিতেছি। সাত-আট বঙ্গের পূর্বেও স্কুলে একটা বিবর লক্ষ্য করিতাম, বেথিতার ছেলেরা যখন অষ্টম শ্রেণী হইতে যখন শ্রেণীতে উঠিয়াছে তখন তাহারা বেশ একটু বদলত হইয়াছে। এখন আর কেউ বেথিতে পাই না। এখন বেথি—ছেলেরা পক্ষ-বর্ড

শ্রেণীতে যখন ছিল, যখন-যখন শ্রেণীতেও ঠিক তেরনই রহিয়াছে, একটুও বাক্যে নাই। যখন পড়ার দত্ত বলিষ্ঠ বাহ্য-বান ছেলে স্কুলে এখন আর একটুও বেথিতে পাই না।

এক ভ বেহের এইরূপ অবস্থা—তাঁহার উপর লক্ষ্যকেন্দ্র আর লক্ষ্য বঙ্গেরই ম্যালেরিয়ার ছুপিতে বেথি। কাহারও

বেহে রক্ত নাই, বুধে প্রকৃত নাই, তাহে জীবনের স্ফোতি নাই। এই সব হেলেনে বাহ্যোত্তরি ভক্ত হুলে ভিন-চার রক্তের ব্যবস্থা আছে। পেটের ভাত জীর্ণ হইতে না হইতে তাহাদিগকে অশ্রুত টকিন বেওরা; প্রীতের বিপ্রহর মৌরে হাত করাইয়াও তাহাদিগকে ফ্লিন করান; ফুটবল, ক্রিকেট খেলায়; তাহাদের রক্তহীন বেহে বৎসরে হুঁচানবার অন্ততঃ কলেক্টা বসন্তের টকা বেওরা। তবে বলিয়া বুঝি—ইহাতে বলবান হেলেনও বাহ্যহাসি বটতে পারে—হুলে বলিয়া বুঝিতে পাই না।

ইহার উপর হেলেনের পুতকের বোঝা তাহাদের বেহের ওজনের অপেক্ষাও বেশী। তাহা হাতা বহরে ভিনবার পরীকা, হুল স্পোর্টস্, ইন্টার হুল স্পোর্টস্, লীগ, হকি—কত কি, নরণ করিতেও পিতা বোঝ হয়। সর্বোপরি ভ্রমাবহ ব্যাপার—এই সব হেলেনে মৈত্রিক চরিত্রের অধোগতি। শহরের নিম্নোক্তাদি এই অধোগতির পক্ষে প্রবান সহায়ক হইতেছে। ক্রাসে হেলেনের মধ্যে আত্মকাল বীতবল ব্যাপার বেধিতে পাওয়া যায়।

কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে পাস করাইবে না। তিপার্টমেন্ট ইহাদের হুল ভুলিয়া দিবে। ইহাদের কিছু আসে যায় না। ইহারা কারিগরী বিদ্যা শিখিবে না। ইহারা চাষ করিতে পারিবে না। ইহারা কি করিবে তাহা জানে না। ইহারা কি চার—তাহাও ইহারা বলিতে পারে না। আমি শিকক, আমি জানি ইহারা বাধ্য চার। সকলেই বলিবেন—ইহাদিগকে বাঁচিরা থাকিতে হইবে।

ইহাদিগকে কাহারো ভুলি করিয়া দ্বিগুণে চার? ইহাদের উপর কেন এত দুঃখ? ইহাদিগকে বাঁচিরা বাইতে বলিবার কাহার অধিকার? নতাবের জুবা কাহারো বুঝিবেন? নতাব বাধ্য চাহিলে কোন্ পিতামাতা তাহাকে বাঁচিরা বাইতে বলিবেন? জাতীয় সরকারের অনাধ্য বিভাগের কি প্রয়োজন? এই সব বিভাগের কর্তৃপক্ষীয় লগ্ন্যা দেশের হাজলগ্ন্যা অপেক্ষাও বেশী। তাহাদের বাধ্যের বত প্রয়োজন। তাহাদের বসন-সুবর্ণের আত্ম প্রয়োজন। দেশের হাজলগ্ন্যা সে প্রয়োজন মিটাইবে না। অবিলম্বে সন্ত বিভাগ ভুলিয়া দিয়া তাহারা চাষে নামুন। লগ্নুবে বর্ষা।

হুলের পরিবর্ধক আছেন। প্রতি বৎসর একবার করিয়া হুল পরিবর্ধন করিতে আসেন। বাবীলতা-সাতের পর তাহাও না আসিলে চলে বেধিতেছি। তাহারা আসিয়া হুলের হিলাব-পত্র বেধেন। ক্রাসে দিরা—শিকক পতাইতে থাকিলে হাজলগ্ন্যা দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন, হাজলগ্ন্যা পতাইতে থাকিলে শিকককে পতাইতে বলেন। হুল কবিতার সেবরণগণ তবে বলিয়া লগ্নাব রাখেন—কোন্ শিকক কর্তৃক টিউটনি করিতেছেন, কোন্ শিককের কবে হুলে পৌঁছিতে হুঁনিমিট বিলম্ব

হইতেছে। প্রবান শিকক ভ্রমায়ক করেন—শিককেরা বাঁচাইয়া আছেন কিনা। কোন্ হুলে কতটুকু হুব বাইতে পাইতেছে, কোন্ হুলে বাজ চারিট ভাত বাইরা হুলে আসিতে পাইতেছে না, কোন্ হুলে চারিট ভাত পাইতেছে ত একটু ভাল পাইতেছে না, কোন্ হুলের একটু করিয়া দ্বিগুণ হাক প্যাট হাক নাট বৈ হুইট করিয়া নাই; এ সব লগ্নাব কাহারোও নইতে দেখি নাই। হেলেনের শীর্ণ বলিন বুধের দিকে চাহিয়া কাহারও হুধনতলে বেধনার আত্মকাল ফুটরা টিউনি দেখিলাম না। আবার পুত্র আছে, কতা আছে। আমি তাহাদের বাঁচিরা-পতাইরা কতা আসে তাবি। আমি বলি—আসে তাহারা বাঁচিরা বাহুক, লেখাপড়া পরে হইবে। এই সব হুলে আসে চারিট বাইরা-বাইরা বাঁচিরা বাহুক, লেখাপড়া তাহাদের পরে হইবে—ইহা বলিবার কি আত্ম বদম্বেশে কেহ নাই?

চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে একবার এক সরকারী অশাখ আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে অশাখ হেলেনেরেবের চারি বেলা খাবারের ব্যবস্থা দেখিরা অশাখ হইয়াছিলাম। হুব, বি, মাহ, বাংল, ভিন, ভরিতরকারী, ভাত, ভাল, রুট প্রভূর। সকলেরই গোলগাল চেহারা। কাহারও হাত বা পিরা বাহির হইরা নাই। আমার আপেকার লহকর্না হুঁএকজন সেখানে চাকরি করিতেছেন দেখিলাম। তাহাদেরও বাইরা-বাইরা সুপুট চেহারা হইরা পিতাছে। সেখানে হেলেনেরেবের পোশাক-পরিচ্ছদ মরলা না হইতেই ধোপায় বাতী যায়। সেখানে ডাক্তার আছে, বেহে ডাক্তার আছে, ডিস্পেনসারি আছে। সেখানে তাঁত আছে, তাঁতি দিরা কাপড় দুমান হয়। আরও কত কি আছে সেখানে। আমাদের সব হুলে নাই কেন? অশাখ হেলেনেরেবের ভক্ত ব্যয় করিবার নিমিত্ত এত অর্থ তো সরকার পাইরা থাকেন। এই অর্থ কাহারো নিকট হইতে আদায় হয় আমাদের হুলের হেলেনা তাহাদের নতাব। আমাদের হুলের হেলেনা একবেলা পেট ভরিরা বাইতে পার না। বেক লগ্ন প্যাটের কাপড়ের ভক্ত তাহাদিগকে বাসি পেটে, শুক বুধে কণ্ট্রোল আপিলে হুটতে হয়। কণ্ট্রোল অকিলার বদকাইরা ভাড়াইরা বেন।

বাড় ইহাদের চাই। প্রভূর বাড় চাই। বাড় ইহাদিগকে জুবাইরা রাখিতে হইবে। হুলে ইচ্ছানত বাইবে, হাঁসের বত বাইবে, কেলাইবে, হুতাইবে—তবে তাহারা দুহ-সবল থাকিবে। আমার বারগা ছিল হুর্জল হেলেনকে অধিক বাড় দিলে তাহার কতি করা হয়। এখন সে বারগা গিয়াছে। আমার বলবান হেলেনও বাজা গিয়াছে। আমার এখন হুলে—বাহার প্রতি দুহুর্জে বহুভর করিয়াছি সেও কৌক করিয়া বাইরা-বাইরা, এখন কি রোগে হুগ্ন্য করিয়াও দুহ-সবল হইরা বাঁচিরা রহিয়াছে। হেলেনের জুবা নাই অশাখ তাহাকে কোর করিয়া বাঁচাইলেই তাহার কতি করা হয়।

হুর্ল পিতামাতার হুর্ল হেলেনও অধিক বাত পাইলে হুর্ল-লম্ব হয়। বহু দিন হইতেই বাঙালীর বাত নাই। প্রকৃতক্ৰমে আত্মীয় 'বাত চাই' 'বাত চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া দিয়াছেন। আত্ম বাঙালী মাঝেই হুর্ল। বাঙালীর হেলেনও হুর্ল। হুর্ল পিতামাতার হুর্ল হেলেনেরে বলিয়া আত্ম বাহারা হুপ করিয়া বলিয়া থাকিতে চান, আমি বলি তাঁহারা নবচেয়ে বেশী হুর্লভিগ্ন। তাঁহারা জাতির নর। কোথায় কিসের দিকে হুর্ল দিয়া, কি দেখিয়া তাঁহারা বাঙালীর কি ভবিষ্যৎ করণা করিতেছেন? আত্মীয় বাঙালীর নহয় নহয় হেলেনের মাঝে থাকিয়া, আত্ম বাঙালীর নহয় নহয় হেলেনের হুর্লমলিন হুর্লের দিকে চাহিয়া আমি দেখিতেছি বাঙালী ভবিষ্যৎ। বিভাত হরিষ পিতা-মাতাও তাঁহাদের হেলেনেরেই পেট ভরিয়া বাতরাইতেছেন, আত্মীয় দেখিয়াছি। আত্ম বাঙালীর হেলেনেরেই বাত নাই। বাঙালী হরিষ।

বাঙালীর বাত নাই—ইহা নত। অধিক বাত উপর করিতে হইবে—ইহাও নত। কিন্তু বাঙালীর হেলেনেরেই প্রকৃত বাত দিবার নত বাত বাংলাদেশে নাই—ইহা নত নর। বাংলার হেলেনেরেই হুর্লের প্রাস কাহারো কাতিরা বাইতেছে? হুর্লের হেলেনেরেই যদি না বাইতে পাইরা মলিন তবে শিকা-নংকারের কি প্রয়োজন? কিসের হুর্লই বা শিকারের, শিকারী, শিকাবিভাগ? হেলেনের বেতন বাড়িয়া, শিকারের বেতন বাট্টা টাকা, মাপসি ভাতা পাট টাকার ব্যবস্থা করিয়া, সরকারী হুর্ল, বেসরকারী হুর্লের প্রভেদ রাখিয়া, প্রথম শিকক এবং সহকারী শিককদের মধ্যে বিভেদ—হুর্লপূর্বক, আপনা হইতে বহু হুর্ল উঠিয়া বাইবার—বাহিষি নাহাওয়ার বাড়ি বেলিলেই কিছু জাতিগঠন হইল না। শিককদের ও হাজরাহীনের প্রতি সরকারের দরদ আদর কতকটা বুঝিয়া লইয়াছি।

শিককদের বাংলায় কথা ভাবিতে গিয়া সকলেই অনেক কষ্ট করিলেন—ওমিলার। শিককদের পেট ভরিয়াছে। এখন শিককদিগকে শিকা দিবার পালা চলিয়াছে। ইহাতেও শিককের কৃতজ্ঞ। শিককদিগকে শিকা দিতে সকলেই চান। নিরক্ষর বাড়িও শিককে কদ জাণী মনে করে না। ইহা বাতাবিক। একটা মাকড়সার দিকট হইতেও শিককেরা শিকালত করিতে প্রস্তুত। নবই চলিতে থাকুক। কিন্তু

অমিলবে যে সকলের—হুর্লের হেলেনের উপর দরদের প্রয়োজন, শিককতার প্রতি পিতামাতার বেতন দরদ থাকে। হুর্লের হাজরাহীনের উপর বাহাদের দরদ নাই তাঁহাদের শিকা বিভাগে থাকা উচিত নর। পিতা-মাতা প্রকৃতি শিককতার হুর্ল দেখিয়া কাহারো শরীরের গ্রামি হুর্লেন। শিকার গলদ হুর্লেন না।

বাহারা বলেন, চাকরী না পাইরা লোকে শিককতা গ্রহণ করে, তাঁহারা হুর্ল বলেন। চাকরী না পাইরা বাহারা শিককতা গ্রহণ করেন তাঁহারা শিকাবিভাগে বেশী দিন থাকিতে পারেন না। দশ বৎসর শিককতা করিলে মাহন অপহার হইরা বার বাহারা বলেন, তাঁহারা শিককদের দারিদ্র্য কথ্য হুর্লেন না। শিককতা করা নহক নর। আত্মীয়-বন্ধন, বন্ধুদ্বন্দ্ব ভ্যাগ করিতে হইবে; চিরদারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে; অপমান, লাজনা অদের আভরণ হইবে; অবজা সর্বত্র চারিদিকে উভত রহিবে; নরদের কোনও অংশে তাঁহাদের এতটুকু স্থান রহিবে না; রাজ্যের কোনও কার্যে তাঁহাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হইবে না; আত্মীয় জাম-নয়নের হুর্লে বলিয়া তাঁহাদিগকে উপলব্ধ হুর্লাইতে হইবে; লেজি নহক কথা। অশিকককে টেমিং দিয়া শিকক করা বার না, বহু শিকককে অবসর দিয়াও শিকার উন্নতি হয় না। শিকার উন্নতি কিলে হয় শিককেরা জানেন। আত্মীয় শিকর নব্যে থাকিয়া বাহাদিগকে শিক হইরা বাইতে হয় তাঁহারা জাতিগঠন করিতে জানেন না ত কাহারো জানেন? সে নব প্রেরই আত্ম শিককদিগের দিকট বহু প্রের নর। শিককদিগের বাহাদিগের প্রেরও আত্ম আর তাঁহাদের দিকট বহু প্রের নর। হাজরাহীনের জীবনের প্রেরই আত্ম তাঁহাদের দিকট নবচেয়ে বহু প্রের। জাতি বাচিয়া থাকিলে তাহাকে লাবধান হইতে হইবে।

আমি সরকারী হুর্লের শিকক নই। সরকারী হুর্লের শিককেরা হরত ইহার বিপরীত বলিবে। সরকারী হুর্লের নবই টিক থাকিতে হইবে। সরকারী হুর্লের হাজরাহীও নাকি বহু লোকের হেলেন। বহুলোক বাঙালীই বা আত্ম কে আহেন? বাহাই বা কোথায়? বাংলাদেশের হুর্লের হাজরাহী নব নব্যবিত্ত সন্ত্রাসের হেলেন। বাংলার নব্যবিত্ত সন্ত্রাসের হুর্লিতেছে। বাঙালীর হুর্লের হেলেনেরেও হরিষে বলিয়াছে—ইহার প্রতিকার চাই।



দেবানন্দ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১

কেলের বেগাব শেষ হইবার কয়েকদিন আগে দেবানন্দ বিয় করিয়াছিল খেল হইতে বাহির হইয়া সে রাজমণির বাইবে। তাহার আবাদ্য বহু ইজের সঙ্গে লক্ষীর বিবাহ হওনাকে তাহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহাদের দুই জনকে বেবিবার ভত।

ছাড়া পাইবার দুই দিন আগে পিতার পত্র আসিল। পরে তিনি তাহাকে সোলা তাহার কর্ণহানে চলিয়া আসিবার ভত লিখিয়াছেন। অগত্যা মনের ইচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে পিতার কর্ণহানে রওনা হইতে হইল।

দেবানন্দ আলিয়া পৌছিল। ভিন্ন হাস সঙ্গের কারাদলের আসামী কেল-প্রত্যাপ্ত পূজের পা হইতে জায়া বুলিয়া লইয়া জীবানন্দ অনেককণ চাহিয়া দেখিলেন। পিতার বুকের ভাব দেখিয়া দেবানন্দ অনেক মনে হাসিয়া বলিল—আমি কেল ভালই ছিলার বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন—চেহারা দেখে কেমন ছিলে কিছু বুঝতে পারছি। এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম কর। তার পর কলকাতা গিরে কলেজে ভর্তি হবে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর কয়েক হাস পরে পরীক্ষা, পরীক্ষার ভত তৈরি হতে হবে।

দেবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল রাজমণির বাইবার কথা পিতাকে এখনই বলিবে কিনা।

জীবানন্দ বলিলেন—তুমি এত দিন যে সকল কারণে পড়া-ভন্দের অবহেলা করেছ সে সবকে এখন আর কিছু বলা নিরর্থক। কতি বা হবার হয়েছে। তবে সর্ব্ব্বা একটা কথা মনে রেখ। তোমাকে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে হবে। ইজের ভত তোমার বিহৃত কর্ম্মচারী দেই যে মনে বাবে। এছাড়া তোমার কাকের বাবীদতা অনেকটা লুপ্তিত করতে হবে।

শিতা ইজের কথা ভোলায় সুযোগ পাইয়া দেবানন্দ বলিল, কলকাতা যদি যেতে হয়—আমি কয়েকটা দিন রাজমণিরে কেন ঘুরে আসি না বাবা? না কি আমার কথা কিছু লেখেন নি?

জীবানন্দ পূজকে এখন রাজমণিরে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। তাহার স্ত্রী জিনবনী লিখিয়াছিলেন—“যেহু শীত খালাস হবে। সে বেন একবার রাজমণিরে আসে। তাকে বেগবার ভত আমি জহির করে পড়েছি।—উত্তরে জীবানন্দ সংকেপে জ্ঞানাইলেন—যেহু পরে রাজমণিরে বাবে। ইজকে লগায়ে

আটকাবার ভত অনেক কটে তার বিয়ে বেগরা হবেহে। আমার বেয়ের ভবিষ্যৎ তেবে যেহুক রাজমণিরে পাঠাতে চাই না এখন। কি জানি তার সংস্পর্শে ইজ যদি আমার চকল হয়ে ওঠে। তার বাপ না দেই, কে তাকে ঠেকাবে? লগায়ে মন বহুক ওর, পরে যেহু রাজমণিরে বাবে।

পূজের কাছে এত কথা না তাকিয়া তিনি বলিলেন—তা লিখেছেন। আমি জানিয়েছি এখন আর রাজমণিরে গিরে যেহুর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। একেবারে পরীক্ষা গিরে বাবে।

দেবানন্দ নিরাশ হইল, কিন্তু পিতার কথার প্রতিবার করিল না।

ট্রান্সকার সার্টিকিফিকেটের ভত ও কলেজে স্থান পাওরা বাইবে কিনা জানিবার ভত কলিকাতার পত্র লেখা হইল। সাত আট দিন লাগিল উত্তর আসিতে। উত্তর আসিলে ঘির হইল দেবানন্দ কলিকাতার এক আদীরের বাসার উট্টরা কলেজে ভর্তি হইবে এবং হটেলে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে।

শিয়ালদহে পৌছিয়া টেননের বাহিরে বাইবার পথে পিছন হইতে হঠাৎ কে দেবানন্দকে জড়াইয়া বলিল।

চমকিয়া দেবানন্দ পিছন করিয়া দেখিল মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র বলিল—তুই কোথার চলেছিস যেহু?

দেবানন্দ—তুই বাচ্চিস কোথার?

মহেন্দ্র বলিল যে, সে কলেজে ভর্তি হইয়া পটলভাকার কলেজ হটেলে স্থান পাইয়াছে। তাহার এক আদীর সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেবানন্দ হটেলে থাকিবে তিনি মহেন্দ্র তাহাকে ছাড়িল না। বলিল, চল, আমার হটেলে উঠবি। ভিন্ন হাস খেল যেটেছিল, তার বাহাছরের খেলে হলেও সরকারী কলেজে জারগা পাবি না, কেন মিহিমিহি ঘুরে বরবি? তার চেয়ে আমার কলেজে ভর্তি হয়ে যা। তা হলে হু'জম এক সঙ্গে থাকতে পারব।

হুলির মাথার মোটাবাট চাপাইয়া দুই বহু পটলভাকার মহেন্দ্রের হটেলে গিয়া উঠিল।

সেই দিনই হুপুয়ে দেবানন্দ কলেজে ভর্তি হইল। হটেলের একট ঘরে দুইট সীট খালি ছিল। সেখানে তাহার স্থান পাইল।

হটেলের যে বরটিকে দেবানন্দ ও মহেন্দ্র অবিকার করিল, সে বরে ভবেন বলিয়া একট খেলে থাকিত। ভবেন তৃতীয় বার্ষিক জেণীর ছাত্র। সে বক্তৃতােকের খেলে, অত্যন্ত বাহু-বাহু। তাহার দুই বাবা কলিকাতার থাকেন। একজন

ব্যারিষ্টার ও অভিনয় ডাক্তার। হঠেলে তাহার বণেই থাকিত। কলমেও তাহার প্রতিপত্তি আছে ভাল বক্তা ও রাজনীতি বলিয়া। হঠেলে নকলে কামিত বি-এ পাস করিয়া সে ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্ত বিলাতে গাইবে।

আলাপ হইবার পরে দেবানন্দ ও মহেন্দ্র তুমিরা আনন্দিত হইল যে তবশে এটি-সারকুলার সোসাইটির তলাটিয়ার হইয়া কনকারেন্সের সময় বরিশাল গিয়াছিল। তিন জনের মধ্যে শ্রীই বন্ধু হইয়া গেল।

দেবানন্দ তবশের বক্ত বসিষ্ঠ পরিচয় পাইতে লাগিল তত দূর হইল। পাঠ্য পুস্তকে বিশেষ অহরজি না থাকিলেও তবশে দাশা রকমের বই, বেশীর ভাগ ইতিহাস ও রাজনীতির বই পড়িত। সে বক্ত বক্ত বেতাদের লগে মিশিত, বক্ত বক্ত লতার বক্তা করিত, এটি-সারকুলার সোসাইটির জন্ত বক্ত পরিচয় করিত। তাহার সমস্ত কালের মধ্যে এমন একটা আত্মরিক-তার দূর ছিল যে দেবানন্দের তাহাকে বক্ত ভাল লাগিল। কয়েক দিন বাইতে না বাইতে হুঁজবের মধ্যে সম্পর্ক হইয়া গাঁড়াইল কতকটা যেরূপেও অগ্র ও অগ্রত হোট তাইয়ের মধ্যে সম্পর্কের বক্ত।

কলিকাতার আলিয়া দেবানন্দ বাংলার প্রাণকেন্দ্রের মধ্যে স্থান লাভ করিল। শুধু বাংলা কেন, লারা ভারতবর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র কলিকাতা তবশ বণেশী আন্দোলনের উত্তেজনার উবেল। পার্কে পার্কে প্রতিদিন লতা চলিতেছে। লতার যবেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা হইতেছে, কুলারী বদলনীতির প্রতিবার করিতেছেন বক্ত বক্ত বেতারা। সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন পরম পরম গ্রহণ, বণেশের দাশা স্থানে লতা-সমিতি ও বদলনীতির সংবাদ পরিবেশন করিতেছে। লহরের বুদ্ধিবীণী-সমাবে, হাজরহলে উত্তেজনার স্রোত বহিতেছে।

দেবানন্দ কয়েকদিন পার্কে পার্কে ঘুরিয়া বক্তা তুমিরা বেতাইল। লতার সময় হঠেলে কিলিলে তর্কবিতর্ক দূর হইল। অত বর হইতে হেলেরা আলিয়া তবশের বক্ত বসিত ও আলোচনার খোপ দিত। কিছু কাল এই তাবে চলিবার পর দেবানন্দের থাকিষ্ঠা বিরক্তি বহিয়া আসিল। সে তাবিল—এখানে বেবহি হেলেরা লবাই কেবল লতা-চতুকা কথা বলে, কাজ কেহ করে না এক তবশ-না হাজা। বক্তার প্রত্যেকটি হেলে বেন হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিশিষ্ট পালের কুল এক একটা লগরণ। কিন্তু মিঠা ও আত্মরিকতা ও কাহারও মধ্যে বেধা বার না। দাশ্য আচ্ছা ও তর্কবিতর্কের জন্ত পড়া-জনা করা হয় না।

আর লহ করিতে না পারিয়া একদিন সে তবশকে বলিল, তবশ-না, যোজ বক্তার চোটে আমার হাঁক ধরে গেছে। লগরণের আচ্ছাটা বক্ত করুন।

তবশ হাসিয়া বলিল—চট করে বক্ত করা বাবে না, তবশ আমি চেষ্টা করব। এবার চল একদিন এটি-সারকুলার সোসাইটির লতার মিলে বাই।

তবশের লগে সোসাইটির লতার কয়েক দিন ঘুরিয়া সোসাইটির কালের দাশা সে লগ্য করিয়াছিল। তাহার লব লগষ্ট হয় বাই। সে তাবিল বরিশাল কনকারেন্সের পরেও এই বরশের কাজে কিছু কল হইবে বলিয়া হাঁহা এলও বিধান রাখেন। আত্মর্য বটে। তবশ তাহার লনের তাব কিছু হুজিল। কয়েক দিন পরে সে বলিল—বেবু, হেলেরের তর্ক-বিতর্ক যোজ শুনহ, এবার বক্ত হলের দানে নেতৃহীনীরের আলোচনা একই শোনা ভাল। কাল আমার হোট দাশা ব্যারিষ্টার মিঃ হারের বাতীতে দাশার কথা আছে। আমার লগে বাবে?

ব্যারিষ্টারের কথা তুমিরা দেবানন্দ বাইতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বলিল—আমি পাড়াপেরে লাহব, তাঁবের অপরিচিত। আমাকে বার দিন তবশ-না।

তবশ হাসিল না। বলিল—এত সফোচ কিলের? কি বরশের আলাপ হয় তাঁবের মধ্যে চুপ করে শুনে বাবে। আমার দাশা মিঃ হার অনেক কালকে ইংরেজীতে রাজনীতিক গ্রন্থ লেখেন। হাজরহলে তাঁর কিছু প্রতিপত্তি আছে। হাজরহলের লগে সংযোগ রাখতে তিনি উৎসুক।...

তবশের অহরোবে দেবানন্দকে তাহার লগে চকবেতে যোতে মিঃ হারের গৃহে বাইতে হইল।

কটক, লম ও পাড়ীবারালাওলা দূহং অটালিকা। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার লাহেবের বাতী। আর্দালী, বর, বায়ুর্ট, ধামলাদা, আদা লবই বদারীতি আছে—ইংরেজী কায়দার ডাইনিং ক্রম, ক্রুটিং ক্রম, বিলিয়ার্ড ক্রম, টেনিস লম, ব্রেক-কাষ্ট, লাক, ডিমার সে গৃহের ব্যবস্থা। বণেশী রীতির মধ্যে প্রণামটির চল আছে। পারদাশা ও ক্রেসিং পাটন পরিহিত মোটা চুর্কট হাতে ব্যারিষ্টার লাহেবকে দেবানন্দ বন্ধুর ইন্দিতে প্রণাম করিল। ব্যারিষ্টার ডিকাল করিলেন—“এট কে তবশ?” তবশ বলিল—“আমার বক্ত সেকো ইহারের হাজ, লুতন এসেছে। এর বাবা দায়বাহাহর, পুলিশের ডি-এস-পি।”

“তাই কাকি? বশ, বশ। তেতরে আলাপ করিরে বিও। তেদী গ্যাত হু মিট ইট (তোমাদের লগে বেধা হওরতে তারি গুণি হলাব)। তোমার বাবা দায়বাহাহর ডি-এস-পি? বশ, বশ। যোর। যোর।”

বর আদিকা সেলাম করিয়া গাঁড়াইল। ব্যারিষ্টার লাহেব বলিলেন—বায়ুকো সেলাম বো।

তবশ দেবানন্দকে লগে লইয়া বর হইতে বাহির হইতে-ছিল। মিঃ হার বলিলেন—বাই বি বাই, তহে তবশ,

আজকের বেদী ও ইতিহাস বিষয়ে আমার হঠাৎ আঁতড়েন
যেয়েছে। কলেক্‌ তোমার বন্ধুদের পক্ষে ভবিষ্যৎ।

অবেশ বলিল—আজ্ঞা।

দেবদাসকে লইয়া অবেশ উপরে উঠিল। পালিশ করা
কার্টের সিঁড়ি, দাক্ষিণ্যে কার্পেট বিছানো। সিঁড়ির মাথার
বহর পনের একটি সুত্রী, ভাষ্যবর্ণ ঘেরে বিছনি বোলাইয়া কি
একটা গানের সুর তাঁকিতেছিল। অবশেষের সঙ্গে অপরিচিত
একটি হেলেকে উপরে আসিতে দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া জ
হুঁচকাইয়া সে ঠাটাইয়া রহিল। উপরে উঠিয়া অবেশ বলিল—
ভদ্র মণিৎ কিট। মামী-না কোথায় রে? কিট বলিল, ভদ্র
মণিৎ।—হুঁচকানো জ্বর নীচের চোখ দুটাইয়া ইন্দিতে সে যে
এক করিল, তার মানে এ আবার কোন আনাতীকে নিয়ে
এলেহ? অবেশ এই ইন্দিতে জবাব না দিয়া দেবদাসকে
লইয়া ড্রইংরুমে বসাইল।

দেবদাস এই প্রথম ভবনকার দিনের বিভ্রান্তী ব্যারিষ্টারের
বালভবনের ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। ঘরের আসবাব ও
লাজাইবার কারুকা দেখিয়া সে বিম্বিত হইল। তাহার ষ্টিক
লম্বুবে দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রকৃত অয়েল পেইন্টিং।
অত বিস্তার দেয়ালে দ্বারা সপ্তম এডোয়ার্ডের ছবি। ঘরের
কোণগুলিতে কাল পাথরের ভেগারার উপরে রূপালি ক্রেনে
বাঁধা ছোট ছোট ছবি, অনেকগুলি বিলাতী হুজুর, কতকগুলি
পরিবারের লোকজনের।

তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া অবেশ অত কক্ষে গিয়াছিল।
কিছুক্ষণ পরে এক জন মহাবয়সী ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে লইয়া
সে ঘরে ঢুকিল। বলিল—দেবদাস, মামী-মাকে প্রণাম কর।
দেবদাস প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার
বাবা মার বাহাহর ডি-এস-পি? বিলাত পেলে তুমি এস. পি.
হতে পারবে। তোমাকে যেখান থেকে চটপটে হুজুরান
হলে বলে মনে হয়। আমার বাবাও মার বাহাহর, তিনি
একজিকিউটিভ মার্জিনে ছিলেন। আমার হুই তাই, এক জন
হুজুরিয়াল মার্জিনে, এক জন ষ্টাটসের এস. ডি. ও.।
পৰ্বণমেষ্ট মার্জিনে বাবে, না অবশেষের বড় ব্যারিষ্টারী পড়বার
ইচ্ছে তোমার? তোমার বাবা যদি দ্বাদশী হয় এক-এ পাশ
করেও যেতে পার। উনি এক ইনের দায়করা হার ছিলেন,
লব দায়দা করে দিতে পারবেন।

দেবদাস ঠাটাইয়া তাঁহার কথা ভাবিতেছিল। তিনি
বলিলেন—বোস, ঠাটাইতে কেন? ওরে কিট শোন দেখি।

কিট জ হুঁচকাইয়া এক হাতে বিছনি টানিতে টানিতে
ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে চাহিয়া মিলেন মার
বলিলেন—কি অনভ্যতা হচ্ছে কিট, বিছনি ছেড়ে বাত।
চোখ মিটমিট করছ কেন? সত্য করে বল এখানে।
অবেশবাবার পুত্র বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ কর। এর বাবা

পৰ্বণমেষ্ট মার্জিনের লোক, মার বাহাহর। ইচ্ছে করলে
হেলেকে বিলেত পাঠাতে পারেন।

কিট বলিল—তুমি বিলেত বাবে সত্যি? টেবিলে বেতে
দান? না এখনও হাত দিয়ে বেখে বাত?

অবেশ—আমি ত হঠাৎ হাত দিয়ে বেখে ভাল-ভাত খাই
কিট।

কিট—তোমার কথা আলাদা। তুমি খাঁট বড় লোক।
তা হাতা সত্যি সত্যি বিলেত বাছ।—দেবদাসের দিকে
কিরিয়া সে বলিল—তোমাদের বাড়ীতে বাবুটি আরা আছে।

দেবদাস কিটর বয়সের ঘেরের এই বয়সের কথাবার্তা
কোছুক বোঝ করিতেছিল। বহু হালিয়া সে বলিল—আমরা
বাবুটির হাতে খাই না।

কিট হুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—বাবুটির হাতে
খাও না? এঃ, বলছ কি পো। ওমা, না, ভদ্র—

কিটর না অতন্ন গিয়াছিল। কিটর বক্তব্য শেব হইল
না।

দেবদাস অত্যন্ত অবজি বোঝ করিল। সে অবশেষে
বলিল—আপনি বোঝ হয় এবেলা এখানে থাকবেন। আমি
হঠাৎ কিরি?

কিট এক লাকে উঠিয়া দেবদাসের হাত চাপিয়া বলিল।
বলিল—রাগ হ'ল তুমি? বল, বল, না তোমাকে না খাইয়ে
যেতে যেবেন তেবেহ? বাবুটির দ্বারা নয়, মিটি বেতে
যেবেন। তোমরা মিটি বেতে খুব ভালবাস, না? আমরা
খাই কেক, পুডিং, ভাতটাইট। হাজার চাইলেও না আনবার
বেশী রসগোলা যেবেন না আমাকে। বিলিটা কীক পেলেই
রসগোলা চুরি করে খেয়ে খেয়ে। বিলিকে জান? আমার
ছোট ভাই।

বর আসিয়া জানাইল যেমনাছেব খানা-কামরার
জাকিতেছেন।

জলযোগ দ্বারা হঠাৎ কিরিবার সময়ে দেবদাস
অবেশকে বলিল—কই, আপনার মামার বাড়ীতে রাজনীতি
চর্চা ত ভালবাস না।

অবেশ হালিয়া বলিল—রাজনীতি চর্চা হয় সন্ধ্যার পরে।
আর এক দিন তোমাকে নিয়ে যাব, তখন তখন—আজ তুমি
পরিচয় করিয়ে দিলাম। সত্যি আজ্ঞার অনেক আসেন। খুব
ভর্ক-বিভর্ক হয়, তুমি উত্তমনার বট হয় কোন কোন দিন।

অবেশ দ্বারিত সন্ধ্যার পরে এই আজ্ঞার শেবের দিকে
উপস্থিত লকলের বেজাক কোদল ও ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে।
মিঃ মার দিকে কথাবার্তা কব বলেন বক্তব্য পলিটিকাল
আলোচনা চলে। শেবের দিকে আলোচনা রাজনীতি দ্বারা
মহোদা হইয়া উঠে। রাজনৈতিক বেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্র,
বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতা, বাত, পলক, শিকার, এতৎসংগত

ইংরেজী ও কন্নড়ী সাহিত্য ইত্যাদি আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। বলের মধ্যে মিঃ গাঙ্গুলী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু ধরন রাখেন। তিনি অরবিন্দ ও তারতন্য হইতে আয়ত্ত করেন, সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে শ্লোক পর্যন্ত সুখর বলেন। তবেশ আড়ার শেখের বিকে বড় থাকে নাই। সে ভবিষ্যতে এই সময়ে আড়া খুব কমিয়া উঠে।

২

কয়েকদিন পরে বিকালের বিকে তবেশ বেবানন্দকে বলিল—আজ চক্রবেতে বাছি। চুই বাবি?

বেবানন্দ—আজ তারতন্যের চক্রবর্তী ও মৌলভী লিলাকং হোলেন নাকি গোলবীথিতে বড়তা দেবেন। সেখানে বাবার ইচ্ছে আছে।

তবেশ—বড়তা রোজ হচ্ছে, সেলেই হ'ল। আজ মাঝামাঝি ওখানেও সভা আছে। হোট লাইট—তুপেন বোল, যে চৌহুরী ও সুরেন্দ্র বাঁকুজেকে তেকে নাকি ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে খুব বরকেছেন, শুকন রট্টেছে। কি ব্যাপার হয়েছে খোদবার ইচ্ছে আছে।

দেবিন্দ্রের অভিজ্ঞতা বেবানন্দের মনে বোঁচাইতেছিল।

তাহার মনে হইল একটা ক্রিমি, আলাদা ভগতে উহার দান করে। সে ভগতের নকে তাহার কোন সংযোগ নাই। সে বাইবার উৎসাহ প্রকাশ করিল না।

তবেশ—আজকের দিন চলু। তাকে নিয়ে বাবার ভক্তে কিট আনাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে। না নিয়ে গেলে খেয়ে ফেলবে। বাইরে থেকে দেখতে ওর বরণ-বরণ ওরকম হলো ওর মনটা খুব ভাল।

কিটর আশ্রয়ের কথা ভাবিয়া বেবানন্দ একটু আকর্ষণ হইল, কথটা সে বিশ্বাস করিল না।

তবেশ নিজের মনে বলিয়া চলিল—যে পতর্নালের কাছে পরে, বাবুর্জির রাজা অবাধ্য থাক, আবার কার কাছে নাকি শিবপুত্রা পিঠেছে। ও একটা অল্পত মেরে ওকের সার্কেলে। ওর বহেশী গান শোনাও একদিন। বেশ ভাল গাইতে পারে।

তবেশ এতখানি আশ্রয় প্রকাশ করিবার পর বেবানন্দকে রাজী হইতে হইল। কিটর শিবপুত্রা করিবার কথা ভাবিয়া তাহার লজ্জার কথা মনে পড়িল। কিটকে শিবপুত্রা করিতে শিখাইল কে?

চক্রবেতে পৌঁছিতে তবেশের একটু বেদী হইয়া গেল। ব্যাখিষ্টার সাহেবের দীতের বলিবার মরে তখন আসল কাঁকিয়া উঠিয়াছে। বেবানন্দকে নকে লইয়া তবেশ মেরে একতাপে হুইখানা চেয়ার অবিকার করিল। কেহ তাহাদের লক্ষ্য করিল না।

আলোচনা চলিতেছিল বহেশী আন্দোলনের অবস্থা লম্বে।

মিঃ রায় বলিলেন—মাকোরাহী চেয়ার ব্যান্ডেটোরে টেলিগ্রাম করেছে বিলাতী কাপড় বিক্রী হচ্ছে না, তারা কনট্রাই করতে পারবে না। ব্যান্ডেটোর থেকে তাদের লম্প-বেশ দিয়ে এবং তর বেধিয়ে তার করা হয়েছে, আবার চেটাই হচ্ছে বেশী মিলগুলোর সব কাপড় কিবে কলে বাত বাকার হাতের মধ্যে আনা যায়।

মিঃ গাঙ্গুলী—আর একটা চেটাইও হচ্ছে। ব্যান্ডেটোরের কাপড়ে বেশী মিলের ছাপ দিয়ে মাকোরাহীদের হাতে বেওয়া হচ্ছে। তারা বেশী বলে সেই কাপড় চালাচ্ছে। ব্যাপার বরা পড়াতে হৈ চৈ আরম্ভ হয়েছে।

মিঃ গোহ—ইংলিসম্যান পবর্ণবেটকে বলেছে, ট্রাইক এট বি ক্রট অব বি এজিটেশন (আন্দোলনের পোতার আঘাত কর)। আবার তর বেধিয়েছে, আনাদের বৈধাধ্যুতি হ'ল বলে।

মিঃ মিটার হাতের সিগারেট কেলিয়া দিয়া বলিলেন—উহ, হ'ল বলে নয়, হয়েছে। কলকাতার ইউরোপীয়ানরা সেবর-র্যাটলিং (তরোয়াল ঘুরাইতে) আরম্ভ করেছে। বলেছে পকাশ বহর তরবারি খাপবহ, ছিল এবার খাপ থেকে বের করতে হবে।

মিঃ গোহ—সুনলান রাইড ট্রাইটের মার্কেটরা আগিলের কেরানীদের তাক (বরখাত) করবে বলে তর বেধিয়েছে।

মিঃ মিটার—হোটলাইট ক্রোকারের মিটতে কি হ'ল ভাসেছেন?

মিঃ রায়—মিঃ হ'ল কোথায়? মিঃ বহুকে হোটলাইট বললেন আপনি ও আপনার বহুরা মিলে ছাত্রদের খেপিয়ে ফুলছেন কেন? মিঃ বহু বললেন—আমরা কিছু করি নি, ছাত্রদের খেপিয়েছে পবর্ণবেট। হোটলাইট বললেন, কতা রিপ্রেসিড বেকার (উগ্র বরনদীতি) নিয়ে তিনি সবাইকে টিট করবেন। মিঃ বহু আর কোন কথা না বলে চলে এলেন।

মিঃ মিটার—মিঃ সুরেন্দ্র ব্যাখাখিও পুলিশ কমিশনারকে ট্রিক এই কথা বলছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী—আজ 'বারে' সুনলান পুলিশ কমিশনারের ইনিত্তে করপোরেশন নতুন বাই-ল (উপরিবি) পাশ করছে পাবলিক কোয়ার ও পার্কে মিটিং বহু করবার ভত।

মিঃ ভাটা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—করক, আমরা কুট-পাথে মিটিং করব। এ বাই-ল পাশ করানো বহু লম্বক হবে না।

মিঃ গোহ শিকা বিভাগের ডিরেক্টর পেডলারের লম্বলট পায়খুলারের কথা ফুলিলেন। বলিলেন, ট্রাইক বইয়ের

মধ্যে দিয়ে রাজতক্তি শেখবার নির্দেশ দিয়েছেন মিঃ পেডলার।
তদ্বিহীন হার ও বাটারদের বরকট মিটিং বাওয়া নিষিদ্ধ করে
নূতন একটা লায়কুলায় বেরুচ্ছে।

মিঃ ডাটা—মিটিং বাওয়া বন্ধ করে লায়কুলায় বের
করলে সব হেলে রাজতক্তি হয়ে বাবে। দি আইডিয়া।
তদ্বিহীন ওয়ার্ডের ফুল-ফলেদের হেলেরা মিলে সেদিন এক-
রাশ বিলিভী কাগজ ও চিনি কিনে আশুন লাগিয়ে পুড়িয়ে
দিয়েছে।

মিঃ পোহ—ইংলিশম্যান বলেছে, মুসলমান ও বাটাররাইরা
বাঙালীদের উপর তারি চটে গিয়েছে এই বদেষী আন্দোলন
চালাবার জন্যে।

মিঃ মিটার—সব মুসলমান চটে মি। পার্টিশন
(বিশেষবিভাগ) আর বদেষী নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি
দল বেধা আছে। এক দল খোলাখুলি বলছেন লর্ড কার্জন
মুসলমানদের নূতন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করে মুসলমানদের
উপকার করেছেন। কিন্তু তাঁদেরই আর এক দল বলছেন,
পার্টিশন মুসলমানদের কষ্ট করবে, পোটা বাঙালী আত্মকে
হুর্দল করবে। এঁরা বদেষীর সমর্থন করছেন। একটা দল
বলছেন, শিকার অঙ্গর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার
মুসলমানেরা চাকরি পাইল না। পার্টিশনের ফলে মুসলমান-
দের চাকরির সুবিধে হবে। হোলভান কাগজখানা খোলা-
খুলি বলছে যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের শত্রু, তবু মুসল-
মানদের বদেষী আন্দোলনে যোগ দেওয়া বরকার নিষেধের
আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্যে।

দেবানন্দ সমোযোগ দিরা এই আলোচনা শুনিতেছিল।
আলোচনা তাহার মন লাগিতেছিল না, কিন্তু সে ভাবিতেছিল
—ইঁহারা নিজেরা কি করিতেছেন সে বিষয়ে ত কিছুই বলিতে-
ছেন না। তাহার ভাব বেধিরা ভবেন্দ্র উদ্ভিয়ার ইন্দিত করিল।
সে উদ্ভিৎছিল, মিঃ পোহর কথা শুনিয়া আবার বলিয়া
পড়িল।

মিঃ পোহ—“সোনার বাংলা” লিকলেট নিয়ে ‘পারোদীর’
‘ইংলিশম্যান’ ও বাঙালী এংলো-ইন্ডিয়ান কাগজগুলো খুব
খালাতে আরত করেছে বাঙালীদের। বেললী খোলাখুলি
বলছে—এটা এংলো-ইন্ডিয়ান কমিউনিটির কীর্ষি।

মিঃ মিটার—“সিড বি ভগ এ ব্যাড দেব বিকোর সিটিং ইট”
—ইংরেজের এটা চিরকালের অভ্যাস। এমিকে আবার এমেকি
প্রোডোকেটওয়ার দল সম্ভ্রতি কাছে সেয়েছে। আমার এক
আত্মীয় বললেন, সেদিন গোল দীঘিতে ইউরোপীয়ান পোশাকে
একজন লোক ইংরেজীতে বক্তৃতা বিচ্ছে—ইংরেজরা আমাদের
শত্রু, তাদের হার। তাদের ভাড়িরে হাও এ বেশ থেকে।
—কাজেই পুলিশের লোক দীড়িরে আছে হুণ করে। এতে
নহজ্জেই লোকের নন্দেহ হর। যে-কোন হুতোর একটা খোল-

বাল বাবিরে দিয়ে বদেষী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কড়া দমননীতি
চালাতে পরবর্তককৈ বাধ্য করতে চায় এংলো-ইন্ডিয়ানরা।

মিঃ গাহুলী—একটা হকার ব্যাপার বলছি শুভম। বিহারে
বদেষী প্রচার করার জন্যে বাঙালী হেলেরা একটা নূতন
ট্যাকটিক্স (কৌশল) নিয়েছে। রাতা-বাটে, হাটে-বাড়ারে
কাগজের একটা স্লিপ লোকের হাতে দিয়ে বাঙালী হেলেরা
সরে পড়ে। স্লিপে লেখা থাকে—বদেষী জিনিস ব্যবহার
করুন। তার দীচে ইনষ্ট্রাকশন (উপদেশ), “এই স্লিপের
সাতখানা কপি করে আপনার সাত জন বন্ধুর মধ্যে বিতরণ
করুন। না করলে এক লক পো ও ব্রাহ্মণ বধের পাণ
আপনাকে লাগবে।” বদেষীর কত বাবের কোন উৎসাহ নেই,
পাণের ভয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে বদেষী প্রচারের কাজ করে
থাকে। আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছে বটে।

মিঃ গাহুলীর গল্প শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন।

পর্দা সরাইয়া সৌম্যহৃদি, কিতকটি সাহেবি পোশাক-পরা,
হাতে সিগার একজন ভরলোক হয়ে চুকিয়া বলিলেন, শুভ
ইভনিং হার, শুভ ইভনিং অল অব ইউ।

ভবেন্দ্র বিবরণে দেবানন্দকে বলিল, ইমিই ডটর চক্রবর্তী
বার কথা ভোকে একদিন বলেছিলেন।

দেবানন্দের মনে পড়িল ভবেন্দ্র একদিন তাহার দ্বাধার বন্ধু
ব্যারিটার ডটর চক্রবর্তীর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিয়াছিল,
তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্যে সম্রাটবাহাদুরী তাঁহাকে প্রদা
করেন, তাঁহার বারাল স্পষ্টবাহিতার জন্যে একই ভরও করেন।

ডঃ চক্রবর্তী আসন গ্রহণ করিলে ভবেন্দ্র দেবানন্দকে
তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, মরকার ভর, কেমন আছেন?

ডঃ চক্রবর্তী ঐ হাতে সিগার সুখ হইতে সরাইয়া কনমর্জন
করিয়া বলিলেন, কে ভবেন্দ্র। খবর ভাল ত?

ভবেন্দ্র দেবানন্দের পরিচয় করিয়া দিরা বলিল, আমার
বন্ধু, ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেন্ট (তোষাখড় হাঙ্গ) ও একটুত (সক্রিয়)
বদেষীওয়াল।

ডঃ চক্রবর্তী—তেরি স্ন্যাড হু মিট ইউ (তোমাদের সঙ্গে
যেখা হয়ে তারি খুশী হলাম)। বসো তোমরা।

ভবেন্দ্র ও দেবানন্দ দুইখানা চেয়ার ডঃ চক্রবর্তীর কাছে
সরাইয়া লইয়া বলিল।

মিঃ ডাটা ও মিঃ গাহুলী বসিখালে হাজমিনকে বেজ-
প্রহারের কথা বলিতেছিলেন।

মিঃ ডাটা বলিলেন—ইংরেজরা নিষেধের সভ্য জাত বলে
গর্হ করে। বসিখালের যত এটোপাস (অভ্যাচারমূলক)
ব্যাপারের কথা কেউ কখনও শুনেছে?

মিঃ গাহুলী—পরবর্তকৈ যোগ হর ইন্ডিয়ান ডেলী মিটিংয়ের
বন্দে মাতরমের ব্যাখ্যা সেনে দিয়েছে। বন্দে মাতরম্ নামে
বাইও এও বীট, বাঁধো আর মাঝো।

ডঃ চক্রবর্তী উভ হাত করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তেরি শুভ ট্রান্সমেলেশান আই রাই লে (এ কথা বলতেই হবে যে তারি চমৎকার অনুবাদ হয়েছে)। বাইও এও বীট। পাছে আশরা তাবের দার লাগাই সেই তরে তারা আশে বেঁকে আশাদের দার লাগাতে শুরু করেছে।

তুলারের এটি-বদেশী লারতুলারের কথা উঠিল। মিঃ ডাটা বলিলেন, তুলের হেলেরা বদেশী মিটিঙে বোগ দিলে রাষ্ট্র-বের স্পেশাল কমেটবল নিরুক্ত করা হবে। বি কামি আইভিরা। পড়ানো বড় করে বিরে রাষ্ট্রেরা স্পাইগিরি কলক আর কি।

ডঃ চক্রবর্তী—যেতার কিয়ার। পূর্ববদ ও আসামে তুলার ও লারন, পক্তিববদে ক্রেকার ও কারলাইল আর গবর্ণমেন্ট অব ইতিয়ার হারবার্ট রিকলে—বে আর তুইং এ শুভ জিন ওয়ার্ক (এরা একসঙ্গে বেশ কাছ করেছে)। এবের লকে আছে নকী-তুলীয় দল, বরিশাল ও রংপুরের এমার্সন, মৈমনসিংয়ের উপনন্দ ও ক্লার্ক। এখানে কারলাইল কর্মান দ্বারি করেছে তুল-কলেজের রাষ্ট্র ও অধ্যাপকদের উপর, ওখানে করেছে তুলার ও লারন।

ডঃ চক্রবর্তী হাতের সিগার এস-ট্রেতে রাখিয়া সোজা হইয়া বলিলেন। দেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা বদেশী আন্দোলন করে ইংরেজের ভাত দারবার ভত হাত বাড়িয়েছ। তোমাদের সিলি কাপকগুলো বলছে, বদেশী রায়ে “রিতাইভ্যাল অব ইতিভেনাল ইভাট্রীক” (বিশি শিরের পুনরুজ্জীবন), এটা ও এটি-ব্রিটিশ আন্দোলন নয়। অতএব গবর্ণ-মেন্টের উচিত বদেশীর সাহায্য করা। তাই শুনে লর্ড রিক্টো বললেন, বদেশীর উপর আমার বড় সিম্প্যাথি (বরব)। ব্যল, কিন্তু তুলারও বলে উঠলেন—আমায়ও।

তিনি এস-ট্রে উপর হইতে সিগারটি তুলিয়া লইলেন। অতঃপরভাবে করেকবার সিগারটি টানিলেন। আবার উহা রাখিয়া বিরা বলিলেন, পার্টিশনের বিরুদ্ধে আবেদন, মিবেদন, লতা-সমিতি চলল। ইংরেজ মনে করল, বাঙালীরাবুর দল একটা আর্টিকিলিয়াল (কলিম) আন্দোলন পাঙ্কিরে তুলছে। লতা-সমিতি করে বরন কিছু হ’ল না তখন বরকট ও বদেশী আরও হ’ল। ইংরেজ শাসকেরা অপেক্ষা করতে লাগল। আন্দোলন বড় বেশির হুতাতে লাগল তত তাবের ড্র কুক্তি ও চক্র রক্তবর্ণ হতে লাগল। ইতিহাসে তীক্ষ্ণ ও অকর্ণ্য বলে বর্ণিত বাঙালী বহি ইংরেজের ব্যবসারে আঘাত করবে তবে তারা এবেশে এসেছে কেন? কিসের ভত পূর্বীক, ওলন্দাজ, করানীলের লদে এত লড়াই করে তাবের হাত থেকে ভারতীয় বাণিক্য কেড়ে বিরে তাবের বাড়িয়েছে?

ডটর চক্রবর্তী একই হুপ করিয়া কণকাল কি

ভাবিলেন, তারপর আবার শুরু করিলেন—ইংরেজ এবেশের বাণিক্যে একচেটে অধিকার লাভ করবার ভত স্বাক্ষ্য বিতায় করেছে। এবেশের বস্ত-শিল, বো-শিল কংল করে ব্যাকটোর ও ল্যাভালারারের লহতি বাড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় কনভার অপ-এরোগ করে এবেশের শিল-বাণিক্য করায়ত্ত করেছে। আত্ম বিলিভী পণ্য বর্জন করে ইংরেজের এত সাবের বাণিক্যে আঘাত করতে বাঙালী বদপয়িকর। এটা কি বরদাত করা দার।...বরকট বদ করবার ভত আইন পাল করতে ছর দাল লেগে বাবে। এ ছর দালে ইংলিশ ষ্ট্রেট উভ বি ডেড (ইংরেজের বাণিক্য বস্তন হয়ে বাবে)। তাই তুলার কর্ণচারীদের উপদেশ দিচ্ছে “hammer them until they come to their senses.” (হুড়ুডি না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীদের হাতুড়ী পেটা করতে থাক)। এই ত লবে কলির লদ্যা।

ডঃ চক্রবর্তী আবার সিগার বরাইলেন। বরের লকলে হুপ করিয়া আছে বেশিরা তিনি হাসিলেন। তবেশ ও দেবা-নন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ডোন্ট পেট কাচি দাই ক্রেকোন। (বাবকে বেও না) তিনি মিঃ দায়ের দিকে ইন্ডিপূর্ণ হুড়ুতে চাহিলেন। মিঃ দার ডাকিলেন—বোর। বোর।

তবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া বরদার করিয়া বর হইতে বাহির হইল।

উপরে উঠিবার সিঁড়ির করেক বাপ উঠিয়া তবেশ ডাকিল, কিট। কিট।

সিঁড়ির পাশের বরে কিট তখন বের গভর্নদের কাছে পক্তিতেছিল। তবেশের ডাক শুনিয়া—“প্রিক্ এজকিউক মি” (আমায় বাপ কলুন) বলিয়া বর হইতে সে ছুটয়া বাহিরে আসিল। তবেশের লকে দেবানন্দকে বেশিরা হুটাং তাহার একই লক্ষ্য হইল। ইহার কারণ সে মিছেই মুকিতে পারিল না। সে বরকিয়া ঠাড়াইল। কিটর লক্ষ্য লুতন জ্বিল। তবেশ উহা লক্ষ্য করিল। কিট বড় ঢালাক বেয়ে। নিজের লক্ষিত ভাব চাকিবার ভত তখনই সে কলরব করিয়া উঠিল। বলিল, শুভ ইভনিং তবেশ-দা, শুভ ইভনিং তবেশদার ক্রেক (বদু)। তবেশ-দা, এই তোমার বিকেলে আলা? আন দা এখন গল্প করতে বললে গভর্নস দার কাছে লাগাবে—কিট লট গার্ল (কিট হুই-বেয়ে)। গল্প গেলে আর পড়াতে দন বের দা।

তবেশ—দেবী হয়ে গেল রে। দীতে আলোচনা তদখিলাব।

কিট অভিমান করিল। বলিল, ঐ হাই আলোচনা তদতে গিরে বডি বরে আমার পতবার লম্বকীতে ওপরে এসে?

তবেশ—তুই পত গিরে। আমরা এখন বাই। আনছে রবিবার আদব।

কিট—রবিবার সকালে এখানে বাবে ভবেশ-না? আমি থাকে বলে রাখব? কি—

ভবেশ তাহার ইচ্ছা: করিবার কারণ বুঝিল। সে দেবানন্দকে ধাইতে বলিতে চাহে। তাহারে বাতীর বাহুরিয়ার দেবানন্দ ধাইবে কিনা তাহার লক্ষ্যেইল। দেবানন্দ ধাইবে না ভবেশ জানিত। তাই বলিল—সকালে ত আসতে পারব না কিট। অনেক কাজ আছে। বিকেলের দিকে আসব।

কিট নিজের বিহুনি টানিতে টানিতে বলিল—তুমি একাই আসবে ত ভবেশ-না?

ভবেশ হাসিল। বলিল—দেবানন্দের সেদিন বিভ্রম ফোটারের মিটিতে বক্তৃতা দেবার কথা আছে। ও ত আসতে পারবে না।

কিট হুই চোখ কপালে তুলিয়া দেবানন্দের কাছে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল—মিটিতে যি: তাটার মত স্পীচ দেবে তুমি? স্পীচ দিতে পার তুমি?

একটু ধামিয়া কিট আবার বলিল, আচ্ছা তা হলে শনিবার এল ভবেশ-না। আমি একটা নৃত্য বদেশী গায় শিখেরি, তোমাদের শোনায।

ভবেশ—আচ্ছা দেখব। দেবুর সহজে সময় হয় না আবার।

কিট—ওঁর খুঁচি ভাল লাগে না আমারে বাতী আসতে?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—সেকথা ওকেই জিজ্ঞেস করু না।

কিটর ভ্র কুঁচি হইল। বলিল—আমার বয়ে গেছে জিজ্ঞেস করতে। ভাল লাগে না—আমি কি খুঁচি না?

কিটর এই অভিমান দেবানন্দের ভাল লাগিল। কোম কথা না বলিয়া সে হুই হাসিল।

হট্টেলে কিরিবার পথে ভট্টর চক্রবর্তীর লব্ধে আলাপ হইল হুই ভবেশের মধ্যে। ভবেশ বলিল—ভট্টর চক্রবর্তী অসাধারণ পণ্ডিত। তাহার লাবারণ কথাবার্তার রস আছে, কিন্তু এই রস অনেক সময়ে ভিত্ত-মুদ্র। অনেকের তাই অপছন্দ। এক বার তাঁকে উত্তেজিত করিতে পারলে কানবার মত অনেক কথা অবগল তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

দেবানন্দ—বাঙালীদের কি কি দোষের কথা তিনি বলতে পারে খেমে গেলেন?

ভবেশ হাসিয়া বলিল—তুমি লক্ষ্য করেছিল দেখছি। ভট্টর চক্রবর্তী বলেন কতগুলো তিনি বাঙালীকে বলিয়ে য়েবেছে। সুবিধে গেলেই তিনি সেগুলোকে আক্রমণ করেন।

ভবেশ—বাঙালী জাতির স্বভাবগত ঝট্ট লব্ধে ভট্টর চক্রবর্তীর অভিমত দেবানন্দকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিল।

বাতী কিরিয়া সে রাতে অনেককণ পর্যন্ত দেবানন্দের ঘুম আসিল না। এলোমেলোভাবে ভট্টর চক্রবর্তীর বক্তৃতার কথা ভাবিতে লাগিল। বুঝাইয়া পড়িবার আগে সে ভাবিল কিট বলিতেছে—এ বাতী আসতে ওঁর খুঁচি ভাল লাগে না? নিজের মনে উত্তর হইল—কিট আছে, কাজেই ভাল লাগে।

ক্রমণ:

ভট্টব্য :—এখানি নৃত্য উপভাস। গত সংখ্যার ভ্রমক্রমে ‘ক্রমণ:’ ছাপা হইয়াছে।—সম্পাদক, ‘প্রবাসী’

প্রভাত

শ্রীমুখীর গুণ

হুঁচির লায়রে ভব ওপো, মহাকবি,
অবশ্যি উট্টিলার এ ভব প্রভাতে,
হুঁচি হোলো যোর মন, রবি-রঙ্গি-পাতে
হেরিলাব বিবলোকে মল্লবের ছবি।
বারিকেল-হুপারির শোভন শাখার
আলো-হারা মারা বোনে, বদীন্দল-মারা
বাকাইয়া ‘নারদে’র হিঁচ একতারা

প্রায়-প্রাত উবাগিয়া প্রবাহিয়া যায়,
পাবীরা কুঁচন করে, অলস আচ্ছাদ
অতীতের ‘আরণ্যক’ জীবনের বাব
বুঝাইয়া আসে মনে, হে মহিমময়,
জীবনে—অগতে জানি য়েবেছে লজ্জাত
অবকার—অবিচার, তবু এ প্রভাত
লব্ধ ছাপারে প্রাণে কাপার বিষয়।

ভারতীয় দর্শন মহাসভা—পুণা অধিবেশন

ডক্টর সীতেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

ভারতীয় দর্শন মহাসভার বহুবিধমুখিত্বের বার্ষিক অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী পুণাতে হইয়া গিয়াছে। অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কান্তনগর কলেজের ওরাহিরা হলিতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅক্ষুণ্ণচন্দ্র সুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনের কার্য সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সঙ্গীতকলাবিধি শ্রীককরা ও কুলমল্লিকর উদ্বোধন-সঙ্গীত ও উপাসনা সমাপন করিবার পর পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এম. আর. জয়াকর মহাসভার প্রতিনিধিবর্গকে সাহস অত্যর্পণা জ্ঞাপন করেন। পরে মহাসভার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক এম. এ. নিকম দেশবিশেষের দর্শনাত্মক মনীষীদের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাহী পাঠ করেন। ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রী এম. ডি. প্যাডসিল মহোদয় সভার বরণ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অত্যর্পণা সমিতির উপাধ্যাক হাববীর শ্রীপ্রতাপ শেঠী তাঁহাকে সাহস অত্যর্পণা জ্ঞাপন করিলে পর তিনি এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ‘জগতের পুনর্গঠনে দর্শনের স্থান’ বিষয়ে তিনি একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান হতাশা ও দুঃখবাহার কথা এবং আত্মজাতিক পরিস্থিতিতে যে সব বিশৃংখলা ও বিবাদ-বিসংবাদ দৃষ্ট হয় তাহার উল্লেখ করেন। দার্শনিক দৃষ্টিতে এ সকল সমস্যার সমাধান করিবার জন্ত তিনি দার্শনিকদের নিকট আবেদন জানান। রাজনীতি, সমাজনীতি ও বর্ণজগতে যে সব বিরুদ্ধ মত ও পথ আজ মানুষের মনকে আন্দোলিত ও বহুবিধভিত্ত করিয়াছে তাহাদের সমন্বয়-সাধন এবং এক উদার মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন—দার্শনিকগণ তাঁহাদের চিন্তা-বারা ও কর্ম দ্বারা এই গুরুত্বব্যা পালন করিতে পারিবেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় ‘মানবীর ব্যক্তিত্ব’ (Human Personality) সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। অবশেষে মহাসভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ. আর. ওরাহিরা সকলকে বক্তব্য দেন।

প্রথম দিনের অপরাহ্নকালীন অধিবেশনে ‘প্রাচ্য ও পশ্চাত্য যেনে মানুষের বহুপন্থের প্রত্যয় ও শিক্ষার দার্শনিক ভঙ্গি’ বিষয়ে এক আলোচনা-সভা হয়। ইহাতে ইউনেস্কো’র (unesco) পক্ষ হইতে মিঃ ক্যাকেন্স হাবে এবং ভারতীয় দর্শন মহাসভার পক্ষ হইতে শাহাব সোফিরা ওরাহিরা, ডাঃ ইল সেন, ডে এম চাব, মহাদেবন, অধ্যাপক ওরাহিরা, বর্তমান লেখক

প্রভৃতি বোণবান করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা মানুষের শিকাহীকার তাহার আধ্যাত্মিক বহুপন্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার এবং প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মধ্যে বর্ধ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সভ্যার অধ্যাপক ওরাহিরা এম পি কলেজে ‘বর্ধনীরপেক রাষ্ট্রদর্শন’ (The Philosophy of a Secular State) সম্বন্ধে জনসাধারণের উপযোগী একটি বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ‘দর্শনের ইতিহাস শাখা’র সভাপতি অধ্যাপক আর. শাহাবজাদারী এবং ন্যায় ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ কালিহাস ভট্টাচার্য্য হুইট সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহার পর ঐতিহ্যবাহকে দর্শন বলা যায় কি না’ (Is Existentialism Philosophy?) এই সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা হয়। ইহাতে ডঃ হাল-বিহারী হাল, অধ্যাপক অমিরকুমার মজুমদার, এম. এ. নিকম তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন এবং অপরাহ্নের প্রতিনিধিরা আলোচনার বোণবান করেন। বৈকালে মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, দর্শনের ইতিহাস এবং ভার ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখাগুলির পৃথক অধিবেশন হয়। এগুলিতে দর্শনের অনেক নূতন ভাব্য বিষয়ে প্রথম পটীত ও আলোচিত হয়। তাহার পর এম পি কলেজে সাধারণের জন্ত ‘দর্শন ও জীবন’ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ডঃ কল্যাণী মল্লিক, মহাদেবন, শাহাব সোফিরা ওরাহিরা প্রভৃতি প্রতিনিধিরা এ সকল বক্তৃতা দেন। এইদিনকার হুইট প্রমোদ-অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। তাহার একটি হইতেছে স্থানীয় পরীক্ষার্থী কলেজে মহারাষ্ট্র মণ্ডলের সত্যদের কীড়া ও ব্যায়াম প্রদর্শন। ইহাতে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকা হইতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকরা যে কীড়ানৈপুণ্য ও ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করেন তাহা দর্শকদের মনে গুণগুণ আমন ও আশার সঞ্চার করিয়াছিল। রাজ্যভিত্তিক এক বিচ্ছিন্নাঙ্গীকৃত নৃত্য ও গীতের সঙ্গে নাট্যকাব্যে উপনিষদের গুণবৈদ্যার উপদেশ এবং সোফোক্লিস ও ক্রিটোর কথোপকথন উপস্থিত সকলের চিত্তবিনোদন করে।

শেষ দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ‘মনোবিজ্ঞান শাখা’র সভাপতি ডঃ বি. এল. জায়ের এবং ‘সমাজবিজ্ঞান শাখা’র সভাপতি অধ্যাপক এম. ডি. হাজের তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর এক বিতর্ক-সভার ‘দিবীর বর্ধ সন্ত কি না?’ এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। ইহাতে অধ্যাপক আর. পি. সিং, এম. আর. কুলকারী প্রভৃতি বোণবান করেন। বৈকালে পূর্বদিনের মত শাখাসভাগুলির অধিবেশনে অনেক

তথ্যপূর্ণ এবং পটীত ও আলোচিত হয়। তাহার পর ত্রিভূতী প্রেমলীলাবাহী তি-ঠাকুরী তাঁহার বারবেলাহ “পর্ণকুটীর” মহাসভার প্রতিবিবিরের এক ঐতিহ্যকে আদর-আপ্যায়ন করেন। সর্বলোকবরণ্য ভারত-পুত্র মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি-বিক্রিত এই মনোরম “পর্ণকুটীর” বর্ণনে সকলের মনে এক অপূর্ণ ভাবের স্রষ্টা হয়। সত্যায় এস শি কলেক্টে ‘এক বিশ্ব-জাতীয় বর্ণনের সত্যাত্মা’ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা হয়। মাহান সোক্রিয়া ওয়াহিয়া, অধ্যাপক বি. এল. আন্ড্রেস, ডঃ মহাদেবন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ

বর্ণনের বীজ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বেদ ও উপনিষদে নিহিত আছে। বৈবিক এমি মানব-সত্যতার অভি প্রাচীন যুগে উদাত্ত হয়ে গাহিয়াছিলেন—‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদতি’। ইহাই বর্ণনামিচরের মহাসময়ের মহামন্ত্র এবং এক উদার বিশ্বজনীন দার্শনিক মতবাদের মূল সূত্র।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে ভারতীয় বর্ণন-সভার বার্ষিক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে মহীশূরে হইবে। বর্ণন মহাসভার রম্যত কর্তী সারক এছ হুই বক্তে প্রকাশিত হইরাহে।

সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কথা

ঐঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত অতন্তম। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের বহু দূর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল আর কাহারও সময়েই ততদূর ছিল না। বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি স্বকীয় শৌর্যবীর্য্যাদির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইহা অহুমান করা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে, এই কারণেই তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনের অনেক দাবিদারকে বশিত করিয়া সমুদ্রগুপ্তকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বস্তুতঃ তিনি সম্রাট হইবার পূর্বেই কোভবংশীর কোন নৃপতিকে এবং অচ্যুত ও নাগসেনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এলাহাবাদ প্রদেশে তাঁহার বিধিকর-বর্ণনা আরম্ভের পূর্বেই ‘উপরোক্ত নৃপতিবিশিষ্টে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন’ ইহা লিপিবদ্ধ করিবার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নহে—‘উপরোক্ত নৃপতি-বিশিষ্টে তিনি সম্রাট হইবার পূর্বেই (অর্থাৎ তাঁহার পিতার জীবদ্দশায়) এবং মহেন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিদের, সম্রাট হইবার পর পরাস্ত করিয়াছিলেন’ ইহা বুঝান হাত। দাক্ষিণাত্যের বিজিত নরপতিগণের মধ্যেই ত কোভবংশীর নরপতির নাম উল্লেখ করা চলিত। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলে এখনও কোভজাতির অস্তিত্ব আছে। (*Indian Antiquary* vol. III.) উত্তরাংশের বিজিত নৃপতিগণের মধ্যে হরিবংশ তাঁহার নাম উল্লেখ করিলে পারিতেন। পূর্ব পঞ্জাব,বিহী অঞ্চলে কোভনারাডিত কিছু ব্রহ্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার ঐ অঞ্চলেই রাজত্ব করিতেন। *Journal of Bihar and Orissa Research Society*-র এক লংঘ্যার কোভবংশীরেরা পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন এবং সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের পরাস্ত করিয়া পাটলিপুত্র অধিকার করেন,

এইরূপ লিখিত হয়। *Journal of Indian History*-র একটি সংখ্যাত্তেও ইহার সমর্থক মত আছে। কিন্তু ইহা হুক্তিবুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। এই মতকে যদি মানিতেই হয় তাহা হইলে বরক পুশ্পপুরকে কাভকুজের সমার্থক বলিয়া লওয়াই (হিউরেন লাভের মতে) ভাল; কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মার প্রাণ্ডিহানের সহিত পুশ্পপুরের (কোভবংশীরের রাজ-বাহীর) স্থানগত বৈষম্য থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষস মার্কের সাক্ষ্য অহুবারী পুশ্পপুরকে পাটলিপুত্র বরাই ভাল (‘তিনীআবি অরক্তরক্খসস ইহীঅং বিঅ হিঅঅং পুশ্পটুরবানী মণিআরসেনেবি চন্দনদাসোপাধ’—ব্রহ্মরাক্ষস প্রথমাক)। তাহা হইলে তিনি পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিবার সময়ে কোভনৃপতি কর্তৃক আক্রান্ত হন—এই মতটাই প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, ডঃ রমেশচন্দ্র বসুসদার মহাশয় কেন যে নিরলিখিত কথাটি বলিতেছেন, বিশেষ বুঝা গেল না। তিনি বলিতেছেন “পুশ্পপুর may denote পাটলিপুত্র; but then we can hardly be definite about its connection with Samudragupta’s victory over the three kings.”

বোঝাই প্রদেশের ধান্য ফেলার অন্তর্গত সোপার নামক স্থানের কাছাকাছি একটি শিলালিপিতে কোভ জাতির উল্লেখ আছে; এবং সাহারাণপুরের কাফস ব্রহ্মার কাফস উল্লেখ আছে। ডঃ ইজাজীর মতে, এই দুই স্থানের যে-কোন একটিতে কোভজাতির অবস্থিতি ছিল; কিন্তু এই বহু হুক্তিবুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; কারণ পুশ্পপুর—হর পাটলিপুত্র না হর কাভকুজ, এই দুইটির কোনটাই সাহারাণপুর বা সোপারের নিকটবর্তী নহে। কোভবংশীর নৃপতিগণ যেখানেই রাজত্ব করত না কেন, উত্তরাংশের বা দাক্ষিণাত্যের কিংবা প্রত্যন্ত নরপতি-

বিপ্লবের মধ্যে তাহাদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলিত, হরিষেণ ইহা করিয়াই তাহা করেন নাই। উহাদের মধ্যেই যদি কোতুলক প্রভৃতি নৃপতির মারোত্তর করিতেন তাহা হইলে নরুলগুণ যে সিংহাসনাভিষিক্ত হইবার পূর্বেই ইহাদের হার করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইত না। বস্তুতঃ কোন কারণ ব্যতিরেকেই যে অত সকলকে বঞ্চিত করিয়া 'নরুলগুণই সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে' ইহা ঘোষণা করিবার মত নির্বুদ্ধিতা চন্দ্রগুপ্তের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হাড়া, শৌর্যবীর্যাদির কথা বাহা বলে অত সকল উত্তরাধিকারীই ত নরুলগুপ্তের সমকক ছিলেন, তুল্য কুলক কবাটির লক্ষণার্থ তাহাই। সুতরাং অত সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকেই সম্রাট করা হইল কেন? তিনি যে কোঠ পুত্র বা ভাষা অধিকারী ছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বরক তাহার বিপরীত প্রমাণই আছে। কোঠ পুত্রই সিংহাসনের ভাষা অধিকারী। তিনি রাজা হইলে অত্যন্ত ভ্রাতার সুখমণ্ডল রাম হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। যে ভাষা অধিকারী নহে তাহার সিংহাসনপ্রাপ্তি দর্শনে অন্য সকলের মনে অবশ্যই কোতের নকার হইতে পারে, চন্দ্রগুপ্তের এই অত্যন্ত আচরণের কারণ কি? নিশ্চয়ই তিনি নরুলগুপ্তের পরাক্রম দর্শনে বিশেষ ঐশ্ব ও হৃদ হইয়াছিলেন, 'কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় নরুলগুপ্ত কখন পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন' এই প্রশ্নের উত্তরে বলা বাইতে পারে যে, "বীরোত্তপাদ কেচিচ্ছরণনৃপপত্না বভ বৃতে প্রণামে" বা 'সংক্রোমহু বহুবুজবিজিতা নিত্যনুজাপকারাঃ,'

এলাহাবাদ প্রভৃতির এই কথাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চন্দ্রগুপ্তের জীবদ্দশায় নরুলগুপ্তের বিপুল পরাক্রম চন্দ্রগুপ্তকে হৃদ করিয়াছিল। বস্তুতঃ উপরোক্ত বাক্যগুলি "একেন যেন কণাহুতুল্যাত্ম্যত নার্সেন স ০ ০ ০ ০ ০ যতৈর্প্রাহর্যৈব" কোতুলকং পুশ্যাস্তরে ক্রীড়তা" এই পরবর্তী বাক্যের ছানিকা বা জাপক রাজ ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যন্ত হয় না।

অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কুমার অবহার যদি তিনি অচ্যুত ও নার্সেনকে পরাক্রম করিয়া থাকেন তাহা হইলে পরবর্তী কালে আবার তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন কেন করিয়া? এই নার্সেন ও অচ্যুত যে উত্তরাপথের বিজিত নার্সেন ও অচ্যুত হইতে তির এইসম্পর্কে তো কোন প্রমাণ নাই। ইহার উত্তরে বলা বাইতে পারে, এখনে পরাক্রম হইয়া আবার হরতো তাহারা বিরোধী হইয়া নিজেদের বাণীম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই অতই পরবর্তীকালে তিনি জুহু হইয়া তাহাদিগকে নরুলে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের রাজ্য বীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণাপথের নৃপতি-বৃন্দকে পরাজিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে বীর সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অত আর্ধ্যাবর্তের নরপতিবৃন্দের রাজ্য ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, সম্রাট নরুলগুপ্তের পক্ষে তো এই ব্যবহার-বৈষম্য শোভা পায় না। ইহার যেতুৎরূপে বলা বাইতে পারে যে, হরত তাহার রাজধানীর নিকটবর্তী বলিয়া উত্তরাপথের নৃপতিবৃন্দকর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া তিনি উত্তরাপথ ব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হেতুটি 'পরাক্রম', 'অধিদেবপরাক্রম', 'হুতাভগরত-সর্গরাকোহেতা' নরুলগুপ্তের মধ্যে প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় কারণটি এই হইতে পারে যে, কোনও কারণে তিনি আর্ধ্যাবর্তের কোন কোন নরপতির উপর অত্যন্ত জুহু হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য আর্ধ্যাবর্তের কোন রাজাকেও বিখাল না করিয়া সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কি কারণে তিনি জুহু হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, এই জুহু প্রবলট সম্রাট নরুলগুপ্তের জীবনের এক অব্যাহার নূতন আলোচনার হ্রস্পাত করিতেহে মাত্র, এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।



রঘুনাথ দত্ত

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী রঘুনাথ দত্ত মহাশয় গত ২০শে কান্তন কলিকাতায় বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাতে বাংলায় কাগজের ব্যবসার বিশেষরূপে কতিপয় হইল। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাহারও তাঁহার অত্যন্ত গভীরভাবে অঙ্গত্ব করিবেন।



রঘুনাথ দত্ত

রঘুনাথ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে বেনিয়াটোলায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত ভোলানাথ দত্ত ১৩৪৪, পুরাতন চীনাধিকারে যে কাগজের দোকান চালাইতেন তাহা বিশেষ উন্নয়নযোগ্য ছিল না।

১৯০৪ সনে বঙ্গের রূপে দোকানে কাগজের চাপ যন্ত্রের কত তিনি তাঁহার পিতার আদেশক্রমে বিভাগের শিকা পরিত্যাগ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার ব্যবসারে সুযোগ্য সহকারী হিলাবে যোগদান করেন। তিনি তাঁহার দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা দ্রুতই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত ভোলানাথ দত্ত এও সল দারক কাগজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হন। ১৯০৮ সনে তাঁহার পিতার ইচ্ছায় পর এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির গুরুদায়িত্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালভের সুযোগ তাঁহার হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবসা কেন্দ্রে তিনি হাতে-কলমে নির্ভরযোগ্য শিক্ষালাভ করিয়া নিজ

ব্যবসায় ও কর্মনিপুণতার দ্বারা শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৯১০ সনে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। একটি আর্থন প্রতিষ্ঠান তাঁহার এই কার্যে বাধা নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য উৎসাহের দিকট বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের হস্তনির্ভর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং পরেও নানা ব্যত-প্রতিবাদের মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু রঘুনাথ দত্তের সহিত ও নির্ভীকভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালিত করিতে থাকেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে ইহার উন্নতিসাধন করেন। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্বি, সত্ততা ও কৃশলতার সাক্ষ্যের এক সমুদ্রল তীর্থে যোগদান করে। তারতের বিভিন্ন রাজ্যের জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিসহ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অত্যন্ত শিকা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সুখ্যাতি ও সুখ পরিব্যাপ্ত হয়। দত্ত মহাশয়ের সকল প্রচেষ্টা কেবল যে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই নিহিত ছিল তাহা নহে, অত্যন্ত ব্যবসাকেন্দ্রে বাঙালীর সুদান বৃদ্ধি করিতেও তিনি অংগুর হইয়াছিলেন।

তিনি রঘুনাথ দত্ত এও সল ও প্রিন্সিপাল কন্ট্রোল স্পিনিং এও উইভিং মিলস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল মিলওয়াল এসোসিয়েশন, দ্বিগ্ন বাহব ভাতার, ক্যাম্পবেল হানপাতাল, অবিদ্যাপ্রতি প্রকৃত ভবন, বেঙ্গল ম্যানুফ্যাকচারিং অফ কমান্স, কে. এম. পাল কোম্পানী, হুগলী ইন্ড কোম্পানী, ঠ্যাণ্ডার্ড টেমপারারী ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড, বাম্বা লাইন এও কেমিক্যাল কোম্পানী প্রকৃতি বহু ব্যবসায়ী ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নিঃস্বার্থভাবে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানকে এবং হুঃ ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অগ্রদূত বিদ্বানদের সহিত তিনি প্রত্যেকভাবে জড়িত না থাকিলেও গোপনে অর্থ ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করিয়া দেশের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন।

‘প্রবাসী’ ও ‘মহার্জি মিত্র’ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিও রঘুনাথের গভীর অঙ্গুরাগ ছিল। বহু সময় বহু ব্যাপারে তাঁহার অনন্ত-সুলভ প্রীতি ও উদারতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সাহিত্য-সেবীদেরও তিনি নামাভাবে সহায়তা করিতে কৃতিত্ব হইতেছেন। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা আত্মীয়বিরোগ-ব্যথা অঙ্গত্ব করিতেছি।

পুস্তক পরিচয়

যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়। নিউ এজ পাবলিশার্স
লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা—১। মূল্য তিন টাকা।

জীবন-চরিত, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা বাংলা-সাহিত্যের একটা
অঙ্গ হিসাবে বহুদিন থেকে স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু ঐ তিনটির
সংমিশ্রণে সাহিত্যের পাঠে নতুন রসের পরিবেশন হেমেন্দ্রবাবুর রসালো ও
বিশুদ্ধ লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। হেমেন্দ্রবাবুর পুস্তকে আমরা যে শুধু
সাহিত্যের ও নাটকের ক্ষেত্রে মহানবীদিগের নতুন চিত্র, নতুন পরিচয়
পাই তাহা নয়, সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা খ্যাতি অর্জন
করেছেন, তাঁদের কবির জন্মেরও হৃদয় আলোকে এই স্মৃতিচিত্রের মধ্যে
পাওয়া যায়।

এই বইয়ে যেমন একদিকে দেখি শরৎ চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল,
বিজ্ঞানলাল ও গিরিশচন্দ্রকে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের সামনে একে-
বারে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। ওস্তাদ করনভূলা খাঁ, গায়ক অমীরখান,
খেলোয়াড় শিবদাস ও অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এবং বিশেষ ভাবে উজ্জল
পরিচয় পাই বাংলার চিত্রকলার পুনর্জাগরণের অন্ততম পথিকৃৎ এক জনের,
যাঁর কথা বাংলার লোকে ভুলতে বসেছে—তিনি রজনন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক কথার বলতে গেলে, হেমেন্দ্রবাবু বাংলার বিগত গৌরবময় বৃহৎ
সাময়িক চরিত্রগুলির পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর এই লেখার মধ্যে দিয়ে
তবে ইতিহাস ও ঘটনার শুকনো শব্দকে তাঁর একান্ত নিজস্ব রসালো
কল্পনার স্রোতে, ভাবার ও ভাবের কীরণে ঘোষে, পরমাণু পরিণত করেছে
তিনি। পাঠক সকল দিক দিয়েই তৃপ্ত হবেন।

শ্রীকেশবদেব চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মন—শ্রীজীবনরায় রায়। রজন পাবলিশিং হাউস
মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক উৎসর্গে লিখিতেছেন, 'পর্যায়নতায় তীব্র ভালো বাদের প্রাণ
অয়িমর করে তুলেছিল,...সেই সব বৃত্তান্তের তাই-বোনদের উদ্দেশ্যে এই
গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।' স্মরণ্য বোকাই বার যে, উপভাস হলেও বইখানি
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আংশিক চিত্র। গল্পটি প্রাথমিকঃ প্রেমের
গল্প, তবে নায়ক-নারিকারা বা উপনায়ক-নারিকারা কেহ কেহ স্বাধীনতা-
সংগ্রামের সহিত জড়িত। অনেকগুলি পুরুষ ও নারীর জীবনের জটিল
সমস্যা লইয়া গল্পাংশ রচিত। লেখক পাঠকের কোতুলক শেষ পর্যন্ত

অদ্বিতীয় লিভার টনিক

"কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়ার নিশ্চিতরূপে
আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য
পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন
কার্যেও সহায়তা করে। "কুমারেশ" লিভার ও পেটের
পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটা অদ্বিতীয়
লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

কুমারেশ

৭ ডিসেম্বর দুই ও সত্তর
রয়ে—



ও, আর, সি, এল, ডি:
সালকিয়া * হাওড়া

জাগ্রত রাখিতে পারিয়াছেন—ইহা তাঁহার কৃতিত্বের কথা। বটনাপন্থার সাজাইবার ও সাধারণ চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাঁহার ভাব বলিষ্ঠ ও বহুদুর্ভাগ্য; বহিঃ কথাভাষার পরট লেখা, তবু ভাষার আভিমান আছে। আজকাল অনেক আধুনিক লেখকের লেখার ভাষা প্রামাণ্য এমন কি ইতরতা লেখাই হইতে দেখা যায়, বর্তমান লেখকের লেখার স্বাক্ষরিত শ্রীতে তাহার কোন স্পর্শ নাই। নারীচরিত্র-ভঙ্গির মধ্যে অগ্নিগুণের সীমার চরিত্র বহিঃ অঙ্গ সকলের চেয়ে ছোট তবু যাহুয়ের মন সেই সকলের অপেক্ষা বেশী টানে। বইখানিতে দেখানোই লেখক কালিকলে ছবি আঁকিয়াছেন, সেখানেই তাহা তাঁহার হাতের টানে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তা সে বাঙালী বধু মালতীর ছবিই হউক কি বুড়ী ঠিক। খিরই ছবিই হউক। বনজঙ্গলও তাঁহার হাতের স্পর্শ প্রাপ্য পাই-রাছে। বইটির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা আর পাঁচ জন লেখকের লেখার মত গতানুগতিক পন্থার লিখিত নহে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইরাছি।

শ্রীশান্তা দেবী

গান্ধী ও ষ্টালিন—লুই কিসার। অনুবাদক—শ্রীকমলা মল্ল। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ২৮২। মূল্য চার টাকা।

বিখ্যাত মার্কিন লেখক লুই কিসারের নাম এদেশের শিক্ষিত সন্তানদের নিকট অপরিচিত নহে। মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও সাধনার আদর্শ তাঁহাকে

ভারতবর্ষে টানিয়া আনিয়াছিল। এই মহাত্মাব্যবহার সম্পর্কে আসিয়া তিনি বর্তমান সমস্তাবস্থান পৃথিবীর অনেক সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। জনগণে আজ বিভিন্ন বিপরীতমুখী চিন্তা ও কর্মধারা প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কোনটা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে শুভ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরিণাম বিবেচনা করিয়া সুখী ব্যক্তির এতলিকে ভাগ করিয়া আপাতকটোর দুর্গম পথেই চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের ভালমন্দ সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের নিরিখেই নিরূপিত হওয়া উচিত। বিশ্ব-কল্যাণ ব্যক্তি ও জাতীয় কল্যাণেরই পূর্ণতামাত্র।

এই অনুবাদ-গ্রন্থ চতুর্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে বর্তমান জনগণের এক বা একাধিক সমস্যা লইয়া লেখক আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিবাদীমত, জাতীয়তা এবং বিশ্বশান্তি এই আলোচনার মুখ্য বিষয়। গান্ধী ও ষ্টালিন বর্তমান যুগের এই দুই বিরাট পুরুষের আদর্শ এবং কর্ম-পদ্ধতি, বিচারের মানদণ্ড ও দুরদৃষ্টির মধ্যে যে কি বিরাট পার্থক্য, লেখকের আলোচনার তাহা সুচিরা উঠিয়াছে। এক জন ক্ষীণকায় হইয়াও বিরাট নৈতিক ও আত্মিক শক্তির অধিকারী, আর একজন বাহুবল: মহাশক্তিশালী হইয়াও নীতির মানদণ্ডে কতই না দুর্বল বলিয়া প্রতিষ্ঠাত হন—সকলকে লাইয়া বড় হইবার কি বিরাট দীর্ঘ চেষ্টা তাঁহার। পৃথিবীর অন্তান্ত সমস্তের আদর্শের সঙ্গে কলীর আদর্শের পার্থক্য কোন্ভাবে লেখক তাহা অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইতিহাসের নানা কালের নানা দেশের মনীষিগণের প্রচারিত উচ্চ

সৌন্দর্য্য রক্ষায় অপরিহার্য্য

নীতের রূক্ষতা দূর করিয়া, মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালতা বৃদ্ধি করে এবং গাভুরের কোমলতা অক্ষুণ্ন রাখে। দিবাভাগে, লাবনি স্নো ও রাতে লাবনি ক্রীম ব্যবহার্য্য।

লোশন
স্নো ও ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

আদর্শকে রূপদানের অক্ষমতাই আজ রূপ কল্যাণিকদের জন্য দিরাছে। এই সকল আদর্শ আশিকভাবেও সকল হইলে, বিশ্বমানবের মঙ্গলসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের প্রতিশ্রুতিগুলি নৈতিক-ভিত্তিহীন আদর্শ ও কর্তব্যভূতি একমাত্রকণ্ঠের সহিত ভাঙিয়া পড়িবে। লেখকের সঙ্গে হিটলার ও ট্যালিনের বীড়ির মধ্যে জের কোনটিই নহে—তা একই মিথ্যার দুইটি দিক মাত্র। ইহারা উভয়েই পাশব শক্তির অন্ধ উপাসক, ব্যক্তিবাদীনতা উভয়ের নিকট মূল্যহীন, উভয়েই নিজেকে, নিজের জাতিককে, নিজের চিন্তা ও কর্তব্যকে জোর করিয়া অগতির সকলের উপর চাপাইয়া দিতে ব্যগ্র। আর মহাত্মা গান্ধীর বিরলস সাধনা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও বিশ্বমানবের হৃদয়ের জন্ত। সত্য তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলই তাঁহার একমাত্র কাম্য—ইহাই সকলকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারিবে। এ জন্ত ব্যক্তির বাধীনতা গান্ধীজীর নিকট খুবই পবিত্র, জাতির বাধীনতা, বিশ্বশান্তির ইহাই উৎস। কাণীবাদী কিংবা কল্যাণিক এই দুইজনের মর্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

এই পুস্তকে সোভিয়েট ও হিটলারী আদর্শের বিশ্লেষণ পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। বর্তমান জগতে গান্ধীজীর সার্থকতা কোথায় তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে। অথচ লেখক বৈদান্তিক হিন্দু নহেন, বাঁচি আমেরিকান, সোভিয়েটেরও শত্রু নহেন। পুস্তকের অনুবাদ হৃদয় হইরাছে।

ঐঅনাথবন্ধু দত্ত

কোণার্ক—ঐকীবনকৃষ্ণ শেঠ। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম দেড় টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। ফুটিট কবিতার বইখানি সম্পূর্ণ। অগ্রান্তর,

ধর্মপদ, কোণার্ক দ্ব্যর্থমন্দির, শ্রুতবেদী, লিঙ্গাধিরা—এই পাঁচটি দ্ব্যর্থ গভকবিতা কোণার্ক-সম্পর্কিত। অবশিষ্ট কবিতাগুলি নাতীর্ঘ, এবং হলে মচিত।

‘কোণার্ক দ্ব্যর্থ-মন্দির’ পাই—

‘চিরন্তনী বাসুদেব এই আলোক-সাধনা,

‘তবসো বা জ্যোতির্গমর’।

এই বাণী বাসুদেবের অজরাচার চিরকালের বাণী।”

‘শবরী’তে আছে,

‘বীরে বীরে নীল মারা উঠিল ছলিরা,

বীরে তার অভিনব হ’ল রূপান্তর...

তাপসী শবরবালা উঠিল শিহরি

আনন্দ-জাগ্রত তনু। সপ্তখে শ্রীরাম

হুণীল নীল-রূপ নয়নাভিরাম।

তপস্তা সার্থক আজি।’

‘শ্রেম’ চতুর্দশগদী কবিতা,

‘এই তো শ্রেমের মীতি,—স্থাবিবে ভরা

এ জগতে সত্য কিবা আছে তার আগে?’

‘মতরে’ আছে,

‘ছুধের ভূমিকা’ পরে মানব-জীবন

শোভিছে নিকশশাশী কনক-লিখন।’

‘লিঙ্গাধিরা’ পাই,

‘সোনার আলোক বলে ভরা বুক তার,

খোরালি জোয়ার তার, সোনালি-জোয়ার।...

লিঙ্গাধিরা অপূরণ নহী।

বাহারে সে খুঁজেছিল পেয়েছে কি তারে?’

শেখরান, অপর্ণা, বৃদ্ধদেব, ময়ূখাঙ্গী, ধর্মপদ প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠকের মনে রেখাপাত করে। কবিতাগুলির মধ্যে আকর্ষণ আছে। হলে সাবলীল। “কোণার্ক” কাব্যমোদী পাঠকের চিত্তকে দমিত করিবে।

ঐশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাতা

যুগবহিঃ—ঐশোভন সেন। পূর্বাচল পাবলিশার্স, ২৪, ভবানীচরণ বসু লেন, কলিকাতা। পু. ১৫২, মূল্য দুই টাকা।

আজিকার দিনে ছলিয়ার প্রতিটি দেশের সমাজে যে ভাড়াচোর্য চলিতেছে সেই পরিবেশে উপভাসের কাহিনী-অংশ গড়িয়া উঠিয়াছে।

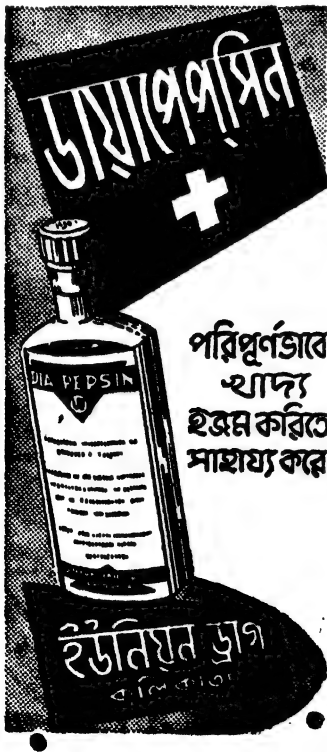
সত্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য কুশলতার নিদর্শন

লিমিটেড

বাংলার ব্যাংকিং জগতে বিরাট বিপ্লবের সূচক ভারত সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ বাট হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অল্পমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত বোঝা শীঘ্রই বখারীতি প্রকাশিত হইবে।

চেকারহ্যান—ঐকবিতা কোলে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ঐকবিতা ব্যাংকার্স



হিন্দু নারীকে লাইন বাঁধিয়া কস্ট্রোলের দোকানে ঝাঁড়াইতে হয় এই বিষয় লইয়া গরের সূচনা—ইন্ডিয়ান এই দিকে অনুসন্ধান নির্দেশ করিয়া গরের পরিণতির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কিন্তু যখন বন্য-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী আবর্তিত হইতে লাগিল তখন দেখি, একটা অস্বাভাবিক বেন সকল পাত্র-পাত্রীকে পাইয়া বসিয়াছে। বিলাত-কেরত অজিত দান্তিক বন্য বুঝক তাহাকে বরং কতকটা সুখা যায়, কিন্তু সুখাতার উদ্ভট আচরণের অর্থ কি? হঠাৎ একটা বাতানী মেয়ে এরূপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল কেন? এরূপ প্রশ্নের মনে উদ্ভিত হওয়া স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গল্প-উপভাসের পাত্রপাত্রীর আচার-আচরণকে ফুটাইয়া তোলাই আজকাল অনেক সাহিত্য-সেবীর উপলব্ধি হইয়া ঝাঁড়াইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থের লেখকও দেখিতেছি এই প্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন।

পুস্তকখানিতে লেখকের আশাশ্রীপ্ত মনোভাবেরও পরিচয় পাই—তাহারই ভোতক এই বইয়ের প্রচ্ছদপট। আভন পূর্ণভঙ্গে প্রচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই অগ্নিবাহের পরই একটা কিছু গড়িয়া উঠিল—এই ভাঙাগড়াই ইতিহাসের টানাপোড়েন।

শ্রীমুরেশচন্দ্র দেব

বেদান্ত দর্শন (১ম বৎ চতুঃসূত্রী)—বারী বিশ্বরূপানন্দ-অনুদিত এবং বারী চিত্তবানন্দ পুরী সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্যালয়। ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ২০৫ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

ব্যাস-রচিত “ব্রহ্মসূত্র”র উপর শঙ্করাচার্যের যে ভাষ্য আছে তাহাই বেদান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে ইহাই সর্বপ্রধান ও

মৌলিক গ্রন্থ। ইহার প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন পণ্ডিত কালীদাস বোদান্ত-বাগীশ বিগত শতকের শেষভাগে। কিন্তু উক্ত অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদমাত্র ও প্রাঞ্জল নহে। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় বঙ্গানুবাদ হর পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে বারী চিত্তবানন্দ পুরীর সহযোগিতায়।

সমালোচ্য গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রের উপর বিস্তৃত শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছে। শঙ্কর-ভাষ্যের উপর রামানন্দ সরস্বতী-কৃত ‘ব্রহ্মসভা’ টীকাও ইহাতে সান্ন্যবাদ সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে ভাষ্যতীর্থে “বৈরাগিক ভাবমালা” অনুবাদসহ থাকার পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভাষ্যানুবাদ ব্যতীত “ভাববীপিকা” নামক বহুত ব্যাখ্যার অনুবাদক বাচস্পতি মিশ্রের ‘ভাবতী’, আনন্দগিরির ‘ভাববির’ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাবলীর সারাংশ দিয়াছেন। সাধারণতঃ অনুবাদ মূলানুগ ও সাবলীল, ব্যাখ্যা সহজবোধ্য, সারগর্ভ, তবে হানে হানে প্রাঞ্জলতার অভাব দৃষ্ট হয়। এই সামান্ত ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি ভালো বেদান্ত-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার দাবি রাখে। ইহা বারী পাঠক-পাটিকা বেদান্ত দর্শনের দ্ব্যর্থো ভাষ্য অবিগত করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতাপাঠের ভূমিকা—শ্রীমুরেশচন্দ্র দেব সম্পাদিত। কলিকাতা-৩১, চাকুরি—১নং রথায় বানার্জী লেন ৪ ‘রথায় গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান’ হইতে শ্রীপেজেননাথ/বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪+২০ পৃঃ। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।



M.B. SIRKAR & SONS

**আমাদের নূতন শোরুম
এবং কারখানা**

১৬৭ মি ১৬৭ মি/১, বঙ্গবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা। আমাদের পুরাতন
শো-রুম এবং কারখানা,
১২৪ ১২৪/১, বঙ্গবাজার স্ট্রীটের
বিপরীত দিকে, আমহার্ট স্ট্রীট,
ও বঙ্গবাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল

এম.বি. সরকার
এও সন্স

শ্রদ্ধাচরিত্রের ওপরকার নির্মাণে
শ্রদ্ধাচরিত্রের ওপরকার নির্মাণে

১৯৩৮ খ্রি. ১২/১২/৩৮
১৯৩৮ খ্রি. ১২/১২/৩৮

৪ বছরের হিসাবে

১৯৫০-এর ভ্যালুয়েশন

গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে 'হিন্দুস্থান'-এর উন্নত উন্নয়ন পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার উপর। সেই টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস যোগ করা হইয়াছে :

মেরাদী বীমার— } ৮- টাকা
আজীবন বীমার— }

ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস এবং অন্ত্যস্ত অনিশ্চিত ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া এবং স্বদেশ হার অঙ্কিত হার অপেক্ষা ২% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশের এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে।

লগ্নীতে কমহারে ২৪ অর্জন, দুর্মূল্যের বাজারে অধিকতর ব্যয় প্রতীতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী নিরাপত্তা, স্বদৃঢ় আর্থিক স্বচ্ছতা এবং পরিচালন-ব্যয়ে স্মিতব্যয়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চলতি বীমা ৭৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল ... ১৫ " ৯৭ " " "
প্রিমিয়ামের আয় ৩ " ৪০ " " "
দাবী শোধ ৭ " ২৩ " " "



হিন্দুস্থান

কো-অপারেশনাল
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
৪৯ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

ইহার উদ্বোধন হয়। এই উৎসবের প্রবর্তক কেজরোহন সাহেব প্রথমপুত্র বেবালদ, বন্য-শালা, এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা বিবিধ জনহিতকর সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীতচন্দ্রের পালার্মো

সঙ্গীতচন্দ্রের "পালার্মো" পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড কর্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পঠন পুস্তক বলিয়া গার্হ্য হইয়াছে। বোর্ড-কর্তৃপক্ষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংসদপাই প্রামাণিক বিধায় ইহা পঠন-পাঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। "পালার্মো" যে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বিষম মাই। পরিষদের রূহ ও সুসম্পাদিত সংস্করণটি গ্রহণ করার মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড সাধারণের বিশেষ বত-বাহার হইয়াছেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

সম্মতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্থায়ী বঙ্গলতা বেড়া, এম্-এ, আইন-পরীক্ষার এন্-এন্-বি উপাধি পাইয়াছেন। ইনি বেদিনীপুরের বিশিষ্ট কর্মিদার ও এডভোকেট শ্রীযুক্ত সুপেন্দ্রনাথ বেঙ্গল বিত্তীরা কতা ও পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলনের ও বেদিনীপুর সম্মিলনের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুক্তকুমার বেঙ্গল তরী।

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

বিষভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রোগ্রামিক শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম্-এ, ডিপ-লিৎ, ভারত-সরকার কর্তৃক যবোনীত হইয়া, কলকাতা-কলেজ টেকনিক্যাল কো-অপারেশন ব্যবস্থাপনায় অষ্ট্রেলিয়ার লাইব্রেরী সেমিনারে যোগদানের জন্য ২২শে ফেব্রুয়ারী বিমানযোগে সিডনী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কলকাতা-কলেজের দিবাগী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র এবং ভারতের প্রোগ্রাম-আয়োজন ও শিল্প সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট লেখক।

ছোট ক্রিমিরোগের অব্যর্থ ঔষধ

"ভেরোনা হেলমিনথিয়া"

পৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ কৃমি ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়-ভায়া প্রাপ্ত হয় "ভেরোনা" জনসাধারণের এই বহুদিনের অসুখিা দূর করিয়াছে।

মূল্য—৪ আঃ শিশু তাঃ মাঃ সহ—২।০ আনা।

ওরিয়েন্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

১।১ বি, গোবিন্দ আজী রোড, কলিকাতা—২৭

কোড—সিটিং ৮৮



পূর্ব-আফ্রিকার নাইরোবিতে ভারতীয় কমিশনারের সেক্রেটারী কর্তৃক অহুষ্ঠিত ঐতি-সম্মেলন

নাইরোবিতে প্রীতিসম্মেলন

গত ২৬শে জানুয়ারী, ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার ভারতীয় কমিশনারের প্রথম সেক্রেটারী—নাইরোবিতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের অত্যাশ্চর্য ভাষা এক বিরাট ঐতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রায় বহু হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদে প্রবাসী বাঙালীদের ছুর্গোৎসব

এই বঙ্গের সর্বপ্রথম হায়দরাবাদে প্রবাসী বাঙালী সমিতি কর্তৃক বিপুল সমারোহে সার্কুলারী ছুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রবাসী বাঙালী-সমাজ হাতা স্থানীয় অত্যন্ত সম্মানের হিন্দুরাও এই অহুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অীববদীশ চৌধুরী বহুতে প্রতিদ্বন্দ্বি নির্বাণ করেন এবং অীববদীশ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অহুষ্ঠান সফল হয়।

১১ই অক্টোবর ঈদলগহুয়ার মতলের পৌরোহিত্যে বিজয়া সম্মেলনের অহুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আরতি, হাতকৌতুক, নাট্যাভিনয় ইত্যাদিতে সভাস্থ আনন্দমুগ্ধ হইয়া উঠে। অীবপুত্রের হাস ও অীবাসভিকা বহু অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শক-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অীবিরজন সাহা ও অীবোলালাব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের উভয়কে মৌপ্যদক ও মৌপ্যনির্মিত 'কাপ' উপহার প্রদান করেন।

ললিতমোহন গুপ্ত

ভারত কটোটাংগ ঠুতিওর বহাবিকারী ললিতমোহন গুপ্ত মহাশয় গত ২৩শে কাভন বীর বালীগহুহ ভবনে ৭৩ বঙ্গের বরসে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতে কটো এন্‌গ্রেডিং কেজে অগ্রহুত উপেনকিশোর রায়চৌধুরীর (ইউ. রায় কোং) সহকারী হিসাবে তিনি কার্য আরম্ভ করেন। পরে তিনি



অমৃততাঞ্জান
সর্বপ্রকার বেদনায় 'আণবিক বোম্বার' ন্যায় কার্যকরী।

দাদেবর মল্লম
চর্ম রোগে 'পরমাণু শক্তির' ন্যায় কার্যকরী।
অমৃততাঞ্জান লিঃ-পেঃ: কলঃ নং ৩৮৩৫-কলিকাতা-৭



স্থাপিত ১৮৯৩

বাণীমতাবে কর্তৃকেনে অবতীর্ণ হন। ভারত কটোচাইপ ঠুতিও প্রতিষ্ঠা করিয়া রক প্রভৃৎকারক এবং চিত্র-মুদ্রাকররূপে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তৎকর্তৃক প্রকাশিত আট জন বদ-মলীবার পরিচয়-সম্বলিত চিত্র-পুস্তক একদা সুবীলম্বাণের দিকট বিশেষ সমাবললাভ করিয়াছিল। 'এবানী' ও 'মতীর্ণ বিত্তি' প্রতিষ্ঠানের সন্দেও তাঁহার বর্নিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

চন্দ্ৰ দাস সজ্জতি ইহলোক পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাক্ত দাস ময়মনসিংহ জেলার অবিবানী।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ১ই অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০ সনে আমেরিকার দিরা তিনি সেবাদকার হাবিমাগান বেভিক্যা

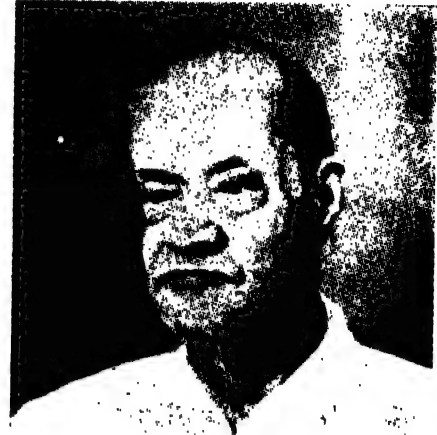


সলিতবোহন গুণ

তাঁহার মনুষ্য ব্যবহার এবং আদর-আপ্যারনে সকলেই বিশেষ ঐতি হইতেন। সাহিত্য এবং সাহিত্যসেবীদের প্রতিও তাঁহার গভীর অহুয়াগ ছিল। কল্পণ সানাত অবহা হইতে দিক পরিচয়, কর্তৃপটুতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাবলে রক-প্রভৃতি ও চিত্র-মুদ্রণ ব্যাপারে তিনি অনন্তসাধারণ কৃতিত্বের অবিকারী হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার প্রমুখাং আদর অনেক কবাই তনিয়াহি। এরূপ একজন বিশেষজ্ঞের হৃত্যুতে বাঙালীরাই হুঃব অহুতব করিবেন।

ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দাস

সক্কা নহরের ব্যাভনাবা হোমিওপ্যাথ, তাক্তার গিরিশ-



গিরিশচন্দ্র দাস

কলেজে ভর্তি হন এবং বখানময়ে এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বেশে করিয়া তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সক্কা নহরে একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ হিলাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি উদারহৃদয় এবং বহু সদ-গুণাবিত ছিলেন।

CHATTERJEE'S PICTURE ALBUMS

IMPORTANT FOR THE CULTURED

The Renaissance of Indian Art has now become an accomplished fact. Even the Western World of Art has given recognition to it.

Price Rs. 4 each number. Postage extra.

Only a few sets Nos. 10 to 17 are available

CHATTERJEE'S Albums are of Great Value :
Historical and Artistic

THE ARTISTS REPRESENTED IN THIS SERIES INCLUDE

Abanindranath Tagore—The Master
Nandalal Bose—Acharya, Kalabhavan, Santiniketan
Gaganendranath Tagore—The Master and Creator
of a school
Asit Haldar—Principal, Government School of Arts
and Crafts Lucknow
Abdur Rahman Chughtai—The foremost
Muselman Painter
Bamarendranath Gupta—Principal, Mayo School of
Art, Lahore
Sarada Ukil—The famous painter of Delhi
Mukul Dey—Principal, Government School of Art,
Calcutta
Surendranath Kar—Kalabhavan, Santiniketan
Bireswar Sen—School of Arts and Crafts, Lucknow
Deviprasad Ray Chowdhury—Principal, Government
School of Arts and Crafts, Madras
Kshitindranath Majumdar—Indian Society of
Oriental Arts
Surendranath Ganguli
Upendra Kishore Ray Chowdhuri

THE MODERN REVIEW OFFICE
120-2, Upper Circular Road, Calcutta

BOOKS AVAILABLE

Rs. As.

Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17

(No. 1, to 9 out of Stock)

each No. at Rs. 4 32 0

History of Orissa Vols. I & II

—R. D. Banerji (Each) 25 0

Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu 12 0

Dynasties of Medieval Orissa—

Pt. Binayak Misra 5 0

Eminent Americans: Whom Indians Should

Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland 4 8

Evolution & Religion— ditto 3 0

Origin and Character of the Bible ditto 3 0

Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee 2 0

Prayag or Allahabad—(Illustrated) 3 0

The Knight Errant (Novel)—Sita Devi 3 8

The Garden Creeper (Illust. Novel)—

Santa Devi & Sita Devi 3 8

Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi 3 0

Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das 3 8

India And A New Civilization— ditto 4 0

Mussolini and the Cult of Italian Youth

(Illust.)—P. N. Roy 4 8

Story of Satara (Illust. History)

—Major B. D. Basu 10 0

My Sojourn in England— ditto 2 0

History of the British Occupation in India

—[An epitome of Major Basu's first
book in the list.]—N. Kasturi 3 0

The History of Medieval Vaishnavism in

Orissa—With introduction by Sir
Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee 6 0

The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy 0 8

Protection of Minorities—

Radha Kumud Mukherji 0 4

Postage Extra.

The Modern Review Office

120-2, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA

- এবার পুজার আনন্দে যে বইগুলি অনশ্য প্রয়োজনীয় -

রাশিয়ার রাজদূত—২১০

পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস জুলে ভার্ণের 'মাইকেল ট্রুগল' গ্রন্থের প্রথম বাঙলা অনূদিত। এ বইটি পৃথিবীর ১২টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ সমস্ত বইবেল ভিন্ন আর কোন বই এত ভাষায় অনূদিত হয় নি। প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত।

ডাক্তারের দিগ্বিজয়—২১০

হিউ লাকটিং লিখিত পৃথিবীবিখ্যাত হাসির গল্পের বই 'টোরি অব ডক্টর ডুলিটল'এর মনোরম অনূদিত। পশু-পক্ষীর ডাক্তার ডুলিটলের আক্রিকায় অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনীটি পড়ে ছেলে বড়ো সকলেই মজা পাবেন। পাতায় পাতায় ছবি।

রাশিয়ার সেরা গল্প—৩

রাশিয়ার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের পৃথিবীবিখ্যাত গল্পগুলির অনূদিত ক'বে সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

কয়েকটি বিদেশী গল্প—২৫০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাছাই করা কয়েকটি গল্পের মনোরম অনূদিত। এই বইপানা পড়লে বিভিন্ন দেশের অস্তরের স্বরূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হবে তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মাধ্যমে। এ অনূদিত পড়ে মনে হবে যেন নতুন সৃষ্টি।

জীবনের বসন্ত—২৫০

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

আপনি নিশ্চয়ই প্রেমের গল্প ভালবাসেন? কে না ভালবাসে। আমাদের হৃদয়ের নিভৃততম কোণটিতে মধুর-তম আঘাত হানতে এ গল্পের আর ছুড়ি নেই। এ বইখানির প্রতিটি গল্পে আপনি পাবেন সেই মধুর রসের সন্ধান, যা আপনাকে করে তুলবে সরস ও সজীব।

আমাদের নূতন বই :-

THIS EUROPE

Girija Mookerjee Rs. 7

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—২১

নরেন রায়

বাঙালি ভুলে যাওয়া যুগের এক অগ্নিময় কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে।

রূপকথা—২১

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

গ্রীক উপকথার দেবদেবীদের নিয়ে রচিত কয়েক সরস গল্প, কল্পনার অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব প্রতিটি গ অতুলনীয়, সিলোফেন পেপারে মোড়া লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবা পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার।

সৃষ্টি ও সভ্যতা—২১০

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

সৃষ্টির একেবারে গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত এর বিবর্তনে ইতিহাস অতি সুন্দর ভাবে সরস করে গল্পের মতন বর্ণনায়। লাইনো টাইপে ছাপা শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ আসাম গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য প্রথম শ্রেণীর পুস্তকরূপে অনূদিত।

আমী প্রজ্ঞানানন্দের কয়েকখানি বই

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস—১০১

(তিন খণ্ড একত্রে বাঁধানো)

সবলতা ও দুর্বলতা—৫০

রাজনীতি—২১

এ ছাড়া আরও কয়েকখানি ছাপা বই বা অনেকদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না, তার পুরোনো কয়েকখানা করে সংগ্রহ করা গেছে

দুর্গোৎসবতত্ত্ব ১০

মাহাত্মা স্তোত্র ১০

অর্থ্য ১০/০

পরার্থীদের মুক্তি ১১

চলার পথ ১০

বিজয়কুমার গোস্বামীর উপদেশাবলী ৫

চন্দ্রগুপ্ত ১০

দীপশিখা (উপন্যাস) ২১

সন্ন্যাসী লাইব্রেরী, সি১৮-১৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা—১২ অথবা :-

আমাদের খুচরা বিক্রয়-কেন্দ্র :- ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটে অফিসস্থান করুন।



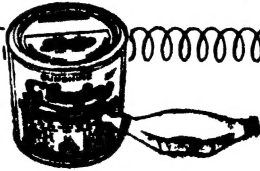
উৎকৃষ্ট ডিটাইন সর্বদাই অতি বিশুদ্ধ হয়

ম্যাক্সো সর্বোৎকৃষ্ট শিশু-খাদ্য—ঠিকমত সমন্বিত ও গ্রীষ্ম
প্রধান দেশে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ম্যাক্সো হামি-
কর বীজাণু-রহিত ও সেই কারণে সাধারণ দুধ ব্যবহারে যে সম
রোগ সচরাচর সংক্রামিত হওয়া সম্ভব তা থেকে নিরাপদ
রাখে। ভিটামিন 'ডি' খনিজ লৌহযুক্ত হওয়ায় দক্ষণ টেঁহা রক্ত-
হীনতা ও বালাস্থি-বিকৃতি রোগ (রিকেটস) থেকে রক্ষা করে।
ম্যাক্সো খেতে দিলে আপনার শিশু সুন্দর লটপুট হয়ে উঠবে।

Glaxo

ম্যাক্সো শিশুদের জন্য অতি বিশুদ্ধ দুগ্ধ-খাদ্য

Copyright



ম্যাক্সো জন্ম ১৯০৫ খ্রিঃ (ইংল্যান্ড) লিঃ, বোম্বাই • কলিকতা • কলকাতা

